১৩১৭ সালের বর্ণানুক্রমিক সূচী।

বিষয়।	লেখক।	পৃষ্ঠা।
অপর জগতের কথা (গল্প) ...	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ...	৭২
অতর্কিত (গল্প) ...	শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ...	৯৯৭
অভিসার (কবিতা) ...	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা ...	১২৪
অমৃতং বালভাষিতং (কবিতা—চয়ন)	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ...	৪২০
অক্ষয় রূপ (গল্প) ...	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ..	৫৪৩
অশ্রুকণা রঙ্গিণী (সচিত্র) ...	... ..	৫২৩
অঙ্কমালার উৎপত্তি ...	শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ..	৬১৪
অনারেবল মিষ্টার সায়েদ আলি ইমাম (সচিত্র	... ..	৯৭
অন্তঃপুর প্রসঙ্গ ...	... ...	৮৭৮
অন্তরতর (কবিতা) ...	শ্রীকমলারঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ...	৯০৪
অন্বেষণ (কবিতা) ...	শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী ...	৯৯৪
আত্মোৎসর্গ ...	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ...	১৩৪
আন্দামান দ্বীপ (চয়ন) ...	ঐ ...	১০১৮
আলো ও ছায়া রচয়িত্রী (সচিত্র)	... ..	১৬৩
আমেরিকা প্রবাসীর পত্র ...	শ্রীনিরুপমচন্দ্র গুহ ...	১৭২
আদেশ পালন (গল্প) ...	শ্রীপাচুলাল ঘোষ ...	৯৯৬
আমেরিকা প্রবাসীর পত্র (সচিত্র)	শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বসু ...	৩৩৩
আপ্তকাম (কবিতা) ...	শ্রীমতী হেমলতা দেবী ...	৪৬৮
আশাহত (গল্প) ...	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি, এল	৫৪১
আগ্রা (চয়ন) ...	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৯৩০
আমার কর্ম্ম ভূমি (কবিতা) ...	শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক, এম, এ ...	৯৬০
ইলায়াস্ মেচ্নিকফ্ (চয়ন) ...	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ...	৩১০
ইংরাজের দৌত্য (সচিত্র) ...	শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি, এ, এফ, এচ, এস, ...	৩০৯, ৪৫৮
ইংরাজদিগের ক্রীড়াকৌতুক (সচিত্র)	সম্পাদিকা ...	৪৭২
ইংরাজের স্বদেশ প্রেম ...	শ্রীঅনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ...	৭২১
ইয়োরোপে সাহিত্য ...	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৯৭৫
উৎকলের শৈল শিল্প ...	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় গুপ্ত ...	২৭২
উইলিয়ম রুদেনষ্টাইন (সচিত্র) ...	শ্রীঅসিতকুমার হালদার ...	১০২৩
উপন্যাসের উপকারিতা (চয়ন)	... ...	৪১৬

এক পৃষ্ঠায় পঞ্চাঙ্ক নাটক (চয়ন)	শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাসগুপ্ত বি, এ ...	২২১
একই (কবিতা) ...	শ্রীহেমলতা দেবী ...	৫৫৮
এলাহাবাদে জাতীয় সম্মিলন (সচিত্র)	... ...	৮৭২
ওলন্দাজি উপনিবেশ সম্বন্ধে মন্তব্য (চয়ন)	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৭৪২
কালিদাসের চিতাভূমি ও অন্তিম কবিতা	মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	৫
কণারক (সচিত্র) ...	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় গুপ্ত ...	৮৯
কীটভুক বা মাংসাশী উদ্ভিদ (সচিত্র)	শ্রীশ্রীশচন্দ্র সিংহ এম, এ ..	১২৫
কন্গ্রেস সম্মিলন (সচিত্র) ...	সম্পাদিকা ...	১৫৮
করুণার দাবী (কবিতা) ...	শ্রীগৌরীচরণ বন্দোপাধ্যায় ...	২৯৯
কাশী যাব কি মক্কা যাব ...	শ্রীশশিভূষণ বিশ্বাস ...	৩১৩
কবি রজনীকান্ত (সচিত্র) ...	.. ...	৩৫০
কীট্‌স্‌ হইতে (কবিতা) ...	শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী বি, এ ..	৫১৪
কবি রজনীকান্ত সেন ...	শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায় ..	৬৯৯
কারীকরী শিক্ষা ...	শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম, এ ...	৭১৭
কুমারী নাইটিংগেল (সচিত্র) ...	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী ...	৭৩৫
কাউণ্ট লিও টলষ্টয় (সচিত্র) ...	শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার ..	৭৭৮
কর্ম্মযোগ ...	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ..	৮৮১
কাব্যে নিদাঘ চিত্র ..	শ্রীযামিনীকান্ত সেন বি, এল ...	৯১৯ ১০৩২
ক্রমবিকাশে অভ্যাসের প্রভাব ...	শ্রীশরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ, এফ, সি, এস	১১২
খন্দমহল ভ্রমণ ...	শ্রীতারকচন্দ্র রায় ...	১৬১
খোকার আগমনী ..	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দত্ত ...	৪১০
খুনে (গল্প) ...	শ্রীচারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় বি, এ	৭১৩
খেয়ালির গান ...	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ...	৯৪২
গতবর্ষ ও নববর্ষ	শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায় .	১
গান ...	শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী বি, এ ...	১০৩৯
গ্রীষ্ম মধ্যাহ্নে (কবিতা) ...	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ...	১৪৬
গুজরাতে অতিথি ...	শ্রী ... নাথ সেন ...	৯৭১
গোধূলি (কবিতা) ...	শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী ...	৫২২
চমারের পরিণাম (গল্প, চয়ন) ...	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ...	৫৬
চিত্রব্যাখ্যা ...		৭২, ১৭৭, ৩৪৯, ৪৩৬, ৫৩২
চীন কুসুম (কবিতা) ...	শ্রীসন্তোষকুমার বসু ...	১৩৩
চন্দ্রলোক ...	... ...	৭৫১

ছবি (গল্প—চয়ন)	শ্রীনরেন্দ্রমোহন চৌধুরী	৫৮৭
জাপানে ভিক্ষুক	শ্রীযদুনাথ সরকার	০২৯
জীবন স্বামী	শ্রীমতী হেমলতা দেবী	৫১
জাগাও (কবিতা)	ঐ	১৯০
জাপানের সভাসমিতি	শ্রীযদুনাথ সরকার	৩০০
জাপানে শিক্ষা	শ্রীগণপতি রায়	৩৭৪
জন্মোৎসব	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩৯৪
জলে বাসা (চয়ন সচিত্র)	শ্রীগুরুদাস আদক	৪০১
জীবনদণ্ড (গল্প—চয়ন)	শ্রীসুখরঞ্জন রায় বি, এ	৫১৫
জাপানের সহর (সচিত্র)	শ্রীযদুনাথ সরকার	৫৩৭, ৬২৭
জোনাকী ও আঁধার (কবিতা)	শ্রীপ্রফুল্লশঙ্কর গুহ	৬৬৯
জয়পুর (চয়ন)	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	৮৫৩
জাপানের সংবাদপত্র	শ্রীযদুনাথ সরকার	৮৭০
জ্ঞান ও কর্ম্ম (সচিত্র)	শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায় বি, এ	৮৬৬
জাপানের খেলা (সচিত্র)	শ্রীযদুনাথ সরকার	৯০৫
ডিরোজিয়োর কবিতা (চয়ন)	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	২৪৯
তুমি এস (কবিতা)	শ্রীসুখরঞ্জন রায় বি, এ	১১৩
তান্‌কা (কবিতা চয়ন)	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	১৩৭
তর্ক	শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক এম এ, এম, ডি	৫৪৬
তরুদত্ত (সচিত্র)	শ্রীদেবাংশুনাথ চক্রবর্ত্তী	৬০৩
তৈমুর লঙ্গ (চয়ন)	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	৬৭৩, ৭৬২, ৮৫৯
দুর্লভ (কবিতা)	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৮৭
দ্বিধা	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪৮৯
দো-সতীনা	শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী এম, এ	৫৫৯
দীপ ও রজনী (কবিতা)	শ্রীপ্রফুল্লশঙ্কর গুহ	৬৬৯
দেবদূতের প্রতি রাজা অরিষ্টনেমি (কবিতা)	শ্রীমতী অনুরূপা দেবী	৭৭১
দুঃখিনী (কবিতা)	শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী	৮৩৯
দেবশক্তি (কবিতা)	শ্রীমতী হেমলতা দেবী	৮৯২
ধূমকেতু	শ্রীবীরেশ্বর সেন	১৬১
ধারা (কবিতা)	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	৪৮
ধূমকেতুর পুচ্ছ কি	শ্রীবিনয়ভূষণ রাহাদাস	২৫৮
নববর্ষে	...	২
নববর্ষে সুধা (গল্প)	শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী	১৫

নবীন প্রভাত (কবিতা) ...	শ্রীমতী হেমলতা দেবী ...	৩৭৩
নারী সৌন্দর্য্য ...	... ...	৪১
নর্ত্তকী (গল্প) ...	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি, এল	৬৪
নীলগিরির টোডা জাতি (সচিত্র)	সম্পাদিকা ...	৭০
প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য (সচিত্র)	শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি, এ, এফ, এচ এস	১
পোষ্যপুত্র (উপন্যাস) ...	শ্রীমতী অনুরূপা দেবী	৭৪, ১০৬, ১৯১, ২৮৩, ৩৮৬, ৪৫৩, ৫৪৯, ৬৫৭, ৭৬৫, ৮৩০, ৮৯৩, ৯৮
প্রাচ্য-গৌরব (চয়ন) ...	শ্রীদীনবন্ধু সেন বি, এ ...	১০১
প্রাচ্য চিত্রকলা প্রদর্শনী (সচিত্র)	শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক এম, এ, এম, ডি	১১
প্রাচীন ভারতের পূজা ...	শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষজায়া ...	১৭
প্রাচীন ভারতের লোকশিক্ষা ...	ঐ ...	৯৬
প্রলোভন (গল্প—চয়ন) ...	শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি, এ, এফ, এচ, এস	২৫
প্রবাসী	শ্রীযদুনাথ সরকার ...	২১
প্রভাতে ও সন্ধ্যায় (কবিতা) ...	শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ...	১৮
পরিসমাপ্তি (কবিতা) ...	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৩১
পরিচয় (কবিতা) ...	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী ...	৩৭
প্রেম (কবিতা) ...	শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী বি, এ ...	৩৮
প্রেম ও মিলন (কবিতা) ...	শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস গুপ্ত বি, এ	৫৬
পূজায় ভিক্ষা প্রার্থনা ...	... ...	৫
প্রাচীন ভারতে বিবাহ পদ্ধতি ...	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ...	৬৪
পর্ত্তুগালে সাধারণ তন্ত্র (সচিত্র) ...	... ...	৬৯
পৃথিবীর ইতিহাস (সচিত্র) ...	... ...	৬৯
প্রাপ্তি স্বীকার	... ...	৭০
প্রয়াণ (কবিতা) ...	শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী ...	৭৩
পলিত পত্র (কবিতা) ...	শ্রীকালিদাস রায় ...	৭৫
প্রাচীন বিবাহপ্রথা ...	শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি, এ, এফ, এচ, এস	৭৫
প্রতিহিংসা (গল্প—চয়ন) ...	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ...	৭৫
পরীক্ষার্থী (গল্প) ...	শ্রীনলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় এম, এ	৮২
প্রাতঃ সূর্য্য (কবিতা) ...	শ্রীমতী হেমলতা দেবী ...	৮২
পাণ্ডুয়া (চয়ন—সচিত্র) ...	শ্রীগুরুদাস আদক ...	৮৫
প্রয়াগে শিল্প প্রদর্শনী (সচিত্র) ...	... ...	৯২
পল্লিগ্রামে ডাইনে খাওয়া ...	শ্রীমতী নিরুপমা দেবী ...	৯৫
বর্ষ বরণ (কবিতা) ...	সম্পাদিকা ও শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী	

বর্ষ শেষ (সচিত্র)	...	...	১০৪৪
বর্ষ বিদায় (কবিতা)	...	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ...	১০৪৬
বুলগেরিয়ায় আতর প্রস্তুত প্রণালী (সচিত্র)		শ্রীনিরুপমচন্দ্র গুহ ...	৮৫
বিবিধ (সচিত্র—চয়ন)	...	৬১, ১৫৩, ২৩৮, ৩২৪, ৪২৭, ৬৮৫, ৯৪৩,	
বন্দী (উপন্যাস—চয়ন)	...	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি,এল	৬৫,১৪১, ২৪৬,৩৩১,৪১১,৫০১,৫৭৬,৬৭৯,৭৬০,৮৬১,৯০৫
বর্ষা গান (কবিতা)	...	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী ...	২১১
বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন	...	শ্রীসতীশচন্দ্র দাস ...	২৬৩
বর্ষা প্রভাত (কবিতা)	...	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী ...	৩৪৪
বরষা (কবিতা)	...	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৩৪৫
বর্ষা	...	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ...	৩৪৭
বঙ্গ সাহিত্যে প্যারীচাঁদ (সচিত্র)		শ্রীবিজয়লাল দত্ত ...	৪২৮
বক্তব্য	...	সম্পাদিকা	৪৮৫, ৮২৬
বারাণসী (চয়ন)	...	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১০২০
বিজ্ঞানের নূতন বাণী	...	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ...	৫৯১
বৌদ্ধ ও প্রাচীন মোগল চিত্র শিল্প (সচিত্র)		শ্রীঅসিতকুমার হালদার	৬০৭, ৬৩৬
বহ্বারম্ভ ( )	...	শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ ...	৬৩৩
ব্রহ্মে বো-টৌ (চয়ন)	...	শ্রীভঃ ...	১০১৪
ব্রহ্মপুত্রে উমানন্দ (সচিত্র)	...	শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ...	৯৭৮
ব্রিটিশ মেডিক্যাল কন্‌ফারেন্স	...	শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক এম,এ, এম, ডি	৬৬১
বণ্টন	...	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি,এ,এফ,এচ,এস ৯৪৭	১০২৬
বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা (চয়ন)		রায় বাহাদুর শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস গুপ্ত সি, আই, ই	৮৯৫
ভারতী বন্দনা	...	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ...	৩
ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডল	...	শ্রীমতী সরলা দেবী ...	১০০০
ভারতের নূতন সম্রাট (সচিত্র)	...	... ...	২৫৩
ভূত দেখা (গল্প)	...	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি,এল	২৫৯
ভারত ও বিলাত	...	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল	২৬৭, ৪৭৯, ৫৩৩
ভাগ্যচক্র (গল্প—চয়ন)	...	শ্রীনরেন্দ্রমোহন চৌধুরী ...	৩২২
ভুবনেশ্বর	...	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় গুপ্ত ...	৪৪৬
ভাব সাধন	...	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৬২১
ভক্তি ও ঘৃণা (কবিতা)	...	শ্রীকালিদাস রায় ...	৭১৫
মরীচিকা (গল্প)	...	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি,এল	৮২
মুর্শিদাবাদের প্রাচীন কাহিনী (চয়ন)		শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	১৩৮,২২৩,৩০৭,৪০৮,৫১১

মধ্যহিমালয়ের কুকু জাতি (চয়ন—সচিত্র)	শ্রীগুরুদাস আরক …	২৭
মানস দর্শন (গান) …	শ্রীরজনীকান্ত সেন বি, এল …	৩৫
মিলন (কবিতা) …	শ্রীবিরজাশঙ্কর বসু …	৪৫
মেয়েযজ্ঞি …	শ্রীমতী শরৎকুমারী চৌধুরাণী …	৬৫
মান ও প্রেম (কবিতা) …	শ্রীকুমুদরঞ্জন ঘোষ …	৮০
মেস্ত (কবিতা) …	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন এম,এ,বি,এল	৮১
মৃত্যু (কবিতা) …	শ্রীবিরজাশঙ্কর বসু …	৮৭
মহর্ষি রুদ্র (পৌরাণিক গল্প) …	শ্রীমতী হেমলতা দেবী …	৯৩
যবদ্বীপে …	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪৯, ১৩১, ২২০ ৩০৩, ৪২১, ৬৯৪, ৫৭৫, ৬৭৭
রেণু রচয়িত্রী (সচিত্র) …	শ্রীগোলোকবিহারী মুখোপাধ্যায় ..	৩৫
রসের ধর্ম …	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ..	১৬
রামতনু লাহিড়ী (সচিত্র) …	শ্রীরাসবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এ	২০১
রসভঙ্গ (গল্প) …	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি, এল	৩৫৬
রসেটা প্রস্তর …	শ্রীতারকচন্দ্র রায় .	৬৬৬
রেডিয়ম রহস্য ..	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য …	৬৮৮
রাবণবধ …	শ্রীযদুনাথ সরকার ..	৭৮৪
লোকান্তরে জীব প্রকৃতি (চয়ন)	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ..	৫২
লঙ্কায় বুদ্ধের দন্ত (সচিত্র) ..	মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ	৭০
লক্ষ্মণ সেন …	শ্রীশশিভূষণ বিশ্বাস …	১০৫৩
লক্ষ্মীর শ্রী ..	শ্রীমতী শরৎকুমারী চৌধুরাণী …	৭২৮
শতদল-রচয়িত্রী …	..	৯৯৫
শতদল (কবিতা) …	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত …	৩৪৪
শারদ লক্ষ্মী (কবিতা) …	শ্রীসুখরঞ্জন রায় বি, এ …	৫৬০
শারদ গীতি (কবিতা) …	শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী …	৪৭৮
শোকবার্ত্তা (সচিত্র) …	… …	৩৪৮
শিবমন্দির (গল্প, চয়ন) …	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য …	৪০৫
শুভদৃষ্টি (গল্প) ..	শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত …	৪৬৯
শিল্পে ভক্তি মন্ত্র …	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর …	৯৭
শক্তি ও সাধনা (গল্প, চয়ন) …	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য …	১৬৭
শিল্প সমিতির দান …	..	৮৮০
শিশিরকুমার ঘোষ (সচিত্র) …	..	৯৫৭
শ্রীপঞ্চমী (গান) …	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী	৮২৮

স্বরলিপি ...	শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী ...	৩, ৮২৮
স্বরলিপি ...	শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ...	২৮১, ৩৬৪
স্বরলিপির ব্যাখ্যা ...	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	, ৪
সার্থকদান (কবিতা) ...	শ্রীদীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১০৩৯
সোমা ডি করস্ (চয়ন) ...	... ...	৬৯
সাময়িক প্রসঙ্গ (সচিত্র) ...	... ...	৮০
সমালোচনা ...		৮৮, ১৭৭, ২৬৪, ৩৪৫, ৪৩৯, ৫২৮, ৬৬১, ৭০২, ৭৯১, ৯৫৯, ১০৶০
সাগর তীরে ...	শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, বি, এ ...	১০৫
সুচরিত্র (গল্প) ...	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি, এল	১১৯
সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড (সচিত্র)	... ...	১৬৮
সুইস গার্ড (গল্প—চয়ন) ...	শ্রীমতী অনুরূপা দেবী ...	২২৭
সমালোচক (গল্প) ...	শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি,এ	২৭৫
স্ত্রীসেনা (চয়ন) ...	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী ...	১০১২
স্পঞ্জ সংগ্রহ ও নকল স্পঞ্জ (সচিত্র)	শ্রীগণপতি রায় ...	৩১৬
সদানন্দের বৈরাগ্য (গল্প) ...	শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ ...	৩৪১
স্নেহের নিরিখ্ ...	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ...	৪২০
স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর (সচিত্র)	... ...	৭৪৩
সন্ন্যাসী (গল্প) ...	শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম,এ,বি,এল	৫৬১
সন্ন্যাসী (গল্প)	শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ...	৯৭০
সীতারাম (সচিত্র)	শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি,এ,এফ,এচ,এস	৫৯৩
সূর্য্য ও সৌরজগত (চয়ন)	... ...	৬৮২
সুশ্রুত	শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ...	৭২৫
সেক্ষপীয়র সম্বন্ধে দুই একটী কথা ...	শ্রীদেবাংশুনাথ চক্রবর্ত্তী এম,এ	৭৩১
সামঞ্জস্য ...	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৭৯৩
স্বামী রামতীর্থ (সচিত্র) ...	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র এম,এ ...	৮০৪
স্বপ্রকাশ (কবিতা) ...	শ্রীদীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৮৩৯
হকিকত রায় ...	শ্রীবিপিন বিহারী চক্রবর্ত্তী ...	১৮৫
হেঁয়ালী নাট্য ...	সম্পাদিকা ...	৪৭৭
হেঁয়ালী নাট্য ...	শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ সাউ ...	৭২৮
হিউয়েনসাং প্রণীত সিই-ইউ-কি, (চয়ন)		৪৯৭, ৫৮২, ৬৭০, ৭৪১, ৮৪০, ৯৩৫, ১০০৭
হিন্দু মুসলমানের একতা ...	শ্রীমৈনুদ্দিন হোসেন ...	৮২২
হার জিত (গল্প) ...	শ্রীপাচুলাল ঘোষ ...	৯১০

সন ১৩১৭ সালের বর্ণানুক্রমণিক চিত্র সূচী

চিত্র	চিত্রকর	সাল
অ্যাডমিরাল রিস্	...	অগ্রহায়ণ
অনারেবল সৈয়দ আলি ইমাম	...	ঐ
অশ্রুকণা রচয়িত্রী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	...	আশ্বিন
অজন্তা গুহার ছাদের নীচের কারুকার্য্য	...	কার্ত্তিক
আংশিক মিলন চিত্র	...	জ্যৈষ্ঠ
আলো ছায়া রচয়িত্রী কামিনী দেবী	...	জ্যৈষ্ঠ
আছ। কুছা পার্ক	...	কার্ত্তিক
ইংরাজের ক্রীড়া কৌতুক	...	আশ্বিন
উয়েনো পার্কের নিকটবর্ত্তী হ্রদ	...	কার্ত্তিক
উইলিয়ম রদেনষ্টাইন	...	চৈত্র
উপাসনান্তে প্রার্থনা	উইলিয়ম রদেনষ্টাইন	চৈত্র
উমানন্দ মন্দির	...	চৈত্র
এডওয়ার্ডের সপরিবার চিত্র	...	আষাঢ়
কণারকের ভগ্ন মন্দির	...	জ্যৈষ্ঠ
কবি রজনীকান্ত	...	শ্রাবণ
কুমারী নাইটিংগেল	...	পৌষ
কাউণ্ট লিও টল্‌ষ্টয়	...	ঐ
কলেজ স্কোয়ারস্থিত ডেভিড হেয়ার	...	আষাঢ়
খোকার যুদ্ধ যাত্রা	...	ফাল্গুন
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	...	মাঘ
চন্দ্রনাথ বসু	...	শ্রাবণ
ছাত্রদিগের ডরমিটারি	...	শ্রাবণ
জুলু রাজ [illegible]	...	শ্রাবণ
জর্ম্মানীর যুবরাজ ও তাঁহার পত্নী	...	চৈত্র
জাপান সম্রাটের পরিখা ও শ্বেত প্রাসাদ	...	অগ্রহায়ণ
টোডারমণী	...	পৌষ
টোডাজাতির বাসগৃহ	.	পৌষ
তোমরা ও আমরা	শ্রীযামিনী প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়	পৌষ
[illegible]	...	কার্ত্তিক
দময়ন্তী	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	আশ্বিন

দুর্গাদাস লাহিড়ী	...	...	...	অগ্রহায়ণ
দশভুজার মন্দির	...	...	...	কার্ত্তিক
দেশের উন্নতি	...	শ্রীযামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়		ফাল্গুন
দুই বোনে খেলিতেছে	...	...	...	ঐ
ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয়	...	শ্রীনন্দলাল বসু	...	ভাদ্র
নেপল্‌স্‌ উপসাগরের ফোটোগ্রাফ	...	...	...	জ্যৈষ্ঠ
নব কোম্পানির তকমা	...	...	...	ভাদ্র
পুরাতন কোম্পানির তকমা	...	...	...	ভাদ্র
প্রয়াগে শিল্প প্রদর্শনী	...	...	...	মাঘ
প্রহরী	...	অজন্তার প্রথম গুহার চিত্র হইতে		কার্ত্তিক
প্রতীক্ষা	...	শ্রীঅসিতকুমার হালদার	...	পৌষ
পত্রলেখা	...	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	মাঘ
পাণ্ডুয়ার মসজিদ	...	...	...	মাঘ
প্যারিচাঁদ	...	...	...	ভাদ্র
বুলগেরিয়ায় গোলাপী আতর প্রস্তুত প্রণালী		...	...	বৈশাখ
বিবাহখেলা	...	শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ	...	ভাদ্র
বুদ্ধদেবের দন্ত	...	...	...	ঐ
বাস রচনায় নিযুক্ত স্থর্গা মৎস্য	...	...	...	আশ্বিন
বৃক্ষশাখায় দোদুল্যমান পিরাই মৎস্য		...	...	ঐ
বঙ্গবীর	...	শ্রীযামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়	...	অগ্রহায়ণ
বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগ	...	...	...	ঐ
বৈরাগী	...	শ্রীঅসিতকুমার হালদার	...	চৈত্র
বৈচিত্র মন্দির	...	...	...	মাঘ
ভাস্কোডিগামা ও কালিকটের জামোরিন		ব্ল্যাকি এণ্ড সন্স	...	বৈশাখ
ম্যাডামকুরি ও তাঁহার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা গৃহ		...	...	বৈশাখ
মাংসাশী উদ্ভিদ	...	...	...	জ্যৈষ্ঠ
মোগল অন্তঃপুরের দৃশ্য	...	...	...	আশ্বিন
মধ্য হিমালয়ের কুলু জাতির বৃক্ষতলস্থ মন্দির		...	...	আষাঢ়
যমুনা পুলিনে	...	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী	...	বৈশাখ
যশোদা ও গোপাল	...	শ্রীঅসিতকুমার হালদার	...	জ্যৈষ্ঠ
রেণু রচয়িত্রী প্রিয়ম্বদা দেবী ও তাঁহার স্বামী		...	...	বৈশাখ
রামতনু লাহিড়ী	...	...	...	আষাঢ়
রাজা প্যারিমোহন	...	...	...	ঐ

রামগোপাল ঘোষ ... ... আষাঢ়

রাজা পঞ্চম জর্জ্জ ও সাম্রাজ্ঞী মেরি ... ... ঐ

রাজকুমার ও শক্তিময়ী ... শ্রীঅসিতকুমার হালদার ... শ্রাবণ

রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর সি, আই ই, ... ভাদ্র

রামসাগর ... ... কার্ত্তিক

রাজা ম্যানুয়েল ও রাজমাতা ... ... অগ্রহায়ণ

রচনানিরত রবীন্দ্রনাথ ... শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ... মাঘ

লেডি মিণ্টো ... ... বৈশাখ

লেডি জেঙ্কিন্স ... ... জ্যৈষ্ঠ

লক্ষ্মী নারায়ণ ... ... কার্ত্তিক

লর্ড মিণ্টো, লেডি মিণ্টো, লর্ড হার্ডিং, লেডি হার্ডিং, লর্ড মর্লি, লর্ড ক্রু ... পৌষ

শক্তিময়ীর স্বপ্ন ... শ্রীঅসিতকুমার হালদার ... বৈশাখ

শতদলরচয়িত্রী সরোজকুমারী দেবী এবং তাঁহার স্বামী ও শিশু পুত্র ... চৈত্র

সার ওয়েদারবর্ণ টেকনিক্যালস্কুলে ... মাঘ

সালঙ্কারা কুলু কুমারী ... ... আষাঢ়

সম্রাট এডওয়ার্ডের সপরিবার চিত্র ... ... ঐ

সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড ও সম্রাজ্ঞী আলেকজান্দ্রা ... ... জ্যৈষ্ঠ

ষ্টাণ্ডফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ... ... শ্রাবণ

সুরদাস ও কৃষ্ণ ... শ্রীনারায়ণ প্রসাদ ... শ্রাবণ

স্পঞ্জসংগ্রহ চিত্র ... ... ঐ

সীতারামের দুর্গাবশেষ ... ... কার্ত্তিক

সেতু সাগর ... ... অগ্রহায়ণ

স্বামী রামতীর্থ ও তাঁহার সন্ন্যাসীবেশ ... ... মাঘ

স্যার উইলিয়ম ওয়েদার বর্ণ ... ... মাঘ

শিশিরকুমার ঘোষ ... ... ফাল্গুন

হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিও ... ... আষাঢ়

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৪৬ ওল্ড বালিগঞ্জ রোড হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

ভারতী।

৩৪শ বর্ষ]　　　বৈশাখ, ১৩১৭　　　[১ম সংখ্যা।

বর্ষ বরণ।

আদিহীন অন্তহীন কাল পুরাতন,
মুহূর্ত্ত কণিকা তাহে তুমি হে নূতন!
অন্ধকার অমঙ্গল আলোক মহান,
সকলি বিশাল, তুমি ক্ষুদ্র বর্ত্তমান!
তবুও সামান্য নহ, আত্মদানে তব,
পলে পলে মহাকালে সৃজিছ, হে নব!
দ্যুলোক ভূলোক সবই সচঞ্চল গতি,
তুমি বিন্দু বর্ত্তমান একা স্থির জ্যোতি!
অপ্রত্যক্ষ স্পর্শাতীত ভূত ভবিষ্যৎ,
প্রত্যক্ষ বন্ধন তার তুমি চিৎ সৎ!
ওহে ক্ষুদ্র, অসামান্য, প্রত্যক্ষ প্রতিমা,
নিরাকার কালে তুমি সাকার মহিমা!
এস হে নূতন এস লই গো বরিয়া,
অসীম সসীমরূপে উঠুক ভরিয়া!

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী।

যুঝাযুঝি অনিবার, ওঠা পড়া বারবার,
তা বলে কি ভূমিতল করিব আশ্রয়!
প্রাণ সাথে থাকে কান্না আলো সাথে
　　　　　　আছে ছায়া
চিরদিন এক সাথে জয় পরাজয়।
দূর করি দিয়া গ্লানি
নূতন বরষ আজি
আশীষ বারতা তব
নবীন আশার বলে
আর না করিব ভ
সুখ দুঃখ যাহা দা
মহাধন্য হব আমি
কণা-মসী ঘুচে এই জীবনের

[illegible]

গতবর্ষ।

ওগো বর্ষ,—ওগো বন্ধু তুমি যবে এলে
হাসিটুকু এনেছিলে; কি লইয়া গেলে?
কারো প্রার্থনার পানে চাহিলেনা ফিরি,
যার যাহা প্রাপ্য ছিল দিলে চুল চিরি!
তবুও শুধাই তোমা এক বৎসরের
এই সুখ দুঃখ,—একি শুধু অতীতের?
তোমার স্মৃতির চিহ্ন কিছু কি এমন,
ধরারাণী ধরে নাই হৃদয়ে আপন?
দিলে না বুঝিতে ওগো কতটুকু কার
রেখে গেলে, নিয়ে গেলে কতটুকু আর!
শুধু আজ ভাবিতেছি বসে' মনে মনে
তুমি গেলে তোমারেই পড়িবে স্মরণে।
তুমি যাহা দিয়ে গেলে তার তুলনায়
কে জানে এ নব বর্ষ দাঁড়াবে কোথায়!

নববর্ষ।

এস বর্ষ,—এস বন্ধু সুখের দুখের,
এস মোর ক্ষুদ্র সঙ্গী দ্বাদশ মাসের।
ভাগ্যলিপি নিয়ে এস পক্ষপুটে ধরি',
প্রত্যেক দিনের প্রাপ্য এক একটী করি'
ঝরে পড়া পক্ষ সম ফেলে দিয়ে যেও
আমার কোলের পরে।—দেখাশুনা স্নেহ
যদি তার মাঝে থাকে কঠিন কঠোর
দুঃস্বপ্নের মত দুষ্ট ভাগ্যখানি মোর।
যদি তার মাঝে থাকে কালি এক কণা
ওগো বন্ধু, তা হ'তেও বঞ্চিত ক'রোনা।
যা কিছু তোমার দান শুভ ও অশুভ,
তাহাই অদৃষ্ট জানি তাহাই যে ধ্রুব।
তাহারি অপেক্ষা করি তোমার কুটিরে
হে বর্ষ দাঁড়ায়ে আছি নত নম্র শিরে।

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়।

নববর্ষে।

এ বিশ্বসৃষ্টি যেমন আদিহীন অন্তহীন, ইহার অনন্ত সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মধ্যে যেমন কোথাও বিচ্ছেদ নাই, বিরাম নাই, কোনটিকেই স্বতন্ত্র করিয়া স্বাধীন করিয়া দেখিবার কোন উপায় নাই, তেমনি এবিশ্ব-জন্মের প্রথমপ্রভাত হইতে [illegible] পর্য্যন্ত সমস্ত জন্মমৃত্যু যাত্রায়[illegible]কে [illegible] করিয়া, সার্থক ও সম্পূর্ণ করিয়া যে মহাকাল দাঁড়াইয়া আছে তাহাকে [illegible] ও স্বাধীন করিয়া [illegible] নাই। কে [illegible] অরুণরাগে তাহার [illegible], কো[illegible] জ্যোৎস্নার মান ছায়াতলে [illegible] কিন্তু এ বিশ্ব-বিধান, এ ক[illegible] [illegible]পনাকে বিচিত্র রূপ [illegible] হন, চির মধুর করিয়া [illegible] নাসিয়া আঘাত না করিত, অমৃত উৎসের আস্বাদ দান না করিত, তাহা হইলে এ সংসারকে একটা লৌহ কঠিন প্রাণহীন কারাগার ভিন্ন আর কিছু মনে করা সম্ভবই হইত না।

তাই আজ পূর্ব্বগগনে উষার প্রথম উন্মেষের পবিত্র স্পর্শে চক্ষু খুলিয়া আকাশ আলোক [illegible] বিশ্ব সকলই নূতন সকলই মধুর মনে হইতেছে। অসীম কালকে আজ আপনার ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে বিচ্ছিন্ন করিয়া নবীন রূপে উপলব্ধি করিতেছি; আজ নব-বর্ষের প্রথম প্রভাতকে নব আনন্দে আলিঙ্গন করিয়া ধন্য হইতেছি!

এ পুলকস্পর্শের মধ্যে দেশ নাই কাল নাই, জাতি নাই ধর্ম নাই। এ আনন্দ-জাগরণ বিশ্ব মানবের নিজস্ব। অন্তরের এই আনন্দ অনুভূতি আজ পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমগ্র মানব সমাজের বাহ্যজীবনকে বিকম্পিত করিয়া তুলিয়াছে। আজ বহুশতাব্দীর সঞ্চিত হীনতা জড়ত্ব হইতে মুক্তি লাভের জন্য হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টান সকলেই সচেষ্ট। দক্ষিণ আফ্রিকার সামান্য শ্রমজীবী ভারতবাসী হইতে প্রবল পরাক্রান্ত ইংলণ্ডবাসী পর্য্যন্ত আজ এ জাগ-রণের আন্দোলনে বিচলিত। চীন, তিব্বত, ভারত, পারস্য, তুরস্ক, মিশর ইত্যাদি প্রাচ্য-প্রতীচ্য সকল দেশই আজ নবজীবনের সাধনার জন্য, মনুষ্যত্বের সম্মানরক্ষার জন্য, আত্মলাভের জন্য অগ্রসর!

আজিকার এই শুভ্রোজ্জ্বল আকাশের তলে দাঁড়াইয়া পৃথিবীর এই পুলক চাঞ্চল্য এই আত্মসাধন ও আত্মান্বেষণ যখন দেখি, তখন কবির মোহন সুরে মুগ্ধ প্রাণ আপনিই গাহিয়া উঠে—

"নব আনন্দে জাগো আজি নব রবি কিরণে,
শুভ্র সুন্দর প্রীতি উজ্জ্বল নির্ম্মল জীবনে।"

নববর্ষে কবির এই মর্ম্মবাণী সত্য সার্থক হউক, এ সংসার শুভ্র সুন্দর প্রীতি-সমুজ্জ্বল নির্ম্মল জীবনে পূর্ণ ও পবিত্র হইয়া উঠুক আজ ইহাই আমাদের অন্তরের প্রার্থনা।

ভারতী-বন্দনা।

ওগো কমল-আসনা,—রঙ্গিনী-বীণাপাণি!
আমি কাহারেও আর জানি না, ভারতি
তোমারেই শুধু জানি।
ওগো মধুর-ছন্দা, হৃদয়ানন্দা
জানি না প্রভাত, না জানি সন্ধ্যা—
তোমারি পর্ব্বে অর্ঘ্য রচিয়া
জীবন ধন্য মানি!

আমি জানিনাত তাহা ভাল কি মন্দ,
বাসহীন কিবা মধুর গন্ধ,
শুধু প্রীতিপূরিত পরমানন্দ
তোমার চরণে দানি।
আমি না চাহি অর্থ বিভব ঋদ্ধি
চাহি না মুক্তি, চাহি না সিদ্ধি
তোমারি প্রসাদ লভিবারে সাধ
তোমারি অমৃত বাণী।

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী।

স্বরলিপি।

ইমনভূপালী—একতালা।

সা সা ॥ {সা সা রা । গা র্সা সন ণা- । -া । -ক্সা ক্সা I ' ' র্সা ।
ও গো ক ম ল আ ৽ স না ৽ ৽ ৽ ৽ ৽ রঙ্গি

। গা গা মা । গা- রা সা । (-া সা সা) I} -া সা সা I সা ' ' ' ক্সা সরা-গা ।
নী বী ণা পা ৽ ণি ৽ "ওগো" ৽ আ মি কা হা রে ই আর ৽

। গা গা গা । গা গা গা I রা রা গা । ক্সা ক্সা ক্সা । গক্সা- পা পা । -া পা পা ॥
জা নি না ভা র তি তোমারে ই শু ধু জা ৽ নি ৽ "ও গো"

[গা গা]
। -া পা পা I {পা ক্সপা গা । পা- া ধা । ধা ধর্সা র্সা । র্সা- া র্সা I ৽র্সা র্রা র্রা ।
৽ ও গো ম ধু র ছ ৽ ন্দা হৃ দ য়া ন ৽ ন্দা জা নি না

র্রা র্সর্রা- র্গা । র্রা র্সা না । ধা- পা ক্সপা I} পা ধা ধা । ধা- র্সা র্সা ।
প্র ভা ত না জা নি স ৽ ন্ধ্যা তো মা রি প ৽ র্ব্বে

পা- ধা ধর্সা । র্সা র্সা র্সা I সা সা রা । গা- ক্সা ক্সপা । গক্সা- গক্সপা পা ।
অ ৽ র্ঘ্য ৽ র চি য়া জী ব ন ধ ৽ ন্য মা ৽ নি

-া পা পা ॥ -া সা সা I সা সা ধ্া। সা সা রা। রা সরগা গা। গা -া গা I
০ "ও গো" ০ আ মি জা নি না ত তা হা ভা ল কি ম ০ ন্দ

ঋা গা রগা। ক্ষা ক্ষা ক্ষা। ক্ষা গক্ষপা পা। পা -া পপপা I পা- ক্ষপধা ধা।
বা স হী ন্ কি বা ম ধু র গ ০ ন্ধশুধু প্রী ০ তি

ধা ধা ধা। পা পক্ষা ধা। পা- ক্ষা ক্ষপা I গা গা রা। গা গা মা।
পূ রি তু প র মা ন ০ ন্দ তো মা র চ র ণে

ঋগা- রা সা। -া পা পা I {পা ক্ষপা গা। পা- া ধা। ধা ধর্সা র্সা।
দা ০ নি ০ আ মি না চা- হি অ ০ ন্য বি ভ ব

র্সা- া র্সা I র্সা র্রা র্রা। সর্রা- র্গা র্গা। র্রা র্সা না। ধা- পা পা I}
ঋ ০ দ্ধি চা হি না মু ০ ক্তি চা হি না সি ০ দ্ধি

পা- ধা ধা। ধর্সা-০র্সা- া। পা ধা ধর্সা। র্সা র্সা- া I সা সা রা। গা ক্ষা ক্ষা।
তো মা বি প্র ০ সা দ ০ ল ভি বা রে সা ধ ০ তো মা র অ মৃ ত

গক্ষা- পা পা। -া পা পা ॥
বা ০ ণী ০ "ও গো

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।

স্বরলিপির ব্যাখ্যা।

১। স, ঋ, গ, ম, প, ধ, ন—সপ্তস্বরের এই সাতটি স্বরাক্ষর।

২। ঋ=কোমল র; জ্ঞ=কোমল গ; ক্ষ=কড়ি ম; দ=কোমল ধ; ণ=কোমল ন।

৩। উচ্চ সপ্তকের স্বরের মাথায় রেফ-চিহ্ন ও খাদ সপ্তকের নীচে হসন্ত-চিহ্ন থাকে; মধ্য-সপ্তকের স্বরে কোন চিহ্ন থাকে না। যথা প্, ধ্, ন্, স, র, গ, ম, প, ধ, ন, র্স, র্র, র্গ ইত্যাদি।

৪। স্বরোচ্চারণের কাল-পরিমাণকে মাত্রা বলে। এক, উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে, তাহাকে এক মাত্রা; এক, দুই উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে তাকে দুই মাত্রা; এক, দুই, তিন উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে তাকে তিন মাত্রা বলে; ইত্যাদি ক্রমে মাত্রা যথেচ্ছা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

মাত্রার চিহ্ন আকার। যথা সা একমাত্রা; সা -া দুই মাত্রা সা -া -া তিন মাত্রা ইত্যাদি। দুইটি স্বর একমাত্রার মধ্যে উচ্চারিত হইলে, দুইটি স্বরাক্ষর যুক্ত হইয়া শেষ অক্ষরের গায়ে আকার বসে; যথা, গমা, পধা; এইরূপ স্থলে প্রতি স্বরটি অর্দ্ধমাত্রা। চারিটি স্বর একমাত্রার মধ্যে উচ্চারিত হইলে, চারিটি স্বরাক্ষর যুক্ত হইয়া শেষ অক্ষরের গায়ে আকার বসে; যথা, সরগমা, এই স্থলে প্রত্যেক স্বরটি সিকি মাত্রা। এইরূপ একমাত্রার মধ্যে যতগুলিই স্বর উচ্চারিত হোক্ না কেন, তাহাদের স্বরাক্ষরগুলি যুক্ত হইয়া শেষ অক্ষরের গায়ে আকার বসে। যথা সরগমপধা, মপধনসা ইত্যাদি। অর্দ্ধমাত্রার বিশেষ চিহ্ন=ঃ বিসর্গ।

৫। সাধারণতঃ উপরোক্ত যুক্তস্বরগুলি গড়ানে ভাবেই উচ্চারিত হয়; যদি কোন স্থলে, উহার প্রত্যেক স্বর এক ঝোঁকে উচ্চারণ করিতে হয়, তাহা হইলে শিরোদেশে বিন্দু-চিহ্ন দেওয়া হইয়া থাকে, যথা সরগমা। কোন

এক স্বর যখন আর এক স্বরে বিশেষরূপে গড়াইয়া যায়, তখন স্বরের নীচে এইরূপ ⌣ চিহ্ন থাকে; যথা, গা-পা।

৬। যখন স্বরাক্ষরের নীচে গানের অক্ষর না থাকে তখন স্বরাক্ষরগুলির মধ্যে হাইফেন (-) চিহ্ন থাকে এবং গানের পংক্তিতে শূন্য (০) চিহ্ন দেওয়া হয়।

৭। কোন আনুসঙ্গিক সুর কোন প্রধান সুরকে ঈষৎ ছুঁইয়া গেলে প্রধান সুরের গায়ে ক্ষুদ্র অক্ষরে এইরূপ লিখিত হয়; যথা ^রসা সা^র ইত্যাদি।

৮। আস্থায়ীর আরম্ভে,—যেখান হইতে রীতিমত তাল সুরু হয়—সেইখানে এইরূপ ‖ যুগল-ছেদ অথবা যুগল II স্তম্ভচিহ্ন এবং প্রত্যেক কলির শেষে যেখানে থামিয়া আস্থায়ীতে আবার ফিরিতে হয়, সেইখানেও এইরূপ ‖ যুগল-ছেদ অথবা যুগল II স্তম্ভচিহ্ন বসে।

৯। { }=পৌনরুক্তির চিহ্ন; যথা { সা রা গা মা } অর্থাৎ এই অংশ দুইবার আবৃত্তি করিতে হইবে।

১০। ( )=পুনরুক্তি-কালে লঙ্ঘনের চিহ্ন; যথা { সা রা (গা মা) পা ধা। অর্থাৎ সা রা গা মা—এই অংশ দ্বিতীয়বার আবৃত্তি করিবার সময় (গা মা) এই অংশ লঙ্ঘন করিয়া একেবারে "পা ধা" এই অংশ ধরিতে হইবে।

১১। প্রতি তাল-বিভাগের পর ছেদ-চিহ্ন বসে; তালের এক আবর্ত্ত পূর্ণ হইলে এই I স্তম্ভ-চিহ্ন দেওয়া হয়।

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মহাকবি কালিদাসের চিতাভূমি ও তাঁহার অন্তিম কবিতা।

লঙ্কার মাতর নগর। লঙ্কার দক্ষিণ বিভাগে মাতর নামে একটী নগর আছে। বিশুদ্ধ ভাষায় উহাকে মহাতীর্থ বলে। উহা কোলম্ব নগরের ১০০ মাইল দক্ষিণে সমুদ্র তীরে অবস্থিত। কোলম্ব হইতে ধূমরথে চড়িয়া উপকূল পথে এই স্থানে উপস্থিত হওয়া যায়। কালিন্দী নামে এক নদী মাতর নগরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ভারত মহাসাগরে নিপতিত হইয়াছে। এই নদী সাধারণতঃ কিরিন্দী নামে প্রসিদ্ধ। ইহার কয়েক মাইল দূরে সমান্তরাল রেখাক্রমে প্রবাহিত হইয়া আর একটি বৃহত্তর নদী ভারত মহাসাগরে পড়িয়াছে। উহার নাম নীলব গঙ্গা। উহার উৎপত্তি স্থান সমন্তকূট পর্ব্বত। কালিন্দী নদী ও ভারত মহাসাগরের সঙ্গম স্থলের সন্নিকটে তিষ্যারাম নামে এক বৌদ্ধ বিহার বিদ্যমান আছে। এই বিহারের প্রাঙ্গণ ভূমি নানা পুষ্পলতা দ্বারা পরিশোভিত। তাহার চতুঃপার্শ্বে অসংখ্য পুগ ও নারিকেল বৃক্ষ।

তথায় কালিদাসের মৃত্যুসম্বন্ধে প্রবাদ। লঙ্কা দ্বীপে একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে যে "ভারতের মহাকবি কালিদাস মাতর নগরে দেহত্যাগ করেন। কালিন্দী তীরে তাঁহার দেহ ভস্মীভূত হইয়াছিল এবং অধুনা যে স্থলে তিষ্যারাম বিহার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে উহার সীমা কালিদাসের চিতাস্থল।"

এই প্রবাদের মূলে কোন সত্য আছে

কিনা জানিবার জন্য আমি লঙ্কার বিভিন্ন প্রদেশের সুবিদ্বান্ ভিক্ষুগণের নিকট অনুসন্ধান করি। তাঁহারা সকলেই মুক্ত কণ্ঠে বলেন এই প্রবাদ অতি প্রাচীন * এবং ইহার সহ আরও অনেক কিংবদন্তীর সংস্রব আছে। এই সকল কিংবদন্তী লঙ্কার প্রকৃত ইতিহাসের সহ এরূপ ভাবে সংস্পৃষ্ট যে অনেক স্থলে উভয়ের পার্থক্য করা যায় না। নিম্নে কয়েকটী ঐতিহাসিক ঘটনা ও কিংবদন্তী উদ্ধৃত করিলাম।

লঙ্কার রাজা কুমারদাস। লঙ্কার প্রামাণিক ইতিহাস মহাবংশ। উহাতে বর্ণিত আছে যে ধাতুসেন নামে মৌর্য্যবংশীয় কোন নরপতি [illegible]—৪৭৯ পর্য্যন্ত লঙ্কার শাসন দণ্ড [illegible] করেন। ইঁহার কোন নীচ কুলোৎপন্না [illegible] কাশ্যপ এবং উচ্চ কুলোৎপন্না [illegible] মৌদ্‌গল্যায়ন নামে পুত্র জন্মে। [illegible] পিতাকে নিহত করিয়া ৪৭৯ খৃঃ [illegible] লঙ্কার সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। মৌদ্‌গল্যায়ন কাশ্যপের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করেন কিন্তু প্রজাবর্গের সম্পূর্ণ সহায়তা লাভ করিতে না পারিয়া পুত্র কলত্রাদি সহ ভারতবর্ষে পলায়ন করেন। মৌদ্‌গল্যায়নের কুমার ধাতুসেন নামে এক পুত্র ছিল। ঐ পুত্র সাধারণতঃ কুমারদাস নামে খ্যাত। মৌদ্‌গল্যায়ন অষ্টাদশ বর্ষ ভারতে অবস্থান করেন। এই দীর্ঘ সময় কুমারদাস ভারতে থাকিয়া সংস্কৃত ভাষার সবিশেষ অনুশীলন করেন। ৪৯৭ খৃঃ অব্দে মৌদ্‌গল্যায়ন বহু ভারতীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে স্বদেশে প্রতিগমন করেন এবং কাশ্যপকে পরাজিত করিয়া লঙ্কার সিংহাসন অধিকার করেন। ৫১৫ খৃঃ অব্দে মৌদ্‌গল্যায়নের মৃত্যু হয়। এই বৎসর কুমারদাস লঙ্কার রাজা হন। ৫২৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন।

তাঁহার জানকী হরণ কাব্য। এই স্থলে রাজা কুমারদাস সম্বন্ধে যে বৃত্তান্ত উল্লিখিত হইল উহা সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক। উহাতে কোনপ্রকার কল্পনার সম্পর্ক নাই। ইতঃপর একটী কিংবদন্তীর উল্লেখ করিতেছি। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে রাজা কুমারদাস ভারতে অবস্থান কালে গীর্ব্বাণবাণীর অনুশীলন করিয়া উহাতে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য লাভ করেন। তিনি লঙ্কায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সংস্কৃত ভাষায় জানকী হরণ নামে এক মহাকাব্য বিরচন করেন। এই মহাকাব্যের উৎকর্ষ পরীক্ষার নিমিত্ত তিনি উহার এক প্রতিলিপি উজ্জয়িনী নগরীতে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নিকট প্রেরণ করেন। কালিদাস ব্যতীত অপর সকল পণ্ডিতই ঐ কাব্যের প্রশংসা করিবেন এই ভাবিয়া মহারাজ বিক্রমাদিত্য ইহা স্বীয় সভাসদ্ পণ্ডিতগণের হস্তে অর্পণ করিলেন, কেবল কালিদাসকে উহা দেখান হইল না। পণ্ডিতগণ উহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বলিলেন "মহারাজ আমরা যদি এই কাব্যের প্রশংসা করিতে পারিতাম তাহা হইলে আমাদের বড়ই আনন্দের বিষয় হইত কিন্তু

* পেরকুম্ব সিরিথ (পরাক্রম বাহু চরিত্র), রেলদিউ রাজুর্নিয় (সিংহল দ্বীপ রাজনীত), পূজাবলি প্রভৃতি গ্রন্থে এই প্রবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে।

হায় আমরা সে আনন্দে বঞ্চিত।" কথিত আছে তাঁহারা এই প্রসঙ্গে আরও বলিয়াছিলেন :—

জানক্যা হরণং কর্ত্তুং রঘুবংশে স্থিতে সতি।
কবিঃ কুমারদাসশ্চ রাবণশ্চ যদি ক্ষমঃ॥ *

তাঁহাদের এই বাক্য শ্লেষপূর্ণ। ইহার এক অর্থ—রঘুবংশ বিদ্যমান থাকিতে জানকীকে হরণ করা কেবল রাবণেরই সাধ্য। অপর অর্থ—রঘুবংশ কাব্য বিদ্যমান থাকিতে জানকী হরণ কাব্য বিরচন করা একমাত্র কবি কুমারদাসেরই যোগ্য।

কালিদাসের সহ কুমারদাসের সখ্য ও কালিদাসের লঙ্কা যাত্রা।

সভাসদ্ পণ্ডিতগণের মন্তব্য শ্রবণ করিয়া মহারাজ বিক্রমাদিত্য বিষণ্ণ হইলেন। তিনি লঙ্কেশ্বরকে কবি সম্মান প্রদান করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহাকে যথোচিত রাজসম্মান প্রদান করিবার জন্য মনঃস্থ করিলেন। তদনুসারে তিনি জানকী হরণ কাব্য রাজ্যের প্রধানতম হস্তীর পুচ্ছে বন্ধন করিয়া নগর প্রদক্ষিণ করাইলেন। যখন হস্তী মহাসমারোহে নগরের মধ্য দিয়া চলিতেছিল তখন কালিদাস তথায় উপস্থিত হইয়া জানকীহরণ কাব্য দেখিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সাধারণ রীতি অনুসারে তাঁহার প্রার্থনা অঙ্গীকৃত হইল। তিনি উক্ত কাব্যের প্রথম শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন—

আসীদবন্ধ্যামতিভোগভারাদ্
দিবোঽবতীর্ণা নগরীব দিব্যা।
ক্ষত্রানলস্থানশমী সমৃদ্ধ্যা
পুরামযোধ্যেতি পুরী পরার্ধ্যা॥

(জানকী হরণ ১। ১)।

"নগর সমূহের মধ্যে অযোধ্যাপুরী শ্রেষ্ঠা। অগ্নি যেমন শমী বৃক্ষকে অবলম্বন করিয়াছিল ক্ষত্রিয় তেজঃ সেইরূপ এই নগরীকে আশ্রয় করিয়া আছে। এই দিব্য নগরী বহুভোগ্য দ্রব্যের ভারেই যেন স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছে।"

এই প্রথম শ্লোক পড়িয়াই কালিদাস কুমারদাসের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ ঐ কাব্য পড়িয়া কালিদাস এত আনন্দিত হইয়াছিলেন যে তিনি উহা স্বীয় মস্তকে স্থাপন করিয়া হস্তীর সঙ্গে সঙ্গে নগর প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। বাগ্দেবীর বরেণ্য পুত্র কালিদাস লঙ্কেশ্বরকে সাধারণের সমক্ষে কবিসম্মান প্রদান করিলেন, এই সংবাদ অনতিবিলম্বে লঙ্কায় পঁহুছিল। রাজা কুমারদাস কৃতজ্ঞতাভরে মহাকবি কালিদাসকে লঙ্কায় যাইবার জন্য আহ্বান করিলেন। লঙ্কেশ্বরের আহ্বান অনুসারে মহাকবি লঙ্কায় গমন করেন। এই সময় তাঁহার বয়ঃক্রম অত্যধিক হয় নাই।

জানকীহরণ কাব্যের মৌলিকতা।

উপরে যে কিংবদন্তী উল্লেখ করিলাম উহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক নহে। উহার অন্ততঃ কিয়দংশ সত্য ঘটনার উপর ন্যস্ত। জানকীহরণ কাব্য আকাশকুসুমের ন্যায়

* কেহ বলেন খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে কবি রাজশেখর এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। জহ্লনের সূক্তি মুক্তাবলী গ্রন্থে এই মন্তব্য উদ্ধৃত হইয়াছে।

অলীক নহে।* দশসর্গাত্মক এই মহাকাব্য বোম্বাই নগরে দেবনাগর অক্ষরে ও কোলম্ব নগরে সিংহলাক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। প্রত্যেক সর্গের অন্তে "ইতি জানকীহরণে মহাকাব্যে সিংহলকবেরতিশয়ভূতস্য কুমারদাসস্য কৃতৌ অমুকোনামঃ অমুকঃসর্গঃ" এইরূপ লিখিত আছে। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে কবি রাজশেখর, দ্বাদশ শতাব্দীতে মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র, তদ্ব্যতীত বৈয়াকরণ উজ্জ্বল দত্ত, কবি জল্হন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ লেখকগণ কুমারদাসকৃত জানকীহরণ কাব্য হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। ঔচিত্যালঙ্কার, শার্ঙ্গধর পদ্ধতি, সুভাষিতাবলী ও সূক্তি মুক্তাবলী প্রভৃতি গ্রন্থেও জানকীহরণ কাব্যের শ্লোক নিবদ্ধ হইয়াছে। বস্তুতঃ রাজা কুমারদাস ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং তাঁহার জানকীহরণ কাব্য আমাদের প্রত্যক্ষ গোচর। মহাকবি কালিদাসেরও অস্তিত্ব কেহ অস্বীকার করেন না। তথাপি এই তিনের সম্বন্ধ যেভাবে উল্লিখিত হইল উহা যথার্থ কি কাল্পনিক তাহা সুধীগণের বিবেচ্য।

লঙ্কার রাজসভায় কালিদাস।

কথিত আছে কালিদাস লঙ্কার রাজসভায় উপস্থিত হইয়া স্বীয় কৃতিত্বের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। এ বিষয়ে নিম্নে একটী কথা উদ্ধৃত হইতেছে। রাজা কুমারদাসের পাঁচ পত্নী ছিল। একদিন তাঁহার দুই পত্নী নির্জ্জনে এমনভাবে পরস্পর কথোপকথন করিতেছিলেন যে উঁহাদের চরিত্র বিষয়ে রাজার মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়। পত্নীদ্বয়ের বিশ্রম্ভালাপ শ্রবণে কৌতূহলী হইয়া রাজা গবাক্ষের অন্তরালে দণ্ডায়মান হইয়া থাকেন। ইহা লক্ষ্য করিয়া এক পত্নী ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন "মূর্খ"। রাজা উঁহাদের অন্য কোন কথাই শুনিতে পাইলেন না, কেবল "মূর্খ" এই কথাটি তাঁহার কর্ণগোচর হইল। উঁহারা মূর্খ শব্দ কেন ব্যবহার করিলেন, ইহার তাৎপর্য্য জানিবার জন্য রাজা পরদিন প্রাতঃকালে সভাসদ্ পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিলেন। পণ্ডিতগণ সভায় উপস্থিত হইবা মাত্র রাজা উঁহাদের প্রত্যেককে "মূর্খ" বলিয়া সম্বোধন করিলেন। এই নূতন রীতির অভ্যর্থনায় প্রীত না হইয়া পণ্ডিতগণ পরস্পর গোপনে বলাবলি করিতেছেন এমন সময়ে মহাকবি কালিদাস সভায় উপস্থিত হইলেন। "মূর্খ" এই অভিনব সম্বোধনে অভ্যর্থিত হইয়া তিনি রাজাকে তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন :—

গতং ন শোচামি কৃতং ন মন্যে
খাদন্ ন গচ্ছামি হসন্ ন ভাষে।
দ্বাভ্যাং তৃতীয়ো ন ভবামি রাজন্
কিং কারণাদেব বদামি মূর্খঃ॥

"আমি গত বিষয়ের শোচনা করি না, কৃত কর্ম্মের বিষয় পুনঃ পুনঃ ভাবনা করি না, চলিতে চলিতে ভোজন করি না, কথা বলিতে বলিতে উচ্চ হাসি হাসি না, যেখানে দুই ব্যক্তি গোপনে কথা বলিতেছে তথায় আমি প্রবেশ করি না। মূর্খের যে পঞ্চ লক্ষণ আছে

* মূল জানকীহরণ কাব্যের কিয়দংশ কালসহকারে নষ্ট হইয়াছিল। লঙ্কায় "সন্ন" নামে উহার এক অতি প্রাচীন অনুবাদ আছে। ভিক্ষু ধর্ম্মারাম ঐ অনুবাদ দেখিয়া সংস্কৃত শ্লোক বিরচনপূর্ব্বক মূলের লুপ্ত অংশের উদ্ধার করিয়াছেন।

আমাতে তাহার একটীও নাই। মহারাজ তবে কেন আমাকে মূর্খ বলিলেন।”

উল্লিখিত প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া রাজা বুঝিতে পারিলেন তাঁহার পত্নী তাঁহাকে কেন “মূর্খ” বলিয়াছেন। পত্নীদ্বয় যেখানে গোপনে কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন তথায় প্রবেশ করা তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুচিত হইয়াছে, ইহা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল। কালিদাসের বুদ্ধিকৌশলে সন্তুষ্ট হইয়া রাজা তাঁহাকে যথোচিত পুরস্কৃত করিলেন।

উপরে যে কথা উদ্ধৃত হইল উহা বিশ্বাসযোগ্য কিনা শ্রোতৃবর্গ বিবেচনা করিবেন। উহার সমর্থন বা নিরাকরণের জন্য আমার কোন প্রকার ব্যগ্রতা নাই, কারণ উহা বর্ত্তমান প্রবন্ধের মুখ্যাঙ্গ নহে। নিম্নে অন্য একটী কিংবদন্তী বিবৃত হইতেছে, শ্রোতৃগণ উহার প্রতি মনোনিবেশ করিলেই আমি চরিতার্থ হইব। বলিতে কি এই কিংবদন্তী বর্ত্তমান প্রস্তাবের মূল ভিত্তি।

কালিদাসের অন্তিম কবিতা।

কথিত আছে রাজা কুমারদাস কোন রূপবতী রমণীর প্রণয়ে আসক্ত ছিলেন। একদিন তিনি অপরাহ্ণ সময়ে উক্ত রমণীর গৃহে উপবিষ্ট আছেন এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন পুরোবর্ত্তী সরোবরে শতদলপদ্মসমূহ বিকসিত হইয়া রহিয়াছে। সহসা একটী মধুকর আসিয়া একটী পদ্মের উপর নিপতিত হইল এবং উহার মধুপান করিবার জন্য অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পদ্মটী মুদ্রিত হইয়া যাওয়ায় মধুকর উহার মধ্যে কারারুদ্ধ হইয়া রহিল। মধুকরের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া রাজার হৃদয়ে কবিত্বের উচ্ছ্বাস হইল। তিনি বলিলেন ;—

সিয় তঁাবরা সিয় তাঁবরা সিয় সেবেনী
সিয়স পূরা নিদি নো লবা উন্ সেবেনী

রাজা এই দুই পংক্তি গৃহের কুড্যে লিখিয়া রমণীকে বলিলেন যিনি ইহার আর দুই পংক্তি পূরণ করিতে পারিবেন তাঁহাকে যথেষ্ট পুরস্কার দেওয়া হইবে। রাজা জানিতেন কালিদাস ভিন্ন অপর কেহ এই কবিতা পূরণ করিতে পারিবেন না। ফলতঃও কালিদাস পরদিন ঐ স্থানে আগমনপূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অপর দুই পংক্তি নিম্নলিখিত ভাবে পূরণ করিলেন—

বন বঁবরা মল নোতলা রোণট বনী
মল দেদরা পণ গলবা গিয় হুবেনী ॥

কালিদাসের মৃত্যু স্থান। রমণী প্রতিশ্রুত পুরস্কারের লোভে কালিদাসকে নিহত করিয়া রাজার নিকট ব্যক্ত করিল যে সে নিজেই দুই পংক্তি রচনা করিয়া কবিতা পূরণ করিয়াছে। রাজা তাহার কথায় বিশ্বাস করিলেন না। তিনি অনেক অনুসন্ধান করিয়া কালিদাসের মৃতদেহ বাহির করিলেন এবং উঁহার জ্বলন্ত চিতায় সাষ্টাঙ্গে পতিত হইয়া আত্মবিসর্জ্জন দিলেন। ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি ও লঙ্কার বিবত্তম নরপতি এতদুভয়ের এইরূপে জীবনাবসান হইল। তাঁহাদের চিতাভূমি ভারত মহাসাগরের উপকণ্ঠে মাতর নগরে কালিন্দী তীরে অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। সেখানে এখন দেখিবার আর কিছুই নাই, কেবল কতকগুলি বন্য পুষ্পলতা সেই স্থানকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে এবং উহার চতুঃ-

পার্শ্বে অসংখ্য পূগ ও নারিকেল বৃক্ষ দণ্ডায়মান হইয়া পথিকদিগকে চিতাভূমি প্রদর্শন করিতেছে। কথিত আছে পুরাকালে লাঙ্কিকগণ চিতাভূমির উপর সাতটী বোধি বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন। অধুনা সেই সকল বৃক্ষের কোন চিহ্ন নাই বটে কিন্তু চিতা স্থানটীকে এখনও হৎবোধিবত্ত বলে। বলা বাহুল্য এই হৎবোধিবত্ত শব্দ সপ্তবোধি-বৰ্ত্ম শব্দের অপভ্রংশ মাত্র।

কালিদাসের এ কবিতা কোন্ ভাষায় লিখিত? এক্ষণে কালিদাস ও কুমারদাস পরস্পর যে কবিতা পূরণ করিয়াছিলেন উহার অর্থের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিব। কবিতাটী লঙ্কার প্রধান প্রধান ভিক্ষু মাত্রেরই জানা আছে। কিন্তু উহার তাৎপর্য্য যথার্থতঃ কেহই জানেন না। কেহ উহার একভাবে অর্থ বুঝেন, অপরে অন্যভাবে বুঝিয়া থাকেন। কেহ দুই তিনটী পদ একত্র করিয়া, কেহ বা একটী পদকে দ্বিখণ্ডে ও ত্রিখণ্ডে বিভাগপূর্ব্বক অর্থের নিষ্কাশন করেন। কাহারও মতে কবিতাটী প্রাচীন সিংহলীভাষায় লিখিত, কেহ বা বলেন উহা কালিদাসের সমসাময়িক ভারতের কোন কথিত ভাষায় রচিত। আমার বোধ হয় উহা প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত। বস্তুতঃ কালিদাসের সময়ে পূর্ব্বে ও পরে লাঢ়দেশের সিংহপুর নগর হইতে অনেক হিন্দু লঙ্কায় গমন করিয়া মাতর প্রভৃতি স্থানে বসতি করেন। সম্ভবতঃ বর্ত্তমান রাঢ় দেশই লাঢ় নামে খ্যাত ছিল। মহাবংশের বর্ণনায় জানা যায় সিংহপুর নগর বঙ্গ হইতে মগধে [illegible]বার পথে অবস্থিত। ইহাতে অনুমিত হয় হুগলী জেলার অন্তর্গত সিঙ্গুর নামক স্থানই পূর্ব্বে সিংহপুর নামে খ্যাত ছিল। এই অনুমান যদি যথার্থ হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে পঞ্চদশ শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশ হইতে যে সকল হিন্দু লঙ্কায় গমন করিয়াছিলেন কবিতাটী তাঁহাদের ভাষায় লিখিত।

কবিতার পাঠান্তর। কালসহকারে এই কবিতার নানা পাঠান্তর ঘটিয়াছে। দৃষ্টান্তস্থলে কয়েকটী পাঠ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

পাঠ।	পাঠান্তর।
ভাবরা	ভমরা
সেবেণী	সুবেনী
সুবেনী	সেবেনী
বঁবরা	বমরা
মল নোভলা	বন বঁবরা
পণ পলবা	পোনি বীলা
পির	পিয়ে

ইত্যাদি।

কবিতার শব্দ বিশ্লেষণ। কোন কোন ভিক্ষুর মতে কবিতাটীর প্রথম দুই পংক্তি কালিদাসের এবং শেষ দুই পংক্তি কুমারদাসের রচিত। অর্থাৎ কুমারদাস শেষ দুই চরণ রচনা করেন এবং কালিদাস আদ্য দুই চরণ রচনা করিয়া কবিতা পূরণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি কবিতাটীর প্রকৃত তাৎপর্য্য সম্বন্ধেও অনেক মতভেদ আছে। উহাতে যে সকল শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার যথাসম্ভব অর্থ নিম্নে লিখিত হইল :—

শব্দ।	অর্থ।
সিয়	(১) স্বকীয়, (২) শত, (৩) বায়ু, (৪) সিংহী, (৫) শীত।

তাঁবরা	তামরস অর্থাৎ পদ্ম।
সেবেনী	(১) সেবন করিতে করিতে, (২) সুখে, (৩) বন্ধন, (৪) ছায়া, (৫) গৃহ।
সিয়স	স্বীয় অক্ষি।
পুরা	পুরিয়া, পূর্ণ করিয়া।
নিদি	নিদ্রা।
নো লবা	ন লব্ধ্বা, লাভ না করিয়া।
উন্	(১) উদ্বেগ, (২) উপবিষ্ট, (৩)প্রবেশ করিল।
বন	(১) অরণ্য, (২) জল।
বঁবরা	ভ্রমর।
মল	(১) পুষ্প, (২) মালা।
নোতলা	উত্তোলন না করিয়া, নষ্ট না করিয়া।
রোণট	(১) রেণোরর্থে, রেণুর নিমিত্ত, (২) রুণু ইতি গুঞ্জন করিতে করিতে।
বনী	প্রবেশ করিল।
দেদরা	অত্যন্ত বিদীর্ণ বা বিকসিত হইলে।
পণ	প্রাণ।
গলবা	গলাইয়া, মোচন করিয়া।
গিয়	গেল।
সুবেনী	সুখে।

কবিতাটীর তাৎপর্য্য। সম্পূর্ণ কবিতাটী নিম্নে লিখিত হইল :—

সিয় তাঁবরা　সিয় তাঁবরা সিয় সেবেনী
সিয়স পুরা নিদি নো লবা উন্ সেবেনী।
(কুমার দাস)।
বন বঁবরা　মল নোতলা　রোণট বনী
মল দেদরা　পণ গবলা গিয় সুবেনী ॥
(কালিদাস)।

এই কবিতার তাৎপর্য্য নিম্ন লিখিত ভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে—কুমার দাসের দুই পংক্তির অর্থ :—

[সন্ধ্যার প্রাক্কালে] ভ্রমর মধুলোভে শতদল পদ্মের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহার শতদলে বদ্ধ হইল। [রাত্রিতে] চক্ষুঃ পুরিয়া নিদ্রা লাভ করিতে না পারিয়া বসিয়া বসিয়া কেবল উদ্বেগ ভোগ করিতে লাগিল। কলিদাসের দুই পংক্তির অর্থ :—

[সন্ধ্যার প্রাক্কালে] বন ভ্রমর পুষ্প নষ্ট না করিয়া মকরন্দ পানের নিমিত্ত উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। [প্রাতঃকালে পুনরায়] পুষ্প বিকসিত হইলে উহার মধ্য হইতে প্রাণ (নিজকে) উদ্ধার করিয়া সুখে চলিয়া গেল।

কবিতার অর্থ লইয়া এ স্থলে আমি কোন বাদানুবাদ করিব না। যাঁহারা প্রাচীন বাঙ্গালা পুথি লইয়া আলোচনা করিতেছেন অথবা যাঁহাদের হৃদয় কবিত্ব রসে পূর্ণ তাঁহারা উহার যথার্থ মর্ম্ম উদ্ঘাটন করুন ইহাই আমার নিবেদন।

কালিদাসের মৃত্যুকাল। উপরে যে শোচনীয় ঘটনা উল্লিখিত হইল উহা যদি যথার্থ হয় তাহা হইলে নিশ্চয়রূপে বলিতে পারা যায় কালিদাস ও কুমারদাস উভয়েই ৫২৪ খৃঃ অব্দে দেহ ত্যাগ করেন। মহাবংশ অনুসারে ঐ বৎসর কুমারদাসের মৃত্যু হয়। এইরূপ সিদ্ধান্তের সহিত অন্যান্য সুবিজ্ঞাত ঘটনা সমূহের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে। কালিদাসের সম-সাময়িক বরাহমিহির ৫০৫ খৃঃ অব্দে পঞ্চসিদ্ধান্তিকা গ্রন্থ বিরচন করেন। উহাদের সমকালে ক্ষপণক নামক এক জৈন পণ্ডিত বলভী নগরীতে বিদ্যমান ছিলেন। ক্ষপণকের প্রকৃত নাম সিদ্ধসেন দিবাকর। ইনি অনুমান ৫২০ খৃঃ অব্দে ন্যায়াবতার, সম্মতি তর্কসূত্র প্রভৃতি জৈন দর্শন গ্রন্থ বিরচন করেন।

মৎপ্রণীত মধ্য যুগের ন্যায় দর্শনের ইতিহাস (History of the Medieval School of Indian Logic) নামক গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে যে কালিদাসের প্রতিপক্ষ বৌদ্ধ নৈয়ায়িক দিঙ্‌নাগ খৃষ্টীয় ৫০০ অব্দে অন্ধ্রদেশে বসিয়া প্রমাণসমুচ্চয়, ন্যায়প্রবেশ, হেতুচক্র প্রভৃতি ন্যায় শাস্ত্রের গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া কালিদাসকে কুমারদাসের সমকালিক বলিতে আমার কোন প্রকার সঙ্কোচ বোধ হয় না।

লঙ্কায় বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ—কালিদাসের লঙ্কাযাত্রাও অসম্ভব ব্যাপার নহে। তাঁহার পূর্ব্বে ও পরে অনেক ভারতীয় ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ পণ্ডিত লঙ্কায় গমন করিয়াছিলেন। বহুকালের কথা নয় ১৪৫৬ খৃঃ অব্দে রামচন্দ্র কবি ভারতী নামক একজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ লঙ্কায় গমন করিয়া শ্রীমৎ রাহুল সংঘরাজের নিকট বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। রামচন্দ্র যে সংঘারামে বাস করিতেন উহা তীর্থগ্রাম নামে প্রসিদ্ধ। অধুনা চলিত কথায় উহাকে টৌ টো গ্রাম বলে। আমি স্বয়ং ঐ সংঘারাম পরিদর্শন করিয়াছি। উহার বর্ত্তমান সংঘনায়ক আমাকে স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপে একটী চন্দন কাষ্ঠময়ী বুদ্ধ মূর্ত্তি ও কয়েকখানি প্রাচীন পালি-পুথি উপহার দিয়া অভিনন্দন প্রদান কালে বলেন "রামচন্দ্র ও সতীশচন্দ্র এই দুই নামের যেরূপ সৌসাদৃশ্য তাহাতে আমাদের বোধ হইতেছে আপনি রামচন্দ্রের আত্মীয় ও তাঁহার বংশের অনেক সংবাদ জানেন।" রামচন্দ্র কবিভারতীর বিস্তৃত পরিচয় এই প্রবন্ধের বিষয় নহে। তিনি লঙ্কায় আত্ম পরিচায়ক যে সকল শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন তাহা হইতে একটী শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

ভারদ্বাজ কুলোদ্ভবা হি জননী দেবীতি নাম্নী সতী
শ্রীকাত্যায়ন বংশজো গণপতি র্ধীমান্ পিতা মে প্রভুঃ।
সোদর্য্যৌ তু হলায়ুধশ্চ গুণিনৌ লক্ষ্মীধরশ্চানুজৌ
গ্রামো মে বিরবাটিকোঽথ বিবুধানন্দো মুকুন্দাশ্রয়ঃ।

"আমার মাতা ভারদ্বাজ গোত্র সম্ভূতা। তাঁহার নাম সতী দেবী। আমার বুদ্ধিমান্ প্রভু পিতা কাত্যায়ন বংশ সম্ভূত। তাঁহার নাম গণপতি। হলায়ুধ ও লক্ষ্মীধর নামে আমার দুই গুণবান্ অনুজ সহোদর আছে। বিরবাটিক গ্রাম আমার জন্মভূমি। ঐ গ্রাম পণ্ডিতগণের বাসস্থান ও মুকুন্দের আশ্রম"।

সেতুবন্ধে কালিদাস। পুরাকালে ভারতবাসিগণ লঙ্কায় গমন করিতেন ইহা ইতিহাস পাঠকের অবিদিত নাই। এই বিষয়ে অধিক প্রমাণ প্রয়োগ করিতে গেলে সিদ্ধ-সাধন দোষ হইবে। সুতরাং সেই উদ্যোগ হইতে আমি নিরস্ত হইলাম। কালিদাস সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন ইহা তাঁহার স্বরচিত কাব্য হইতেই প্রমাণিত হয়। তিনি রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গে সমুদ্র বর্ণন প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :—

বৈদেহি পশ্যামলয়াদ্ বিভক্তং
মৎসেতুনা ফেনিলমম্বুরাশিম্।

"হে বৈদেহি মলয় পর্ব্বত পর্য্যন্ত আমার সেতু দ্বারা বিভক্ত ফেনিল জলরাশির প্রতি দৃষ্টিপাত কর"।

রামেশ্বরের মন্দিরের বাহিরে অগস্ত্য' তীর্থ সমীপে দাঁড়াইয়া সেতুর দিকে অবলোকন করিলে 'বোধ হয় কালিদাস ঐ দৃশ্য স্বয়ং

দেখিয়া উদ্ধৃত পংক্তি লিখিয়াছেন। স্থানীয় লোকে বলে সেতুর একদিকে কলিকাতার সমুদ্র ও অপর দিকে বোম্বাইয়ের সমুদ্র। এই দুই সমুদ্র পরস্পর মিলিতে না পারিয়াই যেন ক্রোধ ভরে সেতুর দুই ধারে ফেন উদ্গিরণ করিতেছে। ঐ সেতুর উপর দিয়া চতুর্দশ মাইল অগ্রসর হইলে ধনুষ্কোটি তীর্থে উপস্থিত হওয়া যায়। কথিত আছে রামচন্দ্র রাবণ বধ করিয়া প্রত্যাগমন কালে ব্রহ্মহত্যার পাপ ক্ষালনের নিমিত্ত এই স্থানে স্নান ও ধনু ধৌত করিয়াছিলেন। এই স্থান হইতে লঙ্কার দিকে তাকাইলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ৬৪ দ্বীপ দৃষ্ট হয়। উহা নাকি প্রাচীন সেতুর ধ্বংসাবশেষ। দাক্ষিণাত্য হইতে জলযানে চড়িয়া রামেশ্বর যাইতে হইলে প্রথমতঃ যে স্থানে উপস্থিত হওয়া যায় উহাকে পাম্বান্ বলে। পাম্বান্, রামেশ্বর ও ধনুষ্কোটি এই তিন লইয়া একটী দ্বীপ। ঐ দ্বীপ প্রাচীন কালে বোধ হয় পাম্বান্ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। পাম্বান্ শব্দটী দ্রাবিড়ীয়। সংস্কৃতে উহাকে নাগ দ্বীপ বলে। নাগদ্বীপ নিতান্ত আধুনিক নহে। কালিদাসের সময়ে উহা, বিশেষ পরিজ্ঞাত ছিল। পালি গ্রন্থে বর্ণিত আছে বুদ্ধদেব নাগ দ্বীপে গমন করিয়াছিলেন। ঐ নাগদ্বীপ হইতে ভারতে ফিরিবার কালে তমালতালী বনরাজি শোভিত তীরভূমির প্রতি তাকাইলে যথার্থতঃ যাহা দেখা যায় উহা কালিদাস নিম্নলিখিত শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন :—

দূরাদয়শ্চক্র নিভস্য তন্বী তমালতালী-
বনরাজি নীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে র্ধারানিবদ্ধেব
কলঙ্ক রেখা।
(রঘুবংশ ১৩। ১৫)।

পাণ্ড্যদেশে কালিদাস। দাক্ষিণাত্যের পাণ্ড্য নৃপতির বর্ণন প্রসঙ্গে কালিদাস লিখিয়াছেন :—

পাণ্ড্যোঽয়মংসার্পিত লম্বহারঃ
কৢপ্তাঙ্গরাগো হরিচন্দনেন।
আভাতি বালাতপ রক্তসানুঃ
সনির্ঝরোদ্গার ইবাদ্রিরাজঃ॥
(রঘুবংশ ৬। ৬০)।

কালিদাসের সময়ে পাণ্ড্য নরপতির স্কন্ধে যেরূপ লম্বমান হার ও অঙ্গে হরিচন্দনের অনুলেপন ছিল, দ্রাবিড়ীয় ভূম্যধিকারিগণের অঙ্গভূষণ অদ্যাপি তদ্রূপ দৃষ্ট হয়। কালিদাসের জীবৎকালে পাণ্ড্যরাজের যেরূপ "ইন্দীবর-শ্যামতনু" ছিল এখনও উহার অধিক পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। কালিদাসের সময়ে পাণ্ড্য দেশের রাজধানী উরগপুরে অবস্থিত ছিল। এই উরগপুর বর্ত্তমান ত্রিচিনপল্লীর অন্তর্গত। ত্রিচিন পল্লীর এক দিকে পর্ব্বতের উপর শিবের মন্দির এবং অপর দিকে কাবেরী নদী পার হইয়া শ্রীরঙ্গমে পঁহুছিলেই ভারতের সর্ব্ব প্রধান বিষ্ণুমন্দির দৃষ্ট হয়। যদিও সমগ্র দাক্ষিণাত্য শৈব ধর্ম্মে পরিপ্লাবিত, কাবেরীর উভয় পার্শ্বে শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের তুল্য প্রভাব অনুভূত হইয়া থাকে। মনে হয় উরগপুরে অবস্থান কালেই যেন কালিদাস হরি ও হর এতদুভয়ের কে জ্যেষ্ঠ ও কে কনিষ্ঠ ইহা নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া লিখিয়াছেন :—

একৈব মূর্ত্তির্বিভিদে ত্রিধা সা
সামান্যমেষাং প্রথমাবরত্বম্।
বিষ্ণোর্হরস্তস্য হরিঃ কদাচিৎ
বেধাস্তয়োস্তাবপি ধাতুরাদ্যৌ॥
কুমারসম্ভব ৭।৪৪।

কাবেরীতীরে কালিদাস। কাবেরী-

নদী গভীর নহে। এখন উহা শুষ্ক প্রায়। বর্ষাকালে এই নদী বিস্তীর্ণ হয়, বটে কিন্তু শরৎকালে উহার জলময় ভাগ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া থাকে। গত অগ্রহায়ণ মাসে কাবেরীতে স্নান কালে শত শত গো মহিষ ও হস্তী অনায়াসে এক পার হইতে অপর পারে চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া কালিদাসের নিম্ন লিখিত শ্লোকটী আমার স্মৃতি পথে উদিত হইল :—

সদ্বৈরূপরিভোগেণ গজদানসুগন্ধিনা।
কাবেরীং সরিতাং পত্যুঃ শঙ্কনীয়ামিবাকরোৎ॥

রঘুবংশ ৪।৪৫

শরৎকালে রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে কালিদাস লিখিয়াছেন হস্তিগণের মদধারায় কাবেরীর জল আমোদিত হইয়াছিল, তাঁহার এই বর্ণনায় কিঞ্চিন্মাত্র অত্যুক্তি নাই।

কালিদাসের দাক্ষিণাত্য পরিদর্শন। টিউটিকোরিন্ নামক বন্দরের কয়েক মাইল দূরে তাম্রপর্ণী নদী। এই নদী যেখানে সমুদ্রে পড়িয়াছে সেই স্থান এক্ষণে মুক্তার আকর। কালিদাসের সময়েও ঐ স্থান মুক্তার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, তাহা নিম্নলিখিত শ্লোক হইতে অনুভূত হয় :—

তাম্রপর্ণী সমেতস্য মুক্তাসারং মহোদধেঃ।
তে নিপত্য দদুস্তস্মৈ যশঃ স্বমিব সঞ্চিতম্॥

রঘুবংশ ৪।৫০

যাঁহারা কেবল রমণীগণের কেশ বিন্যাস স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহারাই কেবল কালিদাসের নিম্নলিখিত শ্লোকের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবেন :—

ভয়োৎসৃষ্ট বিভূষণাণাং তেন কেরল যোষিতাম্।
অলকেষু চমূরেণুশ্চূর্ণ প্রতিনিধী কৃতঃ।

রঘুবংশ ৪।৫৪

লঙ্কেশ্বরের সহ পাণ্ড্যরাজের সন্ধি। অধিক দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া প্রবন্ধের কলেবর অকারণ বৃদ্ধি করা আমার অভিপ্রেত নহে। কালিদাস দাক্ষিণাত্যের অনেক স্থলই স্বয়ং পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার কৃত বর্ণনায় অনেক সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। কালিদাসের সময়ে ও কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যের সহ লঙ্কার রাজনৈতিক সম্বন্ধ ছিল। অনেকেই জানেন খৃঃ অঃ ৪৩৬ হইতে খৃঃ অঃ ৪৬৩ মধ্যে ৬ জন তামিল রাজা দাক্ষিণাত্য হইতে লঙ্কায় গমন করিয়া তথায় রাজত্ব করেন। রাজা কুমারদাসের পিতামহ ধাতুসেন শেষ তামিল রাজকে নিহত করিয়া ৪৬৩ খৃঃ অব্দে লঙ্কার সিংহাসন অধিকার করেন। কুমারদাসের পিতা মৌদ্গল্যায়ন বোধ হয় পাণ্ড্য রাজের সহায়তা পাইয়াই কাশ্যপকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই কালিদাস লিখিয়াছেন :—

অস্ত্রং হরাদাপ্তবতা দুরাপং
যেনেন্দ্রলোকাবজয়ায় দৃপ্তঃ।
পুরা জনস্থান বিমর্দ শঙ্কী
সংধায় লঙ্কাধিপতিঃ প্রতস্থে। রঘুবংশ ৬।৬২

"পাণ্ড্যরাজ শিবের নিকট দুর্লভ অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন। এই হেতু জনস্থানের আক্রমণাশঙ্কী গর্ব্বিত লঙ্কেশ্বর পাণ্ড্য নৃপতির সহ সন্ধি করিয়াই ইন্দ্রলোক জয় করিতে যাইতেন"।

এই বর্ণনায় রাবণ ও ইন্দ্রলোক কবির কল্পনা হইতে পারে, কিন্তু কালিদাসের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বা জীবদ্দশায় লঙ্কেশ্বরের সহ পাণ্ড্য রাজের যে সন্ধি হইয়াছিল ইহা ঐতিহাসিক ঘটনা। পাণ্ড্যরাজ শৈব ছিলেন-ইহা প্রকাশ

Ac. No. ৮৬৮২ dt. ১২.৪.৭

করিবার জন্যই লিখিত হইয়াছে তিনি শিবের নিকট দুর্লভ অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন।

উপসংহার।

লঙ্কায় আজ কাল শৈব ও বৌদ্ধের সংখ্যা প্রায় তুল্য। বৌদ্ধগণ সিংহলী। শৈবগণ তামিল বা দাক্ষিণাত্যের লোক। লঙ্কার প্রাচীন রাজধানী পুলস্ত্যপুরের ধ্বংসাবশেষ খনন করিয়া অনেক প্রস্তর ও পিত্তল মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে নটরাজ শিব, পার্ব্বতী, চণ্ডেশ্বর ও সূর্য্যের মূর্ত্তিই অধিক। ভারতের লোক লঙ্কায় যাইয়া এই সকল মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ পুরাকালে ভারতের সহ লঙ্কার বিশেষ সংস্রব ছিল। অতএব কালিদাস লঙ্কায় গমন করিয়াছিলেন এই প্রবাদ আমার নিকট অমূলক বলিয়া বোধ হয় না।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

নববর্ষে সুধা!

আজ বৈশাখী সংক্রান্তি। হিন্দুর নববর্ষ। সুতরাং ঘরে ঘরে মহা আয়োজন। স্নান ও দান এই উৎসবের প্রধান কার্য্য। ও পাড়ার বড় ও মেজ গিন্নি, ঝি, বউ, লইয়া গঙ্গাস্নানে যাইবেন এবং পথে ভাসুরঝি সুধাকে সঙ্গী করিবেন মনস্থ করিয়াছেন।

ভোর চারিটা হইতে কাজ কর্ম্মের আয়োজনে,দাসী চাকরের ডাকাডাকিতে,ছেলে মেয়ের কোলাহলে ও গৃহিণীগণের ব্যস্ততায় আজ গৃহ মুখরিত।

একে একে বাড়ী শুদ্ধ সকলের মৃত আত্মীয়গণের শুদ্ধি, ও ইষ্টদেবতার উদ্দেশে প্রায় পঞ্চাশটি গঙ্গাজল পূর্ণ মৃণ্ময় কলসী সিন্দুর চন্দনচর্চ্চিত এবং ফুল ও ঘৃতাধারে সজ্জিত,—আর একটি পাত্র নানাবিধ ফল, মিষ্টান্ন, ছোলা মটর যব যজ্ঞোপবীত ও দক্ষিণা ধারণ করিয়া নূতন গামছা দ্বারা আচ্ছাদিত এবং তদপার্শ্বে এক একখানি তালবৃন্ত এবং পুষ্পমাল্য চন্দন ধূপদীপ প্রভৃতি সুরক্ষিত হইয়াছে! গৃহিণী ও অন্যান্য ব্রতকারিণীরা গঙ্গাস্নান করিয়া আসিলে, পুরোহিত ঠাকুর যথা বিধান মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক ঘটোৎসর্গ করাইবেন। ইহা নিদাঘের প্রারম্ভেই প্রেতাত্মার উদ্দেশে দান।

ব্রতায়োজন শেষ হইলে বড় গিন্নি শ্যামা-ঠাকুরাণী তাঁহার মেজ যা দুর্গাসুন্দরীকে ডাকিয়া কহিলেন, "মেজ বৌ, আমি সুধাকে নিয়ে আগে স্নান করে আসি পরে তুমি বেলা হলে বউকে সঙ্গে করে যেয়ো।"

একটি ক্ষুদ্র উদ্যান পথের মধ্যে দিয়া শ্যামাসুন্দরী একটি একতল ক্ষুদ্র বাটীর প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, বাটীটি নিস্তব্ধ।

কেন এ বাড়ীর লোকেরা সকলেই কি এরই মধ্যে গঙ্গাস্নানে গিয়াছে নাকি? এই ভাবিয়া সত্বরপদে শ্যামা ঠাকুরাণী সুধাকে ডাকিতে ডাকিতে, পশ্চাৎদিকের বারাণ্ডায় আসিয়া সুধার কনিষ্ঠা বিধুকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

"কি হয়েছে গা বিধু। সুধা কোথা গেল?"

বিধু বলিল "দিদি পুকুর পাড়ে।" জ্যাঠাইমাকে সঙ্গে লইয়া সে পুষ্করণীর তীরে উপস্থিত হইল।

চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালবিধবা সুধা শ্যামাসুন্দরীর জ্ঞাতিকন্যা; বিষয় সম্পত্তি যাহা আছে ইঁহারাই তাহার তত্বাবধারক।

স্বামীর সহিত সুধার সাধ আহ্লাদ সকলি ফুরাইয়া গিয়াছে, তথাপি তাহার হৃদয়ভরা স্নেহ ফুরাইয়া যায় নাই। মৃত স্বামীর একটি পাখী ছিল তাহাকেই সে সন্তানের স্থলে অভিষিক্ত করিয়াছে। কিন্তু এমনি তাহার দুর্ভাগ্য পুষ্করিণীতে স্নান করাইবার সময় পাখীটিও তাহাকে ত্যাগ করিয়া উড়িয়া গেল, সুধা শোকাকুল হইয়া কাঁদিতেছে।

শ্যামা ঠাকরুণ সুধার শূন্য পিঞ্জর দেখিয়া কহিলেন 'আকপাল পাখীটাও বুঝি গেছে! কোথায় গেল খুঁজলিনি কেন?'

সুধা কাতরকণ্ঠে কহিল "ঢের খুঁজেছি।"

"আচ্ছা আয় গঙ্গাস্নান করে আসি। মিছি মিছি কেঁদে কি তাকে পাওয়া যাবে! আজ বচ্ছরকার পুণ্যাহ দিন ও একটা পাখী পাখী করে কেবল পাগল হয়ে বসে থাকবি! এখন কি আর ও সব ভাবতে আছে; তোর এখন ব্রত নিয়ম পূজা আর্চ্চা উপাস কাপাস করবার সময়"।

সুধা একটু রাগ করিয়া উত্তর করিল, 'না আমি গঙ্গা স্নানে যাব না।'

বালিকা বিধু মুখখানি মলিন করিয়া মৃদু স্বরে দিদির কাণের কাছে গিয়া কহিল "না গেলে জ্যাঠাইমা রাগ করবে, চল ভাই।"

তখন সুধা অগত্যা শূন্য পিঞ্জরটি তুলিয়া নিজ শয়নাগারে রাখিয়া জ্যাঠাইমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল।

শ্যামাঠাকরুণ মনে মনে যথেষ্ট অসন্তুষ্ট হইলেন। একালের মেয়েদের মোটেই ধর্ম্ম কর্ম্মে শ্রদ্ধা নাই! তাইতেই ত সংসারে এত অমঙ্গল অশান্তি!

স্নানান্তে শ্যামাসুন্দরী বাড়ী আসিয়া দেখেন, পুরোহিত আসিয়াছেন কর্ত্তার ঘটোৎসর্গ হইয়াছে, গৃহিণীর অপেক্ষায় সকলে বসিয়া আছেন। তাঁহার হইলে তবে অন্যান্য সকলের উৎসর্গ শেষে ব্রাহ্মণসধবা ও কুমারী ভোজনান্তে ব্রত সমাধা হইবে। শ্যামাসুন্দরী, বাড়ী আসিয়া হস্তপদ প্রক্ষালনান্তে তসরের কাপড় ছাড়িয়া আর একখানি গরদের শাড়ী পরিধানপূর্ব্বক ব্রত স্থানে গিয়া বসিলেন। পুরোহিত যথারীতি ঘটের পূজা করাইয়া নিম্নোক্তমন্ত্র পাঠ করাইলেন।

এষ ধর্ম্মঘটো দত্তো ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবাত্মকঃ।
অস্য প্রদানাৎ সফলা মম সন্তু মনোরথাঃ॥
ঘট ত্বং ধর্ম্মরূপোঽসি ব্রহ্মণা নির্ম্মিতঃ পুরা।
ত্বয়ি লিপ্ত সন্তু লিপ্তাশ্চন্দনৈঃ সর্ব্বদেবতাঃ॥
পানীয়ং প্রাণিনাং প্রাণাঃ পানীয়ং
প্রাণিনাং মহৎ।
পানীয়স্য প্রদানেন তৃপ্তির্ভবতু শাশ্বতী॥

পরে দক্ষিণাদান, বিষ্ণু, গুরু ও পিতৃপ্রণামান্তে গৃহিণী উৎসর্গ কার্য্য শেষ করিলেন।

ক্রমান্বয়ে বড় বউ, মেজ বউ, পিসি, শাশুড়ি, জ্যাঠাই প্রভৃতি সকলের ঘটোৎসর্গ হইয়া গেলে সুধার খোঁজ পড়িল। তখন বেলা প্রায় তিনটা; চারিদিকে ডাকাডাকি হাঁকা হাকি, কিন্তু সুধার কোনই খোঁজ নাই। বুড়ো দিদিমা বলিলেন "আর বাপু এখনকার মেয়েদের ধর্ম্মে কর্ম্মে কি মতি আছে? তারা বলে মরাগরু ঘাস খায়না। এই

বৈশাখের প্রতপ্ত গ্রীষ্মে সুশীতল জল দান করা কি কম পুণ্যি! প্রেতলোকে তাদের আত্মাকে শীতল করা হয় না কি? কে জানে সুধা কি ধরণের মেয়ে!" এই বলিয়া বুড়ী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

এদিকে শ্রান্তক্লান্ত ক্ষুধাতুর সুধা বাগানে অশ্বত্থ তলায় শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। উঠিয়া দেখিল রাস্তার পরপারে দুইটি বালক সেই রৌদ্রে মাঠের উপর ফুটবল খেলিতেছে। তাহাদের খেলা দেখিতে দেখিতে সে ক্ষুধা তৃষ্ণা শ্রান্তি সমস্ত ভুলিয়া গেল। মাঝে মাঝে বলটা রাস্তায় আসিয়া পড়িতেছিল তাহার মনে হইতেছিল—এই বুঝি তাহার উপর আসিয়া পড়ে—সে ভীত হইয়া উঠিতেছিল অথচ খেলা হইতে নয়ন ফিরাইতেও পারিতেছিল না। একবার একটা গরুর গাড়ির উপর বলটা পড়িয়া ঠিকরিয়া দূরে চলিয়া গেল; গাড়োয়ানটা সুমধুর কণ্ঠে বালকদিগকে আত্মীয়তা সম্ভাষণ করিতে করিতে গরুর লেজ মলিয়া দিল, গরু দুইটা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। সুধা হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। হাসিতে হাসিতে অন্য মনে অশ্বত্থ তল হইতে উঠিয়া রাস্তার নিকটবর্ত্তী আর একটি বৃক্ষতলে আসিয়া দাঁড়াইল। এই সময় একটি বালক একটি ক্ষুদ্র পিঞ্জর হস্তে লইয়া চলিয়াছিল, সুধা ভাবিল 'আহা এটি যদি আমার পাখী হয়'। সুধা আত্মহারা ভাবে সেইদিকে ধাবিত হইল। সহসা ফুটবলের গোলাটা তাহার গাত্র স্পর্শ করিয়া চলিয়া গেল। সুধা যে বেশী আঘাত পাইয়াছিল তাহা নহে, আকস্মিক একটা আতঙ্কে তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল,—সে পথিমধ্যে বসিয়া পড়িল।—কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রকৃতিস্থ হইয়া আবার উঠিয়া দাঁড়াইল। তখনো তাহার মন হইতে সে ভয়ের ভাব যায় নাই, তখনো তাহার দেহ বিকম্পিত হইতেছে মস্তক ঘুরিতেছে তথাপি সে করুণকণ্ঠে ডাকিল—"ওগো এদিকে, এদিকে; ওটি কি আমার পাখী—একবার দেখাও না গো?" এই সময় একটি তীক্ষ্ণ স্বর তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল—"বাবারে এমন মেয়ে ভূভারতে দেখিনি! ধর্ম্ম কর্ম্ম সব পড়ে রইল, উনি এই খানে এসে খেলা দেখছেন!" —সুধা অপরাধীর করুণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল। পার্শ্ব হইতে সেই পিঞ্জরধারী বালক আসিয়া কহিল, এটি কি আপনার পাখী আমি ধরে এনেছি।" বিধু কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া খাঁচাটি লইয়া আনন্দে বলিয়া উঠিল "দিদি দিদি তোমার পাখী, সত্যি তোমার পাখী, দেখ।" সুধার গণ্ড বাহিয়া ধীরে ধীরে অশ্রুধারা বাহিয়া পড়িল।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য।

বৈদিককালের সামগান হইতে আমরা জানিতে পারি যে তুগ্রার পুত্র হতভাগ্য ভুজ্য বাণিজ্যব্যপদেশে যেখানে "জল" হইতে স্থল দেখা যায় না এমন স্থলেও যাতায়াত করিতেন। পরলোকগত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার "প্রাচীন ভারতের সভ্যতা" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে সমুদ্রযাত্রা করিতেন

বেদের অনেকস্থলে, তাহার উল্লেখ আছে। (১।১১৬,৩ এবং ৪)। পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে সপ্তম শ্লোকে বরুণদেব আকাশচারী পক্ষী ও সমুদ্রগামী জাহাজের গতায়াতের পথ যে অবগত ছিলেন তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়।* ৪।৫৫,৬,—যাঁহারা অর্থোপার্জ্জনের জন্য সমুদ্রযাত্রা করিতেন, তাঁহারা যাত্রা করিবার পূর্ব্বে সমুদ্রের উপাসনা করিতেন। ৭.৮৮,৩,—বশিষ্ট বলিয়াছেন, তিনি এবং বরুণ নৌকা করিয়া একবার সমুদ্রে গিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আদিম হিন্দুজাতীয় ব্যক্তিগণ সমুদ্রযাত্রা এবং বাণিজ্যার্থ সমুদ্রপথে গমনাগমন করিতেন।

মনুর অষ্টম অধ্যায়ে ১৫৭ শ্লোকে আমরা দেখিতে পাই যে, যেস্থলে টাকা কর্জ্জ দিলে টাকা আদায়ের কিছুই নিশ্চয়তা নাই, সেই প্রকার টাকার সুদ যে সকল ব্যক্তি সমুদ্র-যাত্রায় অভ্যস্থ তাঁহারাই নির্দ্ধারণ করিবেন। ঐতিহাসিক এলফিনষ্টোন এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে এই শ্লোক হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে মনুর সময়েও হিন্দুগণ সমুদ্রযাত্রা করিতেন †। মনুকে যদি আমরা খৃষ্ট জন্মের দশ শতাব্দী পূর্ব্বে স্থান দান করি, তাহা হইলে আমরা প্রমাণ করিতে সক্ষম হইব যে ইহার পূর্ব্বেও পূর্ব্বদেশের সহিত পশ্চিমের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। খৃষ্ট জন্মের ত্রিশ কি পঁচিশ শতাব্দী পূর্ব্বে ফিনিসিয়ান জাতি যে পথে স্বদেশত্যাগ করিয়াছিলেন, স্থলপথে সেই পথ দিয়া পণ্যাদি পশ্চিমাঞ্চলে প্রেরিত হইত। এই পথ দিয়াই জর্ম্মাণি এবং স্কাণ্ডিনেভিয়ার পূর্ব্বাঞ্চলের হস্তিদন্ত নির্ম্মিত দ্রব্যাদি সরবরাহ হইত।‡ এলফিনষ্টোন সাহেবও স্বীকার করিয়াছেন যে মনুর সময়ের পূর্ব্বেও ভারতবর্ষীয়েরা ভূমধ্যসাগরান্তর্গত বন্দরের সহিত বাণিজ্য করিতেন। কিন্তু তাঁহার মতে বাণিজ্যকারিগণ সমুদ্রপথে কি স্থলপথে যাত্রা করিতেন তাহা ঠিক বলা যায় না।

* "The Chinese and Indian navigators were conducted by the flight of birds." Gibbon.: Fall & Decline of the Roman Empire. (Vol. III. Chap.XLI.)

† "As the word used in the original for Sea is not applicable to any inland waters, the fact may be considered as established, that the Hindus navigated the ocean as early as the age of the Code."

‡ "By it also the eastern arts of pottery, ivory-turning, glass-making, enamelling, and wood carving were at last carried into the remotest recesses of Germany & Scandinavia and profoundly influenced the primitive civilizations of those countries. The appearance among the pre-historic remains of Switzerland and Denmark of arms and implements of bronze, in succession to spear and arrowheads of flint, generally affirmed to be one to the displacement of the primeval savage tribe of the west by the immigration of a new races of a higher civilization from the East &c."

—Birdwood: "Reports of the Old records of the India Office."

তবে তাঁহারা, যে পথেই যাত্রা করুন, ইহা একরূপ সর্ব্ববাদীসম্মত যে ভারতবর্ষের সহিত 'পশ্চিমের' বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। *

প্রকৃতপক্ষে, ভারতবর্ষের মূল্যবান বাণিজ্য সম্ভার পুরাকালের সকল দেশবাসীকেই প্রভূত পরিমাণে প্রলুব্ধ করিত। ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্যের সৌকর্য্যার্থ পথ আবিষ্কারে যে সকল জাতি সচেষ্টিত ছিলেন -তাহার মধ্যে ইহুদীগণ বাণিজ্যে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। জেনেসিসের ৩৭ অধ্যায়ের ২৫,২৮ এবং ৩৬ প্যারাগ্রাফে আমরা এ বিষয়ের বিশেষ উল্লেখ দেখিতে পাই। ভারতবর্ষে উৎপন্ন নানাপ্রকার দ্রব্যাদি রাজা সলোমানের দরবারে শোভা পাইত। বাইবেল পাঠে (1. Kings X. 22) স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে অনেক ভারতীয় দ্রব্য ফিনিশিয়ান এবং ইহুদী বণিকদিগের দ্বারা তথায় নীত হইত। অনেকগুলি হিব্রু কথার উৎপত্তি দেখিলে বেশ হৃদয়ঙ্গম হয় যে ভারতীয় শব্দ হইতেই সেগুলির ব্যুৎপত্তি হইয়াছে। সংস্কৃত 'কাপ' শব্দ হইতে হিব্রু কফ্ এবং Shenhabbim (হস্তী-দন্ত—Shen-a-hibbim শব্দের সংক্ষেপ) শেষাংশ সংস্কৃত হইতে গৃহীত হইয়াছে। রাজা সলোমানের কপি, ময়ূর এবং চন্দনকাষ্ঠ সমস্তই ভারত হইতে নীত হইয়াছিল। রাজা হিরামের জাহাজের বোঝাই মাল মধ্যে আমরা যে সমস্ত দ্রব্যাদি দেখিতে পাই তাহা সমস্তই ভারতীয়। কেবলমাত্র যে শুধু দ্রব্যবাচক কতকগুলি শব্দ হিব্রু ভাষান্তরিত হইয়াছিল তাহা নহে,—বস্তুতঃ বাইবেলে Ophir (অফীর) বলিয়া যে স্থানের কথা উল্লেখ আছে তাহা নিঃসন্দেহে মালাবার উপকূলেই অবস্থিত। সম্ভবতঃ ভারতীয় বণিকগণ জাহাজে করিয়া সিন্ধুনদ হইতে বোম্বাই বন্দরে এই সমস্ত প্রেরণ করিতেন এবং সেই স্থান হইতে ফিনিশিয়ান বা অন্যান্য জাতিরা জেরুজালেম পৌঁছাইতেন।

খৃষ্টজন্মের ৫৮৮ বৎসর পূর্ব্বে নেবুচাডেজর ইহুদীদিগের নগর ধ্বংস করিলে, ইহুদীজাতীয় কয়েকজন বণিক নেবুচাডেজারের সহিত বেবিলনে আইসেন। জনপরিপূর্ণ এবং সমৃদ্ধিশালী নগরে আসিয়াও তাঁহারা সমভাবে তাঁহাদের বাণিজ্যাদি কার্য্যে ব্যাপৃত রহিলেন। নরপতি নেবুচাডেজর তাঁহাদের যথেষ্ট সাহায্য করিতে লাগিলেন এবং বাণিজ্যদ্বারা তাঁহারা শীঘ্রই অত্যন্ত ধনশালী হইয়া পড়িলেন। বিশেষতঃ, এই সময়ে ভারতবর্ষের সহিত বাবিলোনের সম্পর্ক কিছু ঘনিষ্টতর হওয়াতে তাঁহারা ভারতীয় পণ্যাদি দ্বারা বিশেষ লাভবান হইতে লাগিলেন। ধনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহুদীদিগের জনবৃদ্ধিও হইতে লাগিল। পারস্য এবং সিরিয়ায় ইহাদের অনেকে বসবাস করিতে লাগিলেন এবং ভারতবর্ষ ও বিশেষতঃ মালাবার উপকূলের সহিত বাণিজ্যসম্পর্ক

* "It seems not improbable that it was in the hands of the Arabs and that part crossed the narrow Sea from the Coast on the west of Sind to Muscat and then passed through Arabia to Egypt & Syria; while another branch might go by land or along the Coast to Babylon & Persia.—Elphinstone.

আরও ঘনিষ্ঠতর হইল। ঠিক কোন সময়ে ইহাদের বংশধরগণ কোচিনে স্থায়িভাবে আসিয়াছিলেন তাহা সঠিক বলা যায় না; তবে কোচিনে ইঁহাদের যে মন্দির (Synagogue) আছে, তথায় রক্ষিত তাম্রপাত্রে যে সমস্ত বিবরণ খোদিত আছে, তাহাতে বোঝা যায় যে, ইঁহারা নেবুচান্দারের রাজত্বের শেষভাগে এদেশে আসিয়া বসবাস করিয়াছিলেন। এই সমস্ত খোদিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে সংখ্যায় তাঁহারা তখন দুই [illegible] ছিলেন, তাঁহারা জামোরিনের দ্বারা বিশেষরূপে অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন এবং ইচ্ছামত তাঁহাদের ধর্ম্মযাজনা করিতে পারিতেন। তাঁহারা ভূমি ক্রয় করিয়া সেখানে মন্দির নির্ম্মাণ করেন এবং নিজেরাই তাঁহাদের মধ্য হইতে একজন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া নিজেদের পরিবারবর্গের শাসনভার তাঁহার উপর ন্যস্ত করেন।

হোমার পাঠে আমরা অবগত হই যে, রাজা মেনেলিয়াসের শয়ন-পালঙ্কে হিন্দুস্থানের হস্তিদন্তসুশোভিত কারুকার্য্য ছিল। গ্রীক ভাষায় হস্তীর কোন প্রতিশব্দ ছিল না এবং সেইজন্য* প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হেরোডোটাস যখন প্রথম হস্তী দেখেন তখন ইহাকে Ivory বা গজদন্ত বলেন।+ অনেক সংস্কৃত-শব্দ গ্রীসদেশীয় ভাষায় এখনও পাওয়া যায় এবং ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে তখন ভারতের সহিত গ্রীসের বাণিজ্যসম্পর্ক ছিল। দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত করকাই নামক স্থানের নাম গ্রীসদেশীয় পুস্তকে পাওয়া যায়। এই করকাই অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী নগর বলিয়া খ্যাত ছিল এবং তখন এস্থানে যথেষ্ট পরিমাণ মুক্তা আমদানী হইত

কতিপয় গ্রীক গ্রন্থকারের মতে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কেবলমাত্র "নদী" লইয়া থাকিতেন। তবে ইহা ঠিক যে সে সময় [illegible] সন্দেহই নাই।

[illegible] নামক এক গ্রন্থকার ভারতীয় [illegible] সমকালীন বলিয়াছেন যে, চতুর্থশ্রেণীর লোক [illegible] প্রস্তুতকারক ও নাবিক" এবং ইহারা নদীতে যাতায়াত করে। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, তৎকালে সমুদ্রে পোতবাহী নাবিক কেহই ছিল না। আলেকজান্দারের নৌসেনাপতি নিয়ার্কাসও এই কথা বলিয়া গিয়াছেন। সিন্ধু হইতে ইউফ্রেটিস পর্য্যন্ত জলপথে নিয়ার্কাস অতি অল্পসংখ্যক মৎস্যতরী ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার তরী দেখেন নাই। সিন্ধুনদীরেও বেশী নৌকা ছিল না। এবং আলেকজান্দারের জন্য ব্যবহৃত বৃহৎ রণতরীগুলি তাঁহাকে নিজেই প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল এবং ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্ত্তী নাবিকদ্বারাই চালনা করিতে হইয়াছিল। নিয়ার্কাসের এ বৃত্তান্ত আমরা পরে প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করিব।

মাসিডনাধিপতি আলেকজান্দারের অভিযানের অন্য যে ফলই হউক না কেন, ইহাতে যে ব্যবসা বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা করিয়াছিল সেবিষয়ে কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বেড্‌রিক সভাই বলিয়াছেন যে "It is impossible to deny that Con-

* "Used the Sanskrit-derived word by which the tusks were known in Commerce."

querors were often in early times pioneers of civilisation! Commerce following peacefully along their bloody track and compensating for their devastation by the blessings which it diffused." Mr. Crindleও তাঁহার ভূমিকায় ঠিক এই কথাই লিখিয়াছেন। বস্তুতঃ আলেক-জান্দার-কর্তৃক উত্তর-পশ্চিম-ভারত বিজয় ও মিশরে আলেকজান্দ্রিয়া নগরী স্থাপনে ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিয়াছিল। এই অভিযানের পরোক্ষ ফলেই চন্দ্রগুপ্তের রাজদরবারে গ্রীসদূত মেগাস্থিনিস আগমন করিয়াছিলেন। মেগাস্থিনিস ভারতীয় বন্দরাদির কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তৎকালীন রাজমন্ত্রী চাণক্য "বাণিজ্য" দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণের ব্যবস্থা দিয়াছেন, এবং তখন যে সোন ও গঙ্গা নদীতীরে অনেক বৃহৎ বন্দর ছিল তাহারও উল্লেখ পাওয়া যায়। শোন নদীর তীরবর্ত্তী লুপ্তপ্রায় প্রস্তরের বাঁধ এখনও বৃহৎ বন্দরের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। এলফিনষ্টোনের কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে যখন নিয়ার্কাস সিন্ধুতীরে বাণিজ্যের আয়োজনমাত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তখন গঙ্গাগর্ভে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নৌকার আদৌ অভাব ছিল না।

সম্প্রতি পণ্ডিতপ্রবর চাণক্য প্রণীত একখানি হস্তলিখিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। এই পুস্তক মহিশূরের পুস্তকাগারের অধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্যামশাস্ত্রী ইংরাজীতে অনুবাদ করিতেছেন। এই পুস্তকপাঠে তদানীন্তন ভারতের অনেক বিষয় বিশেষভাবে জানা যায়। পুস্তকখানির নাম "অর্থশাস্ত্র"। অর্থশাস্ত্রের দ্বিতীয় খণ্ডের ষোড়শ অধ্যায়ে দেখা যায় যে চাণক্য বাণিজ্যাধ্যক্ষের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহারা বৈদেশিক দ্রব্য আমদানী করিবে তাহাদের অনুগ্রহ দেখাইতে হইবে এবং যে সমস্ত নাবিক ও বণিকগণ এই সমস্ত দ্রব্যাদি আনয়ন করিবে তাহাদের কোনরূপ শুল্ক প্রদান করিতে হইবে না। অষ্টাদশ অধ্যায়ে জাহাজের অধ্যক্ষের এবং সার্থবাহের কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহা হইতে আমরা ধারণা করিতে পারি যে বাণিজ্যবহুল দেশ না হইলে চাণক্য তদীয় পুস্তকে এই সমস্ত বিধান লিপিবদ্ধ করিতেন না।

খৃষ্টের জন্মের দুইশত বৎসর পূর্ব্বে আগাথারকাইডিস নামক অন্য একজন গ্রীসীয় গ্রন্থকার ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলবর্ত্তী বন্দর সমূহের সহিত মিশর এবং দক্ষিণ-আরবের বাণিজ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়া গিয়াছেন যে ভারতবর্ষ হইতে ইয়েমেন বন্দরে জাহাজাদি আসিত।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে আমরা এই বাণিজ্য-সংক্রান্ত অনেক বিষয় Periplus of the Erythrean sea নামক গ্রন্থে জানিতে পাই। এই গ্রন্থকার লোহিতসাগর ও আরবদেশের দক্ষিণপূর্ব্ব-সমুদ্রতীরের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সিন্ধুতীর হইতে কমারিণ অন্তরীপ দিয়া স[illegible]ন উপকূলের বৃত্তান্ত এবং তৎসহ এই সমস্ত স্থানের বাণিজ্যাদি বিষয়ক প্রত্যেক বিষয়ই বিস্তারিত লিখিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষ হইতে জাহাজাদি পারস্য উপসাগর হইয়া আরব দিয়া লোহিতসমুদ্রে যাতায়াত

করিত এবং মিশর হইতে গ্রীক বণিকগণ লোহিতসাগর হইয়া মালাবার কূলে আসিত। ভারতীয় উপকূলে ভারতীয়েরা নানারূপ ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিত—এবং যে সকল জাহাজ সিন্ধুনদ দিয়া দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ না করিতে পারিত তাহাদের দ্রব্যাদি বহন করিবার জন্য নদ মুখে অনেক নৌকা অপেক্ষা করিত। বরোচ আসিবার জন্য এবং পথ দেখাইবার জন্য অনেক মৎস্যতরী পরিচালকের (Pilot) কার্য্য করিত। বরোচের দক্ষিণে অনেক বন্দর ছিল এবং বঙ্গোপসাগর হইয়া অনেক বড় বড় নৌকা সুমাত্রা এবং মালয় দ্বীপে যাতায়াত করিত। এই পুস্তক পাঠে সহজেই ধারণা করা যায় যে নিয়ার্কাস যদিও সিন্ধুনদীতে নৌকা দেখেন নাই কিন্তু সেই সময় গঙ্গাবক্ষে অনেক তরী বাণিজ্য ব্যপদেশে নিযুক্ত থাকিত। দাক্ষিণাত্যেও তখন অনেকে যাতায়াত করিতেন তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। জাভা-দ্বীপের ইতিহাস পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে কলিঙ্গ হইতে অনেক হিন্দু তথায় যাইয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন এবং এইক্ষণেও তথায় অনেক সুন্দর সুন্দর হিন্দু মন্দির দেখা যায়।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে সুপ্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক ফাহিয়ান আমাদের দেশে আইসেন। যবদ্বীপের সহিত ভারতবর্ষের যে যথেষ্ট সম্পর্ক ছিল সেকথা তিনিও উল্লেখ করিয়াছেন। পর্য্যটক হুয়েন সাং পাঠেও আমরা জানিতে পারি যে ভারতবাসীরা তখন বাণিজ্যাদি কার্য্যে বিশেষরূপে লিপ্ত ছিলেন।

মিসর এবং সিরিয়া দেশের কথা আমরা পূর্ব্বে কিছু উল্লেখ করিয়াছি। রোমক সম্রাট অরিলিয়াসের সিরিয়া বিজয় হইতেই সিরিয়া ও ভারতবর্ষের বাণিজ্য সম্পর্ক একরূপ লোপ পায়। কিন্তু মিসরের সহিত বাণিজ্যবন্ধন ক্রমেই দৃঢ়তর হইতেছিল। বস্তুতঃ আলেকজান্দারের সময় হইতে মিসরের সহিত যে বাণিজ্য সম্পর্ক সংস্থাপিত হইয়াছিল টলেমীদিগের সময়ে তাহা আরও ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠে। খৃষ্ট জন্মের ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে রোমক সম্রাট অগষ্টাস মিসর বিজয় করিলে এই বাণিজ্য কার্য্য রোমকদিগের হস্তেই পতিত হয়। পূর্ব্বাঞ্চলের দ্রব্যাদি রোমকগণ এতদিন অসুবিধার সহিত ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন কিন্তু এইক্ষণে মিশর লাভ করিয়া জাহাজাদি নির্ম্মাণ দ্বারা নির্ব্বিবাদে এইস্থলে তাঁহারা বাণিজ্য চালাইতে লাগিলেন। দুই দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যকারীগণের সাহসও বাড়িতে লাগিল। তাঁহারা পূর্ব্বতন বক্র পথ পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশ বাবেলমণ্ডবের কূল হইতে সমুদ্র দিয়া বরাবর মালাবার ও গুজরাটে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। হিপালাস নামক একজন পোতবাহক সাময়িক বায়ুর গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া পূর্ব্বতন পথ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রমধ্য দিয়া যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। ইহাতে পূর্ব্বের তুলনায় অর্দ্ধেক সময় সংক্ষেপ হইয়া গেল।

এই সময় হইতে পশ্চিম রোমের পতন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সহিত পশ্চিম প্রদেশের অবাধে বাণিজ্য চলিয়াছিল। প্রতি বৎসর একশত বিশখানি জাহাজ মিসরের অন্তর্গত মায়স হর্ম্মস বন্দর হইতে মালাবারকূলে আসিল

এবং বেরেনস বন্দরে আসিত এবং তথা হইতে লঙ্কাদ্বীপে যাইত। লঙ্কা তখন একটী প্রধান বন্দর ছিল। তখন এই স্থানে বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা এবং কর্ণাট হইতে ব্যবসায়িগণ স্ব স্ব প্রদেশান্তর্গত সূক্ষ্ম এবং অন্যান্য মূল্যবান বস্ত্রাদি আনয়ন করিত এবং এইস্থানে যথেষ্ট ক্রয় বিক্রয় চলিত। রোমকগণ রৌপ্য এবং স্বর্ণের বিনিময়ে এতদ্দেশীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া উপরোক্ত কেবল বিলাসিনী জাহাজ পণ্যদ্রব্য পরিপূর্ণ করিয়া দেশে ফিরিতেন। ডিসেম্বর কি জানুয়ারি মাসে লঙ্কা হইতে এই নৌবাহিনী রেশম, মসলিন, মসলা, গন্ধদ্রব্য এবং ভারতীয় মূল্যবান মণিমুক্তা লইয়া মিসরে ফিরিত। এই বাণিজ্যের ফলস্বরূপ দাক্ষিণাত্যে এখনও যথেষ্ট পরিমাণ রোমক-মুদ্রা পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথ লিখিয়াছেন যে, ১৮৫১ সনে মালাবার উপকূলে কানানোর নামক স্থানে প্রচুর রোমক মুদ্রা পাওয়া গিয়াছিল এবং তদ্দেশীয় প্রচলিত স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা এখনো মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়।* প্লিনি এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে "Amidst the rude igrorance which characterised the middle ages in Europe, the commerce with India served to soften and instruct these nations who participated in it."

৩২৪ খৃষ্টাব্দে রোমের রাজধানী কনষ্টাণ্টিনোপলে স্থানান্তরিত এবং সঙ্গে সঙ্গে "পশ্চিম সাম্রাজ্যে"র পতন আরম্ভ হইলে লোহিতসাগর এবং মিসর পথে ভারত-বাণিজ্যও একরূপ রুদ্ধ হইয়া গেল। আলেকজান্দ্রিয়ার সওদাগরগণের বিলাসিতা-স্রোতে গা ভাসাইয়া দেওয়াই ইহার একটা প্রধান কারণ। ঠিক এই সময়েই আরবদিগের মধ্যে বাণিজ্যলিপ্সা বলবৎ হইয়া পড়ে আরবদেশীয়েরা পূর্ব্ব হইতেই নৌবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। এই সময়ে তাঁহারা হজরৎ মহম্মদ প্রচারিত মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া অপরকে এই ধর্ম্মাবলম্বী করিবার জন্য অন্যান্য দেশ গমনে ব্রতী হইলেন। ইহারই ফলে ভারতবর্ষের সহিত ইঁহারা বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করেন, কেননা ইহাতে ধর্ম্ম অর্থ উভয় দিকেই লাভ। এই জন্য ইঁহারা বৎসর বৎসর সুসজ্জিত অনেকগুলি জাহাজ কেবলমাত্র ভারতবর্ষের সহিতই বাণিজ্যার্থ প্রেরণ করিতে লাগিলেন। মালাবারের হিন্দুরাজাকে নানা প্রলোভনে বশীভূত করিয়া তাঁহারা উহার উপকূলে বাস করিতে স্থান পাইলেন। জনরব এই যে জামোরিন মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন। যাহা হউক, আরবদিগের বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইতে লাগিল। মিসরবাসিগণ সুবিধা মত দরে ভারতীয় দ্রব্যাদি পাইতে লাগিলেন বলিয়া নিজেরা বাণিজ্য বিরত হইলেন। পারসিকেরা প্রথমতঃ বাণিজ্যাদি ব্যাপারে বীতরাগ ছিলেন কিন্তু ভারতীয় বণিকদিগের প্রমুখাৎ পারস্যোপসাগর হইতে মালাবার ও [illegible] যাইবার

* মিঃ স্মিথ ঐ মুদ্রাপ্রাপ্তির কথা উল্লেখ করিয়া মন্তব্যস্বরূপ লিখিয়াছেন যে "It is certain that the Pandya state during the early centuries of the Christian era shared along with the Chera Kingdom of Malabar a very lucrative trade with the Roman Empire."

প্রশস্ত পথ অবগত হইয়া ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্যে ব্রতী হইলেন। বৎসর বৎসর তাঁহারা তরী সজ্জিত করিয়া মালাবারের ভিন্ন ভিন্ন বন্দরে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। এই বাহিনী নয় কি দশ সপ্তাহে তাহাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া নিজেদের দেশজাত দ্রব্য অথবা অর্থ বিনিময়ে ভারতীয় দ্রব্য সম্ভারসহ দেশে প্রত্যাগমন করিত। নৌকা সকল ইউফ্রেটিস নদী দ্বার হইতে আসিরিয়া এবং মেসোপটেমিয়ায় যাতায়াত করিত এবং সেই জন্য কনষ্টাণ্টিনোপলের অধিবাসিগণ তিনা পারস্রমে ভারতীয় দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হইতেন। এইরূপে বিপদসঙ্কুল বাণিজ্যপ্রবৃত্তি তাঁহাদের লুপ্ত হইল।

এই সমস্ত কারণে সপ্তম শতাব্দীতে পারসিক এবং আরবিকগণই ভারতীয় বাণিজ্য অনেকটা একচেটিয়া করিয়া তুলিলেন; বিশেষতঃ পারসিকেরা রেশমের ব্যবসায় সম্পূর্ণ করায়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। তাঁহারা চীনের রেশম লঙ্কায় খরিদ করিয়া দেশে চালান দিতে লাগিলেন। এই সময় পারসিকদিগের কনষ্টাণ্টিনোপলের সম্রাটদিগের সহিত দ্বন্দ্ব ঘটাতে, তাতারদেশের মধ্য দিয়া এতদিন যে চীনের রেশম আসিত তাহাও তাঁহারা আটক রাখিয়া এই সমস্ত দ্রব্যাদির মূল্য ইচ্ছামত ধার্য্য করিতে লাগিলেন। সম্রাট জষ্টিনিয়ান নানাবিধ উপায়ে ইহার প্রতিকারের চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অবশেষে এক অসম্ভাবিত উপায়ে তাঁহার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইল। দুই জন যতি (monks) প্রচার কার্য্যে চীনে এবং ভারতবর্ষে প্রেরিত হইয়া গুটিপোকা (Silk worm) রক্ষণ এবং কি উপায়ে রেশম প্রস্তুত হয় তাহা জানিতে পারেন। ইঁহারা স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক জষ্টিনিয়ানকে এই বৃত্তান্ত অবগত করিলে পর সম্রাট তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার চীনে প্রেরণ করেন। কয়েক বৎসর তথায় থাকিয়া তাঁহারা রেশম প্রস্তুত প্রণালী উত্তমরূপে শিখিয়া, ফিরিবার সময় গুটিপোকার ডিম কতকগুলি একটি শূন্যগর্ভ বেতের অভ্যন্তরে লুকাইত করিয়া আনেন। এই সমস্ত ডিম হইতে কীট উৎপন্ন হইল, এবং পোকাগণ তুঁতগাছের পাতা দ্বারা পালিত হইতে লাগিল। ইহাদের পর্য্যবেক্ষণ করে রীতিমত প্রহরী নিযুক্ত হইল এবং আশাজনক সুফল লাভ করায় সম্রাট, পিলোপনিসাস এবং আর কয়েকটি গ্রীসীয় দ্বীপে রেশম প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত করিলেন। এইরূপে ক্রমে, চীনের রেশমের চালান বন্ধ হওয়াতে পূর্ব্ব দেশের সহিত রোমের বাণিজ্য সম্বন্ধ অনেক পরিমাণে কম হইয়া গেল তথাপি হিন্দুস্থানের দ্রব্যসম্ভার মিসর এবং সিরিয়া হইতে ইতালি এবং গ্রীসে পৌঁছিতে লাগিল কিন্তু পরবর্ত্তী কয়েক শতাব্দীর যুদ্ধ বিগ্রহে ক্রমে ক্রমে ইহাও লোপ পাইয়া আসিল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মহম্মদের প্রচলিত ধর্ম আরববাসিদিগকে এক নূতন জীবনে অনুপ্রাণিত করে। মহম্মদের মৃত্যুর পর বহুসংখ্যক মুসলমান সৈন্যদল পারস্য বিজয় এবং তথায় ইসলাম ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়া খলিফা রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এই

কারণে ভারতবর্ষীয় বাণিজ্য মুসলমানদিগের হস্তে পতিত হয়। বাণিজ্যের প্রতি লোকের তাহাতে বিশেষ দৃষ্টি পড়ে ও বণিকদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য খলিফাগণ বসোরায় বন্দর স্থাপিত করেন। তাঁহাদের উদ্যোগ এবং যত্নে পারসিক বাণিজ্য ক্রমেই উন্নতির মার্গে উঠিতে থাকে। ভারতবর্ষীয় পণ্য বিক্রয়ে বিশেষ লাভ দেখিয়া পারসিকেরা সিরিয়াতেও এই সমস্ত দ্রব্যের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। ৬৩৯ খৃষ্টাব্দে খলিফ আমরুণ মিসর ও সিরিয়া জয় করিলে পর আলেকজান্দ্রিয়ার বণিকগণ, বাইজানসিয়ান রাজত্বের সহিত বাণিজ্য করিতে নিষিদ্ধ হয় এবং গ্রীক ও মুসলমানদিগের মধ্যে ক্রমাগত যুদ্ধ হওয়াতে গ্রীস ও ইতালির লোক ভারতীয় পণ্য ব্যবহারে কিছু দিনের জন্য সম্পূর্ণরূপে অক্ষম হইয়া পড়ে।

যে কয়েকজন ধর্ম্মযাজক চীন হইতে গুটি-পোকা লইয়া কনষ্টাণ্টিনোপলে গিয়াছিলেন তাঁহারা জানিতেন যে খোরাশান দেশস্থিত অক্সাস নদী তীরে আমল ও আকেনজা (বর্ত্তমান আকেনজল) বন্দরে চীন ও ভারতীয় সকল প্রকার পণ্যই পাওয়া যায়। কনষ্টাণ্টিনোপলের কয়েকজন বণিক তাঁহাদের কর্ম্ম-চারিগণকে এই স্থলে প্রেরণ করেন। তাঁহারা অক্সাস হইয়া কাস্পিয়ান সমুদ্র পথে, সাইরাস নদীতীরস্থ বন্দরে পৌঁছিয়া পরে দ্রব্যাদি স্থল-পথে ফ্যাসিসে লইয়া যাইতেন। পুনরায় ফ্যাসিস হইতে নৌকায় করিয়া নদীমুখস্থ নগরে নগরে দ্রব্য বিক্রয়পূর্ব্বক কৃষ্ণসাগর হইয়া তাঁহারা কনষ্টাণ্টিনোপল পৌঁছিতেন। ইহাতে অসুবিধা ও বিপদ যথেষ্টই ছিল কিন্তু তত্রাপি বণিকগণ লাভের আশায় বিপদ তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। দুই বৎসর এই ভাবেই ভারতীয় পণ্য ইউরোপে পৌঁছিত।

মুসলমানগণ এই সময়ে প্রবল আধিপত্য বিস্তার করিতে ছিলেন। আফ্রিকার উত্তরাংশ ও স্পেনের অধিকাংশ তাঁহাদের হস্তগত হইয়াছিল। মালাবারে তাঁহারা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং বঙ্গ, পেগু, শ্যাম এমন কি চীনদেশে পর্য্যন্ত বাণিজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন। কাইরো নগরে যখন বন্দর হইল, তখন শক্রভাবাপন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী ইতালি ও গ্রীস ব্যতীত ইউরোপের অন্যান্য সকল প্রদেশই এই বাণিজ্যের সুবিধা ভোগ করিতে লাগিল। বলা বাহুল্য গ্রীস ও ইতালিবাসীরা ইহা আদৌ পছন্দ করিতেন না। তাহার দেশের মধ্য দিয়া যে যৎসামান্য পণ্যদ্রব্য তথায় পৌঁছিত তাহাতে তাঁহাদের লিপ্সা ক্রমেই বলবৎ হইতে লাগিল।

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে ভিনিস নগরীও বাণিজ্য ব্যাপারে বিশেষরূপে অগ্রসর হইয়াছিল। ৯৯২ খৃষ্টাব্দ হইতেই ভিনিস, আলেকজান্দ্রিয়া ও কনষ্টাণ্টিনোপলের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক সংস্থাপিত করিয়াছিল এবং ১১১৫ খৃষ্টাব্দে ভিনিস, চীন ও ভারত হইতে রেশম এবং ৮১২ খৃষ্টাব্দে মসলা, ঔষধ এবং পশম আমদানী করিতে লাগিল। বলাবাহুল্য এই বাণিজ্য অত্যন্ত লাভ হইত। ধর্ম্মযুদ্ধের অব-সানের কিছু দিন পরে মুসলমান ও খৃষ্টান-দিগের মধ্যে পুনরায় সদ্ভাব ও তুষ্টি হইলে পর, আবার মিশর দিয়া ভারত পণ্যের চলাচল হইল এবং ফ্রান্স, ফ্লান্ডার্স এবং ইংলণ্ডের সক-লের উপরেই আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিল।

ভিনিসের পূর্ব্বেই জেনোয়ানগরী এই বাণিজ্যে ব্রতী হইয়াছিল, কিন্তু জেনোয়া যাহাতে ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যে লিপ্ত না হইতে পারে তজ্জন্য ভিনিস চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। উভয়ের এইরূপ বিবাদের সময় মেডিসিদের তত্ত্বাবধানে ফ্লরেন্স পূর্ব্বাঞ্চলের সহিত বাণিজ্যের সুবিধা ভোগ করিতে লাগিল। সেলিম ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে সিরিয়া ও মিসর জয় করিলে কৃষ্ণসাগরের পথে জেনোইসদিগের গতায়াত বন্ধ হইয়া যায় এবং ভিনিসিয়ানেরাই এই বাণিজ্য একচেটিয়া করিয়া লয়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে সাইপ্রাস ভিনিসিয়ানদিগের হস্তে পড়িলে সাইপ্রাসই বাণিজ্য-প্রধান স্থানে পরিণত হয়।

এই সময় তুর্কীদিগের অত্যাচারে ইউরোপের অনেক রাজত্ব জর্জ্জরিত হইয়া পড়ে এবং স্থলপথে ভারতবর্ষের বাণিজ্যাদি অসুবিধাজনক হওয়াতে আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করিয়া ভারতবর্ষে পৌছান যায় কিনা ইহাই সকলের চিন্তার বিষয় দাঁড়াইল। পঞ্চদশ শতাব্দী পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই পর্ত্তুগীজগণ এই পথ আবিষ্কার করিয়া বাণিজ্যের সুবিধা করিয়া দেলেন।

এইরূপে পণ্যাদি বিক্রয়ার্থ স্থলপথে ভারতের পশ্চিম প্রান্ত দিয়া ব্যাকট্রিয়ায় নীত হইত। বহু কিছু দিন তথা বিক্রয় করিয়া পরে যাত্রীরা ব্যাবিলোন পৌঁছিতেন। এই স্থানে ভারতীয় পণ্য-দ্রব্যের যথেষ্ট আদর ছিল। কাস্পিয়ান সাগরের তীর হইতে জাহাজ যোগে এবং পরে স্থলপথে কৃষ্ণসাগর হইয়া পণ্যাদি ভূমধ্য-সাগরের বন্দরসমূহে প্রেরিত হইত। ব্যাবিলন হইতে পালমারায়, পরে লেভান্ত পৌঁছিয়া পণ্যদ্রব্যাদির ক্রয় বিক্রয় চলিত। সাধারণতঃ, এই সমুদায় স্থলেই আরব ও ভারতীয় পণ্যসমূহের পরিবর্ত্তে ইউরোপীয় পণ্য বিনিময় করা হইত। স্থলপথে দ্রব্যাদি উষ্ট্রে বাহিত হইত। এই পথ অত্যন্ত কষ্টদায়ক ও বহুব্যয়সাধ্য ছিল, সুতরাং জলপথের আবিষ্কার হইলে আর এ পথে সাধারণতঃ কেহ গমনাগমন করিত না। নাবিকেরা ভারত সমুদ্র দিয়া গ্রীষ্মকালে পশ্চিমাভিমুখে গমন ও শীতকালে প্রত্যাগমন করিতেন।

ফিনিসিয়ানেরা যখন এই লাভজনক বাণিজ্যে ব্রতী ছিলেন তখন লোহিতসাগরের নিকটবর্ত্তী আরবের উপকূলে কয়েকটী বন্দর হস্তগত করিবার পর তথা হইতে স্থলপথে তাঁহারা পণ্যদ্রব্য টায়ার নগরীতে প্রেরণ করিতেন। ইহাতেও কম অসুবিধা হইত না। পরে, ভূমধ্যসাগরের রাইনকোলুরার বন্দর তাঁহাদের হস্তগত হইলে তাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে লোহিতসাগরের উপকূল, তথা হইতে রাইনকোলুরায়, পরে আবার তথা হইতে টায়ারে পৌঁছিতেন। ইহাতে [illegible] উহাতে হইলেও স্থলপথে যাতায়াত অপেক্ষা [illegible] সুবিধা হইত। খৃষ্টের জন্মের [illegible] বৎসর পূর্ব্বে টায়ার নগর ধ্বংস হইলে এবং আলেকজান্দার কর্ত্তৃক আলেকজান্দ্রিয়া প্রতিষ্ঠিত হইলে [illegible] যে অষ্টাদশশত বৎসর [illegible] যাতায়াত হইত। আলেকজান্দার প্রথম [illegible] অনুমোদন করেন কিন্তু তিনি তাঁহার সদিচ্ছা কার্য্যে পরিণত

করিতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই টলেমী মিশরের অধিপতি হইয়া অনেক অর্থব্যয়ে আলেকজান্দ্রিয়ায় একটি আলোকগৃহ নির্ম্মাণ করেন। তদীয় পুত্র সুয়েজের মধ্য দিয়া খাল কাটিবার প্রয়াসে ব্যর্থ মনোরথ হইয়া লোহিতসাগরের পশ্চিম কূলে বেরিনিস নামক একটি নগর প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতবর্ষ হইতে কপটসে ও তথা হইতে এই নগরীতে দ্রব্যাদি আনিয়া পরে নীলনদী ও অন্য একটি খালদ্বারা উহা আলেকজান্দ্রিয়ায় নীত হইত। *

যতদিন মিসর স্বাধীন ছিল ততদিন এই পথেই ভারতবর্ষের মূল্যবান দ্রব্যাদি তথায় পৌঁছিত। বেরিনিস হইতে ইউরোপীয় ও আফ্রিকাজাত দ্রব্য আরব ও পারস্য উপসাগরের কূলে এবং সে স্থান হইতে সিন্ধুতীরে পৌঁছিত। কেবল সিন্ধুতীরেই এই কার্য্য সীমাবদ্ধ থাকিত না; সম্ভবতঃ সমুদ্রতীরবর্ত্তী সকল বন্দরেই তাহারা যাতায়াত করিত। এই লাভজনক ব্যবসায় এক-চেটিয়া রাখিবার জন্য মিসরের রাজা অনেক জাহাজ প্রস্তুত রাখিতেন এবং রণতরীর সাহায্যে জলদস্যু দমন করিয়া বাণিজ্যের পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিতেন।

রোমকগণকর্ত্তৃক মিসর জয় হইলেও এই পথেই বাণিজ্য চলিত। আমরা পূর্ব্বেই বন্দরাদের নামোল্লেখ করিয়াছি। প্লিনির Natural History পাঠে আমরা এ বিষয়ে অনেক বৃত্তান্ত জানিতে পারি। প্লিনি লিখিয়াছেন যে ইউরোপীয় পণ্যদ্রব্য নীলনদ এবং একটী ক্ষুদ্র খাল দিয়া কপটসে লইয়া যাওয়া হইত। আলেকজান্দ্রিয়া হইতে কপটস ৩০৩ মাইল। তথা হইতে স্থলপথে লোহিতসাগরের উপকূলস্থ বেরিনিস ২৫৮ মাইল। জাহাজ গ্রীষ্মকালের মধ্যভাগে বেরিনিস হইতে ছাড়িয়া বাবেলমণ্ডব প্রণালীর নিকট কয়েকদিন বিশ্রাম করিয়া পরে মালাবার উপকূলস্থ মসিরিস বন্দরে যাত্রা করিত। বন্দরে পৌঁছিতে মোট ৯৪ দিন লাগিত। ইহার মধ্যে কপটস পর্য্যন্ত আসিতে দ্বাদশ দিবস, বেরিনিস পৌঁছিতেও তদ্রূপ, লোহিতসাগর আসিতে ত্রিশদিন এবং ভারতমহাসাগরে পৌঁছিতে ৪০ দিন লাগিত। প্লিনি পাঠে আমরা ইহাও অবগত হই যে, যে সমস্ত বণিকগণ বঙ্গোপসাগরে, বা মালকায় বাণিজ্য করিতে যাইত তাহারা গোদাবরীনদীর কোন বন্দর হইতে যাত্রা করিত। যে সকল জাহাজ এই কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত তাহা আকারে বৃহৎ ছিল। গ্রীস ও আরবদেশীয় বণিকগণ ইহাদের colandiophonta এবং চিন্দিতে (Coilan-di-pota) কয়লান্দিপোত নাম দিয়াছিল। নাবিকগণ গোদাবরী দিয়া কলিঙ্গ অন্তরীপ পরে সেস্থান হইতে দক্ষিণ হইয়া ত্রিবেণী দিয়া পাটনা পৌঁছিতেন।

পেরিপ্লাস পাঠে জানা যায় যে, সে সময়ে মসলিন এবং নানাপ্রকার ছিটের কাপড়, রেশমী সূত্র, বস্ত্র, নীল এবং অন্যান্য কার

* "Ptolemy thought it necessary to found a city on the western shore of the Red Sea, from whence the ships were to sail. He accordingly built one almost on the frontiers of Ethiopia and he gave it the name of his mother Berenice. The treasures of Arabia, India, Persia, and Ethiopia were landed and from thence they were carried on camels to Coptus where they were again shipped and brought down the Nile to Alexandria which transmitted them to all the west in exchange for merchandise afterwards exported to the east" Ancient History of Egypt.

রং, দারুচিনি, এবং অন্যান্য মসলা, চিনি, হীরকাদি নানাপ্রকার প্রস্তরাদি ও মুক্তা, ইস্পাত, ঔষধ, পণ্যদ্রব্য এবং কখন কখন ক্রীতদাসদাসীও ভারত হইতে বিদেশে রপ্তানী হইত। ১৮৭৯ সনের ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখের সোসাইটী অব আর্টস সংবাদপত্রে প্রথিতনামা সার জন বার্ডউড লিখিয়াছেন যে—

The History of Modern Europe and emphatically of England has been the quest of the aromatic gum resins and balsams and condiments and spices of India and the Indian Arcipelago." Abbe Renaudt নামক সুপরিচিত লেখক ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার Anciennes Relations des Indes et de la chino নামক গ্রন্থে নবম ও দশম শতাব্দীর দুই জন আরব বণিকের ভ্রমণবৃত্তান্তে ভারতীয় চা, মাটীর বাসন (Porcelain) আরক ও চাউলের উল্লেখ করিয়াছেন।

সিসিলির ইদ্রিসি পোর্সলেন, করোমণ্ডল উপকূলস্থ সূক্ষ্ম সূতার বস্ত্র, মালাবারের লঙ্কা ও এলাচি, সুমাত্রার কর্পূর, এবং হায়দ্রাবাদের নেবুর উল্লেখ করিয়াছেন।

টুডেলা নিবাসী বেনজামিন খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে ভ্রমণ ব্যপদেশে ভারতবর্ষে আসিয়া এখানকার রেশম, সূতার কাপড়, শনের সূত্র, রাই, নানাপ্রকার ডাল এবং মসলা রপ্তানীর কথা বলিয়াছেন। টানজিয়ার্সের ইবনবটুটা, ভারতবর্ষীয় মুসব্বর, কর্পূর, চন্দনকাষ্ঠ রপ্তানির কথা, ও ভিনিসদেশীয় মারিনো সানুটো লবঙ্গ, জায়ফল, জৈত্রী মণিমুক্তা ও মসলা, জেনোয়া নিবাসী হিরোণী মোতিসান্টো মুক্তা, দারুচিনি, মূল্যবান প্রস্তরাদি এবং চন্দনকাষ্ঠের রপ্তানীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

বোলন নগরবাসী Ludovico de Varthema নামক অপর একজন ভ্রমণকারী ১৫০ খৃষ্টাব্দে এতদ্দেশে আসিয়া গোলকন্দার কথা লিখিয়াছেন,—"অন্যান্য দেশের ৩০০ জাহাজ ভারতবর্ষে বাণিজ্যার্থে আইসে। পারস্য, তাতার, তুর্কস্থান, সিরিয়া, বারবারি প্রভৃতি দেশে ভারতজাত রেশম ও সূতার বস্ত্র রপ্তানি হয়।"

"এখানে (কালিকটে) মক্কা, বঙ্গ, টেনাসরিম, পিগু, করোমণ্ডল, লঙ্কা, পারস্য, আরব, সিরিয়া, তুর্কীস্থান, প্রভৃতি দেশ হইতে বণিকেরা বাণিজ্যার্থ আইসে।"

কালিকটের জামোরিন ভাস্কো ডিগামার মারফৎ পর্ত্তুগালের রাজাকে যে পত্র লিখেন তাহা হইতেও আমরা জানিতে পারি যে দারুচিনি, লঙ্কা, এবং মূল্যবান প্রস্তরাদি ভারতবাসীরা অন্যান্য দেশের স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতির সহিত বিনিময় করিতেন।

"Vasco de Gama, a nobleman of your household, has visited my kingdom and has given me great pleasure In my kingdom there is abundance of cinammon, cloaves, ginger, pepper and precious stones in great quantities. What I ask from thy country is gold, silver coral and scarlet."*

অধ্যাপক শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

* ভাস্কো ডি গামা ও কালিকটের জামোরিনের চিত্র খানি বিলাতের ব্লাক এণ্ড সন্সের কপি রাইট্। এই প্রবন্ধে ইহা প্রকাশের সম্মতি পাইয়া আমি তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ। লেখক

সামান্য অর্থাভাবে সৎকার করিতে পারিতেছি না, রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বে নিমতলার ঘাটে শব সৎকার না করিলে আমার চৌদ্দপুরুষ নরকগামী হইবে, আপনারা এ ব্রাহ্মণের উদ্ধার না করিলে আর কাহার নিকট গিয়া দাঁড়াইব” ইত্যাদি বাক্যে ভিক্ষাবৃত্তি চালাইত। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে শেষ রাত্রির গাড়ীতে যাঁহারা একাধিকবার যাতায়াত করিয়াছেন তাঁহারাই ইহা বেশ জানেন।

দ্বিতীয় ভিক্ষুক লালবাজারের পুলিশ আদালতের মোড়ে। ইনি পরিষ্কার ভদ্র-বেশধারী, ইহার অভাব অন্য রকম, ইনি বলিতেন “মহাশয় আমি ব্রাহ্মণ, ভদ্রলোক, আমি মফস্বল হইতে কলিকাতায় আসিয়া ছিলাম, ভিড়ের ভিতর আমার মণি-ব্যাগটি অপহৃত হইয়াছে, এখন অর্থাভাবে গ্রামে ফিরিতে পারিতেছি না, শ্যামবাজারে আমার এক আত্মীয় আছেন, তাঁহার নিকট হইতে রেলভাড়া লইয়া দেশে ফিরিবার মনন করিয়াছি, এখন কয়েকটা পয়সা পাইলে ট্রামে শ্যামবাজার আত্মীয়ের নিকট উপস্থিত হইতে পারি, তাই আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছি।” ঠিক সেই ব্যক্তিকে আমি গড়ের মাঠের পথে তিন দিন ঐ ভাবে ভিক্ষা করিতে দেখিয়াছি। সর্ব্বদিন ঠিক এক রকম বক্তৃতা। প্রথম দিন আমি কিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়াছিলাম, তারপর দুই দিন তিরস্কার করিয়াই তাড়াইয়াছি।

ভিক্ষায় মানের হ্রাস হয়। বাস্তবিক জাপানীরা ভিক্ষাবৃত্তিকে নিরতিশয় ঘৃণা করিয়া থাকে। একদিন এক জাপানী কোন ইউরোপীয় প্রবাসীর বাড়ীতে ভিক্ষার্থী হইয়া গমন করে। তথায় গৃহস্বামীকে উপস্থিত না পাইয়া তাঁহার টেবিলের উপর একখানা কাগজে আপন অবস্থা বিশদভাবে বিবৃত করিয়া চলিয়া আইসে। বারান্তরে গিয়া প্রদত্ত সাহায্য গ্রহণ করিবে বলিয়া গৃহস্বামীকে উহা তাঁহার চাকরের নিকট রাখিতে উক্ত আবেদন পত্রেই অনুরোধ করে। বৈদেশিক গৃহস্বামী গৃহে ফিরিয়াই টেবিলের উপর ভাঙ্গা ইংরাজীতে লিখিত আবেদন-খানি দেখিতে পান। তিনি জাপান টাইম্‌স্ নামক পত্রিকায় বিবৃতী সকলসমক্ষে উপস্থিত করেন। পরদিন টোকিওর প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে উহার প্রতিবাদ বাহির হয়। সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠেন যদি ঘটনা সত্য হয় তবে ঐ প্রার্থীকে আমরা জাপান জাতির লোক বলিয়া গণ্য করিতে পারি না; পবিত্র জাপানীরক্ত উহার ধমনীতে প্রবাহিত হয় না। এমন নীচমনা ব্যক্তি জাপানের ত্যাজ্য সন্তান।

রুষযুদ্ধের পর জাপানের উত্তর পূর্ব্ব প্রদেশের ছেনদাই, মোরিওকা এবং আওমোরি নামক তিনটি জেলায় দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হয়। খৃষ্টান পাদরীগণ এবং জাপান গবর্ণমেণ্টের নিয়োজিত ব্যক্তিগণ লোকের দুরবস্থার কথা জানিয়া তদারকে বাহির হন। ছেনদাই নামক জেলাতেই দুর্ভিক্ষের প্রকোপ সব চেয়ে বেশী ছিল। কয়েকজন ইউরোপীয়ান এবং আমেরিকান সাহেব সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়া গ্রামের কোন ব্যক্তির খাদ্যাভাব, তৎসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

প্রত্যেকেই নিজ নিজ অভাব সম্পূর্ণ থাকা সত্বেও রিপোর্ট দিতে লাগিলেন—আমার বাড়ীতে কোন অভাবই নাই, তা ছাড়া গ্রামস্থ প্রত্যেকেরই যথেষ্ট অভাব, প্রত্যেককেই একরূপ অনশনে থাকিতে হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় সকলে এত অভাবে থাকিয়াও নিজ নিজ অভাব গোপন করিতে প্রয়াস পাইলেন। সাহেবগুলি জাপানীদের এই স্বভাব দেখিয়া মুগ্ধ এবং অবাক হইলেন। পাঠক একবার ভাবিয়া দেখুন এরূপ আত্মসম্মান জ্ঞান আমাদের দেশে কয়জনের ভিতর দেখিতে পাওয়া যায়? আমাদের দেশে সাহায্য ভাণ্ডার খুলিলে যাহার অভাব আদৌ নাই বিস্তর এমন লোককেও সাহায্যপ্রার্থী হইতে দেখিতে পাওয়া যায়।

ভিক্ষুককে ভিক্ষা না দেওয়ার জন্ম আমরা জাপানীদিগকে নিষ্ঠুর বলিব কি? যাঁহারা জাপান প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহারা একবাক্যে আমাদিগকেই নিষ্ঠুর বলিবেন, যেহেতু আমরা কত শত শত সুস্থকায় সবল যুবককেও ভিক্ষা-বৃত্তিতে প্রশ্রয় দিয়া তাহাদিগকে একেবারে পশুর অধম করিয়া তুলিতেছি। তাহারা মানব সমাজের বহির্ভূত হইয়া বংশপরম্পরাক্রমে ভিক্ষাবৃত্তিই জীবনের প্রধান অবলম্বন মনে করিতেছে। তাহারা বলিয়া থাকে চাকুরী করিলে তাহাদের জাত এবং ইজ্জতের হানি হয়।

জাপানে নিঃসহায়, দীন দরিদ্র, কর্ম্মক্ষম ব্যক্তি অপরের গলগ্রহ হইয়া জীবন ধারণ করিতে অপমান বোধ করে। আমরা আত্মীয় স্বজনের উপর নির্ভর করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও দ্বিধা বোধ করি না। আর জাপানীরা এক পরিবার ভুক্ত থাকিয়া পরিবারের উপর নির্ভর করিতেও লজ্জা বোধ করে। সক্ষম অবস্থাতে স্বোপার্জ্জিত অর্থে পরিপুষ্ট না হইলে অনেকাংশে পশুপক্ষীর ন্যায় জীবন অতিবাহিত করা হয় না কি?

জাপানের উত্তরে হোকাইদো দ্বীপ। দ্বীপটী অনেকটা সাগালিয়েন দ্বীপের নিকট। তথাকার লোকের ভিতর জাপানের অন্যান্ত প্রদেশবাসীর অপেক্ষা শিক্ষালোক অল্পতর বিস্তৃত হইয়াছে। সেই হোকাইদো দ্বীপের একটী ৬৫ বৎসরের বৃদ্ধা আমাদের বাড়ীতে চাকরাণীর কায করিত একদিন তাহাকে গুরুতর পরিশ্রমে ক্লান্তা দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "ওবাছান্ (মিসেস্ বৃদ্ধা) তোমার বয়স এখন ঢের বেশী হইয়াছে—পরিশ্রম করিবার শক্তি কমিয়া আসিয়াছে, তোমার আর কে আছে, বসিয়া খাইবার কি কোন উপায় নাই?" উত্তরে বৃদ্ধা বলিল "আমার নিজের খাইবার উপায় আছে; আমার ২০।২১ বৎসরের একটী মেয়ে তোকিও মেয়েদের স্কুলে পড়িতেছে, আর এক বৎসরেই ঐ স্কুলের শিক্ষা সমাপন করিয়া বাহির হইতে পারে। আমার কর্ত্তব্য মেয়ে-টীকে লেখাপড়া শিখাইয়া সৎপাত্রে বিবাহ দেওয়া। আমি এখনও এত দুর্ব্বল নহি যে কোন ভদ্রলোকের বাড়ী সাধারণ রকম কাযকর্ম্ম করিয়া মেয়েটীর পড়ার খরচের সাহায্য না করিতে পারি।

একটী অনার্য্য প্রদেশের নিম্নশ্রেণীর বৃদ্ধার কথা শুনিয়া অবাক হইলাম। মনে মনে ভারতের শিক্ষিত উচ্চশ্রেণীর ভদ্রলোকের সহিত এই বৃদ্ধার তুলনা করিলাম। শিক্ষার সহিতই আত্মসম্মান জ্ঞান আসিয়া পড়ে। এই সকল কারণেই জাপান এত উন্নত এবং বৈদেশিক

জাতির নিকট এতদূর সম্মানিত। এই জন্যই আজ বঙ্গদেশ ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে অনেকটা উন্নত। আজ বাঙ্গালীর ভিতর—আত্মসম্মানের জ্ঞান অনেকটা আসিয়া পড়িয়াছে। যে রাজপুত জাতি আত্মসম্মান রক্ষার জন্য জীবনকে তৃণবৎ মনে করিত আজ তাহারাও, শিক্ষাভাবে বাঙ্গালীদের চেয়ে অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। এই রাজপুতানার সাধারণ শ্রেণীর লোকের আচার ব্যবহার দেখিলে মনে হয় না যে [illegible] ভিতর কখনও আত্মসম্মান জ্ঞান [illegible] বাহির হইলে ভিক্ষুকের [illegible] মজুর এবং [illegible] নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীপুরুষ ভদ্রবেশে কাহাকে দেখিলেই অমনি রাস্তার উপর তাঁহার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনায় দ্বিধা বোধ করে না।

যদি জাপানে ভিক্ষা প্রদানের বিধিব্যবস্থা না থাকে তবে হস্তপদবিহীন, চলচ্ছক্তি রহিত অন্ধ, আতুর প্রভৃতির উপায় কি? [illegible] প্রশ্ন অনেকেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। সাধারণে তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। তাহাদের জন্য স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আশ্রম তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছে, সেই সকল আশ্রমে অনেক রকম ছোট খাট জিনিস প্রস্তুতের কারখানাও আছে। [illegible] লোককে যথাসম্ভব কাযে নিয়োজিত রাখা হইয়াছে। যাহার হাত আছে [illegible] নাই তাহাকে এমন কাযে নিয়োগ করা হয় [illegible] শুধু হাতের সাহায্যই আবশ্যক হবে, [illegible] এমন [illegible] কায আছে যাহাতে [illegible] দরকার হয় না শুধু পদ দ্বারাই সম্পন্ন হয়; এমন কাযে হস্তপদবিহীন লোককে নিয়োগ করা হয়। হস্তপদবিহীন ব্যক্তিকেও উহারা কাযে লাগাইয়া থাকে। ঘানিতে ঘোড়া জুড়িয়া দিয়াছে, পাথর কিম্বা অন্য কোন ভারী জিনিস দিয়া চাপা দেওয়ার পরিবর্ত্তে তৎস্থলে হস্তপদবিহীন ব্যক্তিকে রাখা হয়, ঐ ব্যক্তির চাপে ভারী পাথরের কায হয় এবং ঐ ব্যক্তি মুখে [illegible] করিয়া ঘোড়াকে তাড়া দিয়া থাকে। অন্ধের কায পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। [illegible] দুই একটী আতুরকে রাস্তায় ভিক্ষা করিতে দেখিয়াছি।

[illegible] নিপুণা এক ধরণের [illegible] মেয়েরা একরূপ বাদ্য যন্ত্রের সাহায্যে [illegible] গান গাহিয়া কিছু কিছু উপার্জ্জন করিয়া থাকে, কিন্তু উহাদিগকেও সাধারণে [illegible] করে না। যাহারা ঐ [illegible] পছন্দ করে তাহারাই কেবল উহাদিগকে দুই একটী পয়সা দিয়া থাকে।

প্রাচীনকাল হইতে জাপানে পুরোহিত এবং [illegible] ভিক্ষা [illegible] নির্ব্বাহ করিত [illegible] অধুনা তাহাও লোপ পাইতে বসিয়াছে। পুরোহিত এবং ধর্ম্মযাজক এখন অন্য কোন [illegible] অবলম্বন করিতে লজ্জাবোধ করেন না। [illegible] ভিক্ষাবৃত্তিকেই সব চেয়ে [illegible] বলিয়া মনে করে যেহেতু ভিক্ষুকের দ্বারা [illegible] কোন কাযই হয় না [illegible] তাহার জন্য [illegible] সঞ্চিত [illegible]।

জাপানে [illegible] সন্ধ্যার সময় [illegible] দুই জন পুরোহিত শ্রেণীর লোককে [illegible] ধর্ম্মকাহিনী গাহিয়া দুই [illegible] করিতে দেখিয়াছি। উহারা [illegible] আমাদের দেশীয় মুস্কিল আসানের ফকিরের মত।

শ্রীযদুনাথ সরকার।

'রেণু' রচয়িত্রী।

শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী।

বাঙ্‌লা মাসিক পত্রিকাগুলির একটি কোণ আলো করিয়া, বহুদিন হইতে রেণু-রচয়িত্রীর স্বাক্ষরে ছোট ছোট কবিতা প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। বোধ হয়, এতদিনে তাঁহার নাম ও রচনা বঙ্গীয় পাঠক পাঠিকা-গণের নিকট সুপরিচিত হইয়াছে। সাময়িক সাহিত্যে কবিতা, বিশেষতঃ ছোট কবিতা এরূপ সমাদৃত হওয়া অল্প কবিরই ভাগ্যে ঘটে। কবিতাগুলির নিম্নে নিম্নে তাঁহার নামের স্বাক্ষর না থাকিলেও, লেখিকাকে চিনিতে কষ্ট হয় না।

'রেণু'র কবিতাগুলির বিশেষত্ব, তাহার ক্ষুদ্রত্ব! কবিতাগুলি, সুন্দরীর অশ্রুবিন্দুর মত করুণ; বালকের হাসিবিম্বের মত মধুর; বিধবার আশীর্ব্বাদ-ভরা দৃষ্টির মত, স্নিগ্ধ। ছোট হইলেও, তাই সেগুলি সহজে হৃদয় স্পর্শ করিয়া যায়। সেই সহজ সুরের ঝঙ্কারের মত, ভোরের অসমাপ্ত স্বপ্নের মত, কবিতাগুলির মধুর রেশ হৃদয়ে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকে। যেন একটু অসমাপ্তি যেন-একটু সুদূর অতৃপ্তি, যেন-একটু নিস্ফল ব্যাকুলতা কবিতাগুলির "প্রাণ"!

'রেণু' পরস্পর বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীতি-সমষ্টি হইলেও, সুন্দর মালিকার মত, একটী সূক্ষ্ম সূত্রের দ্বারা সুনিপুন-ভাবে গ্রথিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রচ্ছন্ন একটি কথা হাজার সুরের বিচিত্র ছন্দ লীলার অন্তরাল দিয়া হিল্লোলিত হইয়া গিয়াছে। প্রথম শরতে জল-স্থল আকাশে, লতাপাতায়, মুকুলে পুষ্পপল্লবে, নবোদ্ভিন্ন শস্তশীর্ষে, বর্ষা-ধৌত দূর্ব্বাক্ষেত্রে, যেমন একই বৃহৎ আনন্দের সুর হাজার রাগিণীতে ধ্বনিত হইতে থাকে,—গীত গন্ধ বর্ণ, শোভায় যেমন এক-ই পুলক তরঙ্গ নানান্ ছন্দে ছড়াইয়া পড়ে, রেণুর ছোট ছোট কবিতাগুলির মধ্যে তেমনি যেন একটী কথারই সুর বাজিয়া উঠিয়াছে। বিশেষত্ব ও নৈপুণ্য এই,—কোথাও লঘুচপলতা নাই—কোথাও সঙ্কোচ কোথাও স্খলন বা অসংযম নাই।

পূতসংযম এবং তপস্যার ভাব সমস্ত গান গুলিতে কেমন-একটী মহিমা, অনাড়ম্বর ঐশ্বর্য্য, কোমল মাধুর্য্য আনিয়া দিয়াছে— অথচ লেখিকার কল্পনা দূরতম অন্তরীক্ষের প্রতি একেবারে উধাও হইয়া ছুটিয়া যায় নাই। কবির কল্পনা শেলী অপেক্ষা ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থের মত, জগতে সম্বন্ধ বর্জ্জন করে নাই। ধূলা-মাটির যা-কিছু, দুদিনের যা-কিছু, সাধারণ ও প্রতিদিনের যা-কিছু কবি সে গুলিকে এমনি একটি দিব্য আনন্দের বর্ণে রঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছেন যে, সেগুলির মধ্যে, স্বর্গের আভাষ ফুটিয়া উঠিয়াছে! হাসি, অশ্রু, ব্যাকুলতা, বিরহ-ব্যথা, প্রেমের বেদন,—অতি পুরাতন এই কটি ইষ্টক প্রস্তরে, কবি চির-সুন্দর মন্দির গাঁথিয়া তাঁহার দেবতাকে তাহার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সেই মন্দিরের বাহিরে দাঁড়াইয়া পাশের যাত্রিগণ তাঁহার কণ্ঠনিঃসৃত নিভৃত হৃদয়-দেবতার বন্দনা গানের অস্পষ্ট

মধুর ঝঙ্কার শ্রবণে পুলকিত হইয়া যেন তাঁহারি কণ্ঠের সহিত সুর মিলাইয়া গাহিতে ব্যাকুল হইয়া উঠে!

'রেণু' একখানি—In Memoriam বলিলে কবির প্রতি অবিচার করা হয় কিনা জানিনা, তবে নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিলে নিশ্চয়ই দুখানির মধ্যে একটি সুমধুর সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে! দুখানিরই উদ্দেশ্য এক-ই। যে ব্যথার অসহ তীব্রতায় হৃদয়-বীণার তন্ত্রী গুলি প্রায় ছিঁড়িয়া যায়, যে ব্যথায় পরিদৃশ্যমান বাহিরের কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না, —অথচ রুদ্ধ অন্তরের দ্বার আপনা আপনি খুলিয়া যায়, রেণু সেই ব্যথারই গান। যে ব্যথায় দৃশ্য ও অদৃশ্য এক হইয়া যায়, স্বর্গকে মর্ত্তের কাছাকাছি আনিয়া দেয়, 'রেণু' সেই দিব্য ব্যথার, অমর শোকের গান!

হইতে পারে In Memoriam বিদেশী মহাকবির স্বর্গীয় বন্ধুর সূক্ষ্ম কারু-খচিত সমাধি স্তম্ভ, আর 'রেণু' একটি দুর্ব্বলা বাঙ্গালী নারীর কম্পিত হস্ত-রচিত ক্ষুদ্র দেবমন্দির! বিলাপ-দুখানিরই প্রাণ; এ বিলাপ পার্থিব বিচ্ছেদ-ব্যথার নামান্তর মাত্র নহে; এ বিলাপ অন্তরের নিভৃততম প্রদেশে দেবতার প্রতি আত্মসমর্পণ হেতু ব্যাকুলতা; বিপুল নিখিলের তোরণদ্বার রুদ্ধ করিয়া ক্ষুদ্র হৃদয় প্রকোষ্ঠে দেবতার জন্য ভক্তের বিরামহীন বন্দনা!

মোটের উপর অসঙ্কোচে বলিতে পারা যায়, রেণু বঙ্গভাষায় একখানি উচ্চশ্রেণীর কবিতাগ্রন্থ। বিচ্ছিন্নভাবে না দেখিয়া সমগ্রভাবে পাঠ করিলে গ্রন্থখানির মাধুর্য্য ও মূল্য সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

লেখিকার স্বল্পজীবনী নিম্নে প্রদত্ত হইল। লেখিকা মাতৃকুল হইতে যে কবিত্ব শক্তির উত্তরাধিকারিণী হইয়াছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 'বনলতা' রচয়িত্রী শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী লেখিকার জননী। বাল্যকালে কৃষ্ণনগর বালিকা বিদ্যালয় হইতে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়া বৃত্তিলাভ করেন এবং দশ বৎসর বয়সে ১৮৮২ সালে বেথুন স্কুলে প্রবিষ্ট হন। ১৮৮৮ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিলাভ করেন। ১৮৯০ সালে এফ,এ ও ১৮৯২ সালে বি, এ, পাশ করিয়া, বিশেষ পারদর্শিতার জন্য রৌপ্যপদক পুরস্কার পান।

ঐ বৎসরেই তিনি সংসারে প্রবেশ করেন, ১৮৯২ সালে আষাঢ় মাসে স্বর্গীয় তারা দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। লেখিকার স্বল্পস্থায়ী দাম্পত্য জীবন যে অতি সুখময় হইয়াছিল তাহা রেণুর পাঠক বা পাঠিকাকে না বলিলেও চলে। বিবাহের পর স্বামীর সহিত শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত রায়পুরে গমন করেন। তারাদাস বাবু রায়পুরের প্রধান উকিল ছিলেন, তাঁহার দানশীলতা, বদান্যতা ও সহৃদয়তায় রায়পুরবাসিগণ মুগ্ধ ছিল। তিনি কৃষ্ণনগরের এক সম্ভ্রান্তবংশে জন্মগ্রহণ করেন। এবং বাল্যকাল হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তারাদাস বাবু দানশীল। বৃত্তির টাকাগুলি তিনি সহপাঠিগণের প্রীতিভোজে ও গ্রন্থক্রয় করিয়া ব্যয় করিতেন। উপার্জ্জনক্ষম হইয়াও তাঁহার সে স্বভাব পরিবর্ত্তন হয় নাই।

১৮৯৪ সালে প্রিয়ম্বদা দেবী তাঁহার একমাত্র

পুত্র তারাকুমারের জননীত্ব লাভ করেন। হায়, তাঁহার ভাগ্য সূর্য্য তখন মধ্যাকাশ ছাড়িয়া ক্রমে পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িতেছিল। পরবৎসর, ১৮৯৫ সালে সেপ্টেম্বর মাসে, তাঁহার স্বামীর লোকান্তর ঘটে। ইহারি কিছুকাল পরে রেণুর কবিতাগুলি লিখিত। 'রেণুর' পাঠক পাঠিকা কবির জীবনী এইটুকু জানিলেই যথেষ্ট। "কাব্যে যেমন পড়া যায় কবি তেমন নয় গো"—একথা সামাজিকের নিকট মূল্যবান হইতে পারে কিন্তু সাহিত্যিকের নিকট নয়। সাহিত্যিক কবির রচনা মধ্যে তাঁহার অন্তরের পরিচয় খুঁজিয়া লইতে

রেণু-রচয়িত্রী শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী ও তাঁহার স্বামী।

পারেন। অবশ্য কবির লৌকিক জীবনচরিত কবির সহিত পাঠককে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত করিয়া দেয়। অমুক কবি অধিক মাত্রায় তামাক খাইতেন, কি অমুক কবি, মাছ ধরিতে ভাল বাসিতেন জানিয়া বিশেষ কিছু লাভ নাই—কিন্তু যে ঘটনার ছায়া কবির রচনায় প্রচ্ছন্ন আছে—যে ঘটনা কবির বীণায় নূতন সুর জুড়িয়া দিয়াছে সেইটুকু জানিলেই যথেষ্ট।

আর একটী ঘটনা—শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবীর লৌকিক জীবনের শেষ আশার দীপটী নিভাইয়া দিয়াছে। বিধবা নারীর একমাত্র অব-

নন্দন, তাঁহার সংসারের প্রধান বন্ধন, প্রিয় পুত্রটী ১৮৯৬ সালেই অকালে সংসার ত্যাগ করিয়া যায়। এ অবস্থায় তাঁহার লৌকিক জীবন অতিশয় নৈরাশ্যপূর্ণ হইত যদি না তিনি "মৃত্যুঞ্জয়" প্রেমের দ্বারা সমস্ত দুঃখ ও শোককে পরাস্ত করিতেন। কবি তাঁহার সমস্ত জীবনের বিষের সাগর মন্থন করিয়া আমাদের সম্মুখে অমৃতোপহার পাঠাইয়াছেন। আজ আমরা তাঁহাকে কি আর সান্ত্বনার বচন শুনাইব। এ সময়ে টেনিসনের দুছত্র যেমন কবির সান্ত্বনাদায়ক, তেমনি আমাদেরো মর্ম্মকথাটী ব্যক্ত করে;

"It is better to have loved and lost
Than never to have loved at all!

রসের ধর্ম্ম।

আমাদের ধর্ম্মসাধনার দুটো দিক আছে একটা শক্তির দিক্, একটা রসের দিক্। পৃথিবী যেমন জলে স্থলে বিভক্ত এও ঠিক তেম্‌নি।

শক্তির দিক্ হচ্চে বলিষ্ঠ বিশ্বাস। এ বিশ্বাস জ্ঞানের সামগ্রী নয়। ঈশ্বর আছেন এইটুকু-মাত্র বিশ্বাস করাকে বিশ্বাস বলিনে। আমি যার কথা বলচি এই বিশ্বাস সমস্ত চিত্তের একটি অবস্থা; এ একটি অবিচলিত ভরসার ভাব। মন এতে ধ্রুব হয়ে অবস্থিতি করে— আপনাকে সে কোনো অবস্থায় নিরাশ্রয় নিঃসহায় মনে করে না।

এই বিশ্বাস জিনিষটি পৃথিবীর মত দৃঢ়। এ একটি নিশ্চিত আধার। এর মধ্যে মস্ত একটি জোর আছে।

যার মধ্যে এই বিশ্বাসের বল নেই, অর্থাৎ যার চিত্তে এই ধ্রুব স্থিতির বৃত্তির অভাব আছে সে ব্যক্তি সংসারে ক্ষণে ক্ষণে যা-কিছুকে হাতে পায় তাকে অত্যন্ত প্রাণপণ চেষ্টায় আঁকড়ে ধরে। সে যেন অতল জলে পড়েছে—কোথাও সে পায়ের কাছে মাটি পায় না; এইজন্যে, যে সব জিনিষ সংসারের জোয়ারে-ভাঁটায় ভেসে আসে ভেসে চলে যায়, তাদেরই তাড়াতাড়ি দুই মুঠো দিয়ে চেপে ধরাকেই সে পরিত্রাণ বলে মনে করে। তার মধ্যে যা কিছু হারায়, যা কিছু তার মুঠো ছেড়ে চলে যায় তার ক্ষতিকে এমনি সে একান্ত ক্ষতি বলে মনে করে যে কোথাও সে সান্ত্বনা খুঁজে পায় না। কথায় কথায় কেবলি তার মনে হয় সর্ব্বনাশ হয়ে গেল। বাধাবিঘ্ন কেবলি তার মনে নৈরাশ্য ঘনীভূত করে তোলে। সেই সমস্ত বিঘ্নকে ছাড়িয়ে সে কোথাও একটা চরম সফলতার নিঃসংশয় মূর্ত্তি দেখ্‌তে পায় না। যে লোক ডুব জলে সাঁতার দেয়, যার কোথাও দাঁড়াবার উপায় নেই, সামান্য হাঁড়ি কলসি কলার ভেলা তার পরমধন—তার ভয় ভাবনা উদ্বেগের সীমা নেই। আর, যে ব্যক্তির পায়ের নীচে সুদৃঢ় মাটি আছে তারও হাঁড়ি কলসির প্রয়োজন আছে, কিন্তু হাঁড়িকলসি তার জীবনের অবলম্বন নয়—এগুলো যদি কেউ কেড়ে নেয় তাহলে তার যতই অভাব অসুবিধা হোক্ না, সে ডুবে মরবে না।

এইজন্যে দৃঢ়বিশ্বাসী লোকের কাজকর্ম্মে জোর আছে, কিন্তু উদ্বেগ নেই। সে মনের

মধ্যে নিশ্চয় অনুভব করে তার একটা দাঁড়াবার জায়গা আছে, পৌঁছবার স্থান আছে। প্রত্যক্ষ ফল সে না দেখ্‌তে পেলেও সে মনে মনে জানে ফল থেকে সে বঞ্চিত হয় নি—বিরুদ্ধ ফল পেলেও সেই বিরুদ্ধতাকে সে একান্ত করে দেখে না, তার ভিতর থেকেও একটি সার্থকতার প্রত্যয় মনে থাকে। একটি অত্যন্ত বড় জায়গায় চিত্তের দৃঢ়নির্ভরতা, এই জায়গাটিকে ধ্রুবসত্য বলে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা, এই হচ্চে সেই বিশ্বাস যে মাটির উপরে আমাদের ধর্ম্মসাধনা প্রতিষ্ঠিত।

এই বিশ্বাসটির মূলে একটি উপলব্ধি আছে। সেটি হচ্চে এই যে, ঈশ্বর সত্য।

কথাটি শুন্‌তে সহজ, এবং শোনবামাত্রই অনেকে হয় ত বলে উঠ্‌বেন যে, ঈশ্বর সত্য এ কথা ত আমরা অস্বীকার করিনে।

পদে পদেই অস্বীকার করি। ঈশ্বর সত্য নন এইভাবেই প্রতিদিন আমরা সংসারের কাজ করে থাকি। ঈশ্বর সত্য এই উপলব্ধিটির উপরে আমরা ভর দিতে পারিনে। আমাদের মন সেই পর্য্যন্ত পৌঁছে সেখানে গিয়ে স্থিতি করতে পারে না।

আমার যাই ঘটুক্ না কেন, যিনি চরম সত্য পরম সত্য তিনি আছেন, এবং তাঁর মধ্যেই আমি আছি, এই ভরসাটুকু সকল অবস্থাতেই যার মনের মধ্যে লেগেই আছে, সে ব্যক্তি যেমন ভাবে জীবনের কাজ করে আমরা কি তেমন ভাবে করে থাকি?—আছেন, আছেন, তিনি আছেন, তিনি আমার হয়েই আছেন—সকল দেশে সকল কালেই তিনি আছেন এবং তিনি আমারই আছেন—জীবনে যত উলটপালটই হোক্ এই সত্যটি থেকে কেউ আমাকে কিছুমাত্র বঞ্চিত করতে পারবে না এমন জোর এমন ভরসা যার আছে সেই হচ্চে বিশ্বাসী—তিনি আছেন এই সত্যের উপরেই সে বিশ্রাম করে এবং তিনি আছেন এই সত্যের উপরেই সে কাজ করে।

কিন্তু ঈশ্বর যে কেবল সত্যরূপে সকলকে দৃঢ় করে ধারণ করে রেখেছেন, সকলকে আশ্রয় দিয়েছেন এই কথাটিই সম্পূর্ণ কথা নয়।

এই জীবধাত্রী পৃথিবী খুব শক্ত বটে—এর ভিত্তি অনেক পাথরের স্তর দিয়ে গড়া। এই কঠিন দৃঢ়তা না থাকলে এর উপরে আমরা এমন নিঃসংশয়ে ভর দিতে পারতুম না। কিন্তু এই কাঠিন্যই যদি পৃথিবীর চরমরূপ হত তাহলে ত এ একটি প্রস্তরময় ভয়ঙ্কর মরুভূমি হয়ে থাক্‌ত।

এর সমস্ত কাঠিন্যের উপরে একটি রসের বিকাশ আছে—সেইটেই এর চরম পরিণতি। সেটি কোমল, সেটি সুন্দর, সেটি বিচিত্র। সেইখানেই নৃত্য, সেইখানেই গান, সেইখানেই সাজসজ্জা। পৃথিবীর সার্থকরূপটি এইখানেই প্রকাশ পেয়েছে।

অর্থাৎ নিত্যস্থিতির উপরে একটি নিত্যগতির লীলা না থাকলে তার সম্পূর্ণতা নেই। পৃথিবীর ধাতু পাথরের অচল ভিত্তির সর্ব্বোচ্চ তলায় এই গতির প্রবাহ চলেছে, প্রাণের প্রবাহ, যৌবনের প্রবাহ, সৌন্দর্য্যের প্রবাহ—তার চলা-ফেরা আসাযাওয়া মেলামেশার আর অন্ত নেই।

রস জিনিষটি সচল;—সে কঠিন নয় বলে, নম্র বলে, সর্ব্বত্র তার একটি সঞ্চার আছে; এইজন্যেই সে বৈচিত্র্যের মধ্যে হিল্লোলিত হয়ে

উঠে জগৎকে পুলকিত করে তুল্‌চে—এইজন্যেই কেবলি সে আপনার অপূর্ব্বতা প্রকাশ করচে, এইজন্যেই তার নবীনতার অন্ত নেই।

এই রসটি যেখানে শুকিয়ে যায় সেখানে আবার সেই নিশ্চল কঠিনতা বেরিয়ে পড়ে, সেখানে প্রাণের ও যৌবনের নমনীয়তা কমনীয়তা চলে যায়, জরা ও মৃত্যুর যে আড়ষ্টতা তাই উৎকট হয়ে ওঠে।

আমাদের ধর্ম্মসাধনার মধ্যেও এই রসময় গতিতত্ত্বটি না রাখলে তার সম্পূর্ণতা নেই, এমন কি, তার যেটি চরম সার্থকতা সেইটিই নষ্ট হয়।

অনেক সময় ধর্ম্মসাধনায় দেখা যায় কঠিনতাই প্রবল হয়ে ওঠে—তার অবিচলিত দৃঢ়তা নিষ্ঠুর শুষ্কভাবেই আপনাকে প্রকাশ করে। সে আপনার সীমার মধ্যে অত্যন্ত উদ্ধত হয়ে বসে থাকে, সে অন্যকে আঘাত করে; তার মধ্যে কোনো প্রকার নড়াচড়া নেই এইটে নিয়েই সে গৌরব বোধ করে, নিজের স্থানটি ছেড়ে চলে না বলে কেবল সে একটা দিক দিয়েই সমস্ত জগৎকে দেখে, এবং যারা অন্যদিকে আছে তারা কিছুই দেখ্‌চে না এবং সমস্তই ভুল দেখ্‌চে বলে কল্পনা করে। নিজের সঙ্গে অন্যের কোনোপ্রকার অনৈক্যকে এই কাঠিন্য ক্ষমা করতে জানে না, সবাইকে নিজের অচল পাথরের চারিভিতের মধ্যে জোর করে টেনে আন্‌তে চায়। এই কাঠিন্য মাধুর্য্যকে দুর্ব্বলতা এবং বৈচিত্র্যকে মায়ার ইন্দ্রজাল বলে অবজ্ঞা করে, এবং সমস্তকে সবলে একাকার করে দেওয়াকেই সমন্বয় সাধন বলে মনে করে।

কিন্তু কাঠিন্য ধর্ম্মসাধনার অন্তরালদেশে থাকে। তার কাজ, ধারণ করা, প্রকাশ করা নয়। অস্থিপঞ্জর মানবদেহের, তার পরিচয় নয়—সরস কোমল মাংসের দ্বারাই তার প্রকাশ পরিপূর্ণ হয়। সে যে পিণ্ডাকারে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে না, সে যে আঘাত সহ্য করেও ভেঙে যায় না, সে যে আপনার মর্ম্মস্থানগুলিকে সকলপ্রকার উপদ্রব থেকে রক্ষা করে, তার ভিতরকার কারণ হচ্চে তার অস্থিকঙ্কাল। কিন্তু আপনার এই কঠোর শক্তিকে সে আচ্ছন্ন করেই রাখে এবং প্রকাশ করে আপনার রসময়, প্রাণময়, ভাবময়, গতিভঙ্গীময় কোমল অথচ সতেজ সৌন্দর্য্যকে।

ধর্ম্মসাধনারও চরম পরিচয়, যেখানে তার শ্রী প্রকাশ পায়। এই শ্রী জিনিষটি রসের জিনিষ। তার মধ্যে অভাবনীয় বিচিত্রতা এবং অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য ও তার মধ্যে নিত্য-চলনশীল প্রাণের লীলা। শুষ্কতায় অনম্রতায় তার সৌন্দর্য্যকে লোপ করে, তার সচলতাকে রোধ করে, তার বেদনাবোধকে অসাড় করে দেয়। ধর্ম্মসাধনার যেখানে উৎকর্ষ সেখানে গতির বাধাহীনতা, ভাবের বৈচিত্র্য এবং অক্ষুণ্ণ মাধুর্য্যের নিত্যবিকাশ।

নম্রতা নইলে এই জিনিষটিকে পাওয়া যায় না। কিন্তু নম্রতা মানে শিক্ষিত বিনয় নয়। অর্থাৎ কঠিন লোহাকে পুড়িয়ে পিটিয়ে তাকে ইস্পাতরূপে যে ধারালো নমনীয়তা দেওয়া যায় এ সে জিনিষ নয়। সরস সজীব তরুশাখার যে নম্রতা—যে নম্রতার মধ্যে ফুল ফুটে ওঠে, দক্ষিণের বাতাস নৃত্যের আন্দোলন বিস্তার করে, শ্রাবণের ধারা সঙ্গীতে মুখরিত হয়, [illegible] সূর্য্যের কিরণ যন্ত্র সেতারের সুরগুলির মত উৎক্ষিপ্ত হতে থাকে; [illegible]

নানা ছন্দ যে নম্রতার মধ্যে আপনার স্পন্দনকে বিচিত্র করে তোলে—যে নম্রতা সহজভাবে সকলের সঙ্গে আপনার যোগ স্বীকার করে, সায় দেয়, সাড়া দেয়, আঘাতকে সঙ্গীতে পরিণত করে এবং স্বাতন্ত্র্যকে সৌন্দর্য্যের দ্বারা সকলের আপন করে তোলে।

এক কথায় বল্‌তে গেলে এই নম্রতাটি রসের নম্রতা—শিক্ষার নম্রতা নয়। এই নম্রতা শুষ্ক সংযমের বোঝায় নত নয়, সরস প্রাচুর্য্যের দ্বারাই নত; প্রেমের ভক্তিতে আনন্দে পরিপূর্ণতায় নত।

কঠোরতা যেমন স্বভাবতই আপনাকে স্বতন্ত্র রাখে রস তেমনি স্বভাবতই অন্যের দিকে যায়। আনন্দ সহজেই নিজেকে দান করে—আনন্দের ধর্ম্মই হচ্ছে সে আপনাকে অন্যের মধ্যে প্রসারিত করতে চায়। কিন্তু উদ্ধত হয়ে থাকলে কিছুতেই অন্যের সঙ্গে মিল হয় না—অন্যকে চাইতে গেলেই নিজেকে নত করতে হয়—এমন কি, যে রাজা যথার্থ রাজা, প্রজার কাছে তাকে নম্র হতেই হবে। রসের ঐশ্বর্য্যে যে লোক ধনী, নম্রতাই তার প্রাচুর্য্যের লক্ষণ।

বিশ্বজগতের মধ্যে জগদীশ্বর কোন্‌খানে আমাদের কাছে নত? সেখানে তিনি সুন্দর; সেখানে রসোবৈ সঃ; সেখানে আনন্দকে ভাগ না করে তাঁর চলে না; সেখানে নিজের নিয়মের আসনের উপরে কড়া হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারেন না, সেখানে সকলের মাঝখানে নেমে এসে সকলকে তাঁর ডাক দিতে হয়। সেই ডাকের মধ্যে কত করুণা, কত মাধুর্য্য, কত কোমলতা! স্নেহের আনন্দভারে যেমন ক্ষুদ্র শিশুর কাছে পিতামাতা যেমন নত হয়ে পড়েন, জগতের ঈশ্বর তেমনি করেই আমাদের দিকে নত হয়ে পড়েছেন। এইটেই হচ্ছে আমাদের কাছে সকলের চেয়ে বড় কথা;—তাঁর নিয়ম অটল, তাঁর শক্তি অসীম, তাঁর ঐশ্বর্য্য অনন্ত এ সব কথা আমাদের কাছে ওর চেয়ে ছোট; তিনি নত হয়ে সুন্দর হয়ে ভাবে ভঙ্গীতে হাসিতে গানে রসে গন্ধে রূপে আমাদের সকলের কাছে আপনাকে দান করতে এসেছেন এবং আপনার মধ্যে আমাদের সকলকে নিতে এসেছেন এইটেই হচ্ছে আমাদের পক্ষে চরম কথা—তাঁর সকলের চেয়ে পরম পরিচয় হচ্ছে এইখানেই।

জগতে ঈশ্বরের এই যে দুইটি পরিচয়—একটি অটল নিয়মে, আর একটি সুনম্র সৌন্দর্য্যে—এর মধ্যে নিয়মটি আছে গুপ্ত আর সৌন্দর্য্যটি আছে তাকে ঢেকে। নিয়মটি এমন প্রচ্ছন্ন যে, সে যে আছে তা আবিষ্কার করতে মানুষের অনেকদিন লেগেছিল কিন্তু সৌন্দর্য্য চিরদিন আপনাকে ধরা দিয়েছে। সৌন্দর্য্য, মিল্‌বে বলেই, ধরা দেবে বলেই সুন্দর। এই সৌন্দর্য্যের মধ্যেই রসের মধ্যেই মিলনের তত্ত্বটি রয়েছে।

ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে যখন কাঠিন্যই বড় হয়ে ওঠে তখন সে মানুষকে মেলায় না, মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে। এই জন্যে কৃচ্ছ্রসাধনকে যখন কোন ধর্ম্ম আপনার প্রধান অঙ্গ করে তোলে যখন সে আচারবিচারকেই মুখ্য স্থান দেয় তখন সে মানুষের মধ্যে ভেদ আনয়ন করে; তখন তার নীরস কঠোরতা সকলের সঙ্গে তাকে মিল্‌তে বাধা দেয়, সে আপনার নিয়মের মধ্যে নিজেকে অত্যন্ত স্বতন্ত্র করে' আবদ্ধ করে' রাখে; সর্ব্বদাই

ভয়ে ভয়ে থাকে পাছে নিয়মের ত্রুটিতে অপরাধ ঘটে—এই জন্যেই সবাইকে সরিয়ে সরিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চল্‌তে হয়। শুধু তাই নয়, নিয়মপালনের একটা অহঙ্কার মানুষকে শক্ত করে তোলে, নিয়মপালনের একটা লোভ তাকে পেয়ে বসে এবং এই সকল নিয়মকে ধ্রুব ধর্ম্ম বলে জানা তার সংস্কার হয়ে যায় বলেই যেখানে এই নিয়মের অভাব দেখ্‌তে পায় সেখানে তার অত্যন্ত একটা অবজ্ঞা জন্মে।

য়িহুদি এই জন্যে আপনার ধর্ম্মনিয়মের জালের মধ্যে আপনাকে আপাদমস্তক বন্দী করে রেখেছে; ধর্ম্মের ক্ষেত্রে সমস্ত মানুষকে আহ্বান করা এবং সমস্ত মানুষের সঙ্গে মেলা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

বর্ত্তমান হিন্দুসমাজও ধর্ম্মের দ্বারা নিজেকে পৃথিবীর সকল মানুষের সঙ্গেই পৃথক্ করে রেখেছে। নিজের মধ্যেও তার বিভাগের অন্ত নেই। বস্তুত নিজেকে সকলের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করবার জন্যেই সে নিয়মের বেড়া নির্ম্মাণ করেছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষকে সকলের সঙ্গে অবাধে মিলিয়ে দিচ্ছিল বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের সমস্ত নিয়মসংযম প্রধানত তারই প্রতিকারের প্রবল চেষ্টা। সেই চেষ্টাটি আজ পর্য্যন্ত রয়ে গেছে। সে কেবলি দূর করচে, কেবলি ত্যাগ করচে, নিজেকে কেবলি সঙ্কীর্ণ বদ্ধ করে আড়াল করে রাখবার উদ্যোগ করচে। হিন্দুর ধর্ম্ম যেখানে, সেখানে বাহিরের লোকের পক্ষে সমস্ত জানলা দরজা বন্ধ এবং ঘরের লোকের পক্ষে কেবলি বেড়া এবং প্রাচীর।

অন্য দেশে অন্য জাতির মধ্যে স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্যে কোনো চেষ্টা নেই তা বল্‌তে পারিনে। কারণ, স্বাতন্ত্র্য রক্ষার প্রয়োজন আছে, সে প্রয়োজনকে অস্বীকার করা কোনোমতেই চলে না। কিন্তু অন্যত্র এই স্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেষ্টা রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক। অর্থাৎ এই চেষ্টাটা সেখানে নিজের নীচের তলায় বাস করে।

মিলনের বৃত্তিটি স্বাতন্ত্র্য চেষ্টার উপরের জিনিষ। ক্রীতদাস রাজাকে খুন করে সিংহাসনে চড়ে বস্‌লে যেমন হয় স্বাতন্ত্র্যচেষ্টা তেমনি মিলনধর্ম্মকে একেবারে অভিভূত করে দিয়ে তার উপরে যদি আপনার স্থান দখল করে বসে তাহলে সেই রকমের অন্যায় ঘটে। এই জন্যেই পারিবারিক বা সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় স্বার্থবুদ্ধি মানুষকে স্বাতন্ত্র্যের দিকে টেনে রাখ্‌তে থাক্‌লেও ধর্ম্মবুদ্ধি তার উপরে দাঁড়িয়ে তাকে বিশ্বের দিকে বিশ্বমানবের দিকে নিয়ত আহ্বান করে।

আমাদের দেশে বর্ত্তমান কালে সেইখানেই ছিদ্র হয়েছে এবং সেই ছিদ্র পথেই এ দেশের শনি প্রবেশ করেছে। যে ধর্ম্ম মানুষের সঙ্গে মানুষকে মেলায় সেই ধর্ম্মের দোহাই দিয়েই আমরা মানুষকে পৃথক্ করেছি। আমরা বলেছি মানুষের স্পর্শে, তার সঙ্গে এক আসনে আহারে, তার আহরিত অন্নজল গ্রহণে মানুষ ধর্ম্মে পতিত হয়। বন্ধনকে ছেদন করাই যার কাজ তাকে দিয়েই আমরা বন্ধনকে পাকা করে নিয়েছি। তা হলে আজ আমাদের উদ্ধার করবে কে?

আশ্চর্য্য ব্যাপার এই, উদ্ধার করবার ভার আজ আমরা তারই হাতে দিতে চেষ্টা করচি যে জিনিসটা ধর্ম্মের চেয়ে নীচেকার। আমরা

স্বাজাত্যবুদ্ধির উপর বরাত দিয়েছি, ভারতবর্ষের অন্তর্গত মানুষের সঙ্গে মানুষকে মিলিয়ে দেবার জন্যে। আমরা বল্‌চি, তা না হলে আমরা বড় হব না, বলিষ্ঠ হব না, আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধি হবে না।

আমরা ধর্ম্মকে এমন জায়গায় এনে ফেলেছি যে আমাদের জাতীয় স্বার্থবুদ্ধি প্রয়োজন বুদ্ধিও তার চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে। এমন দশা হয়েছে যে, ধর্ম্মে আমাদের উদ্ধার নেই, স্বাজাত্যের দ্বারা আমাদের উদ্ধার পেতে হবে! এমন হয়েছে যে ধর্ম্ম আমাদের পৃথক থাকতে বল্‌চে, স্বাজাত্য আমাদের এক হবার জন্যে তাড়না করচে!

কিন্তু ধর্ম্মবুদ্ধি যে মিলনের ঘটক নয় সে মিলনের উপর আমি ভরসা রাখ্‌তে পারিনে। ধর্ম্মমূলক মিলনতত্ত্বটিকে আমাদের দেশে যদি প্রতিষ্ঠিত করতে পারি, তবেই স্বভাবতই আমরা মিলনের দিকে যাব, কেবলি গণ্ডি আঁকবার এবং বেড়া তোল্‌বার প্রবৃত্তি থেকে আমরা নিষ্কৃতি পাব। ধর্ম্মের সিংহদ্বার খোলা থাকলে তবেই ছোট বড় সকল যজ্ঞের নিমন্ত্রণেই মানুষকে আমরা আহ্বান করতে পারব;—নতুবা কেবলমাত্র প্রয়োজনের বা [illegible]অভিমানের খিড়কির দরজাটুকু যদি [illegible] রাখি তবে ধর্ম্মনিয়মের বাধা অতিক্রম ক[illegible] সেই ফাঁকটুকুর মধ্য দিয়ে আমাদের [illegible] এত প্রভেদ, পার্থক্য এত বিরোধ-[illegible]ল্‌তে পারবে না, মিল্‌তে পারবে না।

[illegible]আন্দোলনের ইতিহাসে এইটি বরাবর [illegible] ধর্ম্ম যখন আপনার রসের মূর্ত্তি [illegible] তখনি সে বাঁধন ভাঙে এবং [illegible]কে এক করবার দিকে ধাবিত হয়। খৃষ্ট যে প্রেমভক্তিরসের বন্যাকে মুক্ত করে দিলেন তা য়িহুদিধর্ম্মের কঠিন শাস্ত্র বন্ধনের মধ্যে নিজেকে বদ্ধ রাখ্‌তে পারলে না এবং সেই ধর্ম্ম আজ পর্য্যন্ত প্রবল জাতির স্বার্থের শৃঙ্খলকে শিথিল করবার জন্য নিয়ত চেষ্টা করচে, আজ পর্য্যন্ত সমস্ত সংস্কার এবং অভিমানের বাধা ভেদ করে মানুষের সঙ্গে মানুষকে মেলাবার দিকে তার আকর্ষণ শক্তি প্রয়োগ করচে।

বৌদ্ধধর্ম্মের মূলে একটি কঠোর তত্ত্বকথা আছে কিন্তু সেই তত্ত্বকথায় মানুষকে এক করেনি; তার মৈত্রী তার করুণা এবং বুদ্ধদেবের বিশ্বব্যাপী হৃদয়প্রসারতাই মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রভেদ ঘুচিয়ে দিয়েছে। নানক বল, রামানন্দ বল, কবীর বল, চৈতন্য বল সকলেই রসের আঘাতে বাঁধন ভেঙে দিয়ে সকল মানুষকে এক জায়গায় ডাক দিয়েছেন।

তাই বলছিলুম, ধর্ম্ম যখন আচারকে নিয়মকে শাসনকে আশ্রয় করে' কঠিন হয়ে ওঠে, তখন সে মানুষকে বিভক্ত করে দেয়, পরস্পরের মধ্যে গতিবিধির পথকে অবরুদ্ধ করে। ধর্ম্মে যখন রসের বর্ষা নেমে আসে তখন যে-সকল গহ্বর পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান রচনা করেছিল তারা ভক্তির স্রোতে প্রেমের বন্যায় ভরে ওঠে, এবং সেই পূর্ণতায় স্বাতন্ত্র্যের অচল সীমাগুলিই সচল হয়ে উঠে অগ্রসর হয়ে সকলকে মিলিয়ে দিতে চায়, বিপরীত পারকে এক করে দেয় এবং দুর্লঙ্ঘ্য দূরকে আনন্দবেগে নিকট করে আনে। মানুষ যখনি সত্যভাবে গভীরভাবে মিলেছে তখন কোনো একটি বিপুল রসের আবির্ভাবেই

মিলেছে, প্রয়োজনে মেলেনি, তত্ত্বজ্ঞানে মেলেনি, আচারের শুষ্কশাসনে মেলেনি।

ধর্ম্মের যখন চরম লক্ষ্যই হচ্চে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনসাধন, তখন সাধককে এ কথা মনে রাখ্‌তে হবে যে, কেবল বিধিবদ্ধ পূজার্চ্চনা আচার অনুষ্ঠান শুচিতার দ্বারা তা হতেই পারে না। এমন কি, তাতে মনকে কঠোর করে ব্যাঘাত আনে এবং ধার্ম্মিকতার অহঙ্কার জাগ্রত হয়ে চিত্তকে সঙ্কীর্ণ করে দেয়। হৃদয়ে রস থাক্‌লে তবেই তাঁর সঙ্গে মিলন হয়, আর কিছুতেই হয় না।

কিন্তু এই কথাটি মনে রাখ্‌তে হবে, ভক্তিরসের প্রেমরসের মধ্যে যে দিকটি সম্ভোগের দিক্ কেবল সেইটিকেই একান্ত করে তুল্‌লে দুর্ব্বলতা এবং বিকার ঘটে। ওর মধ্যে একটি শক্তির দিক্ আছে সেটি না থাক্‌লে রসের দ্বারা মনুষ্যত্ব দুর্গতি প্রাপ্ত হয়।

ভোগই প্রেমের একমাত্র লক্ষণ নয়। প্রেমের একটি প্রধান লক্ষণ হচ্চে এই যে, প্রেম আনন্দে দুঃখকে স্বীকার করে নেয়। কেন্‌না দুঃখের দ্বারা ত্যাগের দ্বারাই তার পূর্ণ সার্থকতা। ভাবাবেশের মধ্যে নয়, সেবার মধ্যে কর্ম্মের মধ্যেই তার পূর্ণ পরিচয়। এই দুঃখের মধ্যে দিয়ে কর্ম্মের মধ্যে দিয়ে, তপস্যার মধ্যে দিয়ে যে প্রেমের পরিপাক হয়েছে সেই প্রেমই বিশুদ্ধ থাকে এবং সেই প্রেমই সর্ব্বাঙ্গীণ হয়ে ওঠে।

এই দুঃখ স্বীকারই প্রেমের মাথার মুকুট; এই তার গৌরব। ত্যাগের দ্বারাই সে আপনাকে লাভ করে; বেদনার দ্বারাই তার রসের মন্থন হয়; সাধ্বী সতীকে যেমন সংসারে কর্ম্ম মলিন করে না, তাকে আরো দীপ্তিমতী করে তোলে, সংসারে মঙ্গলকর্ম্ম যেমন তার সতীপ্রেমকে সার্থক করতে থাকে, তেমনি যে সাধকের চিত্ত ভক্তিতে ভরে উঠেছে কর্ত্তব্যের শাসন তাঁর পক্ষে শৃঙ্খল নয় সে তাঁর অলঙ্কার; দুঃখে তাঁর জীবন নত হয় না, দুঃখেই তাঁর ভক্তি গৌরবান্বিত হয়ে ওঠে। এই জন্যে মানবসমাজে কর্ম্মকাণ্ড যখন অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠে মনুষ্যত্বকে ভারাক্রান্ত করে তোলে তখন একদল বিদ্রোহী জ্ঞানের সহায়তায় কর্ম্মমাত্রেরই মূল উৎপাটন, এবং দুঃখমাত্রকে একান্তভাবে নিরস্ত করে দেবার অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু যাঁরা ভক্তির দ্বারা পূর্ণতার স্বাদ পেয়েছেন তাঁরা কিছুকেই অস্বীকার করবার প্রয়োজন বোধ করেন না— তাঁরা অনায়াসেই কর্ম্মকে শিরোধার্য্য এবং দুঃখকে বরণ করে নেন। নইলে যে তাঁদের ভক্তির মাহাত্ম্যই থাকে না, নইলে যে ভক্তিকে অপমান করা হয়; ভক্তি বাইরের সমস্ত অভাব ও আঘাতের দ্বারাই আপনার ভিতরকার পূর্ণতাকে আপনার কাছে সপ্রমাণ করতে চায়—দুঃখে নম্রতা ও কর্ম্মে আনন্দই তার ঐশ্বর্য্যের পরিচয়। কর্ম্মে মানুষকে জড়িত করে এবং দুঃখ তাকে পীড়া দেয়, রসের আবির্ভাবে মানুষের এই সমস্যাটি একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায় তখন কর্ম্ম এবং দুঃখের মধ্যেই মানুষ যথার্থ ভাবে আপনার মুক্তি উপলব্ধি করে। বসন্তের উত্তাপে পর্ব্বতশিখরের বরফ যখন রসে বিগলিত হয় তখন চলাতেই তার মুক্তি, নিশ্চলতাই তার বন্ধন; তখন অক্লান্ত আনন্দে দেশদেশান্তরকে উর্ব্বর করে সে চল্‌তে থাকে; তখন নুড়ি পাথরের দ্বারা সে যতই প্রতিহত

হয় ততই তার সঙ্গীত জাগ্রত এবং নৃত্য উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

একটা বরফের পিণ্ড এবং ঝরনার মধ্যে তফাৎ কোন্ খানে? না, বরফের পিণ্ডের নিজের মধ্যে গতিতত্ত্ব নেই। তাকে বেঁধে টেনে নিয়ে গেলে তবেই সে চলে। সুতরাং চলাটাই তার বন্ধনের পরিচয়। এই জন্যে বাইরে থেকে তাকে ঠেলা দিয়ে চালনা করে নিয়ে গেলে প্রত্যেক আঘাতেই সে ভেঙে যায় তার ক্ষয় হতে থাকে—এই জন্য চলা ও আঘাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে স্থির নিশ্চল হয়ে থাকাই তার পক্ষে স্বাভাবিক অবস্থা।

কিন্তু ঝরনার যে গতি সে তার নিজেরই গতি, সেই জন্যে এই গতিতেই তার ব্যাপ্তি, মুক্তি, তার সৌন্দর্য্য। এই জন্য গতিপথে সে যত আঘাত পায় ততই তাকে বৈচিত্র্য দান করে। বাধায় তার ক্ষতি নেই, চলায় তার শ্রান্তি নেই।

মানুষের মধ্যেও যখন রসের আবির্ভাব না থাকে, তখনি সে জড়পিণ্ড। তখন ক্ষুধা তৃষ্ণা ভয় ভাবনাই তাকে ঠেলে ঠেলে কাজ করায়, সে কাজে পদে পদেই তার ক্লান্তি। সেই নীরস অবস্থাতেই মানুষ অন্তরের নিশ্চলতা তাকে বাহিরেও কেবলি নিশ্চলতা বিস্তার করতে থাকে। তখনই তার যত খুঁটিনাটি, যত আচার বিচার, যত শাস্ত্র শাসন। তখনই মানুষের মন গতিহীন বলেই বাহিরেও সে আষ্টেপৃষ্ঠে বদ্ধ। তখন তার ওঠা বসা খাওয়া সকল দিকেই বাঁধাবাঁধি। তখনি সে সেই সমস্ত নিরর্থক কর্ম্মকে স্বীকার করে যা তাকে সামনের দিকে অগ্রসর করে না, যা তাকে অন্তহীন পুনরাবৃত্তির মধ্যে কেবলি একই জায়গায় ঘুরিয়ে মারে।

রসের আবির্ভাবে মানুষের জড়ত্ব ঘুচে যায়। সুতরাং তখন সচলতা তার পক্ষে অস্বাভাবিক নয়, তখন অগ্রগামী গতি শক্তির আনন্দেই সে কর্ম্ম করে, সর্ব্বজয়ী প্রাণশক্তির আনন্দেই সে দুঃখকে স্বীকার করে।

বস্তুত মানুষের প্রধান সমস্যা এ নয় যে, কোন্ শক্তি দ্বারা সে দুঃখকে একেবারে নিবৃত্ত করতে পারে।

তার সমস্যাই হচ্চে এই যে, কোন্ শক্তি দ্বারা সে দুঃখকে সহজেই স্বীকার করে নিতে পারে। দুঃখকে নিবৃত্ত করবার পথ যাঁরা দেখাতে চান তাঁরা অহংকেই সমস্ত অনর্থের হেতু বলে একেবারে তাকে বিলুপ্ত করতে বলেন; দুঃখকে স্বীকার করবার শক্তি যাঁরা দিতে চান তাঁরা অহংকে প্রেমের দ্বারা পরিপূর্ণ করে তাকে সার্থক করে তুলতে বলেন। অর্থাৎ গাড়ি থেকে ঘোড়াকে খুলে ফেলাই যে গাড়িকে খানায় পড়া থেকে রক্ষা করবার সুকৌশল তা নয়, ঘোড়ার উপরে সারথিকে স্থাপন করাই হচ্চে গাড়িকে বিপদ থেকে বাঁচানো এবং তাকে গম্যস্থানের অভিমুখে চালানোর যথোচিত উপায়। এই জন্যে মানুষের ধর্ম্মসাধনার মধ্যে যখন ভক্তির আবির্ভাব হয় তখনি সংসারে যেখানে যা কিছু সমস্ত বজায় থেকেও মানুষের সকল সমস্যার মীমাংসা হয়ে যায়—তখন কর্ম্মের মধ্যে সে আনন্দ ও দুঃখের মধ্যে সে গৌরব অনুভব করে; তখন কর্ম্মই তাকে মুক্তি দেয় এবং দুঃখ তার ক্ষতির কারণ হয় না।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বুলগেরিয়ার গোলাপী আতর প্রস্তুত প্রণালী।

প্রসিদ্ধ গ্রীকচিকিৎসক ডায়োসিওরাইডিশের (Dioscorides) বর্ণনা অনুসারে দেখা যায় যে প্রাচীন কালে কেবলমাত্র maceration প্রণালী দ্বারাই অর্থাৎ তৈল কিম্বা চর্ব্বির মধ্যে পুষ্প ডুবাইয়া রাখিয়া গোলাপী আতর প্রস্তুত হইত; এবং কেবল মাত্র জলপাই তৈলই এই কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হইত। অন্যান্য পুস্তক পাঠেও জানা যায় যে পূর্ব্বকালে চ্যাবণপ্রথায় গোলাপী আতর বাহির করা হইত না, এবং মধ্য যুগেও ইহার সম্যক প্রচলন হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। এই প্রণালী কয়েক শত বৎসর মাত্র ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। মোসলমানদের আগমনের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে গোলাপ ছিল কি না, কিম্বা গোলাপ জল ও আতর প্রস্তুত হইত কি না তাহা আমরা জানি না। এ সম্বন্ধে পুরাতত্ত্ববিদগণের মতামত জানিতে স্বতঃই ঔৎসুক্য জন্মে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ তত্ত্ব আলোচনায় কোন পণ্ডিতকেই প্রবৃত্ত দেখি না। প্রাচীন আরব্য গ্রন্থকার ইব খালদান তাঁহার মন্তব্যে প্রকাশ করিয়াছেন যে "মধ্য যুগে গোলাপের চাষ ভারতে ও চীনদেশে অত্যন্ত উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল, এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে ইহার চাষ পারস্য দেশে এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে গোলাপ জল প্রস্তুত ঐরাজ্যের রাজস্বের একটী প্রধান উপকরণ হইয়া উঠে। তৎসময়ে ইহারা চ্যাবণ দ্বারা কেবলমাত্র গোলাপ জলই প্রস্তুত করিত, আতর বাহির করিতে জানিত না। গোলাপ জল হইতে উপরের ভাসমান তৈল সংগ্রহ করার বিষয় প্রথমে কাহার মনে উদিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণযোগ্য কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। আমাদের কলেজ লাইব্রেরীর একখানা পুস্তকে এইরূপ লিখিত আছে—

"This idea occurred only to Princess Nour-i-Djihan, who married the Emperor of Delhi Djahangir who died in 1627."

ইহা সত্য হইলে আমাদের গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই।

ইহার পর হইতেই আরব্য দেশ, ভারতবর্ষ ও অন্যান্য প্রাচ্য দেশ সমূহ এই প্রণালী দ্বারা আতর প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে।

আধুনিক সময়ে সমস্ত সভ্যদেশে এসেন্স প্রস্তুতের জন্য যত গোলাপী আতর ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহার অধিকাংশই বুলগেরিয়া কিম্বা ফ্রান্স সরবরাহ করিয়া থাকে। এত আতর ইহারা কি প্রণালীতে প্রস্তুত করে তাহা আমাদের দেশের লোকের জানিতে কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। আশা করি এই প্রবন্ধ পাঠে তাহা কথঞ্চিৎ নিবৃত্তি হইবে। ফ্রান্স অত্যন্ত উন্নত প্রণালীর চ্যাবক যন্ত্রাদির দ্বারা আতর প্রস্তুত করিতেছে, বুলগেরিয়ার এখনো সেই পূর্ব্বতন পুরাতন প্রণালীই অনুসৃত।

বুলগেরিয়া ১৯০৮ সালের ৮ই অক্টোবর তারিখে ইউরোপীয়ের একটী স্বাধীন রাজ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। প্রিন্স ফার্দ্দিনান্দ 'জার' নাম লইয়া শাসন কর্ত্তার পদে বরিত হইয়াছেন। এই স্থানের আব হাওয়া অত্যন্ত শুষ্ক, কারণ ইহা পাহাড়সঙ্কুল ভূমি। এই রাজ্যের পরিসর ৩৭৩২৬ স্কোয়ার মাইল

ও ইহা ৪,০৩৫৬২৩ লোকের আবাসভূমি। পূর্ব্বে সিরিয়া, উত্তরে রোমেনিয়া, পশ্চিমে কৃষ্ণসাগর এবং দক্ষিণে তুরস্কদেশ অবস্থিত। এই রাজ্যের Joundya এবং Strema নামীয় উপত্যকার মধ্যবর্ত্তী স্থানেই গোলাপের চাষ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে, এই স্থান শীত প্রধান ও শুষ্ক, এই স্থানের নিকটবর্ত্তী স্থানেও অনেকে এই ব্যবসা অবলম্বন করিতেছে।

বুলগেরিয়াতে আতর ও গোলাপজল প্রস্তুতের জন্য ডেমাস্ক গোলাপই (Rosa damascena) সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হয়। এই গোলাপ প্রতি গুচ্ছে তিনটি কিম্বা চারটি এবং প্রতি ডালে ৭টা হইতে ১২টা করিয়া জন্মে, ইহা হইতে অধিক হইলে সেগুলি নিকৃষ্ট বিবেচনায় অতিরিক্ত ফুলগুলি নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। সকলেই জানেন গোলাপ ফুল অতি সহজেই ঝরিয়া পড়ে। এই জাতীয় গোলাপ এত সুকোমল যে প্রস্ফুটিত হইতে না হইতে ফুল নষ্ট হইয়া যায়, সামান্য তুষার পাতও এ ফুল সহিতে পারে না। পশ্চিম ফ্রান্সের ন্যায় এ দেশে গুচ্ছে গুচ্ছে গাছ সকল রোপিত হয় না, প্রতি সাত কিম্বা আট ফুট অন্তর অন্তর বৃক্ষ সকল সারি সারি রোপিত [illegible] এই সমস্ত বৃক্ষ, দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে [illegible] এক প্রকারেরই হইয়া থাকে। [illegible] সাধারণতঃ অক্টোবর মাসে গাছে [illegible] প্রদান করে ও নূতন কলম প্রস্তুত [illegible] আরম্ভ করে; এই সমস্ত কলমের [illegible] যত্ন সহকারে রক্ষা করিলে ও [illegible] বৎসর ছাঁটিয়া সার প্রদান করিলে [illegible] পঁচিশ বৎসর কাল উপযুক্ত ফুল প্রদান করিয়া থাকে। পঞ্চম বৎসরে ফুলের মাত্রা সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হয়।

বৎসরের প্রকৃতি অনুযায়ী ১৫ই মে হইতে ২০শে জুনের মধ্যে ফসল সংগ্রহ আরম্ভ হয়। অতি প্রত্যূষে সাজি হস্তে পুষ্পচয়ক পুরুষ ও রমণীগণ বাগানের ছোট ছোট রাস্তা দিয়া যাইতে আরম্ভ করে, এবং অধিক রৌদ্র হইবার পূর্ব্বেই স্ফোটনোন্মুখ কলি ও অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত গোলাপ চয়ন করিয়া আনে; কারণ ইহা অপর দিনের জন্য রক্ষিত হইলে অধিক ফুটিয়া গন্ধ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এই প্রকারে প্রত্যহ শত শত লোক গোলাপ সংগ্রহ করিতেছে; এত পুষ্প হইতে কেবল-মাত্র কয়েক পাউণ্ড তৈল সোনার দরে বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে। এক 'একার' জমীতে সাধারণতঃ ৩,৩০০ পাউণ্ড গোলাপ উৎপন্ন হয়; কিন্তু তাহা হইতে এক পাউণ্ডের অধিক গোলাপী আতর পাওয়া যায় না।

বুলগেরিয়াতে পুরাতন ধরণের তাম্র নির্ম্মিত বকযন্ত্র সকল ব্যবহৃত হইয়া থাকে; ইহা পাঁচফুট উচ্চ ও তিন খণ্ডে বিভক্ত, কার্য্য কালে এগুলি একত্রে যোজিত হইলে আমাদের দেশের একটি সরু মুখ ডেকচির আকার ধারণ করে। নাড়ানাড়ির সুবিধার জন্যই এই যন্ত্র এইরূপ বিভক্ত অংশে প্রস্তুত। আমাদের দেশে উৎসবের সময় যেমন বড় বড় উনান প্রস্তুত হয় সেইরূপ উনানের উপর ডেকচিগুলি সারি সারি সজ্জিত হইয়া থাকে। বাষ্প জমাইয়া জল করিবার নল (Refriger-ating) কতকগুলি কাষ্ঠ নির্ম্মিত টবের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হয়, এবং তাহা জলধারা দ্বারা ঠাণ্ডা করা হইয়া থাকে। টব

সকলের অপর পার্শ্বস্থ আধারের (flask) জমাট বাষ্প গৃহীত হইয়া থাকে। বকযন্ত্রের সঙ্গে ঐ নল সংযুক্ত থাকে এবং আধারে সমস্ত অংশ সংযোজিত হইলে, ভিতরে

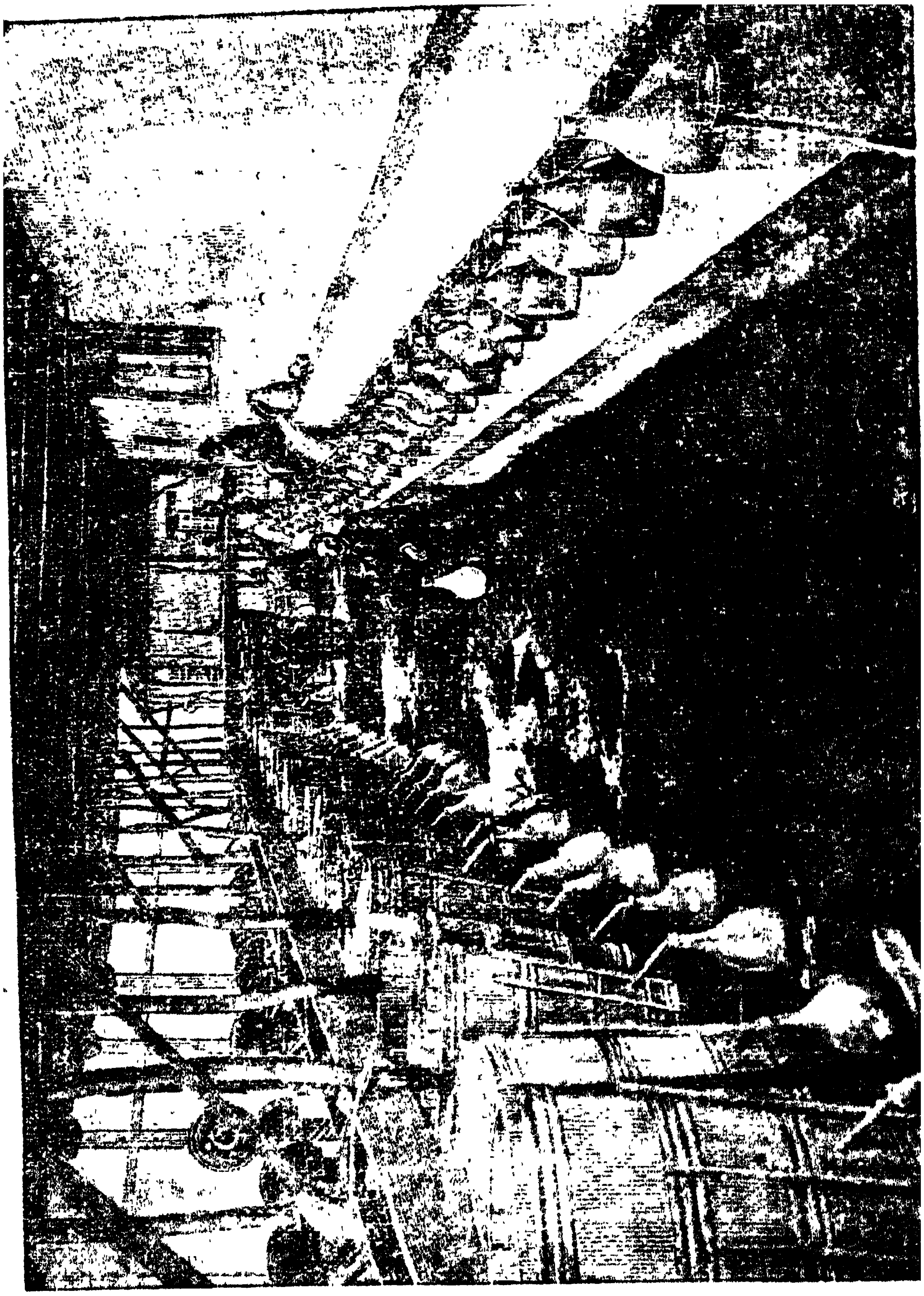

পুষ্প ও জল প্রদান করিয়া ইহাকে চুল্লীর উপর স্থাপন পূর্ব্বক উনানে অগ্নি প্রয়োগ করা হয়। জল ফুটিতে আরম্ভ করিলে ক্রমে ক্রমে উত্তাপ কমাইয়া এক ঘণ্টা কিম্বা দেড় ঘণ্টার পর উত্তাপ সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এই প্রকার ক্রিয়ার ফলে ১২ সের আন্দাজ গোলাপ জল পাত্রে সংগৃহীত হয়। তৎপরে অবশিষ্ট জল হইতে সিক্ত

গোলাপ ছাঁকিয়া ফেলিয়া পুনরায় উহা টাটকা গোলাপে পূর্ণ করা হয়; এই প্রকারে

গোলাপ জল প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহারা সর্ব্বদাই সদ্যোচয়িত টাটকা ফুল ব্যবহার করে।

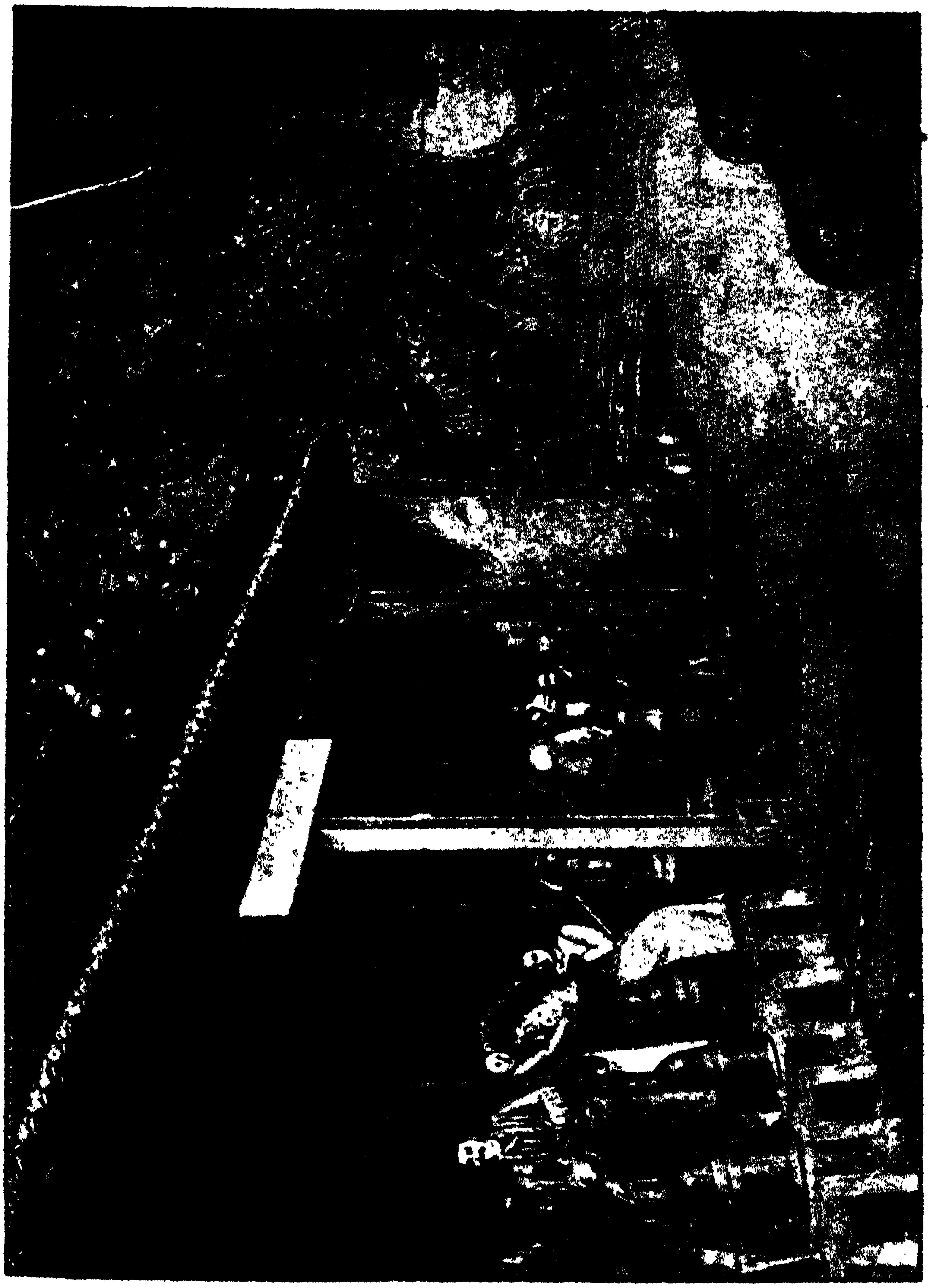

উনানের উপর সজ্জিত বক যন্ত্রে ফুল প্রদান করা হইতেছে

বাসিফুলে কখনও ভাল গোলাপজল প্রস্তুত হয় না।

গোলাপ জল হইতে আতর পাইবার

জন্য ইহাকে পুনরায় চোয়ান হইয়া থাকে; দ্বিতীয় বার চাবঁণে যে সকল প্রণালী অবলম্বিত হয় তাহার

পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা এই স্থানে অসম্ভব। এককথায়, জলের উপর ভাসমান আতরটুকু নানা উপায়ে সংগৃহীত হয়। যাঁহারা গাজিপুরের গোলাপ কারখানা দেখিয়াছেন, এই বিষয়ে সম্ভবতঃ তাহাদের অনেকটা অভিজ্ঞতা থাকিতে পারে। বিশুদ্ধ গোলাপী আতর সামান্য পীতাভ। রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা গিয়াছে যে ষ্টিরোপটীন (Steorop-tene) অর্থাৎ একপ্রকার গন্ধহীন শ্বেতবর্ণের স্ফটিজ (crystalizable) হাইড্রোকার্ব্বাইড (hydrocabide) এবং এক প্রকার তরল পদার্থ geraniol এবং certonellol যাহার প্রধান উপাদান এতদুভয়ের সংমিশ্রণে গোলাপী আতর প্রস্তুত হয়। তদ্ভিন্ন ইহার সহিত আরো দুই একটী পদার্থ মিশ্রিত আছে, যাহা এখনো জৈব রসায়নবিদগণ নির্দ্ধারণ করিতে সক্ষম হন নাই।

বাজারে বিশুদ্ধ গোলাপী আতর এক প্রকার দুষ্প্রাপ্য বলিলেই হয়। কারণ অতি সামান্য আতর প্রস্তুতের জন্য এত অধিক পুষ্প ও পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় যে তাহাতে ইহা একেবারে দুর্ম্মূল্য হইয়া পড়ে।

পরিশেষে আমার এই নিবেদন, কোন ভদ্রলোক গাজিপুরের আতর প্রস্তুত সম্বন্ধে কোন বিবরণী 'ভারতী'তে প্রকাশ করিলে বিশেষ উপকৃত হইব। এই প্রবন্ধের শেষ অংশটুকু অর্থাৎ চ্যাবণ প্রণালীটুকু "লা নাটীর" নামক ফরাসী পত্রিকা হইতে 'ভারতী'র জন্য সংগৃহীত হইল।

শ্রীনিরুপমচন্দ্র গুহ।

ধারা।

১

ওগো এমনি ধারাই হয়!
ফুলের যখন হয় প্রয়োজন
ফাগুন-হাওয়াই বয়!
তৃষ্ণা-করুণ বাজ্‌লে কেকা,
শূন্যে ফোটে জলের রেখা,
চুম্বনের পুলক জাগে, দ্যুলোক ভূলোকময়!

২

তোরা ওগো জানিস্ কি পরের
আপন হওয়ার সুখ?
(তোদের) উদাস আঁখি কারেও দেখি'
হয়নি কি উৎসুক?
নূতন প্রেমের নূতন সুখে
হাসি দেখা দ্যায় নি মুখে?
পূর্ণ চাঁদের আলোয় তোদের পূরেনি কি বুক!

৩

যদি কুসুম-শরে হৃদয় বেঁধে
তবে কেঁদ না,
সে যে ফুলের সুখ-পরশ মাঝে
মৃদু বেদনা!
সে যে দিনের দাহে কুঞ্জ-ছায়ে
স্বপ্ন আনে বিভোল্ বায়ে,
ঘুমের শেষে আলোর দেশে আধেক চেতনা।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

চয়ন।

যবদ্বীপে।

বাতাবিয়া হইতে তোসারী।

(ফেলিসিয়ঁা শালের ফরাসী হইতে)

বাতাবিয়া*।

বুধবার ২৮ নভেম্বর ১৯০০।

বাতাবিয়া একটী বিরাট নগরী—কিংবা একটি বিশাল উদ্যান বলিলেও হয়। সর্ব্বত্রই গাছপালা; সকল বাড়ীরই চারিদিকে উপবন। তাই, বাড়ীর সংলগ্ন ভূমিগুলি অতীব বিস্তৃত; দূরত্বও খুব বেশী। নগরদর্শনে বাহির হইয়া, একপ্রকার লঘু-গঠনের গাড়ীতে বসিয়া, কয়েক ঘণ্টা ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়াইলাম। দেশী গাড়োয়ান। গাড়োয়ানের সহিত গাড়ীতে পিঠাপিঠি বসিতে হয়। এই গাড়ীর নাম 'সাডো'। চারিদিক হইতে, নগরের উপর দিয়া কতকগুলি খাল গিয়াছে খালগুলা সিধাভাবে কাটা। আমরা যেন হল্যাণ্ডে আসিয়াছি। এ-গ্রীষ্মপ্রধান দেশের হল্যাণ্ড।

আজ প্রাতে, নগরের যে অঞ্চলগুলি দর্শন করিলাম, সেই সব অঞ্চল আমার স্মৃতিপটে একটা সুস্পষ্ট ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছে:—খাল-সঙ্কুল বাতাবী-নগর। খালের ধারে ধারে বিপণি। খালের জল একটু পীতাভ। খালের ধারে বাণিজ্য-কুঠি ও ব্যাঙ্কের যে অঞ্চলটি,—সেই অঞ্চলেই অধিকাংশ য়ুরোপীয়ের বাস। Kœningsplein এই নামে একটা তরুহীন বিশাল ময়দান—তার চারিধারে সুন্দর-সুন্দর হোটেল।

রাস্তায়, দেশীলোকের জনতা। শ্যামবর্ণ, সুগঠিত-শরীর, মুখের অবয়বগুলা খুব পরিস্ফুট। স্ত্রীলোকদের গায়ে আঁটা "সারং" (পরিধান বস্ত্র); কোন কোন রমণীর গঠন এরূপ সুন্দর যে পাথরে-খোদা প্রতিমা বলিলেই হয়। নগরের সমস্ত লোক, খালের পীতাভ জলে সমস্ত দিনই স্নান করিতেছে:—শিশুরা, যুবকেরা, নবযুবতীরা, সকল বয়সের স্ত্রী পুরুষেরাই স্নান করিতেছে। আবার কতকগুলি রমণী কাপড় কাচিতেছে। আর্দ্র বস্ত্র গাত্রে আঁটিয়া ধরায় গঠনের সৌন্দর্য্য দিব্য প্রকাশ পাইতেছে:—এই সব স্নায়িকা ও বস্ত্রধৌতকারিণী রমণীমণ্ডলী—চিত্রবৎ সুশোভনা ও যারপর নাই চিত্তহারিণী।

রাস্তায় অনেক চীনে-লোকও আছে; তাদের মাথায় কোণালু টুপি। লাল কিংবা কালো রেশমি সূতা দিয়া বেণীকে আরও দীর্ঘ করা হইয়াছে। তাদের মধ্যে অধিকাংশই ফেরিওয়ালা ক্ষুদ্র দোকানদার:—একটা বাঁশের আগায় তাদের পণ্যদ্রব্য ঝুলাইয়া

* এই বাতাবিয়া হইতে বাতাবী-লেবু ভারতবর্ষে প্রথম আনীত হয়।—অনুবাদক।

রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং কাঠের কর্ত্তাল-সমন্বিত একটা কাঠের যন্ত্র নাড়িয়া ক্রেতাদিগকে আহ্বান করিতেছে।—এইমাত্র একটা হোটেলের সম্মুখে একজন চীনের নিকট হইতে একটা নূতন সাদা পরিচ্ছদ ক্রয় করিলাম; একটু পরেই দেখিতে পাইলাম, উহার গায়ে একটা পুরাতন কালীর দাগ। নূতন বলিয়া চালাইবার জন্য চীনেলোকটা খড়িমাটির প্রলেপ দিয়া ঐ কালীর দাগ সযত্নে ঢাকিবার চেষ্টা করিয়াছে।

অপরাহ্ণের শেষভাগে ও সায়াহ্নে, ওলন্দাজ পুরুষ ও ওলন্দাজ রমণীরা গৃহ হইতে বাহির হয়। খোলামাথায় রাস্তায় পদচারণা করে। অধিকাংশ যুবতীর নগ্ন বাহু, অর্দ্ধেক বুক খোলা। কেহ কেহ, নিজ গৃহের সম্মুখে, পাজামা পরিয়া, দেশী পরিচ্ছদ 'সারং' পরিয়া, খাটো রাত-কাপড় (Night-dress) পরিয়া, নগ্ন পায়ে চটিজুতা পরিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। য়ুরোপীয় মুখশ্রী ও দেশীয় মুখশ্রীর অপূর্ব্ব মিশ্রণ দেখিয়া মেটে-ফিরিঙ্গিদিগকে বেশ চেনা যায়। কতকগুলি ইস্কুলের বালিকা এইখান দিয়া চলিয়া গেল:—ওলন্দাজ বালিকাদিগের কটা চুল, ও ফিরিঙ্গি বালিকাদিগের কালো চুল,—দুই বিপরীত রং-এর মধুর সম্মিলন।

হোটেল। ওলন্দাজ হোটেলটি এই অত্যুষ্ণ দেশেরই উপযোগী। খাবার ঘরের মাথার উপর ছাদ, কিন্তু চারিদিকে খোলা।—আমাদের ভোজনশালায়, হল্যাণ্ডের তরুণবয়স্কা রাণীর অর্দ্ধকায়িক প্রতিমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। নগ্নপদে দেশীয় ভৃত্যেরা পরিবেশন ও পরিচর্য্যা করিতেছে।—Kœnings-plein হইতে বৃহৎ খাল পর্য্যন্ত যে গলি গিয়াছে, সেই গলির বরাবর ভোজনশালাগুলি সন্নিবেশিত; ভোজনশালাগুলি খুব বড়, জানলায় শার্সি-দরজা নাই;—এই খোলা জানলা দিয়া দিবারাত্রি হাওয়া চলিতেছে। খাটে মশারি আছে, একটা গদি তক্তার মত শক্ত, তার উপর একটা চাদর পাতা। একটা মাথার বালিস, আর দুই পায়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী স্থানে একটা বালিস—পাছে দুই পায়ের ঘসাঘসিতে বেশি গরম হয়, এই জন্য এই বালিস্। স্নানের ঘরে একটা মস্ত জালা; একটা চতুষ্কোণ কাষ্ঠ-পাত্র দিয়া উহা হইতে ঠাণ্ডা জল উঠাইয়া গায়ে ঢালিতে হয়।

এখানকার একটা রান্না খুব নূতন ধরণের; ভারতীয় ইংরাজদের যেরূপ কারি-ভাত, সেই কারি-ভাত অপেক্ষাও ইহা বেশী বিমিশ্র; বিবিধ চাট্নি-রসে সুসিক্ত ও খুব বেশি গরম-মশলা দেওয়া ভাত; সেই ভাতের সহিত নানাপ্রকার মাংস ও শাক শবজি মিশ্রিত;—তার মধ্যে গোমাংস আছে, মহিষ-মাংস আছে, মুর্গির মাংস আছে, মৎস্য আছে, ডিম্ব আছে, আম্লেটের টুকরো আছে, সকল জাতীয় শাকসবজি আছে, নারিকেলের গুঁড়া আছে—গরম দিনে যখন অগ্নিমান্দ্য হয়, তখন এই ব্যঞ্জনটা বাস্তবিকই খুব মুখরোচক।

বাতাবিয়ার ওলন্দাজেরা যে নিয়মে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, হোটেলেও প্রায় সেই একই নিয়ম দৃষ্ট হয়:—৬টা ৭টার মধ্যে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান, স্নান, সদুগ্ধ কাফি পান; কাজকর্ম্ম কিংবা পদচারণা; ৯টার সময় চা-এর সঙ্গে 'ঠাণ্ডা' প্রাতরাশ; বাড়ী বসিয়া

কাজকর্ম করা কিংবা গাড়ী করিয়া বেড়ান; একটার সময় মধ্যাহ্ন ভোজন; ২টা হইতে ৪টা ৫টা পর্য্যন্ত দিবানিদ্রা; ৪টা ৫টার মধ্যে স্নান ও চা-পান; ৫টার পর কাজকর্ম কিংবা বেড়ান, ৮টার সময় য়ুরোপীয় ধরণে সায়াহ্ন ভোজন।

আজ রাত্রে ফ্রান্সের কন্সল্ আমাকে 'হার্মনি'-ক্লবে লইয়া গিয়া, সকলের সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন। বাতাবিয়ার এই একমাত্র 'সিভিল' কর্ম্মচারীদিগের ক্লব। ইহা গৃহ-সজ্জায় সুসজ্জিত, ইহার বৈঠকখানা ঘরগুলি বেশ ঠাণ্ডা, মার্বেল-পাথর বসান। ইহার পঠন-শালাটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট; এরূপ বিশ্বজাতীয় পাঠাগার আমি আর কোথাও দেখি নাই। ওলন্দাজদিগের কিরূপ অন্তর্জাতীয় জ্ঞানচর্চ্চা এইখানেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়; উহাদের মধ্যে অনেকেই ফরাসী ভাষায়, জর্ম্মান ভাষায়, ইংরাজি ভাষায় কথা কহে; এখানে, শুধু হল্যাণ্ডের নহে—ফ্রান্সের জর্ম্মানির, ইংলণ্ডের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংবাদপত্রাদি —সচিত্র সংবাদপত্র, সমালোচনপত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ফ্রান্সের Le Figars, Le Gil Blas, La Revue des Deux Mondes, La Revue de Paris, La Nouvelle Revue, Le Mercure de France, E'Illustration, le Theatre—এই সব। টেবিলের উপর, নব আবিষ্ক্রিয়া সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি, ফরাসি উপন্যাসের মধ্যে Pierre Vebe প্রণীত "Amour Amour." (ভালবাসা) আমি-ইহা পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিলাম।

এই পুস্তক পাঠ করিতে করিতে মনে হইল যেন আমি আমার স্বজাতীয় লোকদিগের মধ্যে আবার ফিরিয়া আসিয়াছি; ক্ষণকালের জন্য এখানে আমার যে বৈদেশিক সংস্রব ঘটিয়াছে, এই সংস্রব এখন যেন আরও তীব্ররূপে অনুভব করিতে লাগিলাম। ক্লবের ওলন্দাজেরা চারিদিক হইতে জাভাদেশীয় ভৃত্যদিগকে যালাই ভাষায় Spada! Spada! বলিয়া ডাকিতেছে—শুনিয়া আমার আশ্চর্য্য মনে হইতে লাগিল। আবার যখন আমার হোটেলে ফিরিয়া গিয়া গ্রীষ্মদেশ-সুলভ উজ্জল চন্দ্রালোকে দেখিলাম—খালের ধারে ধারে শ্যামবর্ণ মনুষ্য সকল বৃহৎ তরুতলে বসিয়া আছে—তখন আমি বিস্মিত হইলাম।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জীবনস্বামী। (এইটি চয়ন নহে)

শুভ্র বেশ করি　　শুভ্র মূর্ত্তি ধরি
শুভ্রালোকোপরি কে তুমি বিরাজ'।
দরশ মাগিয়ে　　রয়েছি জাগিয়ে
তোমারি লাগিয়ে হে হৃদয়-রাজ'।
'নিবিড় আঁধারে একা বসি আমি,
তব নাম হৃদে জপেছিনু স্বামী,
নীরব সে বাণী,　　কেমনে না জানি,
মরম হে তব পরশিল আজ'।
জানিনু হৃদয়ে থাকিয়ে গোপনে,
শুনেছিলে মম মরম বেদনে,
(তাই) আঁধার জীবনে,　　ভাসায়ে কিরণে,
উদিলে হে আসি এ হৃদয় মাঝ'।

শ্রীমতী হেমলতা দেবী।

লোকান্তরে জীব-প্রকৃতি।

বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক অভিমত।

আমরা পৃথিবীর উপরে বাস করিয়া অপরাপর গ্রহের অধিবাসী সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য চিরদিনই উৎসুক। মানব-সভ্যতার প্রথম অবস্থা হইতে আজ পর্য্যন্ত বিভিন্ন গ্রহের অধিবাসীগণের আকৃতি প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রকার মত প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ফন্‌টেনেল্ (Fontenelle) নামে একজন সুচতুর লেখক জ্যোতিষশাস্ত্রে এক একটি গ্রহের যেরূপ বিশেষ গুণ বা দোষ বর্ণিত হইয়াছে, তিনিও সেই সকল গ্রহবাসীকে তদনুরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বুধগ্রহের অধিবাসিগণ উদ্ধত চঞ্চলপ্রকৃতি, শুক্রগ্রহের অধিবাসিগণ কোমল প্রেমপূর্ণ প্রকৃতি, মঙ্গলগ্রহের অধিবাসিগণ যুদ্ধপ্রবণ কলহলিপ্ত ইত্যাদি। ডাক্তার হোয়েওয়েল্ (Dr. Whewell) সাহেব এই সকল অধিবাসীর আকৃতি পর্য্যন্ত বর্ণনা করিতে ক্ষান্ত হন নাই।

বস্তুতঃপক্ষে লোকান্তরের জীবপ্রকৃতি নির্ণয় করিবার উপযুক্ত কোনও বৈজ্ঞানিকপ্রমাণই নাই। অধিকন্তু আমাদের বৈজ্ঞানিকগণের বিশ্বাস যে একমাত্র পৃথিবীই সাবয়ব জীবের বাসভূমি। আবার অনেকে বলেন এরূপ বিশ্বাসের কোন ভিত্তি নাই। তবে আমাদের এই পৃথিবীতে আমরা যেরূপ বিভিন্ন অবস্থায় জীবপুষ্টি দেখিতে পাই, তাহাতে এক চন্দ্রালোক ভিন্ন অন্যান্য গ্রহে তাহার অবস্থা ও প্রকৃতি অনুযায়ী জীব বাস করা কিছুই আশ্চর্য্য নহে।

আমাদের এই সৌরজগতে দূরে নিকটে কত বিভিন্ন আকৃতির কত বিভিন্ন প্রকৃতির গ্রহ উপগ্রহই রহিয়াছে। বৃহস্পতি ও শনি যেরূপ দূরে এবং সম্ভবতঃ তাহারা একাল পর্য্যন্ত যেরূপ অত্যধিক উত্তাপময়, তাহাতে তথায় কোন প্রকার জীবের বাস সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু আমরা যতটুকু জানি তাহাতে তাহাদের উপগ্রহগুলি জীবলোক হইবারই অধিকতর সম্ভাবনা। বুধগ্রহ সূর্য্যের যেরূপ সন্নিকটে, তাহাতে তথায় বর্ত্তমান অবস্থায় কোনপ্রকার জীব বাস করে বলিয়াও মনে হয় না। কিন্তু শুক্র ও মঙ্গল এই দুই প্রতিবেশী গ্রহের কথা স্বতন্ত্র।

সময়ে সময়ে শুক্রগ্রহ অপরাপর গ্রহ অপেক্ষা দুই কোটি ষাট লক্ষ মাইল পৃথিবীর নিকটে আসে সত্য, কিন্তু তৎসত্বেও আমরা ইহার সম্বন্ধে অতি অল্পই জানিতে পারিয়াছি। যতটুকু জানিতে পারিয়াছি তাহা দ্বারা ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় যে আমাদের পৃথিবীর ও শুক্রগ্রহের অবস্থা অনেকটা একরূপ। ইহার আয়তন পৃথিবী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্প এবং ইহার গাত্রচিহ্ন হইতে বুঝিতে পারা যায় যে ইহা প্রত্যেক ২৩ ঘণ্টা ২১ মিনিটে একবার করিয়া আপনার মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া যায়। সুতরাং ইহার একদিন প্রায় আমাদের একদিনেরই সমান। জ্যোতিষীগণ অনেক দিন হইতেই বলিয়া আসিতেছেন যে শুক্রগ্রহ উচ্চপর্ব্বতে পরিপূর্ণ। কিছুদিন পূর্ব্বে ইতালি ও অন্যান্য স্থানের জ্যোতিষীগণ ইহার উপরে মহাদেশ ও মহাসাগরের স্পষ্ট চিহ্নও পরিদর্শন করিয়াছেন, এবং সময়ে সময়ে মঙ্গলের মেরুস্থানের ন্যায় ইহার দুইদিকে অত্যুজ্জ্বল দুইটি স্থানও তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

শুক্রগ্রহ যখন সূর্য্যের নিকটে আসে, তখন ইহার চতুর্দ্দিক পৃথিবীর অপেক্ষা দ্বিগুণ ঘন বায়ুমণ্ডলে আবৃত দেখিতে পাওয়া যায় এবং আলোক বিশ্লেষণ যন্ত্রের সাহায্যে সেই বায়ুমণ্ডলে জলবাষ্পও দেখিতে পাওয়া যায়। যে অর্দ্ধভাগ সূর্য্যের বিপরীত দিকে অবস্থিত, তথায় আমাদের সূর্য্যহীন মেরু-প্রদেশের স্নিগ্ধ আলোকের ন্যায় এক প্রকার আলোক রশ্মিও দেখিতে পাওয়া যায়।

অনেকদিন হইতেই শুক্রের উপগ্রহ থাকা না

থাকা সম্বন্ধে অনেকপ্রকার বিরুদ্ধ মত প্রচারিত হইয়া আসিতেছিল। জ্যোতিষীগণের মতে শুক্রের একটি বা ততোধিক উপগ্রহ থাকিলেও সেইটি বা সেইগুলি অত্যন্ত ক্ষুদ্র। অপর পক্ষে তাহার চন্দ্রের অভাব অনেকাংশে পৃথিবীর দ্বারাই দূর হয়। আমাদের এই অন্ধকার পৃথিবী যে আলোকোজ্জ্বল চন্দ্রের কার্য্য করে, একথা শুনিলে অনেকেই হয় ত বিস্মিত হইবেন। কিন্তু শুক্রের অধিবাসীগণ যদি চক্ষুবিশিষ্ট হন, তাহা হইলে তাহারা আমাদের পৃথিবীকে চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল দেখে সন্দেহ নাই। শুক্র যে সময়ে পৃথিবীর নিকটতম স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন ইহার অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকটিই আমরা দেখিতে পাই; কিন্তু পৃথিবীর আলোকিত দিকটি সম্পূর্ণভাবে শুক্রের দিকে ফিরিয়া থাকে বলিয়া সেখান হইতে ইহাকে একটা জ্যোতির্ম্ময় গোলাকার বস্তুর মত দেখায় সন্দেহ নাই।

সূর্য্য হইতে শুক্রের দূরত্ব পৃথিবী হইতে দূরত্বের তিন চতুর্থাংশ অর্থাৎ ৬ কোটি ৭০ লক্ষ মাইল; সুতরাং পৃথিবী অপেক্ষা শুক্র সূর্য্য হইতে প্রায় দ্বিগুণ আলোক ও উত্তাপ লাভ করে। কিন্তু আমরা যে, পৃথিবী অপেক্ষা দ্বিগুণ ঘন বায়ুমণ্ডলের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহা দ্বারা বোধ হয় এই অতিরিক্ত উত্তাপ ও আলোক অনেকটা নষ্ট হইয়া পড়ে। অতএব জ্যোতির্বিজ্ঞানের অনুমান শুক্রগ্রহ আমাদেরই এখানকার মত কোনপ্রকার জীবের বাসভূমি।

মঙ্গলগ্রহ শুক্রের অপেক্ষা অনেক ছোট। ইহার ব্যাস ৪২০০ মাইল, ইহার আয়তন পৃথিবী অপেক্ষা সাত গুণ কম। সূর্য্য হইতে ইহার দূরত্ব ১৩ কোটি ২০ লক্ষ মাইল হইতে ১৪ কোটি ৮০ লক্ষ মাইলের মধ্যে পরিবর্ত্তিত হয়। ৬৮৭ দিনে ইহা একবার সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিয়া আসে এবং ২৪ ঘণ্টা ৩৭ মিনিটে একবার স্বকীয় মেরুদণ্ডে বিঘূর্ণিত হয়। ইহার ঋতুগুলি অনেকটা পৃথবীর মত বলিয়াই অনুমান হয়। ১৮৭৭ সালে জ্যোতিষীগণ ইহার দুইটি উপগ্রহ আবিষ্কার করেন, কিন্তু সে দুইটি এত ছোট যে তাহারা যে বিশেষ আলোক দান করিতে পারে এরূপ মনে হয় না।

ছোট একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারাই মঙ্গলগাত্রের অনেকগুলি দাগ চোখে পড়ে। বড় যন্ত্রের দ্বারা সেগুলি বেশ স্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। স্বাভাবিক চক্ষে ইহাকে যেরূপ রক্তাক্ত দেখায়, যন্ত্রের দ্বারা দেখিলে সেরূপ বোধ হয় না। কিন্তু রক্তবর্ণের সঙ্গে একটু সবুজ ও বেগুণে বর্ণের আভাও দেখিতে পাওয়া যায়। দুইটি মেরুস্থলে দুইটি উজ্জ্বল ধবল চিহ্ন দেখা যায়। সূর্য্যের নৈকট্য ও দূরত্ব অনুসারে, এই উজ্জ্বলতারও হ্রাসবৃদ্ধি হয়। আমাদের পৃথিবীর তুষারমণ্ডিত মেরুদেশের উজ্জ্বলতারও এইরূপ হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

মঙ্গলে এক সময়ে যে সকল চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যায়, অপর সময়ে সেগুলি প্রায় দেখিতেই পাওয়া যায় না। উপরন্তু অপর কতকগুলি নূতন চিহ্ন দেখা যায়। এ সকল পরিবর্ত্তন সম্ভবতঃ মেঘাবৃত বায়ুমণ্ডলের ফলেই হয়।

১৮৬০ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর যেরূপ নিকটে আসিয়াছিল সচরাচর তাহাকে আমাদের এত নিকটে পাওয়া যায় না। ১৮৯২ সালে ইহা একবার এইরূপ নিকটে আসিয়াছিল এবং ১৯২৪ সালে পুনরায় একবার আসিবে। এ বৎসর মঙ্গলগ্রহ পরিদর্শন করিবার জন্য সভ্যজগতের জ্যোতিষীগণ নানাবিধ আয়োজন করিয়াছিলেন। আমেরিকাই এ বিষয়ে অগ্রণী। একজন জ্যোতিষী বেলুনে চড়িয়া পাঁচ ছয় ক্রোশ উর্দ্ধে উঠিয়া আপনাকে এক অ্যালুমিনিয়াম ধাতুর বাক্সের মধ্যে বন্ধ করিয়া বসিয়া ছিলেন। অনেক জ্যোতিষীর বিশ্বাস যে মঙ্গলবাসিগণ অনেকদিন হইতে পৃথিবীতে তাড়িৎ সংকেত প্রেরণ করিতেছেন। উক্ত জ্যোতিষী সেই সঙ্কেত তাঁহার তাড়িৎ-যন্ত্রে গ্রহণ করিবার জন্য আকাশে উঠিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। আর একজন জ্যোতিষী এক বিরাট আয়না লইয়া মঙ্গলবাসীকে সঙ্কেত করিবার জন্য বসিয়া ছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় পৃথিবীর কোন জ্যোতিষীই এবার

অভিজ্ঞতা হইতে আমরা যাহা অসম্ভব বলিয়া মনে করিতেছি, বিধাতার অনন্ত বিধানে তাহা সম্ভব হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে।

শ্রীসুখময়

অধ্যাপক পার্সিভাল লোয়েল সম্প্রতি মঙ্গলগ্রহে আরও একটী খাল (Canal) দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস মঙ্গলে বসতি আছে।

কিন্তু মিউডনে মশিয়ো আণ্টোনার্ডি একটী ৩০ ইঞ্চি দূরবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে অধ্যাপক লোয়েল যেগুলিকে খাল বলিতেছেন সেগুলি ছায়া মাত্র। ছায়াগুলি যে কিসেরত্তাহা আণ্টোনার্ডি স্থির করিতে পারেন নাই। তাহার যে সকল প্রতিকৃতি লইয়াছেন তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে তাহা স্পষ্ট সীমা নির্দ্দেশক রেখা নহে। ইয়ার্কিস (Yerkes) মানমন্দিরে কর্ত্তৃপক্ষগণও আণ্টোনার্ডির সহিত একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কালিফর্ণিয়ার অন্তর্গত উইলসন মানমন্দিরে একটী ৬০ ইঞ্চি দূরবীক্ষণ সহকারে অধ্যাপক হেল মঙ্গলের অনেকগুলি চিত্র লইয়াছেন। এই চিত্রের ছায়া ও আণ্টোনার্ডি গৃহীত চিত্রের ছায়া একই প্রকার। আমেরিকায় ১০০ শত ইঞ্চি মুর্খবিশিষ্ট একটী দূরবীক্ষণ প্রস্তুত হইতেছে। আশা করা যায় : ইহাতে মঙ্গলের ছবি আরও পরিস্ফুট হইবে।

Journal of the British Astronomical Association নামক পত্রিকায় মণ্ডার (Maunder) সাহেব পৃথিবী এবং মঙ্গলের আকারাদির তুলনা করিয়াছেন।

	পৃথিবী	মঙ্গল
ব্যাসরেখা	৭৯২০ মাইল	৪২০০ মাইল
উপরিভাগ	১৯৭০০০০০০ বর্গ মাইল	৫৫৪০০০০০০ বর্গ মাইল
আয়তন	২৬০,০০০,০০০ কিউবিক মাইল	৩৯০,০০০,০০ কিউবিক মাইল

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে পৃথিবী মঙ্গল অপেক্ষা শুধু যে আয়তনে বড় তাহা নয় বাস্থ্য হিসাবেও আমরা সুখে আছি। মঙ্গল অত্যন্ত ঠাণ্ডা। মিঃ মণ্ডার এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে—রাত্রিকাল মঙ্গলে এত ঠাণ্ডা যে পৃথিবীর মধ্যে কোন স্থলই তত ঠাণ্ডা নয় এবং সেরূপ ঠাণ্ডায় সকল জলই জমিয়া যায়। দিনে আবার এত গরম যে জল বাষ্পে পরিণত হইতে দেরী লাগে না। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে আমাদের মত জীবের পক্ষে মঙ্গল বিশেষ লোভনীয় স্থান নহে।

শ্রীতই।

চসারের পরিণয়। গল্প।

(ইংরাজি হইতে)

ইয়ুরোপে যেরূপ হোমার ইংলণ্ডে সেইরূপ চসারই আদি কবি। তাঁহার পূর্ব্বে যে সে দেশে কবিতা বা কবি ছিল না তাহা নহে, কিন্তু তিনিই সর্ব্ব প্রথম কবিতাকে কাব্যাকার প্রদান করিয়া তাহাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩৪৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকে গমন করেন। তিনি যে কেবল কবি ছিলেন তাহা নহে তাঁহার কালের তিনি একজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা, বীর, রাজনীতিজ্ঞ, ও রাজসভাসদ ছিলেন। প্রবল পরাক্রান্ত রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ড ও তাঁহার পরিবারবর্গের তিনি বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন।

ইংলণ্ডের আদি কবি চসারের কবিত্ব মাধুর্য্য ও কল্পনা প্রাচুর্য্য তাঁহার স্মৃতিটিকে আজিও অমর করিয়া রাখিয়াছে। তিনি যৌবনের প্রারম্ভ হইতে এক সুন্দরী যুবতীকে ভাল বাসিতেন। যুবতী বহুকাল তাঁহার প্রেমকে উপেক্ষা করিয়া অবশেষে স্বীয় প্রভু রাজপুত্রের কৌশলে চসারের সহিত পরিণয় বন্ধনে আবদ্ধ হন।

প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে হেমন্তের স্নিগ্ধশীতল প্রভাতে একদল উজ্জ্বলদেহ লোক

এক বিস্তীর্ণ প্রান্তর অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে ছিলেন। এই প্রান্তর এখন রিচ্‌মণ্ড্‌ পুষ্পোদ্যান নামে প্রসিদ্ধ। রাজপুত্র জন্‌ অফ্‌ গণ্ট্‌ তাঁহার রূপবতী পত্নী ডাচেস্‌ ব্লান্‌চেকে সঙ্গে লইয়া রিচ্‌মণ্ডের দুগ্ধশুভ্র মর্ম্মর প্রাসাদে ইংলণ্ডের প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি পিতা তৃতীয় এড্‌ওয়ার্ডের নিকট যাইতে ছিলেন। তাঁহার সহচর অনুচর ভৃত্য ও সৈনিকে সেই সুদীর্ঘপথ পরিপূর্ণ। রাজপুত্র ও তাঁহার অনুচরবর্গের পরিচ্ছদের সৌন্দর্য্য ও পারিপাট্য এতই অধিক যে তাহার নিকট হেমন্ত সূর্য্যের রক্তরাগে সুবর্ণরঞ্জিত পল্লব শোভাও পরাজিত হইয়াছিল। বসনভূষণের বাহুল্য-গৌরব সে যুগের ইংরাজগণের একটা বিশেষত্ব ছিল।

এই বেশভূষার বাহুল্যের মধ্যে কেবল এক ব্যক্তির বেশভূষা অতি সহজ ও সাধারণ। তাঁহার দেহখানি যৌবন তেজে দীপ্ত, নয়ন দুইটি একটা গভীর গাম্ভীর্য্য ময়; আকৃতিটি বেশ প্রফুল্ল মনোহর।

রাজপুত্রের সম্মুখ ও পশ্চাতের সশস্ত্র অশ্বারোহী প্রহরিগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টিত করিয়া ধীর গতিতে পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিতে ছিল, সেই অবকাশে এই দরিদ্র বেশধারী রাজানুচর রাজপুত্রকে ত্যাগ করিয়া সহসা অশ্বতাড়নায় ডাচেসের একটি সহচরীর নিকট আসিলেন। সুন্দরীর অশ্ব পদে আঘাত পাইয়া উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

"আপনি ও প্রকারে আমার অশ্বরক্ষা করিলেন কিসের জন্য? আপনি কি মনে করেন আমি নিজে একটা দুষ্ট অশ্বকে শাসন করিতে পারি না?" কথাগুলি বলিতে বলিতে মহিলাটির গণ্ডদ্বয় ক্রোধে আরক্তিম হইয়া উঠিল।

চসার অপরাধীর ন্যায় কাতরদৃষ্টিতে উত্তর করিলেন—"তা নয় ফিলিপা, আমি মনে করিয়াছিলাম তুমি বিপন্না হইয়াছ। এ অশ্বটি সত্যই খুব ভাল, কেন না ইহা আমাকে তোমার পার্শ্বে আনয়ন করিয়াছে, এবং আমাদের দুই জনকেই দলের ভিড়ের মধ্য হইতে দূরে আনিয়া ফেলিয়াছে।"

"সে কেবল অশ্ব ও আপনি উভয়েই নির্ব্বোধ বলিয়া।"

"ফিলিপা, তোমার কথাগুলি বড়ই নিষ্ঠুর।"

"সেটা কেবল আমি আপনার প্রতি দয়া প্রকাশ করতে চাই, সেই জন্য।"

"সে কিরূপ দয়া, সুন্দরি?"

"অর্থাৎ যাহাতে আপনি আমার নিষ্ফল অনুসরণে আপনার পৌরুষ আর বৃথা নষ্ট না করেন। আপনাকে এ কথা কি আমি পূর্ব্বে সহস্রবার বলি নাই?"

"হাঁ, কিন্তু আরও সহস্রবার বলিলেও আমি তোমার অনুসরণে নিবৃত্ত হইব না, তবুও আশা করিব জীবনে কোনও একদিন হয়ত তুমি সদয় হইয়া আমাকে মিষ্টভাবে সম্বোধন করিবে। তোমারই ঐ দুটি স্নিগ্ধ নয়ন লক্ষ্য করিয়া সেদিন যে কবিতা লিখিয়াছিলাম, তাহাতে কি আমার মনের এই কথারই আভাষ ছিল না?"

"দেখুন আপনার প্রেমোচ্ছাসের ছন্দ অতি মধুর হইলেও তাহার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ, কারণ আমি আপনাকে ভালই বাসি না।"

"প্রিয়তমা ফিলিপা ও কথা, বলিও না। আজ সাত বৎসর ধরিয়া আমি যে তোমাকে

কিরূপ প্রাণ দিয়া ভাল বাসিতেছি, তাহা ত তোমার অবিদিত নাই। পুষ্প যেমন সূর্য্যকিরণকে ভালবাসে, যোদ্ধা যেমন গৌরবকে ভালবাসে, ভক্ত যেমন তার আরাধ্য দেবতাকে ভালবাসে, আমিও যে এতদিন তোমাকে তেমনি ভালবাসিয়াছি ফিলিপা।"

"একের প্রেম যদি অপরের প্রাণে প্রেম-সঞ্চার করা সম্ভব হইত, তাহা হইলে এতদিনে আমার তোমাকে ভালবাসিতে আরম্ভ করা উচিত ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু কৈ আমি তোমাকে আজিও ত ভালবাসিতে পারিলাম না, বোধ হয় কখনও পারিব না; তোমার এই অনুসরণ আমাকে যন্ত্রণা দেয় মাত্র।"

কথাগুলি যেমন নিষ্ঠুর, তাহা প্রকাশের স্বরও তেমনি কঠোর। অপর কাহাকেও বলিলে, এইখানেই তাহার সকল আশা ভরসা চূর্ণ হইত। কিন্তু চসারের প্রেমময় হৃদয় অসীম অধ্যবসায়পূর্ণ। তাহার প্রাণ ব্যর্থতাকে স্বীকার করিতে বা ফিলিপাকে চিরদিনের জন্য বিদায় দিতে কোনমতেই প্রস্তুত নহে।

চসার জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিন্তু ফিলিপা, তুমি আর কাহাকেও ভালবাস না ত'?"

সুন্দরী প্রথমে একটু ক্রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"তুমি কি আমার গুরু যে তোমার নিকট সে কথা প্রকাশ করিতে হইবে?" পরক্ষণেই যেন আপনার কঠোরতায় ঈষৎ অনুতপ্ত হইয়া বলিলেন—"কলহে আবশ্যক নাই, আমাদের চিরদিনের সদ্ভাব যেন সমভাবেই থাকে। আমি আর কাহাকেও ভালবাসি না এবং ভবিষ্যতে বাসিবও না তাহা নিশ্চিৎ। বিধাতা আমাকে ভালবাসার শক্তি দিয়া সৃজন করেন নাই। আজ তবে এখন বিদায়; দেখিও রাজসভা মধ্যে যেন আমাকে আর বিরক্ত বা লজ্জিত করিও না।"

(২)

রাজপ্রাসাদের চতুর্দ্দিকেই চাঞ্চল্য ও কোলাহল। অর্থ, যশ, বা সম্মান লাভের জন্য সকলেই ব্যগ্র। সেই কোলাহলের মধ্যে জিয়ফ্রে চসার প্রাসাদ প্রাচীরে হেলিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া আছেন। নিকটে ও দূরে ভেরী নিনাদ উঠিতেছে, অদূরে কেহ উচ্চ হাস্য করিতেছে, কেহ আদেশ করিতেছে, কেহ বা অশ্ব লইয়া সবেগে অগ্রসর হইতেছে। চতুর্দ্দিকে সৈনিকগণ, যোদ্ধৃগণ ও মহিলাগণ যাতায়াত করিতেছে।

চসার ধ্যানরত প্রতিমামূর্ত্তির ন্যায় সেই প্রাসাদের এক নিভৃত পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। আজ একটু শান্তি লাভের জন্যই তিনি এই জনহীন স্থানে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। চতুর্দ্দিকের এই অশান্ত কোলাহল আজ তাঁহার অন্তরকে কোন মতেই বিক্ষিপ্ত করিতে পারিতেছে না। আজ ইংলণ্ডের প্রথম স্বভাব কবির সম্মুখে প্রকৃতি তাহার মনোহর সৌন্দর্য্যশোভা লইয়া অবতীর্ণা। মুগ্ধ কবির নয়ন সেই সৌন্দর্য্য রসপানে এতই আত্মহারা যে তাঁহার শ্রবণ পর্য্যন্ত আজ বধির।

এমন সময়ে পশ্চাতে একজন বলিয়া উঠিল—"কে, হ'লে কবিবর, তোমার প্রেম-পীড়া এখনও তোমায় ছাড়ে নি?"

কবিবর পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন বক্তা স্বয়ং রাজপুত্র।

"রাজপুত্র, আমি প্রেমের দাস সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া আমার কোনও পীড়া নাই।"

"কিন্তু তবুও তুমি দেখ্‌ছি নির্জ্জনতা ভালবাস এবং আমার বিশ্বাস তোমার মনটাও যে খুব প্রফুল্ল তা নয়।"

"না রাজপুত্র। যে ব্যক্তি একই নারীকে সাত বৎসর ধরিয়া ভালবাসিয়া তাহার নিষ্ঠুর অসম্মতি ভিন্ন আর কিছুই পায় নাই, কিন্তু তথাপি আজিও যে তাহাকে পাইবার আশা ত্যাগ করে নাই, তাহার মনে বিষণ্ণতা স্থান পাইবার আর কোন আশঙ্কাই নাই।"

"তা সত্য, অধিকাংশ পুরুষের প্রাণে এ অবস্থায় ভালবাসার পর্য্যন্ত স্থান পাওয়া কঠিন হইত।"

"কিন্তু আপনি বা আমি সেরূপ পুরুষ নহি।"

"আমি নহি সত্য, কিন্তু ডচেস্ ব্লান্‌চের ন্যায় আর দ্বিতীয় ললনা এ পৃথিবীতে কোথায়? আমার মনে হয় স্বর্গেও তার মত দেবী আছে কিনা সন্দেহ। এ পৃথিবীতে ত নাই-ই।

কবি নত হইয়া তাঁহার সম্পূর্ণ সম্মতি জানাইলেন।

"এবং চসার, তুমি তার জন্ত যে প্রার্থনাটি লিখিয়া দিয়াছ, তাহার জন্ত তিনি তোমাকে ধন্তবাদ জানাইতে অনুরোধ করিয়াছেন। তোমার ছন্দের সুরে তাঁহার প্রার্থনাটি পর্য্যন্ত মধুর হইয়া উঠে।"

কবি আরও নত হইয়া উত্তর করিলেন— "তাঁহার প্রশংসার ন্যায় মধুর এ সংসারে আর কিছুই নাই।"

"কেন, তোমার ফিলিপার হাসি?

"রাজপুত্র এ অধমের ভাগ্যে তাহার হাসিলাভ এ পর্য্যন্ত কখনও ঘটে নাই।"

"আর কাহারও ঘটে নাই বলিয়াও আমার বিশ্বাস। তুমি কি জান না, এতকাল তাহার কাছে থাকিয়াও কি তুমি বুঝিতে পার নাই, যে সেই কৃষ্ণকেশী, হরিণ-নয়না সুন্দরীটি একটু কলহপ্রিয়া?"

"রাজপুত্র, আমার প্রাণে সে কথা স্থান পায় না, কারণ আমি তাহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসি; যতদিন জীবিত থাকিব বাসিব। আমার আর অন্ত পথ নাই।"

"এবং চিরদিন ছন্দোবন্ধে তাহার প্রেমভিক্ষা করিতে থাকিবে। কিন্তু আমি তোমাকে অন্ত কর্ম্মে নিযুক্ত করিব। যে তোমার প্রেমকে ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করে তাহার উদ্দেশে কবিতা লেখা যখন ফরাসী-দেশে বন্দী ছিলে তখনকার পক্ষে হয়ত উপযুক্ত ছিল, কিন্তু একজন স্বাধীন ব্যক্তির এরূপ ভিক্ষাবৃত্তি অসহ্য। তোমাকে আমার সহিত যাইতেই হইবে।"

চসারের প্রাণটা আকুল হইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার এ কথার অর্থ কি, রাজপুত্র?

"আমার কথার অর্থ এই যে, আমি তোমাকে রাজার নিকট হইতে ধারস্বরূপ গ্রহণ করিব। আমার ভ্রাতা লিওনেলের বিবাহস্থলে তোমাকে আমার অনুচর হইয়া যাইতে হইবে। ইতালীতে যাইয়া কত বড় বড় যোদ্ধা ও কবি দেখিতে পাইবে; শুনিতে পাই সেখানে নাকি ঐ দুইটি জিনিষই খুব সহজ প্রাপ্য।

(৩)

রাজপুত্র চসারকে লইয়া ইতালিযাত্রা

করিয়াছেন। ডাচেস্ ব্রানচে সহচরিগণকে লইয়া উদ্যান ভবনে বাস করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে ইতালি হইতে রাজপুত্রের সংবাদ লইয়া পত্রবাহক ডচেসের নিকট উপস্থিত হয়। তৎসঙ্গে অন্যান্য দুইচারখানা ক্ষুদ্র পত্রও অন্য দুইচারিজনের নামে থাকে। চসার যতগুলি পত্র লিখিতেন তাহার অধিকাংশই তাঁহার চিরপ্রিয়া প্রেমহীনা ফিলিপার উদ্দেশেই লিখিত।

ক্রমে শীত যাইয়া বসন্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। একদিন ফুলগন্ধ আমোদিত, বিহঙ্গকুল-কূজনিত মধুর প্রভাতে ডাচেস্ কয়েকজন সহচরীকে সঙ্গে লইয়া উদ্যানভ্রমণে বাহির হইলেন। কিছুদূর যাইয়া রমণীগণ এক কুঞ্জ বিতানের ছায়াতলে শ্যামল তৃণোপরি বহুমূল্য বস্ত্র বিছাইয়া উপবেশন করিলেন। ডাচেস্ মধ্যস্থলে, সহচরিগণ চতুর্দ্দিকে।

এমন সময়ে একজন আমোদপ্রিয়া সহচরী বলিয়া উঠিল—"আমি কুঞ্জের ধারে একটা জিনিষ কুড়াইয়া পাইয়াছি। জিনিষটা কাহার তা বলিতে পারি না, উপরের নামটা পড়িতে পারিতেছি না।" বলিয়া, অর্থপূর্ণ কটাক্ষে ডাচেসের হস্তে একখানি ক্ষুদ্র পত্র দিল। ফিলিপা ব্যস্ত হইয়া সেটি কাড়িয়া লইবার জন্য হাত বাড়াইল। ডাচেস তাহাকে বিরত করিয়া বলিলেন—"ছি ফিলিপা, ওরকম অভদ্রতা করিতে নাই।" এই বলিয়া তিনি ধীরে ধীরে পত্রখানি খুলিয়া দেখিলেন তাহাতে দুইটি ছত্র কবিতা লেখা রহিয়াছে—

দুঃখেরে এতই আমি করেছি আপন,
সুখ সদা আমা হতে করে পলায়ন।

এই দুই ছত্র পড়িয়াই ডাচেস্ বলিয়া উঠিলেন—"ফিলিপা, এ পত্র তোমার। কাব্যে প্রেম জানাইবার আমাদের কেহই নাই।"

ফিলিপা ক্রোধে উন্মত্তা হইয়া পত্রখানি তাঁহার হস্ত হইতে কাড়িয়া লইল, এবং মাথা নত করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু তাহার অশ্রু দেখিয়া কাহারই দয়া হইল না।

একজন জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা ভাই, কবিরা এত দুঃখী হয় কেন বল দেখি?"

অপর একজন উত্তর করিল—"এ আর বুঝতে পার না, বেচারারা এতই নির্ব্বোধ যে ফিলিপার মত নিষ্ঠুর স্ত্রীলোককে ভিন্ন ভালবাসতে জানে না।" পত্রখানি যে প্রথমে বাহির করিয়াছিল সে বলিয়া উঠিল—"আহা চসার যদি আমাকে বিবাহ করিত?

ডাচেস্ বলিলেন—"তার আর কি, রাজপুত্রের সঙ্গে ফিরে এলেই তাঁকে বলব এখন; অবশ্য যদি তার আগেই ইতালীতে কাহাকেও বিবাহ না করিয়া বসেন।"

ফিলিপা নিমেষ মধ্যেই চক্ষের জল মুছিয়া বেশ হাসিমুখ ধারণ করিয়াছিল। কিন্তু তাহার এ ভাবান্তরে কেহ উপহাসক্ষান্ত হইল না। সেকালে স্ত্রীলোকেরা পরস্পরের প্রাণের দিকে চাহিয়া কথা কহিতে জানিতেন না।

একজন বলিয়া উঠিল—"তা সে ইতালীতেই বিবাহ করুক আর এখানেই করুক, ফিলিপাকে যেন না করে। মুখ পোড়াবার ভয় যদি না থাকে তবেই সে আবার ফিলিপাকে পাবার জন্য ব্যস্ত হবে।"

ফিলিপা এক চপেটাঘাতে তাহার এ কথার উত্তর দান করিত, কেবল ডাচেস্

হাত তুলিয়া নিবারণ করিলেন বলিয়াই সহচরীটি সে যাত্রা রক্ষা পাইয়া গেল।

ডাচেস্ বলিয়া উঠিলেন—"এস ভাই, আমাদের আর ঝগড়া বা মারামারীতে কাজ নাই। চন্দ্র এখানে উপস্থিত থাকলে যা ক'রতেন আমরাও সেই রকম করি এস। ফিলিপার এতদিনে বিবাহ হওয়া উচিত ছিল। এস আজ আমরা ওর বিবাহটা শেষ করে ফেলি।"

(৪)

ডাচেসের উদ্যান-ভবন আজ আনন্দ-মুখরিত। নরনারী সকলেই আজ শোভন পরিচ্ছদে সুসজ্জিত। প্রাসাদপ্রাচীরের চতুর্দ্দিকে সশস্ত্র প্রহরী দণ্ডায়মান। প্রতিবেশী প্রজাগণ ভয়ে ভয়ে উদ্যানের কিছুদূরে সমবেত।

ডাচেস্ ব্লান্চে একটি মুক্ত বাতায়নপথ হইতে নত হইয়া তাঁহার অশ্বসজ্জিত করিবার আদেশ দিলেন। আজ সহচরী পরিবৃতা হইয়া তিনি স্বামীকে স্বাগত করিবার জন্য অগ্রসর হইবেন। বাতায়ন পথ হইতে তাঁহার ক্ষীণ তনুটি বঙ্কিম ভঙ্গীতে যখন হেলিয়া পড়িল, তখন তাঁহাকে যেন প্রভাত কিরণের রশ্মিরেখার মত দেখাইতে লাগিল, তেমনি স্নিগ্ধ, সতেজ, সুন্দর, তেমনি আনন্দরাগে রঞ্জিত!

সকল সহচরী যখন সমবেত হইল ডাচেস্ জিজ্ঞাসা করিলেন—"ফিলিপা কোথায়?"

ফিলিপা কোথায় কেহই জানে না। "তাকে রহস্য ক'রে প্রেমের দরবারে শাস্তিদান করব বলেছি, তাই দেখছি সে লুকিয়ে আছে। তাকে খুঁজে নিয়ে এসো।"

কিন্তু তাহারা ফিলিপাকে খুঁজিয়া পাইবে কোথায়? প্রথম ভেরীনিনাদে রাজপুত্রের আগমনবার্ত্তা যে মুহূর্ত্তে তাহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই মুহূর্ত্তেই ফিলিপা গোপনে প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া গেল। ডাচেসের নিকট যাহা সামান্য পরিহাস বলিয়া বোধ হইয়াছিল, তাহার অন্তরে তাহা মর্ম্মান্তিক আঘাতের ন্যায় বিদ্ধ হইয়াছিল। জোর করিয়া তাহার বিবাহ দেওয়া? আর সে বিবাহ কাহার সহিত? রাজপুত্রের অনুচরগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা হীনপদস্থ এক ব্যক্তির সহিত! এ বিবাহ অত্যাচার ও অপমান! সে আজ সর্ব্বপ্রথম রাজপুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবে, তাঁহার সম্মুখে সে আজ জানু পাতিয়া বসিয়া বিচার ও সাহায্য প্রার্থনা করিবে।

সুতরাং রাজপুত্রের দলবল যেই দৃষ্টিগোচর হইল, অমনি তাঁহার সম্মুখে দুই হাত বাড়াইয়া এক আলুলায়িতাকেশ রমণী আসিয়া দাঁড়াইল।

ডাচেস্ তাঁহার জন্য ব্যাকুলচিত্তে অপেক্ষা করিবেন জানিয়া এবং নিজেও পত্নীকে আলিঙ্গন করিবার জন্য উৎসুক হইয়া আছেন বলিয়া, রাজপুত্রই সেই বাহিনীর সর্ব্বপ্রথমে ছিলেন। সম্মুখে চামুণ্ডারূপিণী রমণীকে দেখিয়া তিনি বিস্মিতচিত্তে অশ্বচালককে গতিরোধ করিতে আদেশ করিলেন।

ফিলিপা অশ্রুপূর্ণ নেত্রে তাঁহার সম্মুখে আছাড় খাইয়া পড়িল। রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন "ব্যাপার কি? এ খেলা কিসের জন্য?"

উঠিয়া দাঁড়াইয়া রমণী কহিল, "আমাকে

রক্ষা করুন প্রভু! আমি আপনার আশ্রয় চাই, বিচার চাই।"

"কার বিরুদ্ধে, কি সম্বন্ধে?"

"আমার প্রভুপত্নী ডাচেসের বিরুদ্ধে! তিনি আমাকে একটা নীচ লোকের সহিত বলপূর্ব্বক বিবাহ দিবেন।"

রাজপুত্র তাহার দিকে ফিরিয়া একটু হাসিলেন। তিনি ডাচেস্‌কে চিনিতেন।

"তার আর ভাবনা কি ফিলিপা। যে তোমাকে বিবাহ করিবে আমি তাকে উচ্চপদ দিব।" তার পর হাসিভরা চোখে বলিলেন —"চসার যদি আজ আমাদের সঙ্গে থাকিত তাহা হইলে তোমাকে বিবাহ করিবার পূর্ব্বে তাহাকে চসারের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে হইত নিশ্চয়।

রমণীর আরক্তিম মুখখানি শাদা হইয়া গেল। ভীতচিত্তে ফিলিপা জিজ্ঞাসা করিল—"চসার কি আপনার সহিত প্রত্যাগত হন নাই?"

"সে কি? তুমি কি তবে তার অপমৃত্যুর কথা শোন নাই?"

রমণীর কণ্ঠ হইতে একটা অস্ফুট কাতরধ্বনি বাহির হইল। পরক্ষণেই জ্ঞানহারা হইয়া গেল।

যখন জ্ঞান হইল ফিলিপা দেখিল তাহাকে একটা দোলায় করিয়া বহিয়া লইয়া যাইতেছে ও পার্শ্বে একজন নগ্নশির সুসজ্জিত পুরুষ তাহার অনুসরণ করিতেছে।

চক্ষু খুলিয়াই ব্যথিতা রমণী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। পরক্ষণেই দুর্ব্বল বাহুদুইটি প্রসারিত করিয়া আশ্বস্ত-চিত্তে বলিয়া উঠিল—"আ—আঃ জিয়ফ্রে, তুমি তবে বেঁচে আছ! তোমার তবে কোন দুর্ঘটনা হয়নি?"

চসার আকুল আবেগে নত হইবামাত্র, প্রেমহীনা ফিলিপার দুর্ব্বল দুইটি বাহু তাঁহার কণ্ঠদেশ জড়াইয়া তাঁকে প্রাণপণে বক্ষোপরি বদ্ধ করিয়া ধরিল! উদ্বেলিত কবি-হৃদয় হইতে দুই বিন্দু তপ্ত অশ্রু ঝরিয়া আজ তাঁহার বহুদিনের মিলন বেদনাকে সার্থক করিল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

বিবিধ।

নূতন বেলুন। ফেব্রুয়ারি মাসে ইংলণ্ডের সৈন্যবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ একটি নূতন বেলুন বাতাসে "ভাসাইয়াছেন।" ইহাকে ইচ্ছামত চালনা করা যায় এবং এত গোপনে ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে যে কারখানার লোক ব্যতীত অন্য কেহই ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিত না।

এই বেলুনটি লম্বায় ১৩০ ফুট এবং দেখিতে একটি চুরুটের ন্যায়। তবে লেজের দিকে দুইটি ক্ষুদ্রায়তন বেলুন (balloonets) আছে। বেলুনের খোলসটি রবারে নির্ম্মিত, নীচের নৌকাখানি ধাতুনির্ম্মিত। এঞ্জিনগুলি একশত অশ্বের বেগে (100 horse power) চলে এবং দুই পার্শ্বে অ্যালুমিনিয়ম নির্ম্মিত দুইটি চাকা আছে। ইহারা অক্ষদণ্ডে সংযোজিত এবং ইচ্ছা অনুসারে ইহাদের উঁচুনীচু করা যায়। দুইটী হাল দ্বারা চালকের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কর্ণেল ক্যাপার, লেফটেনাণ্ট ওয়াটারলো, মিঃ ম্যাকওয়েড, এবং মিঃ গ্রীণকে লইয়া বেলুন উড়িতে আরম্ভ করে। শেষোক্ত ব্যক্তিই বেলুনের এঞ্জিন নির্ম্মাতা।

ধীরে ধীরে ইচ্ছামত উঠিতে উঠিতে চালক বেলুনকে সহস্রফীট ঊর্দ্ধে উঠাইয়া অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে প্রায় পঞ্চদশ মাইল ভ্রমণ করিয়া ভূমি স্পর্শ

করিলেন। এ চারজন লোক ব্যতীত অনেকখানি Ballast (বেলুন স্থির রাখিবার জন্য বালুকা ইত্যাদির ভার) লওয়া হইয়াছিল। সুতরাং ইহাতে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে ভারবহনেও বেলুন নিতান্ত অশক্ত নয়।

ইতিপূর্ব্বে সৈন্যবিভাগ হইতে আরও তিনটী এই জাতীয় বেলুন প্রস্তুত হইয়াছিল। এইটীর ঠিক পূর্ব্বে যে বেলুনটী প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা হঠাৎ একটী দমকা বাতাসে স্ফটিক প্রাসাদে পড়িয়া নষ্ট হইয়া যায়। নূতন বেলুনটীর আয়তন অন্যগুলির অপেক্ষা বড়। উদজান গ্যাস রাখিবার পাত্রটী এবার রেশমনির্ম্মিত এবং গলিত রবর যথাস্থলে প্রয়োগ করিয়া আরও দৃঢ়তর করা হইয়াছে। পূর্ব্বের বেলুনটী মাত্র দুইজন লোককে বহন করিতে পারিত কিন্তু এটীর ভারবহনের শক্তি যথেষ্ট।

ম্যাডাম কুরি ও তাঁহার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগৃহ

ম্যাডাম কুরির নূতন আবিষ্কার—

র‍্যাডিয়াম আবিষ্কর্ত্তা ম্যাডাম কুরি পুনরায় সভ্যজগৎকে আর একটী নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার দ্বারা আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছেন। আশ্চর্য্যান্বিত করিবার কথা বলিলাম বটে—কিন্তু অধুনা বৈজ্ঞানিকেরা যেরূপ দ্রুতপদে অগ্রসর হইতেছেন তাহাতে যদি তাঁহারা বলেন যে, কেরোসিনের শূন্যাধার গুলিকে তাঁহারা সুবর্ণ পাত্রে পরিণত করিবেন তাহাতেও লোকে আশ্চর্য্য হয় না। এই কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মাত্র ম্যাডাম কুরি ও তাঁহার স্বামী র‍্যাডিয়াম আবিষ্কার করিয়াছেন। আবার সেদিন তিনি র‍্যাডিয়াম হইতে 'পলোনিয়ম' নামক অতি সূক্ষ্মতম পদার্থকে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। পলোনিয়ম র‍্যাডিয়াম অপেক্ষাও দুর্লভ এবং দুর্দ্দমা। ইহার সংস্পর্শে যে দ্রব্য আইসে তাহাই গলিয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেও দ্রবীভূত হয়। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলিয়াছেন, ইহার তুলনায় বালকের পক্ষে কুঠার দ্বারা একটী কেশকে দ্বিখণ্ড করাও সহজসাধ্য। তিনি পাঁচ টন Pitchlende এবং hydrochloric acid দ্বারা নানারূপ রাসায়নিক ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া বলে এক মিলিগ্রামের দশ ভাগের এক ভাগ মাত্র পোলোনিয়ম সংগ্রহ করিয়াছেন। একটী বোতলের মধ্যে ইহা বিশেষ রূপে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল কিন্তু তথাপি ইহার অর্দ্ধেক

দ্রবীভূত হইয়া গিয়াছে। ম্যাডাম কুরি এইক্ষণে ইহা পুনর্ব্বার বিশ্লেষণ করিয়া ইহার উপাদান নির্ণয় করিবেন। সম্ভবতঃ এক বৎসরের মধ্যেই তিনি এই কার্য্য সমাপন করিতে পারিবেন।

পিসাননগরীর আনত প্রাসাদ।

পিসানগরীর আনত প্রাসাদের (Leaning Tower) কথা অনেকেই অবগত আছেন। অনেকেরই বিশ্বাস যে কোনরূপ ঘটনা চক্রে এই প্রাসাদ এক দিকে হেলিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু মিঃ গুডেয়ার সাহেব নানারূপ পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে ইহা আবহমান কাল এইরূপ অবস্থাতেই আছে এবং স্থপতিগণ সুকৌশলে এই কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। অদ্য আমরা এই প্রাসাদ নির্ম্মাণ বৃত্তান্ত সংক্ষেপে আমাদের পাঠকপাঠিকাদিগকে উপহার দিব।

১১৭০ খৃষ্টাব্দে বোনানাস এই প্রাসাদ নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন। ১৬ বৎসরে চারিতলা প্রস্তুত হয়। ১২৩৩ খৃষ্টাব্দে বেনিনাটো পঞ্চমতলা, ১২৮৬ সনে উইলমূভন ইন্‌ব্রাচ ষষ্ঠতলা এবং ১৩৫০ সনে টমাসো ডি পিসা ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ করেন। প্রাসাদ নির্ম্মাণ কালে যতই ইহা উচ্চে উঠিতেছিল ততই ইহাকে লম্বের দিকে হেলাইয়া দেওয়া হইতেছিল।

গুডিয়ার সাহেব বলেন যে প্রাসাদের চক্রসিঁড়িটি (Spiral Staircase) যেদিকে প্রাসাদ হেলিয়া রহিয়াছে সেই দিকেই আয়তনে বড় করা হইয়াছে এবং সুবিধানুসারে ও প্রয়োজন বুঝিয়া এই সিঁড়ি ছোট বড় করা হইয়াছে। প্রাসাদের উত্তর ও দক্ষিণ দিকের মধ্যস্থলের প্রবেশদ্বার প্রস্থে ৩০ ফুট এবং উচ্চে ৭৯৪ ফুট। উত্তর দিকে, মধ্যস্থলের উচ্চতা ৭৬৩ ফুট পরে ক্রমে ক্রমে উপরে হেলান দিকে ৮১২ ও নিম্নে ৯১৭ ফুট; এই স্তম্ভের ছাদ পড়ে ৮৬৪ ফুট উচ্চ। সিঁড়ির পরবর্ত্তী বাঁকে "টার্ণে" উহাকে কমাইয়া উত্তর দিকে ৭৮০ ফুট এবং হেলান দিকে পুনর্ব্বার ৮,৪০ করা হইয়াছে। সিঁড়ি আবার যেমন ঘুরিয়া উত্তরে আসিয়াছে অমনি আবার তাহাকে কমাইয়া ৭,২৭ ফুট করা হইয়াছে। চারিতলার পরে আর সিঁড়ি নাই।

গুডেয়ার সাহেব বলেন যে চারিতলা পর্য্যন্ত সিঁড়ি করায় ইহারই নির্ম্মাণ কৌশলে এই হেলান প্রাসাদ স্থির রহিয়াছে। প্রথম তলার ছাদটীকেও নিজেদের প্রয়োজন সাধনোদ্দেশ্যে আনতির দিকে নীচু করা হইয়াছে। এই সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে প্রাসাদটীর নির্ম্মাণ কৌশলেই ইহা আবহমান এই ভাবেই আছে। পঞ্চমতলা হইতে এরূপ কোন ব্যবস্থা নাই। কারণ স্বরূপ গুডেয়ার সাহেব বলেন যে পঞ্চমতলা নির্ম্মাণ নিযুক্ত মিস্ত্রীগণ এতদিনেও প্রাসাদের কোন পরিবর্ত্তন হইল না দেখিয়া আর কোন কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিল না।

প্রাসাদ নির্ম্মাণের চারি শত বৎসর পরে কোন গ্রন্থকার লিখিয়া গিয়াছেন যে ভিত্তি বসিয়া যাওয়াতে প্রাসাদ হেলিয়া পড়িয়াছে। বস্তুতঃ তাঁহার বৃত্তান্ত স্বকপোল কল্পিত। যাহাতে এই প্রাসাদ চিরকালই এই ভাবে থাকিয়া পৃথিবীর সপ্তম 'আশ্চর্য্যের' এক আশ্চর্য্য হইতে পারে সেই প্রণালীতেই ইহা নির্ম্মিত।

জাপানে চৌর্য্যবৃত্তি। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী সংবাদ পত্র La Revue পত্রে জাপানে কি প্রকারে বালকদিগকে চৌর্য্যবৃত্তি শিক্ষা দেওয়া হয় তাহার বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। সে দেশে রীতিমত চৌর্য্য বিদ্যালয় আছে, এবং তথায় পাকা চোরগণ বালকবালিকাদিগকে বাল্যকাল হইতেই প্রত্যহ চৌর্য্যবৃত্তি শিক্ষা দেয়। তাহার পর কোন আমোদ প্রমোদের সময় তাহাদের চুরি করিতে পাঠায় এবং তাহারা নিরাপদে কার্য্য সমাধা করিলে তাহাদিগকে পুরস্কার দান করে। যাহারা নির্ব্বিঘ্নে কার্য্য সমাপন করিতে পারে না তাহাদের স্কুল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। এইরূপে যাহারা চুরিবিদ্যায় পাকিয়া যায় তাহারা ক্রমে বিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হয়। প্রত্যেক চোরের নিয়মমত কার্য্যের বিভাগ আছে। কেহ রাস্তায়, কেহ দোকানে, কেহ থিয়েটারে, কেহ রেলগাড়ীতে চুরী করে। পুলিস এই সকল স্কুলের বিষয় অবগত থাকিলেও, ইহাদের বিরুদ্ধে সাধারণতঃ কোন অভিযোগ উপস্থিত করণে আদরন করে না।

'বাবু ইংরাজি।' (য়্যাণ্ড ল্যাংসাহেব লিখিত)। 'বাবু ইংরাজি' বলিয়া আমরা অনেক

সম্বন্ধে অনেক উপহাস করিয়া থাকি। অপরের অসম্পূর্ণতায় উপহাস করার প্রবৃত্তিটা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হইতে পারে কিন্তু ইহাতে আমাদের জ্ঞানের ও সহানুভূতির অভাবই প্রকাশ পায়। বৈদেশিক যে কোন ভাষা, আমরা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে না পারি, সে ভাষায় দুই ছত্র লিখিতে গিয়া আমাদেরও 'বাবু ভাষা' বাহির হইয়া পড়ে। এক সময়ে আমি এক প্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিতকে আমার 'বাবু' ফরাসীতে এক পত্র লিখিয়াছিলাম। তিনি উত্তরে জানাইলেন, যে আমার ফরাসী রচনা প্রশংসা যোগ্য হইলেও তিনি আমার ইংরাজী রচনারই পক্ষপাতী। ফরাসী ভাষায় আমি একটি আস্ত 'বাবু'। ভারতবাসী যখন আমাদের সাহিত্যের মধ্য দিয়া আমাদের ভাষা শিখিতেছে, তখন তাহার ইংরাজি—কতকটা সংবাদ-পত্রের ও কতকটা কেতাবের খিচুড়ি হওয়াই স্বাভাবিক। ভারতের ছাত্রদিগকে নিজের ইংরাজি লিখিতে বলিলে তাহারা পুঁথির গৎ আওড়াইতে থাকে বলিয়া অনেকে অভিযোগ করেন। ইংরাজ ছাত্রকে ইংরাজি গ্রীক বা লাটিনে অনুবাদ করিতে বলিলে তাহারাও কি এইরূপ চুরি করিবার চেষ্টা করে না? অনেক শিক্ষিত ল্যাটিন কবিও বেমালুম চুরি করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। হোমারেও এই দোষ যথেষ্ট ছিল। তাঁহার উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে এরূপ যে কোন পংক্তি তাঁহার মনে আসিত তাহা তাঁহার নিজের হউক বা পরের হউক তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা তাঁহার রচনায় ব্যবহার করিতে কিঞ্চিন্মাত্র কুণ্ঠাবোধ করিতেন না।

এ দেশের বালকগণই যে কেবল মুখস্থ বিদ্যার উদ্গার করিতে পটু তাহা নহে। আমি আমার নিজের দেশীয় বাবুগণের মধ্যে, অর্থাৎ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদের মধ্যে এই মুখস্থ বিদ্যা উদ্গারের চেষ্টা দেখিয়া ত্যালাতন হইয়াছি।

ভাবিয়া দেখিলে—আমরা যখন ভারতের ছাত্রদের জন্য কোন প্রবন্ধ পুস্তক লিখিতে যাই অমনি মুখস্থ ভাষা আপনি আসিয়া পড়ে। হায় বাবু! তুমি মনুষ্য প্রকৃতির চিরসঙ্গী। এ পৃথিবীতে তুমি আমি সকলেই বাবু। টেনিসন্, ভার্জিল্ শিক্ষিত বাবু ছিলেন মাত্র।

বন্দী।

(ধারাবাহিক উপন্যাস। ভিক্টর হিউগো হইতে)

১

ফাঁসি!

আজ পাঁচ সপ্তাহ ধরিয়া, আমার এই একটি চিন্তা! সারা দিনরাত্রি নিঃসঙ্গ, একাকী, আমি মৃত্যুর হিম স্পর্শ অনুভব করিতেছি! রজ্জুতে, যেন, কে আমার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়াছে!

কয়েক সপ্তাহমাত্র পূর্ব্বে, সাধারণ মানুষেরি মত আমি ছিলাম! প্রতি দিন, প্রতি ঘণ্টা, প্রতি মুহূর্ত্তেই, নিজের স্বাধীন মত, স্বাধীন কাজ! আমার তরুণ নির্ম্মল মস্তিষ্ক যেন একটা নেশায় বিভোর ছিল! কোন নিয়ম নাই, শৃঙ্খলা নাই, বাধা নাই, বন্ধন নাই, এমনি একটা জীবনের কল্পনায় অধীর হইয়া উঠিতাম!

সুন্দরী কিশোরী, জয়-পরাজয়, আনন্দ ও আলোকমণ্ডিত রঙ্গালয়, সন্ধ্যার ছায়ায় তরুতলায় কিশোরীর বাহুবন্ধনে ধরা দিয়া স্বপ্নময় পরিভ্রমণ—এমনি সুখের মধ্যে দিন কাটিত! চিন্তার গতি স্বাধীন, নিজেও স্বাধীন!

কিন্তু, আজ, আমি বন্দী! শৃঙ্খলাবদ্ধ, কারাগৃহবাসী বন্দী! মনের মধ্যেও এই কারাগহ্বরের ঘনীভূত অন্ধকার! একটা ভীষণ, নিষ্ঠুর হত্যার কলঙ্ক-কালিমায় গাঢ় তিমিরাচ্ছন্ন! আজ আর কোন চিন্তা নাই, শুধু একটি কথা অহর্নিশি মনে জাগিতেছে—ফাঁসির রজ্জুতে, আমার প্রাণদণ্ড!

অশরীরী ছায়ার মত চিন্তাটুকু আমাকে

ঘেরিয়া আছে! কোন কথা ভাবিবার আর অবসর নাই! তার কথা ভুলিতে চেষ্টা করি, কিন্তু, হায়, বৃথা! তার শীতল স্পর্শ হইতে একদণ্ডও পরিত্রাণ নাই!

আমার সমস্ত কাজের উপর তার রক্ত-আঁখিদুটা স্পষ্ট যেন দেখা যায়! চারিধারে যেন কে বিষাদের গান গায়, আর, মাঝে মাঝে, কার তীব্র হাসি! কারাগৃহের জানালার ধারে, ও কার আঁখি! সে, মৃত্যুর! ভূতের মত সে আমার চারি পাশে ঘুরিতেছে! হাতে তার রজ্জু! আঃ, আমি কি পাগল হইব!

সহসা ঘুম ভাঙিয়া গেল—কে যেন আমার মুখের উপর হইতে দৃষ্টি সরাইয়া লইল! এ কি স্বপ্ন! কারাগৃহের কঠিন প্রস্তরে, আলোকের ক্ষীণ রেখায়, প্রহরীর নীরব ভীষণ মূর্ত্তিতে, জানালার ধারে—সর্ব্বত্র যেন কে ঘুরিতেছে! মুখে তার একই কথা—ফাঁসি! ফাঁসি!

২

অগষ্ট মাস! নির্ম্মল, স্নিগ্ধ, সুন্দর প্রভাত! আজ তিন দিন আমার বিচার আরম্ভ হইয়াছে! এ তিন দিনে আমার অসাধারণত্বের সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অলস লোকগুলা—কাজের জন্য যারা একদণ্ডও বাড়ী ছাড়িতে চাহিত না,—আজ, আমাকে দেখিবার জন্য, আদালতের প্রাঙ্গণে আসিয়া, দল বাঁধিয়া বসিয়া আছে. মৃতদেহের চারিপাশে, শকুনির দল যেমন অধীর দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে, তেমনি আজ আমারি জন্য ইহারা এত অধীর, চঞ্চল! প্রহরীগুলার বীরদাপ, লোকগুলার নিরীহ মূর্ত্তি—আমার যেন অসহ্য বোধ হইতেছিল!

প্রথম দুই রাত্রি চোখে নিদ্রা ছিল না। প্রাণের মধ্যে কি এক ব্যাকুল আর্ত্তনাদ! কি এক সুগভীর আশঙ্কা! তৃতীয় রাত্রে, ক্লান্ত চোখে নিদ্রার মোহস্পর্শ প্রথম অনুভব করিলাম—আবেশময়ী, ব্যথাহারিণী নিদ্রা! প্রহরীর আহ্বানে নিদ্রা ভাঙিল! তার ভারী জুতা, চাবির গোছা, অর্গলমোচন—এ সকলের শব্দেও নিদ্রা ভাঙে নাই, সে আসিয়া ঠেলা দিয়া ডাকিল, "ওঠ!"

আমি চোখ মেলিয়া চাহিলাম! চারিধারে, কারাগৃহের কঠিন প্রস্তর! ছাদের নীচে, বায়ুপথের মধ্য দিয়া একটু আকাশ দেখিলাম! সূর্য্যের আলো ফুটিয়া উঠিয়াছে! এই সূর্য্যের আলোটুকু আমি প্রাণের চেয়ে ভালবাসি!

আমি কহিলাম, "বেশ দিনটি!"

প্রহরীটা চুপ করিয়া রহিল—আমার কথার জবাব দেওয়া, সে প্রয়োজন মনে করিল না—তার পর কি ভাবিয়া সে কহিল, "এমনি ত মনে হয়!"

পাষাণের মত, আমি নিশ্চল! জ্ঞানও ছিল না! আমি সেই বায়ুপথের দিকে চাহিয়াছিলাম! আবার কহিলাম, "বাঃ, বেশ দিনটি!"

লোকটা কহিল, "হা! বাহিরে তোমার জন্য সকলে অপেক্ষা করিতেছে!"

এই কথাটুকু! মাকড়সার জালের মত, এই কথাটুকু আমাকে আবার পুরাণো চিন্তার জালে জড়াইয়া ফেলিল! নিমেষে, যেন আমি দেখিলাম—সেই নির্ম্মম, হৃদয়হীন, রক্তপিপাসু বিচারগৃহ—সেই জজের গম্ভীর অপ্রসন্ন মুখ—নিরীহ সাক্ষীর দল, পুতুলের মত চিত্রকরা যেন তাদের চোখ—সতর্ক, সপ্রতিভ প্রহরী ও চাপরাশির দল—কালো গাউন-মণ্ডিত উকিলের গর্ব্বিত, উদ্ধত মূর্ত্তি

—আর, এই সব অলস ও কাপুরুষ দর্শকের সারি!

আমার সারা দেহে যেন আগুন জ্বলিতেছিল! গা কাঁপিতেছিল! পা টলিতেছিল! প্রহরী আমাকে ধরিয়া কাঠগড়ায় পুরিয়া দিল। বাহিরের বাতাসে, যেন অনেকখানি শ্রান্তি, অনেকখানি দুশ্চিন্তা কাটিয়া গিয়াছিল। মাথার উপর বিস্তৃত নীল আকাশ—রৌদ্রের উষ্ণ মধুর স্পর্শ, চারিধারে পাখীর কোলাহল, গাছের ছায়া—এ পৃথিবী এত সুন্দর ত কখনো দেখি নাই!

তার পর, আবার বিচারগৃহের এই বদ্ধ বায়ু! জীবনের পর মৃত্যুও বুঝি এমনি ভীষণ! আমাকে দেখিয়া চারিধারে যেন একটা কোলাহল পড়িয়া গেল! চুপি-চুপি কথা, কাগজ-পত্র উল্টানো, চলা-ফেরা,—সকলের একটা সুবিকট মিশ্র রাগিণী যেন জাগিয়া উঠিল! এতক্ষণ অধীরভাবে প্রতীক্ষা করিয়া সকলে কষ্ট পাইতেছিল, আমি আসিতে যেন লোকগুলা আরাম পাইয়া বাঁচিল। কি নির্লজ্জ হৃদয়হীনতা! একজন ফাঁসিকাঠে প্রাণ দিতে যাইতেছে, আর, এই অলস পশুর দল তাহা দেখিয়া আমোদ করিতে আসিয়াছে!

চারিধার শান্ত, নিস্তব্ধ! ঝড়ের পূর্ব্বে প্রকৃতি যেমন শান্ত হয়, তেমনি! এখনি ঝড় বহিবে! ভীষণ ঝড়—আমার অস্থিগুলাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া, আমার শিরাগুলাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া, আমার প্রাণটাকে সহস্র খণ্ডে বিদীর্ণ করিয়া, তবে এ ঝড় থামিবে! আজ আমার অপরাধের দণ্ড-বিধান হইবে। দণ্ড! হায়, কে কার দণ্ড দিবে! কে কার অপরাধের বিচার করিবে! আমি নিস্তব্ধভাবে প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। আমার হৃৎপিণ্ড তালে তালে নাচিতেছিল! কি এক গভীর বিরাট স্পন্দন! তার ধ্বক্-ধ্বক্ শব্দটা বন্দুকের শব্দের মতই ভীষণ মনে হইতেছিল!

তখন আমার মনে ভয় ছিল না! ঘরের জানালাগুলা খোলা ছিল। আমি তাহারি মধ্য দিয়া আকাশের দিকে চাহিয়াছিলাম। আকাশের গায় কতকগুলা ছোট পাখী উড়িয়া বেড়াইতেছিল, বাহির হইতে একটা মিশ্র কোলাহল ভাসিয়া আসিতেছিল, আর শান্ত মৃদু বায়ু, মাতার কল্যাণহস্তের মত, আমার শ্রান্ত ললাটে শান্তি বহিয়া আনিতেছিল। জজের নিদ্রাকাতর নয়নের প্রতিও দৃষ্টি পড়িতেছিল! আমি ভাবিলাম, কেন, এ অভিনয়!

বাহিরে দোকানীর দল হাসিতেছিল, গল্প করিতেছিল! তাহারা, আমাকে ভুলিয়া, আজ হাসি-গল্প লইয়া রহিয়াছে! কি নির্ব্বোধ, মূর্খ, এই দোকানীর দল!

চারিধারে এত আনন্দ, এত শোভা! তাহার মধ্যে মৃত্যুর কথা ভাবা নিষ্ঠুরতা—পাপ! এই স্নিগ্ধ বায়ু, এই প্রসন্ন দীপ্ত সূর্য্যকিরণ, ইহার মধ্যে মৃত্যু-চিন্তা, নিতান্ত অসঙ্গত, অশোভন! সূর্য্যরশ্মির মত আশার আলোকচ্ছটা মাঝে মাঝে নিরাশতিমির হৃদয়টাতে আলো দিতেছিল—আহা, যদি আজ মুক্তি পাই!

আমার উকিল বলিলেন, "আশা আছে!"

আমি মৃদু হাসিয়া কহিলাম, "ভালো কথা!"

উকিল বলিলেন, "একটা জিনিষ—হঠাৎ কাজটা হইয়া গিয়াছে, এমনি আমি প্রমাণ করিয়াছি—ফাঁসি ত হইবেই না; তবে আজন্ম বন্দী—দেখা যাক্!"

আমি কহিলাম, "কারাগৃহে, আজন্ম বন্দী! তার চেয়ে মৃত্যু ভালো!"

হাঁ, মৃত্যুও ভালো! আমি বাহিরের দিকে চাহিলাম! গাছের ডালে বসিয়া একটা পাখী ফলে ঠোকর মারিতেছিল! কি স্বচ্ছ, লঘু, উহার আনন্দটুকু! আঃ, আমি যদি আজ ঐ পাখীটার মত স্বাধীন হইতাম!

তখন জজের রায় পড়া হইতেছিল—আমি সেদিকে লক্ষ্য করি নাই! জীবন বা মৃত্যু, দুইটার কথাই তখন ভুলিয়া গিয়াছিলাম। সহসা শুনিলাম, আমার ফাঁসি! মাথায় ঝিন্ ঝিন্ করিয়া ঘাম হইল! চোখের সম্মুখে একটা কিসের পর্দ্দা পড়িয়া গেল—আমি কাঠগড়ায় ঠেস দিয়া দাঁড়াইলাম! জজের মনে, বুঝি, দয়া হইল। তিনি কহিলেন, "তোমার কিছু বলিবার আছে?"

বলিবার অনেক কথাই ছিল। কিন্তু কথা বাহির হইতেছিল না। জিবটা জড়াইয়া গিয়াছিল! দুই হাতের মধ্যে আমি মুখ ঢাকিলাম। লোকগুলা কোলাহল করিতে করিতে বিচার-গৃহ পরিত্যাগ করিতেছিল—তাদের পায়ের শব্দ আমি শুনিতেছিলাম! এতক্ষণে তাহারা বাঁচিয়াছে! কাজকর্ম্ম, বিলাস-বিশ্রাম সব ত্যাগ করিয়া বেচারারা সারাক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত, আজ তাদের ছুটি দিয়াছি! ধন্য, আমি!

অনেকক্ষণ পরে আমার স্বর ফুটিল। আমি কহিলাম, "হুজুর, একটু দয়া করুন—মৃত্যুটা যেন শীঘ্র হয়, আর আমার বলিবার কিছু নাই!"

সমস্ত জগতের উপর আমার অভিমান হইয়াছিল! কিন্তু, জগতের ত তাহাতে এতটুকু ক্ষতি নাই! সে চিরদিনকার মতই হাসিবে-খেলিবে! আমি যে আজ তার ক্রোড়চ্যুত হইয়া চলিলাম, এ অভাব কি কখনো সে অনুভব করিবে! হায়, এমন সুন্দর পৃথিবী, এত সে নিষ্মম! কারো জন্য এতটুকু মায়া নাই, স্নেহ নাই, যেন নিস্পন্দ, কঠিন জড়পিণ্ডটা পড়িয়া রহিয়াছে! এই জগতে কোনমতে টিঁকিয়া থাকার নামই জীবন! ইহার চেয়ে মৃত্যু কি এতই কঠোর!

প্রহরীরা আমাকে বাহিরে লইয়া আসিল! তখনো বাহিরে উৎসুক দর্শকের দল আমাকে দেখিবার জন্য পাগল! এই সব হৃদয়হীন পশুগুলার শিরে বাজ পড়ে না? হা ভগবান! প্রেত, পশুর দল, সব!

বাহিরে আসিয়া বুঝিলাম, কি এ পরিবর্ত্তন! যখন বিচার-গৃহে আসিয়াছিলাম, তখন সকলেরি মত আমি জীবন্ত ছিলাম—এ জগতেরি একজন! আর এখন, এ যেন আমার মৃতদেহটা ভৌতিকবলে চলিয়াছে! আমি, যেন, এখন, আর এ জগতের নহি! এই পাখীর গান, সূর্য্যের কিরণ—ইহারা আজ আমার জন্য নহে! এই নদীর জল, নীল আকাশ, আর সকলের জন্য তেমনি ঠিক আছে! কেবল আমিই ইহাদের মধ্য হইতে ভ্রষ্ট, চ্যুত তারার মত খসিয়া পড়িয়াছি! ঐ ছোট ছোট ফুলগুলি, ঐ গাছের ছায়াটুকু—আজ আমার জন্য আর কিছু নয়! এ সবে আমার আজ কোন অধিকারও নাই!

প্রকাণ্ড, কালো রঙের বন্ধ গাড়ী, বাহিরে, আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। আমি গাড়ীতে উঠিতেছি, এমন সময় শুনিলাম অদূরে কে বলিতেছে, "লোকটার ফাঁসির হুকুম হয়ে গেল!" আমি তার দিকে চাহিয়া দেখিলাম! একটা ব্যর্থ আক্রোশে অন্তরখানা জ্বলিয়া উঠিল!

গাড়ী চলিল! গাড়ীর মধ্যে, ছোট একটু ফাঁকের ভিতর দিয়া পথের পানে চাহিয়াছিলাম,—পথে ছোট ছেলেমেয়েরা খেলা করিতেছিল। পথিকের দল দাঁড়াইয়া হাসি-গল্প করিতেছিল। আমি ভাবিলাম, আজো জগতের হাসিখেলায় একটু বিরাম পড়িবে না! এতটুকু সহানুভূতি নাই! এত হাসি, এত আনন্দ, কিসের জন্য! [ক্রমশঃ]

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়:

সোমা ডি করস্।

(ডাক্তার রসের বক্তৃতা হইতে সংগৃহীত)

হাঙ্গারীর অন্তর্গত ট্রান্সিলভানিয়া প্রদেশান্তর্গত করস্ গ্রামে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল সোমা ডি করস (Csoma de Koros) জন্মগ্রহণ করেন। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে নাগি ইনিয়েড (Nagy Enyed) নামক কলেজে অধ্যাপনা আরম্ভ করিয়া ১৮০১ সনে গটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। তথায়, প্রাচ্য ভাষা ও এতদ্দেশীয় ইতিহাস পাঠেই তিনি অধিকতর মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। পিতৃমাতৃহীন সোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই সংসারে একমাত্র অবলম্বন ছিলেন। ভ্রাতার অবস্থা স্বচ্ছল ছিল এবং সোমা যাহাতে পূর্ব্বদেশীয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ইউরোপের বিদ্বজ্জনকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন, এই অভিলাষে ১৮২০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি সোমার প্রাচ্য দেশ ভ্রমণের ব্যবস্থা করেন। বুখারেষ্ট হইতে যাত্রা করিয়া কোন সময় রেলপথে, কোন সময়ে জলযানে এবং কখন কখনও পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া সফিয়া, এনস, রোডস, আলেকজান্দ্রিয়া, সাইপ্রাস, লাটেকিয়া, আলেপো, বাগদাদ, তিহারণ, বোখারা, বল্‌খ ও কাবুল হইয়া ১৮২২ সনের ১১ই মার্চ্চ তারিখে সোমা লাহোরে পৌঁছেন।

লাহোর হইতে সোমা ১৮২২ খৃষ্টাব্দের ২৬শে আগষ্ট তারিখে মিঃ মুর ক্রফটের সহিত লে যাত্রা করেন। এই স্থানে আসিয়া কয়েকখানি তিব্বতীয় পুস্তক দেখিয়া তাঁহার তিব্বত দর্শনে অভিলাষ জন্মে। তিনি ১৮২২—২৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কাশ্মীরে থাকিয়া তিব্বতীয় ভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন। ক্রফট সাহেব এই সংবাদে সাতিশয় প্রীত হইয়া আর্থিক সাহায্য এবং কতকগুলি সুপারিশ পত্র সংগ্রহ করিয়া দেন। কয়েকজন লামার অনুগ্রহে তিনি তিব্বতীয় ব্যাকরণ শিখিতে আরম্ভ করিলেন। সোমা যখন জনস্করে অবস্থিতি করিতেছিলেন তখন তত্রত্য জনৈক লামার নিকট ৩২০ খানি তিব্বতীয় পুস্তক দেখিতে পান। ঐ পুস্তকগুলিতে তিব্বতীয় ধর্ম্মবিষয়ক সকল বৃত্তান্তই লিপিবদ্ধ ছিল। সোমা এই ৩২০ খানি পুস্তক অনুবাদ এবং ভবিষ্যতে তিব্বতীয় ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্যে এক অভিধান প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। জনস্করের লামা তাঁহার অনুরোধে আর এক সহস্র শব্দ নির্ব্বাচিত করিয়া দেন এবং ক্রমে ক্রমে সোমা তিব্বতীয় সকল শব্দই এই অভিধানের অন্তর্গত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই অভিধান এতদিন বঙ্গদেশীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর গৃহে ছিল। প্রায় এক শতাব্দী অন্তে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় এবং ডাঃ ডেনিসন রস সাহেব, ইহার প্রকাশের ভার লইয়াছেন। উপযুক্ত পাত্রেই কার্য্যভার ন্যস্ত হইয়াছে।

সোমা তিব্বতে ভ্রমণপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি সেই স্থানেই ছিলেন। ডাক্তার জেরার্ড সাহেবের সহিত ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে তথায় সোমার দেখা হয়। ডাক্তার, সোমার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। "আমি কানুমগ্রামে ক্ষুদ্রকুটীরে সোমাকে দেখিতে পাই। তাঁহার চতুর্দ্দিকে পুস্তক রাশি এবং তাঁহার পরিশ্রম এবং উদ্যমের ফলে তিনি যে পুস্তক সকল রচনা করিতেছিলেন তাহা বিশেষ আনন্দ সহকারে আমাকে দেখাইতে লাগিলেন। যে অবস্থায় তিনি কার্য্য করিতেছেন তাহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্য। এ স্থানে শীতের প্রভাব, অত্যন্ত বেশী; এবং গতশীতে আপাদ মস্তক পশমী বস্ত্রে আবৃত হইয়া দিবারাত্র তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। সামান্য আহারের উপর নির্ভর করিয়া, কোনপ্রকার বিশ্রাম বা আরাম উপভোগ না করিয়া তিনি এই দারুণ শীতে তাঁহার ডেস্ক (Desk) সম্মুখে রাখিয়া কালাতিপাত করিয়াছেন। কানুম অপেক্ষা ইংলণ্ডে শীতের প্রকোপ আরও অধিক। সোমা এইখানে সামান্য একটি কক্ষে তাঁহার শিক্ষক লামা ও একটি ভৃত্যকে লইয়া একবৎসর অতিবাহিত করিয়াছেন। ঘরের বাহিরে যাইবার সাধ্য ছিল না কেন না সমস্তই ঘন তুষারাবৃত। এই দারুণ শীতে তিনি একটি বড় কোট গায়ে দিয়া প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিতেন। ভূমিশয্যায় শয়ন এবং সামান্য ওভারকোটেই শীত নিবারণ করিতেন। শীত এত বিষম যে পুস্তকের পাতা উল্টাইতে হাত ওভারকোটের পকেট হইতে বাহির করাও দুঃসাধ্য হইত। কর্কট সংক্রান্তিতেও এখানে বরফ পড়ে—ইহা হইতেই এখানে শীতের প্রকোপ হৃদয়ঙ্গম হইবে। এই অবস্থায় সোমা তিব্বতীয় ত্রিশ সহস্র শব্দ তাঁহার অভিধানের জন্য সংগ্রহ করিয়াছেন।"

১৮৩১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সোমা কলিকাতায় আসিয়া ৫ই মে গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী স্যুইণ্টন সাহেবের নিকট তাঁহার হস্তলিপি প্রদান করেন। ৩১ হইতে ৩৫ সন পর্য্যন্ত চারি বৎসর কাল সোমা কলিকাতায় ছিলেন। তৎপরে তিনি পুনর্ব্বার ভ্রমণে বাহির হইয়া ১৮৩৬ সনে মালদহ যান। এ বৎসর মার্চ্চ মাসে জলপাইগুড়ী হইয়া পূর্ব্ববঙ্গের কয়েকটি স্থলে কিছুদিন থাকিয়া তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই সময়ে তিনি বঙ্গভাষা শিক্ষা ও সংস্কৃতে পারদর্শী হইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ১৮৩৭ হইতে ৪২ সন পর্য্যন্ত বঙ্গদেশীয় এসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকাগারের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত ছিলেন। সেই সময় তিনি খৃষ্টধর্ম্মসংক্রান্ত কয়েকখানি পুস্তক তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন।

কলিকাতায় তিনি কি অবস্থায় ছিলেন সে সম্বন্ধে পাভি সাহেব Revue des Deux Mondes নামক পত্রিকায় নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত দিয়াছেন। "কলিকাতায় অনেক সময় তাঁহার সহিত আমার দেখা হইত। ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় তিনি এক প্রকার মৌনাবলম্বীই ছিলেন। তাঁহার থাকিবার ঘর দেখিলে উহা সন্ন্যাসীর কক্ষ বলিয়াই ভ্রম হইত। কচিৎ ভ্রমণার্থ বারান্দায় আসা ছাড়া তিনি তাঁহার কক্ষ কখনও পরিত্যাগ করিতেন না। তাঁহার ন্যায় প্রবীণ বৈজ্ঞানিক ব্যক্তি কেবলমাত্র একবিষয়েই লেখেন ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়।" মিঃ স্ক্রুফট লিখিয়াছেন—সোমা তাঁহার তিব্বতীয় পুস্তকাদির মধ্যে রাত্রিদিবা নিমজ্জিত থাকিতেন। সন্ধ্যায় কদাচিৎ তিনি শারীরিক পরিশ্রম করিতেন এবং পরে নিজগৃহে তালাবদ্ধ হইয়া থাকিতেন। সেইজন্য তাঁহার সহিত দেখা করিতে হইলে ভৃত্যবর্গকে ডাকিয়া তালা খুলাইতে হইত।

৫৮ বৎসর বয়সের সময় তিনি তাঁহার শেষ যাত্রায় বহির্গত হইয়া ২৪শে মার্চ্চ দার্জ্জিলিং পৌঁছেন। ৬ই এপ্রিল জ্বর হইয়া ১২ই মৃত্যুমুখে পতিত হন। চার বাক্স পুস্তক, কিছু কাগজ, এক প্রস্থ পোষাক এবং রন্ধনের পাত্র ব্যতীত অন্য কিছুই তাঁহার ছিল না। সামান্য ভাত ও চায়ের উপর তিনি নির্ভর করিতেন। চিরদিনই পুস্তক চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া, সামান্য এক মাদুর পাতিয়া নিদ্রা যাইতেন। মদ্যপান ধূমপান বা অন্য কোনরূপ উত্তেজক দ্রব্য ব্যবহার করিতেন না।

অভিধান ব্যতীত সোমা তিব্বতীয় ব্যাকরণ এবং আরও অন্যান্য পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে কঙ্গুর Kangur বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আমরা সোমা প্রণীত ব্যাকরণের শব্দশিক্ষা হইতে একটী গল্প পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি।

কোন গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ যুবক বাস করিতেন। গৃহস্থের গাভী তিনি প্রাতঃকালে মাঠে লইয়া যাইতেন সন্ধ্যাকালে ফিরাইয়া আনিতেন। একদিন কোন গৃহস্থের গাভী ফিরাইয়া আনিয়া ব্রাহ্মণ দেখিলেন, গৃহস্থ সন্ধ্যাভোজনে নিযুক্ত। ব্রাহ্মণ গরুটী গৃহস্থের বাটীর সীমানার মধ্যে ছাড়িয়া দিলেন। বন্ধনমুক্ত গাভীটি সীমানা পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইয়া গেল। গৃহস্থ সন্ধ্যাভোজন সমাপন করিয়া ব্রাহ্মণের নিকট গাভী চাওয়াতে ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন যে তিনি উহা তাঁহার বাটীর সীমানার মধ্যে ছাড়িয়া দিয়াছেন। গৃহস্থ বলিল, আমার দ্রব্য আমাকে প্রত্যর্পণ কর নচেৎ রাজার নিকট বিচারার্থে যাইতে হইবে। ব্রাহ্মণ এ প্রস্তাবে সম্মত হওয়াতে উভয়েই রাজধানী অভিমুখে চলিলেন।

পথিমধ্যে উঁহারা দেখিলেন যে, এক ব্যক্তি তাহার অশ্বিনীকে ধরিতে পারিতেছে না। সে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে অশ্বিনীর গতিরোধার্থে চীৎকার করিয়া অনুরোধ করিলে ব্রাহ্মণ লোষ্ট্র দ্বারা অশ্বিনীর এক পদে আঘাত করিলেন। আঘাত করিবামাত্র অশ্বিনী পতিতা হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। অশ্বিনীস্বামী তখন ব্রাহ্মণকে তাহার অশ্বিনী প্রত্যর্পণে আদেশ করিলে ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন যে, তাহার অনুরোধেই, তিনি অশ্বিনীর গতি প্রতিরোধ করিতে গিয়াছিলেন সুতরাং অশ্বিনীর মৃত্যুর জন্য তিনি আদৌ দায়ী নহেন। অশ্বিনী-স্বামী ছাড়িবার পাত্র নয়; সে রাজার নিকট বিচার প্রার্থী হইবে বলিয়া ব্রাহ্মণ ও গৃহস্থের সঙ্গ লইল।

তিনজনে কিছুদূর যাইতে যাইতে ব্রাহ্মণ ইঁহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আশায় এক প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিবামাত্র এক তন্তুবায়ের উপরে পতিত হইলেন। তাহাতে তন্তুবায়ের মৃত্যু হইল। তখন তন্তুবায়পত্নী ব্রাহ্মণকে তাহার স্বামী প্রত্যর্পণের কথা বলায় ব্রাহ্মণ বলিলেন যে, মৃত ব্যক্তি কখনও পুনর্জ্জীবন পায় না এবং তন্তুবায়ের অপঘাত মৃত্যুর জন্য তিনি কোনরূপে দায়ী নহেন। তন্তুবায় পত্নী ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া অন্য সকলের সহিত রাজদ্বারে চলিল।

কিছুক্ষণ পরে তাঁহারা এক নদী তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, এক কাঠুরিয়া মুখে কুঠার লইয়া নদী পার হইতেছে। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে নদীর গভীরতা জিজ্ঞাসা করায় কাঠুরিয়া "জল বেশী নয়" এই উত্তর করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে কুঠারও নদী গর্ভগত হইল। অনেক পরিশ্রমেও কাঠুরিয়া তাহার কুঠার উদ্ধারে সক্ষম না হইয়া ব্রাহ্মণকে তাহার কুঠার দিতে বলিল। ব্রাহ্মণ বলিলেন যে কাঠুরিয়ার নিজের অসাবধানতার জন্যই সে কুঠার হারাইয়াছে সুতরাং তজ্জন্য তিনি দায়ী নহেন। বাক্‌বিতণ্ডার পর স্থিরীকৃত হইল যে রাজাই এ বিষয়ে মীমাংসা করিবেন।

রাজ সমীপে উপনীত হইয়া প্রথমে গৃহস্থ নিজ আবেদন ব্যক্ত করিল। রাজা ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে,"ব্রাহ্মণ গরু লইয়া ছিলেন কিনা, প্রত্যর্পণ করিবার সময় গৃহস্থ দেখিয়াছে কিনা।" ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন,—গরুও তিনি লইয়াছিলেন এবং প্রত্যর্পণের সময় গৃহস্থও তাহা দেখিয়াছিল। ইহা শুনিয়া রাজা আদেশ করিলেন যে, চক্ষু থাকিতেও যখন গৃহস্থ দেখে নাই তখন তাহার চক্ষু,—এবং জিহ্বা থাকিতেও যখন ব্রাহ্মণ গৃহস্থকে কিছু বলেন নাই তখন ব্রাহ্মণের জিহ্বাও উৎপাটিত হউক। গৃহস্থ এ আদেশে নিজ আর্জ্জি উঠাইয়া লইল। ব্রাহ্মণ নিষ্কৃতি পাইলেন।

অশ্বিনী-স্বামী নিজ দুঃখকাহিনী বর্ণনা করিলে রাজা দণ্ড স্বরূপ ব্যবস্থা করিলেন যে, সে জিহ্বা দ্বারা ব্রাহ্মণকে অনুরোধ করিয়াছিল এবং ব্রাহ্মণ হস্ত দ্বারা লোষ্ট্রখণ্ড নিক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহার জিহ্বা ও ব্রাহ্মণের হস্ত এই উভয়ই ছেদিত হউক। অশ্বিনীস্বামী জিহ্বা হারাইবার ভয়ে নিজ মোকর্দ্দমা উঠাইয়া লইল—ব্রাহ্মণেরও হস্ত থাকিয়া গেল।

এবার তন্তুবায় পত্নীর পালা। রাজা কহিলেন, তন্তুবায় পত্নী ব্রাহ্মণকে বিবাহ করিলেই সে তাহার স্বামী পাইবে। তন্তুবায় পত্নী ইহাতে অস্বীকৃত হওয়ায় এবারও ব্রাহ্মণের কোন সাজা হইল না।

পরিশেষে কাঠুরিয়ার কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন,—তাহার পক্ষে কুঠার হস্তে না লইয়া দন্তে বহন এবং ব্রাহ্মণের পক্ষে সে সময় তাহাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা এই উভয়ই অনুচিত হইয়াছে সুতরাং তাহার দন্ত উৎপাটিত ও ব্রাহ্মণের জিহ্বা কর্ত্তিত হউক। কাঠুরিয়া একে কুঠারের শোক সম্বরণ করিতে পারে নাই; তদুপরি দন্ত উৎপাটিত হইবার ভয়ে তাহার আর্জ্জি উঠাইয়া লইল। ব্রাহ্মণও নিষ্কৃতি পাইয়া গেল।

অপর জগতের কথা। (ইংরাজি হইতে

সে অপর জগতের কথা। সেখানকার সঙ্গে এখানকার কিছুই মেলে না। সে জগৎ এখান থেকে অনেক দূর;—অনন্ত আকাশের অসংখ্য নক্ষত্রমণ্ডলীর মাঝখানে কোনো এক জায়গায় তাহার স্থান।

সেখানকার এক পুরুষ ও এক রমণীর কথা বলিব। তাহারা দুইজনে সর্ব্বদা একত্রে মিলিয়া থাকিত;—দুজনের মধ্যে কোথাও বিচ্ছেদ ছিল না!

সেখানে এক প্রকাণ্ড বন; তাহাতে ঘন ঘন গাছের সারি!—এক গাছ অপর গাছের সহিত গায়ে গায়ে ঠেকিয়া আছে, মধ্যে এতটুকু ব্যবধান নাই। বনের যা-কিছু-সকলই এক অপরের সহিত নিবিড়ভাবে মিলিয়া আছে। কোথাও বিচ্ছেদ নাই;—পাতায় পাতায়, ডালে ডালে, ফলে ফল, ফুলে ফুলে ঠাসা। আকাশের বাতাস, আকাশের জল এবং সেখানকার যে চন্দ্রসূর্য্য তার রশ্মি পর্য্যন্ত সেই গহন বনের বনস্পতি আর তরু-লতাদের সুদৃঢ় মিলন ভাঙিয়া প্রবেশের পথ পায় না।

সেই বনের মাঝে এক মন্দির। সে যে কতকালের তার ঠিক নাই! সে মন্দিরে কেহ থাকিত না, রাত্রে সেখানে দেবতারা আসিতেন। শুনা যায়, সেই সময়ে—সেই ঘোর রাত্রে অন্ধকার বনের মধ্যে জনপ্রাণী সঙ্গে না লইয়া একেলা কেহ যদি মন্দির সম্মুখে উপস্থিত হয়, এবং মর্ম্মর সোপানে নতজানু হইয়া দেবতার আরাধনা করে ও দেবতার উদ্দেশে বুক চিরিয়া রক্ত দেয় তাহা হইলে দেবতার কাছে সে যে প্রার্থনাই জানায় তাহা গ্রাহ্য হয়!

পুরুষ ও রমণী বহুবার এই মন্দিরে গিয়াছে, বহুবার দেবতার কাছে দুজনে দুজনার মঙ্গল প্রার্থনা করিয়াছে কিন্তু দুই জনের মধ্যে কেহ কখন একা সেখানে যায় না। এক পূর্ণিমার রাত্রে পুরুষটিকে সঙ্গে না লইয়া রমণী একেলা মন্দির উদ্দেশে ঘরের বাহির হইয়া গেল! বনের বাহির তখন জ্যোৎস্নার প্লাবনে ভাসিয়া যাইতেছে, জলস্থল আকাশ, শুভ্রতায় ভরিয়া গিয়াছে;—আকাশে নীলিমা নাই, সমুদ্রেও নীলিমা নাই! সব আলোময়, কেবল বনের ভিতর ঘোর অন্ধকার—সেখানে জ্যোৎস্না নাই! আলো নাই!

রমণী সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে পথ চলিয়া মন্দির-সোপানে আসিয়া বসিল। ভক্তিভরে দেবতার নাম জপ করিতে লাগিল,

কিন্তু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। তখন সে একখণ্ড পাথর লইয়া মর্ম্মস্থলে আঘাত করিল;—ধীরে ধীরে বিন্দু বিন্দু রক্ত বুক বাহিয়া মন্দির সোপানে পড়িল। অমনি শব্দ উঠিল—"কি চাও?"

রমণী বলিল—"এক পুরুষ আছেন, তিনি আমার কাছে সব চেয়ে প্রিয়, তাঁকে আপনি বর দিন।"

—"কি বর চাও?"

—"তা তো জানিনা প্রভু! যাতে তাঁর সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল হয় সেই বর দিন।"

—"তথাস্তু!"

বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা আজ সফল হইল। রমণী তখনই উঠিয়া দাঁড়াইল। বর লাভ করিয়া আনন্দে তাহার শরীর পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। পুরুষটিকে সেই সংবাদ দিবার জন্য সে অধীর হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে না চলিয়া মনের উৎকণ্ঠায় দৌড়িতে লাগিল। স্থির বন দ্রুতপাদক্ষেপে কাঁপিয়া উঠিল, স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া শুষ্কপত্র হইতে কান্নার মত মর্ম্মর ধ্বনি উঠিল। অন্ধকারের মধ্যে সেই শব্দ শুনিয়া রমণীর প্রাণ চকিত ও ভীত হইয়া উঠিতে লাগিল!

শীঘ্রই সে বনের বাহির হইয়া আসিল। সে স্থান অন্ধকার নয়, সেখানে তখন বসন্তের বাতাস বহিতেছে, পুষ্পগন্ধে দিক ভরিয়া আছে; দূরে সমুদ্রতীরের বালুকা জ্যোৎস্না-আলোকে আকাশের নক্ষত্রের মত জ্বলিতেছে! সমুদ্রতরঙ্গ চন্দ্রালোকে নাচিতেছে! আকাশে, বাতাসে, জলে স্থলে [illegible] রাগিণী বাজিয়া উঠিয়াছে।

রমণী সমুদ্রের দিকে ছুটিয়া যাইতে, যাইতে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল। অদূরে একখানি তরণী সমুদ্রের বুকে দিব্য ভাসিয়া যাইতেছে, কোথাও আটক নাই, বাধা নাই; সমুদ্র-তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া চলিয়াছে! রমণী ভাবিল—"এমন্ রাতে এমন্ সময় দেশ ছাড়িয়া কে যায়? কে ঐ তরণীর দাঁড় ধরিয়া দাঁড়াইয়া?" অস্পষ্ট আলোকে তাহাকে চেনা যাইতেছিল না, তাহার মুখ ভালো করিয়া দেখাও যাইতেছিল না, কিন্তু রমণী অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝিতে পারিল সে কে! সে মূর্ত্তি যে তাহার হৃদয়পটে আঁকা—সে যে চিরপরিচিত! তরী ক্রমেই দূর হইতে দূরে যাইতে লাগিল, ক্রমেই সব অস্পষ্ট হইয়া আসিল। এমন সময় সে কি দেখিল?—এ কি? এক পরমাসুন্দরী বালিকা —তরণীর হাল ধরিয়া বসিয়া আছে;—তাহার সুন্দর কচিমুখে জ্যোৎস্নার শুভ্র আলো!

রমণীর প্রাণ উতলা হইয়া উঠিল। সে পাগলিনীর মতো ছুটিয়া সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে গেল—নৌকা আটক করিবে! কিন্তু সম্মুখে সমুদ্রতরঙ্গ যে দুর্গপ্রাচীরের মতো ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে! তাহা ভেদ করিয়া যাওয়া অসাধ্য। তবে সে কি করিবে? নিরুপায় হইয়া কাঁদিতে লাগিল। সমুদ্রের দিকে আকুলভাবে বাহুদুটি প্রসারিত করিয়া শুধু বলিতে লাগিল—এস ফিরে এস, বঁধু, ফিরে এস!

রমণী জলে নামিয়া পড়িয়াছে, তরঙ্গ-প্রাচীর ভেদ করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইবার জন্য যুঝিতেছে এমন সময় তাহার কানের পাশে কে যেন বলিল—"এ কি করছিস্?"

বালিকা উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

বলিল—"আমি যে এইমাত্র তাঁর জন্যে বুকের রক্ত দিয়ে দেবতার কাছ থেকে বর ভিক্ষা করে এনেচি!"

কানের পাশে আবার কে বলিল—"বেশ তো! বর তো সে পেয়েছে!"

—"কী বর পেয়েছেন?"

—"তার সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল;—তোর সহিত তার অনন্ত বিচ্ছেদ!"

রমণী স্তম্ভিত হইয়া গেল!

তরণী তখন অগাধ সমুদ্রের মধ্যে কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেছে!

আবার শব্দ উঠিল—"কেমন্, তুই তো সুখী?"

রমণী ধীরে ধীরে কহিল—"হাঁ, সুখী!"

চারিদিক তখন স্তব্ধ হইয়া গেল, আকাশে বাতাসে করুণ রাগিণী বাজিয়া উঠিল। রমণীর চরণ ঘেরিয়া সমুদ্রের চঞ্চল জল ছল্ ছল্ করিয়া কাঁদিয়া ফিরিতে লাগিল!

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

পোষ্যপুত্র। (ধারাবাহিক উপন্যাস)

(গত ১৩১৬ সালের বৈশাখ হইতে আরম্ভ)

(২৩)

শান্তির বিবাহের মাসখানেক পরে স্ত্রীকে তাহার বাপের বাড়ি পাঠাইয়া যোগেন্দ্র মাদ্রায় ফিরিয়া আসিল। এখানে আসিয়া সংবাদ লইয়া জানিল মিঃ রায়ও ফিরিয়াছেন। তিনি এবার আসিয়া অবধি বড় একটা কাজকর্ম্ম দেখেন না, একজন ম্যানেজার রাখা হইয়াছে, মধ্যে মধ্যে তাহাকে বুঝাইয়া শিখাইয়া দিতে অফিসে যাইতে হয় তা ভিন্ন বাকি সময়টা নিজের সেই নির্জ্জন বাসাটিতেই থাকেন।

যোগেন্দ্রের চার্জ্জ লইতে তখনো একদিন দেরি ছিল। সে তৎক্ষণাৎ জুতা ও উড়ানি পরিয়া বাহির হইয়া গেল। সম্মুখেই মালীটা ফুলগাছগুলায় ঝারি করিয়া জল দিতেছিল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "সাহেব বাড়ি আছেন?" উত্তর পাইল বাবু ঘরেই আছেন।" যোগেন্দ্র সম্মুখের হলে কাহাকেও না দেখিয়া একেবারে গৃহস্বামীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। সে ঘরে প্রথম সন্ধ্যাতেই একটা অনুজ্জ্বল প্রদীপ জ্বালাইয়া মেঝের উপর আসন পাড়িয়া বসিয়া নীরদকুমার সম্মুখে এক কাঠের ছোট চৌকির উপর খেরো বাঁধান এক পুঁথি খুলিয়া নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিতেছিল, যোগেন্দ্রের সশব্দ প্রবেশও জানিতে পারিল না।

যোগেন্দ্র একবার ঘরখানার চারিদিকে আশ্চর্য্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, সে ঘরখানা প্রতিমাবর্জ্জিত চণ্ডীমণ্ডপের মতন খাঁ খাঁ করিতেছে। পরে গৃহস্বামীর নিকটে গিয়া বলিয়া উঠিল "জিনিসপত্রগুলো সব গেল কোথায়? আলোটার এমন দশাই বা কেন?

সম্বোধিত ব্যক্তি একটু বিস্ময়ের সহিত মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি দশা?"

"চরম দশা আর কি, ল্যাম্পটা বুঝি চাকররা ভেঙ্গে ফেলেছে? বেটাদের জ্বালায় কিছু তো টিকৃতে পারে না। তা যাহোক

এলে কবে?" নীরদ উত্তর করিল "মিথ্যে চাকরদের গাল দিচ্ছো কেন, তারা ল্যাম্পটা, ভাঙ্গেনি; রাজার দেশের আমদানি তাই তাকে খাতির করে তুলে রেখেছি। কি জানি কোন দিন কি ক্রটি পেয়ে চটে ওঠে। তুমি এলে কবে?"

"আমি আজ এসেছি। বাঃ আমার প্রশ্নটার উত্তরই দেওয়া হলো না! কোথায় যাওয়া হয়েছিল বলো তো?"

নীরদ পুনশ্চ আলোর দিকে ঝুঁকিয়া পুঁথির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া পাতাখানা উল্টাইয়া কহিল "রামনাদ।"

"কি জন্যে?" নীরদ হাসিল "পুলিষের মতন জুলুম আরম্ভ করলে যে! দোহাই দারোগা সাহেব! তোমার সোনার 'দোত' কলম হোক; গরীবকে আর অনর্থক পীড়ন করোনা। তুমি বিলক্ষণ জানো সেখানে কাজের জন্য আমায় মধ্যে মধ্যে যেতে হয়।"

যোগেন্দ্র এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিয়া বিরক্তভাবে বলিল "একটা খাট বা কেদারা কিছুই নাই, বসা যায় কোথা!"

নীরদকুমার তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল "কেন মেজেতে ত বিছানা পাতা রয়েছে বসো না।"

যোগেন্দ্র বসিলনা, দাঁড়াইয়াই বলিল "এটা একেবারেই অনভ্যাস হয়ে পড়েছে। নীচু হওয়া পোষায় না; চলো অন্য ঘরে।"

নীরদকুমার জেদ করিয়া বলিল "দুদিন কেরাণিগিরি করে চির কালের অভ্যাস একেবারে জন্মের মতন ফুরিয়ে গেল, ওগো মশায়! বাঙ্গালীর ছেলে বাঙ্গালা চালই ভাল। মা ধরিত্রীর কোলে বসে দেখ দেখি কতো আরাম পাও।"

"ইস্ একমাসে একেবারে সত্যানন্দ হয়ে উঠেছো যে' তুমি যা করবে তাই বাড়াবাড়ি।"

নীরদ না হাসিয়া গম্ভীর ভাবে তামাসাটা গায়ে লইয়া বলিল "আশীর্ব্বাদ করো তাই যেন হতে পারি।"

অগত্যাই যোগেন্দ্রকে তাহার বিপুল দেহ-ভার ভূমিতেই ন্যস্ত করিতে হইল। আজ তাহার অনেকগুলো ঝগড়া জমা করা' আছে তাহা লইয়া তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ শ্লেষের শরবর্ষণে তাহাকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া তুলিতে সে দৃঢ়সংকল্প,—তাই আর অন্য তর্ক তুলিল না। নহিলে তর্ক করিতে সে কম মজবুৎ নহে। আসন গ্রহণ করিয়া বলিল "পিসে মশায়ের কাছে আমার মুখ দেখানো ভার হয়েছিল তুমি আমায় কি অপ্রতিভটাই না করলে! তোমার ব্যবহারে আমি আশ্চর্য্য হয়েছি।" ইচ্ছা করিয়াই যোগেন্দ্র কথাগুলা যথাসাধ্য কড়া করিয়া বলিল। কিন্তু শ্রোতা তাহাতে উত্তেজিত হইল না, ঈষৎমাত্র চঞ্চলভাবে জিজ্ঞাসা করিল "আমার ব্যবহারে! কেন?"

"কেন? সেদিন তুমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে কিরকম অভদ্রের মতন হঠাৎ চলে এলে! তার পর, সহসা একেবারে নিরুদ্দেশ! যেন কোন দাগী আসামী পুলিশের ভয়ে লুকিয়ে ফিরচে—এমনি ধরণটা। তাঁর পরিবার বর্গের সঙ্গে খুব আলাপ পরিচয় অথচ তাঁর সঙ্গে দেখাটি পর্য্যন্ত নয়, এর মানে কি?"

নীরদকুমার কোন উত্তর প্রদান করিল না। মুখটা একটু নীচু করিয়া নীরবে পুঁথির

খোলা পাতাখানা দেখিতে লাগিল। প্রদীপ ছায়ায় মুখখানা স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া যোগেন্দ্র পুনশ্চ কহিল, "তাঁর কাছে আমি তোমার কতো সুখ্যাতিই করেছিলাম আর তুমি কি অদ্ভুত ভাবেই প্রকাশ হলে!

ধিক্কারের সঙ্গে হতাশার সুরটুকু অত্যন্ত করুণ হইয়া আসিল। নীরদ মাথা তুলিয়া সবেগে বলিয়া উঠিল "আমিতো তোমার কাছে সার্টিফিকেট চাইনি, বাজে খরচটা কেনই বা করতে গিয়েছিলে? যাকে নিজেই ভাল করে চেননি অপরকে তার সম্বন্ধে কি বোঝাতে চাও?"

যোগেন্দ্র এ প্রতিবাদে হটিল না! তবে তাহার উত্তেজনায় অবসাদ আসিয়া গিয়াছিল, মনের দুঃখ আর চাপিতে পারিতেছিলনা! সবিষাদে বলিয়া উঠিল "হায় হায় আমার কি প্ল্যানটাই মাটি করলে! আহা ভবিষ্যতের কি ছবিখানাই বসে বসে এঁকে ছিলুম।'

নীরদকুমার জোর করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল—"Trust no future however pleasant."

সে হাসিটা মোটেই স্বাভাবিক নয় তাহা বুঝিতে স্থূলবুদ্ধি যোগেন্দ্রেরও বেশি বিলম্ব হইল না। সে কোন এক অজ্ঞাত ব্যথায় বন্ধুকে ব্যথিত বুঝিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল।

নীরদ প্রফুল্লতা দেখাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। যোগেন্দ্র স্ত্রী পুত্রকে রাখিয়া আসিয়াছে শুনিয়া বলিল "তবেই তোমার চাকরীটি গেছে; ক'দিন তুমি তিষ্ঠোবে?"

"ইস্ তা যেন পারিনা! ও পুঁথিখানা কিসের হে! মাণিকপীরের গান, না মনসা পুরাণ?"

নীরদকুমার অনুজ্জ্বল প্রদীপটা উজ্জ্বল করিয়া দিয়া হাসিয়া পুঁথিখানা তুলিয়া ললাটে স্পর্শ করাইল তার পর সসম্ভ্রমে উত্তর করিল "বেদান্ত দর্শন।"

"সর্ব্বনাশ! তবেই আমায় সেরেছ!"

নীরদ ঈষৎ বিরক্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল "বেদান্ত দর্শনের সঙ্গে সর্ব্বনাশের সঙ্গে যোগ কি দেখলে?"

"খুব কাছাকাছি। কেন ভাই তোমার কাছে কি অপরাধ করেছি যে এমনি করেই তাড়াবে?"

"তাড়া যদি ইচ্ছা করে খাও, সেজন্যে আমি দায়ী নই, রজ্জুতে সর্প ভ্রম করে একেবারেই আঁৎকে উঠোনা। রসগোল্লাটাকে খোরাক করে না তুলে দুটি দুটি ভাত যদি পাতে নাও, তাহলে মুখটাও থাকে ভাল, স্বাস্থ্যের পক্ষেও সুবিধে হয়! রসালাপটা না হয় একটু কমই হোলো,—ও কি হে আমার মুখের দিকে অমন করে চেয়ে রইলে যে? আমায় কোনরকম ভয়ানক দেখাচ্চে নাকি?"

উথলিত বিস্ময় দমন না করিয়া স্তম্ভিত যোগেন্দ্র সবিষাদে বলিয়া উঠিল "এ কি শ্রী হয়ে গ্যাছে! চুলগুলোরই বা এমন দশা কেন, জটা বানাবে নাকি? "নীরদ সকৌতুকে হাসিয়া কহিল "না সে রকম মৎলব এখনও হয় নি। মিলিটারী ফ্যাসানে চুল না ছেঁটে চিরকেলে প্রথায়—"

যোগেন্দ্রের ক্রমেই ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতেছিল, সে বাধা দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল "গোল্লায় যাক্ তোমার প্রথা! এ আবার তোমার কি নূতন ঢং? তোমার কি আবার সেই সত্যযুগ

আনবার চেষ্টা না কি? হঠাৎ এতো বড় দার্শনিক কি করে হলে?"

"চেষ্টা করা তো উচিত" বলিয়া তর্কটাকে পাকাইয়া না তুলিয়া নীরদ হঠাৎ উঠিয়া পড়িয়া বলিল "চলো একটু বাইরে গিয়ে বসা যাক। এ ঘরটা আজ তোমার ঠিক সইছে না।"

যাইতে যাইতে যোগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল "বিছানাপত্র সব গেল কোথায়?" ভূমে একটা গালিচা পাড়া ছিল, তাহা দেখাইয়া নীরদ বলিল "ঐ যে।" প্রশ্ন হইল "ঐতে শোও?" মৃদু হাস্যের সহিত যোগেন্দ্র ঘাড় নাড়িল "হাঁ"।

অনেক রাত্রে যোগেন্দ্র বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। বিদায় অভিবাদন জানাইতে গেলে, নীরদ ব্যস্ত হইয়া বাধা দিল 'আঃ ওসব কায়দাগুলো ছাড়ো'।

"বলো কি হে, ও যে তোমারি আদর্শ"।

"আবার আমিই প্রত্যাহার করছি"। যোগেন্দ্র যে বাড়ি হইতে আহার করিয়া আইসে নাই তাহা সে এখানের সমস্ত উলোট পালোটের মধ্যে পড়িয়া একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল নীরদও পূর্ব্বের মত নিজে হইতেই নিমন্ত্রণ করিল না, বরং সে বিদায় চাহিবামাত্রই উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "রাত হয়ে গ্যাছে, এসো তবে।"

রাততো পূর্ব্বেও কতদিন হইয়াছে! যোগেন্দ্র বাড়ির টানে ছুটিতে চাহিলে তখন সেই তাহাকে ধরিয়া রাখিয়া দিত! আজ বন্ধুর গর্ব্বে আহত হইয়া যোগেন্দ্র তাই দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল। বাড়ী গিয়া খাবার চাহিতেই পাচক ব্রাহ্মণ কুণ্ঠিতভাবে জানাইল; পূর্ব্বে ম্যানেজার সাহেবের 'বাসায় গিয়া কখনো না খাইয়া ফিরেন নাই বলিয়া আজও সে রাঁধে নাই। যোগেন্দ্র চটিয়া উঠিয়া তাহাকে তিরস্কার করিল, তারপর খুব তাগিদ দিয়া শীঘ্র শীঘ্র লুচি ভাজাইয়া লইয়া আহারে বসিল। পৃথিবীর মধ্যে এই প্রধান জিনিষটাকে সে মনের কোন লাভ লোকসানের অংশভাগী করিতে চাহে না,' সেটা নিয়ম মতন পাওয়া চাই-ই।

পরদিন প্রত্যূষে স্নান করিয়া গরদের ধুতি চাদর পরিয়া শয়ন গৃহেরি একটি পাশে কম্বলের আসনে বসিয়া নীরদকুমার আহ্নিক সারিয়া শঙ্করভাষ্য লইয়া বসিয়া একটা জটিল সূত্রের মীমাংসা খুঁজিয়া হতাশ্বাস হইবার উপক্রম করিয়াছে, এমন সময় ভৃত্যের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে-যোগেন্দ্র সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল "কি হে, যা বলেছি তাই! এরি মধ্যে আমার প্রবেশ নিষেধ?" নীরদ জটিল সমস্যা অমীমাংসাতেই পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া বলিল "শোন যোগেন! সবারি একটা অন্তঃপুর বলে জিনিষ আছে তো? এসো ওঘরে যাই তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।"

"কেন এঘরে কি 'অহিন্দুদে'র স্থান নাই? ঘরটা শুদ্ধ অপবিত্র হয়ে যাবে?" নীরদ অপ্রতিভ হইল না, বরং হাসিয়া উত্তর করিল "মিথ্যা কি, তোমার পায়ে জুতা রয়েছে, তাছাড়া তোমার তো এখানে বসবারও সুবিধা নাই! 'যুবরাজ'কে তো উচ্চাসন দিতে হবে।"

দুজনে নীরদের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিল। সে ঘরে সে সোফা কেদারা কয়খানা আর নাই তাহার পরিবর্ত্তে সতরঞ্চ ও ছাপ-ওয়ালা জাজিম পাতা তক্তোপোষ বিরাজ করিতেছে। লিখিবার ছোট টেবিলটা একধারে দাঁড় করানো রহিয়াছে তাহার উপর পিতলের ফুলদানীটায় কতোদিনকার ফুলগুচ্ছটি শুখাইয়া গিয়াছে, বদলানো হয় নাই, টেবিল হারমোনিয়মটার কোনরকম সাড়াশব্দই পাওয়া গেল না। যোগেন্দ্র চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া অবাক্ হইয়া বন্ধুর মুখের দিকে চাহিল। সে রুদ্ধ জানলাটা খুলিতে খুলিতে আপনিই বলিল "সেগুলো নিলেম করে দিয়েছি"।

"কারণ? সেগুলো তো কই ভাঙ্গেনি?"

"কারণ,—সেগুলো 'আমার' পক্ষে অনাবশ্যক"। "যোগেন্দ্র উত্তেজিত হইয়া উঠিল। "সেগুলো অনাবশ্যক আর যতো আবশ্যকীয় হলো তোমার এই জঘন্য তক্তাপোষ?"

"না এও খুব আবশ্যকীয় নয় তবে কি জানো এরা হলো পৈত্রিক সামিল; তাঁরা হচ্চেন নিমন্ত্রিত। তাঁদের খাতির করতে করতে গরীবের প্রাণ অস্থির হয়ে ওঠে, এরা একপাশে পড়ে থাকে মাত্র মেরামতের খরচা লাগায় না। আর কি জানো,—যে ছিল সেই থাক। নূতনকে আবার ভাস্কর পণ্ডিতের মতন লুটিয়ে দিবার জন্য ডেকে এনে কি হবে? যোগেন্দ্রের তর্ক অনাবশ্যক হলেও শুনতে পারি বিশ্বনাথের তর্ক তাবলে সহ্য হবে না।"

যোগেন্দ্র অনাবশ্যক তর্ক তুলিল না। নীরদ তাহাকে নিজের বক্তব্য বলিতে লাগিল। রামনাদে একদিন সহসা একজন সাধুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ ঘটে। বরাবরই তাহার সাধু সন্ন্যাসীর প্রতি একটু মনের টান ছিল, কিন্তু ইদানীং বিদেশী চালে চলিতে চলিতে সেটা ক্রমেই কমিয়া আসিয়াছিল, তাই পরমানন্দ স্বামীর সহিত প্রথম যে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হয় তাহাতে সে হিন্দু শাস্ত্রকে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া প্রচারকগণের উপর ক্ষুদ্র তীব্র ভাষায় মন্তব্য প্রকাশ করে। তাহাতে সন্ন্যাসী স্মিতগম্ভীর মুখে অনুত্তেজিত কণ্ঠে এমন কতোকগুলি কথা বলিলেন যে একমুহূর্ত্তেই অবিশ্বাসীর মস্তক তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। নীরদ তখন ঠিক প্রকৃতিস্থ ছিল না! সে তখন বিশ্বসংসারের সমস্ত সহজ পথ ছাড়িয়া এমন কোন একটা রাস্তা খুজিয়া বেড়াইতে-ছিল যাহা ধরিয়া গেলে এখানকার বাতাসটুকু পর্য্যন্ত আলোকটুকু পর্য্যন্ত তাহার কাছে না পৌছিতে পারে। অতীত বর্ত্তমানের সহিত ভবিষ্যৎকে পৃথক করিয়া ফেলিবার জন্য সে তখন তাহাদের কাণ্ড পর্য্যন্ত মূল পর্য্যন্ত কাটিয়া তুলিতে একখানা তীক্ষ্ণ অস্ত্রের সন্ধান করিতেছিল, সহসা এই সাক্ষাৎ তাহার নিকট ঈশ্বরের প্রেরণা বলিয়া বোধ লইল। সে নিজেকে একদিনেই সমর্পণ করিল। সে পথহারা পথ চাহে, তাহার কর্ম্মবন্ধন ছিন্নপ্রায়, তাহার কর্ম্ম চাই।

যোগেন্দ্র এই পর্য্যন্ত যথেষ্ট মনোযোগের সহিত শুনিয়া অসহিষ্ণুভাবে বাধা দিল "তাই তিনি দয়া করে এই সহজ পথখানি দেখিয়ে দিলেন! বড় দয়া—বেটা ভণ্ড!" নীরদ গর্জ্জিয়া উঠিল "চুপ্ কাকে কি বলতে আছে তা জানো! তাঁর সমালোচনা তুমি করোনা।" তেমন তীব্রদৃষ্টি যোগেন্দ্র সে চোখে পূর্ব্বে

কখনও দেখে নাই, সে লজ্জিত ও ঈষৎ ভীত হইয়া চুপ করিয়া রহিল। নীরদ বলিতে লাগিল "তিনি একজন কর্ম্মযোগী। হিন্দুধর্ম্ম প্রচার, ও তাহার পরিপোষণ ইঁহার জীবনের মুখ্য কার্য্য। স্বদেশানুসারে সেই উন্নত হৃদয় পরিপূর্ণ। তিনি তাহাকে তাহার সাধ্যানুরূপ একটি সামান্য কার্য্য লইতে বলিয়াছেন, এবং নিজেও সে তাঁহার একজন পণ্ডিত শিষ্যের নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতেছে। তিনি বলিয়াছেন এখন তাহাকে এই পথেই চলিতে হইবে, তারপর যথাসময়ে তিনি তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া দিবেন, সে ভার এখন হইতে তাঁহারি প্রতি অর্পিত রহিল। এখন সে আত্মচিন্তা ভুলিয়া কার্য্য করুক, জীবনে উদ্দেশ্য বোধ হোক! মনুষ্যের জীবন উদ্দেশ্যহীন হইতে পারে না, কর্ম্মময় জগতে কর্ম্ম ফুরাইবার নয়। যেখানে সহজ চক্ষে নিজের জন্য কর্ম্ম নাই, সেখানে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলে উচ্চতর কর্ম্ম সৃজিত হইয়া রহিয়াছে।"

বলিতে বলিতে কল্পনার দ্বার খুলিয়া ভবিষ্যৎ কর্ম্মক্ষেত্রের যে শান্ত পবিত্র অথচ উদ্যমপূর্ণ চিত্রখানা বক্তার মানসপটে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল তাহাতে তাহার কণ্ঠকে উৎসাহ-কম্পিত ও নেত্রে এক অপূর্ব্ব দীপ্তি প্রদান করিল। নীরদ আবার বলিতে লাগিল "যোগেন্! বন্ধু বলিতে এখন একমাত্র তুমিই আমার বন্ধু। তুমি আমায় এ পথে চলিতে একটু সাহায্য করিও, প্রথমে যদি ঠিক মনের মতন নাও বোধহয় আমার প্রতি ভালবাসায় তাহাও সহ্য করিও, সিংহদ্বারের লৌহ কবাট দেখিয়া হতাশ্বাসে পিছন ফিরিও না।"

যোগেন্দ্র এই নূতন ভাবোন্মাদনার কোন তাৎপর্য্য না বুঝিয়া সবিস্ময়ে কে জানে কেমন যেন একটা অজ্ঞাতপূর্ব্ব পুলকের সহিত মাথা হেলাইয়া স্বীকার করিয়া লইল। কিছুক্ষণ কেহ কোন কথা কহিয়া হৃদয়ের ভিতরকার অব্যক্ত ভাবটিকে ব্যক্ত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিল না। যোগেনও বুঝিয়াছিল এমন কতোকগুলি জিনিষ আছে যাহাকে ভাষাপ্রদান করিতে গেলে তাহাদের অবমাননা করিতে যাওয়া হয়।

চিত্র-ব্যাখ্যা।

শক্তিময়ীর স্বপ্ন। শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার অঙ্কিত চিত্রের প্রতিলিপি।

শক্তিময়ী, শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত ফুলের মালা উপাখ্যানের নায়িকা।

বালিকা নিরুপমা ও শক্তিময়ী দুজনেই রাজকুমার গণেশদেবকে ভালবাসিত, বালক গণেশদেব কিন্তু শক্তিময়ীকেই পত্নীরূপে মনোনীত করিয়া একদিন খেলার সময় তাহাকে ফুলের মালা পরাইয়া দেন। বাস্তব জীবনে ঘটনাচক্র অন্যরূপ দাঁড়াইল,—নিরুপমা হইল রাজরাণী, আর পরিত্যক্তা শক্তিময়ী হইলেন, বঙ্গের মহামহীয়সী সুলতানা। ইহার পর গণেশদেব এক সময় বিদ্রোহাপরাধে সুলতান কর্তৃক কারারুদ্ধ হন। সুলতানা তখন তাঁহার স্থলে নিজে বন্দী হইয়া তাহাকে মুক্তিপ্রদান করেন। কারাগারে শুইয়া তন্দ্রাবেশে শক্তি স্বপ্ন দেখিতেছেন—

তিনিও তাঁহার বাল্যসখা উভয়ে নৌকায় ভাসিয়া চলিয়াছেন,—রাজকুমার শক্তিকে ফুলমালা পরাইয়া বাঁশরীতে গাহিতেছেন—

আমি কি চাহি—
সে আমার আমি তার
আমার কি নাহি?

সকলই বাল্যকালের মত, সুন্দর জ্যোৎস্না, ফুলের গন্ধ, দক্ষিণা বাতাস, কোকিল পাপিয়ার মধুর সঙ্গীত, আর তাহার মধ্যে রাজকুমারের বাঁশরীর প্রাণমনোহারী আনন্দ তান।

এই আনন্দ রজনীতে তাঁহারা দুইটি প্রাণী এক আত্মা হইয়া সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর বন্ধন, দেহের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া অসীম আনন্দ রাজ্যে ভাসিয়া চলিয়াছেন।

এই ভাব স্বপ্নচিত্রে চিত্রকর সুন্দররূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

যমুনা পুলিনে। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় অঙ্কিত চিত্রের প্রতিলিপি। এই চিত্রের ব্যাখ্যা অনাবশ্যক।

"শুনিয়া শ্যামের বাঁশী, মন হইল উদাসী" আমাদের দেশের প্রচলিত এই গানটিকেই কবি তাঁহার চিত্রে মূর্ত্তি প্রদান করিয়াছেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

লেডি মিণ্টোর বিদায় সম্মান। লর্ড মিণ্টোর পাঁচ বৎসরকাল পূর্ণ হইয়া গেল,—তিনি সস্ত্রীক আমাদের দেশ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। লর্ড মিণ্টোর রাজত্বকালে দেশে নানারূপ অপ্রীতিকর ও হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটিয়াছে তথাপি তিনি যে অন্তর হইতে দেশের কল্যাণ কামনা করিয়াছেন ইহা

লেডি মিণ্টো।

কেহই অস্বীকার করিবেন না। লেডি মিণ্টোও নানা কার্য্যে আমাদের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন নাই। আজকাল ইংরাজ মহিলাগণের ভারতমহিলাগণের সহিত সখ্যস্থাপনের

একটা প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। মিশ মেরি কার্পেণ্টারই প্রথম এই উদ্দেশ্যে National Indian Association নামক একটি সমিতি স্থাপন করেন। কলিকাতায় ইহার যে মহিলা শাখাসমিতি আছে লেডি মিণ্টো তাহার একজন মেম্বর ছিলেন। এবং আমাদের দেশের লাটপত্নীগণের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম এদেশের মহিলাদিগকে তাঁহার প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করিয়া সমাদৃত করিয়াছেন। নিমন্ত্রিতাগণ তাঁহার সৌজন্যপূর্ণ সরল আতিথ্যে প্রকৃতই মুগ্ধ হইতেন। ২২শে মার্চ্চ মঙ্গলবার এখানকার ইংরাজ এবং বঙ্গ মহিলাগণ কৃতজ্ঞতানিদর্শন স্বরূপ লেডি মিণ্টোকে বিদায়ের পূর্ব্বে একটা প্রীতি উপহার প্রদান করিয়াছেন। উক্ত অপরাহ্নে আমাদের ছোটলাট পত্নী লেডি বেকারের সহিত প্রায় আড়াই শত শিক্ষিতা ও উচ্চ পদস্থা মহিলা লেডিমিণ্টোর প্রাসাদে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে সকল জাতি ও সকল শ্রেণীর মহিলাই ছিলেন। লেডি বেকার তাঁহাদের ও অপরাপর অনুপস্থিত মহিলাগণের প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া উপহার প্রদান করেন। উপহারটি একটি হীরক খচিত পদ্মাকৃতি ব্রোচ। প্রদান কালে লেডি বেকার বলেন—

"আপনি ভারতত্যাগের পূর্ব্বে কলিকাতার ও বঙ্গের মহিলাগণ আপনার নিকট তাঁহাদের অন্তরের প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য একান্ত উৎসুক। ভারতে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীলোকের চিকিৎসার জন্য আপনি যে নিঃস্বার্থ চেষ্টা করিয়াছেন এবং বঙ্গের মহিলাগণের সহিত আপনি যেরূপ আলাপ ও ব্যবহার করিয়াছেন তাহার জন্য আমরা সকলেই আপনার নিকট কৃতজ্ঞ। সেই কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ আজিকার এই ক্ষুদ্র উপহার গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন।" উত্তরে লেডি মিণ্টো বলেন—আমাদের শীঘ্রই ভারতত্যাগ করিতে হইবে বলিয়া আমরা দুঃখিত। কারণ আমি এদেশ ও দেশবাসীকে অন্তরের সহিত ভালবাসি। আমার প্রত্যেক মঙ্গল কর্ম্মে আমি আপনাদের নিকট যে সহানুভূতি ও সহায়তা লাভ করিয়াছি তাহারই ফলে আমার সকল কর্ম্ম সফল হইয়াছে। আপনাদের এই সুন্দর বহুমূল্য প্রীতি উপহারের জন্য আমি আপনাদের প্রত্যেককে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আপনাদের বন্ধুত্ব ও প্রীতির এই নিদর্শনটি আমি চিরদিন সযত্নে রক্ষা করিব। পদ্মাকৃতি অলঙ্কার সর্ব্বদা আমার এই প্রিয় ও পরিচিত দেশটিকে স্মরণ করাইয়া দিবে। আশা করি আপনারা বিস্মৃত হইবেন না যে আমি আপনাদের মধ্যে আর কালাতিপাত না করিলেও, ভারতের মঙ্গল ব্যাপারে আমার আগ্রহ অক্ষুণ্ণই থাকিবে এবং আপনাদের সুখ সমৃদ্ধির জন্য আমি সর্ব্বদাই অন্তরের সহিত প্রার্থনা করিব।" আশা করি আমাদের নূতন লাটপত্নী লেডি মিণ্টোর ন্যায় দেশের রমণীগণের হৃদয় অধিকারে সমর্থ হইবেন। সঃ

বঙ্গবিভাগ ও তজ্জন্য ব্যয়।

গবর্ণমেণ্টকে বঙ্গবিভাগের জন্য কিরূপ ব্যয় করিতে হইতেছে মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের প্রশ্নের ফলে তাহার একটি তালিকা সাধারণে জানিতে পারিয়াছেন। আমরা সেই তালিকাটি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

বঙ্গদেশের আয় ও ব্যয়। ভারতগবর্ণমেণ্টের সাহায্যসহ—	আয়	ব্যয়
১৯০৬ ৭	৫০৩,৫৭০,৮২	৫২২,৩৪৪,৫৭
১৯০৭-৮	৪২১,৫১৭,২৪	৫৪৪,০৮৭,১৮
১৯০৮-৯	৫৫৯,০৩,০০৬	৫৭২,৩৩৩,৭৭
১৯০৯-১০	৫৭৭,৪৩০,০০	৫৪৮,৪৯০,০০

পূর্ব্ববঙ্গের আয় ও ব্যয়। ভারতগবর্ণমেণ্টের সাহায্যসহ—	আয়	ব্যয়
১৯০৬-৭	২৩৩,৮৮০,০০	২৩৫,৮৮১'৪০
১৯০৭-৮	১৪৪,১৯০,৭৮	২৭০,১৫৭,৬০
১৯০৮-৯	২৭২,৮৮৪,৯১	২৯৫,৪৩১,৭৮
১৯০৯-১০	৩০২,৮৭০,০০	২৯৭,৩৮০,০০

বঙ্গবিভাগের পূর্ব্বে অখণ্ড বঙ্গের আয় পাঁচকোটী অষ্টাদশ লক্ষ ছিল এবং ব্যয় পাঁচকোটী একত্রিশ লক্ষ ছিল। এইক্ষণে বিভাগ হওয়াতে আয় সমানই আছে কিন্তু ব্যয় দ্বিগুণেরও বেশী হইয়াছে।

ভারতগবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টকে নিম্নলিখিত ভাবে সাহায্য করিয়াছেন।

	১৯০৬	১৯০৭	১৯০৮	১৯০৯
শিল্পশিক্ষা বাবত	৩৫,০০০৲	৩৫,০০০৲	৩৫০০০৲	৩৫০০০৲
ইয়োরোপীয়দের শিক্ষা	৬৫,০০০৲	৬৫,০০০৲	৬৫,০০০৲	৬৫০০০৲
পুলিস	৪০০,০০০৲	৮০০,০০০৲	১২০০,০০০৲	১৪,৫০,০০০৲
বিশ্ববিদ্যালয়	১৬০,০০০৲	১৬০,০০০৲	১৬০,০০০৲	১৬০,০০০৲
দুর্ভিক্ষ জন্য		২৬০,০০০৲	২৬০,০০০৲	২৬০,০০০৲
স্বাস্থ্য বিভাগ			৪৫০,০০০৲	৪৫০,০০০৲
আয় ব্যয়ের সমতা রক্ষার জন্য ব্যয়			১৬৯৫,০০০৲	৩০৪২,০০০৲

নিয়ে ভারতগবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ববঙ্গ প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে যে সাহায্য করিয়াছেন তাহার তালিকা দেওয়া গেল।

	১৯০৬	১৯০৭	১৯০৮	১৯০৯
কলেজ বাবত	২০,০০০৲	২০,০০০৲	২০,০০০৲	৩০,০০০৲
ইউরোপীয়দের শিক্ষা	৫০০০৲	৫০০০৲	৫০০০৲	৫০০০৲
পুলিস বিভাগ		২৫০,০০০৲	৩৭৫,০০০৲	৫২৫,০০০৲
আয় ও ব্যয়ের সমতা রক্ষার জন্য ব্যয়			১৬১৮১৯৩৲	৩৬৯০,০০০৲

মরীচিকা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বীজ-রোপণ।

চৈত্র মাসের শেষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। ফুলিগাঁয়ের ভবকান্ত এবার এফ, এ পরীক্ষা দিয়াছে। আশপাশের গ্রামের আরো কয়েকটি ছাত্রের এখনো কালেজ বন্ধ হয় নাই, তাই, তাহাদের অনুরোধে, ভবকান্ত এ কয়টা দিন মেসের বাসায় রহিয়া গিয়াছে।

ভবকান্তের এখনো বিবাহ হয় নাই, তাই দেশে ফিরিবার দিকে চাড়ও ততটা ছিল না! এবং কালেজ-যাওয়া, পড়াশুনা প্রভৃতির মধ্যে ব্যস্ত থাকার দরুণ, কলিকাতা সহরের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়-স্থাপনে, যে সুবিধা এতদিন ঘটিয়া উঠে নাই, এখন তার সুব্যবস্থা করিবে বলিয়া সে সঙ্কল্প করিল।

সকালে পরেশনাথের বাগান, দুপুরে কোনদিন চিড়িয়াখানা, মিউজিয়ম, খিদিরপুরের ডক, কোনদিন বা শিবপুর, মনুমেণ্ট, হাইকোর্ট, সন্ধ্যায় ইডেনগার্ডেন, রাত্রে থিয়েটার—ভবকান্তকে কলিকাতায় ধরিয়া রাখিবার পক্ষে, ইহারাই ত পর্য্যাপ্ত! তাহার উপর আবার ছিল, "সংহন্ত্রী" সাপ্তাহিক পত্রিকার পুস্তকবিভাগ হইতে প্রকাশিত এক টাকায় পঞ্চান্নখানি উপন্যাস! এমন বিস্তীর্ণ আয়োজন ফেলিয়া, যে এই অসহ্য গ্রীষ্মে পাড়াগাঁয়, জঙ্গল পরিবেষ্টিত, পানাপুকুরের পাড়ে অবস্থিত জীর্ণ বাটীর মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে, সে ত নিতান্তই হতভাগ্য!

বেলা পড়িয়া আসিয়াছিল। মেসের ছাদে, ভাঙা চেয়ারে বসিয়া ভবকান্ত একাগ্রচিত্তে "পিশাচিনী পারুলকামিনী" পড়িতেছিল। ঘন জঙ্গলে, দস্যু-পরিবৃত ইন্দ্রধ্বজ সিংহের উদ্ধারে ছদ্মবেশিনী, রাজকন্যা অনঙ্গমঞ্জরী একাকিনী আসিয়া, তরবারি-চালনায়, পঞ্চাশজন ভীমবল দস্যুকে চকিতে নিহত করেন, তাহারি লোমহর্ষণ বিবরণী পড়িতে-পড়িতে তার দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছিল! তার পর অনঙ্গমঞ্জরী ও ইন্দ্রধ্বজ সিংহ উভয়েই যখন জানিতে পারিলেন, তাঁহারা পরস্পরকে কত কাল হইতে কি অসহ্যভাবেই ভালোবাসিয়া আসিতেছেন, তখন বেচারা ভবকান্তের হৃদয়তন্ত্রীতে একটা কোমল সুর বাজিয়া উঠিল। আর, ঠিক এই সময় সন্ধ্যার অন্ধকার চারিধার ছাইয়া ফেলিল। বইয়ের অক্ষর ভাল লক্ষ্য হয় না। ভবকান্ত বহি বন্ধ করিয়া আকাশের দিকে চাহিল।

পাশে হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল বীরেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে তাঁর পৌত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে শানাই বাজিতেছিল। একে বসন্তকাল, মৃদুস্নিগ্ধ বায়ু বহিতেছে, তায় সদ্য উপন্যাস উদ্‌ভ্রান্ত তরুণ পাঠকের উন্মুখ হৃদয়, তাহার উপর শানাইয়ের মিষ্ট রাগিণী! ভবকান্ত অধীর চিত্তে আসিয়া ছাদের আলিসার ধারে দাঁড়াইল।

বীরেন্দ্র বাবুর বাড়ীর ছাদে, সবুজ, বাসন্তী প্রভৃতি নানা রঙের কাপড়-পরা ফুটফুটে মেয়েগুলি ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছিল।

ভবকান্ত উদাস দৃষ্টিতে তাহাদের পানে চাহিয়াছিল। তাহার মনে হইতেছিল, জগতে সুখ যদি কোথাও থাকে ত, ঐ বীরেন্দ্রবাবুর বাড়ীর ছাদেই তাহা আছে! আর, এই বীরেন্দ্রবাবুর সহিত যাহাদিগের সম্পর্ক আছে, এ জগতে তাহাদেরি জীবন-ধারণ শুধু সার্থক! এই ছোট মেয়েগুলি অসঙ্কোচে যাহাদের সহিত আলাপ-পরিহাস করে, যাহাদিগকে দেখিলে আনন্দে-অভিমানে মাতিয়া উঠে, ধন্য, শুধু তাহারাই! হায়, সে তাহাদিগের কেহই নহে! তাহার অসুখ হইলে বীরেন্দ্রবাবুর বাটীর দাসদাসীরাও তাহার সন্ধান লইবে না, তাহার সুখে বীরেন্দ্র বাবুর দরোয়ান অবধি এতটুকু আনন্দ জানাইতে আসিবে না, ছেলেমেয়েগুলি ত নহেই! সে যদি আজ সুলিগাঁয়ের ভবকান্ত না হইয়া, বীরেন্দ্র বাবুর বাড়ীর এই ছেলেমেয়েদের গাড়ী টানিবার ভৃত্য হইত, তাহা হইলেও আজ তাহার কত সুখ ছিল! ভবকান্ত ধীরে ধীরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কত কথাই ভাবিতে লাগিল। এই হাস্যময়ী, সজ্জিতা, সুবেশা, চম্পকবরণী ছোট মেয়েগুলির পাশে দাঁড়াইতে পারে, সমগ্র সুলিগাঁ খুঁজিলে, এমন একটি মেয়েও মেলে কি না সন্দেহ! নুরজাহান, বুঝি, শৈশবে ঠিক এমনি ছিল! ইহার মধ্যে, কেহ যদি বেচারা ভবকান্তের হৃদয়ভাগিনী হয়—! বাতাসে, ভবকান্তের দীর্ঘনিশ্বাস ভাসিয়া গেল!

সে রাত্রে বিছানায় শয়ন করিয়া, একটা কথা কেবলি ভবকান্তের মনে হইতেছিল—এত বয়স হইতে চলিল, তবু ত সে কোনদিন কাহারো প্রেমে পড়ে নাই! তার অদৃষ্ট নিতান্তই অপ্রসন্ন! তার বন্ধু যোগেশ্বর প্রেমে পড়িয়াছিল, সত্যরও দুইবার লভ্‌ হইয়াছিল, আর সে এমন কি দোষ করিয়াছে যে, প্রেমের নিরাশ যাতনাটুকু ভোগ করিবার অবকাশও তাহাকে দাও নাই, ভগবান!

আজ সে ভাবিতেছিল, প্রেমে পড়িবার পক্ষে যোগ্যা পাত্রীই বা তার মিলে কোথায়! ঐ বীরেন্দ্র বাবুর বাড়ী—আহা, তা যদি সম্ভব হইত! তাহা হইলে, জগতে তার আর কোন অভাবই থাকিত না! ভবকান্ত না হইয়া, সে যদি আজ কোন উপন্যাসের নায়ক হইত, তাহা হইলে ত দুঃখই ছিল না। দস্যু-হস্তে নিগৃহীত হইতে কি সে পশ্চাৎপদ, যদি অনঙ্গমঞ্জরীর মত, তার উদ্ধার-কর্ত্রী মিলিবার সম্ভাবনা থাকে!

শেষ রাত্রে, ঘুম ভাঙিলে, ভবকান্ত স্থির করিল, কলিকাতায় কাহারো সহিত তাহার তেমন আলাপ নাই, দেশে ফিরিয়া প্রেমে পড়িবার জন্য সে একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবে। লক্ষ্মী উদ্যোগী পুরুষসিংহেরই আশ্রয় গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অঙ্কুরোদ্গম।

সুলিগাঁয়ের বাটির বাহিরের রোয়াকে ভবকান্ত বসিয়াছিল। সম্মুখের বাগানে, পাড়ার বালিকারা ফুল তুলিতেছিল। ইহাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠা শৈবলিনী দেখিতে-শুনিতে মন্দ নহে! নামটিও শৈবলিনী! প্রেমের পক্ষে উপযুক্তা পাত্রী বটে! তবে তাহার শাণিত রসনা দেশে এমন প্রসিদ্ধি বিস্তার করিয়াছিল যে, ভবিষ্যতে সে কলহ-বিদ্যায় অপূর্ব্ব প্রতিভার পরিচয় দিতে পারিবে বলিয়া সকলের স্থির বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। আর শুধুই কি রসনা! কিল-চড় প্রভৃতি প্রহার-বর্ষণেও সে আশ্চর্য্য শক্তির পরিচয় দিত। এক কথায়, ছোট গ্রামখানিতে, সে বর্গীর হাঙ্গামার তুল্যই ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছিল। পাড়ার ছেলেমেয়েরা তাহাকে, সম্রাজ্ঞীর আসনে, বরণ করিয়া সশঙ্কচিত্তে তাহার আজ্ঞা-পালনে, সর্ব্বদা উদ্গ্রীব থাকিত। তার খর বচনের আশঙ্কায়, কলিকাতা-প্রত্যাগত ভবকান্ত একদিনো প্রেমাভিব্যক্তির সাহস পায় নাই। আজ, তাহাকে দেখিয়া, ক্ষোভে, বেচারা ভবকান্তের অন্তর্দাহ উপস্থিত হইয়াছিল! হায়, প্রতাপ! হায়, শৈবলিনী, শৈ—!

সহসা ভবকান্তের চোখের সম্মুখে একটা ছোটখাট যুদ্ধ হইয়া গেল। বুড়ী, ওরুফে সুরমার বয়স আট বৎসর বেশ! শান্ত, ধীর মেয়েটি! সে বেচারী তার মামার বাড়ীতেই প্রায় থাকিত, কাজেই, শৈবলিনীকে তেমন চিনিত না! আজ ফুল তুলিতে আসিয়া ভালো দুটি চাঁপাফুল সে মালীর নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিল। শৈবলিনী দেখিতে পাইয়া তাহাতে সম্রাজ্ঞীর ন্যায্য দাবী বসাইলেও, সুরমা ছাড়িল না। প্রতিপত্তি-রক্ষার জন্য, অগত্যা, শৈবলিনী সুরমার গণ্ডদেশে প্রচণ্ড চপেটাঘাত বর্ষণ করিয়া, তার সাজির ফুলগুলি রাজকোষে বাজেয়াপ্ত করিয়া, স্থান ত্যাগ করিল। অনুগত অক্ষৌহিণীর মত, মেয়ের দল, "মাগো, কি একগুঁয়ে মেয়ে" বলিয়া সগৌরবে শৈবলিনীর অনুসরণ করিল। সুরমা মাটিতে পড়িয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বেচারীর ঠোঁট কাটিয়া রক্ত পড়িতেছিল।

ভবকান্ত তাড়াতাড়ি সুরমাকে তুলিয়া বাটীর মধ্যে লইয়া আসিল। লজেঞ্জেস ও চুরোটের ছবি দিয়া, ডিক্সনারীর ছবি দেখাইয়া, নানা উপায়ে, সে সুরমাকে সান্ত্বনা প্রদান করিল।

ইহার পর হইতে, সুরমা ও ভবকান্তকে প্রায় একত্রে বেড়াইতে দেখা যাইত! ভবকান্ত ছবি দেখাইয়া, গল্প বলিয়া, অনভিজ্ঞা সরলা বালিকাটির হৃদয়-হরণে সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিল। উপন্যাসের নায়কের মত, সে সুরমার জন্য, গাছ হইতে ফুল-ফল পাড়িয়া দিত, সন্ধ্যার সময় রোয়াকে বসিয়া আকাশের তারাও গণিত! এই সময়, লুকাইয়া ভবকান্ত কবিতা লিখিতেও আরম্ভ করিয়াছিল, বাড়ীর লোকে অবশ্য তাহা জানিতে পারে নাই। এক একবার সে ভাবিত, সুরমা নিতান্ত বালিকা, আবার মনে হইত, প্রতাপ ও শৈবলিনী, যখন আম্রকাননে খেলা করিত, তখন তাহাদিগেরি বা এমন কি বয়স হইয়াছিল!

সেদিন দুপুরবেলায় ভবকান্ত কাগজের নৌকা তৈয়ারী করিতেছিল। সুরমা নিকটে বসিয়াছিল। ভবকান্ত ডাকিল, "সুর!"

"কেন, ভবদা?"

"তুমি আমাকে ভালবাস?"

"বাসি।"

"খুব, ভালবাস?"

"খুব!"

তার পর ভবকান্ত আরো কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু কথাটা বাধিয়া গেল! লজ্জায় তার মুখ লাল হইয়া উঠিল। ভবকান্ত আবার ডাকিল, "সুর!"

"কেন?"

"তুমি সাঁতার কাটিতে জান?" কিছুদিন পূর্ব্বে, সে 'চন্দ্রশেখর' পড়িয়াছিল। তাই, বোধ হয় সাঁতারের কথা, তার মনে পড়িতেছিল!

সুরমা কহিল, "না!"

"সাঁতারটা শিখো—শেখা ভালো!"

"মা যে বকে, ভবদা, পুকুরে নাইতে গেলে—"

"বটে!"

ভবকান্ত কহিল, "সুর, তুমি—" কথাটা শেষ হইল না। কে যেন তার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল। চাপা গলায় আবার সে ডাকিল, "সুর!"

"না, ভবদা, অমন করে কথা কয়ো না ভাই, আমার বড় ভয় পায়, জানো ত, 'ঠিক দুক্কুর বেলা, ভূতে মারে ঢেলা!'"

কিন্তু ভবকান্ত আজ মরিয়া হইয়াছিল। আজ সে হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া জানাইতে চাহে, সুরমাকে সে কত ভালবাসে! তাহার জন্য, যদি প্রাণ দিতে হয়, তাহাতেও সে আজ প্রস্তুত। মিথ্যা লজ্জা করিয়া জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ হারাইবে, এত বড় মূর্খ ও কাপুরুষ, সে কখনো নয়!

ভবকান্ত কহিল, "সুর, আমাকে বিয়ে করবে?"

"যাঃ—"

"না, সুর, বল, বল, বিয়ে করবে—তা হলে, আমি তোমাকে অনেক ছবি দেব—কলকেতা থেকে আসবার সময় কত নূতন

পুতুল, রঙীন জলছবি কিনিয়া আনিব—কত জিনিষ দেব, বল, লজ্জা কি? বল, আমাকে তুমি বিয়ে করবে?"

মৃদু হাসিয়া, সুরমা কহিল, "ওমা, দাদার সঙ্গে বুঝি আবার বিয়ে হয়!"

ভবকান্ত ভাবিল, নিরাশ হইলে চলিবে না। সে কহিল, "এস সুর—এখন সকলে ঘুমোচ্ছে, তোমাকে পুকুর থেকে পদ্মফুল তুলে দিইগে!"

"আর, তোমার কাপড় ভিজ্‌লে বকুনি খাবে যে!"

আমি আলাদা কাপড় নিয়ে যাব—কেউ জানতে পারবে, কেন?" "না, ভাই, আমি যাব না! মা জানতে পারলে বকবে!"

"কেউ জানবে না—এসোনা, তুমি পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখো, আমি কেমন ডুব সাঁতার দোব!"

"আমার, ভাই, ডুব সাঁতার কাটা দেখতে বড় ভালো লাগে।"

উভয়ে দীঘির ধারে গেল! ভবকান্ত জলে সাঁতার কাটিতে নামিল। সুরমা উপরে দাঁড়াইয়া রহিল।

এমন সময় তীব্রকণ্ঠে সুরমার পিসিমার চীৎকার ধ্বনি শুনা গেল! পিসিমা বলিলেন, "পোড়ারমুখো মেয়ে এখানে ছুটে বেড়াচ্ছ! হাবলাদের বাড়ী নেমন্তন্ন আছে, না? সকলে খুঁজে খুঁজে সারা—মেয়ে এখানে পুকুর ধারে রোদ পোহাচ্ছেন! পুরুষ মানুষের সঙ্গে বেড়ানো কি, না? বাড়ী যা! চুল বাঁধতে হবে না!"

সুরমা কাঁদিয়া ফেলিল, কহিল, "এ্যাঁ, ভবদা যে বললে, পদ্মফুল তুলে দেবে।"

পিসিমা কহিলেন, "ভব, বাবা, পদ্মফুল নিয়ে খেলা করে না, ছিঃ! তুলে আমাকে দিয়ে এসে কাল পূজো করে বাঁচবো,—কেমন বাবা?"

"বেশ ত, পিসিমা।"

পিসিমা সুরমাকে লইয়া রঙ্গস্থল ত্যাগ করিলেন, ভবকান্ত ক্লিষ্টচিত্তে গৃহে ফিরিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পরিণতি।

সেদিন সুরমা আসিয়া যখন ভবকান্তকে ডাকিল, তখন ভবকান্ত সবেমাত্র "ঝঞ্ঝাময়ী" উপন্যাস শেষ করিয়াছে। বাঙ্‌লা উপন্যাস সবগুলিই প্রায় ভবকান্ত পড়িয়া ফেলিয়াছে। তবে ঝঞ্ঝাময়ী'র মত মর্ম্মস্পর্শী উপন্যাস বাঙলা ভাষায় আর আছে কিনা, সন্দেহ! ৭৭২ খানি পৃষ্ঠা! তাহার পাত্রপাত্রীগুলা ভবকান্তকে বিচিত্র স্বপ্নমোহে বিভোর করিয়া তুলিয়াছিল! সুরমাকে দেখিয়া ভবকান্ত কহিল, "সুর, হালদার্ণীর বাগানে, আজ যদি সন্ধ্যার সময় যাও ত, তোমাকে কাঁচামিঠা আঁব পাড়িয়া দিই।"

কাঁচামিঠা আম্রের প্রতি সুরমার বিশেষ লোভ থাকিলেও, সন্ধ্যাবেলায় গাছপালার নিকট যাইতে তার যথেষ্ট আশঙ্কা ছিল। সে চুপ করিয়া রহিল।

ভবকান্ত কহিল, "যাবে না, সুর?"

কাঁচামিঠা আম্রের লোভ ছাড়াও ত সহজ নহে। শেষ মুহূর্ত্ত অবধি চেষ্টা করিতে ক্ষতি কি! সুরমা কহিল, "যাব।"

"বেশ, মনে থাকে যেন! পুকুরের সিঁড়ির উপর আমি থাকব—তোমার কোন ভয় নেই! উঃ, কি বড় বড় আঁবই হয়েছে!"

"এখন, কেন, আনবে চল না, ভবদা?"

"এখন ওখানে লোক আছে। তারা গাছ জমা নিয়েছে। পাড়তে দেবে কেন?"

"তা বটে!" সুরমার জিবে জল আসিয়াছিল। সেই বড় বড় কাঁচামিঠা আঁবগুলি—আহা, এমন ভালো জিনিষ কি আর আছে! ভবদা তাকে বড় ভালবাসে ত। বড় লক্ষ্মী ছেলে! সে যে আঁব খাইতে ভালবাসে, ভবদা কেমন করিয়া তাহা জানিল!

"তা হলে মনে থাকে যেন সুর—নিশ্চয় এসো—আর কেউ যেন না জানতে পারে, দেখো!"

কাঁচামিঠা আম্রের প্রতি ভবকান্তের যে বিন্দুমাত্রও আকর্ষণ ছিল, তাহা নহে! তুচ্ছ দুটা ফলের জন্য উদ্গ্রীব হইবে, সে কাল আর তাহার নাই! প্রেমের মহিমায় সে আজ সাধারণ মানুষের অনেক উর্দ্ধে উঠিয়াছে।

আপনার স্বার্থ বলি দিতে, আজ সে এতটুকু কাতর নয়! সুরমার জন্য দুটা আঁব পাড়িয়া দেওয়া—সে ত সামান্য ব্যাপার! তার জন্য, সে আজ প্রাণ দিতে পারে! কিন্তু সুরমা কি তার গভীর হৃদয়ের অগাধ অসীম ভালবাসার প্রতিদান দিবে! নাই দিক্—তবু ভালোবাসিয়াই ভবকান্তের সুখ! আহা, পরীক্ষার অন্তরালে, তাহার জন্য, এমন স্বর্গের ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডার উন্মুক্ত ছিল, সে-ত কখনো স্বপ্নেও তাহা ভাবে নাই!

কিন্তু এই আম্রচুরি ব্যাপারটা একেবারে স্বার্থশূন্য ছিল না। সরলা নারী—হউক বালিকা—তার সহিত আজ সে একটু ছলনা করিয়াছে! রণে প্রেমে সে ছলনাটুকু অবশ্য ক্ষমার্হ!

আম্রের লোভ দেখাইয়া সুরমাকে সে বাগানে লইয়া যাইতে চায়। উপন্যাসে সে পড়িয়াছিল, সরোবরের মর্ম্মর সোপানে বসিয়া প্রেমিক-প্রেমিকারা হৃদয়ের কথা ব্যক্ত করে! চন্দ্রকরোজ্জ্বল নিশীথ, মাথার উপর তারকা-খচিত, অনন্ত,নীল আকাশ, পদতলে সরোবরের কালো জল! আহা, সেইত প্রেমাভিব্যক্তির পক্ষে, উপযুক্ত কাল, উপযুক্ত স্থান! সুরমা নিতান্ত বালিকা—পল্লীগ্রামের অশিক্ষিতা বালিকামাত্র—নহিলে, তাহার জন্য, সুরমা একছড়া মালাও কোনদিন গাঁথিয়া দেয় নাই। যাই হোক, আজ সে নিজে চুপি চুপি বেল ও বকুল ফুল দিয়া দুই ছড়া মালা গাঁথিয়াছে! পাছে শুখাইয়া যায়, এই ভয়ে, ডেস্কের মধ্যে এক বাটি জলেসে দুটি ভিজাইয়া রাখিয়াছে! সেই মালার একগাছি সে আজ সুরমার কণ্ঠে পরাইয়া দিবে—আর সুরমাও অপর গাছি তাহার কণ্ঠে পরাইয়া দিবে। নিকটেও পুষ্করিণী ছিল, গ্রামের নরনারী সন্ধ্যার সময় সেখানে বিরল হইলেও সে সকল পুষ্করিণীতে তালগাছের মূলই সোপানের স্থান অধিকার করিয়াছিল—নায়কনায়িকার বসিবার মত উপযুক্ত স্থান ছিল না!

হালদার্দির বাগান লোকালয়ের একটু দূরে! পুষ্করিণীর সোপান মর্ম্মর-রচিত না হইলেও, তথায় জীর্ণ ইষ্টক খণ্ডে বসিবার স্থান সংগ্রহ করিয়া লওয়া যাইত।

সন্ধ্যার পর, কাগজের মধ্যে, মালা দুইটি জড়াইয়া,ভবকান্ত হালদার্দির বাগানে উপস্থিত হইল। সোপানের জীর্ণ ইষ্টকস্তূপে বসিয়া সে অধীর আবেগে নায়িকার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

ক্রমে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। অন্ধকার গাঢ় হইয়া নামিল। জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নাই। স্তব্ধ বিজনতায়, ঝিল্লীর গভীর ধ্বনিতে ভবকান্তের প্রাণটা শিহরিয়া উঠিতেছিল। আকাশে চাঁদ ছিল না! আজ যে, কৃষ্ণ পক্ষের ত্রয়োদশী, অতিরিক্ত অধীরতায়, সেদিকে লক্ষ্য করিবার, ভবকান্তের অবসরই মিলে নাই। চাঁদ উঠিবে না জানিলে, সে কখনই এ দুঃসাহসিক কার্য্যে অগ্রসর হইত না! কাঁচা-মিঠা আম্র পাড়িবার ত তার একটুও ইচ্ছা বা সাহস ছিল না—কেমন করিয়া সে এই আম-কাঁঠালের ঝোপ পার হইয়া, চাঁপাগাছের তলা ঘুরিয়া, বাগান ছাড়িয়া গৃহে যাইবে, ইহা ভাবিয়া, সে আকুল হইয়া উঠিল।

পুষ্করিণীর অপর পারে, গাছের ঝোপে, জোনাকি জ্বলিতেছিল, ভবকান্তের মনে হইল, ওগুলা ভূতের চোখ জ্বলিতেছে! তালগাছের পাতাগুলার মধ্যে বায়ু সোঁ সোঁ শব্দে গর্জ্জিতেছিল, ভবকান্ত ভাবিল, এ ভূতেরই নিশ্বাসের শব্দ! কি বিড়ম্বনা! তার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইবার উপক্রম করিল! আর,মনে হইতেছিল কি পাপীয়সী, বিশ্বাসঘাতিনী, এই সুরমা! অধীর প্রতীক্ষায়, এই অন্ধকারে, বাগানের মধ্যে, ভূতপ্রেতের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া, সে বসিয়া —ভয়ে তার বুক দুর দুর করিতেছে, জিহ্বা শুকাইয়া আসিয়াছে—আর, সেই পিশাচিনী সুরমা, নিশ্চিন্ত চিত্তে, হয়ত তার পিসিমার কাছে আবদার ধরিয়া গল্প শুনিতেছে! সে যদি কোন রাজপুত্র হইত ত, এখনি ঘোড়ায় চড়িয়া

সেখানে উপস্থিত হইত, এবং তরবারির আঘাতে তার এ গভীর পাপের চূড়ান্ত শাস্তির বিধান করিত! কিন্তু হায়, সে রাজপুত্র নহে, তার ঘোড়া নাই, তরবারি নাই, অধিকন্তু সম্ভ পরীক্ষায় ফল বাহির হইবার আশঙ্কায় সে নিতান্ত নিরীহ হইয়া পড়িয়াছে, তাহার উপর, জবরদস্ত প্রেমের এই বিকট অত্যাচার! সে কাঁদিয়া ফেলিল! এ বিশ্বাস ভঙ্গের কি শাস্তি নাই!

সহসা পত্রমর্ম্মর শুনিয়া সে ফিরিয়া চাহিল! তার গা ছম্‌-ছম্‌ করিয়া উঠিল। কে আসে না! সুরমা কি? আহা, সুরমা তবে সত্যই তাহাকে ভালবাসে। কিন্তু এ'ত সুরমার পায়ের শব্দ নয়! এ যে ক্ষিপ্রগতিতে কে ছুটিয়া আসে! ভবকান্ত ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। শৈশবে সে শুনিয়াছিল, হালদারদীর বাগানে, দুপর রাত্রে ভূতের লড়াই হয়! সে ভাবিল, হায়, প্রেমের জন্য ভূতের হাতে, অবশেষে প্রাণটা দিতে হইল। তবু একবার শেষ চেষ্টা—সে যে ভয় পাইয়াছে, ভূতকে সে কথা জানানো হইবে না। মুখে সাহস দেখাইতে হইবে। অমন করিয়া কত লোক ভূতের হাতে বাঁচিয়া গিয়াছে! কিন্তু আর ভাবিবার অবসর নাই! ভূত কাছে আসিয়া পড়িয়াছে।

সে সাহসে ভর করিয়া সিঁড়ির রোয়াকে উঠিল। ভূত যে তাহারি পাশে আসিয়া পড়িয়াছে! সর্ব্বনাশ! সে প্রাণপণে শক্তি-সঞ্চয় করিয়া কহিল "কে!" কথাটা কাঁপিয়া ভাঙিয়া গেল! দূরে প্রতিধ্বনি উঠিল, "কে!"

এমন সময় সম্মুখেই নিশ্বাসের শব্দ, 'মাগো!' ভবকান্ত টাল সামলাইতে না পারিয়া, 'মাগো' বলিয়া, উলটিয়া পাঁকের মধ্যে পড়িয়া গেল!

উড়িয়া মালী ভিজা কাপড় পরা, কাদা মাখা ভবকান্তকে তার গৃহে পৌঁছাইয়া সংবাদ দিল, বাবু বাগানে আঁব চুরি করিতে গিয়াছিল। তার গরুটা দড়ি ছিঁড়িয়া সেদিকে আসে। বাবু ভয় পাইয়া গাছ হইতে বুঝি পাঁকে পড়িয়াছিল। ছোকরা বাবুদিগের জ্বালায় সে মুনিবের কাছে প্রহার খাইয়া মরে!

সে দিন অপরাহ্ণে ভবকান্তের অজ্ঞাতে, তার পরীক্ষায় ফেল হওয়ার সংবাদ আসিয়া সকলকে বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার উপর, আবার, লক্ষ্মীছাড়া ছেলেটা সন্ধ্যা-বেলায়, ছোটলোকের মত, আম চুরি করিতে গিয়াছিল শুনিয়া ভবকান্তের পিতা সমস্ত বিরক্তি ও অপমানের জ্বালা পুত্রের পৃষ্ঠে বর্ষণ করিলেন।

পরদিন হইতে ভবকান্ত সুরমাকে নিকটে ঘেঁসিতে দেয় নাই। নারীজাতির উপর তার আন্তরিক বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল। নারীর প্রেমটা যে কিছুই নহে, তাহা যে নিছক স্বার্থসংশ্লিষ্ট, ইহা সে মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছিল। ইহার পর হইতে সে আরো বুঝিয়াছিল, প্রেমটা জগতে দুষ্প্রাপ্য মরীচিকা মাত্র, আর বাঙলা উপন্যাসগুলা নিতান্তই গাঁজাখুরি! ভবকান্ত প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, জীবনে কখনো আর সে বাঙলা উপন্যাস পড়িবে না! [illegible] এ প্রতিজ্ঞা আজ পর্য্যন্ত যে, সে ভীষ্মের মত অবিচলিতভাবে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে তাহা আমরা হলপ্ করিয়া বলিতে পারি।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

সমালোচনা।

মনীষা।—(মিশ্র কাব্য) শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১।৶০। গ্রন্থখানি ইংরাজ কবি টেনিসনের "দি প্রিন্সেস্" নামক মিশ্রকাব্যের অনুবাদ। সম্প্রতি এখানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষায় পাঠ্য পুস্তক রূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। অনুবাদ হইলেও, মৌলিক গ্রন্থ অপেক্ষা, এরূপ গ্রন্থ রচনা দুরূহ। বিদেশীয় কবির, বিশেষতঃ টেনিসনের অনুবাদ কিরূপ দুঃসাধ্য, তাহা সাহিত্যসেবীমাত্রেই অবগত আছেন। আমরা এ কঠিন সাধনায় প্রবৃত্ত গ্রন্থকারকে যথেষ্ট প্রশংসা করিতেছি। গ্রন্থকার অবশ্য বিদেশী উপমাদির স্থলে দেশীয় উপমার বহুল ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু একটি বিষয়ে তাঁহার মৌলিক ভ্রান্তি বড়ই ক্ষতিকর হইয়াছে। তিনি শাস্তাকে বঙ্গীয় সমাজের যে শ্রেণী হইতে আহরণ করিয়াছেন, সে নির্ব্বাচনটা সুসঙ্গত হয় নাই, মনে হয়। বঙ্গীয় সমাজ এখনো পুরুষ নারীকে ঠিক পাশ্চাত্য প্রেমিকের চক্ষে দর্শন করে না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রণয়-ব্যাপারেও যে প্রভেদ আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এইটুকু ক্ষুদ্র ত্রুটি, কলঙ্কের মত, রহিয়া গিয়াছে। রচনা স্থলবিশেষে, দুর্ব্বল ও উৎকট হইলেও, মোটের উপর সুন্দর হইয়াছে। স্থানে স্থানে ভাষা, ভাবকে ছাড়াইয়া সুন্দর সঙ্গীতের সৃষ্টি করিয়াছে। এবং সাধারণতঃ গ্রন্থখানি [illegible] উপভোগ্য হইয়াছে। আশা করি শক্তিশালী লেখক ভবিষ্যতে অনুবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া বিদেশী গ্রন্থের ছায়া অবলম্বন করিয়া মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিবেন।

দশচক্র।—(কৌতুক-নাট্য) শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, বি, এ, প্রণীত। ৯৭ হরীশ চাটুয্যের ষ্ট্রীট, ভবানীপুর, কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রমোহন চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ছয় আনা। কবিবর রবীন্দ্রনাথের "মুক্তির উপায়" শীর্ষক গল্প অবলম্বনে 'দশচক্র' রচিত হইয়াছে। কৌতুকনাট্য রচনায়, লেখকের অনবধানতায় অনেক সময় সুরুচির মর্য্যাদা রক্ষিত হয় না দেখা যায়। সৌরীন্দ্র বাবুর গ্রন্থের বিশেষ মূল্য এই যে, ইহাতে সর্ব্বত্র সংযত ভাব, সুরুচি ও সরলতা রক্ষিত হইয়াছে। কোথাও কষ্টকল্পনা বা অস্বাভাবিকতার সাহায্যে কৌতুক বা হাস্যরসের সৃষ্টি করিবার প্রয়াস নাই। সাদাসিধা কথার এমন সুন্দর প্রয়োগ করিয়াছেন যে, তাহাতে আপনা আপনিই রসের সৃষ্টি হইয়াছে। নাটকীয় শিল্প-চাতুর্য্যের প্রাণ,—সহজ ও সরল ভাব। যতদূর স্বাভাবিকতা বজায় রাখা যায়, লেখকের ততই কৃতিত্ব প্রকাশ পায়। সৌরীন্দ্রবাবু এ বিষয়ে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তাঁহার রচনার প্রধান গুণ প্রচ্ছন্ন আঘাত। সমাজকে শাসন করিতে হইলে, উপরে ঘা দিলে তাহার চৈতন্য সম্পাদন দূরে থাক, আরো সে উদ্ধত হইয়া উঠে। এমন সুকৌশলে তাহার মর্ম্মে আঘাত দিতে হয় যে সহজেই তার চেতনা হয়। গানগুলি বেশ সুরসাল ও কাব্যহিসাবে সুমধুর—সেগুলি রঙ্গমঞ্চে কিরূপ জমিয়াছে, তাহা দেখিবার অবসর আমাদের ঘটে নাই। একটী বিষয়ে কেবল আমাদের মতভেদ আছে। সৌরীন্দ্র বাবু নূতন লেখক, এখন তাঁহাকে বহুদিন সমালোচকের আদালতে হাজির হইতে হইবে। এখনি এত অধৈর্য্য তাঁহার শোভা পায় না। গ্রন্থের "পূর্ব্বকথায়" তিনি সমালোচকবর্গের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন। যদি সমালোচক আপন কর্ত্তব্য-পালনে অক্ষম হয়, তবে তাঁহার প্রতি কৃপার উদ্রেক হওয়া উচিত, তাঁহাকে আক্রমণ করিতে যাওয়া কখনই শোভন নহে। সমালোচক [illegible], লেখক চিরদিনের।

শ্রীপঃ

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৮৪, [illegible] বালিগঞ্জ রোড হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

ভারতী।

৩৪শ বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭ [২য় সংখ্যা।

কণারক।

ভুবনেশ্বরে, যাহার গঠন, জগন্নাথে তাহা পুষ্ট এবং কণারকে তাহা পরিণত। ভুবনেশ্বর দেখিলে মনে হয়, সৌন্দর্য্যঘন নিখিল স্বর্গ যেন এই পুণ্যভূমিতে নামিয়া আসিয়া মানুষকে আপনার বক্ষে টানিয়া লইয়াছে। জগন্নাথে সৌন্দর্য্য বড় নাই, কিন্তু তাহার সুবিশাল আয়তনে এবং অখণ্ড মাধুর্য্যে, দর্শককে স্তব্ধ করিয়া দেয়। শুনিয়াছি, কণারকের অর্ক-মন্দির এই দ্বিবিধ ভাবেরই প্রসাদ বিতরণ করিত। সৌন্দর্য্যে তাহা অদ্বিতীয় এবং বিশালতায় তাহা অভাবনীয় ছিল। কণারকের বিশালতা এখন কালগর্ভে, সৌন্দর্য্যও প্রায়-বিগত।

পুরী হইতে কণারকের অর্ক-মন্দিরের ব্যবধান আঠারো মাইল। মধ্যে বালু আর বালু আর বালু! সহর নাই, গ্রাম নাই, মনুষ্যজনতা নাই, খাদ্য নাই, দেবতা নাই! সুতরাং তীর্থযাত্রীর ভক্তির ভাণ্ডার জগন্নাথেই শেষ হইয়া যায়।*

কণারকের শিল্পিগণ কবিত্ব ও সৌন্দর্য্য-দৃষ্টির যতটা পরিচয় দিয়াছিল,—শিল্পি-গুরু বিজ্ঞতার, ততটা দিতে পারে নাই। অর্ক-মন্দির এমন স্থানে স্থাপিত হইয়াছিল, যে সাগরের প্রবল হাস্যমুখর উর্ম্মিমালা তাহার চরণে উচ্ছ্বসিত হইয়া গড়াইয়া পড়িত। শিথিল বালুকাভিত্তির উপরে দণ্ডায়মান হইয়া, একটা মেঘভেদী মন্দির সাগরের আসুরিক উপদ্রব কতকাল অটলভাবে সহ্য করিবে? ইহাই অর্কমন্দিরের পতনের প্রধান কারণ।

আর একটি এমন ব্যাপার ঘটিয়া গেল, যাহাতে কণারকের উপরে ধ্বংসের ভীমকর অনধিককাল মধ্যেই প্রসারিত হইল। সম্মুখে, সাগরগর্ভে কতকগুলি গুপ্তশৈল অনেক তরণীর সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিল। অর্কমন্দির শিখরে, এক খণ্ড চুম্বক-পাথর ছিল। বিপন্ন জাহাজের কুসংস্কার-অন্ধ মুসলমান নাবিকেরা স্থির করিল, ঐ পাথরের আকর্ষণেই এখানে জাহাজ ডুবিয়া যায়! নাবিকেরা বলপূর্ব্বক মন্দির শীর্ষ হইতে চুম্বক পাথরখানি বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল। তখন হইতে, দেবায়তনের আরতি রাগিনী আর বিশ্বছন্দের সহিত সুর গাঁথিয়া দিত না। তখন কোথায় গেল পূজার ঘটা, শ্লোকের ছটা, পুষ্পের ডালি, নৈবেদ্যের থালি, অগুরুচন্দনকলাপ এবং জপগাহনার আলাপ! কারণ? যবনের স্পর্শে দেবমহিমা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে! হা দেবতা! মানবের হস্তে এত অল্পে তুমি অপবিত্র হও!

উড়িষ্যার দ্বাদশ বর্ষের রাজত্বে, কণারকের

---

* সম্প্রতি, পুরী হইতে কণারক যাইবার জন্ত রেলপথ নিৰ্ম্মাণের প্রস্তাব হইতেছে। যদি হয়, তাহা হইলে অনেকেই এই অতীত গৌরবের শেষ-চিহ্ন দর্শন করিবার সুযোগ পাইবেন।

মন্দিরচূড়া নীল আকাশের অনেকখানি পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিল। এখন, মন্দিরের উৎকৃষ্টভাগ কালের কবলে আত্মসমর্পণ করিয়াছে,—মাত্র জগমোহনটি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। সেই স্বল্পাবশিষ্টের মধ্যে, আজও যাহা দেখা যায় তাহা অপূর্ব্বসুন্দর। কিন্তু তাহার আশাও আর বেশী দিন করিও না।

জগমোহনের ভিতরে যাইবার উপায় নাই। দ্বার পথ হইতে, স্খলিত প্রস্তর-স্তূপাকীর্ণ কক্ষতল দর্শন করিয়া, অতি সাহসীও তাহার ভিতরে প্রবেশ করাকে, বুদ্ধিমানের কাজ বলিয়া বিবেচনা করেন না। জগমোহনের উপরিভাগ অযত্নসুলভ শৈবাল-চিত্রে শ্যামায়মান। কারুকার্য্য, যা' কিছু দেখা যায়, তা' বাহিরে। মোহনের পিছনে প্রধান মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পর্ব্বতাকারে পড়িয়া আছে।

কণারকের জগমোহনটী প্রথম দৃষ্টিতে অবিকল ভুবনেশ্বরের মত বোধ হয়। এবং সে সাদৃশ্য, এমন পরম্পরানুসারী,—যে দৃষ্টি-বিভ্রম অনিবার্য্য। কিন্তু কণারকের ভিত্তি-গাত্রস্থ কারুকার্য্য দেখিলে, সহজেই সে ভ্রম, টুটিয়া যায়। মন্দিরের অনেক অংশ লুব্ধ মহারাষ্ট্রীয়েরা ঘর বাড়ী তৈয়ারী করিবার জন্য পুরীতে লইয়া গিয়াছে। অরুণস্তম্ভটীও পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের দোলমঞ্চসারি নামক পথের মধ্যে স্থাপিত আছে। তাহার ঋজুতা, তাহার নির্ম্মাণ প্রণালী এবং তাহার সুডৌল সৌন্দর্য্য, যিনি দেখিয়াছেন,—তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন। স্তম্ভটীর মধ্যভাগে কোনরূপ কারুকার্য্য নাই,—নীচেও যে কারুকার্য্য আছে, তাহা অন্নের মধ্যে বেশ। কিন্তু অরুণ স্তম্ভের কথা এখন থাক।

কণারক সম্বন্ধে, পুরুষোত্তম তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

"কোনার্কস্যোদধস্তীরং ভক্তি মুক্তি ফলপ্রদম্।
স্নাত্বৈব সাগরে সূর্য্যায়র্ঘং দত্বা প্রণম্য চ॥"

এইরূপ, নানা তন্ত্রে, নানাশাস্ত্রে কণারকের পাপতারিণী শক্তির কথা উল্লিখিত হইয়াছে। শাস্ত্রমতানুসারে, দ্বারকাপতি শ্রীকৃষ্ণতনয় শাম্ব, সূর্য্যদেবের আরাধনা করিয়া, শাপমুক্ত হইয়া, এই স্থানে সূর্য্যের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। শাম্ব এখানে একটি মন্দির স্থাপনা করিয়াছিলেন। এবং শাকদ্বীপ হইতে অভিজ্ঞ পুরোহিত আনাইয়াছিলেন। শাম্বের উপাখ্যান পরে বলিব। অবশ্য, এখন, যে মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়, তাহা শাম্বপ্রতিষ্ঠিত নয়।

কণারকের মহিমা সম্বন্ধে, অপর এক সংহিতায় দেখা যায়:—

"মৈত্রেয়াখ্যং বনং বিপ্রা মৈত্রেয় তপসার্জ্জিতম্।
তত্র গত্বা নরঃ শীঘ্রং মহারোগাদ্বিমুচ্যতে॥
তত্র যে মাতুনিস্ক্ষ্যিন্তি বীতরাগা বিকল্মষাঃ।
তেষাং মনোরথ ফলং পুরয়েদ্দিবসাধিপঃ॥
মৈত্রেয়াখ্যে বনে রম্যে যে ত্যজন্তি কলেবরম্।
পাপানি সংপরিত্যজ্য জ্যোতির্ল্লোকং
ব্রজন্তি তে॥" প্রভৃতি।

কপিল সংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—উৎকলখণ্ডে চারিটী তীর্থভূমি আছে। শঙ্খক্ষেত্র, চক্রক্ষেত্র, গদাক্ষেত্র এবং পদ্মক্ষেত্র। ভগবান বিষ্ণু গদাসুর-নিধন করিয়া, উৎকলে তাঁহার শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ফেলিয়া যান। যেখানে যেখানে তিনি যাহা ফেলিয়া গিয়াছেন, সেই সেই স্থান সেই নামের এক একটী তীর্থ-ভূমিতে পরিণত হয়। শঙ্খতীর্থ বা জগন্নাথক্ষেত্র, চক্রতীর্থ বা ভুবনেশ্বরক্ষেত্র, গদাতীর্থ বা পার্ব্বতীক্ষেত্র (যাজপুর)

এবং পদ্মতীর্থ বা অর্কক্ষেত্র। কথিত আছে, এখানে আসিয়া সমুদ্রস্নান করিলে, সর্ব্বপাপ দূরে যায়। ...বটের নিম্নে উপাসনা করিলে বিষ্ণুর নির্ম্মাল্য ...ভ করা যায়। রথযাত্রা দেখিলে, স্বশরীরতপন ...নের ফললাভ হয়। শাম্ব ছিলেন, দ্বারকাপতি ...কৃষ্ণের পুত্র। যেমন তাঁহার সুগঠিতাবয়ব, তেমনি ...হার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যশ্রী। শাম্ব ছেলেটি আমাদের ...বদভাগের গোপালের মত "বড় সুবোধ ছেলে" ...লেন না। কেবল দুষ্টামি আর কৌতুক। অমন ... মহাঋষি নারদ, যাঁহাকে স্বয়ং কৃষ্ণ পর্য্যন্ত ভক্তি করিতেন,—শাম্ব তাঁহাকে ভয় করা দূরে থাক্—তাঁহার ...শ্রুর অরণ্য দেখিয়াও টলিতেন না। তাঁহার ...ামির জন্ম, নারদ ত চটিয়া-ই লাল। অবশেষে, শাম্বকে একেবারে জব্দ করিয়া দিবার জন্য, নারদ ...ক ভয়ানক উপায় অবলম্বন করিলেন।

...ের কাছে গিয়া তিনি বলিলেন "আপনার অত ... মহিষী আর শাম্ব—আর অমন সুন্দর যুবা। ...লেন কি না—"

কথাটা না বুঝিবার মত নয়। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন— ...কি হয় ঠাকুর। শাম্ব আমার ছেলে।" নারদ ...লেন, "কিন্তু আপনার মহিষীরা তার বিমাতা।"

শ্রীকৃষ্ণ কথাটা উড়াইয়া দিলেন। কিন্তু আমাদের ...-প্রসিদ্ধ চিরপরিচিত 'ঢেঁকি ঠাকুরটি' কথাটা ...লিলেন না। শ্রীকৃষ্ণের মহিষীরা জলক্রীড়া করিতে-...ন। নারদ আসিয়া শাম্বকে বলিলেন, "শাম্ব, তোমাকে ...মার বাবা ডাকিতেছেন।" বলিয়া, জলক্রীড়ার ...নে তাঁহাকে যাইতে কহিলেন।

...ম্ব কোনরূপ সন্দেহ করিলেন না। তিনি ... হইলেন।

...র হাস্যোৎসবের মধ্যে তখন যাদবরমণিগণের ... হইতেছিল। হয় ত, কোনও সুন্দরী ... উপরে রাঙা পদ্মের মত সাঁতার দিয়া ...যাইতেছিলেন,—কোন তরুণী পুলকাবেগে ...কাঁকন-কলাপের মৃদু শিঞ্জিতের সহিত ...উৎক্ষিপ্ত করিতেছিলেন, পতনশীল ...বিম্বিত সূর্য্যের কম্পমানকিরণ জ্বলিয়া উঠিতেছিল এবং কোন রূপসী পেলবঅঙ্গে কোমলতম হাস্য বিকশিত করিয়া সলিল-তরঙ্গের সঙ্গে লাস্যলীলায় বিভোরা;—তালে তালে বক্ষের রত্ন-হার দুলিয়া, সূর্য্যরাগে জ্বলিয়া উঠিতেছিল। যাদব রমণীরা তখন মদ্যপানে উন্মত্তা। প্রমোদোৎসবে কটি'র বসন খসিয়া পড়িয়াছিল—সেইপথে নারদ-রচিত ষড়যন্ত্রভ্রান্ত শাম্ব আসিয়া দাঁড়াইলেন। সে রূপের জ্যোতিতে সূর্য্যও বুঝি ম্লান হইয়া গেলেন। কামিনীরা জলক্রীড়া ভুলিয়া, শাম্বের দিকে চাহিয়া রহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অভিশাপ দিলেন—তিনি ত নারদ-ঘটিত ব্যাপার জানিতেন না—বলিলেন—"পাপিষ্ঠ! তুই কুষ্ঠগ্রস্ত হ!"

অভিশাপ প্রকট রোগের চিহ্ন দেহে লইয়া, শাম্ব, চন্দ্রভাগা তীরে অর্কদেবের আরাধনায় বসিলেন। হে জগজ্জ্যোতি! হে বিশ্ব-নয়ন! হে সর্ব্বপাপতারণ! তোমার প্রদ্যোতে আমাকে উদ্ধার কর দেব। আমাকে মুক্তি দাও। তপনদেব প্রসন্ন হইলেন। শাম্ব রোগমুক্ত হইলেন।

সূর্য্যের এই মহিমার উপরেই কণারকের প্রতিষ্ঠা। কথিত আছে, কণারকের মন্দিরস্থ অর্কমূরত সুর-কারু বিশ্বকর্ম্মা-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। যদিও, কণারকের সে মহিমা আজ বিগত, তথাপি, এখনো প্রতি মাঘমাসে এক নির্দ্দিষ্ট দিবসে, এখানে এক উৎসব হয়। বৎসরের মধ্যে, সেই একদিনে—অদ্যাপি অর্কের অপার করুণাকাহিনী লক্ষজনকণ্ঠে গগনে পবনে বিঘোষিত হইয়া উঠে। চন্দ্রভাগার জনবিরল দুকূল আবার ক্ষণেকের তরে মুক্তজনতার বিপুলপুলকোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হইয়া যায়। তাহার পর, আবার শ্মশানের গাম্ভীর্য্য! হায় কণারক!

এইবারে, মন্দিরের কাল-নির্ণয় সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্।

ষ্টার্লিংসাহেবের মতে, এই মন্দির ১২৪১

খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হয়।* কণারকের কাল-নিরূপণে গোলমাল আছে। অনেকে অনেক প্রকার বলিয়াছেন। অন্যের মতে, ইহা ৭৩০ বৎসরের পুরাতন। ঐ কথা সম্রাট আকবরের যুগে।† এখনকার কালহিসাব করিলে, ইহার নির্ম্মাণকাল অনেকদিনকার হইয়া পড়ে। পণ্ডিত ফারগুসান্ ঐ মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন—"ইহা এত পুরাতন নয়। কণারক মন্দিরের আদর্শ দেখিয়া বলা যায়, ইহা নবম খৃঃ অব্দের শেষভাগে নির্ম্মিত।‡

আবার হাণ্টারসাহেব কহেন, জগন্নাথ-দেবের মন্দিরের ৫০ বৎসর পরে, কণারকের মন্দির নির্ম্মিত হয়। ইহার নির্ম্মাণকাল ১২৩৭ ও ১২৪২ খৃঃ অব্দের মধ্যভাগে।§ অপর এক জনের মতে, এই মন্দিরের নির্ম্মাণ-কাল, ১২৪১ খৃঃ অব্দ হইতে ১২৬১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বিশ বৎসর।¶ বাঙালী-গৌরব রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রও ঐ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও কিছু ঠিক হয় নাই।

কেহ কেহ বলেন ইহার নির্ম্মাণকাল ১২০০ শকে। (Temple Annals) ঐ পুস্তকে লিখিত আছে লাঙ্গুলা নরসিংহ দেব ২২ বৎসর রাজত্ব করেন। (ইহাকে "tailed king Narsing Deb" বলা হয়।) নরসিংহ দেব, অর্কক্ষেত্রে এক টি মন্দির নির্ম্মাণ করেন। মন্দির-নির্ম্মাণবিষয়ক উক্তিগুলি ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল, ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছেন:

"The lord of the earth, the tailed King Narasingha, erected a temple for the ray-garbanded God in the Sak year twelve hundred."

পুরুষোত্তম চন্দ্রিকায় উক্ত হইয়াছে। রাজা নরসিংহের রাজত্বকাল ১১৫৯ হইতে ১২০৪ শক। কিন্তু মন্দিরনির্ম্মাণকালসম্বন্ধে চন্দ্রিকা নীরব।

দেখা যাইতেছে, ষ্টার্লিং ও হাণ্টারসাহেবের মত, প্রায় একরূপ, যা' দু'এক বছরের এদিক ওদিক। আবার "List of Ancient Monuments of Bengal"এর মতও এই মতেরই কাছ দিয়া যায়। ফারগুসান সাহেব অনেক পিছাইয়া গিয়াছেন এবং আইন-ই-আকবরী লেখক আবুল ফজল আরো পিছনে। Temple-Annals একেবারে আগাইয়া গিয়াছে। কোন মতটী যে সত্য, তাহা ঠিক করিয়া বলা বড় কঠিন। তবে ইহার নির্ম্মাণকাল,—১২৫০ খৃঃ অব্দের পরেই আরম্ভ হইয়াছিল বলিলে—অযুক্তি পূর্ণ হইবে না। ফারগুসান সাহেব, যে নির্ম্মাণপদ্ধতি ও আদর্শ দেখিয়া, কালনিরূপণের কথা বলিয়াছেন,—তাহাতে নির্ভর করা কঠিন। হিন্দুস্থাপত্য, একান্ত রক্ষণশীল। বিশেষতঃ উৎকল-স্থাপত্য। উড়িষ্যায় সহস্র সহস্র মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহাদের কাহারো কাহারো নির্ম্মাণব্যবধান দু'তিন শতাব্দী। কিন্তু আলোচনা করিয়া দেখিলে বুঝিবে, এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে নির্ম্মাণপদ্ধতি অতি

---

* Asiatic Researches Vol. xv p. 327.

† আইন ই আকবরিকার।

‡ History of Indian and Eastern Architecture.

§ Statistical Account of Bengal.

¶ List of Ancient Monuments of Bengal. (1895

অল্পই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সেই ক্রমাতি-সূচি আঁধারগর্ভ মন্দির, সেই এক আদর্শানু-কারিণী মূর্ত্তি! অত যে সিংহমূর্ত্তি,—যে তাহাকে সিংহ না বলিয়া ড্রাগণ বলিলেই ঠিক হয়—সবগুলি এক ছাঁচে ঢালা। এই সেদিনও, পুরীতে কোন মন্দিরের দ্বারদেশে আমরা দুটি সগুনির্ম্মিত সিংহমূর্ত্তি দেখিলাম—তাহাও অবিকল সেই মান্ধাতার আমোলের সিংহমূর্ত্তির মত। শিল্পী যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে, যাহাতে এক চুল এদিক ওদিক না হয়। এখন বল, এমন দেশে তুমি ভিন্ন আদর্শের সন্ধান কোথায় পাইবে? যদি মন্দিরের প্রস্তর পরীক্ষাপূর্ব্বক তুমি তাহা প্রাচীন বা আধুনিক, স্থির করিতে চেষ্টা করো, তাহা হইলে, বরং কৃতকার্য্য হইবে। এবং যদি আদর্শ ও প্রাচীনত্বের দিক দিয়াই ধরা হয়, তাহা হইলে, তুমি বলিতে বাধ্য যে, কণারকের মন্দির,জগন্নাথের দেবায়-তনের পরে, নিশ্চয় নির্ম্মিত হইয়াছে। কারণ শিল্প যত পরিণত হয়, তাহা ততই উৎকর্ষের দিকে যায়। কণারকে ইহার পরিচয় দীপ্যমান। ভুবনেশ্বর বা জগন্নাথ, কি উচ্চতায়, কি গঠন-কৌশলে এবং কি সূক্ষ্ম শিল্পে—কণারকের সমকক্ষ নয়। পরন্তু, ফারগুসন সাহেব ত নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, যে উড়িষ্যার অন্য মন্দিরের মত কণারকের ভিতরটা অন্ধকারে ঢাকা নয়। আমরা বলি কণারক অপেক্ষাকৃত আধুনিক,—ইহাই তাহার প্রধান প্রমাণ। ভুবনেশ্বরের অভ্যন্তর ভাগে অন্ধকার—পরিষ্কার দিবা-কালেও নজর চলে না—প্রতিপদেই হোঁচট খাইয়া পড়িয়া যাইতে হয়। জগন্নাথের মন্দিরেও অন্ধকারের অভাব নাই,—কিন্তু ভুবনেশ্বরের মত নয়। জগন্নাথের মন্দির ও আধুনিক। আর কণারকের মন্দির নিশ্চয়ই আরো আধুনিক, কারণ তথায় আলোক-সমাগমের উপায় আছে। শিল্পীরা পূর্ব্বাভিজ্ঞতায় বুঝিতে পারিল, যে আলোকের উপায় না করিলে, মন্দির অগম্য হইয়া উঠে। ভুবনেশ্বর ও জগন্নাথের মন্দিরের দুরবস্থাই এই সাবধানতার কারণ। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, বলিতে হয়, ভুবনেশ্বর এবং জগন্নাথের মন্দিরের অপেক্ষা কণারক নিশ্চয়ই আধুনিক।

বহুকাল পূর্ব্বে, আবুলফজল অর্ক-মন্দির দেখিতে আসেন। তিনি ইহার সৌন্দর্য্য-দর্শনে যেরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তৎরচিত সূর্য্য মন্দিরের কাহিনীই তাহার প্রমাণ। কিন্তু আবুল-ফজলও মন্দিরের সমগ্র সৌন্দর্য্য দর্শন করেন নাই। কণারকের তখন ভগ্ন-দশা। তিনি যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে জানা যায়, কণারকের সর্ব্বোচ্চ চুড়া, জলদ-ভেদী ছিল। যদিও, এই বর্ণনায়, কল্পনার অভাব নাই, তথাপি ইহা হইতে বেশ বুঝা যায়, কণারক এত উচ্চচুড়সম্পন্ন ছিল, যে মেঘস্পর্শী না বলিলে, তাহার প্রকৃত স্বরূপ পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করিবে না। আবুল ফজল অর্ক-মন্দিরের একটা মোটামুটি বর্ণনাও, আপনার পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাহার একাংশ এইরূপ—

কণারক মন্দিরের চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর আছে। প্রাচীর, উচ্চতায় একশত পঞ্চাশ হাত এবং প্রস্থে উনিশ হাত। প্রবেশ করিবার পথে একটি অষ্টকোণিক স্তম্ভ আছে, তাহা কৃষ্ণ প্রস্তর রচিত। (ইহাই অরুণ স্তম্ভ, এখন পুরীতে আছে) নয়টী সিঁড়ি অতিক্রম করিলেই একটা মুক্তভূমিতে গিয়া পড়া যায়। সেখানে প্রস্তর

গঠিত একটি বৃহৎ খিলান আছে,—তাহা সূর্য্যনক্ষত্র-খচিত। খিলানের চারিদিকে বহুভঙ্গিমাবিশিষ্ট বহু খোদিত মূর্ত্তি। মন্দিরের নিকটেও দেবালয়ের অভাব নাই। তাহারা গণনায় অষ্টবিংশ সংখ্যক।"

আগেই বলা হইয়াছে, লাঙ্গুল্য রাজা নরসিংহ দেব এই মন্দিরে স্থাপয়িতা। তাঁহার অমাত্য শিবাই সউন্তুরার তত্ত্বাবধানে ইহা নির্ম্মিত হয়। উড়িষ্যায়, বহুশতাব্দীর পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ে যে অযুতমন্দিরমালা, একের পর একে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কণারক তাহার মধ্যে সর্ব্ব-বিষয়েরই শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে। উৎকল শিল্পের পরম বিকাশ কণারকে। ভুবনেশ্বর মন্দিরগাত্রে যে চিত্রবহুলশিল্প, সূক্ষ্মতায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, এবং জগন্নাথ দেবায়তনের বিশালতায় যে শিল্প সকলকে বিস্ময়মূক করিয়া তুলিয়াছিল, কণারকে সেই শিল্পই মেঘস্পর্শী মন্দির শিখর হইতে তাহার ভিত্তিমূল পর্য্যন্ত অবিচ্ছেদে সুন্ন-কাঙ্কর কার্য্যে আপনাকে নিয়োজিত করিয়া, শৈল-পটে আপনার অন্তিমবিকাশ লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে। ভুবনেশ্বরে যাহার গঠন, কণারকে তাহার পতন।

উৎকলের অন্যান্য মন্দির, দ্বিভাগে বিভক্ত, কিন্তু ইহার তিনটি ভাগ। প্রথম দু'ভাগে দুটী করিয়া কর্ণিক এবং তৃতীয় ভাগে পাঁচটী। কেশরীরাজবংশসুলভ নবগ্রহ, এখানেও দেখা যায়। উড়িষ্যার প্রায় সকল দেবায়-তনেই সপ্তফণফণী থাকে, এখানেও তাহার অভাব নাই। ইহার গৃহতল চওড়ায় চল্লিশ ফিট। দেওয়াল সরলভাবে উপরে উঠিয়াছে। তাহারো মাপ চল্লিশ ফুট। তাহার পর, আরো বিশ ফুট স্থান লইয়া, যে অংশ,—তাহার ভিতরে ভিতরে ব্রাকেট আছে। তাহার পর ছাদ। অর্থাৎ, ভূমিতল হইতে জগমোহনের ছাদের উচ্চতা ৬০ ফিট। নিম্নাংশটি ৪০ ফিট উচ্চে স্থাপিত। পাঠক-গণের যেন মনে থাকে আমরা মন্দিরের যে কথা বলিলাম ও বলিব,—তাহা সমগ্র অর্কমন্দিরের নয়,—মাত্র তাহার ধ্বংসাতিরিক্ত জগমোহনের,—যাহা অদ্যাপি বিদ্যমান।

জগমোহনটী চতুষ্কোণ—চতুর্দ্দিকেই ৬৬ ফিট দীর্ঘ।* চারিদিকেই একটী করিয়া দরজা। ভিতরের চাইতে বাহির দিকটা ভাল আছে বটে, কিন্তু দরজাগুলির চারিপাশ অপেক্ষাকৃত জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। প্রধান ও বৃহৎ ভোগমণ্ডপটি কিছুদিন আগেও ছিল,—কিন্তু সম্প্রতি তাহা মাটীর ভিতরে বসিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বদ্বারের কারিকরিও উল্লেখযোগ্য সুন্দর। দরজার বাহির দিক, সর্প, বানর ও মনুষ্যমূর্ত্তি এবং আনত শাখাপল্লব প্রভৃতির খোদনচিত্রে পূর্ণ। ছাদটী পিরামিডের মত। তাহার উপরটা, ৭২ ফিট পরিমিত স্থান ঢালু ভাবে নামিয়া আসিয়াছে। চাঁদনির বাহিরে,—উত্তরদিকে একযোড়া সুবৃহৎ অশ্ব ও হস্তিমূর্ত্তি আছে। আর একদিকে একটি সিংহ ও হস্তিমূর্ত্তি।

কণারকে, হিন্দুস্থাপত্যের আর একটী পরিবর্ত্তন দেখা যায়। অনেককেই অনুযোগ করিতে শুনি, হিন্দুরা 'আনাটমী' দক্ষ ছিলেন না বলিয়া, তাঁহারা অপ্রাকৃতিকতা হইতে মুক্ত হইয়া, স্বভাবকে অনুসরণ করিতে পারিতেন

* Antiquities of Orissa.

না। হিন্দুদের অপ্রাকৃতিকতার কারণ যে, তাঁহাদের শারীরিকবিজ্ঞান অনভিজ্ঞতার পরিচয় নয়, আমি ভিন্ন নিবন্ধে তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছি। * এই যে অপ্রাকৃতিকতা,—আশ্চর্য্যের বিষয় কণারকে তাহার পরিচয় দুর্লভ। এখনকার মূর্ত্তিগুলি অনেকাংশে অবিকল স্বভাবানুকারিণী। সেগুলি দেখিলে বেশ বোঝা যায়, উৎকল-শিল্পী শারীর-বিজ্ঞানাভিজ্ঞ ছিলেন। কেবলমাত্র সিংহগুলি,—সিংহের মত দেখিতে নয়। কিন্তু আমরা আগেই বলিয়াছি, হিন্দু শিল্পীরা নিশ্চয়ই সিংহগঠন করিতে যান নাই। পরন্তু সিংহ-প্রাকৃতিক ড্রাগন-গঠনই তাঁহাদের অভিপ্রেত ছিল।

কণারকের মন্দির গাত্রের কারুকার্য্য এমন ঘনসন্নিবিষ্ট, যে হাণ্টার সাহেবও বলিয়াছেন :—

"Viewed from below, this lofty expanse of masonry looks as if one could not place a finger on an unsculptured inch."

অর্থাৎ "দেখিলে, মনে হয় যেন ইহাতে কারুকার্য্য-শূন্য এমন এক ইঞ্চ পরিমিত স্থান নাই, যেখানে তুমি তোমার আঙুল রাখিতে পার।"

কণারকের শিল্প যে-কি অদ্ভুত শক্তি পরিচায়ক, এই উক্তি হইতেই তাহা জানিতে পারিবে।

মন্দিরের একখানি সুন্দর ও বৃহৎ প্রস্তর, একজন সাহেব আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রস্তরখণ্ডের বর্ণ হরিৎ ছিল। সাহেব, একটা গরুর গাড়ীর উপরে, পাথরখানি চাপাইয়া দিয়াছিলেন। গাড়ীখানাকে প্রস্তর সমেত, অতি কষ্টে খানিকদূর আনা হইল। তাহার পরে, সশব্দে গো-শকট ভাঙিয়া পড়িল। পাথর আর আনা হইল না। সেখানি, মাঠের ভিতরে পড়িয়া রহিল।

পূর্ব্বদ্বারপথের কারুকার্য্যখচিত একটি অংশ পড়িয়া যায়। তাহার মাপ ১৯×৪½×৩½। এবং সেটি ২৪ টোন ভারী। তাহাতে, রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু এবং কেতুর মূর্ত্তি খোদিত আছে। ইহারই নাম নবগ্রহ শিলা। এই নবগ্রহ শিলাখানিকে কলিকাতায় আনিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করা হইয়াছিল। রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর প্রার্থনায় গবর্ণমেণ্ট তিনহাজার টাকা, এই প্রস্তরানয়নের ব্যয়-স্বরূপ প্রদান করিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। পাবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্টের উপরে, এই কাজের ভার দেওয়া হয়।‡ অখণ্ড প্রস্তরখানিকে আনা সুকঠিন দেখিয়া, তাহা দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। তাহার খণ্ডিত অংশ হাতীর উপরে চাপানো হইল। কিন্তু তথাপি সেই গুরুভার প্রস্তরখানাকে অধিকদূর আনা গেল না। অসম্ভব বিবেচনায়, এই কার্য্য অবশেষে স্থগিত হয়। তাই হাণ্টার সাহেব বলেন,

"Bishop Heber's criticism that the Indians built like Titans and finished like jewellers." ১

প্রসিদ্ধ বঙ্গীয় লেখক বলেন্দ্র নাথ ঠাকুর, এই নবগ্রহ শিলা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "আর সেই অতুল শিল্প—নবগ্রহ; উজ্জ্বল কৃষ্ণ পাষাণখণ্ডে

---

* ১৩১৬ সালের শ্রাবণ ও আশ্বিন সংখ্যায় ভারতীতে মৎ-রচিত "ভারতীয় চিত্র-কথা" নামক প্রবন্ধ দেখ।
‡ Hunter's Orissa.

মুদ্রিত কয়টি বুদ্ধসদৃশ প্রশান্ত হাস্যবদন, হস্তে কাহারও জপমালা, কাহারও বা অর্দ্ধচন্দ্র, কাহারও বা পূর্ণ ঘট। এখন এই নবগ্রহ-মূর্ত্তি মন্দির হইতে প্রায় চারিশত হস্ত দূরে ইংরাজের লৌহরথোপরি শায়িত—কলিকাতায় আনিতে আনিতে আনা হয় নাই, পথিকেরা তাহার গায়ে সিন্দুর লেপন পূর্ব্বক ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া যায়; কিন্তু এই নূতন লব্ধ ভক্তি এবং প্রীতি লাভ করিয়াও আর কিছুকাল পড়িয়া থাকিলে এই অক্ষুণ্ণ প্রাচীন কীর্ত্তি শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে।" বলেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী। ৫৬৫ পৃষ্ঠা।

কণারকের মন্দির, সমগ্র ভারতের মধ্যে উচ্চতায় শ্রেষ্ঠ। ইহার কারুকার্য্য দেখিয়া মিষ্টার ষ্টার্লিং বলেন,

"The workmanship remains too as

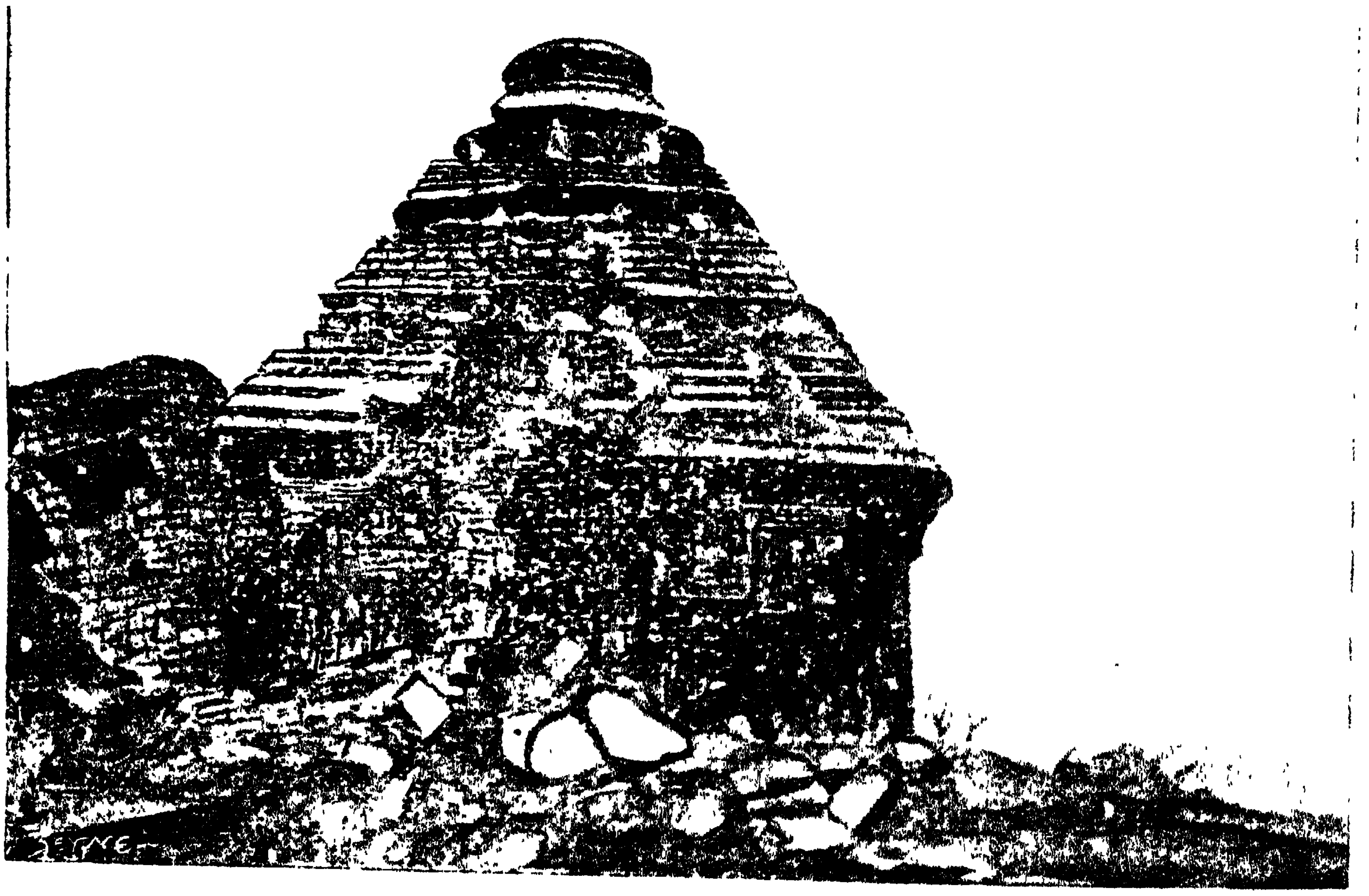

কণারকের ভগ্নমন্দির

perfect as it has come from the chisel of the sculptor owing to the extreme hardness and durability of the stone."

অর্থাৎ—"কণারকের কারুকার্য্য দেখিলে মনে হয়, যেন ইহা এইমাত্র শিল্পীর বাটালি মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে!"

মন্দিরের সূর্য্যমূর্ত্তিটিও এখন স্থানান্তরিত হইয়াছে। তাহা সপ্তম খৃঃ অব্দের আরম্ভ ভাগে এখান হইতে তুলিয়া, পুরীতে লইয়া যাওয়া হয়।*

আর একজন ইউরোপীয় কণারক দেখিয়া বলিয়াছেন:—

* List of Ancient Monuments of Bengal.

"So much so, indeed, that perhaps I do not exaggerate when I say that it is, for its size, the most richly ornamented building—externally at least—in the whole world."

"অত্যুক্তি হইবে না, যদি আমি বলি যে আকারানুসারে, এই কারুকার্য্যখচিত মন্দির,—অন্ততঃ বাহিরের অংশ হিসাবে, ভূমণ্ডলের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।" তাহার পর তিনি বলিতেছেন, "বাহিরের অংশ ধরিলে, এই মন্দিরটী ভারতীয় স্থাপত্যের একটী উৎকৃষ্ট নিদর্শন। তবে উচ্চ ভারতে এমন অনেক মন্দির আছে যাহাদের অভ্যন্তরের সূক্ষ্মকার্য্য সুন্দরতর বটে।"*

কিন্তু, এত প্রশংসাও, কণারককে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিল না। উৎকলরাজশ্রীর সেই কৈবল্য-সোপান ধ্যানপূতঃ পরিকল্পনা, আর আজিকার এই স্মৃতির মশানে গৌরবের অন্তিম দীর্ঘশ্বাস! হা মানুষী শক্তি! কত ক্ষুদ্র তুমি! দ্বাদশবর্ষের রাজস্বে যাহা তুমি নীলকমলনিলীম আকাশের গায়ে কবির স্বপ্নের মত গড়িয়া তুলিলে, আজ কোথায় সেই স্বপ্ন, সেই শৈল-মুদ্রিত শিল্পকাব্য, সেই অসীমের সান্ত-বিকাশ! আজ দেবধানীর সেই গৈরিকঅঙ্গচ্ছদকম স্তব-গাহকগণের শিব-সুন্দরের অনন্ত-গাথা ও নির্ব্বাণ-কীর্ত্তনের সহিত অর্ক-মন্দিরের নিখিল গরিমাও, নির্ব্বাণ-মার্গে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। গৌরবের মরণ এমনি করিয়া হয়। কেহ দেখে না, কেহ শোনে না, কেহ যত্ন লয় না, ধীরে ধীরে অতি ধীরে, বেলান্তের তমিসী যবনিকায় গোধূলির হিরণ্যদীপ্তিপ্রতিম কোথায় মিলাইয়া যায়! যেন, চিকুরের একটা চমক! ফুলের একটু সুরভি! মায়ার একটা ক্ষণিক লীলারহস্য!

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

শিল্পে ভক্তিমন্ত্র।

নারিকেল ফলাম্বুবৎ শিল্পলক্ষ্মী কি উপায়ে কখন যে আমাদের পূর্ণতা দান করিবেন তাহা জানিবার উপায় নাই; তবে এটা জানি যে সেই পূর্ণতা লাভের জন্য সরস ভূমিকে দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া, বাহির হইতে যে ঝড় আসে তাহা হইতে সাবধান থাকিয়া এবং যে স্নিগ্ধ সূর্য্যালোক ও সুবাতাস আসে তাহা হইতে নিজেকে বঞ্চিত না করিয়া গাছটার মত আমাদেরও বাঁচিয়া থাকিতে হইবে।

'ভুক্ত কপিত্থবৎ' শিল্পলক্ষ্মী আমাদের শূন্য করিয়া চলিয়া যাইবেন সেই দিন, যে দিন শিল্পবিষয়ে রক্ষণশীলতা আমরা হারাইব। বিংশ শতাব্দির শিক্ষাগর্ব্বে উন্মত্ত হইয়া পিতৃপুরুষের অমৃত কুম্ভে সবুট পদাঘাত করিয়া গ্রীক মস্তভাণ্ডটার দিকে যে মুহূর্ত্তে হাত বাড়াইব সে মুহূর্ত্তে মানবসমাজের পাগলাগারদে আমাদের স্থান দিতে কেহই ইতস্তত করিবে না। শিল্পবিষয়ে এই পাগলামির লক্ষণ প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া আমাদের ভিতরে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে পাইতে এমন সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় আমাদের উপনীত করিয়াছে যে ভারত শিল্পটা কি

* Picturesque Illustrations of Ancient Architecture in Hindusthan. p.p. 27.

এমন প্রশ্নও আমরা আজ করিতেছি। চোখ যখন ঠিক দেখে তখন এটা কি, এ প্রশ্ন করে না। আদিম অসভ্য অবোধ শিশু এবং অন্ধের মুখেই শোনা যায় এটা কি, ওটা কি। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যাঁহারা ভারত শিল্পের সৃষ্টি করিয়া গেছেন, যাঁহারা আনন্দসহকারে ভারতশিল্পের জয়ধ্বজা সমস্ত প্রাচ্য দেশে বহন করিয়া লইয়া গেছেন, কই তাঁহারা তো কোন দিন এমন প্রশ্ন করেন নাই যে ভারত শিল্পটা কি?

কি জানিয়া তবে ঘরের শিল্পলক্ষ্মীকে ভালবাসিতে চাহি, এটার যে কি ধিক্কার তাহা আমরা যতদিন না বুঝিব ততদিন শিল্প লোকের সিংহদ্বারের বাহিরেই আমাদের থাকিতে হইবে।

শ্রীক্ষেত্রের যাত্রী একদল বাসায় বসিয়া রহিল, একদল মন্দিরে গিয়া প্রবেশ করিল এবং দেবতাকে দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিল। বাসার লোকে প্রশ্ন করিতেছে -কি দেখিলে বল। উত্তর হইতেছে সে যে কি দেখিলাম কি বলিব!

শিল্প সম্বন্ধেও এই প্রশ্নোত্তর মানুষে মানুষে চিরদিন চলিতেছে কিন্তু সেই কি কি, আর আহা সে কি!

যাহারা দেখিল তাহারা বুঝাইয়া বলিতে পারিল না; আর না দেখিয়া, শুনিয়ামাত্র বুঝিতে যাহারা চাহিল তাহারা মাথা মুণ্ডু কি যে বুঝিল তাহা তাহারাই জানে।

"আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনমাশ্চর্য্যবৎ বদতি
তথৈবচান্যঃ
আশ্চর্য্যবচ্চেনমন্যঃ শৃণোতি শ্রুত্বাপ্যেনম্
বেদনচৈব কশ্চিৎ॥"

এই মহদাশ্চর্য্যরূপ ব্যাখ্যা করিতে কাহারও সাধ্য হয় নাই, ব্যাখ্যা শুনিয়া বুঝিতে সাধ্যও কাহার হইবে না; যদি না সকল শিল্পের অধিষ্ঠাতা সেই বিশ্ব শিল্পী—যাঁহার আশ্চর্য্য বিধানে কত সুদৃঢ় বন্দর থাকিতেও শিল্পলক্ষ্মীর সোনার তরী আজ আমাদেরই শ্মশানঘাটে ভিড়িতে চলিয়াছে—তিনিই আমাদের মনশ্চক্ষু খুলিয়া দেন।

কেমন করিয়া বুঝাই ভারতশিল্প কি, এটা যে খেলা নয়, স্বপ্ন নয়, মর্ম্মের ভিতরে যাহার জন্য টান পড়িতেছে, যাহাকে ধরিয়া থাকিতে প্রাণান্ত হইতেছে—সে যে দুঃস্বপ্ন নয়, হৃদয় ধনেরই জাগ্রত মূর্ত্তি কেমন করিয়া বুঝাই!

অমৃতের স্পর্শে জীবন পুলকিত হইতেছে মনোবীণায় মনোমত টান পড়িতেছে অনুভব করিতেছি কিন্তু সেটা যে ক্ষণিক মোহের করসঞ্চালন নয়, আমাদের হৃদয় তন্ত্রীর উপরে সুদীর্ঘকাল পরে শিল্পদেবতারই সহসা অঙ্গুলি তাড়ন তাহা যদি বা বুঝি, বুঝাইতে অক্ষম।

তাই আমি স্থির করিয়াছি কা, কা, কি, কি লইয়া থাকিলে কোন ফল নাই; ইচ্ছা হয় তোমরা তাহা লইয়া থাক, আমাকে অবসর দাও আমি যাহা দেখিয়া ভুলিয়াছি তাহা পাইয়া সুখী হই।

যাহারা তৃষাতুর নও তাহারা বসিয়া বসিয়া বিচার কর; যাহা চাহি তাহা ছায়া কি কায়া সত্য না মরীচিকা; কিন্তু পিপাসিত যাহারা তাহাদের সে বিচারের অবসর কোথা? মরীচিকা হউক আর সত্যই হউক রূপসাগরের দিকে আমাদের এই বলিয়াই ছুটিতে হইবে—

"বিশ্বজীবন বিমোহচ্ছবি কোসিদেব
যত্নদেষি মে পুরঃ
ত্বাং পিবামি হৃদয়েন নির্ভরং তিষ্ঠ তিষ্ঠ...

যেমন হৃদয় দেবতাকে বলিতেছি 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' তেমনি যে বন্ধুরা ভারতশিল্প লইয়া বিচারে লইয়া গেছেন তাঁহাদেরও বলিতেছি 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ'—তোমরা বিচার লইয়া থাক, আমি যাই—পথ ছাড় ; গোলযোগ করিয়া ধূলা উড়াইয়া আমার পথ আঁধার করিও না। আর যাঁহারা চূণকাম ও তৈল সিন্দূর দিয়া ভারতশিল্পলক্ষ্মীকে সুঠাম পরিষ্কার সুভব্য ও সুসভ্য করিয়া তুলিতে চাহেন তাঁহাদেরও বলিতেছি 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ', আর রং চড়াইয়া কায নাই ও যেমন আছে থাক ; ওই কালোরূপে [illegible]শিল্প জগৎ আলো করিয়া আছেন [illegible] রং মাখাইয়া দেবতাকে আর বহুরূপী সাজাও কেন ?

অমানিশার ন্যায় স্তব্ধ শান্ত এই ভারতশিল্প চোখে কালো ঠেকিতেছে কিন্তু হৃদয়দুয়ার খুলিয়া একবার ইহার গভীরতা অনুভব কর, [illegible] বিস্ময়ের মত নিস্তরঙ্গ রসসমুদ্রে অসীম রহস্যের মাঝে স্থির পদ্মাসনা [illegible]নেশ্বরীকে দেখিয়া কৃতার্থ হইবে।

কথায় বলে "তর্কে বহু দূর" ভারতশিল্পকে [illegible] আমরা তুলনায় সমালোচনা করিয়া [illegible] দ্বারা বুঝিতে চলিব ততদিন এই বিরাট [illegible] বহিরঙ্গ অংশটাই তাহার সু এবং [illegible] আমাদের চোখে পড়িবে। আমাদের [illegible]গণ যে শিল্প সৃষ্টি করিয়া গেছেন [illegible] সেকালেও যেমন আমাদের ছিল, [illegible] তেমনি নিতান্ত আমাদেরই [illegible] একথা আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারিব না যতদিন না যাহা দান পাইয়াছি সেটাকে শ্রদ্ধা সহকারে লইতে শিখিব।

স্বল্পই হউক, অধিকই হউক, মহৎ হউক বা না হউক পূর্ব্বপুরুষের শিল্পসম্ভার অসঙ্কোচে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ আমাদের করিতেই হইবে এবং সেইটাই আমাদের পক্ষে শ্রেয়। আর সেটাতে বীতশ্রদ্ধ হইয়া ধারের মাল আত্মসাৎ করিয়া নিজেকে ইউরোপীয় শিল্পীর সমকক্ষ বলিয়া যতই প্রচার করি না কেন তাহাতে দিন দিন নিজেকে হেয় তো করিবই উপরন্তু অসত্যবাদীর নরকের দিকেই অগ্রসর হইব।

শিল্পী বলিয়া আজও যে ভারতবাসীর খ্যাতি আছে সেটা কি আমাদের ওই ধারকরা মালের অধিকারিত্বের বলে না আবহমানকাল সে শিল্প এখনও ধরিয়া আছি তাহারি ফলে ?

সামান্য স্বর্ণকার কুম্ভকার হইতে দেবতার দ্বারে বসিয়া যাহারা পট লিখিতেছে তাহারাই ভারতশিল্পকে যথার্থ আশ্রয় করিয়া আছে এবং তাহারাই আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র, পিতৃপুরুষের শিল্পকে যাহারা প্রত্যাখ্যান করিয়া চলিয়াছে তাহারা নয় ; হরির নামে যাহাদের হরিভক্তি উড়িয়া যায় তাহারা নয়।

দেশের স্বর্ণকার এবং কুম্ভকারগণকে আমি অযথা বাড়াইতে চাহিয়েছি এবং কালীঘাট ও জগন্নাথের পটুয়া সকলকে বিজাতীয় ধরণে শিক্ষিত পেন্টারগণের উচ্চে স্থান দিতেছি বলিয়া অনেকে সচকিত হইয়া উঠিবেন, কিন্তু স্বধর্ম্মের উপরে অটল নির্ভর যদি আমাদের কাছে শ্লাঘনীয় হয় তবে স্বশিল্পে যাহারা এখনও নির্ভর করিতেছে তাহারাই বা আমাদের শ্রদ্ধা কেননা আকর্ষণ করিবে।

চন্দ্র সূর্য্যের আকার, আকাশের নীলিমা পৃথিবীর শ্যাম আভা আগেও যেমনটি আজিও তেমনিটি, কুম্ভকারের ঘট, স্বর্ণকারের অলঙ্কার, পটুয়ার পট আর্য্যসভ্যতার প্রথম যুগেও যেমন আজিও ঠিক তেমনটি এটা যখন আমরা হৃদয়ঙ্গম করি তখন বিশ্বশিল্পের সঙ্গে একসূত্রে গাঁথিয়া যাহারা পুরাকালের স্মৃতি, বিরাট প্রাচ্যসভ্যতার শিল্পনিদর্শন অপরিবর্ত্তিত আকারে এখনও আমাদের গৃহে গৃহে অম্লান মালিকার মত বিতরণ করিতেছে তাহাদের শ্রদ্ধা না করা অসম্ভব। চিরপুরাতন বিশ্ব-জগতের মত চিরপুরাতন আমাদের শিল্প চিরনবীনতার আধার।

যেরূপ ঘটে ঋষিকন্যারা জল আহরণ করিতেন, যেরূপ মৃৎপাত্রে সশিষ্য বুদ্ধদেব গৃহে গৃহে আতিথ্য সৎকার গ্রহণ করিতেন, যেরূপ অলঙ্কার সতীর অঙ্গে শোভা পাইত, যেরূপ পট শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের অশ্রুজলে সিক্ত লক্ষকোটী ভক্তের করস্পর্শে পবিত্র ঠিক সেইরূপ ঘটে পটে অলঙ্কারে গৃহপরিপূর্ণ দেখিলে কার না আনন্দ হয়!

এই কুম্ভকার শিল্প সারনাথের স্তূপ, বাঙ্গালার প্রাচীন মন্দির সকলকে বিচিত্র ইষ্টকে ভূষিত করিয়াছে এই চিত্রশিল্প সমস্ত প্রাচ্যচিত্রের প্রাণস্বরূপ ছিল, এই স্বর্ণালঙ্কার ফিনিসিয়াতে আদর পাইত, গ্রীসের ঘরে ঘরে বিক্রয় হইত! পরের পুঁজিয়া আর্টস্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়া, জুয়েলার সপ্ চালাইয়া শিল্পে নবস্রোত আনিবার ছলে এইগুলার উচ্ছেদ সাধনই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়াই কি স্থির করিতেছি!

কালের স্রোতে শিল্পে পরিবর্ত্তন ঘটিবেই কিন্তু সেই সঙ্গে পরিবর্জ্জনও ঘটিতে দিতে হইবে এমন কি কথা আছে? নবস্রোতকে আসিতে দিতে আপত্তি নাই কিন্তু সেটাকে শিল্পের যে অংশে অনুর্ব্বর বাঁধ বাঁধিয়া খাল কাটিয়া তাহার দিকে চালাইয়া দেওয়াই বুদ্ধিমানের কায, কিন্তু তাহা না করিয়া অবাধ গতিতে সেটাকে প্রাচীন কীর্ত্তি ও উর্ব্বর খণ্ড সকলের উপর প্রচণ্ডবেগে বহিতে দিয়া শিল্পে দ্বিতীয় প্রলয় প্লাবনের সৃষ্টি করিলে শিল্পবিষয়ে নির্ব্বুদ্ধিতার খ্যাতি চিরদিনের জন্য রাখিয়া যাইব যে!

জীর্ণ বাস্তুকে যে দৃঢ় করিয়া বর্ত্তমান রাখে সে কুলপাবন, যে দায়ে পড়িয়া বাস্তুকে রক্ষা করিতে অক্ষম হয় সে কৃপাপাত্র আর যে কুলাঙ্গার দুর্ব্বুদ্ধি কৃপণ স্ব-ইচ্ছায় নিজ ভিটা ধ্বংসের মুখে দেয় সে নরাধমের নরকেও যে স্থান নাই।

শিল্পবিষয়ে ঘোরতর ঔদাসিন্য যে আমাদের একদিন পশুরও অধম করিয়া আদিম অসভ্যদিগের সহিত একসূত্রে গাঁথিয়া দিবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

যে সাহেবী রুচি দেশের শিল্প হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রাখিয়াছে তাহাকে আমি ভয় করি না এবং তাহার দ্বারা দেশীয় শিল্পের সুগতি না হউক দুর্গতিরও তত সম্ভাবনা দেখি না। কিন্তু যে দুর্ব্বুদ্ধি স্বদেশে উৎপন্ন হইতেছে মাত্র এই দাবিতে বিলাতির নকলে এবং পাশ্চাত্য শিল্পের সস্তা ও কুৎসিত সংস্করণে আমাদের ঘর ভরিয়া দিয়া আমাদের শিল্পীকুলকে দুর্ভিক্ষের তাড়নে কলের কুলিগিরি স্বীকার করাইতেছে, বাণিজ্যে প্রতিযোগিতার কূট বাহির করিয়া লৌহযন্ত্রে আমাদের পেষণ

করিয়া কর্ম্মে আনন্দ ও জীবনের গৌরব হইতে আমাদের বঞ্চিত করিতেছে এবং শিল্পীর সিংহাসন হইতে আমাদের নামাইয়া কুলিবাজারে বাসা দিবার বন্দোবস্ত করিতেছে মৃত্যুকালীন সেই দুর্ব্বুদ্ধিকে আমি ভয় করি।

এই দুষ্টবুদ্ধি ভিতরে ভিতরে কি নিঃশব্দে ভারতশিল্পের ভিত্তিতল শিথিল করিয়া দিতেছে দেখাই। কলিকাতা সহরে দেশীয় লোকের দ্বারা চালিত অনেকগুলি লিথোগ্রাফারের দোকান আছে। ইহারা থিয়েটারের প্লাকার্ড হেয়ার অয়েল ইত্যাদির লেবেল্ ও নানা বাজারে কায লইয়া দিন গুজরান করিতেছিল। ঠিক বলিতে পারি না আজকাল এই ছাপাখানাগুলির মধ্যে কোন্‌গুলি ভারতের একটি বিশেষ শিল্পের দিকে সুদৃষ্টিপাত করিয়া মন্দিরের দ্বারে দ্বারে লিথো কালিতে মুদ্রিত দেবদেবীর পট বিক্রয় সুরু করিয়া দিয়াছে, এই সকল পট হাতে-লেখা পটের সস্তা ও কুৎসিত অনুকরণ ; কোন নূতনত্ব নাই; সস্তা এবং সস্তার তিন অবস্থাই সেগুলির একমাত্র গুণ।

আপনারা সকলই জানেন যে ছোট বড় সমস্ত তীর্থস্থানেই হাতে পট লিখিয়া ১০।১২ হইতে ১০০।১০০০ ঘর পটুয়া আবহমানকাল [illegible] জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছে। [illegible] অল্পমূল্যে এই পটগুলি বিক্রয় [illegible] জন্য দেবতার দ্বারে আসিয়া তাহারা [illegible] থাকে, আজ কালের প্রতিযোগিতায় [illegible] দেবতার দ্বারে যাত্রিগণের ভক্তির [illegible] বঞ্চিত হইয়া তাহারা দিনের পর দিন [illegible] মুখে হতাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতেছে। এই [illegible] নিয়মের অভিশাপ কি আমাদের কোন দিন স্পর্শ করিবে না! ইহারা আমাদের ভারত চিত্রশিল্পের উৎকৃষ্ট আদর্শ দিতেছিল না সত্য কিন্তু পটপ্রস্তুত প্রণালী, বর্ণ ও রেখা-সন্নিবেশ প্রথায় তাহারা আবহমানকাল প্রাচীন শিল্পের সুনিয়মগুলি সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছিল, আমাদের শিল্পচর্চ্চাকালে, পটুয়াগণের এই রক্ষণশীল বৃত্তি যে কতটা সুযোগের সামগ্রী তাহা বলিতে হইবে কি ?

"আভোগং পূর্ণচন্দ্রস্য প্রতিপৎকলয়া যথা" ভারতশিল্পের পূর্ণমূর্ত্তি এই সকল কলামাত্রা-বিশিষ্ট শিল্প দিয়াই যে আমাদের হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে!

এই সকল শিল্পী আজ যদি চিরদিনের পেশা ছাড়িয়া বি এ, এম্ এ, পাশ করিয়া সভা হইতে গিয়া অর্থ চাহিতে গিয়া ভারত শিল্পের পুনরুদ্ধারের পথ চিরদিনের মত বিলুপ্ত করিয়া দেয়, তবে সে পাপ তাহাদের নয় ; দুর্ব্বুদ্ধি আমাদেরই। কলের ধূম ভারতশিল্পের শেষ চন্দ্রকলাকে লুপ্ত করিয়া যেদিন এ দেশে অন্ধকারের সৃজন করিবে সেদিন নরকের অন্ধকার হইতে আমরা অধিক দূরে থাকিব না।

আসমুদ্র ভারতবর্ষের ত্রিশকোটী নর-নারীর দৃষ্টিই যে বিপন্ন ভারতশিল্পের দিকে আকৃষ্ট হইতে হইবে এমন প্রয়োজন দেখি না কিন্তু অন্তত তিনজনকেও সেটা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে এবং সেই তিনজনকেই ঝটিকার মুখে বুকের আড়াল দিয়া দীপশিখার ন্যায় তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে। শিল্পীগণ যাহাদের হাতে শিল্পসামগ্রী সৃষ্টি করিবার ভার, এবং ধনীগণ যাহাদের উপরে সেই

সৃষ্টি রক্ষা করিবার ভার, এবং বণিকগণ যাহাদের হাতে এই শিল্পের প্রচার কি সংহার করিবার ভার—এই তিনজনের কাহারও যদি রক্ষণশীল বৃত্তির অভাব ঘটে তবেই সর্ব্বনাশ।

যাহাদের হাতে ভারতশিল্প সৃষ্টি করিবার ভার, তাহারা যদি গ্রীকশিল্প সৃষ্টি করিতে বসিয়া যায়, ভারতশিল্পকে রক্ষা করাই যাহাদের কায তাহারা যদি উপুড় হস্ত করিতে নারাজ হয়, আর যাহাদের হাতে মরণ বাঁচনের কাঠি তাহারা যদি মৃত্যু দণ্ডটাই উদ্যত রাখে তবে যে একটা সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড উপস্থিত হয় ইহাতে কি কোন সন্দেহ আছে! এই ত্রিমূর্ত্তি স্ব স্ব কার্য্যে বিমুখ হইলে প্রলয়ের বিলম্ব ঘটিবে না। শিল্পের বিপন্ন দশা সকল দেশে ঘটে এবং সকল দেশেই প্রতিকারের জন্য এই তিনজনই জাগ্রত থাকে। এই রক্ষণশীল বৃত্তি প্রহরীর কার্য্য করিয়া চলিলেই তবে মঙ্গল।

শিল্পবিষয়ে এই রক্ষণশীলতা আমরা যে হারাইয়াছি তাহার প্রমাণ পদে পদে পাইতেছি। আইন করিয়া এদেশের প্রাচীন কীর্ত্তি সকলকে রক্ষা করিতে হইল। ভারত শিল্পশালায় ভারতশিল্পেরই একাধিপত্য হওয়া প্রয়োজন কিনা এ কথা লইয়া তুমুল তর্ক চলিল ও এখনও চলিতেছে! বিংশ শতাব্দির ইতিহাসে আমাদের এই রুচি কলঙ্ক লক্ষ্মণসেনের পলায়ন কলঙ্কের মত একটা বিশেষ চিহ্ন রাখিয়া যাইবে যদি না শিল্পীর তুলিকা এই কলঙ্কের অঞ্জনকেই চিত্তরঞ্জন নবভাবে প্রকাশ করিয়া দেয়।

বিশ্বশিল্পী যিনি শ্মশানের পার্শ্বেই জীবনের স্রোত বহাইয়া সৃষ্টিকে স্থিতি এবং সংহারকে সংস্থান দিয়া থাকেন তাঁহার বিধানই সত্য বিধান এবং সকল বিষয়ে কল্যাণকর। আমাদের শাণিত বুদ্ধি খড়্গের মত ভারত শিল্পকে সংহার করিতেই উদ্যত রাখিব এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি অমৃতের তীর হইতে আমাদের দূরেই লইয়া যাইবে।

গ্রীক মূর্ত্তিগুলা যে সুন্দর তাহা বিশ্বাস করি এবং সেগুলা যে গ্রীক-শিল্পীরা প্রেম দিয়া ভক্তি দিয়া গড়িয়াছে তাহা ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মুখ হইতেই শুনি ও বিশ্বাস করি। Gods and goddesses the Greek carved because he loved them. কিন্তু সেইগুলাকে দশটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত কয়লার আঁচড় দিয়া বাঙালীর ছেলেরা কাপি করিলে যে এদেশে শিল্পের আবির্ভাব সত্বর ঘটিবে এ কথা কোনদিন কখন বিশ্বাস করিব না। কোন্ প্রেমের আবেগে গ্রীক শিল্পীর হাতের বাটালি শ্বেতমর্ম্মরের কোন্ স্থানে কেমন বেগে আঘাত করিয়া রেখায় রেখায় সৌন্দর্য্যকে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে তাহা ৫০ কেন ৫০০ বৎসর চেষ্টা করিলেও আমরা দখল করিতে পারিব কিনা, জানিনা কিন্তু এটা স্থির জানি, যে শক্তিটা ভারতশিল্পের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা আমাদের হৃদয়ে এখনও ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে; শ্রীচৈতন্যের প্রেমের সঙ্গীত এখনও হৃদয়ে তরঙ্গ তুলিতেছে, বুদ্ধের করুণা বাণী এখনও হৃদয় দ্রব করিতেছে, আর্য্যগণের দেবলোক এখনও আমাদের কাছে অদৃশ্য হয় নাই। যে ভাবের বন্ধন প্রাচ্য শিল্পের সহিত সহস্র নাড়ির বন্ধনে আমাদের যুক্ত রাখিয়াছে

সেই যোগ-সূত্র ছিন্ন করিলে কক্ষচ্যুত গ্রহের মত সর্ব্বনাশের দিকেই আমরা নিপাত লাভ করিব ; গ্রীসের নন্দন কুঞ্জের দিকে এক পাও অগ্রসর হইব না।

"বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং" যাইবার সাধ্য আমাদের কোথায় ? বৃন্দাবন আজ শ্রীহীন ঠেকিতেছে শুধু শ্রীপতির চরণ চিহ্ন চোখে পড়িতেছে না বলিয়া। সেটা সেদিন পড়িবে সেদিন ;—

"বহৈববাম্বেঃ সমাযোগাৎ সর্ব্বমগ্নিময়ং ভবেৎ"

কুরূপ সুরূপ হইবে, সৌন্দর্য্যে সীমা পাইব না। দিবসের প্রায় অর্দ্ধ অংশ জীবনের প্রতিদিনের পাঁচ ঘণ্টাকাল বড় অল্প মূল্যবান নয়। সেই অমূল্য সময়টা আমাদের Art-School এর দুইশত দশের মধ্যে দুইশত দুই ছাত্র ম-মাষ্টার কিসের ধ্যানে অতিবাহিত করিতেছে প্রহরের পর প্রহর বহুদিন আমি সেটা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। যে স্থান দিয়া তাহারা সর্ব্বদা যাতায়াত করে তাহারই আশে পাশে সম্মুখে পশ্চাতে প্রাচীন প্রাচ্য শিল্পের সুন্দরতম নিদর্শনগুলি স্তরে স্তরে সজ্জিত রাখিয়াছি অথচ একদিনের জন্য সে গুলির দিকে কেহ চাহিয়া দেখিল এমন ঘটনা ঘটিতে দেখিলাম না ! যে সকল দেবমূর্ত্তি এক-দিন যাত্রীগণের নয়নানন্দ, ভক্তের হৃদয় মন্দিরে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁহারা আজ সমাট্টার ২০২ ... কৃপাদৃষ্টির আশায় Art-School এর ... আসিয়া বসিলেন, যে সকল চিত্র, ... ধাতুপাত্র বা গৃহসজ্জার মূল্য-... দেশের রাজা বাদশাহেরা এক একটা ... জনা ধরিয়া দিয়াছেন এবং যাহার ... পাইলে জগতের যে কোন শিল্প-শালা ধন্য হইয়া যায়, সেইগুলা আজ এই বাঙালী ছাত্রগণের পাঠাগারের প্রাচীরতল সুবর্ণের জ্যোতি এবং বর্ণের ছটায় চিত্র বিচিত্র করিয়া তুলিল অথচ দিনের পর দিন বৎসরের পর বৎসর তাহাদের কোন সম্মান এমন কি কটাক্ষপাত পর্য্যন্ত লাভ হইতে দেখিলাম না। কোন্ দুঃসাধ্য ব্যাধি আমাদের মর্ম্মে মর্ম্মে জীর্ণ করিয়া করিয়া হৃদয়তন্ত্রী এমন অসাড় করিয়া দিয়াছে যে আনন্দের স্পর্শে তাহাতে আর ঝঙ্কার উঠে না ? এ রোগের ঔষধ কি ? এই যে "মোহামোহ নিমীলিতাঃ, "শ্বসন্নপি ন জীবতি" অবস্থা ইহার প্রতীকার কোনখানে ?

আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর তবে বলিব "একান্তি দৃঢ়া ভক্তি";—পাশ্চাত্য শিল্পের মোহ আকর্ষণ যেটাকে প্রাণের টান বলিয়া ভ্রম করিতেছি সেটা নয়, স্বশিল্পের প্রতি সেই সুদৃঢ় আকর্ষণ যাহা আমাদের বলায়—

"ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ণশঙ্কর
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রী নৈবাত্মা যথা ভবান।"

তুমি যেমন তেমন আর কেহ নয়।

আমি সম্প্রতি আমার কয়েক ছাত্রকে অজন্তা গুহায় বৌদ্ধ শিল্প চর্চ্চা করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলাম। তাহারা নূতন কিছু শিখিবে এই আশায় উৎসাহের সহিত যাত্রা করিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া তাহারা বলিতেছে আমরা নূতন তো কিছু দেখিলাম না ! সে সকল চিত্রাবলীর বর্ণবিন্যাস, রেখাপাত, হাবভাব সকলই তাহাদের চির-পরিচিতের মত বোধ হইল ! এটা আমিও প্রত্যাশা করি নাই। বাংলা ভাষা পড়িতে ও বুঝিতে বাঙালীর যেমন কোন কষ্ট হয় না

তেমনি সহস্র বৎসর পূর্ব্বেকার চিত্রাক্ষর তাহার ভাব ও ভাষা নবীন বাঙালীর কেমন করিয়া সহজে বোধগম্য হয়! এটা কি মন্ত্রের কার্য্য! গোড়া হইতে অক্ষর পরিচয় না ঘটিলে ভারত শিল্পের দেব ভাষার মর্ম্ম-গ্রহণ কোনকালেই সম্ভবপর হয় না, শুধু অক্ষর পরিচয় নয়, অর্থ গ্রহণ, ভাষা জ্ঞান, অলঙ্কার, ভাব প্রভৃতি লইয়া বিস্তর চর্চ্চার প্রয়োজন; এই সমস্তগুলা দখল করিয়া ছাত্রদের উপদেশ দিয়া যদি ভারতশিল্পের সহিত তাহাদের এই সহজ পরিচয় ঘটাইতে হইত তবে ছাত্রগণসহ হিমালয়ে গিয়া ষষ্ঠি সহস্র বৎসর পরমায়ুর জন্য তপস্যা ছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিল না। কত শত বৎসর পূর্ব্বে এই সকল অজন্তা চিত্র লিখিত হইয়াছে তাহার পরে কত প্রলয় কত পরিবর্ত্তন কত বিরুদ্ধ মনোভাব ও শিক্ষা প্রাচীন ভারতের শিল্পীগণের সহিত বিংশ-শতাব্দীর এই কয়জন বাঙ্গালী চিত্রকরকে বিচ্ছিন্ন রাখিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই, আবার এই চিত্রকর . কেমন? কেহ তিন বৎসর মাত্র ভারতশিল্প চর্চ্চা করিতেছে কেহ বা সাত আট মাসের অধিক নয়। ইহারা কেমন করিয়া বলে বৌদ্ধশিল্প আমাদের সম্পূর্ণ পরিচিত: গুরুর কাছে মিথ্যা বলিবে না বৃথা অহঙ্কার করিবে এমন ছাত্রও ইহারা নয়! তবে এ ঘটনা কিরূপে সম্ভব? কোন্ মন্ত্রবলে ইহারা দেশকাল অতিক্রম করিয়া প্রাচীন প্রাচ্য শিল্পকে পরিচিতের মত বোধ করিতেছে? সে মন্ত্র খুঁজিতে আমায় দেশ বিদেশে যাইতে হয় নাই, এই মন্ত্রে আমারও যেমন, ছাত্রদেরও তেমন আর দেশের জনসাধারণেরও তেমনি অধিকার, যাহা আমাদের ঋষিগণেরই দান, চিরদিনের ধন

"নমস্তস্মৈ ভক্তয়ে অচিন্ত্য শক্তয়ে"

অচিন্ত্য শক্তি এই ভক্তিমন্ত্রের সাধন যতদিন আমাদের সম্পূর্ণ না হয় ততদিন ভারতশিল্প চর্চ্চা করিতে যাওয়া বৃথা। পাষাণে পতিত বীজ কবে অঙ্কুরিত হইয়াছে?

"যথা বীজং বিনা ক্ষেত্রং বন্ধ্যাং ধারা শতৈরপি
তথা ভক্তিঃ বিনা কর্ম্ম ব্যর্থং যত্ন শতৈরপি"।

শ্রীকৃষ্ণ একবার কোন ভক্তকে বিষ্ণু-মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু ভক্ত তাঁহার রামরূপের পক্ষপাতী সুতরাং প্রভু রামরূপ ধরিয়া তবে নিস্তার পাইলেন। তেমনি ভারতশিল্পের নবরূপ যদি আমরা দেখিতে চাহি তবে প্রথমেই আমাদের ভক্তি চাই। যেদিন আমরা শিল্পদেবতাকে ভক্তির জালে বাঁধিব সেদিন আমরা তাঁহাকে মনোমত রূপ ধরাইতে সক্ষম হইব। তখন আমরা জোর করিয়া বলিতে পারিব দেবতা তুমি আমাকে আমার মনোমত রূপে দর্শন দাও, তোমার প্রাচীন যুগের ও রূপ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ওই বর্ণকান্তি ভাব ভঙ্গি আমার মনে ধরে না, আমি তোমায় শ্যামসুন্দর না দেখিয়া নবসুন্দর দেখিতে চাহি। দেবতার উপরে এই জোর কেবল ভক্তিবলেই চলে। তর্কের দ্বারা বিচার বলে তাঁহাকে মনোমত রূপ ধরানো চলে না। তার্কিকের দম্ভে তিনি দৃক্‌পাতও করেন না, কিন্তু প্রেমিকের দাবি অন্যায় হইলেও তিনি সর্ব্বদা গ্রাহ্য করেন।

শ্রীঅবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

সাগর তীরে।

আমরা 'কুন্দ' ও 'কমলে'র দেশ ছাড়িয়া এখন 'কপালকুণ্ডলা'র দেশে আসিলাম। এখানে প্রতিপদে লতা গুল্ম অন্তরালে স্মিত-মুখী কুসুমের সন্ধান পাওয়া যায় না; তাহাদের স্থানে কণ্টকাকীর্ণ কেতকী। এখানে 'দখিণ-পবন' গুপ্ত বাসনার মত মৃদু আসে না, এখানকার বাতাস নির্ম্মম, কাপালিকের মত ভীষণ! সাগর 'অজাগর গরজে সদা ফুলিছে'। ইহা মরণের মত ভীষণ অথচ প্রশান্ত। কত নদী, কত জনপদ ধুইয়া কত মৃত্যু বহিয়া আনিতেছে; কত-কালের ধ্বংস সাগরগর্ভে সঞ্চিত হইতেছে। আবার সাগর গর্ভেই কত সৃষ্টি হইতেছে, মৃত্যুর সহিতই জীবন সংযুক্ত, দুই বুঝি একই; সন্ধ্যা ত উষার মতই মনোরম!

সম্মুখে, এত অনন্ত অতল জলরাশি থাকিতেও গ্রাম্য বধূগণ জল লইতে আসে না; তীরে স্বল্প হৃদয়া কূপেই তাহাদের সকল অভাব মিটে! অসীম ছাড়িয়া সসীমের প্রতি মানবের অধিক আগ্রহ।

সন্ধ্যার অন্ধকারে সাগর দেখিয়া সেই অতীতের প্রলয় দৃশ্য আমার মনে পড়িল। তখন আমাদের শ্রীমতী ধরা এরূপ জলে স্থলে বিভক্ত হন নাই। তখন আকাশ ঘন কালো মেঘে আচ্ছন্ন, পৃথিবী এক বিশাল লবণাক্ত জলে মগ্ন। চন্দ্রসূর্য্যের দেখা প্রায় পাওয়া যাইত না। মধ্যে মধ্যে আকাশের বিদ্যুৎ ও ভূগর্ভস্থ অগ্নি সেই ভীষণ আঁধার আলোকিত করিত। বায়ু ভীম প্রভঞ্জন, আবার আকাশ হইতে মুষলধারায় বৃষ্টি পড়িত। তাহার উপর ভূ-কম্পন! এমনি দুর্দ্দিনে জীবন প্রথম জন্ম লইল!—সে আজ কতকাল! তাহার পর কত যুগ-যুগান্তর ধরিয়া সেই জীবন মানুষ হইয়াছে। কিন্তু সে আর কতদূরে যাইবে—জীবন তরী কোথায় ভিড়িবে বলিয়া যাত্রা করিয়াছে—তাহা কে জানে? ইহাও কি নিরুদ্দেশ যাত্রা? ভাবিতে ভাবিতে বাসায় ফিরিলাম।

পরদিন অতি প্রত্যূষে আবার সাগর-তীরে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম পূর্ব্বদিগন্তে 'বধূর-নবলাজ-সম-রক্ত আভা ফুটিয়া উঠিতেছে। অপরিস্ফুট আলোকে আবৃত আর্দ্র-সাগরতট সে আলো প্রতিফলিত করিতেছে। সাগর জল শুভ্র-ফেণ সমন্বিত নীলাভ হরিৎবর্ণ; সাগর-সম্ভূত জলবাষ্প তাহার উপর এক কুয়াসার আবরণ দিয়াছে; বায়ু ও সাগর সূর্য্যোদয়ে নির্লিপ্ত,—তাহারা আপন কলকথায় ব্যস্ত।

রক্তাভা ক্রমে ক্রমে উজ্জ্বল হইয়া দিগন্ত গাঢ় রক্তিমবর্ণে উদ্ভাসিত করিল। লোহিতের ভিতর হইতে ক্রমশঃ পীতের আভা ফুটিয়া উঠিতেছে, রক্ত হইতে পীতের পরিণতি বড় সুন্দর বড় মনোহর ভাবে সম্পন্ন হইল। সাগর সেইরূপই কুয়াসা আবৃত নীলাম্বর। কেবল দিগন্তের ও তটের প্রতিফলিত আভা পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। আকাশে ধূমের মত মেঘসঞ্চার হইল। দিগন্ত এখন পীত, মেঘ এখন ধূসর, জল নীলমাখা হরিৎ, আর্দ্র বেলা আকাশের আলোক শতগুণ

প্রতিফলিত করিতেছে। পশ্চিম দিগন্ত এখনও শ্বেত-কুয়াসায় আবৃত, এখনও সুপ্ত। বিশ্লেষিত 'সূর্য্য লেখার' বর্ণগুলি এখন আকাশে ও বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। ধূসর মেঘ সরাইয়া সূর্য্য ধীর গম্ভীর মৃদুগতিতে জগতে প্রকাশ হইলেন। তখন সেই আদি জনক জননী সবিতা ও নীলসলিলাকে প্রণাম করিয়া ঘরে ফিরিলাম।

শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, বি, এ।

পোষ্যপুত্র। পূর্ব্বের অনুবৃত্তি।

২৪

সেই ক্ষণিক স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া নীরদকুমারই প্রথমে কথা কহিল। প্রফুল্লমুখে আগ্রহের সঙ্গে দেশের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, কথা প্রসঙ্গে শান্তির বিবাহের কথা আসিয়া পড়িল। যোগেন্দ্র বলিল "শান্তির স্বামী খুব সুন্দর হয়েছে, আর বিয়েতে সমারোহ যতোদূর হতে পারে তা হয়েছিল, গহনা এতো দিয়েছে যে পিশেমশাই দেখেই চটে গেছেন, তিনি বলেন ওগুলো অনর্থক অপব্যয়। তা এ কথাটা আমিও মানি, তুমি এতো সংস্কার করছো ঐ জিনিষটার সংস্কার করতে পারো তবে বলি বাহাদুর।" বলিয়া স্তব্ধ নীরদের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল। নীরদ হাসিল না, সে স্তব্ধ হইয়াই বসিয়া রহিল। যোগেন উৎসাহের সহিত বলিয়া যাইতে লাগিল, "যাহোক হেম ছেলে মন্দ নয়, চালটা একটু বড়লোকের মতন অহঙ্কেরে; তাহোক শান্তি অসুখী হ'বেন। বিশেষ শ্বশুরের যা ভালবাসা সে পেয়েছে! আহা শ্যামাকান্ত বেচারা বড় কষ্ট পেয়ে এতোদিনে একটু সুখী হলো! লক্ষ্মীছাড়া বিনোদটা কি আহাম্মুকি করলে, কার আর ক্ষতি হলো নিজেই এমন রাজ ঐশ্বর্য্যে বঞ্চিত হলেন মাত্র। বাপ পর্য্যন্ত তার নাম মুখে আনেনা অন্যের কথা কি! তা নীরদ! এ সব দেখে অদৃষ্ট মানতে হয় ভাই। হেমের কপালটা কিন্তু খুব'—

গভীর একটা দীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দে যোগেন্দ্র সজাগ হইয়া দেখিল নীরদকুমার দুই করতলের মধ্যে মুখ লুকাইয়া ফেলিয়া একটা দারুণ যন্ত্রণাকে যেন সবলে হৃদয়ের মধ্যে চাপিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। যোগেন্দ্র তাহার পিঠে হাত দিয়া ডাকিল, তাহার মাথাটা নিজের কাঁধের উপর সযত্নে রাখিয়া ছোট ভাইটির মতন দুই হাতে কাছে টানিয়া ঈষৎ অনুযোগের সুরে কহিল "শরীরটাকে একেবারেই মাটি করে ফেলচ, একি ছেলেমানুষি!"

নীরদ ক্লান্তভাবে চোক মুছিয়া আবার একটা নিশ্বাস ফেলিল "আঃ যোগেন!" "বলোনা নীরদ, তোমার মনে একটা কি হয়েছে, আমায় কেন লুকুচ্চো ভাই।"

নীরদকুমার হঠাৎ সোজা হইয়া বসিয়া উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, "নিশ্চয়ই একটা কিছু হয়েছে বই কি। কিন্তু সেটা আমি আপাততঃ তোমার কাছে প্রকাশ করছিনা। আসল কথা হচ্চে ভাই তোমাকেও এবার থেকে একটু সংযত হতে হচ্চে—"

"ওরে বাপরে তবেই আমি গেছি! আচ্ছা আগে চা' টা খেয়ে নিয়ে মাথাটা একটু

সাফ্ করে ফেলাযাক্; তার পর প্রচার মশাই তোমার বক্তৃতা শোনা যাবে।" নীরদ মাথা নাড়িয়া মৃদু হাসিল। "সে পাঠ উঠিয়ে দিয়েছি. চা পাচ্চো না"। যোগেন্দ্র ইহা শুনিয়া এমনি চোখ বিস্তার করিয়া চাহিল যে, এমন অদ্ভুত কথা জীবনে সে যেন এই প্রথম শুনিল। 'বলোকিহে! তুমি যে আমায় একেবারে অবাক করে দিলে। চা খেলে কি সাধুত্বও ভাল জমবেনা না কি?"

"তা কেন? তবে ও জিনিষটার অভ্যাসটা 'অনাবশ্যক' বিদেশী।" যোগেন এবার আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিল না; চটিয়া বলিল "অত বাড়াবাড়ি করতে যেও না। অতোটা সহ্যও হবে না লোকেও ভণ্ড বল্‌বে। স্বাস্থ্য হানি করেও চিরকেলে অভ্যাসগুলো গোঁড়ামির জন্যে ত্যাগ করবে?"

নীরদ সংযতভাবে উত্তর করিল "না বিদেশী বলে কোন ভাল অভ্যাস ছাড়তে আমি কোনদিন বল্‌বো না বরং কিছু কিছু ধরতে বল্‌তে চাই। এটা ঠিক ভাল অভ্যাস নয় অজীর্ণ রোগী বাঙ্গালীর পক্ষে 'চা-টা' ঠিক খাটেনা। ওটা ঔষধের মতন ব্যবহারের জন্য রাখলে বরং তারচেয়ে উপকারে লাগে। অনেকগুলো জিনিষ আছে যা আমরা অনুকরণপ্রিয় স্বভাবের বশেই চাই তার ফলাফলটা ভেবেও দেখি না। শীতপ্রধান দেশের লোকের সহিত একই ভাবে শরীর পালন করতে গেলে তাকে ঠিক পালন করা বলা যায় না।"

যুক্তিটা যদিও যোগেন্দ্রের ঠিক মনে লাগিল না তথাপি সে অভ্যাসানুযায়ী বন্ধুর গোঁড়া মতবাদের বিরুদ্ধে আর তর্ক করিল না। সেদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণে কদলীপত্রে নিরামিষ ভোজন মুখরোচক না হইলেও নিগূঢ় অভিমানে এমনি আগ্রহের সহিত সে সমুদয় চাটিয়া খাইল যে নীরদকে বিপন্নভাবে বলিতে হইল তাইতো যোগেন যে ভাত কম পড়্‌লো! আর যে নেই বল্‌ছে! তাইতো করা যায় কি?"

২৫

সেদিন যখন খুব ঘটা করিয়া মেঘ করিল, এবং দেখিতে দেখিতে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া গেল, তখনো পর্য্যন্ত শান্তি তাহার শয়নগৃহের দক্ষিণধারের জানালার নিকট লৌহ গরাদে ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, বৃষ্টির সহিত অল্প ঝড়ও ছিল, গাছগুলার উচ্চ মস্তক বাতাসে নুইয়া নুইয়া পড়িতেছিল, এবং প্রথমে মুক্তাবিন্দুর মতন বৃষ্টি বিন্দু তারপর জলের ঝাট, জানলার মধ্য দিয়া শান্তির গায়ে আসিয়া লাগিতেছিল।

বৃষ্টির একঘেয়ে পতনশব্দ শুনিতে শুনিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া অন্য একটা জানালার ধারে হেমেন্দ্রও বহুক্ষণ হইতে শান্তির মত দাঁড়াইয়া ছিল। আজকাল সিদ্ধেশ্বরীই বাড়ীর একরকম সর্ব্বেসর্ব্বা। বাড়ীর সকলেই প্রায় তাঁহাকে মানিয়া চলে—এবং স্পষ্ট করিয়া নাহোক সকলকারই কথার ভঙ্গিতে হেমেন্দ্র ও শান্তির প্রতি অল্প বিস্তর তাচ্ছিল্য প্রকাশ পায়। হেমেন্দ্রের আচরণে কেহই তো বিশেষ সন্তুষ্ট ছিল না এখন সুযোগ ছাড়িবে কেন? হেমেন্দ্রও সে সমস্ত অপমানের শোধ তাহার পালক পিতার উপর তুলিতে ছাড়ে না তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু আজ আর সুধু দূরে দাঁড়াইয়া শরক্ষেপ চলিল না, সিদ্ধেশ্বরী ও তাঁহার বৈবাহিকদলের

একটা কঠোর রকম মন্তব্য তাহার উষ্ণ মস্তিষ্কের মধ্যে তীব্র দাহ দ্বিগুণিত করিয়া তুলিল। তৎক্ষণাৎ সে শ্যামাকান্তকে গিয়া বলিল 'ওই মাগী দুটোকে তাড়াবেন কিনা ?' শ্যামাকান্ত শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন "সেকি ?" "কোথাকার ছোটলোক মেয়েমানুষ দুটোকে বাড়িতে এনেছেন, ওরা যদি থাকে তাহলে আমরা থাক্‌বো না ব'লে দিচ্ছি"। "হেম, ও যে বিনুর বউ"—আমার পুত্রবধূ। তোমরা দুই ভাই যদি একত্র হতে সে আরো সুখের হতোনা ?" হেমেন্দ্র চীৎকার করিয়া উঠিল "ক্ষেপেছেন, ও বৃন্দাবনের বদমাইস গুণ্ডার দলের মাগী, সব ওর জাল, ওকে আত্মীয় বলে স্বীকার করলেও নিজেকে অপমান করা হয়! কোন কথা আমি শুনতে চাই না, আপনি ওদের দুটোকে বিদায় কর্ব্বেন কিনা ?"

শ্যামাকান্ত যন্ত্রণাব্যঞ্জক ধ্বনি করিয়া উঠিলেন, "তারা!" "হেমেন্দ্র আবার সক্রোধে প্রশ্ন করিল "বিদায় কর্ব্বেন কিনা ?" "অসঙ্গত কথা বলোনা, হেম—" "বিদায় কর্ব্বেন কিনা ?" "কেমন করে তা করবো ?" "তবে ওদেরি নিয়ে থাকুন, কিন্তু আমার আপনি যে সর্ব্বনাশ করেছেন তা আমি সইবো না, দেখি আইন আমায় ঠকায় কিনা!" শ্যামাকান্ত মর্ম্মাহত হইয়া কাতরকণ্ঠে বাধা দিলেন "অমন কথা বলিস্‌নি হেম, তোকে আমি ঠকাবো ? আমার কে আছে।" কঠোর বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ হাসি হেমেন্দ্রের মুখে ফুটিয়া উঠিল! "আমি সব বুঝেছি"!

শান্তির ঘরে আসিয়া হেম দেখিল শান্তি একাই আছে, মনটা একটু প্রসন্ন হইল। শান্তি হঠাৎ স্বামীকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া উঠিয়া আসিল। জোর করিয়া প্রফুল্লতা দেখাইয়া কিছু একটা বলিয়া তাহাকে ভুলাইয়া দিবার জন্য তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিল "গবর্মেণ্ট জ্যেঠামশাইকে নাকি রাজা উপাধি দিতে চেয়েছে?"

"হুঁ। কিন্তু রাজপুরীটা আপাততঃ ত্যাগ করে যেতে হচ্চে ? তবে শোন ওই পাপিষ্ঠ স্ত্রীলোকের সঙ্গে একবাড়ীর বাতাস আমি গায়ে লাগতে দেবোনা, আমরা আজি এখান থেকে যাবো।" শান্তি সজোরে জানলার একটা গরাদে চাপিয়া ধরিল, হেমেন্দ্র চলিয়া গেল।

খানিকক্ষণ পরে যখন হেমেন্দ্র শান্তির কাছে ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি স্থির করলে শান্তি ?" তখন আকস্মিক মৌনভঙ্গে শান্তি চমকিয়া উঠিল। ম্লান মুখ ফিরাইয়া সকরুণনেত্রে স্বামীর দিকে চাহিল। "আমায় এখান থেকে যেতে বলোনা, আমি এবাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে পারবো না।"

"বাপের বাড়ী ?" একমুহূর্ত্ত পরে সে হতাশ ভাবে ঘাড় নাড়িল "বাবাতো বলেন নি! জ্যেঠামশাই—" "থামো আমায় রাগিও না, এই অপমান সহ্য করে এইখানে দাসী চাকরের মতন পড়ে থাকতে হবে ? তোমার লজ্জা করে না ? একটা আত্মসম্মান বোধ নাই ?"

"জ্যেঠামশাইতো আমাদের ভালবাসেন, দিদিতো কিছু বলেনি। তাও যদি হয় সেও আমাদের সহ্য করতে চেষ্টা করা উচিত। তাঁরা যে গুরুলোক।" হেমেন্দ্র ভূমে পদাঘাত করিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল "রেখে দাও তোমার লজিক। তুমি না যাও থাকো, আমি চল্লুম।

না তোমাকেও যেতে হবে তুমি আমার স্ত্রী আমার আদেশ পালনে তুমি সম্পূর্ণ বাধ্য। আমার হুকুম তোমার এখান থেকে সন্ধ্যার সময়েই যেতে হবে। প্রস্তুত হয়ে থেকো।”—“আজ্ঞি, এখনি? আমায় একটু সময় দাও, জ্যেঠামশাইকে একবার? জ্যেঠামশাই তোমায় রক্ষা করতে পার্ব্বেন না, সে চেষ্টা করতে যেও না, মিথ্যা তাতে অনর্থ বাড়াবে, এ জেনে রেখো! এবাড়ির সঙ্গে আমাদের দেনাপাওনা মিটে গ্যাছে। না, আমি আর কিছু শুন্‌তে চাইনা।”—শান্তিকে কথা কহিবার অবকাশ মাত্র না দিয়া সে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল। সন্ধ্যা না হইলেও মেঘান্ধকার ঘেরা বারান্দা ইহারি মধ্যে ঘনায়মান হইয়া আসিয়াছিল, খোলা জানলাটার ঠিক বাহিরে ছাদের নলের মধ্য দিয়া মোটা একটা স্ফটিক ধারার মতন বৃষ্টির জল পড়িতেছিল। ড্রেনের মধ্য দিয়া কলকল শব্দে সেই জল ছুটিয়া চলিয়াছে, বৃষ্টির আর শেষ নাই। হেমেন্দ্র সম্মুখেই এক অপরিচিতা রমণী মূর্ত্তি দেখিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল, সে জানালার দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া তাহার ঘরের সম্মুখেই দাঁড়াইয়া ছিল।

কিন্তু সম্মুখবর্ত্তিনী সে সুযোগ দিল না, [illegible]চিতভাবে তাহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল; [illegible]স্বরে কহিল “ঠাকুরপো একটু দাঁড়াও একটা [illegible] আছে।” অচেনা স্ত্রীলোকের এই সঙ্কোচহীন [illegible] হেমেন্দ্রকে ঈষৎ বিস্মিত করিল। এই [illegible] বিদ্যুৎ তীক্ষ্ণ, অভেদ্য অথচ অচঞ্চলদৃষ্টি [illegible] নিকট সম্পূর্ণ নূতন নূতন ঠেকিল। [illegible] আন্দাজে সে এই ঠাকুরপো সম্বোধন [illegible] চিনিয়াছিল তথাপি আকস্মিক একটা কৌতূহলপূর্ণ বিস্ময়ে তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল “কে?” রমণী তাহার কৃষ্ণতারকোজ্জ্বল বিশালনেত্র নির্ভীকভাবে প্রশ্নকারীর মুখে স্থাপন করিয়া ধীর অথচ সদৃঢ়স্বরে উত্তর করিল “আমি অমু’র-মা, তোমার বড় ভাজ! শুন্‌লেম তুমি আমার সঙ্গে একবাড়িতে থাকতে ইচ্ছা করোনা, সত্য কি? তা যদি হয় তবে তুমি যেওনা, বলো আমিই আমার সেই বনবাসে ফিরে যাই।” হেমেন্দ্রের ললাট হইতে কর্ণমূল পর্য্যন্ত সমুদয় মুখখানা অপরাহ্নের পশ্চিমাকাশের মতন আরক্ত হইয়া উঠিল, তীক্ষ্ণ শ্লেষপূর্ণ বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া সে বলিয়া উঠিল “আপনার এ অভিনয় খুব চমৎকার হচ্ছে, কিন্তু আমার কাছে এসব কেন? নির্ব্বোধ শান্তিকে মুগ্ধ করে রেখেছেন সেই ভাল।”

হেমেন্দ্র চাহিয়া দেখিল না;—সেই মুহূর্ত্তে ঘন মেঘের মধ্য দিয়া অশনিভরা বিদ্যুৎ করালিনীর লোলজিহ্বা বিকম্পিত হইয়া উঠিল, শিবানীর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মুখে তাহার ছায়াপাত হইল। সে আজ অনেক কথা ভাবিয়া অনেকখানি গড়িয়া লইয়া তবে হেমেন্দ্রের সম্মুখীন হইয়াছিল। শিবানীর পক্ষে সহসা একজন অজানা লোকের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ান যে কতোখানি কঠিন ব্যাপার তাহা বোধ হয় বলিবার আবশ্যক করেনা। কিন্তু প্রয়োজন হইলে নিজের দুর্ব্বলতাকে ঠেকাইয়া রাখাও তাহার পক্ষে তেমনি সহজ। সে দেখিল এমন করিয়া দূরে দাঁড়াইয়া থাকিলে আর চলে না, যে অভিনয় চলিতেছে ইহার মধ্যে আসিয়া না দাঁড়াইলে শেষে হয়তো ইহা করুণ রসাত্মক হইয়া দাঁড়াইবে।

নিঃসঙ্কোচে নিজের কর্ত্তব্যভার মাথায় তুলিয়া লইল। সে কেন পরের সুখে ব্যাঘাত দিতে আসে? কে সে? সে একজন অবমানিত অনাদৃতা, পরিত্যক্তাস্ত্রী; কেন সে পরের অধিকৃত সিংহাসন জোর করিয়া কাড়িয়া লইবে? কেন লোক মনে করিতেছে তাহাতেই সে একেবারে বর্ত্তাইয়া যাইবে! কিসের এ অধিকার? কে চায় এ অধিকার? সে ইহাকে ঘৃণা করে। কেন করে? এই ঐশ্বর্য্যের জ্বালা তাহার অপমানিত হৃদয়কে দ্বিগুণ নিপীড়িত করিতেছিল! সে দরিদ্র তাই তো এত অবহেলা! সে কেন তাঁহার যোগ্য হয় নাই? অথবা তিনি কেন দরিদ্র হইলেন না? যে সমস্ত বন্ধন তাহাদের দুই ভিন্নগামী হৃদয়কে এক হইতে দেয় নাই তাহাদের প্রতি তাহার একটা তীব্র বিদ্বেষ তাহার চিত্তকে দিনরাত খরধার ক্ষুরের মতন কাটিয়া কাটিয়া তুলিতেছিল, ইহাদের মধ্য হইতে তাহার সেই শান্তি কুটিরে পলায়ন করিতে পারিলে সে যেন বাঁচে। কিন্তু শান্তিকে ছাড়িতেও আর মন চায় না।

হেমেন্দ্রের কথায় কিন্তু শিবানী রাগ করিল না। সহিষ্ণুতার সহিত অপমানকে স্নেহোপহারের মতন নীরবে গ্রহণ করিয়া প্রসন্ন মুখে কহিল "তুমি রাগ করোনা ঠাকুরপো! ঠিক তোমায় হয়ত আমি আমার সব কথা বুঝিয়ে বলতে পার্ব্বোনা, কিন্তু যেটা আসল কথা সেইটেই বলছি। বাস্তবিকই তো আমি তোমার অংশীদার হতে পারিনা। আমি কে? তবে অমু! আগে সে মানুষই হোক, তার কথা এখন ছেড়ে দাও। সত্য করে আমি বলছি এখানের একটি কুটিতেও আমার অধিকার নেই। এ সব শান্তির। তোমরা কিসের দুঃখে যেতে যাও? আমার জন্য?" শিবানী তীব্র বিষাদের উথলিত অশ্রু জোর করিয়া বক্ষে মথিত করিয়া ফেলিয়া দুঃখের হাসি হাসিল "আমার জন্য যাবে কেন? বরং আমারি কিছু ব্যবস্থা করে দাও, তোমাদের সংসারে দাসীর মতন যদি রাখো শান্তির জন্য বোধ হয় এখন তাও আমি পারি, কে জানে কেনই আমি তাকে এতো ভালবাসি।" আবেগের মুখে আত্মদমন করিতে না পারিয়া সহসা শিবানী নিজের দুর্ব্বলতায় নিজেই লজ্জানুভব করিল। কিন্তু প্রকাশের যে একটি বিমল আনন্দ তাহাতে সেই মুহূর্ত্তে তাহার মনটা যেন কুয়াসার আবরণ কাটিয়া নির্ম্মল আকাশের মতন লঘু হইয়া আসিল। নিজেকে জয়ী বোধ করিয়া সে ঈষৎ গর্ব্বোৎফুল্ল মুখ ফিরাইয়া পরাজিতের দিকে তাকাইল। বিশ্ব রহস্যের একটি রহস্যদ্বার আজ যে উদ্ঘাটিত হইয়া গেল, ইহার মধ্য হইতে কি আলো, কি আনন্দ সম্মুখে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এ লুকান নির্ঝর আজ যেন তপ্ত মরু বালুকাকে শীতল করিয়া দিল। কিন্তু শিবানীর সেই অনবনত হৃদয় আজ তাহার দুষ্কর্ম্মের পুরাতন অভিশাপ দণ্ড ভোগ করিবার জন্যই এই অস্থানে নত হইয়াছিল। হেমেন্দ্র ক্রূর নিষ্ঠুর শ্লেষের সহিত তাহাকে আক্রমণ করিল "শান্তির প্রতি আপনার অশেষ দয়া কিন্তু সে দয়া সে ঘৃণা করে! তার জন্য আর নিজেকে উৎকণ্ঠিত করিবেন না; আপনাদের দয়ার মধ্য থেকে সে এখনি

চলে যাচ্ছে।” আচম্‌কা পিছন হইতে কেহ লাঠির দ্বারা আঘাত করিলে আহত যেমন বিস্ময়ে অস্ফুট গর্জ্জনে একমুহূর্ত্ত পরে আঘাতকারীর পানে তীব্র রোষে ফিরিয়া দাঁড়ায় আঘাত প্রাপ্ত শিবানী তেমনি করিয়া হেমেন্দ্রের প্রতি ফিরিল, “মিথ্যাবাদী তার অপমান করোনা।”

হেমেন্দ্রের মুখখানাও ক্রোধে পাংশু হইয়া গেল, উচ্চকণ্ঠে তীব্র হাসি হাসিয়া সে বলিল “ঘরে এমন চমৎকার অ্যাক্‌ট্রেস থাকতে থিয়েটার কেন আনিয়ে ছিলুম। এমন সুন্দর অ্যাকটিং আমিতো আর কখনো দেখিনি! কদিন তো কপালকুণ্ডলা, ভাওয়ালব্যাপারের অভিনয় দেখা গেল, আজ এটা কোন নাটকের অভিনয় হচ্চে বৌ-ঠাকুরুণ!” শিবানীর সমস্ত শরীরের রক্ত অপমানের রুদ্ধ রোষে টগ বগ্‌ করিয়া উঠিল। সে আর একটি মাত্র কথা না বলিয়া অকস্মাৎ দ্রুতপদে পাশের একটা খোলা দ্বারের দিকে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

হেমেন্দ্রও আর সেখানে দাঁড়াইল না, সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল। শিবানীকে যে দু-একটা কড়া কড়া কথা শুনাইয়া দিতে পারিয়াছে ইহা মনে করিয়াও হেমেন্দ্রের মনটা কতক ঠাণ্ডা হইয়া আসিল। যাহার কথা মনে করিলেও হাড় মাস জ্বালা করিতে থাকে, তিনি কিনা পাদরী মহাশয়ের মতন বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। রাগ ধরিলেও হাসি পায়! সেখানে আর লোক ছিল না।

শিবানীর সেই পাণ্ডুমুখ ও আহত হৃদয়ের উদ্ধত বিষকটাক্ষ মনে করিয়া সে মনে মনে একটু তৃপ্তি অনুভব করিল। যথার্থই সে তবে শান্তিকে ভালবাসে। শান্তি তাহাকে ঘৃণা করে শুনিয়া নহিলে সে এমন শেলাহতের মতন ছটফট করিয়া উঠিত না। হেমেন্দ্র নিজের প্রতি অত্যন্ত খুসী হইল। সে যে বুদ্ধি করিয়া ঠিক পথটি বাহির করিতে পারিয়াছে এবং এমন সব কথাগুলা যথাসময়ে আসিয়া তাহার ওষ্ঠাগ্রে যোগাইয়াছিল, তাহাতে নিজের আশ্চর্য্য উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় পাইয়া সে বিস্মিত হইল। আবার যখন সে সত্য সত্যই তাহাদের নিকট হইতে শান্তিকে কাড়িয়া লইয়া চলিয়া যাইবে তখনকার জন্য তাহাদের আঘাত কল্পনায় সে নিষ্ঠুর হাসি হাসিল। শ্যামাকান্ত চৌধুরী দেখুন একবার তিনিই শুধু গরীবের ছেলের সর্ব্বনাশ করিতে পারেন না, সেও তাঁহাকে ইহার শাস্তি দিতে জানে। সে এটুকু বুঝিত যে ছুঁচটি মানুষের কোন খানটিতে বিঁধাইলে তাহার মর্ম্মভেদ করে; যে শান্তির জন্য তিনি তাহাকে পোষ্যপুত্র লইয়া তাহাকে দুরাকাঙ্ক্ষী করিয়া তুলিয়াছেন, সেই শান্তিকেই সে তাঁহার নিকট হইতে টানিয়া লইয়া গিয়া বুঝাইয়া দিবে, যে শান্তিকে পাইতে হইলে তাহাকেও অনেকখানি খুসী রাখিবার প্রয়োজন আছে।

শিবানী যখন সেই অনুজ্জ্বল ছায়ালোকের মধ্যে সহসা বিচ্ছুরিত বিদ্যুৎশিখার ন্যায় অত্যন্ত সহসা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘগুলা নানা আকার ধারণ করিয়া আকাশময় ছুটাছুটি করিয়া আবার একটা ভারি রকম বৃষ্টি আসিবার উপক্রম করিতেছিল। যেই উপলক্ষ্যে আকাশের প্রহরীদল তুরি বাজাইয়া আলো

জ্বালাইয়া সোরগোল করিয়া বেড়াইতেছে, এবং অদূরবর্ত্তী পুষ্করিণীর ঘাটে ও উদ্যানের নালায় ভেকদলের সম্মিলিত ঐক্যতানে বৃষ্টির ক্ষীণস্বর ডুবিয়া যাইতেছে। প্রথমে কাহাকেও শিবানী সে ঘরে দেখিতে পাইল না। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই একটা দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দে চমকিত হইয়া খাটের নিকট আসিয়া দেখিল সেখানে বিছানার একপ্রান্তে অন্ধকারের ছায়ায় প্রায় মিশিয়া গিয়া শান্তি পড়িয়া আছে। শিবানী ধীরে ধীরে তাহার পাশে বসিয়া আস্তে আস্তে তাহার পিঠের উপর এলোথেলো চুলগুলা সরাইয়া দিতে দিতে ডাকিল "শান্তি!"

শান্তি একবার মাত্র সচমকে মুখ তুলিয়া আবার তাহা বিছানার মধ্যে লুকাইয়া ফেলিল। শিবানী বলিল "শান্তি তুইও আমায় ছেড়ে যাবি? শান্তি ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল, রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বলিল "দিদি, আমার কথা তোমরা ভুলে যেও।' বলিতে বলিতে কাঁদিয়া উঠিল। শিবানী কহিল "কেন যাবি বোন? এ ঘরসংসারের তুই যে লক্ষ্মী, তুই কার হাতে তোর সংসার ফেলে যেতে চাস্? যাস্নি শান্তি, মার কথা ধরিস্নি। ঠাকুরপো যাই বলুন আমি একথা বিশ্বাস করতে পারবো না, বল্ শান্তি তুই আমার ওপোর রাগ করে যাচ্ছিস্ নে?"

শান্তি নীরবে কাঁদিতে লাগিল।

শিবানী ধীরস্বরে কহিল "শান্তি! আরতির সময় হয়ে এলো মন্দিরে যাবি নে? বাবা বোধহয় এতোক্ষণ আমাদের অপেক্ষায় সেখানে বসে আছেন। তোর রাজরাজেশ্বরীকে প্রণাম করতে যাবিনে?" শান্তির সূক্ষ্ম ওষ্ঠপ্রান্তে একফোঁটা বিষাদের হাসি অত্যন্ত ক্ষীণভাবে ফুটিয়া উঠিল "দিদি! রাজরাজেশ্বরী যে আর আমার পূজো নিতে চান্ না ভাই। আমি কি করবো? দিদি! আমায় যদি সত্যি চলে যেতে হয় তুমি আমার মতন করে মালা গেঁথে দিও, ফুল দিয়ে মন্দির সাজিও। তেমনিতর নৈবেদ্য করে ধূপদীপ জ্বেলে দিও, দেখো দেবতার যেন সেবার ব্যাঘাত হয় না।"

শিবানীর কঠিননেত্রে এবার জল আর চাপা থাকিল না, কাঁদিয়া বলিল "সত্যি সত্যিই তুই যাবি? ঠাকুরপো জোর করে নিয়ে যাবে? তুই শুন্‌বি কেন?"

"আমি কি করবো দিদি? আমিতো যেতে চাইনি! কিন্তু যদি যেতেই হয় তুমি আমার হয়ে জ্যেঠামশায়ের সেবা"—বলিতে বলিতে সহসা তাহার কম্পিত কণ্ঠস্বর অস্ফুট হইয়া আসিয়া একেবারেই স্তব্ধ হইয়া পড়িল। পূর্ণিমার কূলে কূলে পরিপূর্ণ সমুদ্রতরঙ্গ হৃদয়মধ্যে আকুল আর্ত্তনাদ করিয়া আছড়াইয়া পড়িল। জ্যেঠামশায়কে সে যে মাতৃহীন করিয়া যাইতেছে, এ অকৃতজ্ঞতা তাঁহার প্রাণে যে বজ্রের মতন বাজিয়া উঠিয়াছে।

"শান্তি এসো গাড়ি এসেছে, আর দেরি করে কাজ নেই। বলিয়া হেমেন্দ্র ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল "বৃষ্টিটা এইবেলা একটু কম আছে খিড়কি দোর দিয়ে এই সময় বেরিয়ে পড়া যাক্।" ঘরে সন্ধ্যার ও মেঘের উভয় অন্ধকারের কালিমা ক্রমেই নিবিড় হইয়া আসিতেছে, কেজানে কি ভাবিয়া দাসী মোক্ষদা এখনও আলো জ্বালাইয়া দিয়া যায় নাই! সেই অন্ধকারালোকে [illegible] তাই শিবানীকে দেখিতে [illegible] সে এখনি

শিবানী একথা শুনিয়াই শান্তির হাত দুখান দুইহাতে শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিল, বলিল "আমি তোমায় যেতে দোবনা শান্তি। বরং ওই গাড়ি করে চুপে চুপে আজ তোমরা আমায় বিদায় করে দাও, আমি তোমাদের সব অমঙ্গল মুছে নিয়ে যাই।" রুষ্টস্বরে হেমেন্দ্রও তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল "শান্তি, শান্তি উঠে এসো, আমি তোমার হুকুম করচি তুমি ঐ মায়াবিনী স্ত্রীলোককে স্পর্শ করোনা শীঘ্র এসো।" শান্তির চারিদিকে অন্ধকার কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল, সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিল "একবার জ্যেঠামশায়ের কাছে যেতে দাও। ওগো, তোমার পায়ে পড়ি একটিবার আমায় যেতে দাও।" হেমেন্দ্র অবিচলিতভাবে কহিল, "এজন্মে আর সেটি হচ্চেনা। অবাধ্য স্ত্রীকে বাধ্য কর্ব্বার অধিকার ও ক্ষমতা এখনও আমার কাছে। সেটুকু আমার প্রয়োগ করতে বাধ্য করে তুলোনা; উঠে এসো! তোমার জ্যেঠামশাই তোমার চেয়ে হাজারগুণ আদরের জিনিষ পেয়েছেন, তিনি আর তোমার জন্য ব্যস্ত ন'ন।"

তুমি এস।

ওগো তুমি এস, নবীন বরনে
নভোনীল হ'তে আপনা হরিয়া—নামিয়া এস।
নদী হ'য়ে কত চলিবে বহিয়া,
ইন্দ্রধনুর বরণ আঁকিয়া
গগনে গগনে উদ্দেশহীনা
ভ্রমিবে কত—ছায়ার মত?
এস এস ওগো তপন হইতে,—নামিয়া এস,
আলোকে পুলকে আমার আঁধার জীবনে হাস।

ওগো তুমি, নন্দন হইতে লুটিয়া গন্ধ
মন্দ সমীর বাহি'
এসগো আনন্দে পলকে ছুটিয়া
সুধাসরে অবগাহি'।
গ্রহ তারা হ'তে গীতি শিখি নিও,
অমিয় সলিলে ওষ্ঠ পূরিও,
রচিও গতিটি বিচিত্র ছন্দে
হরষ ভরে—আমার তরে;
মূরতি ধরিয়া বাহিরে এসগো,—মানস বাহি',
নেত্রে নয় আজি যে তোমায়,—জীবনে চাহি।

জীবনে আমার বহিছে আজিকে,—পাগল ঝড়,
মেঘে অশনি চিরিছে দামিনী,—বক্ষ-কুহর;
টুটিয়া পড়িছে ফুল-পল্লব,
চারিদিকে শুধু গর্জ্জন-রব,
বিদ্রোহী-সিন্ধু ফুলিয়া উঠিছে
ভীষণ রঙ্গে—সমীর সঙ্গে;
ওগো, তুমি আসি' সুধীরে শান্তির,—মন্ত্র পড়,
লুটাবে চরণে নীরব মরণে,—ভীষণ ঝড়।

জীবনে আমার আজো ফুটে নাই,—কত যে ফুল,
কত বা ফুটিয়া টুটিয়া গিয়াছে,—নাহিক কুল;
আলোক-পরশে ফুটাও কোরকে,
সাজাইয়া দাও তরু ঝাঁকে ঝাঁকে,
রোমাঞ্চ-পুলকে জিয়াইয়া তোল
যত খসে'-পড়া—জীবন-হারা;
ওগো তুমি আসি' তোলগো হাসা'য়ে,—শুকান ফুল,
সব মিলাইয়ে মালিকা রচিয়ে,—সাজাও চুল।

ওগো তুমি কোথা? নয়ন সমুখে,—দাঁড়াও হাসি',
জীবনের কল-কল্লোলে উঠুক,—সঙ্গীত ভাসি';
বাঁধি' দাও বীণে ছিন্ন তন্ত্রীগুলি,
মূক রাগিণীতে ফুটাও গো বুলি,
শিথিল গ্রন্থি বেঁধে' তুল ওগো
বিপুল বন্ধে,—ভরা আনন্দে;
মন্ত্র পড়িয়া টানিয়া আনগো,—পল্লব রাশি,
শত বিচিত্রে গড়গো আমারে,—জীবনে আসি'।

শ্রীসুখরঞ্জন রায়।

প্রাচ্য চিত্রকলা প্রদর্শনী।

এবারকার এই প্রাচ্য চিত্রকলাপ্রদর্শনী দেখিয়া আমার যা ভাল লাগিয়াছে তাই লিখিতেছি। চিত্রকলা সম্বন্ধে সনাতন যেটুকু আকর্ষণ ও উপলব্ধি সবাকারই মনে আছে তাছাড়া আমার আর কিছুই নাই। ফরাসী দেশে ও বিলাতে যে সকল চিত্রশালা (Art Gallary) দেখিয়াছি তাহা হইতে এই প্রাচ্য চিত্রকলার (Mental Arts) অনেক প্রভেদ বুঝা যায়। এই চিত্রে যা দেখা যায় যা বুঝা যায় তার অপেক্ষাও এক নূতন ভাব মনের অন্তরালে আসে। ইংরাজী ভাষায় এই কথাটি সহজে বুঝাইতে গেলে এই বলিতে হয়—যে এই প্রাচ্যকলার Suggestive beauty বা অন্তর্নিহিত ভাব অতি উচ্চ এবং ইহাই ভারতশিল্পের বিশেষত্ব। রংটি বা রেখাটি বা রেখা বর্ণের একত্র বিন্যাস ভাল হউক বা না হউক সেই রেখা ও রং যে ইন্দ্রিয়াতীত ভাবটুকু ব্যক্ত করে বা অস্পষ্টভাবে সূচনা করিয়া দেখায় সে গুলি বড়ই সুন্দর। ঠিক প্রকৃতির ছবির সহিত ছবি না মিলিলেও ইহার পরোক্ষে সূচিত ভাবটি অতি মধুর ও উচ্চ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সেই টুকুই প্রাচ্য কলার বিশেষত্ব। কিন্তু তাহা ছাড়াও ভারতীয় এই চিত্র গুলির মধ্যে আরও একটি বিশিষ্টভাব আমি অনুভব করিলাম।

হিন্দুভাবমাত্রেরই মধ্যে কেমন যেন একটুকু সনাতন শান্তিপ্রিয়তা আছে। প্রতিদ্বন্দ্বী দাবী করিলেই সে তার নিজ স্বত্ব বিনা কলহে তার হাতে দিয়া শান্তিময় স্থানে হটিয়া দাঁড়ায়। এই শান্তিপূর্ণ ভাব হইতেই হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুভাব বিশিষ্ট যত কিছু সামাজিক নিয়ম। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের কল্পনার আতিশয্যে সেই ভাবটুকু তাদের কাছে আপনিই আসিয়াছে। তাহার উদ্দেশ্য সর্ব্বদা শান্তি স্থাপনা। এই সুন্দর সনাতন গুণের আতিশয্যেই আমাদের ঐহিক বীতরাগ (Indian Passimism,) নিবৃত্তি মার্গের অনুসন্ধান, প্রবৃত্তিমার্গ বর্জ্জন। ঐহিক সুখের জন্য চেষ্টার একান্ত অভাব ও আমাদের আধুনিক পতন ও দুরবস্থা। সেই ভাবটুকু এই সব নূতন প্রাচ্যকলাতেও (new school of Indian art) পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে অর্থাৎ এদেশের অন্তরের অন্তরতম অবস্থাটি ইহাতে ব্যক্ত করিয়াছে। আর সেই জন্যই ইহার এত মাধুর্য্য এত আদর ও এত গরিমা।

এখন বিবেচ্য কথা এই যে পুরাতন হইতে কিরূপে এই প্রাচ্যকলা নূতন ভাবে অভিব্যক্তি হইল? কি কি ঘটনা এই অভিব্যক্তির সহায়তা করিয়াছে? পুরাতন আর নূতনে তফাৎ কি? নূতন জিনিবই বেশী দিন থাকিলে পুরাতন হইয়া যায়। আবার নূতনের মসলাগুলি অধিকাংশই পুরাতন; কেবল নূতন রকমে সন্নিবিষ্ট। সেই রং সেই রেখা—কেবল বিন্যাস বিভিন্ন। তাই পুরাতন প্রাচ্যকলার (Old Indian art) সঙ্গে এই নূতন কলার (New Indian art) এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। একটি আর একটির অভিব্যক্তি মাত্র। বাহিরের নবাগত শক্তির সঞ্চারেই এরূপ হইয়াছে। প্রতীচ্যের সহিত প্রাচ্যের মিলন মিশ্রণই এই মধুর নূতন ভাব

আনিয়াছে। সে শুধু চিত্রকলার সম্বন্ধে নহে। জীবনের যাবতীয় বিষয়েই তার স্পর্শের এমনি সুফল সহজেই ফলিতে পারে ও ফলিবে। কেবল সে শুভ দিন দেখিতে বাঁচা চাই। সেইটিই এখন কেবল সমস্যার বিষয় দাঁড়াইয়াছে।

চিত্রকলার অনেক উদ্দেশ্য। অনুকরণ স্পৃহা তার মধ্যে আদিম ও প্রধান। পুরাকালে একটি দ্রব্যের সাদৃশ্য লিখিয়াই সেই দ্রব্যটির কথা জানান হইত। ইহা হইতেই শেষে ভাষা-লিপির আবির্ভাব হইয়াছে। প্রাচীন মিসর দেশে ও আমেরিকাতে "পেরু" প্রভৃতি পুরাতন স্থানে এখনও এইরূপ লিখন প্রত্নতত্ত্বরূপে বিদ্যমান দেখা যায়। চিত্রকলার আর একটি উপকারিতা তাহা হইতে পুরাকালের আচার ব্যবহার রীতিনীতির অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। এইরূপ পুরাতন চিত্র হইতেই মিশর প্রভৃতি দেশের প্রাক্কালের ইতিবৃত্ত সংকলিত হইয়াছে, এবং আমাদের দেশেও মন্দিরে, প্রস্তর ফলকে ও পুরাণ চিত্রে এই সব দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মনুষ্য সমাজের সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এখন চিত্রকলার প্রধান ভাব ও উদ্দেশ্য হইয়াছে—"To represent an ideal; to represent what we earnestly desire." যাহা দেখিতেছি ও শুনিতেছি তাহা অপেক্ষাও আরও কিছু উচ্চ—অর্থাৎ প্রকৃত দ্রব্য হইতেও কল্পনা আরও উচ্চে উঠিতে পারে—এই ভাব দেখানই চিত্রের একটি প্রধান লক্ষণ। সুতরাং এই কয় হিসাবে চিত্রগুলি বিচার্য্য।

১ সেই সময়কার রীতিনীতির পরিচয়।

২ উচ্চনীতি শিক্ষার উপযোগী।

৩ উচ্চ সৌন্দর্য্য কল্পনা শক্তির বিস্তার।

এই তিন হিসাবেই আমাদের প্রাচ্য আলেখ্য গুলি চিত্তহারী।

বালক রামলক্ষ্মণকে বশিষ্ঠমুনির ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষাদান; হরপার্ব্বতী-সংবাদ; চোখবাঁধা রাণী গান্ধারী; যশোদা ও গোপালের ছবি; কচ ও দেবযানী; ভারতমাতার ছবি; শক্তিময়ীর স্বপ্ন; উমার খায়েমের রুবায়ত; বিরহীযক্ষ; বিরহিনী যক্ষপত্নী; রুক্মিণীর প্রণয় কাহিনী; তাজ-মহলের স্বপ্ন; আরব্যোপন্যাস কথন; মহাভারত লিখন; প্রভৃতি সমস্ত ছবিগুলিই কি সুন্দর। ইহার অনেকগুলিই পূর্ব্বে ভারতীতে প্রকাশ হইয়া গিয়াছে সুতরাং এস্থলে তাহার বিশদ বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। তথাপি আমি এস্থলে দৃষ্টান্ত স্বরূপ যশোদা ও গোপালের ছবিখানি পুনরুদ্ধৃত করিলাম।—এমন পবিত্র ও মধুর ভাব—আর কোন সম্বন্ধে দেখা যায় না। খৃষ্টধর্ম্মের ম্যাডোনা—বা খৃষ্টমাতার শিশু-ক্রোড়ে কল্পনাও বোধ হয়—ভারতের এই ভাবেরই অনুকরণ।—কি সুন্দর মাতৃমূর্ত্তি! ১

আর একখানি বড় ছবি চিত্রশালায় উচ্চে টাঙ্গান আছে—সেখানির বিষয় গঙ্গার আগমন। উচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গ হইতে পবিত্র স্রোতস্বিনীকে প্রথম বহিয়া আসিতে দেখিলে—দেব মানব সকলেরই কি আনন্দ হইয়াছিল সে ভাব চিত্রিত।

ইহাতে রং ও রেখার কিছুই অলৌকিক দেখিবে না। কেবল সুচিত্ত ভাবই তাহার মহাপ্রাণ। পাশ্চাত্য চিত্র হইতে এই বিষয়েই তাহার মহা প্রভেদ। এই চিত্রে শরীর

যশোদা গোপাল

শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার

বিজ্ঞান শাস্ত্রের অনেক নিয়মেরই ব্যতিক্রম হইলেও অধিকাংশ বিষয়গুলির ভাবার্থ অতি মহান ও হৃদয়স্পর্শী।

দুই একখানি ছোট ছোট ছবি সব পাশে পাশে সাজান দেখিলাম। সে সবগুলি প্রণয় পত্র সম্বন্ধে। আশ্চর্য্য সবগুলি ভিন্ন ভিন্ন চিত্রকর প্রণীত, অথচ ঠিক এক রকম ভাবেই আঁকা।

একখানিতে নিভৃতে রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণকে পদ্মপাতায় ও চন্দনের কালীতে পত্র লিখিতেছেন। তাঁহার ভ্রাতার ইচ্ছা তিনি অপর একজনকে বিবাহ করেন।

আর একটি ছবিতে এক উচ্চ প্রাসাদের জানালা হইতে একটি সুবেশা রমণী একজন দূতের হাতে একখানি প্রণয় পত্র গোপনে পাঠাইতেছেন।

আর একটি ছবিতে একটি কপোত ঠোঁটে করিয়া একখানি প্রণয় পত্র লইয়া উড়িতে উড়িতে আসিতেছে। একটি গবাক্ষে একটি রমণী একান্ত আকুলতার সহিত তার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।

একজন রামায়ণ প্রেমিক জাপানী হালকা হালকা তুলি বুলাইয়া ছয় খানি ছবিতে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ লিখিয়াছেন তাহা কি চমৎকার। যে বিশিষ্ট ভাবের কথা আমি এদেশের চিত্রকলায় আছে মনে করি, সেই বিশিষ্টভাব এই বিদেশী অতি সুন্দর ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। বিদেশী হইলেও তার আন্তরিকতা একান্ত গভীর। তিনি এদেশী চিত্রকরদেরও এই বিষয়ে হারাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার স্বাভাবিক জাতীয় ক্ষমতা অর্থাৎ সুন্দরভাবে রেখা টানিবার ও রং ফলাইবার ক্ষমতাটুকু ত সেই চিত্রে আছেই তাহার উপর এ দেশের ভাবে ছবিখানি অতীব সুন্দর হইয়াছে। এ ছবিগুলি সব রেশমের কাপড়ের উপর আঁকা।

প্রথমখানি রামের বনগমনের ছবি। বল্কল পরিয়া শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবী ও লক্ষ্মণ যাইতে প্রস্তুত, আর আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেই রোরুদ্যমান। শ্রীরামচন্দ্রের নিজেরও এই বিষম মুহূর্ত্তে মুখখানি ম্লান। নিশ্চয়ই সে মলিনতা বনে যাইবার জন্য নহে, পিতামাতা ও পুরবাসীগণকে এমন শোকাতুর দেখিয়া।

দ্বিতীয় ছবিখানিতে তাঁহাদের অরণ্য বাসের ছবি চিত্রিত। গাছতলায় সীতাদেবী রামচন্দ্রের কোলে মাথা রাখিয়া ভূমিশয্যায় শয়ান। রামচন্দ্রের চোখ দুটি ঘুমাবেশে আলস্যমাখা। ভাই লক্ষণ অদূরে থাকিয়া সারারাত্রি ধনুর্ব্বাণ লইয়া সীতাদেবীকে পাহারা দিতেছেন। তাঁহার সে সময়কার উপযোগী যে কিরূপ সুন্দর মূর্ত্তি চিত্রকর আঁকিয়াছেন সে না দেখিলে বুঝান যায় না। লক্ষ্মণের সকল অবস্থাতেই উদ্দৃপ্ত ভাব; সেইভাবে অগ্রবীক্ষে চাহিয়া চারিদিকে তিনি পরচালনা করিয়া সারারাত সীতাদেবীকে রক্ষা করিতেছেন।

তৃতীয় ছবিখানি সীতাহরণ সম্বন্ধে। ভীমাকৃতি রাবণ নিরাশ্রয়া সীতাদেবীকে অপহরণ করিয়া আকাশপথে চলিয়াছেন। সীতাদেবী ভয়ে মুমূর্ষু। রাবণের কৃষ্ণদেহে তাহার ক্ষীণ কাঞ্চন তনুখানি যেন মেঘের মাঝে বিদ্যুতের মত দেখাইতেছে।

চতুর্থ ছবিখানি অপহৃতা সীতাদেবীর রাবণরাজার কারাগারে অশোক তলায়

অবস্থান ছবি। তিনি গাছতলায় ম্লান মুখে একা বসিয়া আছেন—আর দূরে দূরে দেবীরা পাহারা দিতেছেন।

পঞ্চম ছবিখানিতে সীতাদেবীর অগ্নিপরীক্ষা। দেবী করযোড়ে প্রজ্জ্বলিত হুতাশনের ভিতর প্রবেশ করিতেছেন। মুখে প্রশান্ত ভাব। জাপানী চিত্রকর তাঁর পদদেশ ধূমে ঢাকিয়া দিয়া তাঁহার শরীরে অলৌকিক দেবীভাব আরোপণ করিয়াছেন।

শেষ ছবি খানি রাক্ষস নাশ করিয়া সীতা-দেবীকে পুনরুদ্ধার করিয়া রামের পুষ্পকরথে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন। এখানি যেন সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর।

উর্দ্ধমুখ অসীম জনতার চক্ষুকে পরিতৃপ্ত করিয়া জ্যোতির্ম্ময় পুষ্পক রথখানি মেঘ ভেদ করিয়া বিদ্যুৎ হানিয়া আকাশপথে আবির্ভূত হইয়াছে। নীচে ভরত রামের পাদুকা দুখানি মাথায় করিয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।

রামায়ণের সকল চিত্রেরই কি পবিত্র ভাব কি মধুর পবিত্র ইতিহাস। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে ভাবে মোহিত, তার কাছে এই ইতিহাসের ভাবুক চিত্রকর জাপানীর কথা কি।

এই প্রদর্শনীতে যে সকল প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্র দেখিলাম সে গুলিও অতি সুন্দর। দেশের লোক যে প্রকৃত চিত্র আঁকিতে অপটু এই চিত্রগুলি দেখিলে ইহা মিথ্যা অপবাদ বলিয়া সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়। এই সব চিত্র-গুলি সবই আলো ও ছায়া বিশিষ্ট সুন্দর রং ফলান প্রতিকৃতি। "চিলকা"হ্রদ; সূর্য্যোদয়; সূর্য্যাস্ত; চাঁদনীর রাত; ঘন বনের দৃশ্য; আলো ও ছায়ার খেলা; কাঞ্চনজঙ্ঘা; তুষার ধবলশিখর ইত্যাদি। এই চিত্র সকল দেখিয়া আমার মনে হইতে লাগিল ইউরোপের বিভিন্ন চিত্রাগারে যে সকল প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়াছি তাহার তুলনায় কোন অংশে ইহারা অসমকক্ষ নহে।

এইরূপ সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর মত আমারও ঘরে দুইখানি অতি সুন্দর দৃশ্য আছে। একজন অজানা ভাবুক যুবকের লেখা। তিনি কোথাও কখনও চিত্রকলা সম্বন্ধে শিক্ষা পান নাই তাঁহারই নিজের লেখা কবিতারই ছবি। বিষয় "উষা তারা" ও "সন্ধ্যা তারা।" চিত্র দুটিতে উদীয়মান ও অস্তমান এই দুই অবস্থার পার্থক্য দেখান হইয়াছে। সন্ধ্যা তারাটি সন্ধ্যাগগনে ক্রমেই উজ্জ্বলতর হইতেছে, আর তার প্রতিবিম্ব মনের উপরও দীপ্তিমান। চারিদিকের অবস্থা এই সুসময়ের সহিত সুর মিলাইয়া আঁকা। সেখানকার দৃশ্যাবলী সবই উন্নতিশীল গাছপাতায় ভরা। নূতন ও পুরাতন সুগঠন হর্ম্ম্যের গবাক্ষ হইতে আলোর হাসি আসিতেছে। কিন্তু ম্রিয়মান উষার তারার সকলই ম্লান। সে দৃশ্যে গাছগুলি পাতাহীন ও দূরে চালা ঘরগুলি সব ভাঙ্গা ও পরিত্যক্ত। তবে একথা মনে রাখিতে হইবে যে সন্ধ্যা তারাই আবার উষাতারা হয়।

সব্ব শেষে শারীরিক ও মানসিক সকল কার্য্যের ভিত্তিস্বরূপ মনোবিজ্ঞান ও স্নায়ু-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আর দু একটি কথা না বলিলে চিত্রকলা সম্বন্ধে লেখা সম্পূর্ণ হয় না, কেন না সেই তত্ত্বগুলি আধুনিক বিজ্ঞানের তত্ত্ব কথা। বহির্জগতের সহিত অন্তর্জগতের আদান প্রদান স্নায়ুমণ্ডলের সাহায্যেই হইয়া

থাকে। জ্ঞান ও উপলব্ধির প্রধান যন্ত্র মস্তিষ্ক। সেই আশ্চর্য্য যন্ত্রট কোষ ও তন্তু দ্বারা গঠিত। কোষ গুলিতেই শক্তি উদ্ভূত হয়—সেই গুলিই জ্ঞান ও কর্ম্ম করিবার শক্তির কেন্দ্র। সেই কেন্দ্র হইতে তন্তু বহিয়া সেই শক্তিগুলি বিভিন্ন স্থানে যাইয়া তথায় শক্তি সঞ্চার করে। তাই বাহ্য জগতের প্রতিঘাত শরীরের সেই তন্তু পথে মস্তিষ্কে নীত হইয়া বাহ্যবস্তুর জ্ঞান উদ্ভব করে, ও ইচ্ছা শক্তি সেইরূপ তন্তু পথে নাবিয়া আসিয়া মাংসপেশীকে চালনা করিয়া কাজ করায়। সৌন্দর্য্য জ্ঞান সম্বন্ধেও উক্তরূপ কোষ ও তন্তু আছে। নানা স্থান হইতে নানাতন্তু একদিকে একত্র হইয়া সেই কেন্দ্রে সৌন্দর্য্য জ্ঞানের বিকাশ করে। প্রতি তন্তু পথে আনীত এই সৌন্দর্য্য উপলব্ধি একত্র হইয়া আরও স্পষ্ট ভাবে বিকসিত হয়। তাই তাহার শরীর মনের উপর এত শক্তি। তাই তাহার উদ্বেলিত হইয়া বাহ্য জগতে চিত্রকলার সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিবার এত সনাতন প্রয়াস। এইরূপেই সকল কলাবিদ্যার উদ্ভব হইয়াছে। অন্তরের উচ্ছ্বাসেই বিশ্বজগত এত ভাবে প্লাবিত। সে উচ্ছ্বাস অধিকাংশই মস্তকের পশ্চাদ্দিকের কেন্দ্র হইতে নিঃসরিত হয়।

গ্রীষ্ম প্রধান দেশের লোকের এই স্থানই বেশী পরিপুষ্ট, তাই তাহারা অতীতের স্মৃতি ও ভাবোচ্ছাস লইয়া এত বিভোর। মস্তিষ্কের সম্মুখস্থ কেন্দ্রের কাজ নূতন কার্য্য নূতন আলোচনা, নূতন পথে গমন। সে স্থানের পরিপুষ্টিতে মানুষকে নূতন পথে অগ্রসর করায়। শীত প্রধান দেশের লোকের স্বভাবত এই কেন্দ্রই প্রবল।

শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক।

সুচরিত্র।

১

তখন সবেমাত্র প্রোবেসনারি ডিম্ব ভেদ করিয়া, সদ্য ডেপুটি ফুটিয়া, বাগান্দায় বদলি হইয়াছি।

সেদিন কাছারি হইতে ফিরিতেই রীতিমত বৃষ্টি আরম্ভ হইল। আলো জ্বালাইয়া, ইজি-চেয়ারে, পড়িয়া উপন্যাসের মধ্যে মগ্ন হইবার চেষ্টা দেখিতেছিলাম। কিছু ভাল লাগিতেছিল না। একে, আজন্ম কলিকাতায় বাস, তায় সঙ্গীহীন বিজন পল্লী, আবার তার উপর ঘনীভূত বর্ষা! 'প্রত্যাসন্নে নভসি', মেঘদূতের যক্ষের মত, আমার চিত্ত প্রিয়ার জন্য বেশী করিয়াই চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। তখন আমার সবেমাত্র বিবাহ হইয়াছে। বিবাহিত জীবনে, এই প্রথম বর্ষা। রবিবাবুর কাব্যরসগ্রাহী আমার মনের অবস্থা, সুতরাং সহজেই অনুমেয়।

সহসা বাহিরে একটা কোলাহল শুনিয়া উঠিয়া আসিলাম। দেখি, আমার চাপরাসি-পুঙ্গব, উপস্থিত কার্য্য হাতে না থাকায় এক বৃদ্ধা ভিখারিণীর সহিত গোলমাল বাধাইয়া দিয়াছে। বুড়ীটি খঞ্জ! তার অপরাধ, সে এই বৃষ্টিতে, ভিজা-কাপড়ে, এক পা-কাদা শুদ্ধ

'ডিবটি-সাবে'র গাড়ীবারাণ্ডায় আসিয়া অসম্ভব দুঃসাহসিকতা ও আস্পর্দ্ধার পরিচয় দিয়াছে, এবং পুনঃ পুনঃ বলা-কহা সত্ত্বেও এ স্থান ত্যাগ করিতেছে না! 'প্রখর রবির তাপ' ও 'রবি-তপ্ত বালুর' কথা, আমার চট্ করিয়া মনে পড়িয়া গেল। চাপরাশিকে ভর্ৎসনা করিয়া বৃদ্ধাকে কহিলাম, "ওখানে বৃষ্টির ঝাট আস্ছে, তুমি উঠিয়া এই বারাণ্ডায় বস। বৃষ্টি থামিলে যেয়ো!"

বৃদ্ধা গদ্গদকণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করিল, "বেঁচে থাকো বাবা! বুড়ো মানুষ—তায় কদিন ধরে জ্বর হচ্ছে! এই বৃষ্টিতে বড় কাঁপিয়ে দিলে। কাছে কোথাও একটু দাঁড়াবার জায়গা নাই বলে, এখানে একটু বসেছি, বাবা!"

একটা করুণ সহানুভূতিতে আমার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। ডেপুটিগিরিতে তখনো পাকা হই নাই, পুঁথির কথাগুলা, সুতরাং, একেবারে ভুলি নাই। আমি কহিলাম, "জ্বর! তাহলে এই বর্ষায় বেরিয়ে ত ভালো করনি, বাপু, আমি একখানা কম্বল দিচ্ছি—সেইটে মুড়ি দিয়ে এইখানেই আজ পড়ে থাকো। কাল সকালে বাড়ী যেয়ো!"

বৃদ্ধার চোখে, বোধ হয়, জল আসিয়াছিল। রুদ্ধস্বরে, সে কহিল, "গরিবের প্রতি তোমার এত দয়া। ভগবান তোমার ভালো করবেন, বাবা। চিরদিন আমার এমন দুঃখ-দুর্দ্দশা ছিল না।"

কথাটা বিশ্বাসযোগ্য! কারণ তার কণ্ঠস্বর সাধারণ ভিখারিণীর মত নহে! বৃদ্ধাকে একখানি কম্বল ও শুষ্ক বস্ত্র আনাইয়া দিলাম।

ভোজন-শেষে, আবার বারাণ্ডায় আসিলাম। তখনো বৃষ্টি পড়িতেছিল। আমি কহিলাম, "একটু দুধ খাবে?"

বৃদ্ধা কোন উত্তর দিল না। বেহারাকে দুধ আনিতে বলিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার বাড়ী কি, এ দেশেই?"

"হাঁ, বাবা!"

তাহার পর, পরিচয়ে জানিলাম, সে ব্রাহ্মণকন্যা। তার পিতা গ্রামের পৌরোহিত্য করিয়া বেশ সুখ-স্বচ্ছন্দেই দিন কাটাইয়া গিয়াছে। বাল্যে মাতৃহীনা হইলেও, পিতার স্নেহে, সে অভাব তাহাকে একদিনের জন্যও অনুভব করিতে হয় নাই। পিতাও বহুদিন মৃত্যু হইয়াছে। এখন আর সংসারে তার 'আপনার' বলিতে কেহ নাই। বৃদ্ধ ডাক্তার বামাচরণবাবু তাহাকে মাসে দুইটি করিয়া টাকা দেন, আর সে নিজের হাতে পৈতা তৈয়ারী করিয়া বিক্রয় করে! এখন যে এই দুরবস্থা, এ তাহারি গভীর পাপের শাস্তি! বৃদ্ধা কহিল, "আমার মা, বুঝি, এখানে নাই, বাবা?"

তখন নোলোক-পরা, হাসি-ভরা, কোঁকড়া চুলের গুচ্ছ-ঝরা, সুন্দর একটি ছোট মুখের কথা, চকিতে আমার মনে পড়িয়া গেল! দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, আমি কহিলাম, "না, এ দেশে আমি এই নূতন এসেছি। তারা, আর মাসখানেক পরে সব, এখানে আসবে!"

২

সকালেও অবিশ্রান্ত বৃষ্টি! বিরাম নাই! অস্থির করিয়া তুলিল! একে বিদেশ, কাছে এমন একটি লোক নাই, যাহার সহিত দুইদণ্ড কথা কহিয়া বাঁচি! তাহার উপর, প্রকৃতির এই নিরানন্দ ভাব! প্রাণের মধ্যে বিচ্ছেদের ঘন অন্ধকার, বাহিরের আলোকও রুদ্ধ! বৃষ্টি!

বৃষ্টি! বৃষ্টি! প্রাণ যেন বাহির হইবার উপক্রম করিতেছে!

বারাণ্ডায় আসিয়া দেখি, বুড়ী কম্বল মুড়ি দিয়া নিদ্রা যাইতেছে। রোগের চিহ্ন থাকিলেও তার মুখ হইতে লাবণ্যের শেষ রেখাটুকু এখানো ঝরিয়া যায় নাই! মেঘের আড়াল হইতে সূর্য্যের দুই একটা ক্ষীণরশ্মি ফুটিয়া উঠিলে, আকাশে যেমন একটি বিচিত্র বর্ণের আভাষ পাওয়া যায়, অনেকটা যেন, তেমনি!

চাপরাশি সকালের 'ডাক' লইয়া আসিলে, আমি বামাচরণ ডাক্তারের সন্ধান লইলাম। বামাচরণবাবু এখানকার প্রবীণ ডাক্তার; হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেন; গরিবের, নাকি, তিনি মা-বাপ!

আমি একটা চিঠি লিখিয়া চাপরাশিকে বামাচরণবাবুর উদ্দেশ্যে পাঠাইলাম।

৩

তিন চারিদিন রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া একদিন শেষ রাত্রে বৃদ্ধা, নীরবে, আমারি গৃহে দেহত্যাগ করিল। তার মৃত্যুতে প্রাণে একটা আঘাত লাগিল। আহা, অনাথা নারী!

জানালার ধারে বসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়াছিলাম। বেহারা আসিয়া চা রাখিয়া গেল। আমি দেখিলাম। পানে রুচি বা প্রবৃত্তি ছিল না। আমার মনে হইতেছিল, জগতের দারিদ্র্যের কথা! এমনি অসহায়ভাবে, কত দরিদ্র রোগের যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে! ক্ষুধায় অন্ন নাই, রোগে ঔষধ নাই, তৃষ্ণায় জল নাই! কে তাহাদের সন্ধান লয়! কে তাহাদের দেখে! বিলাসী বাবুর [illegible] চুরুটের সহিত কত পয়সা 'ছাই' হইয়া যাইতেছে, আর ইহাদিগের একমুষ্টি অন্নসংগ্রহ করিবারো সামর্থ্য নাই, সঙ্গতি নাই!

বামাচরণবাবু কহিলেন, "আহা, বেচারী এ জীবনে কম কষ্টটা সহ্য করেছে!" বৃদ্ধা সম্বন্ধে বামাচরণবাবু অনেক কথাই বলিলেন। আকৃতিতে বার্দ্ধক্য ঘনীভূত হইলেও, তাহার বয়স চল্লিশ বৎসর অতিক্রম করে নাই। নানা দুঃখে-কষ্টে তাহার শরীর ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। আরো বিশেষ করিয়া তিনি বলিলেন, এই দরিদ্রা, উপেক্ষিতা নারীর হৃদয়-সম্পদের বিশালতার কথা!

তাহার পিতা মধু ভট্টাচার্য্য ছিলেন, গ্রামের পুরোহিত। তাহার বয়স যখন তিন বৎসর, তখন অশীতিবর্ষ কোন কুলীন চূড়ামণির হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিয়া মধু ভট্টাচার্য্য আপনার স্বর্গের পথ সুপ্রশস্ত করেন। বিবাহের সময়, নানাবিধ জটিল ব্যাধিতে পাত্রের জীবনী-শক্তি একেবারে হ্রাস হইয়া আসিয়াছিল। বিবাহের ঠিক তিন দিন পরেই তাহা বিধবা হয়।

বালিকাবয়স হইতেই, বৈধব্য-ব্রতে পালিতা ব্রাহ্মণ-কন্যা তাহার নিষ্ঠার সীমা ছিল না।

তাহার বয়স, তখন, সতেরো বৎসর! তাহার দুর্ভাগ্যের কথা গ্রাহ্য না করিয়া, যৌবন আপন বিচিত্র তুলিকা-পাতে তাহার সারা অবয়ব একটি উজ্জ্বল সুকুমার শ্রীতে মণ্ডিত করিয়া তুলিল। ঠিক যেন, একখানি ভাস্বর প্রতিমা!

এই সময়, গ্রামের জমিদার যোগেন্দ্র চৌধুরীর তরুণ পুত্র নীরেন্দ্রনাথ, বি, এ পাশ করিয়া, স্কুল-প্রতিষ্ঠা, জলাশয়-খনন, চতুষ্পাঠী-

সংস্কার প্রভৃতি সৎকার্য্যে গ্রামের লোকের আদর, শ্রদ্ধা ও সম্মান অধিকার করিয়া নির্ব্বাণোন্মুখ হিন্দুজাতির আশা-প্রদীপ হইয়া উঠিল।

তাহার সহিত নীরেন্দ্রের কখনো সাক্ষাৎ বা আলাপ হইয়াছিল কি না, তাহার কথা জানা নাই। তবে, নীরেন্দ্রকে মধু ভট্টাচার্য্যের নিকট হিন্দুশাস্ত্রের গূঢ় ও গাঢ় তত্ত্বসমূহের আলোচনা করিতে অনেক সময়ই দেখা যাইত; তাহাতে কাহারো মনে কোনরূপ সন্দেহের উদয় না হইয়া, বরং আনন্দেরই সঞ্চার হইয়াছিল। অন্তরাল হইতে মুগ্ধচিত্তে শাস্ত্রালোচনা শুনিতে শুনিতে, তারা অনেকবার এই তরুণ শাস্ত্রজ্ঞের দৃষ্টি, মধু ভট্টাচার্য্যকে অতিক্রম করিয়া গৃহমধ্যে বিচরমান দেখিয়াছে! এবং গৃহমধ্যবর্ত্তিনীর দৃষ্টির সহিত সে দৃষ্টি মিলিলে, এই মেধাবী তরুণ সাধু নানারূপ অবান্তর ও অসঙ্গত তর্কে সে, লজ্জারক্তিম হইয়া উঠিয়াছে, সেটুকুও তারা একাধিকবার লক্ষ্য করিয়াছিল!

সেদিন জমিদারবাটীতে দোলপূর্ণিমা উপলক্ষে, গ্রামের স্ত্রী-পুরুষের সমাগম হইয়াছিল। ভোজনান্তে সকলে গৃহে ফিরিলে, মাষ্টার মহাশয় ও বামাচরণবাবু অনেক রাত্রি অবধি দাবা খেলিয়াছিলেন। রাত্রি অধিক হওয়ায়, বামাচরণবাবু, গৃহে না ফিরিয়া, আফিস ঘরেই নিদ্রার ব্যবস্থা করেন।

৪

বামাচরণবাবু বলিতে লাগিলেন, "ভালো নিদ্রা হইতেছিল না। তার কারণ, মশকের উৎপাতটা নিতান্তই অসহ্য বোধ হইতেছিল। দক্ষিণধারের লাইব্রেরীঘরে বায়ুর আধিক্যে, এ উৎপাত কমিবে ভাবিয়া, উপরে আসিলাম।

ঘরে প্রবেশ করিব, এমন সময়, দেখি, সম্মুখে নীরেন্দ্র। সে বাহিরে আসিতেছিল। সে কহিল, "কে?" তার কণ্ঠস্বরে কেমন একটা অস্বাভাবিক জড়তা ছিল, সে সময়, আমি তাহা অবশ্য তত স্পষ্ট লক্ষ্য করি নাই! আমি কহিলাম, "আমি।"

সে কহিল, "ডাক্তারবাবু! এ সময়, এখানে যে!" আমি কহিলাম, "নীচে, মশার উৎপাতে ঘুম হচ্ছিল না, তাই এ ঘরে হাওয়ায় শুতে এলাম; তা, তুমি এখনো শুতে যাও'নি যে—পড়ছিলে, বুঝি!"

হঠাৎ একটা ঢোক গিলিয়া, সে কহিল, "এঁ্যা—হাঁা,—ঋগ্বেদের ইংরাজী অনুবাদটা সম্প্রতি আনানো গেছে, তাই দেখছিলাম!"

আমি আদার ব্যাপারী, জাহাজের খপরে প্রয়োজন ছিল না! প্রশংসিত নেত্রে তাহার পানে একবার চাহিয়া, জানালার ধারে আসিয়া বসিলাম। সহসা নীচে পথ হইতে একটা কাতর কণ্ঠস্বর শুনিয়া আমি কহিলাম, "ও কি?" নীরেন্দ্র নিকটে আসিল। আমি বারাণ্ডায় আসিলাম! দিব্য জ্যোৎস্না রাত্রি! স্পষ্ট, সেই চন্দ্রালোকে আমি দেখিলাম, একটি স্ত্রীলোক পথের একধারে পড়িয়া;—এ কাতর স্বর, তাহারি! তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া যাইব, এমন সময় নীরেন্দ্র আমার পা দুইটা জড়াইয়া ধরিল, কহিল, "ডাক্তারবাবু, এ কথা কাকেও বলবেন না। আমার কোন দোষ নাই! কারো কোন দোষ নাই। দুজনেই আমরা নিষ্কলঙ্ক!" নীরেন্দ্র কাঁদিয়া

ফেলিল। আমি আশ্চর্য্য হইলাম, কহিলাম, "ব্যাপার কি, নীরু?"

নীরেন্দ্র কহিল, "আগে, নীচে চলুন, তার-পর সব বলব! কিন্তু দেখবেন, কেউ যেন না জানতে পারে!"

নামিয়া আসিলাম। দেখি, পথে পড়িয়া, তারা! তারার সংজ্ঞা ছিল না। অল্পে অল্পে জ্ঞান সঞ্চার হইলে, দুইজনে ধরিয়া তাহাকে লাইব্রেরী ঘরে আনিলাম। তারার পায়ের হাড় ভাঙিয়া গিয়াছিল।

সংজ্ঞা ফিরিলে, আমি ডাকিলাম,"তারা!"

তারা কাঁদিয়া ফেলিল, কহিল, "আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই!"

নীরেন্দ্র কহিল, "আমাকে ক্ষমা কর, তারা!"

কোনমতে তারাকে লইয়া অদূরে মধু ভট্টাচার্য্যের গৃহে ফিরিলাম! মধু ভট্টাচার্য্য জমিদার বাড়ী পূজা সারিয়া ভিন্ন গ্রামে বিবাহ দিতে গিয়াছিলেন। ভগবান যেন সুযোগ ঘটাইয়া দিলেন। হতভাগিনী বিধবা—তাহার বিপদে সাহায্য করিতে কেহ নাই, কিন্তু তার মাথায় বাজ ফেলিবার জন্য, লক্ষ লোক এখনি আসি উন্মত্ত হইয়া উঠিবে!

তারা তখনো কাঁদিতেছিল। সে কহিল, "আপনি বিশ্বাস করবেন, কি? সব কথা আপনাকে বলছি, শুনুন!"

তারা কহিল, কয়দিন ধরিয়া তাহার প্রাণে একটা চঞ্চলতা আসিয়াছিল! কি যেন একটা অভাব তার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়াছিল! পূজায়, বা কাজকর্ম্ম, কিছুতে যেন সে শান্তি পাইতেছিল না! এই নীরেন্দ্র, যদি একবার তাহাকে একটু আদর করিয়া ডাকে, তাহার সহিত যদি, দুইটা কথা কহে, তাহা হইলেই যেন, তাহার নারী-জীবন সার্থক হয়, এমনি একটা-কিছু তারার মনে হইতেছিল!

নীরেন্দ্রেরও দোষ ছিল। সে কেন তারাকে অদৃশ্য বন্ধনে এমন করিয়া বাঁধিতে-ছিল? সে বিধবা—তারার দিকে এমন করিয়া করুণভাবে চাহিবার অধিকারই বা তাহাকে কে দিয়াছিল?

আহারাদির পর, সে রাত্রে তারা বাবুদের নীচেকার দালানেই বসিয়াছিল—প্রতিবেশিনীদ্বয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সহসা নীরেন্দ্র আসিয়া ডাকিল, "তারা, এস!" পাছে প্রতিবেশিনীরা দেখিয়া কিছু মনে করে এই ভয়ে, ভালোমন্দ কিছু না ভাবিয়া মন্ত্র-চালিতের মত একেবারে—পাপিনী সে স্বচ্ছন্দে তাহার অনুসরণ করিল! আর, কি দুর্বৃত্ত আচরণ ও স্পর্দ্ধা, এই নীরেন্দ্রের!

বাড়ীতে সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। শুধু সিঁড়ির পাশের ঘরে চাকরটা দ্বার ভেজাইয়া, সুর করিয়া, রামায়ণ পড়িতেছিল। তারা নীরেন্দ্রের সহিত লাইব্রেরীকক্ষে আসিল।

নীরেন্দ্র ডাকিল, "তারা!" কত কোমল, মিষ্ট, সে আহ্বান! তবু যেন, তাহাতে কি একটা বিকটতা!

তখন নিমেষে তারা বুঝিয়া ফেলিল, কি এ ব্যাপার! পূর্ণিমার এত আলো, তার চোখে কালো হইয়া গেল। তার সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়া যেন বিদ্যুতের একটা তীব্র শিখা বহিয়া গেল। তার প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। সে কহিল, "আমাকে যেতে দিন, নীরুবাবু! আপনি কি সাহসে, কেন, আমাকে এখানে ডেকে আনলেন?"

নীরেন্দ্র কহিল,—তার স্বর কাঁপিয়া উঠিতেছিল,—নীরেন্দ্র কহিল, "এখনি যেও—শুধু একটিবার বল, তারা, আমাকে ভালোবাসবে ?"

ভালবাসা! মূঢ়! পিশাচ! কি তার অর্থ! কি তার সার্থকতা! কি তার ফল!

তারা বলিল, "না! যেতে দিন, আমাকে!" সে-স্বরে যেন বহ্নি ঠিকরিয়া পড়িতেছিল! বাহিরে যাইবে, এমন সময় আমারি পদশব্দ শুনিয়া তারা হঠিয়া আসিল। নীরেন্দ্র কহিল, "দেখ দেখি, কি সর্ব্বনাশ! এখনি আমার সুনাম নষ্ট হবে—অকলঙ্ক চরিত্রে দাগ পড়বে। তোমারো তাই হবে! এখন, উপায়!"

উপায় নাই! কি হইবে! তারা মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা না করিয়া, পাশের বারাণ্ডা হইতে একেবারে নীচে লাফাইয়া পড়িয়াছে!

শেষ রাত্রে তারার সম্বন্ধে যথোচিত ব্যবস্থা করিয়া গৃহে ফিরিলাম।

প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গে বাহিরে আসিয়া দেখি, নীরেন্দ্র দাঁড়াইয়া আছে! সে একেবারে আমার পায়ে ধরিয়া কাঁদে, "ডাক্তারবাবু, দেখবেন, যেন কেউ এ কথা না জানতে পারে! তা হলে, আর আমার মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না! আর, সমাজে বেচারী তারারো লাঞ্ছনার সীমা থাকবে না!"

হায়, স্বার্থপর, কাপুরুষ, এমনিভাবেই তুমি অসহায়া নারীর সর্ব্বনাশে উদ্যত হইয়াছিলে!

আমি কহিলাম, "কোন ভয় নাই, তোমার!"

নীরেন্দ্র চলিয়া গেল। মধু ভট্টাচার্য্য ফিরিলে, তাঁহাকে বুঝাইলাম, রাত্রে হঠাৎ রোয়াক হইতে পড়িয়া তারার পা ভাঙিয়া গিয়াছে!

ভাঙা পা, এ জীবনে, আর, তেমন করিয়া জোড়া লাগিল না।

এইটুকু ভিন্ন, তারার জীবনে, আর, এতটুকু গোপনতা, এতটুকু কলঙ্ক নাই! নিষ্ঠাবতী, করুণাময়ী নারী, সকলের সুখে-দুঃখে, আজীবন সহানুভূতি দেখাইয়া আসিয়াছে! আজ সে নাই, তাই কথাটুকু আপনাকে বলিলাম!"

আমি কহিলাম, "আর, নীরেন্দ্রের সংবাদ কি ?"

"সে, এখন, কলিকাতায় থাকে! তার সুচরিত্রে অবশ্য কোন দাগ পড়ে নাই! এই ঘটনার কিছুদিন পরেই সে কলিকাতা চলিয়া যায়। খবরের কাগজে, তার নাম দেখেন না ? সে যে, এই মর্লির রিফর্ম্মের পর, কাউন্সিলের মেম্বর হইবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছে! এবং এ বিষয়ে সম্ভাবনাও নাকি তার বেশ আছে, শুনিতে পাই!"

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

অভিসার।

এতটুকু ক্ষুদ্র প্রাণ, ক্ষুদ্র বক্ষে মোর,
চাহেনা থাকিতে বন্দী। সে যে গো বিভোর
নিখিলের প্রেমতীর্থে যাইতে একেলা,
বহিঃশিরে হৃদয়ের শত লীলা খেলা।
যাঁর বলে ক্ষুদ্র প্রাণ করে অভিসার,
সে শক্তি প্রাণের নহে—শক্তি বিধাতার।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা। *

* গত চৈত্রে জিজ্ঞাসা নামক কবিতার লেখকের পদবী ভুল লিখিত হইয়াছে। লেখক মাইতি নহেন মহিন্তা।

কীটভুক বা মাংসাশী উদ্ভিদ্‌।

প্রকৃতিদেবীর অনন্তরাজ্যে যে কত আশ্চর্য্য বস্তু আছে এবং নিয়ত কত আশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটিত হইতেছে তাহার কে নির্ণয় করিতে পারে? আজ সমস্ত সভ্যজগৎ বিজ্ঞানের অপূর্ব্ব আলোকে সমুদ্ভাসিত। বিজ্ঞানের সেই অপূর্ব্ব আলোকরশ্মিপাতে প্রকৃতিদেবীর অঞ্চলাবৃত অনেক রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়া আজ আমাদের সমক্ষে দেদীপ্যমান। পাশ্চাত্যদেশের উদ্ভিদ্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ তাঁহাদের বিজ্ঞানচর্চ্চার ও তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসার ফলে উদ্ভিদ্‌জগতেও অনেক আশ্চর্য্য এবং অলৌকিক ঘটনার আবিষ্কার করিয়াছেন। আজ এই প্রবন্ধে উদ্ভিদ্‌জাতির মধ্যে মাংসাহারের প্রচলন বিষয়ক একটি আশ্চর্য্য ঘটনার আলোচনা করিব। যাঁহারা "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" এই নীতিবাক্য অনুসরণ করিয়া স্বচ্ছন্দবনজাত উদ্ভিদের দ্বারা উদরপূর্ত্তিকরতঃ সাত্ত্বিকাহারের আনন্দ উপভোগ করেন তাঁহারা বোধহয় এই প্রবন্ধ পাঠে একটু বিস্মিত ও বিচলিত হইবেন। তবে উদ্ভিদের মধ্যে মাংসাহারের প্রচলনহেতু সাত্ত্বিকাহারের ব্যাঘাত ঘটিবার কোন সম্ভাবনা নাই, কারণ সকল উদ্ভিদই মাংসাশী নহে এবং নিম্নবর্ণিত কীটভুক্ উদ্ভিদ্‌গুলি আজও মনুষ্যের খাদ্যশ্রেণীভুক্ত হয় নাই।

বোধহয় সকলেই অবগত আছেন যে যেমন জীবজন্তুর দেহপুষ্টিসাধনার্থ আহারের প্রয়োজন হয় তেমনি উদ্ভিদদেহপোষণের জন্য উদ্ভিদসকলের খাদ্যের আবশ্যক হয়। উদ্ভিদজাতির মধ্যে যদিও রন্ধনের কোন সুব্যবস্থা নাই বা আহার্য্য প্রস্তুত করণানন্তর মুখগহ্বরে প্রেরণ করার কোন সুবন্দোবস্ত নাই তথাপি ইহারা খাদ্যোপকরণগুলি নানা উপায়ে সংগ্রহ করিয়া এবং সুপাচ্য অবস্থায় রূপান্তরিত করিয়া তদ্দ্বারা জীবনধারণ করে। রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা জানা যায় যে কয়েকটী মৌলিক পদার্থের দ্বারা উদ্ভিদদেহ গঠিত হয় এবং উদ্ভিদদেহ পোষণের জন্যও এই কয়েকটী পদার্থ আবশ্যক। এই মৌলিক পদার্থগুলি সংখ্যায় ১১।১২টী হইবে; যথা— Carbon (অঙ্গারজান), Hydrogen (জলজান), Oxygen (অম্লজান), Nitrogen (যবক্ষারজান), Sulphur (গন্ধক), Phosphorus, Potassium, Calcium, Magnesium, Iron (লৌহ), Chlorine এবং Silicon। এই পদার্থগুলি উদ্ভিদ্ সকল স্ব স্ব প্রয়োজনানুসারে বায়ু বা মৃত্তিকা হইতে সংগ্রহ করে। এই পদার্থগুলি সতত মৃত্তিকাতে প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে এবং উদ্ভিদ সকল যাহার যে পরিমাণে যে পদার্থ আবশ্যক তাহা দ্রব অবস্থায় জলের সহিত শিকড় দ্বারা মৃত্তিকা হইতে শোষণ করে। আবার বায়ু হইতেও অঙ্গারজান প্রচুর পরিমাণে ও সামান্য পরিমাণে জলজান, অম্লজান ও যবক্ষারজান গ্রহণ করে। সকল উদ্ভিদেরই আবার বায়ুস্থিত যবক্ষারজান (Nitrogen) সংগ্রহ করিবার শক্তি নাই। Leguminosœ শ্রেণীভুক্ত অড়হর, মটর, কলাই ইত্যাদি কয়েকটী উদ্ভিদের বায়ু হইতে যবক্ষারজান সংগ্রহ করার,

বিশেষ শক্তি আছে এবং তজ্জন্য বিশেষ উপায়ও আছে। এই জাতীয় উদ্ভিদ্ ব্যতীত অপর জাতীয় উদ্ভিদেরা শুদ্ধ মৃত্তিকা হইতে যবক্ষারজান সংগ্রহ করে। যবক্ষারজান উদ্ভিদের খাদ্যের একটী প্রধান অংশ এবং উদ্ভিদের ভূমিগৃহীত খাদ্যের মধ্যে ইহাকে শীর্ষস্থান দেওয়া যাইতে পারে। কীটভুক্ উদ্ভিদ্‌গুলি সাধারণতঃ জলাময় বা শৈবালাচ্ছাদিত জমীতে জন্মে এবং এরূপ মাটিতে পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্যের বিশেষ অভাব, যবক্ষারজান ত আদৌ মিলে না। উক্ত উদ্ভিদ্‌গুলি বায়ু হইতে কিছু কিছু খাদ্যোপকরণ সংগ্রহ করে বটে কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি বায়ুস্থিত যবক্ষারজান ইহারা গ্রহণ করিতে পারে না। এই যবক্ষারজান সংগ্রহের জন্যই ইহাদিগকে অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হয় এবং এই জন্যই ইহারা মাংসাহার করিয়া থাকে। মাংসাহারের অভাব ঘটিলে এই গাছগুলি শীঘ্রই নিস্তেজ হইয়া পড়ে। কীট, পতঙ্গ ইত্যাদি আক্রমণ করিবার ফাঁদ এক এক গাছে এক এক রকম, তবে সকল গাছেই রূপান্তরিত পত্রের দ্বারায় এই কার্য্য সম্পাদিত হয়।

Drosera (ড্রোসেরা বা নীহারিকা)*— কীটভুক্ উদ্ভিদের মধ্যে ইহার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ ইহা পৃথিবীর অনেকস্থলেই পাওয়া যায়। এই গাছগুলি জলাভূমিতে বা শৈবালাচ্ছাদিত জমীতে জন্মে। ছোটনাগপুরের অন্তর্গত হাজারিবাগের ঝিলের (artificial lake) ধারে এই উদ্ভিদ্ খুব দেখিতে পাওয়া যায়। গাছগুলি দেখিতে খুব ছোট প্রত্যেক

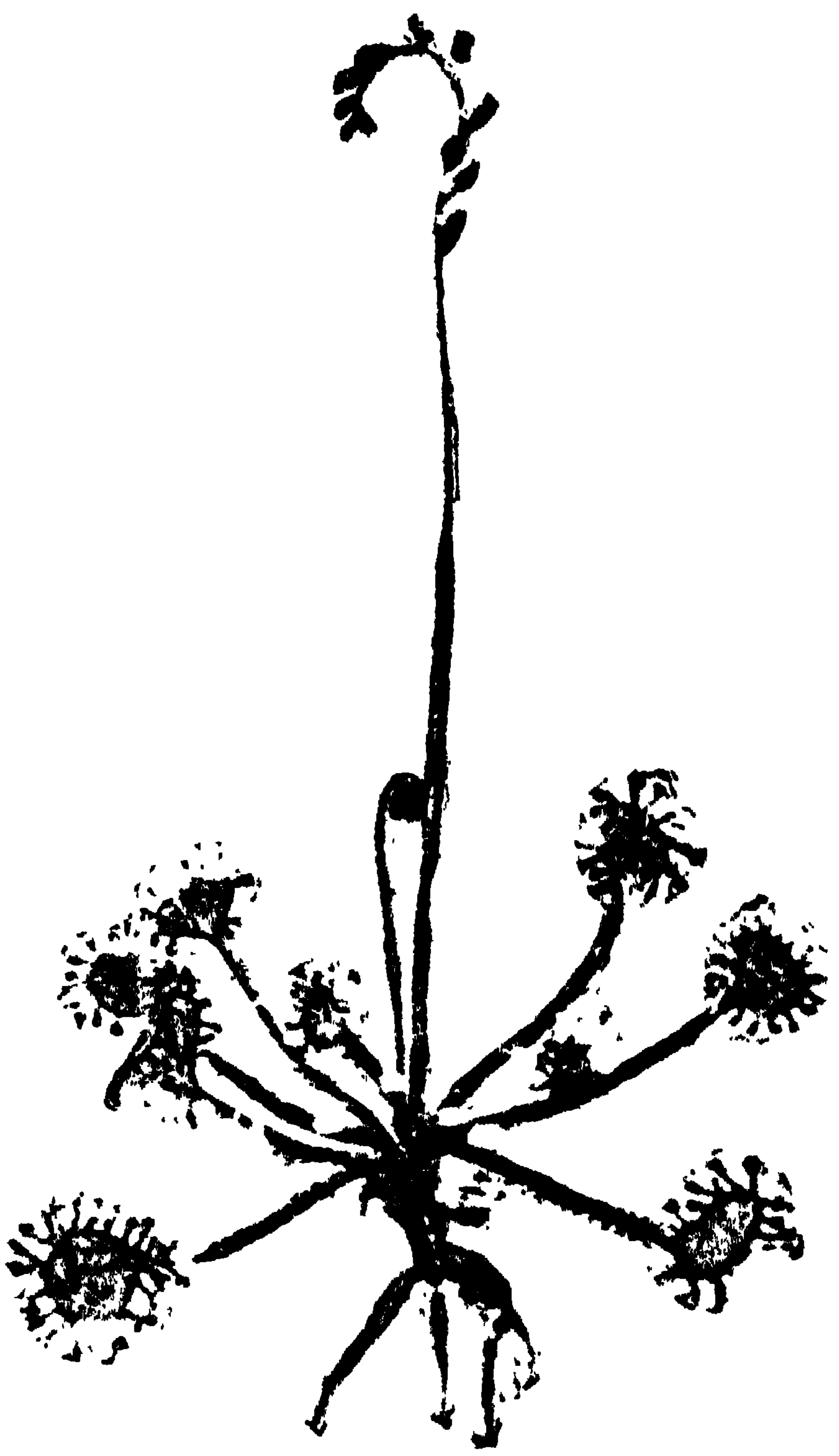

(১ম চিত্র) ড্রোসেরা।

গাছে ৫।৭টী পাতা থাকে। এই পাতার দ্বারায় কীট আক্রমণ ও ভক্ষণকার্য্য সংসাধিত হয়। ইহার শিকড় খুব ছোট এবং শিকড় দ্বারা জলশোষণ করে। পুষ্পিতাবস্থায় গাছের মধ্যভাগ হইতে একটী পুষ্পদণ্ড বহির্গত হয় এবং তাহাতে অনেক পুষ্প দেখা যায়।

প্রত্যেক পাতার উপরিভাগে সূক্ষ্ম সূত্রবৎ বা খুব সরু চুলের মত অসংখ্য শুঁয়া (tentacles) আছে। পাতার মধ্যভাগে যে সকল শুঁয়া

* আমাদের দেশে এই উদ্ভিদের কোন নামকরণ হয় নাই, এইজন্য পাশ্চাত্য নামের (Sundew) অবলম্বনে ইহাকে "নীহারিকা" আখ্যা দিলাম। এই Drosera জাতীয় অন্য একটি উদ্ভিদ্‌কে হিন্দিভাষায় "মুখ-জলি" বলে।

আছে তাহা থর্ব্বাকৃতি এবং একটু সবুজ রঙের এবং পাতার কিনারায় যেগুলি আছে সেগুলি ঈষৎ লম্বা ও একটু বেগুণে রঙের এবং এই শুঁয়াগুলি একটু বাহিরের দিকে হেলিয়া থাকে। প্রত্যেক শুঁয়ার (tentacle) শিরোভাগে একটী ডিম্বাকৃতি গ্রন্থি (gland) আছে। এই গ্রন্থি খুব সূক্ষ্ম, [illegible] ইঞ্চি লম্বা। এই গ্রন্থিগুলি হইতে একপ্রকার আটাযুক্ত তরল পদার্থ নির্গত হইয়া ইহাদিগকে সিক্ত ও বেষ্টিত করিয়া রাখে। এই তরল পদার্থবিন্দুবেষ্টিত গ্রন্থিগুলি ঠিক নীহার বিন্দুর ন্যায় প্রতীয়মান হয় এবং সূর্য্যরশ্মিপাতে উজ্জ্বল হইয়া চক্‌চক্ করে, এইজন্য ইহাকে পাশ্চাত্যভাষায় Sundew বলে।

এই গ্রন্থিগুলি খুব সহজেই উত্তেজিত হয় এবং অল্প উত্তেজনাতেই সাড়া দেয়। উপর্য্যুপরি ৩।৪ বার স্পর্শ করিলে বা কোন দ্রব্যের কণামাত্র কোন গ্রন্থির উপর স্থাপন করিলে ইহা উত্তেজিত হয় এবং উত্তেজনার ফলে সেই উত্তেজিত গ্রন্থিসংলগ্ন শুঁয়াটি নত হয় এবং তৎপ্রেরিত একটী শক্তিপ্রবাহ (motor impulse) অন্যান্য শুঁয়াগুলিতে পৌঁছাইয়া তাহারাও উত্তেজিত হইয়া উত্তেজক দ্রব্যের উপর নত হইয়া পড়ে। শুঁয়াগুলির সম্পূর্ণভাবে নত হইতে ১ঘণ্টা লাগে এবং স্থলবিশেষে ৪।৫ ঘণ্টাও লাগে। পরীক্ষার দ্বারা জানা গিয়াছে যে যবক্ষারজানীয় (Nitrogenous) কোন দ্রব্যের দ্বারা উত্তেজিত হইলে শুঁয়াগুলি শীঘ্রই উত্তেজক দ্রব্যের উপর নত হইয়া পড়ে এবং ঐ নত অবস্থায় অনেকক্ষণ অবস্থান করে। কোন গ্রন্থির উপর সামান্য একটু মাংসের কণা দিয়া দেখা গিয়াছে যে ঐ গ্রন্থিসংলগ্ন শুঁয়াটী ১০ সেকেণ্ডের মধ্যে বক্র হইতে আরম্ভ করিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই সম্পূর্ণভাবে নত হইয়া পড়ে। শুঁয়াগুলি একবার উত্তেজক দ্রব্যের উপর নত হইলে তাহাদিগের কর্ত্তব্য কার্য্য সমাপনান্তে পুনরুত্থান করে। শুঁয়াগুলিকে নত অবস্থায় ১ দিন, ২ দিন এবং স্থলবিশেষে ৭ দিন পর্য্যন্ত থাকিতে দেখা যায়। এই সময়ের ন্যূনাধিক্য অনেকটা পাতার শক্তির ও বয়সের উপর এবং উত্তাপের (temperature) উপর নির্ভর করে।

এই গ্রন্থিগুলি এত সহজেই উত্তেজিত হয় (Sensitive) যে মহাত্মা ডারুউইন একগাছি সরু কেশের সূক্ষ্মাগ্রভাগ হইতে দুইটী কণামাত্র লইয়া একটা পাতার দুইটী স্বতন্ত্র গ্রন্থির উপর স্থাপন করিয়া দেখিলেন যে এই গ্রন্থিসংলগ্ন শুঁয়া দুইটী ১ঘণ্টা ১০মিনিটের মধ্যেই অনেকটা নত হইয়া পড়িল। এই কেশের একটী কণার ওজন [illegible] গ্রেণ এবং [illegible] ইঞ্চি লম্বা এবং অপর কণাটি [illegible] ইঞ্চি লম্বা ছিল। [illegible] ইঞ্চি লম্বা এবং [illegible] গ্রেণ ওজনের কোন দ্রব্যের কণা দ্বারাও গ্রন্থি উত্তেজিত হইতে পারে।

যে রসের দ্বারা গ্রন্থিগুলি সর্ব্বদা সিক্ত ও বেষ্টিত থাকে তাহা গ্রন্থি হইতেই নিঃসৃত হয়। এই রস খুব আটাযুক্ত এবং নাতিতরল। যখন গ্রন্থিগুলি কোন উত্তেজক দ্রব্যের দ্বারা উত্তেজিত হয় তখন উহা হইতে প্রভূত পরিমাণে এই রস নির্গত হইতে থাকে, এবং তখন এই রসে একপ্রকার acid বা অম্লরস দেখিতে পাওয়া যায়। এই অম্লরসের দ্বারা

পরিপাকক্রিয়া সংসাধিত হয়। যবক্ষারজাতীয় কোন দ্রব্যের দ্বারা গ্রন্থিগুলি উত্তেজিত হইলে এই রস খুব বেশী পরিমাণে নির্গত এবং অম্লত্ব প্রাপ্ত হয়। জীবজন্তুর পরিপাকক্রিয়া যে Gastric juice দ্বারা সাধিত হয় তাহাতে যেমন একটী acid (Hydrochloric acid) ও একটি ferment (Pepsin) আছে, তেমনি এই গ্রন্থি-নিঃসৃত রসেও একটী acid ও একটী ferment আছে এবং এতদ্দ্বারা পরিপাক ক্রিয়া সম্পাদিত হয়।

শুঁয়াগুলি উত্তেজক দ্রব্যের উপর নত হইয়া কর্ত্তব্যকার্য্য সমাপনান্তে যখন পুনরুত্থান করে তখন গ্রন্থিগুলি শুষ্ক থাকে। ইহা হইতে রস নির্গত হয় না, ইহাতে প্রকারান্তরে গাছের উপকার সাধিত হয়। ভুক্তাবশিষ্ট যাহা থাকে তাহা বায়ু দ্বারা পরিষ্কৃত হইয়া যায়, শুঁয়াগুলি সম্পূর্ণভাবে পূর্ব্বভাব ধারণ করিলে পুনরায় গ্রন্থি হইতে পূর্ব্ববৎ রস নির্গত হইতে থাকে।

এই পাতাগুলি দ্বা কীট আক্রান্ত ও বিনষ্ট হইয়া থাকে। গাছের কোনপ্রকার গন্ধে আকৃষ্ট হইয়াই হউক বা আশ্রয়াশয়েই হউক যখন কোন ক্ষুদ্র কীট এই পাতার উপর বসে, তখন সেই স্থানের গ্রন্থি-নিঃসৃত আটাযুক্ত রসে আটকাইয়া যায়; এবং সেই গ্রন্থিগুলিও তৎক্ষণাৎ উত্তেজিত হইয়া অন্যান্য শুঁয়াগুলিতে একটী শক্তি প্রবাহ প্রেরণ করে। ফলে এই শুঁয়াগুলিও উত্তেজিত হইয়া ঐ কীটের উপর নত হইয়া পড়ে এবং গ্রন্থিগুলি হইতে প্রভূতপরিমাণে রস নির্গত হইতে থাকে। কীট এই রসসিক্ত হইয়া শীঘ্রই বিনষ্ট হয়। ডাক্তার নিৎকের (Dr. Nitschke) মতে পত্রাসীন কীট ১৫ মিনিটের মধ্যেই রসে কণ্ঠনালী রোধ হইয়া প্রাণ হারায়। কখন কখন সমস্ত পাতাটি বক্র ভাবাপন্ন হইয়া একটী পেয়ালার (Cup) ন্যায় আকার ধারণ করে এবং এইরূপে একটি কৃত্রিম পাকাশয়ের সৃষ্টি হয়। গ্রন্থি হইতে রস খুব প্রচুর পরিমাণে নির্গত হইতে থাকে এবং ইহাতে যে acid ও ferment আছে তদ্দ্বারা পরিপাকক্রিয়া সাধিত হয়। কীট হইতে সারাংশটুকু এই গ্রন্থি দ্বারা শোষিত হইয়া উদ্ভিদ দেহের পুষ্টি সাধন করে।

Dionæa (ডাইওনিয়া)।—এই গাছও পাতার দ্বারা কীট আক্রমণ ও ভক্ষণ করে। এই পাতার বোঁটা প্রশস্ত এবং ইহার

(২য় চিত্র) ডাইওনিয়া।

মধ্যভাগস্থ শিরা দ্বারা পাতাটী দুই অংশে এইরূপভাবে বিভক্ত যে আবশ্যক হইলে একাংশ অপরার্দ্ধের উপর সহজেই নত হইতে পারে, এবং মধ্যস্থ শিরাটী কব্জার ন্যায় কাজ করে। পাতার পার্শ্ব হইতে অনেকগুলি সুঁচাল কাঁটা বাহির হইয়া থাকে। পাতার উপরিভাগ

অনেকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গ্রন্থিদ্বারা সমাবৃত। পাতার প্রত্যেক অর্দ্ধাংশে তিনটী শুঁয়া ত্রিকোণভাবে সংস্থিত। এই শুঁয়াগুলি সহজেই এবং শীঘ্রই উত্তেজিত হয়। কোন কীট এই পাতার উপর বসিয়া এই শুঁয়া স্পর্শ করিলে তৎক্ষণাৎ পাতার উভয় অংশ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হইয়া যায়। জাঁতিকলে ইঁদুর পড়িলে যেমন হয় সেইরূপে তাহা তৎক্ষণাৎ সজোরে বন্ধ হইয়া যায়। এইজন্য ইংরাজী ভাষায় ইহাকে Venus' Fly-trap বলে। কীট এই পত্র মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পত্রের উভয় অংশের চাপে শীঘ্রই পিষ্ট হইয়া যায়। পত্রস্থ গ্রন্থিগুলি প্রথমে বেশ শুষ্ক থাকে কিন্তু শিকার মিলিলে এই গ্রন্থিগুলি হইতে প্রচুর পরিমাণে রস নির্গত হইতে থাকে. এবং তাহা দ্বারা এই কৃত্রিম পাকাশয়ে পরিপাকক্রিয়া সংসাধিত হয়।

Nepenthes বা কুম্ভমুখী গাছ।—

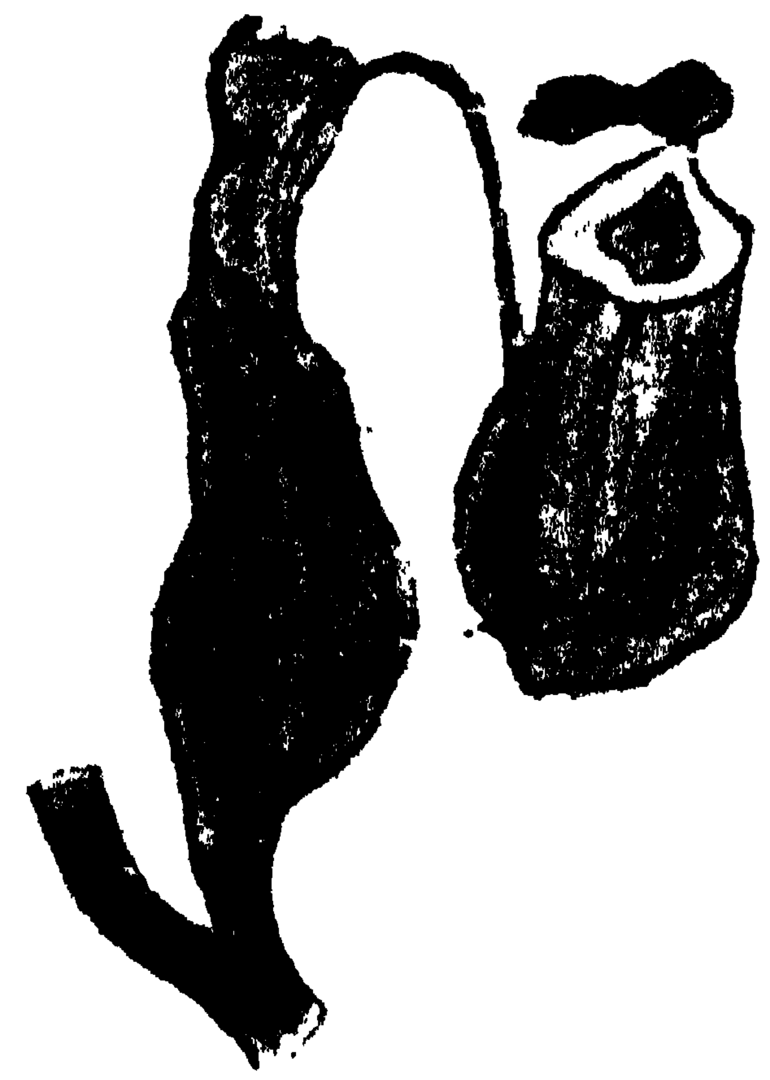

(৩য় চিত্র) কুম্ভমুখী।

এই উদ্ভিদের পত্র রূপান্তরিত হইয়া কুম্ভাকৃতি ধারণ করে। এই রূপান্তরিত পত্রের নিম্নভাগটী প্রশস্ত, তার পর লতাতন্তুর ন্যায় সরু হইয়া শিরোদেশে ঠিক কলসীর ন্যায় একটি পাত্র ধারণ করে। এই কুম্ভাকৃতি পাত্রের মুখে একটী আবরণ (lid) আছে এবং মুখটি সাধারণতঃ খোলা থাকে। এই পাত্রের আভ্যন্তরীণ গাত্রে অনেকগুলি সূক্ষ্ম গ্রন্থি আছে, তাহা হইতে নির্গত একপ্রকার জলীয় পদার্থে কুম্ভের প্রায় ১/৩ অংশ পূর্ণ থাকে। কলসীর আবরণে ও মুখে অনেকগুলি গ্রন্থি আছে, তাহা হইতে মধু ক্ষরিত হয়। কোন কীট মধুলোভে এই পাত্রে পড়িলেই সলিল-সমাধি প্রাপ্ত হয়! এই কুম্ভস্থ জলীয় পদার্থে যে acid ও ferment আছে তদ্দ্বারা পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই উদ্ভিদ্গুলি "বিষকুম্ভ পয়োমুখ"। পাত্রের মুখে ও আবরণে মধুক্ষরিত হয় এবং তদ্দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া কোন কীট মধু আহরণে আসিলে পাত্রাভ্যন্তরস্থ জলীয় পদার্থে নিপতিত হইয়া প্রাণ হারায়। এই "বিষকুম্ভ পয়োমুখ" জাতীয় আরও নানা আকারের উদ্ভিদ্ আছে যথা Cephalotus, Sarracenia ইত্যাদি।

(৪র্থ চিত্র)

Sarracenia সারাসিনিয়ার পত্র রূপান্তরিত হইয়া ভিস্তির ন্যায় আকার ধারণ করে। এই ভিস্তির ন্যায় পাত্রের মুখ ও রঙ্গীণ আবরণ হইতে মধু ক্ষরিত হয়। এই মধু দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া কীট পাত্রাভ্যন্তরস্থ জলে পতিত

হইয়া মরিয়া যায়। কিন্তু এই পাত্রাভ্যন্তরস্থ জলীয় পদার্থের পরিপাক করিবার শক্তি নাই। এই পাত্রে একসঙ্গে অনেকগুলি কীট দেখিতে পাওয়া যায়। পাত্রস্থ জলে পতিত হইয়া এই কীটগুলি শীঘ্রই পচিতে আরম্ভ করে। অনেক কীট ও পতঙ্গ আছে যাহারা এই গাছ ভক্ষণ করে এবং অনেক কীট এই পাত্রে ডিম্ব প্রসব করে, এবং এই অণ্ডোদ্গত কীট পাত্রস্থ বিকৃত ও গলিত পদার্থ হইতে আহার্য্য সংগ্রহ করে। সময়ে সময়ে পক্ষীরা চঞ্চুদ্বারা এই পাত্র দ্বিখণ্ডিত করিয়া অণ্ডোদ্গত কীটগুলি ভক্ষণ করে।

এই জাতীয় উদ্ভিদ্‌গুলি আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া দেশে পাওয়া যায়।

Utricularia বা Bladder-wort (ঝাঁজি) এগুলি প্রায়ই জলে ভাসিয়া থাকে। হাজারীবাগে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার প্রত্যেক পাতা বহুভাগে বিভক্ত এবং এক একটী পাতায় অনেকগুলি থলি (bladder) আছে। এই থলি ⅛ ইঞ্চি লম্বা এবং প্রত্যেকের মুখে ৬।৭টা লম্বা শুঁয়া আছে। থলির মুখে একটি অন্তর্মুখীণ পাতলা স্বচ্ছ পর্দ্দা valve আছে এবং এই পর্দ্দা অনেকগুলি গ্রন্থি দ্বারা এবং থলির আভ্যন্তরীণ পাত্র অনেকগুলি সূক্ষ্ম শুঁয়ার দ্বারা সমাবৃত। ছোট ছোট জলের কীট এই পর্দ্দা ভিতরদিকে ঠেলিয়া সহজেই থলিয়ার ভিতর প্রবেশ করে। প্রবেশ করার পরই পর্দ্দা বন্ধ হইয়া যায়। এই থলিয়া হইতে কোন প্রকার রস নিঃসৃত হয় না। কীট এই থলিয়াতে প্রবেশ করিয়া পচিতে আরম্ভ করিলে তাহা হইতে এই গাছ কিছু কিছু রস শোষণ করে।

(৫ম চিত্র)
ঝাঁজি

কেবলমাত্র উদ্ভিদ বিষয়ে নহে, সকল বিষয়েই পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ কত নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়া, কত বিচিত্র রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া জগতের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতেছেন, বিজ্ঞানের বলে বিজ্ঞানের লীলাভূমি জর্ম্মাণিতে সামান্য আলকাতরা হইতে নানা রকম রং, সুমিষ্ট শর্করা এবং এমন কি Tonone (টোনোন) নামে একপ্রকার সুগন্ধিদ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে। এই বিজ্ঞানের সহায়তায় জর্ম্মাণি কৃত্রিম নীল আবিষ্কার করিয়া ভারতের নীলের ব্যবসায়ের মূলে কুঠারাঘাত করিতে সমর্থ হইয়াছে। বিজ্ঞানের প্রসাদে আজ সমগ্র সভ্যজগত সুখসমৃদ্ধি সম্পন্ন। বিজ্ঞানের কল্যাণেই আজ সমস্ত সভ্য জাতির মধ্যে জাপান সমুচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু ভারত যে তিমিরে সে তিমিরে স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমি আজ দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত, দারিদ্র্যজর্জ্জরিত। তাই বলি ভারতবাসি! যদি দেশের কল্যাণ চাও তবে বিজ্ঞানের সেবা কর। বিজ্ঞানের ঐন্দ্রজালিক স্পর্শ ব্যতীত ভারতের লুপ্ত বিদ্যা সঞ্জীবিত হইবে না। বিজ্ঞানের সুপবন প্রবাহিত না হইলে দেশ হইতে দারিদ্র্য-কুজ্ঝটিকা অপসারিত হইবে না।

শ্রী শ্রীশচন্দ্র সিংহ, এম, এ।

চয়ন।

যবদ্বীপে—বুইতেন্‌জর্গ।

সোমবার, ৩রা ডিসেম্বর।

বাতাবিয়া হইতে বুইতেন্‌জর্গ পর্য্যন্ত এক ঘণ্টার রেল-পথ। বুইতেন্‌জর্গ—ওলন্দাজ-ভারতের বড়লাটের বাসস্থান, বিশেষতঃ একটি বৈজ্ঞানিক উদ্ভিদ্ উদ্যানের জন্য ইহা বিখ্যাত। আজ সারা প্রাতঃকালটা এই চমৎকার উদ্যানটিতে ভ্রমণ করিয়া বড়ই আনন্দলাভ করিলাম—ইহার যে একটা বিশ্বব্যাপী খ্যাতি আছে, বাস্তবিকই ইহা সেই খ্যাতির যোগ্যপাত্র।

প্রথমতঃ ইহা বিজ্ঞানের একটি রত্ন-ভাণ্ডার। এখানে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় দশসহস্র উদ্ভিদ ও প্রত্যেক জাতীয় উদ্ভিদের দুইটি করিয়া নমুনা আছে। বৃক্ষ ও চারা-গাছগুলি অনাবৃত স্থানে সংরক্ষিত; ঢাকা কাচ গৃহের মধ্যে সুরক্ষিত চারাগাছগুলাকে যেরূপ সুচারু রূপে শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়া থাকে, এই সকল গাছগুলাকেও সেইরূপ শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে। এক পরিবারের অন্তর্ভূত উদ্ভিদদিগকে একই স্থানে পুঞ্জীভূত করা হয়; প্রত্যেক চারাগাছের গায়ে উহার ক্রম-সংখ্যা লিখিত থাকে এবং একটা কাষ্ঠখণ্ডের উপর উহার নাম নির্দ্দেশ করা হয়।—উদ্যানের অন্য একভাগে এই বৈজ্ঞানিক উদ্যানের সহিত একটি পরীক্ষা-উদ্যান সংযোজিত। বাগানরোপযোগী প্রয়োজনীয় গাছের চারাগুলি কি নিয়মে পরিবর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হয় তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা, নূতন কোন চাষের ও নূতন কোন সারমাটির পরীক্ষা করা—ইহাই এই পরীক্ষা-উদ্যানের কাজ। আবার ইহার সংলগ্ন কতকগুলি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার স্থাপিত হওয়ায় এই পরীক্ষা-উদ্যানটি পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। এই বৈজ্ঞানিক উদ্ভিদ্-উদ্যানে দুইটি ব্যাপার একসঙ্গে অনুসৃত হয়;—একদিকে নিঃস্বার্থ জ্ঞানের অনুশীলন, আর একদিকে, জাতীয় সমৃদ্ধি সাধন করিবার জন্য, বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলি কৃষিকার্য্যে প্রয়োগ করা।

কলাসৌন্দর্য্যের হিসাবেও এই উদ্যানটি অতীব মনোরম। ইহার পরিবেষ্টনটি কবিত্বময়; উহার প্রত্যেক দিকে, দুইটা বৃহৎ পর্ব্বতের দৃশ্য। উদ্যানের মধ্য দিয়া একটা নদী বহিয়া গিয়াছে; আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী চারিদিক হইতে ইহার সহিত মিলিত হইয়া উদ্যানটিকে বিখণ্ডিত করিয়াছে। খরতাপ ও নিত্য বৃষ্টির প্রভাবে এখানে উদ্ভিজ্জের অত্যন্ত প্রাচুর্য্য। বিশেষতঃ এখানকার লতাকুঞ্জ ও তালজাতীয় তরুপুঞ্জের সন্নিবেশে আমি বড়ই মুগ্ধ হইয়াছি। লতাগুলি বড় বড় "ক্যানারী" গাছকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে;—আবার এই লতাগাছগুলাও পরগাছায় আচ্ছন্ন—সমস্ত মিলিয়া যেন উদ্ভিদের একএকটা বৃহৎ হরিৎ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। বিভিন্ন জাতীয় বহুসংখ্যক তালগাছ।

একটা সরু তরু-পথ বাঁকিয়া গিয়াছে—Brazil দেশের মসৃণ কাণ্ডবিশিষ্ট তালতরুর ছায়ায় ছায়াময়;—তালপত্র সকল নীচের

দিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। তাহাতে পথটির অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। বড়লাটের প্রাসাদ, ধবল মর্ম্মর-প্রস্তরে গঠিত—উদ্ভিদ্ উদ্যানের একেবারে পার্শ্বদেশে অধিষ্ঠিত। উদ্যানের ঘোর শ্যামলতার মধ্যে প্রাসাদের শুভ্রতা যেন আরও ফুটিয়া উঠিয়াছে।

উদ্যানে অনেকক্ষণ বেড়াইয়া, তাহার পর বড়লাটের সেক্রেটারির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। এই উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ আমাকে খুব আদর অভ্যর্থনা করিলেন; 'জোক্‌জকর্ত্তা' ও 'সিয়াকর্ত্তা'—এই দুই দেশীয়-সুলতানের এলাকার মধ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার আমাকে প্রদান করিলেন এবং অনেকগুলি শাসনকর্ত্তার নামে পরিচয়-পত্রও দিলেন। বড়লাট বড় চাপা লোক; আমি তাঁহাদের জাভা-উপনিবেশ-রাজ্যের শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করায়, তিনি তাহার ঠিক উত্তর না দিয়া, বাজে কথায় কথা চাপা দিলেন। তিনি বলিলেন—বড় দুঃখের বিষয়, যে সকল ফরাসী, রাষ্ট্রনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক বিষয়ের অনুশীলন করিবার জন্য এদেশে আসেন, তাঁহারা ওলন্দাজিভাষা একেবারেই জানেন না।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পূর্ব্বে, হোটেলের স্বত্বাধিকারীগণের সহিত আমার বাক্যালাপ হইল। এই হোটেলের ফরাসী নাম "Hotel du chemin de fer"—অর্থাৎ রেলপথের হোটেল। মনে হয়, যে সকল ফরাসী পুরুষ ও রমণী এদেশে আসিয়া আড্ডা গাড়িয়াছে, তাহারা সকলেই নিজ নিজ কাজে বেশ সফলতা লাভ করিয়াছে। একটি ফরাসী রমণী (Samarang) সামারঙের দর্জ্জি ও বেশবিন্যাস-শিল্পিদিগের মধ্যে একজন প্রধান বলিয়া পরিগণিত; এদেশে আসিবার সময় তিনি একটি ফরাসী সহকারিণীকে তাঁহার সঙ্গে আনিয়াছিলেন। "বুনো লোকদিগের সহিত একত্র বাস করিতে হইবে" এই মনে করিয়া তাঁহার সেই সহকারিণী একেবারে বিস্ময়বিহ্বল হইয়াছিল।—জাভার ফরাসীরা, না জানে ওলন্দাজি ভাষা, না জানে মালাই ভাষা। সৌভাগ্যের বিষয়, অধিকাংশ ওলন্দাজ ফরাসী ভাষায় কথা কহিতে পারে। তাহাতেই একরূপ কাজ চলিয়া যায়। ওলন্দাজের অধিকৃত জাভাদেশকে ফরাসীভাষার দেশ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

অপরাহ্ণে, য়ুরোপীয় অঞ্চলটা পর্য্যটন করিলাম। বড় বড় গাছের মধ্যে বাড়ীগুলি অধিষ্ঠিত—মনে হয় যেন উদ্ভিদ্ উদ্যানটি আরও দীর্ঘাকৃতি হইয়া তাহারই মধ্যে বাড়ীগুলি প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছে। উদ্যানের দেশীয় মজুরদিগের গ্রাম দেখিতে গেলাম। খোঁটার উপরে স্থাপিত, চুনকাম-করা ছোট ছোট কতকগুলি কাঠের বাড়ী। চীনে অঞ্চলের মধ্য দিয়া গেলাম; ভয়ানক দুর্গন্ধ। চীনেরা আসিয়ার যে দেশেই থাকুক, তাহাদের অঞ্চলটা দুর্গন্ধ না হইয়া যায় না। অপরাহ্ণের শেষভাগে, বৈজ্ঞানিক উদ্যানে আবার ফিরিয়া গেলাম। একটা ঝড়ের বাতাস উঠিল। ঝড়ে গাছগুলা দুলিতে লাগিল। তাহার মধ্য হইতে ভীষণ সোঁ সোঁ শব্দ হইতে লাগিল। তালগাছগুলা যেন কি-এক যাতনা-ভরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। তাহাদের এই আর্ত্তনাদ শুনিলে, হৃদয়ে কেমন একটা অহেতুকী মর্ম্মবেদনা

উপস্থিত হয়। প্রায় ৬টার সময়, সূর্য্যাস্ত-কালে, ঝড়টা যেন আরও নিকটবর্ত্তী হইল। গ্রীষ্মদেশীয় আকাশের অপূর্ব্ব বর্ণচ্ছটা দেখিবার জন্য আমি একটু দাঁড়াইলাম। গগনের দূরপ্রান্তে, মৃদু গোলাপী রং হইতে তীব্র লাল রং- এবং এই দুই রংএর মাঝামাঝি যতপ্রকার আভা হইতে পারে তাহাদের যেমন সুন্দর সংমিশ্রণ হইয়াছে। ক্রমে সেই দূরপ্রান্ত হইতে কতকগুলা হলদে ও কালো দাগ—(অবশ্য মেঘের দ্বারাই রচিত) যদৃচ্ছাক্রমে প্রসারিত হইতে লাগিল। মনে হয় যেন, চিত্রপটের উপর চিত্রকর সযত্নে রং লেপন করিয়া, পরে তাঁহার ঠিক্ মনঃপূত না হওয়ায় বিরক্ত হইয়া ইতস্ততঃ তুলি বুলাইয়া মুছিয়া দিয়াছেন…আকাশের এই অপূর্ব্ব ভাবটি বোধ হয় আমি আর কখন দেখিতে পাইব না; তাই অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিতে লাগিলাম। আকাশের এই ভাবটি অতীব বিরল ও ক্ষণস্থায়ী বলিয়াই আমার এত ভাল লাগে। তাই, বিশ্বপ্রকৃতির এই শোভাটি আমার স্মৃতিমাঝে ধরিয়া রাখিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি; কেননা, একটু পরেই ইহা চিরকালের মত অন্তর্হিত হইবে।

বাহ্যবস্তুর প্রতি মানবের কর্ত্তব্য কি?—না তাহাদের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করা, তাহাদের শোভা সৌন্দর্য্যের মর্ম্মগ্রহণ করা, তাহাদের ক্ষণস্থায়ী বিচিত্র সৌন্দর্য্য প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করা।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চীন-কুসুম।

(কবি লি পো—অষ্টম শতাব্দী)

শান্ত রজনীতে।

নিশীথ শয়ন পরে
চেয়ে দেখি আমি চাঁদের কিরণ
রেখা টানিয়াছে রজত বরণ,
এমনি উজল, এমনি শীতল,
এমনি ক্ষণেকতরে,
যেন সে আমার স্বপনের তীরে,—
হিমানীর মত হাসে ধীরে ধীরে।
উপাধান হ'তে তুলি ল'য়ে শির
চাঁদটিরে দেখি আমি, !
শয্যাতে পুনঃ করিলে শয়ন,
ভরিয়া আমার সকল স্বপন,
অসীম তোমার রূপ-গরিমায়
ভাসি উঠ ওগো তুমি,
হে মোর জনমভূমি!

চন্দ্রালোকে।

অর্দ্ধচন্দ্রমার ওই স্তিমিত আভায়,
ক্ষীণ প্রতিধ্বনি কত খেলিতেছে দূরে,
নীরবে আসিছে ধীর শারদ সমীর!
আমার অন্তর গেছে তাহার সমরে,
তুষারে আবৃত যথা কানসুর শির,—
প্রিয়তমে পার্শ্বে মোর ফিরাইতে চায়!

শ্রীসন্তোষকুমার বসু

আত্মোৎসর্গ।

মানুষ একদিকে যেমন স্বার্থপর, পশু-প্রকৃতি, অপরদিকে তেমনি আত্মত্যাগী, দেব-প্রকৃতি। জগতের ইতিহাস ছত্রে ছত্রে ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সকল দেশে সকল কালেই স্বার্থের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে শৃঙ্খলাবদ্ধ মানবের মুক্ত আত্মা বিপন্নের উদ্ধারের জন্য, পীড়িতের পরিত্রাণের জন্য, ধর্ম্ম বা সত্যের মাহাত্ম্য রক্ষার জন্য, স্বদেশ বা স্বজাতির স্বাধীনতার জন্য আপনার সর্ব্বস্ব দান করিতে, প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। তাহাদের কতকগুলিকেই আমরা জানি মাত্র, অনেকেই আমাদের নিকট অপরিচিত,—গ্রাম্য কাহিনীর একটি ছত্রে পর্য্যন্ত তাহারা স্থান পায় নাই।

এ ত' গেল অতীতের কথা। কিন্তু আমাদের এই বর্ত্তমান জীবনে আজিও জগতের কতদিকে কতলোক কত ভাবে হাস্যমুখে আপনার সর্ব্বস্ব দান করিতেছে, অযাচিত আত্মোৎসর্গ করিতেছে, তাহাদের সন্ধান পর্য্যন্ত আমরা জানি না। অন্যান্য বিষয় ছাড়িয়া কেবল বিজ্ঞানের দিক দিয়া দেখিলেও আমরা বর্ত্তমান জগতে যে সকল সুমহৎ স্বার্থত্যাগ, আত্মত্যাগ দেখিতে পাই, তাহার তুল্য দৃষ্টান্ত জগতের অতীত ইতিহাসেও বিরল। সত্যের জন্য, জ্ঞানের জন্য, মানবের দৈহিক দুঃখ নিবারণের জন্য যাঁহারা নীরবে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন ও অবশেষে জীবন পর্য্যন্ত দান করিতেছেন, আজ এইরূপ কয়েকটি মহাত্মা পুরুষের বীরত্ব কাহিনীর উল্লেখ করিব।

পাশ্চাত্য জগতে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাতত্ত্ব আবিষ্কৃত হওয়া অবধি কাল পর্য্যন্ত ঔষধের ফলাফল পরীক্ষার জন্য যে সকল চিকিৎসক অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন, প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহাদের সকলের বৃত্তান্ত একখানি বৃহৎ পুস্তকেও ধরে কি না সন্দেহ; সম্প্রতি 'এক্স রে' পরীক্ষায় যে সকল বৈজ্ঞানিক প্রাণদান করিয়াছেন তাহার সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে।

ব্রিটিশ বৈদ্যুতিক চিকিৎসা সমিতির সভাপতি ডাক্তার জন্ হল্ এড্ওয়ার্ডস্ 'এক্স রে' চিকিৎসা পদ্ধতির একজন প্রতিষ্ঠাতা। বহুদিন নানা প্রকারে মানবদেহে 'এক্স্ রে'র ক্রিয়া পরীক্ষা করিয়া ১৯০০ সালে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধে আহত সৈনিকগণের উপর তাঁহার চিকিৎসার উপকারিতা লক্ষ্য করিবার জন্য তথায় গমন করেন। দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে প্রত্যাগমনের কিঞ্চিৎ পরেই তাঁহার দুই হস্তে উক্ত তাড়িৎ সংস্পর্শজনিত একরূপ নালী ঘা হয়। 'এক্স্ রে' ঘা নামেই এ রোগ বিদিত। যতদূর জানা যায় এ রোগের তুল্য নিষ্ঠুর যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি মানবের আর নাই। তাঁহার জীবন যে কিরূপ যন্ত্রণাময় হইবে তাহা জানিয়াও তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা হইতে বিরত হন নাই। পরে যখন রোগ বৃদ্ধি পাইল, তখন তাহা হইতে অব্যাহতি লাভের আর কোন উপায়ই রহিল না।

১৯০৬ সালের 'ব্রিটিশ মেডিকাল জার্ণেল' নামক মাসিক পত্রে তিনি এইরূপ এক পত্র লেখেন;

"আমি গত দুই বৎসরের মধ্যে এক মুহূর্ত্তের জন্যও যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাই নাই। সময়ে সময়ে যন্ত্রণা এতই বিষম হইয়া উঠে যে আমি শারীরিক ও মানসিক সকল প্রকার কর্ম্মেই অশক্ত হইয়া পড়ি। শীতকালে আমি নিজে পরিচ্ছদ পরিধান করিতে পারি না এবং সে সময়ে আমি যে যন্ত্রণা ভোগ করি তাহা প্রকাশের ভাষা নাই। দুইটি করপুটের পশ্চাতে প্রায় শতাধিক স্ফোটক হইয়াছে। প্রত্যেকটি হইতেই পুঁজরক্ত পড়িতেছে। আজ পর্য্যন্ত কোন ঔষধেই আমার লেশমাত্র উপকার হয় নাই। এ অসহ্য যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণের কোন উপায়ই দেখি না মধ্যে মধ্যে যন্ত্রণা এতই অধিক হইয়া উঠে যে চীৎকার করিয়া উঠিতে হয়।"

বহুদিন এইরূপ যন্ত্রণা ভোগের পর তাঁহার বাম-হস্তটি কাটিয়া দেওয়া হয়। বীরহৃদয় সাধক হস্তটি হারাইবার পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত তাঁহার তাড়িৎ লইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। আজ পর্য্যন্ত তাঁহার একমাত্র

ভয়, যে সত্যের জন্ত তিনি আপনার দেহ মন বিসর্জ্জন করিলেন, সেই কষ্টলব্ধ সত্যের বৃত্তান্ত লিখিবার পূর্ব্বেই তাঁহার পাছে মৃত্যু হয়।

মিষ্টার ক্লারেন্স্ ড্যালি—আমেরিকার প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিৎ এডিসন্ সাহেবের পরীক্ষা মন্দিরের প্রধান সহকারী ছিলেন। ১৮৯৭ সালে তিনি কয়েক সপ্তাহ 'এক্স্ রে' লইয়া নানা প্রকার পরীক্ষা করেন। ফলে তাঁহার হাত দুইটীও ফোস্কায় পরিপূর্ণ হইয়া ফুলিয়া উঠিল এবং মুখের ও মস্তকের সমস্ত কেশ খসিয়া পড়িল। প্রথমে যন্ত্রণা আসিয়া দেখা দেয় নাই, হাত দুইটি অসাড় হইয়াছিল মাত্র। দুই বৎসর পরে বাম হস্তে ঘা দেখা দিল। ক্রমে সেই ভীষণ রোগ দক্ষিণ হস্তটিকেও আক্রমণ করিল। প্রতিকারার্থে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইল। পদযুগ হইতে প্রায় দেড় শত চর্ম্ম তুলিয়া হস্তে লাগান হইল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। রোগ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কিছু দিন পরেই বামহস্তটি কাটিয়া দিতে হইল এবং আবার কিছুদিন পরে দক্ষিণ হস্তের চারিটি আঙ্গুল কাটিয়া দেওয়া হইল। অবশেষে দক্ষিণ হস্তটিও হারাইবার পর দুইটি কৃত্রিম হস্ত বসাইয়া দেওয়া হইল। ইহাতেও কিন্তু রোগের উপশম হইল না। সাত বৎসর মৃত্যু যন্ত্রণা সহ্য করিয়া অবশেষে ইনি ইহলীলা সম্বরণ করিলেন।

ফরাসী ডাক্তার এন্ রাভিগেও 'এক্স্ রে' পরীক্ষা করিতে যাইয়া দুই বৎসর উক্ত রোগে কষ্ট পাইয়া ১৯০৩ সালে ইহলোক ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি বলিয়া যান "মানব দেহের উপর তাড়িতের ক্রিয়া সম্বন্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করিবার জন্য যে আমি এ জীবনে অবসর লাভ করিয়াছিলাম, এইজন্ত ঈশ্বরের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।"

'এক্স রে' পরীক্ষা করিতে যাইয়া আরও অনেক বৈজ্ঞানিক বীর এইরূপে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছেন। বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত ভবিষ্যতে এরূপ রোগের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইবার উপায় উদ্ভাবিত হওয়া আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে যে সকল মহাত্মা জীবের উপকারের জন্ত এইরূপ অকাতরে অযাচিত আত্মদান করিয়াছেন ও করিতেছেন তাঁহাদের পবিত্র স্মৃতি অনন্তকাল ধরিয়া স্বার্থান্ধ মানবের ইতিহাসকে উজ্জ্বল ও গৌরবান্বিত করিয়া রাখিবে সন্দেহ নাই।

এই ত' গেল বিজ্ঞানসাধকের কাহিনী। কিন্তু আর্ত্তের দুঃখ নিবারণ, পীড়িতের পরিত্রাণ জীবনের ব্রত করিয়া আমাদের চতুর্দ্দিকে যে সকল চিকিৎসা ব্যবসায়ী প্রফুল্লচিত্তে আত্মদান করিতেছেন, তাঁহাদের সংখ্যা অঙ্গুলিগণ্য নহে। মৃতদেহ পরীক্ষার সময়ে অস্ত্রের সামান্য আঘাত হইতে রক্ত বিষাক্ত হইয়া প্রাণ বিয়োগ হওয়ার বৃত্তান্ত আমরা প্রায়ই শুনিয়া থাকি। অনেক সময়ে যখন অন্য জীবের উপর পরীক্ষার দ্বারা বিষয় বিশেষের অভিজ্ঞতা লাভ অসম্ভব হয়, তখন চিকিৎসকগণ অকুণ্ঠিতচিত্তে আত্মদেহের উপর পরীক্ষা করিতেও লেশমাত্র ভীত হন না। তাঁহাদের মহত্ত্ব সাধারণের নিকট দুঃসাহস বা বাতুলতা বলিয়াই প্রতিভাত হয়। বায়ুর সহিত কি পরিমাণে অঙ্গারাম্ল বাষ্প মিশ্রিত থাকিলে মনুষ্যের প্রাণনাশক হয় এই তথ্যটি আবিষ্কার করিবার জন্ত টিউরিন নগরের একজন চিকিৎসক (Signor Teodors Seribande) চতুর্দ্দিক বদ্ধ একটি লৌহগৃহের মধ্যে বিভিন্ন পরিমাণে অঙ্গারাম্ল বাষ্প মিশ্রিত বায়ু রাখিয়া তিনবার তাহার মধ্যে প্রবেশ করেন। তৃতীয় পরীক্ষার পর তিনি জ্ঞানহীন ও মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলেন। অবশেষে অনেক চিকিৎসার পর তাঁহার সংজ্ঞা পুনরায় ফিরিয়া আসিল।

কিছুদিন পূর্ব্বে ইংলণ্ডের চিকিৎসা-সমিতিতে ডাক্তার হেড (Dr. Head) অনুভূতি-স্নায়ু সম্বন্ধে এক নব তথ্য আবিষ্কার করিয়া সেই সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। লেখক বলেন যে তিনি তাঁহার স্বীয় হস্তের অনুভূতি-স্নায়ুগুলিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার ফলাফল লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। বিচ্ছিন্ন করিবামাত্র তাঁহার অনুভূতি শক্তি একেবারে লোপ পাইল। স্নায়ুগুলিকে সংযুক্ত করিয়া দিয়া তাহার ফলাফলও লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। ফলে তিনি এই তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন যে মানবচর্ম্মে দুই শ্রেণীর

বিভিন্ন স্নায়ু আছে, এক একটি শ্রেণী বিভিন্ন প্রকৃতির অনুভূতি উৎপাদনে সহায়তা করে। প্রথম শ্রেণী যন্ত্রণা ও শীততাপের অনুভূতি দেয়; দ্বিতীয় শ্রেণী আমাদের স্পর্শের অনুভূতি দ্বারা অনুভূতির স্থান নির্দ্দেশে সক্ষম করে। চর্ম্মের আরোগ্যশক্তি প্রথম শ্রেণীর উপরই নির্ভর করে।

বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য, নূতন সত্য লাভের জন্য যাঁহারা অজ্ঞাত দেশে হিংস্র পশুসঙ্কুল গভীর অরণ্যে তপ্তবালুকাময় দুস্তর মরুভূমে, দুর্গম পর্ব্বতশিখরে বা অকূল সমুদ্রবক্ষে প্রবেশ করিতেছেন তাঁহাদের মাহাত্ম্য, আত্মত্যাগও অল্প নহে। বিখ্যাত য়্যাণ্ড্রী (Andree) যখন বেলুনে উঠিয়া উত্তরমেরু আবিষ্কারে অগ্রসর হন, সেই সময়ে তাঁহার একজন বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন "আচ্ছা ধর, বেলুনটা যদি পথিমধ্যে ফাটিয়া যায়, তাহা হইলে তোমাদের কি হইবে?" য়্যাণ্ড্রী সহাস্য মুখে উত্তর করিলেন "হয় ডুবিয়া না হয় চূর্ণ হইয়া মরিব।" বন্ধু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "কতদিনে তোমাদের সংবাদ পাওয়া সম্ভব?" য়্যাণ্ড্রী উত্তর করিলেন "অন্ততঃ তিন মাসের পূর্ব্বে নহে। এক বৎসর বা দুই বৎসর পরেও পাইতে পার। আর যদি কখনও আমাদের কোন সংবাদ না পাও—তাহা হইলে অপর লোক আবার আমাদের ঐ পথ অনুসরণ করিবে এবং কেহ না কেহ এক দিন উত্তর মেরুর অজ্ঞাত দেশ আবিষ্কার করিবে।"

আত্মত্যাগী মহাপুরুষের এই ভবিষ্যদ্বাণী আজ সফল হইয়াছে। আজ পর্য্যন্ত য়্যাণ্ড্রীর কোন সংবাদই পাওয়া যায় নাই, সম্ভবতঃ তাঁহারা ডুবিয়া বা অস্থি চূর্ণ হইয়াই প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার পরে কত লোক তাঁহার পথের অনুসরণ করিল। কত লোক কত কষ্ট পাইল, কত লোক প্রাণত্যাগ করিল! আজ পিয়ারি সাহেব অবশেষে উত্তরমেরু আবিষ্কার করিয়া এগুলি মহামূল্য জীবনের বলিদান সার্থক করিয়াছেন।

মেরুদেশের অবস্থা যে কিরূপ কষ্টকর, তাহা আমরা কল্পনাই করিতে পারি না। গ্রীনল্যাণ্ড অতিক্রম কালে পিয়ারি সাহেব তথাকার কষ্টের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার ঈষৎ উদ্ধৃত করিলেই সে দেশের অবস্থাটা আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব। পিয়ারি লিখিতেছেন,—"সে তুষার দেশে বায়ু এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্থির নহে। বায়ুর সহিত সর্ব্বদাই এক ফুট বা দুই ফুট ঘন বরফের স্রোত ভাসিতেছে। বরফের এই অনন্ত মরুভূমির মধ্যে যখন প্রবল ঝড় বহিতে থাকে তখন এই বরফস্রোত গর্জ্জন ও আস্ফালন করিতে করিতে ভূমি হইতে তিনশত ফিট ঊর্দ্ধে উঠিয়া এক ভীষণ জলপ্রপাতের ন্যায় উন্মত্ত অন্ধ বেগে বহিতে থাকে। তাহার সম্মুখের যাবতীয় বস্তুই বরফের স্তূপের মধ্যে সমাধিস্থ হইয়া যায়। সে ঝড়ের মধ্যে মনুষ্যের নিশ্বাস গ্রহণ পর্য্যন্ত অসম্ভব। প্রকৃতি নিতান্ত অনুকূল হইলেও জানু পর্য্যন্ত গভীর বরফের স্রোত ঠেলিয়া প্রত্যেক পদ অগ্রসর হইতে হয়।"

১৯০২ সালে ওয়ালেস্ ও হাব্বার্ড সাহেব ল্যাব্রেডরের বিরাট মরুপ্রদেশ অতিক্রম করিবার চেষ্টা করেন। পথে সাহায্য ফুরাইয়া গেল, বন্যপশুও বিরল। কষ্টের আর অবধি রহিল না। অনাহারে তাঁহারা অস্থিসার হইয়া পড়িলেন এবং কঙ্কালাবশিষ্ট দেহে উভয়ে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। হাব্বার্ড সাহেব এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন যে তিনি আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। নিরুপায় দেখিয়া পথিমধ্যে তাঁহাকে কম্বল আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়া ওয়ালিস আহারের অন্বেষণে অগ্রসর হইলেন, ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন হাব্বার্ডের প্রাণশূন্য দেহ পড়িয়া রহিয়াছে।

পেলি (Mont Pellie) নামক আগ্নেয়গিরির উদ্গারের পর জি, সি কার্টিস (G. C. Cartis) নামে একজন সত্যসন্ধিৎসু তাহার সেই অসম্ভ গহ্বরের মধ্যে প্রবেশ করেন। পেলির আগ্নেয় উদ্গার তখনও বন্ধ হয় নাই। কুয়াসা, বৃষ্টি, বাষ্প ও ধূলিতে বায়ু এতই আচ্ছন্ন যে ভিতরে কয়েক হস্ত দূরে আর কিছুই দেখা যায় না। গন্ধকের ধূমে চতুর্দ্দিক এমনই আচ্ছন্ন যে নিশ্বাসগ্রহণ একপ্রকার অসম্ভব। সম্মুখের গহ্বর হইতে কামানের বজ্রধ্বনির ন্যায় ধ্বংসের ধ্বনি উঠিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে ভগ্ন পর্ব্বতের বিরাট খণ্ড

তাঁহার গাত্রপার্শ্বে আসিয়া পড়িতেছে। আগ্নেয় উদ্গারের উত্তাপে তাঁহার দেহ পর্য্যন্ত দগ্ধ হইতে লাগিল। পর্ব্বত শৃঙ্গ হইতে অবতরণ কালে সহসা শৃঙ্গের মুখ হইতে কৃষ্ণবর্ণ তরল মৃত্তিকা স্রোত নির্গত হইয়া পর্ব্বতের গাত্র বহিয়া প্রবলবেগে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। কার্টিস ও তাঁহার সঙ্গীদের ঠিক সম্মুখ দিয়া তাহা বেগে নামিয়া গেল। সম্মুখে যাহা কিছু পড়িল তৃণের ন্যায় তাহাতে ভাসিয়া গেল। তাহার ভীষণ গর্জ্জনধ্বনিতে সকলে বধির হইয়া পড়িলেন। আর দুই হাত নিকট দিয়া যাইলেই তাঁহারা সকলেই কোথায় ভাসিয়া যাইতেন তাহার ঠিক নাই।

পাশ্চাত্যজগতে এরূপ দুঃখ ও মৃত্যু বরণের দৃষ্টান্তের অভাব নাই। আমরা গুটিকয়েকের উল্লেখ করিলাম মাত্র। আমাদের দেশের যুবকগণের মধ্যে স্বার্থত্যাগ বা আত্মত্যাগের প্রবৃত্তির অভাব নাই সত্য, কিন্তু তাহা উত্তমরূপে বিশ্বের মঙ্গলপথে নিয়োজিত হইলে, তাহাদের জীবন ধন্য হয়, আর জননী, জন্মভূমিরও গৌরব বৃদ্ধি হয়। সুতোর জন্য, জ্ঞানের জন্য, পরোপকারের জন্য যে দিন দেশের লোক কষ্টসহিষ্ণু হইতে ও সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে শিখিবে, সেই দিনই ভারতের মুখ যথার্থ উজ্জ্বল হইবে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

তান্‌কা।

['তান্‌কা' জাপানী সনেট। ইহা পাঁচ পংক্তিতে সম্পূর্ণ। ইহার প্রথম ও তৃতীয় চরণে পাঁচটি করিয়া এবং দ্বিতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম চরণে সাতটি করিয়া অক্ষর থাকে। তান্‌কা সাধারণতঃ অমিত্রাক্ষর হয়।]

(১)

ফাগুন এ ঠিক্‌,
গগনে আলো না ধরে ;
প্রসন্ন দিক,
তবু কেন ফুল ঝরে ?
ভাবি আর আঁখি ভরে। —কিনো।

(২)

ঝিঁঝিঁ ডাকা শীত।
একা জাগি বিছানায় ;
কাঁপিতেছে হৃৎ,
কাছে কেহ নাহি, হায় ;
ধরণী তুষারে ছায়। —গোকু।

(৩)

দুঃখে কাঁদিনে,
নিয়তির পদে নমি,
ভয় শুধু মনে
শপথ ভেঙেছ তুমি ;
দেবতা কি যাবে ক্ষমি ? —শ্রীমতী উকন্‌।

(৪)

সুন্দ প্রভাত,
শিশির ঝলকে যাসে ;
বসন্তের বাত
সন্ধ্যায় ওই আসে,
সোনার স্বপন নাশে। —আসায়াসু।

(৫)

চপল সে ঠিক
দম্‌কা হাওয়ার মত ;
জানি, তার কথা
ভুলিলেই ভাল হ'ত ;—
ব্যর্থ যতন যত। —শ্রীমতী দৈনী-নো-সাম্মি।

(৬)

যামিনী ফুরালে
প্রভাত আসিবে, জানি ;
সূর্য্য জাগালে,
তবু বিরক্তি মানি ;—
তোমারে বক্ষে টানি। —মিচি-নাবু-ফুজিয়ারা।

(৭)

রাগ কর' না গো
জল দেখি' নয়নেতে ;—
বঁধু গেছে মোর
সুনাম বসেছে যেতে ;
মন বাঁধি কোন্‌ মতে। —শ্রীমতী সাগামি।

(৮)

তার ব্যবহার
বুঝিতে পারি না আর ;
প্রভাত বেলায়
জটা বেঁধে গেছে, হায়,
চুলে আর চিন্তায়। শ্রীমতী হোরিকার।

প্রাচীন মুর্শিদাবাদ কাহিনী।

(১)

(এইচ্, এস্, সাহ্‌রাওয়ার্দ্দি)

পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা ভিন্ন বঙ্গে এমন কোন নগর নাই যাহা ঐতিহাসিক সম্পদে মুর্শিদাবাদের সমতুল্য। ১২০৩ খৃষ্টাব্দে মুসলমানগণ যখন সর্ব্বপ্রথম বঙ্গ জয় করেন, তখন হইতেই মুর্শিদাবাদ ইতিহাসের পত্রে আপন নাম অঙ্কিত করিয়াছে। তখন বঙ্গের রাজা লক্ষ্মণ সেন লক্ষ্মণাবতী বা বর্ত্তমান গৌড় হইতে নবদ্বীপে নূতন রাজধানী স্থাপিত করিয়াছেন। রাজসভায় জ্যোতির্ব্বিদগণ গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে হিন্দুরাজত্ব ধ্বংস হইবে এবং আজানুলম্বিত বাহু কোনও এক ব্যক্তি রাজপরিবারের সর্ব্বনাশ সাধন করিবে। নূতন আক্রমণকারীগণের শ্রেষ্ঠ রণকৌশলের বলে উত্তর ভারতের হিন্দু রাজত্বগুলি একে একে সকলেই বিজয়ী শক্তির অধীন হইয়াছে। বিজিত হিন্দুরাজগণ সকলেই বঙ্গরাজের প্রবল হিন্দুগৌরব রক্ষার জন্য নির্ভর করিতেছিলেন। বঙ্গরাজের পক্ষে স্বাধীনতা রক্ষা করা অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল, কারণ প্রথমতঃ বঙ্গদেশ চিরদিনই ধনধান্যে পরিপূর্ণ, দ্বিতীয়তঃ বঙ্গদেশের ন্যায় লোকসংখ্যা ভারতের অন্য কোনও রাজ্যমধ্যেই ছিল না। সুতরাং সকলেই আশা করিয়াছিলেন বল্লালের বংশই তাঁহাদের মুখোজ্জ্বল করিবে। কিন্তু বঙ্গের শেষ হিন্দুরাজা যোদ্ধৃপদবাচ্যই ছিলেন না। দুর্ব্বল প্রকৃতি, ভীরুস্বভাব, বিলাস-মগ্ন এবং কল্পনাপ্রিয় লক্ষ্মণ সেন অভিজ্ঞ ও কষ্টসহিষ্ণু মুসলমান সেনাপতির সমকক্ষ হইতে পারিলেন না। দিল্লীর নবাবের দ্বারা বঙ্গাধিকারে প্রেরিত বীর বক্তিয়ার খিলিজি যখন নবদ্বীপের নগরপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, লক্ষ্মণসেন নৈশ অন্ধকারের আবরণে একাকী রাজধানী ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। বঙ্গের ক্ষত্রিয় সৈনিকগণ বিদেশী ম্লেচ্ছ আক্রমণকারীগণকে বিদূরিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া সুযোগ অপেক্ষা করিতেছিল, কিন্তু নৃপতির পলায়নে তাহারা হীনতেজ হইয়া পড়িল এবং বিনাযুদ্ধে বক্তিয়ার নবদ্বীপের রাজপুরীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এই দিন হইতে বঙ্গদেশ দিল্লীসাম্রাজ্যের একটী বিরাট বহুমূল্য অংশ বলিয়া পরিগণিত হইল এবং ইস্‌লাম খাঁ স্থাপিত ঢাকা নগরে বঙ্গের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইল।

প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থের মধ্যে 'আকবর নামা'তেই মুর্শিদাবাদের প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তখন ইহার নাম ছিল মাকুসুদাবাদ। কেহ কেহ বলেন উক্ত নগরটি আকবর সাহই স্থাপিত করেন এবং বঙ্গের শাসন-কর্ত্তার ভ্রাতা মাকুসুদ্ আলিখাঁর নামে ইহার নামকরণ হয়। কিন্তু মুর্শিদাবাদের যথার্থ ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে ১৭০৪ খৃষ্টাব্দ হইতে, যখন মুর্শিদ কুলি খাঁ ঢাকা হইতে বঙ্গের রাজধানী এইস্থানে পরিবর্ত্তিত করেন। ইঁহারই নামানুসারে রাজধানীর নাম মুর্শিদাবাদ হয়। পূর্ব্বে মুর্শিদ কুলি খাঁর নাম মহম্মদ হাদি ছিল। তিনি একজন ব্রাহ্মণ সন্তান ছিলেন, তাঁহার পিতা অল্পবয়সে ক্রীতদাস রূপে পারস্যে গমন করেন। তথায় তিনি মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। যে অসাধারণ শক্তি ও প্রতিভার বলে তিনি সামান্য অবস্থা হইতে ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজ্যের শাসনকর্ত্তা পদে উন্নীত হইয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্বাভাস তাঁহার বাল্যজীবনেই প্রকাশ পাইয়াছিল। কিছুকালের জন্য তিনি হায়দ্রাবাদে রাজপ্রতিনিধির পদে নিযুক্ত ছিলেন। অবশেষে ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে সম্রাট ফারাখ্‌শায়ার তাঁহাকে নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ উপাধি দান করিয়া বঙ্গের শাসনকর্ত্তা পদে নিযুক্ত করিলেন। মুর্শিদ নাজিম

দেওয়ানের পদে নিযুক্ত হইয়াই ঢাকা হইতে রাজধানী মাকসুদাবাদে স্থানান্তরিত করিয়া আপন নামানুসারে রাজধানীর নাম মুর্শিদাবাদ রাখিলেন। তৎপূর্ব্বে বঙ্গে ডাকাতি ও যথেচ্ছ অত্যাচারের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত অধিক ছিল। মুর্শিদ দেশের জমিদারগণকে তাহাদের জমিদারীর সকল অপরাধের জন্যই দায়ী করিয়া দেশে এরূপ শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত করিলেন যে, ১৭১৮ সালে দিল্লীশ্বর তাহাকে বঙ্গ ও উড়িষ্যার সহিত বিহার প্রদেশেরও শাসনভার অর্পণ করিলেন। সেই দিন হইতে বঙ্গচ্ছেদ পর্য্যন্ত এই তিনটি প্রদেশ একই রাজ্যভুক্ত বলিয়া গণ্য ছিল। এই তিনটি প্রদেশকে একত্র শাসন করিবার জন্যই যে মুর্শিদ কুলি খাঁর রাজত্বকাল ইতিহাসে প্রসিদ্ধ তাহা নহে, মুসলমান শাসনকর্তৃগণের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম কাটোয়া এবং মুর্শিদগঞ্জে প্রহরী স্থাপিত করিয়া ও জমিদারদিগের বাণিজ্য-প্রভুত্ব খর্ব্ব করিয়া দেশের ভূস্বামীগণের যথেচ্ছ শক্তিকে নষ্ট করেন। স্বধর্মত্যাগীর নবগৃহীত ধর্ম্মের প্রতি যেরূপ অতিরিক্ত অযৌক্তিক অনুরাগ দেখিতে পাওয়া যায়, মুর্শিদ কুলিখাঁরও সেইরূপ মুসলমান ধর্ম্মের প্রতি অতিরিক্ত আগ্রহ প্রকাশ পাইত। হিন্দুগণকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য তাঁহার অধিকাংশ সময়ই ব্যয়িত হইত এবং এ চেষ্টায় তিনি নিরীহ প্রজার প্রতি অনেক নিষ্ঠুর ও বর্ব্বর ব্যবহার করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। ইহা সত্বেও ন্যায়প্রিয়তার জন্য তিনি প্রসিদ্ধ। সপ্তাহে দুই দিন করিয়া তিনি প্রজাগণের অভিযোগ ও আবেদন শ্রবণ করিতেন এবং অপক্ষপাত বিচার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার একজন জীবনী-লেখক লিখিয়াছেন "তাঁহার বিচারনীতি এতই বিশুদ্ধ ছিল এবং আইনের দণ্ডমর্য্যাদা রক্ষার প্রতি এতই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল যে তিনি আইন ভঙ্গের জন্য তাঁহার পুত্রকে পর্য্যন্ত প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই।" তাঁহার রাজস্ব সংগ্রহের সুব্যবস্থার ফলে তিনি বৎসর বৎসর আপন ব্যয় বাদে দেড় কোটী মুদ্রা রাজস্ব সম্রাটসমীপে প্রেরণ করিতেন। অনেকে মুর্শিদকুলিকে আত্মীয়পোষণপরতায় অপবাদ দিয়া থাকেন। কিন্তু সকল দেশেই সকল কালে শক্তিশালী ব্যক্তিগণের মধ্যে এই দোষটি এত প্রবল দেখা যায় যে এই স্বাভাবিক দুর্ব্বলতার জন্য তিনি আমাদের ক্ষমার্হ। তিনি তাঁহার জামাতা সুজাউদ্দৌলাকে উড়িষ্যার সহকারী নবাবপদে নিযুক্ত করেন। তাঁহার দৌহিত্রীর স্বামীকেও তিনি ঐ পদে ঢাকায় নিযুক্ত করেন। মুর্শিদকুলি অধিক দিন রাজত্ব করেন নাই। তাঁহার জীবনের শেষ সময় উপস্থিত বুঝিতে পারিয়া, তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ দৌহিত্র সরফরাজখাঁকে নিকটে ডাকাইলেন এবং সচিববর্গকে ঈশ্বরসাক্ষী করিয়া শপথ করাইলেন যে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহারা রাজকুমারকেই তদীয় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিবেন। ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদের মৃত্যু হয়।

মুর্শিদাবাদ নগর যাঁহারা ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহার এক পথিপার্শ্বে 'ক্ষেত্র মসজিদ' নামে একটি ভগ্ন মসজিদ্ লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। মুর্শিদাবাদ মসনদের স্থাপয়িতার শবদেহ ইহারই গর্ভে প্রোথিত রহিয়াছে। পূর্ব্বে এই অট্টালিকাটি দ্বিতল ছিল। ইহার মধ্যে কোরাণ পাঠের জন্য ৭০টী কামরা ছিল। মুসলমান বিশ্বাসানুসারে ৭০ জন ব্যক্তি মুর্শিদের আত্মার উদ্ধারের নিমিত্ত এই স্থলে নিত্য কোরাণ পাঠ করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন। গত ৯৭ সালের ভীষণ ভূমিকম্পে এই অট্টালিকাটি ভূমিসাৎ হইয়াছে। কেবলমাত্র মুর্শিদের সমাধি স্তম্ভটীই অটুটভাবে আজিও দাঁড়াইয়া আছে। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদ যে রাজপ্রাসাদ নির্ম্মিত করিয়াছিলেন তাহা এক্ষণে জঙ্গলে আচ্ছন্ন হইয়া ভগ্নদশায় পড়িয়া আছে। এই প্রাসাদ মধ্যেই ক্লাইভ্ ও তাঁহার সহকারীগণ সিরাজদ্দৌলার সিংহাসন অপহরণের মন্ত্রণা স্থির করিয়াছিলেন। আজিও তথায় 'জাহানকোষ' বা পৃথিবীর ধ্বংসকারী নামে মুর্শিদের প্রসিদ্ধ তোপটী কুসংস্কারাপন্ন জনতার দ্বারা প্রতি বৃহস্পতিবারে ভক্তিভরে পূজিত হইয়া থাকে। ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে ঢাকায় কর্ম্মকারগণ এই তোপটী নির্ম্মাণ করেন।

মৃত্যুশয্যায় মুর্শিদ তাঁহার সচিববর্গকে যে অনুরোধ করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনান্তে তাহার কোনও ফলোদয়ই হয় নাই। তাঁহার জামাতা সুজাউদ্দৌলা আপন পুত্রের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দী হইয়া দাঁড়াইলেন। উড়িষ্যা হইতে বিরাটবাহিনী লইয়া রাজধানীর বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন, এবং পুত্রকে পরাস্ত করিয়া মুর্শিদাবাদের তোরণদ্বারে আপন বিজয় পতাকা উড্ডীন করিলেন। সুজাউদ্দৌলা ঢাকা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। মুর্শিদ কুলি খাঁ যখন হায়দ্রাবাদের দেওয়ানের পদে নিযুক্ত থাকেন, সেই সময়ে তাঁহার সহিত সুজার আলাপ হয়। সুজা সিংহাসন লাভ করিয়া ডাকাইতি ও অন্যান্য অত্যাচার অপরাধে অবরুদ্ধ জমিদারগণকে মুক্তিদান করেন। তাঁহার চতুর্দ্দশবর্ষ রাজত্বকালে তিনি বঙ্গের অনেকগুলি খণ্ডরাজ্য অধিকার করেন; ত্রিপুরারাজ্য তাহার মধ্যে একটি। তাঁহার বিজয়ী সেনা কুচবিহারের সীমান্তদেশ পর্য্যন্ত আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়াই ক্ষান্ত হয়। কুচবিহার পরাজয় স্বীকার করে নাই। সুজার রাজত্বকালে হাজি আমেদ, আলিবর্দ্দী খাঁ ও ইতিহাসখ্যাত জগৎ শেঠ, এই তিন জন তাঁহার প্রধান সচিব ছিলেন। ইঁহাদের পরামর্শ ফলেই দেশের সমৃদ্ধিবৃদ্ধি হইয়াছিল। মুর্শিদের ন্যায় সুজাও অপক্ষপাত ও ন্যায়পরায়ণ শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার রহস্যপ্রিয়তা ও বিলাস-প্রাচুর্য্যের কাহিনী আজিও বৃদ্ধদিগের অতীত কথার মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়। মুর্শিদাবাদকে নানাভাবে অলঙ্কৃত করিয়া ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে সুজা ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

সুজার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সরফ্রাজ খাঁ মুর্শিদাবাদের মসনদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি স্বভাবত দুর্ব্বল প্রকৃতি, চঞ্চল হৃদয়, অবিবেচক ও ভীরু স্বভাব ছিলেন। তাঁহার দুর্ব্বলতার ফলে তিনি তাঁহার পিতৃ-বন্ধু হাজি-আমেদ ও জগৎশেঠকে তাঁহার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন করিয়া তুলেন। রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইনি ধূর্ত ও কৌশলী আলিবর্দ্দীকে বিহারের সহকারী নবাব পদে নিযুক্ত করেন। ইতিমধ্যেই আলিবর্দ্দী গোপনে মুর্শিদাবাদ আক্রমণের আয়োজন করিতেছিলেন। তাঁহার সৈন্যমধ্যে তিনি একদল যুদ্ধব্যবসায়ী আফগানকে নিযুক্ত করেন। তাহারা অকুণ্ঠিতচিত্তে তাহাদিগের সাময়িক প্রভুর জন্য অকারণ রক্তপাত করিতেও বিমুখ হইত না। কিন্তু আলিবর্দ্দী কেবলমাত্র তাঁহার এই সৈন্যবলের উপর নির্ভর করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তাঁহার কূটবুদ্ধি এবং সৌভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার জয়লাভের প্রধান সহায় হইল। তাঁহার কল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি মুর্শিদাবাদে ও দিল্লীতে নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে তাঁহার আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে তিনি বঙ্গরাজ বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। সরফ্রাজ খাঁ স্বভাবতঃ অলসপ্রকৃতি ও বিলাসপ্রিয় হইলেও বিপৎকালে তিনি উদ্যম ও বীরত্ব প্রকাশে সক্ষম ছিলেন। আলির সহিত যুদ্ধে তিনি সিংহের ন্যায় প্রবল পরাক্রমে সংগ্রাম করিলেন। তাঁহার বীরত্ব প্রভাবে রাজপক্ষীয় সৈন্যগণ অমিত তেজে উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। বীর নৃপতির নেতৃত্বে প্রাণপাত করিবার সুযোগ লাভের জন্য সৈনিকমাত্রেই উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। নবাবের সৌভাগ্যলক্ষ্মী বিমুখ না হইলে সেদিন সেই রণক্ষেত্রে আলিবর্দ্দীর সর্ব্বনাশ সাধিত হইত সন্দেহ নাই। যুদ্ধের মধ্যাবস্থায় তিনি সংবাদ পাইলেন যে বিশ্বাসঘাতক রাজভৃত্যগণ বারুদের পরিবর্ত্তে ইষ্টক আনিয়া শিবিরমধ্যে স্তূপাকার করিয়া রাখিয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া নবাব এণ্টনি ফিরিঙ্গীর পুত্র পাঁচু ফিরিঙ্গীকে তাঁহার সেনাপতি পদে নিয়োজিত করিতে বাধ্য হইলেন। এণ্টনি একজন পর্টুগীজ চিকিৎসক ছিলেন। নূতন সেনাপতি অসীম সাহসে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া চতুর্দ্দিকের দুর্দ্দমনীয় শত্রুস্রোতকে রোধ করিতে পারিলেন না। বীরবর শত্রুসংহার করিতে করিতে রণক্ষেত্রেই প্রাণত্যাগ করিলেন। ঘেরিয়ার ভীষণ যুদ্ধে নবাব এক বন্দুকের গুলিতে মর্ম্মান্তিকরূপে আহত হইলেন। এই আঘাতেই উভয়ের মধ্যে যুদ্ধফলের নিষ্পত্তি হইল। তাঁহার জামাতা কজলকর মহম্মদ খাঁ কয়েক দিন পরে নূতন সৈন্য লইয়া রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু

তৎপূর্ব্বেই সব ফুরাইয়াছে। ইতিমধ্যেই আলিবর্দ্দী বিজয় গর্ব্বে রাজধানী প্রবেশ করিয়া নগদ অর্থ সত্তর লক্ষ এবং মণি মুক্তা অলঙ্কারে পঞ্চাশ ক্রোড় মুদ্রা আত্মসাৎ করিয়াছেন এবং নবাব হাসামৎ উদ্দৌলা আলিবর্দ্দী খাঁ মহাবৎ জঙ্গ এই বিরাট উপাধি লইয়া বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার রাজমুকুট পরিধান করিয়াছেন। যে ঘেরিয়ার রণক্ষেত্রে আলিবর্দ্দী বাঙ্গালার মসনদ অধিকার করেন, তেইশ বৎসর পরে সেই ঘেরিয়ার রণক্ষেত্রেই ইংরাজের নিকট মীরকাশিম পরাজিত হন, এবং ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বীজ রোপিত হয়। [ক্রমশঃ

বন্দী। ধারাবাহিক উপন্যাস।

৩

মৃত্যু! কিন্তু কি তাহাতে ক্ষতি! মানুষ চিরদিন বাঁচে না! একদিন ত, তাকে মরিতেই হইবে। সে দিন ও ক্ষণটুকু তার নির্দ্দিষ্ট নাই, এই প্রভেদ! তবে, কেন আমি মিছা ভাবিয়া মরি!

যেদিন বিচারে আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়া গেল, সেদিন হইতে আজিকার মধ্যে ত কতলোক প্রাণ দিয়াছে! আমার ফাঁসি দেখিবার জন্য কত লোক আকুল হইয়া বসিয়াছিল, কেহ-বা আজ আর ইহলোকে নাই! আরো কত লোক, ইতিমধ্যে, আমার পূর্ব্বে, ইহলোক ত্যাগ করিবে! তবে আমারি বা, এ জীবনের প্রতি এত মায়া, কেন?

আলোক ও বায়ুহীন এই রুদ্ধ কারাগৃহ, কদর্য্য অন্ন, নিঃসঙ্গ জীবন—লাঞ্ছনার বিষে জরজর শিক্ষাগর্ব্বিত হৃদয়, অসভ্য রুক্ষ প্রহরী—ইহাদের মধ্যে বাঁচিয়া কি সুখ! জগতে আমার জন্য, আজ করুণার একবিন্দু অশ্রুও সম্বল নাই! আজ আমি রিক্ত! পাথেয় হারাইয়া বসিয়াছি! কিভীষণ, এখন এ জীবনের ভার বহিয়া বেড়ানো!

৪

কালো রঙের বন্ধ গাড়ী আমাকে আমার কারাগৃহে পৌঁছাইয়া দিল।

পূর্ব্বে দূর হইতে বাড়ীটাকে মন্দ দেখিতাম না! কতবার তাহারি সম্মুখে, উন্মুক্ত প্রান্তরে বসিয়া গান গাহিয়াছি, গল্প করিয়াছি! কিশোর-জীবনের সে প্রাণ-ভরা উল্লাস, মন-ভরা স্ফূর্ত্তি লইয়া, ইহারি সম্মুখে, চন্দ্রালোকে বসিয়া কত ভবিষ্যৎ সুখের কল্পনা করিয়াছি! রাজার প্রাসাদের মত সুদৃশ্য গৃহ! পাশ দিয়া ছোট নদীটি খরস্রোতে বহিয়া গিয়াছে! এমন সুন্দর ছবির মত বাড়ীখানি! কিন্তু আজ পাপের পূতিগন্ধে যেন প্রাণের স্পন্দন চকিতে থামিয়া যাইতেছে!

আমার ঘর? জানালা নাই, সার্শি নাই, শুধু কতকগুলা লৌহগরাদ, বিরাট লৌহকবাট, আর চারিধারে পাষাণ প্রাচীর! তার কোনখানে স্নেহের এতটুকু চিহ্নও নাই! এই গরাদের মধ্য দিয়া পশুশালার পশুর মত, উন্মাদমূর্ত্তি অপরাধীর দলকে বাহির হইতে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়!

৫

সেই পাষাণ প্রাচীর নিমেষে যেন তার কঠিন আলিঙ্গনে আমাকে চাপিয়া ধরিল। প্রহরীর সতর্ক দৃষ্টি সতর্কতর হইল! কোন ক্লেশ, কোন অসুবিধা যেন না হয়! খুব সাবধানে, এখন এ অমূল্য জীবনটাকে রক্ষা

করিতে হইবে—আপনা হইতেই যেন না বাহির হইয়া যায়! খুব সাবধান! যেন আত্ম-হত্যা না করিয়া বসি!

এমনি রাজার যোগ্য আদরে, ছয়-সাত সপ্তাহ আমাকে বাঁচিতে হইবে! তার পর, আমার এই দেহখানা, ফাঁসিকাঠে চড়াইবার জন্য দেবতার অর্ঘ্যের মত, সযত্নে, ইহারা জল্লাদের হাতে তুলিয়া দিবে!

প্রথম দু-একদিন, কি সে করুণা! মৃত্যুর অনলে ফেলিবার পূর্ব্বে শীতল স্নেহের অমৃত-সিঞ্চন! ক্রমে ইহা সহিয়া আসিতেছিল! কিন্তু তাহার পর সেই পরিচিত ও পরিমিত ব্যবহার! আর মাঝে মাঝে বিদ্রূপের স্নিগ্ধধারা!

আমার বয়স, শিক্ষা, সংসর্গ ও চেহারার কিছু কাজ হইল! লেখাপড়া করিবার অনুমতি পাইলাম। সকাল-সন্ধ্যা ভগবানকে ডাকিবার অনুমতিও মিলিল! পরে প্রহরীবেষ্টিত হইয়া মুক্ত বাতাসে একটু পরিক্রমণ! আরো দু-একজন হতভাগ্য বন্দীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে পাইলাম! তারা ইহারি মধ্যে, বেশ সুখ সংগ্রহ করিয়া লইয়া আরামে আছে! তাদের অপরাধ কি, জিজ্ঞাসা করিলাম; কেহ বলিল,—কি সে অভদ্র, কুৎসিৎ ভাষা!—বলিল, চুরি, কেহ-বা, প্রবঞ্চনা—কেহ বা আর-কিছু! কাজগুলা যেন, কত গর্ব্বের! আশ্চর্য্য, ইহাদিগের ধারণা! অদ্ভুত, ইহাদিগের সান্ত্বনার রীতি!

তবু ইহারা আমার দুঃখে সহানুভূতি জানাইত। ইহারাই আজ আমার একমাত্র সঙ্গী, বন্ধু! একদিন ইহাদিগকে কি ঘৃণা করিতাম! আর, আজ, ইহাদিগের সহিত কথা কহিয়াই বাঁচিয়া আছি! নহিলে ত উন্মাদ হইয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু ইহারা কি যথার্থই 'মনুষ্য' নামের যোগ্য! আহা, নিতান্তই হতভাগ্য! যে সাধু তার স্তবগান রচনা করিয়া ধন্য হইতে কে না চায়? যে ধনী, যে ভাগ্যবান, তার একটী প্রসাদবাণী-লাভের জন্য, কে না কাতর? কিন্তু এই সকল ঘৃণ্য, হতভাগ্য জীবকে মানুষ বলিয়া, ভাই বলিয়া যে বুকে টানে, জানিনা, সে কেমন! কোথায় তার স্থান! কি উদার তার হৃদয়!

আর ঐ ত প্রহরীগুলা—তারাও সহানুভূতি দেখাইতে আসিত, কিন্তু সে যেন পরিহাস! আজ দুর্দ্দশায় পড়িয়া প্রথম, মানুষ চিনিলাম! ইহারা ত আমার সহিত কথা কহিতে, আমার দুঃখে সহানুভূতি জানাইতে কুণ্ঠিত নহে, তাহাতে এতটুকু ঘৃণা বোধ করে না—আমার মধ্যে এমন কোন অসাধারণত্বের পরিচয় লইবার জন্য ক্ষেপিয়া উঠে না! অলস দর্শকের মত লোলুপ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া থাকে না!

৬

ভাবিতেছি, এই কথাগুলা যদি লিখিয়া যাই ত, মন্দ হয় না! কথা কহিবার জন্য যখন সঙ্গী মিলিবে না, তখন এই কাগজ-কলমকেই সঙ্গী করিয়া লই! কিন্তু কি লিখিব? আমার এ ব্যর্থ চিন্তার রাশি কাগজের উপর সাজাইয়া লাভ কি? চারিটা প্রাচীরের বেষ্টনির মধ্যে ধরা দিয়া, নির্জ্জীব শৃঙ্খলিত জীবনে সুখদুঃখের মালা গাঁথিয়া, কি ফল! আমি আজ ঠিক এ জগতের নহি ত! ইহ-পরকালের মাঝামাঝি আজ আমি দাঁড়াইয়া! আপনার বলিয়া আশ্রয় করি, এমন কে

আছে, কি আছে, আমার, ভগবান! তবু এ অসহ্য বেদনার কথা লিখিয়া রাখিব।

দেখিয়া, লোকে ঘৃণা করিবে! করুক! লোকের সহানুভূতি ত এতটুকু বিচলিত হইল না! তবে তার ঘৃণাকেই বা ভয় করি, কেন!

অন্তরের মধ্যে যেন ঝড় বহিতেছে! একটা সংগ্রাম! মৃত্যুর সহিত বিপুল, কঠিন সংগ্রাম!

জীবনের দিনগুলি যার এমন করিয়া গণিয়া দেওয়া হইয়াছে, তার—উঃ—কি সে অবস্থা! আলো, হাসি, সমস্তই, হায়, একটা ফুৎকারে নিভিয়া যাইবে!

প্রতিমুহূর্ত্তে আমি যে ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি—তুচ্ছ ফাঁসির রজ্জু, ইহার অধিক কি যন্ত্রণা দিবে! সে ত বিরাট মুক্তির আভাষ দিতেছে! এই বদ্ধ বায়ু ও রুদ্ধ করুণার উপর হইতে বিরাট সঙ্কীর্ণতার প্রস্তরখানা সে যেন হিড় হিড় করিয়া টানিয়া লইবে! তার পর, আঃ, কি সে আশা-আলোকের অপূর্ব্ব রাজ্যে, কি সে মুঞ্জরিত সুখের মধ্যে চকিতে বিলীন হইয়া যাইব!

আর, এই লোকগুলা, যারা আইন করিয়াছে! তারা কি একদণ্ড ভাবে না, মানুষকে ফাঁসির রজ্জুতে ঝুলাইতে মানুষের কি অধিকার! তারও প্রাণ আছে, চেতনা আছে, বুদ্ধি আছে, জ্ঞান আছে! একটা তুচ্ছ রজ্জুর বন্ধনে এ সমস্ত বাঁধিয়া নষ্ট করিবে! তাহারি সঙ্গে কত সাধ, আশা, প্রেম, কতখানি হৃদয় নিমেষে ঝরিয়া যাইবে! কি নৃশংস, এই অনুষ্ঠান! কিন্তু তারা এ সব কথা ভাবে না! তারা ভাবে, একটা রজ্জু, আর একটা কণ্ঠমাত্র, আর কিছু নাই! মূর্খ, অন্ধ প্রতিশোধ, আর হিংসাটাকেই তারা জগতে সর্ব্বস্ব জ্ঞান করিয়াছে!

সেইজন্যই আমি লিখিয়া রাখিব! আমার তুচ্ছ ক্ষুদ্র বেদনাটুকু অবধি ফুটাইয়া ধরিব—মনের মধ্যে কি এ দ্বন্দ্ব চলিয়াছে, কেহ দেখিবে না, বুঝিবে না, এতটুকু তার আভাষ পাইবে না! কি তুচ্ছ শরীরের বেদনা! মনের মধ্যে বেদনার যে গুরুভার নিশ্বাস-রোধ করিয়া ধরিতেছে, তাহার যে, তুলনা নাই!

একদিনো কি কেহ এ কাগজগুলা পড়িয়া দেখিবে না, কি কষ্ট সহিয়া একজন হতভাগ্য প্রাণ দিয়াছে! কে জানে! হয়ত কেহ দেখিবে না! হয়ত, কোন এক দুর্দ্দিনে, ঝড়ের মুখে উড়িয়া, এই কাগজের টুকরাগুলা ধূলা-কাদা মাখিয়া, পথের ধারে পড়িয়া থাকিবে—কালির শেষ রেখাটুকু অবধি, আমার জীবনের শেষ নিশ্বাস-বায়ুর মতই একান্ত নীরবে নিভৃতে, মিলাইয়া যাইবে! লোকচক্ষুর একটা মৃদু ইঙ্গিতও সেগুলাকে স্পর্শ করিবে না!

৭

কিম্বা হয়ত, এ কাগজগুলার উপর একদিন কারো দৃষ্টি পড়িবে—তখন জজের মনে এমন একটা স্পন্দন উঠিবে যে, ফাঁসির প্রথা উঠিয়া যাইবে! কত নির্দ্দোষী, কত দুর্ভাগা, যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্তি পাইবে! কিন্তু তাহাতে আমার কি লাভ! আমার জীবনটা ত কঠিন রজ্জুসংস্পর্শেই বাহির হইয়া যাইবে!

প্রাণটা বাহির হইয়া যাইবে! মৃত্যু ঘটিবে! এই সূর্য্যের আলো, বসন্তের এই

স্নিগ্ধ বায়ু, এই ফলফুলে, পাখীর গানে ভরা, বিচিত্র শ্যাম ধরণী, রঙীন মেঘ, সমস্ত চরাচর, নিমেষে আমি হারাইয়া ফেলিব!

না! নিজেকে রক্ষা করিতে হইবে! আপনাকে বাঁচাইব! কিছুতে কি এ মৃত্যু রোধ করা যায় না! আঃ, ইচ্ছা হয়, কারা-গৃহের এই পাথরের দেয়ালে ঘা দিয়া আপনার মাথাটাকে চূর্ণ করিয়া ফেলি! লোকগুলা ক্ষোভে নিরাশায়, হাহাকার করিয়া উঠিবে, আর আমার, আঃ কি সে আনন্দ!

৮

এখন আগাগোড়া আমি অবস্থাটা ভাবিয়া দেখি! আজ তিন দিন বিচার শেষ হইয়া গিয়াছে! আপিল করিলে হয়! একবার শেষ চেষ্টা!

আট দিন ত দরখাস্তটুকু এ-ঘর ও-ঘর ঘুরিবে। পনের দিন পরে কোর্টের হাতে পড়িবে। তার পর নম্বর, রেজিষ্টারীর হাঙ্গামা আছে! তবে মীমাংসা হইবে, আপিলের অধিকার মিলিবে কি না!

আবার পনের দিন ধরিয়া প্রতীক্ষা—অধীর কাতর প্রতীক্ষা! শেষে আবার বিচারের অভিনয়! গবর্ণমেণ্টের উকিল বুঝাইবে, অন্যায় আস্পর্দ্ধা ও ধৃষ্টতা এই বন্দীর! এমনভাবে অপরাধ প্রমাণ হইয়া গিয়াছে, এখনো আপিল,—ইত্যাদি!

এমনি করিয়া ছয় সপ্তাহ কাটিয়া যাইবে! বালিকার কথাই যথার্থ দেখিতেছি!

৯

একটা উইল লিখিলে হয়, মনে করিতেছি। কিন্তু বৃথা! মকদ্দমার খরচ দিতেই ত আমার যথাসর্ব্বস্ব বাহির হইয়া গিয়াছে! যাহা আছে, তাহার জন্য উইল করিলে কোর্টে আরো কিছু দণ্ড দিবার ব্যবস্থা হয়, বটে!

সংসারে এখনো আমার বৃদ্ধা মাতা, কিশোরী পত্নী, এবং একটি ছোট মেয়ে আছে! তিন বৎসরের শান্ত মেয়েটি! তার গোলাপের মত রাঙা ঠোঁটে হাসিটুকু লাগিয়াই আছে। উজ্জ্বল নীলচক্ষু, কোঁকড়া কেশের গুচ্ছ—তারি দু চারিটা কেশ মুখে-চোখে উড়িয়া পড়িতেছে—ফুলের গায় যেন লতাপাতার ঝালর দুলিতেছে! ছয় মাস তাহাকে আমি দেখি নাই! দীর্ঘ ছয় মাস!

আমার মৃত্যুতে জগতে তিনটি নারী অনাথা হইবে—পুত্রহারা, স্বামিহারা, পিতৃ-হারা—তিনটি অভাগিনী আইনের একটি ইঙ্গিতে তাদের একমাত্র আশ্রয়টুকু ঘুচিয়া যাইবে!

আমার যে দণ্ড হইয়াছে, স্বীকার করি, তাহা ন্যায্য—তাহার দোষ দিতেছি না! কিন্তু এই অসহায়া নারীগুলি, ইহারা কি দোষ করিয়াছিল?

লোকের ঘৃণা বহিয়া যে দুর্ব্বিবহ জীবন তারা বহন করিবে, তাহার জন্য ত ইহারা এতটুকু দায়ী নহে। তবু, ইহারি নাম বিচার! এবং ইহাই সে বিচারের চূড়ান্ত ব্যবস্থা!

বৃদ্ধা মাতার জন্য, আমি কাতর নহি! তাঁহার জীর্ণ দেহখানাকে ধূলিসাৎ করিবার পক্ষে, এ আঘাত পর্য্যাপ্ত!

স্ত্রীর জন্যও চিন্তা নাই! সে চিররুগ্না, শয্যাশায়িনী। রোগে তার জীবন-দীপ নিব-নিব—এ সংবাদ একটি ফুৎকারের মত সে শেষরশ্মিটুকু নিবাইয়া দিবে! অবশ্য যদি সে

পাগল না হইয়া যায়!—লোকে বলে, উন্মাদের জীবন সুদীর্ঘ হয়। হোক সুদীর্ঘ, তবু সে মৃত্যুর মত বিরাম দান করে! শান্তি বহিয়া আনে!

কিন্তু আমার কন্যা—এই শান্ত শিশু, আদরের কন্যা মেরি—হাসি, খেলা, গান লইয়াই যে সে আছে। অভাগিনী জানে না, তার মাথার উপর আজ কি বিপদ উদ্যত হইয়াছে! বজ্রের শিখার মত তার জীবনটী জীর্ণ, দীর্ণ হইয়া যাইবে—এ চিন্তাই যে আমার বক্ষপঞ্জরগুলাকে চূর্ণ করিয়া দিতেছে!

১০

এখনো রাত্রি শেষ হয় নাই। চোখে নিদ্রা নাই! অন্ধকার কারাগৃহ, বাহিরেও এতটুকু সাড়াশব্দ নাই! এখন কি করিয়া সময় কাটাই? রাত্রির এই শেষ দণ্ডটুকু যে একান্ত দুঃসহ!

ঘরের কোণে একটা দীপ জ্বলিতেছিল। তাহা লইয়া দেয়ালের চারিপাশ দেখিতে লাগিলাম। কোথাও কি এতটুকু ছিদ্র নাই—বাহিরের স্নিগ্ধ বায়ু প্রবেশের জন্য ছোট একটু পথ! না!

দেয়ালে কত রকমের মূর্ত্তি আঁকা রহিয়াছে! সে কত কথা, কত ভাষা, কোনটি খড়ির অক্ষর, কোনটী বা কয়লার! আহা, আমারি মত কত হতভাগ্য জীব মনের ব্যথা পাষাণের দেয়ালে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে! তার মর্ম্মের সমস্ত বন্ধন টুটিয়া গিয়াছে, তবু এ পাষাণ প্রাণ সান্ত্বনাচ্ছলে একটী কথাও বলে নাই! একটু ক্ষীণ প্রতিধ্বনিও নহে! মূক, নীরব পাষাণ এমনি দাঁড়াইয়া ছিল, তার ব্যাকুল কণ্ঠের আর্ত্তস্বর সেই পাষাণের গায় ঠেকিয়া চূর্ণ হইয়া গিয়াছে!

তাদের বেদনার কথা কি—তাই দেখিতে লাগিলাম! একটা কাজ জুটিয়া গেল! তাদের এই অশ্রুমাখা বেদনার মালা গাঁথিয়া সময় কাটাইয়া দিই! তবু মৃত্যুর কথা দুদণ্ডের জন্যও ভুলিয়া থাকিব।"

ঠিক আমার শয্যার পার্শ্বে দেয়ালের গায়ে তীরে-গাঁথা দুখানি শোণিতাক্ত হৃদয়—শিল্পী আপনার যেন হৃদয়-শোণিত দিয়াই তাহার মধ্যে লিখিয়া রাখিয়াছে—'প্রাণভরা ভালবাসা!' আহা বেচারা—এখানে বসিয়া সারা দিনরাত্রি তার ভালবাসার কথাই ভাবিয়াছে! তাহারি পাশে কয়লার অক্ষরে কে লিখিয়াছে,"সম্রাটের জয় হোক্!" কি আশা, আশ্বাসের কি মহান আকাঙ্ক্ষা, এই অক্ষরগুলিতে!

একধারে কে লিখিয়াছে, "আমি মাথিয়াকে ভালবাসি!" আর একধারে 'এ' অক্ষরটি—সাদা খড়ির রেখা! সেই অন্ধকারে রূপার অক্ষরের মত সেটি ফুটিয়া উঠিয়াছিল—'এ' বুঝি তার প্রাণের প্রিয়জন,এমা কিম্বা এডিথ! আহা, এই একটি অক্ষরে একখানি ব্যথিত কাতর প্রাণের কতখানি দীর্ঘনিশ্বাস মিশানো রহিয়াছে! আমি বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম! আমার এই নিঃসঙ্গ নির্জ্জন মুহূর্ত্তে পাষাণের দেয়াল যেন করুণা করিয়া জাগিয়া উঠিল! সে তার পাষাণ বক্ষে,এত মর্ম্মব্যথা, এত গোপন কথা লুকাইয়া রাখিয়াছিল! আজ কোথায় তারা, এই সব হতভাগ্যের দল! আজ কোথায় তাদের মাথিয়া, এমা, এডিথ! তারা কোন্ গোলাপকুঞ্জের আড়ালে, কিম্বা কোন বাতায়নের ধারে বসিয়া, আকাশের দিকে চাহিয়া

আছে! তাদের এ বিদায়ের বেদনা ঘুচিয়াছে কি না, কে বলিয়া দিবে?

দীপ লইয়া দেখিতে লাগিলাম। দেয়ালের কোণে এ কি! এ যে ফাঁসিকাঠের ছবি! কে আঁকিয়া রাখিয়াছে! রূঢ়, মূর্খ, বর্ব্বর, এমন করিয়া মৃত্যুকে আবাহন করিয়া লইয়াছে! এই পৃথিবী, এই জীবন, তার কাছে কি এতই ভার বোধ হইয়াছিল। দুই খণ্ড কাঠ সোজা উঠিয়াছে, মাথায় আর একটা কাঠ লাগানো, মধ্যে দড়ি ঝুলিতেছে—একদৃষ্টে আমি তাহার দিকে চাহিয়াছিলাম! মাথা ঘুরিতে লাগিল। হাত হইতে দীপ পড়িয়া গেল! কক্ষ অন্ধকারে পূর্ণ হইল। কি সে, গাঢ়, তীব্র, অন্ধকার, ছুঁচের মত যেন গায় বিঁধিতেছিল। অবসন্নভাবে আমি মেঝের উপর বসিয়া পড়িলাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নে।

(লেকঁৎ-দে-লিল্ হইতে)

মধ্যাহ্ন; গ্রীষ্মের রাজা, মহোচ্চ সে নীলাকাশে বসি'
নিক্ষেপিল রৌপ্যজাল, বিস্তৃত বিশাল পৃথ্বী 'পরে;
মৌন বিশ্ব, দহে বায়ু তুষানলে নিশ্বসি' নিশ্বসি';
জড়ায়ে অনল-শাড়ী বসুন্ধরা মূরছিয়া পড়ে।

ধূ ধূ করে সারা দেশ, প্রান্তরে ছায়ার নাহি লেশ,
লুপ্তধারা গ্রামনদী, বৎস গাভী পানীয় না পায়;
সুদূর কাননভূমি (দেখা যায় যার প্রান্তদেশ)
স্পন্দন-বিহীন আজি, অভিভূত প্রভূত তন্দ্রায়।

গোধূমে সর্ষপে মিলি' ক্ষেত্রে রচে সুবর্ণ সাগর,
সুপ্তিরে করিয়া হেলা বিলসিছে বিস্তারিছে তারা;
নির্ভয়ে করিছে পান তপনের অবিশ্রান্ত কর,
মাতৃক্রোড়ে শান্ত শিশু পিয়ে যথা পীযূষের ধারা।

দীর্ঘনিশ্বাসের মত, সন্তাপিত মর্ম্মতল হ'তে,
মর্ম্মর উঠিছে কভু আপুষ্ট শস্যের শীষে শীষে;
মন্থর, মহিমাময় মহোচ্ছ্বাস জাগিয়া জগতে,
যেন গো মরিয়া যায় ধূলিময় দিগন্তের শেষে।

অদূরে তরুর ছায়ে শুয়ে শুয়ে শুভ্র গাভীগুলি
লোল গল-কম্বলেরে রহি' রহি' করিছে লেহন,

আলসে আয়ত আঁখি স্বপনেতে আছে যেন ভুলি,'
আনমনে দেখে যেন অন্তরের অনন্ত স্বপন।

মানব! চলেছ তুমি তপ্ত মাঠে, মধ্যাহ্ন-সময়ে,
ও তব হৃদয়-পাত্র দুঃখে কিবা সুখে পরিপূর!
পলাও! শূন্য এ বিশ্ব, সূর্য্য শোষে তৃষামত্ত হয়ে,
দেহ যে ধরেছে হেথা দুঃখে সুখে সেই হ'বে চুর।

কিন্তু, যদি পার তুমি হাসি আর অশ্রু বিবর্জ্জিতে,
চঞ্চল জগত মাঝে যদি থাকে বিস্মৃতির সাধ,
অভিশাপে বরলাভে তুল্য জ্ঞান, ক্ষমায় শাস্তিতে
আস্বাদিতে চাহ যদি মহান্ সে বিষণ্ণ আহ্লাদ,—

এস! সূর্য্য ডাকে তোমা, শুনাবে সে কাহিনী নূতন;
আপন দুর্জ্জয় তেজে নিঃশেষে তোমারে পান ক'রে,—
শেষে ক্লিন্ন জনপদে লঘু করে করিবে বর্ষণ,
মর্ম্ম তব সিক্ত করি সপ্তবার নির্ব্বাণ-সাগরে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

শক্তি ও সাধনা।

(বল্লভদাস হইতে)

সুকেশী কিশোরী কুমারী। তার মত রূপসী ও গুণবতী নারী সেকালে আর ছিল না। সুকেশী দরিদ্রের কন্যা। কিন্তু বিকশোন্মুখ নির্জ্জন পুষ্পটির স্নিগ্ধসৌরভ মুগ্ধ ভ্রমরকে যেমন আপনার দিকে টানিয়া আনে, তাহার রূপগুণের গৌরবটকুও তেমনি তাহাকে ছোট-বড় সকলেরই নিকট প্রিয় ও পরিচিত করিয়া তুলিয়াছিল, এবং দেশ দেশান্তর হইতে নানা মুগ্ধচিত্তকে আকৃষ্ট করিয়া নিকটে আনিয়াছিল।

এই সকল আগন্তুকের মধ্যে রাজকুমার ও এক ব্রাহ্মণকুমারই সর্ব্বপ্রধান। একজন শক্তি, অপরজন সাধনা। উভয়েই কুমারীর অন্তরের অনুরাগটুকু আপনার ধন করিবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইলেন।

আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি তখন স্বয়ম্বর প্রথা প্রচলিত ছিল। সুতরাং রাজকুমার ও ব্রাহ্মণকুমার উভয়েই নিঃসঙ্কোচে কিশোরীর অন্তরজয়ে প্রবৃত্ত হইলেন।

রাজকুমার বিরোচন শক্তি ও সম্পদের মদগর্ব্বে স্ফীত। তাঁহার পিতা দৈত্যকুলতিলক প্রহ্লাদ। প্রহ্লাদের শক্তি ও সাম্রাজ্যের

গৌরবে স্বর্গের দেবগণ পর্য্যন্ত লজ্জিত ও ঈর্ষান্বিত। প্রহ্লাদের প্রধান গুণ তিনি ন্যায়পরায়ণ। বিরোচন পিতার প্রবল সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারীর উপযুক্ত শিক্ষাই লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ইন্দ্রের ন্যায় ধনুর্ব্বিদ্‌ এবং মৃগয়ায় অদ্বিতীয়। কিন্তু লোকে চুপি চুপি বলাবলি করিত যে বিরোচন অহঙ্কারী এবং পিতার মহৎগুণে বঞ্চিত।

ব্রাহ্মণকুমার সুধন্বার প্রকৃতি ঠিক বিপরীত। সুধন্বার বিদ্যা ও গুণের যশ চতুর্দ্দিকেই ব্যাপ্ত। ত্রিলোকবিদিত আঙ্গিরসের ঔরসে তাঁহার জন্ম। সুধন্বা শূন্য সম্পদ ও শক্তিকে ঘৃণা করিতেন এবং ইহার গর্ব্বে স্ফীত ব্যক্তিকে নিতান্তই হীন বলিয়া জ্ঞান করিতেন। কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে সৌন্দর্য্য রাজা ও ভিখারী উভয়েরই প্রাপ্য ও ভোগ্য বস্তু। তাঁহার শ্রেষ্ঠ শক্তির বলে তিনি যে সুকেশীকে তাঁহার আপন ধন করিবেন এবং রাজপুত্রের শক্তি সম্পদের মোহ যে তাঁহার ঈপ্সিতাকে অন্ধ করিবে না এ বিষয়েও তাঁহার অন্তরে লেশমাত্র সন্দেহ ছিল না।

সুকেশীর পাণিগ্রহণের জন্য দুইটি যুবককে প্রতিদ্বন্দ্বী দেখিয়া যে তাহার মনে বিশেষ কোন বিরক্তির ভাব আসিত তাহা নহে। নারী চিরদিনই নারী। একদিকে প্রবল পরাক্রান্ত কুবের পুত্র বিরোচন অপরদিকে শুদ্ধাত্মা পণ্ডিতপ্রবর সতেজ সুন্দর ব্রাহ্মণকুমার সুধন্বা তাহার প্রেমভিখারী। সৌন্দর্য্যের পদতলে আজ শক্তি ও সাধনা লুণ্ঠিত! কিশোরী মনে মনে একটা অস্ফুট আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল। ইচ্ছা করিলে সে আজ সমুদ্রমেখলা ধরণীর অধিশ্বরী হইতে পারে, কিন্তু এরূপ জীবনকে সে মর্ম্মমধ্যে ঘৃণা করে। এ সুখের তৃষ্ণা তার নাই,—শক্তিকে বরণ করিবার তার নাই। এই ব্রাহ্মণকুমারকে বরণ করিয়া সাহসও দৈত্যকুমারকে ক্ষুব্ধ করিলে সুধন্বার উপর বিরোচনের প্রবল শক্তির পীড়ন আরম্ভ হইবে সে কথাও সে কোনমতেই ভুলিতে পারিতেছে না।

এক দিন সন্ধ্যায় বিলাস বাহুল্য-মণ্ডিত বিরোচন কিশোরীর গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কন্যা তাঁহাকে সাদরে অভিবাদন করিয়া এক বহুমূল্য আসনে উপবেশন করাইল। আজ বিরোচন কেমন বিরক্ত ও বিষণ্ণ।

সুকেশী জিজ্ঞাসা করিল "আজ আপনার মনটা এত বিষণ্ণ কেন রাজকুমার?"

"ব্রাহ্মণেরা দিন দিন শঠতায় ও ঔদ্ধত্যে পূর্ণ হইতেছে। তাদের যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক।" বিরোচনের স্বর ব্রাহ্মণদ্বেষে পূর্ণ।

"সুধন্বা আমার নিকট আসে বলিয়াই কি আপনি একথা বলিতেছেন?" সুন্দরী মনে করিল বুঝি সেইজন্যই বিরোচনের ঈর্ষা হইয়াছে।

রাজকুমার বলিলেন—"না, তার জন্য তেমন নয়। এটা একটা জাতিগত কথা। আমার স্বজাতি দৈত্যগণই সর্ব্বপ্রধান ও শক্তিবান। তাহারা স্বর্গমর্ত্ত্য শাসন করিতেছে। এমন কি স্বয়ং দৈত্যগণও তাহাদের ভয়ে ভীত। কিন্তু এসব সত্ত্বেও ব্রাহ্মণগণ যে শ্রেষ্ঠতার ভাণ ক'রে আমাদের উপর আধিপত্য করে, এ অসহ্য। এ পুরোহিত গুলার ধৃষ্টতা আর সহ্য হয় না।"

দৈত্যরাজের ব্রাহ্মণের প্রতি এই অধীর ঈর্ষা ও ক্রোধ দেখিয়া সুকেশীর অধরে হাসি আসিয়া দেখা দিল; সে কষ্টে তাহা গোপন করিল। তাহার ভয় হইল হয়ত সুধন্বা তাহার অন্তর অধিকার করিয়াছে বলিয়া দৈত্যরাজের ঈর্ষা হইতেছে। কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া সে তাহার কর্ত্তব্য স্থির করিতে লাগিল।

বিরোচন আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার কি মত পদ্মাক্ষি?" সুকেশী একটু হাসিল, কোন উত্তর করিল না। পরে বলিল—"যুবরাজ, এ প্রশ্ন বড়ই কঠিন, আমার ন্যায় অনভিজ্ঞার এ বিষয়ে উত্তর দেওয়া সঙ্গত নয়।"

জয়োল্লাসে প্রফুল্ল হইয়া বিরোচন বলিলেন—"তাহা হইলে অভিজ্ঞতার একটা মূল্য আছে বলিয়া তুমি মনে কর?"

কিশোরী ধীরে ধীরে উত্তর করিল—"নিশ্চয়।"

"তুমি কি মনে কর আমার অভিজ্ঞতার কোন অভাব আছে?"

"না না; তাহা কি কেহ বলিতে পারে?"

"তবে আমি যে বলিতেছি যে দৈত্যেরা শ্রেষ্ঠ ও ব্রাহ্মণেরা নিকৃষ্ট, ইহাও ঠিক?"

মর্ম্মাহতা বালিকা উত্তর করিল—"আপনি কি সত্যই এইরূপ মনে করেন?"

"এ কথায় তোমার সন্দেহ কেন?"

"দৈত্য ও ব্রাহ্মণ উভয়েরই মধ্যে ত মহৎ ব্যক্তি আছেন।"

"কিন্তু জাতি ভাবে ধরিলে কাহারা বড়?"

"আমি জানি না, আমি ও সব বড় কথা বুঝিতে পারি না।" সুকেশী ধরা দিবার পাত্র নহে।

উত্তর শুনিয়া বিরোচন বুঝিলেন যে তাঁহার অন্তরের অধীশ্বরী কথায় ধরা দিতে প্রস্তুত নহে। কিন্তু তিনি যে প্রবল প্রতাপ প্রহ্লাদের পুত্র একথা তিনি ভুলিতে পারিলেন না। অতি প্রিয় হইলেও তাঁহার সামান্য এক প্রজার নিকট এভাবে পরাজিত হইতে তাঁহার পুরুষত্ব কুণ্ঠিত হইল। তাঁহার প্রভূত অর্থ ও প্রবল পদমর্য্যাদা সত্ত্বেও যে একটা সামান্যা বালিকা তাঁহার গ্রাসের মধ্যে আসিল না ইহাতে বিরোচন একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন—"সুন্দরি, তুমি অত গর্ব্বিতা ও বিজ্ঞা হইবার চেষ্টা করিও না। আমি তোমাকে যে কথা বলি সে কথা কি তুমি অত বিচার বিবেচনা না করিয়াও বিশ্বাস করিতে পার না? যে নারী আমার রাজ্ঞী হইবে তাহার পক্ষে এরূপ অবহেলা কি সঙ্গত?"

"যুবরাজ আপনি উচ্চপ্রাণ রাজপুত্রেরই মত কথা বলিয়াছেন। আপনার মনে কি সত্যই ধারণা যে আমার গর্ব্ব ও জ্ঞান দুইই আছে? গর্ব্ব ও জ্ঞান কি একত্রে থাকা সম্ভব?" রাজ্ঞী হইবার প্রলোভন সুন্দরীকে মুগ্ধ করিল না।

বিরোচন কতকটা অনুযোগ কতকটা অসন্তোষের সুরে বলিলেন "অন্ততঃ তুমি যে গর্ব্বিতা তাহাত কথায় প্রকাশ করিতেছ?" সুকেশী আত্মরক্ষায় বলিয়া উঠিলেন—"তা আমি নিজে ত' কিছুই বুঝিতে পারি না। সে যা হোক গর্ব্ব জিনিসটা গুণ না দোষ যুবরাজ?"

"গর্ব্বটা গুণ, যখন তার পশ্চাতে শক্তি থাকে, নচেৎ নির্ব্বুদ্ধিতা মাত্র।"

"আমার কি কোন শক্তিই নাই? আমার এই সৌন্দর্য্য কি আমার একটা শক্তি নহে?" সুকেশীর আত্মসমর্থনের চেষ্টা দেখিয়া বিরোচন একটু হাসিয়া বলিলেন—"তোমার এ সৌন্দর্য্য লইয়া তুমি করিবে কি?"

চতুরা সুন্দরী বিরোচনের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল। রাজপুত্র যে তাহার ন্যায় সামান্যা নারীর গৃহে উপস্থিত তাহাই ত তাহার সৌন্দর্য্যমাহাত্ম্যের যথেষ্ট প্রমাণ। সে মনে মনে বুঝিল রাজশক্তিও ইহার নিকট পরাজিত। তাহার হাসি ও দৃষ্টি দেখিয়া বিরোচন তাহার মনের ভাব বুঝিলেন। তিনিও একটু হাসিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "কিন্তু তোমার এ সৌন্দর্য্য লইয়া তুমি করিবে কি?"

"তা আমি জানি না। পণ্ডিতে তার পাণ্ডিত্য লইয়া করে কি? রাজারা তাদের শক্তি লইয়া করে কি?"

বিরোচন মনে মনে তাহার বুদ্ধির প্রশংসা করিলেন, মুখে বলিলেন—"ঠিক কথা। কিন্তু পণ্ডিত ও রাজা তার পাণ্ডিত্য ও শক্তি লইয়া কি করে তাহা শুনিতে চাও?"

"হাঁ বলুন, সেটা জানায় আমার স্বার্থ আছে।"

"পণ্ডিতেরা পণ্ডিতের সহিত মিশিয়া আপনার পাণ্ডিত্যের উৎকর্ষ সাধন করেন। রাজারা প্রজারক্ষার নিমিত্ত আপনার শক্তিকে প্রয়োগ করেন। তোমার এ শক্তি লইয়া তুমি কি করিবে ক্ষীণাঙ্গি?"

কিশোরী বলিল—"আমার এ সৌন্দর্য্য জগতের ধর্ম্মসেবার জন্য! বলিতে পারি না আমার এ শক্তির সহিত রাজশক্তির তুলনা সঙ্গত কি না। তবে আমার মনে হয় ইহার রাজশক্তির সহিত মিলিত না হওয়াই ভাল।"

বিরোচন ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন সুন্দরি?"

ঈষৎ ব্রীড়াভরে সুন্দরী উত্তর করিল—"কারণ এ দুই প্রবল শক্তি একত্র সংযুক্ত হইলে, তাহার বেগটুকু নষ্ট করিবার মত শক্তি এ পৃথিবীতে আর থাকিবে না—সৃষ্টি একেবারে রসাতলে যাইবে।"

তাহার উত্তরে অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া বিরোচন বলিলেন—"না না, সেরকম কোন ভয় নাই। আমি দেখিতেছি তোমার শক্তি ও সরসতা দুইই বেশ আছে। এ দুটা যার তার থাকে না।"

"আনন্দিত হইলাম।"

"তাহ'লে আমার কথা তুমি স্বীকার কর?"

"সঙ্গত হইলে অবশ্যই স্বীকার করি।"

"কিন্তু সঙ্গত কি অসঙ্গত প্রমাণ হইবে কি রূপে?"

"আপনার এ আক্রমণ সুধন্বার উপর, সুতরাং এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তাঁহারই আবশ্যক। কাল প্রাতে তিনি আমার নিকট আসিবেন বলিয়া বোধ হয়। ততক্ষণ পর্য্যন্ত দৈত্যগণকেই মহৎ ও ধার্ম্মিক বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত।"

(২)

পরদিন সুধন্বা দেখিলেন বিরোচন কিশোরীর সহিত এক বহুমূল্য আসনে বসিয়া

আছেন, চতুর্দ্দিকে আজ্ঞাবাহী দেব-নর অনুচরবর্গ দাঁড়াইয়া আছে। মদমত্ত বিরোচন তাঁহার উপস্থিতি লক্ষ্যই করিলেন না। সুকেশী তাঁহাকে সাদর অভিবাদন করিবার জন্য আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন।

সুধন্বা ব'লিয়া উঠিলেন—"থাক্ থাক্ সুন্দরী, ব্যস্ত হইবার আবশ্যক নাই। আমি রাজকুমার হইতে কিঞ্চিৎ দূরে ব্রাহ্মণের উপযুক্ত আসনই গ্রহণ করিব।"

এতক্ষণে বিরোচনের যেন চেতন হইল। তিনি বলিলেন—"কে সুধন্বা যে! এস, এস। তুমি আমার পাশে ব'সতে পারবে না তা জানি। তোমার বসবার জন্য একখানা পিঁড়ি ও গাছকতক দর্ভ চাই। দাঁড়াও, আনতে ব'লচি।"

সুধন্বাকে অপমানিত করিবার জন্যই বিরোচন একথাগুলি বলিলেন এবং তাঁহার আশানুরূপ ফলও ফলিল। প্রহ্লাদ পুত্রের ঈদৃশ ব্যবহার দেখিয়া সুধন্বা বিস্মিত হইলেন, তাঁহার এরূপ অসদ্ব্যবহারের কোন কারণ না বুঝিয়া বলিলেন—"তুমি এ কি করিতেছ বিরোচন? এ প্রকারে আমাকে অপমানিত করিবার অর্থ কি? তোমার পিতার ব্রাহ্মণের প্রতি সম্মান বোধ আছে, তুমি তাঁহার পুত্র হইয়া এরূপ কেন?"

বিরোচন ঘৃণার সহিত উত্তর করিলেন—"তুমি একজন সামান্য ব্রাহ্মণ বই ত' নয়, ভূমিতলে দর্ভাসনে বসিতে পার না?" "তোমার মনে এতই অবজ্ঞার ভাব? আমাকে অপমানিত করাতেই কি তোমার মহত্ত্ব?"

"আমি তোমাকে অপমানিত করি নাই। আমি তোমাকে তোমার যথাস্থান দেখাইয়া দিয়াছি মাত্র। দৈত্যেরা শ্রেষ্ঠ জাতি, তাহারা ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে বসিতে পারে না। তোমাকে তোমার যথাস্থানে থাকিতে হইবে।"

সুধন্বা অবাক্ হইলেন। দৈত্যের বহুমূল্য আসনকে তিনি ঘৃণা করেন। তাঁহার প্রিয়তমাকে দেখিবার নিমিত্ত তিনি তথায় উপস্থিত হইয়াছেন মাত্র। হায়, কোমলা-কিশোরী আজ গর্ব্বোদ্ধত দৈত্যের কবলে! প্রহ্লাদপুত্র মোহে অন্ধ,—সে মোহ অসত্য অর্থের আর পাশব শক্তির! ঘৃণায় তাঁহার অধরে ঈষৎ হাসি আসিয়া দেখা দিল।

হাসি দেখিয়া বিরোচন আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—"তুমি কি আমার কথায় সন্দেহ কর?"

"নিশ্চয়ই! দৈত্যরাজপুত্র, তোমার গর্ব্ব মিথ্যা।" সুধন্বার কণ্ঠস্বর ও বাক্যগুলি সহজ এবং সতেজ।

"আমি আমার পদসম্পদ পণ রাখিয়া বলিতে পারি যে দৈত্যই শ্রেষ্ঠ।" বিরোচনের মূর্ত্তি এতই উত্তেজিত যে সেসময়ে অন্য কেহ তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিতে সাহস করিত না। পূর্ব্বদিন তিনি দৈত্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিবেন বলিয়া সুকেশীর নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন; সে তাহার প্রমাণ ভার সুধন্বার উপর দিয়াছিল। সুধন্বার উত্তরের প্রতীক্ষায় সুকেশী চাহিয়া রহিল।

সুধন্বা বলিলেন—"দৈত্যপুত্র, আমি তোমার রাজপদ বা সম্পদকে তৃণাপেক্ষাও হীন জ্ঞান করি। যদি তোমার যথার্থই এরূপ শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে জীবন পণ রাখিতে প্রস্তুত আছ কি?"

রাজকুমার বিরোচন একটু ইতস্ততঃ

করিলেন, মনে মনে ভাবিলেন ব্রাহ্মণদের শঠতারও সীমা নাই। জীবন পণ করিয়া তাঁহাদের এ কলহ নিষ্পত্তির জন্য তাঁহার কি দেবনরের দ্বারস্থ হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু দৈত্যের শ্রেষ্ঠত্ব ও তাঁহার প্রতিজ্ঞাও রক্ষা করা কর্ত্তব্য ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "জীবন পণ রাখাই কি তোমার অভিপ্রায় ?" ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন—"হঁ' তোমার কি মনে ভয় হইতেছে ?"

"নিষ্পত্তির জন্য কাহার নিকট যাইতে চাও ?" "তোমার পিতার নিষ্পত্তিই আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। ইহাতে তুমি সম্মত আছ ?"

বিরোচন উত্তর করিলেন—"হাঁ।" মনে মনে ব্রাহ্মণের এরূপ প্রস্তাবের অর্থ কি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

দুইজনে কিশোরীর গৃহ পরিত্যাগ করিয়া প্রহ্লাদের প্রাসাদ অভিমুখে চলিলেন। বৃদ্ধ রাজা এই দুই ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বীকে একত্র দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। উভয়ে রাজসমীপে দণ্ডায়মান হইলে প্রহ্লাদ পুত্রকে বলিলেন—"ব্রাহ্মণ প্রতিনিধির সহিত তুমি একত্র কেন বৎস ?"

"আমাদের মধ্যে একটা মতভেদ হইয়াছে, উভয়েই জীবন পণ রাখিয়াছি। আপনি নিরপেক্ষ হইয়া তাহার মীমাংসা করুন ইহাই প্রার্থনা।" বিরোচন তাঁহাদের বিবাদের বিষয় সমস্ত বলিলেন।

রাজা প্রহ্লাদ সমস্ত বিবরণ শুনিয়া বড়ই চিন্তান্বিত হইলেন ও ব্রাহ্মণকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিয়া অভিবাদন করিলেন।

রাজার এই ভদ্রতা দেখিয়া সুধন্বা বলিলেন—"মহারাজের সৌজন্য সর্ব্বজনবিদিত এক্ষণে আপনি ন্যায় ও সত্য অনুসারে আমাদের বিবাদের মীমাংসা করিতে প্রস্তুত আছেন কি ?"

রাজা কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—"হে ব্রাহ্মণকুলগুরু, আপনি বিদ্বান ও বিজ্ঞ ; আমার পুত্র নির্ব্বোধ ও উদ্ধত। এক্ষেত্রে আপনি জীবন পণের জন্য আজ্ঞা করিতেছেন কেন ? এ বিবাদ ত্যাগ করা কি আপনার ন্যায় মহৎ ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নহে ?"

রাজার অভিসন্ধি বুঝিয়া সুধন্বা একটু বিরক্ত হইলেন,—বলিলেন—"মহারাজ শুনুন। আপনার নিকট বিচারপ্রার্থীর ন্যায়বিচার করাই আপনার প্রধান কর্ত্তব্য। তাহাতে অসম্মত হইলে বা অন্যায় বিচার করিলে আপনি ধর্ম্মে পতিত হইবেন।"

রাজা বিষম বিপদে পড়িলেন, একদিকে তাঁহার পুত্র অপরদিকে তাঁহার ন্যায় বিচারে বিশ্বাসী ব্রাহ্মণতনয় ! কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তিনি চিন্তার জন্য সময় গ্রহণ করিলেন।

তাঁহার পুত্রের ঔদ্ধত্য ও অসদ্ব্যবহারের কথা তিনি জানিতেন, কিন্তু তাই বলিয়া একজন ব্রাহ্মণের জন্য পুত্রহত্যাই বা করেন কি করিয়া। অবশেষে রাজা নিরুপায় হইয়া সূর্য্যোপাসনা আরম্ভ করিলেন। সূর্য্যদেব সন্তুষ্ট হইয়া এক শুভ্র মরালকে রাজসমীপে প্রেরণ করিলেন।

স্বর্গীয় দূতকে সম্মুখে দেখিয়া প্রহ্লাদ কাতরস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"বিহঙ্গবর, আপনি সকলই জানেন, সকলই বুঝেন। এক্ষণে আমার পুত্র ও এই ব্রাহ্মণের মধ্যে কলহে আমার কি কর্ত্তব্য তাই বলিয়া দিন।

এস্থলে ধর্ম্ম কি এবং তাহা পালন না করিলেই বা ক্ষতি কি?"

মরাল বলিল—"নৃপবর, আপনি পুত্রকে রাজ্য ও সম্পদ দান করিতে পারেন। কিন্তু যেখানে ন্যায় ও সত্যের বিচার তথায় আপনি যথার্থ ধর্ম্মপালনে বাধ্য।"

"সত্যকে গোপন করা কি সম্ভব নয়?" দেবদূত বলিল—"অসম্ভব! যে জানিয়া সত্যপ্রার্থীর নিকট সত্যকে গোপন করে সে না জানিয়া যে ভুল করে তাহার অপেক্ষা শতগুণ অধিক পাপী।"

রাজা কাতরস্বরে বলিয়া উঠিলেন "হায়, তবে কি আমি নিজের পুত্রকে বলি দিব?" "ন্যায়ানুসারে আপনি বাধ্য।" এই বলিয়া দেবদূত অন্তর্হিত হইলেন।

কিছুক্ষণ পরে সুধন্বা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহারাজ কি নিষ্পত্তি করিলেন?"

প্রহ্লাদ দৃঢ়স্বরে উত্তর করিলেন—"নিষ্পত্তি করিলাম যে আমার পুত্রই ভ্রান্ত। দৈত্য ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা মূর্খতা মাত্র। দৈত্যকে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শক্তিশালী বলা যাইতে পারে, কিন্তু শ্রেষ্ঠ বলা ঠিক নহে। কেবল শক্তির কোন মূল্য নাই। শক্তি সৎকর্ম্মে প্রযুক্ত হইলে তবেই তাহা শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণের সৎসাধনা যে আমাদের অপেক্ষা অনেক অধিক তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।"

বিচার শুনিয়া বিরোচন হতাশ্বাস হইলেন। কিন্তু তিনি তাহা গোপন করিবার পূর্ব্বেই সুধন্বা বলিলেন; তিনি পণরক্ষার জন্য পীড়ন করিতে প্রস্তুত নহেন। রাজা যে পুত্রকে বলিদান করিয়াও সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন ইহাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছে। সাধনাই জয়ী হইল।

রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া সুধন্বা যখন পুনরায় সুকেশীর নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন শঙ্কিতা সুন্দরী দুইটি মৃণাল বাহু দিয়া তাঁহাকে বেষ্টিত করিয়া ধরিল, কিশোরীর গণ্ড বহিয়া আনন্দাশ্রু ঝরিল; প্রিয়তমের স্কন্ধোপরি আপনার মস্তকটি হেলাইয়া মৃদুস্বরে বলিল—"তুমি আমাকে এতক্ষণে সেই পশুপ্রকৃতি রাজপুত্রের হস্ত হইতে রক্ষা করিলে! আমার জীবন ধন্য হইল, সাধনা সার্থক হইল।"

বিবিধ।

মানুষের মাথার খুলি।—বহুবৎসর পূর্ব্বে জিব্রালটারে একটী মনুষ্যের করোটি পাওয়া যায়। ইহা লণ্ডনের Royal College of Surgeons নামক বিদ্যালয়ে রক্ষিত আছে। সম্প্রতি অধ্যাপক কিথ খুলি হইতে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। "খুলিটী একটী স্ত্রীলোকের এবং খুব সম্ভব ছয় লক্ষ বৎসর পূর্ব্বের কোন স্ত্রীলোকের। খুলিটি দেখিয়া বোধ হয় যে স্ত্রীলোকটী বেশ চতুরা ছিল এবং তাহার চোয়াল দেখিয়া সে সাধারণতঃ কি কি দ্রব্য আহার করিত তাহাও অনুমান করা যায়। খুব সম্ভব বাদাম জাতীয় ফল ও শিকড়ই তাহার প্রধান খাদ্য ছিল এবং যে সমস্ত খাদ্যাদি অধিক চর্ব্বণ করিতে হয় তাহাই সে উপাদেয় খাদ্য বিবেচনা করিত। স্ত্রীলোকটার হস্ত যুগল দীর্ঘ, পদযুগল খর্ব্ব, কণ্ঠদেশ কঠিন, এবং মস্তিষ্ক যথেষ্ট বড় ছিল।"

অধ্যাপক মহাশয়ের বিশ্বাস সে স্ত্রীলোকটী কথাবার্ত্তা কহিতে পারিত। এবং ইহার সময় মানুষ গৃহাদি নির্ম্মাণে পারগ ছিল না এবং মনুষ্য অধিকাংশ সময় মৃগয়াতেই অতিবাহিত করিত; এবং ধীবর বৃত্তিও করিত।

নেপল্‌স্ উপসাগরের ফটোগ্রাফ।—এই ফোটোগ্রাফখানি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ।

ইহা দৈর্ঘ্যে ২৪ হাত এবং প্রস্থে ৩½ হাত। ছয়খানি ফোটোগ্রাফিক প্লেটে আলাহিদা করিয়া ছবি তুলিয়া পরে সেগুলিকে এমন ভাবে চিত্রকরগণ যোড়া দিয়াছেন যে যোড়ার কোন চিহ্নই পাওয়া যায় না।

ম্যালেরিয়া ও গ্রীক ইতিহাস।—মিষ্টার জোন্‌স্ নামক একজন ইয়ুরোপীয় গ্রন্থকার উল্লিখিত পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। সাহেবের মতে প্রাচীন গ্রীসের অবনতির কয়েকটী কারণের মধ্যে ম্যালেরিয়া একটী প্রধান কারণ।

জোন্‌স্ সাহেব প্রাচীন গ্রীসদেশীয় ভৈষজ্যপুস্তকাবলী এবং অন্যান্যপুস্তক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, অতি প্রাচীনকালে গ্রীসে ম্যালেরিয়া ছিল না। খ্রীষ্ট জন্মের পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে আটিকা প্রদেশে প্রথমে সামান্য ম্যালেরিয়া দেখা দেয়। আরিষ্টফানিস নামক সুপ্রসিদ্ধ হাস্যরসিক নাটকলেখক ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। ডিক্লিয়ান এবং পিলোনিসিয়ান যুদ্ধে ইহার বিস্তৃতির সহায়তা করে।

জোন্‌সের মতে গ্রীস যখন রোমের সম্পূর্ণ করতলগত হয় তখনই সেখানে ম্যালেরিয়ার অতিশয় প্রাদুর্ভাব হওয়াতেই গ্রীস অত সহজে রোমের পদানত হইয়া পড়ে। জোন্‌স্ সাহেব প্রমাণ করিয়াছেন যে, যে স্থলে ম্যালেরিয়া বিষ প্রয়োগ করে সেই দেশের লোকজনের শক্তি এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তি লোপ পায়; শারীরিক এবং মানসিক উভয় প্রকারই অবনতি ঘটে।

সম্ভবতঃ খৃষ্ট-জন্মের ৫০০ শত বৎসর পূর্ব্বে ইতালিতে ম্যালেরিয়া প্রবেশ করে এবং ক্রমে ক্রমে যদিও অনেক শত বৎসর পরে,—সার্ডিনিয়া, সিসিলি ইট্রুরিয়া, আপুলিয়া, লাটিয়াম এবং সর্ব্বশেষে রোমে ম্যালেরিয়া দেবী আশ্রয় গ্রহণ করেন।

খৃষ্ট-জন্মের প্রথম পূর্ব্ব শতাব্দীতে রোমে জ্বর দেবী'র মন্দির ছিল—সিসিরো ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। দার্শনিক এপিকটেটাসও ইহার কথা তুলিয়াছেন। প্লিনি খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে লিখিয়াছেন

যে, এই মন্দিরে জন সাধারণ অর্থ-সাহায্য করিত। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণের মতে এই জর দেবী ম্যালেরিয়া ব্যতীত আর কিছুই নয়। এবং অনেকে বলেন যে, যে সকল জেলায় পূর্ব্বে যথেষ্ট ধনশালী লোকের বসতি ছিল, এখন সেই সকল স্থান শ্মশান হইয়া পড়িয়াছে।

জোন্স সাহেব তাঁহার গবেষণাপূর্ণ পুস্তকে কয়েকটী বিষয় উল্লেখ করেন নাই—সেগুলি এই।

সোফোক্লিস নামক প্রসিদ্ধ নাট্যকার তাঁহার ফিলোকটেটিস নামক নাটকের একটী দৃশ্যে জ্বরের আক্রমণের চিত্র দেখাইয়াছেন। ফিলোকটেটিস নিওপটোলেমাসের সহিত যখন জাহাজে উঠিতে যাইবেন তখন হঠাৎ তিনি জ্বরগ্রস্ত হন। এই জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে গাত্রদাহ, এবং কম্পন আইসে এবং জ্বর-বিরামের সময় ঘর্ম্ম হয়।

আমাদের দেশের প্রায় সকলেই ম্যালেরিয়ার ভাব-ভঙ্গী জানেন, সুতরাং এ প্রসঙ্গে তাহার বিষয় অধিক লেখা বাহুল্য মাত্র। শ্রীভট্ট।

প্রাচীন তিব্বতে চিকিৎসা-বিধি।

ইয়ুরোপ যখন অসভ্য বর্ব্বরে পরিপূর্ণ, সেই প্রাচীন সময় হইতেই তিব্বতের পুরোহিত ও পণ্ডিতগণ সুনিপুন চিকিৎসক ছিলেন।

সম্প্রতি সাইবিরিয়ার বৌদ্ধগণ রুষ গবর্মেণ্টের নিকট এক আবেদন করিয়াছেন যে, তাঁহাদের মধ্যে চিকিৎসা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হউক এবং তথায় তিব্বতের চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হউক। এই আবেদন লইয়া রুষ গবর্মেণ্ট তিব্বতের প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে নানাপ্রকার অনুসন্ধান করিতেছেন। এই অনুসন্ধানের ফলে প্রকাশ পাইয়াছে, যে বার শত বৎসর পূর্ব্বে তিব্বতে ব্যবহৃত বৈদ্যপুস্তকসকলও তৎকালে অতি প্রাচীন ও দুর্লভ বলিয়া গণ্য হইত। সেই পুস্তকে যে সকল ঔষধাদির উল্লেখ আছে, ইয়ুরোপের চিকিৎসকগণ তাহার বহুশতাব্দী পরে সেগুলি আবিষ্কারে সমর্থ হন।

অতি প্রাচীন কালের তিব্বতীয় চিকিৎসকগণ দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে সকল কথাই প্রায় জানিতেন। মনুষ্য-দেহে কয়খানি অস্থি আছে, কতগুলি শিরা, স্নায়ু আছে সকলই তাঁহারা জানিতেন। এমন কি এই পুস্তকে লিখিত আছে যে, মনুষ্যের দেহে এক কোটি দশ লক্ষ লোমকূপ আছে। তাঁহাদের মতে মস্তকই সকল অবয়বের রাজা এবং আমাদের জীবনের অবলম্বন। মানবের কুঅভ্যাস বা অজ্ঞতা হইতেই এবং অধিকাংশ স্থলে অসংযত ইন্দ্রিয়বৃত্তি হইতেই তাহার যাবতীয় রোগের উৎপত্তি। কুচিন্তা আমাদের হৃৎপিণ্ড ও প্লীহার স্বাভাবিক শক্তি নষ্ট করে।

দেড় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই চিকিৎসকগণ রোগ নির্ণয়ের জন্য আধুনিক চিকিৎসকগণের ন্যায়ই উপায় অবলম্বন করিতেন। তাঁহারাও রোগীর নাড়ী, জিহ্বা ইত্যাদি পরীক্ষা করিতেন। যে সকল চিকিৎসক তাঁহাদের অস্ত্রাদি বিশেষভাবে পরিচ্ছন্ন না রাখিতেন তাঁহাদিগকে কঠিন শাস্তি দান করা হইত। এই পুরাতন পুস্তক স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন যে, সুস্থ ব্যক্তিগণ বিবেচনার সহিত নিয়মিতরূপে জীবন অতিবাহিত করিবেন, সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার বা অনিয়ম পরিত্যাগ করিবেন এবং দেহ-মনকে সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিবেন।

বিজ্ঞানের ভবিষ্যদ্বাণী—ইন্‌ডিপেণ্ডেণ্ট্

(Independent) নামক পত্রিকায় আমেরিকার প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিদ্ এডিসন্ সাহেব লিখিয়াছেন যে, আমরা নিত্য যে সকল ইন্ধন ব্যবহার করি, তাহার সম্পূর্ণ শক্তিকে আমাদের ব্যবহারে লাগাইবার উপায় উদ্ভাবন করাই, পৃথিবীর ভবিষ্যৎ বৈজ্ঞানিক সমস্যা-গুলির মধ্যে প্রধান সমস্যা। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় ইন্ধন মাত্রেরই শক্তির যেরূপ অপচয় হইয়া থাকে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে বিস্ময়কর বোধ হইবে। এক পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় অর্দ্ধ সের কয়লার এরূপ শক্তি আছে, যাহার বলে, সে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে পারে। আমরা তাহার উত্তাপ ও শক্তির অতি সামান্য অংশমাত্রই আমাদের ব্যবহারে নিযুক্ত করিতে সমর্থ হই; অধিকাংশভাগই নষ্ট হয়। আধুনিক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাষ্পীয় এঞ্জিন কয়লার শতকরা

১৫ ভাগ শক্তিমাত্র ব্যবহারে সমর্থ। গ্যাস এঞ্জিন হইলে সম্ভবতঃ শতকরা কুড়ি হইতে পঁচিশ ভাগ পর্য্যন্ত ব্যবহারে সমর্থ।

বয়লারে কয়লাকে দগ্ধ না করিয়া, তাহা হইতে তাড়িৎ উৎপন্ন করিবার জন্য আজকাল অনেক প্রকার চেষ্টা হইতেছে। কতক স্থলে অম্লজানের (Oxygen) সাহায্যে, এইরূপ তাড়িৎ উৎপন্ন করিবার চেষ্টা হইতেছে। কয়লাকে অম্লজানের সহিত সংমিশ্রিত করিতে হইলেও তাহাকে প্রথমে দগ্ধ করা আবশ্যক। তবে সেটা খুব ধীরে ধীরে দগ্ধ করিলেই চলে। মরিচা পড়া, দাহ বা স্ফোটনের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই বলিলেই হয়, কেবল রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার বেগের তারতম্য মাত্র।

স্ফোটনশীল পদার্থ অতি শীঘ্র পুড়িয়া যায়। জলযুদ্ধে আজকাল অনেক স্থলে এইরূপ পদার্থ ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু তাহা নিতান্ত ব্যয়-সাপেক্ষ। এক মণ কয়লার যে শক্তি আছে, এক মণ ডিনামাইটের (dynamite) তাহা নাই। পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু যে আপনিই জ্বলিয়া উঠে না, তাহার কারণ কয়লা ভিন্ন প্রায় অপর সকল বস্তুই পূর্ব্বে কোন না কোন অবস্থায় একবার দগ্ধ হইয়াছে। লৌহকে খুব চূর্ণ করিয়া অগ্নিতে দিলে, তাহা জ্বলিতে পারিত এবং আমাদের ইন্ধনের কার্য্যও করিতে পারিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাহা প্রকৃতির অগ্নিকুণ্ডে পূর্ব্ব হইতেই দগ্ধ। কয়লা সঞ্চিত সূর্য্যকিরণ মাত্র; ইহা সূর্য্যের শক্তি-ভাণ্ডার মাত্র। সূর্য্য হইতেই আমরা যে আমাদের প্রায় সকল শক্তি লাভ করিয়া থাকি, তাহা, বোধ হয়, আর কাহাকে বলিয়া দিতে হইবে না।

ইন্ধনের সমস্ত শক্তিটুকু আমাদের ব্যবহারে নিযুক্ত করিবার উপায় শীঘ্রই আবিষ্কৃত হওয়া অসম্ভব নহে, আবার বহুকাল বিলম্ব হওয়াও আশ্চর্য্য নহে

রেডিয়ামের (Radium) শক্তি প্রভূত। তাহার শক্তি অসীম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রেডিয়াম জ্বলন্ত বস্তু নহে। ইহা আপনার পরমাণু পরম্পরা হইতে শক্তি বিকীর্ণ করে; ইহার এই শক্তি যে কিরূপে সংগৃহীত হয়, তাহা আমরা আজিও জানি না। এক গাড়ি রেডিয়ামের শক্তি পৃথিবীর প্রতি বৎসর উত্তোলিত অসংখ্য মণ কয়লার শক্তির সহিত সমান। আধুনিক অধিকাংশ বিজ্ঞানবিদের মতে রেডিয়মই পৃথিবীর উত্তাপের কারণ। রেডিয়ম আছে বলিয়াই, অবিরাম উত্তাপ ত্যাগ সত্বেও এই পুরাতন পৃথিবী আজিও সমানভাবেই উত্তপ্ত রহিয়াছে। পৃথিবীর অভ্যন্তরে রেডিয়ম না থাকিলে এত লক্ষ-লক্ষ বৎসরের উত্তাপ-ত্যাগের ফলে, এ পৃথিবী এতদিনে হিম-শীতল হইয়া যাইত। বৈজ্ঞানিকগণের চেষ্টায় এতদিনে রেডিয়াম অতি অল্পই বাহির হইয়াছে সত্য, কিন্তু জলে-স্থলে, সর্ব্বত্রই রেডিয়াম বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই নবাবিষ্কৃত পদার্থের অনন্ত শক্তিকে মনুষ্যের উপকারে লাগাইবার উপায় উদ্ভাবন করার আশা এক্ষণে সুদূর-পরাহত। রেডিয়ামের সাহায্যে, সম্প্রতি একটি ঘড়ি প্রস্তুত হইয়াছে। ঘড়িটি বিনাদমে বহুশতাব্দী ধরিয়া চলিবে। যান্ত্রিক ব্যবহার ভিন্ন রেডিয়াম মনুষ্যের নানাপ্রকার রোগের চিকিৎসাতেও উপকারী বলিয়া শুনা যায়।

রেডিয়াম ভিন্নও এমন অনেক জিনিষ আছে, যাহার সম্বন্ধে আমরা কিছুই বুঝি না। আজকাল জলপ্রপাতের শক্তিকে মানবের কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার নানাপ্রকার চেষ্টা চলিতেছে। হয়ত কিছুদিন পরে জোয়ার-ভাঁটার প্রবল শক্তি আমাদের দাসত্ব করিতে থাকিবে। জলস্রোতের শক্তি অসামান্য সন্দেহ নাই। বিরাট-দেহ জাহাজগুলাকে ক্রীড়া-পুত্তলির ন্যায় আন্দোলিত করিতে থাকে। পবনদেবের অসীম শক্তি হইতে তাড়িৎ উৎপন্ন করিয়া নানারূপ কর্ম্মে নিযুক্ত করা কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। সূর্য্যতাপে চালিত এঞ্জিনের শক্তিও প্রভূত। এইরূপ এঞ্জিন প্রস্তুত করিবার জন্য আজকাল অনেকে চেষ্টা করিতেছেন। দক্ষিণ আমেরিকাতে এইরূপ একটি এঞ্জিনে কাজ হইতেছে। আগ্নেয়গিরির উত্তাপ হইতে তাড়িৎ সৃষ্টি করিয়াও নানাপ্রকার কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে।

চীনের বিবাহ-প্রথা। বিলাতের Lady's Realm নামক পত্রে চীনের বিবাহ-প্রথা সম্বন্ধে মিসেস লিট্‌ল্ এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। মিসেস

লিট্‌ল্‌ বলেন যে, চীনে কোর্টশিপ-প্রথা আদৌ প্রচলিত নাই। ঘটক ও ঘটকীই বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিয়া দেয়। বর-কন্যা বিবাহের পূর্ব্বে কেহ কাহারো মুখ দেখিতে পায় না। চীনে যে ব্যক্তি বিবাহ করে না, তাহাকে "বক্র যষ্টি" বলে।

পত্নী প্রকৃতপক্ষে স্বামীর "বিনা মাহিনার" চাকরাণী, অথবা শ্বশ্রূমাতার সাহায্যকারিণী ব্যতীত আর কিছুই নহে। স্ত্রী ও মাতাতে কলহ হইলে স্বামী সর্ব্বদাই নিজ মাতার পক্ষ অবলম্বন করেন। যখন বিবাহ হইয়া যায়, তখন বর ও কন্যা উভয়েই উভয়ের পরিধান বস্ত্রের উপর বসিবার চেষ্টা করে; কেন না যাহার বস্ত্রের উপর বসিবে, সেই অপরের দাস বা দাসী হইবে। বিবাহে কোনরূপ মন্ত্রাদি নাই।

বর্ত্তমানকালে কিছু পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে। এখন অনেকে বিবাহের পূর্ব্বে ভাবী পত্নীকে দেখিতে চাহেন এবং বিবাহান্তে কেহ বা নিজ পত্নীকে প্রেম ও শ্রদ্ধার চক্ষেও দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

প্রসিদ্ধ প্রেমপত্র—প্রেম জিনিসটা পদমর্য্যাদার বাধ্য নহে। বড়লোক হইলেই যে তাহার প্রেমটাও বড় হইবে, এমন কোন কথা নাই। তবে বড় লোকের জীবনের অন্য সকল কাহিনী জানিবার জন্য, সাধারণের যেরূপ একটা কৌতূহল হয়, তাঁহাদের প্রেমের পরিচয়টুকু লাভ করিবার জন্যও, সেইরূপ কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ অনেক নরনারীর প্রেমপত্র একত্র করিয়া ফরাসী দেশে একখানি পুস্তক বাহির হইয়াছে। তাহা হইতে আমরা দুই একটা প্রেমপত্রের আভাষ তুলিয়া দিলাম।

একটি প্রসিদ্ধ সুন্দরী তাঁহার প্রেমাকাঙ্ক্ষী এক খ্যাতনামা পুরুষকে লিখিতেছেন, "ভালবাসার বিপদ কোথায় তোমাকে বল্‌ব? প্রেমের একটা অত্যুচ্চ কল্পনা খাড়া করাই তার প্রধান বিপদ। সত্যকথা বলতে গেলে, আমাদের প্রেমটা একটা অন্ধ আবেগ বা বন্ধুত্ব ও সস্নেহ শ্রদ্ধার বন্ধন ছাড়া আর কিছুই নয়। যদি উপন্যাসের বীর নায়কের পথ অনুসরণ করে, তুমি সেইভাবে প্রেমের পথে অগ্রসর হও, তা হলে অচিরেই দেখতে পাবে যে, তোমার সে বীরত্ব প্রেমকে একটা দুঃখময়, এমন কি সাংঘাতিক নির্ব্বুদ্ধিতায় পরিণত করেছে। এরূপে প্রেমকে পেতে যাওয়া কেবল পাগলামিমাত্র। প্রেমকে তার যথার্থরূপে যদি পেতে চাও, তবেই তোমার পক্ষে সুখী হওয়া সম্ভব।

"প্রেমের মধ্যে সাধুতা! তুমি কি করে এ কথা মনে করতে পার, আমি বুঝতে পারি না। হায়, মানুষের মহৎ ভাবগুলার আজকাল আর চলন নাই। আজকাল প্রেম বলতে, কেবল মানুষের প্রকৃতি ও মনোভাব নিয়ে খেলাটাই বুঝায়। অনেক সময়ে যেমন আপনার প্রেমের মহত্ত্বকে গোপন রাখা আবশ্যক হয়, তেমনি যতটুকু সত্য, তার চেয়ে অনেক বেশী ভালবাসি বলেও প্রকাশ করতে হয়।

"আমি তোমায় ভালবাসি" এই তিনটী কথার মূল্য তোমার কাছে বড় বেশি দেখি। তুমি কি অদ্ভুত প্রকৃতির লোক! আত্মসংযতা স্ত্রীলোকের পক্ষে তার অনিচ্ছাসত্ত্বেও "আমি তোমায় ভালবাসি" বলতে বাধ্য হওয়ার চেয়ে বেশী কষ্টকর কাজ আর নাই। তোমার পক্ষে মঙ্গল কিসে বলব? তোমার প্রেমপাত্রীকে ওই কথাটা বলাবার জন্য পীড়ন না করে, এমনভাবে চলো যে, সে যে তোমাকে ভালবাসতে আরম্ভ করেছে, এ কথা যেন সে বুঝতেই না পারে। তোমার কাছে তার অন্তরের প্রেম প্রকাশ করতে বাধ্য করার পূর্ব্বে, তার অন্তরে অজ্ঞাতে প্রেমের সঞ্চার হ'তে দেও। অনেক সময় স্ত্রীলোক পুরুষকে ভালবাসে বলেই, সে তার কাছে তার নিজের প্রেম প্রকাশ করতে চায় না। আমরা মনে মনে ইচ্ছা করলেও অন্তরের প্রেমটা স্বীকার করতে কেমন একটা অপমান বোধ করি।

"আমার বিশ্বাস, তোমার এমন আগ্রহ প্রেমের লক্ষণ নয়, আত্মম্ভরিতার একটা রূপান্তর মাত্র। এ বিষয়ে ভগবান আমাদের একটা স্বাভাবিক বোধশক্তি দিয়াছেন, সেটা যেন মনে থাকে।"

নেপোলিয়নের ভ্রাতা তৎকালীন সর্ব্বপ্রধানা সুন্দরীকে লিখিতেছেন—

"সুন্দরী জুলিয়েট, (সেক্সপীয়রের এক নাটকের

নায়িকা) আজ রোমিও (নায়ক) তোমাকে এই পত্র লিখিতেছে। এই ক্ষুদ্র পত্র পাঠে যদি অসম্মত হও তাহা হইলে তুমি তোমার পিতামাতা অপেক্ষাও অধিক নিষ্ঠুর বলিয়া জানিব। কয়েকদিন পূর্ব্বে তোমার খ্যাতিই আমার নিকট তোমার একমাত্র পরিচয় ছিল। সময়-সময় তোমাকে কোন মন্দিরে বা উৎসবে দেখিয়াছি মাত্র। আমি জানিতাম যে, তোমার ন্যায় সুন্দরী আর নাই, সকলেই তোমার প্রশংসা করিত। কিন্তু তোমার সে রূপপ্রশংসা আমাকে মুগ্ধ করে নাই। এক্ষণে আমাদের সংসারে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু আমার অন্তর অশান্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

"আমি আবার সেদিন তোমাকে দেখিয়াছি। প্রেম আসিয়া আমাকে অধিকার করিয়া বসিল। সেদিন আমরা দুইজনে একই আসনে একান্তে বসিয়াছিলাম। আমার মনে হইল, যেন তোমার উদ্বেলিত অন্তর হইতে একটি দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনিলাম। সেটা কেবল আমার মনের ভ্রান্তিমাত্র। এখন তাহা বুঝিতেছি। আমি প্রাণের আবেগ জানাইয়া তোমার নিকট কেবল পরিহাস পাইলাম।

"হায়, জুলিয়েট! প্রেমহীন জীবন কেবল জ্ঞানহীন নিদ্রামাত্র। সর্ব্বপ্রধানা সুন্দরীর প্রাণও কোমল হওয়া আবশ্যক। তোমার অন্তরের উপর যে আধিপত্য করিবে, এ মরজগতে সে-ই সুখী।"

গ্যাম্বেটা তাঁহার প্রেমপাত্রীকে লিখিতেছেন—"প্রিয়ে, আমাদের পরস্পরের মনোভাব একই প্রকার; আমাদের উভয়ের আত্মা অভিন্ন। আমি তোমার পবিত্র প্রেমের স্বর্গীয় সুধা, প্রাণ ভরিয়া, পান করিতেছি। এ প্রেমের কণাটুকু পাইবার জন্য, পৃথিবীর মহত্তম মানবও চিরদিন লালায়িত। জগতের এই অসংখ্য নারীর মধ্যে একমাত্র তুমিই সে অপূর্ব্ব রত্ন-দানে সক্ষম। আমাদের যে মিলন, সেটা দেহের নয়—আত্মার। আমাদের এই প্রেম, আমার অন্তরে যে, কত অসংখ্য চিন্তা ও অশেষ সুখ আনিয়া উপস্থিত করে, তাহা আর তোমাকে কি বলিব। যে নূতন মনোরম জগৎ আবিষ্কার করিবার জন্য মানবমাত্রেই আকুল, আমি যে, আজ তাহা করায়ত্ত করিয়া অসীম সুখের অধিকারী হইয়াছি, তাহার জন্য আমি তোমারই নিকট সর্ব্বতোভাবে ঋণী। আমি তোমাকে পবিত্র স্বর্গের দেবী জানিয়া অন্তর-মধ্যে পূজা করি।" যঃ।

কল্প্যবেশ সম্মিলন।

লেডি জেঙ্কিন্সের নিমন্ত্রণ। পুরুষ নাই, নানাদেশের নানাবেশের মহিলাগণ কেবল সমাগত।

কাজের সময় কাজ, খেলার সময় খেলা, এই প্রবচনটি ইংরাজদিগের জীবনে অক্ষরে অক্ষরে পালিত হইতে দেখা যায়। বস্তুতঃ কাজের লোক বলিয়াই তাঁহারা জীবন উপভোগ করিতে জানেন। সন্ধ্যার নানারূপ খেলা আমোদপ্রমোদের মধ্যে কল্পাবেশ বা ছদ্মবেশ সম্মিলন তাঁহাদের একটি উপাদেয় প্রমোদ। এইরূপ নিমন্ত্রণে আহূত অতিথিগণের বিভিন্ন মনোহারী সজ্জায় মিলন গৃহ সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে। কেহ দিবা, কেহ রাত্রি, কেহ বসন্ত ঋতু, কেহ শরৎ, কেহ পৌরাণিক কোন দেবতা, কেহ ঐতিহাসিক কোন ব্যক্তি কেহ ভিন্ন দেশবাসী; এইরূপ নানাজনে নানারূপ সাজিয়া বেশভূষার নিদর্শনে তাহা ফুটাইয়া তোলেন। এই কলায় যিনি যত পারদর্শী তিনি তত প্রশংসালাভ করেন। বলা বাহুল্য ইংরাজের মধ্যে এইরূপ সম্মিলনে স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই নিমন্ত্রণ হইয়া থাকে। কিন্তু লেডি জেঙ্কিন্স সম্প্রতি তাঁহার বিলাত-

যাত্রার পূর্ব্বে বঙ্গরমণীগণের আনন্দবিধান উদ্দেশ্যে কেবল মহিলাদিগকেই এই নিমন্ত্রণে আহ্বান করিয়াছিলেন। লেডি মিণ্টো লেডি বেকার হইতে সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ রমণী পর্য্যন্ত এখানে সমবেত হইয়াছিলেন। ইংরাজ রমণীর অনেকেই ষোড়শ শতাব্দীর ফরাসী মহিলা, কেহ বা বঙ্গরমণী, জিপসিরমণী জাপানরমণী, চীনরমণী, তুর্করমণী, ইজিপ্ট-রমণী, কেহ ইংলণ্ডের গ্র্যাজুয়েট ললনা; কেহ প্যানজি ফুল,—এইরূপ কতজনে কত রকম বেশ ধরিয়াছিলেন। নিমন্ত্রণকর্ত্রী লেডি জেঙ্কিন্স স্বয়ং বারাণসী শাড়ী ও মণিমুক্তা অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া সাজিয়াছিলেন বঙ্গদেশের একজন মহারাণী। এ সাজে তাঁহাকে কিরূপ সুন্দর দেখাইতেছিল তাহা চিত্র হইতেই সকলে বুঝিতে পারিবেন। আমার বিশ্বাস ছিল— বাঙ্গালী মেয়েদের যেমন ইংরাজি পোষাকে মানায় না, ইংরাজ মেয়েদিগকেও বুঝি তেমনি শাড়ীতে বেমানান দেখায়। কিন্তু পরীক্ষায় দেখা গেল,—আমাদিগকে ইংরাজি পোষাকে মানায় না ইহাই ঠিক।

বাঙ্গালী মেয়েও অনেকে কল্পিত সাজে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের সাজ যে ইংরাজ মেয়েদের তুলনায় কম শোভন হইয়াছিল —তাহা নহে। ইঁহাদের কেহ পারসীরমণী, কেহ মহারাষ্ট্রী ললনা কেহ বা ইজিপ্টবালা কেহ বা সন্ন্যাসিনী, কেহ ভিখারিণী। একজন সাজিয়াছিলেন, রবিবর্ম্মার চিত্র কল্পিত গঙ্গাদেবী; একজন ফতেমা; একজন তুর্ক রাজকুমারী। ইঁহাদের সাজ এমন সুন্দর হইয়াছিল যে আমার মনে হয় প্রাইজ থাকিলে এই তিনজনের মধ্যেই কেহ পাইতেন।

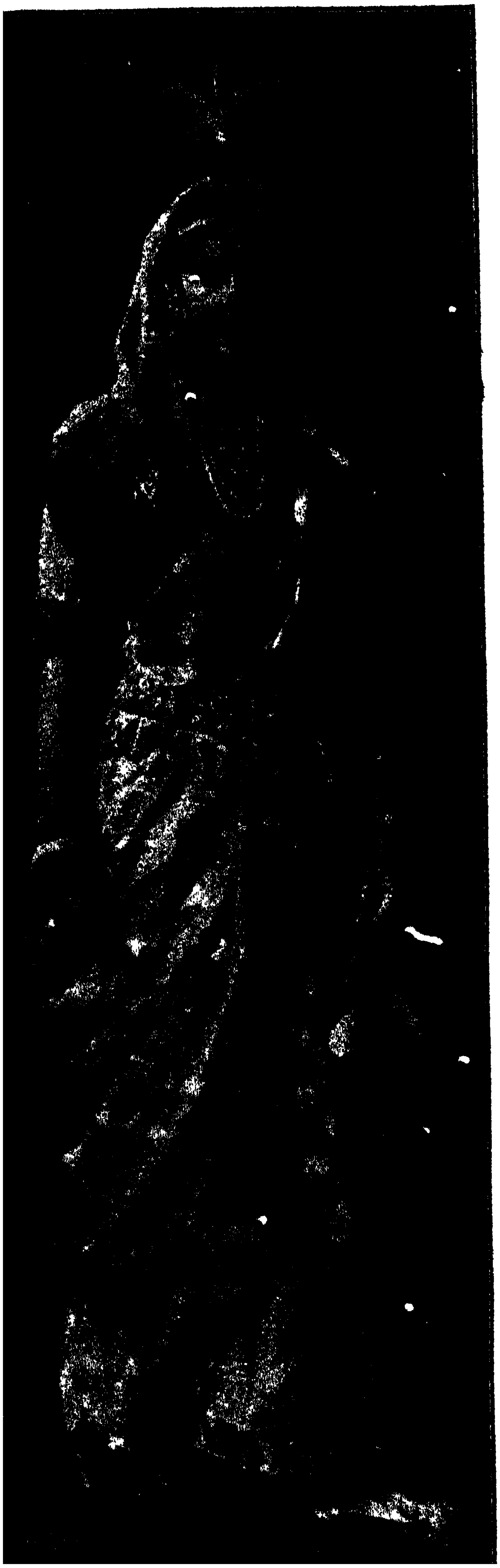

লেডি জেঙ্কিন্স

আংশিক মিলন চিত্র।

নিমন্ত্রণে দুইএকজন মুসলমানকন্যা, ও দুএকজন নেপালকন্যা ছিলেন। তাঁহাদের স্বাভাবিক বেশই আমাদের নিকট কল্পবেশ বলিয়া মনে হইতেছিল।

এই সুচারু সুন্দর দৃশ্য,—বিভিন্ন জাতির অপূর্ব্ব মিলন; সর্ব্বোপরি গৃহকর্ত্রীর আতিথ্য সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছিল। ইঁহার আতিথ্য প্রকৃতই আদর্শ-স্থানীয়। তিনি কেবল নিমন্ত্রিত মহিলাগণের আনন্দ-আয়োজনেই তুষ্ট হইতে পারেন নাই; তাঁহাদের ভৃত্যবর্গ সইস কোচমান দ্বারবান প্রভৃতি যাহাতে প্রভু-পত্নীর অপেক্ষায় রাস্তায় হাই তুলিয়া না কাটায়—সেইজন্য প্রাচীর গাত্রে বায়স্কোপ হইতেছিল,—ভৃত্যগণ সকলেই রাস্তা হইতে দেখিতেছিল। আমি গাড়ীর সঙ্গে একজন অল্পবয়স্ক দ্বারবানকে লইয়া গিয়াছিলাম। বায়স্কোপ দেখিয়া সে এতই মুগ্ধ হইয়াছিল যে আমার কাছেও তাহা প্রকাশের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া বাড়ী ফিরিয়াই উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল—"আজ যাহা দেখিয়াছি—এমন তামাসা জীবনে দেখি নাই।" পরে শুনিলাম—সে উহা প্রকৃত ঘটনা মনে করিয়াছিল।

লেডি জেঙ্কিন্স প্রকৃতই স্বামীর সহধর্ম্মিণী। দেশের লোকের সহিত তাঁহার মেলামেশায়,—আদর যত্নে, কথায় ব্যবহারে ভারী একটা সহজ স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস প্রকাশ পায়।—তিনি যে অন্তর হইতে আমাদের শুভকামনা করেন, এবং আমাদের সহিত মিলন ইচ্ছাও যে তাঁহার মৌখিক নহে তাঁহার সহিত পরিচয়েই তাহা বুঝিতে পারা যায়।

লেডি জেঙ্কিন্স একজন শিকারী মহিলা। শিকার অভিপ্রায়ে তিনি তিব্বত গমন করিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহাকে কিরূপ কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনী পাঠে তাহা জানা যায়।

ধূমকেতু।

কয়েকমাস হইতে ইংরাজী এবং বাঙ্গালা সাময়িক পত্রিকায় ধূমকেতু সম্বন্ধে প্রবন্ধ বাহির হইতেছে। প্রায় সকল লেখকই হ্যালির ধূমকেতুর পুচ্ছের সহিত পৃথিবীর সংঘর্ষণ হইবে বলিয়া অল্পাধিক ভীত হইয়াছেন। কেহ বলেন যে সেই সংঘর্ষণের ফলে আমরা হাসিতে হাসিতেই অথবা কাঁদিতে কাঁদিতেই মরিয়া যাইব। কেহ কেহ পৃথিবী চূর্ণ হইয়া যাইবে বলিয়া আশঙ্কা করেন। কেবল শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় মহাশয় লিখিয়াছেন যে হ্যালির ধূমকেতুর সহিত সংঘর্ষণের কোন আশঙ্কা নাই। কিন্তু তাহার পুচ্ছের ভিতর দিয়া আমাদিগের যাওয়া অপরিহার্য্য। তাহাতে কোন অনিষ্ট হইবে কিনা তৎসম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় চৈত্রের প্রবাসীতে লিখিয়াছেন "ঘর্ষণে বা স্পর্শনে কি অনিষ্ট হইতে পারে, কিংবা কি ইষ্ট কি সৃষ্টিস্থিতির মঙ্গল বিধান হইতে পারে, তাহা ভবিতব্যই জানে।" এক ইউরোপীয় জ্যোতির্বিৎ লিখিয়াছেন যে, সূর্য্যতাপের চাপে ধূমকেতুর পরমাণু বাহির হইয়া পড়িয়াই পুচ্ছের আকার ধারণ করে। সেই পরমাণু কিরূপ তাহা

বিদিত নাই। পৃথিবী তাহার সংস্পর্শে আসিলে আমাদের মঙ্গলও হইতে পারে অমঙ্গলও হইতে পারে।

আমি ধূমকেতু সম্বন্ধে যতগুলি প্রবন্ধ পড়িয়াছি তাহাতে আমার আশঙ্কা হয় যে, কোন প্রবন্ধ লেখকই দুই আর দুই মিলাইলে যেমন চারি হয় সেইরূপ যুক্তি অনুসরণ করিয়া ধূমকেতুর পুচ্ছের উপাদান সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই। তাঁহারা সকলেই লিখিয়াছেন যে কোনো ধূমকেতুরই কিছুমাত্র গুরুত্ব নাই বলিলেই হয়। বিদ্যানিধি মহাশয় লিখিয়াছেন যে সূর্য্য ধূমকেতু ও পৃথিবীর সমসূত্রে অবস্থান-কালে ধূমকেতু মধ্যবর্ত্তী হইলেও আমরা ধূমকেতুর ছায়া পাইব না। বিদ্যানিধি মহাশয় আর এক স্থানে লিখিয়াছেন "লোকে মনে করে কেতুর পুচ্ছ তাহার নিত্য অঙ্গ। হাত পা আমাদের দেহের নিত্য অঙ্গ, কিন্তু কেতুর পুচ্ছ সেরূপ নহে। ইহার প্রধান প্রমাণ, যখন কেতু সূর্য্যের নিকটে আসে, তখনই পুচ্ছ থাকে, এবং সে পুচ্ছ সূর্য্যের বামে যেদিকে, দক্ষিণে সেদিকে থাকে না। কেতু ভীষণ বেগে সূর্য্যের বাম হইতে দক্ষিণে (কিংবা দক্ষিণ হইতে বামে) চলিয়া যায়, পুচ্ছও সঙ্গে সঙ্গে দিক্ পরিবর্ত্তন করে।" অপিচ "যে ভীষণ বেগে দিক্ পরিবর্ত্তিত হয়, তাহাতে পুচ্ছ বিচ্ছিন্ন হইবার কথা।" অবশেষে বিদ্যানিধি মহাশয় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে প্রতি মুহূর্ত্তেই ধূমকেতু হইতে নূতন পরমাণু বাহির হইয়া পুচ্ছাকার ধারণ করে। অথবা 'এখানে বিদ্যানিধি মহাশয়ের নিজের কথাই উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাউক। তিনি বলেন "পুচ্ছ তরল বাষ্পে নির্ম্মিত। ধুঁআর পুচ্ছ এত বেগ সংবরণ করিতে পারিত না। সুতরাং যেমন ধাবমান রেলগাড়ী কিংবা জাহাজের ধুঁআ, কেতুর পুচ্ছও তেমনি বলিয়া অনুমান হয়। এইমাত্র যে ধূমপুঞ্জ দেখিলাম, পরক্ষণে তাহা দেখি না অন্য ধূম দেখি।"

বিদ্যানিধি মহাশয়ের এই সিদ্ধান্ত যদি সত্য হইত তাহা হইলে ধূমকেতুর অস্তিত্ব এতদিন লোপ পাইত। ধূমকেতুমাত্রেই অল্প পরমাণু। যদি প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহা হইতে নূতন পরমাণু বাহির হইয়া যাইত তাহা হইলে অন্তত হ্যালির ধূমকেতু যাহার অন্তত তিন সহস্র বৎসরের ইতিহাস সুপরিজ্ঞাত আছে তাহা বহুদিন বা বহু বৎসর পূর্ব্বে একেবারে নিঃশেষিত হইত।

বিদ্যানিধি মহাশয় বলিয়াছেন যে, "ধূমকেতুর পুচ্ছ সর্ব্বদা সূর্য্যের বিপরীত দিকেই থাকে কেন? কে জানে?"

বিদ্যানিধি মহাশয় এবং অন্যান্য জ্যোতির্বিদেরা ধূমকেতু সম্বন্ধে প্রধানত যে চারিটি তথ্য নির্ণয় করিয়াছেন তাহা হইতেই ত উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। (১) ধূমকেতুর গুরুত্ব বা ভার নাই। (২) ধূমকেতুর পুচ্ছ সর্ব্বদা সূর্য্যের বিপরীতদিকে থাকে। (৩) ধূমকেতু মধ্যে থাকিয়া পৃথিবী ধূমকেতু ও সূর্য্যের সমসূত্রপাত হইলেও পৃথিবীতে সূর্য্যালোকের ন্যূনতা হয় না। এই কয়েকটী নির্ণীত তথ্য হইতে এইরূপ সিদ্ধান্তে আসা যাইতে পারে নাকি যে, ধূমকেতু কাচ সদৃশ স্বচ্ছ বস্তুর শূন্যগর্ভ গোলক বা প্রতি-গোলক বা গোলকাভাস মাত্র। তাহার মধ্য

দিয়া সূর্য্য কিরণ বাহির হইয়াই পাহারাওয়ালার লণ্ঠনের আলোকের মত ক্রমশঃ স্থূল পুচ্ছাকার ধারণ করে। গোলকাভাস (double convex) কাচ আলোকের নিকট ধরিলে যেমন তাহা হইতে বহুদূরগামী পুচ্ছবৎ আলোক বাহির হয় অথবা কোন বস্তু আলোকের যত নিকটে থাকে ততই যেমন তাহার ছায়া বড় হয় তেমনই ধূমকেতু সূর্য্যের যত নিকটে থাকে ততই তাহার পুচ্ছ দীর্ঘ ও স্থূল হয়। ধূমকেতু স্বচ্ছ পদার্থ বলিয়াই সমস্ত্র পাতে তাহার ছায়া পড়ে না। সূর্য্যের আলোক কাচের ভিতর দিয়া বাহির হইলে যেমন তাহার রাসায়নিক কোন পরিবর্ত্তন হয় না সেইরূপ ধূমকেতুর মধ্য দিয়া পুচ্ছাকারে বাহির হইলে তাহা। রাসায়নিক পরিবর্ত্তন হয় না; সুতরাং তাহা হইতে মঙ্গল বা অমঙ্গলের কোন সম্ভাবনা নাই। সমস্ত বস্তুরই ছায়া যেমন সূর্য্যের বিপরীত দিকে থাকে ধূমকেতুর পুচ্ছও তদ্রূপ সর্ব্বদা সূর্য্যের বিপরীত দিকে থাকে।

ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব জ্যোতিষী প্রক্টর এই মতের প্রবর্ত্তক ছিলেন। তিনি প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে ধূমকেতু শূন্যগর্ভ ভারহীন স্বচ্ছ পদার্থ এবং সূর্য্যের আলোক তাহার মধ্য দিয়া বাহির হইয়াই পুচ্ছের আকার ধারণ করে এবং সেই জন্যই পুচ্ছ সর্ব্বদাই সূর্য্যের বিপরীত দিকে থাকে।

শ্রীবীরেশ্বর সেন।

আলো ও ছায়া রচয়িত্রী।

শ্রীমতী কামিনী দেবী।

বাঙলার কাব্যসাহিত্যে শ্রীমতী কামিনী রায়ের নাম বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। তাঁহার রচিত 'আলো ও ছায়া'র পরিচয় নূতন করিয়া দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। কবিবর হেমচন্দ্র একদিন যাঁহার কবিতাবলী পাঠ করিয়া আনন্দিত চিত্তে বলিয়াছিলেন, "কবিতাগুলি ভাবের গভীরতা, ভাষার সরলতা, রুচির নির্ম্মলতা, এবং সর্ব্বত্র হৃদয়গ্রাহিতা গুণে আমি নিরতিশয় মোহিত হইয়াছি", তাঁহার কবিতার রসাস্বাদনে যিনি বঞ্চিত, তিনি হতভাগ্য, সন্দেহ নাই।

কামিনী দেবীর কবিতাগুলির প্রধান গুণ, তাহার কোনখানে অস্পষ্টতা দোষ নাই, ভাবের জটিলতা নাই—ছন্দের আড়ষ্ট ভাব নাই—তাহা অবান্তর চিন্তাতরঙ্গে পাঠকের চিত্তপীড়ার উদ্রেক করে না, তাহা লঘু, স্বচ্ছ, নির্ম্মল। চটুলতা বা অসংলগ্নতা দোষ হইতে মুক্ত! এবং কামিনী দেবীর কবিতা যে, অনুকরণ নহে, এ কথাও মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে।

এতাবৎ তাঁহার চারি খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৮৯ সালে "আলো ও ছায়া," ১৮৯০ সালে "নির্ম্মাল্য," এবং "পৌরাণিকী", ও ১৯০৪ সালে "গুঞ্জন"। তন্মধ্যে "আলো ও ছায়া" এবং "নির্ম্মাল্য" খণ্ডকবিতার সমষ্টি, "পৌরাণিকী," একলব্যের গুরুদক্ষিণা বিষয়ক নাটিকা, এবং "গুঞ্জন" শিশুরাজ্যের কবিতা। খণ্ড কবিতাগুলি কবির সার্দ্ধ পঞ্চদশ হইতে

সার্দ্ধৈকবিংশতি বর্ষ বয়সের মধ্যে লিখিত। নির্ম্মাল্যের কোন কোন কবিতা আরো অল্পবয়সের রচনা।

'আলো ও ছায়া'র অধিকাংশ কবিতাই ভাবসম্পদে পূর্ণ! "যৌবন-তপস্যা," "মুগ্ধ প্রণয়" প্রভৃতি কবিতার ভাবগুলি অতি

সুন্দর। স্থানাভাবে আমরা তাহার বিশদ পরিচয় প্রদানে অক্ষম। প্রণয় মানবকে দিব্য চক্ষু প্রদান করে—সেই দিব্য চক্ষুর অমৃত দৃষ্টি-স্পর্শে প্রণয়মুগ্ধ নর, নারীহৃদয়ে দেবীত্বের সন্ধান পায়। কবি বলিতেছেন,

"পাষাণের প্রতিমাটি যবে,
প্রাণময়ী নারীরূপ ধরে,
নারী তবে পারে না কি তবে
দেবী হতে বিধাতার বরে?"

মুহূর্ত্তের ভুলে স্খলিতা নারী অনুতাপে দগ্ধ হইতেছে, তাহাকে উদ্দেশ করিয়া কবি করুণ সুরে সকলকে ডাকিয়া বলিতেছেন,

"বর্ত্তিকা লইয়া হাতে, চলেছিলে একসাথে,
পথে নিবে গেছে আলো, পড়িয়াছে তাই,
তোমরা কি দয়া করে, তুলিবে না হাত ধরে,
অর্দ্ধদণ্ড তার লাগি থামিবে না ভাই?
তোমাদের বাতি দিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া নিয়া,
তোমাদেরি হাত ধরি হোক্ অগ্রসর;
পঙ্কমাঝে অন্ধকারে, ফেলে যদি যাও তারে,
আঁধার রজনী তার রবে নিরন্তর!"

আবার বলিতেছেন,

"দিনেকের অবহেলা, দিনেকের ঘৃণাক্রোধ,
একটি জীবন তোরা হারাবি জনমশোধ।
তোরা না জীবন দিবি? উপেক্ষা যে বিষবাণ
দুঃখভরা ক্ষমা লয়ে, আন ওরে ডেকে আন্।"

'আলো ও ছায়া'র পরিশিষ্ট অংশে "মহাশ্বেতা" ও "পুণ্ডরীক" খণ্ডকাব্য। এ দুটি ইংরাজীতে অনুবাদিত হইয়া গিয়াছে। "পৌরাণিকী"তে 'একলব্য' নাটিকা ভিন্ন "ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি দ্রোণ" ও "রামের প্রতি অহল্যা" শীর্ষক দুইটি কবিতা আছে। "রামের প্রতি অহল্যা" কবিতাটি অপূর্ব্ব।

অহল্যা বলিতেছেন,

নরদেব, কিছু ভুলি নাই,
কাল যাহা পাপ ছিল, আজো আছে তাই,
শুধু সেই পাপী নাই। পাপী চিরদিন
থাকে না পাপের পঙ্কে বিকৃত, মলিন,
অস্পৃশ্য। প্রভাতালোকে ধরণী তেয়াগি
যায় যথা অন্ধকার, পুণ্যালোক লাগি
দুষ্কৃতি কালিমা হয় চির অন্তর্হিত;
তাই অহল্যার নাম রমণী ঘৃণিত,
রবে না ঘৃণিত আর।"

* * * *

নারীর সতীত্ব যায় মানব ভাষায়
শোনা ছিল, নারী কভু সতীত্ব যে পায়
তুমি তা দেখালে প্রভু, সে কারণে রাম
চিরস্মরণীয় হবে অহল্যার নাম।"

এ কয় ছত্রের মধুরতা ও গভীরতা ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই।

"গুঞ্জন" পুস্তকে যে কবিতাগুলি আছে, তাহা শিশুরাজ্যের। ছড়ার সহজ সুরটুকু কবিতাগুলির মধ্যে দিব্য ফুটিয়াছে! শিশুর কল্পনা বিকাশের পক্ষে কবিতাগুলি অদ্বিতীয় সহচর সেগুলি শিশুদিগের মতই চঞ্চল, সজীব!

এক্ষণে আমরা শ্রীমতী কামিনী দেবীর জীবনীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ১২ই অক্টোবর বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বাসণ্ডাগ্রামে এক মধ্যবিত্ত বৈদ্যপরিবারে কামিনী দেবীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতা স্বনামখ্যাত গ্রন্থকার চণ্ডীচরণ সেন। কামিনীদেবীর পিতামহ ও পিতামহী অতিশয় ধর্ম্মপ্রাণ ও ভাবুক প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহাদের জীবনের প্রভাব তাঁহাদের পুত্রের ও কিয়ৎ পরিমাণে পৌত্রীর জীবনে অনুরঞ্জিত হইয়াছে।

শিশুর কথা ফুটিবার পর হইতেই পিতামহ তাহার নিকট নানাপ্রকার শ্লোক আবৃত্তি করিতেন। প্রতিদিন শুনিয়া শুনিয়া ইহার অধিকাংশই শিশুর মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। কেহ বাড়ীতে আসিলে পিতামহের আদেশে সেগুলি নানাপ্রকার ভঙ্গিসহকারে তিনি পুনরাবৃত্তি করিতেন।

এই সকল বাঙ্গলা ও সংস্কৃত মিশ্রিত শ্লোকে সকল সময়ে পদের মিল না থাকিলেও প্রায় শেষভাগে একটি করিয়া নীতি উপদেশ থাকিত।

যেমন "না করিব হিংসা না করিব রোষ
সভার মধ্যে পড়িব শ্লোক।"
"ওহে গোরা কালা কেন নিন্দ?
কালা রজনী সভা করে চন্দ,
কালা অক্ষর জপয়ে পণ্ডিত,
কালা বৃক্ষ জগৎ পূজিত,

কালা কেশে উজ্জ্বল মুখ।
কালা কোকিলের বচন মধুর।''

কামিনীর প্রথম বর্ণপরিচয় মাতার নিকটে হয়। শিশুর জন্মের পূর্ব্বেই নিজের যত্নে তিনি একটু লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াছিলেন। বাড়ীর প্রবীণাদের ভয়ে তাঁহাকে লুকাইয়া লেখাপড়া করিতে হইত। রন্ধন গৃহের যেস্থানটি হেঁসেল বা হাঁড়িশাল বলিয়া পরিচিত তাহা কাঁচা মাটীর দেয়ালে ঘেরা ছিল। তাহারি গায়ে কাঠ শলাকা দিয়া তিনি অক্ষর লিখিতে অভ্যাস করিতেন ও প্রত্যহ রন্ধনশেষে গোময়মিশ্রিত মৃত্তিকার লেপ দিয়া সব ঢাকিয়া দিতেন। তখন বাসণ্ডাগ্রামের লোকের এইরূপ ধারণা ছিল যে, স্ত্রীলোকদিগকে লেখাপড়া শিখাইলে দুর্নীতির পথ উন্মুক্ত হইবে, স্ত্রীলোকেরা সকলের সহিত গোপনে পত্রালাপ করিবে। সুতরাং মধ্যবিত্ত পরিবারে লেখাপড়ার চর্চ্চাকে কেহ প্রশ্রয় দিত না। ধনাঢ্যগণের গৃহে দশটা সৌখীন কার্য্যের মধ্যে লেখাপড়া শেখাটাও একটা বলিয়া, কোনো কোনো মহিলা আত্মীয়গণের নিকট লেখাপড়া শিখিতেন; কেহবা বালিকা বয়সে সহোদরগণের সহিত গৃহে গুরুমহাশয়ের নিকট লেখা অভ্যাস করিতেন। বাসণ্ডাগ্রামে এই শ্রেণীর কোন কোন মহিলার সুন্দর হস্তাক্ষর আদর্শস্থানীয় ছিল। কামিনীর জন্মের পূর্ব্বে তাঁহার মাতৃদেবীর সন্তান সম্ভাবনার সংবাদ পাইয়া পিতা স্ত্রীকে একখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহাতে সন্তানের প্রতি মাতার কর্ত্তব্য, মাতৃত্বের গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয়ে কিছু উপদেশ ছিল। পত্রখানি ডাকঘর হইতে বাটীতে না আসিয়া গ্রামের কোন এক বিশিষ্ট ব্যক্তির বাড়ীতে গেল, তাহারা চিঠিখানি খুলিয়া পড়িয়া কামিনীর পিতামহের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। পুত্র বধূকে পত্র লিখিয়াছে দেখিয়া তিনি লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইলেন, পত্র লইয়া তাঁহার বৈবাহিকের নিকট গেলেন। তিনিও জামাতার কার্য্যে বড় অপ্রস্তুত হইলেন। চিঠিখানি লইয়া বাড়ীতে খুব একটা হুলুস্থুল ব্যাপার পড়িয়া গিয়াছিল।

কামিনীর চারিবৎসর বয়সে লেখাপড়া আরম্ভ হয়। মাতার নিকটেই তিনি বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ ও শিশুশিক্ষা দ্বিতীয়ভাগ শেষ করেন। দেড় বৎসর ধরিয়া শিশুশিক্ষাখানি ক্রমাগত পড়িতে পড়িতে বইখানি আদ্যোপান্ত তাঁহার মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। মাতা যখন রন্ধনশালে রাঁধিতেন বা শ্বশুরের পরিচর্য্যায় ব্যস্ত থাকিতেন, কামিনী তখন মাটীর দোয়াতে স্বগৃহে ও স্বহস্তে নির্ম্মিত এক দোয়াত কালী ও একতাড়া তালপাতা ও একটা খাকের কলম লইয়া লিখিতে বসিতেন। লেখাপড়া শেষ হইলে তালপাতাগুলি গুছাইয়া একটা রন্ধনীর মধ্যে ভরিয়া তদুপরি কলম রাখিয়া ও কলমের উপর ললাট রাখিয়া নিম্নলিখিত কবিতা আবৃত্তি করিতেন।

"লাগ্ লাগ্ সরস্বতী মোর কণ্ঠে লাগ
যাবজ্জীবন তাবৎ থাক্
আমার ভাগ্যে গুরুর যশ
দিনে দিনে বিদ্যা বাড়িতে থাক।"

"ত্বং ত্বং সরস্বতী নির্ম্মল বরণে
রত্ন বিভূষিত কুণ্ডল করণে
উজ্জ্বল মুকুতা গজমতিহারে
দেবী সরস্বতী বর দেও আমারে
বীণাপুস্তক রঞ্জিত হস্তে
ভগবতি ভারতি দেবি নমস্তে।"

স্কুলে আসিবার কিছুদিন পরেই অপার প্রাইমারী পরীক্ষা দিয়া তিনি প্রথম বিভাগের প্রথম স্থান পাইলেন। পিতা তাঁহাকে গণিত এমন সুন্দর শিখাইয়াছিলেন যে, ক্লাসে সে সময়ে কেহই গণিতে তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। তাঁহাদের গণিতের শিক্ষক বাবু শ্যামাচরণ বসু তাঁহাকে গণিতের পারদর্শিতার জন্য লীলাবতী আখ্যা দিয়াছিলেন। ১৪ বৎসর বয়সে মাইনরপরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এ সময় কামিনীর পিতা জলপাইগুড়ির মুন্সেফ। পিতা চিরকালই অধ্যয়নশীল ছিলেন। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি নানা বিষয়ক গ্রন্থরাশি সংগ্রহ করিয়াছিলেন; দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ রুচি থাকাতে এই সম্বন্ধীয় অনেক পুস্তক তাঁহার পুস্তকাগারে ছিল। মাইনর পরীক্ষা দিয়া বাড়িতে আসিয়া কামিনী সমস্ত সময়ই এই পুস্তকাগারে কাটাইতেন।

বাল্যকাল হইতেই কামিনী ভাবুকতা প্রবণ ও কল্পনাপ্রিয় ছিলেন।

অষ্টমবর্ষ বয়:ক্রম কালে কামিনী প্রথম কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। পদ্য রচনা দর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহার পিতা তাঁহাকে কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামদাসের মহাভারত উপহার দিলেন। তাঁহার যখন নয় বৎসর বয়স তখন তাঁহার পিতা দিনাজপুরের অন্তর্গত ঠাকুরগাঁ সবডিভিসনে মুন্সেফ হইয়া যান। সে সময়ে সে স্থানে যাইতে হইলে কতকটা পথ গরুর গাড়ীতে যাইতে হইত; সপরিবার তথায় যাওয়া সুবিধাজনক নহে বলিয়া স্ত্রী ও কন্যাগণকে কেশববাবুর ভারতাশ্রমে রাখিয়া পিতা একাই কর্ম্মস্থানে গেলেন। ইহার কিছুদিন পরে কামিনী হিন্দুমহিলা বিদ্যালয়ে বোর্ডার হন। ছয়মাসকাল এখানে থাকিয়া তাহার পর আবার পিতার কর্ম্মস্থান মাণিকগঞ্জে ফিরিয়া আইসেন। ইহার পরবর্ত্তী দেড় বৎসরকাল পিতাই কন্যাকে শিক্ষা দিয়াছেন প্রতিদিন সকালে উপাসনার পরই হয় বাইবেল না হয় অন্য কোন ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে অংশ বিশেষ কন্যার পাঠের জন্য নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন; Morning & Evening Meditations নামক পুস্তক হইতেও প্রতিদিন একটি করিয়া কবিতা মুখস্থ করিতে দিতেন। যেখানে যাহা কিছু সুন্দর পড়িতেন, কন্যাকেও সেগুলি পড়াইতেন। ইংরাজী গণিত, ইতিহাস ও ভূগোল সব বিষয়ই নিজেই পড়াইতেন। বার বৎসর বয়সের সময় আবার কামিনীকে বোর্ডিং এ পাঠান হইল। স্কুলে পাঠাইবার সময় পিতা কন্যাকে বলিয়া দিলেন যে সর্ব্বদাই মনে রাখিবে যে, "My life has a mission."

ষোড়শ বর্ষে কামিনী প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি বাংলা ভাষাই দ্বিতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহার পর দুই বৎসর পড়িয়াই F. A. পরীক্ষা দেন এবং সংস্কৃতভাষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। আবার দুই বৎসর পরে B. A. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষায় সংস্কৃত ভাষায় [illegible] অনার পাইয়াছিলেন।

এই সময়ে বেথুন কলেজের Lady Superintendent Miss Lipscombe কর্ম্ম পরিত্যাগ করাতে Miss Bose M. A. Lady Supt. হইলেন। সেই কাজ লইবার জন্য কামিনীকে প্রথমে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু তাঁহার পিতা কন্যাকে কার্য্য লইতে দিলেন না।

"বেশীর ভা'গ পুরুষেরা আজকাল চাকরী পাইবার আশায় লেখাপড়া শেখে" বলিয়া তিনি সর্ব্বদাই দুঃখ প্রকাশ করিতেন; কাজেই কন্যার চাকরীর নামে তিনি বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন "জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য ও জ্ঞানের নির্ম্মল আনন্দ সম্ভোগ করিবার জন্যই আমি কন্যাকে শিক্ষাদান করিয়াছি। চাকরী আমি কখনই তাহাকে করিতে দিব না।" কতিপয় বন্ধু তখন বলিলেন যে "আপনার কন্যার নিজের জীবিকার জন্য অর্থোপার্জ্জনের আবশ্যক নাই, সুতরাং সে যে অর্থের জন্য চাকরী করিতেছে এরূপ ভুল করা কাহারও সম্ভব নহে। কিন্তু এমন অনেক ভদ্র রমণী আছেন যাঁহাদের পক্ষে স্বাবলম্বন প্রয়োজন। কিন্তু দৃষ্টান্তের অভাবে এইরূপ রমণীরাও স্বাধীনভাবে কোন কাজ করিতে পারিতেছেন না। আপনি যদি ইহাকে কাজ করিতে দেন তাহা হইলে পরে আর দশজন স্ত্রীলোকও কার্য্য করিতে অগ্রসর হইবে।" কামিনীর পিতার এই কথাগুলি যুক্তি সঙ্গত মনে হইল।

১৮৮৬ সালে কামিনী বেথুন বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর পদে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার প্রণীত আলো ও ছায়া ১৮৮৯ সালে বাহির হয়। অধিকাংশ কবিতাই অনেক বৎসর পূর্ব্বে লেখা হইয়াছিল। কামিনীর পিতা ও তাঁহার বন্ধুরা তাঁহাকে অনেক বার কবিতাগুলি ছাপাইতে অনুরোধ করিয়াছেন কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত হন নাই। অবশেষে তাঁহার পিতার কোন বন্ধু কবিতাগুলি কবিবর হেমচন্দ্রকে দেখান ও লেখিকার নাম গোপন করিয়া কবিতাগুলি সম্বন্ধে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করেন। তিনি কি মত প্রকাশ করিয়াছিলেন 'আলো ও ছায়া'র ভূমিকাতেই লিপিবদ্ধ আছে। কোন

সমাজের কোন দিকই কামিনীর ভাল করিয়া দেখিবার অবসর বা সুবিধা ঘটে নাই। সামাজিক জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁহার বড়ই কম। তাঁহার আদর্শ বেশীর ভাগ ইংরাজী ও সংস্কৃত সাহিত্য-জগৎ হইতে লব্ধ ও কল্পনাপ্রসূত। কাজেই তাঁহার কবিতাগুলি পুরাতন ছাঁচে ঢালা হইতে পারে নাই।

১৮৯৪ সালে ষ্ট্যাটুটারী সিভিলিয়ান কেদারনাথ রায়ের সহিত কামিনীর বিবাহ হয়। ইনি বহুপূর্ব্ব হইতেই কামিনীর গুণের পক্ষপাতী ছিলেন। "আলো ও ছায়া" প্রকাশিত হইবার পর ইংরাজীতে তাহার এক বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশ করেন। বিবাহের পর কামিনীর কেবল একখানি পুস্তক "গুঞ্জন" বাহির হইয়াছে। কবিতা লেখা ছাড়িয়া দিয়াছেন বলিয়া, তাঁহার কোন বন্ধু অনুযোগ করাতে, কামিনী তাঁহার সন্তানগুলিকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন "এই গুলিই আমার জীবন্ত কবিতা।" স্বামিসেবা, গৃহকর্ম্ম ও সন্তানপালনই তাঁহার নিকট পত্নী ও জননীর প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয় এবং তাহাতেই তাঁহার সমুদয় অবসর ও শক্তি নিযুক্ত রহিয়াছে।

সম্রাট্ সপ্তম এড্ওয়ার্ড।

গত ৬ই মে শুক্রবার রাত্রি ১১টা ৪৫ মিনিটে আমাদের ভারতসম্রাট্ ইংলণ্ডের রাজা সপ্তম এড্ওয়ার্ড ইহলীলা সংবরণ করিয়াছেন। বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের ন্যায় এই নিষ্ঠুর শোক-সংবাদ ভারতের ত্রিশকোটি প্রজাকে বিস্মিত, বিমূঢ় ও অপ্রত্যাশিত আঘাতে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। রাজা হইতে ভিখারী পর্য্যন্ত সকলেই একদিন ইহসংসার হইতে বিদায় লইতে বাধ্য! কিন্তু আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ সপ্তম এড্ওয়ার্ডের প্রতি কালের সেই করাল কবল এতই আকস্মিক ও অদৃষ্টপূর্ব্ব যে তাঁহাকে এরূপভাবে অকস্মাৎ আমাদের মধ্য হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় দিতে আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। তাঁহার মৃত্যুর একসপ্তাহ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি সুস্থদেহে রাজকর্ম্ম পরিচালনা করিয়াছিলেন। রঙ্গালয়ে অভিনয় দেখিতে যাইয়া সহসা শ্লেষ্মা-পীড়িত হইয়া প্রাসাদে প্রত্যাগমন করিলেন! দুই দিনের মধ্যে মানবের চিরন্তন নির্ঘাত আসিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিল!

এড্ওয়ার্ড ভারতের সম্রাট্ ছিলেন বলিয়াই যে আজ আমরা তাঁহার শোকে মুহ্যমান তাহা নহে। তাঁহার অশেষ গুণ-সমন্বিত চরিত্র ও হৃদয়ের জন্য ভারতের রাজা হইতে ভিখারী পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিত ও ভক্তি করিত। স্বর্গগতা ভিক্টোরিয়ার জীবিতাবস্থায় যুবরাজ এড্ওয়ার্ড ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে যখন ভারতসাম্রাজ্য পরিদর্শন উপলক্ষ্যে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন তখন তাঁহার সৌজন্য, সদাশয়তা ও সহানুভূতিতে ভারতের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই মুগ্ধ ও অভিভূত হইয়াছিল। মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত ভারতবাসীর প্রতি তাঁহার সেই স্নেহ ও সহানুভূতি অম্লান ও অক্ষুণ্ণ ছিল; আজ তাঁহাকে হারাইয়া আমরা যে কেবল আমাদের রাজা ও অধীশ্বরকে হারাইয়াছি তাহা নহে আজ তাঁহাকে হারাইয়া আমরা আমাদের আন্তরিক শুভাকাঙ্ক্ষী অকপট বন্ধু ও প্রতিপালক পিতাকে হারাইয়াছি।

১৮৪১ খৃষ্টাব্দে এড্ওয়ার্ডের জন্ম হয়। সপ্তমবর্ষ বয়ঃক্রম হইতে তাঁহার শিক্ষা আরম্ভ

হয়। একুশ বৎসর পর্য্যন্ত তিনি ইংলণ্ডের নানা বিদ্যালয়ে থাকিয়া তদানীন্তন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের নিকট শিক্ষালাভ করেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্যারন্ রেন্‌ফ্রিউ (Baron Renfrew) নামে ছদ্মবেশে স্পেন, পর্ত্তুগাল ও ইতালীতে ভ্রমণ করিয়া আসেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহাকে আমেরিকার কানাডা রাজ্য পরিদর্শন করিতে প্রেরণ করেন। তথায় তাঁহার সদ্‌গুণমহিমায় তিনি প্রজামণ্ডলীর এতই প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন যে যেখানে পদার্পণ করিতেন সেই-খানেই লক্ষ লক্ষ লোক সমবেত হইয়া তাঁহার দর্শনলাভের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করিয়া থাকিত। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ডেন্‌মার্কের রাজ-

কুমারী আলেক্‌জান্দ্রার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। সেই অবধি পতিব্রতা ভিক্টোরিয়া সাধারণ রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন; সুতরাং সেইদিন হইতে যুবরাজ এড্-ওয়ার্ড সর্ব্বপ্রকার সাধারণ ও সামাজিক রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে বাধ্য হন। এই সকল গুরুভারকার্য্য তিনি এরূপ একাগ্রতা, সদাশয়তা ও বিচক্ষণতার সহিত সম্পন্ন করিতেন যে সেই অল্পবয়স হইতেই তিনি কেবল যে ইংলণ্ডবাসীরই প্রিয় হইয়াছিলেন তাহা নহে, সমগ্র সভ্যজগতই

তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দেখিত। দেশের এমন ক্ষুদ্র বৃহৎ সাধু ও সৎকর্ম্ম ছিল না যাহাতে যুবরাজ এড্‌ওয়ার্ড সর্ব্বান্তঃকরণে যোগদান না করিতেন; এমন পণ্ডিত ও প্রতিভাবান লোক ছিলেন না যিনি যুবরাজের অনুগ্রহ ও উৎসাহবাক্য লাভ না করিতেন। তাঁহার নিকট উচ্চ, নীচ, ধনী, দরিদ্রের প্রভেদ ছিল না, তিনি সাম্রাজ্যের সকলকেই সমভাবে স্নেহ করিতেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতে আগমন করেন তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাঁহার আগমনে ভারতের উচ্চনীচ সকলেই যে রাজভক্তি ও অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছিল তাহা অভূতপূর্ব্ব। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ২২শে জানুয়ারী এড্‌ওয়ার্ড রাজপদে অভিষিক্ত হন। তাঁহার অভিষেক উৎসবের উজ্জ্বল স্মৃতি আজিও আমাদিগের অন্তরে জাগিতেছে! হায় কে জানিত এই অল্প দিনের মধ্যেই আবার তাঁহার শোকে আমাদিগকে কাতর হইতে হইবে!!

তাঁহার রাজত্বকাল ভারতের ইতিহাসে চিরদিনই উজ্জ্বল রহিবে। ভারতসাম্রাজ্য-লাভের জুবিলি উৎসবে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি যে ঘোষণাপত্র প্রচার করেন তাহাতে তাঁহার স্বর্গগতা জননী ভিক্টোরিয়ার চিরস্মরণীয় ঘোষণাপত্রের আশ্বাস ও অঙ্গীকার পালনে প্রতিশ্রুতি দান করিয়া তিনি ভারতের অশান্ত প্রজার মনোরঞ্জন করেন। তাঁহার সেই প্রতিশ্রুতিবাক্য আজ আমরা নানারূপে প্রতিপালিত হইতে দেখিতেছি। ভারতবাসীকে উচ্চরাজকার্য্য দান, ভারতের শাসনে সংস্কারবিধান আজ তাঁহার সেই বাক্যের সত্যতা প্রমাণ করিতেছে! সিংহাসনে অধিরোহণকালে তিনি তাঁহার পৃথিবীবাসী প্রজাবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া, বলেন, "স্বর্গগতা মহারাণীর প্রতি প্রজাবৃন্দের স্নেহ ও শ্রদ্ধার উপর নির্ভর করিয়া আমি আজ ঈশ্বর সম্মুখে অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমি সর্ব্বকর্ম্মে আমার স্বর্গগতা জননীর পবিত্র পদানুসরণে প্রবৃত্ত হইবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিব এবং আমার অসংখ্য প্রজার সুখসমৃদ্ধিসাধনে নিজের সকল চেষ্টা ও চিন্তাকে উৎসর্গ করিব।" স্বর্গগত সম্রাট্ তাঁহার এই পবিত্র অঙ্গীকারপূর্ণ করিয়া আজ ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন!

তাঁহার জীবনের নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি হইতে আমরা তাঁহার অন্তরপ্রকৃতির যথার্থ পরিচয় পাইব। আমেরিকার প্রসিদ্ধ ক্রোর-পতি কার্ণেগী সাহেব (Mr. Carnegie) তাঁহার যৌবরাজ্যকালে আমেরিকার এক সংবাদপত্রে তাঁহার নিন্দা করেন। ইহা জানিয়াও সিংহাসনে অধিরোহণ করিবার পর সম্রাট্ এডওয়ার্ড একদিন অনিমন্ত্রিতভাবে কার্ণেগীর ইংলণ্ডের প্রাসাদে উপস্থিত হন এবং আপনার অমায়িক সদাশয়তায় সকলকেই মুগ্ধ করেন।

ইংলণ্ডে অনেকগুলি রাজনৈতিক সম্প্রদায় আছে তাহা সকলেই জানেন। এডওয়ার্ড সকল সম্প্রদায়কেই সমচক্ষে দেখিতেন। প্রজাগণের মধ্যে যে কোন লোকের লেশমাত্র প্রতিভার পরিচয় পাইতেন তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে রাজপ্রাসাদে নিমন্ত্রিত করিয়া আলাপে আপ্যায়িত করিতেন।

মৃত সম্রাটের স্মৃতিশক্তি অসাধারণ ছিল। একদিন পোষ্ট আফিসে যাইয়া তিনি দেখেন

বাতায়ন সম্মুখে এক কর্ম্মচারী বসিয়া আছে। সে ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিবামাত্র যথাযোগ্য অভিবাদন করিল। তাহাকে দেখিবামাত্র এডওয়ার্ড বলিয়া উঠিলেন, "কেও পেন্ (Payne) যে?" এই বলিয়া সস্নেহে তাহার করমর্দ্দন করিলেন। ইহার চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ব্বে এই লোকটি রাজপ্রাসাদে ভৃত্যের কর্ম্ম করিত। সম্রাট এতদিনেও তাঁহাকে বিস্মৃত হন নাই। যাইবার সময় তিনি তাহাকে সস্ত্রীক তাঁহার প্রাসাদে যাইতে নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে এক ফোটোগ্রাফার তাঁহার ফোটো লইবার জন্য রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হয়। যথাসময়ে সম্রাট্ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করি-

লেন "আজ আপনার শরীর ভাল ত?" সম্রা[illegible] মনোমতরূপে দণ্ডায়মান করাইবার জন্য [illegible]টি তাঁহাকে দক্ষিণ হস্তটি একটু সরাই[illegible] আরো দুইপদ অগ্রসর হইতে অনুরোধ [illegible]ল। তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া [illegible]রে ব[illegible], "মহারাজকে মস্তকটি একটু উচ্চ করিয়া রাখিতে অনুরোধ করিতে পারি কি?" সম্রাট্ হাসিয়া উত্তর করিলেন, "ঠিক বলিয়াছ, আজকাল মাথাটা একটু উঁচু করে চলাই দরকার।"

সম্রাট্ রুষের রাজপ্রাসাদে যাইয়া রাজপরিবারের সহিত আলাপ পরিচয়ের পর

বালকবালিকা দিগের সহিত সাক্ষাতের অভিলাষ প্রকাশ করেন। সম্রাটের সরলমূর্ত্তি দেখিবামাত্র রাজান্তঃপুরের বালকবালিকাগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে আসিয়া সমবেত হইল। রাজা তাঁহাদিগের জন্য নানাপ্রকার ক্রীড়া-পুত্তলি লইয়া গিয়াছিলেন। সেইগুলি পাইয়া তাহারা অল্পক্ষণ মধ্যেই তাঁহার সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া ফেলিল। তাহাদের সহিত আলাপকালে সম্রাট দেখিলেন যে তাহাদিগের ধাত্রী একজন আইরিষ স্ত্রীলোক। ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি সেই ধাত্রীকে তাঁহার স্বহস্ত লিখিত এক পত্রের সহিত স্নেহনিদর্শন স্বরূপ এক পুরস্কার প্রেরণ করেন।

রাজ্যের সকল কর্ম্মে তিনি মনোযোগ ও অনুরাগ প্রকাশ করিতেন। সহস্র-বার কৃতকর্ম্ম পুনঃসম্পাদনেও তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও বিরাগ বা বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না। পৌত্র পৌত্রীগণকে লইয়া অবকাশ পাইলেই নানাপ্রকার ক্রীড়া করিতেন এবং তাহাদিগের সুশিক্ষার প্রতি সর্ব্বদা সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। দরিদ্রালয়, অনাথাশ্রম ও হাসপাতাল পরিদর্শন করিতে তিনি আন্তরিক আনন্দবোধ করিতেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়া অবধি তিনি ইয়ুরোপে বিভিন্নজাতি-গণের মধ্যে শান্তিস্থাপনের জন্য সর্ব্বদাই যত্নবান ছিলেন। তাঁহার অমায়িক সরল ব্যবহারে এবং বিচক্ষণ রাজনৈতিক বুদ্ধিতে ইয়ুরোপের সকল রাজশক্তিই তাঁহার সহিত বন্ধুতাসূত্রে বদ্ধ হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডের গৃহবিবাদের এই সঙ্কটকালে তাঁহার ন্যায় বিজ্ঞ বিচক্ষণ রাজার অভাবে বিশেষ ক্ষতি হইবারই সম্ভাবনা!

আমেরিকা প্রবাসীর পত্র।

শ্রীচরণ কমলেষু—

আপনি আমাদের বিষয় কিছু জানিতে চাহিয়াছেন, তাই লিখিতেছি।

ক্যালিফোর্ণিয়া, ষ্ট্যানফোর্ড, ওয়াসিংটন, অর্গণ বিশ্ববিদ্যালয় ও অর্গণ ও ওয়াশিং-টনের ষ্টেট কলেজ এই সকল স্থানেই ভারত-ছাত্র আছে। কিন্তু কালিফোর্ণিয়া ও ষ্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়েই তাহাদের সংখ্যা সব চেয়ে বেশি। কারণ সেখানে আমাদের অনেক সুবিধা আছে, এবং আমেরিকার মধ্যে এই দুইটীই খুব ভাল বিদ্যালয় বলিয়া খ্যাত। কালিফোর্ণিয়াতে আমাদের দেশের আত্ম-নির্ভরপ্রিয় ছাত্রদের পক্ষে বিশেষ সুবিধা এই, সেখানে ছাত্রোপযোগী নানারকম কাজ পাওয়া যায়। কিন্তু এই সুবিধা ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে; কারণ প্রাচ্যজাতির প্রতি এদেশের ঘৃণা দিন দিনই বাড়িতেছে, সেজন্য অনেক স্থলে আমাদের ছাত্রেরা কাজ ত পায়ই না বরং অপমানিত হইয়া আসে। এখানে আমাদের প্রতি ঘৃণা এত অধিক যে অনেক সময় আমাদের থাকি-বার জন্য বাড়িভাড়া পাওয়াও কঠিন হইয়া উঠে, অনেক সময় অনেকে নাপিতের দোকান হইতে অপমানিত হইয়া আসিয়াছে। এই কারণে কালিফোর্ণিয়াতে আমেরিকানদের সহিত আমাদের মিশিবার সুযোগ বড়ই কম;

এখানে ছাত্রাবাসে থাকিতে অনেক খরচ পড়ে, তাই আমরা ৪।৫ জন মিলিয়া বাড়ী ভাড়া লইয়া একত্র থাকি। সেখানে আমরা প্রতি রবিবারে দেশের মত রান্না ও দেশী আহারের ব্যবস্থা করি। যদিও আমাদের মধ্যে অনেকেই দেশী রান্নায় একেবারে অজ্ঞ, তবু উহারি মধ্যে যে একটু রাঁধিতে পারে, তিনি সে দিনের জন্য সর্দ্দারপাচক (dean) এবং অন্যান্য সকলে তাহার সহকারী নিযুক্ত হন। 'ডিন' মহাশয় যাহাকে যাহা করিতে বলেন তাহাকে বিনা বাক্যব্যয়ে তাহা করিতে হয়।

এইরূপ সর্দ্দারব্রাহ্মণের কার্য্য প্রায়ই যোগেন বাবু করিতেন, যোগেন বাবু ডিগ্রি নিয়া দেশে যাত্রা করিযাছেন, বোধ হয় এত দিনে পৌঁছিয়া থাকিবেন, আমিও কালিফোর্ণিয়া ছাড়িয়া আসিয়াছি।

যাহারা আত্মনির্ভরপ্রিয় তাঁহারা কোন পরিবারে ৪ ঘণ্টা করিয়া প্রতিদিন কাজ করেন সেজন্য আহার ও বাসস্থান মিলে। রবিবারে এখানে কোন কাজকর্ম্ম হয় না, তাই তাঁহারা বাঙ্গলা ভোজে যোগদান করিতে পারেন। সপ্তাহের অন্যান্য দিন আমরা আমেরিকানদের মতই খাই, ঐরূপ রান্নায় সময় ও ব্যয় অল্পই লাগে। ষ্টানফোর্ড ও কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ১৫।২০ মাইলের ব্যবধান। কালিফোর্ণিয়ার তুলনায় ওয়াসিংটনে প্রাচ্যবিদ্বেষ নাই বলিলেই চলে, আমেরিকার অধিকাংশ স্থলেই প্রাচ্য বিদ্বেষের মাত্রা অত্যধিক। এখানে আমাদের আমেরিকানদের সঙ্গে মিশিবার বিস্তর সুযোগ, তথাপি আমরা নানাকারণে এ সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণে অপারগ। এখানেও আমাদের ছাত্রেরা অনেকে বাড়ী ভাড়া লইয়া থাকেন; এখানেও কোন পরিবারে ৪।৫ ঘণ্টা কাজ করিয়া খাওয়া ও থাকার যোগাড় করিয়া লন। এখানে ছাত্রের উপযুক্ত কার্য্য পাওয়া বড়ই কঠিন; আর পাওয়া গেলেও আমাদিগকে 'বিদেশী' মনে করিয়া আমাদের উপর এদেশের লোকে অতিরিক্ত জুলুম করে। সিটলে (Seattle) অধিকাংশই পঞ্জাবী ছাত্র ইঁহারা অধিকাংশই নিরামিষভোজী ও মাংসাহারবিদ্বেষী। এমন কি দুই একজন আর্য্যসমাজী ছাত্র মাংসের টেবিলে আহার করিতেও অনিচ্ছুক; ছাত্রাবাসে থাকিবার পক্ষে ইঁহাদিগের ইহাই একটি প্রধান অন্তরায়। অনেক সময় টাকা পয়সাতেও কুলাইয়া উঠে না। সম্প্রতি সিটলে সমস্ত ভারতবাসী ছাত্র মিলিয়া একটী বাড়ী ভাড়া নিয়া একত্রে বাস করিতেছেন, ইহাতে খরচ খুব কম হইতেছে।

একজন সদাশয় মার্কিন মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্নিকটে ভারতীয় ছাত্রদের একটি বাটী নির্ম্মাণ জন্য একখণ্ড জমি দান করিয়াছেন, জমির মূল্য ৪০০০ ডলার অর্থাৎ ১২০০০ হাজার টাকার কিছু বেশি। আমরা সেখানে একটী বাটী নির্ম্মাণের চেষ্টায় আছি; কিন্তু বাটী প্রস্তুত করাইতে আরোও বার হাজার টাকার প্রয়োজন; সে টাকার কোথা হইতে যোগাড় হইবে তাহা এখনো স্থির করিতে পারিতেছি না। দেশে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তির নিকট এজন্য অনেক আবেদন করা হইয়াছে; টাকা দিয়া কোন সহায়তা করা দূরের কথা পত্র-

খানার পর্য্যন্ত উত্তর অবধি পাওয়া যায় নাই; এদেশে কিন্তু পত্রের জবাব না দেওয়া একটী গুরুতর অভদ্রতা বলিয়া বিবেচিত হয়, তা যিনি যত বড়লোকই হউন না কেন! আপনারা একটু চেষ্টা করিলে বোধ হয় বাড়িটা হইয়া যাইবে। আশা করি আপনি একটু কষ্ট লইয়া ভারতের ছাত্রদের জন্য এ সম্বন্ধে একটু চেষ্টা করিবেন। এ বাড়িটা হইলে এখন যে খরচ লাগিতেছে তাহার অর্দ্ধেক খরচে এখানে থাকা যাইবে।

সম্প্রতি অর্গণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ছাত্র মোটে নাই। অর্গণ ষ্টেট কলেজে তিন চার জন ছাত্র আছেন, তাঁহারাও ঘর ভাড়া লইয়া একত্রে বাস করিতেছেন। অর্গণের পোর্টল্যাণ্ড সহরে আমাদের প্রতি ঘৃণার মাত্রা বেশ স্পষ্টানুভূত হয়। আমাদিগের জনৈক বন্ধুর এখানে থাকিবার জন্য ঘর ভাড়া পাইতে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। কলিসে আমাদের প্রতি তত ঘৃণা নাই, ওখানে আমরা বেশ পরিচিত হইয়াছি।

ওয়াশিংটন ষ্টেট কলেজে আমার পূর্ব্বে আর কোন ভারতবাসী আসে নাই। এখানে আমি এখনও কোন প্রকার ঘৃণার ভাব পাই নাই বরং অনেক স্থলে আদরই পাইয়াছি। এদের সমস্ত সামাজিক সম্মিলনী ও নাচে মজলিসে আমার নিমন্ত্রণ হয়; এবং এ সমস্ত স্থলেও কোন ঘৃণার ভাব দেখি নাই।

আমি এখানে কলেজ নিবাসে (College Dormitory) আছি; এখানে তিন শত ছাত্র বাস ও আহার করে। এখানে দুইটী ডরমিটরি অর্থাৎ নিবাস একটী মেয়েদের জন্য, অপরটী ছেলেদের জন্য। মেয়েদের নিবাসে প্রায় আড়াই শত মেয়ে আছেন।

এদেশের ছেলেদের সঙ্গে বেশ আছি, কখনও ইঁহারা আমার প্রতি কোন প্রকার ঘৃণার ভাব দেখান না বরং নানাপ্রকারে আত্মীয়তাই দেখাইয়া থাকেন। এখানে ছেলেদের ডরমিটরির জীবনটুকু বেশ উপভোগ্য। যখন নূতন ছাত্র প্রথম ডরমিটরিতে ঘর পাইবার দরখাস্ত করে, তখন সকলের ভাগ্যে প্রথম বারেই ঘর জোটে না। কারণ দুই তিন হাজার দরখাস্ত পড়ে। আমি বিদেশী বলিয়া প্রথম দরখাস্তেই ঘর পাইয়াছি। নূতন ছাত্র আসিলে উচ্চ নিম্ন সকল শ্রেণীর পুরাতন ছাত্রেরাই ইহাদিগকে দীক্ষিত করে। দীক্ষাটুকু বেশ মজার। কোনদিন দীক্ষা হইবে তাহার কোন স্থিরতা নাই, হঠাৎ একদিন রাত্রি দশটা কিম্বা এগারটার সময় ডরমিটরির হলে (Parlour) খুব হুলস্থুল বাধিয়া গেল। পুরাতন ছাত্রগণ একত্রিত হইয়া নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়া, টিনের বাক্স পিটিয়া যে যে প্রকারে পারে গোলযোগ আরম্ভ করিয়াছেন যতক্ষণ সমস্ত ছাত্র হলে একত্রিত না হয় ততক্ষণ এই প্রকারের গোলমাল চলিতে থাকে। সমস্ত ছাত্র একত্র হইলে প্রত্যেকে নিজের সুবিধামত ছদ্মবেশ ধারণ করে, কেহ আমেরিকার আদিম নিবাসীর (Red Indian) বেশ পরে, কেহ বা দাড়ি গোঁপ লাগাইয়া বৃদ্ধের বেশ ধরে, কেহ কলেজ সভাপতি কিম্বা কোন প্রোফেসারের মত পোষাক পরিয়া তাঁহার অনুকরণ করে, কেহ বা কলেজের মেয়ে-ছাত্রীর অনুকরণে গাউন প্রভৃতি পরিয়া,

...ম্বা চুল লাগাইয়া মিহিসুরে কথা কহে ... তাঁহাদের অনুকরণে নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী করিতে থাকে। এই প্রকারে সাজসজ্জা শেষ হইলে, সকলে দল বাঁধিয়া মেয়েদের ডর্মিটরিতে যায়। তাহাদের গোলমালে আকৃষ্ট হইয়া যখন সমস্ত মেয়েরা হলে সমবেত হন, তখন ছেলেরা সেখানে নানা হাস্যোদ্দীপক গান করিতে থাকে। এইত গেল দীক্ষার প্রথম অঙ্ক। ইহা প্রায়ই শুক্রবার শেষ রাত্রিতে আরম্ভ হয় কারণ অপর দিন ছেলেদের পড়াশুনা থাকে, শনিবার তাহাদের ছুটি। এইরূপ দীক্ষার পর নূতন ছাত্রদিগের কাহাকেও ঘর ঝাঁট কাহাকেও বাগান পরিষ্কার কাহাকেও সার্শি পরিষ্কার এইরূপ নানা ধরণের কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়। এই সমস্ত কাজ ছাত্রদের করিবার কোন দরকার নাই, সেজন্য স্বতন্ত্র চাকর আছে, তথাপি নূতন ছাত্রদের ঐ দিনে এ সমস্ত কাজ করিতে হয়। পুরাতন ছাত্রেরা কেবল পর্য্যবেক্ষণ করে মাত্র। শনিবার ১২টা পর্য্যন্ত এই সমস্ত কাজ হয়; ডিনারের পর সমস্ত ছাত্র একত্র হইয়া আমোদ আহ্লাদ করে; এই গেল দীক্ষা। এই প্রকারের অনেক প্রথা প্রচলিত আছে; আপনাদিগকে একটু আভাষ দেওয়ার জন্য একটীর মাত্র উল্লেখ করিলাম। শিক্ষা সম্বন্ধে এইটুকু বলা যায় যে এখানে স্কুল কেবল 'কেরাণী প্রস্তুতের' জন্য নহে, 'কেরাণী প্রস্তুতের' জন্য স্বতন্ত্র commercial school আছে। এখানে বিদ্যালয় বিজ্ঞানশিক্ষার জন্য। ... স্কুলের গ্রাজুয়েট ছাত্রগণই প্রধানতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে কিম্বা কলেজে ভর্ত্তি হয়। যাহারা গ্রাজুয়েট নহে তাহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষা দিয়া ... ভর্ত্তি হইতে হয়। সাধারণতঃ এ দেশের বিদ্যালয়গুলিতে বৎসরে দুইটি করিয়া term; অর্থাৎ বৎসরে দুইবার কলেজ বসে। কোথাও বা তিন চারিটি টার্ম্মও আছে। সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে কোন বিষয়ের প্রথম শিক্ষা আরম্ভ হয় এবং জানুয়ারির শেষ কিম্বা ফেব্রুয়ারির প্রথম তাহা শেষ হয়; এবং ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে দ্বিতীয়বার শিক্ষা আরম্ভ এবং জুনের মাঝামাঝি শেষ হয়।• এইরূপ ষাণ্মাসিককাল বিভাগকে semester বলে। কোথাও গ্রীষ্মকালে শিক্ষকদের জন্য গ্রীষ্ম স্কুলের (Summer School) ব্যবস্থা হয়। ডিগ্রি লইবার জন্য যে সমস্ত বিষয় প্রয়োজন গ্রীষ্মস্কুলে তাহার অনেক বিষয়েই শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রত্যেক গ্রীষ্মকালে এই স্কুলে যোগ দিতে পারিলে প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে কলেজশিক্ষা শেষ করা যাইতে পারে। গ্রীষ্মস্কুলে ৮ হইতে ১০ সংখ্যা (unit) পর্য্যন্ত রাখা যায়। প্রত্যেক সিমিষ্টারের প্রথমেই কেবল ছাত্র নেওয়া হয়। কলেজ কিম্বা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট হইলে ১৩০টী high school unit পূরণ করিতে হয়। এই সমস্ত ইউনিট্ কলেজ unit বলিয়া গণ্য হয় না। এই ১৩০টী unit যে দেখাইতে পারে না তাহাকে বাহিরের ছাত্র বলিয়া নেওয়া হয় সে নিয়মিত (Regular) ছাত্র হইতে পারে না। যখন সে এই সমস্ত unit পূরণ করিয়াছে বলিয়া প্রমাণ দিতে পারে কিম্বা পরীক্ষায় পাশ করিতে পারে তখন তাহাকে নিয়মিত ছাত্র (regular) করিয়া নেওয়া হয়। কলেজ হইতে ডিগ্রি পাইতে প্রত্যেক ছাত্রকে

১৩০ হইতে ১৬০ unit পূর্ণ করিতে হয়। প্রতি সিমিষ্টারে অর্থাৎ প্রত্যেক ছমাসের প্রতি সপ্তাহের এক ঘণ্টা lecture work—বক্তৃতা শোনার কাজ কিম্বা দুই তিন ঘণ্টা laboratory work—বিজ্ঞানালয়ের কাজ এক এক unit রূপে গৃহীত হয়। আমাদের দেশের মত ডিগ্রির জন্য কোন পরীক্ষা দিতে হয় না, কেবল একটী প্রবন্ধ (thesis) লিখিতে হয়। কোথাও উচ্চতর ডিগ্রির জন্য thesis সত্বেও মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয়। এ পরীক্ষার সময় স্থান-বিশেষে এমন নিয়ম আছে যে সর্ব্বসাধারণে উপস্থিত হইয়া পরীক্ষা গ্রহণ দেখিতে পারেন এবং ছাত্রকে সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। ছাত্র যে বিষয় পড়িতেছেন সেই বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করিয়া তিনি প্রবন্ধের বিষয় স্থির করিয়া লন, এবং তাঁহার উপদেশ অনুসারে সেই বিষয়ের অনুশীলনা অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। সাধারণতঃ thesis একটু মৌলিক হওয়া চাই। এখানে কলেজশিক্ষা প্রত্যুষ আটটা হইতে বিকাল পাঁচটা পর্য্যন্ত হয়; মাঝে এক ঘণ্টা আহারের জন্য বন্ধ থাকে। ভোর আটটা হইতে বারটা পর্য্যন্ত সময় lecture work হইয়া থাকে এবং বিকালে একটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত laboratory work হয়। বিজ্ঞান যন্ত্রালয়ে প্রত্যেক ছাত্রকে শিক্ষকের উপদেশ মত স্বাধীনভাবে যন্ত্র-পরীক্ষা করিতে হয়, এবং প্রত্যেক যন্ত্র-পরীক্ষার বিবরণী শিক্ষককে যথা সময়ে দিতে হয়।

এখানে আর একটী সুন্দর নিয়ম এই যে, প্রত্যেক ছাত্রের একজন পরামর্শদাতা (adviser) আছেন, সাধারণতঃ ছাত্র যে বিভাগে পড়েন তাহার অধ্যক্ষই সেই ছাত্রের পরামর্শদাতার কাজ করিয়া থাকেন; পরামর্শ-দাতা ছাত্রকে সমস্ত বিষয়ে সাহায্য করেন। যখন কোন ছাত্রের টাকা পয়সার অভাব হয়, তখন পরামর্শদাতা তাহার সেই অভাব পূরণের চেষ্টা করেন। আমার অনেকবার দেশ হইতে টাকা পাইতে বিলম্ব হইয়াছে, পরামর্শদাতাকে তাহা বলায় তিনি কলেজের ছাত্র ঋণভাণ্ডার (Students Loan Fund) হইতে আমাকে ধার দিয়া উপকৃত করিয়াছেন। কাহারো কোন প্রকার অসুখ করিলে পরামর্শদাতার নিকট হইতে উপদেশ লইলে সদুপদেশ দিয়া থাকেন। যে কোন বিষয়ের দরকার হউক না কেন, পরামর্শদাতাকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে। পরামর্শদাতার অপর নাম 'ছাত্রবন্ধু'; বন্ধুর নিকট যে সকল বিষয় বলিয়া পরামর্শ লওয়া যায়, পরামর্শদাতাকেও সে সকল বিষয় অবাধে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে।

শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই 'পাশ' হওয়া যায় না। ক্লাশের কার্য্যের (class work) ফলের উপরই 'পাশ ফেল' অধিক নির্ভর করে। শিক্ষক কিম্বা সহপাঠিগণ কখনও আমাদিগকে ঘৃণা করেন না; বরঞ্চ শিক্ষকগণ আমাদিগকে বিদেশী মনে করিয়া, আমাদের প্রতি অধিক যত্ন করিয়া থাকেন।

আরো অনেক কথা বলিবার আছে। বারান্তরে বলিব।

সেবক শ্রীনিরুপমচন্দ্র গুপ্ত।

চিত্র-ব্যাখ্যা।

দীক্ষা—শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু অঙ্কিত চিত্রের প্রতিলিপি। এই চিত্র সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার আবশ্যক নাই, কেবলমাত্র কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছবিখানি উপলক্ষ করিয়া যে গানটি রচনা করিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইবে।

পূরবী—একতালা

নিভৃত প্রাণের দেবতা যেখানে জাগেন একা,
ভক্ত, সেথায় খোল দ্বার আজ লব তাঁর দেখা
সারাদিন শুধু বাহিরে ঘুরে ঘুরে কারে চাহিরে!
সন্ধ্যাবেলার আরতি হয়নি আমার শেখা।
তব জীবনের আলোতে জীবন প্রদীপ জ্বালি
হে পূজারি আজ নিভৃতে সাজাব আমার থালি।
যেথা নিখিলের সাধনা পূজালোক করে রচনা,
আমিও সেথায় ধরিব একটি জ্যোতির রেখা॥

সমালোচনা।

গন্ধপুষ্প। শ্রীমতিলাল দাস, বি, এ, প্রণীত। এলবার্ট লাইব্রেরী, ঢাকা। মূল্য বার আনা। রায় শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর লিখিত ভূমিকা সমেত। এখানি কবিতা-গ্রন্থ। কবি, বোধ হয়, ওয়ার্ডস ওয়ার্থের অনুকরণ করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু সফল হন নাই। উদাহরণ স্বরূপ

"এ শুভ্র বিজনে ক্ষুদ্র আত্মবোধ
আপনি নিভিয়া আসে:
অন্তর বাহির হয়রে বিলীন
বিরাটাসত্ত্বগ্রাসে।"

ইহা বুঝিতে হইলে, মল্লিনাথের শরণাপন্ন হইতে হয়। তবে কবির সকল কবিতাই যে এইরূপ জটিল, তাহা আমরা বলিনা—স্থানে স্থানে কবিত্বের পরিচয়ও পাওয়া যায়। ভূমিকা-লেখক মহাশয় কবিতাগুলির উপর 'Suggestive' ছাপ মারিয়া বেশ নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। কবিতা ও হেঁয়ালি উভয়ের মধ্যে যে প্রভেদ আছে, সেটুকু আমাদিগের কবিগণ মানিয়া চলিলে, অনেক অপ্রিয় প্রসঙ্গের অবতারণা হইতে আমরা নিষ্কৃতি পাই।

জাতীয় মঙ্গল। মহম্মদ মোজাম্মেল হক প্রণীত। মহম্মদ আজিজল হক্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কুন্তলীন প্রেসে, আণ্টিক কাগজে মুদ্রিত, মূল্য ।৵০। এখানি একখানি কবিতা-পুস্তক এবং একজন মুসলমান লেখক কর্ত্তৃক রচিত হইলেও ইহা বাঙালী লেখকের রচনার মতই স্পষ্ট হইয়াছে। কবিতাগুলিতে, মাঝে মাঝে, মিষ্টতা, আন্তরিকতা ও জন্মভূমির প্রতি তরুণ কবির অকৃত্রিম অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়।

শান্তিনিকেতন। (নবম ও দশম খণ্ড) শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। বোলপুর, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য প্রতি খণ্ড, চারি আনা মাত্র। রবীন্দ্রবাবুর দার্শনিক প্রবন্ধগুলি বাঙলা সাহিত্যে অভিনবত্বের সৃষ্টি করিয়াছে। সহজ ভাষায় লিখিত প্রাচ্য আদর্শাদির সুমধুর আলোচনা যথার্থই শান্তির সঞ্চার করে। বর্ত্তমান পুস্তিকা-দ্বয়ে "তপোবন," "চিরনবীনতা" প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

সীতার বনবাস। ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান প্রেস এলাহাবাদ। ১৯০৯। মূল্য বার আনা। 'সীতার বনবাস' সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় মহিলাপাঠ্য এবং ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় বাঙ্গালা রচনার আদর্শ-

রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে'—সেজন্য 'বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবদ্দশায় প্রকাশিত একখানি পুস্তককে আদর্শ করিয়া এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ভূমিকায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী-পরিচয় ও চরিত্রগুলির বিশ্লেষণ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ ও পরিশিষ্টে টীকা সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থলিখিত ব্যক্তিগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। টীকাটুকু মন্দ হয় নাই। গ্রন্থের ছাপা ও সুদৃশ্য বাঁধাই প্রভৃতি বঙ্গীয় মুদ্রাযন্ত্রের উৎকর্ষের পরিচায়ক। অথচ মূল্যও সুলভ। সীতার বনবাসের যে কয়টি সংস্করণ আমরা দেখিয়াছি তন্মধ্যে এখানি শ্রেষ্ঠ বলিয়াই আমাদিগের ধারণা।

শকুন্তলা। ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত। প্রকাশক, ইণ্ডিয়ান প্রেস—এলাহাবাদ ১৯০৯। মূল্য আট আনা। এখানিও, পূর্ব্বলিখিত গ্রন্থখানির ন্যায়, শকুন্তলার মনোজ্ঞ সংস্করণ। ছাপা কাগজ প্রভৃতি সুন্দর। টীকাগুলি উপাদেয়। গ্রন্থের প্রথমে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একখানি সুন্দর হাফটোন চিত্র ও গ্রন্থে আর তিনখানি চিত্রের প্রতিলিপি দেওয়া হইয়াছে। ছাত্রগণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার পক্ষে গ্রন্থখানির বিশেষ সার্থকতা আছে বলিয়াই আমাদিগের বিশ্বাস।

সঙ্গীত-দর্পণ। শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু কর্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত। ১৩নং কাশী মিত্রের ঘাট ষ্ট্রীট, বাগবাজার। মূল্য এক টাকা। এখানি স্বরলিপি-সংগ্রহ। 'গ্রন্থের প্রথমেই মূলসূত্র ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং সর্ব্বসমেত ৩০টি গানের স্বরলিপি ইহাতে আছে। অধিকাংশ গানই সাধারণ রঙ্গমঞ্চে প্রশংসার সহিত গীত হইয়া গিয়াছে; পূর্ণবাবু একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন সঙ্গীতজ্ঞ। সঙ্গীতপ্রিয় ব্যক্তির নিকট তাঁহার স্বরলিপি সংগ্রহখানির যে আদর হইবে, সে সম্বন্ধে সংশয় নাই। তবে মূলসূত্রগুলির আর একটু বিশদ বিশ্লেষণ এবং কয়েকটী সহজ সুর গ্রন্থের প্রথমে সন্নিবিষ্ট হইলে প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে গ্রন্থখানি বেশ সহজ হইত। আশা করি, দ্বিতীয় সংস্করণে পূর্ণবাবু আমাদিগের এ কথাটুকু রক্ষা করিবেন। সঙ্গীত-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে তাঁহাকে আরো একটু অবহিত দেখিলে আমরা সুখী হইব।

ফরিদপুরের ইতিহাস। শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় প্রণীত। ১ম খণ্ড (ভৌগোলিক তত্ত্ব ও প্রাচীন ইতিবৃত্ত)। নব্যভারত প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ৷৵০ দশ আনা। ইতিহাসের প্রতি বাঙালী লেখক ও পাঠক উভয়েরি যে আগ্রহ-দৃষ্টি পড়িয়াছে ইহা যে, দেশের পক্ষে শুভলক্ষণ, সে সম্বন্ধে এতটুকু সন্দেহ নাই। গ্রন্থখানি হইতে লেখকের অনুসন্ধিৎসা ও পরিশ্রমের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থখানিতে একখানি প্রাচীন মানচিত্র ও রাজনগর একুশ রত্নের একখানি চিত্রও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থখানির ত্রুটি, লেখক বেশ গুছাইয়া সকল কথা বলিতে পারেন নাই। স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ বা রিপোর্টাদির পুস্তিকার মত গ্রন্থখানি নিতান্তই খণ্ড বিবরণীর সংগ্রহ স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যেমন-কে-তেমন। (গীতিনাট্য) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ রায় প্রণীত। মূল্য ৷০ আট আনা। এখানি পারস্যের সাহজাদা প্রভৃতির বিবরণী ঘটিত একখানি গীতিনাট্য। গ্রন্থকার ক্ষমা করিবেন, আমরা তাঁহার গীতিনাট্যের রসগ্রহণে অক্ষম। তবে একটা সুখের বিষয়, ইহাতে রঙ্গালয়-সুলভ অশ্লীলতাটুকু নাই।

হিন্দুসমাজ। শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। (১ম ও ২য় খণ্ড। নিবেদন পত্র।) ১০ কলুটোলা ষ্ট্রীট ধন্বন্তরী ষ্টীম মেসিন প্রেসে মুদ্রিত। এখানি উপেন্দ্রবাবু রচিত Dying Race পুস্তিকার বাঙলা সংস্করণ। গ্রন্থখানি সকলেরি পাঠ করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। সামাজিক কঠিন সমস্যার সুন্দর আলোচনা। পুস্তিকার মূল্য লিখিত নাই। এখানি বিতরণ অথবা বিক্রয়ার্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বুঝা গেল না।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৪৪, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

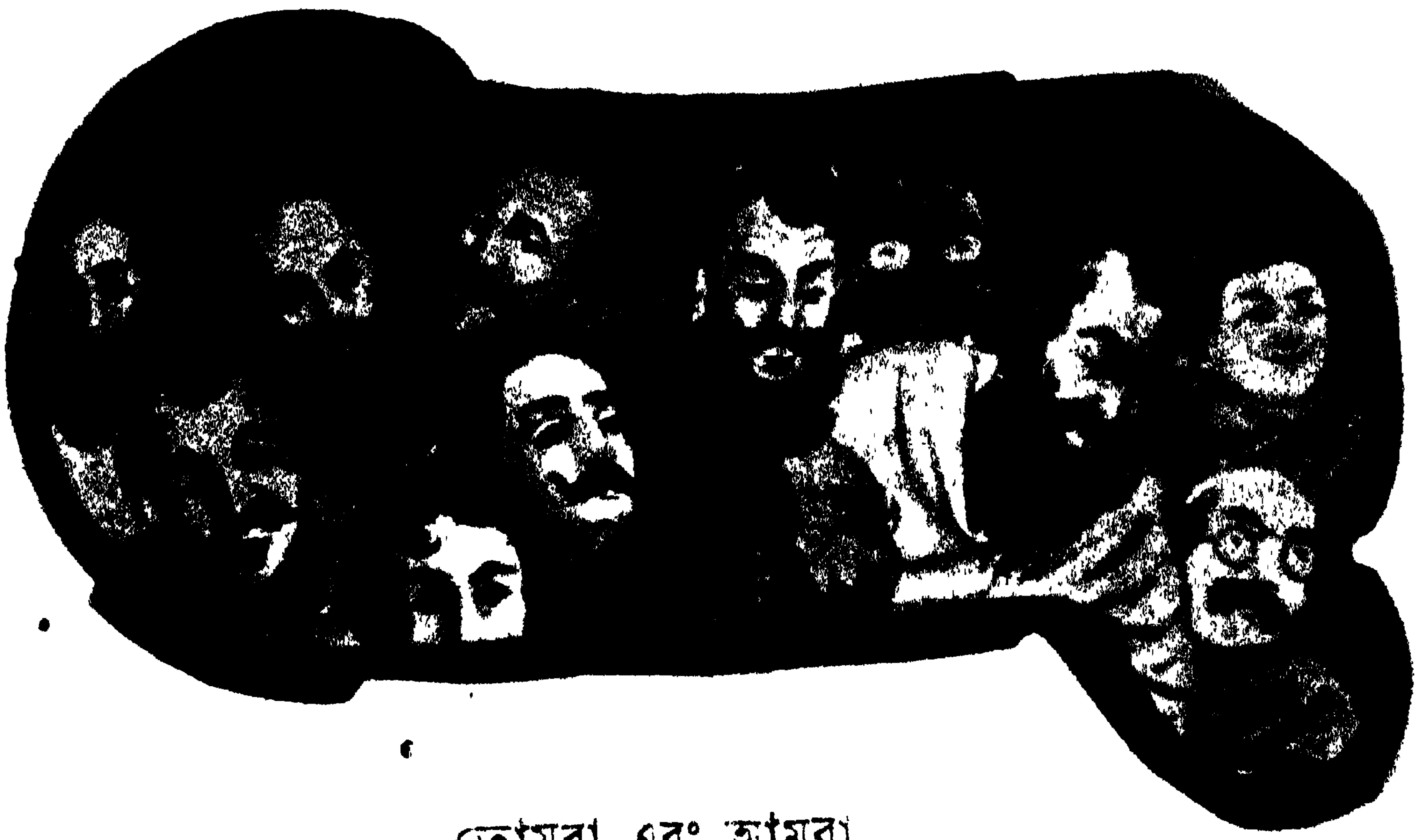

তোমরা এবং আমরা

তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও
  কুলুকুলুকল নদীর স্রোতের মত।
আমরা তীরেতে দাঁড়ায়ে চাহিয়া থাকি
  মরমে গুমরি মরিছে কামনা কত।

আপনা আপনি কানাকানি কর সুখে,
কৌতুক ছটা উছলিছে চোখে মুখে,
কমল চরণ পড়িছে ধরণী মাঝে,
কনক নূপুর রিনিকি ঝিনিকি বাজে।

— রবীন্দ্রনাথ

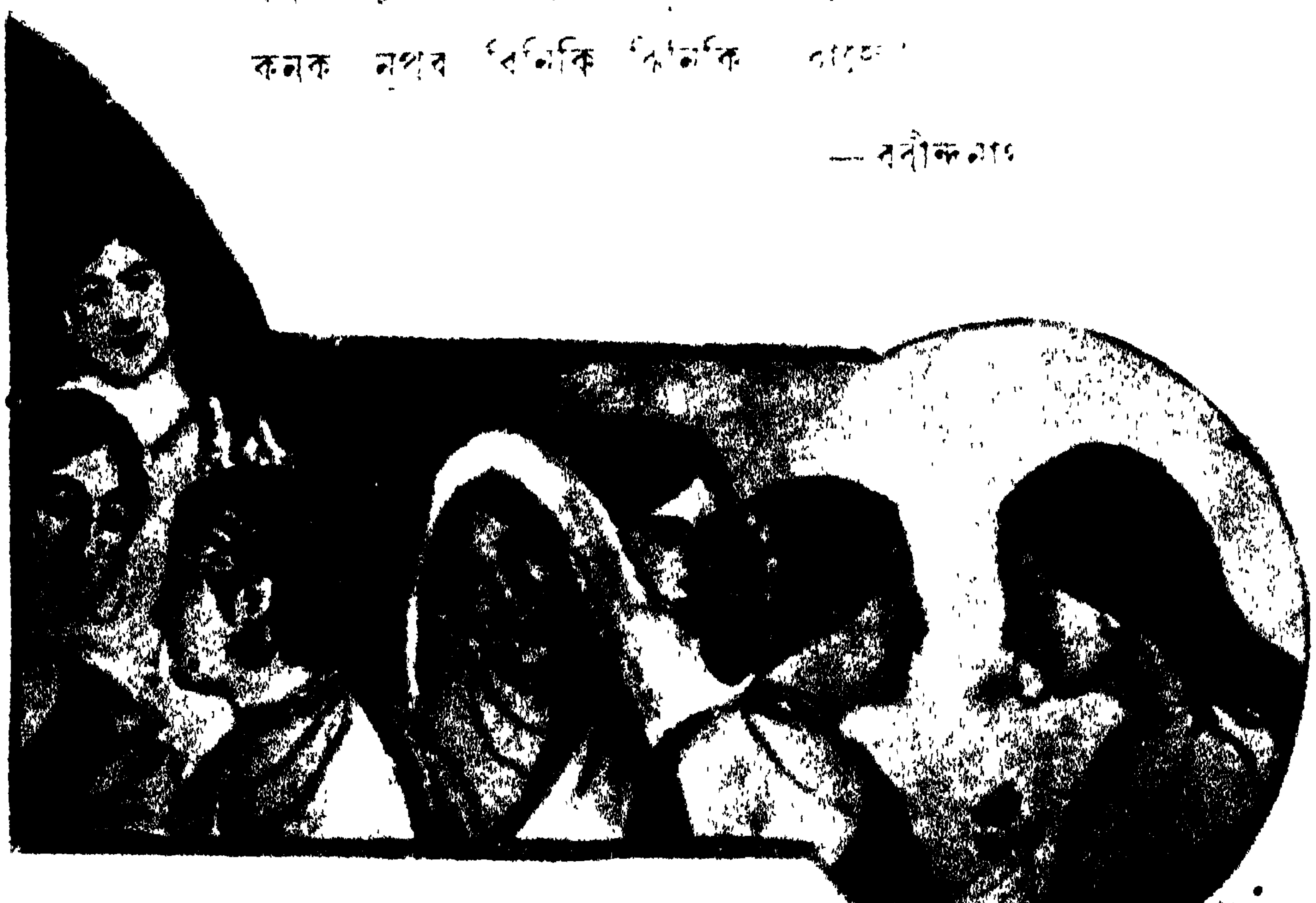

শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় অঙ্কিত চিত্র হইতে

ইউ, রায় কর্তৃক ব্লক] [কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত

ভারতী

৩৪শ বর্ষ] আষাঢ়, ১৩১৭ [৩য় সংখ্যা

প্রাচীন ভারতের পূজা।

সে এক স্নিগ্ধ উষায় সকলে যখন নিদ্রাবিষ্ট, তখন তরুণ তাপস ভারতবর্ষ আপন যোগাসনে জাগ্রত থাকিয়া সুপ্তবিশ্বের শিয়রে দাঁড়াইয়া, মেঘমন্দ্রস্বরে উচ্চারণ করিয়াছিল, "হে অমৃতের অধিকারি' তোমরা জাগ, শাশ্বত জ্ঞানের যে অক্ষয় সুধাধার—নিখিল লোকের যাহাতে সম বিভক্তস্বত্ব, তাহা প্রত্যেকে গ্রহণ কর।" দিক্ দিগন্তরে লোক লোকান্তরে তাহার সেই বার্ত্তা প্রচারিত হইল; যে জাগিয়াছিল সে উঠিয়া দাঁড়াইল, যে নিরাশ ছিল সে আশান্বিত হইল, যে সন্ত্রাসিত ছিল সে নির্ভয় প্রাপ্ত হইল;—এই একটি মহা আমন্ত্রণ বিশ্বমানবের পৌরোহিত্য গ্রহণ করিয়া নিখিলের মাঝখানে তাহার আবাহন ঘোষণা করিয়া দিল, "অমৃতের অধিকারী, তোমরা জাগ!"

প্রকৃতি লোক-জননী। শিশু-চিত্ত যেমন আপনার অজ্ঞাতসারে মাতৃপ্রভাবের দ্বারা বিকসিত হয়, ভারতবর্ষ তেমনি এই চির-নীল মুক্তাম্বরের নীচে থাকিয়া, এই শশি-সূর্য্যতারার অবাধ আলোকে বাস করিয়া একটি অপূর্ব্ব উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই ঋতু বৈচিত্র্য, এই শোভা-বৈচিত্র্য—আকাশে, বাতাসে, ফল-পল্লবে বা সৌরভে এমন করিয়া তাহার মনকে প্রীতিময় গীতিময় করিয়া তুলিয়াছিল, এমন করিয়া তাহাকে উদার ও বিশাল করিয়া গড়িয়াছিল যে, সে নিখিল লোকের মাঝখানে পরিপূর্ণ শতদলের মত ফুটিয়া উঠিয়াছিল! প্রজাপতি যেমন সমস্ত বিশ্বের শোভা লইয়া তাঁহার মানস-কন্যাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তেমনি ভারতবর্ষের চিত্ত তাহার চারিদিক্কার সমস্ত মহান্ বৈভবের অংশ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল! মহাসমুদ্রের তরঙ্গ-কল্লোল যখন তাহার ঘুম পাড়াইবার গান গাহিয়াছিল, তখন দক্ষিণ পবন তাহার ক্রীড়া-সাহচর্য্য লইয়া তাহার পাশে দাঁড়াইয়াছিল। এমনি করিয়া রূপশালিনী জননীর রূপ তাহার অঙ্গে অঙ্গে সঞ্চারিত হইয়া গিয়াছিল।

অনন্ত তারকা-খচিত আকাশে একটী তারা সীমন্ত-মণির মত দীপ্তি পায়। ভারতবর্ষের ললাটে এই রকম যে তারাটি উদিত হইয়াছিল, তাহার নাম ভক্তি—দীনভাব তাহার জনক, আত্মলোপ তাহার জননী। অহং জিনিষ বাবলার মত, একবার স্থান পাইলে ক্রমশঃ সে নিজের অধিকারের সীমা ছাড়াইয়া সমস্ত দিককে গ্রাস করিয়া ফেলে, তখন তাহাকে উৎপাটন করিবার কোন পথ থাকে না, তাই ভারতবর্ষ ধর্ম্ম জীবনের প্রথম সোপানে দাঁড়াইয়া আপনাকে পদতল-দলিত তৃণের মত দেখিতে উপদেশ দিয়াছে। 'Self-respect

(আত্ম-সম্মান) বলিয়া যে জিনিসটি, তাহার সহিত কোনও সম্পর্ক রাখে নাই। কারণ যে সব জিনিস সমপ্রকৃতির, তাহার ভিতর হইতে একটি বিশেষ জিনিসের পার্থক্য রক্ষা করা সুকঠিন।

আত্ম-সম্মানের সঙ্গে আত্মাদরের একটা সাদৃশ্য আছে, এই সাদৃশ্য-সঙ্কট এড়াইবার জন্য, ভারতবর্ষের ধর্ম্মনীতি আত্মসম্মানকে দূরে রাখিয়া আসিয়াছে। ফল যখন পাকে, তখন আপনা হইতেই বোঁটা ছাড়িয়া পড়ে, পাকাইবার জন্য তাহাকে বৃন্তহীন করিলে তাহা বিকৃতই হয়, পরিণত হয় না।

এইরূপে চাষের প্রথম পত্তনে অহং-বৃত্তির সর্ব্ব-বিসারী গুল্ম উৎপাটিত করিয়া ভারতবর্ষ ধর্ম্ম-সাধনের ক্ষেত্র এমন সমতল করিয়া দিয়াছিল, যে কেহ তাহার দুয়ার হইতে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যায় নাই, প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক বর্ণ তাহার বিরাট রাজছত্রতলে একটা সুচারু শ্রেণীর ভিতর স্থান পাইয়াছে।

'পৌত্তলিক' বলিয়া ভারতবর্ষের একটা দুর্নাম আছে। বিরোধ জিনিসটা প্রধানতঃ সহানুভূতির অভাবেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, দূর হইতে যাঁহারা অপযশ ঘোষণা করেন, তাঁহারা আপন অন্ধ অপ্রশস্ত অনুমানের দ্বারাই চালিত হন, সত্যের দ্বারা নহে। জননী যেমন আপনার রুগ্ন ও সুস্থ—দুর্ব্বল ও সবল সন্তানকে সমস্নেহে যোগ্য আহার বণ্টন করিয়া দেন, তেমনিভাবে ভারতবর্ষ তাহার যোগ্য ও অযোগ্য অধিকারী ভেদে ধর্ম্মকে সমতুল্য করিয়া সকলের কাছে বিভাগ করিয়া দিয়াছিল। বিভিন্নমুখী শক্তি-সমূহকে এক সমতল-ক্ষেত্রে আনিয়া একটি মাত্র লক্ষ্যবেধের অক্ষমতার দ্বারা ভারগ্রস্ত করিয়া তোলে নাই। নির্গুণ ধারণাতীত ব্রহ্ম, বলিতে যত সহজ ধ্যানে তত সহজ নয়; অথচ এই পরাভক্তিকে বাদ দিয়া যে জীবন, ভারতবর্ষ কদাচ তাহার অনুমোদন করে নাই, ব্রহ্মবর্জ্জিত যে মানব তাহার মানবত্ব কখনও সে স্বীকার করে নাই! পদ্মপলাশলোচন হরিকে খুঁজিতে বাহির হইয়া, প্রহ্লাদ যেমন হিংস্র শ্বাপদের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষ তেমনি তাহার অসীম আকুলতায় বিশ্বভুবনের দ্বারে লুণ্ঠিত হইয়াছে, শিলাখণ্ডের কাছেও কাঁদিয়া বলিয়াছে, "যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ, য ওষধিষু যো বনস্পতিষু"—সেই তুমি ইহারও ভিতর অধিষ্ঠিত আছ! সে জড়কে শুধু জড় বলিয়া দেখে নাই, তাহার পশ্চাতে যে চিন্ময় মূর্ত্তি, যাঁহার বিভাতিতে এই নিখিল লোক বিভাত হইয়াছে, তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে দেখিয়াছে, তাই তাহার জড়-অজড়ের ভেদ ঘুচিয়া গিয়াছিল। কাজেই ভারতবর্ষকে যখন পৌত্তলিক বলা যায়, তখন তাহার দ্বারা কতখানি সত্য প্রচারিত করা হয়, তাহা বলা যায় না। ভারতবর্ষ ব্রহ্মকে বিশ্বপ্রকৃতির ভিতর দিয়া উপলব্ধি করিয়াছিল, আকাশে, বাতাসে, চন্দ্রে, সূর্য্যে, মৃত্তিকায়, শূন্যে—এই বিশ্বলোকের মাঝখানে সেই বিশ্বনাথকে অনুভব করিয়াছিল, যিনি "অরা ইব রথনাভৌ" ইহার ভিতর অধিষ্ঠিত আছেন।

শিশু যেমন যাহা দেখে, তাহাকেই সচেতন বলিয়া মনে করে, তেমনি ভারতবর্ষ প্রভাতে জাগিয়া যখন এই বিচিত্র শক্তিশালিনী প্রকৃতিকে তাহার চোখের কাছে দেখিয়াছিল, তখন সে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাহাতেই ঈশ্বরত্বের

আরোপ করিয়াছিল। কিন্তু ক্রমশই সে দেখিতে পাইল এই চন্দ্র, সূর্য্য, ক্ষিতি, অপ্, উষা, বরুণ, দিবস, রাত্রি—ইহাদিগের অন্তরে আর একটি শক্তি কার্য্য করিতেছে; তখন সে বলিয়া উঠিল, "এতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তা যস্য বৈ তৎকর্ম সবৈ বেদিতব্যঃ!" যিনি এই সূর্য্য-চন্দ্রাদির সৃষ্টিকর্ত্তা, এই সূর্য্য-চন্দ্রাদি যাহার দ্বারা সৃষ্ট, তাঁহাকেই জানা আবশ্যক। তখন তাহার চোখের কাছ হইতে সেই পর্দ্দাটি সরিয়া গেল, প্রকৃতির সেই গোপন অন্তর্কক্ষের দ্বার তাহার কাছে উদ্ঘাটিত হইয়া গেল—

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা
বিদ্যুতোভান্তি কুতঃয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং যস্য ভাসা
সর্ব্বমিদম্ বিভাতি॥"

সূর্য্য সেখানে কিরণ দেয় না, চন্দ্রতারা সেখানে কিরণ দেয় না; বিদ্যুৎ, অগ্নি, সেখানে প্রকাশিত হয় না। তাঁহার আলোই এই সমস্ত আলোকিত করিতেছে, তাঁহার প্রভায় এই সমস্ত প্রতিভাত হইতেছে।

এইখানেই সে বিরত হইল না, তাহার পুলকোদ্বেল কণ্ঠ বিশ্বময় ঘোষণা করিয়া দিল—

"যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্ম্মনোমতন্
যচ্চক্ষুসা ন পশ্যতি যেন চক্ষুংষি পশ্যতি
যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদম্ শ্রুতম্।
যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে
যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে।

মন যাঁকে মনন করিতে পারে না, কিন্তু যিনি মনকে চালিত করিতেছেন, চক্ষু যাঁহাকে দেখিতে পায় না, কিন্তু যিনি চক্ষুতে দৃষ্টি-দান করিতেছেন, শ্রোত্র যাহাকে শুনিতে পায় না, কিন্তু যিনি শ্রুতিকার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন, প্রাণ যাঁহাকে প্রাণবান করিতে পারে না, কিন্তু যিনি জীবপ্রাণের প্রণেতা তিনিই ব্রহ্ম। অমৃতের অধিকারী, তোমরা তাঁহাকে জ্ঞাত হও!

ঠিক কথা যদি বলা যায়, তবে ভারতবর্ষই ব্রহ্মকে আবিষ্কার করিয়াছিল।

বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান যুগপর্য্যন্ত ভারতবর্ষে সাধনার তিনটি যুগ (Period) দেখা যায়। প্রথম, বৈদিক যুগ, সাধন-তন্ত্রের সোপান। ভারতবর্ষের নব-উন্মীলিত শিশু-চক্ষে জড় প্রকৃতি ও তাহার দুর্দ্ধর্ষ শক্তি ঐশ্বরিক মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে, স্তব্ধ বন-তল নিশাবসানে হিরণ্যগর্ভ পূষার অর্চ্চনা-গীতির ঝঙ্কারে ভরিয়া উঠিয়াছে। তিনি অগ্নিময় রথচক্রে দিবসকে বাঁধিয়া আনিতেছেন, তিনি যজ্ঞ-হবি গ্রহণ করিয়া শস্যক্ষেত্রকে উর্ব্বর ও যজ্ঞীয় পশুদল বৃদ্ধি করিয়া দিবেন, তাঁহার আশীর্ব্বাদে ধন, বল, আয়ু বর্দ্ধিত হইবে। প্রত্যেক ঋক্ যেন এক একটি চিত্র, তাহার ভিতর দিয়া তখনকার অকৃত্রিম সরল জীবন উজ্জ্বল ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার পর মধ্য যুগ। সেই অনায়াস-লব্ধ সহজ জ্ঞান তখন অপসারিত হইয়াছে, সৃষ্টি বৈচিত্র্যের পুলক-হিল্লোলের বিহ্বলতা চক্ষু হইতে অপগত হইয়াছে, তখন সে বিজ্ঞানের দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া বলিতেছে, "স এব নেতি নেতি, নেত্যাত্মাহ গৃহ্যোন হি গৃহ্যতে" তিনি ইহা নন, ইহা নন, ইন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা যাহা গ্রাহ্য তাহা তিনি নহেন, তিনি

"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথারসংনিত্যমগন্ধবচ্চযৎ
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য তং মৃত্যু মুখাৎ প্রমুচ্যতে"

তিনি অশব্দ অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, অরস, নিত্য, অগন্ধবৎ, তিনি মহৎ হইতে মহৎ, নিত্য ও নির্ব্বিকার, তাঁহাকে জানিয়া জীব মৃত্যুমুখ হইতে মুক্ত হয়।

ইহা হইতে প্রাণ মন ও সমুদয় ইন্দ্রিয় আকাশ বায়ু জ্যোতি জল ও সকলের আধার পৃথিবী উৎপন্ন হইতেছে, এই অক্ষয় পুরুষের শাসনে ত্রিলোক বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে, ইঁহার ভয়ে অগ্নি প্রজ্জলিত হইতেছে, সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, মেঘ বর্ষণ করিতেছে, বায়ু বহমান হইতেছে, মৃত্যু ধাবমান হইতেছে! ইনি "পর্য্যগাচ্ছুক্রম কায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধম-পাপবিদ্ধম্, কবির্ম্মনীষী পরিভূস্বয়স্তুঃ!" শৈশবের খেলা-ধূলা তাহার অঙ্গ হইতে তখন মুছিয়া গিয়াছে, পরিপূর্ণ যৌবনের অপূর্ব্ব কান্তির ভিতর তাহার জটাজাল ভূষিত ললাটে তপস্তেজ স্ফুরিত হইতেছে; মহোল্লাসে তখন সে বলিতেছে, "সোঽহং" আমিই তিনি—যিনি এই "নদী গিরিগুহা পারাবারে জলে স্থলে ব্যাপ্ত" আছেন!

অবশেষে বার্দ্ধক্য! ভারতবর্ষের মেরুদণ্ড আজ আনত হইয়া গিয়াছে, তাহার শক্তি ও তেজ জ্বলিয়া নিভিয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট পড়িয়া আছে শুধু ভস্ম—লোলচর্ম্ম ও শুষ্ক পেশী, আর তাহার নীচে একটি অতিশয় শীর্ণ কঙ্কাল! ভারতবর্ষ এখন জরাগ্রস্ত হইয়া ঝিমাইতেছে, যে বাণী একদিন তাহার আপন কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল, তাহা সে নিজে এখন বুঝিতে পারিতেছে না, তাহার চক্ষের নেত্রচ্ছদ সমস্ত ঢাকিয়া ফেলিয়াছে! তাহার মন্ত্র এখন শব্দ-সমষ্টিতে পরিসমাপ্ত হইয়াছে, ক্রিয়াকাণ্ড অনুষ্ঠান-মাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সব যেন প্রাণ-হীন অর্থহীন—অন্তরের যোগসূত্র যে তাহার কখন কোথায় ছিঁড়িয়া পড়িয়া গিয়াছে, তাহা খুঁজিয়া বাহির করা যায় না। এই বৃহৎ কঞ্চুকটির মধ্য হইতে সেই অতিকায় সর্প যে নিঃশব্দে বাহির হইয়া গিয়াছে, তাহা কেহ দেখিতে পায় নাই!

জাতবস্তু মাত্রেই জরার অধীন। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর বীজ উপ্ত হয়, এক একটি জাতি ও ধর্ম্ম তাহার ফুৎকারে প্রদীপের মত জ্বলিয়া নিভিয়া যাইতেছে! সৃষ্টির নেমিচক্র ঊর্দ্ধে ও নিম্নে আবহমান কাল উত্থিত ও পতিত হইতেছে—একের হস্তচ্যুত কেতন অপরে লইয়া অগ্রসর হইতেছে, এক একটি জাতি ও দেশকে অবলম্বন করিয়া অনন্ত কালের অনন্ত অভিব্যক্তি শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছে—তাহা বিশ্বজগতের কেতন, বিশ্বমানবের কেতন, বিশ্ববাসীর কেতন, তাহা জাতি বিশেষের বা ব্যক্তি বিশেষের অধিকৃত নয়!

ভারতবর্ষের প্রাচীন ধারাগুলির সহিত অনেক নূতন ধারা আসিয়া মিলিয়াছে। বর্ত্তমান উপাসনা-পদ্ধতি তাহার অন্যতম। ভগবদ্ভক্তির কয়েকটা স্তর আছে, তাহার এক একটি বিভাগ এক একটি রেখার দ্বারা বিভিন্নীকৃত। প্রথম দাস্য ভাব। মানব-চিত্ত তখন স্রষ্টার বিরাট মহিমার নিকট আপনার দৈন্যে কুণ্ঠিত ভাবে নতশিরে দাঁড়াইয়া আছে। পরে ঈশ্বরে পিতৃমাতৃত্বের আরোপ এবং পরে আরো নিবিড় হইয়া সে ভাব বাৎসল্যে ও তাহা হইতে

ন্তভাবে পৌঁছিয়াছে। কিছু পূর্ব্বে যে ষ্টির সম্মুখে সে কুণ্ঠায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতে-ল, এখন তাহাকেই প্রেমাবেশে বলিতেছে—

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল,
লাখ লাখ যুগ হিয়া পর রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল"।

এই কান্তভাবের মধ্যে একটি অপরূপত্ব আছে। সৃষ্টির প্রারম্ভে জীবাত্মায় ও পরমাত্মায় যে ভেদ হইয়াছিল, তাহা এই চরণ কয়টিতে বাজিয়া উঠিয়াছে; সেই অনন্ত কালের বিরহ-ব্যথা, দূরত্বে যাহা প্রতিদিন নিবিড় হইয়া উঠিতেছে, বিশ্বচরাচরের সেই অখণ্ড তৃষ্ণা, অসহ আকুলতা, লক্ষ যুগের বিচ্ছেদ-দুঃখ স্মরণ করিয়া আজ চিত্ত কাঁদিয়া উঠিয়াছে!

ভারতবর্ষের এই অনন্যের পরানুরক্তির ভিতর আর একটি জিনিস লালিত হইয়াছিল, তাহা উদারতা। একই ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া যখন পৃথিবীর অপর জাতি শুধু আচারগত ভেদ লইয়া হিংস্র শ্বাপদের মত পরস্পরের রক্তপাতের জন্য যুঝিয়া মরিতেছিল, ভারতবর্ষ তখন শান্ত সমাহিত চিত্তে আপনার এক অঙ্গ-তলেই আর্য্য অনার্য্য বর্ণসঙ্কর সমস্ত বিভিন্ন জাতির পূজার স্থান করিয়া দিতেছিল। কারণ সে একা শুধু জানিয়াছিল যে,

"যল্লব্ধা পুমান্ সিদ্ধো ভবত্যমৃতী ভবতি
তৃপ্তো ভবতি।
যৎপ্রাপ্য ন কিঞ্চিদ্বাঞ্ছতি, ন শোচতি ন
দ্বেষ্টি ন রমতে ন উৎসাহী ভবতি॥"

যাঁহাকে লাভ করিলে মনুষ্য সিদ্ধ হয়, অমৃত হয়, তৃপ্ত হয়, যাঁহাকে পাইলে মনুষ্যের দ্বেষ, তৃষ্ণা, শোক গত হয়, বাসনার তন্তু ছিন্ন হয়, যিনি "গুণরহিতং জন্মরহিতং প্রতিক্ষণ বর্দ্ধমানম্ বিছিন্নং সূক্ষ্মতরমনুভবরূপ," "যিনি অদৃশ্যমগ্রাহ্যমবর্ণমচক্ষুঃ শ্রোত্রং তদপাণিপাদং নিত্যম বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনি—যিনি অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র, অবর্ণ, অচক্ষু, অশ্রোত্র, হস্তপদ রহিত, নিত্য, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বগত, সূক্ষ্ম, অব্যয় ও ভূতযোনি —তাঁহাকে শুধু নামের দ্বারা বিভক্ত করা বিমূঢ়তা মাত্র। হ্রদ তড়াগ নদী সাগর উপসাগর প্রভৃতি নামের সহস্র বিভিন্নতা সত্ত্বেও জল যেমন বিভিন্নতা প্রাপ্ত হয় না, তেমনি তিনি ও আধারের ভেদে বিভিন্ন হন না, কেন না ইনি-ই তিনি

"যদেবেহ তদমুত্র যদ-মুত্র তদন্বিহ
মৃত্যু স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি"

যিনি এখানে তিনিই সেখানে, যিনি সেখানে তিনি-ই এখানে, যে ইঁহাকে নানা রূপে দেখে সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়।

একজন অপরিচিত লোককে দেখিলে যেমন প্রথমেই তাহার অবয়ব ও পরিচ্ছদ আমাদের চোখে পড়ে, কিন্তু নিকটতম-আত্মীয়কে দেখিলে শুধু তাহার স্নেহই মনে জাগ্রত হইয়া উঠে তেমনি ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে ব্রহ্মের নামরূপ ভারতবর্ষের চোখে পড়ে নাই—সে শুধু তাহার মধ্য হইতে দেখিতে পাইয়াছে তাঁহাকে—যাঁহার

"অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্র সূর্য্যৌ
দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্‌বৃতাশ্চ বেদাঃ
বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য পদ্ভ্যাং
পৃথিবী।"

অগ্নি যাঁহার মূর্দ্ধা, চক্ষু চন্দ্র সূর্য্য, দিক্‌সমূহ শ্রোত্র, বাক্য বেদ, বায়ু প্রাণ, হৃদয় বিশ্বলোক, চরণ পৃথিবী।

হৃদয়ের এই তুঙ্গ শিখর হইতে যে উৎসটি নামিয়াছে—তাহা ঝড় অঝড় চেতন অচেতনের বিভেদ মানে নাই—পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, তরুলতায় তাহা প্লাবিত করিয়া গিয়াছে। দিগ্বিজয়ী রাজা দিলীপ রাজ্ঞীসহ বনছায়ায় নন্দিনী গাভীর তৃণাহরণ করিয়াছে, দীনবেশে যাজ্ঞিকের মত রাজসম্মান ত্যাগ করিয়া সম্বৎসর তাহার পরিচর্য্যা করিয়াছে। সে কি বিরাট সমারোহ! তাহা বর্ণনা করিতে মহাকবির সর্গের পর সর্গ রচিত হইয়াছে তবু শেষ হয় নাই! মাধবী লতার সহিত সখীত্বে আবদ্ধ, শকুন্তলা পতিগৃহে যাত্রাকালে সেই সযত্ন জল-সেবিত ক্ষীণাঙ্গী লতার পুষ্পোদ্গম ও আশ্রম তরুগণের ছায়া-নিবিড় শাখার দিকে সাশ্রু নেত্রে সে ফিরিয়া চাহিতেছে, রাজ্যাধীপ স্বামীর সোহাগ স্মৃতি তাহা বারণ করিয়া রাখিতে পারিতেছে না। এই জটাজুট-ধারী সন্ন্যাসী ভারতের বক্ষস্থলে যে অসীম প্রেম উত্তপ্ত হইয়া ফুটিতেছিল, তাহা উৎসারিত করিয়া দিতে তাহার স্থান কুলায় নাই, কাহারো কথা সে বিস্মৃত হয় নাই, কাহারো কোনো সে তুচ্ছ করে নাই, তাহার বিশাল প্রাণের বিরাট পরিসরের ভিতর বিশ্বনাথের বিশ্বরূপ ভরিয়া গিয়াছিল!

প্রাচীন ভারতের ঈশ্বরারাধনা একটী অত্যন্ত নিগূঢ় ব্যাপার। নিভৃতে, নির্জ্জনে, ইন্দ্রিয় প্রাণ নিরোধক তাহার অনুষ্ঠান একেবারে বহির্জ্জগত ছাড়াইয়া গিয়াছে। প্রথমেই তাহার যেখানে দাঁড়াইতে হইয়াছে তাহা ঐকান্তিক একাগ্রতা—তাহার এতটুকু ব্যত্যয় হইলে চলিবে না। হৃদয়ের এই প্রবাহ—বিষয় সমূহ যাহাতে প্রতিনিয়ত তরঙ্গ জাগাইতেছে তাহাকে সে একটা অমিত স্থৈর্য্যের দ্বারা বন্ধন করিয়া তাহার উপর বিশ্বনাথের নিস্তরঙ্গ আসনটি বিছাইয়াছে, কারণ—

"নায়ম্ আত্মা প্রবচনেন লভ্যো,
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য
স্তসেষৈ আত্মা বৃণুতে তণূং স্বাম্।

এই আত্মাকে বেদাধ্যয়ন কিম্বা মেধা দ্বারা লাভ করা যায় না, যাঁহাকে ইনি আত্ম-দর্শনার্থ প্রেরণ করেন তাহা দ্বারাই ইনি লভ্য। মন যখন হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাঁহার প্রতি স্থির লক্ষ্য হয়, তখনই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, বিশ্বসংসার যখন মনের কাছে আসিয়া উপস্থিত হয় তখন নয়।

এ কথাটা আমরা সম্প্রতি ভুলিয়া গিয়াছি, আজ আমরা বিরাট জনসঙ্ঘের সন্নিবেশ ছাড়া তাঁহাকে ডাকিতে পারি না, আমাদের অন্তরে এমন দৈন্য প্রবেশ করিয়াছে যে একাকী আমরা তাঁহার সম্মুখীন হইতে পারি না! নিজের ভাণ্ডার খালি বলিয়া আমাদের নিরন্তর পরের ধন দিয়া আপন নগ্নতা ঢাকিতে হইতেছে, আপনার নিভৃত একাগ্রতাকে ছাড়িয়া বহুজনের সম্মিলিত শক্তির দ্বারা হৃদয়ের শূন্যতা পুরাইবার জন্য চেষ্টিত হইতে হইতেছে!

পরস্পরে গভীর অনুরক্ত প্রণয়ী যেমন তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতিতে প্রসন্ন না হইয়া বাধাই পাইতে থাকে, প্রাচীন ভারতবর্ষ তেমনি তাহার ও তাহার প্রিয়তমের মাঝখানে

অপর কাহাকেও আসিতে দেয় নাই। তাহার প্রজন মিলন মন্দিরের অভিসার পথে তাহার মানস-বধূ অনন্যচিত্তের অখণ্ড অনুরাগ দীপ স্বরূপ জ্বালাইয়া গিয়াছে! এই খানে প্রাচীন ভারতের গুরুবাদের একটা প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে,—কিন্তু বিজ্ঞানী ভারতবর্ষ জানিয়াছিল যে মানুষ নিরন্তর তাহার হৃদয়-দৌর্ব্বল্যের অধীন। এই বন্ধুর পিচ্ছিল পথে চলিতে গিয়া পাছে তাহার পদ-স্খলিত হইয়া পড়িয়া থাকিতে হয়, পাছে তাহার আপন চোখের দৃষ্টি কম বলিয়া ঠিক্ গম্য পথটি দেখিয়া লইতে ভুল হয়, সংশয় যখন ঝড়ের বেগে আসিয়া পড়িবে, হাতের ক্ষীণ আলোটি অন্তরালের অভাবে পাছে নিভিয়া যায়—তাই সে শ্রেষ্ঠতর জ্ঞানের সাহায্য লইবার উপদেশ দিয়াছে! প্রথম হাঁটিবার বেলায় শিশু যেমন জননীর অঙ্গুলি ধরিয়া হাঁটিতে শেখে ঠিক্ তেমনি ভাবে সে গুরূপদেশ গ্রহণ করিয়াছে—খঞ্জের যষ্টির মত তাহাতে চির-নির্ভর স্থাপন করে নাই!

শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষজায়া।

হকিকত রায়।

পঞ্জাব প্রদেশে লাহোরের নিকটবর্ত্তী রাবিনদীর তীরে একটি অনতি বৃহৎ সমাধি রহিয়াছে। তথায় প্রতি বৎসর সরস্বতী পূজার দিন খুব সমারোহের সহিত একটি মেলা হইয়া থাকে। ঐ সমাধিটি একটি একাদশ বর্ষবয়স্ক বালকের—যাঁহার অসাধারণ সাহস, অটল প্রতিজ্ঞা, অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতা ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠা একদা সমস্ত ভারতবর্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল; যাঁহার নাম স্মৃতিপথারূঢ় হইবামাত্র হৃদয় যুগপৎ ভক্তি, আনন্দ ও বিষাদে পূর্ণ হয়; সেই ধীরপ্রকৃতি স্থিরপ্রতিজ্ঞ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, স্বধর্ম্মপরায়ণ বালকের নাম হকিকত রায়।

অগ্গর নামক একজন পঞ্জাবী কবির রচিত একটি গ্রাম্য-সংগীত পাঠে জানাযায় যে, হকিকত রায় ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে স্যালকোট নামক জনপদে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল লালা বাগমল। তিনি পুত্রকে সংস্কৃত ভাষায় বুৎপন্ন করিয়া পরে একমৌলবীর নিকট পারসী অধ্যয়নার্থ প্রেরণ করেন।

শৈশব হইতেই হকিকতের ধর্ম্মের প্রতি একটা প্রবল আনুরক্তি ছিল, তিনি স্বীয় মাতার নিকট রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণাদির কথা শুনিতে খুবই ভাল বাসিতেন।

হকিকত যে মৌলবীর নিকট পারসী পড়িতেন, একদিন তিনি কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গিয়াছিলেন। সেই সময় সকল মুসলমানবালক মিলিত হইয়া হিন্দুদিগের ঠাকুর দেবতার প্রতি অসম্মান সূচক নানাবিধ ঠাট্টা তামাসা করিতে লাগিল। স্বধর্ম্মপরায়ণ হকিকতের তাহা নিতান্ত অসহ্য বোধ হইল। তিনিও মহম্মদ এবং পৈগম্বর প্রভৃতির নামে উপহাস করিলেন। ক্রমশঃ উভয়পক্ষে কলহ উপস্থিত হইল। যথা সময়ে মৌলবী প্রত্যাগমন করিলে মুসলমান বালকেরা তাঁহার নিকট হকিকতের বিরুদ্ধে নালিশ করিল।

মৌলবী ক্রুদ্ধচিত্তে হকিকত রায়কে তৎক্ষণাৎ কাজির নিকট পাঠাইলেন। কাজি সবিশেষ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত ও কুপিত হইলেন, এবং হকিকতের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞাদিয়া তদ্বিষয়ে চূড়ান্ত বিচারের জন্য তাঁহাকে লাহোরের সুবাদারের নিকট পাঠাইলেন।

জফর খাঁ নামক একজন পাঠান তখন লাহোরের সুবাদার ছিলেন। হকিকত রায় সুবাদারের সম্মুখে আনীত হইয়া সমুচিত বিনীতভাবে ও একান্ত অকপট-চিত্তে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন, নিজ জীবন রক্ষার জন্য এক চুলও অসত্য বলিলেন না। সুবাদার এই একাদশবর্ষীয় বালকের প্রবল স্বধর্ম্মানুরাগ, অটল সত্যনিষ্ঠা, ও সুকোমল শান্ত-স্বভাব নিরীক্ষণ করিয়া একান্ত মুগ্ধ ও দয়ার্দ্র হইলেন; কিন্তু কাজির আজ্ঞা অমান্য করিতেও সাহসী না হইয়া বলিলেন—"হকিকত, তুমি নিশ্চিন্ত হও। আমি তোমার প্রাণ রক্ষার এক সুন্দর উপায় ঠিক করিয়াছি, পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ কর।" এই কথা শ্রবণমাত্র হকিকত রায় সমুচিত দৃঢ়তার সহিত বলিলেন "আমি মৃত্যুদণ্ড স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি কিন্তু স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব না।"

হকিকতের পিতামাতার নিকট এই মর্ম্মান্তিক সংবাদ বিদ্যুৎবেগে আসিয়া পৌঁছিল। তাঁহারা শোকোন্মত্ত হইয়া পুত্রকে দেখিবার জন্য লাহোর যাত্রা করিলেন।

সুবাদার তাঁহাদিগকে যথোপযুক্ত সম্বর্দ্ধনা ও সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন—"হকিকত যদি ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে—তবেই সম্পূর্ণ নিরাপদ হইতে পারে আপনারা তাহাকে বুঝাইয়া বলুন।" পুত্রের প্রাণের দায়ে হকিকতের মাতা পর্য্যন্ত তাঁহাকে ধর্ম্মান্তর গ্রহণে পরামর্শ প্রদান করিলেন। মাতার নিকট হইতে এইরূপ অপ্রত্যাশিত আদেশ পাইয়া পুত্র বলিলেন, "মা তুমিই তো আমাকে বরাবর বলিয়াছ যে, এই ক্ষণ-ভঙ্গুর শরীরকে কোনো অসার পার্থিব ভোগবিলাসের অধীন না করিয়া সৎকার্য্যে উৎসর্গ করাই মানব জীবনের চরম লক্ষ্য। এখনই ত আমার পরীক্ষার প্রকৃত সময়। এখন আমাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে পরামর্শ না দিয়া আশীর্ব্বাদ কর যেন পরমেশ্বরের নাম স্মরণ করিতে করিতে হাসিতে হাসিতে এই নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিতে পারি। আত্মা অবিনশ্বর ও চিরউন্নতিশীল, তাহাকে কেহই বধ করিতে পারে না। সুতরাং যথার্থ হকিকত রায়কে নষ্ট করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই।" তাঁহার পিতাও তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন, সুবাদার তাঁহাকে জামাতা করিবার লোভ পর্য্যন্ত দেখাইলেন। কিন্তু হকিকত স্থির অচঞ্চল ও দৃঢ়সংকল্প। পরিশেষে সুবাদার উপায়ান্তর না দেখিয়া প্রাণবধের জন্য তাঁহাকে জল্লাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

পিতামাতার হৃদয়বিদারক আর্ত্তনাদের মধ্যে হকিকত রায় বধ্য-ভূমিতে আনীত হইলেন। ক্ষণকালের মধ্যেই সেস্থান লোকে পূর্ণ হইয়া গেল, সকলের মুখেই হাহাকার ধ্বনি, সকলেরই চক্ষু জলপূর্ণ, কিন্তু হকিকত রায় নির্ভীক বীরপুরুষের ন্যায় প্রশান্ত ভাবে দণ্ডায়মান! জল্লাদ তাঁহার শিরশ্ছেদ করিবার জন্য খড়্গ উঠাইল, কিন্তু পারিল না;

খড়্গ মাটিতে পড়িয়া গেল। হকিকত রায় সেই মুহূর্ত্তে খড়্গ তুলিয়া জল্লাদের হাতে দিলেন এবং বলিলেন,—"নিজ কর্ত্তব্য কার্য্যে পরাঙ্মুখ হয়ো না, শীঘ্র কায সমাধা কর।" এবার জল্লাদ তাহার কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিল। হকিকতের মস্তক শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইল। সমাগত জনমণ্ডলীর মধ্য হইতে বিলাপ ও ক্রন্দনের ধ্বনি উত্থিত হইল। বৃদ্ধ পিতামাতাকে শোকানলে নিক্ষেপ করিয়া স্বধর্ম্মপরায়ণ তেজস্বী বালক সহাস্যবদনে ও সগর্ব্বে এই মরজগত ছাড়িয়া অমরধামে পরম-পিতার ক্রোড়ে চিরাশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেই হইতে হকিকত রায়ের নাম জনসমাজে 'ধর্ম্মবীর' বলিয়া ঘোষিত হইল।

হিন্দুগণ এই অসাধারণ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ তেজস্বী বালকের নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য রাবি-নদীর তীরে তাঁহার এক সমাধি মন্দির স্থাপন করিলেন। অদ্যাপি তথায় প্রতিবৎসর মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমীর দিনে মহাসমারোহের সহিত একটি মেলা হইয়া থাকে। এই সমাধির ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য মহারাজ রণজিৎ সিং স্যালকোটের অন্তর্গত দুইটি গ্রাম দান করেন; কিন্তু সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট ঐ গ্রাম দুইটি খাশ করিয়া লইয়াছেন এবং তাহার পরিবর্ত্তে বার্ষিক একশত কুড়ি টাকা করিয়া দেন।

শ্রীবিপিনবিহারী চক্রচর্ত্তী।

দুর্লভ।

ঈশ্বরের মধ্যে মনকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারিনে, মন বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, এই কথা অনেকের মুখে শোনা যায়।

পারিনে যখন বলি তার অর্থ এই, সহজে পারিনে; যেমন করে নিঃশ্বাস গ্রহণ করচি কোনো সাধনার প্রয়োজন হচ্চেনা, ঈশ্বরকে তেমন করে আমাদের চেতনার মধ্যে গ্রহণ করতে পারিনে।

কিন্তু গোড়া থেকেই মানুষের পক্ষে কিছুই সহজ নয়; ইন্দ্রিয় বোধ থেকে আরম্ভ করে ধর্ম্মবুদ্ধি পর্য্যন্ত সমস্তই মানুষকে এত সুদূর টেনে নিয়ে যেতে হয় যে মানুষ হয়ে ওঠা সকল দিকেই তার পক্ষে কঠিন সাধনার বিষয়। যেখানে সে বল্‌বে "আমি পারিনে" সেইখানেই তার মনুষ্যত্বের ভিত্তি ক্ষয় হয়ে যাবে, তার দুর্গতি আরম্ভ হবে; সমস্তই তাকে পারতেই হবে।

পশুশাবককে দাঁড়াতে এবং চল্‌তে শিখতে হয় নি। মানুষকে অনেকদিন ধরে বারবার উঠে পড়ে তবে চলা অভ্যাস করতে হয়েছে; আমি পারিনে বলে সে নিষ্কৃতি পায়নি। মাঝে মাঝে এমন ঘটনা শোনা গেছে, পশুমাতা মানবশিশুকে হরণ করে বনে নিয়ে গিয়ে পালন করেছে। সেই সব মানুষ জন্তুদের মত হাতে পায়ে হাঁটে। বস্তুত তেমন করে হাঁটা সহজ। সেই জন্য শিশুদের পক্ষে হামাগুড়ি দেওয়া কঠিন নয়।

কিন্তু মানুষকে উপরের দিকে মাথা তুলে

খাড়া হয়ে দাঁড়াতে হবে। এই খাড়া হয়ে দাঁড়ানো থেকেই মানুষের উন্নতির আরম্ভ। এই উপায়ে যখনি সে আপনার দুই হাতকে মুক্তিদান করতে পেরেছে তখনি পৃথিবীর উপরে সে কর্ত্তৃত্বের অধিকার লাভ করেছে। কিন্তু শরীরটাকে সরল রেখায় খাড়া রেখে দুই পায়ের উপর চলা সহজ নয়। তবু জীবন-যাত্রার আরম্ভেই এই কঠিন কাজকেই তার সহজ করে নিতে হয়েছে; যে মাধ্যাকর্ষণ তার সমস্ত শরীরের ভারকে নীচের দিকে টানচে, তার কাছে পরাভব স্বীকার না করবার শিক্ষাই তার প্রথম কঠিন শিক্ষা।

বহু চেষ্টায় এই সোজা হয়ে চলা যখন তার পক্ষে সহজ হয়ে দাঁড়াল, যখন সে আকাশের আলোকের মধ্যে অনায়াসে মাথা তুলতে পারল তখন জ্যোতিষ্কবিরাজিত বৃহৎ বিশ্বজগতের সঙ্গে সে আপনার সম্বন্ধ উপলব্ধি করে আনন্দ ও গৌরব লাভ করলে।

এই যেমন জগতের মধ্যে চলা মানুষকে কষ্ট করে শিখ্‌তে হয়েছে, সমাজের মধ্যে চলাও তাকে বহুকষ্টে শিখ্‌তে হয়েছে। খাওয়া পরা, শোওয়া বসা, বসা চলা এমন কিছুই নেই যা তাকে বিশেষ যত্নে অভ্যাস না করতে হয়েছে। কত রীতিনীতি নিয়ম সংযম মান্‌লে তবে চারদিকের মানুষের সঙ্গে তার আদানপ্রদান, তার প্রয়োজন ও আনন্দের সম্বন্ধ সম্পূর্ণ ও সহজ হতে পারে। যতদিন তা না হয় ততদিন তাকে পদে পদে দুঃখ ও অপমান স্বীকার করতে হয়—ততদিন তার যা দেবার ও তার যা নেবার উভয়ই বাধাগ্রস্ত হয়।

জ্ঞানরাজ্যে অধিকার লাভের চেষ্টাতেও মানুষকে অল্প ক্লেশ পেতে হয় না। যা চোখে দেখচি কানে শুনচি তাকেই আরামে স্বীকার করে গেলেই মানুষের চলে না। এই জন্যেই বিদ্যালয় বলে কত বড় একটা প্রকাণ্ড বোঝা মানুষের সমাজকে বহন করে বেড়াতে হয়—তার কত আয়োজন, কত ব্যবস্থা! জীবনের প্রথম কুড়ি পঁচিশ বছর মানুষকে কেবল শিক্ষা সমাধা করতেই কাটিয়ে দিতে হয়—এবং যাদের জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা প্রবল সমস্ত জীবনেও তাদের শিক্ষা শেষ হয় না।

এম্‌নি সকল দিকেই দেখ্‌তে পাই মানুষ মনুষ্যত্বলাভের সাধনায় তপস্যা করচে। আহারের জন্যে রৌদ্রবৃষ্টি মাথায় করে নিয়ে চাষ করাও তার তপস্যা, আর নক্ষত্রলোকের রহস্য ভেদ করবার জন্যে আকাশে দূরবীন তুলে জেগে থাকাও তার তপস্যা।

এমনি প্রাণের রাজ্যেই বল, জ্ঞানের রাজ্যেই বল, সামাজিকতার রাজ্যেই বল সর্ব্বত্রই আপনার পূর্ণ অধিকার লাভ করবার জন্যে মানুষকে প্রাণপণ করতে হয়েছে। যারা বলেছে, পারিনে, তারাই নেবে গিয়েছে। যা সহজ না, তারই মধ্যে মানুষকে সহজ হতে হবে—সহজের প্রকাণ্ড মাধ্যাকর্ষণকে কাটিয়ে তাকে সর্ব্বত্রই উপরে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে।

প্রথম থেকেই সহজের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে এই প্রবৃত্তি মানুষের পক্ষে এমনি স্বাভাবিক হয়ে গেছে যে অনাবশ্যক দুঃসাধ্যসাধনও তাকে আনন্দ দেয়। আর কোনো প্রাণীর মধ্যেই এই অদ্ভুত জিনিষটা নেই। যেটা সহজ, সেটা আরামের, তার ব্যতিক্রম দেখ্‌লে অন্য কোনো প্রাণী সুখ বোধ

করতে পারে না। অন্য প্রাণীরা যে লড়াই করে সে কেবল প্রয়োজন সাধনের জন্যে, আত্মরক্ষার জন্যে, অর্থাৎ দায়ে পড়ে; সে লড়াই গায়ে পড়ে দুঃসাধ্য সাধনের জন্যে নয়। কিন্তু মানুষই কেবলমাত্র কঠিন কাজকে সম্পন্ন করাতেই বিশেষ আনন্দ পায়।

এই জন্যেই যে ব্যায়ামকৌশলে কোনো প্রয়োজনই নেই সেটা দেখা মানুষের একটা আমোদের অঙ্গ। যখন শুনতে পাই বারম্বার পরাস্ত হয়েও মানুষ উত্তরমেরুর তুষার-মরুক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থলে আপনার জয়পতাকা পুঁতে এসেছে তখন এই কার্য্যের লাভ সম্বন্ধে কোনো হিসাব না করেও আমাদের ভিতরকার তপস্বী মনুষ্যত্ব পুলক অনুভব করে। মানুষের প্রায় প্রত্যেক খেলার মধ্যেই শরীর বা মনের একটা কিছু কষ্টের হেতু আছে—এমন একটা কিছু আছে যা সহজ নয় বলেই মানুষের পক্ষে সুখকর।

যখন কোনো ক্ষেত্রেই মানুষকে "পারিনে" একথাটা বল্তে দেওয়া হয়নি তখন ব্রহ্মের মধ্যে মানুষ সহজ হবে সত্য হবে, এসম্বন্ধেও "পারিনে" বলা তার চল্‌বে না। সকল শ্রেষ্ঠতাতেই চেষ্টা করে তাকে সফল হতে হয়েছে আর যেটা সকলের চেয়ে পরম শ্রেষ্ঠতা সেইখানেই সে নিতান্ত সামান্য চেষ্টা করেই যদি ফল না পায় তবেই একথা বলা তার সাজবে না যে আমার দ্বারা একেবারে সাধ্য নয়।

যতই সহজ ও যতই আরামের হোক্ তবু আমরা কেবল মাটির দিকেই মাথা করে পশুর মত চলে বেড়াব না মানুষের ভিতর এই একটি তাগিদ্ ছিল বলেই মানুষ যেমন বহু চেষ্টায় আকাশে মাথা তুলেছে—এবং সেই আকাশে মাথা তুলেছে বলে পৃথিবীর অধিকার থেকে সে বঞ্চিত হয়নি, বরঞ্চ পশুর চেয়ে তার অধিকার অনেক বৃহৎভাবে ব্যাপ্ত হয়েছে, তেমনি আমাদের মনের অন্তরতম দেশে আর একটি গভীরতম উত্তেজনা আছে, আমরা কেবলি সংসারের দিকে মাথা রেখে সমস্ত জীবন ঘোর বিষয়ীর মত ধূলা ঘ্রাণ করে করেই বেড়াতে পারব না—অনন্তের মধ্যে, অভয়ের মধ্যে, অশোকের মধ্যে মাথা তুলে আমরা সরল হয়ে উন্নত হয়ে সঞ্চরণ করব। যদি তাই করি তবে সংসার থেকে আমরা ভ্রষ্ট হব না বরঞ্চ সংসারে আমাদের অধিকার বৃহৎ হবে, সত্য হবে, সার্থক হবে। তখন মুক্তভাবে আমরা সংসারে বিচরণ করতে পারব বলেই সংসারে আমাদের যথার্থ কর্ত্তৃত্ব প্রশস্ত হবে।

জন্তু যেমন চার পায়ে চলে বলে হাতের ব্যবহার পায় না তেমনি বিষয়ীলোক সংসারে চার পায়ে চলে বলে কেবল চলে মাত্র, সে ভাল করে কিছুই দিতে পারে না এবং নিতে পারেনা। কিন্তু যাঁরা সাধনার জোরে ব্রহ্মের দিকে মাথা তুলে চল্‌তে শিখেচেন, তাঁদের হাত পা উভয়ই মাটিতে বদ্ধ নয়—তাঁদের দুই হাত মুক্ত হয়েছে—তাঁদের নেবার শক্তি এবং দেবার শক্তি পূর্ণতালাভ করেছে—তাঁরা কেবলমাত্র চলেন তা নয়, তাঁরা কর্ত্তা, তাঁরা সৃষ্টিকর্ত্তা।

যে সৃষ্টিকর্ত্তা সে আপনাকে সর্জ্জন করে; আপনাকে ত্যাগ করেই সে সৃষ্টি করে। এই ত্যাগের শক্তিই হচ্চে সকলের চেয়ে বড় শক্তি। এই ত্যাগের শক্তির দ্বারাই মানুষ বড় হয়ে

উঠেছে। যে পরিমাণেই সে আপনাকে ত্যাগ করতে পেরেছে সেই পরিমাণেই সে লাভ করেছে। এই ত্যাগের শক্তিই সৃষ্টি শক্তি। এই সৃষ্টি শক্তিই ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য। তিনি বন্ধনহীন বলেই আনন্দে আপনাকে নিত্যকাল ত্যাগ করেন। এই ত্যাগই তাঁর সৃষ্টি। আমাদের চিত্ত যে পরিমাণে স্বার্থবর্জ্জিত হয়ে মুক্ত আনন্দে তাঁর সঙ্গে যোগ দেয় সেই পরিমাণে সেও সৃষ্টি করে, সেই পরিমাণেই তার চিন্তা, তার কর্ম্ম, সৃষ্টি হয়ে উঠে।

যাঁরা সংসার থেকে উচ্চ হয়ে উঠে ব্রহ্মের মধ্যে মাথা তুলে সঞ্চরণ করতে শিখেছেন তাঁদের এই ত্যাগের শক্তিই মুক্তিলাভ করেছে। এই আসক্তিবন্ধনহীন আত্মত্যাগের অব্যাহত শক্তি দ্বারাই আধ্যাত্মিকলোকে তাঁরা শ্রেষ্ঠ অধিকার লাভ করেন। এই অধিকারের জোরে সর্ব্বত্রই তাঁরা রাজা। এই অধিকারই মানুষের পরম অধিকার। এই অধিকারের মধ্যেই মানুষের চরম স্থিতি। এইখানে মানুষকে "পারিনে" বল্লে চল্‌বে না—চিরজীবন সাধনা করেও এই চরম গতি তাকে লাভ করতে হবে, নইলে সে যদি সমস্ত পৃথিবীরও সম্রাট হয় তবু তার "মহতী বিনষ্টিঃ"।

যে ব্রহ্মের শক্তি আমার অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্রই নিজেকে উৎসর্জ্জন করচে, যিনি "আত্মদা", আমি জলে স্থলে আকাশে সুখে দুঃখে সর্ব্বত্র সকল অবস্থায় তাঁর মধ্যেই আছি এই চেতনাকে প্রতিদিনের চেষ্টায় সহজ করে তুল্‌তে হবে। এই সাধনার ধ্যানই হচ্চে গায়ত্রী। এই সাধনাই হচ্চে তাঁর মধ্যে দাঁড়াতে এবং চল্‌তে শেখা। অনেকবার টল্‌তে হবে, বারবার পড়্‌তে হবে, কিন্তু তাই বলে ভয় করলে হবে না, তবে বুঝি পারব না। পারবই, নিশ্চয়ই পারব। কেননা অন্তরের মধ্যে এইদিকেই মানুষের একটা প্রেরণা আছে—এই জন্যে মানুষ দুঃসাধ্যতাকে ভয় করে না তাকে বরণ করে নেয়—এই জন্যেই মানুষ এত বড় একটা আশ্চর্য্য কথা বলে জগতের অন্য সকল প্রাণীর চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে, ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জাগাও।

জাগাও, জাগাও,
মম অন্তর আলোকে তব আলোক মিশাও।
মম [illegible] বেদন,
মম [illegible] চেতন,
তব আলোক কিরণে
এবে—ফুটাও ফুটাও।
মম হৃদয় মন্থন,
মম নিবিড় ক্রন্দন,
তব পরশে, নিমেষে
এবে—ঘুচাও ঘুচাও।
মম গোপন মরম,
মম গভীর সরম,
তব মোহন মিলনে
এবে—ডুবাও ডুবাও।

শ্রীহেমলতা দেবী।

পোষ্যপুত্র। ধারাবাহিক উপন্যাস।

২৬

দেবমন্দিরের মধ্যে তখন সন্ধ্যারতির কাঁসরঘণ্টা বাজিয়া বাজিয়া থামিয়া গিয়াছে। উপরে সাটিনের উপর জরীর বুটিদার চাঁদোয়া, তাহার নীচে মর্ম্মর প্রস্তরের বেদির উপর রৌপ্য সিংহাসনে রাধা শ্যামের যুগলমূর্ত্তি পাশাপাশি স্থাপিত। যুগলকিশোরের নিকষ কৃষ্ণপাথরের চিক্কনদেহ পীতাম্বরে এবং ময়ূরপুচ্ছ সুবর্ণবংশী ও স্বর্ণচূড়ায় সাজান। বিগ্রহের গলায় তখনও সেই শান্তির হস্তের গাঁথা বিনাসূতায় মালা চামরের অল্প বাতাসে দুলিয়া দুলিয়া সুবাস ছড়াইতেছে। সে মালা এখনও অম্লান। রাধার তপ্তকাঞ্চনবর্ণ নীলাম্বরে সুশোভিত। সে বস্ত্রের প্রত্যেক চুমকি-সলমাটি শান্তি নিজের হাতে অনেক যত্নপূর্ব্বক বসাইয়াছিল। বস্ত্রালঙ্কারশোভিত সেই কাঞ্চনমূর্ত্তি দুই পার্শ্বস্থ অন্যান্য দেবপ্রতিমাগণের সহিত প্রতিদিনকার মতই আলোকঝলকিত। তবুও আজ সমস্ত দেবালয়টা যেন বর্ষার বাতাসের মতন হাহা করিয়া উঠিতেছে, তবুও যেন আজ সেখানে কেহই নাই।

পুষ্পচন্দনের সুকোমল ঘনসৌরভে মন্দিরের বায়ুস্তর আমোদিত। বাতির আলো বহুশাখাবিশিষ্ট বেলওয়ারি ঝাড়ের মধ্য হইতে তাহাদের পিঙ্গলবর্ণ আভা বিচ্ছুরিত করিয়া নিম্নে চাহিয়া দেখিতেছে। নিত্যসেবার ভোজ্য নৈবেদ্য প্রতিদিনকার মতই সযত্নে রচিত। কিন্তু তথাপি বৃদ্ধ পুরোহিত তাহারি মধ্য হইতে শত শত খুঁটিনাটিতে ত্রুটি ধরিতে লাগিলেন। ঠাকুরের পানের বাটা আজ এপর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছে নাই। ধূনা জ্বালাইবার জন্য অগ্নি রাখা হয় নাই। রাজরাজেশ্বরীর পূজার উপকরণ শ্যামের সম্মুখে এবং শ্যামের ভোজ্যপেয় শ্যামার বামভাগে রাখা হইয়াছে। পুরোহিত ঠাকুর বিলম্বে প্রাপ্ত ধূনাচির অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠখণ্ডের মধ্যে ধূনাচূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া অপ্রসন্ন মুখে কহিলেন "মালক্ষ্মী তো বাড়ী এসেছেন, তবে আবার এসব বেবন্দোবস্ত হচ্চে কেন?"

শ্যামাকান্ত যখন আলোক প্রদর্শিত পথে ছাতা মাথায় দিয়া অল্পবৃষ্টিটুকু বাঁচাইয়া মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন আরতি শেষ হইয়া আসিয়াছে। আচার্য্য পঞ্চপ্রদীপ, শঙ্খ ও পুষ্পদ্বারা আরতি সমাপ্ত করিয়া ভোজ্যোৎসর্গ সমাধা করিতেছেন।

বৃদ্ধ জমীদার তাঁহার বিগ্রহত্রয়কে ভক্তি-ভরে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া উঠিয়া বসিতেই এই মঙ্গল উৎসবের সর্ব্বাঙ্গীন অপূর্ণতা প্রথমেই তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। পুরোহিতের পশ্চাতে, অদূরে মর্ম্মর মেজের উপর কোমল করতল রক্ষা করিয়া অর্দ্ধাব-গুণ্ঠনবতী শান্তি তো আজ বসিয়া নাই। শ্যামাকান্তের মনটা সহসা বিকল হইয়া উঠিল, সেতো কখনোই এখানে অনুপস্থিত থাকে না! উঠিয়া দ্বারের নিকট আসিয়া একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বৌমায়া এসেছিলেন?" সে জানাইল "তাঁহারা আসেন নাই"। "বাড়িতে জিজ্ঞাসা করে আয় বৌমা কেন আসেননি, অসুখ করেনি তো?"

ভৃত্য চলিয়া গেল। শ্যামাকান্ত সেইখানেই দরজা ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, উদ্বেগে ও অনুতাপে মনটা অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়া-

ছিল। সে কেন আসিল না? সেও কি আজ তাঁহার স্নেহে সন্দিহান হইয়াছে? না অভিমান করিয়া আসে নাই? কয়দিন যে তিনি হেমের নিষ্ঠুর আঘাতে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন! সেও বুঝি বা স্বামীর অবিবেচনার নিদারুণ আঘাতে লুটাইয়া পড়িয়াছে! এখনি তিনি সেখানে গিয়া দুই হাতে তাহার লুণ্ঠিত মাথাটা কোলে তুলিয়া লইয়া ডাকিবেন "মা, কেন, মা ছেলের ওপোর আজ রাগ করেছিস্? কুপুত্র হলেও কুমাতা তো হবার যো নেই।" শ্যামাকান্ত স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, শান্তির সজল বিশালনেত্রের মেঘান্ধকার বিদারণ করিয়া স্নিগ্ধ বিদ্যুৎস্ফুরণ হইল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া সে মধুর কলহাস্যের সহিত উত্তর দিল "আমি আবার রাগ করলুম কখন জ্যেঠামশাই?" কিন্তু কে জানে মানুষের কেমন সঙ্কীর্ণ সঙ্কুচিত্ত সে সহজ কথাটা মনে করিতে গিয়াও হাজারবার পিছাইয়া আসে। মুহুর্মুহু চকিত বিদ্যুতালোকে শ্যামাকান্তের ক্রোড়স্থ মুখখানাকে দশরথ রাজার স্বহস্তবিদ্ধ ঋষিকুমার সিন্ধুর মরণাহত শুভ্রমুখের মতন বলিয়া মনে হইল, তিনি শিহরিয়া দেবীপ্রতিমার পানে চাহিয়া নিশ্বাস ফেলিলেন "দুর্গে!" অল্প পরেই ভৃত্য বিস্ময়চকিত ভাবে ফিরিয়া আসিয়া খবর দিল, "তারিণী বল্লে একটুখানি আগে ছোটবাবু ছোটমাকে নিয়ে গাড়ি করে কোথায় চলে গেছেন, আর বড়মা তাঁর ঘরে বসে কান্‌চেন?"

শুনিয়া শ্যামাকান্তের চোখের উপর হইতে অকস্মাৎ সমুদয় আলোকদীপ্তি নিষ্প্রভ হইয়া গেল। তিনি নিশ্চলভাবে প্রস্তরপ্রতিমাদের মতই অন্ধকার বাহিরের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

অনেকক্ষণ পরে যখন প্রস্থানোদ্যত ভট্টাচার্য্য মহাশয় সাহস করিয়া মূর্চ্ছিত প্রায় স্তব্ধ বৃদ্ধ জমীদারের নিকবটর্ত্তী হইয়া ধীরে ধীরে সসঙ্কোচে তাঁহার বাহুস্পর্শ করিলেন, তখন চমকিয়া উঠিয়া প্রথমটা শ্যামাকান্ত ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলেন না, যে তিনি ঘুমাইয়া একটা ঘোরতর দুঃস্বপ্নের দ্বারা এতক্ষণ পীড়িত হইতেছিলেন কিনা? পুরোহিতের দিকে চাহিয়া বলিলেন "সত্যি কি মা, আমায় ছেড়ে চলে গেছেন?"

"একি কথা বলছেন? মা জগদম্বা আপনার ভক্তি ডোরে বাঁধা, আপনার মত ভেদবোধহীন সাধক কি এ কলিকালে দ্বিতীয় আছে? মার প্রসন্নমুখে অপ্রসন্নতার ছায়াটিও পড়ে নাই। ঐ দেখুন বরাভয়দায়িনী আপনার পানে চেয়ে অভয় হাস্য কচ্চেন।"

মাতৃহীন শিশু যখন মা বলিয়া আব্দার ধরে তখন যদি তাহার বিমাতাকে দেখাইয়া কেহ বলে এই তোমার মা তাহা হইলে যেমন হয় তেমনিভাবে বৃদ্ধ জমীদার হতাশার সহিত একমুহূর্ত্ত দেবীমূর্ত্তির প্রসন্নমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন "মাগো জগদম্বে! যদি অপ্রসন্ন হোস্‌নি তবে কেন আমার মাকে কেড়ে নিলি মা? আমার মাকে আমায় ফিরিয়ে দেমা, আমার শান্তিকে আমায় ফিরিয়ে দে।"

আচার্য্য অদ্ভুতভাবে শ্যামাকান্তের পানে তাকাইলেন "মালক্ষ্মীর কি হয়েছে? তিনিতো ভালই ছিলেন।—

বৃদ্ধ জমীদার কাঁদিয়া ফেলিলেন "হেম[..]কে এখান থেকে নিয়ে গ্যাছে, নিশ্চয়ই [জো]র করে নিয়ে গেছে"—

"সেকি এই দুর্য্যোগে এই ভাদ্র মাসে? [ছো]টবাবু পুরো নাস্তিক হলেন যে। এতোবড় [বং]শের সন্তান! হা জগদম্বে!" বিস্ময়ে [পু]রোহিতের নেত্র বিস্ফারিত হইয়া রহিল। [এ]র কথায় ব্যাকুলবৃদ্ধ ছটফট করিয়া মন্দিরের রুদ্ধদ্বার খুলিয়া ফেলিয়া একেবারে দ্রুতপদে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

জমাট বাঁধা কালো মেঘে থাকিয়া থাকিয়া তখনও বিদ্যুৎস্ফুরণ হইতেছে ঝুপ্ ঝুপ করিয়া বর্ষণও চলিতেছে, পুখুর ঘাটে ভেকদলের আনন্দ-কলরবের শেষ নাই। দুর্য্যোগ পূর্ণ অন্ধকার প্রকৃতির পানে তাকাইয়া তাঁহার সহস্র বেদনায় বিদ্ধ অশান্ত চিত্ত আজ আবার নূতন নৈরাশ্যে হাহাকার করিয়া উঠিল।

এই অন্ধকার প্রলয়বার্ত্তা ঘোষণার মাঝখানে তাঁহার সাধনার লক্ষ্মী কাহার নিঠুর শাপে আজ অতল সিন্ধুতলে নিমজ্জিত হইয়া গেল! শোকদীর্ণা প্রকৃতির বুকের ক্রন্দন আকর্ষণ করিয়া তাঁহার প্রাণের মধ্যে হাহাকার ধ্বনি উঠিল, ঝড়ের শব্দে মিশিয়া তাঁহার বেদনারুদ্ধ ক্রন্দন ব্যাকুল আবেগে বিমানের স্তরে স্তরে উঠিয়া বলিতে লাগিল, "তুই কেন গেলিমা! তুই কোথা গেলি? আর কি আমি তোকে ফিরে পাবো?"

২১

লর্ড কর্জ্জনের প্রবর্ত্তিত বঙ্গব্যবচ্ছেদ ব্যাপার লইয়া বাঙ্গালায় সেই সময় স্বদেশী আন্দোলন তুমুল হইয়া উঠিয়াছে। সুখসুপ্ত বঙ্গবাসীগণ রাবণের আহ্বানে অকাল জাগ্রত কুম্ভকর্ণের ন্যায় তখনও বিস্ময় বিহ্বল, তখনও পর্য্যন্ত তাহারা বুদ্ধি বা কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইতে পারে নাই। যুবকগণ বিশেষতঃ বালকের দল উদ্যমের সহিত উঠিয়া দাঁড়াইলেও বড় বড় প্রবীণ 'লীডারেরা' তখনও পর্য্যন্ত চিন্তান্বিত মুখে গোঁফে চাড়া দিতে দিতে বলিতেছেন "এ কি টিঁকিবে?"

মহৎ উদ্দেশ্য এপর্য্যন্ত কোন দেশে কখনও ব্যর্থ হয় নাই; আজো হইল না। স্বদেশী আন্দোলন বৈশাখী আকাশে ক্ষণিক বজ্র বিদ্যুতের অগ্নিমুখী গর্জ্জনের পর একটা স্থায়ী বর্ষণের আগ্রহে পরিপূর্ণ নবীন মেঘরাশি সুশোভিত রূপ ধারণ করিল। যে সকল দেশবাসী এই সময়ে প্রকৃত পথই অনুসরণোদ্যত হইলেন রজনীনাথ তাহাদের মধ্যে একজন।

রজনীনাথ কদিন হাঁফ ফেলিবারও অবসর পান নাই। নিজের কাজের ভিড় ঠেলিয়া ফেলিয়া নূতন উদ্যমে নূতন উৎসাহে সভার যোগদান ও মফঃসলের কার্য্যে ঘুরিয়া বেড়াইয়া, স্বদেশী শিল্প গ্রহণে উৎসাহ দান করিয়া বহু দিনের আক্ষেপ মিটাইতে ছিলেন। একদিন কাজকর্ম্ম সারিয়া ভিতরে আসিলে বসুমতী তাঁহার উৎসাহদীপ্ত অথচ স্নানাহারের অনিয়মে ঈষৎ শুষ্ক মুখেরদিকে চাহিয়া অনুযোগের সুরে বলিলেন "একি শ্রী হয়েচে, মাগো তোমার সকলি কি বাড়াবাড়ি!" রজনীনাথ আয়নার সম্মুখে গিয়া হাসিয়া কহিলেন "কেন বসু? এইতো দিব্যি শ্রী রয়েছে, আবার কি চাও?" বসুমতী চেষ্টা করিয়া হাসি চাপিয়া রাখিলেন; "হ্যাঁ হাঁ! বড্ড শ্রী বেড়েছে! বলি একেবারেই

কি বাড়ী ঘর সব ত্যাগ করবে না কি? শান্তিদের যে দু এক দিনের মধ্যে লক্ষ্মীপুরে ফেরবার কথা ছিল তার কিছু কি খবর পেলে?" "তাইতো তোমায় বলিনি বুঝি!" রজনীনাথ একটু অপ্রতিভভাবে পত্নীর সাগ্রহ দৃষ্টির উপর সহাস্য দৃষ্টি স্থাপন করিয়া প্রফুল্ল মুখে কহিলেন; "তারা যে এসেছে আজ বিকেলে আমি সেখানে যাব মনে করেছি।"

লক্ষ্মীপুর গিয়া সেখানকার প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে শ্যামাকান্তের বাকী রহিল না। তাঁহার প্রতি হেমেন্দ্রের ভক্তিপ্রীতিশূন্য অবিনীত ব্যবহার; শান্তির প্রতি প্রেমহীন অবহেলা সমস্তই তাঁহাকে নিদারুণ পীড়িত করিয়া তুলিল। শ্যামাকান্তও সেই প্রথম দিনেই উইলের কথাটা পাড়িয়া বসিলেন। তাঁহার ইচ্ছা বিনোদের পুত্রের সহিত শান্তিকে তিনি তুল্যাংশে বিষয় ভাগ করিয়া দিবেন। হেমেন্দ্র নিজের হাত খরচের মতন মাসিক কিছু কিছু টাকা পাইবেন মাত্র। শুনিয়া রজনীনাথ একটুখানি উত্তেজিত ভাবে মুখ তুলিয়া ঈষৎ তীব্রভাবে বলিয়া উঠিলেন "কেন, আবার কি কৃষ্ণকান্তের উইলের অভিনয় করাতে চান? চৌধুরী মশায় মনে কর্ব্বেন না আপনার হেম কোনও অংশে গোবিন্দলালের চেয়ে ভাল।" তার পর একটু লজ্জিত হইয়া নম্রভাবে কহিলেন "আমার পরামর্শ এই যে বিনোদের ছেলের সঙ্গে জমীদারির ভাগ অন্য কারুকে না দেওয়াই উচিত। এ থেকে চিরকালের জন্য একটা বিবাদের সৃষ্টি করা ভিন্ন অন্য কোন লাভই হবে না।"

শ্যামাকান্ত বৈবাহিকের নিকটে অপরাধহীন হইলেও নিজের মনকে তাহা কিছুতেই বুঝাইয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। পাছে রজনীনাথ কিছু মনে করেন সেই জন্যই বিষয় ভাগের কথাটা হঠাৎ তাড়াতাড়ি করিয়া তুলিয়াছিলেন। বেহাইএর প্রস্তাবে আনন্দে বিস্ময়ে কিছুক্ষণের জন্য তাঁহার বাক্‌রুদ্ধ হইয়া গেল। কিছু পরে রজনীনাথের পিঠে হাত রাখিয়া অবরুদ্ধ কণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন "কি বলে আশীর্ব্বাদ করব রজনি! ঈশ্বর তোমার চিরমঙ্গল করুন, মা তোমার সহায় হোন। তোমার কাছে আজ আমার যে মুখ দেখাতে লজ্জা করচে ভাই; কি বলবো! যাহোক আসল কথাটা হচ্ছে এই,হেমের হাতে বিষয়টা পড়ে এটা আমার মোটেই ইচ্ছা নয়। সত্যি কথা বলতে কি ভাই আমি ওটা সাহসই করচি না। একেতো সে আমার মার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে না তার উপর টাকাকড়ি হাতে যদি পড়ে তাহলে কি আর রক্ষা আছে। আমার মাকে যে অযত্ন করে আমার তার মুখদেখতে ইচ্ছে করে না। বৃদ্ধ হয়েছি কোনদিন আছি কোন দিন নেই,— ও সব হাঙ্গামা মিটিয়ে রাখাই ভাল। মাকে আমার অর্দ্ধেক সম্পত্তি দেবোই।" শুনিয়া একমুহূর্ত্ত রজনীনাথ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। এক মুহূর্ত্ত বেদনাদীর্ণ চিত্তে হাহাকার উঠিল; কিন্তু দুঃখে নিরাশায় অবসন্ন বা হতাশ হওয়া রজনীনাথের স্বভাব নয়। পরমুহূর্ত্তেই ক্রোধ ও বেদনাকে সবলে বক্ষে চাপিয়া জামাতাকে সংশোধন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া ধীরভাবে কহিলেন, "কিন্তু ভেবে দেখুন আপনার উইলও তো নাতির পক্ষে কিছু মঙ্গলের হবে না। যে প্ল্যানটা আপনি নিচ্ছেন সেইটেই যে হেমের পক্ষে সবচেয়ে

অমঙ্গলের। আমি শান্তির বাপ হিসাবে শুধু এ পরামর্শ চক্ষু লজ্জার খাতিরে দিচ্ছিনা। আপনার বন্ধু হিসাবেই বলচি এখন উইলের নামও কর্ব্বেন না। এই অবসরে যদি হেম একটু মানুষ হয়ে উঠতে পারে সেই চেষ্টাই করুন। বোধ হয় ভগবান তারি রক্ষার জন্য এই শুভ মুহূর্ত্ত দান করলেন।—"

শ্যামাকান্ত দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। "আমার অদৃষ্টে তা কি হবে, তারা আমার এমন দিন কি দেবেন! কিন্তু দেখো ভাই শেষটা আমি যেন আমার মার উপর অন্যায় না করে ফেলি, যদি আমি হঠাৎ মরে যাই তা হলে আইন তো—"

"আপনার নগদ টাকাও তো খুব অল্প নয়। ইচ্ছে করেন তো জমীদারি ভাগ না করে ওদের সেইটেই দেবেন। কিন্তু এখন ওসব কথা থাক। হেমকে একটু খানি তার ভবিষ্যৎ ভাববার অবসর দিন। না হলে জানবেন চৌধুরী মশায় অপনার সমুদয় জমীদারি ও বিষয় বিভব শান্তির চোখের জল থামাতে পার্ব্বেনা।"

শ্যামাকান্ত শিহরিয়া বলিয়া উঠিলেন "তারা!"

মনের জ্বালা মনে গোপন করিয়া, এই ঘটনাটাকে ছাঁটিয়া কাটিয়া রজনীনাথ বাড়ী ফিরিয়া বসুমতীকে যাহা জানাইলেন তাহার অর্থ এই যে, শ্যামাকান্তের শান্তিকে অর্দ্ধ সম্পত্তিদানে রজনীনাথই বাধা দিয়াছেন; কারণ আইনানুসারে যখন পোষ্যপুত্রের বধূ এই সম্পত্তির অধিকারিণী নহে তখন তাঁহার কন্যা তাহা কেন লইবে? বসুমতী এস্বার্থ-ত্যাগের মহত্ব বুঝিলেন না। বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "তারপর মেয়েটা খাবে কি? বিনোদের বউ যখন বিদায় করে দেবে? হেমের তো ঐ বিদ্যে!"

রজনীনাথ বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন "কেন তুমি মেয়েকে যে ঘরজামাই করতে চেয়েছিলে এরি মধ্যে ভয় হয়ে গেল পাছে দুদিন খেতে দিতে হয়! দক্ষপিতার কথাই পড়া গিয়েছিল মা এমন কৃপণ কখনও শুনা যায়নি!" পরে গম্ভীর মুখে কহিলেন "হেম একটু মানুষ হোকনা। কেন তাতে তোমরা সকলেই বাধা দিতে চাও? জেনো বসু, ঈশ্বর যা করেন সবি ভালর জন্য। কারণ চৌধুরী যদি হেমকে সত্য সত্যই বিষয় থেকে বঞ্চিত করতে পারতেন তা হলেই হেমের পক্ষে সবচেয়ে মঙ্গল হতো। আর আমার লতিটারও বড্ড উপকার হতো। গরীবের স্ত্রীর আদর থাকে বসু। বড়লোকের স্ত্রী হওনি তাই বুঝতে পারবেনা তারা কি আগুন হীরের জ্যোতিতে লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। ভগবান আমার মেয়েকে তাদের দল থেকে রক্ষা করুন।"

ঠিক মনের সহিত না মিলিলেও বসুমতী চুপ করিয়া রহিলেন, স্বামীর মতের বিরুদ্ধ মনোভাবকে প্রশ্রয় দিতে তিনি সাহসী হইতেন না। জামাতার দারিদ্র্য লাভের আশীর্ব্বাদটা কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মনঃপুত হইল না; মনে মনে শান্তিকে রাজরাণী হইবার জন্য পুনঃ পুনঃ আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

রাস্তার একটা গোলমাল ও সেই সঙ্গে ফটকের মধ্যে একখানা গাড়ি জোরে প্রবেশ করিবার শব্দ উভয়কেই সেইদিকে আকৃষ্ট করিল। সম্মুখের দেয়ালের উপর একটা ঘড়ি নিজের কাজে ব্যস্ত ছিল,

সেইদিকে চকিত নেত্রপাত করিয়া রজনীনাথ ঈষৎ উত্যক্তভাবে আপনাআপনি বলিলেন "এত রাত্রেও মক্কেল নাকি? কি মুস্কিল!" চকিতমাত্র একটা সম্ভাবনার কথা মনে উদয় হইল কিন্তু হেম যে এতরাত্রে আসিবে না তাহা স্থির নিশ্চয় করিয়া সেদিক হইতে মনটাকে ফিরাইয়া লইলেন। বসুমতী একটু উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি যে বল্লে হেম আজকালের মধ্যেই আসবে কই এলোনা তো?"

রজনীনাথ উত্তর করিলেন না; ক্ষোভের সহিত নীরব হইয়া রহিলেন, গাড়িখানা গাড়ি বারান্দার মধ্যে প্রবেশ করিয়া থামিল।

রজনীনাথ জোর করিয়া মনটাকে প্রফুল্ল রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন: "বঙ্গলক্ষ্মী মিলের মতন আরও দুটো একটা মিল যদি বসান যায় এই সময় তাহলে বড়ই কাজ হয়। চৌধুরীর নগদ টাকা অনেক, সেই টাকাটা তিনি যদি এরকম করে খাটান ত উভয় পক্ষেই মস্ত কাজ হয়। মনে করচি এবার গিয়ে হেমকে নিয়ে আসি আর তাঁকেও এ পরামর্শ দিয়ে দেখি। আমার মনে হয় তাঁর শান্তির বাবার পরামর্শ তিনি অগ্রাহ্য করতে পার্ব্বেন না; আমার বুড়ির যে রকম উৎসাহ—একি? একি শান্তি তুই?"

নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া ধীরে ধীরে কম্পিত পদে গৃহে প্রবেশ করিবা মাত্র শান্তি সহসা বাধাপ্রাপ্তের মতন থমকিয়া দাঁড়াইল। সে ভাবিয়াছিল এত রাত্রে তাহার পিতামাতা নিদ্রিত হইয়াছেন। সে সুধু গৃহের স্তিমিতালোকে বিছানার পাশে একবারটিমাত্র তাঁহাদের ঘুমন্ত স্নেহমুখ নিরীক্ষণ করিয়া নিঃশব্দে চলিয়া যাইবে। রাত্রের মত তাঁহাদের কাছে জবাবদিহি করার হাত হইতে নিস্তার পাইবে মনে করিয়াও একটুখানি আরাম বোধ করিতেছিল। যে মাবাপের স্নেহকোল সে উৎকণ্ঠিত আগ্রহে কামনা করিয়া আসিয়াছে, আজ নিকটে আসিয়াও সে আশ্রয় গ্রহণ করিতে শান্তি সঙ্কুচিত।

একবার চিরঅভ্যস্থ মা শব্দ তাহার মুখে আসিয়া পৌঁছিল। সে জানিত সে ডাকে আগমনীর প্রভাতে গিরিরাজ পত্নী উমা জননীরই মত তাহার মা ব্যাকুল স্নেহে প্রাণাধিকা কন্যাকে বক্ষে টানিয়া লইবেন। কিন্তু হায় হায় শান্তি কি সে অধিকার লইয়া তাঁহাদের দ্বারে আসিয়াছে? সে কি দুহিতৃগর্ব্বে পিতামাতার স্নেহবক্ষে স্থান পাইতে অধিকারিণী? অপরাধী স্বামীর সহিত অপরাধিনী পত্নী আজ তাহার পিতৃগৃহের নির্ম্মল বায়ুটুকু পর্য্যন্ত যে দূষিত করিতেছে। আজ সে কোন মুখে চিরমধুর মা' নাম লইয়া ডাকিয়া বলিবে "আমি এসেছি"। কিন্তু দ্বার খুলিয়াই সে কুণ্ঠিত বিস্ময়ে দেখিল, আলোকিত কক্ষে তখনও পিতামাতা জাগিয়া। আর তাঁহারা তাহারি নাম স্নেহকম্পিত কণ্ঠে উচ্চারণ করিতেছেন। তাহার পাদুখানা যেন সেইখানেই আটকাইয়া গেল। খুব সাবধানে প্রবেশ করিলেও শান্তির হাতের চুড়ি বালা ও আঁচলে বাঁধা চাবির গোচ্ছার একটুখানি মৃদু শব্দ হইয়াছিল। সে শব্দটুকু রজনীনাথের কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি বিস্ময়ের সহিত দ্বারের দিকে চাহিলেন। সত্য! শব্দ তবে তাঁহাকে প্রতারণা করে

নাই! যে শব্দে তাঁহার বক্ষের মধ্যে হৃদ্‌পিণ্ডটা অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে আঘাত করিয়া উঠিয়াছিল তাহা বাস্তবিকই শান্তির হাতের চুড়ির! আনন্দপূর্ণ বিস্ময়ে কলের মতন বলিয়া উঠিলেন "এত রাত্রে তুই কেমন করে এলিরে বুড়ি?" পরক্ষণেই আনন্দে নির্ব্বাক বসুমতীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন "দেখছো বড় তোমার বেহাই কত ভদ্র, অনেকদিন তুমি মেয়েকে দেখনি তাই নিজেই পাঠিয়ে দিয়েছেন। ওকিরে লতি অমন করে দাঁড়িয়ে রৈলি কেন? আয় মা আমার কাছে আয়, ক্ষেম এসেছে তো? তোকে হঠাৎ যে বড় পাঠালেন?"

বিদ্যুতে পরিপূর্ণ জলীয়বাষ্পে ভরা মেঘখানা বর্ষণোন্মুখ ভাবে যখন আকাশের গায়ে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়ায় তখন কতটুকুই বা উত্তরে হাওয়ার প্রয়োজন থাকে! একটু-খানি মাত্র ঠাণ্ডা বাতাসের একটা দম্‌কাতেই সেখানাকে ফাটাইয়া সরাইয়া এককালে নিঃশেষে বর্ষণ করিয়া দেয়। তেমনি করিয়া শান্তির রুদ্ধ বাষ্পে ভরা হৃদয় সেই বিশ্বাসপূর্ণ স্নেহাদরে যেন ফাটিয়া পড়িল। পিতার পদতলে মাটিতে বসিয়া অবরুদ্ধ স্বরে উত্তর করিল—

"আমায় তিনি পাঠাননি বাবা, আমি লুকিয়ে চলে এসেছি, আমি সেখানে থাকতে পারলুম না—"

আর কিছু শান্তি বলিতেও পারিল না; আর কিছু শুনিবারও প্রয়োজন ছিল না বজ্রাহতের মতন রজনীনাথ অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। একথাও তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে হইবে?

শান্তি নিরুত্তরে বসিয়া রহিল। বিস্ময়ে বেদনায় কম্পিতকণ্ঠে পিতা কহিলেন "নীচের সঙ্গে থেকে তুমি এতো হীন হয়ে গ্যাছ শান্তি! একথা আমি যে স্বপ্নেও মনে করতে পারিনি! আমার সব যত্ন সব শিক্ষা এমনি করেই জলে ডুবিয়ে দিলে?"

অপরাধিনী একবার নতমুখ তুলিয়া পিতার পানে চাহিল, কিন্তু সেই কঠিন বিচারকের দৃষ্টির সম্মুখে তাহার চকিত দৃষ্টি আপনা হইতে পুনরায় নত হইয়া আসিল। সে কি বলিবে? বলিবে কি তাহার ঈর্ষা-পীড়িত স্বামী জোর করিয়া তাহার আশ্রয় নীড় হইতে তাহাকে এখানে টানিয়া আনিয়াছে, সে স্বেচ্ছায় আসে নাই? স্ত্রী হইয়া স্বামীকে পিতার নিকট অপদস্থ করিবে কি করিয়া?

বসুমতী স্বামীর রূঢ়তায় একটু বিরক্তির সহিত উঠিয়া আসিয়া মেয়ের হাত ধরিয়া একটু তীক্ষ্ণভাবে বলিয়া উঠিলেন "তুমি ওর ওপোর মিথ্যে রাগ করচ কেন? নিশ্চয়ই বিনোদের বউ ওকে কিছু বলেছে; না হয়তো চৌধুরী ভাল ব্যবহার করেনি। নৈলে আমার এমন মেয়ে নয় যে আপনা হতে চলে আসে। তখনি তো তোমায় বল্লুম ছোট ঘরের মেয়ে কখন ভাল হয় না—আমার বাছাকে আমার কাছে এনে দাও। আয় মা তুই উঠে আয়।"

শান্তি নড়িল না, তাহার চোখের কোল ছাপাইয়া যে অজস্র অশ্রুজল উথলাইয়া উঠিতেছিল, তাহা ঝর ঝর করিয়া বিন্দুর পর বিন্দু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কেমন করিয়া সে এ অপবাদ সহ্য করিবে, কেমন করিয়াই বা সব কথা বলিবে!

রজনীনাথ তীক্ষ্ণ গম্ভীর দৃষ্টিতে কন্যার দিকে চাহিলেন "আমি এখনি আসচি, শান্তি তোমার কাছ থেকে এ আমি আশা করিনি, পরের কাছে দাবী নেই—নিজের সন্তানও শেষে এমন করে আশা ভঙ্গ করবে।"

রজনীনাথ উঠিয়া গেলেন। বসুমতীও উঠিয়া কন্যা জামাতার সেবার জন্য দাসদাসীদের ডাকিয়া আদেশ প্রদান করিলেন। কয়দিন ধরিয়া মেয়ের জন্য তাঁহার মনটা বড়ই ব্যাকুল হইয়াছিল, কোনরকমে তাহাকে কাছে পাইয়াই তিনি বর্ত্তাইয়া গিয়াছেন।

সেখানে যে আর বনিবনাও হইবার সম্ভাবনা নাই সে কথাতো তিনি প্রথম হইতেই 'পই পই' করিয়া বলিতেছেন। রজনীনাথ যদি তাহা হাসিয়া না উড়াইয়া দিতেন তাহা হইলে আর এ সমস্ত কাণ্ড হয় না। অনেক নির্য্যাতন না পাইলে কিছু আর শান্তি এমন করিয়া চলিয়া আসিতে বাধ্য হয় নাই; পুরুষ মানুষে লেখাপড়া বিষয় কার্য্য ভাল বুঝিলেও গৃহস্থালীর ব্যাপার ও লোকচরিত্র মেয়েমানুষের মত বোঝেনা। কিন্তু ঐ যে পুরুষ মানুষের কেমন একটা 'সবজান্তা' রোগ সেই দোষেই তাহারা মেয়েদের বুদ্ধিকে অগ্রাহ্য করিতে গিয়া যখন তখন সংসারে অস্বস্তির সৃষ্টি করিয়া বসে। বৃদ্ধ বৈবাহিকের উপরেও বসুমতীর রাগ করিবার যথেষ্ট কারণ ছিল। তাঁহার কন্যার উপর সে বৃদ্ধের বরাবরই অত্যাচার! তিনি যখন নিজের ঠিক মনের মতন দেখিয়া শুনিয়া সেই ছেলেটীকে বাছিয়া লইলেন, মনে মনে একখানা কাল্পনিক চিত্র আঁকিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তাহাতে নূতন রং নূতন সৌরভে ফুটাইয়া তুলিয়া সেখানাকে একেবারে শোভা সৌন্দর্য্যের আদর্শ করিয়া তুলিয়াছেন, হঠাৎ এমন সময় কোথা হইতে লোভাতুর বৃদ্ধ তাঁহার সে কল্পনা কুসুম ছিন্ন করিয়া লইতে হাত বাড়াইল। বসুমতী অন্য মায়েদের মত মেয়ের ঐশ্বর্য্যের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া তাহার মনের সুখই অধিক বাঞ্ছনীয় মনে করিতেন, তাই তাঁহার কল্পনাভঙ্গের দুঃখ বড়লোকের পোষ্যপুত্র জামাতায় এখন পর্য্যন্ত মিটিতেছিল না। বিশেষতঃ মেয়ে যখন শ্বশুরের সঙ্গে দীর্ঘ তীর্থ ভ্রমণে চলিয়া গেল তখন আর তাঁহার বিস্ময় ও ক্ষোভের সীমা রহিল না। রজনীনাথের সান্ত্বনাবাক্যে তাঁহার কোন আস্থাই হইল না; বলিলেন, "হাঁগা তুমি কি আমায় এরকম করে ছেড়ে দিতে? তাই মনে করে দেখ না!"

বসুমতী ক্রমে স্পষ্টই দেখিতেছিলেন "স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী" বলিয়া শাস্ত্রকারেরা যে একটা ভয়ানক ভুলকে চিরদিন লোকের মনের মধ্যে প্রশ্রয় দিবার সাহায্য করিয়া আসিতেছেন, তাহার বিষময় ফল তাঁহার সংসারে কি রকম করিয়া ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। জামাই কখনও মা' বলিয়া কথা কহিল না, মেয়ের উপর তাহার টান তো কিছুই নাই তার উপর হরিহরি, সে আবার লক্ষপতির পরিবর্ত্তে একজন দরিদ্র ভিক্ষুকে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল! তখন যদি রজনীনাথ নীরদের সহিত মেয়ের বিবাহ দেন তাহা হইলে এসব নাটকীয় অভিনয়ের অংশ আর তাঁহাদের গ্রহণ করিতে হয় না।

রজনীনাথ যখন ফিরিয়া আসিলেন, বসুমতী তাঁহাকে কি বলিতে গিয়া তাঁহার ঝড়ের আকাশের মতন শুব্ধ গম্ভীর মুখের

দিকে চাহিয়াই থমকিয়া গিয়া চুপ করিলেন। শান্তি তখনও মাটিতে বসিয়াছিল তাহার চোখের জল তখনও ফুরায় নাই। রজনীনাথ বলিলেন "যা শুনলুম তাতে বেশ দেখচি তুমিই দোষী। লোকের কথাই তোমার বড় হলো! একবার ভেবে দেখলে না যে তোমার এই ব্যবহার তোমার বাপকে কতখানি আঘাত করবে—তুমি আমার সেই শান্তি! যাক্ সবি আমার কপাল, আমার সবি সহ্য করতে হবে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত না তোমার শ্বশুর তোমায় ক্ষমা করচেন সে পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে তোমাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই,—

শান্তির চোখের জল মুছাইবার চেষ্টা করিতে করিতে বসুমতী তীব্রভাবে ফিরিয়া মুহূর্ত্ত সংযত হইয়া ব্যাকুলভাবে কহিলেন; "অমন কথা বলোনা; দোষ তোমার গোঁয়ার গোবিন্দ জামায়ের। ওরে কেন শুধু শুধু ওসব নিষ্ঠুর কথা বলচো—তুমিতো এমন নিষ্ঠুর ছিলে না।"

রজনীনাথ ঈষৎ চঞ্চলভাবে বিছানার উপর বসিয়া পড়িলেন। "সত্যই কি তিনি নিষ্ঠুরতা করিতেছেন? কাহার প্রতি সে নিষ্ঠুরতা? যে তাঁহার জীবনের আধখানা জুড়িয়া রহিয়াছে, তাহার প্রতি। না নিষ্ঠুরতা নয়, লোকে ইহাকে যেমন ইচ্ছা শব্দ দ্বারা বিশেষিত করুক—তিনি জানেন তিনি কর্ত্তব্য পরায়ণ পিতা; সন্তানের ভুলের, অন্যায়ের প্রশ্রয় দিয়া তাহাদের সর্ব্বনাশের পথে [illegible] পিতৃ কর্ত্তব্য নয়।

[illegible]মতী স্বামীকে একটু চিন্তিত দেখিয়া আশ্ব[illegible] হইয়া বলিলেন "এখন এরা থাক; তুমি তুমি না [illegible] একদিন লক্ষ্মীপুরে গিয়ে—

"না আমি হেমকে বলে এসেছি কাল সকালের ট্রেনেই এরা বাড়ি ফিরে যাবে।"

পাশের ঘরের খোলা দরজার মধ্য দিয়া সন্থনিদ্রোত্থিত সুপ্রকাশ অনাবৃত দেহে অসংযত বস্ত্রে উঠিয়া আসিল। তাহার বড় বড় চোখের চঞ্চল কালো তারা ও দীর্ঘ পল্লবগুলি ঘুমে জড়াইয়া রহিয়াছে, স্থূল শুভ্র স্কন্ধের কাছে কালো চুলের গোছাগুলিকেও যেন নিদ্রিত সর্পশিশুর মতন দেখাইতেছিল। "বাবা দিদি কি এসেচে? আমি দিদিকে যেন স্বপ্নে দেখছিলুম। ঐতো দিদি—" বলিতে বলিতে হঠাৎ দিদির উপরে দৃষ্টি পড়ায় বিস্ময় মিশ্রিত আনন্দধ্বনি করিয়া বালক দিদির কাছে ছুটিয়া গিয়া দুইহাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। নিদ্রাবিদূরিত কালো চোখ আহ্লাদে উজ্জ্বল করিয়া সাগ্রহে ঈষৎ অভিমান প্রকাশ করিল। "হ্যাঁ দিদি চুপি চুপি না এসে আমায় কেন আগে থেকে লিখলিনে ভাই, তা হলে তো আমি কক্ষণো ঘুমতুমনা, নিশ্চয়ই তোকে ইষ্টিসান থেকে আনতে যেতুম—" রজনীনাথ আদেশ করিলেন "সুকু তুমি এখন দিদির কাছে যেওনা নিজের বিছানায় যাও—"

চমকিয়া শান্তি তাহার বক্ষলগ্ন স্নেহের ভাইটিকে ছাড়িয়া দিল, সাশ্চর্য্যে বালক দিদিকে পরিত্যাগ করিয়া বিস্ময়বিস্ফারিত চক্ষে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু তখন তাঁহার মুখের এমন একটা ভাব ছিল যাহা দেখিয়া আদুরে নির্ভীকছেলে সুপ্রকাশও ভয় পাইল। সেই অলঙ্ঘ্য আদেশের বিরুদ্ধে একটিমাত্র প্রতিবাদের শব্দ উচ্চারণ করিতে সাহসহীন সুকু ছলছল চক্ষে একবার দিদির অশ্রুহীন চোখের পানে চাহিয়া দেখিল—দিদির

মুখে হাসি নাই, চোখের দৃষ্টি নত, মুখ এমন ম্লান যে পূর্ব্বে কখনও এ রকম সে দেখে নাই। মৃদু অনিচ্ছুক পদে সে চলিয়া গেল; কিন্তু পাশের ঘর হইতে তাহার রোদনের ফোঁপানির শব্দ আসিতে কোন বাধা পাইল না। এবার শান্তি হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল, মুখ তুলিয়া দৃঢ়ভাবে সে পিতার দিকে চাহিয়া বলিল "বাবা আর কারু সঙ্গে আমায় তাহলে লক্ষ্মীপুরে পাঠিয়ে দিন, নাহলে" হেমেন্দ্রের সহিত পথে বাহির হইবার সাহস তাহার নাই একথা সে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও বলিতে পারিতেছিল না। স্বামীকে পিতার চক্ষে মসিবর্ণে রঞ্জিত করিয়া তুলিতে কষ্টের চেয়ে লজ্জা অনেকখানি বেশি ছিল। তা ভিন্ন সে স্বামীকে এইটুকু পর্য্যন্ত বিশ্বাস করে না দেখিয়া তাহার পিতাই বা কি মনে করিবেন? তাই সে তাহার মনের আতঙ্ক স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিতে না পারিয়া কথাটা অসমাপ্ত থাকিতেই মাথা নীচু করিল। রজনীনাথ একটু চঞ্চল হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "তাকি হয়, হেমও ফিরে যাক। দোষ সত্যি সত্যি ওঁরিই তো! ওকে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। দেখ মা অনেকখানি ভেবে চলতে হয়—"

"জামাই বাবু বলচেন যেতে হয়তো এই চারটের টেরেণে যাওয়াই সুবিধে"। এই বলিয়া মোক্ষদা গৃহে প্রবেশ করিল।

বসুমতী ধড়মড়িয়া উঠিয়া পড়িয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন "সে আবার কি কথা! যেতে হয় বিকেলে যাবে, এই রাত্তিরে না খাওয়া না ঘুমন, এখন কোথায় যাবে? যাতো রে শিগ্যির করে তোলা উনানটা ধরিয়ে দুটি ময়দা মাখ্‌গে, বামুনদিকেও উঠিয়ে দিগে, আমিও যাচ্ছি। কপির একটা ডাল্‌না আর খানকতক আলু বেগুন ভাজা লুচিস্। আর কিছু কাজ নেই অনেক দেরি হয়ে যাবে।"

মোক্ষদা চলিয়া গেল ও একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল "জামাইবাবু বল্লেন এই ভোর রাত্তিরে কি খাওয়া যায়, মাকে ওসব করতে বারণ কর। এই টেরেণে যেতেই হবে। আবার কাল নাহোক পরশু তিনি এইখানেই তো আসচেন, দেরি হলে মিথ্যে একটা লোক জানাজানি হবে বৈতো নয়—"

জামাতার সুমতি দেখিয়া রজনীনাথের মুখের কঠিনভাব অনেকটা কমিয়া আসিল। হেমেন্দ্র তবে নিজের অন্যায়টা বুঝিতে পারিয়াছে! শান্তির একটু কাছে আসিয়া বলিলেন "তবে সেই ভাল, দেরি করে তাহলে আর কাজ নেই। শান্তি এবার যেন তোমায় তুচ্ছ বিষয়ে কর্ত্তব্য ত্যাগ করতে না দেখি,"—শান্তি মাটিতে পিতামাতার পায়ের কাছে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বসুমতী তাহাকে দুইহাতে বুকে চাপিয়া ধরিয়া কপালে চুম্বন করিলেন, রজনীনাথ মুখ ফিরাইয়া একমুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া থাকিয়া খাটের পিছনের জানলাটা খুলিবার জন্য চলিয়া গেলেন। মাহুত যেমন করিয়া অনিচ্ছুক হস্তীকে অঙ্কুশাঘাতে ফিরায় তেমনি করিয়া প্রবল ইচ্ছাকে তাঁহার রোধ করিতে হইল। শান্তি মায়ের বুকে একবারটি মাথা রাখিয়া একমুহূর্ত্তকাল স্থিরদৃষ্টিতে তাঁহার আরক্ত মুখের পানে চাহিয়া দেখিল, তারপর আস্তে আস্তে সেই স্নেহবন্ধন হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া সকালবেলাকার ম্লান

শুকতারা যেমন তাহার সবটুকু জ্যোতিঃ একেবারে উষার নবীন কিরণালোকের মধ্যে নিঃশেষ করিয়া ঢালিয়া দিয়া ঘননীলিমার মাঝখানে নিঃশব্দে মিলাইয়া যায় তেমনি করিয়া নীরবে সে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। তাহার চোখে তখন আর জলের রেখাটুকুও দেখা যাইতেছিল না, স্থিরপ্রতিজ্ঞার একটি দৃঢ়তা সে যেন পিতার নিকট হইতে তাঁহার মৌন আশীর্ব্বাদস্বরূপ সেই মুহূর্ত্তে লাভ করিয়াছিল, বেদনা ও লজ্জার বিহ্বলতা দূরে ফেলিয়া সে স্থিরপদে ফিরিয়া গেল। বসুমতী দুঃখে অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিলেন; রুদ্ধস্বরে বলিলেন "তখনি আমি বলেছিলুম ওখানে শান্তির বিয়ে দিও না, তাতো তুমি শুনলে না। এমনি করে মেয়েকে আমার ঐ হেমই দেখছি খুন করবে, মাগো বাছা আমার এমন গোঁয়ারের হাতেও পড়লো!"

মোক্ষদা দ্বারের নিকট গিয়া ফিরিয়া আসিয়া চুপে চুপে সাবধান করিয়া দিল; "চুপ করো মা জামাইবাবু বাইরে রয়েচেন।"

রামতনু লাহিড়ী।

রামতনু লাহিড়ী ও তদানীন্তন বঙ্গীয় সমাজ। শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ।

Ramtanu Lahiri Brahman and reformer—from the Bengali of Sivanath Sastri by Sir Lethbridge K. C. I. E.

বাংলা সাহিত্যে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রীর নামের নূতন করিয়া পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস লেখক শাস্ত্রী মহাশয়ের ভাষার মধ্যে এমন একটা কমনীয় বৈচিত্র্য ও সারল্য আছে যে, তাঁহার রচনা পাঠ করিবার সময় মনে হয় যেন কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মুখে মনোরম কাহিনী শুনিতেছি। ভাষার যেমন মিষ্ট সুর, তেমনি কেমন একটী স্নেহের প্রবাহ আগাগোড়া বহিয়া গিয়াছে। তাঁহার প্রত্যেক কথাটি একেবারে মর্ম্মবিদ্ধ করে। মতভেদ সত্ত্বেও তাঁহার সমস্ত কথাটুকু শুনিবার প্রলোভন ত্যাগ করা সম্ভব পর বা সহজসাধ্য হইয়া উঠে না। তাঁহার রচিত রামতনু লাহিড়ী ও তদানীন্তন বঙ্গীয় সমাজ বাঙলা সাহিত্যে একখানি অভিনব গ্রন্থ! লেখকের বিচিত্র তুলিকায় বাঙলার পুরাতন সমাজের ছবি এমন সুন্দর ফুটিয়াছে যে নির্নিমেষ নয়নে তাহার প্রতি দুই দণ্ড চাহিয়া থাকিতে হয়। বহিখানি উপন্যাস অপেক্ষাও হৃদয়গ্রাহী। সেই গ্রন্থের একখানি ইংরাজী অনুবাদও প্রকাশিত হইয়াছে—অনুবাদক স্যার রোপার লেথব্রিজ কে, সি, আই, ই।

দুইখানি গ্রন্থই লোকসাহিত্যে বিশিষ্ট সম্পদ স্বরূপ! আমরা এই দুই খানির অবলম্বনে স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের জীবন সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিব।

রামতনু লাহিড়ী আত্মপ্রকাশের একান্ত বিরোধী ছিলেন। নিষ্কামী পুরুষের ন্যায় তিনি নীরবে আপনার কর্ত্তব্য করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার সমসাময়িক মহাপুরুষগণ দেবেন্দ্রনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র, মধুসূদন, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, যেন নেতা হইবার জন্যই জগতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। প্রতিভায় ইঁহারা শ্রেষ্ঠ ছিলেন সন্দেহ নাই, কেহ ধর্ম্মালোচনায় কেহ বা সমাজসংস্কারে আবার কেহ বা

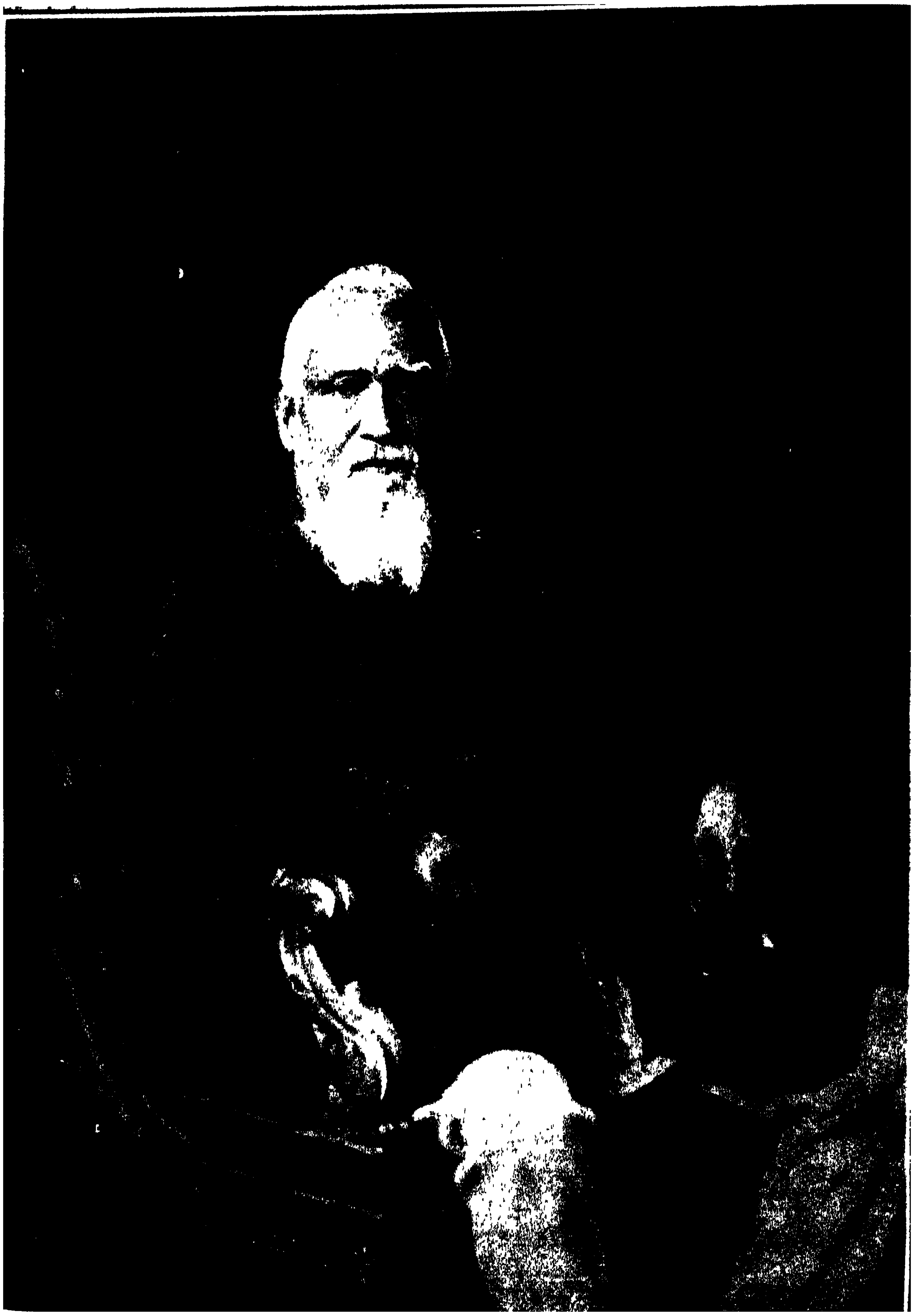

রামতনু লাহিড়ী

সাহিত্য সাধনায় আপনার নাম সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু নব্যবঙ্গের জ্ঞানোন্মেষে ও সুবিচারশক্তি প্রবুদ্ধ করিবার বিষয়ে রামতনু বাবুর প্রভাব সামান্য ছিল না। অথচ যশের লালসা রামতনুর চিত্তে এতটুকু রেখাপাত করিতে পারে নাই। সংসারে

থাকিয়া আদর্শ গৃহীর ন্যায় জীবন যাপন তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। প্রকৃত মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশে রামতনুর চরিত্র সমুজ্জ্বল।

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে নদীয়ার অন্তঃপাতী বারুই-পোতা গ্রামে, মাতুলালয়ে রামতনু বাবু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা রামকৃষ্ণ লাহিড়ী সম্ভ্রান্ত কুলীনবংশোদ্ভব ও সাতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। রামতনুর পূর্ব্বপুরুষগণ সহস্র প্রলোভনের মধ্য দিয়া কর্ত্তব্যপরায়ণতা, সত্য-নিষ্ঠা ও পরোপকারিতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার মাতা জগদ্ধাত্রী দেবী পিতৃগৃহের অতুল সুখস্বচ্ছন্দ্য তুচ্ছ করিয়া দরিদ্র স্বামীর মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত পতিগৃহে হৃষ্টচিত্তে অনভ্যস্ত শারীরিক শ্রমের দ্বারা সমুদয় গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া প্রতি-বেশীবর্গ তাঁহাকে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী নামে অভিহিত করিতেন। এই মহৎকুলে জন্মগ্রহণই রাম-তনুর আদর্শ চরিত্র লাভের কারণ।

দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে পাঠশালার পৈশা-চিক নির্য্যাতন হইতে রামতনু মুক্তিলাভ করেন। কৃষ্ণনগরের তদানীন্তন পঙ্কিল সমাজ এবং বিশেষতঃ স্থানীয় কলুষিত চরিত্র বালকদিগের কুপ্রভাব হইতে পুত্রকে বিচ্ছিন্ন রাখিবার জন্য রামতনুর পিতামাতা অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে রামতনুর অগ্রজ কেশবচন্দ্র জনক জননীর ব্যগ্রতা দেখিয়া কনিষ্ঠকে কর্ম্মস্থল আলিপুরের সন্নি-কটস্থ চেৎলার বাসাতে আনিলেন। চেৎ-লার নিকটে ইংরাজী বিদ্যালয় না থাকাতে কেশবচন্দ্র প্রাতে ও সন্ধ্যায় তাঁহাকে আরবী পারসী ইংরাজী হস্তলিপি লিখন প্রণালী শিখাইতেন। অবশেষে প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা ডেভিড হেয়ার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের আনুকূল্যে হেয়ার সাহেব রামতনুকে বিনা বেতনে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া লন। রামতনু কখনও হেয়ারের এই মহানুভবতা বিস্মৃত হন নাই। উত্তরকালে তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার পরিচিত বন্ধুবর্গকে হেয়ারের স্মৃতি রক্ষার জন্য অনুরোধ করিতেন। বৃদ্ধাবস্থায় চলৎশক্তিহীন হইলেও কলেজ-স্কোয়ারে মৃতগুরুর, বার্ষিক স্মরণসভায় শিবিকারোহণে উপস্থিত হইতেন। কেশবচন্দ্র রামতনুকে গৌরমোহনের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া চেৎলায় ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু তথায় তাঁহার বন্ধুবর্গের কুরুচিপূর্ণ আলাপ বালকের নীতিশিক্ষার পক্ষে যথেষ্ট অন্তরায় ছিল। তদ্ভিন্ন রামতনুকে সর্ব্বদা রন্ধন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হইত বলিয়া তিনি পাঠের প্রতি সবিশেষ মনোযোগ দিতে পারিতেন না। এই সকল অসুবিধা কেশব-চন্দ্রের শ্রবণগোচর হইবামাত্র তিনি কনিষ্ঠকে শ্যামপুকুরে তাঁহার সম্পর্কীয় রামকান্ত খাঁ মহাশয়ের ভবনে রাখিয়া দিলেন। খাঁ মহা-শয়ের পত্নী রামতনুকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। এখানে আসিয়া রামতনু তাঁহার সহপাঠী দিগ-ম্বর মিত্রের ভবনে যাতায়াত করিতেন। ভবিষ্যতে দিগম্বর বাবু রাজা ও C. S. I উপাধি পাইয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। দিগম্বরের জননী তাঁহার পুত্রের সহাধ্যায়ীকে সস্নেহে সদুপদেশ প্রদান করিতেন।

১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে হেয়ার সাহেবের স্কুল হইতে বৃত্তি লাভ করিয়া রামতনু হিন্দু কলেজের চতুর্থ শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। এখানে সুপ্রসিদ্ধ রামগোপাল ঘোষ,

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মজুমদার প্রভৃতি তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের সুহৃদগণ

উক্ত কলেজের বিভিন্ন শ্রেণীতে পাঠ করিতে-ছিলেন। সেই সময় রামতনুর শ্রেণীতে

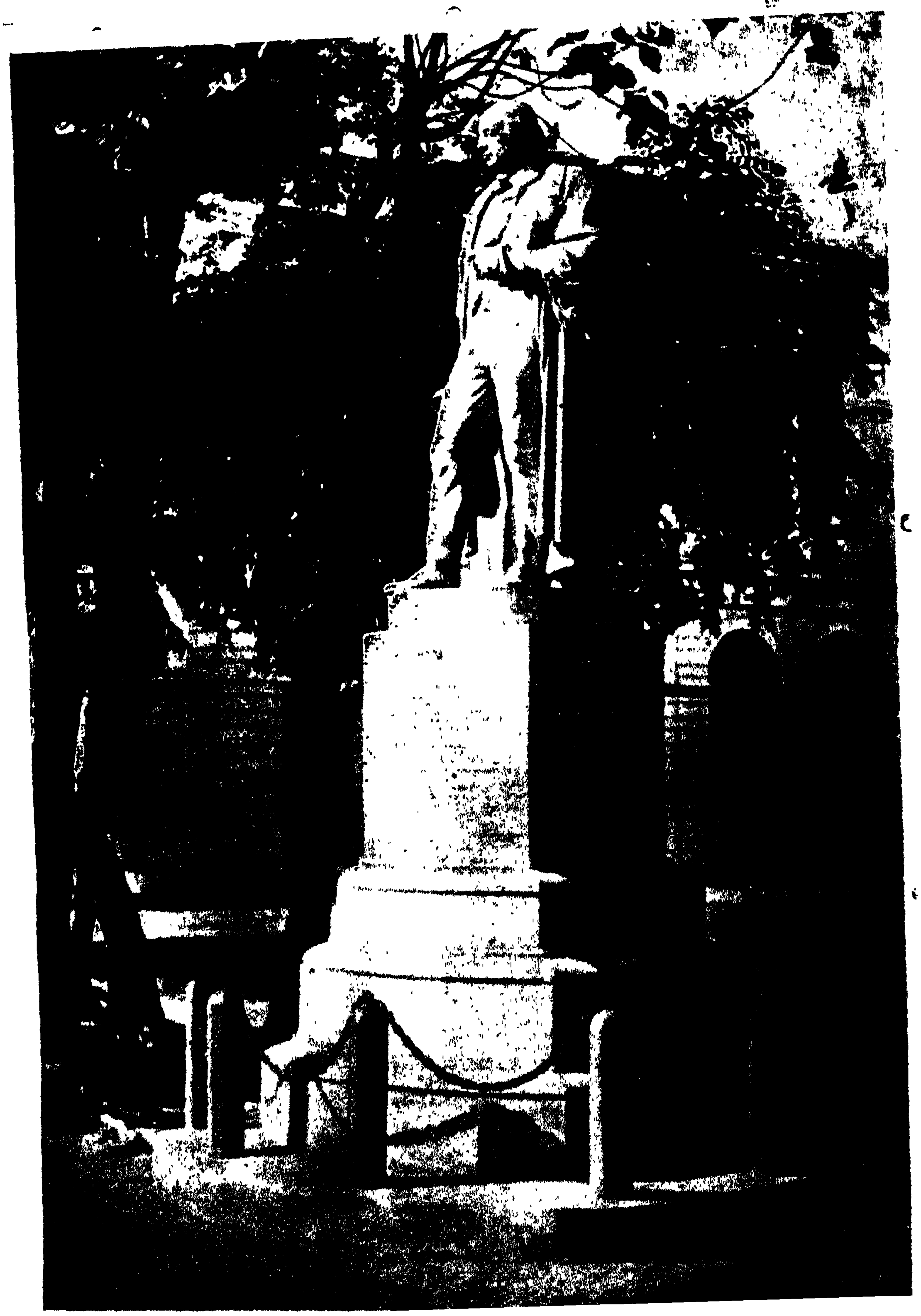

কলেজ স্কোয়ারে স্থিত ডেভিড্ হেয়ারের প্রতিমূর্ত্তি।

অসামান্য প্রতিভাবান (Henry Vivian Derozio) হেন্‌রি ভিভিয়ান ডিরোজিও

নামক একজন ফিরিঙ্গী যুবক অধ্যাপনা করিতেন। নব্যবঙ্গের উপর এই অসাধারণ

শক্তিশালী পুরুষের প্রভাবের সীমা ছিল না। তাঁহার পূর্ব্বে বা পরে এমন ভাবে ছাত্রদের জীবন নিজের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন করিয়া কেহই গঠিত করিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ বঙ্গের জ্ঞান ও নীতির ইতিহাসে তিনি একটি সম্পূর্ণ নূতন যুগ আনিয়াছিলেন। রামতনু, রামগোপাল, কৃষ্ণমোহন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ চরিত্রের ভিত্তির মূলে ডিরোজিও। চতুর্থ শ্রেণীতে শিক্ষকতা করিলেও বিদ্যালয়ের প্রায় সকল বালকের সহিতই ডিরোজিও পরিচিত ছিলেন। এবং অপরাহ্নে রামগোপাল, রামতনু প্রভৃতি ছাত্রবৃন্দ ডিরোজিওর স্নেহে আকৃষ্ট হইয়া গুরুগৃহে পানাহার ও বিবিধ প্রসঙ্গের আলোচনা করিতেন।

সত্যের উপাসনা এবং স্বাধীন চিন্তার বিকাশ ডিরোজিওর জীবনের আদর্শ ছিল। ছাত্রদিগের প্রাচীন বিশ্বাস ও সংস্কারের অযৌক্তিকতা তিনি এরূপ সরল ভাবে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতেন যে তাহাদের চক্ষে ডিরোজিও অভ্রান্ত মহাপুরুষের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। কিন্তু ইহার একটি কুফল হইল এই যে, যাহা কিছু প্রাচ্য তাহাই হেয় এবং যাহা প্রতীচ্য তাহাই সাদরে গ্রহণীয় এইরূপ একটি ধারণা ছাত্রদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া গেল। মেকলের কথামত তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "A single shelf of European books is worth the whole native literatures of India & Arabia. হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটি ছাত্র প্রকাশ্য সভায় আপনার মত ব্যক্ত করিলেন "পৃথিবীতে যদি কোন জিনিসকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিত, সে হিন্দু ধর্ম্ম।" রামতনুও এই প্রতীচ্য উপাসনার প্রবল স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিলেন। সুরাপান ও সমাজনিষিদ্ধ অন্যান্য ক্রিয়া তখন তাঁহার নিকটও নিন্দনীয় ছিল না।

ফলতঃ ডিরোজিওর শিষ্যত্ব গ্রহণ রামতনুর জীবনে একটি স্মরণীয় ঘটনা। সেই দিন হইতে তাঁহার বহুদিনের সঞ্চিত অন্ধ বিশ্বাসের উপর ধীরে ধীরে যে আঘাত পড়িতে আরম্ভ হইল তাহার ফলে তাঁহার জীবন সম্পূর্ণ নূতন পথ গ্রহণ করিল। হিন্দুসমাজের সংকীর্ণতা চূর্ণ করিয়া বিভিন্ন জাতির সহিত পানাহার করিতে তাঁহার উৎসাহের সীমা ছিলনা।

শিক্ষকতার যশের জন্য রামতনু তাঁহার গুরুর নিকট বহুল পরিমাণে ঋণী এবং তাঁহার ছাত্রদের প্রতি যত্ন ও স্নেহ ডিরোজিওর জীবনের অনুকরণ মাত্র। ডিরোজিওর সত্যানুরাগ রামতনুর জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে উজ্জ্বল ভাবে প্রতিফলিত।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে রামতনু কলেজ হইতে সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া ৩০৲ টাকা বেতনে হিন্দুকলেজের শিক্ষক নিযুক্ত হন। এই স্বল্প আয়ে তিনি নিজের ও ভ্রাতৃদ্বয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ এবং অনেক নিরাশ্রয় ব্যক্তিকে আশ্রয় দান করিয়াও দেশে পিতামাতাকে সাধ্যমত সাহায্য করিতে লাগিলেন। কনিষ্ঠ ও আশ্রিতদিগের প্রতি তাঁহার যত্নের সীমা ছিলনা। কনিষ্ঠ কালিচরণ বাবুর পরীক্ষার কয়েকমাস পূর্ব্বে চক্ষের পীড়া হওয়ায় রামতনু বাবু প্রতিদিন কলেজের কার্য্যসমাপনান্তে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত ভ্রাতার পাঠ্যগ্রন্থ পড়িয়া তাঁহাকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণনগর কলেজ স্থাপিত হইলে রামতনু বাবু স্কুল বিভাগের দ্বিতীয়

শিক্ষক হইয়া গমন করেন। তৎকালে বঙ্গে প্যারিচরণ সরকার, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, হরগোবিন্দ সেন প্রভৃতি অনেক উপযুক্ত শিক্ষক ছিলেন! কিন্তু পাণ্ডিত্যে তাঁহারা শ্রেষ্ঠ হইলেও অধ্যাপনায় কেহ রামতনুর সমকক্ষ ছিলেন না। রামতনু যেন শিক্ষক

হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিও

হইবার নিমিত্তই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মানবজীবনে শিক্ষকতা অতিশয় দায়িত্বপূর্ণ পবিত্র ও মহৎ কার্য্য এই ধারণা রামতনুর হৃদয়ে চিরকাল বদ্ধমূল ছিল। হিন্দুকলেজের সুবিখ্যাত রিচার্ডসন সাহেব ও ডিরোজিও এঁর জ্ঞানস্পৃহা তাঁহার হৃদয়ে উদ্দীপ্ত করিয়া দিয়াছিলেন রামতনু ছাত্রদের হৃদয়ে সেই বহ্নিই প্রজ্জ্বলিত করিবার প্রয়াস পাইতে

লাগিলেন। কিরূপে মানব হৃদয়ের উচ্চতর ভাবগুলি ছাত্রদিগের মনে অঙ্কুরিত করিয়া দিবেন এই চিন্তায় তিনি অহরহ রত থাকিতেন। ছাত্রদিগকে আয়ত্তাধীন করিবার নিমিত্ত তিনি তাহাদের সহিত মিশিতেন, তাহাদের ক্রীড়াকৌতুকে যোগ দিতেন, নাম, ধর্ম্ম, অভিভাবকের অবস্থা ইত্যাদি প্রত্যেক খবরটি তাঁহার ওষ্ঠাগ্রে থাকিত। গুরু ডিরোজিওর ন্যায় সন্ধ্যাকালে ছাত্রগণ পরিবৃত হইয়া ধর্ম্ম নীতি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা করিতেন। এইরূপে ছাত্রহৃদয় সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়া তিনি তাহাদিগকে ক্রীড়া পুত্তলিকার ন্যায় চালিত করিতেন। যখন কোন শ্রেণীতে ছাত্রগণ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়া অধ্যাপনার ব্যাঘাত ঘটাইত, রামতনুবাবুর উপস্থিতি সে স্থলে নিমেষে শৃঙ্খলা ও শান্তি পুনরানয়ন করিত। ছাত্রেরা তাঁহার সন্তানের ন্যায় ছিল। যাহাতে তাহাদের শিক্ষা সর্ব্বাঙ্গীণ হয়, এবং তাহারা আপনার ও সমাজের কল্যাণ সাধন করিতে পারে, সে বিষয়ে রামতনুবাবুর প্রখর দৃষ্টি ছিল। ছাত্রজীবন যে বালকের সাংসারিক উন্নতি বা অবনতির সোপান এই কথাটি তিনি এমন গভীরভাবে বালকদিগের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দিতেন যে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাহারা তাঁহার উপদেশ ভুলিতে পারিত না। স্বাবলম্বন ও যত্নের দ্বারা প্রত্যেক ছাত্রই আপনার এবং দেশের অশেষ উপকার করিতে পারেন, রামতনুবাবুর এই উপদেশটি উত্তরকালে অদ্ভুত ফল প্রসব করিয়াছিল।

আদর্শ শিক্ষকরূপে রামতনুবাবু চিরকাল বাঙ্গালীর হৃদয়ে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া থাকিবেন। সরল ও চিত্তাকর্ষক করিয়া বুঝাইবার শক্তি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে সম্প্রতি যে Kindergarten বা বস্তুশিক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে, অর্দ্ধশতাব্দীর পূর্ব্বেও রামতনুবাবুর তাহা অগোচর ছিল না। ছাত্রদিগের সৌন্দর্য্যশক্তির উন্মেষের জন্য তিনি Milton, Burns, Campbell প্রভৃতি ইংরাজ কবিগণের গ্রন্থ হইতে স্থানবিশেষ আবৃত্তি করিতেন। তাঁহার পাঠের ঐকান্তিকতা ও তন্ময়তা দৃষ্টে ছাত্রেরাও আত্মহারা হইয়া যাইত। শিক্ষকজীবনের সফলতার অন্তরালে তাঁহার প্রবল জ্ঞানস্পৃহা উল্লেখযোগ্য। শিক্ষণীয় বিষয়গুলি তিনি গৃহে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করিয়া বিদ্যালয়ে যাইতেন। তিনি পড়াইতেন অল্প, কিন্তু অধীত অংশগুলি সম্বন্ধে ছাত্রগণ সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকিত। যদি কোন ছাত্র তাঁহার অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ব্যাখ্যা করিতে পারিত, কিম্বা তাঁহার ভ্রম প্রদর্শন করিতে পারিত, তিনি অতিশয় আনন্দের সহিত ছাত্রসমক্ষে আপন ত্রুটি স্বীকার করিতেন। ছাত্রদিগের অদ্ভুত গুরুভক্তি তাঁহার শিক্ষকতায় সাফল্য লাভের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ। যে কেহ তাঁহার উজ্জ্বল চরিত্রের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বর্গীয় গুরুর গুণাবলী ঘোষণা করিয়াছেন। রামতনু অসামান্য আদর্শচরিত্রবলেই ছাত্রগণের নিকট পুজোচিত ব্যবহার পাইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে উত্তরপাড়ার পণ্ডিতাগ্রগণ্য রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ও স্বর্গীয় কালীচরণ ঘোষের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ১৫০৲ টাকা বেতনে

রামতনুবাবু বর্দ্ধমানের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। এই সময় হইতে জনসাধারণ তাঁহার

সত্যনিষ্ঠা ও মানসিকবলের পরিচয় পায়। সাম্য মতের পোষক ও নিরাকার ভগবানের উপাসক

রাজা প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায়

রামতনু যজ্ঞোপবীতসহ হিন্দুমতানুযায়ী শ্রাদ্ধ করিতে গিয়া জনৈক বালকের বিদ্রূপ আকর্ষণ

করেন। রামতনু আপনার ভ্রম বুঝিলেন; বিশ্বাস ও কার্য্যের মধ্যে বিসদৃশতা লক্ষ্য

করিয়া উপবীত বর্জ্জন করিলেন। অচিরে বর্দ্ধমান তুমুল আন্দোলনে বিক্ষোভিত হইয়াছিল। রজক, ক্ষৌরকার, দাসদাসী, একে একে সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। রামতনু এ বিপদে হিমাচলের ন্যায় অচল ছিলেন, বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রকাশ্য দিবালোকে প্রফুল্লচিত্তে ভৃত্যের অভাব স্বকীয় বাহুবলে পূরণ করিয়া লইতেন। জল বহা কাঠ কাটা বাজার করা প্রভৃতি ভৃত্যের সমস্ত কার্য্যই তিনি নিজে করিতে লাগিলেন; কোন দিন ক্লান্তি বোধ করিতেন না। সাধারণের অসহ্য নির্য্যাতনে তিনি কখনও বিন্দুমাত্র বিরক্তি বা বিদ্বেষ প্রকাশ করেন নাই।

কৃষ্ণনগরে লাহিড়ী মহাশয়ের উপবীত ত্যাগের কথা প্রচারিত হইল। রামতনুর বৃদ্ধ পিতা শোকে মর্ম্মাহত হইলেন। তদুপরি প্রতিবেশীর তীব্র লাঞ্ছনা বৃদ্ধের শোকতপ্ত বক্ষে দারুণ কশাঘাত করিতে লাগিল। রামতনু শুনিলেন। প্রাণবিনিময়েও যদি পিতার শোকোপশম করিতে পারিতেন তাহা হইলে তিনি অকাতরে প্রাণবিসর্জ্জন করিতেন। কিন্তু এ ত প্রাণের সহিত সংঘর্ষ নয়, এ যে সত্যের সহিত সংঘর্ষ! সত্যনিষ্ঠা যে তুচ্ছ প্রাণের অনেক উচ্চে! যে সত্যানুরাগ তাঁহার জীবনের ধ্রুবতারা, যাহার উজ্জল আলোক অম্লান ও অক্ষুণ্ণ হইয়া জীবনপথের চিরন্তন সহচর হইয়াছে, ডিরোজিও যাহা চিরকালের সুবর্ণ অক্ষরে তাঁহার হৃদয়ে খোদিত করিয়া রাখিয়াছেন, যাহা তাঁহার মজ্জায় মজ্জায় অনুপ্রবিষ্ট—সমগ্র পৃথিবীর বিনিময়েও রামতনু আজ তাহাকে ত্যাগ করিতে অক্ষম! রামতনু উপবীত পুনর্গ্রহণ করিতে পারিলেন না। নিজের বিশ্বাসমত কার্য্য করিতে গিয়া যিনি পৃথিবীর বিরুদ্ধে নির্ভীকভাবে দাঁড়াইতে পারেন, ঘনীভূত বিপদের মেঘ ভ্রূকুটির সহিত হৃদয় আচ্ছন্ন করিবার উদ্যোগ করিলে যিনি সপ্তরথীবেষ্টিত অভিমন্যুর ন্যায় বীর ও প্রশান্তচিত্ত থাকিতে পারেন তাঁহার অমানুষিক মহত্ত্বের কথা কে অস্বীকার করিবে? তাঁহার সহিত আমাদের অনেক মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার গুণরাজির প্রতি উদাসীন হইলে মনের সঙ্কীর্ণতাই প্রকাশ পায়।

সত্যের প্রতি অসীম অনুরাগ তাঁহার জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে প্রতিফলিত। মদ্যপায়ী ইংরাজজাতিকে জ্ঞান ও সভ্যতার উচ্চতম শিখরে আসীন দেখিয়া রামতনু মদ্যপানকে দুষ্ক্রিয়া বিবেচনা করিতে পারিতেন না। কিন্তু যেদিন তিনি অতিরিক্ত সুরাপানজনিত বিকৃত মস্তিষ্ক কোন যুবকের নির্লজ্জ আচরণ প্রত্যক্ষ করিলেন সেই দিন হইতে তিনি সুরাপান ত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন। প্রিয়বন্ধু রামগোপাল ঘোষকে ডাকিয়া কহিলেন, "দেখ রামগোপাল আমাদের সুরাপান দেখিয়া বাড়ীর ছেলেরা খারাপ হইয়া যাইতেছে এস আমরা সুরা পান ত্যাগ করি।"

রামতনু চরিত্রের আর একটি উজ্জল দিক আমরা এখনও লক্ষ্য করি নাই। সেটি তাঁহার ভগবদ্ভক্তি। "Never take the Lord's name in vain". ভগবানের নাম কখনও বৃথা লইও না, এই কথাটি তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। ভগবানের নাম উচ্চারণ করিলেই

এক অপূর্ব্ব ভাবাবেশে তাঁহার অশ্রুপ্রবাহ গণ্ডদেশ সিক্ত করিত। ভগবানের গুণকীর্ত্তনের

সময় প্রিয়তম বন্ধুরও লঘুচিত্ততা বা চপলতা তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিত। ভবিষ্যতে

রামগোপাল ঘোষ

সেই লোককে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কোন কার্য্যে আহ্বান করিতেন না। ভক্তদিগের প্রতিও তাঁহার অশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল। এবিষয়ে

তিনি কোন সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতেন না। হিন্দু, ব্রাহ্ম, ক্রিশ্চিয়ান সকল সম্প্রদায়ের লোককে তিনি সমভাবে

শ্রদ্ধা করিতেন। এই উদারতাটুকু রামতনু চরিত্রের বিশেষত্ব এবং ইহাই তাঁহাকে অপর সাধারণ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছে। ভগবানের করুণার প্রতি তাঁহার অবিচলিত বিশ্বাস ছিল। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে পেনসন গ্রহণ করিবার পর তিনি সাংসারিক সুখোপভোগে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিলেন। উপযুক্ত কন্যা ও পুত্রদ্বয়ের অকাল মৃত্যু, জামাতার আত্মহত্যা, প্রাণপ্রিয় কনিষ্ঠের তিরোধান কিছুই তাঁহার বিশ্বাসকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে সক্ষম হয় নাই। তাঁহার কন্যার মৃত্যুতে তিনি লিখিয়াছিলেন, "তোমরা শুনিয়া সুখী হবে যে ইন্দুমতীর রোগযন্ত্রণা আর নাই, সে এখন বেশ সুখে আছে।" যদি কেহ তাঁহার পুত্রকন্যাবিয়োগের জন্য দুঃখপ্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে তিনি বলিয়া উঠিতেন, "এর জন্য আপনারা দুঃখ কচ্ছেন কেন? ভগবান যে এই কয়টি রাখিয়াছেন, তাহাই কি যথেষ্ট নয়?"

ভগবানের প্রতি কি অপূর্ব্ব অসাধারণ বিশ্বাস! রামতনুর জীবনী আলোচনা করিলে এই শিক্ষাটি আমাদের হৃদয়ে জাগরূক থাকে যে পৃথিবীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে হইলে অসাধারণ প্রতিভা বা অর্থের কোন প্রয়োজন হয় না। অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিয়া চরিত্রবলে মনুষ্য আপনাকে ও স্বজাতিকে কতদূর উন্নীত করিতে পারে রামতনু লাহিড়ীর জীবন তাহারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত!

রামতনু বাবুর জীবনের ছোট ছোট অনেক গল্পে তাঁহার চরিত্র-মাহাত্ম্য পরিস্ফুট হইয়া উঠে। বাহুল্যভয়ে আমরা এস্থলে তাহার আবৃত্তি হইতে বিরত রহিলাম! ভবিষ্যতে তাহা প্রকাশের ইচ্ছা রহিল!

শ্রীরাসবিহারী মুখোপাধ্যায়।

বর্ষাগমে।

পরিব্যাপ্ত নীলিমায় সম্মুখ আকাশে
নির্ম্মল প্রসন্ন-দৃষ্টি সূর্য্যরশ্মি হাসে
বরদাত্রী অভয়ার মত; দূরতর
দিগন্ত সীমায় ঘনকৃষ্ণ মেঘস্তর
নেমেছে প্রান্তরে, যেন স্থান নাহি তার
অপার আকাশে; চমকিছে চপলার
বিহ্বল প্রলয় দীপ্তি ত্রস্ত ক্ষণে ক্ষণে,
উঠিতেছে, পড়িতেছে মত্ত আন্দোলনে
দ্রুমদল, পবনের ভৈরব আক্রোশে।
চেয়ে আছি ব্যাকুল আগ্রহে, রুদ্ররোষে
মেঘপুঞ্জ আবরিবে মঙ্গল কিরণ?
অথবা আনিবে বর্ষা করুণা প্লাবন,
হবে ইন্দ্রধনু মিশি হাসি অশ্রুজল
ব্যাপি সীমাহীন নভ স্পর্শি ধরাতল!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

প্রবাসী।

গ্রাম্যস্কুলবিদ্যা শেষ করিয়াই প্রবাসীর দলে ঢুকিলেও গত পাঁচ ছয় বৎসর যাবৎ প্রকৃত প্রবাসী হইয়া দাঁড়াইয়াছি। আজ প্রবাসী জীবনের কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা পাঠকগণের নিকট নিবেদন করিব। প্রবাসী জীবনে শান্তি নাই। নিরবচ্ছিন্ন চিন্তাস্রোত প্রবাসীর হৃদয়ে কিরূপ অশান্তির উদ্রেক করে তাহা যাঁহারা বঙ্গের আবহাওয়ায় পরিবর্দ্ধিত হইয়াছেন এবং গৃহের স্নেহ-মমতা বিচ্ছিন্ন করিয়া ভিন্ন প্রদেশে না গিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে ধারণা করা সুকঠিন। সাময়িক উত্তেজনায় অথবা উদরান্নের সংস্থানে কখন কখন আমরা স্থানান্তরে যাইতে উৎসুক হইয়া উঠি বটে, কিন্তু কতিপয় দিবসেই সে উত্তেজনা সে ঔৎসুক্য একেবারে নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। এমন কি তখন যেন মনে হয় আত্মীয় স্বজনপরিবৃত হইয়া উদরান্নের তাড়না সহ্য করাও শতগুণে শ্রেয়ঃ।

যখন বিদেশযাত্রা উদ্দেশে প্রস্তুত হইতেছিলাম তখন যেন কোনো দৈবশক্তি হৃদয়ে বল সঞ্চার করিয়া দিতেছিল। আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবের ভয় প্রদর্শন, এবং অনুনয় বিনয় উপেক্ষা করিয়া সপ্তরথীর ন্যায় অসীম সাহসে ভর করিয়া আমরা সাতজন কলিকাতার ঘাটে জাহাজে চড়িলাম। আত্মীয় স্বজন সাশ্রুলোচনে ডিঙ্গির সাহায্যে খিদিরপুর পর্য্যন্ত আমাদের জাহাজের অনুগমন করিয়াছিলেন। আমরা সকলেই নূতন সাহেব সাজিয়া অতি স্ফূর্ত্তির সহিত লম্ফ ঝম্প দিয়া জাহাজে উঠিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু জাহাজ যখন কলিকাতার সীমানা অতিক্রম করিয়া মেটেবুরুজ গার্ডেনরিচের নিকট গিয়া দ্রুত গতিতে সাগর উদ্দেশে ছুটিল তখন চাহিয়া দেখিলাম আমার ন্যায় সকলেই নিঃশব্দে ম্লানবদনে গালে হাত দিয়া বসিয়া আছেন। চক্ষু সকলেরই রক্তবর্ণ; কাহারও কাহারও দুই এক ফোঁটা অশ্রুজলও কপোল বাহিয়া পড়িতেছিল। সমস্ত দিন কত কি নূতন নূতন দৃশ্য দৃষ্টি পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল কিন্তু অন্তরে অন্তরে সকলেই মায়ার তাড়নায় জর্জ্জরিত হইতেছিলাম বলিয়া, কিছুই ভাল করিয়া দেখা হইল না। সন্ধ্যার প্রাক্কালে জাহাজ সমুদ্রে পড়িল, তারপর একে একে সকলেই শয্যাগত হইলাম, বলাবাহুল্য দুই দিন অনাহারে অনিদ্রায় শয্যাশায়ী হইয়া সকলেই বিদেশ যাত্রায় ধিক্কার দিয়াছিলাম।

তার পর জাপানে পৌঁছিলে ভাষা এবং আহার্য্য বিভিন্নতায় প্রথম প্রথম এতই অসুবিধা বোধ হইত যে তখন সোনার ভারত কেন ছাড়িয়াছিলাম বলিয়া আরও অনুতাপ জন্মিত। ভাষার অসুবিধা সম্বন্ধে একটী ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত এস্থলে উল্লেখ করি। একদিন জনৈক জাপানী বন্ধুর সহিত রাস্তায় বেড়াইতে বাহির হইয়াছি। স্থানে স্থানে বিজ্ঞাপন পত্রে বড় বড় অক্ষরে "রাইওন" দেখিতে পাইয়া বন্ধুকে উহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন রাইওন অর্থাৎ দন্তমার্জ্জন। তখনই দন্তমার্জ্জনের প্রতিশব্দটী মুখস্থ করিয়া রাখিলাম। অপর এক দিন

বেড়াইতে বাহির হইয়া এক দোকানে দন্তমার্জ্জন কিনিতে গেলাম। সেদিন একাকী। কখন দোকানে কোন জিনিস ক্রয় করিতে যাইলে প্রথমতঃ অভিধান দেখিয়া প্রস্তুত হইয়া যাইতাম। কিন্তু দন্তমার্জ্জনের প্রতিশব্দ জানি বলিয়াই সেদিন অভিধান দেখিবার আবশ্যক আদৌ বোধ করি নাই। দোকানদারের নিকট গিয়া "রাইওন" চাহিলাম, সে অনেক ইতস্তত করিয়া একটা রংয়ের বাক্স বাহির করিয়া দিল। আমি বলিলাম উহা নহে। তার পর দ্বিতীয় ব্যক্তি বুঝিয়াছি বলিয়া এক বাণ্ডিল তুলি বাহির করিয়া দিল। মহাবিপদে পড়িলাম, উপায়ান্তর না দেখিয়া যে ভাবে দন্ত পরিষ্কার করিতে মাজন ব্যবহৃত হইয়া থাকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশে তাহা দেখাইলাম। দোকানদার ঠিক ঠিক বলিয়া চেঁচাইয়া একটি ফ্লুট (বাঁশী) বাহির করিয়া দিল। তাহাতেও সন্তুষ্ট না হওয়ায় অবশেষে দোকানদার আমাকে অন্য এক দোকানে লইয়া গেল। অদৃষ্টক্রমে সে দোকানের সম্মুখ ভাগেই কতকগুলি দন্তব্রুশ সাজান ছিল। উহার একটি হাতে লইয়া যেভাবে ব্রুশের সাহায্যে মার্জ্জন ব্যবহৃত হইয়া থাকে দেখাইতেই দোকানদার তাহা বাহির করিয়া দিল। বলাবাহুল্য আমার এই বিপত্তিতে দুই দোকানেই অনেক লোক জমিয়াছিল। নিষ্কৃতি লাভ করিয়া অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিতে দিতে কলেজ বোর্ডিংয়ে ফিরিয়া আমার সেই বন্ধু প্রবরের নিকট গেলাম। তাঁহাকে টুথপাউডারের জাপানী প্রতিশব্দ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন "হামিগাকি", আমি চমকিয়া উঠিয়া সেই দিনের রাইওনের কথা স্মরণ করাইয়া দিলাম। তিনি বলিলেন রাইওন কোন এক বিশেষ দন্তমার্জ্জনের ট্রেডমার্ক। রাইওন (লায়ন) অর্থাৎ সিংহ মার্কা। জাপানী অক্ষরে লিখিতে এবং উচ্চারণ করিতে লায়ন রাইওন হইয়া দাঁড়ায়। উহাদের ভাষায় "ল" নাই। জাপানী ভাষায় ট ঠ ড ঢ অক্ষর বা উহার উচ্চারণ নাই। উহার পরিবর্ত্তে ত, থ, দ, ধ। ইংরাজী ভাষা হইতে অনুবাদ করা হয় বলিয়া আমার মনে হয় আমাদের সংবাদ পত্র সমূহে তোকিও কিওতো, তোঁগো, ইতো প্রভৃতির পরিবর্ত্তে টোকিও, কিওটো, টোগো, এবং ইটো প্রভৃতি লিখিত হইয়া থাকে। বলাবাহুল্য এরূপ উচ্চারণ জাপানীরা বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

সামান্য বিষয়ে ভাষার জন্য এতটা বিপদে পতিত হইলে কাহার না তখন স্বদেশের কথা মনে পড়ে। জাপানের উত্তর ভাগে সাগালিয়েন দ্বীপের নিকট হোক্কাইদো দ্বীপ। ঐ দ্বীপের রাজধানী ছাপ্পোরো সহর তোকিও সহর হইতে প্রায় ৭৫০ মাইল দূর। জনৈক ভারতীয় বন্ধুর সহিত তথাকার কৃষি-কলেজে পড়িবার জন্য ঐ দ্বীপে গমন করি এবং এক বৎসর কাল তথায় অবস্থান করি, শীতের পাঁচ মাস ঐ স্থান অনবরত ৪।৫ ফুট বরফে আবৃত থাকে। ঐ কয়েক মাস বাড়ী ঘর গাছপালা মাঠ ময়দান পাহাড় পর্ব্বত সমস্তই যেন রজত নির্ম্মিত বলিয়া মনে হয়। শীতের প্রকোপ অতি ভীষণ, জানুয়ারী এবং ফেব্রুয়ারী মাসে কোন কোন দিন তাপ পরিমাণ —২২° ডিগ্রিতে পরিণত হইত। নীচের তলার ঘরে গরম জলে মাথা ধুইয়া উপরে উঠিতে উঠিতেই মাথার জল গলিত চর্ব্বির ন্যায়

জমাট বাঁধিয়া যাইত। স্কুল কলেজ সর্ব্বদাই ষ্টিম ইঞ্জিনের সাহায্যে গরম রাখা হইত। এরূপ প্রদেশে বাস করিতে কোন্ ভারতবাসীর প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে স্বদেশের কথা মনে না হয়?

এই একবৎসর অজ্ঞাত বসবাস বা দ্বীপান্তর বাস সমাপ্তির পর যখন কয়েক বৎসর প্রায় ৩০।৪০ জন ভারতবাসীর সহিত তোকিও সহরে বাস করিতেছিলাম তখনই কি কেহ স্বদেশের কথা ভুলিতে পারিয়াছিলাম? আমার মনে হয় সেই সময়ই স্বদেশের জন্য সকলে আরও ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কারণ সে সময় বঙ্গ বিচ্ছেদ স্বদেশী বয়কট প্রভৃতি আন্দোলনে ভারত আলোড়িত। চিঠিপত্রে এবং খবরের কাগজে জানা যাইত কাহার ভাই জেলে গিয়াছে, কাহার শ্যালক হাজতে আছে, কাহার পিসে মহাশয় জরিমানা দিয়াই অব্যাহতি পাইয়াছেন। কাহার পিতা সরকারী চাকুরী হইতে বরখাস্ত হইয়াছেন, কাহার কোন আত্মীয় পিউনিটিভ পুলিসের ... প্রহারে ক্লিষ্ট হইয়া হাঁসপাতালে আছেন ইত্যাদি। কাযেই অনেক বন্ধু এক সঙ্গে থাকিলেও তখন দেখিতাম যে স্বদেশ ও আত্মীয় স্বজনের জন্য সকলেই নিরতিশয় চিন্তাগ্রস্ত। সাধারণতঃ সপ্তাহে একদিন ভারতের ডাক পাইতাম, উহাও প্রায় রাত্রি ১০টা হইতে ১১টার মধ্যে। নির্দ্দিষ্ট দিনে অনেকেই ডাকের প্রতীক্ষায় থাকিতেন। তার পর ডাক পৌছিলে খবরের কাগজে মোটামুটি ঘটনাগুলি দেখিতে দেখিতেই কোন কোন দিন রাত্রি তিনটা বাজিয়া যাইত। ভারতবাসী পরিচালিত হিন্দুস্থানের প্রায় সকল প্রদেশের প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রই আমরা পাইতাম। এই সকল কারণে দেখিয়াছি যে প্রবাসী জীবনে শান্তি অতি বিরল। যে কর্ত্তব্যের অনুরোধে বিদেশে থাকিতে হয় তাহার দায়িত্ব অতি গুরুতর। তার উপর আবার দেশ ও আত্মীয় স্বজনের চিন্তা!

বৈদেশিক সমাজে যখন আমরা ঘৃণিত জীবজন্তুর ন্যায় বিবেচিত হই এবং বৈদেশিক সংবাদপত্র সমূহ যখন আমাদের দেশের কেবল নিন্দা কুৎসাই গাহিতে থাকে তখন ইচ্ছা হয় না যে সে দেশে ক্ষণকালের জন্যও অবস্থান করি। তখন কি সেই দেশের প্রতি ঘৃণার ভাব এবং স্বর্গাদপি গরিয়সী জন্মভূমির প্রতি প্রীতির ভাব উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে না? জাপানেও আমাদের তেমনি হইত। জাপান আজ বড় হইয়াছে। পৃথিবীর প্রধান প্রধান জাতি উহাদের নিকট মস্তক অবনত করিয়েছে তাই আজ জাপানীরা আমাদের ভারতের কিছুতেই সৌন্দর্য্য দেখিতে পায় না। আজ তাহারা স্তবস্তুতির পরিবর্ত্তে ভারতবাসীর প্রতি কেবল গালি বর্ষণ করিতেই আনন্দ বোধ করে। যে জাপানীরা স্বদেশপ্রেমে মাতোয়ারা এবং যাহারা কাহারও মুখে জাপানের সামান্য কিছু নিন্দা শুনিলেই তাহাকে চিরশত্রু বলিয়া মনে করে, সেই জাপের দেশে অবস্থান কালে তাহাদের মুখে ভারতের নিন্দাবাদ শুনিলে আমাদেরই বা তাহা প্রীতিকর হইবে কেন? এই জন্যই জাপান-জীবনে প্রত্যেক শিক্ষিত প্রবাসী ভারতবাসীর এমন একটি দিনও অতিবাহিত হয় না যেদিন তিনি তাঁহার স্বদেশের বিষয় কিঞ্চিৎ চিন্

না করেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর কোন প্রবাসী ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে অন্যান্য ভারতীয় ছাত্রগণ যখন ষ্টেশনে তাঁহাকে বিদায় দিতে যান তখন প্রত্যেকেরই সেই জাহাজে ভারতযাত্রার ইচ্ছা হয়।

সেই বিদেশে যে কোন অশিক্ষিত ভারত-বাসীকে পাইলেও কত আনন্দ। আমাদের একটা প্রবচন আছে যে "দেশের কুকুর আর বিদেশের ঠাকুর" সমান। এই জন্যই জাহাজে অন্যান্য দেশীয় শিক্ষিত আরোহীদিগকে উপেক্ষা করিয়া ভারতীয় অশিক্ষিত খালাসী-দের সহিত আলাপ করিতেও ঔৎসুক্য জন্মে। আমাদের জাহাজ সাঙ্ঘাই বন্দরে পৌছিলেই তীরে একজন ভীমমূর্ত্তি শিখ প্রহরীকে দেখিয়া তাহার সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছা হইল। নামিবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই দেখিতে পাইলাম যে সেই প্রহরী একজন নির্দ্দোষ চীনা রিক্শওয়ালাকে নির্দ্দয় ভাবে প্রহার করিতেছে। কাযেই তাহার সহিত আলাপের আর প্রবৃত্তি রহিল না। সহরে ঢুকিলাম। স্থানে স্থানে সহরের রাস্তায় এবং বড় বড় বৈদেশিকের কুঠীর দ্বারদেশে সবলকায় এক এক হিন্দুস্থানী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আগ্রহের সহিত প্রত্যেকের নিকট গিয়া দুই এক কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। প্রায় সকলকেই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—ভাই হিন্দুস্থানের কোন প্রদেশে তোমার বাড়ী? কত দিন এখানে আছ? আহারাদি বাদে দেশে কিছু পাঠাইতে পার কি? ইত্যাদি। বলাবাহুল্য দুই একজন বাদে সকলেই গরম মেজাজে এবং তুচ্ছ জ্ঞানে উত্তর দিয়াছিল। একজন কোটপেণ্টলুন এবং টুপী পরিহিত হিন্দুস্থানীকে মিউনিসিপাল বাগানে উপবিষ্ট দেখিয়া তাহার নিকট গিয়া ঘেঁসিয়া বসিলাম। কথাবার্ত্তায় জানিতে পারিলাম সে জনৈক বৈদেশিকের দরোয়ান, ইংরাজী কিম্বা হিন্দি লিখিতে পড়িতে কিছুই জানে না, একেবারে নিরক্ষর। তাহার প্রভু প্রদত্ত পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া রবিবারের অবকাশ সময় টুকু বাগানে হাওয়া খাওয়ার জন্য বাহির হইয়াছে। লোকটী ছয় বৎসর সাঙ্ঘাই সহরে আছে। অথচ সহরের কোন খবরই সে দিতে পারিল না, যেহেতু সে নাকি তাহার কার্য্যস্থল আর ঐ বাগান ছাড়া উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম কিছুই জানে না। আমি কোথা হইতে আসিতেছি, জাপানে কতজন ভারতবাসী ছাত্র আছে, তাহাদের মাসিক আয় কত ইত্যাদি সে জিজ্ঞাসা করিল। উত্তরে—ছাত্রদের কোন আয় নাই, প্রতি মাসেই ভারত হইতে টাকা আনিয়া বিস্তর খরচ করিতে হয় শুনিয়া সে অবাক হইয়া বলিয়া উঠিল, তবে ছেলেরা জাপান ছাড়িয়া এখানে কেন চলিয়া আইসে না? এখানে দরোয়ানী কাযে মাসিক ১০৲ টাকা উপার্জ্জন করিয়া আহারাদি বাদে অন্ততঃ চারি টাকা দেশে পাঠাইতে পারিবে। মনের ভাব চাপা দিয়া বন্ধুদিগকে লেখাপড়া ছাড়িয়া দরোয়ানী কাযে সাঙ্ঘাই আসিতে লিখিব বলিয়া তাহাকে আশ্বাস দিলাম; বাস্তবিক তথা হইতে বন্ধুদিগকে এ বিষয় জ্ঞাপনও করিয়াছিলাম। মনে মনে ভাবিলাম, হা ভগবান ভারতের লোককে এমনই অবস্থার অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত রাখিয়াছ যে ছয় হাজার মাইল দূরে আসিয়াও শিক্ষালোকে তাহার নেত্র উন্মীলিত হয় না?

একটু চিন্তা করিয়া দেখিলাম এমন নিরক্ষর প্রবাসীরও স্বদেশের প্রতি আন্তরিক টান রহিয়াছে; যেহেতু প্রতি মাসে প্রত্যেকে অন্ততঃ চারি টাকা দেশে পাঠাইতে পারিবে বলিয়া জাপানস্থ ভারতীয় ছাত্রদিগকে সে সাজ্বাই আসিতে পরামর্শ দিতেছিল।

বাস্তবিক প্রবাসী প্রত্যক্ষভাবে দেশের কাযে যোগ দিতে না পারিলেও তাহার মন যে নিরন্তর স্বদেশের দিকে আকৃষ্ট তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রবাসী হাজার মাইল দূরে থাকিলেও জন্মস্থানের উদ্দেশে স্বপ্নে ও জাগরণে বলে

কামিনীর কমনীয় কণ্ঠভূষাহারে
দ্যুতিমান মধ্যমণি যেমন সুন্দর
সেইরূপ সমুদায় মেদিনী মাঝারে
আছে দিব্যস্থান এক অতি মনোহর!

(ক্রমশঃ)। শ্রীযদুনাথ সরকার।

আদেশ পালন।

পরীক্ষায়, বহুবার ফেল্ হইলে ছাত্র যেমন সিদ্ধিলাভে হতাশ হইয়া পড়ে, আমার বিবাহের বিস্তর সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় উহাতে সিদ্ধিলাভ সম্বন্ধে আমিও সেইরূপ সন্দিহান্ হইয়াছিলাম। যাহা হউক বহুকাল পরে হঠাৎ একদিন একটি নূতন সম্বন্ধ আসিয়া উপস্থিত। ঘটকী রূপবর্ণনা করিবার পূর্ব্বেই আমি মনে-মনে পাত্রীর ছবি আঁকিয়া ফেলিলাম—ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা—রঙটুকু চাঁপা ফুলের মত—এক পিঠ কালো চুল, তার কতকগুলি গণ্ড বহিয়া বক্ষে পড়িয়া বাতাসে সর্পশিশুর মত খেলা করিতেছে—সুন্দর নিটোল ললাট, যেন আধখানি চাঁদ ফুটিয়া আছে,—ভুলিটানা বঙ্কিম ভ্রূরেখার নিম্নে দুইটি ডাগর চক্ষু—মধ্যভাগে "শুকচঞ্চুজিনি নাসা"—তার নীচে দুইখানি গোলাপের পাপড়ি—কিন্তু, হায়! আমার কল্পনার ছবিটুকু শেষ না করিতেই ঘটকঠাকুরাণী তাঁর ব্যবসা-ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বলিলেন,—"পাত্রীটি সুশ্রী নয়, তবে দেবে-থোবে ঢের, জামাইকে বিলেত পাঠাবে।" আমার বুকটা যেন 'ধড়াস্' করিয়া উঠিল! সুশ্রী নয়, অর্থাৎ তবে রীতিমত কুৎসিত!'

'দেবে-থোবে ঢের, জামাইকে বিলেত পাঠাবে' এই কথাটা কিন্তু আমার অভিভাবকের কাণে বড় মিষ্ট লাগিল। বধূর রূপ লইয়া বাড়ির সকলে কি ধুইয়া খাইবে? টাকা! অল্প-স্বল্প নয়—'বিলেত পাঠাবে জামাইকে!' অন্ততঃ দশ বারো হাজার টাকা! শুধু তাই? আবার এক খানা বাড়ি!

তার পর সে এক শুভ দিনে শুভ লগ্নে আমার বিবাহ হইয়া গেল—সেই কাল কুৎসিত মেয়েটার সহিত। একটি জীবন্ত অন্ধকারকে আমি বিবাহ করিয়া আনিয়া ঘর কালো করিয়া তুলিলাম।

আকাশের অন্ধকারে তারার শোভা আছে, আমার "অন্ধকারে" গহনার শোভা ছিল। অন্ধকার রাত্রে লোকে আকাশের দিকে চাহে অন্ধকার দেখিতে নয়, তারা দেখিতে, আমাদের বাড়ীতেও যে

মেয়ের গাঁদি লাগিত, তারাও সত্য বলিতে গেলে, গহনা দেখিতেই আসিত।

বিবাহের আট দিন এক রকমে ত, কাটিয়া গেল। দাম্পত্য প্রেমের প্রথম আলাপ শুনিবার উৎকট ইচ্ছায় অনেককে কক্ষের পাশে-পাশে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, আঁধারে মশক-দংশন সহ্য করিয়া অবশেষে নিরাশ হইতে হইয়াছিল।

যখন আমার শয্যার আধখানা অন্ধকার করিয়া তিনি শয়ন করিতেন তখন আমার মনে হইত, 'আমি'-রূপ চন্দ্রে 'তিনি-, রূপ 'গ্রহণ' লাগিয়াছেন!

নয় দিনের দিন আমি'গ্রহণ'মুক্ত হইলাম। এ কয়দিন তাঁহার সঙ্গে আমার বাক্যালাপ—তোমরা যদি বিশ্বাস কর—একটুও হয় নাই। তবে একদিন হইবার উপক্রম হইয়াছিল। সেদিন বড় গরম পড়িয়াছিল। শয্যার একাংশে পড়িয়া আমি ছট্-ফট্ করিতেছিলাম, আর ভাবিতেছিলাম—"কোথা থেকে উড়ে এসে (অর্থাৎ শয্যার অর্দ্ধেকটা) জুড়ে বসেছেন"—সেই সময় আমার হৃদয়ের "অন্ধকার" অতি মৃদু—আর, আর, তোমরা যদি ঠাট্টা না কর—অতি মধুর স্বরে বলিলেন, "বাতাস করব?"

কিন্তু সে মধুরতায় আমার রূপতৃষ্ণা মিটিল না; সুতরাং মনও নরম হইল না। কোন উত্তর না দিয়া আমি বিছানায় পড়িয়া রহিলাম। একটু পরেই চুড়ীর মৃদু আওয়াজের সহিত পাখার বাতাস সুরু হইল। আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গে দেখি দেবী "অমাবস্যা" আমার পদপ্রান্তে অন্ধকার ছড়াইয়া নিদ্রা যাইতেছেন।

এক মাস অতীত হইলে আমার বিলাত যাইবার আয়োজন হইতে লাগিল। বিলাত গমনের পূর্ব্বে একবার আমাকে শ্বশুরালয়ে যাইতে হইয়াছিল। যাইবার ইচ্ছা ছিল না—কিন্তু নেহাৎ খারাপ দেখায়, সেই জন্য গিয়াছিলাম, কিন্তু বড় ভয়ে-ভয়ে! যদি আবার আমার "অন্ধকার" দেখা দিয়া সম্ভাষণ করিতে আসেন? তাহাকে দেখিলেই আমি যে তাহার স্বামী এই কথাটা আমার মনে আসিয়া পড়িত—আমার তাহাতে বড় লজ্জা ও অপমান বোধ হইত! ছিঃ ছিঃ আমি এই বিশ্বকুৎসিতার স্বামী!

শ্বশুর বাড়ীতে গিয়া দেখি সেখানে রটিয়া গিয়াছে 'অন্ধকার'কে আমার পছন্দ হইয়াছে। আমি অতি "সুবোধ" "সুশীল" ইত্যাদি নানা-বিধ প্রশংসা-বাণী আমার উপর বর্ষণ করিয়া শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা জানাইলেন যে,তাঁহাদের অন্ধকার মেয়েটিকে আমি হাসি মুখে গ্রহণ করেছি শুনিয়া তাঁহারা পরম সুখী! আমি-ত শুনিয়া অবাক! তাঁহারা যে আমাকে এইরূপ সৌন্দর্য্যজ্ঞানহীন ভাবিয়াছেন ইহাতে আমি মনে মনে বড়ই চটিয়াছিলাম—কিন্তু হাজার হোক্ তবু শ্বশুরবাড়ী!

সেদিন সেখানেই রাত্রিটা কাটাইতে হইল। 'অন্ধকার' আসিয়া আমায় প্রণাম করিলেন।

আমাকে নীরব দেখিয়া 'তিনি' একটি ছোট-খাট নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আমি তোমার কি করেছি?"

আমি নীরব। এবার যেন একটু অভিমানভরে তিনি বলিলেন, "আমি কালো-কুৎসিত, তা তুমি কেন আবার বিবাহ কর না!"

তার পর শ্বশুরের অর্থে বিলাত যাত্রা করিলাম। যাত্রা করিবার পূর্ব্বে যেরূপ আনন্দ হইয়াছিল, আত্মীয় স্বজনকে ছাড়িয়া যাইবার সময় তাহা রহিল না। বন্দর হইতে জাহাজ যতই সমুদ্রের দিকে যাইতে লাগিল আমার হৃদয়ের স্নেহে ততই টান পড়িতে লাগিল। দেশের প্রতি, দেশের দশ জনের প্রতি যে ভালবাসা এতদিন আমার অজ্ঞাতসারে অন্তরে বিলীন হইয়াছিল আজ সহসা যেন সে আমার সম্মুখে আসিয়া আত্মপরিচয় দিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে যে কয়জন বাঙালী ছিলেন তাঁহারাই যেন আমার একান্ত আত্মীয় হইয়া উঠিলেন। বাঙ্‌লাদেশ ছাড়িয়া প্রথম বুঝিলাম, বাঙ্‌লা-দেশকে কতখানি ভালবাসি—তখন বাঙ্‌লাদেশে, বাঙালীর মধ্যে সকলকেই আমার প্রিয়জন বলিয়া মনে হইল। আর আমার "অন্ধকার"? আহা, সে-ও তো বাঙ্‌লাদেশের মাটিতে জন্মিয়াছে!

মনে করিলাম, বিলাত পৌঁছিয়া তাহাকে পত্র দিব। কিন্তু সেখানে গিয়া তাহাকে পত্র দেওয়া দূরে থাক্, জন্মভূমির প্রতি আমার যে মনের ভাব ছিল, তাহারো পরিবর্ত্তন হইয়া গেল! পোষ্যপুত্র যেমন পালিকা মাতার বাহিরের বিভব দেখিয়া তাঁহাতেই আকৃষ্ট হইয়া আপনার স্নেহময়ী দুঃখিনী মাতাকে অবজ্ঞার চোখে দেখিতে থাকে, আমার দশাটা কতকটা সেইরূপ দাঁড়াইয়াছিল। ইংলণ্ড আর ভারতবর্ষ! স্বর্গ আর মর্ত্ত্য! তখন ভুলিয়া গিয়াছিলাম, ইংলণ্ডে এ স্বর্গের সৃষ্টি কাহার ধনরত্নে হইয়াছিল!

পড়াশুনায়, আমোদ-আহ্লাদে বিলাস-বিভ্রমে তিন বৎসর কাটাইয়া দিলাম। বিলাতে থাকিবার সময় আমার দুই কূল (পিতৃ ও শ্বশুর) হইতে চিঠিপত্র আসিত। আমিও নিয়মমত সকলকে উত্তর দিতাম, ত্রুটি করিতাম না। আমার "অন্ধকার"ও আমায় দুইখানি চিঠি লিখিয়া তাহার উত্তর না পাইয়া আর আমায় চিঠি লিখিয়া অনুগৃহীত করেন নাই! আমিও তাহাতে তখন বিশেষ দুঃখিত হইয়াছিলাম বলিয়া ত মনে হয় না। তাঁহার পত্রের এক স্থানে লেখা ছিল, "বাড়ী ফিরিবার আগে আমায় খবর দিয়ো।' আমি কিন্তু কথা মত কাজ করি নাই—আর করিলেই বা কি হইত!

ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে ফিরিলাম। ফ্লোরা সঙ্গে আসিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়াছিল, নানা কারণে তাহার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারিলাম না। আমার মনে হইয়াছিল যেন প্রাণের আধখানা সেই শ্বেতদ্বীপে রাখিয়া আমি স্বদেশে ফিরিতে-ছিলাম। ফ্লোরা আমার কে? আজ সে আমার কেহ নয়!

প্রবাস হইতে যেদিন বাঙালী বাঙ্‌লা দেশের কোলে ফিরিয়া আসে, সেদিন তার কি আনন্দ! কিন্তু আমার মত দুর্ভাগ্যের কপালে সে আনন্দলাভ ঘটে নাই! বিদেশের লতাকে প্রাণে জড়াইয়া বিদেশেই ফেলিয়া আসিতে হইলে, বুঝি, মানুষের কপালে স্বদেশের স্নেহলাভ তেমন ঘটে না!

কলিকাতায় পৌঁছিয়া দেখি, আত্মীয়-স্বজনেরা আমার জন্য অপেক্ষা করিতে-ছেন। দেখিয়া ভাবিলাম . বাড়িতে

অবরোধের মধ্যে কতগুলি হৃদয় আমার আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। সেই সঙ্গে আমার 'অন্ধকার'ও হয়ত পথ চাহিয়া আছে! আবার মনে হইল, কেন সে থাকিতে যাবে? আমা দ্বারা সে কতটুকু সুখী হইয়াছে?

ফ্লোরাকে ভালবাসি আর যাই করি 'তাহাকে' আর ব্যথা দিব না এইটা একরকম ঠিক করিয়াছিলাম। কিন্তু বাড়ি আসিয়া 'তাহাকে' দেখিতে পাইলাম না। রাত্রি আসিল, কিন্তু আমার অন্ধকার কৈ! আমার নিকট আসিল না ত! ভাবিলাম একবার শ্বশুর বাড়ি যাই! কিন্তু মনে একটু অভিমান হইল! তিন বৎসর পরে বিদেশ হইতে আসিলাম, এখন কি না 'তিনি' বাপের বাড়ি বসিয়া রহিলেন! কিন্তু আমি ত, তাহার প্রার্থনামত তাহাকে জানাই নাই যে, আমি বাটী যাইতেছি! ইচ্ছা করিলে সে কি জানিতে পারিত না, আমি কবে আসিব? আমার রাগ-অভিমান হইতে পারে আর তাহারি কি হইতে পারে না? তবু কেমন রাগ হইল—শ্বশুর বাড়ী যাওয়া স্থগিত রাখিলাম।

তার পর এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। বাটীর কাহারও নিকট তাহার সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না—কেহ উপযাচক হইয়াও আমাকে কিছু বলিতে আসিল না।

তাহার কিছুদিন পরেই ঘটকঠাকরুণ দশহাজার টাকার এক সম্বন্ধ লইয়া উপস্থিত! আবার আমার বিবাহ! এবার মেয়ে নিখুঁত সুন্দরী। বাড়ীর মেয়েদের বড় আহ্লাদ। এবার তাঁরা কালো-কুৎসিত বউ ফেলিয়া আলো-করা বউ ঘরে তুলিবেন! আর আমি!

শুভসংবাদ যেমন আগ্রহে মানুষ মানুষকে জানায়, বাড়ীর মেয়েরা তেমনি আগ্রহভরে আমাকে জানাইলেন যে, সেই 'কালো বৌ' আজ দু'মাস হইল, মারা গিয়াছে!

তাঁরা ভাবিয়াছিলেন এ সংবাদে আমি সুখী বই অসুখী হইব না—নিজেও আমি তাহা মনে করিতাম—কিন্তু কই সুখী হইতে পারিলাম না তো! আমার মর্ম্মে মর্ম্মে একটা আঘাত বেদনা জাগিল; তাহার প্রতি আমার নিষ্ঠুর ব্যবহার স্মরণ করিয়া আমি এক মুহূর্ত্তে জাগরিত, সন্তপ্ত, অনুতপ্ত হইয়া উঠিলাম। তাহার প্রতি নিমেষের জন্য আমার যে করুণা জাগিয়া উঠিয়াছিল এই মৃত্যুসংবাদে তাহা জলন্ত প্রেম রূপে হৃদয় দগ্ধ করিয়া তুলিল। জীবনে আমার জন্য যে সতত লালায়িত হইয়া থাকিত মৃত্যুতে তাহারই জন্য আমার হৃদয় চির লালায়িত হইয়া উঠিল। একদিন যে আমার নয়নে অসুন্দর, ধ্যানে অপ্রিয়, জীবনে অভিশম্পাতস্বরূপ ছিল, মৃত্যু আজ তাহাকে আমার অন্তর-নয়নে চিরসুন্দর, ধ্যানে চিরপ্রিয়, পরজন্মের আকাঙ্খিত বস্তু করিয়া তুলিল! কেন এমন হইল? জানিনা!

একমাস পরে অনেক ডাকঘরের ছাপ পড়া একটী পার্সেল আমার নিকট পৌঁছিল। দেখিলাম, পার্সেলটি কলিকাতা হইতেই পাঠান হইয়াছিল। তারপর স্বদেশে ফিরিবার সময় আমি যে যে দেশ ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম পার্সেলটিও সেই সেই দেশ ঘুরিয়া শেষে এখানে আসিয়াছে। কিন্তু উহার ভিতর

জিনিষটা কি? কে উহা এখান হইতে পাঠাইয়াছিল? বুঝিতে পারিলাম না। পার্সেলটা খুলিয়া ফেলিলাম।

দেখিলাম, একখানি ফোটো—তাহার তলে লেখা, "তুমি আসিয়া আবার বিবাহ করো, আর এখানা পুড়াইয়া ফেলো।"

এই আদেশের দুইটিই আমি পালন করিব, প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। একটি ইহারি মধ্যে পালন করিয়াছি—আবার আমি বিবাহ করিয়াছি! কাহাকে? সেই ফোটোখানিকে!

ফোটোখানি পুড়াইয়া ফেলিবারও আদেশ আছে। সে আদেশও পালন করিব, যেদিন পুড়িয়া ছাই হইব, সেইদিন!

শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ।

চয়ন।

যবদ্বীপে। (গ্যারোয়েট্ ও পপন্দয়ন্)

মঙ্গলবার, ৪ঠা ডিসেম্বর।

যেখান হইতে পপন্দয়ন্ নামক আগ্নেয়-গিরিতে আরোহণ করিতে হয়, সেই গ্যারোয়েট, বুইতেন্‌জর্গ হইতে রেলে সাত ঘণ্টার পথ। প্রাতঃকাল প্রায় ৮ ঘটিকার সময় আমরা বুইতেন্‌জর্গ ছাড়িলাম। বুইতেন্‌জর্গ ছাড়িয়া, অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক শোভা উপভোগ করিলাম। প্রথমেই ত শ্যাম-তরঙ্গময়ী একটি বৃহৎ নদী। এই নদীতে দেশীয় লোকেরা স্নান করিতেছে; আবার কতকগুলি লোক, গাছের গুঁড়ির সরু সরু ডোঙ্গার উপর দাঁড়াইয়া যাতায়াত করিতেছে। নদীর পশ্চাদ্‌ভাগে তালগাছের যেন একটি সমুদ্র বায়ুভরে আন্দোলিত হইতেছে। দূরান্তে কঠোর-দর্শন আগ্নেয়গিরি—সালক। একখণ্ড পাতলা ধূম-জালের মুকুটে তাহার চূড়া বিভূষিত। যেন চিত্রটি অতি যত্নে অঙ্কিত হইয়াছে। চারি দিকের সহিত সুর মিলাইয়া এমন একটি সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে—দেখিলে মনে হয় ঠিক যেন সেকেলে গ্রীসীয় শিল্পকলার সৌন্দর্য্য।

সমস্ত পথটা, যাবা-দেশীয় ভূখণ্ডের চিত্রপট ক্রমশঃ যেন উদ্‌ঘাটিত হইতে লাগিল। ধানের ক্ষেতগুলি মাটির দেয়ালে ঘেরা। দেয়ালের উপর দেয়াল চাপানো। অনেকগুলি ক্ষেত জলপ্লাবিত; সেই কর্দ্দমের মধ্যে কৃষকেরা চাষ করিতেছে। উহারা শ্যামবর্ণ, উহাদের মাথায় কোণালু ধরণের খড়ের টোপা। উহাদের গায়ের জামা খাটো, উহাদের পায়জামা হাঁটু পর্য্যন্ত গুটাইয়া তোলা। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সাদা মহিষ উহাদের কাজে খাটিতেছে;—অতীব ধৈর্য্যসহকারে হাল টানিতেছে। প্রায়ই দেখা যায়,—বৃহৎ অরণ্যের মধ্য দিয়া ট্রেন্ চলিতেছে। এই অরণ্যের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষগুলি প্রায়ই লতাসমাচ্ছন্ন। এই সকল বৃক্ষের বিচিত্র সৌন্দর্য্য আমি মুগ্ধনেত্রে দেখিতে লাগিলাম; উহাদের বৃহৎ কাণ্ড, বৃহৎ পত্রাবলী,—বিচিত্র আকারের ও বিচিত্র বর্ণের;—কোনটা গোলাকৃতি, কোনটা বিখণ্ডিত, কোনটা ম্যাড়্‌মেড়ে, কোনটা চক্‌চকে, কোনটা উজ্জ্বল সবুজ, কোনটা ঘোর সবুজ, কোনটা লাল্‌চে সবুজ।

৩টার সময়, গারোয়েটে আসিয়া পৌছিলাম। ক্ষুদ্র সহর; ওলন্দাজেরা, উপকূলের উত্তাপ পরিহার করিয়া এইখানে বিশ্রামার্থ আসিয়া থাকে। ইহা যবদ্বীপের অধিকাংশ নগরেরই মত,—একটা আগ্নেয়গিরি প্রদেশের কেন্দ্রে অবস্থিত বলিয়াই যাহা কিছু ইহার বিশেষত্ব। সহরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে প্রধান রাজপুরুষদিগের বাসগৃহ কার্য্যালয় ও মসজিদ। তাহার পর য়ুরোপীয় অঞ্চল,—এখানকার বাড়ীগুলি উদ্যানে বেষ্টিত। সর্ব্বশেষে দেশীয় অঞ্চল; এক-তলা কাঠের বাড়ী, খোটার উপর স্থাপিত;—ইটের কিংবা খড়ের ছাদ। গৃহের পার্শ্বে ও গৃহ হইতে উচ্চ, খোটার উপর স্থাপিত ধানের গোলা ঘর।

আমি এই দেশীয় অঞ্চলে অনেকক্ষণ ধরিয়া ভ্রমণ করিলাম; সাদাসিদা কৃষকদিগের শান্তিময় জীবনের উদ্বেগহীন কাজকর্ম দেখিতে লাগিলাম। আমি এখন ভিন্ন জাতির মধ্যে, ভিন্ন প্রকৃতির লোকের মধ্যে বাস করিতেছি। ইহাদের জীবন আমাদের জীবন হইতে কত তফাৎ—ইহাদের আচার ব্যবহার আমাদের হইতে কত ভিন্ন,—আমাদের অপেক্ষা কতটা চাঞ্চল্যবর্জ্জিত, কতটা স্বাভাবিক, কতটা জ্ঞানীজনোচিত।

যখন হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম, তখন রাত্রি আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু ঐ দেখ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নৈশ অন্ধকারকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতেছে; চারিদিক হইতে, চলমান্ ভাস্বর বিন্দুসমূহ জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে; একবার নিকটে আসিতেছে, আবার দূরে পলাইয়া যাইতেছে; ইহারা সেই প্রাচ্যখণ্ডের জোনাকী—জ্যোতিরিঙ্গণ। অপূর্ব্ব মায়াদৃশ্য। মনে হয় যেন স্বপ্ন দেখিতেছি। এই তারাগুলি—যাহা এইমাত্র আকাশে উদয় হইয়াছে—মনে হয়, কে যেন অসংখ্য জোনাকি গগনমণ্ডলের গায়ে বিঁধাইয়া রাখিয়াছে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এক পৃষ্ঠায় পঞ্চাঙ্ক নাটক।

প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে ইতালীয় কবি গাওভেনী ভেন্টুরা (Giovanni Ventura) এক পৃষ্ঠার মধ্যে একখানি করুণরসাত্মক পঞ্চাঙ্ক নাটক লিখিয়াছিলেন। নাটকখানির নাম 'রসমুণ্ডা' (Rosmunda)। টুরীণ ও মিলান প্রদেশে বহুবার এই নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। অভিনয়ক্ষেত্রে রসমুণ্ডা জনসাধারণের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইয়া তৎকালীন নাটকগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছিল। আমরা এই অতি ক্ষুদ্র, অথচ পঞ্চাঙ্ক, নাটকখানির সম্পূর্ণ অনুবাদ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

(করুণরসাত্মক পঞ্চাঙ্ক নাটক)

গাওভেনী ভেন্টুরা প্রণীত।

নাট্যোক্ত চরিত্র।

এল্‌বিয়ন্	...	...	রাজা।
রসমুণ্ডা	...	...	রাণী।
			(রাজা কুনীমণ্ডের কন্যা)।
পেরিডেন্স্	...	...	নফর।

রসমুণ্ডা।

প্রথম অঙ্ক।

মদ্যপূর্ণ নরকপাল রসমুণ্ডার মুখের সম্মুখে ধরিয়া এল্‌বিয়ন্ বলিলেন—নাও, তোমার পিতার মাথার খুলিতে ভ'রে এই মদ এনেছি—পান কর।

রসমুণ্ডা (পানপাত্র দেখিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া)—ওঃ!

এল্‌বিয়ন্। আমার আদেশ—পান কর।

রসমুণ্ডা। (মদ্যপান করিতে করিতে) তুমি অধঃপাতে যাও!

দ্বিতীয় অঙ্ক।

এল্‌বিয়ন্। (প্রেমবিহ্বলভাবে)—প্রিয়তমে, এত বিষণ্ণ কেন?

রসমুণ্ডা। কিরূপে প্রসন্ন থাকব বল?

এল্‌বিয়ন্। অতীতের কথা ভুলে যাও, প্রিয়ে!

রাজা রসমুণ্ডার দিকে অগ্রসর হইলেন।

রসমুণ্ডা। (সরিয়া যাইয়া) যাও আমাকে স্পর্শ করোনা।

এল্‌বিয়ন্। রসমুণ্ডা, আমাকে তুমি ঘৃণা করছ?

রসমুণ্ডা। ঘৃণা? না।

তৃতীয় অঙ্ক।

রসমুণ্ডা ছুরিকার ধার পরীক্ষা করিতেছিলেন। পরে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন—গোলাম!

পেরিডেন্স্ প্রবেশ করিল এবং জানু পাতিয়া বসিয়া বলিল—মহারাণী!

রসমুণ্ডা একটু থামিয়া, পরে পেরিডেন্সের প্রতি প্রেমচকিতনয়নে দৃষ্টিপাত করিলেন, ধীরে ধীরে বলিলেন—গোলাম, আমি তোমাকে ভালবাসি।

পেরিডেন্স্ চমকিয়া কহিল—অ্যাঁ, সেকি!

রসমুণ্ডা। হাঁ, এস—কাছে এস।

রাণী নফরকে আলিঙ্গন করিলেন।

চতুর্থ অঙ্ক।

পার্শ্বস্থ কক্ষে রাজা সুপ্তিমগ্ন, তাঁহার নাসিকাধ্বনি শুনা যাইতেছিল।

রসমুণ্ডা পেরিডেন্সের হস্তে ছুরিকা প্রদান করিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বলিলেন—যাও, এই মুহূর্ত্তে খুন কর।

পেরিডেন্স্। (ইতস্ততঃ করিয়া) রাজাকে খুন করব?

রসমুণ্ডা। হাঁ, রাজা!—যে রাজা তোমার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী!

পেরিডেন্স্। তবে—

পেরিডেন্স্ লঘুপদে রাজার শয়নগৃহের দিকে গমন করিল।

পঞ্চম অঙ্ক।

নেপথ্যে রুদ্ধকণ্ঠে রাজা চীৎকার করিয়া উঠিলেন—রক্ষা কর! রক্ষা কর!

রসমুণ্ডা (শঙ্কলক্ষ্যে)—তোমার নিপাত হোক্!

(রক্তাক্ত ছুরিকাহস্তে প্রবেশ করিয়া)

পেরিডেন্স্। কাজ শেষ!

রসমুণ্ডা পেরিডেন্সের হস্ত হইতে ছুরিকা কাড়িয়া লইলেন এবং তাহার অগ্রভাগ উচ্চে তুলিয়া ধরিয়া তারকণ্ঠে বলিলেন—পিতা! পিতা! এই রক্ত! এই রক্ত পান ক'রে আজ তোমার আত্মা তৃপ্ত হোক্!

যবনিকা।

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাসগুপ্ত।

মুর্শিদাবাদের প্রাচীন কাহিনী।

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি)

মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে আলিবর্দ্দী খাঁর নামই সর্ব্বপ্রধান। পঞ্চদশ বর্ষ রাজত্বকালের নানা ঝড় ঝঞ্ঝার মধ্যে তিনি এরূপ মহৎ গুণাবলীর পরিচয় দিয়াছিলেন, যাহা হইতে নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় যে তাঁহার সমসাময়িকগণের মধ্যে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ও বীর ছিলেন এবং তাঁহার ন্যায় বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞও তৎকালে দুষ্প্রাপ্য ছিল। তাঁহার ভবিষ্যৎ দৃষ্টি ও অসাধারণ সদ্‌গুণের ফলে তিনি মুর্শিদাবাদকে তৎকালীন রাজধানী সকলের মধ্যে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, এবং তাহাকে পূর্ব্ব ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পকলা ও সাহিত্য-সাধনার কেন্দ্রস্থল করিয়া তুলিয়াছিলেন।

প্রাচীন ঢাকা নগরীর গৌরবঘটা তখন উজ্জ্বল নীরবতার মধ্যে নিমজ্জিত; যে দিল্লিনগরী এতকাল সমগ্র ভারতের বিশাল সাম্রাজ্যের বিচিত্র স্মৃতির সহিত জড়িত ছিল এবং যাহা বহুশতাব্দী ধরিয়া প্রাচ্য-দেশে সার্ব্বভৌম শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর বন্দর কেন্দ্রস্থল ছিল, সে দিল্লি তখন অধঃপতনোন্মুখ; দক্ষিণভারতের বিশাল মুসলমান সাম্রাজ্য ভারতে আধিপত্য বিস্তার-লোলুপ দুই ইয়ুরোপীয় জাতির কৌশলজালে জড়িত হইয়া কিছুদিন হইতে পীড়িত। দেশের এই দুর্দ্দশার দিনে একমাত্র মুর্শিদাবাদই ইহার পারদর্শী নবাবের অধীনে মুসলমান বীর্য্য ও গৌরব প্রকাশে সক্ষম হইয়াছিল। মুর্শিদাবাদ তদানীন্তন ভারতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান নগরী বলিয়া বিবেচিত হইত যে দিল্লির সম্রাট শাহ আলম যখন সরফরাজের মৃত্যু ও আলিবর্দ্দীর বিদ্রোহ ও সিংহাসন লাভের সংবাদ পাইলেন তখন তিনি মুর্শিদাবাদের অধঃপতন ভাবিয়া অশ্রুপাত করিয়াছিলেন। কিন্তু আলিবর্দ্দী মুর্শিদাবাদের গৌরব হীন করা দূরে থাক, বর্দ্ধন করিয়া তুলিয়াছিলেন। একজন প্রখ্যাতনামা ইংরাজ ঐতিহাসিক আলিবর্দ্দীর মহত্ত্ব বর্ণনাকালে বলিয়াছেন যে, তাঁহার সমসাময়িক প্রাচ্য নৃপতিগণের মধ্যে একমাত্র তাঁহাকেই কেহ কখনও হত্যা করিবার বাসনা করে নাই। তাঁহার সদ্‌গুণাবলী এবং তাঁহার চমকপ্রদ রণযাত্রা ও বিজয়গৌরব এবং বার বার শত্রু জয়ে ও দুষ্ট দমনে কৃতকার্য্যতা তাঁহাকে তাঁহার প্রজার প্রিয়পাত্র করিয়া তুলিয়াছিল। আলিবর্দ্দী যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তাঁহার বয়স ষাট বৎসরের অধিক। তাহার পরেও দশ বৎসর তিনি প্রবল পরাক্রমে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালেই মুর্শিদাবাদ উন্নতির শীর্ষস্থান আরোহণ করে; তাঁহার দরবার দেশের শ্রেষ্ঠ কলাবিৎ ও গায়কে পরিপূর্ণ থাকিত; তাঁহার প্রাসাদ দরিদ্র ও পীড়িতের আশ্রয় স্থল ছিল। তিনি মুর্শিদাবাদকে শিক্ষা ও সাধনায় এরূপ উন্নত করিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর তিন বৎসর পরেও ক্লাইভ ইহাকে লণ্ডন নগরের সহিত সমতুল্য বলিয়া ঘোষণা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

'যুদ্ধক্ষেত্রের যম' নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদের মসনদে আরোহণ করেন। ঘেরিয়ার ভীষণ যুদ্ধে সরফরাজকে পরাজিত করিয়া তিনি একদিন নগরের বাহিরে অবস্থান করিলেন, পাছে তাঁহার লুণ্ঠনপ্রিয় সৈনিকগণ নগর লুণ্ঠন করিয়া তাহার সুন্দর স্থপতিকীর্ত্তিগুলি নষ্ট করে। নগরের তোরণ-দ্বারে প্রবেশ করিয়াই তিনি সর্ব্বপ্রথম রাজপ্রাসাদে যাইয়া মুর্শিদের কন্যা ও হতভাগ্য নবাব সরফরাজের জননী জেবুন্নেসা-অল-নিসার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন প্রাসাদদ্বারে হস্তী হইতে অবতীর্ণ হইয়া নতশিরে নবাব-জননীকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন—

"অদৃষ্টে যাহা লিখিত ছিল তাহা ঘটিয়াছে। আপনার অযোগ্য ভৃত্যের অকৃতজ্ঞতা ইতিহাসের অমর পত্রে মুদ্রিত হইল। কিন্তু আজ সে শপথ করিয়া বলিতেছে যে ভবিষ্যতে কোনও দিন সে আর সম্মান বা বশ্যতার পথ হইতে বিচলিত হইবে না। সে আশা করে কালে আপনার ক্ষমাপূর্ণ অন্তর হইতে তাহার দুষ্কর্ম্মের কালিমা মুছিয়া যাইবে এবং আজ আপনি তাহার সম্পূর্ণ বশ্যতা ও 'কর্ত্তব্যপরায়ণতার নিদর্শন স্বরূপ এই উক্তিগুলি সস্নেহে গ্রহণ করিবেন।"

পুত্রশোকাতুরা জননীর নিকট কোনও উত্তর না পাইয়া এবং আলির সরল উক্তিকে তিনি তখনও সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছেন বুঝিয়া, নবাব সমারোহের সহিত "চেহেল সাটুন" (চল্লিশ স্তম্ভ) নামক দরবার প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। তথায় বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার নৃপতির অভিষেক উৎসব সম্পূর্ণ হইল। ইহার অব্যবহিত পরেই আলি তাঁহার সিংহাসন রাজানুমোদিত করিবার জন্য দিল্লীর সম্রাটের নিকট এক ক্রোড় মুদ্রা ও সাত লক্ষ মুদ্রা মূল্যের রেশম মখমল মণি-মুক্তাদি উপঢৌকন প্রেরণ করিলেন। এই বহুমূল্য উপঢৌকন লাভ করিয়াই সম্রাট সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহাকে সপ্তদশ সহস্র অশ্বারোহীর অধিনায়ক নিযুক্ত করিলেন। তদ্ভিন্ন তাঁহাকে, তাঁহার জামাতাকে ও তাঁহার দৌহিত্রগণকে উপাধি বিতরণ করিলেন। কিন্তু সম্রাট এই উপঢৌকনে অধিক দিন সন্তুষ্ট না থাকিয়া, দুই বৎসরের রাজস্ব ও মৃত নবাবের সম্পত্তি আদায় করিবার জন্য মুরীদ খাঁ নামে এক কর্ম্মচারীকে প্রেরণ করিলেন। আলিবর্দ্দী সরফরাজের সম্পত্তি তাহার স্ত্রীপুত্রকে দান করিয়াছিলেন। তাহারা সেই সম্পত্তি লইয়া ঢাকায় যাইয়া বাস করিতেছিলেন। মৃত নবাবের এক ভগিনী কেবল মুর্শিদাবাদে থাকিয়া আলিবর্দ্দীর ভ্রাতুষ্পুত্র ও জ্যেষ্ঠ জামাতা সাহামৎ জঙ্গের অন্তঃপুরে প্রাসাদরক্ষিকার কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছিলেন। সম্রাটের নিকট হইতে দূত আসিতেছে শুনিয়া আলিবর্দ্দী রাজধানী ত্যাগ করিয়া অবিলম্বে অগ্রসর হইলেন এবং রাজমহলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সম্রাটকে বিপুল উপঢৌকন প্রদান করিয়া এবং মুরীদ ও তাহার অনুচরবর্গকে গোপনে অর্থদান করিয়া তিনি তাহাদিগকে দিল্লীতে ফিরিয়া পাঠাইলেন।

এই প্রকারে মুর্শিদাবাদের মসনদে নিরাপদে বসিয়া নবাব তাঁহার রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মনোযোগ প্রদান করিলেন। মৃত নবাবের শ্যালক মুর্শিদকুলি উড়িষ্যারাজ্যে প্রায় স্বাধীন রাজার মতই রাজত্ব করিতেছিলেন। মুর্শিদের হস্ত হইতে উড়িষ্যা উদ্ধার করাই নবাবের প্রথম লক্ষ্য হইল। তিনি মুর্শিদের প্রতি হুকুম জারি করিলেন যে, "অবিলম্বে সিংহাসন ত্যাগ কর, নচেৎ বিশেষ শাস্তি লাভ করিবে।" উড়িষ্যার যুবা রাজা যোদ্ধা ছিলেন না। তিনি প্রথমে মনে করিলেন নবাবের ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য গ্রহণ করিয়া সপরিবারে রাজ্যত্যাগ করাই শ্রেয়। তাঁহার পত্নী কিন্তু বীরহৃদয়া ও উচ্চাভিলাষিণী ছিলেন এবং তিনি স্বামীকে ওরূপ নির্ব্বোধের মত রাজ্যত্যাগ করার সংকল্প হইতে বিরত করিলেন। পত্নীর অক্লান্ত উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া রণক্ষেত্রে তিনি নবাবকে রণক্ষেত্রে আহ্বান করিয়া স্বদেশ রক্ষার আয়োজনে নিযুক্ত হইলেন। আলিবর্দ্দীও উড়িষ্যা আক্রমণের একটা সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিলেন, এই আহ্বান পত্র তাঁহাকে অপরাধমুক্ত করিল। তিনি তৎক্ষণাৎ দ্বাদশসহস্র সৈন্য লইয়া, রাজধানীর কর্ম্মভার তাঁহার ভ্রাতা হাজি আহমেদের হস্তে অর্পণ করিয়া উড়িষ্যা যাত্রা করিলেন। নবাবের আগমন সংবাদ শুনিবামাত্র মুর্শিদ কুলি কটক ত্যাগ করিয়া বালেশ্বরে অগ্রসর হইলেন। আলিবর্দ্দীর সৈন্য যখন উড়িষ্যায় উপস্থিত হইল তখন তাহারা দীর্ঘকাল যুদ্ধের পক্ষে নিতান্তই অনুপযুক্ত। দীর্ঘ-পথের শ্রান্তি এবং আহার্য্যের অভাবে নবাবের সৈন্য যেরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহাতে বিজয়লক্ষ্মী মুর্শিদের পক্ষানুবর্ত্তিনী হওয়ারই সম্ভাবনা ছিল। মুর্শিদ প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে তাহাই হইত, কিন্তু অদৃষ্টের বিধান বিপরীত! জয়োল্লাসে মত্ত হইয়া এবং আপনাদের অধিকৃত স্থানের শ্রেষ্ঠতার প্রতি অতিরিক্ত মাত্রায় নির্ভর স্থাপন করিয়া উড়িষ্যার এক সেনাপতি আলিবর্দ্দীর সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। নবাবের সৈন্য কেবল এই সুযোগের জন্যই অপেক্ষা করিতেছিল। তৎক্ষণাৎ জলস্রোতের ন্যায় তাহারা শত্রুশিবিরে প্রবেশ করিয়া উড়িষ্যাবাহিনীকে পরাজিত করিল। আলিবর্দ্দী বিজয়গর্ব্বে কটকনগরে প্রবেশ করিলেন এবং আপন কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা সাউলাৎ জঙ্গকে উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। পরাজয়ের পরমুহূর্ত্তেই

মুর্শিদ জাহাজে চড়িয়া মাসুলিপট্টমে পলায়ন করিলেন।

কিছুকাল উড়িষ্যা শান্ত হইয়া রহিল কিন্তু অচিরেই আবার অশান্তি আসিয়া উপস্থিত হইল। বিলাসপ্রিয় ভীরুস্বভাব নূতন শাসনকর্ত্তা প্রজাগণকে তাঁহার প্রতি বীতানুরাগ করিয়া তুলিলেন, এবং তাঁহাদের একমাত্র সহায়স্বরূপ সৈন্যবলকে উপেক্ষা করিয়া আপনার সর্ব্বনাশ আপনি সাধন করিলেন। প্রজাগণ গোপনে মুর্শিদ কুলিকে শাসনভার গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিয়া পাঠাইল। মুর্শিদ নিশ্চিন্তচিত্তে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন, তিনি পুনরায় রণক্ষেত্রে ভাগ্যনির্ণয়ের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইতে প্রবৃত্ত হইলেন না। বকির খাঁ নামে তাঁহার এক ধূর্ত্ত সেনাপতি অনায়াসে উড়িষ্যাবাসীর প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলেন এবং দেশে সাধারণ বিদ্রোহ উপস্থিত করাইয়া সাউলাৎকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিলেন। উড়িষ্যার এই গোলযোগের সংবাদ পাইবামাত্র আলিবর্দ্দী বিশ সহস্র পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া যাত্রা করিলেন, এবং সৈনিকগণকে উৎসাহিত করিবার জন্য ঘোষণা করিলেন, যে কেহ সাউলাৎকে কারাগারমুক্ত করিতে পারিবে তাহাকেই প্রচুর পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। এবার আলি মুর্শিদাবাদের শাসনভার তাঁহার জামাতা শাহমতের উপর ন্যস্ত করিয়া গিয়াছিলেন। উড়িষ্যায় উপনীত হইয়া বকিরকে পরাজিত করিয়া নবাব তাহাকে দেশ হইতে বিদূরিত করিয়া দিলেন। সাউলাৎ নিরাপদে মুক্তি লাভ করিলেন। পরামর্শ হইয়াছিল যে যদি বকিরের পরাজয় হয়, তাহা হইলে সাউলাতের শিবিকার প্রহরিগণ তৎক্ষণাৎ শিবিকা মধ্যে তাহাদিগের বর্শাবিদ্ধ করিয়া বকিরের প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রাণ বধ করিবে। সাউলাৎকে কৌশলে শিবিকা হইতে স্থানান্তরিত করিয়া তাঁহার বৃদ্ধ পিতা হাজি আহমদ্ শিবিকার মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন। ভ্রমক্রমে প্রহরিগণ তাঁহাকেই বধ করিবার উপক্রম করিয়াছিল। বিজয়ী ও নিশ্চিন্ত হইয়া আলিবর্দ্দী এই স্থানে তাঁহার সৈনিকগণকে বিদায় দান করিলেন। এই ভ্রমের ফলে অনতিবিলম্বে মহারাষ্ট্রীদিগের বঙ্গ আক্রমণকালে তাঁহাকে বিশেষ বিপদগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। মহম্মদ মসুম নামে তাঁহার এক বীর ও বিচক্ষণ কর্ম্মচারীকে উড়িষ্যার নায়েবের পদে নিযুক্ত করিয়া ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে তিনি মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পথিমধ্যে, মেদিনীপুর নগরে আলিবর্দ্দী শুনিলেন যে, বেরার মহারাষ্ট্রের অধিপতি ভোঁসলা তাঁহার প্রধান সেনা-নায়ক পণ্ডিত ভাস্কর রাওর নেতৃত্বে নবাবের নিকট হইতে বঙ্গের 'চৌথ' অর্থাৎ রাজস্বের এক চতুর্থাংশ আদায় করিবার জন্য চল্লিশ সহস্র সেনা প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বুঝিলেন যে মহারাষ্ট্র-সৈন্য বেহারের মধ্য দিয়া বঙ্গে প্রবেশ করিবে। তিনি দ্রুতপদে মুর্শিদাবাদের দিকে যাত্রা করিলেন। মুর্শিদাবাদে যাইয়া মহারাষ্ট্রগণকে রাজ্যপ্রবেশে বাধা দিবার সংকল্প করিলেন। কিন্তু যাত্রা করিতে না করিতেই তিনি শুনিলেন মহারাষ্ট্রগণ রাজ্য মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহারা দক্ষিণপথ দিয়া প্রবেশ করিয়াছে এবং তাঁহার নিকট হইতে বিশ ক্রোশ দূরেও নাই। ছল ও কৌশলই এক্ষণে পরিত্রাণের একমাত্র উপায়। নবাব তৎক্ষণাৎ বর্দ্ধমানের দিকে অগ্রসর হইলেন ও তথায় তাঁহার যুদ্ধদ্রব্যাদি রাখিয়া দ্বিগুণবেগে মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিলেন। দ্রব্যাদি রক্ষকগণ নির্দ্দয় লুণ্ঠনকারী মহারাষ্ট্রের যথেচ্ছ পীড়নের পাত্র হইয়া পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে অসম্মত হইল। স্বল্পশস্ত্র দ্রুতাশ্বারোহী লুণ্ঠনকারিগণ নবাবের সৈন্য অপেক্ষা স্বভাবতই অধিক দ্রুতগামী। বর্দ্ধমানের কয়েক ক্রোশ দূরেই তাহারা নবাবের দ্রব্যাদি আক্রমণ করিল, পশ্চাৎপদ যাবতীয় সৈনিককে হত্যা করিল এবং পথিমধ্যস্থ গ্রাম সকল ধ্বংস করিল। বঙ্গে প্রবেশ করিয়া ভাস্করের 'চৌথ' স্বরূপ দশ লক্ষ মুদ্রা দাবী করিয়া বসিল এবং এক্ষণে আলিবর্দ্দীও উক্ত অর্থ দানে সম্মত হইলেন। কিন্তু দ্বারে জয়োল্লাসে উত্তেজিত মহারাষ্ট্র সেনা আলিবর্দ্দীর প্রস্তাবকে ঘৃণায়

সহিত অবজ্ঞা করিয়া এক ক্রোড় মুদ্রা দাবী করিয়া বসিল। আলিবর্দ্দীও বীর ছিলেন। মহারাষ্ট্রের এ অপমানকর প্রস্তাবে তিনি অসম্মত হইলেন। কাজেই যুদ্ধ চলিতে লাগিল। নবাবের সৈন্য ক্রমেই পলায়ন করিতে লাগিল, মহারাষ্ট্রগণও তাহাদিগের অনুসরণ করিতে লাগিল। অবশেষে অনাহারক্লিষ্ট শ্রান্ত নবাবসৈন্য কাটোয়ায় যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। মহারাষ্ট্রগণ ইতিপূর্ব্বেই কাটোয়া লুণ্ঠন করিয়া নবাবের শস্যাগারগুলিতে অগ্নিদান করিয়া ধ্বংস করিয়াছিল। ক্ষুধিত সৈনিকগণ সেই দগ্ধ শস্যই আগ্রহভরে গ্রহণ করিতে লাগিল এবং যতদিন না মুর্শিদাবাদ হইতে শাহমৎ নূতন সৈন্য লইয়া তথায় উপস্থিত হন ততদিন নবাবসৈন্য কাটোয়াতেই অপেক্ষা করিতে লাগিল। এমন সময়ে সৌভাগ্যবশতঃ বর্ষা নামিল এবং ভাস্কর রাও শীতের প্রারম্ভে পুনরাগমন করিবার অভিপ্রায়ে বেরারে যাইবার সংকল্প করিলেন। কিন্তু উড়িষ্যায় সারফ্রাজকে সাহায্য করিবার জন্য যে সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল তাহাদিগের অধিনায়ক মীর হবিব এক্ষণে মহারাষ্ট্রের অধীনে কর্ম্ম করিতেছিলেন। ভাস্কর রাওকে তিনি নবাবের কাটোয়ায় অবস্থানের অবসরে মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করিবার পরামর্শ প্রদান করিলেন। মহারাষ্ট্র সেনা গোপনে নৈশ অন্ধকারের অন্তরালে যাত্রা করিল। কিন্তু তাঁহাদের এই গুপ্তযাত্রার সংবাদ নবাবের কর্ণগোচর হইবামাত্র, তিনি অবিলম্বে রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ মহারাষ্ট্রগণ নবাবের একদিন পূর্ব্বে আসিয়া রাজধানী অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। এইদিন মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে এক চিরস্মরণীয় দিন। লুণ্ঠনকারী শত্রুগণ যথাসাধ্য লুণ্ঠন করিয়া, জগৎ শেঠের ধনাগার ভস্ম করিয়া, নবাবসৈন্যের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ মাত্র নগর ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল এবং হবিবের পরামর্শমতে কাটোয়া নগরে শিবির স্থাপন করিল। নবাব অবিলম্বে রাজধানী পুনর্গঠনে মনোযোগী হইলেন। ১৭৪২ সালের বর্ষায় কিন্তু ভাস্কর নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। হবিবের সাহায্যে তিনি মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান, রাজশাহী ও বীরভূম অধিকার করিলেন।

ক্রুদ্ধ আলিবর্দ্দী ভীষণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার সংকল্প করিয়া তাঁহার পত্নীকন্যাকে পারিবারিক ধনরত্নাদির সহিত শাহমতের রক্ষণাবেক্ষণে গোদাগরিতে প্রেরণ করিলেন। রাজধানীর এতাদৃশ নিকটে মহারাষ্ট্রদিগকে দেখিয়া রাজধানীর অনেক অধিবাসী কলিকাতায় ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির আশ্রয়ে যাইয়া উপস্থিত হইল। নবাবের অনুমতি ক্রমে কলিকাতার ইংরাজগণ মহারাষ্ট্রের আক্রমণ হইতে কলিকাতা রক্ষা করিবার জন্য নগরীর চতুর্দ্দিকে তুইশত হস্ত দীর্ঘ এক জলপ্রণালী খনন করিলেন। সেই অবধি এই প্রণালীটি 'মহারাষ্ট্র খানা' নামেই খ্যাত।

সমস্ত বর্ষা ধরিয়া আলিবর্দ্দী গোপনে যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। এক প্রবলবাহিনী সংগ্রহ করিয়া শীতের প্রারম্ভেই ভাগীরথী বক্ষে এক নৌসেতু নির্ম্মাণ করিলেন, এবং রাত্রের অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া মহারাষ্ট্রসেনাকে সহসা আক্রমণ করিলেন। মহারাষ্ট্র সেনা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল, এবং আলিবর্দ্দী কাটোয়ার বহিঃপ্রদেশে তাহাদিগের প্রভূত যুদ্ধদ্রব্যাদি অধিকার করিলেন মহারাষ্ট্রগণ বিষ্ণুপুরে পলায়ন করিল। তথায় গভীর অরণ্যের আশ্রয়ে নবাবের অনুসরণকে ব্যর্থ করিয়া মেদিনীপুরে উপস্থিত হইল। ইতিমধ্যে উড়িষ্যার সহকারী শাসনকর্ত্তা মসুম মহারাষ্ট্র কবল হইতে স্বকীয় প্রজাকে রক্ষা করিবার জন্য এক ক্ষুদ্র সৈন্যবাহিনী লইয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। মেদিনীপুর হইতে মহারাষ্ট্রসেনার এক অংশ তদভিমুখে অগ্রসর হইল। যুদ্ধে মসুম পরাজিত হইলেন। আলিবর্দ্দী তখন বর্দ্ধমানাভিমুখে অগ্রসর হইয়া মেদিনীপুরে মহারাষ্ট্র দিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এই যুদ্ধে নবাব জয়ী হইলেন এবং মহারাষ্ট্রগণ অবিলম্বে বেরারে পলায়ন করিল। অতঃপর আলিবর্দ্দী কটকে উপস্থিত হইয়া রসুল খাঁকে তাঁহার প্রতিনিধি পদে নিযুক্ত করিয়া স্বকীয় রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। মহারাষ্ট্রের প্রথম বঙ্গাক্রমণ এইভাবে অবসিত হইল।

সুইস্-গার্ড।

"সিমোইন-কুমারি! এই মুহূর্ত্তেই আপনার প্যারিস্ ত্যাগ করা উচিত"।

সোফি চিত্রফ্রেমের উপর হইতে দৃষ্টি তুলিয়া সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?" সোফি তার সুন্দর নীলনেত্রদ্বয় উপদেষ্টার মুখে স্থাপন করিয়া তুলি নামাইয়া রাখিল। পীতাভ সুপ্রচুর কেশের রাশি তার শুভ্র মুখের চারিদিকে আন্দোলিত হইয়া উঠিল। সোফি অপূর্ব্ব সুন্দরী।

যাহার সহিত সে কথা কহিতেছিল, তার গঠন সুদৃঢ় ও বয়স সাতাশ বৎসর হইলেও তাহাকে সুপুরুষ বলা যায় না। সচ্চরিত্র উচ্চহৃদয় সংস্কারক। ক্যাজটি গম্ভীরভাবে বলিলেন, "কেন? কারণ, প্যারিস খুব শীঘ্রই আপনার বাসের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হয়ে দাঁড়াবে।"

"ওঃ, আপনি বিপ্লবের কথা বলচেন?" সোফি তার সূক্ষ্ম ভ্রূদ্বয় ঈষৎ কুঞ্চিত করিল, কহিল, "কতকগুলো চোরডাকাত ও ছোটলোক জড় করে আপনারা এ সব কি করচেন? ইউরোপ দুদিনেই এ বিদ্রোহকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেবে।"

"ক্ষমা করবেন—এই বিপ্লবই ইউরোপের-যথেচ্ছাচারকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলবে। আমরা এখন এক নূতন যুগের সম্মুখে দণ্ডায়মান! সুপ্রভাত আগত।"

"যার যেমন ইচ্ছা, সে তেমনি বিশ্বাস করবার অধিকারী। কিন্তু ক্যাজটি মহাশয়, আপনার রাজনৈতিক বক্তৃতা আমাকে ক্লান্ত ক'রে তুলছে।"

"আমি রাজনীতি সম্বন্ধে কিছু বলি নাই; সাধারণ ধারণার কথা বলছি মাত্র। ভেবে দেখুন, আপনার পৃষ্ঠপোষক কারা? অভিজাত সম্প্রদায় ও ধনী লোকেরাই ত? তারা ক্রমেই ফ্রান্স ত্যাগ করে সুইজারল্যাণ্ড অষ্ট্রিয়া এমন কি অসভ্য ইংলণ্ডে পলায়ন করছে, তাদের সাহায্য ব্যতীত আপনি এখানে চিত্রাঙ্কন করে জীবিকানির্ব্বাহ করবেন কেমন করে? তা ছাড়া আর একটা মস্ত বিপদের সম্ভাবনা আছে, সেটাও ভাববেন। এই মুহূর্ত্তে না ঘটুক, আপনার সৌন্দর্য্য যে আপনার মহাশত্রু হয়ে দাঁড়াবে।"

সোফি কহিল, "সে বিপদ সকল সময়েই নাই কি, ক্যাজটি মহাশয়?" আপনি বুঝি বিদ্রোহীদের বন্ধু? তাদের মতলব আপনার সব জানা আছে, তাই অত ভয় দেখাচ্ছেন, আমি তো বিপদ কোথা খুঁজেও পাচ্ছি না।"

"আমি স্বাধীনতার বন্ধু! অত্যাচারিত লোকদের পক্ষে আছি, যত কিছু নিষ্ঠুর অত্যাচারের বিরুদ্ধে চিরদিন আমি একটা শত্রুতা পোষণ করে আসছি। আমার ভবিষ্যৎ দৃষ্টিই আমাকে পরিষ্কার দেখিয়ে দিচ্ছে যে, দেশের লোকের পায়ের বেড়ি ভাঙ্গবার পূর্ব্বে সমস্ত দেশে রক্তের নদী বয়ে যাবে, অত্যাচারের আগুন নির্ব্বাণের জন্য কলস ভ'রে রক্তের ধারা ঢেলে দিতে হবে। নবজাগ্রত শক্তি কোন বাধা মানবে না, দোষীরা দণ্ড পাবে, কিন্তু সেই সঙ্গে অনেক নির্দ্দোষীও কষ্ট পাবে। আমি মিনতি করে বলচি, এখনি আপনি দেশ ছেড়ে যান, আবার

সুসময়ে এই নবগঠিত উন্নত জাতির উদ্দীপ্ত গৌরবের সময় তাদের আশা উৎসাহের অংশ গ্রহণ করতে আসবেন, তারা আপনাকে আদর করে ডেকে নেবে।"

পাম্‌পলেটের লেখক ও বক্তা জীন ক্যাজটি এই কথা বলিয়া আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন ও গৃহের মধ্যে পদচারণ করিতে লাগিলেন। সোফি আপনার কাজ করিয়া যাইতেছিল; এখন একটু করুণা ও বিদ্রূপের সহিত উত্তেজিত সংস্কারকের দিকে চাহিয়া বলিল. "ক্যাজটি মশায়, আসুন, আমরা আরো একটা বেশি চিত্তাকর্ষক বিষয় নিয়ে কথাবার্ত্তা কই! আমার মডেল পিরি না আসাতে আমি ভারি হতাশ হয়ে পড়েছি, সে কিন্তু আর কখনো আমায় এরকম হতাশ করেনি।"

ক্যাজটি নতমস্তকে নম্র অভিবাদনের সহিত কহিলেন, "অধিক চিত্তাকর্ষক বিষয় ত আপনার কথা ছাড়া আর কিছু খুঁজে পাই না, বিশেষতঃ, এ সময়ে।"

"অনুগ্রহ করে আমাকে আর ক্লান্ত করে তুলবেন না। আপনি ·· যা খুসী তাই বলছেন। আমাদের সর্ত্তটা মনে রাখবেন! আপনি যতক্ষণ অবধি না ভালবাসার কথা বলবেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আপনি আমার পরম বন্ধু! নয়, কি "মশায়?" সোফি তার সুকোমল কর ক্যাজটির দিকে বাড়াইয়া দিল।

ক্যাজটি ধীরে ধীরে নিজের হাতের মধ্যে সেই শুভ্র হাতখানি তুলিয়া লইয়া তাহাতে চুম্বন করিলেন, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আমি নিজের অধিকার রক্ষা করতে জানি, সুন্দরি! আমি জানি, আপনি ভীত নন, কিন্তু বাতাসে ঝড়ের বেগ বাড়ছে। আজকার দিন একটা স্মরণীয় দিন হয়ে দাঁড়াবে। আমি জানি মারসেল্‌স্‌ থেকে একদল দুর্দ্ধর্ষ নাগরিক সৈন্য প্যারিসে এসেছে। তা ছাড়া অসংখ্য ক্ষুধিত, ক্রুদ্ধ, উন্মত্ত লোক সেণ্ট আণ্টনি ও সেণ্ট মারসিও থেকে জলপথে এসে জমা হয়েছে। সে ভয়ানক দৃশ্য আপনার দেখবার যোগ্য নয়। তাই বলি, এখানে আপনি থাকবেন না। এখনও পালান, এখনও আমি আপনাকে অনুমতি পত্র এনে দিতে পারবো"!

"না, ক্যাজটি মহাশয়! আমি প্যারিস্‌ ছেড়ে কিছুতে যাবো না। ডাকাতগুলো জমা হোক, তারা কি করতে পারবে, সৈন্যেরা নিশ্চয়ই রাজপক্ষে আছে"।

"সে সম্বন্ধেও একেবারে নিশ্চিন্ত হবেন না! ক্যাজটি স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। গ্রীষ্মের শুষ্ক বায়ু আলোড়িত করিয়া অসংখ্য বন্দুক গর্জ্জিয়া উঠিল। সে শব্দ সহসা থামিল না, অবিশ্রাম রহিয়া গেল। ক্যাজটি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সোফির বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিলেন। উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "টুইলারীর উপর আক্রমণ হচ্ছে। বেতন-ভূক্‌গুলা আমার দেশের লোকের উপর গুলি চালাতে সাহস করচে। শীঘ্রই এর ফল পাবে, একটা বদমায়েসও আজ সূর্য্যাস্তের পর বেঁচে থাকবে না।"

"ও মশায়! আমার সুইস্‌ সৈন্য! আমার সাহসী স্বদেশী!" শিহরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া সোফি উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—তুলি হাত হইতে পড়িয়া গেল—"তারা তাদের রাজার জন্য যুদ্ধ করচে?"

ক্যাজটি ঘৃণার সহিত কহিলেন, "রাজা!

দুর্ব্বল, ভীরু! তাকে তার দলের সঙ্গে শীঘ্রই ঝাঁট দিয়ে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দেওয়া হবে। কুমারি! আমি এখন চল্লেম, ঠিক খপর নিয়ে আবার শীঘ্রই ফিরে আসবো।" ক্যাজটি ছড়ি ও টুপি লইয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

তখন সোফি সহসা একখানা আসনে বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিল। গুলিবর্ষণ চলিতেছে, মৃত্যু-যন্ত্রণার তীব্র আর্ত্তনাদে বাতাস ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। সোফি কল্পনানেত্রে দেখিতে লাগিল, সুইস্‌ সৈন্যগণ তাহার দেশের অটল পর্ব্বতমালার মতই অটলভাবে আপন স্থানে দাঁড়াইয়া রাজার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেছে। "ঈশ্বর তাদের শক্তি দান করুন!" হঠাৎ বন্দুকের শব্দ থামিয়া গেল, সোফি ভাবিল, যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই একসঙ্গে বজ্রের মত, সহস্র কামান, মহাশব্দে গর্জ্জিয়া উঠিল! বন্দুকের কামানের চীৎকারে প্যারিস কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। তার পর আবার সে শব্দ থামিয়া জয়ের উল্লাস ধ্বনি ও প্রতিহিংসার হিংস্র চীৎকার সোফির শিরায় শিরায় চলন্ত রক্তস্রোত স্তম্ভিত করিয়া দিল। লোকের দর্পিত পদধ্বনি, পৈশাচিক চীৎকার ও মধ্যে মধ্যে পিস্তলের আওয়াজ ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। সোফি বুঝিতে পারিল, বিদ্রোহীর দলই জয়ী হইয়াছে। এবং একটা ভীষণ নির্ম্মম হত্যা-কাণ্ডের অভিনয় করিয়া বেড়াইতেছে।

সহসা সেই ঘূর্ণাবর্ত্ত হইতে বিচ্ছিন্ন এক জন পরিশ্রান্ত ব্যক্তির প্রাণপণ শক্তির দ্বারা প্রাচীরারোহণ শব্দ সোফিকে ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া ফেলিল, পরক্ষণেই জানালার মধ্য দিয়া এক দীর্ঘাকৃতি রক্ত পরিচ্ছদধারী যুবক লাফাইয়া পড়িল। সোফি তড়িৎবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল। তার পর আগন্তুকের দিকে চাহিয়া দারুণ আতঙ্কে বলিয়া উঠিল "হেনরি!" পলাতক সৈনিক পুরুষ বিস্ময়ের সহিত কহিল, "সোফি! ক্ষমা কর! তাড়া-তাড়িতে আমি এটা তোমার বাড়ি বলে চিনতে পারিনি, এখনি ফিরে যাচ্চি।" আগন্তুক জানালার দিকে অগ্রসর হইল। সোফি আতঙ্কে তাহার হাত চাপিয়া ধরিল—"না না ক্যাপ্‌টেন লেস্‌ট্রেঞ্জ! ওরা তোমায় মেরে ফেলবে, তুমি এখানে লুকিয়ে থাক।"

"অসম্ভব! হত্যাকারীদের আমি তোমার বাড়ি আনতে পারি না! অসম্ভব। তারা এই রাস্তায় আমায় ঢুকতে দেখেছে। সমুদয় বাড়ি অনুসন্ধান করবে। তোমার উপর আমার কোন দাবী নেই, লিয়োইন-কুমারি, তুমি তো আমায় ত্যাগ করেছ!" "এ রকম কথা বলোনা, হেনরি, তুমি আমায় যত নিষ্ঠুর মনে কর ততো নিষ্ঠুর আমি নই, তোমার এই ভয়ানক বিপদ, তা ছাড়া তুমি আমার স্বদেশী। আর সময় নষ্ট করোনা। যাও, শীঘ্র এই পর্দ্দার মধ্যে যাও, ওখানে অনেক পোষাক আছে।" লেস্‌ট্রেঞ্জ মুহূর্ত্তমাত্র ইতস্তত করিল; একবার সোফির উৎকণ্ঠিত নীল চোখের প্রতি দৃষ্টি করিয়া পরমুহূর্ত্তে তার আজ্ঞা পালন করিল।

যখন জীন ক্যাজটি বিজয় গৌরবে প্রফুল্লচিত্তে ফিরিয়া আসিল তখন, সোফি নিবিষ্ট চিত্তে চিত্রাঙ্কন করিতেছে, মঞ্চের উপর একজন মস্তেন সেকালের বড় লোকদের

মত পোষাক-পরা, হাতে ক্ষুদ্র তরবারি ও নস্যদানী লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। ক্যাজটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মডেলের প্রতি চাহিল। "এতক্ষণে তাহলে পিরি এসেছে !

"না, না, পিরি তো নয়। সে সাংঘাতিক পীড়ায় শয্যাগত বলে আসতে পারেনি একজন প্রতিনিধি পাঠিয়েছে। জ্যাক্‌স্ তোমার মাথা বাঁ দিকে একটু ফেরাতে হবে। আপনার দলই জিতেছে, না, ক্যাজটি মশায় ? ব্যাপারটা দেখ্‌চি বড় সহজ নয় : যে রকম গোলমাল শোনা যাচ্চে, তাতে মনে হয় ত, তারা নীতিজ্ঞানশূন্য হয়ে দেশ উজাড় করচে।"

ক্যাজটি আসন গ্রহণ করিলেন এবং উত্তর দিবার পূর্ব্বে আবার একবার মডেলের পানে চাহিয়া দেখিলেন, কহিলেন,"হাঁ জাতীয় দলই জয়ী হয়েছে, সম্পূর্ণ জয়ী। ভাড়া করা কসাইগুলোর মধ্যে একটাও বেঁচে আছে কি না, সন্দেহ। সিটিজেন লুইস্ কেপেট সপরিবারে টুইলারী ছেড়ে গেছে। সুইস্‌রা রক্ষী ছিল। পেট্রিয়টদল প্যালেসে পৌঁছিলে বন্দুকের গুলি দিয়ে তাদের অভ্যর্থনা করেছিল, অনেক পেট্রিয়ট মারা গিয়াছে, এমন সময় সিটিজেন ক্যাপেট গুলি চালান বন্ধ করবার হুকুম পাঠায়।" "উত্তম; বাকি অংশটা কেবল হত্যাকাণ্ড ?"

"মারসিনারিরা খুব শিক্ষা পেয়ে গেছে। যাহোক অন্যদল থেকে আমাদের কোন কষ্ট পেতে হয়নি। তোমার মডেলকে যে বড় ক্লান্ত দেখাচ্চে, একে কেউ দেখলে মনে করবে, বুঝি এইমাত্র ভয়ানক ছুটে পালিয়ে এসেছে"। "আমি যে অপেক্ষায় ছিলেম, ক্যাজটি মশায়, সে জন্য জ্যাক্‌স্‌কে আমি ধন্যবাদ দিচ্চি।"

"নিশ্চয়! আমি কি জিজ্ঞাসা করতে পারি, মডেলটি ফরাসী কিনা ?" "তা আমি কেমন করে বলবো ? মডেলের সঙ্গে কেউ এ সব বিষয়ে কথা কইতে বসে না,আমার এই পর্য্যন্ত দরকার যে তার চেহারাটি ভাল।" "তা সত্য! আমার ভয় হচ্ছে, আপনি আপনার অবস্থা বুঝছেন না। এ বাড়ি খুব ভাল রকম অনুসন্ধান করবারই সম্ভাবনা, তা কি ভুলে যাচ্চেন ? পেট্রিয়টরা খুব কাছে এসেছেন।"

"অসম্ভব! কিছুতে এরকম অত্যাচার হতে পারবে না, আমি এ অশিষ্টতা সহ্য করতে পারব না। ক্যাজটি মশায়, আপনার তো ঐ সব দস্যুবীরদের উপর কিছু ক্ষমতা আছে, আপনি অবশ্য তাদের বাধা দেবেন ?" "আমি !" ক্যাজটি বিস্মিতনেত্রে সোফির পানে চাহিলেন, "স্বয়ং জেনারেল লাফেট বা মিরাবো পর্য্যন্ত এ অনুসন্ধান বন্ধ করতে পারেন কিনা সন্দেহ। আমার উপর আপনি কোন ভরসা রাখবেন না।" "ওঃ, বুঝেছি, আমাকে বাধিত কর্ব্বার জন্য আপনি নিজেকে বিপদগ্রস্ত করতে ইচ্ছুক নন, জ্যাক্‌স্, একটু স্থির হও, নড়োনা—"ক্যাজটি ঘরের অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পায়চারি করিয়া আসিয়া সোফির চিত্রের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। সোফি এক মনে ছবির দিকেই চাহিয়াছিল। ক্যাজটির মুখে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়া উঠিল। কেশের মধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া তিনি বলিলেন, "আজ আমি আপনার ছবির সুখ্যাতি করতে পারলেম না, কুমারি! আপনার অসাধারণ অঙ্কন

ক্ষমতা আজ আপনি হারিয়ে ফেলেছেন। সত্য কথা বলতে কি, চিত্রখানা জঘন্য হচ্ছে। ক্ষমা করবেন, এতটা স্পষ্ট বলা আমার উচিত নয়!"

"আপনার মত বন্ধুর উপদেশে আমি উপকৃত, আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, আপনি পুরানো বন্ধুর মতই কথা বলেছেন। সত্যই এ গোলমালে আমার ছবি ভাল হয় নাই। এই দেখুন আমার হাত কাঁপচে।"

"বাস্তবিক তাই। আপনার মডেলকে কি এখন বিদায় করা ভাল নয়? ঐ শুনুন, পেট্রিয়টরা দুইটা বাড়ি তফাতে চীৎকার করছে—"পরাভূতগণ নিপাত যাক্‌।" "জ্যাকস্‌ তোমার হাত তরবারি থেকে সরিয়ে নাও, তুমি তোমার ভাব ঠিক রাখবার চেষ্টা করচোনা।" সোফি নির্ভীকভাবে কথা কহিতেছিল বটে, কিন্তু তাহার দেহ কাঁপিতেছিল, মুখ একেবারে রক্তহীন হইয়া পড়িয়াছিল। ক্যাজটি তীব্র স্বরে কহিল, "আপনার এই জ্যাক্‌স্‌, বোধ হয়, তার কাজে শিক্ষানবিসি আরম্ভ করেছে, না? তাকে এ অবস্থায় রাখা ভারী নিষ্ঠুরতা হচ্ছে, কারণ সে ভারী চঞ্চল হয়ে পড়েচে—"

সোফি ক্রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল, "ক্যাজটি মশায়, আপনার নিজের চেয়ারে বসুন, আমার পিছনে কেউ দাঁড়ায় আমি সেটা পছন্দ করি না।" ক্যাজটি পর্দ্দার নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন; সোফি তীব্রস্বরে কহিল, "পর্দ্দার ভিতর এমন কোন আশ্চর্য্য জিনিষ নাই, যে জন্য ওখানে উঁকি দিচ্ছেন, আপনার চেয়ারে বসুন।"

কিন্তু, আপত্তি টিঁকিল না। ক্যাজটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্দ্দার পিছনে যেখানে কতকগুলা কাপড় চোপড় পড়িয়াছিল সেইদিকে দেখিতে লাগিলেন। একটা উজ্জ্বল বর্ণ! সহস্র বর্ণের মধ্যেও তাহা লুকান যায় না। ক্যাজটির তীক্ষ্ণ চক্ষু মডেলের পোষাকের মধ্য হইতে আবিষ্কার করিল। ঈষৎ হাসিয়া তিনি ফিরিলেন, বলিলেন, "ক্ষমা করুন, কুমারি! আমি জানি আপনার লুকাইবার কিছু নাই। ঐ সিটিজেনরা প্রায় আসিয়া পৌঁছিল। আর কয় মিনিট মাত্র পরে, যারা সুকুমার শিল্পের আদর বুঝে না, তাদের কঠোর হস্তে এই চিত্রশালা বিধ্বস্ত হবে, তখন তাদের কেমন করে প্রতারণা করবেন? মনে করুন, তারা আমাদের জ্যাকস্‌ বেচারাকে হয় তো একজন অভিজাত বলে ভুল করে বসবে! ভুলে অনেক সময় অনেক বিপদ ঘটে—কিন্তু আপনার মডেলের হলো কি? আমি দেখছি, সে কাঁপচে। তাকে সিটিজেনদের কাছে নিজেকে একজন দরিদ্র ব্যক্তি এবং মডেলের কাজ করেই জীবিকা নির্ব্বাহ করে এর জন্য প্রমাণাদি দিতে হবে ত।" "জ্যাক্‌স্‌, স্থির হও!" মডেল কম্পিত হয় নাই! সে প্রস্তর মূর্ত্তির মত স্তব্ধ ও গতিহীন হইয়া গিয়াছিল। সোফি তার চিত্রাঙ্কন দ্রব্য দূরে নিক্ষেপ করিয়া শঙ্কিতভাবে চেয়ারের উপর হেলিয়া পড়িল। ক্ষুধার্ত্ত বন্য জন্তু যেমন গম্ভীর গর্জ্জনে অরণ্য প্রতিধ্বনিত করিয়া শীকার অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়, তেমনি গর্জ্জনের সহিত সৈন্যদল বাড়ির কাছে আসিয়া পৌঁছিল। ক্যাজটি সোফির মডেলের প্রতি একবার চাহিয়া দেখিল, তার পর সোফির কাছে আসিয়া তীক্ষ্ণস্বরে কহিল, "কুমারি

আপনার হ্যাট নিয়ে এই বেলা আমার সঙ্গে আসুন, আমায় সকলে চেনে—এখনও আপনাকে রক্ষা করবার সময় আছে, কিন্তু মডেলটকে এইখানেই ছেড়ে যেতে হবে"।

"তা আমি পারব না, কিছুতে না, ক্যাজটি মশায়, আপনি আমাদের রক্ষা করুন। আপনি—"

ক্যাজটি তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিল, "এ আপনার কে?" সোফি মস্তক নত করিল, মৃদুস্বরে উত্তর করিল, "এ আমার স্বদেশী, তারা একে হত্যা করবে।" হেনরি লেসট্রেঞ্জ মঞ্চ হইতে নামিয়া পড়িয়া দ্রুতকণ্ঠে কহিল, "লিমোইন-কুমারি, আমার জন্য তুমি আত্মরক্ষায় পরাঙ্মুখ হয়ো না! আমায় ফিরে যেতে অনুমতি দাও, সব সমস্যা দূর হোক। মশায়! আপনাকে কিছু বলবার নাই, যারা আমার সহচর, বন্ধুদের হত্যা করেছে, আপনি তাদেরি দলের লোক, অন্য স্থানে আপনার সঙ্গে দেখা হলে বড় সুখী হতেম, কিন্তু তা অসম্ভব, আমি আমার মৃত্যুকে বরণ করতে চল্লেম। যুদ্ধ করে মরবো, এবং আমার হত্যাকারীদের সঙ্গে নিজের পোষাকেই সাক্ষাৎ করতে যাবো। বিদায়, সোফি। তোমার করুণার জন্য শত ধন্যবাদ। কিন্তু মিনতি করে বলচি, তুমি এই ভদ্রলোকের সঙ্গে যাও, ঈশ্বরের নিকট আমার শেষ প্রার্থনা, তুমি সুখী হও।"

সোফিকে অভিবাদন করিয়া সে পর্দার দিকে অগ্রসর হইতে গেল। কিন্তু সোফি দুই হাতে তাহাকে ধরিয়া রাখিল, "হায়, হেনরি! সেদিন নিজের হৃদয় না বুঝে তোমায় বিদায় দিয়েছিলাম, কিন্তু এতদিন পরে আজ যখন এসেছ, আর আমায় ছেড়ে যেও না, আসুক তারা, আমরা এক সঙ্গে মরবো।" হেনরি সোফির মৃত্যু বিবর্ণ অধরে চুম্বন করিল, রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "কি আনন্দ! কি বিজয়! কিন্তু প্রাণের সোফি, আমরা ফাঁসি কাঠের নীচে দাঁড়িয়ে আছি। আমি তোমাকে আমার মৃত্যুর সঙ্গী করতে পারব না, আমায় ছেড়ে দাও, যেতে দাও।"

ক্যাজটির উপস্থিতি তাহারা ভুলিয়া গিয়াছিল! রিপবলিকান ক্যাজটি প্রস্তর মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া বিস্ময়ব্যাকুল নেত্রে তাহাদের দিকে চাহিয়াছিলেন। সোফিকে সত্যই তিনি প্রাণের সহিত ভাল বাসেন, আজ আপনার সম্মুখেই তাহাকে অন্যের বাহুবন্ধনে বদ্ধ দেখিয়া তাঁহার প্রশস্ত বক্ষ যেন চূর্ণ হইয়া গেল। যাহাকে ভালবাসেন, আর কয় মিনিট পরেই তাহাকে তাহার প্রেমাস্পদের পাশে দলিত পুষ্পের মত ছিন্ন-বিচ্ছিন্নভাবে পড়িয়া থাকিতে দেখিবেন! তাঁহার মস্তিষ্ক জ্বলিয়া উঠিল। এখন ইহাদিগকে কিছুতেই কি বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবেন না। এদিকে ক্রুদ্ধ সমুদ্রতরঙ্গের মত বিপুল জনসঙ্ঘ বাড়ির উপর আসিয়া পড়িয়াছে। ক্যাজটি নিজে এখানে উপস্থিত থাকিলে বিপদে পড়িবেন। কিন্তু কেমন করিয়া ইহাদিগকে ত্যাগ করেন। সৈনিকটা মরিলে বাঁচিলে তাঁহার সমানই ক্ষতি, সোফি চিরকালের জন্য তাহার নিকট হইতে চলিয়া যাইবে। কখন তো সে তাঁহার দিকে এমন করিয়া চাহে নাই। কখনও ত সোফির হৃদয় তাঁহার জন্য এমন ব্যাকুল হয়

নাই? ক্যাজটি একটি সুগভীর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন তারপর সহসা একটা নূতন চিন্তা তাঁহার যন্ত্রণা-পীড়িত মস্তিষ্কের মধ্যে বিদ্যুতের মত চমকিয়া উঠিল, "আঃ, এই পথ, এই একমাত্র উপায়ে ব্যর্থ জীবন এবং যন্ত্রণার উপশম হইবে, এবং অসাধারণ ত্যাগের মহিমাদ্বারাই সোফির অন্তরে তাহার স্মৃতি উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত রাখিবে। মনুষ্যত্বের ও বীরত্বের এই শৃঙ্খল দিয়া তাহাকে নিজের কাছে বাঁধিয়া রাখিবার লোভ, ক্যাজটি সম্বরণ করিতে পারিলেন না। বক্তা ও কবির কল্পনা তাঁহাকে এ উৎসর্গের দিকে সবলে আকর্ষণ করিতে লাগিল। কলের পুতুলের মত ক্যাজটি বলিলেন, "মশায়, আপনি মঞ্চের উপর যান। লিমোইন কুমারি, আপনার কাজ আরম্ভ করুন। আমার দ্বারা যেটুকু সাহায্য হতে পারে, তা করব। এই ছাড়পত্র,—ইহার সাহায্যে আপনারা পালাতে পারবেন। এখন আমি চল্লেম, হয়তো আর আসতে পারবো না।" পর্দ্দা সরাইয়া ক্যাজটি সুইস্‌ গার্ডের লাল পোষাকটা সংগ্রহ করিয়া লইলেন। তার পর এক বার শুধু সোফির মুখের দিকে চাহিয়া তার শীতল হস্তে একটিমাত্র বাগ্র চুম্বন অঙ্কিত করিয়া দ্রুতপদে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। দ্বার বন্ধ হইল।

হেনরি লেসট্রেঞ্জ মঞ্চের উপর আসিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু তরবারিখানা এবার খাপ হইতে খুলিয়া রাখিল, জিজ্ঞাসা করিল "তোমাকে বিশ্বাস করবো কি, সোফি?"

"হাঁ, আমি জানি, ক্যাজটি আমার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।"

কিন্তু কি করে এত অল্প সময়ের মধ্যে আমার লাল পোষাকটা লুকিয়ে ফেলবে, আমি ভেবে পাচ্ছি না, যদি ওগুলো ধরা পড়ে, তাহলে এ বাড়ির প্রত্যেক ইট সুদ্ধ খসিয়ে তারা অনুসন্ধান করতে ছাড়বে না। ঐ শোন! তারা সিঁড়ি দিয়ে উঠছে!"

"ভয় কি হেনরি? সাহস আনো!" —সোফির কণ্ঠরোধ হইল, দারুণ আতঙ্কে দুই জানুর মধ্যে মুখ লুকাইয়া সে কাঁপিতে লাগিল। দ্বারের সম্মুখে বহু লোকের পদধ্বনি শুনা গেল, শব্দটা সরিয়া গেল। তার পর উচ্চ চীৎকার, "রাজা দূরে দীর্ঘজীবী হোন" এবং বন্দুকের গর্জ্জন ঘরটাকে কাঁপাইয়া তুলিল। সেই সঙ্গে একটা গুরু বস্তু পতনের শব্দে সোফি মূর্চ্ছিতা হইল। সৈনিক সোফিকে আসন হইতে তুলিয়া তার হাত ধরিয়া দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু সেবার কেহই প্রবেশ করিল না, বরং তাহারা শুনিল হত্যাকারীগণ বিকট চীৎকারে জয়ধ্বনি করিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িতেছে। তাহাদের প্রতিহিংসা কিসে চরিতার্থ হইল?

চিত্রশালার দ্বার হইতে কিছু দূরে লাল পোষাক পরা মৃত জীর্ণ ক্যাজটির দেহ পড়িয়া আছে। তাহার অসংখ্য ক্ষত হইতে শোণিতধারা প্রবাহিত হইয়া সিঁড়ি বাহিয়া পড়িতেছিল। প্যারিসের প্রসিদ্ধ বক্তা, চিরদিনের জন্য, আজ নীরব হইয়া গিয়াছেন।

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

মধ্যহিমালয়ের কুলুজাতি।

কুলু মধ্য হিমালয়ের অন্তর্বর্ত্তী একটী উপত্যকা ভূমি। সিমলা হইতে প্রায় ১২০ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ৫০ মাইল এবং প্রস্থে প্রায় দুই মাইল, স্থানে স্থানে আরও সঙ্কীর্ণ। প্রধান উপত্যকার সহিত আরও কতকগুলি ছোট ছোট উপত্যকার সংযোগ আছে। এই উপত্যকাগুলি সাধারণতঃ 'নালাস' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ উপত্যকাগুলি সর্ব্বদাই তুষারাচ্ছন্ন। নিম্নভাগেরও কতকাংশ প্রায় জুন মাস পর্য্যন্ত বরফাবৃত থাকে। কেবল মধ প্রদেশটুকুই লোকের বাসস্থান ও কৃষিকার্য্যের উপযোগী।

ইহার উত্তরে দুইটি এবং দক্ষিণে একটি প্রবেশ পথ আছে। উত্তর পথ দুইটীর মধ্যে একটীর নাম ডল্‌চি-পাস (Pulchi pass) ইহা প্রায় ছয় হাজার ফুট উচ্চ। অপরটীর নাম বুবু-পাস (Buboo pass) ইহাও প্রায় দশ হাজার ফুট উচ্চ হই৲। দক্ষিণ দিকের পথটীর নাম রোটংপাস (Rohtung pass) ইহার উচ্চতা ন্যূনকল্পে পনের হাজার ফুট।

কুলুর অধিবাসিগণ সাধারণতঃ অলস প্রকৃতির। কাজকর্ম্ম করিতে তাহারা বড় একটা ভালবাসে না। কৃষি ইহাদিগের প্রধান উপজীবিকা। অধিবাসিগণের মধ্যে সকলেরই কিছু না কিছু জমি আছে। তাহারই চাষ করিয়া কোনমতে জীবনধারণ করে। জমিগুলি প্রায়ই নদীর সমীপবর্ত্তী ছোট ছোট সীমানায় বিভক্ত এবং পাহাড়ের গায়ে বলিয়া ঈষৎ ঢালু।

কুলু দেশীয় পুরুষগণ সাধারণতঃ সুশ্রী নহে। তাহাদিগের তুলনায় স্ত্রীলোকদিগকে সুরূপা বলা যাইতে পারে। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের আয়ুকাল অল্প। পঞ্চবিংশতিবর্ষ অতিক্রম না করিতেই তাহারা প্রায় জরাগ্রস্ত হইয়া পড়ে।

ইহাদিগের ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মেরই অংশ স্বরূপ। প্রত্যেক গ্রামেই 'দেওতা' নামে একপ্রকার দেবমূর্ত্তি আছে। কুলুবাসিগণ সেই দেবপ্রতিমার পূজা করিয়া থাকে। ইনি জলের দেবতা, যখন অতি বৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি হয় তখন গ্রামবাসিগণ তাঁহার নিকট আবেদন জ্ঞাপন করে, বৎসরের মধ্যে একদিন কেবল এই আবেদন জ্ঞাপনের দিন। সেই জন্য তাহারা শস্য সংগ্রহের জন্য যে শুভদিন নির্দ্ধারিত করে—সেই দিনই ধূমধামের সহিত এই দেবতার পূজা করিয়া থাকে। পূজা উপলক্ষে দেবতার নিকট জীবজন্তু বলি দেওয়া হয়, এবং পরে তাহারা প্রসাদ গ্রহণ করে।

এই প্রথা এখন ইহাদিগের মধ্যে বার্ষিক উৎসবে পরিণত হইয়াছে। দেবতার প্রতি যে বিশেষ কিছু ঐকান্তিক ভক্তি বশতঃ তাহারা এইরূপ করে তাহা বোধ হয় না। ইহা যেন একটা জাতীয় বাৎসরিক ভোগের দিন,—সকলে মিলিয়া এই দিন আমোদ আহ্লাদ করিয়া থাকে। কিন্তু শুধু পূজা নহে, দেবতাকে শাস্তিও গ্রহণ করিতে হয়। যদি কখনো তাহাদের প্রার্থনা-পূরণে দেবতার কৃপণতা প্রকাশ পায়, তাহা হইলে তাহারা উপযুক্ত শাস্তি

দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। অনেক সময় দেবতাকে মন্দির হইতে বাহির করিয়া আনে, কখন বা হেটমুণ্ডে রাখে; এমন কি দেবতার পৃষ্ঠে পাদুকা বর্ষণ অবধি বাদ যায় না।

কুলুবাসিগণ অত্যন্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন। পবিত্রজ্ঞানে যে সকল বৃক্ষ ইহারা পূজা করে সেই সকল বৃক্ষের তলদেশে ক্ষুদ্র মন্দির গঠিত থাকে। এই সকল বৃক্ষে ভূত বা প্রেতযোনি বাস করে বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস। কতকগুলি নদীও পবিত্রজ্ঞানে পূজিত হইয়া থাকে। এই সকল নদীর জলে কোনপ্রকার অপবিত্র জিনিস নিক্ষেপ করিতে দেয়না। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি বিদেশী এই স্থান দেখিতে আসিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, তাঁহারা এই সকল নদীর জল অপবিত্র করায় সে বৎসর উক্ত দেবতার কোপে অতিবৃষ্টি হইয়াছিল। এই ঘটনায় কুলুবাসিদিগের হৃদয়ের বিশ্বাস দৃঢ়তর হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

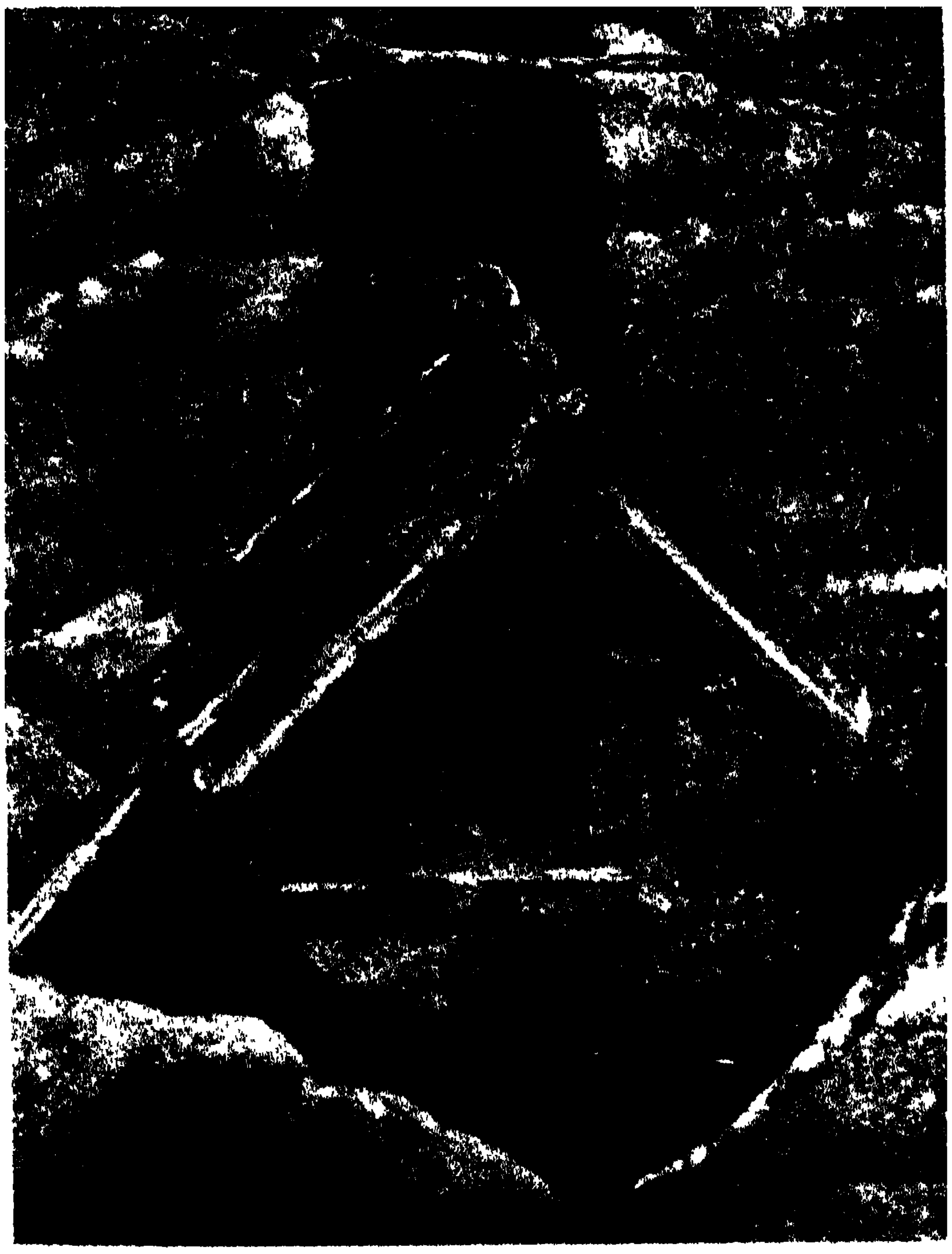

বৃক্ষতলস্থ মন্দির।

কুলুবাসিদিগের আবাসগৃহ প্রায়ই দ্বিতল এবং একটীমাত্র প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট। সাধারণতঃ কেবল একটীমাত্র দ্বার ব্যতীত বায়ুসঞ্চালনের দ্বিতীয় উপায় নাই। গৃহপালিত জীবজন্তু নীচের ঘরেই থাকে। এই সকল গৃহ বৎসরে একটি দিন মাত্র পরিষ্কার করা হয়। এবং সমস্ত জঞ্জাল জমির সারের জন্য ব্যবহৃত হয়। স্বাস্থ্যের দিকে ইহাদের মোটেই দৃষ্টি নাই। পর্ব্বতের স্বাভাবিক নির্ম্মল বায়ু না থাকিলে, ইহাদের মধ্যে সংক্রামক রোগ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিত, সন্দেহ নাই। গৃহের চারিধারের বারাণ্ডায় শস্যাদি সংগৃহীত থাকে। শীতকালে অত্যধিক বরফ পড়ায় এই সকল বারাণ্ডা কাষ্ঠের বেষ্টনিতে ঘেরিয়া রাখা হয়। কুলুর পুরুষদিগের পরিচ্ছদের মধ্যে পট্টু নামক একপ্রকার তদ্দেশজাত পশমের একটি কোট, একটী পেণ্টলুন, ও একটী টুপি। কখনও কখনও শোভার জন্য তাহারা পুষ্পাভরণও ব্যবহার করিয়া থাকে। স্ত্রীজাতির পোষাকের মধ্যে কেবল একটী কম্বল। পরিধানের এমনি কৌশল যে, এই কম্বল ঘাগরার মত কটি বেষ্টন করিয়াও দেহের উর্দ্ধভাগের অনেকটা অংশ আচ্ছাদন করে। সভ্যজাতীয়া রমণীর ন্যায় কুলুনারীও অল-

ভূষণের বিশেষ অনুরাগিনী। কোন মেলা উপলক্ষ্যে তাহাদের বেশভূষার বিশেষ পারিপাট্য লক্ষিত হইয়া থাকে! এখানে স্ত্রীলোকেরাও চাষের কার্য্য করে। বহুবিবাহ-প্রথার এখানে প্রচলন আছে। যাঁহারা একটু ধনবান গৃহস্থ, কিম্বা প্রচুর জমিজমার অধিকারী, সাধারণতঃ তাঁহাদের অনেক কর্ম্মীর প্রয়োজন হয়। কাজেই বহুবিবাহ তাঁহাদিগের পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। বিবাহের পূর্ব্বে বরপক্ষ কন্যাপক্ষকে বিস্তর যৌতুক দিয়া থাকে এবং আত্মীয় স্বজনের মধ্যে রীতিমত প্রীতি ভোজেরও ব্যবস্থা আছে। এই সকল কার্য্যে 'লুগরি' নামক একপ্রকার দেশী মদ্য প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ একাদশ বা দ্বাদশ বৎসর বয়সেই বালিকাদিগের বিবাহ হয়, বিবাহিতা বালিকাদের মধ্যে অনেকটা স্বাধীনতাও আছে।

কুলুদেশের বর্ত্তমান কৃষিকর্ম্মপদ্ধতি দশসহস্র বৎসর পূর্ব্বেকারই অনুরূপ। পূর্ব্বে বলিয়াছি, কুলু দেশের কৃষিক্ষেত্রগুলি সাধারণতঃ অতি অল্প পরিসর স্থানে সীমাবদ্ধ। এইজন্য হলচালনে সুবিধা না হওয়ায় হস্ত দ্বারাই জমি কর্ষিত হইয়া থাকে। এখানে মই দিবার ব্যবস্থাও অনুরূপ। একখানি বড় তক্তার উপর আর একটী তক্তা রাখা হয়। সেই তক্তা দড়ির সাহায্যে কর্ষিত জমীর উপর দিয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া হয়। ইহাদিগের মধ্যে শস্য-সংগ্রহের প্রথাও বিশেষ আয়াসসাধ্য। প্রত্যেক শস্যের শীষ পৃথকভাবে সংগৃহীত হইয়া থাকে। শস্য হইতে দানা বাহির করিবার ব্যবস্থা অনেকটা বঙ্গদেশেরই অনুরূপ। উপত্যকায় বসতি যে খুব ঘন, তাহা নহে। এই জন্য যে সামান্য শস্য উৎপন্ন হয় তাহাতেই দেশবাসীর অন্নাভাব দূর হয়। কুলুজাতি বেশ আমোদপ্রিয়। কুলুজাতির আমোদ মেলায়। আমাদের দেশের মেলায় অনেক দোকান-পাট বসিয়া থাকে। স্থানীয় জনসাধারণ হাটবাজার, আমোদ-

সালঙ্কারা কুলুকুমারী।

প্রমোদ প্রভৃতি করিয়া থাকে। কিন্তু কুলুদিগের মধ্যে এরূপ কোন ব্যবস্থা নাই। তাহাদিগের মেলায় সাধারণতঃ দুই তিনখানি গ্রামের অধিবাসী একত্র সম্মিলিত হয়। যে যাহার গ্রামের দেবতা লইয়া আসে। সেই সকল দেবমূর্ত্তি মধ্যে রাখিয়া নাচগান আমোদ-আহ্লাদ করে। সেদিন প্রত্যেকেই কিছু না

কিছু মদ্যপান করিয়া থাকে। এই সময়ে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে, সাধারণতঃ, বিলাসিতার প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায়। পুরুষেরা রঙ্গিন টুপি এবং পুষ্পমাল্যে ভূষিত হইয়া মেলায় যোগদান করে।

কুলুদিগের মধ্যে কোন দুরারোগ্য রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায় না। নিম্ন উপত্যকায় শরৎকালে কখনো কখনো ম্যালেরিয়ার প্রকোপ হয় বটে, কিন্তু, এত সামান্য যে দুই এক মাত্রা কুইনাইন সেবনেই তাহা আরোগ্য হইয়া যায়। সমুদায় উপত্যকা প্রদেশে কেবল বাত ও গলগণ্ড রোগেরই যা একটু প্রাদুর্ভাব। ভূটান, লাডক্, নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি যে সকল স্থানে শীত আরও অধিক, থাকার অধিবাসীগণ অনেকেই শীতকালটা এখানে কাটাইতে আসে।

এই সকল প্রবাসী সাধারণতঃ বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী। তাহারা নদীর ধারে তাঁবু খাটাইয়া বাস করে; এবং কোনরূপে প্রবল শীতের কয় মাস কাটাইয়া দেয়। তাহাদের নিকট সর্ব্বদাই একটী ছোট বাক্স দেখিতে পাওয়া যায়। এই বাক্সে তাহাদের প্রার্থনাচক্র এবং তিব্বত দেশীয় বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত শাস্ত্রগ্রন্থাদি থাকে। সিংহল, ব্রহ্ম, জাপান প্রভৃতি প্রদেশে প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত ইহাদের ধর্ম্মের মিল নাই। বৌদ্ধ ধর্ম্মের সূক্ষ্ম আবরণের মধ্যে ইহা ভোজবাজী, দৈত্য-পূজা ও কুসংস্কার সংমিশ্রণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহাদের বিশ্বাস, বাতাসে ভূতযোনি বাস করে। কোন উপায়ে নিজেকে বিপদ হইতে রক্ষা করাই ইহাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। এইজন্য প্রত্যেক লামা (ধর্ম্মগুরু) অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত থাকে এবং প্রত্যেক স্ত্রীপুরুষেই এক একটী মাদুলি ধারণ করে।

কুলুর বাহ্যিক ধর্ম্মভাবটা বড় বেশি বলিয়া বোধ হয়। চারিদিকেই লামাদিগের মঠ। এগুলি সাধারণতঃ প্রস্তরনির্ম্মিত এবং বহু কোণযুক্ত। প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ডে লেখা আছে "ওঁ মণিপদ্মে হুম্"। লামাগণ এই সকল মঠ প্রস্তুত করিয়া তথাকার অধিবাসিগণের নিকট তাহা বিক্রয় অবধি করিয়া থাকে।

এখানে লামা সম্প্রদায়ের সংখ্যা এত অধিক যে, প্রত্যেক ছয়জন অধিবাসীর মধ্যে অন্তত একজন লামা আছেই। ইহারাও আবার দুইটী বিভিন্ন দলে বিভক্ত। একটী দলের নাম গেলুগ-পা (gelugpa) এবং অপর দলের নাম নিন্-মা-পা। (Nin-ma-pa)

কুলু উপত্যকা সকল জাতির পক্ষেই বেশ স্বাস্থ্যকর স্থান। নাসপাতি আপেল প্রভৃতি ফলের জন্য এ স্থান প্রসিদ্ধ। খাদ্যদ্রব্যও এখানে নিতান্ত দুর্ম্মূল্য নহে। সুতরাং অল্প খরচেই বেশ স্বচ্ছন্দে চলিয়া যায়।

শ্রীগুরুদাস আদক।

বিবিধ।

রমণীর অধিকার।

আমরা গতবর্ষের বৈশাখের ভারতীতে ইংলণ্ডের রমণীগণের রাজনৈতিক অধিকারলাভের জন্য সংগ্রাম ও আত্মোৎসর্গের একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিয়াছিলাম। এই এক বৎসরে তাঁহাদের আদর্শে ইয়ুরোপের অন্যান্য দেশের রমণীকেও রাষ্ট্রীয় অধিকারলাভে উত্তেজিত করিয়াছে। ফরাসীদেশের প্রায় প্রত্যেক স্থান হইতেই শিক্ষিতা রমণীগণ শাসন-সমিতির সভ্য হইবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন। ইঁহারা অনেকেই ডাক্তার, ব্যবহারজীবি বা অপর কোন শিক্ষিতক্ষেত্রে অর্থোপার্জ্জনে নিযুক্ত। ইহাদের মধ্যে আবার নানাপ্রকার রাজনৈতিক দল আছে, কেহ উদার-নৈতিক, কেহ সোসিয়ালিষ্ট, কেহ বা অপর কোন প্রচলিত দলভুক্ত। অপরাপর বিষয়ে ফরাসী রমণীরা পুরুষের সহিত প্রায় তুল্যাসনেই অধিষ্ঠিতা। এক্ষণে রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও তাঁহারা তুল্যাধিকার লাভের জন্য পুরুষজাতির সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইংলণ্ডের রমণীরা এই রাষ্ট্রীয় অধিকার পাইবার জন্য যেরূপ আয়োজন, চেষ্টা ও কষ্ট স্বীকার করিতেছেন তাহার কতকটা আভাষ আমরা লেডি লিটনের দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝিতে পারি। লর্ডের কন্যা হইয়া, কুলশীলমানে উচ্চপদস্থ হইয়া, চিরসুখ-পালিতা লেডি লিটন যেরূপ অম্লানবদনে সুখসম্মান ও সংসারকে উপেক্ষা করিয়া কারাগৃহে সামান্যা দুষ্কৃতা নারীর ন্যায় কালাতিপাত করিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিলে তাঁহার বীরত্বে, একাগ্রতায় ও আত্মত্যাগে নরনারী সকলকেই মুগ্ধ হইতে হয়। তাঁহার এই কারাকাহিনী আমরা তাঁহার নিজের কথাতেই বর্ণনা করিলাম। বিলাতের প্রসিদ্ধ টাইমস্ পত্রিকায় তিনি এই পত্রটি প্রকাশিত করেন—

"গতবর্ষে অক্টোবর মাসে বিলাতের স্বদেশসচিব পার্লিমেন্টের সাধারণ সভা সমক্ষে বলেন যে;—আড়াই দিন অনাহারের পরেও যে তাঁহারা আমাকে বলপূর্ব্বক আহার না করাইয়া কারাগার হইতে মুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন, আমার হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতাই তাহার কারণ। তিনি ইহাও বলেন যে আমার পদের বা সামাজিক মর্য্যাদার জন্য যে আমাকে মুক্তিদান করা হইয়াছিল একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। কিন্তু আমার বিচার ও মুক্তি সংক্রান্ত ঘটনাবলী সমালোচনা করিয়া দেখিলে, অন্যান্য কারাবাসিনীর তুলনায় আমার প্রতি যে বিশেষ পক্ষপাত ব্যবহার হইয়াছিল তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়।

"আজ পর্য্যন্ত গবর্মেণ্ট নারীগণের রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের প্রস্তাবকে সমভাবেই উপেক্ষা করিয়া আসিতেছেন, এবং এই সম্প্রদায়ভুক্ত বন্দিনীগণের প্রতি দুর্ব্যবহার দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। এইরূপ কতকগুলি বন্দিনীর প্রতি অত্যাচারের কাহিনীতে উত্তেজিত হইয়া আমি গত ১৪ই জানুয়ারি শুক্রবারে লিভারপুলের কারাগারের সম্মুখে ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার জন্য এক সভায় যোগদান করি। পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা হইতে এবারে আমি সাবধান হইয়াই উপস্থিত হইয়াছিলাম। আমি ছদ্মবেশে যাইয়া আপনাকে জেন ওয়ার্টন্ নামে প্রকাশ করিয়াছিলাম আমি শ্রোতৃবৃন্দকে গবর্ণরের বাটী পর্য্যন্ত আমাকে অনুসরণ করিতে উত্তেজিত করিয়াছিলাম বলিয়া পরদিন আমার প্রতি চতুর্দ্দশ দিবস সশ্রম কারাবাসের দণ্ডাজ্ঞা হইল।

"কারাগারে যাইয়া আমি প্রায় দুই দিন (৮০ ঘণ্টা) কিছুই আহার করিলাম না। অবশেষে আমাকে বলপূর্ব্বক আহার করান হইল। এবারে ডাক্তার আমার হৃৎপিণ্ড বা নাড়ী কেহই পরীক্ষা করিয়া দেখিল না। সেইদিন হইতে আর আমার মুক্তির দিন পর্য্যন্ত আমাকে এইভাবে বলপূর্ব্বক আহার করাইয়াছিল। সে যে কি কষ্ট তাহা বলা যায় না। আমি যতদিন জীবিত থাকিব ততদিন সে যন্ত্রণার কথা ভুলিতে পারিব না। প্রথম দিন আহারে অসম্মত হওয়ায় ডাক্তার আমার গালে চপেটাঘাত করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। প্রতিদিনই

তাঁহারা বলপূর্ব্বক খাওয়াইতেন ও যন্ত্রণার তাড়নায় আমি তাহা বমি করিয়া ফেলিতাম। ইহা দেখিয়া ডাক্তার আরও রাগিয়া যাইতেন। পরে যখন ক্রমাগতই বমি হইতে থাকিল তখন তিনি অপর এক ডাক্তার আনাইয়া আমার হৃৎপিণ্ড পরীক্ষা করাইলেন। ডাক্তার একটু নাড়িয়া চাড়িয়া বলিলেন "না, হৃৎপিণ্ড বেশ সবল"। তার কারণ এ হৃৎপিণ্ড যে জেন ওয়ার্টনের—লেলি লিটনের ত নয়। তাহার পর হইতে কিন্তু আমার প্রতি ইঁহারা অনেকটা ভদ্র ব্যবহার করিতেন।"

ইংলণ্ডের রমণীগণ দিন দিন তথাকার অনেক শিক্ষিত ও গণ্যমান্য পুরুষের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতেছেন। সেদিন প্রসিদ্ধ উপন্যাসলেখক য্যাঙ্গুইল (Zanguill) সাহেব বলিয়াছেন—"আমাদের দেশে এমন দিন আসিতেছে যেদিন বৈদ্যুতিক শক্তিহীন গাড়ী ও রাষ্ট্রীয় অধিকারহীন নারী আর দেখিতে পাওয়া যাইবে না। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া আমাদের দেশের রমণীগণ যে কঠোর সাধনায় ব্রতী হইয়াছেন, তাহা সিদ্ধ হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই। এই ইংলণ্ড হইতেই নরনারীর সাম্যনীতি জগতে ব্যাপ্ত হইবে এবং ইংলণ্ড আবার জগতে মুক্তিজননীর আসন পুনরধিকার করিবে। পুরুষ ও নারীর মধ্যে এ অধিকারের পার্থক্যের যে কারণ কি তাহা ভাবিয়া দেখিলে মনে মনে লজ্জিত হইতে হয়। নরনারীগণের বিরুদ্ধে এক প্রধান যুক্তির অস্ত্র এই যে, তাহারা যখন শত্রুর হস্ত হইতে দেশ রক্ষা করিতে সমর্থ নয়, তখন তাহারা দেশশাসন সম্বন্ধে পুরুষের সহিত তুল্যাধিকার পাইতে পারে না। কিন্তু সকল পুরুষই কি যুদ্ধ করিতে সক্ষম? আমি নিজে ত' বন্দুক ধরিতে জানি না, কিন্তু আমার একটি ভোট আছে। কেহ কেহ বলেন স্ত্রীলোকেরা রাজ্যের জটিল ব্যাপার বুঝে না। আমরাই কি বুঝি? আমার মতে তুমি রাজকর্ম্ম বুঝ না, তোমার মতে আমি রাজকর্ম্ম বুঝি না।"

আবার, প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিৎ মেচ্‌নিকফ (Metchnikoff) সাহেবের মতে নারী কোনকালেই পুরুষের তুল্য হইতে পারে না। তিনি বলেন—"পুরুষের সহিত তুল্যাধিকারপ্রার্থিনীগণের তর্ক এই যে, বহু শতাব্দীর দাসত্বের ফলে আজ নারীর শক্তি পুরুষের অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইয়াছে। পুরুষ নিষ্ঠুর ক্রীতদাসঅধিকারীর ন্যায় তাহাকে সমাজের সর্ব্ববিধ কর্ম্মক্ষেত্র হইতে দূরে রাখিয়াছে, সর্ব্বপ্রকার উন্নত বুদ্ধিবৃত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়াছে এবং নানাবিধ অস্বাভাবিক উপায়ে নারীকে তাহার ক্রীড়ার পুত্তলি করিয়া তুলিয়াছে। এই অত্যাচারের ফলে নারীর মানসিক শক্তি পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে, তাহার স্বাভাবিক শক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং তাহার বুদ্ধিও হীন হইয়া পড়িয়াছে। সুযোগ পাইলে তাঁহারা তাঁহাদের সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করিয়া পুরুষের তুল্য হইতে পারেন, এমন কি পুরুষকেও পরাজিত করিতে পারেন।

"আমরা স্বীকার করিলাম যে অনেক বিষয় হইতে আমরা নারীকে বঞ্চিত রাখিয়াছি এবং সেই জন্যই সে সকল ক্ষেত্রে তাঁহারা হীনশক্তি হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু এ স্থলে ইহাও আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে কতকগুলি বিষয়ে তাঁহাদের চিরদিনই অবাধ অধিকার আছে। যেমন সঙ্গীত বিদ্যা। আমাদের দেশে পুরুষগণ কন্যা, পত্নী বা ভগিনীকে সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শী করিবার জন্য যথাসাধ্য উৎসাহ দিয়া থাকেন। কিন্তু এই কলাবিদ্যায় নারীর শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিষ্ঠা কোথায়? অসংখ্য সঙ্গীতবিদ্‌ পুরুষের সমকক্ষ একটা নারীও কি আজ পর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? পৃথিবীর সঙ্গীত গুরুদের সহিত কি একটী নারীর নামও মানবের ইতিহাসে অমর স্থান অধিকার করিয়াছে?

"চিত্রকলাতেও পুরুষ নারীর পথে বাধা প্রদান করে নাই। কিন্তু কৈ, পৃথিবীর প্রসিদ্ধ চিত্রকরগণের মধ্যে নারীর নাম কৈ?"

এই বলিয়া মেচনিকফ্‌ সভাহল হইতে ফিরিতে ছিলেন, এমন সময়ে কতকগুলি নারী আত্মরক্ষায় অক্ষম হইয়া পার্শ্বস্থ কয়েকটি পুরুষকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আপনারা চুপ করিয়া আছেন কেন? উঁহার আক্রমণের প্রতিবাদ করুন না।"

মেচনিকফ্ হাসিয়া বলিলেন "এইবার আপনারা নিজ মূর্ত্তিতে ধরা পড়িয়াছেন। আপনাদের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্যও আপনাদের পুরুষের সাহায্য ব্যতিরেকে চলে না।"

ভেরা ফিগ্নার।

ভেরা ফিগ্নার রুষের বিদ্রোহীদলের একজন অসাধারণ বীর রমণী এবং অধিনায়িকা। ইঁহার জীবনের বিশ বৎসর ইনি রুষের এক দুর্গ কারাগারে অতিবাহিত করেন। কিছুদিন পূর্ব্বে ইনি ইংলণ্ডে আগমন করিয়াছিলেন।

১৮৫২ সালে এক অর্থবান উচ্চপদস্থ পরিবারে—ভেরার জন্ম হয়। বাল্যকালে ধনী কন্যাদিগের সহিত এক বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষালাভ করেন এবং প্রতি পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়া তথাকার শিক্ষা সমাপ্ত করেন। সে সময়ে রুষিয়াতে স্ত্রীশিক্ষা ও প্রজাগণের রাষ্ট্রীয় অধিকার লইয়া এক বিরাট আন্দোলন চলিতেছিল। ভেরা এই আন্দোলনে যোগদান করিলেন। ১৮৭২ সালে ভেরা সুইজর্লণ্ডে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার্থে গমন করেন। তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া স্বদেশে দরিদ্রদিগের মধ্যে চিকিৎসা করিবেন ইহাই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল।

কিন্তু তাঁহার এ সাধু উদ্দেশ্য সফল হইল না। ১৮৭৫ সালে রুষ গবর্মেণ্ট আজ্ঞা প্রচার করিলেন যে, সুইজর্লণ্ডে যত রুষছাত্র আছে সকলের অবিলম্বে স্বদেশে প্রত্যাগমন করা আবশ্যক—নচেৎ তাহাদিগকে নির্ব্বাসিত বলিয়া স্থির করা হইবে। স্বদেশের যথেচ্ছ রাজশক্তির সহিত ভেরার এই প্রথম সংঘর্ষণ। নিরুপায় দেখিয়া তিনি দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তথায় ধাত্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দরিদ্র কৃষক-দিগের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিলেন।

কারাবাস কালে তাঁহার মোহিনী শক্তির প্রভাবে কারাস্থিত অপরাপর বন্দী ও বন্দিনী অন্তরে শান্তি-লাভ করিত। তাহারা ভেরাকে চক্ষেও দেখিতে পাইত না, কিন্তু ভেরার তাহাদিগের মধ্যে অবস্থিতি ও অসম সাহস তাহাদিগের অন্তরে বল প্রদান করিত। স্বাধীন অবস্থায় ভেরা তাঁহার স্বদেশবাসীর জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে পারিতেন, কারাগারে তাঁহার সহবাসীগণের জন্যও তিনি প্রাণদান করিতে প্রস্তুত ছিলেন।

অনেক দিন ধরিয়া অনেক চেষ্টা, অনাহার, আত্মহত্যা ও আত্মোৎসর্গের ফলে বন্দিনীগণ পুস্তকপাঠ ও কিঞ্চিৎ শারীরিক শ্রম করিবার অধিকার লাভ করিয়াছিল। ১৯০২ সালে কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদের সে অধিকার টুকু হরণ করিলেন। ভেরা দেখিলেন, এরূপ নিষ্ঠুর আদেশ অনেকেরই পক্ষে প্রাণ দণ্ডাজ্ঞার তুল্য হইবে অনেকেই উন্মত্ত হইয়া, ভীষণ রোগে প্রাণত্যাগ করিবে বা যন্ত্রণার তাড়নায় আত্মহত্যা করিবে। ইতিপূর্ব্বে এই ভাবে বহু অভাগা ও অভাগিনীর ইহলীলা শেষ হইয়াছে।

এই ভাবিয়া ভেরা সকলকে রক্ষা করিবার জন্য আপনাকে উৎসর্গ করাই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করি-লেন। তিনি স্থির করিলেন যে তিনি কারাগারের কোনও নিয়ম লঙ্ঘন করিলেই তাঁহার প্রাণদণ্ড হইবে সত্য, কিন্তু বিচারালয়ে নীত হইলে তিনি এই কারাপ্রাচীরের অন্তরালের দুর্দ্দশাকাহিনী ব্যক্ত করিবার অবসর লাভ করিবেন।

একদিন কারা রক্ষক তাঁহার অন্ধকূপে প্রবেশ মাত্র তিনি তাহার বস্ত্র ছিন্ন করিলেন। তিনি জানি-তেন ইহার ফলে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইবে কিন্তু তিনি তাহার জন্য প্রস্তুত ছিলেন।

কিন্তু রুষের শাসননীতি অপরাপর দেশের মত নহে। স্থানীয় শাসনকর্ত্তা কোনও বিচার না করিয়াই অভিযুক্তের প্রাণদণ্ড করিতে পারেন। আবার আইন অনুসারে যে প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত সে বিনা কারণে মুক্তিলাভও করিতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সামান্য গোলমাল করার অপরাধে প্রায় দুই শত ছাত্রকে রুষ গবর্মেণ্ট ইহার কিছুদিন পূর্ব্বেই পোর্ট আর্থারে সৈনিকের কর্ম্ম করিবার জন্য নির্ব্বাসিত করিয়া ছিলেন।

ভেরা যখন এই কঠিন অপরাধ করিলেন ঠিক সেই সময়ে রুষ রাজ্যে ছাত্রদিগের ব্যাপার লইয়া এক তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল। এরূপ উত্তেজনা ও আন্দোলনের কালে ভেরার ন্যায় একজন রমণীর প্রাণদণ্ড করা নিরাপদ নহে ভাবিয়া কর্তৃপক্ষ তাহা করিলেন না।

যাহা হউক দেশবাসীর দুঃখ ও দারিদ্র্য দূর করিবার চেষ্টা করিয়া ভেরা রুষের অপরাপর সংস্কারকের ন্যায় একই ফল লাভ করিলেন। তিনি দেখিলেন যে কর্তৃপক্ষের এরূপ যথেচ্ছ শক্তি থাকিতে প্রজার দুঃখ দূর করিবার কোন চেষ্টাই সফল হওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং সেই দিন হইতে তিনি দেশের শাসননীতি পরিবর্ত্তন প্রয়াসী দলের একজন সভ্য হইলেন।

প্রফুল্ল যৌবন, মনোহর রূপ, ধন সম্পদের লালসা, জীবনের ব্যক্তিগত সকল আশা সাধ,—স্বদেশের জন্য এ সমস্তকেই তিনি ঘৃণাভরে পদাঘাত করিলেন। ১৮৮০ হইতে ১৮৮২ সাল পর্য্যন্ত দেশে প্রবল বিদ্রোহী-দল যে সকল অসমসাহসিক কর্ম্ম করিয়াছিল, তিনি তাহার একজন প্রধানা অধিনায়িকা ছিলেন।

১১৮২ সালে এক বিশ্বাসঘাতকের ষড়যন্ত্রে তিনি ধৃত হন। দুই বৎসর তাঁহাকে নির্জ্জন কারাবাসে অন্ধকূপ মধ্যে থাকিতে হয়। পরে ১৮৮৪ সালে অপর ত্রয়োদশটি বিদ্রোহীর সহিত তাঁহার বিচার আরম্ভ হয়।

বিচারে প্রথমে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা পরে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাবাসের আজ্ঞা হইল। কিন্তু সাধারণ কারাগারে না রাখিয়া তাঁহাকে এক দুর্গের অন্ধকূপ মধ্যে যাবজ্জীবন বদ্ধ রাখিতে আজ্ঞা দেওয়া হইল। সে অন্ধকূপ হইতে কেহ কখনও জীবিত অবস্থায় মুক্তি পায় নাই।

সেই অন্ধকূপ মধ্যে ভেরা বিশ বৎসর অতিবাহিত করেন। ১৯০৪ সালে পর্য্যন্ত তিনি বাহ্য জগতের কোনও সংবাদই পান নাই। ত্রয়োদশ বর্ষ পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট একখানি পত্র পর্য্যন্ত উপস্থিত হইতে পারিত না, বা তাঁহার বৃদ্ধা মাতাকে তিনি কোন পত্র লিখিতে পাইতেন না।

ইহার দুই বৎসর পরে রুষ রাজের বংশধর জন্মগ্রহণ করিলেন এবং ভেরার কারাবাস কাল বিংশতি বৎসরে পরিণত হইল। তিনি কারামুক্ত হইয়া রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশে নির্ব্বাসিত হইলেন।

তাহার পর চিরস্মরণীয় ১৯০৫ সাল আসিয়া উপস্থিত হইল। অক্টোবর মাসে যখন প্রজাগণের মন্ত্রণাসমিতি স্থাপিত হইল তখন তাঁহার অন্তর আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। কিন্তু সে আনন্দ ক্ষণস্থায়ী। তরবারি, গলরজ্জু ও অগ্নির সাহায্যে প্রাচীন শাসননীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল,—ভেরার প্রফুল্ল অন্তর আবার বিষাদ কালিমায় আচ্ছন্ন হইল।

কিছুদিন পূর্ব্বে ভেরা এক বক্তৃতাস্থলে বলিয়াছিলেন—"আমি আবার সেই অন্ধকূপ হইতে মুক্ত হইয়াছি বলিয়া দুঃখ হয়। সেখানে মৃতের ন্যায় আমি ইহা অপেক্ষা সুখে ছিলাম। বহির্জগতের কোন সংবাদই পাইতাম না সুতরাং দুঃখও কম ছিল।"

শ্রীভঃ।

জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধে কুসংস্কার।

আমেরিকার নিউইয়র্ক নগরের Popular Science Monthly নামক সংবাদ পত্রে জন ডিন সাহেব উক্ত বিষয়ে একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। গত সেপ্টেম্বর মাসে প্রাতঃকালে পূর্ব্বাকাশে উদিত উজ্জ্বল নক্ষত্রটির নাম অনেকেই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান। যিশু খৃষ্টের জন্মের পূর্ব্বে বেথলিহমে যে নক্ষত্র উদিত হইয়াছিল এবং যাহা তিন শত বৎসর অন্তর আকাশে দেখিতে পাওয়া যায়, অনেকেই ভাবিয়াছিলেন যে উহা তাহাই। বস্তুতঃ উহা শুক্র গ্রহ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। ডিন সাহেবের উত্তরে প্রশ্নকর্ত্তাগণ যখন বুঝিলেন যে ইহা বেথলিহমের তারা নহে, তখন ও সম্বন্ধে তাঁহাদের সকল অনুসন্ধিৎসা লোপ পাইল।

ডিন সাহেব লিখিয়াছেন যে সৌখীন সমিতিতে

(যাহাকে Fashionable Society বলা হয়) সামুদ্রিক বিদ্যা, ফলিত জ্যোতিষ, আত্মাসম্বন্ধীয় বিষয়-বিশেষের যথেষ্ট আলোচনা হয় কিন্তু যদি ঐরূপ স্থলে কেহ জ্যোতিষ বা বিজ্ঞানের কোন বিষয় আলোচনা করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সভ্যসমাজে প্রচলিত Bore (অর্থাৎ হাড় জ্বালান জীব) উপাধি ধারণ করিতে হয়। এই বিষয়টি চিত্রে প্রকটিত করিবার অভিপ্রায়ে সুপ্রসিদ্ধ কৌতুকচিত্র-শিল্পী ডুমরিয়ার সাহেব "পাঞ্চ" নামক সংবাদ পত্রে 'সান্ধ্যসমিতিতে বিজ্ঞান ও সঙ্গীত' (Science and music at an Evening Party) নামক ছবিতে রহস্যচ্ছলে দেখাইয়াছেন যে একটি সান্ধ্যসভায় একজন অধ্যাপক বিজ্ঞানের বিষয় আলোচনা করিতেছেন তাঁহার একটিমাত্র শ্রোতা। বক্রী সকলেই পিয়ানো ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। চেষ্টারফিল্‌ডের নাম অনেক পাঠক অবগত আছেন। তিনি তাঁহার পুত্রকে এই কথাই প্রকারান্তরে লিখিয়াছিলেন যে, "তোমার বিদ্যা এবং ঘড়ী উভয়ই পকেটের বাহির করিও না। ঘড়ী বাহির করিলে লোকে মনে করিবে তুমি ঐ স্থানে থাকিতে চাওনা। আর অন্যটী প্রকাশে আমন্ত্রিতগণকে তুমি বিরক্ত করিয়া তুলিবে।"

ডিন সাহেব তাঁহার সুলিখিত প্রবন্ধে বিভিন্ন জাতির জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় কুসংস্কারের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে মুসলমানদিগের বিশ্বোৎপত্তি ও সৃষ্টি বিজ্ঞানের ধারণা বালকেরই শোভা পায়। কোরাণে, পৃথিবী সমতল এবং সমুদ্রে ভাসমান। পর্ব্বতগুলি ইহার সমতা রক্ষা করে এবং একটী প্রকাণ্ড গম্বুজই আকাশকে বহন করে। আকাশের উপরে সপ্তম স্বর্গ; একের উপরে অন্যটা এবং সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ স্বর্গে ভগবান্‌ বাস করেন। এই উচ্চতম স্বর্গ পক্ষবিশিষ্ট জন্তুগণ বহন করেন। উল্কাসকল কুস্বভাবাপন্ন প্রেতদিগের প্রতি নিক্ষিপ্ত জ্বলন্তপ্রস্তর ব্যতীত আর কিছুই নয়।

তৎপর, লেখক ইহুদীদিগের সৃষ্টি বিজ্ঞানের কথা লিখিয়াছেন—ইহাদের পৃথিবী ছয় দিবসে প্রস্তুত হইয়াছিল, মধ্যস্থলে পৃথিবী এবং চতুর্দ্দিকে আকাশ। সূর্য্য, চন্দ্র এবং তারা সকল পৃথিবীতে আলোকরশ্মি বিতরণার্থই প্রস্তুত। মনুষ্যই সৃষ্ট পদার্থের প্রধান বস্তু। এই মত মুসলমান এবং খৃষ্টিয়ানদিগের মধ্যেও প্রচলিত। রোম এবং গ্রীসের অনেকগুলি পৌরাণিক কথা এই জ্যোতিষ সংক্রান্ত কুসংস্কারের উপরই স্থাপিত। প্রথিতনামা চিত্রকর গিডোর (guedo) উষাদেবীর (Aurora) চিত্রে এই বিষয়টী বেশ পরিস্ফুট। সূর্য্যদেব এই চিত্রের প্রধান দেবতা; তাঁহার চতুর্দ্দিকে পল দণ্ডগুলি (hours) তাঁহাকে ঘিরিয়া আছেন এবং উষাদেবী সকলের অগ্রগামিনী হইয়া পুষ্প এবং শিশির বিতরণ করিতে করিতে চলিয়াছেন।

রোমে বালকবালিকাগণকে শিক্ষা দেওয়া হইত যে সূর্য্য আপলোদেবের (Apollo) রথচক্র মাত্র। প্রাতঃকালে এই দেবতা পূর্ব্ব সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়া চতুরশ্বযোজিত যান আরোহণে স্বর্গ ভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যাবেলায় পশ্চিম সমুদ্রে অবগাহন করেন। রাত্রিতে একখানি সুবর্ণ নির্ম্মিত নৌকায় তিনি নিদ্রা যান এবং এই নৌকাখানি পৃথিবীর উত্তর সীমানা দিয়া পূর্ব্বে সমুদ্রে তাঁহাকে পৌছাইয়া দেয়। চন্দ্র আপলোর ভগিনীরূপে আখ্যাত।

তখন লোকে ভাবিত গ্রহগণের পরিভ্রমণ সময়ে গীতধ্বনি হয় কিন্তু ইহা এত স্বর্গীয় যে মনুষ্যগণের অপবিত্র কর্ণে ইহা ধ্বনিত হয় না। বস্তুতঃ সেক্ষপীর, মিলটনের অনেক স্থলে এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়।

পৃথিবী যে গোলাকার এবং চন্দ্র যে সূর্য্য হইতে রশ্মি গ্রহণ করে, তাহা খৃষ্টজন্মের ছয় শতাব্দী পূর্ব্বে থেলিস নামক গ্রীকজ্যোতির্ব্বিদই প্রথম প্রচার করেন। আনাক্সাগোরাস নামক অন্য একজন জ্যোতির্ব্বিদ্‌ চন্দ্রগ্রহণ স্বাভাবিক কারণেই হইয়া থাকে এইরূপ প্রচার করাতে তিনি ও তাঁহার সকল আত্মীয় স্বজন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইবার আদেশ পান। তাঁহার বন্ধু পেরিক্লিস তখন আথেন্সের সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন,

কিন্তু তত্রাপি তিনি অতি কষ্টেও সকলকে নির্ব্বাসন দণ্ড হইতে রক্ষা করিতে পারেন নাই।

খৃষ্টজন্মের চারি শত বৎসর পূর্ব্বে পিথাগোরাস জন্ম গ্রহণ করেন। প্রবাদ এই, গ্রহ সকল যে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে তিনিই তাহার প্রথম প্রচার করেন। কোপারনিকাস যখন ... বৎসর পরে এই কথা পুনর্ব্বার জনসাধারণের সমক্ষে আনেন তখন তাঁহাকে পৌত্তলিক আখ্যা দেওয়া হয়। প্রকৃত পক্ষে খৃষ্টজন্মের তিন শত বৎসর পূর্ব্বে ইয়ুরোপে বর্ত্তমান জ্যোতিষের প্রচার হয়। এই সময়েই আলেকজান্দ্রিয়া নগরে ইউক্লিড, ইরাটস্থিনিস্ হিপার্কাস, এবং টলেমীর আবির্ভাব,—আর তাহার কত পূর্ব্ব হইতে ভারতবর্ষের লোকে জ্যোতিঃ-শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন।

জ্যোতিষ সম্বন্ধে আমাদের দেশে কুসংস্কারের অভাব নাই, কিন্তু সভ্য ইউরোপেও ইহার প্রভাব বড় কম নহে। সে দেশে অমাবস্যার পরেই যদি কেহ কাহারও দক্ষিণ স্কন্ধের উপর দিয়া চন্দ্র দেখেন তবে তাহা সৌভাগ্য জ্ঞাপক,—কাহারও বাম স্কন্ধের উপর হইতে চন্দ্র দেখা বিপত্তিসূচক। সমতলভূমিতে চন্দ্রের বৃদ্ধির সময় আর নিম্নভূমিতে চন্দ্রের হ্রাসের সময় শস্য লাগান সুফলপ্রদ; এই প্রকার কত সংস্কার এখনও সুসভ্য ইউরোপে প্রচলিত,—তাহার বিস্তারিত তালিকা দিতে হইলে ভারতীর পৃষ্ঠায় স্থান সঙ্কুলান হয় না।

জাপানে কুসংস্কার।

জাপানী ডাক্তার ইয়ামাদা লিখিত "জাপানে কুসংস্কার" নামক গ্রন্থ পাঠে দেখা যায় জাপানীদের সহিত আমাদের কুসংস্কারের আশ্চর্য্যরূপ সাদৃশ্য। দৈবজ্ঞকে জিজ্ঞাসা না করিয়া সাধারণতঃ কোন জাপানী স্থান পরিত্যাগ করে না। অনেক সময় দৈব কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট স্থলে যদি যথেষ্ট যায়গা না থাকে তাহা হইলে প্রথমত সেই "শুভস্থলে" অস্থায়ী ভাবে কষ্টেসৃষ্টে কয়েকদিন থাকিয়া পরে অন্য স্থলে যায়। নূতন স্থানে বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে হইলেও তাহারা দৈবজ্ঞের পরামর্শ লইয়া থাকে। নূতন বাটীর সদর, দরজা, গবাক্ষ, পাকশালা প্রভৃতিও দৈবজ্ঞের নির্দ্দেশ মতই নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

যখন যে ডাক্তার "শুভস্থলে" বাস করে, তাহাকেই চিকিৎসার্থ আহ্বান করা হয়। সে ডাক্তার অশিক্ষিত হইলেও আসে যায় না। কোন স্থলে যাত্রা করিবার সময়ও তাহারা আমাদের ন্যায় দিনক্ষণ দেখিয়া যাত্রা করে। যদি শুভদিন না থাকে তবে যাত্রা বন্ধ রাখে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ডাক্তার ... শয় উল্লেখ করিয়াছেন, যে এক ব্যক্তি পিতার ...পের সংবাদ টেলিগ্রামে অবগত হইয়া দৈবজ্ঞের নিকট গমন করায় দৈবজ্ঞ বলিলেন—তিন চারি দিনের মধ্যে যাত্রার শুভদিন নাই। কাজেই যাত্রায় তাহার বিলম্ব হইয়া পড়িল। ফলে দাঁড়াইল এই, বাটী পৌঁছিয়া সে দেখিল যে, ঠিক পূর্ব্ব দিন তাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে। অনেক সময় স্কুলের ছাত্রেরা যে বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী সেই বিষয়েও ভাল পরীক্ষা দিতে পারে না—কারণ দৈবজ্ঞ বলিয়াছেন পরীক্ষার সময়টি শুভ নহে। একদিন ডাক্তার মহাশয় কোন গল্প-লেখককে পরিহাসচ্ছলে বলেন যে, শীঘ্রই তিনি একটি আঘাত পাইবেন। এই কথা শুনিবামাত্র গল্পলেখক এমন বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন যে, ডাক্তার তখন কথাটা রহস্যমাত্র বারংবার ইহা বলিয়াও তাহার সে বিশ্বাস দূর করিতে পারিলেন না। গল্পলেখক দিনদিন শুকাইয়া যাইতে লাগিলেন। ডাক্তার মহা প্রমাদ গণিয়া অবশেষে আশাকুসা নগরীর মন্দির হইতে মাদুলি আনাইয়া এবং মাদুলির যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া গল্প-লেখককে উহা ধারণ করিতে দিলেন। মাদুলি ধারণের পর হইতেই গল্পলেখক ক্রমশ সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

উক্ত প্রবন্ধে কুসংস্কারের আর একটী বেশ মজার

গল্প লিখিত হইয়াছে। টকিও নগরীর এক দেবমন্দিরের সংস্কার কার্য্যে নিযুক্ত কোন কারিকর চূড়া হইতে দেখিল যে, মন্দিরের পার্শ্বে একজন মজুর মন্দিরেরই একটী মুরগী শ্বাসবন্ধ করিয়া মারিয়া একটী থালি থলিয়ার মধ্যে লুকাইয়া রাখিল। কারিকর তাহার সহযোগীদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া মুরগীটি লইয়া সকলে মিলিয়া আহার করিলেন। এবং তৎপরিবর্ত্তে থলির মধ্যে এক দেবতার প্রতিকৃতি রাখিয়া দিলেন। দেবতা মুরগীকে দেবমূর্ত্তিতে পরিণত করিয়াছেন,—দেখিয়া মজুর বেচারা ইহা তৎপ্রতি দেবতার শাপজ্ঞানে মৃতবৎ হইয়া পড়িল। ইহা শুনিয়া কারিকর মজুরের নিকট উপস্থিত হইয়া আমূল বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন এবং আশ্চর্য্যের বিষয়,—সে কথা শুনিবার কয়েক দিনের মধ্যেই মজুর পূর্ব্বের ন্যায় সুস্থ হইয়া উঠিল।

শ্রীষঃ

পৃথিবীর পরিণাম।

কিছুদিন পূর্ব্বে অধ্যাপক ল্যাঙ্গলে (Langley) বলিয়াছিলেন যে আমাদের এ সৌরজগত শীঘ্রই ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। সূর্য্যের উত্তাপ দিন দিন কমিয়া আসিবে এবং অসম্ভব ঠাণ্ডায় প্রাণিগণ প্রাণত্যাগ করিবে। কিন্তু শীঘ্র হইলেও সূর্য্যের সেরূপ ভাবে উত্তাপহীন হইতে এখনও ত্রিশ চল্লিশ লক্ষ বৎসর। সম্প্রতি ল্যাঙ্গলে মহাশয় আমাদিগের অচিরে ধ্বংসপ্রাপ্তির আর এক ভয় দেখাইয়াছেন।

চন্দ্রের প্রভাবে যে জোয়ার ভাঁটা হয় তাহার ফলে পৃথিবীর দিবাভাগ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতেছে। এই পরিবর্ত্তন অবশ্য এতই সামান্য যে আজও পর্য্যন্ত কোন বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাহার পরিমাণ ধরিতে পারা যায় নাই। কিন্তু ব্যাপারটা যে সত্য সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বাষ্পীয় শক্তির অবিশ্রাম প্রয়োগ না থাকিলে রেলের গাড়ী ছুটিতে ছুটিতে যেমন রেলের ঘর্ষণে ক্রমে ক্রমে গতিহীন হইয়া পড়ে ইহাও সেইরূপ।

চন্দ্রের আকর্ষণে পৃথিবীর জল যে পরিমাণে স্ফীত হয় তাহা নানাদেশে বিভক্ত হইয়া নানাপ্রকার ফল উৎপন্ন করে সত্য, কিন্তু সমগ্রভাবে দেখিলে আমরা বুঝিতে পারি যে এই জলস্ফীতির ফলে পৃথিবীর গতি মন্দীভূত হইতেছে। তিন ফুট উচ্চ একটা তরঙ্গ পৃথিবীর গতির বিরুদ্ধপথে অবিরাম ছুটিলে তাহার গতি যেটুকু প্রতিহত হওয়া সম্ভব এ স্থলেও তাহাই হইতেছে। জ্যোতির্ব্বিদগণ বলেন যে চন্দ্রলোকেও এইরূপ জলস্ফীতির হেতু তাহার দিবসের সংখ্যা প্রায় ২৮ দিন কমিয়া গিয়াছে।

আমাদের পৃথিবীর গতি যত কমিয়া আসিবে দিবসের দৈর্ঘ্য ততই বাড়িবে। এবং রাত্রিগুলা তখন এত অধিক ঠাণ্ডা হইবে যে রাত্রিকালের সেই সুভীষণ শীত, এবং দিবসের প্রচণ্ড উত্তাপ প্রাণিগণের সমানই প্রাণসংহারক হইবে। কিন্তু পৃথিবীর সেরূপ অবস্থা আসিতে এখনও লক্ষ লক্ষ বৎসর।

পৃথিবীর ধ্বংসের আর এক কারণ তাহার ক্ষয়। পৃথিবীর স্থলভাগের অবিরামই ক্ষয় হইতেছে। ওয়ালেস সাহেব গণনা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে প্রতি তিন সহস্র বৎসরে এক ফুট করিয়া পৃথিবীর স্থলভাগ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া সমুদ্রগর্ভে যাইতেছে। এ হিসাবে দশ লক্ষ বৎসরে তিন শত ফুট ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে। ইয়ুরোপের সাধারণ উচ্চতা ৬৭১ ফুট এবং আমেরিকার উচ্চতা ৭৪৮ ফুট। সুতরাং এইরূপভাবে পৃথিবীর ক্ষয় যদি চলিতে থাকে তাহা হইলে বিশ লক্ষ বৎসরের পর ইয়োরোপ ধৌত হইয়া সমুদ্র গর্ভে যাইবে এবং আমেরিকা ত্রিশ লক্ষ বৎসরে তুলাদশা প্রাপ্ত হইবে। তাহার পর আমাদের অদৃষ্টে যে কি আছে তাহা আমরা কেহই জানি না।

আশ্চর্য্য টেলিফোন্।

মিষ্টার এস্. জি, ব্রাউন (S. G. Brown) নামে এক ইংরাজ একটি অদ্ভুত টেলিফোন্ যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। সাধারণ টেলিফোন যন্ত্রের অপেক্ষা ইহা দ্বারা শব্দের গতির দূরত্ব অভূতপূর্ব্ব ভাবে বর্দ্ধিত হইবে।

ইংলণ্ডের এক বিজ্ঞান সমিতিতে ব্রাউন সাহেব

তাঁহার এই নবাবিষ্কৃত যন্ত্র সম্বন্ধে সেদিন এক বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতার সারাংশ আমরা নিম্নে সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

মনুষ্য কণ্ঠস্বরের বা অন্য যাবতীয় শব্দের কম্পন টেলিফোনের তারের উপর দিয়া প্রবাহিত হইবার কারণ এই যে, সেই তারের মধ্য দিয়া যে বৈদ্যুতিক প্রবাহ চলিতে থাকে, উক্ত কম্পন সকল সেই বৈদ্যুতিক শক্তিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া সেই বিক্ষেপের সাহায্যে অন্যস্থানে আপনাদিগকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়। টেলিফোনে যে ব্যক্তি শব্দ শ্রবণ করে, যথার্থপক্ষে সে সেই বৈদ্যুতিক প্রবাহের গতি বিক্ষেপ শ্রবণ করে মাত্র। বর্ত্তমান অবস্থায় কিন্তু তাড়িৎপ্রবাহে বিক্ষেপ ঘটাইবার এবং সেইগুলিকে দূর পথে লইয়া যাইবার একটা সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে। সুতরাং স্বাভাবিকভাবে আমাদের কর্ণে যেমন অতি তীব্র ও অতি মৃদু শব্দ আসিয়া আঘাত করে, টেলিফোনেও সেইরূপ এত মৃদু শব্দ আসিয়া উপস্থিত হয়, যে অনেক সময় তাহা অনুভব পর্য্যন্ত করা সম্ভব হয়না। ব্রাউন সাহেবের টেলিফোন্ এরূপভাবে নির্ম্মিত যে ইহার সাহায্যে এই সকল মৃদু শব্দ পর্য্যন্ত স্পষ্ট হইয়া প্রকাশিত হইবে। ব্রাউন সাহেবের কৌশলটী আর কিছুই নহে। তিনি প্রবাহবাহী তারের একস্থানে এক অতি ক্ষুদ্র ছেদ রাখিয়াছেন মাত্র। এই ছেদের ফলে দুইটি সংযোগ সীমার মধ্যের দূরত্ব প্রবাহের দ্বারা আপনিই রক্ষিত হয়। ছেদের দুইটি মুখে Asmiumiridium নামক কঠিনতম ধাতুর দুইটি টিপ লাগান আছে।

এইরূপ যন্ত্রের সাহায্যে কিছু কালের মধ্যেই কলিকাতায় বসিয়া লাহোরে কোন বন্ধুর সহিত আলাপ করা সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা যায়। তাহার টেলিফোনের তারগুলি এখনকার ন্যায় অধিক মোটা করিবার আর আবশ্যক হইবে না। সামান্য সরু তারেই সহস্র মাইল দূরে শব্দ প্রবাহিত হইবে। সুতরাং ব্যয়ও অনেক লাঘব হইবে সন্দেহ নাই।

এই আবিষ্ক্রিয়ায় আর একটি উপকার সাধিত হইবে। আজকাল তারবিহীন টেলিগ্রাফে যে সকল সংবাদ প্রেরণ করা হয়, সেগুলি অধিক দূরের হইলে আর কিছুই শুনিতে পাওয়া যায় না। এই যন্ত্রের দ্বারা সেগুলি খুব স্পষ্ট রূপেই শুনা যাইবে। আটলাণ্টিক মহাসাগরের পশ্চিম প্রান্ত হইতে পূর্ব্ব প্রান্ত পর্য্যন্ত তারবিহীন টেলিগ্রাফে সংবাদ প্রেরণ করিলে এক্ষণে তাহা অনায়াসেই শুনিতে পাওয়া সম্ভব হইবে।

টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ সম্বন্ধে ত এই গেল। কিন্তু বিজ্ঞানের আরও এক দিকে এই যন্ত্র যুগান্তর উপস্থিত করিবে বলিয়া মনে হয়। ষ্টেথোস্কোপ (stethoscope) যন্ত্রের নাম অনেকেই জানেন। ডাক্তারেরা এই যন্ত্রের সাহায্যে হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের শব্দ পরীক্ষা করিয়া থাকেন। ব্রাউন সাহেব তাঁহার এই নবাবিষ্কৃত উপায়ে এক অতি সূক্ষ্মশক্তি সম্পন্ন বৈদ্যুতিক ষ্টেথোসকোপ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অর্থাৎ যন্ত্রটি এখনকার ন্যায় ভেঁপুর আকার না হইয়া, একটি সূক্ষ্ম টেলিফোন্ দাঁড়াইবে। ভবিষ্যতে চিকিৎসকগণ রোগীর হৃৎপিণ্ড বা ফুসফুসের অতি সামান্য শব্দও এতদ্বারা লক্ষ্য করিতে পারিবেন। আরও এক নূতন ব্যাপার হইবে। রোগীর বুকের উপর যন্ত্র বসাইয়া তাহা টেলিফোনের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলে চিকিৎসক বহুযোজন দূরে বসিয়াই তাহা শুনিতে পাইবেন এবং আবশ্যক মত ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। লণ্ডনে বসিয়া ওয়াইট দ্বীপ হইতে এই প্রকারে হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনা গিয়াছে। বিজ্ঞান দিনে দিনে কি অসম্ভবকেই না সম্ভব করিয়া তুলিতেছে।

শ্রীঃ

বন্দী।

১১

ফিরিয়া দুই হাতে মাথা রাখিয়া আমি শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। প্রাণটা অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল—এই পাষাণ দেয়ালের প্রত্যেক কথাটি জানিবার জন্য এক বিরাট আগ্রহ!

অন্ধকারে দেয়াল হাঁতড়াইতে লাগিলাম! মাকড়সার জালে হাত জড়াইয়া গেল। জাল মুক্ত করিয়া শয্যার উপর বসিলাম! ঘুমে চোখ ভরিয়া আসিতেছিল। নিদ্রা-ভঙ্গে দেখি, কক্ষে অস্পষ্ট আলো আসিয়াছে। আবার সেই পাষাণ দেয়ালের সম্মুখে দাঁড়াইলাম। দেয়ালের কোণে চারিটি নাম লেখা,—দাঁতো, ১৮১৫; পুলে ১৮১৮; জিন মার্টিন ১৮২১; কাস্তের্গ ১৮২৩। নামগুলার সহিত কি এক ভীষণ স্মৃতি মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল!

দাতোঁ ভ্রাতৃহন্তা, পিশাচ পুলে তার স্ত্রীকে হত্যা করিয়াছিল, জিন মার্টিন বন্দুকের গুলিতে বৃদ্ধ পিতার মা:: উড়াইয়া দিয়াছে, আর কাস্তের্গ—ডাক্তার কাস্তের্গ তার বন্ধুকে বিষ দিয়াছিল!

আমার সমস্ত প্রাণখানা শিহরিয়া উঠিল। তাহাদেরি শেষ নিশ্বাসে এ গৃহের বায়ু এখনো যেন ভরিয়া রহিয়াছে! এই শয্যার উপর তারা তাদের রক্তমাখা হৃদয়ের শেষ কথা, শেষ চিন্তাটুকু ঢালিয়া দিয়াছে! এই ঘরের মধ্যেই তারা চলা-ফেরা করিয়াছে! আজো তাদের দীর্ঘশ্বাস এ ক্ষুদ্র ঘরটিকে উষ্ণ রাখিয়াছে—শীতল হইবার অবকাশটুকুও দান করে নাই!

তার পর, আমি তাদেরি পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি! তারা যেন চারিধার হইতে হাত নাড়িয়া আমাকে ডাকিতেছে—ঐ না তাদের কণ্ঠস্বর শুনা যায়! আমি চক্ষু মুদিলাম। তাদের মূর্ত্তি যেন আরো স্পষ্ট হইয়া উঠিল!

এ সত্য, না স্বপ্ন, না মতিভ্রম! খানিকটা জল পায়ে লাগিল—কি, এ! মাকড়সা—বড় একটা মাকড়সাকে আমি পা দিয়া চাপিয়া মারিয়াছি—ইহারই জাল আমার হস্তস্পর্শে ছিঁড়িয়া গিয়াছে! আমার চেতনা হইল—এতক্ষণ যেন মূর্চ্ছিত হইয়াছিলাম! কি সব ছায়ামূর্ত্তি আমার চারিধারে ঘুরিতেছে!

না, না! মনকে সুস্থ সবল করিতে হইবে। পলে পলে মৃত্যু যন্ত্রণা! ইহার গ্রাস হইতে উদ্ধার পাইতেই হইবে। দাতোঁ পুলের দল কবরের নীচে নিদ্রা যাইতেছে—তারা এখানে আসিবে না, কখনো না—বৃথা তাদের চিন্তায় কেন অবশ হইয়া পড়ি! এ কারাগৃহ হইতে পলায়ন বরং সম্ভব, কিন্তু মাটির নিম্নে, কবর ভেদ করিয়া বাহির হওয়া একেবারে অসম্ভব! তবে, কেন, আমি মিছা ভয়ে সারা হই?

১২

উজ্জ্বল, প্রশস্ত দিবালোক। কারার চারিধার হইতে একটা কোলাহলের ধ্বনি আসিতেছিল। প্রকাণ্ড ভারী দ্বারগুলা মুক্ত ও বদ্ধ করিবার শব্দে, চাবীর ঝন্‌-ঝন্ আওয়াজে, চীৎকার-ধ্বনিতে চারিধার মুখরিত হইয়া উঠিতেছিল! এই নীরস, কঠিন পাষাণ

গৃহ আজ কি উল্লাস-সঙ্গীতে সহসা ভরিয়া উঠিল! চারিধারে আনন্দ, কোলাহল, সজীবতা, তাহার মধ্যে নিরানন্দ উদাস, শুধু, আমি!

দ্বারের পাশ দিয়া একটা প্রহরী চলিয়া গেল। তাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এত গোলমাল, কেন? এত আহ্লাদ কিসের?"

প্রহরীটা উত্তর দিল, "ওঃ, আজ যে কয়েদীগুলার পায়ে বেড়ি দেওয়া হচ্ছে— কাল ওরা তুর্ণোয় যাবে, তুমি দেখিবে না কি?"

সন্ন্যাসীর মত, এই বৈচিত্র্যহীন, অপ্রসন্ন, নিঃসঙ্গ জীবন, ত, আর বহা যায় না! আমি দেখিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

প্রহরী আমাকে অতিরিক্ত সতর্কভাবে একটা ঘরে লইয়া চলিল। ঘরটায় বসিবার জন্ত একখানি আসনও ছিল না, শুধু একটা প্রকাণ্ড জানালা ছিল! মুক্ত জানালা! তাহারি গরাদের মধ্য দিয়া, আজ, কতদিন পরে অনেকখানি আকাশ দেখিয়া বাঁচিলাম!

প্রহরীটা কহিল, "এখান হইতে দেখিতে পাইবে! রাজার মত বসিয়া দেখ, কাহারো ঘেঁস সহিতে হইবে না!"

কপাটটা শেষ করিয়া বিরাট শব্দে সে দ্বারে তালা লাগাইয়া বাহির হইয়া গেল!

জানালা দিয়া বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ-ভূমি দেখা যাইতেছিল! প্রাঙ্গণের সীমা উচ্চ প্রাচীর দিয়া ঘেরা! পায়রার খোপের মত জানালা-ভরা প্রকাণ্ড দালান, তারি মাঝে মাঝে দেয়াল! জানালাগুলা অসংখ্য নরশিরে ভরিয়া গিয়াছে! সকলেই কৌতুক দেখিতে দাঁড়াইয়া! মুখে-চোখে একটা আগ্রহের চিহ্ন—কৌতুহলের বিরাট রেখা! নরকের প্রেতগুলা, যেন, একটু ফাঁক পাইয়া, আজ বাহিরের মুক্ত বায়ু ও আলো দেখিয়া, আনন্দে মত্তোয়ারা হইয়া উঠিয়াছে! প্রাঙ্গণের দিকেই সকলে চাহিয়াছিল। আর কিছু দেখিবার কাহারো অবসর ছিল না।

বারোটা বাজিল। কোণের ফটক খুলিয়া গেল। কত নূতন মূর্ত্তি আসিয়া রঙ্গস্থলে দেখা দিল। নিমেষে যেন সেই মূক, মৌন কারাগৃহ বিচিত্র কলরবে চঞ্চল হইয়া উঠিল। চারিদিকে একটা জীবনের স্পন্দন দেখা দিল। উচ্চ হাস্য ও চীৎকার, মুহূর্ত্তেই স্থানটীকে আনন্দ-পরিপূর্ণ ক্রীড়া-ভূমিতে পরিণত করিল। যেন, দৈত্যের দল, আজ, ছুটি পাইয়া, আনন্দে সাড়া দিয়া উঠিয়াছে।

বন্দীদলের নতদৃষ্টি, প্রহরীগুলার বীর-দাপ সমস্ত মিলিয়া একটা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়াছিল।

বন্দীদিগের নাম-ডাক হইল। কি তাদের অপরাধ, দণ্ডের পরিমাণই বা কি? যাদের দণ্ডের পরিমাণ অধিক, তাদের নাম-ডাকের সহিত উচ্চ জয়ধ্বনি উঠিতে লাগিল। উৎসুক উদগ্রীব দর্শকের দল মনের আবেগ যেন ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিল না! বন্দীর দল, যেন, সৈন্যের মত, আজ যুদ্ধ জয় করিয়া ফিরিয়াছে, তাই এ বিরাট উল্লাসের উন্মাদ চীৎকার! দুই একজন দর্শক আনন্দে ডিগবাজী খাইয়া ফেলিল!

তার পর, বন্দীর দলে পরস্পরে আলাপ পরিচয় আছে কি না, তাহারি সন্ধান হইতে-ছিল! যদি থাকে, তবে তাহাদিগকে স্বতন্ত্র

করিয়া দাও, একসঙ্গে রাখিও না! দণ্ডের কঠিনতা তাহাতে হ্রাস হইয়া যাইবে! এবং তাহা হইলে, তাহারা দিব্য আমোদ-আহ্লাদে দিন কাটাইয়া দিবে!

চারিদিকের এই বিচিত্র কলরব আমার কাছে এক অখণ্ড রাগিণীর ঝঙ্কারের মত ভাসিয়া আসিতেছিল। যেন কোন্ মায়া-লোকের বিচিত্র সঙ্গীতধ্বনি! কিন্তু অর্থহীন, লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্যহীন রাগিণী! মৃদু বায়ু আমার তপ্ত ললাটে আসিয়া লাগিতেছিল—রৌদ্রের মধ্য দিয়া স্নিগ্ধ আশার রশ্মি যেন ছড়াইয়া পড়িতেছিল। মনে হইতেছিল, ইহাই ত জীবন! এই রৌদ্রকিরণ, মুক্ত বায়ু, উদার আকাশ,—এ সব হইতে দূরে থাকা—সে ত মৃত্যু!

রৌদ্রটা যেন বায়ুর মতই সরিয়া গেল! কে যেন তার উপর দিয়া একটা সূক্ষ্ম কালো পরদা টানিয়া দিল—বিহঙ্গ-পক্ষের মত, লঘু মেঘ, পৃথিবী ও রৌদ্রের মধ্যে ব্যবধানের সৃষ্টি করিল। স্বপ্নের কুহকজালেরি মত, ঈষন্নিবিড় ছায়া আসিয়া আলোটুকুর সম্মুখে দাঁড়াইল। সহসা দুই এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গেল! প্রাঙ্গণ হইতে দর্শকের দল সরিয়া পড়িল। নীড়-হারা পাখীর মত, অসহায়ভাবে বন্দীগুলা ভিজিতে লাগিল! দু-একজন কাঁপিয়া উঠিতেছিল! তবু নিস্তার নাই! কারণ, তারা বন্দী, তাদের আবার আরাম-স্বস্তি কি!

বৃষ্টি থামিলে প্রহরীরা শৃঙ্খল টানিয়া আনিল! পিছনে কামারের দল! বন্দীগুলাকে বসাইয়া দেওয়া হইলে, শৃঙ্খল আঁটিয়া কামার তাহাতে মুগুরের ঘা দিল। কি পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা

কেহ ভূমে লুটাইল, কেহ কাঁদিয়া উঠিল—প্রহরী-দলের গুঁতায় আদবকায়দা তখনি রক্ষা পাইল! নিশ্চল পাষাণের মত, আমি দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলাম। তার পর, ডাক্তারের পরীক্ষা!

তখন মেঘ কাটিয়া গিয়াছে। আবার সূর্য্যের আলো ফুটিয়াছে! কালো পরদাখানি কে যেন দুইহাতে সরাইয়া লইয়াছে! ভিতর হইতে বন্দীর দলে, কেহ শিষ দিল—কেহ-বা একছত্র গান গাহিয়া উঠিল!

তার পর সারি দিয়া সকলে বসিয়া গেল! এবার ভোজনের পালা। আহার আসিল, সঙ্গে বড় বড় বাল্তি—তাহার মধ্যে সবুজ রঙের কি একটা জলীয় পদার্থ! এগুলাতে স্বাদ নাই, গন্ধ নাই, যাহারা ভুক্তভোগী তাহারা জানে, কি এ ভয়ঙ্কর জিনিস!

তবু তারা—বেচারা ক্ষুধিতের দল—তৃপ্তির সহিত, তাহারি সদ্ব্যবহারে ব্যস্ত!

আগ্রহের সহিত আমি সব দেখিতেছিলাম, কোন জ্ঞান ছিল না! কি একটা করুণায় আমার সমগ্র চিত্ত ভরিয়া উঠিয়াছিল। চোখে জল আসিয়াছিল।

সহসা একটা উচ্চ চীৎকার ধ্বনি-শুনিলাম, "ওঠ, চল—"। বন্দীর দলে কোলাহল পড়িয়া গেল। সকলে দাঁড়াইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে সকলে চলিতে আরম্ভ করিল!

আমারি জানালার পাশ দিয়া তাহারা চলিতেছিল! আমাকে দেখিয়া একবার দাঁড়াইল! আমার বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল! আমি কি পশুশালার পশু যে, এমন করিয়া আমাকে দেখিতে দাঁড়াইবে!

একজন কহিল, "ফাঁসির লোক" দেখ—

ফাঁসি হবে এর।" চারিধারে একটা হাসির ধুম পড়িয়া গেল! বর্ব্বর!

আমার মাথা ঘুরিয়া গেল! মনে হইতেছিল, আমি যেন শূন্যে ঝুলিতেছি, ভূমির উপর দাঁড়াইয়া নাই! কি করিয়া ইহারা জানিল যে, আমার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হইয়া গিয়াছে!

"বিদায়, বিদায়, বন্ধু", নির্লজ্জভাবে তাহারা চীৎকার করিয়া উঠিল! একজন কহিল, "আমার চেয়ে ভালো—শীঘ্র ছুটি মিলিবে! আমি চৌদ্দ বৎসর ধরিয়া জেলে পচিব।"

আমার কোন চেতনা ছিল না! নড়িবার শক্তিটুকু অবধি না! আমার চোখের সম্মুখ দিয়া, জলের স্রোতের মত, বন্দীর দল চলিয়া গেল!

সহসা চেতনা ফিরিলে আমি শিহরিয়া উঠিলাম, ভাবিলাম, এই জানালার বাহিরে কত আলো, কত আনন্দ,—আর ভিতরে বায়ু, আলো, প্রাণ সকলই রুদ্ধ। যদি এই গরাদগুলা না থাকিত—আঃ—গরাদ ধরিয়া প্রাণপণ বলে একবার নাড়া দিলাম! একটুও সে নড়িল না। আমিই আঘাত পাইলাম। কি এক অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম! রাগে, ক্ষোভে, আমার অন্তরখানা বিদীর্ণ হইবার উপক্রম করিতেছিল!

দূর হইতে কোলাহলের একটা অস্পষ্ট ধ্বনি শুনা যাইতেছিল—আমি জানালার গরাদ ধরিয়া বসিয়া পড়িলাম। দূরের কোলাহল ক্রমে আমার কর্ণে ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল—আলোটুকুর উপর কে যেন আবরণ টানিয়া দিতেছিল—একটা অস্ফুট চীৎকার করিয়া আমি মূর্চ্ছিত হইলাম!

(ক্রমশঃ)

ডিরোজিয়োর কবিতা।

বাল বিধবা।

আমার স্বপন, সুখের স্বপন,
নিমেষে ফুরাল,—এই সে ক্লেশ;
ইন্দ্র ধনুর ভঙ্গুর তনু
অস্ত রবির কিরণে শেষ।

ছিন্ন শাখার রক্তিম পাতা,
বাতাসে হতাশে কাঁপিয়া মরি,
নিঠুর জগতে আছি কোনো মতে,
জানি না কখন পড়িব ঝরি'।

গঙ্গার ধারা যতদূর যায়
ওগো দয়াময়! তাহারো পারে
লয়ে যেয়ো এই সুখ-বঞ্চিত
চিরলাঞ্ছিত ভগ্ন ভারে।

"বৌ-দিদি।"

বৌদিদি চাস্? বোন্‌টি আমার,
বৌদিদি তোর চাই?
তারার হাটে খুঁজব এবার
দেখ্‌ব যদি পাই!

তুই যে মোদের পুণ্যপ্রভা,—
ঠাকুর ঘরের দীপ ;
তোর মতোটিই আন্‌তে হ'বে
পুণ্য হোমের টিপ্।

স্বপ্ন-দেবীর পাখা দু'খান্
ধার ক'রে-না-নিয়ে,
ঝড়ের রাতে বেরিয়ে যাব
কারেও না জানিয়ে ;
ধর্‌ব গিয়ে ঝড়ের বেগে
রামধনুকের ডোর,
রামধনুকের একটি রেখা
বৌদি' হ'বে তোর !

ডুব্‌ব সোজা সাগর জলে
সূর্য্যালোকের মত,
প্রবাল গুহায় অপ্সরীরা
নাইতে যেথায় রত,
পরীরাণীর মুকুটমণি,
আন্‌ব সাথে মোর ;
সেই মুকুটের মধ্যখনি
বৌদি' হ'বে তোর !

পক্ষীরাজের পিঠেতে সাজ
মুখে লাগাম দিয়ে,
যাদু-জানা পাগল্‌-পানা
কল্পনাকে নিয়ে,
সটান্ গিয়ে কল্পলোকের
আন্‌ব সে মন্দার,
বৌদি' তোমার সেই তো হ'বে ;
বোন্‌টি গো আমার।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

প্রলোভন।

(ফরাসী গল্প)

"কে ? পল ! খুব লোক ভাই তুমি ! সাড়ে ছটার সময় তোমার আসবার কথা— এলে ৭৷৷০টায়, ঠিক একটি ঘণ্টা দেরী ! খাবারগুলো সব জমে যেন বরফ হয়ে গেছে। আবার আজ দোকানে যেতে হবে। সন্তানের একটা জ্যাকেট না কিনলে নয়। আজ 'সেলে'র শেষ দিন—তাও বুঝি ভুলে গিয়েছ ?"

এইরূপে পত্নী স্বামীকে গৃহে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। দম্পতির আজ চারি বৎসর বিবাহ হইয়াছে। যুবক পেরীর মহাসভার সভ্য। এককালে তাঁহার ভাল দিন ছিল কিন্তু ভাগ্য বিপর্য্যয়ে আজ তাঁহাকে বাৎসরিক ১০ পাউণ্ডে পেরীর একটী ক্ষুদ্র অজানা পল্লীতে পাঁচতলার উপর কক্ষ ভাড়া করিয়া বাস করিতে হইতেছে। ঘরে আসবাব পত্র অতি সামান্যই—একখানি ডেস্ক, দুজনের জন্য দুখানি চেয়ার এবং আহারের জন্য ছোট একটি টেবিল। ঘরের কোণে স্তূপাকার "ব্লু" বুক অর্থাৎ মহাসভাসম্বন্ধীয় পুস্তক। ডাইনিং টেবিলের চাদরটাতেও ছিদ্রের অভাব নাই। দেওয়ালে একখানি ছবি ও একখানি দর্পণ। মুহূর্ত্তের দৃষ্টিতেই গৃহবাসীর অর্থকষ্টের যে পষ্ট

প্রমাণ পাওয়া যায়। যুবকের বেশভূষাতেও ব্যয়বাহুল্যের লক্ষণ কিছুমাত্র নাই।

চারি বৎসরের অভাব ও হাড়ভাঙ্গা খাটুনিতে যুবতীকে কিন্তু সৌন্দর্য্যহীনা করিতে পারে নাই। তাহার পরিধেয় বসন অল্প মূল্যের হইলেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—মাথায় চুলগুলি সুবিন্যস্ত, মুখখানি প্রফুল্লতা মাখান। ক্ষুদ্র টেবিলে আহারের পাত্রগুলি সাজাইয়া সহাস্য বদনে তিনি স্বামীকে বলিলেন "আসতে আজ্ঞা হউক—ডেপুটী মহাশয়। পেরীর মহানগরীর মহাসভার ডেপুটীর যোগ্য আহার্য্য প্রস্তুত।" যুবকও হাসিতে হাসিতে টেবিলে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আজ কি বেঁধেছ?"

"কেন? ঢের!—সুপ আছে, মাংস হয়েছে তার উপর একটু চাটনিও আছে।" সঙ্গে সঙ্গে একটী দীর্ঘ নিশ্বাসও পড়িল। যুবক এ নিশ্বাসের অর্থ বুঝিলেন, কহিলেন, "প্রিয়তমে, তোমার জন্যই বেঁচে আছি। আজ সারাদিন বজেটের তর্কবিতর্কে কোটী কোটী মুদ্রার কথা আলোচনা করেছি—আর আমার ঘরে—" যুবতী বাধা দিয়া বলিলেন "যাও—ও সব ভেবে কি হবে? একদিন না একদিন ভগবান দিন দেবেনই। এখন রান্না কেমন হয়েছে বল দেখি?" এক প্লেট সুপ নিঃশেষ করিয়া যুবক বলিলেন "বেশ হয়েছে। আর একটু দাও। সত্যি বলছি পেরী নগরীতে তোমার চেয়ে পাকা রাঁধুনী আর নেই।" তার পর দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে বলিলেন "এই রাত্রে কষ্ট করে যে তোমাকে সস্তা জ্যাকেট কিনতে যেতে হবে একথা কখনও ভাবিনি।"

"আবার ঐ কথা?" যুবতী অন্য কথায় প্রবৃত্ত হইলেন।

আহারাদির পর স্বামীকে এক পেয়ালা কফি, ও অতি স্বল্পমূল্যের একটী চুরুট দিয়া গৃহিণী বহির্গমনে প্রস্তুত হইলেন। যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কি সঙ্গে যাব"? উত্তর হইল "না—আমি এক্ষুণি আসছি। এখন বাইরে গেলে প্রবন্ধটা শেষ করবে কখন? কালই ত' ওটা চাই।"

(২)

এত দুঃখের মধ্যে এত কষ্ট সহ্য করিয়াও আমাদের ডেপুটী মহাশয় সুখী। কেবল, যখন তিনি তাঁর স্ত্রীর কষ্টের কথা মনে করেন তখন আর তাঁর জ্ঞান থাকে না, বুক ফাটিয়া ওঠে। এই মহাসভা আরও এক বৎসর বসিবে,—কিন্তু নূতন অধিবেশনে তাঁহার নির্ব্বাচিত হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই। তিনি সুবক্তা নহেন—তিনি দরিদ্র সুতরাং তাঁহাকে আর কে সাহায্য করিবে? সত্য—তাঁর কলমের জোর আছে কিন্তু খবরের কাগজওয়ালারা ত নিজ স্বার্থ ছাড়িয়া তাঁহার স্বার্থ দেখিবে না। ডেপুটী পীড়িত অবসন্ন হৃদয়ে উঠিয়া প্রবন্ধ লিখিবার জন্য ডেস্কের নিকট বসিলেন। হঠাৎ তাঁহার দ্বারে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল—এবং দ্বার খুলিবামাত্র সান্ধ্যবেশ পরিহিত একটী অপরিচিত ব্যক্তি—"ক্ষমা করিবেন—আপনিই বোধ হয় ডেপুটী মহাশয়?" এই বলিয়া হস্ত প্রসারণ করিলেন। "আজ্ঞা হাঁ আমিই তাই বটে। আসন গ্রহণ করিতে আজ্ঞা হউক।" "অবশ্য! অবশ্য! বড় অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করিতে আসিয়াছি।

আপনার কক্ষে আর কেহ আছেন কি ?” “না আমার পত্নী এইমাত্র বাহিরে গেলেন।

অপরিচিত আসন গ্রহণ করিয়া একবার কক্ষের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, “আমার নাম জিন লিক্রিয়ার। আমি বিশেষ প্রয়োজনেই আপনাকে বিরক্ত করিতে সাহসী হইয়াছি। ফ্রেঞ্চ-মিডল্যাণ্ড লাইন নির্ম্মাণ প্রস্তাবে মহাসভা যে কমিটি গঠিত করিয়াছেন আপনি ঐ কমিটির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন শুনিয়াছি। এই রেল নির্ম্মাণে ফরাসী জাতির যে যথেষ্ট আর্থিক লাভ হইবে এই বিষয় বলিতে ও মহাশয়ের মতামত জানিবার জন্য আসিয়াছি। কাগজ পত্রাদি সকলই আমার সঙ্গে আছে—আমার দৃঢ় বিশ্বাস এগুলি দেখিলে আপনি নিশ্চয়ই রেল নির্ম্মাণের পক্ষে মত দিবেন।” ডেপুটী উত্তর করিলেন “ক্ষমা করিবেন! আমি যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহাতে এ রেল নির্ম্মাণে আমাদের যথেষ্ট লোকসান এবং সেইজন্য আমি ইহার বিরুদ্ধেই মত দিব।” “যদি কিছু মনে না করেন, তবে এ সম্বন্ধে আপনাকে কিছু কাগজ পত্র দেখাইতে পারি কি ?” “তাহাতে ক্ষতি কি ?” ডেপুটী কাগজ দেখিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে দরজায় অতি জোরে ঘণ্টা বাজিতে লাগিল।

ডেপুটী দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেখিলেন যে, বাড়ীওয়ালার লোক বাড়ীভাড়ার তাগাদার জন্য আসিয়াছে। গত তিন মাসের ভাড়া বাকী পড়িয়াছে। ‘আগামী কল্য ভাড়া দেওয়া যাইবে’ একথার উত্তরে দরোয়ান মুখের উপরই বলিয়া ফেলিল যে, “ইঁহারা আইন প্রণয়নকার অথচ নিজের আইন মানেন না।” অতি কষ্টে দরোয়ানকে ফিরাইয়া দিয়া ডেপুটী অন্যমনস্ক ভাবে পুনর্ব্বার কাগজ উল্টাইতে লাগিলেন। অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন “এ কি ? এ ৫০,০০০ হাজার ফ্রাঙ্কের চেক এখানে কে রাখিল ?”

মৃদুহাস্য করিয়া জিন লিক্রিয়ার বলিলেন “আপনার ভোট আমাদের একান্ত আবশ্যক। কমিটির ছয় জন সদস্যের মধ্যে তিন জন আমাদেরই পক্ষ ভুক্ত। বক্রী তিনজন আমাদের বিপক্ষ সুতরাং তাহারা যে আমাদের বিরুদ্ধে ভোট দিবে ইহা অবশ্যম্ভাবী। আপনি কোন পক্ষভুক্তই নহেন—ইহাতে আপনার ব্যক্তিগত লাভ লোকসান কিছুই নাই। আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের পক্ষে ভোট দিতে স্বীকৃত হন, তবে আমাদেরই জয় হইবে।” ডেপুটী নির্ব্বাক—তাঁহার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে—কপালে ঘর্ম্মবিন্দু দেখা দিয়াছে—তিনি থর থর করিয়া কাঁপিতেছেন। চেকখানি এখনও হাতে আছে দেখিয়া জিন লিক্রিয়ার বলিতে লাগিলেন “রাজনীতিতেই আপনাকে নিঃস্ব করিয়াছে। আপনি কি ভাবে দিনপাত করিতেছেন একবার তাহাই বিবেচনা করুন। আপনার প্রিয়তমা পত্নীর কথা মনে করুন—এই রাত্রিকালে দুর্য্যোগে তাঁহাকে “সেলে”সস্তা জ্যাকেট কিনিতে যাইতে হইল।” লিক্রিয়ার উত্তর প্রত্যাশায় ডেপুটীর মুখের দিকে চাহিলেন। ডেপুটী এখনও নির্ব্বাক। লিক্রিয়ার বলিতে লাগিলেন “৫০ সহস্র ফ্রাঙ্ক। ইহা দ্বারা আপনি আপনার অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন। নূতন নির্ব্বাচনে ইহার কিয়দংশ ব্যয় করিলেই আপনার নির্ব্বাচন কেহই

প্রতিরোধ করিতে পারিবে না। আপনার স্ত্রীকে সুখী করিতে পারিবেন—দুচার খানি গহনাও দিতে পারিবেন। আপনার কি লজ্জাবোধ হয় না যে ঐ সুন্দর অঙ্গুলিতে আপনি এই চারি বৎসরেও একটি আংটি পরাইতে পারেন নাই—একটি ভাল পোষাক দিতে পারেন নাই! খাটিতে খাটিতে বেচারীর সোনার বর্ণ কালি হইয়া গেল—তাহা কি আপনি দেখিয়াও দেখেন না?"

ডেপুটীও ঠিক তাহাই ভাবিতেছিলেন—"কি ছিল! কি হইয়াছে! মেরির খাটিতে খাটিতে হাত দুখানি শক্ত হইয়া গিয়াছে। এত কষ্ট! এত দারিদ্র্য! বাড়ীওয়ালার দরোয়ানের কাছে অপমান—দুধওয়ালার জোগান বন্ধ—মুদীর তাগিদপত্র! অর্থ কষ্ট, মনোকষ্ট, শারীরিক কষ্ট, অনাহার সবই একদিকে—কিন্তু অপর দিকে ধর্ম্ম সাধুতা সুনাম! কি করি?" লিক্লিয়ার আবার স্মরণ করিয়া দিলেন "ম্যাডাম ক্রুণোকে আপনি সুখী করিতে কি চান না?"

"ম্যাডাম ক্রুণোর কথা কে বলিতেছেন।" মেরি গৃহপ্রবেশ করিয়া নিজনাম অপরিচিতের মুখে শুনিয়া, ও স্বামীর বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কে ম্যাডাম ক্রুণোর কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন?" ডেপুটীর প্রাণে এক নূতন বল সঞ্চারিত হইল। "মেরি! আমাকে রক্ষা কর।" এই বলিয়া তিনি তাঁহার বক্তব্য সুন্দররূপে মেরিকে বলিয়া যাইতে লাগিলেন। ডেপুটীর কণ্ঠে যেন তখন সরস্বতীর আবির্ভাব হইল!—তাঁহার অনর্গল কথা শুনিয়া জিন লিক্লিয়ার মনে মনে বলিতে লাগিলেন, মহাসভায় যদি এই ভাবে ডেপুটী বক্তৃতা করিতে পারেন তাহা হইলে আর তাঁহার কোন কষ্ট থাকে না। ডেপুটী বক্তব্য শেষ করিয়া চেকখানি মেরিকে দিয়া বলিলেন "ধর্ম্ম দিয়া অর্থ কিনিব বা অর্থ ছাড়িয়া ধর্ম্ম রাখিব—তুমিই এখন তাহা স্থির কর মেরি।" মেরি চেকখানি ফেরৎ দিয়া বলিলেন, "আত্মসম্মান এখানে বিক্রয় হয় না। আপনি অন্য পথ দেখুন।" এই বলিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দিলেন। ডেপুটী মেরীকে চুম্বন করিয়া বলিলেন "৫০০০০ হাজার ফ্রাঙ্ক! তোমার নরম হাত দুখানি যে লাল,"—

"লাল কিন্তু অকলঙ্ক!"

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

ভারতের নূতন সম্রাট।

স্বর্গগত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের দ্বিতীয় পুত্র প্রিন্স এলবার্ট জর্জ্জ, পঞ্চম জর্জ্জ উপাধি গ্রহণ করিয়া পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছেন। ১৮৬৫ সালের ৩রা জুন প্রিন্স জর্জ্জ জন্মগ্রহণ করেন। ইংলণ্ডে রাজার জ্যেষ্ঠপুত্রই পিতৃসিংহাসন লাভ করেন এবং যুবরাজ পদে অধিষ্ঠিত হন। সুতরাং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রিন্স জর্জ্জকে রাজপুত্রোচিত শিক্ষাদান করিয়া নৌবিভাগে নিযুক্ত করা হয়। এই বিভাগে তিনি

সম্রাট পঞ্চম জর্জ।

সম্রাজ্ঞী মেরি।

১৯ বৎসর বিশেষ দক্ষতার সহিত কর্ম্ম করেন। রাজপুত্র হইলেও তাঁহার অন্তর এতই উদার ও অমায়িক ছিল যে তিনি তদীয় বিভাগের কোন কর্ম্মচারীকে তাঁহার প্রতি রাজসম্মান প্রদর্শন করিতে দেখিলে বিশেষ অসন্তুষ্ট হইতেন; এমন কি তাঁহাকে রাজপুত্র বলিয়া সম্বোধন করিতে পর্য্যন্ত তিনি নিষেধ করিতেন। আহার বিহার আনন্দে সকলের সহিত সমভাবে যোগদান করিয়া সর্ব্বদা সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় কালাতিপাত করাতেই তিনি আনন্দবোধ করিতেন। পুস্তকের মধ্যে তাঁহার নিজের লেখাপড়ার জন্য জাহাজের মধ্যে একটি কামরা থাকিত মাত্র। যুবরাজের পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে তিনি "নাবিক প্রিন্স" নামেই সকলের নিকট পরিচিত ছিলেন।

১৮৯১ সালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রিন্স এলবার্ট ভিক্টরের সহিত প্রিন্সেস্ মে অফ্ টেকের বিবাহ স্থির হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহার একমাস পরেই যুবরাজের মৃত্যু হয়। সুতরাং সেই শোকের মধ্যেই প্রিন্স জর্জ্জ যুবরাজের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এবং দুই বৎসর পরে জ্যেষ্ঠের মনোনীত প্রিন্সেস্ মের সহিত যুবরাজের বিবাহ হইল।

যুবরাজ জর্জ্জ সম্রাট জর্জ্জ হইয়া কিরূপে রাজ্যশাসন করিবেন এই বিষয় লইয়া আজকাল বিলাতের প্রায় সকল সংবাদ পত্রেই আলোচনা চলিতেছে। এ বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা কাহারও পক্ষেই ঠিক নিরাপদ নহে। যৌবরাজ্য হইতে সাম্রাজ্যের দায়িত্ব স্কন্ধে লইলে মনুষ্য যে কতদূর পরিবর্ত্তিত হওয়া সম্ভব, তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত আমরা স্বর্গগত সম্রাটেই দেখিয়াছি। তবে আপাততঃ ইংলণ্ডের লোক এইরূপ কল্পনা করেন যে, আমাদের নূতন সম্রাট তাঁহার স্বর্গগত পিতার ন্যায় ইতর ভদ্র সর্ব্বসাধারণের প্রিয় হইবেন কি না তাহা সন্দেহ। ইঁহার স্বর্গীয় পিতা লোকের মনোহরণে সিদ্ধহস্ত ছিলেন এবং ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সঙ্গে এ কথাও বলা যাইতে পারে যে পঞ্চম জর্জ্জ দেশের শক্তিবান মন্ত্রীসমাজের ক্রীড়াপুত্তলি হওয়া কোন মতেই সম্ভব নহে। রাজনৈতিক হইতে সামাজিক পর্য্যন্ত সাম্রাজ্যের সকল বিষয়েই তাঁহার নিজেই একটা নির্দ্দিষ্ট মত আছে এবং তাহা প্রকাশ করিতেও তিনি কোন দিনই কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। এ সকল বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞান অসাধারণ। দেশে যখনই কোনও বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে যুবরাজ জর্জ্জ সর্ব্বান্তঃকরণে তাহার সকল দিক জানিবার চেষ্টা করিয়াছেন। দিনের পর দিন তিনি পার্লামেণ্টে যাইয়া দেশের সকল সম্প্রদায়ের মতামত মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতেন। সাম্রাজ্য সম্বন্ধেও তাঁহার অভিজ্ঞতা অসাধারণ। নৌবিভাগে থাকিয়া তিনি পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে যেরূপ ভ্রমণ করিয়াছেন, সেরূপ কোনও ভাবী রাজার অদৃষ্টেই সচরাচর ঘটে না। এক সময়ে বক্তৃতাকালে তিনি বলিয়াছিলেন—"যদি আপনাদিগকে এ কথা বলি যে এখানে এমন কোন ব্যক্তিই উপস্থিত নাই যিনি আমার ন্যায় বিভিন্ন ব্রিটিশ রাজ্যে পদার্পণ করিয়াছেন; তাহা হইলে সেটা বোধ হয় আমার পক্ষে খুব অন্যায় গর্ব্ব হইবে না। এত ভ্রমণের

সাম্রাজ্য লাভের পর সম্রাট এডওয়ার্ডের সপরিবার চিত্র।

পরেও যদি আমি পৃথিবীব্যাপী ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ না করিয়া থাকি বা সাম্রাজ্যের উন্নতি ও মঙ্গলের প্রতি মনোযোগী না হই, তাহা হইলে ব্যাপারটা খুব বিস্ময়কর হইবে সন্দেহ নাই।" আর এক সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন—"ইংলণ্ড বলিতে আমি কেবল পশ্চিম সমুদ্রের এই দ্বীপপুঞ্জকে বুঝি না, আমার ইংলণ্ড পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়া আছে।"

যুবরাজ জর্জ্জ যখন যেখানে গমন করিয়াছেন, তাঁহার ব্যবহারে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই বুঝিয়াছেন যে তাঁহাদের শ্রীসমৃদ্ধির জন্য যুবরাজ অন্তরের সহিত ব্যগ্র ও সচেষ্ট। অপরের অবস্থার প্রতি সহানুভূতির ফলে তিনি সকল দেশেই সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে অচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব সূত্রে বদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি অতি তীক্ষ্ণ। তিনি ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে ফিরিয়া গিয়া ভারতের ইংরাজ কর্ম্মচারীকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন—আমাদের শাসন প্রণালী মধ্যে আমরা সহানুভূতিকে অধিকতর প্রসার দান করিলে, ভারত শাসন আরও সহজ ও সুখকর হইয়া উঠে।" পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতিই যে রাজা প্রজার সম্বন্ধ বন্ধনের মূল তাহা যুবরাজ বিস্মৃত হন নাই।

সম্রাট জর্জ্জ অনেক সদ্গুণে ভূষিত। তাঁহার প্রকৃতি সরল, অকপট, বিনয়ী,—পরদুঃখকাতর, সংযমী, ও ধর্ম্মভীরু। কোনও প্রকারের কাপট্য বা বঞ্চনাকে তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করেন। তিনি নিজের প্রতি নিতান্তই কঠোর। আহার বিহারে তাঁহার ন্যায় সংযমী পুরুষ খুব অল্পই দেখা যায়। সকল সময়েই তিনি আপনাকে কর্ম্মে নিযুক্ত রাখেন। পুস্তক পাঠ করা তাঁহার একটি বিশেষ প্রিয় কর্ম্ম। সম্রাটের গৃহজীবন ইংলণ্ডের আদর্শ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী উভয়ে পরস্পরের প্রতি একান্ত অনুরক্ত। পিতামাতা উভয়ে সন্তানগুলিকে লইয়া সর্ব্বদা কালাতিপাত করেন। তাঁহার চরিত্র নিষ্কলঙ্ক। আজ পর্য্যন্ত তাঁহার চরিত্রের প্রতি কেহ ইঙ্গিতেও কোনো দোষারোপ করিতে সাহস করে নাই। জুয়াখেলা, ঘোড়দৌড় ইত্যাদি ব্যসনকে তিনি ঘৃণা করেন। শিকারই তাঁহার একমাত্র আনন্দদায়ক ক্রীড়া। আমাদের নূতন সম্রাজ্ঞীও বিশেষ গুণবতী রমণী। তাঁহার বিচক্ষণ বুদ্ধি, তীক্ষ্ণ বিচারশক্তি এবং স্বাভাবিক সদাশয়তার গুণে তিনি পতির কঠোর কর্ম্মে যথার্থ সহধর্ম্মিণী হইবেন বলিয়া আশা করা যায়।

রাজ্য গ্রহণ করিয়াই তিনি ভারতবাসীকে তাঁহার পিতৃশোকে সহানুভূতি প্রকাশের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিয়া যে আশ্বাস বাণী প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে আশা হয় যে তাঁহার স্বর্গীয় পিতা ও পিতামহীর পদানুসরণ করিয়া, তিনিও ভারতের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে এবং প্রজার অসন্তোষ ও অশান্তি দূর করিতে যত্নবান হইবেন। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি,—আমাদের এ আশা সফল হউক এবং নূতন সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী যথার্থ রাজধর্ম্ম পালন করিয়া অক্ষয়-কীর্ত্তি লাভ করুন।

ধূমকেতুর পুচ্ছ কি।

ধূমকেতুর পুচ্ছ কি? এ সম্বন্ধে ভারতীতে আলোচনা হইতেছে দেখিলাম।

"ধূমকেতু কাচসদৃশ স্বচ্ছ বস্তুর শূন্যগর্ভ গোলক বা প্রতিগোলক বা গোলকাভাস মাত্র;"—Proctor এর সময় এ মত প্রকাশ তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু এপর্য্যন্ত পণ্ডিতগণ বিজ্ঞানে যতদূর অগ্রসর হইয়াছেন তাহাতে আকাশে কোন শূন্যগর্ভ গোলকের অবস্থিতি তাঁহারা কল্পনা করিতে পারেন না। যেরূপে গ্রহগণের উদ্ভব কল্পনা করা হইয়া থাকে তাহাতে শূন্যগর্ভ কোন গোলক আকাশে উৎপন্ন হইতে পারে না। ধূমকেতু যেরূপ বিপুলকায় এবং যেরূপ প্রবলবেগে ভ্রমণ করিতেছে তাহা দেখিয়া পণ্ডিতেরা ইহাকে বাষ্পময় কল্পনা করিতেও সাহসী হন না। এমন কি কিছুদিন পরে হয়ত ধূমকেতুর চন্দ্রও নিজ কক্ষে আবর্ত্তন পর্য্যন্ত পণ্ডিতেরা দেখিতে পাইবেন। বর্ত্তমান হেলির ধূমকেতুর (Halley' Comet) পার্শ্বে এবং অন্য দুই একটী ধূমকেতুর পার্শ্বে ছোট ছোট ধূমকেতু পণ্ডিতেরা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। কিছুদিন পরে হয়ত দেখা যাইবে এগুলি বাস্তবিক তাহাদের চারিদিকে ভ্রমণ করে। যদিও সাধারণ চক্ষে ধূমকেতুর পুচ্ছ একটী মাত্র দেখা যায় কিন্তু বাস্তবিক সব সময় তাহা একটী নয়।*

২৬শে এপ্রেল কোদাই কেনাল মানমন্দিরে যে ফোটোগ্রাফ লওয়া হইয়াছে তাহাতে দেখা গিয়াছে হেলির ধূমকেতুর পুচ্ছ সংখ্যা সাতটীর কম নয়। ইহার ব্যাখ্যা কিরূপে করা যাইতে পারে। ধূমকেতুর পুচ্ছ ভিন্ন ইহার চারিপার্শ্বে বহুদূর পর্য্যন্ত একটী আলোকময় আবরণ থাকে। ইহা ব্যতীত সূর্য্যের শুধু বিপরীত দিকে নয় সূর্য্যের দিকেও পুচ্ছ দেখা যায়। আবার কখন কখন দেখা যায় যে যখন দূরে থাকে তখন পুচ্ছ সূর্য্যের দিকে কিন্তু নিকটে আসিলে তাহা সূর্য্যের বিপরীত দিকে চলিয়া যায়। ইহার কারণ কি? শুধু যে পুচ্ছ দিক পরিবর্ত্তন করে তাহাও নয়, কখনও কখনও দেখা যায় পুচ্ছের ঔজ্জ্বল্য হঠাৎ কমিয়া যায়, পুচ্ছ কম্পিত ও তরঙ্গায়িত হইতে থাকে; এবং পুচ্ছের দৈর্ঘ্য হঠাৎ কমিয়া যায় বা বাড়িয়া উঠে। এ সমস্তের কি কারণ দর্শান যাইতে পারে? এতৎ সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রবন্ধে আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীবিনয়ভূষণ রাহা দাস।

* Chamber's, Hand Book of Astronomy, page 411:—

"In five instances when the Comet has more than one tail the second has extended more or less towards the sun. This was the case with the Comet of 1823, 1831 (iv) 1877, (ii); 1880 (vi)"

"Although Comets usually have but one tail yet two is by no means an uncommon number." (dunlop)

ভূত দেখা।

১

ভূত আছে কি না, তাহা লইয়াই তর্ক চলিতেছিল।

তর্কের মাত্রা অতিরিক্ত চড়িয়াছিল। উমেশ ভায়া প্রাণপণ বলে বলিয়া উঠিল, "চাক্ষুষ প্রমাণ ছাড়া বিশ্বাস না করলে ত, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার অস্তিত্বও স্বীকার করা যায় না!"

যতীশ কহিল, "আমি নিজে না দেখে থাকি, অপরে ত তাঁকে দেখেছে, তার পর টাকা ও টিকিটের উপর মুখের ছবি, ফটোগ্রাফ—এ সবেও ত তাঁর অস্তিত্ব দস্তুরমত প্রমাণ হচ্ছে!"

উমেশ উচ্চ হাস্যের সহিত কহিল, "পথে এসো, দাদা—তেমনি ভূতও অনেকে দেখেছে—এবং এখানে না হলেও, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে তার ফটো পাওয়া যাচ্ছে!"

সত্য! কথাটা উড়াইবার উপায় ছিল না। যতীশ কোম্পানি নিজেদের ফাঁদে আপনা হইতেই ধরা দিল। শ্যাম এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল, তর্ক থামিতে সে কহিল, "আমি একটা চাক্ষুষ প্রমাণের কথা জানি।"

সকলে সাগ্রহে কহিল, "কি রকম?"

"ও সব নিয়ে বাজে তর্ক করলে চলবে, কেন?" বলিয়া সূক্ষ্ম শরীর, অ্যাষ্ট্রাল প্লেন প্রভৃতি, কতকগুলা দুর্ব্বোধ্য প্রকাণ্ড কথা, উমেশ এক নিশ্বাসে বলিয়া গেল।

আমরা শ্যামকে চাপিয়া ধরিলাম, "কি রকম প্রমাণটা হে?"

শ্যাম কহিল, "তবে শোন!"

২

শ্যাম আরম্ভ করিল, "সে আজ প্রায় আঠারো বৎসরের কথা! তখন প্রেসিডেন্সিতে বি, এ পড়ি। মাঘ মাস। মন্মথর বিবাহের ধূমে হোষ্টেলে কাহারো কাজকর্ম্ম ছিল না। বর্দ্ধমানে বিবাহ হইবে—ট্রেণের সেকেণ্ড ক্লাস রিজার্ভ করা হইয়াছিল। 'সহর বর্দ্ধমান কখনো দেখি নাই, দেখিব; তাহার উপর, হাবড়া হইতে বর্দ্ধমান অবধি সেকেণ্ড ক্লাশে লগেজ-নারী বিবর্জ্জিত অবস্থায় ভ্রমণে, বন্ধুবান্ধবে মিলিয়া হাসি গল্প-গানে সারাপথ নিশ্চিন্ত আরামে কাটাইয়া দিব—ইহারি আনন্দে বিভোর হইয়া উঠিলাম।

বিবাহের দিন, সজ্জিত বেশে সকলে বাহির হইলাম। মন্মথ যাইয়া বরবেশে ফার্ষ্ট ক্লাশে উঠিল—আমরা, বরযাত্রীর দল, সেকেণ্ড ক্লাশের রিজার্ভ কক্ষ অধিকার করিলাম। আকাশটা মেঘাচ্ছন্ন ছিল—একজন চীৎকার করিয়া উঠিল, "ধন্য রাজা পুণ্য দেশ, যদি বর্ষে মাঘের শেষ"! কথাটা আমাদের মোটেই ভাল লাগে নাই। কারণ, শাল দোশালা পাম্প-সু ভিজিয়া মাটি হইয়া যাইলে, 'রাজার পুণ্য দেশের জয়' গাহিবার প্রবৃত্তিই হইবে না! ট্রেণ শ্রীরামপুর ষ্টেশন ছাড়িলে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। এবং শীতটিও প্রচণ্ডভাব ধারণ করিল! আমাদের আনন্দের স্রোত, তখন, বরফের মত, জমিয়া আসিতেছিল।

কায়ক্লেশে বর্দ্ধমানে কন্যাপক্ষের বাটী

পৌঁছিলাম। আয়োজনের ত্রুটি ছিল না। বরযাত্রীদিগের রাত্রিবাসের জন্য তাঁহারা সম্মুখের একটি বাড়ী ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। নৃত্যগীতেরও ব্যবস্থা ছিল—বৃষ্টিতে আসর তেমন জমিতে পারিল না। আহারাদি শেষ করিয়া বিশ্রাম-বাটিতে গেলাম। বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছিল। মাঝে-মাঝে মেঘের গর্জ্জন ও বিদ্যুতের চমক উৎসবানন্দের পরিবর্ত্তে বিভীষিকার সঞ্চার করিতেছিল। আমাদিগের অপরিচিত একটি যুবক,—বোধ হয়, কন্যাপক্ষীয়,—বলিয়া উঠিল, "কি দুর্য্যোগ! ভূতপ্রেতেই এ দুর্য্যোগে শুধু বাহির হয় মানুষে পারে না! নিমন্ত্রণের জন্যও না।"

হল ঘরের কোণে বসিয়া একটি ভদ্র লোক তামাকু সেবন করিতেছিলেন—দাড়ী, গোঁফে তাঁর মুখটাকে একেবারে ঢাকিয়া রাখিয়া ছিল। মাথায় প্রকাণ্ড চুল—অর্থাৎ দেখিলে তাঁহাকে থিয়সফিষ্ট কিম্বা কোন সম্প্রদায় বিশেষের লোক বলিয়া মনে হয়। তাঁর নামটা, বুঝি, রতনবাবু,—পরিচয়ে জানিয়া ছিলাম—রতন বাবু বলিলেন, "বলেন কি মশায়—! ভূতগুলার কি কাণ্ডজ্ঞান নাই যে,এই দুর্য্যোগে মরিবার জন্য বাহির হইবে।"

কক্ষমধ্যে হাস্যের তরঙ্গ উঠিল! আমি কহিলাম, "ভূতেরও মরিবার ভয় আছে নাকি?"

রতন বাবু কহিলেন, "তারা এ দুর্য্যোগে বাহির হয় না—জ্যোৎস্নারাত্রিটারই তারা পক্ষপাতী!"

অপরিচিত যুবকটি কহিলেন, "আপনার সঙ্গে তাদের কথাবার্ত্তা হয়েছিল, বুঝি?"

রতনবাবু কহিলেন, "নিশ্চয়—!"

অপরিচিত যুবকটি কহিলেন, "ভূত! যার অস্তিত্বই নাই—তাই দেখিয়াছেন! আশ্চর্য্য!"

রতনবাবু কহিলেন, "ও বয়সে সবই আশ্চর্য্য বলে মনে হয়! যদি আপনাকে দেখাইতে পারি—?"

অপরিচিত যুবকটি বাধা দিয়া কহিলেন, "আর, যদি না পারেন?"

"না পারি?" রতনবাবু পকেট হইতে ব্যাগ বাহির করিয়া কহিলেন, "আমার নিকট নোটে-টাকায় আটচল্লিশ টাকা আছে, আমি এগুলি আপনাকে দিব।"

আমাদের দলের মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠিল, "রীতিমত বাজি!"

অপরিচিত যুবকটি হাসিয়া কহিল, "আমার কাছে অত কিছু নাই—আসিয়াছি, বিবাহের নিমন্ত্রণে—সঙ্গে তিন-চারিটি টাকা ত মোটে আছে।"

রতনবাবু কহিলেন, "তবে আর মিছা বাজি রাখিয়া কি হইবে?" হোষ্টেলের দল মাতিয়া উঠিল। আমরা কহিলাম, "দেখান্ ভূত—আমরা চাঁদা দিয়া বাজি রাখিব!"

রতনবাবু হুঁকা নামাইয়া, হাসিয়া কহিলেন, "যখন বাজিরি কথাই হল, তখন টাকা বাহির করুন! তা ছাড়া, তর্কটা ওঁর সঙ্গেই হচ্ছে, যখন—"

"বেশ!" বলিয়া সকলে পকেট হইতে ব্যাগ বাহির করিলাম। চাঁদায় পঞ্চাশ টাকা উঠিল। অপরিচিত যুবকের হাতে দিয়া কহিলাম,"রাখুন মশায়,টাকা,আপনিই রাখুন! যদি উনি ভূত দেখাইতে পারেন ত, সব উনি লইবেন, আর যদি না পারেন ত, উঁহার আটচল্লিশ টাকা আমরা ভাগ করিয়া লইব!"

রতনবাবু কহিলেন, "খুব ভাল কথা!"

আমরা কহিলাম, "তা হলে, এখনি ভূত দেখাইবেন ত?"

দলের মধ্যে একজন ছিল—যাদব মিত্র, এখন সে ব্যারিষ্টার—তার ভূতের ভয় ছিল। সে কহিল, "তোমরা কি ঘুমাতে দেবে না? ভূতের হাঙ্গামা বাধাইয়া তুলিলে!"

আমরা তখন উৎসাহে মত্ত—বেচারার কথা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিলাম না।

রতনবাবু কহিলেন, "ওঁর যখন ভয় আছে, তখন এখানে ও সব হাঙ্গামা না করাই ভালো, শেষে—"

আমরা কহিলাম, "কোথায়, তবে যাব, এই জলে, কাদায়?"

কন্যাপক্ষীয় একটি ভদ্রলোক আমাদিগের অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত ছিলেন,—তিনি কহিলেন,—"দু রশিটাক দূরে বাঙলা স্কুল আছে, সেখানে গেলে হয় না?"

"খুব ভালো হয়—" বলিয়া রতনবাবু অগ্রসর হইলেন। আমরাও পশ্চাতে চলিলাম। কাদা বা জলের জন্য, তখন আর এতটুকু দ্বিধা ছিল না। বিবাহবাটী হইতে শঙ্খধ্বনি শুনা যাইতেছিল।

বাঙলা স্কুল খুলাইয়া কন্যাপক্ষীয় ভদ্রলোকটি, দালানে, বেঞ্চ টানিয়া আমাদিগকে, বসাইলেন।

অপরিচিত যুবকটিকে লইয়া রতনবাবু পার্শ্বের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। জানালা খুলিয়া দিয়া বলিলেন, "এই চেয়ারে বসুন!" তিনি চেয়ারে বসিলে, রতনবাবু বাহিরে আসিলেন, কহিলেন, "আমরা বাহিরেই থাকিব—ঘরটি বাহির হইতে বন্ধ থাক্—"

বাহিরের খোলা জানালা দিয়া হু হু করিয়া ঠাণ্ডা বাতাস আসিতেছিল—আমাদিগের হাড় অবধি কাঁপাইয়া তুলিতেছিল! কিন্তু সে দিকে আমাদিগের লক্ষ্যও ছিল না। ঘরের মধ্যে কি হয়, দালানের জানালা দিয়া, আমরা তাহাই দেখিতেছিলাম। রতনবাবু বলিলেন, "আপনি বসিয়াছেন ত! কোন ভয় করিতেছে না?"

তিনি কহিলেন, "আপনার ও সব বুজরুকি গৎ রাখিয়া, চাক্ষুষ প্রমাণ দেখান দেখি।"

রতনবাবু বলিলেন, "বেশ! বাহিরের জানালার দিকে চাহিয়া দেখুন—কি দেখিতেছেন?"

তিনি কহিলেন, "বিদ্যুতের চমক—আর অস্পষ্ট গাছপালা—"

আমরা হাসিয়া উঠিলাম।

"বেশ—বাহিরের দিকেই চাহিয়া থাকুন" —বলিয়া, রতনবাবু ক্ষিপ্র সুরে খানিকটা ছড়া বলিয়া গেলেন! "জঙ্গল ফুঁড়ে, আয়রে উড়ে—" ধরণের প্রকাণ্ড এক ছড়া!

ছড়া শেষ হইলে রতনবাবু কহিলেন, কি দেখিতেছেন?"

ভিতর হইতে তিনি কহিলেন, "বাহিরে, জানালার ধারে খানিকটা ধোঁয়া—!"

আমরা উদ্‌গ্রীবভাবে সেদিকে লক্ষ্য করিলাম—কিছু দেখিতে পাইলাম না। কহিলাম, "কই মশায়, কিছুই দেখিতেছি না ত।" রতনবাবু গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "চুপ!" তার পর কহিলেন, "আচ্ছা! আপনার ভয় হইতেছে?"

"ধোঁয়া দেখিয়া, ভয়?"

রতনবাবু আবার খানিকটা ছড়া বলিয়া কহিলেন, "এবার কি দেখিতেছেন ?"

"ধোঁয়াটা উপরে উঠিয়া কুণ্ডলী পাকাইতেছে—তাহা হইতে একটা মানুষের মূর্ত্তি! এ কি, এ যে আমার এক বন্ধু—"

রতনবাবু কহিলেন, "বন্ধু ? ইনি জীবিত আছেন ?"

"না,—আজ তিন বৎসর হইল—বন্দুকের গুলিতে আত্মহত্যা করিয়াছেন!" আমরা আশ্চর্য্য হইলাম।

রতনবাবু কহিলেন, "এখন আপনার ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাস হইতেছে ?"

"বলেন কি, এট আমার দৃষ্টিবিভ্রমও ত হইতে পারে।"

আমরা অস্থির হইয়া উঠিতেছিলাম। এত বড় অবিশ্বাসী লোক! ভূত দেখিতেছে, তবু মানিবে না! আর আমরা চাঁদা দিয়া মোটে দেখিতেই পাইলাম না! গা-টা ছম্‌-ছম্‌ করিতেছিল—থাকিয়া-থাকিয়া দেহে রোমাঞ্চ হইতেছিল!

"দৃষ্টিবিভ্রম! বেশ! তবে আর একটু দেখুন", বলিয়া, রতনবাবু আবার ছড়া সুরু করিলেন, কহিলেন, "এখন কি দেখিতেছেন ?"

"লোকটার কেমন ছায়ার শরীর—আমার দিকে আসিতেছে,—আমার পাশে দাঁড়াইয়াছে,—হাত তুলিতেছে—আমার গায়ের দিকে—ভারী ঠাণ্ডা হাত—উঃ,যেন ছুঁচ বিঁধিতেছে—বাবারে!" অপরিচিত যুবকটি মূর্চ্ছিত হইয়া সশব্দে ভূমিতে পড়িয়া গেল!

আমরা তাড়াতাড়ি ভিতরে যাইলাম! 'জল, জল' শব্দে স্থানটা মুখরিত হইয়া উঠিল! রতনবাবু বলিলেন, "দু পাতা ইংরাজী পড়িয়া ভূত মানেন না—দেবতা মানেন না—ধরাকে সরা জ্ঞান করেন—এ রোগের ঔষধ কি ? তা যাক্‌, বাজি জিতিয়াছি—আমার টাকার প্রয়োজন নাই—উঁহার যে শিক্ষা হইয়াছে, তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট! আপনারা নব্যের দল,—আপনারাও ত চক্ষে দেখিলেন!"

আমরা তখন মূর্চ্ছিতকে লইয়া ব্যস্ত হইলাম। জ্ঞান-সঞ্চার হইতেই, অপরিচিত যুবকটি কহিলেন, "কোথায় গেল, সে বেটা! ভণ্ড, বুজরুক! উঃ, আমার প্রাণটাই গিয়াছিল—আমি তাকে পুলিশে দিব, এখনি থানায় টানিয়া লইয়া যাইব,—বেটা—"

কথাটা বলিতে বলিতে তিনি বাহিরের দিকে ছুটিলেন।

আমরা সকলে মিলিয়া চেয়ার-টেবিলগুলা তুলিয়া, বাতি জ্বালিয়া বাসার দিকে চলিলাম! কন্যাপক্ষীয় ভদ্রলোকটি কহিলেন, "তাই ত, ব্যাপারটা ভালো, বুঝা গেল না ত!"

বাসায় আসিয়া দেখি, যাদব মিত্র আপাদ-মস্তক লেপ মুড়ি দিয়া পড়িয়া আছে। আমরা ফিরিতেই সে কহিল, "কি দেখিলে ?"

আমরা কহিলাম, "আশ্চর্য্য কাণ্ড! যথার্থই ভূত আছে! তিন বৎসর পূর্ব্বে যে লোক মারা গিয়াছে, সে একেবারে আজ সশরীরে উপস্থিত।"

যাদব কহিল, "স্বচক্ষে দেখিলে ?"

আমরা কহিলাম, "স্বচক্ষে ঠিক নয়—তবে, হাঁ, একরকম স্বচক্ষু বই কি! সেই যে ভদ্রলোকটি মিনি তর্ক করছিলেন, তিনি দেখিয়া ভয়ে মূর্চ্ছা গিয়াছিলেন!"

যাদব কহিল, "মূর্চ্ছা ভাঙিয়াছে ?"

আমরা কহিলাম, "হাঁ !"

"কোথায় তিনি ?"

"এখানে ফিরিয়া আসেন নাই ?"

"না !"

"রতনবাবুও এখানে ফিরেন নাই ?"

"কই না !"

"তবে বুঝি বিবাহবাড়ীতে গিয়াছেন ! সে ভদ্রলোকটিত এমনি চটিয়া উঠিয়াছেন, যে ভয় দেখানোর জন্য, রতনবাবুকে পুলিশে দিবেন বলিয়া শাসাইয়া তাঁহারি সন্ধানে গিয়াছেন !"

৩

গল্পে-গুজবে সময় কাটাইবার পর, শেষ রাত্রে আমাদিগের নিদ্রা আসিল। প্রভাতে, নিদ্রাভঙ্গে রতনবাবুদের সন্ধান লইলাম—তাঁহাদের চিহ্নও নাই ! ব্যাপার কি !

চা মিষ্টান্ন প্রভৃতি লইয়া কন্যাপক্ষীয় ভদ্রলোকটি আসিয়া কহিলেন, "আপনাদের দলের তাঁরা কোথা গেলেন ! সেই ভূত ! তাঁদের দেখিতেছি না ত !"

আমরা কহিলাম, "কই এখানে ত, আসেন নাই ! আঃ তাঁরা ত আমাদের দলের নন ! কন্যাযাত্রী, না ?"

"না ! তাঁরা আপনাদিগের আসিবার পূর্ব্বেই আসিয়া সন্ধান লইয়াছিলেন, বরযাত্রীর দল আসিয়াছে কি না—বরযাত্রী বলিয়াই ত পরিচয় দিয়াছিলেন !"

আমরা আকাশ হইতে পড়িলাম। তবে কি ! ভালো কথা, আমরা চাঁদা করিয়া পঞ্চাশটি টাকা যে সেই অপরিচিত যুবকটির হাতে রাখিয়াছিলাম !

রীতিমত গোলমাল বাধিয়া গেল। থানায়, ষ্টেশনে লোক ছুটিল ! সংবাদ আসিল, রাত্রে কুলির দল গোঁফ-দাড়ী সমাচ্ছন্ন একটি লোককে সঙ্গীসহ, ষ্টেশনে, প্ল্যাটফর্ম্মের বেঞ্চে, বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিল, তার পর যে, তাহারা কোথায় গিয়াছে, তাহা কেহই বলিতে পারে না !

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ষোল আনা বাঙ্গালীর নিজস্ব ; বাঙ্গালীর উৎসাহ ও আবেগে স্থাপিত এবং তদধিক উৎসাহে তৎকর্তৃক পরিচালিত। এদেশের অন্যান্য অর্থাৎ রাজনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি সমিতি ও সম্মিলনের তুলনায় এই সম্মিলনের বিশেষত্ব এই যে এখানকার চেষ্টা ও উদ্যম শুধু আলোচনায় ও বক্তৃতাতেই পর্য্যবসিত হয় না। এখানে যাঁহারা আলোচনা বা বক্তৃতা করেন, তাঁহাদেরই কায করিতে হয়। "আত্মবশই সুখম্" এই মহাবাক্যের প্রকৃত মর্ম্ম নব্য বাঙ্গালী ঠিক্ কোন্ সময়ে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন বলিতে পারি না। তবে ইহা নিশ্চিত, বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদ্-সংস্থাপন এই সত্যটীর উপলব্ধির একটা প্রথম ও প্রধান ফল।

বৎসর বৎসরই সরস্বতী পূজা দেখিয়া আসিতেছি, কিন্তু বিগত বাসন্তী পঞ্চমীর সময়ে ভাগলপুরের সাহিত্য সম্মিলন ক্ষেত্রে যে মূর্ত্তিতে বা দেখা দিয়াছিলেন তাহা বস্তুতঃই প্রাণোন্মাদ কারিণী।

কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিজ্ঞানাচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রত্নতত্ত্ববিৎ শরচ্চন্দ্র দাস ও ইতিহাসাচার্য

যদুনাথ সরকার প্রভৃতি মহারথী হইতে আমাদের ন্যায় সামান্য তত্ত্বজিজ্ঞাসুজন মাতৃচরণে ভক্তি পুষ্পাগুলি প্রদান মানসে জ্ঞানপিপাসী বৌদ্ধ শ্রমণ পদরেণুপূত প্রাচীন অঙ্গদেশের প্রধান নগরীতে সমবেত হইয়াছিলেন। সকলেই কর্ম্মী, মাতৃভাষার দারিদ্র্য বিমোচনে ব্রতী।

সম্মিলনের দ্বিতীয় দিবস প্রাতে আচার্য্য ত্রিবেদী মহাশয় তাঁহার ওজস্বিনী ও প্রাণস্পর্শিনী ভাষায় বর্ণনা করিলেন, সাহিত্য সম্পদে আমরা কত দরিদ্র! আমাদের ইতিহাস, আমাদের সমাজতত্ত্ব, আমাদের ভূমি ও বৃক্ষাদির গুণাগুণ বিচার এখনও বার আনা বিদেশীয়ের চিন্তা ও গবেষণার বিষয়ীভূত। যাহাতে এই শোচনীয় অবস্থা অধিককাল না থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিবার নিমিত্তই তিন বৎসর যাবৎ সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠিত। এই দৈন্য মোচনার্থে মায়ের কৃতিসন্তানগণ দৃঢ়সংকল্প। দেখিলাম, পূর্ব্ববর্ত্তী রাজসাহী সম্মিলনীতে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল সেইগুলি বহুল পরিমাণে কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। কেহ কেহ প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্র মন্থন করিয়া বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলন করিতেছেন; কেহ বা স্বদেশের ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহে কেহ এতদ্দেশীয় প্রাচীন রাসায়নিক দ্রব্যাদি বিশ্লেষণে নিযুক্ত, কেহ কেহ মস্তকের আকার ও গঠনাদি পরীক্ষা দ্বারা জাতিতত্ত্বানুসন্ধানে ব্যস্ত। এতদ্ব্যতীত ভাগলপুরবাসীদের যত্নে তথায় একটী কৌতুকাগার খোলা হইয়াছিল। তাহাতে প্রাচীন পুঁথি, মুদ্রা, শিলালিপি, প্রস্তরমূর্ত্তি, মন্দিরাদির চিত্র প্রভৃতি ইতিহাসের উপকরণ এবং বঙ্গীয় জাতীয় বিদ্যালয়ে নির্ম্মিত বিবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি দর্শকবৃন্দের জ্ঞানভাণ্ডার প্রসারণার্থ উন্মুক্ত ছিল। সম্মিলনী সঙ্কল্প করিয়াছেন অচিরে কলিকাতায় একটী মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিবেন। ইহাও আমাদের একটী জাতীয় সম্পত্তি হইবে। এতদ্ব্যতীত পরিষদ শিল্পশিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিবেন।

ইহাতে কাহার মনে আশার সঞ্চার না হয়? সুধীবর বকল্ (Buckle) তদীয় সুবিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে ফরাশি জাতির স্বাধীন চিন্তা প্রবাহের যে একখানি সুন্দর, উজ্জ্বল আলেখ্য প্রদান করিয়াছেন, মনে হয়, এদেশের ইতিহাসেও অনতিকাল মধ্যেই তদ্রূপ অথবা তদপেক্ষাও উজ্জ্বলতর অথচ শান্তিপ্রদ একখানি চিত্র দেখিতে পাইব। অর্দ্ধ শতাব্দী অতীত হয় নাই একদিন বঙ্কিমবাবু বাঙ্গালীর অতীত ইতিহাস সমালোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—যে সমস্তগুণে জাতি গঠিত হয় বাঙ্গালীর সেই সবগুণ কখনও ছিল না। কিন্তু—

"যখন বাঙ্গালী মাত্রেরই হৃদয়ে সেই অভিলাষের বেগ এরূপ গুরুতর হইবে যে, সকল বাঙ্গালীই তজ্জন্য আলস্য, সুখ তুচ্ছবোধ করিবে, তখন উদ্যমের সঙ্গে ঐক্য মিলিত হইবে। * *

'যদি এই বেগবৎ অভিলাষ কিছুকাল স্থায়ী হয়, তবে অধ্যবসায় জন্মিবে।

'বাঙ্গালীর এরূপ মানসিক অবস্থা যে কখন ঘটিবে না, এ কথা বলিতে পারা যায় না। যে কোন সময়ে ঘটিতে পারে।"

ভাগলপুরের বিগত সাহিত্য সম্মিলন যিনি দেখিয়াছেন—তিনিই বলিবেন—বঙ্কিমবাবুর ভবিষ্যদ্বাণী আজ সফল।

শ্রীসতীশচন্দ্র দাস।

সমালোচনা ও প্রাপ্তি স্বীকার।

নকুড়বাবু। (নূতন নক্সা) শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত। পশুপতি প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু দ্বারা মুদ্রিত। কলিকাতা—বহুবাজার ৭নং পঞ্চাননতলা লেন হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আট আনা। গ্রন্থকার 'ভূমিকা'তে লিখিয়াছেন, 'এ বহি নাটক নহে, নক্সা মাত্র' এবং

আরো বলিয়াছেন যে তিনি 'সখ্' করিয়া আমোদের জন্য এই বহি লেখেন নাই। বড়ই 'মনঃকষ্টে' লিখিয়াছেন। তাঁহার মনোকষ্ট বাড়াইবার আশঙ্কায় আমরা ইহার সমালোচনা হইতে বিরত হইলাম। তবে একটি কথা বলিয়া রাখি, পল্লীগ্রামে বাস করিলেই দেবচরিত্র এবং সহরে বাস করিলেই পশুচরিত্র হয়—এমন অদ্ভুত ও বীভৎস ধারণা সমর্থন যোগ্য নহে। এই কুসংস্কার লইয়া বিস্তর গ্রন্থকার মাথা ঘামাইতেছেন দেখিয়া, প্রকৃতই দুঃখ হয়।

দময়ন্তী। (কথাগ্রন্থ) শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিবৃত। প্রাপ্তিস্থান চাটার্জ্জি ব্রাদার্স, ১৪৪নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন আনা মাত্র। বালিকাদিগের জন্য এই গ্রন্থখানি বিরচিত হইয়াছে। লেখকের উদ্দেশ্য সাধু। এ শ্রেণীর গ্রন্থের বহুলপ্রচার সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়। লেখক বেশ হৃদয় দিয়া কাহিনীটি লিখিয়াছেন। তবে ভাষা তেমন সরল হয় নাই। আরো একটি কথা, এ শ্রেণীর গ্রন্থের ছাপা কাগজ প্রভৃতি একটু নয়নাভিরাম হইলে পাঠকপাঠিকাদিগের পক্ষে অধিকতর আদরণীয় হয়। আশা করি, দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থকার ছোটখাট ত্রুটিগুলির সংস্কার করিবেন।

ঋণ-পরিশোধ। (উপন্যাস) শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত এম-এ প্রণীত। সিটিবুক সোসাইটি, ৬৪নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। কমলা প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য দেড় টাকা মাত্র। উপন্যাসখানি ৩৮০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইয়াছে। পাশ্চাত্য ভাবমুগ্ধ ধনী ঘনশ্যাম—পল্লীযুবকের সহিত বিবাহিতা বালিকা কন্যার বিবাহ নামঞ্জুর করিয়া পিতার মৃত্যুর পর কন্যাকে কলিকাতায় লইয়া আসেন ও পাশ্চাত্যধরণে তাহার চরিত্রগঠনের চেষ্টা করেন। এমন কি, কন্যার আবার বিবাহ দিবারও আয়োজন করেন। পরে, ঘটনাচক্রে তাঁহার চৈতন্যোদয় হইলে, তিনি কন্যাকে জামাতার হস্তে প্রদান করেন। গ্রন্থকারের কেণাইয়া বলিবার ক্ষমতা আছে। এত বড় উপন্যাসখানি অসাবধানতা ও অস্বাভাবিকতার দোষে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ভাষাটুকু মন্দ নহে। কয়েকটি বিষম ত্রুটির উল্লেখ করিতেছি। গ্রন্থকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিতে ভূষিত, সুতরাং আমাদিগের আশা তিনি সেগুলি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। প্রথমতঃ, ছোয়াছুঁয়ি লইয়া পশ্চিমে সন্ন্যাসীদ্বয়ের ছুটাছুটিটুকু মানিয়া লইলেও, কলিকাতায় এই আইন-পুলিশের দিন আনন্দাশ্রমের বীভৎস অবতারণা একান্ত উদ্ভট ও অস্বাভাবিক। 'গুপ্তকথার' যুগ গিয়াছে, সে কথাটি গ্রন্থকার বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছেন। তদ্ভিন্ন এলাহাবাদের মত বড় ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে সাহেবী পরিচ্ছদধারী এবং প্রথম শ্রেণীর যাত্রী ঘনশ্যাম ও বিলাত-প্রত্যাগত হিরণের সম্মুখেই নব্যবেশধারিণী ঘনশ্যাম-কন্যা গৌরী (ওরফে, এমা) ও তৎসহচরী রঙ্গিণীর প্রতি মাতাল গার্ডের অপমান-সূচক বিদ্রূপাদির অবতারণা নিতান্তই সৃষ্টিছাড়া। উপন্যাসখানিতে এই আতিশয্য-দোষ একাধিক স্থানেই আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। গোঁড়ামি সকল বিষয়েই, বিশেষতঃ, কলা-সাহিত্যে সর্ব্বনাশের কারণ। আরো দুইট ত্রুটি, অতিরিক্ত ইংরাজী কথাবার্ত্তা (তার অনুবাদ থাকা সত্ত্বেও) এবং পদা-ভৃত্যের সুদীর্ঘ প্রাদেশিক বক্তৃতা—ইহাতে বহুস্থলেই রসভঙ্গ হইয়াছে। গ্রন্থকার ভবিষ্যতে চরিত্র-চিত্রাঙ্কনে সংযম অবলম্বন করিবেন—সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে সৃষ্ট চরিত্রগুলি মাটি হইয়া যায়, এটুকু মনে রাখিয়া উপন্যাস রচনা করিবেন। উপন্যাসবর্ণিত কয়েকটি চরিত্রের আদর্শ উচ্চ কিন্তু গ্রন্থকারের একদেশদর্শিতা-বশতঃ তাহা নিতান্তই ব্যর্থ হইয়া পড়িয়াছে।

সরল চণ্ডী। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত এম-এ ও শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার প্রণীত। বঙ্গীয় সাহিত্য-প্রচার সমিতি হইতে শ্রীত্রিপুরানন্দ সেন বি, এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য বার আনা মাত্র। গ্রন্থখানি মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর সরল ও সহজ সংস্করণ। গ্রন্থখানির ছাপা, বাঁধাই প্রভৃতি উৎকৃষ্ট এবং ইহাতে পনেরো খানি চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অধিকাংশ চিত্রই বেশ নয়নাভিরাম। বালকবালিকাদিগের জন্য রূপকথার ভাষায় গ্রন্থখানি লিখিত। এই

ধরণের বহু প্রয়োজনীয় গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকারদ্বয় সমগ্র দেশের ধন্যবাদার্হ। তবে তাঁহাদিগের একটি ত্রুটি—ভ.ষার অত্যধিক প্রাদেশিকতা। বাঁধাই ছাপা প্রভৃতির তুলনায়, পুস্তকের মূল্য সুলভ হইয়াছে।

খোকাখুকুর খেলা। শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার প্রণীত। কলিকাতা ৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৷৶৹ দশ আনা। বহি খানিতে ছেলেমেয়েদের উপযোগী কতকগুলি কবিতা ও ছড়া সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বহুবিধ রঙ্গীন্ চিত্রে ও সুন্দর কাগজে পরিষ্কার ছাপা এই বহিখানি পাইয়া ছেলেমেয়েরা যে আনন্দে উৎফুল্ল হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে ছড়া গুলির ভাষা আরও একটু সহজ সরল হইলে ভাল হইত।

চিত্ররেখা। সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। কলিকাতা, ৪৭ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, বাণী প্রেসে মুদ্রিত। প্রকাশক, শ্রীবগলারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, ৬৬ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট। মূল্য আট আনা। 'চিত্ররেখা, ছয়টি গল্পের সমষ্টি! সেগুলি ছোট এবং সুন্দর। সেগুলির মধ্যে কোন আড়ম্বর নাই. অস্বাভাবিকতা নাই। বাঙালীর ঘরের সুখ দুঃখের নিখুঁত ছবি, ভাষা সুন্দর প্রাঞ্জল। ছোট গল্পের রচনায় সুধীন্দ্রনাথ সিদ্ধহস্ত। বর্ণিত চিত্রগুলি যেন সজীব। "পরিণাম" ও "পিতা ও পুত্র" গল্প দুইটির মত উৎকৃষ্ট গল্প বহুদিন পাঠ করি নাই। গ্রন্থের ছাপা—মলাট সুন্দর, নয়নাভিরাম;—আকারেও অভিনবত্ব আছে, পকেটে অনায়াসে রক্ষা করা যায়।

বিনিময়। (নাটক) মহাকবি সেক্সপীয়রের measure for measure নামক নাটকের গল্পাংশের ছায়া অবলম্বনে। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত। ভারতমিহির যন্ত্রে মুদ্রিত। গ্রন্থকার যদি মহাকবির কণ্ঠ চাপিয়া হত্যা করিতেন তাহা হইলেও অধিকতর নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পাইত না।

রাবেয়া। (নাটক) শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত। ভারতমিহির যন্ত্রে মুদ্রিত। প্রকাশক শ্রীবিনোদবিহারী বিশ্বাস, নদীয়া। মূল্য এক টাকামাত্র। গ্রন্থকার মুখবন্ধে লিখিয়াছেন, রাবেয়া ঐতিহাসিক মহিলা। তবে তাঁহার বর্ত্তমান নাটকের সহিত ইতিহাসসম্বন্ধ অতিঅল্প। লেখকের গদ্যভাষাটুকু মিষ্ট—সরস, নাটক রচনার উপযোগী। ঘটনাটি সুকৌশলে গ্রথিত, তাহাতে একটু বৈচিত্র্য আছে। তবে চরিত্রগুলি সম্যক বিকাশ লাভ করে নাই। কোনটি পুঁথিগত আদর্শের প্রতিচ্ছায়ার অর্থাৎ সদগুণের টিকিট-মারা মাটির পুতুল—কোনটি বা আতিশয্য দোষে মাটি। সুদীর্ঘ বক্তৃতায় এবং অনাবশ্যক দৃশ্য যোজনায় স্থানে স্থানে রসভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। অথচ প্লটটুকু মন্দ নহে। মোটের উপর রচনাভঙ্গি আশাপ্রদ। লেখক কবিতা ছাড়িয়া গদ্যেরই সাধনা করুন। ছাপা ও কাগজ পরিপাটি।

সাবিত্রী। (নাটক) শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন প্রণীত। নব্যভারত প্রেসে মুদ্রিত। প্রকাশক, শ্রীমহেন্দ্রমোহন সেন, সদর ঘাট, চট্টগ্রাম। মূল্য বাঁধাই ১৷৹ আবাঁধাই ১৲। নাটক খানিতে লেখকের কবিত্ব শক্তি ও মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। পৌরাণিককাহিনী হিসাবেও এখানি সুখপাঠ্য। কিন্তু অতিরিক্ত ভাবপ্রবণতা ও সুদীর্ঘ একঘেয়ে বক্তৃতায় বহুস্থলেই রসভঙ্গ হইয়াছে। সর্ব্বত্রই লেখকের একটা বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যা দিবার ব্যর্থ প্রয়াস লক্ষিত হয়। শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

প্রাপ্তি স্বীকার।

আমরা ধন্যবাদসহকারে কবিরাজ শ্রীযুক্ত এস, পি, সেনের এক শিশি সুরমা তৈল এবং দুই শিশি সেণ্টের প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি। দেশের প্রস্তুত এই সকল সুগন্ধি দ্রব্য দেখিলে স্বতঃই আনন্দ জন্মে। সুরমা তৈল বিলাতী উৎকৃষ্ট কেশতৈল হইতে কোন অংশেই নিকৃষ্ট নহে। সেণ্ট দুইটিও মনোহর গন্ধযুক্ত।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৪৪, ভক্ত রাজিরাম রোড হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

রাজকুমার ও শক্তিময়ী—নদীতীরে (ফুলের মালা)

শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার অঙ্কিত চিত্র হইতে

উ, রায় কর্তৃক ব্লক] [কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত

ভারতী

৩৪শ বর্ষ]　　শ্রাবণ, ১৩১৭　　[৪র্থ সংখ্যা

ভারত ও বিলাত।

বিলাতপ্রবাসীর পত্র।

১

দশ বৎসর পরে।

এ আমার প্রথম বিলাত-প্রবাস নহে। দশ বৎসর পূর্ব্বে, আর একবার এদেশে দুই বৎসরকাল কাটাইয়া গিয়াছি। কিন্তু সেকালে আর একালে বিস্তর প্রভেদ। আমার ভিতরে কত প্রভেদ, এদের বাহিরেই বা কত প্রভেদ!

এক দিন, সে নিতান্ত বহুদিনের কথাও নয়—ইংরেজি-নবিশ ভারতবাসীর নিকট বিলাত পুণ্যভূমি ছিল। আমরা তখন নিজে-দের সাহেব ক'রে তুলিবার জন্ত ও ভারতকে বিলাতে পরিণত করিবার জন্ত নিরতিশয় ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিলাম। তখন বিলাতের সবই আমাদের চক্ষে ভাল ছিল, আর আমাদের সকলই মন্দ ছিল। ইংরেজের সমকক্ষ হইবার আশায় তখন আমরা বাঙলা বুলি ভুলিয়া ইংরেজি স্ল্যাঙ শিখিতে লাগিলাম, কুশাসন, গালিচা, সতরঞ্চ ছাড়িয়া টেবিল-চেয়ার ধরিলাম; ধুতি চাদর ছাড়িয়া হাট কোট পরিলাম; গৃহিণীকে গাউন পরাইয়া ঘরের বাহির করিলাম; সর্ব্ববিষয়ে ইংরেজ সাজিবার জন্ত ব্যস্ত হইলাম। পোষাকে ও বুলিতে, চাল ও চলনে যে কালো সাদা হয় না, জীত বিজেতা হয় না, দাস প্রভু হয় না, এ জ্ঞান তখনো জন্মায় নাই। যখন ইংরেজের কৃপায় সে জ্ঞান জন্মাইল, তখন আমরা একেবারে উল্টা সুর ভাঁজিতে আরম্ভ করিলাম। এক সময় যেমন বিলাতের সবই ভাল ও স্বদেশের সবই মন্দ ছিল, এখন তেমনি স্বদেশের সবই ভাল, আর বিলাতের সবই মন্দ হইয়া উঠিল। অজ্ঞ ইংরেজ ভারতবর্ষকে যে চক্ষে দেখে, এখন বিজ্ঞতাভিমানী ভারতবাসীও ইংলণ্ডকে সেইভাবে দেখিতে আরম্ভ করিলেন। ইংরেজের চক্ষে আমাদের সদাচার অশ্লীলতা, আমাদের সভ্যতা বর্ব্বরতা, আমাদের সৌজন্ত কাপুরুষতা, আমাদের ভক্তি অতিশয়োক্তি, আমাদের ধর্ম্ম কুসংস্কার, আমাদের দেশচর্য্যা বিদ্রোহ। প্রতিক্রিয়ার মুখে, ভারতবাসীও ইংরেজের সকল বিষয়ই এইরূপ মন্দ চক্ষে দেখিতে লাগিল। সে ভাব এখনো নষ্ট হয় নাই; কত দিনে যে নষ্ট হইবে, কত দিনে যে ইংরেজ ও ভারতবাসী পরস্পরে পরস্পরকে সত্যভাবে দেখিতে ও বুঝিতে পারিবে, ভগবান জানেন!

২। দাঁড়ি-পাল্লা।

কোনো জিনিষের ওজন করিতে গেলে, সকলের আগে দাঁড়িপাল্লাটা ঠিক করিয়া লইতে হয়। অজ্ঞ ইংরেজ কথনো সাচ্চা দাঁড়িপাল্লা দিয়া ভারতের সভ্যতা ও সাধনার ওজন করিতে চায় নাই। প্রত্যেক জিনিসেরই একটা নিজস্ব মাপকাটী আছে। ইংরেজ আমাদের মাপকাটী দিয়া আমাদের মাপ করিতে পারে নাই, তাই পদে পদে ভুল করিয়াছে। আমরাও এ পর্য্যন্ত তার নিজের মাপকাটী দিয়া ইংরেজের সভ্যতা ও সাধনার ওজন করিতে যাই নাই, তাই পদে পদে ভুল বুঝিয়াছি। ভাল বা মন্দ এ দুনিয়ায় কারোই একচেটিয়া নয়। সর্ব্বত্রই ভালোর সঙ্গে মন্দ ও মন্দর সঙ্গে ভাল মাখামাখি হইয়া আছে। আলো ও আঁধারের ন্যায়, ভালমন্দ, উৎকর্ষাপকর্ষ, দুনিয়া জুড়িয়া রহিয়াছে। অকৃতবুদ্ধি লোকে ইহা তলাইয়া দেখে না। যারা ইহা দেখে ও বোঝে, তারাই সত্য দেখে ও সত্য বোঝে। ইংরেজ আপনার ফুট-ইঞ্চির সরু ফিতা হাতে লইয়া, ভারতের বিশাল সভ্যতা ও সাধনার কালি করিতে যায়, তাই ভারতের ভালকেও ধরিতে পারে না, মন্দকেও বুঝিতে পারে না। আর আমরাও ভারতের তুলাদণ্ডে ইংরেজের তোল করিতে যাইয়া, তারই মত ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হই। আমরা যে দুই স্বতন্ত্র জাতি, দুই আলাহিদা ছাঁচে গড়া, দুই বিভিন্ন সভ্যতা ও সাধনার উত্তরাধিকারী, এ মোটা কথাটা ভুলিয়া গেলে চলিবে কেন?

৩। হিন্দুর জাতি বিচার।

হিন্দু কথনো ইতিপূর্ব্বে এ মোটা কথাটা ভুলিয়া যায় নাই। আজই যে হিন্দু দুনিয়ার মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছে, এমন নয়। প্রাচীনকালে, আধুনিক সভ্যতা ও সাধনার জন্মের বহু যুগ পূর্ব্বে, হিন্দু বহু দেশের, বহু জাতির বহুবিধ সভ্যতা ও সাধনার সংস্পর্শে আসিয়াছিল। ক্ষুদ্র বৃহৎ অসংখ্য স্রোতস্বিনী যেমন গঙ্গা-যমুনার স্রোতে আপনাকে মিশাইয়া দিয়া, অনন্ত সাগরোদ্দেশে গিয়াছে; সেইরূপ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, পরিণত ও অপরিণত, বহু সাধনা ও বহু সভ্যতা, হিন্দুর বিশাল সভ্যতা ও সাধনার অঙ্গীভূত হইয়া, হিন্দুর সনাতন লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। তখন হিন্দু আপনাকে চিনিত; আর আপনাকে চিনিত বলিয়াই, অপরকেও চিনিতে পারিত। এ জন্য হিন্দু চিরদিনই জাতিগত স্বাতন্ত্র্যের পক্ষপাতী। এমন কি হিন্দুর প্রচলিত জাতিভেদের মূলেও এই প্রাচীন পক্ষপাতিত্বই বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু আজিকার দুর্দ্দিনে এ জাতিভেদ যে সংকীর্ণ সংস্কারে পরিণত হইয়াছে, এক দিন তাহা হয় নাই। এজন্যই, হিন্দু আপনার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াও, আপনার বিশাল অঙ্কে বহু জাতির, বহু বর্ণের, বহু সমাজের, বহু সভ্যতার সমাবেশ করিতে পারিয়াছিল। তাই হিন্দু সমাজে বহু সমাজের স্থান হইয়াছে, হিন্দুধর্ম্মে বহু ধর্ম্মের সমন্বয় হইয়াছে। হিন্দু সাধনায় বহু পন্থা অবলম্বিত হইয়াছে। এমন সার্ব্বভৌমিক জাতীয় আদর্শ জগতের আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ইংরেজি শিক্ষার কুহকে পড়িয়া

এই সনাতন হিন্দুত্বভ্রষ্ট হইয়া, আমরা মাঝে কিছু দিনের জন্য, এই জাতিতত্ত্ব ভুলিয়া গিয়াছিলাম। বৈষম্যেই যে সাম্যের প্রতিষ্ঠা, এ মহা সত্য মনে ছিল না। তাই আত্মবিস্মৃত হইয়া ইংরেজের সমান হইবার লালসায় নিজেদের ইংরেজের মাপে মাপিতে ও ইংরেজের ছাঁচে গড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। আবার, ইংরেজ নিজে যখন আমাদের এ সাধে বাদ সাধিতে আরম্ভ করিল, তখন হতাশের তীব্র বিরক্তি সহকারে, সে পথ পরিত্যাগ করিয়া, নিজেদের মাপকাটিতে ইংরেজের সভ্যতা ও সাধনার পরিমাণ করিতে যাইয়া, তার অযথা নিন্দাবাদে নিযুক্ত হইয়াছিলাম।

৪। জাতিত্ব ও মনুষ্যত্ব।

একদিন আমরা মনুষ্যত্বের নামে,জাতিত্বের প্রতিবাদ আরম্ভ করি। সকলেই মানুষ, তখন আর এ জাতি, ও জাতি, এ অলীক ভেদবিচার কেন? মানুষের ভূমিতে এ অভেদবুদ্ধির প্রতিষ্ঠা, হিন্দু সাধনায় পাওয়া যায় না। আমরা অভেদ বলিতে সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদৃষ্টি বুঝিয়া থাকি। "সর্ব্বংখলু ব্রহ্মময়ং ইদং জগৎ"—এই নিখিল জগৎ ব্রহ্মময়, ইহাই আমাদের অভেদজ্ঞানের মূল সূত্র। "ঈশাবাস্যং ইদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চজগত্যাং জগৎ"—ঈশোপনিষদের এই সনাতন শ্রুতি আমাদের অভেদ-সাধনার মূল মন্ত্র। এ অভেদ পারমার্থিক, ব্যবহারিক নহে। এ অভেদের অর্থ সকলেই মানুষ, অতএব সমান ইহা নহে; কিন্তু সকলই ব্রহ্ম। ব্রহ্মদৃষ্টি যেমন অভেদ, মনুষ্য দৃষ্টিতে তেমনি ভেদ, উভয়ই সত্য। ব্যবহারিক জগতে, ব্যবহারিক জ্ঞানে, ভেদই সত্য; এখানে অভেদ কোথায়? ইন্দ্রিয়গ্রাম অভেদ নয়, নিত্য ভেদই প্রতিষ্ঠিত করিতেছে। বর্ণ ও আকার, ভেদ চক্ষুর প্রাণ। এ ভেদ না থাকিলে রূপের জ্ঞান অসম্ভব হইত। সুর ও লয়ভেদ কর্ণের প্রাণ; এ ভেদ না থাকিলে শ্রবণ অসম্ভব হইত। শীতোষ্ণভেদে স্পর্শের প্রতিষ্ঠা। তিক্ত কষায়াদি ভেদেই আস্বাদনের প্রতিষ্ঠা। সকল ইন্দ্রিয়ই ভেদের উপরে প্রতিষ্ঠিত। অভেদএকাকারে ইন্দ্রিয়ের কার্য্য রুদ্ধ; ইন্দ্রিয়ের সহায় বিনা বিষয়জ্ঞান লাভ অসাধ্য। এই বিষয়জ্ঞানেই ব্যবহারিক জগতের প্রতিষ্ঠা। এরাজ্যে ভেদই প্রবল। ভেদই এ রাজ্যের স্বভাব। এখানে অভেদ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস, শূন্যে সুবিশাল অট্টালিকা নির্ম্মাণের ন্যায় অলীক কল্পনা মাত্র। অথচ য়ুরোপীয় সাধক এই একান্ত অসম্ভব সাধনায় নিযুক্ত হইয়াই ব্যবহারিক জগতে এক অলীক সাম্যের প্রতিষ্ঠা করিতে বসিয়াছে। আর এই অলীক সাম্যবাদই কল্পিত মনুষ্যত্বের নামে, জাতিত্বের বা জাতীয়তার প্রত্যক্ষ সত্যকে ফুৎকারে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে।

৫।

য়ুরোপীয় সাম্যবাদ।

য়ুরোপীয়েরা আমাদের সমাজে ছোটবড়র বিষম বৈষম্যে পীড়িত হইয়া, ইতর জনকে অভিজাতবর্গের, দরিদ্রকে ধনীর, প্রজাসাধারণকে রাজপুরুষদিগের স্বেচ্ছাচার শাসন ও পীড়ন হইতে মুক্ত করিবার জন্য সাম্য,

মৈত্রী, স্বাধীনতার আদর্শ প্রচারে প্রবৃত্ত হন। ইহাই ফরাসীস-বিপ্লবের মূল আদর্শ। এই আদর্শের সঙ্গে ফরাসীস্ সমাজ ও ফরাসীস্ রাষ্ট্রতন্ত্রের একটা সত্য ও স্বাভাবিক সম্বন্ধ ছিল। য়ুরোপীয় সমাজের শ্রেষ্ঠজনেরা ইতর সাধারণের সঙ্গে যে অমানুষিক ব্যবহার করিতেন, তাহারই প্রতিবাদ স্বরূপ এই সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা হয়। নানা কারণে, বহুদিন হইতে, য়ুরোপীয় মনুষ্যত্বের সম্মান ও সমাদর নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ল্যাটিন প্রচারক ও পুরোহিতদিগের প্রভাবে খৃষ্টধর্ম্ম মধ্যযুগে যে আকার ধারণ করে, তাহাতে মানুষকে বড়ই হীন করিয়া ফেলে। পাপ-পুণ্যগ্রথিত এই প্রকৃতি, সুখদুঃখময় এই মানবজীবন, প্রথম নরদম্পতির পাপের ফল, পাপেই মানুষের জন্ম। পাপেই মানুষের স্থিতি। পাপেই সহজ মানুষের বৃদ্ধি ও পরিণতি। মানব প্রকৃতিকে এরূপ চক্ষে যাঁরা দেখে, মানবের প্রতি, মানব বলিয়া যে সম্মান ও সমাদর, তাহাদের চিত্তে ও চরিত্রে, ইহার প্রসার ও প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। রোগীকে সুস্থলোকে যেমন অনুকম্পা করে, সাধুজনেরা প্রাকৃতজনকে সেরূপ অনুকম্পা করিতে পারেন। আর্ত্তের দুঃখমোচনের জন্য মানব-চিত্তে যে স্বাভাবিক সহানুভূতির উদ্রেক হয়, এক্ষেত্রে সে সহানুভূতি ও সে লোক-হিতৈষারও উদ্ভব সম্ভব—কিন্তু মানুষকে মানুষ বলিয়া শ্রদ্ধা ও সম্মান করা অসম্ভব। ঈশ্বরের নরদেহ ধারণ ও অবতার স্বীকার করিয়াও, ল্যাটীন্ খৃষ্টবাদ, এজন্য য়ুরোপে মানুষের মানুষ বলিয়াই যে শ্রদ্ধা ও সম্মান, কখনো ইহা সমাজের আচার ব্যবহারে, জনমণ্ডলীর চিত্তে ও চরিত্রে, প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই। এজন্য য়ুরোপে অভিজাতবর্গ ইতর জনমণ্ডলীকে সর্ব্বদা পশুর মত ব্যবহার করিয়াছে! সামাজিক পদমর্য্যাদার স্বাভাবিক বৈষম্য হইতে, সামাজিক অত্যাচার ও উৎপীড়নের উৎপত্তি হইয়াছে। জনমণ্ডলী যখন এই অত্যাচার ও উৎপীড়নের হস্ত হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া দাঁড়াইল, তখন মনুষ্যত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিল। সাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টায়, য়ুরোপ ধনীর ধন লুণ্ঠন করিতে লাগিল, অভিজাতের মর্য্যাদা হরণ করিতে লাগিল, জ্ঞানীর জ্ঞানকে, ধার্ম্মিকের ধর্ম্মকে, জগতে যেখানে যা কিছু শ্রেষ্ঠ, যা কিছু উচ্চ, যা কিছু অসাধারণ, তৎসমুদয়কে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একাকার করিতে চাহিল। এরূপ সাম্য অসত্য, অস্বাভাবিক। এসাম্যের প্রতিষ্ঠা দুনিয়ায় অসম্ভব! ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম লোকক্ষয়, সমাজের উচ্ছেদ-অরাজকতা। বৈষম্য, ইতর বিশেষ, ছোটবড়, দুর্ব্বল সবল,—জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ, ব্যবহারিক জগতে স্বতঃ সিদ্ধ। এ বৈষম্যের উচ্ছেদ অসম্ভব ও অসাধ্য। হিন্দু এ অসাধ্য সাধনে কখনো নিযুক্ত হয় নাই।

৬। হিন্দুর সাম্যবাদ।

অথচ হিন্দু সাম্যবাদী। হিন্দুর সাম্যবাদ প্রাচীন বস্তু। যেদিন হিন্দু বহুর মধ্যে এককে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে, যেদিন হিন্দু এই মহান একত্বের সন্ধান পাইয়া,

একং সদ্ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি—

বলিয়া জগতের বহুদেববাদকে নিঃশেষ নিরস্ত করিয়াছিল, সেই দিনই এই উদার সাম্য-বাদের সূচনা হয়। যেদিন ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি, "শ্বেতকেতো তত্ত্বমসি" বলিয়া, জীবব্রহ্মের ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেই দিনই এই সাম্যবাদ হিন্দু সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়। হিন্দু এই সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া, এই এক মূল তত্ত্বেরই সাধনা করিতেছে। হিন্দুর এই সাম্যবাদ ব্যবহারিক জগতের অপরিহার্য্য বৈষম্যকে বিনাশ করিয়া প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। পরন্তু এই বৈষম্যকে স্বীকার করিয়া, এই বৈষম্যকে মান্য করিয়া, এই বৈষম্যকে অধ্যাত্মশক্তিকে অতিক্রম করিয়া, প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ প্রতিদিন, ত্রিসন্ধ্যাকালে, এই সাম্যের সাধনা করেন।

অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি
ব্রহ্মাস্মি ন চ শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽস্মি
নিত্যমুক্ত স্বভাববান্॥

আমি দেবতা, অন্য কেহ নই; আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ, নিত্যমুক্ত স্বভাববান্। এ কেবল ব্রাহ্মণ সম্বন্ধেই যে সত্য, তাহা নহে। পরমার্থতঃ ব্রাহ্মণ সমুদ্রের ভেদ নাই। পরমার্থ দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল সকলেই সমান।

বিদ্যা বিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥

আত্মজ্ঞানী পণ্ডিতগণ বিদ্যাবিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তি, কুকুর এবং চণ্ডালকে সমভাবে দর্শন করেন।

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥

যোগযুক্ত হইয়া যিনি সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি লাভ করেন, তিনি আমাকে সর্ব্বভূতে, ও সর্ব্বভূতকে আত্মাতে অবস্থিত দর্শন করেন। যিনি আমাকে সকলে প্রত্যক্ষ করেন, ও সকলকে আমাতে প্রত্যক্ষ করেন, আমি কখনো তাঁহার অদৃশ্য হই না, তিনিও কখনো আমার অদৃশ্য হয়েন না।

এই পারমার্থিক আত্মতত্ত্বের উপরেই হিন্দুর সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত। এজন্য হিন্দু সর্ব্বপ্রকারের ব্যবহারিক ও সামাজিক ভেদ গ্রাহ্য করিয়াও, কখনো জীবের প্রতি, মানুষের প্রতি, একান্ত অশ্রদ্ধাবান হইতে পারে নাই। মানুষকে মানুষ বলিয়া নহে, মানুষকে দেবতা বলিয়া, হিন্দু সর্ব্বদাই সম্মান করিয়াছে।

৭। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা।

যেমন য়ুরোপের সাম্য, হিন্দুর সাম্য নহে; সেইরূপ য়ুরোপের মৈত্রীও আমাদের মৈত্রী নহে। য়ুরোপের অনধীনতা বা ইণ্ডিপেণ্ডেন্স্‌ও আমাদের স্বাধীনতা নহে। ফলতঃ ফরাসী বিপ্লবের ফ্রেটর্নিটিকে ভারতের সনাতন মৈত্রী বলিয়া প্রচার করা নিতান্তই অসঙ্গত। মৈত্রী সর্ব্বভূতে স্নেহ, সর্ব্বজীবে আত্মবোধ। ফ্রেটর্নিটী ভ্রাতৃভাব বা ভ্রাতৃত্ব। কিন্তু ইহাও আমাদের ভ্রাতৃ-সম্বন্ধ নহে। আমাদের ভ্রাতৃ-সম্বন্ধে জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ ভেদ আছে। একদিকে স্নেহ, অন্যদিকে ভক্তির উপরে এ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত। বিলাতী সাম্যে বা ইকুয়ালিটীতে ব্যষ্টিভাব বা ইণ্ডিভিডুয়ালিজ্‌মই (individualism) প্রবল। এই সাম্য মানুষকে

একান্ত একাকিত্বে স্থাপিত করে। ব্যক্তিগত অধিকারের উপর এই সাম্য বা ইকুয়ালিটী প্রতিষ্ঠিত। ব্যক্তিগত অধিকার ও স্বাতন্ত্র্যের এই বিচ্ছিন্নতাকে সংযত করিয়া সমষ্টির সঙ্গে রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ স্থাপনই য়ুরোপীয় ফ্রেটরনিটীর উদ্দেশ্য। য়ুরোপের এই কল্পিত ফ্রেটর্নিটী আমাদের সনাতন মৈত্রী নহে। আর য়ুরোপের লিবার্টি এবং আমাদের স্বাধীনতায়ও আকাশপাতাল প্রভেদ। লিবার্টি, ফ্রিডম, ইণ্ডিপেণ্ডেন্স—(liberty, freedom indipendence) এ সকলই মূলতঃ অভাবাত্মক। স্বাধীনতা ভাবাত্মক। লিবার্টি, অনধীনতা মাত্র। ফ্রিডমে বাধার, ইণ্ডিপেণ্ডেন্সে আনুগত্যের অভাব বোঝায়। এ সকলই অভাবাত্মক। স্বাধীনতা ভাবাত্মক। স্বাধীনতায় অধীনতার একান্ত অভাব বোঝায় না; কিন্তু "স্ব"এর অধীনতা বোঝায়। আমাদের "স্ব" অহং, পর ইদং। আর এই "স্ব", এই অহং বস্তু যে কত বড়, ইহা হিন্দু যেমন বুঝিয়াছিল এমন আর কেহ বোঝে নাই।

এই "স্ব" বস্তু তত্ত্ব-বস্তু। ইহা পরমার্থ পর্য্যায়ভুক্ত। এই "স্ব"এর সঙ্গে বিশ্বের একাত্মতা রহিয়াছে। ইহা কেবল আমার "স্ব" বা তোমার "স্ব" নহে, ইহা বিশ্বের "স্ব"; বিশ্বজনীন বস্তু। ইহা শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব, পরম তত্ত্ব। এই তত্ত্বে আমাদের সাম্য, আমাদের মৈত্রী, আমাদের স্বাধীনতা, আমাদের তৃপ্তি ও মুক্তি সকলই প্রতিষ্ঠিত। ব্যবহারিক জগতে সাম্য অসাধ্য। ব্যবহারিক জগতে বিরোধ নিত্য। আর যেখানে দ্বন্দ্ব, সেখানে সত্য স্বাধীনতাই বা কোথায়? আমাদের সভ্যতা ও সাধনায়, সাম্য স্বাধীনতা, মৈত্রী, এ সকল পারমার্থিক আদর্শ। য়ুরোপে এসকল ব্যবহারিক আদর্শ। য়ুরোপের অর্থে, সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা—আমাদের ছিল না, নাই, হইবে কিনা, জানি না। কিন্তু আমাদের নিজেদের অর্থে, সাম্যও ছিল, মৈত্রীও ছিল, স্বাধীনতাও ছিল। ইহা আমাদের সভ্যতা ও সাধনার অস্থিমজ্জাগত। ইহাই আমাদের লক্ষ্য। ইহাই আমাদের গতি।

৮। য়ুরোপ ও ভারতবর্ষ।

এক সময়ে আমরা একথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তখন আমরা য়ুরোপের মাপে নিজেদের মাপিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু এ মোহ বেশী দিন টিকে নাই। সত্বরেই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়। তখন আমরা ঠিক বিপরীত পন্থা অবলম্বন করিলাম। য়ুরোপের মাপে আমাদের না মাপিয়া, আমাদের মাপে তখন য়ুরোপকে মাপিতে লাগিলাম। এক সময় যেমন য়ুরোপের আদর্শে ভারতের সনাতন সভ্যতা ও সাধনাকে বিচার করিতে যাইয়া, ভারতের সবই লঘু ও হীনতর বলিয়া ভাবিয়াছিলাম, এখন সেইরূপ ভারতের আদর্শে য়ুরোপের সমাজ ও সভ্যতার ওজন করিতে যাইয়া, য়ুরোপের সকল বিষয়ই মন্দ, এই স্থূল সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম। কিন্তু এই উভয় সিদ্ধান্তেরই মূলে ভুল। এ জ্ঞান ক্রমে স্ফুটতর হইতেছে।

এখন আর আমরা য়ুরোপের ওজনে নিজেদের সভ্যতা ও সাধনার ওজন করিতে যাই না। আমাদের আদর্শেই আমাদের বিচার করি। য়ুরোপের তুলনায় আমরা হীন, এ ভাব আমাদের নাই। এ ক্ষোভ একেবারে

বুঝিয়াছে। আমরা এক সময়ে বড় ছিলাম, এখন ছোট হইয়াছি। এ ভাবও যাইতেছে। এ ভাবের মূলেও বিদেশের মোহ প্রচ্ছন্ন ছিল। আমরা য়ুরোপ অপেক্ষা হীন এ জ্ঞান যতই আমাদের আত্মসম্মানে আঘাত করিতেছিল, ততই সে সম্মানকে সজীব রাখিবার চেষ্টায় আমরা প্রবলতর বেগে আমাদের গত বৈভব ও লুপ্ত গৌরবের প্রতিষ্ঠায় নিযুক্ত হই। "তোমরা যখন পর্ব্বতগুহায় বাস করিতে, আম মাংস ভক্ষণ করিতে, প্রস্তরনির্ম্মিত অস্ত্র ব্যবহার করিতে,—তখন আমরা জগতের বরণীয় ছিলাম"—এই বলিয়া বর্ত্তমানের হীনতাকে অতীতের স্মৃতি দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিতে চেষ্টা করি। ফলতঃ যতই বর্ত্তমানের হীনতার দুঃসহ জ্ঞান আমাদিগকে চাপিয়া ধরিত, ততই আমরা উৎসাহসহকারে অতীতের স্মৃতিভস্ম মাখিয়া আস্ফালন করিতাম। ইহাতে যে এই হীনতাকে আরো উজ্জ্বল করিয়া দিত, এ জ্ঞান তখনো জন্মে নাই। এ জ্ঞান এখন জন্মিয়াছে। আর তার সঙ্গে সঙ্গেই নিজেদের আদর্শে নিজেদের বিচার করিবার প্রবৃত্তিও প্রবল হইয়াছে।

হীনতাবোধ ব্যতিরেকে উন্নতির চেষ্টা হয় না। আমরা যে হীন, এ জ্ঞান ক্রমশঃই উজ্জ্বলতর হইতেছে। মধ্যযুগের প্রতিক্রিয়ায় ইহা একরূপ নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এরূপ হীনতার জ্ঞান নূতন ভাবের। পূর্ব্বে য়ুরোপের তুলনায় নিজেদের হীন ভাবিতাম। আজ য়ুরোপের তুলনায় আর নিজেদের কোনো রূপে হীন ভাবি না। দুনিয়ায় এখনো যে আমরা অভিজাত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত—শ্রেষ্ঠ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠজনের সমকক্ষ,—য়ুরোপ—আমেরিকার সমক্ষে যে আমরা উন্নতমস্তকে দণ্ডায়মান হইতে পারি,—এ জ্ঞান এ গৌরব ক্রমশই বাড়িতেছে। এ গৌরবেই আমাদের জাতীয় অভ্যুত্থানের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু ইহারই সঙ্গে সঙ্গে, আমাদের নিজস্ব আদর্শের তুলনায় আমরা যে অতি হীন, এ জ্ঞানও উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইতেছে। আর এই স্বাভাবিক হীনতাবোধের উপরেই আমাদের সর্ব্ববিধ জাতীয় চেষ্টার প্রতিষ্ঠা। এখানেই আমাদের শক্তি এখানেই আমাদের আশা ও ভরসা।

আজ আমরা ভারতকে আর বিলাতের তৌলদণ্ডে তুলিয়া ধরি না; বিলাতকেও ভারতের তুলাদণ্ডে তুলিতে যাই না। এখন আমরা বুঝিয়াছি—

"যার যেই রস সেই সর্ব্বোত্তম।"

কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে একথাও ভুলিয়া যাই নাই যে—

"তটস্থ হইয়া বিচারিলে, আছে তর-তম।"

ভারতের সনাতন সার্ব্বজনীন আদর্শে, তটস্থ হইয়া বিচার করিলে, উচ্চনীচ, ভালমন্দ, সকলেরই স্থান আছে। বিলাতকে ভারতের ওজনে এখন আর মাপিতে যাই না, বিলাতকে বিলাতের ওজনেই মাপিতে আরম্ভ করিয়াছি। এজন্য বিলাত সম্বন্ধে আমাদের মতামতও বিচারসিদ্ধান্ত, পূর্ব্বাপেক্ষা সত্যোপেত ও নিরপেক্ষ হইতেছে, সন্দেহনাই।

৯। সাম্য ও বৈষম্য।

বিলাতের সাম্য ও আমাদের সাম্যে একটা বিশেষ প্রভেদ এই যে, বিলাতী সাম্য বৈষম্যকে বিনাশ করিয়া বৈষম্যের সমাধি-

মন্দিরে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়াছে। ভারতের সাম্য বৈষম্যকে বিনাশ না করিয়া, বৈষম্যকে অতিক্রম করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। আমাদের সাম্য পারমার্থিক। বিলাতী সাম্য ব্যবহারিক। আমাদের সাম্যের আদর্শ একান্ত আধ্যাত্মিক। বিলাতী সাম্যের আদর্শ সামাজিক। সামাজিক সাম্যের পন্থা আত্মপ্রতিষ্ঠা; পারমার্থিক সাম্যের প্রতিষ্ঠা আত্মসংযমে ও আত্মবিলোপে। আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে সাম্যের সন্ধান করিলে, দলাদলি, রোষারোষি, হিংসাদ্বেষ, এ সকল বিষ উদ্গীর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। মানব প্রকৃতিতে একটা অদ্ভুত আকর্ষণ শক্তি আছে। যে যেমন লোক, সচরাচর অপরলোকের সহিত আলাপে আত্মীয়তায় সে আপনার প্রকৃতির অনুরূপ ভাবই তাহাদের মধ্যে জাগাইয়া থাকে। যে পশু হইয়া আমার সম্মুখীন হয় সে অলক্ষিতে আমার অন্তর্নিহিত পশুত্বকে জাগাইয়া তোলে। যে মানুষ হইয়া আমার নিকট আসে, সে আমার মনুষ্যত্বকে প্রবুদ্ধ করে। যে দেবতা হইয়া আসিতে পারে, সে তাহার পবিত্র সংস্পর্শে আমাকে দেবতা করিয়া তোলে। মানব সম্বন্ধের এই অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি প্রভাবে, আত্মপ্রতিষ্ঠা দ্বারা যে সাম্যের প্রতিষ্ঠা করিতে যায়, সে সমাজে সমরানল প্রজ্বলিত করিবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি? অভিমান অভিমানকে জাগায়, হিংসা হিংসাকে জাগায়, খলতা খলতাকে বাড়াইয়া তোলে। বিলাতী সাম্যবাদে সমাজে এই বিষম দ্বন্দ্ব উপস্থিত করিয়াছে। এখানে সকলেই আপনাকে বাড়াইয়া বড় হইতে চাহে। যে নির্ধন সে ধনী হইয়া ধনীর সমকক্ষতা লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র। যে ছোটঘরে জন্মিয়াছে, বড় ঘরের সমকক্ষ হইতে তাহার বাসনা;—ইহাই এখানকার সমাজ যন্ত্রের মূল চালক শক্তি। এই বলবতী বাসনার তাড়নায় সমাজ অবিরত ঘুরিতেছে। যে সমতা ভারতের সনাতন আদর্শ, এ সমাজে তাহার আদর কথঞ্চিৎ হইলেও, স্থান আদৌ নাই।

নির্দ্বন্দ্বস্থ নিত্য সত্যস্থ নির্যোগক্ষেম আত্মবান্—

এ চরিত্র এখানে দুর্লভ কেবল নহে—সর্ব্বত্রই ইহা অতি দুর্লভ,—কিন্তু এখানে একেবারে অসম্ভব। এদেশের লোকে ইহার মাহাত্ম্য কল্পনাতেও গ্রহণ করিতে পারে না। দ্বন্দ্ব নাই, চেষ্টা নাই আক্ষেপ নাই, গতি নাই,—এ অবস্থা এদেশে মৃত্যুর চিহ্ন, জীবিতের লক্ষণ নহে। এক অর্থে ইহা মৃত্যুরই লক্ষণ সন্দেহ নাই। নিশ্চেষ্টতা ও নির্দ্বন্দ্বতা জীবিতের চিহ্ন নয়, সত্য। আমরা সচরাচর যাহাকে জীবন বলি, সেখানে চেষ্টা, দ্বন্দ্ব, সংগ্রাম এসকলের নিত্যলীলাই প্রবল। কিন্তু আমরা যাহাকে সচরাচর জীবন বলি, তার উপরেও জীবন আছে। ইচ্ছা হয়, তাহাকে "অতিজীবন" বল। শাস্ত্রে ইহাকে জীবনমুক্ত বলে। য়ুরোপীয় চিন্তাও ক্রমে এই "অতিজীবনের" সন্ধান পাইতেছে। য়ুরোপীয়েরা এখন প্রাকৃত মানুষের উপরে শ্রেষ্ঠতর "অতি-মানুষ" বা সুপারম্যানের (Super-man) কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমাদের শাস্ত্রসাহিত্যে যাঁহাদিগকে আত্মবান বলিয়াছে, তাহারা য়ুরোপীয়দের "সুপারম্যান" বা অতি-মানুষ। কিন্তু এ আদর্শ এখনো ভাল করিয়া ফোটে

নাই; কতদিনে যে ফুটিবার পূর্ণ অবসর প্রাপ্ত হইবে, তাহাও এখন বলা কঠিন। এখন সমাজ সাধারণ মনুষ্যের দ্বন্দ্ব কোলাহল লইয়াই ব্যস্ত রহিয়াছে।

সুতরাং সাম্যের আদর্শ সমাজে শান্তি স্থাপন না করিয়া, জনগণের দ্বন্দ্ব কোলাহলই বাড়াইয়া দিতেছে। আমরা যে সাম্যের কথা জানি, আমাদের সাধনায় যে সাম্যের গুণবর্ণনা পাঠ করি—গীতা যে সাম্যের মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন,—

ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥
—৫-১৯।

—এ সাম্যের সন্ধান আধুনিক য়ুরোপীয় সাধনায় এখনো পাওয়া যায় নাই। এখানকার সাম্য এজন্য সমাজের সংগ্রাম কোলাহলই বাড়াইয়া দিতেছে। এ সংগ্রামের নিবৃত্তি কোথায় কে জানে?

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

সমালোচক।

এম, এ পাশ করিয়া ল ক্লাসে ভর্ত্তি হইলাম। প্রভাতে উঠিয়া চা পান করিয়া খবরের কাগজ উল্টাইতে উল্টাইতে কলেজের সময় হইয়া আসিত। নয়টা হইতে ক্লাস্ আরম্ভ হইত কোন প্রকারে সাড়ে নয়টা অথবা পৌনে দশটার সময় কলেজে পৌঁছিয়া বাকি সময়টুকু কলেজের কেরাণীর সহিত বচসা করিয়া বা বন্ধুবান্ধবদের সহিত গল্প করিয়া কাটাইয়া দিতাম। ঘণ্টা বাজিলে দ্বারদেশ হইতে উচ্চস্বরে একবার Present Sir বলিয়া আফিস গমনোন্মুখ বিরাট কেরাণী স্রোত ঠেলিয়া গৃহে ফিরিতাম।

আমাদের কলেজের কেরাণী নিরীহ-প্রকৃতির লোক ছিলেন; তিনি ত আমাদের উৎপীড়নে মধ্যে মধ্যে অধীর হইয়া উঠিতেন। যত প্রকার অন্যায় এবং অদ্ভুত প্রস্তাব হইতে পারে আমরা তাঁহার নিকট নিয়ত উপস্থিত করিতাম।

আমরা শুনিয়াছি তিনি তাঁহার কোনও বন্ধুর নিকট দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন "ভাই যদি কোন প্রকারে ভগবানের সহিত দেখা হয় ত' বলি, প্রভু পরজন্মে আমাকে Law Class এর কেরাণী করিয়া সংসারে পাঠাইও না।"

দ্বিপ্রহরের অধিকাংশ আমার বঙ্গসাহিত্য আলোচনায় কাটিত। বাল্যকাল হইতেই আমার প্রবল অভিলাষ ছিল যে কবি হইব—কিন্তু আমার ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। ভাগ্যফেরে কেমন করিয়া তাহা ঠিক বুঝিতে পারিনা ক্রমশঃ কবি না হইয়া অলক্ষ্যে কবির শত্রু-সমালোচক হইয়া পড়িলাম। অদৃষ্ট যখন সর্ব্বপ্রথম তাহার বিচিত্র দণ্ড আমার মস্তকোপরি ঘুরাইয়া আমাকে সমালোচক করিয়া তুলিতে আরম্ভ করিয়াছিল তখনকার একটী ঘটনা মনে পড়িলে আজও হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না।

তখন এনট্রান্স পড়িতাম। আমার জনৈক বন্ধু সুশীলচন্দ্র বাংলা কবিতা লিখিত।

এবং আমারই দুর্ভাগাবশতঃ আমাকে রসগ্রাহী স্থির করিয়া প্রত্যহ নব নব রচিত কবিতা শুনাইতে আসিত এবং আমার অভিমত জিজ্ঞাসা করিত। ভাল লাগিলেও আমি প্রকাশ করিতাম না এবং কবিতাগুলি বিবিধ প্রকারে সংশোধিত করিয়া দিতাম। কোনও স্থানে ছন্দ ভঙ্গ, কোনও স্থানে অর্থবিভ্রাট, কোনও স্থানে ব্যাকরণ অশুদ্ধি এবং কিছু না পাইলে শ্রুতিকটু হইয়াছে বলিতাম। ক্রমশঃ সুশীলচন্দ্রের আমার সমালোচনায় সন্দেহ জন্মিল। কয়েক দিন আর কবিতা শুনাইতে আসিল না। একদিন সন্ধ্যার পর আমি আমার পড়িবার ঘরে বসিয়া আছি, এমন সময়ে সহসা সুশীল আসিয়া উপস্থিত। পকেট হইতে একটী কাগজ বাহির করিয়া আমার হাতে দিয়া বলিল "ভাই অনেকদিন পরে একটা কবিতা লিখেছি কেমন হয়েছে দেখ।"

আমারও অনেকদিন সমালোচনা না করিয়া সমালোচনার প্রবৃত্তি সাতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। সোৎসুকে তাহার হস্ত হইতে কবিতাটি লইয়া সংশোধন কার্য্যে ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। কবিতাটি অনুমান বিশ ছত্রের হইবে। অন্যূন চল্লিশটি সংশোধন করিয়া সুশীলের হস্তে দিয়া বলিলাম "তেমন সুবিধা হয় নাই।"

চাহিয়া দেখিলাম সুশীলের মুখ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। সে কোনও কথা না কহিয়া পকেটের মধ্য হইতে নীরবে একখানি ক্ষুদ্র পরিচ্ছন্ন পুস্তক বাহির করিল। লক্ষ্মীছাড়া আমাকে মজাইবার জন্য রবিবাবুর কোনও প্রসিদ্ধ কবিতা হইতে কয়েক লাইন লিখিয়া আনিয়াছিল আমি তাহারই উপর অবাধে কলম চালাইয়াছি!! অসংলগ্ন ভাষায় কৈফিয়ৎ প্রদান করিবার চেষ্টায় যাহা বলিলাম তাহা নিতান্ত নির্ব্বোধের উক্তির ন্যায় শুনিতে হইল। আমার বিপন্ন অবস্থা দেখিয়া সুশীলের বোধহয় দয়া হইল, সে বাড়ি চলিয়া গেল।

এইখান হইতেই সমালোচকের পথ পরিত্যাগ করিলে বোধহয় মন্দ হইত না। কিন্তু ভবিতব্য কে খণ্ডন করে! ক্রমশঃ আমি রীতিমত সমালোচক হইয়া দাঁড়াইলাম। নিয়মিতভাবে আমার সমালোচনা প্রকাশিত হয়।

চেষ্টা করিয়াও কবি হইতে পারি নাই বলিয়াই হউক বা যে কারণেই হউক কবি ও কবিতার প্রতি আমার কিঞ্চিৎ খরদৃষ্টি আছে—আক্রোশ বলিলেও বোধহয় নিতান্ত অত্যুক্তি হইবে না। আমি জানি, আমার নির্ম্মম সমালোচনার তাড়নায় কয়েকটী নূতন কবি শান্ত ছেলের মত বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিয়াছে।

কিন্তু সম্প্রতি একটি নূতন কবিকে লইয়া আমি কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। প্রায় বিগত ছয় মাস হইতে "সন্ধ্যাকাশ" নামক মাসিকপত্রে প্রতি মাসে ধারাবাহিক ভাবে শ্রীমতী তরুবালা দেবী স্বাক্ষরিত কোন মহিলার কবিতাবলী প্রকাশিত হইতেছে। কবিতাগুলি সাধারণতঃ মাসিকপত্রে প্রকাশিত কবিতার ন্যায় ভাবগৌরববর্জ্জিত ছন্দোবদ্ধ কোমল বাক্যসমষ্টি। অন্ততঃ আমার তাহাই ধারণা।

চারি পাঁচটি কবিতা প্রকাশিত হইবার

পর "অবসর চিন্তা" পত্রিকায় আমি কবিতাগুলির কিঞ্চিৎ তীব্র সমালোচনা করিলাম; যথা,—"এক সময় অবশ্য ছিল যখন মহিলামাত্রেরই রচনা অতিরিক্ত এবং অনেক সময়ে অযথা প্রশংসা লাভ করিত। কিন্তু সে সময়ের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান কালে বঙ্গভাষায় সুলেখিকার সংখ্যা অল্প নহে এবং সাধারণ লেখিকা প্রচুর। এরূপ অবস্থায় বর্ত্তমান লেখিকাকে আমরা অকারণ উৎসাহ দিতে ইচ্ছা করি না। জীবনের মধ্যে কবিতা রচনাই চরম সফলতা নহে। আরও বহুবিধ কর্ত্তব্য আছে যাহা পালন করিয়া আমরা জীবন সার্থক করিতে পারি। ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু বিস্ময়ের সহিত দেখিলাম কিছুমাত্র নিরুৎসাহিত না হইয়া শ্রীমতী তরুবালা সন্ধ্যাকাশের পরসংখ্যায় আরও দুই তিনটি কবিতা প্রকাশিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি কবিতা কিছু বিদ্রূপাত্মক, এবং বিশেষ প্রণিধান পূর্ব্বক বিবেচনা করিলে মনে হয় সে বিদ্রূপ যেন আমারই প্রতি বর্ষিত হইয়াছে। কিন্তু এমন চতুরতার সহিত প্রচ্ছন্ন যে সহজে কাহারও তাহা বোধগম্য হইবার নহে।

তীব্রতর সমালোচনা করিলাম। বহুপ্রকারে তিরস্কার ও নিন্দা করিয়া পরিশেষে লিখিলাম,—ভগবান কাহাকেও কাব্য রচনা করিবার শক্তি প্রদান করিয়াছেন, কাহাকেও কাব্য উপভোগ করিবার প্রবৃত্তি দিয়াছেন,—সকলকে কাব্যরচনা করিবার ক্ষমতা কেন দেন নাই সে রহস্য তিনিই শুধু জানেন। কিন্তু যাহাকে শক্তি দেন নাই—তাহাকে লালসা কেন দিয়াছেন তাহা আরও রহস্যপূর্ণ! সমালোচনা সমাপ্ত হইলে চাহিয়া দেখিলাম ঘড়িতে উভয় কাঁটাই ১২টার ঘরে একত্র হইয়াছে। সুইস্ টিপিয়া দিয়া শয্যায় শয়ন করিলাম। শুইয়া ভাবিয়া দেখিলাম প্রকৃত পক্ষে তরুবালার কবিতার নিরপেক্ষ সমালোচনা করি নাই। দোষটুকু দেখাইবার পক্ষে কোন ত্রুটি করি নাই কিন্তু যাহা প্রশংসার যোগ্য তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ মৌন থাকিয়াছি। দীপহীন কক্ষের ঘন অন্ধকারের মধ্যে কাল্পনিক তরুবালার কাতর মুখমণ্ডল আমার চক্ষের সম্মুখে যেন প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। অন্ধকারে স্নিগ্ধ হইয়াই হউক বা যে কারণেই হউক মমতায় মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। অজ্ঞাত কুঞ্জবনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন পুষ্প তাহার যতটুকু সাধ্য সুগন্ধ প্রেরণ করিতেছে আমি কেন অকারণ তাহাকে ছিন্ন করিবার জন্য ব্যস্ত হই। স্থির করিলাম সমালোচনা পরিবর্ত্তিত না করিয়া পাঠাইব না।

প্রভাতে উঠিয়া দেখিলাম ঘর আলোকে উজ্জ্বল হইয়া গিয়াছে; রাত্রে অন্ধকারের নিবিড়তায় যাহা স্থির করিয়াছিলাম দিনের আলোকে তাহা অতি সহজে লুপ্ত হইয়া গেল। সমালোচনা একটা কভারে মুড়িয়া "অবসর চিন্তা" সম্পাদকের নামে পাঠাইয়া দিয়া মিঃ মুখার্জ্জির গৃহে চা পান করিবার জন্য বাহির হইলাম। মিঃ মুখার্জ্জি ব্যারিষ্টার, এবং আমাদের ল' প্রোফেসার। তাঁহার পুত্র সুবোধ আমার বন্ধু।

সেদিন রবিবার ছিল। প্রতি রবিবার আমি নিয়মিত ভাবে মিঃ মুখার্জ্জির গৃহে চা পান করিবার জন্য উপস্থিত হইতাম। মিঃ মুখার্জ্জির পুত্র সুবোধ ইংলণ্ডে সিভিল্ সারভিস্

পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। এবং তাঁহার রুগ্না পত্নী স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য দারজিলিংএ অবস্থান করিতেছেন। কেবল মাত্র কন্যা নিরুপমা পিতার পরিচর্য্যার জন্য কলিকাতায় আছেন। উপস্থিত হইয়া দেখিলাম বারাণ্ডায় চা-টেবিলের পার্শ্বে মিঃ মুখার্জি তাঁহার কন্যা ও জনৈক বন্ধু সহ, আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।

মিঃ মুখার্জি তাঁহার বন্ধুর সহিত গল্প করিতে লাগিলেন নিরুপমা আমায় বলিলেন "প্রকাশ বাবু, এবারকার "সন্ধ্যাকাশে" আবার তরুবালার কয়েকটা কবিতা বের হয়েছে। আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন ?"

আমি বলিলাম—"হ্যাঁ, দেখেছি বই কি, কাল রাত্রেই তার সমালোচনাও করে ফেলেছি —আজ সকালে "অবসর চিন্তায়" পাঠিয়ে দিয়েছি। এবার বোধ হয় তরুকে মরুতে মারা পড়তে হবে !"

শুনিয়া নিরুপমা হাসিতে লাগিল।

অবসর চিন্তায় আমি নাম পরিবর্ত্তন করিয়া সমালোচনা প্রকাশ করিতাম। সে কথা কেবল নিরুপমাই জানিতেন। বাঙ্গলা কাব্য সম্বন্ধে নিরুপমার সহিত আমার সম্পূর্ণ মতৈক্য হইত—বিশেষতঃ তরুবালার কবিতা সম্বন্ধে। তরুবালার কবিতা নিরুপমার আদৌ পছন্দ হইত না। বাঙ্গলা সাহিত্যে নিরুপমার বিশেষ অধিকার জন্মিয়াছিল। কারণ মিঃ মুখার্জি ইংরাজি শিক্ষার প্রতি তত দৃষ্টি না দিয়া সংস্কৃত ও বাঙ্গলা সাহিত্যে নিরুপমাকে বিশেষ ভাবে শিক্ষা দান করিয়াছিলেন।— নিরুপমা ঔৎসুক্যের সহিত বলিলেন "আপনি কি খুব তীব্র সমালোচনা করেছেন ?"

আমি হাসিয়া বলিলাম—"বোধ হয় একটু অতিরিক্ত কঠিন হয়েচে। কিন্তু তার কারণ আছে। "ক্ষমা" কবিতাটা ভাল করে পড়ে দেখেছেন ?" নিরুপমা হাসিয়া বলিলেন, "দেখেছি সেটা আপনাকে লক্ষ্য করে লেখা —তা বেশ বোঝা যায়।" আমি বলিলাম,— "হ্যাঁ সেই জন্য "ক্ষমার" লেখিকাকে আমি ক্ষমা করতে পারলাম না"। নিরুপমা বলিলেন, "বেশ করেছেন—স্ত্রীলোক হয়ে এত কিসের গর্ব; দেখছি—যা ইচ্ছা তাই লিখচে !"

আমি বলিলাম—"আর কিছুই নয়, উপযুক্ত শিক্ষার অভাব। আপনাদের মত শিক্ষিতা মেয়েরা যদি বাঙ্গলা লেখেন তা হলে উৎকৃষ্ট জিনিস উৎপন্ন হতে পারে। আপনি এত ভাল বাঙ্গলা জানেন একটু একটু লিখতে আরম্ভ করুন না।"

নিরুপমা হাসিয়া বলিলেন "কেন ? তা হলে কি আপনি তরুবালাকে ত্যাগ করে নিরুপমার সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করেন ?"—"না আপনি যদি কবিতা লেখেন তা' হলে আমার কলম থেকে অন্য প্রকার সমালোচনা বের হবে।"

"এরূপ পক্ষপাতী সমালোচক পেলে কবিতা লিখতে প্রলোভন হয় বটে—কিন্তু প্রকাশ বাবু, পক্ষপাতিতা সমালোচকের পক্ষে একটা মস্ত দোষ।"

আমি ঈষৎ রঙ্গচ্ছলে বলিলাম—"তা নিশ্চয়ই কিন্তু—আমি যদি আপনার পক্ষপাতী না হই তা হলে সেটা আমার পক্ষে শুধু দোষ নয়, পাপ হবে।" নিরুপমার মুখ রক্তিম হইয়া উঠিল।—"কিন্তু বেচারী তরুবালা আপনার কাছে এমন কি অপরাধ করেছে যে

আপনি তার এমন ঘোরতর বিপক্ষ হয়ে উঠেচেন ?"

আমি কিন্তু অপ্রতিভ হইলাম। বলিলাম "তা বলতে পারিনে—কিন্তু তার উপর আমার বড় রাগ হয়।" ঘণ্টাখানেক কথাবার্ত্তার ...র গৃহে ফিরিলাম।

প্রায় মাসাবধি পরে একদিন সন্ধ্যাকালে মিঃ মুখার্জির drawing room এ বসিয়া দার্জ্জিলিঙ্গ হইতে সদ্যপ্রত্যাগতা মুখার্জি পত্নীর সহিত গল্প করিতেছিলাম--এবং নিকটে বসিয়া নিরুপমা এলবামে দার্জিলিঙ্গ হইতে সংগৃহীত ফার্ণ সাজাইতেছিলেন।

মুখার্জি পত্নী বলিলেন—"প্রকাশ প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত ভাবে তোমার পত্র পেতাম বলে দার্জিলিঙ্গে অনেকটা সুস্থচিত্তে কাটাতে পেরেছিলাম। তোমার পরীক্ষার সুফল সেখানে জানতে পেরে মনে অতিশয় আনন্দ বোধ হয়েছিল। বিএল পরীক্ষায় তুমি যে সর্ব্বপ্রথম হবে—তাহা আমরা বরাবরি আশা করতাম। কর্ত্তা ত সর্ব্বদাই তোমার সুখ্যাতি করতেন যে ক্লাসের মধ্যে তুমিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র।"

একজন ভৃত্য আসিয়া টেবিলের উপর একটা কাগজ রাখিয়া গেল। দেখিলাম সন্ধ্যা-কাশ। খুলিয়া দেখিলাম "তরু" স্বাক্ষরিত সমা-লোচক নামে একটী ব্যঙ্গ কবিতা প্রকাশিত। বলা বাহুল্য আমাকেই আক্রমণ করা হইয়াছে। কবিতার মর্ম্ম এইরূপ :—কোন এক চিত্রকর একটি সুন্দরী রমণীর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। চিত্রটি অতি সুন্দর হইয়াছিল। কিন্তু এক মূর্খ সমালোচক সেটিকে উল্টা করিয়া ধরিয়া বলিয়াছিল "ইহাতে বর্ণের বাহুল্য আছে, তুলিকার চাতুর্য্য আছে কিন্তু অত্যন্ত ভাবের বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে; কারণ এই চিত্রটিতে সুন্দরীর পদদ্বয় উর্দ্ধদিকে এবং মস্তক নিম্নদিকে অঙ্কিত হইয়াছে। তাহাতে চিত্রটি সর্ব্বতোভাবে অস্বাভাবিক হইয়াছে।

কবিতা পাঠ করিয়া আমার আপাদমস্তক রাগে জ্বলিয়া উঠিল। চাহিয়া দেখিলাম, গৃহিণী স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছেন—এবং নিরুপমা ফার্ণ সাজাইতে ব্যস্ত।

রুক্ষস্বরে আমি বলিলাম, "সন্ধ্যাকাশ" এসেছে।"

নিরূপমা আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন "এবার বোধ হয় তরুবালার তিরোভাব !"

আমি বলিলাম "না—অতিশয় অভদ্র ভাবে আবিভাব। এই নিন্ পড়ুন।"

অত্যন্ত ব্যস্ততার সহিত আমার হাত হইতে সন্ধ্যাকাশ লইয়া নিরুপমা পড়িলেন। পড়িয়া বলিলেন—"অন্যায়, ভারি অন্যায়! প্রকাশ বাবু আপনি এর একটা প্রতিকার করুন। অত্যন্ত কড়া করে এর একটা উত্তর দিতে হবে। স্ত্রীলোকের এতটা অভদ্রতা অত্যন্ত অগৌরবের কথা !"

আমি দেখিলাম নিরুপমা সত্যই বিচ-লিত, বলিলাম—"না এ ব্যাপারটাকে আমি একেবারে লঘু করে দিতে চাই। এ জঘন্য কবিতার উত্তর দিলে নিজেকেই ছোট হতে হবে। কিন্তু আমার মনে হচ্চে যে তরুবালা স্ত্রীলোক নয়—কোন পুরুষ স্ত্রীলো-কের নাম দিয়ে এসকল লিখছে। স্ত্রীলোক এতটা নির্লজ্জ হতে পারে আমার মনে হয় না।"

অন্যমনস্ক ভাবে নিরুপমা বলিল "তা

হবে।" চারি পাঁচ দিন পরে মিঃ মুখার্জির এক পত্র পাইলাম। পত্রে নিরুপমার সহিত আমার বিবাহের প্রস্তাব।

পত্র পাঠ করিয়া বিশেষ বিস্মিত হইলাম না। কারণ আমার কতকটা ধারণা ছিল যে একদিন সম্ভবতঃ এ প্রস্তাব আসিবে। কিন্তু আনন্দিত হইলাম। অমিশ্রিত আনন্দ কাহাকে বলে তাহা সেদিন বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

মিঃ মুখার্জির ভৃত্যের হস্তেই উত্তর লিখিয়া পাঠাইলাম। সংক্ষেপে লিখিলাম—"আপনার স্নেহসিক্ত প্রস্তাব অদ্য আমাকে গৌরবান্বিত করিয়াছে। এ বিষয়ে অধিক কথা লিখিয়া আমাকে অপ্রতিভ করিয়াছেন মাত্র। আশীর্ব্বাদ স্বরূপ আপনার শুভ-ইচ্ছা আমি ভক্তির সহিত গ্রহণ করিয়াছি। তবে আমার মনে হয় এ বিষয়ে একবার আপনার কন্যার অভিমত লওয়াও আবশ্যক।"

বৈকালে মিঃ মুখার্জির পত্র পাইলাম; সন্ধ্যার পর চা খাইবার নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

যথা সময়ে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম মিঃ মুখার্জি পত্নীসহ বেড়াইতে গিয়াছেন। গৃহে আমার জন্য নিরুপমা অপেক্ষা করিতেছেন। উদ্দেশ্য বুঝিতে বিলম্ব হইল না। কিন্তু দুই একটা কথা বার্ত্তার পর বুঝিতে পারিলাম যে নিরুপমা একথা এখনো জানেন না।

নিরুপমা বলিলেন—"প্রকাশ বাবু চা খেয়েই পালাতে পারবেন না। মা বলে গেছেন তাঁদের ফেরা পর্য্যন্ত আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে।"

আমি বলিলাম—"তাহলে চিনির সঙ্গে একটু নুন মিশিয়ে দিন—তাহলে আর নিমকহারামী করতে পারবো না।"

নিরুপমা হাসিয়া বলিলেন,—"হ্যাঁ এমন অনেক লোক আছে যাদের বাধ্য করতে হলে শুধু মিষ্ট রসে হয় না অন্য প্রকার রসেরও প্রয়োজন।"

ভৃত্য একটা ট্রে করিয়া চায়ের জল দুগ্ধ ও চিনি রাখিয়া গেল। নিরুপমা আমার জন্য চা তৈয়ারি করিতে ব্যস্ত হইলেন। এবং আমিও একবার ভাল করিয়া নিরুপমাকে দেখিয়া লইতে ব্যস্ত হইলাম। ভাল করিয়া অর্থাৎ নূতন ভাবে নূতন চক্ষে। মিঃ মুখার্জির প্রস্তাব নিরুপমাকে আমার নিকট আজ নূতন করিয়া দিয়াছে। জানি আজ প্রভাত হইতে আমার চক্ষে এক নবজ্যোতির সঞ্চার হইয়াছে যাহাতে সমগ্র বিশ্ব আমার নিকট নবপ্রভায় উদ্ভাসিত মনে হইতেছে—কিন্তু নিরুপমা যে এত সুন্দরী তাহাত জানিতাম না! মৃদু সঞ্চালনে নিরুপমার কর্ণলগ্ন হীরকখণ্ড পর্য্যন্ত নির্ম্মল পুণ্যের ন্যায় ঝিক্‌ঝিক্ করিতেছিল কি সুন্দর! হীরকের উপর নূতন করিয়া আমার শ্রদ্ধা হইল!

চা'র পেয়ালা আমার সম্মুখে রাখিয়া নিরুপমা বলিলেন—"প্রকাশ বাবু, খান। আপনি আবার গরম না হলে খেতে পারেন না।"

হায় মুগ্ধে, প্রকাশ বাবু তখন যে সুধাপান করিতেছিলেন তাহার নিকট চা অত্যন্ত তুচ্ছ। এবং দ্রুত রক্ত সঞ্চালনে শরীর এত উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে গরম খাইবার পক্ষে কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না।

"নিরু!" কণ্ঠস্বর কিছু অস্বাভাবিক ভাবে বিকৃত হইয়া গেল।

নিরুপমা বিস্মিত হইয়া আমার মুখ নিরীক্ষণ করিলেন। কতকটা সামলাইয়া

বলিলাম,—"আমরা আর আপনি বলে সম্বোধন করবনা কি বলেন?" বোধ হয় আমার দেহ হইতে তাহার দেহেও তড়িৎ প্রবাহ সঞ্চারিত হইয়াছিল। নিরুপমা নীরব। "'আপনি' শব্দটা বড় কর্কশ, দুজনের মধ্যে তাতে কেমন একটা ব্যবধান রেখে দেয়। তুমি শব্দ পরস্পরকে নিকটে আনে। নিরুপমা, তোমার কাছে আমার একটা আবেদন আছে।"

নিরুপমা উপবেশন করিল। পকেট হইতে মিঃ মুখার্জির পত্রখানা বাহির করিয়া নিরুপমার হস্তে দিয়া বলিলাম "এই আমার আবেদন।"

নিরুপমা ধীরে ধীরে শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া আমাকে ফিরাইয়া দিলেন।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল। আমি বলিলাম তোমার কোনও আপত্তি আছে। নিরুপমা একবার আমার মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

"লজ্জা কোরোনা নিরুপমা, এ লজ্জার সময় নয়। তোমার যদি কোন প্রকার আপত্তি থাকে তা হলে আমি কখনই তোমাকে বিবাহ করে তোমার কষ্টের কারণ হব না।"

"আমার একটা কথা আছে।"

"কি কথা, বল।"

নিরুপমা একবার আমার মুখের দিকে চাহিয়া—একটু হাসিয়া বলিলেন—"আমিই তরুবালা!"

কি সর্ব্বনাশ! একি রহস্য! মনে হইল মা পৃথিবী তুমি দুফাঁক হও আমি তোমার মধ্যে লুকাই!

* * *

তথাপি আমাদের বিবাহ হইয়া গেল। নিরুপমা আমার পত্নী হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে কবিতা লিখিতেছেন। কিন্তু আমি সমালোচনা ছাড়িয়া দিয়াছি। নিরুপমা মাঝে মাঝে আমাকে সমালোচনা লিখিতে অনুরোধ করেন বোধ হয় পরিহাস করিয়া। কিন্তু আমি শপথ করিয়াছি আর বেলতলায় যাইব না।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

স্বরলিপি।

কাফী—আড়াঠেকা।

(টপ্পা)

কত* গয়ী প্রাণ-পিয়ারী, আনিয়ে হো মেরে।
চন্দ্র বিন যোন † চকোর ন জীয়ে,
জল বিন মীন দুখিয়ারে, আনিয়ে হো মেরে॥

বিখ্যাত টপ্পা রচয়িতা হম্‌দম্ কৃত।

০ ১ ২´ ৩

II সা রা রা মজ্ঞা। -া সরা মা মা I পা -া -া মমা। -পধা -ণর্সা -ণধা -ণা।

ত গ য়ী প্রা • • ণ পি য়া • • রী• ০ • ০ • • • •

০ ॥ ১ ২´
। -া ধা পধপা মগা। মা -জ্ঞা -রা রা I রজ্ঞা -মপা -মজ্ঞা রমা।
০ আ নি ০ য়ে০ হো ০ ০ মে য়ে০ ০০ ০০ ০০

৩
। জ্ঞমা -জ্ঞরা -সণ্ া সা II
০০ ০০ ০০ "ক"

১ ২´ ৩ ০
মা II -া পা -া ধা। না -া -া -র্সা। ধনা -র্সা র্সা -া। -া -া -া র্সনা।
চ ০ন্দ্র ০ বি ন ০ ০ ০ ০ ০ যোন০ ০ ০ ০ চ০

১ ২´ ৩ ০
। র্সা র্রা র্রা -া। র্রজ্ঞা -র্মমা -র্জ্ঞরা -র্সণা। র্সরা -র্সণা -ধপা -মমা। -া পা র্সনা র্সা।
কো র, ন ০ জ্যো০ ০০ ০০ ০০ য়ে০ ০০ ০০ ০০ ০ জ ল বি

১ ২´ ৩ ০
। র্সা র্সা ণর্সা ণধণা। ধা পা -া মা। পধা -ণর্সা -ণধা -ণা। -া ধা পধপা মগা।
ন মী ন০ ০০০ দু খি ০ য়া রে০ ০০ ০০ ০ ০ আ নি ০ য়ে০

১ ২´ ৩
। মা জ্ঞা রা রা I রজ্ঞা -মপা -মজ্ঞা -রমা। জ্ঞমা -জ্ঞরা -সণ্ া সা IIII
হো ০ ০ মে রে০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ "ক"

২´ ৩
(১) তান I সরা -মপা -ধণা-র্সণা। ধপা -মগা -মা সা I
আ০ ০০ ০০ আ০ ০০ ০ "ক"

২´ ৩
(২) তান I র্সসা -ণধা -পমা -গমা। পমা -জ্ঞরা -সণ্ া সা I
আ০ ০০ ০০ ০০ আ০ ০০ ০০ "ক"

২´ ৩
(৩) তান I ণ্সা -রমা -পর্সা -ণধা। পমা -জ্ঞরা -সণ্ া সা I
আ০ ০০ ০০ ০০ আ০ ০০ ০০ "ক"

২´
(৪) তান I র্সর্রা -র্সণা -ধপা -মপা। মজ্ঞা -রসা -ণ্ া সা I
আ০ ০০ ০০ ০০ আ০ ০০ ০ "ক"

"কত* গয়াঁ প্রাণ পি"—এই অংশ পর্য্যন্ত গাইয়া তান সকল ধরিতে হইবে।

সঙ্গীত-বিদ্যার্ণব
শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

* কত=কে'পায়। † যোন=যেমন।

সুরদাস ও কৃষ্ণ

শ্রীযুক্ত নারায়ণপ্রসাদ অঙ্কিত চিত্র হইতে

প্রভাতে।

কেন হে রজনি! পোহালে?
কেন আজি এই বিষাদ মাখান
দিবস আমারে জাগালে?
এ চেতনা চেয়ে ভাল ছিল ঘুম
বিস্মৃতি তিমিরে ঢাকা,
শতগুণে ভাল ছিল স্বপনের
কোলেতে লুকায়ে থাকা;
প্রেমময়ী লতা বক্ষ বিজড়িয়া
চাহিল মুখের পানে,
কত সুধাধারা বহিল মুহূর্ত্তে
উভয়ের প্রাণে প্রাণে।
কেন হে রজনি। পোহা'লে?
দগ্ধস্মৃতি ঘেরা এ দিবস কেন,
আমারে আবার জাগা'লে?
তাহার যাকিছু স্মৃতি নিদর্শন
এগৃহের সবঠাঁই,
তোমার আঁধারে ছিল যে ডুবিয়া
আবার দেখিতে পাই,
বড় ভাল হ'ত যদি নিশি তুমি
না ভাঙ্গিতে ঘুমঘোর,
হরিয়া লইতে প্রাণটা আমার
করিতে দুঃখের ভোর।

সন্ধ্যায়।

আজি কেন এলে সন্ধ্যা! দীনের কুটির দ্বারে!
সে যে নাই, সে যে নাই, খুঁজিতেছ তুমি যারে;
কে লবে জালিয়া দীপ তোমারে আদরে বরি,'
কে আজি তোমার প্রাণ ধূপগন্ধে দিবে ভরি'?
উঠানে পড়েনি ঝাঁট, দুয়ারে পড়েনি জল,
শুধু মোর আঁখিনীরে ভিজিতেছে গৃহতল।
তুলসীর বেদীমূলে জ্বলেনি প্রদীপ আজি,
উঠে নাই ধূপধুম, শোভেনি ফুলের সাজি।
গলবস্ত্রে নমি আজি ভক্তিভরে পদে তার,
ঢালে নাই কেহ বারি—প্রীতিমাখা প্রেমধার।
আজি কেন এলে সন্ধ্যা; দীনের কুটির দ্বারে?
সে যে নাই, সে যে নাই খুঁজিতেছ তুমি যারে।
আঁচল হইতে তব কে তুলিবে যুঁই বেলা,
কে গাঁথিবে বিনাসূতে সন্ধ্যামণি ফুলমালা!
মধুর হাসিতে তব মিলাইয়া সুধা হাসি,
কে আজি পরাবে মালা মোর গলে ছুটি আসি।
ওই হের আলুথালু বিছানা বালিশ পড়ি,
ওই হের শিশু তার ধরাতলে গড়াগড়ি।
এই দেখ মোর প্রাণে উঠিছে কি হাহাকার,
জ্বলিতেছে বুক যুড়ি কি ভীষণ চিতাহার!
আজি কেন এলে সন্ধ্যা! দীনের কুটির দ্বারে?
সে যে নাই, সে যে নাই, খুঁজিতেছ তুমি যারে!

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

পোষ্যপুত্র।

২৭

শরীর ভাল নাই বলিয়া বসুমতী সেদিন ানের পর নিজের শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া-ছেন। মোক্ষদা আহারের জন্য ডাকিতে আসিয়া ক থাইয়া গিয়াছে, আর কেহ ডাকিতে হস করে নাই। সুপ্রকাশ সকালে উঠিয়া, চলিয়া গিয়াছে দেখিয়া পর্য্যন্ত, এমনি হাঙ্গামা বাধাইয়া তুলিয়াছে যে কেহই তাহাকে শান্ত করিতে পারিতেছে না। "দিদি যে তাহার চেয়ে হেমবাবুকেই বেশি ভালবাসে সে বিষয়ে সে আজ দৃঢ় নিশ্চয় হইয়াছে এবং আর কক্ষণও সে দিদির কথায় বিশ্বাস করিবে না, এ বিষয়ে সে সরকারমশাই হইতে

রজনীনাথ পর্য্যন্ত সকলকে সাক্ষী রাখিয়াই পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞা করিল।

ইণ্ডিয়ার মানচিত্রে কোন একটি নগরের অস্তিত্ব লইয়া গুরুশিষ্যে সেদিন ভারী মনোমালিন্য চলিতেছিল। ছাত্র জলভরা চোখ ও কম্পিত অধরে ভৃত্যের দ্বারা আনীত হইয়া ঘরে ঢুকিবামাত্র মাষ্টার মহাশয় তাহার মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছুমাত্র কৌতূহলী না হইয়া একেবারে ম্যাপ খুলিয়া তাহার মধ্য হইতে একটা সৃষ্টি ছাড়া অনাবশ্যক দেশের নাম খুঁজিয়া বাহির করিতে আদেশ করিলেন। এবিষয়ে তাহার অনুরাগের কথা জানা ছিল বলিয়াই তিনি তাহাকে ভুলাইবার জন্যই এই ফন্দি আঁটিয়া ছিলেন কিন্তু ইহাতে আজ হিতে বিপরীত হইল। কলম্বস যখন প্রথম আমেরিকার উপকূলে দাঁড়াইয়া তাহা নিজের আবিষ্কৃত নূতন জগৎ বলিয়া জানিতে পারিলেন তখন তাহার যে প্রকার মনোভাব হইয়াছিল, বিচিত্র বর্ণের ভূগোল চিত্র হইতে ক্ষুদ্র অক্ষরে ছাপান নূতন নূতন দেশের নাম আবিষ্কার করিয়া সে সেই রকমই একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করিত। কিন্তু আজ তাহার মনের সে অবস্থা নয়। দুএকবার চিত্রের দিকে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে হঠাৎ সে রাগিয়া গেল। পুস্তক হইতে দৃষ্টি উঠাইয়া গম্ভীর মুখে চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইল, মাষ্টার তাহাকে চিনিতেন,—বুঝিলেন বিপদ সামান্য নয়।

রজনীনাথের ডাকার শব্দে সুকু অন্য দিন শান্তমূর্ত্তিতে ফিরিয়া আসে—আজও একবার সে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল কিন্তু তৎক্ষণাৎ সেভাব সামলাইয়া লইয়া আরও কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। মাষ্টারের উত্তেজিত স্বর বিমনা রজনীনাথকে অনেকক্ষণ পরে যখন সেঘরে টানিয়া আনিল তখনও তাঁহার কাপড় ছাড়া হয় নাই। রজনীনাথ কি হইয়াছে জানিতে চাহিলেন না, পুত্রের কাছে আসিয়া তাহার কুঞ্চিত কেশের উপর ডান হাতটি রাখিয়া বামহস্তে তাহাকে কোলের কছে টানিয়া লইয়া একবার গম্ভীর বিষাদপূর্ণ দৃষ্টিতে পুত্রের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। সুকুর ঠোট কাঁপিতেছিল, চোখের জল এতক্ষণ জেদ করিয়া চাপিয়া রাখিয়াছিল কিন্তু আর সে নিজের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিল না; ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। রজনীনাথ একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া মাষ্টারের দিকে ফিরিয়া ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "সুকুর আজ শরীর ভাল নেই অবাধ্যতার জন্য আপনাকে প্রণাম করে মাপ চাইলে কি ওকে আজ ছুটী দেবেন?"

মাষ্টার চলিয়া গেলে গভীর স্নেহে পুত্রকে বুকে টানিয়া লইয়া রজনীনাথ তাহার ললাটে অনেকক্ষণ ধরিয়া অনেকখানি স্নেহ ঢালিয়া চুম্বন করিলেন। বালক সেদিনকার অপরাধের সামান্য শাস্তির পরেই এতখানি আদরের মর্ম্ম ঠিক তাঁহার সজল গম্ভীর মুখে খুঁজিয়া না পাইলেও আপনা আপনিই কেবলি তাহার চোখে জল আসিতে লাগিল। পিতার প্রতি অভিমান ভুলিয়া গিয়া তাঁহার উপর কেমন যেন একটা প্রবল সহানুভূতি আসিয়া পড়িল, মনে হইতে লাগিল, "বাবা কেন আজ এমন করে চাইচেন, বোধ হয় বাবাও মনে করচেন দিদি এখন বাবাকে সে রকম ভালবাসে না। দিদি কেন এমন হলো!"

রজনীনাথ অনেক রাত্রে শয়ন করিতে গেলেন। নিঃশব্দে দিনরাত্রি কাটিয়া গেল।

তার পর আরো একটা দিন আসিল এবং চলিয়া গেল। ডাকের পিয়নটা দুইতিন দফায় সংবাদপত্র ও চিঠিতে রজনীনাথের পড়িবার ঘরের বড় টেবিলটা ভরাইয়া দিয়া গেল! কিন্তু কোন একখানাতেও প্রত্যাশিত অক্ষরের ছাপ নজরে পড়িল না। সংসারটা কেবলি কার্য্যের জন্য সৃষ্ট মনের কোন অবস্থাতেই কার্য্য পরিত্যাগ করিবার উপায় নাই, রজনীনাথ সমাগত মক্কেলদের কাজ দেখিতে উঠিয়া গেলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহাদের সহিত মোকর্দ্দমা সংক্রান্ত কথা বার্ত্তায় কাটাইয়া তাহারা বিদায় হইলে জোর করিয়া উঠিয়া পড়িবার ঘরে আসিয়া মোটামোটা আইনের বই খুলিয়া বসিলেন। কিন্তু যতই বেশি আগ্রহের সহিত সেগুলাকে নাড়াচাড়া করিতে লাগিলেন তাহাদের মধ্যকার ছাপার অক্ষরগুলা ততই তাঁহার মনের মধ্যে দুর্ব্বোধ্য ও জটিল হইয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে পিনালকোডের ধারার উপর একখানা সকরুণ মুখচ্ছবি কেবলি অঙ্কিত হইয়া উঠিতে লাগিল। সে মুখের নেগেটিভ খানা যে তাঁহারি বুকের মাঝখানে বসান রহিয়াছে, অশ্রুজলে অস্পষ্ট সে সুন্দর বর্ষাধৌত জুঁই-ফুলের মতন ক্ষুদ্র মুখখানা যে তাঁহারি আদরিণী অপরাধিনী কন্যার! পিতার পক্ষে সে চিন্তা যেন অসহ্য হইয়া উঠিল।

২৮

সেদিনও মেঘদম্ম আকাশখানা জলভারের ভারে বদ্ধ বিদ্যুৎ বক্ষে বহিয়া আনিয়া স্তব্ধ হইয়াছিল। নদীর এপারে ওপারে যেখানে যেখানে আকাশখানা হেলিয়া পড়িয়া সবুজ গাছগুলার মাথাকে স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে; সর্ব্বত্রই যেন কালী ঢালা। কালো আকাশের নীচে সবুজ গাছের শ্রেণী আবার সেই সবুজ ঝোপের মধ্যে মধ্যে কোথাও একটা গাছভরা রাঙ্গা ছাতিম ফুল কোথাও বা গোটাকতক কদম্বফুটিয়া গাছ আলো করিয়া রহিয়াছে। আসন্ন বৃষ্টির ভয়ে বক চিল ও পাখীগুলা ঝাঁক বাঁধিয়া উচ্চ আকাশের কোল দিয়া কৃষ্ণতারকা শ্রেণীর মত ক্ষুদ্রাকারে উড়িয়া যাইতেছিল; কেবল কাকগুলা তখনও পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত নির্ভরতার সহিত গাছের ডালে ও প্রাচীরের ধারে বসিয়া স্বর অভ্যাস করিতেছিল। আসন্ন বিপদের ভাবনায় তাহারা বর্ত্তমানকে উপেক্ষা করিতে প্রস্তুত নহে।

জানালার নিকটে আরাম কেদারাখানার পড়িয়া শ্যামাকান্ত চৌধুরী বিশ্রাম করিতেছিলেন, নিকটে একটা ছোট টেবিলের উপর চশমার খাপ ও একখানা বাংলা সংবাদ পত্র পড়িয়া রহিয়াছে সেখানার এখনও ভাঁজ খোলা হয় নাই। একই সময়ে নিজের অন্তরের সঙ্গে ও বাহিরের সহিত তাঁহার যে সংগ্রাম বাধিয়া উঠিয়াছিল তাহা হইতে আত্মরক্ষা করা শ্যামাকান্তের পক্ষে প্রায় অসাধ্য। কৃত কর্ম্মের অনুশোচনা ও অকৃত কার্য্যের ফলভোগ তাঁহার পক্ষে এখন অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। মনের দৃঢ়তা বহুপূর্ব্বেই যে গিয়াছিল,—কেমন করিয়া এত বড় বড় আঘাতগুলা সহ্য করিয়া চারিদিককার বিরোধকে শান্ত করিয়া সামঞ্জস্য করিয়া চালাইয়া যাইবেন সেকথা মনে করিবার মতন একটা বলও তো সেই চিন্তাজীর্ণ বক্ষের ভিতর নাই। অবসাদের ক্লান্তিতে শুভ্র মস্তক ভার হইয়া আসে, স্তিমিত চক্ষু কেবলি মুদিয়া আসিতে থাকে; উপায় ও চেষ্টা মনের

মধ্যে ধরা দেয় না। তবে একটা আশা তিনি সকল সময়ই ছাড়িতে পারেন না তাই মনের এমন সঙ্কট অবস্থাতেও নিকটবর্ত্তী সমস্যাটার অপেক্ষা দুরস্থ সঙ্কটের কথাই তাঁহার মনে লৌহদণ্ডের মতন আঘাত করে। বেদনার চেয়ে সময়ে সময়ে এই ব্লিষ্টারের জ্বালা আরও ভয়ানক। মনের এ অবস্থাকে ছাড়াইয়া চলিবার আর যেন কোন দিক দিয়া পথ পাওয়া যাইতেছিল না। চারিদিক হইতে সব দ্বারগুলা একে একে রুদ্ধ হইয়া যাইতেছে, অন্ধকার ক্রমে ঘন ও ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে, অন্ধকারে যে ক্ষুদ্র শুকতারাটি আপনার সবটুকু স্নিগ্ধ আলোক ঢালিয়া দিয়া তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছিল সেও সহসা এই নিবিড় অন্ধকার রাশির মধ্যে ক্ষুদ্র বিন্দুটির মতন লুপ্ত হইয়া গেল। এখন এই গভীরতম অন্ধকারে এই চারিদিককার রুদ্ধদ্বার দুর্গকারার নির্জ্জন পথে দৃষ্টিহীন অন্ধকে কে হাত ধরিয়া পথ চিনাইয়া এখান হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইবে? অন্ধকারে ভীত বালক যেমন নির্ভরতার সহিত মাতৃবক্ষে মুখ লুকাইয়া নিজেকে ঢাকিতে চায় তেমনি করিয়া শ্যামাকান্ত ব্যাকুল ভাবে মা বলিয়া একখানি স্নেহ বক্ষের ছায়াতলে আত্ম সমর্পণ করিতে গিয়া স্বপ্ন দৃষ্টের মতন চমকিয়া ফিরিয়া আসিলেন। হায় মাতৃহারা! কোথায় আজি সে কোথায়? কোথা মা কোথা মা মাগো তুই ফিরে আয়!

শ্যামাকান্ত সবচেয়ে আপনাকেই বেশি তিরস্কার করিতেছিলেন। যে সময় পূর্ব্বকালের লোকেরা সংসারাশ্রমকে পরিত্যক্ত বস্ত্র খণ্ডের মতন অনায়াসে অবহেলার সহিত পরিত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া পারলৌকিক চিন্তায় মনঃসংযোগ করিতেন,—আর তিনি কিনা ঠিক সেই সময় একটি শিশুর স্নেহে অন্ধ হইয়া তাহাকে কোলে পাইবার জন্য যে কোন উপায় খুঁজিয়া উন্মাদের মতন বেড়াইতেছেন! তাঁহার কি একথাও ভাবা উচিত ছিল না যে, তাঁহার খেয়ালের দায়ে তিনি যাহাকে কাছে টানিতেছেন তাহার জীবন কেবল মাত্র তাঁহাকে খেলার সুখদান করিবার জন্যই সৃষ্ট হয় নাই। রেশমে সোনায় হীরায় সাজাইয়া কাচের দেরাজে সাজাইয়া রাখাতেই তাহার জীবনের চরমসুখ ও পরিণতি নয়। এখন তাঁহার ঘরের দুষ্ট শিশু যদি তাঁহাকে ঠেলিয়া তাঁহার সে যত্নের প্রতিমা সিংহাসন চ্যুত করিয়া ডাকের সাজ খুলিয়া কাদামাটি মাখাইয়া ফেলিয়া দেয় তিনি তাহাকে কেমন করিয়াই বা রক্ষা করিবেন? যে মূর্ত্তিউপাসক নয় তাহার সাক্ষাতে দেবতার স্থাপনা করিতে যাওয়াই যে প্রথমে বিড়ম্বনা হইয়া ছিল! যে প্রতিমায় সাধক মহাশক্তির পূর্ণমূর্ত্তি ভক্তির চক্ষে দেখিতে পায় অবিশ্বাসীর দৃষ্টিতে সে মাটি খড়ের জড় শরীর লইয়া প্রকাশ পায় মাত্র, চিন্ময়ীরূপে আবির্ভূতা হয় না। এই সোজা কথাটা বুঝিতেই কি সবচেয়ে দেরি হইল! রজনীনাথের মেয়ে তাঁহার হৃদয়ে যে অধিকার বিস্তৃত করিয়াছিল তাহা লইয়া খুসী থাকিলেই তো চলিতে পারিত; মানসমন্দিরের ত দেবী পূজার ফল অধিক। রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন "কাঠ খড় আর মাটির গঠন কাজ কি রে তোর সে গঠনে, আয় মনোময়ী প্রতিমা গড়ি পূজা করি সঙ্গোপনে"।

সেদিন শ্যামাকান্তের বিশ্রাম অবসন্ন ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িল ভৃত্য প্রবেশ করিয়া জানাইল—"বাবু এসেচেন।"

"কে বাবু?" এই প্রশ্ন উঠিবার পূর্ব্বেই রজনীনাথ গৃহে প্রবেশ করিলেন। "একি রজনী! আশ্চর্য্য হইয়া শ্যামাকান্ত উঠিয়া সোজা হইয়া বসিলেন "এসো এসো আমি তোমার কাছেই লোক পাঠাব ভাবছিলুম। বসো, সব ভালতো?" শেষের স্বরটা কাঁপিয়া আসিল। রজনীনাথ বেহাইকে প্রণাম করিয়া ভৃত্যের দেওয়া কেদারাখানা শ্যামাকান্তের আসনের দিকে একটু সরাইয়া লইয়া বসিতে বসিতে উত্তর করিলেন "আপনার আশীর্ব্বাদে সব এক রকম চলচে"—মানুষ খুব বেশি রকম একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া উঠিলে প্রথম যে মুহূর্ত্তে সেটাকে অবাস্তব বলিয়া জানিতে পারে সেই মুহূর্ত্তেই তাহার মনে প্রাণে যে রকম একটা গভীর শান্তি ও মুক্তির আনন্দ জাগিয়া উঠে রজনীনাথের আগমনে শ্যামাকান্তও ঠিক সেই রকম একটা স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ আরাম অনুভব করিতে লাগিলেন। বুকের মধ্যে যে যন্ত্রণার শূল ব্যথাটা কণ্ঠ অবধি ঠেলিয়া ঠেলিয়া উঠিতে ছিল মন্ত্র চিকিৎসার অব্যর্থ প্রয়োগের ন্যায় তাহা মুহূর্ত্তে নিবৃত্ত হইয়া গিয়া শরীরে যেন নূতন আশা ও বলের সৃষ্টি করিল। পরিত্যক্ত আলবোলার নলটা তুলিয়া লইয়া ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "আর কেউ এসেছে?" রজনীনাথ শ্যামাকান্তের মুখের পাণ্ডুতা লক্ষ্য করিয়া ঈষৎ কুণ্ঠিত ভাবে মৃদুস্বরে কহিলেন "...নেষ করল সেজন্য একাই এলেম, আপনি ...আছেন তো?

...গশভাবে শ্যামাকান্ত কেদারার পৃষ্ঠে মস্তক নিক্ষেপ করিয়া অধীর কণ্ঠে উত্তর করিলেন "আর ভাল, মৃত্যু ভুলে গিয়েছে তাই বেঁচে থাকা,—না হলে মরণের সময় তো হয়েছে।"

এই কথা কয়টা রজনীনাথকে এমন প্রবলভাবে আঘাত করিল যে তিনি ব্যথিত ও লজ্জিত মস্তক নীরবে হেঁট করিলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শ্যামাকান্ত আর কোন কথাই কহিলেন না, রজনীনাথও চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, বক্তব্য বিষয়টিকে বেশ করিয়া গুছাইয়া সহজ করিয়া লইতে আজ তাঁহার অত্যধিক বিলম্ব ঘটিতেছিল। ক্রমে স্তব্ধ গাছপালা দোলাইয়া, নাড়া দিয়া একটা সর্ সর্ শব্দ উঠিল ও কড় কড় করিয়া মেঘ ডাকিয়া মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল। তখনও ঝাঁক বাঁধিয়া পাখীগুলা ওপারের আশ্রয়াভিমুখে নদীর উপর দিয়া সাঁ সাঁ করিয়া উড়িয়া চলিয়াছে; এপারের ছায়াময় ঘাটের পথে পল্লীবধূগণের মলের ও চুড়ির শব্দ মুখর হইয়া উঠিল। সঙ্কোচ কুণ্ঠিত ভাবে রজনীনাথ সহসা বলিয়া ফেলিলেন—

"আপনি বোধহয় তাদের ক্ষমা করেছেন? সে এরকম ব্যবহার করবে তা"—শ্যামাকান্ত প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কাদের ক্ষমা করেছি?" আবার রজনীনাথ ইতস্তত করিতে লাগিলেন; একটু থামিয়া বলিলেন "যারা আপনার কাছে অমার্জ্জনীয় অপরাধে অপরাধী,—হেম বড় অন্যায় করেছে কিন্তু তার চেয়ে—"

যে নামটা তাঁহার জিহ্বা অপরাধী শ্রেণীর সহিত সংযুক্ত করিতে জড়াইয়া আসিতেছিল সেটা তাঁহাকে জোর করিয়া উচ্চারণ করিবার

প্রয়োজন হইল না। শ্যামাকান্ত বাধা দিয়া কহিয়া উঠিলেন "ক্ষমা,—আমিতো রাগ করিনি ক্ষমা কিসের জন্য? বরং ধরতে গেলে তার কাছে আমিই অপরাধী—"

বৃদ্ধ যেন ধরা ছোঁয়া দিতে রাজি নহেন, রজনীনাথ হতাশ হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

এই সময় বড় রকম একটা ঝড়ো হাওয়া উঠিয়া ঘরের কাগজপত্র ওলোট পালট করিয়া দিয়া রজনীনাথকে একটা কাজ আনিয়া দিল ও পরক্ষণে গর্জ্জন শব্দে মেঘ ডাকিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হওয়াতে তাঁহাকে জানালা বন্ধ করিবার জন্য উঠিতে হইল। ফিরিবার সময় রজনীনাথ একখানা সংবাদপত্র টেবিলের উপর হইতে উঠাইয়া লইয়া আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন কিন্তু শোকাতুর বৃদ্ধের অভিমানাহত চিত্তের রুদ্ধ হতাশা তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ ভিতরে ভিতরে আঘাত করিতে ছাড়িল না।

সেদিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত শিবানী ভিজা চুলগুলা পিঠের উপর ছড়াইয়া দিয়া নিজের শোবার ঘরে নদীর উপরকার জানালাটার কাছে বসিয়া ছিল। এখানে অমূল্যর কোন ভারই তাহাকে লইতে হয় না, দাসী চাকর ও আত্মীয় আশ্রিতদের কোলে কোলে ঘুরিতেই তাহার মাটিতে পা দিবার সময় থাকে না। শিবানীর হাতে কোন বিশেষ একটা কাজও নাই। সংসারের ছোট বড় শত কার্য্য শত দিকে ছড়ান রহিয়াছে। কত দিকে কত বিশৃঙ্খলা কত অপব্যয়, কিন্তু তাহার জন্য একটিও কাজ খালি ছিল না। সে যে কাজে হাত দিতে যায় চারিদিক হইতে মাসী পিসি দিদির দল বাঘিনীর মতন ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরে এবং শুষ্কচক্ষে জল আনিয়া জিব কাটিয়া কান্নারসুরে বিনাইয়া বলিতে থাকে, "ওমা তুমি কি দুঃখে কুটনো কুটবে মা, ওমা আমার বিমুরবৌ, আমি থাকতে পানসেজে হাত ময়লা করবে আর আমি তাই পোড়া চক্ষে বসে দেখব? ও আমার অভাগ্যির দশা!" শিবানীর আর কাজের ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি থাকে না; সে মুহূর্ত্তে হাতের কাজ হাত হইতে নামাইয়া দ্রুতপদে নিজের ঘরে চলিয়া যায়। পরদিন আর কাজে হাত দিতে তাহার কিছুমাত্র আগ্রহ জন্মায় না। এমনি করিয়া কোন একটা জায়গায় সে আপনার বিপর্য্যস্ত হৃদয়কে আবদ্ধ করিবার অবসর বা সাহায্য পর্য্যন্ত পাইতেছিল না। যেটাকে সে কাছে টানিতে যায় সেইটেই যেন নদীস্রোতের বিপরীত মুখে চলিয়া গিয়া তাহাকে উপহাসের সঙ্গে চাহিয়া দেখে। কাজের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিবেদন করিয়া দিয়া যে একটি আত্মতৃপ্তি সে এতদিন বরাবর উপভোগ করিয়া আসিয়াছিল, পূর্ব্বের কর্ম্মশ্রান্ত শরীরের মধ্যাহ্ন ও রজনীর বিশ্রাম অবসরটুকু বেদনায়, কল্পনায় প্রতীক্ষায় ও নিরাশায় যেমন একটি বাঞ্ছনার বিষয় ছিল, সেটুকু তাহার এই নূতন অবস্থা জোর করিয়া তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছে। বন্ধনহীন দীর্ঘাবকাশের স্মৃতির দাহের কাছে সেই স্বল্পাবসরের চিন্তাটুকু কত লোভনীয় শিবানী এখন তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছিল।

বৃষ্টি থামার পর হইতে মেঘ কাটিয়া যাইতেছে। মহাজনী নৌকা ইট ও ...

বোঝাই হইয়া অনিচ্ছুক গতিতে ও খেয়ার নৌকা দ্রুতগমনে গন্তব্য পথে চলিয়াছে। তাহাদের দাঁড়ের উত্থানপতনের শব্দ ও তটপ্রান্তে নিপতিত ভগ্নতরঙ্গের অস্ফুট আর্ত্তনাদে গৃহস্থ গৃহের সন্ধ্যার শঙ্খধ্বনি মিলিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে বর্ষার বাতাস নদীতীরের বাঁধাঘাট হইতে হুহু করিয়া ছুটিয়া আসিল। সেই সাড়ায় চমকিয়া শিবানী একবার মুখ তুলিল, সম্মুখের দেওয়ালে চওড়া ফ্রেমে আঁটা বিনোদ কুমারের অপরিচিত বালক মূর্ত্তি অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া আসিয়াছে। হাঁফ ছাড়িয়া সে আবার মুখ ফিরাইয়া লইল। এখন আর সন্ধ্যা তাহাকে চকিত করিয়া প্রদীপের কাছে টানিয়া আনে না, সন্ধ্যাশঙ্খ অভিমানে মৌন পড়িয়া থাকে।

এমন সময়ে দীপহস্তে সিদ্ধেশ্বরী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন "ঢের ঢের বেহায়া দেখেছি বাবা, এমন ধারা কিন্তু আমার বাপ চোদ্দপুরুষে কখনও দেখেনি! মিনষে কোন মুখ নিয়ে আবার ওকেলতি করতে এলো গা?"

শিবানী যেন ঈষৎ চকিত হইয়া উঠিল, হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল "কে মা?" কন্যার এই অনুসন্ধিৎসায় সিদ্ধেশ্বরী হঠাৎ খুব উৎসাহিত হইয়া প্রসন্নভাবে বলিয়া উঠিলেন—"হেমার শ্বশুর মিন্‌সে এসেছে যে তা জানিসনে? সেই অবধি বেইএর কাছে হত্যে দিয়ে পড়ে আছে, ওঠবার নামটি পর্য্যন্ত নেই। কি যে সলাচ্ছেন কলাপাতে তা কেষ্ট জানেন। একে তো বুড়র তাদের ওপারেই সাতটা প্রাণ—আমার গুঁড়োটুকু যেন ওর"—শিবানী বিদ্যুৎ স্পৃষ্টের মত মুহূর্ত্তে ফিরিয়া বলিল "তিনি কি একলা এসেছেন মা?" সিদ্ধেশ্বরী সাদা পাথরের টেবিলে তৈলদীপটা নামাইয়া রাখিয়া একটুখানি মুখ বাঁকাইয়া অপ্রসন্ন স্বরে উত্তর করিলেন "আপাতক একলাই বটে, তা বেশিক্ষণ আর একলা থাকচে না! মিন্‌ষে আমাদের শত্রুর ছিল, তা দেখমা শিবু, একটা কাজ কর দেখিন্ সকল্ দিকেই ভাল হবে। তোর শ্বশুরকে বল্ আমি ওদের সঙ্গে থাকতে পারব না—থাকতে হয় ওরা অন্য কোথাও থাকুক—"

দীপ্ত সূর্য্যালোকের উপর মেঘ আসিয়া পড়িলে তাহা যেমন এক মুহূর্ত্তেই ম্লান হইয়া যায়। শিবানীর মুখ তেমনি মুহূর্ত্তে অন্ধকার হইয়া আসিল। সে একটুখানি মুখ ফিরাইয়া বক্ষের আঘাতটা সামাইয়া লইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল। মার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ফিরিয়া উদ্ধতভাবে বলিল 'না'। তাহার মুখের উপর ঘন লাল রংয়ের একটা তপ্ত শোণিতের উচ্ছ্বাস স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল দীপের আলোকেও তাহা সিদ্ধেশ্বরীর অগোচর রহিল না। তিনি মনে মনে একটু ভয় পাইয়া গেলেও হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া গেলেন, অথচ কন্যার এই আসন্ন ঝড়ের মতন স্তব্ধ মুখের দিকে চাহিয়া—তাহাকে তাহার জেদের বিরুদ্ধে লওয়াতে চেষ্টা করা যে কতখানি অসাধ্য ব্যাপার তাহা বুঝিলেন। তাহা নাজানা ছিল এমনও নয়। মনে মনে জ্বলিতে লাগিলেন। কিন্তু যাহা আর কখনও ঘটিতে দেখা যায় না আজ তাহাই ঘটিল। এক মুহূর্ত্ত পরেই শিবানীর মুখের রং বদলাইয়া গেল ও সে চমকিত

হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া ব্যস্ত হইয়া বলিল, "রজনীবাবুর খাবার বন্দোবস্ত করতে হবেতো মা, তাঁকে বোধহয় খাওয়ান হয়নি ?"

"কে জানে বাছা আমার অত সাত-কুটুমের খপর রাখবার অবসর নেই, যাদের রস পড়েচে তারা করুক গিয়ে। আমি নিজের জ্বালায় নিজেই জলে মরচি—নেহাৎই সন্ধ্যাবেলায় 'বাড়ি বন্ধনের' তুকটি না করলে নয় তাই এই শরীল নিয়েও মরতে মরতে আসি। বলি কোন্‌দিন আবার চোরডাকাতে সব্বসিৎ লুটে নে যাবে।—থাকগে—যদ্দিন আছি কেউ বুঝুক না বুঝুক আমার কম্মতো আমি করি,—তাপর যার কপালের যা লেখন আছে সে ভুগ্‌বে। হরি হে দীনবন্ধু !"

সিদ্ধেশ্বরী গলায় অঞ্চলের প্রান্ত দিয়া নদীর দিকে মুখ করিয়া দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া নদীতীরস্থ সন্ধ্যাদেবীকে প্রণাম করিতে করিতে দেখিলেন, শিবানী চলিয়া যাইতেছে। এক মুহূর্ত্তে সিদ্ধেশ্বরীর পায়ের তলা হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত রাগে ঝাঁ ঝাঁ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। হ—াগা মেয়ে তাঁহার একটা পরামর্শ লইবে না আবার উল্‌টিয়া বিশেষ করিয়াই যেন তাঁহার শত্রু পক্ষের সঙ্গেই মেলা মেশা আদর আপ্যায়িত করিবে। এ পেটের শত্রুরই তাঁহার সবচেয়ে যন্ত্রণার কারণ হইয়াছে। এক বাবু বুঝি যদি নিজের ভাল মন্দ নিজে দেখ। তা যখন পারবে না তখন মায়ের চেয়ে তো আর কেউ সংসারে আপন হবে না তা সেই মাকেই তোর লাভ লোক-সান ভারবার ভার দিয়ে যা বলি তা চুপকরে মেনে যা—তা নয় ! যেটিতে নিজের ক্ষতি হবে সেইটিই যেন বিশেষ করেই করবে ? প্রকাশ্যে বিরক্ত কণ্ঠে তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন "শোন্‌ শিবানী ! তোর ভাল যদি চাস্‌ এখনো বুঝে চল, ওদের এ বাড়িতে ঢোকবার পথ বন্ধ কর। না হলে এখানে তোর জায়গা হবে না তা কিন্তু আমি এই দিব্যি করে বলে দিলুম,—দেখে নিস্‌"—শিবানী যাইতে যাইতে বিদ্যুৎবেগে ফিরিয়া দাঁড়াইল, তাহার দুই চক্ষু প্রদীপ্ত—সে কঠিন স্বরে বলিল, "নাই বা হলো আমি এ বাড়িতে জায়গা চাইনে !"—

সিদ্ধেশ্বরী আজন্ম ধরিয়া তাহাকে চিনিয়া আসিলেও তাহার আজিকার এই কয়টা কথায় অত্যন্ত চমকিত হইলেন। এই বাড়ি, এই দাসী চাকর, এই বাগান বাগিচা, সোনাদানা, রাজ ঐশ্বর্য্য সে এসব চাহে না ? শিবানী বলে কি ? সে পাগল হইয়াছে ! বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "সত্যি কি তুই তাদের জন্যে পেটের ছেলেটাকে সুদ্ধ ফাঁকি দিতে চাস্‌ নাকি ?" সংসারে যে এরকম অনাসৃষ্টি বুদ্ধ থাকিতে পারে সে কথা যেন তিনি তাঁহার এই এতখানি বয়সের মধ্যে এই প্রথম জানিতে পারিলেন। শিবানী দৃঢ়স্বরে উত্তর করিল "হুঁয়া"। সিদ্ধেশ্বরী দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া গালে হাত দিলেন, এ মতের বিরুদ্ধে কোন প্রকার যুক্তি তর্ক প্রযুক্ত হইতে পারে বলিয়া তখন আর তাঁহার মনে হইল না। শিবানী নীরবে ঘর হইতে বাহির হইয়া পাশের সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল। মুখে যত খান দেখাক্‌ ভিতরে ভিতরে শত্রু নিপাতে যে সেও খুসী না হইয়া থাকিতে পারে নাই এমন বিশ্বাস সিদ্ধেশ্বর

এতদিন নিঃসন্দেহ রূপে ত্যাগ করিতে পারেন নাই। কিন্তু আজ তাহার সংশয় দূর হইল। সে যে জুয়াচোর রজনীনাথের জালে সম্পূর্ণরূপ জড়াইয়া একেবারেই নিজের সর্ব্বনাশ করিয়া বসিবে, এই বাড়ি এই ঘর সমুদয় চুলচেরা করিয়া পোষ্যপুত্র হেমেন্দ্র তাহার অসহায় দুধের শিশুর সহিত ভাগ করিয়া লইয়া এখানে আসিয়া বসিবে, তাহা তিনি দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। আর তখন যে সে একদিন কোনও ছুতায় শিশুকে নিজের ঘরে লইয়া গিয়া তাহার গলাটি টিপিয়া মারিয়া আম বাগানে ঐ ভাঙ্গা পাতকুয়াটার মধ্যে ফেলিয়া দিবে না তাই বা কে বলিতে পারে। আর যদি বা তা নাও দেয় তবুও এই কাঁড়ি কাঁড়ি পিতলকাঁসার বাসন, সিন্দুক সিন্দুক সাল দোসালা, রূপাসোনার বস্তু এসবই তো তাঁহার নিকট হইতে অর্দ্ধাঅর্দ্ধি ছিনাইয়া লইবে! এমন কি রান্নাঘরের পিঁড়িগুলি পর্য্যন্ত ভাগের হাত এড়াইতে পারিবে না! এ অত্যাচার অসহ্য! হে ঠাকুর! যে হতভাগারা বিনি অপরাধে এমন করিয়া তাঁহার গলা মারিতে কোমর বাঁধিয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে তাহাদের কি কখনও ভাল হওয়া উচিত? না ভাল হইবে?

সিদ্ধেশ্বরী রাগে গস গস করিতে করিতে নীচে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, শিবানী রান্নাঘরে গিয়া কাহারও নিষেধ না মানিয়া নিজের হাতে মাছের কালিয়া রাঁধিতে বসিয়া গিয়াছে। মাসিমা কহিলেন, "এত করে বারণ করলুম কিছুতেই বৌমা শুনলেন না। দেখলে দিদি কি রকম সাহস—এই গরম!" সিদ্ধেশ্বরীর মুখ কালো হইয়া উঠিয়াছিল ঝঙ্কার করিয়া বলিয়া উঠিলেন "মরুকগে; পোড়ামেয়ে যাদের বাঁদিগিরি করতে জন্মেচেন তাদের সেবা করে মরুন! নেহাৎ মায়ের প্রাণ তাই ওর জন্যে শরীর পাত করে মরি,—থাকতে পারিনে তাই বলি,—কুপুত্তুর হলেও তো কুমাতা হবার যো নেই। তা অধম্মি মেয়েটা একবার সেটা ভাবে!" মাসিমা হরি নামের মালা ফিরাইতে ফিরাইতে একটু সহানুভূতির স্বরে কহিলেন "ওকথা আর বলো কেন বোন, ঐ দুঃখেই মরে আছি! আমার মনটা বড়ই নরম কিনা, কারু কষ্ট দেখলে চোখের জল সামলাতে পারিনে। ওইযে কথায় বলে "আপন দুঃখ অসম্বারি, পরের দুঃখ সইতে নারি"— আমার হয়েচে ঠিক তাই। তা বোন ভাল কথা, আমায় আজ তোমার সেই জল পড়াটি শিখিয়ে দাও না ভাই। বিধুর ছোট মেয়েটা বিকেল থেকে পেট কামড়ে খুন হয়ে যাচ্ছে। অমন গুণ তো কোন ড্যাক্তর ওষুধেরও দেখতে পাইনে! সেদিন কেষ্টা ছোঁড়াটার কি কান্নাই থামিয়ে দিলে!"

সিদ্ধেশ্বরীর মনের অবস্থা তখন মন্ত্রদানের ঠিক উপযোগী না হইলেও মন্ত্র মাহাত্ম্য শ্রবণে তাঁহার মনটা হঠাৎ গলিয়া পড়িল। খুসী হইয়া কহিলেন "তা তোমায় শেখাতে পারি বোন। কিন্তু যেন দু'কান না হয়ে যায়; তাহলে আর ওতে কাজ হবে না। এ মন্তর কি অমনি পেয়েচি! আমার পিস শাশুড়ির ননদের 'মা' কত সাধ্যি সাধনায় তবে মরবার সময়ে আমায় দিয়ে গ্যাছে! এ আর কেউ জানে না এই তুমিই যা আজ শুনে নিলে। শোন বলি তবে; কানের কাছে চুপি চুপি বলতে হবে কেউ কোথা দিয়ে না শুনে ফেলে—

"রাম লক্ষ্মণ সীতে যান কিষ্কিন্দার পথে; সাথে নিলে হনুমান আর সুগ্রীব মিতে; সুগ্রীব বলেন মিতে আমি মন্তর এক জানি, পেটের ব্যথায় অব্যথা হয়ে যায় প্রাণী।" তিনবার মন্তর বলে জলে তিনটি ফুঁ দিয়ে ছেঁতেলায় দাঁড়িয়ে খাওয়াতে হবে। এ অব্যর্থ বোন অব্যর্থ।"

উৎকলের শৈল-শিল্প।

উৎকলের শিল্প-ভাণ্ডার বিশাল-অতলস্পর্শ! সাগর-তটে, লোকালয়ে, অরণ্যে এবং পর্ব্বতে, এই অসাধারণ শিল্প-কীর্ত্তি-মালার, কত ক্ষুদ্র-বৃহৎ চিহ্ন যে বর্ত্তমান আছে, তাহার সকলগুলির সম্পূর্ণ ইতিহাস সঙ্কলন করা একান্ত কঠিন,—এমন কি অসম্ভব। আজও পর্য্যন্ত কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ এ বিষয়ে সফল কাম হইতে পারেন নাই। পরন্তু, কাল-প্রভাবে প্রাচ্য-শিল্পের কত উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ধ্বংস কবল-গত হইয়াছে, তাহাও জানিবার উপায় নাই। এবং অনেক শিল্প-কীর্ত্তি, হয়ত' আজও পর্য্যন্ত নর-দৃষ্টির অন্তরালে অরণ্যচারী শ্বাপদের নিরাপদ বিরাম সঙ্কেতন হইয়া আছে।

এই উৎকলেই সম্রাট ধর্ম্মাশোকের প্রসিদ্ধ অনুশাসনলিপি, শৈলাঙ্গে উৎকীর্ণ হইয়া সর্ব্বজীবে অহিংসা, সাম্য ও মৈত্রী প্রচার করিতেছে। এই উৎকলেই বৌদ্ধধর্ম্মের অন্তিম-নিশ্বাস হিন্দুধর্ম্মের সহিত একীভূত হইয়া গিয়া সর্ব্বলোক নমস্য জগন্নাথের সৃষ্টি করিয়াছিল এবং নীচের প্রতি উচ্চের অত্যাচার, শূন্যগর্ভ আভিজাত্যবাদ ও তুচ্ছ সাম্প্রদায়িক ভেদ-নীতি ঘুচাইয়া, নিখিলের এক-ই আসন নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিল। এবং এই উৎকলেই প্রাচ্য-স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন-মালা অদ্যাপি বিদ্যমান। পুস্তক-বদ্ধ ইতিহাস সর্ব্বস্থলে দুষ্প্রাপ্য। উৎকলের শিল্পের সহিত বহু বিচিত্র ইতিহাসের উপকরণ বর্ত্তমান। আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে যোগ্যতর ব্যক্তি তাহা সংগ্রহের জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন।

উৎকলের অধিকাংশ স্থান এক শৈল-শৃঙ্খলে বেষ্টিত। স্থানে স্থানে তাহা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। যেখানে যেখানে তাহা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, সেইখানেই একই শৈলের বিভিন্ন নাম প্রদত্ত হইয়াছে। যেমন মুণ্ডক, মহা-বিনায়ক, কপিলাশ, খণ্ডগিরি, উদয়গিরি, রত্নগিরি, ললিতগিরি, নীলগিরি ও ধবলাগিরি প্রভৃতি। খণ্ডগিরির একাংশকে উদয়গিরি বলা হয়। তদ্ভিন্ন আর এক উদয়গিরি আছে। তাহা বিরূপা নদীর তটে অবস্থিত। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, এই উদয়গিরিকেই তাঁহার "সীতারামে"র সেই প্রসিদ্ধ বর্ণনায় স্থানদান করিয়াছেন।

আমরা সেই উজ্জ্বল বর্ণনা এখানে উদ্ধার না করিয়া পারিলাম না। ইহাতে আমাদের বক্তব্য বিষয় আরো প্রস্ফুট হইবে।:—

"এক পারে উদয়গিরি, অপর পারে ললিতগিরি, মধ্যে স্বচ্ছসলিলা কল্লোলিনী বিরূপানদী, * * *

উদয়গিরি বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ, কিন্তু ললিতগিরি বৃক্ষশূন্য প্রস্তরময়। এককালে ইহার শিখর ও সানুদেশ অট্টালিকা, স্তূপ এবং বৌদ্ধ মন্দিরাদিতে শোভিত ছিল। এখন শোভার মধ্যে শিখরদেশে [illegible]বৃক্ষ, আর মৃত্তিকা প্রোথিত ভগ্নগৃহাবিশিষ্ট প্রস্তর, ইষ্টক বা মনোমুগ্ধকর প্রস্তরগঠিত মূর্ত্তিরাশি। তাহার দুই চারিটা কলিকাতার বড় বড় ইমারতের সঙ্গে থাকিলে কলিকাতার শোভা হইত। * * এই ললিতগিরি আমার চিরকাল মনে থাকিবে। * * চারিপাশে মৃত মহাত্মাদের মহীয়সী কীর্ত্তি। পাথর এমন করিয়া কে পালিশ করিয়াছিল, সেকি এই আমাদের মত হিন্দু? এমন করিয়া বিনাবন্ধনে যে গাঁথিয়াছিল, সে কি আমাদের মত হিন্দু? আর এই প্রস্তর মূর্ত্তিসকল যে খোদিয়াছিল,—এই দিব্য পুষ্পমাল্যাভরণ-ভূষিত বিকম্পিত চেলাঞ্চলপ্রযুক্ত সৌন্দর্য্য, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গঠন, পৌরুষের সহিত লাবণ্যের মূর্ত্তিমান সংমিলন স্বরূপ পুরুষমূর্ত্তি, যাহারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু? এই কোপপ্রেমগর্ব্ব সৌভাগ্যস্ফুরিতাধরা, চীনাম্বরা, তরলিতরত্নহারা, পীবর যৌবন ভারাবনতদেহা—

[illegible] শিখরদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণী প্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ—

এই সকল স্ত্রীমূর্ত্তি যারা গড়িয়াছে, তারা কি হিন্দু? তখন হিন্দুকে মনে পড়িল। * * সেই ললিতগিরির * * হস্তিগুম্ফা নামে এক গুহা ছিল। * * গুহা * আর নাই।* কিন্তু গুহা বড় সুন্দর ছিল। পর্ব্বতাঙ্গ হইতে খোদিত স্তম্ভপ্রাকার প্রভৃতি বড় রমণীয় ছিল। চারিদিকে অপূর্ব্ব প্রস্তরে খোদিত নরমূর্ত্তি সকল শোভা করিত। তাহারই দুই চারিটি আজিও আছে। কিন্তু ছাতা পড়িয়াছে, রঙ্গ জ্বলিয়া গিয়াছে, কাহারও নাক ভাঙ্গিয়াছে, কাহারও হাত ভাঙ্গিয়াছে, কাহারও পা ভাঙ্গিয়াছে। পুতুলগুলাও আধুনিক হিন্দুর মত অঙ্গহীন হইয়া আছে। কিন্তু গুহার এ দশা [illegible]কাল হইয়াছে।"*

*[illegible]নায়ক পর্ব্বত ব্রাহ্মণীনদীর তটে অবস্থিত। উহার উপরে গণপতির মন্দির আছে। মন্দির, সাতশত বৎসরের প্রাচীন। রত্নগিরি কেলুনো শাখার উত্তর দিকের তীরে বিরাজিত। কপিলাশ শৈল দু'হাজার ফুট উচ্চ। নীলগিরি একটী সুদীর্ঘ শৈল,—কিন্তু ইহার উচ্চতাও অধিক নয়, এবং এখানে আজ অবধি কোন প্রাচীন কীর্ত্তি আবিষ্কৃত হয় নাই। নীলগিরি, শিকারের জন্য প্রসিদ্ধ। ধবলগিরি বা ধৌলি পর্ব্বত, উৎকলের খুর্দ্দা বিভাগের অন্তর্গত। এখানেই সম্রাট অশোকের পালিভাষার অনুশাসনলিপি আছে। আমরা, এই ধবলগিরি হইতেই আমাদের প্রবন্ধ আরম্ভ করিব। কিন্তু তাহার আগে, উৎকলের ইতিহাস সম্বন্ধে সামান্য আলোচনার আবশ্যক। প্রাচীন উৎকলের ইতিহাস পৃষ্ঠায় দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে, কি অপূর্ব্ব বৈচিত্র্য দেখা যায়!

উৎকলের রাজনীতিক্ষেত্রের উপর দিয়া, এত বিভিন্ন জাতির এবং বিভিন্ন বংশের পরাক্রান্ত নেতাগণের পরস্পর সংঘর্ষণের জন্য তুমুল ঝটিকা বহিয়া গিয়াছে, যে ভাবিয়া দেখিলে অবাক হইতে হয়! প্রাচীন উৎকলে কত জাতির উত্থান-পতন হইয়া গিয়াছে, আমরা নিম্নে তাহার একটী তালিকা দিলাম :—

রাজবংশ	কল্যাব্দ
১ আর্য্য-রাজত্ব	১—২৭৮২
২ বৌদ্ধ রাজত্ব	২৭৮৩—৩৫৭৩
৩ কেশরীবংশ	৩৫৭৪—৪২৩০
৪ গঙ্গাবংশ	৪২৩১—৪৬৩৪
৫ রাজপুত রাজত্ব	৪৬৩৪—৪৬৫৭
৬ পাঠান রাজত্ব	৪৬৫৮—৪৭১০
৭ মোগল রাজত্ব	৪৭১১—৪৮৫০

* সীতারাম—১৪—১৭

৮ মহারাষ্ট্রীয় রাজত্ব ৪৮৫১—৪৯০৩
৯ ইংরাজ রাজত্ব ৪৯০৪—

উৎকলের শিল্পযুগ, বলিতে গেলে, গঙ্গাবংশের পরেই একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়া যায়। এবং এই শিল্পযুগের আরম্ভ হইয়াছিল বৌদ্ধ-রাজত্বে। তাহার পর, মোগল পাঠানের হস্তে উৎকলীয় শিল্পের অশেষ দুর্দ্দশা হইয়াছে। এই অত্যাচারী পরধর্ম্মদ্বেষিগণের হস্তে উৎকল শিল্পের উৎকৃষ্ট ভাগ বিধ্বংস স্তূপে পরিণত হইয়াছে। কণারকে, জগন্নাথে ও ভুবনেশ্বরে ইহার সংখ্যাধিক দৃষ্টান্ত দেখা যায়। এই অত্যাচারের পরিবর্ত্তে, মুসলমানগণও উৎকলে কয়েকটী শিল্পসৌন্দর্য্য দান করিয়া গিয়াছে। ভিন্ন প্রবন্ধে, যথাসময়ে তাহা লিখিত হইবে।

ধবল-গিরি।—১৮৩৮ খৃঃ অব্দে, মার্কহাম কিটো, এই স্থান পরিদর্শন করেন। এবং তিনিই সর্ব্বপ্রথমে ইহার কাহিনী সকলের গোচরীভূত করেন। এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্নালে, তিনি এই স্থানের যে বিবরণ প্রকাশ করেন, তাহাতে জানা যায়,—তাঁহার পরে, ধবলগিরির শিল্প ভাণ্ডারের বহু পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে। আমরা তাঁহার বর্ণনা হইতে স্থলবিশেষ উদ্ধার করিলাম :—

"ধবলগিরির তিনটী শৈল, সমতল-ভূমি হইতে উঠিয়াছে। ইহারা পাঁচ কারলং স্থান অধিকার করিয়া আছে। নিকটে, সাত দশ মাইলের ভিতরে আর কোন শৈল নাই। পশ্চিমদিকের শৈলের উচ্চতা ২৫০ ফুট হইবে। পূর্ব্বদিকের শৈলে, মহাদেবের একটী ধ্বংস-ভগ্ন মন্দির আছে। এবং অন্যান্যদিকে কয়েকটী ক্ষুদ্র গুম্ফা আছে। পরন্তু অনেক গুম্ফার ভগ্নাবশেষও দেখা যায়।" (Journal of Asiatic Society. vol. VII. pp. 436.

ধবলগিরির উপরে, "কোশল-গঙ্গা" নামে একটী প্রসিদ্ধ বাপী আছে। এই বাপী সম্বন্ধে একটী কাহিনী আছে। কিন্তু রাজেন্দ্রবাবু তাহা প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করেন না। এইখানেই ধর্ম্মাশোকের অনুশাসনলিপি আছে।

দশ ফুট চওড়া ও আঠারো ফুট লম্বা, একটী স্থান উত্তমরূপে পালিশ করা হইয়াছে। তাহার উপরেই অনুশাসনের অক্ষরগুলি খোদিত হইয়াছে। খোদিত স্থানটী চারি ভাগে বিভক্ত। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন,—

"প্রথম অংশটী, অপর ভাগত্রয়ের সঙ্গেই খোদিত হয় নাই। তাহা ভিন্নকালে খোদিত।"

Antiquities of Orrissa. Vol. I. p.p. 55.

এই অনুশাসনের কাছেই একটী চাতাল আছে। তাহার পরিমাপ, লম্বে ১৬ ফুট ও চওড়ায় ১৮ ফুট। চাতালের দক্ষিণ দিকে একটী হস্তীর পূর্ব্বার্দ্ধভাগ বর্ত্তমান আছে। তাহার উচ্চতা চার ফুট। হাতিটীর অঙ্গের ডৌল ও গঠন, শিল্পীর নিপুণতার পরিচায়ক। ডাঃ হাণ্টার বলেন :—

"সর্ব্বপ্রাচীন অনুশাসন-লিপির খোদনকাল, খৃঃ পূঃ ২৫০ বৎসর। বুদ্ধের বৃহৎ মূর্ত্তিও এখানে পাওয়া গিয়াছে।"

(Hunter's "Orissa',—Vol. I., p.p. 178-9)

বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ ডাঃ উইলসন ও মহাত্মা প্রিন্‌সেপ অশোকের অনুশাসন অনুবাদ করিয়াছেন। প্রিন্সেপের অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমেই এই অমূল্য অনুশাসন আবিষ্কৃত হয়। তাহার অনুবাদ এখানে দেওয়া অসম্ভব। আমরা তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এখানে প্রকটিত করিয়া দিলাম :—

"আপনার উদর পূরণ অথবা যজ্ঞের নিমিত্ত পশু পক্ষী বিনাশ করিও না।

"কি মানব এবং কি পশু, সকলের জন্যই চিকিৎসালয় স্থাপন করিও। আতপতাপ ও তৃষ্ণার্ত্তের জন্য পথিপার্শ্বে তরুরোপণ ও বাপি-খনন করিও।

"পঞ্চম-বৎসরান্তে ধর্ম্ম-বিষয়ক আদেশ প্রচার করিও।

"বিগত ও বিদ্যমান রাজার শাসনের তুলনা করিও।

"স্বদেশীয় ও বিদেশীয়ের নিমিত্ত প্রচারক নিযুক্ত করিও।

"প্রজাগণের উন্নতি ও শিক্ষাবিধানের জন্য লোক-নিযুক্ত করিও।

"অসম্প্রদায়িতা পরিহার করিও।

"বিগত রাজাগণের ইন্দ্রিয় বিলাস ও রাজশাসনের পরিবর্ত্তন—উভয়ের সম্বন্ধ পৃথক।

"ধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশদানের তুল্য অমূল্য দান আর নাই।

"সকলকে উপদেশ দেওয়া উচিত।

"ধর্ম্মই প্রকৃত সুখের নিয়ন্তা। পবিত্র-কর্ম্মে ইচ্ছা প্রবর্ত্তন—ধার্ম্মিক হইতে হইলে পুনঃ অনুষ্ঠানের আবশ্যক। এবং পর-হিতৈষিতা, ও সত্যবাদিতা, বদান্যতা ও করুণা প্রভৃতির তুল্য পবিত্র অনুষ্ঠান কোথায়?"

বৌদ্ধ ভক্তগণের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ জন্য এই সকল সদুপদেশ লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। তাঁহারা, এই উপদেশ অনুসারেই কার্য্য করিতেন। এবং যতদিন তাঁহারা এই উপদেশ বিস্মৃত হন নাই, ততদিন বৌদ্ধধর্ম্মের ক্রমিক প্রসার হইয়াছিল।

রত্নগিরি।—উৎকল শৈল-শিল্পের এই অপূর্ব্ব স্থানের আবিষ্কর্ত্তা একজন বাঙ্গালী; তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী। সৌভাগ্যের বিষয়, সন্দেহ নাই।

পাহাড়ের শীর্ষে মহাকালীর এক মন্দির আছে। মন্দিরের সম্মুখভাগ পশ্চিমদিকে। মন্দিরটী অপেক্ষাকৃত আধুনিক; অন্ততঃ দেখিলে, এইরূপ বোধহয়। দ্বারপথের নিকটে বিভিন্ন ভঙ্গিমার অনেকগুলি প্রস্তর মুরত আছে। তাহাদের কোনটীর উচ্চতা একফুট মাত্র এবং কোনো কোনোটী সাড়ে তিন ফুট। সম্ভবতঃ, অদ্যাপি অনেক প্রস্তরমূর্ত্তি এখানে প্রোথিত আছে। ইতিমধ্যেই, তাহার কতকগুলি খননপূর্ব্বক উদ্ধার করা হইয়াছে।

পাহাড়ের উচ্চাংশে একটী ইষ্টক-বাঁধ (Brick mound) দেখা যায়। বোধহয়, উহা কোন প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংস সাক্ষ্যস্বরূপ। খননের ফলে, কতকগুলি ভগ্নমূর্ত্তির মস্তক পাওয়া গিয়াছিল। স্থির হইয়াছে, মস্তকগুলি বুদ্ধের। মুখগুলির ঠোঁট পুরু,—কাফ্রিদের মত। নাসিকা চ্যাপটা। পাহাড়ের ইতস্তত অনেক খণ্ড প্রস্তর বিক্ষিপ্ত আছে। তাহাতে পশু ও লতাপাতার খোদনচিত্র দেখা যায়।

"এখানকার মন্দির রাজা বাসুকল্প কেশরী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। ললিতগিরির শিল্পকার্য্য ইহারই কৃত।" (List of Ancient Monuments of Bengal.")

রত্নগিরি সম্বন্ধে, ইতিহাসে আর বেশী কিছু কথা পাওয়া যায় না। তবে, ইহার প্রাকৃতিক শোভা বিচিত্র। দূরে তৃণ শ্যামলিতা ভূমি, বিহগের কল-বিরাব, মধুপের গুঞ্জন-গীতি। যেন একখানি সুলিখিত চিত্র। যেন একটী মূর্ত্তিমান সঙ্গীত।

উদয়গিরি।—আগেই বলিয়াছি, বিরূপার তীরে, উদয়গিরি অবস্থিত। বৎসরের অন্যান্য কালে বিরূপা নদী তেমন ভয়ানক নয়, কিন্তু বর্ষাকালে ইহার শ্রী ফিরিয়া যায়।

চারিদিকের শোভা অপূর্ব্ব। কোথাও দূর-প্রসার বালুকাপ্রান্তর, কোথাও নবহরিৎ ধান্য ভূমির মাধুরিমা, কোথাও কুসুমিত বনকুঞ্জের রাঙিমা, কোথাও মেঘচ্ছায়া সুপ্ত বনান্তের শ্যামলিমা, উপরে আকাশের নবঘন নীলিমা এবং মধ্যে পরমা শান্তির নিভৃত তপোবন প্রতিম উদয় ও ললিত গিরির শাশ্বত শিল্প মহিমা!

এই পাহাড়ের উদয়গিরি নাম হইবার কারণ আছে। সমগ্র উড়িষ্যার মধ্যে এই স্থান হইতেই প্রাচী'র তোরণে ভাস্করের মুকুটচ্ছটা সর্ব্বপ্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার অপর নাম আলতিগিরি। অনেকে বলেন, এই পাহাড়ের তলদেশ দিয়া আগে সাগরের তরঙ্গ-ভীষণ ফেনায়িত বিশাল বারিরাশি বহিয়া যাইত। পাহাড়ের পূর্ব্বদিকে এখনো সাগর-তট পর্য্যন্ত এক বৃহৎ বালুকাভূমি দেখা যায়।

উদয়গিরির প্রধান মন্দিরটী বুদ্ধদেবের। ইহা তিনভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগে বুদ্ধের একটী বৃহৎ প্রস্তর-মূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিটী এখন আ-বক্ষ-প্রোথিত। ইহা মূল হইতে উচ্চতায় দশ ফুট। ইহার সম্মুখে, একটী চাঁদনী ছিল, তাহার ধ্বংসাবশেষ এখনো দেখা যায়। ১৮৭০খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ইহা বর্ত্তমান ছিল। কতকগুলি সমভুজ (rectangular) স্তম্ভ ইহার ভার-বহন করিত। মন্দিরের শেষভাগে একটী ইষ্টকপ্রাচীর এবং পূর্ব্বমুখী একটী দ্বারপথ ছিল। এখন একটী বাঁধ, তাহাদের শেষচিহ্ন স্বরূপ বর্ত্তমান আছে। মন্দিরের উত্তরদিকে বোধিসত্ত্বের দুটী প্রকাণ্ড মূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিদ্বয়ের কার্য্য নিপুণভাবে সম্পাদিত। আশেপাশে আরো কতকগুলি ক্ষুদ্রতর মূর্ত্তি। তাহার ভিতরে, একটীর উচ্চতা চারিহাত। কিছু উত্তরে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আবিষ্কৃত আরো দুটী মূর্ত্তি। তন্মধ্যে একটী পুরাতন ইষ্টকরাশির ভিতর হইতে তোলা হইয়াছিল, এবং অপরটী জঙ্গল পরিষ্কার করিবার সময়ে দৃষ্টিপথে পড়িয়া যায়। উভয়মূর্ত্তিই বোধিসত্ত্বের এবং উভয়েরই উচ্চতা এক,—ছয় ফুট। পশ্চিমদিকে, শৈলাঙ্গে একটী বৃহৎ বাপী। সেটি চতুর্দ্দিকে ২৩ ফুট এবং গভীরতায় ২৮ ফুট। খণ্ডগিরির 'আকাশগঙ্গা' এত বড় না হইলেও—তাহার গভীরতা ইহার অপেক্ষা অধিক। ইহার চারিপাশে একটী পাথরের চাতাল। ৯৪২ ফুট লম্বা ও ৩৯ ফুট চওড়া। চাতালে যাইবার পথে দুটি ভগ্ন স্তম্ভ আছে। ইহার কিছু দূরে একটী সোপান,—তাহার ৩০টী ধাপ। ধাপগুলি পূর্ব্বোক্ত কুণ্ডের জলের দিকে নামিয়া গিয়াছে। সকলের নীচের ধাপ ও প্রাচীরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে, শৈলাঙ্গ খিলানের আকারে কর্ত্তিত হইয়াছে। তাহার উপরে লিখিত আছে, "স্বস্তি বালক শ্রীব্রজনাগস্য বাপী।". ইহা দ্বারা জানা যায় শ্রীব্রজনাগ নামা কোন ব্যক্তির দ্বারা এই কুণ্ড খনিত হইয়াছিল।

প্রবেশপথে দ্বিহস্ত পদ্মপাণি বোধিসত্ত্বের একটী প্রস্তরমূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিটী দণ্ডায়মান। উচ্চে আট ফুট। মিঃ জে বিম্‌স্ সি এস, এসিয়াটীক সোসাইটীর মাসিকপত্রে ইহাকে আট ফুটই বলিয়াছেন; কিন্তু শ্রীযুত চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন—

"এই মূর্ত্তির অর্দ্ধাংশ জঙ্গল দ্বারা আবৃত, এবং আর এক অংশ ভূমধ্যে প্রোথিত। ইহার সম্পূর্ণ উচ্চতা নয় ফুট। এবং জানু হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সাত ফুট।"

Journal of Asiatic Society. xxxix. p.p. 16..)

ইহাই উদয়গিরির বর্ত্তমান অবস্থা। উপরিউক্ত বিবরণপাঠে, সকলেই বুঝিতে পারিবেন,—এমন কোন দর্শনযোগ্য বিষয় উদয়গিরিতে নাই,—যাহার জন্ত কাহারো লুব্ধচিত্ত তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এখন কেবল ধ্বংসের পর ধ্বংসস্তূপ—এখানে একটা মূর্ত্তি গড়াগড়ি যাইতেছে, ওখানে উচ্চছাদ কঙ্করে পরিণত হইয়াছে, পাথরের শিল্পকার্য্য, সেই কারুকল্পিত লতাপাতা, সুগ্রীব অশ্ব, সুগঠন হস্তী, তাহাদের সতেজ ভঙ্গিমা,—মনোহারিভাব লইয়া—পাথরের গায়েই মিলাইয়া গিয়াছে, কুণ্ডের জলে পানা ধরিয়াছে, সমস্তই যেন বিয়োগান্ত নাটকের শেষ দৃশ্যের মত,—যে দেখিবে, সেই চোখের জল রাখিতে পারিবে না।

ললিতগিরি। ইহার অপর নাম নাল্তিগিরি। ইহার দুইটী অসমোচ্চ শিখর আছে। মধ্যে একটী পথ। যে পাহাড়ের শীর্ষ, অন্যটীর অপেক্ষা ছোট,—তাহারই উপরে প্রধান ধ্বংসস্তূপ দেখা যায়। পূর্ব্বোক্ত মধ্যবর্ত্তীপথের উপরে একটী ছোটখাটো মন্দির আছে। সেই মন্দিরের নাম, শুক্ বাসুলী ঠাকুরাণী। মন্দিরটী আধুনিক, সন্দেহ নাই,—কিন্তু মালমসলা পুরাতন। চাঁদনীর ছাদ পড়িয়া গিয়াছে। একস্থানে, পাঁচটী মূর্ত্তি ছিল। সেগুলি উর্দ্ধমুখে, ভূতলে গড়াগড়ি যাইতেছে। মূর্ত্তিগুলির উচ্চতা পাঁচ ফুট। মূর্ত্তিগুলি দেখিতে বেশ। একটী মূর্ত্তি, সমৃণাল-পদ্মপাণি।

আরো উর্দ্ধে, আর একটী ছোট মন্দির। তাহাও ভগ্ন,—ছাদ পড়িয়া গিয়াছে। আরো উপরের ভূমি সমতল এবং স্থানচ্যুত ইষ্টকাদির চূর্ণে পূর্ণ। সেই চূর্ণরাশির ভিতরে নানা আকৃতির কারুকার্য্যক্রম বঙ্কিম ও সুদর্শন প্রস্তরখণ্ডও আছে। এককালে, সেগুলি কোন মন্দির বা প্রাসাদের শোভাবৃদ্ধি করিত। এবং এইস্থানে আগে যে খুব চমৎকার কোন প্রাসাদ ছিল, তাহাও নিঃসন্দেহে বলা যায়। এখন, সে সকল কথা, একাধিক সহস্র রজনীর মত উপকথায় পরিণত হইয়াছে। এ উপকথাও আর বেশিদিন থাকিবে না।

জানা গিয়াছে, উক্ত প্রাসাদ রাজা বাসুকল্প কেশরীর ছিল। ইষ্টক ও প্রস্তর চূর্ণে পূর্ণ স্থানটীর একপ্রান্তে এখন একটী ছোট চন্দন গাছ আছে। এখানকার ধ্বংসস্তূপ খনন করা হইয়াছিল। ফলে, দুইটী মূর্ত্তি উত্তোলিত হইয়াছে। তাহার উচ্চতা যথাক্রমে আট ও ছয় ফুট। সম্ভবতঃ, এখানে এখনো অনেক মরকত প্রোথিত আছে।

অপর পাহাড়ের শিখর নিম্ন সমতল। সেই স্থানের পরিমাপ, দৈর্ঘ্যে ৩৪০ ও প্রস্থে ২২০ ফুট। শুনা যায়, আগে এখানে রাজার অশ্ব ও হস্তিশালা এবং কর্ম্মচারিগণের নিবাসগৃহ ছিল। পাহাড়টীর শেষ অংশে আটটী প্রস্তরমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। তাহার কোনোটীর অর্দ্ধাংশ মৃত্তিকাগুপ্ত, কোনটী মস্তকহীন হইয়া শায়িত,—কোন কোনটী অদ্যাপি দণ্ডায়মান। সকলের হাতে

একটী করিয়া পদ্ম। উক্ত অষ্টমূর্ত্তির মধ্যে একটী স্ত্রীমূর্ত্তি। শিখরের সর্ব্বোচ্চ স্থানে চাতাল-করা খানিকটা যায়গা। দেখিলে, মনে হয়, এখানে আগে কোন মন্দির অথবা প্রহরিগণের গৃহ ছিল। এই যায়গাটির পশ্চাতে একটী অমুক্ত-অলকা রমণীমূর্ত্তি। শিল্পীর বাটালির মুখে, তাহার ভাবভঙ্গি বড় চমৎকাররূপে খোদিত হইয়াছে।

পাহাড়ের পূর্ব্বদিকে একটী দুর্গের ভগ্নাবশেষ নজরে পড়ে। তাহার নাম ছিল, অমরাবতী। দুর্গের প্রাচীর চতুষ্কোণবিশিষ্ট। পূর্ব্বদিকে, একটীমাত্র প্রস্তরের প্রবেশ-পথ। একদিকে, একটী ভগ্নস্তম্ভবিশিষ্ট উচ্চস্থান (platform) রহিয়াছে। তাহা, শুনা যায়, আগে রাজার অন্তঃপুর ছিল। না জানি, কোন অনির্দ্ধারিত মধুর অতীতযুগে, এইস্থানে ভ্রূভঙ্গিবিলাসের কত লীলাচঞ্চল অভিনয় হইয়া গিয়াছে! সে যুগ নাই,—এবং সেই কটাক্ষচকিতনেত্রা, রত্নালঙ্কাররম্যা তন্বঙ্গিগণও আর নাই। আছে কি? স্মৃতি। তাহাও আর কতদিন!

আর একটী ক্ষুদ্রতম মঞ্চের উপরে একটী মন্দির ছিল। সম্প্রতি তাহা যাদুকরকালের কুহকদণ্ডস্পর্শে অদৃশ্য। এখানে, দেবরাজ ইন্দ্র এবং সুররাজপত্নী ইন্দ্রাণীর প্রতিমূর্ত্তিদ্বয় এখনো দেখিতে পাওয়া যায়। দুটী মূর্ত্তিই ভঙ্গিবঙ্কিমা এবং চারু-শিল্প-কমা।

কেশরীরাজবংশের পাঁচটা প্রধান কটক ছিল। তন্মধ্যে আমাদের আলোচ্য অমরাবতীও একটা। পশ্চিমদিকে একটী গুহা। আকৃতিতে ছোট। বারান্দা আছে। এই গুহা জৈনগণের হস্তে খোদিত।

(List of Ancient Monuments of Bengal.)

বাস্তবিক, ললিতগিরি দ্রষ্টব্য স্থান।—কিন্তু সকলের জন্য নয়। যাঁহারা সুদূর অতীতের স্মৃতি ভালবাসেন এবং সেই বিষয় লইয়া চিন্তা করিয়া সুখী হন, তাঁহারা ললিতগিরিতে আসুন,—তৃপ্ত হইবেন। এই ভগ্নাবশেষ,—এখানে কোন পরাক্রান্ত রাজার আবাস ছিল, এবং সেই রাজা বড় দরিদ্রও ছিলেন না,—এই জনবিরল পর্ব্বতের উপরে তাঁহার দুর্গ ছিল,—প্রাসাদ ছিল, অন্তঃপুর ছিল, হস্তিশালা, অশ্বশালা ছিল, প্রহরীর জন্য নির্দ্ধারিত স্থান ছিল, আরাধনার জন্য মন্দির ছিল এবং কর্ম্মচারী থাকিবার জন্য গৃহ ছিল, এস্থানে তিনি যেন একটী ছোট খাটো সহর গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। পরন্তু, বলিতে কি—ইহাও সুনিশ্চয় যে আমাদের এই রাজাটী কঠিন রাজকর্ম্মজীবী হইলেও কবির মতন পেলব প্রাণবিশিষ্ট ছিলেন! এমন মুক্ত আলো, এমন অনাহত প্রশান্ত অম্বর, এবং এমন তট-তাল-তমাল-তল-সুপ্ত ভানু-প্রস্রোত-রম্য তটিনী! এই সুবিজন স্তব্ধতা ও এই অনল-মলয় পরিমল বায়ু কবি না হইলে উপভোগ করিতে জানেন না। অকবির প্রাণ এখানে এক মুহূর্ত্তের জন্য তিষ্ঠিতে পারে না। যে দেশের রাজার প্রাণ এমন কোমল, সে দেশের শিল্প, সর্ব্বলোকের বিস্ময়ের কারণ না হইবে কেন? যে শিল্পকীর্ত্তিগুলির কথা বলিলাম, তন্মধ্যে প্রথমটী অর্থাৎ ধৌলির পর্ব্বত ভিন্ন সকলগুলিই প্রাচীন "হিন্দুরাজত্ব" কালে, নির্ম্মিত। কোনগুলিই এক সময়ে নির্ম্মিত হয় নাই। এবং নির্ম্মাণকাল সম্বন্ধে

সঠিক মন্তব্য প্রকাশ করাও কঠিন। কারণ, নির্ম্মাতাগণ সে বিষয় জানিবার জন্য কোনো সুবিধা করিয়া রাখিয়া যান নাই। কোনো কোনো স্থানে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়েরই হস্তের শিল্প পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে বোধ হয়, আগে বৌদ্ধগণ উদয় এবং ললিতগিরি প্রভৃতি স্থানে কিছু কিছু শিল্পকার্য্য রাখিয়া গিয়াছিলেন এবং পরে বৌদ্ধধর্ম্ম যখন সাগর পারে নির্ব্বাসিত হইল, তখন নব জাগ্রত ব্রহ্মণ্য-শক্তিও ঐ সকল স্থানে আপনাদের চিহ্ন রাখিয়া যায়। এই শেষোক্ত মতই সম্ভবতঃ সত্য, এবং ডাঃ হাণ্টারও এই কথা বলেন। (Vide Hunters' Orissa: Vol I. P.P. 178—9.)

উৎকলে, আরো কয়েকটী শৈল-শিল্প আছে। কিন্তু সেগুলির আলোচনা আজ আর আবশ্যক নাই। আমরা প্রবীন কয়েকটীর উল্লেখ ও সে সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনাও করিলাম। উৎকল-শিল্পের বিশালতা ইহা হইতেই সকলে বুঝিতে পারিবেন। পরিশেষে, বক্তব্য কর্ত্তব্য যে, যদিও স্থাপত্যে উৎকল অদ্বিতীয়, তথাপি শৈল-শিল্পে উৎকল তেমন উন্নত নয়। সে বিষয়ে দক্ষিণ প্রদেশ অপ্রতিদ্বন্দ্বী। উৎকলে শৈলশিল্প সুপ্রাচীন এবং সেই জন্যই তাহা আলোচ্য। প্রাচীন মন্দ হইলেও, তাহার আলোচনায় গৌরব আছে। কারণ, তাহা স্মৃতির তীর্থভূমি।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

করুণার দাবী।

শাক্য-সিংহ পরম ধীমান,
রাজপুত্র করুণা নিদান,
দয়ার শরীর।
দেবদত্ত—পিতৃব্য কুমার,
জীবহিংসা ব্যবসায় তা'র,—
হস্তে ধনু তীর;
ব্যোমচারী হংস বক্ষোপরে
বিঁধিলেন তীব্র-তীক্ষ্ণ শরে,—
—স্নেহ-লেশ হীন।
হংস শিশু দ্রুত অগোচরে
পড়িল সে শাক্য সিংহ ক্রোড়ে,
—স্পন্দন বিহীন।
দেবদত্ত কহে, "এ শাবক,
প্রাপ্য, মোর, আমি হন্তারক,
দেহ হংস মোরে!"

শাক্য সিংহ কহিলেন, "নয়,
এ মরাল আমার নিশ্চয়,
চাহ কোন জোরে?
নিষ্ঠুরতা, অধিকার-হীন,
করুণার দাবী চিরদিন
বেশী তাহা হ'তে;
মারে যে, জীবের পরে তার
বিন্দুমাত্র নাহি অধিকার
প্রেমের জগতে।
আপনারে করি তুচ্ছজ্ঞান
যে জন রক্ষয়ে জীব-প্রাণ,
—জেন ইহা সার;
বিপুল এ বিশ্ব-ভূমণ্ডল
তা'র দাবী মানিবে কেবল,
সহিবে বিচার।"

শ্রীগৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

জাপানের সভাসমিতি।

জাপানে সভাসমিতির অন্ত নাই। স্কুল-কলেজের ছেলেদের, মেয়েদের ভদ্র অভদ্র সকল লোকের কত সমিতি রহিয়াছে ইয়ত্তা করা যায় না। কৃষক, ধোপা, নাপিত, দুধওয়ালা, তরকারিওয়ালা, দরজি, কামার, চামার প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যবসায়ীরই বা কত সমিতি! কলেজে আমাদের এক শ্রেণীতেই কতগুলি সমিতি বলিলে শুনিলে এখানকার লোকে আশ্চর্য্য হইবেন। আমাদের বি, এ ক্লাশে যেমন কেহ এ কোর্স, কেহ বি, কোর্স, কেহ বিশেষ বিষয়ে অনার কোর্স লইয়া থাকে, তেমনি তথাকার একশ্রেণীরই ছাত্র কেহ কেহ রসায়ন বিদ্যা কেহ কেহ উদ্ভিদবিদ্যা, কেহ বা ধনবিদ্যা, কেহ বা কৃষিবিদ্যা কেহ কেহ ভূতত্ত্ব, কেহ পশুচিকিৎসা, কেহ রেশম কৃষি, প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা করিয়া থাকে। ঐ ঐ বিভিন্ন বিষয়ে ছাত্রদের ভিন্ন ভিন্ন সমিতি, তারপর এক কলেজে এবং এক-শ্রেণীতে ভিন্ন জেলার যে সকল ছাত্র আছে তাহাদের পৃথক পৃথক জেলা সমিতি। অধ্যাপকগণ আপন আপন জেলা এবং আপন আপন বিষয়ের সমিতিতে যোগদান করিয়া ছাত্রদিগকে উৎসাহিত করিয়া থাকেন। আমাদের দেশের অনেক সভাতেই অনুরোধ করিয়া বক্তাকে উঠাইতে হয়। জাপানের সভাসমিতিতে দেখিয়াছি এক বক্তা বক্তৃতা শেষ করিতে না করিতেই অপর বক্তা উঠিয়া দাঁড়ান। প্রত্যেকেই বলিবার জন্য যেন উদ্‌গ্রীব, কোন দিনই সময়ে সঙ্কুলান হইয়া উঠে না। কিন্তু স্কুল কলেজের সভাসমিতির ন্যায় সাধারণ ভদ্র লোকের সভাসমিতিতে বক্তৃতা ছড়াছড়ি অতি বিরল। পরস্পর মেলামেশা, আলাপ প্রসঙ্গ, গীতবাদ্য খাওয়াদাওয়াই অধিকাংশ সভার প্রধান কাজ। অনেকটা আমাদের দেশের নিমন্ত্রণ সম্মিলনের মত। সভাসমিতি হইলেই বুঝিতে হইবে যে তথায় ভোজের বন্দোবস্ত হইয়াছে এবং তজ্জন্য চাঁদা দিতেই হইবে। পুরুষদের ন্যায় স্ত্রীলোকদেরও অসংখ্য সভাসমিতি। আবার স্ত্রীপুরুষে পরিচালিত সভাসমিতিরও অভাব নাই, জাপানের বিখ্যাত রেডক্রশ সোসাইটী স্ত্রীপুরুষ পরিচালিত।

গত যুদ্ধে এই সোসাইটীর কার্য্যাবলী জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছে। অনেক রাজকুমারী এই সোসাইটির মেম্বর। প্রধান সেনাপতি মার্শাল ওইয়ামার পত্নী প্রিন্সেস ওইয়ামা (তৎকালে মার্সিওনেস্ ওইয়ামা) তাঁহার যুদ্ধ বিবরণীতে লিখিয়াছেন "যে সকল রাজকন্যা রুমালের চেয়ে ভারী জিনিষ কখনও বহন করেন নাই, যাঁহারা ২।৩ জন পরিচারিকা ব্যতিরেকে কখনও ঘরের বাহির হন নাই, যাঁহারা দুধ সর, নবনী ভোজনেও অনিচ্ছা-প্রকাশ করিতেন, আজ সেই সকল রাজকন্যা একাকিনী ব্যাগ হস্তে অনশনে, অনিদ্রায় বিজন অরণ্যে বা পার্ব্বত্য দেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আহত সৈন্যদের সেবাশুশ্রূষায় নিয়োজিতা।"

১৮৭৭ খৃঃ অব্দে জাপানের রেডক্রশ সোসাইটীর প্রথম সূত্রপাত হয়। এই সময়কার গৃহ বিবাদে অনেক লোক হত এবং আহত হওয়াতেই তখন একটী সমিতির আবশ্যক উপলব্ধি হয়। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে জাপানের এই সমিতি জেনেভা কন্‌ফারেন্সে যোগ দেয় এবং এই সময় হইতে রেডক্রশ

সোসাইটি নাম ধারণ করে। উক্ত সোসাইটি কারলশ্রুর চতুর্থ অন্তর্জাতিক সভার প্রতিনিধি প্রেরণ করে। ১৮৯৪-৯৫ চীন জাপান যুদ্ধে এবং ১৯০০ খৃষ্টাব্দের বক্সার যুদ্ধে জাপানের রেড্‌ক্রশ সোসাইটীর নাম ও সুযশ জগৎ-বিখ্যাত হইয়া উঠে।

জাপানের রেড্‌ক্রশ সোসাইটীর একটী প্রধান আফিস এবং ৪৮টী শাখা আফিস আছে, প্রধান আফিসের সংশ্লিষ্ট হাঁসপাতালে নার্শ (পরিচারিকা) দিগকে তিন বৎসর এবং শাখা হাঁসপাতাল সমূহে নার্শদিগকে দুই বৎসর পুস্তকগত এবং কার্য্যকরী বিদ্যায় শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ৪৩৫৫ জন লোক এই সোসাইটীর হাসপাতালে কার্য্য করিতেছিল। উপরিউক্ত সংখ্যার ৬ জন ম্যানেজার, ৩৮০ জন ডাক্তার ১৮০ জন কম্পাউণ্ডার, ১৫৪ জন কেরাণী, ২৩৮ জন প্রধান নার্শ, ২৪৯০ জন সাধারণ নার্শ, ১০১৮ জন চাকর, পাচক, পরিচারক ইত্যাদি এবং ১৪৩ শিবিকা বাহক ছিল। রুস-জাপান যুদ্ধের সময় উহার সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছিল, এবং পূর্ব্বে দুই খানা জাহাজে সোসাইটীর কাজ চলিত; ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে চারি খানা জাহাজ সোসাইটীর কায করিত। যুদ্ধের সময় সোসাইটীর কার্য্যে ৭৫[illegible]৮১৲ টাকা খরচ হয়, কিন্তু ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের হিসাবে দেখা যায় ইহা সত্ত্বেও তহবিলে ৯,৮৪৩,৭৫০৲ টাকা মজুত। গত যুদ্ধে সোসাইটীর তিন জন ডাক্তার, ৩ জন কম্পাউণ্ডার, ২ জন কেরাণী, ২৫ জন নার্শ, ৩৫ জন সহকারী নার্শ এবং ১০ জন শিবিকা বাহকের মৃত্যু হইয়াছে। এবং সোসাইটী ১০১৫২২৯ জন জাপানী এবং ২৮৩৭৯ জন রুসিয়ান আহত ব্যক্তির সেবা শুশ্রূষা করিয়াছে। সোসাইটীর জাহাজ ঐ যুদ্ধে ৬১৪ বার আহত ব্যক্তির জন্য নানা স্থানে চালিত হইয়াছিল।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে সোসাইটীর মেম্বর সংখ্যা ১১০৩৭২১ জন ছিল; দুই বৎসর পর ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ঐ সংখ্যা ১৩৩০০০০ জনে পরিণত হইয়াছে। সমিতির মহদুদ্দেশ্যে যাহার যেমন সাধ্য সাহায্য করিতেছেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে মোট ৪৬৩৯৬০৭৭, টাকা চাঁদা উঠিয়াছে কিন্তু ঐ বৎসর খরচের বরাদ্দ মোট ২৮৮৯৫০২৲ টাকা মাত্র ছিল।

আমাদের রামও নাই রহিমও নাই। প্রায় সকল সদনুষ্ঠানই কিছুদিন পরে অর্থ এবং উৎসাহী লোকের অভাবে মৃত বা মুমূর্ষু হইয়া পড়ে। কয়েক মাস পূর্ব্বে যখন আমাদের মহিলাগণ নিপীড়িত, বিপন্ন এবং দুর্দ্দশাগ্রস্ত দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীর সাহায্য করে কলিকাতা লাহোর প্রভৃতি স্থানে সমিতি স্থাপন করেন তখন আমার জাপান-মহিলা সমিতির কথা মনে পড়িল। সকল কার্য্যেই দশ জনের সমবায় চেষ্টা এবং সহানুভূতির দরকার। দুই একজনে হাবুডুবু খাইলে কি হইবে? এত অসুবিধার মধ্যেও আমাদের কারাগারে আবদ্ধ মেয়েরা যাহা কিছু করিতেছেন তাহাই তাঁহাদের পক্ষে বাহাদুরী বলিতে হইবে।

সার্ব্বজনীন হিতকর কার্য্যে জাপানী মেয়েরা কত পন্থাই অবলম্বন করিতেছেন। তাঁহাদের কন্‌সার্ট পার্টি, থিয়েটার এবং প্রদর্শনীর যেন অবধি নাই। কার্য্যনির্ব্বাহক

এবং অভ্যর্থনা সমিতির গঠন, স্বেচ্ছাসেবিকা দলের নিয়োগ প্রভৃতি মেয়েরা নিজেই করিয়া থাকেন। রাজপরিবারের মেয়েরাও সানন্দে এই সকল কাযে যোগ দেন।

গত যুদ্ধের পর যখন সেনাপতি এবং সৈন্যগণ জয়মাল্যে ভূষিত হইয়া মাঞ্চুরিয়া হইতে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন তখন পুরুষদের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন সমিতির চিহ্নধারিণী রমণীগণও সারি সারি জাতীয় নিশান হাতে লইয়া এবং তালে তালে নাচিয়া জয়গীতি গাহিতে গাহিতে তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়াছিলেন। আমার মনে হয় অন্ধকারে আবদ্ধ কূপমণ্ডূকপ্রায় ভারতনারী বলিয়া কেন—সুসভ্য দেশেও এরূপ উজ্জ্বলদৃশ্য বিরল।

জাপানে অন্ধ আতুর প্রভৃতির জন্য, মাতৃপিতৃহীন শিশুদের জন্য, দুষ্টের সংস্কার প্রভৃতির জন্য বিস্তর সমিতি আছে। তন্মধ্যে ৭:টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেক সমিতি সংশ্লিষ্ট একটি করিয়া আশ্রম আছে। প্রত্যেক আশ্রমের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুল এবং কার্য্যক্ষম ব্যক্তিদের জন্য নানারূপ কাজের বন্দোবস্ত রহিয়াছে। বোবা ও বধির দের জন্য ন্যূন সংখ্যায় ২৭টী স্কুল এবং বোর্ডিং হাউস আছে।

মহিলাদের শত শত সমিতি আছে। আজ উহার একটি বিশেষ সমিতির বিষয় কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিব। দেখিতে দেখিতে "দাই নিপ্পন জ্যো কাই (জাপান মহিলাসমিতি) সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইংরাজীতে উহার নাম The Japan women's league। এই সমিতির সাত আট বৎসরের জীবনী পর্য্যালোচনা করিলে নব্য উদ্বুদ্ধ জাপানের বীর্য্যবতী মেয়েদের সম্বন্ধে অনেকটা জ্ঞান জন্মিতে পারে।

বক্সার যুদ্ধের পর ১৯০০ অব্দে চীনের উত্তর প্রদেশে জনসাধারণের ভিতর দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি, গৃহবিবাদ প্রভৃতি নানারূপ উপদ্রব উপস্থিত হয়। ঐ সকল উপদ্রবের নিরাকরণ মানসে জাপানের হিগালি হোঙ্গান ধর্ম্মমন্দির হইতে কতিপয় ব্যক্তি উত্তর চীনে গমন করেন। ঐ সকল ব্যক্তির মধ্যে বৃদ্ধা মহিলা ওকুমুরা একজন। এই বৃদ্ধা মহিলা কর্ত্তৃকই জাপানের বিখ্যাত মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি চীনের স্বদেশ প্রেম এবং পরস্পর সহানুভূতি ও একতার অভাবে নানারূপ বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি পরিলক্ষণে, জাপানী সৈনিক বিভাগের সুবন্দোবস্ত এবং উহাদের স্বদেশ প্রেম ও কার্য্যতৎপরতাই জাতীয় সুখ শান্তির মূল এবং সাধারণের সুখশান্তিই জাতীয় শক্তির মূল বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করেন। জাপানী সেনা বিভাগের এই স্বদেশ প্রেম এবং কার্য্য তৎপরতার বীজ সমগ্রজাতির মধ্যে উপ্ত হইয়া যাহাতে দেশকে উন্নতির চরমশিখরে দাঁড় করাইতে পারে তজ্জন্য তিনি মহিলাসমিতি সংস্থাপনে কৃতসঙ্কল্পা হয়েন। দেশে ফিরিয়া তিনি জনসাধারণের মধ্যে তাঁহার অভিপ্রেত বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে, প্রিন্স কোণোয়ে তাঁহার পোষকতা করিতে লাগিলেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারীমাসে সমিতির প্রথম অধিবেশন হয়। অথচ এই অল্প সময়ের মধ্যে অন্যূন পাঁচলক্ষ মহিলা এই সমিতির সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন: স্বয়ং সম্রাজ্ঞী প্রধান উৎসাহদায়িনী। তিনি প্রতি বৎসর দুই সহস্র ইয়েন

অর্থাৎ তিন সহস্রাধিক টাকা সাহায্য করিয়া থাকেন। তিন বৎসর পূর্ব্বে সমিতির মজুত তহবিল ছিল ৭১৪০৬২॥০ টাকা, উহা এখন দ্বিগুণ হইয়া উঠিয়াছে। সমিতির প্রত্যেক মহিলা বার্ষিক ৩৶০ তিন টাকা দুই আনা হারে চাঁদা দিয়া থাকেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বহির্দ্দেশ হইতে এই সমিতি ৭৮১২৫৲ টাকা অর্থ সাহায্য পাইয়াছে। জনৈক চীন অধিবাসী ১৫৬২৫৲ টাকা পাঠাইয়াছিলেন।

বৃদ্ধা ওকুমুরার মিতব্যয়িতা সম্বন্ধীয় বক্তৃতায় অনেক মহিলা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া কবরী-ভূষণ ও রুমালের ব্যয় সংক্ষেপ করেন। এইভাবে সংগৃহীত অর্থ দ্বারাই সমিতির ভাণ্ডার স্থাপিত হয়। যুদ্ধে নিহত স্বামীপুত্র শোকাতুরা কত শত অসহায়া আজ এই সমিতির সাহায্যে প্রতিপালিত। একবার সমিতির বার্ষিক উৎসব দেখিয়াছি। এক ময়দানে লক্ষাধিক মহিলার সমাগম হইয়াছিল। তখন বৃদ্ধা মহিলার কি অপার আনন্দ!

আজকাল সম্রাট পরিবারের প্রিন্সেস খান্নিন ঐ সমিতির পেট্রন, প্রিন্সেস ইওয়াকুরা প্রেসিডেণ্ট এবং ইচিজো, তোকুগাওয়া, কোণোয়ে, শিমাজু, দাওয়াগার, প্রিন্সেস মোরি, ওইয়ামা প্রভৃতি প্রিন্সেসগণ ম্যানেজার অর্থাৎ পরিচালিকা এবং বৃদ্ধা মহিলা ওকুমুরা অ্যাড্‌ভাইসার—পরামর্শদাতা।

শ্রীযদুনাথ সরকার।

চয়ন।

যবদ্বীপে।

বুধবার—৪ ডিসেম্বর

বৎসরের এই সময়ে, ভ্রমণে বাহির হইতে হইলে, খুব সকালে ছাড়িতে হয়। কেননা, এখন বর্ষাকাল। প্রাতঃকালে আকাশ বেশ পরিষ্কার থাকে, কিন্তু প্রায়ই দশটার সময়, মেঘগুলা সমুদ্র হইতে উঠিয়া জমিতে থাকে এবং সমস্ত আকাশকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। মধ্যাহ্ন সময়ে ঝড় উঠে; প্রায়ই অপরাহ্ণে, প্রবল বেগে জল বর্ষণ হয়; ঠিক্‌ মনে হয় রাস্তার উপর দিয়া নদী বহিয়া যাইতেছে।

আমার ভৃত্যকে ৪॥০ টার সময় আমাকে জাগাইয়া দিতে হুকুম দিয়াছিলাম। পাছে হুকুমে অন্যথায় হয়, সে আমাকে এক ঘণ্টা আগে জাগাইয়া দিয়াছে। উদ্যানের দ্বারদেশে একটা "কাহার" আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে: এই "কাহার" একটা ছোট গাড়ী, —তিনটা ঘোড়ায় টানে; গাড়ীর উপর সমান্তরালে দুইটি কাষ্ঠাসন; একটি গাড়োয়ানের জন্য, আর একটি আরোহীর জন্য। আমরা ৪॥০টার সময় ছাড়িলাম। অন্ধকার রাত্রি। দিনমানে খুব গরম ছিল, এখন আবার প্রায় শীতকালের মত ঠাণ্ডা। আমার সাদা পরিচ্ছদের উপর একটা বড় শাল জড়াইয়া লইলাম।

দিনের আরম্ভেই, আমার গাড়ী একটা সরু পথ ধরিয়া খুব দ্রুত চলিতে লাগিল। পথের দুই ধারে, সরু সরু উচ্চ গাছ; কোথাও কোথাও হরিৎ তৃণপুঞ্জ। লণ্ডনের "ন্যাশনাল

গ্যালারি” নামক চিত্রশালার চিত্রকর (Hobbema) হবেমার বিরচিত যে-একটি ভূখণ্ডের চিত্র দেখিয়াছিলাম, এই সরু পথটি সেই চিত্রখানি স্মরণ করাইয়া দিল; কি-একটা অদ্ভুত সাদৃশ্যের ভাব আমার মনে আনিয়া দিল। যাবা-দেশের একটি পথ, একজন ফরাসীকে স্মরণ করাইয়া দিল কি?—না, ইংলণ্ডে প্রশংসিত একটি ওলন্দাজি চিত্র! ইহাতে কি প্রমাণ হয় না,—আমাদের সভ্যতা ইহার মধ্যেই আন্তর্জাতিক ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে; আমাদের মনে, প্রকৃত বিশ্বনাগরিক ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে?

আমাদের পথটা পর্য্যায়ক্রমে ধান্যক্ষেত্র ও গ্রামসমূহের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। জলপ্লাবিত ধান্য-ক্ষেত্রের কাদার মধ্যে, খালি-পায়ে পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা ধানের তরুণ শিষগুলা তুলিয়া লইতেছে। গ্রামগুলি জীবন উদ্যমে পূর্ণ। সময়ে সময়ে হাট বসে। হাটে মাছ, চাউল, ফল, পান, কাপড়—এই সব বিক্রী হয়।

এই পথ দিয়া, লোকেরা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইতেছে। কুলিরা, একটা বাঁশের দুই প্রান্তে, তাহাদের বোঝা ঝুলাইয়া, ছুটিয়া চলিয়াছে, কিংবা একটা বাঁশ দিয়া, ছোট ছোট শকট ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে। সকলেই খুব নম্রভাবে প্রণতি করে; রাস্তার ধারের রথ্যা-গর্ত্তের মধ্যে নামিয়া, তাহাদের বোঝা নামাইয়া, তাহাদের একাণ্ড খড়ের টোপা মাথা হইতে খুলিয়া লয়। অনেকেই,—আমরা নিকটে যাইবার বহু পূর্ব্বেই, এমন কি, দূরে ক্ষেতের কাজ করিতে করিতেই, আমাদের দেখিবামাত্র, এইরূপে তাহাদের টোপা খোলে। স্ত্রীলোকেরা, মুখ ফিরাইয়া, ছাতা নামাইয়া, প্রণাম করে। উহাদের এই ছাতাগুলা চ্যাপ্টা,—অদ্ভুত ধরণের; ছাতার রংও খুব উজ্জ্বল। ছোট ছোট মেয়ে ও বৃদ্ধারা হাঁটু গাড়িয়া প্রণাম করে; একজন স্ত্রীলোক, দুষ্ট য়ুরোপীয় হইতে যেন আত্মরক্ষা করিবার জন্য তাহার শিশুটিকে বুকে জাপটাইয়া ধরিয়া রাস্তার ধারের রথ্যার উপর বসিয়া পড়িয়াছে ...দেশীয় লোকদের এইরূপ অতিনম্র বিনীত ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। সেদিন, একজন প্রধান রাজপুরুষের নিকট হইতে পত্র আনিয়া আমার হাতে দিবার সময়, একজন দেশীয় লোক আমার সম্মুখে নতজানু হইল। একটা সমগ্র জাতির এইরূপ হীন দাসত্বের ভাব দেখিয়া মনে কেমন একটা কষ্ট হয়। বেশ বুঝা যায়,—শত শত বৎসরের দারুণ উৎপীড়ন অত্যাচার, এই জাতির মেরুদণ্ড ভাঙিয়া দিয়াছে—উহাদিগকে একেবারে নত করিয়া ফেলিয়াছে। এক্ষণে, এই বশ্যতার ভাবভঙ্গিগুলি যেন উহাদের স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বোধ হয়, ভাবভঙ্গীগুলির মত উহাদের হৃদয়ও দাস্যপ্রবণ হইয়া পড়িয়াছে। আমি শুনিলাম, যে য়ুরোপীয় এই সকল দেশীয় লোকের নিকটে যাইতে চেষ্টা করে, এই দুই জাতির মধ্যে ব্যবধান কমাইতে প্রয়াস পায়, সেই য়ুরোপীয়কে এই দেশীয় লোকেরাই ঘৃণা করে। ইহা যদি সত্য হয়, তবে ইহা তীব্র অত্যাচার-সমন্বিত শাসনতন্ত্রেরই ফল বলিতে হইবে। জোর-জবরদস্তির শাসননীতি এই সকল দুর্ব্বল লোকের অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়া, উহাদিগকে একেবারে পিষিয়া ফেলিয়াছে। “দাসত্ব, মানুষকে এতটা অধঃপাতে লইয়া যায়, যে মানুষ অবশেষে

দাসত্বকেই ভালবাসে।" দাসের এতটা অধোগতি হয় যে, যাহারা তাহাদের প্রতি দাসবৎ ব্যবহার না করে, দাসেরা তাহাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে।

তিজ্‌ভেরোপান গ্রামে গাড়ী ছাড়িয়া এইবার অশ্বারোহণ করিতে হইবে। এইখান হইতে আগ্নেয়গিরিতে উঠিতে হইবে। এখানকার পান্থশালায়, দুইজন তরুণবয়স্ক ওলন্দাজের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। ইঁহারা সুমাত্রায় কেরোসিন্‌-তৈল-খনির ইঞ্জিনিয়ার। দুজনেই বিশুদ্ধরূপে অনর্গল ফরাসী বলেন। আমরা এখন সবাই একসঙ্গে ভ্রমণ করিতেছি।

আমরা ঘোড়ায় চড়িয়া পর্ব্বতে উঠিতেছি, আমাদের দেশীয় পথপ্রদর্শক আমাদের পিছনে পিছনে চলিতেছে।

প্রথমে আমরা কুইনিন্‌ ও কাফির ক্ষেত পার হইলাম। ঘোর সবুজ কাফিগাছের পাতাগুলা ঝিক্‌মিক্‌ করিতেছে—মধ্যে মধ্যে খুব উচ্চ ফিকা-সবুজ বাঁশগাছের ঝাড়। তাহার পর একটী সুরম্য সরুপথ, তাহার দুইধারে একরকম গাছ—তাহাতে লম্বা ঘণ্টার মত সাদা-সাদা ফুল ধরিয়াছে। তার পরেই অরণ্যের আরম্ভ। দুর্ভেদ্য ঘননিবিড় অরণ্য। ইহার মধ্য দিয়া মানুষ কি করিয়া পথ করিল, ইহাই আশ্চর্য্য। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পর্ণ-তরু (Fern), নানাপ্রকার অজানা বৃক্ষ,—খুব উচ্চ,খুব বিশাল;—সমস্তই লতাগাছে আচ্ছন্ন। এই অরণ্যের অসীমতার মধ্যে মানুষ যেন আপনাকে অতিক্ষুদ্র, নগণ্য, বিলুপ্তপ্রায় বলিয়া অনুভব করে। এই উদ্ভিজ্জের প্রাচুর্য্য এখানকার অতিউর্ব্বরা ও আর্দ্র মৃত্তিকারই ফল। তাছাড়া, এখানে সৌরতাপের যেরূপ প্রখরতা এরূপ আর কোথাও নাই। অজস্র বৃষ্টিধারায় এখানকার মাটি নিয়মিতরূপে আর্দ্র হয় বলিয়া, গাছপালায় সমস্তভূমি আচ্ছন্ন। অগ্নিময় প্রখর সূর্য্যের সহিত আর্দ্র বায়ুর চির-আলিঙ্গন বশত, এই সব গাছপালা ক্রমাগত প্রসারিত হইতে চেষ্টা করে, যতদূর পারে উর্দ্ধে উঠিতে সচেষ্ট হয়। প্রকৃতির এই অসীম শক্তির সমক্ষে, কল্পনাতীত এই সব প্রাকৃতিক ব্যাপারের সমক্ষে, মানুষের মন একেবারে বিহ্বল ও হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে।

গভীর অরণ্যের মধ্যে উপনীত হইতে এক ঘণ্টা লাগিল। তাহার পর গাছগুলা ক্রমেই নীচু হইয়া আসিল, সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিল, কমিয়া আসিল। পরে একেবারেই অদৃশ্য হইল। এখন কেবল কতকগুলি ক্ষুদ্র পর্ণ-তরু ও কতকগুলি রডোডেন্‌ড্রন্‌ গাছ মাত্র অবশিষ্ট। পথটা ভস্মরাশিতে একেবারে সাদা হইয়া গিয়াছে;—ধাতব পদার্থে, ও ফোঁপ্‌রা প্রস্তরখণ্ডে আচ্ছন্ন। ক্রমাগত উপরে উঠিয়া অবশেষে আগ্নেয়গিরির একেবারে কেন্দ্রদেশে উপনীত হইলাম।

আগ্নেয়গিরির এই কেন্দ্রস্থল পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে অবস্থিত। কেবল একদিক্‌ হইতে ধূসর-বর্ণ পাথরের একটা দেয়াল খাড়া হইয়া আছে। লোকে ইহার এইরূপ হেতুনির্দ্দেশ করে যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই পদ্ময়ন আগ্নেয়গিরির যে অগ্নিস্ফোটন হইয়াছিল, সেই অগ্নিস্ফোটনে অগ্নি-গহ্বরের দেয়ালের একটা সমস্ত পাশ উড়াইয়া লইয়া যায় এবং উহাতে করিয়া একটা পথ উন্মুক্ত হয়,—এখন এই পথ

দিয়া একেবারে জ্বলন্ত অগ্নির প্রদেশে যাওয়া যায়।

অগ্নিস্ফোটনের পর হইতে এই আগ্নেয়-গিরির তাপ অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। আমরা এখন ঘোড়াদের বাঁধিয়া রাখিয়া, এই অপূর্ব্ব অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে, পদব্রজে বেড়াইতে লাগিলাম। আমাদের পথপ্রদর্শক আগে আগে চলিয়াছে। পথপ্রদর্শক এখানকার পথ ও মাটি বেশ চিনে;—যেখানে তাপ কম, যেখানে জুতা পুড়িয়া যায় না,—এইরূপ পথ দিয়া আমাদিগকে লইয়া গেল। ধূসরবর্ণ ভস্ম-ক্ষেত্র; হরিদ্রাবর্ণ গন্ধক-ক্ষেত্র; ছোট ছোট কুণ্ডে জল ফুটিতেছে। রহস্যময় ভীষণ বিবরসমূহ হইতে, প্রচণ্ডবেগে পীতবর্ণ ধূমধারা নিঃসৃত হইতেছে; দেখিলে মনে হয়, কে যেন 'বয়লারের' ছিদ্র-পথের ঢাকাটা খুলিয়া দিয়াছে। কি ভীষণ গর্জ্জন! উহার নিকটে গেলে কেহ কাহারও কথা শুনিতে পায় না। আকাশ ধূমাচ্ছন্ন। গন্ধকের এরূপ তীব্র গন্ধ, যে চোখ দিয়া জল পড়ে, ক্রমাগত কাসিতে হয়; আমাদের ঘড়ীর রূপালী চে' একেবারে হলদে হইয়া গেল।

ভ্রমণ শেষ হইলে, আমরা তাড়াতাড়ি আহার করিয়া লইলাম। ওলন্দাজ যুবকদ্বয়, আমাদের নিকট সুমাত্রার ভীষণ অরণ্যের বর্ণনা করিলেন, ঐ দেশের প্রভূত প্রশংসা করিলেন; বলিলেন— যবদ্বীপ অপেক্ষা সুমাত্রা আরও আদিম-ধরণের এবং আরও সুদৃশ্য। আমি তাঁহাদের নিকট ভারতের কথা বলিলাম, নবজিলণ্ডের কথা বলিলাম। তারপর আমরা আবার ঘোড়ায় চড়িলাম। বোধহয় আরোহণ অপেক্ষা অবরোহণের সময়ে, এখানকার এই চমৎকার আরণ্য-দৃশ্য, চিত্তকে আরও মুগ্ধ করে; অবরোহণের সময়েই তরুগণের উচ্চতা, তৃণরাশির প্রাচুর্য্য, তরুলতার শোভন নমনীয়তা যেন আরও বেশী হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

গ্রামে গিয়া আবার আমাদের 'কাহার' (গাড়ী) পাইলাম। এখন অত্যন্ত গরম হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এখন ঘোড়া ছুটাইয়া যাওয়া বড়ই ক্লান্তিজনক।

গ্যারোয়েটে আসিয়া আহার করিলাম। ভ্রমণে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া অপরাহ্নের কাকনিদ্রা বেশ উপভোগ করা গেল। বাহিরে ঝড় উঠিয়াছে—কৃষ্ণ মেঘ-সমাচ্ছন্ন আকাশ হইতে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে।

বৃহস্পতিবার, ৬ ডিসেম্বর।

গ্যারোয়েট হইতে ছাড়িবার পূর্ব্বে আজ প্রাতে, ছায়াময় পথ দিয়া, Sitac Bagendit পর্য্যন্ত গাড়ি করিয়া বেড়াইয়া আসিলাম। ইহা ধীবরদিগের একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। আমি একটা ডোঙ্গায় উঠিলাম,—ডোঙ্গাটী গাছের গুঁড়ি খুঁদিয়া নির্ম্মিত; আমি ডোঙ্গার এক-প্রান্তে বসিলাম, মাঝি ডোঙ্গার অপর প্রান্তে বসিল। একটা অত্যন্ত ক্ষুদ্র দাঁড় দিয়া মাঝি একহাতে দাঁড় বাহিতে লাগিল। ডোঙ্গাটী প্রশান্ত জলরাশি ভেদ করিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। কমুদিনীর বৃহৎ পত্র সমূহে হ্রদের জল আচ্ছন্ন। এই সুন্দর জলজগাছ-গুলি ডোঙ্গায় ঠেকিয়া, তাহার ঘর্ষণে একটি মধুর শব্দ নিঃসৃত হইতে লাগিল; তাহার পর, হ্রদের সবুজ জল, আর চমৎকার নিস্তব্ধতা; আমরা একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে গিয়া উঠিলাম। সেখানে একটা পাহাড় আছে, সেই পাহাড়ের

চূড়াদেশে আরোহণ করিলাম। তাহার উপর হইতে, সমস্ত দৃশ্য আমাদের নেত্রসমক্ষে প্রসারিত হইল।

এই রমণীয় কুমুদিনী-হ্রদকে ঘিরিয়া, চারিদিক হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কঠোরদর্শন আগ্নেয়গিরি মাথা তুলিয়া রহিয়াছে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মুর্শিদাবাদের প্রাচীন-কাহিনী।

১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভেই মহারাষ্ট্রীয়গণ পুনরায় বঙ্গদেশে আসিয়া দেখা দিল। এবারে রঘুজি স্বয়ং 'চৌথ' আদায় করিবার জন্য এবং গতবারের পরাজয়ের প্রতিশোধ নবাবের উপর লইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তিনি বঙ্গদেশে প্রবেশ করিতে না করিতেই পুনার মহারাষ্ট্র-অধিপতি বল্লজি-রাও দিল্লী সম্রাটের আদেশক্রমে আলিবর্দ্দীর নিকট হইতে একাদশ লক্ষ মুদ্রা গ্রহণ করিতে আগমন করিলেন। এই দুইজন মহারাষ্ট্র নায়কের মধ্যে লেশমাত্রও সদ্ভাব ছিল না। উভয়েই 'পেশওয়া' অর্থাৎ রাজপদ প্রার্থী বলিয়া উভয়ের মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর শত্রুতা ছিল। নবাব আলিবর্দ্দীও উভয়ের মধ্যে এই মনোভাবের সুযোগগ্রহণ করিতে বিলম্ব করিলেন না। তিনি তাঁহাদের দুইজনকে পরস্পরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া স্বয়ং উভয়েরই হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের সংকল্প করিলেন। তদনুসারে তিনি ভাগীরথীর পরপারে যাইয়া বল্লজির সৈন্যের সহিত যোগদান করিয়া উভয়ে একত্রে বর্দ্ধমানের দিকে যাত্রা করিলেন। রঘুজির অধীনস্থ বেরার মহারাষ্ট্রগণ বৰ্দ্ধমানেই শিবিরস্থাপন করিয়াছিল। বল্লজি কিন্তু কিছুদূর যাইয়াই আলিবর্দ্দীকে ত্যাগ করিয়া একাকীই শত্রুনিধনে অগ্রসর হইলেন এবং রঘুজিকে বঙ্গদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। এই কর্ম্মের জন্য তিনি নবাবের বিপুল অর্থ গ্রহণ করিয়া পুনা যাত্রা করিলেন। এই বিচিত্র সংগ্রামে দেশের চতুর্দ্দিক শ্মশানে পরিণত হইল। এই নিষ্ঠুর দস্যুগণ যেখানে লোকালয় দেখিত তৎক্ষণাৎ তাহা ধ্বংস বা ভস্মসাৎ করিত। স্ত্রীলোক ও বালকও তাহাদের হস্তে পরিত্রাণ লাভ করিত না, এমন কি মাতার ক্রোড়স্থ শিশুকে পর্য্যন্ত হত্যা করিতে তাহারা কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করিত না। তাহাদের এ দানবীয় অত্যাচার দেশবাসীর অন্তরে এরূপ শঙ্কার উদ্রেক করিয়াছিল যে আজও পর্য্যন্ত দুষ্ট বালকবালিকাকে শাসিত করিবার জন্য লোকে সেই নিষ্ঠুর দস্যুদলপতিগণের নাম করিয়া থাকে।

রঘুজি কিন্তু এ পরাজয় শান্তভাবে গ্রহণ করিবার লোক ছিলেন না। বার বার পরাজয়ে তাঁহার প্রতিহিংসাবৃত্তি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, এবং ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভাস্করকে কাটোয়া নগরে শিবির স্থাপন করিতে আদেশ দিয়া পুনরায় এদেশে পাঠাইয়া দিলেন।

এতদিনের অভিজ্ঞতায় মহারাষ্ট্রীয়েরা নবাবের বাহুবলের বিশেষ পরিচয় পাইয়াছিলেন। সুতরাং এবারে রঘুজি গোপনে ভাস্করকে বলিয়া দিলেন যে নবাব অর্থদানে অগ্রসর হইলেই যেন তিনি সন্ধিস্থাপনে বিরত না হন। এদিকে আলিবর্দ্দীও মহারাষ্ট্রের বার বার আক্রমণে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনিও এবারে বলপ্রয়োগ না করিয়া ছল বা কৌশলে আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে মনস্থ করিলেন। অর্থ পাইলেই সন্ধি করিবার উপদেশের কথা গোপনে জানিতে পারিয়া আলিবর্দ্দী তাঁহার সচিব প্রধান রাজা জানকীরামকে ভাস্করের নিকটে প্রেরণ করিলেন; এবং তাঁহাকে বলিয়া দিলেন তিনি যেন ধীরে ধীরে ক্রমে ইঙ্গিত অর্থদানেই সম্মতি প্রদর্শন করেন এবং কৌশলে ভাস্করকে রাজধানী হইতে বারশ ক্রোশ দূরে তাঁহার শিবিরে আনয়ন করেন।

রাজা জানকীরামের কৌশলে প্রতারিত হইয়া ভাস্কর নিঃশঙ্কচিত্তে সামান্য অনুচর সমভিব্যাহারে শিবির সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নবাবের কর্ম্মচারীগণ মহাসমারোহে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়া তাঁহাকে নবাবের শিবিরাভ্যন্তরে লইয়া গেলেন।

ভাস্কর ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্র নবাব বাহু-প্রসারিত করিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ভাস্কর কোন্ ব্যক্তি। ভাস্করকে দেখাইয়া দিবামাত্র নবাব বলিয়া উঠিলেন "বিধর্ম্মীর শিরশ্ছেদন কর।" তৎক্ষণাৎ যবনিকার অন্তরাল হইতে লুকায়িত কয়েকজন ব্যক্তি বেগে অগ্রসর হইয়া তরবারিদ্বারা আগন্তুকগণের সকলকেই খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। নবাবের সৈন্যগণও আদিষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ বহিঃস্থিত মহারাষ্ট্র সৈনিকগণকে আক্রমণ করিয়া কাটোয়া অভিমুখে বিদূরিত করিয়া দিল। ভাস্করের হত্যা নবাবের বিশ্বাসঘাতকতা এবং নিজামৎ সৈন্যের পশ্চাদ্ধাবনের সংবাদ পাইবামাত্র কাটোয়াস্থিত সমগ্র মহারাষ্ট্রবাহিনী অবিলম্বে শিবির উত্তোলিত করিয়া বেরারাভিমুখে পলায়ন করিল। এই সময়কার এইরূপ একটি গল্প আছে, মহারাষ্ট্রদিগকে আক্রমণ করিবামাত্র শিবিরে মহাকোলাহল ও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়ায় নবাবের একজন অনুচর তাঁহাকে হস্তীতে আরোহণ করিয়া পলায়ন করিতে পরামর্শ দেন। নবাবের একটি পাদুকা হারাইয়া যাওয়ায় তাহা না পাওয়া পর্য্যন্ত নবাব শিবির ত্যাগ করিতে অস্বীকার করিলেন। তাঁহার সচিব উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "পাদুকা অন্বেষণ করিবার কি এই সময়?" নবাব উত্তর করিলেন, "না, তাহা নহে সত্য, কিন্তু এখন যদি আমি পাদুকা ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করি, পরে লোকে বলিবে—আলিবর্দ্দী খাঁ প্রাণ লইয়া পলাইবার জন্য এতই উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন যে পাদুকা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন।"

ভাস্করের হত্যার পর যুদ্ধক্লান্ত নবাবসৈন্য বিশ্রাম পাইতে না পাইতে তাহাদের ভাগ্যে আবার এক নূতন বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইল। নবাব সৈন্যের একজন সেনাপতি সহসা বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। নবাব যুদ্ধকালে জয়ী সেনাপতিগণকে বিশেষ পারিতোষিক দানে প্রতিশ্রুত হইতেন। মুস্তাফা খাঁ নামে একজন সেনাপতি বেহারে সহকারী শাসনকর্ত্তার পদ পাইবার আশায় ছিলেন। নবাব কিন্তু উক্তপদ সাউকৎ জঙ্গ নামে একজন শ্রেষ্ঠ শাসননীতিজ্ঞ ব্যক্তিকে দান করিয়াছিলেন। নবাবের এই ব্যবহারে মুস্তাফা নিজেকে অপমানিত জ্ঞান করিয়া বিদ্রোহের অবসর খুঁজিতেছিলেন। এক্ষণে সুযোগলাভ করিয়া নবাব-সৈন্যকে স্বদলে আনিয়া তিনি আলিবর্দ্দীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিলেন এবং স্বয়ং নাজিম পদ অধিকার করিয়া বসিলেন। নবাব মুস্তাফাকে অন্তরের সহিত স্নেহ করিতেন। সেইজন্য তাঁহার এ দুষ্কৃতি সত্বেও তাঁহাকে প্রচুর ধনসম্পত্তি দান করিয়া সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিলেন। বহুদিন ধরিয়া উভয়ের মধ্যে এই মনোমালিন্য চলিতে লাগিল এবং একটা বিশেষ ঘটনা উপস্থিত না হইলে আরও অনেক দিন এইরূপ চলিত বলিয়াই বোধ হয়। একজন ইতিহাসিক এই ব্যাপারের যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

একদিন মুস্তাফা খাঁ নবাবের সাক্ষাৎ প্রার্থনায় তাঁহার দুইটি প্রধান কর্ম্মচারীকে নবাবের নিকট প্রেরণ করিলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইলে তাঁহার প্রতি কোন প্রকার বিশ্বাসঘাতকতা করা সম্ভব কিনা, তাহাই স্থির করা তাঁহার উদ্দেশ্য। বিদ্রোহের পর হইতে তিনি সর্ব্বদাই সাবধানে কর্ম্ম করিতেন। কর্ম্মচারীদ্বয় নবাবকে অভিবাদন করিয়া সেনাপতির অপেক্ষায় উপবেশন করিলেন। কিন্তু সেনাপতির আগমনবার্ত্তা ঘোষিত হইবামাত্র অন্তঃপুর হইতে এক ভৃত্য আসিয়া নবাবকে সংবাদ দিল—যে তাঁহার একজন বেগম সহসা পীড়িতা হইয়াছেন এবং তাঁহাকে দেখিবার বাসনা প্রকাশ করিয়াছেন। নবাব সেনাপতির কর্ম্মচারীদ্বয়কে তাঁহার ক্ষণিক অনুপস্থিতির কারণ তাহাদিগের প্রভুকে বুঝাইয়া

বলিতে অনুরোধ করিয়া প্রস্থান করিলেন। তাঁহার গমনের পরই অন্তঃপুর পথে দ্রুত পদশব্দ ও অস্ত্রমর্ম্মর ধ্বনি শ্রুত হইল। সেনাপতির কর্ম্মচারীগণ সর্ব্বদাই বিশ্বাসঘাতকতার ভয়ে ভীত; সুতরাং তাঁহারা এই শব্দ শুনিয়া মনে করিলেন তাঁহাদের প্রভুকে হত্যা করিবার জন্য বোধহয় অস্ত্রধারী পুরুষ লুকায়িত রাখা হইতেছে এবং নবাবের শিবির ত্যাগে তাঁহাদিগের এ সন্দেহ বদ্ধমূল হওয়াতে তাঁহারা ছুটিয়া গিয়া অশ্বাবতীর্ণ মুস্তাফাকে তাঁহাদের সন্দেহের কথা বলিলেন। পাপচিত্ত সেনাপতি সহজেই ভীত হইয়া পুনরায় অশ্বারোহণ করিয়া আপন দুর্গাভিমুখে প্রাণপণে ছুটিলেন। নবাব তন্মুহূর্ত্তেই দরবার গৃহে ফিরিয়া আসিয়া সেনাপতির পলায়নবার্ত্তা শুনিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শাহামৎকে সেনাপতির নিকট পাঠাইয়া বলিয়া দিলেন যে তাঁহার এ অন্তর্ধানের কারণ জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তিনি উৎকণ্ঠিতচিত্তে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন এবং যদি কোন বিশ্বাসঘাতকার ভয় তাঁহার মনে উদিত হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহা নিতান্তই অমূলক। কিন্তু সন্দিগ্ধচিত্ত মুস্তাফা কোনমতেই ফিরিয়া যাইতে সম্মত হইলেন না। কিছুকাল নগরে থাকিয়া তিনি কৌশলে আফগান সৈন্যের অন্তর জয় করিয়া স্বদলে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নবাবের নিকট এই সংবাদ উপস্থিত হইবামাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ সেনাপতিকে নগর ত্যাগ করিতে আদেশ করেন। মুস্তাফা ক্রোধে ও অপমানে নগর ত্যাগ করিলেন এবং যাত্রাপথে রাজমহল লুণ্ঠন করিলেন। আজিমাবাদে উপস্থিত হইয়া নগর অধিকার করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং তিনি মুঙ্গেরের দিকে অগ্রসর হইলেন। ঘো[illegible] যুদ্ধের পর মুঙ্গেরের ভগ্ন দুর্গ মুস্তাফার করতল গত হইল। তথা হইতে তিনি পাটনার দিকে যাত্রা করিলেন। শাউকৎ জঙ্গ মুস্তাফার রাজদ্রোহিতার সংবাদ [illegible] সসৈন্যে আসিয়া তাঁহার পথরোধ করিয়া দাঁড়া[illegible] কিন্তু মুস্তাফার অসংখ্য সৈন্যের সহিত যুদ্ধ [illegible] আনিয়া ধূর্ত শাউকৎ বিদ্রোহীর নিকট দূত প্রেরণ করিয়া বলিলেন যে, যতক্ষণ তিনি নবাবের 'ফার্ম্মান' অর্থাৎ আদেশপত্র দেখাইতে না পারিবেন, ততক্ষণ তাঁহাকে তথা হইতে এক পদও অগ্রসর হইতে দিতে তিনি প্রস্তুত নহেন। বিদ্রোহী মুস্তাফার পক্ষে রাজাদেশ প্রদর্শন করা অসম্ভব, কিন্তু শাউকৎকে তিনি যে উদ্ধত উত্তর দান করিয়াছিলেন তাহা আজিও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হইয়া আছে। এক দীর্ঘপত্রের শেষে তিনি লিখিলেন—"যে দেশ জয় করে সে তাহার অধিকারী, তবে আর নবাবের ফার্ম্মানের আবশ্যক কোথায়? আপনার লোকখ্যাত খুল্লতাত যখন সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া রাজধানী আক্রমণ করিয়াছিলেন তখন তাঁহার কয়খানা আদেশপত্র ছিল?"

এরূপ অপমান সহ্য করা শাউকতের প্রকৃতির পক্ষে অসম্ভব। তিনি তৎক্ষণাৎ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া পঞ্চ সহস্রের অপেক্ষাও অল্প সৈন্য লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। কিন্তু যুদ্ধ বাধিলে শাউকৎ—যে সকল অশিক্ষিত নূতন লোককে সৈন্য দলভুক্ত করিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া পলাইল। কেবল তাঁহার পুরাতন শিক্ষিত যোদ্ধৃগণ অজেয় ব্যূহরচনা করিয়া বীর রাজকুমারের রক্ষার জন্য প্রাণপর্য্যন্ত উপেক্ষা করিয়া অবিরাম যুদ্ধ করিতে লাগিল। সকলেই বুঝিল যে, সেদিন শাউকতের পরাজয় অনিবার্য্য। এমন সময়ে সহসা সৌভাগ্যবশতঃ সামান্য এক কারণে শত্রুপক্ষ বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। মুস্তাফার মাহুত যুদ্ধে হত হইবা মাত্র উত্তেজিত হস্তীটি চালকাভাবে সেনাপতিকে ভূপৃষ্ঠে ফেলিয়া দিল। মুস্তাফা কিন্তু তৎক্ষণাৎ এক অশ্বে আরোহণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। শূন্যপৃষ্ঠ হস্তী দেখিয়া বিদ্রোহী সৈন্য ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। আট দিন উৎকণ্ঠিতচিত্তে সকলে মুস্তাফার সংবাদের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন কিন্তু কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। পরে অষ্টম দিনে শুনা গেল যে মুস্তাফা সসৈন্যে বিহারের সীমান্ত দেশে যাত্রা করিতেছেন। এদিকে আলিবর্দ্দী অসংখ্য সৈন্য লইয়া, পাটনার দিকে

যাত্রা করিতে ছিলেন। তিনি পথিমধ্যে মুস্তাফাকে বিপুলবেগে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিলেন। যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া মুস্তাফা চুনারে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় অযোধ্যার নরপতি নবাব সাফ্দর জঙ্গ বঙ্গের বীরনৃপতির প্রতি ঈর্ষাবশে তাঁহাকে আশ্রয় দান করিলেন।

ইলায়াস মেচনিকফ্। (Elias Metchnikoff)

(লণ্ডন ম্যাগাজিন হইতে)

বাইবেলে লেখা আছে মানুষের পরমায়ু ৭০ বৎসর। আমাদের মধ্যে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে অতি অল্প লোকেরই সেরূপ পরমায়ু দেখা যায়। এবং সহস্রে এক জনকেও শত বৎসর বাঁচিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও অতি পুরাকাল হইতেই মনুষ্য পরমায়ু বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। কারণ পরজগতে আমাদের যতই বিশ্বাস ও নির্ভর থাক্ না কেন ইহজগতে যথাসম্ভব অধিক দিন অবস্থান করিবার জন্যই আমরা আকুল। এমন অল্প-লোকই আছেন যাঁহারা 'শেষের সে দিন"কে আতঙ্কের চক্ষে দেখেন না। সুতরাং প্রত্যেক যুগেই চিকিৎসক ও পণ্ডিতগণ যে জীবনের পরিমিত কালকে অপরিমিত করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছেন ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। এই কারণেই অতীতে যাঁহারা গুপ্তবিদ্যার দ্বারা মৃত্যুঞ্জয় ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করিতেন তাঁহারা বিলক্ষণ অর্থ ও প্রতিপত্তি লাভ করিতেন।

এই মৃত্যুঞ্জয় সুধা অন্বেষণের সর্ব্বাপেক্ষা বিরাট চেষ্টা আমরা প্রথমে চীনদেশে দেখিতে পাই। তৃতীয় শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ চীন যাদুকর সু-চি (Su—chi) প্রচার করেন যে চীনদেশের পূর্ব্বভাগে "সুখদ্বীপ" (Happy Isles) নামে এক দ্বীপপুঞ্জ আছে তথাকার অধিবাসীরা এমন এক পানীয় সুধা প্রস্তুত করিতে জানে যে তাহা পান করিলেই মনুষ্য অমর হইয়া যায়। চীন সম্রাট চি-হং টি (Chi Hong Ti) এই কথা শুনিয়া এক বিরাট বাহিনী সঙ্গে লইয়া সেই মৃত্যুঞ্জয় সুধার অন্বেষণে বাহির হইয়াছিলেন।

ইলায়াস মেচনিকফের জীবনের ইতিহাসে ঔপন্যাসিক কিছুই নাই। ১৮৪৫ সালের ১৫ই মে তারিখে তিনি রুষিয়ার এক সামান্য কৃষিজীবির গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। বালক কাল হইতেই মেচনিকফ্ অধ্যয়নশীল ছিলেন। ১৭ বৎসর বয়সে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞান অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন। ১৮৬২ হইতে ১৮৬৭ সাল পর্য্যন্ত তিনি তথায় অধ্যয়ন করেন। তাহার পরে তিন বৎসর তিনি সাগ্রহে প্রাণীতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন। এই বিষয়ে তিনি এরূপ পাণ্ডিত্য ও পারদর্শিতা প্রকাশ করেন যে ১৮৭০ সালে কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে ওডেসা (Odssa) বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণীতত্ত্বের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করিলেন। ১৮৮৬ সাল পর্য্যন্ত তিনি এই কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। পরে নগরে বিসূচিকার প্রাদুর্ভাব হওয়াতে গবমেণ্ট ওডেসাতে একটি বীজাণু পরীক্ষাগার প্রতিষ্ঠিত করিয়া মেচনিকফকে তাহার তত্ত্বাবধারক (Director) নিযুক্ত করিলেন।

এই সময়ে ফরাসী বিজ্ঞানবিদ্ প্যাস্চরের (Pasteur) আবিষ্ক্রিয়ার প্রতি মেচনিকফের বিশেষ দৃষ্টি পড়িল। এক গ্রীষ্মাবকাশে তিনি প্যারিস্ নগরে সেই প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি ওডেসার কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া প্যাস্চর ইনষ্টিটিউটে যোগদান করিবার জন্য প্যারিসে গমন করেন। আজ পর্য্যন্ত তিনি এই স্থানেই আছেন। ১৯০৪ সালে ফরাসী গবমেণ্ট তাঁহাকে উক্তস্থানের সহকারী তত্ত্বাবধারক নিযুক্ত করিয়াছেন।

মেচনিকফ্ প্রথম বয়সে যে সকল অনুশীলন ও

পরীক্ষা করিয়াছিলেন তাহা হইতেই তিনি বীজাণু-নীতির সত্য সম্বন্ধে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রথমে কতকগুলি রোগ বিশেষের বীজাণু পরীক্ষা দ্বারাই তিনি বৈজ্ঞানিক জগতে সুপরিচিত হন। কিন্তু পরে 'ফ্যাগোসাইট্ (Phagocyte) নামে এক অজ্ঞাতপূর্ব্ব বস্তুর আবিষ্কার দ্বারাই জগৎবিখ্যাত হইয়াছেন। এ স্থলে 'ফ্যাগোসাইট্' বস্তুটা কি তাহা বুঝাইয়া বলা আবশ্যক। ইহা আমাদের রক্তের মধ্যে শ্বেতবর্ণ সজীব এক প্রকার গুলিকা (Glo bule)। এই গুলিকা আমাদের দেহ মধ্যে এক অতি জটিল ও অত্যাবশ্যকীয় ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকে।

এই 'ফ্যাগোসাইট'গুলি মনুষ্য দেহে পুলিস প্রহরীর কার্য্য করে বলা যাইতে পারে। এই সজীব বীজাণুগুলি কুম্ভকর্ণের ন্যায় অতিভোজী এবং অত্যাশ্চর্য্য গতিশীল এবং দ্রুতকর্ম্মক্ষম। আমাদের দেহ মধ্যে অনিষ্টকর বীজগুলি সদাসর্ব্বদাই প্রবেশ ও জন্মলাভ করিতেছে। 'ফ্যাগোসাইট্ এই বীজাণুগুলিকে গ্রাস করিয়া নিয়তই নষ্ট করিতে থাকে। এই শ্বেতবর্ণ গুলিকাগুলির এরূপ অদ্ভুত প্রাণশক্তি যে শরীরের যেখানে অনিষ্টকর বীজাণুগুলি আছে তাহারা ঝাঁকে ঝাঁকে সেই স্থানে যাইয়া উপস্থিত হয় এবং সেগুলিকে গ্রাস করিতে থাকে।

'ফ্যাগোসাইট্'গুলি এই সকল বীজাণুর উপরে বসিয়া একপ্রকার জীর্ণকর চিনির ন্যায় চূর্ণ বস্তু প্রসব করে এবং তাহা দ্বারা সেগুলিকে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়। আমাদের দেহের স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থায় এই 'ফ্যাগোসাইট'গুলি অনিষ্টকর বীজাণুগুলিকে সহজেই বশীভূত করিয়া ফেলে। শরীর যখন অসুস্থ হয়, তৎক্ষণাৎ সেই বীজাণুগুলি অসংখ্য হইয়া উঠে এবং 'ফ্যাগোসাইট' গুলিও অধিকতর কর্ম্ম তৎপর হইয়া উঠে। [illegible] অবস্থাবিশেষে অনিষ্টকর বীজাণুগুলি এত অ[illegible] হইয়া উঠে যে 'ফ্যাগোসাইট্'গুলি আর কিছুই ক[illegible]তে পারে না, অধিকন্তু নিজেরাই বীজাণুর নিকটে [illegible]ত হইয়া নষ্ট হইয়া যায়।

ম্যা[illegible], সর্ব্বপ্রথম যখন 'ফ্যাগোসাইটের' অস্তিত্ব [illegible] করেন তখন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ তাহার প্রতি লেশমাত্রও মনোযোগ দেন নাই। উপরন্তু অনেকে তাঁহার 'ফ্যাগোসাইটের কথা ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মেচনিকফ্ এ আক্রমণে ভীত হইলেন না। পঁচিশ বৎসর ধরিয়া তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে ও অদম্য অধ্যবসায়ে তাঁহার আবিষ্কৃত তত্ত্বের সত্য সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নিত্য নূতন নূতন প্রমাণ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বহুদিনের বাদানুবাদ, আক্রমণ ও সমালোচনার পরে আজ পৃথিবীর প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতই তাঁহার মতের সমর্থন করিতেছেন, বস্তুতঃ এক্ষণে সে সত্য অস্বীকার করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

এইবার মেচনিকফের জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ম্মের পরিচয় দিব। মেচনিকফ্ দেখিলেন যে, 'ফ্যাগোসাইট' গুলির সহিত রোগের বীজাণুগুলির অবিরাম দ্বন্দ্ব চলিতেছে। ইহা হইতে তাঁহার মনে হইল যে এই শ্বেতবর্ণ গুলিকাগুলির শক্তিবৃদ্ধি করিতে পারিলে এবং বীজাণুগুলির সহিত সংগ্রামে তাহাদিগকে সাহায্য করিতে পারিলে, মনুষ্যের রোগনিবারণ শক্তি বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব! আমাদের এই শক্তি যতই বৃদ্ধি পাইবে, আমরা ততই দেহকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইব, দীর্ঘায়ু লাভ করিতে পারিব।

বহুদিন হইতে নানাবিধ জন্তুর পরীক্ষা করিয়া মেচনিকফ্ বুঝিলেন যে মনুষ্য তাহার স্বাভাবিক আয়ু হইতে বঞ্চিত। তাঁহার মতে আমরা যে অকালে জরাগ্রস্ত হই তাহার কারণ এই বিষাক্ত বীজাণুগুলি কোটি কোটি সংখ্যায় পুষ্ট হইয়া রাত্রিদিন ক্রমে ক্রমে শরীরকে নষ্ট করিতে থাকে; তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই আমাদের পাকাশয়ে বিশেষতঃ উর্দ্ধতন অন্ত্রস্থলে অবস্থান করে।

সর্ব্বপ্রকার অবস্থার মধ্যে এই বিষাক্ত বীজাণুগুলির ক্রিয়া অনুশীলন করিয়া এবং তাহাদের ধ্বংসকারী ক্রিয়া সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়া তিনি এরূপ কোন ক্ষতিপূরণকর বীজাণুর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, যাহা রক্তের 'ফ্যাগোসাইটের সহিত সংযুক্ত

হইয়া সেই প্রাণহানিকারক বীজাণুগুলি নষ্ট করিতে পারে। ইহাদিগের মনুষ্যদেহের উপর ক্রিয়া প্রমাণ করিবার জন্য মেচনিকফ্ যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা উল্লেখযোগ্য। জরাগ্রস্ত ও রুগ্ন ব্যক্তির মলাদি হইতে তিনি এই বীজাণু নির্গত করিয়া সেগুলিকে প্রথমে প্রবলরূপে উত্তেজক ও ক্রিয়াশীল করেন। পরে সেইগুলিকে কতকগুলি অল্পবয়স্ক বনমানুষ ও বানরের দেহে প্রবিষ্ট করাইয়া দেন। ইহা দ্বারা অল্পকাল মধ্যেই নিঃসন্দেহ ফল ফলিল। কিছুদিনের মধ্যেই সেই জন্তুগুলি রুগ্ন ও অকাল বৃদ্ধ হইয়া ক্রমশ মৃত্যুমুখে পতিত হইল। মেচনিকফ্ যে কেবল বনমানুষের দেহেই ইহা পরীক্ষা করিয়াছিলেন তাহা নহে, অন্যান্য সকল প্রকার পশুর দেহেই এই বীজাণুর ফল পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

এই প্রকারে বার্দ্ধক্য বীজাণুর অস্তিত্ব ফল এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া তিনি এই দেহক্ষয়কর পদার্থের ক্রিয়াকে নষ্ট করিতে পারে এরূপ কোন বস্তু আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনেক দিন হইতেই তিনি দুগ্ধের পচন হইতে রক্ষা করিবার আশ্চর্য্য শক্তি লক্ষ্য করিয়া আসিতে ছিলেন। অনেক উষ্ণপ্রধান দেশে কৃষকগণ মাংসকে দুগ্ধে এবং বিশেষতঃ ঘোল বা দধিতে ডুবাইয়া রাখিয়া বহুদিন তাহাকে স্বাভাবিক ভাবে রক্ষা করে। এই দেখিয়া তাঁহার মনে প্রশ্ন উঠিল—"দুগ্ধ যদি এ প্রকারে পচন নিবারণে সক্ষম হয় তাহা হইলে আমাদের পাকনালীতে অবিরাম যে পচন ক্রিয়া চলিতেছে, তাহাও নিবারণ করিতে অক্ষম হইবে কেন?"

তদ্ভিন্ন ইহা নিঃসন্দেহ রূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, যে সকল জাতি প্রধানতঃ ছানার জল বা দধি খাইয়া জীবন ধারণ করে এবং যাহারা সচরাচর মাংস ভক্ষণ করেই না, তাহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অত্যধিক সংখ্যায় সুস্থ ও সবলদেহ বৃদ্ধ ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

তিনি আরও দেখিলেন যে অনেক সবল বৃদ্ধ বহুদিন হইতে কেবল ছানার জল বা দধি পান করিয়া জীবন ধারণ করিতেছেন। এই সকল লোকের মলমূত্রাদি অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, সাধারণ বৃদ্ধদিগের অপেক্ষা তাহাতে ক্ষয়কর বীজাণু লক্ষাধিক গুণ কম রহিয়াছে।

সুতরাং অধ্যাপক মেচনিকফ্ দুগ্ধ লইয়াই নানা প্রকার পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। নিজের ও অপরাপর প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিদের পরীক্ষার ফল লক্ষ্য করিয়া তিনি তাঁহার নিজের ও বিদ্যালয়ের সহকারীদিগের উপর পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। কিছুদিন পরীক্ষার পরই তিনি বুঝিলেন যে ঘোল বা দধি যতই উপকারী হউক না কেন, নানা কারণে কাঁচা দুধের প্রস্তুত দধি আহার করা অনিষ্টকর। কাঁচা দুগ্ধের সকল প্রকার খাদ্য দ্রব্যেই সহস্র সহস্র ক্ষতিকর বীজাণু দেখিতে পাওয়া যায়। মেচনিকফ্ দেখিলেন যে এই সকল খাদ্যের মধ্যে ক্ষয়কাশ, টাইফয়েড ও বিসূচিকার বীজাণু উপস্থিত থাকে। কাঁচা দুগ্ধের ঘোল বা দধির মধ্যে বিসূচিকার বীজ ৪৮ দিনেরও অধিক জীবিত থাকে। সুতরাং ছানার জল বা ঘোল হইতে যথার্থ উপকার লাভ করিতে হইলে সেগুলিকে বিশেষ ভাবে প্রস্তুত করা আবশ্যক।*

এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রথমে দুগ্ধ হইতে মাখন তুলিয়া, পরে সে দুগ্ধ ফুটাইয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে অতি অল্পকালের মধ্যেই তাহাকে শীতল করিলেন। এই দুগ্ধে তাঁহার প্রস্তুত বিশুদ্ধ বীজাণু প্রয়োগ করিলেন এবং সেগুলি তৎক্ষণাৎ দধি ক্রিয়া আরম্ভ করিয়া দিল।

ইতিপূর্ব্বে নানাবিধ পরীক্ষা দ্বারা মেচনিকফ্ স্থির করিয়াছিলেন যে দুগ্ধে এমন এক প্রকার বীজাণু আছে যাহা সতেজ অম্ল (acid) প্রসব করিয়া দেহের পচন ক্রিয়া রোধ করে। তিনি ইহাও দেখিয়াছিলেন যে বুলগারিয়া (Bulgaria) দেশের কৃষকগণ

---

* আমাদের দেশে জ্বাল দেওয়া দুগ্ধেরই দই, ঘোল, ছানা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। সুতরাং আমাদের প্রণালী বৈজ্ঞানিক প্রণালী সম্মত সন্দেহ নাই। ভাঃ সঃ

যে এক প্রকার ঘোল পান করে তাহাতেই এই বীজাণু সর্ব্বাপেক্ষা প্রবলভাবে অবস্থান করে। তাহাদের সেই ঘোল হইতে বীজাণু বহির্গত করিয়া তিনি বিশুদ্ধ বীজাণু প্রস্তুত করিলেন। এই বুলগেরিয়ান দুগ্ধে মিশ্রিত করিয়া মেচনিকফ্ তাহার Cemnttin অর্থাৎ দধি প্রস্তুত করিলেন।

কতকগুলি শ্বেত ইন্দুরের দেহে বার্দ্ধক্যের বীজাণু প্রবিষ্ট করাইয়া তাহাদিগকে দুগ্ধ ব্যতীত অন্যান্য খাদ্য দিয়া রাখা হইল। আর কয়েকটি ইন্দুরের শরীরে উক্ত বীজাণু প্রবিষ্ট করাইয়া তাহাদিগকে মেচনিকফের প্রস্তুত দধি ভোজন করাইয়া রাখা হইল। প্রথম দলের প্রত্যেকটিই জরাগ্রস্ত হইয়া পড়িল, কিন্তু দ্বিতীয় দলের মধ্যে সে লক্ষণ কিছুই দেখা গেল না, তাহারা দিন দিন সবল সতেজ হইয়া উঠিতে লাগিল।

এই পরীক্ষাতেই মেচনিকফ্ ক্ষান্ত হইলেন না। অপরাপর অনেক জন্তু লইয়া তিনি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। একটি বানরের দেহে বার্দ্ধক্যের বীজাণু প্রবিষ্ট করাইবার পর কয়েক সপ্তাহ পরেই বানরটি অসুস্থ হইয়া পড়িল এবং তাহার বার্দ্ধক্য আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পর তাহাকে বুলগেরিয়ান বীজাণু-প্রস্তুত দধি ভক্ষণ করাইতে থাকায় ছয় মাসের মধ্যেই সে পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল এবং পরীক্ষা দ্বারা দেখা গেল যে তাহার দেহে বার্দ্ধক্য বীজাণু আর নাই।

মেচনিকফ্ নিজে এই দুগ্ধ বীজাণু আট বৎসর সেবন করিয়া বিশেষ উপকার বোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস যে এই ব্যবস্থায় তাঁহার পরমায়ু বৃদ্ধি পাইতেছে। তাঁহার মতে আমাদের নিত্যই যে দধি ভক্ষণ আবশ্যক তাহা নহে, বিশুদ্ধ বুলগেরিয়ান বীজাণু নিত্য সেবন করিলেই যথেষ্ট। কিন্তু তাহার সঙ্গে অল্প কোন মিষ্ট দ্রব্য আহার করা আবশ্যক, নচেৎ বীজাণুগুলি অম্ল প্রসব করে না। দুগ্ধ-বীজাণুগুলি 'ফ্যাগোসাইটের সহিত মিশ্রিত হইলে আমাদের দেহক্ষয়কর বীজাণু-গুলিকে সহজেই নষ্ট করিতে পারে।

মেচনিকফ্ বলেন—"যদি আমাদের পাকাশয়ের বিশেষতঃ ঊর্দ্ধতন অন্ত্রদলের অসংখ্য দেহক্ষয়কর বীজাণুগুলি আমাদের বার্দ্ধক্য আনিয়া উপস্থিত করে ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে যে বীজাণুগুলি দ্বারা তাহা শক্তিহীন ও নষ্ট হয়, তাহার বার্দ্ধক্য ও জরারোধ করিবার শক্তি আছে ইহাও সত্য।"

মেচনিকফের মতে অশীতি বর্ষের বৃদ্ধ ক্রমে চল্লিশ বৎসরের মনুষ্যের ন্যায় শিল্পকর্ম্ম ও সবল মস্তিষ্ক হইতে পারে। পৃথিবীতে একদিন অশীতি বর্ষের মনুষ্য যুবা বলিয়া পরিগণিত হইবে। আমরা ততদিন বাঁচিব না ইহাই দুঃখ।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

"কাশী যাব কি মক্কা যাব ?"

পুরাতন গল্প।

এক ব্রাহ্মণ—পথিমধ্যে কোন অস্পৃশ্য বস্তু স্পর্শ করায় মনে মনে চিন্তা করিলেন যে পাপ হইল, এজন্য তিনি গৃহে প্রবেশ না করিয়াই গঙ্গাভিমুখে চলিলেন। সেখান হইতে গঙ্গা অনেক দূর। পথিমধ্যে সন্ধ্যা হইল; চারিদিকে মাঠ; ভারী বৃষ্টি আরম্ভ হইল। নিকটে একটিমাত্র কুটীর; তাহা এক চর্ম্মকারের। ব্রাহ্মণ ভাবিতে লাগিলেন ব্রাহ্মণ হইয়া চর্ম্মকারের বাটীতে কেমন করিয়া থাকি! কিন্তু ক্রমে বৃষ্টি চাপিয়া আসিল; ঝড়ও আরম্ভ হইল, চারিদিক অন্ধকারে ঢাকিয়া গেল—ঘন ঘন বজ্রপাত হইতে লাগিল। তখন ব্রাহ্মণ মনে করিলেন, কোন রকমে রাতটা কাটানো বইত নয়, তাতে আর দোষ কি? এই ভাবিয়া তিনি

চর্ম্মকারের বাটীতে প্রবেশ করিলেন; চর্ম্মকার ব্রাহ্মণকে দেখিয়া আহ্লাদিত হইল; ভক্তিভরে প্রণত হইয়া তাঁহাকে বসিবার আসন দিল। ব্রাহ্মণ বলিলেন "বাপু, আমি তোমার ঘরে কোন জিনিস স্পর্শ করিব না; আমি কেবল একটু মাথা গুঁজিবার ঠাঁই চাই—ঝড় বৃষ্টি কাটিয়া গেলে স্বস্থানে চলিয়া যাইব।" চর্ম্মকার কহিল "ঠাকুর সে কি হয়? আমার বাটীতে যখন পায়ের ধূলা পুড়িয়াছে তখন পাক করিয়া খাইয়া না গেলে আমি ছাড়িব না।" ব্রাহ্মণ ভাবিলেন—সর্ব্বনাশ! আমি অস্পৃশ্য বস্তু স্পর্শের পাপ ক্ষালন করিবার জন্য গঙ্গাস্নানে যাইতেছি; পথিমধ্যে এ কি বিপদ! চামারের অন্ন গ্রহণ করিতে হইবে! আমার চৌদ্দ পুরুষে এমন কাজ কখনো করে নাই! প্রকাশ্যে কহিলেন "না হে বাপু, আমি একাহারী রাত্রে কিছুই খাই না।" চর্ম্মকার কহিল "ঠাকুর! অপরাধ লইবেন না—আমার গৃহে অতিথি উপবাসী থাকিবে, এ পাপ আমি গ্রহণ করিতে পারিবনা—আপনি অন্যত্র আশ্রয় লউন।" তখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে; ঘন ঘন বজ্রপাত হইতেছে। ঘরের বাহির হয় কাহার সাধ্য! চর্ম্ম-কার কহিল, "যা হয় একটা কর—হয় খাও দাও ঘুমোও, নয় অন্য জায়গা খোঁজ ঠাকুর! দাঁড়িয়ে ভাবলে কি হবে।" ব্রাহ্মণ বলিলেন "আচ্ছা, বাপু, তোর কথাই থাকুক; তোর খুব পুণ্যবল! আমি রাঁধা বাড়া করিয়াই খাব; তবে নূতন পাত্র চাই।" চর্ম্মকার সেই দিবসই হাট হইতে নূতন রন্ধন-পাত্র আনিয়া রাখিয়াছিল; গৃহে চাল ডাল তৈল লবণ ইত্যাদি ছিল। চর্ম্মকার ব্রাহ্মণকে একটি পরিষ্কার ঘর দেখাইয়া দিল। ব্রাহ্মণের আজ্ঞায় চর্ম্মকার-পত্নী তাহাতে পুনরায় গোময় লেপন করিয়া তাহা শুদ্ধ করিয়া দিল। ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, স্বহস্তে সমস্ত দ্রব্যের আয়োজন করিয়া লইব তাহাতে বিশেষ দোষ ঘটিবে না। যথাসময়ে ব্রাহ্মণ নিকটস্থ পুষ্করিণী হইতে জল আনিয়া নূতন পাত্রে সিদ্ধ-পক্ক চড়াইয়া দিলেন। যথাসময়ে পাক সমাধা হইল। ব্রাহ্মণ এক কদলিপত্রে অন্ন রাখিয়া দেখিলেন যে জল ফুরাইয়া গিয়াছে। সুতরাং তাঁহাকে পুনরায় জল আনিতে যাইতে হইবে। চর্ম্মকার কহিল, আমি সঙ্গে সঙ্গে আলো লইয়া যাই-তেছি; অন্ধকারে অপরিচিত পথে যাইবেন না। ব্রাহ্মণ বলিলেন "চলত বাপু।" চর্ম্মকার আপনার পত্নীকে ডাকিয়া ব্রাহ্মণের ভাতের পাহারায় রাখিয়া দিয়া প্রদীপ লইয়া ব্রাহ্মণের সঙ্গে সঙ্গে পুষ্করিণীর ঘাটে গেল। যথাসময়ে উভয়ে ফিরিয়া আসিলেন। ব্রাহ্মণ ভোজন সমাধা করিয়া আপনার উত্তরীয়টি বিছাইয়া শয়ন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি শুনিতেছেন যে চর্ম্মকার তাহার পত্নীকে ভয়ানক প্রহার করিতেছে সে যন্ত্রণায় ঘোর চীৎকার করিতেছে। ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি দৌড়িয়া গিয়া চর্ম্মকারকে কহিলেন "হাঁ, হাঁ, কর কি কর কি; স্ত্রীহত্যা করবে না কি!" চর্ম্মকার কহিল "ঠাকুর মশায়, এ রকম স্ত্রীর মরণই ভাল; ওর মুখ দেখিতে নাই।"

ব্রাহ্মণ ব্যগ্র ভাবে কহিলেন—"কেন? কেন? কি হয়েছে?"

চর্ম্মকার তখন ক্রোধে ফুলিতেছে। সে কহিল "দেখুন ত মশায়! চামারণির কাণ্ড দেখেছেন, আমি সারাদিন খেটে খুটে রাত্রে

নিয়েচে, যে পেটই ভ'রল না।" ব্রাহ্মণ চর্ম্মকারপত্নীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "কেন গো বাছা, চারটি চাল বেশি নিলেই ত হ'ত; ভাত যদি বেশি থাকতো ভিজিয়ে রেখে খেতে!" চর্ম্মকারপত্নী তখন প্রহারের যন্ত্রণায় অস্থির। ব্রাহ্মণের প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর না দিতে পারিলে পাছে আরো প্রহার খাইতে হয় এই ভয়ে সে আসল কথা বলিয়া ফেলিল। সে বলিল "ঠাকুর মহাশয়, চাল ঠিকই নিয়েছিলাম; আপনার ভাতের কাছে যখন পাহারা দিচ্ছিলাম তখন ছেলেটা কেঁদে উঠল; ভাবলাম টপ্ ক'রে ছেলেটাকে বিছানা থেকে তুলে এনে কোলে করে আপনার ভাতের কাছে বসি। ছেলে আনতে গেছি, এর মধ্যে ঐ যে পোড়ারমুখো কুকুরটা দাওয়ায় শুয়ে আছে, আপনার ভাতের অর্দ্ধেক খেয়ে ফেলে। আমি ভাবলাম যে, যদি চামার জানতে পারে তবে, আমার ঘাড়ে মাথা রাখবে না। আমি তাড়াতাড়ি আমার হাঁড়ি থেকে ভাত বার করে এনে আপনার ভাতে মিশিয়ে দিলাম। ভাবলুম আমার ভাগটাই গেল, আমি না হয় রাত্রে উপোস করে থাকব। এখন দেখচি চামারেরও ভাত কম হয়ে গেছে। ঠাকুর মহাশয় এক দিন এক মুঠো কম খেলে কি আর চলেনা।" ব্রাহ্মণ অস্নাত; অস্পৃশ্যস্পর্শজনিত পাপ মোচনের জন্য গঙ্গাস্নানে যাইতেছেন; পথিমধ্যে আরো গুরুতর পাপ সঞ্চয় করিলেন। শুধু যে কুক্কুর-ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন আহার করিলেন তাহা নহে; চর্ম্মকার-রমণী-পক্ক অন্নও উদরস্থ করিলেন। হায়, হায়, এ পাপ মোচন করিতে গঙ্গাস্নানে গেলে ত চলিবে না—কাশী যাইতে হইবে।

পর দিবস প্রত্যূষে চর্ম্মকার-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ বারাণসী অভিমুখে চলিলেন। পথে এক ব্রাহ্মণ-কন্যার গৃহে অতিথি হইতে হইল। ব্রাহ্মণ-কন্যা নানা অন্নব্যঞ্জন পাক করিয়া অতি পরিতোষের সহিত তাঁহাকে খাওয়াইল। আহারান্তে ব্রাহ্মণ তামাকু সেবন করিতেছেন, এমন সময় ব্রাহ্মণ-কন্যা অবগুণ্ঠন টানিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ব্রাহ্মণ কহিলেন "কি মা?" ব্রাহ্মণ-কন্যা কহিল "বাবা, আপনার কাছ থেকে একটা ব্যবস্থা নিতে এসেচি।"

ব্রাহ্মণ কহিলেন—"কি ব্যবস্থা, মা?"

"বাবা, আমার ঐ যে ছেলেটি, ওটির বাপ ছিল একজন মুসলমান। আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে; আমাকে সেই মুসলমানটা ভুলিয়ে নিয়ে এসেছিল। ঐ ছেলেটা যখন আমার গর্ভে তখন সেই মুসলমানটার মৃত্যু হয়। সেই অবধি আমি ব্রাহ্মণের মতই আছি। এখন ভাবচি ছেলেটা তো তার, তবে ওর পৈতে দিব কি ওকে মুসলমান করাব।"

ব্রাহ্মণ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন; মুখ দিয়া কথা সরিল না। ব্রাহ্মণ-কন্যা ভাবিল যে,—সে কঠিন প্রশ্ন করিয়াছে কিনা, তাই ব্রাহ্মণকে ভাবিতে হইতেছে। অনেকক্ষণ ব্রাহ্মণকে নীরব দেখিয়া ব্রাহ্মণ-কন্যা আবার কহিল "বলুন না, কি ক'রব।" তখন ব্রাহ্মণ রাগিয়া কহিলেন "তুই যা জানিস্ তা ক'রগে। আমি ভাবচি, আমি কি ক'রব? আমি এখন কাশী যাব কি মক্কা যাব?"

শ্রীশশিভূষণ বিশ্বাস।

স্পঞ্জসংগ্রহ ও নকল স্পঞ্জ উৎপন্ন প্রণালী।

স্পঞ্জ বা শোষণী সমুদ্র গর্ভজাত একরূপ সজীব পদার্থ। ঝিনুকের ন্যায় ডুবারীদিগের দ্বারাই ইহা উত্তোলিত হইয়া থাকে। স্পঞ্জের ব্যবসায় আমেরিকার যুক্তরাজ্যে অর্দ্ধ শতাব্দীর কিঞ্চিদধিক সময় হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। তখন 'কি-ওয়েষ্ট' (Key west) নামক ক্ষুদ্র দ্বীপের চতুঃপার্শ্বস্থ সমুদ্র হইতে তৎস্থানের অধিবাসীগণ স্পঞ্জ সংগ্রহ করিত। ক্রমশঃ স্পঞ্জের কাটতি যত বাড়িতে লাগিল ততই নানাস্থান হইতে ইহার সংগ্রহ চলিতে লাগিল। আমরা এক্ষণে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সন্নিকটবর্ত্তী সাগর গর্ভের স্পঞ্জ সংগ্রহ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। ফ্লোরিডার পশ্চিম উপকূলে টারপান স্প্রীংস্ (Tarpan Springs) এবং কিউবা দ্বীপের দক্ষিণ দিক্‌বর্ত্তী বাটাবানো (Batabano) নামক স্থানে বহুপরিমাণে স্পঞ্জ উৎপন্ন হয়। যদিও এই দুইটি স্থান পরস্পর অতি সন্নিকটবর্ত্তী—এমন কি ইহা একস্থান হইতে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে অপর স্থানে সহজেই পতিত হইতে পারে,—তথাপি উভয়-স্থানের স্পঞ্জ সংগ্রহপ্রণালী সম্পূর্ণরূপে পৃথক। ফ্লোরিডা উপকূলের স্পঞ্জ উত্তোলনপ্রণালী বর্ত্তমান জগতের কৌশল ও বিজ্ঞানানুমোদিত। কিন্তু কিউবা উপকূলে অতি প্রাচীনকালোপযোগী প্রথাতেই স্পঞ্জ সংগৃহীত হয়। কিউবা দ্বীপবাসীগণ ডোঙ্গার ন্যায় একপ্রকার নৌকাযোগে সমুদ্রমধ্যে গমন করে। সেই নৌকার 'পাটাতন' সুপ্রশস্ত। তাহারা এই নৌকাকে চালুপা (chalupa) বলিয়া থাকে। ডুবুরিগণ সমুদ্র মধ্যে সহজে যে প্রকার অস্ত্র চালিত হইতে পারে এমত অস্ত্র সঙ্গে লইয়া প্রথমে এই নৌকায় ওঠে। এই অস্ত্র আর কিছুই নহে—এক প্রকার "নগা"। প্রত্যেক ডুবুরিকে তিনখানি করিয়া এই "নগা" সঙ্গে লইতে হয়। এগুলি যথাক্রমে ৭, ২০ ও ৩৪ হস্ত দীর্ঘ। প্রত্যেকটির আগায় তিনটি করিয়া সূক্ষ্ম বক্রাকৃতি তীক্ষ্ণ ধার লৌহশলাকা সন্নিবিষ্ট থাকে। ঐ অস্ত্র তিমি প্রভৃতি ভয়াল হিংস্র জন্তু নিকটবর্ত্তী হইলে তাহাকে হনন করিবার জন্য। উহা আমাদের দেশের অনেকটা বল্লমের অনুরূপ। এই অস্ত্র সঙ্গে লইবার প্রথা আর অধুনা দৃষ্ট হয় না। ডুবুরিগণ বহুদূর দৃষ্টিক্ষম চসমা পরিয়া চালুপার সাহায্যে ধীরে ধীরে সমুদ্রগর্ভে গমন করিতে থাকে। সার্সী যে গ্লাসের দ্বারা প্রস্তুত এই চসমাও অধিকাংশ সেই গ্লাসের প্রস্তুত। যে

পাত্রের মধ্যে জল প্রবেশ করিতে পারে না (Water-tight-cylinder) এমনতর উভয়

মুখ খোলা পাত্রের একদিকে এই গ্লাস উত্তমরূপে বসাইয়া দেওয়া হয় ও অপর মুখ চক্ষের উপরে স্থাপিত করা হয়। ডুবুরিগণ তাহাদের মস্তক ছবিনির্দ্দিষ্ট যন্ত্রের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়া সমুদ্রের তলদেশে গমন করিতে থাকে। তলদেশের ৩৪ হস্ত পরিমিত স্থান এই যন্ত্র সাহায্যে তাহারা পরিদর্শন করিতে পারে। গ্লাসের উপর তরঙ্গাঘাত হইলেও তাহাতে দর্শনের কোনপ্রকার বিঘ্ন সমুপস্থিত হয় না। সে নির্ব্বিঘ্নে তাহার দর্শনীয় দ্রব্যাদি অবলোকন করিয়া কার্য্যোদ্ধার করে। সমুদ্রের উপরিভাগে উর্ম্মিমালা যেমন প্রায় সতত‌ই নৃত্য করিতেছে তেমনি উহার তলদেশেও জোয়ার ভাঁটা ও নিম্নস্রোত আছে সুতরাং তথায়ও কাহারও নিরাপদে থাকিবার সুবিধা নাই। যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত প্রকার চসমা এবং একপ্রকার সামুদ্রিক দূরবীক্ষণের সাহায্যে সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতঃ ধীবরেরা স্পঞ্জ দর্শনমাত্র একরূপ বঁড়শীর দ্বারা তাহা টানিয়া লয়। কিন্তু এবম্প্রকার পুরাতন প্রথানুসারে স্পঞ্জ সংগ্রহ নিতান্ত দুরূহ এবং অতীব সাহসিকতার পরিচায়ক। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বেও এই পুরাতন প্রথানুসারে ফ্লোরিডা উপকূলে স্পঞ্জ সংগ্রহ হইত। তথাকার অধিবাসীগণের মধ্যে কেহ কেহ অদ্যাবধিও এই প্রকার প্রথানুযায়ী কার্য্য করিয়া থাকে। এক্ষণে প্রায় লোক দলবদ্ধ হইয়া দ্বিমাস্তুলযুক্ত অতঃপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোত সঙ্গে লইয়া স্পঞ্জ সংগ্রহের জন্য উক্ত স্থানের বন্দরসমূহে গমন করে। এই নৌকাকে আমেরিকায় "স্কুনার"(Schooner) কহে। প্রত্যেক নৌকার নাবিক সংখ্যা ৬জন এবং একজন পাচক—সর্ব্বশুদ্ধ ৭ জন মাত্র। ইহার সঙ্গে আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিঙ্গি থাকে। প্রত্যহ প্রাতঃকালে তাহারা এই স্কুনার হইতে ডিঙ্গিতে করিয়া স্পঞ্জ সংগ্রহের স্থানে উপস্থিত হয়। ঐ ক্ষুদ্র ডিঙ্গিতে দুইজন করিয়া লোক থাকে। তন্মধ্যে এক ব্যক্তিকে "হুকার" (Hooker) ও অপর ব্যক্তিকে "স্কালার" (Sculler) কহে। প্রথম ব্যক্তি নতজানু এবং নতমস্তক হইয়া সারাদিন সেই শুণ্ডাকৃতি যন্ত্রটি মুখোসের ন্যায় পরিধান করিয়া দূরবীন দিয়া একদৃষ্টে সমুদ্র গর্ভ নিরীক্ষণ করিতে থাকে। তখন তাহাকে দেখিলে করী-শিশু বলিয়া ভ্রম জন্মে। দ্বিতীয় ব্যক্তি অতি সন্তর্পণে নৌকাখানি বাহিতে থাকে। প্রথম ব্যক্তির ঐ প্রকার নাম প্রদান করিবার সার্থকতা এই যে, সে ঐ যন্ত্র সাহায্যে সমুদ্র মধ্যস্থিত ৩৪।৩ হস্ত দূরের দ্রব্য দর্শন করিয়া হস্তস্থিত সুদীর্ঘ হুক বা আকর্ষণীর দ্বারা সমুদ্র তলদেশস্থিত স্পঞ্জ টানিয়া আনে। সন্ধ্যা না হওয়া পর্য্যন্ত এই প্রকার কার্য্য সাধিত হয়। অবশেষে স্পঞ্জে নৌকা পূর্ণ করিয়া তাহাদের ক্ষুদ্র আড্ডা স্কুনারের নিকট লইয়া যায়। এইরূপে নৌকার গুদামে আট সপ্তাহ ধরিয়া স্পঞ্জ সংগৃহীত হইলে তাহা বন্দর উপকূলে আনীত হয়।

আমাদের দেশে যেমন বৃহৎ বৃহৎ কারখানায় বহু আয়াসসাধ্য ছুতারের কার্য্য চীনেদের দ্বারা সম্পাদিত হয় আমেরিকার ফ্লোরিডা উপকূলেও সেইরূপ গ্রীক ডুবুরী দ্বারা বহু আয়াসসাধ্য স্পঞ্জ উত্তোলন কার্য্য সম্পাদিত হয়। গ্রীকবাসী

ডুবুরীগণ পূর্ব্বে ভূমধ্য সাগর হইতে স্পঞ্জ সংগ্রহ করিত। পরে ইহারা সে স্থান হইতে বিতাড়িত হইয়া সুদূর আমেরিকার ফ্লোরিডা নামক স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করতঃ স্পঞ্জ উত্তোলন কার্য্যে নিযুক্ত আছে। বহু বৎসর ধরিয়া তাহারা এই কার্য্য করায় এসম্বন্ধে তাহারা অদ্বিতীয় পারদর্শী। এই ডুবুরীগণের একপ্রকার পোষাক আছে তাহাকে "স্যাফ্যাণ্ডার" (Shafander) বলে। তাহারা এই পোষাকাবৃত হইয়া সুগভীর সমুদ্র তলদেশে গমনকরতঃ যে প্রকার স্পঞ্জ সংগ্রহ করে এবং সুগভীর সলিলাভ্যন্তরে স্পঞ্জ দেখিলেই ভালমন্দ যেরূপ বুঝিয়া লইতে পারে এমন আমেরিকাবাসী কোন ধীবর পারে না। এই পোষাক বর্ত্তমানকালের বিজ্ঞান সম্মত। কিন্তু পোষাকের অধিকাংশ স্থলই সিসা দ্বারা প্রস্তুত বলিয়া অতিরিক্ত ভারাক্রান্ত;—এমন কি বিনামার তলদেশ ইংরাজিতে যাহাকে sole বলে তাহাও সিসার। ধীবরেরা সঙ্গে একএকটি প্রকাণ্ড জালের থলি লইয়া যায়। পর্ব্বত হইতে কমলালেবু সংগ্রহের জন্য যে প্রকার জালের ব্যাগ ব্যবহৃত হয় ইহাও তদ্রূপ, কিন্তু আকারে অনেক বড়। উক্ত ব্যাগ কোমরের সঙ্গে ঝুলান থাকে। স্পঞ্জ সংগ্রহ করিয়া তাহারা ঐ ব্যাগের মধ্যে রাখিয়া দেয়। এবং তাহা স্পঞ্জপূর্ণ হইলে তাহার একদিকের রজ্জু ধরিয়া টানিয়া নৌকার লোক উহা গ্রহণ করে—আবার শূন্য ব্যাগটি ডুবুরীগণ অপর পার্শ্বের রজ্জু ধরিয়া টানিয়া লইয়া থাকে। স্পঞ্জ সংগ্রহ কার্য্য উভয় হস্ত দ্বারাই সম্পন্ন হয়। ডুবুরীগণের নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া যাহাতে সহজে সম্পন্ন হইতে পারে এমন একটি পম্প যন্ত্র ধীবরগণের নাসিকার সংযোগ করিয়া দেওয়া হয়।

পূর্ব্বে যে পোষাকের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি তাহাতে বৈজ্ঞানিক দোষ না থাকিলেও উহাতে জীবনের আশঙ্কা দূর করিতে পারে না। সমুদ্র মধ্যে হাঙ্গরের ভয়ই অধিক। যে সকল স্থানে স্পঞ্জের আধিক্য দৃষ্ট হয় তথায় ভয়ের কারণ বিলক্ষণ আছে। তথায় মনুষ্য-রক্ত পিপাসু বহু সামুদ্রিক জন্তু বাস করে। এই সমুদায় জন্তুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রের আবশ্যক। অথচ এই ধীবরগণ কখনও সেরূপ কোনও অস্ত্র সঙ্গে লইয়া যায় না। ইহার কারণ কি? মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর এক স্থলে উক্ত আছে—শুম্ভ নিশুম্ভ বধ উদ্দেশ্যে দেবী কালীমূর্ত্তি ধারণ করতঃ রক্তবীজ বধ কালে দেখিলেন, অস্ত্রাঘাতে উক্ত অসুরের দেহ হইতে শোণিত ভূমিতলে নিপতিত হইবামাত্র শত সহস্র অসুর দেহধারী রক্তবীজের আবির্ভাব হইতে লাগিল। এই হাঙ্গরগণের বেলাও তাহাই হইয়া থাকে। আহত হাঙ্গরের এক বিন্দু শোণিত জলের সঙ্গে সংমিলিত হইবামাত্র শত শত হাঙ্গর আসিয়া তথায় উপস্থিত হয়। ইহারাও রক্তবীজের বংশধর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সকল কারণে ডুবুরীগণ কোন ক্রমেই অস্ত্র সঙ্গে লয় না। একটি হাঙ্গরের রক্তপাত করিয়া শত সহস্র হাঙ্গরের দ্বারা ভক্ষিত হইতে কে ইচ্ছা করে? হাঙ্গরের প্রাণশক্তি অতিশয় প্রবল। এই ধীবরগণের পোষাকের গুরুভার নিবন্ধন হাঙ্গরের হস্ত হইতে পলায়ন করিবারও কোনও উপায় নাই। তবে

হাঙ্গরের কবল হইতে রক্ষা পাইবার একটি মাত্র উপায় আছে। যত্তপি কোন প্রবল পরাক্রান্ত নরমাংসভোজী হাঙ্গর ঘটনাক্রমে অভিনয় স্থলে সমুপস্থিত হয় তখন ডুবুরীকে মৃতের ন্যায় স্থির ভাবে সমুদ্রগর্ভে পড়িয়া থাকিতে হইবে; তাহাতেই তাহার প্রাণ বাঁচিয়া যাইতে পারে। কারণ হাঙ্গরেরা সিংহ ভল্লুকের ন্যায় মৃত প্রাণী ভক্ষণ করে না। কিন্তু একজন গ্রীক দেশীয় সুবিখ্যাত ও অভিজ্ঞ ডুবুরী এইরূপ বলিয়াছে, "দশম হস্ত পরিমিত একটি ক্ষুধার্ত্ত হাঙ্গরের সম্মুখে নিশ্চলভাবে বহুক্ষণ সমুদ্র গর্ভে মৃতপ্রায় পড়িয়া থাকিতে মনুষ্যের পক্ষে অস্বাভাবিক স্নায়বিক শক্তির আবশ্যক। এই কার্য্যে অনেকেই অক্ষমতা প্রকাশ করিয়া প্রাণ হারাইয়া থাকে। একটি প্রকাণ্ড হাঙ্গর যখন মনুষ্যটিকে ঘেরিয়া ফেলিয়া অবিশ্রান্ত লাঙ্গুলাঘাত করিতে থাকে তখন কাহার সাধ্য তথায় স্থিরভাবে অবস্থিত করিতে পারে?"

সংগ্রহের পর স্পঞ্জগুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা হইতে বড় জাহাজে তোলা হয়—এবং উহার অন্তর্গত দ্রব্যগুলি বাহির হইয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত গুদাম-জাহাজের পাটাতনে সেগুলি পড়িয়া থাকে। এই স্পঞ্জরূপী জীবগুলির দেহ হইতে প্রথমে তীব্র অ্যামোনিয়ার (Ammonia) গন্ধ বহির্গত হইতে থাকে। এবং অল্পদিন পরে তাহা হইতে উৎকৃত সামুদ্রিক বৃক্ষ বিশেষের ন্যায় অপেক্ষাকৃত সুমিষ্ট গন্ধে চারিদিক মুখরিত হইতে থাকে। অতঃপর স্পঞ্জবাহী জাহাজ উপকূলাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সেই সমুদয় স্পঞ্জগুলিকে লৌহগরাদে দ্বারা প্রস্তুত খোঁয়াড়ের মধ্যে রাখিয়া দেওয়া হয়। উক্ত খোঁয়াড়ে সমুদ্রের উপকূলস্থিত জল আসিয়া ক্রমাগত সেগুলিকে বিধৌত করিতে থাকে। এক সপ্তাহকাল ধৌত ক্রিয়ার পর স্পঞ্জগুলি ক্রমশঃ গুটাইয়া আইসে এবং আকারে ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে; তখন তাহার উপর দণ্ডের দ্বারা ক্রমাগত আঘাত করা হয়। এই প্রকারে তন্মধ্যস্থিত জীবন্ত দ্রব্যাদি সমূলে নষ্ট হইয়া যায়। ইহার পর জাহাজ পূর্ণ হইয়া স্পঞ্জরাশি নিলামে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়। তথা হইতে প্যাক-কারী এজেন্টগণ উহা ক্রয় করিয়া লইয়া যায় এবং বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করিয়া ব্যবসায়ের প্রসার বৃদ্ধি করে। স্পঞ্জ প্যাক করিবার পূর্ব্বে উহা পুনরায় চূর্ণমিশ্রিত সামুদ্রিক জলে ধৌত করিতে হয়। যত্তপি এই জলের মধ্যে চূণের অংশ অধিক হইয়া পড়ে তবে স্পঞ্জ অমসৃণ হইয়া পড়ে এবং সহজেই ছিন্ন করিতে পারা যায়। ইহা সত্ত্বেও বহু ব্যবসায়ী চূণের অংশ অধিক দিয়াই স্পঞ্জ ধৌত করে। কারণ অত্যধিক চূণ দ্বারা স্পঞ্জ ধৌত করিলে তাহার ভার অধিক হইয়া থাকে। এবং তাহা হইলেই উহা অধিক মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে।

বিভিন্নজাতীয় স্পঞ্জ

জগতে তুর্ক দেশীয় স্পঞ্জ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। প্রায় অৰ্দ্ধসের তুর্কস্পঞ্জ এক শত ছাপান্ন টাকা চারি আনা (১৫৬।০ আনা) মূল্যে বিক্রয় হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর স্পঞ্জ উলের মত বলিয়া উহাকে মেষ-লোম জাতীয় স্পঞ্জ বলা হয়। মেষের লোমের পশমের ন্যায় ইহা অত্যন্ত কোমল ও মনোরম,

অথচ ইহার মূল্যও অতিরিক্ত নহে। এই জাতীয় স্পঞ্জ বেশ বিন্যাস করিবার টেবিলে রক্ষিত হইয়া থাকে। তুরস্ক দেশীয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্পঞ্জ অপেক্ষা ইহার ব্যবহার অধিক,—কারণ ইহার মূল্য সুলভ। অতঃপর ভেলভেট ও পীত জাতীয় স্পঞ্জ এবং তদপেক্ষা নিকৃষ্টতর ঘাসের ন্যায় এক প্রকার স্পঞ্জ এবং অবশেষে সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ দস্তানাজাতীয় স্পঞ্জ। গুণানুসারেই স্পঞ্জের মূল্যেরও তারতম্য হইয়া থাকে। তদনুসারেই আমরা উহার শ্রেণী বিভাগ করিয়া দিলাম। ভেলভেট জাতীয় স্পঞ্জ ফ্লোরিডা উপকূলে অত্যল্প পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং উহার মূল্যও গুণানুসারে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। পূর্ব্বে যে ঘাস ও দস্তানা জাতীয় স্পঞ্জের কথা বলিয়াছি তাহার প্রায় অর্দ্ধসেরের কয়েক সেণ্ট (আমেরিকা দেশীয় মুদ্রাবিশেষ) মূল্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সেণ্টের ব্যবহার আমেরিকার যুক্তরাজ্যে এবং মেক্সিকো ও আসিয়া মহাদেশের সিঙ্গাপুর প্রভৃতি স্থানে প্রচলিত আছে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ১০০ সেণ্টে (cent) এক ডলার (dollar) হয়। উহা রৌপ্য নির্ম্মিত। ঐ ডলারের মূল্য ২ শিলিং ২ পেন্স মাত্র। উহা আমাদের দেশের মূল্যানুসারে প্রায় তিন টাকা দুই আনা হয়। স্পঞ্জ উত্তম রূপে শুষ্ক হইলে তুলার ন্যায় হালকা হইয়া পড়ে। অর্দ্ধসের শুষ্ক স্পঞ্জ রাশিকৃত দেখায়।

স্পঞ্জের চাষ—

তুরস্ক দেশীয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্পঞ্জ পৃথিবীর অপর স্থানে চাষ করিবার জন্য বহু গবেষণা চলিতেছে এবং আমেরিকার পণ্ডিতগণ উক্ত চেষ্টার ফলে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তাঁহারা তুরস্ক দেশের উপকূলবর্ত্তী সাগরগর্ভ হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট জীবিত স্পঞ্জ উত্তোলন করিয়া সুবৃহৎ চৌবাচ্চায় সামুদ্রিক লবনাক্ত জলপূর্ণ করিয়া তন্মধ্যে "জিয়াইয়া" রাখিয়া ও সেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চৌবাচ্চা পূর্ণ দ্রব্য আমেরিকার উপকূলে লইয়া আসিয়া স্পঞ্জ উৎপন্নোপযোগী সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ বা রোপণ করিবেন, এইরূপ স্থির হইয়াছে। আমেরিকার বিখ্যাত প্রাণীতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ডাক্তার এইচ, এফ্, মুর (Dr. H. F. Moore.) বহু পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, স্পঞ্জের মূলোৎপাটিত হইলেও তন্মধ্যস্থিত জীবাণু ধ্বংস হয় না। তিনি মূলহীন স্পঞ্জের চাষ করিয়া বহু স্পঞ্জ উৎপন্ন করিয়াছিলেন। তিনি বলেন স্পঞ্জের মূলগুলি অতিসূক্ষ্ম এবং ক্ষণভঙ্গুর। স্পঞ্জে হস্ত স্পর্শ করিবামাত্র উহার মূলগুলি ভগ্ন হইয়া যায়। আর স্বভাবজাত স্পঞ্জ অপেক্ষা এই প্রকার স্পঞ্জের স্থায়িত্ব অধিক। ডাক্তার মুরের স্পঞ্জ প্রস্তুত প্রক্রিয়া নিম্নে প্রদত্ত হইল:—দুই কিউবিক ইঞ্চি পরিমিত করিয়া মূলবিহীন জীবিত স্পঞ্জগুলি সুতীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া কর্ত্তন করিতে হইবে। কর্ত্তনকার্য্য সম্পন্ন হইলে উহাদের স্বাভাবিক গাত্র-চর্ম্মদ্বারা অন্ততঃ এক প্রান্ত আবৃত করিয়া দিতে হইবে। প্রত্যেক টুকরা লম্বালম্বিভাবে এক ইঞ্চি গভীর রূপে চিরিয়া একটি তারের উপর স্থাপন পূর্ব্বক একটি এ্যালিউমিনিয়ম তার দ্বারা চিরবদ্ধ করিয়া দিতে হইবে। উক্ত তারটি কোনরূপ অপরিষ্কার

বা মরিচা ধরা না হয়। এক সপ্তাহের মধ্যে স্পঞ্জ বৃদ্ধি হইয়া ঝুলান তারটি ঢাকিয়া যাইবে। লম্বা লম্বা তারের চারিদিক মালার আকারে গ্রন্থন করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডীকৃত স্পঞ্জ চির দিয়া নাতি সুগভীর সমুদ্রের তলদেশে ঐ তার ঝুলাইয়া দিতে হইবে। এইপ্রকার বহু দীর্ঘ তারের সঙ্গে স্পঞ্জের মালা সমুদ্রের মধ্যে ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে। আঠার মাস এই অবস্থায় থাকিলে স্পঞ্জ পাঁচশগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এবং উহার ভার ও তদনুরূপ বর্দ্ধিত হইবে। এইপ্রকারে যত্নপূর্ব্বক অস্বাভাবিক উপায়ে স্পঞ্জ উৎপন্ন করিতে আরম্ভ করিলে শতকরা ৯৫টি কর্ত্তিত স্পঞ্জ নষ্ট না হইয়া বর্দ্ধিতায়তন হইয়া থাকে। এই সকল স্পঞ্জ গোলাকার পিণ্ডবৎ অথবা কর্ত্তিত ডিম্বের ন্যায় আকার ধারণ করে। উহা কিন্তু হস্ত সংস্পর্শে নষ্ট হয় না বা উহার মূল ভাঙ্গিয়া যায় না। স্পঞ্জের মূলগুলি উহার মধ্যভাগে জন্মিয়া থাকে। এই প্রকার স্পঞ্জ মেষের উলের ন্যায় প্রতীয়মান হয় এবং উহা বহুবৎসর স্থায়ী হয়। যতপ্রকার স্পঞ্জ দৃষ্ট হয় তাহার সকল প্রকারই এইরূপ অস্বাভাবিক উপায়ে উৎপন্ন হইতে পারে। স্পঞ্জ উত্তোলন কার্য্য সকল সময়ে এবং সকল ঋতুতে প্রচলিত রাখিয়া এই ব্যবসায় নির্ম্মূল হইতে বসিয়াছে। গ্রীক ধীবরগণ স্পঞ্জ উত্তোলন করিয়া স্পঞ্জবংশ এক প্রকার ধ্বংস করিবার উপক্রম করিয়া তুলিয়াছে। তজ্জন্য যুক্তরাজ্যের কংগ্রেসে এই বিষয় আলোচিত হইয়া একটি নূতন আইন পাশ হইয়া গিয়াছে। উহার মর্ম্ম এই—আর কেহ সকল ঋতুতে সমভাবে স্পঞ্জ উত্তোলন করিতে পারিবে না। উহা নির্দ্দিষ্ট ঋতুতে তুলিতে হইবে। ধীবরগণ বৎসরের মধ্যে ১লা মে হইতে ১লা অক্টোবর পর্য্যন্ত স্পঞ্জ তুলিতে পারিবে না। অর্থাৎ সমুদ্রে ৩৪ হস্ত গভীর জল না থাকিলে আর তথায় কার্য্য করা চলিবে না। নব আইনের এই নিষেধবাণী প্রকৃতপক্ষে পালিত হইতেছে কিনা তাহা দেখিবার জন্য ফ্লোরিডা উপকূলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজে রাজকর্ম্মচারীগণ গমনাগমন করেন। এই আইনদ্বারা কেবল যে স্পঞ্জবংশ রক্ষা পাইয়াছে তাহা নহে। আমেরিকাবাসী যেসকল ধীবরগণ এই ব্যবসায়লব্ধ অর্থ দ্বারা জীবনাতিবাহিত করিয়া থাকে তাহারাও রক্ষা পাইয়াছে। কারণ স্পঞ্জ ধ্বংস হইয়া গেলে তাহাদের বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা। ফ্লোরিডা দ্বীপে গ্রীক ধীবরগণ অত্যধিক পরিমাণে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে, তথাকার গ্রীক পল্লীগুলি দর্শন করিলে মনে হয় ইহা গ্রীসদেশের একটি অন্তর্ভুক্ত স্থান। তাহাদের চালচলন, পোষাকপরিচ্ছদ, ভাষা এবং 'টারপান' প্রবর্ত্তিত গ্রীক গৃহাদি গ্রীকদেশের ন্যায়। ডুবুরীগণের নৌকাখানি পর্য্যন্ত গ্রীসদেশ হইতে আনীত, গ্রীকগণের জাতীয় অবনতি সাধিত হইলেও তাহারা আজ পর্য্যন্ত জাতি, ধর্ম্ম, ভাষা, পোষাকপরিচ্ছদ ত্যাগ করে নাই। ইহা তাহাদের বিশেষ গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই।

শ্রীগণপতি রায়।

ভাগ্য-চক্র।

(ইংরাজী হইতে)

নোটের তাড়া মাটীর উপর পড়িয়া ছিল! জন ধীরে ধীরে পা দিয়া চাপিয়া ধরিল। চারিধারে চাহিয়া ধীরে ধীরে তাড়াটি পকেটে ফেলিয়া সে চলিয়া গেল। তখন সন্ধ্যা। ব্যাঙ্কের ছুটি হইয়া গিয়াছে। বরাবর চলিয়া আসিয়া একটি আলোর ধারে ভাঁজ খুলিয়া জন দেখে দশ টাকা করিয়া দশখানি নোটে—একশত টাকা!

মৃদু হাসিয়া সেগুলি ওয়েষ্ট কোটের পকেটে রাখিয়া জন দ্রুতপদে চলিল।

১৮নং বাড়ীর সম্মুখে সে থামিল। অপর বাড়ীগুলা হইতে এবাড়ীর গঠনে কোন পার্থক্য ছিল না। কেবল তার সম্মুখে একটি লাল আলো জ্বলিতেছিল!

সিঁড়ি বাহিয়া উপরে গিয়া জন দরজায় ঘা দিল। দ্বার খুলিল!

টেবিলে প্রেমারা খেলা চলিতেছিল। বাজির পর বাজি! কাহারো মুখে উৎসাহের চিহ্ন কাহারো বা গভীর হতাশা।

একশ টাকা হারিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া জন বাহিরে চলিয়া আসিল!

পথ ধরিয়া একেবারে সে ব্যাঙ্কের সম্মুখে আসিয়া পড়িল। এইটিই তার গৃহে ফিরিবার পথ! তার মনটা খুবই বিমর্ষ ছিল! একেবারে একশ' টাকাই হারিয়াছে! তাইত! হাজার হোক, অধর্ম্মের টাকা কিনা! থাকিবার নয়!

ব্যাঙ্কের সম্মুখে, সে চাহিয়া দেখে, অধীর প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া এক প্রৌঢ়া নারী! তার মুখখানিতে যেন কে বিষাদের কালি টানিয়া দিয়াছে! নারীটি যেন কিছুর সন্ধানে ব্যস্ত।

জন কহিল—"আপনি এসময়ে কি খুঁজিতেছেন! কিছু হারাইয়াছেন নাকি?"

নারী কহিল—"হাঁ মশায় আমার লোক চেক ভাঙ্গাইতে আসিয়া নোট হারাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী ফিরিয়াছে। আমি এখন জানিতে পারিয়া সন্ধানে ছুটিয়া আসিয়াছি।"

জন চারিধার চাহিয়া দেখিল। নিকটে কেহ ছিল না। সে কহিল, "কত টাকার নোট?"

"একশ টাকা! ওঃ, সর্ব্বনাশ হইয়াছে! যদি কেহ পাইয়া থাকে সে কি আর মিলিবে?" তবু চারিধারে খুঁজিতেছি যদি পাই!"

"বৃথা চেষ্টা—আমি পাইয়াছিলাম"—

"আপনি? আঃ দিন্ দিন্—ধন্যবাদ আপনাকে! আমি পুরস্কার দিব। কই সে নোটগুলি?"

"নাই!"

"নাই? সে কি? কোথা গেল?"

"হারিয়াছি!"

"হারিয়াছেন? বলেন কি মশায়? কেমন করিয়া হারিলেন?"

"ক্ষমা করিবেন, আমাদের জীবনে হারজিৎ আছেই—কেবলি ঢেউয়ে উঠা নামা। কাল কি হয় আজ তা কে বলিতে পারে?

"ওসব কথা থাক্ মশায়! দিন্ সে নোটগুলি,নইলে আমি এখনি পুলিস ডাকিব।"

"কোন লাভ নাই তাতে! তবে শুনুন"—

"বলুন, কি বলতে চান—কোন সাফাই শুনিব না!"

"দেখুন আমি একজন ভদ্রলোক—কিছু সঙ্গতি যে নাই এমন নহে! এ জীবনটাই জুয়াখেলা ছাড়া আর কি? একঘণ্টা পূর্ব্বে আমি প্রেমারা খেলায় মাতিয়াছিলাম। তাহাতে জিতিবার সম্ভাবনা ছিল—কিন্তু জিতিলাম না—অদৃষ্ট মন্দ! একশ টাকাই হারিয়াছি!"

"বদমায়েস, জুয়াচোর—"

নারীর পক্ষে ধৈর্য্য রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। জনের প্রাণ সহানুভূতিতে ভরিয়া গেল। সে আর্দ্রকণ্ঠে কহিল "দেখুন এর জন্য আমিও দুঃখিত। তবে ইহা নিশ্চয় যে যদি জিতিতাম তাহা হইলে আপনাকেও তার অংশ দিতাম! কি করিব সবই আমার অদৃষ্ট! আর কারো হাতে সে নোট পড়িলে সে সংবাদও আপনার মিলিত না! এখন বলুন আমি কি করিতে পারি! যদি আপনার সাহায্য করিতে পারি তাহাতে আমি প্রস্তুত।"

দুঃখে নারীর হৃদয় জলিয়া উঠিয়াছিল! সে কহিল "সাহায্য করিবে তুমি! চোর কোথাকার—"

"যা ইচ্ছা হয় বলুন—প্রেমারা খেলার নেশা আমি ছাড়িতে পারি না—ভাগ্য পরীক্ষার এমন পথ আর নাই। আমার যদি শক্তি থাকিত তবে আবার খেলিয়া বাজি জিতিয়া আসিতাম।"

"তার অর্থ?"

"প্রেমারায় কখনো জিত কখনো হার। এ মুহূর্ত্তে হার পরমুহূর্ত্তে জিৎ। একনিমেষে নিশ্চয়! আপনার কাছে কি দশটা টাকাও নাই—তা যদি দিতে পারেন ত একবার চেষ্টা দেখিতে পারি।"

"দশ টাকা কাড়িয়া লইতেও তোমার লজ্জা নাই!"

"দেখুন, আমি জুয়াচোর নহি। আপনি আমাকে দশটাকা ধার দিন—এক ঘণ্টার জন্য—আপনি এই খানেই প্রতীক্ষা করুন এখনি আপনার সব টাকা জিতিয়া আনিতেছি। এবার নিশ্চয় জিতিব!

"তুমি ফিরিয়া আসিবে?"

"নিশ্চয়। ভদ্রলোকের এক কথা।"

নারী পকেটে হাত দিয়া একখানি নোট দিয়া বলিল "এই আমার সম্বল।"

জন নোট লইয়া ১৮ নং বাড়ীর উদ্দেশে ছুটিল!

এক, দুই, তিন,—দশ বাজি খেলা চলিল! প্রতি বাজিতেই জিৎ! জন আট শত টাকা জিতিয়াছে। সকলে তার পিঠ চাপড়াইয়া কহিল, "সাবাস, জন সাবাস।" জন উঠিয়া পড়িল। এই পড়তার মুখে সরিয়া পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ—কি জানি যদি আবার হার হয়!

২

নারীটি তখনো প্রতীক্ষা করিতেছিল। জন আসিয়া কহিল "এই নিন্ টাকা। জিতিয়া আনিয়াছি।" "জিতিয়াছেন! আঃ!"

নারী হাত পাতিল। জন কহিল "না, না, রাস্তার ধারে গণিবেন না চলুন একটু আড়ালে যাই।"

একটা গাছের তলায় গিয়া নোট গণিয়া নারী দেখিল আট শত টাকা। জন কহিল "আপনাকে কষ্ট দিবার জন্য ক্ষমা করিবেন। এ টাকা সবই আপনার—"

"আমার সব? সে কি?" বলিয়া নারী স্তম্ভিত ভাবে জনের মুখের দিকে চাহিল। জন কহিল "হাঁ, এ সবই আপনার। আপনার টাকাতেই ত জিতিয়াছি। টাকা ত আপনার —আমি উপলক্ষ মাত্র। হারিলে আপনারই যাইত!" "ও! মশায় ধন্যবাদ! শতসহস্র ধন্যবাদ আপনাকে! এত ভদ্রলোক আপনি! আমার রূঢ়তা ক্ষমা করিবেন। দশ টাকায় আটশ টাকা জিৎ! আশ্চর্য্য!"

"হাঁ, এইটুকুই খেলার আমোদ! রাজা ফকির হচ্ছে, ফকির রাজা হচ্ছে! এ'কেই বলে ভাগ্যচক্র।"

নারী উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিল "দশ টাকায় আটশ টাকা! অ্যাঁ দশ টাকায় আটশ টাকা! তবে এই নিন টাকা। আবার খেলুন। যা' মিলিবে তার মধ্যে হাজার টাকা আমার বাকী আপনার—"

"আবার খেলিব? হানি কি? বেশ, দিন্।" জন আটশ টাকার নোট পকেটে ফেলিয়া ছুট দিল। নারী আসিয়া আলোর ধারে দাঁড়াইল!

সময় আর কাটিতে চাহে না। প্রতি-মুহূর্ত্তেই অধীরতা বাড়িতেছিল। এখনো কেন আসিতেছে না! কত টাকা এবার পাওয়া যাইবে। দশ টাকায় যদি আটশত পাওয়া যায়, তবে আটশত টাকায়—অসংখ্য! আজিকার সন্ধ্যাটুকু কি সুন্দর! এত লাভ?

সহসা একটি বালক আসিয়া কহিল, "এইযে ১০৩ নম্বর আলো! আমি মিষ্টার জনের নিকট হইতে আসিতেছি আপনি কি তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন!" "হাঁ, কি খপর?"

'চিঠি আছে!'

"কৈ? দাও শীঘ্র!" "এই নিন্!"

ব্যগ্র কৌতূহলে নারী খাম ছিঁড়িয়া ফেলিল; চিঠিখানি আলোর ধারে আনিয়া ধরিল,—স্পষ্টাক্ষরে লেখা রহিয়াছে, "বাজি হারিয়াছি!"

শ্রীনরেন্দ্রমোহন চৌধুরী।

বিবিধ।

বীজাণু ও পরিপাক।

কিছুদিন পূর্ব্বে বিলাতের 'ডেলি টেলিগ্রাফ' (Daily Telegraph) পত্রে সার রে ল্যাঙ্কেষ্টার সাহেব (Sir Ray Lankester) আমাদের দেহে পরিপাক ক্রিয়ার উপর বীজাণুর ফলাফল সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন—

মনুষ্যদেহে এবং অন্যান্য যাবতীয় জীব ও উদ্ভিদ দেহে নানাজাতীয় অসংখ্য বীজাণুর অবস্থিতি আবিষ্কৃত হওয়া অবধি বিজ্ঞানবিদগণের মনে ধারণা হইয়াছে যে মনুষ্যদেহ বিশেষতঃ তাহার খাদ্য প্রবাহী নালী অসংখ্যপ্রকার বীজাণুতে পরিপূর্ণ; এক জাতীয় বীজাণু অপর জাতীয় বীজাণুর সহিত আত্মরক্ষার জন্য অবিরাম

যুদ্ধে প্রবৃত্ত; এবং অবশেষে এই কঠোর সংগ্রামের ফলে ও মনুষ্যজাতিবিশেষের খাদ্য ও অবস্থাদির প্রভাবে এক এক জাতির দেহে বীজাণুর শ্রেণীবিশেষ অধিক পুষ্টি লাভ করে এবং কতকগুলি বীজাণু একেবারেই নষ্ট হইয়া যায়। এই প্রকারে জাতিবিশেষের খাদ্য ও অভ্যাসবিশেষের ফলে কতকগুলি বীজাণু এক এক জাতিতে অধিক প্রাধান্য লাভ করিতে দেখা যায়। এরূপ অবস্থায় এই প্রাকৃতিক বিধানে হস্তক্ষেপ করা বিপজ্জনক না হইলেও নিতান্ত দুঃসাহসের কর্ম্ম সন্দেহ নাই। এইরূপ প্রাকৃতিক বিধানে হস্তক্ষেপ করিলে কোন বিষাক্ত বীজাণু অতিরিক্ত প্রাধান্য লাভ করিয়া দেহের বিশেষ অনিষ্ট সাধন করা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। মেচনিকফ্ মনুষ্যের অন্ত্রমধ্যে ল্যাকৃটিক্ বীজাণু প্রবিষ্ট করাইয়া বিষাক্ত বীজাণু নষ্ট করিবার প্রস্তাব করিয়া অসমসাহসের পরিচয় দিয়াছেন সন্দেহ নাই। তাঁহার মতে দেহস্থিত বীজাণুকে স্বাভাবিক ক্রিয়া ও গতি দিয়া আমাদের নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে—উপরন্তু তাহাদিগকে দমন ও নষ্ট করিবার চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। তিনি বলেন,—প্রথম অবস্থায় এই সকল বিষাক্ত বীজাণুকে আয়ত্ত করিতে যাইয়া আমাদিগের অনেক ভুল ত্রুটি হওয়া সম্ভব সত্য, কিন্তু তাহা ভিন্ন কোন উন্নতিই কখনও লাভ করা সম্ভব হয় নাই এবং ভবিষ্যতে হইবে বলিয়াও আশা করা যায় না। ভ্রান্তির সম্ভাবনা আছে বলিয়া ব্যাধি ও মৃত্যুর অত্যাচার পীড়ন নীরবে সহ্য করা মূর্খতা মাত্র।

অনেক কাল হইতে আমাদের মধ্যে একটা ধারণা আছে যে, পচনক্রিয়াশীল বীজাণুগুলি আমাদের পাকস্থলীর খাদ্যকে চূর্ণ করিয়া পরিপাকে সহায়তা করে এবং এই মিশ্রিত দ্রব খাদ্য হইতে দেহ তাহার আবশ্যকীয় রক্ত শোষণে সক্ষম হয়। উদ্ভিদের দেহ পুষ্টির প্রতি লক্ষ্য করিলে এই মতই অনেকটা সত্য বলিয়া মনে হয়। ভূপৃষ্ঠে যে সকল মৃতদেহ এবং জীবজন্তুদের মলাদি পতিত হয়, তাহাই উদ্ভিদসারে পরিণত না হইলেও বীজাণুবিশেষ তাহার উপর পচনক্রিয়া রাসায়নিক ক্রিয়ার দ্বারা যতক্ষণ না তাহাকে নানাপ্রকার রাসায়নিক বস্তুতে বিশ্লেষিত করে, ততক্ষণ কোন উদ্ভিদই তাহা খাদ্যস্বরূপে গ্রহণ করিতে পারে না। ঐ সকল মৃতদেহ ও মলাদি রাসায়নিক রসে পরিণত হইলে পর তবে উদ্ভিদ তাহা আকর্ষণ করিয়া আপন দেহমধ্যে খাদ্যরূপে গ্রহণ করে। সেইরূপ আমাদিগের দেহমধ্যেও খাদ্যকে বিশ্লেষিত করিয়া পরিপাকের উপযুক্ত করিবার নিমিত্ত পচনকারী বীজাণুর অবস্থিতি আবশ্যক ইহা আশ্চর্য্য নহে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্ (Schottelius) নবজাত কুক্কুটশাবক লইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ডিম্ব হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবামাত্র বৈজ্ঞানিক উপায়দ্বারা তিনি তাহাদিগের খাদ্য ও বাসগৃহ বীজাণু বর্জ্জিত করিয়া দেখিলেন যে শাবকগুলি অল্পকালের মধ্যেই দুর্ব্বল হইয়া মৃত্যুমুখে পড়িল। তাহাদের খাদ্যমধ্যে কতকগুলি বীজাণু মিশ্রিত করিয়া দিলেই তাহারা ক্রমে সুস্থ ও সবল হইয়া শক্তিতে পরিণত হইতে পারিত। ইহা হইতে তিনি মীমাংসা করিলেন যে, অন্ত্রমধ্যে বীজাণু ব্যতিরেকে প্রাণীগণের জীবন ধারণ একেবারে অসম্ভব।

দুই বৎসর পূর্ব্বে একজন রুষ বিজ্ঞানবিদ মাছির ডিম্ব লইয়া এক অভিনব পরীক্ষা করিয়াছিলেন। কতকগুলি ডিম্ব লইয়া পরিচ্ছন্ন করিয়া এক বিশুদ্ধ মাংসখণ্ডের উপরে রাখিয়া দিলেন। ডিম্বগুলি ফুটিয়া সেই মাংস খাইতে লাগিল। অপর কতকগুলি বীজাণুপূর্ণ অবস্থায় থাকিয়া বিষাক্ত বীজাণুপূর্ণ পচা মাংস খাইতে লাগিল। আশ্চর্য্য এই যে শেষোক্তগুলিই পূর্ব্বদল অপেক্ষা অনেক পূর্ব্বে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল। ইহা দেখিয়া তিনি স্থির করিলেন যে পচামাংসের বীজাণুগুলিই শেষোক্ত মাছিগুলির পরিপাক ক্রিয়ার সহায়তা করে বলিয়াই তাহারা অত শীঘ্র পুষ্ট হইয়া উঠিল। এই স্থির করিয়া তিনি কতকগুলি পরিচ্ছন্ন মাছি লইয়া তাহাদিগকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পচান মাংস খাওয়াইতে লাগিলেন। তাহাতে তাহারা বেশ সবল ও পুষ্ট হইতে লাগিল। ইহা হইতে তিনি স্থির করিলেন যে পচনশীল বীজাণুগুলি এই সকল মাছির পাকস্থলীতে প্রবেশ করিয়া মাংস পরিপাকে সহায়তা করে।

কিন্তু ইহার পরে অনেক পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে অনেক জীবদেহ বীজাণুর সাহায্য ব্যতিরেকেও বেশ পুষ্টিলাভ করা সম্ভব। কিন্তু মেরুদণ্ডবিশিষ্ট জীবের পক্ষে নহে। ম্যাডাম মেচনিকফ্ পরীক্ষাদ্বারা দেখিয়াছেন যে বেঙাচিদের পক্ষে বীজাণুব্যতিরেকে পুষ্টিলাভ করা প্রায় অসম্ভব। সুতরাং দেখা যাইতেছে মেরুদণ্ডবিশিষ্ট জীবের পরিপাকক্রিয়ার সাহায্যের জন্য বীজাণুর অবস্থিতি আবশ্যক; অন্তত: পক্ষে যত দিন না তাহারা পূর্ণযৌবন লাভ করে ততদিন তাহাদের পরিপাক শক্তি এরূপ প্রবল হয় না যে তাহারা বীজাণুর সাহায্য অগ্রাহ্য করিতে পারে।

আমাদের খাদ্যপ্রবাহী নালীতে বীজাণু ক্রিয়া যথার্থরূপে স্থির করিবার জন্য অধ্যাপক মেচনিকফ্ বহুদিন হইতে এইরূপ একটি জীবের অনুসন্ধান করিতেছিলেন যাহার পাকযন্ত্রের মধ্যে বীজাণু একবারেই নাই বা তাহার সংখ্যা অতি সামান্য মাত্র। মনুষ্যের পাকযন্ত্রের মধ্যে যে অসংখ্যপ্রকার বীজাণু আছে তাহাদের প্রত্যেকের প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিতে এখনও আমাদিগের বহুযুগের অনুসন্ধান ও পরীক্ষা আবশ্যক। তাহাদের প্রত্যেকের প্রকৃত রাসায়নিক ক্রিয়া কি এবং পরস্পরের প্রতি সমবেত ফল কিরূপ তাহা আমরা এক্ষণে কিছুই জানি না। আমাদের দেহের বৃহৎ অন্ত্র বা কোলন্ (Colon) অসংখ্য বীজাণুর আশ্রয়স্থল। এস্থলে আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, এই স্থলে আমাদের পরিপাকের কোনই ক্রিয়া হয় না বা যাহা কিছু হয় তাহা অতি সামান্য মাত্র। আন্ত্রিক বীজাণুবিরহিত জীবের অন্বেষণ করিতে যাইয়া মেচনিকফ্ স্থির করিলেন যে, যে সকল জীবের কোলন্ অতি ক্ষুদ্র বা একেবারেই নাই তাহাদিগের মধ্যেই এরূপ জাতি মেলা সম্ভব। সুতরাং বাদুড়ের প্রতিই তাঁহার প্রথম দৃষ্টি পড়িল। প্রাচ্য দেশের ফলভুক্ বাদুড় লইয়া তিনি তাহাদের দেহস্থিত বীজাণুর প্রকৃতি ও ক্রিয়া সম্বন্ধে পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। সম্প্রতি তাঁহার পরীক্ষাফল প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল বাদুড়ের ক্ষুদ্র অর্থাৎ উর্দ্ধতন অন্ত্রস্থলে কোন প্রকার বীজাণু নাই বলিলেই হয়। যা দুই একটি আছে তাহাও তাহাদিগের খাদ্য হইতে দেহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। আমাদিগের মধ্যে যেমন স্বাভাবিকভাবে অসংখ্য বীজাণু পরিবার বৃদ্ধি ও পুষ্টিলাভ করিতেছে তাহাদিগের মধ্যে সেরূপ কোন লক্ষণই পাওয়া যায় না।

মেচনিকফের এই পরীক্ষার কতকগুলি নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। কেবল মাত্র আমিষ ভোজনের উপর রাখিয়া তিনি দেখিলেন যে, বাদুর গুলির অন্ত্রস্থলে নানা প্রকার বীজাণুর উৎপত্তি হইয়া সেগুলি মরিয়া গেল। কিন্তু কেবলমাত্র কদলী ভোজন করাইয়া দেখা গেল যে তাহাদিগের অন্ত্রস্থলে দুই একটি সামান্য বীজাণু ব্যতীত আর কিছুই নাই। কিন্তু খরগোষ ও বানরকে বাদুড়ের ন্যায় নিরামিষ খাওয়াইয়া দেখা গেল যে তাহাদের অন্ত্রস্থলে অসংখ্য বীজাণুর উৎপত্তি হইল। অধ্যাপক মেচনিকফ্ বলেন যে, বাদুড় যে বীজাণুমুক্ত থাকে তাহার কারণ তাহার অন্ত্রস্থল এরূপ ভাবে গঠিত এবং কোলনের এক প্রকার অভাব বলিয়াই তথায় জীর্ণ বস্তু বহুক্ষণ থাকিয়া পচিতে পায় না। অন্যান্য জন্তুর দেহ কিন্তু সেরূপে গঠিত নহে। এক্ষণে সেই বৃহৎ অন্ত্রস্থলের আবশ্যকতা ও উপকারিতা স্থির করা প্রয়োজন। এই স্থলে আমাদের জীর্ণ খাদ্য জমিয়া পচিতে থাকে এবং অসংখ্য বীজাণু তাহাতে পুষ্টি লাভ করিয়া নানা প্রকার বিষাক্ত রস সৃষ্টি করে। এই সকল বিষাক্ত রস আমাদের দেহ মধ্যে শোষিত হয় এবং ইহার ফলে জীবন বিপন্ন হইলে এই অন্ত্র স্থলকে কাটিয়া বাহির করিয়া লইলে রোগীর ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্ট হয় না। সুতরাং এই ভাগের উপকারিতা যে কি তাহা স্থির করিয়া বলা অতি কঠিন। বহুদিনের অনুসন্ধান ও পরীক্ষার ফলে কোন দিন এ সত্য আবিষ্কার হওয়া অসম্ভব নহে। এক্ষণে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে কোন কোন জন্তুর পরিণত বয়সে উর্দ্ধতন অন্ত্রস্থল এবং বীজাণুর সাহায্য ব্যতিরেকেও পরিপাক ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। আমাদের বর্ত্তমান জ্ঞানে আর বেশী কিছু বলিতে যাওয়া নিতান্ত দুঃসাহসিকতা হইয়া পড়ে।*

ধূলিকণা।

রোগের বীজাণু সম্বন্ধে নানা প্রকার নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হওয়া অবধি বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ এই সকল বীজাণু কি প্রকারে ব্যাপ্তি লাভ করে তাহারই অনুসন্ধান করিতেছেন। এই অনুসন্ধানের ফলে তাঁহারা দেখিয়াছেন যে ধূলিকণা না থাকিলে অধিকাংশ রোগের বীজাণুই মনুষ্যদেহে প্রবেশ করিতে পারিত না। আমাদের চতুর্দ্দিকের বায়ুমণ্ডল ধূলিকণায় পরিপূর্ণ তাহা আমরা সকলেই জানি। এই ধূলিকণাগুলি রোগের বীজাণুর বাহন স্বরূপ। এই বাহনের আশ্রয়ে রোগের বীজাণুগুলি রোগীর গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সুস্থ ব্যক্তির মুখ ও বুকের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকেও আক্রমণ করে। পথের গাড়ী, সাধারণ বাড়ী বা সহরের পথের ধূলি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়,—রোগের বীজাণুতে একেবারে পরিপূর্ণ। এই কারণেই আজকাল পরিচ্ছন্নতার একটা চেষ্টা পৃথিবীময় আরম্ভ হইয়াছে। পুরাতন ধরণের ঝাড়ন আজকাল বৈজ্ঞানিকগণ অনুপযুক্ত বলিয়া মনে করেন। কারণ তাহা দ্বারা ধূলি যথার্থ পক্ষে নষ্ট বা দূরীভূত হয় না। গৃহ পরিষ্কার করিবার পূর্ব্বে চতুর্দ্দিকে অল্প করিয়া জলসিঞ্চন আবশ্যক এবং বহিষ্কৃত আবর্জ্জনাগুলি দগ্ধ করা আবশ্যক। একটি ভিজা কাপড়ে করিয়া গৃহ মুছিয়া লইয়া পরে কাপড় খানিকে উত্তপ্ত জলে সিক্ত করাই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ। ধূলিকণা যে আমাদের কিরূপ পরম মিত্র ও চরম শত্রু তাহা আমরা অধ্যাপক সার্ভিসের (G. P. Serviss) প্রবন্ধ পাঠে বেশ উপলব্ধি করিতে পারি। ধূলিকণা না থাকিলে পৃথিবীর অবস্থা কিরূপ হইত অধ্যাপক সার্ভিস তাঁহার প্রবন্ধে তাহার একটি সুন্দর চিত্র আঁকিয়াছেন। কিন্তু এই আশ্চর্য্য ফলোৎপাদক ধূলিকণাগুলি মনুষ্য চক্ষের অদৃশ্য হইয়া আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া আছে। ইহার কতকাংশ শুষ্ক ধূলিকণা এবং অবশিষ্টাংশ বায়ুস্রোতে ... তরল অবস্থাতেই দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব ধূলি একেবারে না থাকিলে যে পৃথিবী থাকিত না তাহা নহে, তবে সে পৃথিবী বর্ত্তমান পৃথিবী হইতে এত আশ্চর্য্য স্বতন্ত্র প্রকৃতির হইত যে আমাদের পক্ষে তাহা নূতন লোক।

প্রায় সকল লোকেই মনে করেন যে কেবল সূর্য্য হইতেই আমরা দিবালোক পাইয়া থাকি। কিন্তু ইহা আমাদের এক মহাভ্রম। বায়ুমণ্ডল হইতে শুষ্ক ও তরল উভয় প্রকার ধূলিকণা দূর করিয়া দিলে এ পৃথিবী এক নূতন মায়ালোক বলিয়া বোধ হইবে। দিবা ও রাত্রিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবার আর কোন শক্তিই থাকিবে না যে স্থলে সূর্য্যকিরণ অবাধে আসিয়া পড়িবে সেই স্থানটিই আলোকিত হইয়া উঠিবে, কিন্তু সেখানে কোনও প্রকার অস্বচ্ছ বস্তু সম্মুখে পড়িবে তাহার অন্তরালে গভীর অন্ধকার আসিয়া অধিকার করিয়া বসিবে। প্রত্যেক বাটীর পশ্চাতে, প্রত্যেক প্রাচীরের অন্তরালে, উদ্যানের কুঞ্জপথে ছায়া শীতল তরুতলে, চিরাভ্যস্ত গৃহ মধ্যে অন্ধকারের আবরণ এতই নিবিড় হইয়া উঠিবে যে তাহা ভেদ করিয়া দেখিতে পাওয়া চর্ম্ম চক্ষে সম্ভব হইবে না। দিবাভাগ রাত্রেরই ন্যায় বোধ হইবে, প্রভেদের মধ্যে মাঝে মাঝে সূর্য্যালোক রশ্মি দেখিতে পাওয়া যাইবে মাত্র।

ইহার কারণ, বিশুদ্ধ ধূলিমুক্ত বায়ু আলোক রশ্মিকে ব্যাপ্ত করিতে অক্ষম। বৈজ্ঞানিক উপায়ে একটি কাচের গৃহকে ধূলিশূন্য করিয়া তাহার মধ্যের একটি ছিদ্র দ্বারা সূর্য্য রশ্মি প্রবেশ করিতে দিয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, যে স্থানটিতে আলোক রশ্মি গিয়া পড়িয়াছে ঠিক সেই স্থানটিই আলোকিত মাত্র; অন্যাংশ অন্ধকার। গৃহ মধ্যের চতুর্দ্দিক আমাদের কল্পনাতীত নিবিড় তিমিরে মগ্ন। কিন্তু গৃহ মধ্যে ধূলি থাকিলে ছিদ্র দ্বারা আলোক রশ্মি প্রবেশ করিবামাত্র গৃহটি আলোকিত হইয়া উঠিবে। বর্ত্তমান গৃহে আলোক রশ্মির রেখাপথে চক্ষু না রাখিলে সেটিকে পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া সম্ভব নহে।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল হইতে ধূলা বহির্গত করিয়া লইলে এই আলোক প্লাবিত পৃথিবীরও উক্তরূপ দশা হইবে। নীল আকাশ পর্য্যন্ত আর দেখা যাইবে না। উর্দ্ধে কেবল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ এক চন্দ্রাতপ—তাহার চতুর্দ্দিকেই নক্ষত্র এবং সকলগুলিই সূর্য্যের অতি নিকটে বলিয়া মনে হইবে। ক্ষুদ্র ধূলিকণার চতুর্দ্দিকে জলীয় বাষ্প জমিয়া সংলগ্ন হওয়াতেই বর্ত্তমান মেঘমালার সৃষ্টি। ফলতঃ তখন বৃষ্টি বলিয়াও আর কোন ব্যাপার থাকিবে না। বস্তুত আলোক বিকীর্ণ করিবার উপযুক্ত ধূলিকণা না থাকিলে পৃথিবীটা একটা খুব মজার স্থান হইত—চতুর্দ্দিক কালো কালো দাগে ও রেখায় পরিপূর্ণ—এই সকল দাগের মধ্যস্থিত কোন বস্তুই দেখা যাইত না। সুন্দর পুষ্পোদ্যানের মধ্যে যদি কোন অট্টালিকা থাকিত, তাহা হইলে তাহার পশ্চাতের আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইত না। পথে মোটর গাড়ী ঘোড়া মানুষ—সব ছুটিতেছে কিন্তু তাহার কিছুই দেখা যাইতেছে না। হত্যা করিয়া পলাইলে আর ধরিবার কোন সম্ভাবনাই থাকিত না। গৃহ মধ্যে বাতায়ন পথে যেদিকে আলোক প্রবেশ করে সেই স্থানটি ভিন্ন অপর কোন দিকে আলোক বিকীর্ণ হইতে পারিত না—অবশিষ্ট সমস্ত গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। চতুর্দ্দিকে অসংখ্য আয়না রাখিলে গৃহটি আলোকিত হইতে পারিত।

ধূলিকণা না থাকিলে যে কেবল আলোকেরই অভাব হইত তাহা নহে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ধূলিকণা না থাকিলে মেঘ বা বৃষ্টি—কোন মতেই সম্ভব হইত না—তবে পৃথিবী শিশির সিক্ত হইত বটে। সূর্য্য এখনকারই ন্যায় সলিল আকর্ষণ করিয়া বাষ্পে পরিণত করিত এবং বায়ু সেই বাষ্প লইয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দিত। সুতরাং কঠিন পদার্থের সংস্পর্শে আসিয়া সেই বাষ্প জমিয়া যাইত এবং সমস্ত বস্তুই সর্ব্বদা বাষ্পসিক্ত থাকিত। এই কারণে উদ্ভিদগণকে এখনকার ন্যায় বৃষ্টি হইতে রসগ্রহণ না করিয়া বায়ুস্থিত বাষ্প হইতেই রসগ্রহণ করিতে হইত। ছত্রের আর কোন আবশ্যকই থাকিত না, তবে চিরন্তন সিক্তবায়ু হইতে দেহ রক্ষার কোন নূতন উপায় আবিষ্কার করা আবশ্যক হইত। কিন্তু বিদ্যুৎ ও বজ্রধ্বনি মোটেই থাকিত না এবং বায়ুপ্রবাহের বিধানও অনেক পরিবর্ত্তিত হইত সন্দেহ নাই।

মেঘের ন্যায় কুয়াসাও থাকিত না। সেটা তত দুঃখের কারণ না হইলেও মেঘের অভাবটা বড়ই কষ্টপ্রদ হইত সন্দেহ নাই। বারমাস প্রখর সূর্য্যকিরণের উত্তাপ মধ্যে বাস করা বিশেষ প্রীতিকর বলিয়া বোধ হইত বলিয়া মনে হয় না।

সম্ভবতঃ ধূলিকণা না থাকিলে বায়ুস্থিত তাড়িতেরও অস্তিত্ব থাকিত না। সেটাও আমাদের পক্ষে বিশেষ লোভনীয় বা কল্যাণকর নহে। বায়ুস্থিত তাড়িতের উপকারিতা আমরা দিন দিন বুঝিতেছি, ধূলির হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য আমরা তাহাকে হারাইতে চাহি না। ধূলি আমাদের শত্রু হইলেও সে যে আমাদের কতদূর মিত্র তাহা ভাবিয়া দেখিলে আর তাহাকে হারাইতে ইচ্ছা হয় না,—ধূলার শরীর লইয়া ধূলার মাঝে থাকাই শ্রেয় বলিয়া মনে হয়।

শ্রীসুখময়।

পোলোনিয়মের অদ্ভুত শক্তি।

এতদিন রেডিয়মই সর্ব্বাপেক্ষা দুষ্প্রাপ্য বস্তু বলিয়া পরিচিত ছিল। ইহা আবিষ্কৃত হওয়া অবধি অমিশ্র পদার্থ (element) সম্বন্ধে পুরাতন প্রচলিত মত একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে বিজ্ঞানবিদেরা মনে করিতেন অমিশ্র পদার্থের পরমাণুগুলি এক একটি স্বতন্ত্র ও অবিভাজ্য কিন্তু রেডিয়াম আবিষ্কৃত হওয়ার পর দেখা গেল যে ইহার পরমাণুগুলি অবিরামই অপর একটি স্বতন্ত্র অমিশ্র পদার্থে পরিণত হইবার চেষ্টা করিতেছে। রেডিয়মের স্বয়ং অচিন্ত্য শক্তিতে এবং ক্ষয়হীনতায় আমাদিগকে বিস্মিত করিয়াছে। ইহার অন্তর্নিহিত ধ্বংসকারী শক্তি দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হইয়াছি।

কিন্তু একণে আবার নবাবিষ্কৃত পোলোনিয়মের নিকট রেডিয়মও পরাজিত হইয়াছে। * অসাধারণ

বৈজ্ঞানিক প্রতিভাবতী ম্যাডাম কুরি (Mme Curie) পূর্ব্বে রেডিয়ম আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি ও লিপম্যান (C. Lipman) সাহেব বিশুদ্ধ পোলোনিয়ম আবিষ্কার করিয়াছেন। পোলোনিয়ম রেডিয়ম অপেক্ষা চারিশত গুণ অধিক শক্তিশালী এবং কতকগুলি নূতন গুণে ভূষিত। পোলোনিয়ম রেডিয়ম হইতেই উদ্ভূত। রেডিয়মের পরমাণুগুলি পোলোনিয়মে পরিবর্ত্তিত হয় মাত্র।

ম্যাডাম কুরি পোলোনিয়মের শক্তি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আশা এখনও প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু অন্যান্য বিজ্ঞানবিদগণ পরীক্ষার দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, এই নবাবিষ্কৃত পদার্থটি রেডিয়ম অপেক্ষা বহু সহস্রগুণ অধিক শক্তিশালী।

তবে এ স্থলে আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে উভয়ের মধ্যে এই শক্তির পার্থক্য প্রথমাবস্থাতেই থাকিবে, পরে দিন দিন উভয়েরই শক্তি হ্রাস পাইবে। আড়াই হাজার বৎসরে একটা নির্দ্দিষ্ট রেডিয়ম পিণ্ড তাহার অৰ্দ্ধেক শক্তি হারাইয়া ফেলিবে, কিন্তু পোলোনিয়ম ১৪০ দিনের মধ্যেই অৰ্দ্ধেক শক্তি হারাইয়া ফেলে। সুতরাং পোলোনিয়মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রথমাবস্থাতেই থাকে, স্থায়িত্ব হিসাবে রেডিয়মই অধিক শক্তিশালী।

কিন্তু তাহা হইলেও প্রথমাবস্থায় এই শক্তির পার্থক্যের অর্থ যে কি তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা না বুঝাইলে উপলব্ধি করা যায় না। নখের এক টিপ পোলোনিয়মের মধ্যে দশলক্ষ 'কেলরি' (Ca'ories) অর্থাৎ উত্তাপের বীজ বর্ত্তমান আছে। সুতরাং ১৫ সের পোলোনিয়মে পঁচিশ কোটি গ্যালন জল দুই ডিগ্রি উত্তপ্ত হইয়া উঠিবে। সেই পরিমাণ পোলোনিয়মে [illegible] সহস্র কোটি গ্যালন জল সেই পরিমাণে উত্তপ্ত হইয়া উঠিবে।

গণনার দ্বারা স্থির করা হইয়াছে যে এক আউন্স রেডিয়ম দুই কোটি পঁচাত্তর হাজার মণ একটা বস্তুকে পৃথিবী হইতে এক মাইল উর্দ্ধে তুলিবার শক্তি ধারণ করে, সুতরাং সেই হিসাবে পোলোনিয়মের শক্তি যে কি বিরাট তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। এই শক্তি ব্যবহারে লাগাইলে জাহাজ, রেল-গাড়ী ইত্যাদি কিরূপ অনায়াস বেগে যাইতে পারে তাহা কল্পনা করিয়া দেখুন। বাইশ আউন্স পোলোনিয়মের যে চালক শক্তি ছয় কোটি সাতাশি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মণ কয়লায় সে শক্তি নাই।

কি অপূর্ব্ব ব্যাপার! পৃথিবীর একটা কোন স্থানে সাড়ে সাতাশ মণ পোলোনিয়ম রাখিতে পারিলেই পৃথিবীর সমস্ত কল কারখানা, রেল, ট্রাম, মোটর, জাহাজ, আলোক, টেলিগ্রাম ইত্যাদি আপনিই চলিতে পারিবে।

এক আউন্স রেডিয়ম থাকিলেই আঠার লক্ষ আট চল্লিশ হাজার পাউণ্ডকে মিনিটে এক ফুট লইয়া যাইবার শক্তিসম্পন্ন একটী মোটর গাড়ী ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল গতিতে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে পারে। এক আউন্স পোলোনিয়ম থাকিলে এইরূপ একটি গাড়ী পৃথিবীকে চারিশত বার প্রদক্ষিণ করিতে পারে। কল্পনা স্তম্ভিত হইয়া পড়ে।

কিন্তু এই দুই বস্তুকে এইরূপে মনুষ্যের ব্যবহারে নিযুক্ত করিতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে। তবে ইহার মধ্যেই তাহাদের যথাসাধ্য ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। নিউ-ইয়র্ক কলেজে একটি রেডিয়মের ঘড়ি আজ তিন বৎসর ব্যবহৃত হইতেছে। ঘড়িটি বিনা দমে ত্রিশ সহস্র বৎসর চলিবে। ভবিষ্যতে আরও কত অভিনব ব্যাপার সংঘটিত হইবে তাহা এক্ষণে আমাদের কল্পনাতীত। শ্রীতঃ

জুলু বাদ্যযন্ত্র।

রেভারেণ্ড ফাদার ক্লাস বের নামক একজন ধর্ম্মযাজক জুলু দেশীয় বাদ্যযন্ত্রাদির বিষয়ে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে, জুলুগণের সঙ্গীত[illegible] এবং যথেষ্ট বাদ্যযন্ত্র থাকা সত্ত্বেও দিন দিন সেখানে গ্রামোফোন ও বিলাতী স্বল্পমূল্যের বাদ্যযন্ত্রের এত আমদানী হইতেছে যে শীঘ্রই জুলুদিগের আবহমান প্রচলিত যন্ত্রাদি লোপ পাইবে। আমরা এই সংখ্যার ভারতীতে জুলু-

দেশীয় প্রচলিত ছয়টী বাদ্যযন্ত্র ও তাহাদের বাদকের প্রতিকৃতি দিলাম। ধর্ম্মযাজক মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে জুলুবাদ্য শুনিতে আদৌ মধুর নহে এবং যন্ত্রোত্থিত শব্দও অত্যন্ত ক্ষীণ।

শ্রীযঃ

বন্দী।

১৩

যখন চোখ চাহিলাম তখন রাত্রি। নেয়ারের খাটে আমি শুইয়াছিলাম। আলো জ্বলিতেছিল—প্রকাণ্ড ঘর, বিছানার সারি! তখন বুঝিলাম, আমি হাঁসপাতালে আসিয়াছি। চারিধার নিস্তব্ধ!

কিছুক্ষণের জন্য আমার জ্ঞান ছিল না! আমি স্পষ্ট জাগিয়া আছি, কিন্তু চেতনা নাই, কিছু মনে পড়ে না! কিছুকাল পূর্ব্বে কারাগৃহের মধ্যে এই হাঁসপাতাল আমার নিকট কি ঘৃণার স্থান ছিল, কিন্তু আজ আর আমি সে লোক নহি! অপরিচ্ছন্ন মোটা চাদর, রোগের একটা তীব্র বিকট গন্ধ—চারিধারে যেন কি এক অশান্তি, কি এক বিভীষিকা! চক্ষু মুদিলাম—নিদ্রার শীতলস্পর্শে সকল জ্বালা জুড়াইল!

সহসা ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। উজ্জ্বল দিবালোক! বাহির হইতে কোলাহল শুনা যাইতেছিল! জানালার ধারে আমার বিছানা ছিল। বিছানায় বসিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখি, কয়েদীর দল কাজে বাহির হইবার উপক্রম করিতেছে, তাহাদেরি পায়ের বেড়ির ঝনঝন শব্দে চারিধার মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে! শুনিলাম ভোরে একজনের ফাঁসি হইয়া গিয়াছে—উৎসুক দর্শকের দল তাহা দেখিতে আসিয়া গগনভেদী আনন্দধ্বনি তুলিয়াছিল, এত কোলাহল তাহারি! নির্লজ্জ পাষণ্ড লোকগুলা, এই নিষ্ঠুর মৃত্যু দেখিয়া আনন্দে উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছে। তোমাদের মাথায় পড়িবার জন্য কি আকাশের বজ্র নাই!

১৪

আমি সুস্থ হইয়া উঠিলাম, এমনি আমার দুর্ভাগ্য! কাজেই হাঁসপাতাল ছাড়িতে হইল। আবার সেই বন্দীশালার রুদ্ধ কক্ষ, আমারি দীর্ঘনিশ্বাসে উত্তপ্ত বায়ু সে কক্ষ ভরিয়া রাখিবে, যাহার চারিদিকে নিরাশা, ও বিষাদের নিরানন্দ বিমর্ষভাব—সেই কক্ষে জীবনের শেষ মুহূর্ত্তগুলা কাটিবে!

কোন অসুখ নাই! এই তরুণ, সুস্থ, সবল দেহ, রোগের গ্রাসেই বা তাহা জীর্ণ হইবে কেন? শিরার মধ্য দিয়া তপ্তরক্ত বহিয়া চলিয়াছে, এমন বুদ্ধি, এমন স্বাস্থ্য তবু মনটা কি ভীষণ কীটের দংশনে পলে পলে জ্বলিয়া যাইতেছে!

হাঁসপাতাল হইতে চলিয়া আসিবার পর, একটা কথা কেবলি মনে পড়িতেছে—সেখান হইতে পলায়নের সুযোগ ছিল; সে সুযোগ, মূর্খ আমি, কেন ছাড়িলাম! কি সহজ সুন্দর সুযোগটুকু! রাত্রের নিস্তব্ধ অন্ধকারে চুপি চুপি বাহির হইয়া পড়িলেই—কি সে সুখ স্বাধীনতার উদার রাজ্য! মাথার মধ্যে শিরাগুলা উত্তেজনার দপ্ দপ্ করিয়া উঠিল!

চারিধারটা চোখের সম্মুখে নীল গোলার মত ভাসিয়া ভাসিয়া উঠিতে লাগিল!

যদি পলাইতাম! আহা, তাহাতে ইহাদেরই বা কি এমন ক্ষতি হইত! আপিলে যদি মুক্তিলাভ করি! কিন্তু সম্ভাবনাই বা কোথায়? সাক্ষীর দল হলপ্ করিয়া সকল কথা বলিয়াছে—শুনানির চূড়ান্ত হইয়া গিয়াছে। এখন আপিলে কি লাভ হইবে? কিছু না! হায়, সকলি বৃথা! নাই, কোন আশা নাই! ফাঁসির রজ্জুই আমার শেষ নিশ্বাসবায়ুটুকু ছিনাইয়া লইবে। আপিলের ক্ষীণ আশাসূত্রটুকু—কোথায় তার বল!

যদি আজ ক্ষমা মিলিয়া যায়! ক্ষমা কিন্তু কেন মিলিবে! এই যে অসংখ্য হতভাগ্যের দল—মোট বহিয়া, বেড়ি টানিয়া জেলে দিনযাপন করিতেছে—কদর্য্য অন্নে ক্ষুধার শান্তি হইতেছে, কোথায় তাহাদের স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু; কোথাই বা তাহাদের গৃহ! তাহারা এই যাতনা সমানে ভোগ করিবে আর আমি ক্ষমা লাভ করিয়া সানন্দে গৃহে ফিরিব! কেন, কি কারণে তাহারা আমাকে ক্ষমা করিবে? অন্যায় দৃষ্টান্তে দেশের লোকের বিপদ যে আসন্ন হইয়া উঠিবে! ক্ষমা নহে, ফাঁসি—ফাঁসিই আমার মুক্তির একমাত্র উপায়!

১৫

যদি পলাইতাম! সবুজ মাঠের উপর দিয়া, ছোট পাহাড় ঘুরিয়া বননদী অতিক্রম করিয়া কোথায় কোন্ অজানা দেশের অভিমুখে ছুটিয়া চলিতাম! কাহারো মুখের দিকে চাহিব না, কাহারো দ্বারে আশ্রয় মাগিব না, এক মুষ্টি অন্নও না—গাছের ফলে ক্ষুধা, নদীর জলে তৃষ্ণা দূর—পাখীর গানে বিশ্রাম, তরুর তলে নিদ্রা—লোকালয়ে না—যদি কেহ সন্দেহ করে! আবার যদি ধরে! ছুটিব না—তাহাতে সন্দেহ জন্মাইতে পারে! মৃদু শান্ত পাদক্ষেপে কত গ্রামনগর অতিক্রম করিয়া যাইব, তাহার সংখ্যা নাই! একটী ছদ্মবেশ সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে! গ্রামের প্রান্তে একটী নিবিড় ঝোপ আছে—সেখানে গিয়া প্রথমে বিশ্রাম লইব! সেই ঝোপে কত শ্যাম সন্ধ্যা, কত শান্ত প্রভাত কাটাইয়া দিয়াছি! শৈশবে-লুকোচুরি খেলা, সঙ্গীর দলে কি সে আনন্দের হুড়াহুড়ি পড়িয়া যাইত! আঃ কি সে সুখের দিন! আজ তাহার একটি মুহূর্ত্ত, যদি নিমেষের জন্য কুড়াইয়া পাই!

আবার যখন আঁধার নামিবে, তখন পথে বাহির হইব! ষ্টেসনে যাইব! না! পথে নদী আছে, পার হইবার সময় বিঘ্ন ঘটিতে পারে! আপাঙ্গনে যাইব! বোধ হয়, সেণ্ট জার্মেণে যাইলেই ভালো হয়—সেখান হইতে হেভার, হেভার হইতে ইংলণ্ড! কিন্তু সে সময় যদি পুলিশে ধরিয়া ফেলে, সে যখন ছাড়পত্র চাহিবে! তবেই ত বিপদ!

হা রে হতভাগ্য, স্বপ্নভ্রান্ত জীব, এই তিনফুট মোটা দেয়ালটা অতিক্রম করাই যে দুঃসাধ্য ব্যাপার, অসম্ভব! তাহা হইলে, আর উপায় নাই,—মৃত্যু, মৃত্যুই আমার প্রিয়সুহৃদ!

সোণার শৈশবের কথা মনে পড়িতেছে! যখন বালক ছিলাম, তখন কতবার এই জেলের ধারে ফাঁসি দেখিতে আসিয়াছি, কি সে ভিড়! আর আজ!

১৬

দীপের আলো ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে!

দিনের আলো এখনি ফুটিবে! গির্জ্জার বড় ঘড়িতে ছয়টা বাজিয়া গিয়াছে।

প্রহরীটা ধীরে ধীরে আসিয়া মাথার টুপি খুলিয়া অভিবাদন করিল। নম্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আমার কিছু খাইতে সাধ আছে কি না! আশ্চর্য্য! এমন বিনয়-নম্র ব্যবহার!

আমার সারা অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল! তবে কি আজই—?

১৭

হাঁ, আজ! কারাধ্যক্ষ স্বয়ং আসিয়াছিল! আমি কি চাহি, না চাহি, তাহারি সন্ধান করিতেছিল! আরো সে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, কোন ভৃত্য বা প্রহরী আমার মর্য্যাদার হানি করে নাই ত! আমার স্বাস্থ্য কেমন, রাত্রে নিদ্রা হইয়াছিল কি না! আমাকে 'স্যার' বলিয়া সে সম্বোধন করিল! কোন সন্দেহ নাই আজ—আজই' তবে সেই স্মরণীয় দিন! যে দিনের কথা মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলি নাই!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

আমেরিকাপ্রবাসীর পত্র।

ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়
১০ই এপ্রিল।

শ্রীচরণেষু

কলেজে এইটি আমার শেষ term, তাই বিশেষ ব্যস্ত আছি। এখান হইতে যাহা আহরণ করিবার তাহা দুই তিন মাসের মধ্যেই শেষ করিতে হইবে, তাই কাজের এত ভিড়। এই জননীস্বরূপা শিক্ষাভূমি (আমার প্রকৃত alma mater) এখানকার পরমবন্ধু-প্রতিম শিক্ষকগণ ও অন্যান্য বন্ধুগণকে ছাড়িয়া যাইতে মন সরিতেছে না। তাঁহারা আমাকে তাঁহাদের স্নেহাতিশয্যে অভিভূত করিয়া তুলিয়াছেন।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটু আভাস দিলে ব্যস্ততার কারণ বুঝিতে পারিবেন। আমরা এখানে তিনজন ভারতীয় ছাত্র—একজন পাঞ্জাবী দুইজন বাঙ্গালী—একটা ছোট বাড়ী লইয়া আছি। আমাদের দুইটি শুইবার, একটি বসিবার, একটি খাইবার ভিন্ন একটি পাকের ঘর। ঘরের আসবাব পত্র সামান্য,—কিছু নাই বলিলেই হয়, (ইংরাজীতে যাহাকে severe and simple বলে) কিন্তু ভারতবাসী আমাদের পক্ষে তাহা যথেষ্ট। এদেশবাসীর পক্ষে অবশ্য ইহা যথেষ্ট নহে এবং ইঁহাদের স্বাচ্ছন্দ্যের আদর্শ আরও কঠিন। সাধারণতঃ এদেশে দৈন্য ও অভাবের কোন স্থান বা সমাদর নাই—তাহা দুর্ব্বলতা ও পাপের প্রশ্রয়জনক বলিয়া পরিগণিত। কিন্তু এদেশেও এমন অনেক লোক আছেন যাঁহারা ভারতের আড়ম্বরহীন সরলজীবনের আদর্শকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। সুতরাং আমাদের বন্ধুবান্ধবের অভাব নাই। আমরাও কাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে লজ্জিত হই না। এখানে অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারে আমরা মায়ের স্নেহ ও ভাইয়ের সমপ্রাণতা পাইয়া প্রবাসজীবনের

ষ্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়।

অভাব ভুলিয়া যাই। প্রাতরাশ শেষ করিয়া ৮টার সময় ক্লাসে যাই! প্রাতে সাধারণতঃ ৮টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত ক্লাসের পড়া হয়। বৈকাল ১টা হইতে ৫টা যন্ত্রাগারে (Laboratory) কাজ করিতে হয়। দুপুরের খাদ্য কাগজে বাঁধিয়া লইয়া যাই, যন্ত্রাগারে কাজ করিতে করিতে আহার করি। ৫॥০টায় বাসায় আসিয়া রাঁধিতে হয়। আমাদের খাওয়া যথাসম্ভব সহজ সুলভ, অথচ পুষ্টিকর। মাথামুণ্ড কি যে পাক করি তা' আর বলিয়া কাজ নাই—জটিল রকম পাক করা পোষায়ও না। রুটি, মাখন, ওট, গম, মুড়ি খই জাতীয় জিনিষ, পনীর, দুধ, ফল, তরকারী ডাল, কখনও ডিম ও কচিৎ মাংস ইহাই আমাদের প্রধান খাদ্য। খাওয়ার পর বাসন কোসন মাজিয়া ঘর দুয়ার পরিষ্কার করিয়া ৭টার সময় বিদ্যালয়ের পাঠাগারে (Libiary) ক্লাসের পড়া প্রস্তুত করিতে চলিয়া যাই।

এখানে সব বিশ্ববিদ্যালয়েই ছেলে মেয়েদের একত্র বসিয়া পড়িবার প্রকাণ্ড হল থাকে। ৩।৪ শত জন বসিবার স্থান। কলেজের পাঠাগার এ দেশের একটি অতি সুন্দর অনুষ্ঠান। পৃথিবীর যাবতীয় প্রধান ভাষার সাহিত্য, বিজ্ঞান কলা ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকারের সাহিত্য প্রায় দুই সহস্র রকমের রাখা হয় এবং যাবতীয় দেশের ও ভাষার নানাবিধ পুস্তক সমূহ দ্বারা পূর্ণ থাকে। পুস্তক সংখ্যা ১॥০লক্ষ হইতে ৮ লক্ষ পর্য্যন্ত। যে কোন নূতন পুস্তক বাহির হয় তাহা শীঘ্রই পাঠাগারে পাওয়া যায়। পুস্তকই বা কত, আর বিষয়ই বা কত! যেন জ্ঞানের সমুদ্র—ইচ্ছা হয় ইহারই মধ্যে ডুবিয়া থাকি। এদেশের প্রত্যেক পাঠাগার যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশের কলেজের পাঠাগারগুলি কীটদষ্ট হইয়া বায়ুহীন অন্ধকার ঘরে দপ্তরী ও বৃদ্ধ লাইব্রেরিয়ানের সুষুপ্তি আনয়ন করে। ক্লাসে পড়াইবার সময় অধ্যাপক নানা পুস্তকের নাম বলিয়া দেন তাহা পাঠাগারে আসিয়া পড়িতে হয়। এইরূপে প্রতিদিন ৪।৫খানা বহির সহিত পরিচয় করিতে হয় ও তাহার মধ্যস্থিত কোন কোন বিষয়ে ক্লাসে আলোচনা হয়। আর একটি বেশ সুন্দর নিয়ম,—যে সব বইয়ের দাম বেশী বা খুব দরকারি এবং অনেক লোকে পড়ে লাইব্রেরিতে তাহা ১০।১২ খানা করিয়া রাখা হয়। প্রত্যেকে তাহা এক ঘণ্টার জন্য নাম লিখিয়া আনেন ও একঘণ্টা পরে তাহা ফিরাইয়া দিতে হয়। আমাদের গরীব দেশে গরীব ছাত্রগণের পক্ষে এই নিয়মটি পরম উপকারজনক।

এদেশের প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের একটা স্বাতন্ত্র্য আছে। কিন্তু সাধারণতঃ এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক শিক্ষা (under-graduate work) জ্ঞানের প্রসারতার দিকেই বেশী দৃষ্টি। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া একটি নির্দ্দিষ্ট বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হয় এবং আনুষঙ্গিক শিক্ষণীয় বিষয়গুলির মধ্যে কতকগুলি বিষয় নির্ব্বাচনে ছাত্রগণের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। তাঁহাদের অভিরুচি, শিক্ষা ও ক্ষমতা অনুসারে তাঁহারা সেগুলি বাছিয়া লন। এখানকার শিক্ষার আদর্শ,—ছাত্রগণের নিকট জ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার অল্পে অল্পে উন্মুক্ত করা ও সেই জ্ঞান আহরণ করিবার শক্তিসামর্থ্য তাহাদের মধ্যে এমন ভাবে জাগাইয়া তোলা

যেন ছাত্র অবশেষে নিজেই রত্নরাশি সংগ্রহ করিয়া লইতে পারেন। প্রথম দুই বৎসর আনুষঙ্গিক বিষয় ও নির্ব্বাচিত বিষয়ের প্রাথমিক ভাগ সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়। তৃতীয় বৎসর হইতে বিশেষ শিক্ষা আরম্ভ হয়। প্রথম উপাধির জন্য চারি বৎসর লাগে। গভীরতর শিক্ষা (research work) গ্রাজুয়েট হইবার পর আরম্ভ হয়। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন বিচিত্র আনন্দ ও উৎসাহে পূর্ণ। ইহার দ্বার সকলের জন্যই উন্মুক্ত। আমাদের দেশের ন্যায় নিয়ম-কঠোর, নীরস ও প্রাণহীন নহে। এখানে কচিৎ কেহ বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষায় বিফলমনোরথ হন। এমন কি শতকরা ৯০ জন শিক্ষা শেষ করিয়া বাহির হন। এখানে বিশ্ববিদ্যালয় কেবলমাত্র পরীক্ষাকেন্দ্র নহে তাহা শিক্ষার স্থান—মানুষ তৈয়ারির স্থান। এদেশের সর্ব্বোচ্চ শাসনকর্ত্তা (President) ও সকল বিখ্যাত লোকই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সাধারণতঃ পরীক্ষা দ্বারা আমাদের মুর্খতার পরিমাপেই ব্যস্ত থাকেন এদেশে প্রকৃত শিক্ষা দেওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কার্য্য। সাধারণতঃ একই স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত ও জ্ঞানের নানা বিভাগ,—সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান (ফলিত ও বিশুদ্ধ) রাজনীতি, সমাজনীতি, কলা, সঙ্গীত ইত্যাদি নানা বিষয়ের এক একটি কলেজ লইয়া বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত। দুই হইতে তিন শত বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। অধ্যাপক সংখ্যা দুই শত হইতে চারি শত। ছাত্র দেড় হাজার হইতে পাঁচ হাজার। এত ছাত্র ডিগ্রী পান্ ইহাতে মনে হইতে পারে যে এখানে পরীক্ষা ব্যাপারটি একেবারেই নাই। কিন্তু পরীক্ষা যথেষ্ট আছে; তাহা কেবল সেকেলে ধরণের ইংরাজী আদর্শে চালিত নহে। ক্লাসের প্রতিদিনের পড়া নির্দ্দিষ্ট থাকে ও তাহা না পড়িলে উপায় নাই। কারণ ক্লাসে আমাদের দেশের ৫ম শ্রেণীর ছাত্রের মত সকলকে প্রশ্ন করা হয় এবং প্রতি মাসে একটি কখনও বা দুইটি বেশী পরীক্ষা হয়। ক্লাসের পড়া ও পরীক্ষার ফল ভাল না হইলে ঐ বিষয়টি ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করা হয়। শেষ পরীক্ষায় তেমন কড়াকড়ি নাই, সারা বৎসরের ফলের উপর ছাত্রের উন্নতি অধোগতি নির্ভর করে। মোটের উপর পড়ায় অমনোযোগী হইলে কলেজ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেয়। যিনি সর্ব্বদা অধ্যাপনা করেন তিনিই পরীক্ষক,—ছাত্রের গুণাগুণ বা উপযুক্ততার বিচার তিনিই করেন। কারণ তিনিই প্রকৃত বিচার করিতে সমর্থ। এই নিয়মটি জার্ম্মেনী হইতে এদেশে প্রচলিত হইয়াছে ও ইহার সাফল্য যথেষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। ইহার তুলনায় আমাদের দেশের আধুনিক পরীক্ষপ্রণালী বুদ্ধিহীন ও অর্থশূন্য বলিয়া মনে হয়। আমাদের পুরাতন শিক্ষাপ্রণালীর সহিত ইহার অনেকটা সাদৃশ্য আছে। পূর্ব্বে গুরু শিষ্যকে বিদ্যাদানে নিজে নানা গুণে গড়িয়া তুলিতেন ও উপযুক্ত বিবেচনা করিলে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশের অনুমতি দিতেন। আমাদের বিকৃত রুচির আর এক পরিচয়,—সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্ধঅনুকরণে সংস্কৃত উপাধি ও পাণ্ডিত্য পরীক্ষাগুলি!

এখানে অধ্যাপক ও ছাত্রগণের মধ্যে

কোন ব্যবধান নাই। কারণ অধ্যাপকগণ আমাদের নিত্য সঙ্গী ও প্রিয় বন্ধু। অন্তরঙ্গ বন্ধুর সহিত আমরা যেমন প্রাণ খুলিয়া সর্ব্ববিষয়ে আলাপ করি অধ্যাপকের সহিতও তেমনি করি। মতদ্বৈধ হইলে ক্লাসে যথেষ্ট তর্ক আলোচনা হয় ও বাহিরে রহস্যালাপেরও অভাব নাই। ইঁহারা কেবল অধ্যাপক নহেন একপ্রকার সমপাঠী ও বন্ধু।

আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়ে ও ছেলে একত্র পড়েন; একই ক্লাস, একই অধ্যাপক। কেবল ছাত্রদিগের ও ছাত্রীদিগের ডর্ম্মিটরি অর্থাৎ শয়নাগার স্বতন্ত্র। আমেরিকা রমণীর দেশ,—তাঁহাদেরই একাধিপত্য; সেজন্য কি শিক্ষা কি চরিত্রগুণ কি কার্য্যতৎপরতা অনেক বিষয়েই ইঁহারা পুরুষকে পশ্চাতে ফেলিয়াছেন। পড়ায় ক্লাসে ইঁহাদের

ছাত্রদিগের ডর্ম্মিটরি। ছাত্রীদিগের ডর্ম্মিটরিও এইরূপ।

সহিত আঁটিয়া উঠা সহজ নহে। সাধারণতঃ ইহারা সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজনীতি, কলা, শিক্ষাশাস্ত্র, দর্শন, মনোবিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয় বেশী অধ্যয়ন করেন। এক এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ ছাড়া জ্ঞানের সমস্ত বিভাগই ইহারা আক্রমণ করিয়াছেন ও সে জন্য পুরুষদের তাঁহারা সদাই সজাগ ও ব্যতিব্যস্ত রাখেন। হতভাগ্য আমরা কোনও প্রকারে ক্লাসে টিকিয়া থাকি, কারণ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইঁহাদেরই জিত!

এখানে দুই টার্ম্মে কলেজের এক বৎসর। অগষ্ট হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত প্রথম টার্ম্ম ও জানুয়ারি হইতে মে দ্বিতীয় টার্ম্ম। প্রথম টার্ম্মে ভর্ত্তি হওয়াই প্রশস্ত। তবে দ্বিতীয় টার্ম্মেও ভর্ত্তি হওয়া যায়। গ্রীষ্মের ছুটী তিন মাস ও বড়দিনের একমাস আন্দাজ।

কলেজের সময় বড় ছুটী থাকে না। এক নিশ্বাসে একটি টার্ম্ম শেষ করিতে হয়। * *

আমেরিকায় প্রথম শ্রেণীর প্রায় ২০টী বড় বিশ্ববিদ্যালয় আছে। ইহা ছাড়া ছোট ত অসংখ্য আছে। আমাদের এখান হইতে অনতিদূরে ক্যালিফোর্নিয়া ষ্টেটের বিশ্ব-বিদ্যালয়। এদেশের অন্য কোন ষ্টেটে এত নিকটে ও এই রকম উচ্চ অঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয় নাই। ইহা আমাদের প্রাচ্য দেশবাসীর পক্ষে একটী পরম সুবিধা। ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভারসিটিতে এখন ১০।১১ জন ভারতীয় ছাত্র আছেন। ঘটনা-চক্রে তাঁহারা সকলেই বাঙ্গালী—না, একজন উড়িষ্যাবাসী আছেন, তাঁহাকেও আমরা একপ্রকার বাঙ্গালী করিয়া লইয়াছি। একজন পাঞ্জাবী, একজন মান্দ্রাজী ও ৩।৪ জন বাঙ্গালীছাত্র শিক্ষা শেষ করিয়া সম্প্রতি দেশে ফিরিয়াছেন। সব বাঙ্গালী হওয়ায় আমাদের অবস্থা একঘেয়ে হইয়া পড়িয়াছে! এখানে একটা কথা বলিয়া যাই। আমরা আজকাল বড় একটু বেশী রকম বাঙ্গালী বাঙ্গালী করি। সকলেই যদি নিজ গ্রাম ও প্রদেশকে সর্ব্বাগ্রে স্থাপন করেন তবে ভারতবর্ষ—আমাদের সকলের ভারতবর্ষ কোথায় দাঁড়াইবে? ভারতবর্ষই যে আমাদের সকলের পিতা ও সকলের উপরে,—এই ভারতবর্ষকেই সর্ব্বাগ্রে আমাদের প্রাণের অভ্যন্তরে আপন বলিয়া অনুভব করিতে হইবে। যেমন পিতাকে অনুভব করিতে চেষ্টার আবশ্যক হয় না ভারতবর্ষকে তেমনই করিয়া আপন বলিয়া অনুভব করিতে হইবে। অনেকে বলেন যে আপনার পরিবারকে ও সেইরূপ আপনার গ্রামকে ও প্রদেশকে আপন বলিয়া অনুভব না করিতে পারিলে সমগ্র দেশকে আপন করা যায় না। কিন্তু এইখানে আমরা একটা ভুল করি। যাহা আমাকে সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে স্নেহ ও আনন্দদ্বারা অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে—তাহার প্রতি আমার হৃদয় স্বতঃই আকৃষ্ট হইয়া আছে—সেখানে বেশী করিয়া তাহাকে আপন করিতে গেলে অনেক সময় সঙ্কীর্ণতা আসিয়া পড়ে, ভাব বিস্তৃত না হইয়া ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে। আমার মাতৃভাব মাতা ও সন্তানের সম্বন্ধ মাত্র নহে, —ইহা বিশ্বজনীন মাতৃভাবের একটী অভিব্যক্তি মাত্র বলিয়া বিশাল গভীর ও প্রাণস্পর্শী। সেইরূপ আমার গ্রাম, আমার প্রদেশ সমগ্র ভারতের একটী অংশ মাত্র। এবং সেইজন্যই তাহা আমার প্রিয় ও আপনার—তাহার ভিন্ন বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব আমি স্বীকার করি না। ভারতবর্ষ আমাদের সকলের পিতা এবং আমরা প্রথমে ভারত-বাসী ও পরে বাঙ্গালী। প্রাদেশিকতার সঙ্কীর্ণতা আমাদের স্বদেশভক্তিকে এখনও ম্লান করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে অনেকেই প্রাদেশিকতাকেই স্বদেশভক্তি বলিয়া মনে করিতেছেন। সেদিন 'প্রবাসী'তে দেখিলাম বিহার হইতে একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক বিহারের কোন কোন বিদ্যালয়ে বাঙ্গালীর প্রবেশ কষ্টসাধ্য বলিয়া অনেক আক্ষেপ ও দুঃখ করিয়া এক "বাঙ্গালী বিদ্যালয়" খুলিতে চান—যেখানে কেবলই বাঙ্গালীর প্রবেশাধিকার থাকিবে! বিশেষতঃ তিনি এমন বলিতেও লজ্জিত হন নাই যে

তাহা জাতীয় বিদ্যালয় হইলে চলিবে না! পড়িয়া লজ্জায় ও ক্ষোভে আমরা পীড়িত হইয়াছি। এই প্রকার একদেশদর্শী চিন্তা-প্রণালীর কারণ কি? লেখকের মঙ্গল উদ্দেশ্যের সহিত আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি আছে, কিন্তু বিদ্যালয়টী 'জাতীয়' হইবে না কেন ও যে সঙ্কীর্ণতার জন্য তিনি আক্ষেপ করিয়াছেন সেই সঙ্কীর্ণতাই ইহার ভিত্তি হইবে কেন? বোধ করি, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের বিকৃত প্রাণহীন শিক্ষাই ইহার এক প্রধান কারণ। আমাদের জাতীয় শিল্পপরিষদ প্রকৃত শিক্ষার সূত্রপাত করিয়াছেন কিন্তু তাহা যথেষ্ট সমাদর লাভ করিতেছে না, ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। ২য় কারণ, আমরা এখনও প্রাদেশিকতার উর্দ্ধে উঠিতে পারি নাই। এই প্রাদেশিকতা কালক্রমে আরও সঙ্কীর্ণ হইয়া গ্রাম্যতা ও পারিবারিকতাতে পরিণত হইয়া আমাদের অবনতির অন্যতম কারণ হইয়াছে। একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এবং সামান্য পরিমাণে মুসলমান যুগে সমগ্র ভারতের জীবনে একটা যোগ ছিল। তখন কেবলমাত্র জ্ঞান ও শিক্ষার আদানপ্রদান নহে সমগ্র ভারতে একটা সামাজিক সম্বন্ধও অল্পাধিক পরিমাণে প্রচলিত ছিল। সে যুগের সংস্কৃতসাহিত্যে তাহার অনেক প্রমাণ রহিয়াছে। কিন্তু ক্রমে নানা প্রদেশের সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া নিজগ্রাম ও পারিবারিক স্বার্থের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যেই আমাদের জাতীয় জীবন লয় পাইল। বিস্তৃতি ও বিকাশই জীবনের লক্ষণ, সঙ্কীর্ণতা পতন ও মৃত্যুর অগ্রদূত।

আমরা যখন ভারতের নানা প্রদেশের ছাত্রবৃন্দ একত্র থাকি এবং আমাদের সামান্য ক্ষুদ্রতা ও দ্বন্দকোলাহলের মধ্য দিয়া ভারতের সেই বিশাল ও সুগভীর একত্ব যখন উপলব্ধি করি তখন আনন্দ ও উৎসাহে হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠে। বিদেশে আমার ইহাই এক প্রধান শিক্ষা ও এমন আনন্দ ও বল আর কিছুতে পাই নাই। এখন মনে হয় ভারতের যে কোন স্থানে যাইয়া জীবন কাটাইতে পারি, কারণ তাহারা, সকলেই যে আমার আপনার জন।

আমেরিকাস্থিত ভারতীয় ছাত্রবৃন্দ অধিকাংশই নিজে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া এদেশের সমস্ত খরচপত্র নির্ব্বাহ করেন। কেহ কেহ এজন্য দৈনিক ৩,৪ ঘণ্টাকাল অবসর সময়ে কাজ করেন কেহ কেহ ছুটীর সময় বা কিছুদিন কলেজে না যাইয়া বাহিরে পয়সা উপার্জ্জন করিয়া পরে কলেজে ভর্ত্তি হন। যদিও ইহাতে কিছু বেশী সময় লাগে তবুও ইহাই প্রশস্ত বলিয়া মনে হয়। কারণ ইহার পর সমস্ত সময় কলেজের কাজে নিযুক্ত থাকা যায় ও বিদ্যালয়ে এত শিখিবার জিনিষ আছে যে যত সময় দেওয়া যায় ততই ভাল। কাজ ও পড়া এক সঙ্গে করিলে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকিতে হয় কিন্তু অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে শেষ করিবার আশায় অনেকে ইহাই পছন্দ করেন। কেহ বাড়ী হইতে কিছু কিছু অর্থ পান কিন্তু তাহাতে খরচ কুলায় না, সুতরাং সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে কাজ করিতেই হয়। এই স্বাবলম্বনে একটা সবল আনন্দ আছে ও কোন দুঃখ কষ্টই আমাদিগকে অভিভূত করিতে পারে না। ইহাতে অবশ্য আমাদের গৌরব করিবার

কিছু নাই। দেশের নানারূপ দুঃখ দৈন্যের তুলনায় আমরা এখানে ভালই আছি। আমাদের অভাব দৈন্য দেশের তুলনায় সামান্য। কেহ কেহ এই সামান্য ব্যাপারকেই মহা স্বার্থত্যাগ ও দেশের পক্ষে গৌরবজনক বলিয়া বৃথা বাড়াইয়া থাকেন। কিন্তু এই অযথা প্রশংসায় আমাদের অপকারেরই সম্ভাবনা। ইহা আমাদের আত্ম-মর্য্যাদাকে আঘাত করে এবং সামান্য কার্য্যকে বড় করিয়া আমাদের কর্ত্তব্যের গুরুত্ববোধকে আমরা ক্ষুণ্ণ করি। * * *

আমাদের দেশের জনসাধারণের ব্যবহারের বিষয়ে আরও দুই একটী কথা বলিবার আছে। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের দোষ দুর্ব্বলতা বিষয়ক নিন্দায় আমাদের শিক্ষিত সমাজের একদল মুখরিত হইয়া আছেন। আবার আর এক দলের বিশ্বাস যাহা কিছু পুরাতন তাহাই ভাল নিখুঁত ও তাহা হইতে আর কিছু মহত্তর হইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত দলের মধ্যে অনেকেই অসহিষ্ণু সমাজসংস্কারক, যুগযুগান্তরের আবর্জ্জনা তাঁহারা একদিনেই পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে চান, এবং তাহা অসম্ভব দেখিয়া স্বয় আদর্শ বজায় রাখিবার জন্য সমাজ শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কালক্রমে এতদূরে চলিয়া যান যে সমাজ হৃদয়ের স্পন্দন তাঁহাদিগকে আর স্পর্শ করে না। ফলে উভয় পক্ষেরই ক্ষতি। তাঁহারা যে উচ্চ উদ্দেশ্য ও মঙ্গল ইচ্ছা লইয়া কার্য্যারম্ভ করেন পরিশেষে তাহাই অজানিত ভাবে সঙ্কীর্ণতায় পরিণত হয়। সমাজের কাজ করিবার জন্য যে সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায়, ও অনন্তপ্রেমের আবশ্যক তাহার অভাব বশতঃই এরূপ হইয়া থাকে। অপরদিকে শিক্ষিত সমাজের গোঁড়া দল, চিন্তা শূন্য, উদ্যমহীন ও মৃতপ্রায়। সমাজের সহস্র দোষ দুর্ব্বলতা দেখিয়াও বুঝিয়াও তাহার নিরাকরণের কোন চেষ্টা নাই; মূকের মত তাহাই সহ্য করিয়া পিষ্ট হইতেছেন। ইঁহারাও সমাজ শরীরের ব্যাধি স্বরূপ। কেবল সমাজের দোষ দেখিয়া ও কীর্ত্তন করিয়া বিশেষ লাভ নাই। সেবা ও শিক্ষা বিস্তার দ্বারা সমাজের এই দুর্ব্বলতাগুলিকে দূর করিতে হইবে। ভারতের প্রত্যেক নরনারী লইয়া আমাদের যে সমাজ গঠিত তাহা শত দোষ দুর্ব্বলতা সত্বেও আমার প্রাণেরপ্রাণ, আমি তাহারই একজন; তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন আমার কোন অস্তিত্ব নাই। মাতার যে ব্যাধি তাহা নিবারণের জন্য কায়মন প্রাণে আমাদের তাঁহার সেবা করিতে হইবে। মাটির মত সহিষ্ণু হইয়া যেন চিরকাল তাঁহারই সেবা করিতে পারি। সেবাই আমাদের ধর্ম্ম ও সেবাই আমাদের কর্ম্ম। * * *

নিম্নশ্রেণীর উপর অত্যাচার পৃথিবীর সর্ব্বদেশেই হইয়া আসিয়াছে ও এখনও যথেষ্ট হইতেছে। অথচ জনসাধারণ পৃথিবী ভরিয়াই আজ মাথা তুলিয়া উঠিতেছে ও তাহাদের ন্যায্য অধিকারের দাবী করিতেছে। এই অত্যাচার প্রসঙ্গে আমাদের অনেক লজ্জাকর কথার সহিত প্রশংসার কথাও কিছু আছে। পাশ্চাত্য দেশের প্রবলজাতি সমূহের সংঘর্ষে আসিয়া অনেক দুর্ব্বল জাতি পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়াছে ও হইতেছে এমন কি এখন অনেক জাতি ইহা পৌরুষকর বলিয়া মনে

করেন! আমাদের ইতিহাস এ কলঙ্কে মলিন নহে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ভারতে সমস্ত অধিবাসী লইয়া একটী বিশাল জাতি গঠনের চেষ্টা করিয়াছেন ও সে চেষ্টা আজও চলিতেছে। ভারতের ইতিহাস গভীরভাবে আলোচনা করিলে আমরা এই চেষ্টার অনেক প্রমাণ পাই। কার্য্যতঃ তাহা লাভ না করিতে পারিলেও তাঁহারা আমাদের এমন এক মহান আদর্শ দিয়াছেন যে সেই ভিত্তির উপরই আমাদের এই বিচিত্র মহাজাতি সংগঠন সম্ভব। সর্ব্বভূতে ঈশ্বরত্ব বেদান্তের এই শিক্ষা আমাদের বিচিত্র জাতি সমূহকে এক করিবার এক প্রধান উপায় বলিয়া মনে হয়, এবং ইহাই আমাদের জাতীয়তার এক প্রধান অবলম্বন হইবে। এই জটিল জাতি সমস্যার সমাধানই আমাদের গৌরবের জিনিস হইবে এবং বিধাতা ইহারই জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত করিতেছিলেন। আমরা অতীত ভারতের গৌরব করিয়া থাকি, কিন্তু আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে কার্য্যের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন এবং যাহা সম্পূর্ণ না হওয়ায় আমাদের পতনের কারণ হইয়াছে সেই কার্য্যকে সম্পূর্ণ করিয়া আমাদের দেশ ও জাতিকে আরও গৌরবান্বিত ও মহিমান্বিত করিতে পারিলেই আমরা সেই গৌরব করিবার অধিকারী। * *

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপন ইতিহাস অতি বিচিত্র। একটী রমণীর (Mrs. Stanford) মহদন্তঃকরণ ও উদারতায় ইহা আজ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অর্থশালী বিদ্যালয়। পরীক্ষা হইয়া গেলে এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠাইবার ইচ্ছা রহিল। এই মে মাসের পর হইতে নিয়ম মত লিখিতে পারিব বলিয়া ভরসা করি।

ইতি, সেবক শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বসু।

সদানন্দের বৈরাগ্য।

বাপমায়ে বড় সাধ করিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিল সদানন্দ। পাড়ার দুষ্টলোকেরা তাঁহাদের স্নেহের ভুলটাকে সংশোধন করিয়া তাহাকে নিরানন্দ বলিত।

সে ছেলেবেলা হইতেই কেমন অনাবশ্যক গম্ভীর। শৈশবে সে 'তাই তাই' করিয়া হাসে নাই। বাল্যে পাঠশালায় গিয়া চঞ্চলতা প্রকাশ করে নাই। এজন্য তাহার সহপাঠীরা তাহাকে গুরুমশায় বলিত। এখন সদানন্দ যৌবনপথের অনেকখানি অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, এখন ও তাহার না হাসিবারই কথা।

সদানন্দ হাসে নাই কিন্তু তাহার যথারীতি বিবাহ হইয়াছে; এবং গুটিকত শিশুর কলকাকলিতে তাহার গৃহ মুখর হইয়া উঠিতেছে।

এইসব ব্যাপারগুলা সদানন্দের জীবনের সঙ্গে ঠিক খাপ খাইতেছিল না। প্রথম, বিবাহ ব্যাপারটাই তাহার গাম্ভীর্য্যের প্রতি নিষ্ঠুর উপহাস—বাপমায়ের দারুণ ষড়যন্ত্র। ছাদনাতলায় শালাশালীতে কান মলিয়া, বাসরঘরে বিদ্রূপ করিয়া, কথায় কথায় ঠকাইয়া সদানন্দের গাম্ভীর্য্যকে টলটলায়মান করিয়া তুলিয়াছিল।

স্ত্রীটি অপরিবর্জ্জনীয় উপদ্রব। খাও দাও থাক। তা না, তাঁহার আবার সখ কত! হাসি চাই, ঠাট্টা চাই, রসিকতা চাই। সদানন্দের প্রাণ এই এক কোথাকার-কে উড়িয়া-আসিয়া-জুড়িয়া-বসা অত্যাচারীর উৎপাতে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতেছিল। বেচারার বারবার মনে হইত—

"স্ত্রীর চাইতে কুমীর ভালো
বলে সর্ব্ব শাস্ত্রী।
কুমীর ধরলে ছাড়ে তবু,
ধরলে ছাড়ে না স্ত্রী।"

বিবাহের দুচার বছর পরেই স্ত্রীটি নূতনতর উপদ্রবের পন্থা আবিষ্কার করিল। বছরে একটি করিয়া শিশুর আমদানিতে ঘর ভরিয়া ফেলিবার উপক্রম। শুধু তাই হইলেও ত সদানন্দ বাঁচিত। শিশুগুলা হাসে! তাহারা নাচে গায়, বত্রিশ রকম মুখভঙ্গী করে, সদানন্দের ভীষণ গম্ভীর শ্মশ্রুবহুল মুখ দেখিয়া একটুও ভয় করে না, বরং তাহাদের আক্রোশ দাড়ির উপরেই অধিক। এইসব দেখিয়া শুনিয়া সদানন্দের গাম্ভীর্য্য রক্ষা করা অনেক সময় দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত।

গাঁয়ের লোকেরাও কি কম উৎপাত করে। তাহারা সদানন্দের অমন গাম্ভীর্য্যের কিছুমাত্র খাতির না করিয়া কেহ বা তাহার মাথায় চাঁটি মারিত, কেহ বা গায়ে হুঁকার জল ঢালিত, কেহবা তাহার দাড়ি ধরিয়া টানিত।

বাল্যাবধি লোকের অভদ্র উৎপাতে সদানন্দ মনে মনে ভারি বিরক্ত হইতেছিল। ক্রমে তাহার গৃহ যখন পাঁচ ছয়টি শিশুর ক্রন্দন কোলাহল আবদারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল তখন একদিন সদানন্দ "ধুত্তোর" বলিয়া গৃহ ছাড়িয়া প্রস্থান করিল।

সে গৃহ ছাড়িল, অদৃষ্ট কিন্তু তাহাকে ছাড়িল না।

সদানন্দ চায় বেশ একটি নিঃসঙ্গ নির্জ্জনে সে আপনাকে লইয়া গুম হইয়া জীবনটা কাটাইয়া দেয়। তাহার ভাগ্যবিধাতা কিন্তু ব্যবস্থা করিয়াছিলেন অন্যরূপ। দূর হইতে পর্ব্বতের গুহা, গহন বন মনের মধ্যে বেশ একটা বিরাট রকমের ভাবসঞ্চার করে, কিন্তু বাস্তব জীবনে সেগুলার মধ্যে কবিত্বের অংশটা খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। গুহার মধ্যে কাঁকর বা বনের মধ্যে ফলপাকড় খাইয়া ত জীবনটাকে অধিক দিন ঠেকাইয়া রাখা যায় না। ক্ষুধা জিনিষটা সদানন্দের অতবড় গাম্ভীর্য্যকে একেবারেই ভয় করিত না।

সদানন্দ এক গ্রামের সুদূর প্রান্তে একখানা কুঁড়ে বাঁধিল। আঃ সেখানেও কী জ্বালাতন! হাটের ব্যাপারী লোকগুলা তাহারই কুটীরে গিয়া তামাক খাইবার আগুন চায়, কৃষকেরা গান গাহিয়া শান্তিভঙ্গ করে, ভবঘুরে ছেলেগুলো মরিবার আর জায়গা না পাইয়া তাহারই কুটীরের চারিদিকে ঘুরপাক খায়।

আহারের সঞ্চয়ের জন্য মাঝে মাঝে গ্রামেও ঢুকিতে হয়। সেখানেও কি যত জঞ্জাল! গ্রামের কুকুরগুলা ঘেউ ঘেউ করিয়া তাহাকে নাচাইয়া তুলে, ছেলেগুলা সেই সঙ্গে হাততালি দিয়া ক্ষেপাইয়া দেয়, মেয়েরা পর্য্যন্ত ঘোমটার আড়াল হইতে সন্ন্যাসী মিনসের নাকাল দেখিয়া কটাক্ষ হানিয়া মুচকি হাসে—অত বড় গাম্ভীর্য্যটাকে একটুও

গ্রাহ্য না করিয়া একেবারে নাস্তানাবুদ করিয়া দেয়।

সদানন্দের সে গ্রামে আর বাস করা চলিল না। সে খুঁজিয়া খুঁজিয়া এক গ্রামের বাহিরে তেপান্তর মাঠে শ্মশানের মাঝে আপনার আস্তানা গাড়িল।

শ্মশানডাঙ্গায় কেহ তাহাকে বিরক্ত করিতে আসিত না। কালেভদ্রে শব-সঙ্গীরা তাহার কুটীরে আশ্রয় লইত, প্রতিদানে যাহা দিয়া যাইত সদানন্দের তাহাতেই কোনো রকমে দিন-গত পাপক্ষয় হইত।

এখানে সদানন্দ এক রকম মনের সুখেই নিশ্চিন্ত ছিল। বেচারার ভাগ্যবিধাতা কিন্তু নিশ্চিন্ত ছিলেন না।

একদিন কয়েক জন লোক একটি শব সংকার করিতে শ্মশানে আসিয়াছে। ভয়ানক বৃষ্টি আরম্ভ হইল। তাহারা তাড়াতাড়ি শবটাকে আনিয়া সদানন্দের কুটীরের বাহিরে রাখিল এবং অভ্যর্থনার অপেক্ষা না করিয়াই সদানন্দের কুটীরের মধ্যে ঠেলিয়া ঢুকিয়া পড়িল।

ছোট কুটীর। তাহার মধ্যে পাঁচ ছয় জন লোক ঢুকিয়া জটলা কলরব আরম্ভ করিয়া দিল। সদানন্দের তাহা অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। তাহার উপর তাহারা তামাকের ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকাইয়া সদানন্দ বেচারাকে একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। সদানন্দ আস্তে আস্তে পাশ কাটাইয়া কুটীরের দ্বারের মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

মুষল ধারে বৃষ্টি হইতেছে। শব বাহিরে পড়িয়া ভিজিতেছে। সদানন্দ তাহাই দেখিতেছে। হঠাৎ তাহার মনে হইল, শব যেন একটু নড়িল। দানো পাইল নাকি!

সদানন্দ ভয়ের বড় একটা তোয়াক্কা রাখিত না, রাখিলে শ্মশান আপনার বাসস্থান বলিয়া বাছিয়া লইতে পারে? সে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া রোমবহুল ঝাঁপালো ভ্রূর তলদেশ হইতে চক্ষু চাড়িয়া দেখিতে লাগিল বাস্তবিকই শব নড়িতেছে। যাহারা শব আনিয়াছিল তাহারা ঘরের ভিতরে আপন মনে ধূমপানে ও গল্পগুজবে মত্ত ছিল, আর সদানন্দ ছিল দ্বার আগুলিয়া; তাহারা বাহিরের ব্যাপার কিছুই জানিতেছিল না।

সদানন্দ যখন দেখিল যে শব স্পষ্টই নড়িতেছে তখন সে কুটীর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। শববাহী একজন বলিল "কি ঠাকুর, কোথায় যাও।"

সদানন্দ কোনো উত্তর দিল না। শবের কাছে গিয়া মুখের ঢাকা খুলিয়া ফেলিল। শব চক্ষু মেলিয়াছে, বৃষ্টিধারা হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া পান করিতেছে। সদানন্দ শবের ম্যাচকা ধরিয়া হড় হড় করিয়া কুটীরের মধ্যে টানিয়া লইয়া গেল। শববাহীরা কোলাহল করিয়া আপত্তির স্বরে বলিল "ওকি ঠাকুর, ওটাকে আবার এর মধ্যে ভরছ কেন?"

সদানন্দ এ কথায় কর্ণপাত না করিয়া শবের শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল। সকলে সবিস্ময়ে দেখিল শব চেতনা লাভ করিয়া উজ্জীবিত হইয়া উঠিতেছে। সকলে ভয়ে বিস্ময়ে অবাক আড়ষ্ট হইয়া গেল। সন্ন্যাসী বাবা সিদ্ধ পুরুষ, তাঁহার পুণ্যস্পর্শে মৃত শব সঞ্জীবিত হয়, ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়া তাহাদের রোমাঞ্চ হইল। সকলে ভক্তিভরে মহাপুরুষের পায়ের ধূলা মাথায় লইল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গেল

সন্ন্যাসী মরা মানুষ বাঁচাইতে পারেন। গাঁ ভাঙিয়া রাজ্যের নরনারী আবালবৃদ্ধবনিতা সদানন্দের কুটীর ঘিরিয়া ভিড় জমাইয়া তুলিল। পীড়িতের আত্মীয় স্বজন সদানন্দের চরণে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে সদানন্দের খ্যাতি দাবানলের মতো ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। প্রতিদিন কত দেশের বাসি মড়া, গলিত কুষ্ঠ আসিয়া তাহার দ্বারে ধন্না দিতে লাগিল। শ্মশানডাঙ্গায় মেলা বসিল, দোকান পসার হাটে জমজমাট। কত দেশের কত লোক কত রকম মানসিক করিয়া সন্ন্যাসী বাবার চরণে আসিয়া পড়িতে লাগিল। সদানন্দের কোনো পুরুষে কেহ বৈদ্য ছিল না, অথচ বেচারাকে ঘিরিয়া দুনিয়ার রোগীর সনির্ব্বন্ধ করুণ প্রার্থনা দিবানিশি ধ্বনিত হইতে লাগিল।

নাচার সদানন্দ হাতের মাথায় যাহা পায় তাহাই দেয়। সকলে ভক্তিভরে সেবন করে, মাদুলি করিয়া ধারণ করে। অনেকের রোগ বিশ্বাসের জোরেই সারিতে লাগিল। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসী বাবার খ্যাতি প্রতিপত্তি বাড়িয়া চলিল। যাহাদের রোগ সারিত না তাহারা দ্বিগুণ আগ্রহে সদানন্দের চরণ চাপিয়া ধরিয়া বলিত "হে বাবাঠাকুর, কি পাপ দেখে আমার ওপর দয়া হল না।"

সদানন্দ বেচারা উত্যক্ত হইয়া উঠিল। সংসার ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে বলিয়া বিশ্ববিধাতা আজ সারা সংসার ডাকিয়া তাহারই কুটীরদ্বারে আনিয়া হাজির করিয়াছেন। সদানন্দ দেখিল এর চেয়ে সে নিজের গ্রামে নিজের গৃহে ঢের শান্তিতে, ঢের আরামে, ঢের শান্তিতে ছিল। তাহার বৈরাগ্যের উপর বৈরাগ্য আসিল।

একদিন সকালে সকলে সবিস্ময়ে আবিষ্কার করিল—বাবা সিদ্ধপুরুষ অন্তর্ধান করিয়াছেন। সকলে হায় হায় করিতে লাগিল। সিদ্ধপুরুষের অন্তর্ধানে শ্মশানডাঙ্গা ক্রমে ক্রমে আবার শ্মশান হইয়া গেল।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বর্ষাপ্রভাত।

বর্ষা এল, প্রিয়তম অসীম অম্বর
সীমাগত পুঞ্জমেঘে, প্রাতঃ সূর্য্যকর
নিরুত্তম একেবারে সুধীর মতন,
সুশ্যামল তরুলতা, বন উপবন
মর্ম্মর সঙ্গীত মুগ্ধ পল্লব নিচয়
পবনের আন্দোলনে আজি ছন্দোময়।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

শতদল।

আজি ভরা শ্রাবণের অবিশ্রান্ত ধারে,
মেঘের কাজল-কালো শ্যাম অন্ধকারে,
অপূর্ব্ব-উজ্জ্বল শুভ্র বিদ্যুল্লেখা সম
নিরাশা-নিকষ-কৃষ্ণ হৃদয়েতে মম
জাগিছে তোমার স্মৃতি করুণ কোমল!
অসিত সরসী জলে পূর্ণ—শতদল।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

বরষা।

আজ বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে ;
চলেছে গরজি, চলেছে নিবিড় সাজে।
হৃদয়ে তাহার নাচিয়া উঠেছে ভীমা,
ধাইতে ধাইতে লোপ করে চলে সীমা,
কোন্ তাড়নায় মেঘের সহিত মেঘে
বক্ষে বক্ষে মিলিয়া বজ্র বাজে !
বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে।

পুঞ্জে পুঞ্জে দূর সুদূরের পানে
দলে দলে চলে কেন চলে নাহি জানে।
জানেনা কিছুই কোন্ মহাদ্রি তলে
গভীর শ্রাবণে গলিয়া পড়িবে জলে,
নাহি জানে তার ঘন ঘোর সমারোহে
কোন্ সে ভীষণ জীবন মরণ রাজে !
বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে।

ঈশান কোণেতে ঐ যে ঝড়ের বাণী
গুরু গুরু রবে কি করিছে কানাকানি !
দিগন্তরালে কোন্ ভবিতব্যতা
স্তব্ধ তিমিরে বহে ভাষাহীন ব্যথা,
কালো কল্পনা নিবিড় ছায়ার তলে
ঘনায়ে উঠেছে কোন্ আসন্ন কাজে !
বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সমালোচনা।

জীবনের দৃশ্যমালা। ইংলণ্ডে বঙ্গ-মহিলা প্রণীত। দাসযন্ত্রে মুদ্রিত। ১৩১৬। মূল্য লিখিত নাই। এ খানি কবিতাগ্রন্থ। শতাধিক কবিতা গ্রন্থের কলেবর পূর্ণ। বাঙালী নারীর জীবন দুঃখকাহিনী। বেদনায় একটা করুণ সুর আগাগোড়া বহিয়া গিয়াছে। তবে এরূপ ব্যক্তিগত কবিতা ঠিক সমালোচনার সামগ্রী নহে।

মোসলেম কর্ম্মবীর চরিতমালা— প্রথম খণ্ড। হামেদ আলী প্রণীত। ৪নং উইলিয়মস্ লেন, দাসযন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য দশ আনা। মুসলমান

সমাজের বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন কর্ম্মবীরের জীবনী ইহাতে সঙ্কলিত হইয়াছে। লেখকের ভাষা বিশুদ্ধ, গম্ভীর—তবে রচনায় সরসতার অভাব। মুসলমান বালকের চরিত্রগঠনে আদর্শগুলি অদ্বিতীয় সহচর এবং সাধারণের পক্ষে জ্ঞাতব্য ভাবে পূর্ণ এই গ্রন্থখানি বিশিষ্ট আদর লাভের যোগ্য।

বিলাত ভ্রমণ। প্রথম ভাগ। বিলাতের পথে। ডাক্তার শ্রীযুক্ত ইন্দুমাধব মল্লিক এম, এ. এম, ডি, প্রণীত। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। মূল্য দশ আনা মাত্র। বাঙালী পাঠকের নিকট ইন্দুবাবুর নাম সুপরিচিত। বিলাত যাইবার সময় তিনি পথে যাহা দেখিয়াছিলেন তাহারি বিবরণী লইয়া পাঠক সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার হৃদয় কবির হৃদয়—সেই জন্যই তাঁহার রচিত ভ্রমণ কাহিনী উপন্যাসের মত সুললিত, কবিতার মত মর্ম্মস্পর্শী। লেখকের যেমনি উদার সহানুভূতি তেমনি সূক্ষ্ম দৃষ্টি! অতি ছোট বিষয়টি—যাহা সাধারণের চক্ষু এড়াইয়া যায় তাহা তাঁহার চিত্তে গভীর ভাবের তরঙ্গ তুলে। ইন্দুবাবুর রচনার বিশেষ সৌন্দর্য্য কি—গ্রন্থের ভূমিকায় সুলেখক শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার প্রতি মনোজ্ঞ ইঙ্গিত করিয়াছেন। বাঙালায় 'ভ্রমণ কাহিনী' ছাপমারা গ্রন্থের সংখ্যা প্রচুর কিন্তু—তাহার মধ্যে প্রকৃত 'ভ্রমণ কাহিনী' অল্পই। সেই অল্পসংখ্যক গ্রন্থাবলীর মধ্যে ইন্দুবাবুর 'বিলাত ভ্রমণ' যে বিশিষ্ট স্থান পাইবার যোগ্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কেবল লেখকের ভাষার দিকে একটু সতর্ক দৃষ্টি থাকিলে ভাল হয়: গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ দেখিবার আশায় আমরা উদ্গ্রীব রহিলাম।

ঋগ্বেদসংহিতা। (বঙ্গানুবাদ পদ্যে) শ্রীরামচন্দ্র সাহিত্য সরস্বতী কর্ত্তৃক অনুবাদিত, রাজসাহী আর্য্যসম্মিলনী হরিসভা হইতে প্রকাশিত। বঙ্গাব্দ ১৩১৭। বার্ষিক মূল্য সাধারণের পক্ষে ৩৵৹, ছাত্রগণের পক্ষে ৩৲। ঢাকা শ্রীনাথ প্রেসে মুদ্রিত। প্রতি মাসে খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইবে। অনুবাদক 'ভূমিকা'য় লিখিয়াছেন, "গদ্য অপেক্ষা পদ্যময় বাক্য আমাদের মনের উপর বেশী ক্রিয়া করে—কবিতার চোদ্দ অক্ষরের একটি ক্ষুদ্র পঙ্‌ক্তি মানবের মনে যে বিশ্বাস জন্মাইয়া দেয় শত ঐতিহাসিকের সহস্র পৃষ্ঠা নিঃশেষিত ইতিহাসও তাহা দূর করিতে পারে না"; তাই বেদগ্রন্থের বহুল প্রচারার্থ অনুবাদকের প্রয়াস। সাহিত্য-সরস্বতী মহাশয় ক্ষমা করিবেন, তাঁহার উদ্দেশ্যের সফলতা সম্বন্ধে আমাদিগের বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। কারণ এই গ্রন্থে অনুবাদের ভাষা ও বাক্য এমনি উৎকট যে তাহার রস গ্রহণে সাধ হইলেও সাধ্য হইবে না। ইহাপেক্ষা সরল গদ্যে অনুবাদ করিলে লোকে সহজেই বুঝিতে পারিত—এবং অনুবাদককেও এই দারুণ গ্রীষ্মে 'চৌদ্দ গণিয়া গলদঘর্ম্ম হইতে হইত না।

বিদ্যালয় বিধায়ক বিবিধ বিধান—শ্রীঅঘোরনাথ অধিকারী প্রণীত। ভারতমিহির যন্ত্রে মুদ্রিত। বাঁধাই শুদ্ধ দুই টাকা। কবিতা নাটক নভেল প্রাবিত বঙ্গসাহিত্যে প্রয়োজনীয় শিশু-শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থ বিরল বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয়। 'জাতি,' 'জাতি বলিয়া গগনভেদী বক্তৃতায়—আমরা রীতিমত করতালি সংগ্রহ করি, প্রবন্ধ লিখিয়া 'বাহবা' লই, অথচ সেই জাতি-গঠনের মূলে যে ভবিষ্যৎ বংশীয়গণের সুশিক্ষা নির্ভর করিতেছে—সে সম্বন্ধে আমরা ভুলিয়াও দুইটা কথা কহি না। বাঙলার অধ্যাপক ও শিক্ষকমহাশয়গণ কাব্য সমালোচনা, রসরচনাতেই অবসরকাল যাপন করেন, অথচ তাঁহাদিগের ভূয়োদর্শন বা অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁহাদিগের মতামত সাধারণে জানিতে পারিলে কত উপকার হয় তাহা কেহ ভাবিয়াও দেখেন না! অবশ্য আমরা এমন বলিতেছি না যে তাঁহারা কাব্যালোচনা প্রভৃতি ছাড়িয়া দিউন। তবে এ বিষয়েও তাঁহাদিগের একটি কর্ত্তব্য আছে। আমাদের অধ্যাপক ও শিক্ষক মহাশয় গণের মধ্যে এমন অনেক আছেন, ওকালতী ডাক্তারী করিলে যাঁহারা ধনকুবের হইতে পারিতেন, তাঁহারা শুধুই উদরান্নের জন্য যে শিক্ষকতা

করিতেছেন, এ কথা মনে করাও পাপ। বর্ত্তমান গ্রন্থখানি অঘোর বাবুর বহুদর্শিতার অমূল্য ফল। পাঠ করিয়া আমরা আনন্দিত ও মুগ্ধ হইয়াছি। বালকগণের শিক্ষা, শাসন, শরীর পালন, নীতি, ধর্ম্ম প্রভৃতি সমস্ত প্রয়োজনীয় কথা, গ্রন্থকার এই পুস্তকে বলিয়াছেন। এই গ্রন্থ সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকার ও প্রকাশক, বাঙালী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতা ভাজন। বালকবালিকা, অধ্যাপক, অভিভাবক সকলের পক্ষেই গ্রন্থখানি অতুলনীয় সামগ্রী। সকলেরই পাঠ করিয়া দেখা উচিত। গ্রন্থখানি গৃহ পঞ্জিকার মত বাঙালীর গৃহে বিরাজ করুক, ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা।

জাপানী ফানুস। শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ মূল্য আট আনা। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত ও ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। এক বৎসরের মধ্যেই এদেশে যে গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় তাহার আবার নূতন করিয়া পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। ইহার গল্পগুলি মনোরম—শিশু-সাহিত্যের গৌরব। দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থের ভাষা স্থানে স্থানে পূর্ব্বাপেক্ষা সহজ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং বাঁধাইটুকুও চমৎকার হইয়াছে। অথচ মূল্য বাড়ে নাই।

টাক্‌ ডুমা ডুম্‌ ডুম্‌। প্রকাশক শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। এখানিও শিশুপাঠ্য গ্রন্থ। গ্রন্থকারের নাম অজ্ঞাত। শিশু-সাহিত্য রচনায় তিনি প্রভূত দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। বেগুন-ক্ষেতে শৃগালের নাসিকায় কাঁটা ফুটিয়া যাওয়ার পুরাতন চিরসুন্দর গল্পটি নাট্যাকারে পরিণত করা সহজ নহে। লেখকের প্রয়াস সার্থক হইয়াছে। সাতটি দৃশ্যে শিয়ালের অদৃষ্টের অপূর্ব্ব প্রতি-পর্য্যায় সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা সহজ এবং মিষ্ট—শিশুহৃদয় নিমেষেই তাহাতে আকৃষ্ট হইবে। শিশুগণ 'টাক্‌ ডুমা ডুম্‌ ডুম্‌' পাইয়া যে আনন্দে উৎফুল্ল হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আটখানি উৎকৃষ্ট চিত্রে সোনায় সোহাগা মিশিয়াছে। গ্রন্থের মূল্য চার আনা।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

বর্ষা।

ঐ দেখ গো আজ্‌কে আবার পাগ্‌লি জেগেছে,
ছাই মাখা তার মাথার জটায় আকাশ ঢেকেছে!
মলিন হাতে ছুঁয়েছে সে ছুঁয়েছে সব ঠাঁই।
পাগল মেয়ের জ্বালায় পরিচ্ছন্ন কিছুই নাই।

মাঠের পারে দাঁড়িয়েছিল ঈশান কোণেতে,
বিশাল শাখা পাতায় ঢাকা শালের বনেতে;
হঠাৎ হেসে দৌড়ে এসে শেয়ালের ঝোঁকে;
ভিজিয়ে দিলে ঘরমুখো ওই পায়রা গুলোকে।

বজ্র হাতের হাততালি সে বাজিয়ে হেসে চায়,
বুকের ভিতর রক্তধারা নাচিয়ে দিয়ে যায়;
দাঁত দেখিয়ে হাসে আবার ঝিক্‌ মিকিয়ে সে,
আকাশ জুড়ে চিক্‌ মিকিয়ে চিক্‌ মিকিয়ে রে!

ময়ূর বলে 'কে গো?' এযে আকুল করা রূপ,
ভেকেরা কয় 'নাহিক ভয়,' জগৎ রহে চুপ্‌;
পাগ্‌লি হাসে আপন মনে পাগ্‌লি কাঁদে হায়
চুমার মত চোখের ধারা পড়্‌ছে ধরার গায়।

কোন্‌ মোহিনীর ওড়্‌না সে আজ উড়িয়ে এনেছে,
পূবে হাওয়ায় ঘুরিয়ে আমার অঙ্গে হেনেছে;
চম্‌কে দেখি চক্ষে মুখে লেগেছে এক রাশ
ঘুম পাড়ানো কেয়ার রেণু, কদম ফুলের বাস।

বাদল্‌ হাওয়ায় আজ্‌কে আমার পাগ্‌লি মেতেছে;
ছিন্ন কাঁথা সূর্য্যশশীর সভায় পেতেছে।
আপন মনে গান গাহে সে নাই কিছু দৃক্‌পাত,
মুগ্ধ জগৎ, মৌন দিবা, সংজ্ঞাহারা রাত।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

শোকবার্ত্তা।

চন্দ্রনাথ বসু।

সাহিত্যসেবী শ্রদ্ধাস্পদ চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় গত ৬ই আষাঢ় পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলাসাহিত্য একটি পুরাতন প্রিয় সেবক হারাইল। চন্দ্রনাথ ১২৪১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। আপন প্রতিভাবলে যশের সহিত প্রবেশিকা হইতে আইন পরীক্ষায় পর্য্যন্ত উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কিছুদিন ওকালতী করেন।

চন্দ্রনাথ বসু

পরে সে কর্ম্ম ভাল না লাগায় অল্প দিনের জন্য ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটী করিয়া বেঙ্গল লাইব্রেরির অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বেঙ্গল লাইব্রেরিয়ান বলিয়াই সকলে তাঁহাকে জানিত।

বাংলা ভাষাকে ঘৃণা করা এবং বাঙালী হইয়া মাতৃভাষায় মূর্খ হওয়া সে যুগের একটা রোগ ছিল। চন্দ্রনাথও অর্দ্ধজীবন পর্য্যন্ত বাংলা জানিতেন না বা অনুশীলনও করিতেন না। ইংরাজিতে প্রবন্ধ লিখিতেন, ইংরাজি সাহিত্যের অনুশীলন করিতেন। পরে স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি মাতৃভাষার প্রতি মনোযোগ দান করেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই দেশের সাহিত্যক্ষেত্রে লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক হইয়া উঠেন। বঙ্গদর্শন ভারতী নব্যভারত প্রভৃতি মাসিক পত্রে তাঁহার যে সকল লেখা বাহির হইয়াছিল তাহাই ক্রমে ক্রমে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। শকুন্তলাতত্ত্ব, ত্রিধারা, সংযমশিক্ষা প্রভৃতি গ্রন্থগুলি স্বর্গীয় চন্দ্রনাথের স্মৃতিকে অমর করিয়া রাখিবে।

ভোলানাথ চন্দ্র।

ইঁহার নাম আজকালকার পাঠক পাঠিকারা হয়ত অনেকেই জানেন না। মৃত্যুকালে তাঁহার ৯২ বৎসর বয়স হইয়াছিল। তিনি স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও রামতনু লাহিড়ীর সমসাময়িক ছিলেন। তাঁহার নাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিতে ভারাক্রান্ত না হইলেও তাঁহার ন্যায় ইংরাজি ও পাশ্চাত্য সাহিত্যে পণ্ডিত খুব অল্প লোকই আমাদের মধ্যে দেখা যায়। তিনি যেমন পণ্ডিত ছিলেন তেমনি অক্লান্ত সাহিত্যসেবী ছিলেন। শৈশব হইতে মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত তিনি যশের বা খ্যাতির প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া নীরবে সরস্বতীর পূজা করিয়া গিয়াছেন। অর্থের প্রতিও তাঁহার লোভ ছিল না। কলিকাতার এক পুরাতন এটর্ণির অফিসে কর্ম্ম করিয়া যাহা পাইতেন তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকিতেন। তিনি রাজা দিগম্বর মিত্রের জীবনী এবং ভারতে ভ্রমণকাহিনী প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক ইংরাজি ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন। তাহাই বাঙ্গালীর নিকট তাঁহার স্মৃতিস্বরূপ বিরাজ করিবে।

চিত্রব্যাখ্যা।

রাজকুমার ও শক্তিময়ী—নদীতীরে। (ফুলের মালা)। শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার অঙ্কিত চিত্র হইতে।

বহুদিন পরে আবার বাল্যসখা গণেশদেবের সহিত বাল্যসখী শক্তিময়ীর সহসা দেখা হইয়াছে, তাঁহারা বিজন নদীতীরে আসিয়া বসিয়াছেন। এখন গণেশদেব যুবা পুরুষ—শক্তিময়ী যুবতী।

সূর্য্য অস্তে গিয়াছে, কিন্তু তখনো সন্ধ্যার ধূম্রবরণে পৃথিবী আচ্ছাদিত হয় নাই। পশ্চিম গগনে উজ্জ্বল লাল মেঘের স্তর জমিয়াছে—তাহার আভায় জলস্থল উজ্জ্বল লাল হইয়া

উঠিয়া—শক্তির মুখমণ্ডল অপূর্ব্ব শোভিত করিয়া তুলিয়াছে। সেই রূপমাধুর্য্যে রাজকুমার মুগ্ধ—আত্মবিস্মৃত, তাঁহার মনে হইতেছে,—নদীতীরের এই বনতল—তাঁহাদের বাল্যকালেরই সেই ক্রীড়া-উপবন, তিনি সেই চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালক, আর শক্তি তাঁহার বালিকাসখী, তাঁহার রাণী। • • • তিনি তখনকার দিনের মত শক্তিকে বাঁশি বাজাইয়া শুনাইতেছেন,—শক্তি তন্ময় হইয়া শুনিতেছে। কবিও তন্ময় হইয়া এই চিত্র আঁকিয়াছেন।

সুরদাস ও কৃষ্ণ—শ্রীযুক্ত নারায়ণপ্রসাদ অঙ্কিত চিত্রের প্রতিলিপি।

পরম কৃষ্ণভক্ত অন্ধ কবি সুরদাস একদিন বনের ভিতর একলা আপন মনে চলিয়াছেন, সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড খাল, আর দুই পা অগ্রসর হইলেই অগাধ জলে গিয়া পড়িবেন—রক্ষা করিবার কেহ নাই—এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া তাঁহার হাত ধরিলেন। সুরদাস তাঁহার স্পর্শ মাত্রেই বুঝিতে পারিলেন তাঁহার চিরজীবনের আরাধ্য দেবতা স্বয়ং সম্মুখে! তিনি ব্যাকুলভাবে তাঁহাকে ধরিতে গেলেন; কিন্তু কৃষ্ণ ধরা না দিয়া নির্ম্মমভাবে হাত ছিনাইয়া পলাইয়া গেলেন। কবি তখন ব্যথিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন;—

কর ছিটকায়ে যাত হো
দুর্ব্বল জান্‌কে মোয়।
হৃদয়'তে যব যাও গে
মর্দ্দ বাখানু তোয়॥

আমাকে দুর্ব্বল পেয়ে হাত ছিনিয়ে পালিয়ে গেলে—যদি হৃদয় থেকে পালাতে পার তবেই বুঝব তুমি মরদ!

উপরোক্ত শ্লোকটি অবলম্বন করিয়া এই চিত্রখানি অঙ্কিত।

কবি রজনীকান্ত।

স্বচ্ছতা ও মুক্তপ্রাণতা আজকালের কবিতায় বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া যে কথা উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে কিছু-না-কিছু সত্য নিহিত আছে। ভাবের স্পষ্টতা কবিতার প্রাণ—আধুনিক অজাতশ্মশ্রু বালক-কবির মঞ্জীর, নীল কুঞ্জ বীথি, মঞ্জুল প্রভৃতি কথার আড়ম্বরে ভাবের অন্তর্নিহিত খাঁটি ভাবটুকুও প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে। সেকালের—সেকালেই বা বলি কি করিয়া,—এইত সেদিনের কথা—কবি ঈশ্বর গুপ্ত, দীনবন্ধু প্রভৃতির কবিতাদি কূপমণ্ডূকশ্রেণীভুক্ত রুচি-বাগীশ পাঠককে আমোদ দিতে না পারিলেও, রসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই সে সকল কবিতায় ভাবের স্বচ্ছতা ও প্রাঞ্জলতা এবং মুক্তপ্রাণ কবির আন্তরিক উচ্ছ্বাস দেখিয়া মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারেন না! তাহা খাঁটি জিনিস—বিবিধ বর্ণচ্ছটার আলোকে তাহা পাঠকের চকিত বিভ্রমের সৃষ্টি না করিয়া একটা চিরন্তন সত্যের সহিত পরিচয় ঘটাইয়া দেয়

দেশের এই দুর্দ্দিনে কবি রজনীকান্ত রচিত "বাণী" ও "কল্যাণী" পাঠ করিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। রজনীকান্ত খাঁটি বাঙালী কবি। বহুদিন পরে এমন অনাড়ম্বর গীতিময় স্বচ্ছ সরল ভাবোন্মাদনা প্রণোদিত

পক্ষেই আমাদিগকে বিশিষ্ট আনন্দ দান করিয়াছে। ইহাতে পাশ্চাত্য বিভ্রমের লেশ নাই, বিলাতী এসেন্সের তীব্র গন্ধ নাই, ইহা যেন বাণীদেবীর চরণাঞ্জলির যোগ্য অনাঘ্রাত অনবদ্য নির্ম্মল পুষ্প!

শুধু ভাবের স্বচ্ছতা কেন, রজনীকান্তের ভাষা ও ছন্দের মধ্য দিয়া এমন একটি তরঙ্গ বহিয়া গিয়াছে যে পাঠকের চিত্ত নাচিয়া নাচিয়া ভাবের অনুসরণ করে! সংক্ষেপে রজনীকান্তের কাব্যের সহিত পাঠকের পরিচয়

সাধনে আমরা চেষ্টা করিব। এই স্বল্পপরিসর স্থানে রজনীকান্তের কাব্যের সম্যক আলোচনা অসম্ভব এবং বোধ হয় সে সময় এখনো আসে নাই। স্বদেশীর পুণ্যমন্ত্র যেদিন বাঙলার ঘাটমাঠ কুটীর প্রাসাদ মুখরিত করিয়া তুলিল বাঙলার কবি সেদিন গাহিলেন,

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নেরে ভাই--"

"তাই ভালো মোদের
মায়ের ঘরের শুধু ভাত,
মায়ের ঘরের ঘি সৈন্ধব,
মার বাগানের কলার পাত।

বাঙালীর প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল! ঠিক কথা! এমন খাঁটি প্রাণের কথা শাস্ত্রে নাই—কোথাও নাই! প্রাণের সুপ্ত তারে যেন ঘা লাগিল—সমস্বরে তার বাজিয়া উঠিল! এই প্রাণের গান প্রথম গাহিয়াছিলেন, কবি শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সেন।

শুধু কি প্রাণের গান গাহিয়াই কবি নীরব? না! মাতৃপূজার যোগ্য অর্ঘ্য তিনি ভারে ভারে বহন করিয়া আনিয়াছেন! করুণ-কণ্ঠে মাতৃনাম গাহিয়া তিনি মাতৃপূজায় বহু ভক্তকে দীক্ষিত করিয়াছেন—তাহাতে জ্বালা নাই, ঈর্ষা নাই, সে শুধু কবি হৃদয়ের "ফুল-চন্দন বন্দন-উপহার!" সাধকের সাধনার উপহার! সাধকের সাধনার অনুরূপ! ধ্যানের তুল্য! অভিসারিকার চঞ্চল চরণের নূপুর রব সে ধ্যানের বিঘ্ন সম্পাদন করে নাই!

তারপর হাসির গান। রজনীকান্ত হাসির গানেও অপূর্ব্ব প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেন। কেহ কেহ রজনীকান্তকে "রাজসাহীর ডি, এল, রায়" বলেন—ইহাতে রজনীকান্তের প্রতি অবিচার করা হয়! কাট্‌স্ কাট্‌স্, সেলি সেলি—যেমনি রজনীকান্ত ও দ্বিজেন্দ্র লালেও প্রভেদ [illegible] রজনীকান্তের হাসির গান অনুকরণ নহে, অনুবাদও নহে—তাহাতে বিলাতীর সংস্পর্শ নাই—তাহা খাঁটি স্বদেশী! রজনীকান্তের মিষ্ট স্বরটুকু যে তাঁহার নিজেরই তাহা সহজেই বুঝা যায়।

বাণীর কবিতাগুলি কেবল কবিতা নহে—সেগুলি গান। কবি স্বয়ং তাহাতে সুর সংযোগ করিয়া দিয়াছেন। অনেকগুলি গান আমাদিগের শুনিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল তাহা হইতেই বলিতে পারি গানগুলি সজীব—ভাব যেন মূর্ত্তি ধরিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে।

কবি গাহিয়াছেন,—

"তোমারি দেওয়া প্রাণে, তোমারি দেওয়া দুখ
তোমারি দেওয়া বুকে, তোমারি অনুভব।
তোমারি দুনয়নে তোমারি শোকবারি
তোমারি ব্যাকুলতা তোমারি হা হা রব।"

* * * *

আমিও তোমারি গো তোমারি সকলি ত
জানিয়ে জানে না এ মোহ-হত চিত
আমারি বলে কেন ভ্রান্তি হল হেন
ভাঙ্গ এ অহমিকা মিথ্যা গৌরব।"

বিশ্বরাজের সম্মুখে কুণ্ঠিত কবির আত্ম নিবেদন,—

তুমি কি মহান বিভু আমি মলিন ক্ষুদ্র,
আমি পঙ্কিল সলিলবিন্দু তুমি যে সুধাসমুদ্র!
তবু তুমি মোরে ভালবাস, ডাকিলে হৃদয়ে এস
তাই এত অযোগ্যের লাজ!"

কি সুন্দর, কি মর্ম্মস্পর্শী! বিশ্বজগতের ক্ষুদ্রতা সেই বিশ্বরাজের মহিমার বিরাটতারই অংশ বিশেষ। কবির সুনিপুণ ইঙ্গিত—

"তোর প্রেমনির্ঝরের একটি বুদ্বুদ লয়ে
ফেলে দিলে প্রেমধারা চলিল অশ্রান্ত বয়ে,
অমান জননী করিল স্নেহ, সতীপ্রেমে পূর্ণ গেহ
গ্রহ ছুটে এ উহার পাছ!"

এই কয় ছত্র দর্শনশাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বের কি সহজ বিশ্লেষণ! রজনীকান্তের "বিশ্ব-সঙ্গীত" ভাবে-ভাষায় এক বিচিত্র সৃষ্টি!

সিন্ধুর গম্ভীর গর্জ্জনটুকু অবধি যেন সুরের মধ্যে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে!

সিন্ধু-সঙ্গীত শুনিয়া কবি বায়রণকে মনে পড়ে! ভাবে ভাষায় তেমনি তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে!

'বাণী'তে বিশ্বরাজের সন্ধান-রত কবির কাতর চিত্তের পরিচয় পাওয়া যায়। "কল্যাণী"-তে সে পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিশ্বরাজ এখন আর দূরে নহেন—কুহেলিকার মধ্যে তিনি নাই, তিনি এখন মনে সচ্চিদানন্দ-স্বরূপমূর্ত্তিতে বিরাজমান! এই ঐশীভাব সনাতন ধর্ম্মের ছায়াপাতে দিব্য স্নিগ্ধ মনোরম। 'বাণী'তে তিনি গাহিয়াছেন,—

"(মম) সুপ্ত হৃদয় করি নয়ন নিমীলন,
না করিল তব করুণা অনুশীলন;
মোহ ঘিরিল মোরে রহি চির ঘুমঘোরে
ব্যর্থজীবন গেল ফুরাইয়ে হায়।"

'কল্যাণী'তে কবি তাঁহার হারানিধি ফিরিয়া পাইয়াছেন—তাঁহার প্রাণভরা তৃষা ব্যাকুলতার শান্তি হইয়াছে—তাই 'কল্যাণী'তে বিভূসৃষ্টির দর্শনে মুগ্ধ কবি গাহিয়াছেন,

"তুমি সুন্দর তাই তোমারি বিশ্ব
সুন্দর শোভাময়,
তুমি উজ্জ্বল তাই নিখিল দৃশ্য-
নন্দন প্রভাময়!
তুমি অমৃত বারিধি হরি হে,
তাই তোমারি ভুবন ভরি হে—
পূর্ণচন্দ্রে পুষ্পগন্ধে সুধার লহরী বয়;
ঝরে সুধাজল ধরে পুষ্পফল পিয়াসা ক্ষুধা না রয়।
তুমি সদয় শক্তিমূল হে
তাহে ... কি বিপুল হে!
সে যাহার কাজ নীরবে সাধিছে
উপদেশ নাহি লয়;
নাহি ...-ভঙ্গ পূর্ণ প্রতি অঙ্গ
নাহি বৃদ্ধি অপচয়!
...নি প্রেমের চিরনিবাস হে,
...ই প্রাণে প্রাণে প্রেমপাশ হে,
তাই ...নবতায় বিটাপ-লতায়
মিলি প্রেম কথা কয়;
জননীর স্নেহ, সতীর প্রণয় গাহে তব
প্রেমময়!"

এই গানে আমাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা মধুর লাগিয়াছে 'জননীর স্নেহ,' 'সতীর প্রণয়'! এই দুইটিই প্রাচ্য কবির বিশেষত্ব! এ বিশ্বরাজকে বুঝিতে কষ্ট হয় না! ইনি তার্কিকের কুতর্কজালের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন নহেন, বিজ্ঞ দার্শনিকের পুঁথির পৃষ্ঠায় আবৃত নহেন, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ধূমে অস্পষ্ট নহেন, সারা বিশ্ববাসীর হৃদয়ই ইঁহার পূজার মন্দির!

ভাবের গাম্ভীর্য্যে, ভাষার সৌন্দর্য্যে ও সহজ স্পষ্ট অভিব্যক্তিতে 'বাণী' ও 'কল্যাণী' রবীন্দ্রনাথের "নৈবেদ্য" গ্রন্থের অনুরূপ। তবে 'কল্যাণী'তে আর একটু বিশেষত্ব আছে, সেটি ইহার সহজ সরল সুর—ইহা পড়িলে প্রাচীনকালের বাঙালীর রামপ্রসাদকে বারবার মনে পড়ে!

'রহস্যে'ও রজনীকান্তের অসামান্য প্রতিভা! মাঝে মাঝে হাসি ও অশ্রুতে মিশিয়া এমন সৌন্দর্য্য বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে যে তাহা উপভোগ্য। হাস্যের সহিত নয়নে অশ্রুতরঙ্গ উছলিত হইয়া উঠে। রজনীকান্ত গাহিয়াছেন,

"আছত বেশ মনের সুখে!
আঁধারে কি না কর, আলোয় বেড়াও
বুকটি ঠুকে!
দিয়ে লোকের মাথায় বাড়ি,
আনলে টাকা গাড়ী গাড়ী
প্রেয়সীর গয়না সাড়ী হলো,
গেল লেঠা চুকে!
সমাজের নাইক মাথা কেউ ত আর
দেয় না বাধা,
সবি টের পাবে দাদা সে রাখছে
বেবাক টুকে!

* * *

"এর মজা বুঝবে, সেদিন, যেদিন
যাবে সিঙে ফুঁকে।"

'পুরাতত্ত্ববিৎ' 'বুড়ার বুদ্ধ' "মৌতাত"

"খিচুড়ী" "উকিল" "কন্যাদায়" প্রভৃতি কবিতা গুলিতে উজ্জ্বল হাস্যরস হীরকখণ্ডের ন্যায় দেদীপ্যমান।

আমরা সর্ব্বাপেক্ষা হাসিয়াছি রজনীবাবুর "ঔদরিকে"র কথায়! বেচারা ভাবিতেছিল, 'পানতোয়া যদি কুমড়ার মত হত, ছানাবড়া তালের মত আর তরমুজ রসগোল্লা হত, তাহা হইলে ক্ষেতে কুঁড়ে বেঁধে পাহারা দিতাম, 'সারারাত তামাক খেতাম আর পাহারা দিতাম, খেঁকশিয়াল আর চোর তাড়াতাম, পাহারা দিতাম।—আরো বলিতেছে,

যেমন সরোবর মাঝে কমলের বনে
শত শত পদ্মপাত,
তেমনি ক্ষীর সরসীতে শত শত লুচি
যদি রেখে দিত ধাতা—"

এবং "যদি বিলিতি কুমড়ো হত লেডিকেনি
পটোলের মত পুলি,
আর পায়েসের গঙ্গা বয়ে যেত, পান
কর্ত্তাম দুহাতে তুলি।"

কিন্তু ইহাতেও বেচারার স্বস্তি নাই—তাহার প্রধান ভাবনা,—

"সকলিত হবে বিজ্ঞানের বলে,
নাহি অসম্ভব কর্ম্ম,
শুধু এই খেদ, কান্ত, আগে মরে যাবে
(আর) হবে না মানব জন্ম।
(আর খেতে পাবে না, কান্ত আর খেতে
পাবে না;
° ° শেয়াল কি কুক্কুর হবে আর খেতে
পাবে না;
আর সবাই খাবে গো, তাকিয়ে দেখবে
খেতে পাবে না!
ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইবে খেতে
পাবে না;
সবাই তাড়া তড়ো করে খেদিয়ে দেবে গো
খেতে পাবে না)

সুরলয়ে এই গানে হাস্যরস চরম উথলিয়া উঠে!

কবির নূতন ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থ "অমৃত" সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকখানি সার্থকনামা। ইহার কবিতাগুলি প্রকৃতই অমৃতের ন্যায় মধুর উপাদেয়।

নিদারুণ রোগশয্যায় শায়িত হইয়া এগুলি রচনা করিয়াছেন—তাই বুঝি সংসারনির্লিপ্ত নির্ব্বিকার কবিত্ব-মহিমায় ইহা এমন সমুজ্জ্বল।

গ্রন্থখানি শিশুদিগের জন্য লিখিত। কিন্তু কেবল বালকগণ কেন—আমরা অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিতে পারি,—আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেই এই অমৃত পানে পরিতৃপ্ত হইবেন। প্রাচ্যভাবই "অমৃতে"র বিশেষত্ব। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

দাম্ভিকের পরাজয়।

গিরি কহে, "সিন্ধু তব বিশাল শরীর,
আমার চরণে কেন, লুটাইছ শির?
এ অভয় পদে যদি লয়েছ শরণ
কি প্রার্থনা, কহ আমি করিব পূরণ।
সাগর হাসিয়া কহে—"আমি রত্নাকর
আমার অভাব কিছু নাহি গিরিবর;
তব পিতৃপিতামহ ডুবেছে এ নীরে—
সেই বার্ত্তা দিতে আমি আসি ঘুরে ফিরে!

প্রকৃত পক্ষে একটি কবিতা তুলিয়া তৃপ্তি হয় না; ইহার প্রত্যেক কবিতা—এক একটি ক্ষুদ্র হীরক খণ্ড; কোনটি রাখিয়া কোনটি গ্রহণ করিব—তাহা যেন বুঝিয়া উঠা যায় না; এইরূপ ৪০টি কবিতা মণিকাহারে গ্রন্থখানি গ্রথিত। আশাকরি বঙ্গবাসীর ঘরে ঘরে ইহা সমাদরে রক্ষিত হইবে।

সংক্ষেপত আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি কাব্যের মধ্যে ভক্তি করুণ ও হাস্যরসের এমন অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ বাঙ্গালা সাহিত্যে বিরল! আমরা কবির নূতন কাব্যগ্রন্থ "আনন্দময়ী" পাঠের জন্য উদ্গ্রীব হইয়া রহিলাম।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৪৪, নং বালিগঞ্জ রোড হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয়

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু কর্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে

পরিসমাপ্তি।

ওগো আমার এই জীবনের পরিপূর্ণতা
মরণ, আমার মরণ, তুমি কও আমারে কথা !
সারা জনম তোমার লাগি
প্রতিদিন যে আছি জাগি,
তোমার তরে বহে বেড়াই
দুঃখ সুখের ব্যথা ;
মরণ, আমার মরণ, তুমি
কও আমারে কথা।
যা পেয়েছি, যা হয়েছি,
যা কিছু মোর আশা
না জেনে ধায় তোমার পানে
সকল ভালবাসা।
মিলন হবে আমার সাথে,
একটি শুভ দৃষ্টিপাতে
জীবনবধূ হবে তোমার
নিত্য অনুগতা,
মরণ, আমার মরণ, তুমি
কও আমারে কথা।
বরণমালা গাঁথা আছে
আমার চিত্ত মাঝে,
কবে নীরব হাস্যমুখে
আস্‌বে বরের সাজে !
সেদিন আমার রবেনা ঘর,
কেইবা আপন, কেইবা অপর,
বিজন রাতে পতির সাথে
মিল্‌বে পতিব্রতা।
মরণ, আমার মরণ, তুমি
কও আমারে কথা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রসভঙ্গ।

১

রমেন্দ্রনাথ কবি না হইলেও কবিতারসজ্ঞ বটে! তাহার ঘরের পরিচ্ছন্ন আলমারিগুলি নানাবিধ কবিতাপুস্তকে পরিপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের "মানসী", "খেয়া" হইতে আরম্ভ করিয়া ভবিষ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি মকরন্দ ঘোষের "পট্টাম্বরা," "অট্টহাসি" অবধিও বাদ পড়ে নাই!

তরুণ বয়স ও স্বাস্থ্য-ধন-জনের অধিকারী হইয়া এবং কলিকাতা সহরে বাস করিয়াও, নগর-সুলভ উচ্ছৃঙ্খল আমোদ-বিলাসে ভাবপ্রবণ রমেন্দ্রনাথের কখনো অনুরাগ দেখা যায় নাই! তাহার উপর, আর একটি অমূল্য সামগ্রী বিধাতা তাহাকে দান করিয়া ধন্য করিয়াছিলেন,—সেটি তাহার শিক্ষিতা সুন্দরী স্ত্রী, মায়া!

আজ পাঁচ বৎসর রমেন্দ্রনাথের বিবাহ হইয়াছে।

মায়াকে সে ঠিক আপনার মনের মতই গড়িয়া তুলিয়াছিল। প্রথম যেদিন মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় 'শ্রীমতী মায়াদেবী'-স্বাক্ষরিত কবিতা প্রকাশিত হইল, সেদিন রমেন্দ্রনাথ স্ত্রীকে বাহুবন্ধনে নিপীড়িত করিয়া কবির সুরে গাহিয়াছিল, "আমার পরাণ যাহা চায়, তুমি তাই, তুমি তাই গো!"

পুরাতন ডেস্ক খুঁজিলে বিস্তর কাগজ-পত্র রমেন্দ্রনাথের কবিযশোলাভের বিফল প্রয়াসের প্রচুর সাক্ষ্য প্রদান যে না করে, তাহা নহে! এমন কি, বিবাহের অব্যবহিত পূর্ব্বেই, পত্র লিখিবার সময়, রবীন্দ্রনাথের কবিতা ভাঙিয়া-চুরিয়া সে আপনার বিকচোন্মুখী কবি প্রতিভার পরিচয়-প্রদানের চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু যেদিন সে মায়ার বাক্সে, তাহার রচিত "পাখীর প্রতি," ও "আকাশের তারা" প্রভৃতি কবিতার দর্শন পাইল, সেইদিন হইতে, নিতান্ত বুদ্ধিমানের মত, কবিতার লেখক হইবার বাঞ্ছা পরিত্যাগ করিয়া সে ভক্ত পাঠক মাত্র হইয়া উঠিল! কবিতা-রচনার স্বত্বটুকু স্ত্রীর নামেই সে দানপত্র লিখিয়া দিল!

কিন্তু এত কথা বলিবার আমাদিগের বিশেষ প্রয়োজন দেখি না। তবে এক পরিপূর্ণ বর্ষার দিনে রমেন্দ্রনাথের এই কাব্যরসজ্ঞতার মাত্রা অতিরিক্ত বাড়িয়া উঠিয়াছিল। সেই কথাই এখন আমরা বলিতে বসিয়াছি!

২

শ্রাবণ মাসের শেষ! সারাদিন মেঘ আর বৃষ্টি! মুহূর্ত্ত বিরাম নাই! রৌদ্র যেন চিরকালের জন্য দেশত্যাগ করিয়াছে! দর্দ্দুরের নিরবচ্ছিন্ন সঘন রব,—চারিধারে একটা নিরানন্দ ভাব জাগাইয়া তুলিতেছিল!

দিবা দ্বিপ্রহর! আপনার কক্ষে খাটে শুইয়া রমেন্দ্রনাথ 'কাব্যগ্রন্থ' পাঠ করিতেছিল। মায়া নিকটে নাই! ভগ্নীর বিবাহোপলক্ষে সে চাঁপাতলায় পিত্রালয়ে গিয়াছিল। ফিরিতে এখনো দুই-তিন দিন বিলম্ব হইবে!

কাব্য পড়িতে পড়িতে রমেন্দ্রনাথের চিত্ত উদাস হইয়া উঠিল! দক্ষিণের জানালা খোলা ছিল। তাহারি মধ্য দিয়া সে মাঝে-মাঝে আকাশের পানে চাহিতেছিল। ঘরের নীচে ছোট বাগান। বাগানের কোণে একটা কদম

ফুলের গাছ, অজস্র ফুলে ভরিয়া গিয়াছে; তাহারি মিষ্ট গন্ধ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল। নোনাগাছে বসিয়া একটা কাক নিঝুম ভাবে ভিজিতেছিল! পাতার ফাঁক দিয়া বৃষ্টির ফোঁটা তার কালো পালকের উপর পড়িতেছিল—কাকটা মাঝে-মাঝে চক্ষু মুদিতেছিল—আর কখনো-বা সিক্ত শাখায় চঞ্চু ঘসিতেছিল। চারিধারে কোন সাড়া-শব্দ নাই, শুধু বৃষ্টির একটা ঝমঝম শব্দ! নিরীহ কাকটাকে অবলম্বন করিয়াই রমেন্দ্রনাথের কল্পনা ধীরে ধীরে আসরে নামিল! সে ভাবিল, আহা বেচারা পাখী! নিতান্ত নিঃসঙ্গ, আশ্রয়হীন! কোথায় তার গৃহ, কোথায় তার সঙ্গীর দল, কোথায় তার প্রিয়া, আর কোথায়ই বা সে! তাহারি মত নিঃসঙ্গ, অসহায় অবস্থা আজ রমেন্দ্রনাথের! বিশ্বের বিরহব্যথা আজ এমন বর্ষা পাইয়া তাহার হৃদয় ঐ সুদূর কালো মেঘের মতই ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে! উঠিয়া জানালার ধারে আসিয়া রমেন্দ্রনাথ দাঁড়াইল! ভাবিল, একবার চাঁপাতলা ঘুরিয়া আসি! কিন্তু মায়া বারণ করিয়াছে। মায়া লিখিয়াছে,—চিঠিখানি তখনো 'কাব্যগ্রন্থের' মধ্যে রক্ষিত ছিল—রমেন্দ্রনাথ আবার চিঠি পড়িল,—অন্যান্য কথার পর মায়া লিখিয়াছে,—"তুমি চিঠিতে যা-তা অমন করে লিখোনো—তোমার চিঠি এলে সকলে এখানে বড় টানাটানি করে, বিশেষ সেজদিদি। তার কাছে ছাড়ান্ পাবার জো নাই! আর তুমি এখানে বেড়াতে আসবে কি না আমার মত চেয়েছ তাই লিখছি—তুমি এসো না—আর ত তিন দিন পরেই আমি যাব! এমনি ত তুমি এদিকে বড় একটা আসনা, বিয়ের সময় যা দুদিন এসেছিলে, তার পর আবার-এখন যদি আস ত, সবাই ঠাট্টা করবে—বলবে, মায়া আছে বলেই এত ঘন-ঘন আসে। লক্ষীটি তোমার পায়ে পড়ি, তুমি এলে আমি ভারী লজ্জা পাব।' ইত্যাদি!

রমেন্দ্রনাথের বুকটার ভিতর কে যেন পাথরের ঘা মারিতেছিল। পকেটে চিঠি রাখিয়া সে বাহিরের দিকে চাহিল! নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর, চিঠিতে দুইটা প্রাণের কথা বলিয়া, তৃপ্তি পাইবার চেষ্টা করি, তাহাতেও তোমার লজ্জা! একবার গিয়া একটা চকিত চাহনিমাত্র আকাঙ্ক্ষা করি, তাহাতেও তোমার আপত্তি! কেন এমন কর, মায়া! উদ্গত, উন্মুখ, পিয়াসী প্রাণীকে নিরাশার শাসনে এমন অযথা ব্যথিত কর! বেশী নয়, দীর্ঘ নয়, শুধু এতটুকু মৃদু স্পর্শ! ওগো প্রিয়া, ওগো চিরপ্রিয়া, তাহা হইতেও বঞ্চিত করিয়া তুমি কি সুখ পাও! একটা বীণা যেমন নিজে একখণ্ড কাষ্ঠ ও তারের সমষ্টিমাত্র, বাদকের কর-স্পর্শে কেমন বিচিত্র সঙ্গীতে সে মুখরিত হইয়া উঠে, রমেন্দ্রনাথ ভাবিতেছিল সে-ও যে ঠিক তেমনি! মায়ার বিরহে সে-ও তেমনি অচেতন জড়মাত্র!

এমন কাজল-ঘন মেঘ, এমন সীমাহীন স্বপ্নময়তা,—প্রাণটাকে যে কিছুতেই বাঁধিয়া রাখা যায় না! রমেন্দ্রনাথ কাব্য রাখিয়া হার্মোনিয়মের পাশে গিয়া বসিল—গান ধরিল,—

"মম যৌবন-নিকুঞ্জে গাহে পাখী,
সখি, জাগো জাগো"—

ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "প্রিয়বাবু এসেছেন!"

রমেন্দ্রনাথ চমকিয়া উঠিল, "প্রিয়বাবু! এই বৃষ্টিতে!"

প্রিয় রমেন্দ্রনাথের বন্ধু। উভয়ে এক সঙ্গে কলেজে পড়িত। ল পাশ করিয়া আজ তিন বৎসর সে হাইকোর্টে মিথ্যা যাতায়াত করিতেছে!

রমেন্দ্র বাহিরে আসিয়া কহিল, "কিহে ব্যাপার কি? এই বৃষ্টিতে! কোর্টে যাওনি?"

প্রিয় কহিল, "ক্ষেপেছ! এই বর্ষায় কোর্ট! আর, তা ছাড়া একটু কাজ আছে!"

রমেন্দ্র কহিল, "কি কাজ?"

প্রিয় কহিল, "তোমাকে একবার আমার সঙ্গে বারাশত যেতে হবে!"

রমেন্দ্র কহিল, "অপরাধ?"

প্রিয় কহিল, "আরে—এক ফ্যাসাদে পড়েছি, ভাই! আমার ঐ পিসতুতো ভাইটার বিয়ের জন্য পাত্রী দেখতে! তাঁরা আবার চলে যাবেন, পিসিমারও বড্ড জেদ—তাই, একলা কোথায় যাব, এই বৃষ্টিতে! তোমাকে পাকড়াতে এসেছি, নাও, নাও, আর দেরী নয়—ধড়াচুড়ো পরে নাও"—

রমেন্দ্র কহিল, "[illegible] দাঁড়াও! এই বৃষ্টি!"

"আর দাঁড়াবার সময় নাই" বলিয়া প্রিয় তাড়াতাড়ি ঘড়ি খুলিয়া [illegible]লিল, "এই ত একটা বেজে পঁচিশ মিনিট হয়েছে! দুটোয় ট্রেণ! আমার রথ প্রস্তুত। তুমি শুধু কাপড়টা ছেড়ে চট্ করে এসো! তোমায় প্রথম রাত্রেই পৌঁছে দিয়ে যাব! আর হার ম্যাজেষ্টিও ত এখানে নেই হে! আহা, এমন বর্ষাটা, দাদা, মাঠে মারা গেল! যাও, যাও,—ওরে ভুলো, বাবুর জামা [illegible] ঠিক করে দে, শীগগির!"

রমেন্দ্রনাথ ট্রেণে চড়িয়া হাঁফ ছাড়িল। এই যে লাইনের দুই ধারে মাঠের পর মাঠ, দূরে কোথাও গ্রামের সীমা নিমেষের জন্য জাগিয়া উঠিয়াছে,—এই অনাড়ম্বর উদার সৌন্দর্য্য, বর্ষায় সবুজ প্রাচুর্য্যের এমন শোভা—এই চিরপরিচিতা পল্লীশ্রী,—নয়নে কখনো ইহা পুরাতন হইবার নহে!

বিজন মাঠের প্রান্তে কুটির দেখিয়া রমেন্দ্র কহিল, "বাঃ, কি সুন্দর!"

প্রিয় কহিল, "ঐ ট্রেণ থেকেই দেখতে বেশ! ওখানে বাস করতে হলে, ব্যাপার ভীষণ হয়ে উঠবে! না আছে, কাছে বাজার, না ডাক্তার—"

রমেন্দ্র কহিল, "তোমরা অতি হতভাগ্য! এমন সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে পারো না! কেবল ডাক্তার আর বাজারের ভাবনাতেই আকুল হয়ে ওঠ! কবি কি বলেছেন, জানো,

"নিরালা বনের মাঝে, তৃণগুল্ম যেথা রাজে,
রচিব কুটির, প্রিয়ে, তোমারি লাগিয়া,
একান্তে দুজনে রব, যত কথা সবি কব,
বিশ্বেরে রাখিব দূরে, দুয়ার রুধিয়া।"

প্রিয় কহিল, "তাহলে প্রিয়াকে নিয়ে একবার কবিত্ব-বিকাশের অবসরটুকু আয়ত্ত কর, কবিবর!"

প্রিয় ঠাট্টা করিয়া কথাটা বলিল বটে, কিন্তু রমেন্দ্রের মাথায় বেশ একটি সুন্দর মতলব জাগিয়া উঠিল।

৩

মায়া ঘরে বসিয়া কবিতা নকল করিতেছিল। রমেন্দ্র আসিয়া কহিল, "আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে, মায়া।"

মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া মায়া কহিল, "কি ?"

রমেন্দ্র ইজি চেয়ারে বসিয়া পড়িল,কহিল, "কলকাতার এ একঘেয়ে জীবন অসহ্য হয়ে পড়েছে ! তাই—"

মায়া হাসিয়া নিকটে আসিল, কহিল, "তাই, কি করতে হবে, শুনি !"

রমেন্দ্র কহিল, "একটু পল্লীবাসের আয়োজন স্থির করেছি—!"

মায়া বিস্মিতভাবে কহিল, "সে আবার কিগো ?"

রমেন্দ্র কহিল, "বজ্‌বজ্‌ যাবার পথে সন্তোষপুর ষ্টেশন। সেখানে আমার এক বন্ধুর বাগানবাড়ী আছে,—যখন কলেজে পড়তুম, তখন দু-একবার গিয়েছি,—সেখানে চল, দু-চার দিন বাস করে আসা যাক ! শুধু তুমি আর আমি, সঙ্গে আর কেউ নয় !"

মায়া কহিল, "খাওয়া-দাওয়ার উপায় ? কাব্যে ত পেট ভরবে না !"

রমেন্দ্র কহিল, "ঐ জন্যই ত তোমাদের কোন উন্নতি হয় না ! যেখানে যাবে, অমনি সাত-শ অক্ষৌহিণী সঙ্গে নিতে হবে ! কেন, নিজেরা দুদিন আর খাওয়ার বন্দোবস্ত করতে পারব না ?"

মায়া কহিল, "তার পর বিদেশ-বিভুঁই, পাঁড়া গাঁ হোক, যাই হোক্‌, ফাই-ফরমাসটার জন্যও ত একটা লোক নিয়ে যেতে হবে !"

রমেন্দ্র কহিল, "কোন দরকার নাই—তাদের মালী সেখানে আছে—সব সে ঠিক করে দেবে !"

মায়া কহিল, "বাঃ ! তুমি সব ঠিক করে ফেলেছ—আমার জন্য আর কিছু বাকী রাখনি !"

রমেন্দ্র কহিল, "যথেষ্টই রেখেছি—এখন, একটা ফর্দ্দ করে ফেল দেখি,এক সপ্তাহ অন্ততঃ থাকব—তার মত ফর্দ্দ করলেই হবে !"

মায়ারও মতলবখানা মন্দ লাগিতেছিল না ! তাহা হইলে, কিন্তু বেশ হয় ! সেই ছেলেবেলা, কবে, মায়া একবার পল্লীগ্রামে, তার পিসিমার বাড়ী গিয়াছিল,—কত বাগান, পুষ্করিণী, খোলা জায়গা, পল্লীরমণীগণের কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি ! চারিধারে হাসি-আনন্দ যেন ঠিকরিয়া পড়িতেছে ! পরস্পরের মধ্যে কি সে এক গভীর প্রীতির বন্ধন,—কলিকাতায় যাহা একান্ত বিরল ! পাখীর বিচিত্র কলরবে নিত্য-মুখরিত ছায়া-নিবিড় ঘাটে রমণীগণের স্বচ্ছন্দ নিরাপদ মজলিস, সে যেন আর এক রাজ্য, সম্পূর্ণ এক নূতন জিনিস ! অবরোধের লৌহকপাট কোন জায়গায় চাপিয়া ধরে নাই ; দিব্য মুক্ত স্বাধীনতার বিশাল উদার সুখ ! কি সুন্দর !

স্বামীস্ত্রীতে মিলিয়া তখনি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের তালিকা করিয়া ফেলিল। বিছানা, ষ্টোভ, হরিকেন লণ্ঠন, বাতি, কুইনিন, চায়ের সরঞ্জাম, কণ্ডেন্সড্‌ মিল্ক, সোডা, লেমনেড, সাবান, অল্প পরিমাণে মসলা, চাল, ডাল, ঘৃত, লবণ, জলের কুঁজা, গেলাস প্রভৃতি অর্থাৎ যাহা না লইলে নয়, এমন জিনিসমাত্র ! থালা প্রভৃতি বহিবার কোন প্রয়োজন নাই, সেখানে কদলীপত্র নিশ্চয়ই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় !

প্রিয় শুনিয়া বারণ করিল, "এ সময়টা

ম্যালেরিয়া ধরে হে, ও বাই ছাড়ো।" কিন্তু রমেন্দ্র হটিবার পাত্র নহে! বুধবার যাইবার দিনস্থির হইল।

৪

বিছানাপত্র বাঁধিয়া ভৃত্য ষ্টেশনে চলিয়া গেল। সেগুলি পূর্ব্বাহ্নেই পাঠাইয়া দেওয়া হইবে! রমেন্দ্র ও মায়া ৩-৪০ মিনিটের গাড়ীতে রওনা হইবে!

রমেন্দ্র ও মায়া যখন বেলিয়াঘাটা ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল, তখন বজবজের ট্রেণ ছাড়িয়া গিয়াছে। রেলোয়ে ও কলিকাতার সময় লইয়া রমেন্দ্র গোল বাধাইয়া বসিয়াছিল। পরবর্ত্তী ট্রেণ ছাড়িবে, ৫-৫৪ মিনিটে। চারিধারে তখন মেঘ জমিতেছিল। এতক্ষণ ধরিয়া ষ্টেশনে বসিয়া থাকাও ত সহজ ব্যাপার নহে!

মায়া বলিল, "প্রথমেই যখন বাধা পড়ল, তখন বাড়ী ফিরে চল, বাবু, আর কাজ নেই সন্তোষপুর গিয়ে!"

রমেন্দ্র কহিল, "বাড়ী থেকে যখন বেরিয়েছি, তখন যাবই!"

পাঁচটা চুয়ান্নর গাড়ীও বেলিয়াঘাটা ছাড়িল, আর মাথার উপর আকাশও যেন ভাঙিয়া পড়িল! কি সে ভয়ঙ্কর বৃষ্টি! মেঘে চারিদিক অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল। সেকেণ্ড ক্লাশের এক কক্ষেই রমেন্দ্র ও মায়া উভয়ে বসিয়াছিল। বাহিরে চারিদিক দেখিতে মন্দ নয়! দুইধারে বড় বড় হোগলা-বন! মায়া এই প্রথম হোগলা দেখিল! এই হোগলা! কাজকর্ম্মের সময়, ইহাদ্বারাই ছাদে ম্যারাপ বাঁধা হয়! বাঃ, বেশ ত! কালিঘাট ও মাজেরহাট ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী স্থানটুকু মায়ার বেশ লাগিল।

রেলোয়ে লাইনের পাশ দিয়া খাল বহিয়া গিয়াছে, খালের উভয় পার্শ্বে স্তূপাকার মাটি কাটিয়া জমা করিয়াছে! মায়া এ দৃশ্য-বৈচিত্র্যে বৃষ্টির কথা ভুলিয়া গিয়াছিল।

গাড়ী যখন মাজেরহাট ষ্টেশন ছাড়িল, তখন বৃষ্টি আরো চাপিয়া আসিল। গাড়ীর ছাদ ভেদ করিয়া বৃষ্টির ফোঁটা পড়িতে লাগিল। ষ্টোভ, লণ্ঠন কোন্‌টাই বা সামলাইয়া রাখিবে? একদিককার সাশি এমন আঁট হইয়াছিল যে, তাহা বৃথা টানাটানি করিতে গিয়া রমেন্দ্র ভিজিয়া সারা হইল। মায়া কহিল, "আমি তখনি বলেছিলুম—এই বর্ষায় বেরিয়ো না!"

রমেন্দ্র কহিল, "কেন, এ মন্দ কি? একঘেয়ে জীবনের চেয়ে ভালো নয় কি?"

কথাটা মুখে সে বলিল বটে, কিন্তু তাহারো মনে ভয় হইতেছিল! এই বর্ষার রাত্রি—অপরিচিত স্থানে কি করিয়া কাটিবে! কিন্তু ফিরিবার মুখ ত, সে রাখে নাই! বেলিয়াঘাটা হইতে মায়ার কথায়, যদি সে ফিরিত! কুগ্রহ আর কাহাকে বলে!

ট্রেণ যখন সন্তোষপুরে থামিল, তখনো বৃষ্টির বিরাম নাই! রমেন্দ্র ভাবিতেছিল, বরাবর বজবজ গিয়া এই ট্রেণেই আবার সে ফিরিবে! কিন্তু সন্তোষপুর পৌঁছিবামাত্র দ্বিতীয় চিন্তা না করিয়া সে মায়ার হাত ধরিয়া নামিয়া পড়িল। অতিকষ্টে মোটপত্র নামাইয়া টিনের সেডের তলায় বেঞ্চে আসিয়া বসিল। ট্রেণও ছাড়িয়া দিল!

চারিধার হইতে তখন ভেকের দল রাগিণী

তুলিয়াছিল! জীর্ণ টিনের সেডখানি বর্ষার আক্রমণ হইতে আপনাকে যেন আর রক্ষা করিতে পারে না! একটা প্রকাণ্ড বাঁশের ছাতা মাথায় দিয়া, ষ্টেশনমাষ্টার অদূরস্থ বাসায় চলিয়াছিলেন, এমন সময়, এই অভাবনীয় অতিথিকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন! এমন স্থানে এমনটি দেখিবার আশা করাই যে বাতুলতা! ষ্টেশনে একটা জমাদার ছিল—আর জনপ্রাণী না! ষ্টেশনের নিম্নে জমিগুলা জলে ভরিয়া গিয়াছে, তাহার মধ্য হইতে সরু পথ কোনমতে আত্ম-প্রকাশ করিতেছে। আকাশের গতিক একটুও আশাপ্রদ নহে! বরং, রীতিমত আশঙ্কাজনক!

ষ্টেশনমাষ্টার কহিল, "মশায়, এখানে—আপনি—?"

রমেন্দ্র কহিল, বিশেষ প্রয়োজনে এখানে সস্ত্রীক সে আসিয়া পড়িয়াছে। পথিমধ্যে এই দুর্য্যোগ! সন্তোষপুর গোয়ালাপাড়ায় কলিকাতার হংসেশ্বর চৌধুরীর বাগানবাড়ী—সেখানে সে যাইবে! জমাদার সে বাগান চিনিত। কহিল, "সে যে পোড়ো বাড়ী, বাবু!"

মায়া ভড়কাইয়া গিয়াছিল! ষ্টেশনে ওয়েটিং রুম নাই, এবং গাড়ী নাই, এমন দেশ, ইংরাজের আমলে কলিকাতার কাছে যে থাকিতে পারে, ইহা সে স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই! এ কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে? তবু স্ত্রীলোকের সকল বল-ভরসা যে স্বামী, তিনি নিকটে, এইটুকুই তাহার একমাত্র সান্ত্বনা! নহিলে সে এতক্ষণে কাঁদিয়া-কাটিয়া হুলস্থূল বাধাইয়া তুলিত। রমেন্দ্র সন্ধান লইয়া জানিল, তাহার নামে বিছানার নগেন্দ্র বা কোন নগেন্দ্র এখানে আসে নাই! শুনিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। ইহার অর্থ কি?

ভিজা জিনিসপত্র—কতক ষ্টেশন-মাষ্টারের জিম্মায় রাখিয়া, কতক জমাদারের মাথায় চাপাইয়া, স্বামীস্ত্রী জলপথেই যাত্রা করিল। ষ্টেশনমাষ্টার মহাশয় একখানি পর্ণ-কুটিরে কোনমতে মস্তক রক্ষা করিতেন, কাজেই সেখানে আতিথ্যগ্রহণ একেবারে সম্ভাবনার বাহিরে! মায়া বলিল, "বাড়ী ফিরে চল!"

রমেন্দ্র কহিল, "আবার ও কথা? ছিঃ—এরা পাগল মনে করবে যে!" রমেন্দ্রেরও ফিরিবার সম্পূর্ণ ইচ্ছা, কিন্তু চক্ষুলজ্জা ত্যাগ করাও ত সম্ভব নহে!

৫

পথে রমেন্দ্রের পাম্পসু ভিজিয়া আপনার জুতা-জন্ম বিসর্জ্জন দিবার উপক্রম করিল!

জলে হাঁটিয়া বাসায় পৌঁছাইয়া রমেন্দ্র জমাদারকে বখশিস্ দিয়া বিদায় করিল।

হরিকেন লণ্ঠনটিকে কোনমতে জ্বালাইয়া রমেন্দ্র দেখিল, গৃহটি চামচিকার আবাসস্থল! আরশুলা-মাকড়সা প্রভৃতিরো অন্ত নাই! ছাদ দিয়া ঘরের মধ্যে বেশ জল পড়ে! একখানি ভগ্ন পালঙ্কমাত্র অতীত গৌরবের শেষ স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার একখানি পদ অদৃশ্য! পাঁচ-ছয়খানি ইষ্টকখণ্ডে পালঙ্ক আপন পদমর্য্যাদা কোনমতে রক্ষা করিয়াছে!

কাব্যরসজ্ঞ হইলেও রমেন্দ্রনাথ ক্ষুধার সময় আহার না পাইলে অস্থির হইয়া পড়ে! এইটুকুই তাহার বিশেষত্ব! কিন্তু তাহারো যেমন দুর্ভাগ্য, একটা হাঁড়ির মধ্যে কয়েকখানা

লুচি ও কিছু তরকারী কলিকাতা হইতে অন্ত রাত্রির জন্য আনা হইয়াছিল, সেটির কোন সন্ধান পাওয়া গেল না—হয়, বেলিয়াঘাটা ষ্টেশনে, নয় ট্রেণে নিশ্চয় সেটি ফেলিয়া আসা হইয়াছে!

মায়া বলিল, "তুমি বলেছিলে, মালী আছে—কই সে?"

রমেন্দ্র কহিল, "তাইত, বেটা হয়ত কোথায় ভেগেছে!"

মায়া কহিল, "মাগো. এখানেও জনমানব থাকে! যেন বনবাসে এসেছি।"

রমেন্দ্র মায়ার অধরে চুম্বন করিয়া কহিল, "বেশ ত মায়া, এটা আমাদের পঞ্চবটী।"

অনাহারে রাত্রি কাটাইবার সঙ্কল্প করিয়া পালঙ্কে স্বামিস্ত্রী কোনমতে নিদ্রার আয়োজন করিয়া লইল! নিদ্রাই কি হয়! বাহিরে সোঁ সোঁ করিয়া বায়ু গর্জ্জিতেছে! বৃষ্টির অবিশ্রাম ধারা! মেঘের বিকট গর্জ্জন! আর ভিতরে মশারো তেমনি দৌরাত্ম্য! আর একি মশা! যেন এক-একটা পাখী! মায়ার মনে হইতেছিল, বুঝি মহাপ্রলয়ের দিন আসিয়াছে! রমেন্দ্র ভাবিতেছিল, "হায়, হায়, সাধ করিয়া কেন এ বিপদ ডাকিয়া আনিলাম!"

একবার মায়ার মনে হইল, বাহিরে কে যেন কাঁদিতেছে,—ঐ না দ্বারে কে ঠেলা দেয়! সে প্রাণপণ বলে স্বামীকে জড়াইয়া ধরিল। একান্ত নিরুপায় রমেন্দ্রনাথ চারিটী বাতি জ্বালাইয়া স্ত্রীর ভরসার জন্য সারারাত্রি জাগিয়া কাটাইল।

৬

ভোর হইল! তবু বৃষ্টির বিরাম নাই! তাহার উপর আবার ঝড় আরম্ভ হইয়াছে! রমেন্দ্র কহিল, "তুমি দোর দিয়ে বসে থাক, আমি একটু আহারের যোগাড় দেখি!"

মায়া কহিল, "না—চল, বাড়ী ফিরে যাই!"

রমেন্দ্র কহিল, "আমারই কি অসাধ, মায়া? তবে এই ঝড়-বৃষ্টি,—কোথায় ষ্টেশন—পথ চিনি না—তোমাকে নিয়ে শেষে বিপদে পড়ব! একটা মানুষকেও ত তাহলে খুঁজে দেখা দরকার! এ যে অন্ধকূপ-হত্যার জোগাড়!"

মায়া কহিল, "তাইত, এখন উপায়? তোমাকে তখনি বলেছিলুম!"

রমেন্দ্র কহিল, "বাহিরে একটু দেখি—লোকালয়ের কিছু চিহ্ন আছে কিনা।" উভয়ে বাহিরের বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইল। দূর হইতে দুই-একটা ছেলের চীৎকার শুনা যাইতেছিল! আর সেই দূরে কদলী কুঞ্জের আড়ালে একটা চালাঘর না ঐ দেখা যায়!

রমেন্দ্র কহিল, "তুমি একটু সাহস করে এইখানে বস, মায়া। আমি আহারের সন্ধানে যাই, নহিলে কি এই বনের মধ্যে মরিয়া থাকিব, দুজনে!"

মায়া কহিল, "কিন্তু শীঘ্র এস—নহিলে আমি ভয়েই হয়ত মরিয়া থাকিব।"

ভিজিতে-ভিজিতে রমেন্দ্র চলিয়া গেল! কিছু দূরে পথটা ঘুরিয়া গিয়াছে। সেই মোড়ের উপর রাঙচিত্রের বেড়া-ঘেরা পাতার কুটির,—সেখানে একঘর গোয়ালার বাস! রমেন্দ্রের ডাকাডাকিতে গোপরমণী আসিয়া দ্বারান্তরালে অবগুণ্ঠন টানিয়া দাঁড়াইল!

রমেন্দ্র কহিল, "বাড়ীতে পুরুষ মানুষ আছে কি কেউ ?"

সে রমণী—পরপুরুষের সহিত কথা কহে কি বলিয়া! দ্বার হইতে নড়িতেও চাহে না, অথচ,মাথা নাড়িয়া উত্তরটা দেওয়াও প্রয়োজন মনে করে না! রমেন্দ্র ভাবিল, কি অদ্ভুত জীব!

বিরক্ত হইয়া রমেন্দ্র ফিরিল! দেখে, অদূরে একটা লোক টোকা মাথায় দিয়া এদিকে আসিতেছে। লোকটা আসিয়া কহিল, "বাবু, আপনার বিছানার মোট আজ ভোরে এসে পৌঁচেছে। গোলমালে একেবারে বজবজ চলে গিয়েছিল—সেখানে সারারাত্র বৃষ্টিতে ভিজেছে। সকালে হঠাৎ গার্ড-সাহেবের চোখে পড়ায় ভোরের ট্রেণে সন্তোষপুর এসেছে। ষ্টেশনমাষ্টার মশায় খপর দিয়ে পাঠালেন!" লোকটা কল্যাকার ষ্টেশনের জমাদার!

ইতিমধ্যে গোয়ালা আসিয়া পড়িল। হংসেশ্বর বাবুর বাড়ীতে অতিথি,—শুনিবামাত্র গোয়ালা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বাবুদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করিল! পরে বলিল, "বাবু, রাত্রে ও বাড়ীতে ভূতের উপদ্রব হয়, শুনেছি—তবে দেখিনি! মালীর কাছেই শুনেছি। সে দু-তিনদিন ভয় পেয়ে জ্বরে পড়ে—সেজন্ত আজ সাত-আট দিন সে পালিয়েছে!"

রমেন্দ্র ভাবিল, কথাটা ভাগো কাল তাহারা শুনিবার অবসর পায় নাই!

গোয়ালা ও জমাদারের সাহায্যে বাজারের ব্যবস্থা হইল। মৌরলামাছ, পুঁইশাক ও দুই-চারিটি মাত্র কাঁচকলা!

রমেন্দ্র কহিল, "খিচুড়ী চড়ানো যাক! বেশী লেঠায় কাজ নাই!"

উভয়ে ভীষণ উদ্যমে লাগিয়া যে আহার্য্য প্রস্তুত করিল, তাহা মনুষ্যের মুখে রুচিবার মত ত নহেই! ডাল ও চালে মিলিয়া যে এমন বীভৎস দ্রব্যের সৃষ্টি করিতে পারে, তাহা কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না! কিন্তু ক্ষুধাতিশয্যে তাহাও এতটুকু পড়িয়া রহিল না।

রমেন্দ্র কহিল, "খাসা হয়েছে, মায়া!"

মায়া লজ্জায় মরিয়া গেল! তাহার মনে ধিক্কার জন্মিয়াছিল! কবিতা লিখিয়া কত সম্পাদকের নিকট হইতে সে বাহবা লইয়াছে, কিন্তু নারীর কর্ত্তব্য-সম্পাদনে সে এত অপদার্থ! স্বামীকে একদিন রাঁধিয়া খাওয়াইয়া যে তৃপ্তিদান করিবে, সে সামর্থ্য-টুকুও তার নাই! ছিঃ!

বিকালের দিকে ঝড় ও বৃষ্টি থামিল! এবং কম্প দিয়া মায়ার জ্বর আসিল! রমেন্দ্র পাগলের মত হইয়া উঠিল! এখন, উপায় কি? এমনো দেশ—না আছে, গাড়ী, না পাল্কী!

গোয়ালার সাহায্যে একখানা ডুলি সংগ্রহ করিয়া, স্ত্রীকে লইয়া রমেন্দ্র ষ্টেশনে আসিয়া পড়িল! এবং সাড়ে সাতটার টেণে উঠিয়া একেবারে কলিকাতায়! জিনিষপত্র পাঠাইবার ভার ষ্টেশন্‌-মাষ্টারবাবুটি গ্রহণ করিয়া রমেন্দ্রকে যথেষ্ট অনুগৃহীত করিলেন!

কলিকাতায় আসিয়াই রমেন্দ্রের আমাশয় হইল! সে দিনকার লুচির হাঁড়ির সন্ধান মিলিয়াছিল; সেটা বাড়ীতেই পড়িয়াছিল; ষ্টেশনে হারায় নাই।

দশ-বারো দিন রোগ ভোগ করিয়া উভয়েই আরোগ্য-লাভ করিল। আরোগ্যলাভ

করিয়াই মায়া পঞ্জিকা আনিয়া রমেন্দ্রকে দেখাইল,—যেদিন তাহারা স্বামীস্ত্রীতে সন্তোষপুর গিয়াছিল, সেদিন যাত্রার পক্ষে মহা অশুভ দিন! কারণ, সেদিন ত্র্যহস্পর্শ যোগ ছিল! পঞ্জিকা না দেখাতেই যে এই বিভ্রাট ঘটিয়াছিল,—ইহা প্রমাণ করিয়া রমেন্দ্রর লজ্জা ও সঙ্কোচটুকু সে দূর করিতে সক্ষম হইয়াছিল কিনা, তাহার সঠিক সংবাদ আমরা বলিতে পারি না। তবে, আরোগ্য-লাভের পর, কয়েকটি বিশিষ্ট পরিবর্ত্তন আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। যথা, পল্লীগ্রামের নামে সেই অবধি রমেন্দ্রনাথের প্রাণ শিহরিয়া উঠে; মাসিক পত্রিকার সম্পাদকবর্গ নানা অনুরোধ-উপরোধেও মায়া দেবীর কবিতা পান না, এবং রমেন্দ্রনাথের বন্ধুবান্ধবেরা প্রায়ই রমেন্দ্র-ভবনে নিমন্ত্রণে ভূরি-ভোজনে আপ্যায়িত হইয়া থাকেন,—নানাবিধ নিরামিষ তরকারী, দই মাছ, কাটলেট, চপ, পোলাও,—কোনটিই রসনার পক্ষে অল্প লোভনীয় নহে! এবং ইহাও আমরা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি যে, সকল খাদ্যই স্বহস্তে প্রস্তুত করেন, বাঙলা মাসিক পত্রিকাদির ভূতপূর্ব্ব কবি, শ্রীমতী মায়া দেবী!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

স্বরলিপি।

সিন্দুড়া—তেতালা।

গাহিবার সময় রাত্রি ২য় প্রহর। সম্পূর্ণ জাতি। কোমল—গ, দুই নি। বাদী—প, সংবাদী—রি। বাকি সুর সকল অনুবাদী।

আজ মন বশ গয়ী রী
সাবরকি সুরতিয়া প্যারী প্যারী
সখিরি কা কহুঁ তোসে অপনে জীয়াকি
বিতী (১) সগরী (২) ও আহকে বিন দেখে কলন
পরত মোহে।
আহা করত তোরে পৈঁয়া (৩) পরত হুঁ
জো পিয়া আন মিলেরি মো সোঁ
হুঁতো চেরী (৪) সদন ভয়ী তেরী॥

দয়াসখী—কৃত।

	০	১	২´	৩	॥
II	ণা -া -া পা।	মা জ্ঞা রা সা I	না র্সা -া -া।	র্সরা´ -র্সণা ধপা পধা।	
	আ ০ ০ জ	ম ন ব শ	গ য়ী ০ ০	রী ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০	

	০	১	২´	৩ .
।	নর্সা´ -ণধা -ণা -পা।	জ্ঞমা জ্ঞরা সন্া সা I	না র্সা´ -া র্সা´।	না র্রা´ র্সা´ র্রা´।
	আ০ ০০ ০ জ	ম০ ন০ ব০ শ	গ য়ী ০ সা	০ ব র কি

(১) বিতী=গত। (২) সগরী=সমস্ত। (৩) পৈঁয়া=পদ, চরণ। (৪) চেরী=দাসী।

০ ১ ২´ ৩
। না র্সা ধা ণা। পা ধা ণা র্সা। পা ধপা মা মা। -জ্ঞা মা পা রমা।
সু র তি রা প্যা রী প্যা রী স খি০ রি কা ০ ক হুঁ তো০

০ ১ ২´ ৩
। -জ্ঞরা সা মা মা। পা ধা মা পা I না না র্সা র্রা। র্রমা র্রজ্ঞা র্রা র্সা।
০ ০ সে অ প নে ত্তী রা কি বি ত্তী স গ রী ০ ০ ০ ওআ হু

০ ১ ২´ ৩
। র্রা না র্সা পা। -পা ধা ণা ণর্রা। র্সা ণা ধা পা। রমা -জ্ঞরা রা -া II
কে বি ন দে ০ খে ক ল০ ন প র ত মো০ ০ ০ হে ০

০ ১ ২´ ৩
II । পা পা ধা। মা পা না র্সা I র্রা র্রমা -র্রজ্ঞা র্সা। র্রা না র্সা -া।
০ আ হা ক র ত তোরে পৈঁ য়া০ ০ ০ প র ত হুঁ ০

০ ১ ২´ ৩
। র্মা -র্মা র্রা র্সা। ণর্সা -ধণা পা মা I রমা -জ্ঞরা জ্ঞা -া। রা -া সা -া।
জো ০ পি য়া আ০ ০ ০ ন নি লে০ ০ ০ রী ০ মো ০ সোঁ ০

০ ১ ২´ ৩
। -া পা -া ধা। না -া র্সা র্রা। র্সা ণা ধা পা। রমা -রজ্ঞা রা -া IIII
০ হুঁ ০ তো চে ০ রী স ন দ ভ য়ী তে০ ০ ০ রী ০

২´ ৩
১ তান I সরা মপা -ধণা -র্রসা। র্রণা -র্সণা -ধপা -মপা I
আ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩
২ তান I র্মজ্ঞা -র্রসা -ণধা পধা। ণর্রা -র্সণা -ধপা -মপা I
আ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩
৩ তান I সরা -মপা -র্সর্রা -ণধা। পমা -ধপা -মজ্ঞা -রসা I
আ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

"আজ মন বশ" এই অংশ পর্য্যন্ত গাইয়া তান সকল ধরিতে হইবে।

সঙ্গীত-বিত্তার্ণব
শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

খন্দ মহল ভ্রমণ।

১৯০৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি বেলা আট টার সময় মান্দ্রাজ মেল হইতে বহরমপুর ষ্টেসনে অবতরণ করিয়া ডাকবাংলা অভিমুখে চলিলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে যাইয়া দেখি সমস্ত বাংলাটি দুইজন শ্বেতাঙ্গ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। ষ্টেশনের নিকটেই একটি ধরমশালা আছে শুনিয়া ফিরিয়া তদভিমুখে চলিলাম। একটি মান্দ্রাজী ব্রাহ্মণ—গলদেশে উপবীত লম্বমান—দ্বার প্রান্তে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি আমার পোষাকের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন "এ ধরমশালা হিন্দুর জন্য"। বিজাতীয় পোষাক পরিধান করিয়াছিলাম, তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইল। বলিলাম "আমি ব্রাহ্মণ"। ব্রাহ্মণ আমার কথা বিশ্বাস করিলেন না, বোধ হইল। তখন অগত্যা কোট ও সার্টের বোতাম খুলিয়া মলিন উপবীতটি বাহির করিতে বাধ্য হইলাম। উপবীত দেখিয়া ব্রাহ্মণের মুখ প্রসন্ন হইল। দরজা দেখাইয়া ভিতরে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—রাঁধিয়া খাইবে, অথবা ধরমশালায় ব্রাহ্মণের পাক খাইবেন। বেলা তখন দশটা। বাজার সেখান হইতে এক মাইল। ক্ষুধার তীব্রতায় কহিলাম "আপনার ব্রাহ্মণের পাকই খাইব"। জিনিস পত্র একঘরে রক্ষা করিয়া গাড়ীর বন্দোবস্ত করিতে বাহির হইলাম।

বহরমপুরে এক রকম অশ্বচালিত শকট আছে তাহার উপরে মাদুরের আচ্ছাদন। তাহাকে ঝট্‌কা বলে। খন্দমহল পর্য্যন্ত ঝট্‌কা যাইবে না জানিতাম—কাজেই গরুর গাড়ীর অনুসন্ধান করিতে হইল। দেখিতে পাইলাম বাঙ্গালী বেশধারী একটি ভদ্রলোক আমার অগ্রে অগ্রে যাইতেছেন। ত্বরিতগমনে তাঁহার নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসিলাম "মহাশয় বাঙ্গালী?" উত্তর পাইলাম "হাঁ"। ধরমশালায় গিয়াছি বলিয়া ভদ্রলোকটি তখন অনুযোগ করিতে লাগিলেন এবং হুকুম করিলেন "এখনি ঝট্‌কা করিয়া জিনিস পত্রসহ "বাঙ্গালী বাবুর" বাসায় চলিয়া আসুন"। বহরমপুরে তাঁহাদের বাটীকে বাঙ্গালী বাবুর বাটী বলে। তৎক্ষণাৎ ধরমশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আমার সঙ্গীসহ বাঙ্গালী বাবুর বাটী পৌঁছিলাম। প্রবাসী বাঙ্গালী বাঙ্গালীকে যত্ন করে শুনিয়াছিলাম। কিন্তু পূর্ব্বে কখনও প্রত্যক্ষ করি নাই। বাঙ্গালী বাবুর বাটীতে দুইবেলা পরিতোষপূর্ব্বক আহার করিয়া সন্ধ্যার সময় দুইখানা গোযানে সঙ্গীসহ যাত্রা করিলাম।

বাঙ্গালী বাবুর ছোট ভাই বহরমপুর কলেজে পড়েন। তাঁহার সমপাঠী কয়েকটি মান্দ্রাজী ছাত্র তাঁহাদের বাটীতে আসিয়াছিলেন; তাঁহাদের সহিত আলাপ হইল। কৃষ্ণবর্ণ মস্তকের সম্মুখ ভাগের অর্দ্ধেক কামানো; কিন্তু দিব্য প্রতিভোজ্জ্বল মুখ। দেখিয়া অনেক কথা মনে হইল। ইঁহারা দ্রাবিড় জাতীয়—যে জাতি আর্য্যদিগের পূর্ব্বে অধিকাংশ ভারতবর্ষ দখল করিয়াছিলেন। তাঁহারাই যে ভারতের আদিম অধিবাসী প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এসম্বন্ধেও নিঃসন্দিগ্ধ নহেন। ছেলেবেলায় ইতিহাসে পড়িয়াছিলাম আর্য্যদিগের ভারত জয়ের পূর্ব্বে, যে সমস্ত জাতি ভারতে বাস করিত তাহারা একান্ত

অসভ্য ছিল। কিন্তু দ্রাবিড়িগণ যে সুসভ্য ছিলেন আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদগণ তাহার প্রমাণ পাইয়াছেন। দ্রাবিড়ীয়গণ ও প্রাচীন মিশরিয়গণ একজাতি ভুক্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহারা অনুমান করেন। বেবিলনীয়গণ একপ্রকার মসলিন ব্যবহার করিত, তাহার নাম ছিল "সিন্ধু"। সিন্ধুনদের তীরবর্ত্তী স্থান হইতে রপ্তানি হইত বলিয়া উহার সিন্ধু নামকরণ হইয়াছিল। তখনও আর্য্যগণ ভারতবর্ষে আগমন করেন নাই। এত প্রাচীন কালে যে জাতি মস্‌লিন বয়ন করিতে শিখিয়াছিল তাহারা যে সুসভ্য ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। দ্রাবিড়ীয়গণ স্বনির্ম্মিত জাহাজে তাহাদের বাণিজ্য দ্রব্য বেবিলনে রপ্তানি করিত। ভারতবর্ষে আসিয়া আর্য্যগণ দ্রাবিড়ীয় সভ্যতা বহুল পরিমাণে গ্রহণ করিয়াছিলেন। দ্রাবিড়ীয়গণও উন্নততর আর্য্য-ধর্ম্মনীতি গ্রহণ করিয়া কালে জ্ঞানে ও ধর্ম্মে আর্য্যদিগেরই সমকক্ষ হইয়াছিলেন। বেদ ভাষ্যকার সায়নাচার্য্য ও বৈদান্তিক শঙ্কর ও রামানুজ এই দ্রাবিড় বংশোৎপন্ন।

মান্দ্রাজী ছাত্রদিগের মধ্যে একটি বহরমপুরের একজিকিউটিভ্ এঞ্জিনিয়ারের ভাগিনেয় ও তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। মাতুলকন্যা বিবাহ বঙ্গদেশে নিষিদ্ধ কিন্তু আর্য্যরীতি বিরুদ্ধ নহে। সিদ্ধার্থ স্বীয় মাতুল কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন।

বহরমপুর ও ছত্রপুর মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির গঞ্জাম জেলার সদর সহর। রাজকীয় কার্য্যালয় অর্দ্ধেক বহরমপুরে ও অর্দ্ধেক ছত্রপুরে স্থাপিত।

রাত্রি নয়টার সময় গোশকটে যাত্রা করিলাম। পরদিন বেলা নয়টার সময় আস্কায় পৌছিলাম। আস্কায় একটী মদ ও চিনির কারখানা আছে। অবশ্য সাহেবের। আস্কায় বাংলায় আহারাদি সমাপন করিয়া সন্ধ্যাকালে পুনরায় শকটে আরোহণ করিলাম। রাসেনকান্দা আস্কা হইতে ২৫ মাইল। পরদিন বেলা নয়টার সময় তথায় পৌছিলাম। গঞ্জাম জেলায় পথিকদিগের জন্য কি চমৎকার বন্দোবস্ত। প্রত্যেক সহরে ধরমশালা অথবা চৌলটী আছে। তথায় থাকিতে এক পয়সা ব্যয় নাই। চাউল ডাল কিনিয়া রাঁধিয়া খাইলেই হইল। বাংলা দেশ হইতে অতিথি সংকার ক্রমে উঠিয়া যাইতেছে। গৃহস্থের বাটীতে অতিথির আগমন হইলে আজিকালি গৃহস্থের মুখভার হয়। পল্লীগ্রামে গৃহস্থের বাটী হইতে অতিথিকে এখনও বড় ফিরিতে হয় না; কিন্তু নগরে অতিথির নাম করিবার যো নাই। সমস্ত কলিকাতা সহরে বিদেশী লোকের দুই এক বেলা থাকিবার স্থান নাই। পূর্ব্বে যখন অভ্যাগত সৎকত্র গুরুবৎ পূজনীয় ছিলেন তখন ধরমশালার প্রয়োজন ছিলনা। বর্ত্তমানে প্রতি সহরে ধরমশালার প্রতিষ্ঠা হওয়ার প্রয়োজন।

রাসেন নামক এক ইংরাজ রাসেনকান্দার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক খন্দদিগের মধ্যে নরবলি বন্ধ করিতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। রাসেনকান্দা আমাদের সাধারণ জেলা সহর অপেক্ষা বড় সহর। ইহা গঞ্জাম জেলার একটি মহকুমা।

রাত্রিতে রাসেনকান্দা হইতে যাত্রা করিয়া পরদিন বেলা দশটার সময় কলিঙ্গা নামক স্থানে পৌছিলাম। এক "ঘাটি" (পাহাড়)

অতিক্রম করিয়া তবে কলিঙ্গা পৌছিতে হয়। রাসেনকান্দা হইতে কলিঙ্গা বিশ মাইল। কলিঙ্গা একটী পল্লী মাত্র; দুই একটি দোকান ও একটি ডাকবাংলা আছে। কলিঙ্গার ঘাটিতে বড় দস্যুর উপদ্রব। কয়েকজন পুলিশ কনেষ্টবল অনবরত ঘাটি পাহারা দিতে নিযুক্ত আছে। কিন্তু তাহাতে দস্যুতা কমে নাই। • মধ্যরাত্রে গাড়োয়ান দিগের চীৎকারে জাগরিত হইয়া শুনিতে পাইলাম, দুইটী শার্দ্দূলপুঙ্গব আমাদিগের গাড়ির সমান্তরাল ভাবে পার্শ্বস্থ জঙ্গলের ভিতর দিয়া যাইতেছেন। বহরমপুর হইতে কলিঙ্গা পর্য্যন্ত রাস্তার দুই পার্শ্বে নিবিড় জঙ্গল। পাহাড়ের উপর দিয়া রাস্তা আসিয়াছে কিন্তু কলিঙ্গার "ঘাটি" ব্যতীত অন্যান্য পাহাড় বেশী উচ্চ নহে। ব্যাঘ্রের উপদ্রব ভয়ে একাধিক শকট একসঙ্গে যাত্রা করে। আমাদের সঙ্গে খন্দমহল যাত্রী এক মহাজনের একখানি শকট ছিল। ব্যাঘ্রের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া কয়েকবার রিভল্‌ভারের আওয়াজ করিলাম। ব্যাঘ্রদ্বয় আমাদের অভদ্রতায় ক্ষুণ্ণ হইয়া চলিয়া গেলেন।

কলিঙ্গা হইতে অপরাহ্ণে যাত্রা করিয়া মধ্যরাত্রিতে গুমাগড় ও পরদিন সকালে বিষপাড়ায় পৌছিলাম। বিষপাড়ায় পূর্ব্বে খন্দমহলের সদর আফিস স্থাপিত ছিল— কিন্তু অস্বাস্থ্যকর বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। শুনিয়াছি এক বাঙ্গালী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হঠাৎ বিষপাড়ায় প্রাণত্যাগ করায়, তাঁহার স্ত্রী বন্ধুবান্ধববিহীন স্থানে একাকী পড়িয়া অহিফেন সেবনে আত্মহত্যা করেন। অধুনা মহকুমার সদর আফিস বিষপাড়া হইতে ছয় মাইল দূরবর্ত্তী ফুলবাণী নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত। বিষপাড়া হইতে দুই মাইল গোশকটে আসিয়া সঙ্গীসহ আমি পদব্রজে ফুলবাণী পৌছিলাম।

ফুলবাণীর প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি রমণীয়। চারিদিকে ঘন বৃক্ষ সমাচ্ছাদিত পর্ব্বতশ্রেণী মধ্যস্থানে ক্ষুদ্র সহর ফুলবাণী। ফুলবাণীকে প্রকৃতপক্ষে সহর বলা যায় না। সরকারী আফিস ব্যতীত ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ ফুলবাণীতে নাই। চারিদিকে পর্ব্বতবেষ্টিত একটি ক্ষুদ্র উপত্যকায় ফুলবাণী স্থাপিত। এক পার্শ্বের পর্ব্বতের পার্শ্বদেশ দিয়া একটি ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য নদী প্রবাহিত। নদীতে অতি সামান্যই জল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ডের উপর দিয়া অনতি-গভীর জলরেখা খরবেগে ধাবিত। মৃত্তিকার বর্ণ লাল। পর্ব্বতোপরিস্থ অরণ্যে ব্যাঘ্র ভল্লুকের অধিবাস। মাঝে মাঝে ময়ূরের কেকারব বনমধ্যে উত্থিত হইয়া পর্ব্বতে প্রতিধ্বনিত হয়। রাত্রিকালে ঘন কৃষ্ণ পর্ব্বতের উপরে বহুদূর বিস্তৃত বক্রগতি অগ্নিরেখা মেঘের কোলে স্থির সৌদামিনীর ন্যায় প্রতীয়মান হয়। খন্দগণ জঙ্গলে আগুন লাগাইয়া দেয়। অনেক প্রকাণ্ড মহীরুহ সে আগুনে ভস্মীভূত হয়। সেই ভস্ম নববর্ষাগমে পর্ব্বতগাত্র হইতে বৃষ্টি স্রোতে সমতলক্ষেত্রে পতিত হইয়া ভূমির উর্ব্বরতা সম্পাদন করে ইহাই খন্দদিগের বিশ্বাস। কিন্তু ভস্মের অধিকাংশ নদীগর্ভে পতিত হয়, এবং উড়িষ্যার সমতলক্ষেত্রে নীত হইয়া তত্রত্য ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে। খন্দগণ তদ্দ্বারা অতি সামান্য উপকার লাভ করে। সমস্ত খন্দমহল একটি অরণ্য বিশেষ।

অরণ্যের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী অবস্থিত। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শালতরু মস্তক উত্তোলন করিয়া আছে—তাহাদের দৈর্ঘ্য ও বিস্তার অত্যধিক। বঙ্গদেশে অত বড় শাল গাছের আমদানি দেখি নাই। খন্দগণ নির্দ্দয় ভাবে সে অরণ্যের ধ্বংস সম্পাদনে ব্যাপৃত। কিন্তু সে অক্ষয় অরণ্য ধ্বংস হইবার নহে। যুগযুগান্তর হইতে খন্দকুঠারাঘাত সহ্য করিয়া তাহা এখনও তেমনি বিপুলই আছে। অনেক অরণ্যে বোধহয় এখনও পর্য্যন্ত খন্দকুঠার প্রতিধ্বনিত হয় নাই—সেগুলি মহা-ভীষণ। বোধ হয় পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যগণ যখন সমতল ক্ষেত্র হইতে খন্দদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন তখনও ইহারা বর্ত্তমান ছিল।

খন্দগণ গৃহনির্ম্মাণে এই বৃক্ষ বহুল-পরিমাণে ব্যবহার করে। বিপুলকায় বৃক্ষ খণ্ড খণ্ড করিয়া ঊর্দ্ধভাবে মৃত্তিকা প্রোথিত করে। খণ্ডগুলি অতি ঘনঘন পরস্পর সংলগ্ন হইয়া প্রোথিত হয় এবং বহুসংখ্যক বৃক্ষখণ্ডদ্বারা গৃহের দেয়াল নির্ম্মিত হয়। অনেকে এই কাষ্ঠনির্ম্মিত দেয়ালের উপরি-ভাগে রক্তবর্ণ মৃত্তিকার লেপ দিয়া থাকে। সূত্রধরের যন্ত্রের মধ্যে কুঠারের ব্যবহার মাত্র খন্দগণ অবগত আছে। করাতের ব্যবহার সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। নাতিস্থূল বৃক্ষ কুঠার দ্বারা তিনখানি অথবা চারিখানি তক্তায় বিভক্ত হয় এবং সেই পুরু তক্তার দ্বারা গৃহের দরজা নির্ম্মিত হয়। দরজায় লোহের কব্জা অথবা ইঁসকল নাই। কাষ্ঠের মধ্যে ছিদ্র করিয়া এক প্রকার ইঁসকল নির্ম্মিত হয় তদ্দারা চৌকাঠে কপাট সংলগ্ন হয়। খন্দগণ বোধহয় সভ্য প্রতিবেশীদিগের নিকট হইতে কিছুই শিক্ষালাভ করে নাই। সূত্রধরের যন্ত্রের অভাবে যে বিপুল পরিশ্রম অযথা ব্যয়িত হয় তাহা দেখিয়া মনে বড়ই কষ্ট হয়। খন্দমহলের সবডিভিসন্তাল অফিসার মিঃ ওলেনব্যাকের চেষ্টায় সম্প্রতি দুইএকজন খন্দ করাত ও অন্য দুই একটি যন্ত্রের ব্যবহার শিখিয়াছে। ওলেনব্যাক সাহেব ফুলবাণীতে একটি টেকনিকাল স্কুল স্থাপনের চেষ্টায় আছেন। কৃতকার্য্য হইলে খন্দদিগের শিল্প-রাজ্যে যুগান্তর উপস্থিত হইবে। দুই একটি খন্দ ইষ্টক নির্ম্মাণও শিখিয়াছে।

খন্দমহল অঙ্গুল জেলার একটি মহকুমা। কিন্তু অঙ্গুল ও খন্দমহলের মধ্যদেশে বৌধরাজ্যের একাংশ বিস্তৃত। খন্দমহাল ও জেলার সদর মহকুমা পরস্পর সংলগ্ন নহে।

খন্দমহল পূর্ব্বে বৌধরাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। উড়িষ্যায় অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করদরাজ্য আছে, বৌধ তাহাদিগের অন্যতম। খন্দ-দিগের মধ্যে নরবলিপ্রথা প্রচলিত আছে—এই সংবাদ ভারত গভর্ণমেণ্টের গোচর হইলে তাঁহারা বৌধরাজকে উক্ত জঘন্য প্রথা রহিত করিতে আদেশ করেন। রাজা অনেক চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। গভর্ণমেণ্টকে অগত্যা খন্দমহলে একটি সৈনিক মিশন প্রেরণ করিতে হয়। খন্দগণ অস্ত্রধারণ করে। চতুর ইংরাজ সেনাপতি বহুকৌশলে যৎসামান্য রক্তপাতের পর উক্ত প্রথা রহিত করিতে সমর্থ হন। কিন্তু তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের পরে আবার খন্দগণ পূর্ব্ব প্রথা অবলম্বন করে। এবং পুনরায় তাহাদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিতে হয়।

কয়েকবার সৈন্য প্রেরণের পর বিদ্রোহের সফলতায় হতাশ হইয়া খন্দগণ শান্তভাব অবলম্বন করে। কিন্তু উক্ত প্রদেশ বোধ-রাজ্যের অন্তর্গত থাকিলে নরবলি প্রথা পুনরায় প্রবর্ত্তিত হইবে এই আশঙ্কায় বোধরাজ ভারত গভর্ণমেণ্টকে প্রদেশ প্রদান করেন। তদবধি খন্দমহল বৃটিশ রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এখন নরবলিপ্রথা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। সভ্যতা ও করুণার দাবী পূরণ করিবার জন্যই গভর্ণমেণ্ট খন্দমহলের শাসন ভার গ্রহণ করিয়াছেন। জমীর উপর তথায় কোনও কর ধার্য্য হয় নাই। চাষ কর নামক একমাত্র কর তথায় আদায় হয়। প্রতি হলের উপর ৵০ আনা অথবা ৶০ আনা মাত্র নির্দ্দিষ্ট আছে। হলের সংখ্যা যাহার বেশি তাহাকে বেশী কর দিতে হয়। যাহার হল নাই তাহাকে কিছুই দিতে হয় না। এতদ্ভিন্ন আবকারী হইতে গবর্মেণ্টের কয়েক সহস্র টাকা লাভ হয়। কিন্তু খন্দমহলের আয় অপেক্ষা ব্যয় অত্যধিক। প্রায় প্রতি গ্রামে স্কুল হইয়াছে। বিনা বেতনে তাহাতে বালক-বালিকাগণ পড়িতেছে। খন্দ মহলের সব-ডিভিসনাল অফিসার মিঃ ওলেনব্যাক বাড়ী বাড়ী যাইয়া অনুরোধ করায় তবে সমস্ত বালক বালিকা স্কুলে আসিতেছে। গবর্মেণ্ট হইতে বিনা মূল্যে তাহাদিগকে পুস্তক স্লেট কাগজ কলম প্রভৃতি দেওয়া হইতেছে। স্কুলে বেতন নাই। যে রকম ভাবে কাজ চলিতেছে তাহাতে ১৫।১৬ বৎসর পরে খন্দমহলে বর্ণ জ্ঞানহীন পুরুষ অথবা স্ত্রী দুষ্প্রাপ্য হইবে বলিয়া বোধ হয়। রাস্তা ঘাটেরও ক্রমে উন্নতি হইতেছে। অসভ্য প্রজার প্রতি সুসভ্য গবর্মেণ্টের যত কর্ত্তব্য আছে খন্দ মহলে তৎসমস্তই পালন করিবার চেষ্টা হইতেছে।

নরবলি প্রথাকে খন্দগণ "মেরিয়া" বলে। অনাবৃষ্টি হইলে তাহারা মনে করিত পৃথিবী দেবী (তুর্কী-পেনু) ক্রুদ্ধা হইয়াছেন এবং নরশোণিতে তাহার বক্ষদেশ সিক্ত না করিয়া দিলে তাঁহার ক্রোধোপশম হইবে না। খন্দ মহালে "পান" নামক এক জাতি আছে। ইহাদের অনেকে বলির উপযোগী নরশিশুর ব্যবসা করিত। পিতা মাতার নিকট হইতে শিশুদিগকে চুরি করিয়া আনিয়া কিছুদিন তাহারা পালন করিত, পরে বলিদানেচ্ছু খন্দের নিকট বিক্রয় করিত। ক্রীত শিশু পুষ্টিকর খাদ্যে হৃষ্টপুষ্ট হইয়া উঠিলে, বলির দিনে মৃত্তিকা প্রোথিত কাষ্ঠ খণ্ডে তাহাকে দৃঢ় ভাবে বদ্ধ করিয়া ছুরিকা দ্বারা তাহার গাত্রের মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া কর্ত্তন করা হইত। কর্ত্তিত মাংস লইয়া সমাগত জনগণ প্রত্যেকে নিজ নিজ জমিতে প্রোথিত করিত। তাহাদের বিশ্বাস তাহাতে জমীর উর্ব্বরতা শক্তি বর্দ্ধিত হয়। এই নৃশংস লোমাঞ্চকর নরযজ্ঞে যাহারা পুরোহিতের কার্য্য করিত তাহাদিগকে দেহেরী বলিত। দেহেরী এখনও আছে—কিন্তু নরবলি আর নাই।

খন্দমহাল কতিপয় সংখ্যক মুঠায় বিভক্ত। প্রত্যেক মুঠা একাধিক গ্রাম লইয়া গঠিত। প্রতিমুঠায় একজন "মালিক" আছেন, মুঠার সমস্ত লোক মালিকের অনুগত। মালিক ব্যতীত প্রতি মুঠায় একজন সর্দ্দার আছে। বর্ত্তমানে সবডিভিসনাল অফিসারকর্ত্তৃক সর্দ্দার নিযুক্ত হয়। মুঠার ন্যায় প্রতি গ্রামেও একজন

"গ্রাম মালিক" ও একজন সর্দ্দার আছে। সমগ্র মুঠায় মুঠামালিক ও মুঠাসর্দ্দারের যে প্রতিপত্তি, গ্রামে গ্রামমালিক ও গ্রাম-সর্দ্দারেরও তদ্রূপ। খন্দগণ তাহাদের মালিক ও সর্দ্দারের আজ্ঞানুবর্ত্তী,—প্রায়ই তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ করেনা।

খন্দদিগের শপথ করিবার প্রথা একটু নূতন রকমের। শস্য ও দুগ্ধাদি মাপিবার জন্য তাহারা একপ্রকার মৃত্তিকাভাণ্ড ব্যবহার করে তাহাকে তামলি বলে। এই তামলির মধ্যে কিয়দংশ ব্যাঘ্র চর্ম্ম, কিছু ধান, লবণ, কয়েকটী তুলসীপত্র ও "সবিনো" নামক গাছের কয়েকটী পত্র ও অন্য দুই একটী দ্রব্য রাখিয়া শপথকারীর হস্তে তামলিটি প্রদান করা হয়; এবং তামলি ও তৎস্থিত প্রত্যেক পদার্থের নাম করিয়া আদালতে তাহাদিগকে শপথ পড়ান হয়। অন্যত্র মদ্য স্পর্শ করিয়া শপথ করিবার নিয়মও প্রচলিত আছে। আমি যখন খন্দমহলে ছিলাম তখন কতকগুলি খন্দ শপথ করিয়া মদ্য ত্যাগ করিয়াছিল। শুনিয়াছি ওইদ্বারা মদ স্পর্শ করিয়াই তাহারা মদ ত্যাগের শপথ করে।

খন্দগণ অপরিমিত মদ্যপায়ী। সুখের বিষয় তাহাদের স্ত্রীলোকেরা মদ খায় না, তাহা না হইলে মদ্যের প্রভাবে এতদিনে খন্দ জাতি বোধ হয় বিলুপ্ত হইয়া যাইত। মদ খাইবার পূর্ব্বে তাহারা কিয়দংশ মৃত্তিকার উপর ফেলিয়া "তুর্কীপেণু"কে নিবেদন করে। তাহাদের বিশ্বাস মদ্যদানে পৃথিবীকে তুষ্ট না করিলে তিনি রুষ্ট হইয়া শস্যাদি কিছু দান করিবেন না। পূর্ব্বে খন্দগণ নিজেই মদ্য প্রস্তুত করিত। অধুনা গবর্মেন্টের আবকারী আইনানুসারে খোলা ভাঁটীতে মদ প্রস্তুত হয়। খন্দগণ বলে শৌণ্ডিকহস্ত কলুষিত মদ্য পৃথিবী তত তৃপ্তির সহিত গ্রহণ করেন না এবং তজ্জন্য পূর্ব্বমত শস্যাদি দান করিতেছেন না। তুর্কীপেণুকে মদ না দিলে যখন চলিবে না তখন তাহারাই বা মদ ত্যাগ করিবে কেন? করিলে তুর্কী-পেণুর পূজার ব্যাঘাত হইবে।

খন্দমহলের অধিবাসীগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, উড়িয়া ও খন্দ। উড়িয়াদিগের অধিকাংশই মহাজন। অত্যধিক সুদে টাকা ধার দিয়া খন্দদিগের সর্ব্বনাশ সাধনে তাহারা বড়ই পটু। খন্দ মহলের অধিকাংশ জমী অধুনা তাহাদেরই হস্তগত। মদ্য পিপাসা যখন প্রবল হইয়া উঠে তখন খন্দগণ শস্য ও জমী বন্দক দিয়া সে পিপাসা নিবৃত্তি করিতে কুণ্ঠিত হয় না। মহাজনদিগের অত্যাচার হইতে খন্দদিগকে রক্ষা করিতে সরকারী কর্ম্মচারীগণ আজ কাল বিশেষ চেষ্টিত আছেন। খন্দমহলে প্রচুর পরিমাণে হলুদ উৎপন্ন হয়; গাড়ী করিয়া উড়িয়া মহাজনগণ অন্যত্র রপ্তানী করে।

কোনও রকম তরকারী ব্যবহার খন্দগণ অবগত নহে। ফুলবাণীতে যে কয়েকটী রাজকর্ম্মচারী আছেন তাঁহারা স্বীয় ব্যবহারের জন্য কলিকাতা হইতে বীজ লইয়া তরকারীর চাষ করেন। সম্ভবতঃ তাঁহাদের দৃষ্টান্তে তরকারীর ব্যবহার খন্দদিগের মধ্যে প্রচলিত হইবে। মৎস্য একপ্রকার অপ্রাপ্য। বহুকষ্টে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য দুই একটী পাওয়া যায়।

খন্দদিগের বাসগৃহে জানালা নাই; একমাত্র দরজা। গৃহ অনবরত ধূমে পরিপূর্ণ থাকে।

মশা তাড়াইবার জন্যই ঘরে অগ্নি রাখা হয়। ধূম পরিপূর্ণ ঘরে নিদ্রা যাইতে তাহারা বিন্দুমাত্র অসুবিধা বোধ করে না।

খন্দগণ অত্যন্ত স্বাবলম্বনপ্রিয়। পুত্র বিবাহ করিয়াই পিতা মাতা হইতে পৃথক্ বাস করে। খন্দ ভিক্ষুক দুর্লভ।

ব্যভিচার খন্দরমণীর মধ্যে বিরল। একবার একটি খন্দরমণী একজন উড়িয়া কনট্রাক্টরের সহিত চলিয়া যায়; তাহাতে খন্দদিগের মধ্যে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। স্ত্রীলোকটী এখনও সেই উড়িয়ার সহিত বাস করিতেছে; কিন্তু কোনও খন্দ তাহার সংশ্রবে আসে না।

খন্দগণ প্রায়ই কৃষ্ণবর্ণ। কিন্তু উজ্জ্বল রক্তাভ গৌরবর্ণ খন্দরমণীও দেখিয়াছি।

খন্দগণ বহুদেবে বিশ্বাস করে। তাহাদের উপাস্য কয়েকটী দেবতার নাম নিম্নে উল্লিখিত হইল।

১। তুর্কীপেনু—পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

২। পর্ব্বত দেবতা—পর্ব্বতের অধিষ্ঠাত্রী। তিনি কাঠুরিয়াদিগকে হিংস্র পশুর কবল হইতে রক্ষা করেন। জঙ্গলে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে কাঠুরিয়াগণ তাঁহাকে স্মরণ করে।

৩। গ্রাম দেবতা—যাবতীয় গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী একদেবতা।

৪। উনাপেনু—ইঁহার পূজা করিলে পুত্র লাভ হয়। আমাদের ষষ্ঠী।

৫। বরাবালী—ইনি রুষ্ট হইলে গৃহপালিত পশুদিগের মধ্যে মড়ক উপস্থিত হয়।

৬। পিতাবলী—পূজা দ্বারা ইঁহাকে তুষ্ট না করিলে অরণ্যে ব্যাঘ্রকবলে পতিত হইতে হয়।

৭। খমশেরী—ইঁহাকে তুষ্ট না করিলে ইনি মানুষকে নানা বিপদগ্রস্ত করেন।

৮। ডুম্বালনী—খোস পাঁচড়ার দেবতা।

৯। দারাকুম্ব—ইনিও খমশেরীর ন্যায় মানুষকে বিপদে ফেলেন।

১০। লিঙ্গাপেনু—প্রতি খন্দগৃহে ইহার মূর্ত্তি রক্ষিত হয়। ইনি কোনও সময় মানুষ ও কোনও সময় পশু মূর্ত্তি ধরিয়া খন্দদিগকে দেখা দেন। গৃহে যত অল্পই শস্য থাকুক না কেন ইঁহার অনুগ্রহ হইলে তাহাতে বহুদিন চলিয়া যায়। ইনি তাহাদের লক্ষ্মী।

১১। ধর্ম্মপেনু—জন্মদাতা।

১২। ঝাকরকুণ্ঠি—ইনি গ্রাম রক্ষা করেন।

খন্দগণ বহু দেবতায় বিশ্বাস করে বটে—কিন্তু সকল দেবতার উপরে যে একজন আছেন তাহাও বিশ্বাস করে। এই পরম দেবতাকে তাহারা "বটাপেনু" বলে। শূকর বলিদ্বারা এই দেবতার পূজা হয়। এই সমস্ত দেবতার কয়েকটী, বিশেষতঃ ধর্ম্মদেবতাকে, খন্দগণ যে হিন্দুদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

খন্দদিগের মধ্যে প্রবাদ আছে যে "মহাপ্রভুর" স্কন্ধদেশ হইতে তাহারা জন্মগ্রহণ করে এবং "কন্দ" খাইয়া তাহারা জীবন ধারণ করিত বলিয়া "কন্দ" নামে অভিহিত হয়। খন্দগণ আপনাদিগকে কন্ধই বলে। খন্দ মহলে কচুর মত এক রকম বৃক্ষমূল খন্দগণ কর্ত্তৃক খাদ্যরূপে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। তাহাকে কন্দ বলে। শুনিয়াছি কন্দ খাইতে

বেশ সুস্বাদু। খন্দগণ শুধু কন্দ খাইয়া অনেক দিন কাটাইতে পারে। মহাপ্রভু কে তাহা জানিতে পারি নাই। তিনি মহাপ্রভু নামেই খন্দদিগের নিকট পরিচিত। সম্ভবতঃ উপরোক্ত 'রটাপেনু' হইবেন। যাহা হউক প্রবাদ আছে খন্দগণ পূর্ব্বে কন্দ ও বনফল খাইয়া জীবনযাপন করিত। বহু দিন পরে তাহাদের মধ্যে কতিপয় জ্ঞানীলোক—আবির্ভূত হইয়া অন্ন ভোজন প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। তদবধি খন্দ সমাজে অসত্যের উদ্ভব হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে অনৃতভাষী খন্দের সংখ্যা এখনো বেশী নহে।

খন্দগণ বিশ্বাস করে তাহাদের পূর্ব্বে কূর্ম্ম নামধারী একজাতি পৃথিবীতে বাস করিত। তাহাদের "যুগ" শেষ হইলে খন্দগণের আবির্ভাব হয়। এই প্রবাদের মূলে কি কোনও সত্য নাই? কূর্ম্মজাতির অধ্যুষিত কালকে খন্দগণ কূর্ম্মাবতার বলে।

খন্দগণ গোমাংস ভক্ষণ করে না। শুনিয়াছি সাঁওতাল বা ভীলগণও গোমাংস ভক্ষণ করে না। অথচ আর্য্যগণ অতি প্রাচীন কালে গোমাংস ভক্ষণ করিতেন তাহার প্রমাণ আছে। আর্য্যগণ যে অনার্য্য দ্রাবিড়ীয় সভ্যতা বহুল পরিমাণে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাও নিশ্চিত। গোমাংস ভক্ষণ ত্যাগ কি দ্রাবিড়ীয় আচারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনেচ্ছার অভিব্যক্তি?

শ্রীতারকচন্দ্র রায়।

নবীন প্রভাত।

প্রথম যেদিন তোমায় আমায়
হয়েছিল দেখা।
আমি তখন ঘুমিয়েছিনু
তুমি জেগে একা।
আমি তখন দেখছি স্বপন
ফিরছি কত দেশ।
রচছি কত নূতন ভুবন
ধরছি কত বেশ।
আপন মনে ভাঙ্গা গড়া
স্বপন দেশের খেলা।
দিনে সেথা রাতের আঁধার
রাতে দিনের মেলা।
আধেক আলো আধেক ছায়া
আধেক স্বপন ঘোর।
দেখায় কত কুহক শত
পরায় কত ডোর।
এলে তুমি কাছে আমার
শিরে দিলে হাত।
ভাঙ্গলে আমার এতদিনের
স্বপন ঘেরা রাত।
জেগে এখন তুমি আমি
বসেছি এক সাথে।
মধুর হাওয়া বইছে আজি
নবীন প্রভাতে।

শ্রীহেমলতা দেবী।

জাপানে শিক্ষা।

প্রকৃত পক্ষে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে জাপানের সর্ব্ব প্রথম ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সময় হইতেই বর্ত্তমান জাপানবাসীগণের উন্নতির সূত্রপাত। তিন বা সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্ব্বে কনফিউকাস সম্প্রদায়ের সঙ্গে বৌদ্ধ পুরোহিতগণ মিলিত হইয়া কার্য্য করিত। অতঃপর দিনেমারেরা জাপানবাসীগণের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার বীজ উপ্ত করিয়া দিয়াছিল। তৎপূর্ব্বে তথায় দিনেমার ভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। অবশেষে যখন ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকাবাসীগণ জাপানে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিলেন এবং ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড এলগিন সপারিষদ যখন জাপানে আগমন করিলেন তখন তথায় খাস ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন ও ব্রিটিস-জাপ সন্ধি স্থাপিত হইল। তখন হইতেই জাপানবাসীগণের মধ্যে নবভাবের উন্মেষ।

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে জাপানে অস্থায়ী শিক্ষা সমিতি গঠিত হইবার তিন বৎসর পরে শিক্ষার বিভিন্ন বিভাগ স্থাপিত হইল, এই বিভাগকে জাপানীভাষায় "মম্বুসো" (Mombusho) কহে। রাজমন্ত্রী ইগান সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে জাপানে সর্ব্বপ্রথম শিক্ষা আইন (Educational Code) প্রচারিত হয়। জাপানের রাজা তাহাতে নিম্নলিখিত রূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন:—তিনি বলেন, "কর্ম্মচারী, কৃষাণ, শিল্পী ভাস্কর, কবিরাজ অথবা চিকিৎসাব্যবসায়ী প্রভৃতি সকলেরই স্ব স্ব প্রসার বৃদ্ধিকরণ মানসে জ্ঞানার্জ্জনের আবশ্যক। আমি আশা করি বিদ্যালয় বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে লোকের জ্ঞানলিপ্সাও এমন বর্দ্ধিত হইয়া উঠিবে যে তখন গ্রামে গ্রামে, সুদূর পল্লীতে পল্লীতে শিক্ষা ব্যাপৃত হইয়া পড়িবে। কি ধনী কি দরিদ্র তখন কোন পরিবারেই একটি নিরক্ষর লোক থাকিবে না। শিক্ষার ইচ্ছায় দেশ মাতোয়ারা হইয়া উঠিবে।" জাপানরাজের বাণী বর্ণে বর্ণে ফলিয়া গিয়াছে।

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ষড়বিংশ বৎসরের মধ্যে জাপানে ৭৯ লক্ষ, ২৫ সহস্র, ৪ শত, জন পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুপণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। ইউরোপের পণ্ডিতগণ বলেন, সেই বর্ষে জাপানে কেবল বিদ্যালয়ের বালকগণের মধ্যে শত করা ৮২ জন পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছিল। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবীর দৌত্যকার্য্য (World's Embassy) পরিপালন মানসে ৪৯ জন সম্ভ্রান্ত বংশীয় ব্যক্তি দ্বারা একটি সমিতি স্থাপিত হইল। ইহারাই সমগ্র জাপানের মুখপত্র বা প্রতিনিধি স্বরূপ। তন্মধ্যে রাজপুত্র ইয়াকুরা (Iwakura) ও মারকুইস্ ইটো (Ito) প্রধান ছিলেন। ইঁহারা সকলে মিলিত হইয়া যাহাতে জাপানে উচ্চ শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধি পায় তদুপায় বিধানে মনোযোগী হইলেন। শত শত জাপছাত্রগণকে ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রেরণ করিতে লাগিলেন। এই প্রকার বিভিন্নদেশে জাপছাত্র প্রেরণের ব্যবস্থা বহুদিন ধরিয়া চলিয়াছিল। বর্ত্তমান জ্ঞান বিজ্ঞান প্রভৃতির শিক্ষাপদ্ধতি শিক্ষা

করিবার জন্যই জাপানের ছাত্রগণ ইউরোপ আমেরিকায় প্রেরিত হইত। বর্ত্তমান সময়ে জাপানে বিদ্বান লোকের সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে এবং তাঁহারাই জাপান বিশ্ববিদ্যালয় তত্ত্বাবধান করিয়া সুন্দর রূপে পরিচালিত করিতেছেন। সুতরাং অধুনা আর প্রায়ই জাপান হইতে শিক্ষার্থীছাত্র আমেরিকা, ইউরোপ প্রভৃতি মহাদেশে প্রেরিত হয় না। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে আড়াই শত ছাত্র রাজবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া বিভিন্ন দেশে গমন করিয়াছিল। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বসমেত একাদশটিমাত্র ছাত্র উক্ত বৃত্তি লইয়া বিদেশে গমন করে। সর্ব্ব প্রথমে আমেরিকা ও ইউরোপ হইতে অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক লইয়া আসিয়া জাপানছাত্রগণকে শিক্ষা প্রদান করা হইতেছিল পরে সে ব্যবস্থাও রহিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বশুদ্ধ ৩১ জন বৈদেশিক শিক্ষক ছিল তন্মধ্যে ১৮ জন গ্রেটব্রিটেনবাসী ১১ জন আমেরিকান। ইহাই হইল তথাকার সরকারী কলেজের কথা। বেসরকারী কলেজাদিতে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৬৭ জন পুরুষ ১০১ জন স্ত্রীলোক শিক্ষকতার জন্য ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে জাপানে আনা হইয়াছিল। প্রেসিডেণ্ট ইবুকা আমেরিকায় বক্তৃতাকালে বলিয়াছিলেন,—জাপানবাসীগণকে পাশ্চাত্য বিদ্যায় পারদর্শী হইতে হইলে গ্রেটব্রিটানের নিকট নৌ-বিদ্যা ও আমেরিকার নিকট হইতে বিজ্ঞান শিক্ষাপদ্ধতি গ্রহণ করিতে হইবে। কার্য্যতঃ তাহাই হইয়াছে।

জাপানের এলিমেণ্টারী (Elementary) স্কুল সমূহ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) সাধারণ ও (২) উচ্চ। এই শ্রেণীর বিদ্যালয়ের সমষ্টি ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ সহস্র ৩ শত ২২টি ছিল। ইহার ব্যয় ১৭ লক্ষ, ১৫ হাজার, ৩ শত, ৭০ পাউণ্ড। তন্মধ্যে ১৭ লক্ষ, ৫০ হাজার, ৪ শত, ৩৬ পাউণ্ড করদাতৃগণের নিকট হইতে চাঁদা পাওয়া গিয়াছিল। অনুমান পঞ্চ সহস্র এই শ্রেণীর বিদ্যালয়ে কিঞ্চিৎ উচ্চ শিক্ষা প্রদান করা হয়। তাহাতে বিজ্ঞানসম্মত কৃষি-কর্ম্ম, কৃষিঅর্থ, নীতি এবং অধিকন্তু অপরাপর পরিশ্রমসাধ্য শিল্পাদি শিক্ষা প্রদান করা হয়। জাপবালিকাগণকে বিশেষ যত্নপূর্ব্বক গৃহস্থালী ও সূচী কার্য্যাদি শিক্ষা প্রদান করা হয়। জাপান গবর্ণমেণ্ট, ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাস হইতে প্রাথমিক বিদ্যালয়াদিতে বিনা বেতনে সকলেই শিক্ষালাভ করিতে পারিবেক এইরূপ ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন। জাপবালিকাগণ পূর্ব্বে বিনা কারণে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকিত। সত্বরই ইহার প্রতিবিধান করণে অনেকেই বদ্ধপরিকর হইলেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের মন্ত্রী বলিলেন, "জাপানে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার বৃদ্ধি করিতে না পারিলে সমগ্র জাপানে শিক্ষা ব্যাপৃত হইতে পারিবে না। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, কি বালক, কি বালিকা সকলেরই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া শিক্ষালাভ করিতে হইবে। এই প্রকার আদেশ প্রচারিত হওয়ায় বালকবালিকাগণ সকলেই বিদ্যার্জ্জনে মনোনিবেশ করিল। পুরাকালে ললনাগণের শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। জাপানীগণ ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে উপযাচক হইয়া ১ লক্ষ ৫৪ হাজার পাউণ্ড বা সুবর্ণ মুদ্রা বিদ্যালয়াদির জন্য প্রদান করে। কেবল তাহাই নহে,

এই এক বৎসরের মধ্যে জাপানীগণ শিক্ষাকল্পে ৩৬ লক্ষ ৭৭ হাজার 'একার' জমি, ১৪ হাজার পুস্তক এবং ১৬ হাজার শিক্ষা-কার্য্যের যন্ত্রাদি দান করিয়াছিল। লিউইজ সাহেব বলেন, "জাপানের শিক্ষাকার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইবার জন্য এককালীন দানের সংখ্যাই অধিক। তাহার এক পঞ্চমাংশ বেতনাদি বাবদ কলেজাদি হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়।" ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বৈদেশিক শিক্ষক শতকরা ১৫ জন হইতে ১৯ জনে পরিণত হইয়াছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়াদির কিঞ্চিদূর্দ্ধে যে সকল বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে তাহাও দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। (১) মধ্যবৃত্ত স্কুল ও (২) উচ্চ বিদ্যালয় সমূহ। এই সময় হইতে তাহাদিগকে সৈন্যদলভুক্ত হইয়া যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন সময় বিভাগ করিয়া লইতে হয়। সুতরাং তাহাদিগের মধ্যে কেহই ২৮ বৎসরের পূর্ব্বে স্কুল হইতে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতে পারে না। নিম্ন শ্রেণীর বিদ্যালয় সমূহের সহিত উচ্চ বিদ্যালয়াদির সংযোগ এবং একতা সংরক্ষিত না হইলে দেশের উন্নতির অন্তরায় হইতে পারে সে কথা জাপানের শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষেরা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কোন ছাত্র নিম্ন স্কুল হইতে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অপর উচ্চ বিদ্যালয়ে বিনা পরীক্ষায় প্রবেশাধিকারলাভে সমর্থ হইতে পারে। এমন কি, যদ্যপি কেহ উচ্চ বিদ্যালয়ের পাঠাদি নিয়মিত অধ্যয়ন করিয়াছে বলিয়া কোন প্রশংসাপত্র (Certificate) প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে সে প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রদান না করিয়াই কলেজে ভর্ত্তি হইতে পারে এবং তাহার যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার সহজেই হইতে পারে। প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণ যে সকল কর্ম্ম প্রাপ্ত হইবে সেও তদপেক্ষা নিম্নপদ প্রাপ্ত হইবে না। নিম্ন স্কুলের সঙ্গে উচ্চ বিদ্যালয়ের এমন সহানুভূতি সকলেরই অনুকরণীয়। অপর কোন দেশে ঈদৃশ ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় না। কোন বেসরকারী বিদ্যালয়ের অবস্থা শোচনীয় হইলে তাহাকে অপর উচ্চ বিদ্যালয়াদি সাহায্য প্রদান করিয়া থাকে। এইরূপ সম্পদে বিপদে ছোট বড় সকলেই পরস্পরে মিত্রতাসূত্রে সম্বদ্ধ আছে বলিয়া তথাকার অবস্থা এতাদৃশ উন্নত।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে জাপানে সর্ব্বসমেত ১৬৯টি সাধারণ মধ্যবিদ্যালয় এবং ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ৬টি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। উহার শিক্ষক সংখ্যা ছিল ২ হাজার ৬১ জন; তন্মধ্যে দ্বাদশজন বিদেশী পুরুষ; আর ছাত্র সংখ্যা ছিল ৪ হাজার ২ শত ৮১ জন। এই সকল ছাত্র মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিত। পরে ইহার ৭/৮ অংশ উচ্চ বিদ্যালয়ে গমন করিল; ১/১৫ অংশ সৈন্যদলভুক্ত এবং ১/১০ অংশ বিদ্যালয় সমূহে শিক্ষকতায় নিযুক্ত হইয়াছিল। উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধ্যে ৫৬ জন আইন ১২৭ জন স্থপতি বিদ্যা (Engineering), ১ হাজার ৪ শত ৫৯ জন ডাক্তারী এবং ২ হাজার ৫ শত ৮৯ জন সাধারণ বিভাগে সাহিত্যাদি অধ্যয়ন করিত। ইহাই হইল পূর্ব্বকার অবস্থা।

মধ্যম শ্রেণীর বিদ্যালয়াদিতে ইংরাজী ভাষার প্রচলন আছে। জাপ ভাষা

চৈনিক ভাষার পরস্পর নিকট সম্পর্ক বলিয়া উভয়েরই সমভাবে প্রচলন আছে। জাপানের সাধারণ লোক জিমনাষ্টিক বা অঙ্গ চালনাদি ব্যায়ামে যেরূপ মনোযোগী,—গণিত বা ইতিহাস পাঠে সেরূপ নহে। দর্শন ও মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি পাঠে আরও অবহেলা দেখা যায়। ব্যবসায় বাণিজ্যাদির জন্ম যতটুকু বিজ্ঞান শিক্ষার আবশ্যক সেইটুকু জ্ঞানলাভ হইলেই তাহারা যথেষ্ট বিবেচনা করে। তাহাদের বিশ্বাস শারীরিক বলাধান হইলেই বহিঃশত্রু এবং বিভ্রমাদি বিদূরীত হইতে পারে। কিন্তু সরকারী উচ্চবিদ্যালয়াদিতে সকল বিষয়ই তুল্যরূপে শিক্ষা দেওয়া হয়। তন্মধ্যে পাঁচটি বিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী সাধারণ বিদ্যাসকল বহু যত্নে শিক্ষা দেওয়া হয়। একটি সর্ব্বোচ্চ আইন ও স্থপতিবিদ্যা শিক্ষার স্থান। তাহার ফলে কাইটো বিশ্ববিদ্যালয় (Kyoto University) সৃষ্ট হইয়াছে। মধ্য এবং উচ্চ বিদ্যালয় সমূহে টেক্‌নিক্যাল শিক্ষাপদ্ধতি ধীরে ধীরে প্রবেশলাভ করতঃ তথাকার উচ্চ শিক্ষার পথ প্রসার করিয়া দিয়াছে।

জাপানে দুইটি প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় আছে। একটি টোকিয়ো ও অপরটি কাইটো সহরে অবস্থিত। তন্মধ্যে প্রথমটিই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। রাজকীয় টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়া ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে আদর্শানুযায়ীরূপে গঠিত হয়। পরে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ইহার সঙ্গে কৃষিবিদ্যা বিষয়ক উচ্চ কলেজের সংযোগ করা হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবার পর হইতে দশবৎসর পর্য্যন্ত জাপানবাসীগণ আমেরিকা খণ্ডের পদ্ধতি অনুসারে কার্য্য করিয়া আসিতেছিল। তাহার পরবর্ত্তী সময় হইতে এখানে জর্ম্মাণ দেশ প্রচলিত প্রথায় কার্য্য চলিতেছে।

বর্ত্তমান সময়ে টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয় বহু অংশে বিভক্ত। আইন, বিজ্ঞান, স্থপতিবিদ্যা, ডাক্তারী, কৃষিকার্য্য, সাহিত্য, পুস্তকরক্ষণ প্রণালী, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, মানমন্দির সংশ্লিষ্ট জ্যোতিষ, (Astronomical observatory), সামুদ্রিক রসায়ন, হাসপাতালের রোগীচর্য্যা প্রভৃতি বহু বিষয় এখানে পঠিত হইয়া থাকে। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপানে ১ শত ৬২ জন অধ্যাপক ছিলেন;—আইনে ২২ জন, ডাক্তারীতে ৩৫ জন, স্থপতিবিদ্যায় ৩৫ জন, সাহিত্যে ২৫, বিজ্ঞানে ১৮, কৃষিবিদ্যায় ৩১ জন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ; ২ শত, পাঁচজন। আর টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা কিপ্রকার বাড়িতেছে একটি তালিকা প্রদান করিলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন।

কলেজের নাম ও বিষয়		১৮০৫	১৮৯০	১৮৯৫	১৮৯৬	১৮৯৭
ইউনিভারসিটি হল (কলেজ)		০	৪৭	১০৫	১৪৬	১৭৪
আইন	”	২১৭	৩০১	৪৭২	৫৬১	৭৩১
বিজ্ঞান	”	৪৩	৭৭	১০২	১০৫	১০৫
স্থপতিবিদ্যা	”	৩০	১০৬	২৯৫	৩৪৫	৩৮৫
ডাক্তারী	”	৭২৬	১৮৮	১৭৮	২২৩	৩৯৭

সাহিত্য কলেজ	১২৯	৮৮	২১৯	২৩৮	২৭৮
কৃষি ”	০	৪৮১	২৪৯	২১৫	২৩২
মোট ৭ কলেজ	১,১৪৫	১২৯২	১৬২০	১৮১১	২২০৮

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে শতকরা ৩০ জন ছাত্র আইন, ৯ জন ডাক্তারী, ৩১ জন স্থপতি বিদ্যা, ৭ জন বিজ্ঞান এবং ৪ জন কৃষিশিল্প অধ্যয়ন করিত।

লিউস সাহেব বলেন, ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে যে সকল ছাত্র গ্রাজুয়েট হইয়া ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহার সংখ্যা ৩০৮ জন। তন্মধ্যে ১০৭ জনকে জাপান গভর্ণমেণ্ট শাসন বিভাগে নিযুক্ত করিয়াছেন। ৪৮ জন বিশ্ববিদ্যালয় হল নামক কলেজে বিবিধগ্রন্থের গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। ৪৫ জন ব্যাঙ্ক ও বাণিজ্যাদি সংক্রান্ত কার্যে বিনিযুক্ত। ৪৪ জন কোন কার্য্যাদিই করিতেছেন না। ৪২ জন স্কুল ও কলেজের অধ্যাপক হইয়াছেন। ১৫ জন গ্রাজুয়েট হইয়া সরকার হইতে বৃত্তিভোগ করতঃ রিসার্চ্চ বা গবেষণার কার্য্য করিতেছেন। ইহাকে ইংরাজীতে Post-graduate এর কার্য্য কহে। অবশিষ্ট ৭ জন অপর ব্যবসায়াদি গ্রহণ করিয়াছেন। এই হইল ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের কথা। পূর্ব্বে এইপ্রকারে কার্য্য চলিত। বর্ত্তমান সময়ে জাপানের ছাত্রগণ উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া দেশের বহুবিধ মঙ্গলকার্য্যে রত হইতেছে। কেহ যৌবনজীবন কৌমার্য্য অবস্থায় কলেজ-লাইব্রেরীতে বিবিধ গবেষণায় কালাতিপাত করিতেছেন। কেহ বিজ্ঞানচর্চ্চায় গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিতেছেন।

শ্রীগণপতি রায়।

মানস দর্শন।

(মিশ্র ভৈরবী—কাওয়ালী)

(কবে) চিরমধুমাধুরীমণ্ডিত মুখ তব
রাজিবে মলিনমরমতলে।
পাতকীপুলকে শিহরি হেরিবে
মুগ্ধমানসে নেত্র জলে॥
সঞ্চিতপুঞ্জিত দুষ্কৃতি-বেদনা
রাখিবে চরণে তোমারি দান,
সকল হরষ আশা, সকল ভাবনা ভাষা,
সফল হইবে হরি করুণাবলে
সফল হইবে হরি করুণাবলে॥

শ্রীরজনীকান্ত সেন।

পরিচয়।

তুমি যে সুন্দর তাহা দেখিনু নয়নে
নয়ন-ভুলান এই তোমার ভুবনে;
তুমি যে অসীম তাও জেনেছি হৃদয়ে
আপনার হৃদয়ের প্রেমের বিস্ময়ে;
করুণা সাগর হয়ে তবু ন্যায়বান
বুঝিলাম দেখি তব এ বিশ্ব মহান,
উচ্চনীচ, ভালমন্দ যেথা নির্ব্বিচার
ভুঞ্জে অবারিত দান আলোক আঁধার,
জল, বায়ু, পুষ্প, ফল, তব বনচ্ছায়া
নীলকান্ত আকাশের সীমাহীন মায়া,
জরা মরণের চির অমোঘ বিধান
সম্রাট দরিদ্র'পরে নিয়ত সমান।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

ইংরাজের দৌত্য।

(১)

সময়—সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ।

তখন নূতন ও পুরাতন দুই কোম্পানিতে বিশেষ গোলযোগ বাধিয়া গিয়াছিল। ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে বিলাতে গবর্নমেণ্টের দুই কোটী টাকার আবশ্যক হইয়াছিল। এই টাকার জন্যই তথাকার গবর্নমেণ্টকে বাধ্য হইয়া ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য করিবার অধিকার দিয়া নূতন একটী কোম্পানি গঠনের অনুমতি দিতে হয়। এই নূতন কোম্পানি গঠনের প্রস্তাব পার্লিয়ামেণ্টের সমক্ষে উপনীত হইলে পুরাতন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি একখানি আবেদনপত্র উক্ত মহাসভায় পেশ করেন। নূতন এবং প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হইলে যে বিস্তর অসুবিধা হইবে—সেই সমুদয় বিষয় উল্লেখ করিয়া আবেদন প্রেরিত হইলেও নূতন কোম্পানির সনন্দ পাইতে কোন বিঘ্নই হইল না। প্রকৃত পক্ষে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অংশীদার প্রভৃতির মধ্যে অনেক ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি থাকিলেও, সাধারণে কোম্পানীকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না। সুতরাং সহজেই পার্লিয়ামেণ্ট ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় একটী কোম্পানি স্থাপনে অনুমতি দিলেন।

ইহাতে বিবাদ বিসম্বাদ অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। পুরাতন কোম্পানি নূতন কোম্পানিকে ভয় করিয়া চলা দূরে থাকুক, তাঁহাদের দূরদেশস্থ এজেণ্টদিগকে যে ভাবে পত্র দিয়াছিলেন তাহা দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে নূতন কোম্পানির সহিত বিবাদ বাধাইতেই তাঁহারা সমুৎসুক। "যেমন এক রাজ্যে দুইজন রাজা থাকিতে পারেন না, তদ্রূপ এদেশেও দুইটী কোম্পানী একত্র থাকিতে পারে না। পুরাতন এবং নূতনে শীঘ্রই যুদ্ধ বাধিবে এবং ২।৩ বৎসরের যুদ্ধে যে হয় একদল জিতিবেই। পুরাতন কোম্পানীর সকল কর্ম্মচারীই দক্ষ সুতরাং যদি কর্ম্মচারীগণ রীতিমত ভাবে কার্য্য করেন, তাহা হইলে পরাজয়ের কোন সম্ভাবনাই নাই। এই প্রকার অন্তর্বিরোধে পৃথিবী হাসিবে, হাসুক—উপায় নাই।"*

একই উদ্দেশ্যে ২টী কোম্পানি স্থাপিত হওয়াতে ভারতবর্ষে বিশেষ গোলমাল বাধিয়া গেল। নরপতি তৃতীয় উইলিয়াম নূতন কোম্পানিটির দিকেই বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। সুতরাং তিনি ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে হিন্দুস্থানের সম্রাট আউরঙ্গজীবের নিকট এই সদ্যোজাত শিশুর জন্য কার্য্যাণ

* "The truth is, that the whole of this contest was only one division of the great battle, that agitated the state, between the tories and the whigs ; of whom the former favored the new Company the latter the old"...Grants' "A sketch of the History of the East India Company."

ইত্যাদি লইবার প্রত্যাশায় স্যার উইলিয়ম নরিশকে পাঠাইয়া দিলেন।

স্যার উইলিয়াম নরিস, ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দের ২৫শে সেপ্টেম্বর জাহাজ হইতে মছলিপট্টমে অবতরণ করিলেন। দুই কোম্পানির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাধ্য হইয়া, তাঁহাকে ১৭০০ সনের শেষভাগ পর্য্যন্ত সেই স্থানেই নিশ্চল হইয়া থাকিতে হইল। ১০ই ডিসেম্বর তিনি সুরাট পৌছিলেন। কিন্তু পুরাতন কোম্পানির এজেণ্ট সার জন গেয়ারের চক্রান্তে সুরাটের

Reproduced by kind permission of the Government of India.

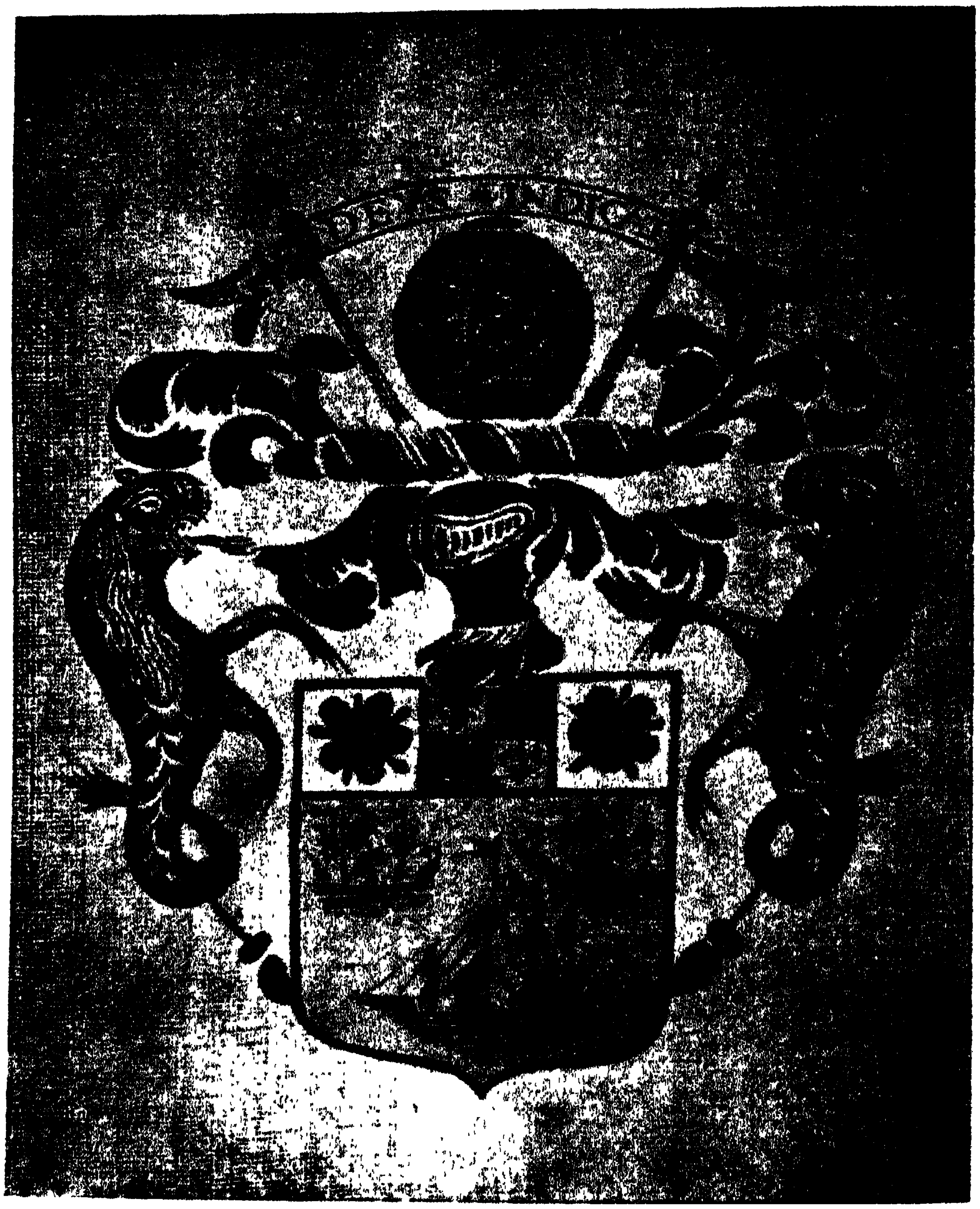

পুরাতন কোম্পানির তকমা।

শাসনকর্ত্তা নরিশকে প্রথমে রাজপ্রতিনিধি বলিয়া অভ্যর্থনা করিতে অস্বীকৃত হইলেন। কিন্তু পরে তাঁহার নিকট উইলিয়াম প্রেরিত পত্রাদি দেখিয়া তাঁহাকে বন্দরে নামিতে অনুমতি দিলেন। তখন নূতন কোম্পানির কনসাল সার নিকোলাস ওয়েট যথোপযুক্ত সম্মানের সহিত রাজপ্রতিনিধিকে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন।

১৭০১ সনের ২৬শে জানুয়ারী সার উইলিয়াম নরিস ৬০ জন ইউরোপীয়ান এবং ৩০০ শত দেশীয় সিপাহীসহ বাদসাহের ছাউনি অভিমুখে যাত্রা করিয়া ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সুরাট হইতে ৬০ ক্রোশ দূরে কোকেলি নামক স্থলে উপনীত হইলেন।

Reproduced by kind permission of the Government of India.

নব কোম্পানির তকমা।

এই স্থানে সংবাদ আসিল যে সুরাটের শাসনকর্তা, পুরাতন কোম্পানির এজেন্ট সার জন গেয়ার এবং কোম্পানির অন্যান্য কর্মচারীদিগকে আটক করিয়া কয়েদ করিয়াছেন; এবং দুই লক্ষ টাকার হুণ্ডি লইয়া, তাঁহাদের উকীল রাজদরবারে তাঁহাদের মুক্তির জন্য যাত্রা

করিয়াছেন। সম্রাটের নিকট এ সম্বন্ধে উপযুক্ত আর্জি করিবার অভিপ্রায়ে ফেব্রুয়ারী মাসের চতুর্দ্দশ দিনে নরিস সাহেব বানকোলীতে পৌঁছিয়া, কাহার আদেশে সুরাটের শাসনকর্ত্তা, সার জন গেয়ার ও কোম্পানির কর্ম্মচারীগণকে আটক করিয়াছেন তাহা জানিবার জন্য পত্রবাহক প্রেরণ করিলেন।

এই সময়ে তাঁহার সঙ্গী পদাতিকগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে। কিন্তু নরিস সাহেবের শরীর রক্ষকগণ অচিরেই সেই বিদ্রোহ দমনে সক্ষম হয়। পথে সার নিকোলাস ওয়েট, তাঁহাকে সুরাট হইতে সংবাদ দেন যে দক্ষিণ ভারতসমুদ্রের জলদস্যুর আক্রমণ নিবারণের জন্য সুরাটের শাসনকর্ত্তা তাঁহার নিকট জামিন চাহিয়াছেন। যে সমস্ত জাহাজ লণ্ডন কোম্পানির জাহাজ কর্ত্তৃক ধৃত হইবে কেবলমাত্র তাহাদের জন্য নরিস সাহেব জামিন হইতে প্রস্তুত হইলেন এবং এই সকল বিষয় সাহান সা সম্রাটের সহিত বন্দোবস্ত করিবেন তাহারও আভাষ দিলেন।

১৯শে ফেব্রুয়ারী নরিস সাহেব আওরাঙ্গাবাদের নিকটবর্ত্তী গেল গাঁ নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া সার নিকোলাস ওয়েটকে সংবাদ দিলেন যে, সার জন গেয়ার এবং লণ্ডন কোম্পানীর কর্ম্মচারীবৃন্দ মুক্ত হইলে হয় ত তাঁহারা প্রতিশোধ কামনায় সুরাট বন্দর আক্রমণ করিতে পারেন। কিন্তু রাজদরবারে ইহাতে কার্য্যের বিশেষ বিঘ্ন হইবে। সুতরাং ইহা নিবারণকল্পে ওয়েট সাহেব যেন বন্দরের নিকট একটী যুদ্ধ জাহাজ রাখিয়া দেন এবং ওরূপ চেষ্টা করিলে যেন তাহাতে অবশ্য অবশ্য বাধা প্রদান করেন। ২১শে তারিখে সার নিকোলাস ওয়েট নরিস সাহেবকে সংবাদ পাঠান যে ফার্ম্মাণ পাইবার জন্য যতটাকারই প্রয়োজন হউক না কেন, তাহা দিতে নরিস সাহেব যেন বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত না হন; এবং যাহাতে সম্রাট এ প্রস্তাব সহজেই গ্রাহ্য করেন, তজ্জন্য প্রতি বৎসরে ৬৲ টাকা দরে ছয় হাজার মণ করিয়া সীসা দিবেন, যেন এইরূপ অঙ্গীকার করেন।

৩রা মার্চ্চ নরিস সাহেব ব্রামপুরে পৌঁছেন। সেই স্থানে উজীর গাজখাঁ অবস্থিতি করিতেছিলেন। নরিস সাহেব সপারিষদ্ তাঁহার সহিত সাক্ষাতের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। উজীর এই প্রস্তাবে অসম্মত হওয়াতে মিঃ নরিস ইহাতে বিশেষ অপমানিত বোধ করিয়া উজীরের সহিত দেখা না করিয়াই ব্রামপুর পরিত্যাগ করিয়া ৭ই এপ্রিল পাণেলায় উপনীত হইলেন। সম্রাট তখন ছাউনি করিয়া এইখানেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। রাজ-প্রতিনিধি নরিসের আগমন সংবাদ সম্রাট সমীপে প্রেরিত হইবামাত্রে সম্রাট তাঁহাকে ছাউনি ফেলিতে অনুমতি দিলেন। শীঘ্রই আউরঙ্গজীবের সহিত সাক্ষাতের সময় নির্দ্ধারিত হইল এবং শোভাযাত্রা সংক্রান্ত শিষ্টাচার বিধিও ঠিক হইয়া গেল।

১৭০১ সনের ২৮শে এপ্রিল ইংলণ্ডেশ্বর চতুর্থ উইলিয়াম প্রেরিত রাজদূত ভারতবর্ষের সাহনসা সম্রাটের সহিত দর্শনাভিলাষে অগ্রসর হইলেন। সঙ্গের দলবল নিম্নলিখিত ভাবে তাঁহার সহিত যাত্রা করিলেন।

১। অশ্বপৃষ্ঠে রাজপ্রতিনিধির গোলন্দাজ সৈন্যের সেনানায়ক।

২। দ্বাদশ খানি শকটে উপহারার্থ দ্বাদশটি পিত্তলের-কামান।

৩। পাঁচখানি শকটে নানাবিধ বস্ত্রাদি।

৪। কতকগুলি শকটে নানাবিধ কাচের দ্রব্য ও দর্পণাদিসহ একশত ব্যক্তি।

৫। সুসজ্জিত দুইটী উৎকৃষ্ট আরব দেশীয় অশ্ব।

৬। রাজপতাকাধারী সাজসজ্জাবিহীন উৎকৃষ্ট আরব দেশীয় ২টা অশ্ব।

৭। উপহাররক্ষক চারিজন অশ্বারোহী গোরা সৈন্য।

৮। লোহিত, শ্বেত, এবং নীলবর্ণের পতাকা সমূহ ও সুসজ্জিত সাতটী মূল্যবান অশ্ব।

৯। রাজা উইলিয়াম ও রাজপ্রতিনিধির শিরস্ত্রাণ।

১০। বহুমূল্য রৌপ্যনির্ম্মিত জরীর কারু-কার্য্যখচিত ইংরাজী ধরণে সুসজ্জিত পাল্কী।

১১। অন্য দুইটী শিরস্ত্রাণ।

১২। সুসজ্জিত অশ্বারোহী বাদকগণ।

১৩। অশ্বপৃষ্ঠে রাজপ্রতিনিধির পদাতিক সৈন্যের লেফটেনাণ্ট।

১৪। অশ্বারোহণে সুসজ্জিত দশটি ভৃত্য।

১৫। রাজা উইলিয়াম এবং প্রতিনিধির কুলচিহ্ন। (arms)

১৬। সুসজ্জিত অশ্বারোহী ডঙ্কাবাহী। সুসজ্জিত তুরীবাদক তিন জন অশ্বারোহী সৈন্য।

১৭। রাজপ্রতিনিধির শরীররক্ষকদিগের সেনানায়ক।

১৮। ইংরাজী ধরণে বিশেষ রূপে সজ্জিত দ্বাদশ জন অশ্বারোহী সৈন্য।

১৯। রাজপ্রতিনিধির অশ্বারোহী সৈন্যের সেনানায়ক।

২০। রাজা উইলিয়াম এবং রাজ প্রতি-নিধির সুবর্ণ গিল্টি করা অস্ত্র। (Arms)*

২১। মূল্যবান পোষাক পরিহিত অশ্বা-রোহণে মিঃ মিল, এবং মিঃ হুইটেকার।

২২। উন্মুক্ত অসি হস্তে মূল্যবান পোষাক পরিহিত অশ্বারোহীসৈন্যের অধ্যক্ষ মিঃ হেল।

২৩। বহু মূল্যবান সুসজ্জিত পাল্কী আরোহণে রাজপ্রতিনিধি।

২৪। সুসজ্জিত চারি জন ভৃত্য—পাল্কীর সহিত।

২৫। রাজার পত্র সঙ্গে লইয়া মূল্যবান পাল্কিতে সেক্রেটারী এডোয়ার্ড।

২৬। এই পাল্কির উভয় পার্শ্বে অশ্বারোহী দুই জন সাহেব।

২৭। সুসজ্জিত শকটারোহণে কোষাধ্যক্ষ ও রাজপ্রতিনিধির খাস সেক্রেটারী।

আউরংজীব ইংরাজ রাজপ্রতিনিধিকে প্রকাশ্য দরবারে অভ্যর্থনা করিলেন এবং সমাদরের সহিত তাঁহাকে আসন পরিগ্রহ করিতে আদেশ দিলেন। সার নরিস তখন নূতন কোম্পানীর অবাধ বাণিজ্যের জন্য ফার্ম্মাণ প্রার্থনা করিলেন। এ প্রার্থনার উত্তর উজীরকে জানাইবেন সম্রাট এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিলেন। কয়েক দিবস

---

* প্রথমটী বহন করিতে ষোল জন বাহক লাগিয়াছিল।

পরে নরিস সাহেব সম্রাটকে নজর স্বরূপ ২০০ মোহর প্রদান করাতে আউরংজেব কিছু সন্তুষ্ট হইয়াছেন বোঝা গেল। কিন্তু এই ইংরাজ দূতের দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সময়েই সুরাট হইতে সংবাদ আসিল—যে মক্কাযাত্রীসহ তিন খানি জাহাজ ইংরাজ জলদস্যু আটক করিয়াছে। এই জাহাজগুলি যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে আইসে তাহার জন্য উজীরগণ নরিস সাহেবের নিকট প্রতিভূ চাহিলেন ও ভবিষ্যতে ইংরাজ দস্যু যাহাতে মোগলের বাণিজ্যের কোন রূপ বাধাবিঘ্ন না জন্মায় তাহার জন্যও জামিন চাহিলেন। ইংরাজ দূত এ প্রস্তাবে অসম্মত হওয়াতে সম্রাট কোন রূপ ফার্ম্মাণই দিলেন না। বাধ্য হইয়া এই নবেম্বর সার নরিস মোগলছাউনি পরিত্যাগ করিলেন। সম্রাটের মন্ত্রীগণ নরিসকে জলদস্যুর জামিন লইতে সম্মত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং ব্রামপারে কয়েক দিন তাঁহাকে এক প্রকার আটকাইয়াও রাখিলেন। ইতি মধ্যে ইংলণ্ডেশ্বরের জন্য সাহানসা প্রেরিত এক পত্র ও তরবারি পৌঁছিল এবং ৭ই জানুয়ারী নরিস তাঁহার গন্তব্য পথে অগ্রসর হইলেন। ১২ই এপ্রিল সুরাট পৌঁছিয়া তিনি ২৯শে তারিখে জন্মভূমি অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। দুঃখের বিষয় তিনি সেণ্ট হেলেনা পৌঁছিবার পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

এই দৌত্যকার্য্যে কোন সুবিধা হওয়া দূরে থাকুক ইংরাজ কোম্পানীর যথেষ্ট অর্থধ্বংস হইয়াছিল। পরন্তু সম্রাটের আদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে অসম্মত হওয়াতে এবং ইংরাজ জলদস্যুগণের অত্যাচার দিন দিন বর্দ্ধিত হওয়াতে সম্রাট ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহার সাম্রাজ্যের প্রত্যেক ইউরোপীয়ানকেই কারাগারে নিক্ষেপের আদেশ দেন।*

পরবর্ত্তী প্রবন্ধে আমরা অন্য দৌত্যের বিবরণীতে দেখাইব যে সেবার ইংরাজ ইচ্ছানুযায়ী সফল কাম হইয়াছিলেন।

এই প্রবন্ধের সহিত আমরা নূতন ও পুরাতন কোম্পানির তখনকার তকমা (Arms) চিত্র সংযোজিত করিলাম।

পুরাতন কোম্পানির তকমা উজ্জ্বল বিচিত্র বর্ণের আর নব কোম্পানির তকমার রংচং অপেক্ষাকৃত কম। এ সম্বন্ধে Sir George Birdwood যাহা বলিয়াছেন তাহা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। "The change of arms and particularly in the dominant colours of the arms of the East India Company, as shown in Plates I and II foreshadowed its transformation from a mercantile corporation into a great military power."

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

* Stuart. Also Broome P. 32.

প্রেম।

কাল রজনীতে উঠেনিক চাঁদ, ফুটেনি একটি তারা,
আঁধারের মাঝে বিরহী বাতাস হয়েছিল দিশাহারা ;
জোনাকি জ্বলেনি যূথিমালঞ্চে ঝিঁঝিঁট ডাকেনি ঝাড়ে,
টিটিপাখী শুধু টিট্‌কারি দিয়ে কেঁদেছে দীঘির পাড়ে ;
তারি মাঝে আমি ইমন-বেহাগে সেধেছিনু বাঁশীখানি,—
কেহ না শুনুক্ তুমি শুনেছিলে, মনে মনে তাহা জানি।

আজ রাতে যবে ঝরঝরধারে বাদর ঝরিছে মেঘে,
হরষ-সরস কণ্ঠ তুলিয়া ভেকেরা উঠেছে জেগে ;
ঘরে ঘরে ঘরে শিকল বাজিয়ে বায়ু দিয়ে যায় নাড়া,
আর্দ্র পাতায় সিক্ত শাখায় পাখীরা না দেয় সাড়া ;
কাহার হৃদয় কাঁপিছে সেতারে মল্লারে মীড় টানি ;—
সে ব্যথা কাহার, কেহ না জানুক—আমি তাহা ভাল জানি।

কোথায় কাঁপিছে করুণ সেতার, কোথায় কাঁপিছে বাঁশী,
দুটি অন্তর কতদূর থেকে তবু কত পাশাপাশি !
দুটি হৃদয়ের ইঙ্গিত দিয়া হৃদয়ের বিনিময়,
দুটি সুকরুণ সঙ্গীত মাঝে সুনিবিড় পরিচয় !
কোথা প'ড়ে আছে দেহের সীমানা, কোথা মিলে আসি' প্রাণ,
অন্তরায়ের অন্তর টুটি' মিলনের মহা গান !

এমনি যেন গো চিরদিন ধরে' দূরে থেকে থাকি কাছে,
এর বেশী যেন চেয়ে কোনদিন কাঁদতে না হয় পাছে !
অন্তর মাঝে থাকিতে আলোক দূরে কেন তারে খুঁজি ?
ভাল করে' যেন বুঝিবারে গিয়ে মূলেই ভুল না বুঝি !
দূরে থেকে যেন চিরদিন রাত দুজনারে বাসে ভালো,—
দুখানি হৃদয় উজলিয়া রাখে প্রেমের অমৃত আলো !

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী বি, এ।

পোষ্যপুত্র।

২৯

জল খাবাবের কাছে দাঁড়াইয়া রজনীনাথ যখন প্রত্যাশা পূর্ণ উৎসুকনেত্রে চাহিয়া দেখিলেন তখন সে ঘরের চারিদিককার অসম্পূর্ণতা তাঁহাকে প্রায় বিহ্বল করিয়া তুলিল। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই একহাতে একটা পাথরের গ্লাসে বরফ দেওয়া জল ও অপর হস্তে পুত্রের হাত ধরিয়া শিবানী সেই ঘরে প্রবেশ করিল, রজনীনাথ তাহাদের দিকে সস্নেহে একবার চাহিয়া দেখিয়া আসনের উপরে বসিলেন। যেখানটাকে মরুভূমি বলিয়া মনে একটা সন্দেহের আতঙ্ক জাগিয়া উঠিয়াছিল সেটা যদি হঠাৎ নদীতীরের বালুকা বলিয়া জানিতে পারা যায় তাহা হইলে তৃষ্ণার্ত্ত যেমন আরামের নিশ্বাস পরিত্যাগ করে তাঁহার ও সেই রকম একটা নিশ্বাস বাহির হইল। শিবানী জলের গ্লাসটা নামাইয়া দিয়া রজনীনাথের পায়ের কাছে প্রণাম করিল। ছেলেও মায়ের দেখাদেখি মাটিতে মাথা ঠুকিয়া একটা দীর্ঘচ্ছন্দের প্রণাম করিয়া অভ্যাস মতন এই অপরিচিতের সম্মুখে চুম্বনের দাবীতে মুখ বাড়াইয়া দিল। প্রণাম প্রাপ্তির পর চুম্বন প্রত্যর্পণ যে একটা অকাট্যনীতি সে বিষয়ে তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। হাসিয়া রজনীনাথ বিনোদের পুত্রকে কোলে তুলিয়া লইলেন। মুখের ভাব গায়ের রং চোখের দীপ্তি তাঁহার স্মৃতিসাগর মথিত করিয়া আবার একটা নিশ্বাস বহন করিয়া আনিল। কিছুই ফুরায় না; পুরাতন নূতন হইয়া দেখা দেয় মাত্র! শিশুর দাবী মিটাইয়া দিয়া তাহাকে নিজের রেকাব হইতে ফল ও মিষ্টান্ন দিয়া বশ করিবার চেষ্টায় তাঁহাকে ব্যর্থ হইতে হইল। ন্যায়পরায়ণ হাকিমের মতন সে ঘুষের প্রলোভন জয় করিয়া নিজের পাওনাটি মাত্র আদায় করিয়া লইয়া মার কাছে ফিরিয়া আসিল। রজনীনাথও তখন ভাল করিয়া সেই দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন। একি! তপস্যাপরায়ণা উমার সজীব যোগিনী মূর্ত্তি কোন সুনিপুন চিত্রকর এখানে সাজাইয়া রাখিয়া গিয়াছে? এই কি বিনোদকুমারের অনাদৃতা পত্নী! রজনীনাথ অত্যন্ত বিস্ময় অনুভব করিলেন। বিনোদকে তিনি জানিতেন, সুধু তাহার বাহিরটা নয় তাহার অন্তঃপ্রকৃতির সহিতও তাঁহার কিছু কিছু পরিচয় ছিল। তাই কল্পনায় যে ঈষৎ সুশাঙ্গী গৌরবর্ণা লজ্জাসঙ্কুচিতা অশ্রুম্লান নারীমূর্ত্তি কোন এক অজ্ঞাত সময়ে আপনা আপনি তাঁহার মনে চিত্রিত হইয়া গিয়াছিল—এখন অত্যন্ত সহজ এই রমণী তাহাকে ধিক্কারের সহিত বিদূরিত করিয়া সেইখানে ফুটিয়া উঠিল। অবিচার করিয়া কাহারও দণ্ডবিধান করিবার পর তাহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া জানিতে পারিলে বিচারক যেমনতর একটা উৎকট আত্মগ্লানি অনুভব করিতে থাকেন রজনীনাথ সেই রকম এই স্বামীত্যক্ত রমণীর দিকে চাহিয়া মাথা নীচু করিলেন। এতো উপেক্ষিতা মুখ নয়! এ দৃষ্টির নির্ভীকতা, আত্মনির্ভরশীলতা ও একান্ত দৃঢ়ভাব তাঁহার মানব চরিত্র সম্বন্ধে পূর্ণ অনভিজ্ঞতার কথাই

বিবাহ-খেলা—ফুলের মালা

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায় অঙ্কিত চিত্র হইতে

ব্যক্ত করিতে লাগিল। মনে মনে পরাজয় স্বীকার করিয়া বলিলেন, "আশ্চর্য্য! আমি আশ্চর্য্য হইলাম, বিনোদ কি তবে আমি যেমন মনে করি তেমন নয়? সাধারণ লোকের মত একজন খেয়ালি যুবক মাত্র?" রজনীনাথ যে পরিমাণে বিনোদের পরিত্যক্ত স্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা মমতা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন সেই পরিমাণেই বিনোদের চরিত্রের লঘুতা তাহার প্রতি তাঁহাকে শ্রদ্ধাহীন করিয়া তুলিল। এমন রত্ন পাইয়াও তাহার মর্য্যাদা বুঝিল না সে এমনি পাষণ্ড? এমনি সময় শিবানী তাহার আনত নেত্রদ্বয় তুলিয়া একটু অনুযোগের স্বরে কহিল "আপনি বস্‌লেন না?" রজনীনাথ শিবানীর কথায় ও স্বরে একটু খানি কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু বিস্ময় বোধ করিলেন না,—এই রকমই স্বর যেন এ রকম মুখ হইতে ঠিক মানায়,—অনুযোগ পূর্ণ আদেশের স্বর। হাত ধুইয়া রেকাবটা একটু খানি কাছে টানিয়া লইলেন ও তারপর একটু খানি কি ভাবিয়া হঠাৎ মুখ তুলিয়া শিবানীর অকুণ্ঠিত মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন "আমার ছোট মেয়ে তার দিদির কাছে যে দোষ করেছে তার ক্ষমা পেতেও বোধ হয় বেশি দেরি হয়নি, নয় মা?" শিবানী কখনও পিতৃস্নেহ জানিত না; শ্বশুরের নিকট আসিয়া অবধি সে তাঁহার স্নেহোদ্বেলিত হৃদয়ের যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছিল বটে, কিন্তু সে স্নেহে সে যেন সান্ত্বনা খুঁজিয়া পাইত না। যেখানে অধিকারের অকুণ্ঠিত গর্ব্বে সে স্থান পায় নাই, সেখানে চোরের মতন প্রবেশ করিয়া পর্য্যন্ত সে অপরাধকুণ্ঠিত হইয়া আছে। পরের পূর্ণ অধিকারকে খর্ব্ব করায় সে দারুণ আত্মগ্লানি অনুভব করিতেছিল—তাই তাহাকে এখানকার কোন পাওনাই হাসিমুখে লইতে দেয় না। কিন্তু রজনীনাথের কথা কয়টা তাহাকে আজ অপ্রত্যাশিত ভাবে চকিত করিয়া তুলিল। কে জানে কেন সহসা তাহার সর্ব্ব শরীরকে কণ্টকিত করিয়া আনন্দের একটা তাড়িৎ শিরার ভিতর দিয়া দিয়া বহিয়া গেল ও আচমকা তাহার কঠিননেত্র অশ্রুজলের একটা প্রবল উচ্ছাসে স্পন্দিত হইয়া উঠিল। শিবানী এক মুহূর্ত্তকাল আবেগ রুদ্ধ কণ্ঠে চুপ করিয়া রহিল ও তার পর নতনেত্রে কম্পিতকণ্ঠে উত্তর করিল "দিদি আমার কাছে আসবার জন্যে কত ব্যগ্র হয়ে রয়েছে তা কি আমি জানি না বাবা? কিন্তু ঠাকুরপো আমার সঙ্গে বাস করতে ইচ্ছুক নন। আপনি আমার একটা কিছু বন্দোবস্ত করে দিন। আমার জন্যে এতবড় সংসারটা না নষ্ট হয়ে যায়—

শিবানী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া আসিলেও শত বার সঙ্কোচ ও আত্মাভিমান আসিয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরিতে লাগিল ও সমস্ত শরীরের ভিতর যেন হিম হইয়া আসিতেছিল তথাপি কোন বাধাই আজ সে গ্রাহ্য করিল না।

শিবানীর কথাগুলা কিন্তু রজনীনাথের কানে একটু অদ্ভুত রকম শুনাইল। কি যেন একটা অজানিত আশঙ্কার আভাসে তাঁহার চিত্ত স্পন্দিত হইয়া উঠিল। এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া তার পর ধীরে ধীরে সস্নেহকণ্ঠে বলিলেন,—

"মা, জগতে ন্যায় সত্য ও ভালবাসারই জয় হয়ে থাকে। অন্যায়ের প্রশ্রয় বা পুরস্কার

বিধাতার হাতে কেউ কখনও পায়নি। তোমার স্নেহ তাদের তোমার পাশে দাঁড়াবার উপযুক্ত করে গড়ে নেবে মা, আমি আজ থেকে তাদের জন্ম আরও বেশি নিশ্চিন্ত হতে পারব। সেতো তার অন্যায় আচরণের ক্ষমা চাইতে কুণ্ঠিত হয়নি?"

ভাল করিয়া কিছু বুঝিতে না পারিয়া শিবানী একটু ভাবিয়া বলিল "সেতো কিছু দোষ করেনি বাবা! ঠাকুরপো তাকে ত জোর করে নিয়ে গেল। সে যে কিছুতেই যেতে চায়নি! সেদিনকার সে মুখ যে আমি কিছুতেই ভুলতে পারচি না"—বলিতে বলিতে অশ্রুভারাক্রান্ত রুদ্ধকণ্ঠে ব্যথিতা শিবানী সহসা থামিয়া গিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। তাহার আত্মবিস্মৃত অশ্রুবিন্দু ক্রোড়স্থ শিশুর অঙ্গে পড়াতে সে তাহার সম্মুখস্থ অপরিচিত "দাদাবাবুর" উপর হইতে বিস্মিত দৃষ্টি তুলিয়া মায়ের মুখে স্থাপন করিয়া বিস্ময়-নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। এ রকম কাণ্ডটা বড় একটা তাহার চোখে পড়ে না, মায়ের কোল ও তাহার চোখের জল দুইই এখন তাহার কতকটা অপরিচিত। রজনীনাথের গম্ভীর বিচারকের দৃষ্টি মুহূর্তে বিস্ময় চকিত হইয়া উঠিল, ঈষৎ কম্পিত-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন "সেকি তবে বাড়ির লোকদের অনাদর সহ্য করতে না পেরে চলে যায়নি? সেতো এ কথা আমায় বল্লে না।"

শিবানী তীব্রভাবে কহিল, "আপনি কি তাই মনে করেছিলেন নাকি? সে কি সেই রকম মেয়ে?" এ ভর্ৎসনা রজনীনাথকে খুব আঘাত দিয়াই বিঁধিল। কয় দিন হইতে একটা নিদারুণ অনুতাপে তিনি দগ্ধ হইতেছিলেন। তাঁহার অন্তর তাঁহাকে বলিতেছিল "সে কি এমন কাজ করিতে পারে! তিনি সম্ভবত তাহাকে বৃথা দোষী করিয়াছেন!"

শিবানীর কথায় তাঁহার মনেরই যেন প্রতিধ্বনি বাজিয়া উঠিল! সত্যই তো সে তো এ রকম দুর্বিনীত ব্যবহার করিবার মত মেয়ে নয়। এ কথাটা তিনি কেন ভাবিয়া দেখিলেন না? পরের ছেলের উপর রাগ করিয়া কেন নিজের সন্তানকে এমন কঠোর দণ্ড দিলেন? রজনীনাথ অস্পর্শিত আহার্য্য ছাড়িয়া সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া অনুতাপবেদনাপূর্ণ কণ্ঠে সাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন, "তাই বুঝি গতি রাগ করে আমার কাছে আসেনি! মা তাকে একবার ডাক তো। বল তার অনুতপ্ত বাপ তার জন্যে তার চির-স্নেহের কোল পেতে রেখেছে; তাকে বুকে নেবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে তার প্রতীক্ষা করচে।" পিতার কণ্ঠস্বর বাষ্পজড়িত হইয়া রুদ্ধ হইয়া আসিল, মনের দুর্ব্বলতা চাপিয়া ফেলিবার জন্য তাড়াতাড়ি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইলেন। কি বিস্ময়! শিবানী বিস্ফারিত নেত্রে আশ্চর্য্য হইয়া চাহিল, অসাবধানে তাহার মাথার কাপড়টা মাথা হইতে খসিয়া পড়িয়াছিল তাহা সে জানিতে পারে নাই, এলোচুলগুলা বাতাসে উড়িয়া মুখে বুকে ছড়াইয়া পড়িয়া সেই যোগিনী মূর্ত্তির অসম্পূর্ণতা পরিপূরণ করিয়াছিল। অমূল্য মার কোল হইতে নামিয়া তাহার পিঠের উপর পড়িয়া সেই জটা-বাঁধা চুলগুলা লইয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়া দিল, শিবানী ভাল করিয়া সে সবং কিছু জানিতেও পারে নাই। কিছুক্ষণ সে নির্ব্বাক

হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল "আপনি কাকে ডেকে দিতে বলচেন?" বিস্মিত হইয়া রজনীনাথ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন "শান্তিকে শান্তিকে!" "এখানে শান্তি কোথায়? তারা তো কদিন হলো আপনার কাছেই গ্যাছে"—

রজনীনাথের বুকের ভিতরে একটা আঘাত পড়িল,—"সে কি! আমি যে তাদের সেই রাত্রেই এখানে ফিরিয়ে পাঠিয়েছি, হেম এখানে আসেনি?"

রজনীনাথের বিলম্ব দেখিয়া ও নিজের মনের দুর্ব্বলতায় তাঁহার প্রতি সমুচিত সমাদর না দেখাইতে পারায় অনুতপ্ত হইয়া শ্যামাকান্ত তাঁহার অনুসন্ধানে আজ কয়েকদিন পরে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেছিলেন, দ্বারে রজনীনাথের কথা কয়েকটা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল, কাম্পতশ্বাসে বলিয়া উঠিলেন "হার হরি এমন কাজও করে! সে পাষণ্ড সকল আক্রোশ আমার মার ওপোরেই মেটাবার জন্যে তাঁকে এখানে আনেনি।" বৃদ্ধ হতাশ্বাসে কপাট ধরিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন। বাসার কাছে আসিয়া পক্ষীমাতা তাহার ছোট শাবকটিকে অপহৃত দেখিলে এই রকমই অনুপায় ক্ষোভে বুঝি লুটাইয়া পড়ে। শ্বশুরের আগমনে শিবানী আত্মসম্বরণ করিয়া লইয়াছিল, মাথার কাপড়টা যথাস্থানে স্থাপন করিয়া রুক্ষ চুলগুলাকে অবহেলার সহিত হস্ত তাড়নায় বিতাড়িত করিয়া অকম্পিত পদে উঠিয়া দাঁড়াইল।

অমূল্য ব্যাপার কি না বুঝিয়াও ব্যাপার কিছু কঠিন ইহা বুঝিতে পারিয়া মাতার কাপড়ের একটা প্রান্ত শক্ত করিয়া ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া সকলকার মুখের দিকে এক একবার করিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। তাহার প্রতিও সকলকার একটা অবহেলার ভাব তাহার বড় ভাল লাগিতেছিল না। তাহার পর সকলকার মুখেই যেন একটা আসন্নপ্রায় ঝড়ের চিহ্ন—অভিমানে তাহার রাঙ্গা ঠোঁট ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। রজনীনাথ শিশুর দিকে চাহিয়া দেখিয়াই তাহার নিকটে আসিয়া তাহার মাথায় হাত রাখিয়া আদর করিয়া বলিলেন, "এসতো দাদা আমরা বাইরে যাই ঘরে বড় গরম হচ্চে।" বলিয়াই তাহার সম্মতির অপেক্ষা না করিয়াই তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া অগ্রসর হইতে হইতে শ্যামাকান্তর দিকে না ফিরিয়াই কহিলেন "আসুন চৌধুরী মশায় ভাইটিকে নিয়ে একটু খেলা করা যাক।" শিবানী ও শ্যামাকান্ত অনেকখানি বিস্ময়ের সহিত তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিলেন।

সকলে চলিয়া গেলে ঝড়ের মতন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সিদ্ধেশ্বরী সক্রোধকণ্ঠে কন্যাকে বলিয়া উঠিলেন "হ্যাঁলো শিবি তোর জ্বালায় কি আমি গলায় দড়ি দোব নাকি লো? বলি এই কি তোর বুদ্ধি সুদ্ধি হচ্চে? এতদিন ধরে যে এত শিখানু পড়ানু তার কি এই প্রতিফল দিলি?" শিবানী মাটি হইতে চোখ তুলিয়া দৃঢ় স্বরে জিজ্ঞাসা করিল "কি করেছি?" "কি করিস্‌নি তাই বল। ও মিন্সেকে অত আপ্যায়িত করে তোর কি লাভ বল দেখি? শত্তুর গেছে সাতটা সরষে দে গঙ্গাছান করে আয়গে—তা না মেয়ের সপ্তসিন্ধু উথলে উঠলো! দেখ্ ওসব অসইরণ দেখতে পারিনে! এখন ছেলে যে ডাইনের হাতে

পড়ল তার হুঁস্ আছে! যা ছেলেকে চেয়ে আনাগে; যদি ছেলে বাঁচাতে চাস্ তো ওঠ।”

শিবানী শক্ত হইয়া পা দিয়া মাটী চাপিয়া দাঁড়াইল। তাহার শীতল হাত পা গরম হইয়া আসিল; কঠিন কণ্ঠে সে কহিল “না মা আমি ছেলে চেয়ে আনাব না! কেন তুমি অমন করে কেবলি ওঁদের অপমান কর! কেন তুমি ওসব কথা বল!” বলিতে বলিতে সহসা সে রুদ্ধবাক্ হইয়া দ্রুতপদে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। সিদ্ধেশ্বরী অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। শ্রীহরি! এত করিয়াও মেয়েব মন পাইলেন না! এমন বোকা একগুঁয়ে মেয়েও গর্ভে ধরিয়াছিলেন! এ'কেই বলে “যার বে তার মনে নেই পাড়াপড়সির ঘুম নেই! চুলোয় যাক—তোর যদি পেটের পোর ওপোর দরদ নেই তবে আমারই বা কিসের গরজ এত! আমার তোরা কি করবিরে বাবু! বড় কল্লেন পেটের পো আর কর্বেন নাতি! আমার যা আছে তাই কে খায় ঠিক নেই! হরি বল মন!” অভুক্ত আহার্য্য পাত্রটার দিকে চোখ পড়ায় ও বারান্দায় মাসির গলার সাড়া পাইয়া তাঁহাকে শুনাইয়া বলিলেন “মিন্‌সের দেমাক দেখেচো, ওমা মেয়েটা এতটা খেটেখুটে খাবার তৈরি করলে গো একটু খুঁটেও মুখে দিয়ে দেখলে না! হিংসে সুধু হিংসে! পোড়া মেয়ে আবার ওদের জন্যেই মরেন।” মাসিমাতা চিন্তা রুগ্ন পূর্ব্বক এক হাতে হরিনামের মালা ও অন্য হস্তে বস্ত্রপ্রান্ত ধরিয়া উঁকি দিয়া ঘরের মধ্যে চাহিয়া দেখিয়া একটুখানি হাসিয়া কহিলেন, “কলকেতার লোকদের বেন ধরণই ঐ!”

তাঁহার মনে পড়িল এই ঘরেই রজনীনাথকে তিনি নিজে কাছে বসিয়া কত যত্ন করিয়া খাওয়াইয়াছেন। তাঁহার পুরাণ রসিকতায় যোগ না দিয়া রজনীনাথ মেয়ের সামনে কুণ্ঠিত হইয়া পড়ায় বেরসিক বলিয়া সে দিনও কত উপহাস করিয়াছিলেন। তাঁহার রন্ধনের সুখ্যাতি শুনিবার জন্য, “তোমার খাবার কষ্ট হল—এ রান্না খাবে কি করে” এইরূপ কত কথা বলিয়া নানা ছলে অজস্র প্রশংসালাভ করিয়া মন খুলিয়া সার্টিফিকেট দিয়াছেন,—খাইয়ে এমন সুখ কিন্তু কারুকে হয় না বাবু! আজ তাই সেই রজনীনাথের কাচ হতে চরিত্র পর্য্যন্ত মসিলিপ্ত করিবার পক্ষে সাক্ষ্য দিতে তাঁহার মনেও একটু বিঁধিল, তাই ঠিক সায় দিয়া যাইতে পারিলেন না।

সেদিন বাড়িবন্ধনের মন্ত্রটি মাসিমার পরিবর্ত্তে মাসিমাকে শিখাইবার প্রতিজ্ঞা করিয়া সিদ্ধেশ্বরী অপ্রসন্ন নীরসমুখে সন্ধ্যা করিবার জন্য ঠাকুরঘরে যাইবার সময় তুলসীতলায় প্রণাম করিয়া কন্যার মতি গতি পরিবর্ত্তনের মূল্যস্বরূপ সওয়া পাঁচ টাকার হরিরলুট তুলসী ঠাকুরকে মানত করিয়া গেলেন। নিজের দ্বারা যাহা সাধন করা যায় না মানুষমাত্রেই সেখানে দেবতার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া থাকে। সিদ্ধেশ্বরী এতখানি বয়সের অশ্রান্ত চেষ্টাদ্বারাও যখন তাঁহার এই একরোখা জেদী মেয়েটিকে নিজের আয়ত্তগত করিয়া উঠিতে পারিলেন না তখন আত্মশক্তিতে বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিয়া একান্ত অসহায় ভাবে দেবতার শরণাপন্ন হইয়া পড়িয়া তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন “দেখি তুমি কত জাগ্রত

ঠাকুর, আমার একটা মাত্তর মেয়ে ওকে নিয়েই আমার সংসার,—ওর যাতে সংসারের ওপোর মন হয় তাই কর ঠাকুর, তাই কর।" ঠাকুর কি অলক্ষ্যে থাকিয়া হাসিয়া বলিয়াছিলেন "তথাস্তু"।

(৩০)

নদীটি নিতান্ত ছোট না হইলেও খুব বড় নয়। বর্ষায় পাহাড়ের জল নামিয়া যেমন পূর্ণ দেখাইত শীতের আরম্ভে তাহার অর্দ্ধেক কমিয়া গিয়া তীরের নুড়ি শামুক ও বেলেমাটির অনেক দূর পর্য্যন্ত বাহির হইয়া গিয়াছে। পরিষ্কার জলের নীচে বাতাসের হিল্লোলে জলের সঙ্গে সঙ্গে বালির উপর নুড়িগুলি পর্য্যন্ত যেন কাঁপিয়া উঠিতেছে; তীরে মৃদু ঢেউগুলি ক্রীড়াস্থলে আঘাত করিতে করিতে অস্ফুটবাক্ শিশুর মত আধ আধ কলকণ্ঠে টলিয়া পড়িতেছে। স্নেহময়ী জননী ধরিত্রী কখনও সোহাগের আবদার কখনও অভিমানের ক্রন্দন কখনও ক্রোধের নিষ্ফল তাড়না অচঞ্চল হাসিমুখে চিরদিন ধরিয়া গ্রহণ করিতেছেন,—বিকার নাই বিরাগ নাই মাতৃ স্নেহের মতনই তাহা অকুণ্ঠিত, সাংস্ফূর্ত্তাপূর্ণ ও দ্বিধাহীন। মা জননীর জননী! তোমার ঐ নীরব স্নেহধারায় অভিষিক্ত হইয়া পলে পলে কতখানি গ্রহণ করিতেছি তাহার কতটুকুই বা আমরা ভাবিয়া দেখি না! নদীর নাম বিরূপাক্ষী! বিরূপাক্ষীর পূর্ব্বতীরে একটি নূতন বাঁধান ঘাট। উপরে আম নারিকেল প্রভৃতি ঘন বিন্যস্ত বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য দিয়া একটি মাঝারি রকম দোতলা বাড়ি দেখা যাইতেছিল। পূর্ব্বে এইখানে একজন নীলকর সাহেবের কুঠি ছিল, তারপর বাঙ্গলা দেশ হইতে নীলের চাষ উঠিয়া গেলে সাহেব কুঠি তুলিয়া দিয়া দেশে গিয়াছেন। সেই পর্য্যন্ত এখানে কেহ বাস করে নাই। বাগানটা জঙ্গলে ও বাড়িটা ভগ্ন স্তূপে পরিণত হইবার আর খুব বেশি দেরী নাই—এমন সময় বিরূপাক্ষীর নৌকা-যাত্রীর কৌতূহল পূর্ণ দৃষ্টির উপর দেখিতে দেখিতে বাড়িখানা মেরামত হইয়া ঝকঝকে হইয়া উঠিল এবং বাড়ীর আশেপাশের জঙ্গলও দিব্য একটি সুন্দর ফুলবাগানে গড়িয়া উঠিল। নদীতে বর্ষায় ভিন্ন অন্য সময়ে নৌকাও বেশি চলিত না। কিন্তু যাহারা সেপথে যাতায়াত করিত আশ্চর্য্য হইয়া মুগ্ধনেত্রে নব নির্ম্মিত উদ্যানে ক্রীড়াপরায়ণ বালকগুলির দিকে চাহিয়া দেখিত। দেখিত ছেলেরা নিজের হাতে মাটি নিড়াইতেছে, নিজের হাতে জল আনিয়া খাইতেছে, নিজেরাই গাছ কাটিতেছে, আবার ফুল তুলিয়া, মালা গাঁথিয়া, তোড়া বাঁধিয়া, পরস্পরকে দান করিয়া, লাফাইয়া খেলিয়া, হাসিতে কথায় নির্জ্জন নদীতটে স্বপ্নরাজ্য রচনা করিতেছে। নির্জ্জীবতম প্রশান্ত বালকগণ ম্লান পাণ্ডুর মুখে তাহাদের দিকে চাহিয়া ভাবিত, তাহারা কি আরব্য উপন্যাসের মধ্য হইতে বাহির হইয়া সদ্য এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে? মৃত্তিকা কলসে জল আহরণ বেড়াবাঁধা হইতে সমকণ্ঠে সন্ধ্যাবন্দনা, সংস্কৃত শ্লোকাবৃত্তি মুগ্ধযাত্রীগণের বিস্মিত চক্ষে পুরাকালিন পুণ্যাশ্রমবাসী ঋষি-কুমারগণের সৌম্যসুন্দর তরুণ মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া তুলিত। কোন কোন প্রবীন ব্যক্তি মুগ্ধকর্ণে "চিদানন্দরূপ শিবোহং শিবোহং"

শুনিতে শুনিতে অশ্রুবিগলিত গদ্ গদ্ স্বরে বলিয়া উঠিতেন "আবার হবে রে, আবার আসবে, সেদিন আবার ফিরে আসবে।"

নিকটে দ্বিতীয় লোকাবাস নাই, বাগানের পশ্চাতে দু-একটা সরিষাক্ষেত্র পার হইলে গ্রামের সীমানা চোখে পড়ে ও কোলাহলধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করে। সকালে সন্ধ্যায় কিন্তু সেই নির্জ্জন তট হাসির কাশীর কলহের ও ইষ্টমন্ত্র পঠনের ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক প্রকার শব্দদ্বারা মুখরিত হইতে থাকিত। গ্রাম্য শিশুগণের বাহু দ্বারা তাড়না প্রাপ্ত ঘুমন্ত তরঙ্গ শিশুগণ ছলছল কলকল শব্দে কাঁদিয়া কাঁদিয়া উছলাইয়া পড়িত। নদী সুন্দরীর সুন্দর প্রতিবিম্ব বক্ষে ধারণ করিয়া কৃতজ্ঞতা স্বরূপে শীতলতা দান করিত; বৃদ্ধার ভক্তি জলাঞ্জলি ইষ্টদেবতার চরণে নীরবে অর্পণ করিয়া মানবের সুখদুঃখের নিত্য ভাগ গ্রহণ করিত। তার পর নদীতীরের গাছগুলি যখন দীর্ঘচ্ছায়া জলে ফেলিয়া উত্তপ্ত ক্লান্ত শ্বাস ফেলিতে থাকে এবং আমবাগানের মধ্য দিয়া নিমগাছের ছায়াবহুল ঘন শাখা পল্লবে ঢাকা শীতল অঙ্ক দিয়া, বটফল-বিছানো সেফালিকা ছড়ানো আঁকাবাঁকা পথ দিয়া, তাবিজ লঙ্কফুল কলসীর গাত্রে বাজাইয়া, সিক্তবসনা হাস্যাধরা গ্রাম্যবধূরা পরস্পরে সুখদুঃখের আলোচনা করিতে করিতে গ্রামের ভিতর ফিরিয়া যায় ও গ্রামের কৃষাণযুবকগণ কাঁচালঙ্কা ও লবণের সাহায্যে বাসীভাতে উদর পূর্ণ করিয়া প্রফুল্ল চিত্তে বাগানের উত্তর দিকে ফিরিয়া মোটা সুর হাঁকিয়া ক্ষেতের পথ ধরে, সেই সময় এই নির্জ্জন নদীতীর যোগা-শ্রমের মতন নিস্তব্ধ হইয়া যায়। নিঃশব্দ প্রকৃতি তাঁহার শান্ত করুণ চোখ দুখানির পাতা মুদিয়া বিশ্রাম শয়নে যেন বালিকার মতন ঘুমাইয়া থাকেন, রৌদ্রতপ্ত বাতাস নিবিড় বৃক্ষচ্ছায়ায় স্নিগ্ধ হইয়া আসিয়া ললাটে মৃদু মৃদু হাত বুলাইতে থাকে, দূর শস্যক্ষেত্র হইতে বা ছায়ানিবিড় বটবৃক্ষ তলস্থ বিশ্রাম শয্যা হইতে কচিৎ কোন একটা পরিচিত রাগিণীর একটি চরণ আকুল করুণ সুরে ভাসিয়া আসিতে থাকিলেও সেই বিশ্রাম সুখের কিছুমাত্র ব্যাঘাত জন্মায় না। শ্যামল লতাগুল্মের ফাঁকে ফাঁকে সূর্য্যালোক ঝিলমিল করিয়া সকৌতুকে উঁকি দিয়া রাঙ্গামুখে চাহিয়া চাহিয়া সরিয়া যায়। মুখের উপর রেখাপাত করিতে যেন সাহসী হয় না। ঝোপের মধ্যে লুকাইয়া পাখীরা কূজন করিয়া উঠিলে বাতাস একটু চঞ্চল হইয়া উঠিয়া ঘনঘন নিশ্বাসে তাহাদের সতর্ক করিয়া দিয়া আবার নিজের সস্নেহ পরিচর্য্যা গ্রহণ করিয়া ধীরে ধীরে বহিতে থাকে। কোলের ছেলেটিকে ঘুম পাড়াইয়া মা যেমন সতর্কস্নেহে সজাগ হইয়া থাকেন সেও যেন তেমনি করিয়া জাগিয়া মাথার কাছে বসিয়া আছে। কোথাও একটা সাড়া পাইলে নিশ্বাস টানিয়া উৎকর্ণ হইয়া ফিরিয়া চাহে ও নিঃশব্দে তর্জ্জনি তুলিয়া নিবারণ করিয়া থামাইয়া দেয়।

কিন্তু দ্বিপ্রহরের নিস্তব্ধ প্রকৃতির বিশ্রাম সুখ অব্যাহত রাখিয়াও সেই শান্ত তপোবনের মধ্যস্থ গৃহ হইতে একটা স্ফুট অস্ফুট শব্দলহরী তাহার স্তব্ধতার কেন্দ্রে কেন্দ্রে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিতে থাকিয়া সুদূর মধু-চক্রে মধুমক্ষিকার গুঞ্জনের মতন একটা

মৃদু তানলয়যুক্ত শব্দবহন করিয়া আনিত! শিশুকণ্ঠের অস্পষ্ট আবৃত্তি হইতে ভিন্ন ভাষার সুস্পষ্ট উচ্চারণ আবার একবার সেই পুরাকালের স্মৃতি জাগাইয়া দিয়া যায়। সে শব্দ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার। কারণ এই বাড়িখানি একটি স্কুলবাড়ি বা স্কুল বোর্ডিং।

অপরাহ্নের ক্ষীণচ্ছায়া দূরে সরাইয়া ফেলিয়া হীনতেজ সূর্য্যকিরণ দেয়ালের উপর হইতে সরিয়া সরিয়া ক্রমে ছাদের আলিসার উপর—আরও দূরে আরও দূরে সরিতে সরিতে অবশেষে নদীতীরের উচ্চশীর্ষ নারিকেল গাছের মাথার উপর হইতে নদীর শীতল স্থির জলের উপর ছায়া ফেলিয়া দিয়া ওপারের বিস্তীর্ণ বালুকাতীরের উপর ছড়াইয়া পড়িল ও জলের একটুখানি রৌপ্যময় করিয়া তীরের নুড়িপাথর ভাঙ্গা পাত্র ও বালুকাকণায় সেই রশ্মি হীরকখণ্ডবৎ জ্বলিতে লাগিল। নদীজলের কোথাও একখানা ভাসন্ত সাদা মেঘে সূর্য্যালোকের লাল ছায়া প্রতিবিম্বিত হইয়া উঠিয়াছে কোথাও নীল আকাশের সৌম্যতা স্থির হইয়া মিশিয়া গিয়াছে। শীত সায়াহ্নের অন্ধকার এপারের গাছপালাকে ইহার মধ্যে কাছে টানিয়া আঁচলে ঢাকিয়া ঘুম পাড়াইতে ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে।

স্কুলের ছেলেদের মধ্যে সকলের ছোটগুলি মিলিয়া তাহাদের পণ্ডিত মহাশয়কে বুড়ি করিয়া লুকাচুরি খেলিতেছিল। জনকতক বালক ও কয়েকজন যুবকছাত্র ও মাষ্টারে ফুটবল খেলিবার জন্য একত্র সমবেত হইয়াছিল। একদিকে কয়েকটি বালকে মিলিয়া কপিচারার তলায় জল দিয়া মাটি নিড়াইয়া দিতে দিতে বটানি এগ্রিকলচার সম্বন্ধে যথাজ্ঞান আলোচনা করিতেছিল। সকলেই কার্য্যে নিযুক্ত, উৎসাহপূর্ণ প্রফুল্ল এবং কর্ত্তব্যের নিয়ম শৃঙ্খলাপূর্ণ শাসনে সংযত। কেবল রুগ্ন সুধীর একপাশে একটি কাঠের বেঞ্চের উপর বসিয়া বিষণ্ণমুখে চাহিয়া দেখিতেছিল। সে বহুদিন ম্যালেরিয়া ভুগিয়া জ্বরগায়েই এখানে আসিয়াছে, প্লীহা যকৃতের আয়তন ঈষৎ হ্রস্ব হইলেও এখনও আরোগ্য পাইতে অনেক বিলম্ব আছে। এই উদ্দীপনাপূর্ণ মুখগুলি তাহার নিরুদ্যম হৃদয়ের ভবিষ্যতের সম্বলস্বরূপ হইলেও বর্ত্তমানকে সমধিক পরিমাণে নিরানন্দকর করিয়া তুলিতেছিল। সে কর্ম্মহীন।

জল দেওয়া হইয়া গেছে; ওদিকে একটা হৈচৈ পড়িয়া গিয়াছিল তাহাও আবার থামিয়া গিয়াছে, ননী 'চোর' হইয়া রাগিয়া গিয়াছিল বুড়ি তাহাদের সে কোন্দল মিটাইয়া দিয়াছেন। ঠিক হইয়া গিয়াছে ননী কাপুরুষের মতন পলাইয়া আত্মরক্ষা না করিয়া সম্মুখ বিচারে আত্মসমর্থন করিবে।

দু একটি ক্রীড়াশ্রান্ত বালক নূতন দলের উপর ভার দিয়া ক্রীড়াস্থল ত্যাগ করিয়া একটু দূরে একখানা বেঞ্চের উপর আসিয়া বসিল। স্বাস্থ্য ভাল নয় বলিয়া ইহাদের বেশিক্ষণ খেলিতে নিষেধ আছে। নলিন এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিয়া অন্য একজনকে প্রশ্ন করিল "কৈ হে গুরুদেবকে যে আজ দেখচি না?" নলিন গুরুদেব বলার লোভটুকু সহজে দমন করিতে পারিত না—তাই তাহার গুরুদেবের অপছন্দ স্বত্বেও সকল ছেলেদের মধ্যেই এই শব্দটার প্রচলন করিয়া তুলিয়াছিল। সতীশ বলিল "আজ স্বামীজি এসেচেন,

তাই বোধহয় তিনি বাইরে আসেন নি"। এমন সময় চশমা পরিয়া একজন যুবক মাষ্টার ও একটি তাঁহারই সমবয়স্ক ছাত্র আসিয়া উত্তেজিতকণ্ঠে প্রশ্ন করিয়া উঠিল "বলোতো নলিন, কুর্‌প্যাটকিনের চেয়ে অ্যাডমিরাল টোগো বড়টা কিসে হলো? ওরা আজ হেরে গেছে বলে কি,বীরের অসম্মান করতে হবে! এ আপনার নেহাৎ Prejudice স্যার।"

মাষ্টার আর একটু গলা চড়াইয়া কহিলেন, "Oh ho sir no,—শুধুতো তর্ক করলেই হবে না প্রমাণ করা চাই। কুরপ্যাটকিন্ তোমার কিসে অ্যাডমিরাল টোগোর চেয়ে বড় বলো?"

জন্মোৎসব।*

আজ আমার জন্মদিনে তোমরা উৎসব করে আমাকে আহ্বান করেছ—এতে আমার অনেক দিনের স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলেছে।

জন্মদিনে বিশেষভাবে নিজের জীবনের প্রতি দৃষ্টি করবার কথা অনেকদিন আমার মনে জাগেনি। কত ২৫শে বৈশাখ চলে গিয়েছে, তারা অন্য তারিখের চেয়ে নিজেকে কিছুমাত্র বড় করে আমার কাছে প্রকাশ করেনি।

বস্তুত নিজের জন্মদিন বৎসরের অন্য ৩৬৪ দিনের চেয়ে নিজের কাছে কিছুমাত্র বড় নয়। যদি অন্যের কাছে তার মূল্য থাকে তবেই তার মূল্য।

যেদিন আমরা এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলুম সেদিন নূতন অতিথিকে নিয়ে যে উৎসব হয়েছিল সে আমাদের নিজের উৎসব নয়। অজ্ঞাত গোপনতার মধ্য থেকে আমাদের সদ্য আবির্ভাবকে যাঁরা একটি পরমলাভ বলে মনে করেছিলেন উৎসব তাঁদেরই। আনন্দলোক থেকে একটি আনন্দ উপহার পেয়ে তাঁরা আত্মার আত্মীয়তার ক্ষেত্রকে বড় করে উপলব্ধি করেছিলেন তাই তাঁদের উৎসব।

এই উপলব্ধি চিরকাল সকলের কাছে সমান নবীন থাকে না। অতিথি ক্রমে পুরাতন হয়ে আসে—সংসারে তার আবির্ভাব যে পরমরহস্যময় এবং সে যে চিরদিন এখানে থাকবে না সে কথা ভুলে যেতে হয়। বৎসরের পর বৎসর স্বভাবেই প্রায় চলে যেতে থাকে—মনে হয় তার ক্ষতিও নেই, সে আছে ত আছেই—তার মধ্যে অন্তরের প্রকাশ আর আমরা দেখ্‌তে পাইনে। তখন যদি আমরা উৎসব করি সে বাঁধা প্রথার উৎসব—সে এক-রকম দায়ে পড়ে করা।

যতক্ষণ মানুষের মধ্যে নব নব সম্ভাবনার পথ খোলা থাকে ততক্ষণ তাকে আমরা নূতন করেই দেখি; তার সম্বন্ধে ততক্ষণ আমাদের আশার অন্ত থাকে না, সে আমাদের ঔৎসুক্যকে সমান জাগিয়ে রেখে দেয়।

জীবনে একটা বয়স আসে যখন মানুষের

* বক্তার জন্মদিনে বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের বালকদিগের নিকট কথিত।

সম্বন্ধে আর নূতন প্রত্যাশা করবার কিছুই থাকে না—তখন সে যেন আমাদের কাছে এক রকম ফুরিয়ে আসে। সে রকম অবস্থায় তাকে দিয়ে আমাদের প্রতিদিনের ব্যবহার চল্‌তে পারে কিন্তু উৎসব চল্‌তে পারে না—কারণ, উৎসব জিনিষটাই হচ্চে নবীনতার উপলব্ধি—তা আমাদের প্রতিদিনের অতীত। উৎসব হচ্চে জীবনের কবিত্ব, যেখানে রস সেই খানেই তার প্রকাশ!

আজ আমি উনপঞ্চাশ বৎসর সম্পূর্ণ করে পঞ্চাশে পড়েছি। কিন্তু আমার সেইদিনের কথা মনে পড়চে যখন আমার জন্মদিন নবীনতার উজ্জ্বলতায় উৎসবের উপযুক্ত ছিল।

তখন আমার তরুণ বয়স। প্রভাত হতে না হতে প্রিয়জনেরা আমাকে কত আনন্দে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, যে, আজ তোমার জন্মদিন। আজ তোমরা যেমন ফুল তুলেছ, ঘর সাজিয়েছ সেই রকম আয়োজনই তখন হয়েছে। আত্মীয়দের সেই আনন্দ উৎসাহের মধ্যে মনুষ্যজন্মের একটি বিশেষ মূল্য সেদিন অনুভব করতুম। যেদিকে সংসারে আমি অসংখ্য বহুর মধ্যে একজনমাত্র সেদিক থেকে আমার দৃষ্টি ফিরে গিয়ে যেখানে আমি আমিই, যেখানে আমি বিশেষভাবে একমাত্র, সেখানেই আমার দৃষ্টি পড়ত—নিজের গৌরবে সেদিন প্রাতঃকালে হৃদয় বিকশিত হয়ে উঠত।

এমনি করে আত্মীয়দের স্নেহ দৃষ্টির পথ বেয়ে নিজের জীবনের দিকে যখন তাকাতুম তখন আমার জীবনের দূরবিস্তৃত ভবিষ্যৎ তার অনাবিষ্কৃত রহস্যলোক থেকে এমন একটি বাঁশি বাজাত যাতে আমার সমস্ত চিত্ত দুলে উঠ্‌ত। বস্তুত জীবন তখন আমার সাম্‌নেই—পিছনে তার অতি অল্পই। জীবনে যেটুকু গোচর ছিল তার চেয়ে অগোচরই ছিল অনেক বেশি। আমার তরুণ বয়সের অল্প কয়েকটি অতীত বৎসরকে গানের ধুয়াটির মত অবলম্বন করে সমস্ত অনাগত ভবিষ্যৎ তার উপরে অনির্ব্বচনীয়ের তান লাগাতে থাক্‌ত।

পথ তখন নির্দ্দিষ্ট হয় নি। নানাদিকে তার শাখাপ্রশাখা! কোন্‌দিক দিয়ে কোথায় যাব এবং কোথায় গেলে কি পাব তার অধিকাংশই কল্পনার মধ্যে ছিল। এইজন্য প্রতিবৎসর জন্মদিনে জীবনের সেই অনির্দ্দেশ্য অসীম প্রত্যাশায় চিত্ত বিশেষ ভাবে জাগ্রত হয়ে উঠ্‌ত।

ঝরনা যখন প্রথম জেগে ওঠে, নদী যখন প্রথম চল্‌তে আরম্ভ করে তখন নিজের সুবিধার পথ বের করতে তাকে নানা দিকে নানা গতি পরিবর্ত্তন করতে হয়। অবশেষে বাধার দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়ে যখন তার পথ সুনির্দ্দিষ্ট হয় তখন নূতন পথের সন্ধান তার বন্ধ হয়ে যায়। তখন নিজের খনিত পথকে অতিক্রম করাই তার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।

আমারও জীবনের ধারা যখন ঘাতপ্রতিঘাতের মাঝখান দিয়ে আপনার পথটি তৈরি করে নিলে, তখন বর্ষার বন্যার বেগও সেই পথেই স্ফীত হয়ে বইতে লাগ্‌ল এবং গ্রীষ্মের রিক্ততাও সেই পথেই সঙ্কুচিত হয়ে চল্‌তে থাক্‌ল। তখন নিজের জীবনকে বারম্বার আর নূতন করে আলোচনা করবার দরকার রইল না। এই জন্যে তখন থেকে জন্মদিন আর কোনো নূতন আশার সুরে বাজ্‌তে থাক্‌ল না। সেইজন্যে জন্মদিনের

সঙ্গীতটি যখন নিজের ও অন্যের কাছে বদ্ধ হয়ে এল তখন আস্তে আস্তে উৎসবের প্রদীপটিও নিবে এল। আমার বা আর কারো কাছে এর আর কোন প্রয়োজনই ছিল না।

এমন সময় আজ তোমরা যখন আমাকে এই জন্মোৎসবের সভা সাজিয়ে তার মধ্যে আহ্বান করলে তখন প্রথমটা আমার মনের মধ্যে সঙ্কোচ উপস্থিত হয়েছিল। আমার মনে হল, জন্ম ত আমার অর্দ্ধ শতাব্দীর প্রান্তে কোথায় পড়ে রয়েছে, সে যে কবেকার পুরাণো কথা তার আর ঠিক নেই—মৃত্যু-দিনের মূর্ত্তি তার চেয়ে অনেক বেশি কাছে এসেছে—এই জীর্ণ জন্মদিনকে নিয়ে উৎসব করবার বয়স কি আমার?

এমন সময় একটি কথা আমার মনে উদয় হল—এবং সেই কথাটাই তোমাদের সাম্‌নে আমি বল্‌তে ইচ্ছা করি।

পূর্ব্বেই আভাস দিয়েছি, জন্মোৎসবের ভিতরকার সার্থকতাটা কিসে? জগতে আমরা অনেক জিনিষকে চোখের দেখা করে দেখি, কানের শোনা করে শুনি, ব্যবহারের পাওয়া করে পাই; কিন্তু অতি অল্প জিনিষকেই আপন করে পাই। আপন করে পাওয়াতেই আমাদের আনন্দ—তাতেই আমরা আপনাকে বহুগুণ করে পাই। পৃথিবীতে অসংখ্য লোক; তারা আমাদের চারিদিকেই আছে কিন্তু তাদের আমরা পাইনি, তারা আমাদের আপন নয়, তাই তাদের মধ্যে আমাদের আনন্দ নেই।

তাই বল্‌ছিলুম, আপন করে পাওয়াই হচ্ছে একমাত্র লাভ, তার জন্যেই মানুষের যত কিছু সাধনা। শিশু ঘরে জন্মগ্রহণ করবামাত্রই তার মা বাপ এবং ঘরের লোক এক মুহূর্ত্তেই আপনার লোককে পায়,—পরিচয়ের আরম্ভকাল থেকেই সে যেন চিরন্তন। অল্পকাল পূর্ব্বেই সে একেবারে কেউ ছিল না—না-জানার অনাদি অন্ধকার থেকে বাহির হয়েই সে আপন-করে-জানার মধ্যে অতি অনায়াসেই প্রবেশ করলে; এজন্যে পরস্পরের মধ্যে কোনো সাধনার, কোনো দেখাসাক্ষাৎ আনাগোনার, কোনো প্রয়োজন হয়নি।

যেখানেই এই আপন করে পাওয়া আছে সেইখানেই উৎসব। ঘর সাজিয়ে বাঁশি বাজিয়ে সেই পাওয়াটিকে মানুষ সুন্দর করে তুলে প্রকাশ করতে চায়। বিবাহেও পরকে যখন চিরদিনের মত আপন করে পাওয়া যায় তখনো এই সাজসজ্জা এই গীতবাদ্য। "তুমি আমার আপন" এই কথাটি মানুষ প্রতিদিনের সুরে বল্‌তে পারে না—এতে সৌন্দর্য্যের সুর ঢেলে দিতে হয়।

শিশুর প্রথম জন্মে যেদিন তার আত্মীয়েরা আনন্দধ্বনিতে বলেছিল তোমাকে আমরা পেয়েছি—সেইদিনে ফিরে ফিরে বৎসরে বৎসরে তারা ঐ একই কথা আওড়াতে চায় যে, তোমাকে আমরা পেয়েছি। তোমাকে পাওয়ায় আমাদের সৌভাগ্য, তোমাকে পাওয়ায় আমাদের আনন্দ, কেননা তুমি যে আমাদের আপন, তোমাকে পাওয়াতে আমরা আপনাকে অধিক করে পেয়েছি।

আজ আমার জন্মদিনে তোমরা যে উৎসব করচ তার মধ্যে যদি সেই কথাটি থাকে, তোমরা যদি আমাকে আপন করে পেয়ে থাক, আজ প্রভাতে সেই পাওয়ার আনন্দ-

কেই যদি তোমাদের প্রকাশ করবার ইচ্ছা হয়ে থাকে তাহলেই এই উৎসব সার্থক। তোমাদের জীবনের সঙ্গে আমার জীবন যদি বিশেষভাবে মিলে থাকে, আমাদের পরস্পরের মধ্যে যদি কোন গভীরতর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়ে থাকে তবেই যথার্থভাবে এই উৎসবের প্রয়োজন আছে, তার মূল্য আছে।

এই জীবনে মানুষের যে কেবল একবার জন্ম হয় তা বল্‌তে পারিনে। বীজকে মরে অঙ্কুর হতে হয়, অঙ্কুরকে মরে গাছ হতে হয়—তেমনি মানুষকে বারবার মরে নূতন জীবনে প্রবেশ করতে হয়।

একদিন আমি আমার পিতামাতার ঘরে জন্ম নিয়েছিলুম—কোন্ রহস্যধাম থেকে প্রকাশ হয়ে ছিলুম, কে জানে! কিন্তু জীবনের পালা, প্রকাশের লীলা সেই ঘরের মধ্যেই সমাপ্ত হয়ে চুকে যায় নি।

সেখানকার সুখদুঃখ ও স্নেহপ্রেমের পরিবেষ্টন থেকে আজ জীবনের নূতনক্ষেত্রে জন্মলাভ করেছি। বাপমায়ের ঘরে যখন জন্মেছিলুম তখন অকস্মাৎ কত নূতন লোক চিরদিনের মত আমার আপনার হয়ে গিয়েছিল। আজ ঘরের বাইরে আর একটি ঘরে আমার জীবন যে জন্মলাভ করেছে এখানেও একত্র কতলোকের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ বেঁধে গেছে! সেই জন্যেই আজকের এত আনন্দ।

আমার প্রথম বয়সে, সেই পূর্ব্বজীবনের মধ্যে আজকের এই নবজন্মের সম্ভাবনা এতই সম্পূর্ণ গোপনে ছিল যে তা কল্পনারও গোচর হতে পারত না। এই লোক আমার কাছে অজ্ঞাত লোক ছিল।

সেই জন্যে আমার এই পঞ্চাশ বৎসর বয়সেও আমাকে তোমরা নূতন করে পেয়েছ; আমার সঙ্গে তোমাদের সম্বন্ধের মধ্যে জরাজীর্ণতার লেশমাত্র লক্ষণ নেই। তাই আজ সকালে তোমাদের আনন্দ উৎসবের মাঝখানে বসে আমার এই নবজন্মের নবীনতা অন্তরে বাহিরে উপলব্ধি করচি।

এই যেখানে তোমাদের সকলের সঙ্গে আমি আপন হয়ে বসেছি এ আমার সংসারলোক নয়, এ মঙ্গললোক। এখানে দৈহিক জন্মের সম্বন্ধ নয়, এখানে অহেতুক কল্যাণের সম্বন্ধ।

মানুষের মধ্যে দ্বিজত্ব আছে; মানুষ একবার জন্মায় গর্ভের মধ্যে, আবার জন্মায় মুক্ত পৃথিবীতে। তেমনি আর একদিক দিয়ে মানুষের এক জন্ম আপনাকে নিয়ে, আর এক জন্ম সকলকে নিয়ে।

পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়ে তবে মানুষের জন্মের সমাপ্তি, তেমনি স্বার্থের আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে মঙ্গলের মধ্যে উত্তীর্ণ হওয়া মনুষ্যত্বের সমাপ্তি। জঠরের মধ্যে ভ্রূণই হচ্চে কেন্দ্রবর্ত্তী, সমস্ত জঠর তাকেই ধারণ করে এবং পোষণ করে, কিন্তু পৃথিবীতে জন্মমাত্র তার সেই নিজের একমাত্র কেন্দ্রত্ব ঘুচে যায়—এখানে সে অনেকের অন্তর্ব্বর্ত্তী। স্বার্থলোকেও আমিই হচ্চি কেন্দ্র, অন্য সমস্ত তার পরিধি, মঙ্গললোকে আমিই কেন্দ্র নই, আমি সমগ্রের অন্তর্ব্বর্ত্তী; সুতরাং এই সমগ্রের প্রাণেই সেই আমির প্রাণ, সমগ্রের ভালমন্দেই তার ভালমন্দ।

পৃথিবীতে আমাদের দৈহিক জীবন একেবারেই পাকা হয় না। যদিও মুক্ত আকাশে

আমরা জন্মগ্রহণ করি বটে তবু শক্তির অভাবে আমরা মুক্তভাবে সঞ্চরণ করতে পারিনে; মায়ের কোলেই ঘরের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে থাকি। তার পরে ক্রমশই পরিপুষ্টি ও সাধনা থেকে পৃথিবীলোকে আমাদের মুক্ত অধিকার বিস্তৃত হতে থাকে।

বাইরের দিক্ থেকে এ যেমন, অন্তরের দিক্ থেকেও আমাদের দ্বিতীয় জন্মের সেই রকমের একটি ক্রমবিকাশ আছে। ঈশ্বর যখন স্বার্থের জীবন থেকে আমাদের মঙ্গলের জীবনে এনে উপস্থিত করেন তখন আমরা একেবারেই পূর্ণ শক্তিতে সেই জীবনের অধিকার লাভ করতে পারিনে। ভ্রূণত্বের জড়তা আমরা একেবারেই কাটিয়ে উঠিনে। তখন আমরা চল্‌তে চাই, কারণ, চারিদিকে চলার ক্ষেত্র অবাধবিস্তৃত— কিন্তু চল্‌তে পারিনে, কেননা আমাদের শক্তি অপরিণত। এই হচ্চে দ্বন্দ্বের অবস্থা। শিশুর মত চল্‌তে গিয়ে বারম্বার পড়তে হয় এবং আঘাত পেতে হয়; যতটা চলি তার চেয়ে পড়ি অনেক বেশি। তবুও ওঠা ও পড়ার এই সুকঠোর বিরোধের মধ্য দিয়েই মঙ্গললোকে আমাদের মুক্তির অধিকার ক্রমশ প্রশস্ত হতে থাকে।

কিন্তু শিশু যখন মায়ের কোলে প্রায় অহোরাত্র শুয়ে ঘুমিয়েই কাটাচ্চে তখনো যেমন জানা যায় সে এই চলা ফেরা জাগরণের পৃথিবীতেই জন্মগ্রহণ করেছে এবং তার সঙ্গে আমাদের সাংসারিক সম্বন্ধ অনুভব করতে কোনো সংশয়মাত্র থাকেনা তেম্‌নি যখন আমরা স্বার্থলোক থেকে মঙ্গললোকে প্রথম ভূমিষ্ঠ হই তখন পদে পদে আমাদের জড়ত্ব ও অকৃতার্থতা সত্ত্বেও আমাদের জীবনের ক্ষেত্র পরিবর্ত্তন হয়েছে সে কথা একরকম করে বুঝতে পারা যায়। এমন কি জড়তার সঙ্গে নবলব্ধ চেতনার বহুতর বিরোধের দ্বারাই সেই খবরটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বস্তুত স্বার্থের জঠরের মধ্যে মানুষ যখন শয়ান থাকে তখন সে দ্বিধাহীন আরামের মধ্যেই কালযাপন করে। এর থেকে যখন প্রথম মুক্তিলাভ করে তখন অনেক দুঃখস্বীকার করতে হয়, তখন নিজের সঙ্গে অনেক সংগ্রাম করতে হয়।

তখন ত্যাগ তার পক্ষে সহজ হয় না কিন্তু তবু তাকে ত্যাগ করতেই হয়, কারণ, এলোকের জীবনই হচ্চে ত্যাগ। তখন তার সমস্ত চেষ্টার মধ্যে সম্পূর্ণ আনন্দ থাকেনা, তবু তাকে চেষ্টা করতেই হয়। তখন তার মন যা বলে তার আচরণ তার প্রতিবাদ করে, তার অন্তরাত্মা যে ভালকে আশ্রয় করে তার ইন্দ্রিয় তাকেই কুঠারাঘাত করতে থাকে; যে শ্রেয়কে আশ্রয় করে' সে অহঙ্কারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে, অহঙ্কার গোপনে সেই শ্রেয়কেই আশ্রয় করে গভীরতররূপে আপনাকে পোষণ করতে থাকে। এমনি করে প্রথম অবস্থায় বিরোধ অসামঞ্জস্যের বিষম দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে তার আর দুঃখের অন্ত থাকেনা।

আমি আজ তোমাদের মধ্যে যেখানে এসেছি এখানে আমার পূর্ব্বজীবনের অনুবৃত্তি নেই। বস্তুত, সে জীবনকে ভেদ করেই এখানে আমাকে ভূমিষ্ঠ হতে হয়েছে। এই জন্যেই আমার জীবনের উৎসব সেখানে বিলুপ্ত হয়ে এখানেই প্রকাশ পেয়েছে। দেশালাইয়ের কাঠির মুখে যে আলো একটু-

খানি দেখা দিয়েছিল সেই আলো আজ প্রদীপের বাতির মুখে ধ্রুবতর হয়ে জলে উঠেছে।

কিন্তু একথা তোমাদের কাছে নিঃসন্দেহই অগোচর নেই যে, এই নূতন জীবনকে আমি শিশুর মত আশ্রয় করেছিমাত্র বয়স্কের মত একে আমি অধিকার করতে পারিনি। তবু আমার সমস্ত দ্বন্দ্ব এবং অপূর্ণতার বিচিত্র অসঙ্গতির ভিতরেও আমি তোমাদের কাছে এসেছি সেটা তোমরা উপলব্ধি করেছ—একটি মঙ্গললোকের সম্বন্ধে তোমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমি তোমাদের আপন হয়েছি সেইটে তোমরা হৃদয়ে জেনেছ এবং সেই জন্যেই আজ তোমরা আমাকে নিয়ে এই উৎসবের আয়োজন করেছ একথা যদি সত্য হয় তবেই আমি আপনাকে ধন্য বলে মনে করব; তোমাদের সকলের আনন্দের মধ্যে আমার নূতন জীবনকে সার্থক বলে জানব।

এই সঙ্গে একটি কথা তোমাদের মনে করতে হবে, যেলোকের সিংহদ্বারে তোমরা সকলে আত্মীয় বলে আমাকে আজ অভ্যর্থনা করতে এসেছ, এলোকে তোমাদের জীবনও প্রতিষ্ঠালাভ করেছে নইলে আমাকে তোমরা আপনার বলে জানতে পারতে না। এই আশ্রমটি তোমাদের দ্বিজত্বের জন্মস্থান। ঝরণাগুলি যেমন পরস্পরের অপরিচিত নানাসুদূর শিখর থেকে নিঃসৃত হয়ে একটি বৃহৎধারায় সম্মিলিত হয়ে নদী জন্মলাভ করে—তোমাদের ছোট ছোট জীবনের ধারাগুলি তেমনি কত দূরদূরান্তর গৃহ থেকে বেরিয়ে এসেছে—তারা এই আশ্রমের মধ্যে এসে বিচ্ছিন্নতা পরিহার করে একটি সম্মিলিত প্রশস্ত মঙ্গলের গতি প্রাপ্ত হয়েছে। ঘরের মধ্যে তোমরা কেবল ঘরের ছেলেটি বলে আপনাদের জানতে—সেই জানার সঙ্কীর্ণতা ছিন্ন করে এখানে তোমরা সকলের মধ্যে নিজেকে দেখতে পাচ্চ—এমনি করে নিজের মহত্তর সত্তাকে এখানে উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছ এই হচ্চে তোমাদের নবজন্মের পরিচয়। এই নবজন্মে বংশগৌরব নেই, আত্মাভিমান নেই, রক্ত সম্বন্ধের গণ্ডি নেই, আত্মপরের কোন সঙ্কীর্ণ ব্যবধান নেই; এখানে তিনিই পিতা হয়ে প্রভু হয়ে আছেন, "য একঃ" যিনি এক, "অবর্ণঃ," যাঁর জাতি নেই, "বর্ণান্ অনেকান্ নিহিতার্থো দধাতি," যিনি অনেক বর্ণের অনেক নিগূঢ়নিহিত প্রয়োজন সকল বিধান করচেন,—"বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ," বিশ্বের সমস্ত আরম্ভেও যিনি পরিণামেও যিনি, "সদেবঃ" সেই দেবতা। "সনোবুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।" তিনি আমাদের সকলকে মঙ্গল বুদ্ধির দ্বারা সংযুক্ত করুন্। এই মঙ্গললোকে স্বার্থবুদ্ধি নয়, বিষয় বুদ্ধি নয়, এখানে আমাদের পরস্পরের যে যোগসম্বন্ধ সে কেবলমাত্র সেই একের বোধে অনুপ্রাণিত মঙ্গলবুদ্ধির দ্বারাই সম্ভব।

২৫শে বৈশাখ ১৩১৭

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

লঙ্কায় বুদ্ধের দন্ত।

লঙ্কা দ্বীপের ক্যাণ্ডিনগরে ভগবান্ বুদ্ধের একটি দন্ত সুরক্ষিত আছে। ক্যাণ্ডিনগর মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত। উহার প্রাচীন নাম শ্রীবর্দ্ধনপুর। ১১৯২ হইতে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উহা সমগ্র লঙ্কা দ্বীপের রাজধানী ছিল। দন্তধাতু যে মন্দিরে সংরক্ষিত আছে উহার নাম মালিগাব মন্দির। উহা তত্রত্য বৌদ্ধ বিহারের অভ্যন্তরে অবস্থিত। আমি বিগত শ্রাবণ মাসে পেরহের (প্রাতিহার্য্য) মহোৎসব উপলক্ষে ক্যাণ্ডিনগরে গমন করিয়া মালিগাব মন্দির পরিদর্শন করি। কোলম্ব-নগরের বৌদ্ধ মহানায়ক মহাস্থবির সুমঙ্গলের বিশেষ চেষ্টায় আমি এই দন্তধাতু অবলোকন করিবার অধিকার পাই। তিনি আমাকে একখানি অনুরোধপত্র সহিত ক্যাণ্ডিনগরের প্রধান বৌদ্ধনায়ক মহাস্থবির সিদ্ধার্থের নিকট প্রেরণ করেন। দন্তধাতু যে মন্দিরে অবস্থিত উহার চাবি সিদ্ধার্থের হস্তে ন্যস্ত আছে। উঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ৯০ বৎসর। সিদ্ধার্থের বিহারে অনেক ছাত্র আছে বটে কিন্তু তিনি স্বয়ং সর্ব্বদা চাবি রক্ষণেই ব্যস্ত থাকেন। পাছে কেহ কোন ছলে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দন্তধাতু অপহরণ করে সর্ব্বদা তাঁহার মনে এই উদ্বেগ বিদ্যমান থাকে। দন্তধাতু দেখাইবার তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার না থাকিলেও ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি, সিংহলী রাজবংশের প্রতিনিধি, বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের প্রতিনিধি প্রভৃতি সকলের মত লইয়া তিনি মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিতে পারেন। মন্দির ৪।৫ বৎসর অন্তর কোন বিশেষ ঘটনায় উদ্‌ঘাটিত হয়। মন্দিরের চাবি সিদ্ধার্থের হস্তে থাকে বলিয়া লঙ্কাদ্বীপে সিদ্ধার্থের মহা প্রতিপত্তি। আমি ক্যাণ্ডিনগরে গমন করিয়া সিদ্ধার্থের সহিত পালি ও সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক আলোচনা উত্থাপন করি। কিন্তু দেখিলাম সিদ্ধার্থের অন্তঃকরণ উহাতে বিচলিত হইবার নহে। দিনে ও রাত্রে, উঠিতে ও বসিতে সকল সময়েই চাবি তাঁহার হাতেই থাকে। রাত্রিতে নিদ্রার সময়ে উহা কোথায় রাখেন জানা যায় না। সিদ্ধার্থ আমার সহিত অনেক কথা বলিলেন, আমাকে সঙ্গে করিয়া নগরের অনেক বস্তু দেখাইলেন কিন্তু বলিলেন দন্তধাতু দেখাইবার সুযোগ হইবে না। পরে আমি সিংহলী রাজবংশের প্রতিনিধি, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি প্রভৃতি সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদিগকে সম্মত করি। তদনন্তর সিদ্ধার্থও দন্তধাতু দেখাইতে সম্মত হন। রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া বিহারের ত্রিতল কক্ষে মালিগাব মন্দিরে প্রবেশ করেন। রাজপথ হইতে মালিগাব মন্দিরে প্রবেশকাল পর্য্যন্ত আমাকে অনেক দ্বার ও সোপান অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মন্দির বিহারের অভ্যন্তরে অবস্থিত। বিহারটি আবার একটি হ্রদের পশ্চিম কূলে প্রতিষ্ঠিত। বিহার ও হ্রদের চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতমালা বিরাজিত। দন্তধাতুর মন্দিরের দ্বার হস্তিদন্ত নির্ম্মিত। এই দ্বারে নিম্নলিখিত শ্লোক লিখিত আছে :—

সর্ব্বজ্ঞপঙ্কজসরসীরুহরাজহংসং
কুন্দেন্দুসুন্দররুচিং সুরবৃন্দবন্দ্যম্।

সদ্ধর্ম্মচক্রসহজং জনপারিজাতং
শ্রীদন্তধাতুমমলং প্রণমামি ভক্ত্যা॥

মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একখানি অতি বৃহৎ ও ভারি রৌপ্য টেবিল দেখিলাম। এই টেবিলের উপর একটি ঘণ্টাকৃতি অতি বৃহৎ সুবর্ণ করণ্ড প্রতিষ্ঠিত। এই সুবর্ণ করণ্ডের উপরে যে সকল কারুকার্য্য দেখিলাম তাহা বর্ণনাতীত। করণ্ডের উপরিভাগ মণিমাণিক্য মরকত বৈদূর্য্য ইন্দ্রনীল প্রভৃতি বহুমূল্য ধাতুর দ্বারা সুশোভিত। বৃহৎ করণ্ডের অভ্যন্তরে আর ছয়টি সুবর্ণ করণ্ড যথাক্রমে একটির অভ্যন্তরে অপরটি অবস্থিত। প্রত্যেক করণ্ডই নানা ধাতুর ঞ্জিত। সর্ব্বমধ্যস্থিত করণ্ড প্রায় ১ ফুট উচ্চ; উহার মধ্যে নানা ধাতু রঞ্জিত একটি সুবর্ণ পদ্ম অবস্থিত। সুবর্ণ পদ্মের অভ্যন্তরে বুদ্ধের দন্তধাতু নিহিত। এই দন্তধাতু কুন্দ কুসুমের ন্যায় শুভ্রবর্ণ। উহার উপর বৈদূর্য্য ইন্দ্রনীল প্রভৃতি প্রতিফলিত হওয়ায় বোধ হইল যেন দন্তটি ক্ষণে ক্ষণে নানা বর্ণ ধারণ করিতেছে। পূর্ব্বমুখ হইয়া দাঁড়াইলে দন্ত হইতে এক প্রকার আভা উদ্গীর্ণ হইতে দেখা গেল, আবার পশ্চিমমুখ হইয়া দাঁড়াইলে সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকার আভার আবির্ভাব হইল। এই দন্তধাতু যে করণ্ডসমূহের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত উহাদের তুলনা জগতে নাই। অনেক ইউরোপীয় পরিদর্শক বলিয়াছেন ক্যাণ্ডিনগরের মালিগাব মন্দির পৃথিবীর মধ্যে সমৃদ্ধতম।

লঙ্কাদ্বীপে সর্ব্বজনবিশ্রুত একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে ঐ দন্তধাতু যিনি অধিকার করিবেন তিনি সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইবেন। উল্লিখিত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া বিগত ২৫০০ বৎসর কাল অনেক দুরাত্মা এই দন্তধাতু অপহরণ করিবার প্রয়াস করিয়াছিল। অতীত কালে উহা কত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়াছে তাহা শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। নিম্নে এই দন্তের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রদত্ত হইল:—

যীশুখৃষ্টের জন্মগ্রহণের ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধদেব কুশীনগরে মহাপরিনির্ব্বাণ লাভ করেন। যখন তাঁহার দেহ ভস্মীভূত হয় তখন তাঁহার এক শিষ্য একটি দন্ত তুলিয়া লইয়া কলিঙ্গ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দন্তপুরের রাজাকে অর্পণ করেন। ৮০০ বৎসর কাল এই দন্ত কলিঙ্গরাজ্যে পূজিত হয়। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের পাণ্ডুনামক একজন ব্রাহ্মণ রাজা বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ এই দন্ত ধাতু অপহরণ করিয়া স্বরাজ্যে লইয়া যান এবং উহার ধ্বংসের নিমিত্ত নানাপ্রকার কৌশল অবলম্বন করেন। তাঁহার অসৎ উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ায় তিনি স্বয়ং বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং দন্তটী কলিঙ্গ সাম্রাজ্যের দন্তপুরের রাজাকে প্রত্যর্পণ করেন। কিয়ৎকাল পরে আরও বহু আততায়ী আগমন করিয়া ঐ দন্ত ধাতু অধিকার করিবার নিমিত্ত দন্তপুর আক্রমণ করে। দন্তপুরের রাজা প্রতিজ্ঞা করিলেন তাঁহার জীবন যায় সেও শ্লাঘ্য তথাপি তিনি দন্ত স্থানান্তরিত হইতে দিবেন না। শত্রুকর্তৃক নগর বেষ্টিত হইলে রাজা দন্তটী স্বীয় দুহিতার মস্তকাস্থিত কেশ মধ্যে লুক্কায়িত করিয়া ঐ দুহিতাকে জামাতা ও একটী ভিক্ষু সমভিব্যাহারে ব্রাহ্মণের বেশে জলযানে লঙ্কায় প্রেরণ করিলেন এবং স্বয়ং শত্রুহস্তে নিহত হইলেন। ৩১০ খৃঃ অব্দে

দন্তধাতু লঙ্কায় উপস্থিত হইল। তত্রত্য রাজা কীর্ত্তিশ্রী মেঘবর্ণ ঐ দন্তধাতু সমাদরে গ্রহণ করিলেন এবং উহার যথোচিত পূজার নিমিত্ত অনুরাধপুরে এক প্রকাণ্ড মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন। প্রতিবৎসর ঐ দন্ত-ধাতু সাধারণকে দেখাইবার নিমিত্ত একটী দন্তমহোৎসবের প্রতিষ্ঠা হইল। যাহাতে এই উৎসব প্রতিবৎসর সংঘটিত হয় তজ্জন্য তিনি রাজসরকার হইতে বহু অর্থ প্রদান করেন। ৪১৩ খৃঃ অব্দে চীন পরিব্রাজক ফা'হয়ান্ লঙ্কা দ্বীপ পরিদর্শন করেন। তিনি স্বীয় ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে অনুরাধ-পুরের দন্ত মহোৎসব উপলক্ষে অতি সমারোহে বুদ্ধের দন্ত রাজপথে হস্তিপৃষ্ঠে পরিদর্শিত হইয়া থাকে। ৪৫৯ ৪৭৭ খৃঃ অব্দে লঙ্কার রাজা ধাতুসেন এই দন্তধাতু রাখিবার জন্য রত্নখচিত একটী সুবর্ণ করণ্ড নির্ম্মাণ করেন। ১১৯০ খৃঃ অব্দে লঙ্কার রাজধানী পুলস্ত্যপুরে অবস্থিত ছিল। রাজা পরাক্রমবাহু পুলস্ত্যপুরে অত্যন্ত মনোরম একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দন্তধাতু অনুরাধপুর হইতে তথায় আনয়ন করেন। পুলস্ত্যপুরে এই মন্দির অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। ইহার কারু-কার্য্য দেখিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সকলেই বিমোহিত হইয়া থাকেন। ১২৪০ খৃঃ অব্দে রাজা বিজয়বাহু ঐ দন্তধাতু পুলস্ত্যপুর হইতে দেম্বদেনের নামক স্থানে লইয়া যান এবং তথা হইতে রাজা ভুবনৈকবাহু উহা যপহু নামক স্থানে অন্তরিত করেন। ১২৬৮ খৃঃ অব্দে এই দন্তধাতু ক্যাণ্ডি নগরে আনীত হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তখন ক্যাণ্ডিনগর শ্রীবর্দ্ধনপুর নামে খ্যাত ছিল।

১২৮৪ খৃঃ অব্দে মার্কোপোলো নামক ইউরোপীয় পর্য্যটক লঙ্কায় আগমন করেন। তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে এই দন্তধাতুর বিস্তারিত বিবরণ পরিদৃষ্ট হয়। মার্কোপোলো বলেন তাঁহার সময়ে বৌদ্ধগণ ঐ দন্তকে বুদ্ধের দন্ত মনে করিয়া পূজা করিতেন; মুসলমান মূরগণ উহা আদমের দন্ত বলিয়া মনে করিতেন। মূরগণের বিশ্বাস ছিল যে আদম সয়তানের চক্রান্তে স্বর্গ হইতে বিদূরিত হইয়া লঙ্কাদ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার এই দন্ত লঙ্কাদ্বীপে রক্ষিত হইয়াছিল। তামিল হিন্দুগণ এই দন্তকে হনুমানের দন্ত বলিয়া পূজা করিতেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে হনুমান সীতার অন্বেষণে লঙ্কায় গমনপূর্ব্বক চিহ্নস্বরূপ একটী দন্ত তথায় রাখিয়া আইসেন।

১৩০৩ ১৩১৪ খৃঃ অব্দে দাক্ষিণাত্যের তামিল বংশীয় রাজা পাণ্ড্য লঙ্কাদ্বীপ আক্রমণ করেন এবং বুদ্ধের দন্ত বলপূর্ব্বক দাক্ষিণাত্যের রাজধানী মদুরায় লইয়া আইসেন। লঙ্কার রাজা তৃতীয় পরাক্রমবাহু স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে আগমন করিয়া নানাপ্রকারে রাজা পাণ্ড্যের চিত্তবিনোদনপূর্ব্বক দন্তধাতু পুনরায় লঙ্কায় লইয়া যান। তাঁহার পুত্র ১৩১৯ খৃঃ অব্দে ঐ দন্ত হস্তিশৈলপুর নামক নগরে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহার পরে লঙ্কায় নানাপ্রকার রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটে। এই দুঃসময়ে সিংহলিগণ দন্তটী নানাস্থানে গুপ্তভাবে সংরক্ষণ করেন। পরিশেষে উহা লঙ্কার জাফ্‌না নগরের তামিল হিন্দুরাজগণের হস্তে আসিয়া পড়ে। ১৫৬০ খৃঃ অব্দে পর্ত্তুগীজ আক্রমণকারিগণ জাফ্‌না-নগর অবরোধ করে। এই সময়ে দন্তধাতু উহাদের

হস্তগত হয়। পর্ত্তুগীজ পুরাবিদ্‌গণ বলেন যে পর্ত্তুগীজ রাজপ্রতিনিধি Constantion da Bragancaর আদেশ অনুসারে এই দন্ত ভারতের গোয়ানগরে আনীত হয়; তথায় সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে উহা ভস্মীভূত করিয়া উহার অঙ্গার সমীপবর্ত্তী নদীর জলে নিক্ষিপ্ত হয়। পর্ত্তুগীজ পুরাবিদ্‌গণের মতে ১৫৬৬ খৃঃ অব্দে লঙ্কার রাজা বিক্রমবাহু একটী হস্তীর দন্ত বুদ্ধের দন্ত বলিয়া প্রচারপূর্ব্বক ক্যাণ্ডি নগরের মালিগাব মন্দিরে সংস্থাপিত করেন। পক্ষান্তরে সিংহলী পুরাবিদ্‌গণ বলেন যে লঙ্কাদ্বীপে পর্ত্তুগীজগণের আগমনের অব্যবহিত পরেই বুদ্ধের প্রকৃত দন্ত দেল্‌গাগা, সব্রাগাম এবং অন্যান্য স্থলে লুকাইয়া রাখা হয়। পর্ত্তুগীজগণ গোয়া নগরে যে দন্ত ভস্মীভূত করিয়াছিলেন উহা খাঁটী দন্ত নহে। আমি অনুসন্ধান করিয়া যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাহাতে বোধহয় পর্ত্তুগীজ আক্রমণকারীর সন্তোষ উৎপাদনের নিমিত্ত জাফ্‌নার তামিল হিন্দু রাজা একটী সাধারণ নরদন্ত পর্ত্তুগীজগণের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধের প্রকৃত দন্ত সিংহলী বৌদ্ধগণ স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন।

১৫৮৬ খৃঃ অব্দে সীতাবকের রাজা রাজসিংহ ক্যাণ্ডিনগর অধিকার করেন। তিনি খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া রোমান্ ক্যাথোলিক সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হন। রাজসিংহ বহু অনুসন্ধান করিয়াও ক্যাণ্ডিনগরে বুদ্ধের দন্ত দেখিতে পান নাই। তাঁহার পরবর্ত্তী রাজা জয়বীরের পুত্রও রোমান্ ক্যাথোলিক ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তিনিও দন্তের সন্ধান করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তদনন্তর তাঁহার ভগিনী লঙ্কার সিংহাসন অধিকার করেন। তিনিও রোমান্ ক্যাথোলিক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁহার সময়েও বুদ্ধের দন্ত ক্যাণ্ডিনগরে দৃষ্ট হয় নাই। ১৫৮৯ খৃঃ অব্দে বিমলচন্দ্র নামক রাজা লঙ্কার অধীশ্বর হন। ইনি বুদ্ধের পরম ভক্ত। এই নিষ্ঠাবান্ বৌদ্ধ নৃপতির সময়ে বুদ্ধের দন্তধাতু পুনরায় ক্যাণ্ডিনগরে আবির্ভূত হয়। তদনন্তর কীর্ত্তিশ্রী রাজসিংহ ক্যাণ্ডিনগরে অতি মহামূল্য একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া ঐ দন্তধাতু উহার মধ্যে স্থাপিত করেন। এই মন্দিরের নাম মালিগাব মন্দির। উহা ক্যাণ্ডির মনোহর রাজপ্রাসাদের সহিত সংলগ্ন। ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে কীর্ত্তিশ্রী রাজসিংহ সাধারণের সমক্ষে ঐ দন্ত প্রকটিত করেন।

১৮১৫ খৃঃ অব্দে লঙ্কাদ্বীপ ইংরাজগণের হস্তগত হয়। সঙ্গে সঙ্গে দন্তধাতুও তাঁহাদের অধীনে আসিয়া পড়ে। ১৮১৮ খৃঃ অব্দে ইংরাজগণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। এই সময়ে কেহ অলক্ষিত ভাবে মালিগাব মন্দির হইতে বুদ্ধদন্ত অপসারিত করে। বিদ্রোহ প্রশমিত হইলে দন্তধাতু পুনরায় মালিগাব মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হয়। তদনন্তর বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ক্যাণ্ডিনগরের ইংরাজ প্রতিনিধিকে (British Resident at Kandy) বুদ্ধদন্তের রক্ষক নিযুক্ত করেন এবং একজন ইংরাজ সৈন্য ঐ মন্দিরের দ্বারবান্ পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৮২৮ খৃঃঅব্দে মহাসমারোহে ক্যাণ্ডিনগরে দন্ত প্রদর্শনী নামে এক মহোৎসব হয়। ঐ সময়ে বুদ্ধের দন্ত সাধারণকে দেখান হইয়াছিল। ১৮ ৪ খৃঃ অব্দে কতিপয় সিংহলী বৌদ্ধ দন্তধাতু মালিগাব মন্দির হইতে স্থানান্তরিত করিবার জন্য

গোপনে ষড়যন্ত্র করে। গবর্ণমেণ্ট জানিতে পারিয়া ষড়যন্ত্রকারীদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া যথোচিত শাস্তি প্রদান করেন। ১৮৩৯ খৃঃ অব্দে খৃষ্টীয় সমিতির ইচ্ছানুসারে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট দন্তধাতুর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রক্ষকতার ভার ত্যাগ করেন। তখন স্থিরীকৃত হয় যে মালিগাব মন্দির ক্যাণ্ডির ইংরাজ প্রতিনিধি, সিংহলী রাজবংশের প্রতিনিধি, স্থানীয় বৌদ্ধ মহা-নায়ক প্রভৃতি চারি ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে থাকিবে। এই চারিজনের যুগপৎ অনুমতি

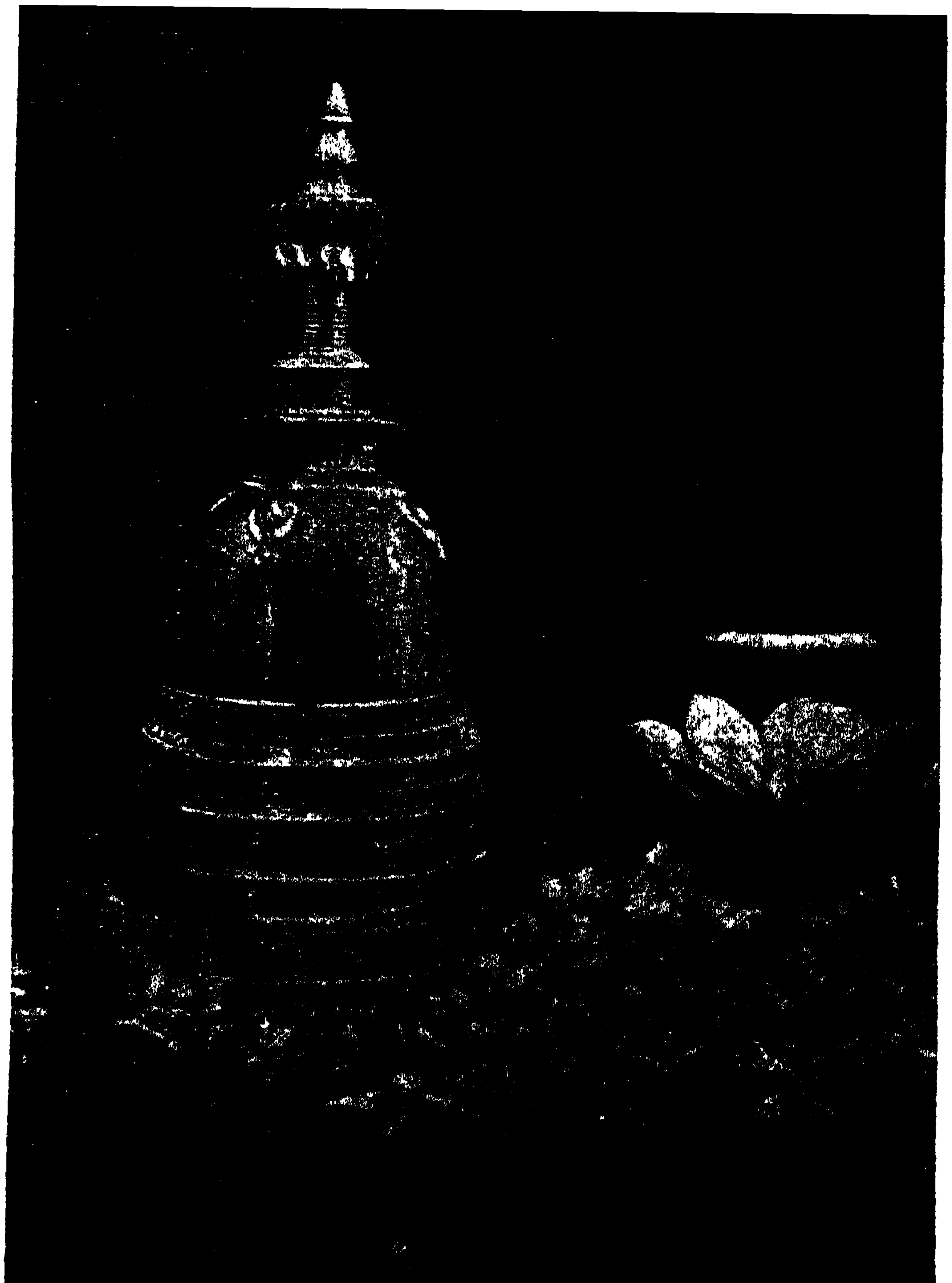

বুদ্ধদেবের দন্ত।

ব্যতীত কেহই দন্তধাতুর মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। অদ্যাপি এই নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হয়। লঙ্কাদ্বীপে বুদ্ধের দন্ত কিরূপ যত্নে রক্ষিত আছে তাহা উল্লিখিত ইতিবৃত্তদ্বারা কিয়ৎপরিমাণে অনুমিত হয়। সিংহলী রাজগণ পরম্পরাক্রমে যে সকল স্বর্ণ রত্ন মণি মাণিক্য প্রভৃতিদ্বারা খচিত সুন্দর সুন্দর দ্রব্য দন্তধাতুর মন্দিরে উপহার দিয়াছেন উহা দেখিয়া আমার প্রতীতি হইল লঙ্কা যথার্থই স্বর্ণপুরী।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

চয়ন।

শিবমন্দির।

পবিত্র ভাগীরথীর উত্তর দেশে বিহার-প্রদেশের মধ্যস্থলে এক প্রকাণ্ড পুষ্করিণী আছে। পুষ্করিণীটি এত পুরাতন যে সেটি যে কে কবে খনন করিয়াছিল তাহা স্থির করিবার আর কোনও উপায়ই নাই। সেই গভীর জলের চতুর্দ্দিকে খণ্ডগিরির ন্যায় উচ্চ পাহাড়দেশ নিবিড় জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন আছে; কালে বোধ হয় এই জঙ্গল বহুদূরব্যাপী ছিল। এখন সেখানে কৃষিক্ষেত্র ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম হইয়াছে;—পুষ্করিণীটির চারি পার্শ্বে কেবল সেই পুরাতন বনের অবশিষ্ট চিহ্ন মাত্র বর্ত্তমান। দক্ষিণ তটের গভীর বনের মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন মনোহর পুরাতন মন্দির; তাহার দ্বারদেশ হইতেই এক সুন্দর ঘাটের সোপানাবলী সেই গভীর জলের মধ্যে নামিয়া গিয়াছে।

শীতের এক সুন্দর দিনে আমি এই স্থানে শীকার করিতে গিয়াছিলাম। কতকগুলি সুন্দর পাখী মারিবার পর আমার বৃদ্ধ মাঝি আমাদের নৌকাটিকে সেই সোপানের পার্শ্বে এক বৃদ্ধবিটপীর ছায়াতলে আনিয়া বাঁধিয়া আমাকে সেই স্থানটির ইতিহাস বলিতে বসিল। গল্পটি তাহার জন্মাইবার বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে এই ভাবেই তথাকার অধিবাসীদিগের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে।

"বহু শতাব্দী পূর্ব্বে এক সময়ে যখন ইহার নিকটবর্ত্তী সমস্ত দেশ বনজঙ্গলে পূর্ণ ছিল এবং চতুর্দ্দিকে বাঘ ও বন্যহস্তী ঘুরিয়া বেড়াইত, তখন একদিন নেপালের যুবরাজ প্রাণভয়ে অযোধ্যা হইতে এইখানে পলাইয়া আসেন। অযোধ্যারাজের এক কন্যা ছিল। মেয়েটি বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রের ন্যায় রূপবতী, তাল-বৃক্ষের ন্যায় ঋজু ও ক্ষীণাঙ্গী, যুবতী ও পদ্মাক্ষী। সুতরাং তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া অনেক রাজপুত্র আসিয়া তাহার পরিণয়ভিক্ষা করিতে লাগিল। নেপালের যুবরাজও তাহাদের মধ্যে একজন। যুবরাজ রূপবান এবং পিতৃসিংহাসনের ভাবী অধিকারী। এই দেখিয়া অযোধ্যারাজ তাঁহাকেই মনোনীত করিলেন। নেপালরাজ তখন প্রচলিত প্রথানুসারে বহু অনুচর ও উপঢৌকনাদি দিয়া পুত্রকে অযোধ্যায় পাঠাইয়া দিলেন।

অযোধ্যার চতুর্দ্দিকেই আনন্দ উৎসব। কয়েকদিন পরে যুবরাজের সহিত তাঁহার ভাবী পত্নীর সাক্ষাতের দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই দিনে উভয়ের শুভদৃষ্টি হইবে এবং যুবরাজ স্বহস্তে পত্নীর সীমন্তে সিন্দুর পরাইয়া দিবেন। রাজকুমারের বীরের ন্যায় আকৃতি ও সুন্দর রূপ দেখিয়া রাজপ্রাসাদের সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন কেবল রাজার দ্বিতীয় রাণী তাঁহাকে দুই চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। রাণীটি বন্ধ্যা। সেই জন্য রাজকন্যা ও নূতন জামাতাকে তিনি মনে মনে ঘৃণা করিতেন। রাণীটি এক ডাইনি এবং প্রত্যহ দৈত্যদের সহিত তাঁহার দেখা সাক্ষাৎ ও কথা-বার্ত্তা চলিত। অনেক ব্রত ও যাগযজ্ঞ করিয়া রাণী এমন ক্ষমতা পাইয়াছিলেন যে দেবতারাও তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতেন। সেই

হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি রাজকুমারকে যাদু করিলেন। অপরে যখন এরূপ গুণবান জামাতা লাভের জন্ত রাজার সৌভাগ্যের প্রশংসাকরিত, রাণী হিংসায় হাসিয়া বলিতেন, "আগে দেখি মেয়ে তার রূপবান স্বামীকে কি রকম পছন্দ করে।" যাহা হউক শুভদৃষ্টির দিনে সমস্ত ক্রিয়া কর্ম্ম সম্পূর্ণ হইলে পর রাজা নিজে রাজকুমারের হাত ধরিয়া পরদার নিকটে লইয়া গিয়া ভিতরে ঠেলিয়া দিলেন। এই পরদার পিছনে রাজকুমারী দাঁড়াইয়া ছিলেন। তার পর যা ঘটিল তাহাতে সকলেই ভীত ও বিস্মিত হইলেন। রাজকুমারকে ঠেলিবামাত্র পর্দ্দার পশ্চাৎ হইতে একটা ভীত ক্রন্দনধ্বনি উঠিল এবং রাজকুমারী বলিয়া উঠিলেন—"হায় পিতঃ, এ কাহাকে আপনি আমার স্বামী মনোনীত করিয়াছেন? এ আমাকে আলিঙ্গন করিবে কি করিয়া? এ যে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত!" রাণীর মন্ত্রবলে এই ব্যাপার ঘটিয়াছিল। রাজকুমার যখন পর্দ্দার ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, সকলে আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল তাঁহার বুকের পরিচ্ছদ ছিন্ন এবং অঙ্গে শ্বেত কুষ্ঠের চিহ্ন! এই দেখিয়া রাজা ক্রোধে ও ক্ষোভে তাঁহাকে অনুচরবর্গ সহ বনের মধ্যে তাড়াইয়া দিলেন। অনেক দিন বনে বনে ঘুরিয়া—এবং বন্যপশু ও দস্যুদের হস্তে অনেক অনুচর হারাইয়া, শেষে একদিন শ্রান্তদেহে ক্লিষ্টমনে যুবরাজ এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বহুদিন স্নানাদি না করিয়া যুবরাজের বড়ই কষ্ট হইতেছিল। সেইজন্য আহারের পর ভৃত্যদিগকে নিকটস্থ কোন স্থান হইতে জল আনিতে আদেশ করিলেন। জলাভাবে কুষ্ঠের ক্ষতগুলি শুকাইয়া বড়ই কষ্ট দিতেছিল। ভৃত্যেরা বহুক্ষণ ধরিয়া চতুর্দ্দিকে জল অন্বেষণ করিল, কিন্তু কোথাও একটু নির্ম্মল জল খুঁজিয়া পাইল না। শেষে অনেক কষ্টে এক মহিষের ডোবা হইতে এক ভাঁড় কাদামাখা জল লইয়া আসিল। সেই জলেই রাজকুমার পা ধুইলেন। কি আশ্চর্য্য! তাঁর সেই কুষ্ঠের চিহ্ন সব মিলাইয়া গিয়া তাঁহার অঙ্গ বেশ সুস্থের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। এই দেখিয়া রাজকুমার বুঝিলেন যে কোন দেবতা নিশ্চয়ই তাঁহার উপর দয়াপরবশ হইয়া এইরূপ করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং তখন সেই ডোবার নিকট আসিয়া মহাদেবের উপাসনা পূর্ব্বক সেই কর্দ্দমাক্ত জলে স্নান করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ রোগমুক্ত হইলেন।

কিন্তু তবু তাঁর কষ্টের শেষ হইল না। অনেক মাস ধরিয়া অনুচরদিগকে লইয়া যুবরাজ গভীর বনের মধ্যে দৈত্য ও পশুদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন,—কখনও বনের মধ্যে হারাইয়া যাইতেছেন, কখনও জলের মধ্যে ডুবিয়া যাইতেছেন, কখনও ভয়ঙ্কর সর্পের মুখে পড়িতেছেন, আবার কখনও দস্যুহস্তে পড়িতেছেন। ক্রমে তাঁহার সেই অসংখ্য অনুচরের মধ্যে একে একে সকলেই মরিয়া গেল। কেবল রাজপুত্র স্বয়ং ও দুইটি অতি বিশ্বস্ত অনুচরমাত্র জীবিত রহিলেন। শেষে এই তিনটিতেও যখন জীবনের আশা ছাড়িয়া দিয়া সেই গভীর অরণ্যের মধ্যেই মৃত্যু স্থির করিলেন, তখন একদিন হঠাৎ একটা ফাঁকা জায়গায় আসিয়া বহুদিনের পরে সূর্য্যালোক দেখিতে

পাইলেন। এই নির্জ্জন স্থানে এক ঋষি তাঁহার আশ্রম স্থাপন করিয়া একান্ত মনে ঈশ্বরারাধনা করিতেছিলেন। রাজকুমার তাঁহার নিকট আপন অবস্থা বর্ণনা করাতে ঋষি তাঁহাদের পথ দেখাইয়া দিলেন। এতদিনে রাজকুমার বনের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। যুবরাজের অনুরোধ ক্রমে ঋষিবর তাঁহাদিগকে অযোধ্যার পথই দেখাইয়া দিয়াছিলেন। একদিন গভীর রাত্রে তিন জনে গোপনে ছদ্মবেশে নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যেদিন তিনি এই নগর হইতে লাঞ্ছিত হইয়া তাড়িত হইয়াছিলেন, সে আজ প্রায় এক বৎসরের অধিক হইল। আজ নগর আবার আনন্দ উৎসবে পরিপূর্ণ। প্রাসাদের নিকটে যাইয়া রাজকুমার দেখিলেন চতুর্দ্দিক প্রহরী বেষ্টিত। এক প্রহরীকে এ উৎসবের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল—"এঁ্যা, তুমি কি জান না যে কাল আমাদের রাজকুমারীর বিবাহ?" রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন—"বিবাহ হইবে কাহার সহিত?" "রাজমন্ত্রীর সহিত। আমার বাজে কথা কহিয়া সময় নষ্ট করিবার অবকাশ নাই।"

রাণী মন্ত্রীর প্রতি বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন এবং রাজাকে বুঝাইয়া তাঁহাকেই জামাতা করা স্থির করিয়াছেন।

ক্ষোভে ও ক্রোধে রাজকুমার জ্ঞানশূন্য হইয়া মহাদেবের নিকট প্রার্থনা করিলেন যে এরূপ ঘটনা যেন না ঘটে, তাঁহার মনোনীতা পত্নী যেন অপরের না হয়। সেই রাত্রে স্বপ্নে মহাদেব আসিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন "আমি তোমার পত্নীর উদ্ধারের উপায় বলিয়া দিব।"

পর দিন যখন উৎসবপ্রাঙ্গণে সকলে সমবেত হইয়াছে, রাজা কন্যাদান করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন এবং পাপচিত্ত মন্ত্রী রাজকুমারীর সীমন্তে সিন্দুর দিবার জন্য পর্দ্দার অন্তরালে যাইতেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ চীরপরিহিত ভস্মমাখা এক ফকির জনতা ভেদ করিয়া রাজসমীপে অগ্রসর হইতে হইতে চীৎকার করিয়া উঠিল—"দোহাই, মহারাজ, দোহাই!" রাজা ন্যায়বিচার দানে বাধ্য, সুতরাং বলিয়া উঠিলেন—"কে তুমি বিচার প্রার্থনা করিতেছ?" "আমি ঐ দুষ্টানারী ও এই মন্ত্রীর ষড়যন্ত্রে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলাম, এক্ষণে মহাদেবের কৃপায় সে রোগ হইতে মুক্ত হইয়া আমার পত্নীভিক্ষা করিতে আসিয়াছি।" তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে মহাদেবের শাপে রাণী ও মন্ত্রী ভয়ঙ্কর কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইল। এতদিনে রাজার চক্ষু ফুটিল। তিনি রাণী ও মন্ত্রীকে অরণ্যে তাড়াইয়া দিলেন। যুবরাজের সহিত রাজকুমারীর বিবাহ হইয়া গেল।

তৎপরে মহাদেবের কৃপার কথা স্মরণ করিয়া যুবরাজ সেই মহিষের ডোবা খুঁজিয়া বাহির করিলেন এবং তাঁহার আদেশে সেই স্থানে এই পুষ্করিণী খনিত হইল। তিনি ডোবার চতুর্দ্দিকের ভূমি কর্ষিত করিয়া তাহার মধ্যে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা ছড়াইয়া দিয়া চতুর্দ্দিক পুনরায় মৃত্তিকা দ্বারা ঢাকিয়া দিলেন। যুবরাজ প্রচার করিলেন যে এই মাটি খুঁড়িয়া যে যতগুলি মুদ্রা পাইবে সেগুলি তাহার নিজের পারিশ্রমিক হইবে। নানাদেশ হইতে লোক আসিয়া

মাটি খুঁড়িতে আরম্ভ করিল। দক্ষিণ তীরে এক মন্দির প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সেখানকার বৃক্ষগুলি ছেদিত হইতে লাগিল। শেষ বৃক্ষটির অঙ্গে কুঠারাঘাত হইবামাত্র অমনি ক্ষতস্থান হইতে রক্ত বাহির হইতে লাগিল এবং একটা অস্ফুট ক্রন্দন ধ্বনি শুনা গেল। এই সংবাদে যুবরাজ সেই বৃক্ষটির ছেদন বন্ধ করিয়া দিলেন। সেই দিন রাত্রে স্বপ্নে মহাদেব আসিয়া বলিলেন—"আমি ঐ বৃক্ষে আশ্রয় লইয়াছি। উহা ছেদন করিয়া এমন একটি শিকড়ের অনুসন্ধান করিবে যেটি পৃথিবীর মধ্যস্থল পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। সেই শিকড় কাটিয়া আমার মূর্ত্তি প্রস্তুত করিবে এবং ঐ মন্দিরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবে।"

যুবরাজ সেইরূপই করিলেন। আজও ঐ মন্দির মধ্যে সেই দারু মূর্ত্তিই বিরাজিত!

মাঝি গল্প শেষ করিয়া আমার নৌকাটিকে আনিয়া তীরে লাগাইল। আমি সেই প্রাচীন কথা ভাবিতে ভাবিতে শিবিরে ফিরিলাম।

মুর্শিদাবাদের প্রাচীন কাহিনী।

মহারাষ্ট্র বীর রঘুজি ভোঁসলে ভাস্করের হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য উদ্বিগ্নচিত্তে অপেক্ষা করিতেছিলেন। সুতরাং মুস্তাফার বিদ্রোহ ও বঙ্গে অশান্তি ও অরাজকতার সংবাদ পাইবামাত্র তিনি অবসর বুঝিয়া বঙ্গদেশে আগমণ করিলেন; আলিবর্দ্দী তখন তাঁহার রণক্লান্ত সৈন্য লইয়া পাটনা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। এই সংবাদ পাইবামাত্র তিনি রাজধানী রক্ষা করিবার এবং রঘুজি ও মুস্তাফার সংযোগ-নিবারণ উদ্দেশ্যে তৎক্ষণাৎ মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিলেন। লুণ্ঠনকারী মহারাষ্ট্র বীর তিন ক্রোড় মুদ্রা নজর চাহিয়াছেন শুনিয়া নবাব তাঁহার কর্ম্মচারীকে রঘুজির সহিত কৌশলে কালক্ষেপ করিতে উপদেশ দিলেন। ইতিমধ্যে মুস্তাফা নবাবকে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সন্ধিস্থাপনে নিযুক্ত স্থির করিয়া এক প্রবল বাহিনী লইয়া বঙ্গদেশের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু বীরবর শাহজঙ্গ তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ যাত্রা করিয়া জগদীশপুরের যুদ্ধে বিদ্রোহীগণকে পরাজিত করিলেন। মুস্তাফা নিজে রণক্ষেত্রে হত হইলেন এবং তাঁহার অনুচরবর্গ প্রভুর মৃতদেহ দেখিবামাত্র ভগ্নোদ্যম হইয়া পলায়ন করিল। পরে মুস্তাফার পুত্র মুর্ত্তাজা নেতা হইয়া পার্ব্বত্য প্রদেশ উৎখাত করিতে লাগিল এবং অবশেষে মহারাষ্ট্রদিগের সহিত সংযুক্ত হইয়া পুনরায় নবাবের বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল।

এদিকে জগদীশপুরের যুদ্ধের জয়বার্ত্তা শুনিবামাত্র নবাবের দুশ্চিন্তা অনেকটা দূর হইল এবং তিনি মহারাষ্ট্রীয়দিগকে শাসিত করিবার সুযোগ বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ রঘুজিকে এক পত্র প্রেরণ করিলেন। সেকালে মুসলমান আদবকায়দার এতই বাহুল্য ছিল যে যুদ্ধঘোষক বার্ত্তা পর্য্যন্ত চাটুবাক্যে মণ্ডিত হইত। তাঁহার পত্রের মর্ম্ম এই।

"শত্রুর নিকট যাহারা সন্ধিভিক্ষা করে তাহারা আপনার স্বার্থের ক্ষতি বা হীনতা বা ভবিষ্যতে সুযোগের আশার দ্বারাই চালিত হয়; কিন্তু পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ! সত্যধর্ম্মানুরাগী বীরগণ অবিশ্বাসীর সহিত সংগ্রাম করিতে ভীত নহে। সুতরাং সন্ধি এই ক্ষেত্রে সম্ভব,—যখন ইসলামধর্ম্মী সিংহগণ পৌত্তলিক দৈত্যগণের সহিত এরূপ কঠোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে যে তাহারা পরস্পরের রক্তস্রোতে সন্তরণ দিবে এবং একপক্ষ বিপর্য্যস্ত হইয়া শান্তি ভিক্ষা করিবে।"

ইহার উত্তরে রঘুজি লিখিলেন—"সেই দিগ্‌পতি

করিবার জন্যই তিনি তাঁহার স্বদেশ হইতে প্রায় সহস্র মাইল পথ অগ্রসর হইয়া আসিয়াছেন কিন্তু নবাব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশে এখনও একশত মাইলও অগ্রসর হন নাই।"

আলিবর্দ্দী উত্তরে লিখিলেন—"যেরূপ বর্ষা উপস্থিত হইয়াছে এবং এই দীর্ঘ যাত্রার ফলে রঘুজি যেরূপ শ্রান্ত ও পীড়িত হইয়াছেন, তাহাতে বর্ষার কয়মাস কোনও সুবিধাজনক স্থানে অতিবাহিত করাই তাঁহার পক্ষে সমীচীন। তাঁহার সৈন্তেরা বিশ্রামের পর নবতেজে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্ত প্রস্তুত হইলে তিনি সসম্মানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিবেন, এমন কি তাঁহার স্বরাজ্যে পর্য্যন্ত যাইতে তিনি প্রস্তুত।"

শীতের প্রারম্ভেই আলিবর্দ্দী রাজধানী ত্যাগ করিয়া বীরভূম যাত্রা করিলেন। নবাবের আগমনের সংবাদ পাইয়া রঘুজি বিহারে পলায়ন করিলেন। তথায় মুস্তাফার ধ্বংসাবশিষ্ট সৈন্ত তাঁহার সহিত সংযুক্ত হইল। তখন উভয়ে নূতন সৈন্ত সংগ্রহ করিবার জন্ত সোন্ নদী পার হইবামাত্র, নবাব নদী-তীরস্থ আলিপুর নগরে যাত্রা করিলেন। এই স্থানে উভয় পক্ষে দুই চারিটি খণ্ডযুদ্ধ হইল। এক যুদ্ধে রঘুজি স্বয়ং বন্দী হন, কিন্তু নবাব সৈন্যস্থ দুই জন আফগান সেনাপতির সাহায্যে সে যাত্রা মুক্তিলাভ করিয়া হবিবের পরামর্শানুসারে অবিলম্বে মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করেন। নবাবও তৎক্ষণাৎ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করেন। সৌভাগ্য বশতঃ রাজধানী লুণ্ঠিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই নবাব নগরদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহারাষ্ট্রীয়গণ তখন নগরের সন্নিকটস্থ স্থানগুলি লুণ্ঠনে নিযুক্ত। নবাবসৈন্য আসিয়াছে দেখিয়া তাহারা অচিরাৎ পলায়নপর হইল। এমন সময়ে স্বদেশে বিদ্রোহের সংবাদ পাইয়া মহারাষ্ট্র সেনাপতি তৎক্ষণাৎ বেরার যাত্রা করিলেন; মীর হবির উড়িষ্যার অধিপতি নিযুক্ত রহিলেন।

মহারাষ্ট্রীয়দিগের এই আকস্মিক দেশত্যাগে নিশ্চিন্ত হইয়া নবাব এইবার সেই দুই আফগান সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তিদানে মানস করিলেন। তাহারা রঘুজির সহিত যে সকল পত্র দ্বারা ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, সেগুলি সাউকতের সাহায্যে বাহির হইয়া পড়িল এবং তাহাদের অপরাধ নিঃসন্দেহ রূপে প্রমাণিত হইল। কিন্তু তাহাদের এই দুষ্কৃতি সত্ত্বেও আলিবর্দ্দী তাহাদিগের অতীত উপকার বিস্মৃত হইলেন না। তিনি ক্রোধের বশীভূত হইয়া তাহাদিগকে লাঞ্ছিত করিয়া বিদায় দিলেন না। তাহারা তাহাদের সমস্ত ধনরত্ন, পরিবার ও অনুচরবর্গ লইয়া উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর উপযুক্ত সমারোহের সহিত রাজধানী ত্যাগ করিয়া তাহাদের জন্মভূমি দ্বারভঙ্গে গমন করিল। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দের বিহারবিদ্রোহের পূর্ব্বে আমরা তাহাদের আর কোনও সংবাদ পাই না।

এই প্রাচীন রাজধানীর ইতিহাসে ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দ চির-স্মরণীয় থাকিবে। এই সালেই সিরাজ-উদ্দৌলার বিবাহোৎসবে এরূপ সমারোহ হইয়াছিল, যে বিলাস বাহুল্যখ্যাত মুর্শিদাবাদ নগরীতেও তৎপূর্ব্বে এরূপ মহোৎসব আর হয় নাই। কয়েক মাস ধরিয়া নগরে কেবল গীতবাদ্য ও রোশনাই চলিয়াছিল। বৃদ্ধ নবাব প্রিয়তম দৌহিত্রের বিবাহোৎসবকে চিরস্মরণীয় করিবার জন্য কোন যত্নের বা ব্যয়েরই ত্রুটি করেন নাই। কর্ম্মক্লিষ্ট আলিবর্দ্দীর জীবনে আরাম ও আনন্দ উপভোগ এই প্রথম।

১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে নবাব পুনরায় উড়িষ্যা উদ্ধারে মনোযোগী হইলেন। উৎকলদেশ তখনও মহারাষ্ট্র কবলে। এই লুণ্ঠনকারীদিগকে বিতাড়িত করিবার জন্য, নবাব তাঁহার ভগিনীপতি মিরজাফরকে সসৈন্যে উৎকলে প্রেরণ করিলেন। জাফর তখন মেদিনীপুরের ফৌজদার। প্রথম প্রথম জাফর খুব সাহস ও দৃঢ়চিত্ততা দেখাইয়া কয়েকটি যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে পরাজিত করিলেন। কিন্তু তাঁহার দুর্ব্বল চিত্ত অল্পদিনের মধ্যেই ইন্দ্রিয় ভোগে উন্মত্ত হইল। শুদ্ধচরিত্র নবাব এই সংবাদ পাইয়া বিশেষ ক্রুদ্ধ হইলেন। নূতন ফৌজদারের অপদার্থতার সুযোগ গ্রহণ করিতে বেরার মহারাষ্ট্রীয়েরাও বিলম্ব করিলনা।

তাহারা অবিলম্বে একদল সৈন্য প্রেরণ করিয়া জাফরকে উৎকল হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিল। পলাতক জাফর বর্দ্ধমানে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আলিবর্দ্দী তৎক্ষণাৎ আতাউল্লা নামে এক সুদক্ষ সেনাপতিকে তথায় প্রেরণ করিলেন। তিনি মহারাষ্ট্রীয়দিগকে বিতাড়িত করিলেন বটে, কিন্তু এক ভবিষ্যদ্বক্তার কথায় প্ররোচিত হইয়া ম্যাকবেথের ন্যায় সিংহাসন লাভের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু আলিবর্দ্দী অনতিবিলম্বেই তাঁহার শক্তি খর্ব্ব করিয়া তাঁহাকে মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ করিলেন। মিরজাফরকে কঠোর তিরস্কার করিয়া রাজদরবার হইতে বহিস্কৃত করিলেন। জাফর ইহাতে এত ক্রুদ্ধ হইলেন, যে তিনি আর কখনও দরবারে উপস্থিত হন নাই। কিছুকাল পরে জাফরের প্রতি অত্যধিক কঠোর ব্যবহার করার জন্য দুঃখিত হইয়া আলিবর্দ্দী একদিন জাফরের এক আত্মীয়ের মৃত্যু উপলক্ষে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য স্বয়ং তাঁহার শিবিরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। জাফর তাঁহাকে সাদরে অভিবাদন করা দূরে থাক, অত্যন্ত অপমান সূচক ব্যবহারই করিয়াছিলেন। নবাব যখন দেখিলেন যে তাঁহার জাফরের সহিত মনোমালিন্য দূর করিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইল, তখন তিনি জাফরের সৈন্য কাড়িয়া লইয়া তাহার সহিত রাজ্যের সকল সম্পর্ক শেষ করিলেন।

১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে রঘুজির পুত্র জানুজি ভোঁসলে পিতার ন্যায় বঙ্গ লুণ্ঠন উদ্দেশ্যে দেশে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু নবাবের নিকট পরাজিত হইয়া মেদিনীপুরে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এই সালে যে কেবল মহারাষ্ট্রীয়গণই উৎপাত আরম্ভ করিয়াছিল তাহা নহে, পূর্ব্বোল্লিখিত বিহারের ভীষণ বিদ্রোহও এই সালেই হয়। নবাব যখন মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধকল্পে মেদিনীপুর যাত্রা করেন, সেই সময়ে পথেই তিনি আফগান সেনাপতিদ্বয় সর্দ্দার খাঁ ও শমসের খাঁর রাজদ্রোহিতার সংবাদ পান। মহারাষ্ট্রদিগের সহিত ষড়যন্ত্রের অপরাধে ইহারা কর্ম্মচ্যুত হইয়াছিল, বোধ হয় পাঠকের স্মরণ আছে। বিহারের শাসনকর্ত্তা জাইনদ্দিন জঙ্গ নিতান্তই দয়াশীল ছিলেন। তিনি এই দুই সেনাপতিকে ক্ষমা করিবার জন্য নবাবকে অনুরোধ করিয়া পাঠান। নবাব ভ্রাতষ্পুত্রের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিলেন না।

নবাবের নিকট হইতে আফগানদ্বয়ের ক্ষমালাভ করিয়া জাইনদ্দিন দেখাইতে চাহিলেন যে তাঁহার বিবেচনায় নবাব তাহাদের প্রতি অন্যায় আচরণ করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি উভয়কেই পাটনাতে নিমন্ত্রণ করিলেন এবং গোপনে উভয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পরদিন সর্দ্দার খাঁ শাসনকর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশে পাটনায় গমন করিল। তাহার সকল সন্দেহ দূর করিবার জন্য জাইনদ্দিন তাঁহার শরীররক্ষক প্রহরীগণকে পর্য্যন্ত বিদায় দিলেন এবং বিশেষ সমাদরের সহিত আফগান সেনাপতিকে রাজদরবারে অভিবাদন করিলেন। সমসের শাসনকর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ছলে সশস্ত্র সৈন্যসমভিব্যাহারে পাটনা নগরে প্রবেশ করিল। নবাব তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য যেমন অগ্রসর হইবেন, অমনি শমসেরের এক সৈনিক তাঁহার হৃৎপিণ্ডের নিম্নে ছুরিকাঘাত করিল। নবাব তৎক্ষণাৎ অসিগ্রহণের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অসি কোষমুক্ত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার শির ভূমে লুটাইয়া পড়িল। আফগানেরা নগর অধিকার করিয়া নগরবাসীর উপর পীড়ন এবং বহু নির্দ্দোষীকে হত্যা করিতে লাগিল। নবাবের ধনরত্ন কোথায় লুক্কায়িত আছে তাহা না জানিতে পারিয়া তাহারা কোষাধ্যক্ষ বৃদ্ধ হাজি আমেদকে নিষ্ঠুরভাবে পীড়ন করিয়া হত্যা করিল। জাইনদ্দিনের বেগমদিগকে পর্য্যন্ত তাহারা অধিকার করিল। আলির প্রিয় কন্যা ও সিরাজের মাতা সুন্দরী আমিনা বেগমও তাহাদের হস্তগত হইলেন।

এই বিপদের সংবাদে আলিবর্দ্দী নিতান্ত বিহ্বল ও কাতর হইয়া পড়িলেন। প্রিয়তমা কন্যা, বর্ব্বর ইন্দ্রিয়ভোগপরস্তের কবলে, ভগিনী নিষ্ঠুরগণের ক্রীতদাসী,

এবং সহোদর ভ্রাতা দানবীয় পীড়নে প্রাণ হারাইয়াছেন এই সকল ভাবিয়া নবাবের জীবন দুর্ব্বহ ভারস্বরূপ বোধ হইল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন হয় তাহাদিগকে উদ্ধার করিবেন ও অত্যাচারীর শাস্তিবিধান করিবেন, আর না হয় সমাধির ক্রোড়ে শান্তিলাভ করিবেন—'মন্ত্রের সাধন কি শরীর পতন'। এই স্থির করিয়া তিনি তাঁহার চিরঅনুগত কর্ম্মচারী ও সৈনিকগণকে ডাকিয়া সাশ্রুনয়নে মর্ম্মস্পর্শী স্বরে তাঁহার সংকল্প বুঝাইয়া বলিলেন। সমবেত প্রধানবর্গ সকলেই একবাক্যে কোরাণস্পর্শ করিয়া শপথ করিলেন যে, যতদিন জীবন থাকিবে ততদিন তাঁহারা বীর নবাবের অনুগত থাকিয়া যুদ্ধ করিবেন।

ইহার পরেই নবাব এক ঘোষণা প্রচার করিলেন যে, যাঁহাদের পক্ষে সম্ভব তাঁহারা অন্ততঃ কিছুকালের জন্য রাজধানী ত্যাগ করিয়া কোনও নিরাপদ স্থানে গমন করুন। মহারাষ্ট্রীর হস্ত হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করাই এরূপ ঘোষণার উদ্দেশ্য। আলিবর্দ্দীর বিচিত্রঘটনাসঙ্কুল রাজত্বকালের মধ্যে এই নগর ত্যাগের তুল্য শোচনীয় দৃশ্য বুঝি আর হয় নাই। ধীরে ধীরে সেই বিরাট নগরী জনশূন্য হইতেছে—শ্রেণীর পর শ্রেণী প্রজাবৃন্দ কাশিমবাজার বা কলিকাতার প্রাচীরবেষ্টিত ইংরাজ কুঠির মধ্যে আশ্রয় লইবার জন্য সাশ্রুনয়নে নগরের তোরণদ্বার অতিক্রম করিয়া যাইতেছে। কয়েক দিনের মধ্যেই সেই সম্পদমণ্ডিত, আনন্দ কোলাহল মুখরিত রাজধানী নিস্তব্ধ, শোচনীয় শ্মশানে পরিণত হইল। কেবল মধ্যে মধ্যে পথে দুই একটি নগর রক্ষক বা নগরত্যাগে অশক্ত অসহায় বা আতুর ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে মাত্র। নবাব যখন নিত্য এই দৃশ্য দেখিতেন নীরবে অশ্রুত্যাগ করিতেন। পরে মামুৎ ও আতাউল্লা রাজধানীর রক্ষক এবং শাউয়েৎ জঙ্গ রাজপথ ও জলপথের রক্ষক নিযুক্ত হইলেন। কারণ এই উভয় পথ দিয়া নবাবের নিকট যুদ্ধের আবশ্যকীয় বস্তু সকল সরবরাহ হওয়া আবশ্যক।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

বন্দী।

১৮

কারাধ্যক্ষ বা তার লোকজন—কাহারো কোন ত্রুটি যে থাকিতে পারে, এ কথা সে মোটে বিশ্বাসই করিবে না। ঠিক কথা! ত্রুটির কথা বলাই যে অন্যায়! তারা কর্ত্তব্য করিয়াছে মাত্র! সতর্কভাবে আমার প্রহরীর কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে, আমার প্রতি কোন পরুষ আচরণ করে নাই! আমার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট সন্তোষের কারণ নয় কি?

আর এই কারাধ্যক্ষ—এই ভদ্রলোকটি, মৃদু হাস্যের সহিত শান্ত আলাপ, সতর্ক অথচ প্রীতিমধুর দৃষ্টিটুকু, দীর্ঘ বলিষ্ঠ বাহু—কারাগৃহের প্রতিবিম্ব বলিলেই চলে—পাষাণ-কারা যেন মানুষের মূর্ত্তি ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে! চারিধারে কারাগৃহের সুস্পষ্ট প্রতিবিম্ব—লোকজন, লৌহগরাদ, প্রস্তর-দেওয়াল,—সর্ব্বত্রই! চাবি-তালাগুলা পর্য্যন্ত,—যেন রক্তমাংসের জীব বলিয়া মনে হয়—আমাকে সকলে মিলিয়া পাহারা দিতেছে! আর এই কারাগৃহ,—নিষ্ঠুর কারাগৃহ, অর্দ্ধপ্রস্তর ও অর্দ্ধ মানবদেহবিশিষ্ট প্রাণীরই স্বরূপ মূর্ত্তি, আমাকে চাপিয়া ধরিয়াছে, চারিধার হইতে জড়াইয়াছে, বাঁধিয়া রাখিয়াছে! লৌহহৃদয় লইয়া আলিঙ্গন করিতে আসিয়াছে! দরিদ্র, হতভাগ্য আমি, আমাকে লইয়া আজ ইহারা, করিবে কি?

১৯

শান্ত চিত্ত। কোন ভাবনা নাই, দ্বিধা নাই! জেলের কর্ত্তা আসিয়া দেখিয়া গিয়াছেন —তাঁহার সহিত সাক্ষাতের পর-মুহূর্ত্ত হইতেই ভালো আছি! পূর্ব্বে মনে যে আশাটুকু রাখিতাম, এখন সেটুকুও যে ছাড়িতে পারিয়াছি, ইহা শুধু তাঁহারি বচনে!

সাড়ে ছয়টা—কি পৌনে সাতটা—এমন সময় আমার কক্ষের দ্বার মুক্ত হইল—পলিত-কেশ একটি লোক ভিতরে প্রবেশ করিলেন; আসিয়াই, তাঁর প্রকাণ্ড ভারী কোট খুলিয়া, বসিলেন—পোষাক হইতে বুঝিলাম, ইনি আচার্য্য মহাশয়! বন্দীদিগের আচার্য্য নন, অবশ্য!

আমার সম্মুখে তিনি বসিলেন। মাথা নাড়িয়া আকাশের দিকে চাহিলেন। এ দৃষ্টির অর্থ বুঝিতে আমার বিলম্ব হইল না!

তিনি কহিলেন, "তুমি প্রস্তুত হয়েছ, বৎস?"

অনুচ্চ কণ্ঠে আমি কহিলাম, "প্রস্তুত ঠিক হই নাই,—তবে, হাঁ, এখনি উঠিতে সম্মত আছি।"

আমার দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল। কপালে বিন্দুবিন্দু ঘাম হইতেছিল! প্রস্তুত,—একেবারে প্রস্তুত,- কিন্তু কিসের জন্য? আমার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল! প্রাণের মধ্যে কি-একটা বিকট শব্দ ধ্বনিত হইতেছিল!

আচার্য্য অনেক কথাই বলিতেছিলেন—তাঁহার ঠোঁট নড়িতেছিল, হাত পা ঘাড়ও সেই সঙ্গে নড়িতেছিল। কি বলিতেছিলেন, তাহা জানিনা, কারণ, আমার মনে কোন কথাই পৌঁছিতেছিল না।

আবার দ্বার খুলিল। এইবার জেলকর্ত্তা স্বয়ং সশরীরে উপস্থিত। গায় দীর্ঘ কালো-কোট, হাতে এক বাণ্ডিল কাগজ—জোর করিয়া তিনি মুখে বিষাদের দাগ টানিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

জেলকর্ত্তা কহিলেন, "আদালত হইতে সংবাদ আসিয়াছে।" একটা তড়িতশিখা আমার হৃদয়ের ভিতর দিয়া বহিয়া গেল।

আমি কহিলাম, "কি? আদালত কি এখনি আমার মাথাটা চাহে? সে-ত আমার পক্ষে গৌরবের কথা! এ মাথাটার উপর সরকারী উকিলের বিলক্ষণ লোভ—তা জানি —বেশ—আমিও প্রস্তুত!" তিনি কাগজের ভাঁজ খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন,—আদালতের চির-জটিল অস্পষ্ট বর্ণাক্ষরমালা—কতকগুলা বিকট দীর্ঘ শব্দের ঝঙ্কার—অনেক কষ্টে অর্থ বাহির করিতে হয়! আধঘণ্টা কাগজ ঘাঁটিয়া, অর্থ বুঝা গেল,—আমার আপীল প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে! বেশ!

তিনি কাগজ হইতে মাথা না তুলিয়া এক নিশ্বাসেই বলিয়া গেলেন,—"প্লে দি গ্রীভে ফাঁসি হইবে! সাড়ে সাতটায় আমরা কাঁসিয়ারজারি জেলে যাইবে! অনুগ্রহ করিয়া অনুসরণ করিবেন।"

কয়েক মুহূর্ত্ত অবধি কাহারো কথায় আমি কাণ দিই নাই। জেলের কর্ত্তা ও আচার্য্যে বেশ গল্প জমিয়াছিল—দেশেরও দশের কথায় তাঁহারা মাতিয়া উঠিয়াছিলেন!

এমন সময় দ্বার খুলিয়া চারিজন সশস্ত্র প্রহরী ভিতরে আসিল! যেন যমদূত! অভিবাদন করিয়া তাহারা জানাইল, "সময় হয়েছে।"

আমি কহিলাম, "বেশ, আমিও প্রস্তুত—চল!"

তাহারা কহিল, আধ ঘণ্টার মধ্যেই যাত্রা করিতে হইবে! তার পর সকলে বাহির হইয়া গেল।

এখন একবার শেষ চেষ্টা! ভগবান, সত্যই কি কোনো আশা নাই? পলাইব, নিশ্চয় আমি পলাইব! দ্বার, জানালা, ছাদ ভেদ করিয়া, যেখান দিয়া পারি, পলাইব! দেহের মাংসগুলাকে রাখিয়া যাইতে হয়, যদি, তবু এই অস্থিকয়খানা লইয়াই পলাইব!

কোথায় এখন যন্ত্র—অস্ত্র? রাক্ষসের মত বলে ও উদ্যমে যন্ত্রপাতি লইয়া যদি লাগিয়া যাই, তথাপি এ দেয়াল ভাঙ্গিতে একমাস সময় লাগিবে! কিন্তু আমার হাতে একটা পেরেক অবধি নাই—হারে দুরাশা—একান্ত দুরাশা!

২০

কাঁসিয়ারজারির জেলে আমি আসিয়াছি। নিজের ইচ্ছায় নয়—সতর্ক প্রহরীবেষ্টিত বন্দী অবস্থাতেই আসিয়াছি! পথের কথাটুকু বলিবার মত।

সাড়ে সাতটার সময় আমার প্রহরী আসিয়া সেলাম করিয়া কহিল, "সঙ্গে আসুন, মশায়!" আদব-কায়দার কোন ত্রুটি নাই। আমি উঠিয়া তাহার অনুসরণ করিলাম। মাথা এমনি ভার বোধ হইতেছিল, আর পা দুইটা এত দুর্ব্বল—যে চলা যায় না! তবু চেষ্টা করিয়া চলিলাম। বাহির হইতে একবার আমার নির্জ্জন ঘরটির দিকে চাহিলাম—এতদিনের আশ্রয়—কেমন একটা মায়া পড়িয়া গিয়াছিল। আজ তাহা শূন্য রাখিয়া চলিলাম,—কি বিচিত্র, এ দৃশ্য! কিন্তু অধিকক্ষণের জন্য নয়—সন্ধ্যার সময়, আবার এক নূতন অতিথি আসিয়া শূন্য ঘর পূর্ণ করিবে! ধন্য বিধান!

প্রাঙ্গণের সম্মুখেই আচার্য্য বসিয়াছিলেন—তিনি তাঁর আহারটুকু শেষ করিতেছিলেন। জেল-কর্ত্তা আমার করকম্পন করিলেন—তারপর চারিজন সশস্ত্র প্রহরী দ্বারা বেষ্টিত হইয়া আমি চলিলাম।

হাঁসপাতাল হইতে একটি লোক অভিবাদন করিল। তখন আমি মুক্ত প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম! কিন্তু, কতক্ষণের জন্য?

বাহিরে গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল। সেই গাড়ী—যাহার মারফত্ এখানে আসিয়াছিলাম। লম্বা গাড়ী, ভিতরটা রেলিঙের দ্বারা দুইভাগে বিভক্ত! যেন লোহা দিয়া কে মাকড়সার জাল বুনিয়াছে! দুইটা ঘরের স্বতন্ত্র দ্বার—একটি পিছনে, অপরটি সম্মুখে। গাড়ীর মধ্যে যেমন অন্ধকার, তেমনি ধূলা ও আবর্জ্জনার রাশি! ইহার তুলনায় আমার সে নির্জ্জন ঘর ত, প্রাসাদ-কক্ষ! এই কবরে জীবন্ত সমাধিলাভের পূর্ব্বে বাহিরের দিকে একবার প্রাণ ভরিয়া চাহিয়া দেখিলাম! এই মুক্ত গগনের স্মৃতিটুকু লইয়া আঁধার সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হইবে! দ্বারের সম্মুখে দর্শকের দল সারি দিয়া দাঁড়াইয়াছিল! টিপ-টিপ করিয়া বৃষ্টিও পড়িতেছিল—বোধ হয় সারাদিনে এ বৃষ্টির বিরাম হইবে না! পথ ও প্রাঙ্গণ কাদায় ভরিয়া গিয়াছিল—চারিধারে একটা অপরিচ্ছন্ন ভাব!

গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। সম্মুখভাগে সর্দ্দার প্রহরী, ও সশস্ত্র প্রহরীর দল, এবং আচার্য্য—পশ্চাতের কামরায়; আমি একেলা!

বাহিরে অশ্বপৃষ্ঠে আর চারিজন প্রহরী গাড়ীর সহিত চলিল! আমাকে পাহারা দিবার জন্য আটজন সশস্ত্র প্রহরী এবং তদতিরিক্ত লোকজন ত ছিলই! রাজার মত চলিয়াছি!

গাড়ী ছাড়িয়া দিল! জলে, রাস্তার পাথর বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ স্পষ্ট শুনা যাইতেছিল। পশ্চাতে সশব্দে জেলের ফটক বন্ধ হইল—সে শব্দও শুনিলাম। আমি যেন তন্দ্রাবিষ্ট হইয়া ছিলাম—কোন ভয় বা ভাবনা ছিল না। চোখে জল বা মুখে হাসিও ছিল না! যেন আমার জীবন্ত কবর হইয়া গিয়াছে, এমনি ভাবখানা! ঘোড়ার গলায় ঘণ্টা বাঁধা ছিল—তাহার চাকার ও ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ সমস্ত একত্র মিলিয়া বেশ একটি বিচিত্র রাগিণীর সৃষ্টি করিল। যেন ঝড়ের পিঠে চড়িয়া কোথায় আমি নিরুদ্দেশ যাত্রায় বাহির হইয়াছি! যেন কোন্ স্বপ্নলোকে, কোন্ ঘুমন্ত পরীকন্যার সন্ধানে চলিয়াছি!

গাড়ীর মধ্যে, ছিদ্র দিয়া পথ দেখিতেছিলাম। এক জায়গায় প্রকাণ্ড অক্ষরে, "বৃদ্ধদিগের জন্য হাঁসপাতাল," কথাটি লেখা রহিয়াছে! এ জগতে, তবে, লোক বৃদ্ধ হইবার অবকাশ পায়! আশ্চর্য্য ব্যাপার, সন্দেহ নাই! এই ত আমার তরুণ বয়স—কিন্তু যাক্, সে কথা!

গাড়ী মোড় ঘুরিল। দূরে নোতর-দামের চূড়া দেখা গেল—পারি সহরের কুয়াসা ভেদ করিয়া গগনস্পর্শী চূড়া উঠিয়াছে! আমি ভাবিলাম, "বাঃ, উহার উপর হইতে চারিধারটা বেশ দেখিতে পাওয়া যায়, নিশ্চয়!"

এই সময় আচার্য্য নূতন করিয়া আলাপ আরম্ভ করিলেন। তিনি অনর্গল বকিয়া চলিলেন, বাধা দিবার জন্য ত কেহ ছিল না—আমি সে কথায় কর্ণপাতও করি নাই! আচার্য্যের গল্প অপেক্ষা ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দে বেশ একটা মধুরতা ছিল! চারিধারেই ত বিচিত্র কোলাহল—মাত্রা আর একটু বাড়িলে, ক্ষতি কি?

সমস্ত শব্দ কাণে আসিয়া লাগিতেছিল! কিন্তু কোনটি স্বতন্ত্রভাবে নহে—বেশ একটা মিশ্র রাগিণী,—নির্ঝরের ধারাপাতের অনুরূপ!

সহসা শুনিলাম, আচার্য্য বলিতেছেন, "কি বিশ্রী গাড়ী,—একটা কথাও যদি শুনিবার জো থাকে!"

কথাটি সত্য—খাঁটি সত্য, এতটুকু অতিরঞ্জিত নহে।

আচার্য্য কহিলেন, "তুমি, বোধ হয়, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না! কি বলছিলাম,—হাঁ, ভালো কথা, সারা পারি কিসের সংবাদে আজ সরগরম, জানো কি?"

আমি শিহরিয়া উঠিলাম! নূতন সংবাদ আবার কিছু আছে নাকি? বোধ হয়, আমারি কথা লইয়া পারিতে হুলস্থূল বাধিয়া গিয়াছে।

আচার্য্য কহিলেন, "কাগজখানাও ত সন্ধ্যার আগে দেখিবার সুবিধা হবে না! সন্ধ্যার পর, আমি খবরের কাগজ পড়ি, একেবারে দিনের শেষ খপরটি অবধি পাওয়া যায়—তাতে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।"

সর্দ্দার প্রহরীর কথা ফুটিল—সে কহিল, "কি? এমন মজার খপর কিছু শোনেননি, এখনো?"

আমি কহিলাম, "আমি জানি, বোধ হয়!"

সে কহিল, "আপনি জানেন? আশ্চর্য্য—ব্যাপারখানা কি, বলুন দেখি!"

"তুমি শোনবার জন্ম ব্যাকুল হয়ে পড়েছ!"

সে কহিল, "কেন, মশায়? রাজ্যের কথায় সকলেরি আলাদা মত আছে! তা সে যে-ই কেন হোক্ না! আপনি কয়েদী, তাতে কি এসে যায়? আমি ত স্থাশস্থাল গার্ডের দিকে। ছেলেবেলায় তাদের দলে কাপ্তেনীও করেছিলাম। ভারী ভালো লাগত!"

আমি বাধা দিয়া কহিলাম, "না, মশায়, আমি অন্য কোন সংবাদ মনে করছিলাম।"

সে কহিল, "তাই নাকি? বলেন কি, আপনি? আপনি জানিলেন কি করিয়া? কে সংবাদ দিলে, আপনাকে? বলুন ত, আবার কি খবর? শুনি!"

আচার্য্য কহিলেন, "তুমি কি মনে করছিলে?"

আমি কহিলাম, "সন্ধ্যার পর, আর মনে করবার কিছু থাকবে না, এই কথাটাই মনে করছিলাম।"

আচার্য্য কহিলেন, "আহা, তোমার বড় দুঃখে, দুর্ভাবনায় সময় কাটছে,—কি করবে বল! এরি মধ্যে মনটাকে ভালো রাখবার চেষ্টা কর!"

সন্ধ্যার প্রহরী কহিল, "আপনি একেবারে মনমরা হয়ে পড়েছেন—কাস্তের্গ সারা পথ রসের গল্পে হাসিয়ে মেরেছিল!"

তার পর সে আপনার প্রতিপত্তির কথা বলিল, পাপাভোঁর সঙ্গে সে গিয়াছিল,—সারা পথ সে কি চুরুট টানিয়াছিল। তারপর স্কুলের সেই ছোকরাগুলা—বকিয়া, চীৎকার করিয়া, কাণ ঝালাপালা করিয়া তুলিয়াছিল!

আচার্য্য কহিলেন, "পাগলের দল! বেচারারা বুদ্ধির দোষে কষ্ট পায় বৈ ত নয়। কিন্তু—মশায়, আপনাকে বড় বিমর্ষ দেখছি। এই অল্প বয়স, আপনার—"

আমি কহিলাম,—স্বরে বেশ একটু তীব্র রস ঢালিয়া দিয়াছিলাম—কহিলাম,—"অল্প বয়স! বলেন কি? আপনার চেয়ে আমি বৃদ্ধ! প্রতি ঘণ্টায় আমার দশ বৎসর ক'রে আয়ু বাড়ছে।"

আচার্য্য কহিলেন, "তামাসা—তাই ভালো—আমি তোমার পিতামহের বয়সী!

আমি গম্ভীরভাবে কহিলাম "তামাসা নয়,—অন্ততঃ আমার এমনি ধারণা!"

আচার্য্য নস্যদানি বাহির করিয়া ডালা খুলিলেন। কহিলেন, "রাগ করো না—ভাই, বুঝলে?"

আমি কহিলাম, "না, না, রাগের কথা নয়—আমি রাগ করিনি!"

এমন সময় গাড়ীর ধাক্কায় তাঁর নস্যদানি উল্টাইয়া গেল—সমস্ত নস্যটুকু পড়িয়া গেল। শশব্যস্তে নস্যদানি তুলিয়া আচার্য্য কহিলেন, "যাঃ, সব পড়ে গিয়েছে—এখন উপায়?"

আমি কহিলাম, "সয়ে থাকুন—তুচ্ছ একটু আরাম সুখ,—আমাকে দেখে সহ্য করতে শিখুন।"

আচার্য্য গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "আরে রেখে দাও, সহ্য করা! তোমার কি কষ্ট হে, বাপু! বুড়ামানুষ—নস্য না নিয়ে এতটা পথ চলি কি করিয়া? হায়, হায়, হায়!"

আশ্চর্য্য! আমার তুলনায় আচার্য্যের

কষ্ট আরো অধিক। এমনি মানুষের স্বার্থান্ধতা বটে!

আচার্য্য মনের শান্তি-সুখ হারাইয়া একেবারে স্থির হইলেন! ভিতরে কথাবার্ত্তা বন্ধ হইল। একঘেয়ে শব্দ করিয়া গাড়ী চলিতে লাগিল!

ক্রমে সহরের কর্ম্ম-কোলাহলের স্রোতে আসিয়া মিশিলাম। গাড়ী কষ্টম-হাউসের সম্মুখে দাঁড়াইল। লোকজন আসিয়া পরীক্ষা করিয়া গেল! যদি আমরা ছাগল কিম্বা অপর কোন পশু হইতাম, তাহা হইলে এখানে কিছু দক্ষিণা দিতে হইত, কিন্তু মানুষ বিনাব্যয়ে মুক্তি পাইয়া থাকে।

তার পর, আঁকাবাঁকা অসংখ্য পথ ঘুরিয়া গাড়ী পাথরে বাঁধানো বড় রাস্তায় আসিয়া পড়িল! এই রাস্তা সোজা কাঁসিয়ারজারি গিয়াছে! গাড়ীর বিকট শব্দে পথিকের দল অবাক হইয়া চাহিয়া দেখিতেছিল—আর খপরের কাগজ-ওয়ালারা বগলে কাগজ লইয়া পথের এধার-ওধার ছুটাছুটি করিতেছিল।

সাড়ে আটটার, কাঁসিয়ারজারিতে আসিয়া পৌঁছিলাম। দীর্ঘ সোপানের শ্রেণী, নিস্তব্ধ উপাসনা-মন্দির, এবং প্রকাণ্ড লৌহকপাট দেখিয়া আমার রক্ত হিম হইয়া গেল! গাড়ী থামিলে আমার মনে হইল, বুঝি হৃদয়ের স্পন্দনটুকুও এখনি থামিয়া যাইবে!

মনে সাহস আনিলাম। বিদ্যুতের ত্বরিত গতির মত, চকিতে দ্বার খুলিয়া গেল। আমি আমার অন্ধকার গহ্বর হইতে লাফাইয়া নীচে নামিলাম। দুইজন প্রহরী আসিয়া দুই হাত ধরিল। দুইধারে কাতার দিয়া সৈন্তের দল দাঁড়াইয়াছিল—তাহারি মধ্য দিয়া আমি চলিলাম। আমাদিগকে, অর্থাৎ, আমাকে দেখিবার জন্ম, বাহিরে, রীতিমত ভিড় জমিয়া গিয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

উপবাসের উপকারিতা।

আমাদের ভারতবর্ষের ঋষিগণ মনুষ্যদেহে খাদ্যের ফলাফল সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান করিয়া ভারতবাসীর আহার বিধি স্থির করিয়া গিয়াছিলেন। পীড়া বিশেষে লঙ্ঘন বিধির উপকারিতা তাঁহারা যত বুঝিতেন, পাশ্চাত্যেরা এতদিন সেরূপ বুঝিতেন না। কবিরাজী চিকিৎসায় রোগীকে 'শুখাইয়া মারে' বলিয়া আমরা আজকাল আয়ুর্ব্বেদকে উপহাস করিতাম। কিন্তু এতদিনে পাশ্চাত্যগণেরও এ সকল বিষয়ে চৈতন্ত হইতেছে বলিয়া মনে হয়। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ আজকাল জীবের খাদ্যের পরিমাণ ও গুণাগুণ সম্বন্ধে নানা প্রকার আলোচনা করিতেছেন ও প্রতিদিনই নব নব সত্যে উপনীত হইতেছেন।

আমরা নিত্য যে সকল খাদ্য ভোজন করিয়া থাকি তাহা প্রায়ই আমাদের আবশ্যকের অপেক্ষা অধিক হইয়া পড়ে। সেই অতিরিক্ত অংশটুকু জীর্ণ বা বহিষ্কৃত না হইলে দেহে বাত, অজীর্ণ ইত্যাদি নানাপ্রকার রোগের উৎপত্তি হয়। সেই জন্যই আমাদের ঋষিগণের ব্যবস্থায় মধ্যে মধ্যে উপবাস বিধিটা এক প্রকার ধর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ পরিগণিত হইয়াছিল। আমেরিকার এক প্রসিদ্ধ উপন্যাস-লেখক লিখিয়াছিলেন—"আমার চতুর্দ্দিকে যখন

চাহিয়া দেখি, দেখিতে পাই পরিচিতগণের মধ্যে প্রায় সকলেই অসুস্থ।" সিন্‌ক্লেয়ার (Mr. upton Sinclair) সাহেবের কথাটা সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও, আজকালের উচ্চ সভ্যতাভিমানী নরসমাজের দশভাগের নয়ভাগ যে যথার্থ সুস্থ নহেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাল্যের সেই উদ্দাম চঞ্চল সবল স্বাস্থ্য আমরা যৌবনেই হারাইয়া ফেলি। যথার্থ যৌবনের পরিপূর্ণ বলদৃপ্ত স্বাস্থ্যের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ ঘটেই না বলিলে চলে, পরিচয় ত' দূরের কথা। এরূপ হইবার কারণ কি?

আজ দশ বৎসর ধরিয়া সিন্‌ক্লেয়ার সাহেব তাঁহার নিজের ও পরিচিতগণের অস্বাস্থ্যের কারণ অনুসন্ধান করিতেছিলেন। এতদিনে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন যে তিনি এ অসুস্থতার কারণ ও প্রতীকার উভয়ই আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি নিজের সম্বন্ধে যতদূর পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, তাহাতে বুঝিয়াছেন যে 'পোড়া পেট'-ই-যত অনিষ্টের মূল। কথাটা যে কেবল তাঁহারই সম্বন্ধে সত্য তাহা নহে—আমাদের অধিকাংশ অসুস্থতারই কারণ ঐ 'পোড়া পেট'।

ফ্লেচার নামে এক সাহেব (Mr. Horace Fletcher) বহুদিন অজীর্ণ রোগে পীড়িত হইয়া স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বহু পুস্তক প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে সকলেরই খাদ্যকে এরূপ চিবাইয়া খাওয়া উচিত যে প্রত্যেক গ্রাস হইতে আমরা যথা সম্ভব সারাংশ লাভ করিতে পারি, এবং প্রত্যেকের যথার্থ আবশ্যকের অধিক কোন মতেই আহার করা কর্ত্তব্য নহে। এই নীতির অনুসরণ করিয়া লক্ষ লক্ষ লোক নীরোগ হইয়াছেন ও দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছেন। ফ্লেচার সাহেবের নীতির অনুসরণ করিয়া সিন্‌ক্লেয়ার বিশেষ উপকার না পাইলেও, উক্ত উপদেশেই আহারের প্রতি তাঁহার প্রথম দৃষ্টি পড়ে। যাহা হউক এ উপায়ে তিনি বিশেষ কোন ফললাভ না করিয়া অধ্যাপক মেচনিকফের পথ অনুসরণ করিলেন। মেচনিকফের মতে কেবল শুষ্ক রুটি ও দধি বা ঘোল খাইয়া থাকিলে আমরা সকলেই এক শত কুড়ি বৎসর পরমায়ু লাভ করিতে পারি। ইহা হইতে সিন্‌ক্লেয়ার বুঝিলেন যে অজীর্ণ খাদ্যাংশ আমাদের অন্ত্রস্থলে থাকিয়া নানা প্রকার বিষাক্ত বীজের উৎপত্তি সাধন করে, এবং সেইগুলি রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া নানা প্রকার রোগকে প্রসব করে। তিনি নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে তাঁহার বাহ্যিক সুস্থাবস্থাতে অন্ত্রস্থ পদার্থের এক আউন্সের মধ্যে প্রায় ছয় কোটি বিষাক্ত বীজ রহিয়াছে, এবং একদিন অসুস্থ বোধ হওয়ায় দেখিলেন বীজাণু সংখ্যা প্রায় ১২০ কোটি হইয়াছে।

নানা প্রকার ঔষধ সেবন ও বায়ু পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহার সাময়িক উপকার হইল মাত্র, স্থায়ী ফল কিছুই হইল না। তিনি বুঝিলেন যে অধিক আহার হইতেছে নিশ্চয়, কিন্তু ক্ষুধা নিবৃত্তি না হইলেই বা আহার বন্ধ করেন কি করিয়া? তবু তিনি অধিকাংশ লোকের অপেক্ষা অল্পাহারী ছিলেন। এইরূপ অবস্থায় দিন কাটিতেছে, এমন সময়ে একদিন এক মহিলার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল—মহিলাটির উজ্জ্বলবর্ণ ও অসাধারণ স্বাস্থ্য দেখিয়া সকলেই তাঁহার প্রশংসা করে। তিনি সেই মহিলার ইতিহাস সংগ্রহ করিলেন। ইতিপূর্ব্বে দশ পনের বৎসর তিনি এত অসুস্থ ছিলেন যে প্রায়ই শয্যাগতা থাকিতেন। তাঁহার সন্তানাদি হইয়াছিল বটে এবং সংসার ধর্ম্মও করিতে হইত সত্য, কিন্তু দেহটি রোগের আধার হইয়া উঠিয়াছিল। রক্তহীনতা, দৌর্ব্বল্য, ভয়ঙ্কর বাত ইত্যাদি পাঁচ সাতটি রোগ আসিয়া নিতান্ত আত্মীয় ভাবে তাঁহার আশ্রয় লইয়াছিল। এইরূপ অবস্থায় একদিন ঘোড়ায় চড়িয়া ভয়ঙ্কর ঝড় দুর্য্যোগের রাত্রে পার্ব্বত্য প্রদেশের উপর দিয়া তাঁহাকে আটাশ মাইল যাইতে হয়। ইহার পূর্ব্বে চারি দিন তিনি সম্পূর্ণ উপবাসী ছিলেন। এই উপবাসের ও শ্রমের ফলে তিনি দেখিলেন তাঁহার সকল রোগ সহসা পলাইয়া গেল।

এই বৃত্তান্ত শুনিয়া সিন্‌ক্লেয়ার নিজে উপবাস করিয়া পরীক্ষা করিলেন। প্রথম দিন ভয়ঙ্কর ক্ষুধা বোধ হইল—অজীর্ণ রোগীদের যে একটা রাক্ষুসে বৃথা ক্ষুধা হয় ইহা অনেকটা সেই রকম। দ্বিতীয়

দিন প্রাতেও কিছু ক্ষুধা বোধ হইল, কিন্তু তাহার পরে আর ক্ষুধাবোধ হয় নাই। ইতিপূর্ব্বে এক সপ্তাহ ধরিয়া তাঁহার মাথা ধরিয়া ছিল, দ্বিতীয় দিনেই তাহা অদৃশ্য হইল। তৃতীয় ও চতুর্থ দিনে একটা দুর্ব্বলতা ও জড়তার ভাব দেখা দিল বটে, কিন্তু মনটা যেন খুব পরিষ্কার ও সতেজ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পঞ্চম দিনের পর তাঁহার অনেকটা সবল বোধ হইল। সেদিন বেশ বেড়াইয়া আসিলেন ও অনেকটা লিখিয়া ফেলিলেন। দ্বাদশ দিনের পর তিনি উপবাস ভঙ্গ করিলেন। প্রথমে একটু কমলালেবুর রস খাইয়া পরে ঘন ঘন প্রচুর দুগ্ধপান করিতে লাগিলেন। সেইদিন জীবনে যেন সর্ব্বপ্রথম তিনি সম্পূর্ণ সুস্থবোধ করিলেন। মনের শক্তিও যেমন তীক্ষ্ণ বোধ হইতে লাগিল, শারীরিক শ্রমের জন্যও সেইরূপ একটা প্রবল ইচ্ছা জন্মিতে লাগিল। সিন্‌ক্লেয়ার বলেন উপবাস যে কেবল আমাদের স্বাস্থ্য ও মানসিক শক্তির জন্য আবশ্যক তাহা নহে, ইহার দ্বারা অনন্ত যৌবন লাভ করা যায়।

এরূপে উপবাস করিতে হইলে কিন্তু দুইটি বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। প্রথম মনটাকে ভীত হইতে দিলে চলিবে না। চতুর্দ্দিকে এরূপ আত্মীয় রাখা কর্ত্তব্য নহে, যাহারা সর্ব্বদাই সশঙ্ক চিত্তে বলিতে থাকিবে "ওমা এ রকম ক'রে উপবাস কল্লে যে একেবারে মারা যাবে; এই ক'দিনেই শরীর একেবারে দড়ি হ'য়ে গেছে ইত্যাদি।" দ্বিতীয়তঃ উপবাস ভঙ্গের পরে প্রথম আহারের বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। প্রথমে কেবল প্রচুর দুগ্ধ পান করাই কর্ত্তব্য। আধ ঘণ্টা অন্তর এক গ্লাস করিয়া দুগ্ধপান করিলে আর ক্ষুধার কোনও কষ্ট হইবে না এবং জীর্ণদেহ দেখিতে দেখিতে স্বাস্থ্যপূর্ণ স্থূলাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিবে।

চিকিৎসকগণের মতে শিশু, বালক বা বৃদ্ধের এরূপ উপবাস কর্ত্তব্য নহে। তদ্ভিন্ন যে সকল যুবক যুবতীর দেহে উপবাস হেতু দৌর্ব্বল্য প্রভাবে নানা প্রকার মূর্চ্ছা ও মোহ আসিয়া উপস্থিত হইবে—তাহাদিগকেও কিছু কিছু আহার্য্য দান করা আবশ্যক। কিন্তু সকলেরই পক্ষে যথেষ্ট জলপান করা বিশেষ প্রয়োজন। তাহার দ্বারা দেহের সমল অংশগুলি ধৌত হইয়া বাহির হইয়া যায়। প্রকৃতিগত কোষ্ঠ-বদ্ধতা জনিত পীড়িত ব্যক্তিদিগের পক্ষে এরূপে উপবাস করা বিশেষ বিপজ্জনক। অজীর্ণ রোগীদের পক্ষেও প্রথমে অজীর্ণের কারণ নির্ণয় করিয়া তাহা দূর করা আবশ্যক। তাহাতেও যদি আরোগ্য না হয়, তখন উপবাসনীতি অবলম্বন করিয়া দেখা যাইতে পারে।

নারীসৌন্দর্য্য।

আজকাল ইয়ুরোপে এক দলের মতে নারী বুদ্ধিমতী হইলেই তাহার সৌন্দর্য্যের অভাব হইয়া থাকে। আধুনিক মনোবিজ্ঞান এতদিনে এই পুরাতন রহস্যের উত্তর বাহির করিয়াছে বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস। তাঁহাদের মতে চিন্তা একটা প্রবল, সৃষ্টিকারী ও ধ্বংসকারী শক্তি। আমাদের প্রত্যেক চিন্তা মস্তিষ্কে উৎপন্ন হইয়া মুখে আসিয়া আপন প্রকৃতিকে প্রকাশ করে। নারীরা যখনই কোন চিন্তা করেন তখনই তাঁহার মুখের সৌন্দর্য্যরেখা গভীর চিন্তরেখায় পরিণত হয়। রূপ জিনিষটা নিষ্ক্রিয় এবং চিন্তাহীনতাও নিষ্ক্রিয়তা ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুন্দরী নারী নিদ্রাগতা হইলে মদনদেব রং ও তুলি লইয়া তাহার শিয়রে আসিয়া উপস্থিত হন এবং ধীরে ধীরে তাহার মুখে সৌন্দর্য্য বিধান করেন। অবশেষে নিদ্রাভঙ্গে দেখা যায় সুন্দরীর রূপ চতুর্দ্দিকে উছলিয়া পড়িতেছে। জর্ম্মান দার্শনিক (Karl Von Hegelmann) এই দলের প্রধান। তবে, সুন্দরী নারীমাত্রেই মস্তিষ্কের শক্তিবিহীন—একথা অবশ্য তাঁহারা বলেন না। কেননা—এতবড়

একটা ভুল কথা বলিলে কথাটা একেবারেই বাতুলের কথা দাঁড়াইত। সুতরাং আত্মরক্ষার জন্য ইঁহাদিগকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, অনেক স্থলে সুন্দরী নারীকেও শিক্ষা, বুদ্ধি ও ভাবরসে শ্রেষ্ঠ পুরুষের সমকক্ষ হইতে দেখা যায়। চিন্তার প্রভাব তাঁহাদের মুখের সৌন্দর্য্য নষ্ট করিতে পারে না।

ইঁহাদের মতের সমর্থন স্বরূপ ইহারা বলেন, ফরাসী সুন্দরী মনটিস্পা (Marquise de Montespan) কেবল রূপের বলে সম্রাট লুইকে করতলগত রাখিয়াছিলেন। পৃথিবীর মধ্যে তাঁহার কেবল দুইটি মাত্র চিন্তা ছিল—কি করিলে নিজের রূপ ও সম্রাটের কৃপা তিনি রক্ষা করিতে পারিবেন। একটি সামান্য রসিকতা করিবার মত বুদ্ধি শক্তিও তাঁহার ছিল না। কিন্তু পরে যে নারী আসিয়া সম্রাটকে তাহার হস্তচ্যুত করিয়া এবং ত্রিশ বৎসর কাল ফ্রান্সের রাজ্ঞীরূপে একাধিপত্য করিয়াছিলেন, তিনি সুন্দরী নহেন—বুদ্ধিমতী।

এই দুইটি নারীর মধ্যে আকৃতির কি প্রভেদ। মনটেস্পার রূপ অতি মধুর, অতি কোমল, উন্মাদকর—ভ্রূ হইতে চিবুক পর্য্যন্ত নিখুঁত, নিটোল, সুন্দর! আর দ্বিতীয় নারীর কর্কশ ভাব, ক্ষুদ্র চক্ষু, দীর্ঘ বক্র নাসিকা, বৃহৎ নাসিকা রন্ধ্র এবং ওষ্ঠের গঠন দেখিলেই বুঝা যায় যে ইহার মধ্যে জ্ঞান বুদ্ধি ভরিয়া আছে! ইতিহাসের প্রসিদ্ধা সুন্দরীগণের উল্লেখ করিয়া তাঁহারা বলেন; রূপ গৌরবে অতুলনীয়া লেডি হ্যামিল্টনের ন্যায় অশিক্ষিতা ও বুদ্ধিহীন নারী খুব অল্পই দেখা যায়! সামান্য নীচ গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া এই নারী এক স্থানে দাসীর কর্ম্ম করিতেন। তাহার পরে এক পান্থশালায় কর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই স্থানে লণ্ডনের অভিনেতাগণ প্রায়ই যাতায়াত করিতেন। তথায় কিছুকাল যথেচ্ছভাবে কালাতিপাত করিয়া হ্যামিল্টনকে মুগ্ধ করেন এবং হ্যামিল্টন তাহাকে বিবাহ করিয়া রাজদরবারে আনয়ন করেন। যতক্ষণ "কিঞ্চিন্ন ভাষাতে" ততক্ষণ লেডি হ্যামিল্টনকে দেখিলে সকলেই মুগ্ধ হইত।

উক্ত দলের মতে, ইতিহাসপ্রসিদ্ধা প্রায় সকল সুন্দরীরই ইতিহাস প্রায় এইরূপ। সর্ব্বজন স্বীকৃত বুদ্ধিমতী নারীর আলোচনা করিয়া তাঁহারা দেখাইতেছেন,—রোজা বনহর (Rosa Bonheur) নামে একটি চিত্রকরনারীর বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ ও প্রখর ছিল। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার মুখে চিন্তা ও একাগ্রতার স্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পাইত। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাঁহার মুখের আকার ও ভাব ঠিক পুরুষের ন্যায় হইয়া আসিল। কবি এলিজাবেথ ব্রাউনিংও এইরূপ সৌন্দর্য গৌরবে বঞ্চিতা। ম্যাডাম কুরি (Curia) একজন বৈজ্ঞানিক প্রতিভাবতী নারী। রাসায়নিক তত্ত্বাবিষ্কারে তিনি আধুনিক জগতের একজন অগ্রগণ্য। তিনি ও তাঁহার স্বামীই রেডিয়াম আবিষ্কার করিয়া তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া পৃথিবীর সম্মুখে প্রদর্শন করেন। তাঁহার মুখের প্রতি রেখায় বুদ্ধি উছলিয়া পড়িতেছে, কিন্তু সৌন্দর্য্যের কোন চিহ্নই নাই।

ইতিহাস প্রসিদ্ধা চারিটি রাজ্ঞীর সম্বন্ধে তাঁহারা বলিতেছেন, কেথেরাইন ডি মেডিসির (Catherine de Medici) কূট রাজনীতি-কৌশলে ও শাসন কর্তৃত্বে অসাধারণ প্রতিভা ছিল; কেথেরাইন অফ্ রুষিয়াও কূট রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন; ইংলণ্ডের এলিজবেথ অসম্ভব বুদ্ধিমতী ছিলেন এবং অষ্ট্রিয়ার মেরিয়া থেরেসা (Maria Theresa) রাজ্যগঠনে ও তত্ত্বাবধারণে ইয়ুরোপের অগ্রগণ্য ছিলেন। কিন্তু ইহাদের কেহই সুন্দরী ছিলেন না।

উপন্যাসলেখিকা জর্জ্জ এলিয়ট, জর্জ্জ স্যাণ্ড, শার্লট রণ্ট ইঁহারাও রূপের ধার ধারিতেন না।

উপরে যাহা লিখিত হইল তাহা পক্ষপাতী সম্প্রদায় বিশেষের মত। অপক্ষপাত ভাবে দেখিলে এ মতের সমর্থন করা অসম্ভব। বুদ্ধি বা চিন্তার সহিত যে সৌন্দর্য্যের কোন জন্মগত বিরোধ আছে, ইহার প্রমাণ আমরা আজিও পাই নাই। মস্তিষ্কক্রিয়ার বিকাশ হইলেই যে অঙ্গ সৌষ্ঠবের ব্যাঘাত বা বিকৃতি জন্মিবে, দেহতত্ত্বে এরূপ কোন কথা আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই। বরংচ আমাদের বিশ্বাস বুদ্ধিমতী হইলে কুরূপা নারীকেও সুরূপা দেখায়, বুদ্ধির এমনি উজ্জ্বল সৌন্দর্য্য। পুরাকাল

অপেক্ষা আধুনিক জনসমাজে নারীগণ সাধারণ ভাবে যে অধিক মস্তিষ্ক চালনা করিতেছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই জন্য নারীসৌন্দর্য্য কি দিন দিন হ্রাস পাইতেছে? উপযুক্ত বিচারক-গণের মতে বরং তাহার বিপরীত। আমাদের অপেক্ষা ভাস্কর ও চিত্রকরগণই নারীসৌন্দর্য্যের তুলনায় অধিক সক্ষম। ইয়ুরোপের প্রসিদ্ধ কলাবিদ্‌গণের মতে সকল বস্তুই ধীরে ধীরে সম্পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে, নারীর রূপও দিন দিন অধিকতর প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতেছে। প্রবন্ধকার যেমন গুটি-কয়েক রূপহীনা নারীর উল্লেখ করিয়াছেন, আমরাও শত শত রমণী রত্নের উল্লেখ করিতে পারি যাঁহারা রূপে ও গুণে জনসমাজের আদর্শস্থানীয়া ছিলেন। হিন্দুভারতে বিদুষী নারীর অভাব ছিল না, কিন্তু তাঁহারা কেহই কুরূপা ছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। মুসলমানের রাজত্বকালেও যাঁহারা বিদুষী বলিয়া পরিচিতা ছিলেন তাঁহাদের অধিকাংশেরই সুন্দরী বলিয়া খ্যাতি ছিল। আধুনিক কালেও সেরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। তবে সৌন্দর্য্য জিনিষটা সুলভ কোন দিনই নহে। কিন্তু সৌন্দর্য্য থাকিলে মস্তিষ্ক শক্তির বিকাশের দ্বারা তাহা বৃদ্ধি পায় বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস এবং ফলেও কোন বৈলক্ষণ্য দেখি না। তবে কুবুদ্ধিতে শ্রী নষ্ট হয় একথা আমরা মানি,—ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত,—কেথারাইন ডি মেডিচিকে তাহারই দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে।

স্নেহের নিরীখ্।

(ক্যাপ্‌লন্)

কাঁটায় তুলে তৌল্ করে মহাজনের মাল,
নিখ্‌তি ক'রে সোনার ওজন জানে;
ব্যাভারে পাপ ঢুক্‌লে পরে দেখ্‌ছি চিরকাল
আইন বহির নিরীখ্ লোকে মানে।
কিন্তু তোরা জানিস্ কিগো?
বল্‌তে পারিস্ মোরে?
পেয়ে কোলে প্রথম ছেলে
(ম'রে আবার বেঁচে)
মা হওয়ার যে নূতন সুখে
মায়ের পরাণ ভরে,—
সে ধন ওজন করার নিরীখ্-নিখ্‌তি
কোথায় আছে?

খোকার আগমনী।

(ক্যাপ্‌লন্)

রামধনুকের রঙীন্ নৌকো দিয়ে
নাম্‌লে কেগো সটান্ স্বর্গ থেকে!
মুখে মুঠায় সোহাগ-সুধা নিয়ে
উজল চোখে স্নেহের কাজল এঁকে!

এগিয়ে তারে আন্ দেবতা কত,—
কতই পরী নাইক লেখাজোখা!
পথ চেয়ে তার রয়েছে লোক যত;
বাছনি! আনন্দ-দুলাল! খোকা!

'অমৃতং বালভাষিতং'।

(ক্যাপ্‌লন্)

রাজার কথা অটল-সুগম্ভীর,
শাস্ত্র-কথা প্রশান্ত-উদার;
ন্যায়ের কথা নিলয় সে যুক্তির,
শিশুর কথা? – পুলক-পারাবার!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

যবদ্বীপে।

বর-বোদোরের ধ্বংসাবশেষ।

রবিবার—৯ ডিসেম্বর

বর-বোদোর :—ইহা সহস্র বুদ্ধের মন্দির, এবং ইহার ধ্বংসাবশেষ বহু 'কিলোমেটার' (এক কিলোমেটার ৩২৮০ ফুটের কিছু অধিক) প্রসারিত ও প্রতিমাদিতে পূর্ণ। ফ্রান্‌স হইতে যখন যাত্রা করিলাম তখন হইতেই এই মন্দিরের অদ্ভুত নামে আমি আকৃষ্ট হই। আমার বোধ হয়, যবদ্বীপে যাইবার যদি আর কোন গুরুতর উদ্দেশ্য নাও থাকিত, তথাপি শুধু বর-বোদোর দেখিবার জন্য আমি তাড়াতাড়ি একবার যবদ্বীপ ঘুরিয়া আসিতাম।

প্রাতে পাঁচটার সময়, আমি জক্‌জকর্ত্তা ছাড়িলাম। এই নগরটি একজন দেশীয় রাজার রাজধানী। হোটেলে থাকিয়া আমি যে জাঁকালো গাড়িটি ভাড়া করিয়াছিলাম (ভাড়ার মূল্য ১৪ ফ্লোরিন্, ২৮ ফ্রাঙ্ক অর্থাৎ প্রায় ৩০।৩৫ টাকা) উহা চার ঘোড়ার গাড়ী; সম্মুখে কোচ্‌মানের আসন,—পিছনে সহিসের। এই প্রসিদ্ধ ধ্বংসাবশেষে পৌঁছিতে ৩৬ কিলোমেটার পথ অতিক্রম করিতে হইবে।

এই পথটা কতকগুলি দেশীয় গ্রামের ("দেশা") মধ্য দিয়া গিয়াছে গ্রামগুলি বেশ জীবন উদ্যমে পূর্ণ। অধিকাংশ গ্রামেই এক একটি বাজার আছে। বাজারে বহুলোকের সমাগম। সুচালিত দোকানগুলি প্রায়ই চীনেদের। বাজারের পথ প্রায় শূন্য দেখা যায় না—বহু লোক ক্রমাগত যাতায়াত করিতেছে। লোকের আকৃতি খাঁটি মালাই ছাঁচের—অনেকটা হিন্দু ছাঁচের কাছাকাছি। পুরুষদের ঘোর-নীল রঙ্গের কাপড়, কোমরে কিরীচ। স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই সুশ্রী; দেহের গঠন অতি চমৎকার, একপ্রকার নীল কাঁচুলীতে গাত্র আঁটা। বক্ষের উপরি ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত অনাবৃত। প্রায়ই উহারা শিশু সন্তানকে একটা চাদরে বাঁধিয়া কটিদেশে বহন করে। সুন্দর-সুন্দর অনেক ছেলে মেয়ে একেবারে বিবস্ত্র হইয়া রাস্তায় ছুটাছুটি করিতেছে।

গ্রামের মধ্যে-মধ্যে, ধানের ক্ষেত, ইক্ষুর ক্ষেত। একটা চিনির কারখানা—সমস্ত সাদা—তাহা হইতে একটা উচ্চ ধূম-নল উঠিয়াছে;—এই কারখানাটা দেখিয়া বিস্মিত ও মর্ম্মাহত হইলাম। কেননা, এ জিনিষটা নিতান্তই বিলাতী—এখানকার দৃশ্যের সহিত আদপে খাপ্ খায় না।

বর-বোদোরে পৌঁছিবার কিছু পূর্ব্বে, (Mendoct) মেণ্ডোয়েট্ নামক একটি মন্দির প্রথমেই দেখা গেল; কিন্তু এখন উহার মেরামৎ চলিতেছে;—ভারা-মঞ্চাদিতে মন্দিরটি এরূপ আচ্ছন্ন যে ভাল দেখা যায় না। অতি কষ্টে একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন ছোটো কুঠরীর মধ্যে প্রবেশ করা গেল; সেখানে একটি অতীব সুন্দর বুদ্ধ-মূর্ত্তি এবং তাহার তলদেশে বুদ্ধের আশীর্ব্বাদগ্রাহী, স্বাভাবিক মানুষ-প্রমাণ, দুইটি রাজকুমারের মূর্ত্তি অতি কষ্টে চিনিতে পারা গেল।

প্রথম দৃষ্টিতে বর-বোদোরের সমস্তটা

দেখিয়া মনে যেরূপ ধারণা হয় তাহা একটু নৈরাশ্যজনক; ভ্রমণকারীদিগের মধ্যে অনেকেই একথা স্বীকার করিয়াছেন। আমারও ধারণা তাঁহাদেরই মত'। মন্দিরের ফোটো-চিত্র দেখিলে মনে হয়, যেন মন্দিরটি বেশ অটুট অক্ষত, খুব উচ্চ, খুব জাঁকালো; আমি ত মূর্ত্তিগুলির উচ্চতা, সমস্ত স্মৃতিমন্দিরের উচ্চতা, বাস্তব অপেক্ষা অনেক বেশী করিয়া কল্পনা করিয়াছিলাম। শোনা গিয়াছিল, সমস্ত মূর্ত্তি-আদি লইয়া উহার আয়তন তিন Kilometre। কিন্তু উহার বাস্তব উচ্চতা ও প্রশস্ততা এত কম দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। মন্দিরটি ৩৫ metre-এর অধিক উচ্চ নহে; দেখিলে মনে হয়, গুরুভারে অতীব ভারাক্রান্ত; সমস্তই ধ্বংসদশাপন্ন। মনুষ্যকৃত উৎকৃষ্ট আদর্শের অধিকাংশ স্থাপত্য-কীর্ত্তি দেখিয়া যে ধারণা হয়, এই মন্দিরের সমস্তটা একসঙ্গে দেখিলে, তাহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়াই মনে হয়।—বালু-ভূমি-সমুত্থিত সেই প্রকাণ্ড সমাধি-মন্দির "পিরামিড্," প্রথম দৃষ্টিতেই কেমন একটা তীব্র বিষাদের ভাব মনে আনিয়া দেয়; উহাদের প্রকাণ্ড গঠন, উহাদের সুস্পষ্ট নিশ্চলতা, উহাদের নিঃসঙ্গতা, উহাদের চতুর্দ্দিকস্থ মরুভূমি, কত কত শতাব্দী হইতে কবরস্থ রাজকুমারগণ—এই সমস্তই মৃত্যুর বিরাট-গম্ভীর মূর্ত্তি চিত্ত-পটে অঙ্কিত করিয়া দেয়;—সেই মৃত্যু, যাহা অনিবার্য্য, বিশ্বব্যাপী ও নিত্য; পিরামিডের পাশেই Sphinx মূর্ত্তি সমুত্থিত—যেন তাহার অস্তিত্বের প্রহেলিকা মানুষ সমাধান করিতে কখনই পারিবে না এইরূপ মনে মনে স্পর্দ্ধা করিয়াই যেন চারিদিকে রহস্যময় উপহাস-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে।

পৃথিবীর মধ্যে সুন্দরতম স্মৃতিমন্দির সেই তাজমহল যাহা একজন মোগল সম্রাট তাঁহার প্রিয়তমা বেগমের স্মৃতির উদ্দেশে আগ্রার নিকটস্থ একটি চমৎকার উদ্যানে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন—সেই স্মৃতিমন্দির যাহা সর্ব্বতোভাবে সুন্দর, পুরাতন গ্রীসীয় শিল্পকলার হিসাবে সুন্দর, প্রাচ্যদেশীয় সৌন্দর্য্যের হিসাবে সুন্দর, প্রকাণ্ডতার হিসাবে সুন্দর, লঘুতার হিসাবে সুন্দর, শুভ্রতার হিসাবে সুন্দর, কবিতার হিসাবে সুন্দর।—ভারতের দক্ষিণ প্রদেশস্থ মথুরার মন্দিরও এক হিসাবে সুন্দর; উহা অতীব রহস্যময় কোন এক জাতিবিশেষের কোন এক অপূর্ব্ব ধর্ম্মসম্প্রদায়ের কলারুচির প্রবল ও জটিল অভিব্যক্তি। বর-বোদোরের মধ্যে এই প্রকারের কোন সৌন্দর্য্যই আমি দেখিতে পাইলাম না।*

* শ্যামদেশীয় ক্যাম্বোজায়, অ্যাঙ্করের (Angkor) যে ধ্বংসাবশেষ আছে, বর-বোদরের পরে, সেই ধ্বংসাবশেষটি দেখিবার আমার সুযোগ ঘটে। প্রথম দৃষ্টিতেই উহার ছবিখানি আমার চিত্তপটে গভীরভাবে মুদ্রিত হয়:—১ Angkor-Wat তিন-তলাবিশিষ্ট একটি বিশাল মন্দির, ধ্বংসদশা হইতে বেশ সুরক্ষিত; উহার অনেকগুলি চূড়া, অত্যুচ্চ সোপান-সমূহ, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বারাণ্ডা, বারাণ্ডার দেয়ালে রামায়ণের প্রসিদ্ধ দৃশ্যগুলি খোদিত;—নর বানরের যুদ্ধ, ক্ষীর-সমুদ্রের তরঙ্গ-সংক্ষোভ। Angkor-Thom, Angkor-Wat-এর মত ততটা সুরক্ষিত নহে, কিন্তু বেশী জাঁকালো;—অরণ্যের দ্বারা আক্রান্ত ও কবলিত বলিলেও হয়। বিষাদময় বড় বড় তরুপুঞ্জের মধ্যে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চূড়া দৃশ্যমান; চূড়ার চারিমুখে ব্রহ্মার প্রকাণ্ড সস্মিত

অনাবশ্যক কিন্তু অপরিহার্য্য—একজন পাণ্ডাকে সঙ্গে করিয়া আরও নিকট হইতে খুঁটিনাটিগুলি দেখিবার জন্য, মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। ৫টা চৌকোণা ছাদ, ন্যূনাধিক প্রসারিত—একটার উর্দ্ধে আর একটা উঠিয়াছে; প্রত্যেক ছাদের দেয়ালে কতকগুলি কুলুঙ্গি আছে, তাহার মধ্যে অনেকগুলি বুদ্ধ-মূর্ত্তি; দুই দেয়ালের মধ্যে, প্রত্যেক ছাদ ঘুরিয়া একএকটা বারাণ্ডা গিয়াছে; সেই বারাণ্ডার প্রস্তর-গাত্রে উৎকীর্ণ সারি সারি মূর্ত্তি বরাবর চলিয়াছে। চারিটা চৌকোণা ছাদের উপরে, তিনটা চক্রাকার ছাদ; এই ছাদগুলি কিছু ছোটো, তাহাতে কতকগুলি গম্বুজের ভগ্নাবশেষ; সেই গম্বুজের মধ্যে ভগবানের মূর্ত্তিসমূহ; সকলের উপরে, একটা প্রকাণ্ড গম্বুজ (দাগোবা)।

সমগ্র মন্দির অপেক্ষা মন্দিরের খুঁটিনাটি কাজগুলি আরও বেশী দ্রষ্টব্য সন্দেহ নাই। নিকটে গিয়া ঐগুলি যত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিতেছি, ততই আমার দেখিবার আগ্রহ বাড়িতেছে। প্রস্তরে উৎকীর্ণ মূর্ত্তিগুলির অবস্থা সব সমান নহে—কতকগুলি ভগ্ন ও কতকগুলি ভগ্নদশা হইতে বেশ সুরক্ষিত। যাই হোক, অধিকাংশ মূর্ত্তি অনেকটা ভাল অবস্থাতেই আছে। অনেকগুলির তক্ষণকার্য্য অতীব সূক্ষ্ম ও যথাযথ,—সমস্তই অকপট ধর্ম্মের ভাবে অনুপ্রাণিত। দো-তলার মূর্ত্তিগুলিতে বুদ্ধের জীবনের ঘটনাবলী প্রদর্শিত হইয়াছে; তিন-তলায়, বুদ্ধের মহিমা ও চৌতলায়, যে সকল বৌদ্ধ রাজারা এই স্মৃতিমন্দিরটি নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাহাদের মহিমা পরিঘোষিত হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা, দ্বিতীয় ছাদের উৎকীর্ণ মূর্ত্তিগুলি—বিশেষতঃ বুদ্ধের ধর্ম্মপ্রচারের কতকগুলি দৃশ্য আমার ভাল লাগিয়াছে; বুদ্ধদেবের মস্তক কিরণ-মণ্ডলে ভূষিত; তিনি মৈত্রী সম্বন্ধে—সন্ন্যাস সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছেন; তাঁহার শ্রোতৃমণ্ডলী মুগ্ধ হইয়া শ্রবণ করিতেছে; উহারা অর্দ্ধনিমীলিত লোচনে আনন্দের উচ্ছ্বাসে, গুরুদেবের রসনা-নিঃসৃত অমৃত ধারা পান করিতেছে; উহাদের মুখে নিগূঢ় আনন্দের ভাব সুন্দররূপে প্রকাশ পাইতেছে। এই তক্ষণ-কার্য্যে শুধু শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ পায় বলিলে যথেষ্ট হয় না,—উহা দৈবপ্রতিভার দ্বারা অনুপ্রাণিত। বৌদ্ধধর্ম্ম স্বীয় ভক্তগণের অন্তঃকরণকে যে সকল সুন্দর ভাব-সম্পদে বিভূষিত করিয়াছেন,—উহা হইতে তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যায়। ইহার পূর্ব্বে কলিকাতার জাদুঘরে এইরূপ কতকগুলি বৌদ্ধ উৎকীর্ণ মূর্ত্তি,—বিশেষতঃ বারাণসীর নিকটবর্ত্তী সারনাথ স্তূপ হইতে আনীত কতকগুলি উৎকীর্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া আমার এইরূপ মনের ভাব হইয়াছিল; বিশেষত আমার সেই ক্ষুদ্র উৎকীর্ণ চিত্রটি মনে পড়ে—যাহাতে কতকগুলি ক্ষুদ্র শিশু তাঁহার সমীপে আসিয়াছে—তিনি প্রসন্নদৃষ্টিতে তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন......

অধিকাংশ বৌদ্ধশিল্পীর ন্যায়, বর-বোদোরের শিল্পীরাও কতকগুলি জীবজন্তুর মূর্ত্তি অতি

মুখমণ্ডল: ঝোপ্‌ঝাড়ের মধ্য হইতে চূর্ণ-বিচূর্ণ প্রাসাদ, ভগ্ন সোপান ও প্রাচীর প্রভৃতি বাহির হইয়াছে। প্রাচীরের গায়ে, সারীবন্দি হস্তী প্রভৃতি (স্বাভাবিক উচ্চতার প্রমাণ) বৃহৎ দৃশ্যসমূহ খোদিত রহিয়াছে।

যন্ত্রের সহিত গড়িয়াছে:—হাতী, ঘোড়া, বানর, পাখী; জীবমাত্রেরই উপর বৌদ্ধ-ধর্ম্মের যেরূপ দয়া—সেই উদার জীব-দয়ার দ্বারাই উহাদের শিল্প-চেষ্টা সকল অনুপ্রাণিত।

ভগবানের মূর্ত্তিগুলি, প্রায়ই লুপ্তাঙ্গ; কিন্তু তাহা সত্বেও, বেশ চিত্তাকর্ষক; স্মৃতি-মন্দিরের এক মুখভাগের মূর্ত্তিগুলি একই ধরণের, কিন্তু অন্য মুখভাগের মূর্ত্তিগুলিতে এক-একটু পার্থক্য দৃষ্ট হয়। বুদ্ধদেব যোগাসনে বসিয়া—দক্ষিণ হস্তের দ্বারা একটা সাংকেতিক ভঙ্গী করিতেছেন। কোথাও বা দুই হাত কাছাকাছি করিয়া ধ্যান করিতেছেন। কোথাও বা দক্ষিণ করতল উন্মুক্ত করিয়া উপদেশ দিতেছেন,—যেন মহাসত্য সকল তাঁহার রসনা হইতে নিঃসৃত হইতে উদ্যত; কোথাও বা, বাহু উত্তোলন করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতেছেন; অবশেষে কোথাওবা, চমৎকার গূঢ় অর্থযুক্ত অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিতেছেন:—পায়ের উপর হাত রহিয়াছে, ভিতরদিকে করতল অবনত, অঙ্গুলিগুলি অলসভাবে পড়িয়া আছে:—একটি গভীর বৌদ্ধভাব, মানব-হৃদয়ের একটি গভীর আকাঙ্ক্ষা এইরূপ অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে,—জীবনে বিরক্তি, একটা শান্তি ও আরামের ইচ্ছা, সেই চরম পরিণাম—নির্ব্বাণের আশা.. আর সর্ব্বোচ্চ চূড়ার উপরে বৃহৎ গম্বুজের মধ্যে যে বুদ্ধমূর্ত্তি -উহা অসম্পূর্ণ গঠন,--যেন ইচ্ছা করিয়াই উহাকে অসম্পূর্ণ অবস্থায় রাখা হইয়াছে: ভগবানের মূর্ত্তিকল্পনা করা মানবশক্তির অতীত, ইহাই প্রকাশ করিবার জন্যই কি মূর্ত্তিটির এই অসম্পূর্ণতা? ভগবানের সমক্ষে মানববুদ্ধির নম্রতা স্বীকার করাই কি ইহার সাঙ্কেতিক তাৎপর্য্য?

এইরূপ স্মৃতিমন্দির,—একটা ধর্ম্মের ভাব মনে গভীররূপে মুদ্রিত করিয়া দেয়। একটু অনুকূল ইচ্ছা ও সহানুভূতির কল্পনা থাকিলে আজিও এইরূপ ধর্ম্মের ভাব উপলব্ধি করা যায়। আভাস ইঙ্গিতের দ্বারাই শিল্পকলা কাজ করে: যেরূপ ছন্দ সঙ্গীত ও কবিতায় সেইরূপ বাস্তুশিল্পে. ইচ্ছা করিয়া একই মূল-কল্পনার ক্রমাগত আবৃত্তি করায়, মানুষের ইচ্ছাশক্তি ক্রমশ যেন নিদ্রিত হইয়া পড়ে, এবং চৈতন্য কতকটা সম্মোহন-সুপ্তির অবস্থায় উপনীত হয়; তখন তাহার নিকট যে কোন ধর্ম্মভাবের আভাস ইঙ্গিত উপস্থিত করিবে তাহাই সে গ্রহণ করিবে। এই সকল একই প্রকারের বড় বড় বুদ্ধমূর্ত্তি, এবং প্রস্তরে উৎকীর্ণ বিভিন্ন প্রকারের ক্ষুদ্র বুদ্ধমূর্ত্তি দেখিয়া দেখিয়া, ক্রমশ চিত্ত যেন একপ্রকার স্বাপ্নিক মোহের দ্বারা অভিভূত হয়। অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে বৌদ্ধভাব ক্রমশ প্রবেশ লাভ করে। সিংহলে কোন বুদ্ধমূর্ত্তিতে সন্ন্যাসের অঙ্গভঙ্গী প্রথম দেখিয়া যেরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলাম, এখানে দেখিয়া তাহা অপেক্ষা আরও মুগ্ধ হইয়াছি; আমি যেন এখন মানুষকে বেশী বুঝিতে পারিতেছি, বৌদ্ধনীতির গভীরতা আরও বেশী উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। যে সকল যাত্রী এই মন্দিরে আইসে,—ফিরিয়া যাইবার সময়, বৌদ্ধধর্ম্মের অপ্রতিম প্রভাবে তাহাদের বিশ্বাস আরও বর্দ্ধিত হয়, অনিবার্য্য দুঃখকষ্টে তারা আরও ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে পারে, সর্ব্ব-

জীবের প্রতি আরও সহৃদয়তা প্রকাশ করিতে পারে।

অনেকগুলি খুঁটিনাটি কাজ দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়, বুদ্ধের বহুপরবর্ত্তী শিষ্যেরা এই মন্দিরটি নির্ম্মাণ করে। তাঁহার আবির্ভাব এবং তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে এই কীর্ত্তি স্থাপন—এই দুয়ের মধ্যে বহুকালের ব্যবধান। কাল-ক্রমে ধর্ম্ম পুরোহিত-তন্ত্রের অধীন হইয়া পড়িয়াছে; বর-বোদোরের এই ধর্ম্ম-কীর্ত্তি, এক্ষণে পৌরোহিতিক কীর্ত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে সকল উৎকীর্ণ মূর্ত্তি, বুদ্ধের মানব-জীবন স্মরণ করাইয়া দেয়, তাহার সংখ্যা কম এবং যে সকল দৃশ্যে ভগবানের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে তাহারই সংখ্যা সমধিক। বুদ্ধ-জীবনের অনুকরণের গৌরব ক্রমশ কমিয়া আসিয়াছে, তাহার স্থলে বুদ্ধরূপ ভগবানের নাম কীর্ত্তনের গৌরব বৃদ্ধি পাইয়াছে। পুরোহিত সম্প্রদায়, এই কীর্ত্তির মধ্যে আভিজাত্যের ভাব ও রাজকীয় ভাব আনিয়া ফেলিয়াছেন। সব মানুষই সমান—এই যে বৌদ্ধভাব, এই ভাবটি উহার দ্বারা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে; যে সকল নৃপতি এই মন্দিরটি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মূর্ত্তির সংখ্যা ও ভগবানের মূর্ত্তির সংখ্যা প্রায় সমান। আমাদের বর্ত্তমান ক্যাথলিক খৃষ্টসম্প্রদায়ও, যিনি দুঃখী জনের নিকট ও পতিতা রমণীদের নিকট প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন সেই ন্যাজারেথের সূত্রধরের স্মৃতিরক্ষার জন্য যত না আগ্রহান্বিত, তদপেক্ষা খ্রীষ্টধর্ম্মের একটা সর্ব্বশক্তিমান সমাজ সংগঠনের জন্য, খৃষ্টসমাজের মিত্রদিগের, মূলধনীদিগের, ও রাজাদিগের মহিমাকীর্ত্তনের জন্য অধিক লালায়িত…

হঠাৎ একটা ঝড় উঠায়, আমি এই ভগ্নাবশেষ হইতে পলাইয়া উহার সম্মুখস্থ একটি ক্ষুদ্র হোটেলে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলাম। প্রাতরাশের সময়, প্রাচীন হোটেল-কর্ত্তা আমাকে বলিলেন,—এই দশ বৎসরের পূর্ব্বে তিনি এখানে একটিও ফরাসী দেখেন নাই; আজ-কাল, প্রতিবৎসরেই ফরাসীরা বর-বোদোর দেখিতে আসেন; "ফরাসীরা নাকি ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন?"—এই কথা বৃদ্ধ ওলন্দাজ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

ভোজনের পর, আমি আবার বর-বোদোরে ফিরিয়া গেলাম—এবার আর সঙ্গে পাণ্ডা লইলাম না। পাণ্ডা সঙ্গে থাকিলে স্বাধীনতার বড়ই ব্যাঘাত হয়। সমস্ত এক সঙ্গে দেখিয়া যে মন্দিরে আমি নিরাশ হইয়াছিলাম, এক্ষণে সমস্ত খুঁটিনাটিগুলি পৃথক্‌ভাবে দেখিয়া মন্দিরটি আমার ক্রমেই আরও ভাল লাগিতেছে।

এই বহুস্মৃতিপূর্ণ ভগ্নাবশেষের প্রতি আমার অন্তরে একটা অপূর্ব্ব সহানুভূতির ভাব বর্দ্ধিত হইতেছে বলিয়া বেশ অনুভব করিতেছি। এই সকল অলিন্দের উৎকীর্ণ মূর্ত্তির মধ্যে একাকী বিচরণ করিয়া, সর্ব্বোচ্চ গম্বুজের চূড়া-দেশে আরোহণ করিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইতেছে। এখান হইতে, এই পরিত্যক্ত মন্দিরটির শোচনীয় জরাজীর্ণতা আরও ভাল করিয়া উপলব্ধি করা যায়। যবদ্বীপবাসীরা মুসলমান হইয়া গিয়া, তাহাদের পুরাতন ধর্ম্ম একেবারে বিস্মৃত হইয়াছে। যবদ্বীপে বৌদ্ধধর্ম্ম

মৃত। উচ্চতম ধর্ম্মমতের উপরেও কালের জয়; প্রচলিত ধর্ম্মমতগুলির মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। আমাদের খৃষ্টধর্ম্মও মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইবে।

বর-বোদোরের উচ্চতম চূড়ায় বসিয়া,আমি ভাবিতেছি, য়ুরোপে কোন্ ধর্ম্ম খ্রীষ্টধর্ম্মের স্থান অধিকার করিবে;—অবশ্য এমন কোন ধর্ম্ম যাহা সত্যেতে শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানেতে শ্রেষ্ঠ, উদার বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ, ন্যায়পরতায় শ্রেষ্ঠ, ভূতদয়ায় শ্রেষ্ঠ;—এমন কোন ধর্ম্ম যাহা বুদ্ধির অগম্য কেবল কতকগুলি দার্শনিক কথার সমষ্টি নহে, —যাহা কোন সংশয়পূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্যের উপর সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত নহে;—এমন কোন ধর্ম্ম যাহা জগৎসংসারকে স্বরূপত মন্দ বলিয়া বিবেচনা করে না, যাহা বিজ্ঞানকে সীমাবদ্ধ করে না, যাহা সৌন্দর্য্যকে অবজ্ঞা করে না, যাহা প্রেমের নিন্দা করে না, যাহা আনন্দকে দূষ্য মনে করে না, যাহা দেহমনের কষ্ট অপ্রতিবাদে সহ্য করে না; এমন কোন ধর্ম্ম, যাহা অন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত যে কোন সামাজিক অবস্থার পক্ষপাতী নহে--সামাজিক অবস্থায়, অতীব কঠোর শ্রম করিয়াও অধিকাংশ লোক জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে না,—পক্ষান্তরে বিনাপরিশ্রমেও কতকগুলি লোক সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে;—এমন কোন ধর্ম্ম, যাহা কল্যাণকর বীর্য্যবান সমাজ বিপ্লবের বিরুদ্ধে অতিপার্থিব ললিত কোমল সুখের আশাকে দাঁড় করায় না, যাহা দুঃখময় মানবজীবনকে জঘন্য অনন্ত নরকের ভয় দেখাইয়া আরও তমসাচ্ছন্ন করে না... যে ধর্ম্ম খৃষ্টধর্ম্মের স্থান অধিকার করিবে, তাহা অনেকের মনে স্পষ্টাক্ষরে না থাকুক, কতকটা এখনি অস্পষ্ট অনুভূতির আকারে অবস্থিতি করিতেছে; ইহা সেই জ্ঞান মূলক মৈত্রী ও সখ্যতার গূঢ় ভাব যাহা আমাদের শ্রেষ্ঠ লোকদিগকে পরস্পরের সন্নিকর্ষে আনিতেছে। সেই ধর্ম্ম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অসীমতা প্রতিপাদন করে; সেই ধর্ম্ম, মানুষের অসীম ব্যক্তিত্বকে জ্ঞান ও প্রেমের দ্বারা অনন্তগুণে প্রসারিত করিতে বলে; সেই ধর্ম্ম, জ্ঞানের দ্বারা মানুষকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সহিত যুক্ত করিয়া দেয়, শিল্পকলার দ্বারা সমস্ত বাস্তবকে উপলব্ধি করায়, বিশেষতঃ প্রেমের দ্বারা সৌন্দর্য্যজনিত মুক্ত আনন্দের আস্বাদ প্রদান করে—সেই প্রেম সর্ব্বমনুষ্যের প্রতি প্রেম, সর্ব্বজীবের প্রতি প্রেম, সর্ব্বপদার্থের প্রতি প্রেম; সেই ধর্ম্ম ন্যায়পরতার দ্বারা, স্বাধীনতার শান্তিময় ঐক্যের দ্বারা, মানুষদিগের পরস্পরের মধ্যে মিল ঘটাইয়া দেয়; সেই ধর্ম্ম, সমস্ত মানবজীবনের—সমস্ত বিশ্বজীবনের শীর্ষদেশে সেই উদার আনন্দময় কর্ম্ম-চেষ্টাকে স্থাপন করে, যাহা দ্বারা মানুষ মানুষের মধ্যে ন্যায়ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া, স্বকীয় প্রেম প্রকাশ করে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান বিস্তার করে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিবিধ।

প্রাচীন জগতে ভারতের প্রভাব।

কিছুকাল পূর্ব্বে লেকক্ (Lecoq) নামে এক ব্যক্তি মধ্য আসিয়ার তারফান (Tarfan) নগরে কতকগুলি সংস্কৃত পুঁথি আবিষ্কৃত করেন। সেদিন এক জর্ম্মাণ পণ্ডিত (Herr Lueden) নাকি সেগুলির অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া দেখিয়াছেন, সেগুলি কয়েকখানি প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের নির্ব্বাচিত দৃশ্যের অনুলিপি। এই সকল নাটকের এক এক খানি ২০০০ বৎসরেরও অধিক প্রাচীন। কিন্তু ইহাতে আমাদের আশ্চর্যান্বিত হইবার কিছুই নাই। ভারতের সভ্যতা যে ২০০০ বৎসরেরও পূর্ব্বে উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আমরা পাইয়া থাকি। তবে এই আবিষ্কারের দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, সেই প্রাচীন যুগের হিন্দু সভ্যতা ও শিক্ষার প্রভাব কেবল ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, আসিয়া মহাদেশের সকল স্থানেই তাহা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। আমরা আজ সেই হিন্দুসন্তান, এ কথা মনে করিলেও চক্ষে জল আসে।

হিন্দুর শাস্ত্র ও সামাজিক সংস্কার।

আধুনিক হিন্দু রীতিনীতি সম্বন্ধে শাস্ত্রের মতামত জানিবার জন্য কিছুদিন হইল বরোদার মহারাজা মহীশূরের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহাদেব শাস্ত্রীকে স্বরাজ্যে আহ্বান করেন। আজকাল ভারতে তাঁহার ন্যায় সংস্কৃতশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বিরল। বহু অনুসন্ধানের পর তিনি স্থির করিয়াছেন, আমাদের বর্ত্তমান সমাজে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া যে সকল বিধি ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তাহার অধিকাংশই শাস্ত্রানুমোদিত নহে।

বেদ এবং অন্যান্য শাস্ত্র হইতে তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, পুরুষ বা নারী, ধনী বা দরিদ্র বা শূদ্র সকলেরই আপনাদের নৈতিক, শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি করিবার তুল্য অধিকার আছে। আজকালের জাতিভেদের কঠিন নিগড় সমাজের এ অধঃপতিত অবস্থারই উপযুক্ত,—শ্রুতিতে তাহার কোন উল্লেখই নাই।

আমাদের দেশের সংস্কারবিরোধীর দল বর্ত্তমান দুর্নীতিগুলির সমর্থনকালে সদা সর্ব্বদা শাস্ত্রের দোহাই দিয়া থাকেন। মহাদেব শাস্ত্রী সেই শাস্ত্র হইতেই প্রমাণ করিতেছেন যে, সেগুলি যে কেবল শাস্ত্রানুমোদিত নহে তাহা নহে—অধিকন্তু সম্পূর্ণ শাস্ত্র বিরুদ্ধ।

শাস্ত্র হইতেই তিনি প্রতিপন্ন করিতেছেন; আমরা সকলেই একজাতির অন্তর্গত, অর্থাৎ আমরা সকলেই ব্রাহ্মণ। একদিন আমরা সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলাম। কালে দিন দিন আমরা বেদের উচ্চ আদর্শ যতই বিস্মৃত হইতে লাগিলাম, ততই ক্রমে বিভক্ত হইয়া বর্ত্তমান অসংখ্য জাতির দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলাম। বিভিন্ন উপজীবিকার ফলেই এইরূপ ঘটিল। আজকাল আমরা এক পরিবারের পাঁচ জন যেরূপ বিভিন্ন প্রকার উপজীবিকা অবলম্বন করিয়া থাকি, সেকালেও আর্য্যগণের মধ্যে তাহাই ঘটিত। এই কর্ম্মস্বাতন্ত্র্যের ফলে ক্রমে তাহাদের পরস্পরের বিভেদ ঘটিল। প্রথম প্রথম এই বিচ্ছেদের ফলে কোনও মনুষ্য অনন্তকালের জন্য আপন পদের উন্নতি বিধানে অক্ষম বলিয়া গণ্য হইত না। ক্রমে আমাদের স্বার্থ ও সংকীর্ণতা শূদ্র ও শূদ্রবেষী দলের সৃষ্টি করিল। তৎসত্ত্বেও সেকালে নিষ্ঠাবান ও শুদ্ধাত্মা ব্রাহ্মণেরা শূদ্রের দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য ভক্ষণ করিতেন—এমন কি সে খাদ্য দেবকর্ম্মে পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইত। প্রকৃত পক্ষে তৎকালে রন্ধন ও অন্যান্য গৃহকর্ম্ম শূদ্রের দ্বারাই সম্পন্ন হইত।

উত্তরকালে এ সকল কর্ম্ম যখন শূদ্রের পক্ষে নিষিদ্ধ হইল, তাহাদের কর্ম্মভার নারীদের স্কন্ধে আসিয়া

পড়িল। এই শূদ্র বিদ্বেষের ফলে আমাদের পুর-নারীগণকে—জননী, ভগিনী, পত্নীকে—আমরা শূদ্রে পরিণত করিলাম। আজিও তাঁহারা সেই শূদ্রই রহিয়াছেন এবং আমরা সগর্ব্বে তাঁহাদের এই অবস্থার সমর্থন করিতেছি।

বৈদিক যুগে যে কোন শূদ্র ব্রাহ্মণ হইতে পারিত এবং যে কোন নারী ইচ্ছাক্রমে বিবাহিতা হইতে বা অবিবাহিতা থাকিতে পারিতেন। শ্রুতিতে কন্যা-দানের ভাবাত্মক কোন কথাটি পর্য্যন্ত নাই।

জীবনকে যথার্থ ধর্ম্মপথে অতিবাহিত করাই প্রত্যেক আর্য্যের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। আপনাকে এই উচ্চ আদর্শে গঠিত করিলে তাহার মনে আর শূদ্র বিদ্বেষ থাকে না বা নারীকে আর সে আপনার ভোগের বা সেবার যন্ত্র বলিয়া মনে করিতে পারে না।

জীবনকে এইরূপে গঠিত করিতে হইলে প্রত্যে-কেরই যথার্থ ব্রাহ্মণ হওয়া আবশ্যক। প্রকৃত ব্রাহ্মণ হইবার, ব্রহ্মের সহিত লীন হইবার পূর্ব্বে মনুষ্যের তিনটি অবস্থা উত্তীর্ণ সহকারে তাহার তিনটি ঋণ পরিশোধ করা আবশ্যক; (১) ধর্ম্মোদ্দেশে সন্তান সৃষ্টি করিয়া পিতৃঋণ; (২) উপার্জ্জিত বিদ্যা বিতরণ করিয়া ঋষিঋণ; (৩) আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করিয়া দেবঋণ।

তাহার পর তিনটি জন্মলাভ করা আবশ্যক—(১) মাতৃগর্ভে; (২) উপনয়নে অর্থাৎ দ্বিজত্ব লাভে; (৩) সোমযাগ দীক্ষায়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে পৃথিবীর মনুষ্যমাত্রেই এই ব্রাহ্মণত্ব লাভে অধিকারী।

প্রায় পঁচিশ বৎসর শাস্ত্রানুসন্ধান করিয়া মহাদেব শাস্ত্রী এই রূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, আর আমরা রঘুবংশের মল্লিনাথের টীকা পাতা কতক মুখস্থ করিয়াই গোঁফ হারাইলেও শাস্ত্রের দোহাই দিয়া থাকি। আর্য্যসন্তানের এ অন্ধতা আর থাকিবে কত দিন!

১

বঙ্গসাহিত্যে প্যারীচাঁদ।*

প্যারীচাঁদ যখন মাতৃভাষার পরিচর্য্যায় লেখনী ধারণ করেন, তখন বঙ্গদেশে দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক ভাষা প্রচলিত ছিল, একটী লিখিবার ভাষা অর্থাৎ সাধুভাষা অপরটী কথোপকথনের ভাষা বা চলিত ভাষা। তৎকালে পদ্যগ্রন্থ রচনায় সংস্কৃত মূলক সাধু ভাষাই বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। কিন্তু উহা সহজে সাধারণের বোধগম্য হইত না। তৎসময়ে বাঙ্গালা গদ্য রচনাও নিতান্ত দীন ভাবাপন্ন ছিল। যাঁহারা ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত ছিলেন তাঁহাদের অধিকাংশের সহিত বাঙ্গালা ভাষার কোনরূপ সম্পর্ক ছিল না। তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষাকে একটী ভাষা বলিয়া গণনার মধ্যে আনিতেন না। দু'দশজন লোক যদি বা দুই একখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ পাঠ করিতেন, কিন্তু বাঙ্গালায় গ্রন্থ রচনার জন্য তাঁহাদের মনে কোনরূপ আগ্রহ জন্মিত না। আবর্জ্জনা পরিপূর্ণ অপরিস্কৃত দুর্গন্ধময় কূপোদকের ন্যায় বঙ্গভাষাও তৎকালে পীড়াদায়ক ও অরুচিকর বোধে ইংরাজী শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক অনাদৃত ও পরিত্যক্ত হইত।

বঙ্গভূমির ক্ষণজন্মা সুসন্তান মহাত্মা রাম-মোহনরায়ের যত্নে বাঙ্গালা ভাষার উৎকর্ষ

* কিছুকাল হইল এই প্রবন্ধটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরে লেখককর্ত্তৃক পঠিত হইয়াছিল।

সাধনের সূচনা হইলেও তৎকালে জনসাধারণের রুচি প্রবৃত্তির কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই। কিন্তু একথা অবশ্যই মানিতে হইবে যে এই মহাত্মার সময় হইতেই বঙ্গভাষা ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাঁহার পরলোক গমনের কিছুকাল পরে পণ্ডিতাগ্রগণ্য দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয় ও সুপণ্ডিত অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় বঙ্গভাষার উৎকর্ষ সাধনে বঙ্গসাহিত্যের সেবায় নিযুক্ত হন। পণ্ডিত অক্ষয়কুমার দত্ত একজন চিন্তাশীল লেখক ছিলেন; তাঁহার সুনাম শিক্ষিত সমাজে শীঘ্রই প্রচারিত হইয়াছিল। এই সময় আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। তিনি ক্রমান্বয়ে দ্বাদশবর্ষকাল দক্ষতার সহিত উহার পরিচালন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার গভীর চিন্তাপূর্ণ বিবিধ ধর্ম্মনৈতিক প্রবন্ধে উক্ত পত্রিকা সুশোভিত হইয়া বঙ্গভাষার বিশেষ উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিল। দুঃখের বিষয় এই যে তৎকালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ন্যায় একখানি ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ক উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকার পাঠকসংখ্যা অতি অল্পই ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় অধিকতর পরিমার্জ্জিত ও কথঞ্চিৎ প্রাঞ্জল ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়া পাঠকগণের রুচি উন্নতির পথে লইয়া গিয়াছিলেন।

তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন প্যারীচাঁদ উল্লিখিত মহাত্মাদ্বয়ের রচিত গ্রন্থের ভাষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। ইংরাজি ভাষায় তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। ক্যালকাটা রিভিউ, বেঙ্গল হরকরা ও হিন্দু পেট্রিয়ট্ প্রভৃতি নানা ইংরাজি পত্রে তিনি বিস্তর সার-গর্ভ প্রবন্ধ লিখিতেন। তৎপ্রণীত কতিপয় ইংরাজীগ্রন্থ হইতেও বেশ বুঝা যায় যে, তিনি ইচ্ছা করিলে তাঁহার সমসাময়িক লেখকদিগের ন্যায় আজীবন ইংরাজী ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়া যশস্বী হইতে পারিতেন। কিন্তু সহৃদয় প্যারীচাঁদ সেই প্রশংসা লাভের জন্যে ব্যাকুল হন নাই। মাতৃভাষার দুর্গতি

ও বঙ্গসাহিত্যের দীনতা দেখিয়াই তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়াছিল। এজন্য তাঁহার সময়ে বাঙ্গালা ভাষায় প্রবন্ধ রচনা কিছুমাত্র সম্মান বা গৌরবের বিষয় না হইলেও তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে মাতৃভাষার পরিচর্য্যায়, বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালীর পক্ষে বাঙ্গালা ভাষায় পরিচর্য্যা যে কত

সুখের ও কত গৌরবের বিষয় তাহা তিনি প্রাণ ভরিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন; এ জন্য তিনি বঙ্গসাহিত্যে অভিনব প্রাণ, নবীন আলোক ও নূতন মাধুর্য্য ঢালিয়া দিয়া উহার প্রকৃত উন্নতির পথ প্রসারণে হৃদয়ের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

১৮৫৪ খৃঃ অব্দে তিনি তদীয় বন্ধু রাধানাথ শিকদারের সহিত তৎকালের উপযোগী সহজ চলিত ভাষায় লিখিত বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধ পূর্ণ একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। উহার নাম "মাসিক পত্রিকা" দিয়া তিনি স্বয়ং উহাতে নিয়মিত রূপে লিখিতে আরম্ভ করেন। তিনি পূর্ব্ব হইতে জানিতেন যে তাঁহার অবলম্বিত ভাষা সংস্কৃতমূলক সাধুভাষাপ্রিয়-পণ্ডিত ও লেখকদিগের অনুরাগ আকর্ষণে সক্ষম হইবে না; পক্ষান্তরে অনেক সংস্কৃতাভিমানী ব্যক্তি উহার তীব্র সমালোচনা করিবেন। তথাপি তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। পত্রিকার শীর্ষস্থানে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন লিখিত থাকিত;—

"এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের জন্য ছাপা হইতেছে। যে ভাষায় আমাদের সচরাচর কথাবার্ত্তা হয় তাহাতেই প্রস্তাব সকলের রচনা হইবে। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্ত এই প্রবন্ধ লিখিত হইতেছে না।"

উল্লিখিত কৈফিয়েৎ দিয়া তিনি কথোপকথনের ভাষায় প্রবন্ধ রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। পত্রিকার প্রথম খণ্ড হইতেই তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "আলালের ঘরের দুলাল" নিয়মিত রূপে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল। এস্থলে একথা উল্লেখ করা অসঙ্গত হইবে না যে, স্ত্রীশিক্ষার প্রতি তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল। তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার শিক্ষা, চিন্তা ও সাধনার প্রিয় সহচরী করিবার জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে যত্নবান ছিলেন। বঙ্গের গৃহলক্ষ্মীগণের সুশিক্ষা বিধান ও শিক্ষার সহায়তা করা উক্ত মাসিক পত্র প্রচারের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

মাসিকপত্র প্রকাশের কিছুকাল পরেই প্যারীচাঁদ স্বীয় নামের পরিবর্ত্তে "টেকচাঁদ ঠাকুর" এই কল্পিত নাম দিয়া "আলালের ঘরের দুলাল" "মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়," "রামা রঞ্জিকা," "যৎকিঞ্চিৎ", "অভেদী" প্রভৃতি কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। রজনীর প্রগাঢ় অন্ধকারের পর ঊষার মধুর আলোক যেমন পথভ্রান্ত পথিককে আশ্বস্ত ও উৎসাহিত করে, মহাত্মা প্যারীচাঁদের প্রবর্ত্তিত তরল অথচ আবেগময়ী ভাষা তেমনই সন্দেহাকুল সাহিত্য-সেবিগণের সম্মুখে নূতন আলোক আনিয়া তাঁহাদের গন্তব্যপথ অবধারণে বিশেষ সহায়তা দান করিল। ইহার পূর্ব্বে সংস্কৃতাভিমানী বিজ্ঞপণ্ডিতগণের অবলম্বিত কর্কশ ভাষা এবং মহাত্মা বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় প্রমুখ লেখকগণের অপেক্ষাকৃত অধিকতর পরিমার্জ্জিত ভাষা লইয়া ভিন্ন ভিন্ন রুচির পাঠক, লেখক ও সমালোচকগণের মধ্যে বিষম মতভেদ ও বিবাদ বিসম্বাদ চলিতেছিল। কত সমালোচনা, কত উপহাস কত শ্লেষপূর্ণ বিদ্রূপ স্রোতের ন্যায় অবাধে চলিয়াছিল, কিন্তু কোন পক্ষই সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। এই সময় "আলালের ঘরের দুলালের" আড়ম্বর

বিহীন ও কঠোরতা পরিশূন্য সহজ চলিত ভাষা স্বচ্ছন্দ বিহারিণী তরঙ্গিনীর ন্যায় তরতর প্রবাহে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গসাহিত্যের অভিনব শোভা ও উন্নতি সম্বর্দ্ধন করিতেছে দেখিয়া একদল ইংরাজী শিক্ষিত লোক উহার বিশেষ পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন! অন্যদিকে প্রবীণ সুবিজ্ঞ পণ্ডিতের দল উহা গাম্ভীর্য্য-বিহীন, নিতান্ত তরল ও গ্রাম্য ভাষা বলিয়া উহার অসারতা প্রতিপাদনে বদ্ধপরিকর হইলেন। প্রাচীনতন্ত্রের সহিত নব্যতন্ত্রের ঘোরতর মতভেদ ও বিবাদ বাড়িতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে প্যারীচাঁদ প্রবর্ত্তিত নূতন ভঙ্গিমাবিশিষ্ট সহজ ভাষার প্রভাব চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তাঁহার প্রদর্শিত পথ অবলম্বনে অনেকে পুস্তক ও প্রবন্ধ রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। অল্পদিনের মধ্যে প্যারীচাঁদের অবরোধমুক্ত সরলভাষা বঙ্গসাহিত্যের পরিপুষ্টিসাধন ও সম্পদবৰ্দ্ধনে এক নূতন যুগ আনয়ন করিল! প্যারীচাঁদের স্বচ্ছন্দ বিহারিণী আবেগময়ী ভাষার প্রভাব ও প্রতিপত্তি দেখিয়া কতকগুলি সংস্কৃতাভিমানী পণ্ডিত তাঁহার উপর তীব্র সমালোচনার বাণ বর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাদের মধ্যে সোমপ্রকাশের সম্পাদক স্বর্গীয় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ও স্বর্গীয় পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নাম সর্ব্বাগ্রগণ্য। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন তৎপ্রণীত "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে" প্যারীচাঁদ প্রবর্ত্তিত ভাষার "আলালী ভাষা" এই নাম দিয়া উহার বিস্তৃতরূপ সমালোচনা করিয়াছিলেন। নিম্নে তাহার কিঞ্চিৎ নমুনা প্রদর্শন করিতেছি।

"আলালের ঘরের দুলাল বল, হুতুম পেঁচার নক্সা, বল, আর মৃণালিনী বস—পত্নী বা পাঁচজন বয়স্যের সহিত পাঠ করিয়া আমোদ অনুভব করিতে পারি—কিন্তু পিতাপুত্রে একত্র বসিয়া অসঙ্কুচিত মুখে কখনই ওসকল পড়িতে পারি না। বর্ণনীয় বিষয়ের লজ্জাজনকতা উহা পড়িতে না পারিবার কারণ নহে—ঐ ভাষাতে কেমন একরূপ ভঙ্গী আছে, যাহা গুরুজন সমক্ষে উচ্চারণ করিতেও লজ্জা বোধ হয়।"

অন্যত্র,—

"আলালী ভাষা সম্প্রদায় বিশেষের বিশেষ মনোরঞ্জিকা হইলেও উহা সর্ব্ববিধ পাঠকের পক্ষে উপযুক্ত নহে। যদি তাহা না হইল, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে ঐরূপ ভাষায় গ্রন্থ রচনা করা উচিত কিনা? আমাদের বোধে অবশ্য উচিত। যেমন ফলারে বসিয়া অনবরত মিঠাই মণ্ডা খাইলে জিহ্বা একরূপ বিকৃত হইয়া যায়—মধ্যে মধ্যে আদার কুচি ও কুমড়ার খাট্টা মুখে না দিলে সে বিকৃতির নিবারণ হয় না, সেইরূপ কেবল বিদ্যাসাগরী রচনা শ্রবণে কর্ণের যে একরূপ ভাব জন্মে তাহার পরিবর্ত্তন করণার্থ মধ্যে মধ্যে অপরবিধ রচনা শ্রবণ করা পাঠকদিগের আবশ্যক। ফল কথা এই যে পাঠক যেমন নানাপ্রকার, তাঁহাদের রুচিও সেইরূপ নানাপ্রকার।"

কোন কোন সমালোচক "আলালী" ভাষার প্রতি নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া পরক্ষণেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে উহা বঙ্গসাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধনের নূতন প্রণালী প্রবর্ত্তনে অনেকের চিত্তাকর্ষণে সমর্থ হইয়াছে।" বস্তুতঃ উক্ত ভাষার যিনি যতই দোষ বাহির ও নিন্দাবাদ করুন না কেন, তাঁহাকে একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, প্যারীচাঁদ বঙ্গভাষাকে কঠিন অবরোধ উন্মোচন

পূর্ব্বক সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত গণ্ডির বাহিরে আনিয়া উহাতে নূতন প্রাণ ও অপূর্ব্ব আবেগ ঢালিয়া দিয়া জাতীয় সাহিত্যের বিশেষ উন্নতিসাধন করিয়াছেন। সেই স্বদেশপ্রেমিক বিশেষরূপে বুঝিয়াছিলেন যে প্রাতঃস্মরণীয় আর্য্যসন্তানগণের প্রতিভা ও সুকৃতির বিশালক্ষেত্র বঙ্গভূমি আহারে,বিহারে, আচারে ব্যবহারে আমোদে প্রমোদে, শিক্ষায় দীক্ষায়, সামাজিক ও ধর্ম্মনৈতিক, সকল বিষয়ে যেরূপ বিজাতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত ও স্বেচ্ছাচার-সম্মত কদর্য্য রীতিনীতি ও প্রথায় পরিপ্লাবিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার সংশোধন না হইলে এদেশের শোচনীয় দুরবস্থা উপস্থিত হইবে। তিনি ইহাও জানিতেন যে চলিতভাষায় সহজকথায় সরলভাবে লিখিত হাস্য ও করুণরসোদ্দীপক প্রবন্ধ সহজেই জনসাধারণের চিত্তাকর্ষক ও প্রীতিপ্রদ হইবে, এবং উক্তরূপ প্রবন্ধের বহুল প্রচারে বঙ্গসাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি ও তৎসঙ্গে বঙ্গভূমির বিস্তর কল্যাণ সাধিত হইবে।

অল্পদিনের মধ্যেই আলালের ঘরের দুলালের গৌরব বঙ্গদেশের চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। যে দেশে বর্ত্তমান সময়েও স্কুল বা কলেজের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তক ভিন্ন বিস্তর উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় গ্রন্থ অনাদরে উপেক্ষিত হয়, সেই দেশে এক সময়ে "আলালের ঘরের দুলালের" বিশেষ আদর ও প্রতিপত্তি ছিল। তৎকালে এ দেশে যে সকল ভাগ্যবান পুরুষ "সুরসিক" বলিয়া পরিচিত ছিলেন, অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলে যাঁহারা "রসিকচূড়ামণি" বলিয়া সম্মানিত হইতেন, ছাত্রসভায় বিবাহ বাসরে ও বরের আসরে বৈঠকখানায়, ও অন্যান্য প্রকাশ্য সম্মিলন স্থলে যাঁহারা রসাত্মক মধুমাখা কথার অবতারণা করিতে ভাল বাসিতেন, শুনিয়াছি "আলালের ঘরের দুলাল" এক সময়ে তাঁহাদের প্রধান উপভোগ্য ছিল; তদ্ভিন্ন সাধারণ পাঠকবর্গ এই গ্রন্থখানি বিশেষ অনুরাগ ভরে পাঠ করিতেন।

"আলালের ঘরের দুলাল" প্রকাশিত হইবার পর দীর্ঘকাল বঙ্গদেশে দুই প্রকার ভাষার প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল—একটী বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রমুখ ইংরাজী ও সংস্কৃত উভয় ভাষাবিদ লেখকগণের পরিমার্জ্জিত সাধুভাষা, অপরটী প্যারীচাঁদ প্রমুখ লেখকদিগের অবলম্বিত গ্রাম্য কথামিশ্রিত চলিত সরলভাষা। কোন ভাষা ভবিষ্যতে শিক্ষিত সমাজে বিজয়লাভ করিবে তৎসম্বন্ধে অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির অন্তর দীর্ঘকাল গভীর সন্দেহে আন্দোলিত হইয়াছিল। দূরদর্শী চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ধীরভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া এই সহজ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, উক্ত দুইপ্রকার ছাঁচের ভাষার সম্মিলনে একটী মিশ্র ভাষার উৎপত্তি হইবে; পরে তাহাই বঙ্গসাহিত্যে বিশেষ আধিপত্য স্থাপন করিবে। এই মিশ্র ভাষা ব্যবহারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বঙ্গভূমির ক্ষণজন্মা সুসন্তান সুবিখ্যাত উপন্যাসলেখক স্বনামধন্য মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্র সর্ব্বাগ্রে প্রদর্শন করিয়াছেন। ইনিই ভক্ত শিষ্যের ন্যায় প্যারীচাঁদ প্রদর্শিত পথ আগ্রহের সহিত অবলম্বনে তৎপ্রবর্ত্তিত ভাষা অধিকতর পরিমাণে মার্জ্জিত, সুকোমল, শ্রুতিমধুর ও মনো-

মুগ্ধকর করিয়া বঙ্গ সাহিত্যকে বিবিধ রত্নালঙ্কারে বিভূষিত করিয়া উহার বিপুল গৌরব বর্দ্ধনে অমরতা লাভ করিয়াছেন।

বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবকালেও আলালীভাষা ও সাধুভাষার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতা বহুল পরিমাণে পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ইহা নিবারণের জন্য অনেকে অনেক প্রকার উপদেশ দিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে বঙ্গসাহিত্যানুরাগী সুবিখ্যাত সিভিলিয়ান শ্রীযুক্ত জন্ বিম্‌স্ একটী সুন্দর প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তিনি ১৮৭২ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালাভাষার দুইশ্রেণীর লেখকদিগের অবলম্বিত ভাষার সমালোচনা ও তাঁহাদের বিভিন্ন ভঙ্গিময় রচনার সামঞ্জস্য উদ্দেশ্যে যে সুযুক্তিপূর্ণ প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই—

"সাহিত্য আলোচনা ও সভ্যতায় বঙ্গদেশ ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশের অগ্রগামী—তাহার সাহিত্য ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যের শৈশবাবস্থা অতিক্রম করিয়া ইয়ুরোপীয় আদর্শের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। এই সময় বাঙ্গালা ভাষাকে একটী নির্দ্দিষ্ট ছাঁচে ফেলিয়া উহাকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্দ্দিষ্ট ভাবে গঠনের সময় উপস্থিত হইয়াছে। একদিকে সংস্কৃত শব্দের ও সমাসের অতিরিক্ত প্রসারণ রোধ করা যেমন কর্ত্তব্য, অপর দিকে প্রচলিত গ্রাম্য শব্দের অযথা ব্যবহার তেমনই পরিহার্য্য, যাহাতে বাঙ্গালা ভাষায় দলাদলি ভাব না থাকিয়া উহা নির্দ্দিষ্ট নিয়মে সুশৃঙ্খলাবদ্ধভাবে এক ভাবে দাঁড়ায় তজ্জন্য আমি একটী সভা (Academy) সংস্থাপনের পরামর্শ দিতেছি—উহার সহায়তায় বাঙ্গালা ভাষা সুগঠিত ও একটী নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে পরিচালিত হইবে।"

বঙ্গসাহিত্যের বন্ধু শ্রীযুক্ত বিম্‌স্ সাহেবের প্রস্তাব সর্ব্বথা সুসঙ্গত বিবেচিত হইলেও দীর্ঘকাল কেহই তদনুসারে কার্য্য করিতে উদ্যোগী হন নাই। প্রায় বারবৎসর পরে তৎপক্ষে একটী সামান্য উদ্যোগের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু সাহিত্যসেবিগণের মতের বিভিন্নতা জনিত তাহা বিফল হইয়াছিল। উহার একুশ বৎসর পরে তৎসম্বন্ধে যে পুনরুদ্যম হইয়াছিল তাহার ফল স্বরূপ বর্ত্তমান সাহিত্য-পরিষৎ ও সাহিত্যানুরাগী সহৃদয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের যত্ন-পরিপুষ্ট সাহিত্য সভার উৎপত্তি হইয়াছে। এই দুই সভা বিম্‌স্ সাহেবের পরামর্শ অনুরূপ প্রণালীতে পরিচালিত না হইলেও এতদ্দ্বারা তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনের ব্যবস্থা অলক্ষিত ভাবে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

আলালী ভাষা ও মিশ্রভাষার সমালোচনায় আমি কিছু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। আলালের ঘরের দুলালের প্রতিপত্তি প্রদর্শনের জন্য আমি আর দুই একটী কথার উল্লেখ করিব। যে সকল ইংরেজ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এ দেশে রাজ কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন, বাঙ্গালা ভাষায় অধিকার লাভের জন্য দীর্ঘকাল ধরিয়া উক্ত পুস্তক তাঁহাদের প্রিয় পাঠ্য পুস্তকরূপে পরিগৃহীত হইয়াছিল। তাঁহারা তদানীন্তন পণ্ডিতগণের কঠোর ও দুর্বোধ্য ভাষা পরিহার পূর্ব্বক আবেগময়ী আলালী ভাষার মধুরতা পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিতেন। ভারতবাসী ইংরেজ সমাজে উক্ত পুস্তকের বিশেষ আদর হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ কাউয়েল্ সাহেব একবার ইংরাজী-ভাষায় উহার অনুবাদ প্রণয়ণ করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সহজ-সাধ্য নহে

মনে করিয়া সে চেষ্টায় নিবৃত্ত হন। দীর্ঘকাল পরে শ্রীযুক্ত অস্‌ওয়েল্‌ সাহেব উহার আদ্যন্ত সুন্দর অনুবাদ করিয়া বিশেষ প্রশংসা ভাজন হইয়াছেন। আমি আলালের ঘরের দুলাল সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলাম, কারণ এই যে, এই পুস্তক খানিই ঘটনা বৈচিত্র্যে ও ভাষার অভিনব ভঙ্গিমা ও মাধুরীতে গ্রন্থকর্ত্তার সর্ব্বপ্রধান পুস্তক,—উহাই প্রকৃত প্রস্তাবে বঙ্গসাহিত্যের বিকাশ ও উন্নতির পথে নূতন যুগ আনিয়া গ্রন্থকর্ত্তার মস্তকে চিরস্থায়ী যশের মুকুট পরাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছে।

আলালের ঘরের দুলাল শেষ হইলে প্যারীচাঁদ ক্রমান্বয়ে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রণয়ন করেন:—১ মদখাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়, ২ রামারঞ্জিকা, ৩ কৃষিপাঠ ৪ গীতাঙ্কুর, ৫ যৎকিঞ্চিৎ, ৬ অভেদী, ৭ এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা, ৮ ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত, ৯ আধ্যাত্মিকা, ১০ বামাতোষিণী। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে কতকগুলি শ্লেষাত্মক ও হাস্য পরিহাস পূর্ণ হইলেও বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। কি সামাজিক কি ধর্ম্মনৈতিক যে বিষয়ে তিনি যখন যে পুস্তক রচনা করিয়াছেন তাহাতেই তিনি লোক-চরিত্র, সামাজিক রীতিনীতি, দেশীয় আচার ব্যবহার ও সনাতন উদার ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধীয় গভীর জ্ঞান ও সহৃদয়তার যথেষ্ট পরিচয় দান করিয়াছেন।

১৮৮৩ খৃঃ অব্দে মহাত্মা প্যারীচাঁদের স্বর্গারোহণের কিছুকাল পরে তৎপ্রণীত গ্রন্থের অনেকগুলি বিলুপ্তপ্রায় হইবার উপক্রম করিয়াছিল। বিগত ১২৯৯ সালে মহাত্মা প্যারীচাঁদের পুত্রগণের উৎসাহে ক্যানিং লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বর্গীয় মহাত্মার গ্রন্থাবলী "লুপ্ত রত্নোদ্ধার নামে" পুনর্মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। বর্ত্তমান কালের বঙ্গসাহিত্যের অসাধারণ উন্নতি বিধাতা বঙ্গভূমির অদ্ভুত প্রতিভাশালী সুসন্তান,মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্র উক্ত "লুপ্তরত্নোদ্ধার" গ্রন্থের যে সুন্দর ভূমিকা লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে বঙ্গসাহিত্যে মহাত্মা প্যারীচাঁদের স্থান যে কত উচ্চ এবং উক্ত সাহিত্য তাঁহার নিকট যে কি পরিমাণে ঋণী তাহা সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারা যাইবে।

"বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান অতি উচ্চ। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের ও বাঙ্গালা গদ্যের একজন প্রধান সংস্কারক।' অনন্তর তিনি বাঙ্গালা গদ্যের পূর্ব্বাবস্থার পরিচয় দিয়া উহার উৎকর্ষের কাল নির্দ্দেশ ও উহার প্রকৃত উন্নতির অবস্থার সূচনার বিষয় উল্লেখ করিতে অগ্রসর হইয়া এইরূপ লিখিয়াছেন—"... এই সংস্কৃতানুসারিণী ভাষা প্রথম মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে কিছু সংস্কার প্রাপ্ত হইল। ইঁহাদিগের ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী হইলেও তত দুর্ব্বোধ্য নহে। বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি মধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্ব্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে পারে নাই, এবং তাঁহার পরেও কেহ পারিবে না। কিন্তু তাহা হইলেও সর্ব্বজনবোধগম্য ভাষা হইতে ইহা অনেক দূরে রহিল। সকল প্রকার কথা এ ভাষায় ব্যবহৃত হইত না বলিয়া ইহাতে সকলপ্রকার ভাব প্রকাশ করা যাইত না, এবং সকল প্রকার রচনা ইহাতে চলিত না। গদ্য ভাষার ওজস্বিতা এবং বৈচিত্র্যের অভাব হইলে ভাষা উন্নতিশালিনী হয় না। কিন্তু প্রাচীন প্রথায় আবদ্ধ এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের

ভাষার মনোহারিতায় বিমুগ্ধ হইয়া কেহই আর কোন প্রকার ভাষার রচনা করিতে ইচ্ছুক বা সাহসী হইত না। কাযেই বাঙ্গালা সাহিত্য পূর্ব্বমত সঙ্কীর্ণ পথেই চলিল।

"ইহা অপেক্ষা বাঙ্গালা ভাষার আরও একটী গুরুতর বিপদ ঘটিয়াছিল; সাহিত্যের ভাষাও যেমন সঙ্কীর্ণ পথে চলিতেছিল, উহার বিষয়ও ততোধিক সঙ্কীর্ণ পথে চলিতেছিল। যেমন ভাষাও সংস্কৃতের ছায়ামাত্র ছিল, সাহিত্যের বিষয়ও তেমনই সংস্কৃত এবং কদাচিৎ ইংরাজীর ছায়ামাত্র ছিল। সংস্কৃত বা ইংরাজী গ্রন্থের সারসঙ্কলন বা অনুবাদ ভিন্ন বাঙ্গালা সাহিত্য আর কিছুই প্রসব করিত না। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিভাশালী লেখক ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার শকুন্তলা ও সীতার বনবাস সংস্কৃত হইতে, ভ্রান্তিবিলাস ইংরেজী হইতে ও বেতাল পঞ্চবিংশতি হিন্দি হইতে সংগৃহীত। অক্ষয়কুমার দত্তের ইংরাজীই একমাত্র অবলম্বন ছিল। আর সকলে তাঁহাদের অনুকারী এবং অনুবর্ত্তী। বাঙ্গালী লেখকেরা পণ্ডিতমণ্ডলীর বাহিরে হস্ত প্রসারণ করিতেন না। জগতের অনন্ত ভাণ্ডার আপনাদের অধিকারে আনিবার চেষ্টা না করিয়া সকলেই ইংরাজী ও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে চুরির সন্ধানে বেড়াইতেন। সাহিত্যের পক্ষে ইহার অপেক্ষা গুরুতর বিপদ আর কিছুই নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয়বাবু যাহা করিয়াছিলেন তাহা সময়ের প্রয়োজনানুমত, অতএব তাঁহারা প্রশংসা ভিন্ন অপ্রশংসার পাত্র নহেন; কিন্তু সমস্ত বাঙ্গালী লেখকের দল সেই একমাত্র পথের পথিক হওয়াই বিপদ।

"এই দুইটী গুরুতর বিপদ হইতে প্যারীচাঁদ মিত্রই বাঙ্গালা সাহিত্যকে উদ্ধার করেন। যে ভাষা সকল বাঙ্গালীর বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গালীকর্তৃক ব্যবহৃত, প্রথমে তিনিই তাহা গ্রন্থ প্রণয়নে ব্যবহার করিলেন। এবং তিনিই প্রথম ইংরাজী ও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে পূর্ব্বগামী লেখকদিগের উচ্ছিষ্টাবশেষের অনুসন্ধান না করিয়া, স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে আপনার রচনার উপাদান সংগ্রহ করিলেন। এক "আলালের ঘরের দুলাল" হইতে এই উভয়বিধ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। উহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তৎপরে কেহ প্রণীত করিয়া থাকিতে পারেন, অথবা ভবিষ্যতে কেহ করিতে পারেন, কিন্তু "আলালের ঘরের দুলালের" দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছে, আর কোন বাঙ্গালা গ্রন্থের দ্বারা সেরূপ হয় নাই, এবং ভবিষ্যতেও হইবে কি না সন্দেহ।"

"আমি এমন কথা বলিতেছি না যে "আলালের ঘরের দুলালের" ভাষা আদর্শ ভাষা। উহাতে গাম্ভীর্য্য এবং বিশুদ্ধির অভাব আছে এবং উহাতে অতি উন্নত ভাব সকল, সকল সময় পরিস্ফুট করা যায় কি না সন্দেহ। কিন্তু উহাতেই প্রথম এ বাঙ্গালা দেশে প্রচারিত হইল যে, যে বাঙ্গালা সর্ব্বজন মধ্যে কথিত ও প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থ রচনা করা যায়, সে রচনা সুন্দরও হয় এবং যে সর্ব্বজন-হৃদয়-গ্রাহিত্ব সংস্কৃতানুসারিণী ভাষার পক্ষে দুর্ল্লভ, এ ভাষার তাহা সহজ গুণ। এইকথা জানিতে পারার পর হইতে উন্নতির পথে বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি অতিশয় দ্রুতবেগে চলিতেছে। প্যারীচরণ মিত্র আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, কিন্তু বাঙ্গালা গদ্য যে উন্নতির পথে দাঁড়াইয়াছে, প্যারীচাঁদ তাহার প্রধান ও প্রথম কারণ, ইহাই তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি।

"আর তাঁহার দ্বিতীয় অক্ষয় কীর্ত্তি এই যে, তিনিই সর্ব্ব প্রথমে দেখাইলেন যে সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে—তাহার জন্য ইংরাজী বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা চাহিতে হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে, তেমনই সাহিত্যে ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না। তিনিই প্রথমে দেখাইলেন যে, যদি সাহিত্যের দ্বারা বাঙ্গালা দেশকে উন্নত করিতে হয়, তবে বাঙ্গালা দেশের কথা লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি "আলালের ঘরের দুলাল"। প্যারীচাঁদ মিত্রের ইহাই দ্বিতীয় কীর্ত্তি।"

সহৃদয় বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং মুক্তকণ্ঠে স্বীকার

করিয়া ছিলেন যে বঙ্গসাহিত্যের সেবা ও উন্নতি সাধনে মহাত্মা প্যারীচাদ তাঁহাকে পথ প্রদর্শন পূর্ব্বক যথেষ্ট উৎসাহ দান করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং সুকৃতিপুরুষ ছিলেন, সুতরাং গুণের আদর করিতে তিনি অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতেন—তিনি প্যারীচাঁদের মন্ত্র শিষ্য রূপে তাঁহার প্রতিভা ও ক্ষমতা স্বীকার করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। গত ১৩০১ সালের আষাঢ় মাসের ভারতীতে মৎলিখিত বঙ্কিমচন্দ্র শীর্ষক প্রবন্ধে এ বিষয়ের উল্লেখ আছে।

প্রায় ৪ মাস গত হইল বঙ্গসাহিত্যের অন্যতর ভক্ত উপাসক স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের বাটীতে রাসপূর্ণিমা উপলক্ষে বঙ্গসাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণের যে একটী সম্মিলন হইয়াছিল, তাহাতে যোগ্য পিতার যোগ্যপুত্র শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র স্বরচিত রাস-মিলনশীর্ষক একটী সুমধুর কবিতাময় প্রবন্ধে পরলোকগত প্রধান প্রধান সাহিত্যসেবিগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন উপলক্ষে দুই ছত্র মধুর কবিতায় মহাত্মা প্যারীচাঁদের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার মধুর ঝঙ্কার এখনও আমার হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

"ভুলনা পিয়ারীচাঁদে—দুলাল সে বাংলার,
জননীর কণ্ঠে দিল গৃহ-জাত দিব্য হার।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি কেবলমাত্র মহাত্মা প্যারীচাঁদের বঙ্গ-সাহিত্যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছি—ইহাতে তাঁহার সমুন্নত জীবনের অন্যান্য মধুময় কাহিনীর পরিচয় দেওয়া হয় নাই। আমি উক্ত মহাত্মার সুবিস্তৃত জীবনচরিত লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি—নানাবিধ প্রতিকূল ঘটনায় আমি এতদিন তাহা শেষ করিতে পারি নাই। মঙ্গলময় বিশ্বনাথের কৃপায় আমি তাহা শেষ করিয়া উঠিতে পারিলে, উক্ত মহাত্মা সমাজনীতি, রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতিক্ষেত্রে কিরূপ প্রতিভা ও ক্ষমতার পরিচয় দান করিয়াছিলেন, বঙ্গসাহিত্যানুরাগী মহাশয়গণ তাহার বিস্তৃত পরিচয় পাইবেন।

শ্রীবিজয়লাল দত্ত।

চিত্রব্যাখ্যা।

বিবাহ-খেলা—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ অঙ্কিত চিত্র হইতে।

ফাল্গুন মাস, নব বসন্তের হিল্লোলে বৃক্ষপত্র মর্ম্মর করিতেছে! প্রস্ফুটিত আম্রমুকুলের সুগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইয়া উঠিয়াছে। কোকিল পাপিয়া দিগন্ত ছাপিয়া ঝঙ্কার তুলিয়াছে। সেই মলয়হিল্লোলিত বসন্তপক্ষীকুজিত পরিমলাকুল কাননতলে, বালিকা সখী চারিজন—রাজারাণী খেলা খেলিতেছিল; এমন সময় বালক রাজকুমার গণেশদেব সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কুসুম জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা রাজকুমার তুমিই বল—কে রাণী; শক্তি না নিরুপমা?" রাজকুমার কহিলেন—"কার রাণী? রাজা কে?"

দুজনে হাসিয়া বলিল—রাজা আবার কে? রাজা তুমি।—"

"আমি রাজা আর রাণী কে?"—নিরুপমা এতক্ষণ ধরিয়া যে বকুল ফুলের মালাগাছি

গাঁথিয়া মাটিতে ফেলিয়া রাখিয়াছিল—তাহা উঠাইয়া লইয়া শক্তির গলায় দিয়া রাজকুমার বলিলেন "এই দেখ"।

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত ফুলের মালার এই দৃশ্যই চিত্রকর অঙ্কিত করিয়াছেন।

ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয়—শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু অঙ্কিত চিত্র হইতে।

অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে সঞ্জয় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সম্বাদ দিতেছেন ইহাই চিত্রের বর্ণনীয় বিষয়।

স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর।

গত ১৩ই শ্রাবণ শুক্রবার প্রাতে স্বনামধন্য মনস্বী রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। কালীপ্রসন্ন বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু প্রভৃতির সমসাময়িক লোক। বালককাল হইতেই মেধাশক্তিতে, চিন্তাশীলতায়, পাণ্ডিত্যে ও বাগ্মিতায় তিনি অসাধারণ ছিলেন। ১২৫০ সালে কালীপ্রসন্ন যখন জন্মগ্রহণ করেন, সে সময়ে দেশে সংস্কৃত ও ফার্সী অধ্যয়নই প্রচলিত ছিল—ইংরাজির আধিপত্য তখনও বৃদ্ধদিগের মনে বদ্ধমূল হয় নাই। সুতরাং বালককালে কালীপ্রসন্ন ইংরাজি পাঠের সুযোগ পান নাই। অবশেষে কিছুকাল পরে যখন ইংরাজি শিক্ষা করিবার সুযোগ ঘটিল, তখন তিনি এরূপ অন্তরের সহিত অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন যে অল্পকালের মধ্যেই ইংরাজি সাহিত্য দর্শনে পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। সেকালের ইংরাজি শিক্ষিতগণের মধ্যে মাতৃভাষা বড়ই হেয় ছিল, কিছু লিখিতে বা বলিতে হইলে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ রাজভাষার আশ্রয় লইতেন। কালীপ্রসন্ন সেই স্রোতে ভাসিলেন। পাঠ্যাবস্থা হইতেই ইংরাজিতে এরূপ প্রবন্ধ ও বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেন যে তাঁহার অসামান্য প্রতিভাদর্শনে স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ডাক্তার লালবিহারী দে ইত্যাদি মনস্বীগণ,—এমন কি, রেভারেণ্ড ডাউ প্রভৃতি ইংরাজগণও বিস্মিত হইতেন। তাঁহার ভাষার মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্য এত অসামান্য ছিল, ভাবের গভীরতা ও শব্দ যোজনাশক্তি এতই সুন্দর ছিল যে এক সময়ে তাঁহার ইংরাজি বক্তৃতা শুনিয়া ঢাকার কমিশনার টয়নবি সাহেব বলেন "আমি ইতালির বাদ্য বড় ভালবাসি এবং অনেক দিন তাহা শুনিয়াছি; কিন্তু কালীপ্রসন্নের বক্তৃতায় যে একটা অপূর্ব্ব ও অসাধারণ মাধুরী আছে, ইতালির বাদ্য সঙ্গীতেও তাহা নাই।" বাঙ্গালীর ছেলের শিক্ষিত ইংরাজের নিকট হইতে এরূপ প্রশংসালাভ সহজ শক্তির পরিচায়ক নহে। কিন্তু দেশের পক্ষে, মাতৃভাষার পক্ষে তাঁহার এই অসাধারণ প্রতিভা এতদিন নষ্ট হইতেছিল। সৌভাগ্যবশতঃ এক ইংরেজ বন্ধুর প্ররোচনায় কালীপ্রসন্ন কায়মনোবাক্যে মাতৃভাষার সেবায় নিযুক্ত হইয়া বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে ঢাকা নগরে বান্ধব নামে এক মাসিক পত্র বাহির করিলেন। তখন বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন লিখিতেছেন। কালীপ্রসন্নের বাঙ্গালা রচনা দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন "ভাষা সুন্দর, চিন্তা অসামান্য।"

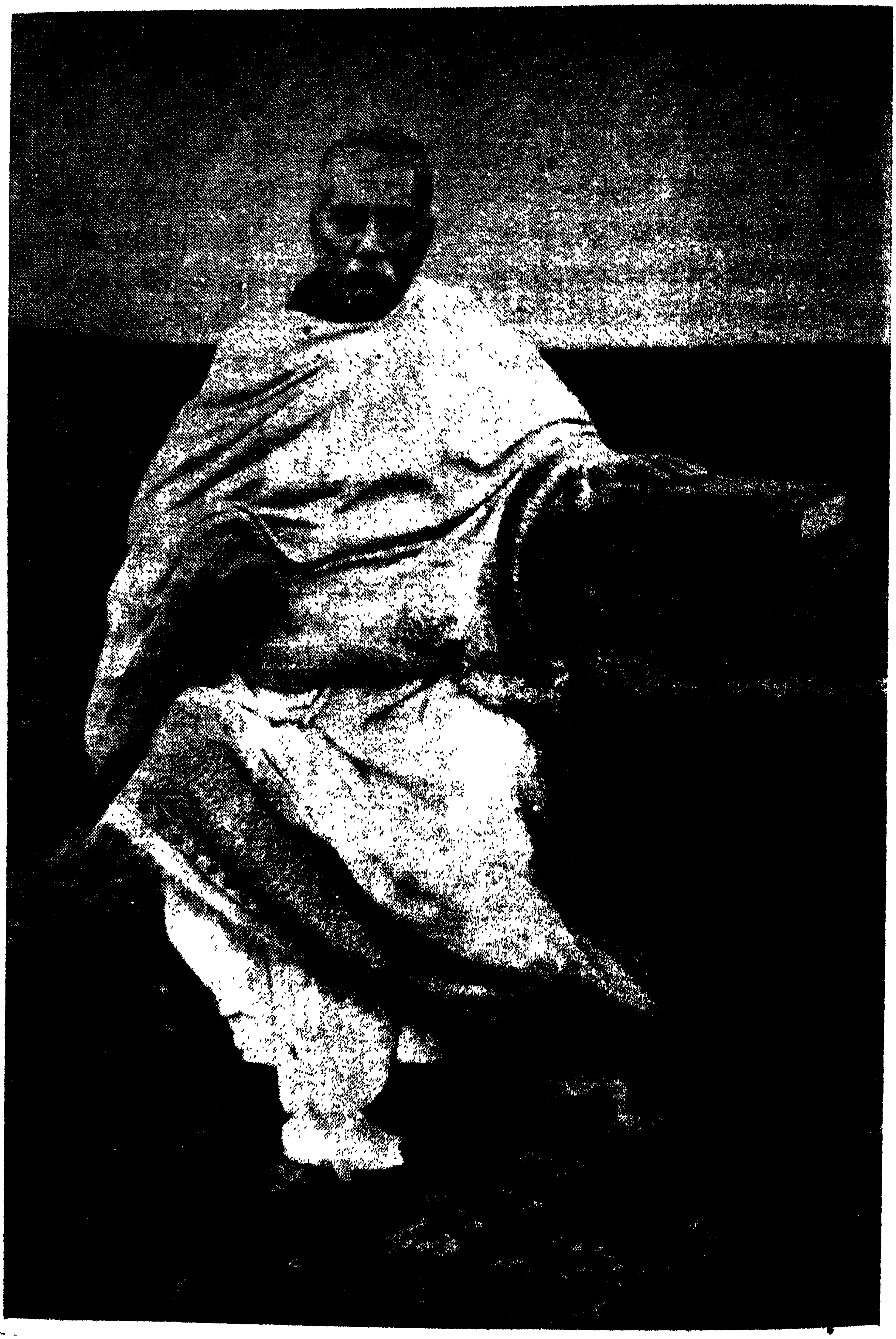

রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর সি, আই, ই।

বঙ্কিমের ন্যায় কঠোর সমালোচকের নিকট এ প্রশংসার মূল্য অনেক। ক্রমে কালীপ্রসন্নের "প্রভাত চিন্তা," "নিভৃত চিন্তা," "নিশীথ চিন্তা" ইত্যাদি পুস্তক বাহির হইতে লাগিল। কালীপ্রসন্নের কবিত্ব ও ভাবুকতা ছিল সত্য, কিন্তু গভীর মনস্তত্ত্বের অনুসন্ধানেই তিনি সমধিক আনন্দ পাইতেন এবং তাহাতেই তাঁহার প্রতিভা সম্পূর্ণ বিকশিত হইত। তাঁহার চিন্তালহরী পাঠ করিলে তাঁহার ভাষার লালিত্যমাধুর্য্যে ও ভাবের গাম্ভীর্য্যে মন মুগ্ধ ও পুলকিত হইয়া উঠে। মাতৃভাষার সেবার প্রতি, তাঁহার অনুরাগ এরূপ প্রগাঢ় ও আন্তরিক ছিল যে ঢাকা পরিত্যাগ করিলে পাছে তাঁহার সাহিত্যকর্ম্মে বিশেষতঃ বান্ধব পত্র পরিচালনে ব্যাঘাত ঘটে, সেই ভয়ে তিনি তখন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটি হইতে অন্যান্য অযাচিত উচ্চ কর্ম্ম পর্য্যন্ত গ্রহণে অস্বীকার করেন। দুঃখের বিষয় পরে শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন এবং অন্যান্য কারণে বান্ধব পত্র তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হয়। ইদানীং তিনি ভাওয়ালের প্রখ্যাতনামা জমিদারগণের ষ্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। এ কর্ম্মেও তিনি বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

ইঁহার মৃত্যুতে আমরা বঙ্গসাহিত্যের আর একটি পুরাতন গৌরবকে হারাইলাম। কিন্তু হারাইলাম বলিতেছি কেন? কীর্ত্তিমান পুরুষের কি মৃত্যু আছে। এই মরজগতে তাঁহারাই চিরঞ্জীব। কালিপ্রসন্নের সেই স্নিগ্ধ শান্ত সৌম্যমূর্ত্তি আমাদের আর নয়নগোচর না হইলেও তাঁহার রচিত গ্রন্থমধ্যে তিনি চিরদিনই বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে মূর্ত্তিমান হইয়া অবস্থিতি করিবেন।

সমালোচনা।

ওয়ালটেয়ার-ভিজাগাপত্তন। শ্রী দাস প্রণীত। কলিকাতা, উইলিয়ম্‌স্‌ লেন ৪নং ভবনস্থ দাস যন্ত্রে শ্রীঅমৃতলাল ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা। গ্রন্থকার ভূমিকায় বলিয়াছেন, "যাহারা স্বাস্থ্যের জন্য ওয়ালটেয়ার ভিজাগাপত্তন যাইতে ইচ্ছুক, তাঁহারা এই পুস্তক পাঠ করিলে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কোন অসুবিধা ভোগ করিবেন না; খুঁটিনাটি সামান্য বিষয় হইতে উচ্চ বিষয় পর্য্যন্ত সকলেরই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ইহাতে বর্ণনা আছে।" ইহা একটুও অত্যুক্তি নহে; 'গাইড্'-হিসাবে গ্রন্থখানি সুন্দর, অমূল্য। এ গ্রন্থ সঙ্গে থাকিলে, যে, ওয়ালটেয়ারযাত্রীকে পরমুখাপেক্ষী হইতে হইবে না, তাহা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি। গ্রন্থকার পাকা সংসারী। কোথায় থাকিলে অল্প খরচ লাগিবে, অথচ স্বাস্থ্যোন্নতির পক্ষে কিছুমাত্র বিঘ্ন ঘটিবে না, কোথায় কোন্ দ্রব্য পাওয়া যাইবে, না-যাইবে, বাজার-দর কিরূপ, এসকলের তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করিয়াছেন। ওয়ালটেয়ারযাত্রীর পক্ষে গ্রন্থখানি সজীব রক্তমাংসবিশিষ্ট বান্ধবের মত হিতকারী। বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ এই গ্রন্থখানি, আমরা একাসনে বসিয়াই পড়িয়া ফেলিয়াছি।

মা। (মাতৃবিয়োগান্তে রচিত শোক-গীতি) শ্রীমোহিনীরঞ্জন সেন প্রণীত। চট্টগ্রাম, সনাতনপ্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। শোক-গীতি সাধারণতঃ

সমালোচনার সামগ্রী নহে। ব্যক্তিগত শোকোচ্ছ্বাস সাহিত্যের অঙ্গীভূত নহে। তবে টেনিসনের In Memoriam, সেলির Adonais, রবীন্দ্রনাথের "স্মরণ" প্রভৃতি ব্যক্তিগত শোকোচ্ছ্বাস হইলেও, ভাবের বিশালতায় তাহা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যমধ্যে গণনীয়। গ্রন্থের ছাপা ও বহিরবয়ব সুন্দর হইয়াছে।

অমর-বাণী। শ্রীবিনয়ভূষণ সরকার বি,এ, বি,টি সঙ্কলিত। কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা। গ্রন্থকার টেনিসন, সেক্সপীয়র ইমার্সন প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতের কয়েকটি মহান্ উক্তির বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। গ্রন্থের সার্থকতা সম্বন্ধে আমাদিগের সন্দেহ নাই। লেখকের উদ্যমও প্রশংসনীয়। তবে অনুবাদ অনেক স্থলেই যেন আড়ষ্ট হইয়া আছে, কেমন যেন প্রাণহীন। তাহা ছাড়া উক্তিগুলি বেশ সুশৃঙ্খলভাবে সঙ্কলিত নহে।

বনফুল। শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। কাসিমবাজার সত্যরত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। 'বনফুল' কবিতা-গ্রন্থ। ইহাতে সর্ব্বসমেত সাতাইশটি কবিতা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অধিকাংশ কবিতাই মিষ্ট। ভাবে-ছন্দে বেশ একটি বৈচিত্র্য আছে, সুর আছে। কষ্ট-কল্পনায় ভারাক্রান্ত নহে। তবে রবীন্দ্রনাথের অতিরিক্ত প্রভাবে কবির স্বাতন্ত্র্যটুকু না লোপ পায়, ইহাই আমাদিগের আশঙ্কা। "অবসান" "প্রবাহ", "ধূর্ত্ততা", "নাথের ছবি," "ভুল", "যাত্রা" প্রভৃতি অনেকগুলি কবিতাই উল্লেখযোগ্য। আজকালকার দিনে, ইহা অল্প প্রশংসা নহে। কাব্যকুঞ্জে আমরা নবীন কবিকে সানন্দে অভিনন্দন করিতেছি। গ্রন্থের ছাপা ও কভার সুন্দর, নয়নাভিরাম।

মানবজীবন। "বর্ত্তমানকালে ভারতে মানবজীবন যাপনের যেরূপ আদর্শ হওয়া আবশ্যক। শ্রীনিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম,এ, বি,এল, প্রণীত। কলিকাতা এস, কে, লাহিড়ী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য বার আনা। ভূমিকাপাঠে জানা যায় যে, "যুবকদিগের সমক্ষে একটি উৎকৃষ্ট সর্ব্বাঙ্গীন্ জীবনাদর্শ প্রদর্শন করা * * এই ক্ষুদ্র পুস্তকের উদ্দেশ্য।" গ্রন্থখানির প্রয়োজনীয়তা সকলেই সম্যক উপলব্ধি করিবেন। গ্রন্থকার মহাশয় এ পথের পথিক হইয়া সকলের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। তবে তিনি অল্প-পরিসর স্থানে এত অধিক গুরুতর বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন যে, সর্ব্বত্র তাহার সম্যক্ অনুশীলন হইয়া উঠে নাই। অনেকস্থলেই, বক্তব্য অপরিস্ফুট ও জটিল রহিয়া গিয়াছে। আশা করি, দ্বিতীয় সংস্করণে অধিকতর যুক্তিতর্কের সাহায্যে গ্রন্থকার আপনার বক্তব্য আরো ফুটাইয়া তুলিবেন। বিদ্যালয়পাঠ্য গ্রন্থের পক্ষে বর্ত্তমান সংস্করণটি উপযোগী হইয়াছে—কিন্তু সরসতার অভাব রহিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থখানি যাহাতে কেবল বিদ্যালয়-পাঠ্যের উপযোগী না হইয়া সাধারণের উপকারে লাগিতে পারে, এমনভাবে সুসংস্কৃত করিলে আমরা যথেষ্ট সুখী হইব।

আমিষ ও নিরামিষ ভোজন। শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ, বি, এ; এল, এম, এস সঙ্কলিত। হিতবাদী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। মূল্য আট আনা। আমিষ-ভোজন 'নরাখ্যাধারী' জীবমাত্রের "স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় নহে—বরং ধর্ম্মবিরুদ্ধ।" এই সময়োচিত সামাজিক সংস্কার জন্য এতাদৃশ সুদুর্লভ" পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বিবিধ বচনের দ্বারা লেখক নিরামিষ ভোজনের সারবত্তা প্রমাণ করিয়াছেন। জীবহিংসা প্রভৃতি যুক্তির কথা ছাড়িয়া দিলেও, আমিষ ভোজন যে শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রসিদ্ধ আচার্য্য মেচনিকফও এই মতের সমর্থন করেন। ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য পরিণত হইয়াছে। গ্রন্থকার নানা যুক্তি-তর্কে আপনার মত সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। গ্রন্থখানি সকলেরই পাঠ করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। গ্রন্থের ভাষা নীরস—আপনা হইতেই বেশ-একটা কৌতূহলের সৃষ্টি করে না—এইটুকুই ক্রটি।

ঊষারাণী। শ্রীসীতানাথ চক্রবর্ত্তী বিরচিত। হিতবাদী লাইব্রেরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য

বার আনা মাত্র। এখানি উপন্যাস। গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা কমল "পোড়ারমুখো গোকুল"কে ডাকিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন। তৃতীয় পরিচ্ছেদে 'ইঁচড়ে-পাকা' কমল চতুর্দ্দশবর্ষীয়া ঊষার সহিত 'ছড়া কাটিতে বসিয়াছে'—বর্ণনীয় বিষয়, সেই উপন্যাস-বাজারের একচেটিয়া বেসাতি, প্রেম। একুশ বছরের ছোকরা নরেন্দ্র আসিয়া 'অশোক তরুর অন্তরালে লুকাইয়া' তাহাদিগের ছড়া শুনিতে লাগিলেন। এসব মামুলী গৎ অসহ্য! তারপর 'ফাজিল' ছোকরা, —ইনি উপন্যাসের নায়ক, কিনা—তাই আর কি করেন,—সন্ধ্যার পর ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বসিয়া নিরাশ প্রেমের soliloquy লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন—কারণ, তাঁর চিরঈপ্সিতা ঊষার অপরের সহিত বিবাহ হইবে! পর পরিচ্ছেদে ঊষারাণী, মনের দুঃখে, "মা, আমি নদীগর্ভে প্রাণত্যাগ করিলাম" বলিয়া অদৃশ্য হইলেন! আপদ চুকিল। এমন মেয়ের নদীগর্ভে প্রাণত্যাগ করাই উচিত। আর পড়িবার প্রবৃত্তি হইল না। গ্রন্থের যেমনি, ভাষা বিন্যাস, ঘটনা-সৃষ্টিতেও তেমনি অসামঞ্জস্য—'কারে রেখে কারে দেখি।'

মেঘদূত। শ্রীনিতাইচাঁদ শীলকর্তৃক অনুবাদিত। চুঁচুড়া, শীলগলি। মূল্য আট আনা। মেঘদূতের বিস্তর পদ্যানুবাদ হইয়াছে—তাহার মধ্যে সহজ ভাব এবং সরলতায় কয়েক খানি বাঙলা কাব্য সাহিত্যে বিশিষ্ট আসন অধিকার করিয়াছে। বর্ত্তমান অনুবাদে বিশেষত্ব কিছুই নাই—নিতান্ত প্রাণহীন রচনা। চর্চ্চার উদ্দেশ্যে, নিভৃতে, এমন কবিতা রচনা করা যাইতে পারে, কিন্তু যাহা লেখা যায়, তাহাই যে, ছাপিতে হইবে এমন কি আইন আছে?

বীর বালক। (কাব্য)। শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী প্রণীত। এনং কলেজষ্ট্রীট সেন ব্রাদার্স এণ্ড কোং কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আট আনা। স্বনামখ্যাত লেখক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "এই রচনা পাঠ করিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। তিনি যে এই অল্প বয়সে মাইকেলের ছন্দোবন্ধ ও ভঙ্গী কিরূপে আয়ত্ত করিয়াছেন" ইত্যাদি। দুঃখের বিষয়, আমরা পাঠ করিয়া বিস্মিত হইলাম না। চর্চ্চা করিলে লেখিকা কালে ভালো লিখিতে পারিবেন, সে আশা অসঙ্গত নহে, তবে বীর বালকে আমরা এমন কিছু প্রতিভার পরিচয় পাইলাম না। অনেক স্থলেই অবান্তর ও অসঙ্গত উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য আছে। অর্থাৎ, অনেক প্রথম রচনা যে শ্রেণীর হইয়া থাকে, ইহাও সেইরূপ। তবে ভাবাটুকু গম্ভীর। ছন্দে একটা সহজ প্রবাহ নাই—কষ্ট কল্পনার ভারে বহুস্থলই নিপীড়িত। বঙ্গসাহিত্যে মহিলা কবির অসদ্ভাব নাই; সেই জন্যই বীরবালকের কবির অতিরিক্ত প্রশংসা করিতে পারিলাম না। রচনায় বহু দোষ রহিয়া গিয়াছে।

বেদান্তের আমি। শ্রীভগবৎদাস প্রণীত। মূল্য আট আনা মাত্র। গ্রন্থের সমস্ত স্বত্ব লেখককর্তৃক বৈদ্যনাথস্থ 'বাক চক' আখড়ায় উৎসর্গীকৃত। গ্রন্থখানিতে 'আমি', 'ত্রিত্ব', 'অদৃষ্টবাদ' 'আহার', 'শয়ন' প্রভৃতি অনেক প্রয়োজনীয় কথার সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। সাধারণের পক্ষে সেগুলি সুবোধ্যও হইয়াছে লেখকের সহিত সর্ব্বত্র আমাদিগের মতের মিল না থাকিলেও, গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্ত হইয়াছি। ইহাতে কোথাও পাণ্ডিত্যের হুঙ্কার নাই, ইহাই ইহার প্রধান বিশেষত্ব।

পুরাণদর্শন-সূত্র উপক্রমণিকা—অথবা আর্য্যধর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্ম শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীভুবনমোহন শর্ম্মা। কাশীপ্রেসে, মুদ্রিত, বেনারস সিটি। গ্রন্থখানির উদ্দেশ্য, সাকারত্ব ওপুরুষ প্রকৃতি-তত্ব, যুগাদির দৈব বা জ্যোতিষিক ও ঐতিহাসিক কাল-নিরূপণ, তীর্থাদি ও পাপপুণ্যের আলোচনা ইত্যাদি। গ্রন্থখানি পাঠ করিলে লেখকের সুগভীর অনুসন্ধিৎসা ও তাহার সুশৃঙ্খল বিন্যাস দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। 'আত্মা', 'গুরু', 'স্মৃতি' প্রভৃতির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাগুলি সুন্দর, প্রাণস্পর্শী। সহজ করিয়া বলিবার লেখকের বেশ শক্তি আছে। তাঁহার অবতারিত তথ্যসমূহের যাথার্থ্য-নিরূপণের ভার বিশেষজ্ঞেরা গ্রহণ করুন। তবে আমরা এখানি পাঠ করিয়া

তৃপ্তি পাইয়াছি। আগাগোড়া দিব্য কৌতূহল জাগরূক থাকে। অসামর্থ্য হেতু প্রায় ১০ পৃষ্ঠা গ্রন্থকার প্রকাশ করিতে পারেন নাই। দেশেরো দুর্ভাগ্য, সন্দেহ নাই। প্রাচীন ভারত ও শাস্ত্রাদি সম্বন্ধে লেখকের ভূয়োদর্শিতা বাস্তবিকই উপভোগ্য। গ্রন্থের মূল্য কোথাও লিখিত দেখিলাম না।

বঙ্গীয় নাট্যশালা। শ্রীধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায় প্রণীত। এমারেল্ড্ প্রিণ্টিংওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য বারো আনা। গ্রন্থখানি সাধারণ বঙ্গীয় নাট্যশালার সমালোচনা। সমাজে নাট্যশালার যে একটি স্থান আছে, সে সম্বন্ধে কাহারো মতভেদ থাকিতে পারে না। আনন্দ-দান উদ্দেশ্য হইলেও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শিক্ষাদান কার্য্যও ইহার দ্বারা সাধিত হয়। বঙ্গীয় সাধারণ নাট্যশালা, অভিনয়কৃত্রিমতায়, শিক্ষাশৈথিল্যে, সুরুচি ও সুভাব-বর্দ্ধক পুস্তকের অভাবে ক্রমেই অধঃপতনের পথে চলিয়াছে। হিতোপদেশ যে সে কর্ণে গ্রহণও করে না, ইহাই তাহার অবশ্যম্ভাবী দ্রুত পতনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ! রুচি বিকৃত করিবার দিকে আধুনিক নাট্যশালার দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি আমরা বহুবার লক্ষ্য করিয়াছি! বর্ত্তমান গ্রন্থে "পুস্তকনির্ব্বাচন" "অভিনয় শিক্ষা" "পোষাক পরিচ্ছদ," "দৃশ্যপটাদি," "নাচ-গান" প্রভৃতি সকল প্রয়োজনীয় বিষয়েই লেখক আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার সহিত সর্ব্বত্র আমাদিগের মতের মিল না থাকিলেও তাঁহার যুক্তি ও সিদ্ধান্ত, আলোচনা-যোগ্য। বাঙলা রঙ্গভূমি সম্বন্ধে, 'ভারতী'তে পূর্ব্বে বহু আলোচনা হইয়াছে; কিন্তু 'কাকস্য পরিবেদনা'! বাঙলার প্রবল প্রতাপশালী রঙ্গালয়াধ্যক্ষ আপনার 'সবজান্তা' গিরি ছাড়িয়া সাধারণ মতামত ত গ্রাহ্য করিতে পারেন না! গ্রন্থকার-বর্ণিত চরিত্রাদির সম্যক ধারণা না করিয়া অভিনেতার দল কিরূপ হাস্য ও বিরক্তির উদ্রেক করেন, তাহা বুঝিবারো যদি তাঁহাদিগের ক্ষমতা থাকিত! অভিনয়-কলার প্রতি যাঁহার কিছুমাত্র অনুরাগ আছে, বর্ত্তমান গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া তিনি যে সুখী হইবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রঙ্গালয়ের সমালোচনা, সাপ্তাহিক পত্রাদির কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া আমরা মনে করি, কিন্তু স্বর্ণপাশের কি মোহিনী শক্তি,—তাহারি মায়ায় মুগ্ধ সম্পাদক, বীভৎস নাটকে, সেক্সপিয়রের রচনা-কৌশল, চরিত্রবিন্যাসের ঘটা দেখিয়া আত্মহারা হইয়া উঠেন! বর্ত্তমান গ্রন্থে "দর্শক ও সমালোচক" শীর্ষক নিবন্ধটি স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে মুদ্রিত করিয়া রঙ্গালয়গুলির দ্বারদেশে বিনামূল্যে বিতরিত হইলে ভালো হয়। গ্রন্থখানি দুই একটি দোষ উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না—প্রথমতঃ, গ্রন্থখানি up to-date হইয়া উঠে নাই—দ্বিতীয়তঃ, বিস্তর অপদার্থ অভিনেতা ও অভিনেত্রীর নামে গ্রন্থের পৃষ্ঠা ভারাক্রান্ত হইয়াছে। তাহাদিগকে এমন অযথা প্রশ্রয় দান করা এতটুকু সমীচীন হয় নাই বলিয়াই আমাদিগের ধারণা।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

মিলন।

প্রেম ছিল সুনিভৃতে, সুখস্বপ্ন ঘোরে,
ভক্তি দোঁহে বাঁধি দিল সুমঙ্গল ডোরে।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৪৪, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

দময়ন্তী

[illegible]

[illegible] প্রেসে মুদ্রিত

৺ভারতী

৩৪শ বর্ষ] আশ্বিন, ১৩১৭ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

অক্ষয় রূপ।

সে ছিল সন্ন্যাসী। জপ তপ পূজা আরাধনা নিয়েই সে থাকত। পৃথিবীর কোনো মানুষের পানে, কোনো জিনিসের দিকে সে ফিরেও চাইত না। বনের মাঝে দেবতার মন্দিরে তার আস্তানা ছিল। বনের যত জন্তু তার মন্দিরদ্বারে এসে খেলা করত, যত পাখী মন্দিরচূড়ায় বসে কাকলী গাইত। মানুষের সমাগম বড় হত না।

মন্দিরের মধ্যে দেবতার কোনো বিগ্রহ ছিল না, সন্ন্যাসী বসে বসে যে কার পূজা, কার ধ্যান করত তা সেই জানে।

এমনি দিন যায়। বর্ষার বাদল ভাঙা মন্দির বেয়ে দুপুর রাতে কার চোখের জলের মতো এসে তার গায়ে উপচে পড়ে, গ্রীষ্মের রৌদ্র ভাঙা দরজার ফাঁক দিয়ে এসে তার মাথায় সোনার কিরীট পরিয়ে দেয়, সে সব সে খেয়ালই করে না। দিনের আলো, রাতের আঁধার, বসন্তের বাতাস, চাঁদের জোছনা তার প্রাণের মধ্যে কোনো ভাবের লহরী তুলতেই পারত না। দেখলে বোধ হত যেন পাথরের মানুষ!

মাঝে মাঝে পথহারা পথিক দুপুর রাত্রে এসে তার মন্দিরে আশ্রয় নিত, ভোর না হতেই পথ খুঁজে চলে যেত, সন্ন্যাসী তাদের কাউকে কোন কথা শুধাত না, তারা কিছু জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দিত না—চোখ বুজে বসে থাকত। কেউ যদি এসে ভক্তিভরে তার পদসেবা করতে যেত সে পা টেনে নিত। কেউ কিছু ভেট দিলে ছুঁড়ে ফেলে দিত।

এক ভোর রাত্রে এক নর্ত্তকী রাজার বাড়ি গাওনা শেষ করে ফিরচে, পথে ঝড়বৃষ্টিতে পড়ে এই মন্দিরে আশ্রয় নিলে। সে শুনেছিল এইখানে এক সন্ন্যাসী থাকে। অনেকদিন থেকে এই সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা করবার তার ভারি ইচ্ছা, কিন্তু দেখা ঘটে ওঠেনি। আজ দৈবযোগে দেখা হয়ে তার ভারি আনন্দ হল। মনে হল—আমি যা খুঁজি এই সন্ন্যাসীর কাছে তার সন্ধান নিশ্চয়ই পাবো, নইলে আজ রাত্রে এরই কাছে বা এসে পড়ব কেন? নিশ্চয় এ ভগবানের খেলা!

নর্ত্তকী পরম রূপসী। তার রূপের প্রশংসা দেশজোড়া, সেই গরবে তার মাটিতে পা পড়ে না। কিন্তু তার বড় ভয় কখন সে গরব টুটে! রূপতো আর চিরদিন থাকে না! এরই মধ্যে তার রূপের প্রভা নিবে আসচে। এক একদিন আয়নার সমুখে দাঁড়িয়ে যখন দেখে নিটোল অঙ্গ

টোল খেয়ে আসচে, ঘনকৃষ্ণ কেশের মধ্যে থেকে শুভ্রতা উঁকি মারচে, কপালে, গালে বয়সের কুঞ্চন-রেখা ফুটে উঠচে, দেহলাবণ্য দিন দিন উবে যাচ্ছে; শত চেষ্টা করেও চোখ দুটো আর তেমন করে কটাক্ষ হানতে পারচে না, তখন তার বুকের রক্ত যেন শুকিয়ে আসে; ভয়ে রূপ আরো মলিন হয়ে পড়ে। কি করলে রূপ অটুট থাকে এখন এই তার ভাবনা। সে যতই ভাবে কিছুতেই কিছু ঠিক করতে পারেনা—কেবল হতাশ হয়ে পড়ে।

একদিন তার দাসী তাকে বলেছিল কোনো সন্ন্যাসীর কাছ থেকে যদি কোনো ওষুধ নিতে পারো তবেই রূপ বজায় থাকে; সন্ন্যাসীরা মহাপুরুষ, তাঁরা ইচ্ছা করলে সবই করতে পারেন। দাসীর এই কথা শুনে অবধি নর্ত্তকীর মনে একটু আশার উদয় হয়েছে। দৈবযোগে আজ সন্ন্যাসীর দেখা পেয়ে সেই আশা দৃঢ় হয়ে উঠল।

হাবভাব ছলাকলা যা কিছু সম্বল ছিল তাই দিয়ে নর্ত্তকী সন্ন্যাসীকে বশ করবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু সন্ন্যাসী এমনি উদাসভাবে তার পানে চাইলে যে সে চাহনি দেখে তার ভয় করতে লাগল। সে তখন সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে বল্লে—"সন্ন্যাসী ঠাকুর! দয়া কর।"

সন্ন্যাসী সে কথা যেন শুনতেই পেলেনা। যেমন ভোলাভাবে বসে ছিল তেমনি বসে রইল।

সন্ন্যাসী যতই তার কথা ঠেলে ফেলে দেয়, যতই উদাসভাব দেখায় নর্ত্তকীর মনের বিশ্বাস ততই বেড়ে উঠতে থাকে। সে ভাবে —এইই আসল সন্ন্যাসী বটে! এরই কাছে যা খুঁজচি তা পাবো। এঁকে ছাড়া নয়। এই ভেবে সে সন্ন্যাসীর পা দুটো খুব জোর করে চেপে ধরলে। সন্ন্যাসী দেখলে ভারি বিপদ! সে তখন ছুটে মন্দির থেকে বেরিয়ে বনের মধ্যে গিয়ে লুকোলো। নর্ত্তকী হতাশ হয়ে সেদিনকার মতো বাড়ি ফিরে গেল।

তারপর থেকে রোজই সে সন্ন্যাসীর কাছে আসে—তার পায়ে ধন্না দিয়ে পড়ে থাকে! তার দাসী তাকে বলে দিয়েছিল সাধুপুরুষের কৃপা সহজে হয় না, তাই সে পড়ে পড়ে সাধ্যসাধনা করতে লাগল।

এমনি করে দিন যায়। রাজ্যের লোকে নর্ত্তকীর দেখা পায় না, রাজ্যের আমোদ বন্ধ, রাজার প্রমোদভবন শূন্য। সকলে হায় হায় করতে লাগল।

রাজা বল্লেন—"যেখান থেকে হ'ক নর্ত্তকীকে এনে হাজির কর। নইলে আমি তিষ্ঠতে পারচি না।"

রাজার লোক মন্দির ঘেরাও করে নর্ত্তকীকে রাজসভায় এনে হাজির করলে। নাচ গান আরম্ভ হল, কিন্তু নর্ত্তকীর মনে ফূর্ত্তি নেই বলে আসর তেমন জমল না।

নর্ত্তকী ছাড়া পেয়েই সন্ন্যাসীর কাছে ছুটল, রাজার লোক তার পর দিন আবার তাকে ধরে নিয়ে এল। এমনি রোজ হতে লাগল। তার মন টানে তাকে মন্দিরের দিকে, রাজা টানে রাজসভায়! টানাটানির মধ্যে পড়ে নর্ত্তকী অস্থির।

সন্ন্যাসী দেখলে মহা বিপদ! বন ছিল নির্জ্জন, জপতপের বেশ সুবিধে। এখন রাজার লোক এসে রোজ রোজ হল্লা করে;—

হাতী ঘোড়ার চীৎকারে কান ঝালাপালা! সে ভাবলে এ তো চলবে না। একটা উপায় করতে হবে—নইলে তিষ্ঠতে পারব না, জপতপ সব ঘুরে যাচ্ছে। নর্ত্তকী কি চায় সেকথা তাকে জিজ্ঞাসা করে তাকে তাড়াতে হচ্ছে। এই ভেবে সে নর্ত্তকীকে বল্লে—"কি চাও তুমি?"

সন্ন্যাসীর মুখে কথা শুনে নর্ত্তকীর মনে আশার উদয় হল। সে ভাবলে এতদিনের সাধনা আজ বুঝি সফল হল। সে বল্লে—"বাবা ঠাকুর! আমার রূপের যাতে ক্ষয় না হয় তাই তোমায় করতে হবে।"

সন্ন্যাসী বল্লে—"সে কি কথা! আমি তার কি করব!"

নর্ত্তকী বুঝলে এক কথায় কাজ হচ্ছে না। তখন সে সন্ন্যাসীকে খুব করে ধরে পড়ে বল্লে—"তুমিই পারবে! ঠাকুর তাই ত তোমার শরণ নিয়েছি।"

কথা শুনে সন্ন্যাসী হো হো করে হেসে উঠল। বল্লে—"রূপ কখন অক্ষয় হয়!"

নর্ত্তকী বল্লে—"হয় ঠাকুর! হয়! তোমরা দেবতার জানিত লোক—তোমরা সব পারো। আমি কোনো কথা শুনচি না! অক্ষয় রূপ না দিলে কিছুতে ছাড়ব না—এই রইলুম পড়ে!"

সন্ন্যাসী একটুখানি হাসলে। বল্লে—"কৃপণ তার ধনকে কেমন করে অক্ষয় করে রাখে জান?"

নটী বল্লে—"জানি। কৃপণ টাকা মাটিতে পুঁতে রাখে।"

সন্ন্যাসী বল্লে—"কৃপণের টাকার মতো তোমার রূপকে সকলের দৃষ্টি থেকে যদি একেবারে লুকিয়ে ফেলতে পার তাহলে রূপ তোমার অক্ষয় হয়ে থাকবে।"

নটী চুপ করে বসে ভাবলে;—নিশ্বাস ফেলে জিজ্ঞাসা করলে—"সকলকে লুকিয়ে যদি কেবল একজনের কাছে দেখাই তাহলে কি ক্ষতি হবে?"

সন্ন্যাসী বল্লে—"হাঁ, তাহলেও ক্ষয় হতে থাকবে।"

নটী বল্লে—"এমন করে লুকবো কি উপায়ে?"

সন্ন্যাসী হেসে বল্লে—"উপায় আমি ঠিক করে দেব। তুমি যদি মনের সঙ্গে ইচ্ছা কর তাহলে তোমার রূপ আমি এমন করে ঢেকে দেব যে কোথাও একটুও ছিদ্র থাকবে না;—তোমার রূপ আছে বলে কেউ সন্দেহও করতে পারবে না।"

নর্ত্তকী আবার একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপ করে রইল।

সন্ন্যাসী বল্লে—"আজ রাতে চিন্তা করে দেখো, কাল সকালে এসে তোমার ইচ্ছা জানিয়ো।"

পরদিন সকালে নটী ফিরে এসে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করলে। বল্লে—"আমার অক্ষয় রূপে প্রয়োজন নেই ঠাকুর!"

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

ভুবনেশ্বর।

মন্দির নির্ম্মাণ হইতে হইতে হইল না; মহাকালের আহ্বানে যযাতি কেশরীকে সংসার হইতে দোকানপাঠ তুলিতে হইল।

সে আজ পনেরো শত বৎসরের কথা। কেশরীবংশীয়গণের ললাট, তখন রাজশ্রীর পূত তিলকে উজ্জ্বল। সে রাজবংশের প্রায় সকলেই শিল্পের একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। তাহার ফলেই উৎকলের মন্দিরমালা আজ পৃথ্বী প্রখ্যাত।

ইতিহাস বলে, উৎকলীয়গণ, সম্রাট অশোকের সময় হইতে, গুপ্ত বংশীয়গণের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত প্রধানত বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিল। (খৃঃ পূঃ ২৫০—৩১৯ খৃঃ অব্দ) *

তাহার পর প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম্মে এবং নবজাগ্রত শৈবধর্ম্মে প্রবল বিরোধ আরম্ভ হয়। শঙ্কর কর্ত্তৃক উদ্বোধিত শৈবধর্ম্ম উৎকলে আসিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। এই বিখ্যাত ধর্ম্ম বিপ্লবের কাহিনী চিত্তোত্তেজক উপন্যাস অপেক্ষা অল্প কৌতূহলজনক নয়। হাণ্টার সাহেব বলেন, "For 150 years Buddhism and Siva worship struggled for the victory."

সর্ব্বব্যাপী বুদ্ধের সাম্যনীতি, উৎকলে তখন পুরাতন কাহিনী হইয়া উঠিয়াছিল। বৈরাগ্য বড় কঠোর, বিলাস অতি পেলব! বুদ্ধের সে ধ্যান-গম্ভীর প্রশান্ত আনন শৈল-প্রাচীরে শিল্পের মহিমাই মৌন ব্যক্ত করিতে লাগিল,—সে অর্দ্ধ-নিমীলিত পদ্ম-নেত্রের শান্ত নিষেধ যতিগণের পক্ষে প্রচুর হইল না,—নব-প্রাপ্ত তন্ত্রাচারে তাঁহাদের মন্ত্র-পূতঃ গেরুয়া-বসন তখন কলুষিত হইয়া উঠিয়াছিল। কোথায় রহিল ধর্ম্ম,—আর কোথায় রহিল কর্ম্ম! এ লব্ধ সুযোগ যযাতি কেশরী ছাড়িলেন না। শিব তাঁহার দেবতা,—উৎকলে তিনি শ্মশান-পতির ত্রিশূল রোপণ করিয়া দিলেন। এবং সাগরের ফেনা-ধবলিত নাদ-ভীষণ উত্তাল তরঙ্গে যেমন নদীর ক্ষুদ্র বীচিমালা গান-হারা হইয়া যায়,—তেমনি প্রবল ব্রহ্মণ্য শক্তির সম্মুখে অনাচার দুর্ব্বল বৌদ্ধধর্ম্ম আপনার সকল গর্ব্ব নিঃশেষিত করিয়া ফেলিল।

উড়িষ্যার তালপত্রের পঞ্জিকা (Palmleaf Records) আমাদের জানাইয়া দিতেছে, কেশরী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা যযাতি কেশরী ৫০০ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যা হইতে দশ হাজার ব্রাহ্মণ, উৎকলে আনয়ন করেন এবং এই উপবীতধারী সদ্য-নমস্ত নব আগন্তুকগণের জন্য যাজপুরে অনেকখানি যায়গা ছাড়িয়া দেন। যযাতি কেশরী নিজে উৎকলের অধিবাসী ছিলেন না। তাঁহার আদিনিবাস ছিল,—অযোধ্যায়। আপনার বাহুবল এবং পরাক্রমে, উৎকলভূমিতে তিনি একটি বহুশতাব্দীস্থায়ী রাজবংশের সৃষ্টি করিয়া যান। তাঁহারই নামানুকরণে যাজপুরের নামকরণ হইয়াছে। যাজপুর, তাঁহারই রাজধানী ছিল। বিদ্যমানকালে তাঁহার চিহ্নমাত্রও নাই। বৌদ্ধগণকে বিতা-

* History of Indian & Eastern Architectury.

ড়িত করিয়া তিনি ভুবনেশ্বরে, রাজধানী স্থাপন এবং মন্দিরনির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ করেন।

মন্দিরের কাজ কিছু কিছু হইতেছে, এমন সময়ে তাঁহার মৃত্যু হইল। তালপত্রপঞ্জীর মতানুসারে তিনি ৪৭৪ খৃঃ অঃ হইতে ৫২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। যযাতি কেশরীর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সূর্য্যকেশরী সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু মন্দিরের কোন কাজেই তিনি হস্তক্ষেপ করেন নাই। তাঁহার পরবর্ত্তী রাজা অনন্ত কেশরী মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য পুনরায় আরম্ভ করেন এবং অলাবুকেশরীর রাজত্বকালে ইহা সম্পূর্ণ হয়। (৬৫৭ খৃঃ অঃ)। * জগৎ কেশরী কর্ত্তৃক ভোগমণ্ডপ নির্ম্মিত হয়। (৮৫০—৮৭০ খৃঃ অব্দ)। নাট মন্দিরটী কেশরী রাজবংশের এক রাজ্ঞী ("The wife of salini") কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ হয়। (১০৯৯—১১০৪)। † মন্দির নির্ম্মাণের ত্রিশ বৎসর পরেই কেশরী রাজবংশের পতন হয়। "And the last public act of the Dynasty was the building of the beautiful vestibule to the great shrine of Bhubaneswor between 1099 and 1104 A. D. or barely thirty years before the extinction of the race" (Hunters Orissa)। ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়া একাদশ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে সমাপ্ত হইয়াছে। মধ্যে সুদীর্ঘ ছয় শতাব্দীর পরিবর্ত্তন বহিয়া গিয়াছে। জগতে আর কোন দেবমন্দির নির্ম্মাণ করিতে বোধ হয় এত সময়ের আবশ্যক হয় নাই।

কেশরী বংশে ৪৩ জন রাজা হইয়াছিলেন। এবং তাহাদের প্রায় সকলেরই জীবনকাল, এই একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিতে শেষ হইয়াছে! এখন সে বংশের কেহই বিদ্যমান নাই। তাঁহাদের রাজধানীও কিরূপ ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। রামেশ্বর মন্দিরের সম্মুখে বহু সংখ্যক ধ্বংসভগ্ন প্রস্তর স্তূপ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দেখা যায়। জনপ্রবাদ বলে, ইহাই কেশরীরাজগণের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ।

শুনা যায় এখানে আগে ক্ষুদ্র বৃহৎ এক লক্ষ মন্দির ছিল। এখন এক লক্ষ দূরে যাউক সাতশত মন্দির আছে কিনা সন্দেহ। সম্প্রতি, ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে তাহাও ধ্বংস হইয়াছে। বৈদান্তিক বলেন, জগৎ মিথ্যা,—মায়ামাত্র। ভুবনেশ্বরের বর্ত্তমান অবস্থার কথা স্মরণ করিলে, তাহাই মনে হয়। এখানে ভগ্নস্তূপ, ওখানে চূর্ণ বিচূর্ণ প্রাসাদাবশেষ এবং তাহারই চারিদিকে কতকগুলা জীর্ণ ভগ্ন মন্দির; কাহারও চূড়া খসিয়াছে, কাহারও কারুকার্য্য বিলুপ্ত হইয়াছে—কাহারও শিরে আরণ্য বৃক্ষ শিকড় রোপণ করিয়াছে—

* পুরুষোত্তম চন্দ্রিকায় অলাবু কেশরীর নাম পাওয়া যায়, ষ্টার্লিং সাহেব ইহাকে ললাটেন্দু কেশরী নামে উল্লেখ করিয়াছেন। (Asiatic Researchs XV 1866)। ফারগুসান সাহেবও বলেন, "It seems almost certainly to have been built by Lolat Indrakesari, who reigned from A. D. 617 to A. D. 657."

† পুরুষোত্তম চন্দ্রিকা ৩৪ পৃষ্ঠা।

কাহারও দেব মহিমা বিগত—মানুষেরই মত দেবতার পাষাণদেহ পঞ্চভূতে মিশিয়াছে।

পদ্মক্ষেত্র অতি প্রাচীন স্থান। একাধিক পুরাণাদিতে ইহার উল্লেখ আছে।

এই স্থানের "ভুবনেশ্বর" নাম আধুনিক। "ক্ষেত্রমেকাম্রকং"—অর্থাৎ "একাম্রক্ষেত্র"ই ইহার প্রাচীন নাম। *

নীলগিরির দুই যোজন অন্তরে, একাম্র কানন অবস্থিত।

এই স্থানের একাম্রকানন নাম হইবার কারণ সম্বন্ধে কপিল সংহিতাকার এবং ব্রাহ্মপুরাণও বলেন :—

একটীমাত্র আম্রবৃক্ষ থাকার জন্য, ইহার নাম "একাম্র কানন" হইয়াছে।

"একাম্র-চন্দ্রিকা" নামক আর একখানি পুস্তকে, ইহার সীমা-নির্দ্দেশ আছে। যথাঃ

"খণ্ডাচলং সমাসাদ্য যত্রাস্তে কুণ্ডলেশ্বরঃ।
আসাদ্য বারাহীদেবী মহিরন্দেশ্বরাবধি ॥"

এখানে "ভুবনেশ্বরে"র স্থিতি সম্বন্ধে নানা পুরাণে নানাবিধ কাহিনী আছে। সে সকল কাহিনীর উল্লেখ করিতে হইলে, আজ আর অন্য কথা হয় না। তবে প্রধানতঃ ইহাই জানা যায়, যে মুক্তজনতা বারাণসী ত্যাগ করিয়া, মহাদেব বিষ্ণুর নিকটে সত্যবদ্ধ হন, যে তিনি আর কখনো কাশীতে প্রত্যাগমন করিবেন না। তাহার পর হইতে তিনি এখানেই বাস করিতে থাকেন।

পুরাণ আরো অনেক মনোহারিণী কাহিনী বলিয়াছে। শিবরমা উমা এখানে গোষ্ঠলীলা করিয়াছিলেন। সাধক রামপ্রসাদ "শ্রীশ্রীকালী কীর্ত্তনে" একাম্র কাননে মায়ের গোষ্ঠলীলা, ভাবময়ী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন।

জগন্নাথের মন্দির, ভুবনেশ্বরের মন্দির অপেক্ষা উচ্চ বটে; কিন্তু তাহার উচ্চতা ভুবনেশ্বরের গৌরবকে খর্ব্ব করিতে পারে নাই। বহুকালব্যাপী পরিশ্রম ও চেষ্টায়, ভুবনেশ্বর দেবায়তনের স্তরে স্তরে শিল্পের যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারুকার্য্য পুষ্পপ্রতিম ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা স্বপ্নের মত, সুন্দর। প্রথম দৃষ্টিতে তাহা মানবহস্তগঠিত বলিয়া বিশ্বাস হয় না। এবং একদিন বা দুইদিন তাহার চারিপাশে না ঘুরিয়া বেড়াইলে কিছুই দেখা হয় না। তাই ফারগুসান সাহেব বলিয়াছেন;

"A weaks study of the Jagomohan, would every hour reveal new beauties."

ভুবনেশ্বরের মন্দিরের পূর্ব্বদিকে, কপিলেশ্বর মন্দিরাভিমুখগামী একটী পথ আছে। পশ্চিমদিকে কতকগুলি ছোটছোট ধ্বংসভগ্ন মন্দির। উত্তর দিকে, বড় ডাণ্ডা নামধেয় একটী প্রশস্ত রাজপথ এবং দক্ষিণদিকে অনিবিড় জঙ্গল,—সেই স্থানে আগে রাজপ্রাসাদ ছিল।

ডাঃ রাজেন্দ্রলাল ইহার সীমানির্দ্দেশ করিয়াছেন :

"Its present boundary may be roughly described to extend from the Temple of Ramesvara to a little to the west of that of Bhuvanesvara on the west; from the latter of Temple of Kapilesvara on the south; from the last to the temple of Bhaskaresvara on the east; and from the last to Ramesvara on the north."*

* The Antiquities of Orissa.

ভুবনেশ্বরের মন্দিরাবস্থানের পরিমাণ উনিশ বিঘা ভূমি। চারিদিক দুর্ভেদ্য উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। প্রাচীর-প্রসার ৭ ফুট ৫ ইঞ্চ। উর্দ্ধেও সামান্য নয়, ৩৩ হাত। বিধর্ম্মীর অত্যাচারের জন্য মন্দিরের নির্ম্মাতাগণকে সর্ব্বদাই সশঙ্কিত থাকিতে হইত। ভারতের অনেক দেবালয় মুসলমানগণের অন্ধ ধর্ম্মবিদ্বেষিতায় বিধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। এই বিপদ নিবারণের জন্য ভারতের মন্দির-নির্ম্মাতাগণ, মন্দিরগুলিকে এক একটী ছোট-খাটো দুর্গের মত করিয়া তুলিতেন। সেই জন্যই মামুদ সহজে সোমনাথের প্রসিদ্ধ মন্দির করতলগত করিতে পারেন নাই। সোমনাথের পূজকগণ, মন্দির প্রাচীরের অন্তরালে আত্মগোপন পূর্ব্বক শাস্ত্র ছাড়িয়া শস্ত্র-ধারণ করিয়া, মোগলের আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জন্য দাঁড়াইয়াছিলেন।

এরূপ বিপদ ঘটিবার অবসর, বোধ করি ভুবনেশ্বরেও খুব সুলভ ছিল। তাই মন্দিরের চারিপাশে এইরূপ উচ্চ প্রাচীর নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছিল।

সুধু তাহাই নয়,—প্রাচীরের গর্ভে, যাহাতে যোদ্ধাগণের অবস্থান হইতে পারে, এমন কার্য্যও আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু এ কাজ শেষ হয় নাই,—প্রাচীরের দু'এক দিকে তাহার চিহ্নমাত্র নজরে পড়িয়া যায়।

মন্দিরের দ্বারপথ তিনটী। তন্মধ্যে যেটী সর্ব্ববৃহৎ, সেটী পূর্ব্বমুখী। দ্বারপ্রসার ৩১ ফুট উপরে ছাদ আছে। দূর হইতে দেখিলে, দ্বার পথটীকে একটী ছোটখাটো মন্দির বলিয়া ভ্রম হয়। দ্বার পথের দুপাশে দুটী কল্পনা-বিকৃত সিংহমূর্ত্তি আছে। দ্বার-গৃহটীর উচ্চতা ৫০ ফুট।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া, উঠানের উপরে পড়িলে দেখা যায়, প্রধান দেবালয় বেষ্টন করিয়া চারিদিকে বহুসংখ্যক দেবালয়। সকলগুলিই ছোট,—তাহাদের উচ্চতা ৬ হইতে আরম্ভ করিয়া ৩০ ফুট পর্য্যন্ত। প্রত্যেকটীর বিভিন্ন নাম,—এবং কাহারও নির্ম্মাণাদর্শ একরূপ নয়। সকলগুলিই বিভিন্নকালের বিভিন্ন শিল্পী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত।

জনৈক লেখক বলেন, "কি ঐতিহাসিক, বা কি গঠন ও শিল্প হিসাবে, এই মন্দিরগুলির কোন মূল্য নাই।"* আসল কথা, মন্দিরগুলি লুব্ধ পুরোহিতগণের দ্বারা বিভিন্ন সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল! কেবল ভুবনেশ্বর, সকলের অর্থলাভ বাসনা চরিতার্থ করিতে পারেন না দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা নিজ নিজ ব্যয়ে এই সকল মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিল। তাহাদের অভি-প্রায় ছিল, নূতন দেবতার প্রতিষ্ঠা করিয়া, অর্থোপার্জ্জনের নূতন পথ মুক্ত করা,—সুতরাং মন্দিরগুলি শিল্পের সহিত সর্ব্বসম্বন্ধমুক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই সকল মন্দিরের ভিতরে দু'একটীর নাম উল্লেখ যোগ্য। একটী মন্দিরের গৃহতল,—অন্যান্য মন্দির অপেক্ষাও নিম্নাভিমুখী। এই মন্দিরটী এখানকার সকল মন্দির অপেক্ষা প্রাচীন এবং অনেকে বলেন, ইহাই ভুবনেশ্বরের সর্ব্বপ্রথম মন্দির। মন্দিরের ভিতরে এখনো একটী শিবলিঙ্গ আছে।

* List of Ancient Monuments in Bengal.

লিঙ্গ একবার প্রতিষ্ঠিত হইলে আর তাহাকে স্থানান্তরিত করা চলে না। সেই কারণেই উক্ত লিঙ্গ অদ্যাপি একস্থানেই বিরাজিত আছে। এই কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মপিপাসু তীর্থযাত্রিগণের যে ভক্তি স্রোত আজ নূতন মন্দিরের বিরাট শিবলিঙ্গের উদ্দেশে প্রবাহিত হয় তাহা উক্ত "ভাঙা দেউলের দেবতারই প্রাপ্য! কিন্তু এই মতের মধ্যে কতখানি সত্য এবং কতখানি মিথ্যা আছে—তাহা আলোচনার বিষয়। আমাদের বিবেচনায় উক্ত মত ভিত্তিহীন।

ভুবনেশ্বরের প্রধান মন্দিরের আশে পাশে যে সকল বৃহত্তম মন্দির দেখা যায়,—তন্মধ্যে পার্ব্বতীর সুপ্রসিদ্ধ মন্দিরটী সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই মন্দিরটী প্রধান মন্দির নির্ম্মাণের দুই শত বর্ষ পরে, বিজয় কেশরীর রাজত্বকালে স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার কারুকার্য্যের বৈচিত্র্য দর্শন করিলে, দর্শকমাত্রকেই স্তম্ভিত হইতে হয়। স্বভাব সুন্দর অপূর্ব্ব মূর্ত্তি,—তাহাদের বিবিধ ভঙ্গী, বঙ্কিমলতা—তাহার সর্ব্বত্র সুপেলব পত্রপুষ্পসৌন্দর্য্য—উৎকল শিল্পীর অসাধারণ ক্ষোদন কৌশলের বিন্যাসপটুতার পরিচায়ক! এবং তাহার চারিধারেই প্রাচ্যশিল্পের একটী দর্শন-মধুর আলোক-ছায়া-মাধুরী যেন অজানিত পরীরাজ্যের একটা বিচিত্র বিভ্রম-জাল রচনা করিতেছে!

ইহার পর ভোগ-মণ্ডপ। এখানে ভুবনেশ্বরের ভোগাদি ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। তাহার পরে নাটমন্দির, মোহন এবং সর্ব্বশেষে প্রধান দেউল। পুরীর জগন্নাথের মন্দির চারিভাগে বিভক্ত; ভুবনেশ্বরও তাহাই। মোহন এবং প্রধান মন্দিরটীর নির্ম্মাণকাল এক। ভোগমণ্ডপ এবং নাটমন্দিরটীর নির্ম্মাণ আদর্শ এতদুভয়ের সম্পূর্ণ বিপরীত। এ দুইটী আরো আধুনিক।

প্রধান মন্দিরের উচ্চতা ১৬০ ফুট, কলিকাতার মনুমেণ্টর উচ্চতা গৌরবও ইহার নিকটে খর্ব্ব। প্রাঙ্গণতল হইতে মন্দিরের দেওয়াল ৫৫ ফুট উচ্চে উঠিয়াছে। তাহার পর ছাদ! দেওয়াল হইতে মন্দিরের চূড়ার পরিমাপ ১০৫ ফুট। মন্দিরটি মণ্ডলাকার। সর্ব্বোচ্চ চূড়ার নিম্নভাগে চারিদিকে দ্বাদশটী বিনতজানু সিংহমূর্ত্তি।

মন্দির গাত্রে, চারিদিকেই অনেকগুলি কুলুঙ্গি বা কোটর আছে। তাহার ভিতরে ভিতরে সংখ্যাতীত পৌরাণিক মূর্ত্তি। মূর্ত্তিগুলি পাছে প্রাকৃতিক বিপ্লবে নষ্ট হইয়া যায়, সেই ভয়ে মাঝে মাঝে ছোট ছোট ঘর করিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রকৃতির এখানে প্রবেশ নিষেধ বটে,—কিন্তু তথাপি এমন মূর্ত্তি একটীও দেখিলাম না, যাহা অখণ্ড আছে। এই দুর্দ্দশার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, পাণ্ডারা বলিল, সেনাপতি কালাপাহাড়ের অত্যাচারে মূর্ত্তিগুলি ভগ্নচূর্ণ হইয়াছে।

মন্দিরের প্রায় মধ্যস্থলে একটী বিরাট সিংহমূর্ত্তি আপনার অর্দ্ধদেহ শূন্যে প্রসারিত করিয়া আছে। নিম্নভাগে কোনখানে ইন্দ্র, কোনখানে কুবের এবং কোনখানে বা অগ্নি ও যম প্রভৃতির ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রতিমূর্ত্তি। এক-জায়গায় প্রস্তরের উপরে কেশরী রাজবংশের চিহ্ন-সূচক কারুকার্য্য। অনেকে বলেন, উহা কেশরী বংশের "Coat of Arms." নাটমন্দিরের কক্ষতলে, একটী শায়িত বলদ-মূর্ত্তি;

—হঠাৎ দেখিলে দ্বিধায় পড়িতে হয়, যে উহা জীবন্ত কি না। বাস্তবিক, এই বলদ মূর্ত্তিটী উৎকল-ভাস্কর্য্যের একটী শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

মন্দিরটি এখন জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। স্থানে স্থানে বসিয়া গিয়াছে। জগমোহনে, আলোক প্রবেশের জন্য যে গবাক্ষগুলি ছিল, তাহাও প্রস্তরাদি দ্বারা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার কারণ বিরাট ছাদভারে গবাক্ষ-পার্শ্ববর্ত্তী স্থান বসিয়া যাইতেছিল। একে ত মন্দিরের ভিতরে আলোক আসিবার সুযোগ একপ্রকার ছিল-ই না, তাহাতে গবাক্ষ গুলি রুদ্ধ হওয়াতে মন্দিরাভ্যন্তরে অমা-রজনীর অন্ধতামস প্রসারিত হইয়াছে। ভুবনেশ্বরের কারুকার্য্যের পরম-পরিণতি নাটমন্দিরে দেখা যায়! এক জায়গায় নীল পাথরের উপরে শিল্প সুন্দর ক্ষোদন দেখিয়া আমরা মুগ্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। কি সে শিল্প! যেন একটা প্রজাপতির পাখা! যেন একটা চিত্রিত স্বপ্ন!

আর এক জায়গায় একটি কুঠরির ভিতরে এক বৃহৎ রমণীমূর্ত্তি দেখিলাম। মূর্ত্তির আপাদ-মস্তক অলঙ্কার জড়িত। আর সে অলঙ্কারের ক্ষোদনশিল্প এমন সূক্ষ্ম যে, তাহা বর্ণনাতীত। মন্দির গাত্রে, সর্ব্বত্রই যে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তি আছে,—তাহাও কি অবহেলার যোগ্য? দেখিলেই মনে হয়, তাহাদের প্রত্যেকটীর উপরেই শিল্পের কমনীয় সৌন্দর্য্য-রেখা মুদ্রিত করিয়া দিতে শিল্পিগণ সাধ্যমত যত্নের ত্রুটি করে নাই! প্রত্যেক মূর্ত্তির মুখেই বিভিন্নপ্রকার ভাবের বিকশিত সৌন্দর্য্য। কেহ আলিঙ্গনোন্মত্ত, কেহ হর্ষোৎফুল্ল, কেহ জপমগ্ন। কেহ প্রণয়ভাবণপুলকিত, কেহ রণগমনোদ্যত, এবং কেহ ক্রোধকুটিলনেত্র। এমনি কত বিচিত্র লীলা। নিপুণ কর্ম্মিগণের হাতে অমন যে কঠিন প্রস্তর, তাহাও যেন ফুলের মত কোমল হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু তথাপি সত্যের অনুরোধে বলিতে হয়, উৎকলের ভাস্কর্য্যশিল্প তেমন উন্নত নয়। স্থাপত্যে উৎকলের প্রতিদ্বন্দ্বী জগতে নাই। কিন্তু ভাস্কর্য্যের উন্নত আদর্শ, উৎকল-শিল্পীর হাতে পরিণতি লাভ ত, করিতেই পারে নাই, পরন্তু খর্ব্বতা-লাভ করিয়াছে। হাণ্টার সাহেব বলিয়াছেন যে,—

"The warriors form models of manly grace and the ladies frequently exhibit that exquisite type of face which the Grecian Artists have left behind them alike in Eastern and western India." অর্থাৎ উৎকল ভাস্কর্য্যের যোদ্ধাগণ পুরুষোচিত সৌন্দর্য্যের আদর্শ স্থানীয় এবং গ্রীসদেশীয় শিল্পীরা পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভারতে পরম রমণীয় মুখের শ্রী-সৌন্দর্য্যের যে দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, রমণী মূর্ত্তি সকলে প্রায়ই তাহা দেখা যায়।"

৺ বলেন্দ্রনাথও লিখিয়াছেন "ভুবনেশ্বরের দেওয়ালে কতকগুলি উন্নতগ্রীবা দীর্ঘাবয়বা নারীমূর্ত্তি দেখিলে এমনি য়ুরোপীয় ছাঁচের বোধ হয় এবং কোন কোনটীর ভঙ্গী এমনি য়ুরোপীয় যে, গ্রীকপ্রভাব অস্বীকার করিতে বিস্তর চেষ্টার আবশ্যক করে। বিশেষতঃ যখন পার্ব্বতী-মূর্ত্তির সন্নিহিত নিভৃতকোণে কলানিপুণা রমণীগণের মধ্যে সহসা গ্রীসীয় লায়র যন্ত্রহস্তা নারীমূর্ত্তি দেখা যায়, তখন চমকিয়া উঠিতে হয়—এ কি গ্রীস না ভারতবর্ষ!"

উৎকল ভাস্কর্য্যে গ্রীসীয় শিল্পের ছায়াপাত লক্ষ্য করা যায়, তাহা অস্বীকার্য্য নয়, কিন্তু গ্রীসীয় ভাস্কর্য্যকে অনুকরণ করিয়াও উৎ-

কলীয় শিল্পিগণ শ্রেষ্ঠতালাভ করিতে পারেন নাই। উৎকলভাস্কর্য্যপ্রসূত কয়েকটী সুগঠিত মূর্ত্তি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বটে,—কিন্তু সহস্র সহস্র মূর্ত্তির মধ্যে মাত্র সেই কয়েকটির শিল্পগৌরব কতটুকু? ভারতের অন্যান্য প্রদেশের কথা ছাড়িয়া দিতেছি, একমাত্র সাঞ্চীর ভগ্নচূর্ণ ভাস্কর্য্যকীর্ত্তি এ বিষয়ে সমগ্র উৎকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রকৃতকথা, ভাস্কর্য্য শিল্প ভারতের অন্যান্য প্রদেশেই যথার্থভাবে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল এবং উৎকলীয় শিল্পিগণ তাহাতে হস্তক্ষেপ করিয়াও শিল্পের শাশ্বত প্রসাদ হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। ইহার প্রধান কারণ, তাঁহারা যে সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে অক্ষম ছিলেন, তাহা নয়, পরন্তু মৌলিক পরিকল্পনার অভাবই তাঁহাদের অকৃতকার্য্যতার একটী প্রধান কারণরূপে বিবেচিত হইতে পারে। নতুবা সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে এবং গঠন-পারিপাট্যে, তাঁহারা কোন দেশের শিল্পকর্ম্মার অপেক্ষা হীন ছিলেন না।

এখন, বিন্দুসরোবর সম্বন্ধে কিছু বলিয়া, আমরা উপস্থিত অধ্যায় সমাপ্ত করিব।

বিন্দু সরোবর বা সাগর, ভুবনেশ্বর মন্দির হইতে ছয় শত হাত উত্তরে অবস্থিত।

ভুবনেশ্বরে, প্রধান ও পবিত্র সরোবরের সংখ্যা আটটী। তাহার ভিতরে বিন্দুসাগরই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। উক্ত আটটী সরোবরের নামঃ—

১। বিন্দুসাগর। ২। গঙ্গা-যমুনা।
৩। কোটিতীর্থ। ৪। পাপ-নাশিনী।
৫। অলাবুকুণ্ড। ৬। ব্রহ্মকুণ্ড।
৭। মেঘকুণ্ড। ৮। রামকুণ্ড।

হিন্দুগণের শাস্ত্রমতে সকল তীর্থের পবিত্র সলিলে বিন্দুসাগর পূর্ণ হইয়াছে।

এই সরোবরের পরিমাপ, ১৩০০×৭০০ ফুট। ইহার গভীরতা, ১৬ ফুট। আগে, ইহার চারিদিকেই পাথরে বাঁধানো সোপান শ্রেণী বিরাজিত ছিল,—এখন অন্যান্য দিকের সোপান ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, কেবল একদিকে বর্ত্তমান আছে। সরোবরের মধ্যস্থলে একটী কৃত্রিম দ্বীপ আছে, তাহার পরিমাপ, ১১০×১০০ ফুট। দ্বীপের উত্তর পশ্চিম কোণে একটী ছোট মন্দির। মন্দিরের সমুখে একটী চাতাল এবং তাহার মধ্যস্থলে একটী শিল্পোৎকর্ষ-রম্য উৎস আছে। পুরীতেও এইরূপ দ্বীপ সমেত একটী সরোবর আছে, তাহার নাম "নরেন্দ্র তালাও। কিন্তু বিন্দুসাগর তদপেক্ষা বৃহৎ। বিন্দুসাগরের জল, এখন অযত্নে এবং অসংখ্য যাত্রীর স্বেচ্ছা-কৃত ব্যবহারে তেমন পরিষ্কার নাই। সরোবরের জলে নাকি অসংখ্য কুমীর আছে। কিন্তু পাণ্ডারা যথেষ্ট ভরসা দিয়া থাকে, যে এই কুমীরেরা পিতৃপিতামহ পর্য্যায়ক্রমে এখানেই পরমসুখে বসবাস করিয়া আসিতেছে এবং দেবাদিদেবের ভয়ে, তাহারা মানুষের কোন অপকার করে না। তাহারা একেবারেই পরম বৈষ্ণব শুনিয়া, আমার সঙ্গী বন্ধুবর্গ ধর্ম্মের অপার লীলা ভাবিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে জলে সাঁতার দিতে লাগিলেন।

আগে, এই সরোবরের দৃশ্য বড়ই চমৎকার ছিল। ইহার চারিদিকে বন-বন-শ্যামা ছায়ালোকক্রীড়াবিচিত্রা ভূমি। সেই বনের মাথায় মাথায়, মন্দিরের পর মন্দির,—তাহার পর মন্দির—এই রূপ সপ্তসহস্র দেবায়তনের সৌধ-

সহস্র চূড়া আকাশ ভেদ করিয়া উঠিত,—এবং সন্ধ্যা সমাগমে যখন সেই সপ্তসহস্র দেবপীঠের অসংখ্য অর্চ্চকগণের ভক্তিবিহ্বল কণ্ঠ হইতে ভগবানের অনাহত উদাত্ত মহিমাগাথা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত, মন্দিরের অযুতদীপমালার উজ্জ্বল-আলোক যখন বিন্দু সাগরের অমলজলের সহিত তালে তালে নাচিতে থাকিত, তখন স্বর্গের সৌন্দর্য্যও বুঝি ম্লান হইয়া যাইত! আজ আর সে দিন নাই। এখন কয়েক শত মাত্র মন্দির আছে, তাহাও পতনোন্মুখ,—ধ্বংস,—ভগ্ন! এখন কেবল যেন একটা অটল গাম্ভীর্য্য বিপুলবেদনাভার বক্ষে চাপিয়া এই পুণ্য ভূমিতে স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া আছে! আর তাহার চারিদিকে, শ্যামায়িত বনস্পতির শাখায় শাখায় উন্মাদ পবনের রোদন-মাখা বেহাগ-তান যেন অন্তরের স্মৃতি-কাতর মৌন ভাষার সহিত করুণ সুর জুড়িয়া দিতেছে।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

পোষ্যপুত্র।

৩১

বাড়িখানির দরজার উপরে পাথরের উপর সোনালি অক্ষরে বড় বড় করিয়া লেখা আছে আশ্রম। আশ্রমের পশ্চাতে বাগানের শেষ-ভাগে পেয়ারা ও লিচু গাছের মধ্য দিয়া একটি ছোট কুটির দেখা যাইতেছিল,—সেই কুটিরে ছেলেদের কথিত স্বামীজি আসিয়া বাস করেন।

মাটির দাওয়ায় মৃগচর্ম্মে উপবিষ্ট সন্ন্যাসীর নিকট কম্বলের আসনে শিষ্য বসিয়া আছেন! বাঁশের খুঁটি জড়াইয়া তরুলতা ও ঝুমকাফুল খোলার চালের উপর পর্য্যন্ত ছাইয়া রহিয়াছে, মাটির দেওয়াল আইভি জড়িত হইয়া ছবিখানির মতন দেখাইতেছিল। ঘরের দরজাটি ভেজান আছে; ভিতরে সুমার্জ্জিত পিত্তলের কমণ্ডলু, একটি ধূনাচি ও পিত্তল পিলসুজের উপর একটি প্রদীপ ভিন্ন একখানি কম্বলের শয্যা মাত্র উপকরণ। শীতের স্বল্পায়ু সূর্য্যকিরণ সেই শাখা-নিবিড় বৃক্ষান্তরাল দিয়া সাদরে গুরু-শিষ্যের অঙ্গ বেষ্টন করিয়াছিল। চারিদিকের গাছগুলায় বুলবুল পাপিয়া চড়াই প্রভৃতি পাখীরা আনন্দ কলরবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। একটি চক্রবাকমিথুন নদীতীরে তাহাদের সারারজনীর আগতপ্রায় বিচ্ছেদাশঙ্কায় মৌন-বিষাদে মুখামুখি বসিয়া আছে। মাছরাঙ্গা ও বকগুলা শিকারের চেষ্টায় তখনও জলের মধ্যে পা ডুবাইয়া উৎসুক নেত্রে ঘুরিতেছে। কর্ম্ম-ক্ষেত্র সংসারের প্রত্যেক ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রাণীটি প্রতিনিয়ত তাঁহাদের কর্ম্মকেন্দ্রের চারি পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কেহই কর্ম্মহীন নয়।

শিষ্য কিছুক্ষণ সেই সমস্ত চাহিয়া চাহিয়া দেখিল; তার পর দৃষ্টি স্থির করিয়া কহিল "তবে কি আপনি কর্ম্মযোগকেই প্রধান যোগ ও গৃহস্থাশ্রমকে প্রধান আশ্রম বলেই মনে করেন?" গুরু কহিলেন "আমার এই প্রকার ধারণা।"

"মার্জ্জনা করবেন, তবে সে আশ্রম ত্যাগ করে আপনি কেন এপথে এসেছেন?"

সন্ন্যাসী একটু হাসিলেন, বলিলেন, "ঈশ্বরের

অভিপ্রায়ে, বৎস! আমাকে আদর্শ করোনা; আমরা মহাজনের পদানুসরণ করতেই উপদিষ্ট হয়ে থাকি।"

"গুরুদেব সেই উপদেশ তো "শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ মাকুরু যত্নং বিগ্রহ সন্ধৌঃ"। তাতো আমায় বলচেন না।"

"নীরদ! তুমি যে ভুলপথ ধরে বসে আছ। তোমার যাবার দরকার কোন্নগর তুমি পঞ্জাবমেলে চড়ে বসলে। এখন অগত্যাই সেইখান থেকে ফিরে আবার পেসেঞ্জারে চাপতে হবে। তোমাদের মহাজন ভগবান্ শঙ্কর নহেন। নরশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রই হিন্দু গৃহস্থের আদর্শ।"

শিষ্য ঈষৎ চমকিয়া উঠিল, কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া কণ্ঠোত্থিত দীর্ঘ নিশ্বাসটা অল্পে অল্পে পরিত্যাগ করিয়া অর্দ্ধ স্ফুটস্বরে আপনা-আপনি বলিল "রামায়ণের রামচন্দ্র, পিতৃবৎসল পত্নী-প্রেমের আদর্শ! গুরুদেব যে পথে মানুষের মুক্তিমার্গে পৌছবার শত বাধা সেই পথকেই আপনি কিজন্যে শ্রেষ্ঠ পথ বলচেন?

গুরুদেব হাসিয়া বলিলেন, "ভরত ও রামচন্দ্র দুজনকেই "বিশ্বামিত্র জিজ্ঞাসা করে-ছিলেন একটা পথ বিপদসঙ্কুল কিন্তু সেই পথেই শীঘ্র পৌছন যায়,—আর একটা পথ নিরাপদ কিন্তু গম্যস্থানে পৌছতে বিলম্ব হয়। ভরত কি বলেছিলেন তাত জান?" তার পর একটু গম্ভীর মুখে বলিতে লাগিলেন "বৎস! মনে কর তুমি আমি সকলেই আমরা সংসার ত্যাগী হইয়া কৌপীন গ্রহণ করিয়া এই বিরূপাক্ষের দুই তীরে যোগাসনে বসিয়া রহিলাম, কিন্তু তাহার পর? আমাদের আহার যোগাইবে কে? তখন যদি ধার্ম্মিক গৃহস্থ আমাদের ডাকিয়া আহার না দেন তবে আমাদের সাধন ভজন যোগ উপাসনা সমুদয়ই তো নদীগর্ভে বিসর্জ্জন দান করিয়া আহার্য্যান্বেষণে ছুটিতে হইবে? তবেই দেখ যে নিজে নিষ্কাম নির্লিপ্ত থাকিয়া অন্যের ধর্ম্ম কর্ম্মের সহায় হয় সে বড়—না যে অন্যের উপরে নিজের ভার চাপাইয়া দিয়া নিজের ভাবনা মাত্র লইয়া রহিল সে বড়?"

শিষ্য চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, কথা কহিলেন না। গুরু পুনশ্চ কহিলেন "আমার নিজেরি উদাহরণ দেখ, পূর্ব্বে আমি দশজনকে অন্ন দিতাম, নিজের সঙ্গে অন্য পাঁচজন আত্মীয় স্বজনের শুদ্ধ জীবিকার উপায় করতাম,—কিন্তু এখন আমি কি করছি? নিজের আহার অবশ্য বন্ধ হয়নি তা অন্য পাঁচজনে যোগাচ্ছে; কিন্তু অন্যের আহার যোগাবার আমার যেটুকু ক্ষমতা ছিল সেইটুকুই ত্যাগ করেছি। গৃহীই যথার্থ স্বার্থত্যাগী; সে যা কিছু করে সকলি প্রায় অন্যের জন্য—পিতামাতা পত্নীপুত্র আত্মীয়পর কারও না কারও জন্য; কিন্তু সন্ন্যাসী যা কিছু করে সে সমুদয়ই তার নিজের জন্য। গৃহীর ধর্ম্ম কি বড় নয়?"

নীরদ কুণ্ঠিত হইয়া কহিল, "কিন্তু সেরকম গৃহস্থ এখন আর কৈ?" গুরু কহিলেন, "আছে বৈ কি বেটা অনেক আছে। অধার্ম্মিক গৃহস্থ ও ভণ্ড সন্ন্যাসী উভয়েরি সংখ্যা নিতান্ত কম নয়, কিন্তু তুলনায় বোধ হয় ভণ্ড সাধুর সংখ্যাই অনেক বেশি। বৎস তোমার সঙ্গে আমার তো এ বিষয়ে অনেক বারই কথাবার্ত্তা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণরূপী ভগবান বলিয়াছেন "কর্ম্মযোগ ব্যতীত সন্ন্যাস

পাওয়া অসম্ভব।" নবপ্রতিষ্ঠিত আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা যুবক আবার বহুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া অবশেষে দিনান্তের শেষ আলোটুকু শীত-শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নাজড়িত ম্লান কুহেলিকায় মিশাইয়া গেল। বারান্দার সম্মুখে শুক্লা তৃতীয়ার চাঁদ কুয়াসা ও হিম জাল ভেদ করিয়া অন্ধকার বনবীথির পরপার হইতে ভাসিয়া উঠিলেন, শীতের বাতাস ঝির ঝির করিয়া স্তব্ধ স্থির গাছের পাতা কাঁপাইতে লাগিল, পল্লীবধূদের কোমল ওষ্ঠপূত মঙ্গল শঙ্খধ্বনি তখন থামিয়া গিয়া চারিদিক নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। ব্যগ্র কণ্ঠে নীরদ জিজ্ঞাসা করিলেন "যদি আমি আমার কর্ত্তব্য করিতে গিয়া অন্যের ক্ষতি করিয়া ফেলি?

"রামচন্দ্র বনবাসে যাইবার সময় পুরবাসীর শোক দেখিয়াও কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হন নাই, নিজের হৃদ্‌পিণ্ড ছিঁড়িয়া ফেলিয়াও সাধ্বী সহধর্ম্মিণীকে বর্জ্জন পূর্ব্বক রাজ কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিলেন। নীরদকুমার! যার দেশে এখনও সে চিত্র রয়েচে সে কেন বৃথা সন্দেহ পোষণ করে কষ্ট পায়!

শিষ্য নীরদকুমার অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অধীর কণ্ঠে কহিল, "সন্ধ্যার সময় চলে যাচ্ছে আমি বিদায় নিই।" নীরদ অপ্রকৃতিস্থ ভাবে প্রণাম করিয়া সন্ন্যাসীর আশীর্ব্বাদ শেষ হইবার পূর্ব্বেই চলিয়া গেল; সন্ন্যাসী ঈষৎ বিস্ময়ের সহিত স্বাভাবিক গম্ভীর ভাবে উঠিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন।

৩২

সন্ধ্যাবন্দনা সারিয়া বাড়ির মধ্যে না গিয়া নীরদ কুমার সেদিন অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দক্ষিণের খোলা বারান্দায় পদচারণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। অনেকদিন পরে আজ আবার যেন তাঁহার স্মৃতিসাগরের তলদেশ পর্য্যন্ত আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল,—তাহার বৈচিত্র্যময়ী জীবননাটিকা আদ্যোপান্ত একে একে অঙ্কের পর অঙ্কে অভিনীত হইতে হইতে আজ এমন একটি জটিল সমস্যাপূর্ণ স্থানে আসিয়া পড়িয়াছে যে এখানে আটকাইয়া থাকা বা ইহার পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাওয়াও আর সম্ভব নয়। মহাসমুদ্রে যে ভেলা ইচ্ছাস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিল আজ হঠাৎ সে চড়ায় আসিয়া ঠেকিয়াছে, এখানকার আশ্রয় সবলে ঠেলিয়া নীরদ সারাজীবন ভাসিতেও সম্মত ছিল; কিন্তু যে কঠিন আদেশের হস্ত তাহার বাহু ধরিয়া এই দিকেই আকর্ষণ করিয়া আনিতেছে তাহাকে বাধা দিবার যে শক্তি নাই!

নীরদের সমুদয় শরীর পুনঃপুনঃ কাঁটা দিয়া শিহরিয়া উঠিল। যাহার কাছে মুখ দেখাইবার একটুখানি মাত্র উপায় রাখে নাই; যাহার প্রতি নিজের নিদারুণ ব্যবহার মনে করিলে জগতের সমুদয় অন্ধকার দিয়াও লজ্জিত মুখ ঢাকা পড়ে না,—কেমন করিয়া সে এই অপরাধের কালিমাখা মুখে তাহার সেই অবিচলিত স্থির অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইবে? সে কি তাঁহাকে ক্ষমা করিবে? সে কখনও ক্ষমা করিতে পারে? সে কি তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমা পাইয়াছিল? না না দ্বিধা নয়, লজ্জা নয়, বল চাই, মনে বল চাই, জোর করিয়া হৃদয়ের এ দুর্ব্বলতা ত্যাগ করিতেই হইবে,—অপরাধের দণ্ড মাথা পাতিয়া লইতেই হইবে। যে অহঙ্কার এতদিন

ধরিয়া এই নরক যন্ত্রণা সহ্য করাইল সেই গর্ব্বকে ভূলুণ্ঠিত না দেখিলে বুঝি তাহার ভাগ্য-বিধাতা প্রসন্ন হইবেন না। তবে তাই হোক, তবে তাই হোক! নীরদ একটা থামের গায়ে ভর দিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করিয়া অনির্দ্দেশ্য অন্ধকারে চাহিয়া রহিল। যদি সে এখনও এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করে তবে চিরজীবন অনুতাপ করা ভিন্ন তাহার আর দ্বিতীয় পথ নাই। একখানা পাতলা মেঘে চাঁদকে ঢাকিয়া ফেলিল,ঝোপের ভিতর হইতে শৃগাল ডাকিতে লাগিল,আকাশে নক্ষত্র দেখা যাইতেছিল না,—বর্দ্ধিতান্ধকারে গাছের গায়ে জোনাকির পুঞ্জ ঝকমক করিয়া জ্বলিতেছিল; নিশ্বাস যেন বুকের মধ্যে আটকাইয়া আসিতেছিল; জোর করিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস টানিয়া নীরদ অস্ফুটধ্বনি করিয়া উঠিল "মা।" মা বলিতেই এক-সঙ্গে অনেক দিনের অনেক কথাই তাহার মনে জাগিয়া উঠিতে লাগিল, ক্রমে দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল; আবার সে মৃদুস্বরে বলিল "মা মা মা"! এমন সময় কে তাহাকে স্পর্শ করিল, সে স্পর্শ কি স্নেহপূর্ণ কি সান্ত্বনা মাখান! নীরদ অভিভূত ভাবেই তাঁহার বাহুর মধ্যে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়া মুদিতনেত্রে ক্ষীণকণ্ঠে কহিল 'মাগো!' সন্ন্যাসী ছোট ছেলেটির মতন তাহার মাথাটা নিজের কাঁধের উপর রাখিয়া কহিলেন "তোমার কি মা আছেন?" নীরদের দুই চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল; সে মাথা নাড়িয়া জানাইল যে "না"। সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার বক্ষের ভারও অনেকখানি কমিয়া আসিতেছে বুঝিতে পারিয়া সন্ন্যাসী কোন বাধা দিলেন না, গম্ভীর মুখে সস্নেহে তাহার মাথায় পিঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন। নীরদের মনে হইল যে, মাকে সে এই মাত্র প্রাণের দারুণ জ্বালায় অস্থির হইয়া ডাকিয়াছিল তিনিই তাহার ব্যাকুল আহ্বান অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া অদৃশ্য লোক হইতে মাতৃহৃদয়ের সমস্তটুকু স্নেহধারা এই স্পর্শের মধ্যে ঢালিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন। প্রত্যেক অঙ্গুলীটি তাহার প্রতিশিরার ভিতর দিয়া একটি তাড়িত সঞ্চা-লিত করিয়া দিতেছিল,—এ রকম স্পর্শ সে কতদিন অনুভব করে নাই। এই টুকুর জন্যই যে তাহার মনঃপ্রাণ নিদারুণ তৃষ্ণায় শুখাইয়া উঠিয়াছিল,—সমস্ত জীবনের বিনিময়েও সে যে শুধু এইটুই চাহিয়াছে; শুধু এই টুকুই চাহি-তেছে,—তাহা আজ সে জীবনে এই প্রথমবার যেন ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল। সারাজীবনটা বুঝি এই পাওনাটুকুর অভাবেই তাহার এমন ব্যর্থভাবে কাটিয়া গেল,—এইটুকু দাবীই বুঝি তাহার চিত্তে বাল্যাবধি দুর্জ্জয় অভিমানরূপে জাগিয়া রহিয়াছিল। মাতৃকরতলের স্নেহ তাড়-নায় তো তাহা প্রসুপ্ত হইবার অবসর পায় নাই; মাতৃ স্তন্যের ক্ষীর ধারায় তো সে শুষ্ককণ্ঠ আর্দ্র হইবার সময় পায় নাই, তাই সে বুঝি এতদিন বিশ্বস্তহৃদয়া বালিকার কল্যাণময় প্রীতি স্পর্শেও সঙ্কুচিত সন্দেহে কেবল নিষ্ক্রিয় কাঁটার দিকেই বদ্ধ দৃষ্টিতে লক্ষ্য রাখিয়াছে, ওজনের ফাঁকি ধরিয়া লড়াই করিয়া বেড়াই-য়াছে, বিশ্রামের সুখ চিনে নাই। কেমন করিয়া চিনিবে? সে যে জন্মান্ধ, অভাব ও আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ের কানায় কানায় ভরিয়া আছে, অথচ জানে না যে সে কিসের আকাঙ্ক্ষা;

কোনখানটায় তাহার অভাব ঘটিতেছে। ধূলা-মলিন,কণ্টকক্ষত, ক্লান্ত চরণ, ঘূর্ণিত মস্তক, জীবন যুদ্ধে পরাভূতপ্রায় আজ সে বুঝিল, তাহার হৃদয় কেন ত্যাগের আনন্দ, ক্ষমার শান্তি উপভোগ করিতে,সহ্য করিতে পারে না। পৌরুষ,মনুষ্যত্ব,যশ সমস্তই যেন তাহার কাছে ছায়াবাজির মতন অস্পষ্ট, স্বপ্নের মতন মিথ্যা হইয়া দেখা দেয়। তাহার চরিত্রের দৃঢ়তা, তাহার মানসিক বল, তাহার কর্ম্মের উদ্দীপনা তাহার নৈতিক উন্নতির "বর্ষ" প্রভৃতি লইয়া তাহার ভক্তগণের আন্দোলন,চারিদিকের অজস্র প্রশংসাবাদ ও ধন্যধ্বনি তাহার চিত্তে যেন জলন্ত লোহার বাড়ি মারে।

সন্ন্যাসী নিঃশব্দে তাহার শিথিল একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া আরো একটু কাছে সরিয়া আসিলেন। ঘরের ভিতর হইতে একটা ঘড়ি বাজিয়া আবার থামিয়া গেল। আকাশে তরল কোয়াশার পাতলা আবরণ সরাইয়া চাঁদ একবার কিছুক্ষণের জন্য পূর্ণ কৌতূহলে উজ্জল মুখে চাহিয়া দেখিলেন। নীরদ এতক্ষণে কথা কহিল "গুরুদেব"? গুরুদেব তাহার ঈষৎ স্থির মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়া সকরুণ স্নেহে তাহার মাথায় হাত রাখিয়া কহিলেন "নীরদ"?

"আমি যদি দূরে থেকে প্রায়শ্চিত্ত করি? কাছে যাবার আমার যে উপায় নেই—।"

"তাতে কি প্রায়শ্চিত্ত ঠিক হবে নীরদ? তাই কি কর্ত্তব্য?" আবার সেই কর্ত্তব্য। অধীর হইয়া নীরদকুমার বলিয়া উঠিল। "অনেক যে দেরি হয়ে গেছে—এখন এ ভুল কেমন করে শোধরাব তা যে কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিনে"।

সন্ন্যাসী বলিলেন "নীরদ, মানবের প্রবৃত্তি মানবকে পদে পদে প্রলোভিত করিয়া থাকে, তাই বলিয়াই কি তাহার হাতে শিশুর মত আত্মসমর্পণ করিয়া দিবে? বিলম্বে অন্যায়ের মাত্রা বর্দ্ধিত হইতে থাকে—কমে না।" সন্ন্যাসী তাহার উত্তর প্রতীক্ষায় অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করিয়া রহিলেন। কোন উত্তর বা সাড়া না পাইয়া অবশেষে আবার বলিলেন"পথ খুঁজেছিলে,—সোজা সরল সত্যের পথ তোমার সম্মুখে। সাহস করে, দ্বিধাহীন হয়ে, কোন দিকে না চেয়ে চলে যাও। দেখবে গম্যস্থানে পৌঁছান কিছুই কঠিন নয়"।

মুখ হইতে হাত সরাইয়া লইয়া অবরুদ্ধ স্বরে ক্ষীণকণ্ঠে নীরদ কহিল "কিন্তু আমি যদি কাহারও সুখের হন্তারক হই? যদি কেহ আমার কার্য্য ফলে অসুখী হয়?"

"কর্ম্মণ্যে বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন, এই মহাবাক্য ভুলিও না? কর্ত্তব্য কর্ম্মে দ্বিধা করিতে নাই।"

চাঁদের আলোয় যে মুখ মরণাহত রোগীর মুখের মতন ম্লান দেখাইতেছিল, মুহূর্ত্তে তাহা নবীন স্বাস্থ্যের উজ্জলতায় দীপ্ত হইয়া উঠিল। সে তৎক্ষণাৎ ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করিল, দুই পায়ের ধূলা লইয়া মস্তকে দিল, তার পর উঠিয়া দৃঢ়স্বরে কহিল "আশীর্ব্বাদ করুন আপনার উপদেশে কর্ত্তব্য পালনে যেন আর দ্বিধাযুক্ত না হই। ভাগ্যে যা হয় হোক।" সন্ন্যাসী তাহার শ্রদ্ধান্বিত মস্তকে দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া প্রসন্ন কণ্ঠে কহিলেন, "ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন"।

ইংরাজের দৌত্য।

সময়—অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ।

(২)

নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ বাহাদুর যখন দেখিলেন যে উৎকোচ ও অন্যান্য অসদুপায়ে ইংরাজ কোম্পানি বাৎসরিক মাত্র তিন সহস্র মুদ্রার বিনিময়ে অবাধ বাণিজ্যের অধিকারী হইয়াছেন এবং ইচ্ছামত দুর্গাদি নির্ম্মাণ করিতেছেন, তখন হিন্দু ও অন্যান্য বণিকগণ যে হারে শুল্ক প্রদান করিয়া বাণিজ্য করিতেন, তদ্রূপ হার ইংরাজ দিগের নিকট দাবী করিলেন। অবশ্যই ইংরাজগণ এ প্রস্তাবে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বিলাতে তাঁহাদের ডিরেক্টরগণের নিকট মত চাহিয়া পাঠাইলেন। ডিরেক্টরগণ নবাবের এই আচরণের বিরুদ্ধে দিল্লীতে বাদসাহ সকাশে দূত প্রেরণের ব্যবস্থা দিলেন এবং যাহাতে বোম্বাই ও মান্দ্রাজের অধ্যক্ষগণ বাংলার অধ্যক্ষের সহিত একত্র হইয়া এই কার্য্য করেন তজ্জন্য আদেশ প্রেরণ করিলেন।

কলিকাতার শাসনকর্ত্তা বঙ্গদেশ হইতে সারমান ও ষ্টিভেনসন নামক দুইজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে এই কার্য্যের জন্য মনোনীত করিলেন। ইংরাজী ও পারসীভাষাভিজ্ঞ খোজা সারহদ নামক একজন আর্ম্মানী এবং ডাক্তার হ্যামিল্টনও এই কার্য্যের সহকারী নিযুক্ত হইলেন। কলিকাতার সদস্যগণ বা খোজা সারহদ তৎকালীন দিল্লিদরবারের আভ্যন্তরিক বৃত্তান্ত কিছুই অবগত ছিলেন না! কিন্তু একমাত্র লাভাকাঙ্ক্ষা প্রণোদিত হইয়াই খোজা সারহাদ এই দৌত্যকার্য্যে সহকারী হইলেন। ইঁহারা কলিকাতা হইতে নৌকাযোগে যাত্রা করিয়া প্রথমে পাটনা পরে তথা হইতে ১৭১৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুলাই দিল্লী পৌছেন। মাত্র তিন মাস সময় পথে অতিবাহিত হইয়াছিল। এই দৌত্যকার্য্য সংক্রান্ত পত্রগুলি মান্দ্রাজে রক্ষিত আছে;—ইহা হইতে আমরা দিল্লীর তৎকালীন অনেক অবস্থা অবগত হই।

দিল্লীর প্রথম পত্র—তারিখ ৮ই জুলাই, ১৭১৫ সন—"গত ২৪শে জুন আমরা আগ্রা হইতে আপনাদিগকে (কলিকাতার সদস্যগণকে) পত্র দিয়াছি। জাঠদিগের হস্তে আমাদিগের বিশেষ কোন অসুবিধা হয় নাই; তবে এক রাত্রিতে কতকগুলা দস্যু তিনবার আমাদের বিরক্ত করিয়াছিল। কিন্তু কিছুই করিতে পারে নাই। ৩রা জুলাই আমরা ফরক্কাবাদ পৌছি। তথায় পাদ্রী ষ্টিফেনাস্ আমাদের নিকট দুইটী সিরপাঁ আনেন—আমরা যথোচিত সমাদরের সহিত উহা গ্রহণ করি। ৪ঠা তারিখে আমরা দিল্লী হইতে ছয় মাইল দূরবর্ত্তী বাওড়াপুলে পৌছি এবং দরবারে শীঘ্র প্রবেশাধিকারলাভের চেষ্টার জন্য পাদ্রীকে দিল্লী পাঠাইয়া দিই। ৭ই তারিখে আমরা রীতিমত সাজসজ্জাসহ দিল্লী প্রবেশ করি। সম্রাট দুইজন মনসবদার এবং দুইশত অশ্বারোহী ও

পদাতিক সৈন্য আমাদের অভ্যর্থনার্থ প্রেরণ করেন।* নগরের মধ্যে পৌঁছিলে খানবাহাদুর সলাবৎ আমাদিগকে প্রাসাদ পর্য্যন্ত সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। তথায় আমরা বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করি। ইতিপূর্ব্বে খানদৌরান বাহাদুর † আমাদের বিশেষ সাদর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করেন এবং আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করিবেন এরূপ আশ্বাস দেন। দুইপ্রহরে সম্রাট দরবারী হইলেন এবং সেই সময়ে আমরা সকলেই উপঢৌকন দ্রব্যের কিছু কিছু নিজ নিজ হস্তে করিয়া তাঁহাকে উপহার দিলাম। উপহারের মধ্যে হাজার এক স্বর্ণমোহর, মূল্যবান প্রস্তরাদি সমন্বিত ঘড়ী, পৃথিবীর মানচিত্র, গন্ধদ্রব্য এবং অন্যান্য উপহার এবং তৎসহ গবর্ণরের পত্র তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। ‡ সারমান এবং সারহাদকে সম্রাট মূল্যবান খেলাৎ দিলেন এবং আমরা সকলেই বিশেষভাবে অভ্যর্থিত হইলাম। নির্দ্দিষ্ট বাসা বাটীতে উপনীত হইলে আমাদের যথেষ্ট পরিমাণ রসদ দেওয়া হইল। সন্ধ্যার সময় সলাবৎখান পুনরায় আমাদের তত্ত্বানুসন্ধানে আসিয়া নানারূপ গল্পে দুই ঘণ্টাকাল অতিবাহিত করিলেন। আমরা প্রথমে খানদৌরানের ও পরে উজীর ও অন্যান্য সকলের সহিত সাক্ষাতের জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলাম। উজীরকে অসন্তুষ্ট করিবার আমাদের ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু খানদৌরান যখন আমাদের প্রতি বিশেষ কৃপান্বিত, তখন ইহা ভিন্ন অন্য উপায় দেখিলাম না।”

১৭ই জুলাই তারিখে দিল্লী হইতে যে পত্র লিখিত হয় তাহাতে আমরা জানিতে পারি যে ইংরাজ দূতগণ জৌদি খাঁ নামক একজন সভাসদের পরামর্শে কার্য্য করিতেছিলেন। পত্র নিম্নলিখিত মর্ম্মে লিখিত হইয়াছিল "দিল্লী ১৭ই জুলাই—আমরা পূর্ব্বেই দিল্লীতে নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছা সংবাদ পাঠাইয়াছি এবং সেই পত্রে বাদসাহের সহিত সাক্ষাতের কথাও লিখিয়াছি। তৎপর, আমরা উজীর আবদুল্লা খাঁ ও খানদৌরানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি;

* সম্রাটের উপঢৌকনের আনুমানিক মূল্য সাড়ে চারি লক্ষ টাকা কিন্তু খোজা সারহাদ দিল্লীতে যে সমস্ত পত্র লেখেন তাহাতে জানান্ যে উহাদের মূল্য পনর লক্ষ টাকা। সম্রাট এই সংবাদ লোকপরম্পরায় অবগত হইয়া, যে যে প্রদেশের মধ্য দিয়া ইংরাজদূতদিগের দিল্লী যাইবার পথ নির্দ্দিষ্ট হয় সেই সেই প্রদেশের শাসনকর্ত্তাদের নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন যে তাঁহারা যেন এই দৌত্য-বাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণের রীতিমত বন্দোবস্ত করেন।

† খোজা হোসেন বঙ্গদেশ হইতে ফেরোকসিয়ারের সমভিব্যাহারে দিল্লি আইসেন। ইনি সম্রাটের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। সম্রাট সিংহাসনারোহণ করিয়াই ইঁহাকে খানদৌরান উপাধি দেন। ইনি সম্রাটের বেতন বিভাগের কর্ত্তা ছিলেন এবং সম্রাট ইঁহার পরামর্শ অনুসারেই সকল কার্য্য করিতেন।

‡ "1001 gold mohurs, the table clock set with precious stones, the unicorn's horns, the gold escretoire ,the large piece of amber greese, and chelumgie Manilla work and the map of the world." Vide Wheeler's Early Records of British India. Escretoire অর্থাৎ লিখিবার টেবিল ambergreese সমুদ্রে ভাসমান একপ্রকার গন্ধদ্রব্য। ইহা উষ্ণ-প্রধানদেশের সমুদ্রের উপকূলে অথবা তিমি মৎস্যের উদরে পাওয়া যায়।

উভয় স্থলেই আমরা সসম্মান অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছি এবং যাহাতে কার্য্যাদি নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় তাহার ভরসাও পাইয়াছি। এপর্য্যন্ত যাহা করিতেছি তাহা জৌদিখাঁর পরামর্শানুসারেই করা হইতেছে। * গত ১১ই তারিখে আমরা ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। ইংরাজদিগের নিকট যে তিনি যথেষ্ট কৃতজ্ঞ একথা তিনি বারংবার বলিলেন এবং এপর্য্যন্ত যদিও কোন প্রত্যুপকার করিতে পারেন নাই—এইবার করিবেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন। যাহাতে আমরা খানদৌরান এবং সালাবৎখার মন্ত্রণানুসারেই সকল কার্য্য করি তজ্জন্য বিশেষ উপদেশ দিলেন। যখন আপনার (গবর্ণরের) পত্র তাঁহার নিকট পাঠাই, তখন তিনি পত্রেও এই উপদেশ দেন। আমাদের প্রতীতি হইয়াছে যে তিনি বন্ধুর ন্যায়ই উপদেশ দিতেছেন। আমরা তাঁহার উপদেশানুযায়ীই কার্য্য করিতেছি। কিন্তু যাহাতে উজীর অসন্তুষ্ট না হন সেদিকেও বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছি। জৌদিখাঁর দরবারে বিশেষ আধিপত্য এবং পূর্ব্ব হইতেই যাহাতে দরবারে আমাদের কার্য্যসিদ্ধি হয় তজ্জন্য কোন্ সময়ে আর্জী পেশ করিব, তাহা তাঁহাকে সংবাদ পাঠাইয়াছি।”

সম্রাট ফেরোকসায়ারের সহিত যে সৈয়দ ভ্রাতাদের মনোমালিন্য গুরুতর হইয়া উঠিতেছে তাহা পরপত্রে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। এই পত্র দিল্লী হইতে ১৭১৫ সনের ৪ঠা আগষ্ট লিখিত। “পূর্ব্বেই আমি জানাইয়াছি যে সম্রাট ধর্ম্মালোচনার ছলে নগর পরিত্যাগ করিয়া দিল্লী হইতে ছয় ক্রোশ দূরে অবস্থান করিতেছেন। দুর্গে-বাস তিনি পছন্দ করিতেছেন না, কেননা সেস্থানে তিনি স্বাধীন ভাবে থাকিতে পারেন না। রাজ্যের ওমরাহগণ তাঁহাকে নগরে প্রত্যাবর্ত্তনে অনুরোধ করিতেছেন। কিন্তু বাদসাহ কোন সময়ে লাহোর যাইবেন, এবং কোন সময়ে আজমীরাভিমুখে যাইবেন এইরূপ মত প্রকাশ করিতেছেন। আমরা এই সমস্ত সংবাদে বিশেষ চিন্তিত হইয়াছি। কি করিয়া যে মূল্যবান উপঢৌকনাদি স্থানান্তরিত করিব তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিলাম না। যাহা হউক অবশেষে স্থির হইয়াছে বাদসাহ সহরে না থাকিলেও যথা সম্ভব তাঁহার সহিত দেখা করা কর্ত্তব্য। এই সংকল্পে আমরা জাপানী টেবিল এবং বন্দুকাদি প্রভৃতি উপহার দ্রব্যসহ সম্রাটের সহিত তাঁহার ছাউনিতেই সাক্ষাৎ করিলাম। দ্বিতীয় দিনে একশত থান বস্ত্র, তৃতীয় দিনে আরও নানা প্রকার বস্ত্রাদি এবং চতুর্থ দিনে

* জৌদিখাঁর বিষয় বিশেষ কিছু জানা যায় না, তবে তিনি ইংরাজদিগের শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন তাহা জানা যায়। Wheeler তাঁহার Early Records এ লিখিয়াছেন "Accordingly a friendly letter was sent to Mr Pitt, by an influential official named Zoudi Khan. The Moghal minister professed great kindness for the English and made a tender of his services to the Madras Governor. Mr. Pitt promptly asked for a firman confirming all the privilege which had been granted by Aurangzeb. The request was acceded to with equal promptitude.' p. 116.

নানা প্রকার বহু মূল্যবান বস্ত্রাদি উপহার দিয়া নগরে ফিরিয়া আসিয়া, আরও যাহা ছিল তাহা লইয়া গেলাম। এইবার আমরা ৫টী বৃহৎ ঘটিকা যন্ত্র, দ্বাদশ খানি দর্পণ এবং ভূমণ্ডলের মানচিত্র খানি উপহার পাঠাইলাম। সম্রাট সমস্ত দ্রব্যাদি দেখিয়া যতদিন তিনি নগরে না ফেরেন ততদিন ঘড়িগুলি আমাদের জিম্মায় রাখিতে আদেশ দিলেন। এই আদেশ পাওয়াতে সম্রাটকে আমরা অন্যান্য দ্রব্যাদি উপহার দিতে পারিলাম না। সম্রাট ঘোষণা করিলেন যে দিল্লী হইতে চল্লিশ ক্রোশ দূরে একটী তীর্থস্থানে যাইয়া তথা হইতে সহরে প্রত্যাগমন করিবেন। আমরা ষ্টিফেনসন এবং ফিলিপ সাহেবকে সহরে দ্রব্যাদির হেপাজতে রাখিয়া সম্রাটের সহিত যাইতে মনস্থ করিলাম। আবশ্যক হইলে যেন ষ্টিফেনসন সাহেব দ্রব্যাদিসহ আমাদের নিকট যান এইরূপ উপদেশ দিয়া আমরা বাদসাহের সহিত দিল্লী হইতে বিশক্রোশ দূরে আসিয়াছি। আরজি দাখিল করিবার জন্য আমরা প্রস্তুত হইতেছি। খান দৌরান এবং তাঁহার সহকারী সৈয়দ সলাবৎখান আমাদের বিশেষ সাহায্য করিতেছেন। অবশ্যই জেদিখান ত আছেনই,—কিন্তু বর্ত্তমানে তাঁহার তত ক্ষমতা নাই। হোসেন আলিখাঁ * সম্পূর্ণ দাক্ষিণাত্যের শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছেন। আপনারা অবশ্যই অবগত হইয়াছেন যে হোসেন খাঁ সাহানসা সম্রাটের আদেশের বিরুদ্ধেও কি প্রকার কার্য্য করিতেছেন। সেই জন্যই আমরা অনুরোধ করিতেছি যে আপনারা হোসেনের সহিত সখ্যতা রাখিবেন। নতুবা আমরা যাহাই করিনা কেন, তাঁহার অমতে কিছুই হইবে না।"

দিল্লী হইতে ৩১শে আগষ্ট যে পত্র লিখিত হয় তাহাতে দিল্লীর তদানীন্তন অবস্থার চিত্র আরও পরিস্ফুট হইয়া পড়ে—"আমরা অবগত হইলাম যে হুসেন আলিখাঁ ও দাউদখাঁর † সহিত শীঘ্রই বিবাদ ঘটিবে এবং সম্ভবতঃ যুদ্ধও ঘটিতে পারে। দাউদখাঁ দাক্ষিণাত্যের অনেক লোককে তাঁহার পক্ষভুক্ত করিয়াছেন। পরম্পরা শোনা যাইতেছে যে হোসেন খাঁর গর্ব্ব ও প্রতাপ খর্ব্ব করিবার জন্যই এ চক্রান্ত। বাদসাহ পাণিপথ পর্য্যন্ত যাইয়া ১৫ই তারিখে দিল্লী প্রত্যাগমন করিয়াছেন কিন্তু অসুস্থ থাকাতে দরবারে আইসেন নাই। এই জন্য আমরা বাকী উপঢৌকন দিতে বা স্বকীয় কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারি নাই। আগামী ১লা তারিখে পারিব এমন আশা আছে।"

যাহা হউক এই দৌত্যকার্য্য সফল হইবার আশা ক্রমেই ক্ষীণ হইতেছিল। বঙ্গদেশের নবাব ইংরাজদিগের এই অভিযান প্রীতিচক্ষে দেখেন নাই এবং উজীরের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া সাধ্যমত বাধা দিতেও ত্রুটি করেন নাই। অন্য কোন কারণ না হইলে নবাবের উদ্দেশ্যই সাধিত হইত; কিন্তু এই সময়ে এক অভাবনীয় ঘটনায় নবাব ত অকৃতকার্য্য হইলেনই, ভবিষ্যতে ইংরাজের সুখসূর্য্যও চিরদীপ্তিমান হইয়া উঠিল।

* অন্যতম সৈয়দ ভ্রাতা।

† গুজরাটের শাসন কর্ত্তা। ফেরোকসায়ার হসেন আলিখাঁকে গুপ্ত হত্যা করিতে ইঁহাকেই আদেশ দেন

রাজা অজিৎসিংহের কন্যার সহিত ফেরোকসায়ার অনেকদিন হইতেই বিবাহে অভিলাষী ছিলেন। রাজকুমারীও দিল্লি পৌছিয়া ছিলেন। কিন্তু সম্রাট এই সময়ে অসুস্থ হইয়া পড়েন। সম্রাটের কোনও চিকিৎসকই সম্রাটকে আরোগ্য করিতে সমর্থ না হওয়ায় খান দৌরানের পরামর্শে ইংরাজ ডাক্তার হ্যামিলটনকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়। ডাক্তার সাহেব অস্ত্র চিকিৎসার দ্বারা সম্রাটকে আরোগ্য করায় তাঁহার বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন—এবং অনেক মূল্যবান উপহার লাভ করেন। * ডাক্তার সাহেব যাহা প্রার্থনাই করুন না কেন তাহাই পূর্ণ করিবেন সম্রাট এমনতর আশ্বাস পর্য্যন্ত দেন। এই সময় হ্যামিল্‌টন নিজস্বার্থ সম্পূর্ণরূপ বিসর্জ্জন দিয়া দূতের অভিলাষ পূর্ণ করিবার প্রার্থনা জানাইলেন। † সম্রাট এই নিঃস্বার্থপরতায় মুগ্ধ হইয়া স্বীকৃত হইলেন যে, শুভ-বিবাহান্তেই এই বিষয় বিবেচনা করিয়া তাঁহার যতদূর সাধ্য ইংরেজকে বাণিজ্যের সুবিধা করিয়া দিবেন।

নিম্নোদ্ধৃত পত্রে এই বিষয়ের বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়। "দিল্লী ৭ই ডিসেম্বর—সম্রাটের শুভ আরোগ্য সংবাদ আপনাদের প্রেরণ করিতেছি। সকলকে জ্ঞাত করাইবার জন্য তিনি গত ২৩শে তারিখে আরোগ্য স্নান করিয়াছেন। হ্যামিল্‌টনের যত্ন এবং কৃতকার্য্যতার জন্য ৩০ তারিখে তিনি হ্যামিল্‌টনকে প্রকাশ্য দরবারে মূল্যবান পোষাক, দুইটী হীরকাঙ্গুরীয়ক, একটী হস্তী, একটী অশ্ব, নগদ পাঁচ সহস্র মুদ্রা এবং কোট ও ওয়েষ্টকোটের জন্য সুবর্ণ বোতাম এবং মণিমুক্তা সংযুক্ত ক্রস উপহার দেন। খোজা সারহাদও সেই দিন একটী হস্তী ও একটী পোষাক উপহার পাইয়াছেন।

এই ব্যাপারকে আমরা বিশেষ শুভ মনে করিতেছি। খান দৌরানের অভিপ্রায়ানুসারে, সম্রাটের আরোগ্য লাভের পর বিবাহের সময়োপযোগী কিছু যৌতুক রাখিয়া অন্যান্য দ্রব্যাদি সম্রাটকে অর্পণ করিয়াছি। সেই সময়ে সলাবৎজঙ্গ কিছু অসুস্থ থাকায় নিজে উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই কিন্তু আমাদের সুপারেশ পত্র দিয়াছিলেন। সম্রাটের আরোগ্য লাভের সময় হইতে খোজা সারহাদ খানদৌরানকে আমাদের কথা সম্রাটকে স্মরণ করাইয়া দিতে অনুরোধ করিতে ছিলেন। কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বে কিছুই হইতে পারে না খানদৌরান এইরূপ বলিয়াছেন। রাজ্যের সকল কার্য্যালয়ই বন্ধ এবং এই শুভ উৎসব সুসম্পন্ন না হইলে কোন কার্য্যই হইবে না।

রাজপুতেরা এই বিবাহে বিশেষ সম্মানিত হইবেন। অদ্য সন্ধ্যাকালে সম্রাট সপারিষদ তাঁহার ভাবী সম্রাজ্ঞীকে অভ্যর্থনার্থ অগ্রসর

* "Among the presents given to Mr. Hamilton on this occasion were model of all his surgical instruments, made of pure gold. Vide Stewart.

† গ্রীসের ইতিহাসে এইরূপ একটী দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। স্পার্টান লাইস্যাণ্ডারকে যখন সাইরাস উপহার দিবার প্রস্তাব করেন তখন লাইস্যাণ্ডার নিজস্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সৈন্যদের বেতন বৃদ্ধির প্রার্থনা করেন।

হইবেন। দুর্গ এবং রাজপথ আলোক মালায় সুশোভিত হইবে এবং যতদূর সম্ভব সমারোহ হইবে।"*

পরবর্ত্তী পত্রে দিল্লীর তৎকালীন অবস্থা আরও পরিস্ফুট।

"দিল্লী ১০ই মার্চ্চ—আপনারা অবশ্যই দিল্লীর অবস্থার বিষয় কিছু কিছু অবগত হইয়াছেন। তাতার সৈন্যগণ তাহাদের বেতনের জন্য বিদ্রোহী হইয়াছে এবং বলিতেছে যে উজীর কিম্বা খানদৌরানের নিকট হইতে তাহারা ইহা আদায় করিয়া লইবে। উভয় পক্ষেই সৈন্যসংগ্রহ এবং সমাবেশ হইয়াছে। উজীরের পক্ষে প্রায় বিংশতিসহস্র অশ্বারোহী একত্রিত হইয়াছে; ইহারা সদাসর্ব্বদাই উজীরের পার্শ্বচরের ন্যায় রহিয়াছে। খানদৌরান এবং অন্যান্য আমিরগণ তাঁহাদের সৈন্যসামন্ত লইয়া দুর্গ রক্ষা করিতেছেন। উজীর তাতার সৈন্যদিগের বেতন না দিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যাহা হউক সৈন্যদেরই হার মানিতে হইয়াছে। একটী আপোষ বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে। তাতারেরা ছত্রভঙ্গ হইয়াছে। এবং আমির জুমলা† লাহোরে প্রত্যাবর্ত্তনে আদিষ্ট হইয়াছেন। সম্রাট চিনক্লিজখাঁকে আমির জুমলার সহিত কিছুদূর অগ্রসর হইতে আদেশ করিয়াছেন এবং মীর জুমলার জাইগির প্রভৃতির বাজেয়াপ্তের হুকুম করিয়াছেন। সহরে প্রকাশ,—এ সবই উজীরকে জব্দ করিবার জন্য এবং সুবিধা হইলে তাঁহাকে নিহত করা হইবে। আমিরজুমলা লাহোরাভিমুখী হইয়াছেন কিন্তু সম্ভবতঃ তাঁহার পদগৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিবে। এই সমস্ত কারণে কাছারী প্রায় একমাস বন্ধ ছিল এবং আমরা একমাস পূর্ব্বেও যে অবস্থায় ছিলাম বর্ত্তমানেও তদ্রূপই আছি। খানদৌরান সকল সময়েই আমাদের আশ্বাস দেন কিন্তু দেখিতেছি তিনি বড় ঢিলে প্রকৃতির লোক। কিন্তু ইহার উপায় নাই কেননা রাজ্য মধ্যে তিনিই একমাত্র সম্রাটের প্রিয়পাত্র।"

এই পত্রেই শিখগুরু বান্দার কথা আছে। "শিখদিগের প্রধান গুরু বান্দা লাহোরের শাসনকর্ত্তা কর্ত্তৃক সপরিবারে ধৃত হইয়াছেন। কয়েকদিন অতিবাহিত হইল শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় তাঁহারা সহরে প্রবেশ করিয়াছেন। প্রকাশ,—তাঁহাকে সম্রাটের নিকট আনয়ন করিয়া পরে কারাগারে নিক্ষেপ করা হইয়াছে। তাঁহার রাজ্যে যে সমস্ত ধন প্রোথিত আছে সেই ধনের ও সাহায্যকারী ব্যক্তিগণের সন্ধান বাহির করিয়া লইবার জন্য এখনো তাঁহার প্রতি কোন গুরুতর দণ্ড প্রয়োগ করা হইতেছে না! প্রত্যহ তাঁহার একশত অনুচরকে দণ্ড দেওয়া হইতেছে। অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে ৭৮০ জন অনুচরের কেহই প্রাণের জন্য ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতেছে না এবং নির্ভীক হৃদয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেছে।"

* "All will appear as glorious as the riches of Hindusthan and two months indefatigable labour can provide."

† "Two nights ago, Amir Jumla arrived in this place from Behar, attended by about eight or ten horesmen, much to the surprise of this city; for it is but at best supposed that he has made an elopement from his own camp for fear of his soldiers who mutinied for pay."

পরের পত্রে ইংরাজ দুতের যে সাত ঘাটের জল খাইতে হইতেছিল তাহারই বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। "দিল্লী ২১শে মার্চ্চ—আমরা কয়েকবার খানদৌরানের বিলম্বের কথা উল্লেখ করিয়াছি। খানদৌরান কখনও প্রকাশ্য সভায় আইসেন না; সুতরাং পাল্কিতে উঠিবার সময় ব্যতীত অন্য সময়ে কোন কথা বলিবার সাবকাশ ঘটে না। সে অবসরও অনেক দিন পরে পরে পাওয়া যায়। তাঁহার সহকারী সালাবৎখাঁও কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। সুতরাং কথাবার্ত্তা পত্রাদিতেই হইতেছে। কেবল আশাতেই দিন কাটিতেছে। কয়েক দিন পূর্ব্বে যখন খোজা সারহাদ তাঁহার সহিত দেখা করিয়া আমাদের দরবারের কথা স্মরণ করাইয়া দেন, তখন খানদৌরান উত্তর দেন "কেন? আমি তোমাদের সকল কাজই সমাধান করিয়া দিয়াছি।" খোজা সারহাদ বেশী কিছু উত্তর দিতে পারেন নাই। এত সময় নষ্ট করিয়া, এত খরচপত্র করিয়া কি যে করিয়া উঠিতে পারিব তাহা ত বলিতে পারি না! যাহা হউক, আমরা অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছি যে খানদৌরানকে তাঁহার কর্ম্মচারীগণ উপদেশ দিয়াছেন যে, তিনি নিজে কোন কার্য্যে অগ্রসর না হইয়া যেন উজীর দিয়া ইংরাজদিগের কার্য্য সম্পন্ন করান। আমরা আশা করিয়াছিলাম যে খানদৌরানকে দিয়া কার্য্য সিদ্ধি হইলে উজীরকে কিছু উৎকোচ প্রদানে করায়ত্ত করা যাইবে:—কিন্তু এইক্ষণ কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না।"

পর পত্রে দরবারের আভ্যন্তরিণ বৃত্তান্ত। ইহা ২০শে এপ্রিলে লিখিত। "দিল্লী হইতে চতুর্দ্দশ ক্রোশ দূরে সম্রাট শীকারে নিযুক্ত। খানদৌরান ও মামুদ আমিনখাঁর লোকের কথায় কথায় বিবাদ হওয়াতে একটী খণ্ড যুদ্ধ ঘটিয়া গিয়াছে। সম্রাটের নিষেধ সত্বেও দুই ঘণ্টা ব্যাপী এই যুদ্ধে একশত লোক হতাহত হইয়াছে। সম্রাট অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছেন।"

নানা কারণে এক বৎসর কাটিয়া গেল। অবশেষে ১৭১৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আর্জ্জি খাসদরবারে পেশ হইল। অন্যান্য কথার মধ্যে ইহাতে প্রার্থিত হইল যে "কলিকাতা সভার সভাপতি কর্তৃক দস্তখত যুক্ত দস্তক থাকিলে যেন নবাবের কর্ম্মচারীগণ কোনরূপ খানাতাল্লাসী বা আটক না করেন। মুর্শিদাবাদের টাকশালের অধ্যক্ষগণ যেন সপ্তাহে তিন দিবস ইংরাজদের মুদ্রা প্রস্তুত করিয়া দেন, ইউরোপীয় বা ভারতবর্ষীয় কোম্পানীর দেনদারকে চাহিবামাত্রই যেন কলিকাতায় সমর্পণ করা হয় এবং ইংরাজ কোম্পানি যেন ৩৮টী গ্রাম খরিদ করিতে পারেন।" সম্রাট তাঁহার সভাসদগণের নিকট এই আর্জ্জির প্রার্থিত বিষয়ের সম্বন্ধে মতামত চাহিলে উজীর গুরুতর বিষয় গুলিতে আপত্তি করিলেন। বাধ্য হইয়া ইংরাজদূত পুনরায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় আর্জ্জি পেষ করিলেন; এবার আর উজীর কোন আপত্তি করিলেন না। হুকুম জারির হইল কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ ইহাতে সম্রাটের নিজ দস্তখত ছিল না।* খোজাসারহাদও

* উজীরের দস্তখতি পরোয়ানা দূর প্রদেশে কার্য্যকরী হইত না। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা উজীরের আদেশ লঙ্ঘনে সাহসী হইতেন, কিন্তু সম্রাটের দস্তখতি আদেশ অলঙ্ঘনীয়।

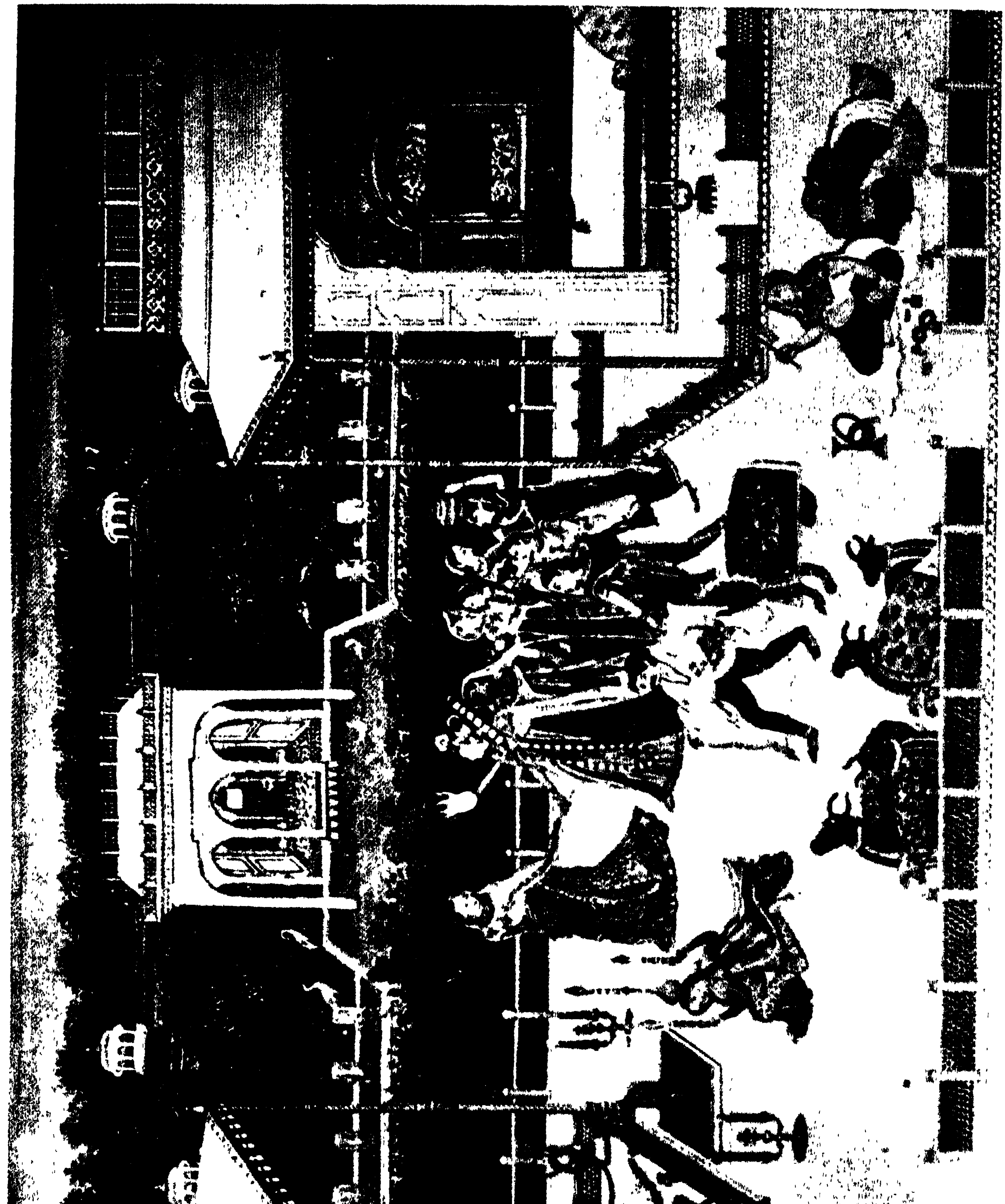

এই সময়ে গুপ্ত পরামর্শ সকল অপরকে জানাইয়া দেওয়াতে ইংরাজদিগের বিশেষ অসুবিধা হইতে লাগিল। বঙ্গদেশের নবাবের কর্ম্মচারীগণও বিশেষ প্রতিবন্ধক দিতে লাগিল। অবশেষে ইংরাজেরা খাস অন্তঃপুরের এক খোজাকে প্রচুর উৎকোচ প্রদান করিলেন। উজীর ইহার পরে আর কোন আপত্তি করিলেন না এবং শীঘ্রই ৩৪টী বিশেষাধিকার সহ পত্র প্রদত্ত হইল এবং ইহাতে সাহনসা সম্রাটও দস্তখত করিয়া দিলেন।

প্রায় দুই বৎসর এই দৌত্যকার্য্যে অতিবাহিত হইয়াছিল। ১৭১৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুলাই ইংরাজদূতেরা দিল্লী পৌঁছেন। ১৭১৭ ৭ই জুনের পত্রে তাঁহারা যে পত্র লেখেন তাহা নিম্নে দেওয়া হইল।

"দিল্লী—৭ই জুন ১৭১৭। গত ২০শে তারিখে সারমান সাহেব সম্রাট হইতে সম্মান স্বরূপ একটী অশ্ব উপহার পাইয়াছেন। অন্যান্য সকলেরই উপহার মিলিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে দিল্লী পরিত্যাগের আদেশ ও ছাড়পত্র পাইয়াছেন। কেবল ডাক্তার হ্যামিল্টনকে সম্রাটের দরবারে থাকিতে হুকুম হইল। এই আদেশে আমারা মর্ম্মাহত হইলাম। যাহা হউক উজীরের অনেক খোসামোদ করিয়া সম্রাটকে প্রার্থনা জানাইতে তিনি ডাক্তারকে প্রস্থানের অনুমতি দিলেন। ৬ই জুন এই আদেশ পৌঁছিয়াছে।"

ইংরাজদের কার্য্য সাধিত হইল।

এই প্রবন্ধের সহিত আমরা "মোগল-অন্তঃপুরের একখানি পুরাতন চিত্র প্রদান করিলাম। চিত্রখানি ঠিক প্রাসঙ্গিক না হইলেও চিত্তাকর্ষক। এ চিত্রখানি কোন্ সময়ে চিত্রিত তাহা জানিবার উপায় নাই। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে উইলিয়াম হজেস্ নামে এক জন প্রসিদ্ধ চিত্রকর ভারতবর্ষে আইসেন। তিনি এই চিত্রখানি স্বদেশে লইয়া যান। তিনিও লিখিয়াছেন যে এই চিত্রখানি বহুপূর্ব্বে চিত্রিত। মোগল চিত্র প্রণালীর সহিত এই চিত্রের যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

দুর্লঙ্ঘ্য।

দিনের আলো নিভিয়া আসিতেছিল। দুইজনে নদীর তীরে বসিয়াছিল। মাথার উপর দিয়া পাখীর দল ঝাঁকে ঝাঁকে বাসায় ফিরিতেছিল।

রজ্জব কহিল, "এত বিষয়-সম্পত্তি—তুমি বিবাহ না করেই জীবনটা কাটিয়ে দিলে!"

মীর আলি কহিল, "বিশেষ অসুবিধা ত দেখি না!"

রজ্জব কহিল, "অথচ নারীজাতির প্রতি তোমার এত সম্ভ্রম! আশ্চর্য্য!"

মীর আলি কহিল, "আশ্চর্য্য নয় মোটে! নারী পূজার যোগ্য! তুমি কি কথাটা স্বীকার কর না?"

রজ্জব কহিল, "অস্বীকার করি না—তবে দোষে-গুণে পুরুষও যেমন, নারীও তেমন—কবিদের মত বাড়াবাড়ি করা আমার

স্বভাব নয়! মোদ্দা সে কথা যাক্— বদরুদ্দিন তার মেয়ে সোফির জন্য অত পীড়াপীড়ি করেছিল—আমরা ভেবেছিলাম,—”

বাধা দিয়া মীর আলি কহিল, “রজ্জব, লোকে ভালবাসে একবার এবং একজনকে মাত্র! দুজনকে ভালবাসা যায় না!”

রজ্জব কহিল,“সে কি! তুমি আবার কবে কাকে ভালবাসলে!”

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মীর আলি কহিল, “বেসেছিলাম, রজ্জব!”

রজ্জব চমকিয়া উঠিল! একটু আর্দ্রকণ্ঠে কহিল, “বলতে কোন আপত্তি আছে কি?”

মীর আলি জলের দিকে চাহিয়াছিল। ছোট ঢেউগুলি নদীর তটে আসিয়া লাগিতেছিল!

মীর আলি কহিল, “না, আপত্তি আর কি!”

সন্ধ্যার আঁধার নিবিড়তর হইতেছিল। আকাশে চাঁদ ছিল না! বাতাসটুকু আরো শান্ত শীতল হইয়া আসিল। মীর আলি কহিল, “সে যেন স্বপ্ন! তখন আফগান যুদ্ধ বাধিয়াছে। আফগান-বালিকা মরিয়মকে প্রথম দেখি, এক ঝরণার ধারে। শ্রান্ত হইয়াছিলাম। ঘোড়াটাকে নিকটে একটি গাছে বাঁধিয়া পাহাড়ের পাথরে ঠেস দিয়া আমি বসিয়াছিলাম! রোদ পড়িয়া আসিতেছিল। দুই একটা পাখী ডাকিতেছিল—তাহাই শুনিতেছিলাম। মন হইতে সকল দুর্ভাবনা, সকল বাসনা দূর করিয়া দিয়াছিলাম! অশ্বের হ্রেষা নাই, নররক্তলোলুপ সৈনিকের হুঙ্কার নাই! রণবাদ্যের সে উন্মাদ ঝন্‌ঝনা নাই! যুদ্ধ সেদিন বন্ধ ছিল। চারিধারে অপূর্ব্ব শান্তি! আমি ভাবিতেছিলাম, মানুষের নিষ্ঠুরতার কথা! এই শান্তি-সুখ, নষ্ট করিতে তার কি পৈশাচিক আগ্রহ!

এমন সময় মরিয়মকে দেখিলাম। সে জল লইতে আসিয়াছিল। সহসা তাহাকে দেখিয়া আমার মনে হইল, যেন আকাশ হইতে হুরী নামিয়া আসিয়াছে! এমন রূপ!

আমাকে দেখিয়া সে যেন শিহরিয়া উঠিল। বন্দুকটা আমার পাশেই পড়িয়াছিল। সে চলিয়া যাইতেছিল। আমি আশ্বাস দিলাম! সে কহিল, না জানিয়া সে আসিয়াছে। নিকটেই তার কুটির। সেখানে, বৃদ্ধা বিধবা পিতামহী, তাহারি জন্য সে জল লইতে আসে। একটি ভাই আছে, মহম্মদ,—সে আফগান সৈন্যবিভাগে কাজ করে! প্রত্যহই এমন সময়, সে এখানে আসে। এধারে কোন সৈনিক যাতায়াত করে না। বনের প্রান্ত পথও নাই,—তাই কোন পথিকেরো এদিকে আসিবার বড় একটা প্রয়োজন হয় না!

তার পর হইতে প্রতিদিন কি এক বিচিত্র আকর্ষণে, সন্ধ্যার পূর্ব্বে, সকলের অলক্ষ্যে সেই ঝরণার ধারে আসিয়া আমি বসিতাম! চারিধার পাখীর গানে ভরিয়া উঠিত! ঝরণার জল শতধারে ঝরিয়া পড়িত! এই নিভৃত নির্জ্জনে, আফগান-কন্যা মরিয়মকে নিতান্ত আপনার জন করিয়া তুলিলাম! এক-একবার মনে হইত,এই দানবী হিংসা-দ্বেষ ছাড়িয়া, মরিয়মকে লইয়া, দূর বনের কোণে কোথায় চলিয়া যাই! মরিয়মকে একদিন কথাটা বলিলাম।

সে কহিল, যতদিন তার পিতামহী বাঁচিয়া

আছে, ততদিন সে নিজের সুখের কথা ভাবিবে না! আমার সঙ্গে যে তার দেখা হইত, সে কথা পিতামহী জানিত না।

মরিয়ম আমার জন্য আঙুর, আপেল, বেদানা প্রভৃতি লইয়া আসিত, আমিও পাহাড়ী ফুলে-লতায় তাহাকে সাজাইয়া দিতাম!

তার পর যুদ্ধের কোলাহল তীব্রতর হইয়া উঠিল। প্রায় একমাস আর আমাদিগের দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। সন্ধ্যার সময়, আমার প্রাণ, —কি সে চঞ্চল হইয়া উঠিত, কিন্তু উপায়ও ছিল না।

সেদিন বেলা পড়িয়া আসিয়াছিল। চারিজন সৈনিক এক তরুণ আফগান বালককে লইয়া আসিল! দিব্য কোমল সুন্দর মুখশ্রী! বালকটি চর,—গুপ্তভাবে সন্ধান লইতে আসিয়া ধরা পড়িয়াছে।

চাহিয়া দেখিতেই মরিয়মের মুখ মনে পড়িল! যেন, মরিয়মের ছায়া। ভাবিলাম, এ তার ভাই! নিশ্চয়! এ মুখ আর কাহারো নয়! কিন্তু কর্ত্তব্যের সম্মুখে সম্পর্ক কত তুচ্ছ! ইহা ভাবিয়াই অবিচলিত কণ্ঠে তখনি তার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলাম! সৈন্যেরা তাহাকে বাহিরে লইয়া গেল!

আমার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। সেই নিভৃত ঝরণার ধারে যাইবার জন্য আকুল হইয়া উঠিলাম। কতদিন আমার মরিয়মকে দেখি নাই! কিন্তু তখন চারিধারে ফৌজের ছাউনী পড়িয়াছে—যাওয়া সহজ ছিল না। একজন সৈন্য আসিয়া বলিল, বন্দী আমার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে চাহে।

আমি আসিতে বলিলাম। নির্জ্জন কক্ষে বন্দী ও আমি—আর কেহ ছিল না। আমি কহিলাম, "কি চাও, তুমি?"

সেলাম করিয়া সে বলিল, "মরিয়মকে জানেন! আমি তার ভাই!"

অবিচলিতকণ্ঠে আমি কহিলাম, "তার খবর, তুমি জানো?

সে কহিল, "একখানা চিঠি আছে, আপনার জন্য! মরিয়ম দিয়াছে। কিন্তু এখন মিলিবে না! কোমরবন্ধে আছে; আমার মৃত্যুর পর লইয়া পড়িবেন।"

তারপর প্রহরী আসিয়া আমার ইঙ্গিতে তাহাকে লইয়া গেল। আমিও তাঁবুর বাহিরে আসিয়া বসিলাম। আকাশে তখন মেঘ জমিতেছিল।

একটু পরে বন্দুকের শব্দ পাইলাম! আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল। চোখ বুজিলাম। চকিতে, আবার মরিয়মের মুখ মনে পড়িল। কি করিব? কর্ত্তব্যের কাছে যে আমি বন্দী! ধিক্ এমন কর্ত্তব্য!

মৃতদেহের নিকট গেলাম। কোমরবন্ধ হইতে পত্র বাহির করিয়া, বালকের কবরের আদেশ দিয়া তাঁবুতে ফিরিলাম।

তখন কড়্কড় শব্দে মেঘ ডাকিয়া উঠিল। তাঁবুর ভিতর আলো জ্বালাইয়া পত্র খুলিলাম। মরিয়ম নিজের হাতে অক্ষরগুলি সাজাইয়া পত্র লিখিয়াছে—ধরণটা এইরূপ—

"প্রাণের আলি,

প্রিয়তম, খোদার কাছে তুমিই আমার স্বামী। তুমি জানো, আমার ভাই মহম্মদ ফৌজে চরের কাজ করিত। যুদ্ধের সময়, কাজের সময়, সে শিবির ছাড়িয়া আমাদের কাছে আসে। মরণকে তার বড় ভয়—

পৃথিবী ছাড়িতে তার ইচ্ছা নাই—তাই সে পলাইয়া আসিয়াছিল।

তুমি জানো, এ দোষের ক্ষমা নাই। আমরা গরিব, কিন্তু আমার পিতা-পিতামহ রাজার কাজে, হাসিমুখে, যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছে—কুলাঙ্গার মহম্মদের জন্য সে গৌরব ধূলায় মিশিবে—আমার সহ্য হইল না! তাই তার বেশ ধরিয়া আমি তার কাজে আসিয়া যোগ দিলাম। কেহ চিনিতেও পারিল না।

পিতামহীকে লইয়া মহম্মদ দেশ ছাড়িল। কোনদিন যদি সে হতভাগার দেখা পাও ত, ছাড়িয়া দিও—এমন হীন প্রাণ লইয়া বাঁচিয়া থাকিতে যদি তার সাধ হয়, তবে বাঁচিতে দিও, মারিও না—তোমার কাছে এইটুকু শুধু আমার মিনতি।

চর বেশে তোমাদের দলের সন্ধানে আসিয়া ধরা পড়ি—তারপর কি হইল, সব জানো—সে কথা আর বলিয়া লাভ কি?

এখন বিদায়, আলি—তোমাকে কত ভালবাসিতাম, তাহা বুঝাইতে পারিলাম না, এই দুঃখ রহিয়া গেল! তবু তোমারি দেওয়া মৃত্যুদণ্ড লইয়া হাসিতে হাসিতে মরিলাম, এ কি কম সুখ!

আজ এই পর্য্যন্ত। যদি বেহেস্ত্ থাকে, তবে সেখানে আবার দুইজনের দেখা হইবে। আজ আসি, আলি, বিদায় দাও।

তোমার মরিয়ম!"

রজ্জব, নিজের হাতে আমি নিজের বুকের পাঁজর ভাঙিয়াছি! স্বহস্তে আমার মরিয়মকে হত্যা করিয়াছি।"

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

আপ্তকাম।

ছড়িয়ে দিয়ে কুড়িয়ে নেওয়া
বাড়িয়ে দেওয়া কাজ,
এম্‌নি করে কাটাও তুমি
সারা সকাল সাঁঝ।
দেখাও কত কর্ম্ম রত
ব্যাপ্ত কত দিক্,
যায় না জানা কোথায় থানা
পায় না কেহ ঠিক্।
দেখাও যেন বইছ যেন
কত শত ভার,
রাতে দিনে নিজগুণে
করছ কত পার।
জেগে দেখি সকল ফাঁকি
আরত কিছু নাই,
একা তুমি আপন মনে
চলেছ গান গাই।
এই কথাটি সবার মাঝে
বল্‌তে নাহি দাও,
পূর্ণ হ'য়ে আছ যে হে
কারেও নাহি চাও

শ্রীহেমলতা দেবী

শুভদৃষ্টি।

আমার স্বহস্ত-রোপিত মাধবীলতিকায় আজ প্রথম পুষ্পকলিকা দেখা দিয়াছে। আনন্দের আতিশয্যে দাদা মহাশয়কে খবরটা দিবার জন্য তাঁহার কক্ষদ্বারে আসিয়া ডাকিলাম, "দাদা মহাশয়"—জবাব পাইলাম না!

পরদা ঈষৎ সরাইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, দাদা মহাশয় পিতৃদেবের সহিত ধীরে ধীরে কি কথা বলিতেছেন! আমি আবার ডাকিলাম "দাদা মহাশয়,"—এবারও কোন উত্তর পাইলাম না!

বুড়ার উপর ভারি চটিয়া গেলাম। শুনিয়াছিলাম, আসলের চেয়ে সুদের উপর লোকের মায়া বেশী! এ বুড়ার দেখিলাম, সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাব! পিতামহ আপদে বিপদে লোককে টাকা ধার দিতেন বটে, কিন্তু কোন দিন তাঁহাকে সুদ নিতে দেখি নাই;—তাই বোধ হয়, সুদ কি 'চিজ্', তাহা তিনি চিনিতে পারেন নাই!

এমন সময় সেই কক্ষ মধ্যে এক অপরিচিত পুরুষ প্রবেশ করিলেন। ত্রস্তভাবে পিতা ও পিতামহ উভয়েই দণ্ডায়মান হইলেন। পিতামহ বলিলেন "আসতে আজ্ঞে হোক, আমরা মহাশয়ের কথাই বলিতেছিলাম।"

যিনি প্রবেশ করিলেন, তাঁহার চেহারাটী দেখিবার মত বটে! সেই দীর্ঘ আর্য্যচ্ছন্দের মুখমণ্ডল, প্রশস্ত ললাটদেশ; উন্নত নাসিকা, বিশাল চক্ষুদ্বয়, সর্ব্বোপরি সেই সুগৌর সুদীর্ঘ বপু, প্রথম দৃষ্টিতেই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে!

পিতা ও পিতামহ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া আমাকে বলিলেন, "শিশির, প্রণাম কর, ইনি বিখ্যাত জ্যোতিষী রঘুদেব শাস্ত্রী!"

আমি মুগ্ধ নয়নে সেই বিরাটমূর্ত্তি দর্শন করিতেছিলাম, পিতামহের সম্বোধনে চমক ভাঙ্গিল; অগ্রসর হইয়া প্রণাম করিলাম।

যখন উঠিয়া সোজা হইয়া জ্যোতিষীর সম্মুখে দাঁড়াইলাম, তখন দেখিলাম, তিনি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছেন। মিনিটকাল পরে তিনি ঈষৎ হাস্য করিলেন! পিতামহ উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দেখিতেছেন?"

"পরে বলিতেছি, কিছু রক্তচন্দন অথবা অলক্তক আনিতে বলুন দেখি।"

চন্দন আনীত হইল। শাস্ত্রী আমাকে বলিলেন,

"হস্তে লেপন কর"—

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কেন?"

"রেখাগুলি সুস্পষ্ট বুঝা যাইবে; উহাতে গণনার পক্ষে সুবিধা হইবে।"

আমি আমার চন্দনসিক্ত হস্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট অগ্রসর করিয়া দিলাম।

প্রায় এক ঘণ্টা কাল ধরিয়া তিনি বিশেষ রূপে প্রত্যেক করেখা পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। ললাটদেশ, মস্তকের স্থান বিশেষ ও চক্ষুর্দ্বয় পরীক্ষা করিলেন! গণনায় অন্যান্য ফলের মধ্যে বলিলেন,

"যতদূর বুঝিতেছি, এই বালকের পরিণয় অসম্ভব; যাহার সহিত এই বালকের যথার্থ শুভদৃষ্টি হইবে—অর্থাৎ যে কন্যার চক্ষু দেখিয়া মোহিত হইবে, যদি সেই কন্যার সহিত ইহার বিবাহ হয়, তবেই বিবাহ সম্ভব ও মঙ্গলজনক, নতুবা নহে।"

পিতামহ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন,—

পিতৃদেবের বিশাল ললাট দেশও একটু কুঞ্চিত হইয়া উঠিল; আমিই যে বংশের একমাত্র দুলাল! দেখিয়া শুনিয়া মনে মনে আমি একটু হাসিলাম; ভাবিলাম, যদি জ্যোতিষী অভ্রান্ত হন, তবে জীবনটা উপন্যাসের নায়কের মতই কাটিবে।

(২)

দেখিতে দেখিতে প্রায় এক বৎসর কাটিয়া গেল। চৈত্রের বায়ুতে বিতাড়িত হইয়া বসন্ত পলায়ন করিয়াছে; কিন্তু তখনও ভোরের দিকে ও সন্ধ্যার পর এমন একটা প্রীতিপ্রদ দক্ষিণ বায়ু প্রবাহিত হয়, যাহাতে শরীরকে স্নিগ্ধ করে ও মনকে প্রফুল্ল করিয়া তুলে! অপরিণত আম্রগুটিকার কাছে তখনও ভ্রমরের গুঞ্জনগীতি মিলাইয়া যায় নাই! বসন্ত চলিয়া গেলেও তাহার রেশ্‌টুকু যেন রাখিয়া গিয়াছে!

চৈত্রের শেষ। এফ্‌, এ, পরীক্ষা দিয়া আসিয়া দেখিলাম,—বাড়ীতে আনন্দরোল জাগিয়া উঠিয়াছে! ব্যাপারটা সহজেই বুঝিতে পারিলাম! জানিলাম, আমার বিবাহ! ফুলহাটীর জমীদার প্যারীশঙ্কর বাবুর কন্যা গৌরীর সহিত।

আমার বিবাহ! সেই জ্যোতিষীর গণনা এখনও ভুলিতে পারি নাই! পিতা কি ভুলিয়াছেন? পিতামহের কি সেই অভ্রান্ত জ্যোতিষীর কথা একেবারেই মনে নাই? কি জানি!

* * *

পরদিন সন্ধ্যাবেলা আমি ও আমার বাল্য-বন্ধু সুরেশ ফুলহাটী হইতে 'সাইকেলে' ফিরিয়া আসিতেছি! আমরা কনে দেখিতে গিয়াছিলাম; অবশ্য গোপনে, তাহা বলা বাহুল্য।

মাঠের মাঝখান দিয়া প্রশস্ত বর্ত্ম চলিয়া গিয়াছে; আমরা পাশাপাশি তীরবেগে 'সাইকেল' ছুটাইয়া অগ্রসর হইতেছি! সম্মুখে বিরাট সূর্য্য, সেই বিশাল নীলাকাশের পশ্চিম প্রান্তে ধীরে ধীরে ডুবিয়া যাইতেছেন! সে কি অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য উছলিয়া পড়িতেছে! এক ঝাঁক টীয়াপাখী উড়িয়া গেল; কবি সার্থক লিখিয়াছিলেন "অন্তন্তঃ তোরণ স্রজ;"! সেই অভিনব মালিকা নীলাকাশের গায়ে ভাসিয়া ভাসিয়া দূর চক্রবাল রেখায় সহিত মিশিয়া গেল!

সুরেশ আমাকে জিজ্ঞাসা করিল "কেমন দেখিলে? শুভদর্শন ত!"

"হ্যা সুন্দর—বই কি! কিন্তু"—

"কিন্তু কি আবার।"

"এটুকু বালিকা উহার চোখে এমন কি সৌন্দর্য্য থাকিতে পারে, যাহা দেখিয়া মুগ্ধ হইব?"

সুরেশ—"সে কি! এমন সুন্দর চোখ ত প্রায় দেখা যায়না"—

"আমার ভাই কোনো ভাবই হয়নি, মুগ্ধ হওয়াতো দূরের কথা!"

"যা'ই কেন বলনা ভাই, তা'র চূর্ণকুন্তল বেষ্টিত কমনীয় মুখখানি দেখিয়া"—

"তুই যে একেবারে কবি হ'য়ে উঠ্‌লি সুরো! তবু যদি—'গৌরী' না হ'ত"—বলিয়া একটু হাসিলাম।

আমাদের আর কোনও কথা হইল না!

মেয়েটীর বয়স আট কি নয় বৎসর!

প্যারীশঙ্করবাবু অষ্টমবর্ষীয়া কন্যাসম্প্রদান করিয়া "গৌরীদানের" ফললাভ করিবেন।

(৩)

ভবিতব্য কে খণ্ডন করিবে?

আমাদের বিবাহ বাসর উপস্থিত হইল। শুভলগ্নের প্রায় পাঁচ ছয় ঘণ্টা পূর্ব্বে আমরা ফুলহাটী উপস্থিত হইলাম।

সত্যকথা বলিতে কি আমার মনের 'খট্‌কা' তখনও দূর হয় নাই; বোধ হয় পিতামহেরও নহে! সেই জন্যই কি তিনি বারংবার বিবাহের উজ্জ্বল বেশপরিহিত পৌত্রের দিকে স্নেহপূর্ণ নয়নে চাহিয়া দেখিতে ছিলেন! আর আমি? বালিকার আকর্ণচুম্বিত নয়ন দুটী কেন আমাকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই—তাহাই ভাবিতেছিলাম;—মুগ্ধ হই নাই, তবু আমাদের বিবাহ হইবে; মিথ্যা সেই জ্যোতিষীর কথা; মিথ্যা গণনা—!

প্রায় বারটার সময় অন্তঃপুর হইতে একটী যুবক বাহির হইয়া আসিয়া প্যারীশঙ্কর বাবুর কানে কানে কি কথা বলিল; তিনি শুনিয়া, "কি সর্ব্বনাশ!" বলিয়া ব্যস্তভাবে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন!

ভবিতব্য তাহার কঠোর হস্ত বিস্তার করিয়া আমাদিগকে আলিঙ্গন করিতে আসিতেছে কি?

একটা অস্ফুট ক্রন্দনের রোল উঠিল; কোন্ অলক্ষ্য শক্তি যেন আমাকে ভিতর বাড়ীতে টানিয়া লইয়া গেল! সঙ্গে সুরেশ ও পিতামহও ছিলেন!

কি দেখিলাম? শুভ্রশয্যার উপর বালক-নখরছিন্ন পদ্ম কোরকের ন্যায় সেই ক্ষুদ্র বালিকা পড়িয়া রহিয়াছে! সন্ধ্যার অন্ধকারে পল্লীপথপ্রান্তে পতিত যূথিকাগুচ্ছের ন্যায় সেই অতুল সৌন্দর্য্য পরিম্লান হইয়া পড়িয়াছে! সেই আকর্ণ চুম্বিত নয়ন যুগল অর্দ্ধনিমীলিত; সুবর্ণ বলয়ালঙ্কৃত হস্ত দুই খানি দুগ্ধফেননিভ শয্যার উপর শিথিলভাবে বিন্যস্ত! বালিকা দুরন্ত কলেরা-রোগ আক্রান্ত!

সেই উজ্জ্বল আলোকোদ্ভাসিত গৃহের মধ্যে যখন আমি আসিয়া দাঁড়াইলাম, তখন বালিকার মাতা অবগুণ্ঠনের ভিতর দিয়া আমার দিকে একবার চাহিলেন; তার পর তিনি অস্ফুট স্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন!

পিতামহ নিমেষশূন্য লোচনে বালিকাকে দেখিতেছিলেন, স্নেহকোমল বৃদ্ধের অশ্রু যেন বাধা মানিতেছিল না!

তিনি বলিয়া উঠিলেন—

"প্যারী বাবু আমি সমস্তই বুঝিতে পারিতেছি; জ্যোতিষীর গণনা মিথ্যা হইবার নহে; শিশিরের সহিত ইহার বিবাহ আশা ত্যাগ করিলাম। আমি বলিতেছি, নারায়ণের কৃপায় আপনার কন্যা নিশ্চয়ই রক্ষা পাইবে।"

সেই অত্যুজ্জ্বল আলোকে, রোগ শয্যাশায়িতা বালিকার পরিম্লান মুখচ্ছবি আমাকে নিতান্তই ব্যথিত করিয়া তুলিতে-ছিল! আমার পরিহিত উজ্জ্বল বিবাহ-বেশ যেন আমাকে তীব্র কষাঘাত করিয়া উপহাস করিতে লাগিল! আমি একবার সুরেশের মুখের দিকে চাহিলাম, সেই অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা দেবীকে দেখিলাম; সর্ব্বশেষে সেই রোগ শয্যাশায়িতা অনাঘ্রাত কুসুম-কোরক-তুল্য ক্ষুদ্র বালিকার দিকে চাহিয়া মনে মনে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বাহিরে আসিলাম!

প্রাণের অন্তঃস্তল হইতে বালিকার কল্যাণ-কামনায় আকুল প্রার্থনা বাহির হইয়া বিশ্বরাজের চরণতলে লুটাইয়া পড়িতেছিল!

মাথার উপর চন্দ্র হাসিতেছে। নক্ষত্র জ্বলিতেছে। খণ্ড খণ্ড লঘু মেঘ চন্দ্রকর-স্নাত হইয়া আকাশের গায় ভাসিয়া যাইতেছে;—যাহা কিছু চক্ষে পড়িল, সবই তো সুন্দর—অসুন্দর কিছু দেখিলাম না! বুঝিলাম, পিতামহের বাক্যই সত্য—বালিকা রক্ষা পাইবে!

(৪)

তার পর প্রায় আট বৎসর চলিয়া গিয়াছে। অবস্থার কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে; প্যারীশঙ্কর বাবুর কন্যা নিরাময় হইয়া উঠিলে সুরেশের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইয়াছে; কিন্তু বলা বাহুল্য, আমার এখনও বিবাহ হয় নাই। সুদীর্ঘকালের মধ্যে কত বালিকা, কত কিশোরী, কত যুবতী দেখিলাম, কই, কাহারও নয়ন সৌন্দর্য্য তো আমাকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই। বিধাতা কি সে চক্ষু নির্ম্মাণ করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন! এ কি নিষ্ঠুর জ্যোতিষিক গণনা আমাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে! ব্যর্থ, উন্মুখ আশা, আকণ্ঠ পরিপূর্ণ তৃষা লইয়া আমার মানসীর সন্ধানে আমি কোথায় যাইব? হা ভগবান্, শুধু এক মুহূর্ত্তের জন্য আমাকে আমার সেই মানসী প্রতিমা দেখাইয়া দাও! মৃদুগুঞ্জনে আশাবেড়া আমার প্রাণের মাঝে ঝঙ্কার দিয়া বলিত "ওগো সে আছে, সে আছে, সে আছে!"

এ আশা মিথ্যা হইল না, এ আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রহিল না, সত্যই একদিন তাহাকে দেখিলাম; আমার ভাগিনেয়ীর বিবাহ রজনীতে বাসর গৃহের এক পার্শ্বে দণ্ডায়মানা সেই চির-আকাঙ্ক্ষিতা ষোড়শী মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম, একবার চোখে চোখে মিলন হইল—এক মুহূর্ত্ত মাত্র;—সেই মুহূর্ত্তের দৃষ্টিতে এক অভূতপূর্ব্ব অমৃতময় বিদ্যুৎ তরঙ্গে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন আলোড়িত, লুপ্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু কে এ রমণী? এ শুভ দৃষ্টি কাহার সহিত? পরিপূর্ণ যৌবন-শ্রীমণ্ডিতা, দেবতার পুণ্য আশীর্ব্বাদ রূপিণী এ রমণী কে? সে গৌরী! সে আজ বিধবা!

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।

ইংরাজদিগের ক্রীড়াকৌতুক।

ছোট খাট কাজকর্ম্মে, আচারব্যবহারে কোন মানুষ বা জাতির স্বভাবলক্ষণ যেমন ধরা পড়ে, এমন তাহার কোন বৃহৎ অনুষ্ঠানে নহে। পাশ্চাত্য জাতির যে আজ পৃথিবী জুড়িয়া এত প্রতাপ—তাহার প্রধান কারণ তাঁহাদের সামান্য কাজটিও উদ্দেশ্যবিহীন নহে; পান হইতে চূণটুকুও যাহাতে নিরর্থক না খসে, সে দিকেও সর্ব্বদা তাঁহাদের দৃষ্টি;—এমন কি তাঁহাদের প্রত্যেক পদক্ষেপে—প্রত্যেক অঙ্গচালনায় পর্য্যন্ত একটি আদায়ের অভিপ্রায় নিহিত। আমরা যদি তাঁহাদের সামান্য ক্রীড়াকৌতুকগুলির প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখি—তাহা হইলে এ কথার সার্থকতা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারি।

আমাদের দেশে তাস দশপঁচিশ বড় আমোদজনক খেলা। দুই চারিজনে মিলিলেন,

ও অমনি তাস বা কড়ি খেলিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কত কলহ, কত প্রমোদ উত্তেজনা! —এমন কি বাজিতে জিতিলে—নৃত্যগীত পর্য্যন্ত চলিল! পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে তাস খেলার এরূপ বৃথা উন্মত্ততা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহারা যে একেবারে তাস খেলে না এমন নহে, কিন্তু সে খেলার উদ্দেশ্যও আদায়—বিনা বাজিতে নিরর্থক তাস খেলা তাহাদের মধ্যে বোধ হয় নাই।

আমাদের দেশে নিমন্ত্রণ মজলিসে যেখানে গীতবাদ্য না থাকে, সেখানে কতকলোক খোস গল্প করিয়া, কতক লোক মুখ চাওয়াচাওয়ি করিয়া সময়টা নিরর্থক কাটাইয়া দিয়া অবশেষে ভোজনান্তে গৃহে গমন করেন। পুরুষদিগের সম্বন্ধে সর্ব্বস্থলে আজ কাল এ কথাটা নাও খাটিতে পারে—কিন্তু মেয়ে নিমন্ত্রণে ইহাই পদ্ধতি। ইংরাজদিগের ছোট বড় সকল নিমন্ত্রণেই অতিথিদিগের মনোরঞ্জনার্থে কোন না কোনরূপ আমোদ-প্রমোদের আয়োজন থাকা চাইই—চাই;—এবং সে সকল আমোদ একটিও নিরর্থক নহে, সকলের মধ্যেই হয় স্বাস্থ্যজনক না হয় বুদ্ধিস্ফূর্ত্তিজনক কোন একটা উদ্দেশ্য নিহিত।

বৈকালিক চায়ের নিমন্ত্রণে টেনিসাদি খেলা—অধিকন্তু প্রায়ই পরে গীতবাদ্যাদি হইয়া থাকে। মাঝে মাঝে পরিবর্ত্তন স্বরূপ —বর্ষার সময়ে—অন্য অনেক সময়েও শারীরিক ব্যায়ামের স্থলে মানসিক ব্যায়াম পরিচালনা দেখা যায়। বল্লাবেশ সম্মিলনের কথা, গত জ্যৈষ্ঠের ভারতীতে বলিয়াছি—তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। কিন্তু এরূপ বৃহৎ অনুষ্ঠান, কালে ভদ্রে ডিনার শেষেই প্রায় হইয়া থাকে। প্রবাদ সজ্জা, বহি সজ্জা, প্রশ্নোত্তর খেলা, ছন্দমিল, হেঁয়ালি নাট্য প্রভৃতি ছোট খাট অভিনয় ও সাজ সজ্জা-খেলাগুলিই প্রায় বৈকালিক বা সান্ধ্য সম্মিলনীতে সদা সর্ব্বদা দেখা যায়।

সম্প্রতি কলিকাতা হাইকোর্টের কোন জজপত্নীর বাড়ী মহিলা-গণের প্রবাদ সাজিয়া যাইবার নিমন্ত্রণ ছিল। সকলেই কোন একটি প্রবাদ বাছিয়া তাহার চিহ্ন ধারণ করিয়া গিয়াছিলেন। এ খেলায়,—সাঙ্কেতিক চিহ্ন ধারণে—যিনি সর্ব্বাপেক্ষা চাতুর্য্য দেখাইতে পারেন, এবং যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সঙ্কেত বুঝিতে পারেন, উভয়কেই গৃহকর্ত্রী পুরস্কার প্রদান করেন। নিম্নে দুই চারিটি প্রবাদ সজ্জার দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা গেল।

১। একজন মহিলা—একখানি পাতলা কাগজে আঁকা একটি সুন্দরী রমণীর ছবি লইয়া আসিয়াছিলেন। সেই কাগজখানি তুলিয়া ধরিলে নীচের আর একখানি কাগজে সেই সুন্দর মূর্ত্তির কঙ্কাল দেখা যাইতে ছিল। ইহা হইতে বুঝা গেল, তাঁহার প্রবাদ—Beauty is but skin-deep.

২। আর একজনের প্রবাদ—Time and tide wait for no man. তিনি একটা ঘড়ি (time) ও একটা ফিতায় বাঁধা ছোট বাটখারা (tied weight) বক্ষে ঝুলাইয়া আসিয়াছিলেন। ঘড়ির কাঁটা চারিটার (four) ঘরে ছিল এবং যিনি পরিয়াছিলেন তিনি পুরুষ নহেন,—স্ত্রীলোক।

৩। একটি মহিলা একটা কাগজে অনেকগুলি অঙ্কসংখ্যা লিখিয়া তাহাই সেফটি পিনে বিঁধিয়া বক্ষবস্ত্রে পরিয়া-

ছিলেন। ইহারপ্রবাদ—There is safety in numbers.

৪। একজনের প্রবাদ—you cant eat your cake and have it too. তিনি লইয়া আসিয়াছিলেন একখানি কাগজে আঁকা দুইটি ছেলে মেয়ের ছবি। মেয়েটি কেক খাইতেছে—ছেলেটি আপনার ভাগ নিঃশেষ করিয়া লুব্ধ দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে চাহিয়া আছে।

৫। একজন কতকগুলি ঘাস সেফ্‌টি-পিনের মধ্যে পরিয়া—ঘাসের মধ্যে একটা-পিন গুঁজিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার প্রবাদ—A pin in a bundle of hay.

৬। একজন সকণ্টক গোলাপ ফুল পরিয়া আসিয়াছিলেন,—No rose without its thorn.

আর একটি প্রবাদ অনেকেরই সজ্জায় দেখা গেল,—All that glitters is not gold: ঝকমকে ঝুটার জরির কাপড়, বা

চকচকে পুঁথির জামা প্রভৃতি পরিয়া এই প্রবাদটি ইঙ্গিত করা হইয়াছিল।

স্বয়ং গৃহকর্ত্রী অর্দ্ধ খণ্ড রুটি স্কন্ধের কাপড়ে আঁটিয়া একটি নিতান্ত সহজ প্রবাদের সঙ্কেত ধারণ করিয়াছিলেন,--Half a bread is better than nothing.

অধিকাংশ বাঙ্গালী মেয়ের সঙ্কেত কৌশল সুন্দর হইয়াছিল। প্রথম পুরস্কার একজন বঙ্গ-রমণীই দখল করিয়া লইলেন। সেই ছবিখানি আমরা পূর্ব্বপৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি; পাঠক পাঠিকা ইহা দেখিয়া প্রবাদটি কি অনুমান করুন—পরে চিত্রব্যাখ্যা দেখিবেন।

বহিসজ্জা খেলায়—প্রবাদের পরিবর্ত্তে কোন একখানি বহির চিহ্ন ধারণ করিতে হয়।

আমরা একদিন বই সাজিয়া আসিবার নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। বাঙ্গালী মহিলারা

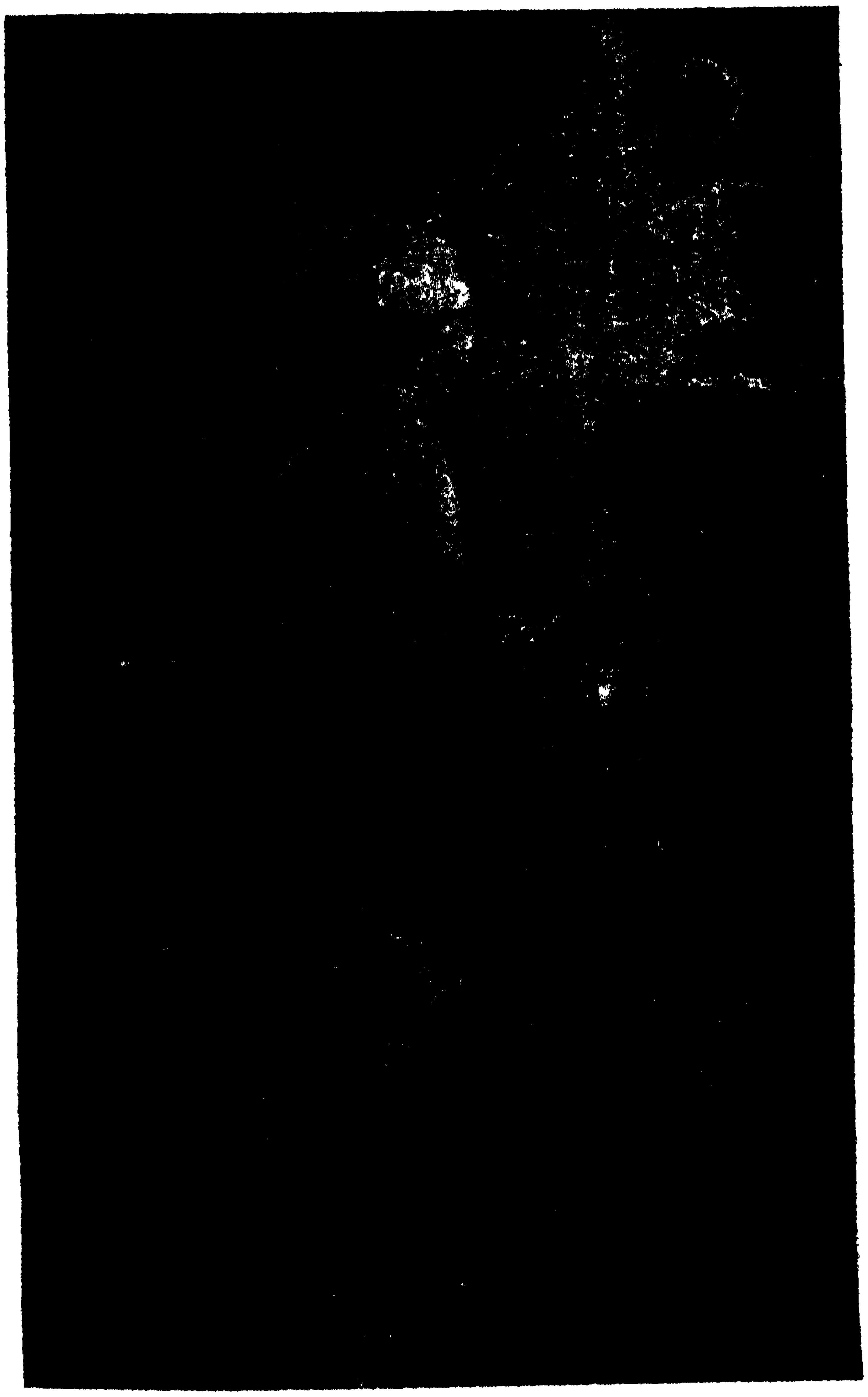

বাঙ্গলা বা সংস্কৃত পুস্তকের চিহ্ন ধারণ করিয়াছিলেন, ইংরাজমহিলাগণ অবশ্য ইংরাজি বহি সাজিয়াছিলেন। দুই চারিটি সজ্জার বিবরণ নিম্নে দিলাম।

একজন মহিলার নাম কমলা,—তিনি তাঁহার কান্তের একখানি ক্ষুদ্র ছবির পার্শ্বে একটি দপ্তর আঁকিয়া সেই ছবি ব্রোচের মধ্যে পরিয়া আসিয়াছিলেন,—অর্থাৎ কমলাকান্তের দপ্তর।

একজন ভারতের ম্যাপ আঁকিয়া তাহার পার্শ্বে দীর্ঘ ঈ বসাইয়াছিলেন—অর্থাৎ ভারতী।

মাধবের একখানি চিত্রের পার্শ্বে একটি মালতী ফুল পরিয়া একজন সাজিয়াছিলেন মালতী মাধব।

একজন মাত্র একটি সরু A অক্ষর আঁকিয়া

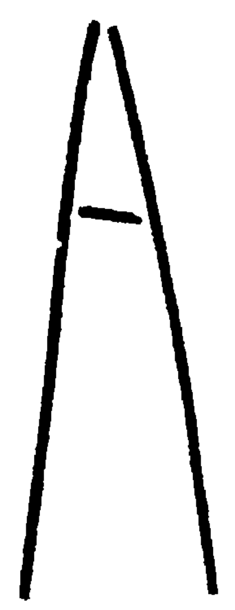

সেই কাগজ বস্ত্রে পিনবিদ্ধ করিয়া পরিয়াছিলেন,—In no sense A broad—অর্থাৎ Inocence abroad—.

আমরা পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় একখানি বহির সাঙ্কেতিক চিত্র দিলাম। পাঠক বলুন —এখানি কি বই?

প্রশ্নোত্তর খেলা অন্যরূপ। কোন জীব জন্তু মনুষ্য বা অন্য কোন পদার্থের নাম লেখা একখানি কাগজ প্রত্যেকের পিঠে—পিন করিয়া দেওয়া হয়। কাগজে কি লেখা আছে অন্যেরা দেখিতে পায়;—কাগজধারী ত নিজে তাহা দেখিতে পান না; তিনি অন্যকে প্রশ্ন করিয়া তবে সেই লেখাটি কি তাহা বাহির করিয়া লন। যেমন একজনের পিঠে লেখা হইল—মিসেস বেসেণ্ট। কাগজ-ধারী জিজ্ঞাসা করিলেন "কোনও জীব?" উত্তর হইল। "হ্যাঁ"।

"স্ত্রীলোক?"—"হ্যাঁ।"—"মৃত?" "না।" "জীবিত?" "হ্যাঁ।" "এ দেশের লোক?" "না।"—"ইংরাজরমণী?" "হ্যাঁ"—"এদেশে থাকেন?" "হ্যাঁ"।—"দেখিয়াছি?" "জানি না।" "খ্যাতনামা?" "হ্যাঁ।"—"কলিকাতায় থাকেন?" "না।" "পশ্চিমে"? "হ্যাঁ।" "কাশীতে?" "হ্যাঁ।" "কাশীতে কলেজ করেছেন?" "হ্যাঁ।"

এইরূপ নানা প্রশ্নের পর মিসেস বেসেণ্টের নাম আসিয়া পড়িল।

ছন্দমিলের খেলায় এরূপ অনুমান নাই। একজন একছত্র ছন্দ মিলাইয়া দ্বিতীয় ব্যক্তিকে শেষ কথাটি মাত্র দেখান; দ্বিতীয় ব্যক্তি সেই ছন্দে আর একটী ছত্র মিলাইয়া তৃতীয় ব্যক্তিকে তাহার মিল করিতে বলেন। এইরূপে—অনেকগুলি ছত্র হইলে পড়িতে বেশ মজার লাগে। যথা—

১। আকাশ মেঘেতে ভরা অন্ধকার দিক্।
২। না জানে কহিতে কথা নামটি রসিক।
৩। কে তুমি দাঁড়ায়ে পথে কি নাম পথিক।
৪। নয়নে ঝরছে জল হাসে ফিক ফিক।

মুখে মুখে উপন্যাস রচনা সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধি-স্ফূর্ত্তিজনক খেলা। একটি গল্পের এক পরিচ্ছেদ একজন রচনা করিয়া বলিয়া গেলেন,—আর একজন অমনি পরের পরিচ্ছেদ বলিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে দুইচারিজনে মিলিয়া গল্পটি শেষ করিয়া ফেলিলেন।

হেঁয়ালি নাট্যাভিনয়ে—কোন একটি বা দুইটি কথা অভিনয়ের মধ্যে বার বার কৌশলে উল্লেখ করিতে হয়। তাহা হইতে দর্শকগণ কথাটি বাহির করেন। এ খেলাটী বড় কৌতুকজনক। পুরাতন ভারতীতে বহু হেঁয়ালি নাট্য প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপ আর একটি হেঁয়ালি নাট্য রচনা করিয়া দিলাম।

হেঁয়ালি নাট্য।

হরি গৃহে বসিয়া কবিতা পাঠ করিতেছেন, হরের প্রবেশ।

হর! কি পড়ছ ভায়া?

হরি। এই যে হর, এস এস, তোমাকে না শুনিয়ে কিছুতেই তৃপ্তি হচ্ছে না!

হর। পড় পড়—আমিও চাতকের মত তৃষিত হয়ে আছি! সেই কাব্যখানা বুঝি শেষ হোল? কি নামটা? এই যাঃ ভুলে যাচ্ছি যে!"—

হরি। সিন্ধু প্রভঞ্জন।

হর। ঠিক ঠিক। সিন্ধু প্রভঞ্জন,—লিখে লিখে মেমরিটা কেমন খারাপ হয়ে গেছে—অনবরত ব্রেনের একসাইস কিনা! পড় পড়,—তারপর—আমার নাটকের শেষটাও শোনাব এখন, সঙ্গে এনেছি।

হরি। বেশ!

আলোড়ি বিমথি সিন্ধু ভীষণ গর্জ্জনে—
নিক্ষেপি প্রবল বেগে—উত্তাল নিবিড়—
তরঙ্গ মহান উচ্চ পর্ব্বত সমান,
ঘেরিয়া অম্বরতল, ঢাকি বিবস্বান্—
প্রলয়ের প্রভঞ্জন ঘোষিলা সরোষে—
করাল আঁধারে পৃথ্বী করিয়া মগন!!!

হর। থাম ভাই, একটু থাম, আমার মাথা ঘুরে গেল, আমার চোখে আর এককণা সূর্য্যকরও বিভাসিত হচ্ছে না,—বিশ্ব মহা-অন্ধকারে—আত্মা প্রলয়ান্ধকারে মগ্ন হয়ে পড়েছে! চমৎকার চমৎকার!

হরি। কি বল ভাই হর,—সত্যি? তোমার নাটকের নায়িকার রূপ বর্ণনা শুনতে শুনতে আত্মা যেমন সপ্তম স্বর্গের চূড়ায় দুলতে থাকে তেমনি এ কবিতাটা কি সত্যিই—

হর। সত্যি বলছি হরি সত্যি! এবার আমাদের হতে বঙ্গসাহিত্য নিশ্চয়ই ফেল হবে, নিশ্চয় নিশ্চয়! কোন সন্দেহ নাই! সরস্বতী সেই আদি যুগে বাল্মীকিতে আবির্ভাব হয়েছিলেন—আর এ যুগে এতদিনে—

বিষ্ণুর প্রবেশ।

বিষ্ণু।—হরি হরের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। আমার আজ পরম সৌভাগ্য যে হরি হরের একত্র সাক্ষাৎ লাভ করেছি!

হরি। এস এস বিষ্ণু এস—বন্ধুবর,—এতক্ষণ তোমারি অভাব অনুভব করছিলেম।

হর। এখন মন সন্তুষ্ট হোল, প্রাণ তৃপ্ত হোল, হরিহর আত্মার মিলন হোল,—এস ভাই এস। হরি ভাই! তোমার কবিতাটা আর একবার পড়ে—বিষ্ণুকে শোনাও না।

হরি। না না তোমার নায়িকার রূপ বর্ণনাটা আগে শোনাও। বলব কি বিষ্ণু—প্রতি অক্ষরে সাক্ষাৎ রতিদেবী যেন মূর্ত্তিমতী অথচ তাতে একটি অশ্লীলতা নেই—সমস্তই আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ।

বিষ্ণু। দুঃখ কেবল এই,—লোক গুলাকে এ কথা কিছুতেই বোঝাতে পারছিনে; তাদের রুচি এমন বিকৃত হয়ে গেছে যে তারা অশ্লীলতাকে শ্লীলতা, কুভাবকে সুভাব, ঐন্দ্রিয়িককে আধ্যাত্মিক ভেবে নিয়ে প্রমাদ ঘটাচ্ছে!

হরি। কি দুঃখ কি দুঃখ, বেচারাদের জন্য বড় দুঃখ!

হর। উঃ বল কি! এই সকল দীনহীন হতভাগাদের পরিত্রাণের—পাপীতাপী উদ্ধারের উপায় হবে কি করে!

উভয়ের রোদন।

বিষ্ণু। ভেবোনা, দাদারা কেঁদনা। সে উপায় আমি ঠিক করেছি। হরিহর আত্মায় মিলিত হলে বিশ্ব রসাতলে যায়—আর আমরা সাহিত্যে এতটুকু বিপ্লব ঘটাতে পারব না! এই দেখ ব্রহ্মাস্ত্র, হিমালয় হতে কুমারিকা এতে কম্পিত হয়ে উঠবে, সূর্য্য চন্দ্র তারকা জ্যোতিহীন হয়ে যাবে, বঙ্গসাহিত্য ভেঙ্গে চুরে একেবারে রসাতলে নিমগ্ন হবে,—আর সেই প্রলয় পয়োধিজলে কেবল আমাদের নূতন সাহিত্য গুলি নারায়ণের মত ভেসে ভেসে বেড়াবে।

হর। ও হরি! আমার মাথা যে ভোঁভোঁ করছে, মনে হচ্ছে আমি সেই প্রলয়ান্ধকারে নিমগ্ন হয়ে পড়ছি!—

হর। আর আমার মনে হচ্ছে,—আমি যেন নারায়ণ হয়ে সেই প্রলয়জলে পদ্মপত্রের উপর ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছি!

বিষ্ণু। আর আমার মনে হচ্ছে—আমি তোমাদের দুজনকে ধরে টেনে টেনে ডাঙ্গায় তুলছি—

হরি হর। (দুজনে দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে) বন্ধু হে তুমিই ভরসা!

শারদগীতি।

'হল দেখা তখনি বিদায়'—
চরাচর অন্তহীন এই গান গায়।
এই যে মিলন আজি বরষের পরে!
ইহাও কি শুধু তবে দুদিনের তরে!
মিলন কাতর তাই বিরহ ছায়ায়,
আনন্দ আপনহারা বিষাদে লুটায়!

শুধু দুদিনের দেখা আর কিছু নয়?
এ কথা তবু ত মাগো মনে নাহি লয়!
ফুলের সুবাস মত জন্মান্তর স্মৃতি,
ঢালিছে হৃদয়ে একি স্বপ্নময় প্রীতি!
জনমে জনমে যেন শত শত বার!
ফুটেছে তোমারি কোলে চেতনা আমার!
সেই পরিচিত দর সেই স্নেহ মুখ,
সেই পুণ্য স্মৃতিময় কত সুখ দুখ,
শোনায় আশ্বাস বাণী জাগায় বিশ্বাস—
ফুরাবে এ দিন তবু নাহি এর নাশ।

ঢাল তবে ঢাল চাঁদ জোছনার হাসি,
বাজুক মধুর সুরে উৎসবের বাঁশি,
ভোল ক্ষুধা দুটো দিনো, ওহে ক্ষুধাশীর্ণ,
ফেলে দাও নবানন্দে ছিন্ন চির জীর্ণ।
ওই শোন ওই শোন মায়ের আহ্বান—
সুখে দুঃখে তাঁরি কোলে চিরজন্ম স্থান।

শ্রীহিরণ্ময়ী দেবী।

ভারত ও বিলাত।

বিলাত-প্রবাসীর পত্র।

১। সভ্যতার মাপকাটি।

সভ্যতা কা'কে বলে? এই কথা লইয়া য়ুরোপের সঙ্গে বাকি দুনিয়ার একটা গুরুতর বিরোধ ক্রমে পাকিয়া উঠিতেছে। এত কাল ধরিয়া সাদা জাতের সভ্যতার দাবিটাকে দুনিয়ার লোকে নীরবে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। য়ুরোপ যদি সংযত হইয়া চলিতে পারিত, আত্মবিলোপের ভিতর দিয়া যে মহত্তর আত্মপ্রতিষ্ঠার পন্থা যিশুখৃষ্ট দেখাইয়া গিয়াছিলেন, খৃষ্টোপাসকেরা যদি সে পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া না পড়িত, তবে আজো এ দাবির প্রতিবাদ করিতে কেহ দাঁড়াইত কি না, সন্দেহের কথা। সর্ব্বত্রই লোকে সংযমের সম্মান করিয়া থাকে, বিশেষতঃ শক্তিশালীর সংযমের সমক্ষে মানুষের মাথা আপনা হইতেই ভক্তিভরে অবনত হইয়া পড়ে। শ্রেষ্ঠজনে যদি সংযম ছাড়িয়া আপনার শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া আস্ফালন করিতে আরম্ভ করেন, প্রাকৃত জনে আর সে শ্রেষ্টতা সহজে মানিয়া লইতে চাহে না। ধরে বেঁধে যে কেবল প্রেম হয় না, তা' নয়; ধরে বেঁধে ভক্তি এবং শ্রদ্ধাও হয় না। য়ুরোপ যে দিন ধরে বেঁধে আপনার শ্রেষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সে দিন হইতেই এ শ্রেষ্ঠত্ব সাঁচ্চা না ভেজাল জিনিষ, এ সন্দেহও লোকের মনে উঠিয়াছে। এ সন্দেহ আজ দৃঢ় হইয়াছে। তার সঙ্গে সঙ্গে য়ুরোপের সভ্যতা ও সাধনাকে লোকে সূক্ষ্মভাবে পরখ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, ভারতের ইংরেজি-নবিশেরা য়ুরোপীয় সভ্যতাকে সার্ব্বজনীন সভ্যতার আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। সে মোহ ক্রমে কাটিতেছে, কিন্তু এখনো একেবারে কাটিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। য়ুরোপের ধর্ম্ম যে ভারতের সনাতন ধর্ম্ম অপেক্ষা কোনো রূপে শ্রেষ্ঠ নহে, দেশের ইংরেজি নবিশেরাও বহুদিন হইতে এ কথা একরূপ মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু স্বদেশী ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়াও, স্বদেশের সমাজগঠনের হীনতা অনেকেই স্বীকার করিতেন। এজন্য ধর্ম্ম-সংস্কারকেরা উপাসনা-কাণ্ডে খৃষ্ট-তত্ত্ব ও খৃষ্টীয় পদ্ধতি বর্জ্জন করিয়াও, সামাজিক রীতিনীতি বিষয়ে খৃষ্টীয় সমাজের অল্প-বিস্তর অনুকরণ হইতে বিরত হন নাই। ইঁহারা হিন্দুর বর্ণভেদের উপরে খড়্গ-হস্ত। এ বর্ণভেদের দোষ অনেক, ইহা অস্বীকার না করিয়াও, ইহা যে খৃষ্টীয়দেশের শ্রেণীভেদ অপেক্ষা ভাল বই মন্দ নহে,—হিন্দুর বর্ণভেদে মনুষ্যত্বের যে অবমাননা করা হইয়াছে, খৃষ্টীয় দেশের শ্রেণীভেদে যে তদপেক্ষা শতগুণ অধিক অবমাননা করা হয়, এ কথা স্বীকার করা যাইতে পারে। কিন্তু আমাদের সমাজ সংস্কারকেরা কখনো গভীরভাবে এই বর্ণভেদ ও শ্রেণীভেদের মূল অনুসন্ধান করিয়া দেখেন নাই। তাই অনেক সময় আমাদের প্রাচীন জাতি বা বর্ণভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ-গৃহকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বিদেশী শ্রেণী-ভেদের উপর নতুন করিয়া গড়িয়া তুলিবার

চেষ্টা করিয়াছেন। এখনো এ চেষ্টার একান্ত বিরাম হয় নাই। এইরূপে, ভারতের সমাজে স্ত্রীপুরুষের সামাজিক মেলা-মেশার যে কতকটা অন্তরায় আছে, ইহাকে স্ত্রীচরিত্র-গঠনের অন্তরায় ভাবিয়া, নিজেদের সামাজিক রীতি-নীতিকে কতকটা বিলাতি ছাঁচে ঢালিবার চেষ্টা করিতেছেন। এখনো আমরা সমাজ সংস্কারের নামে বিলাতের আদর্শে ভারতবর্ষকে নূতন করিয়া গড়িবার চেষ্টা হইতে বিরত হই নাই। কিন্তু এ মোহও ক্রমে কাটিতেছে। আমরা যেমন আছি, তেমনটিই যে থাকিব, এমন কথা কোনো বুদ্ধিমান লোকে এখন আর বলিবেন না। দুই বা পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে যেমন ছিলাম, আবার তেমনটিই হইব, এ কল্পনাও কোনো বিচক্ষণ লোকের মনে স্থান পায় না। জগৎ-বিবর্ত্তনে চিরদিন সমভাবে থাকা যেমন একেবারে অসম্ভব, যে অবস্থা অনেক পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছি, তাহাতে প্রত্যাবর্ত্তন করাও তেমনি অসাধ্য। বেদ পড়িলেই বৈদিকযুগে ফিরিয়া যাওয়া যায় না। উপনিষদের সময়ে হিন্দুর সমাজবিবর্ত্তনের যে ধাপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেখানে ফিরিয়া যাওয়া যায় না। কল্যকার উপনিষদের অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা হইতেও কৃত কর্ম্মকে আজ যেমন ডাকিয়া আনিতে পারি না,—তাহার ফলমাত্র ভোগ করিতে পারি, সেইরূপ জাতীয় জীবনের অতীতকালকেও টেঁচাহেঁচ করিয়া, বা টিকি ধরিয়া টানিয়া আনা যায় না, তার কর্ম্মফলমাত্র ভোগ করা যায়। উপযোগী চেষ্টা দ্বারা সে কর্ম্মফলকে সংশোধন করা যাইতে পারে, অন্য কর্ম্ম দ্বারা তাহাকে নিরস্ত করাও সাধ্যায়ত্ত হইতে পারে, কিন্তু গত কর্ম্মকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নহে। সেকালের মানুষ লইয়াই সেকাল কাজ করিয়াছে, আর একাল ও সেকালের মানুষের মধ্যে যখন এতটাই প্রত্যক্ষ প্রভেদ দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তখন এই নূতন মানুষ লইয়া সে প্রাচীন সাধনাকে ফিরাইয়া আনা কি সম্ভব? কিন্তু এ সকল সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়াও, বিদেশী ছাঁচে স্বদেশকে ঢালিবার উৎকট উদ্যোগের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করা যাইতে পারে। নূতন যুগে ভারতবর্ষ নূতন আকার ধারণ করিবে, এ কথা মানি। কিন্তু এ আকার যে বিলাতী আকার হইবে, বা হওয়া কোনো রূপে বাঞ্ছনীয়, এ কথা মানিতে রাজি নহি। ভারতে যা আছে, তাহা থাকুক, এ কথা বলি না। বলিলেও দুরন্ত কাল সে কথা শুনিবে না। যা আছে, তাহা থাকিবে না। যা যেমন আছে, তাহা সেরূপ থাকিতে পারে না। তাহা বাঞ্ছনীয়ও নহে। পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য। পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু একরূপ পরিবর্ত্তন মৃত্যুকে ডাকিয়া আনে, অপরবিধ পরিবর্ত্তন জীবনকে ফুটাইয়া তোলে। যে পরিবর্ত্তনে নিজত্ব লোপ পায়, তাহা মৃত্যুর পথ, যে পরিবর্ত্তনে নিজত্বকে ব্যক্ত করে, দৃঢ় করে, বিস্তৃত করে, পরিণত করে,—সেই পরিবর্ত্তনই জীবনের পথ।

ধর্ম্মে যেমন ভারতবর্ষ ক্রমশঃ আপনার নিজস্বটুকু আঁকড়াইয়া ধরিতেছে, সমাজ-গঠনে, রাষ্ট্রনীতিতে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে শিল্প-সাহিত্যে,—সমাজ-জীবনের প্রত্যেক অঙ্গে ও সকল বিভাগে সেইরূপে নিজস্বটুকুকে আঁকড়াইয়া ধরিতে হইবে। এ বিষয়ে

আমাদিগকে ভাল করিয়া এইটুকু বুঝিতে হইবে যে সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা বিগুণ স্বধর্ম্মও শ্রেষ্ঠ।

স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্ম ভয়াবহ।

স্বধর্ম্ম পালনের চেষ্টায় সফলতা লাভ না করিয়া যদি বিনাশ প্রাপ্ত হই, তাহাও শ্রেয়স্কর, কিন্তু পরধর্ম্ম সর্ব্বদাই ভয়াবহ।

আমরা একদিন এই "স্ব"কে হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম। কেবল আমরা কেন, দুনিয়ার প্রায় প্রত্যেক প্রাচীন জাতিই, আপনাদের এই সনাতন "স্ব"কে হারাইয়াছিল। এ জগতে জীব ব্যষ্টিভাবেই হউক আর সমষ্টিভাবেই হউক, নিয়ত এই সনাতন "স্ব"কে হারাইতেছে, খুঁজিতেছে, পাইতেছে, পাইয়া আবার হারাইতেছে, আবার খুঁজিতেছে, আবার পাইতেছে; এইরূপে জগৎ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। ইহাই জীবের উন্নতির ও বিকাশের সার্ব্বজনীন নিয়ম ও পন্থা। প্রত্যেক সমাজই যুগে যুগে আপনার এই "স্ব"কে হারায়, "স্ব"কে খোঁজে, "স্ব"কে ফিরিয়া পায়। কিন্তু প্রতিবারেই পূর্ব্বেকার অপেক্ষা বৃহত্তর, স্ফুটতর, উন্নততর, বলবত্তর "স্ব"কে প্রাপ্ত হয়। হারাইয়াছিলাম বলিয়া দুঃখ নাই, খুঁজিতেছি বলিয়া শ্রান্তির বেদনা নাই। কতবার হারাইয়াছি, কতবার খুঁজিয়াছি, আবার কতবার পাইয়াছি। আবার পাইব, আবার হারাইব, আবার খুঁজিতে হইবে। এই পথেই এই সনাতন বস্তু আপনাকে ফুটাইয়া তোলে। যখন কিছুদিন পূর্ব্বে এই "স্ব"-বস্তুকে হারাইয়া আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলাম, তখন বিদেশের মোহ আসিয়া আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। আজ সেই সনাতন "স্ব"কে অল্পে-অল্পে ফিরিয়া পাইতেছি বলিয়া, এ দাবির বিরুদ্ধে আপত্তি দায়ের করিতে আরম্ভ করিয়াছি।

১০। য়ুরোপের কাছে দুনিয়ার ঋণ।

এই যে আজ আসিয়ার প্রাচীন জাতিগুলি অল্পে অল্পে আপনাদিগের সনাতন "স্ব"-বস্তুকে ফিরিয়া পাইতেছে, ইহার জন্য আমরা সকলেই য়ুরোপের নিকট অতিশয় ঋণী। এ ঋণ অস্বীকার করিলে কৃতঘ্ন হইতে হয়। য়ুরোপ যে ইচ্ছা করিয়া, দুনিয়ার হিতকল্পে এ কাজ করিয়াছে, এমন কথা বলা যায় না। য়ুরোপ নিজের দায়ে আসিয়ায় আসিয়া পড়িয়াছে। নিজের সার্থকতার জন্য আসিয়ায় আপনার প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এ সকলই সত্য। কিন্তু ইহাও সত্য যে য়ুরোপ যদি এমনভাবে আসিয়া আসিয়ার উপর না পড়িত, আপনার সভ্যতা, সাধনা, শিল্প, সাহিত্য, রাষ্ট্র ও কর্ম্মকে আপনার সাধনা, আপনার শক্তি ও আপনার বেশাতির দ্বারা যদি আসিয়ার প্রাচীন সমাজসমূহের সভ্যতা একান্ত অভিভূত করিবার প্রয়াস না পাইত, তবে আজ আসিয়াও আপনাকে আবার ফিরিয়া পাইত না। পরের সম্মুখীন না হইলে, পরের দ্বারা অভিভূত না হইলে, পরের সঙ্গে সংঘর্ষ ব্যতিরেকে, কেহ কখনো আপনার "স্ব"কে ফিরিয়া পাইতে পারে না। আপনাকে জানাই আপনাকে পাওয়া। "স্ব"বস্তু মাত্রেই ব্রহ্মপর্য্যায়ভুক্ত। ব্রহ্ম সম্বন্ধে যেমন—জ্ঞানেনৈব আপ্তব্যং—কেবল জ্ঞানের দ্বারাই তাঁহাকে পাওয়া যায়,—ব্যক্তির "স্ব"ই হউক, আর জাতির "স্ব"ই

হউক, তাহার সম্বন্ধেও সেইরূপ—জ্ঞানেরই আপ্তব্য, সুতরাং কেবল জ্ঞানের দ্বারাই তাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আপনাকে পাইতে হইলে, আপনাকে জানিতে হইবে। ইহার অন্য উপায় আর নাই।

আর ভেদ ব্যতিরেকে জ্ঞানের সূচনাই হয় না। একাকার নিরাকারে জ্ঞান দাঁড়াইবার স্থান পায় না। অন্ধকার আছে বলিয়াই আলোকের জ্ঞান সম্ভব হয়। দূরত্ব আছে বলিয়াই নৈকট্য যে কি, তাহা জানিতে পারি। দুঃখ আছে বলিয়াই সুখ, ও সুখ আছে বলিয়াই দুঃখ যে কি বস্তু এবং সুখই বা কি, ইহা বুঝিতে পারি। সেইরূপ পর আছে বলিয়াই আপনাকে চিনিতে পারি ও জানিতে পারি। ইদংএর সাক্ষাৎকার না হইলে অহংএর জ্ঞান জন্মে না, জন্মিতে পারে না। আর যে পরিমাণে ইদংএর সঙ্গে বিরোধ ও সংঘর্ষ তীব্র হইয়া উঠে সেই পরিমাণে অহংএর জ্ঞানও পরিস্ফুট এবং ইদংএর জ্ঞানও উজ্জ্বল হইতে থাকে। ব্যক্তি সম্বন্ধে এ কথা যেমন সত্য, জাতি সম্বন্ধেও সেইরূপ। কোনো জাতি যতদিন কেবল আপনার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে, পরজাতির সঙ্গে যতদিন না তার সাক্ষাৎকার ও সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, ততদিন তার নিজের "স্ব"এর জ্ঞান ভাল করিয়া ফুটিতে পারে না। বিদেশে আপনাদিগের রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা, ও পরজাতির মধ্যে আপনার ধর্ম্ম প্রচার, এই দ্বিবিধ উপায়ে য়ুরোপীয় লোকেরা ভিন্ন লোকের সঙ্গে সংঘর্ষ লাভ করিয়া, আপনাদিগের স্বাভিমানকে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। আর এই সংঘর্ষ হইতেই আসিয়া এবং আফ্রিকারও আত্মজ্ঞান ফুটিতে আরম্ভ হইয়াছে। য়ুরোপ যদি এতটা প্রবলবেগে আমাদের উপরে আসিয়া না পড়িত, তবে কি চীন কি জাপান, কি ভারত কি মিশর, কোনো প্রাচীন দেশই আজ এমনভাবে আপনাকে ফিরিয়া পাইত না। দুনিয়ার এই নব-জাগরণের রাজ্যে সকলকেই আজ য়ুরোপের নিকট এই বিপুল ঋণ স্বীকার করিতে হইবে। য়ুরোপের যাহা যথার্থ প্রাপ্য, তাহা দিতে কুণ্ঠিত হইলে চলিবে কেন?

১১। অহং ও ইদং।

ইদংএর সম্মুখীন না হইলে, ইদংএর সঙ্গে সংঘর্ষ ও বিরোধ উপস্থিত না হইলে, অহংএর জ্ঞান জন্মে না সত্য, কিন্তু প্রথম যখন ইদং অহংএর সম্মুখীন হয়, তখনই যে এ জ্ঞান হঠাৎ ফুটিয়া ওঠে তাহা নহে। প্রথমে বরং অহং ইদংএর দ্বারা একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ে। এ অবস্থায় অহং ইদং ও ইদং অহং হইয়া যায়—একটা গোলমেলে রকমের একাকারের সৃষ্টি হয়। শিশুদিগের প্রথম জ্ঞানোন্মেষের সময় এটি অতি পরিষ্কাররূপে লক্ষ্য করা যায়। তারা ইদংকে নিজেদেরই মত ভাবে ও দেখে, আর নিজেদেরও ইদংএর মতই দেখে ও ভাবে। অহং এবং ইদংএর মধ্যে যে বিশাল বিভেদ রহিয়াছে, এ জ্ঞান প্রথমেই তাহাদের ফুটিয়া ওঠে না। এইরূপে একটা গোলমেলে রকমের একাকারের মধ্যে শিশুর চৈতন্য ক্রীড়া করিতে থাকে। কোনো জাতি যখন বহুকাল আপনার মধ্যে বাস করিয়া, সহসা একটা অপর জাতির সঙ্গে তীব্র সংঘর্ষে আসিয়া পড়ে, বিশেষতঃ যখন এই অপর জাতি একটা অভিনব

সভ্যতার উজ্জ্বল চাকচিক্য দ্বারা তাহার চক্ষুকে ঝলসাইয়া দেয়,—তখন তাহার জ্ঞানে এইরূপ একটা গোলমেলে রকমের একাকারের প্রতিষ্ঠা হয়। এবং এই একাকারের মধ্যে সে আপনাকে একান্তই হারাইয়া ফেলে। তখন সে স্বকেই পর ও পরকেই স্ব বলিয়া ধরিতে আরম্ভ করে।

আধুনিক য়ুরোপের সঙ্গে প্রথম সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে, আসিয়ার প্রাচীন জাতি সকলেরো এই দশাই উপস্থিত হইয়াছিল। প্রথমে তাহাদের জ্ঞানে একটা গোলমেলে রকমের একাকারের সৃষ্টি হয়। কিছুদিন পর্য্যন্ত স্ব-পর ভেদ একরূপ বিলুপ্ত হইয়া যায়। আমরা সকলেই ইদংএর দ্বারা একান্ত অভিভূত হইয়া, অহংকে ভাল করিয়া ধরিতে পারি নাই! আর অহংকে ভাল করিয়া ধরিতে পারি নাই বলিয়া, ইদংকেও ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। ক্রমে এই গোলমেলে একাকারের অবস্থা অতিক্রম করিয়া উঠিতেছি। এবং য়ুরোপ যতই তাহার দুদিনের সভ্যতা দ্বারা, আমাদের যুগযুগান্তের সাধনাকে ঠেলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে, ততই তার এই সভ্যতার দাবিটা যে কি, এ দাবির ভিত্তি ও যুক্তি কত শক্ত, এ সকল বিচার করিতে আরম্ভ করিয়াছি।

১২। সভ্যতা ও অসভ্যতা।

প্রথমে যখন য়ুরোপ আমাদিগকে অসভ্য বলিয়াছিল, তখন আমরা মাথা হেঁট করিয়া, তার এই রায়কে মানিয়া লইয়াছিলাম। আমরা খালি গায়ে থাকি, খালি পায়ে হাঁটি, মাটিতে আঁচল পাতিয়া বসি, হাত দিয়া খাই, ঠাকুর দেবতা মানি, শ্রাদ্ধশান্তি করি, বীণাবেণু বাজাই,—আমাদের গায়ে কোট পেণ্টলুন নাই, পায়ে জুতাজামা নাই, ঘরে সোফা চৌকী নাই; আমরা টেবিলে খাই না, কাঁটা চামচ ধরি না; পুতুলের পূজা করি, মরা মানুষের পিণ্ডদান করি, হারমোনিয়ম পিয়ানো বাজাই না;—এসকলই আমাদের বর্ব্বরতার লক্ষণ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম। সেই সময়ে মাইকেল্‌কে মিল্টন বলিয়া, বঙ্কিমকে স্কট বলিয়া, রবীন্দ্রকে শেলী বলিয়া, কালিদাসকে শেক্ষপীয়র বলিয়া, আমাদের মন সান্ত্বনা লাভ করিত। আমরাও যে সভ্য, আমাদেরো যে একটা সনাতন, একটা নিজস্ব সভ্যতা ও সাধনা আছে, এ জ্ঞান তখনো জন্মে নাই। ক্রমে এখন সে জ্ঞান জন্মিয়াছে। প্রথম সময়ের গোলমেলে একাকারের পরিবর্ত্তে, এখন স্ব-পরভেদটা ক্রমশঃই জ্ঞানে স্ফুটতর হইয়া উঠিতেছে। তাই এখন আমরা বুঝিতেছি যে খালি গায়ে থাকা, খালি পায়ে চলা, আসনে বসা, হাতে খাওয়া,—এ সকল অসভ্যতার চিহ্ন নয়। প্রত্যেক দেশের রীতিনীতি, আচারব্যবহার, সেই সেই দেশের ভিতরের ও বাহিরের অবস্থা হইতে, স্বাভাবিক নিয়মে গড়িয়া উঠে। ইংরেজ বা জর্ম্মাণ, চিরদিনই যে কাঁটাচামচে দিয়া খাইত, বা চেয়ার-সোফায় বসিত, এমন নহে। আর হঠাৎ একদিন যে সকলে মিলিয়া সভা করিয়া, হাত তুলিয়া ঠিক করিয়াছিল যে আর আমরা হাতে খাইব না, বা মাটিতে বসিব না, এমনো নহে। এ সকল রীতিনীতি কালক্রমে, প্রয়োজনানুরোধে সমাজে অল্পে অল্পে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। লজ্জা নিবারণের জন্ম মানুষ প্রথমে কাপড় পরিতে

আরম্ভ করে নাই, সে সময়ে নগ্নতায় লজ্জা ভাব আদৌ জন্মে নাই। শীত নিবারণের জন্য, অথবা কেবলমাত্র সৌখিনতার খাতিরে, আপনার দেহযষ্টিকে সাজাইয়া সুন্দর করিবার জন্যই মানুষ প্রথমে কাপড় পরিতে আরম্ভ করে। এ অবস্থায়, শীতপ্রধান দেশে যেরূপ পোষাক প্রবর্ত্তিত হওয়া স্বাভাবিক, গ্রীষ্মপ্রধানদেশে সেরূপ হওয়া সম্ভব নহে। ইংরাজ, জর্ম্মান, রুশ, এসকল জাতির লোকেরা শীত নিবারণের জন্যই আপনার সর্ব্বাঙ্গ একেবারে আবৃত করিয়া থাকে। আর আমরা, গ্রীষ্মপ্রধানদেশে বাস করি,—এত কাপড়চোপড়ে আমাদের স্বাস্থ্য ও সোয়াস্তি দুই নষ্ট হয়। সুতরাং ইংরাজের কোট প্যাণ্টালুন যেমন সুখকর, স্বাস্থ্যকর, ও সভ্যতার পরিচায়ক; আমাদের ধুতি উত্তরীয়ও সেইরূপ সুখকর, স্বাস্থ্যকর, সুশোভন ও সুসভ্য। একসময়ে এ জ্ঞান আমাদের ভাল করিয়া জন্মায় নাই। ধুতি পরিয়া ইংরেজের সম্মুখীন হইতে, সেকালে আমাদের সঙ্কোচ বোধ হইত। আমরা আমাদের মাতা ও ভগীর নিকটে খালি গায়ে বসিতে ও চলিতে কোনো কুণ্ঠা বোধ করিতাম না, কিন্তু সাহেব বিবি দেখিলেই গা ঢাকিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িতাম। এখন আর এরূপ ব্যস্ত হইব না। একদিন আমরা ইংরেজের পোষাকেই সুরুচি ও শ্লীলতা দেখিতাম, আমাদের ধুতী বা শাড়ীতে সে সুরুচি বা অশ্লীলতা দেখি নাই। আজ এভাবও বদলাইয়া গিয়াছে বা যাইতেছে। এখন ধুতির সুচারুতা প্যাণ্টালুনের অপেক্ষা বেশীই বলিয়া বোধ হয়, আর বিবিদের আঁটাশাঁটা পোষাকে দেহযষ্টিকে ঢাকিবার ভাণ করিয়াও যে ঢাকিতে চাহে না, ইহা যতই লক্ষ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছি, ততই আমাদের সাদাসিধে শাড়ীর ভিতরে কি শ্রী, কি শোভা, কি কমনীয় শ্লীলতা আছে, ইহা বুঝিতে পারিতেছি। মোট কথা এই—এসকল পোষাকপরিচ্ছদ, এসকল রীতিনীতি, এসকল আচারব্যবহার, ইহারা বাহিরের বস্তু ও বিষয় সত্য, কিন্তু একান্ত বাহিরেরো নয়। বাহিরের ব্যাপার হইলেও, এসকলে প্রত্যেক জাতির ভিতরকার স্বভাব, আন্তরিক প্রকৃতি, এবং যুগযুগান্তরব্যাপী সাধনা ও সভ্যতার মর্ম্ম প্রকাশ করিয়া থাকে। প্রত্যেক জাতির পোষাকপরিচ্ছদের ভিতরে তাহাদের চিরন্তন সৌন্দর্য্যের আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। সেইরূপ তাহাদের খাওয়াদাওয়ায়, আচার-পদ্ধতিতে তাহাদের ধর্ম্মের আদর্শ, তাহাদের ব্যবসাবাণিজ্যে তাহাদের কর্ম্মের আদর্শ, এবং এই সকল বিবিধ আকারের চেষ্টাচরিত্রে, জাতীয় সভ্যতা ও সাধনার মৌখিক আদর্শ যে কি, ইহা ধরিতে পারা যায়। আর এই সকলের দ্বারাই বিভিন্ন সভ্যতার বিচার করিতে হয়। দুঃখের বিষয় এই, য়ুরোপের লোকেরা এখনো এভাবে, তুলনায় সমালোচনা করিয়া, সভ্যতার লক্ষণ নির্ণয়ে সমর্থ হয় নাই। তাই তাহাদের শ্রেষ্ঠজনেরাও, য়ুরোপের বাহিরেও যে অতি উচ্চ ও উদার সভ্যতা আছে বা থাকিতে পারে, একথা সহজে বিশ্বাস বা স্বীকার করিতে পারেন না। এজন্য তাঁরা এখনো সভ্যতার সত্যিকার মাপকাটিটা খুঁজিয়া পান নাই।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

বক্তব্য।

"ভারত ও বিলাত" সম্বন্ধে বিপিনবাবু যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি আমাদের যে দুর্ব্বলতাটির প্রতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সে বিষয়ে আমাদের ভাবিবার ও শিখিবার অনেক বিষয় আছে। কিন্তু স্থানে স্থানে আমরা তাঁহার যুক্তির ঠিক অনুসরণ করিতে পারিলাম না। ভারত ও বিলাতের সভ্যতা লইয়া তিনি যে সমালোচনা করিয়াছেন তাহার মধ্যে তাঁহার অনেকগুলি কথা পড়িলে মনে কেমন একটা সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হয় যেন যাহা কিছু স্বদেশী তাহার ঢোল আনার সমর্থন করাই তাঁহার আন্তরিক উদ্দেশ্য। আমাদের এ ধারণা ভ্রমাত্মক বলিয়া জানিতে পারিলে সুখী হইব।

বিপিনবাবু তাঁহার প্রবন্ধে এমন কতকগুলি কথার অবতারণা করিয়াছেন, যাহা হয় ত' তাঁহার অজ্ঞাতে ও অনিচ্ছাক্রমেই ঈষৎ পক্ষপাতিতার বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। সেই সকল স্থানগুলি নির্দ্দেশ করিয়া তাহার প্রতি প্রবন্ধলেখকের মনোযোগ আকর্ষণ করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

তিনি বলিতেছেন আমরা "য়ুরোপীয় সভ্যতাকে সার্ব্বজনীন সভ্যতার আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম।" যদি তাহা করিয়া থাকি তাহা হইলে ভুল করিয়াছি সন্দেহ নাই। যাহা নির্দ্দোষ, যাহা সম্পূর্ণ, যাহা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বকালে ও সর্ব্ব দেশে সত্য, তাহাই সার্ব্বজনীন আদর্শ হইবার যোগ্য—সর্ব্বলোকের বরণীয় ও গ্রহণীয়। এই দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে শুধু য়ুরোপের কেন, পৃথিবীর কোন দেশেরই সভ্যতা সার্ব্বজনীন আদর্শ হইবার যোগ্য নহে। ব্যক্তিগত চরিত্রের সার্ব্বজনীন আদর্শ যেমন কোন ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে সমগ্রভাবে পাওয়া অসম্ভব, বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন গুণের আদর্শ অনুসন্ধান করা আবশ্যক; জাতিগত ভাবেও তেমনি কোনও জাতিবিশেষের মধ্যে সার্ব্বজনীন আদর্শ খুঁজিয়া পাওয়া অসম্ভব,—তা' সে য়ুরোপেই হউক আর এসিয়াতেই হউক, ইংলণ্ডেই হউক আর ভারতেই হউক! মনুষ্যত্বকে সম্পূর্ণ করিতে হইলে যে সমগ্র মনুষ্যসমাজের নিকটে যাইয়া দাঁড়াইতে হইবে, শ্রেণীবিশেষের মধ্যে বদ্ধ থাকিলে চলিবে না, সে কথা বোধ হয় আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। সংসারের সব ভাল কাহারও একচেটিয়া সম্পত্তি নহে। ভাল—কিছু বা আমার আছে, কিছু বা তোমার আছে, কিছু বা অপরের আছে। ইহাই জগতের চিরন্তন সত্য। বিপিনবাবু ইতিপূর্ব্বে নিজেই এ কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

সেইজন্য আমাদের ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ বলিয়া যে অনিবার্য্য সত্যরূপে আমাদের সমাজের সকল ব্যাপার শ্রেষ্ঠ হইতেই হইবে, সৃষ্টিনিয়মে এরূপ কথা কোথাও লেখা নাই। সমাজ ইত্যাদি সকল বিষয়েই আমাদের উন্নতির মূলে শিক্ষা অর্থাৎ জ্ঞান। সেই শিক্ষার আবার দুই পথ,—দেখা আর ঠেকা। এই দেখা ও ঠেকার ফলেই দিনে দিনে যুগে যুগে তিল তিল করিয়া সভ্যতা ও সমাজ পরিবর্ত্তিত ও পরিপুষ্ট আকারে উন্নত হইয়া উঠে! কিন্তু এই উন্নতির ফলে আজ কি সমাজ

তাহার সেই অন্তর্নিহিত চিরন্তন শক্তির প্রয়োজনের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে? তাহা যে দিন দাঁড়াইবে সে দিন ত' সে মৃত—তাহার জীবনীশক্তিই সে হারাইবে! বাহিরের পৃথিবীকে দেখিয়া আমরা যদি কাহারও ভালটি গ্রহণ করিতে অগ্রসর হই, তাহা হইলে সেটা কি নির্ব্বোধ অনুকরণ? নির্ব্বুদ্ধিতা কোন্‌টা—বাহিরের ভাল দেখিয়াও আপনার ত্রুটি স্বীকার করিয়া অবিলম্বে অপরের সেই ভালটিকে সাদরে গ্রহণ করা, না, চোখ বুজিয়া থাকিয়া তাহাকে অস্বীকার করা? ভিতরে ভিতরে ঠেকিয়াও নিজের বস্তুটি শ্রেষ্ঠ বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করাই কি যথার্থ মনুষ্যত্বের লক্ষণ? বিপিনবাবু এরূপ যুক্তির সমর্থন করিবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নহে।

লেখক বলিয়াছেন, "বিদেশী ছাঁচে স্বদেশকে ঢালিবার উৎকট উদ্যোগের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করা যাইতে পারে।" ইহার অর্থ কি—বিদেশী আদর্শ মাত্রেই আমাদের পরিবর্জ্জনীয়? তাহা কি আমাদের পক্ষে অমঙ্গলকর? কিন্তু আমাদের ত মনে হয় আদর্শ গ্রহণ করায় দোষ বা লজ্জা নাই। বরং তাহাতে উপকার আছে বলিয়াই আমাদিগের ধারণা।

আমরা যদি কেবলমাত্র অপরের বাহ্য চাকচিক্যের মোহে মুগ্ধ হইয়া অকারণে, অপ্রয়োজনে, অবোধের ন্যায় অপরের অনুকরণ করিতে থাকি, তাহা হইলে আমরা অপরাধী সন্দেহ নাই। কিন্তু গ্রহণ মাত্রেই যে অনুকরণ নহে এ কথাটি আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে।

বস্তুত একটী জাতিতে কোন গুণের উৎকর্ষ দেখিয়া অপর জাতি যদি তাহার ছাঁচে আপনাকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করে তবে তাহাকে অনুকরণ বলাই সঙ্গত হয় না; তাহা সুপ্তভাবের উদ্বোধন মাত্র।

১২৯৭ সালের ভাদ্র সংখ্যা 'ভারতী ও বালকে' পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার আর্য্যামি ও সাহেবিআনা প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়াছিলেন,—"নেপোলিয়নের দৃষ্টান্তে শত সহস্র সেনা তোপের মুখে জরাজীর্ণ সেতু অতিক্রম করিয়া শত্রু সৈন্য পরাভূত করিল, তাহা হইতে এমন বুঝায় না যে নেপোলিয়নের অনুকরণে সৈন্যগণ সেই মুহূর্ত্তে 'ভুঁই ফোঁড়' বীর হইয়া উঠিল—তাহাদের অন্তরে যে বীর ভাব সুপ্ত ছিল নেপোলিয়নের দৃষ্টান্তে তাহাই উদ্বোধিত হইয়া উঠিল মাত্র। সৈন্যগণ যদি তাঁহার ধরণে ওয়েষ্ট কোটের পকেটে হাত দিয়া দাঁড়াইত কিম্বা তাঁহার ঢঙের কোর্ত্তা পরিত তবেই অনুকরণ হইত।"

পরিবর্ত্তন যে অনিবার্য্য, অবশ্যম্ভাবী তাহা বিপিনবাবু নিজেও স্বীকার করিয়াছেন। তবে সেই পরিবর্ত্তনের আকার লইয়াই সমস্যা! আমরা যদি আমাদের নারীদের মেম সাজাইয়া পুতুলের মত নাচাই, তাহা হইলে ব্যাপারটা যেমন হাস্যাস্পদ তেমনি ক্ষতিকর সন্দেহ নাই।

আর্য্যামি ও সাহেবিআনার ভাষায়—"যাহা সাজে না তাহা আপনার গাত্রে বলপূর্ব্বক সাজাইতে যাওয়ার নামই অনুকরণ! Museকে সাড়ী পরা সাজে না—সরস্বতীকে গৌন পরাও সাজে না * * * ।" প্রকৃত অনুকরণ ইহাই। কিন্তু যদি

আমাদের নারী-সমাজের বর্ত্তমান অবস্থাটি চিরস্থায়ী করিবার ইচ্ছা বা কল্পনা সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক না হয় তবে কতক পরিমাণে বিলাতি আদর্শ গ্রহণ করাও আমাদের স্বাভাবিক,—এবং সুলক্ষণ। আর আদর্শ গ্রহণ করিলেই যে কোন জাতি ভিন্ন জাতি হয় না; তাহার দৃষ্টান্ত জাপান। জাপান অন্যের ছাঁচ গ্রহণ করিয়াও সে জাপানই আছে। কৌলিক নিয়ম Law of heridity এবং সঙ্গতি নিয়ম Law of adaptation এই দুই নিয়মেই সংসার ও সমাজ চলিতেছে। চতুর্দ্দিকের পরিবর্ত্তনশীল অবস্থার সহিত চলিতে না পারিলে কোনও জীব—কোন সমাজ পৃথিবীতে টিঁকিতে পারে না—এবং এই সঙ্গতি রক্ষা করিয়া চলিতে হইলেই জীবের পৈতৃক গুণ সকলও অল্পে অল্পে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। আসল কথাটাই হইল এই। এই ছাঁচ বা আকার আমাদের কাহারও অন্তরের আকাঙ্খার অনুবর্ত্তী হইতে বাধ্য নহে। যে নিয়মের বলে পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী, সেই নিয়মের ফলেই আকারও অবশ্যম্ভাবী! নূতন যুগের স্বধর্ম্ম যেরূপ, তাহার অভিব্যক্তির আকারও সেইরূপ হইবে। পরিবর্ত্তন ক্রিয়া আপনা হইতে স্বাভাবিক নিয়মে যতদিন চলিতে থাকিবে ততদিন আমাদের কাহারও পক্ষেই "মৃত্যুকে ডাকিয়া আনা" অসম্ভব, কারণ ডাকটা আমাদের নিজের নহে,—যুগধর্ম্মের! সেই ধর্ম্মানুসারে যদি আমাদের জাতিগতভাবে অপর কোন জাতির সহিত আকারের সাদৃশ্য আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে আমরা অতীতকে হারাইবার জন্য আক্ষেপ করিতে পারি সত্য, কিন্তু বর্ত্তমানের জন্য অনুতাপ করিলে কার্য্যটা ঠিক যুক্তিসঙ্গত হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

ঘরে মা বোনের কাছে আমরা যেভাবে থাকি সেইভাবে সাহেব মেম বা অপর কাহারও নিকট আত্মপ্রকাশ করিতে লজ্জাবোধ করি বলিয়া বিপিনবাবু বাঙ্গালীকে একটু লজ্জা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে লজ্জা পাইবার হেতু ত' আমরা খুঁজিয়া পাইলাম না। ভিতর ও বাহির বলিয়া একটা ব্যাপার চিরদিনই সকল দেশে ও সকল সমাজে আছে। ইংরাজ আসিবার পূর্ব্বে কি আমাদের মধ্যে তাহার কোনও বিপরীত রীতি প্রচলিত ছিল? তা ছাড়া পুরুষদের কাছে পুরুষের যেভাবে মেশায় কোনও বাধা থাকেনা, স্ত্রীলোকের সহিত মিশিতে গেলে সেভাবে চলা কোনমতেই সঙ্গত বা শোভন হয় না—একটু সংযত হওয়া আবশ্যক হইয়া পড়ে। পুরুষের সহিত স্ত্রীলোকের মেলা মেশা সম্বন্ধেও একথা খাটে।

আর একস্থানে তিনি বলিয়াছেন—"হিন্দুর বর্ণভেদে মনুষ্যত্বের যে অবমাননা করা হইয়াছে, খৃষ্টীয় দেশের শ্রেণীভেদে যে তদপেক্ষা শতগুণ অধিক অবমাননা করা হয়, এ কথা স্বীকার করা যাইতে পারে।" এ স্বীকারের মূলের যুক্তিটি শুনিবার জন্য আমরা উৎসুক রহিলাম। য়ুরোপে শ্রেণীভেদ আছে সত্য,—সেখানে মানুষ উচ্চ নীচ কেবল অর্থের তারতম্যে। বেশ! মানুষকে না দেখিয়া তাহার অর্থসম্পদকে দেখিলে যে তাহার মনুষ্যত্বকে অবমাননা করা হয় তাহা বুঝিলাম। কিন্তু অর্থহীনের অর্থবান হওয়া

একটা অসম্ভব ব্যাপার নহে। সেইজন্য য়ুরোপে আজ যে হীন একদিন সে বা তাহার বংশধর আবার উচ্চ বা মহৎ হইবার আশা করিতে পারে, হইয়াও থাকে। কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান বর্ণভেদও কি তাই? আমাদের মধ্যে যে নীচ তাহার পক্ষে কি কোন দিন উচ্চ হওয়া সম্ভব? সে কি অনন্তকাল নীচ থাকিতেই বাধ্য নহে? মানুষ মানুষকে—এমন কি তাহার ছায়াটিকে পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে ঘৃণা বোধ করে, ঘরে ঢুকিলে তাহার সংস্পর্শে জড়বস্তুটি পর্য্যন্ত অপবিত্র হইল বলিয়া মনে করে, ইহা অপেক্ষা মনুষ্যত্বের অবমাননা যে অধিক কি হইতে পারে তাহা আমরা কল্পনা করিতেও অক্ষম। কোটি কোটি মনুষ্যকে—তাহাদের সুপ্ত মনুষ্যত্বকে ফুটাইয়া তুলিবার উপযুক্ত শিক্ষা, সুযোগ ও সঙ্গ হইতে বঞ্চিত রাখাই ত' মনুষ্যত্বের চরম অবমাননা! এ নিষ্ঠুর নীতিকে সমর্থন করা যে কি প্রকারে সম্ভব, তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম।

আর একটা কথার উল্লেখ করিয়াই আমরা শেষ করিব। বিপিনবাবুর মতে "সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা বিগুণ স্বধর্ম্মও শ্রেষ্ঠ।" কিন্তু স্বধর্ম্ম বিগুণ হইলেই ত' সে অধর্ম্মের তুল্য হইল। যাহা আমার গুণকে প্রকাশ করে, বিকাশ করে, সুন্দর ও সার্থক করে, তাহাই আমার স্বধর্ম্ম। এসকলের অন্তরায় ঘটিলে বুঝিতে হইবে আমি আমার স্বধর্ম্ম হারাইয়াছি,—অধর্ম্মের অধীন হইয়াছি! তখনও "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়" বলিয়া চক্ষু বুজিয়া বসিয়া থাকাই কি বাঞ্ছনীয়? পৃথিবীর মধ্যে থাকিয়া পরকে বাদ দিলে চলিবে না। পরেরও স্বয়ের মধ্যে অনন্তকাল ধরিয়া অবিরাম আদান প্রদান চলিতেছে—এই নিয়মের ফলেই তুমি আমি! এখানে তোমাকে বাদ দিলে আমি কোথায়, আমাকে বাদ দিলে তুমি কোথায়? বিপিনবাবুর কথাটার অর্থ আমরা বুঝিলাম না।

আমাদের উপরের কথায় যেন কেহ মনে না করেন যে আমরা সাহেবিয়ানারই সমর্থন করিতেছি। সাহেবিয়ানা জিনিষটা একটা মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি তাহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও বলি যে আর্য্যামি জিনিষটাও আমাদের পক্ষে অল্প ভয়ঙ্কর ব্যাধি নহে। সকল দিক হইতেই গোঁড়ামি আমাদের উন্নতির পথের বিষম অন্তরায়। কালের উপযোগী করিয়া আপনাকে গড়িবার সমাজের যে একটি স্বাভাবিক প্রবণতা আছে তাহাতে বাধা দিলে সমাজশক্তি স্বাস্থ্য ও কার্য্যকারিতা হারাইয়া নিতান্ত ব্যর্থ হইয়া পড়ে,—বদ্ধজলের মতই তখন তাহা নানা রোগের আকরস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। সাহেব হওয়া আর সাহেবি-আনা যেমন এক নহে আর্য্য হওয়া আর আর্য্যামি করাও তেমনি কোনমতেই এক নহে। সাহেবিয়ানাও যেরূপ প্রাণহীন, কপট, আত্মপ্রবঞ্চনা, আর্য্যামিও সেইরূপ অন্ধ, আত্মক্ষয়কর আত্মপ্রবঞ্চনা। এ বিষয়ে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১২৯৭ সালের ভাদ্রের ভারতীতে "আর্য্যামি ও সাহেবিয়ানা" প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, পাঠকগণকে তাহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। তাঁহার বক্তব্যের উপর নূতন করিয়া বলিবার আর কিছুই নাই!

দ্বিধা।

দুইকে নিয়ে মানুষের কারবার। সে প্রকৃতির, আবার সে প্রকৃতির উপরের। একদিকে সে কায়া দিয়ে বেষ্টিত, আর একদিকে সে কায়ার চেয়ে অনেক বেশি।

মানুষকে একই সঙ্গে দুটি ক্ষেত্রে বিচরণ করতে হয়। সেই দুটির মধ্যে এমন বৈপরীত্য আছে যে তারই সামঞ্জস্য সংঘটনের দুরূহ সাধনায় মানুষকে চিরজীবন নিযুক্ত থাকতে হয়। সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, ধর্ম্মনীতির ভিতর দিয়ে মানুষের উন্নতির ইতিহাস হচ্চে এই সামঞ্জস্যসাধনেরই ইতিহাস। যতকিছু অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান শিক্ষা দীক্ষা সাহিত্য শিল্প সমস্তই হচ্চে মানুষের দ্বন্দ্বসমন্বয়চেষ্টার বিচিত্র ফল।

দ্বন্দ্বের মধ্যেই যত দুঃখ, এবং এই দুঃখই হচ্চে উন্নতির মূলে। জন্তুদের ভাগ্যে পাকস্থলীর সঙ্গে তার খাবার জিনিষের বিচ্ছেদ ঘটে গেছে—এই দুটোকে এক করবার জন্যে বহু দুঃখে তার বুদ্ধিকে শক্তিকে সর্ব্বদাই জাগিয়ে রেখেছে; গাছ নিজের খাবারের মধ্যেই দাঁড়িয়ে থাকে—ক্ষুধার সঙ্গে আহারের সামঞ্জস্যসাধনের জন্যে তাকে নিরন্তর দুঃখ পেতে হয় না। জন্তুদের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষের বিচ্ছেদ ঘটে গেছে—এই বিচ্ছেদের সামঞ্জস্যসাধনের দুঃখ থেকে কত বীরত্ব ও কত সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হচ্চে তার আর সীমা নেই; উদ্ভিদরাজ্যে যেখানে স্ত্রীপুরুষের ভেদ নেই, অথবা যেখানে তার মিলনসাধনের জন্যে বাইরের উপায় কাজ করে সেখানে কোনো দুঃখ নেই, সমস্ত সহজ।

মনুষ্যত্বের মূলে আর একটি প্রকাণ্ড দ্বন্দ্ব আছে; তাকে বলা যেতে পারে প্রকৃতি এবং আত্মার দ্বন্দ্ব। স্বার্থের দিক্ এবং পরমার্থের দিক্, বন্ধনের দিক এবং মুক্তির দিক, সীমার দিক এবং অনন্তের দিক—এই দুইকে মিলিয়ে চল্‌তে হবে মানুষকে।

যতদিন ভাল করে মেলাতে না পারা যায় ততদিনকার যে চেষ্টার দুঃখ, উত্থান পতনের দুঃখ সে বড় বিষম দুঃখ। যে ধর্ম্মের মধ্যে মানুষের এই দ্বন্দ্বের সামঞ্জস্য ঘট্‌তে পারে সেই ধর্ম্মের পথ মানুষের পক্ষে কত কঠিন পথ। এই ক্ষুরধারশাণিত দুর্গম পথেই মানুষের যাত্রা;—একথা তার বলবার জো নেই যে এই দুঃখ আমি এড়িয়ে চল্‌ব। এই দুঃখকে যে স্বীকার না করে তাকে দুর্গতির মধ্যে নেমে যেতে হয়;—সেই দুর্গতি যে কি নিদারুণ পশুরা তা কল্পনাও করতে পারে না। কেননা, পশুদের মধ্যে এই দ্বন্দ্বের দুঃখ নেই—তারা কেবলমাত্র পশু। তারা কেবলমাত্র শরীর ধারণ এবং বংশবৃদ্ধি করে চল্‌বে এতে তাদের কোনো ধিক্কার নেই। তাই তাদের পশুজন্ম একেবারে নিঃসঙ্কোচ।

মানবজন্মের মধ্যে পদে পদে সঙ্কোচ। শিশুকাল থেকেই মানুষকে কত লজ্জা, কত পরিতাপ, কত আবরণ আড়ালের মধ্যে দিয়েই চল্‌তে হয়—তার আহার বিহার তার নিজের মধ্যেই কত বাধাগ্রস্ত—নিতান্ত স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলিকেও সম্পূর্ণ স্বীকার করা তার পক্ষে কত কঠিন, এমন কি, নিজের নিত্য-

সহচর শরীরকেও মানুষ লজ্জায় আচ্ছন্ন করে রাখে।

কারণ মানুষ যে পশু এবং মানুষ দুইই। একদিকে সে আপনার আর একদিকে সে বিশ্বের। একদিকে তার সুখ, আর একদিকে তার মঙ্গল। সুখভোগের মধ্যে মানুষের সম্পূর্ণ অর্থ পাওয়া যায় না। গর্ভের মধ্যে ভ্রূণ আরামে থাকে এবং সেখানে তার কোনো অভাব থাকে না কিন্তু সেখানে তার সম্পূর্ণ তাৎপর্য্য পাওয়া যায় না। সেখানে তার হাত পা চোখ কান মুখ সমস্তই নিরর্থক। যদি জান্‌তে পারি যে এই ভ্রূণ একদিন ভূমিষ্ঠ হবে তাহলেই বুঝতে পারি এ সমস্ত ইন্দ্রিয় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তার কেন আছে। এই সকল আপাত অনর্থক অঙ্গ হতেই অনুমান করা যায়, অন্ধকার বাসই এর চরম নয়, আলোকেই এর সমাপ্তি, বন্ধন এর পক্ষে ক্ষণকালীন এবং মুক্তিই এর পরিণাম। তেমনি মনুষ্যত্বের মধ্যে এমন কতকগুলি লক্ষণ আছে কেবলমাত্র স্বার্থের মধ্যে সুখভোগের মধ্যে যার পরিপূর্ণ অর্থই পাওয়া যায় না—উন্মুক্ত মঙ্গললোকেই যদি তার পরিণাম না হয় তবে সেই সমস্ত স্বার্থবিরোধী প্রবৃত্তির কোনো অর্থই থাকে না। যে সমস্ত প্রবৃত্তি মানুষকে নিজের দিক থেকে দুর্নিবারবেগে অন্যের দিকে নিয়ে যায়, সংগ্রহের দিক থেকে ত্যাগের দিকে নিয়ে যায়, এমন কি, জীবনে আসক্তির দিক থেকে মৃত্যুকে বরণের দিকে নিয়ে যায়—যা মানুষকে বিনা প্রয়োজনে বৃহত্তর জ্ঞান ও মহত্তর চেষ্টার দিকে অর্থাৎ ভূমার দিকে আকর্ষণ করে, যা মানুষকে বিনা কারণেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দুঃখকে স্বীকার করতে, সুখকে বিসর্জ্জন করতে প্রবৃত্ত করে—তাতেই কেবল জানিয়ে দিতে থাকে, সুখে স্বার্থে মানুষের স্থিতি নেই—তার থেকে নিষ্ক্রান্ত হবার জন্যে মানুষকে বন্ধনের পর বন্ধন ছেদন করতে হবে—মঙ্গলের সম্বন্ধে বিশ্বের সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে মানুষকে মুক্তিলাভ করতে হবে।

এই স্বার্থের আবরণ থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়াই হচ্চে স্বার্থ ও পরমার্থের সামঞ্জস্যসাধন। কারণ স্বার্থের মধ্যে আবৃত থাক্‌লেই তাকে সত্যরূপে পাওয়া যায় না। স্বার্থ থেকে যখন আমরা বহির্গত হই তখনই আমরা পরিপূর্ণরূপে স্বার্থকে লাভ করি। তখনি আমরা আপনাকে পাই বলেই অন্য সমস্তকেই পাই। গর্ভের শিশু নিজেকে জানেনা বলেই তার মাকে জানেনা—যখনি মাতার মধ্য হতে মুক্ত হয়ে সে নিজেকে জানে তখনি সে মাকে জানে।

সেই জন্যে যতক্ষণ স্বার্থের নাড়ির বন্ধন ছিন্ন করে মানুষ এই মঙ্গললোকের মধ্যে জন্মলাভ না করে ততক্ষণ তার বেদনার অন্ত নেই। কারণ, যেখানে তার চরম স্থিতি নয়, যেখানে সে অসম্পূর্ণ, সেখানেই চিরদিন স্থিতির চেষ্টা করতে গেলেই তাকে কেবলি টানাটানির মধ্যে থাক্‌তে হবে। সেখানে সে যা গড়ে তুল্‌বে তা ভেঙে পড়বে, যা সংগ্রহ করবে তা হারাবে এবং যাকে সে সকলের চেয়ে লোভনীয় বলে কামনা করবে তাই তাকে আবদ্ধ করে ফেল্‌বে।

তখন কেবল আঘাত, কেবল আঘাত। তখন পিতার কাছে আমাদের কামনা এই—মা মা হিংসীঃ—আমাকে আঘাত কোরোনা, আমাকে আর আঘাত কোরোনা। আমি

এমন করে কেবলি দ্বিধার মধ্যে আর বাঁচিনে।

কিন্তু এ পিতারই হাতের আঘাত—এ মঙ্গললোকের আকর্ষণেরই বেদনা। নইলে পাপে দুঃখ থাকত না—পাপ বলেই কোনো পদার্থ থাকত না,—মানুষ পশুদের মত অপাপ হয়ে থাকত। কিন্তু, মানুষকে মানুষ হতে হবে বলেই এই দ্বন্দ্ব, এই বিদ্রোহ, বিরোধ, এই পাপ, এই পাপের বেদনা।

তাই জন্যে মানুষ ছাড়া এ প্রার্থনা কেউ কোনোদিন করতে পারে না—'বিশ্বানি দেব সবিত দুরিতানি পরাসুব'—হে দেব, হে পিতা, আমার সমস্ত পাপ দূর করে দাও! এ ক্ষুধামোচনের প্রার্থনা নয়, এ প্রয়োজন সাধনের প্রার্থনা নয়—মানুষের প্রার্থনা হচ্ছে আমাকে পাপ হতে মুক্ত কর। তা না করলে আমার দ্বিধা ঘুচবে না—পূর্ণতার মধ্যে আমি ভূমিষ্ঠ হতে পারচিনে—হে অপাপবিদ্ধ নির্ম্মল পুরুষ, তুমিই যে আমার পিতা এই বোধ আমার সম্পূর্ণ হতে পারচে না—তোমাকে সত্যভাবে নমস্কার করতে পারচিনে।

'যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব'—যা ভাল তাই আমাদের দাও। মানুষের পক্ষে এ প্রার্থনা অত্যন্ত কঠিন প্রার্থনা। কেননা মানুষ যে দ্বন্দ্বের জীব—ভাল যে মানুষের পক্ষে সহজ নয়। তাই, যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব, এ আমাদের ত্যাগের প্রার্থনা দুঃখের প্রার্থনা—নাড়ি ছেদনের প্রার্থনা। পিতার কাছে এই কঠোর প্রার্থনা মানুষ ছাড়া আর কেউ করতে পারেনা।

পিতানোঽসি, পিতা নো বোধি, নমস্তেঽস্তু—যজুর্বেদের এই মন্ত্রটি নমস্কারের প্রার্থনা। তুমি আমাদের পিতা, তোমাকে আমাদের পিতা বলে যেন বুঝি এবং তোমাতে আমাদের নমস্কার যেন সত্য হয়।

অর্থাৎ আমার দিকেই সমস্ত টানবার যে একটা প্রবৃত্তি আছে, সেটাকে নিরস্ত করে দিয়ে তোমার দিকেই সমস্ত যেন নত করে সমর্পণ করে দিতে পারি। তাহলেই যে দ্বন্দ্বের অবসান হয়ে যায়—আমার যেখানে সার্থকতা সেইখানেই পৌঁছতে পারি। সেখানে যে পৌঁচেছি সে কেবল তোমাকে নমস্কারের দ্বারাই চেনা যায়;—সেখানে কোনো অহঙ্কার টিঁকতেই পারে না—ধনী সেখানে দরিদ্রের সঙ্গে তোমার পায়ের কাছে এসে মেলে, তত্ত্বজ্ঞানী সেখানে মূঢ়ের সঙ্গেই তোমার পায়ের কাছে এসে নত হয়;—মানুষের দ্বন্দ্বের যেখানে অবসান সেখানে তোমাকে পরিপূর্ণ নমস্কার, অহঙ্কারের একান্ত বিসর্জ্জন।

এই নমস্কারটি কেমন নমস্কার?

নমঃ সম্ভবায় চ ময়োভবায় চ,
নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ,
নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।

যিনি সুখকর তাঁকেও নমস্কার যিনি মঙ্গলকর তাঁকেও নমস্কার—যিনি সুখের আকর তাঁকেও নমস্কার, যিনি মঙ্গলের আকর তাঁকেও নমস্কার; যিনি মঙ্গল তাঁকে নমস্কার যিনি চরম মঙ্গল তাঁকে নমস্কার।

সংসারে পিতা ও মাতার ভেদ আছে কিন্তু বেদের মন্ত্রে যাঁকে পিতা বলে নমস্কার করচে তাঁর মধ্যে পিতা ও মাতা দুইই এক হয়ে আছে। তাই তাঁকে কেবল পিতা বলেছে। সংস্কৃত সাহিত্যে দেখা গেছে পিতরৌ

বল্‌তে পিতা ও মাতা উভয়কেই একত্রে বুঝিয়েছে।

মাতা পুত্রকে একান্ত করে দেখেন—তাঁর পুত্র তাঁর কাছে আর সমস্তকে অতিক্রম করে থাকে। এই জন্যে তাকে দেখা শোনা তাকে খাওয়ানো পরানো সাজানো নাচানো তাকে সুখী করানোতেই মা মুখ্যভাবে নিযুক্ত থাকেন। গর্ভে সে যেমন তাঁর নিজের মধ্যে একমাত্ররূপে পরিবেষ্টিত হয়ে ছিল, বাইরেও তিনি যেন তার জন্যে একটি বৃহত্তর গর্ভবাস তৈরি করে তুলে পুত্রের পুষ্টি ও তুষ্টির জন্যে সর্ব্বপ্রকার আয়োজন করে থাকেন। মাতার এই একান্ত স্নেহে পুত্র স্বতন্ত্রভাবে নিজের একটি বিশেষ মূল্য যেন অনুভব করে।

কিন্তু পিতা পুত্রকে কেবলমাত্র তাঁর ঘরের ছেলে করে তাকে একটি সঙ্কীর্ণ পরিধির কেন্দ্রস্থলে একমাত্র করে গড়ে তোলেন না। তাকে তিনি সকলের সামগ্রী, তাকে সমাজের মানুষ করে তোলবার জন্যেই চেষ্টা করেন। এই জন্যে তাকে সুখী করে তিনি স্থির থাকেন না, তাকে দুঃখ দিতে হয়। সে যদি এক মাত্র হত নিজেতেই নিজে সম্পূর্ণ হত তাহলে সে যা চায় তাই তাকে দিলে ক্ষতি হত না; কিন্তু তাকে সকলের সঙ্গে মিলনের যোগ্য করতে হলে তাকে তার অনেক কামনার সামগ্রী থেকে বঞ্চিত করতে হয়—তাকে অনেক কাঁদাতে হয়। ছোট হয়ে না থেকে বড় হয়ে ওঠবার যে দুঃখ তা তাকে না দিলে চলে না। বড় হয়ে সকলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তবেই সে যে সত্য হবে, তার সমস্ত শরীর ও মন, জ্ঞান, ভাব ও শক্তি সমগ্রভাবে সার্থক হবে এবং সেই সার্থকতাতেই সে যথার্থ মুক্তি-লাভ করবে—এই কথা বুঝে কঠোর শিক্ষার ভিতর দিয়ে পুত্রকে মানুষ করে তোলাই পিতার কর্ত্তব্য হয়ে ওঠে।

ঈশ্বরের মধ্যে এই মাতা পিতা এক হয়ে আছে। তাই দেখতে পাই আমি সুখী হব বলে জগতে আয়োজনের অন্ত নেই। আকাশের নীলিমা এবং পৃথিবীর শ্যামলতায় আমাদের চোখ জুড়িয়ে যায়—যদি নাও যেত তবু এই জগতে আমাদের বাস অসম্ভব হত না। ফলে শস্যে আমাদের রসনার তৃপ্তি হয়—যদি নাও হত তবু প্রাণের দায়ে আমাদের পেট ভরাতেই হত। জীবনধারণে কেবল যে আমাদের বা প্রকৃতির প্রয়োজন তা নয়, তাতে আমাদের আনন্দ; শরীর চালনা করতে আমাদের আনন্দ, চিন্তা করতে আমাদের আমাদের আনন্দ, কাজ করতে আমাদের আনন্দ, প্রকাশ করতে আমাদের আনন্দ। আমাদের সমস্ত প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্য্য এবং রসের যোগ আছে।

তাই দেখ্‌তে পাই বিশ্বচেষ্টার বিচিত্র-ব্যাপারের মধ্যে এ চেষ্টাও নিয়ত রয়েছে, যে, জগৎ চল্‌বে, জীবন চল্‌বে এবং সেই সঙ্গে আমি পদে পদে খুসি হতে থাকব। নক্ষত্র-লোকের যে সমস্ত প্রয়োজন তা যতই প্রকাণ্ড প্রভূত ও আমার জীবনের পক্ষে যতই সুদূরবর্ত্তী হোক্ না কেন, তবুও নিশীথের আকাশে আমার কাছে মনোহর হয়ে ওঠাও তার একটা কাজ। সেই জন্য অতবড় অচিন্তনীয় বিরাট্ কাণ্ডও প্রয়োজনবিহীন গৃহসজ্জার মত হয়ে উঠে—আমাদের ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ আকাশমণ্ডপটিকে চুম্‌কির কাজে খচিত করে তুলেছে।

এমনি পদে পদে দেখ্‌তে পাচ্চি জগতের রাজা আমাকে খুসি করবার জন্য তাঁর বহুলক্ষ যোজনান্তরেরও অনুচর পরিচরদের হুকুম দিয়ে রেখেছেন ; তাদের সকল কাজের মধ্যে এটাও তারা ভুল্‌তে পারে না। এ জগতে আমার মূল্য সামান্য নয়।

কিন্তু সুখের আয়োজনের মধ্যেই যখন নিঃশেষে প্রবেশ করতে চাই—তখন আবার কে আমাদের হাত চেপে ধরে—বলে, যে, তোমাকে বদ্ধ হতে দেব না। এই সমস্ত সুখের সামগ্রীর মধ্যে ত্যাগী হয়ে মুক্ত হয়ে তোমাকে থাক্‌তে হবে তবেই এই আয়োজন সার্থক হবে। শিশু যেমন গর্ভ থেকে মুক্ত হয়ে তবেই যথার্থভাবে সম্পূর্ণভাবে সচেতনভাবে তার মাকে পায় তেমনি এই সমস্ত সুখের বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যখন মঙ্গললোকে মুক্তিলোকে ভূমিষ্ঠ হবে তখনই সমস্তকে পরিপূর্ণরূপে পাবে। যখনি আসক্তির পথে যাবে তখনই সমগ্রকে হারাবার পথেই যাবে—বস্তুকে যখনি চোখের উপরে টেনে আনবে তখনি তাকে আর দেখ্‌তে পাবে না, তখনি চোখ অন্ধ হয়ে যাবে।

আমাদের পিতা সুখের মধ্যে আমাদের বদ্ধ হতে দেন না, কেননা সমগ্রের সঙ্গে আমাকে যুক্ত হতে হবে—এবং সেই যোগের মধ্য দিয়েই তাঁর সঙ্গে আমার সত্য যোগ।

এই, সমগ্রের সঙ্গে যাতে আমাদের যোগ সাধন করে তাকেই বলে মঙ্গল। এই মঙ্গল বোধই মানুষকে কিছুতেই সুখের মধ্যে স্থির থাক্‌তে দিচ্চেনা—এই মঙ্গল বোধই পাপের বেদনায় মানুষকে এই কান্না কাঁদাচ্চে—মা মা হিংসীঃ, বিশ্বানি দেব সবিত দুরিতানি পরাসুব, যদ্‌ভদ্রং তন্ন আসুব। সমস্ত খাওয়া পরার কান্না ছাড়িয়ে এই কান্না উঠেছে—আমাকে দ্বন্দ্বের মধ্যে রেখে আর আঘাত কোরো না, আমাকে পাপ থেকে মুক্ত কর ; আমাকে সম্পূর্ণ তোমার মধ্যে আনন্দে নত করে দাও।

তাই মানুষ এই বলে নমস্কারের সাধনা করচে, নমঃ সম্ভবায় চ ময়োভবায় চ—সেই সুখকর যে তাঁকেও নমস্কার,আর সেই কল্যাণকর যে তাঁকেও নমস্কার— একবার মাতারূপে তাঁকে নমস্কার, একবার পিতারূপে তাঁকে নমস্কার। মানবজীবনের দ্বন্দ্বের দোলার মধ্যে চড়ে যেদিকেই হেলি সেইদিকে তাঁকেই নমস্কার করতে শিখ্‌তে হবে—তাই বলি, নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ—সুখের আকর যিনি তাঁকেও নমস্কার, মঙ্গলের আকর যিনি তাঁকেও নমস্কার—মাতা যিনি সীমার মধ্যে বেঁধে ধারণ করচেন পালন করচেন তাঁকেও নমস্কার, আর পিতা যিনি বন্ধন ছেদন করে অসীমের মধ্যে আমাদের পদে পদে অগ্রসর করচেন তাঁকেও নমস্কার। অবশেষে দ্বিধা অবসান হয় যখন সব নমস্কার একে এসে মেলে —তখন নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ—তখন সুখে মঙ্গলে আর ভেদ নেই বিরোধ নেই—তখন শিব, শিব, শিব, তখন শিব এবং শিবতর —তখন পিতা এবং মাতা একই—তখন একমাত্র পিতা ;—এবং দ্বিধাবিহীন নিস্তব্ধ প্রশান্ত মানবজীবনের একটিমাত্র চরম নমস্কার,

নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।

নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত ঊর্দ্ধগামী একাগ্র এই নমস্কার—অনুত্তরঙ্গ মহাসমুদ্রের মত দশদিগন্তব্যাপী বিপুল এই নমস্কার—

নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চয়ন।

যবদ্বীপে।

তসারী ও ব্রোমো।

মঙ্গলবার ১৬ ডিসেম্বর

আমাকে কেহ কেহ আগ্রহাতিশয় সহকারে পরামর্শ দিয়াছিলেন, যেন আমি পূর্ব্বপ্রান্তস্থ আগ্নেয় গিরি-প্রদেশ না দেখিয়া, ব্রোমোয় আরোহণ না করিয়া, যবদ্বীপ হইতে প্রস্থান না করি। তাহা করিতে হইলে, যবদ্বীপের প্রধান প্রাচ্য বন্দর সোরাবয়া হইতে যাত্রা করিতে হয়, এবং প্রথমেই প্যাসো রোয়ানের রেল-গাড়ী ধরিতে হয়।

প্যাসোরোয়ানের ষ্টেশনে, নানা দেশের পর্য্যটকেরা একত্র মিলিত হইয়াছে ঃ— কতকগুলি ওলন্দাজ রাজপুরুষ; কতকগুলি স্থূলকায় ওলন্দাজ-রমণী; কতকগুলি যাবা-দেশীয় পুরুষ ও যাবা-দেশীয় রমণী; একজন মেটে ফিরিঙ্গি ষ্টেশান মাষ্টার; কতকগুলি সুশ্রী ফিরিঙ্গী-রমণী,—শ্যামবর্ণ, সুন্দর কালো চুল, হৃদয়ের প্রচণ্ড আবেগসূচক বড় বড় চোখ্; কতকগুলি চীনে, কতকগুলি আরব; একটি ক্ষুদ্রকায় বিবাহিতা চীন-রমণী;— তাহার ফিকা নীল ও গোলাপী রঙ্গের পরিচ্ছদ—উদ্ভট্ ধরণের নক্সা-কাজে আচ্ছন্ন।

প্যাসোরোয়ানে,—পোয়েস্পোয়ে যাইবার জন্য একটা গাড়ী লইলাম। এই ক্ষুদ্র গাড়ীটি একটা সমভূমি বড় রাস্তার উপর দয়া খুব দ্রুত চলিতে লাগিল। রাস্তার দুই ধারে সুন্দর বৃক্ষশ্রেণী;—আমার পাণ্ডা বলিলেন, এই গাছগুলি তেঁতুল গাছ: —এই চমৎকার সুশ্যামল তরুমণ্ডপের ছায়ায়,—প্রখর সূর্য্যকিরণ সত্ত্বেও—পথটি অন্ধকারাচ্ছন্ন; গথিক ক্যাথিড্রালে প্রবেশ করিলে যেরূপ মনের ভাব হয়, এইখানে আসিয়াও যেন আমার সেইরূপ হইল। এখানকার চুন-কাম-করা কাঠের বাড়ীগুলি, যাবাদ্বীপের পশ্চিম-অঞ্চল অপেক্ষা, বেশী আদিম ধরণের—অনেকটা কুটীরের কাছা-কাছি; বিচিত্র ধরণে আড়াআড়ি বাঁশ দিয়া, উচ্চ দ্বার গঠিত হইয়াছে, মনে হয় যেন ভঙ্গুর বিজয়-তোরণ; কোথাও-কোথাও, ইহার গঠনে বেশ একটু শিল্প-সৌন্দর্য্যেরও পরিচয় পাওয়া যায়। গৃহের অঙ্গনে, পায়রার খোপ্-যুক্ত উচ্চ বংশদণ্ড খাড়া হইয়া আছে। মধ্যে মধ্যে তালীবন। এখানে বড়ই গরম। এ এক রকম গুরুভার উত্তাপ, যাহার প্রভাবে মানুষ, পশুপক্ষী, গাছপালা, সমস্ত পদার্থই যেন ঘুমাইয়া পড়ে। বেশ অনুভব করা যায়— আমরা আমাদের য়ুরোপ হইতে বহু দূরে আসিয়াছি—প্রকৃতির উষ্ণপ্রধান রাজ্যে আসিয়াছি, কোন একটা সাগর দ্বীপের গভীর প্রদেশে আসিয়া পড়িয়াছি।

পাস্রেপান নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামে, আমাদের গাড়ী উচ্চে উঠিতে আরম্ভ করিল। এই সময়ে, যাইতে যাইতে অনেক দেশীয় লোক দেখিতে পাইলাম;—তাহারা ছোট ছোট টাট্টু লইয়া যাইতেছে, কিংবা ভারী-

ভারী কাঠের গরুর গাড়ী হাঁকাইয়া চলিয়াছে। এই সকল টাট্টু ঘোড়া, ও শকটের উপর শাকসব্‌জি বোঝাই করা,—এইগুলা আমাদের পরিচিত শাক্‌সব্‌জি। এই অঞ্চলের পাহাড় পর্ব্বতের উপর, কোন বিশেষ-জাতীয় লোক, এই সব শাক্‌-সব্‌জি চাষ করিয়া সমস্ত দেশে সরবরাহ করে; ইহাদের নাম তেঙ্গেরেস্‌; ইহারা যবদ্বীপের শেষ হিন্দু-উপনিবেশী; কোন এক সময়ে ইহারা মুসলমান হইয়া যায়। উহাদের ধর্ম্মদ্বেষী মুসলমানদিগের নিকট হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়া, উহারা স্বকীয় পুরোহিতদিগের নিকট হইতে এই আদেশ পায় যে তাহারা যেন কখন ধানের চাষ না করে। পুরোহিতদিগের এই আশঙ্কা হইয়াছিল পাছে ধান চাষ করিতে গিয়া উহারা ভূমিতে আবদ্ধ হইয়া পড়ে এবং এইরূপে বিজেতাদিগের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। এক্ষণে তেঙ্গেরেস্‌রা পাহাড় পর্ব্বতের উপর বেশ শান্তিতে আছে; সেই পুরাতন আদেশটির প্রকৃত তাৎপর্য্য বিলুপ্ত হইয়াছে, তবু এখনও তাহারা সেই আদেশ পালন করিয়া থাকে; ধান চাষ না করিয়া, শাক্‌সব্‌জীর চাষ করে;—যাহা যাবাতে সচরাচর দেখা যায় না।

একটি ছোট মেয়ে, রাস্তায় কলা বিক্রী করিতেছে; আমি তাহার কাছে গেলাম; প্রথমে সে ভয় পাইয়া পলাইল। পরে, একটু সাহস পাইয়া সে আমার নিকটে আসিল। কয়েক পয়সায় আমাকে সে ত্রিশটা কলা দিল। আমি তাহা আমার শকট-বাহকের সহিত ভাগ করিয়া খাইলাম। এখানকার জীবন যাত্রার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, য়ুরোপ অপেক্ষা অনেক সস্তা।

পোস্‌পোয় আসিয়া আমার গাড়ী থামিল। এখন প্রাতরাশের সময়। একজন স্থূলকায় য়ুরোপীয় হোটেল-কর্ত্তা আমার দিকে অগ্রসর হইল। আমি ইংরাজীতে তাহাকে আমার জন্য আহার প্রস্তুত করিতে বলিলাম। সে আমাকে ফরাসীতে উত্তর দিল,—বলিল, সে ইংরাজি জানে না। সে একজন সুইস্‌ জর্ম্মাণ, ভারত-সৈন্যদলের অন্তর্গত একজন সৈনিক; সৈনিক কার্য্য হইতে অবসর প্রাপ্ত হইয়া যবদ্বীপে অবস্থিতি করিতেছে। তাহার টেবিলের উপর দুইখানা ফরাসী ও জর্ম্মাণ সাময়িক পত্র রহিয়াছে। প্যাসেরোয়ানের ওলন্দাজী অধ্যয়ন-সমাজ, এই পত্রদ্বয় তাহাকে ধার দিয়াছে:—"লা সুভেল রেভিউ" ও "ডুশে রুন্দশাউ"। একটু সঙ্কোচের ভাবে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, দেশীয়দিগের সহিত একত্র আহার করিতে আমার আপত্তি আছে কি না। "কোন আপত্তি নাই!" দেশীয় ও য়ুরোপীয় একত্র আহার করিতেছে—এ দৃশ্য এখানে এত বিরল যে, আমি বিস্মিত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—টেবিলে আমার পাশে ভোজনে কে কে বসিবে। —"বোর্নিয়োর দুইজন রাজকুমার ও দুইজন কুমার-রাণী! এই মহাদ্বীপের প্রধান সুলতানের ঔরসজাত পুত্রদ্বয় এবং উহাদের পত্নী! উঁহারা য়ুরোপ ভ্রমণ করিয়া সম্প্রতি প্রত্যাগত হইয়াছেন, হল্যাণ্ডের রাণীর নিকট হইতে আদর-অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হইয়াছেন..."—রাজকুমারদ্বয়, রাণীদ্বয় ও আমি—আমরা টেবিলে আসিয়াই

পরস্পরকে দস্তুরমত নতশিরে নমস্কার করিলাম। উঁহাদের শ্যামলবর্ণ; মুখে বেশ একটা বুদ্ধির ভাব; সাদা কাপড়ের পরিচ্ছদ,—একরকম নূতন ধরণে পরিধান করিয়াছেন, সম্পূর্ণ য়ুরোপীয়ও নহে, সম্পূর্ণ দেশীয়ও নহে। উঁহার মধ্যে বয়ঃজ্যেষ্ঠা রাণীর মুখের অবয়বগুলি খুব পরিস্ফুট, একটু কপি-ধরণের; যে সর্ব্বাপেক্ষা কনিষ্ঠা,—ইহার মধ্যেই স্থূল হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু দেখিতে সুশ্রী। এই রাজদম্পতিদ্বয় য়ুরোপীয় ধরণে আহার করেন, টেবিলে বসিয়া বেশ শিষ্টজনোচিত ব্যবহার করেন। একমাত্র আমিই কেবল টেবিলের চাদরে দাগ লাগাইয়াছিলাম। রাজকুমারদ্বয়, য়ুরোপীয় ভাষার মধ্যে কেবল ওলন্দাজী ভাষাতেই কথা কহেন: এখন আমার দুঃখ হইতেছে, কেন আমি ওলন্দাজী ভাষা শিখি নাই!

পোস্‌পো হইতে ডোসারীতে ঘোড়ায় চড়িয়া গেলাম। এখানকার দৃশ্য কতকটা আমাদের পার্ব্বত্য প্রদেশের ন্যায়: কদলী বৃক্ষ, 'পর্ণ'-তরু- ইহাদের সহিত আমাদের দেশের গাছপালাও মিশিয়াছে। একপ্রকার নির্য্যাসস্রাবী চিরহরিৎ বৃক্ষ এখানে প্রায়ই দেখা যায়,—তাহার ফিঁকা সবুজ রঙ্গের দীর্ঘ পত্রগুলি ঝুলিয়া পড়িয়াছে। কতকগুলা ছাগল, কতকগুলা গরু—উঁহাদের গলায় ছোট ছোট কাঠের ঘণ্টা। অনেকগুলা হলদে-ঠোঁট বড় বড় কালো পাখী গরুদের কাঁধের উপর বসিয়া আছে, আমার ঘোড়া দেখিয়াই উঁহারা উড়িয়া গেল···আকাশে মেঘ জমিয়াছে, বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। পর্ব্বতের মধ্যে, বজ্রের ভীষণ নিনাদ প্রতিধ্বনিত হইতেছে। মধ্যে মধ্যে সচল মেঘগুলা আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। আমি প্রায় চারিটার সময় ডোসারীতে পৌঁছিলাম।

ডোসারী একটা পার্ব্বত্য আড্ডা। পর্ব্বতটা ১৭১৭ metre উচ্চ। যবদ্বীপের উত্তাপে অবসন্ন হইয়া ওলন্দাজেরা আরাম বিরামের জন্য এইখানে আসে। একটি গ্রামে দেশীয়দিগের ঘনসন্নিবিষ্ট গৃহসমূহ, সেই গ্রামের পার্শ্বদেশে স্বাস্থ্যনিবাসের হোটেল। উৎকৃষ্ট হোটেল; ভারতীয় ওলন্দাজরাজ্যের মধ্যে এরূপ হোটেল আর নাই—এখানকার হাওয়া বেশ ঠাণ্ডা। সাদা কাপড়ের পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া এখানে গরম কাপড় পরিতে হয়। এখানকার ঘরের জান্‌লায় সাশি আছে; বিছানায় দুইটা করিয়া চাদর, কতকগুলা কম্বল, একটা পাশের বালিশ—ঠিক্ বিলাতের মত।

রাত্রিতে, ভোজনের পূর্ব্বে, হোটেলবাসীরা, তাহাদের নিত্যনিয়মিত জোলাপ সেবন করিল—আদা ও কোন তিক্ত দ্রব্যের মিশ্রণে এই জোলাপ প্রস্তুত হইয়া থাকে। জোলাপ লইয়া তাহার পর উহারা তাস ও বিলিয়ার্ড খেলিতে আরম্ভ করিল। এই দেশের ওলন্দাজী সংবাদপত্র সকল আমি পড়িতে লাগিলাম। বিলাতের সমস্ত খবর ইহাতে আছে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। কেননা, ভারতীয় ইংরাজি সংবাদপত্রগুলা বিলাতের সংবাদ ভাল করিয়া কিছুই দেয় না। ইঙ্গ ভারতীয় রাজ্য, ফরাসী দেশ সম্বন্ধে বড় একটা খোঁজখবর রাখে না, কিন্তু মনে হয় ফরাসী দেশ, এখানকার সংবাদপত্রের একটা বৃহৎ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

এখানকার সংবাদপত্রসমূহ, ফরাসী রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে দীর্ঘ দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া থাকে। সামারঙ্গে প্রকাশিত Lokomotief পত্রের এক সংখ্যা আমার হাতে পড়িল; তাহাতে Millerand কৃত "প্রকৃত ব্যবহারোপযোগী সাম্যমূলক সমাজতন্ত্র"—গ্রন্থের খুব প্রশংসা করিয়াছে। ফরাসীদিগের প্রতি যাবার ওলন্দাজদিগের যে সহানুভূতি আছে উহার বিজ্ঞাপন দেখিলেও বুঝা যায়:—"প্রকৃত ফরাসী উৎপন্ন দ্রব্য, ফরাসী জাহাজে আসিয়াছে"—একজন পরিচ্ছদের দোকান্‌দার এইরূপ বিজ্ঞাপন দিয়াছে...এবং হোটেলের যে বৈঠকখানায় বসিয়া আমি এই স্থানীয় সংবাদপত্রাদি পাঠ করিয়া থাকি, সেই ঘরটি ফরাসী মুদ্রণ-চিত্রের দ্বারা বিভূষিত। আমাদের সাংগ্রামিক চিত্রকরগণ ফরাসী-জর্ম্মাণ যুদ্ধের যে সকল বিষাদময় দৃশ্য অঙ্কিত করিয়াছেন—ইহা সেই সব চিত্র।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

হিউয়েনসাং প্রণীত সিউ-ইউ-কি।

(Buddhist Records of the Western World)

"His book is a treasure-house of accurate information, indispensable to every student of Indian antiquity and has done more than any archaeological discovery to render possible the remarkable resuscitation of lost Indian history which has recently been effected."—Mr. Vincent Smith in "Early History of India".

সিই-ইউ-কি প্রণেতার সংক্ষিপ্ত জীবনী।

৬০৩ খৃষ্টাব্দে চীনের অন্তর্গত হোনান প্রদেশে চিন লিউ নগরে এই মনস্বী পরিব্রাজক জন্মগ্রহণ করেন। হিউয়েনসাংয়ের জ্যেষ্ঠ আরও তিন সহোদর ছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় ভ্রাতা চাংসি তাঁহাকে অল্প বয়সেই শিক্ষার্থে লোইয়াং সহরে লইয়া যান এবং ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে, হিউয়েনসাং শ্রমণ ব্রত গ্রহণ করেন। বিংশ বৎসরে তিনি ভিক্ষু হয়েন ও কিছু দিন পরেই তিনি উপযুক্ত শিক্ষকের অনুসন্ধানে রঙ্গী হইয়া চাঙ্গাগানে উপনীত হন। এই স্থলেই, তিনি ভারতবর্ষে যাইয়া অধ্যয়ন করিবেন এইরূপ স্থিরসংকল্প হইয়া অন্য একটী ভিক্ষুর সহিত ছাব্বিশ বৎসর বয়সে চাঙগান পরিত্যাগ করেন ও ৬২৯ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে পৌছেন। ৬২৯ হইতে ৬৪৫ পর্য্যন্ত তিনি ভারতবর্ষেই অতিবাহিত করেন। পরে স্বদেশে পৌছিয়া ৬৬১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি ভারত হইতে নীত পুস্তকাদি অনুবাদে ব্যাপৃত থাকেন। ৬৬৪ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন। ভারতবর্ষ

বিজ্ঞাপন।

পৃথিবীর ইতিহাস

অন্যূন ৩০ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে। শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত। খিরেরতলা, হাওড়া।

হইতে প্রত্যাগমনকালীন হিউয়েনসাং নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়া যান :—

(১) তথাগতের শরীরের পাঁচ শত প্রকারের স্মরণ চিহ্ন (relics)

(২) স্বচ্ছ পাদদানের উপর স্থাপিত বুদ্ধদেবের ২টী সুবর্ণ প্রতিমূর্ত্তি

(৩) স্বচ্ছ পাদদানের উপর স্থাপিত চন্দন কাষ্ঠ নির্ম্মিত ৩টী বুদ্ধ মূর্ত্তি

(৪) স্বচ্ছ পাদ দানের উপর স্থাপিত বুদ্ধদেবের রৌপ্য মূর্ত্তি

(৫) মহাযান সংক্রান্ত ১২৪ খানি সুত্র গ্রন্থ।

(৬) অন্যান্য ৬২০ খানি পুস্তকের দপ্তর। ইহা বহন করিতে দ্বাবিংশটী অশ্বের প্রয়োজন হইয়াছিল।

"সি-ইউ-কি"র মুখবন্ধ।

(টাংহুয়ানসাং নরপতির মন্ত্রী চ্যাং ইউয়ে কর্ত্তৃক লিখিত)

যখন উর্ণা তাহার জ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছিল, সহস্র পৃথিবীর উপর শিশির পতিত হইতেছিল, চন্দ্র তাহার কিরণ মালা বিস্তার করিতেছিল এবং সুগন্ধি বায়ু দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত করিতেছিল, তখনই জানা গেল যে যিনি পৃথিবী-পতি বলিয়া খ্যাত তিনিই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার জ্যোতি বিশ্বের চতুঃপার্শ্বে ব্যাপৃত কিন্তু তাঁহার মহান্ আদর্শ পৃথিবীর মধ্যস্থলেই স্থিত। যখন সূর্য্য অস্তমিত হইতেছিল তখন তাঁহার উপদেশের ছায়া পূর্ব্বদিকে ফলিত হইয়াছিল, সম্রাটের আদেশাবলী চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইতে লাগিল এবং তাঁহার সম্ভ্রমাকর্ষক বিধানগুলি পশ্চিমদিকে সীমান্ত পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল।

ত্রিপিটক-পারদর্শী হিউয়েনসাং নামক এক পণ্ডিত মন্দিরে বাস করিতেন। তিনি সাধারণতঃ চিন্‌সি নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বতন পুরুষগণ ইংচুয়েন প্রদেশে বাস করিতেন। স্বভাবের সৌন্দর্য্য ও পুণ্য তাঁহাতে সমাবিষ্ট ছিল। এই বীজগুলি উত্তমরূপে প্রোথিত হইয়া শীঘ্রই ফল উৎপাদন করিয়াছিল। তাঁহার জ্ঞানের উৎস গভীর ছিল এবং উহা আশ্চর্য্যরূপে বর্দ্ধিত হইতেছিল। জীবনের প্রথম উন্মেষে তিনি সান্ধ্য বাতাসের ন্যায় গোলাপী আভাযুক্ত এবং উদীয়মান চন্দ্রের ন্যায় পূর্ণ ছিলেন। বাল্যে দারুচিনির ন্যায় তাঁহার সুগন্ধ ছিল। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তিনি ফান ওয়ু (১) সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিলেন। তাঁহার সুযশ দিগদিগন্ত ব্যাপৃত হইতে লাগিল এবং পঞ্চপরিষদে তাঁহার খ্যাতি ধ্বনিত হইতে লাগিল।

প্রভাতে তিনি সত্য ও মিথ্যা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং রাত্রিতেও তাঁহার সাধুতা দীপ্তিমান থাকিত। সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া তিনি ইন্দ্রিয়সুখে বিরত থাকিতেন এবং পরিত্রাণের জন্য কোন সন্ন্যাসীর আশ্রমে থাকিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেন। তাঁহার সদাশয় ভ্রাতা চাংসীও বৌদ্ধ শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। হস্তী বা অসুর যে প্রকার সমকালিক জীবাদির মধ্যে শ্রেষ্ঠ তিনিও সেই প্রকার তৎকালীন লোকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। যেরূপ সারস বা শ্যেন পক্ষী অপর সকল পক্ষী অপেক্ষা ঊর্দ্ধে বিচরণ করে সেইরূপ বিদ্যাকাশে তিনিও সর্ব্বোচ্চে বিচরণ করিতেন। কি রাজদরবারে কি গহন বনে সর্ব্বত্রই তিনি বিদ্যার গৌরবে পরিচিত ছিলেন। উভয় ভ্রাতার মধ্যে বিশেষ প্রীতি ছিল। হিউয়েনসাং ছাত্রজীবনে পাঠে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। এক মুহূর্ত্তও তিনি অপব্যয় করিতেন না এবং অধ্যয়ন দ্বারা তাঁহার শিক্ষকদিগকে মহিমান্বিত করিয়াছিলেন ও স্বগ্রামের অলঙ্কারস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার সদ্‌গুণের সমতা ছিল এবং তাঁহার খ্যাতি তাঁহার বাসস্থলের চতুর্দ্দিকেই ব্যাপৃত হইয়াছিল। সকল বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া পরে তিনি বেদাধ্যয়নে মনোনিবেশ করিলেন।

এই সময় হইতে তিনি নানা স্থল ভ্রমণ এবং সকল বিচার স্থলে যাইতে আরম্ভ করিলেন। এইপ্রকারে তিনি অনেক বৎসর অতিবাহিত করিয়া তাঁহার বিদ্যা

(১) ২৮৫২ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ হইতে ২৬৯৭ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চীনের প্রাচীন ইতিহাস।

শিক্ষা সমাপ্ত করিলেন। হোয়ান ইয়ান দেশে তিনি লৌহবর্ম্ম পরিহিত (১) পণ্ডিতকে তর্কে পরাস্ত করিলেন। পিংলো গ্রামে তিনি এক দুরূহ সমস্যা পূরণ করিলেন। চতুর্দ্দিকে তাঁহার খ্যাতি ও যশ বিস্তৃত হইতে লাগিল।

এই সময় সম্প্রদায় সকল বিবাদপ্রিয় ছিল। তাহারা সত্য ত্যাগ করিয়া অসত্যের আকাঙ্ক্ষা করিত। দেশ মধ্যে বিরুদ্ধবাদীদের কেবলমাত্র "হাঁ" বা "না" এই কথাই শোনা যাইত। হিউয়েনসাং ইহাতে মর্ম্মাহত হইতেন। যদি অনুবাদের ভ্রম বাহির করিতে সক্ষম না হয়েন এই ভয়ে তিনি গন্ধহস্তী (২) সংক্রান্ত সম্পূর্ণ সাহিত্য পরীক্ষার সঙ্কল্প করিলেন এবং সর্পপ্রাসাদের (৩) সকল পুস্তকগুলি নকল করিতে মনস্থ করিলেন।

শুভমুহূর্ত্ত দেখিয়া তিনি ভ্রমণ-যষ্টি হস্তে করিয়া ও বস্ত্রাদির ধূলি ঝাড়িয়া দূরদেশ যাত্রা করিলেন। পা নদী পার হইয়া সাংলিং পর্ব্বতাভিমুখী হইলেন। নদ নদী উত্তীর্ণ ও পর্ব্বতাদি আরোহণকালীন তাঁহাকে যথেষ্ট বিপদ ভোগ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার তুলনায় পোওয়া, (৪) বা ফাহিয়ান (৫) অত্যল্প দেশেই ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি যে সকল স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, সেই সকল দেশের ভাষাই তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। সর্ব্বত্রই তিনি ধর্ম্মের সকল তত্ত্বের এবং জ্ঞানের উৎসের সূক্ষ্মানুসন্ধান করিতেন। এইপ্রকারেই তিনি ভারতীয় পুস্তক শুদ্ধ করিতে ও ভারতীয় লেখকগণকে অতিক্রম করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সকল পুস্তকগুলি তালপত্রে নকল করিয়া তিনি দেশে প্রত্যাগমন করেন।

সম্রাট তৈসঙ্গ এই স্বনাম-প্রসিদ্ধ মনস্বীর প্রত্যাগমনের জন্য উদ্বিগ্ন চিত্তে অপেক্ষা করিতেছিলেন। সম্রাট তাঁহাকে নিজ সিংহাসনের পার্শ্বে আসন প্রদান করিয়া তাঁহার সম্মুখে নতজানু হইয়া তাঁহার স্তুতিবাদ করিলেন। হিউয়েনসাং ৭৮০ কথা দ্বারা ত্রিপিটকের একটী ভূমিকা লিখিলেন। বর্ত্তমান সম্রাটও ৫৭৯ কথায় লিখিয়াছেন কিন্তু হিউয়েনসাং যদি কুক্কুটসংগ্রহে (৬) কিম্বা গৃধ্রকূট পর্ব্বতে (৭) তাঁহার বিদ্যার পরিচয় না দিতেন, তাহা হইলে আর বর্ত্তমান সম্রাটের পক্ষে ইহা সম্ভবপর ছিলনা।

সম্রাটের আদেশে হিউয়েনসাং সংস্কৃত ৬৫৭ গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন। বিভিন্ন দেশের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, দেশের উৎপন্ন দ্রব্য, জাতিবিভাগ, রাজকীয় পঞ্জিবিতরণের স্থল প্রভৃতি সকল বিষয়ই তিনি টাটাংসিইউকি নামক দ্বাদশখানি পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থে তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত সকল গূঢ় বিষয়ই সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রকৃতই বলা যায় যে তাঁহার গ্রন্থ অবিনশ্বর।

সিউ-ইউ-কি। প্রথম ভাগ।

ভূমিকা।*

হিউয়েনসাং যে যে দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন সেই সকল দেশেরই বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন। যদিও তিনি প্রত্যেক দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা বিশেষরূপ পর্য্যালোচনা করেন নাই। তাহা হইলেও তিনি যে সকল বৃত্তান্ত রাখিয়া গিয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করা যাইতে পারে। তিনি যে সম্রাটের (৮) বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা হইতে আমরা

(১) এই পণ্ডিতপ্রবর পাছে তাঁহার বিদ্যা পেট হইতে ফাটিয়া বাহির হয় সেই জন্য উদরের উপর লৌহাবরণ ব্যবহার করিতেন। (২) "গন্ধহস্তীর উল্লেখ" বৌদ্ধ পুস্তিকাসমূহে যথেষ্ট পাওয়া যায়। ইহার যথার্থ অর্থ পাওয়া যায় না। Beal সাহেব বলেন যে "It may refer to the Solitary elephant (bull elephant) when in ruto. A perfume then flows from his ears." (৩) নিরাপদে রাখিবার জন্য সর্পরাজের প্রাসাদে অনেকগুলি পুস্তক রক্ষিত হইয়াছিল এইরূপ প্রবাদ আছে। (৪) ইহার প্রকৃত নাম চাংগিয়েন—ইনিই প্রথম চীন পর্য্যটক (৫) সুপ্রসিদ্ধ ভারতীয় পর্য্যটক (৩৯৯—৪১৪) (৬) পাটনার নিকটবর্ত্তী (৭) রাজগৃহের সন্নিকট।

* এই ভূমিকা পূর্ব্বোক্ত চাংইয়ে কর্ত্তৃক লিখিত। (৮) সম্রাট হর্ষ।

জানিতে পারি যে সকল জীবই তাঁহার অনুগ্রহভাজন ছিল এবং সকলেই তাঁহার যশোগান করিত। রাজধানী হইতে দেশ-দেশান্তরের সকল লোকই রাজকীয় পঞ্জিকা প্রাপ্ত হইয়া রাজাদেশ পালন করিত। তাঁহার শস্ত্রচালনা ও বিদ্যা উভয় বিষয়ই সকলে সমভাবে প্রশংসা করিত। তাঁহার চরিত্র ও বাকপটুতা প্রশংসনীয় ছিল। ইতিপূর্ব্বে এরূপ আর কোনদিন দেখা বা শোনা যায় নাই। রাজশাসনে প্রজাবৃন্দের সুখের বর্ণনা করিয়া এইক্ষণ আমরা অন্যান্য বিষয় বর্ণনা করিব।

সহস্র সহস্র পৃথিবীর সমষ্টি এই "মহালোকের" উপর এক বুদ্ধদেবেরই আধ্যাত্মিক প্রভাব। ইহারই মধ্যস্থলে চন্দ্রসূর্য্যসেবিত চারিটী মহাদেশে বুদ্ধগণ, লোকনাথগণ, পবিত্রচেতা এবং বিষয়াসক্ত লোককে শিক্ষা দেওয়ার জন্য জন্মগ্রহণ (২) করেন ও এইখানেই তাঁহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন।

সুমেরুপর্ব্বত সুবর্ণ চক্রস্থিত সমুদ্রের মধ্যস্থলে স্থাপিত। চন্দ্র ও সূর্য্য এই পর্ব্বত প্রদক্ষিণ করে। চারিটি মূল্যবান ধাতুদ্বারা এই পর্ব্বত নির্ম্মিত এবং দেবতাগণ এই পর্ব্বতে বাস করেন। ইহার চতুঃপার্শ্বে সাতটী পর্ব্বত শ্রেণী এবং সাতটী সমুদ্র। প্রত্যেক পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্য দিয়া অষ্টগুণান্বিত সমুদ্র। সাতটী সুবর্ণ পর্ব্বতের বহির্দ্দেশে লবণ সমুদ্র। এই লবণ সমুদ্রে চারিটি জনাকীর্ণ দ্বীপ আছে। পূর্ব্বে বিদেহ, দক্ষিণে জম্বুদ্বীপ, পশ্চিমে গোধান্য এবং উত্তরে কুরুদ্বীপ।

সুবর্ণ চক্রধারী (২) এক রাজা এই দ্বীপপুঞ্জ ধর্ম্মানুসারে শাসন করেন। রৌপ্যচক্রধারী রাজা কুরুদ্বীপ ব্যতীত অপর তিনটী, তাম্রচক্রধারী কুরু ও গোধান্য ব্যতীত অপর দুইটী এবং লৌহচক্রধারী রাজা একমাত্র জম্বুদ্বীপই শাসন করেন। যখন কোন চক্রবর্ত্তী রাজা সিংহাসন অধিরোহণ করেন। তখন একটী বৃহৎ রত্নচক্র শূন্যে ভাসিয়া রাজার নিকট আসিতে থাকে। এই চক্রদ্বারাই (অর্থাৎ সুবর্ণ কি রৌপ্য কি তাম্র কি লৌহ) রাজার অদৃষ্ট ও নাম (৩) নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে।

জম্বুদ্বীপের মধ্যস্থলে অনবতপ্ত নামে একটী হ্রদ আছে। ইহা গন্ধবাহী পর্ব্বতের দক্ষিণে এবং তুষার পর্ব্বতের উত্তরে অবস্থিত। ইহার পরিধি আটশত লি অপেক্ষাও বেশী। ইহার চতুঃপার্শ্ব স্বর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা (৪) ও স্ফটিক নির্ম্মিত। ইহার তলদেশে স্বর্ণরেণু এবং ইহার জল দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ। বোধিসত্ব তাঁহার তপস্যাবলে নাগরাজে পরিণত হইয়া এইস্থানে বাস করেন। তাঁহারই আবাস হইতে শীতল জল নির্গত হইয়া জম্বুদ্বীপকে উর্ব্বর করে।

এই হ্রদের পূর্ব্বপার্শ্ব হইতে একটী রৌপ্যনির্ম্মিত বৃষ-মুখ হইতে গঙ্গা নির্গত হইয়াছে। হ্রদকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া গঙ্গা দক্ষিণপূর্ব্ব সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে। হ্রদের দক্ষিণে স্বর্ণহস্তীর মুখ হইতে সিন্ধুনদ নির্গত হইয়া এবং হ্রদকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া দক্ষিণপশ্চিম সমুদ্রের সহিত ইহা মিশ্রিত হইয়াছে। হ্রদের পশ্চিম দিক হইতে রত্ননির্ম্মিত অশ্ব মুখ দিয়া বক্ষু নদী (৫) বহির্গত হইয়া হ্রদকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া আবার উত্তরপশ্চিম সমুদ্রে মিশিয়াছে। হ্রদের উত্তর হইতে স্ফটিক সিংহের মুখগহ্বর হইতে সিটা। (৬) নদী বহির্গত হইয়া এবং হ্রদকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া ইহা উত্তরপূর্ব্ব সমুদ্রে মিশিয়াছে। পরম্পরায় প্রকাশ যে এই সিটা নদী পৃথিবী প্রবেশ করিয়া পরে সি পর্ব্বতের নিম্ন দিয়া চীনে পীত নদীতে পরিণত হইয়াছে।

যখন কোন রাজচক্রবর্ত্তী থাকেন না তখন জম্বুদ্বীপে ৪ জন রাজা থাকেন। দক্ষিণে গজপতি—

(১) বৌদ্ধশাস্ত্রে ইহাকে "অনুপপাদক" বলে। (২) রাজচক্রবর্ত্তী (৩) এই চিহ্ন হইতে তাঁহার নাম (অর্থাৎ সুবর্ণ চক্রবর্ত্তী কি রৌপ্য কি তাম্র কি লৌহ ইহা) নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে।

(৪) lapiolezuli a mineral of beautiful ultramerine colour used largely in ornamental and mosaic work and for sumptuous altars and shrines.

(৫) অক্সাস (৬) ইয়ারকন্দ নদী।

এই দেশ উষ্ণ ও আর্দ্র—হস্তিদের পক্ষে উপযোগী। পশ্চিমে ছত্রপতি—এখানে যথেষ্ট রত্ন পাওয়া যায়। উত্তরে অশ্বপতি—অশ্বগণের উপযোগী এই দেশ শৈত্য প্রধান। পূর্ব্বে নরপতি—এই দেশের স্বাস্থ্য সুন্দর এবং দেশটী বহু জনাকীর্ণ।

গজপতিদেশীয় লোক উৎসাহী। ইহারা যাদু-বিদ্যায় পারদর্শী। ইহারা দক্ষিণ স্কন্ধ অনাবৃত রাখিয়া বস্ত্র পরিধান করে। ইহারা চুল বন্ধন করিয়া শীর্ষ দেশে চুল বর্ত্তুলাকার করিয়া রাখে। মস্তিষ্কের চতুঃপার্শ্বের চুল আঁচড়ায় না। ইহারা ভিন্ন ভিন্ন নগরে বাস করে। ইহাদের বাটীগুলি একের উপরে অন্যটী স্থাপিত। ছত্রপতির দেশের লোক ভদ্রতা বা সাধুতা জানে না। ইহারা কেবল অর্থ সঞ্চয়ই করে। ইহারা চুল কাটে এবং গোঁফে "তা" দেয়। ইহারা প্রাচীর বেষ্টিত নগরে বাস করে এবং ব্যবসায়ে লাভ করিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র। অশ্বপতির দেশের লোক স্বভাবতঃই ভ্রমণশীল এবং দুরন্ত। ইহারা হিংস্রপ্রকৃতি, জীবহত্যা করে এবং বৃহৎ পশমের তাম্বু ব্যবহার করে। নরপতির দেশের লোক বুদ্ধিমান। ইহারা ধার্ম্মিক ও সাধু। ইহারা মস্তকাবরণ ও কোমরবন্ধ ব্যবহার করে। পোষাকের শেষাংশ দক্ষিণ দিকে ঝুলিতে থাকে। ইহার পদমর্য্যাদানুযায়ী যান ও পরিচ্ছদ ব্যবহার করে। ইহারা এক স্থানেই বাস করে। ইহারা কর্ম্ম-পটু এবং নানা শ্রেণীতে বিভক্ত।

এই কয় দেশের মধ্যে, পূর্ব্বাঞ্চলের লোকদিগকেই সকলে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করে। ইহারা পূর্ব্বদ্বারী ঘরে বাস করে এবং প্রাতঃকালে যখন সূর্য্য ওঠে তখন ইহারা সূর্য্যকে প্রণাম করে। এই দেশে দক্ষিণ দিকই বিশেষ সম্মানের চক্ষে দেখা হয়।

রাজার প্রতি প্রজার, শ্রেষ্ঠের প্রতি নিকৃষ্টের শিষ্টতা এবং আইন ও সাহিত্য বিষয়ে নরপতির রাজ্যের লোকই অন্যান্য দেশের লোকের অগ্রণী। নরপতিরাজ্যের লোক যাহাতে আত্মা পবিত্র হয় বা যাহাতে জীবাত্মা জীবন্মৃত্যুর বন্ধন হইতে পরিত্রাণ পায় এই সকল বিষয়ক বিধির জন্যই প্রসিদ্ধ। ইহাদের দেশের পুস্তকাদি ও রাজাদেশ এই বিষয়ক ব্যবস্থায় পরিপূর্ণ। হিউয়েনসাং ভারতবর্ষীয় বৃত্তান্তাদি তদ্দেশীয় লোকপ্রমুখাৎ অবগত হইয়া ও বিশেষ অধ্যবসায় সহকারে চক্ষু ও কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া সকল বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

হস্তিরাজের দেশের পূর্ব্ববৃত্তান্ত কিছুই জানা যায় না। পরম্পরায় শোনা যায় যে সে দেশীয় লোক ধার্ম্মিক ও দয়ার্দ্রচিত্ত। অসভ্য জাতিগণ প্রাচীর বেষ্টিত নগর নির্ম্মাণ করে এবং কৃষিকার্য্য ও পশুচারণে ব্যাপৃত থাকে। ইহারা অর্থ সঞ্চয় করে এবং ধর্ম্ম ও সাধুতার আশ্রয় লয় না। বিবাহাদি বিষয়ে ইহাদের শীলতা দেখা যায় না এবং উচ্চ ও নীচে কোন প্রভেদ নাই। স্ত্রীলোক পুরুষকে বলে যে আমি তোমাকে স্বামীত্বে বরণ করিতে প্রস্তুত এবং তোমার স্বাধীনতা স্বীকার করিলাম। ইহাই বিবাহপ্রথা। ইহারা মৃতদেহ দাহন করে এবং অশৌচের কোন কালাকাল প্রতি-পালন করে না। ইহারা মুখমণ্ডল অস্ত্রদ্বারা ক্ষত করে এবং কর্ণ বিদ্ধ করে। ইহারা চুল কাটে ও বস্ত্রাদি ছিন্ন করে। উৎসবাদিতে শুভ্র বস্ত্র এবং শোকের সময় কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র ব্যবহার করে। পশু হত্যাদ্বারা পিতৃলোকের তর্পণ করে।

হিউয়েনসাং পূর্ব্বে অগ্নি, কুচে, বালুক, নাজকেন্দ, চাজ, ফর্গণা, সমরকন্দ, মাধিয়ান, কেবুদ, কাশানিয়া, কুয়ান,বোখারা, বেতিক, খর্জ্জাম, কেশ, তার্ম্মদ, চাঘানিয়ান, গার্ম্মা, সুমান, কুলাব, কুবাদিয়ান, ওয়াক, খোটল, দারোয়াজ, রোসান, বাঘলাম, রুই সমানগন, খুলম, বল্ক, জাঝগানা, টালিকান, গাষ, মামিয়ান, কপিশা ভ্রমণ করিয়া পরে ভারতবর্ষে পৌঁছেন।

দ্বিতীয় ভাগে তিনি ভারতবর্ষের বৃত্তান্ত আরম্ভ করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

বন্দী।

২১

সেই সৈন্যশ্রেণীর মধ্য দিয়া চলিবার সময় আমার মনে কেমন একটা লঘুতা আসিল—মনে হইল, আমি যেন স্বাধীন —বন্দী নহি! কিন্তু তারপর যখন সোপান অতিক্রম করিয়া ছোট দ্বার দিয়া অন্ধকার ঘরগুলার মধ্যে আসিয়া পড়িলাম—তখনি একটা নিরানন্দ অবসাদের ভাব আমাকে সম্পূর্ণ অভিভূত করিয়া তুলিল।

প্রহরী আগাগোড়া সঙ্গে আসিল। আচার্য্য মহাশয় দুই ঘণ্টা পরে আসিয়া সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া বিদায় হইলেন। তাঁর আরো সব কি কাজ আছে! সেইজন্য!

অবশেষে অধ্যক্ষের ঘরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। তাঁহারি হাতে প্রহরী আমাকে সঁপিয়া দিল! আমার মনে একটা কৌতুকের হাসি দেখা দিল! সঁপিয়া দিল—আমার প্রিয়জনের হাতে এত যত্নে আমি সমর্পিত হইলাম!

অধ্যক্ষ মহাশয় তখন বড় ব্যস্ত ছিলেন। প্রহরীকে বলিলেন, "একটু সবুর কর—আমি বুঝিয়া নিতেছি!"

সত্যই ত—একটা মানুষকে জমাখরচের খাতায়, তহবিল না মিলাইয়া, কি করিয়া জমা করেন! আর একজন হতভাগ্য বন্দীর অদৃষ্ট লইয়া তিনি তখন অতিরিক্ত ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন। প্রহরী বলিল, "বেশ আমিও আমার কাগজপত্রগুলা একবার ভালো করিয়া গুছাইয়া লই!"

একতাড়া কাগজ বাহির করিয়া প্রহরীও তখন ব্যস্ত হইয়া পড়িল! আমি ঘরের কোণে দাঁড়াইয়া ছিলাম! লোহার মোটা গরাদের মধ্য দিয়া বাহিরে আকাশ দেখা যাইতেছিল—রৌদ্র দেখিয়া মনে হইতেছিল, আকাশের গায় যেন কে রঙ্ মাখাইয়া দিয়াছে! উজ্জ্বল নীল বর্ণের আকাশ!

আকাশের দিকে চাহিয়াছিলাম—একআধবার মনে হইতেছিল—এই একই আকাশের নীচে এখানে আমি দাঁড়াইয়া আছি —আমার স্ত্রী, আমার কন্যা তারাও আছে! কিন্তু আর কি তাদের দেখিতে পাইব?

প্রহরী আমাকে পাশে একটা ছোট কুঠুরিতে লইয়া চলিল—অন্ধকূপের মত ছোট কুঠ্রি! মোটা লোহার জালে জানালা দুটি ঘেরা! আমি জানালার ধারে আসিয়া বসিলাম!

কতক্ষণ বসিয়াছিলাম, মনে পড়েনা! সহসা একটা অট্টহাসিতে ফিরিয়া চাহিলাম! ঘরে আর একজন লোক! বয়স পঞ্চাশের ঊর্দ্ধে—পিঠ ঝুঁকিয়া গিয়াছে মাথার চুল পাকিয়া গিয়াছে, অথচ বেশ মজবুত দোহারা দেহ—চোখে মুখে কেমন একটা বিকট ভাব—লোকটাকে সহসা দেখিলে প্রাণ যেন শিহরিয়া উঠে—তার সঙ্গ হইতে দূরে থাকিবার জন্য প্রবল আগ্রহ জন্মে!

লোকটাকে পূর্ব্বে আমি লক্ষ্যই করি নাই! অথচ, সে এই ঘরে বসিয়াছিল! আশ্চর্য্য! এ কি তবে মৃত্যু—আজ এমন বেশে আসিয়া আমাকে দেখা দিয়াছে!

লোকটা কহিল, "দেখছি, তোমার ভাবখানা! কি এমন ভাবে মসগুল হে যে, একটা লোককে চোখে দেখারও অবসর পাও না! তোমার নাম কি ?"

আমি কথা কহিলাম না। শুধু তার দিকে চাহিয়া রহিলাম!

সে কহিল, "কি হে, আমাকে দেখে বুঝি অবাক হয়ে গেছ! আমি একটা লগেজ,—ষ্টেশনের ছাপ-মারা হয়ে পড়ে আছি! গাড়ীতে তুলে নিলেই হয়!"

লোকটা বেশ রসিক ত! আমি কহিলাম, "তার অর্থ?"

হো হো করিয়া সে হাসিয়া উঠিল—কহিল, "এর সরল অর্থটুকু এমন কি কঠিন যে, বুঝলে না? আর ছয় সপ্তাহ পরে আমাকে ভবপারে পাঠাবে—তারি জন্ম আজ 'লগেজ বুক' হয়ে রইলাম! অর্থাৎ ছয় ঘণ্টা পরে তোমার যে দশা, ছয় সপ্তাহ পরে আমারো তাই! এমন দিনে, এমন বন্ধুর দিকেও তুমি ফিরে চাচ্ছ না?"

ঠিক কথা! আমার দেহের শিরাগুলায় যেন টান পড়িল!

লোকটা কহিল, "চুপ করে ভেবে আর কি হবে, বল, বন্ধু?—তার চেয়ে আমার কাহিনীটা বলি, শোন—মন্দ লাগবে না! সময়টুকুও বেশ কেটে যাবে!"

সে বলিতে আরম্ভ করিল—"আমরা কয়পুরুষ ধরিয়া চুরি বিদ্যায় বেশ দক্ষতা লাভ করিয়াছি। এমন শাণিত বুদ্ধি ফাঁসি-কাঠের চাপে ঝরিয়া মরিবে! অদৃষ্ট, বন্ধু!

ছয় বৎসর বয়সের সময় মা-বাপ হারাইয়া বসিলাম। লোকের পকেট কাটিয়া, নির্ব্বোধ ভুলাইয়া বেশ দুইপয়সা উপার্জ্জন করিতে লাগিলাম! হাজার হউক, বংশগত বিদ্যা ত!

শীতের দুরন্ত রাত্রে, বরফে যখন পথ-মাঠ ভরিয়া যাইত, তখন শুধু পায় পথ চলাও রীতিমত অভ্যাস হইয়া গেল। তার পর ষ্টেশনে, হোটেলে, ট্রেণে, লোকের পকেট কাটিতে দড় হইয়া উঠিলাম!

পনেরো বৎসর বয়সে প্রথম ধরা পড়ি! কয়েক ঘা বেত ও দুই চারি দিনের জন্ম জেল হইল! জেলের ফেরত হইলে, আমার প্রতিপত্তি বাড়িয়া গেল! দলের সর্দ্দার হইয়া উঠিলাম!

তারপর বড় বড় কাজে হাত দিলাম। সহরের বিখ্যাত জহরতওয়ালার দোকানে দল লইয়া উপস্থিত হইলাম! দোকান-ঘর উজাড় করিয়া ফেলিলাম—দুইটা দারবানও প্রাণ দিল! তখন আমার দম্ভও বাড়িয়া গেল। দলের একটা হতভাগা স্বার্থপর বিশ্বাস-ভঙ্গ করিয়া ধরাইয়া দিল! সাত বৎসর জেল ঘুরিয়া আসিলাম। স্পষ্ট প্রমাণ তেমন কিছু ছিল না—নহিলে জেল হইতে হয়ত আর বাহির হইতে পাইতাম না! রাগ পড়িয়া গেল—সেই স্বার্থপর বিশ্বাসঘাতকটার উপর!

যখন বিচার শেষ হয়—সে তখন আদালতের বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল। তার প্রতি শুধু একটা রক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গেলাম। সে দৃষ্টিতে আগুনের হল্কা ছিল—লোকটার হাড়ে হাড়ে সে জ্বালা বিঁধিয়াছিল! ভয়ে তার মুখ শুখাইয়া গেল! সাত বৎসর দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল! তার পর আবার একদিন জেলের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম!

দুই দিন ঘুরিয়াই কাটিল! মুখে অন্ন দিই নাই! প্রতিহিংসার জন্ম দারুণ আক্রোশ জাগিয়াছিল!

রাত্রে জানালা ভাঙ্গিয়া হোটেলে ঢুকিয়া আহার করিলাম—পূর্ণ পরিতৃপ্তি! চুপি চুপি! কেহ জানিতেও পারিল না!

সাত আট দিন পরে দলের দুইচারিজন লোকের সহিত দেখা হইল! তারা চুরি ছাড়িয়া চাষের ক্ষেতে কেহ বা অন্য কোন কাজে দিব্য যোগ দিয়াছে! ভীরু, কাপুরুষের দল, সব!

নূতন করিয়া দল গড়িলাম! বাছাই-করা জোয়ান, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক!

তার পর কিছুকাল খুব সরগরমে কাজ চলিল। নিত্য লুঠ, নিত্য জয়—নিত্য আমোদ! আনন্দে জ্ঞান হারাইবার উপক্রম করিলাম!—কিন্তু আবার পুনর্মূষিক হইলাম। সঙ্গীর দল গা-ঢাকা দিল। আমার কাজও বন্ধ হইল। রাগে দেহ কাঁপিয়া উঠিল!

তার পর একদিন পথে সেই বিশ্বাসঘাতকটাকে দেখিলাম! আমাকে দেখিয়া সে যেন কাঁপিয়া উঠিল! আমি তার চুলের মুঠি সবলে চাপিয়া ধরিলাম! কহিলাম, "কেমন? আজ!"

সে কাঁদিয়া উঠিল, বলিল, "মাপ,—মাপ কর সর্দ্দার!"

আমি কহিলাম, "বিশ্বাসঘাতকের ক্ষমা নাই—তা যে কাজেই হোক!"

সে কহিল "আমি তোমার গোলাম!"

"বিশ্বাসঘাতক গোলামকে এমন করিয়া আমি শিক্ষা দিই" বলিয়া তার পৃষ্ঠে প্রচণ্ড পদাঘাত করিলাম! ছিট্‌কাইয়া সে পাঁচ হাত দূরে গিয়া পড়িল! মুখ দিয়া গল্‌গল্‌ করিয়া রক্ত পড়িতেছিল। আমি কহিলাম, "উঠে আয়!"

সে আসিল—আমি তখন,—আঃ পিশাচের মত ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিলাম—আমার এমন দল, পুরানো সঙ্গীর দল—এই বিশ্বাসঘাতকটার জন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল! শয়তান!

পকেট হইতে ছুরি বাহির করিয়া তার কাণ দুইটা কাটিয়া দিলাম। সে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল! আমার মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিতেছিল! সেখান হইতে সরিয়া পড়িলাম!

তার পর সে পুলিশে যাইয়া সব কথা বলিয়া দিল। পরে, একদিন হাঁসপাতালেই মরিল—আমি ধরা পড়িলাম—আমার ফাঁসির হুকুম হইয়া গিয়াছে—ন্যায্যই হইয়াছে, কি বল? অমন করিয়া লোকটাকে মারিলাম! যাক্, ফাঁসির জন্য আমি কাতর নহি! চুরির কাজে স্ফূর্ত্তি কমিয়া আসিয়াছিল—বোকার মত, হীন চোরের মত, আমার চুরি নয়। তাতে রীতিমত বুদ্ধি খেলানো দরকার। মনের মত সঙ্গীও মিলেনা! কাজেই জীবনে আর তেমন আকর্ষণ নাই! তবু মরিবার পূর্ব্বে বিশ্বাসঘাতককে যে নিজের হাতে দণ্ড দিয়াছি ইহাই সুখ! শুনিলে ত, বন্ধু, আমার কাহিনী। চুরির কথাও দুই একটা বলিতেছি! শুনিলে বুঝিবে, এদিকটায় আমার বুদ্ধি কেমন খেলে! এমন মাথাটা ফাঁসিকাঠে ঝুলিতে চলিয়াছে, দেশেরো এটা অল্প দুর্ভাগ্য নয়, বন্ধু!"

লোকটার কথা শুনিয়া আমার আপাদমস্তক কাঁপিতেছিল! এখন এ রাক্ষস,

পিশাচটার হেয় সংসর্গ হইতে মুক্তি পাইলে যে বাঁচি!

সে কহিল, "তুমি বড় নিরীহ! ছ্যাঃ! ফাঁসিকাঠে চলেছ, এখনো মুখে অমন দুঃখের চিহ্ন! লোকে মজা পায় এতে, জানো! তার চেয়ে তোফা আমোদ-আহ্লাদ কর, লোকে দেখুক, ফাঁসিকাঠকে এরা ডরায় না! মরণ তার খেলার সাথী। দেখে অবাক হয়ে যাবে স্তম্ভিত হয়ে যাবে—বাহাদুর ঠাওরাবে! দেখছ ত, আমার স্ফূর্ত্তিটা! দুঃখ করে ফল কি!

আমি কহিলাম "আপনি মহাশয় ব্যক্তি!"

হো হো করিয়া সে আবার হাসিয়া উঠিল, ছোট ঘর সে হাসির শব্দে যেন কাঁপিয়া উঠিল। সে কহিল, "ওহো 'মহাশয়' ব্যক্তি! আপনারা ভদ্র, মহাশয়, সে কথাটা মনে ছিল না! বটে, বটে! মহাশয় ব্যক্তিরও ফাঁসিতে চড়িবার সখ হয়—ভালো, ভালো!" কথাটার সহিত বেশ একটু টিট্‌কারী মিশানো ছিল!

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। সে কহিল, "কি? আচার্য্যের জন্যই বুঝি আপনার দেবাটুকু! তা আপনি ত একজন জমিদার মানুষ, শুনলাম—ফাঁসিতে চড়তে চলেছেন—অমন ভালো জামাটা নষ্ট হয় কেন? আমাকে দিন! এই শীতে তবু পরে বাঁচব, তার পর না হয়, বেচিয়া চুরুট তামাকের জোগাড় দেখিব!"

আমি কোট খুলিয়া দিলাম। কিন্তু শীতে কাঁপিয়া উঠিতেছিলাম। সে কহিল, "আপনারা বড় লোক। এ শীত সহিবে না। নিন, আপনার কোট গায়ে দিন!"

লোকটার কথার সুর যেন একটু ফিরিল! আমি কহিলাম, "এ শীত আমার সহ্য হবে! কোটের দরকার নাই!"

লোকটা জানালার নীচে আসিয়া কোটটাকে সূক্ষ্মভাবে দেখিতে লাগিল—উল্টাইয়া পাল্টাইয়া ভালো করিয়া দেখিল। পরে বলিল, "এ যে একেবারে নূতন! তা বেশ, ছয় সপ্তাহের তামাকের জোগাড় হল, আপনারি জন্য, ধন্যবাদ মশায়! কিছু মনে করবেন না, আমরা গরিব চাষা লোক!"

এমন সময় দ্বার খুলিল। অধ্যক্ষ আসিয়া আমাকে একটা প্রহরীর জিম্মা করিয়া দিলেন এবং সেই লোকটার ভার আর দুইজন প্রহরীর হাতে দিয়া বাহিরে গেলেন! আমরাও বাহিরে আসিলাম! বাহিরে আসিয়া সে কহিল, "মনে রাখবেন, মশায়, এখানে এই শেষ দেখা! আবার দেখা হবে, ছয় সপ্তাহ পরে। এই পুরানো বন্ধুত্বের খাতিরে সেদিন অপেক্ষা করবেন আমার জন্য।"

কথাটা শুনিয়া আমার হৃৎকম্প হইল। বলে কি, এ? পাগল, না বোকা? কে, এ?

২২

ভারী মজার লোক ত! আমার কোটটি দিব্য লইয়া গেল!

আমি কি দান করিলাম—? তাহা নহে! আমি ভাবিলাম, বুঝি তামাসা করিতেছে! তার পর চক্ষুলজ্জায় চাহিতেও পারিলাম না!

পাকা পুরানো চোর! পা দিয়া যাহাকে দলিতে পারি, এমন স্পর্দ্ধার সহিত, সে বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করিল? রোষে, ক্ষোভে, আক্রোশে আমার চিত্ত গর্জ্জিয়া উঠিতে ছিল! মরণ আসিয়া দেখা দিয়াছে, এখনি

নিষ্ঠুরভাবে আমাকে ধূলায় পিষিয়া মারিবে! তবু এ মুহূর্ত্তে আভিজাত্যের এ নিষ্ফল আস্ফালন, কেন?

২৩

বায়ু ও আলোকহীন ছোট ঘরে আবার আমি বন্দী! বন্দী হইয়াছি বলিয়া কি আলো বায়ুতেও আমি অধিকার হারাইয়াছি! বিচারের নামে, মানুষের প্রতি মানুষ এমন অবিচার করে! যদি শাস্তি দেওয়াই প্রয়োজন হয়, তবে অল্প খরচে আরো সহজ উপায় ত ছিল! প্রাচীনযুগের মত, একটা থলির মধ্যে পুরিয়া নদীর জলে ডুবাইয়া দিলে ত চূড়ান্ত ব্যবস্থা হইত! এত কড়া পাহারা, এমন জবরদস্ত তদারকের পরিশ্রম ও ব্যয়টাও বাঁচিয়া যাইত!

ঘরে বিছানা ছিল না! প্রহরীকে বিছানার জন্য বলিতে সে অবাক হইয়া গেল! যেন আকাশ হইতে পড়িয়াছে, এমন ভাবখানা! অর্থাৎ ছয় ঘণ্টার জন্য আর বিছানা লইয়া আমি কি করিব?

যাহা হউক, ঘরের কোণে অধ্যক্ষ মহাশয় তখনি একটা বিছানা করাইয়া দিলেন! তাঁর দয়া অসাধারণ! মরিবার সময়, তাঁর দয়ার কথা ভাবিয়া মরিতে পাইব! কিন্তু আমার ঘরের দ্বারে পাহারা মোতায়েন রহিল—পাছে বিছানার কম্বল গলায় জড়াইয়া ফাঁসিকাঠকে আমি ফাঁকি দিই!

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

জলে বাসা।

অন্ধকার ও বিজনতার মধ্যে গৃহ-নির্ম্মাণের কল্পনা যে কেবল জুল ভার্ণের ন্যায় কবির উর্ব্বর মস্তিষ্কেই প্রথম স্থান পাইয়াছিল, তাহা নহে। লোকচক্ষুর অগোচরে সমুদ্রতলের অধিবাসী মৎস্য ও কাঁকড়াদির আবাস নির্ম্মাণের প্রণালীটুকু প্রকৃতপক্ষে অপূর্ব্ব কৌতূহল ও বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

সমুদ্র এবং হ্রদ, পুষ্করিণী প্রভৃতির নির্ম্মল জলতলে, প্রসবের সময় ডিম্ব এবং সন্তানাদি রক্ষার জন্য গৃহনির্ম্মাণে মৎস্যজাতির সবিশেষ ব্যগ্রতা দেখা যায়। এই সকল গৃহের নির্ম্মাণ প্রণালী বেশ কৌতূহলজনক। কোন কোন স্থানে এগুলি কেবল সমুদ্রের তলদেশে বালুকা ও পঙ্কের মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র গহ্বর বিশেষ, আবার কোথাও বা জলজ শৈবাল ও উদ্ভিদ্‌রাজিতে আচ্ছন্ন, আবার কোথাও বা অধিকতর শ্রমকর নির্ম্মাণ প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়। সে কথা পরে বলিতেছি।

সারগাসো সমুদ্রে (Sargaso Sea) মৎস্যগণের আবাস-নির্ম্মাণের প্রণালীটুকু অধিকতর বিস্ময়োদ্দীপক। সারগাসো সমুদ্র ২৬০০০০ বর্গ মাইল ব্যাপী এবং তাহা প্রায়ই জলজ উদ্ভিদে পরিপূর্ণ, প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণের তত্ত্বসংগ্রহের পক্ষে সারগাসো সমুদ্রই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ, এই সকল জলজ উদ্ভিদের মধ্যে বহুবিধ অদ্ভুত জীব বাস করে। এই সকল জীবের জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের পক্ষে সারগাসো সমুদ্রই উপযুক্ত স্থান। অন্যান্য হিংস্র জীব হইতে আত্মরক্ষার জন্য ইহারা এই সকল উদ্ভিদাবরণের মধ্যে আশ্রয়

গ্রহণ করে। আন্তেনারিয়া (Antennaria) নামক ক্ষুদ্রাকার বিশিষ্ট একরূপ মৎস্য এই সমুদ্রে বাস করে। ইহাদিগের মস্তকের উপর শৃঙ্গের ন্যায় একপ্রকার তীক্ষ্ণ শুঁড় আছে, সাধারণতঃ শীকারকার্য্যে ইহাই তাহাদিগের প্রধান অস্ত্রস্বরূপ। ইহাদের মুখের ভঙ্গিমাও অদ্ভুত ধরণের।

এই ক্ষুদ্র জাতীয় মৎস্য সমুদ্রে ডিম্বাকৃতি একপ্রকার গৃহ নির্ম্মাণ করে। এই সকল আবাস-স্থান সাধারণতঃ ফুটবলের অপেক্ষা কিছু বৃহৎ আকারের। সারগাসম্ জাতীয় উদ্ভিদে সুতার মত সূক্ষ্ম অসংখ্য স্তবক থাকে; এই সকল স্তবকের গাত্রে বহু পরিমাণ বায়ু-পূর্ণ কোষ জন্মে। এই সকল কোষের সাহায্যে স্তবকগুলি ঠিক সমুদ্রের উপর অর্দ্ধ নিমজ্জিত ভাবে থাকে। অনেকগুলি স্তবক যেখানে একত্র জড়িত হইয়াছে, কেবল সেই সকল স্থানেই মৎস্যেরা আপনাদিগের বাসোপ-যোগী নীড় রচনা করিয়া লয়।

এক্ষণে ইহাদিগের আবাস-নির্ম্মাণের প্রণালী সম্বন্ধে আমরা দুই এক কথা বলিব। প্রথমতঃ একটী সুদীর্ঘ লতার এক প্রান্ত সেই স্তূপাকার স্তবকগুলির ভিতর দিয়া ইহারা টানিয়া লয়। ইহাদিগের এই কার্য্য-প্রণালী অনেকটা আমাদের দেশে প্রচলিত তাঁতের মাকুর মত। এই ভাবে পুনঃ পুনঃ লতা-নিবার পর যখন জড়িত লতাগুল্মগুলি বেশ জট পাকাইয়া যায়, তখন শিরিষের মত এক প্রকার নির্য্যাসের দ্বারা তাহারা সেই সকল 'লতানে' উদ্ভিদগুলি পরস্পর সংলগ্ন করিয়া দেয়। এই নির্য্যাস সাধারণতঃ তাহাদিগেরই উদরের লালাগ্রন্থি হইতে নির্গত হইয়া থাকে।

ইহাদিগের বাসস্থানগুলির সহিত পক্ষী-দিগের বাসস্থানের কোনরূপ সৌসাদৃশ্য নাই। ইহাদিগের বাসস্থানের মধ্যভাগে বাসের জন্য গহ্বর থাকে না। ডিম্বগুলি উদ্ভিদ সমূহের গাত্রে দৃঢ়ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকে। প্রসবের পর সেই সকল উদ্ভিদের আর একটী স্তর ইহারা বাসস্থানের উপর গড়িয়া তুলে। এই কার্য্যের অব্যবহিত পরেই পুরুভুজ নামক একপ্রকার ক্ষুদ্র এবং অপরূপ উদ্ভিজ্জ প্রাণি-বিশেষ গুচ্ছাকারে এই সকল উদ্ভিদের প্রত্যেক শাখা-প্রশাখায় ঝুলিতে থাকে। তাহা-দিগের অঙ্গ দিয়া ফস্ফরাসের ন্যায় এক প্রকার নীল ও শুভ্র জ্যোতি বাহির হয়। এইরূপে একে একে বাসস্থানগুলির নির্ম্মাণ-কার্য্য সমাপ্ত হইলে সেই সকল উদ্ভিদের শাখা প্রশাখা হইতে সবুজ ও পীত বর্ণের নানা সুকোমল পল্লব বাহির হইতে থাকে। প্রায় সমস্ত আবাসস্থানটুকুই সমুদ্রের উপরিভাগে ভাসিয়া থাকায় অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার হয়। প্রসূতি মৎস্য স্বীয় আবাসগৃহের চারি পার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়ায়, কখনো বা আবাসগৃহের উপরেই সে আপনা ভাসাইয়া বিশ্রাম করে।

ডিম্বগুলি একে একে ফুটিতে আরম্ভ করিলে, পূর্ব্বোল্লিখিত উদ্ভিদগুলির বন্ধন ক্রমশই শিথিল হইয়া পড়ে। তখন বাসগৃহটি ঠিক একটী লতাকুঞ্জের মত দেখায়। শিশু মৎস্যগুলি একটু সক্ষম হইলেই সেই লতা-কুঞ্জের আশে-পাশে ধীরে ধীরে সন্তরণ করিয়া বেড়ায় এবং কোন বিপদের আশঙ্কা দেখিলেই লতাকুঞ্জের মধ্যে লুকাইয়া পড়ে।

ভূমধ্যসাগরে ব্লেক গোবি (black goby) নামক অন্য এক জাতীয় মৎস্য বহুল

পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগের গৃহনির্ম্মাণপ্রণালী অতি চমৎকার। (kelp) নামক এক প্রকার শৈবালের সাহায্যে ইহারা গৃহনির্ম্মাণ করে। এই সকল গৃহের মধ্যস্থল ফাঁপা। ইহার অভ্যন্তরেই প্রসূতি মৎস্য ডিম্ব প্রসব করে এবং যতদিন না শিশু-গুলি একটু বড় হয়, ততদিন পুরুষ মৎস্য গৃহের সম্মুখে পাহারা দিয়া থাকে। অপর-জাতীয় মৎস্য ইহার মধ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিলে উভয়ের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া যায়।

গ্রীষ্মপ্রধান প্রদেশে কটকটে (toad) নামক অপর এক জাতীয় মৎস্যকে গৃহ রচনা করিতে দেখা যায়। ইহাদিগের গৃহ-নির্ম্মাণ প্রণালীও বেশ। এই সকল মৎস্য দেখিতে অতি কদাকার; বর্ণও কতকটা শৈবালা-চ্ছাদিত প্রস্তরখণ্ডের অনুরূপ। যখন ইহারা বালুকারাশির উপর দিয়া গুড়ি মারিয়া বেড়ায়, সেই সময় কোন স্তূপাকার শৈবাল কিম্বা প্রস্তরখণ্ড দেখিতে পাইলে তাহাতেই গর্ত্ত করিয়া বাস নির্ম্মাণ করে। সেই গর্ত্তের মধ্যে ডিম্বগুলি রক্ষিত হয়। সন্তানগুলি ডিম্ব হইতে বাহির হইয়া যতদিন অবধি না সবল হইয়া উঠে, ততদিন, প্রসূতি স্বয়ং সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণ করে।

আবার এমন কতকগুলি সামুদ্রিক মৎস্য আছে, যাহারা নদীতে আসিয়া প্রসব করে। স্যামন, ঈল প্রভৃতি মৎস্য এই শ্রেণীর। প্রসবের সময় এই সকল মৎস্য বহুল পরিমাণে ধরা পড়ে। প্রসবের পর ইহাদের স্বাদও তেমন মধুর থাকে না। স্যামন মৎস্য সাধারণতঃ ক্ষীণতোয়া পার্ব্বত্য নদীতেই ডিম্ব প্রসব করে। এই সকল নদীতে আসিবার সময় তাহাদিগকে অনেক বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া আসিতে হয়। নদীগর্ভের খানিকটা স্থান ক্রমাগত লেজের ঝটকায় পরিচ্ছন্ন করিয়া সেই স্থানে ইহারা ডিম্ব প্রসব করে। স্রোতের মুখ হইতে ডিম্বগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য চারিদিকে ছোট ছোট প্রস্তরখণ্ডের দ্বারা আইল বাঁধিয়া দেয়।

বসন্তাগমের সঙ্গে সঙ্গেই এই সকল মৎস্য সমুদ্র হইতে নদীতে চলিয়া আসে এবং তথায় প্রসবের উপযুক্ত স্থান মনোনীত করিয়া লয়। ইহাদিগের প্রথম কার্য্য সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানের প্রস্তর বালুকা প্রভৃতি আবর্জ্জনারাশি একপার্শ্বে ঠেলিয়া রাখিয়া সেই স্থানটীকে উত্তমরূপে পরিষ্কার করা। কখন বা দুইটী মৎস্য পরস্পরে ক্রমাগত কুণ্ডলী পাকায়, আবার কখনো বা পরস্পরে জড়াজড়ি করিয়া এই কার্য্য সম্পন্ন করে। তাহাদিগের এই কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া মনে হয় যেন, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ভীষণ সংগ্রাম বাধিয়াছে।

এইরূপে স্থানটী পরিষ্কৃত হইলে আবাস নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রস্তর-খণ্ডগুলি উপর-উপর সাজাইয়া দুই তিন ফুট উচ্চ করে। ছোট ছোট প্রস্তরখণ্ডগুলি সাধারণতঃ ইহারা মুখে করিয়াই বহন করিয়া আনে, কিন্তু যেগুলি একটু বৃহৎ সেগুলি মুখে করিয়া বহন করিতে পারে না। এক্ষেত্রে তাহারা বেশ একটী সুন্দর উপায় অবলম্বন করে; তাহা হইতে ইহাদিগের বুদ্ধিরও বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

সাধারণতঃ বেগবান স্রোতের মুখেই ইহারা বাসের উপযোগী স্থান সংগ্রহ করিয়া

লয়। নদীর উপরিভাগে কিছুক্ষণ সন্তরণ করিয়া একটী বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড ইহারা বাছিয়া লয়। তৎপরে ক্রমাগত ধাক্কা এবং নীচে হইতে মোচড় দিয়া সেটিকে কিয়দ্দূর সরাইয়া আনে। পরে মসৃণ দিকটী জমির উপরে আসিলে মুখ দিয়া সমগ্র প্রস্তরখণ্ডটী উত্তমরূপে কামড়াইয়া ধরিয়া লেজটী উপর দিকে তুলিয়া ধরে। প্রস্তর ও মৎস্য উভয়ই তখন স্রোতের টানে খানিকদূর ভাসিয়া আসে। দুই চারিবার এইরূপ করিলে প্রস্তরখণ্ড ঈপ্সিত স্থানে আসিয়া পড়ে এবং নিপুণ ইঞ্জিনিয়ারের মতই মৎস্য আপন বাসা নির্ম্মাণ করিয়া লয়।

বাইন (Lamprey) মৎস্যের আবাস আকারে অনেকটা ডিম্বের মত। প্রস্তরখণ্ড বেশ সুদৃশ্যভাবে পর-পর সাজান। এক পাশে কেবল একটী ছোট প্রবেশ দ্বার থাকে। ইহার অভ্যন্তরেই ডিম্বগুলি সযত্নে রক্ষিত হয়। শিশু মৎস্যগুলি কোন বিপদের সম্ভাবনা দেখিলে এই সকল প্রস্তরখণ্ডের যুক্ত-স্থানের মধ্যস্থিত ছিদ্র পথে লুকাইয়া পড়ে।

অনেক ছোট ছোট নদীতে (ষ্টিকিল ব্যাক (sticle back) নামক আর এক জাতীয় মৎস্য দেখিতে পাওয়া যায়। সুন্দর গৃহনির্ম্মাণে ইহারা বেশ নিপুণ শিল্পী। সন্তানদিগের রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়েও ইহারা বিশেষ সতর্ক। এই জাতীয় মৎস্য সচরাচর আকারে অতি ক্ষুদ্র এবং সেই অনুযায়ী ইহাদিগের গৃহও ক্ষুদ্রাকার। ছোট ছোট আগাছা সংগ্রহ করিয়াই ইহারা বাসা নির্ম্মাণ করে। এই সকল গৃহ সাধারণতঃ গোলাকার এবং ফাঁপা। ইহার মধ্যেই স্ত্রীমৎস্য ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে।

সাধারণতঃ পুষ্করিণীতে যে সকল ষ্টিকিল ব্যাক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগের গৃহ-নির্ম্মাণে বেশ শিল্পচাতুর্য্য আছে। যিনি একটু যত্ন করিয়া ইহাদিগের বাসস্থানগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তিনিই দেখিয়া থাকিবেন, কতকটা বন্য ইন্দুরের বাসার ন্যায় ইহারাও পুষ্করিণীজাত লতাগুল্মাদি দ্বারা বেশ সুন্দর গৃহ প্রস্তুত করিতে পারে।

যাঁহাদিগের এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীর আচারব্যবহার ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে জ্ঞান-লাভের জন্য অন্ততঃ একটুও আগ্রহ আছে, তাঁহারা গৃহ-প্রাঙ্গণে ছোট ছোট চৌবাচ্চা প্রস্তুত করাইয়া তাহাতে নানাবিধ জলজ আগাছা এবং ষ্টিকিল-ব্যাক প্রভৃতি মৎস্য অতি যত্নসহকারে যদি সঞ্চয় করিয়া রাখেন, তবে সময়ে সময়ে তাহাদের কার্য্যপ্রণালী পর্য্যালোচনা করিলে প্রাণিতত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তর জ্ঞানলাভ করিতে পারেন।

আমেরিকাপ্রদেশে অনেক বন্য নদীতে সূর্য্যমৎস্য (sun fish) নামক একজাতীয় বিচিত্র মৎস্য বাস করে। ইহারা সাধারণতঃ নানাবিধ আগাছাবেষ্টিত কঙ্করময় স্থানেই বাসস্থান রচনা করে। এই সকল উদ্ভিদ-জাতীয় লতাগুল্মাদি এমন সুশৃঙ্খলতার সহিত সজ্জিত করে যে দেখিলে মনে হয় যেন কে নদীর অভ্যন্তরে একটী সুন্দর ফুলের বাগান সাজাইয়া রাখিয়াছে! প্রথমতঃ ইহারা গৃহনির্ম্মাণোপযোগী স্থানটী মনোনীত করে; প্রায় ১২ ইঞ্চি বর্গ পরিমাণ স্থানের সমুদয় গাছগাছড়া প্রভৃতি উৎপাটিত করিয়া সেই স্থানটীকে বেশ পরিষ্কার করিয়া লয়; তৎপরে ক্রমাগত লেজের আঘাতে জল-ঘূর্ণনের

দ্বারা তথা হইতে নুড়ি, প্রস্তরখণ্ড প্রভৃতি আবর্জ্জনারাশি অপসারিত করিয়া ডিম্বাকারে একটী গহ্বর রচনা করে এবং সেই গর্ত্তেই প্রসবকালে ডিম্বাদি রক্ষিত হইয়া থাকে। আশপাশের উদ্ভিদরাশির শাখাপ্রশাখা ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হইয়া তাহাদের গৃহটীকে ছোটখাট একটী কুঞ্জের মত রমণীয় করিয়া তোলে।

আর একজাতীয় বর্ত্তিকা. মৎস্য (বাটা মাছ) আমেরিকায় সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগের বাস-নির্ম্মাণ-প্রণালী অভিনব ধরণের। দারুণ গ্রীষ্মের সময় ইহারা নদীগর্ভের কতকটা স্থান বেশ সুন্দররূপে পরিচ্ছন্ন করিয়া তাহাতেই এক স্তর ডিম্ব প্রসব করে। পরে নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে ছোট ছোট প্রস্তরখণ্ড সংগ্রহ করিয়া তাহা দ্বারা সেই ডিম্বের স্তরটীকে বেশ করিয়া আচ্ছাদিত করিয়া দেয়। এই কার্য্য সম্পন্ন হইলে সেই সকল আচ্ছাদন

বাসরচনায় নিযুক্ত সূর্য্য মৎস্য।

বৃক্ষশাখায় দোদুল্যমান 'পিরাই' মৎস্যের বাসা।

প্রস্তরখণ্ডের উপর আর এক স্তর ডিম্ব প্রসব করে এবং তাহাও পূর্ব্বের ন্যায় প্রস্তর-খণ্ডের দ্বারা আবৃত করিয়া দেয়। এইরূপে একে একে স্তরগুলি ভূমি হইতে প্রায় আট ইঞ্চি অবধি উচ্চ করে।

অরিনকো (Orinoco) নদীতে পিরাই (Perai) নামক একশ্রেণীর মৎস্য বাস করে। ইহারা সাধারণতঃ নদীতটস্থিত বড় বড় বৃক্ষ হইতে লম্বমান নদীজলস্পর্শী লতাতন্তু দ্বারা দিব্য বাসস্থান রচনা করে। চিত্র হইতেই তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় মিলিবে।

শ্রীগুরুদাস আদক।

মুর্শিদাবাদের প্রাচীন কাহিনী।

১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে আলিবর্দ্দী খাঁ মুঙ্গের যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে বিশ্বাসঘাতক আতাউল্লার কয়েকখানি পত্র তাঁহার হস্তগত হইল। এই সকল পত্রে আতাউল্লা বিদ্রোহীগণকে নির্ভয়ে রাজশক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পরামর্শ দিয়া পরিশিষ্টে আশ্বাস দিয়াছেন যে তাহাদের অভীষ্টসাধনে কোন প্রকার বাধা বা বিপদ উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদিগকে সাধ্যমত সাহায্য করিতে ত্রুটি করিবেন না। মুঙ্গের হইতে নবাব একেবারে বঢ়ে যাত্রা করিলেন। এই বঢ়েই বিদ্রোহীরা তাহাদের প্রধান আড্ডা স্থাপিত করিয়াছিল। বিপৎকালে মহারাষ্ট্রেরা তাহাদিগকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত ছিল। সেই জন্য তাহারা তথায় প্রতিক্ষণেই মহারাষ্ট্রের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। শমশীর খাঁ ইতিপূর্ব্বে একদিন হবিবকে ভোজনে নিমন্ত্রণ করিয়া, মহারাষ্ট্রদিগের প্রতিজ্ঞা রক্ষার প্রতিভূ স্বরূপ তাহাকে স্বকীয় শিবিরে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল। শত্রুপক্ষের মধ্যে এইরূপ বিরোধ ও মনোমালিন্যে নবাবের আরও সুবিধাই হইল। যুদ্ধের প্রারম্ভেই সর্দ্দার খাঁ নিহত হইলেন এবং তাহার সৈন্যদল তৎক্ষণাৎ ছত্রভঙ্গ হইয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। দুর্দ্দান্ত শমশীরের সহিত মুর্শিদাবাদস্থ হবিব বেগ নামে এক ব্যক্তি দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তৎকালে মুর্শিদাবাদের লোকেরা অসিক্রীড়ায় নিপুণতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। হবিব তাহার শ্রেষ্ঠ কৌশলের বলে অবিলম্বে শমশীরের মস্তক দেহচ্যুত করিয়া নবাবের পদতলে রাখিয়া দিল। বিদ্রোহী আফগানদিগকে প্রথমে পরাজিত করিয়া পরে মহারাষ্ট্রদিগকে শাসিত করাই নবাবের উদ্দেশ্য ছিল। শামশীর ও সর্দ্দারের মৃত্যুতে তাহাদের সৈন্যগণ রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। অগত্যা মহারাষ্ট্রেরাও যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করিয়া মেদিনীপুর অভিমুখে পলায়ন করিল। পরিত্যক্ত শত্রুশিবিরে প্রবেশ করিয়াই আলিবর্দ্দী তাঁহার কন্যাকে আলিঙ্গন করিলেন। প্রিয়তমা কন্যাকে ফিরিয়া পাইয়া তিনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দান করিলেন ও দরিদ্রদিগের মধ্যে প্রভূত অর্থ বিতরিত করিলেন। এইবার জয়গর্ব্বে পাটনা নগরে প্রবেশ করিয়া তিনি তাঁহার বালক দৌহিত্র সিরাজ উদ্দৌলাকে তদীয় পিতৃপদে অধিষ্ঠিত করিলেন। সিরাজ বঙ্গের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হইলেন। সিরাজের অনভিজ্ঞতাহেতু নবাব রাজা জানকী রামকে সহকারী শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিলেন। আতাউল্লার অতীত রাজসেবা স্মরণ করিয়া নবাব তাহাকে অপর কোন শাস্তি না দিয়া কর্ম্মচ্যুত করিলেন এবং তাহার সঞ্চিত অতুল সম্পত্তি সঙ্গে লইয়া রাজধানী ত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। আলিবর্দ্দীর অন্তর এত উদার ও মহৎ ছিল যে তাঁহার কোন কর্ম্মচারী বিদ্রোহী বা বিশ্বাসঘাতক হইয়াছে বলিয়া তিনি তাহার পরিবারবর্গের উপর কোন প্রকার অত্যাচার করা নিতান্ত হীনতা বলিয়া জ্ঞান করিতেন। সেইজন্য তিনি বিদ্রোহী আফগান সেনাপতির পরিবারবর্গকে তাহাদের শোকে সহানুভূতি জানাইয়া এক পত্র লিখিলেন এবং বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ অর্থ ও উপঢৌকনাদি পাঠাইয়া দিলেন। এমন কি তিনি বিশ্বাসঘাতক মির হবিবের পত্নীকে অর্থ ও অন্যান্য উপহার প্রদান করিয়া স্বকীয় ব্যয়ে তাঁহাকে তাঁহার স্বামীর নিকট উড়িষ্যাতে পাঠাইয়া দিলেন। এই বৎসরেই জানুজি ভোঁসলে মাতৃবিয়োগ হওয়াতে মেদিনীপুর ত্যাগ করিয়া বেরার যাত্রা করিলেন।

১৭৪৯ খৃষ্টাব্দেই অক্লান্ত বীর আলিবর্দ্দী পুনরায় রণসজ্জায় সজ্জিত হইলেন। এবার তিনি মহারাষ্ট্রদিগকে উড়িষ্যা হইতে চিরদিনের জন্য বিতাড়িত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। কিন্তু কৌশলী মহারাষ্ট্রদিগের নিকট ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া তিনি এই লুণ্ঠনকারীদিগের হস্ত হইতে রাজ্যরক্ষা করিবার জন্য

পুনরায় বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন। এবার আলিবর্দ্দী মেদিনীপুরেই বর্ষাযাপন করিয়া শীতের প্রারম্ভেই মহারাষ্ট্রদিগের সহিত শেষ-যুদ্ধ করিতে মনস্থ করিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি মেদিনীপুরের চতুর্দ্দিকে দুর্গাদি নির্ম্মাণ করিবার আদেশ প্রচার করিলেন। কিন্তু এই নির্ম্মাণ-ক্রিয়া শেষ হইতে না হইতেই সিরাজের বিদ্রোহ-সংবাদ আসিয়া উপস্থিত হইল। সুতরাং উপস্থিত আলিবর্দ্দীকে বিহারের প্রতিই মনোযোগী হইতে হইল। সিরাজ স্বাধীনভাবে রাজ্যভার গ্রহণ করিবার জন্য জানকীরামের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন সংবাদ পাইয়া নবাব বিচলিত হইয়া উঠিলেন। কিঞ্চিৎ সৈন্য সঙ্গে লইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিলেন। কিন্তু সিরাজ তৎপূর্ব্বেই বিহারে উপস্থিত হইয়া জানকীরামের নিকট হইতে পাটনা নগর হস্তগত করিয়াছিলেন। নবাব যে সিরাজকে কিরূপ ভাল বাসিতেন, তাহা জানকীরাম জানিতেন। সুতরাং এরূপ স্থলে তাঁহার যে কি কর্ত্তব্য তাহা তিনি স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অবশেষে বিনারক্তপাতে যুদ্ধ শেষ করাই শ্রেয় স্থির করিয়া, তিনি সিরাজকে পরাজিত করিয়াও অক্ষত দেহে সসৈন্যে পলায়ন করিবার অবসর প্রদান করিলেন। অনেক কষ্টে সিরাজকে বুঝাইয়া তাঁহার চিরস্নেহপূর্ণ বৃদ্ধ মাতামহের নিকটে আনিয়া উপস্থিত করা হইল। বৃদ্ধ নবাব তাঁহাকে তিরস্কার করা দূরে থাক, তৎক্ষণাৎ বক্ষের মধ্যে লইয়া বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহার সকল অপরাধ ক্ষমা করিলেন। সিরাজের অকৃতজ্ঞতা বা ঔদ্ধত্যের জন্য নবাব লেশমাত্র ক্রোধ বা বিরক্তি প্রকাশ করিলেন না।

১৭৫১ সালে আবার মহারাষ্ট্র ও নবাবসেনার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এতকাল ধরিয়া যুদ্ধ করিয়া উভয় পক্ষই শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং একটা সন্ধি স্থাপনের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া ছিল। আলিবর্দ্দী যেদিন বাঙ্গলার মসনদে আরোহণ করিয়াছিলেন, আজ আর তিনি সে আলিবর্দ্দী নাই। একে বার্দ্ধক্য তাহার উপর আবার প্রাণপ্রিয় দৌহিত্রের এই বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁহার হৃদয় একেবারে ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল—সে সাহস ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা যেন দিন দিন তাঁহাকে ত্যাগ করিতেছিল। এক্ষণে তাঁহার মনের অবস্থা এমন হইয়াছিল যে তিনি তাঁহার পদ বা খ্যাতির পক্ষে ক্ষতিকর সন্ধি করিয়াও মহারাষ্ট্রের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভে প্রস্তুত ছিলেন। নবাব ও মহারাষ্ট্রের মধ্যে যে সন্ধি হয় ষ্টুয়ার্ট (Stewart) সাহেব তাহার এই সংক্ষিপ্তসার দিয়াছেন :—

(১) মির হবিব নবাবের সহকারীরূপে গণ্য হইবেন। রাজা রঘুজি ভোঁসলের সৈন্যগণের যে টাকা প্রাপ্য আছে, মির হবিব উড়িষ্যা'র রাজস্ব হইতে তাহা পরিশোধ করিবেন। এতদ্ভিন্ন নবাব উক্ত রাজার প্রতিনিধিকে বাৎসরিক বার লক্ষ টাকা নজর দিবেন, তাহা হইলে মহারাষ্ট্রীরা আর নবাবের রাজ্য মধ্যে পদার্পণ করিবে না।

(২) বালেশ্বরের নিকটস্থ সোণামুখী নদী উভয় রাজ্যের মধ্যে সীমায় বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং মহারাষ্ট্রেরা কোনও দিন তাহা উত্তীর্ণ হইবে না, এমন কি নদীবক্ষে অবতরণ পর্য্যন্ত করিবে না।

আলিবর্দ্দী তাঁহার জীবনের শেষভাগে রাজ্যরক্ষণেই নিযুক্ত ছিলেন। বৰ্দ্ধক্য সত্ত্বেও তাঁহার বুদ্ধি বা মস্তিষ্কের শক্তি কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই। সিরাজের প্রতি স্নেহাধিক্যই তাঁহার চরিত্রের একমাত্র দুর্ব্বলতা ছিল। এই দুর্ব্বলতার ফলে সিরাজ এক্ষণে তাঁহার উপর নিজের আধিপত্য স্থাপন করিয়া তাঁহাকে সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য করিলেন। কিন্তু সিরাজকে নবাব এতই ভাল বাসিতেন যে তাহার উচ্ছৃঙ্খলতার ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার জন্য এ সময় তিনি তাঁহার রাজ্যের প্রত্যেক জেলার উপর "আবোয়াব" কর স্থাপন করিয়াছিলেন। সিরাজ এক্ষণে তাঁহার মাতামহের রাজ্যমধ্যে যথেচ্ছশক্তি লাভ করিয়া আপন উদ্দাম প্রবৃত্তিলালসার স্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া দিলেন। অনেক উচ্চ পদস্থ সভাসদকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। ১৭৫৩ সালে চিরবিশ্বস্ত বীর শাহামৎ এবং তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা সৌলৎ জঙ্গের মৃত্যু হয়। উড়িষ্যা হইতে

নির্ব্বাসিত হওয়া অবধি সৌলৎ তাঁহার চরিত্র-সংশোধন করিয়াছিলেন, এবং এক্ষণে তাঁহার মৃত্যুতে পুর্ণিয়ার তাঁহার প্রজাবৃন্দ শোকে অভিভূত হইয়া পড়িল। শাহামতের অতুল বীরত্ব, অটল সাহস, এবং বিপদে ধৈর্য্য ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্যই যে লোকে তাঁহাকে ভালবাসিত তাহা নহে। তাঁহার চরিত্র এরূপ নিষ্কলঙ্ক উদার ও মহৎ ছিল যে সকলেই তাঁহাকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিত ও ভালবাসিত। তাঁহার দানশীলতা এত অধিক ছিল যে তাঁহার মৃত্যুর পরে দেখা গেল সহস্র সহস্র বিধবা ও অনাথার ভরণপোষণ তাঁহার দাতব্য অর্থের উপর নির্ভর করিত। মাসিক ৩১ হাজার টাকা তিনি এইরূপে গোপনে দান করিতেন। কিন্তু ভবিষ্যতে মতিঝিলের বিরাট প্রাসাদশ্রেণীর নির্ম্মাতা ও অধিকারী রূপেই তাঁহার নাম চিরস্মরনীয় রহিবে। সে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অট্টালিকা শ্রেণী আজ কণ্টক-গুল্মে আচ্ছন্ন। এক হ্রদের মধ্যস্থলে এই প্রাসাদ-শ্রেণী গঠিত হয়। শুনা যায় ভাগিরথীর সহসা গতি পরিবর্ত্তনেই এই মনোহর সরোবরের সৃষ্টি। রাজধানীর কর্ম্মসঙ্কুল জীবন হইতে কিছুক্ষণ অবসর গ্রহণ করিয়া প্রকৃতির ক্রোড়ের মধ্যে শান্তি সম্ভোগ করিবার জন্য শাহামৎ তাঁহার গুণান্বিতা পত্নী, আলিবর্দ্দীর জ্যেষ্ঠা কন্যা, ঘসিটি বেগমের সহিত এই মতিঝিলে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। মুক্তা-সরোবরের (Pearl Lake) নাম মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধ রহিবে। এই স্থান হইতেই সিরাজ পলাসীর যুগান্তরকারী রণক্ষেত্রের উদ্দেশে যাত্রা করেন; এই স্থানেই ইংরাজ মীরজাফরকে বাংলার নবাব নাজিম বলিয়া অভিবাদন করেন; এই স্থানেই ক্লাইব নিজ-মুদ্দৌলা মুরশিদাবাদের সহিত একত্রে উপবেশন করেন; এই স্থানেই বৎসরের পর বৎসর মুর্শিদাবাদের প্রকৃত শাসনকর্ত্তাগণ অর্থাৎ ইংরাজ গভর্ণরের রাজনৈতিক প্রতিনিধিগণ বাস করিতেন। এখন সেই সৌধ-শ্রেণীর মধ্যে অবশিষ্ট আছে কেবল একটি ভগ্ন গৃহ! গৃহটি দৈর্ঘ্যে ৪২হাত এবং উর্দ্ধে ১২ হাত, কোথাও প্রবেশ পথ নাই। শুনা যায় ইহার অন্ধকার গর্ভের মধ্যে নাকি শাহামৎএর অনন্ত ধনরাজী প্রোথিত আছে। আজ পর্য্যন্ত কেহ সাহস করিয়া এ স্থানটি খনন করিয়া দেখেন নাই। যে দেখিতে চেষ্টা করিবে সে নাকি ভীষণ শাপগ্রস্ত হইবে।

১৭৫৬ সালে আলিবর্দ্দী উদরী রোগে আক্রান্ত হন, এবং বহুদিন যন্ত্রণাভোগ করিয়া এপ্রিল মাসে ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার আদেশ অনুসারে তাঁহার স্বর্গীয় জননীর পদপ্রান্তে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়। আলীবর্দ্দী খাঁর জীবন অতি পবিত্র ও ধর্ম্মনিষ্ঠাপূর্ণ ছিল। অতি প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়াই তিনি কোরাণ পাঠ করিতেন ও ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন। তাঁহার দানশীলতা এরূপ অধিক ছিল যে শুনা যায় তাঁহার হীনতম কর্ম্মচারীরও সঞ্চিত ধন সহস্র সহস্র মুদ্রা থাকিত। তাঁহার দারিদ্র্যের দিনে যাঁহারা তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের প্রতি তিনি বিশেষ ভাবে মুক্তহস্ত ছিলেন। তিনি এরূপ কৃতজ্ঞ-প্রকৃতি ছিলেন যে তাঁহার উপকারী ব্যক্তি অতি হীন অবস্থায় থাকিলেও তিনি তাহাকে একদিনের জন্যও বিস্মৃত হইতেন না। কন্যাগুলিকে তিনি বড়ই ভালবাসিতেন। তাঁহার স্বকীয় যত্নের ফলেই তাঁহার কন্যাগুলি এরূপ অশেষ-গুণসম্পন্না হইয়াছিল। একাধিক পত্নীগ্রহণ করা আমাদের দেশের নবাবদের রীতি ছিল। কিন্তু আলিবর্দ্দী তাহা করেন নাই। তাঁহার সদ্গুণের ফলে তদীয় রাজসভাতে চতুর্দ্দিক হইতে কবি, পণ্ডিত ও গুণীগণ আসিয়া সমবেত হইতেন। আলিবর্দ্দীর মুশৈরার গৌরব মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধ থাকিবে। এই সকল মুশৈরাতে শ্রেষ্ঠ কবিগণ আসিয়া তাঁহাদের রচনা পাঠ করিয়া শুনাইতেন। নবাব জীবনে কোন দিন একাকী ভোজন করেন নাই, সর্ব্বদাই দুই চারি জন সহচর সঙ্গে লইয়া একত্রে ভোজন করিতেন। তাঁহার চরিত্রনীতি অতি শুদ্ধ ও কঠোর ছিল এবং অন্তর যৎপরোনাস্তি উদার ও মহৎ ছিল। অশীতি বৎসর বয়সে আলিবর্দ্দী যখন দেহত্যাগ করিলেন, তাঁহার প্রজাগণ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে তাঁহার শবানুসরণ করিল। আলিবর্দ্দীর মৃত্যুতে অশ্রুত্যাগ করেন নাই এরূপ লোক নিতান্তই বিরল ছিল বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার সেই মৃত্যুদিন

হইতে আজ পর্য্যন্ত তাঁহার নাম করিবামাত্র এক মহিমান্বিত উদার পুরুষের পবিত্র স্মৃতি বাঙ্গালীর মনে ভাসিয়া উঠে।

এক সময়ে এক প্রাচ্য পর্য্যটক বলিয়া গিয়াছেন—"সাধারণ লোকের সম্বন্ধে আমরা যে ভাবে বিচার করি, রাজাদের দোষ ত্রুটির বিষয় সে ভাবে বিচার করিলে চলে না।" এ কথাটা খুবই সত্য। অন্যের সম্বন্ধে যে দোষ আমরা সহজেই ক্ষমা করিয়া থাকি, অনেকে আলিবর্দ্দীকে সেই প্রকার দোষের জন্য অপরাধী করিয়াছেন। শিবজী সায়েস্তা খাঁকে যে শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহা ক্ষমা করিতে যাঁহারা প্রস্তুত, তাঁহারাই ভাস্করকে হত্যা করার জন্য আলিবর্দ্দীর চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিয়া থাকেন। কিন্তু আলিবর্দ্দীর কাল হইতে আজিকার মধ্যে জগতের নীতি-আদর্শ যে বিশেষ ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে সে কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। সে যুগে এরূপ কর্ম্ম রাজনৈতিক বিচক্ষণতারই পরিচায়ক বলিয়া গণ্য হইত।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

কীট্‌স্‌ হইতে

এস এস হে আনন্দ, এস হে বিষাদ,
নরকতিমির এস, স্বরগের আলো,
এস আজ এস কাল পূরাও গো সাধ—
দুজনারে একসাথে আমি বাসি ভালো।
সুন্দর বসন্তপ্রাতে মুখখানি কালো
ভালবাসি—উল্কাপাতে উল্লাসের হাসি—
ভাল মন্দ একসঙ্গে দোঁহে ভালবাসি।
দাবাগ্নির বক্ষোপরে উন্মুক্ত প্রান্তর,
বিস্ময়ের মুগ্ধ মুখে উচ্চ কলস্বর;
গম্ভীর মুখশ্রী আর রঙ্গ এক সাথে,
শ্মশানের হরিধ্বনি বিবাহের রাতে;
স্তন্যপায়ী শিশু—তার খুলি নিয়ে খেলা,
মগ্ন তরণীর দৃশ্য শান্ত ভোর বেলা;
শ্যামলতা অঙ্গে বিষবল্লীর গাঁথনি,
প্রস্ফুট গোলাপকুঞ্জে সর্প গরজনি;
'ক্লিওপেট্রা' সুসজ্জিত রাজ্ঞী আড়ম্বরে—
ভুজঙ্গ-দংশন চিহ্ন রক্ত পয়োধরে;
নর্ত্তনের বাদ্যসাথে আর্ত্ত কণ্ঠরোল
পাশাপাশি একসঙ্গে পণ্ডিত পাগোল;
রৌদ্র ও করুণরস একত্র মিলন,
রাহুর উন্মুক্ত গ্রাসে মধ্যাহ্ন তপন;
হাসি শেষে কান্না—ফিরে পুন হাসিমুখ—
হায়, সে কি সুমধুর বেদনার সুখ!
এস রুদ্র, তুমিও গো করুণা সুন্দরি,
মুখের অঞ্চল-বাস দূরে অপসরি'
দেখা দাও, দেখা দাও—দাও দেখিবারে
দিবারাত্রি যুগ্ম শোভা যুক্ত একাধারে;—
মিটায়ে গো তৃষ্ণা আজি উপকণ্ঠ ভরি'
বেদনার মহানন্দরসপান করি।
রচিব নিকুঞ্জ মোর বিষবিটপীতে—
তুলসী মঞ্জরী মালা গ্রন্থিত যাহায়;
নিম্ব আর দেবদারু যার চারিভিতে,
লভিব বিশ্রাম সেথা শ্মশান শয্যায়।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

জীবন-দণ্ড।

(বেল্‌জাক হইতে)

ফ্রান্সের এক তরুণ কর্ম্মচারী মেণ্ডাসহরের শৈলস্থিত প্রাসাদ-সংলগ্ন বাগানের প্রাচীরের কাছে বসিয়াছিল। মাথার উপর স্পেন-দেশসুলভ মৃদু নীল আকাশের চাঁদোয়া, নিম্নে চন্দ্রতারা-কিরণে সমুজ্জ্বল শৈললগ্ন সুন্দর উপত্যকা। একটি মুঞ্জরিত কমলালেবু গাছে হেলান দিয়া একশত ফিট নীচে অবস্থিত মেণ্ডা সহরের পানে সে চাহিয়াছিল। তাহার মনে হইতেছিল, যেন এই সহরটি উত্তর বায়ুতে উড়িয়া আসিয়া শৈলের সানুদেশে আশ্রয়স্বরূপ রহিয়া গিয়াছে। অন্যদিকে বিপুল সমুদ্র, সুবিস্তৃত রজত উড়ানির মত তটের বন্ধনে সুপ্তিসুখে একরূপ শান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রাসাদটি আলোকময়; নৃত্য-গীত-আমোদ ও হাসিগানের দূর মৃদুশব্দ বীচিমর্ম্মরের সহিত মিলিয়া বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল।

স্পেনের জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই প্রাসাদের অধিকারী। তিনি ও তাঁহার পরিবারবর্গ তখন সেখানে বাস করিতে-ছিলেন। সারা বিকাল ধরিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যাটি যেরূপ করুণামাখা স্নেহ-ব্যাকুলতার সহিত এই যুবককে নিরীক্ষণ করিয়া আসিতেছে, তাহাতে এই ফরাসী যুবকের হৃদয়ে যে একটা স্বপ্ন-ভাবনা জাগিয়া উঠিবে, ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি!

ক্লেরা সুন্দরী; সম্ভ্রান্তবংশীয় স্পেনবাসী যে এক ফরাসী মুদী-তনয়ের হস্তে কন্যা সমর্পণ করিবেন না, ইহা সে জানিত। বিশেষতঃ স্পেনীয়েরা তখন ফরাসীদিগকে ঘৃণা করিত। সেই রাজ্যের শাসনকর্ত্তা জেনারেল গতিয়ে এই মার্কুয়েসকে ফার্দ্দিনন্দের বিপক্ষে ষড়যন্ত্রকারী বলিয়াই সন্দেহ করিতেন। মার্কুয়েস ও তাঁহার অনুগত লোকজনকে সংযত রাখিবার জন্য ভিক্টরের অধীনে একটি সেনাদল নিযুক্ত ছিল। বিশেষতঃ এদিকে মার্শে-লনের প্রেরিত সংবাদে শীঘ্রই ইংরাজ অভি-যানের সম্ভাবনা বুঝা যাইতেছে এবং তাহাতে মার্কুয়েসেরও সহযোগিতার কথা নিতান্ত গোপন ছিল না।

সেই কারণেই স্পেনীয়দের সাদর আহ্বান সত্ত্বেও ভিক্টর বরাবর সতর্ক ছিল। নীচের দিকে চাহিয়া মার্কুয়েসের অকৃত্রিম বন্ধুপ্রীতি ও স্পেনবাসীদিগের শান্ত মৌন বাধ্যতার সঙ্গে জেনারেল গতিয়ের সন্দেহ কি করিয়া খাপ খায়, সে তাহাই ভাবিতেছিল। কিন্তু হঠাৎ এক নিমেষে সমস্ত চিন্তাজাল ছিন্ন করিয়া একটা আত্মরক্ষার ভাব ও ন্যায়সঙ্গত কৌতূহল তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। আজিকার সেন্ট্ জেমস্ উৎসবে প্রাসাদ ব্যতীত অন্য সকল স্থানে এ সময় আলো জ্বালাইয়া রাখা ত সে নিষেধ করিয়া দিয়াছে, তবে এ আলোক-রশ্মি কোথা হইতে আসে? এ কি! চৌকিস্থান হইতে তাহারি নিযুক্ত সৈন্যবর্গের বেয়নেট না মাঝে-মাঝে ঝলসিয়া উঠিতেছে? কিন্তু তখনো চারিদিকে সুগভীর নিস্তব্ধতা; স্পেনবাসী উৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছে, বলিয়া ত, কোনো

লক্ষণ দেখা যাইতেছে না! স্থানে স্থানে পুলিশের উপর দৃষ্টি রাখিবার জন্য, সে সৈন্যকর্ম্মচারী মোতায়েন রাখিয়া আসিয়াছে; তবে, ইতিমধ্যে স্পেনীয়দের মধ্যে এমন কি ঘটিতে পারে? সে নীচে নামিতে আরম্ভ করিল। হঠাৎ পশ্চাদ্দিকে মৃদু চরণধ্বনি শুনিয়া আবার থমকিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু পশ্চাতে চাহিয়া কিছুই সে দেখিতে পাইল না, কেবল সমুদ্র তার অসামান্য ঔজ্জ্বল্য লইয়া দৃষ্টির সম্মুখে ঝলসিয়া উঠিল। তন্মুহূর্ত্তেই সে এমন-কিছু দেখিল যাহাতে তাহার দৃষ্টিকে সে সহসা বিশ্বাস করিতে পারিল না। শরীরের মধ্য দিয়া যেন একটা কম্পন বহিয়া গেল; বহুদূরে কতকগুলি জাহাজ ভাসিতেছিল, চাঁদের কিরণে তাহার চোখে, সেটা মোহ বিভ্রম বলিয়া মনে হইল। সেই সময় কর্কশ কণ্ঠে তাহার নাম উচ্চারিত হইতে শুনিয়া সে ফিরিয়া দেখিল, তাহারই এক অনুচর উপরে উঠিয়া আসিতেছে। সে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "সেনাপতি, আপনি কি— ?" যুবক সতর্ক নিম্নস্বরে উত্তর করিল "হাঁ, কি চাও।"

"নীচে সব পাজি ব্যাটারা পিপীলিকার মত এদিক ওদিক ফিরিতেছে, আমি যা কিছু দেখিয়াছি, তাহাও শুনুন।"

"বল।"

"এইমাত্র এদিকে আমি প্রাসাদ হইতে আগত একটা লোকের অনুসরণ করিয়াছিলাম; এত রাতে লণ্ঠনটা ভয়ানক সন্দেহের জিনিষ। আমি মনে ভাবিলাম ব্যাটারা আমাদের হাড়গোড় চিবিয়ে খেতে চায়। তাই এই পথে পাছে পাছে তার অন্ধি সন্ধি লক্ষ্য করিতে গেলাম। দেখি একটা প্রকাণ্ড জ্বালানি কাঠের আঁটি অল্প দূরে একটা উঁচু জায়গায় একেবারে স্তূপাকার করিয়া রাখা হইয়াছে—"

কথাটা শেষ হইল না। সহসা একটা ভয়ানক চীৎকার-ধ্বনি সহরের বুক চিরিয়া ভাসিয়া উঠিল। সেই সঙ্গে একটা উজ্জ্বল আলোও ভিক্টরের সম্মুখে ঝলসিয়া উঠিল। মাথায় গোলার আঘাত পাইয়া সৈন্যটি পড়িয়া গেল। যুবকের দশ-বারো পদ দূরে খড়কুটা ও শুক্‌নো কাঠে দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। নাচঘরে মুহূর্ত্তের মাঝে হাস্যগীত থামিয়া গেল। সহসা উৎসবের গীতধ্বনি ও মধুর উন্মাদনার স্থানে মৃত্যুর বিরাট স্তব্ধতা আসিয়া চারিদিক ঘেরিয়া বসিল; শুধু মাঝে মাঝে অস্ফুট কাতরধ্বনিতে এই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইতেছিল। কামানের বজ্রধ্বনি কাঁপিয়া কাঁপিয়া সমুদ্রের বুকের উপর দিয়া বহিয়া গেল। ভিক্টরের ললাট ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল। হায়! এই দুঃসময়ে একটা অসিও তাহার হাতে নাই। ইতিমধ্যে তাহার সব লোক যে নিহত হইয়াছে তাহা সে বুঝিতে পারিল। ইংরাজেরাও শীঘ্র আসিয়া পৌঁছিবে। বাঁচিয়া থাকিলে ভবিষ্যতে তাহার জন্য অপমান সঞ্চিত হইয়া আছে, সে তাহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিল। উপত্যকার গভীরতা চক্ষুদ্বারা পরিমাপ করিয়া সে নীচে লাফাইয়া পড়িতে উদ্যত হইল, অমনি নিঃশব্দে ক্লেরা আসিয়া পশ্চাৎ হইতে তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। ক্লেরা বলিল, "পালাও, আমার ভাইরা তোমাকে মারিবার জন্য অনুসরণ করিতেছে; এদিকে পাহাড়ের

নীচে জুয়ানিটোর ঘোড়া আছে,—ছুটিয়া যাও।"

বিস্মিত যুবক তাহার দিকে ক্ষণকাল হতবুদ্ধি হইয়া চাহিয়া রহিল। ক্লেরা তাহাকে ঠেলিয়া দিল, তখন আত্মরক্ষার জন্য একটা স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাবশে, সে ক্লেরার প্রদর্শিত পথে ছুটিয়া চলিল। যে পথে মেষ ছাড়া মানুষ কখনো চলে নাই, ভিক্টর সেই দুর্গম পাহাড়ের পথে লাফাইয়া পড়িল; সে শুনিল, ক্লেরা তাহার ভাইদিগের নিকট চীৎকার করিয়া তাহাকে অনুসরণ করিবার জন্য বলিয়া দিতেছে, আততায়ীরা তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে, কত গোলাগুলি কানের পাশ দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। কিন্তু সে নির্বিঘ্নে নীচে পৌঁছিল, দেখিল, ঘোড়া বাঁধা আছে; নিমেষের মধ্যে তার পিঠে চড়িয়া বসিয়া সে বিদ্যুদ্বেগে সেখান হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

দুই এক ঘণ্টার মধ্যেই জেনারেল গতিয়ের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। গতিয়ে তখন অনুচরবর্গসহ ডিনারে বসিয়াছেন।

তাহার মুখ ফ্যাকাশে এবং বিকৃত হইয়া গিয়াছে। দাঁড়াইয়াই সে সমস্ত বিপদের বার্ত্তা বিবৃত করিল। সকলে নির্ব্বাক বিস্ময়ের সহিত শুনিল।

কিছুক্ষণ পরে কঠোরহৃদয় গতিয়ে বলিলেন, 'তোমাকে দোষীর চেয়ে বেশী দুর্ভাগা বলিয়াই মনে হয়; স্পেনবাসীদের এই বিপ্লবের জন্য অবশ্য তুমি দায়ী নও; আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম, তবে মার্শেল অন্য বিচার না করিলে ভালো।"

বেচারা ভিক্টর ইহাতে অল্পই সান্ত্বনা পাইল, সে বলিল, "কিন্তু যখন সম্রাট শুনিবেন?"

"তোমাকে বধ করিতে চাহিবেন! যা হোক, সে বিষয়ে আর কথা নয়—তবে এমন একটা প্রতিশোধ লইতে হইবে যে সমস্ত দেশ জুড়িয়া একটা আতঙ্ক জাগিয়া উঠে, দেখিব হতভাগারা কেমন সব অসভ্যের মত যুদ্ধ করে।"

এক ঘণ্টার মধ্যে অশ্বারোহী ও পদাতিকে মিলিয়া বিপুল সৈন্যবাহিনী অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া অভিযানে বাহির হইল। গতিয়ে ও ভিক্টর সকলের আগে চলিলেন। সৈন্যেরা সহযাত্রীগণের এই নিদারুণ নিধন বার্ত্তা শুনিয়া উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। আশ্চর্য্য দ্রুততার সহিত সকলে আসিয়া মেণ্ডায় পৌঁছিল। জেনারেল দেখিলেন পথে সমস্ত গ্রাম বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে; একে একে সবগুলিকে ঘেরাও করিয়া তিনি অসংখ্য গ্রামবাসীর হত্যাসাধন করিলেন।

কোন দুর্জ্ঞেয় কারণে ইংরাজ জাহাজগুলি আর অগ্রসর হয় নাই। শেষে জানা গেল যে এইগুলি তাহাদের সঙ্গীর দলকে পাছে ফেলিয়া কেবল অস্ত্র শস্ত্র নিয়া চলিয়া আসিয়াছে। কাজেই ইংরাজাগমনোৎফুল্ল মেণ্ডাসহর হঠাৎ যখন সে সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া গেল, তখন বিনা যুদ্ধে ফরাসীদের হাতে আত্ম-সমর্পণ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় রহিল না। প্রাসাদের সামান্য ভৃত্যটি হইতে মার্কুয়েস অবধি সকলে বন্দীভাবে তাঁহার হাতে বিচারের অপেক্ষা করিতে স্বীকৃত হইলে, জেনারেল অত্যাচার হইতে অবশিষ্ট সকলকে রক্ষা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিলেন।

সৈন্যদলের নিরাপদের জন্য জেনারেল যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিলেন। সৈন্যাবাসের জন্য শিবির সংস্থাপন করিয়া পাহাড়ে উঠিয়া প্রাসাদ অধিকার করিলেন। লিয়াগেরিস্ পরিবারের সকলেই অনুচর বর্গের সহিত বলনাচের সুবৃহৎ কক্ষে বন্দী হইলেন। সেই কক্ষের জানালা দিয়া উন্নত ভূমির নিম্নদেশে প্রসারিত মেণ্ডা সহর অবস্থিত।

জেনারেল বিচারে বসিলেন। দুই শত বন্দী স্পেনবাসীকে প্রাসাদসংলগ্ন উন্নত স্থানটির উপর গুলি করিয়া মারা হইল। এবং প্রাসাদের বন্দীদিগের জন্য ফাঁসিকাষ্ঠ স্থাপিত হইল। তাড়াতাড়ি জেনারেলের নিকট আসিয়া ভিক্টর আবেগপূর্ণ ভগ্নকণ্ঠে বলিল "আমি আপনার নিকট একটা ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছি।"

জেনারেল তীব্র ব্যঙ্গস্বরে বলিলেন "তুমি?"

ভিক্টর বলিল,"মার্কুয়েস্ ফাঁসিকাষ্ঠ স্থাপিত হইতে দেখিয়াছেন; তাঁহার পরিবারবর্গের নিধন-সাধনের জন্য অন্য কোনো উপায় অবলম্বন করিবেন এইটুকু তিনি আশা করেন।"

জেনারেল বলিলেন,"আচ্ছা, তাই হউক।"

ভিক্টর বলিল, "তাঁরা আপনার কাছে আরো প্রার্থনা করেন যে, আপনি তাহাদিগকে ধর্ম্মের শেষ সান্ত্বনা গ্রহণ এবং বন্ধন মোচনের অনুমতি দিবেন; তাঁহারা পলাইবার কোনো চেষ্টা করিবেন না, এরূপ প্রতিজ্ঞা করিতেছেন।"

জেনারেল বলিলেন, "আচ্ছা আমি স্বীকৃত কিন্তু তুমি তাদের জন্য দায়ী রহিলে।"

"বৃদ্ধ তাঁহার ছোট ছেলের জীবনের বিনিময়ে আপনাকে তাঁহার সমস্ত ধনসম্পত্তি দিতেও প্রস্তুত আছেন।"

জেনারেল বলিলেন, "বাঃ! তার সব ত এখন রাজা জোশেফের।" কিছু ক্ষণ থামিয়া অবজ্ঞাসূচক মুখভঙ্গিসহকারে জেনারেল আবার বলিলেন "শেষ অনুরোধটির মর্ম্ম এখন আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি। ভালো তাহার বংশ বরাবর টিঁকিয়া থাকুক, কিন্তু স্পেনবাসীরা তাহার বিশ্বাসঘাতকতা এবং শোচনীয় শাস্তির কথা চিরদিন স্মরণ রাখিবে। তার কোনো পুত্র যদি আজ জহ্লাদের কাজ করত তাকে তার জীবন এবং সমস্ত ধনসম্পত্তি ফিরাইয়া দিতে প্রস্তুত আছি। যাও, এ সম্বন্ধে আমাকে আর বেশী কথা বলিও না।"

গর্ব্বোদ্ধত লিয়াগেরিস্ পরিবার আজ মর্ম্মান্তিক শোকে দগ্ধ হইতেছে। ভিক্টর করুণার সহিত তাহাদিগের দিকে চাহিয়া দেখিল। গত রজনীতেই এই অনিন্দ্যরূপা বালিকাদুটিকে এবং তিন ভ্রাতাকে এই কক্ষের মাঝেই নৃত্যগীত-রঙ্গের মধুরোন্মাদে সে মগ্ন দেখিয়াছিল! এত শীঘ্র তাহাদের সুন্দর শিরগুলি স্কন্ধ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িবে! নিরুপায়! এই কথাটা স্মরণ করিয়া ভিক্টর কাঁপিয়া উঠিল। তাহাদের স্বর্ণাঙ্কিত চেয়ারে রজ্জুবদ্ধ পিতা এবং মাতা, তাঁহাদের দুইটি মেয়ে ও তিনটি ছেলে, গতিহীন মৌন হইয়া বসিয়া রহিয়াছে। তাহাদের সম্মুখে আট জন অনুচর পশ্চাদ্বদ্ধ হাতে দাঁড়াইয়া আছে। এই পনের জনে পরস্পর মুখচাওয়াচায়ি করিতেছে। অন্তরে যে প্রবল চিন্তা

উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে, চোখে তার বিন্দুমাত্র আভাস নাই, শুধু আত্মসমর্পণ এবং সম্মিলিত চেষ্টার অসম্ভাবিত নিষ্ফলতার। নিবিড় ছায়া কাহারো বা মুখে অঙ্কিত! পাহারায় নিযুক্ত সৈন্যেরাও তাহাদের নির্ম্মম শত্রুদিগের এই নির্ব্বাক শোকাভিনয়ে মৌন-করুণ শ্রদ্ধা-মিশ্রিত সহানুভূতি প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছে না। ভিক্টরের আগমনে একটা ব্যগ্র কৌতূহলে সকলের চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। সৈন্যদিগকে বন্দীদের বন্ধন মোচন করিতে সে আদেশ দিল এবং স্বয়ং গিয়া ক্লেরাকে বন্ধনমুক্ত করিল।

অধরপুটে একটি সুকরুণ মৃদু হাসি ফুটাইয়া ক্লেরা বলিল, "তুমি কৃতকার্য্য হয়েছিলে?" তাহার চোখে তখনো বাল্যের সরল মধুরিমা বিরাজ করিতেছিল।

অলক্ষিতে ভিক্টরের দীর্ঘনিশ্বাস বায়ুতে মিলাইয়া গেল। সকাতর দৃষ্টিতে সে একবার ক্লেরা এবং তাহার তিনটি ভাইয়ের দিকে চাহিল। বড় ভাইটির বয়স ত্রিশ,—খর্ব্বাকৃতি, তার দৃষ্টি গর্ব্ব এবং ঔদ্ধত্যে পূর্ণ, কিন্তু সমস্ত দেহভাঙ্গতে একটা উন্নত আভিজাত্যের গৌরব ফুটিয়া বাহির হইতেছে এবং যে সূক্ষ্ম কোমল পরদুঃখকাতর হৃদয়ভাব অন্যত্র স্পেনদেশের নাইট সম্প্রদায়ের বীরত্বগর্ব্বে দেশ বিদেশে যশোমণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে, জুয়ানিটোতে তাহারো অভাব বোধ হইল না। দ্বিতীয় ভাইটির নাম ফেলিপি; বয়স বিশ, দেখিতে ক্লেরার মত। সবার ছোট ম্যানুয়েলের বয়স আট, তাহার মুখভঙ্গিতে একটা সুগভীর দৃঢ়তার ভাব অঙ্কিত। বৃদ্ধ মার্কুয়েসের উন্নত দেহ পলিত কেশ। জেনারেলের প্রস্তাব যে তাহারা কখনো মানিয়া লইবে, এমন আশা ভিক্টর হৃদয়ে পোষণ করিতে পারিল না। তথাপি ক্লেরার নিকট সে ধীরে ধীরে প্রস্তাবটি পাড়িয়া ফেলিল। প্রথমটা ক্লেরা বিস্ময়-চমকে কাঁপিয়া উঠিল; শেষে স্বাভাবিক শান্তভাবে পিতার কাছে গিয়া হাঁটু গাঁড়িয়া সে বলিল, "পিতা, জুয়ানিটোকে এই কাজ করতে বাধ্য করাও, তাতে আমাদের মঙ্গল হবে।" মার্কুয়েস-পত্নী ক্লেরার মর্ম্মান্তিক প্রস্তাব শুনিয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন। জুয়ানিটো পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত সহসা লাফাইয়া উঠিল। ভিক্টর তখন সৈন্য গণকে সরিয়া যাইতে বলিল। যখন ভিক্টর ছাড়া সেখানে অন্য লোক আর কেহ রহিল না, তখন মার্কুয়েস্ ডাকিলেন, গম্ভীর কণ্ঠে "জুয়ানিটো!"

মাথা নাড়িয়া অস্বীকার করা ব্যতীত জুয়ানিটো কথায় কোনো উত্তর দিল না। ক্লেরা নিকট গিয়া তাহার হাঁটুর উপর বসিল, এবং বাহুদ্বারা জুয়ানিটোর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া তাহার আঁখির পাতায় চুম্বন করিল। মৃদু হাসিয়া ক্লেরা বলিল, "জুয়ানিটো, ভাই, তুমি যদি শুধু জানতে, তোমার হাতে মরণ আমাদের কত সুখের, তা হলে জহ্লাদের হাতের স্পর্শ হতে এখনি রক্ষা করবে। আমাদের জন্য যত দুঃখ সঞ্চিত আছে, সে সব হতে তুমিই আজ মুক্তি দিতে পার—অন্যের হাতের লাঞ্ছনা তুমি দেখতে পারবে না, জানি, তবে—" কথা শেষ না করিয়া জুয়ানিটোর হৃদয়ে ফরাসীবিদ্বেষ জাগাইয়া দিবার জন্যই ক্লেরা তীব্র দৃষ্টিতে একবার ভিক্টরের দিকে চাহিল।

ফেলিপি বলিল, "ভয় কিসের? ভেবে

দেখ, আমাদের বংশ বরাবর একরকমে স্পেনে রাজা গড়ে এসেছে, তুমি যদি না থাক, তবে সে বংশ একেবারে নির্ম্মূল হয়ে যাবে যে!"

সহসা ক্লেরা উঠিয়া দাঁড়াইল এবং জুয়ানিটোর চারিদিক হইতে সকলে সরিয়া আসিল, বৃদ্ধ পিতা তখন উচ্চস্বরে বলিলেন, "জুয়ানিটো, আমি তোমাকে আদেশ করছি।"

যুবক কাউণ্ট নির্ব্বাকভাবে বসিয়া রহিল। তাহার পিতা সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন; ক্লেরা ম্যানুয়েল ফেলিপি মেরিকুইটা অলক্ষিতে তাঁহার অনুসরণ করিল। তাহারা সকলে জুয়ানিটোর দিকে হাত জোড় করিয়া রহিল। সে-ই শুধু তাহাদিগকে অপমান হইতে রক্ষা করিতে পারে! তাহার দৃঢ়তার উপরেই পুরাতন লিয়াগেরিস বংশের গৌরব ও স্থায়িত্ব নির্ভর করিতেছে!

সকলে মার্কুয়েসের কথারই পুনরাবৃত্তি করিতেছিল। পিতা কহিলেন, "তুমি কি তোমার সমস্ত শক্তি এবং স্পেনের বীরত্ব-গর্ব্ব আজ বিসর্জ্জন দিবে? কতক্ষণ তুমি তোমার পিতাকে এমন অবস্থায় রাখিবে? তোমার জীবন ও দুঃখের কথা ভাবিবার এখন তোমার কি অধিকার আছে?" পরে বৃদ্ধ পত্নীর দিকে চাহিয়া বলিলেন "লিনা, এই কি আমার পুত্র?"

মার্কুয়েস্-পত্নী হতাশার স্বরে বলিলেন, "ও স্বীকার করেছে গো!" জুয়ানিটোর চক্ষুর পাতা নামিয়া পড়িল জননী শুধু অর্থ বুঝিয়াছিলেন।

ছোট মেয়ে মেরিকুইটা তখনো তেমন হাঁটু গাঁড়িয়া রহিয়াছিল; সে তাহার মায়ের কণ্ঠ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া ছোট ভাই ম্যানুয়েল তাহাকে খুব ভৎসনা করিল। সেই মুহূর্ত্তে বংশ-পুরোহিত সেই কক্ষে প্রবেশ করিল; সমস্ত পরিবারটি আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল এবং জুয়ানিটোর কাছে লইয়া গেল। এ দৃশ্য ভিক্টরের আর সহ্য হইল না, সে ক্লেরাকে ইঙ্গিত করিয়া শেষ চেষ্টার একবার জন্য জেনারেলের নিকট ছুটিয়া চলিল। জেনারেল তখন সহচরদিগের সহিত আমোদ-উৎসবে রত!

ঘণ্টাখানেক পরে মেণ্ডার অধিবাসীদের মধ্যে এক শত জন মাতব্বর ব্যক্তি জেনারেলের আদেশে লিয়াগেরিস্ পরিবারের হত্যা দেখিবার জন্য প্রাসাদের সম্মুখস্থিত সমতলভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। মার্কুয়েসের ভৃত্যেরা তখনো ফাঁসীকাঠে ঝুলিতেছিল। বধ্যকাষ্ঠ, খড়্গ, এবং জুয়ানিটোর অস্বীকৃতি আশঙ্কায় সহরের জহ্লাদ, তখনো মার্কুয়েস্ পরিবারের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে স্পেনবাসীরা তখন কাহাদের চরণ ধ্বনি শুনিতে পাইল; সজ্জিত সৈন্যবর্গের পরিমিত পদক্ষেপ, অস্ত্রশস্ত্রের ঠুন-ঠুনি সৈন্য কর্ম্মচারীদের আমোদোৎসবের বিচিত্র কলধ্বনির সহিত মিলিয়া তাঁহাদের কাণে ভাসিয়া বাজিতেছিল। গত নিশীথোৎসবের আড়ালে যেমন এক বিশ্বাসঘাতক হত্যাকাণ্ড লুকাইয়াছিল, আজিকার হাসিগান ও পানোন্মত্ত সৈন্য কর্ম্মচারীদের উদ্ভ্রান্ত উন্মাদনার আড়ালেও তেমনি এক করুণ অভিনয় চলিতেছিল। সকলের দৃষ্টি প্রাসাদের দিকেই নিবদ্ধ ছিল; সম্ভ্রান্ত পরিবারটির সকলকেই আশ্চর্য্য পদগৌরবের সহিত অগ্রসর হইয়া আসিতে দেখা গেল।

সকলের মুখই একটা প্রশান্ত গাম্ভীর্য্যে মণ্ডিত; শুধু এক জনকে অত্যন্ত মলিন ও ফ্যাকাশে বলিয়া বোধ হইল; সে ধর্ম্ম-যাজকের বাহুর উপর হেলান দিয়া হাঁটিয়া আসিতেছিল। তাহাকেই কেবল ধর্ম্মযাজক সান্ত্বনা দিতেছিলেন—কেবল তাহাকেই, মরিবার যার ক্ষমতা নাই, যাহাকে কঠোর কর্ত্তব্যের জন্য সারাজীবনের জন্য আপনার সুখশান্তি বিসর্জ্জন দিয়া বাঁচিতে হইবে, যাহাকে আজিকার মৃত্যু হইতে বঞ্চিত হইয়া একই জীবনে শত সহস্র মৃত্যুক্লেশ বরণ করিয়া লইতে হইবে! তারো আজ দণ্ড! জীবন-দণ্ড! সকলে বুঝিল জুয়ানিটো আজিকার জহ্লাদের কাজ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। বৃদ্ধ মার্কুয়েস্ ও তাঁহার পত্নী, ক্লেরা ও মেরিকুইটা এবং তাহাদের দুইটি ভাই বধ্যস্থান হইতে অল্পদূরে ভূমিতে হাঁটু গাড়িয়া বসিল। জুয়ানিটো সেখানে আসিলে জহ্লাদ তাহাকে আড়ালে লইয়া দুই একটা উপদেশ দিল।

তাহারা অত্যন্ত সহজভাবে হাঁটু গাড়িয়া বসিল। মুখভঙ্গিতে উত্তেজনা কিম্বা ভয়ের চিহ্নমাত্র ছিল না।

ক্লেরা সকলের আগে আসিয়া জুয়ানিটোকে বলিল "জুয়ানিটো, আমার দুর্ব্বলতার জন্য আমাকে একটু দয়া করো, আমাকে দিয়াই তোমার কাজ আরম্ভ কর্‌তে হবে।"

তখন বেগে কে একজন অপর প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্লেরা একরূপ প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার শুভ্র মরাল-গ্রীবাটি খড়্গের ধার পরখ করিবার জন্য যেন উন্মুখ অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। দেখিয়া ভিক্টরের চক্ষু স্থির এবং মুখ মলিন হইয়া গেল। হৃদয়ও কেমন এক আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিল। তবু সে কোনোমতে নিকটে আসিয়া ক্লেরার কানে কানে বলিল, "তুমি আমাকে বিবাহ কর্‌লে জেনারেল তোমার জীবন-ভিক্ষা দিতে রাজী আছেন।" স্পেন-মহিলা গর্ব্বিত ঘৃণার সহিত যুবকের দিকে চাহিল, তার পর মুখ ফিরাইয়া বলিল, "আঘাত কর, জুয়ানিটো।" স্বর গম্ভীর, দৃঢ়।

ক্লেরার ছিন্ন শির ভিক্টরের পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িল; মার্কুয়েস্-পত্নীর সর্ব্বশরীর দিয়া একটা তড়িৎরেখা বহিয়া গেল; তার পর আসিল, ফেলিপি। ছোট ম্যানুয়েল ভাইকে জিজ্ঞাসা করিল, "জুয়ানিটো, আমি ঠিক আছি ত?"

জুয়ানিটো তার বোনকে বলিল "মেরিকুইটা, তুই কাঁদছিস্!"

বালিকা উত্তর করিল, "হাঁ দাদা, আমি তোমার কথা ভাবছি; আমাদের ছেড়ে তুমি কি করে থাক্‌বে ভাই?"

* * * *

তার পর মার্কুয়েস আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি তাঁহার সন্তানগণের রক্তধারা লক্ষ্য করিলেন, পরে নির্ব্বাক নিস্পন্দ দর্শকমণ্ডলীর দিকে মুখ ফিরাইলেন। তার পর জুয়ানিটোর দিকে চাহিয়া হাত বাড়াইয়া দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন, "স্পেনবাসী ভাই সব, আমি আমার পুত্রকে পিতার আশীর্ব্বাদ দিয়ে যাচ্ছি। জুয়ানিটো, আজ তুমি মার্কুয়েস; খড়্গ চালাও, কিছু ভয় করোনা, এতে তোমার কোনো পাপ নেই। তুমি পুণ্য কার্য্য করছ।"

সর্ব্বশেষে ধর্ম্মযাজকের গায় ভর দিয়া জুয়ানিটোর মাতা আসিলেন; জুয়ানিটো

আর পারিল না, চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল "না, আমি পার্ব্ব না।" তাহার চীৎকারে দর্শক বৃন্দের মুখ হইতে একটা সুস্পষ্ট যন্ত্রণাধ্বনি ফুটিয়া বাহির হইল। তাহাতে উৎসবের আনন্দ-রব ও হাস্যচ্ছটা ক্ষণকালের জন্য ডুবিয়া গেল। মার্কুয়েস পত্নী জুয়ানিটোর দৌর্ব্বল্য লক্ষ্য করিয়া স্তম্ভশ্রেণীর উপর দিয়া লাফাইয়া পড়িলেন, নীচে পাহাড়ের গায় লাগিয়া তাঁহার মস্তক চূর্ণ হইয়া গেল। সকলে প্রশংসাধ্বনি করিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে জুয়ানিটোর মূর্চ্ছিত দেহও ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

শ্রীসুখরঞ্জন রায়।

গোধূলি।

ছায়াঝিকিমিকি স্বর্ণ আলোক আমি
সান্ধ্য রবির কিরণের অনুগামী,
প্রদোষ নীরবে ধীরে ধীরে আমি নামি—
গোধূলি আমার নাম।
পাখীদের আমি কুলায়ে ভুলায়ে আনি,
হাওয়ায় বহাই ফুলের সুরভিখানি,
ক্লান্ত গাভীরে গৃহপানে আমি টানি—
বিশ্রাম অভিরাম।
সন্ধ্যার তারা মোরে হেরে তবে ফুটে,
আরতিশঙ্খ মোরি সাথে বেজে উঠে,
দিনের ক্লান্তি আদেশে আমার টুটে
লভিতে শান্তি ক্রোড়;
গৃহদীপখানি আমারে হেরিয়া জ্বলে,
বিরাম-শয়ন রচি বাতায়নতলে,
বিছাই তন্দ্রা ধরণীর স্থলে জলে
স্বপ্ন পরশে মোর।
অথচ আমার ক্ষণিকের পরমায়ু—
প্রদোষ বাতাসে তাই কাঁদে মোর বায়ু;
দিয়ে যাই তবু যতটুকু আছে আয়ু
ধরার সুখের লাগি;
দিনে দিয়া ছুটি রাত্রিকে ডেকে আনি,
শ্রান্তির পরে শান্তির রেখা টানি,
সন্ধ্যার বায়ে রটায়ে বিরাম-বাণী
তার পর ছুটি মাগি।
অস্তরবির হিরণকিরণাসীনা,
পশ্চিম মেঘে চঞ্চলালোকলীনা,
দূর দিগন্তে বাজাই স্বর্ণবীণা—
তন্দ্রা বিছানো তান;
দিকে দিকে মেলি' চঞ্চল কম-কায়া,
তালের বাকলে রচিয়া সোনার মায়া,
জাহ্নবী-জলে বিছায়ে রক্ত ছায়া,
তবে মোর অবসান—
গাহি নির্ব্বাণ গান।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

'অশ্রুকণা'-রচয়িত্রী।

শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

প্রায় পঞ্চত্রিংশ বৎসর পূর্ব্বে যখন এক বঙ্গীয়া বালিকা কবির রচিত 'কবিতাহার' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, তখন বাঙ্গালার সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' (১২৮০ জ্যৈষ্ঠ) তাহার সমালোচনাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "ইহার অনেক স্থান এমন যে তাহা কোন প্রকারেই অল্পবয়স্কা বালিকার রচনা বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না।" সুদূর শৈশবে যে প্রতিভার স্ফুরণমাত্র দেখিয়া সাহিত্য-সম্রাট মুগ্ধ হইয়াছিলেন, আজ তাহা বিকশিত হইয়া বাঙ্গালার কাব্য-সাহিত্য অপূর্ব্ব কিরণে উদ্ভাসিত করিয়াছে। এই প্রতিভাশালিনী কবি, শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী।

গিরীন্দ্রমোহিনী-রচিত 'অশ্রুকণা', 'আভাষ' 'অর্ঘ্য', 'শিখা' 'সিন্ধুগাথা' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থগুলি ভাবসম্পদ ও স-লীল সহজ অভিব্যক্তির গুণে মনোরম। এগুলি পাঠ না করিলে, কাব্য-পাঠ অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়।

গীতিকবিতার আধুনিক যুগে অনুকরণের ধূম লাগিয়া গিয়াছে। পুরুষ ও মহিলা কবির কাব্যে নূতন ভাবের পরিচয়-লাভ যে দুর্ঘট হইয়া উঠিয়াছে, সে কথা সত্য এবং আজ এমন দিনও আসিয়াছে, যখন মহিলারচিত বলিয়াই নিরপেক্ষ সমালোচনার হাত হইতে সাহিত্য অব্যাহতি পাইবে না। সে আপনার পাওনা-গণ্ডা কড়াক্রান্তিতে বুঝিয়া তবে আজ লেখক-লেখিকাগণকে আপন প্রবেশদ্বারে ছাড়পত্র দিবে! কঠোর এবং সূক্ষ্ম পর্য্যালোচনায় গিরীন্দ্রমোহিনীর কাব্যগুলি যে বঙ্গীয় সমালোচকের মতে বিশিষ্ট উচ্চাসন লাভ করিবে, সে বিষয়ে সংশয় নাই।

অতি শৈশব হইতেই কাব্যের প্রতি গিরীন্দ্রমোহিনীর সবিশেষ অনুরাগ লক্ষিত হইয়াছিল। যে বয়সে বালিকারা 'পুতুলখেলা' ও কলহাদি লইয়া মাতিয়া থাকে, সেই সময় বাণীদেবী তাঁহার গোপন ইন্দ্রজালে বালিকাকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। 'গণেশবন্দনা' লিখিয়া গিরীন্দ্রমোহিনী প্রথম কাব্য-সাহিত্যে 'হাতে খড়ি' করেন! সে সকল শৈশব রচনা কালের প্রভাবে 'অজানা'লোকে প্রয়াণ করিয়াছে, কিন্তু সে যে সূচনার আভাষ দিয়া গিয়াছে, তাহার শুভ পরিণতি আজ স্পষ্টতা লাভ করিয়া বাঙ্গালীর অন্তরের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে!

শৈশবেই গিরীন্দ্রমোহিনী-রচিত "ভারত-কুসুম" ও "কবিতাহার" প্রকাশিত হয়। গ্রন্থে কবির নাম ছিল না। 'জনৈক হিন্দু মহিলা' লিখিত—বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। কবিতাহার পাঠে সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার ৺দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় এতদূর প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন যে, তিনি কবিকে তদ্‌রচিত অমূল্য নাটকাবলী উপহার দিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন নানা ইংরাজী পত্রিকাতেও গ্রন্থের সুখ্যাতি পাঠ করিয়া নারীজাতির পরম হিতৈষিণী মেরি কার্পেণ্টার মহোদয়া গিরীন্দ্রমোহিনীর সহিত সাক্ষাতের অভিলাষিণী হয়েন, কিন্তু নানাকারণে উভয়ের সাক্ষাৎকার ঘটিয়া উঠে নাই!

তারপর, গিরীন্দ্রমোহিনীর তৃতীয় গ্রন্থ

অশ্রুকণা' প্রকাশিত হয়। স্বামীর মৃত্যুতে গিরীন্দ্রমোহিনীর হৃদয়ে যে শোকের সিন্ধু উথলিয়া উঠিল, 'অশ্রুকণা' তাহারি বিন্দু আভাষমাত্র! এই গ্রন্থের সহজ করুণ সুর পাঠকের চিত্তকে উদ্বেল করিয়া তুলে। সাধারণ শোকোচ্ছ্বাস ত এমন অনেক প্রকাশিত হয়, কিন্তু তাহার মধ্যে কয়টি সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য! গিরীন্দ্র-মোহিনীর কবিতা বিশ্বসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত! কারণ সে শোক উদার, তাহা সঙ্কীর্ণ নহে। আজি অবধি 'অশ্রুকণার' চারিটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে—তাহা হইতেই কাব্যের মর্ম্মস্পর্শিতা সকলে অনুমান করিতে পারিবেন। বাঙ্গালা দেশে যে কাব্য-গ্রন্থের চারিটি সংস্করণ অচিরকালের মধ্যে প্রকাশিত হয়, তাহার সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন হয় না!

নিষ্ঠুর কাল হিন্দু নারীর ললাটের সিন্দুর ঘুচাইয়া দিল—এ শোক সান্ত্বনার অতীত—কিন্তু যখন ভাবি সেই সিন্দুরহীন ললাটই কবিযশের অম্লান মুকুটমণির ছটায় ভরিয়া উঠিয়াছে, তখন আমরা সে শোকেও কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করি। 'অশ্রুকণায়' কবির আন্তরিক শোক যেন মূর্ত্তি ধরিয়া বাহির হইয়াছে, তাই ইহার উচ্ছ্বাসগুলি এমন মর্ম্মস্পর্শী। তাহার মধ্যে কোন আড়ম্বর নাই, কৃত্রিমতা নাই! তাহা বিধবা নারীর হৃদয়ের গান! 'অশ্রুকণা'র মুখপত্রে কবির উক্তিটুকু,—দুই ছত্রমাত্র—কাব্যের মূলসূত্র-টুকু ধরিয়া দিয়াছে,—

যথা অগ্নিহোত্র দ্বিজ, দীপ্ত রাখে অগ্নি নিজ,
—চিরদীপ্ত রবে হুতাশন!

'অশ্রুকণার' পরে প্রকাশিত অপর কাব্যগুলির মধ্য দিয়াও এই শোকের ধারা বহিয়া গিয়াছে! কোথাও কূলপ্লাবী সাগরের বিপুল ধারা, কোথাও বা অন্তরবাহিনী ফল্গুর শীর্ণ রেখা! তাঁহার কবি-জীবনের প্রধান ব্রত পতির ধ্যান—পতির পূজা! পতি-দেবতার প্রীতিকামনায় তিনি কাব্য রচনা করেন, তাই,'অশ্রুকণা'র শেষ কবিতায় কবি বলিয়াছেন,—

"তবে কি লিখিব 'শেষ'—গান সমাপন?
হায় রে হবে কি কভু থাকিবে জীবন?
লিখিব কি তবে শেষ হল অশ্রুকণা?
তা হলে মুহূর্ত্ত তরে আর বাঁচিব না।"

'অশ্রুকণা' পাঠ করিয়া সুকবি ৺অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় তাহার সমালোচনা করেন ও কবির উদ্দেশে একটি কবিতা রচনা করেন। অক্ষয়চন্দ্র লিখিয়াছিলেন, "তাঁহার কাব্য পড়িতে পড়িতে এমন মনে হয় না যে, তিনি কাগজ কলম লইয়া কখনো কবিতা লিখিতে বসিয়াছিলেন—যেমন শিশিরকণা দূর্ব্বাদলে পড়িয়া মুক্তারূপে ফুটিয়া উঠে, সেইরকম গিরীন্দ্রমোহিনীর কাব্যে তাঁহার কল্পনার উচ্ছ্বাসগুলি যেন অক্ষররূপে পরিণত হইয়াছে। * * কল্পনা 'স্নিগ্ধ বিদ্যুতের' ন্যায় উজ্জল, অথচ তীব্র নহে, লীলাময়ী অথচ দুরন্ত নহে, মুগ্ধকরী অথচ মর্ম্মভেদী নহে!" মনস্বী ৺চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিয়া-ছিলেন, This is poetry in life and as expression of that poetry *Asrukona* is the history of the soul of a noble Hindu woman.

'অশ্রুকণা'র পর "আভাষ"। কবি ভূমিকাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

"হৃদয়ে উথলে মম যে সিন্ধু-উচ্ছ্বাস,
'আভাষ' তাহার মাত্র প্রকাশে আভাষ।"

আভাষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাগুলি ভাবরসে আগাগোড়া ভরিয়া রহিয়াছে। কবির একটি করুণ উক্তি,

"বসে ওই মেঘের'পরে সাধ করে সই
যাইলো ভেসে,
হৃদয়ের ধন, প্রাণের রতন আছে যেথায়
যাই সে দেশে॥"

ইহার মধ্যে সমগ্র 'মেঘদূত' খানি যেন এক অভিনবভাবে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে! "শিখা" তাঁহার এই পতি-যজ্ঞের উজ্জ্বল হোমাগ্নি শিখা! তার পর কবি 'অর্ঘ্য' নিবেদন করিয়াছেন, পতিদেবতার পূজার জন্য! অর্ঘ্যের কবিতাগুলি এমন ওজোগুণসম্পন্ন যে,তাহা অর্ঘ্যপাত্রস্থিত রক্তজবার মতই সুস্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে! 'হৃদিছেঁড়া রক্তফুলে' কবি পতির পূজা করিয়াছেন!

তাহার পর "সিন্ধুগাথা"। ইহা কবির পতিস্মৃতি-উদ্বেলিত হৃদয়সিন্ধুর গম্ভীর ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত। ভাবে ছন্দে যেন তরঙ্গ খেলিয়া যাইতেছে—তাহার মধ্যেও সেই আর্ত্তচিত্তের করুণ সুর—

"দূরে নীল আকাশের কোলে ভেসে আসে
শুভ্র পোতখানি,—
ওপারের সংবাদ কাহার আনিছে এ প্রভাতে
না জানি!"

গিরীন্দ্রমোহিনীর কাব্যের সহিত পরিচয় সাধন করিতে হইলে দুই এক ছত্র কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দিলে বক্তব্য অসম্পূর্ণই রহিয়া যায়। এতগুলি উৎকৃষ্ট কবিতা লিখিয়া যশস্বিনী হইয়াছেন, এমন কবি বাঙ্গালাদেশে বিরল।

গিরীন্দ্রমোহিনীর সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক রচনা, "স্বদেশিনী"। সরল ভক্তি ও স্বদেশ-প্রেমের এমন মিশ্র ডালি বাণীদেবীর চরণ শোভা যে সমধিক বর্দ্ধিত করিয়াছে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই!

এক্ষণে সংক্ষেপে কবির জীবনীর পরিচয় দিয়া আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

সন ১২৬৫ সালে ৩রা ভাদ্র কলিকাতা ভবানীপুরে মাতুলালয়ে গিরীন্দ্রমোহিনীর জন্ম হয়। গিরীন্দ্রমোহিনীর পিতা ৺ হারাণচন্দ্র মিত্রের আদিনিবাস কলিকাতার চারি ক্রোশ উত্তরে, গঙ্গাতীরবর্ত্তী পাণিহাটি গ্রামে।

মজিলপুরগ্রামে গিরীন্দ্রমোহিনীর শৈশব অতিবাহিত হইয়াছিল। বাটিস্থ বালিকা বিদ্যালয়ে ইনি প্রথম শিক্ষা লাভ করেন। দিনের অধিকাংশ সময়ই গ্রন্থপাঠে অতিবাহিত হইত। শিক্ষার প্রতি গিরীন্দ্রমোহিনীর অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল। খেলাধূলার সময় খেলা করিতে তিনি বড় একটা ভাল বাসিতেন না। বিদ্যালয়ে সর্ব্বদাই তিনি রৌপ্যপদকাদি সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। শৈশব হইতেই তাঁহার চিত্ত পরদুঃখকাতর, শান্তিপ্রিয়, তিনি যখন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন, তখন তাঁহার সহপাঠিনী এক দরিদ্র বালিকা একদিন কাণ বিঁধাইয়া, কাণে সুতা পরিয়া বিদ্যালয়ে আসিয়াছিল। কাণে সুতা পরিবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বালিকা বলিল,"আমরা গরিব মানুষ, সোণার মাকড়ি পাব কোথা, ভাই, তোমাদের মত।" কথাটা বলিবার সময় বালিকার চোখ ছলছল করিয়াছিল, তাহাতে সহৃদয়া গিরীন্দ্রমোহিনী এমন বিচলিতা হইলেন যে তদ্দণ্ডেই আপনার কর্ণ হইতে মুক্তার মাকড়ি খুলিয়া তিনি বালিকার কর্ণে পরাইয়া দেন। এমন করিয়া বিত্তর দরিদ্রা বালিকাকে তিনি নূতন বস্ত্র জামা প্রভৃতি দান করিতেন। এ বিষয়ে মাতরা

অনুজ্ঞার অপেক্ষাও রাখিতেন না। মাতা কন্যার অতিরিক্ত দানশীলতায় বিরক্ত হইলে, বালিকা কন্যা করুণ কণ্ঠে কহিতেন, "আহা, ওদের যে নাই মা।"

শৈশবে শিক্ষকের নিকট গিরীন্দ্রমোহিনী ফলিত জ্যোতিষ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন! বিজ্ঞান সম্বন্ধেও তিনি পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন। বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে বিজ্ঞানশিক্ষার ব্যাঘাত হয়। সেই সময় ইংরাজী শিখিবার উদ্যোগ হয়। স্বামীর নিকট তিনি ইংরাজী পড়িতেন; কিন্তু কিছুকাল পড়িয়াই পড়া ছাড়িয়া দিলেন। স্বামী অনুযোগ করিলে গিরীন্দ্রমোহিনী বলিলেন, "গুরুমহাশয়ের নিকট না পড়িলে বিদ্যা-শিক্ষা হয় না!" কবির দাম্পত্যজীবনের এ রহস্যটুকু কেমন মিষ্ট ও উপভোগ্য।

শৈশবেই তাঁহার কাব্যানুরাগ প্রস্ফুট হইয়াছিল। কেহ নাম জিজ্ঞাসা করিলে, বালিকা গিরীন্দ্রমোহিনী আধ-আধ ভাবে বলিতেন,

"আমার নামটি বাবু চাঁদা।

পাখী মারি, ভাত খাই, চোখে লাগাই ধাঁধা!"

গিরীন্দ্রমোহিনীর পিতা হারাণচন্দ্র মধ্যে মধ্যে ইংরাজী ভাষায় কবিতা লিখিতেন। গিরীন্দ্রমোহিনীর বয়স যখন দ্বাদশ বর্ষ, সেই সময়, একদিন তিনি কন্যার নিকট একটি ইংরাজী কবিতা বাঙ্গালা ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইয়াছিলেন। তাহা শুনিয়া বালিকা কন্যা ছন্দে সেই বিদেশী কবিতার মর্ম্ম গাঁথিয়া পিতাকে দেখাইলেন। এই কবিতাটি "তপোবন" নামে "ভারত-কুসুমে" প্রকাশিত হইয়াছে। তারপর বালিকার কল্পনাবিকাশের সহায়তাকল্পে পিতা তাঁহাকে

Paul and Virginia, Theodosius, Constancia প্রভৃতি পুস্তক ও গল্প বাঙ্গালা ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতেন। তাহা হইতে, এবং মাতামহী-সংগৃহীত 'মহানাটক', 'কোকিলদূত', 'যোজনগন্ধা', 'বাসবদত্তা', "ইসফ জেলেখা," "কবিকঙ্কণ" প্রভৃতি পাঠ করিয়া গিরীন্দ্রমোহিনীর কাব্য-প্রতিভা স্ফুরিত হইয়া উঠে।

দশ বৎসর বয়সে গিরীন্দ্রমোহিনীর বিবাহ হয়। তাঁহার স্বামী ৺ নরেশচন্দ্র দত্ত বহুবাজারনিবাসী সম্রান্ত জমিদার ৺ অক্রূর দত্ত মহাশয়ের প্রপৌত্র ৺ দুর্গাচরণ দত্তের কনিষ্ঠ পুত্র।

বিবাহের পর, বিদ্যাশিক্ষায় ব্যাঘাত জন্মিলেও কাব্যানুরাগ বিন্দুপরিমাণে শিথিল হয় নাই। শিক্ষা নানাপথে তাঁহার প্রতিভাকে চালিত করিয়াছে। সূচীর সূক্ষ্ম শিল্প এবং রন্ধনাদিকার্য্যে গিরীন্দ্রমোহিনী সুনিপুণা। পরিণত বয়সে চিত্রকার্য্যেও তিনি সুপটু হইয়াছেন। তাঁহার অঙ্কিত অনেকগুলি উৎকৃষ্ট চিত্র বঙ্গদেশের নানা শিল্প প্রদর্শনীতে সমাদর ও পদকাদি লাভে সমর্থ হইয়াছে, ইহা অল্প প্রশংসার কথা নহে!

গিরীন্দ্রমোহিনীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কবিতাহার' প্রকাশ সম্বন্ধে বেশ একটু ইতিহাস আছে। ইংরাজী ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার রচিত গদ্যে পদ্যে লিখিত কয়েকখানি পত্র তাঁহার স্বামীর জনৈক বন্ধু "জনৈক হিন্দু-মহিলার পত্র" নাম দিয়া প্রকাশ করেন। পত্র প্রকাশিত হইলে, নববধূ গিরীন্দ্রমোহিনী অতিশয় লজ্জিত ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হইয়া প্রবাসী স্বামীকে লিখিয়াছিলেন, "যদি আমার রচনা লোককে দেখাইতে এত ইচ্ছা হইয়াছিল, তবে বলিলে আমি অন্য কবিতা না হয় দিতাম। পত্র কেন প্রচার করিলে?"

ইহার ফলেই গিরীন্দ্রমোহিনীর প্রথম কবিতাগ্রন্থ "কবিতাহার" প্রকাশিত হয়। 'কবিতাহারের' সমালোচনা-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

গিরীন্দ্রমোহিনীর প্রকৃতিটি প্রকৃতই কবিজনোচিত। গর্ব্ব নাই, দ্বেষ নাই, আড়ম্বর নাই। শান্ত মৃদু কথাবার্ত্তায়, মিষ্ট মধুর বচনে অবরোধ-বাসিনী কবি নিতান্তই যেন 'প্রকৃতিপালিতা'। আজো পর্য্যন্ত ইনি গম্ভীর-প্রকৃতি গৃহিণী (Serious house-wife) নহেন। কিন্তু ভবসমুদ্রের কূলে তিনি আবার সমুদ্রেরই মত গম্ভীর।

গিরীন্দ্রমোহিনীর জীবনে আর একটি উল্লেখ যোগ্য ঘটনা, 'ভারতী'-সম্পাদিকার সহিত তাঁহার অকৃত্রিম সখ্য। এমন সখ্যভাব সাহিত্য-জগতে —বিশেষতঃ প্রতিদ্বন্দিতার ক্ষেত্রে—বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সখ্যভাব আজীবন সমভাবে রহিয়াছে। ভারতী সম্পাদিকা তাঁহার রচিত 'স্নেহলতা' গিরীন্দ্রমোহিনীকে উপহার প্রদান করিয়াছেন, গিরীন্দ্রমোহিনীও সখীকে তদ্রচিত "শিখা" প্রত্যুপহার দিয়াছেন।

ইঁহাদিগের পরস্পরের প্রীতি-সম্পর্কের নাম, "মিলন"। একদিন গিরীন্দ্রমোহিনী ভারতী সম্পাদিকার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া আপনার মাথার চুলের কাঁটা ফেলিয়া যান, সেই ছলে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ভারতী- সম্পাদিকা এই কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন,—

অধরে মোহন হাসি, নয়নে অমৃত ভাসে,
বিরহ আগ তে শুধু মিলন পরাণে আসে।
কই রে মিলন কোথা, সে কি হেথা আছে আর!
রাখিয়া গিয়াছে শুধু গরল পরশ তার।
ফুলটী সে দিয়ে গেছে প্রভাতের আলো নিয়ে,
হাসি যত নিয়ে গেছে, অশ্রুজল গেছে দিয়ে।
সন্ধ্যা করে দিয়ে গেছে, নিয়ে গেছে সন্ধ্যা-তারা
আঁধার পড়িয়া আছে সুষমা হইয়া হারা
ফুলটী সে নিয়ে গেছে ফেলে গেছে কাঁটাচুটী,
বিরহ কাঁদিয়া সারা নয়ন মেলিয়ে উঠি।

গিরিন্দ্রমোহিনী "আভাষে" স্বীয় সখীকে লিখিতেছেন :—

মিলন মিলন কত বারই বলি,
কই রে মিলন কই!
মিলন চাহিতে বিরহ-সাগরে,
ডোব-ডোব তরী সই!
ভাসা ভাসা নদী, আশাভরা তরী
বেয়ে চলি ধীরি ধীরি,

অনন্তের কূলে মধুর মিলনে,
যদি রে মিশিতে পারি।
লইয়া বিদায় সবে চলে যায়
দেখা না হইতে শেষ—
বুঝি, তাই ভয়ে মরি, যাই সরি সরি
করিতে প্রাণে প্রবেশ।
লাগে যদি বোঝা ফেলে যেও সোজা,
গিয়াছে ফেলিয়া সবে।
একা আসিয়াছি যাব চলে একা,
ভেসে ভেসে ভবার্ণবে।

গিরীন্দ্রমোহিনীর জীবন দুঃখের জীবন। বাণীর কমল-বন, বুঝি, চিরকণ্টকাকীর্ণ। তাঁহার স্বামী নরেশচন্দ্রের স্বাস্থ্য কখনো ভাল ছিল না। প্রবাসে, স্বাস্থ্য-নিবাসেই তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত। গিরীন্দ্রমোহিনী নরেশচন্দ্রের ছায়াস্বরূপিনী বলিলে, অত্যুক্তি হয় না। পতিগতপ্রাণা হিন্দু সহধর্ম্মিণীর তিনি আদর্শস্থানীয়া। পতির জন্যই তাঁহার জীবন—নিজের কোন স্বাতন্ত্র্য নাই, কিছু নাই, এমন ভাবেই তিনি অনুপ্রাণিতা।

বালিকাবধূ দশ বৎসর বয়সে আসিয়া স্বামীর পাশে দাঁড়াইয়াছিলেন—কালের কঠিন বিধানে আজ সে স্বামী পাশে নাই—শরীরী হইয়া নাই, কিন্তু অশরীরী আত্মায় মিশাইয়া আছেন—এই ভাবই গিরীন্দ্রমোহিনীর কাব্যের মেরুদণ্ড। এইটুকু মনে রাখিয়া গিরীন্দ্রমোহিনীর কাব্য পাঠ করিতে হইবে। নচেৎ কাব্য ও কবির প্রতি সুবিচার না হইতেও পারে।

ইংরাজী ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে (সন ১২৯০ সাল) নরেশচন্দ্রের মৃত্যু হয়। স্বামীকে হারাইয়া গিরীন্দ্রমোহিনীর হৃদয় যে বিপুল শোকে ভরিয়া উঠিল, তাহারি 'অশ্রু-কণা' লাভ করিয়া বাঙ্গালার কাব্য-সাহিত্য ধন্য হইল। মৃত্যুর ভীষণতাকে ভাসাইয়া দিয়া শোকের যে সিন্ধু উথলিয়া উঠিল, অমরতার অমৃতবারিতে তাহা চিরদিন ভরিয়া রহিবে এবং বাঙ্গালী সে সিন্ধুর 'আনন্দে করিবে পান, সুধা, নিরবধি!'

সমালোচনা।

গীতাঞ্জলি।—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত। ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত, মূল্য এক টাকা মাত্র। কবিবরের রচিত ষড়শতাধিক অধুনা-রচিত উৎকৃষ্ট ভগবদ্-সঙ্গীতে গীতাঞ্জলি রচিত হইয়াছে। কবিবরের গীতের নূতন করিয়া পরিচয় দিতে যাওয়া ধৃষ্টতা! এই গীত-গ্রন্থখানি ভগবদ্ভক্তের আনন্দ, শোকার্ত্তের সান্ত্বনা, গৃহস্থের কল্যাণস্বরূপ! কবিবর আপনাকে নিখিলের মধ্যে একেবারে ব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছেন। সংসারের সমস্ত ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতার ঊর্দ্ধে ভগবানের সহিত অন্তর্মিলনের যে পরিচয় আজকাল তাঁহার রচনায় আমরা বহুলভাবে পাই, ইহাও তাহার অন্যতম। এই অন্তর্মিলনে তিনি যে শুধু পরম আনন্দ ভোগ করেন তাহা নহে, ইহা ব্যথিতের বেদনা মোচন করে এবং পীড়িতকে শান্তি দান করে। একমাত্র হৃদয় দিয়াই ইহা অনুভব করা যায়—সমালোচনা ইহার নিকট নিতান্তই মূক হইয়া রহে।

কাশীরাম দাসের চরিত্র মহাভারত।—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। এলাহাবাদ, ইণ্ডিয়ান প্রেস। ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য তিন টাকা মাত্র। রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্য দুইখানির নানাবিধ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। দেশের পক্ষে ইহা বিশেষ শুভ লক্ষণ। চরিত্রগঠনের সহায়তা-কল্পে রামায়ণ ও মহাভারতের অনুরূপ গ্রন্থ বিশ্বের সাহিত্যে আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বর্ত্তমান সংস্করণখানি নানা কারণে আমাদিগের নিকট ভালো লাগিয়াছে! সম্পাদক মহাশয় গুরুতর শ্রম স্বীকার করিয়া

আধুনিক রুচি-অনুযায়ী ইহার অশ্লীল শব্দ স্থানবিশেষে পরিবর্জ্জন করিয়াছেন বা প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন। তাঁহার লিখিত ভূমিকাটুকু উপাদেয়। সংক্ষেপে কাশীরামের কালনিরূপণাদির তত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়া পাঠকবর্গকে গুরুগবেষণার দায় হইতে তিনি মুক্তি দিয়াছেন। দুরূহ শব্দাদির টীকা, প্রাচীন ভারতের ভৌগোলিক সংস্থান বুঝিবার সুবিধা-বিধানের জন্য ভৌগোলিক টীকা ও মানচিত্রের সন্নিবেশে গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে।

তবে গ্রন্থের একটি ত্রুটির উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না—ইহাতে বত্রিশখানি নানাবর্ণে রঞ্জিত চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু কয়েকখানির পরিকল্পনা আমাদের ভাল লাগিল না। "ভীষ্মপ্রতিজ্ঞা" "শ্রীকৃষ্ণ ও দ্রৌপদী" "শ্রীকৃষ্ণের কপট নিদ্রা" প্রভৃতি চিত্র নিতান্তই যাত্রার অনুকরণে অঙ্কিত। মুখ চোখ সব উদ্ভট ধরণের। শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত কর্ত্তৃক অঙ্কিত 'প্রহ্লাদ'-চিত্রখানি সুন্দর হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয় ভূমিকা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "মহাভারতের ভাষানুবাদ পড়িয়াই শিবাজী মহারাজ দেশহিতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, আর মাইকেল মধুসূদন দত্ত কবি হইয়াছিলেন, এই কাশীদাসী মহাভারত পড়িয়া। আমরা সেই কাশীদাসী মহাভারতের পূর্ণাবয়ব সুসংস্কৃত সুলভ সংস্করণ বঙ্গের তরুণ পাঠকপাঠিকার সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি, ইহা তাঁহাদের ধর্ম্মে কর্ম্মে কাব্যে কলায় অনুরাগ-বৃদ্ধির সহায় হইবে, আশা করি।" আমরাও কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, সম্পাদক মহাশয়ের এ শুভ আশা পূর্ণ হউক। আমাদিগের সদর ও অন্দরের নীতি-শিক্ষা-সৌকার্য্যের জন্য রামায়ণ ও মহাভারত গ্রন্থই পর্য্যাপ্ত। উৎকৃষ্ট ছাপা ও বাঁধা এই দ্বাদশশত পৃষ্ঠাব্যাপী এই প্রকাণ্ড গ্রন্থের মূল্য নিতান্ত সুলভ হইয়াছে বলিয়াই আমাদিগের ধারণা।

মূর্ত্তিপূজা।—শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। ৫৭ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই আনা। 'দেবালয়'-সভায় সাপ্তাহিক অধিবেশনে প্রবন্ধটি পঠিত হইয়াছিল। তাহাই একণে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। পাঠ করিয়া সুখী হইয়াছি। ইহাতে অসঙ্গত উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য বা অন্ধ বিশ্বাসের দোহাই দেওয়া হয় নাই। মূর্ত্তিপূজার স্বপক্ষে যুক্তি-তর্কের সমাবেশে গ্রন্থখানি উপাদেয় হইয়াছে।

শিখগুরু ও শিখজাতি।—শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় প্রণীত। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেসে মুদ্রিত। ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা মাত্র। গ্রন্থের ভাষা সুন্দর হৃদয়গ্রাহী ও প্রাঞ্জল। বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের পক্ষে এমন উপযোগী ইতিহাস-গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অল্পই আছে। ইহা শুধু ইতিহাসের কঙ্কালমাত্র নহে—লেখকের সহৃদয়তার গুণে বর্ণিত বিষয়গুলি যেন চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইতিহাস-গ্রন্থ রচনায় শরৎবাবু নূতন পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। গ্রন্থখানিতে বেশ একটি ধারাবাহিকতা আছে—ইহার অংশগুলি স্বতন্ত্র বা বিচ্ছিন্ন নহে, ইহাই তাঁহার ইতিহাস-গ্রন্থের বিশেষত্ব। বর্ত্তমান গ্রন্থখানি আরো উপাদেয় হইয়াছে—গ্রন্থের প্রারম্ভে রবীন্দ্র বাবুর ভূমিকা-সমাবেশে। সুচিন্তিত ভূমিকাটি পাঠ করিলে ইতিহাস কাহাকে বলে, তাহার বিশদ আভাষ পাওয়া যায়। শিখ ও মারাঠা জাতির উত্থান-পতনের কারণ-নির্দ্দেশ, ভারতীয় আদর্শের স্বাতন্ত্র্য-নির্ণয় প্রভৃতি বিষয়গুলি কবিবরের ভূমিকায় সংক্ষেপে বেশ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত হইয়াছে। এমন জ্ঞানগভীর রচনা আমরা বহুদিন পাঠ করি নাই। গ্রন্থের ছাপা বাঁধাইও বেশ মনোজ্ঞ হইয়াছে। গুরু নানক, গুরু গোবিন্দ, সের সিং, রণজিৎ সিং, খড়্গ সিং, অমৃতসর স্বর্ণমন্দির প্রভৃতি বহু চিত্রও গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

আলপনা। শ্রীযুক্ত স্বর্ণলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আট আনা। এখানি গল্পের বহি। বর্ত্তমান গ্রন্থে গ্রন্থকার রচিত আটটি গল্প—তন্মধ্যে চারিটি

বিদেশী, দুইটি মৌলিক,—এবং একটি মৌলিক রস-রচনা "হুকার জন্ম" প্রকাশিত হইয়াছে। বিদেশীয় সাহিত্য হইতে বিস্তর গল্প সঙ্কলন করিয়া মণিলাল বাবু বঙ্গসাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। 'বরলাভ' "জয়মাল্য" "কিসমৎ" প্রভৃতি বিদেশী গল্পগুলি এমনি হৃদয় দিয়া লিখিত হইয়াছে যে পাঠকালীন আমাদিগের সহানুভূতি সহজেই উদ্রিক্ত হয়—বিদেশীয়ত্ব টুকু সে বিষয়ে মোটেই বাধা দেয় না। ইহা অল্প শক্তির পরিচায়ক নহে।

"জয়মাল্য" ক্ষুদ্র একটি প্রসঙ্গ; তাহার মধ্যে নাট্যকারের তুলিকাপাত আছে, কবির সহানুভূতি আছে, একটি জীবনের সমগ্র ইতিহাস আছে।

"কিসমৎ,"—রাজাধিরাজের বিলাস ও উৎসব-প্রাচুর্য্যের পাশ দিয়া কঠিন মৃত্যুর ছদ্ম প্রবেশ, লিপিচাতুর্য্যের সুন্দর পরিচয়। গল্পগুলি আমা-দিগকে একান্তই মুগ্ধ করিয়াছে। কোনখানে অস্বাভাবি-কতা নাই, আড়ম্বর নাই। "ঘটনাচক্র" ও "দেবতার কোপ" 'গল্প দুইটি মণিবাবুর মৌলিক রচনা। গল্পদুটি ছোট গল্পের আর্ট হিসাবে সুন্দর হইয়াছে। ব্যঙ্গেও লেখকে চমৎকার অধিকার আছে —'ঘটনাচক্রের' মধ্য দিয়া একটি স্নিগ্ধ হাস্যরসধারা আগাগোড়া বহিয়া গিয়াছে। "হুকার জন্ম" রসরচনা, —সার্থক হইয়াছে। পাঠ করিলে কমলাকান্তকে মনে পড়ে। রচনার কোনখানে এতটুকু অক্ষমতা নাই—হাস্যরসের নামে যাঁহারা শিহরিয়া উঠেন, এমন গম্ভীরপ্রকৃতি পাঠকও ইহা পাঠে হাস্যসম্বরণ করিতে পারিবেন না। ভাষা কবিতার মত মর্ম্মস্পর্শী। গ্রন্থে তিন খানি চিত্র আছে। পরিষ্কার ছাপা, পরিপাটি বাঁধাই, ও কভারে 'আল্‌পনা'র চিত্রটুকু সুন্দর, উপভোগ্য।

বিষ্ণুপুরাণ। (গার্হস্থ্য সংস্করণ) শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ প্রণীত। এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেস ও কলিকাতা ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত; মূল্য দশ আনা মাত্র। আখ্যায়িকাগুলিকে অবিকল রাখিয়া বিষ্ণুপুরাণের প্রায় সকল উপাখ্যানই গ্রন্থকার সরল কথায় নিজের ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। আখ্যা-য়িকাগুলি কৌতুক ও শিক্ষাপ্রদ। সৃষ্টিতত্ত্বের মত গুরুতর বিষয়ও লেখকের বর্ণনাগুণে বেশ সরল ও সহজ হইয়াছে। গ্রন্থখানি একাসনে বসিয়াই আমরা আদ্যোপান্ত পড়িয়া ফেলিয়াছি। লেখকের রচনায় বেশ একটি আকর্ষণী শক্তি আছে। পড়িতে বসিলে ক্লান্তি অনুভব হয় না। এমন সশ্রদ্ধভাবে সহজ ভাষায় আখ্যায়িকাগুলি বর্ণিত হইয়াছে—যে তাহা উপন্যাসের মত মধুর হইয়াছে। এইরূপ গ্রন্থই ছাত্র-দিগের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হওয়া উচিত মনে করি। জ্ঞানীর আনন্দ, শিক্ষার্থীর শিক্ষা, কাব্যামোদীর কল্পনা-বিকাশ—সকল বিষয়েই অতুলনীয় সহচরস্বরূপ এই গ্রন্থখানি বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্পদ যে সমধিক বর্দ্ধিত করিয়াছে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। গ্রন্থে চারিখানি নানাবর্ণে সুরঞ্জিত চিত্র, কভারের সুন্দর পরিকল্পনা, ছাপা কাগজ প্রভৃতি বহিরবয়বও বিশেষ পরিপাটি হইয়াছে।

পরদেশী। শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখো-পাধ্যায় বি, এ, প্রণীত। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। মূল্য আট আনা মাত্র। বাঙ্গালায় এগারোটি পরদেশীয় গল্পের সমষ্টি। ছাপা, কাগজ, কভার সুন্দর। গ্রন্থের আকার ও বিষয়ের হিসাবে মূল্যও যথেষ্ট সুলভ। গ্রন্থারম্ভে একখানি সুন্দর হাফটোন চিত্রও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সকল সাহিত্য-রচনার দুইটি পথ আছে। এক মৌলিক রচনা, অপর অনুবাদ বা ছায়ানুবাদ। দুই প্রকার রচনারই প্রয়োজনীয়তা আছে। মৌলিক রচনাই উৎকৃষ্ট; কিন্তু সময়ে সময়ে যথার্থ সাহিত্য-পুষ্টির জন্ম অনুবাদেরও একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে। সাহিত্যে যখন অন্তর্নিহিত শক্তির অভাব হয়, তখন বহিঃ-শক্তি দ্বারা সঞ্জীবিত না করিলে সাহিত্যের সমূহ ক্ষতি। পরদেশীয় সাহিত্য সেই বহিঃশক্তি সঞ্চারিত করিয়া সাহিত্যকে দুর্দ্দিনে জীবিত রাখে; এইখানেই অনুবাদের সার্থকতা, এইখানেই বিদেশীয় সাহিত্যের একান্ত প্রয়োজনীয়তা।

ছোট গল্প হিসাবে বাঙ্গালা সাহিত্যে সে দুর্দ্দিন

যে আসিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আজকাল বাঙ্গালা মাসিকে গল্প প্রকাশিত করিবার অন্ধ চেষ্টা জাগিয়া উঠিয়াছে তা' সে যেমন গল্পই হউক না। তাহার ফল এই হইয়াছে যে, ছোট গল্পের আদর্শ দিন দিন ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িতেছে। ব্যবসায়ের প্রতিযোগিতার নিকট সাহিত্য অনাদৃত হইতেছে।

ঠিক এমন দিনেই পরদেশী গল্প-অনুবাদের প্রয়োজন হইয়াছে। ছোট গল্প লেখার মধ্যেও যে একটা শিক্ষা ও আর্টের প্রয়োজন আছে, সে কথাটা আজিকার বাঙ্গালা গল্প যদি মনে করাইয়া না দিতে পারে ত' উৎকৃষ্ট বিদেশীয় গল্পের শরণ লওয়া ভিন্ন উপায় কি? সৌরীন্দ্রবাবু একজন প্রতিভাবান মৌলিক গল্প-লেখক হইলেও সাহিত্যের এই অভাবটা তাঁহার প্রতিভার নিকট ধরা পড়িয়াছে, তাই তিনি আজ আমাদিগের নিকট বিদেশীয় ছোট বড় কতকগুলি মণি-মাণিক্য-রত্ন-সংগ্রহ লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্য ও বাঙ্গালী আজ তাঁহাকে এবং তাঁহারই মত দুই একজন প্রচেষ্টাশীল লেখককে সাদরে অভিনন্দন করিতেছে।

গল্পগুলি যেন এক একটি হীরার টুকরা। সৌরীন্দ্রবাবুর শক্তির বিশেষত্ব এই যে, পরদেশীয় গল্পগুলিকে তিনি নিজের দেশের করিয়া ফেলিয়াছেন। তাহার অর্থ ইহা নয় যে, তিনি নায়ক-নায়িকার নাম-গুলা পর্য্যন্ত বদ্‌লাইয়া একটা খিচুড়ি পাকাইয়াছেন। গল্পগুলি বাহির হইতে সম্পূর্ণ বিদেশীই আছে; কিন্তু তাহাদের ভিতর প্রত্যেক ভাব, স্নেহের প্রত্যেক দৃষ্টান্ত, ভালবাসার প্রত্যেক পরিচয় আমাদের নিজস্ব, বুকের মধ্যে সত্য বলিয়াই তাহা আমরা অনুভব করি "প্রায়শ্চিত্ত"র আশ্রয়হীনা ক্রন্দন-শীলা কারেণ আমাদিগের হৃদয়কে ঠিক ততখানি শোকভারাবনত করিয়া তোলে, যতখানি ক্রোধ পিশাচ রলফের উপর পুঞ্জীভূত হইয়া উঠে! "বৃষ্টি" শুধু চীনের গল্প নহে, তাহা বিশ্বের! "সিন্ধুবক্ষে" বাতিঘরের চা'রিধারে যখন তুফান গর্জ্জন করিয়া উঠে, তখন আমাদেরও নিশ্বাস-রোধ হইয়া আসিতে থাকে, এবং "মুক্তিতে" "জো"র বেহালার প্রত্যেক করুণ রাগিণীর সহিত আমাদের চোখের জল উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। এমন কত পরিচয় দিব—সমস্ত গল্পগুলি পড়িয়াই আমরা মুগ্ধ হইয়াছি।

শিশির-সিক্ত প্রভাতের ফুলগুলির মত সব গল্প-গুলিই যেন টাট্‌কা, তাজা, প্রাণপূর্ণ। বিদেশের স্বাস্থ্য পূর্ণ বাতাসের একটা প্রবাহ শরতের এই আনন্দের দিনে আমাদের সোনার বাঙ্গালায় সঞ্চারিত হইয়া দিকে দিকে সৌন্দর্য্য ও সুষমা বিকশিত করিয়া তুলিবে, এ আশা আমাদের সম্পূর্ণভাবেই আছে।

পুষ্পপাত্র। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ প্রণীত। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দশ আনা মাত্র। এখানি গল্পের বহি। চারুবাবু বহুদিন যাবৎ মাসিক পত্রিকাদিতে গল্প লিখিতেছেন—সাহিত্যে তাঁহার পরিচয় নূতন করিয়া দিতে হইবে না। তাঁহার বিবিধ গল্প হইতে কয়েকটি মাত্র 'পুষ্পপাত্রে' সংগৃহীত হইয়াছে গল্পগুলি নানা রসাশ্রিত। চারুবাবুর গল্পগুলির একটি বিশেষত্ব—সেগুলির মধ্যে বেশ একটু মনোরম বৈচিত্র্য আছে। ভাষাও সুন্দর। সাধারণ গল্পের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া তিনি নূতনত্বের অবতারণা করিয়াছেন। দুই একটি গল্পে একটু অস্বাভাবিকতা দোষ লক্ষিত হইল। তবে বৈচিত্র্য হিসাবে তাহা ততটা ধর্ত্তব্য নহে। বাঙ্গালা গল্পে আমরা এরূপ বৈচিত্র্যেরই পক্ষপাতী। "সেবিকা" ও "নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী" গল্প দুইটি আমাদিগের মতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট,—বাঙ্গালা গল্পের রাজ্যে নূতন, বিশিষ্ট স্থান পাইবার যোগ্য। লেখক "কৈফিয়তে" বলিয়াছেন, "কতকগুলির মধ্যে সংস্কৃতের গন্ধ বড় বেশি আছে। যে সময় যে ভাষার চর্চ্চা করিতেছিলাম, সেই সময়-কার রচনায় সেই নূতন শিক্ষিত ভাষার লেখার ঝোঁক আমার অজ্ঞাতসারেই প্রকাশ পাইয়াছিল। ইহারও একটা উপভোগের দিক আছে বলিয়া পুরাতন লেখা যেমন ছিল তেমনিই প্রকাশ করিলাম।" ঠিক কথা। আমরা সে ভাষা উপভোগ করিয়াছি। কিন্তু আর্ট হিসাবে উক্ত ভাষা কতক পরিমাণে গল্পের সৌন্দর্য্যহানি করিয়াছে বলিয়াই আমাদিগের ধারণা।

পুস্তকের বাঁধাই, ছাপা, কাগজ প্রভৃতি সমস্তই সুন্দর হইয়াছে। মূল্যও সুলভ।

তীর্থরেণু। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা মাত্র। সুকবি বলিয়া অল্পদিনের মধ্যেই সত্যেন্দ্রবাবু প্রভূত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। নানাদেশের কবি রচিত নানা ভাষার কবিতার বঙ্গানুবাদে তীর্থরেণু সংগৃহীত। কবিতাগুলি অনুবাদ বলিয়া মোটেই মনে হয় না। উৎকৃষ্ট মৌলিক কবিতার মতই কবিতাগুলি সুন্দর-উপভোগ্য। গ্রন্থের আরো একটি বিশেষ গুণ, কবিতাগুলির বৈচিত্র্য। একবার আরম্ভ করিলে সমস্ত কবিতাগুলি পড়িতেই হইবে। এমন কথা একমাত্র রবীন্দ্রবাবুর কাব্য সম্বন্ধেই খাটে। রবীন্দ্রবাবুর কাব্যের পর কবিতা-পাঠে এমন আনন্দ আমরা আর কখনো উপভোগ করি নাই। যেমন মিষ্ট কোমল ভাষা, ছন্দেও তেমনি লীলাতরঙ্গ। এতগুলি উৎকৃষ্ট কবিতার পরিপূর্ণ এই সুবৃহৎ গ্রন্থের মূল্য এক টাকা মাত্র। গ্রন্থের পরিশিষ্টে গ্রন্থোক্ত কবিগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও বর্ণিত হইয়াছে। বাঙ্গালার কাব্যকুঞ্জ ক্রমেই জংলাঘরে ভরিয়া উঠিতেছে—অক্ষম কবিযশঃপ্রার্থীর ভাবহীন কর্কশ সুরে মুখরিত হইতেছে, এমন দুর্দ্দিনে উদীয়মান প্রতিভাশালী কবির "তীর্থরেণু" বাঙ্গালার কাব্য-সাহিত্যে নবজীবন সঞ্চারিত করিয়া দিল। বাঙ্গালার কাব্যসাহিত্য তীর্থরেণুর পবিত্র স্পর্শে ধন্য হউক! কবিতাগুলির ভাবৈশ্বর্য্যের উজ্জ্বল ছটায় তার জীর্ণ মলিনতা ঘুচিয়া যাউক—বাঙ্গালীর প্রতিগৃহ তীর্থরেণুর লীলাছন্দের কোমল, মধুর ঝঙ্কারে ভরিয়া উঠুক!

সমালোচক।

চিত্রব্যাখ্যা।

দময়ন্তী।—দময়ন্তী ও হংসের উপাখ্যান সুপরিচিত। রাজা নল হংসকে দূত করিয়া দময়ন্তীর নিকট পাঠাইয়াছিলেন। হংস দময়ন্তীকে নলের সংবাদ জানাইয়া দময়ন্তীর প্রতিসন্দেশ বহন করিয়া নলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছে। এবং দময়ন্তীর অন্তরে আনন্দরসের সঞ্চার হওয়াতে সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইয়াছে। পুলকগদ্গদ দময়ন্তী উড্ডীয়মান হংসকে নিরীক্ষণ করিতেছেন ইহাই চিত্রের বর্ণিত বিষয়। চিত্রখানি শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিকল্পনা।

ইংরাজের ক্রীড়াকৌতুক।—৪৭৪ পৃষ্ঠার ছবির অর্থ, Honesty is the best policy. On ST is the best Polly See. Polly অর্থে টিয়াপাখী। তিনটি টিয়াপাখীর মধ্যে মাঝেরটিই বড় সুতরাং সর্ব্বোৎকৃষ্ট, best.

৪৭৫ পৃষ্ঠার ছবির অর্থ,—দীপ-নির্ব্বাণ।

পূজায় ভিক্ষা-প্রার্থনা।

ভারতীর পাঠক-পাঠিকাগণ, বোধ হয়, মহিলা শিল্পাশ্রমের বিষয় সকলেই অবগত আছেন।

ভারতীতে ইহার সবিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা একটি হিন্দু বিধবাশ্রম। শিল্পাদি শিক্ষা দ্বারা যাহাতে হিন্দুবিধবাগণ স্ব স্ব জীবিকা-অর্জ্জনে সক্ষম হন, তদুদ্দেশ্যে ইহা স্থাপিত। এখানে তাঁত, [illegible] মোজা এবং অন্যান্য শিল্প-শিক্ষা দেওয়া হয় [illegible]পাততঃ প্রায় ত্রিশজন অনাথা মহিলা এই আশ্রমে বাস করিতেছেন। বলা বাহুল্য, এই আশ্রমরক্ষার ব্যয় বিস্তর—অথচ ইহার স্থায়ী কোন ফণ্ড নাই—প্রধানতঃ ভিক্ষা[র] উপরই ইহার জীবন-নির্ভর। বাঙ্গালী-গৃ[হে] পূজার সময় কেহ ভিক্ষাপাত্র লইয়া দ্বার[স্থ] হইলে গৃহস্বামী কখনই তাহাকে শূন্য হ[স্তে] ফিরাইতে পারেন না। আমরাও তাই আ[শা]পূর্ণ হৃদয়ে পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট এ[ই] অনাথা মহিলাদের জন্য সাহায্য প্রার্[থনা] করিতেছি। প্রত্যেকে যদি অন্ততঃ এক [টাকা] করিয়া টাকাও এজন্য [illegible]দান করেন কৃতার্থ হইব। ভারতী কার্য্যালয়েই পাঠাইতে অনুরোধ করি।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রী[illegible] দ্বারা মুদ্রিত ও ২২, [illegible] হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

প্রহরী

অজন্তার প্রথম গুহার চিত্র হইতে

ইউ, রায় কর্ত্তৃক ব্লক] [কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত

ভারতী

৩৪শ বর্ষ] কার্ত্তিক, ১৩১৭ [৭ম সংখ্যা

ভারত ও বিলাত।

(বিলাত-প্রবাসীর পত্র।)

১৩। ব্যক্তিত্ব ও জাতিত্ব।

এ জগতের ভিন্ন ভিন্ন জাতি একএকটা নিজস্ব আদর্শের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। এ আদর্শ তার ভিতর হইতে ফুটিয়া উঠিয়াছে; বাহির হইতে কোনো জাতিই আপনার এই নিজস্ব আদর্শটীকে ধার করিয়া লইতে পারে না। এই যে আদর্শের বিশেষত্ব, ইহাকেই জাতীয়তা বা জাতিত্ব বলা যায়। ব্যক্তির পক্ষে যেমন ব্যক্তিত্ব বলিয়া একটা জিনিষ আছে, জাতির পক্ষেও ঠিক সেইরূপ জাতিত্ব বলিয়া একটা বস্তু আছে। এই ব্যক্তিত্ব কাকে বলি? আমার ভিতরে, আমার দেহগঠনে, আমার চাল্‌চলনে, আমার ভাব ও চিন্তাতে, এমন কিছু আছে, যাহাতে দুনিয়ার অপর সকল লোক হইতে আমাকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। আমিও তাদেরই মত মানুষ, তাদেরই মত আমার হাত পা, আমার নাক মুখ চোখ। আমার শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকলই অপর মানুষের মতন। কিন্তু এগুলির ব্যবহারে আমার এমন একটা বিশেষত্ব ফুটিয়া বাহির হয়, যাহা অপরের হয় না। আমার কণ্ঠনালীতে আর অপরের কণ্ঠনালীতে কোনো পার্থক্য নাই, যদি কিছু থাকে, তাহাও সহজে ধরা যায় না। অথচ কণ্ঠনালীর গঠন আমাদের একরূপ হইলেও, আমার স্বরে ও অপরের স্বরে বিস্তর প্রভেদ লক্ষিত হয়। গঠন মোটামুটি এক, কিন্তু উচ্চারণ বিভিন্ন। এটি আমার ব্যক্তিত্ব বা বিশেষত্বের একটা বহিঃপ্রকাশ। সেইরূপ আমার পায়ে যে ক'খানা হাড় ও পেশী, অপর মানুষেরো তাই আছে; কিন্তু আমার পায়ের শব্দ ও তাদের পায়ের শব্দ এক নয়। আমাকে যাঁরা ভাল করিয়া চিনেন, আমার পায়ের শব্দে তাঁরা আমার পরিচয় পাইয়া থাকেন। শরীরের ও শারীর ক্রিয়ার ভিতরেও আমার নিজত্বটুকু এমনভাবে আপনাকে প্রতিনিয়তই ব্যক্ত করিয়া থাকে। আর যাহাতে আমার এই নিজত্বটুকুকে,—বিশাল বিশ্বে আমার এই বিশেষত্বটুকুকে ব্যক্ত করে, তাহাই আমার ব্যক্তিত্ব।

শরীর সম্বন্ধে যেমন আমার একটা বিশেষত্ব বা নিজত্ব আছে, শরীর সম্বন্ধে যেমন আমি দুনিয়ার সকল মানুষের সমান হইয়াও সমান নই, সাধারণ শারীর ধর্ম্ম আমার যেমন অপরেরো সেইরূপ, ইহা সত্য হইলেও

এই সত্যে ইহারই ভিতর আমার যে একটা বিশেষত্ব আছে, এই সাম্যের ভিতরই যে একটা চিরন্তন বৈষম্য ফুটিয়া উঠিতেছে, ইহাকে নষ্ট করে না। সেইরূপ আমার মনের গঠনে এবং চিন্তার প্রণালীতেও এমন কিছু আছে, যা'তে আমার চিন্তাকে, আমার বিচারকে, জীবনের জটিল সমস্যা আমি যেভাবে ভেদ করিতে যাই, তাহাকে, অপর লোকের চিন্তা, অপর লোকের বিচার, অপর লোকের বিশ্ব সমস্যার মীমাংসা হইতে পৃথক করিয়া রাখে। আমাদের চিন্তা যখন এক হয়, তখনো সে চিন্তার অভিব্যক্তি স্বতন্ত্র ও বিভিন্ন হইয়া থাকে। একই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়া, আমরা প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আমাদের নিজেদের মত করিয়া সে সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করি ও অপরের নিকট প্রয়োজন মত তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়া থাকি। আমাদের কণ্ঠের যেমন একটা সুর আছে, এ সুর যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির স্বতন্ত্র; একই কথা বলিতেছি, একই বর্ণ উচ্চারণ করিতেছি, উচ্চারণও সমভাবে সাধু হইতেছে, অথচ আমার সুর আমার, তোমার সুর তোমার, ইহা যেমন সত্য; সেইরূপ আমাদের মনেরো একটা সুর আছে। আমাদের অভিজ্ঞতা এক, আমাদের মত এক, আমাদের বিশ্বাস এক, আমাদের সিদ্ধান্ত এক,—এ সকলই হয়ত এক; কিন্তু তথাপি এই একই অভিজ্ঞতা, একই মত, একই বিশ্বাস, একই সিদ্ধান্ত যখন আমি প্রতিষ্ঠিত করিতে যাই, তখন তার ভিতরে আমার মনের যে নিজস্ব সুরটুকু আছে, তাহাই বাজিয়া উঠে, আর তোমার মনের যে নিজস্ব সুরটুকু আছে, তোমার চিন্তাতে, তোমার বিচারে, তোমার অভিব্যক্তিতে তাহাই বাজিয়া উঠে। এই মনের সুরটার নামই ভাষা। আমাদের ভাষাতে, যেভাবে আমরা শব্দ-যোজনা করি, যেরূপে আমরা কথাবার্ত্তা কহি, যে প্রণালীতে আমরা বিবিধ বিষয়ের বিচার-আলোচনা করি, এককথায় আমাদের লেখার ধরণে, রচনার প্রণালীতে, সর্ব্বদাই আমাদের মনের এই সুরটি ফুটিয়া বাহির হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির রচনার গাঁথুনীর দ্বারা তাঁর মনেরো গাঁথুনীর পরিচয় পাওয়া যায়। যাঁর চিন্তা লঘু, তাঁর ভাষাও লঘু হয়। যাঁর চিন্তা সতেজ, শক্ত, যুক্তি পরম্পরার উপরে সর্ব্বদা আপনার সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে, যাঁর ভিতরকার মনের স্বভাব এরূপ, তাঁর ভাষাতেও ইহা প্রকাশিত হইয়া থাকে। আর এই ভাষাটুকু আমাদের প্রত্যেকেরই আলাহিদা। রচনার কোনো বিশেষত্ব নাই, এমন লোকও আছেন। তাঁরা যখন যে বই পড়েন, তখন সেই লেখকের ভাষাই লেখেন ও বলেন। এরূপ তুলারাশি লোকের মনের বিশেষত্ব ফুটে নাই, ভাষারো বিশেষত্ব ফুটে নাই। তাঁদের মনেরো একটা বিশেষত্ব আছে, সত্য। কালক্রমে উপযুক্ত অনুশীলনে সে বিশেষত্বটুকু ফুটিয়া উঠিবে। আর তখন তাঁদের ভাষাও তাঁদের নিজস্ব বস্তু হইয়া দাঁড়াইবে। যাঁদের ভাষা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাঁদের লেখাতে সর্ব্বদাই তাঁদের নিজস্ব বা ব্যক্তিত্বটুকু ফুটিয়া বাহির হয়। অনেক লোকের ছবির মাঝখানে পরিচিত বন্ধুর ছবি যেমন সহজেই চেনা যায়, অনেক লেখকের রচনার ভিতরেও সেইরূপ

পরিচিত লেখকের লেখাটা সহজেই চিনিতে পারা যায়। যাঁরা বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের লেখা ভাল করিয়া পড়িয়াছেন, বিপুল সাহিত্য সংগ্রহের ভিতর হইতেও তাঁদের পক্ষে এই দুই সাহিত্যরথীর রচনা পৃথক্ করা একটুও কঠিন কাজ নহে। আর ইহাও কি সত্য নহে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা যখন পড়ি, তখন তার বর্ণে বর্ণে, পংক্তিতে পংক্তিতে, বঙ্কিমচন্দ্রের মানস-রূপ আমাদের মানসচক্ষে আসিয়া উপস্থিত হয়? রবীন্দ্রনাথের লেখা যখন পড়ি, তখন কেবল তাঁর লেখা নয়, উপরন্তু রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং আমাদের মনের মাঝখানে আসিয়া উপস্থিত হন? প্রত্যেক ব্যক্তির কণ্ঠে যেমন এক একটা বিশেষ সুর আছে, আর এই সুর যেমন তাঁর নিজস্ব বস্তু, ইহাতে তাঁর বিশেষত্ব বা ব্যক্তিত্বটুকুকে প্রকাশ করে; সেইরূপ প্রত্যেকের ভাষাতেও একটা বিশেষ সুর আছে, এ সুর কণ্ঠের নহে, মনের; আর তাঁদের মনের, চিন্তার যে বিশেষত্ব বা ব্যক্তিত্বটুকু আছে, তাহাই এই মনের সুরের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে। আর এই যে ভাষার সুর, ইহার ভিতর কোন্ দিক্ দিয়া এই বিশাল বিশ্ব-সমস্যার মীমাংসা করিতেছেন, কে কোন্ ভাবে এই জগৎটাকে দেখিতেছেন, এটিও স্বল্পবিস্তর বুঝিতে পারা যায়। কারণ এই বিশ্ব-সমস্যাই আমাদের চিন্তার মূল বিষয়ীভূত হইয়া রহিয়াছে। এই ইদং ও এই অহং—এই দুই বিরাটতত্ত্ব লইয়াই মন দিবানিশি ব্যস্ত রহিয়াছে। এই অহং ও ইদংএর জটিল সম্বন্ধের অর্থ কি, এই প্রশ্নের মীমাংসা করিবার চেষ্টা হইতেই মানুষের সর্ব্বপ্রকার শাস্ত্র-সাহিত্য, ও শিল্পবিজ্ঞানাদির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আমাদের লঘুগুরু, ক্ষুদ্রবৃহৎ, সকল আলোচনা ও সকল সমস্যার পশ্চাতেই এই বিশাল বিশ্বসমস্যা সতত দাঁড়াইয়া আছে। আমরা তাহাকে জ্ঞানে সকল সময় ধরিতে পারি না, সত্য; কিন্তু ধরি আর না ধরি, তাহাকে অতিক্রম করিয়া, ক্ষুদ্রবৃহৎ, বিশেষ-নির্ব্বিশেষে, কোনো সিদ্ধান্তেরই প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না। কোনো জ্ঞানই, ফলতঃ সম্ভব হইতে পারে না।

আমাদের শারীর ধর্ম্মে ও মানস ধর্ম্মে এই যে এক একটা বিশেষত্ব বা নিজস্ব আছে, যে বিশেষত্ব বা নিজস্বটুকুতে তোমাকে আমা হইতে, আমাকে তোমা হইতে পৃথক্ করিয়াছে, ও আমাদের উভয়কে, ও জগতের প্রত্যেক মানুষকে, অপর সকল হইতে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছে, ইহাই আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব। এইটুকুই আমাদের মৌলিকত্ব। ইহাই আমাদের নিজস্ব বস্তু। আর ব্যষ্টিভাবে, তোমার আমার এই যে ব্যক্তিত্ব, সমষ্টিভাবে, তাহাই প্রত্যেক জাতির জাতিত্ব। আমাদের প্রত্যেকের চেহারা যেমন স্বতন্ত্র, আমাদের সুর যেমন আলাহিদা, আমাদের চিন্তার ধরণ যেমন পৃথক্ পৃথক্, সেইরূপ সমষ্টিভাবে জগতের ভিন্ন ভিন্ন জাতিরো চেহারা স্বতন্ত্র, সুর স্বতন্ত্র, সমাজগঠন ও চিন্তার ধরণ, এ সকলই স্বল্পবিস্তর স্বতন্ত্র ও পরস্পর হইতে বিভিন্ন। এই যে স্বাতন্ত্র্য, এই যে বিভিন্নতা, এই যে বিশেষত্ব ইহারই নাম জাতিত্ব। আর এই যে জাতিত্ব, ইহা প্রত্যেক জাতির শারীর ধর্ম্মে ও মানস ধর্ম্মে, উভয়ক্ষেত্রেই প্রকাশিত হইয়া থাকে। এক ব্যক্তির চেহারা যেমন আর এক ব্যক্তির চেহারা হইতে ভিন্ন, সেইরূপ

জগতের ভিন্ন জাতি সমুহেরো পরস্পরের চেহারা বিভিন্ন। শরীরের বর্ণে ও গঠনে, এক জাতি অপর জাতি হইতে পৃথক হইয়া রহিয়াছে। জাপানের লোকের চেহারার সঙ্গে ভারতবর্ষের লোকের চেহারার মিল নাই। হিন্দুর চেহারার সঙ্গে কাফ্রির চেহারার মিল নাই। অতিশয় কালো হিন্দুকেও কৃষ্ণকায় কাফ্রি বলিয়া কেহ কখনো ভুল করিতে পারে না। আমেরিকাতে এমন প্রায়ই দেখা যায় যে রং দেখিয়া হঠাৎ কোনো হিন্দুকে লোকে কাফ্রি ভাবিয়াছে, কিন্তু মুখের দিকে চাহিয়াই, অপরাধীর মত, ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছে। শরীর-গঠনে যেমন, মনের গঠনেও সেইরূপ প্রত্যেক জাতির এক একটা বিশেষত্ব আছে। এই বিশেষত্ব তাহাদের ভাষার গঠনে প্রকাশিত হইয়া থাকে। কতকগুলি ভাষাতে অহং প্রত্যয়ের জ্ঞান প্রবল, কতকগুলিতে ইদং প্রত্যয়ের উপরেই ঝোঁক বেশী। সংস্কৃত ও সংস্কৃতের সঙ্গে যাদের মৌলিক সম্বন্ধ আছে, লাটিন, গ্রীক্ প্রভৃতি আর্য্যভাসাতে, অহং আমি, আমি আছি, এই পদ সিদ্ধ হয়, অপর জাতির ভাষাতে ইহা সিদ্ধ হয় না। শুদ্ধ অস্তিত্বের জ্ঞান স্মরণাতীত কাল হইতে,—ইতিহাস যে কালের খোঁজ পাইয়াছে,—তার বহু পূর্ব্ব হইতে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে, এই সকল জাতির ভিতর আশ্চর্য্যরূপে ফুটিয়াছিল, তাই তাদের ভাষায় শুদ্ধ অস্তিত্ব-জ্ঞাপক, অহং অস্মি ইত্যাকার পদ নিষ্পন্ন হইতে পারে। এমন ভাষাও আছে, যাহা এই অস্তিত্বকে ব্যক্ত করিতে যাইয়া সর্ব্বদাই কোনো ক্রিয়ার সঙ্গে তাহাকে যুক্ত করিয়া দেয়। আমরা যেখানে বলি, রাম আছে, সেখানে তারা বলে রাম বসিয়া আছে, বা দাঁড়াইয়া আছে, ইত্যাদি। এই যে বিভিন্ন জাতির আপন আপন ভাষার গঠনে এক একটা মৌলিক বিশেষত্ব আছে, ইহাতে এদের নিজস্ব চিন্তার ধরণটা প্রকাশিত হইতেছে। যে যে ভাবে চিন্তা করে, তার ভাষা সেইরূপই হয়। ইহা ব্যক্তির সম্বন্ধে যেমন সত্য, জাতিসমূহের সম্বন্ধেও সেইরূপ সত্য।

১৪। চিন্তা ও ভাষা।

ভাষার মুখ্য অঙ্গ তিনটী; কর্ত্তা, কর্ম্ম, ক্রিয়া। এ তিনের মধ্যে যে ভাষায় যেরূপ সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা করে,তাহারই দ্বারা সেই ভাষা যাহারা ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে, তাহাদের চিন্তার ধরণা জানিতে পারা যায়। কোনো জাতির ভাষায় কর্ত্তার উপরেই ঝোঁক বেশী, যাবার কোনো ভাষায় কর্ম্মের প্রতিই দৃষ্টি বেশী। এমন ভাষাও দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাতে কর্ত্তার উপরেও নয়, কর্ম্মের উপরেও নয়, কিন্তু শুদ্ধ ক্রিয়ার উপরই চিন্তার সকল জোরটা যেন আসিয়া পড়িয়াছে। রাম আঘাত করিয়াছে, সকল আর্য্য ভাষাতেই এরূপ পদ নিষ্পন্ন হয়। এখানে রাম কর্ত্তা, রামই এখানে মুখ্য শব্দ। কাকে আঘাত করিয়াছে, কিরূপে আঘাত করিয়াছে, এ সকল বিষয় সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া সর্ব্বাদৌ কে আঘাত করিয়াছে, মন এখানে তারই সন্ধান লইয়াছে। যে জাতির ভাষায় এই পদ নিষ্পন্ন হয়, সে জাতির চিন্তাতে কর্ত্তা বা অহংএর জ্ঞানই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। আবার এমন ভাষাও আছে, যাহাতে এই

একই অভিজ্ঞতা অন্যভাবে ব্যক্ত হয়। যদি কোনো ভাষায়, "রাম যদুকে আঘাত করিয়াছে, এরূপ পদ নিষ্পন্ন না হইয়া কেবল এই হয় যে, "যদু আহত হইয়াছে," তবে সেই ভাষা যাঁরা ব্যবহার করেন, তাঁহাদের চিন্তায় ও জ্ঞানে কর্ত্তা অপেক্ষা কর্ম্মের জ্ঞানই যে আদিকাল হইতে অধিকতর প্রবল ছিল; এ সিদ্ধান্ত সহজেই উপলব্ধি হয়। আবার এমন ভাষাও আছে, যাতে কর্ত্তা ও কর্ম্ম উভয়েরই জ্ঞান অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ, কেবল ক্রিয়ার জ্ঞানটাই নিরতিশয় প্রবল। এরূপ ভাষা আদিম কাল হইতে যে জাতি ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে, তাহাদের চিন্তার ধরণ যে অপরের চিন্তার ধরণ হইতে স্বতন্ত্র হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি ?

১৫। বিশ্বসমস্যা।

এই বিশ্বের মুখ্য তত্ত্ব দুটী—অহং ও ইদং। অহং কর্ত্তা, ইদং কর্ম্ম। অহং বিষয়ী, ইদং বিষয়। এই অহংএর সহিত এই ইদং এর সম্বন্ধ কি ? ইহাই বিশ্বের বিশাল ও সনাতন সমস্যা। এদের সম্বন্ধ-নির্ণয় করিতে যাইয়াই মানুষের জ্ঞান বিজ্ঞান, শাস্ত্র সাহিত্য, ধর্ম্ম কর্ম্ম, সকলই ফুটিয়া উঠিয়াছে। যে জাতি অনাদিকাল হইতে যে ভাবে এই বিশ্বসমস্যাকে দেখিয়াছে, ধরিয়াছে, তার যেরূপ মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়াছে, সে ভাবেই সেই জাতির ধর্ম্ম ও দর্শন, শিল্প ও সাহিত্য, এক কথায় তার সাধনা ও সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে। আর প্রত্যেক জাতির ভাষার মৌলিক গঠনের মধ্যে, সে জাতি এই বিশাল বিশ্বসমস্যাকে কিরূপে দেখিয়াছে ও ধরিয়াছে, তার মূল সূত্রটী খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কোথাও বা মানুষ অহংকে সকল অবস্থাতেই ইদং এর উপরে প্রভুত্ব করিতে দেখিয়াছে, সেখানে তার সাধনা ও সভ্যতা অহংমুখীন বা অন্তর্মুখীন হইয়াছে। সেখানে সে সর্ব্বদাই বিষয়ের মধ্যে বিষয়ীকে খুঁজিয়াছে, বিষয়-জাল ছেদন করিয়া, বিষয়ীকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। তার ধর্ম্ম আধ্যাত্মিক, তার দর্শন অদ্বৈত, তার শিল্প অন্তর্মুখীন, তার সকলই একটা বিষয়াতীত, অতীন্দ্রিয় প্রভাবের দ্বারা অভিভূত হইয়াছে। আবার কোথাও বা মানুষ বিষয়ের মধ্যে বিষয়ীকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। বিষয়ের প্রভাবে তার জ্ঞান এমনই অভিভূত হইয়াছে যে সে কিছুতেই বিষয়ীকে বিষয়ের উপরে একান্তভাবে স্থাপন করিতে পারে নাই। যে জাতি এইরূপে বিষয়ের দ্বারা অভিভূত হইয়া যায়, তার ধর্ম্ম, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য সকলই অতিমাত্রায় বহির্মুখীন ও বিষয়াধীন হইয়া পড়ে। মানুষ আদিকাল হইতেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এই বিশ্বসমস্যাকে দেখিয়াছে। বিভিন্ন পন্থা অবলম্বনে এই সমস্যার মীমাংসা করিতে চেষ্টা পাইয়াছে। এই জন্য তাদের সভ্যতাও পরস্পর হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে। এই চেষ্টা হইতেই ভিন্ন ভিন্ন জাতির ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছে।

১৬। জাতিত্ব ও মনুষ্যত্ব।

কিন্তু জগতের বিভিন্ন মানুষের একটা বিশেষ ব্যক্তিত্ব এবং বিভিন্ন জাতির একটা বিশেষ জাতিত্ব বা জাতীয়তা আছে বলিয়া যে তারা পরস্পরে সমান নহে, এমনো বলা

যায় না। জগতের সর্ব্বত্রই বৈষম্যের মধ্যে সাম্য ও সাম্যের মধ্যেই বৈষম্য রহিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির যেমন এক একটা বিশেষ জাতিত্ব আছে, তেমনি অপর সকলেরই মধ্যে একটা সাধারণ ও সার্ব্বজনীন মনুষ্যত্ত রহিয়াছে। সকলেই মানুষ। মানুষে মানুষে আকারে বিভিন্নতা, গঠনে বিভিন্নতা, চাল্‌-চলনে বিভিন্নতা, ভাবে ও চিন্তাতে বিভিন্নতা, একের আকার অপর হইতে পৃথক্‌, একের মনের গতি অপরের মনের গতি হইতে পৃথক্‌, একের প্রকৃতি অপরের প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র; কেহ বা তামসিক, কেহ বা রাজসিক, কেহ বা সাত্বিক, কিন্তু এ সকল বৈষম্য সত্বেও সকলেই মানুষ। স্বরূপতঃ সকলেই এক। সকলেরই মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে। আর এই মনুষ্যত্ব বস্তু পূর্ণ বস্তু, অখণ্ড বস্তু; তার ভাগ বাটোয়ারা হয় না। কারো মধ্যে এই সাধারণ মনুষ্যত্ব বেশী ফুটিয়াছে, কারো মধ্যে এখনো পরিমাণে ততটা ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। এইরূপে প্রকাশের অভিব্যক্তির ইতর-বিশেষ ভেদ আছে; কিন্তু মূল বস্তুর তারতম্য নাই। স্বরূপতঃ সকলে পরিপূর্ণ বস্তু। আর তাই বলিয়াই স্বরূপতঃ সকলে এক। আর স্বরূপতঃ সকলে এক বলিয়াই তারা পরস্পরকে জানিতে পারিতেছে, বুঝিতে পারিতেছে, পরস্পরের সঙ্গে ঐ এক ও অদ্বৈত স্বরূপের ভিতর দিয়া অশেষ প্রকারের সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে পারিতেছে। এক ব্যক্তির মধ্যে যাহা প্রকট, অপরে তাহা অপ্রকট; এদের ভিতরে ইহাই পার্থক্য। সেইরূপ এক জাতির মধ্যে যাহা ব্যক্ত, অপরে তাহা এখনো অব্যক্ত রহিয়াছে। নতুবা মূলে তারা সকলে একই ছাঁচে ঢালা, একই পূর্ণতার প্রকাশ, একই অদ্বৈত অখণ্ড বস্তুর অভিব্যক্তি। এই অদ্বৈত, অখণ্ড পরিপূর্ণ অব্যক্ত বস্তু, ভিন্ন ভিন্ন আধারের ভিতরে থাকিয়া, সেই সকল বিভিন্ন আধারের ভিতর দিয়া আপনাকে ব্যক্ত করিতেছেন। এজন্য এই বিশ্বের বিপুল অভিব্যক্তিতে ঋণের বা দানের প্রয়োজন নাই, স্থানও নাই, প্রত্যেকেরই একটা নিজস্ব, একটা বিশেষত্ব, একটা ব্যক্তিত্ব আছে বলিয়া, অপরের নিকট হইতে সে কখনো আপনার জীবনের মূল বস্তু-গুলি ধার করিয়া লইতে পারে না। এক রাজ্যে যেমন অপর রাজ্যের টাকাকড়ি চলে না, ভারতের টাকা বা পয়সা যেমন ফরাসীস দেশে রূপার বা তামার বাজার দরে বেচিতে হয়, টাকা বা পয়সা বলিয়া সেখানে তার কোনো দাম নাই, সেইরূপ এক ব্যক্তির সত্য ও ধর্ম্ম অপর ব্যক্তির জীবনে ও কর্ম্মে চলে না, সেখানে তার নিজস্ব মূল্যে বিকাইতে পারে না। সেইরূপ এক জাতির সভ্যতা এবং সাধনাও অপর জাতির ভিতরে তার নিজের দরে বিকায় না, বিকাইতে পারে না। সেখানে তাহাকে সাধারণ সার্ব্বজনীন মনুষ্যত্বের ওজনে মাপিতে হয়, ও এই মনুষ্য-ত্বের দরে তার দাম-দস্তুর হইয়া থাকে। সেখানে তার বিশেষ মূল্যটুকু আর থাকে না। সেই মূল্যটুকু জোর করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলে, তাহা ভয়াবহ পরধর্ম্ম হইয়া উঠে। সুতরাং এরূপ অবস্থায় ধারকর্জ্জও আর চলে না। তাহাতে লোকসান বই লাভ কখনো হইতে পারে না। আর এরূপ ধার-কর্জ্জের কোনো প্রয়োজনও নাই। কারণ সকলের ভিতরে যখন একই পূর্ণ, অদ্বৈত,

অখণ্ড বস্তু রহিয়াছে, সেই একই পূর্ণ ও অদ্বৈত বস্তু যখন নানাভাবে, নানা আকারে, সকল আধারের ভিতর দিয়াই আপনাকে ফুটাইয়া তুলিতেছেন, তখন এক ব্যক্তি বা এক জাতি তার নিজস্ব ধনের জন্য অপরের দ্বারে কেনই বা প্রার্থী হইতে যাইব? এই জন্যই এ বিশ্ব-বিবর্ত্তনে দানের কণামাত্রও স্থান নাই, অনুকরণ একান্তই নিষ্প্রয়োজন।

১৭। মনুষ্যত্বের ইতিহাস।

সকল অপূর্ণের ভিতরেই যে পূর্ণ বস্তু রহিয়াছে, সকল দ্বৈতের মূলেই যে অদ্বৈত বস্তু, সকল ভাগবিভাগের ভিতরেই যে এক অখণ্ড ও অবিভাজ্য তত্ত্বপদার্থ নিহিত রহিয়াছে, এবং বিশ্ববিবর্ত্তনে অনন্তভাবে, অনন্ত আধারে, অনন্তরূপে সেই নিত্য স্বরূপ বস্তু আপনাকে প্রকাশিত করিতেছেন, য়ুরোপ এই সত্যকে এখনো ভাল করিয়া ধরিতে পারে নাই। আর তারই জন্য য়ুরোপ অনেক তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াও এখনো পর্য্যন্ত মানবসমাজের একটা সার্ব্বজনীন ইতিহাস গড়িয়া তুলিতে পারে নাই। য়ুরোপ প্রাচীন কালের বহু সাধনা ও সভ্যতার আলোচনা করিয়াছে ও করিতেছে। সমাজের অতি প্রাচীন সময়ের অনেক লুপ্ততত্ত্ব উদ্ধার করিয়াছে ও করিতেছে, বর্ত্তমানে ভিন্ন ভিন্ন জাতির শাস্ত্র সাহিত্য, আচার পদ্ধতি, এ সকলের অনেক সংগ্রহ করিয়াছে ও করিতেছে, কিন্তু এমন সুন্দর, এমন মূল্যবান, এরূপ বিরাট আয়োজন ও উপকরণ সত্বেও, মানব সমাজের একটা সার্ব্বজনীন ইতিহাসের পত্তন পর্য্যন্ত করিতে পারে নাই। সমগ্র মানবমণ্ডলীকে য়ুরোপ এপর্য্যন্ত খণ্ড খণ্ড ভাবেই দেখিয়াছে। আর একটা কল্পিত, অলীক সূত্রে এ সকল খণ্ড বস্তুকে গাঁথিয়া তাহাদের মধ্যে একটা কাল্পনিক একত্ব প্রতিষ্ঠারও চেষ্টা করিয়াছে। মানুষের যেমন পৌগণ্ড, বাল্য, যৌবন, জরা প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থা হয়; প্রত্যেক ব্যক্তি যেমন এই সকল অবস্থার ভিতর দিয়া যাইয়া আপনার পরিণতি ও পরিপক্বতা লাভ করে, আর এক এক অবস্থা অতিক্রম করিয়া, মানুষ যেমন অপর পূর্ণতর অবস্থা প্রাপ্ত হয়; সেইরূপ সমগ্র মানবজাতিও ধারাবাহিকরূপে, সমাজ-পরিবর্ত্তনের ভিন্ন ভিন্ন ধাপ্ বা অবস্থা অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। ভারতে ও মিশরে, লুদিয়ায় ও ব্যাবিলনে, এই "বিশ্ব-মানব" পৌগণ্ড ও বাল্যদশায় ছিলেন। গ্রীসে ও রোমে যৌবনের প্রথম প্রান্ত প্রাপ্ত হন। আধুনিক য়ুরোপে যৌবনের পূর্ণতা ও জীবনের পরিপক্বতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। সুতরাং য়ুরোপের বাহিরে যারা পড়িয়া আছে, আধুনিক য়ুরোপীয় সাধনা ও সভ্যতার যারা অধিকারী নহে, তারা বালকরূপে স্নেহ, কৃপা, ও অনুকম্পার পাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু সমকক্ষরূপে কখনো সমাদৃত হইতে পারে না। য়ুরোপীয় পাণ্ডিত্য এইভাবেই মানবসমাজের একটা সার্ব্বজনীন ইতিহাস রচনা করিয়াছে ও করিতেছে।

কিন্তু পৌগণ্ড, বাল্য, যৌবন প্রভৃতি একই ব্যক্তির জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা। এক জনে পৌগণ্ডাবস্থা শেষ হইয়া, আর এক জনে বাল্যের সূচনা, ও তাহার বাল্যাবস্থার অবসানে তৃতীয় ব্যক্তির যৌবনের প্রতিষ্ঠা

কখনো হয় না। প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের ক্রমটা কখনো ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রকাশিত হয় না। যার পৌগণ্ড, তারই বাল্য, তারই আবার যৌবন, সেই একই ব্যক্তি আবার যৌবনের পর ক্রমে জরা প্রাপ্ত হয়। এই যে একত্ব, ইহাই এই বিবর্ত্তনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে। ভারতের পৌগণ্ড, বাল্য, যৌবন, জরা, এ সকল অবস্থার পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারি। কারণ এ সকল অবস্থার ভিতর দিয়া, ভারতে একত্ব বল, নিজত্ব বল, জাতিত্ব বল, তাহা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ভারতের সমাজ-জীবনে কোন ভঙ্গ, কোন বিচ্ছেদ ঘটে নাই। সেইরূপ বিলাতেরও পৌগণ্ড যৌবনাদি অবস্থাভেদ, ও এই সকলের মধ্য দিয়া তার জীবনের পরিবর্ত্তন ও পরিণতি হইয়াছে, ইহা বুঝি। কিন্তু মিশরে বাল্য ছিল, আর আজ মিশরের পুরাতন পৌগণ্ড মার্কিনের যৌবনে পরিণত হইয়াছে, ইহা অতি অদ্ভুত কথা। অথচ য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা এই অদ্ভুত তত্ত্বের উপরই মানবসমাজের সার্ব্বজনীন ইতিহাস রচনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে মিশর, ভারত, পারস্য, চীন, আসিরীয়, ব্যাবিলন—এ সকল "বিশ্বমানবের" বিকাশের বিভিন্ন অবস্থার পরিচয় প্রদান করে। বর্ত্তমান য়ুরোপ সেই বিশ্বমানবের বিবর্ত্তনের সকলের শেষ অবস্থার প্রমাণ দিতেছে। এজন্য য়ুরোপীয় সাধনা প্রাচীন হিন্দু বা ইহুদীয় সভ্যতা ও সাধনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। য়ুরোপীয় সাধনার মাপকাটি দিয়া জগতের প্রাচীন সাধনা সকলের ভাল মন্দের বিচার করিতে হইবে। মিশর, ভারত, পারস্য, ব্যাবিলন্ প্রভৃতি প্রাচীন জাতি সকলের জীবনের ও ইতিহাসের সঙ্গে আধুনিক য়ুরোপীয় জাতিসকলের যদি একটা নিরবছিন্ন যোগ ও সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হইত, তবেও বা এই সিদ্ধান্ত কিয়ৎ পরিমাণে দাঁড়াইবার স্থান লাভ করিত। আধুনিক য়ুরোপের সঙ্গে প্রাচীন গ্রীস ও রোমের এরূপ একটা সম্বন্ধ আছে। গ্রীসীয় ও রোমক সাধনার সঙ্গে বর্ত্তমান য়ুরোপীয়সাধনার একটা অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। বর্ত্তমান য়ুরোপের জ্ঞানবিজ্ঞান, শিল্পসাহিত্য সকলই বহুল পরিমাণে, প্রাচীন গ্রীসীয় ও রোমক সাধনার উপর প্রতিষ্ঠিত। গ্রীস ও রোমের অর্জ্জিত সম্পদেই আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতার বিভবগৌরব রচিত হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে কিয়ৎপরিমাণে, গ্রীস ও রোমকে বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সাধনা ও সভ্যতার বাল্য বা প্রথম যৌবনের অবস্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কিন্তু মিশর বা চীন বা পারস্য বা ভারতের প্রাচীন সাধনার সঙ্গে বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সাধনার সে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই। বর্ত্তমান য়ুরোপ এখনো প্রাচীন ভারত বা চীনের সাধনার উত্তরাধিকারী হয় নাই। সে সাধনাকে গ্রহণ করিয়া তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া, তাহারই উপর এক নূতন সাধনা গড়িয়া তোলে নাই। এ অবস্থায় ভারত বা চীনকে য়ুরোপীয় সাধনার পূর্ব্বতন পৌগণ্ড বা বাল্য অবস্থা বলা যাইতে পারে না।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

আশা-হত।

১

বড়দিনের ছুটি ফুরাইয়া আসিয়াছিল। তাসের ব্রে খেলা চলিতেছিল। ইস্কাবনের বিবির ভয়ে সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম। এমন সময় প্রভাস আসিয়া উপস্থিত।

আমি কহিলাম, "কি হে, কি মনে করে?"

প্রভাস কহিল, "বিশেষ দরকার আছে। একটু নিরিবিলিতে বলব।"

সে বাজি শেষ হইলে প্রভাসকে লইয়া পাশের নিভৃত কক্ষে গেলাম। প্রভাস কহিল, "একখানা নাটক লিখেছি!"

আমি হাসিয়া কহিলাম, "আমাকে বুঝি সমজদার পেয়েছ, তার? হায়, হায়!"

প্রভাস একটু অপ্রতিভভাবে কহিল, "তা নয়, তবে তোমার সঙ্গে না ইণ্ডিয়ান থিয়েটারের ম্যানেজারের আলাপ আছে, কুঞ্জ বলছিল—তাই যদি একবার তাদের দেখিয়ে সুবিধা করে দিতে পার! তা ছাড়া, তোমাকেও একবার দেখাতে চাই, তোমার মতটা জানবার জন্ম! কাউকে পড়িয়ে শোনাই নি' এখনো!"

আমি গণিতের অধ্যাপক। সাহিত্যরসের আস্বাদ-বোধ কি আমার সাধ্য! প্রভাসের কথায় মনে একটু গর্ব্ব হইল! আমি কহিলাম, "বেশ কথা—আজ রাত্রে পড়া যাবে! এখানেই খাওয়া-দাওয়া করো—সে সময়টা বেশ নিরিবিলিও থাকি!"

মলিন শালের মধ্য হইতে একখানি মোটা বাঁধানো খাতা লইয়া প্রভাস আমার হাতে দিল—আমি সেটি টেবিলের ড্রয়ারে রাখিয়া দিলাম।

প্রভাস আমার সহপাঠী! ক্লাশে তাহার সহিত বরাবর আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিত! প্রবেশিকা পরীক্ষায় সে পনেরো টাকা বৃত্তি পাইয়া আমাকে পরাস্ত করিয়াছিল। সেই আক্রোশে আমার ছাত্রজীবন এমন কঠোর সাধনার মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইয়াছিল যে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সরস্বতী তাঁহার শ্রেষ্ঠ উপহার গুলি আমার হাতে তুলিয়া দিতে একটুকু দ্বিধা বোধ করেন নাই!

বি, এ, পরীক্ষার ব্যূহভেদ করিতে না পারায় প্রভাসের ছাত্রজীবনের গতি মন্থর হইয়া পড়িল!

বাঙ্গালা সাহিত্যের নেশা তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল! ছেলেবেলা হইতেই কেমন-একটা স্বপ্নময় অস্পষ্টভাবে তাহাকে ঘেরিয়া থাকিত। ক্রমে সেই ভাব তাহার চারিধারে এমন একটি সুনিবিড় জাল রচনা করিল যে, পাঠ্যপুস্তকের প্রতি তাহার অনুরাগ শিথিল হইয়া আসিল! কাব্যের ইন্দ্রজালময় রহস্যালোকে তাহার চিত্ত কিসের সন্ধানে ফিরিত, সেখানে সে কি সুখের স্বাদ পাইত, তাহা আমরা ধারণাও করিতে পারিতাম না! তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কঠিন পাষাণ-ভবনের দ্বার তাহার বিরুদ্ধে রুদ্ধ হইলেও, কল্পনার কমলবনে বাণীদেবী তাহার জন্ম স্নেহ আসন বিছাইয়া দিতেছিলেন! সহসা একদিন দেখা গেল, তাহার বন্ধুবান্ধব যখন ছাত্র-জীবনের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন

সে সাহিত্যক্ষেত্রে তাহার কুহক-রচনার মধ্য দিয়া একটা সুপ্রতিষ্ঠ স্থান সংগ্রহ করিয়া লইলেও কর্ম্মক্ষেত্রে এতটুকু অগ্রসর হইতে পারে নাই!

সাহিত্য আর যে আনন্দই দান করুক না কেন,—শূন্য উদর কিম্বা দারিদ্র্যের রাহুগ্রাস হইতে পরিত্রাণ-লাভের কোন পন্থাই সে নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারে না। অবশেষে একদিন বৃদ্ধা মাতা ও স্ত্রী-পুত্রের প্রতি কর্ত্তব্য-পালনের জন্য বাঙ্গালার উদীয়মান সাহিত্যিক সংবাদ-পত্রের অফিসে কর্ম্মের উমেদার হইয়া আসিয়া দাঁড়াইল! লক্ষ্মীদেবী কৃপা করিলেন—সহজেই প্রভাসের চল্লিশ টাকার একটা চাকুরি মিলিল!

কিন্তু এ কি অসহ্য দুঃখ! তীব্র পরিহাস! মন যখন কল্পনা-কুঞ্জে পুষ্প-সুরভির জন্য আকুল হইয়া উঠে, গোপন ঊর্দ্ধলোকে আদর্শের সন্ধানে ফিরে, কর্ত্তব্য তখন খুন-ডাকাতের বীভৎস রিপোর্ট লিখিবার জন্য তাগাদা দেয়! ইংরাজী সংবাদ-পত্রের সার-সঙ্কলন, গরিলা-বনমানুষের বিচিত্র বার্ত্তা-সংগ্রহ, ও গ্রীণলণ্ডের রাজনীতির চর্চ্চা করিয়া ত এমন একঘেয়ে হীন জীবনও বহন করা যায় না! কিন্তু উপায় নাই! লোকে আদর্শ বা কাব্য পড়িতে চাহে না, কারণ, তাহা দুর্ব্বোধ হইয়া পড়ে। কাজকর্ম্মের অবসরে এইরূপ দুই-চারিটা উদ্ভট সংবাদ পাইলেই তাহারা কৃতার্থ হইয়া যায়!

রাত্রে প্রভাস কহিল, "খপরের কাগজে ত আর টেঁকা যায় না—জীবনে যেন ক্রমেই কালো কালি মাখছি! চাকরি রাখা দুষ্কর হয়েছে!"

প্রভাস পরচর্চ্চা বা গ্লানির কথা লিখিতে পারে না, কড়া দুই চারিটা সমালোচনায় সহযোগীর প্রতিষ্ঠা সে দূর করিতে পারে না, তোষামোদ করিয়া লেখনীর সাহায্যে ধনীর শিরে সে পুষ্পবৃষ্টিও করিতে পারে না, কাজেই স্বত্বাধিকারী বিরক্ত, পাঠকের দলও আগ্রহশূন্য!

প্রভাস কহিল, "শুনেছি থিয়েটারওলারা পয়সা দিয়ে বই নেয়—মোটা বাঁধা মাহিনাও দেয়—তাই বহু চেষ্টায় এই নাটক লিখেছি!"

আমি কহিলাম, "তুমিও যেমন—থিয়েটারে কেবল হীন রুচি, সেখানে নাটক জোগানো কি তোমার মত লোকের কাজ! কতকগুলো পচা অশ্লীল ইয়ারকি, আর নাটকের মাথায় লাঠি মেরে সেখানে নাটক লিখতে হয়!"

প্রভাস কহিল, "তবু তুমি একবার দেখ না!"

প্রভাস নাটক পড়িতে লাগিল—নাটকের নাম,"রাজকন্যা।" যেখানে যেমন প্রয়োজন, তেমনি ভাবভঙ্গীর সহিত সুর খেলাইয়া সে স্বরচিত নাটক পড়িতে লাগিল! রচনায় এমন একটা আশ্চর্য্য আকর্ষণী শক্তি ছিল যে, আমার নীরস গণিতচর্চ্চারত মস্তিষ্কও মুগ্ধ হইয়া গেল! করুণরসের স্নিগ্ধ ধারায় আমার চিত্ত আর্দ্র হইয়া আসিতেছিল, শরীরে রোমাঞ্চ হইতেছিল, অজানা লোকের দুঃখিনী রাজকন্যার মর্ম্মবেদনায় অন্তরটা হা-হা করিয়া উঠিতেছিল! যখন নাটক পাঠ শেষ হইল, তখন আমার মনে হইল, যেন একটা স্বপ্ন দেখিতেছিলাম!

সাহিত্যের সহিত আমার কোন সংশ্রব ছিল না, তবু এটুকু বুঝিলাম, যাহা সচরাচর পাঠ

করা যায় "রাজকন্যা" তেমন নহে! ইহাতে যাহা আছে, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে বড়-একটা দেখিতে পাওয়া যায় না! চরিত্রগুলিতে একটা অসাধারণত্ব ছিল!

২

আমার পিতৃব্য ইণ্ডিয়ান থিয়েটারের এটর্ণি ছিলেন। সেই সূত্রে ম্যানেজারের সহিত আমার অল্প আলাপ ছিল!

প্রভাসকে লইয়া ম্যানেজার রামকালী বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। সুদক্ষ অভিনেতা ও প্রসিদ্ধ নাট্যকার রামকালীর বাবুর নাম আর কে না শুনিয়াছে? রীতিমত আগ্রহের সহিত রামকালীবাবু প্রভাসের নাটক খানি হাতে লইলেন। বলিলেন, "দশ বারো দিন পরে সংবাদ দিব।"

আমি তাঁহাকে অন্তরালে লইয়া গিয়া কহিলাম, "বহিখানা সাধারণ নাটকের মত নয়।"

রামকালীবাবু বলিলেন, "সাহিত্যে প্রভাস বাবুর নাম কে না জানে?"

দুই সপ্তাহ পরে রামকালী বাবুর বেহারা আসিয়া আমাকে একখানি পত্র দিল! পত্রের মর্ম্ম,—প্রভাসবাবুর নাটক সাহিত্য-হিসাবে সুন্দর হইলেও অভিনয়ে তেমন জমিবে না—দৃশ্যপটাদি অঙ্কনেও বিস্তর ব্যয় হইবে। নূতন গ্রন্থকারের জন্য সহসা এত টাকা ব্যয় করিতে তাঁহার সাহসে কুলায় না। ওথেলো হ্যামলেট আজকাল অভিনীত হইলেও দর্শক জুটে না—তেমনি প্রভাস বাবুর নাটক দৃশ্য-কাব্য হইয়াছে বটে, কিন্তু অভিনয়ের উপযোগী নহে। কাজেই তিনি দুঃখের সহিত নাটক খানি ফেরত পাঠাইয়াছেন।

প্রভাস প্রত্যহই আপনার অদৃষ্ট-ফলের কথা জানিবার জন্য আমার নিকট আসিত। সেদিনও আসিয়াছিল! রামকালীবাবুর পত্র দেখিয়া সে অবসন্ন হইয়া পড়িল। তার মুখ সাদা হইয়া গেল। কোন কথা না বলিয়াই সে খাতাখানি লইয়া চলিয়া গেল! আমি ডাকিলাম, কিন্তু সে ফিরিয়াও একবার চাহিল না! বেচারার হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল!

এই সময় চৌবাড়ীর জমিদার ক্ষিতীশ চৌধুরীরা এক সখের থিয়েটারের দল খুলিল। তাহারা নূতন নাটকের সন্ধান করিতেছিল। আমি প্রভাসের নাটকের কথা বলিতে সে পাঁচ শত টাকা দিয়া নাটকের স্বত্ব ক্রয় করিয়া লইতে উদ্যত হইল! আমি গিয়া প্রভাসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সকল কথা বলিলাম।

প্রভাস কহিল, "সে খাতা পুড়িয়ে ফেলেছি!"

আমি অবাক হইয়া গেলাম। "সে কি? তার নকল নাই?"

"না—তার কোন চিহ্ন রাখিনি! ব্যর্থতার সাক্ষ্য রেখে লাভ কি?"

ক্ষোভে আমার অন্তর ভরিয়া উঠিল!

প্রভাস কহিল, "কাল আমি ইণ্ডিয়ান থিয়েটারে গেছলাম—নাটক দেখতে। যা দেখলাম—কদর্য্য!"

আমি কহিলাম, "রামকালীবাবুর নাটক?"

"না।"

"রামকালীবাবুর নাটক একদিন দেখে এস, কি রকম ধরণটা ওরা চায়!"

"দাসত্ব করতে বল, তুমি?"

"তা নয়, ঠিক! তবে টেজের জন্যই যদি

লেখ, তা হলে ষ্টেজকে একেবারে উড়িয়ে দিলে চলবে কেন? এতগুলো দর্শকের রুচি তুমি ত আর একরাত্রেই হঠিয়ে দিতে পারচ না?"

"তা বলে তাদের কুৎসিত রুচির অনুসরণ করতেও পারব না—এতে না খেয়ে সপরিবারে মরি যদি, সে-ও ভালো!"

৩

কিছুদিন পরে প্রভাস আসিয়া আবার সহসা দর্শন দিল। কহিল, "আজ থিয়েটারে যাবে? একখানা নূতন বই আছে।"

থিয়েটার দেখার প্রতি আমার কোন ঔৎসুক্য ছিল না! রাত্রি জাগরণ সহ্য হইত না,—তাহার উপর, হেদুয়ার ধারে প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়া দেখিতাম, সারারাত্রি বায়ু ও আলোক-হীন, অন্ধকূপের মত, থিয়েটার হইতে দর্শকের দল শীর্ণ মুখে শুষ্ক চোখে গৃহে ফিরিতেছে—এই নিষ্ঠুর আমোদ প্রিয়তা দেখিয়া আমি শিহরিয়া উঠিতাম। থিয়েটারের নামে আমার কেমন আতঙ্ক জন্মিয়াছিল।

তাই আমি কহিলাম,"সারারাত্রি গারদঘরে আটক থাকা আমার দ্বারা পোষাবে না!"

প্রভাস কহিল, "সারারাত্রি না-ই বা থাকলাম—একখানা নূতন নাটকের অভিনয় হবে—রামকালীবাবুর লেখা!"

একখানিমাত্র নাটক! "জেলে খুন", "কালো ভূত' প্রভৃতি গীতিনাট্য ও প্রহসনে পাঁচ ফুলের সাজির ব্যবস্থা হয় নাই শুনিয়া আমি আশ্চর্য্য ও আশ্বস্ত হইলাম!

প্রভাস আরো কহিল, "রামকালীবাবুর লেখার ধরণটা কেমন—দেখ্‌বে!"

আমি কহিলাম, "কি নাটক?"

প্রভাস একখানা হ্যাণ্ডবিল ফেলিয়া দিল! কেমন করিয়া আত্ম-প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইতে হয়, হ্যাণ্ডবিলখানি তাহার চূড়ান্ত পরিচয়! এমন নাটক আর কখনো প্রকাশিত হয় নাই—নাটকের রাজ্যে একেবারে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে ইত্যাদি বাগাড়ম্বরের ত্রুটি ছিল না এবং খুব মোটা চিত্র-বিচিত্র অস্পষ্ট অক্ষরে নাটকের নাম লেখা—"কমলাবতী", —নূতন ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক। নায়ক বিনায়ক সাজিবেন, নাট্যকার স্বয়ং,—বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চের আর্ভিং, শ্রীযুক্ত রামকালী হালদার।

রাত্রে ইণ্ডিয়ান থিয়েটারে উপস্থিত হইলাম। দুইখানি টিকিট কিনিয়া ভিতরে গেলাম। কি ভিড়! কলিকাতার যত লোক যেন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। একই রাত্রে এত লোকের থিয়েটার দেখিবার সখ জাগিয়া উঠিয়াছে ভাবিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। রামকালীবাবু গর্ব্বস্ফীত বক্ষে টিকিট-ঘরের নিকট দাঁড়াইয়াছিলেন—আমরা সাবধানে তাঁহার দৃষ্টিটুকু এড়াইয়া আসিলাম!

ঐক্যতান-বাদনের পর পটোত্তোলন হইল—প্রথম দৃশ্যে এক সুবিস্তীর্ণা নদী—দুই কূল দেখা যায় না! নদীবক্ষে একখানি সুদৃশ্য তরণী! তরণীর উপর বসিয়া রাজকন্যা কমলাবতী বাঁশী বাজাইতেছেন! দৃশ্যপটের আড়ম্বরে ও রাজকন্যার সুদক্ষ বাঁশীর সুরে কেমন-একটা বিভ্রম আনিয়া দিল! তাহার পর নানা ঘটনার মধ্য দিয়া নাটকের গতি ত্বরিতভাবে অগ্রসর হইয়া চলিল! দুই-চারিটা দৃশ্যের পর আমি চমকিয়া উঠিলাম,—এ যে প্রভাসের নাটক! কেবল নামগুলা ও দৃশ্য-যোজনায়

একটু পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছে! রচনার ভাব, ভঙ্গী, উপাখ্যানের অভিনবত্ব, সমস্তই প্রভাসের! আশ্চর্য্য হইয়া আমি প্রভাসের দিকে চাহিলাম। অভিনয়ের মধ্যে সে একেবারে তন্ময় হইয়া গিয়াছিল! প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত হইলে, প্রভাস কহিল, "আমার 'রাজকন্যার' মত মনে হচ্ছে, না?"

আমি কহিলাম, "হুবহু তাই বলে ত আমার মনে হয়!"

চোখ দুইটা বিস্ফারিত করিয়া প্রভাস সুগভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল! আমি কহিলাম, "আর একটু দেখা যাক! ভদ্রতায় না হয়, কোর্ট আছে!" প্রভাস কথা কহিল না!

তার পর দ্বিতীয় অঙ্ক আরম্ভ হইল! কথাবার্ত্তায়, ভাবে-ভাষায় এতটুকু আর প্রভেদ রহিল না—হুবহু প্রভাসের রচনা! কেবল ঐ নামগুলাই যা বদলাইয়া দিয়াছে!

অভিনয় দেখিতে দেখিতে দর্শকের দল মাতিয়া উঠিল! এমন নাটক বাঙ্গালা থিয়েটারে কখনো অভিনীত হয় নাই! যেমন উচ্চভাব, গানগুলিতেও তেমনি কবিত্ব,—থিয়েটারী সাহিত্যে যে দুটি জিনিস একান্তই দুর্লভ!

পার্শ্বস্থ জনৈক দর্শক কহিল,"রামকালীবাবু কি আশ্চর্য্য নূতন ভাবে লেখার স্রোত ফিরিয়েছেন!"

আর একজন কহিল, "প্রতিভার লক্ষণই ত এই!"

প্রভাস ক্ষেপিয়া উঠিল। সে কহিল,"চুরি! আমার লেখা বেমালুম চুরি করেছে!"

লোক দুইজন অবাক হইয়া গেল! এমন অদ্ভুত কথা তাহারা শুনিবে বলিয়া কখনো আশাও করে নাই!

আমি কহিলাম, "কথাটা সত্য!"

তাহারা কহিল, "হুঁঃ! বলেন কি মশায়?"

উৎসাহী দর্শকের সঘন করতালিবর্ষণে প্রভাস অস্থির হইয়া পড়িল!

তখন তৃতীয় অঙ্ক চলিতেছিল। দৃশ্যটি বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল! নায়ক বিনায়ক যুদ্ধ জয় করিয়া আসিয়াছে—রাজা হংসবাহন বিপুল ভাবনা ও দায় হইতে মুক্তি পাইয়াছেন—জয়মাল্য লইয়া রাজকন্যা কমলাবতী সম্মুখে উপস্থিত! এমন সময় ষড়যন্ত্রকারী কতিপয় রাজ অনুচরের প্রচুর প্রমাণে বিনায়কের বিশ্বাস-ঘাতকতার পরিচয় পরিস্ফুট হইয়া উঠিল—রাজা শিহরিয়া বিশ্বাসঘাতকের দণ্ডবিধান করিলেন! রাজকন্যার কর হইতে পুষ্পমাল্য খসিয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইল। এ অসম্ভব কথায় সভাসদগণ অবাক হইয়া গিয়াছিল। রাজা নিরুপায়, প্রমাণ পাইয়া দোষীর দণ্ডবিধান না করিলে কর্ত্তব্যহানি হইবে! বিনায়ক অবিচলিত হৃদয়ে সমস্ত অপবাদ মাথায় বহিয়া কারাগৃহে যাইবার সময় ধীরস্বরে করুণ আক্ষেপবাণীতে দর্শকের হৃদয় আর্দ্র করিয়া দিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় প্রভাস দাঁড়াইয়া উঠিল!

পিছন হইতে অধীর দর্শকের দল একসঙ্গে গর্জ্জিয়া উঠিল—"আঃ বসুন না, মশায়—আপনি ত transparent নন যে, দেখতে পাব!"

প্রভাস ধীরস্বরে কহিল, "চোর—চোর! আমার বই চুরি করেছে—নির্লজ্জ চোর কোথাকার!"

আকস্মিক রসভঙ্গে অভিনেতাও স্থির হইল। চারিধারে রীতিমত গোল বাধিয়া

গেল! গ্যালারি হইতে চীৎকার উঠিল—"দুর করে দাও, মাতালটাকে—দুর করে দাও!

আমি প্রভাসের হাত ধরিলাম! প্রভাস কহিল, "বল, তুমিই বল, চুরি কি না! আমি মাতাল নই, অজ্ঞান নই—এ নাটক আমার লেখা। রামকালী বাবুকে দেখতে দেওয়া হয়েছিল—তিনি ফেরত দিয়ে বলেন, ভালো হয়নি—তার পর সেই বই নিজে আগাগোড়া চুরি করে নিজের নামে চালিয়েছেন—চোর কোথাকার! প্রমাণ অবধি রাখিনি, আমি! ওঃ! সে খাতা পুড়িয়ে ফেলেছি!"

'দুর করে দাও', 'পাগল', 'মাতাল' শব্দে চারিধারে যেন বজ্রনিনাদ উঠিল! মধুচক্রে লোষ্ট্রনিক্ষেপ করিলে যেমন হয়, তেমনি ভাবখানা!

নায়ক বিনায়ক মঞ্চ হইতে হাঁকিলেন—"গার্ড!"

ষ্টেজের গার্ড আসিয়া প্রভাসের হাত ধরিল! প্রভাস কহিল, "ছেড়ে দাও—অসভ্য, বেয়াদব্।"

প্রভাসকে শান্ত করিবার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। থিয়েটারের দুইচারি জন লোক আসিয়া প্রভাসের গলা ধরিয়া ধাক্কা দিল। আমি কোনমতে গোল থামাইয়া প্রভাসকে লইয়া বাহিরে আসিলাম!

রাস্তার ধারে আসিয়া গাড়ীর সন্ধান করিতেছি, এমন সময় ভিতরে তুমুল রবে করতালির ধ্বনি উঠিল! প্রভাস তখন আমার বুকে মাথা রাখিয়া ধীরে ধীরে মূর্চ্ছাতুর হইয়া পড়িতেছিল!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

তর্কী।

তর্কী ইংলণ্ডের দক্ষিণে ডিভনসায়ারে সমুদ্রতীরের উপর অবস্থিত একটি স্বাস্থ্য নিবাস। ষ্টেসনে গিয়া দেখি, লোকে লোকারণ্য। সকলেই প্রায় তর্কীতে যাইবার জন্য ব্যস্ত। সকলেরই হাতে এক একটি হ্যাণ্ডব্যাগ—তাহাতে দুই তিন দিনের মত তাঁহাদের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি যথা,—শার্ট কলার রুমাল ইত্যাদি। আহার ও বাসোপযোগী অন্যান্য দ্রব্যাদি সেখানকার হোটেলেই মিলিয়া থাকে। আমাদের এক দিন বাড়ি হইতে বাহির হইতে হইলে কত ভাবনা হয়—কি খাইব, কোথায় থাকিব। কিন্তু এই সব দেশে সে কথা কিছুই ভাবিতে হয় না বলিয়া আমোদ বা ব্যবসার জন্য দেশ-ভ্রমণে কত সুবিধা।

যাত্রীর এত ভিড় যে সব গাড়ি গুলিই ভরিয়া গিয়াছে। ছেলেপিলে লইয়া বাপ মা আনন্দ করিতে করিতে চলিয়াছেন। কেহ বা লাল রঙের ধ্বজা উড়াইয়া গান গাহিতে গাহিতে ষ্টেসন ও রেলগাড়ি প্রতিধ্বনিত করিয়া চলিয়াছে। ছেলে মেয়েদের প্রায় সকলের বুকেই এক একটি ফুল গোঁজা।

এই স্থানে ষ্টেসনে ডাক্তার কার্ণিজী

ব্রাউন সাহেবের সহিত দেখা হইল। গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের রোগ নিরাকরণ করিবার জন্য যে সমিতি আছে, ইনি তারই সেক্রেটারী। সাদরে আলাপ করিয়া—লণ্ডনে ফিরিলে তাঁহার সহিত দেখা করিতে বলিয়া তিনি তাঁহার নামের কার্ড আমাকে দিলেন। ঠিকানা ৩২ নং হারলী ষ্ট্রীট। সেখানে ডাক্তারের আপিস বাটী, কিন্তু তিনি থাকেন হ্যামষ্টেড্ নামক লণ্ডনের একটি নির্জ্জন পল্লীতে। এই মনোহর স্থানে রাত্রি যাপন করিয়া সকালে কর্ম্ম-স্থানে আসেন ও সারা দিন সেখানেই কাজ করিয়া রাত্রে বাটী ফিরিয়া যান। মাঠের নীচে দিয়া যে রেল-লাইন গিয়াছে তাহার সাহায্যে আধ ঘণ্টায় যাতায়াত হয়। সে দেশে আমাদের এদেশের মত এত গাড়ি ঘোড়ার খরচ নাই। সবাই পথে চলে ও সাধারণ লোকের সঙ্গে যাতায়াত করে; তাহাতে অপমান বোধ করে না। অনর্থক খরচ নিবারণ করা সে দেশের রীতি। তাই তাহাদের এত স্বচ্ছল অবস্থা।

সেই গাড়িতে ডিভনশায়ারেরই এক কৃষক ও কৃষকবধূর সহিত আলাপ হইল। তাঁহারাও দুই দিনের অবসরে স্বাস্থ্যকর স্থানে বিশ্রাম ও বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য যাইতে-ছেন। তাঁহাদের খুব সরল ভাব। রমণীটি ক্ষীণাঙ্গী এবং দেখিতেও বেশ সুশ্রী। তাঁহার সহিত করমর্দ্দন করিবার সময় দেখিলাম—তাঁহার হাতগুলি চাষার ঘরের মোটা কাজ করিয়া, শক্ত হইয়া গিয়াছে—মোটেই কোমল নহে। তাঁহারা আমাদের দেশের কথা সাগ্রহে শুনিতে চাহিলেন।

আর একজন সহযাত্রী ছিলেন তিনি কারিগর। মজবুৎ লোহার তোরঙ্গ তৈয়ার করাই তাঁহার কাজ। কারখানার ভিতরটা বড়ই উত্তপ্ত—তাহারই মধ্যে তিনি দিনে প্রায় আট ঘণ্টা কাজ করেন। প্রতি সপ্তাহে দুই দিন ছুটি পান। আর সেই দুই দিন কালীঝুলী মাখা পোষাক ত্যাগ করিয়া আমোদ করিয়া বেড়ান। সপ্তাহে ছয় পাউণ্ড আয়। স্ত্রী আছেন, ও একটি দুই বছরের ছেলে আছে। স্ত্রী এখন ছেলেটকে লইয়া তর্কীতেই রহিয়াছেন। আজ এক মাস পরে দুইজনের দেখা হইবে।

খোলা মাঠ, শস্যক্ষেত্র, ঘরবাড়ি, ও ষ্টেশনের পর ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া গাড়ি অচিরে সমুদ্রের ধারে পৌঁছিল। তীরে কত ছেলে মেয়ে ও নরনারী শুধু পা করিয়া হাতের কাপড় গুটাইয়া বালি ঘাঁটিয়া ঝিনুক কুড়াইতেছে। কেহ বা ছোট নৌকায় করিয়া সমুদ্রে বেড়াইতেছে। সকলেই একটি না একটি খেলায় ব্যস্ত—কেহই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া অপরের খেলা দেখিতেছে না!

তর্কীতে পৌঁছাইয়া সেখানকার নিকটবর্ত্তী একটি হোটেলে আহার করিলাম। পরে রেলের গুদামঘরে আমার হাতব্যাগটী জিম্মা রাখিয়া দেশ দেখিতে বাহির হইলাম। সে সব স্থানে ষ্টেসনেই মানুষের মোটঘাট জমা রাখিবার ব্যবস্থা আছে। দুই এক পেনি দিলেই তাহারা একদিনের জন্য জিনিষপত্র জমা রাখে। ইহাতে কত সুবিধা,—মোটঘাটপত্র লইয়া বিব্রত হইতে হয় না।

এ ষ্টেসনটিও সমুদ্রের ধারে। সেখান হইতে সুনীল সমুদ্র অনেকদূর অবধি দেখা

যায়। দূরে দুই একটি ছোট দ্বীপ বুকে লইয়া নীল সমুদ্র নীল আকাশে মিলিয়া আছে। সুন্দর সুন্দর ছোট ছোট জাহাজগুলি এদিক ওদিক করিয়া যাত্রী পার করিতেছে। নিকটেই ব্রাইটনের ঘাট। সমুদ্রে স্নান করিবার ছোট ছোট ঢাকা গাড়ির সারি। তাহার মধ্যে কাপড় ছাড়িয়া কৌপীন পরিয়া জলে নামিতে হয়। অনেক স্থলে Mixed bathing বা স্ত্রী পুরুষে একত্রে স্নানের আড্ডা আছে। সেগুলিতেই বেশি ভিড়। সাঁতার শিখার উপলক্ষ করিয়া যত অযথা ঘটনা হয় তার সব ছবি-ছাপা কাগজ বাজারে বিক্রয় হয়। এখন এ প্রথা বন্ধ করিবার চেষ্টা হইতেছে।

সমুদ্রের ধারে-ধারে পাথর-বাঁধান রাস্তা। তার তলায় কত সুন্দর জলজ উদ্ভিদ ভাসিয়া আছে। চলিতে চলিতেই সে সব দেখা যায়। কত জেলী মাছ দেখিলাম। ধীবরদের নৌকাগুলিতে বলিষ্ঠকায় ছেলেরা ঝাঁপাঝাঁপি করিতেছে। আর সমুদ্রের ধারে ধারে অত্যুচ্চ পাহাড়ের উপর বড় বড় বাড়ী। সেখান হইতে অসীম সমুদ্রের দৃশ্য কি সুন্দর! পাহাড়ের ধারে ধারে অসংখ্য ফুল গাছ। এ সব স্থান আমাদের ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানেরই মত প্রায় গরম। এমন কি—তাল গাছ অবধি দেখা যায়। রৌদ্রে বাহির হইলে মাথা ঢাকা দিতে হয়, তাই শীতকালেই এই স্থানে যাত্রীর এত জনতা। এই স্থানে যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসার জন্য অনেকগুলি চিকিৎসাশালা আছে। সেখানকার চিকিৎসার ব্যবস্থা ঔষধ খাওয়ানো নহে। নির্ম্মল বায়ু সেবন, নিয়মিত ব্যায়াম, ও সূর্য্যালোকে সারা দিন থাকাই নিয়ম। নিয়মিত সময়ে আহার ও নিদ্রা চাই। এইরূপ ব্যবস্থায় যক্ষ্মাকাশের রোগীরা যত শীঘ্র ও যত বেশি আরাম পায়, অন্য কোন প্রকারে তাহা পায় না। তাই এখন সকল সভ্য দেশে এইরূপ চিকিৎসারই বেশি চলন হইতেছে। আমাদের দেশে রোগী কেবল ঔষধ খাইয়াই তাহা মারা যায়!

স্থানটি ছোট ও সেখানে দেখিবার জিনিস অল্পই আছে। এবং দৈনিক খরচ প্রায় পনেরো শিলিং—এই কারণে সেই দিনই সেখান হইতে ফিরিবার মনস্থ করিলাম। কখন ট্রেণ পাওয়া যায়, জানা ছিল না;—ষ্টেসনে আহারের ঘরের তত্ত্বাবধান মেয়েরাই করেন, তাঁহারা বই দেখিয়া সমস্ত খবর আমাকে বলিয়া দিলেন। বিলাতে ও অন্যান্য সভ্য ও উন্নতিশীল স্থানে মেয়েদের উপযোগী সকল কাজে কেবল মেয়েদিগকেই নিযুক্ত করা হয়, যথা পোষ্ট আপিস, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন্ সংক্রান্ত কার্য্য, আহারের তত্ত্বাবধান, কেরাণীগিরি ইত্যাদি। এ সব না করিয়া রমণীরা পরমুখাপেক্ষী হইলে কেমন করিয়া তাঁহাদের স্বাধীনতা থাকিবে! এই সব কাজ রমণীগণ দিব্য সুচারুরূপে ও এমন সুব্যবস্থার সহিত সম্পন্ন করিতে পারেন দেখিয়া তাঁহাদিগকে অন্য কাজ দিবার ব্যবস্থা হইতেছে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে কাজ করিয়া তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট সময়ে ছুটি পান। তখন সুন্দরভাবে সাজ সজ্জা করিয়া তাঁহারা আমোদ-প্রমোদ করিতে বাহির হন। সেই সুন্দর পোষাকগুলি সবই প্রায় অবসর সময়ে তাঁহাদের নিজের হাতের তৈয়ারী। সুতরাং সজ্জাতে তত অর্থ

ব্যয় করিতে হয় না—তাঁহারা নিজেরা শিক্ষিত ও নিপুণ বলিয়া তাঁহাদের কত দৈনিক খরচ বাঁচিয়া যায়।

সেইদিনই বৈকালে ট্রেণে চড়িয়া রাত্রি নয়টার সময় আমি লণ্ডনে পৌঁছিলাম।

শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক।

পোষ্যপুত্র।

৩৩

সারারাত্রি জাগিয়া ভোরের সময় ঘুমাইবার বহু চেষ্টা সত্বেও অকৃতকার্য্য হইয়া বিরক্তচিত্তে নীরদকুমার বিছানা ছাড়িয়া জানালার নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, এমন সময় বাহিরে দরজায় ঘা পড়িল। কোন ছাত্র হয়ত কোন প্রয়োজনে তাহাকে ডাকিতে আসিয়াছে এই কথাই তাহার মনে হইয়াছিল, কিন্তু প্রবেশ করিল যোগেন্দ্র। যোগেন্দ্র এখন আর একটু মোটা হইয়া গিয়াছে, মাথার চুলও দুইচারি গাছা সাদা হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, বেশ ভূষার পারিপাট্যও তখনকার মত কিছু নাই, তবু তাহার মুখে সেই সরল প্রাণখোলা হাসিটুকুর অভাব ছিল না। ঘরে ঢুকিয়া একবার মাত্র বন্ধুর মুখের দিকে চাহিতেই যোগেন্দ্রের মুখে হাসির পরিবর্ত্তে ঘোর বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। সে আর অগ্রসর না হইয়া সেইখানেই থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল "একি! তোমার কি হয়েচে?"

নীরদ তাহার বিস্ময়ের কারণ কতকটা বুঝিয়াই তাড়াতাড়ি মুখের ভাব বদলাইবার চেষ্টা করিয়া হাসিয়া বলিল, "কি? ভূত দেখলে নাকি?" "ভূত আমি দেখচি কি, কাল রাত্রে তুমি ঐ জানলায় দাঁড়িয়ে দেখেছিলে তাত ঠিক বুঝতে পারচিনে! যাহোক তোমার কি কোন বেশি রকম অসুখ করেছে?" সত্যই খুব বড় একটা কঠিন পীড়া মানুষকে অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই যেন কত বৎসরের পরিবর্ত্তনে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়া যায়, নীরদের মুখে সেই রকম একটা দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধির আক্রমণ শুচিহ্নে সুপরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে। যোগেন্দ্র তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে দেখিয়া একটু বিচলিতভাবে সে সরিয়া আসিল। আবার হাসিবার চেষ্টা করিয়া মৃদুস্বরে উত্তর করিল, "হাঁ, মাথাটা ভারী ধরেচে।" "সেইজন্য বুঝি কাল খেলে না? ঠাকুর বল্লে তুমি সন্ন্যাসী ঠাকুরের কাছে আছ,—আর ওদিকে বড়—বুঝেছ তো! আমিতো জানিনা তোমার অসুখ করেচে—একি! একবারও বিছানায় শোওনি নাকি? ঐ জন্যেই তো বলিরে দাদা, সাধু সন্ন্যাসীতে কি আর তোমার আমার ধাত বোঝে? সারা দিনরাত্রি ধরে যোগ-যাগ হ'চ্ছিল বুঝি?"

যোগেন্দ্রের আক্ষেপোক্তি শুনিয়া নীরদ একটু হাসিল, বলিল, "পাগল নাকি! কে যোগ শিখচে? রজ্জুতে সর্পভ্রম করে যখন তখন খুব শিউরে উঠতে পারো, যাহোক!"

যোগেন্দ্র যেন গম্ভীর হইয়া কহিল "বাঁচালে,

সর্পেতে রজ্জুভ্রম করিনে ত, সেইটেই সাংঘাতিক" নীরদ হাসিয়া ফেলিল "ও একই কথা মোদ্দা ভ্রমতো বটেই"।

"আচ্ছা না হয় আমারি ভ্রম, কিন্তু সেই যে মত্থরার অমন্ হাসিখুসি, আমোদ আহ্লাদ, খাসা বাড়ি, তোফা ব্যবস্থা, চা-কফি, পাঁঠা পাখী, কোথাও কোন ফাঁকটি ছিল না;—দেশের কাজ,নিজের সুখ একসঙ্গে সবি ছিল,—হুড়হুড় করে টাকা আসছিল,—আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপের মত হঠাৎ কোথা থেকে এক দৈত্য এসে তোমার ঘাড়ে চাপলো বল দেখি? রাতারাতি একেবারে সন্ন্যাসী!"

যোগেন্দ্র আসন গ্রহণ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

নীরদ পরিহাস করিয়া বলিল "সে কষ্ট যে আর ভুলতে পারচো না? শুনেছিলুম সময়ে সকলি সহিয়া যায়। তোমার দেখচি ঠিক বিপরীত"।

"ভুলতে দিলে কৈ বলো, সেওতো ঐ তোমারি কীর্ত্তি। মাছ—এমন তোফা টাট্‌কা মাছ চোখের ওপোর দিয়ে জেলে ব্যাটারা ধরে নিয়ে যাবে রোজ দুবেলা—তাই ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে দেখচি। উপায় নেই! জিভে যত চোখে তত জল ঝরতে থাকে। কাছে কেউ থাকলে বলি চোখে কি একটা পোকা না কি পড়ল। নিজেতো আলো চাল ধরেছ, যেন না কি বাপ—"

নীরদ সকৌতুক হাস্যে যোগেন্দ্রের দুঃখ-কাহিনী শুনিতেছিল; শেষের দিকটায় অকস্মাৎ চমকিয়া সে বাধা দিল; "যোগেন যা খুসী তাই বলে বসোনা ওসব কি কথা—"

যোগেন্দ্র আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কিছুক্ষণ বন্ধুর উত্তেজিত মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া অপেক্ষাকৃত অপ্রতিভভাবে একটু হাসিয়া সে বলিল "এ কি তুমি যে একেবারে আমায় অবাক করে দিলে? তামাসা করে কি নাকি একটা কথা বলেছি, তাতে চটবার এতো কি পেলে? এতেই বলে—উচিত কথায় দেবতা তুষ্ট, উচিত বল্লে মানুষ রুষ্ট—। সত্যিই তো আর তোমার স্বর্গগত বাপ দ্বিতীয়বার তোমাকে কাছা পরাবার জন্যে স্থানচ্যুত হয়ে আসচেন না! ভক্তি কত? বৎসরান্তে এক গণ্ডুষ জলও তো দিতে দেখিনে।—"

নীরদকুমার যোগেন্দ্রের পিঠের উপর একটা অধীর চপেটাঘাত করিয়া তাহাকে একটুখানি ঠেলিয়া দিয়া অসহিষ্ণু ভাবে বলিয়া উঠিল, "ও সব কথা ছেড়ে দাও যোগেন, তুমি যদি সত্যসত্য এখানে ক্লান্ত হয়ে থাক তা হলে সেকথা স্পষ্ট করে বলেই কেন অবসর নাওনা, জোর তো কিছু নেই! আর জোর করলেই বা মানবে কেন? আর পার যদি", নীরদ একটু হাসিল, "এই হতভাগা স্কুলটাকে সিডিসনের আড্ডা বলে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে একটা রিপোর্ট করে দিও, খুব উন্নতি হয়ে যাবে এখন।"

যোগেন্দ্র এই বিদ্রূপে শিহরিয়া উঠিল, "বলে নাও; ভগবান মুখ দিয়েছেন যত পার বলো। জানো কিনা হতভাগাটাকে বঁড়শিতে বিঁধে রেখেছ, ওর আর কোথাও এক পা নড়বার জো নেই—তাই মাঝে মাঝে খেলিয়ে দেখে নেওয়া বইত না! তাই যদি পারবো নীরু, তাহলে আর মত্থরার তেমন চাকরীটে খুইয়ে তোমার সঙ্গে এসে

বনবাসী হই? স্ত্রীপুত্র সব ছাড়িয়েছ, আরও তুমি বলো তোমায় ছেড়ে যেতে চাই?"

নীরদ মনে মনে অনেকখানি লজ্জা বোধ করিল, যোগেন্দ্র যাহা বলিতেছে সে কথা সম্পূর্ণ সত্য। যোগেন্দ্রের স্বার্থত্যাগ ও বন্ধুপ্রেম যথার্থই অনুকরণীয়। নীরদ জানিত যে কয়জন যুবক তাহার এই নবপ্রতিষ্ঠিত স্কুলের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া নিজেদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দিয়াছেন, যোগেন্দ্রনাথ তাহাদেরই মধ্যে একজন নহে। অন্য সকলে দেশকে ভালবাসিয়া কর্ত্তব্যকে ভালবাসিয়া যশ ও ভবিষ্যতের আশা লইয়া তাহার সহিত যোগদান করিয়াছেন কিন্তু যোগেন্দ্র স্বেচ্ছায় এ কার্য্য গ্রহণ করিয়াছে, সুধু তাহাকে ভালবাসিয়া! ইহার জন্য সে বেচারা ঘরে অনেকখানি নির্য্যাতন সহ্য করিয়া থাকে। পাছে নীরদ মণিমালার চরিত্রের এই দুর্ব্বলতা ও সঙ্কীর্ণতা জানিতে পারে সেই ভয়েই যে সে এই কয়মাস তাহাকে এখানে আনিতে পর্য্যন্ত সাহসী হয় নাই, একথাও নীরদ যে একটু একটু না বুঝিয়াছিল, এমন নয়। দুএকবার সে একটু আভাস দিয়াও সাবধান করিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিল। "গিন্নির কাছে অভিশপ্ত করো না ভাই, দেখো।"

নীরদ চুপ করিয়া রহিল। যোগেন্দ্র আরও একটু আশ্চর্য্য হইয়া গেল। অবশেষে হঠাৎ তাহার মনে পড়িল, আজ নীরদ অসুস্থ, এবং তাহার আহার হয় নাই। এক মুহূর্ত্তের জন্যও যে সে বিরুদ্ধ ভাব হৃদয়ে স্থান দিয়াছিল ইহা ভাবিয়া অনুতাপের ধিক্কারে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল, ব্যগ্র হইয়া তাড়াতাড়ি সে বলিয়া ফেলিল, "ডাক্তারকে একবার ডাকতে পাঠাই তা হলে?" নীরদ মাথা নাড়িয়া বলিল, "না না ডাক্তার কি হবে? তেমন কিছুতো হয়নি"। "সে কি! মুখের চেহারা দেখলে যে ভয় করে! তবে না হয় থার্ম্মোমিটারটা আনি। নিশ্চয়ই তোমার শরীর বেশি খারাপ আছে।" যোগেন্দ্র উঠিল,—নীরদ ডাকিল, "না, না ও সব কিছু করতে হবে না,—যোগেন, শোন শোন—এসোনা একটু গল্প করা যাক। একটা কথা আছে—" যোগেন্দ্র ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিল, "অসুখটা বাড়িয়ে কি হবে?"

"বেশতো তোমরা না হয় একটু সেবা যত্ন করবে! পারবে?" "রা আর আছি কই?" নীরদকুমার হাসিয়া বলিলেন "হওনা কেন তোমরা,—আমি কি বারণ করেছি? বিরহের পালা-অন্তে মিলনের নাট্য রচনা করো, আমি দেখে যাই।"

"কি বল্লে, দেখে যাই? অর্থ?"

"ঐ যে আগে বল্লুম একটা কথা আছে, এটা তারি সূচনা।"

"সূচনা শুনেইতো হৃৎকম্প উপস্থিত! আরম্ভ করো তবে—দেখা যাক কোথায় গিয়ে শেষ—!"

৩৪

সেইদিন প্রাতঃকালে নীরদকুমারের গুরু বিদায় লইয়া গিয়াছেন। বৈকালে পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিয়া একটুখানি অন্যমনস্ক হইবার আশায় নীরদকুমার ঘরটার চারিদিকে একবার প্রত্যাশিতনেত্রে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল। ঘরের দুই কোণে দুইটা আলমারিতে

পুস্তক ভরা আছে, বাংলা সংস্কৃত ইংরাজি সকল ভাষার কিছু না-কিছু ভাল বই তাহার সংগ্রহে ছিল। ম্যাক্সমূলারের "অমিতাভ বুদ্ধ" একবার হাতে করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া যখন সে ঈষৎ ক্লান্তভাবে উপরের তাকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, তখন একখানি ক্ষুদ্রাকৃতি পুস্তিকা নিজের পূর্ব্বস্মৃতির সবটুকু মধুরতা ঢালিয়া দিয়া উজ্জ্বল সুবর্ণাক্ষরে হাসিয়া তাহাকে আহ্বান করিল। যন্ত্রচালিতের মত বইখানা তুলিয়া লইয়া নীরদ আলমারি বন্ধ করিয়া ঘরের মাঝখানে টেবিলের কাছে ফিরিয়া আসিল। টেবিলের উপর সাদা কাপড়ের আস্তরণ বিছানো ও তাহার উপর কাশীর পিতলের সুন্দর কারুকার্য্য খচিত ফুলদানিতে এক গুচ্ছ হাসনাহানা ফুল তাহার শুষ্ক হৃদয়টির ভিতর হইতে ঘরখানিকে ক্ষীণ শেষ সুরভি দান করিয়া যেন সফলতার গৌরবে চাহিয়া দেখিতেছিল। আসন্ন মরণের পানে চাহিয়া সে যেন হাসিয়া বলিতেছে, "দেখ সবটুকু দিয়া দিয়াছি,—অনুতাপ করিবার কিছু নাই।" বাতাস তাহারি সুরভি স্মৃতিতে পূর্ণ হইয়া প্রাণপণে তাহাকে তাজা রাখিবার চেষ্টা করিতেছিল। সে-ও শুধু লইয়া সন্তুষ্ট নয়, কিছু দিতে চাহে। বইখানা খুলিতে প্রথমেই নীরদের চোখে পড়িল,

All look for thee Love, Light and Song.
Light in the sky deep red above
Song in the Lark of pinions strong
And in my heart true Love.
Apart we miss our nature's goal
Why strive to cheat our destinies?
Was not my love for thy Soul?
Thy beauty for mine eyes!
No longer sleep oh listen now!
I wait and weep, But where art thou?"

অত্যন্ত ভাল লাগিল। And in my heart, true Love. সে দুইবার উচ্চারণ করিল, True Love? "হাঁ সত্যই তাই! ইহাকেই True Love বলে! স্বার্থসিদ্ধি, রূপের মোহ, মিষ্টতার স্বাভাবিক আকর্ষণ, সে সব কি প্রেম? ভুল, ভুল, সে সব ভুল! সত্য বলিয়া পূর্ণ মিথ্যাকে আশ্রয় করিতে সবেগে দুই হাত সে উর্দ্ধে তুলিয়াছিল, তাই সত্যের অধীশ্বর তাহার সে বাতুলতা সহ্য করিতে পারেন নাই! তাঁহার অমোঘ বজ্রনিক্ষেপে তাহার গতি প্রতিহত করিয়া দিয়া সত্যের গৌরব রক্ষা ও সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহাকেও রক্ষা করিয়াছেন। অন্তরের মধ্যে একটা স্থানে যেন নীরদ একটু হাল্কা বোধ করিল। যাহা বজ্রাহত বলিয়া ভয় ছিল, ভাল করিয়া দেখিয়া বুঝিল তাহা উপরের সামান্য আঁচড়মাত্র,—ভস্মচিহ্ন নয়।

পিছন হইতে যোগেন্দ্র হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "হরি তুমি সত্য! দেখো এতদিন তুমি আছ কি না আছ এ বিষয়ে বিষম সন্দেহ পোষণ করে এসেছিলাম; আজ আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কর্ব্বো যে তুমি আছ, আছ, আছ, এই পৃথিবীতেই আছ"। নীরদ হাসিয়া মুখ ফিরাইল, "হঠাৎ বেল্লিকের মুখে হরিধ্বনি শুনলে যে আতঙ্ক উপস্থিত হয়! লক্ষণ তো বড় শুভ মনে হচ্চে না, যোগেন"! যোগেন্দ্র নীরদের পিঠে একটা চপেটাঘাত করিয়া সোৎসাহে বলিল, "শুভ লক্ষণ বলে তোমার মনে হচ্চে না?

আমার কিন্তু এখনকার লক্ষণটা বড্ডই সু বলে মনে হচ্ছে! কি বলব দাদা যদি তোমার মত ছিপছিপে শরীরখানি আজকের জন্য পেতাম তাহলে একবার আহ্লাদটা প্রকাশ করে দেখাতাম। আমার ইচ্ছে করচে আনন্দে হয় নেচে, নয় গলা ছেড়ে একবার কেঁদে উঠি।"

"কেন হঠাৎ তোমার হলো কি, বলো দেখি? শ্রীমতী মণিমালা তবে আজই আসছেন, কেমন?"

"তিনি আসছেন, কাল। কিন্তু তা নয় নীরদ, তোমার এই রুচি পরিবর্ত্তন দেখে আমার আজ যে আনন্দটা হচ্ছে ভাই তা আর কি বল্‌ব!" যোগেন্দ্র খুব উৎসাহিত হইয়া উঠিয়া আবার বন্ধুর পিঠ চাপড়াইয়া বলিয়া উঠিল,"বেঁচে থাক, ভাই, আমার বড্ড ভাবনাই হয়েছিল, এখন আবার আশা হচ্ছে—।"

নীরদ দেহ সঙ্কুচিত করিয়া লইয়া সরিয়া গেল। ঈষৎ কোপ প্রকাশ করিয়া বলিল "বেওয়ারিস্ মাল পেয়েছ, যোগেন! পিঠখানা ভেঙ্গে দেওয়ায় বিশেষ কোন লাভ তোমার নেই! হঠাৎ অতটা উচ্ছ্বাস ভাল নয়, একটু রেখে খরচ কর—।"

যোগেন্দ্র নীরদের পাশে আসন গ্রহণ করিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিল, "যাই বল, ভাই আমি হাঁপিয়ে উঠেছিলাম,—গম্ভীর মুখ আর ভাষ্য ভস্ম আমার প্রাণটাকে একেবারে চেপে মেরে ফেলবার যোগাড় করেছিল! নীরু তোমার মুখে শেলি, বার্ণস্, রবীন্দ্রনাথের কবিতা কত মিষ্ট শোনায়! ও গলা কি মোহ মুদ্গর আবৃত্তি করবার জন্য, ভাই! তুমি যে গোদার উপরেও খোদাগরি করেছিলে!—আমি বেশ বুঝতে পারছিলুম অতটা বিদ্রোহ তোমার বরদাস্ত হবে না। এখন, কি কথাটা বলবে বলেছিলে—শুনি?"

নীরদ এতক্ষণ যোগেন্দ্রের কথায় বেশ একটু কৌতুক অনুভব করিতেছিল। শেষ প্রশ্নে সহসা সে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। "বলবো 'খন"।

"কখন বলবে, পাঁজিপুঁথি আনতে হবে নাকি? তারপর দুখানা নৈবেদ্য একটা শাঁক ফুল ও চন্দন?"—নীরদ হাসিয়া ফেলিল, "জালিও না, থামো, কি বলবো?"

"যা বলবে বলেছিলে!" নীরদ অত্যন্ত সহসা বলিয়া উঠিল, "কি বলা উচিত, বুঝতে পারচি না"—তাহার মুখ চোখ গরম এবং লাল হইয়া উঠিল; মাথা ও মুখের ভিতর উত্তপ্ত রক্ত ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল। যোগেন্দ্র কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় দুইটী স্কুলের ছেলে ঘরে আসিয়া নত-মস্তকে দাঁড়াইল। নীরদ দরজার দিকে ফিরিয়া বসিয়াছিল, তাহাদের দেখিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলচো সুধীর, বিনয়?" সুধীর সোজা নীরদের মুখের দিকে চাহিয়া অকুণ্ঠিতভাবে কহিল, "আপনি আজও কি বাগানে যাবেন না? রোজ রোজ আপনি না থাকলে কেমন করে চলবে?" বালকের এই কথা কয়টা আচমকা নীরদকে যেন আঘাত করিল। ছি, ছি, সে স্বার্থপর নিতান্ত কাপুরুষের মত নিজের অন্তর্দাহ লইয়া এ কোণে ও কোণে লুকাইয়া বেড়াই-তেছে! নীরদের উত্তর দিবার পূর্ব্বেই যোগেন্দ্র একটু ব্যস্তভাবে বলিল, "আজ নীরদের শরীর ভাল নেই সুধী, কিন্তু, তোমরা খেলতে যাও।

কাল থেকে তোমাদের খেলার সময় আমরা ঠিক উপস্থিত থাকব দেখো"। বালক দুইটি একসঙ্গে নীরদের স্তম্ভিত মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। বিনয় ধীরে ধীরে ব্যথিত নেত্র নামাইয়া বলিল,—"তবে থাক্—এসো সুধীর!"

তাহারা ফিরিল, কিন্তু তাহাদের মৌন অভিমানের প্রচ্ছন্ন ব্যথা নীরদের অপরাধী চিত্তকে তাহাদের মত সহজে ক্ষমা করিতে চাহিল না। সে অনুতপ্ত হইয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "না না চলো আমি যাচ্চি। আজ তোমাদের ম্যাচ আছে, না?" বিনয় ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হাসিমুখে উত্তর করিল, "সেতো কাল হয়ে গেছে।" সুধীরের মুখ হইতে তখনও অভিমানের ছল-ছল ভাব চলিয়া যায় নাই। সে মুখ না ফিরাইয়া রুদ্ধস্বরে বলিল, "আপনার শরীর ভাল নেই। আজ থাক" "তা হোক আমার কিছু কষ্ট হবে না এসো।" এই বলিয়া নীরদ দ্রুতপদে বাহির হইয়া পড়িল; যোগেন্দ্র একটু অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল—তারপর কার্য্যান্তরে উঠিয়া গেল। খেয়ালী-লোকদের চরিত্র বোঝা তাহার সাধ্যের অতীত, সে কথা সে পুনঃপুনঃই স্বীকার করিয়া আসিয়াছে। আজ আর নূতন কি বলিবে?

ছেলেরা ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিতেছিল; যাহারা খেলা করিতেছিল না, তাহারা আপনা-আপনি দাঁড়াইয়া হাসি গল্প করিতেছিল। ছোট ছোট গাছগুলি বিকাল বেলার বাতাসে তাজা হইয়া ধীরে ধীরে মাথা কাঁপাইতেছিল, অদূরে নদীর পারে অস্তোন্মুখ সূর্য্যের রাঙা কিরণটুকু যেন ঋষিপত্নীর ক্ষৌম বসনের রাঙা পাড়টির মত আসন্ন সন্ধ্যার তলে ফুটিয়া রহিয়াছে। নীরদ সুধীরের হাত দৃঢ় ভাবে চাপিয়া ধরিয়া মৃদুস্বরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি না দেখলে তোমাদের খেলতে ভাল লাগে না?" সুধীর এখন অভিমান ভুলিয়া গিয়াছিল; সে সেই হাতখানার উপর অল্প একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়া প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "একটুও না"।

এই পৃথিবী এমন সুন্দর! এই স্নিগ্ধ বায়ু, প্রসন্ন সূর্য্যকিরণ, ঐ আকাশের গায় মিশিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে যে ছোট ছোট পাখীগুলি, নদীতীর হইতে ভাসিয়া আসা, সহজ হাস্য মিশ্র কলরব, এখানকার কিছুই তো নিরাশার অন্ধকার গায় মাখে না! উত্তাপে তাহারা ম্লান হয়, আবার বাতাসে হাসিয়া উঠে। অন্ধকারে ঘুমাইয়া থাকে, আলো আসিলেই জাগিয়া উঠে। তবে এই সজীব শান্ত আলোকিত জগতের মাঝখানে ইহাদেরি সঙ্গে মিশিয়া সে কেন এক হইয়া যাইতে পারে না! আরো, তাহার উপর অন্য সকলের এই যে নিঃস্বার্থ ভালবাসাটুকু, এই যে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি, ইহাই কি তাহার পক্ষে যথেষ্ট নহে। সে তো অনেক পাইয়াছে। তাহার জীবন ব্যর্থ নহে, সে ধন্য!

৩৫

সেদিন ও তার পরদিনটা পর্য্যন্ত নীরদ যোগেন্দ্রের হাত এড়াইয়া কোন রকমে আত্ম-রক্ষা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। আবশ্যক তাহার নিজের,—কথাটা প্রথম সেই তুলি-য়াছে,—বলিবার প্রয়োজন এখনও বিদ্যমান, অথচ যোগেন্দ্রকে দেখিলেই বুক যেন কাঁপিয়া

উঠে! হাত পায়ের তলাগুলা অসাড় হিম হইয়া আসিতে থাকে।

মণিমালা তাহার দুইটি পুত্র কন্যা সঙ্গে লইয়া আসিয়া পৌঁছিলে যোগেন্দ্রের হাত হইতে আপাতত রক্ষা পাইল মনে করিয়া নীরদ কতকটা আরাম বোধ করিতে লাগিল। সন্ধ্যাবেলা ছেলেদের লইয়া গল্প করিয়া রাত্রে যখন সে শয়ন করিতে গেল,—কল্যাণময়ী জননীর মত সর্ব্বসন্তাপহরা নিদ্রাদেবী তাহার শ্রান্ত ললাটের উপর কোমল হাতখানি বুলাইয়া দিলেন।

প্রভাত আবার যুদ্ধের সাজে সাজিয়া আসিল। আবার সেই জীবন-সংগ্রামে হৃদয়ের সহিত ধস্তাধস্তি! বিদ্রোহী চিত্তকে সহজ প্রলোভনে ভুলাইয়া বশীভূত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা!

তখনও ঠিক প্রভাত হয় নাই। দূরে পূর্ব্বাকাশের একটি প্রান্ত সবেমাত্র লাল হইতে আরম্ভ করিয়াছে। পাখীরা সদ্য জাগ্রত হইয়া আপনাদিগের শিশু শাবকগণের সহিত আলাপ শেষ করিয়া দিবসের মত বিদায় লইতেছিল। দুইটী পক্ষী-দম্পতী একটি গাছের ডালের কাছাকাছি বসিয়া এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিতেছে। মন্দিরের প্রাঙ্গণ হইতে বালকদের সমবেত কণ্ঠোচ্চারিত সংস্কৃত স্তব আবৃত্তির গাম্ভীর্য্যময় ঝঙ্কার স্তব্ধ প্রভাতের বাতাসে-আকাশে কম্পিত হইতে লাগিল। মন্ত্রমুগ্ধের মত নীরদ এক পা এক পা করিয়া অগ্রসর হইতে হইতে কোন এক সময়ে আসিয়া তাহাদের সহিত যোগদান করিল।

সেই দিন আসন্ন সন্ধ্যার ছায়াচ্ছন্ন কানন-পথে ফিরিতে ফিরিতে গ্রামের বৈরাগী যখন খঞ্জনী বাজাইয়া আপন মনে গাহিয়া চলিয়াছিল, "সামাল মাঝি এই পারাবারে বান ডেকেছে সাগরে। এবার তোমার দফা, হল রফা, পড়ে গেলে ফাঁপরে"—তখন পাশে বেড়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া নীরদ আপনার মনের সহিত শত-শত প্রশ্নোত্তর করিতেছিল। যুদ্ধ শেষ হইয়া আসিয়াছে। কল্য প্রভাতেই জীবন-ব্যাপী মহাসমরের সমাপ্তি—তার পর? তারপর কি অপূর্ব্ব শান্তি, অটুট সুখ! লুব্ধ বালকের মত আপনাকে আপনি সে ভুলাইতেছিল। গান একটা সামান্য ভিক্ষাজীবি গ্রাম্য বৈরাগীর অশিক্ষিত কণ্ঠের স্বাভাবিক স্বরমাত্র, সারাদিনের ধূলি-রৌদ্রমাখা ক্লান্তচিত্তের একটুখানি আত্মতৃপ্তি, কিন্তু নীরদের কানে ইহা আজ সংসারের মধ্যে সব চেয়ে মিষ্ট ও মধুর ঠেকিল। বৈরাগী যেন তাহার সঙ্কট বুঝিয়া দুরন্ত পারাবারে ভাসমান নৌকাখানিকে প্রাণপণে সামলাইতে বলিতেছে! বান ডাকিয়াছে, যদি সে সাবধান না হয়, তাহার ক্ষুদ্রতরী রক্ষা করা দায় হইয়া উঠিবে।

কয়দিন সমস্ত মানসিক শক্তি খরচ করিয়া করিয়া আর সব মীমাংসা একরকম সে করিয়া আনিয়াছে; কিন্তু একটা অদম্য লজ্জা সে কিছুতে পরিত্যাগ করিতে পারিতেছিল না। লক্ষ্মীপুরে সে কাহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইবে? সে যে শান্তির স্বামীকে তাহার সর্ব্বস্ব দান করিয়া দিয়াছে। আবার কি সে দান ফিরাইয়া লইবে? নীরদের আরক্ত মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, তাহার চঞ্চল হৃৎপিণ্ড পুনঃপুনঃ নিশ্চল হইয়া পড়িতে লাগিল। ঘড়িতে যেন দম আর একটুও নাই। সামলান বুঝি দায় হয়, যাত্রী

এবার ফাঁপরেই পড়িল! সন্ত ফোটা ফুলের মত আকাশভরা নক্ষত্রগুলা সকৌতুকে তাহার লজ্জাক্লিষ্ট মুখের পানে চাহিয়া রহিল; শীতের কনকনে বাতাস গায় তীরের মত বিঁধিয়া ফিরিয়া ব্যঙ্গের হাসি হাসিল, অনেক দূর হইতে ক্ষীণ সঙ্গীতের ধ্বনি তখনও শুনা যাইতেছিল কিন্তু বুঝিতে পারা যাইতেছিল না। অনেকক্ষণ পরে অদূরস্থ অন্ধকারাচ্ছন্ন কলাঝাড়ের পানে চাহিয়া চাহিয়া সুদীর্ঘ নিশ্বাসে সুগভীর লজ্জাকে যেন জোর করিয়া সে পরিত্যাগ করিতে চাহিল "আমার যেতে হবে, আমি যাবো,—তার সম্মুখে দাঁড়িয়েই আমায় প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে,—তাই করব,—আমার যাওয়া ভিন্ন উপায় নাই।"

নীরদ যখন ঘরে ফিরিয়া আসিল তখনও অপর দিকের ঘরগুলি হইতে ছেলেদের পাঠের সাড়া আসিতেছিল। তাহার ঘরে টুলের উপর একটি তেলের প্রদীপ জ্বলিতেছিল ও যোগেন্দ্র আলোর কাছে একখানা চৌকিতে বসিয়া খপরের কাগজ হইতে পুনঃপুনঃ চোখ তুলিয়া দরজার দিকে চাহিতেছিল। নীরদ ঘরে ঢুকিতেই কাগজখানা ফেলিয়া দিয়া সে বলিয়া উঠিল "হ্যালো ম্যান! তোমার যে পাত্তাই পাওয়া যায় না—হলো কি? কেবলি ঠাণ্ডা বাতাস, আর দীর্ঘশ্বাস!—না, আর কিছু?" নীরদ যোগেন্দ্রের চৌকি ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল, হাসিয়া বলিল, "না আর কিছু না।"

"I wait and weep but where art thou? সুধু তাই?"

"তাই, কিন্তু যোগেন, তামাসা যাক, কাজের কথা বলো, আমার কথার উত্তর কই? আমি চলে গেলে আমার কাজের ভার তুমি নেবেত?"

"আমার প্রশ্নটারি উত্তর কেন প্রথমে হোক না! তোমার মতলব কি?"

"কার মনে কখন কি মতলব ওঠে, তা কি সব সময় খুলে বলা যায়? তবে এই পর্য্যন্ত বলচি, মন্দ কিছু নয়, গুরুদেবের আদেশে আমি যাচ্ছি।"

"ঐ তো ওখানেই যে গলদ! তাঁর যে একটি তল্পি বয়বার চেলার দরকার হয়নি, তা ভরসা করব কি করে?"

মাথা নীচু করিয়া নীরদ কহিল, "তা হলে ত আমার সৌভাগ্য!"

বন্ধুর অন্তর্ভেদী দীর্ঘশ্বাস যোগেন্দ্র শুনিতে পাইল না। সে মাথা নাড়িয়া অতি করুণ কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "ওটাও যে একটা দুর্লক্ষণ! এ বোঝনা—মহা মহা পাপীরাই তো শেষ কালটায় বড় বড় সাধু হয়। জগাই মাধাই পাপী ছিল, হরিনামের গুণে তরে গেল। আর জানো তো মহামুনি বাল্মীকির পূর্ব্ব ইতিহাসটা? যত দেখবে মস্ত জটা, ততই তাঁর পূর্ব্বলীলার সন্ধান নিতে থাক, দেখবে যে কেউ আর বাদ পড়চেন না—"

আর একটু গাম্ভীর্য্যের চেষ্টা করিয়া সে বলিল, "আচ্ছা, তাহলে এখন ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করা যাক—ব্যাপার হচ্ছে এই যে, তুমি আপাততঃ কোন অজ্ঞাত মতলবে কিছু দিনের জন্য নিরুদ্দেশ হচ্চো—না হয় পর্য্যটনেই বেরুচ্চো! এখন তোমার অনুপস্থিতিতে আমরা এখানকার সব ভারতার নিজেদের স্কন্ধে বহন করি, তোমার অনুরোধ—এই, না? আমার এখন জিজ্ঞাসা, এই ভারবাহী গর্দ্দভের গলায় কত দিন আর এ রকম শিকল বাঁধা থাকবে?"

নীরদ একটু ভাবিয়া বলিল "তাতো জানি না। হয় তো খুব শীঘ্রও হতে পারে আর নয় তো অনেক দেরিও হয়ে যেতে পারে। কি জানি যোগেন কি হবে!" নীরদের স্বর কম্পিত হইতেছিল! যোগেন্দ্র জানিত ভাবুক লোকের কথা বার্ত্তা চাল চলন সাধারণ লোকের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না। সে কহিল "তোমার আদেশ কবে অগ্রাহ্য করেছি। কিন্তু একটা কথা—এই বৎসবৃন্দ নিয়ে দিন রাত গোষ্ঠলীলা করতে করতে যে সময় প্রাণটা পরিত্রাহি ডাক ছাড়বে সেই সময়টিতেই যে ঠিক মানভঞ্জনের পালা গাইতে খুব ভাল লাগবে এমন তো ভরসা করা যায় না। তাই ভাবচি ওপরের ঘরগুলো ওঁদের খাসমহল করে দিয়ে তোমার এই নারীবর্জ্জিত গৃহে আস্তানা গেড়ে একবার জিরিয়ে নেওয়া যাবে, নৈলে ত আর পারা যায় না।"

নীরদ তীক্ষ্ণ শ্লেষের সহিত ব্যঙ্গ করিল, "যো খায়া উওভি পস্তায়া!—আর যো নেহি খায়া—উওভি পস্তায়া! তা ত দেখতে পাচ্চি মশায়! এখন বল দেখি কোথায় যাচ্চ, কোন দেশে?"

নীরদ হঠাৎ ঘামিয়া উঠিল, তাহার বুকের মধ্যে এত জোরে জোরে হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল যে তাহার নিশ্বাস আটকাইয়া পড়িবার মত হইয়া আসিল। মাটির দিকে চাহিয়া রুদ্ধশ্বাসে মৃদু স্বরে সে উত্তর করিল, "মাপ করো ভাই, আর আমায় কিছু জিজ্ঞাসা করো না।"

যোগেন্দ্র মনে মনে বিস্মিত হইল কিন্তু বাহিরে তাহা প্রকাশ না করিয়া কহিল "এত লুকোচুরি কিসের বলো তো শুনি? তা যাও যাও যদি সঙ্গিনী-সংগ্রহের ইচ্ছা হয়ে থাকে তো বলে যাও আমি মণিকে দিয়ে বরণডালা সাজিয়ে রাখি। ও কি চমকালে যে? ঠিক ধরেছি নাকি? দেখ আজ তোমার বলি—শান্তিকে ভালবেসেও তুমি যখন তাকে পাবার চেষ্টা করলে না তখনি আমার একটু সন্দেহ হয়েছিল যে তোমার আত্মলীলার কোথাও কোন গলদ আছে। কে সে ভাগ্যবতী শুনি এতদিন পরে যার কপাল ফিরলো? নিশ্চয়ই কোন ব্রাহ্ম মেয়ে হবে নৈলে কে আর এখনও আইবুড় বসে আছে। নীরদ নীরদ! ও কি? রাগ কল্লে?" যোগেন্দ্রনাথ সহসা লজ্জাতাড়িত আবেগে এই কথা বলিয়া তাহার হাত ধরিবার জন্য নীরদের দিকে দুই হাত বাড়াইয়া দিল। কিন্তু বন্ধু তাহার প্রতি কোন লক্ষ্য না করিয়া বেত্রাহতের মত চমকিয়া দ্রুত পদে পাশের ঘরে চলিয়া গেল। সেথায় স্তব্ধভাবে জানালার নিকট দাঁড়াইয়া বাহিরের অন্ধকার দৃশ্যের দিকে সে চাহিয়া রহিল।

যদি তাহার বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ তখন হতবুদ্ধি না হইয়া গিয়া উঠিয়া আসিয়া একটা আলো হাতে করিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইত, তাহা হইলে তাহার বিস্ময় সীমা অতিক্রম করিয়া উঠিত কারণ সে মুখে লজ্জার যে নিবিড় ছায়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহাতে অমার্জ্জনীয় অপরাধেরই চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছিল। যোগেন্দ্র তাহার বন্ধুকে ঠিক দেবতার মত পবিত্র বলিয়া জানে সে যখন জানিবে যে বাস্তবিক সে তাহা নয়!

ক্রমে অন্ধকার কাটিয়া গিয়া কুয়াশা-

ছন্ন ক্ষীণ জ্যোৎস্না ছড়াইয়া আকাশে চাঁদ উঠিল, জানালার নীচে টবের মধ্য হইতে চন্দ্রমল্লিকার গন্ধ আসিতে লাগিল, শাখা বিরল সজিনা গাছের উপর হইতে একটা নিশাচর পক্ষী কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার করিতে করিতে বাতাসে ডানা মেলিয়া জানালার নিকট দিয়া উড়িয়া গেল।

ধীরে ধীরে নীরদ পূর্ব্বকক্ষে ফিরিয়া আসিল। সে ঘরে যেখানে সে তাহাকে ছাড়িয়া গিয়াছিল—ঠিক সেইখানটিতে সেই অবস্থায় যোগেন্দ্র তখনও স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিল। অনুতাপের গ্লানিতে তাহার মুখ পরিপূর্ণ। নীরদ ধীরে ধীরে তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল "যোগেন্ তাই বলো, বরণডালা সাজাতেই বলো, আমি আমার স্ত্রীকে আনতে যাচ্ছি।" তাহার জিহ্বায় তখন আর একটুও জড়তা ছিল না। যোগেন্দ্রের কণ্ঠ মধ্য হইতে অস্ফুট চীৎকারের মত বাহির হইয়া পড়িল "তোমার স্ত্রী!"

নীরদ উত্তর করিল, "হাঁ আমার পরিত্যক্তা অত্যাচারিতা, স্ত্রী শিবানী।" সম্মুখে কোন অশরীরি মূর্ত্তির ছায়া দেখিলে লোকে যেমন চমকিয়া পলাইতে যায় তেমনি ভাবে পিছাইয়া গিয়া অস্ফুট কণ্ঠে যোগেন্দ্র কহিয়া উঠিল, "তবে তুমি, তবে তুমি শাস্তির—" পরিত্যক্ত চৌকিখানা সরাইয়া বসিয়া নীরদ স্থির কণ্ঠে উত্তর করিল "হাঁ। কিন্তু যোগেন ওসব কথা নিয়ে আলোচনা এখন থাক। প্রতিজ্ঞা কর, আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত তুমি কারু কাছে এ কথা বলবে না?"

প্রকৃতিস্থ হইবার চেষ্টা করিতে করিতে যোগেন্দ্র কহিল "আচ্ছা।"

একই।

একই সুরে সবাই বাঁধা
জান বা আর না জান।
একই তারে সবাই গাঁথা
মান বা আর না মান।
একই মরণ, সবাই মরে
মরতে চাও আর নাই বা চাও।
একই জনম সবাই ধরে
ধরতে চাও আর নাইবা চাও।
একই কথা সবাই বলে
ভাষা যতই হোক্ না কো।
এক রাগিণীই সবাই ভাঁজে
সুরের তফাৎ থাক না কো।

এক জোড়নে সবাই জোড়া
বাঁধা সবাই এক তাঁতে।
দশার ফেরে যতই ফিরুক
আগ্‌-পিছুতে এক সাথে।
এক নিয়মে গড়ছে সবাই
যতই কর কোলাহল।
ভাঙ্গতে তারে পারবে না কেউ
কারিকরের এম্‌নি কল।
একই ধরম একই করম
একেরই সব কারখানা।
এক ছাড়া দুই নাই রে ও ভাই
যতই কর কল্পনা।

দো-সতীনা।

হুগলী জেলার অন্তর্গত 'দে পাড়া' একটি ক্ষুদ্রায়তন পল্লীগ্রাম। তথাকার অধিবাসীদের মধ্যে কয়েকঘর কর্ম্মকার, কুম্ভকার ও ক্ষৌরকার মাত্র হিন্দু; অবশিষ্ট সকলে মুসলমান। গ্রামের পূর্ব্বদিকে বিস্তৃত ধান্যক্ষেত্র এবং তার পরেই দুইটি সুপ্রশস্ত পুষ্করিণী পথিকের মনে সুদূর অতীতের কোনো প্রাচীন স্মৃতি স্বতঃই জাগাইয়া তোলে। এই সুবৃহৎ প্রসিদ্ধ সরোবর দুইটিই "দো-সতীনা" নামে জনসাধারণের নিকট পরিচিত। এই পুরাতন বিখ্যাত সরোবর দুইটির সম্বন্ধে যে প্রবাদ-কথা প্রচলিত আছে তাহা ঐতিহাসিক মূল্যরঞ্জিত না হইলেও কৌতূহলোদ্দীপক, ভাবিয়া নিম্নে তাহা প্রকাশিত করিলাম।

প্রায় ছয়শত বৎসর পূর্ব্বে এই স্থানের নাম ছিল, 'দেবপল্লী', এবং এখানে দেবপাল নামক একজন ভূপতি বাস করিতেন। তাঁহার মাতাপিতার পরিচয় পাওয়া যায় না—তিনি যে কত বৎসর যাবৎ এখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহাও নির্ণয় করিবার উপায় নাই। রাজা দেবপাল প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর আবার বিবাহ করিতে অভিলাষী হইলেন। তাঁহার বিস্তৃত সম্পত্তি, তরুণ বয়স ও অসাধারণ রূপলাবণ্য দৃষ্টে লক্ষ্মীকান্ত নামে জনৈক রাজা আপন কন্যা ইলাকে দেবপালের হস্তে অর্পণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। দেবপালও ইলার অপরূপ রূপ-মাধুরী দর্শনে একান্ত মুগ্ধ হইলেন। যথাসময়ে বিবাহের দিনও স্থির হইল। নির্দ্দিষ্ট দিনে দেবপাল বরবেশে সুসজ্জিত হইয়া আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণসহ রাজা লক্ষ্মীকান্তের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। বরযাত্রী এবং কন্যাযাত্রীর দলে পরস্পরে আলাপ-পরিচয় হইতে লাগিল, উভয় পক্ষের অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যগণের মধ্যে বিবিধ শাস্ত্রের বিচার ও তর্ক-বিতর্ক উপস্থিত হইল। বিবাহের লগ্ন উপস্থিত হইলে, বর সম্প্রদান স্থানে আনীত হইলেন। পুরমহিলারা শঙ্খ-ধ্বনি করিতে লাগিলেন,—বাহিরে শানাইএর সহিত নহবৎ বাজিতে লাগিল; বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা পীঠোপরি উপবিষ্টা পাত্রীকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে আনা হইল। পুরোহিত ঠাকুর মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক সম্প্রদানকার্য্য আরম্ভ করিলেন। এমন সময় সহসা রণভেরীর ভীষণ নিনাদ শ্রবণ করিয়া সকলেই সেইদিকে উৎকর্ণ হইলেন। দেখিতে দেখিতে বহু অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যপাদভরে সম্প্রদান-ভূমি কাঁপিয়া উঠিল। অগণ্য সেনা ভীমরবে সকলের প্রাণে দারুণ ভীতির সঞ্চার করিয়া তোরণ-দ্বার হইতে বিবাহ স্থান অবধি দুই সারিতে বিভক্ত হইয়া দাঁড়াইল। বিবাহ আর হইতে পারিল না। সৈন্যগণ ইলাকে লইয়া প্রস্থান করিল।

সভাস্থ সকলে চিত্রার্পিত পুত্তলিকাবৎ নিশ্চল ও নিস্পন্দ হইয়া রহিল। কাহারো মুখে একটি কথা নাই। ক্ষণকাল পরে বাড়ির ভিতর হইতে ক্রন্দনের ধ্বনি উঠিল, কয়েকজন দস্যুদলের অনুসন্ধানে ছুটিল। ক্রমে রাত্রি অবসান হইয়া আসিলে, দেবপাল উপায়ান্তর না দেখিয়া অগত্যা 'মালতী' ও 'মাধবী' নাম্নী ইলার দুই সখীকে লইয়া

গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং যথারীতি তাহাদের দুজনকেই বিবাহ করিলেন। কিন্তু ঐ দুজনের মধ্যে একজনও ব্রাহ্মণকন্যা নহে; একটি কর্ম্মকার ও অপরটি কুম্ভকারের কন্যা। এই কথা প্রচার হইবামাত্র গ্রামস্থ সকলেই দেবপালের উপর অসন্তুষ্ট হইল। অনন্তর রাজা দেবপাল স্বীয় প্রাসাদের পূর্ব্ব-প্রান্তে দুইটি সুবৃহৎ পুষ্করিণী খনন করাইলেন এবং উহার মধ্যস্থলে এক-একটি বাড়ি প্রস্তুত করাইয়া দুই স্ত্রীকে তথায় রাখিলেন। তদবধি ঐ দুই দীঘির নাম "দো-সতীনা" বলিয়া চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হইল। অতঃপর কেহই আর দেবপালকে ব্রাহ্মণ বলিয়া মান্য করিত না এবং তাঁহার সংশ্রবে থাকিলে জাতি ও ধর্ম্ম নষ্ট হইবে, এই আশঙ্কায় সেই গ্রামবাসী ব্রাহ্মণগণ সকলেই স্ব স্ব পৈত্রিক বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন গ্রামে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

সেই অবধি ঐ গ্রাম ব্রাহ্মণশূন্য হইয়াছে। রাজা দেবপাল দীর্ঘকাল বাঁচিয়া ছিলেন কিন্তু তাঁহার কোনো পুত্রকন্যা জন্মে নাই। কালক্রমে ঐ দেবপল্লীর নাম 'দে-পাড়া' হইয়াছে। উক্ত গ্রামবাসীদের নিকট রাজা দে পালের নাম ও অনেক বিচিত্র কাহিনী শুনা যায়। তাহাদের কথিত দে পালই যে সেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দেবপাল, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনো কারণ নাই। অতীতের সাক্ষ্যস্বরূপ এই "দো-সতীনা" দীর্ঘিকা আজ অবধি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী।

শারদ-লক্ষ্মী।

পুলক-ঢালা আকাশ-নীলে ছায় কি তব স্পর্শ?
উড়িয়ে-চলা মেঘের কোলে বেড়ায় ছুটে হর্ষ?
ছড়িয়ে-পড়া সোনার রোদে ভাসে মুখের দীপ্তি?
আকাশ বন সমীর চুমি ভায় কি তব তৃপ্তি?
সবুজ ধানে ঢেউ তুলিয়ে বহ কি তুমি বহ গো?
কৃষাণ-বধূ পরাণ মধু চুমিয়া তুমি রহ গো?
মদিরঘন শেফালিবাসে বিকাশে হৃদি-বেদনা?
কল-আরাবে কুহরে কি গো মুখর শত কামনা?
পরাণ আজি করুণ বাজি খুঁজিয়া ফিরে তোমারে,
নয়ন-মনে পরশসুখে চাই যে তব দেখা রে?
কপোতগলে বরণ-মালে চকিতে যাও মিলায়ে,
কাশের ফুলে ধরিতে গেলে যাও যে মেঘে পলায়ে!
ফাটিয়ে-টুটা চকিতে-ছুটা তোমার পাব দেখা কি?
বাঁধন-হারা কণাগুলির কোথাও আছে মেলা কি?

শ্রীসুখরঞ্জন রায়।

প্রেম ও মিলন।

প্রেম চায় মিলনের নিবিড় সংযোগ,
অনিবৃত্ত আকাঙ্ক্ষার অবিচ্ছেদ ভোগ;
মিলন কাঁদিয়া ফিরে সরমের মাঝে,—
প্রেম-কণ্ঠে নিরাশার ভগ্নবীণা বাজে!

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত।

সন্ন্যাসী।

১

ঘাটের ধারে বৃদ্ধ বটগাছের ছায়ায় যে জীর্ণপ্রায় পরিত্যক্ত কুটীর বহুদিন শূন্য পড়িয়াছিল, হঠাৎ একদিন প্রাতে গ্রামবাসীগণ বিস্মিত হইয়া দেখিল, সেখানে এক সন্ন্যাসী!

রং গৌরবর্ণ, মাথায় দীর্ঘ জটা, পরণে জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড; এই সন্ন্যাসী একদিনের মধ্যেই সমগ্র গ্রামবাসীর কৌতূহল আকর্ষণ করিল।

সন্ন্যাসী বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড জ্বালাইয়া সমস্তদিন ধরিয়া হোম করে, মাথার উপর রৌদ্র যখন খর হয় তখনও তাহার বিরতি নাই, এবং সব চেয়ে বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ভোজনের জন্য তাহার কোন প্রয়োজন বা চেষ্টার লক্ষণ দেখা যায় না।

এত বড় একটা অদ্ভুত প্রাণী সচরাচর মেলে না—বিশেষ এই ললিতগাঁয়ে।

গ্রামবাসীরা সমস্ত দিন তাহার দুয়ারে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, অবশেষে বেলা-অবসানেও যখন তাহারা কিছুতে সন্ন্যাসীর লক্ষ্য আকর্ষণ করিতে পারিল না, তখন ফিরিয়া গেল।

২

পরদিন এক বৃদ্ধা আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া ডাকিল, "ঠাকুর"—

সন্ন্যাসী কহিল, "কি?"

"আপনি কে আমাদের দয়া করে এখেনে এসেছেন?" সন্ন্যাসী একটু হাসিল, "আপনাদেরই মত মানুষ—বোধ হয় তাও নয়—"

বৃদ্ধা জিভ কাটিল, "অমন কথা বলবেন না—আপনি দেবতা—"

হোমের আগুণ লক্ লক্ করিয়া

সন্ন্যাসী কহিল, "মা, যাকে তাকে দেবতা বলে পাপের ভাগী করবেন না—দেবতা কি সহজে হয়?"

বৃদ্ধা আর একবার গড় করিল, "একটা কথা বলব?"

সন্ন্যাসী কহিল, "বলুন"—

"আপনার সেবার জন্যে কিছু এনেছি, যদি দয়া করে গ্রহণ করেন"—বলিয়া একথাল অন্ন এবং অন্যান্য ভোজ্য সন্ন্যাসীর সম্মুখে রাখিল।

সন্ন্যাসীর মুখে আবার হাসি দেখা দিল, "গ্রহণ করব বৈ কি মা! পরের দেওয়া অন্নে আট বৎসর উদর পূর্ত্তি কচ্ছি, আজ আর তা নইলে আমার চলে না।"

সেইদিন হইতে প্রত্যহ গ্রামবাসীগণ সন্ন্যাসীর জন্য অন্ন দিয়া যাইত।

৩

সন্ন্যাসীর কুটির হইতে খানিকটা দূরে জমিদার বিপিনবাবুর বাটি।

নবীন যৌবনে বিপিনবাবুর উদ্দাম চরিত্রের কথা দেশবিদেশে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর সহসা একদিন কোথা হইতে তিনি কাহাকে বিবাহ করিয়া আনিয়া কলিকাতাবাসী হইলেন। চার-পাঁচ বৎসর কলিকাতায় থাকার পর যখন তিনি দেশে ফিরিলেন,—তখন তাঁহার সঙ্গে আসিল তাঁহার স্ত্রী ও তাঁহার ছোট ফুটফুটে মেয়ে মন্দা।

এই বিবাহ সম্বন্ধে কি একটা গোলযোগ

উঠিয়াছিল, কিন্তু সে অত্যন্ত অস্ফুট, কারণ বিপিনবাবু জমিদার!

কলিকাতায় যখন বিপিনবাবু ছিলেন তখন দেশের লোকে বাঁচিয়াছিল—তিনি যখন ফিরিলেন, তখন তাহারা প্রমাদ গণিল।

৪

কিছুদিনের মধ্যেই সন্ন্যাসীর কতকগুলি ভক্ত এবং বন্ধু জুটিয়া গেল। জমিদারকন্যা মন্দা দ্বিতীয় দলের অন্তর্ভুক্ত।

দুপুরবেলা একটা ছিন্ন বই হাতে লইয়া মন্দা আসিয়া উপস্থিত, "সন্ন্যাসী ঠাকুর—"

সন্ন্যাসী ধ্যান-মগ্ন ছিল, চোখ খুলিয়া বলিল "মা এসেছ?—এই দুপুর রৌদ্রে ঘুমোলেনা কেন?"

মন্দা প্রবলভাবে ঘাড় নাড়িয়া কহিল "নাঃ,—কত পড়েছি আপনাকে তাই দেখাতে এলাম,—আর একটা জিনিষ এনেছি সন্ন্যাসী ঠাকুর—"

ধ্যান অগত্যা বন্ধ রাখিতে হইল। সন্ন্যাসী কহিল, "কি, দেখি?"

কাপড়ের ভিতর হইতে একটা পুতুল বাহির করিয়া মন্দা কহিল, "এ হচ্ছে বড় বৌ। আরো মেজ বৌ, সেজ বৌ, ন বৌ, ছোট বৌ, ঘরে আছে, নিয়ে আসব?"

সন্ন্যাসী হাসিয়া কহিল, "না থাক্, আজ আর আনতে হবে না, কাল এ না।"

তখন বড় বৌকে কোলে রাখিয়া মন্দা তার ঘরকন্নার কথা পাড়িল। 'ওদের বাড়ীর কুন্দর ছেলের সহিত বড় বৌএর মেয়ের এই সে দিন বিবাহ হইয়া গেছে—তাতে কত ঘটা কত আমোদ!' ছোট দুইখানি হাত ঘুরাইয়া মন্দা তাহারই কথা বলিতে লাগিল!

সন্ন্যাসীর কঠিন হৃদয় আর্দ্র হইয়া উঠিতেছিল, চোখে জল আসিয়াছিল। এই একটা অবোধ ছোট মেয়ে,—কি জানি কেন এর এত মোহ! সে তার ছোট দুখানি হাতে এমন সুদৃঢ় বন্ধন রচনা করিয়াছে যে, এই দীর্ঘ আট বৎসরের কঠিন সংযমের পরও সন্ন্যাসী সে বন্ধনে বদ্ধ হইয়া পড়িতেছিল। ওই তার সুন্দর মুখখানি—সে কাহার কথা মনে করাইয়া দেয়! কিসের একটা অভাব—কিসের একটা স্মৃতি! নদীর জল ছলছল করিতে থাকে, গাছের পাতায় হাওয়া সির্ সির্ করিয়া উঠে, চোখের জল কোন রকম করিয়া ঢাকিয়া সন্ন্যাসী মন্দাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলে, "যাও মা, বাড়ী যাও, বেলা পড়ে আসছে।"

অনর্গল কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ মন্দা থামিয়া যায়—"সন্ন্যাসী ঠাকুর, আপনার চোখে জল কেন?"

সন্ন্যাসী হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলে "আমার কি চোখে জল আসে মা? ঐ হোমের আগুনে সব শুকিয়ে গেছে—"

মন্দা গলা জড়াইয়া ধরে "কিন্তু ঐ ত' রয়েছে—!" তখন অশ্রুজল উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। মন্দার মুখচুম্বন করিয়া সন্ন্যাসী তাহাকে বাড়ী পাঠাইয়া দেয়।

৫

বাড়ীতে ইহার জন্য মন্দাকে অল্প লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইত না। তাহার ঠাকুমা দেখিবামাত্র তাহাকে শাসন করিতেন, কহিতেন,

"কোথা গিয়েছিলি রে?"

মন্দা একটা ঢোক গিলিয়া বলিত, "ঘাটের ধারে।"

"সন্ন্যাসীর কাছে বুঝি ?"

মন্দা চুপ করিয়া থাকিত।

তখন ঠাকুমা গর্জ্জন করিয়া উঠিতেন "এমন মেয়েও ত দেখিনি! সন্ন্যাসীর কাছে দিবারাত্র পড়ে থাকা এমন ত শুনিনি! হতভাগা মেয়ে,—তারা কত কি জানে, তাদের কাছে কি থাকতে আছে,—তারা নজর দিলে অনাছিষ্টি হয়—অসুখ বিসুখ করে দিয়ে মেরে ফেলে,—কতবার বলি—রাক্কুসী মেয়ে তবু শোনে না!"

মন্দা কহিত "না ঠাকুমা, সন্ন্যাসী ঠাকুর আমাকে কত ভালবাসেন, কত গল্প বলেন,—কত আদর করেন—"

ঠাকুমা সভয়ে বলিতেন, "ঐ রে, মেয়েটাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে বিপাকে ফেল্‌বে দেখ্‌ছি—"

সন্ন্যাসীরও বিপদের অন্ত ছিল না। মন্দার মত দুএকটি বন্ধু ছাড়া তাহার অসংখ্য ভক্তও জুটিয়াছিল। সময়ে সময়ে তাহাদের ভক্তিস্রোত যখন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত তখন সন্ন্যাসী প্রমাদ গণিত।

কিন্তু প্রকৃত বিপদ ছিল এই যে, ভক্তের প্রার্থনা প্রায় ঔষধ-বাঞ্ছারূপেই প্রকাশ পাইত। "সন্ন্যাসী ঠাকুর, আমার মেজবৌমার হজম হয় না"। "আমার ছেলেটার পিলে হয়েছে", "নাতিটা জ্বর-বিকারে মর মর", "মেয়েটা কেমন রোগা হয়ে যাচ্চে" ইত্যাকার রোগের বিবরণ ও তাহার পর ঔষধ প্রার্থনা, সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত —ইহার বিরাম থাকিত না।

সন্ন্যাসী বিস্মিত হইয়া ভাবিত, চিকিৎসা-শাস্ত্রে তাহার এ অধিকার কবে হইতে! এতগুলা লোকের বিশ্বাস সে কেমন করিয়া বিনা প্রমাণে জন্মাইয়া দিয়াছে! এবং এ বিশ্বাসের মূলই বা কি ?

সে কিছুতেই ঔষধ দিতে সম্মত হইত না, কিন্তু ভক্তেরা নাছোড়বন্দ। অগত্যা প্রত্যেক প্রার্থীকেই একটু করিয়া হোমের ভস্ম দিয়া তুষ্ট করিতে হইত।

তাহার ফল এই হইত, যাহারা বাঁচিবার তাহারা বাঁচিয়া যাইত। কিন্তু ইহাতেই সন্ন্যাসীর খ্যাতি বহুবিস্তৃত হইয়া পড়িল, এবং ঔষধ-প্রার্থীর সংখ্যাও দিন দিন বাড়িয়া চলিল।

কিন্তু সব চেয়ে বড় বিপদ হইয়াছিল, মন্দাকে লইয়া। সে এমন করিয়া হৃদয়কে অভিভূত করিয়া দেয় কেন,—সন্ন্যাসীর কঠিন প্রাণকে এমন করিয়া স্নেহ-কোমল প্রেম-আর্দ্র করিয়া দেয়, কিসের মোহে! ভগবানের ধ্যান করিতে করিতে চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে মন্দার মুখ; মন সমস্ত দিন উন্মুখ হইয়া থাকে, মন্দার লঘু-পদ-শব্দের প্রতীক্ষায়! সংসারের মায়া কাটাইয়া এ কি মায়াবিনীর মোহ-পাশে আজ নূতন করিয়া বন্ধন!

দুই হাত জোড় করিয়া সে কহে "দেবতা আমার! যেমন করিয়া আমাকে সেবার সংসার হ'তে মুক্তি দিয়েছিলে, তেমনি করে এ নতুন বন্ধন কেটে দিয়ে আমাকে তোমার পায়ের তলায় নিয়ে চলো!"

সন্ন্যাসীর চারিপার্শ্বে দেশের লোক যে বিরক্তি এবং মন্দা যে আকর্ষণ গড়িয়া তুলিয়াছিল, সন্ন্যাসী একদিন স্থির করিল তাহা হইতে আপনাকে সেই রাত্রে সে মুক্তি দিবে।

কিন্তু মন্দা! দু'দিন মন্দা আসে নাই, তাই তাহার জন্ম প্রাণ ছটফট করিয়াছে! কেন? আজ রাত্রে সে মুক্ত হইবে, বন্ধনহীন হইবে—তবে আর কাহার জন্ম চিন্তা। সে আজ চিত্ত দৃঢ় করিয়াছে!

কিন্তু হায়, তবু মন বলে, মন্দা!

৬

সন্ধ্যার সময় বন্দনা শেষ করিয়া সন্ন্যাসী বসিয়াছে। আজ গভীর রাত্রে সে ললিতগাঁ ত্যাগ করিবে।

এমন সময় মন্দার ঠাকুমা আসিয়া প্রণাম করিল, "ঠাকুর, মন্দার বড় অসুখ করেছে, একবার তাকে দেখ্‌বেন চলুন।"

সন্ন্যাসী চমকিয়া উঠিল, "মন্দার অসুখ—কি অসুখ?"

"বসন্ত হয়েছে।"

সন্ন্যাসী কাঠের মত বসিয়া রহিল। এ কি পরীক্ষা! আজ সে যখন সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিতেছিল, তখন সব চেয়ে কঠিন বন্ধনের কি এ নিদারুণ আকর্ষণ! মন্দা তাহার কেহ নয়, বিশেষ সে চিকিৎসক নহে, কি হবে মন্দাকে দেখিয়া? আর নহে, আবার নূতন করিয়া সে ধরা দিতে রাজী নহে।

"আমি গৃহীর বাড়ীতে যাই না ত আপনাকে আমি এই ছাই দিচ্ছি, এতেই ভাল হবে।"

বৃদ্ধা অনেক অনুনয় করিল, কহিল, "ঠাকুর তোমারই কাছে সে আস্‌ত, এখানেই কি অপরাধ করে সে রোগগ্রস্ত হয়েছে,—তুমি দয়া করলেই সে সেরে উঠ্‌বে—একটিবার চলো।"

সন্ন্যাসী কহিল, "না"—।

৭

হোমের আগুণ নিভিয়া গিয়াছে—এইবার গ্রাম ত্যাগ করিবার সময় আসিয়াছে। অদূরে মন্দাদের বাড়ী, একটা ঘর হইতে আলো আসিতেছিল—বোধ হয়, ঐ ঘরে মন্দা আছে।

সেই দিকে চাহিয়া সন্ন্যাসীর চোখে জল আসিল,—কিন্তু না!

সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে উঠিল, এইবার সে ললিতগাঁ ও তাহার স্মৃতির সহিত সমস্ত সম্বন্ধ শেষ করিবে।

এমন সময় কুটিরের দ্বারে একজন স্ত্রীলোক আসিয়া দাঁড়াইল,—বস্ত্রে সমস্ত দেহ সংবৃত, মুখ খোলা।

বিস্মিত সন্ন্যাসী কহিল, "কে?"

সন্ন্যাসীর পায়ে মাথা রাখিয়া সে কহিল, "কমলা—"

মুহূর্ত্তে সন্ন্যাসী দশ হাত সরিয়া গেল,—ক্ষীণ আলোকে একবার মুখখানা দেখিয়া লইল—"কমলা?"

বোধ হয় দাঁড়াইবার ক্ষমতা লোপ পাইয়াছিল—সন্ন্যাসী বসিয়া পড়িল। "এ কি?"

দুই পা বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া কমলা কাঁদিতে লাগিল "এক মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতা আমাকে কি পাপের মাঝখানে এনে ফেলেছে—তা তোমাকে কি বলব? তোমার সমস্ত হোমাগ্নির দাহর চেয়ে তীব্র জ্বালা আমাকে দিনরাত্রি পুড়িয়ে মারচে—উপায় নেই,—উপায় নেই—"

সন্ন্যাসী পা ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিল—"আমাকে স্পর্শ করোনা—"

কমলা ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

"তোমাকে ছেড়ে এসে অবধি কি চিতার আগুনে আমি পুড়চি তা বলতে পারবো না। সারাজীবন তেমনি পুড়তে হবে; তোমার পায়ের তলায় আজ এক মুহূর্ত্তের জন্য তার বিরাম হয়েছে,—দয়া করো, এই এক মুহূর্ত্তের জন্যে আমাকে বঞ্চিত করোনা,—তুমি দেবতা, তোমার স্পর্শ আমাকে ভিক্ষা দাও!"

সন্ন্যাসী কহিল, "আমি এখনি এ গ্রাম ত্যাগ করে চলে যাব—"

কমলা কহিল "তবে বিলম্ব করোনা—আমার ক্ষমা নেই, আমার অনন্ত নরক, অনন্ত দাহ, জানি,কিন্তু তোমার ঐ ছোট মেয়ে মন্দা, সেই তোমার একমাত্র স্মৃতি, যাকে বুকে করে তোমার কথা মনে করে, প্রাণ জুড়োই,—তাকে তুমি বাঁচাও, তুমি মনে করলে, তুমি দয়া করলে সে নিশ্চয় বাঁচবে। একমাসের মেয়ে, তাকে কোলে করে আমি বেরিয়ে ছিলাম—"

সন্ন্যাসী ব্যগ্রভাবে কহিল, "চুপ কর, চুপ কর, সে কাহিনী শুন্‌লে, বাতাস নিশ্চল হবে, গাছপালা শিউরে উঠবে!"

সন্ন্যাসীর পায়ে মাথা রাখিয়া কমলা কহিল, "তবে থাক্। কিন্তু তুমি চলো—তাকে বাঁচাও, দয়া করো, দয়া করো।"

যন্ত্রচালিতের মত সন্ন্যাসী কহিল, "চল"।

৮

মন্দার মাথার শিয়রে আসিয়া যখন সন্ন্যাসী বসিল, তখন মন্দার ঠাকুমা কহিলেন, "ঠাকুর, আমার প্রার্থনা শুনে অবশেষে যে তুমি মন্দাকে দেখ্‌তে এসেছ, এতেই আমার মনে হচ্ছে, মন্দা নিশ্চয় বাঁচবে।"

সন্ন্যাসী কহিল, "বাঁচবে বৈ কি—বাঁচবে। ভেবেছিলাম আস্‌বনা—কিন্তু মন্দাকে না দেখে থাকৃতে পারলাম না—"

ঠাকুমা কহিলেন, "তার ওপর এই দয়া চিরকাল রেখো, ঠাকুর।"

সে কি অক্লান্ত সেবা! দিন এবং রাত্রির মধ্যে ব্যবধান ঘুচিয়া গেল—বিনিদ্র, নিরলস ভাবে সন্ন্যাসী সাতদিন মন্দার মাথার শিয়রে কাটাইয়া দিল। যে রাত্রে মন্দাকে সে দেখিতে আসে,—সে রাত্রের কথা একটা স্বপ্ন-কাহিনীর মত, ঐ ছোট মেয়ে মন্দা, যে আজ ব্যাধির প্রকোপে সংজ্ঞাহীন, সে তারই, সে সেই ছোট এক মাসের মেয়ে, যে তার ক্রোড়-চ্যুত হয়েছিল! তার ব্রণাঙ্কিত অধরে সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে চুম্বন দান করে,—সেবার মধ্যে দিবারাত্রি প্রার্থনা করে, "হে ঠাকুর মন্দাকে বাঁচাও, পতিতার, আশ্রয়হীনা কলঙ্কিনীর সেই একটি মাত্র শীতল সান্ত্বনা, একটিমাত্র স্মৃতি! তাকে ফিরিয়ে দাও!"

সাতদিনের পর যখন মন্দা রোগমুক্ত হইল, তখন সন্ন্যাসী বলিল, "এখন তবে যাই!"

ঠাকুমা কহিলেন, "ঠাকুর আপনাকে কি বলব, কি দেবো, জানিনে! আপনি দেবতা।"

সন্ন্যাসী কহিল,"আমাকে আর কিছু দিতে হবে না, শুধু মুক্তি দিন, আর আবার যদি কখনও ফিরি, মন্দাকে দেখ্‌তে দেবেন।"

ঠাকুমা কহিলেন, "মন্দা ত ঠাকুর, আপনারই! আপনি তার প্রাণ দিয়েছেন, সে আর আমাদের নয়। তাকে দেখ্‌তে ইচ্ছে কল্লেই দেখতে পাবেন—এ ত ছোট কথা!"

বিদায়ের সময় মন্দাকে বুকের মধ্যে লইয়া সন্ন্যাসী বার-বার আদর করিতে লাগিল—

ছাড়িতে ইচ্ছা করে না,—তার পর অশ্রুজল রোধ করিয়া সহসা অন্তর্হিত হইল!

৯

ললিতগাঁ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী বাহির হইল,—সমস্ত অঙ্গে নিদারুণ বেদনা! সাত দিন ও রাত্রির পরিশ্রমের জন্য শরীরটা বড়ই অসুস্থ বোধ হইতেছিল—তবু আর একদণ্ড থাকিবে না। স্মৃতি আবার তাহার ভাগ্যে সত্যরূপ ফিরিয়া আসিয়াছে এবং বন্ধন আরও দৃঢ় হইয়াছে—সুতরাং আর না!

ললিতগাঁ হইতে সে বেশী দূর হইবে না, এক ক্রোশের মধ্যেই,—ততদূর গিয়া আর চলিতে পারিল না, একটা গাছের তলায় সন্ন্যাসী বসিয়া পড়িল।

কেন,এমন হইল? আপনার দেহের দিকে চাহিয়া সন্ন্যাসী দেখিল, বসন্ত-গুটিকায় সমস্ত দেহ ভরিয়া গিয়াছে!

চোখ বুজিয়া সন্ন্যাসী ভাবিল, "আঃ—এই ত ভাল! আমার মত অভাগার মৃত্যু লোকালয়ে শোভা পেত না. তাই ভগবান মনুষ্যের সম্পর্ক থেকে দূরে এইখেনে আমাকে এনে ফেলেছেন! এখানকার মুক্ত বাতাস, গম্ভীর স্তব্ধতা, এই ত সন্ন্যাসীর মৃত্যুর উপযোগী!"

গাছের একটা শিকড়ে মাথা রাখিয়া সন্ন্যাসী শয়ন করিল।

নিদ্রার মধ্যে,চেতনা-হীনতার মধ্যে একটি মাত্র মুখ ভাসিয়া উঠে, সে মন্দার! সেই একমাসের ছোট মেয়ে মন্দার, তাহার স্নেহময়ী জননীর ক্রোড়-শায়িতা মন্দার, আটবৎসর পূর্ব্বেকার লতাপাতাঘেরা আনন্দ ও প্রেমোজ্জ্বল গৃহের মন্দার!।

১০

কতদিন এমন ভাবে কাটিয়াছিল স্থির নাই। যেদিন সন্ন্যাসী চোখ খুলিল, সেদিন তাহার মুখে মৃত্যুর ছায়া সুনিবিড় হইয়া আসিয়াছিল।

একটা গরুর গাড়ী যাইতেছিল, গাড়োয়ান সন্ন্যাসীকে দেখিয়া নামিয়া আসিল। ভাল করিয়া দেখিয়া চিনিল, ললিতগাঁর সেই সন্ন্যাসী যে তাহার প্লীহা আরাম করিয়াছিল।

হাতজোড় করিয়া সে কহিল, "ঠাকুর আপনার এ দশা কেন? আপনার জন্যে আমি কি করতে পারি?"

সন্ন্যাসী কহিল, "দয়া করে যদি একটি কাজ করো। তোমার ঐ গাড়ীতে আমাকে একটু জায়গা দিয়ে ললিতগাঁর বিপিনবাবুর বাড়ীতে পৌছে দাও—একবার মন্দাকে দেখতে ইচ্ছে হয়েছে।"

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। অতি ধীরে ধীরে গাড়ী হইতে নামিয়া সন্ন্যাসী রোয়াকে উপবেশন করিল।

ভাল আওয়াজ বাহির হয় না,—কম্পিতকণ্ঠে সন্ন্যাসী ডাকিল, "মন্দা---ও মন্দা—"

শুনিয়া মন্দার ঠাকুমা মুখ বাড়াইলেন, "ওমা সন্ন্যাসী ঠাকুর যে! বসন্ত হয়েছে দেখছি—এমন অবস্থায় এখেনে এলেন কেন, —ছেলেপুলের বাড়ী—"

সন্ন্যাসী মৃদুস্বরে কহিল, "একবার মন্দাকে দেখতে এসেছি—"

ঠাকুমা সুর উচ্চ করিয়া বলিলেন, "না, না, সে কাহিল, এখন সে উঠতে পারবেনা,—তাকে এখন দেখা হতে পারে না—" •

গোলমাল শুনিয়া বিপিনবাবু বাহিরে আসিলেন, "কি হয়েছে ?"

তাঁহার মাতা চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "একবার মন্দাকে ত ঐ অসুখে ফেলেছিলেন, আবার এই অবস্থায় তাকে দেখতে চান,—কেন, বাপু, তার ওপর এত নজর—"

বিপিন বাবুর দিকে চাহিয়া সন্ন্যাসী কহিল, "মরবার আগে একটিবার শুধু চোখের দেখা দেখব—দয়া করুন—"

ধীরে ধীরে সন্ন্যাসী রোয়াকে শুইয়া পড়িতেছিল।

বিপিনবাবু ক্রোধের ভরে বলিলেন, "না—না, তা হবে না। মন্দা, মন্দা, সমস্ত দিন শুধু মন্দা, মন্দার সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ—?"

সন্ন্যাসী ঊর্দ্ধে চাহিল, "তিনি জানেন !"

আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বিপিনবাবু কহিলেন, "যাও, যাও, ও সব হবে না বল্‌ছি, আমার বাড়ী থেকে বেরোও—"

চোখের জল বাধা মানিল না। "একবার, একটিবার, শুধু—তারপর চলে যাবো—"

ক্রোধের তখন পরিসীমা ছিল না, বিপিনবাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "তবু যাবে না—দারোয়ান, এই পাগলটাকে গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দে !"

শুনিয়া সন্ন্যাসী দুই হাতের উপর ভর করিয়া উঠিবার চেষ্টা করিল,—অবলম্বনহীন মস্তক দুই হাতের মাঝখানে ঝুলিয়া পড়িল,—তবু সে চেষ্টা করিতে লাগিল,—এবং অদূরে দরোয়ান আসিয়া দাঁড়াইল।

এমন সময় মন্দার হাত ধরিয়া মন্দার মা সেই কোলাহলের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। সন্ন্যাসীর শির আপনার কোলের উপর রক্ষা করিয়া তাহাকে শয়ন করাইল, তাহার মুখের নিকট মুখ লইয়া গিয়া নিশ্বাস-সৌরভে আপনাকে ব্যাপ্ত করিয়া লইল, এবং তাহার ব্রণাঙ্কিত কপোলে বারবার চুম্বন দান করিয়া কহিল, "ঐ এসেছে, তোমার মন্দা এসেছে,—আমি তাকে এনেছি—"

সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে চোখ খুলিয়া কমলার মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তাহার পর মন্দার হাত আপনার বুকের মধ্যে টানিয়া আবার চোখ বুজিল !

বিস্মিত দর্শকের দল নিস্পন্দ নির্ব্বাকভাবে চাহিয়া রহিল !

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

জাপানের সহর।

যখন আমরা জাপান যাই তখন মনে করিয়াছিলাম যে তথায় কলিকাতার চেয়েও কত বড় বড় হর্ম্ম্যমালানুশোভিত নগর দেখিতে পাইব। হয়ত কত গগনভেদী অক্‌টারলোনী মনুমেণ্ট জাপানের নব উচ্চতালাভের পরিচয় প্রদান করিতে দণ্ডায়মান রহিয়াছে; হয়ত লাটভবন, ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ প্রভৃতির ন্যায় কত বড় বড় মনোহর প্রাসাদশ্রেণী দর্শকের দৃষ্টি স্তম্ভিত করিয়া দিতেছে! যে জাপান বাস্তবিকই রুষিয়ার ন্যায় একটি ইউরোপের অতি প্রধান শক্তিকে জলে স্থলে পরাভূত করিল, অট্টালিকাগৌরবে ইয়োরোপের কোন

সহরের অসমতুল্য হইবে না ইহাই আমরা কল্পনা করিয়াছিলাম। যখন আমাদের জাহাজ ইয়োকোহামা বন্দরে পৌঁছিল এবং সিঙাপুর ছাড়িয়া আমরা ঠিক দুই সপ্তাহ পরে লোকালয়ের দর্শন লাভ করিলাম তখনও জাপানের সহর সম্বন্ধে একেবারে নৈরাশ্যে নিমজ্জিত হই নাই। প্রকাণ্ড ইয়োকোহামা সহর দেখিয়া মনে করিলাম রাজধানী তোকিও সহর নিশ্চয়ই ইহার চেয়ে অধিক জাঁকাল এবং জাতীয় ঐশ্বর্য্য-জ্ঞাপক! কিন্তু যখন তোকিও সহরে গিয়া পোঁছিলাম,তখন পূর্ব্বকল্পনা লোপ পাইতে লাগিল। কয়েকদিন সহরের আদ্যন্ত খুঁজিয়াও চৌরঙ্গী, গড়ের মাঠ, ডালহৌসী-স্কোয়ার প্রভৃতির সাক্ষাৎ পাইলাম না, আর সে মাড়োয়ারীদের অত্যুচ্চ আকাশস্পর্শী হর্ম্ম্যরাজিও দেখিতে পাইলাম না। পক্ষান্তরে দেখিতে পাইলাম বাড়ী ঘর ছোট হইলেও বেশ পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে, রাস্তা ঘাট তুলিতে অঙ্কিত চিত্রপটের ন্যায়। দিনান্তে সন্ধ্যাবেলায় পার্লিয়ামেণ্টের মেম্বর, লর্ড, রাজমন্ত্রী, ক্রোর-পতি প্রভৃতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সহিত দীন-দরিদ্র মুটে মজুরও সমভাবে ইডেন গার্ডেনে আনন্দ উপভোগ করিতেছে। সেখানে ইডেন্-গার্ডেন্ নামে কোন গার্ডেন না থাকিলেও সেইরূপ গার্ডেন এবং পার্ক অনেক আছে। সকলেই এক আসনে উপবেশন করিয়া আলাপ করিতেছে; এবং একই মঞ্চে দাঁড়াইয়া দেশের কথা, দশের কথা এবং প্রকৃতির কথা আলোচনা করিতেছে। আর এক বৈশিষ্ট্য, সহরের ভিতর ছোট বড় অধিকাংশ বাড়ীতে এবং দোকানে ছোটখাট ধরণের কোন জিনিষ প্রস্তুতের কারখানা; আর দেখিলাম সহরতলীর চারিধারেই সারি সারি বড় বড় ফ্যাক্টরীর অসংখ্য চিম্‌নির ধূম মেঘের ন্যায় সূর্য্যরশ্মি-বিকাশ প্রতিবন্ধক জন্মাইতেছে। রাস্তাঘাটে লোকজন কলের মত দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি করিয়া কাজ করিতেছে। নিভৃত পল্লীগ্রামের লোক কলিকাতায় গিয়া রাস্তায় লোকজনের দ্রুততা দেখিয়া যেমন অবাক হয় তেমনি কলিকাতার লোক জাপানের এই অতিস্ফূর্ত্তিময় ভাব দেখিয়া অবাক না হইয়া থাকিতে পারে না।

কলিকাতার রাস্তায় দলে দলে লোক ছোটে সত্য, কিন্তু অধিকাংশ লোকের বদনমণ্ডলে যেন বিষাদের ছায়া প্রকটিত। যাঁহারা ভদ্রসন্তান এবং যাহাদের উদরান্নের কথঞ্চিৎ সংস্থান আছে তাঁহারাও উপর-ওয়ালার তাড়না ও গঞ্জনার ভয়ে বিষণ্ন স্ফূর্ত্তি-হীন মনে আফিসপানে ছুটিতেছে। স্কুল কলেজের ছেলেরাও যেন গারদে বা মসানে যাইবার পথে থরথর করিয়া চলিতেছে। এই স্থলে কবিবর নবীনচন্দ্রের একটি কথা মনে পড়িল। তিনি এক জায়গায় লিখিয়াছেন "আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় করালবদনী নৃমুণ্ড-মালিনী কালিকাদেবীর ন্যায় পরীক্ষারূপ তরবারি দ্বারা সহস্র সহস্র সবলপ্রকৃতি তরুণ যুবকদের মস্তক ছেদন করিতেছে।" তারপর অপর সাধারণ উদরান্নচিন্তাভারগ্রস্ত হইয়া যেন চক্ষে সরিষাফুল নিরীক্ষণ করিতে করিতে চলিয়াছে। ভাবনায় সকলেরই স্বাস্থ্য বসিয়া গিয়াছে, হৃদয় দমিয়া পড়িয়াছে। আর জাপানের রাস্তায় সকলকেই যেন রাম-মূর্ত্তিবৎ দেখিতে পাইলাম। যেমন হৃষ্টপুষ্ট শরীর, তেমনি বদনমণ্ডলে স্ফূর্ত্তি সঞ্জ্ঞাপক

ভাব। অন্ন চিন্তা কাহার নাই ? কিন্তু তাহাই তাহাদের প্রধান চিন্তা নহে, জীবনের কর্ত্তব্য সাধনে সকলেই ব্যস্ত। পশুর ন্যায় শুধু উদরান্নের সংস্থানে মনুষ্য সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না, অন্যান্য জন্তুর চেয়ে তাহাদের জীবনের অপর কর্ত্তব্য আছে। তাই তাহারা স্ত্রী পুরুষ সকলেই রাস্তায় ঘাটে কলের ন্যায় দ্রুতভাবে কর্ত্তব সাধনে ব্যস্ত।

জাপানী সহরের ঘরদরজার দিকে তাকাইয়া দেখিলাম উহা কত সামান্য ধরণের। কাষ্ঠ নির্ম্মিত একতালা কি দোতালা—বড় জোর কচিৎ দুই একটা তিনতালা দালান দেখিলাম। ইয়োকোহামা এবং কোবে সহর দুটী সমুদ্র-তীরস্থ বড় বন্দর। এই দুই সহরেই বৈদেশিক বণিকদের অত্যন্ত বড় বড় আমদানী রপ্তানীর কারবার রহিয়াছে। তাই এ সহর দুটী অনেকটা ইউরোপীয় সহর অর্থাৎ কতকটা কলিকাতার ধরণের। তোকিও সম্পূর্ণ জাপানী সহর। ইয়োকোহামা এবং কোবে বাদে অন্যান্য সকল সহরই জাপানী সহর। জাপানী সহরে নীরস কৃত্রিম সৌন্দর্য্যের পরিবর্ত্তে মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যেরই প্রাবল্য অধিক। সহরের ভিতর কত পার্ক, গাছপালা এবং বাগান। অনেক সহরের ভিতর ছোট ছোট পাহাড় এবং হ্রদ ও সরিৎ অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যে ভরিয়া রহিয়াছে। আবার জাপানের অধিকাংশ প্রধান প্রধান সহরের পাদদেশই প্রশান্ত মহাসাগরে বিধৌত হইতেছে, বাস্তবিক জাপান যেন প্রকৃতি দেবীকে আয়ত্তাধীন রাখিবার জন্য নানা প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে; প্রকৃতি দেবীও প্রিয় সন্তানগণের মনস্তুষ্টির জন্য প্রতিনিয়ত তাহাদের সম্মুখে নানারূপ বেশভূষায় অলঙ্কৃতা হইয়া বিরাজিতা। জাপানীরা গাছপালা, লতাপাতা, ফুল প্রভৃতির যেরূপ সমাদর করিয়া থাকে পৃথিবীর অন্য কোন জাতি তেমন করে কিনা জানি না। তাহারা সহরের নীরস ক্ষেত্রকেও কুঞ্জবনে পরিণত করিয়া তাহাতে বাস করে, প্রায় সকলের বাড়ীর সম্মুখেই অন্ততঃ ছোট একটী বাগান আছে। যাহাদের বাড়ীর সম্মুখে বাগানের স্থান নাই তাহারা কতকগুলি টবের সাহায্যে বারেন্দায় অতি ক্ষুদ্র একটী বাগান রচনা করিয়া রাখে।

জাপানে যে সহরের লোক-সংখ্যা বিশ হাজারের উপর তাহাকে সি অর্থাৎ নগর এবং তন্নিম্নে মাচি অর্থাৎ সহর বলা হয়। ক্ষুদ্র দেশের তুলনায় জাপানে নগরের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি। উত্তর দক্ষিণে প্রায় বারশত মাইলের মধ্যে অধিকাংশ প্রধান সহরই আমি দেখিয়াছি। তন্মধ্যে তোকিও, ওসাকা, কিওতো, কোবে, নাগোইয়া, ইয়োকোহামা, ছেনদাই, মোরিওকা, আওমোরি হাকোদাতে, ওতারু, ছাপ্পোরো, ইয়োকোসুকা এবং মোজি বিখ্যাত। নাগাসাকি, হিরোসিমা এবং ওকাইয়ামা সহরত্রয়ও বেশ কারবারী। স্থূল কথা একটী সহর দেখিলেই সকল জাপানী সহরেরই ধারণা করা যায়। জাপানে ৪৬টী জেলা সহর, উহার প্রত্যেকটীর লোক সংখ্যাই প্রায় পঞ্চাশ হাজারের উপর। সংক্ষেপে রাজধানী তোকিও সহরের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রশান্ত মহাসাগরস্থ তোকিও উপসাগরের উপর সহরটি অবস্থিত। আয়তনে ৬৪ বর্গ মাইল। জাপান টাইম্‌স্ রিপোর্টে দেখিয়াছি আয়তনে তোকিও সহর পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বা-

পেক্ষা বড়; আর তোকিও সহরে দৈনিক তাড়িতের খরচ লণ্ডন অপেক্ষাও অধিক। ঘুরিয়া ফিরিয়া সহরের কূলকিনারা ঠিক পাওয়াও মুস্কিল। কাষ্ঠনির্ম্মিত একতালা বাড়ীর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক; সহরের ভিতর কয়েকটি বড় বড় পার্ক আছে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি পাহাড় আছে। এই সকল কারণে সহরটি অনেক জায়গা জুড়িয়া আছে। সহরের ভিতর দিয়া হুগলী নদীর চেয়ে কিঞ্চিৎ অল্প পরিসর বিশিষ্ট ছুমিদানদী প্রবাহিতা। নদীর দুই তীরেই সহর। চারিটি সেতুর উপর দিয় লোকজন গাড়ী ঘোড়া এবং ট্রাম নদীর অপর তীরে যাতায়াত করিতেছে। ছুমিদানদীর ছোট ছোট শাখা সহরের ভিতরে চলিয়া যাওয়ায় ব্যবসা বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। একখানি গ্রন্থে দেখিয়াছি এই সকল খালের উপর দিয়া চলাচলের সুবিধার জন্য তোকিও সহরে ছোট বড় অন্যূন তিন সহস্র সেতু (bridges and culverts) রহিয়াছে। প্রতিদিনই সহরের চতুষ্পার্শ্বের আয়তন বৃদ্ধি পাইতেছে। গত আদম সুমারীর পর লোকসংখ্যা বিস্তর বাড়িয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বলেন এখন লোকসংখ্যা একুশ লক্ষের উপর, আমার মনে হয় বিশ লক্ষের কম নহে।

হিবিয়া, শিবা, উয়েনো, আছাকুছা এবং কুদান এই পাঁচটি পার্ক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সম্রাটের বাড়ী এবং হিবিয়া পার্কের মধ্যে কেবল পরিখা মাত্র ব্যবধান। এই পার্ক সহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহার পাশেই মিকাদোর বাড়ী, পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার হাউস্ অব লর্ডস্ এবং হাউস্ অব্ কমন্স্, এবং তোকিও সহরের গবর্ণরের অফিস। নিকটেই সমরবিভাগের অফিষ, চেম্বার অব কমার্স, শিক্ষাবিভাগের অফিষ, বড় বড় সংবাদপত্র অফিষ, পিয়ার্স ক্লাব; ইম্পিরিয়াল হোটেল, নিপ্পন ইউসেন কাইসা অপিস, সেণ্ট্রাল ও শিম্বাসী রেলওয়ে ষ্টেশন এবং বিখ্যাত গিঞ্জা ষ্ট্রীট। পার্কের ভিতরে স্থানে স্থানে বিশ্রামাগার এবং ভোজনালয় রহিয়াছে। রাস্তাগুলি ধব্‌ধবে; কোন যায়গায় ফুলের বাগান আবার কোথাও বা সুন্দর সুন্দর বৃক্ষশ্রেণী ও কুঞ্জবন। কোথাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ে নানা রঙের মৎস্য ক্রীড়া করিতেছে। ফোয়ারায় জল উঠিতেছে, কোথাও তালে তালে ব্যাণ্ড বাজিতেছে। স্থানে স্থানে যুবকের দল জিমখানাতে ব্যায়াম করিতেছে। কোথাও ব্যাটবল খেলিতেছে। ব্যাটবল জাপানের প্রধান খেলা। ইহারা আমেরিকা হইতে এই খেলার প্রবর্ত্তন করিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাজ্যে ইহা প্রধান খেলা বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। আবার স্থানে স্থানে ছোট কৃত্রিম পাহাড়ের উপর বসিবার আসন রহিয়াছে, রাত্রিবেলায় তাড়িতালোকে উদ্ভাসিত পার্কটী নন্দনকানন বলিয়া মনে হয়। পরিষ্কার দিনে সন্ধ্যাবেলায় বিশেষতঃ বসন্তের সন্ধ্যায় বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে। রুষ জাপান যুদ্ধের সময় যখন প্রায় প্রতিদিনই নূতন নূতন জয়ের সংবাদ আসিতেছিল, পার্কে দিন রাত সমভাবে আনন্দের ছড়াছড়ি চলিত। আমরাও কোন কোন দিন সে আনন্দে যোগ দিতাম। পার্কের চারিধারেই প্রাতে ৫টা হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত ট্রাম চলিয়া থাকে।

হিরিয়া পার্ক হইতে অর্দ্ধমাইল দূরে শিবা পার্ক, দুই মাইল দূরে উয়েনো পার্ক। শিবা পার্কে কতকগুলি অত্যুচ্চ প্রাচীন বৃক্ষ আছে। ক্ষুদ্র পাহাড়ের একটী স্থান বেশ উঁচু। তাহার উপর একটি ধ্যানস্থ দেবমূর্ত্তি রাখিয়াছে। ঐ উচ্চ স্থানে উঠিলে অদূরে সমুদ্রের দৃশ্য এবং চতুর্দ্দিকস্থ সহরের দৃশ্য অতি সুন্দর দেখায়। শিবাপার্কের দেব মন্দির এবং নিকটবর্ত্তী স্থায়ী প্রদর্শনী (কাঙ্কোবা) বিশেষ বিখ্যাত। শিবার দেব মন্দিরেই সব চেয়ে মূল্যবান প্রস্তর এবং ধাতব পদার্থ রহিয়াছে। সময় সময় সম্রাট এবং সম্রাট পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তি তথায় গিয়া থাকেন।

উয়েনো পার্ক একটি দেখিবার জিনিস। উয়েনোপার্কের পাদদেশে হ্রদ। হ্রদ মধ্যস্থ দ্বীপের উপর বিখ্যাত বেন্তেন দেবীর মন্দির,

উয়েনো পার্কের নিকটবর্ত্তী হ্রদ।

বিশ্রামাগার, এবং দ্বীপে যাইবার রাস্তা। পার্কটী অত্যুচ্চ পাহাড়ের উপর অবস্থিত। উহার একধারে একটী হ্রদ এবং দুই ধারে রেলের রাস্তা আর অপর পার্শ্বে পল্লী। হ্রদের চতুর্দ্দিকে বেড়াইবার প্রশস্ত রাস্তা আছে। জুন মাসে হ্রদের ভিতর পদ্মফুল ফুটিলে সৌন্দর্য্যের তুলনা থাকে না। প্রাতে ও সন্ধ্যায় লোকের ভিড় হইয়া থাকে। এই হ্রদের তীরে জয়মাল্যে ভূষিত প্রত্যাগত মার্শ্যাল ওইয়ামাকে অভ্যর্থনা করা হয়। সে দিন অবিরল বৃষ্টিপাতেও যেরূপ লোক সমাগম দেখিয়াছি জীবনে কোন সমারোহ-ব্যাপারে

তেমনটি দ্বিতীয়বার দেখিব বলিয়া কল্পনাও করিতে পারি না। এই হ্রদের তীরেই যুদ্ধের পর জাপানের বিখ্যাত প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। যুদ্ধের পর ঐ রাস্তা হ্রদের অপর তীর পর্য্যন্ত প্রস্তর সেতুর সাহায্যে যোগ করা হইয়াছে। উয়েনো পার্কের গাছপালাগুলি বেশ বড় বড়, এখানে সাকুরা বা চেরি পুষ্পের সময় বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে। চেরি পুষ্প সম্বন্ধে অন্য কোনো সময় লিখিবার আশা রহিল। পার্কের ভিতরে যাদুঘর; চিড়িয়াখানা, ২৫ ফিট উচ্চ বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি, অনেকগুলি ধর্ম্ম মন্দির, মৃত ব্যক্তির স্মৃতিরক্ষার আঙ্গিনা, আর্টস্কুল এবং ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী রহিয়াছে। প্যানোরামা মন্দির সর্ব্বসমক্ষে রুষ জাপান যুদ্ধের জীবন্ত দৃশ্য ধরিয়া আছে। পার্কের নীচেই প্রসিদ্ধ উয়েনো রেল ষ্টেশন। নিকটেই উয়েনো কাঙ্কোবা বা স্থায়ী প্রদর্শনী।

আছাকুছা পার্ক আমোদ-প্রমোদের প্রধান স্থল। তথায় পদস্থ ব্যক্তির ততদূর সমাগম দেখা যায় না। দিন রাত থিয়েটার সার্কাস্‌, বায়োস্কোপ, পুতুল নাচ, পাখীর

আছাকুছা পার্ক।

গান, কুস্তি, জীবন্ত চিত্র টেব্লো, গেইসা নাচ, নানারূপ জুয়াখেলা, প্যানোরামা দৃশ্য প্রভৃতি দেখিবার জন্য সকালে বিকালে কোন সময়েই জনস্রোতের বিরাম নাই। পর্ব্বদিনে লোকে লোকারণ্য হইয়া যায়। কারণ, ঐ দিন কল কারখানা অফিস প্রভৃতি বন্ধ থাকায় সকলেরই ছুটি। একটি পুকুরের চতুষ্পার্শ্বে ঐ সকল আমোদ উৎসব হইয়া থাকে। ফোয়ারার পিছনে ক্ষুদ্র মন্দির, অদূরে প্রকাণ্ড এবং বুদ্ধদেবের

এক বিখ্যাত মন্দির। অনেক সময় স্ত্রীলোকে পূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। বৃদ্ধার সংখ্যাই অধিক। সকলেই ভক্তি গদগদ চিত্তে হাত জোড় করিয়া নিবিষ্ট মনে পুরোহিত মহাশয়ের উচ্চারিত মন্ত্র শ্রবণ করিতেছেন। বলা বাহুল্য ঐ মন্ত্র স্ত্রীলোকদের কেন আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিদের পক্ষেও বুঝিয়া উঠা মুস্কিল; যেহেতু উহা পালি এবং দুর্ব্বোধ্য প্রাচীন জাপানী, কোরিয়ান এবং চীনা ভাষার সংমিশ্রণ। অনেক দিন কলেজের জাপানী বন্ধুদের সহিত আমি মন্দিরে গিয়া দেখিয়াছি ইঁহারাও সে মন্ত্র বোঝেন না। বৃদ্ধারা বুদ্ধদেবের সম্মুখস্থ অগ্নিপাত্রে ধূপ ধূনা নিক্ষেপ করিতেছেন, কেহ বা মোমের বাতি জ্বালাইতেছেন। কেহ কেহ পাইন-বৃক্ষের পল্লব, পুষ্প বিশেষতঃ পদ্মফুল ফলমূল, এবং নানারূপ মিষ্ট দ্রব্যে অর্ঘ্য প্রদান করিতেছেন। এবং মাঝে মাঝে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া অস্পষ্টস্বরে কি বলিতেছেন। অনেকেই জানেন যে জাপানীদের নাক চেপটা। ধর্ম্মমন্দিরের স্থানে স্থানে বুদ্ধদেবের যে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত অনেককে তাহার নাকের সহিত নিজ নিজ নাক স্পর্শ করাইতে দেখিয়াছি। তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করায় বৃদ্ধাদের নিকট শুনিয়াছি সমুন্নত নাকের প্রত্যাশায় প্রাচীন কাল হইতেই জাপানীরা এইরূপ করিয়া আসিতেছে। ফলতঃ এই দাঁড়াইয়াছে যে ঘষিতে ঘষিতে বুদ্ধদেবের নাক একেবারে লোপ পাইয়াছে। এই মন্দিরের অনতিদূরেই জুনিকাই অর্থাৎ বারতালা উচ্চ স্তম্ভের ন্যায় সঙ্কীর্ণ দালান বিশেষ। উহার উপর উঠিলে দূরবীক্ষণের সাহায্যে তোকিও সহরের দৃশ্য অতি বিশাল দেখায়।

হিবিয়া পার্কের বিপরীত দিকে সম্রাটের বাড়ীর অপর পার্শ্বে কুদান পার্ক অবস্থিত। কুদান পার্কের ভিতর একটী মিউজিয়ম আছে। এখানে গত রুষ জাপান এবং চীন জাপান-যুদ্ধে লব্ধ বন্দুক, কামান, তরবারি এমন কি সেনাপতির খাট ও বিছানাপত্র সর্ব্বসাধারণকে দেখাইবার জন্য সুন্দরভাবে সজ্জিত রহিয়াছে। পার্কের ভিতর প্রসিদ্ধ শিন্তো মন্দির। প্রতি বৎসর এপ্রিল মাসে এই মন্দিরে মৃত সৈনিক পুরুষদের বার্ষিক শ্রাদ্ধ-উৎসব হইয়া থাকে। স্বয়ং সম্রাট সেনাপতিগণ সহ উপস্থিত থাকিয়া প্রথম দিন ক্রিয়া আরম্ভ করেন। তিন দিনে এই ব্যাপার শেষ হয়। দিবসত্রয় প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত সেই লোক-সমুদ্রে একবার শরীর ঢালিয়া দিলে যেন পদ-সঞ্চালনের দরকার হয় না; অনায়াসে পার্কের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে চলিয়া যাওয়া যায়। সে তিন দিন তথায় সার্কাস, থিয়েটার প্রভৃতির অবধি নাই। রাত্রে আতস বাজীর মহা ধুম। শোকে অভিভূত হওয়া জাপানে কাপুরুষতার লক্ষণ। মৃতব্যক্তির সদ্গতির জন্য শ্রাদ্ধ দিনে বিশেষতঃ সৈনিকের শ্রাদ্ধে তাহারা আমোদ উৎসব করিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে অন্য কোন সময়ে বিস্তারিত লিখিবার ইচ্ছা রহিল। শিন্তো মন্দিরের পশ্চাৎভাগে অন্যান্য পার্কের ন্যায় এ পার্কেও পুকুর ফোয়ারা, কুঞ্জবন প্রভৃতি যথেষ্টই আছে।

এই কয়েকটী উল্লেখযোগ্য পার্ক ছাড়া আরও ছোট ছোট পার্ক যথেষ্ট আছে।

অনেক ভদ্রলোকের বাগানগুলিও কতকটা পার্কের অনুকরণে রচিত। তোকিও সহরের উশিগোম অঞ্চলে বোটানিকাল গার্ডেন আছে। জাপানের সহর গ্রাম সকলই গাছ-পালায় সজ্জিত বলিয়া সর্ব্বত্রই যেন বোটানিকাল গার্ডেন। উশিগোমের বোটানিকাল গার্ডেন, আমাদের শিবপুরের বোটানিকাল গার্ডেনের চেয়ে অনেক ছোট। আশ্চর্য্যের বিষয় জাপানের ছাত্রগণ এমন কি মেয়েরা এবং সাধারণ লোক পর্য্যন্ত অনেকে সাধারণ গাছ পালার বোটা-নিকাল শ্রেণী বিভাগ বেশ বুঝিতে পারে।

উয়েনো পার্কের ভিতর যে যাদুঘরের কথায় উল্লেখ করিয়াছি উহাই জাপানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাদুঘর। উহা আমাদের কলিকাতার যাদুঘর অপেক্ষা অনেক ছোট। কলিকাতার যাদুঘর পৃথিবীর মধ্যে একটী উল্লেখ যোগ্য যাদুঘর। আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ব্রায়ান সাহেব উহাকে পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান প্রদান করিয়াছেন। জাপানের প্রত্যেক জেলা সহরেই একটী করিয়া যাদুঘর আছে। এক তোকিও সহরেই বলিতে গেলে অনেকগুলি যাদুঘর। উয়েনোর ইম্পিরিয়াল মিউজিয়াম ছাড়া গবর্ণ-মেণ্টের কৃষি এবং বাণিজ্য বিষয়ক একটী মিউজিয়ম (নোশোমুখো) রহিয়াছে। তা ছাড়া সুন্দর সুন্দর প্রকাণ্ড বাড়ীতে সহরের স্থানে স্থানে কাম্বোবা নামক প্রদর্শনীর ন্যায় স্থায়ী বাজার প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত অসংখ্য দর্শক এবং ক্রেতাদের চিত্তাকর্ষণ করিতেছে।

প্রাচীনকাল হইতেই জাপানীরা সামরিক জাতি। আর পূর্ব্বপুরুষদের প্রতি উহাদের অসাধারণ উচ্চবিশ্বাস এবং অচলা ভক্তি। তাই যাদুঘরের দুই তিনটা ঘর কেবল প্রাচীন তরবারিতেই পূর্ণ। প্রাচীন ধনুর্ব্বাণ প্রাচীন পোষাক, প্রাচীন দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রভৃতিতে যাদুঘর সজ্জিত। আধুনিক কলা ও শিল্পবিদ্যা সম্ভূত জিনিসপত্র তথায় অতি অল্প। সে সমস্ত রাস্তাঘাটে ও হাটে-বাজারে সর্ব্বত্রই দ্রষ্টব্য। একস্থলে দুই ব্যক্তির জীর্ণ বস্ত্র এবং টুপি আর তাঁহাদের তৈল চিত্র অতি সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। উহারা উভয়ে ইউরোপে গিয়া সর্ব্বপ্রথম খনিজবিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং খনিতে কায করিতে করিতে পাথরের চাপে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। তাই জাতীয় সম্মান প্রদর্শনের জন্য উহাঁদের স্মৃতি সাধারণের সমক্ষে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে।

আমাদের কোন ভারতীয় বন্ধু বলিয়াছেন, ভারতের তুলনায় জাপান অতি ক্ষুদ্র দেশ অথচ পৃথিবীতে এমন কিছু নাই যাহা জাপানে নাই! তাই সমগ্র জাপান দেশকে একটী বড় আকারের যাদুঘর মনে করিলেও চলে। সহর কিম্বা গ্রামে পুকুরের সংখ্যা অতি অল্প; নাই বলিলেও চলে। কোন কোন বন্ধু বলেন একে ক্ষুদ্র দেশের ৮৪ ভাগ পাহাড়ে আবৃত তাহার উপর যদি পুকুর খনন করা যায় তবে কৃষি করিবে কোথায়!

মিউজিয়মের অনতিদূরে পার্কের ভিতরই চিড়িয়াখানা। চিড়িয়াখানায় জীবজন্তু অধিকাংশই বিদেশ হইতে আনীত—যেহেতু জাপানে জীবজন্তুর বৈচিত্র্য এবং সংখ্যা অতি অল্প। সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, বানর, ভল্লুক প্রভৃতি গ্রীষ্ম প্রধান দেশ হইতেই আমদানী করা হয়। শকট পরিচালন এবং কৃষি-

কার্য্যের জন্য গরু এবং ঘোড়া ইউরোপ ও অষ্ট্রেলিয়া হইতে আনীত হইয়া থাকে। সমগ্র জাপানে তিনটী বই হাতী নাই। আমাদের আলিপুরের চিড়িয়াখানা দেখিলে আর জাপানের চিড়িয়াখানায় দেখিবার উপযোগী কিছুই থাকে না। সময় সময় দুই একটী বিশেষ শ্রেণীর জাপানী মোরগ দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের পুচ্ছ ১২।১৪ হাত লম্বা। ঐরূপ এক একটী মোরগের দাম নাকি চারি পাঁচ শত টাকা।

তোকিও সহরে বৌদ্ধ ও শিন্তো মন্দিরের সংখ্যা নির্ণয় করা দুরূহ। সাধারণ পার্কে, রাস্তার ধারে নদীর ঘাটে, পাহাড়ের উপর কত যে মন্দির তাহার ইয়ত্তা নাই। রাজপুতানায় বিকানীর রাজ্যে যেখানে সেখানে মন্দির; কিন্তু জাপানে মন্দিরের সংখ্যা তার চেয়েও ঢের বেশী। বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীদের বাড়ীতে অনেকের ঘরের মধ্যেও অতি ক্ষুদ্র আয়তনের একটী করিয়া মন্দির আছে। উহা কাষ্ঠে নির্ম্মিত, অনেকটা আমাদের পাখীর খাঁচা বা পিঁজরার মত। প্রতিদিন তথায় ভাতের ভোগ দেওয়া হয় এবং সন্ধ্যায় মোমের বাতি জ্বালান হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীযদুনাথ সরকার।

চয়ন।

যবদ্বীপে।

বুধবার—১২ ডিসেম্বর

আজ প্রাতে, ছয় ঘটিকার সময়, হোটেলের সম্মুখস্থ উদ্যান হইতে একটি চমৎকার দৃশ্য আমার দৃষ্টিগোচর হইল; সম্মুখের সমভূমি হইতে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় উঠিয়াছে, উহার উপর তেঙ্গেরেসের কতকগুলি গ্রাম; তাহার পশ্চাতে জলপ্লাবিত ধানের ক্ষেত ঝিক্‌মিক্ করিতেছে; দক্ষিণে নীল সমুদ্র—পাতলা কুয়াসায় আচ্ছন্ন; বামে, ঈষৎ-ধূসরবর্ণের কুজ্ঝটিকা-জাল প্রসারিত; তাহার পশ্চাতে, বিরাট-দর্শন কৃষ্ণবর্ণ কতকগুলা আগ্নেয়গিরি। বর্ষাকালে, প্রভাতেই কচিৎ-কখন এইরূপ প্রসারিত ভূখণ্ডের দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

হোটেলের ঘোড়াগুলা সবই ভাড়া হইয়া গিয়াছে; তাই আজ ত্রোমায় যাওয়া হইল না; কাল যাইব। আজিকার একটা দিন হাতে পাইয়াছি। এই অবসরে তোসারীর আশপাশগুলা পদব্রজে ভ্রমণ করিব। Ngadivono নামক একটি গ্রাম দেখিবার জন্য একজন পাণ্ডা সঙ্গে লইলাম; কিন্তু এই পাণ্ডার পথ দেখাইবার ধরণটা অতি অদ্ভুত; রাস্তার প্রত্যেক চৌমাথায় থামিয়া আমাকে একটা পথ নির্ব্বাচণ করিতে বলে এবং মালাই ভাষায় একটা লম্বা বক্তৃতা ঝাড়ে...হোটেলে ফিরিয়া গিয়া, তাহাকে সেইখানে ছাড়িয়া দিলাম; আমি একলাই হাঁটিয়া চলিলাম।

পর্ব্বতের খুঁড়ি পথগুলি ধরিয়া, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে বড়ই ভাল লাগে। এই সকল গ্রাম ছোট ছোট পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত। তাহার

চারিদিকে বেড়ায় ঘের; কোন কোন গৃহে যেরূপ এক একটা তোরণ আছে, এই ঘেরের মধ্যেও সেইরূপ একটা তোরণ আছে; এই তোরণদ্বার আড়াআড়ি বাঁশ দিয়া নির্ম্মিত। এখানকার লোকেরা সমভূমির লোক হইতে খুবই তফাৎ; ইহারা রূঢ় প্রকৃতি বলিষ্ঠ পর্ব্বতবাসী; উহাদের চালচলনে বেশ একটা তেজ ও বীর্য্যের ভাব লক্ষিত হয়। ইহারা এই গ্রামের চত্বরে ক্রীড়ামোদ করে। আমি একজন অপূর্ব্ব-ধরণের য়ুরোপীয়, পাণ্ডা না লইয়া যেখানে-সেখানে ইচ্ছামত বেড়াইতেছি—আমাকে দেখিয়া উহারা কিছুমাত্র ভয় করিতেছে না। পাহাড়ের ধার দিয়া ছোট ছোট রাস্তা গিয়াছে—সেই সব রাস্তা ধরিয়া আমি গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ভ্রমণ করিতেছি। ক্ষেতে য়ুরোপ-সুলভ শাকসব্জি জন্মিয়াছে; তাহার পর, কতকগুলা ভেরাণ্ডা, কতকগুলা পর্ণতুরু, কতকগুলা কলা-গাছ। আমাকে দেখিয়া ভয়ে গণ্ডা-পাঁচ কেনারী-পাখী তাহাদের ক্ষুদ্র পীত পক্ষ বিস্তার করিয়া ঝাঁ করিয়া উড়িয়া গেল। একটা সুঁড়ি পথের বাঁকে আসিয়া, একটী স্রোতস্বিনী পাইলাম। একটি দেশীয় তরুণী তাহার জলে স্নান করিতেছে; আমাকে দেখিয়া একটা চীৎকার শব্দ করিয়া, তাড়াতাড়ি কাপড় পরিয়া, ছুটিয়া পলাইল; আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না।

আমি তোসারীতে ফিরিয়া আসিলাম। শাকসব্‌জি বহন করিয়া দুইজন কৃষক-রমণীও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। একটা প্রকাণ্ড কালো প্রজাপতি উড়িতেছিল,—উহারা আমাকে দেখাইল এবং মালাই ভাষায় কি বলিতে লাগিল—আমি ফরাসী ভাষায় বলিলাম এইরূপ পরস্পরের সহিত দুই চারিটা কথার বিনিময় হইল, কিন্তু আমরা কেহই কাহার কথা বুঝিলাম না। পরে, হঠাৎ এই হাস্যজনক অবস্থাটা আমাদের হৃদয়ঙ্গম হওয়ায় আমাদের ভারী মজা লাগিল,—আমরা সকলেই এক সঙ্গে হাসিতে লাগিলাম।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বন্দী।

২৪

বেলা দশটা বাজিয়াছে!

আমার মেরির কথা মনে পড়িতেছিল: হা হতভাগিনী কন্যা আমার, আর ছয় ঘণ্টা পরে কোথায় এ পৃথিবী, কোথায় আমি! হাঁসপাতালের টেবিলে একটা কদর্য্য মাংসপিণ্ডের মত আমি পড়িয়া রহিব। দেহ-ব্যবচ্ছেদ করিয়া তবে তাহারা আমাকে মুক্তি দিবে! তারপর সেই টুকরা-টুকরা মাংস ও অস্থিগুলা ধরণীর কোলে বিছাইয়া দিবে—তবে আমার ছুটি মিলিবে! হায় মেরি, তোমার পিতার জীবনের এ কি পরিণাম!

অথচ এখানে কেহ আমাকে ঘৃণার চক্ষে দেখে না! করুণায় সকলের প্রাণ ভরিয়া গিয়াছে! যত্ন বা সেবার এতটুকু

ত্রুটি নাই! তবু আমাকে বাঁচিতে দিবে না! করুণা—কিন্তু এ কি নির্ম্মম তার বিধি! আমাকে হত্যা করিবে—কিছুতে ছাড়িবে না!

বেচারী মেরি আমার! পিতার সে কি ভালবাসা তোমাকে ঘেরিয়া রাখিয়াছিল, তার সে কি মধুর চুম্বনে তুমি তৃপ্তি পাইতে, তোমার ঐ কুঞ্চিত কেশের গুচ্ছে মৃদু দোল দিয়া পিতা সে কি আদর করিত—ফুলের মত তোমার কচি নরম মুখখানি হাসিতে নিত্য ভরিয়া রহিত—আনন্দের কলহাস্যে সারা গৃহে সে কি বিচিত্র সঙ্গীতের ঝঙ্কার উঠিত, তার পর নিদ্রার পূর্ব্বে ছোট হাতদুটিতে মুঠি ভরিয়া পিতার সহিত বিধাতার বন্দনা-গীতে যোগ দিয়া দিনের সকল শ্রান্তি, সকল তাপ ঘুচাইয়া দিতে—কি সে আবেগপূর্ণ আন্তরিক আরাধনা! এমন সুখের স্বাদ আর কে পাইয়াছে—কিন্তু হায়, আজ সে সব যেন স্বপ্ন! হায় বালিকা, তেমন করিয়া তোমাকে বুকে তুলিয়া কে আর অজস্র চুমায় তোমার ছোট মুখখানি ভরাইয়া দিবে—তেমন ভাল আর কে বাসিবে! সবার গৃহে ছোট ছেলে-মেয়ে গুলি যখন সুখে-দুঃখে উৎসবে-আনন্দে পিতার আদরে নাচিয়া মাতিয়া উঠিবে, তখন তোমরা আঁখির কোণ শুধু জলে ভরিয়া উঠিবে—গভীর বেদনার তাপে তোমার টলটল মুখখানি শুখাইয়া যাইবে ম্লান নেত্রে সবার পানে চাহিয়াই তোমার দিন কাটিবে! বৎসরের প্রথম দিনে না আছে কোন উপহার, না আছে পিতার আদর! নাই, কিছু নাই, হা রে অভাগিনী, স্নেহকাঙ্গালিনী, তোর হৃদয় স্নেহের তৃষায় আকুল তৃষিত হইয়া উঠিবে—কিন্তু তার পরিতৃপ্তির কোন আশা থাকিবে না! পিতৃহারা অনাথিনী মেরি!

জুরির দল একবার যদি আমার মেরিকে দেখিত, তাহা হইলে এ মৃত্যুদণ্ড দিবার পূর্ব্বে আমার কথাটা একটুও বুঝি তারা বিবেচনা করিত! তিন বৎসরের অবোধ সে বালিকা! তবু তার সাশ্রু নেত্র দেখিয়া তাদের কঠোর চিত্ত নিশ্চয় চঞ্চল হইত! সন্দেহ নাই, কোন সন্দেহ নাই! আমার মেরি,—তার দুঃখ দেখিলে কার না প্রাণ কাটিয়া যায়!

মেরি! যখন তার বয়স বাড়িবে, জ্ঞান হইবে, সকল কথা বুঝিবার তার শক্তি হইবে, তখন কোথায় আমি! সারা প্যারির একটা কলঙ্কিত স্মৃতি মাত্র! আমার নামে তার প্রাণ কি শিহরিয়া উঠিবে না! আমার নামে জীবনের যত দুর্দ্দৈব, যত লজ্জা, নিমেষে তার অন্তরে কি জাগিয়া উঠিবে না! লোকের ঘৃণায় তার সমস্ত জীবন কি এক অসহ্য জ্বালায় ভরিয়া যাইবে! মেরি, আদরিণী মেরি আমার—পিতার নামে একবিন্দু অশ্রুর পরিবর্ত্তে কি তোমার চক্ষু বীভৎস ঘৃণার দাহ বর্ষণ করিবে! না, মেরি, না, একবিন্দু অশ্রু দিও! শুধু একবিন্দু মাত্র! হা ভগবান, আমি এমন কি অপরাধ করিয়াছি, পাপ করিয়াছি যে, সমাজ আজ এমন একটা গুরুতর অপরাধ ও পাপে তার প্রায়শ্চিত্ত করিতে বসিয়াছে!

আজিকার সূর্য্য যখন অস্ত যাইবে—তখন কোথায় আমি! এ পৃথিবীতে সকল অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছি! আজ আমার জীবনের শেষ দিন! ইহা কি সত্য? স্বপ্ন নয়?

বাহিরে অস্পষ্ট একটা কি কোলাহল! আমারি মৃত্যু দেখিবার জন্ত সকলে বুঝি ছুটিয়া চলিয়াছে! কৌতূহলী দর্শক, স্পর্দ্ধিত প্রহরী, সজ্জিত আচার্য্য—আমাকে দেখিবার জন্তই সকলের এত আগ্রহ! মৃত্যু তবে সত্যই আজ আমাকে গ্রহণ করিবে! আমাকে—? যে আমি বসিয়া রহিয়াছি, নিশ্বাস ফেলিতেছি, দেখিতেছি, শুনিতেছি, বায়ু-স্পর্শ অনুভব করিতেছি—সেই আমি এখনই মরিব!

২৫

এ ব্যাপারখানা আমারো কিছু জানা আছে! প্লে দি গ্রীভের পাশ দিয়া যাইতেছিলাম—সে আজ বহুদিনের কথা! বেলা তখন এগারোটা বাজিয়াছিল! সহসা আমার গাড়ী থামিয়া পড়িল।

পথে বিস্তর লোক জমিয়াছিল। গাড়ীর মধ্য হইতে আমি মাথা বাহির করিয়া দেখি, আবালবৃদ্ধবনিতায় সারা পথ ভরিয়া গিয়াছে! নরশিরের সংখ্যা ছিল না! গৃহের প্রাচীর, বৃক্ষচূড়া কোন স্থান বাদ যায় নাই! এবং অদূরে ঊর্দ্ধে স্থাপিত—ফাঁসিকাঠও দেখা যাইতেছিল! ফাঁসির সকল সরঞ্জামই প্রস্তুত ছিল!

আজও সেইদিন! কিন্তু আজ আমি দর্শক নই, আজ আমাকে দেখিবার জন্তই সেখানে তেমনি লোক জমিয়াছে!

একটী রজ্জুকে অবলম্বন করিব—নিমেষে অমনি কি বিরাট অতলস্পর্শ অন্ধকারের মধ্যে নামিয়া পড়িব! জমাট অন্ধকার! তারপর—

আঃ, একখণ্ড প্রস্তর যদি কুড়াইয়া পাই, ত তারি আঘাতে এখনি মস্তকটা চূর্ণ করিয়া ফেলি!

২৬

মার্জ্জনা! ওগো, মার্জ্জনা! আমায় মার্জ্জনা কর! হয়ত আমি মুক্তি পাইব! রাজার প্রাণ করুণায় গলিবে—মার্জ্জনার আজ্ঞা বহিয়া এখনি দূত ছুটিয়া আসিবে! শীঘ্র—শীঘ্র এসো! তখন এই সমস্ত অন্ধকার চকিতে মুছিয়া যাইবে—এবং কি সে তীব্র দীপ্ত মুক্ত আলোর রাজ্যে প্রবেশ করিব! জয়ের সে কি বিকট উল্লাসে সারা চিত্ত ভরিয়া উঠিবে!

আমার প্রাণ ভিক্ষা দাও! ওগো, স্নেহমায়াভরা এমন সুন্দর পৃথিবী,—প্রাণ যে ছাড়িতে চাহে না! আমায় রক্ষা কর! ওগো, তপ্ত লৌহশলাকায় সর্ব্বদেহ আমার বিঁধিয়া দাও—লোকালয়ে প্রবেশ করিতে দিও না—বিশ বৎসর, পঁচিশ বৎসর জেলে রাখিয়া দাও, শুধু এই সূর্য্যের আলো আকাশ বাতাস হইতে বঞ্চিত করিও না—বন্দী যে, সে-ও চলে, দেখে, ভাবে, কথা কয়, সে-ও সুখী! শুধু এই প্রাণটা ভিক্ষা দাও,—আর আমার কোন প্রার্থনা নাই!

২৭

আচার্য্য ফিরিয়া আসিল। তাঁর পলিত কেশ, শান্ত কথাবার্ত্তা, নম্র প্রকৃতি। শ্রদ্ধার যোগ্য পাত্র বটে।

আজই সকালে আপনার সমস্ত জ্ঞান বন্দীর দলে তাঁহাকে বিতরণ করিতে দেখিয়াছি! কিন্তু আমার তাহাতে কি লাভ! তাঁর কথার দিকে আমার মনই ছিল না! বৃষ্টির জল সার্শির গায় লাগিয়া যেমন ঝরিয়া পিছলাইয়া

যায়, আমার মনে লাগিয়া তাঁহার অমূল্য-বাণীও তেমন পিছলাইয়া যাইতেছিল!

তবু তাঁহাকে দেখিয়া প্রাণটা যেন জুড়াইল! চারিধারে এই পরুষ রুক্ষতার মধ্যে তিনি যেন কি এক আনন্দশ্রী বিকশিত করিয়া দিলেন!

আমরা বসিলাম—তিনি চেয়ারে এবং আমি আমার সেই জীর্ণ শয্যার উপর।

"ভাই!" তিনি কহিলেন—কথাটা আমার হৃদয়ে বিঁধিল! তিনি কহিলেন, "ঈশ্বরে তোমার বিশ্বাস আছে কি?"

আমি কহিলাম, "আছে।"

"এই যে উদার ক্যাথলিক ধর্ম্ম—ইহার প্রতি তোমার ভক্তি আছে?"

আমি কহিলাম, "নিশ্চয় আছে।"

"তবে শোন।" আচার্য্য বলিতে লাগিলেন! কি বলিতেছিলেন তাহা আমার মনে নাই, কতক্ষণ বলিতেছিলেন তাহাও জানি না! আমি অন্যদিকে চাহিয়াছিলাম—সহসা তিনি কহিলেন, "কি?" আমার চমক ভাঙ্গিল। আমি দাঁড়াইয়া উঠিলাম। কহিলাম, "অনুগ্রহ করে আমাকে একলা থাকতে দিন। আমার কিছু ভাল লাগছেনা।"

"কখন আসব আমি, বল।"

"খবর দেব'খন।"

তিনি উঠিলেন, মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, "নাস্তিক।"

নাস্তিক! না—যতই কেন হীন হই না আমি, তবু নাস্তিক নই! ভগবান জানেন তাঁর প্রতি কি গভীর আমার বিশ্বাস! কিন্তু এ আচার্য্য আর নূতন এমন কি কথা বলিবে! আমার সংক্ষুব্ধ আত্মা যাহা পাইয়া পূর্ণ তৃপ্তি পাইবে, তাহা দিতে ইহার সামর্থ্যই বা কোথা? কতকগুলা বাঁধা গৎ বকিয়া শুধু অস্থির করিবে মাত্র!

খুনী ও ডাকাতের সম্মুখে মুখস্থ বিদ্যা জাহির করা যাহার পেশা, ক্ষুব্ধ আত্মাকে শান্তি দিবার চেষ্টা করা, তার পক্ষে ধৃষ্টতা! ভগবানের নাম লইয়া কি এ শ্ব-বৃত্তি? বিধাতার নামে এমন পরিহাস! অথচ ইহাই রাজধর্ম্মে অনুমোদিত হইয়া কতকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে! আশ্চর্য্য!

কিন্তু এই বৃদ্ধ আচার্য্য! ইহারই বা দোষ কি? কি তার শিক্ষা, কি তার জ্ঞান? তুচ্ছ কয়টা মুদ্রার জন্য সে এই কাজ করিতেছে! ইহাই তার জীবিকার অবলম্বন,—নহিলে উদরপূর্ত্তি হয় না যে! এমন অশ্রদ্ধা দেখানোটা আমার পক্ষে উচিত হয় নাই! কিন্তু উপায় নাই! আমার নিশ্বাস-বায়ুস্পর্শে চারিধার জ্বলিয়া যাইতেছে, মুখের কথায় বিষ বাহির হইতেছে, আমি ত উপলক্ষ্যমাত্র, ভবিতব্য কঠিন!

প্রহরী আমার জন্য নানাবিধ আহার লইয়া আসিয়াছে! ইহজীবনের মত একবার বাসনা মিটাইয়া খাইয়া লইতে হইবে। যথেষ্ট হইয়াছে! এমন কদর্য্য ঘৃণা, এমন হীনতা আর গলাধঃকরণ করা যায় না!

২৮

একটা লোক,—মাথায় টুপি—হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত! ব্যস্ত ভাব, কোনদিকে তার লক্ষ্য নাই! হাতে গজের ফিতা ও কাগজপত্রের বাণ্ডিল! আসিয়াই সে দেয়াল মাপিতে লাগিল! 'আচ্ছা'—'পাঁচফুট' এখানটা বদলানো

দরকার' প্রভৃতি নানা কথা আপনার মনেই সে বকিয়া যাইতে লাগিল।

প্রহরীর মুখে শুনিলাম, সে একজন কণ্ট্রাক্টর! কারাগৃহের সংস্কার হইবে, তাই সে মাপ করিতে আসিয়াছে!

কাজ শেষ হইলে সে আমাকে কহিল, "আপনার বুঝি আজ ফাঁসি হবে—আহা!"

আমি উত্তর দিলাম না। সে আমার দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

সে কহিল, "ছ'মাস পরে এ জেল আর চেনা যাবে না, এর আগাগোড়া বদল হয়ে যাবে, আর কি জমকালো রকমই না সে দেখতে হবে।"

অর্থাৎ তার কথার মর্ম্ম,—আমি নিতান্তই বেচারা, এমন কাণ্ড দেখা আমার অদৃষ্টে ঘটিবে না—।

তার মুখে কাষ্ঠ হাসি দেখা দিল। প্রহরী তাহাকে কহিল, "এখানে দাঁড়াবার হুকুম নাই! আপনার কাজ হয়ে থাকে যদি ত, বাহিরে গেলে ভালো হয়!"

সে চলিয়া গেল। আর আমি—যে পাষাণ-দেয়াল সে ফিতা লইয়া মাপিতেছিল - সেই পাষাণ দেয়ালেরই মত নিশ্চল মূক হইয়া বসিয়া রহিলাম।

২৯

এমন সময় এক মজার কাণ্ড ঘটিল। প্রহরী বদল হইল। নূতন প্রহরীর অসভ্য-ভাব-ভঙ্গী, বিশ্রী চেহারা, কর্কশ স্বর! যেন যমদূত!

প্রহরী কহিল, "ওহে, তোমার মনে দয়া-মায়া কিছু আছে কি, ভাই?" আমি কহিলাম, "না!"

আমার স্বরে একটা তীক্ষ্ণতা ছিল—কিন্তু সে হঠিবার পাত্র নহে। সে কহিল, "বলি, একটা কথা, শোনই না!"

আমি কহিলাম, "অত রসিকতা আমার সহ্য হবে না।"

সে কহিল, "আমি বড় দুঃখী, ভাই, নেহাৎ হতভাগা। তুমি একটু দয়া করলে যদি ভালো হয় ত, কর না! চিরদিন আমি কৃতজ্ঞ থাকব!"

চিরদিন! আমার সে 'চির' ত সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই ফুরাইয়া যাইবে! আমি কহিলাম, "তুমি কি পাগল? তোমার সুখদুঃখের খোঁজ নিয়ে আমি মিছে মাথা ঘামাই কেন?"

তবু সে ছাড়িবে না—কহিল, "বলি শোনইনা কথাটা!" তার পর চারিধারে চাহিয়া নিম্নকণ্ঠে সে কহিতে লাগিল, "দেখ দাদা, আমার যা কিছু সুখ, যা কিছু ভালো, তা তোমারি হাতে নির্ভর কচ্ছে! নেহাৎ গরীব আমি—এ কাজে কি পরিশ্রম, আর মাহিনাটা কি কম! এর উপর আবার নিজের খরচে একটা ঘোড়া রাখতে হয়! চাকরির সুখ কত! তাই বুঝেই, ভাই, লটারির টিকিটটা আসটা মাঝে-মাঝে আমি কিনি! জীবনে একটা কিছু করা চাই ত! কিন্তু এই যে আজ সাত-আট বৎসর লটারিতে এত টাকা দিচ্ছি, তা এ ত লটারিতে নয়, সব জলে দিচ্ছি! আমার নম্বর যদি হয়, ৭৬, ত ঠিক ৭৭ নম্বরের টিকিট টাকা পেয়ে বসে আছে। আবার যদি দেখে-শুনে ৭৭ নম্বরের টিকিট কিনি ত, হয় ৭৬ নম্বর, নয় ৭৮ নম্বর টাকা পায়! বরাত দেখ না! তাই মনে করেছি -কি জানো?" কথাটা বলিয়া সে আমার দিকে চাহিল। আমি কহিলাম, "কি মনে করেছ?"

সে কহিল,—"তাই মনে করছি একটা সুবিধা হতে পারে তোমা হতে।"

আমি আশ্চর্য্য হইলাম, কহিলাম, "আমা হতে সুবিধা?"

সে কহিল, "হাঁ, দাদা সে তোমারি হাত। দেখ,মানুষ মরে গেলে ভূতভবিষ্যত সব দেখতে পায়, তা তুমি ত এই ক'ঘণ্টা পরেই মরচ, তাই বলছি কি, জানো, আমাকে যদি ঐ ঠিক নম্বরটি বলে দাও ত আমি সেই নম্বরের টিকিট-খানি কিনি! বেশ দু পয়সা তা হলে হাতেও আসে! রাতারাতি বড়মানুষ হয়ে পড়ি,আর এই লক্ষ্মীছাড়া চাকরি ছেড়ে বাঁচি—ভূতকে আমি ভয় করি না, বুঝলে কি না—কোন বাধা নাই! আমার নাম কাসেঁ পাঁপিকুর! বি নম্বর ঘর, ২৬ নম্বর বিছানা—মনে থাকবে ত? আজই সন্ধ্যার পর তা হলে বলে দিও, দাদা। দোহাই তোমার।"

এ কথার আমি উত্তর দিতাম না—প্রবৃত্তি ছিল না—কিন্তু একটা উন্মদ আশা আমার মনে জাগিয়া উঠিল—একবার শেষ চেষ্টা! আমি কহিলাম, "দেখ, তুমি টাকা চাও?"

"হঁা, দাদা! আর পয়সার দুঃখ ভোগ করতে পারিনে!"

আমি কহিলাম, "বেশ—আমি তোমাকে রাজার ঐশ্বর্য্য দেব, অগাধ টাকা যদি এক কাজ করতে পার!"

তার চোখ যেন জ্বলিয়া উঠিল। সে কহিল, "বল, আমি এখনি করব—যত বড় শক্ত সে কাজ হোক, তবু পেছুবো না।"

আমি কহিলাম, "শুধু আমাদের পোষাক বদল করতে হবে, ব্যস—আর কিছু নয়!"

"এই কাজ! ওঃ, এখনি রাজী আছি।" বলিয়াই সে জামার বোতাম খুলিতে লাগিল।

ক্ষিপ্র গতিতে আমি উঠিলাম। বুকটা ধ্বক করিয়া উঠিল। আর একমুহূর্ত্ত বিলম্ব নয়—এখনি সব পণ্ড হইবে! আঃ, ভগবান, ধন্য তুমি! নিমেষে আমি দেখিলাম, আমার সম্মুখে আগাগোড়া সমস্ত দ্বার মুক্ত—কোথাও বাধা নাই, বন্ধ নাই—মুক্ত আকাশতলে আবার আমি দাঁড়াইয়াছি—মাথার উপর পাখীর দল উড়িয়া চলিয়াছে, স্নিগ্ধ শীতল বায়ুর স্পর্শ অবধি যেন আমি স্পষ্ট অনুভব করিলাম,—সে এক সম্পূর্ণ নূতন জীবন!

সহসা প্রহরীটা থমকিয়া গেল—কহিল, "ওঃহো! বুঝেছি তোমার মতলবখানা—তুমি পালিয়ে যেতে চাও?"

একটা ঢোক গিলিয়া আমি কহিলাম, "তাইত চাই, নইলে তোমাকে টাকা দেব কি করে?"

প্রহরী জামার বোতাম আঁটিতে লাগিল। আমার অন্তরের মধ্য দিয়া একটা তীব্র বিদ্যুৎ শিখা বহিয়া গেল—মাথায় রক্ত চন্ চন্ করিয়া উঠিল।

সে কহিল, "না—তা কি হয়? ও সব হাঙ্গামায় আমি নাই—মরে তুমি টাকার কিনারা করো ভাই, যেমন বললুম—এ রকম প্যাঁলয়ে—আরে না—না।"

আমি বসিয়া পড়িলাম—আমার পা টলিতেছিল! আশা নাই—কোন আশা নাই! নিরাশার সুগভীর বেদনায় আমার নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

হিউয়েনসাং প্রণীত সিউ-ইউ-কি।

দ্বিতীয় ভাগ।

ভারতবর্ষের অনেকগুলি নাম আছে। পূর্ব্বে ইহাকে সিণ্টু নামে অভিহিত করা হইত। কেহ কেহ ইহাকে হিয়েনটোও বলিত। কিন্তু ইহার প্রকৃত নাম হইতেছে ইণ্টু। নিজ নিজ জিলা অনুযায়ী ইণ্টু দেশীয় লোকেরা ইহার নামকরণ করিয়া থাকে। প্রত্যেক প্রদেশের আচার ব্যবহার বিভিন্ন প্রকারের। চীন ভাষায় ইণ্টু অর্থে চন্দ্র।

ভারতবর্ষের ব্যক্তিগণ বিভিন্ন বর্ণে বিভক্ত। ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের কৌলীন্য ও চরিত্রের জন্য প্রসিদ্ধ। জনশ্রুতি ব্রাহ্মণদের কাহিনী পবিত্রতাপূর্ণ করিয়াছে। জনসাধারণে ভারতবর্ষকে ব্রাহ্মণদের দেশ এইরূপ বলিয়া থাকে।

পরিমাণ, জলবায়ু প্রভৃতি।

ভারতবর্ষ নামক পরিচিত দেশগুলি পঞ্চসিন্ধু নামে কথিত হইয়া থাকে। এই দেশের পরিধি ৯০,০০০ লি; ইহার তিন দিকেই সুবিশাল সাগর এবং ইহার উত্তরে তুষার পর্ব্বত। ইহার উত্তরাংশ প্রশস্ত; দক্ষিণাংশ সঙ্কীর্ণ। দেখিতে অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি। সমগ্র দেশটী ৭০ কি ততোধিক প্রদেশে বিভক্ত। ঋতুগুলি অত্যন্ত উষ্ণ; ভারতভূমি সুজলা এবং আর্দ্র। উত্তরাংশ উপত্যকাপূর্ণ ও সমতল. এই সকল উপত্যকা ও সমতল ক্ষেত্রগুলি সুজলা ও কর্ষিত বলিয়া উর্ব্বর ও ফলোৎপাদক। দক্ষিণাংশ বনরাজি. ও শাক পরিপূর্ণ। পশ্চিমাংশ কঙ্করময় এবং অনুর্ব্বর

ভারতবর্ষের পরিমাপ লইতে হইলে প্রথমে যোজন গণনা করা হইয়া থাকে। অতি প্রাচীনকাল হইতেই সৈন্যদের একদিনের কুচকে যোজন বলে। পুরাতন পুস্তকাদিতে ৪০ লিতে এক যোজন এইরূপ দেখা যায়। সাধারণতঃ ৩০লিতে এক যোজন পরিগণিত করা হয়—কিন্তু ধর্ম্ম পুস্তকে দেখা যায় যে ১৬ লিতে এক যোজন হয়। আট ক্রোশে এক যোজন। গরুর ডাক যতদূর হইতে কর্ণে প্রবেশ করিতে পারে সেই দূরত্বকে ক্রোশ বলে। এক ক্রোশে ৫০০ শত ধনু। চার হাতে এক ধনু এবং ২৪ অঙ্গুলিতে এক হস্ত হয়। ৭ যবে এক অঙ্গুলি এবং এই প্রকারে আরও নানাপ্রকার পরিমাপের প্রণালী আছে। ইহার পরে আবার অণু ও পরমাণু আছে।

জ্যোতিষ, পঞ্জিকা ইত্যাদি।

সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র সময়কে ক্ষণ বলে। একশত বিশ ক্ষণে তৎক্ষণ; ৬০ তৎক্ষণে এক পল, ৩০ পলে এক মুহূর্ত্ত এবং ৫ মুহূর্ত্তে কাল এবং ৬ কালে এক অহোরাত্র হয়। সাধারণতঃ দিবারাত্রি আট-কালে বিভক্ত করা হয়। প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত শুক্লপক্ষ, পূর্ণিমা হইতে অমাবস্যাকে কৃষ্ণপক্ষ বলা হয়। চৌদ্দ কি পনের দিনে কৃষ্ণপক্ষ হয়—কেননা মাস কখন দীর্ঘ কখন ছোট হইয়া থাকে। কৃষ্ণপক্ষ ও তৎপরবর্ত্তী শুক্লপক্ষ লইয়া একমাস। ছয় মাসে দুই অয়ন। সূর্য্য যখন বিষবরেখার মধ্যবর্ত্তী থাকে তখন ইহাকে উত্তরায়ন ও বহির্ভাগে থাকিলে দক্ষিণায়ন বলে। এই দুই অয়ন লইয়া এক বৎসর পরিগণিত হয়।

বৎসর ছয় ঋতুতে বিভক্ত। প্রথম মাসের ষোড়শ দিবস হইতে তৃতীয় মাসের পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত গ্রীষ্মকাল; তৃতীয় মাসের ষোড়শ দিবস হইতে পঞ্চম মাসের পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত পূর্ণ গ্রীষ্মকাল; পঞ্চম মাসের ষোড়শ দিবস হইতে সপ্তম মাসের পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত বর্ষাকাল। সপ্তম মাসের ষোড়শ দিবস হইতে নবম মাসের পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত শস্যবৃদ্ধিকাল। নবম মাসের ষোড়শ দিবস হইতে একাদশ মাসের পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত শীত ঋতুর প্রারম্ভকাল ও একাদশ মাসের ষোড়শ দিন হইতে প্রথম মাসের পঞ্চদশ দিবস পূর্ণ শীতকাল।

তথাগতের শাস্ত্রানুযায়ী বৎসরে মাত্র ৩টী ঋতু। প্রথমমাসের ষোড়শ দিবস হইতে পঞ্চম মাসের পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত গ্রীষ্মঋতু। পঞ্চম মাসের ষোড়শ দিবস হইতে নবম মাসের পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত বর্ষাঋতু ও নবম মাসের ষোড়শ দিবস হইতে প্রথম মাসের পঞ্চদশ

দিবস পর্য্যন্ত শীত ঋতু। আবার চারিঋতুও কথিত হইয়া থাকে—বসন্ত, গ্রীষ্ম, হেমন্ত ও শীত। বসন্তের মাস হইতেছে চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ। প্রথম মাসের ষোড়শ দিবস হইতে চতুর্থ মাসের পঞ্চদশ দিবসের সহিত এই মাসত্রয়ের ঐক্য দেখা যায়। আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্রপদ মাস লইয়া গ্রীষ্মকাল। চতুর্থ মাসের ষোড়শ দিবস হইতে সপ্তম মাসের পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত এই গ্রীষ্মকালের ঐক্য দেখা যায়। আশ্বিন কার্ত্তিক, মার্গশীর্ষ এই তিনমাস লইয়া হেমন্ত। সপ্তম মাসের ষোড়শ দিবস হইতে দশম মাসের পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত সময়ের ঐক্য আছে। পৌষ, মাঘ, এবং ফাল্গুন—এই কয়মাস শীতকাল। দশম মাসের ষোড়শ দিন হইতে প্রথম মাসের পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত এই কাল। পুরাকালে পুরোহিতগণ বুদ্ধদেবের নিয়মাবলী অবলম্বন করিয়া বর্ষাকালে দুইবার বিশ্রাম করিতেন *—প্রথম তিনমাস অথবা শেষ তিন মাস। সূত্র ও বিনয় অনুবাদকারীগণ—এই বিষয় শুদ্ধরূপে অনুধাবন করিতে পারিতেন না, তাহার কারণ এই যে সীমান্ত প্রদেশের অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ মধ্যপ্রদেশের ভাষা বোধগম্য করিতে পারিত না। এবং এই কারণেই তথাগতের জন্ম, গৃহত্যাগ, নির্ব্বাণ প্রভৃতির সঠিক সময় নির্দ্ধারিত হইয়া উঠে নাই।

নগর ইত্যাদি।

নগর ও গ্রামের মধ্যে দরজা আছে। প্রাচীর উচ্চ ও প্রশস্ত। পথ ও উপপথ সকল পাকানো এবং রাজপথগুলি ঘোরানো। পথগুলি অপরিষ্কার এবং ইহাদের পার্শ্বে সুসজ্জিত বিপণিগুলি যথাযোগ্য চিহ্নে শোভিত। কসাই, মৎস্যজীবি, নর্ত্তক নর্ত্তকী, জল্লাদ ও সম্মার্জ্জক প্রভৃতির বাস নগরের বহির্ভাগে। ইহাদিগকে রাজপথের বামপার্শ্ব দিয়া গমনাগমন করিতে হয়। ইহাদের গৃহাদি অনুচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত এবং উপনগর বলিয়া খ্যাত। মৃত্তিকা নরম ও কর্দ্দময় বলিয়া নগরের প্রাচীরগুলি ইষ্টক বা টালী দ্বারা প্রস্তুত। প্রাচীরের উপরিস্থ প্রাসাদগুলি কাষ্ঠ বা বংশনির্ম্মিত গৃহাদিতে বারান্দা ও আমোদগৃহ আছে। এইগুলি কাষ্ঠনির্ম্মিত। তবে ইহাদের বহির্দ্দেশে চুণ বা সুরকীর আস্তরণ থাকে এবং ছাদ ইষ্টকের। চীনের ন্যায় তৃণ, শুষ্ক শাখা, টালি বা কাষ্ঠ ছাদের জন্য ব্যবহৃত হয়। দেওয়ালগুলি চুণ ও কর্দ্দমলিপ্ত এবং পবিত্রতার জন্য গোময়ও মিশ্রিত হইয়া থাকে।

সঙ্ঘারামগুলির নির্ম্মাণ কৌশল অত্যন্ত অসাধারণ। চতুষ্কোণের চতুর্দ্দিকেই এক একটী ত্রিতল মন্দির নির্ম্মিত হইয়া থাকে। কড়িকাঠ ও কার্ণিস নানাপ্রকারে খোদিত হইয়া থাকে। দরজা জানালা এবং অনুচ্চ প্রাচীরগুলি মুক্তহস্তে চিত্রিত। সন্ন্যাসীগণের কক্ষের অভ্যন্তর কারুকার্য্যখচিত কিন্তু বহির্দ্দেশ অনলঙ্কৃত। মধ্যস্থলে উচ্চ ও বিস্তৃত ঘর। দরজাগুলি পূর্ব্বমুখ; রাজসিংহাসনও পূর্ব্বমুখে স্থাপিত।

আসন, বসন ইত্যাদি।

ভারতবাসীরা উপবেশন বা বিশ্রামের কালে মাদুর ব্যবহার করে। রাজপরিবারস্থ ব্যক্তিগণ এবং সম্ভ্রান্তব্যক্তি ও সহকারী কর্ম্মচারীগণ কারুকার্য্য শোভিত মাদুর ব্যবহার করে কিন্তু আকারে সকল মাদুরই এক প্রকার। রাজার সিংহাসন বৃহৎ উচ্চ এবং মূল্যবান মণিমুক্তাসজ্জিত; ইহাকে সিংহাসন বলে। সিংহাসন অতি উৎকৃষ্ট বস্ত্র দ্বারা মণ্ডিত; পাদদানটী পর্য্যন্ত মণিমুক্তাখচিত। সম্ভ্রান্তব্যক্তিগণ নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী সুচিত্রিত ও মূল্যবান আসন ব্যবহার করেন।

পোষাক পরিচ্ছদের কোন রূপ "ছাট কাট" নাই। শুভ্র পোষাকই তাহারা পছন্দ করে; বহুবর্ণ বা সুশোভিত পরিচ্ছদ তাহাদের মনঃপুত হয় না। পুরুষেরা মধ্যদেশে তাহাদের পরিচ্ছদ জড়াইয়া, কুক্ষিতলে ন্যস্ত করিয়া দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া ঝুলাইয়া দেয়। স্ত্রীলোকের পোষাক মৃত্তিকা স্পর্শ করে এবং সম্পূর্ণরূপে তাহাদের স্কন্ধ আবৃত করে। তাহারা মস্তকোপরি কেশের কিয়দংশ দ্বারা কবরী বন্ধন করে

* এই সকল আচার ব্যবহারগুলি ইৎসিংও উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

এবং অন্ত চুলগুলি আলগা করিয়া রাখে। কেহ কেহ গোঁফ ছেদন করে *। মস্তকোপরি তাহারা মুকুট ও মণিময় মাল্য ব্যবহার করে। তাহাদের পরিচ্ছদ কৌষেয় * ও কার্পাস নির্ম্মিত। ক্ষৌম বস্ত্রের পরিচ্ছদও দেখা যায়। উৎকৃষ্ট ছাগলোম দ্বারা কম্বল প্রস্তুত হয়। করাল (বন্য পশুর সুচিক্কণ-লোম) দ্বারা বস্ত্র বয়ন করা হয়। ইহা বয়ন করা সহজসাধ্য নয় এবং সেই জন্য ইহার পরিচ্ছদ মূল্যবান এবং ইহা উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদরূপে গণিত হয়।

উত্তর ভারতে বায়ু শীতল এবং সেই জন্য তথায় তাহারা ছোট এবং আঁটা পোষাক ব্যবহার করে। অবিশ্বাসীদিগের পরিচ্ছদ ও গহনা বহুবিধ ও মিশ্রিত। কেহ ময়ূরপুচ্ছ, কেহ নরকঙ্কাল ব্যবহার করে। কেহ বা উলঙ্গ থাকে, আবার কেহ পত্র বা বল্কল পরিধান করে। কেহ কেশ কর্ত্তন করে, কেহ বা গোঁফ মুণ্ডন করে। পক্ষান্তরে দীর্ঘ গোঁফ এবং মাথার উপর চুলের কবরী ও দেখা যায়। ইহাদের পরিচ্ছদ একরূপ নহে এবং এক এক সময় এক এক প্রকার রংয়ের পোষাক ব্যবহার করে।

শ্রমণগণের তিন প্রকার পরিচ্ছদ *। এই তিন প্রকার পরিচ্ছদের "ছাঁট" এক প্রকার নহে—ইহা সম্প্রদায় বিশেষের উপর নির্ভর করে। কাহারও কাহারও সূত্রপাড় কাহার আবার চওড়া। কোন কোন পোষাক আবার কমবেশী ঝুলিয়া পড়ে। এক প্রকার পোষাক কেবল বাম স্কন্ধ ও উভয় কুক্ষিতল আবৃত রাখে। ইহা বামদিকে অনাবৃত রাখিয়া দক্ষিণদিক আবৃত করিয়া রাখে। কোমরের নীচে ইহা ঝুলিয়া পড়ে। অন্য প্রকার পোষাকের কটিবন্ধ বা খোবা নাই। পরিধানকালীন ইহার নিম্নাংশ ভাঁজ করিয়া পরিতে হয় ও কটিদেশে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া রাখিতে হয়। সম্প্রদায় সকলের পরিচ্ছদের বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু—পীত ও লোহিত উভয়ই ব্যবহৃত হয়।

ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণগণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বস্ত্রাদি ব্যবহার করেন এবং সাদাসিধা ভাবে ও মিতব্যয়িতার সহিত জীবন ধারণ করেন। রাজা এবং মন্ত্রীগণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার ব্যবহার করেন। রত্নখচিত উষ্ণীষ এবং পুষ্প কেশে ব্যবহার করেন। তাঁহারা বলয় ও মাল্য দ্বারা নিজেদের ভূষিত করেন।

অনেক ধনবান বণিক স্বর্ণালঙ্কারের ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকেন। ইঁহারা নগ্নপদে যাতায়াত করেন—কদাচিৎ কেহ উপানৎ ব্যবহার করে। ইহারা দন্ত লোহিত কিম্বা কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত এবং কর্ণ বিদ্ধ করে। ইহাদের নাসিকা চিত্রিত এবং চক্ষুগুলি আয়ত।

পরিচ্ছন্নতা।

ইহারা শারীরিক পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী এবং এই বিষয়ে কোনরূপেই শৈথিল্য প্রকাশ করে না। আহারের পূর্ব্বে সকলেই স্নান করিয়া থাকে; কখনও উচ্ছিষ্ট ভোজন করে না এবং একের ভোজনপাত্র অপরে ব্যবহার করে না। কাষ্ঠ বা প্রস্তর পাত্র ব্যবহৃত হইলেই নষ্ট করিয়া ফেলে। সুবর্ণ, রৌপ্য, তাম্র বা লৌহ পাত্র প্রত্যেকবার ব্যবহারের পর ধৌত ও মার্জ্জিত করে। আহারাদির পরে তাহারা দন্তকাষ্ঠ † ব্যবহার করে এবং মুখ ও হস্ত প্রক্ষালন করে *। স্নানের পূর্ব্বে কেহ কাহাকেও স্পর্শ করে না।। শৌচান্তে প্রত্যেকবার তাহারা গাত্র ধৌত করে এবং চন্দন ও হরিদ্রার সুগন্ধি ব্যবহার করে। রাজার স্নানকালে ঢক্কা নাদ হয় ও বাদ্যযন্ত্র যোগে সঙ্গীত হয়। পূজা বা প্রার্থনার পূর্ব্বে ইহারা অবগাহন করে।

লিখন, বর্ণমালা, ভাষা পুস্তক প্রভৃতি।

ভারতবর্ষীয়দের বর্ণমালা ব্রহ্মদেব কর্তৃক রচিত হইয়াছিল এবং সেই সময় হইতেই প্রচলিত রহিয়াছে। সংখ্যায় ইহারা ৪৭ এবং দেশ কালপাত্র অনুযায়ী

* এই সকল আচার ব্যবহারগুলি ইৎসিংও উল্লেখ করিয়া গিয়াছে।

† দন্তকাষ্ঠের ব্যবহার ইৎসিংয়ের গ্রন্থে এবং আরও অনেক প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়। "বিভিন্ন দেশের ইতিহাসে ভারতের কথা" প্রবন্ধে (ভারতী ১৩১৬ শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যা) দ্রষ্টব্য।

শব্দ রচনার উপযোগী ভাবে সংযুক্ত। এই বর্ণমালা নানা দেশের নানা ভাষায় প্রচলিত হইয়াছে এবং সেই জন্যই দেশভেদে উচ্চারণে ব্যতিক্রম দেখা যায় কিন্তু সাধারণতঃ বিশেষ কিছু প্রভেদ নাই। মধ্য ভারতে ইহা আদিকাল হইতে এক ভাবেই আছে। এই স্থানের উচ্চারণ শুনিতে মধুর এবং দেবতাদিগের ভাষার ন্যায়। সীমান্ত প্রদেশবাসীদের উচ্চারণে ভ্রম দেখা যায় কেন না চরিত্রগত দোষের জন্য তাহাদের ভাষাও দূষিত হইয়া পড়ে।

প্রত্যেক প্রদেশে সাময়িক ঘটনা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন। এই সকল বিবরণকে নীলপিত বলে। শুভাশুভ সর্ব্ববিধ ঘটনাই ইহাতে লিপিবদ্ধ হয়।

বালকদিগের শিক্ষা ও উৎসাহের জন্য তাহাদিগকে প্রথমতঃ দ্বাদশ অধ্যায় বিশিষ্ট সিদ্ধবস্তু নামক পুস্তক অধ্যয়ন করান হয়। সপ্তম বর্ষে উপনীত হইলে তাহারা পঞ্চবিদ্যা নামক শাস্ত্র অধ্যয়ন করে। প্রথমেঃ তাহারা শব্দবিদ্যা অধ্যয়ন করে। এই পুস্তক শব্দের অন্বয় এবং পদের ব্যুৎপত্তি বিষয়ক তত্ত্ব শিক্ষা দেয়। দ্বিতীয়তঃ, তাহারা শিল্পস্থান বিদ্যা অর্থাৎ শিল্পশক্তি নির্ণয়কবিদ্যা এবং জ্যোতিষ অধ্যয়ন করে। পরে চিকিৎসাবিদ্যা অর্থাৎ যাহাতে স্বাস্থ্যরক্ষা ও গুপ্তমন্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দেয় তাহাই অধ্যয়ন করে। পরে হেতুবিদ্যা ও আত্মবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। শেষোক্তটিতে পঞ্চ বৌদ্ধ শাস্ত্রের * সকল তত্ত্ব নিদ্ধারিত আছে।

ব্রাহ্মণে চতুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করেন। প্রথম বেদকে আয়ুর্ব্বেদ বলে কেন না ইহা জীবনরক্ষণ বিষয়ে পর্য্যালোচনা করে। দ্বিতীয় যজুর্ব্বেদ, তৃতীয় সামবেদ ও চতুর্থ অথর্ব্ববেদ।

এই সকল বেদে যে সকল গূঢ় ও গুপ্ততত্ত্ব সন্নিবিষ্ট আছে তাহা এতদ্দেশীয় শিক্ষকগণ যে উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়াছেন তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহারা প্রথমতঃ উহাদের ভাবার্থ ব্যাখ্যা করিয়া পরে ছাত্রদিগকে দুরূহ শব্দ সমূহের অর্থ বোধগম্য করাইয়া দেন। তাঁহারা শিষ্যদিগকে উৎসাহিত করেন এবং সুকৌশলে তাহাদের পরিচালিত করেন। যদি তাঁহারা দেখেন যে তাঁহাদের শিষ্যগণ অধীত বিদ্যায় সন্তুষ্ট হইয়া সাংসারিক কার্য্যে লিপ্ত হইতে ইচ্ছুক তাহা হইলে তাঁহারা উহাদের স্বকীয় বশে রাখেন। তাহাদের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে এবং ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম প্রাপ্ত হইলে তাহাদের চরিত্র গঠিত এবং জ্ঞান পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। যখন তাহারা কোন কার্য্যে নিযুক্ত হয় তখন প্রথমে তাহারা গুরুদেবের যত্নের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দেয়। পুরাতত্ত্বে অভিজ্ঞ অনেকে বিদ্যা-চর্চ্চাতেই জীবনাতিপাত করেন এবং এবং সংসার হইতে দূরে বাস করিয়া নিজেদের স্বভাব অক্ষুণ্ণ রাখেন। পার্থিব বিষয়ের ইহারা কিছুই ধার ধারেন না; নিন্দা বা প্রশংসায় ইঁহাদের কিছুই যায় আসে না। তাঁহাদের সুযশ দিগদিগন্তে বিস্তৃত হওয়ায়, রাজন্যবর্গ তাঁহাদের যথেষ্ট সম্মান করেন কিন্তু তাঁহারা কদাপিও রাজসভায় উপস্থিত হন না। গুণের জন্য নরপতি তাঁহাদের সম্মান করেন এবং প্রজাবৃন্দ তাঁহাদের যশোরাশির প্রশংসা করে এবং সর্ব্ব-সাধারণে তাঁহাদের ভক্তি করে। এই কারণেই তাঁহারা দৃঢ়তা ও উৎসাহ সহকারে অক্লান্ত ভাবে বিদ্যাচর্চ্চায় সময়াতিপাত করিতে পারেন। তাঁহারা আত্মবলে নির্ভর করিয়া জ্ঞানান্বেষণ করেন। যদিও তাঁহারা বিপুল ধনের অধিকারী তথাপি তাঁহারা সামান্য জীবিকার জন্য নানাস্থান ভ্রমণ করেন। পক্ষান্তরে, এরূপ লোকও দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা বিদ্যার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াও নির্লজ্জভাবে কর্ত্তব্য পালনে বিমুখ হইয়া কেবল মাত্র সুখলালসায় অর্থরাশির অপচয় করে। ইহারা বহুমূল্য আহারাদি ও বস্ত্র নিজ সম্পত্তি বিনষ্ট করে। নিজেদের নৈতিক বল এবং অধ্যয়নস্পৃহা না থাকাতে ইহারা অপমানিত হয় এবং ইহাদের দুর্নাম চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

নিজ নিজ শ্রেণী অনুযায়ী, সকলেই তথাগতের

* পঞ্চযান—(১) বুদ্ধ (২) বোধিসত্ত্ব (৩) প্রত্যেক বুদ্ধ (৪) যতি (৫) অন্ত্য শিষ্য।

ধর্ম্মমত জ্ঞাত আছে। কিন্তু তাঁহার আবির্ভাবের পরে বহুকাল গত হওয়াতে, তাঁহার মতের রূপান্তর হইয়াছে এবং কেবলমাত্র তত্ত্বান্বেষিগণের অনুসন্ধানের উপরই এইক্ষণ এই জ্ঞান নির্ভর করে।

বৌদ্ধ সম্প্রদায়, পুস্তক, বিচার, বিনয় প্রভৃতি।

ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মতের যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায় এবং সমুদ্রের তরঙ্গমালার ন্যায় তাঁহাদের মধ্যে তর্কবিতর্ক উত্থিত হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্য আছেন এবং যদিও তাঁহাদের মতামত বিভিন্নমুখী, তথাপি তাঁহাদের লক্ষ্য এক।

অষ্টাদশটী সম্প্রদায় আছে এবং প্রত্যেকই অপরের উপর প্রাধান্য প্রকাশ করিতে অভিলাষী। মহাযান এবং হীনযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ পৃথক পৃথক বাস করিতেই ইচ্ছুক। অনেকে নীরব ধ্যানেই আসক্ত এবং ভ্রমণে, উপবেশনে, দণ্ডায়মান থাকিয়া সকল সময়েই জ্ঞানার্জ্জন ও সূক্ষ্ম দর্শনের জন্য নিমগ্ন থাকেন। কেহ কেহ স্ব স্ব মতের পোষকার্থ চীৎকার করিয়া তর্ক বিতর্ক করেন। নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক নিয়ম অনুসারে বৌদ্ধগণ চালিত হন।

বিনয়, বিচার, এবং সূত্রপিটক—সকলই বৌদ্ধ-পুস্তক। যিনি এই সকল গ্রন্থের এক শ্রেণীর সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করিতে পারেন, তাঁহাকে কর্ম্মদানের শাসন হইতে মুক্তি দেওয়া হয়। যদি তিনি দুই শ্রেণীর ব্যাখ্যা করিতে পারেন তবে তাঁহাকে দ্বিতীয় তলে বাসের জন্য আসবাব দেওয়া হয়। যিনি তিন অংশ ব্যাখ্যা করিতে পারেন, তাঁহাকে পরিচর্য্যা করিবার জন্য কয়েকটী ভৃত্য দেওয়া হয়। যিনি চারি অংশের ব্যাখ্যা করিতে পারেন তাঁহাকে উপাসক নিযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। যিনি পঞ্চাংশ ব্যাখ্যা করিতে পারেন তাঁহাকে হস্তিযান দেওয়া হয়। যিনি ছয় অংশেরই ব্যাখ্যা করিতে পারেন তাঁহাকে শরীররক্ষী প্রদত্ত হয়। যখন কাহারও সুযশ উচ্চ সীমায় উপনীত হয়, তখন বিচারের জন্য তিনি সভা আহ্বান করেন। যাঁহারা সভায় উপস্থিত হন, তিনি তাঁহাদের গুণের বিচার করেন; তিনি বুদ্ধিমানদিগকে প্রশংসা করেন এবং ভ্রান্ত ব্যক্তিকে তিরস্কার করেন। সভায় যদি কেহ মার্জ্জিত ভাষা, সূক্ষ্ম অনুসন্ধান, তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় দেন তাহা হইলে তাঁহাকে সুসজ্জিত হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া এবং বহুসংখ্যক সহচর সঙ্গে দিয়া মঠের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত আনয়ন করা হয়। পক্ষান্তরে, যদি কেহ বিচারকালীন অসাধু ভাষা প্রয়োগ করেন, অথবা কুতর্ক অবলম্বন করেন, তাহা হইলে সকলে তাহার মুখ লাল ও সাদা রঙ্গে রঞ্জিত করিয়া দেয়, তাহার সর্ব্বাবয়বে ধূলি ও কর্দ্দম মাখাইয়া দেয় এবং পরে কোন নির্জ্জন স্থানে বা পয়ঃপ্রণালীতে রাখিয়া আইসে। এই প্রকারে তাহারা গুণী ব্যক্তিকে সম্মান এবং গুণহীনকে অপদস্থ করে।

ভোগবিলাস সাংসারিক জীবনেই শোভা পায় এবং জ্ঞানার্জ্জনই ধর্ম্মজীবনের লক্ষণ। শেষোক্ত জীবন পরিত্যাগ করিয়া সাংসারিক ভোগবিলাসে লিপ্ত হওয়া অত্যন্ত গর্হিত। যদি কেহ বিনয়ের নিয়ম ভঙ্গ করে তবে তাহাকে প্রকাশ্যে তিরস্কার করা হয়। সামান্য দোষে, তিরস্কার বা কয়েকদিবসের জন্য নির্ব্বাসন দেওয়া হয়। অপরাধ গুরুতর হইলে চিরদিনের জন্য মঠ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। যাহারা এইরূপে বহিষ্কৃত হয় তাহারা অন্যত্র আবাস অন্বেষণ করে এবং যদি তাহাতে অসমর্থ হয় তবে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায়। কখনও কখনও তাহারা পুনরায় গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করে।

বর্ণবিভাগ ও বিবাহ।

ইহারা চারিবর্ণে বিভক্ত। প্রথম ব্রাহ্মণ—ইঁহারা সদাচারী। ইহারাই ধর্ম্মপরায়ণ এবং নিয়মাবলী পালনে বিশেষ তৎপর। দ্বিতীয় শ্রেণীকে ক্ষত্রিয় বলে, ইহারা রাজজাতীয়। বহুযুগ হইতে ইঁহারা দেশ শাসন করিতেছেন। ইহারাও ধার্ম্মিক ও দয়াশীল। তৃতীয় বৈশ্য—ইহারা বাণিজ্য ব্যবসায়ী।

ইহারা ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকে ও দেশ বিদেশে ধনার্জ্জন করে। চতুর্থ শ্রেণীকে শূদ্র বলে—ইহারা কৃষিজীবি। ইহারা হলচালন ও কর্ষণ করে। এই চতুর্ব্বর্ণে জাতীয় বিশুদ্ধতা বা অবিশুদ্ধতা অনুসারেই পদ-মর্য্যাদা নির্দ্ধারিত হয়। যখন ইহারা বিবাহ করে, তখন নূতন কুটুম্বিতা অনুসারে ইহাদের পদমর্য্যাদার হ্রাসবৃদ্ধি হয়। আত্মীয় স্বজনের সহিত বিবাহপ্রথা প্রচলিত নাই। একবার স্ত্রীলোকের বিবাহ হইলে আর বিবাহ হয় না। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বহু জাতি আছে যাহারা নিজ নিজ ব্যবসানুযায়ী বিবাহ করে।

ক্রমশঃ

ছবি।

(ইংরাজী হইতে)

শরতের স্নিগ্ধ অপরাহ্ণে প্রসিদ্ধ চিত্রকর সেমুর সস্ত্রীক নদীতীরে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। অস্তগামী সূর্য্যকিরণে তখন নদীর জল লাল হইয়া গিয়াছিল।

অদূরে শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া এক বালক কাষ্ঠখণ্ড লইয়া ছুরিকার সাহায্যে ছোট নৌকা তৈয়ার করিতেছিল। বালকের বেশ ছিন্ন ও মলিন। আপনার কাযে সে এমন তন্ময় হইয়া গিয়াছিল যে, পথের দিকে তার কোন লক্ষ্যই ছিল না।

সেমুর ভাবিল, বাঃ—চিত্রের যোগ্য বটে! স্ত্রী কিটিকে কহিল, "আঁকবার মত নয় কি?"

কিটি কহিল, "নিশ্চয়, সুন্দর হবে।"

অগ্রসর হইয়া বালকটির কাঁধে হাত দিয়া সেমুর কহিল, "তোমার নাম কি?"

বালক চমকাইয়া সেমুরের মুখের দিকে চাহিল, কহিল, "আমি জিম"। বলিয়া সে আবার আপনার কাযে মন দিল।

কিটির নিকট আসিয়া সেমুর কহিল, "আমি এখনি সব জিনিষপত্র আনছি—তুমি একে কিছুতে উঠতে দিও না, কোন রকমে ভুলিয়ে রেখো।"

সেমুর যখন ফিরিয়া আসিল, বালকটি তখনো তেমনিভাবে নৌকা তৈয়ার করিতেছিল। সেমুর পট লইয়া বসিয়া গেল।

তখন চারিধারে আঁধার নামিতেছিল। জিম্ একবার আকাশের দিকে চাহিয়া ছোট নৌকাটী বুকে লইয়া উঠিয়া পড়িল।

সেমুর কহিল, "আর একটু,—জিম, আর একটু বস।" পরে পকেট হইতে একটী রৌপ্যমুদ্রা বাহির করিয়া কহিল, "আর একটু বসলে দেব?"

জিম্ অবাক হইয়া গেল। কহিল, "আমাকে দেবেন?"

"হাঁ, তুমি আর একটু ঐখানে বস, তা হলে দেব। কিন্তু কাল আবার আসা চাই, আবার দেব। কেমন আসবে ত, জিম?"

জিম্ ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

সে রাত্রে সেমুর বাড়ীওয়ালীকে জিমের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিল, "ওঃ, নিশ্চয় তবে সে জিম মেরিডিথ। আহা

বেচারা জিম্! তাদের দুঃখের কথা আর বলব কি, সে আজ প্রায় দু বৎসরের কথা। হাঁ, ঠিক দু বৎসর। জিমের বাপ ওয়েনের সঙ্গে তার বন্ধু রিজের কি বচসা হয়, ওয়েন রিজকে একটা ধাক্কা দেয়। ওয়েনের ধাক্কায় রিজ কেমন বে-কায়দায় পড়ে অজ্ঞান হয়। রিজ বুঝি মারা গেল ভেবে ভয়ে দুঃখে ওয়েনও কোথা চলে গেল। তার পর, তার আর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।"

কিটি কহিল, "রিজ কি সত্যই মারা গেছে?"

"নাঃ, মরবে কেন? জোয়ান মানুষ, একটা ধাক্কায় কি মরে কখনো? প্রায় হপ্তা দুই পরে সে বেশ সেরে উঠল! ওয়েনের জন্য কতদিন সে কেঁদেছে, তার কত খোঁজও করেছে—আহা, বড় ভাব ছিল দুজনে. তার উপর রিজেরই নাকি দোষ ছিল—তা কোথায় ওয়েন—তার কোন সন্ধানই নেই!" কথাটা বলিয়া বাড়ীওয়ালী ছোটখাট একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

২

পরদিন সেমুর নদীতীরে আসিয়া দেখে জিম্ তাহারই প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। কিন্তু আজ আর সে জিম নয়—আজিকার জিম দিব্য পরিচ্ছন্ন। বেশ ধোপদস্ত পোষাক পরিয়া সে আসিয়াছে। মুখের কালি সাবানে ধুইয়া ফেলিয়াছে, উস্ক-খুস্ক চুলগুলা তৈল-চিক্কণ, ব্রসের সাহায্যে তার পারিপাট্যই বা কি!

সেমুর কহিল, "এ কি করেছ জিম্—তুমি আর সে জিম নও যে—এঃ, এমন সেজে আসতে কে বলেছিল?"

বালকের মুখ শুখাইয়া গেল। সে বলিল, "মা সাজিয়ে দিয়েছে, ছবি তোলার কথা বল্‌তে, মা—"

"না, না শীঘ্র যাও, কাল যেমন ছিলে, তেমনটী হয়ে এস—কিছু মনে করোনা জিম্, এই দেখ তোমার চুলে এমন তেল মেখেছ—এ সব ঠিক করে এস, যাও, না হলে ছবি ভাল হবে না ত। ঠিক কালকের মত পোষাকে এস।"

এমন ভদ্রোচিত বেশ সেমুরের কেন যে মনঃপূত হইল না,—জিম তাহার মর্ম্মই মোটে গ্রহণ করিতে পারিল না।

* * * *

ছবিখানি সম্পূর্ণ হইল। সেমুরের নিপুণ তুলিকাপাতে সুন্দর ফুটিল! চিত্রশিল্পে তার দক্ষতাও ছিল অসামান্য!

কিটি ছবি দেখিয়া মুগ্ধ হইল। সোৎসাহে স্বামীকে কহিল, "বাঃ, চমৎকার হয়েছে।"

"তোমার ভাল লেগেছে ত কিটি, তাহলেই আমি সুখী। জিম তুমিও একবার এসে তোমার ছবি দেখ।"

জিম গৃহমধ্যে যাইয়া অনেকক্ষণ একদৃষ্টে ছবির পানে চাহিয়া রহিল! এই কি সে! দেখিল, একেবারে ঠিক—ক্রমে আপনার বেশের প্রতি তার নজর পড়িল—লজ্জায় সে আপন বেশের ছিন্ন স্থান গুলা হাত দিয়া ঢাকিতেছিল। তার কেমন একটা সঙ্কোচ হইতেছিল—'তাইত ছবিতে এগুলাও আঁকা হইয়া গিয়াছে!'

জিমের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সেমুর হাসিয়া

কহিল, "জিম্ ঐ গুলার জন্যই ত ছবি খানির দাম! বুঝলে?"

পরে কহিল, "আর পাঁচ-সাত দিনের মধ্যেই আমরা চলে যাচ্ছি!"

বালক কাতর দৃষ্টিতে সেমুরের প্রতি চাহিল, কহিল, "চলে যাবেন? কোথায়?"

"লণ্ডনে যাব, বুঝলে, জিম্, তুমি যাবে?" বালক বলিয়া উঠিল, "মা বলছিল সেখানে আমার বাবা আছেন", পরে সে আবার কহিল, "সেখানে আপনারা আমার বাবাকে নিশ্চয় দেখবেন, দেখা হলে আমার আর মার কথা যদি বলেন—" বলিতে বলিতে বালকের চোখের পাতা ভিজিয়া আসিল।

সেমুর ও কিটির অন্তর দুঃখে ভরিয়া গেল! জিমকে বুকে টানিয়া কিটি কহিল, "কেঁদোনা জিম। চুপ কর।" সেমুর কহিল, "জিম তোমার বাবাকে নিশ্চয় আমি এখানে পাঠিয়ে দেব, তোমার মাকে বলো।"

* * * *

৩

গুরু রাত্রি। লণ্ডনের এক গৃহমধ্যে নিম্নকণ্ঠে কে কহিল "হা ভগবান!" লোকটীর মুখ শুষ্ক বিবর্ণ! সে চোর, চুরি করিতে আসিয়াছিল।

রাত্রি তখন প্রায় দুই প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। গৃহের মেঝেতে চোরের পরিশ্রমলব্ধ জিনিষপত্র সংগৃহীত—সকলগুলিই রৌপ্য-নির্ম্মিত—ঝক্ ঝক্ করিতেছে! নিকটে একটী থলিও পড়িয়াছিল।

চোর সহসা থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। কাহারো কোনো সাড়াশব্দ নাই—চারিধার নিস্তব্ধ!

বাহিরে কেবল খড়খড়ির গায় বৃষ্টির ফোঁটার পট-পট শব্দ আর রাস্তার কচিৎ গৃহমুখী গাড়ীর ঘর্ঘর শব্দ ভিন্ন আর কিছুই শুনা যায় না। চারিধারে বিরাট নিস্তব্ধতা! চোরের মুখ পাংশুবর্ণ, তার সর্ব্বশরীরে রোমাঞ্চ।

সম্মুখে গৃহকোণে একটী চিত্রের প্রতি মন্ত্রমুগ্ধের মত সে একদৃষ্টে চাহিয়াছিল। তার পর ধীরে ধীরে দেয়াল হইতে ছবিখানি সে নামাইয়া লইল।

দ্বার খোলার শব্দ হইল—সে শুনিতে পাইল না, তন্ময় হইয়া ছবি দেখিতেছিল।

একখানি চেয়ারে সে ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল। পশ্চাতে তখনো প্রবেশদ্বার অর্দ্ধমুক্ত রহিয়া গেল। হাঁটুর উপর ছবিখানি রাখিয়া একমনে সে তাহাই দেখিতেছিল।

নদীতীরে শিলাখণ্ডের উপর উপবিষ্ট এক বালকের প্রতিমূর্ত্তি—বালকের বেশ ছিন্ন মলিন! মুখে কেমন করুণ ভাব! সুন্দর!

দেখিতে দেখিতে একটা অব্যক্ত বেদনায় তার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল—অলক্ষিতে তার চক্ষু হইতে বড় একফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া চিত্রের উপর পড়িল। ক্রমে দুইটী—তিনটী। আপনাকে সে আর কোনমতে সম্বরণ করিতে পারিল না।

এমন ভাবেই খানিকটা সময় কাটিয়া গেল। তখনও সে ছবি দেখিতেছিল। চোখের জলে ছবি অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছিল! এতক্ষণ কখন সে চলিয়া যাইত, কিন্তু আজ তার একি মোহ!

তখন উষার প্রথম আলোকচ্ছটা ধরণীতে ব্যাপ্ত হইতেছিল। তাহারই একটী অস্পষ্ট

কণা খড়খড়ির ফাঁকের মধ্য দিয়া ঘরে আসিয়া পড়িয়াছিল। ক্রমে কক্ষমধ্যে বাতির আলোও ম্লান হইয়া আসিল।

রাস্তায় ময়লা গাড়ীর ঘর্ঘর শব্দে সে চমকিয়া উঠিল। সম্মুখে থলি ও মেঝেতে স্তূপীকৃত দ্রব্যাদির প্রতি চাহিতেই সব কথা তার মনে পড়িয়া গেল। কিছুক্ষণ সে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। পরে ছবিখানি দেয়ালে টাঙ্গাইয়া সে ভাবিল, "হা, ভগবান! ধন্য তুমি,—আজ রাত্রে এ কি নূতন পথ দেখালে! আজ হতে আমি নূতন মানুষ! আর আমার কোন লোভ নাই—অভাব নাই, আজ হতে আমি চুরি ছাড়লাম।" ধীরে ধীরে দ্বারের দিকে সে অগ্রসর হইল। কে যেন তার বুক চাপিয়া ধরিয়াছিল! দ্বারের নিকট আসিয়া সে দেখে, বাহির হইতে তাহা রুদ্ধ। আর সম্মুখে রিভলভার হস্তে দাঁড়াইয়া স্বয়ং গৃহস্বামী তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছে!

গৃহস্বামী কহিল, "দাঁড়াও!" তার স্বর বজ্রগম্ভীর!

চোর থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। চোরের দিকে রিভলভার তুলিয়া গৃহস্বামী হাঁকিল, "চুরি—চুরি করতে এসেছে, যাও যেমন বসেছিলে তেমন ভাবে বস, নইলে এখনি মাথা উড়িয়ে দেব!"

চোর ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল, কহিল, "বিশ্বাস করুন, আর নাই করুন, আমি সত্য কথা বলব—ঐ ছবি! এখানা চোখে না পড়লে কোন্ মুহূর্ত্তে আমি এ সব জিনিষ নিয়ে সরে পড়তাম! শুধু ঐ ছবি। ঐ ছবি খানিই আজ চোরের হাত হতে আপনার জিনিষপত্র রক্ষা করেছে!"

চোরের কথা শুনিয়া গৃহস্বামী রিভলভার নামাইয়া একপদ অগ্রসর হইল, বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল "ছবি,—কোন্ ছবি?"

চোর কহিল, "ঐ যে একটি ছেলে নদীর ধারে পাথরের উপর বসে, উস্কো-খুস্কো চুল—ছেঁড়া পোষাক—"

গৃহস্বামী কহিল, "ওগো! বুঝেছি সেই ছবি—ভালো, তোমার নাম? তুমি—"

"ওয়েন মেরিডিথ—ঐ ছেলেটির মত আমারো একটি ছেলে—"

গৃহস্বামী অধীরভাবে কহিল, "তার নাম?"

চোর কহিল, "জিম্।"

গৃহস্বামী স্তম্ভিত হইলেন। চোরের স্কন্ধে হাত রাখিয়া কহিলেন, "ওয়েন মেরিডিথ্ তোমাকে এমন চোরের বেশে দেখব, তা স্বপ্নেও ভাবিনি!"

শিশুর ন্যায় ওয়েন কাঁদিয়া উঠিল। পরে রুদ্ধস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি আমার জিমের ছবি কেমন করে পেলেন?"

সুগভীর বেদনায় গৃহস্বামীর অন্তর আকুল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "সে আজ চার বৎসর, ঠিক চার বৎসরের কথা—যখন আমি ঐ ছবি আঁকি। ঐ ছবিই আমার উন্নতির প্রথম সোপান—সে এক শুভ মুহূর্ত্তের কি উজ্জ্বল স্মৃতি! আমার স্ত্রী কিটি ও আমি বেড়াতে গেছলাম—দুজনে জিমকে দেখি,—আমি এই ছবি আঁকি—তারপর আমার জীবনের উপর দিয়ে কি ঝড় বয়ে গেল—আজ কোথায় কিটি—এ ছবি আমাদের সেই মহা সুখের স্মৃতি—তাই

আবার আমি কিনে রেখেছি, ওয়েন আজ তোমাকে পেয়ে আমার বড় আহ্লাদ হচ্ছে! তোমার জন্য বাড়ীতে তোমার স্ত্রী-পুত্র-বন্ধু সকলে অধীর, তোমারই সন্ধান করছে। তোমার বন্ধু—"

ওয়েনের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে কহিল—"জানেন ত—খুনের দায়ে আমি,—"

"ওহো, সে তোমার ভুল, ওয়েন, রিজ মরেনি—বেঁচে আছে! তোমার দুঃখিনী স্ত্রী, আদরের জিম্, প্রাণের বন্ধু রিজ সকলে তোমারই জন্য আজ অধীর।"

ওয়েনের চোখ জ্বলিয়া উঠিল, এ কি স্বপ্ন! উন্মাদের মত সে জড়িতস্বরে কহিল "রিজ,—রিজ বেঁচে আছে!—কি আশ্চর্য্য, আর আমি—"

সেমুর কহিল "তুমি চারটি খেয়ে নিয়ে আজই বাড়ী যাও—আমি টেলিগ্রাম করে দিচ্ছি।"

শ্রীনরেন্দ্রমোহন চৌধুরী।

বিজ্ঞানের নূতন বাণী।

এতদিন পর্য্যন্ত লোকে কবি ও বৈজ্ঞানিকের মধ্যে এই পার্থক্যটাই লক্ষ্য করিয়াছে যে বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির দুয়ার পর্য্যন্ত মাত্র অগ্রসর হইয়াই ক্ষান্ত হন, কিন্তু কবি সে গণ্ডীর মধ্যে আপনাকে ধরা দেন না; তিনি প্রকৃতির গৃহাভ্যন্তরে গমন করিয়া প্রকৃতি অহরহ যে পাদপদ্মের দিকে তাহার অর্ঘ্যাঞ্জলি প্রেরণ করিতেছেন তাহারই সন্ধান গ্রহণ করেন। বৈজ্ঞানিক নাকি কবির এই কাজটিকে হাসিয়া উড়াইয়া দেন—অন্ততঃ অনেকেই তাহা মনে করে। এই জন্যই কবির সহিত বৈজ্ঞানিকের বিরোধ অনেকটা প্রবাদে দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

কিন্তু সেদিন আর থাকিবার নহে। যাঁহারা বিজ্ঞানের কেবল কাঠামোটুকু লইয়া আলোচনা করেন তাঁহারা সেই পুরাতনটা লইয়াই আছেন। বিজ্ঞানের প্রাথমিক শিক্ষার্থীরা এই দলের। কিন্তু আজকাল যাঁহারা বিজ্ঞানের অন্তরদেশে প্রবেশ করিয়া তাহাকে তলাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারা বিজ্ঞানের ভিতর হইতেই একটা বড় কথার সন্ধান পাইয়াছেন। তাহাতে কবির সহিত বৈজ্ঞানিকের সমস্ত বিরোধ দূর হইয়াছে, এবং দুইদিক হইতে দুইজনের লক্ষ্য যে একই দিকে ফিরিয়া আছে তাহা স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা গিয়াছে।

বৈজ্ঞানিক বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যকে দেখিবার সাধক। তিনি নানা প্রাকৃতিক ঘটনা লইয়া আলোচনা করিয়া তাহাদের সকলগুলির ভিতরে সাধারণ চক্ষুর অন্তরালে যে সত্যটি কাজ করিতেছে তাহাই আবিষ্কার করিয়া থাকেন। এই গুলিই তাঁহার বিজ্ঞান-সৌধ নির্ম্মাণের ইষ্টক। বৈচিত্র্য তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। গরমিল দেখিয়া তিনি নিরাশ হন না, বরঞ্চ সেই গরমিলের মধ্যে মিল খুঁজিবার জন্য তাঁহার উৎসাহ ও উদ্যম জাগ্রত হইয়া উঠে। লোকে

যেখানে কোনো মিল দেখে না বৈজ্ঞানিককে সেই স্থানেই মিল আবিষ্কার করিতে হয়।

বৈজ্ঞানিক যে নিয়মের সূত্রে নানা প্রাকৃতিক ঘটনাকে একত্র বাঁধেন সেগুলি এই ঐক্যের অনুসন্ধানের ফলস্বরূপ। এই নিয়মগুলিই একটা ঘটনার সহিত আর একটা ঘটনাকে এবং অতীতের সহিত বর্ত্তমান ও বর্ত্তমানের সহিত ভবিষ্যৎকে বন্ধন করিয়া ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকে একসূত্রে বাঁধে। যে কারণে একবার যাহা ঘটিয়াছে, এখনো সে কারণে তাহাই ঘটে, ভবিষ্যতেও ঘটিবে। দশটি ঘটনা যে সুদৃঢ় নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া ঘটে সেই নিয়মগুলিই বিজ্ঞানের প্রাণ।

এক সময় ছিল যখন লোকে বৃক্ষ হইতে ফলের পতনের কারণ এবং সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পৃথিবীর গতি অব্যাহত থাকার কারণ যে একই তাহা কল্পনাই করিতে পারিত না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক এই দুই ঘটনার মধ্যেও ঐক্য আবিষ্কার করিয়াছেন তাই প্রচারিত হইয়া গিয়াছে যে সৌর জগতের সমস্ত গ্রহ উপগ্রহের গতি যে ক্ষতিরহিত হইয়া অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে মহাকর্ষণই তাহার কারণ। সমগ্র সৌর জগৎটি যে সূত্রে গ্রথিত হইয়া একটি হইয়া আছে তাহা মহাকর্ষণ। পৃথিবীর অতি প্রচণ্ড বেগ সত্ত্বেও যে কারণে ভূপৃষ্ঠস্থ কোনো পদার্থই পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে না তাহাও মহাকর্ষণ। যে শক্তিতে পরমাণুর সম্পাতে অণু এবং অণুর সম্পাতে পদার্থ গঠিত হইয়া রহিয়াছে তাহাও আকর্ষণ। অত্যতি সূক্ষ্ম হইতে অত্যতি বৃহৎ ক্ষেত্রেও সেই এক মহাকর্ষণ শক্তি যে কাজ করিতেছে তাহাই আবিষ্কার করিয়া বিজ্ঞান কি কম ঐক্যের সাধনার পরিচয় দিয়াছে?

জ্যোতির্বিদেরা বলেন, আমরা আকাশে যে সকল নক্ষত্র দেখিতে পাই তাহাদের প্রত্যেকটিই এক একটি সূর্য্য। তাহাদের এক একটির চারিদিকে তাহাদের আপন আপন গ্রহগুলি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এ কথাও অসম্ভব নহে। এমন কথাও বলা হয় যে গ্রহ উপগ্রহ সহ আমাদের এই সৌর জগৎটি এমনিতর আরো কত কত জগতের সহিত কোনো এক অজ্ঞাত বৃহত্তর সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। নক্ষত্রগুলি আমাদের নিকট হইতে এত দূরে যে সে গুলির কোনোটিরই সহিত সৌর জগতের কোনো সম্পর্ক আজো স্থাপিত হইতে পারে নাই। এইটা হইলে বিশ্বাকাশকে একই সূত্রে গ্রথিত দেখিতে পাইতাম। একদিন ছিল যখন কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই যে একটি মাত্র কারণে সৌর জগৎ এক হইয়া আছে এবং তাহার প্রতি অংশেরই গতি এরূপ নিয়মবদ্ধ; কিন্তু আজ সেটাও যে সত্য তাহাতে আমাদের কোনো সন্দেহ উপস্থিত হইবার আর অবকাশ মাত্র নাই। একদিন হয়তো জানা যাইবে যে মহাকর্ষণই একমাত্র শক্তি যাহাতে কেবল সৌর জগৎ নহে, সমগ্র বিশ্বযন্ত্র সুনিয়মে চলিতেছে। তখন সৌরজগৎকে বিশ্বের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে আবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যাইবে। তখন দশ বিশটা পদার্থের মধ্যে যে ঐক্য দেখিয়া আমরা এত আনন্দ লাভ করিতেছি তাহাই আরো প্রসারতা লাভ করিয়া একটা মহা ঐক্যরূপে আমাদের নিকট প্রতিভাত হইবে।

জীব জগতেও এমনিতর একটা সত্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, কিন্তু এখনো কোনো কথা জোরের সহিত বলিবার সামর্থ জন্মে নাই। দারউইন্ বানরত্বকে মানুষের পূর্ব্বাবস্থারূপে নির্দ্দেশ করিয়া এই দুইটি জীবের মধ্যে একটি সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি আর অগ্রসর হইতে পারেন নাই।

দারউইনের পথে আজো কোনো মহা-ঐক্যে উপস্থিত হইতে পারা যায় নাই সত্য এবং মহাকর্ষণের ভিতর দিয়াও আমরা কোনো পরম ঐক্যকে দেখি নাই সত্য কিন্তু আর এক স্থানে বৈজ্ঞানিক ঐক্যের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। সমগ্র জগৎকে তিনি এক করিয়া দেখিতে পারিয়াছেন।

এতদিন এইটুকু মাত্র জানিতাম যে পরমাণুর সম্পাতে অণু এবং অণুর সম্পাতে পদার্থ গঠিত হইয়াছে। এক সময় ছিল যখন অণুতেই আমাদের গতিবিধি শেষ হইত, আরো সূক্ষ্মতায় যাওয়া কাহারো সাধ্য ছিল না। এ গণ্ডী এখন উত্তীর্ণ হওয়া গিয়াছে। বিজ্ঞান এই এক সত্য প্রচার করিয়াছে যে, ভৌতিক পদার্থের অণুগুলি অভৌতিক পদার্থের সম্পাতে গঠিত। সাধারণত যে যে গুণ থাকিলে আমরা কোনো কিছুকে পদার্থ বলি এই অভৌতিক পদার্থ গুলিতে সেগুলির কোনোটিই নাই। এ গুলি শক্তিকণা। সকল বস্তুরই অণু এই শক্তিকণার সম্পাতে গঠিত। এই সম্পাতের বিশেষত্ব অনুসারে পদার্থের মধ্যে বিশেষত্ব জন্মে। স্বর্ণ যাহা, রৌপ্যও তাহাই, আবার সামান্য অঙ্গার খণ্ডের উপাদান ও সেই একই শক্তি। একই এই জগতের উপাদন। ভূলোক, ভুবলোক এবং অন্তরীক্ষ একই শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ।

বিজ্ঞান এই এক শক্তিকে জগতের উপাদানরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারিয়া ঐক্যের সাধনায় সিদ্ধির সংবাদ দিয়াছে। বিপুলভাবে এককে উপলব্ধি করিয়া বৈজ্ঞানিক কবির সহিত তাহার দ্বন্দ্ব মিটাইয়া ফেলিয়াছে এবং উভয়েই বলিতে আরম্ভ করিয়াছে—এই বৈচিত্র্যময় বিশ্বের মূল এক।

বর্ত্তমান যুগ আমাদিগকে একটি একটি করিয়া বৃহৎ হইতে বৃহত্তর উপলব্ধির মধ্যে লইয়া যাইতেছে। যে বিজ্ঞানকে এতদিন আধ্যাত্মিকতার শত্রু বলিয়া লোকে মনে করিত সেই আজ এমন এক নূতন বাণী প্রচারিত করিয়াছে যে তাঁহাতে ভগবদ্ভক্তের ঈশ্বরোপলব্ধি স্বতই সায় পাইতেছে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সীতারাম।

সীতারামের ক্রীড়াক্ষেত্র, প্রতাপাদিত্যের লীলাস্থল, সেই সোণার যশোহর আজ আর নাই। যে যশোহর একদিন সহস্র সহস্র যোদ্ধার হুঙ্কারে নিত্য মুখরিত হইত, অসি যষ্টি ও বন্দুক ক্রীড়ায়, মগ, ফিরিঙ্গি, পাঠান ও মোগলের ভীতি সঞ্চারিত করিত, সুপ্রসিদ্ধ গৌড় নগরীর যশহর—করিয়াছিল বলিয়া যাহা যশোহর নামে প্রখ্যাত হইয়াছিল, যথাকার প্রতি পল্লী—প্রতাপাদিত্য ও সীতারাম নির্ম্মিত, গোবিন্দদেব, লক্ষ্মীনারায়ণ ও

কালী, দুর্গা প্রভৃতি দেবদেবীর উচ্চ শীর্ষ মন্দিরাবলীতে সুশোভিত ছিল, যেখানকার পল্লী, ছত্র, দেবমন্দির সমূহ একদিন লক্ষ লক্ষ যাত্রী ও অতিথিকে চর্ব্বচোষ্য লেহ্যপেয় আহারাদি দ্বারা পরিতুষ্ট করিত, প্রতাপ এবং সীতারামের সুবিখ্যাত সেই রাজধানী আজ আর নাই। এখন তাহার কতক অংশ সমুদ্র গর্ভে নিহিত, কতক অংশ বা গভীর অরণ্যে পরিণত; অবশিষ্ট যেটুকু আছে, তাহা ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণ সামান্য পল্লীগ্রাম মাত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

আজ সে রামও নাই—সে অযোধ্যাও নাই—আছে কেবল তাহার ক্ষীণ স্মৃতিটুকু।—সেই স্মৃতিটুকু লইয়াই আমরা ধন্য। ইতিহাসের উজ্জ্বল অক্ষরে সেই ক্ষীণ আলোকটুকুও যদি স্থায়ী করিতে পারি তবেই আমাদের প্রয়াস সার্থক হইবে।

দুঃখের বিষয় অতীত ইতিহাস এ সব কথা বড় বলে না। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ এ সকল বীরের কথা ফুৎকারে নির্ব্বাণের চেষ্টা করিয়াছেন। তাই সীতারামের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ আমরা যশোহরবাসী জানি না। কেহ কেহ বলেন যে ১৭১২ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে তাঁহার মৃত্যু হয়। ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব তাঁহার "যশোহরের বিবরণী"তে তাহাই লিখিয়াছেন। আবার কেহ কেহ বলিতে চান যে সীতারাম ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্তও জীবিত ছিলেন। শেষোক্ত পক্ষীয় ব্যক্তিগণ Long's Selections from the records of Government নিম্নোদ্ধৃত কয়েকখানি পত্রের উপর নির্ভর করিয়াই ঐ কথা বলেন।

"যে পত্রে আপনি রোজ সাহেব নামক ইংরাজ সওদাগরের নৌকা লুট ও তাঁহার মৃত্যুর কথা লিখিয়াছেন সে পত্র আমার হস্তগত হইয়াছে। বাখরগঞ্জের নিকট যে তাঁহাকে মারিয়া ফেলা হইয়াছে এবং ডাকাইতগণ যে সীতারামের জমিদারীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে তাহাও আপনার পত্রে অবগত হইয়াছি। আপনার অনুরোধানুযায়ী যাহাতে উক্ত জমিদার ঐ লুষ্ঠিত সম্পত্তি ফেরত দেন ও ঐ অঞ্চলে যাহাতে আর দস্যুভয় না থাকে তজ্জন্য বন্দোবস্ত করিতে সৈয়দ রেজা খাঁকে অদ্য পত্র দিয়াছি।" (কলিকাতার শাসনকর্ত্তার নামে নবাবের পত্র) [প্রথম খণ্ড ৩৬১ পৃষ্ঠা]। ঐ খণ্ডের ৩৮৭, ৩৮৮ এবং ৩৮৯ পৃষ্ঠায় পুনরায় এই ঘটনার উল্লেখ আছে। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দের ১৪ই নবেম্বর তারিখে গবর্ণর মহাশয় নবাবকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহারও মর্ম্ম এইরূপ—"পূর্ব্বেই আপনাকে রোজ সাহেবের নৌকা-লুট ও তাঁহার মৃত্যুর কথা এবং দস্যুগণ যে সীতারামের জমিদারীতে আশ্রয় লইয়াছে তাহাও বলিয়াছি। আমি একজন ইংরাজকে এই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে সীতারামের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম কিন্তু উক্ত জমিদার এই দূতকে গ্রাহ্য করেন নাই!" এইত গেল এক কথা।

দ্বিতীয়তঃ, ৺কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয় একটী প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন যে, সীতারামকে ধৃত করিবার জন্য যে সৈন্যবাহিনী প্রেরিত হয় তাহার সহিত দয়ারাম প্রেরিত হইয়াছিলেন। এবং সীতারামের পরাজয়ের পর দয়ারাম নবাব কর্ত্তৃক পুরস্কৃত হইয়া-

ছিলেন। (কলিকাতা রিভিউ ১৮৮৩ সনের জানুয়ারী)। লং সাহেবের পুস্তকে উপরোক্ত রোজ সাহেবের মৃত্যু-ঘটনা বিবৃত হওয়ার অব্যবহিত পরেই দয়ারাম সংক্রান্ত একটী ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী তারিখে গবর্ণর কর্ত্তৃক লিখিত পত্রে জানা যায় যে কাশীমবাজার কুঠীর অধ্যক্ষ উইলিয়ামসন্ গবর্ণরকে অবগত করিয়াছিলেন যে, রামপুর-বোয়ালিয়া হইতে নৌকাযোগে কোম্পানির ১০০ শত মণ রেশম আসিতেছিল কিন্তু দয়ারাম ঐ রেশম আটক করেন। এই সকল ঘটনা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে সীতারাম এই সময় পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। অর্থাৎ, উপর্য্যুক্ত সীতারাম যদি আমাদেরই সীতারাম হন, তবে বলিতে হইবে যে কোম্পানির দেওয়ানী সনন্দ প্রাপ্তির ২১ বৎসর পূর্ব্বেও তিনি জীবিত ছিলেন। আমরা দেখাইতে চেষ্ট করিব যে তাহা সম্ভবপর নহে।

প্রথমতঃ সীতারাম মুর্শীদকুলীখাঁর আমলেই সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মুর্শীদকুলিখাঁ ১৭০৪ হইতে ১৭২৫ পর্য্যন্ত বাংলার গদী উপভোগ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ, সীতারাম তাঁহার দেওয়ান যদু মজুমদারকে যে সনন্দ প্রদান করেন তাহাতে ১১১৪ সনের ২৫ বৈশাখ তারিখ আছে। এই বাংলা তারিখ ইংরাজী ১৭০৭ খৃষ্টাব্দ।

তৃতীয়তঃ, সীতারাম-প্রতিষ্ঠিত দশভূজা মন্দিরে নিম্নলিখিত কবিতা লিখিত ছিল—

"মহীভুজরসক্ষৌণীশকে দশভুজালয়ং
অকারি শ্রীমতাসীতারামরায়েণ মন্দিরং।"

অর্থঃ—মহী এই স্থলে '১'র পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। মহী বা পৃথিবী মাত্র একটী—সেইজন্য মহী=১

ভুজ—এই স্থলে '২'র পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। ভুজ বলিতে দুই বা দুই বুঝায় সেইজন্য ভুজ=২

রস—এই স্থলে '৬'র পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। রস ছয়টী। সেইজন্য রস=৬

ক্ষৌণী—এই স্থলে (১)র পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। ক্ষৌণী বা পৃথিবী মাত্র একটী—সেইজন্য ক্ষৌণী=১।

ইহা হইতে আমরা ১,২,৬,১, এই অঙ্ক চারিটী সজ্জিত করিয়া ১২৬১ শকে যে এই মন্দিরটী প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারি। ১২৬১ শক ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে আরম্ভ হইয়াছিল।

লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরে নিম্নলিখিত শিলালিপি ছিল।

"লক্ষ্মীনারায়ণস্থিত্যৈ তর্কাক্ষিরসভূমিতে
নির্ম্মিতং পিতৃপুণ্যার্থে সীতারামেণ মন্দিরং।"

অর্থাৎ তর্ক (ন্যায় (৬)), অক্ষি (২,), রস (৬), ভূমি (১) হইতে আমরা ১৬২৬ শকের নিদর্শন পাই। এই শক ১৭০৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে আরম্ভ হইয়াছিল। তাহা হইলেই আমরা দেখিতে পাইতেছি যাঁহারা ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সীতারামকে টানাটানি করিতে চান, তাঁহাদের যুক্তি ভ্রমসঙ্কুল।

ঐতিহাসিক ষ্টুয়ার্ট সাহেব তাঁহার "বাংলার ইতিহাসে" সীতারামের নিম্নলিখিত কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা ষ্টুয়ার্টের বর্ণিত কাহিনীর স্থূলবৃত্তান্ত পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিলাম।

"আবু তোরাব নামক একজন সদ্বংশজাত ওমরাহ বঙ্গদেশের অন্তর্গত ভূষণার ফৌজদার নিযুক্ত ছিলেন। সেই সময়, ভূষণার নিকট সীতারাম নামক একজন অবাধ্য জমিদারের অধীনে অনেকগুলি দস্যু থাকিত। সীতারাম ইচ্ছানুযায়ী নিজ লোকজন সহায়তায় ডাকাতী করিতেন। আবুতোরাব এই দুর্দান্ত দস্যু দমন মানসে নবাবের সাহায্য প্রার্থনা করা

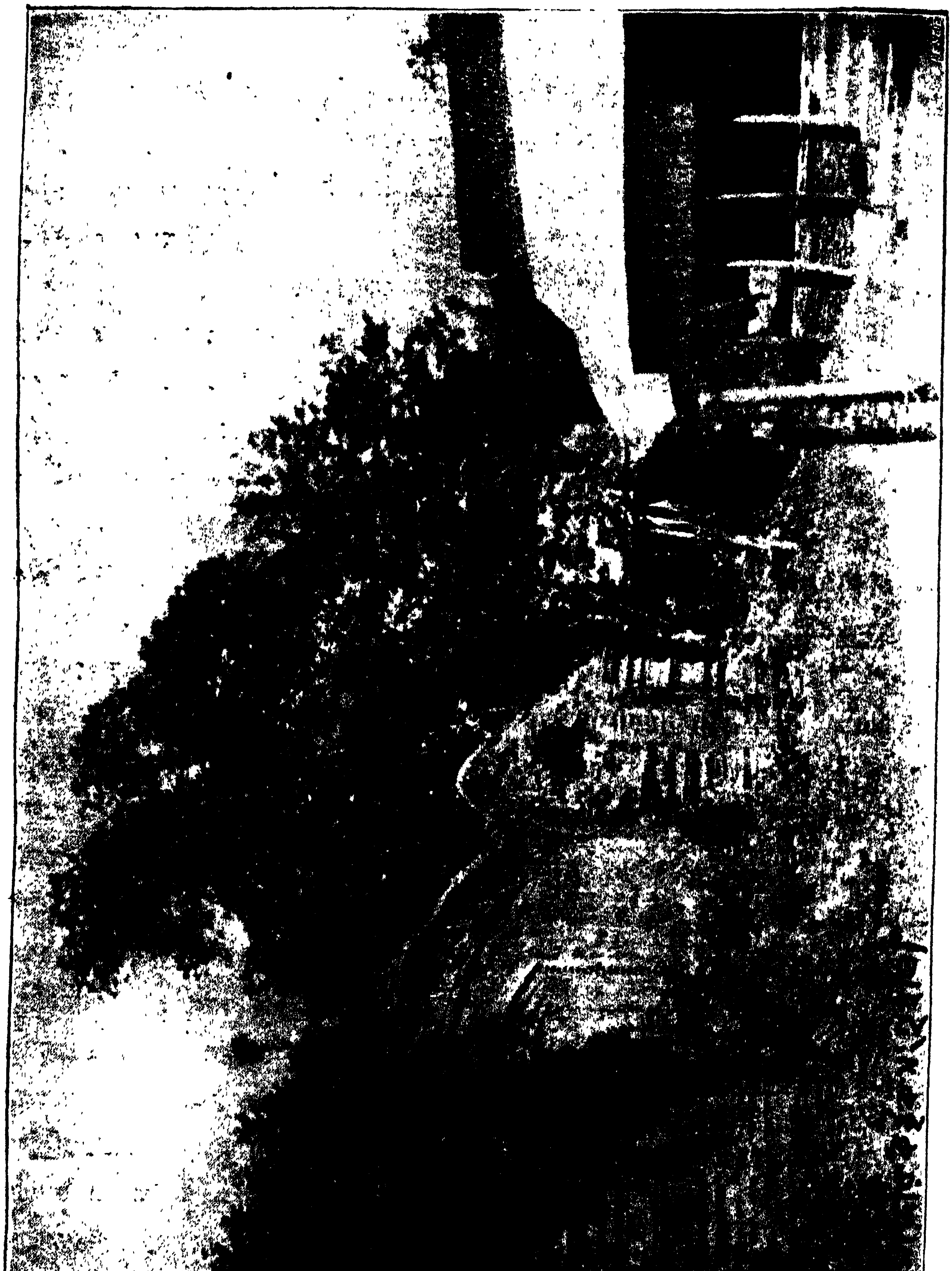

নলডাঙ্গা মন্দির।

সত্ত্বেও নবাব তাঁহাকে কোন সাহায্য প্রদান করেন নাই। অবশেষে, এই দস্যুকে ধৃত করিবার জন্য ফৌজদার পিরখাঁ নামক তাঁহার একজন সেনাপতিকে প্রেরণ করেন। সীতারাম এই সংবাদ পাইয়া নিজ আড্ডা পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করেন

লক্ষ্মীনারায়ণ।

ঘটনাচক্রে ফৌজদার আবু তোরাব এই স্থলেই মৃগয়ার্থ আগমন করিয়াছিলেন এবং সীতারাম পৌছিবার পূর্ব্বেই তাঁহার অধীনস্থ দস্যুগণ আবু তোরাবকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার মুণ্ডচ্ছেদ করে। সীতারাম এই ঘটনায় অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়েন এবং আবুতোরাবের মৃতদেহ তাঁহার অনুচরগণের নিকট প্রত্যর্পণ করেন। আবুতোরাবের অনুচরগণ মৃতদেহ ভূষণার নিকটেই কবর দেয়।

নবাব, আবুতোরাবের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া বক্স ইলাহি খাঁ নামক সেনাপতিকে সীতারামের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন এবং ইলাহি খাঁকে সাহায্য করিবার জন্য নিকটবর্ত্তী জমিদারদিগকে পরোয়ানা প্রেরণ করেন। সীতারাম সপরিবারে ধৃত হইয়া মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হন। সেইস্থানে পৌছিবামাত্র তাঁহার পরিবারবর্গকে বিক্রয় করা এবং সীতারামের মৃত্যুদণ্ড হয়।"

ষ্টুয়ার্ট সাহেব যে বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন তাহা উপন্যাস হইতে পারে কিন্তু আমরা ইহাকে ইতিহাসে পরিগণিত করিতে পারি না। ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব সত্যই লিখিয়াছেন যে "The tanks and temples and ruins at Muhammadpur consist far better with the local legend than with the Muhammadpur account." অর্থাৎ সীতারামকৃত দীর্ঘিকা, মন্দির এবং মহম্মদপুরের ভগ্নাবশেষ দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে সীতারাম সম্বন্ধীয় প্রবাদই সত্য।

ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব * যে বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছেলেন আমরা সেই বৃত্তান্তকেই মোটের উপর সত্য বলিয়া গণ্য করি এবং তাহাই আমরা নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

বঙ্গদেশে এই সময় দ্বাদশটী ভুঁইয়া ছিলেন। এই ভুঁইয়াগণ এক প্রকার স্বাধীন ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না এবং বাদসাহ বা তাহার প্রতিনিধি নবাবকে বিশেষ গণ্যমান্যও করিতেন না বা নিরূপিত রূপে রাজস্বও প্রেরণ করিতেন না। সম্ভবতঃ কোন এক ভুঁইয়াকে শাসন করিবার জন্যই হৌক বা ফতেয়াবাদ স্থিত কোন পাঠান ওমরাহকে দমন করিবার জন্যই হৌক নবাব সায়েস্তাখাঁ কর্ত্তৃক সীতারাম বঙ্গদেশে প্রেরিত হইয়া ছিলেন। তিনি ইহাতে কৃতকার্য্য হওয়াতেই পুরস্কার স্বরূপ নলদী পরগণা লাভ করেন। এবং সম্রাট আউরংজীব তাঁহাকে সনন্দ প্রদান করিয়া রাজা উপাধিতে ভূষিত করেন। সম্রাট প্রদত্ত ফার্ম্মাণসহ সীতারাম মুরশিদকুলি খাঁর নিকট পৌছিয়া রীতিমত নজর দিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলে নবাব তাঁহাকে কয়েক বৎসরের জন্য ঐ সকল ভূমি নিষ্কর দখল করিতে অনুমতি প্রদান করেন। সীতারাম ফিরিয়া আসিয়া মহম্মদপুর নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হন। কি কারণে হিন্দু-কুলতিলক সীতারাম তাঁহার রাজধানী মহম্মদপুর নামে আখ্যাত করেন তাহা ঠিক

* Mr. Blochman supposes him to be one of the descendants of successors of the equally notorious Mokund, who possessed the Sirkar of Fathabad and Pergunna of Bhoosna..—Ibid.

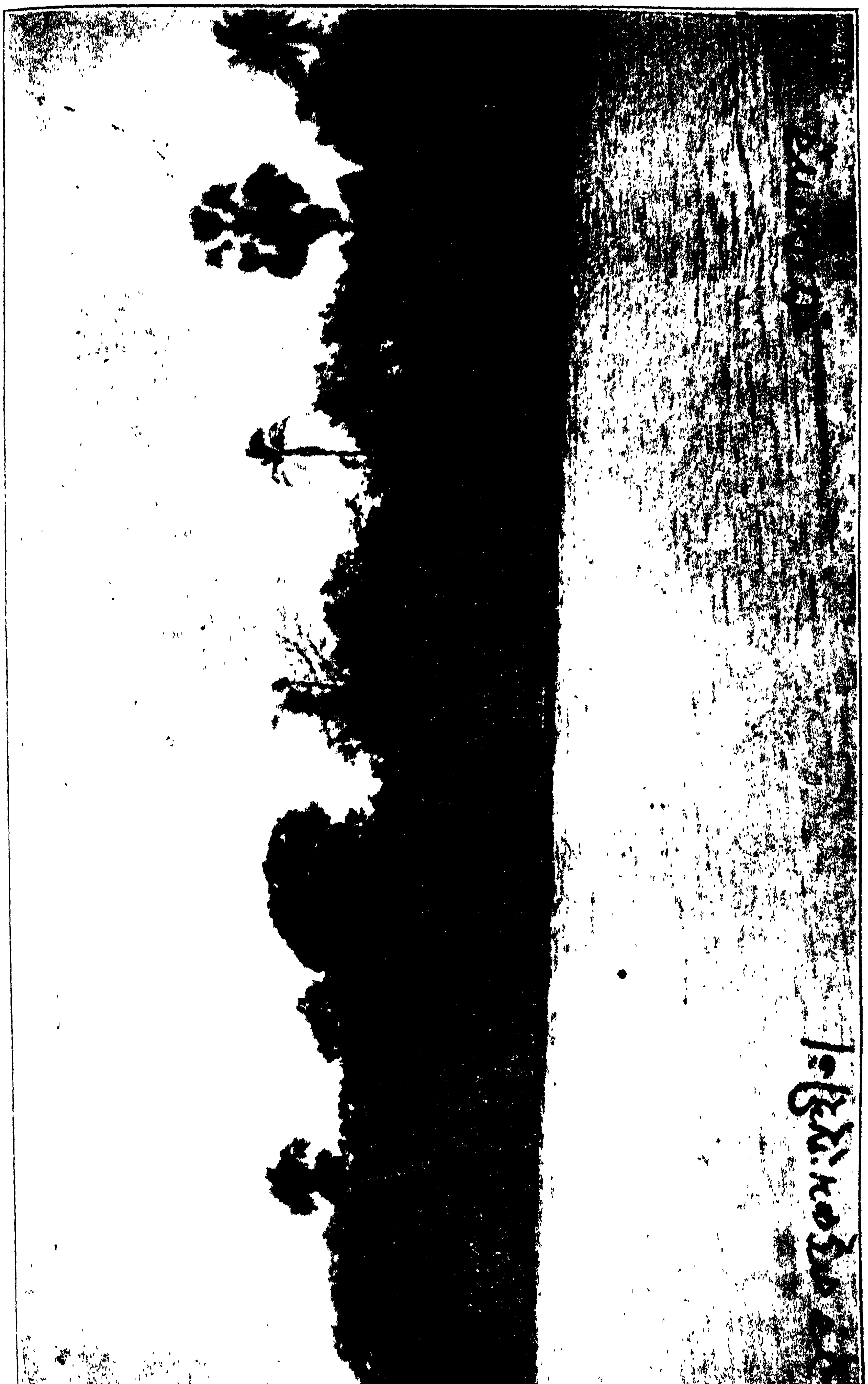

রামসাগর।

জানা যায় না। ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেবের মতে সীতারাম যেস্থানে নিজ প্রাসাদ নির্ম্মাণে মনস্থ করেন, সেই স্থানে এক ফকীর বাস করিতেন। সীতারাম ফকীরকে ঐ স্থান পরিত্যাগে অনুরোধ করিলে ফকীর অস্বীকার করেন। পরে, অনেক অনুরোধ উপরোধে স্থান পরিত্যাগে স্বীকৃত হন কিন্তু সীতারাম ফকীরের নামানুযায়ী ঐ স্থান মহম্মদপুর নামে আখ্যাত করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন। জনশ্রুতি এইরূপও শোনা যায় যে, মহম্মদ আলি নামক এক ফকীর সীতারামকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন ও আবশ্যক মত উপদেশাদি প্রদান করিতেন। নব-রাজ্য সংস্থাপনোদ্যত সীতারামকে তিনি উপদেশ দিলেন যে সীতারাম হিন্দু হইয়া যদি মুসলমান-পয়গম্বরের নামে নগর প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা হইলে মুসলমান প্রজাও সন্তুষ্ট হইবে। এই নূতন রাজা যে হিন্দু মুসলমান উভয়কেই অপত্যনির্ব্বিশেষে ও নিরপেক্ষভাবে দেখিবেন, ইহা তাহারা বুঝিবে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাস সীতারামে এই মতই অবলম্বন করিয়াছেন।*

প্রচলিত জনশ্রুতি এই যে, সীতারামের পিতা উদয়নারায়ণ একদিন অশ্বারোহণে এই স্থান দিয়া যাইবার সময় তাঁহার অশ্বক্ষুর কর্দ্দমে প্রোথিত হইয়া যায়। বহুকষ্টে অশ্বপদ কর্দ্দম হইতে উঠান হইলে দেখা গেল যে অশ্বক্ষুর ত্রিশূলে বিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এবং অনুসন্ধানে লক্ষ্মীনারায়ণ শিলাও এইস্থানে পাওয়া গেল। অন্য একটী প্রবাদ এইরূপ যে সীতারামের অশ্বই এই ত্রিশূলে আবদ্ধ হইয়া যায় এবং সেইজন্য সীতারাম এই স্থলেই রাজধানী ও দুর্গ নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন।

সীতারাম রাজা হইয়া অন্যান্য ভূঁইয়াদের নিকট হইতে রাজকর আদায় করিতে আরম্ভ করেন। মেনাহাতী, বক্তার, ফকীর মাছকাটা, রূপচাঁদ ঢালি প্রভৃতি সৈনিকদিগের তত্ত্বাবধানে তাঁহার বহু সৈন্যদল সুশিক্ষিত হইয়া উঠিল। সাধারণতঃ নিকটবর্ত্তী জনপদ সমূহ হইতেই এই সৈন্যদল গঠিত হইয়াছিল। সীতারামের সৈন্যদলমধ্যে ক্ষত্রিয়েরও অভাব ছিল না। মহম্মদপুরের নিকটবর্ত্তী ২।১টী স্থলে এখনও ক্ষত্রিয় বাস আছে।

এই অঞ্চলে তখন আবুতোরাব নামক এক ব্যক্তি নবাবের প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি সীতারাম রায়ের উন্নতি সহ্য করিতে পারিলেন না। গৃহশত্রু সীতারামের উকীলও গোপনে আবুতোরাবকে সকল অভিসন্ধি প্রকাশ করিয়া দিতে লাগিলেন। ফলে,

* "The ruins at Mohamadpur called after Mahmud Shah, the twelfth king of Bengal wrongly designated by Mr. Westland Muhammadpur. They all belong to the period of Sitaram Rai, the notorious Zeminder of Bhoosnah, styled by the writer of the Report Raja"...Calcutta Review CXXV. রেণী সাহেবের এ বাক্যোক্তিতে ঐতিহাসিক সত্য পাওয়া যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র সীতারাম উপন্যাসে যে ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ করিয়াছেন ইহা সকলেই অবগত আছেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী মহাশয় সীতারাম্ নামে এক নাটক লিখিয়াছেন। তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে "সন্তোষ রঙ্গমঞ্চে" ইহার অভিনয়ও দেখিয়াছি। নাটকখানি প্রকাশিত হইলে সীতারাম সম্বন্ধে আমরা আরও কিছু নূতন নূতন বিষয় জানিতে পারিব।

আবুতোরাব দলবলসহ সীতারামকে আক্রমণ করিলেন। সীতারাম প্রস্তুত ছিলেন। এ যুদ্ধে বাঙ্গালীর নিকট আবুতোরাব পরাস্ত হইলেন। তাঁহার অবিমৃষ্যকারিতার ফলস্বরূপ মেনাহাতী তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া সীতারামকে উপহার প্রদান করিলেন। বক্স ইলাহিখাঁর অধীনে আবার সৈন্য প্রেরিত হইল। সীতারাম এই যুদ্ধে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ

সীতারামের দুর্গাবশেষ।

কালা খাঁ ও ঝুমঝুম খাঁ নামক ২টী কামান দ্বারা মুসলমানবাহিনী বিধ্বস্ত করিয়া দিলেন। জয়শ্রী সীতারামকে জয়মাল্য দিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করিলেন না।

এই দুই যুদ্ধের ফলে সীতারাম বিদ্রোহী বলিয়া পরিগণিত হইলেন। তাঁহার "মস্তকের জন্য" পুরস্কার ঘোষিত হইল এবং সীতারামকে সমূলে দলন করিবার জন্য সিংহরাম নামক এক প্রথিতনামা সেনানী প্রেরিত হইলেন। গুপ্তচরে সিংহরামকে সংবাদ দিল যে মেনাহাতী যতদিন জীবিত আছেন ততদিন সীতারাম অপরাজেয়। তাই মেনাহাতী একদিন যখন দোলমঞ্চ সমীপে সন্ধ্যা করিতেছিলেন, তখন তাঁহাকে সিংহরাম সমীপে আনয়ন করা হইল। নিরস্ত্র বীর আত্মরক্ষায় সক্ষম হইলেন না। প্রবাদ এই, মেনাহাতী নিজ শরীরে গুপ্তভাবে একপ্রকার ঔষধ ধারণ করিতেন। সেই ঔষধপ্রভাবে কোনপ্রকার অস্ত্রই তাঁহার শরীরে ক্ষত করিতে পারিত না। কিন্তু বেদনা নিবারণের কোন উপায় তিনি জানিতেন না। তাই যখন শত্রুপক্ষীয় সৈনিকগণ তাঁহাকে অস্ত্র দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল, তখন যন্ত্রণায় অধীর হইয়া তিনি ঔষধের কথা ব্যক্ত করিয়া দিলেন। ইহাতেই তাঁহার মৃত্যু হইল। তাঁহার ছিন্নশির নবাব সমীপে প্রেরিত হইলে নবাব এরূপ বীরের এই শোচনীয় মৃত্যুতে আক্ষেপ করিয়া বলিলেন যে ইঁহাকে জীবন্ত ধৃত করিয়া আনাই সমীচীন ছিল।

মেনাহাতীর এই আকস্মিক মৃত্যুতে সীতারাম মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তত্রাপি তিনি সিংহরামকে যুদ্ধে পরাস্ত করিলেন। দুঃখের বিষয়, তিনি সিংহরামকে পরাস্ত করিলেও তাঁহার গতিরোধ করিতে পারিলেন না। সিংহরাম তাঁহার দুর্গাধিকার করিলেন।

সীতারামের মৃত্যু কাহিনীর সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। কেহ কেহ বলেন যে দুর্গ আক্রমণ কালে সীতারাম বীরের ন্যায় মুসলমান বাহিনীর গতিরোধ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। অন্য প্রবাদ, ফকীর মহম্মদ আলি তাঁহার এক শিষ্যকে সীতারামের রাজপোষাকে সজ্জিত করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছিলেন। শিষ্য মৃত্যুমুখে পতিত হইলে মুসলমানসৈন্যগণ সীতারাম হত হইয়াছেন ইহা মনে করিয়া আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া পড়িলে ফকীর সীতারামকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে স্থানান্তরে লইয়া শুশ্রূষা করিয়া তাঁহাকে জীবন দান করেন।

আমরা সংক্ষেপে সীতারাম সম্বন্ধে কয়েকটি কথা লিখিবার প্রয়াস পাইয়াছি। কিন্তু মহাপুরুষের কাহিনী সামান্য কয়েক পৃষ্ঠায় বিবৃত করা সম্ভবপর নহে। বারান্তরে এই বীরের কাহিনী আরও পর্য্যালোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। অন্য কেহ সীতারাম ও যশোহরের লুপ্ত কাহিনী উদ্ধারে আমাদিগকে সাহায্য করিলে আমরা কৃতার্থ বিবেচনা করিব।*

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

---

* বহু দিন পূর্ব্বে যশোহরের ইতিহাসের জন্য উপকরণ সংগ্রহে ব্যাপৃত ছিলাম। গৃহদাহে সবই ভস্মীভূত হইয়াছে। আবার এই দুরূহ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার বাসনা জাগিয়াছে। কিন্তু সমগ্র যশোহরবাসীর আন্তরিক ইচ্ছা ও অনুগ্রহ ব্যতীত এ কার্য্য অসম্ভব—তাই সকলের নিকট আমরা সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি।

তরু দত্ত।

"Full many a flower is born to
blush unseen,
And waste its sweetness on the
desert air." Gray.

কবি তরু দত্তের নাম অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে কিছু বলা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, তাঁহার কবিতার সহিত আমরা বঙ্গীয় পাঠকের পরিচয় সাধন করিব মাত্র।

তরুবালা ১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতায় রামবাগানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা গোবিন্দচন্দ্র দত্ত মহাশয় শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। অব্জু, অরু এবং তরু তিন ভগ্নী, তন্মধ্যে তরু সর্ব্ব-

কনিষ্ঠা। তের বৎসর বয়সে তরু পিতার সহিত য়ুরোপ ভ্রমণে গমন করেন এবং ফ্রান্স ও কেম্ব্রিজে কিছুকাল অধ্যয়ন করেন। তিনি পাঁচ বৎসর য়ুরোপে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বিদেশ ভ্রমণের এরূপ সুযোগ কুমারী তরুর ন্যায় অপর কোন ভারত রমণীর ভাগ্যে সচরাচর ঘটে না। য়ুরোপে অবস্থানকালে তিনি তাঁহার ভ্রমণের বিস্তারিত বিবরণ দৈনিক লিপিতে লিপিবদ্ধ রাখিতেন। অতি অল্প বয়স হইতেই তিনি সুন্দর পিয়ানো বাজাইতে ও গান করিতে পারিতেন; এবং তাঁহার অসাধারণ স্মরণ শক্তি ছিল। বাল্যকাল হইতেই তিনি বিভিন্ন ভাষায় লিখিত নানা গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে বড় ভালবাসিতেন। তিনি সেক্ষপিয়র, মিল্টন, গেটে, ভিক্টর হিউগো, ব্রাউনিং প্রভৃতির কাব্য পাঠ করিতেন। সংস্কৃত ও ফরাসী ভাষায় লিখিত বহু কবিতা ও গল্প তিনি ইংরাজী ভাষায় অনূদিত করিয়াছিলেন। বিদেশীয় ভাষা সুন্দররূপে আয়ত্ত করা ও সেই ভাষায় গ্রন্থ প্রণয়ন করা অত্যন্ত কঠিন কার্য্য। মিল্টন ইতালীয় ভাষায় এবং সুইনবর্ণ ফরাসী ভাষায় কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। পরদেশীয় ভাষায় উচ্চশ্রেণীর কবিতা রচনা করার দৃষ্টান্ত সাহিত্য জগতে অপর এই দুইটী ভিন্ন আর বড়-একটা দেখা যায় না। তরুবালা ইংরাজী ভাষায় বহু কবিতা লিখিয়া আপনাকে চিরস্মরণীয়া করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে অধিকদিন এ সংসারে রাখিলেন না। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে, ২১ বৎসর মাত্র বয়সে, তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার এই অকালমৃত্যুতে অমর কবি Keats এর কথা মনে পড়ে। তরুর নিজের ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয়—

"A creature of the starry skies,
Too lovely for the earth to keep."

তরুদত্তের বাল্যরচিত কবিতার কতকগুলি উল্লেখ-যোগ্যও নহে। কতকগুলি নিতান্ত অপরিপক্ক, গাম্ভীর্য্য-বিহীন, এবং দোষ বহুল। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাবের কিরূপ বিকাশ হয় তাঁহার কবিতা হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনের শেষভাগে লিখিত কবিতাবলী হইতে যথার্থ কবিত্ব-রসের আস্বাদ যথেষ্ট পরিমাণেই পাওয়া যায়। ইংরাজী সাহিত্যের পাঠকেরাও জানেন সেক্ষপিয়রের 'Midsummer Night's Dream' এবং 'Hamlet'এ রচনার কিরূপ প্রভেদ। সকল কবির সম্বন্ধে এই একই কথা খাটে।

তবে এ কথা বলা যাইতে পারে যে বাল্যাবস্থা হইতেই তাঁহার রচনায় কবিত্বের একটা লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। তাঁহার রচনা স্বতঃই সরল, অনাড়ম্বর এবং কবিতার ছন্দ মধুর ও সাবলীল।

'Ancient Ballads and Legends of Hindustan' নামক গ্রন্থটীতে হিন্দুদিগের কতকগুলি পুরাতন গল্প মধুর ছন্দে বর্ণিত হইয়াছে। কোন্ হিন্দু রমণী না সাবিত্রীর উপাখ্যান পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হন? তরু দত্ত এইরূপ বহু প্রচলিত ভারতীয় গল্প তাঁহার সুললিত ভাষায় নূতনতর করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

'Royal Ascetic and the Hind' কবিতায় নির্জ্জন কাননে কিরূপে একজন বানপ্রস্থাবলম্বী সম্রাটের মন একটী মৃগশাবকের

প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহাই বর্ণনা করিয়া কবি মানব হৃদয়ের স্বাভাবিক স্নেহপ্রবণতার একটী হৃদয়গ্রাহী চিত্র প্রদান করিয়াছেন। সম্রাটের মৃত্যুকালে মৃগশিশুটী সজলনয়নে, পিতার মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে মলিনমুখ শিশুরই ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে! কি সুন্দর প্রাণস্পর্শী বর্ণনা! কবির প্রতিপাদ্য, কেবল কঠোর শারীর নির্য্যাতন দ্বারা দয়ার আধার ঈশ্বরকে পাইবার চেষ্টা করা ভুল। গল্পের এই মর্ম্মার্থটুকু শেষে সুন্দররূপে কয় ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"Not in seclusion, not apart from all,
Not in a place elected for its peace,
But in the heat and bustle of the world,
'Mid sorrow, sickness, suffering, and sin,
Must he still labour with a loving soul
Who strives to enter through the narrow gate."

তাঁহাকে পাইতে হইলে সংসারের দুঃখ, দৈন্য, বেদনা সমস্তই বরণ করিতে হইবে। তিনিই সমস্ত, কাজেই সমস্তকে স্বীকার না করিলে তাঁহাকে স্বীকার করা হয় না, তাঁহাকে পাওয়াও যায় না।

ধ্রুবোপাখ্যানটী এই মণিকাঞ্চনময় কাব্য-কুসুম মালার একটী উজ্জ্বল রত্ন। বালক ধ্রুব তাহার পিতার ক্রোড়ে উঠিবার আশায় পিতার নিকট গিয়া রাজার প্রিয়া ভার্য্যা মুখরা সুরুচির তাড়নায় ক্ষুব্ধ হইয়া মাতার নিকট ক্রন্দন করিতেছে। সুনীতি তাহাকে বুঝাইলেন—

"The sins of previous lives must bear their fruit."

কিন্তু কর্ম্মফলে মানুষ কষ্ট পায়, ধ্রুবের মন এ কথায় ভুলিল না, তাহার উত্তর কি বীরত্বপূর্ণ!

"There is a crown above my father's crown,
I shall obtain it, and at any cost
Of toil, or penance, or unceasing prayer."

কঠোর অধ্যবসায়, কঠোরতর প্রায়শ্চিত্ত এবং অবিচ্ছিন্ন প্রার্থনা দ্বারা—কিম্বা যেমন করিয়াই হউক সে পিতার মুকুট লাভ করিবেই।

"Well kept the boy his promise made that day!
By prayer and penance Dhruba gained at last
The highest heavens, and there he shines a star!
Nightly men see him in the firmament,"

ধ্রুব আপনার কথা রাখিয়াছিল। স্বর্গলোকের শীর্ষদেশে আজো সে অপূর্ব্ব আলোকে উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিতেছে।

সিন্ধু, বটু, প্রহ্লাদ, সীতা প্রভৃতি কবিতাগুলির ছন্দ যেমন মধুর ভাবও তেমনি সুগম্ভীর! প্রবন্ধবিস্তারের আশঙ্কায় এগুলি হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিবার ইচ্ছা দমন করিতে হইল।

'Our Casurina Tree' কবিতাটি অতি সুন্দর! কবি বলিতেছেন,

"Dear is the Casurina to my soul :
Beneath it we have played ;
though year may roll,
O sweet companions, loved
with love intense,
For your sakes'shall the tree
be ever dear !
Blent with your images,
it shall arise
In Memory, till the hot tears
blind mine eyes !"

কবি অতীত স্মৃতিতে প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্টবন্ধনে আবদ্ধ! গাছটির ছায়ায় কেমন করিয়া একদিন সঙ্গীদের সহিত আনন্দে কাল কাটাইয়াছেন সেই শৈশবের স্বর্গসুখের দিন স্মরণ হওয়ায় গাছটি কবির নিকট কি এক অভিনবরূপে প্রকাশ পাইয়াছে!

তরু দত্তের প্রকৃতি-বর্ণনা বড়ই সুন্দর। 'Ancient Ballads'এর কবিতাবলী পারিজাতকুসুমমাল্যের ন্যায় সদাই নূতন। যত পাঠ করা যায় প্রতিবারই নব নব সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইতে হয়।

'A sheaf gleaned in French fields' নামক গ্রন্থ chateaubriand, Heine, Victor Hugo, Sainte-Beuve, Dupont, Gramont প্রভৃতি নানা বিখ্যাত (অধিকাংশ ফরাসী) কবির অনুবাদ সমষ্টি। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলিই সাহিত্য-জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। অনুবাদের বিশেষত্ব এই যে মূলের ভাব ও সৌন্দর্য্যের কিছুমাত্র হ্রাস না করিয়া কবি নিজের কবিত্বেরও প্রভূত পরিচয় দিয়াছেন।

'The young Captive' (Andre Chenierএর অনুবাদ) কবিতার নায়িকার চক্ষে মানবজীবনই সৃষ্টিকর্ত্তার শ্রেষ্ঠ দান। তাহার উক্তি কি কারুণ্যে পূর্ণ—

"At the banquet of life
I have barely sat down,
My lips have but pressed
the bright foaming Crown
Of the wine in my cup
bubbling high.
* * *
O Death, thou canst wait ;
leave, leave me to dream ;
* * *
The world has delights,
the Muses have songs,
I wish not to perish too soon"

সে আজো জগৎপিতার শ্রেষ্ঠ দানটির সদ্ব্যবহার করিয়া উঠিতে পারে নাই, এখনো যে সে যাইবার জন্য প্রস্তুত হয় নাই! কবির নিজের জীবনদীপটি এমনি অকালে নিভিয়া গিয়াছিল!

ভিক্টর হিউগোর 'Universal Republic' কবিতা বেশ সুচারুরূপে অনূদিত হইয়াছে। ইহাতে টেনিসনের "Parliament of man, the Federation of the world"এর মত মানবের ভবিষ্যৎ ভ্রাতৃভাবের কথা সুন্দররূপে বর্ণিত আছে।

"Rancour and hatred are effaced
One picture in all hearts is traced,
One purpose animates all minds ;
Equality—no king, no chief."

পাঠ করিলে Shelleyর ছত্রগুলি মনে পড়ে—

"The loathsome mask has fallen,
the man remains—
Sceptreles, free, uncircumscribed,
but man :
Equal, unclassed, tribeless,
and nationless."

সমস্ত স্বাতন্ত্র্যের ভাব চলিয়া গিয়াছে। কোথাও আর বাধা নাই; শাসকের দণ্ড কোথায় খসিয়া পড়িয়াছে! বিশ্বে আর শ্রেণী নাই, জাতি নাই—সকলেই সমান!

'To a bereaved mother' (Jean Reboul এর অনুবাদ) কবিতায় শোকাকুলা মাতাকে পৃথিবীতে অবিমিশ্র সুখ পাওয়া যায় না—"চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ" প্রভৃতি কথায় দেবদূত শান্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন—

"Here never is an unmixed joy,
Distinct from suffering and from pain,
Nothing, alas, without alloy;
No smile but has its sigh again.

বাল্যকালাবধি তরুবালার আকাঙ্ক্ষা ছিল যে তিনি একখানি উপন্যাস রচনা করিবেন এবং চিত্রবিদ্যাকুশলা ভগ্নী অরুবালা তাহার চিত্র অঙ্কন করিবেন। এই উপন্যাসখানি ফরাসীভাষায় এবং দৈনিকলিপির আকারে লিখিত হইয়াছে। ইহা ফরাসীদেশের একটি চিত্র, এবং নায়কনায়িকাগণও সেই দেশীয়। এখানি এখনও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই।

ইংরাজদিগের মধ্যে Elizabeth Barrett Browning প্রভৃতি অনেক মহিলা স্বীয় ভাষায় কাব্য রচনা করিয়া যশোলাভ করিয়াছেন। একজন বঙ্গ-মহিলা যে ইংরাজী ও ফরাসীভাষায় এরূপ কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহা ভারতের পক্ষে অল্প গৌরবের কথা নহে। সুবিখ্যাত সাহিত্য সমালোচক Edmund Gosse তরুবালার 'Ancient Ballads' গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে বিদেশীয় সাহিত্যে তরুবালার স্থান কত উচ্চে।

শ্রীদেবাংশুনাথ চক্রবর্ত্তী।

বৌদ্ধ ও প্রাচীন মোগল চিত্রশিল্প।

ভারতীয় চিত্রের আদর্শ আমরা পাই, প্রথমত বৌদ্ধ গুহা থেকে, দ্বিতীয়ত—মোগল রাজাদের প্রাসাদ এবং পুস্তকে অঙ্কিত চিত্রাদি থেকে।

আমরা এখন দেখাতে চাই, এই বৌদ্ধ-যুগের আর মুসলমান যুগের ছবির মধ্যে কি কি বিষয়েই বা পার্থক্য এবং কি কি বিষয়েই বা ঐক্য আছে। মূলে দেখ্‌তে গেলে আমরা দেখি, উভয় শিল্প প্রায় একই নিয়মে রচিত। পাশ্চাত্য শিল্পের মত ওগুলি শুধু আলো ও ছায়ার খেলা দেখিয়ে পালাতে চায় না; ওরা ভাব ফুটিয়ে তোলবারই কেবল চেষ্টা করে। যাঁদের ধারণা, স্বভাবের হুবহু নকল করার নাম,

অথবা কাগজে থিয়েটার দেখানরই নামই চিত্র-শিল্প, তাঁরা যদি অজন্তা গুহায় পদার্পণ করেন তবে নিশ্চয়ই তাঁদের সে ভুল বিশ্বাস দূর হবে! একদিকে তাঁরা সুবৃহৎ চিত্র-ভাণ্ডার গুলির অপূর্ব্ব কীর্ত্তিকলাপ দেখে বিস্মিত হয়ে যাবেন, অন্যদিকে--আমাদের দেশে শত-সহস্র বৎসর আগে এইরকম সুন্দর ছবি আঁকা হয়েছিল বলে—আত্মগৌরবে অভিভূত হয়ে পড়বেন।

অজন্তার শিল্পীরা যে সমস্ত পরিকল্পিত চিত্রে গিরি-গুহা পরিশোভিত করে রেখে গেছেন সে সমস্তগুলির শুধু নকল করতে পারাও বিশেষ ক্ষমতার কায। এমন কি আমরা শুনেছি বিলাতের বড় বড় শিল্পিরাও সুন্দররূপে তার দুএকটা ছবিরও সামান্য প্রতিলিপি করে উঠতে পারেননি। বিশেষত ছবির যেখানে প্রাণ, অর্থাৎ ছবির আসল ভাবটা একেবারেই বজায় রাখতে পারেননি। মোগলশিল্পও ইংরাজ চিত্রকরগণের কাছে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার! একটা নখের মত স্থানের মধ্যে সংখ্যাতীত কারু শিল্প যে কি করে দেখান যায়, তা' তাঁরা বুঝে উঠতে পারেন না। সূক্ষ্ম কারু-শিল্প বিষয়ে মোগল শিল্প শ্রেষ্ঠ; আর বৌদ্ধ শিল্প ভাব পরিকল্পনায় সর্ব্বপ্রধান।

আমরা যখন গিরি-গুহায় প্রবেশ ক'রে সর্ব্বপ্রথম সেই অনন্ত অসংখ্য কারু-শিল্প দেখলুম, তখন মনে হয়েছিল, এই সকল কাজ না জানি কত যুগ ধরে কতশত শিল্পী মিলে এঁকেছেন; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমরা যতই সেগুলি দেখতে লাগলুম ততই আমাদের মনে হ'তে লাগল, যেন অবলীলাক্রমে নির্ঝরের মত এই সকল বিচিত্র কারুশিল্পসমূহ শিল্পিগণের অন্তর হতে প্রবাহিত। সেগুলো তখন দেখলে আর মনেই হত না যে,সে সব অনেক মাথা ঘামিয়ে বা বহু পরিশ্রমে আঁকা! যেন আলাদিনের প্রদীপের গল্পের মত সে এক বিচিত্র ব্যাপার! একএকটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে যখন সূর্য্যালোক গুহাগুলো আলোকিত করত; তখন, গুহার দেয়ালের ছবিগুলি আলোতে যেন প্রাণ পেয়ে সজীব হ'য়ে উঠে আমাদের চোখে সে যে কি বিস্ময়ময় সৌন্দর্য্যের অবতারণা করতো তা বলা অসম্ভব! সে ব্যাপার যিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, তিনিই কেবল বুঝতে পারেন। দেয়ালের কোথাও রাজারাণী পারিষদবর্গে বেষ্টিত হ'য়ে সিংহাসনে ব'সে, কোথাও রাজ্যাভিষেক,—বাইরে ভিখারী বিদায় হ'চ্চে, কোথাও গান-বাজনা,—বেণু-বীণা বাজিয়ে নর্ত্তক-নর্ত্তকীরা আসর জমিয়ে তুলেচে; কোথাও বা রাস্তায় রাস্তায় ঢোল মৃদঙ্গ নিয়ে সংকীর্ত্তন বেরিয়েছে, এই রকম আরও শত শত চিত্র এক সঙ্গে চোখের উপর ফুটে উঠে আমাদের যেন কোন্ এক নূতন অনন্ত সৌন্দর্য্যের রাজ্যের মধ্যে নিয়ে যেত। প্রথম প্রথম আমরা কোন্‌টা ছেড়ে যে কোন্‌টা দেখবো ভেবে ঠিক্ করতেই পারতুম না! মনে হত যেন কি এক ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারের মধ্যে পড়ে আত্মহারা হয়ে পড়চি! মোগল চিত্র দেখে এরকম ভাব আমাদের কখনও হয়নি। মোগল চিত্র চোখের সামনে ধরে তার মধ্যের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিল্পের বিচার করে তবে সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করা যায়। মোগলচিত্রে আমরা প্রধানত বিলাস ও

ক্রীড়ার ভাবই দেখ্‌তে পাই। কিন্তু সমস্ত বৌদ্ধ চিত্রই একটা আধ্যাত্মিক আবেশ ও শান্তির ভাবে মণ্ডিত! এমন কি যুদ্ধ বিদ্রোহের ছবিতে পর্য্যন্ত ধর্ম্মভাব প্রবেশ করেছে। তা'হলে বুঝতে হবে মোগলশিল্প বিলাসপ্রধান এবং বৌদ্ধ শিল্প শান্তিময়। মোগলদের

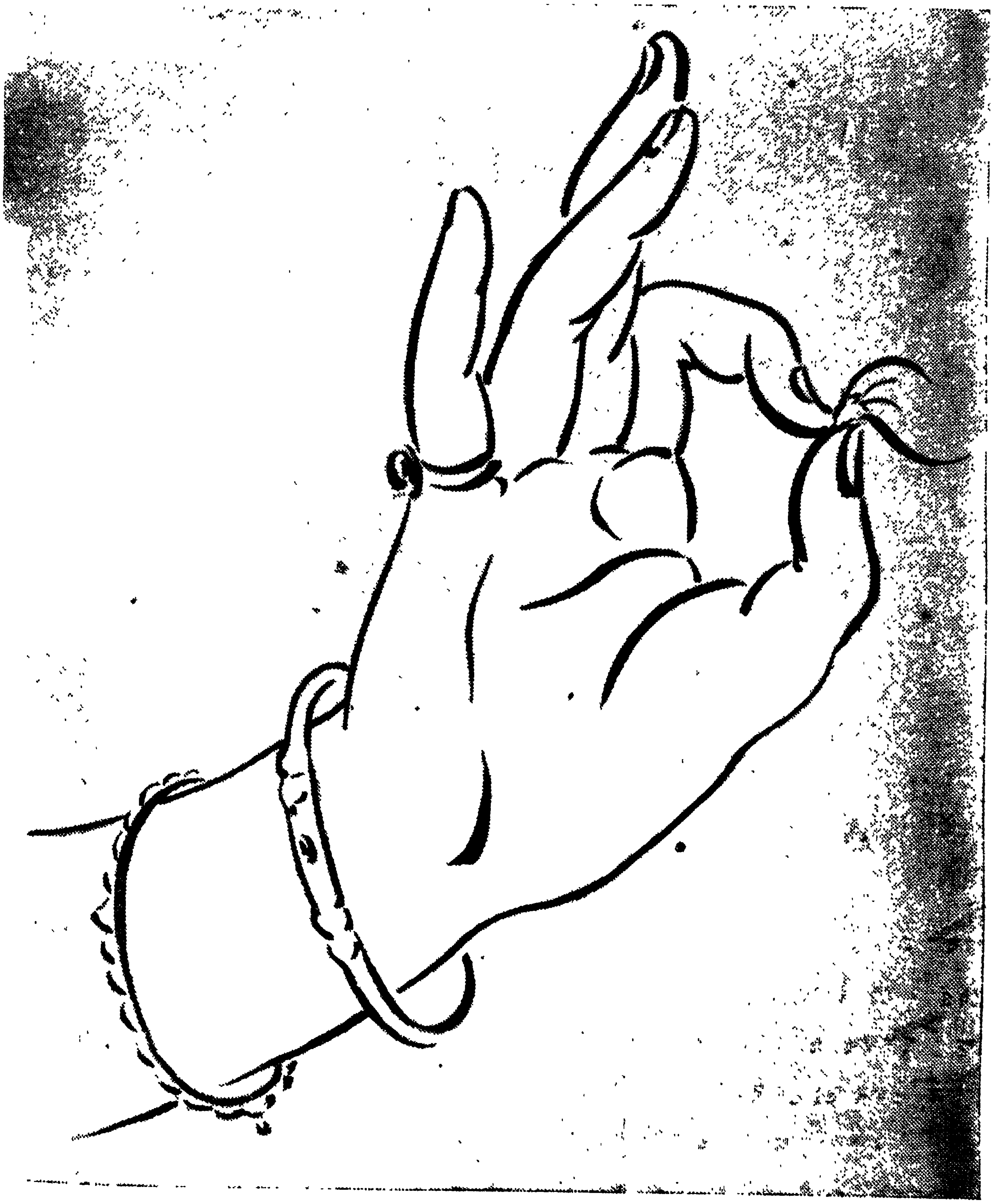

চিত্ররচনা প্রণালী ও বৌদ্ধ শিল্পিদের চিত্র-রচনা প্রণালীর মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্য আছে। মোগল শিল্পিরা চিত্রের যে ভাব অতি চেষ্টা ও যত্ন নিয়ে ও সূক্ষ্ম কারুকার্য্য দ্বারা ফুটিয়ে তোলেন বৌদ্ধশিল্পীরা সেটা দুই চারটা সরু-মোটা রেখার টানে দেখিয়ে দেন। বৌদ্ধশিল্পী অঙ্কিত উপরের ছবিখানি দেখলে সেটা বোঝা যাবে। অজন্তাচিত্র

বর্ণসমাবেশেও অতি মনোরম !* তার প্রতিবর্ণ যেন চোখে স্নিগ্ধ শীতল ভাব আনে। মোগল কিম্বা অন্য কোন শিল্পে সে রকমটা প্রায় দেখা যায় না! বৌদ্ধ আর মোগলচিত্র উভয়েরই রঙের একটা প্রধান গুণ, শত শত বৎসরের পুরাতন মোগল ছবি এবং সহস্র বৎসরের জীর্ণ বৌদ্ধ ছবিগুলির কোনোটারই বর্ণের অদ্যাপি কোন রকম পরিবর্ত্তন ঘটেনি। সেগুলি যেন চিরনবীন! দেখলে হঠাৎ মনে হয়, এইমাত্র বুঝি কেউ রং দিয়ে গেল! স্বভাবত পরিবর্ত্তনশীল রঙের মধ্যে সাদা আর নীল রংগুলি অজন্তার ছবিতে এখনও এত পরিষ্কাররূপে বর্ত্তমান যে, ইংরাজ দর্শকেরা সে যে সহস্র বৎসরের পুরাতন রং, একথা মোটেই স্বীকার করতে চান না! তাঁরা বলেন, পরবর্ত্তী চিত্রকরেরা সংস্কারের সময় ওগুলিতে নূতন করে রঙ দিয়েছিলেন। যাই হ'ক, ভারতীয় চিত্রের রঙ যে ইউরোপীয় তৈলচিত্রের চেয়ে স্থায়িত্বে শ্রেষ্ঠ সেকথা সর্ব্ববাদিসম্মত।

বৌদ্ধ শিল্পীদের অসীম, ধৈর্য্য দেখলেও স্তম্ভিত হতে হয়! সেই অবরুদ্ধ অন্ধকার গুহার ভিতর নানান অসুবিধার মধ্যে বিশেষত ছাদের নীচে (ceiling) যে কি করে ঐ সমস্ত বিস্ময়কর ও নয়নানন্দ কারুকার্য্য করে গেছেন, এখন তা বোঝাই অসাধ্য। এ বিষয়ে মোগল চিত্রকর অথবা অন্য কোন দেশের চিত্রকরকেই এতটা কষ্ট স্বীকার করতে দেখা যায় না। আলঙ্কারিকশিল্প(decorative art) সম্বন্ধে বৌদ্ধশিল্পী এবং মোগল শিল্পিগণ প্রায় সমকক্ষ। অজন্তা গুহার শীর্ষদেশ সজ্জা (ceiling decoration) এক বিচিত্রকাণ্ড! হঠাৎ দেখলে মনে হয়, যেন মাথার উপর একখানি বহুমূল্য শালের চাঁদোয়া টাঙান রয়েছে! প্রত্যেক চাঁদোয়ার মধ্যে একটা করে প্রকাণ্ড শ্বেত পদ্ম বিকশিত; আর চারিধারে গোলভাবে সজ্জিত সারি সারি হাঁস, কিম্বা ময়ুর,অথবা মৃণাল দল-মন্থন-তৎপর হাতীর পাল; এবং চার কোণে নানারকম লতা-পাতার কাজ। সেগুলির মধ্যে যে একটা বিশেষ অর্থ আছে তা দেখলেই বোধ হয়। মোগল decorative চিত্র সূক্ষ্মতা হিসাবে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বটে; কিন্তু অজন্তার আলঙ্কারিক চিত্রের মত অর্থ পূর্ণ বলে মনে হয় না। অজন্তাগুহায় গাছপালার চিত্রগুলিও প্রায় নিখুঁত। মোগল চিত্রেও বৃক্ষাদির ছবি অতি সুন্দর! পাশ্চাত্য শিল্পীদের মত ওঁরা শুধু তুলির স্পর্শে একটা গাছের ভাব খাড়া করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হন না; তাঁরা যতদূর সম্ভব গাছের পাতাগুলি এমন কি গুঁড়ির আকারের তারতম্য ঠিকভাবে এঁকে গাছের পরিচয় দিয়ে দেন; অর্থাৎ ভারতবর্ষীয় চিত্রের গাছপালা দেখলে জিজ্ঞাসা করতে হয় না যে, 'এটা কী গাছ?' Perspective সম্বন্ধে অজন্তার ছবিতে প্রায় কোন ভুল দেখলুম না। মোগল শিল্পীরা বোধ হয় ও বিষয়ে ততটা লক্ষ্য রাখতেন না। আমরা এক নম্বর গুহার দেয়ালের এক জায়গায় একটা ছবির নকল নেবার সময় হঠাৎ পিছন ফিরতেই দেখলুম গুহার চারিদিকের বারান্দা দেওয়া প্রকাণ্ড হল ঘরটা

* এ সংখ্যা 'ভারতী'তে মুখপত্রের ছবি দ্রষ্টব্য।

যেমন, চিত্রকরেরা যেন ঠিক সেইটে ছবি এঁকেছেন। এতে বোধ হয় যে, দেখেই ছবিতে একটা বারাণ্ডা দেওয়া হলের তখন Perspective বলে একটা কিছু কথা

ছাদের নীচের কারুকার্য্য
(অজন্তার সপ্তদশ গুহার চিত্র হইতে)

না থাকলেও তাঁরা ও বিষয় নেহাৎ অজ্ঞ ছিলেন না। তবে, তাঁরা পাশ্চাত্য শিল্পিদের মত ওটাকেই ছবির সার বা চূড়ান্ত জিনিস বলে মানতেন না। অজন্তা ছবি ছায়া-আলোক সমাবেশেও (shade and light) নয়ন-তৃপ্তিকর! বিলাতী ছবিতে যেমন ছবির একদিকে খুব আলো আর অপর দিকে আঁধার ঘনিয়ে দিয়ে ছবির কোমলত্ব ঘুচিয়ে দেয়, এ তা নয়। অজন্তার ছবিতে গঠন দেখাবার জন্যে কোন কোন জায়গায় সামান্য, কোন কোন জায়গায় প্রচুর shade দেওয়া আছে।—তাতে ছবিতে ভারি চমৎকার এক স্নিগ্ধ ও স্বাভাবিক ভাব এনে ফেলেচে! মোগল ছবিতে ক্বচিৎ shade দেওয়া দেখতে পাই। ইহার প্রধান কারণ,—তাঁরা সাধারণতঃ ছোট ছোট ছবি আঁকতেন বলে তাঁদের ছবিতে যেটুকু shade দিতেন তা চোখে প্রায় দেখা যায় না।

অজন্তার চিত্রে আমরা অ্যানাটমির ভুল কোথাও দেখেছি বলে মনে হয় না। আমাদের সঙ্গে যে একজন ইংরাজ মহিলা শিল্পী (Mrs. Herringham) ছিলেন, তিনি বল্‌তেন, "এত প্রাচীন কালে আঁকা তোমাদের দেশে এরকম নিখুঁত ছবি দেখলে সত্য সত্যই আনন্দ হয়। আমাদের দেশে এ রকম ছবি থাকলে আমরা তাদের নিজেদের জীবনের চেয়েও বেশী যত্ন করতুম! বড় দুঃখের বিষয় যে তোমরা এমন অমূল্য বস্তুর আদর জান না।" মোগল চিত্রকরগণ স্থানে স্থানে anatomy এবং proportion সম্বন্ধে বিশেষ অন্যথা করেচেন বটে, কিন্তু তাতে যে তাঁদের ছবির ছবিত্ব লোপ পেয়েছে তা নয়, বরং সেই জন্যেই তাঁদের অনেক ছবিতে শুদ্ধ শান্ত ভাব এসেছে।

অজন্তার ছবিতে আমরা যে সমস্ত নানা রকমের নিখুঁত ভাবে আঁকা জীবজন্তু, পশু, পক্ষী, গাছ-পালা, প্রাসাদ, দোকান, প্রাচীর, কুটীর প্রভৃতির চিত্র দেখ্‌তে পাই, সে সমস্ত কোনো আদর্শের অনুকরণ না করে কেবল কল্পনার দ্বারা যে কি রূপে তাঁদের মাথায় এসেছিল তা আমাদের জ্ঞানাতীত! তাঁরা তাঁদের চিত্রের দু এক জায়গায় যে সমস্ত সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করেছেন, সে গুলির স্থানে স্থানে রং উঠে যাওয়ায়, তাহা অল্প অল্প প্রকাশ হয়ে পড়েছে। সেগুলি দেখে, বেশ স্পষ্ট বোধ হ'ল যে, তাঁদের যা-কিছু যখন মাথায় আস্‌ত, অমনি গোবরমাটী-লেপা দেয়ালে সাদা রঙের একটা জমি করে এক এক তুলির টানে তা এঁকে যেতেন। তার পরে, তাঁদের ইচ্ছামত তার উপর রং দিয়ে ঢেকে সংশোধন কিম্বা পরিবর্ত্তন করতেন। আজকালকার মত পেনসিলের দাগ বারবার রবারে ঘসে ঘসে ইচ্ছামত বদল কিম্বা শোধ্‌রাতে পার্‌তেন না। এ বিষয়ে তৈল-চিত্রে অনেক সুবিধা; কেন না, নরম মাটীতে পুতুল গড়ার মত একটা ছবির উপর অবলীলাক্রমে যেমন ইচ্ছা পরিবর্ত্তন করা চলে। অজন্তার শিল্পিরা ছবিতে সংশোধন করা একপ্রকার অসম্ভব জেনে, যে বিষয়টা আঁকতেন যথাসম্ভব তার রূপ ধ্যান করতে করতে যখন মানসচক্ষে দেখতেন সাদা দেয়ালের উপর ছবিটা ফুটে উঠেছে তখন তুলিতে হাত দিতেন! মোগল চিত্রকরগণ কিম্বা অন্য দেশের খুব অল্প শিল্পী

মহাত্মারাই ওরকম পদ্ধতিতে ছবি আঁক্‌তে জান্‌তেন।

অজন্তা গুহার এক এক দেয়ালে এক এক ধরণের (style) ছবি। তা'তে বেশ বোঝা যায় যে গুহাগুলি একটা বিরাট শিল্প-বিদ্যালয় বা আশ্রম ছিল; এবং গুরু শিষ্যেরা মিলে এক একটা দেয়ালে ছবি আঁকতেন। আমরা অজন্তার দেয়ালে অসম্পূর্ণ ছবিও অনেক দেখেছি; কিন্তু, সে গুলির মধ্যে কতকগুলি অসম্পূর্ণ হ'লেও দেখে মনে হ'ল যেন কোন ওস্তাদেরই হাতের কাজ। দু নম্বর গুহায় এ অসম্পূর্ণ কাজের সংখ্যা অধিক। অল্পবয়স্ক বালকের হাতের কাজও কোন কোন দেয়ালে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়।

গুহার ক্ষোদিত শিল্পেও চিত্রশিল্পীগণ রং দিতে ছাড়েন নি; দুয়ের নম্বর গুহার বারাণ্ডায় দেখ্‌লুম থামের উপর এবং থামের ধারে ধারে সাদা high light দিয়ে থামের গঠন ফুটিয়ে তুলেছেন। সেই নির্জ্জন ইন্দ্র-পুরী তুল্য গিরিগুহায় নির্ঝরণীর পাশে, স্তব্ধ স্নিগ্ধ ভাবে বিভোর হ'য়ে পুণ্যাত্মা শিল্পিরা বাঁদর পেঁচা যা কিছু এঁকে গেছেন তারই ভিতর থেকে যেন আমরা এক অমৃতময় শান্তি ও আনন্দের বিকাশ দেখ্‌তে পাই! অজন্তার ছবির আর একটি বিশেষ বাহাদুরী এই যে, কোন ছবি কোনটার নকলে আঁকা হয় নি। প্রত্যেকটার ভাব ও ব্যাপার ভিন্ন। কালিদাস প্রভৃতি প্রাচীন কবিরা বর্ণনায় যে সে ভাব ব্যক্ত করে গেছেন, অজন্তার ছবিতে সেই সমস্ত ভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। কালিদাস যেমন বিবাহের বরযাত্রী দেখ্‌বার জন্যে উৎসুক মহিলাদের কাউকে লাক্ষ-বর্ষণ-তৎপরা, কাউকে চুল বাঁধ্‌তে বাঁধ্‌তে,—কাউকে বা আল্‌তা পায়ে দিতে দিতে ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে জানালার কাছে উঠে আস্‌তে দেখিয়েছেন;—অজন্তাতেও ঠিক্‌ সেই সমস্ত ভাবের ছবি অঙ্কিত আছে। পদ্মবনে হাতী, হংস-মিথুন, চকা-চকি, মৃগ-মৃগী প্রভৃতি পূর্ব্ব কবিদের বর্ণিত বিষয় অজন্তার ছবিতে দেখতে পাই। পূর্ব্ব কবিরা যেমন সুন্দরী ললনার উপমায় কৃশাঙ্গী, পীণপয়োধরা প্রভৃতির দ্বারা আকৃতি-বর্ণনা কর্‌তেন, আমরা অজন্তাতে ঠিক্‌ সেই বর্ণনার অনুরূপ চিত্র দেখ্‌তে পাই। কালিদাসের রঘুবংশে আছে, বন পথ দিয়ে যখন মহারাজ দিলীপ আর রাণী সুদক্ষিণা পুত্রকামনায় বিমানে চড়ে বশিষ্ঠঋষির আশ্রমে যাচ্চেন, তখন তাঁদের রথের শব্দে হরিণ-হরিণীগণ কিছু মাত্রও ভীত ত্রস্ত না হ'য়ে বরং যেন রাজা রাণীকে দেখ্‌বার জন্যেই পথ ছেড়ে রথবর্ত্মের দিকে অনিমেষ নেত্রে চেয়ে আছে। অজন্তা চিত্রের মধ্যেও একটা ঠিক্‌ এই ভাবেরই ছবি আছে।

আমরা ছবিতে এমন-সব অনেক জিনিষ আঁকা দেখ্‌তে পাই, যে গুলো আমরা আমাদের ভারতের জিনিষ ব'লে মোটেই জানি না।—আমাদের বোধ হয় কারো ধারণাই নেই যে, বগলস'টা আমাদের দেশে অনেকদিন থেকে চলে আস্‌চে! একটা ঘরে, কল্‌কাতার ঠিক্‌ কুক কম্পানির ঘোড়ার আড়গড়ার মত অনেকগুলি ঘোড়া রাখা আর হুকের উপর সাজসরঞ্জাম টাঙান। দেখ্‌লে সত্যি সত্যি অবাক্‌ হয়ে যেতে হয়!

অজন্তার ছবি দেখ্‌লে বেশ বোঝা যায় যে, আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার আদব কায়দায় যেমন কোট বা কুর্ত্তা-না পর্‌লে সভ্যশ্রেণীর মধ্যে গণ্য হওয়া যায় না, এবং অধিক গহনা পরাটা যেমন ভয়ানক বর্ব্বরতা, অজন্তার ছবিতে দেখি, ঠিক্‌ তার বিপরীত। যত নর্ত্তক-নর্ত্তকী আর সাধারণ লোকদের গায় কোর্ত্তা আঁটা, গয়না নেই বল্লেও হয়। আর যত বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত লোকের অঙ্গেই অলঙ্কারের পরিমাণ বেশী। বড় লোকদের গায় কখনও কখনও কোমরে একটা নাম মাত্র সূক্ষ্ম উত্তরীয় ফিতের মত ক'রে বাঁধা। আর ভৃত্যগণ তাঁদের পার্শ্বে পান-পাত্র কিম্বা আর কিছু নিয়ে একান্ত অনুগত ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। খুব সম্ভব সেই সমস্ত দাসেরা বিদেশীয়। যাঁর যত পদমর্য্যাদা ও সম্মান বেশী তাঁর গায়ের গহনার মূল্যও তত অধিক।

অজন্তায় যে কেবল বড় বড় ছবিই আছে তা' নয়। ১৭নং গুহার সাম্‌নের বারান্দার এক পাশে দেয়ালে একটা প্রকাণ্ড রথের চাকার ভিতর টুক্‌রো টুক্‌রো ছোট ছোট অনেক ছবি সুন্দর ভাবে আঁকা আছে। অজন্তায় যেমন মানুষের চেয়ে বড় ছবি দেখা যায়, তেম্‌নি চার পাঁচ ইঞ্চি ছবিও বিরল নয়। মোগল ছবি সাধারণত ছোটই বেশী দেখ্‌তে পাওয়া যায়; সূক্ষ্মত্ব হিসাবে আজ পর্য্যন্ত কোন দেশের চিত্র ওর কাছে ঘেঁস্‌তে পারেনি, কিন্তু অজন্তার মত প্রশান্ত ভাবপূর্ণ এবং বড় চিত্রও বোধ হয় আর কোথাও নেই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅসিতকুমার হালদার।

অঙ্কমালার উৎপত্তি।

পাটীগণিত বাঙলার নিজস্ব বলিলেও চলে; কারণ শুভঙ্কর বাঙালী ছিলেন এবং তাঁহার আর্য্যা, দেহের পক্ষে মাতৃদুগ্ধের ন্যায় প্রত্যেক বঙ্গবাসীর মস্তিষ্কের স্বাভাবিক পরিপোষক! মানসাঙ্ক এই পাটীগণিতেরই অঙ্গ মাত্র, এবং বাঙালী যে এককালে বর্ত্তমান মাড়ওয়ারীগণের ন্যায় অতীব চতুর ও কর্ম্মঠ ব্যবসায়ী ছিলেন, তাঁহার অদ্ভুত ক্ষিপ্রগণনাকৌশলই তাহার প্রমাণ। বিবিধ প্রকার Table বা Ready Reckoner সাহায্যে, উচ্চ-বেতন-ভোগী বর্ত্তমান হিসাব-নবীশ যাহা কষিতে গিয়া ডেসিমেলের সাহায্যে (দুরদৃষ্ট বশতঃ তাহা আবার মধ্যে মধ্যে Recurringএ পরিণত হয়) কোনরূপ একটা মোটামুটী সমাধা বাহির করেন, অনধিক-পঞ্চদশমুদ্রা-বেতন সে কালের পাঠশালে পড়া সরকার বা মুহুরী, কড়াক্রান্তি মিলাইয়া তাহার সিকি সময়ে সেই সমাধাটি মুখে মুখে বলিয়া দেন। দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে গিয়া আজি কালিকার শিক্ষাভিমানী কয়জন, দাম ঠিক হইল কিনা বুঝিয়া লইয়া মূল্য দিয়া থাকেন? বিশেষতঃ ইংরাজের দোকানে

হইলে বিনা বাক্যব্যয়ে বিক্রেতানির্দ্ধারিত মূল্য দিয়া আসিয়া, পরে বাটীতে কাগজ কলমের সাহায্যে হিসাব করিয়া দেখিতে হয়।

শুভঙ্করের মানসাঙ্কের শিক্ষা থাকিলে আর এরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। বাঙালী যে পাটীগণিত বা তদঙ্গীভূত মানসাঙ্কে নির্ব্বিবাদে পৃথিবীর অপরজাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহার কারণ ইহা বলা যাইতে পারে যে বঙ্গদেশ হইতেই অঙ্কমালার (Numerals) সৃষ্টি। যে জাতি যে বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, ঈশ্বর সেই জাতির মধ্যেই তাহার উদ্ভব বা প্রথমাবিষ্কার ঘটাইয়া থাকেন। বিজ্ঞানপটু ইয়োরোপীয় জাতির মধ্যেই বাষ্পীয়যান ও বিদ্যুৎযান প্রভৃতি যন্ত্রের প্রথমাবিষ্কার; অধুনা কৃত্রিম শিল্প-বিদ্যাবলে সস্তার প্রলোভন দেখাইয়া জর্ম্মণি, প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীগণের মধ্যেও নিজ বাণিজ্য বিস্তারে প্রয়াসী, সেই জন্য কৃত্রিম প্রণয়ণ বিদ্যা এক্ষণে জর্ম্মণিরই একরূপ একচেটিয়া বলিলেই হয়। বাণিজ্যকুশল বাঙালী, সেই জন্যই বহুপূর্ব্বে, অঙ্কমালার উদ্ভাবনে সমর্থ হইয়াছিলেন।

উক্ত কথার সমর্থনোপযোগী প্রমাণ প্রয়োগের পূর্ব্বে এইটুকু বলিয়া রাখি যে ইয়োরোপীয়গণ এক্ষণে স্বীকার করেন যে ভারতেই পাটীগণিতের প্রথম আবির্ভাব। ছোট বড় সকল ঐতিহাসিকই বলেন পাটীগণিত ভারতভূমি হইতে প্রাচীন আরব-গণ কর্ত্তৃক মিশ্রদেশ পথে ইয়ারোপে আনীত হয়—সুতরাং উহার পুনঃ সমর্থন নিষ্প্রয়োজন। এক্ষণে দ্রষ্টব্য এই যে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের কোন প্রদেশ বা দেশে ইহার প্রথম উৎপত্তি। আমি নিম্নলিখিত যুক্তি দ্বারা এইটুকু প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিব যে আমাদের 'সোনার বাঙলা'ই অঙ্কমালার উৎপত্তি স্থান।

প্রমাণ।

১। এক, দুই, তিন, চারি, প্রভৃতি শব্দের মাত্রা বর্জ্জিত প্রথম বা প্রধান অক্ষর ও অঙ্কমালার অঙ্কগুলি পরস্পর পার্শ্বে রাখিয়া উহাদের আকার সাদৃশ্য অবলোকন করুন। যথা:—

১	এ	এক
২	দ	দুই
৩	ত	তিন
৪	চ	চারি
৫	প	পাঁচ
৬	ছ	ছয়
৭	স	সাত
৮	ট	আট
৯	৯	নয়
১০	শ	দশ

বলা বাহুল্য, ট-ই আট শব্দের প্রধান অক্ষর ও শ-ই দশ শব্দের প্রধান অক্ষর! প ও ছ অক্ষর দুইটীর সামান্য পরিবর্ত্তনেই অর্থাৎ একের দাঁড়ি ও অপরের পুচ্ছ বাদ দিলেই ৫ ও ৬ হয়। "যোড়া পুটুলী শ লেখো!" কে জানিত এই যোড়া পুটুলী শ-ই অঙ্ক মালার 'জ্ঞান' "০" অঙ্কের উদ্ভাবক? শ এর দাঁড়ি বাদ দিলেই ১০ অঙ্কটী পাওয়া যায় এবং শ এর দ্বিতীয় পুটুলীই শূন্য "০" অঙ্কের মূল।

দৈব সাহায্যই অনেক আবিষ্কারের মূল! মৃত ভেক-দেহের সহসা স্পন্দনই বিদ্যুৎ শক্তির উদ্ভাবক। দ্বিবিধ ধাতু ও তাহাদের সংযোগ সঙ্কেতের নির্দ্দেশক। দশ শব্দের শ অক্ষরটির এই বিচিত্র পুটুলী বহুল আকৃতি না থাকিলে

'শূন্য' প্রাণ অঙ্ক মালার সৃষ্টি আদৌ হইত কি না, কে বলিতে পারে?

২। এগারো, বারো, তেরো, প্রভৃতি শব্দের ও তাহার অর্থ ও অঙ্ক লিখন প্রণালী পর্য্যালোচনা করিলেও বুঝা যায় দশ অঙ্ক দুই অঙ্ক বিশিষ্ট (১ ও ০) হইবার পর, এগারো অর্থাৎ এক আর ও, বারো অর্থাৎ দুই আরও, তেরো অর্থাৎ তিন আরও এই রূপ ভাবে পর পর অঙ্কগুলি এক অঙ্কের পাশে যোজনা করিয়া অপর অঙ্কগুলি লেখা হয়।

৩। শ হইতেই যে শূন্য (০) অঙ্কের সৃষ্টি, তাহা বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ প্রভৃতির অঙ্কপাত প্রণালী দ্বারা সমর্থিত হয়।

৪। শূন্যের এই আশ্চর্য্য ক্ষমতা উপলব্ধি হইবার পর, অপর শূন্য প্রয়োগে ১০০, ১০০০, প্রভৃতি অঙ্কের সৃষ্টি হইয়া পাটীগণিত সম্পূর্ণ হইয়াছে—বলা বাহুল্য।

শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সমালোচনা।

ঝুমঝুমি। শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউশ হইতে প্রকাশিত। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ছয় আনা। এখানি শিশুপাঠ্য গল্পের বহি। গল্পগুলি জাপানীগল্পের ভাব লইয়া রচিত। লিপিচাতুর্য্যে মৌলিক গল্পেরই মত সুন্দর ফুটিয়াছে। গল্পগুলি সহজ সরল ভাষায় উপভোগ্য, কৌতুক ও আনন্দ-রসের ধারায় সুস্নিগ্ধ। পাঠ করিলে দুরন্ত শিশুও বশ মানিবে। শিশুসাহিত্য-রচনায় মণিলাল বাবুর দক্ষতা অসাধারণ। "ইঁদুরের মোকর্দ্দমা" কবিতাটি সুন্দর,বাঙ্গালা সাহিত্যে সম্পূর্ণ অভিনব ও মনোরম। গ্রন্থে এগার খানি নানাবর্ণে রঞ্জিত চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মলাটের উপর কাশী ছাপে গ্রন্থের নাম ও ঝুমঝুমির চিত্রখানি চমৎকার হইয়াছে। ছাপা কাগজও উৎকৃষ্ট।

হৃদয় ও মনের ভাষা। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সিংহ প্রণীত। কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা সবিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি। 'আগে ভাব খোঁজ, ভাষার অভাব থাকিবে না,' 'যে মানুষ ও যে জাতি যেমন, তাহার চিন্তা ও ভাবও তেমন—তাহার ভাষাও তেমন। ইংরাজী ও পার্শী শক্তির ভাষা—বলের ভাষা। সংস্কৃত ও গ্রীক, সত্য ও সুন্দরের ভাষা। লাটিন জ্ঞান বিজ্ঞানের ভাষা। ইটালিয়ান, উর্দ্দু ও বাঙ্গালা স্নেহের কোমলতার ভাষা.''ভাষার মধ্যে মানবের চিন্তা ভাব ও জীবনের অস্থি, কঙ্কাল সমাধিস্থ' প্রভৃতি কয়েকটি সুগভীর সত্য লেখকের যুক্তিতর্কে বেশ সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দুই এক স্থলে লেখকের সহিত আমাদিগের মতের মিল হয় নাই, তথাপি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা লেখকের সুগভীর চিন্তাশীলতা, ও কাব্যরসগ্রাহিতার পরিচয় পাইয়াছি। গ্রন্থখানিতে একটিও বাজে কথা নাই, এইটুকুই ইহার মনোরম বিশেষত্ব।

বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব। ৺রামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত। শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এল কর্তৃক সম্পাদিত। তৃতীয় সংস্করণ, ১৩১৭। বাণী প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য সাড়ে তিন টাকা মাত্র। বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস সম্বন্ধে এইখানিই প্রথম গ্রন্থ। ভূমিকা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিয়াছেন, "বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে এরূপ ভাবের আলোচনা ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পূর্ব্বে কেহই করেন নাই। সাহিত্য পথের পরবর্ত্তী পথিকেরা * কেহই নূতন মার্গে বিচরণ করিতে পারেন নাই। * * ন্যায়রত্ন মহাশয় যে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন,

পরবর্ত্তীগণ পতিয়া সেই অট্টালিকার চুণ-বালি ধরাইয়া রঙ ফলাইয়া শিল্পীর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন মাত্র, নক্সা বদলাইতে পারেন নাই।" গ্রন্থকার বাঙ্গালা ভাষার পরিবর্ত্তনের কালকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন আদ্য, মধ্য ও ইদানীন্তন অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষার বাল্য যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থা। অনির্দ্দিষ্ট কাল হইতে চৈতন্যদেবের প্রাদুর্ভাবকাল অবধি বাল্য, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস ও কৃত্তিবাস এই কালের লেখক। পরে ভারতচন্দ্রের সময় অবধি যৌবন, মুকুন্দরাম, ক্ষেমানন্দ, কাশীরাম, রামপ্রসাদ প্রভৃতি এই কালের লেখক এবং তাহার পর ইদানীন্তন অথবা বাঙ্গালা ভাষার প্রৌঢ়কাল। গ্রন্থখানির উপাদেয়তা সম্বন্ধে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে অবিশেষজ্ঞ ব্যক্তিও ইহা বেশ সহজভাবে আগাগোড়া পাঠ করিতে পারিবেন। গবেষণার অত্যধিক ভারে বক্তব্য কোথাও চাপা পড়ে নাই—গ্রন্থের ধারাবাহিকতাটুকু গ্রন্থকারের লিপিকুশলতায় কোনখানে প্রচ্ছন্ন বা অস্পষ্ট হয় নাই। প্রাচীন সাহিত্যের কাল-নিরূপণাদি সম্বন্ধে যে সকল নূতন তথ্য অধুনা আবিষ্কৃত হইয়াছে, সম্পাদক মহাশয় ফুটনোটে সে সমস্তই সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। পুরাতন মতও বাদ দেওয়া হয় নাই। গ্রন্থকার সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ও কবিবর মাইকেল সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সহিত অনেকেরই সহানুভূতি হইবে না। গ্রন্থের পরিশিষ্টে বাঙ্গালার সমগ্র সাময়িক পত্রাদির সতারিখ এবং কতিপয় নবীন গ্রন্থকারের বর্ণানুক্রমিক তালিকা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থকারদিগের নামের তালিকায় সম্পাদক মহাশয় 'বাহুল্যভয়ে' বিস্তারিত বিবরণ দিতে পারেন নাই; উক্ত তালিকায় অপ্রথিত বা অজ্ঞাত নামা প্রায় সাত আট জন লেখকের নাম লিপিবদ্ধ হইয়াছে, অথচ সুকবি ৺রজনীকান্ত সেন, শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর, ও নবীন আরো দুই চারি জন প্রতিভাশালী লেখক এবং কবি প্রিয়ম্বদা দেবী, শরৎকুমারী চৌধুরাণী প্রভৃতির নামোল্লেখ দেখিলাম না। সম্পাদক মহাশয়ের এ কর্ত্তব্য-শৈথিল্য উপেক্ষণীয় নহে। আশা করি ভবিষ্যতে এ ত্রুটি স্খলিত হইবে।

কবীর। প্রথম খণ্ড। শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। বোলপুর। মূল্য ছয় আনা। সাধু কবীর রচিত প্রায় শতাধিক দোঁহাবলী অনুবাদসহ সংগৃহীত হইয়াছে। কবীরের দোঁহার নূতন করিয়া পরিচয় দিতে হইবে না। ক্ষিতিবাবু বিস্তর পরিশ্রম করিয়া বহু নূতন দোঁহা সংগ্রহ করিয়াছেন,—অনুবাদ গুলির ভাষা বেশ সরল ও প্রাঞ্জল—মূলের ভাব কোথাও নষ্ট হয় নাই। এই গ্রন্থখানি বঙ্গভাষার সম্পদ যে সমধিক বর্দ্ধিত করিয়াছে সে কথা বলা বাহুল্যমাত্র। গ্রন্থের ভূমিকায় কবীরের সংক্ষিপ্ত জীবনী-পরিচয়ও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। লেখকের উদ্যম জয়যুক্ত হউক, ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা।

সাবিত্রী। শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দাসগুপ্ত প্রণীত। মূল্য ছয় আনা। দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রথম সংস্করণে আমরা বই খানির যে প্রশংসা করিয়াছিলাম তাহার অতিরিক্ত বলিবার কিছু নাই।

রেখা। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী প্রণীত। মূল্য বারো আনা। এখানি কবিতার বই। যতীন্দ্রবাবু কবিতা লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। তাঁহার রচনায় কবিত্ব আছে, ভাবে মৌলিকতা, ভাষায় সরলতা, শব্দচিত্রে নিপুণতা ও ছন্দে একটা লীলা আছে। তাঁহার বর্ণনাগুলি ছবির মত ফুটিয়া উঠে। তাঁহার কোনো কোনো কবিতা রবিবাবুর ভাবে অনুপ্রাণিত হইলেও সেগুলি উপভোগ্য।

টুনটুনির বই। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রণীত। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এখানি শিশুপাঠ্য গল্পের বহি। 'টুনটুনি পাখী,' 'দুষ্টু বিড়াল,' 'নরহরি দাস,' 'বুদ্ধুর বাপ,' 'পান্তবুড়ী' প্রভৃতি চিরপরিচিত গল্পগুলি গ্রন্থকারের সহজ সরল রূপকথার ভাষায় চমৎকার ফুটিয়াছে। বহিখানির জন্য শিশুরাজ্যে রীতিমত কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইবে। গল্পগুলি আগাগোড়া হৃদয়-গ্রাহী এবং সেগুলির মধ্যে বেশ একটি মনোরম বৈচিত্র্য আছে। বহিখানির পাতায় পাতায় ছবি—আকারে ছোট হইলেও সংখ্যায় অনেক। কভার

কাগজ পরিপাটি, এবং ছাপা, কান্তিক প্রেসের স্বাভাবিক মুদ্রণ-নৈপুণ্যেরই প্রকৃষ্ট পরিচায়ক।

আর্য্য-বিধবা। শ্রীযুক্ত প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত কর্ত্তৃক বিরচিত ও বগুড়া হইতে প্রকাশিত। রায়প্রেসে মুদ্রিত। ১২৯৯ সাল। মূল্য তিন আনা। ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানিতে বিধবার কর্ত্তব্যাদি সম্বন্ধে লেখক সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন। সুখপ্রিয়া নিরাশ্রয়া বা সংযম-অক্ষমা নারীর পক্ষে বিবাহ দোষের নহে, কর্ত্তব্য; তবে ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ-গৌরব চিরদিনই অক্ষুণ্ণ থাকিবে, ইহাই এ ক্ষুদ্র পুস্তিকা খানির প্রতিপাদ্য। লেখকের যুক্তিগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত; গ্রন্থে কোথাও গোঁড়ামি নাই—সকলদিকই লেখক সহৃদয়তার সহিত আলোচনা করিয়াছেন।

গার্গী। শ্রীযুক্ত প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত এম, এম, এস প্রণীত। নব্যভারত প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য তিন আনা। গ্রন্থকার ক্ষমা করিবেন—তাঁহার বিরাট ভাষা-গহন ভেদ করিয়া অগ্রসর হওয়া আমাদিগের সাধ্যায়ত্ত নহে। রচনা যেমন নীরস, তেমনি দুর্ব্বোধ্য জটিল, গ্রন্থে ভাষার দোষ ও দৈন্যের দৃষ্টান্তও প্রচুর।

বঙ্গের রত্নমালা। বা বঙ্গীয় সমাজের কতিপয় নীতিগর্ভ ঘটনা ও চরিত্র। শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। নববিভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত। বাঁধাই মূল্য দশ আনা। বালকবালিকাগণের নীতিশিক্ষা প্রদানোদ্দেশ্যে সাধারণ ও অসাধারণ বাঙ্গালী-জীবনের ছোট বড় ঘটনা হইতে সৌভ্রাত্র, পরদুঃখানুভব, আহারে সংযম, চরিত্রে বল, কর্ত্তব্য-পালন, প্রভুপরায়ণতা প্রভৃতি শিক্ষণীয় গুণাবলীর দৃষ্টান্ত এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার একটা উপভোগের দিক আছে। দেবচরিত্র বা বিদেশীয় মহৎচরিত্র অনেকস্থলে হৃদয়ে ঠিক ততখানি দাগ টানিতে পারে না, যতখানি আমাদিগেরই মত 'সাদাসিধা' বাঙ্গালী চরিত্রের দ্বারা সম্ভব হয়। গ্রন্থকার কলেজের অধ্যাপক হইলেও তাঁহার ভাষা বজ্র-নির্ঘোষের মত কর্ণপটহের পীড়াদায়িকা নহে, তাহা বেশ সরল ও সতেজ! সহৃদয়তার গুণে গল্পগুলি বেশ ফুটিয়াছে। তবে মাঝে মাঝে ভাবভঙ্গির অভিব্যক্তিতে অযথা বাড়াবাড়ি আছে। যথা, "জননী এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তাঁহার চক্ষু দিয়া যেন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল।" 'চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির' প্রভৃতি রচনারীতি নিতান্তই অসহ্য ঠেকে। বালক বালিকাগণের নীতিশিক্ষার উপযোগী ত গ্রন্থখানি বটেই, উপরন্ত অভিভাবকগণও ইহা পাঠে পরিতৃপ্ত হইবেন। গ্রন্থের ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর হইয়াছে।

খোকার বই। দ্বিতীয় ভাগ। শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন বসু প্রণীত। বারদী ঢাকা হইতে প্রকাশিত। মূল্য তিন আনা মাত্র। এখানি শিশু-পাঠ্য গ্রন্থ। গ্রন্থের ভাষা কটমট, নীরস এবং দুরূহ। "হরিভক্ত প্রহ্লাদ", "ভারতবর্ষ" প্রভৃতির ভাষা নিতান্তই অসহ্য! কবিতাগুলিতে না আছে ভাব বা ভাষা, না আছে কোমল লালিত্য। কোন আখ্যানই ভালো করিয়া ফুটে নাই! শিশুদিগের পক্ষে গ্রন্থখানির উপযোগিতা বিষয়ে আমাদিগের ঘোরতর সন্দেহ আছে। পাঠে অনুরাগের পরিবর্ত্তে শিশুহৃদয়ে বিভীষিকার সঞ্চার হইবে।

মেহেরনেগার-কাব্য। শ্রীযুক্ত আব্বাছ-আলী প্রণীত। মৈমনসিং ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দশ আনা। গ্রন্থখানি কাব্য কি হেঁয়ালি ঠিক বুঝিতে পারা গেল না। কবিত্বেরও একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হইল। নমুনা স্বরূপ দুই ছত্র উদ্ধৃত হইল।

"* * বলি, এক কৌটা বিষপূর্ণ,
স্বকরে গলায় ঢালি পড়িলা ভূতলে।"

উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিক। প্রকৃত ঘটনামূলক উপন্যাস। প্রথম খণ্ড। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রণীত। সাধনপুর "শরৎ পুস্তকালয়" হইতে প্রকাশিত। চট্টগ্রাম সনাতন যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ছয় আনা। এমন বীভৎস ও সৃষ্টিছাড়া কল্পনা কচিৎ দেখা যায়। পনের বৎসরের বালক ও বারো বৎসরের বালিকা সকলেই গ্রামের পাঠশালায় একসঙ্গে পাঠাভ্যাস করেন এবং প্রেমে পড়েন। গ্রন্থের নায়ক স্কুল পরিদর্শনে গিয়া একটী বার বৎসরের বালিকার হাত ধরিয়া 'বেণী বড় দুরন্ত বালক' পড়াইতেছিলেন, সহসা তাঁহার "শরীর শিহরিয়া উঠিল। হৃদয়ে তাড়িৎ-

বৎ কি প্রবেশ করিল। চারিদিকে অন্ধকার দেখিতে পাইলেন; পুনঃ পুনঃ বালিকার মুখ দেখিবার ইচ্ছা জন্মিল।" আবার টিপ্পনী আছে,—"ঈশ্বরের সব ইচ্ছা" আমরা বলি, প্রভু ঔপন্যাসিক, আপনারই সব ইচ্ছা! এমন হীন প্রকৃতির যুবককে বালিকাবিদ্যালয়ের সীমানায় প্রবেশ করিতে দিতে নাই,—প্রেমে পড়িবার জন্য ইহারা যেন সর্ব্বদা উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছে! এমন কাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত লেখককেও উপন্যাস লিখিতে হইবে। হায় বঙ্গসাহিত্য!

কায়স্থ দর্পণ। প্রথম ভাগ। শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র রায় চৌধুরী প্রণীত। সাধনপুর কায়স্থ সভা হইতে প্রকাশিত। কলিকাতা বিশ্বকোষ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য দেড় টাকা। কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়, তাঁহাদের উপনয়ন সংস্কার বিধেয় এবং উপনয়নের প্রণালী প্রভৃতি সম্বন্ধে লেখক বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। কায়স্থগণের আচার ব্যবহার ও প্রধান প্রধান বংশের পরিচয়ও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থখানি নানা তথ্যে পূর্ণ, কৌতূহলোদ্দীপক। কায়স্থগণের নিকট সমাদর লাভের যোগ্য।

শিক্ষাবিজ্ঞানের ভূমিকা। শ্রীযুক্ত বিনয় কুমার সরকার প্রণীত। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। ইণ্ডিয়া প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য লিখিত নাই। গ্রন্থকার সুপণ্ডিত। "তিনি শিক্ষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে এক বিপুল গ্রন্থের আয়োজন করিয়াছেন, এই পুস্তিকা তাহার ভূমিকা।" প্রথম ভাগে "শিক্ষাতত্ত্ব" ও দ্বিতীয় ভাগে "শিক্ষার প্রণালী" সবিস্তারে আলোচিত হইবে। ভূমিকায় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় "গ্রন্থকারের যোগ্যতা অধ্যবসায় ও ঐকান্তিকতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া" এ মহৎ অনুষ্ঠানের সফলতা সম্বন্ধে সবিশেষ আশান্বিত। আমরাও তদ্রূপ আশান্বিত। গ্রন্থকার শিক্ষাব্রতে আপনার সকল চিন্তা সকল চিত্ত অর্পণ করিয়াছেন। শিক্ষাদান কার্য্যে তিনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী—সমগ্র ভারতবাসীর শ্রদ্ধাভাজন। 'শিক্ষাবিজ্ঞানের ভূমিকা' পাঠে গ্রন্থকারের শক্তি সম্বন্ধে কাহারো সংশয় থাকিতে পারে না। এমন পাণ্ডিত্য ও তাহার সুব্যবহার আজিকালিকার এ স্বার্থের যুগে দুর্লভ, প্রাচীন ভারতের কথা মনে পড়ে। বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে এই গ্রন্থ বিরাজ করুক। শিক্ষার প্রকৃষ্টতর আদর্শে বাঙ্গালী উন্নতির পথে উঠিবে সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। গ্রন্থের ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

ধ্রুব। শ্রীযুক্ত প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত প্রণীত। নব্যভারত প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা মাত্র। লেখক আধুনিক নভেলের ছাঁচে ধ্রুবোপাখ্যান লিখিয়াছেন। রচনাটি ব্যর্থ হইয়াছে। যাত্রার ধরণের উচ্ছ্বাস ও হীন নাটকের রুচির পরিচয়ই সর্ব্বত্র প্রস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ সুরুচি-চরিত্রে রুচির মর্য্যাদায় লগুড়াঘাত করা হইয়াছে।

সংক্ষিপ্ত রামায়ণ ও মহাভারত।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। সরকার এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত। লোকনাথ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামের মহাভারতের সংক্ষেপ-সঙ্কলনে সঙ্কলয়িতা বেশ কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। প্রয়োজনীয় অংশগুলি কোথাও বাদ পড়ে নাই। ইহা অল্প প্রশংসার কথা নহে। তবে ফুটনোটের টীকাগুলি সর্ব্বত্র সহজ হয় নাই। 'স্বয়ম্বরা'র ব্যাখ্যা 'নিজেই স্বামী বাছিয়া নিতে ইচ্ছিতা' তেমন সহজ বলিয়া মনে হইল না। গ্রন্থে দুইখানি হাফটোন চিত্র আছে—ছাপা ভাল, তবে পরিকল্পনা সুখ্যাতির যোগ্য নহে। গ্রন্থের মূল্য সুলভ।

অভিনয়-প্রণালী ও অথার। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী দত্ত প্রণীত। শ্রীঅমূল্যচরণ নাগচৌধুরী (নাট্যভূষণ) কর্ত্তৃক প্রকাশিত। গ্রেট ইডিন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ছয় আনামাত্র। 'অভিনয় সম্বন্ধীয় পুস্তকের অভাব হেতু এবং অধুনা অভিনয়ের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া' গ্রন্থকার লেখনী ধরিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার প্রয়াস সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। গ্রন্থকার 'অভিনয় প্রথারূপ পথের আবর্জ্জনা' দূর করিতে গিয়া বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে আবর্জ্জনা নিক্ষেপ করিয়াছেন। পুস্তিকাখানি পাঠ করিয়া প্রহসনকারের গীতের ছত্র মনে পড়ে, 'আপনি অন্ধ দৃষ্টি বন্ধ, পরকে দেখায় পথ।' 'অথার' ক্ষুদ্র রঙ্গপ্রহসন। 'অথার' নামধারী অক্ষম লেখককে ব্যঙ্গ করাই 'অথারের'

উদ্দেশ্য। পাঠ করিয়া 'ছুঁচ' ও 'চালুনীর' প্রচলিত প্রাচীন প্রবাদ-কথা, মনে পড়ে।

সংসারী। (হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা পুস্তক) ডাক্তার এম. সি, ব্যানার্জ্জী প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত। শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পশুপতি প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য বার আনা। গ্রন্থখানিতে হোমিওপ্যাথি মতে রোগ নির্দ্দেশ ও ঔষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা বেশ সহজ ভাষায় সরলভাবে বর্ণিত হইয়াছে। জ্বর, ওলাউঠা, ও জটিল স্ত্রী-ব্যাধি হইতে ক্রিমি, চুলকণা অবধি রোগের ঔষধ নির্দ্দেশে গ্রন্থখানি সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। অথচ গ্রন্থের কলেবর হিসাবে মূল্যও সুলভ। ডাক্তার মহাশয়ের ইংরাজী ধরণে নামকরণের সহিত আমাদিগের কোন সহানুভূতি নাই। এ ব্যাধি তাঁহাকে সহসা আক্রমণ করিল কেন, ইহার প্রতিকার সাধনে ডাক্তার মহাশয়ের মনোযোগ আমরা সবিনয়ে আকর্ষণ করিতেছি। এ নাম-বিভ্রাট আর কেন?

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

খাদ্য। শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু প্রণীত। মূল্য এক টাকা। আমরা চুনীলাল বাবুর খাদ্য সম্বন্ধে পুস্তকখানি অতি যত্নের সহিত পড়িয়াছি। পুস্তকখানি প্রায় আড়াই শত পৃষ্ঠায় পূর্ণ ও নানা বিষয়ের অনুশীলনে বড়ই শিক্ষাপ্রদ ও সুখপাঠ্য হইয়াছে। সাধারণ পাঠকের বুঝিবার সুবিধার জন্য শারীর বিজ্ঞানের পরিপাক প্রণালীর ও ছবির সহিত সরল বিবৃত্তি আছে। তা ছাড়া আরও অনেক অত্যাবশ্যকীয় বিষয় সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যথা

স্বাস্থ্যের সহিত খাদ্যের সম্বন্ধ।

খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান ও তাহাদের গুণ।

খাদ্যের পরিমাণ নিরূপণ। নিত্য ব্যবহার্য্য খাদ্য সম্বন্ধে দুই একটি কথা।

রন্ধন। আমিষ ও নিরামিষ ভোজন। খাদ্যে ভেজাল ও তন্নিরূপণের উপায়। ইত্যাদি।

আমাদের দেশের খাদ্য সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে; কিন্তু খাদ্য সম্বন্ধে পুস্তক বঙ্গভাষায় অতি বিরল। ডাক্তারবাবুর এই ছোট পুস্তকখানিতে আমাদের আয়ুর্ব্বেদীয় ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সঙ্গত অনেক কথা বিবৃত আছে। তাহাতে পুস্তকখানি দেশের লোকের খাদ্য সম্বন্ধে পড়িবার ও শিখিবার বড়ই উপযোগী হইয়াছে। পুস্তকখানির ভাষা অতি সরল ও বলিবার প্রথা অতি প্রাঞ্জল হওয়াতে সকলেরই সহজে বোধগম্য হয়।

আমাদের দেশে বিশেষ কলিকাতায় প্রায় সকল খাদ্যদ্রব্যই অল্প বিস্তর ভেজাল দেওয়া। আইন করিবার সময় এমন একটু শিথিলতা ছিল যে লোকে ভেজাল জিনিষ বেচিলেও যদি

"ভেজাল দেওয়া" "মিশ্র দুধ" "মিশ্র ঘী"

বলিয়া বেচে, তবু তার আইনমত দোষ হয় না। চুনীবাবু এসকল নিবারণ করিবার অনেকগুলি উপায় দেখাইয়াছেন। তিনি সাধারণ লোকদেরও সাবধান হইতে বলেন ও কোম্পানী বাহাদুরকে আইন সংস্কার করিতে বলেন।

চুনীবাবুর এই মত অনুসরণ করিয়া যদি ভেজাল দেওয়া খাদ্যের প্রচলন বন্ধ হয় ত দেশের কত উপকার হইবে। কলিকাতায় খাদ্যের দোষে কত লোক মন্দাগ্নি অম্ল প্রভৃতি রোগে কষ্ট পাইতেছে। ও কলেরা টাইফইড যক্ষ্মাকাশ ইত্যাদি রোগও দুষ্ট খাদ্য হইতে উৎপন্ন। দুধ ঘী প্রভৃতি নিত্য ব্যবহারের অনেক জিনিষই ভেজাল দেওয়া। দেশের লোকের স্বাস্থ্যের পক্ষে তাহা কত হানিকর। দুধের অভাবে ও দুধের দোষে আমাদের দেশে হাজার করা তিন শত তেত্রিশটি শিশু মারা যায়। এ সকলের প্রতিকার স্বরূপ তিনি যে কয়টি উপায় করিতে বলিয়াছেন তা মোটামুটি এই

১ লোক শিক্ষা। ২ আইন সংস্কার। ৩ আবশ্যকীয় ব্যবসায় যৌথ কারবার রূপে আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের—মনোযোগ ও চেষ্টা।

এই সদুপদেশপূর্ণ, জ্ঞানগর্ভ ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত পুস্তকখানি আমাদের দেশের গৃহলক্ষ্মীদের হাতে পড়িয়া নিশ্চয় অশেষ সুফল দিবে। এ পুস্তকখানি ঘরে ঘরে রাখা উচিত।

শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৪৪, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

বঙ্গবীর

ভুলুবাবু বসি পাশের ঘরেতে
নামতা পড়েন উচ্চ স্বরেতে,
হিষ্ট্রী কেতাব লইয়া করেতে
কেদারা হেলান দিয়ে।
দুই ভাই মোরা সুখে সমাসীন,
মেজের উপরে জ্বলে কেরোসিন,
পড়িয়া ফেলেছি চ্যাপ্টার তিন,
দাদা এম এ, আমি বি এ।

রবীন্দ্রনাথ।

শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিকল্পনা হইতে।

ইউ, রায় কর্ত্তৃক ব্লক] [কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত

ভারতী

৩৪শ বর্ষ]　　অগ্রহায়ণ, ১৩১৭　　[৮ম সংখ্যা

ভাবসাধন।

চিরকাল যাহার সঙ্গে আড়ি করিয়া বসিয়া আছি, আজ হঠাৎ 'এস' বলিয়া তাহার দিকে কর প্রসারণ করিলেই যে সে আমাদের হইয়া যাইবে এমন কথা কে বলিল? ঘরের শিল্প, তাহার সঙ্গে ভাব রাখিবার কোন পন্থা, কোন ইচ্ছা আমরা এতকাল রাখি নাই, আমাদের শিক্ষা দীক্ষা সমস্তই নিজস্ব শিল্পের সঙ্গে ভাবের অভাব ঘটাইবার জন্যই এতদিন প্রয়োগ করিয়া আসিতেছিলাম, আজ সখ হইয়াছে ভাব করিব কিন্তু তাহা হয় কই? এখন সাধিয়া হাতে পায়ে ধরিয়া ভাব করা ছাড়া তো উপায় নাই।

শিল্প তো সখের খেলনা নহে, সাধনার বস্তু। রত্নহার নির্জীব পদার্থ, তাহাকে যখন ইচ্ছা টানিয়া ফেল, যখন ইচ্ছা কণ্ঠে ধর। কিন্তু বন্ধুর বাহুপাশের মত পূর্ব্বপুরুষগণের ভাব সঞ্জীবিত যে শিল্প তাহাকে আজ টানিয়া ফেলিলে কাল চাহিবামাত্র ফিরিয়া পাওয়া দুষ্কর।

ভা ও ব সহজ দুইটা অক্ষর যে টান্‌কে বুঝায় মনে সেটার অভাব থাকিতে প্রাচীন ভারতশিল্পটা যে আমাদের যত্নের আদরের ও গৌরবের সামগ্রী এটা আমরা কিছুতেই বোধ করিতে পারিব না, সুতরাং এ অবস্থায় তাহাকে বুঝিতে অথবা বুঝাইতে যাওয়াই বিড়ম্বনা। ঠিক কোন্ ভাবে ভারতশিল্পটা গ্রহণ করিব তাহা বোঝা আমাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। আমরা দেখিতেছি যে পাশ্চাত্য শিল্পটা যেমন অবাধে আমাদের কাছে ধরা দিতেছে মনে হইতেছে, ভারতশিল্পটা সেরূপ করিতেছে না। শিল্পের যে একটা গুণ সহজে সাধারণের বোধগম্য ও মনোরঞ্জক হওয়া যেন সেই গুণের অভাব ভারতশিল্পে লক্ষ্য করিয়া আমরা ভারতশিল্পকে নানা দোষদুষ্ট অপরিণত এবং অসম্পূর্ণ বলিয়া বোধ করিয়া থাকি; কিন্তু আমাদের নিকট কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই যে সকল সময়ে ভারতশিল্পটারই দোষ একথা বলিতে পারি না, এ বিষয়ে আমাদের নিজের দিকেও যে ভারতশিল্পকে বুঝিবার একটা প্রকাণ্ড অক্ষমতা জন্মিয়াছে সেটা আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে।

অল্পকালই হইল আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে পড়িয়াছি এবং এই অল্প কালের মধ্যেই প্রাচীন ভারতবাসীর ভাব গতিকের সহিত আমাদের ভাবগতিকের একটা প্রচণ্ড বৈপরীত্য সংঘটিত হইয়াছে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যেমন করিয়া যে কাজটি করিতেন, যে সকল বিষয় লইয়া

যে ভাবে চিন্তা করিতেন, আমরা আজকাল ঠিক সেরূপটা করিনা। উন্নতির পথেই বল বা অবনতির দিকেই বল অগ্রসর হইতে হইতে আমরা প্রাচীন আর্য্যসভ্যতার সহিত যোগাযোগের পথ প্রায় রুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছি সুতরাং এ অবস্থায় ভারতশিল্পের নিগূঢ় সৌন্দর্য্য বুঝিবার অবসর আমাদের কোথায়? অন্তরে বাহিরে ধর্ম্মে কর্ম্মে প্রাচীন ভাব-নদীর সহিত বিচ্ছিন্ন রহিয়া পিপাসা তো আমাদের কোন দিন মিটিবে না উপরন্তু নদীর নাম ধরিয়া চিৎকার করিলে স্বরভঙ্গ হইয়া মরিবারই সম্ভাবনা। এ অবস্থায় তপস্যা করিয়া নদীর স্রোত নিজের দিকে আনা, নিজেকে প্রাণপণে নদীর দিকেই অগ্রসর করা অথবা ভগবানের কৃপা ভিক্ষা করিয়া স্থির থাকা ছাড়া উপায় কি! নীরস আধুনিক ও বিজ্ঞান যুগের মরু প্রান্তরে আমরা প্রাণ হারাইতে বসিয়াছি, জীবনে ভাবের প্রভাব সৌন্দর্য্যের স্পর্শ হইতে বঞ্চিত হইয়া কোন নরকের দিকে যে আমরা অগ্রসর হইতেছি তাহা বুঝিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত আমাদের লোপ হইয়াছে।

বিজ্ঞানের চোখে শিল্পটাকে দেখা চলেনা, ভাবের চক্ষে ধরা যায়। বিজ্ঞানের চক্ষে শিল্পে এটার অভাব, ওটার অভাব, আর ভাবের চক্ষে সকল অভাব পূর্ণ হইয়া শিল্পের স্বরূপ আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়। কি ভারত কি ইউরোপীয় সকল শিল্পকেই বুঝিবার এই একমাত্র অমোঘ উপায়।

প্রাচীন ভারতশিল্প যেটা প্রাচীন ভারত-বাসীর ভাবের বিকাশ সেটাকে হৃদয়ঙ্গম করিতে চাহি কিন্তু হৃদয়টাকে বিপরীত ভাবের বর্ম্মাচ্ছাদনে ঢাকিয়া রাখিয়া। এ অবস্থায় ভারতশিল্প যে কোনদিন আমাদের হৃদয় স্পর্শ করিবে এ আশা দুরাশা।

এই নবযুগের সুতীক্ষ্ণ জ্ঞানের অণুবীক্ষণ সাহায্যে লুপ্ত অক্ষর উদ্ধার করিয়া প্রত্নতত্ত্ব প্রকাশ করা চলে কিন্তু তাহাতে পুরাতন পুঁথির ভাব ও রস গ্রহণে কোন সহায়তা করে না। শিল্পেও তেমনি ভাবের চশমা না লাগাইলে আমাদের কোন লাভেরই আশা নাই।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, প্রাচীন সভ্যতার ও ভাবের সহিত যদি আধুনিক আমরা বিচ্ছিন্নই হইলাম তবে প্রাচীন শিল্পটাকেই বা ধরিয়া থাকিব কেন? আমরা একটা নূতন অবস্থার উপযোগী নব শিল্পের অবতারণা কেন না করি? অবশ্য এ কথা গ্রাহ্য হইবে সেইদিন যেদিন আমরা নবভাবে এমনই অনুপ্রাণিত হইব যে ভারতবাসী বলিয়া আমরা নিজেকে স্বপ্নেও অনুভব করিতে পারিব না, যে দিন আমাদের কাব্য সঙ্গীত আচার ব্যবহার ধর্ম্ম কর্ম্ম আমাদের নিকটে অসভ্যের খেয়াল কৌতুকের সামগ্রী মাত্র বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।

নব নব জ্ঞানের রেলগাড়িতে চলিয়া যে দ্রুত গতিতে আমরা অগ্রসর হইতেছি—তাহাতে সেদিনের আর বড় বিলম্ব নাই, কিন্তু আশার বিষয় এই যে ভারতের কোটী কোটী নরনারীর মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক জীবই এই মহাযাত্রায় টিকিট কিনিয়াছি।

দেশের কুলকামিনীগণের হস্ত হইতে সেই সত্যযুগের শঙ্খ আভরণ এখনও স্খলিত হয় নাই। বেদ ধ্বনিতে ব্রাহ্মণেরা এখনও প্রাণপণ

ধ্বনিত করিয়া থাকেন, দেশের সাড়ে পনরো আনা শিল্পির নির্ভর এখনও সেই প্রাচীন শিল্পেরই উপর, দীন দরিদ্র ধনী গৃহস্থ যতি সন্ন্যাসী এখনও অন্তরে অন্তরে সেই আর্য্য সভ্যতার অম্লান তিলকাঙ্ক বহন করিতেছে, আর ভগবান এই ভারতের ষড়ঋতুর সৌন্দর্য্যবিকাশে চিরন্তন প্রথার কোন ব্যতিক্রম ঘটতে দিতেছেন না। কালিদাস যে বর্ষার গান শরতের শোভা বসন্তের মাধুরী দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন সেই গ্রীষ্ম বর্ষাদি ঋতুগণ ঠিক তেমনি ভাবেই আমাদের চোখের সম্মুখ দিয়া আজও আসিতেছে যাইতেছে তবে কেমন করিয়া বলি নূতন শিল্প আমাদের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে!

এই কলিকাতা সহরে এখনও এমন লোকও আমি দেখিয়াছি যিনি ক্রোরপতি হইয়াও নিজের Portrait অঙ্কিত করাইবার সময় নিজেকে মহামূল্য সিংহাসনে না বসাইয়া গুরুদেবের ছত্রধারিরূপে অঙ্কিত করাইয়াছেন। আর্য্য সভ্যতা যখন এখনও ওতঃপ্রোতভাবে আমাদের জীবনের সঙ্গে বিজড়িত রহিয়াছে তখন অতি শিক্ষিত আমাদের মত দুই দশজন বাঙালীর কথায় আর্য্যশিল্পকে দেশ হইতে নির্ব্বাসন দিতে যাওয়া মূর্খতার কার্য্য।

যতদিন না এই ভারতখণ্ড তাহার তেত্রিশকোটী নরনারী তাহার এই শস্যশ্যামলা মূর্ত্তি লইয়া সমুদ্রের অতল গর্ভে প্রবেশ করে ততদিন জগতের লোক আমাদের প্রাচ্যজাতি বলিয়াই জানিবে এবং আমাদের নিকট হইতে প্রাচ্য শিল্পই প্রত্যাশা করিবে, ইতালীয় শিল্পও নয় ফ্রেঞ্চ শিল্পও নয় অথবা প্রাচ্য ইতালীয় এবং ফ্রেঞ্চ শিল্পের খিচুড়িও নয়। এ অবস্থায় ইউরোপের সহিত Loan খুলিবার যে বিশেষ আবশ্যক আছে এমন বোধ করি না।

আমরা নিজের ভাণ্ডার হইতে সল্প হইলেও যেটুকু দান করিব জগৎবাসীর নিকটে তাহারই মূল্য আছে, আর ধার করিয়া যেটা বিতরণ করিয়া যাইব তাহা চিরদিন চোরাই মালের সামিল হইয়া থাকিবে।

সমস্ত মানবজাতির মধ্যেই ভাবের আদানপ্রদান যখন চলিতেছে তখন শিল্পেও আদানপ্রদান চলিতে থাকিবে, সেটাকে ঠেকাইবার সাধ্য কাহারও নাই এবং সেরূপ আদানপ্রদানে দোষও দেখি না; কিন্তু দানই গ্রহণ করিতেছি দান করিতে অপারক এরূপটা হইলে আজ না হউক দশদিন পরেও অর্দ্ধচন্দ্র আমাদের ভাগ্যে সুনিশ্চিত।

Science of Perspective ইত্যাদি তুচ্ছ সামগ্রীর লোভে পুরুষ-পরম্পরালব্ধ যে আশ্চর্য্য শিল্প কৌশলটা হারাইতে বসিয়াছি সেটা জগতের আর কোন শিল্পই আমাদের দিতে পারিবে না। এই পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া perspective, anatomy আরও কত কি আমরা দখল করিয়াছি কিন্তু প্রাচীন ভারতের একটা মন্দির চূড়া অথবা একটি চিত্রের এক রেখা এক বর্ণও পুনঃসংস্কার করিবার ক্ষমতা লাভ করিয়াছি বলিয়া তো বোধ হয় না! তবে বৃথা পরিশ্রমে কোন্ লাভ? নূতন artএর সৃষ্টি করিতেছি এমন অহঙ্কারও আমরা রাখিতে পারি না, কেননা এই পঞ্চাশ বৎসরে ইউরোপীয়

শিল্প আমার যেটুকু অধিগত হইল সেটুকুও *ইউরোপে এখন অপ্রচলিত* out of fashion *হইয়া পড়িয়াছে সুতরাং সেটা লইয়া* ইউরোপের হাটবাজার গরম করিতে চেষ্টাও বৃথা, ইউরোপ এখন প্রাচ্যদেশের পুরাতন প্রদীপের মূল্য বুঝিয়াছে এবং তাহার আদরও করিতে শিখিয়াছে।

একবার আমার এক সাহেব বন্ধু আমাদের দেশের ঠিক বিলাতি দস্তুর মত লেখা কতকগুলি oil painting দেখিয়া বলিলেন এরূপ তো আমাদের Englandএ মেয়েরা পর্য্যন্ত আঁকে! লোকটা নিজেই artist এবং যেভাবে ঐ কথাগুলা বলিল তাহাতে আমার একটু রাগ হইল। ঠিক সেই সময় আমার হাতের কাছে কয়েকখানা চিত্র পুস্তক ছিল আমি তাহা হইতে একখানা লইয়া বলিলাম 'দেখ দেখি এগুলা কেমন'? সে বলিল এমন সুন্দর ফুল পাতা ইউরোপের কোন artistই আঁকিতে পারে না। আমি এইবার শোধ তুলিয়া বলিলাম এগুলি জাপানের Girl Schoolএর বালিকাগণের হাতের কাজ। তারপর আমাদের প্রাচীন শিল্পের পালা পড়িল। অর্দ্ধ ঘণ্টা আহা উহু ইত্যাদির পর সাহেবটি আমায় বলিয়া গেলেন যে "যে হিসাবে জাপানের Girl Schoolর drawing গুলি ইউরোপকেও হার মানায়, ঠিক সেই হিসাবে ভারত-শিল্পের নিজস্ব সামগ্রীটাও জগৎবাসীর কাছে আদর পাইবার যোগ্য এবং সে সামগ্রীটি হচ্ছে individuality.

সৃষ্টি হওয়া অবধি কালে কালে সকল দেশের সকল শিল্পই জগতের বক্ষে আপন আপন ছাপ রাখিয়া গেছে। শিল মোহরের মত এক ছাপ অন্যের গ্রহণ করিবার অধিকার *নাই! আমাদের ভারতশিল্প যে* ছাপ রাখিয়া গেছে তাহা ভারতসন্তান হইয়া পরিবর্জ্জন করিবার ক্ষমতা আমাদের কোথায়! এই শিলমোহরের ছাপ ভৃগুপদচিহ্নের মত চিরদিন ভারতের বক্ষে শোভা পাইবে, আমাদের ডসনের বুটের শত ঘর্ষণেও মুছিবার নয়। প্রাচীন শিল মোহরটা হল্ মার্কের মত সুদৃশ্য না হউক কিন্তু জগৎ শিল্পের খাতায় ভারতশিল্পের মোহরে অদলবদল ঘটাইবার ক্ষমতা আর্য্য শিল্পের স্বধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত কোন্ ভারতবাসীর আছে!

সমরক্ষেত্রে যুদ্ধের নিশানটা সব সময়ে মহামূল্যও নয় মহাসুন্দরও নয় কিন্তু লোকে প্রাণপণে তাহারই গৌরব রক্ষায় ব্যস্ত! আর ভারতশিল্পের ইন্দ্রধ্বজাটা কুশ্রী বলিয়া ধূলায় লুটাইয়া আমরা কোন্ কীর্ত্তিলাভ করিতে চলিয়াছি?

ভারতশিল্পের আকৃতি বিকৃতি ইহারই তর্ক মীমাংসা করিতে দিন কাটাইয়া কি লাভ। যে সুচেহারা দেখিয়া বন্ধুতা করিতে চলে তাহার পক্ষে বন্ধুলাভ যেমন দুর্ঘট, বিচার করিয়া তেমনি ভারতশিল্প কেন জগতের কোন শিল্পকেই পাইবার সম্ভাবনা নাই। অনিন্দ্য সুন্দর শিল্প মর্ত্তলোকে দুর্ল্লভ। যদি সত্যই আমরা ভারতশিল্পের মর্ম্মগ্রহণ করিয়া সুখী হইতে চাহি তবে তুমি সুন্দর নও, তোমার হাত পা কাঠির মত, তোমাতে perspective নাই, তোমার দেহের অস্থিগুলা ডাক্তারি শাস্ত্রসম্মত নয়, ইহা বলিয়া বসিয়া থাকিলে চলে কই? তুমি

কালো অতএব আমি তোমায় ভালবাসি, তুমি আমার হৃদয় আলো করিয়া থাক তোমাকে সকলে তুচ্ছ করে করুক আমি তোমাকে গৃহে স্থান দিব, তোমাকে নির্ব্বাসনে পাঠাইতে পারিব না, আমার কাছে তোমার তুলনা সে একমাত্র তুমি!—এই ভাব সাধন করিয়া যেদিন আমরা ভারতশিল্পের দিকে অগ্রসর হইব সেইদিনই শিল্পচর্চ্চায় আমরা সফলতা লাভ করিব। সেইদিন ভারতশিল্পের শীর্ণ কঙ্কালের ভিতরে আমরা যে পরমানন্দের অমৃত কণার সন্ধান পাইব তাহার কাছে শিল্পের বহিরঙ্গীন অংশগুলার মাদক আকর্ষণ কত না তুচ্ছ হইয়া যাইবে। বিকলাঙ্গী জননীকে যদি ভালবাসিতে কোন বাধা না থাকে, তবে আমাদের দেশের পাশ্চাত্য শিল্পপন্থীরা যাহার হাড়গোড় মুচড়াইয়া ডাক্তারি শাস্ত্রমতে সোজা করিতে প্রয়াস পাইতেছে সেই অনাদৃত শিল্পকে ভাল বাসিবার পক্ষে ভারতবাসী আমাদের যে কোন বাধা আছে এরূপ কল্পনা মনে স্থান দেওয়াতেও পাপ আছে মনে করি।

ভারতশিল্পটা আমাদের কাছে দুর্ব্বোধ্য হইবার কারণ ভারতশিল্পের মধ্যে নাই, কারণটা সম্পূর্ণরূপেই আমাদের অন্তরে কৃমিকীটের মত বাসা বাঁধিয়া আছে।

"যাকো রহে ভাবনা যৈসি
প্রভু মুরত দেখি তিন্ তৈসি।"

দুর্ভাবনার দিনে শরৎকালের পূর্ণচন্দ্রও আমাদের কাছে মলিন বোধ হয়, সেটা বিশ্বশিল্পিরও দোষ নয়, চন্দ্রেরও দোষ নয়, দোষ এই অধীর মনেরই বলিতে হয়।

নব সভ্যতার স্রোত প্রাচীন আর্য্য সভ্যতা হইতে আমাদের দিন দিন দূরেই লইতেছে। প্রাচীন শিল্প সাহিত্য কাব্য অলঙ্কার ভাব ভাষা প্রভৃতির সহস্র বন্ধন হইতে ক্রমশ বিযুক্ত হইয়া এমন অবস্থায় আমরা পড়িয়াছি যে এককালে যে শিল্পটা সম্পূর্ণ আমাদের ছিল আজ তাহাকে আলোচনা দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা পাইতে হইতেছে, ইহা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় কি হইতে পারে? শিল্প বিষয়ে এরূপ দীনতা আর কোন জাতির অদৃষ্টে কোন দিন ঘটিয়াছে কি! এই দীনতা আমাদের কিছুতেই ঘুচিবেনা যতদিন না প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও কলাবিদ্যাকে আর সকল শিল্প সকল সভ্যতা হইতে শ্রেষ্ঠ মানিয়া চলিতে শিখিব।

আধুনিক শিক্ষায় আমরা মজবুদ্ কেরাণী সুপটু উকিল এবং R,A, বা রোমীয় artistএর যৎকুৎসিৎ নকল হইতেছি মাত্র। আমরা ভারতবাসীরা যদি নিজস্ব শিল্পের কোন চিহ্ন জগতে রাখিয়া যাইতে চাহি তবে এই কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে ডাক্তারি শিখিতে মৃতদেহ যেমন প্রয়োজন উকিলের পক্ষে সাবেক কালের Roman Law, কেরাণীর পক্ষে চিরপুরাতন অঙ্কশাস্ত্র যেমন অত্যাবশ্যক প্রাচীন শিল্পটাও আমাদের সুশিক্ষার পক্ষে তেমনি অপরিহার্য্য। পুরাতনকে মৃত বলিয়া যে অগ্রাহ্য করে তাহার মত মূর্খ কোথায়! শিল্প সাধনে যদি আমরা অগ্রসর হইতে চাহি তবে ভারত শিল্পের শবাসনই আমাদের আদরের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে।

ভারত শিল্পকে আমাদের জীবনে পুনরধিষ্ঠিত করিতে হইলে, তাহার শ্রেষ্ঠতা ও আমাদের পক্ষে তাহার উপযোগিতা সম্বন্ধে

একেবারে নিঃসংশয় হইতে হইবে, তর্ক ও আলোচনা কোন দিন আমাদের নিঃসংশয় করিয়া দিতে পারিবে না।

হৃদয় রতন যাচিয়া মেলে, অযাচিত ও পাওয়া যায় কিন্তু যে যাচাইয়া গ্রহণ করিতে চাহে তাহাকে ঠেকিতে হয়।

আমাদের প্রাচীন শিল্পটাকে আমরা তামাকু ধরাইবার টিকাটার মত যৎসামান্য করিয়া দেখি সুতরাং তাহার যেখানে সেখানে আগুন ধরাইয়া সেটাকে ছাই ভস্ম করিয়া দিতে আমাদের কোন ভাবনা উপস্থিত হয় না। আমরা কথায় কথায় বলিয়া ফেলি, ভারত শিল্পের আকৃতি প্রকৃতিটা ইউরোপীয় দস্তর দিয়া একটু আধটু সোজা করিয়া দিলে ক্ষতিটা কি? এস তাহার বেমানান্ হাত পায়ের স্থানে গ্রীকমূর্ত্তির হাত পা কাটিয়া বসাইয়া দেওয়া যাউক, তাহার চম্পক অঙ্গুলির পরিমাণ উখা ঘসিয়া খাটো করিয়া ফেলি; তাহার গালের একদিক সাদা একদিক কালো করিয়া তাহার সুচেহারাটা ফুটাইয়া তুলি, তাহার তপস্যায় শীর্ণ দেহটাকে গোস্ত খাওয়াইয়া তাজা করিয়া তোলা যাক—ঠিক গ্রীসিয় কুস্তিগিরের মত!

শিল্প যে ছেলাখেলা নয় আমাদের জীবনের উপরে তাহার একটা প্রভাব আছে এটা যদি আমাদের জ্ঞান থাকিত তবে এত সহজে আমরা ভারত শিল্পের উপরে ছুরি চালানো ব্যাপারে উৎসাহের সহিত যোগ দিতে পারিতাম না।

যাঁহারা হাতে কলমে শিল্প চর্চ্চা করিয়া থাকেন তাঁহারা জানেন যে কোন চিত্রের বা কোন মূর্ত্তির রেখাপাত বা বর্ণ সন্নিবেশ প্রথায় সামান্য মাত্র ব্যতিক্রম ঘটাইলে চিত্রটার বা মূর্ত্তিটার ভাবে ও অর্থের কতই না বদল হইয়া পড়ে। চিত্রণের মুখে গঠনের বেলায় যেটা বাহির হয় তাহার উপরে হাত চালাইতে যিনি শিল্পি তিনিই সাহস করেন না আর আমরা অতি সহজে বলিয়া ফেলি কেন এরূপ পরিবর্ত্তনে দোষ কি? দোষ যে কি তাহা প্রস্তাবকারীর চোখে না পড়িতে পারে কিন্তু যাহাদের প্রাণ আছে প্রাণ থাকিতে তাহারা আনাড়ির হাতে ভারত শিল্পের চিকিৎসার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে কই!

যুগযুগান্তর ধরিয়া ভারত শিল্পের ভিত্তিতলে কত না শিল্পের কত তরঙ্গ আসিয়া বারম্বার আঘাত করিয়াছে কিন্তু কোন দিন তাহাকে স্বস্থানচ্যুত করিতে পারে নাই কিন্তু এই যে তাহার আশ্রয়-ভূমি আমাদের মন তাহার ভিতর হইতে যে একটা জিঘাংসা প্রবল ভূমিকম্পের মত সজোরে তাহাকে নাড়া দিতেছে তাহাতে ভারত শিল্পের পতন অবশ্যম্ভাবী। ভারত শিল্পের মন্দির চূড়া পাকা মসলায় গাঁথা দুই চারিটা ভূমিকম্প সে সহিবে কিন্তু তাহার অধিক নয়। সেই প্রলয়ের দিনে যে ভূমি তাহাকে নাড়া দিতেছে সেই ভূখণ্ডের সহিত কোন অতলে সে প্রবেশ করিবে তাহাই ভাবিয়া দেখ।

চ বর্গের উষ্ট্রবন্ধ ঞ-র মত ভারত শিল্পটা যদি বা আমাদের চক্ষে বিসদৃশ ঠেকে তথাপি ঞকে N করিয়া যেমন আমাদের কোন লাভ নাই তেমনি ভারত শিল্পকে পাশ্চাত্য শিল্পের ভারবাহী গর্দ্দভ করিয়াও আমাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে না।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জাপানের সহর।

(২)

জাপানের দৃশ্য অতি মনোরম। সমগ্র জাপানই যেন শিলং, দার্জ্জিলিং, শিমলা, মুসুরী, নাইনিতাল প্রভৃতি স্থানে পূর্ণ। জাপানের শতকরা ৮৪.৩ ভাগ পাহাড়ে আবৃত। শত শত ঝরণা, প্রস্রবণ প্রভৃতির ঝরঝর শব্দ বড়ই আনন্দদায়ক। আবার কোন কোন জায়গায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড waterfallগুলি ভীতিসঞ্চার করিয়া থাকে। আর সে শীতপ্রধান দেশে বরফের কোন নূতনত্ব নাই। পার্ব্বত্য জাপান ছোট বড় ৬০০ দ্বীপ সমষ্টি। ছোট ছোট নদীর সংখ্যা অল্প নয়। পর্ব্বতের ভিতর দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া সমুদ্রে গিয়া পড়িয়াছে। সমুদ্রের অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ দেশের নানাস্থানের অভ্যন্তর প্রদেশে প্রবেশ করিয়া এক অনির্ব্বচনীয় দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়াছে। সমুদ্র এবং পর্ব্বতের সম্মিলনেই প্রাকৃতিক দৃশ্যের চূড়ান্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

গতমাসে তোকিও সহরের ভিন্ন ভিন্ন পার্কের বিবরণ ভারতীয় পাঠকবর্গের নিকট বিবৃত করিয়াছি। অদ্য সহরের অন্যান্য বিষয় উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে জাপান সম্রাট মিকাদোর প্রাসাদ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিব। ১৮৬৭ খৃঃ পর্য্যন্ত সোগুণ উপাধিধারী সম্রাটের প্রধান সেনাপতি তোকিও সহরে বাস করিতেন। সে সময়ে তোকিও ইয়েদো নামে অভিহিত হইত। নামে সেনাপতি হইলেও সোগুণের প্রতিপত্তি এত বেশী ছিল যে কার্য্যতঃ তিনিই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন; সম্রাট মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্যের ন্যায় সহর হইতেই তিন শতাধিক মাইল দূরবর্ত্তী কিওতো রাজধানীতে অবস্থান করিতেছিলেন। যে রাষ্ট্রবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে জাপানের মধ্যযুগের অবসান হইয়া বর্ত্তমান যুগের প্রবর্ত্তন হয় সেই রাষ্ট্রবিপ্লবই প্রকৃত প্রস্তাবে তোকিও সহরকে রাজধানী পদে উন্নীত করে। তোকিও তখন অতি ক্ষুদ্র সহর ছিল। সেনাপতি স্বেচ্ছায় এবং সানন্দে আপন বাসভবন সম্রাটকে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ মনে করেন। সে আজ প্রায় ৩৩ বৎসরের কথা। তদবধি তোকিও জাপানের রাজধানী। তখন জাপানে রেল ছিল না। সম্রাট শিবিকারোহণে দূরবর্ত্তী কিওতো হইতে নূতন রাজধানী তোকিও সহরে আগমন করেন। পাঠক মনে করিবেন না যে সেনাপতির বাড়ী বলিয়া সম্রাটের বর্ত্তমান প্রাসাদ ছোট, বা সামান্য ধরণের। উহা বিশাল এবং বিস্তৃত। আমার যে সকল বন্ধু ইউরোপের প্রধান প্রধান দেশ এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্য দেখিয়া জাপানে আসিয়াছেন সকলেই মিকাদোর বাড়ীকেই সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রদান করেন। কোন কোন সম্রাট কিম্বা প্রেসিডেণ্টের প্রাসাদ অপেক্ষাকৃত বড় হইলেও মোটের উপর জাপান রাজভবন অনেক বিষয়ে অধিকতর সুন্দর। বাড়ী খানা একটা দুর্গের মত; তোকিও সহরের মধ্যস্থলে দীর্ঘে প্রস্থে আনুমানিক এক মাইল ব্যাপিয়া অবস্থিত

এবং পরিখায় বেষ্টিত। পরিখাগর্ভ হইতে উত্থিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হার্কিউলিয়ান পাথরে প্রথিত অত্যুচ্চ দিব্য দেওয়ালের উপর সবুজ দূর্ব্বাচ্ছদিত বেষ্টন এবং তাহার উপর সারি সারি কামান। পরিখার উপরিস্থিত ভিন্ন ভিন্ন দ্বারদেশের প্রশস্ত প্রস্তর সেতু সহরের

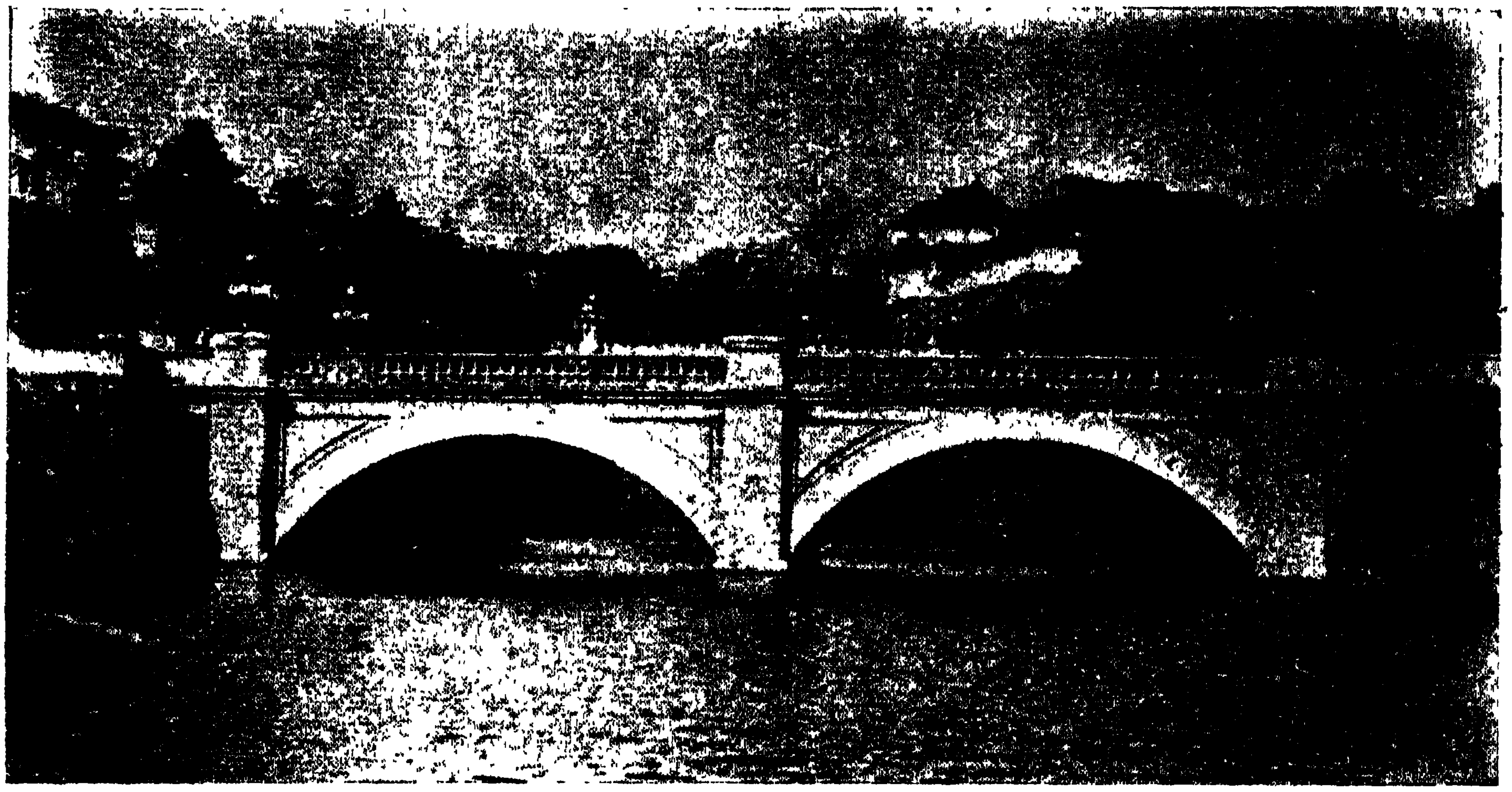

সম্রাটের বাড়ীর চতুষ্পার্শ্বস্থ পরিখা, তদুপরিস্থ সেতু, হার্কিউলিয়ন্ পাথরের দেয়াল এবং প্রহরীদের বিশ্রামাগার।

বিস্তৃত রাস্তার সহিত সংযোজিত রহিয়াছে। বহির্দ্দেশের তৃণাবৃত বিস্তৃত আঙ্গিণাগুলি এতই পরিষ্কার যে বহুমূল্য মকমল এবং কার্পেটাবৃত প্রাঙ্গণও তাহার নিকট লজ্জা পায়। সাধারণ লোক বহির্দ্দেশের কয়েকটী প্রাঙ্গণ পর্য্যন্তই অগ্রসর হইতে পারে। রাজভবনের দুই ধারে দুইটী পাব্লিক পার্ক। রাজবাড়ীর চারি ধারেই বৈদ্যুতিক ট্রামের রাস্তা।

রাজবাটীর প্রায় অর্দ্ধমাইল দূরে এক বিস্তৃত জায়গায় রাজপুত্রের (ক্রাউন প্রিন্সের) বাড়ী। এ বাড়ীর আয়তনও স্বয়ং সম্রাটের বাড়ীর অপেক্ষা নিতান্ত কম নহে, ইহারও কয়েক ধারে বিস্তৃত রাস্তা। তিন ধার দিয়া বৈদ্যুতিক ট্রাম এবং অপর ধারের তলদেশ দিয়া সুড়ঙ্গ পথে রেলগাড়ী ও বৈদ্যুতিক ট্রাম উভয়ই চলিতেছে। সম্প্রতি শ্বেত প্রাসাদ নামে নামক রাজপুত্রের জন্য যে প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা দেখিবার জিনিস। রাজপুত্র তাঁহার স্ত্রীপুত্রাদিসহ এই বাড়ীতে অবস্থান করেন। এই বাড়ীর এক পার্শ্বে সৈন্যদের কাওয়াজ খেলিবার বিস্তৃত মাঠ; ব্যারাক, এবং মিলিটারী কলেজ। রাজপুত্রের প্রাসাদ আওইয়ামা প্যালেস্ নামে পরিচিত। সহরের ঐ অঞ্চলের নাম আওই-য়ামা। আমাদের ভারতীয় ছাত্রদের তোকিওস্থ ইণ্ডিয়ান হাউস্ রাজপুত্রের বাড়ীর এক পার্শ্বেই অবস্থিত ছিল। রাজপ্রাসাদের নিকটবর্ত্তী প্রদেশেই বৈদেশিক নৃপতি মণ্ডলীর প্রতিনিধি বর্গের আবাসস্থল। রাজবাড়ীর নিকটেই শাসন, শিক্ষা, যুদ্ধ, এবং অন্যান্য বিভাগীয় বড় বড় আফিষ এবং পার্লিয়ামেণ্ট হাউসদ্বয়,

পার্লিয়ামেণ্ট এবং বড় বড় আফিষের অধিকাংশ বাড়ীই কাষ্ঠ নির্ম্মিত। জাপানীরা বাহ্যিক আড়ম্বরের বশবর্ত্তী হইয়া কোন বিষয়ে প্রচুর অর্থ আটক রাখিতে এবং তন্নিবন্ধন দেশের কারবারের প্রতিবন্ধক জন্মাইতে প্রস্তুত নহে। খর্ব্বাকৃতি, ক্ষুদ্রদেহধারী জাপানী সাধারণ ভাবে থাকিয়া বড় বড় কায করিতেই অভ্যস্ত।

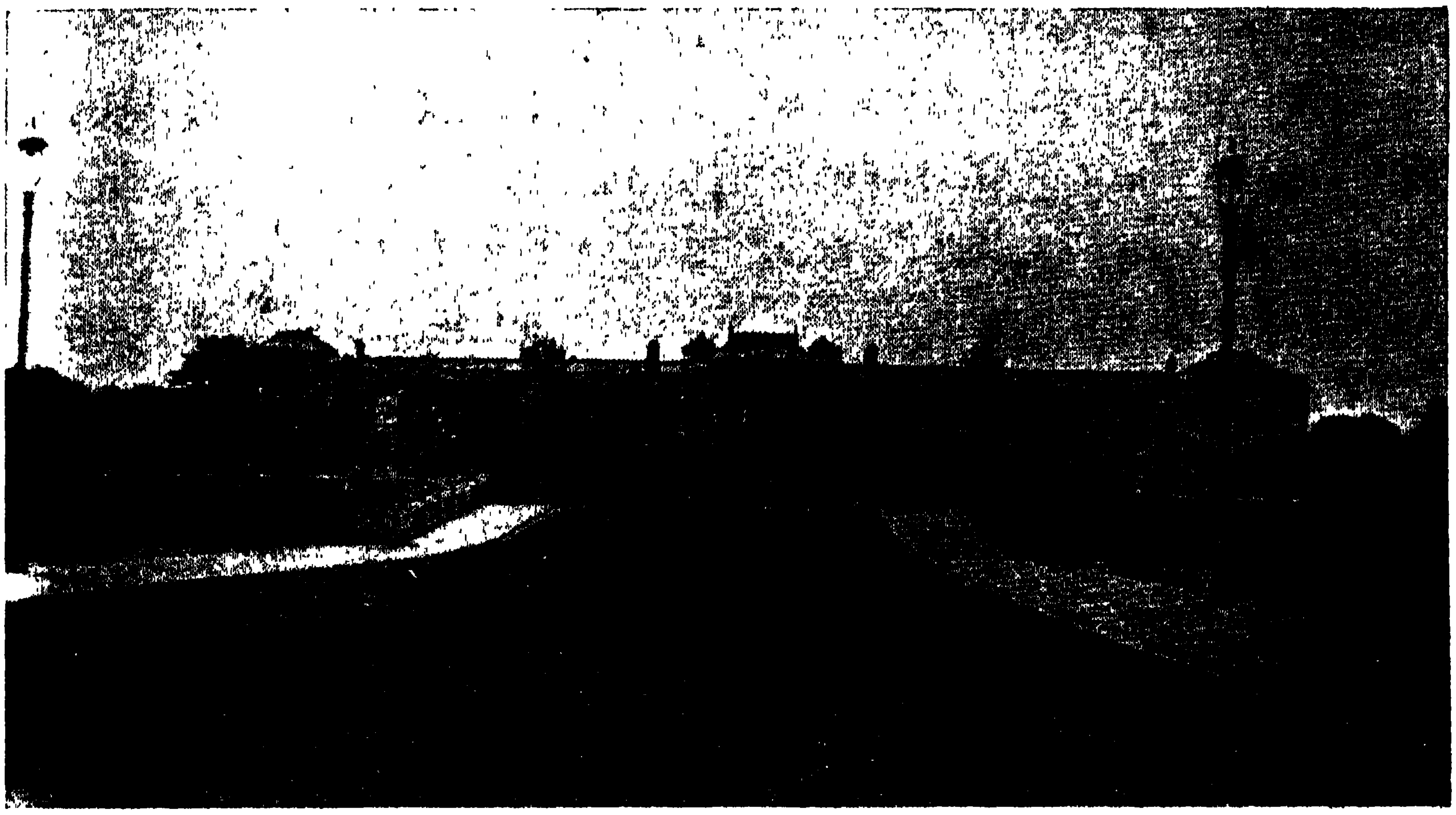

শ্বেত প্রাসাদ

প্রাচীন রাজধানী কিওতোর প্রাসাদ আজও পর্য্যন্ত অতি সযত্নে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। ইংরাজ রাজপ্রতিনিধির পরিচয় পত্র লইয়া উক্ত প্রাসাদ দেখিয়া আসিয়াছি। অন্দর এবং বাহিরবাটী সমস্তই প্রাচীন ধরণের, অনেকটা হিন্দুস্থানী ধরণের। টেবিল চেয়ারের পরিবর্ত্তে সর্ব্বত্রই তাতামি অর্থাৎ সুন্দর সুন্দর মাদুরে আচ্ছাদিত মেজে বা ভূমিতল। নানারূপ চিত্রিত পটে দেওয়াল সুসজ্জিত। প্রাচীনকালের চিত্রিত পট বলিতেই বুঝিতে হইবে যে সামুরাই জাতির যুদ্ধবিগ্রহের চিত্র। যুদ্ধবিগ্রহের চিত্র ছাড়া কোন কোন স্থানে জীবজন্তুর এবং গাছপালার চিত্রও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন রাজপ্রাসাদ দেখিলে বেশ প্রতীতি জন্মে যে প্রাচ্যের সভ্যতা জাপানে অনেক দিন পূর্ব্ব হইতেই বিস্তারিত হইয়াছিল।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে ছুমিদা নদীর দুই ধারে তোকিও সহর অবস্থিত। ইতিপূর্ব্বে যতকিছু উল্লেখ করিয়াছি সমস্তই ছুমিদা নদীর পশ্চিম তীরে। অপর তীরে রাশি রাশি কল কারখানা ব্যতীত উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু নাই। ম্যারিন স্কুল, কিশারি স্কুল প্রভৃতি কয়েকটী নূতন ধরণের ইন্‌ষ্টিটিউশন সহরের এই অঞ্চলেই। এ অঞ্চলে প্রত্যেক বাড়ীতেই ছোট খাট কোন না কোন কারখানা আছেই। আমাদের ভারতীয় ছাত্রদের

যাহারা কারখানায় কাজ শিখিতে যায় তাহাদের অধিকাংশকেই ছুমিদা নদীর এই পারে কায শিখিতে আসিতে হয়।

ছুমিদা নদী ক্ষুদ্র হইলেও বাণিজ্য-বহুল; ছোট ছোট ষ্টীমার এবং নৌকায় পূর্ণ; প্রতি পাঁচ মিনিট পর পর ছোট ছোট ফেরি ষ্টীমার সহরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে আরোহী বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। অর্দ্ধ কিম্বা এক মাইল অন্তর অন্তরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ষ্টেশন। এই নদীর উপর রিওগোকু জাপানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেতু। ইহার উপর বৎসরে জুলাই মাসে একদিন "হানাবি" অর্থাৎ আতসবাজির মহাসমারোহ হইয়া থাকে। এতদুপলক্ষে লক্ষ লক্ষ লোকসমাগম দেখিতে পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ী রাত্রিকালে তাড়িতালোক এবং আতসবাজির সাহায্যে স্ব স্ব ব্যবসায়ের বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া থাকে। সহস্র সহস্র নৌকা সমাগমে সেদিন জলে ও স্থলে যেন কোন ভেদ থাকে না।

নদীর ধারে বসন্তকালে মুকোজিমা নামক স্থানের চেরি প্রস্ফুটিত হইবার সময় প্রায় একমাস কাল সংসার-চিন্তা ভুলিয়া সহস্র সহস্র লোক অপার আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া উঠে। তখন তথায় রোজই যেন চূড়ামণি যোগ লাগিয়া আছে বলিয়া মনে হয়।

জাপানের বড় সহরের সহিত ছোট সহরের পার্থক্য কেবল আয়তনে এবং লোকসংখ্যায়। চাল চলন সর্ব্বত্রই এক। রাস্তা ঘাট, ঘর, দুয়ার অধিকাংশ সহরেই এক রকম। উত্তর অঞ্চল অর্থাৎ শীতপ্রধান প্রদেশস্থ সহরগুলির এবং তোকিও, ওসাকা, কোবে এবং ইয়োকোহামা প্রভৃতি কারবারী সহরের লোকগুলি সুচতুর এবং কর্ম্মঠ।

মার্কিন জাতির ন্যায় জাপানীরা আজকাল সহর প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে; দেশের গণ্য মান্য এবং নব্য ভদ্রলোকগণ রাজধানী অথবা অন্য কোন বড় সহরে বাড়ী করিয়া অবস্থান করিয়া থাকেন। অবস্থাপন্ন ব্যক্তির সমুদ্রতীরে, হ্রদ অথবা বিখ্যাত জলপ্রপাতের নিকটবর্ত্তী স্থানে গ্রীষ্মাবাস দেখিতে পাওয়া যায়।

জাপানের মিউনিসিপালিটী আমাদের মিউনিসিপালিটীর ন্যায় নহে। সহরের রাস্তা ঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইলেও নর্দ্দামাগুলি খোলা; ঢাকা সহরের নর্দ্দামার মত। নূতন রাস্তা ঘাট প্রস্তুত কিম্বা পুরাতনের মেরামত ভার মিউনিসিপালিটীর হস্তে। মিউনি-সিপালিটীর পার্ক প্রভৃতিতে মিউনিসিপালিটী হইতেই আলো দেওয়া হয়। তাছাড়া দোকানদারগণ এবং সহরের অধিবাসিগণ নিজ নিজ ব্যয়ে স্ব স্ব বাড়ীর সম্মুখে আলো দিয়া থাকে। অবস্থানুযায়ী কেহ তাড়িতা-লোক, কেহ বা গ্যাসের, আবার কেহ বা কেরোশিনের আলো বাড়ীর সম্মুখদেশে ব্যবহার করিয়া থাকে। আর বাড়ীর সম্মুখবর্ত্তী রাস্তাতেও গৃহস্বামীই পরিষ্কার রাখিয়া জল সিঞ্চন করিয়া থাকে। প্রত্যেক বাড়ীর আবর্জ্জনাদি নিক্ষেপ করিবার জন্য বাড়ীর এক পাশে একটি কাঠের বাক্স রাখিয়া দেওয়া হয়। দুই একদিন পর পর উহা পরিষ্কৃত হইয়া থাকে। পরিষ্কার করিবার জন্য কতকগুলি লোক নিয়োজিত আছে সত্য, কিন্তু তাহাদিগকে পারিশ্রমিক স্বরূপ অতি সামান্যই দিতে হয়; যেহেতু আবর্জ্জনা জমির পক্ষে মূল্যবান। উহারা

উহা মফস্বলে বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট উপার্জ্জন করিয়া থাকে। সহরে আলো দেওয়ার জন্য অনেক প্রাইভেট কোম্পানী রহিয়াছে, মাসের শেষে বিল করিয়া আলোর খরচ লইয়া থাকে। বড় বড় সহরে জলের কল আছে। সংরতলি এবং ক্ষুদ্র সহরে কূপের জল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জাপানীরা অদ্ভুত জীব। হোক্কাইদো দ্বীপে একটি ক্ষুদ্র সহরের লোক সংখ্যা বিশ হাজার। লৌহ এবং কয়লার আকর থাকায় ইহা একটি বাণিজ্যস্থান। কিন্তু এখানে জলের বড়ই অভাব। ত্রিশ মাইল দূরবর্ত্তী ছাপ্পোরের সহর হইতে রোজ রেলে তথায় জল নীত হইতেছে।

তোকিওর ন্যায় বড় সহরের রাস্তাতেও জল সিঞ্চনের বেশ বন্দোবস্ত নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি দোকানদার এবং সাধারণ বাসিন্দাগণ নিজেদের বাড়ীর সম্মুখের রাস্তা সিক্ত করিয়া থাকে। উহারা খোলা নর্দ্দামার কিম্বা নিকটবর্ত্তী খালের জল অথবা নিজ বাড়ীর কূপ অথবা কলের জলই রাস্তায় ছিটায়। আর পাবলিক রাস্তা এবং পার্ক প্রভৃতির জন্য স্থানে স্থানে রাস্তার ধারে কূপ আছে। ভিস্তি একরূপ কাঠের গাড়ীতে জল লইয়া রাস্তায় দেয়।

পায়খানার বিবরণ ভারতবাসীর নিকট একটু অভিনব। সহরে এবং গ্রামে সর্ব্বত্রই পায়খানার প্রচলন, মিউনিসিপালিটীর সহিত উহার কোন সম্পর্ক নাই; উহা গৃহস্বামীরই তত্ত্বাবধাধীন। সহরে কতকগুলি কোম্পানী আছে, ময়লা সংগ্রহ করাই তাহাদের ব্যবসা। কোম্পানীনিয়োজিত লোক কাষ্ঠনির্ম্মিত পাত্রে ময়লা সংগ্রহ করিয়া থাকে। এক একজন ঐরূপ ৮।১০টী পাত্র একখানা গাড়ীর উপর সাজাইয়া মফস্বলে টানিয়া লইয়া যায়। যে সময়েই তোকিওর পথে বাহির হও না কেন দেখিবে সারি সারি ময়লা গাড়ীর যেন শেষ নাই। জাপানীরা উহার গন্ধে অভ্যস্ত; আমরা কিন্তু নাকে রুমাল না দিয়া চলিতে পারিতাম না। জাপানীদের উহাতে একটু ঘৃণার ভাবও পরিলক্ষিত হয় না। এমন কি সহরের অনেক কেন্দ্রস্থলে ঐ সকল গাড়ীর আড্ডা দেখিতে পাওয়া যায়। জলপথেও বহু দূরবর্ত্তী গ্রামে ঐ সকল গাড়ী লইয়া যাওয়া হয়। তোকিও সহরে জলপথে নৌকাযোগে উহা রপ্তানী হইবার উল্লেখযোগ্য প্রধান ষ্টেশন আছাকুশার বিখ্যাত হায়ার পলিটেকনিক ইন্‌ষ্টিটিউশানের দ্বারদেশের সম্মুখভাগ। আমাদের দেশে—সাধারণ ভদ্রলোকের বাড়ীর সম্মুখেও এরূপ ষ্টেশন থাকিতে পারে না। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি সে বিষয়ে আদৌ আকৃষ্ট হয় না; যেহেতু উহা অনেকটা ধানের বস্তা, তুলার বস্তা, পাটের বস্তা প্রভৃতির ন্যায় বিবেচিত হইয়া থাকে।

শীতপ্রধান দেশ বলিয়াই ইহাদ্বারা সহজে ব্যারামের বীজ ছড়াইয়া পড়ে না। কোম্পানীর লোকগণ মফস্বলের কৃষকদের নিকট উহা বিক্রয় করিয়া থাকে। গৃহস্বামীকে ময়লা পরিষ্কার করার জন্য মেথরকে কিছুই দিতে হয় না বরং ইচ্ছা করিলে গৃহস্বামী মেথরের নিকট হইতে ময়লার মূল্যস্বরূপ কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিতে পারে। সাধারণতঃ অনেকেই নগদ মূল্য গ্রহণ করে না। ময়লার পরিবর্ত্তে মাঝে মাঝে শাক শব্জীর ভেট লইয়া থাকে। জাপানে মেথরশ্রেণী বলিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট

শ্রেণী নাই। যে কেহ পায়খানা পরিষ্কার করিতে পারে, তাহাতে জাতিভ্রষ্ট কিম্বা সমাজচ্যুত হইবার কোনরূপ আশঙ্কা নাই।

অনেকেই জানেন যে গরুর বিষ্ঠা জমির পক্ষে মূল্যবান সার। মনুষ্যের বিষ্ঠা উহা অপেক্ষাও অধিকতর মূল্যবান, যেহেতু মনুষ্য গরুর চেয়ে পুষ্টিকর এবং মূল্যবান পদার্থ আহার্য্যরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে। আমাদের ভুক্ত পদার্থের কিয়দংশ অস্থি, মাংস ও রক্তে পরিণত হইয়া দেহ পুষ্ট করে এবং বাকী অধিকাংশই রূপান্তরিত হইয়া বিষ্ঠারূপে বহির্গত হয়। উহা উদ্ভিজ্জের পরিপোষণে বিস্তর সহায়তা করে। মনুষ্য খাদ্যের সহিত উহা পুনরায় গ্রহণ করিয়া থাকে। অতি অল্প খরচে এই মূল্যবান সার সকলেই লইতে পারে। জাপানে ছোট বড় ধনী দরিদ্র কেহই এ সার জমিতে প্রয়োগ করিতে ঘৃণা বোধ করে না।

মিউনিসিপালিটীর ট্যাক্সের দায়ে গরীব সহরবাসীকে ঝালাপালা হইতে হয় না। যে যেরূপ চালচলনে চলিতে চায় তেমনি পারে। গরীব ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে বাড়ীর সম্মুখে আলো নাও জ্বালাইতে পারে। আর পাড়াপ্রতিবেশীর কলের জলেই তাহার সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।

সহরে এবং বড় বড় গ্রামে গতায়াতের সুবিধার জন্য ট্রাম এবং রিকশার বন্দোবস্ত আছে। তোকিও সহর কলিকাতার চেয়ে অনেক বড় হইলেও সেখানে গাড়ী ঘোড়া এবং মোটরকারের ধূম কলিকাতা হইতে অনেক কম। তোকিও সহর বৈদ্যুতিক ট্রামে ছাইয়া ফেলিয়াছে। তথায় চারি বৎসর অবস্থান কালে সংবাদপত্র স্তম্ভে একদিনের জন্যেও মোটর গাড়ী কিম্বা বৈদ্যুতিক ট্রামের চাপায় একটী ব্যক্তিরও অপমৃত্যুর সংবাদ অবগত হই নাই। তোকিওর ন্যায় ভারী সহরে ১৫।২০ খানার বেশী মোটর গাড়ীও নাই। ঘোড়ার গাড়ীর সংখ্যাও প্রায় তদ্রূপই। বাইসিকেল আজকাল ভদ্রলোকে কমই ব্যবহার করিয়া থাকে। ফেরিওয়ালা এবং সংবাদবাহকগণের ভিতরই উহার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। স্কুল কলেজের ছেলেরাও ব্যবহার করিয়া থাকে।

গাড়ী ঘোড়ার আড়ম্বর নাই বলিয়াই যে জাপানীরা আমাদের চেয়ে গরীব তাহা নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে উহারা এরূপ ব্যয়কে অপব্যয় বলিয়া মনে করে। একবার হায়দরাবাদের নিজামের ভাগিনেয় এক নবাব তোকিও সহরে গিয়াছিলেন। তাঁহার সেক্রেটারী এবং সৈন্যবিভাগীয় কাপ্তেনের সহিত তাঁহাদের আগমনের দ্বিতীয় দিবস সহর ভ্রমণে বাহির হই। তাঁহারা কয়েক মিনিটের অভিজ্ঞতাতেই গাড়ী ঘোড়া প্রভৃতির আড়ম্বর না দেখিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন "আরে ভিকারী সম্রাট রে! আরে ভিকারী মিউনিসিপালিটী রে। আরে ভিকারী জাপান রে।" বলাবাহুল্য মাসাধিক কাল অবস্থানের পর তাঁহাদের মনের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। তাঁহারা তখন দরিদ্র জাপানীদের ভিতরও ঐশ্বর্য্য পরিজ্ঞাপক কিছু না কিছু দেখিতে পাইতেন। বাস্তবিক দরিদ্র চাকরাণীগুলির রাশি রাশি যেরূপ মূল্যবান রেশমী বস্ত্র দেখিতাম আমাদের দেশের বিশিষ্ট অবস্থাপন্না ভদ্র

মহিলারও তেমন আছে কিনা বলিতে পারি না। জাপানের দরিদ্র কৃষকও তিন বার পরিতোষ সহকারে উদর পূর্ত্তি আর রেশমী বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকে। তেমন স্বচ্ছল অবস্থা আমরা কি কখন হিন্দুস্থানে আশা করিতে পারি।

শ্রীযদুনাথ সরকার।

বহ্বারম্ভ।

(১)

নীহারিকা একদিন তার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, আমি যদি এখন মরি, তুমি কি কর?"

সুকুমার গভীর ব্যথার ব্যঙ্গভাব প্রকাশ করিয়া বলিল, "ওঃ! তা হলে?—একটা মস্ত কবিতা লিখে ফেলি!"

নীহারিকা কহিল, "না—ঠাট্টা নয়! সত্যি বল—তুমি ফের বে কর?"

"তুমি আমায় এত অধম ভাব?"

নীহারিকা হাসিয়া বলিল, "দেখা যাবে!"

"কি দেখ্‌বে?"

"এই, ফের বে কর কিনা।"

সুকুমার একটু বিরক্ত ব্যথিত হইয়া বলিল—"যদি বে-ই করি তুমি আর দেখ্‌বে কোত্থেকে?"

নীহারিকা মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল—"সে তখন বুঝবে!"

ইহার কিছু দিন পরে নীহারিকা তার পিতার কর্ম্মস্থল—হাজারিবাগে গেল। তার বড় বোন প্রভাতকুমারীও স্বামীর সহিত তখন পিত্রালয়ে আসিয়াছিল। অরুণ বাবুর শরীর খারাপ। ছুটি লইয়াছেন—এখন হাজারিবাগেই থাকিবেন। লোকনাথ বাবু, জামাতাকে পৃথক বাটী ভাড়া করিতে দেন নাই।

(২)

এপ্রিল মাসের আর বেশী দেরী নাই। প্রভাত বলিল, "নীহার, আয় সুকুমার বাবুকে 'এপ্রিল্ ফুল্' করি।"

নীহারিকা সাহ্লাদে বলিয়া উঠিল—"বেশ! আমার একটা প্ল্যানও তৈরি আছে।"

"সত্যি নাকি? কি, বল্ দেখি! যাতে ঠকে, এমন করতে হবে!"

"নিশ্চয়ই ঠক্‌বেন, তা ছাড়া সেই সঙ্গে বেশ একটা রীতিমত একজামিনও করা হবে!"

"তা হলেত খুব মজা!—কি প্ল্যান করেচিস্?"

নীহারিকা বলিতে লাগিল, "একদিন তাঁকে জিজ্ঞেস্ কল্লুম—'আমি যদি মরে যাই তুমি কি কর'—?"

প্রভাত খুব হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "ও হরি! সকলেরি দেখচি এক রোগ!"

নীহারিকা বলিল, "ওমা! তুমিও বুঝি ঐ কথা জিজ্ঞেস্ করো?—তা, কি উত্তর পাও?"

তিনি অম্‌নি চোখছুটো কপালে তুলে

বলেন, "তা হলে ঘন ঘন মূর্চ্ছা যাবো আর কবিতা লিখিব!"

নীহারিকা গালে হাত দিয়া বলিল—"সকলেরি দেখ্‌চি এক প্রেস্কৃপশান!"

"তা যাক এখন তোর প্লানটা কি শুনি।"

"অরুণ বাবুকে দিয়ে একখানা চিঠি তাঁকে লেখান যাকে যে, হঠাৎ হার্টফেল হয়ে আমি মারা গেছি! দেখি কি করেন।"

প্রভাতের মনে প্লানটা তত সুবিধার বলিয়া মনে হইল না; নীহারিকার দিকে চাহিয়া সে বলিল, "দূর! সেকি ভাল?—"

নীহার বলিল, "তোমার ভয় নেই দিদি, আমি মরবো না!"

"দূর, তা কেন?"

"তবে কি?"

"যদি আবার বে করে বসে!"

নীহারিকার মুখ একটু লাল হইয়া উঠিল—সে বলিল, "না, সেটুকু বিশ্বাস আছে।"

প্রভাত কহিল—"তবে আবার একজামিন কেন?"

"ভাল ছাত্রকেও তো একজামিন দিতে হয়!"

প্রভাত কৃত্রিম দুঃখে বলিল—"আহা, বেচারা সেই বেলা থেকে একজামিন দিতে দিতে জ্বালাতন হয়ে গেচে—আবার তোর কাছে একজামিন!"

নীহারিকা হাসিয়া বলিল—"পুরুষের সারাজীবনই ত একজামিন।"

এমন সময়ে অরুণচন্দ্র সেখানে আসিয়া বলিলেন—"আর মশায়রা বুঝি বসে বসে প্রাইজ দিবেন!" অরুণবাবুর দিকে না. চাহিয়াই নীহার হাসিয়া বলিল—"সেই রকম ত মনে হয়!"

(৩)

'এপ্রিল ফুলের' প্লান শুনিয়া অরুণচন্দ্র প্রথমটা রাজি হইলেন না কিন্তু হঠাৎ আর একটা মতলব তাঁর মাথায় আসিল—তিনি বলিলেন, "বেশ, আমিও রাজী!"

নীহারিকা ও প্রভাত সকৌতুক ব্যগ্রতার সহিত সুকুমারের পত্রের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। পাঁচ দিনের দিন সুকুমারের নিকট হইতে পত্র আসিল। অরুণ বলিলেন, "নীহার, দেখো, সুকুমার 'মাই ডিয়ার অরুণবাবু'—লিখেই তোমার শোকে চোখের জলে ভেসে গেছে—এই দেখো কাগজ চুপসে গেছে!"

স্বামীর সুগভীর স্নেহ স্মরণ করিয়া নীহারিকার ডাগর চক্ষু দুটী অশ্রুসজল হইয়া উঠিল!

কিছু দিন পরে প্রভাতের নিকট সুকুমারের সম্পাদিত 'মলয়া'র চৈত্র সংখ্যা আসিল। নীহারিকা দেখিল, কাগজের প্রথমেই আর একখানি 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমে'র সৃষ্টি হইয়াছে! প্রবন্ধের নীচে লেখা—"অভাগা"।

দুই ভগিনীতে খুব খানিকটা হাসিলেও প্রিয়জনকে কৌতুকের খাতিরে বেদনা দেওয়ায় নীহারিকা অন্তরে অন্তরে ব্যথা অনুভব করিতে লাগিল। নীহারিকা বলিল, "না ভাই! আর বেচারাকে কষ্ট দিয়ে কাজ নেই, এবার বহরমপুর যাওয়া যাক্!"

প্রভাত রাজী হইল না—বলিল, "আচ্ছা, আর একটু দেরী করনা, বেদনা ও বিরহ আর একটু পেকে আসুক।"

বৈশাখের "মলয়ায়" নীহারিকা দেখিল—

তার ছবি বাহির হইয়াছে—চারি ধারে মোটা কালো 'বর্ডার' মধ্যে একটী করুণ মর্ম্মস্পর্শী সনেট! নীহারের ব্যথিত প্রাণ বহরমপুর যাইবার জন্য আবার অস্থির হইয়া উঠিল! প্রভাত বাধা দিল। আরো চারি মাস কাটিয়া গেল—ইহার মধ্যে "মলয়াতে" নীহারিকার শোকে অনেকগুলি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে! সেই সঙ্গে সম্পাদকের ব্যঙ্গরসাত্মক কয়েকটী ক্ষুদ্র গল্পও আছে।

নীহার একটু আশ্চর্য্য হইয়া প্রভাতকে একদিন বলিল—"আচ্ছা! তাঁর যদি মন খারাপ তা হলে এমন হাসির লেখা বেরুচ্চে কেমন করে?"

প্রভাত হাসিয়া বলিল—"ঐটি পুরুষদের বিশেষ তো লেখক জাতের বাহাদুরী!—আরো এরকম কাণ্ড আমি দেখেছি!"

নীহারিকা বলিল, "তবে কি পুরুষের হাসাও মিছে কাঁদাও মিছে?—"

"ভাদ্রের রোদবিষ্টি কি মিছে?"

"মিছে নয় বটে কিন্তু কোন কাজেরও নয়—সে জলে মাটিও তেমন ভেজেনা, সে রোদে কাপড়ও শুখোয় না!

(৪)

আশ্বিন মাস। ছুটির আগেই 'মলয়া' বাহির হইবার কথা। নীহারিকা ভাবিতেছিল, এবার পূজার সংখ্যার ছদ্মাবরণে প্রিয়তমের ব্যথিত প্রাণের আর একটু ভাবতরঙ্গ পাইব —না জানি পূজার 'মলয়া'র ছত্রে ছত্রে বর্ণে বর্ণে তাঁর কত ব্যথা কত মর্ম্মপীড়া কত অশ্রুসিক্ত ভালবাসা নিহিত আছে!—সত্যই আমি নিষ্ঠুর!—বড় নিষ্ঠুর—একজনের প্রাণের ব্যথা নিয়ে আমোদ কৌতুক!

এমন সময় প্রভাত পিছন হইতে বলিল—"নীহার! নাঃ! সুকুমারটা শেষে ফেল্-ই হ'ল।" কথাটা বলিয়া আশ্বিনের 'মলয়া'খানা তার সম্মুখে ফেলিয়া সে চলিয়া গেল!

"সুকুমার ফেল্!"—নীহারিকার মুখের রংটা পাঁশের মত হইয়া গেল। সে কম্পিত হৃদয়ে, 'মলয়ার' পাতা খুলিয়া দেখিল সুকুমারের নব-পরিণীতা স্ত্রীর ছবি—এমন সুন্দর অথচ এমন কুৎসিত বুঝি নীহারিকা জীবনে কিছু দেখে নাই! আবার ছবির তলে চারি লাইন কবিতা—

"ক্ষমা কর তুমি দেবী!—অতীত প্রতিমা!
তুমিই এসেছ ফিরে নব প্রতিমায়
ধুইয়া স্বর্ণদীনীরে মৃত্যুর কালিমা,
এই জ্ঞানে স্থাপিয়াছি এ চারুবালায়!"

নীহারিকার চক্ষু ফাটিয়া যেন আগুনের হল্কা বাহির হইতে লাগিল! নীহারিকার মৃত্যুসংবাদ তার স্বামীকে ব্যথা দেয় নাই—কবিতার উপাদান যোগাইয়াছে মাত্র!—যে নারী স্বামীর স্মৃতি হৃদয়ে আমরণ জাগাইয়া রাখে, সেই স্বামী স্ত্রীর চিতার আগুণ না জুড়াইতেই আবার ঘটকের দ্বারস্থ হয়!—নীহারিকা যতই ভাবিতে লাগিল, ততই যেন তার বুকটা ফাটিয়া যাইবার উপক্রম করিল!

এমন সময় পশ্চাৎ হইতে পরিচিত কণ্ঠে কে বলিল—"এ কি! নীহার তুমি বেঁচে!"

নীহার চম্‌কাইয়া উঠিল—দেখিল,—তার স্বামী!

সুকুমার হাসিয়া বলিল "সতীনের হাতে স্বামীটিকে দিয়ে বুঝি স্বর্গে মন্ টিঁকল না? এখন সতীনটিকে আদর করে ডেকে আনো! গাড়ীতে বসে আছে।"

নীহার গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল—"বেশত! চল না!"

সুকুমার বলিল—"ইস্—থাক্ না!—এখনি আবার স্মেলিং সল্টের দরকার হবে!"

নীহারিকা বলিল—"তুমি ত আচ্ছা লোক! কাগজে ছাপালে কেমন করে?"

এমন সময় প্রভাত ও অরুণচন্দ্র সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নীহার তাঁর দিকে ফিরিয়া বলিল—"অরুণবাবু, শেষে আপনার এই বিশ্বাসঘাতকতা!"

অরুণবাবু সহাস্যে বলিলেন "কি করি বল! পাখোয়াজের দুদিকেই ঘা দিতে হয়, নহিলে যে বেসুরো বাজবে! তোমরা দুই বোনে এককাট্টা হয়ে বেচারাকে জব্দ করতে গিছলে, আমি একটু তাঁর পক্ষ নিয়েছিলুম—আবার কোন্ দিন আমায়ও তো অমনি কর্‌তে পারো! তখন কে সহায় হবে, বল!"

নীহারিকা বলিল—"নাঃ, আপনার জন্যই আমাদের এই হারটা হল!"

প্রভাত বলিল—"আচ্ছা, সে যেন হোল—কিন্তু সেই সঙ্গে 'মলয়া'র এতগুলি নিরীহ পাঠক কি অপরাধ করেছিল যে তারাও ঠক্‌ল!"

সুকুমার হাসিয়া বলিল—"ওহো ও কথানা আপনাদের জন্য স্পেশ্যাল্ কাপি!"

শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ।

বৌদ্ধ ও প্রাচীন মোগল চিত্রশিল্প।

আশ্চর্য্যের বিষয় অজন্তার ছবির মধ্যে আমরা বাঙ্গলাদেশের দৃশ্যের আভাষ পাই। প্রথমত আমরা গুহার নিকটবর্ত্তী ও দূরবর্ত্তী গ্রামে বেড়াতে গিয়ে যত কুটীর দেখেছি, সবগুলিরই মাটীর ছাদ; কিন্তু, অজন্তার ছবিতে অবিকল বাঙ্গলার মত আটচালা! ও দেশের লোক নারকল গাছ চোখে দেখেনি; কিন্তু ছবিতে নারকল গাছ যথেষ্ট! বঙ্গদেশে যেমন উঁচু বৃষস্কন্ধ দেখা যায়, অন্য কোন দেশের ষাঁড়ের বোধ হয় তত উঁচু কাঁধ নয়; অজন্তার ১ নং গুহায় ষাঁড়ের লড়াইয়ের ছবিতে ঠিক আমাদের দেশের ষাঁড়ই অঙ্কিত। এই সমস্ত দেখে অনেকে বলেন যে, বাঙ্গলা দেশ থেকে কোন ছাত্র অজন্তার শিল্পাশ্রমে চিত্রবিদ্যা শিখ্‌তে গিয়ে ছিলেন। কিছুই বিচিত্র নয়! আবার নয় নম্বর গুহায় থামের গায়ে আঁকা যে কয়েকটি বুদ্ধদেবের ছবি আছে—সেগুলি অবিকল চীন ছবির অনুরূপ! তা দেখে অনেকে অনুমান করেন যে, চীন কারিকর এদেশে এসে আমাদের চিত্রশিল্প শিখে গিয়েছিলেন। আমি এখানে অনেক জায়গায় রোমশিল্পের আভাষও দেখেছি। গ্রীক প্রভৃতি বিদেশীয়গণও যে এ দেশে শিল্পশিক্ষার অভিপ্রায়ে এসেছিলেন—এ থেকে এরূপ অনুমানও অসঙ্গত নয়। যাঁরাই এসেছেন তাঁরাই এখানে নিজের দেশের শিল্পের কিছু কিছু রেখে গেছেন। চীন ও জাপান-বাসীরা ত স্বীকারই করেন যে, বৌদ্ধ ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের

দেশের শিল্প-বিদ্যাও তাঁদের দেশে এবং অন্যান্য সকল দেশে গেছে।

অনেকে মনে করেন পূজনীয় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রের আদর্শ জাপান চিত্র হইতে গৃহীত—অজন্তার ছবি দেখলে কিন্তু এ ভ্রম একেবারেই দূর হয়ে যায়। তাঁর চিত্র—এমন কি সেই চিত্রের প্রাণ পর্য্যন্ত যে ভারতবর্ষীয় তাহা অজন্তার চিত্র দেখলে আর সন্দেহ থাকে না।

ইংরাজেরা নয় নম্বর গুহাকেই অন্যান্য সকল গুহার চেয়ে বেশী প্রাচীন বলেন,—কেন জানি না। তাঁরা বোধ হয়, গুহার অনেকগুলি ছবিতে অপকৃষ্ট অসভ্যের আকৃতি দেখ্‌তে পান বলে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন! কিন্তু, সেই গুহাটাতেই আবার আমরা 'বুদ্ধদেবের প্রচার' প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ছবিও দেখেছি। তবে, থামের গায়ে খোদা যে একটা লেখা আছে সেইটে ধরে' যদি—তাঁরা কিছু আবিষ্কার করে থাকেন ত' সে কথা স্বতন্ত্র!

আমরা অজন্তার ছবিগুলিতে মাত্র দু-এক যায়গায় পালি অক্ষরের মত লেখা দেখেছিলুম। আর পাথরের দেওয়ালের উপর খোদা লেখাও দুএকটা গুহাতে পেয়েছি। সেগুলিতে ঐতিহাসিকদের জান্‌বার বিষয় অনেক থাক্‌তে পারে। আমরা এক, নম্বর, দুই, নয়, দশ, ষোল, সতের, উনিশ প্রভৃতি নম্বরের কতকগুলি গুহা ভিন্ন, আটাশটা গুহার মধ্যে অন্য কোনটাতে বড় একটা ছবি দেখ্‌তে পাইনি। পথ না থাকায় একটা গুহাতে তো একেবারে যাওয়াই গেল না। অল্পসংখ্যক কতকগুলি গুহা অসম্পূর্ণ ভাবে পড়ে আছে। কোনটার কেবল বারান্দাটুকু খোদা মাত্র হয়েছে, কোনটা কেবলমাত্র খুদ্‌তে আরম্ভ করেছিল; পাহাড়ের গায়ে বাটালীর দাগ এখনও বেশ পরিষ্কার ফুটে আছে! দেখ্‌লে মনে হয় যেন এইমাত্র শিল্পীরা বসে বসে কাটছিল, পরিশ্রান্ত হয়ে যে যার বাড়ী গেছে। কতকগুলিতে পূর্ব্বে ছবি ছিল,—কিম্বা আঁকা হচ্ছিল—কালে মাটী চাপা পড়ে সেগুলি একেবারে অদৃশ্য হয়েছে! অজন্তার বেশীর ভাগ ছবি একেবারে লুপ্ত ও নষ্ট হয়ে গেলেও এখনও তাকে অক্ষয় ভাণ্ডার বলা চলে। যে সব ছবি এখনও বর্ত্তমান আছে সে গুলির আমরা কেউ যদি আজীবন ধরে প্রতিলিপি (copy) করি, তবে, এ জীবনে সেগুলি শেষ করে উঠতে পারি কিনা সন্দেহ!

আমি এইবার অজন্তার বিশেষ বিশেষ কয়েকটা ছবির বিষয় কিছু বো'লে আমার প্রবন্ধ শেষ ক'র্‌ব। প্রথম নম্বর গুহায় আমরা একটা বিশাল, সৌম্য, ও সুন্দর কান্তি বিশিষ্ট বুদ্ধদেবের ছবি গুহাটীকে উজ্জ্বল ক'রে রেখেছে দেখ্‌তে পাই। সেখানি বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগের চিত্র ব'লে মনে হয়। সেই ছবি খানিতে চিত্র-শিল্পিরা বাস্তবিকই তাঁদের মহৎ ও উদার অন্তঃকরণের পরিচয় দিয়ে গেছেন; কেন না, তাঁদের মন সেরূপ উচ্চ না হ'লে ছবিতে তেমন বিশ্বপ্রেমে বিহ্বল ও আত্মহারা ভাব কখনই দেখাতে পার্‌তেন না। সাধারণতঃ কবিদের লেখায়, আর চিত্রকরের চিত্রে তাঁদের চিত্তের ভাব প্রতিফলিত হ'তে দেখা

বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগ।

(অজন্তার প্রথম গুহার চিত্র হইতে)

যায়। এক নম্বর গুহার মধ্যে "বুদ্ধদেবের প্রলোভন" ছবি খানিও সুন্দর ভাব-ব্যঞ্জক চিত্র! সে ছবি খানিতে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ মাৎসর্য্য প্রভৃতি রিপুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও পরিবেষ্টিত হ'য়ে ভগবান বুদ্ধদেব অটল-গম্ভীর ভাবে ধ্যানে নিমগ্ন! তিনি শত-সহস্র প্রলোভনের মধ্যে থেকেও মনে মনে তাদের চেয়ে ঢের তফাতে যেন কোন শান্তির আলোকময় রাজ্যে ভাস্‌চেন! আর তাঁর জড়-তনু খানি সেখানে প্রাণশূন্য হ'য়ে পুতুলের মত বসে আছে! এদিকে আশে-পাশে চারিদিকে দুর্দ্ধর্ষ শত্রুরা তাঁকে প্রলোভিত করবার জন্যে যার-যতদূর সাধ্য চেষ্টা কর্‌চে। কাম সুন্দরী স্ত্রী মূর্ত্তি ধরে, লোভ চারুবেশে, মোহ দানব সেজে, মদ-মাৎসর্য্য প্রভৃতিরা আরও রকম রকম মূর্ত্তি ধরে তাঁকে প্রলোভিত করার নানা রকম কৌশল করচে। রাজসভায় দুজন পণ্ডিতের তর্ক বিতর্কের ছবিখানি অত্যন্ত কৌতুকজনক! এক নম্বর গুহায় যে একটা প্রকাণ্ড ভীষণ দর্শন সাপের ছবি আছে, সেটা এত স্বাভাবিক যে, হঠাৎ দেখ্‌লে আতঙ্কে শিউরে উঠ্‌তে হয়!

সতের নম্বর গুহায় উৎকৃষ্ট ছবির সংখ্যা কিছু বেশী। অন্যান্য ভাল ভাল ছবির মধ্যে ভিখারী বেশী বুদ্ধদেবের সাম্‌নে মাতৃমূর্ত্তির ছবি খানিতেই গিরিগুহাটী অলঙ্কৃত করে তুলেছে। মা ছেলের হাত ধরে তাকে দিয়ে বুদ্ধদেবকে ভিক্ষা দিতে গেছেন, অবশেষে মহাত্মা বুদ্ধদেবের সৌম্যোজ্জ্বল কান্তি দেখে, ভক্তি-প্রেম-বিহ্বল হ'য়ে তাঁর চরণ-প্রান্তে পুত্র সমেত নিজেকে নিবেদন করতে যাচ্ছেন! অন্তর্য্যামী বুদ্ধদেবও যেন তার মনোগত ভাব বুঝ্‌তে পেরে নত হয়ে তাদের দেওয়া ভিক্ষা সাদরে গ্রহণ কর্‌ছেন! ভিক্ষাপাত্রধারী বালকটীর মুখে সরল-নির্ভীক-হৃদয়ের মাতৃ-ভক্তি ও আনুগত্যের ভাব সুন্দর প্রকাশ পেয়েছে! বুদ্ধদেবকে দেখ্‌লে মনে হয়, যেন তাঁর অন্তর-নিভৃতে কি এক কোমল করুণ সুর বাজচে, যেন তাই তিনি অপরের বেদনায় ব্যথিত, দুঃখে দুঃখিত, এবং ভগবৎ প্রেমে বিহ্বল!—এক কথায়—ছবি খানিতে জননীর স্নেহ, ভক্তের প্রেম, বুদ্ধদেবের করুণা এবং পুত্রের আনুগত্যের ভাব সুন্দর ফুটেছে! বুদ্ধের ছবি খানি মাতৃমূর্ত্তির দ্বিগুণ বা ততোধিক বড়। তা'তে বোধ হয় যে, মাতৃমূর্ত্তির হৃদয় পটে মহাতাপস বুদ্ধদেবের যে বিশাল ও উদার ছবি খানি প্রতিফলিত হয়েছিল, সেই ভাবটা দেখাবার জন্যেই শিল্পী বুদ্ধ-মূর্ত্তিটীকে ও রকম অস্বাভাবিক বড় করে এঁকেছিলেন। বুদ্ধদেবের ছবির এখন শুধু ব্লকটুকুই বর্ত্তমান! কিন্তু তাতেও তার সৌন্দর্য্য লোপ পায়নি।

সতের নম্বর গুহায় সিংহল বিজয়ের চিত্র-গুলিতে আমরা ধর্ম্ম যুদ্ধের আদর্শ দেখ্‌তে পাই। যাঁরা কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি পুরাকালের যুদ্ধ-প্রণালী আর নারাচ, বজ্র, শেল, শূল আদি নানারকম অস্ত্র ও অস্ত্রের চালনা কিরূপ ছিল জানতে চান, তাঁরা সিংহল বিজয়ের ছবি গুলিতে তা' দেখ্‌তে পাবেন। কোন কোন যায়গায় (সম্ভবতঃ সিংহলের) দুর্গদ্বারে বিপক্ষের অশ্বারোহী আর পদাতিক যোদ্ধার দল বীর-দর্পে ও মহোল্লাসে যেন মেদিনী কাঁপিয়ে প্রবেশ কর্‌ছে।

পরাজিতেরা এখনও সম্মুখ সমরে তৎপর। এই যুদ্ধ ব্যাপারের ছবিগুলি দেখলে মনে বাস্তবিক আলো আঁধারের মত আনন্দ ও আতঙ্কের উদ্রেক হয়! সিংহল বিজয়ের ছবিগুলিতে আমরা প্রাচীন অর্ণবপোতের ছবি দেখতে পাই। এক যায়গায় একটা মিছিলের চিত্রে কতকগুলি লোক আনন্দে চীৎকার করচে, কতকগুলি লোক হাতীর পিঠ থেকে ভেঁপু বাজাচ্চে। তাদের ভাব-ভঙ্গি একমনে কিছুক্ষণ দেখলে ঢাকার জন্মাষ্টমী মিছিলের কিম্বা কল্‌কাতার বড়লোকের বিবাহের সমারোহের বাদ্যকোলাহলময় শব্দ, কানে যেন খুব স্পষ্ট ভাবে এসে লাগে। ছবিতে এরকম ভাব দেখান কম ক্ষমতার কাজ নয়। মৃগয়ার ছবিগুলিও বেশ চিত্তরঞ্জক! সেগুলি আজ কালকার মত 'ফাঁসকল' পেতে শীকার করার ছবি নয়। তাতে অনেক বিষয় বোঝবার ও দেখবার আছে। হরিণদের স্বাভাবিক ভয়বিহ্বল চপলভাব আর শিকারীদের মৃগয়াকৌশল তাতে সুস্পষ্ট। নর-নারীর বিলাসচিত্র ও দাম্পত্য প্রেমের ছবিও যথেষ্ট পাওয়া যায়। তার মধ্যে ১৭ নং গুহায়, প্রবেশ দ্বারের উপর কতকগুলি দম্পতির ছবি উল্লেখযোগ্য। আর এক জায়গায় কোন কামিনী বসন্ত আগমনে হৃষ্টচিত্তে বাসন্তি রঙের কাপড় প'রে দোলনায় দুলছে; তার আননে ও গঠনে যৌবনের ধীর ও প্রফুল্ল ভাব সুন্দর ফুটেছে! ৷ নম্বর গুহায় একস্থানে দুয়ারের দুধারে দুটি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড একতলার সমান বড় বুদ্ধমূর্ত্তি আছে; সে দুটীর মধ্যে একটি এখন অস্পষ্ট ছায়াকার হয়ে পড়েছে আর একটীর কেবল শ্বেত শতদলের উপর চরণ কমল দুটী অবশিষ্ট! চরণ দুটী এত সুন্দর ও ভাবপূর্ণ যে, তার তলায় পড়ে থাকতে ইচ্ছে হয়! আবার ঐ গুহাতেই গগনচারিণী দেবকন্যাদের কতকগুলি পা দেখেছি অতি আশ্চর্য্য ভাবে আঁকা! সেগুলো দেখ্‌লেই তারা যে শূন্যে মেঘের কোলে ভাস্‌চে সে বিষয় কোন সন্দেহই থাকে না! ১৯ নম্বর গুহার এক জায়গায় একটা পুষ্পিত পলাশ গাছের গুঁড়ির উপর সারবন্দী পিঁপড়ের দল উঠছে। শিল্পীরা একটা সামান্য পিঁপড়ে থেকে হাতী ঘোড়া লোক লস্কর প্রাসাদ প্রাচীর—দুনিয়ার কিছুই যেন বাদ দেন নি।

খানিকক্ষণ ধরে ছবি দেখতে দেখতে আমরা এমন তন্ময় হয়ে পড়তুম যে বাইরের সমস্ত বিষয়, এমন কি নিজের বিষয়ও যেন ভুলে যেতুম! আমাদের মনে কেবল সেই তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বের কাল জেগে উঠত। আমরা যখন যে ছবিটার কাছে দাঁড়াতুম, তখন, এজগতের সমস্ত বিষয় ভুলে গিয়ে তাতেই ডুবে যেতুম! হয়ত, আমি কোন একটা মিছিলের ছবি দেখচি, দেখতে দেখতে মনে হ'ত আমিও বুঝি সেই মিছিলের মধ্যের একটা লোক! কোলাহল দেখতে দেখতে কোলাহলে যোগ দিতে ইচ্ছা হ'ত। কখন হয় ত, কোন পারিষদ্‌বর্গ বেষ্টিত সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট রাজার দরবারের ছবি দেখে মনে হত, যেন, ত্রেতাযুগে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কাছে কোন বিষয়ের প্রার্থী হয়ে এসেছি। কোথাও যদি গান বাজনা হচ্চে এরকম ছবি দেখতুম, তো

সেখানে শ্রোতা হয়ে যেতুম! চির-মৌন ছবি-তেও যেন রাগ-রাগিণী বেজে উঠ্‌তো! চিত্রে এরকম আশ্চর্য্য ভাব খুব কমই দেখা যায়। ছবিগুলি দেখে ঠিক্ যে ভাব মনে উদয় হতো তা' ভাষায় জানান আমায় পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব! আমি এ জীবনে সেই সব ভাব কখনও ভুল্‌তে পারব না। অজন্তার প্রথম নম্বর গুহা থেকে বুদ্ধদেবের জীবনের বাল্যের ঘটনা আরম্ভ করে, ২৬নং গুহায় তাঁর চির নির্ব্বাণের চিত্র দেওয়া আছে। এবং প্রসঙ্গ ক্রমে অনেক স্থানে তখনকার প্রচলিত উপকথা ও জাতকাদি গল্পের ছবি আছে।

অনেকে অজন্তার ছবিকে নগ্ন বলে উপ-হাস করে থাকেন; কিন্তু, এর নগ্নভাব আর বিলাতি নগ্নভাবের মধ্যে অনেক প্রভেদ! ইউরোপীয় ছবিতে নগ্নতা বিশেষ করে নগ্নতার ভাবই মনে করিয়ে দেয়, আর অজন্তার ছবিতে নগ্নতা কেবলমাত্র গঠনের সৌন্দর্য্য দেখায়! এ সম্বন্ধে মোগল ছবি অজন্তাচিত্রেরই অনুরূপ।

হেমেন্দ্র রায় মহাশয় ইতিপূর্ব্বে ভারতীতে অজন্তা গুহাগুলির অবস্থা ও বিবরণ সুন্দর ভাবে লিখেছেন। তাই বাহুল্যভয়ে আর সে সব কথা এ প্রবন্ধে লিখতে চাইনা। মোট কথা,—সূক্ষ্ম কারুকার্য্য হিসাবে মোগল চিত্র শ্রেষ্ঠ হলেও চিত্র হিসাবে অজন্তার ছবি ঢের মূল্যবান।

শ্রীঅসিতকুমার হালদার।

নর্ত্তকী।

কুশীলব।

বীরসিংহ…রাজ-সেনাপতি।
রাধাবাই…নর্ত্তকী।
হেমরাজ…অজ্ঞাতপরিচয় যুবক।
তরুণসিংহ…বীরসিংহের সহকারী।

দৃশ্য—সজ্জিত প্রমোদ-কক্ষ। মুক্ত বাতায়ন-পথে অস্পষ্ট আলো-অন্ধকারের মধ্য দিয়া অদূরস্থ নদী দেখা যাইতেছিল। কাল, জ্যোৎস্না-রাত্রি।

রাধা বাতায়ন পার্শ্বে মখমল-আস্তীর্ণ উচ্চাসনে বসিয়া মৃদুকণ্ঠে গান গাহিতেছিল।

রাধা—(গীত)

ক্যায়সে মুসে রহেনা যায় সামেলিয়াসে
প্রীতিকর পাছে ভানি,
ক্যায়সে করু ক্যায়সে করু মেরি সজনি—
পিয়ারে সুরত সামেলিয়া—

বীরসিংহ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

বীরসিংহ—চারিধার নিস্তব্ধ হয়েছে, রাধা!

রাধা—এখনো তার দেখা নেই।

বীরসিংহ—বেচারা জানেনা সে কি ফাঁদে পা দিয়েছে—আজ সে বন্দী হবে! আমি আড়ালে সরে যাই! কিন্তু এখনো সে দেরী করছে কেন? সে কি কোন সন্দেহ করেছে?

রাধা—আসবে কি না, তাই বা কে জানে?

বীরসিংহ—তাহলে তোমায় ধিক! এমন

রূপের আগুন জেলে রেখেছে—তুচ্ছ এ পতঙ্গটা কি ঝাঁপ দেবে না ? রাধা—

রাধা—চুপ! কি সুন্দর রাত্রি! চাঁদের আলোয় চারিধার ছেয়ে গেছে—যেন আগাগোড়া স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে!

বীরসিংহ—থাক্—আমি তা দেখতে চাইনে! এমন চাঁদের আলো, এমন তুমি, তা হলে সব কাজ মাটি হয়ে যাবে! কি সুন্দর তোমাকে আজ দেখাচ্ছে, রাধা!

রাধা—একটা কঠোর দস্যুর প্রাণ টলাবার জন্য এত আয়োজন—

বীরসিংহ—সব কি পণ্ড হবে ?

রাধা—না—কুহকিনীর কুহকের শক্তি অসাধারণ—তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, সেনাপতি, যদি সে আসে ত আজ রাত্রে বন্দী করে তাকে তোমার হাতে দেব, নিশ্চয়—

বীরসিংহ—আঃ কি সে সম্মান, কি সে গৌরব, তার পর, রাধা, তুচ্ছ সংসার, তুচ্ছ কর্ত্তব্য সব থেকে অবসর নিয়ে তোমারি প্রেমে ডুবে থাকব! সে কি সুখ, কি আরাম—

রাধা—সে কথার সময় আছে, সেনাপতি! এখন মোহের ফাঁদে ধরা পড়ো না—

বীরসিংহ—রাধা—রাধা—তুমি আমায় কি করেছ—জানোনা তুমি!—নারীকে কখনো আমি জানবার অবসর পাইনি! মানুষ মারার নানা কৌশলের মধ্যেই এতদিন মগ্ন ছিলাম। তার পর এই দুর্ব্বৃত্ত দস্যু চাঁদরায়কে ধরবার নানা চেষ্টা বিফল হল, শেষে তাকে ধরবার জন্ত তোমার সাহায্য গ্রহণ করলাম—তুমি যখন একলা বসে নিজের মনে, গান গাও, আমার প্রাণের মধ্যে কি যেন একটা অভাব হাহাকার করে ওঠে! তোমার পাশে বসে তোমার মুখের পানে চেয়ে থাকতে শুধু সাধ যায়! আমাকে কি এক নেশায় তুমি মাতিয়ে তুলেছ—এমন বেণী দুলিয়ে রঙীন কাপড় পরে গোলাপী ওড়না উড়িয়ে যখন তুমি বসে থাকো, তখন আমার কি সাধ যায়—জানো—

রাধা—চাঁদরায় জানলার ধারে আমাকে প্রথম দেখে—চোরের মত সে এসেছিল! আমার অতুল ঐশ্বর্য্য আছে ভেবে সে তা লুণ্ঠন করতে এসেছিল—জানেনা যে আমি ব্যাধের মত বসে আছি! আমি তখন গান গাচ্ছিলাম—তন্ময় হয়ে সে আমার পাশে এসে দাঁড়াল—তার পর পাগলের মত এসে কি সব বললে—আমার মনে যে কি আহ্লাদ হল—পাখী ধরবার জন্ত ফাঁদ পাতা হয়েছিল—পাখী এসে আপনা-হতে সে ফাঁদে পা দিয়েছে—উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবার আর কোন আশঙ্কা রইল না—যে কাজের জন্ত সেনাপতির নিমক খেয়েছি—সে নিমকের মর্য্যাদা থাকবে—

বীরসিংহ—আর সেই সঙ্গে সেনাপতিকে এমন ভাবে জয় করে বসেছ যে সে চিরজন্ম তোমারি কাছে বন্দী থাকবে! এমন পরাজয় হয়েছে আজ তার!

রাধা—প্রেমের কথা তুলো না—সেনাপতি! আমি হীন নর্ত্তকী—রূপ ব্যবসায়িনী আমি, আর তুমি সম্ভ্রান্ত রাজপুত সেনাপতি—এ সাম্রাজ্যের ভিত্তি তুমি!

বীরসিংহ—যাক সে ভিত্তি রসাতলে!

রাধা—চাঁদরায়ই যে হেমরাজ, কেমন

করে জানলে, তুমি? সে জানে, আমি কোন সর্দ্দার-কন্যা! আমার প্রেমে বিভোর হয়ে পড়েছে সে!

বীরসিংহ—এটা তার সুবুদ্ধিরই পরিচয়!

রাধা—সে জানেনা, সন্দেহ করবারো সে কোন অবকাশ পায় নি যে, আমি একজন সামান্যা নর্ত্তকী মাত্র—তাকে ধরবার জন্য বিরাট আয়োজন করে বসে আছি! সে এমন বশ মেনেছে যে আমার কথায় স্বচ্ছন্দে সহরে যেতে এখন সে এতটুকু সঙ্কোচ বা দ্বিধা করবে না!

বীরসিংহ—রাধা, আমাকে ত আশ্বাসের কথা কিছু বললে না, তুমি!

রাধা—সে কথার এখনো ত সময় যায়নি, সেনাপতি!

বীরসিংহ—এমন সুন্দর তুমি, হায় নারী, আবার এমনি নির্ম্মম! পাষাণের প্রতিমা!

রাধা—সেনাপতি বীরসিংহ, প্রেমোচ্ছ্বাসের সময় এ নয়!

বীরসিংহ—সময় নয়, কি বল, রাধা? এমন জ্যোৎস্না রাত্রি, এমন নিস্তব্ধ দিক, এমন শান্ত সুন্দর তুমি, এমন নির্জ্জন—

রাধা—চুপ! দূরে ঐ ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ! তুমি আড়ালে যাও—

বীরসিংহ—রাধা, ধিক এ কর্ত্তব্যে!

প্রস্থান।

রাধা—(আপনার মনে গান ধরিল।)

দেখে বিনু কল নাহি পরত চায়ন মোহে
ছিপি রহে বনোয়ারী মেরি সজনি,
কোই দেউনা বাতাওয়ে—

হেমরাজের প্রবেশ।

হেমরাজ—রাধা!

রাধা—হেম!

হেমরাজ—এত রাত্রে এখনো তুমি একলাটি বসে আছ!

রাধা—(হেমরাজের মুখের পানে চাহিয়া রহিল।)

হেমরাজ—এখনো তুমি জেগে আছ, রাধা?

রাধা—হুঁ! কিন্তু তোমার এত দেরী হল কেন, হেম! এত রাত্রে কি এমন তোমার কাজ ছিল!

হেমরাজ—সে কথা জিজ্ঞাসা করোনা, আমাকে! (রাধার হাত আপনার হাতে তুলিয়া লইল) আমারি জন্য তুমি বসে আছ, রাধা?

রাধা—(হেমরাজের মুখের পানেই সে চাহিয়া রহিল—কোন উত্তর দিল না।)

হেমরাজ—(রাধার হাত ছাড়িয়া) তুমি জানোনা—আজ সারাক্ষণ কি যন্ত্রণা আমি ভোগ কচ্ছি!

রাধা—বল, আমাকে! (হেমরাজের হাত ধরিল) বলবে না?

হেমরাজ—আমাকে স্পর্শ করোনা, তুমি! তোমার পাশে দাঁড়াবার যোগ্যতাও আমার নেই! আমি আজ বিদায় নিতে এসেছি।

রাধা—বিদায়? কোথা যাবে, তুমি?

হেমরাজ—জানি না। তবে তোমার সামনে আর আসবো না, কখনো!

রাধা—আমাকে তুমি গ্রহণ করবে, বলেছ ত!

হেমরাজ—তা হয় না, রাধা!

রাধা—কেন? কি দোষ করেছি আমি?

হেমরাজ—দোষ তোমার নয়, রাধা, দোষ আমার!

রাধা—তোমার? কি, সে? এত ভালবাসা—

হেমরাজ—সেই ভালবাসার জন্য আমি দূরে যেতে চাই! রাধা, সূর্য্য তুমি, আমি পথের মলিন ধূলিমাত্র! তোমার দীপ্ত আলোর সামনে আমার মলিনতা আরো ব্যক্ত হয়ে ওঠে। তুমি আলো, আমি অন্ধকার!

রাধা—এ তুমি কি বলছো, আজ?

হেমরাজ—বুঝতে পারছ না? তবে শোন বলি—

রাধা—(বসিল) বল!

হেমরাজ—(চকিতভাবে) ও কিসের শব্দ?

রাধা—কিছু না!

হেমরাজ—আমার মনের তা হলে! রাধা যা বলব তা শুনলে এখনি সমস্ত আলো নিভে যাবে—বাতাস স্তব্ধ হয়ে যাবে, আকাশ কেঁপে উঠবে, তুমিও স্তম্ভিত হবে—তবু শোন…রাধা আমাকে চেননা তুমি, আমি সর্দ্দার নই, হেমরাহ নই, আমি ঘৃণিত দস্যু! রাজদণ্ডে দণ্ডিত!

রাধা—হেম——

হেমরাজ—আমি সেই দুর্দ্দান্ত দস্যু চাঁদ রায়—তোমাকে যা বলেছি, মিথ্যা! সব মিথ্যা! তাই আজ তোমার পথ থেকে সরে যেতে চাই! এ মণি রাজার মুকুট-শোভার জন্য, হীন দস্যুর বুকের জন্য নয়, রাধা!

রাধা—আমি তোমায় ভালবাসি, হেম!

হেমরাজ—ভুলে যাও, রাধা, দুঃস্বপ্নের মত আমার কথা ভুলে যাও, তুমি! আমিও তোমাকে ভালবেসেছিলাম—অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল! কিন্তু তোমার নির্ম্মল প্রেমের যোগ্য নই, আমি!

রাধা—তবু আমি ভালবাসি, হেম! তুমি দস্যু হও, যে হও, তবু তুমি আমার সর্ব্বস্ব!

হেমরাজ—না! তুমি ভালবাস সর্দ্দার হেমরাজকে, দস্যু চাঁদরায় তোমার ভালবাসার যোগ্য পাত্র নয়, রাধা!

রাধা—হেম!

হেমরাজ—কি?

রাধা—তবে আমারো কিছু বলবার আছে। শোন—আমিও মিথ্যা বলেছি—আমি সর্দ্দারকন্যা নই, হীন নর্ত্তকী, আমার নাম লছমি! তোমাকে ধরবার জন্য শুধু ফাঁদ পেতেছিলাম রাজার আদেশে,—কিন্তু কি ফাঁদে ধরা পড়েছি, তা তুমিই জানো!

হেমরাজ—নর্ত্তকী লছমী! রূপব্যবসায়িনী লছমী—

রাধা—হাঁ, হীন, অতি হীন নর্ত্তকীর প্রাণ তোমারই প্রেমে সে আজ নূতন রূপে ভরে উঠেছে! জীবনে এই প্রথম সে ভালবাসার স্বাদ পেয়েছে! তা থেকে বঞ্চিত করোনা তাকে!

হেমরাজ—লছমী—

রাধা—না, লছমী নয়, লছমী মরেছে, আমি রাধা!

হেমরাজ—রাধা, এ কথা আমাকে বিশ্বাস করতে বল, তুমি?

রাধা—কি কথা?

হেমরাজ—যে আমাকে তুমি ভালবাস, যে আমি তোমার সর্ব্বস্ব!

রাধা—বিশ্বাস কর, হেম, সত্য বল্‌ছি. এ

কথা বিশ্বাস কর, পৃথিবীতে এমন সত্য আর কিছু নেই!

হেমরাজ—আমাকে ধরিয়ে দেবার জন্য ফাঁদ পেতেছিলে তুমি, অথচ...

রাধা—অথচ নিজেই আমি কি এক নূতন ফাঁদে ধরা পড়েছি!

হেমরাজ—এ কথা সত্য?

রাধা—সত্য, তোমার পদ স্পর্শ করে বলছি, এ কথা সত্য! আজ যখন তোমারি প্রতীক্ষায় এখানে এসে বসলাম তখন চারিধার জ্যোৎস্নায় ভরে গেছে—কি সে সৌন্দর্য্য, কি সে শোভা—মনে তৃপ্তি ছিল না। তোমার জন্য প্রাণ অস্থির হয়ে উঠছিল—কি অধীর তীব্র সে ব্যাকুলতা! সেই সময় প্রথম জানলাম এ খেলা নয়, প্রেমেরি জটিল বন্ধন! সে বন্ধন ছেদন করবার শক্তি আমার নেই! সে এমনি দৃঢ়!

হেমরাজ—রাধা, তুমি জানোনা, কাল যদি ঘুণাক্ষরে এ কথা সন্দেহও করতাম আমি, তাহলে তোমার ঐ কোমল বুকে ছুরি বসাতেও দ্বিধা করতাম না! (বক্ষ হইতে ছুরি বাহির করিল) এই দেখো!

রাধা—তাই করো—তোমার উপেক্ষার চেয়ে শাণিত ছুরিই আমার আদরের, গৌরবের, লাভের!

হেমরাজ—না—দূর হোক, এ ছুরি—(ছুরিকা বাহিরে ফেলিয়া দিল)—রাধা—

রাধা—কি?

হেমরাজ—জীবনে আমার আর কোন স্পৃহা নেই! সেনাপতিকে ডাক—প্রহরীদের ডাক—আমায় তারা বন্ধন করুক!

রাধা—না!

হেমরাজ—তবে আমি আত্মসমর্পণ করিগে, চাঁদরায়ের অস্তিত্ব এ পৃথিবী থেকে মুছে যাক!

রাধা—না, না!

হেমরাজ—তবে কি চাও, তুমি?

রাধা—চল হেম, লোকালয় ছেড়ে বনে যাই! দুজনে থাকব...দুজনে শুধু—তুমি প্রভু, আমি দাসী! বনের মাঝে হিংসা নেই, দ্বন্দ্ব নেই, কোন কোলাহল নেই!

হেমরাজ—লছমী—

রাধা—না, রাধা আমি! আমার সমস্ত অতীত কলঙ্ক মুছে পায়ে যদি না স্থান দাও আমাকে, তবে হত্যা কর, এখনি হত্যা কর (হেমরাজের পদতলে লুণ্ঠিতা হইল।)

হেমরাজ—(নির্ব্বাকভাবে চাহিয়া) রাধা, ওঠ—(রাধা দাঁড়াইল।) এ প্রেম কতদিনের জন্য! এমন মিথ্যা হতে, সন্দেহ হতে, প্রবঞ্চনা হতে যে প্রেমের সৃষ্টি, যে প্রেম সত্যের উপর, মর্য্যাদার উপর, ভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, সে প্রেম কত দিন!

রাধা—তবু, সে প্রেম!

হেমরাজ—কে জানে এ-ও ক্ষণিকের খেলা নয়? খেলায় আমার সাধ নেই! রুচিও নেই!

রাধা—উপরে ঐ অনন্ত আকাশ তার শপথ, এ প্রেম চিরদিনের—মেঘশূন্য ঐ আকাশেরই মত সুন্দর, উদার, নির্ম্মল এ প্রেম!

বীরসিংহ আসিয়া অন্তরালে দাঁড়াইল।

হেমরাজ—এ প্রেমে কোন পাপের স্পর্শ নেই?

রাধা—অনুতাপের অশ্রুতেও কি তা মুছে যাবে না?

হেমরাজ—কিন্তু স্মৃতি! সে যে বৃশ্চিকের মত মাঝে মাঝে দংশন করে উঠবে—তখন? না রাধা, আমি ধরা দিই—সকল খেলার অন্ত হোক!

রাধা—না, চলো হেম, এই রাত্রের নীরবতার মধ্য দিয়ে আমরা চলে যাই! সমস্ত অতীত, সমস্ত পাপ, রাত্রির মত পোহাবে—তারপর দিনের আলোয় নূতন প্রেমোজ্জল জীবনে নবজাগরণ! আনন্দ ও পুণ্যের যে স্নিগ্ধ জ্যোতি!

হেমরাজ—কিন্তু লছমী—

রাধা—বুঝেছি, কোথায় তোমার বাধছে,—বেশ, নর্ত্তকী বলে ভুলতে না পারো যদি ত, দাসী বলে—

হেমরাজ—(সহসা রাধাকে বক্ষে ধরিল।) রাধা—

রাধা—হেম!

হেমরাজ—তাই হবে, সমস্ত অতীত ভুলবো—আমি চাঁদরায় নই, হেমরাজ! আর তুমি রাধা, আমার স্ত্রী! (চুম্বন করিল।)

রাধা—আঃ, কি সুখ!

হেমরাজ—যাক্, সমস্ত অতীত মুছে যাক্। আজ আমাদের পুনর্জ্জন্ম! প্রেমের মোহন স্পর্শে সমস্ত মলিনতা ঘুচে যাক—নূতন আলো, নূতন পৃথিবী, নূতন জীবন!

রাধা—প্রভু, স্বামী—

হেমরাজ—এসো, রাধা,—

উভয়ে বাতায়ন-পথ দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল।

বীরসিংহ আসিয়া নির্ব্বাকভাবে বাতায়নের ধারে দাঁড়াইল।

বীরসিংহ—দুর্ভাগা বীরসিংহ! যাও, প্রেমের বর্ম্মে আচ্ছাদিত হয়ে দুজনে চলে যাও! তোমাদের কেশাগ্র স্পর্শ করবারও কারো সাধ্য হবে না!

তরুণের প্রবেশ।

তরুণ—কৈ, কোথা সে দস্যু, চাঁদরায়? সেনাপতি—

বীরসিংহ—(ফিরিয়া) তরুণ—

তরুণ—কি, পালিয়েছে? (শশব্যস্তে বাতায়নের ধারে আসিল।)

বীরসিংম—না—আমারি ভুল হয়েছিল!

তরুণ—ভুল?

বীরসিংহ—হাঁ! দস্যু চাঁদরায় ও স্বাধীন সর্দ্দার হেমরাজ, দুজনে এক লোক নয়!

তরুণ সিংহ স্তম্ভিতভাবে বাতায়নের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

যবনিকা।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

প্রাচীন ভারতে বিবাহ-পদ্ধতি।

আজকাল ভারতের নরনারী আধুনিক বিবাহ-রীতিতে সন্তুষ্ট নহেন। পুরাকালে যে সকল রীতি আমাদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল তাহা বহুকাল হইল, অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। আজকালকার রীতিগুলি সেই সকল প্রাচীন রীতির অপভ্রংশ মাত্র। সুতরাং আজকাল ব্যক্তিগত ও মতগত স্বাধীনতা লাভ করিয়া অনেকে সমাজকেও

মধ্যযুগের অন্যায় ও অযৌক্তিক বন্ধন হইতে মুক্ত করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন।

অনেকে মনে করেন যে আমাদের দেশেও বিবাহের পূর্ব্বে কোন একটা নির্দ্দিষ্ট আকারে ভাবী পতিপত্নীর আলাপ ও পরিচয়ের অবসর থাকা আবশ্যক। তাঁহাদের মতে যে যাহাকে বিবাহ করিবে তাহাকে তাহার আপনি ভাল করিয়া দেখিয়া ও বুঝিয়া লওয়া নিতান্ত আবশ্যক। এরূপ করিতে হইলে বর্ত্তমান বিবাহপদ্ধতির সমূল উচ্ছেদ করিয়া বালকবালিকার স্থলে যুবকযুবতীর পরিণয়রীতি প্রচলিত করাই আবশ্যক হইয়া পড়ে। প্রাচীন ভারতে যে এরূপ যুবকযুবতীর স্বয়ম্বর-প্রথা প্রচলিত ছিল এবং তাহার ফলে যে সমাজের মঙ্গলই হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রামায়ণ ও মহাভারতে এরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্তের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় এবং হিন্দু মাত্রেই এই সকল কাহিনী শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত পবিত্র জ্ঞানে পাঠ করিয়া থাকেন। প্রাচীনকালে এই ভারতবর্ষেই যদি যুবকযুবতীর স্বয়ম্বরে ও বিবাহপূর্ব্বে আলাপ-পরিচয়ে কোন ক্ষতি না হইয়া থাকে, তাহা হইলে এক্ষণে তাহার সমস্ত না হইলেও কতকাংশ বর্ত্তমান সমাজ মধ্যে প্রচলিত করিলে আমাদেরও বিশেষ ক্ষতি না হইয়া বরং অনেক ইষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক। ভারতের পুরাতন বিবাহপদ্ধতিতে আমরা পাশ্চাত্যজগতের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সম্পূর্ণ বিকাশই দেখিতে পাই,—কেবল ইহার মধ্যে পাশ্চাত্য সমাজের যথেচ্ছ ব্যবহার ও শৈথিল্যটুকু নাই। তাহার কারণ ভারতের প্রাচীন সভ্যতার মর্ম্মটুকু প্রতীচ্য সভ্যতার ন্যায় জড়বাদিত্বের পঙ্কে পূর্ণ ছিল না। ভারতের সনাতন ধর্ম্ম বা চরিত্রনীতি আপামর সকলকেই এরূপ শিক্ষা দান করিয়াছিল, যদ্বারা তাহারা কেহই পার্থিব বস্তুকেই জীবনের চরম লক্ষ্য করিতে শিখে নাই, সকলেই জগদতীত এক বৃহত্তর ও উচ্চতর লক্ষ্যের অনুসন্ধানে ছুটিত। ভারতবাসী পৃথিবীকে কর্ম্মভূমির চক্ষেই দেখিত—ইহাকেই সে কোনদিন চরম লক্ষ্যভূমি বলিয়া জ্ঞান করে নাই। পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু, আনন্দ, সুখ বা সম্ভোগ্য বস্তু, সে সকলকেই পরম লক্ষ্য বলিয়া জ্ঞান না করিয়া, এ সকলকে সে কেবল শ্রেষ্ঠতম লক্ষ্য লাভের উপায়স্বরূপ বলিয়া মর্ম্মমধ্যে বিশ্বাস করিত। এই বিশ্বনীতিটুকু উচ্চ নীচ সকলেই আপন আপন জীবনে সফল করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিত। যে মহাপাপী ও অত্যাচারী সেও আপনাকে মানব চরিত্রের এই নীতিটুকুর অধীন বলিয়া জানিত। লঙ্কেশ্বর রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া দ্বাদশ বর্ষ বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছিল সত্য, সীতার শুভাশুভ তাহার নিমেষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছিল সত্য, কিন্তু তথাপি রাক্ষসরাজ এই দীর্ঘকালের মধ্যেও সীতার অনিচ্ছায় তাঁহাকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে সাহস করে নাই। সেকালের নীতিই ছিল যে তাহার ইচ্ছা ব্যতীত কোনও রমণীকে কেহ স্পর্শ করিবে না। সেকালের আপামর সকলেই কিরূপ ধর্ম্মানুরক্ত ছিল তাহার অসংখ্য দৃষ্টান্ত আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে অমর অক্ষরে চিত্রিত রহিয়াছে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যখন এরূপ ছিলেন, তখন আমরা যে এক্ষণে কতকাংশেও তাঁহাদিগের ন্যায় হইতে পারি না, ইহার কারণ কি?

পণ্ডিতগণ তাঁহাদের চিরপ্রচলিত সংস্কার অনুসারে বলিয়া থাকেন যে আধুনিক হিন্দু জীবনের বাহ্যিক অবস্থাগুলা প্রাচীন সনাতন ধর্ম্ম অনুষ্ঠানের পক্ষে অনুপযুক্ত এবং এই সকল বাহ্যিক অবস্থার পরিবর্ত্তন সম্ভব হইলে আমাদের পুনরায় ভারতের প্রাচীন আদর্শ অনুসারে জীবনগঠন করা সম্ভব। কিন্তু এ স্থলে বিবেচ্য এই যে সেই সকল বাহ্যিক অবস্থাকে পরিবর্ত্তিত করায় আমাদের যথার্থ বাধা কোথায়! আমাদিগের আপন অজ্ঞতা বা দুর্ব্বলতা ভিন্ন অপর কোন শক্তিই আমাদিগকে বিদেশী আদর্শের অর্থাৎ তাহার বিকৃত অনুকৃতির আদর করিতে, অথবা আপনার শ্রেষ্ঠ ধনকে উপেক্ষা করিতে বাধ্য করিয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই যে সেকালে নারী ও পুরুষের মধ্যে চরম স্বাধীনতা ছিল এবং পুরুষের সাহায্য ব্যতিরেকে ভারতরমণীর আত্মরক্ষা করিবার পক্ষেও যথেষ্ট বল ও শক্তি ছিল। আমরা ইহাও দেখিতে পাই যে সেকালে ভারতের নরনারীর মধ্যে পাশ্চাত্য জগতের ন্যায় স্বাধীনতার অপব্যবহার প্রচলিত ছিল না, অন্ততঃ সেরূপ প্রবল ও সাধারণ ভাবে নহে সেটা নিশ্চয়। সেকালে পতিপত্নী যথেচ্ছাচারকে সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিয়া বিজ্ঞান-সম্মত ভাবে শ্রেষ্ঠ সন্তানোৎপাদনের জন্যই চেষ্টা করিতেন। বিবাহ ব্যাপারটা কেবল একটা লৌকিক অনুষ্ঠান মাত্র ছিল। যুবক যুবতী প্রথমে বিবেচনা করিয়া দেখিত যে তাহাদের উভয়ের মিলন তাহাদের নিজেদের বা সন্তানের পক্ষে আবশ্যক কি না। তাহারা এরূপ আবশ্যকতা বোধ করিলে তবে সমাজ ও ধর্ম্ম তাহাদিগের মিলনকে স্বীকার করিত। আজকাল এ নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। সমাজের মতে বিবাহ কর্ম্মটা প্রথম হয়, তাহার পর উভয়ের মিলন-ইচ্ছা জাগ্রত হইতে থাকে। সে কালের কাহিনী হইতে ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে তখন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পরস্পরকে ত্যাগ করিয়া যাওয়ার রীতিটা অল্পাধিক প্রচলিত ছিল। অনেক ঋষি লোক-সমাজ ত্যাগ করিয়া বনে বা পবিত্র নদীতীরে বাস করিয়াও সময়ে সময়ে আপনার বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য কোনও নারীর সহিত মিলিত হইতে কুণ্ঠিত হইতেন না, এবং উভয়ে বিচ্ছিন্ন হইবার পর আর কেহ কাহারও বিষয় চিন্তাই করিতেন না। স্বার্থ বা অপবিত্র মোহই অধিকাংশ সময়ে তাঁহাদের এ অস্থায়ী মিলনের যথার্থ কারণ। অনেক সময়ে শ্রেষ্ঠ সন্তান উৎপাদনের জন্যও নরনারী এরূপ ভাবে মিলিত হইতেন।

বিশ্ববসু ও মেনকার মিলনে একটি কন্যার জন্ম হয়। তাহারা উভয়েই গন্ধর্ব্ব। বিবাহ-সূত্রে বদ্ধ নহে বলিয়া তাহারা তাহাদের শিশু কন্যাটিকে স্থূলকেশী নামে এক ঋষির আশ্রমে ফেলিয়া যায়। শিশুর রূপে মুগ্ধ হইয়া মুনিবর তাহাকে ভূমি হইতে তুলিয়া গৃহে লইয়া যাইলেন ও তাহাকে আপন পোষ্য-কন্যারূপে গ্রহণ করিলেন। দিনে দিনে শিশুটির বয়সের সহিত রূপগুণ প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল এবং সকলেই তাহাকে ঋষিকন্যা বলিয়াই জানিল।

এদিকে প্রসিদ্ধ ভৃগুমুনির পুত্র রুরু স্থূলকেশীর আশ্রমে প্রায়ই যাতায়াত করিতেন

এবং সেই অসামান্যা সুন্দরী ঋষিকন্যাকে দর্শন করিতেন। রুরু সেই সুন্দরীর রূপে এতই মুগ্ধ হইলেন যে তাহাকে না পাইয়া জীবন-ধারণ করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। অবশেষে তিনি তাহার নিকট আপনার অন্তরের গুপ্তপ্রেম প্রকাশ করিয়া জানিলেন যে কিশোরীও তাঁহার প্রেমে আত্মহারা। তখন তিনি তাহার পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করিবার জন্য আপন পিতা ভৃগুকে স্থূলকেশী মুনির নিকটে প্রেরণ করিলেন। স্থূলকেশী যুবক-যুবতীর মনোভাব পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন, এক্ষণে ভৃগুমুনির মুখে এই প্রস্তাব শুনিবা মাত্র সানন্দচিত্তে সম্মতি দান করিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে তাহাদের বিবাহ স্থির হইবার পরেই একদিন সেই ঋষিকন্যা অন্যান্য আশ্রম-বালাদিগের সহিত উদ্যানে ক্রীড়া করিতে-ছিলেন, এমন সময়ে সহসা অজ্ঞাতে এক সর্পকে পদাঘাত করেন। সর্পটি তৎক্ষণাৎ তাহাকে দংশন করিল এবং অনতিবিলম্বেই ঋষিকন্যার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।

এই শোকসংবাদ অল্পকাল মধ্যেই তাহার আত্মীয়বর্গের নিকট উপস্থিত হইল। তাঁহারা সকলে তাহার সেই অচেতন দেহের পার্শ্বে আসিয়া দেখিলেন সে মূর্ত্তিতে মৃত্যু-কালিমা কিছুই নাই,—নিদ্রাগতা স্বর্ণলতার ন্যায় ভূতলে পড়িয়া আছে! চতুর্দ্দিকের যত মুনিঋষি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ত্রিলোকখ্যাত ভরদ্বাজ ও গৌতম মুনিও তথায় উপস্থিত হইলেন। শোকবিহ্বল রুরুও তথায় গিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু ভূতলে তাঁহার প্রাণপ্রিয়ার মৃত দেহ দেখিয়া তাঁহার চিত্ত এতই কাতর হইল যে তিনি সে স্থান ত্যাগ করিয়া এক নির্জ্জন বৃক্ষতলে যাইয়া অবিশ্রাম অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কাতরহৃদয়ে দেবতার নিকট তাহার প্রাণভিক্ষা চাহিতে লাগিলেন, কারণ তাহাকে হারাইয়া তাঁহার প্রাণধারণ করা অসম্ভব! তিনি নিজে একজন দেবতা-বিদিত তপস্বী, সুতরাং ইন্দ্রদেব তাঁহার প্রার্থনা শুনিয়া শোকার্ত্ত রুরুর নিকট এক দূত প্রেরণ করিলেন।

দেবদূত আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল "ঋষিপুত্র, তোমার এ শোকের কারণ কি? ইন্দ্রদেব তোমাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য আমায় পাঠাইয়াছেন। মানুষ একবার মরিলে কি আবার বাঁচে? তোমার এ শোক নিতান্তই বৃথা!"

ঋষিপুত্র বলিলেন—"কিন্তু আমি এমন কোন কুকর্ম্মই করি নাই, যাহার জন্য আমার প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর শাস্তি-বিধান হইতে পারে। শৈশব হইতে আজ পর্য্যন্ত আমি কোন অন্যায় কর্ম্মই করি নাই এবং কোন দিন মনুষ্য বা দেবতার প্রতি কর্ত্তব্যেও পরাঙ্মুখ হই নাই। ইন্দ্রদেব ইচ্ছা করিলে কি আমার প্রাণপ্রিয়াকে ফিরাইয়া দিতে পারেন না?"

দেবদূত—"তোমার প্রাণপ্রিয়া একজন সামান্যা মানবী ছিল না; গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরার ঔরসে তাহার জন্ম। এরূপ জীবের পৃথিবীতে কতকাল থাকা সম্ভব? সেই জন্য দেখ, তাহার এই অকালমৃত্যু হইয়াছে,—এ মৃত্যু বিধাতার বিধান অনুসারেই হইয়াছে।"

রুরু—"কিন্তু আমি তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া পাইতে চাই, তাহার কি কোন উপায়ই নাই?"

দেব—"হাঁ আছে। ইন্দ্রদেব আমাকে

বলিয়াছেন যে যদি তুমি তোমার অর্দ্ধেক পরমায়ু ত্যাগ করিতে সম্মত থাক, তাহা হইলে সেই কাল পর্য্যন্ত এই রমণীকে জীবিত রাখা যাইতে পারে।"

রুরু—"আমি আমার নিজের অর্দ্ধেক জীবন ত্যাগ করিতে সম্মত হইলাম।"

এই কথা শুনিবামাত্র দেবদূত যমরাজের নিকট যাইয়া ঋষি-কন্যাকে পুনর্জ্জীবিত করিবার আদেশ লইয়া আসিলেন। দেবদূত ফিরিবামাত্র ঋষিকন্যা নিদ্রোত্থিতার ন্যায় ভূমি হইতে উত্থিতা হইলেন,—সকলে বিস্মিত ও পুলকিত হইয়া উঠিল।

পরে উভয়ে বিবাহিত হইয়া পরমসুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। এই আখ্যানের মধ্যে আমরা বিবাহের পূর্ব্বে যুবক যুবতীর প্রেমের প্রাচীন আদর্শটিকে পরিস্ফুট দেখিতে পাই, এবং অসাধারণ অবস্থার মধ্যে ব্রাহ্মণযুবার আন্তরিক প্রেমের কঠোর পরীক্ষা দেখিতে পাই।

আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে মনুষ্য-প্রকৃতির বিশেষত্বগুলি এরূপভাবে চিত্রিত হইয়াছে যে তাহার মধ্যে প্রেমের সম্বন্ধ ব্যতিরেকেও বিবাহ ব্যাপারের অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। এখনকার ন্যায় মহাভারতের কালেও সাধারণের বিশ্বাস ছিল যে বংশরক্ষার জন্য পূর্ব্বপুরুষগণের যন্ত্রণার সীমা থাকে না। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা অগ্নিতেজা তপস্বী জরৎকারুকে বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হইতে দেখিতে পাই।

জরৎকারু কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ও তপস্যার দ্বারা দেবপিতা ব্রহ্মাকে পর্য্যন্ত তুষ্ট করিয়াছিলেন। আমরণ কুমার থাকিবেন বলিয়াই তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল। কিন্তু তাঁহার আর ছয়টি ভ্রাতাও কুমার অবস্থায় প্রাণত্যাগ করাতে পিতৃদেবগণ বংশলোপ হইবার ভয়ে দারুণ বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন।

জরৎ এক অতল কূপের মধ্য হইতে তাঁহাদের ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইয়া তাঁহাদের শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

পিতৃদেবগণ তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া উত্তর করিলেন "হে অপরিচিত, আমাদের ইচ্ছা তুমি জরৎকারু নামক চিরকুমার-ব্রতী অভাগাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া বল যে আমাদিগের উদ্ধারের জন্য তাহার বিবাহ করিয়া বংশরক্ষা করা আবশ্যক।"

জরৎ বলিলেন—"আমিই সেই অভাগা। আপনাদের যাহা কিছু বক্তব্য, আমাকে বলিতে পারেন।"

"আমরা জানি যে তুমি কঠোর তপস্যার দ্বারা সাধনমার্গে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছ, কিন্তু তুমি অপুত্রক বলিয়া আমাদিগের উদ্ধারের আর আশা নাই। সুতরাং তোমাকে বিবাহ করিতেই হইবে।"

"আমি আজ পর্য্যন্ত বিবাহে মনোযোগী হই নাই। কিন্তু যখন আপনারা ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন তখন আমি বিবাহ করিতে সম্মত আছি, কিন্তু একটা সর্ত্ত আছে!"

"কি সর্ত্ত?"

"আমি সাধারণভাবে বিবাহ করিতে পারিব না ইহা স্থির, সে আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি যাহাকে লেশমাত্রও ভালবাসি না, তাহার সহিত প্রেমের ছলনা করিতে পারিব না। তবে ভিক্ষা করিতে

করিতে আমি একটি পত্নী ভিক্ষা চাহিব। যদি কেহ আমারই ন্যায় নামবিশিষ্টা কোন কন্যাকে ভিক্ষাদান করে, তাহা হইলে আমার একটি সন্তান হওয়া পর্য্যন্ত সে আমার পত্নী থাকিবে।"

এই প্রতিজ্ঞা অনুসারে এই ব্রহ্মচারী পত্নী অন্বেষণে বাহির হইলেন। কিন্তু তিনি দরিদ্র বলিয়া এবং অন্নভিক্ষার সহিত পত্নীভিক্ষা করিতেছেন দেখিয়া কেহই তাঁহাকে কন্যাদান করিতে অগ্রসর হইল না। তিনি পত্নীলাভের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া বিরত হইবার বাসনা করিতেছিলেন এরূপ সময়ে নাগরাজ বাসুকী তাঁহার ভগ্নীর জন্য এইরূপ একটি পাত্রের অন্বেষণ করিতেছিলেন। এই অসাধারণ ঘটনাটি দেবগণের ব্যবস্থানুসারে হইয়াছিল বলিয়া মহাভারতে লিখিত আছে। রাজা পরীক্ষিতের পুত্র সর্পযজ্ঞ করিতেছেন দেখিয়া নাগগণ সবংশে ধ্বংশ হইবার ভয়ে ভীত হইয়া দেবতাগণের নিকটে যাইয়া প্রার্থনা করিল যে তাহাদের কতকগুলিকে ধ্বংশ করিয়া অবশিষ্টকে রক্ষা করা হউক। তাহাদিগের প্রার্থনা পূরণের জন্য দেবগণ বলিলেন যে যদি তাহারা তাহাদের একটি কন্যাকে কোন পত্নীভিক্ষুকে ভিক্ষাস্বরূপ দান করে তাহা হইলে সেই কন্যার গর্ভজাত সন্তান তাহাদিগকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করিবে।

সেইজন্য রাজা বাসুকী পুরবাসীদিগকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে তাঁহার প্রাসাদে কোন পত্নীভিক্ষু উপস্থিত হইলে তাঁহাকে যেন অবিলম্বে সংবাদ দেওয়া হয়। তিনি তাঁহার ভগ্নীকে ইতিপূর্ব্বেই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে তিনি ভিক্ষুকের পত্নী হইয়া তাঁহার স্বজাতিকে উদ্ধার করিতে সম্মত কি না, তাহাতে তিনি আপন আত্মোৎসর্গের অভিলাষ জানাইয়া বলিয়াছিলেন—"রমণী বিবাহ করে, হয় প্রেমের জন্য না হয় কর্ত্তব্যের জন্য। প্রেমের জন্য বিবাহ করা যদি আমার পক্ষে সম্ভব না হয়, তাহা হইলে আমি কর্ত্তব্যের জন্য বিবাহ করিয়া স্বজাতিকে রক্ষা করিতে প্রস্তুত আছি।"

সুতরাং জরৎকারু যখন নাগরাজ্যে অন্ন ভিক্ষা করিতে যাইয়া প্রতি দ্বারে তিনবার করিয়া পত্নী ভিক্ষা করিয়া ফিরিতে লাগিলেন, তখন এ সংবাদ অবিলম্বে যাইয়া রাজা বাসুকির নিকট উপস্থিত হইল; এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার ভগ্নী বহুমূল্য বস্ত্রশোভিতা হইয়া সলজ্জ পাদক্ষেপে সেই ভিক্ষুকের নিকট উপস্থিত হইয়া সানন্দ চিত্তে আপনাকে ভিক্ষা স্বরূপ দান করিলেন।

নাগকন্যার ঈদৃশ আচরণ দেখিয়া জরৎকারু বিস্মিত হইলেন। রমণীর নাম তাঁহার অনুরূপ কিনা এই সন্দেহে তিনি সেই মনমোহিনী সুন্দরীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার নাম কি, সুন্দরী?"

নাগকন্যা ভাবী পতির এই প্রথম সাদর সম্ভাষণ শ্রবণ করিয়া উত্তর করিলেন—"আমার নাম জরৎকারু, আমি রাজা বাসুকীর ভগ্নী।"

এমন সময়ে স্বয়ং রাজা বাসুকী তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"মুনিবর, এই কুমারী আমার সহোদরা। সে আপনারই জন্য এতদিন অপেক্ষা করিয়াছিল, এক্ষণে আপনি তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করুন ইহাই প্রার্থনা।"

ব্রহ্মচারী উত্তর করিলেন—"তুমি রাজগৃহে

জন্মগ্রহণ করিয়াছ আর আমি কঠোর তপস্বী। তোমাকে যে আমি ভরণপোষণ করিতে পারিব না তাহা জানিয়াও তুমি আমার পত্নী হইতে চাহিতেছ ?"

বাসুকি উত্তর করিলেন—"আমি তাহা বেশ জানি। আপনার যতদিন ইচ্ছা আমি আপনাকে ও আমার ভগ্নীকে রক্ষা করিব। আপনার ন্যায় মহাপুরুষের জন্যই আমি এত দিন আমার সহোদরাকে কুমারী রাখিয়াছিলাম।"

এই কথা শুনিয়া জরৎকারু কঠোর স্বরে বলিলেন—"তবে বাসুকীরাজ শ্রবণ করুন। আমি রাজকুমারীকে পত্নীস্বরূপ রাখিবার জন্য আমার দারিদ্র্য বা অবস্থা পরিবর্ত্তিত করিতে চাহি না। অধিকন্তু আপনার সহোদরা লেশমাত্র অবাধ্য হইলে আমি তাহা সহ্য করিব না। যে মুহূর্ত্তে সে আমার অমনোমত কোন কথা বলিবে বা কর্ম্ম করিবে সেই মুহূর্ত্তেই আমি তাহাকে ত্যাগ করিব।"

বাসুকি লেশমাত্রও চিন্তা না করিয়া কহিলেন—"তথাস্তু।"

এইরূপ অভূতপূর্ব্ব ভাবে নাগ-রাজ্যে সুন্দরী রাজকুমারীর সহিত এক কুৎসিৎ ব্রাহ্মণ কুমারের বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহ দিবসে রাজপ্রাসাদের আনন্দ—কোলাহলের মধ্যে রাজকুমারী বেশ প্রফুল্ল ও সুখী। ব্রাহ্মণকুমার কিন্তু তাপসোচিতভাবে রাজ-প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যানে বাস করিতে লাগিলেন। বিবাহ সময়ে অভদ্র ব্রাহ্মণ যথাসম্ভব মধুরভাষী হইবার চেষ্টা করিয়া পত্নীকে চুপি চুপি বলিতে লাগিলেন—"ভদ্রে, তুমি কদাচ আমার বিরক্তিকর কোন কর্ম্ম করিও না বা অপ্রীতিকর কোন কথা উচ্চারণ করিও না। যে দিন এইরূপ করিবে সেই দিনই আমি তোমাকে ত্যাগ করিব, তুমি আর আমার পত্নী থাকিবে না।"

মনুষ্যপ্রকৃতি তখনও আমাদের মতই ছিল। বিবাহের দিনে স্বামীর নিকট এরূপ সুমিষ্ট কথা শুনিবার জন্য কেহই প্রস্তুত থাকে না। সুতরাং মুনিবরের বাক্য শ্রবণমাত্র রাজকুমারী কম্পিত কলেবরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সাশ্রুনয়নে স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"ঋষিবর, আমি জীবনে একদিনের জন্যও আপনার অবাধ্য বা অপ্রীতিকর হইব না প্রতিজ্ঞা করিতেছি।"

বিবাহের পর ঋষিপত্নী প্রাণপণে স্বামী-সেবা ও তাঁহার সন্তোষ বিধানের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, সর্ব্বদাই ভয় পাছে তাঁহার কোন অজ্ঞাত ত্রুটির জন্য চিরপরিত্যক্তা হইয়া জীবনপাত করিতে হয়।

কিন্তু সে দুর্ঘটনা ঘটিতে অধিক বিলম্ব হইল না। তিন চারিমাস পরেই একদিন এক অভাবনীয় ব্যাপারে উভয়ের চিরবিচ্ছেদ ঘটিল।

একদিন বৈকালে এই কঠোর ব্রাহ্মণ পত্নীর অঙ্কোপরে মস্তক রাখিয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন। সূর্য্য অস্ত গেল তথাপি তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল না। কর্ত্তব্যপরায়ণা পত্নী মহা সমস্যায় পড়িলেন। সান্ধ্য আহ্নিকের সময় উপস্থিত, এ সময়ে স্বামীকে নিদ্রোত্থিত না করিলে তিনি কুপিত হইবেন, আবার তাঁহার অনিচ্ছায় নিদ্রাভঙ্গ করিলেও তিনি অসন্তুষ্ট হইবেন। এই উভয়সঙ্কটে পড়িয়া স্বামীগতপ্রাণা ঋষিকন্যার মুখমণ্ডল স্বেদসিক্ত

হইয়া উঠিল, বাত্যান্দোলিত বল্লরীবৎ সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। অবশেষে মনে হইল যে সান্ধ্য-আহ্নিক না করিলে তাঁহার প্রাণেশ্বরের অমঙ্গল হইবে। আর তাঁহার দ্বিধা রহিল না। স্বামীর অমঙ্গলের অপেক্ষা আপনার অমঙ্গলকেই শ্রেয় মনে ক'রয়া তিনি পতির নিদ্রাভঙ্গের জন্য বলিলেন—"হে পুরুষ-শ্রেষ্ঠ, জাগ্রত হও। সন্ধ্যা আগতপ্রায়, সূর্য্য অস্তাচলগামী হইয়াছে। তোমার সূর্য্যোপাসনার সময় হয় নাই কি? দেবপূজার সময় উপস্থিত, সুতরাং অধানীর অপরাধ ক্ষমা করিও।"

জরৎকারু ধীরে পত্নীর অঙ্ক ত্যাগ করিয়া উঠিয়া নয়ন মুছিয়া দেখিলেন তাঁহার নিকটে কে উপস্থিত রহিয়াছে। পার্শ্বে তদ্গতচিত্তা পত্নীকে দেখিয়া বুঝিলেন তিনিই তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছেন। ক্রোধে তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, অধরোষ্ঠ কম্পিত হইতে লাগিল। বিচ্ছেদভয়বিধুরা পত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"নাগরাজ দুহিতা, তুমি কোন্ সাহসে আমার নিদ্রাভঙ্গ করিতে এবং আমি আমার আপন ধর্ম্মসাধনে অমনোযোগী বলিয়া আমাকে এইরূপে অপমানিত করিতে সাহসী হইলে? তুমি আমাদের উভয়ের সর্ত্তভঙ্গ করিলে বলিয়া আমি দুঃখিত, কিন্তু এক্ষণে তোমাকে এই মুহূর্ত্তেই ত্যাগ করিতে আমি বাধ্য।"

ভীতিবিহ্বলা রাজকুমারী কাতরে বলিয়া উঠিলেন—"হায় তাপসবর, আমি তোমাকে অপমানিত করিবার জন্য নিদ্রাভঙ্গ করি নাই, তোমারই অমঙ্গলের আশঙ্কাতেই করিয়াছিলাম।"

পাষাণহৃদয় ঋষি উত্তর করিলেন—"আমি যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহা ভঙ্গ হইতে পারে না। এতদিন তোমাদের নিকটে বিবাহিত জীবনের সুখসম্ভোগ করিতেছিলাম। আজ বিদায়! তোমার ভ্রাতা বাসুকিরাজকে সংবাদ দিও! আমি তোমাকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম বলিয়া আক্ষেপ করিও না।"

ঋষিকন্যার সকল আশা দূর হইল। বেদনায় তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, সর্ব্বদেহ কাঁপিতে লাগিল, তাঁহার সেই প্রেমপূর্ণ নয়ন দুইটি অশ্রুভারে আচ্ছন্ন হইয়া আসিল এবং লজ্জাবতী লতার ন্যায় এই নিষ্ঠুর আঘাতে একেবারে মর্ম্মমধ্যে সঙ্কুচিতা হইয়া পড়িলেন। পরে চিরবিদায়ের পূর্ব্বে নৈরাশ্যের সাহসে ভর করিয়া কাতরে করযোড়ে কহিলেন—"স্বামী, প্রভু, আমি অনুক্ষণ তোমার সেবা ও পূজা করিয়াছি, এক মুহূর্ত্তের জন্যও কোন অন্যায় কর্ম্ম করি নাই, তবে বিনা অপরাধে আজ তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিবে কেন প্রভু? রাজা বাসুকি তোমার ঔরসে সন্তান জন্মিয়া নাগজাতিকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবে বলিয়া তোমার সহিত আমার বিবাহ দিয়াছিলেন। এক্ষণে তুমি আমাকে এ ভাবে ত্যাগ করিয়া যাইলে তিনিও যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইবেন।"

জরৎকারু বলিলেন—"ভদ্রে, তুমি যাহা বলিতেছ সত্য, কিন্তু তুমি ভুল বুঝিতেছ। আমি আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতেছি বলিয়া তোমাদের কোন অনিষ্ট করিবার বাসনা আমার নাই। দেবতার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। আর কয়েকমাস পরে তোমার যে পুত্র হইবে

তাহার দ্বারা আমার পিতৃপুরুষগণ এবং নাগজাতি উদ্ধার পাইবে। এক্ষণে বোধ হয় বুঝিতেছ তোমার শোকের কোন কারণ নাই?"

এইভাবে ব্রহ্মচারীর অনিচ্ছাকৃত বিবাহের উপসংহার হইল। পতি পত্নীর মধ্যে ব্যবহার-বিধি সামরিক বিধির ন্যায় কঠোর ও প্রাণহীন! আজকালের গুরুজন-আদিষ্ট বিবাহের মধ্যে এইরূপ দাম্পত্য-সুখহীন সম্বন্ধ কত সুলভ তাহা পাঠক স্থির করিবেন।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

মেয়ে-মজ্‌লিস।

(১৩১৬ পৌষের প্রবন্ধের অনুবৃত্তি)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রবন্ধ লেখা বড় দায়। যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহাই ঘটিয়াছে। আমার শত্রুমিত্র আত্মীয়কুটুম্ব সকলেই নানা দিক হতে নানা প্রকারে আমাকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

আমি যে সকল পত্র পাইয়াছি তাহার মধ্যে ২।৪ খানি ভারতীর পাঠকপাঠিকার গোচরার্থ প্রকাশ করিতেছি।

পত্র নং ১

ভাই দিদি—

আমরা গরীব বলে যে 'আমাদের বুদ্ধি শুদ্ধি নাই তা মনে কোর না। তুমি লিখেছ "সুশিক্ষিতা-মহিলা-মজ্‌লিসে বিশৃঙ্খলা হয় না। কিন্তু ভাই বিবেচনা করে দেখ, তাঁরা সুশিক্ষিতা বলেই বিশৃঙ্খলা ঘটে না অথবা ধনী বলে ঘটে না। তাঁদের প্রচুর দাসদাসী আছে, আয়া আছে গবর্ণেস্ আছে,—মাষ্টার পণ্ডিত আছে। তাঁরা মধ্যাহ্ন ভোজনের পূর্ব্বে কি পরে বিকেলের আহারাদির হুকুম দিলেন বা ভাঁড়ার দিলেন। একটু বিশ্রামের পর ইচ্ছামত নিজের গাড়ীতে নিমন্ত্রণ স্থানে গিয়ে মিলিত হলেন। তার পর আহার,—তা অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। মনে কর সেদিন তাঁর কোলের খোকাটি অসুস্থ—দেখ্‌ছেন আহারের দেরী আছে—সত্য মিথ্যা যে কোন প্রকার একটা ওজর করে তিনি চলে গেলেন। আমাদের ঘরে ভাই ওরকম সুবিধা হবার আশা করতেই পার না।

জান ত আমার শাশুড়ী ঠাকরুণ বুড়ো মানুষ—সংসারের কোন কিছুর মধ্যে থাকেন না। আমার ৬টী সন্তান—বড়টী এই দশ বৎসরের; একটি মাত্র ঝি অবলম্বন করে ঘরকন্নার সকল কায চালাই। নিমন্ত্রণ যাবার দিন যদি তাদের কোনমতে ঘরে রেখে যেতেও পারি—কিন্তু খাবার কোথায় পাব? বিকালের রান্নাখাওয়ার সময়টা থেকে কোনমতে ছুটী নিয়ে তবে ত বাড়ীর বাহির হতে পারবো। তাদের জন্যে রেঁধে বেড়ে রেখে যেতে হলে আর যাওয়া হয় না। তা ভাই লোকলৌকতা ত রক্ষা করতে হবে! ছেলেদের কষ্ট হবে বলে কি আত্মকুটুম্ব সব ত্যাগ করবো? আজ তবে আসি।

তোমার ছোট বোন্।

পত্র নং ২

শ্রীচরণেষু

দিদিমা, তুমি যে দেখ্‌ছি "সমাজ-সংস্কারক" হয়ে উঠ্‌লে। আর যা কর না কর মেয়ে-মজ্‌লিসের সময়টা নির্দ্দিষ্ট করে দিয়ো না। ভেবে দেখ তোমার এ সেবক যে কাজকর্ম্ম উপলক্ষে তোমাদের শ্রীচরণ দর্শন পায় তার কত না অন্তরায় ঘটবে। আমার ত এই কুঁড়ে ঘর—দিদিমার দল কি পরিমাণ জানইত। মনে পড়ে কি ঠাকুর মা বলে ছিলেন "বাপরে যেদিকে চেয়ে দেখি, দেখি বড় বৌএর বাপের বাড়ীর কুটুম!" তা তোমাদের তো কোন কায কর্ম্মে বাদ দিতে পারি না - না ডাকলেও তো তোমরা ছাড় না। তার পর এ দাসের বিবাহ দিয়াছ; তা গৃহিনীর পিত্রালয়টী কিছু বাদ দেওয়া চলে না। বাকী রইলেন খুড়ী জ্যেঠাই মাসী পিসি ভগিনী পাড়া প্রতিবাসী প্রভৃতি। এঁদেরও অনেককে না ডাক্‌লে হয় না। এঁরা না হলে কাজ কর্ম্ম করেই বা কে? তা আমার নিবেদনটা এই যে অনির্দ্দিষ্ট সময়েরও একটা সুবিধে আছে। কতক আসছেন, খাওয়া দাওয়া সেরে যাচ্ছেন— আবার কতক আসছেন,—এমনি করে মধ্যাহ্ন ভোজন থেকে আরম্ভ করে সায়াহ্ন ভোজন পর্য্যন্ত খাওয়া দাওয়া চলতে থাকে। তাই বলছি আর যা কর সময়টা নির্দ্দিষ্ট করে কাজ নেই। আমার মত কুঁড়ে ঘরে অনেকেরই বাস। শুধু একেলা কি আমি?

ইতি সেবক রাজু।

পত্র নং ৩

শ্রীচরণ কমলেষু

মাসিমা আমার প্রণাম জানিবেন। ভারতীতে আপনার যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে তাহা আমরা পড়িয়াছি।

এ কি মাসিমা আমাদের উপর আবার আক্রমণ কেন? আপনার মা, মাসিমারা আমাদের যেমন শিখাইয়াছেন তেমনি শিখিয়াছি।

আপনাদের এমনি শিক্ষা দেবার ঝোঁক, যে কবে যে আমাদের অক্ষর পরিচয় হয়েছিল তা ত মনেই পড়ে না। পাঁচ বছর বয়সে যখন আমরা ইংরাজি স্কুলে ভর্ত্তি হলুম তখন বাড়িতে মাষ্টার মশায় রাজর্ষি আর সেকেণ্ড বুক পড়াতেন। এ ত গল্প কথা নয় মাসিমা এ সত্যিকার ঘরের কথা। ভোরে সেই বিছানা থেকে উঠেই স্কুলে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে হত। ঘড়ির কাঁটার ৮॥০ টা বাজলে আমরা গাড়ীতে উঠে স্কুল চলে যেতুম—আর সেই সন্ধ্যা ৫।৫॥০ টায় বাড়ীতে ফিরে আসতুম। রান্না বান্না ঘরের কায শেখবার অবসর পাওয়া দূরে থাক্ খেলা করতে অবসর পেতাম না। আবার সন্ধ্যাজ্বালার সঙ্গে সঙ্গেই মাষ্টার মশায় এসে হাজীর হতেন। এমনি করে খেলার সুখের মুহূর্ত্ত টুকুও আমরা ভোগ করতে পাই নাই বল্লে হয়।

যাহোক তার পর বিবাহ। বিবাহের পর পরের ঘরে পরের হাতে পড়েছি। তাঁরা যেমন তেমনি হতে হয়েছে। রান্না বান্নায় কায ঘাড়ে পড়ে নাই—কাযেই তেমন পটু নহি যে তা স্বীকার করিতেছি।

আগুণতাতে গেলেই মাথা ধরে তাত সত্য। রান্নার কায তেমন অনায়াসে করতে পারি না বটে কিন্তু তা ছাড়া যে সব কায আমাদের

করতে হয় তার পক্ষে কি রান্নার কায করাটা এমনই শক্ত? অনভ্যাস বশতঃ শারীরিক ক্লেশ হয় কিন্তু কাযটা কঠিন নয়। তার চেয়ে সংসারের সুশৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য প্রতি খুটি-নাটির দিকে দৃষ্টি রাখা সুকঠিন নয় কি? সন্তানদের দেখা শোনা, দাস দাসীদের পরি-চালান করা, ঘর দ্বার পরিষ্কার রাখা, আর যাঁহার হাতে আমাকে সমর্পণ করেছেন তাঁর সর্ব্ব কার্য্যে সহায়তা করা ও তাঁর সুখস্বচ্ছন্দের দিকে সর্ব্বপ্রকারে দৃষ্টি রাখতে আমাদের যত হয় এমনটি পল্লী মহিলাদের কিন্তু হয় না। আমি অনেক পল্লীগ্রামে গিয়েছি তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি তাঁতে এইটুকু বুঝেছি যে আমাদের ঘরকন্নার দায়ীত্ব তাঁদের চেয়ে অনেক বেশি হয়ে পড়েছে। আজ তবে আসি।

আপনার স্নেহের রেণু

পত্র নং ৪

ভাই ঠাকুরঝি —

আর বোল' না জ্বলে মলুম। পুরুষদের চক্ষু যে ভগবান কেন দিয়েছেন বলতে পারি না। একটু কি পসন্দ নেই। মেজবৌমাকে চড়ুকের তত্ব কোরবো বলে দুটো জ্যাকেট কিনে আনতে বলেছিলুম বোলবো কি ভাই তোমার দাদা মোটা মোটা দুটো সাটিনের জামা এনে হাজির। তাতে বিশ্বের জরী ফিতে লেস দেওয়া আছে। সে দুটো জ্যাকেট কি বালিসের খোল তার ঠিক নেই! দেখে ত অবাক। তোমাদের শিল্পবিদ্যালয় কেমন চলছে? রথের তত্বর জন্য কয়েকটী জ্যাকেট আমাকে তৈরি করাইয়া দিতে পারবি? দেখো যেন ভাল রকম হয়। ছিঃ ছিঃ পুরুষ মানুষের কি কিছু পসন্দ নাই। এদিকে ত ভাল কাপড়খানি পরলে হাঁ করে চেয়ে থাকেন।

তোমার বৌদিদি

পত্র নং ৫

প্রিয় ভগিনি—

ভারত'তে আপনার মেয়ে যজ্ঞির বিশৃঙ্খলা পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। মহিলাবর্গের দোষগুণ, অভাব, অভিযোগ মহিলাদেরই করা উচিত। আপনি এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া ভাল করিয়াছেন। এক্ষণে মহিলাগণের নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন প্রত্যেকে গৃহস্থালী বিদ্যাশিক্ষা শিশু পালন প্রভৃতির উন্নতি ও সুশৃঙ্খলা সম্বন্ধে চিন্তা করেন এবং এই সকল বিষয়ে নিজেদের মধ্যে পত্রিকা প্রভৃতিতে আন্দোলন করেন। কেহ কোন বিষয়ের ত্রুটী দেখাইলে ক্ষুণ্ণ না হইয়া যেন ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা করেন। নমস্কার।

আপনার শ্রীমতী দয়াবতী দেবী

এক্ষণে ভারতীর পাঠিকাবর্গের প্রতি আমার নিবেদন এই যে, মেয়েযজ্ঞির বিশৃঙ্খলা নিবারণের উপায় যাঁহার যাহা মনে হয় যেন ভারতীতে প্রকাশ করিয়া আমাকে রক্ষা করেন

শ্রীশরৎকুমারী চৌধুরাণী।

পোষ্যপুত্র।

গড়ের মাঠের নির্জ্জন রাস্তা ছাড়াইয়া একখানা গাড়ি আফিস কোয়ার্টারের জনহীন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়িগুলাকে অতিক্রম করিয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই লোক চলাচল পূর্ণ আলোকিত হাওড়ার পুলের নিকট আসিয়া পড়িল,হঠাৎ সেই সময়েস্তব্ধ শান্তি বিস্মিতনেত্রে বাহিরের পানে চাহিয়া দেখিল। সমস্ত পথটা দুজনেই নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল, কেহ কাহারও সহিত একটি কথা পর্য্যন্ত কহে নাই, আসিবার সময়েও এই প্রকারে আসিয়াছে কিন্তু সেবারে শান্তি সমস্ত পথটাই কাঁদিয়াছিল, এবারে সে কাঁদিতে পারে নাই।

হেমেন্দ্রও একবার চাহিয়া দেখিল, রাস্তার ধারে আলোকাধার হইতে অত্যুজ্জ্বল, তীব্র একটা আলোকের ছটা গাড়ির ভিতরকার অন্ধকার ভেদ করিয়া তাহাদের মুখে পড়িল; হেমেন্দ্র ক্ষিপ্রহস্তে দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল। শান্তি সন্দিগ্ধনেত্রে সেই অন্ধকারের মধ্যে স্বামীর মুখের ভাব দেখিতে চেষ্টা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল; "হাবড়া ষ্টেশনে নিয়ে এলো যে?"

হেমেন্দ্র উত্তর দিল না, যেন শুনিতেই পায় নাই এমনি করিয়া বসিয়া রহিল। শান্তির বুকটা এবার একটা কি যেন নূতন আশঙ্কার আভাষে হঠাৎ ধড়াস্ করিয়া উঠিল, চঞ্চল ভাবে সে পিছনদিকের একটা খড়খড়ি টানিয়া আবার উৎকণ্ঠিতনেত্রে বাহিরের দিকে চাহিল। গঙ্গার জলে সহস্র বিদ্যুতালোক জ্বলিতেছে, অগণ্য নক্ষত্র এখানে প্রভাহীন, সাদা ও লাল ফুলে গাঁথা মালার মতন পশ্চাতে আলোকের শ্রেণী পড়িয়া রহিয়াছে। শান্তি ব্যগ্রস্বরে বলিয়া উঠিল "গাড়োয়ানটা ভুল করেচে, আমাদের সেয়ালদায় না নিয়ে গিয়ে হাবড়ায় নিয়ে এলো"—হেমেন্দ্র এবারেও কোন উত্তর করিল না।

গাড়ি আসিয়া যথাস্থানে থামিলে দরজা খুলিয়া হেমেন্দ্র গাড়ি হইতে নামিয়া দাঁড়াইল। শান্তিকে নামিবার চেষ্টা বিরহিত দেখিয়া বলিল "নেবে এসো একখানা গাড়ি বোধ হচ্চে দাঁড়িয়ে রয়েছে।"

শান্তি নামিল না বরং গদির উপর একটু শক্ত হইয়া বসিল। হেমেন্দ্রের ললাট মেঘাচ্ছন্ন হইয়াই ছিল, শান্তির অবাধ্যতায় গভীর বিরক্তিতে তাহা আরো কুঞ্চিত হইয়া উঠিল; তথাপি সংযতভাবে শান্তির অঙ্গ স্পর্শ করিয়া ডাকিল "শান্তি শুনচো নেবে এসো"। শান্তি এবার দ্রুতকণ্ঠে বলিল "কোথায় আমায় নিয়ে যাচ্চ তা না বল্লে আমি নাববো না।"

শান্তির স্বরের দৃঢ়তায় ও কথার ধরণে হেমেন্দ্র প্রথমটা একটু থতমত খাইয়া গেল। তাহার মুখের উপরে এমন জোরের সহিত প্রতিবাদ করা যে কাহারও পক্ষে সম্ভব হইতে পারে নাই, বিশেষতঃ শান্তির মুখে এমন উদ্ধত স্বর সে একদিনমাত্র শুনিয়াছিল বটে কিন্তু সেদিনকার সে ভর্ৎসনা নারী হৃদয়ের উদ্বৃত অভিমানাশ্রুরাশির মতনই প্রেমপূর্ণ, কিন্তু আজ তাহার মধ্যে একি কঠোরতা একি বিচারকের অলঙ্ঘ্য আদেশের কঠিন

সুর! হেমেন্দ্র ঘোর বিরক্তিতে আরক্ত হইয়া উঠিল। তাহাকে সামান্ত কীটপতঙ্গগুলাও এখন হইতে অপমান করিতে পারিলে ছাড়িবে না বোধহয়! অদূরে গাড়ি ছাড়িবার বাঁশি বাজিয়া উঠিল। স্বল্পসংখ্যক লোক কেহ মাথায় মোট কেহ ব্যাগ হাতে ছাতা বগলে প্লাটফরমের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। হেমেন্দ্র উদ্গত রোষাগ্নি হৃদয়ে চাপিয়া ফেলিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল; "শিগ্গির এসো এখনও যদি গাড়িটা না পাই তা হলে হয়ত সকাল অবধি বসে থাকতে হবে।"

শান্তি নামিয়া আসিল, কিন্তু সে হেমেন্দ্রের অনুসরণ করিল না; প্রাচীরের গায় পিঠ রাখিয়া কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। গাড়িভাড়া চুকাইয়া দিয়া হেমেন্দ্র দ্রুতপদে ষ্টেশনের ভিতর চলিয়া গিয়াছিল; মনে করিয়াছিল শান্তিও তাহার পশ্চাতে আসিতেছে, কিন্তু টিকিট কিনিতে গিয়া একটু ভাবিবার জন্ত দাঁড়াইল, তারপর হঠাৎ পিছনে চাহিয়া দেখিল শান্তি তাহার সঙ্গে আসে নাই, দারুণ বিরক্তি ও অপমানে ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া টিকিট না কিনিয়াই ফিরিয়া আসিল। ট্রেণ ছাড়িয়া দিয়াছিল।

ভোর হইয়া আসিতেছিল, দূরে আলোকের মালা ঈষৎ হীনপ্রভ হইয়া আসিয়াছে। লোকজনও খুব বেশি চলিতেছে না। ষ্টেশনের প্রবেশ পথের সম্মুখে কতকগুলি থার্ড ক্লাশের যাত্রী গাড়ির আগমন প্রতীক্ষা করিয়া ছোট বড় বোঁচকা পাশে রাখিয়া ঘুমে ঢুলিতেছে। ক্রুদ্ধকণ্ঠে হেমেন্দ্র বলিল "এ কি রকম ব্যবহার তোমার শান্তি! সুধুসুধু ট্রেণটা ফেল করালে!"

শান্তি ক্ষিপ্রহস্তে অশ্রু মুছিয়া ফেলিয়া দৃঢ়কণ্ঠে কহিল "বলেছিতো আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্চো না বল্লে আমি যাবো না, কোথা যাচ্চো?"

হেমেন্দ্র এবারও বিস্ময় বোধ করিল, কিন্তু নিজেকে পুনঃ পুনঃ অপমানিত করিতে দিতে আর সে সাহস করিল না। দিনের আলোয় কোন পরিচিত বন্ধুবান্ধবের চোখে এই অবস্থায় যদি পড়িয়া যায় তাহার চেয়ে অপমানের বিষয় তাহার পক্ষে আর কিছুই নাই। স্বরটা একটু কোমল করিয়া বলিল "কোথা যাচ্চি তা কেমন করে বল্‌বো বলো, আমাদের স্থান কোথা? যেখানে হয় কোথাও চলে যাই এসো।" শান্তি রুদ্ধস্বরে বলিল—

"না আমরা লক্ষ্মীপুরেই যাবো, কেন তুমি এখানে নিয়ে এলে? চলো ফিরে যাই। সেখানে না গিয়ে কোথায় যেতে চাইছো?"

এবার আবার শান্তির চোখে জল ভরিয়া আসিয়া পতনোন্মুখ হইল। তাহার স্বর কাঁপিতেছিল। হেমেন্দ্র পরুষ শ্লেষের সহিত সক্রোধকণ্ঠে কহিয়া উঠিল—

"এ জন্মে আর নয়, জাহান্নমে যাব সেও ভাল তবু সেখানে নয়, তোমার খুসী হয় তুমি যাও।"—চারিদিকের আলোক মালা নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়া উষার অম্লোজ্জ্বলমূর্ত্তি প্রকাশ পাইল। আকাশে মেঘ ছিল না কিন্তু গত দিবসের বৃষ্টিচিহ্ন রাজপথকে পিচ্ছিল করিয়া রাখিয়াছিল, লোকের ভিড় ও গাড়ীর শব্দে ষ্টেসন ভরিয়া উঠিল। শান্তির ঠোঁট কাঁপিতেছিল প্রথমটা সে কথা কহিতেই পারিল না। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই আত্মসম্বরণ করিয়া লইয়া সে সোজা হইয়া দাঁড়াইল, স্থির

স্বরে কহিল, বেশ তাই তবে হোক, "আমি জ্যেঠামশায়ের কাছেই যাবো।" রোষে ক্ষোভে গুমরিয়া হেমেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল। এ সংসারে তাহার কোন দাবীই নাই! যে স্ত্রী ভিন্ন তাহার যথার্থ আপনার বলিতে গেলে কেহই বিদ্যমান নাই সেও তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে চায়। সে কি এমনি অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়িল! কিন্তু না হেমেন্দ্র তাহাকে কিছুতেই এখন হাতছাড়া করিতে পারে না। সেই এখন তাহার অভিষ্ট সিদ্ধির একমাত্র অস্ত্র।

হেমেন্দ্র বড় বিপদেই পড়িল, শান্তি ক্রমেই বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছে! এখন তাহাকে বুঝাইয়া ভুলাইয়া নিজের মতে লইয়া আসা সম্ভবই নয়। এদিকে আর কতক্ষণই বা এমন করিয়া সাধারণের কৌতুহল দৃষ্টির দৃশ্যরূপে পথের ধারে দাঁড়াইয়া থাকা যায়! কিছুক্ষণ এদিকে ওদিকে একটু বেড়াইয়া আসিয়া আবার একটু কোমলভাবে কহিল—"দিন-কতোক পশ্চিমে বেড়িয়ে আসি চলো।" কথাটা অসঙ্গততায় নিজেই যেন সঙ্কোচে জড়াইয়া আসিল; শান্তির মুখেও একটা অবিশ্বাসের বিষণ্ণ হাসির ছায়া অতি সন্তর্পণে ফুটিয়া উঠিয়াছিল,—সেটুকু হেমেন্দ্রের দৃষ্টি এড়ায় নাই, অপ্রতিভ হইয়া সে থামিয়া গেল। তার পর আবার বলিল "যাবে না?"

শান্তি কথা কহিল না,—সুধু তাহার দিকে চাহিয়া দেখিয়া মাথা নাড়িল 'না'।

ক্রোধে অপমানে হেমেন্দ্রের আপাদমস্তক কাঁপিতে ছিল। কিন্তু সে কেমন করিয়া এই শান্ত বশিষ্ট লজ্জানম্র শান্তিকে যে তাহার একটা মিষ্ট কথার জন্য লালায়িত, তাহার কৃপাদৃষ্টির উপর মাত্র যাহার সমস্ত জীবনের সুখশান্তি নির্ভর—কেমন করিয়া তাহাকে আজ নিজের মতে লইয়া আসে ভাবিয়া অস্থির হইয়া উঠিল। এত লোকের মাঝখানে তো আর তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে পারে না।

চারিদিকের লোক হাঁ করিয়া তাহার-দিকেই চাহিয়া আছে, হেমেন্দ্র অস্থির হইয়া পড়িল। এই সময় একখানা মেল আসিয়া প্ল্যাটফরমে প্রবেশ করিল; কোলাহলে ষ্টেশন মুখরিত করিয়া আরোহীরা ক্রমে বাহির হইয়া যাইতেছিল;—হঠাৎ তাহার মধ্য হইতে যোগেশ আসিয়া হেমের হাত ধরিল "আরে ছোট বাবু যে, কোথায়?" বলিতে বলিতে হেমেন্দ্রের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া শান্তির পানে চাহিল "বৌ দিদিও সঙ্গে যে! ব্যাপারখানা কি বলো তো? যাওয়া হচ্চে কোথায়?"

শান্তি যোগেশকে দেখিয়াই মুখে ঘোমটা টানিয়া দিয়াছিল। হেমেন্দ্র যেন সেদিকের ভাবনা হইতে মুক্ত হইয়া হাঁফ ফেলিয়া বাঁচিল! যোগেশকে পাইয়া সে এই সঙ্কটের মধ্যে যেন একটা কুল পাইল। কিন্তু নিজের স্বভাবসিদ্ধ আত্মাভিমান ত্যাগ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব,—ঈষৎ গাম্ভীর্য্যের সহিত উত্তর করিল "পশ্চিম" "পশ্চিম!" বলিয়া যোগেশ একবার চারিদিকে চাহিয়া লোক জন বা লগেজ পত্রের অনুসন্ধান করিয়া ব্যর্থ হইল।

কই কাউকে তো দেখ্‌চিনা? আর এমন সময় পশ্চিমের গাড়ি কোথা? যোগেশ সকৌতুহলে হেমেন্দ্রের পানে চাহিল। হেমেন্দ্র বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল একটু খানি মাথা চুলকাইয়া, এদিক ওদিক চাহিয়া কহিল,

তা বটে এখনতো কোন ট্রেণ নেই; তাহলে যোগেশ কি করা যায় বলো দেখি?"

যোগেশ অনুমানে ব্যাপারটা বুঝিয়া ফেলিল, চট করিয়া তাহার মাথায় বুদ্ধি খেলিয়া গেল, হেমেন্দ্রকে একটু আড়ালে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল "ব্যাপারটা কি বলো দেখি? শ্বশুরবাড়ি গেলেনা কেন?"

হেমেন্দ্রের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল কিন্তু সব কথা খুলিয়া না বলিয়া কেবল মাত্র উত্তর করিল "না।" "বাড়িতে আর বনবেনা তা আমি আগেই জানতুম। তা কোন জায়গাটায় যাওয়া ঠিক হয়েছে?" হেমেন্দ্র মুখ নীচু করিয়া আস্তে আস্তে উত্তর করিল "এখনও কিছুই ঠিক করিনি।" "ঠিক না করেই টিকিট কিনবে নাকি? সঙ্গে কে আছে? জিনিষ পত্র কই?"

একি পরিহাস! হেমেন্দ্রের লোকজন জিনিষ পত্র! তার কি আছে? কে আছে? মৃদুহাসিয়া বলিল "সঙ্গে কে থাকবে? যোগেশ যখন বাড়ি থেকে এসেছিলুম সঙ্গে কে এসেছিল? আর কিছুই তো আনিনি, যেমন এসেছিলুম তেমনিই যাব। শুধু যে বোঝা ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন সেইটেই বইতে হবে।"

"এর নাম পশ্চিম যাওয়া! পশ্চিমে গিয়ে কি করবে? চলবে কেমন করে?"

হেমেন্দ্রের আরক্তমুখ বিবর্ণ হইয়া আসিল, সম্মুখে দিগন্তপ্রসারী সংসার সমুদ্র, সে গলায় কলসী বাঁধিয়া তাহাতে ঝাঁপ দিয়া পড়িতে আসিয়াছে, সাঁতারও জানেনা, তথাপি গর্ব্বের সহিত কহিল "কোথাও একটা চাকরী বাকরী চেষ্টা করব, ভিক্ষের ভাত আর খাবো না। যোগেশ আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েচে।"—

যোগেশ মৃদু মৃদু হাসিতেছিল! বলিল "ভিক্ষে, সবিতো তোমার। খুড়র ভীমরথি হয়েচে বলে দেশের আইন আদালত সুদ্ধ কি উঠে গেল? মাগী আদালতে প্রমাণ করুকনা কেমন সে বিনোদের স্ত্রী।"

হেমেন্দ্রের চোখের সম্মুখ হইতে যেন একখানা কাল পর্দ্দা কে সরাইয়া দিল। সত্যিতো মূর্খ বিনোদ কুমারের মতন সেও অভিমানে দেশ ছাড়া হইবে নাকি? তাহাতে ক্ষতিই বা কাহার? সাগ্রহে বলিয়া উঠিল "কিন্তু শ্বশুর তো আমাদের কিছুমাত্র সাহায্য কর্ব্বেনা আমার তো কিছুই নেই—"

যোগেশ বন্ধুর পিট চাপড়াইয়া তাহাকে তাহাকে উৎসাহিত করিয়া কহিল "কিছু ভেবনা সব আমি ঠিক করে ফেলব। এখন তবে কোথায় থাকবে! ফরেস ডাঙ্গায় আমার এক শালীর বাড়ি আছে চলো বলত তোমাদের বরঞ্চ সেইখানেই নিয়ে যাই। তারা গেছে কাশীবাস করতে,—বাড়িখানা ভাড়াও হয়নি খালি পড়ে রয়েচে।"

একটু পরেই একখানা প্যাসেঞ্জার গাড়ি ছাড়িবে—যোগেশ গিয়া শান্তিকে বলিল,"বৌদি এখানে দাঁড়িয়ে কেন গাড়িতে এসে বসুন, চারিদিকে ভদ্র লোকের ভিড়।—" শান্তি দ্বিরুক্তি মাত্র না করিয়া যোগেশের সহিত আসিল! হেমেন্দ্র দেখিয়া বিস্ময়ের সহিত ভাবিল যোগেশ নাজানি কিউপায়েই তাহার মন ফিরাইয়াছে!

ট্রেন ছাড়িয়া দিলে একে একে জনকোলাহলময়ী নগরীর দৃশ্য চক্ষের সম্মুখ হইতে সরিয়া গেলে পর শান্তি যখন মুখ ফিরাইল, হেমেন্দ্র দেখিল একরাত্রির ভিতরে

তাহার যেরকম পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে সেরূপ অনেক বৎসরেও হয় না। সে ভিতরে ভিতরে একটু শিহরিয়া উঠিল। একবার মনে করিল, কাজ নাই শান্তিকে লক্ষ্মীপুরে ফিরাইয়া লইয়া যাই—" কিন্তু দারুণ আত্মাভিমান পরমুহূর্ত্তেই তিরস্কার করিয়া উঠিল,—ভীরু! স্ত্রীর জন্যে নিজেকে লোকের কাছে নীচু করবে! হেমেন্দ্র জোর করিয়া মনের কোমলতাটুকুকে পদদলিত কীটের মত দূরে নিক্ষেপ করিয়া যোগেশের কাছে সরিয়া বসিল।

যোগেশ বন্ধুকে মৃদুস্বরে অনেক রকম পরামর্শ দিতে দিতে মধ্যে মধ্যে শান্তির ভাব লক্ষ্য করিতেছিল। হেমেন্দ্র না বুঝিলেও সে বুঝিয়াছিল শান্তি বাহিরের লোকের সম্মুখে আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্যই শুধু স্বামীর সঙ্গে আসিল।

তাহার মুখের আশাহীন বেদনার নিদারুণ আঘাতচিহ্ন কশাঘাত চিহ্নের মতনই সুস্পষ্ট রেখায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সকরুণ-নেত্রে যোগেশ তাহার পানে চাহিয়া চাহিয়া মনে মনে বলিল "তোমার ভাগ্যে অনেক দুঃখ আছে; তুমি যার হাতে পড়েছ সে তোমায় চিনবে না সে তোমার আদর বুঝবে না। তবে আমি যেটুকু পারি তোমার মঙ্গল চেষ্টা করবো।"

শ্রীঅনুরূপা দেবী

ব্রিটিশ মেডিক্যাল কন্‌ফারেন্স।

সমস্ত ইউরোপে এই ব্যবস্থা যে শীতকালে তাঁহারা বাড়ীতে বা দেশে থাকিয়া কাজ করেন, আর গ্রীষ্মকাল পড়িলেই স্বাস্থ্যলাভ-উদ্দেশ্যে আনন্দে নানা দেশ বিদেশে বেড়াইয়া —সঙ্গে সঙ্গে নূতন জ্ঞান অর্জ্জনও করেন। Winter session বা শীতকালের কাজ তাহাদের দেশে ছয় মাস চলে, কিন্তু summer session গ্রীষ্মকালের কাজ তিনমাস মাত্র চলে। বাকী তিনমাস ছুটী ও বেড়াইবার বা বিশ্রাম করিবার সময়। তাই এই অবসর সময়েই যত সভা, সমিতি, ও সম্মিলনীর অধিবেশন হইয়া থাকে।

বিলাতে সব ডাক্তারদের একত্রে মিলিবার একটি সমিতি আছে তাকেই British Medical Association "চিকিৎসকসভা" বলে। পৃথিবী জুড়িয়া সকল পাস করা ডাক্তারই তাহার সভ্য হইতে পারেন। বৎসরে তজ্জন্য প্রায় বিশ টাকা দিতে হয়। বিভিন্ন দেশ হইতেও সেই বিলাতি সভার সভ্য হওয়া চলে। দূরে থাকিয়া কাগজ-পত্র পাঠাইয়া ও জ্ঞানের আদানপ্রদান করিয়া নিকটে থাকার মতই একত্রে কার্য্য করা যায়। আসল সভাটি বিলাতে বটে, কিন্তু প্রত্যেক স্থানে শাখা সমিতি আছে। আমাদের ভারতেও তার একটি খণ্ড সমিতি আছে। এইরূপে বিভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন রোগ পরীক্ষা ও রোগ চর্চ্চার ফল পরে একত্র হইয়া সেই পীঠস্থান বিলাতের প্রধান সমিতিতে যাইয়া মিলে। জ্ঞানোপার্জ্জনের সে দেশে এমনই পৃথিবী জুড়িয়া সুব্যবস্থা।

আমি যে সময়ে বিলাতে ছিলাম, সেই সময়েও গ্রীষ্মকালে সেই মহাসভায় পৃথিবীর সকল সভ্যকে নিমন্ত্রণ করা হয়। প্রতিবৎসর এক স্থানে ইহার অধিবেশন হয় না। কখনও বা বর্ম্মিংহামে, কখনও বা লণ্ডনে, কখনও বা এডিনবরায় এই মহাসভা আহূত হইয়া থাকে। সে বৎসর ইংলণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে ডিভনসায়ারের "একসেটর" নামক একটি পুরাতন স্থানে এই অধিবেশন হইয়াছিল।

আমি এত নিকটে থাকিয়াও এই বাৎসরিক অধিবেশনের কথা কিছুই জানিতাম না। অধিবেশনের সবেমাত্র দুই দিন পূর্ব্বে আমার এক পরম হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু একজন পার্শী ভদ্রলোক আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়া এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। তাঁহার আর একজন বন্ধু সেই সভার সভ্য হইয়া যাইতেছিলেন। শুনিবামাত্র আমি তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত যাত্রা করিতে প্রস্তুত হইলাম। সে সব দেশে যাত্রার উদ্যোগ করিতে বেশী সময় লাগে না। মংলবেরও সহজে ঠিক হয়, তাহা কার্য্যে পরিণত করাও সহজ সাধ্য এবং যাতায়াতেরও অশেষ সুবিধা। সুতরাং একঘণ্টার মধ্যেই একটি হাতব্যাগ, ওভারকোট ও দুইটি সার্ট ও চারখানি রুমাল লইয়া গাড়ি ধরিতে চলিলাম। ১৭ শিলিং মাত্র দিয়া টিকিট ক্রয় করিয়া গাড়িতে উঠিলাম। গাড়িগুলি যদিও খুব দ্রুত চলে—তবুও লণ্ডন হইতে যাত্রা করিয়া সন্ধ্যার সময় সে স্থানে পৌঁছিলাম। যাইবার পথে কতই নূতন দৃশ্য দেখিলাম। সে অঞ্চলগুলি সবই পাড়াগাঁয়ের মত। শস্যক্ষেত্র, গোচারণ মাঠ, বাগান ও দরিদ্র-লোকের ছোট ছোট বসত বাড়ী। চারিদিকে গরু, বাছুর, ভেড়া, ঘোড়া চরিতেছে। সুস্থশরীর ও কর্ম্মপটু কৃষকেরা ও কৃষকবধূরা শস্যক্ষেত্রে হাতের আস্তেন গুটাইয়া পাশাপাশি নিজের হাতে কাজ করিতেছে।

আমাদের দেশে যেমন রেল দিয়া যাইতে যাইতে ক্রমে কত পরিত্যক্ত ঘর বাড়ী ও গ্রাম দেখা যায়, ও দেশে সেরূপ মোটেই দেখিলাম না। অভাব, অযত্ন দুঃসময়, বা মৃত্যুর চিহ্ন যেন কোথাও নাই। চারিদিকেই সমৃদ্ধির লক্ষণ; পুরাতনের উপরও পরিপূর্ণ নূতন সংস্কার। যাইবার পথে "বাথ" প্রভৃতি কতগুলি নূতন সহরও দেখা যায়; সেগুলি সব লণ্ডনের ভাব ও নূতন সমৃদ্ধি লইয়া গঠিত। যাইবার কালে পথে কতগুলি সমুদ্রধারের স্বাস্থ্যনিবাসও দেখা গেল। সে গুলির বর্ণনা ব্রাইটন সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে পূর্ব্বেই করিয়াছি। আনন্দমাখা মুখ ও হাবভাব লইয়া সব ছেলে মেয়েগুলি খালি পা করিয়া হাঁটু জলে ছুটাছুটী করিয়া খেলা করিতেছে ও ছিপ ও কুড়াজালি করিয়া মাছ ধরিতেছে। অনেক স্থলে অবগাহন স্নান করিবার জন্য ছোট ছোট ঢাকা গাড়ি। কোথাও বা প্রণয়ীদের নির্জ্জন গাছের তলায় গুপ্ত সম্মিলন স্থান। সেস্থানে অনেকে অনেকক্ষণ ধরিয়া নিত্য সময় কাটান।

সন্ধ্যা ছয়টায় গাড়িখানি একসেটরের ষ্টেসনে পৌঁছিল। সেটি একটি পুরাতন সহর। ষ্টেসনটিও তত বড় নয়। একাই সাহস করিয়া গিয়াছি কিন্তু নাবিয়া যে কোথায় যাইতে হইবে ও কোথায় থাকিব,

তার কিছুই জানিনা। কিন্তু ষ্টেশনে নাবিয়াই দেখিলাম সভ্যদের জন্য আহ্বান-সমিতির লোক সেই খানেই উপস্থিত আছেন।

এত দেশ বিদেশের লোক সেস্থানে তখন সমাবেশ হইয়াছিল যে আশ্রয় স্থান খুঁজিয়া পাওয়াই দুরূহ। সবাই আগে হইতে চিঠি লিখিয়া আপনার আপনার স্থান ঠিক রাখিয়াছে। আমার জন্য কোনই ভাল স্থান নাই। আহ্বান-সমিতির লোকেরা নিকটস্থ একটি বড় হোটেলে লইয়া গিয়া আমাকে আশ্রয় দিলেন। সেখানে একদিন মাত্র মাথা গুঁজিয়া ছিলাম তাহাতেই অনেক শিক্ষা হইয়াছে। যত বড় লোকের সেই হোটেলে আড্ডা। সুধু আহার করিবার জন্য ১২ শিলিং লাগে—সমবেত সভ্যেরা আহারের সময় যে সকল মদ্য পান করিলেন,—তার রং যেমন সুন্দর গন্ধ তেমনি মধুর। ফেণাগুলি দানা দানা হইয়া গেলাসের ধারে বৈদ্যুতিক আলোকে মুক্তার শোভায় শোভা পাইতে লাগিল। বোধ হইতে লাগিল আজ ইহারা যেরূপ দামী মদ পান করিতেছেন অন্য দিন এমন করেন না।

দুইটি যুবতী রমণী হোটেল তত্ত্বাবধানে নিযুক্তা ছিলেন। তাঁহারা সকলকেই এমনি মিষ্ট কথায় আপ্যায়িত করিতেছিলেন যে লোভ হইতে লাগিল, বেশী পয়সা খরচ হইলেও সেস্থানে কিছু দিন থাকি।

দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি যাঁহার স্থান দখল করিয়াছিলাম, পরদিন তিনি আসিয়া পৌছিলেন। সুতরাং আমাকে সে স্থান ত্যাগ করিতে হইল। তাঁহারাই আমার জন্য অন্য স্থান ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কিন্তু সে স্থানটি বড়ই অপছন্দসই। কি করি বাধ্য হইয়া থাকিতে হইল। হোটেলটির নামও বড় ভাল নয়—"প্যাক্ হস হোটেল।" সেখানেও দৈনিক এক পাউণ্ড খরচ করিয়া থাকিতে হইল।

শীতের দেশে বড় একটা ক্লান্তি আসে না। অতিরিক্ত পরিশ্রমের পরও খানিক ক্ষণ মাত্র বিশ্রাম করিলেই শ্রান্তি দূর হয়। গাড়ি হইতে নামিয়া প্রথমেই এসোসিয়সেনের আপিশে যাই। সেখানে সব সই করিয়া তবে ব্যবস্থা করিয়া লইতে হয়। একার্য্যে সনাক্ত করিবার দুইজন লোক চাই। আমাকে জানে না বলিয়া প্রথমে কেহই সনাক্ত করিতে চায় না। পরে একজন অবসর প্রাপ্ত I. M. S. কর্ম্মচারী আমাকে নিজে না জানিয়াও সই করিলেন, ও অন্য একজনকেও সই করিতে অনুরোধ করিলেন! এই সদাশয় পুরুষের নাম ডাক্তার "জইলাস্"। ইনি এখন কার্য্য হইতে অবসর লইয়া "প্লাইমাউথে" ডাক্তারী করেন। ইনি Tropical Journal-এর একজন সম্পাদক ও ভারতবর্ষীয় ছাত্রদের উপর ইঁহার বড়ই দয়া। আমাকে দেখিবামাত্রই জানাশুনা না থাকিলেও ইনি নিজে আমার স্বাক্ষর নিম্নে সই করিলেন ও অপর একজন ডাক্তারকে দিয়াও সই করাইয়া দিলেন। ইনিই (St. Mary) "সেণ্টমেরী" হাঁসপাতালে ডাক্তার রাইটের (Sir Amruth Wright) কাছে আমাকে পরিচয় করাইয়া দিয়া চিঠি দেন। সেই চিঠি লইয়াই আমি সে হাঁসপাতালে ভর্ত্তি হই। সে চিঠির একস্থানে এই কথা লিখিত ছিল Dr. Mallick hails from India—and is our fellow-subject. He like all Indian, is very

shy, and hence the necessity of this introduction. অর্থাৎ—"আমরাও যেমন ব্রীটিশ প্রজা ডাক্তার মল্লিকও সেইরূপ। আর সকল ভারতবাসীই যেমন সকল বিষয়ে লাজুক ইনিও সেই প্রকৃতির। তাই ইঁহার হাতে আমি এই চিঠিখানি দিলাম।"

এই কথা কয়টির ভিতর কেমন একটু আন্তরিক ভালবাসা ও শুভ ইচ্ছা মাখান আছে। ভারতবর্ষে উপস্থিতিকালে তিনি কত তন্ন তন্ন করিয়া ভারতবাসীর চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন তাহা এই চিঠিখানি হইতে বুঝা গেল।

অত বড় একটি বৃহৎ সমিতির স্থান হইবার মত একটি বড় বাড়ী সহজে পাওয়া যায় না। তাই সমিতির বিভিন্নশাখার অধিবেশন বিভিন্ন স্থানে হইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। এলবার্ট হল নামক বাটীতে গ্রীষ্মদেশের রোগ-সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। Albert Hallটী অতি সুন্দর স্থান। সেইটিই ষ্টেশনের নিকট ও সহরেরও প্রায় মধ্যস্থলে। সকল দিক হইতে যাতায়াতের সুবিধা আছে। বাড়ীটিও বেশ বড়, সেখানে অনেক বিষয়ের মিউজিয়ম আছে। সবগুলিই অতি সুনিয়মে সাজান। একটি ঘরে চাষবাসের যত কল কারখানা সব একত্র পাশাপাশি সাজান ও তাহার কলকৌশলও বর্ণনা করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া আছে। একটিতে খনিজ পদার্থের প্রদর্শনী। আর একটিতে জীবজন্ত ও মনুষ্য কঙ্কাল সাজান। সকলগুলিই শিক্ষার উপযোগী। এই স্থানেই Polytechnic নামক শিক্ষা স্থান। এইখানে সকল বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য প্রতি সন্ধ্যায় বক্তৃতা হয়। লোকেরা দিবসের কাজকর্ম্ম শেষে অবসর সময়ে এখানে আসিয়া তাহা শুনে। একটি স্থানে কতকগুলি সুন্দর ছবি ছিল। তার এক শ্রেণীর ছবিগুলি সবই দরিদ্র ঘরের ঘটনার চিত্র। সে চিত্রকর দরিদ্র লোকের বিভিন্ন অবস্থারই চিত্র লিখিয়া গিয়াছেন। একখানিতে একটি ছোট কুঁড়ে ঘরের মধ্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সামান্য সমিতি। ঘরে ছেলেরা সব আগুন পোহাইবার জন্য আগুনের ধারে ধারে বসিয়া আছে। একটি অনাথ বালকও আসিয়া তাদের দ্বারে আশ্রয় পাইয়াছে। দরিদ্রই দারিদ্র্যের ব্যথা জানে। একান্ত সহানুভূতির ভাব সে চিত্রে সুন্দর চিত্রিত।

সেখানে নানা রকমের বিভিন্ন সমিতি থাকিলেও আমি দুটি সমিতিতে মাত্র মিশিয়াছিলাম। "গ্রীষ্মপ্রধান দেশের রোগের সমিতি" ও "জীবাণু বিদ্যার সমিতি"। সে সকল স্থানে বক্তৃতার প্রথা এই যে, একজন কেহ একটি বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া সেই সম্বন্ধে নিজের বক্তব্য বলেন, তারই উপর তর্কবিতর্ক চলিতে থাকে। তাতে বিভিন্ন লোকের মুখ হইতে অল্পসময়ে কত কথাই শেখা যায়। প্রথমেই গ্রীষ্মপ্রধান-দেশের মেলেরিয়া প্রভৃতি জ্বরের প্রাদুর্ভাবের কথা উঠিল। এ দেশে যত লোক মরে তার অর্দ্ধেক সংখ্যা জ্বরের তালিকাভুক্ত। এমন কি যাহারা মরে না তারাও জ্বরে ভুগিয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তাই এত জাতীয় দুর্ব্বলতা আসিয়াছে। মেলেরিয়া বিষ মশক দংশনে ঘটে। তাই মশা মারিয়া অনেক দেশে ফল পাওয়া গিয়াছে। মেলেরিয়া প্রকোপেই গ্রীসের পতন হয়। ইহাতেই দেশ

জুড়িয়া জাতীয় দুর্ব্বলতা আসে ও সঙ্গে সঙ্গে পতনও ঘটে। গ্রীসে ম্যালেরিয়া আসিবার প্রথম কারণ মেলেরিয়ার দেশ হইতে তথায় কৃতদাস ধরিয়া আনা হয়। আমি নিজে বহুমূত্র রোগের বিষয় কিছু বলিলাম। এই সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন উঠিয়াছিল যে ভারতবর্ষেই কেন এ রোগ এত অধিক হয়। তার উত্তর অনেক আছে—যথা আমাদের অসার আহার, বাল্যবিবাহ, ও মস্তিষ্কের বেশী চালনা। সমিতিতে সকলেরই বলিবার সময় নির্দ্দিষ্ট আছে, কেহই তার বেশী সময় লইতে পারেন না। সবই অতি সুব্যবস্থায় চালিত—কোনও গোলমাল নাই। আমাদের এদেশের সমিতিতে কত অব্যবস্থা ও গোলমাল উঠে। এইরূপ,—অস্ত্রচিকিৎসা, চক্ষুর চিকিৎসা, ধাত্রীবিদ্যা প্রভৃতি নানা বিষয়ের শাখা ছিল। অন্যান্য স্থানে নানা বিষয়ের জিনিষপত্র দেখাইবার নানারূপ প্রদর্শিনীও চলিতেছিল। তার মধ্যে একটি কেবলই অনুবীক্ষণের ব্যাপার। রোগ নিরূপণে ও রোগ চিকিৎসায় সে যন্ত্রের আজকাল বড়ই আদর। সেখানে সকল রকম ডাক্তারী নূতন ঔষধ ও নূতন যন্ত্র ইত্যাদিরও প্রদর্শনী আছে। অনেক প্রকার (X ray) যন্ত্র দেখিলাম। যন্ত্রব্যবসাদারেরা নানা দেশ হইতে আপনাদের জিনিষ দেখাইতে ও বেচিতে লইয়া আসিয়াছে। সকল জিনিষেরই গায়ে দাম লেখা। বড় একটা দরদস্তর করিতে হয় না। তার মধ্যে বৈদ্যুতিক চিকিৎসার যন্ত্রই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্থান লইয়াছে। Cancer বা কর্কট রোগের চিকিৎসার জন্য কতনা বৈদ্যুতিক ও রেডিয়ম যন্ত্র দেখিলাম। তা ছাড়া নানারূপ নূতন ঔষধ ও খাদ্যসামগ্রীও ছিল। সবগুলিই লোক চক্ষু আকর্ষণ করিবার জন্য বিপুল আড়ম্বরে সজ্জিত। সকল গুলিই বুঝাইয়া দিবার জন্য ছাপা কাগজ আছে, ও দেখাইয়া বুঝাইয়া দিবারও লোক আছে। তুমি কেনো বা নাই কেনো তাতে ক্ষতি নাই,আপাততঃ যন্ত্রগুলিতে তোমার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিলেই হইল। আর তখনই তোমার নাম ধাম খাতায় টোকা হইয়া গেল। পরে তার সুফল ফলিবে—এই আশায় চিরদিন তোমাকে তাদের জিনিষের বিজ্ঞাপন ছাপা কাগজ পাঠাইবে। আমি এখনও এখানে ওরূপ কাগজ কত পাই। বিলাতী ব্যবসায়ের এই দস্তুর।

অধিবেশন শেষ হইলেই কত স্থান দেখিবার ও নিমন্ত্রণ খাইবার আহ্বান আসিল। সে দেশের মিউনিসিপালিটি ও নিকটবর্ত্তী স্থানের বড় লোকেরাই অতিথিগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া বিভিন্ন স্থান দেখাইতেন ও নানারূপে আপ্যায়িত করিতেন। খরচ তাঁদেরই সব; তবে কে যাইবে কে না যাইবে তাহা আগে হইতে ঠিক করিয়া বলা চাই। ওরূপ নিয়মবদ্ধ ঠিকঠাকের দেশে একবার যাইব বলিয়া শেষে 'না' বলা চলে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ডেভনসায়ারে এমন বেশী কিছু দেখিবার নাই। বিখ্যাত রাসায়নিক "ডেভী"র এইস্থানে জন্ম হইয়াছিল। তাছাড়া একটি বহু পুরাতন ও বড় গির্জ্জা আছে।

স্থানটি আয়তনে খুবই ছোট—তবুও রাস্তায় রাস্তায় বৈদ্যুতিক ট্রামগাড়ি চলে। আর পূর্ব্বে মালপত্র যাতায়াতের সুবিধার জন্য কতকগুলি খাল কাটা হইয়া-

ছিল,—এখন তাহার তত দরকার না থাকিলেও সেগুলি যত্ন করিয়া রাখা হইয়াছে। আমাদের দেশে কত খাল এখন অযত্নে নষ্ট হইয়া গেছে। আর একটি বিস্ময়কর দৃশ্য দেখিলাম—যুবতী বালিকাদের সুবেশ পরিয়া হাবভাব দেখাইয়া পথে বেড়ান। যেস্থানে জনতা হয় সেই স্থানেই তাঁহাদের গতি।

অতিথি বলিয়া সমিতির অভিভাবকগণ আমাদের কত কি দ্রব্য স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ উপহার দিলেন। তার ভিতর একখানি সাদা কাফ্ লেদারে বাঁধান সুন্দর সোনার জল দিয়ে লেখা, বহু ছবিবিশিষ্ট "Exeter" নামক সেই স্থানটিরই ইতিহাস। সে বইখানি আমার কাছে এখনও আছে। দেখিলেই সেই দিনের কথা মনে হয়।

সমিতি শেষ হইবার পরদিনই প্রাতে এই সব কাগজ ও খাতাপত্র সযত্নে থলির মধ্যে পূরিয়া ও হাতব্যাগ হাতে লইয়া সমুদ্র ধারের স্বাস্থ্যনিবাস "তর্কী" নামক স্থানে যাইবার জন্য গাড়ি ধরিতে ছুটিলাম। তাহাতে কোন ক্লান্তিই বোধ করি নাই। ঠাণ্ডা দেশে ও উদ্যমশীল বীরজাতির সংসর্গে মনে তখন কত উৎসাহ দেহে তখন কত বল! আজ এদেশে ফিরিয়া আসিয়া তাহার কিছুই নাই! সকলই আবহাওয়ার গুণ!

শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক।

রসেটা প্রস্তর।

হার্মিস্ ত্রিস্ মেজিষ্টাস্ নামক মিশরীয় দার্শনিক স্বদেশকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,"হা মিশর, তোমার ধর্ম্মের অনিশ্চিত কিংবদন্তী মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। ভবিষ্যদ্বংশীয়গণ তাহা বিশ্বাস করিতে চাহিবে না। প্রস্তরোৎকীর্ণ শব্দাবলী মাত্র তোমার ধর্ম্মজীবনের সাক্ষ্য প্রদান করিবে। সিথীয় অথবা ভারতীয়গণ, অথবা অন্যতর বর্ব্বর প্রতিবেশী আসিয়া মিশরে বাস করিবে। দেবতাগণ স্বর্গে প্রতিগমন করিবেন। মানব ও দেবতাবর্জ্জিত মিশর মরুভূমিতে পরিণত হইবে।"

স্বদেশপ্রেমিক দার্শনিকের সেই করুণ ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হইয়াছে। পারসীক গ্রীক ও রোমকগণ একে একে মিশর জয় করিয়া তথায় স্ব স্ব বিজয় পতাকা উড়াইয়াছে। অবশেষে মুসলমানগণ প্রাচীন সভ্যতার শেষ চিহ্নটুকুও বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে। প্রাচীন মিশরীয় সাম্রাজ্য শুধু কথায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। মিশরীয় সভ্যতা ও ধর্ম্মের কাহিনী বহুদিন যাবৎ শুধু কিংবদন্তীতেই নিবদ্ধ ছিল। সে কিম্বদন্তীও মিশর ত্যাগ করিয়া গ্রীক ও রোমক সাহিত্যে আশ্রয়লাভ করিয়াছিল। মিশরে ছিল শুধু প্রস্তরোৎকীর্ণ শব্দাবলী। দুই সহস্র বৎসর যাবৎ তাহাদের মধ্যে মিশরীয় রহস্য লুক্কায়িত ছিল। দুই সহস্র বৎসর যাবৎ তাহারা মানবের অনুসন্ধিৎসা ব্যর্থ করিয়াছিল। অবশেষে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অতর্কিতভাবে সেই রহস্য

কুহেলিকা পরিষ্কৃত হইয়া পড়ে এবং মিশরীয় সাহিত্য সুধীগণের কৌতূহল তৃপ্তি করিতে সক্ষম হয়।

গ্রীকগণ যখন মিশর জয় করিয়াছিল তখনও প্রাচীন ভাষাভিজ্ঞ লোকের সম্পূর্ণ অভাব ঘটে নাই। কিন্তু এই ভাষা শিক্ষা করিতে গ্রীকগণ বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। দুই একজন চেষ্টা করিয়া থাকিলেও তাহার শিক্ষা বিবরণ পাওয়া যায় নাই। অন্ততঃ কোন গ্রীক পণ্ডিতই মিশরীয় ভাষা শিক্ষা ও পড়িবার উপায় সম্বন্ধে কিছুই লিখিয়া যান নাই। মিশরীয় লিপিকে গ্রীকগণ যে নামে অভিহিত করিত—তাহা হইতে বোধ হয় গ্রীকগণ উক্ত লিপিকে ধর্ম্মের গুহ্যতত্ত্ব প্রকাশক সাঙ্কেতিক চিহ্ন বলিয়া মনে করিত। (Hieroglyphics—hieros sacred, glyphein—to carve) কিন্তু মিশ,-রীয়গণের দৈনিক ব্যাপারেও যে ঐ একই লিপি ব্যবহৃত হইত তাহা পরে জানা গিয়াছে।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে মিশর রোমক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই প্রাচীন মিশরীয় ভাষা বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছিল। মিশরের পূর্ণ অভ্যুদয়ের সময়ও কতিপয় সুধীগণ ভিন্ন অন্য কেহই প্রাচীন মিশরীয় ভাষায় কথা বলিতে বা লিখিতে পারিত না। প্রাচীন ভাষা ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া এক স্বতন্ত্রভাষায় পরিণত হইয়া পড়িয়াছিল। মিশর রোমীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইবার পরে প্রাচীন ভাষা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যায়। তখন প্রাচীন ভাষা লিখিতে ও পড়িতে পারে এমন লোকের সম্পূর্ণ অভাব হইয়া পড়ে।

নেপোলিয়ান বোনাপার্টির মিশরাভিযানের সহিত কয়েকজন বৈজ্ঞানিক মিশরে গিয়াছিলেন। মিশরে উপনীত হইয়াই তাঁহারা মিশরীয় প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত হন, এবং মিশরের পুরাবস্তু সমূহ ফ্রান্সে অপসারিত করিতে প্রয়াসী হন। ইংরেজের প্রতিবন্ধকতায় ইহাতে তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ইংরেজগণ অনেক পুরাবস্তু স্বদেশে লইয়া যান। রসেটাপ্রস্তর তাহাদিগের অন্যতম। ১৭৯৮ খৃঃ অব্দে নীলনদের মোহানায় রসেটা নগরের সান্নিধ্যে সেণ্ট জুলিয়ান দুর্গের ভগ্নাবশেষের মধ্যে ফরাসীগণ রসেটা প্রস্তরখানা প্রাপ্ত হন। আলেকজান্দ্রিয়ায় সন্ধির পরে প্রস্তরখানি ইংরেজদিগকে অর্পিত হয়। ইংরেজগণ বৃটিশ মিউজিয়মে ইহাকে রক্ষা করেন।

রসেটা প্রস্তরের উপর ত্রিবিধ লিপি খোদিত আছে। প্রথমে মিশরীয় চিত্র লিপি, তৎপরে রেখা, কোণ্ ও চিত্রার্দ্ধসম্বলিত এক প্রকার লিপি। ইহা দেখিয়া একরূপ সংক্ষিপ্ত লিপি বলিয়াই ধারণা হয়! ইহাকে প্রাকৃত লিপি (Enchorial or demolic) বলে। সর্ব্ব নিম্নে গ্রীক লিপি। একত্র সমাবেশিত ত্রিবিধ লিপি দেখিয়া প্রথমেই মনে হয় একই কথা ভিন্ন ভিন্ন লিপিতে লিখিত হইয়াছে। বাস্তবিকও পণ্ডিতগণ আবিষ্কার করিয়াছেন যে, একই কথা তিন লিপিতে খোদিত আছে! ১৯৫ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে মেম্‌ফিস্ নগরের যাজকগণ মিশরের গ্রীক রাজা পঞ্চম টলেমি, এপিফেনস্‌কে দেব-সম্মান প্রদান করেন,—প্রস্তর লিপি তাহারই নিদর্শন।

বৃটিশ মিউজিয়মের কর্ত্তৃপক্ষগণ রসেটা

প্রস্তর দেখিয়াই তাহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন, এবং সমগ্র প্রস্তরীয় লিথোগ্রাফ চিত্র প্রকাশিত করেন। ইউরোপের যাবতীয় দেশের পণ্ডিতগণ দ্বাদশ বৎসর যাবৎ চেষ্টা করিয়াও প্রস্তর খোদিত মিশরীয় লিপিদ্বয় পড়িতে সক্ষম হন নাই। অবশেষে ইংরেজ টমাস্ ইয়ং ও ফরাসী চ্যাম্পোলিন কর্ত্তৃক এই সমস্যার সমাধান হয়।

রসেটা প্রস্তরের পাঠোদ্ধারে কৃতসংকল্প হইয়া ইয়ং বর্ত্তমান মিশরীয় ভাষা কপ্ত শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। প্রচুর অধ্যবসায় সহকারে এক বৎসরের মধ্যে তিনি কপ্ত ভাষা আয়ত্ত করিয়া ফেলেন, এবং তাঁহার দৃঢ় ধারণা হয়—প্রাচীন মিশরীয় ভাষার সহিত কপ্ত ভাষার সাদৃশ্য আছে। প্রস্তরে খোদিত লিপি বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সর্ব্বনিম্নস্থ গ্রীক ভাষায় খোদিত বাক্যাবলীর অর্থ তিনি উপরিস্থ লিপিদ্বয় হইতে আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করেন এবং অবশেষে নিম্নলিখিত বিষয় আবিষ্কার করেন।

(১) চিত্রলিপির অনেক চিত্রদ্বারা চিত্রসূচিত পদার্থ সূচিত হইয়াছে। মানুষের চিত্রদ্বারা মানুষ, সিংহের চিত্রদ্বারা সিংহ ('শব্দ' নহে শব্দসূচিত পদার্থ) সূচিত হইয়াছে।

(২) অনেক চিত্রদ্বারা তৎসূচিত পদার্থ সূচিত না হইয়া পদার্থান্তর সূচিত হইয়াছে। শব্দসূচিত পদার্থের সহিত পদার্থান্তরের সম্বন্ধই এই ব্যাখ্যার কারণ।

(৩) পুনরুক্তিদ্বারা বহুবচন সূচিত হইয়াছে।

(৪) রেখাদ্বারা সংখ্যা সূচিত হইয়াছে।

(৫) দক্ষিণ অথবা বাম উভয় দিক হইতেই চিত্রলিপি পড়া যায়। কিন্তু যেদিকে জন্তুগুলির মুখ থাকে—সেই দিক হইতে পড়িতে হয়।

(৬) লোক অথবা পদার্থটি (proper nouns) শেষের নামসূচক চিত্রগুলি এক-প্রকার ডিম্বাকার রেখাদ্বারা বেষ্টিত থাকে। ইয়ং এই ডিম্বাকার রেখাকে কার্ত্তুস্ (cortoushe) আখ্যা দিয়াছেন।

(৭) রসেটাপ্রস্তরস্থ কার্ত্তুস্‌গুলির মধ্যে "টলেমির" নাম লিখিত আছে।

(৮) কার্ত্তুসের পরে কোনও স্ত্রীলোকের চিত্র থাকিলে তদ্দারা কার্ত্তুস্‌মধ্যস্থ নামের স্ত্রীত্ব সূচিত হয়।

(৯) কার্ত্তুস্‌মধ্যস্থ চিত্রগুলি শাব্দিক চিহ্নস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে (phonetic symbol)। কোথাও তাহারা মৌলিক ধ্বনির চিহ্নস্বরূপ (alphabetical), কোথাও কতিপয় সমবায়ে গঠিত শব্দাংশের চিহ্নস্বরূপে syllebic রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

(১০) একাধিক চিত্রদ্বারা একই ধ্বনি সূচিত হইতে পারে।

চতুর্দ্দশটী ধ্বনিসূচক চিত্রের নির্দ্দেশ ইয়ং করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ছয়টী মাত্র পরবর্ত্তী পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়াছেন। ইয়ং শুধু কার্ত্তুসের মধ্যেই বর্ণমালার ব্যবহার স্বীকার করিয়াছিলেন। বস্তু অথবা ব্যক্তি বিশেষের নাম ভিন্ন অন্যত্রও যে মিশরীয় ভাষায় বর্ণমালার ব্যবহার হইত—ইয়ং তাহা বুঝিতে পারেন নাই। ফরাসী চ্যাম্পোলিন এই তথ্য অবাধে স্বীকার করেন।

রসেটাপ্রস্তর ও অন্যান্য অনেক মিশরীয়

লিখন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া চ্যাম্পোলিন বুঝিতে পারেন মিশরীয়গণ একপ্রকার বর্ণমালা ব্যবহার করিত। তিনি মিশরীয় ভাষার সম্পূর্ণ বর্ণমালার আবিষ্কার করেন। তন্মধ্যে স্বরবর্ণের সংখ্যা অতি কম।

কিন্তু চ্যাম্পোলিনের মতও সুধীগণ কর্ত্তৃক পরিবর্ত্তিত আকারে গৃহীত হইয়াছে। মিশরীয় ভাষার চিত্র দ্বারা শুধু বর্ণই যে সূচিত হইত তাহা নহে। অনেক চিত্র দ্বারা পূর্ণ শব্দ ও অনেকগুলি দ্বারা শব্দাংশও সূচিত হইত। আবার অনেক চিত্র দ্বারা শব্দ সূচিত না হইয়া শব্দ নির্দ্দিষ্ট পদার্থই সূচিত হইত।

চ্যাম্পোলিনের পরে তৎশিষ্য রসেলিনি ও অন্যান্য অনেক পণ্ডিত তৎপ্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করিয়া বিস্তর মিশরীয় পুরাবস্তু আবিষ্কার করতঃ মিশরের ইতিহাস গঠন করিয়াছেন। এই সমস্ত পণ্ডিতের গবেষণার ফলে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে—মিশরীয়গণের মধ্যে প্রথমে চিত্রলিপিই প্রচলিত ছিল বর্ণমালার ব্যবহার প্রথমে হয় নাই। এবং বর্ণমালার ব্যবহার প্রচলিত হইবার পরেও চিত্রগুলি পরিত্যক্ত হয় নাই। বর্ণমালার অলঙ্কারের পূর্ব্বে প্রথমে চিত্র দ্বারা পদার্থ সূচিত হইত। প্রতি পদার্থ বুঝাইতে এক একটি চিত্র ব্যবহৃত হইত। তৎপরে চিত্র দ্বারা পদার্থ সূচিত না হইয়া তৎকালে শব্দ সূচিত হইত। একাধিক অর্থে প্রযুক্ত হইলেও একই চিত্র দ্বারা শব্দ বিশেষ সূচিত হইত। একাধিক শব্দাংশের (Syllable) সমবায়ে শব্দ ও একাধিক মৌলিক ধ্বনির সমবায়ে শব্দাংশ গঠিত। প্রথমতঃ শব্দাংশের জন্য চিত্র ব্যবহার করিয়া অবশেষে মৌলিক ধ্বনির জন্য স্বতন্ত্র চিত্রের ব্যবহার পর্য্যন্ত মিশরীয়গণ শিখিয়াছিল। প্রতি মৌলিক ধ্বনির জন্য স্বতন্ত্র চিত্র ব্যবহার করা ও বর্ণমালার ব্যবহার একই কথা। প্রথমে যে চিত্রগুলি মৌলিক ধ্বনি প্রকাশ করিতে ব্যবহৃত হইত—কালে সরলীকৃত হইয়া তাহারাই অক্ষরে পরিণত হইয়াছে। এই অক্ষরমালার ব্যবহার শিখিয়াও মিশরীয়গণ চিত্র ব্যবহার ত্যাগ করে নাই। কোনও শব্দ বর্ণ সাহায্যে বানান করিয়া তৎপরে তৎসূচক চিত্রও তাহারা ব্যবহার করিত। ফিনিসীয়গণ মিশরীয়গণের সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের অবলম্বিত লিপিপ্রণালী অবলম্বন করে। কিন্তু তাহারা মিশরীয় লিপির অনাবশ্যক চিত্রগুলি ত্যাগ করিয়া শুধু অক্ষরগুলি গ্রহণ করতঃ লিপিবিদ্যাকে অনেক সরল করিয়া দেয়। ফিনিসীয়গণের নিকট হইতেই যাবতীয় ইয়োরোপীয়গণ আপনাদের অক্ষরমালা প্রাপ্ত হইয়াছে।

শ্রীতারকচন্দ্র রায়।

জোনাকি ও আঁধার।

জোনাকি কহিল হাসি—শোন গো আঁধার,
আমার প্রকাশে বাড়ে সৌন্দর্য্য তোমার!
আঁধার কহিল—নাহি কর অহঙ্কার,
তোমার প্রকাশ হয় উদয়ে আমার!

দীপ ও রজনী।

দীপ কহে—হে রজনী আলোকে আমার,
ধরা মাঝে হয় সদা প্রকাশ তোমার!
রজনী কহিল হাসি—মোর অবসানে,
হে দীপ, তোমার কথা কেহ নাহি জানে!

শ্রীপ্রফুল্লশঙ্কর গুহ।

চয়ন।

হিউয়েনসাং প্রণীত সিউ-ইউ-কি।

রাজ-পরিবার, সৈন্যাদি ও অস্ত্রশস্ত্র।

ক্ষত্রিয়গণই রাজপদে অভিষিক্ত হন। ইঁহারা সময় সময় বলপ্রয়োগে ও রক্তপাতে রাজসিংহাসন অধিকার করিয়াছেন। ইঁহাদিগকেও বিশেষ সম্মানের চক্ষে দেখা হয়।

জনমণ্ডলীর মধ্যে যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী তাহাদিগকেই বিশিষ্ট সৈন্য শ্রেণীভুক্ত করা হয়। যেহেতু পুত্র পিতার ব্যবসায় অবলম্বন করে, সেই জন্য ইহারা শীঘ্রই যুদ্ধবিদ্যার পারদর্শী হয়। শান্তির সময় ইহারা রাজ-প্রাসাদের চতুর্দ্দিকস্থ শিবিরে বাস করে কিন্তু যখন যুদ্ধ উপস্থিত হয় তখন ইহারা সকলের অগ্রবর্ত্তী হয়। সৈন্যগণ চারিশ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম, পদাতিক, দ্বিতীয় অশ্বারোহী, তৃতীয়, রথী এবং চতুর্থ গজারোহী। হস্তীগণকে সুদৃঢ় বর্ম্মে আবৃত করা হয় এবং তাহাদের দন্তেও তীক্ষ্ণ কণ্টক থাকে। সেনাপতি রথে উপবিষ্ট থাকিয়া আদেশ প্রদান করেন এবং তাঁহার দক্ষিণে ও বামে দুই জন করিয়া চালক রথ চালনা করে। এই সকল রথ চতুরশ্বযোজিত। সৈন্যাধ্যক্ষ রথেই থাকেন; এবং চতুর্দ্দিকে সৈন্যগণ তাঁহার রথচক্রের নিকটে থাকে।

অশ্বারোহী সৈন্য আক্রমণ প্রতিরোধ জন্য সর্ব্বাগ্রে থাকে এবং পরাজয় হইলে সংবাদ বহনের জন্য ইতস্ততঃ গমন করে। পদাতিকগণ ক্ষিপ্রকারিতার জন্য প্রতিরোধে নিযুক্ত থাকে। সাহস ও শারীরিক বলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ইহাদের নির্ব্বাচন হয়। ইহারা দীর্ঘ বর্শা ও প্রশস্ত ঢাল বহন করে। কখন কখন ইহারা তরবারীও ব্যবহার করে এবং প্রচণ্ড বেগে অগ্রসর হয়। ইহাদের যুদ্ধোপযোগী সকল অস্ত্রই তীক্ষ্ণধার ও সূক্ষ্মাগ্র। বর্শা, ঢাল, তীর, ধনুক, তরবারী, কুঠার, টাঙ্গী, এবং নানা প্রকার ফিঙ্গা যন্ত্র ইহারা ব্যবহার করে। এই সকল অস্ত্রাদি ইহারা বহুকাল হইতে ব্যবহার করিয়া আসিতেছে।

রীতিনীতি, বিচার, পরীক্ষা প্রভৃতি।

সাধারণ ভারতবাসীগণ যদিও লঘুচিত্ত, তত্রাপি তাহারা সৎ ও অপকার্য্যবিমুখ। অর্থাদি বিষয়ে তঞ্চকতা জানেনা এবং বিচার কার্য্যে ইহারা সতর্ক। পরকালের শাস্তির জন্য ইহারা বিশেষ ভীত কিন্তু বর্ত্তমানের বিষয় ইহারা বিশেষ চিন্তা করে না। ব্যবহারে ইহারা প্রতারণা বা বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় লয় না এবং প্রতিজ্ঞাপালনে বিশেষ তৎপর। রাজ্য-শাসন সংক্রান্ত নিয়মাবলী সাধুতাপরিপূর্ণ এবং ইহাদের ব্যবহার অত্যন্ত সরল ও মধুর। দেশে অপরাধীর সংখ্যা অত্যন্ত কম এবং অতি অল্প সময়ই ইহারা উপদ্রব করে। যখন কেহ আইন-বিরুদ্ধ আচরণ করে, তখন সেই বিষয় সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্মরূপে অনুসন্ধান করা হয়। শারীরিক কোন প্রকার শাস্তি প্রয়োগ করা হয় না। শীলতা অথবা ন্যায়ের বিধিলঙ্ঘন, দাম্পত্য-সম্বন্ধ ভঙ্গ, বা পিতৃমাতৃভক্তিতে ঔদাসীন্য দেখিলে সেই ব্যক্তির নাসাকর্ণ ছেদন অথবা হস্তপদাদি কর্ত্তন করিয়া অথবা দেশ হইতে বিতাড়িত বা মরুভূমিতে তাড়িত করিয়া শাস্তি দেওয়া হয়। অন্যান্য দোষে, সামান্য অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। অপরাধী ব্যক্তির দোষানুসন্ধানের জন্য কোনরূপ বেত্র বা দণ্ড ব্যবহৃত হয় না। অপরাধীকে জিজ্ঞাসা করিলে সে যদি নিজ দোষ স্বীকার করে তবে তাহাকে লঘুশাস্তি দেওয়া হয়। কিন্তু যদি অপরাধী নিজ দোষ স্বীকার না করে অথবা অপরাধ করিয়া থাকিলেও দোষক্ষালনের চেষ্টা করে, তাহা হইলে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অনুসন্ধান করিয়া নিম্ন লিখিত কোন প্রকারে শাস্তি প্রয়োগ করা—যথা (১) জল, (২) অগ্নি (৩) পরিমাণ প্রয়োগ অথবা (৪) বিষ।

প্রথমোক্ত বিধিতে অপরাধীকে থলিয়ায় করিয়া প্রস্তর পাত্রসহ গভীর জলে নিক্ষেপ করা হয়। যদি ঐ ব্যক্তি জলমগ্ন হয় ও প্রস্তর পাত্র

ভাসিয়া ওঠে তাহা হইলে সে অপরাধী বলিয়া পরিগণিত হয়। কিন্তু যদি প্রস্তর জলমগ্ন হয় ও ঐ ব্যক্তি ভাসিয়া ওঠে তাহা হইলে সে নির্দ্দোষ বলিয়া গণ্য হয়।

দ্বিতীয়তঃ—ভারতবাসীরা লৌহপাত্র উত্তপ্ত করিয়া অপরাধীকে তাহার উপর উপবেশন করায়। এবং ঐ উষ্ণ লৌহপাত্র অপরাধীকে ক্রমান্বয়ে হস্ত, পদ ও জিহ্বাদ্বারা স্পর্শ করিতে হয়। যদি ইহাতে কোন ক্ষত না হয় তবে সে নির্দ্দোষ এবং ক্ষত হইলে দোষী বলিয়া গণ্য হয়। কোন দুর্ব্বল ভীরু ব্যক্তি এইরূপ পরীক্ষায় অসম্মত হইলে, তাহাকে একটি ফুলের কলিকা অগ্নির দিকে নিক্ষেপ করিতে হয়। যদি কলিকাটি প্রস্ফুটিত হয় তবে সে ব্যক্তি নির্দ্দোষ এবং পুষ্পটী দগ্ধ হইলে অপরাধী বলিয়া গণ্য হয়।

তৃতীয় দণ্ডের নিয়ম, অপরাধীর সমপরিমাণ প্রস্তর একত্র তৌল করা হয়। যদি তৌলকালীন অপরাধীর ওজন প্রস্তরাপেক্ষা কম হয় তবে তাহাকে নির্দ্দোষ বলা হয়। আর যদি সে প্রকৃত অপরাধী হয় তবে, প্রস্তরের ভারই বেশী হয়।

চতুর্থ দণ্ডের নিয়ম ; একটী মেষের দক্ষিণ উরুতে ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে সকল প্রকার বিষ ও অপরাধীর আহার্য্যের কিয়দংশ দেওয়া হয়। যদি ঐ ব্যক্তি প্রকৃত অপরাধী হয় তবে মেষটী মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং নিরপরাধ হইলে বিষে কোন ক্ষতি করিতে পারে না।

উপরোক্ত চারিটী উপায়েই দুষ্কার্য্যের পথ রোধ করা হইয়া থাকে।

সম্মান প্রদর্শনের নিয়ম।

নিম্ন লিখিত নয় প্রকারে সম্মান প্রদর্শন করা হইয়া থাকে।—(১) অনুরোধ কালীন মিষ্ট সম্ভাষণ করিয়া (২) সম্মান প্রদর্শনের জন্য মস্তক অবনত করিয়া (৩) হস্তোত্তোলন করিয়া এবং নত হইয়া (৪) হাত জোড় করিয়া এবং নত হইয়া (৫) জানু নীচু করিয়া (৬) সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া—(৭) জানু ও হস্তের উপর ভর দিয়া (৮) পঞ্চচক্রে মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া এবং (৯) পঞ্চাঙ্গে প্রণত হইয়া এবং মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া।

এই কয় প্রকারের মধ্যে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত এবং পরে জানু পাতিয়া সম্বোধিত ব্যক্তির গুণকীর্ত্তনই হইতেছে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মাননীয় ব্যক্তি দূরে থাকিলে অবনত হইয়া প্রণাম করাই বিধেয়। নিকটে থাকিলে পদ চুম্বন এবং সম্বোধিত ব্যক্তির গুল্ফ স্পর্শ করাই উচিত।

উচ্চ পদস্থ ব্যক্তির আদেশ গ্রহণের সময়, পরিধেয় প্রান্ত ভাগ উত্তোলন করিয়া ভূমিতে প্রণত হইতে হয়। উচ্চ পদস্থ বা সম্মানীয় ব্যক্তি—যাঁহাকে উপরোক্ত রূপে সম্মান প্রদর্শন করা হয়—তিনি মস্তক স্পর্শন বা পৃষ্ঠে হস্তার্পণ করিয়া মিষ্ট বাক্যে উপদেশ দান অথবা স্নেহ প্রদর্শন করেন।

যখন কোন শ্রমণকে—যিনি ধর্ম্ম চর্চ্চায় নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন—এইরূপ অভিবাদন করা হয়, তখন তিনি প্রত্যুত্তরে শুভ কামনা করেন।

ভারতবর্ষে প্রণামই একমাত্র সম্মান উপায় নহে। তাহারা নানা প্রকারে প্রদক্ষিণ করিয়াও সম্মান প্রদর্শন করে।

ঔষধ, সৎকার প্রভৃতি।

কাহারও কোন রূপ ব্যাধি হইলে তিনি সাত দিবস উপবাসী থাকেন। অনেকে এই উপবাসকালীনই আরোগ্য লাভ করেন কিন্তু ইহাতে আরোগ্যলাভ না করিলে তখন ঔষধ সেবন করেন। এই সকল ঔষধের ফল ও নাম বিভিন্ন। চিকিৎসকগণ রোগ পরীক্ষা এবং চিকিৎসা সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী।

যখন কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয়, যাহারা সৎকার করে, তাহারা বিশেষরূপে শোক প্রকাশ করে এবং সকলে একত্র হইয়া ক্রন্দন করে। তাহারা তাহাদের বস্ত্রাদি ছিন্ন ভিন্ন, এবং কেশবন্ধন উন্মুক্ত করিয়া মস্তকে ও বক্ষে আঘাত করিতে থাকে। অশৌচকালীন কিরূপ পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে হইবে এবং কতদিন অশৌচ পালন করিতে হইবে তাহার কিছুই স্থিরতা নাই।

মৃতদেহ সৎকার করিবার তিনটী প্রণালী আছে। প্রথম দাহ, চিতা সজ্জিত করিয়া কাষ্ঠ দ্বারা দাহ করা হয়। দ্বিতীয়, গভীর জলে মৃতদেহ নিক্ষেপ; এবং তৃতীয় পশুপক্ষীর আহারের জন্য মৃতদেহ নির্জ্জন স্থানে বিসর্জ্জন।

রাজার মৃত্যু হইলে, প্রথমতঃ তাঁহার উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত হয়। কেননা উত্তরাধিকারীকেই রাজার সৎকার কার্য্য সম্পাদন করিতে হয় এবং প্রজাগণকে তাঁহার প্রাধান্ত স্বীকার করিতে হয়। রাজার গুণানুসারে তাঁহার জীবদ্দশাতেই তাঁহাকে উপাধি ভূষিত করা হয়। মৃত্যুর পরে আর কোন প্রকার উপাধি দেওয়ার রীতি নাই।

যে বাড়ীতে মৃত্যু হয়, তথায় যতক্ষণ মৃতের সৎকার না হয় ততক্ষণ আহারাদি স্থগিত থাকে। সৎকারের পর পূর্ব্ববৎ আহারাদি ও ক্রিয়া কলাপ হয়। মৃতের জন্ম কোন প্রকার বাৎসরিক অনুষ্ঠানের রীতি নাই। যাহারা সৎকারে ব্যাপৃত থাকে তাহারা নিজেদের অপবিত্র বিবেচনা করে। তাহারা নগরের বহির্ভাগে স্নান করিয়া পরে গৃহ প্রবেশ করে।

বৃদ্ধ ও স্থবির অথবা যাহারা গুরুতর ব্যাধি গ্রস্ত তাহারা যদি মৃত্যুমুখে পতিত হইতে বাসনা করে, অথবা যদি কেহ সংসারের ভোগাদি হইতে মুক্তির বাসনা করে, তবে তাহাদের আত্মীয় ও বন্ধুগণ তাহাদিগকে নিমন্ত্রণাদি করিয়া বাদ্যসহকারে নৌকায় উঠাইয়া দিয়া নৌকা গঙ্গার মধ্যস্থলে আনয়ন করিলে, এই সকল ব্যক্তি গঙ্গাগর্ভে নিমগ্ন হয়। এই ভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলে উঁহারা দেবলোকে জন্মগ্রহণ করিবে—এইরূপ ইঁহাদের বিশ্বাস।

পুরোহিতগণ মৃত ব্যক্তির জন্ম শোক প্রকাশ বা ক্রন্দন করিতে পারে না। যখন কোন পুরোহিতের মাতার বা পিতার মৃত্যু হয়, তখন তাহারা মন্ত্র পাঠ করে এবং অতীতের বিষয় স্মরণ করিয়া সৎকারে প্রবৃত্ত হয়। ইঁহাদের বিশ্বাস যে এইরূপ করিলে ইঁহাদের ধর্ম্মভাব বৃদ্ধি পায়।

রাজনীতি, রাজকর প্রভৃতি।

ভারতবর্ষের রাজনীতি মঙ্গলজনক বিধির সহিত জড়িত বলিয়া, শাসনকার্য্য অত্যন্ত সহজ। অধিবাসীদিগের নামধাম লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার প্রথা নাই এবং তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক সৈন্য শ্রেণীভুক্ত করিবারও নিয়ম নাই। রাজাদিগের নিজ ভূম্যধিকার আয় প্রধানত চারি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশ রাজকীয় কার্য্য এবং পূজা হোমাদিতে,—দ্বিতীয়াংশ মন্ত্রী ও রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীবর্গের বেতনাদিতে,—তৃতীয়াংশ রাজ্যের লব্ধ প্রতিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের পুরস্কারার্থে, এবং চতুর্থাংশ ধর্ম্মসভা প্রভৃতিতে ব্যয় হইয়া সুবৃত্তি সকলের অনুশীলনে উৎসাহ প্রদান করা হইয়া থাকে। এই প্রকারে প্রজার রাজকরের পরিমাণ অল্প এবং তাহাদের ব্যক্তিগত যে পরিশ্রম করিতে হয় তাহাও পরিমিত। প্রত্যেকেই নিজ নিজ দ্রব্যাদি শান্তিতে রক্ষা করিতে পারে এবং জীবিকার জন্য স্ব স্ব ভূমি কর্ষণ করে। যাহারা রাজকীয় ভূমি কর্ষণ করে, তাহাদিগকে উৎপন্ন দ্রব্যের ষষ্ঠাংশ রাজকর রূপে দিতে হয়। বণিকগণ ইচ্ছামত যাতায়াত করিতে পারেন। সামান্য কর প্রদত্ত হইলেই জলপথ ও স্থলপথ উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। পূর্ত্তকার্য্যের জন্য আবশ্যক হইলে প্রজাদের কাজ করিতে হয় বটে কিন্তু তজ্জন্য তাহারা বেতন পায়। কার্য্যের অনুপাতানুযায়ী বেতন দেওয়া হয়।

সৈনিকগণ সীমান্ত প্রদেশ রক্ষা করে অথবা অবাধ্যদিগকে শাস্তি দিতে বহির্গত হয়। সৈন্যগণ, শাসনকর্ত্তাগণ, মন্ত্রীগণ, নগরপাল এবং কর্ম্মচারীগণ নিজ নিজ ভরণপোষণের জন্য নির্দ্ধারিত ভূমি লাভ করেন।

তরুলতা, কৃষি, আহার্য্য, পানীয় এবং পাক ক্রিয়া।

ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের জলবায়ু বলিয়া, ভূমির উৎপন্ন দ্রব্যও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের। পুষ্প, লতা, ফল, বৃক্ষ নানা প্রকারের এবং তাহাদের নামও বিভিন্ন। আমলা, সাধুক, ভাব্র, কপিথ, তিন্দুক, মোচা, নারিকেল, এবং পানস ফল প্রায় সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। এদেশের সকল প্রকার ফলের নামকরণ

অসম্ভব। খর্জ্জুর, বাদাম, এদেশে পাওয়া যায় না। আঙ্গুর, পীচ প্রভৃতি ফল কাশ্মীর হইতে আনীত। দাড়িম্ব ও মিষ্ট কমলা সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়।

উপযুক্ত সময়ে কর্ষণ, বপন, কর্ত্তন হয়। কার্য্য শেষে কৃষকেরা কিছুকাল বিশ্রাম করে। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে চাউলই প্রধান। আদা, শরিষা, তরমুজ, লাউ, কদু, যথেষ্ট পাওয়া যায়। পেঁয়াজ ও রসুন বেশী পাওয়া যায় না। যদি কেহ পেঁয়াজ বা রসুন ব্যবহার করে তাহা হইলে তাহাকে নগরের বহির্ভাগে নির্ব্বাসন করা হয়। দুগ্ধ, মাখন, সর, চিনি, গুড়, শর্ষপতৈল, এবং পিষ্টকই সর্ব্বজন খাদ্য। মৎস্য ও মেষ মাংসও সচরাচরই লোকে খায়। কখন কখন নোনা মৎস্যমাংসও ব্যবহৃত হয়। গো, গর্দ্দভ, হস্তী, অশ্ব, শূকর, কুক্কুর, শৃগাল, নেকড়ে সিংহ, বানর এবং লোমশ পশুর মাংস নিষিদ্ধ। যাহারা এই সকল পশুমাংস ভক্ষণ করে, তাহাদিগকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখা হয় এবং সকলেই তাহাদের নিন্দা করে। ইহারা নগরের বহির্ভাগে বাস করে এবং কদাচিৎ ভদ্র মনুষ্যের সহিত মিলিত হয়।

নানা প্রকার মদ্য আছে। ক্ষত্রিয়গণ আঙ্গুর ও ইক্ষু নির্ম্মিত সুরা পান করে। বৈশ্যগণ তেজস্কর মদ্য পান করে। শ্রমণ ব্রাহ্মণগণ আঙ্গুর অথবা ইক্ষু সরবৎ পান করে। এই সরবৎ তীক্ষ্ণতেজ নহে। বর্ণসঙ্কর ও নীচ জাতিগণ অন্যান্য জাতি অপেক্ষা আচার ব্যবহারে বিভিন্ন নহে। কেবলমাত্র ইহারা যে পাত্র ব্যবহার করে তাহা অনুরূপ। ইহাদের গৃহকার্য্যোপযোগী দ্রব্যাদির অভাব নাই। যদিও ইহাদের কড়াই ও হাঁড়ী আছে কিন্তু তত্রাপি ইহারা অন্নপাকের জন্য ধাতব দ্রব্যের ব্যবহার জানে না। নানা প্রকার মৃন্ময় পাত্রাদি ইহারা ব্যবহার করে। সকল প্রকার দ্রব্য একটী পাত্রে একত্র করিয়া অঙ্গুলি সংযোগে মাখিয়া আহার করে। ইহারা চামচ বা পেয়ালা ব্যবহার করে না। পীড়িত হইলে ইহারা তাম্রপাত্র ব্যবহার করে।

বাণিজ্যাদি—

স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, শ্বেত অশ্ব এবং মুক্তাই এই দেশের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। এতদ্ব্যতীত নানারূপ মূল্যবান রত্ন এবং নানা প্রকার প্রস্তরাদি এদেশে পাওয়া যায়। ইহারা অন্যান্য দ্রব্যের সহিত এইগুলি বিনিময় করে। ইহাদের স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রা নাই।

ভারতবর্ষ এবং নিকটবর্ত্তী প্রদেশ সমূহের সীমা উপরে বিস্তারিত রূপে বর্ণনা করা হইল। জলবায়ু ও ভূমির বিষয়ও বর্ণনা করা হইয়াছে। এইক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের বিবরণ প্রদত্ত হইবে। (ক্রমশঃ)

তৈমুর লঙ্গ।

প্রথম সম্রাট। (মানুশি হইতে)

যে বীরপুরুষ তাতার দেশের এক সামান্য গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া নিজ শক্তি ও প্রতিভার বলে ভারত হইতে পশ্চিমে ম্যাসিডোনিয়া পর্য্যন্ত আপন সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনের সম্পূর্ণ ইতিহাস বর্ণনা করিতে হইলে এক বৃহৎ পুস্তক রচনা করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। তৈমুর লেন বা তৈমুর লঙ্গ দুইটি তাতার কথার সংযোগে রচিত হইয়াছে। তৈমুর অর্থে লৌহ। চিরদিন লৌহ অস্ত্রে পরিবেষ্টিত ও কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত থাকিতেন বলিয়া তাঁহাকে তৈমুর বলা হইত। লঙ্গ অর্থে খঞ্জ। তৈমুরের জন্মাবধি একটি পা খোঁড়া ছিল। তাতার দেশের কাশ নগরে ইঁহার জন্ম হয়। মুসলমানদিগের ইতিহাসে এই সম্রাটের জন্ম সম্বন্ধে একটি অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অসাধারণ প্রতিভাশালীর জন্ম সম্বন্ধে এইরূপ কোন গল্প রচনা করা প্রাচ্যজাতির অভ্যাস।

শুনা যায় তৈমুরের মাতার নাকি বিবাহের পূর্ব্বেই সহসা পুত্রবতীর লক্ষণ প্রকাশ পায়। কুমারীর পিতা নিতান্তই ভীত হইয়া পড়িলেন; কন্যাকে নানাপ্রকার তিরস্কার করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া দুষ্টা কন্যাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া স্বীয় অপমানের প্রতিশোধ লইতে উদ্যত হইলেন। এরূপ সময়ে যুবতী পিতার পদতলে পড়িয়া তাহার অবস্থার আশ্চর্য্য কাহিনী প্রকাশ করিল। সে বলিল "তাহার গৃহের জানালায় একটি সামান্য ছিদ্র ছিল। সেই ছিদ্রের মধ্য দিয়া একটি ক্ষীণ সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করিয়া তাহাকে এরূপ ভাবে বেষ্টিত করিয়া ধরিল, যে মনে হইল যেন সে উজ্জ্বল আলোক-পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়াছে। পরে সেই রশ্মি তাহাকে আদর করিতে লাগিল। পরে কুমারী কাতরে কহিল, পিতা, আপনার আমার প্রতি ক্রোধ সঙ্গত সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার এ অবস্থার কারণ ইহা ভিন্ন আর কিছুই নহে।" পিতা সন্ধান লইয়া জানিলেন কন্যার কথাই সত্য। অবশেষে তাহার মনে বিশ্বাস জন্মিল যে, সকল তেজের আকর সূর্য্যের অনুগ্রহে যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহার গৌরব-কীর্ত্তিতে তাঁহার বংশের নাম অমর হইবে।

এই গল্পটি নিতান্ত গল্প হইলেও তৈমুরের পিতার নাম হইতেই এই গল্পের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার নাম ছিল টার্গে অর্থাৎ "আলোকের উৎপত্তি-স্থল।" হুসেন নামে এক নৃপতি সে সময়ে তুর্কিস্থান ও তাতারের একছত্র অধিপতি ছিলেন। এই হুসেনের রাজসভার মধ্যে টার্গে একজন অতি বিখ্যাত সম্রান্ত সভাসদ ছিলেন। "মোগল" এই কথাটার আদি অর্থে কোন দেশবিশেষকে বা সাম্রাজ্য বিশেষকে বুঝায় না। "মোগল" একটা পরিবার বিশেষের নাম মাত্র। এই পরিবার বহুদিন হইতে তাতার প্রদেশের দক্ষিণভাগে রাজত্ব করিত। এই পরিবার হইতেই তৈমুরের উৎপত্তি। ইঁহারই পূর্ব্ব-পুরুষ চেঙ্গিস খাঁ আসিয়ার প্রধানতম রণবীর বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। এই প্রসিদ্ধ মোগল বর্ত্তমান উত্তর তাতার প্রদেশকেই শাসন করিতেন। নিজ ভুজবলে তিনি চীনদেশ পর্য্যন্ত পদানত করিয়াছিলেন। তাঁহারই বংশধরগণ চীনে সম্রাটের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

হিজরা ৭৩৬ অব্দে অর্থাৎ ১৩৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তৈমুরের জন্ম হয়। এই সময়ে হুসেন নামে চেঙ্গিসের এক বংশধর দক্ষিণ তাতারে রাজত্ব করিতেন। মোগলদিগের রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিলেও, তৈমুর রাজসভা ও রাজধানী হইতে দূরেই শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন এবং দেশের প্রচলিত প্রথানুসারে তিনি বাল্যকালে তাঁহার পিতার মেষ পালন করিয়া বেড়াইতেন। সেই সময় হইতেই তাঁহার বাক্যে ব্যবহারে একটা অদম্য তেজের ভাব প্রকাশ পাইত। তাহা ছাড়া সেই অল্প বয়সেই তিনি চতুর্দ্দিকস্থ মেষপালক বালকগণের উপর যেরূপ প্রভুত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাহা দেখিলে তিনি যে প্রভুত্ব করিতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা বেশ বুঝা যাইত। পল্লীর বালকগণ সকলেই তাঁহাকে দলপতির ন্যায় সম্মান করিত এবং পরস্পরের মধ্যে বিবাদ হইলে তাঁহাকেই বিচারক বলিয়া মনোনীত করিত। মেষ চারণের স্থান লইয়া যখন বিবাদ ও দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইত, তাহারা বালক তৈমুরের নিকট বিচারপ্রার্থী হইয়া আসিত এবং তিনি যাহা বিচার করিয়া নিষ্পত্তি করিতেন তাহার বিরুদ্ধে আর কোন আপিল করা তাহারা আবশ্যক মনে করিত না। একবার এক উষ্ট্র দলভ্রষ্ট হইয়া বালকদের মেষ-চারণের স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। বালকেরা তাহাকে ধরিয়া রাখিবে কি ছাড়িয়া দিবে স্থির করিতে না পারিয়া, তাহাদের অভ্রান্ত বিচারক তৈমুরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। তৈমুর বিচার করিয়া বলিলেন—"এই উষ্ট্র যদি নিম্নভূমি হইতে তোমাদের নিকটে আসিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া স্বদলে যুক্ত হইতে দেওয়াই কর্ত্তব্য, আর যদি সে পার্ব্বত্য ভূমি হইতে নামিয়া আসিয়া থাকে তাহা হইলে পুনরায় স্বদলে মিলিত হওয়া সম্ভব নয় বরং বন্যজন্তুর দ্বারা হত হওয়াই সম্ভব, সুতরাং সেরূপ স্থলে উহাকে রাখিয়া দেওয়াই তোমাদের কর্ত্তব্য।" বালকগণ তাহাই

করিল, উষ্ট্রটিকে নিজেদের নিকটেই রাখিয়া দিল। এইরূপে বালকদের ক্রীড়ার মধ্যেই পৃথিবীর অভূত-পূর্ব্ব বিরাট সাম্রাজ্যের প্রথম ভিত্তি গঠিত হইতে আরম্ভ হইল। ক্রমে সেই মেষপালক বালকগণ বড় হইয়া উঠিতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে তৈমুরেরও তাহাদের উপর প্রভুত্ব ও প্রভাব বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

এই প্রভুত্বের অধিকার-বলে তিনি অনুচরদিগকে যেরূপ কঠোরভাবে শাসিত করিতেন, তাহাতে ক্রমে তাহারা তাঁহাকে অত্যন্ত ভীতির চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিল, তাঁহার প্রতিবাদ করিতে আর কেহই সাহসী হইত না। একদিন তৈমুর শুনিলেন এক নেকড়ে বাঘ একটি মেষকে লইয়া গিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ মেষপালককে তাহার অসাবধানতার জন্য সমুচিত দণ্ড দানের ব্যবস্থা করিলেন। কিছুদিন পরে তাঁহার এক প্রজা একটি গরু চুরি করিতে যাইয়া ধরা পড়ে। নবীন নৃপতি তৎক্ষণাৎ তাহাকে শূলদণ্ডে বধ করিবার আজ্ঞা দিলেন। এই বিচারের ফলে মেষপালকের অধিনায়ক তাঁহার শক্তির বল বুঝিলেন এবং সাম্রাজ্য বৃদ্ধির আকাঙ্খায় প্রণোদিত হইলেন। মৃত ব্যক্তির পিতা মাতা মনে করিলেন মেষপালকগণ বালক তৈমুরের হস্তে যে ক্ষমতা দান করিয়াছে তৈমুর এক্ষেত্রে তাহার অপব্যবহার করিয়াছে। এই বিশ্বাসে তাহারা বিচারক ও তাঁহার নৃশংস শাসনের পরামর্শদাতাগণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিল। শাস্তিটা যে অসঙ্গত হইয়াছিল তাহা তাহারা মনে করে নাই। কিন্তু যে ব্যক্তি শাস্তি দান করিয়াছিল তাহাকে শাসনকর্ত্তারূপে স্বীকার করিতে তাহারা প্রস্তুত নহে। সেই জন্য এই অন্যায় মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য দুই গ্রামের অধিবাসীরা অর্থাৎ দুই পরিবারের পরিজনবর্গ নিকটবর্ত্তী মেষচারণ-ক্ষেত্রে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল। তৈমুর তাঁহার অল্প বয়স্ক বীরগণকে লইয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন এবং এই দুই পরিবারকে পরাজিত করিয়া তাঁহার অনুচর-বর্গ প্রথম জয়গৌরব লাভ করিল। তৈমুরের সাহস ও দক্ষতার বিবরণ শুনিয়া দেশের শ্রেষ্ঠ সাহসী যুবকগণ দলে দলে আসিয়া তাঁহার সহিত যোগ দিল। ইহারা সকলেই তাঁহার প্রজা হইবার জন্য উৎসুক, এবং যথার্থ রাজার ন্যায় তৈমুরের আজ্ঞাপালন করিয়া ইহারা এক প্রকার গর্ব্ব ও আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল।

তৈমুরের যে সকল মেষপাল ছিল তাহাদের চারণোপযোগী যথেষ্ট ভূমি লাভ করিবার জন্য এবং এতগুলি অনুচর মেষপালকের অধিকার বৃদ্ধির জন্য, তাঁহার নূতন ভূমি জয় করা আবশ্যক হইয়া পড়িল। সুলতান্ মামুদই তাঁহাদের নিকটতম প্রতিবেশী ছিলেন। তাহারা তাঁহাকেই সর্ব্বপ্রথম আক্রমণ করা সঙ্গত বলিয়া স্থির করিল, এবং তাঁহার রাজ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া একেবারে রাজধানী অধিকার করিবার পরামর্শ করিল। এই রাজধানীতে সেই প্রদেশের যত অল্পবয়স্ক মেষপালকগণ যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিত।

যুদ্ধ ব্যাপারে অনভিজ্ঞ এই অল্পবয়স্ক মেষ-পালক-গণ তাহাদেরই ন্যায় অল্পবুদ্ধি ও অল্পবয়স্ক এক নায়কের নেতৃত্বে চালিত হইয়া রাজধানীর সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল। তৈমুরের সৈন্যগণ যে কোথায় ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল তাহার ঠিক নাই। অবশেষে তৈমুর অনুচর-বিহীন ভাবে একাকী পদব্রজে ভিক্ষা করিতে করিতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হইলেন। একদিন এক গ্রামের মধ্য দিয়া যাইবার সময়ে তিনি খাদ্য সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিলেন। এক বৃদ্ধা তাঁহাকে চিনিত। সে তাঁহাকে তাহার আপন কুটীরে লইয়া গেল এবং রাখালরাজকে এক সঙ্কীর্ণ রেকাবে করিয়া দুটি গরম ভাত দিল। ক্ষুধায় কাতর হইয়া তৈমুর রেকাবের মধ্যস্থল হইতে ভাত লইয়া তাড়াতাড়ি যেমন খাইতে গেলেন, অমনি তাঁহার মুখ পুড়িয়া গেল। বৃদ্ধা হাসিয়া বলিল, "প্রভু, এই ঘটনা হইতে শিক্ষা করুন যে ভবিষ্যতে আর কখনও মধ্যস্থল হইতে আরম্ভ করিবেন না, প্রান্তভাগ হইতে আরম্ভ করিবেন। প্রথমে সীমান্ত দেশ জয় না করিয়া ব্যস্ততা সহকারে দেশের মধ্যস্থলে

যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলে বিপদ ও ব্যর্থতা অনিবার্য্য।"

এই উপদেশ তৈমুর কখনও বিস্মৃত হন নাই। ভবিষ্যতে যাবতীয় যুদ্ধে তিনি সর্ব্বদাই এই নীতির অনুসরণ করিতেন। তাঁহার যাত্রার ব্যাঘাত করিতে পারে বা পলায়নে বাধা প্রদান করিতে বা জয়লাভকে ব্যর্থ করিতে পারে, এরূপ কারণ তিনি সেই অবধি কখনও পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিতেন না। যাহা হউক তাঁহার জীবনের এই প্রথম বাধায় তিনি ভগ্নোদ্যম হন নাই। তাঁহার বিচ্ছিন্ন অনুচরবর্গ বিভিন্ন পথ দিয়া পলায়ন করিয়া পুনরায় তাঁহার নিকট যাইয়া সমবেত হইল। তাহারা পূর্ব্বের ন্যায়ই তাঁহার অনুগত রহিল। কিন্তু এই দুর্ঘটনার পর হইতেই তৈমুর যেন কিছু অত্যধিক উদ্ধত ও কঠোর হইয়া পড়িলেন। ক্রমে তিনি নিকটবর্ত্তী ভূমিসমূহ অধিকার করিতে লাগিলেন। প্রতি স্থলেই জয় লাভ করিয়া রাখালরাজ তাঁহার পূর্ব্ব পরাজয়ের স্থানটির এত নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন যে তিনি সেই নগরটিকে পুনরায় অধিকার করিতে চেষ্টা করিবার সঙ্কল্প করিলেন। নগর অধিকৃত হইল এবং এই সংবাদে বহুদূর পর্য্যন্ত সকলে ভীত হইয়া পড়িল।

এই সকল রাখাল ও তাহাদের অধিনায়কের অদম্য সাহস দেখিয়া হুসেন ও তাঁহার সভাসদ্‌বর্গ ভীত হইয়া উঠিলেন। তাতার প্রদেশে তাঁহার রাজ্যমধ্যে তৈমুর একপ্রকার রাজশক্তি অধিকার করিয়া বসিয়া ছিলেন। হুসেন এই নবীন বিজেতার অগ্রসরের পথ বলপূর্ব্বক রোধ করা আবশ্যক স্থির করিলেন। মামুদের পরাজয়ে তৈমুরের শক্তি দেখিয়া বস্তুতঃ অনেকেই ঈর্ষা বোধ করিত। অমাত্যবর্গ হুসেনকে পরামর্শ দিল যে এরূপ যুদ্ধকর্ম্মে অনভিজ্ঞ মুষ্টিমেয় অর্ব্বাচীন ও অল্পবয়স্ক মেষ-পালককে পরাজিত করার জন্য অল্পসংখ্যক সুশিক্ষিত ও সুদক্ষ সৈন্যই যথেষ্ট। অস্ত্রের প্রভেদ হিসাবে এরূপ অসমান যুদ্ধ কখনও হইয়াছে কি না জানি না। রাজসৈনিকেরা উজ্জ্বল লৌহবর্ম্মে আচ্ছাদিত হইয়া ধনুর্ব্বাণ ও তরবারি লইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাতার দেশীয়গণ এ সময়ে বন্দুকের ব্যবহার জানিলেও তাহা যুদ্ধে ব্যবহার করা তখনও প্রচলিত হয় নাই। তৈমুরের লোকেরা কেবল শড়কি ও বর্শা লইয়া উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলেও তৈমুরের লোকেরা সকলেই যৌবনের অদম্য তেজে উদ্দীপ্ত,—তাহাদের দেহ ক্লান্তি জানে না, মন সঙ্কোচ জানে না। তাহা ছাড়া তাহাদের মনোনীত নায়কের আদর্শে ও জয়োল্লাসে তাহারা সকলেই উৎফুল্ল; যুদ্ধ ব্যাপারে তৈমুরের একপ্রকার ঐশী শক্তি ছিল। অনভিজ্ঞ হইলেও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির বলে তিনি সুদক্ষ বীরের ন্যায় সৈন্যচালনা করিতেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইল; মেষপালকগণের প্রবল ব্যূহ হুসেন কোনমতেই ভেদ করিতে পারিলেন না। তৈমুর স্বয়ং ব্যূহমুখে উপস্থিত থাকিয়া অসমসাহসে শত্রুসংহার করিতে লাগিলেন। অবশেষে তৈমুরই জয়ী হইলেন, হুসেন জীবন ও রাজমুকুট দুইই হারাইলেন।

(ক্রমশঃ)

যবদ্বীপে।

বৃহস্পতিবার।

একটি উৎকৃষ্ট টাটুঘোড়ার উপর চড়িয়া, প্রাতঃকাল পাঁচটার সময় ব্রমোর অভিমুখে যাত্রা করিলাম। আমার পথপ্রদর্শক—একটি যাবা-দেশীয় যুবক—মুখে একটি বেশ মধুর সরল ভাব। গায়ে একটা সাদা ছোটো জামা, এবং আ-জানু-লম্বিত একটা খাটো ছুচ্-কোর্ত্তা। জঙ্ঘা ও পদদ্বয় নগ্ন।

দুই ঘণ্টা ধরিয়া, শাক্‌সবজির ক্ষেতের উপর দিয়া, বনজঙ্গলের মধ্য দিয়া চলিলাম।

পরে, হঠাৎ একটা ক্ষুদ্র পাহাড়ের চূড়া হইতে, একটা বিরাট দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হইল। বালু-সমুদ্র। এই ধূসর বালু-সমুদ্র, একটা বিশাল পরিসর ভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। তাহার চারিদিকে, আগ্নেয় গিরির প্রাচীর। বোধ হয় ইহা আগ্নেয় গিরির একটা পুরাতন অগ্নি-গহ্বর। এই বিরাট গহ্বর হইতে ৪।৫টা প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড আগ্নেয় গিরি সমুত্থিত হইয়াছে :—বাটক্,—উদ্ভিজ্জে সমাচ্ছন্ন; তাহার পশ্চাতে ব্রমো; আরও দূরে, আর কতকগুলা আগ্নেয় গিরি; দক্ষিণে, Smeroc গিরি; তাহা হইতে ধূম নির্গত হইতেছে; দেখিলে মনে হয় যেন টুপির মাথায় পালোকের থোপ্না উঠিয়াছে...এই অনন্য-সাধারণ বিরাট-গম্ভীর দৃশ্য অনেকক্ষণ দেখিয়াও ক্লান্তি বোধ হয় না। আর-কি নিস্তব্ধতা! বাতাসের শব্দমাত্র নাই—একটি পাখীর ডানার শব্দও নাই: এই বিরাট-গম্ভীর দৃশ্য দেখিয়া মনোমধ্যে যে এক অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য-রস অনুভূত হয়, তাহা আর কিছুতেই বিক্ষিপ্ত হইবার নহে।...

পাহাড়ের পাদদেশে নামিয়া বালু-সমুদ্রে পৌঁছিলাম। নীচে হইতে দৃশ্যটা আর এক হিসাবে আরও জম্‌কালো।—নীচে হইতে আগ্নেয় গিরিগুলার প্রশস্ততা আরও বেশী উপলব্ধি করা যায়। উপর হইতে শুধু কল্পনা করা যায় মাত্র। আবার ঘোড়ায় চড়িয়া, বাটকের মধ্য দিয়া,—বায়ু সমুদ্রের চতুর্দ্দিকে, স্ফীতকায় উদ্ভিজ্জ-শ্যামল যে গিরি-প্রাচীর আছে—তাহার প্রায় চূড়াদেশে আরোহণ করিলাম। এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া আনন্দে এরূপ উন্মত্ত হইলাম যে সেই বালু-সমুদ্রের উপর দিয়া আমার টাটুকে খুব ছুটাইয়া ব্রমোর পাদদেশে আসিয়া পৌঁছিলাম। ব্রমোর পশ্চাতে, আগ্নেয় পদার্থসমূহের সূক্ষ্ম রেণুরাশি জলদ-জালের ন্যায় সমুত্থিত হইয়াছে। আমার পথপ্রদর্শক এত পিছনে পড়িয়া গিয়াছে যে, সে একটি বিন্দুর ন্যায় অদৃশ্যপ্রায়। তাহার এই ক্ষুদ্রতা হইতে, চতুর্দ্দিকস্থ পদার্থসমূহের বিশালতা আরও যেন বেশী উপলব্ধি করিতে পারিতেছি।

আমি ব্রমোর দুরারোহ ঢালুর উপর পদব্রজে উঠিলাম। একটা বন্ধুর সুঁড়ি-পথ, তার পর একপ্রকারের সোপান ধাপ—এই পথ ও ধাপের উপর দিয়া একেবারে চূড়ায় উঠিলাম।

এই শৈল-প্রাচীরের চূড়া হইতে, পাদদেশের গহ্বর দেখা যায়—এই আগ্নেয় গহ্বরটা অতীব বিশাল। শৈল-গাত্রে দ্রব-ধাতু গড়াইয়া পড়িতেছে; ফিকা হল্‌দে কিংবা ঘোর-সবুজ রঙ্গের গন্ধকের বড়-বড় পস্তর। অসংখ্য রন্ধ্রপথ দিয়া ধূমের ফোয়ারা নিঃসৃত হইয়া খুব উচ্চে উঠিয়াছে। একেবারে তলদেশে, জল টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতেছে; ঐ ফুটন্ত জল পর্য্যায়ক্রমে ধূসর, সাদা, কালো, সবুজ—এইরূপ বিচিত্র বর্ণ ধারণ করিতেছে। একটা বাষ্প উঠিতেছে—এই বাষ্প কখন কুয়াসার মত পাতলা কখন মেঘের মত ঘন... সমুদ্র গর্জ্জনের ন্যায় একটা গভীর শব্দ ক্রমাগত শুনা যাইতেছে—যেন সৈকত বেলার উপর তরঙ্গাঘাত হইতেছে। সময়ে-সময়ে এই মূল-ধ্বনির সহিত, সোঁ-সোঁ শব্দ, ঘোর গর্জ্জন, ও বজ্রনিনাদ মিশ্রিত হইতেছে...

এই নৈসর্গিক নাট্য, নাট্য-সঙ্গীত, নাট্য-

সজ্জা সমস্তই অতীব অদ্ভুত। আমি ভাবিতে লাগিলাম—আমার অন্তরাত্মা যদি ধর্ম্মপ্রবণ ও উপধর্ম্মভীরু হইত এবং মধ্যযুগের যোগীদিগের ন্যায় আমার প্রবল কল্পনা শক্তি থাকিত, তাহা হইলে এই আগ্নেয়গহ্বর দেখিয়া নিশ্চয়ই আমার আতঙ্ক উপস্থিত হইত; আমার মনে হইত, আমার পাদদেশে একটা নরকের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে—যে নরকে,—প্রেমময় ঈশ্বরের ইচ্ছায়, অসংখ্য পাপী অনন্তকাল ধরিয়া দগ্ধ হইতেছে!

কিন্তু আমি উনবিংশতি শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আধুনিক বিজ্ঞান, আমার অন্তরে শান্তিতর ভাবের অঙ্কুর, উচ্চতর চিন্তার অঙ্কুর স্থাপন করিয়াছে। বিজ্ঞান নিরাকুলভাবে এই সকল প্রাকৃতিক ব্যাপারের ব্যাখ্যা করিয়া থাকে; বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এই যে, পৃথিবীর গর্ভকেন্দ্রে একটা বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত রহিয়াছে।—বিজ্ঞানের এই আভাস ইঙ্গিতে, মানুষের কল্পনা ছুটিয়া চলিয়াছে। না জানি এই পৃথিবীর গর্ভস্থ উত্তাপ কতদূর হইতে আসিয়া, আমার নিকটবর্ত্তী এই জলরাশিকে ফুটাইয়া তুলিতেছে! কি প্রকাণ্ড আমাদের পৃথিবী! কি প্রকাণ্ড আমাদের সৌরজগৎ—যাহার নিকট আমাদের এই পৃথিবীও একটি ক্ষুদ্র বিন্দু মাত্র! আর, এই সমস্ত অসংখ্য তারা, এই সমস্ত গ্রহ, এই সমস্ত সূর্য্য লইয়া যে ব্রহ্মাণ্ড—এই ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড, কি অমেয়, কি অসীম!...এই যবদ্বীপের আগ্নেয়-গিরি আমার মনে অনন্তের ভাব জাগাইয়া তুলিয়াছে—তারা-সঙ্কুল নির্মেঘ আকাশ দর্শনে যেরূপ অনন্তের ভাব উদ্বোধিত হয়, ইহাও কতকটা সেইরূপ।

আমার এইরূপ মনোভাবের হেতু নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিতে করিতে, ব্রমোর শিখরে উঠিয়া, বিরাট্-রস (sublime) সম্বন্ধে ক্যাণ্টের (kant) সিদ্ধান্ত আমার মনে পড়িয়া গেল। ক্যাণ্টের মতে,—মানুষ যখন যুগপৎ আপনাকে ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট ক্ষুদ্র জীব ও জ্ঞান-নীতি সম্পন্ন উন্নত জীব বলিয়া মনে করে, তখনই মানুষের মনে বিরাট্-রসের আবির্ভাব হয়। ক্যাণ্ট যেভাবে বিরাটের অর্থ করেন, সেই অর্থে এই যবদ্বীপের আগ্নেয়-গিরি, বিরাট ভাবোদ্দীপক। এই সকল আগ্নেয়-গিরি আমাদের মনে অনন্তের ভাব উদ্বোধিত করে; পক্ষান্তরে ইহাও মনে করাইয়া দেয়, প্রকৃতি যতই বৃহৎ হোক্ না কেন, মানুষ প্রকৃতি অপেক্ষা বড়, প্রকৃতি অপেক্ষা বুদ্ধিমান, প্রকৃতি অপেক্ষা প্রীতিভাজন। বিজ্ঞানের দ্বারা মানুষ যখন বাস্তবকে বুঝিতে পারে, মানুষ যখন বিশ্ব-বাসী কতকগুলি জীবের দুঃখ হ্রাস ও সুখ বর্দ্ধন করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে, তখনই মানুষ আপনার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বন্দী।

৩০

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া আমি বসিয়াছিলাম—অতীতের সমস্ত কথা মনে পড়িতেছিল—স্বপ্নের মত বিচিত্রমধুর কৈশোরের কথাগুলি! দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তার এই ভীষণ কণ্টক, সে কথাগুলি তাহারি পার্শ্বে যেন সুন্দর, শুভ্র কুসুমের রাশি!

প্রফুল্ল মুখ, নিশ্চিন্ত হৃদয়, উল্লসিত প্রাণ—কি সে মধুর দিন! উদ্যানের মাঝে ছুটাছুটি খেলা, সঙ্গীদের প্রাণভরা ভালবাসা, সে কি সুখ! তার পর কৈশোরের স্বপ্নরাজ্যে নূতন আলোকের উন্মেষ! নিরালা কাননে পার্শ্বে ছিল তরুণী সঙ্গিনী!

সুদীর্ঘ টানা চক্ষু, কেশের রাশি, গৌর তনু, রক্তাভ অধর—অপূর্ব্বরূপিণী চতুর্দ্দশী পেপা! বাগানে আমরা একত্রে কত খেলা করিয়াছি! কত হাসি, কত গল্প!

কলহেরো অন্ত ছিল না! তার প্রকৃতিটি ছিল শান্ত মধুর! পাখীর বাসা চুরি করিয়া হৃষ্টমনে ধীরে ধীরে যখন আমি গাছ হইতে নামিতাম তার ম্লান চোখ দেখিয়া আমি জ্বলিয়া যাইতাম। সে দিন সে মিনতি করিয়া বলিয়াছিল, "কেন তুমি বাসা চুরি কর—আহা, ছোট ছানাগুলি—বড় নিষ্ঠুর তুমি!" এত বড় একটা বীরত্বের কাজ সারিয়া আসিতেছি কোথায় সে উৎসাহ দিবে, না, তিরস্কার! পাখীর বাসা ছুড়িয়া তাহাকে আঘাত করিলাম! গৃহে ফিরিলে যখন তার মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর এখানে কি হয়েছে রে?" সে অমনি অসঙ্কোচে বলিয়া উঠিল, "পড়ে গেছলুম, মা!"

তার পর কতদিন আমার স্কন্ধে ভর দিয়া নদী তীরে সে বেড়াইয়াছে! কখনো ধীর, কখনো-বা দ্রুত গতি! তীরে দাঁড়াইয়া নদীর তরঙ্গ দেখিতাম—সন্ধ্যা নামিয়া আসিত—চারিদিক ধীরে ধীরে আঁধারে অস্পষ্ট হইয়া উঠিত—মৃদু সঙ্গীতের মত নদীর জল তটের কূলে আছাড়িয়া পড়িত—আমাদের কণ্ঠস্বরও মৃদু হইত! কত গল্প করিতাম—কত রাজকন্যার কথা, ব্যর্থ প্রণয়ের কত করুণ কাহিনী! মাঝে মাঝে কেমন সঙ্কোচে-সরমে সে মুখ নত করিত!

পেপার হাতের রুমাল পড়িয়া গেল—আমি তাড়াতাড়ি সেখানি তুলিয়া তাহার হাতে দিলাম—স্পর্শে হাত কাঁপিয়া উঠিল!

সে এক গ্রীষ্মের সন্ধ্যা! বাগানের কোণে বাদাম গাছের তলায় আমরা বসিয়াছিলাম।

সহসা পেপা কহিল, "এস খানিক ছুটি!" সূক্ষ্ম তনুটি লইয়া সে ছুটিয়া চলিল—বোল্‌তার মত লঘু তার সে গতিটুকু! কেশের গুচ্ছ উড়িয়া পড়িতেছিল—মাঝে মাঝে গলার সুন্দর রঙ ফুটিয়া উঠিতেছিল—যেন তামাটে মেঘে বিদ্যুৎ খেলিয়া যাইতেছিল!

একটা কূপের পার্শ্বে সে বসিয়া পড়িল—ললাটে স্বেদের বিন্দু মুক্তার মত ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আমি তাহার পার্শ্বে বসিয়া পড়িলাম—সে হাঁকাইয়া পড়িয়াছিল—নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া

যাইতেছিল—কৃষ্ণ পক্ষ্মের তলে চক্ষু দুটি যেন শ্বেতপদ্মের মত! আমি তাহারি প্রতি চাহিয়াছিলাম।

পেপা বলিল, "একটু পড়ি এস! এখনো ত আলো রয়েছে; বই নেই তোমার কাছে?"

পকেটে একখানি ভ্রমণকাহিনী ছিল—তাহার পৃষ্ঠা খুলিলাম। আমার স্কন্ধে মাথা রাখিয়া সে পড়িতে লাগিল—আমার পূর্ব্বেই তার পাঠ শেষ হইতেছিল—তার বুদ্ধিও বেশ তীক্ষ্ণ!

পাঠ শেষ করিয়া আমার পানে চাহিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার পড়া হয়েছে?" আমি তখন সবেমাত্র পড়া সুরু করিয়াছি!

আমাদের উভয়ের কেশাগ্র পরস্পর স্পর্শ করিল, তার নিশ্বাস বায়ু আমার গালে লাগিল, তার পর উভয়ের ওষ্ঠও মিলিল! আবার যখন বই খুলিলাম, তখন মাথার উপর এক আকাশ নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে!

গৃহে ফিরিয়া সে ডাকিল, "মা, মা, আজ আমরা খুব ছুটেছি!" আমার মুখে কথা বাধিয়া গেল!

তিনি বলিলেন, "তুই যে কিছু বলছিস না রে? তোর মুখ যে শুখিয়ে গেছে—মনে দুঃখ হয়েছে নাকি কিছু?"

দুঃখ! আনন্দে আমার হৃদয়ের দুই কূল যে ছাপিয়া গিয়াছে! সেই স্নিগ্ধ সুন্দর সন্ধ্যার কথা, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত অবধি ভুলিতে পারিব না যে!

জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত—? হায়, তার আর বিলম্বই বা কি?

৩১

কয়টা বাজিয়াছে জানি না! কিসের একটা মিশ্র শব্দ ভ্রমর-গুঞ্জনের মত কাণে আসিতেছে! বুঝি আমারি শেষ চিন্তাগুলা মাথার মধ্যে এক বিরাট কোলাহল বাধাইয়া দিয়াছে!

আমার অপরাধের কথা ভাবিতে সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিতেছে, কিন্তু এ অনুতাপ আর কতটুকু সময়ের জন্যই বা!

দণ্ডের পূর্ব্বে অনুতাপের বোঝা যে বুকে চাপিয়াছিল, এখন মৃত্যুর কথা ছাড়া আর কিছুর জন্য ত আমার হৃদয়ে স্থান নাই! অতীতের কথা ভাবিতে গেলেও—ফাঁসির রজ্জুর কথাটা যে ভুলিতে পারি না! মধুর শৈশব, গৌরবোজ্জ্বল কৈশোর, আজ এমনি রক্ত মাখিয়া সে অবসিত হইবে! অতীত ও বর্ত্তমানের মধ্যে একটা রক্তনদীর ব্যবধান! যদি কেহ অনুগ্রহ করিয়া আমার এ জীবনের কাহিনী পাঠ করেন ত ঘৃণায় বিভীষিকায় কতখানি তিনি শিহরিয়া উঠিবেন! এ কি বিশ্বাসের যোগ্য কথা! কি রক্তপিপাসী আইন! হা নিষ্ঠুর মানুষ—আমি কি এমনি মন্দ? না, কখনো না!

আর কয় ঘণ্টা পরেই সকল চিন্তা সকল ভাবনার সুগভীর সমাপ্তি! অথচ সে আজ কত দিনই বা, যখন শুদ্ধ স্বাধীন চিত্তে নদীর তীরে, বৃক্ষের তলে, পত্র-মর্ম্মর পথে স্বচ্ছন্দ গতিতে বেড়াইয়া আমার দিন কাটিত!

৩২

আমার এ রুদ্ধ ঘরেরই অনতিদূরে সুখের গৃহগুলি তরুণতরুণীর সুখগুঞ্জন ও শিশুর কলোচ্ছ্বাসের বিহ্বল রাগিণীর উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ—আশা-নিরাশার ও সুখ-দুঃখের ভার লইয়া অসংখ্য নরনারী পথে চলিয়াছে!

বালকের দল হাঁকিয়া সংবাদপত্র বিক্রয় করিতেছে! জীবনের কি বিরাট স্ফূর্ত্তি চারি দিকে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িতেছে, আর আমি? —কিন্তু আর কেন সে চিন্তা!

পুরানো এক দিনের কথা মনে পড়ে। তখন আমি বালকমাত্র! নোতরদমের ঘণ্টা দেখিতে আসিয়াছিলাম। অন্ধকারে আঁকা-বাঁকা বিস্তর সোপান অতিক্রম করিতে আমার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল—উপরে উঠিয়া দেখি সারা পারি সহর যেন আমার চরণতলে বিচিত্র গালিচার মত বিছানো রহিয়াছে!

তারপর ঘণ্টা দেখিলাম! কি সে প্রকাণ্ড ঘণ্টা! কিন্তু আমি পারি সহর দেখিতেছিলাম—নোতরদমের গগনস্পর্শী ভবনশির হইতে নিম্নে পথের লোকগুলাকে পিপীলিকার মত ক্ষুদ্র দেখাইতেছিল! এমন সময় সহসা আকাশ বাতাস কাঁপাইয়া ভীমরোলে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল—বজ্রের মত ভীষণ সে নিনাদ! চূড়া কাঁপিয়া উঠিল! আমার পা কাঁপিয়া গেল আমি মেঝের উপর বসিয়া পড়িলাম—স্তব্ধ নির্ব্বাক পাষাণের মত আমি বসিয়াছিলাম! ঘণ্টাধ্বনি থামিয়া গেলেও তার প্রতিধ্বনি অসংখ্য ভ্রমণগুঞ্জণের মত কাণে আসিয়া লাগিতেছিল!

আজো আমার তেমনই মনে হইতেছে! ঘণ্টাধ্বনি নাই, তবু যেন চারিধারের কোলাহল একটা অস্পষ্ট শব্দের ঝঙ্কারে শ্রুতিটাকে ভরাইয়া তুলিয়াছে—আমার ললাটের শিরগুলাও দপ দপ করিতেছে! ছায়ার মত অস্পষ্ট যেন আমি দেখিতেছি—আমারি চারিদিকে অসংখ্য নরনারী হর্ষকোলাহলে মাতিয়া চলাফেরা করিতেছে, তাদের উল্লাসের চীৎকার না ঐ শুনা যায়! আর আমি নিস্পন্দ জড়ের মত বসিয়া রহিয়াছি—কোথায় শান্তি—কোথায় আরাম!

৩৪

ভিলা হোটেলের সূক্ষ্ম চূড়ার গায়ে স্থাপিত বিচিত্র ঘড়িটা যে ঐ দেখা যায়! প্লে দী গ্রীভের পরুষ কঠিন প্রাচীরের দিকেই ঘড়িটা যেন চাহিয়া রহিয়াছে! কতকালের প্রাচীন জীর্ণ প্রাচীর—রং কালো, এমন কালো যে দীপ্ত সূর্য্য কিরণেও তার সে কৃষ্ণাভা দূর হয় না!

যেদিন কাহারো জীবন ফাঁসির রজ্জু ধরিয়া অজানা লোকের ভীমান্ধকারে ঝুলিয়া পড়ে সেদিন প্লে দী গ্রীভের সকল দ্বারগুলার সম্মুখে অসংখ্য প্রহরীর চক্ষু যেন কি এক কৌতুহলের দৃষ্টি লইয়া জাগিয়া উঠে; হতভাগ্য মরণপথের যাত্রী সে ব্যগ্র দৃষ্টির একমাত্র লক্ষ্য! লুব্ধ দৃষ্টির সম্মুখে সে আপনার জীবনের সকল কাহিনী শেষ করিয়া দেয়, আর সন্ধ্যার ম্লানিমার মধ্যে দীপ্ত চন্দ্রের মত হোটেলের ঐ জ্বলন্ত ঘড়ি ফুটিয়া উঠে!

৩৫

একটা বাজিয়া পনেরো মিনিট হইয়াছে!

আমার এখন অবস্থাটা! মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা! যেন কে মাথার মধ্যে আগুন জ্বালিয়া দিয়াছে! যখনি বসি, কিম্বা উঠিয়া দাঁড়াই, মনে হয় মাথার মধ্যে কিসের একটা রুদ্ধ স্রোত যেন আমার মাথার খুলি বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়া যাইবে।

কেমন একটা আতঙ্কে সারা অঙ্গ শিহরিয়া উঠিতেছে। অঙ্গুলি হইতে লেখনী খসিয়া

পড়িতেছে—হাতে যেন একটা বৈদ্যুতিক তরঙ্গ লাগিয়াছে!

দুই চোখের কোণ জলে ভরিয়া গিয়াছে, যেন আমি ধূমাচ্ছন্ন ঘরের মধ্যে বসিয়া আছি! বাহুমূলে কি একটা বেদনা! কিন্তু আর পৌনে তিন ঘণ্টা মাত্র! তাহার পর আমার সকল যন্ত্রণা জুড়াইবে—আঃ, চিরদিনের জন্য বিরাম লাভ করিব! সে কি তীব্র অসহ্য সুখ!

৩৬

কেহ বলেন, যন্ত্রণা—সে-ত কিছুই নহে—বিজ্ঞানের এমনি অপূর্ব্ব কৌশল যে মৃত্যুর পথে যন্ত্রণা আমার মোটেই হইবে না! যন্ত্রণা কিছু নয়?

এই ছয় ঘণ্টা ধরিয়া আমি যে বেদনায় সারা হইয়া যাইতেছি—ইহাপেক্ষা মৃত্যুযন্ত্রণা কি এমনি ভীষণ? এই যে প্রতিমুহূর্ত্তটি এমন ধীরগতিতে চলিয়াছে—আমার মনে হইতেছে সে কি দ্রুত! বেদনার অসংখ্য সোপান বহিয়া মৃত্যুলোকে চলিয়াছি! কি অসহ্য এ যন্ত্রণা!

তবু, ইহা কিছুই নয়?

প্রতি শিরা হইতে যেন রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছে! বুকের উপর কে যেন পাষাণ ভার চাপিয়া ধরিয়াছে—শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসে!

কি এ যন্ত্রণা! বুঝিবে কে, বুঝাইবে বা কে? ফাঁসির পরমুহূর্ত্তে, দ্বিখণ্ডিত নরশির যদি একবার আসিয়া এ বেদনাটা বুঝাইতে পারিত তবে আর যাহাই বলুক বিজ্ঞানের কৌশলের তারিফ্ সে নিশ্চয়ই দিত না—কখনো না!

চক্ষের পলক পড়িবারো অবকাশ মিলিবে না। এখনি সব সমাধা হইবে! এই যে অসংখ্য কৌতূহলী দর্শক, এই যে অগণ্য রাজপুরুষের দল,—ইঁহারা এ যন্ত্রণার মাত্রা কি বুঝিবেন! ভীষণ রজ্জু এখনি একটি নিমেষে কণ্ঠ চাপিয়া ধরিবে—সমস্ত শিরার মুখ সঙ্কুচিত হইয়া যাইবে দেহের রক্ত স্তম্ভিত স্তব্ধ হইয়া যাইবে! সমুদ্রের গতি রুদ্ধ হইলে রোষে সে যেমন ফুলিয়া উঠে,—তেমনি বাধা পাইয়া সমস্ত ভিতরটা ছুটিয়া বাহির হইবার জন্য যে বিরাট দ্বন্দ্ব বাধাইবে, হা রে হতভাগ্য, তাহারি নিষ্ঠুর ভীষণ চাপে সব শেষ! ভিতরে বাহিরে প্রবল সংঘর্ষ—সে কি ভয়ঙ্কর! ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

সূর্য্য ও সৌরজগত।

সূর্য্যদেবকে আমাদের আয়ত্তাধীন করিতে পারিলে এ পৃথিবীতে কিরূপ অভিনব ঘটনা সম্ভব, এই বিষয় লইয়া বিলাতের টাইমস্ (Times) পত্রিকায় একটি মনোহর প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। প্রবন্ধকার লিখিতেছেন—

"একবার এক প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিদকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে তাঁহার মতে গত শতাব্দীর কোন্ আবিষ্ক্রিয়াটিকে মানব-সমাজের পক্ষে যুগান্তরকারী বলিয়া তিনি মনে করেন। তিনি উত্তর করিলেন, "সাধারণ দোকানে যে একপ্রকার খেলেনা বিক্রয় হয়, যাহার মধ্যে দুইটি ছোট ছোট চাকা সূর্য্যরশ্মির প্রভাবে আপনি ঘুরিতে থাকে, সেইটিই তাঁহার মতে অতীত যুগের সর্ব্বপ্রধান আবিষ্ক্রিয়া।"

বস্তুতঃ কিছুদিন পূর্ব্বে অধ্যাপক নুক্লেসেনুডে

(Fessenden) বায়ুর বেগ ও সূর্য্যতাপের শক্তিকে মানুষের কাজে লাগাইবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তৎসত্ত্বেও আজিও যে আমরা ইহাদিগকে লইয়া খেলা করা ভিন্ন অন্য কিছু আবশ্যকীয় ব্যবহারে ইহাদিগকে নিযুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছি এরূপ কোন প্রমাণ নাই; কিন্তু তাই বলিয়া তিনি যে সম্ভাবনার বিষয় আলোচনা করিয়াছেন তাহা যে নিতান্তই কল্পনা মাত্র তাহাও নহে।

যদি কোনদিন আমরা সূর্য্যতাপের শক্তিকে আমাদের নিত্যকর্ম্মে নিযুক্ত করিতে সক্ষম হই, তাহা হইলে আমাদের আর্থিক অবস্থারও যে বিশেষ উন্নতি ঘটিবে তাহা সহজেই বুঝা যায়। অধ্যাপক ফেসেনডেন্ একটু বিদ্রূপের সুরে বলিয়াছিলেন যে সূর্য্যতাপ প্রয়োগ করিবার পক্ষে ইংলণ্ড বেশ উপযুক্ত স্থান নহে। তবে সেই সঙ্গে সান্ত্বনা স্বরূপ ইহাও বলিয়াছিলেন যে ইংলণ্ডের বায়ুর বেগ সাধারণত বেশ প্রবল। এ বিষয়ে ভুক্তভোগী মাত্রেই সাক্ষ্য দিতে সক্ষম। উত্তরের এই তুষারাচ্ছন্ন দেশে সূর্য্যরশ্মি যেরূপ চঞ্চল অস্থায়ী, তাহাতে এদেশে সূর্য্য শক্তির অধিক ব্যবহার সম্ভব নহে সত্য।

এ বিষয়ে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের বড়ই সুবিধা। এ সকল দেশে সূর্য্য হইতে উদ্ভূত শক্তিকে সঞ্চিত ও নিযুক্ত করিবার পক্ষে অনেক সুবিধা। প্রথমে হয় ত মনে হইবে এরূপ আবিষ্ক্রিয়া যদি কোনও দিন সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে তাহার ফলে পরিণামে সভ্য জগতের সমস্ত প্রাধান্যই নষ্ট হইবে। যে সকল দেশে স্বাভাবিক সম্পদ অধিক, স্বাভাবিক উর্ব্বরতা অসাধারণ, পরিশ্রম করিবার জন্য অগণ্য লোক অল্পমূল্যে পাওয়া সম্ভব এবং সূর্য্য হইতে সর্ব্বাপেক্ষা সুলভে শক্তিলাভ করা যায়, সে সকল দেশের নিকট কালে উত্তরের সভ্য জাতিদিগের পরাজয় অনিবার্য্য। কিন্তু অধ্যাপক ফেসেন্‌ডেনের স্বপ্ন সত্য হইলেও পৃথিবীর রাজনৈতিক ও আর্থিক কেন্দ্রস্থল কি কোন কালেও উষ্ণ কটিমণ্ডলে স্থানান্তরিত হওয়া সম্ভব?

আমাদের ত তাহা মনে হয় না। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিদিগের মধ্যে প্রাধান্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার দ্বারা কোনও দিনই নির্দ্দিষ্ট হইবার নহে, মানবসমাজের চরিত্র ও গুণই উচ্চ নীচ স্থান স্থির করিবে। সূর্য্যশক্তি ব্যবহারের অপেক্ষা মানব শক্তি ও উৎসাহের সাধনাই ভবিষ্যতে পার্থিব উন্নতির প্রধান নিয়ন্তা হইবে।

দেশের জলবায়ুই মানবের গতিশক্তির প্রধান নিরূপক। আমরা চিরদিনই দেখিতেছি যে শীতপ্রধান দেশের জলবায়ুর সহিত যাহাদিগকে অবিরাম সংগ্রাম করিতে হয়, তাহারা স্বভাবতঃ এরূপ সবল, সতেজ ও কঠিন হয় যে মানবের ইতিহাসে তাহারাই প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে। বিজ্ঞানের যাদুমন্ত্র জলবায়ুর প্রবলতর ও সজীবতর শক্তিকে পরিবর্ত্তিত করিতে কোনদিনই পারে নাই। হিমপ্রধান দেশের দুর্জ্জয় প্রকৃতির সহিত যাহারা যুগযুগান্তর ধরিয়া যুদ্ধ করিয়া আসিতেছে, কোন নূতন আবিষ্ক্রিয়াই তাহাদের অন্তর্জাত শক্তিকে নষ্ট করা সম্ভব নহে। কঠোর প্রকৃতির মধ্যে লালিত হইলে যে শ্রেষ্ঠ অন্তর্শক্তি জাগিয়া উঠে, নগরের বিলাসবহুল জীবন তাহা আজিও নষ্ট করিতে পারে নাই এবং আরও দুই চারিশত বৎসরেও যে পারিবে এরূপ মনে হয় না।

অনেকে বলিতে পারেন যে সভ্যতার অভিব্যক্তি গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই সর্ব্বপ্রথম হইয়াছিল। এ কথাটা সম্ভবতঃ সত্য, কিন্তু সভ্যতার আদি জন্মভূমি যে ঠিক কোথায় তাহা আজিও স্থির হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা ভূপৃষ্ঠ খনন করিয়া অনেক প্রোথিত নগর আবিষ্কার করিতেছেন সত্য, কিন্তু সভ্যতার প্রথম প্রভাত যে কোন্ দেশবিশেষে হইয়াছিল, আজিও তাঁহারা তাহা আবিষ্কার করিতে সক্ষম হন নাই। তাঁহারা আমাদিগকে প্রাচীন নানা জাতির কথা বলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা আজও সেই সকল জাতির উৎপত্তির এমন কোনও যুক্তি-সঙ্গত নিষ্পত্তি করিতে পারেন নাই যাহা দ্বারা আমরা তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের আভাষ পাইতে পারি। যতদূর জানা যায় তাহাতে মনে হয় যে প্রাচীনতম সভ্যজাতিরা পার্শ্ববর্ত্তী বা উত্তর দিকেই অগ্রসর হইয়াছিলেন, দক্ষিণে অগ্রসর হইতে বড় একটা দেখা যায়

না। ভারতবাসীর ন্যায় যাঁহারা দক্ষিণে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জলবায়ুর প্রভাবে অবিলম্বেই কোমল প্রকৃতি হইয়া পড়িয়াছিলেন।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যে সকল শ্রেষ্ঠ সভ্যতার দৃষ্টান্ত দেখা যায় তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই জন্ম হইতেই একটা আশু ও অকাল অধঃপতনের বীজ দেখিতে পাওয়া যায়। রাজপুতেরাই কেবল প্রবল শৌর্য্য বীর্য্য রক্ষা করিতে পারিয়াছিল, কারণ বালুময় মরুর মধ্যে জীবনধারণ করিতে তাহাদের যে নিত্য সংগ্রামের আবশ্যক হইত, তাহা অনেকটা উত্তর দেশের কঠোর অবস্থার অনুরূপ। এই কারণেই আরবগণ প্রবল-তেজে চতুর্দ্দিক মথিত করিয়া বেড়াইয়াছিল। কিন্তু তাহারা তাহাদের উত্থানের অব্যবহিত পরেই উত্তর দেশের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল। যে সকল বিজয়ী জাতির কীর্ত্তিকলাপ পৃথিবীর ইতিহাসে অমর হইয়া আছে, তাহাদের অধিকাংশই জনহীন শস্যহীন কঠোর পার্ব্বত্য ভূমি হইতে উত্থিত, প্রকৃতির ভীষণ লীলার মধ্যেই তাহাদের চরিত্র গঠিত ও পুষ্ট; যে সকল অবস্থার মধ্যে মানুষ সর্ব্বাপেক্ষা বলবান, কর্ম্মক্ষম হয় ও শ্রেষ্ঠত্বলাভ করে, ঠিক সেই সকল অবস্থার মধ্যেই তাহারা পালিত। আর অন্তহীন সূর্য্যকিরণ মনুষ্যকে অধঃপতনের পথেই অগ্রসর করিয়াছে। মানব সমাজ চিরদিন এই একই নিয়মে চলিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। সুতরাং অধ্যাপক ফেসেনডেনের শৌর শক্তিভাণ্ডার একটা সম্ভব ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত হইলেও, ইয়ুরোপবাসীর ভীত হইবার কোনই কারণ নাই।

"এই স্থলে ইহাও বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে শীত-প্রধান দেশের জাতিগণ হইতে অসংখ্য ব্যক্তি নূতন জলবায়ুর দেশে যাইয়া বাস করিতেছে, কিন্তু আজিও তাহাদের যথার্থ কোনও অনিষ্ট হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায় না। গত তিন শতাব্দীর মধ্যে ইয়ুরোপ হইতে লক্ষ লক্ষ লোক নূতন নূতন মহাদেশে যাইয়া বাস করিয়াছে। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং অষ্ট্রেলিয়ার অধিবাসী প্রায় সকলেই প্রাচীন পৃথিবীর উত্তর দেশ সমূহ হইতে আগত। আমরা এখানে থাকিয়া অনেকেই মনে করি যে যাহারা সমুদ্রপারে দেশান্তরে গিয়াছে তাহাদের চরিত্রে আর কোন পরিবর্ত্তন হইবে না। অনেক সময়ে আমাদের মনে হয় যেন তাহাদের চরিত্রে আমরা নূতন গুণের পরিচয় পাই, কিন্তু অন্তরে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে যাহারা দেশান্তরে গিয়াছে, চরিত্রগত তাহারা আমাদের অনুরূপই আছে। মোটের উপর এ কথা আজিও সত্য হইতে পারে বটে, কিন্তু চিরদিন এরূপ থাকিবে না বলিয়াই বোধ হয়। মানবসমাজের অভিব্যক্তির পক্ষে তিনশত বৎসর এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক হইলেও হইতে পারে। আমাদের এ অভি-ব্যক্তি যে কত লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসি-তেছে তাহার কিছুই ঠিকানা নাই। পৃথিবীর আদি-কালের মানুষের ভঙ্গুর অস্থি এতদিনে লোপ পাই-য়াছে সত্য, কিন্তু পর্ব্বত পাষাণে এখনও তাহাদের অস্তিত্বের ক্ষীণ স্মৃতি জাগিয়া আছে।

যে সকল জাতি আজ নব নব দেশে যাইয়া বাস করিতেছে, তাহাদের বাহ্যিক জাতিগত গর্ব্ব, স্বদেশ-প্রেম বা রাজনৈতিক ভাবের অন্তরালে যে যথার্থ জাতীয় চরিত্র প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা চিরদিন একই ভাবে থাকিবে কি না, তাহা আজ বলিতে যাওয়া দূরদৃষ্টির প্রতি কিছু অযথা অত্যাচার করা হইয়া পড়ে। এক থাকিবে বলিয়া ত মনে হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া এখন হইতে ভবিষ্যৎ পরিবর্ত্তনের ভয় দেখাইলে বিপদের আশঙ্কা যথেষ্টই আছে। এই যেমন অষ্ট্রেলিয়ায় যাইয়া যে ইংরাজ জাতির চরিত্র পরিবর্ত্তিত হইতেছে এখন এ কথা বলাটা আমরা নিতান্ত অন্যায় বলিয়াই মনে করি। পাঁচশত বৎসর পরে অবশ্য সে কথার আলোচনা করা সঙ্গত হইবে। আসল কথা এই যে প্রেম দয়া আশা সাহস ইত্যাদি আমাদের যে প্রকৃতিগত প্রধান গুণ আছে তাহা কোন দেশে বা কোন কালেই নষ্ট হইবার নহে।"

অধ্যাপক ফেসেনডেনের প্রস্তাব সম্বন্ধে প্রবন্ধকার এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু অধ্যা-পকের প্রস্তাবটা যে কি তাহা এখনও ভাঙ্গিয়া বলা হয় নাই। বায়ু ও সূর্য্য হইতে শক্তি গ্রহণ

করিয়া তাহাকে আমাদের কর্ম্মে নিযুক্ত করাই যে অধ্যাপকের আলোচ্য বিষয় তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই সম্বন্ধে তিনি ইংলণ্ডের প্রধান বিজ্ঞান সমিতিতে যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন তাহা হইতে মনে হয় যে এরূপ শক্তি সংগ্রহ করিয়া আমরা তাহা বাণিজ্যকর্ম্মে নিযুক্ত করিতে পারি। তবে প্রথমেই একটা মহা বাধা এই যে সূর্য্যতাপের পরিমাণ সকল স্থানে সমান নয়। অধ্যাপক ফেসেন্‌ডেন্ বলেন যে ইহা প্রতি মুহূর্ত্তে প্রত্যেক বর্গ ফুটের উপর প্রায় ১৫০ পাউণ্ড ভারের তুল্য, কিন্তু তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহার এ হিসাব বোধহয় আসলের অপেক্ষা কিছু অতিরিক্ত হইবে। অপর কোনও অধ্যাপকের মতে ইহা ৬৩-৪২ পাউণ্ড, আবার অপর একজনের মতে ইহা ৯১-৩৫।

অধ্যাপক ভেরি (Very) যে হিসাব করিয়াছেন তাহা হইতেও আমরা দেখিতে পাই যে সংগ্রহযোগ্য সূর্য্যশক্তি দেশকাল ও অবস্থা ভেদে ভিন্নরূপ হইয়া থাকে। এরূপ শক্তি সংগ্রহ করিয়া রাখিতে যে ব্যয় হইবে বলিয়া অধ্যাপক ফেসেন্‌ডেন্ বলিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে এখন কোনও মতামত প্রকাশ করা অসম্ভব, কারণ আবশ্যকীয় যন্ত্রাদির বিষয় তিনি এখনও সাধারণের নিকট কিছুই প্রকাশ করেন নাই।

এই সকল শক্তিভাণ্ডারে সুবিধামত বায়ু চালিত কল থাকিবে, তাহার শক্তিও ইহার সহিত যুক্ত হইবে। অধ্যাপক বলেন, যে সকল স্থানে জলের শক্তি সংগ্রহ করিবার সুবিধা নাই, সেই সকল স্থানে সূর্য্য বা বায়ুর শক্তি অনায়াসেই ব্যবহার করা যাইতে পারে। দিন দিন খণিজ পদার্থের যত অভাব ঘটিবে, তাহার পূরণার্থে এইরূপ কোনও একটা উপায় অবলম্বন করা নিতান্তই আবশ্যক হইয়া পড়িবে সন্দেহ নাই। সূর্য্য ও বায়ু এতদিন আমাদিগকে ফাঁকি দিয়া আসিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বে তাহারা রাবণের যেরূপ আজ্ঞাপালন করিয়া চলিত একদিন যে আমাদেরও সেইরূপ আজ্ঞাবাহী হইবে, ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে।

বিবিধ।

পৃথিবীর বয়স।

বহুকাল হইতেই দুই বৈজ্ঞানিক দলের মধ্যে পৃথিবীর বয়স লইয়া মতভেদ চলিয়া আসিতেছে। ভূতত্ত্ববিদগণ বলেন পৃথিবীর জন্ম ৩০ কোটি বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল। কিন্তু পদার্থ বিজ্ঞানবিদগণের মতে ২ বা ৩ কোটি বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর প্রথম জন্ম হয়। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ভূতত্ত্ববিভাগের অধ্যাপক ক্লার্ক ও বেকার সাহেব সম্প্রতি গণনা করিয়া বলিয়াছেন,—বর্ত্তমান পৃথিবীর বয়স ৭ কোটি বৎসরের অধিক নহে এবং ৫ কোটি ৫০ লক্ষ বৎসরের কম নহে। আধুনিক কালের যে সকল বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত পৃথিবীর বয়স নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এক একটা নূতন বয়স স্থির করিয়াছেন; কাহারও সহিত কাহারও মতের মিল নাই। লর্ড কেলভিন (Lord kelvin) ১৮৬২ সালে গণনা করিয়া বলেন ২ কোটি হইতে ৪০ কোটির মধ্যে, সম্ভবতঃ ৯ কোটি ৮০ লক্ষ বৎসর। ১৮০৩ সালে কিং ও বেরাস (Clarence King and Carl Baras) বলেন ২ কোটি ৪০ লক্ষ বৎসর। ১৪৯৭ সালে পুনরায় গণনা করিয়া লর্ড কেলভিন বলেন ২ কোটি হইতে ৪ কোটির মধ্যে। ১৮৯০ সালে লাপেরাণ্ট (De Lapperant) বলেন ৬ কোটি ৭০ লক্ষ হইতে ৯ কোটির মধ্যে। ১৮৯৩ সালে ওয়ালকট (Charles D. Walcott) বলেন ৭ কোটির অধিক হইবে না। ১৮৯৯ সালে জোলি (J. Joly) বলেন পৃথিবীর

সমুদ্রের বয়স ৮ কোটি হইতে ৯ কোটির মধ্যে। ১৯০৯ সালে সোলাস (W. J. Sollas) বলেন, সমুদ্রের বয়স ৮ কোটি হইতে ১৫ কোটির মধ্যে।

প্রাচীন মিশরের স্মৃতি।

সম্প্রতি এক অধ্যাপক মিশর দেশের ভূগর্ভ হইতে এক স্ত্রীলোকের প্রলেপ রক্ষিত মৃতদেহ 'মামি' বাহির করিয়াছেন। তাঁহার মতে স্ত্রীলোকটি প্রায় নয় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিল। তাহার দেহটি আজও অটুট রহিয়াছে। কিন্তু সেই দেহের সহিত এমন সকল আশ্চর্য্য রত্নরাজি ও নিত্যব্যবহারোপযোগী স্বুবর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কারাদি পাওয়া গিয়াছে, যে সেগুলি খৃষ্টীয় শতাব্দীর সাত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে গঠিত বলিয়া কোন মতেই মনে হয় না। অলঙ্কারগুলি সমস্তই আধুনিক ফ্যাসানের সুন্দর ও মনোহর। তাহার মধ্যে আধুনিক কণ্ঠহার, কর্ণফুল হইতে ব্রোচ পর্য্যন্ত সবই আছে।

ইহা ছাড়া এই স্ত্রীলোকটি মাথার দুই পাশে দুই খানি চিরুনি পরিত, সেগুলিও প্রায় আমাদের চিরুনির অনুরূপ। কিন্তু তাহার ছোট ছোট রত্নখচিত সোনার বাক্সগুলিই সব চেয়ে আশ্চর্য্য। ইহার কোনটিতে অঞ্জন থাকিত, কোনটিতে গন্ধদ্রব্য বা অন্যান্য প্রলেপাদি থাকিত। সেগুলি ঠিক আজকালের বড় বড় দোকানের শিল্পবহুল মূল্যবান কৌটার মত। ইহা হইতেই মনে করা যায় যে বেশভূষার বিলাস হিসাবে আজকালের সুন্দরীগণের সহিত সেই অতীত যুগের মিশর-নারীদিগের বড় একটা প্রভেদ ছিল না। তবে আজকাল পাশ্চাত্যদেশে সাধারণ মহিলাগণ যে সকল রত্নখচিত অলঙ্কার ব্যবহার করেন তাহা প্রাচীন মিশরে দুই চারিটি রাজ রাণীর ভাগ্যে জুটিত কিনা সন্দেহ। তাহার একটা কারণও আছে। সেকালে মিশরে আজকালের মত নানা প্রকারের রত্ন পাওয়া দুর্লভ ছিল। হীরা, মুক্তা, পান্নার অলঙ্কার প্রায় দেখিতেই পাওয়া যায় না, কিন্তু বিচিত্র শিল্পচাতুর্য্যে তাহারা অতুলনীয় উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। আজিও কোন জাতি তাহার অনুরূপ অনুকরণ করিতে পারিল না। সেকালে রাজারা অলঙ্কারের চাকচিক্যে মুগ্ধ হইতেন না। যে অলঙ্কারের শিল্পকলা যত মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিতে হইত, সেই অলঙ্কারকে তাঁহারা তত অধিক প্রশংসা করিতেন। সেকালে নীলকান্ত মণির সন্ধান তাঁহারা জানিতেন না, তৎপরিবর্ত্তে নীল কাচ ব্যবহার করিতেন। কাচ লইয়া তাহারা এরূপ সুন্দর অলঙ্কার প্রস্তুত করিত যে তাহাতেই রত্নের অভাব অনেক অংশে দূর হইত। তাহারা যেরূপ নানাবর্ণের কাচ লইয়া মালা ইত্যাদি করিত, আজ পর্য্যন্ত আর তাহার অনুকরণ সম্ভব হইল না। পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তাহারা কাচ হইতে এরূপ শুক্তি ও রত্নাদি প্রস্তুত করিত যে দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়, হঠাৎ স্বাভাবিক বলিয়াই ভ্রম হয়।

গুপ্ত জাতির অনুসন্ধান।

বহুকাল হইতেই ইয়ুরোপের সভ্য জাতির মনে একটা ধারণা আছে যে উষ্ণপ্রধান দেশের গভীরতম প্রদেশে চতুর্দ্দিকের কৃষ্ণকায় অধিবাসীর মধ্যে গুপ্তভাবে এক শ্বেতকায় আর্য্য জাতি অজ্ঞাতবাস করিতেছে। এরূপ ধারণা যে কেবল কৌতূহলজনক তাহা নহে, কল্পনার একটা মধুর মোহও ইহার সঙ্গে মিশ্রিত আছে।

পুরাকালে যে সকল সাহসী পর্য্যটক মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় যাইতেন, তাঁহারা দেশে ফিরিয়া আসিয়া তথাকার দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতমালার পরপারে অভিনব প্রচ্ছন্ন জনপদের কাহিনী প্রচার করিতেন। দক্ষিণ-আফ্রিকাতে প্রচলিত এইরূপ একটি জনরব অবলম্বন করিয়াই রাইডার হ্যাগার্ড (Rider Haggard) তাঁহার একখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন।

পৃথিবীর যে সকল দেশ সম্বন্ধে আমরা এখনও কোনও বিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই, সেই সকল স্থান সম্বন্ধেই এইরূপ একটা জনরব আজিও প্রচলিত আছে। আর এই জনশ্রুতি অনেক বিষয়ে প্রায় একরূপ ও এক প্রকৃতির। প্রায় সকল স্থানেই এই রহস্যময় জাতি কোন এক পর্ব্বতমালার পরপারের নিভৃত আশ্রয়ে বাস করিতেছে বলিয়া শুনা যায়; চতুর্দ্দিকের অধিবাসীদের নিকট হইতে তাহারা সর্ব্বতোভাবে স্বতন্ত্র থাকে; সচরাচর তাহাদিগকে দেখাই যায় না। কিন্তু সকলেই একবাক্যে বলিয়া থাকে যে তাহারা নিকটস্থ কৃষ্ণকায় জাতিদিগের অপেক্ষা অধিক সভ্য ও শিক্ষিত।

এই সকল জাতি যে কোথা হইতে উৎপন্ন হইল বা কোন দেশ হইতে আসিল তাহা কেহ বলিতে পারে না; দেশীয় জনশ্রুতিতে তাহার কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে আমরা মনে করিতাম যে, বহুদিনের বিস্মৃত শ্বেতকায় পর্য্যটকেরা হয়ত এই সকল ভীষণ স্থানে বহুযুগ হইতে অজ্ঞাতবাস করিতেছে। কিন্তু একটু পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই এই কাল্পনিক শ্বেতকায়জাতির অস্তিত্ব একেবারেই লোপ পাইয়া যায়। কিন্তু তথাচ এই ধারণাটা আমাদের মস্তিষ্কে এরূপ অটল আসন পাতিয়া বসিয়াছে যে এই বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগেও লোকে এই ব্যাপারটাকে একেবারে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতে ঠিক প্রস্তুত নহে। প্রায় ৭ বৎসর পূর্ব্বে ফিলিপাইন দ্বীপে মুরদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধকর্ম্মে ব্যাপৃত একজন আমেরিকান সৈনিক মিনডানাও দ্বীপের অভ্যন্তরে এক শ্বেতকায় জাতির অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রবল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠেন। এই দ্বীপের পর্ব্বত প্রদেশের মধ্যে সভ্যজগতের কেহ কখনও প্রবেশ করে নাই, এমন কি ইহার সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী স্থান সম্বন্ধেও আমরা অল্পই জানি।

কিন্তু এই দ্বীপতীরস্থ অধিবাসীদের মধ্যে এইরূপ একটা বিশ্বাস প্রচলিত যে, অভ্যন্তর প্রদেশের অরণ্যনিবিড় গিরিমালার অন্তরালে এক প্রবল শ্বেতকায় জাতি-বাস করে। অনেকে বলে যে তাহারা এক শ্বেতাঙ্গী সুন্দরী বালিকাকে তাহাদের দেখিবামাত্র পর্ব্বতের দিকে পলাইয়া যাইতে স্বচক্ষে দেখিয়াছে। যে সকল সাহসী কৃষ্ণকায় কৌতূহল বশতঃ পার্ব্বত্য-প্রদেশের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে তাহারা নাকি শ্বেতকায় নরনারী দেখিতে পাইয়াছে। এই সকল সংবাদ শুনিয়া সেই আমেরিকান সৈনিক এতদূর উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন যে তিনি একটি দল বাঁধিয়া সেই দ্বীপের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। কিন্তু বোধ হয় সেই অজ্ঞাত শ্বেতজাতি তাঁহাদের যাত্রার সংবাদ পাইবামাত্র অদৃশ্য হইয়া থাকিবে, নচেৎ এতদিনে আমরা তাহাদের অস্তিত্বের পরিচয় পাইতাম।

আরব দেশে কিন্তু এরূপ একটা শ্বেতকায় জাতি থাকা অধিক সম্ভব। বহুবৎসর হইতেই পারস্য উপসাগরে এরূপ জাতির কাহিনী শুনিতে পাওয়া যাইতেছে এবং কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মস্কটের এক খৃষ্টান ধর্ম্মযাজক লিখিয়াছিলেন—"এখানকার কফি-পানের দোকানে এক অজ্ঞাত শ্বেতকায় জাতি সম্বন্ধে নানা জনশ্রুতি শুনা যায়। তাহারা পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করে, অপরিচিত হইতে দূরে থাকে, এবং অভিনব ভাষা ব্যবহার করে।

এই ধারণার উৎপত্তির মীমাংসা করিবার জন্য অনেকে অনেক প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ ১৮৭৫ সালে কর্ণেল মাইল্‌স্ (Colonel Miles) নামে এক ব্রিটিশ কর্ম্মচারীর ভ্রমণ কাহিনী হইতেই এই অদ্ভুত বিশ্বাসের উৎপত্তি। তিনি ভ্রমণ কালে শেরাজি নামে একটি নগরে যাইয়া উপস্থিত হন। নগরটি একেবারে পর্ব্বতমালার মধ্য স্থলে একটি অত্যুচ্চ বন্ধুর গিরিচূড়ার উপর পক্ষী-নীড়ের ন্যায় অবস্থিত। এখানকার অধিবাসীদের বর্ণ দেশের অন্যান্য জাতির অপেক্ষা অধিক গৌর। তাহারা সচরাচর সমতল ভূমিতে নামেই না, এবং সাধারণ আরবদিগের সহিত বিবাহাদি কোন সম্বন্ধই রাখে না।

কর্ণেল মাইল্‌স্ অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে দশম শতাব্দীতে যে পারসিক সেনা ওমান আক্রমণ

করিয়াছিল ইহারা তাহাদেরই কতকগুলির বংশধর। ইহাদের বাসস্থানের দূরত্ব এবং আচার ব্যবহারের বিশেষত্ব হইতেই তীরবর্ত্তী স্থানের হাটে বাজারে নানারূপ অতি রঞ্জিত কাহিনীর প্রচার হইয়াছে। এ সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত বলিয়া মনে হয় না।

এখনকার পৃথিবী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বলিতে হইবে। প্যারাগুয়ে হইতে তিব্বত পর্য্যন্ত দেশ আবিষ্কারকের কর্ম্মও প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। নিষিদ্ধ নগরের মধ্যে কতলোক প্রবেশ করিয়াছে। গুপ্ত নগর এখন কেবল উপন্যাস লেখকের কল্পনা রাজ্যেই অধিষ্ঠান করিতেছে। এ কালে আর প্রচ্ছন্ন শ্বেতকায় জাতির অজ্ঞাতবাসের স্থান নাই।

আফ্রিকার মধ্যস্থল দিয়া এখন রেলের এঞ্জিন ছুটিতেছে। আফ্রিকার মধ্যস্থলে এক অভিনব গৌরজাতি বাস করে বলিলে এখন আর কেহ সহজে বিশ্বাস করিবে না। হ্যাগার্ড সাহেব তাঁহার উপন্যাসে যে জাতির উল্লেখ করিয়াছেন তাহারা সম্ভবতঃ বাহিমা জাতি। অনেকে বলেন যে এই জাতি দেখিয়াই আফ্রিকাতে শ্বেতকায়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নানা প্রকার জনশ্রুতি উঠিয়াছে। তাহাদের বর্ণ বেশ গৌর এবং তাহারা দেশের সাধারণ লোকের সহিত মেশে না। সত্যের সম্মুখে কল্পনা নিতান্তই সংকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে।

রেডিয়াম রহস্য।

রেডিয়াম এতদিনে ধাতুর আকারে পরিণত হইল। বর্ত্তমান যুগে যতগুলি অভিনব আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছে ইহা তন্মধ্যে সর্ব্ব প্রধান। ম্যাডাম কুরিই যে সর্ব্ব প্রথমে এই নূতন ধাতু আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছেন ইহা আরও আনন্দের বিষয়। তিনি ও তাঁহার স্বর্গগত স্বামী উভয়েই এই ধাতুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে বহুদিন হইতে অনুমান করিতেছিলেন, এবং এই অজ্ঞাতপূর্ব্ব ধাতু আবিষ্কার করিবার জন্য নানা প্রকার পরীক্ষা করিতেছিলেন। প্রথমে তাঁহারা উভয়েই পিচব্লেণ্ড (Pitchblend) নামে পদার্থের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। এই পদার্থ লক্ষ লক্ষ মণ প্রস্তরের মধ্যে বালুকণার ন্যায় সামান্য অংশে পাওয়া যায় মাত্র। অসাধারণ অধ্যবসায় ও কৌশলের ফলে ইঁহারা বহুবৎসরের সাধনায় সামান্য সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। এতদিনে সেই সাধনার সম্পূর্ণ সিদ্ধি লাভ হইল। কিন্তু পতিহীনা ম্যাডাম কুরি এখন একাকিনীই উভয়ের চেষ্টার সার্থকতার আনন্দ সম্ভোগ করিতেছেন।

বহুকালের বিপরীত ধারণা সত্ত্বেও বহুদিন হইতে বৈজ্ঞানিক জগতে এমন সকল সত্য প্রকাশ পাইতে আরম্ভ হইয়াছিল যে, তাহা দ্বারা অনেকেরই মনে ক্রমে একটা বিশ্বাস জন্মিতেছিল যে, বায়ুর অপেক্ষা লঘু ও জটিল কোন অমিশ্র পদার্থ থাকা সম্ভব এবং হয়ত স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ হইতে বায়ুস্থিত অম্লজান পর্য্যন্ত সেই একই পদার্থ হইতে উৎপন্ন। এক ধাতু হইতে যে অপর এক ধাতু উৎপন্ন করা সম্ভব তাহা রসায়ন নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া এতদিন বিজ্ঞানবিদেরা হাসিয়া উড়াইতেন, কিন্তু এখন আবার তাহা সম্ভব বলিয়া অনেকের মনে বিশ্বাস জন্মিতে আরম্ভ হইল। প্রথমে যখন আবিষ্কৃত হইল যে কয়েকটি ধাতু এমন রশ্মি বিকীর্ণ করে যে তাহারা সাধারণ একটি শুষ্ক ফটোগ্রাফের প্লেটে নিজেদের চিহ্ন রাখিয়া দেয়, তখন হইতেই এ বিশ্বাসের উৎপত্তি। যে কেহ ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। একখানি শুষ্ক প্লেটের উপর অনেক ভাঁজ কাগজ জড়াইয়া তাহার উপরে একখণ্ড সাধারণ দস্তা রাখিয়া দিন। দুই এক মাসের মধ্যেই প্লেটের উপরে সেই দস্তা খণ্ডের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া সম্ভব; সকল ক্ষেত্রেই যে দেখিতে পাওয়া যাইবে তাহা নহে। দস্তাটি যদি প্রায় বিশুদ্ধ অবস্থায় হয়, তাহা হইলে প্লেটে

আর কোনও পরিবর্ত্তন হইবে না। ইয়ুরেনিয়াম (uranium) যে শুষ্ক প্লেটকে নষ্ট করে এ অপবাদ তাহার বহুকাল হইতেই ছিল। ইয়ুরেনিয়াম সর্ব্বাপেক্ষা গুরুভার ধাতুগুলির মধ্যে একটি।

ম্যাডাম কুরির এই যুগান্তরকারী আবিষ্ক্রিয়ার পর ইহা বলা সহজ যে সেই গুরুভার ধাতু ইয়ুরেনিয়াম নিশ্চয়ই নিজেকে কোন সরলতর পদার্থে চূর্ণ করিয়া, তাহার লঘু অণুগুলিকে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া ফেলে, এবং এই উপায়ে যাহাতে পেষিত হইয়া ইহা বর্ত্তমান ঘনত্বে পরিণত হইয়াছিল, তাহার কতকাংশ পরিত্যাগ করে। কিন্তু রাসায়নিক তুলাদণ্ডে যতদূর জানিতে পারা যায় তাহাতে মনে হয় যে এই ভাবে নিজেকে চূর্ণ করিয়া কাগজ ভেদ করিয়া ইয়ুরেনিয়াম যে ফটোগ্রাফের প্লেটকে নষ্ট করে, তাহাতে ইহার ভার বা শক্তি কিছুই কমে না। সুতরাং খনিজ ধাতুর মধ্যে যে এমন কোন বৈজ্ঞানিক জগতের বস্তু বা ধাতু লুক্কায়িত ছিল যাহা বহুদিনের যত্নশ্রমে আবিষ্কৃত হওয়া সম্ভব সে বিষয়ে কোন সন্দেহই ছিল না ইহাও দেখা গিয়াছিল যে ইয়ুরেনিয়াম মিশ্রিত পদার্থই সকল পদার্থ অপেক্ষা অধিক শক্তিসম্পন্ন। সেই জন্যই যে খনিজ পদার্থ হইতে ইয়ুরেনিয়ম প্রস্তুত হয়, তাহার মধ্যেই কুরী দম্পতি অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। সেই খনিজ পদার্থ পিচব্লেণ্ড।

প্লেটের উপরে কালিমা চিহ্ন পড়া ভিন্ন অন্য কারণেও পিচব্লেণ্ডের উপরই ইঁহাদের প্রথম দৃষ্টি পড়ে। তাড়িৎ পূর্ণ একটি তাড়িৎ পরিচালক দণ্ড এই খনিজ পদার্থের সম্মুখে ধরিলে তাহা একেবারে তাড়িৎ শূন্য হইয়া যায়। ইহার দ্বারাই প্রমাণ হইতেছে যে এতৎ সংঘর্ষে তাড়িৎ পরিচালক দণ্ডের চতুর্দ্দিকস্থ বায়ু কোন না কোন প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়া নিজের স্বাভাবিক অপরিচালকত্ব ত্যাগ করিয়া পরিচালকত্ব লাভ করে। এই দুই বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াই কুরি দম্পতি তাঁহাদের কঠোর পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হন। রেডিয়ামের অন্বেষণ যে সময়ে আরম্ভ হয় ঠিক সেই সময়েই ক্যাথোড্ (cathode) তাড়িৎরশ্মি, এক্স তাড়িৎরশ্মি (Xrays) এবং অন্যান্য বহু প্রকারের অদৃশ্য অংশুবিকিরণ তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়। সম্ভবতঃই বিজ্ঞানবিদগণের মনে হইল যে সেই অজ্ঞাত ধাতুর অন্তর্নিহিত পদার্থ হইতেই এক্স তাড়িৎরশ্মি বিকীর্ণ হয়।

কুরি দম্পতি তাঁহাদের পরীক্ষার প্রথমেই দেখিলেন যে কারখানায় যে সকল অব্যবহার্য্য বস্তু ফেলিয়া দেওয়া হয় সেগুলি তাঁহারা যে ইয়ুরেনিয়াম প্রস্তুত করিতেছিলেন তাহার অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ও অংশুবিকিরণকারী (radio active)। সুতরাং ম্যাডাম কুরি সেই সকল অব্যবহার্য্য বস্তু লইয়াই তাঁহার পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন।

এস্থলে একটা কথা বলিবার বিষয়। আজও পর্য্যন্ত যত রেডিয়াম প্রসবকারী পিচব্লেণ্ড আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই অষ্ট্রিয়া দেশে পাওয়া গিয়াছে। ইয়ুরেনিয়ামের চতুর্দ্দিকে যে আবর্জ্জনাস্তূপ পড়িয়া আছে, তাহাই এ পৃথিবীর রেডিয়াম উৎপাদনের প্রধান উপাদান। অষ্ট্রিয়ার গবর্মেণ্ট এ সুযোগ ছাড়িবার পাত্র নহেন। ম্যাডামকুরির রেডিয়াম আবিষ্ক্রিয়ার কথা যেমন প্রচারিত হইল অমনি অষ্ট্রিয়া হইতে পিচব্লেণ্ড বা ইয়ুরেনিয়াম কারখানার আবর্জ্জনার রপ্তানি একেবারে বন্ধ হইল। কাজেই রেডিয়ামের উৎপাদন শক্তি অষ্ট্রিয়া একচেটিয়া করিয়া লইয়াছেন বলিলেও হয়। তাহার পরে রেডিয়ামের উপযুক্ত খনিজ পদার্থ পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই এবং ইংলণ্ডের তিন চারিটি স্থানে পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও আজিও অষ্ট্রিয়াই এ বিষয়ে অগ্রগণ্য।

এই রেডিয়ামের অনুসন্ধান করিতে ম্যাডাম কুরির যে কিরূপ একান্ত অধ্যবসায়ের আবশ্যক হইয়াছিল, তাহা পাঠককে বুঝান অসম্ভব। সহস্র সহস্র মণ প্রস্তরখণ্ড হইতে এক এক চামচ পরিমাণ প্রস্তর লইয়া, ধীরে ধীরে সেগুলিকে তাহাদের অন্তর্নিহিত উপাদানে বিশ্লেষিত করিতে হইয়াছে এবং তাহার মধ্যে যে গুলির অংশুবিকিরণ শক্তি দেখা গিয়াছে সেগুলিকে একত্রিত করিতে হইয়াছে। প্রথমে যখন এই অসামান্য নারী প্রায় দুই শত মণ প্রস্তর হইতে এমন কয়েক বিন্দু নূতন পদার্থ বাহির করেন যাহা অন্ধকার

খদ্যোতের ন্যায় জ্বলিতে লাগিল, তখনই ইঁহার কঠোর সাধনার প্রথম পুরস্কার লাভ হয়। এই বিন্দুগুলি অশুদ্ধ রেডিয়াম ব্রোমাইড্। সত্যই যে রেডিয়াম বিন্দুগুলি জ্বলিতেছিল তাহা নহে, কিন্তু ইহাদের বিকীর্ণ আলোক রশ্মিতে ব্রোরামের (brorum) অংশগুলিকে উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। এই রেডিয়াম ব্রোমাইড অধ্যাপক কুরি লণ্ডন নগরের রয়েল ইনষ্টিটিউটে ইংলণ্ডের বিজ্ঞানবিদগণকে দেখাইবার জন্য আনিয়াছিলেন। এই বহুমূল্য দ্রব্যের মোড়কটি তিনি তাঁহার ওয়েষ্ট কোটের পকেটে করিয়া ইংলণ্ডে আনেন এবং সেই ভাবেই পুনরায় প্যারিস নগরে লইয়া যান। কয়েক দিন পরে তিনি ঠিক সেই পকেটের নীচে গায়ে একটি দাগ দেখিতে পাইলেন। এই দাগটি ক্রমে সাংঘাতিক ঘায়ে দাঁড়াইল এবং তাঁহাকে অশেষ যন্ত্রণা দিতে লাগিল। এই ঘটনা হইতেই পৃথিবী জানিল যে রেডিয়াম অন্য পদার্থের সহিত মিশ্রিত থাকিলে এমন তেজ বিকীর্ণ করে যে অসাবধান হইলে তাহা আমাদিগকে নানা প্রকারে কষ্ট দিতে পারে।

এই নূতন সরল পদার্থ রেডিয়ামের ব্যবহারের কথা অনেকে অনেক রকম বলিয়াছেন। ইহা সম্ভবতঃই তাপ ও আলোক বিকীর্ণ করে। ধীরে ধীরে ইহা যখন অন্য কোন পদার্থে পরিবর্ত্তিত হয়, তখন ইহা প্রভূত পরিমাণে শক্তি ত্যাগ করিতে থাকে। সেই জন্য অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে ইহা আমাদের এঞ্জিন চালাইবে ও অন্যান্য নানাবিধ আশ্চর্য্য কার্য্য করিবে। পরে যখন অধিক পরিমাণে রেডিয়াম প্রস্তুত হইতে লাগিল তখন চিকিৎসকেরা এই পদার্থের সাহায্যে নানা প্রকার দুরারোগ্য চর্ম্মরোগের চিকিৎসা করিলেন এবং ক্যান্সার রোগীর যন্ত্রণা উপশমের জন্য ইহা ব্যবহার করিতে লাগিলেন; কিন্তু ম্যাডাম কুরি ইহাকে ধাতুতে পরিণত করিয়া রেডিয়াম সম্বন্ধে চরম সফলতা লাভ করিয়াছেন। তাড়িতের সাহায্যে তিনি ব্রোমাইডকে বিচ্ছিন্ন করিয়া এক প্রকার উজ্জ্বল ধাতু বাহির করিয়াছেন। প্রকৃতির রহস্যময় বিধানে ইহা প্রবল বেগে একত্রিত এবং ক্রমশঃ চূর্ণ হইয়া সরলতর পদার্থে পরিণত হইতেছে এবং বাহিরের বায়ু সংস্পর্শে আসিয়া ধীরে ধীরে অবিরামগতিতে এরূপ উত্তাপ বিকিরণ করিতেছে, যে ইহার সংস্পর্শে এক টুকরা কাগজ আনিলে তাহা তৎক্ষণাৎ জ্বলিয়া উঠে

সৃষ্টির কোন্ আদি অবস্থায় প্রকৃতির প্রবল শক্তির পেষণে এই রেডিয়াম প্রস্তুত হইয়াছিল, আর আজ আমরা এতদিন পরে তাহাকে বিশুদ্ধ অবস্থায় আনিতে পাইলাম। প্রকৃতির রহস্য যেমন নিগূঢ়, মনুষ্য বুদ্ধির চেষ্টাও তেমনি অজেয়!

শ্রীভঃ

পর্ত্তুগালে সাধারণ তন্ত্র।

পর্ত্তুগালের রাজনৈতিক আকাশে অনেকদিন হইতেই অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল। শাসন বিশৃঙ্খলায়, পুরোহিত ও ধনী সম্প্রদায়ের অত্যাচারে পর্ত্তুগালবাসী অনেকদিন হইতেই পীড়িত হইতেছিল। বর্ত্তমান রাজার পিতাকে কয়েকজন উন্মত্ত প্রজা রাজপথের মধ্যে যেরূপ নিষ্ঠুরভাবে বোমা মারিয়া হত্যা করে—তাহা আমরা আজিও ভুলি নাই। রাজা মানুয়েল যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তিনি প্রজারঞ্জনে প্রতিশ্রুত হইয়া অনেককে আশ্বাস দান করেন। কিন্তু শেষে যখন প্রজারা দেখিল দেশের অবস্থা 'যথাপূর্ব্বং তথাপরং,' তখন সেনাবিভাগের ও নৌ-বিভাগের কতিপয় অধিনায়ক মিলিয়া সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন

এ ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য যে ব্যক্তিগত স্বার্থনীতির বশবর্ত্তী হইয়া আধুনিক ভাবে প্রতিশোধ বা লাভের চেষ্টা তাহা নহে। স্বদেশের ও স্বজাতির উন্নতি করাই

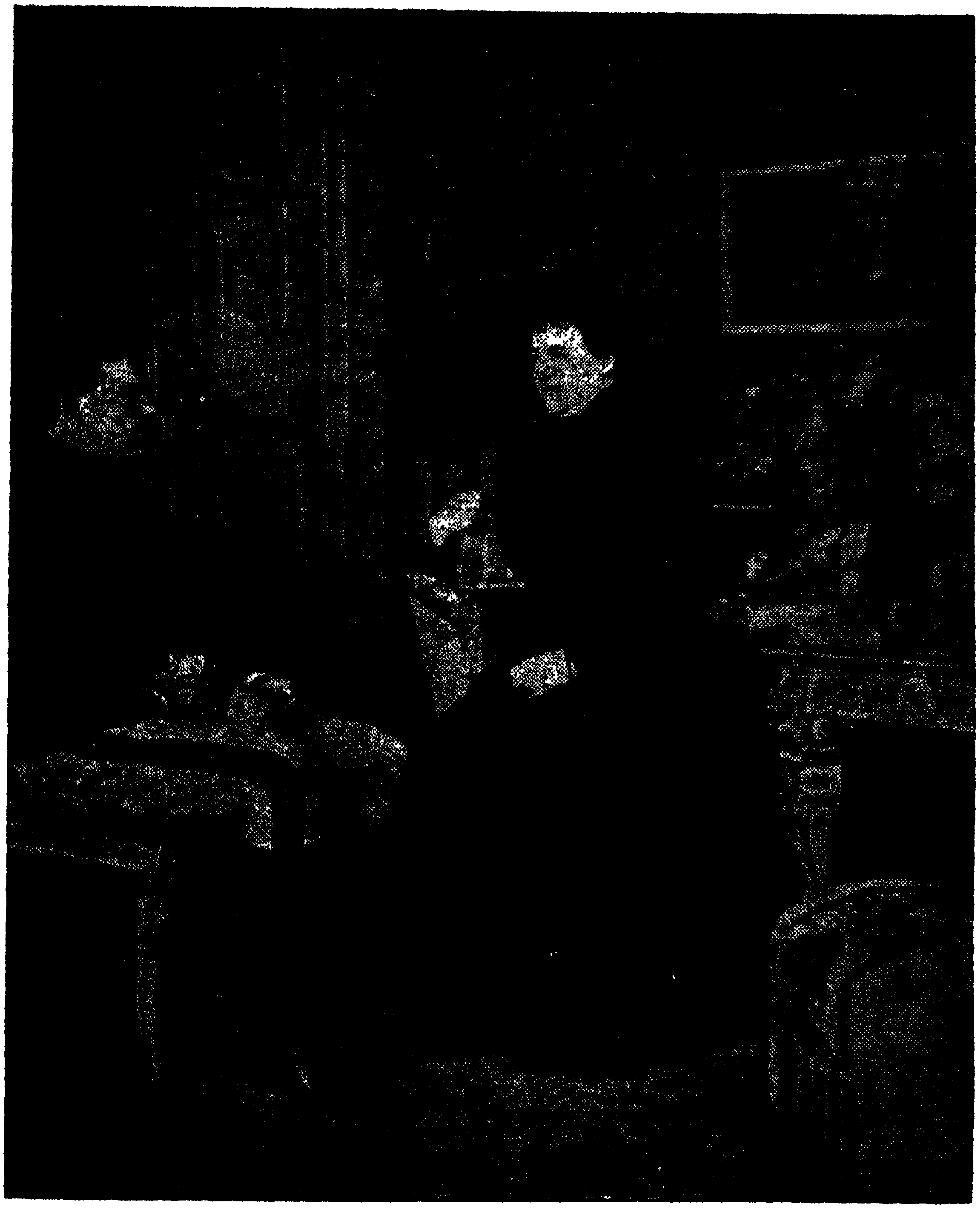

রাজা ম্যানুয়েল ও রাজমাতার ইংলণ্ডে পলাইয়া আসিবার পরে গৃহীত ফটোগ্রাফ।

বিদ্রোহীদের প্রধান লক্ষ্য। যতদূর জানিতে পারা যায় তাহাতে মনে হয় আডমিরেল রীস (Reis) সাহেবই এই বিদ্রোহের প্রধান সহায় ও অধিনায়ক। পূর্ব্ব হইতেই তিনি রাজপক্ষের সহিত সংগ্রামের সমস্ত হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনিই বিদ্রোহীদিগের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া সাধারণ তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিবেন স্থির ছিল। কিন্তু অতিরিক্ত আত্মসম্মান বোধের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি মধ্যে মধ্যে ভ্রান্ত

অভিমানে এরূপ অসঙ্গত কর্ম্ম করিয়া বসিতেন যে অপরের পক্ষে তাহার তাৎপর্য্য বুঝিয়া উঠা কঠিন হইয়া দাঁড়াইত। রীস সাহেব স্থির করিয়াছিলেন যে অক্টোবরের প্রথম মঙ্গলবারের রাত্রি ১টার সময়ে বিদ্রোহ আরম্ভ হইবে। স্থির ছিল যে

অ্যাডমিরেল রিস্।

তিনি ১টার কিছু পূর্ব্বে এক নৌকায় করিয়া কতিপয় সহচর সঙ্গে লইয়া বন্দরের 'সান্ রাফেল' নামে রণতরির উপর যাইবেন। পরে তথা হইতে এক দল বিদ্রোহী সঙ্গে লইয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া বিদ্রোহ আরম্ভ করিবেন। ইতিমধ্যে গবর্ণমেণ্ট ষড়যন্ত্রের সন্ধান পাইয়া পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হইতেছিলেন এবং বিদ্রোহীদের ব্যর্থ করিবার নানাবিধ আয়োজন করিতেছিলেন। গবর্ণমেণ্ট যদি কেবল আত্মরক্ষার চেষ্টা না করিয়া অঙ্কুরেই ইহাকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিতেন তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহাদের এত শীঘ্র এরূপ শোচনীয় পরাজয় হইত না। যাহা হউক বিদ্রোহের নির্দ্ধারিত সময়ের প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্বে নৌ-সচিব রণতরি-সমূহে টেলিগ্রাফ দ্বারা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন যে, আবশ্যক হইলে মুহূর্ত্তমধ্যে আক্রমণকারী শত্রুকে পরাজিত করিতে তাঁহারা প্রস্তুত কি না। এই অনুসন্ধান দেখিবামাত্র ষড়যন্ত্রীরা ভীত হইয়া পড়িল। তাহাদের ভয় হইল, বোধ হয় সকল কথা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের কৌশল ব্যর্থ হইয়াছে এবং বিদ্রোহের সম্ভাবনা একেবারেই নষ্ট হইয়াছে। আডমিরেল রীস কিন্তু কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। বার বার তিনি তাঁহার সহচরদিগকে নৌকাযোগে রণতরীতে যাইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মতে গবর্মেণ্ট সাবধান হওয়া সত্ত্বেও বিদ্রোহ ঘোষণা করাই তখন তাঁহাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। কিন্তু তাঁহার সহচরেরা দেখিলেন যে এরূপ স্থলে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে কার্য্যসিদ্ধি হওয়ার ত সম্ভাবনা নাইই, বিপদের সম্ভাবনা ও আশঙ্কাই প্রবল। এই ভাবিয়া শেষ মুহূর্ত্তে তাঁহারা তাঁহাদের এই কঠোর ব্রতসাধনে পশ্চাৎপদ হইলেন। আর বিলম্ব নাই! নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত! নৌকা অপেক্ষা করিতেছে, রণতরিতে দলবল আত্মদানের জন্য উৎসুক হইয়া দাঁড়াইয়া আছে! এমন সময়ে রাজধানী লিসবনের ষড়যন্ত্রীরা তাহাদের অধিনায়ককে উপেক্ষা করিল, ত্যাগ করিল! এই প্রকারে বিদ্রোহের প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হইল। এ অবস্থায় পরিণামে ব্যর্থতাই অবশ্যম্ভাবী! আডমিরেল রীস্ সমস্ত বিষয়ে স্বয়ং দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাঁহার আত্মসম্মানবোধ অতি প্রবল ছিল। তাঁহার মনে

ধারণা হইল যে তিনিই তাঁহার স্বদেশকে ও বন্ধুবর্গকে বিপদসাগরে ডুবাইলেন, সাধারণ তন্ত্র প্রতিষ্ঠার আশা সুদূর পরাহত করিলেন। এই সকল অমঙ্গলের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তিনি উন্মাদের ন্যায় হইয়া আত্মহত্যা করিলেন। তাঁহার এই অপ্রত্যাশিত মৃত্যুতে সকলেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। কে যে কি করিবে তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিল না, অনেকেই মনে করিল বিদ্রোহের সকল আশা ব্যর্থ হইল!

কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ এই সময়ে অন্যান্য অধিনায়ক আসিয়া উপস্থিত হইল। মেকাডো সান্টেস (Machado Santes) নামে এক নৌ-কর্ম্মচারী এই সময়ে অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও নেতৃত্বশক্তির পরিচয় দিলেন। তিনি প্রাণপণ চেষ্টায় আডমিরেল রীসের অভাব পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষিপ্রবেগে তিনি সৈনিকগণকে, সাধারণ প্রজা ও ছাত্রবৃন্দকে একত্রিত করিয়া বিদ্রোহীদলের সৈন্যরচনা করিলেন। রাজধানীর পথে পথে আত্মরক্ষার জন্য প্রাচীর গঠিত করিলেন। এই প্রতিভাবান পুরুষের প্রবল চেষ্টায় রীসের মৃত্যুর প্রায় ৪৫ মিনিট পরে বিদ্রোহীর কামান গর্জ্জিয়া উঠিল। সংগ্রামসচিব তখন কোমল শয্যায় নিদ্রাসুখ ভোগ করিতেছেন। প্রধানসচিব তখন নিশ্চেষ্ট হইয়া রাজপ্রাসাদে বসিয়া আছেন। রাজধানীর পথে পথে বিদ্রোহ জ্বলিয়া উঠিল। রাজপক্ষীয়েরাও সশস্ত্রে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। বিদ্রোহীদের অসম সাহস ও আত্মোৎসর্গের সম্মুখে তাঁহারা পদে পদে পরাজিত হইতে লাগিলেন। রাজা মানুয়েল সেই রাত্রেই রাজপরিবার লইয়া রাজধানী ত্যাগ করিয়া জিব্রালটারে পলাইলেন। দুই দিনের মধ্যেই একপ্রকার বিনা রক্তপাতে সাধারণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহা একটি অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার।

যুদ্ধের পরে সাধারণ-তন্ত্রীরা রাজপক্ষীয় সেনাপতি কন্‌সিরোকে (conciro) ডাকিয়া পাঠাইয়া বলিলেন রাজা যখন সিংহাসনত্যাগ করিয়াছেন তখন তাঁহার রাজপক্ষ ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। তিনি ঘৃণাভরে তাহাদের সে অনুরোধ উপেক্ষা করিলেন। রাজা যে সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছেন এ কথা তাঁহার কোনমতেই বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইল না। তিনি যে বিদ্রোহদমনে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন এই কথা স্বয়ং রাজাকে জানাইতে তিনি তৎক্ষণাৎ রাজপ্রাসাদে গেলেন। কিন্তু রাজা কোথায়! ক্ষোভে অন্ধ হইয়া বিদ্রোহীদের নেতৃসমীপে উপস্থিত হইয়া তিনি বলিলেন—"এখন আমি তোমাদের শাসন স্বীকার করিলাম এবং তোমাদের প্রজা হইতে প্রস্তুত হইলাম। কিন্তু আমি তোমাদের পক্ষ লইয়া অস্ত্রধারণ করিতে অক্ষম। আমি আমার সেনাপতিত্ব আজ হইতে ত্যাগ করিলাম।" এই সেনাপতির অস্ত্রত্যাগেই বিদ্রোহীদল পরিণামে জয়ী হইল।

পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে অল্পবয়স্ক রাজা মানুয়েল যেমন অপ্রত্যাশিতভাবে অকস্মাৎ সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, আজ তাহা হইতেও অধিক অকস্মাৎভাবে রাজ্যচ্যুত, সিংহাসনচ্যুত হইলেন। কালের খেলা এমনি দুর্ব্বোধ্য! এক রাত্রির মধ্যে রাজা ভিখারী!

এই প্রসঙ্গে ভারতের সহিত পর্ত্তুগালের সম্বন্ধ বিবরণ কিছু বলিলে বোধ হয় পাঠকের অপ্রীতিকর হইবে না।

আজ পর্ত্তুগাল ইয়ুরোপে এক প্রকার নগণ্য বলিলেও হয়। কিন্তু একদিন এই পর্ত্তুগালই বাণিজ্যব্যাপারে ও সাম্রাজ্য বিস্তারে ইয়ুরোপের অগ্রগণ্য ছিল। পর্ত্তুগাল নাবিকগণ প্রাচ্য জগতের যে কত দেশ ও দ্বীপ আবিষ্কার করেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। জলপথ দিয়া ভারতবর্ষে আসবার পথ সর্ব্ব প্রথম পর্ত্তুগালই বাহির করে। ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ নাবিক ভাস্কো ডি গামা যেদিন আফ্রিকার গুডহোপ অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া কালিকাটে (calicut) পদার্পণ করেন, সেই দিন হইতেই পৃথিবীর ইতিহাসে এক যুগান্তরের সূচনা হইল। তাহার পূর্ব্বে ভারত ও প্রাচ্য দেশের সহিত সমুদয় বাণিজ্যই আরবদিগের হস্তগত ছিল। এই বহুমূল্য বাণিজ্য হস্তগত করিবার উদ্দেশ্যেই ভারতবর্ষের পথ আবিষ্কৃত হয় এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ও আমেরিকাও সভ্যজগতের সহিত সংযুক্ত হয়। সে সময়ে পর্ত্তুগালের রাজার নাম ছিল এমানুয়েল (Emmanuel)। তাঁহাকে সকলেই সৌভাগ্যবান বলিয়া ডাকিত। কিন্তু তাঁহার প্রজাগণের এই সকল আবিষ্ক্রিয়ার সফলতা যে রাজসাহায্যে বা উৎসাহে সম্পন্ন হইয়াছিল এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষের জলপথ আবিষ্কার করিবার পর ভাস্কো ডি গামা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পরে পুনরায়—ভারতে আগমন করিয়া তিনি মালাবার তীরে একছত্র বাণিজ্যসত্ব লাভ করেন। ফ্রান্সিস্ (Francis at Almedia) ভারতে প্রথম পর্ত্তুগীজ রাজপ্রতিনিধি। ফ্রান্সিস ভাস্কোর বিজিত রাজ্যে অনেকগুলি কারখানা স্থাপিত করেন এবং সিংহল ও মালডিভ্ দ্বীপপুঞ্জ পর্ত্তুগালের সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। কিন্তু ভারতে পর্ত্তুগীজ শাসন কর্ত্তৃগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠপুরুষ ছিলেন আবুকার্ক (Albuquerqu) ১৫১০ খৃষ্টাব্দে গোয়া নগর অধিকারই তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। তাঁহার এই যুদ্ধজয়ের ফলে পর্ত্তুগালই পারস্য উপকূল হইতে জাপান পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাচ্য জগতের বাণিজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা রহিল, এবং প্রায় ৬০ বৎসর ধরিয়া পর্ত্তুগালের রাজাই আসিয়ার দক্ষিণ ভাগের সর্ব্বময় অধীশ্বর বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। আবুকার্কই সর্ব্বপ্রথম সুয়েজ পর্য্যন্ত রণপোত লইয়া অগ্রসর হন। এই বাণিজ্য পথটি তাঁহাদের জাতীয় সম্পত্তি করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। সেকালে পারস্য উপসাগরে আর্ম্মাজ নগর একটি প্রধান বাণিজ্য স্থান ছিল। আবু অনেক কষ্টে তাহা অধিকার করিলেন। কিন্তু তাঁহার খ্যাতি ও শক্তি দেখিয়া রাজদরবারে তাঁহার অনেকগুলি শত্রু জুটিয়াছিল। অরমাজ অধিকার করিয়া ফিরিতেছেন, এরূপ সময়ে গোয়া বন্দরের মুখে একখানি জাহাজ তাঁহাকে তাঁহার কর্ম্মচ্যুতির আদেশপত্র দান করিল। তিনি দেখিলেন তাঁহার একজন চিরশত্রু তাঁহার কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছে। এ অপমান তাঁহার সহ্য হইল না, তাঁহাকে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে হইল না,,, পথেই তাঁহার মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি তাঁহার রাজাকে একখানি পত্র লিখিয়া তাঁহার

শত্রুদিগের রটনা যে মিথ্যা তাহা প্রমাণ করিয়া যান এবং তাঁহার ন্যায়তঃ প্রাপ্য পুরস্কারাদি তাঁহার পুত্রকে দিতে অনুরোধ করেন। পত্র পাইয়া রাজার জ্ঞান হইল, কিন্তু তখন আর আবুকে ফিরিয়া পাইবার কোনও উপায় নাই। অগত্যা তাঁহার পুত্রকেই তিনি সম্মান ও সম্পদে ভূষিত করিলেন। আবুর প্রকৃতি উদ্ধত ও যথেচ্ছাচারী ছিল সত্য, কিন্তু তিনি এরূপ বীর এবং সুদক্ষ ও ন্যায়পরায়ণ শাসনকর্ত্তা ছিলেন যে তাঁহার মৃত্যুর পরে, হিন্দু মুসলমান তাঁহার সমাধি স্তম্ভের নিকটে গিয়া পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তাদিগের অত্যাচার হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিত।

যেদিন হইতে পর্ত্তুগাল স্পেন রাজ্যের অধীন হইল এবং স্পেনের সহিত অন্যান্য ইয়ুরোপীয়গণ যোগদান করিল সেই দিন হইতেই ভারতে তাহার শক্তির অধঃপতন আরম্ভ হইল। পর্ত্তুগালের শক্তি হ্রাসের আরম্ভেই ডাচেরা প্রাচ্যদেশের সহিত বাণিজ্য করিবার জন্য একটি কোম্পানি গঠিত করিল। ১৬০২ হইতে ১৬১০ সালের মধ্যে তাহারা পর্ত্তুগালের প্রাচ্য রাজ্যসমূহ প্রায় সবই অধিকার করিয়া লইল। ভারতে দুই চারটি ক্ষুদ্র স্থান ভিন্ন পর্ত্তুগালের আর কিছুই রহিল না। দক্ষিণ আফ্রিকা, সিংহল ও যবদ্বীপ সমস্তই ডাচেরা অধিকার করিল। পর্ত্তুগাল প্রথমে পথ দেখাইল বটে, কিন্তু পরে ক্রমে ক্রমে অন্যান্য জাতিরা আসিয়া একে একে ভারতে আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিল। ১৬০০ সালে ইংরাজ, ১৬০৪ সালে ফরাসী ও ১৬১২ সালে দীনেমারেরা আসিল। আজিও গোয়া ও যে দু' চারিটি ক্ষুদ্র স্থানে পর্ত্তুগাল উপনিবেশ আছে সে সকল স্থানেও সাধারণ তন্ত্রের অধীনে এখন স্বায়ত্ত শাসন স্থাপিত হইতে চলিল।

পৃথিবীর ইতিহাস।

বাঙ্গালা সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন, শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় "পৃথিবীর ইতিহাস" সঙ্কলনে উদ্যোগী হইয়াছেন। আমরা এগ্রন্থখানি পাঠ করিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়াছিলাম। এক্ষণে "পৃথিবীর ইতিহাস" গ্রন্থের প্রথম খণ্ড-ভারতবর্ষ প্রকাশিত হইয়াছে। এই খণ্ডে প্রাচীন ভারতবর্ষ আখ্যায়, বেদ চতুষ্টয়, ষড়্‌বেদাঙ্গ, ষড়্‌দর্শন, পুরাণ, তন্ত্র, প্রভৃতি বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা বাঁধাই কাগজ প্রভৃতি দিব্য পরিপাটি। গ্রন্থকার সূচনায় বলিয়াছেন, "এই পৃথিবীর ইতিহাস এক বিরাট কল্পনা। অন্যূন ত্রিংশ খণ্ডে সম্পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা। * * পৃথিবীর সকলদেশের সর্ব্ববিধ জ্ঞাতব্য তত্ত্ব বাঙ্গালা ভাষার এই পৃথিবীর ইতিহাসে সন্নিবিষ্ট করিব।" বর্ত্তমান খণ্ড এই সুবিরাট গ্রন্থের ভূমিকা মাত্র।

একের চেষ্টায় এ ব্রত-উদ্যাপন হওয়া দুরূহ ব্যাপার। বিষয়টি যেমন গুরুতর এবং বিশাল, তাহাতে বিশেষজ্ঞগণের সম্মিলিত চেষ্টা এতৎপ্রতি প্রযুক্ত হইলে সমগ্র বিশ্বের সাহিত্যে

"পৃথিবীর ইতিহাস" এক অভিনব সম্পদ স্বরূপ হইবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। সম্ভবতঃ, দুর্গাদাস বাবু এরূপ আয়োজনে ত্রুটি করেন নাই।

আলোচ্য খণ্ড পাঠ করিয়া আমরা গ্রন্থকারের অনুসন্ধিৎসা, পাঠানুরাগ, ও সুগভীর জ্ঞানের প্রভূত পরিচয় পাইয়াছি। অদ্ভুত তাঁহার তত্ত্বসংগ্রহশক্তি, অপূর্ব্ব তাঁহার সরল বিবৃতিভঙ্গী! এক-একটি বিষয়ের পূর্ণ আলোচনা করিয়া তবে অপর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ এইগ্রন্থ পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকগণকে নূতন পথ দেখাইবে, একথা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি। বিষয়ের প্রভূত ও অসীমতার কথা

শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী।

ভাবিয়া দেখিলে, গ্রন্থকারের সহিত স্থানে স্থানে মতভেদ হওয়া বিচিত্র নহে, বরং তাহা একান্ত স্বাভাবিক। তবে গ্রন্থকারের যুক্তি পরম্পরাও নিতান্ত উপেক্ষনীয় নহে। এই টুকুই ইহার বিশেষত্ব। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আরো মুগ্ধ হইয়াছি আমরা গ্রন্থকারের বিনয় সন্দর্শনে! গ্রন্থকার স্পষ্টই বলিয়াছেন, "আমি যদি কোন নূতন সিদ্ধান্তে উপনীত হই, পাঠকমাত্রকেই যে তাহা মানিয়া লইতে হইবে, সেরূপ স্পর্দ্ধা সেরূপ উদ্দেশ্য আমার

আদৌ নাই।" তিনি শুধু ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রচলিত সাধারণ মত পরম্পরার পরিচয় দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন; অর্থাৎ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষীগণ কোন্ বিষয় কিভাবে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন তাহারি আভাষমাত্র দিয়াছেন; প্রাচীন বিষয়ের আলোচনায় প্রধানতঃ শাস্ত্র মতেরই তিনি অনুসরণ করিয়াছেন।

আরো দুই চারি খণ্ড না দেখিলে গ্রন্থের প্রকৃত মূল্য সম্বন্ধে আমরা স্পষ্ট কিছু ধারণা করিতে পারিতেছি না, তথাপি এইটুকু বলিতে পারি "পৃথিবীর ইতিহাস" বাঙ্গালা লাইব্রেরীটিকে অপূর্ব্ব শোভায় ভূষিত করিবে! যে বয়সে সকলে বিশ্রামের জন্য লালায়িত হয়েন, দুর্গাদাস বাবু সেই বয়সে এই মহাব্রত সাধনে উদ্যোগী হইয়াছেন, তাঁহার এ অধ্যবসায় ও জ্ঞানচর্চ্চা সকলের পক্ষে অনুকরণীয়! তাঁহার সাধু সঙ্কল্প সফল হউক, বঙ্গভাষা ধন্য হইবে! গ্রন্থের দুই একটি ছোটখাট ত্রুটি আমাদিগের চোখে পড়িয়াছে তৎপ্রতি গ্রন্থকারের মনোযোগ আমরা সবিনয়ে আকর্ষণ করিতেছি। মাঝে মাঝে একদেশদর্শিতা এবং ব্যক্তিগত উচ্ছাসের প্রাবল্য ঘটিয়াছে। ঐতিহাসিককে রীতিমত উদার ও সমদর্শী হইতে হইবে, ব্যক্তি বা জাতিধর্ম্মগত পক্ষপাতিত্বে ইতিহাসের মর্য্যাদা ক্ষুন্ন হয় একথা প্রবীণ গ্রন্থকার মহাশয়কে নূতন করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না। তবে স্বজাতি বা স্বদেশের গৌরব স্মরণে ভাবের রশ্মি ঈষৎ চঞ্চল হইয়া পড়া সম্ভব ও স্বাভাবিক। তাই বিশেষ করিয়াই কথাটির উল্লেখ করিলাম। পরিশেষে সাহিত্যানুরাগী, বঙ্গীয় ভূম্যধিকারীগণের আদর্শস্থানীয় দানশীল, মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয় এই খণ্ডের ব্যয়ভার সম্পূর্ণতঃ গ্রহণ করিয়া প্রকৃত গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। এজন্য সাধারণের তরফ হইতে তাঁহাকে আমরা বিশেষভাবে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

অনারেবল মিষ্টার সায়েদ আলি ইমাম।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় ভারতের ব্যবস্থাসচিবের পদ ত্যাগ করায় লর্ড মিণ্টো ও লর্ড মর্লি মাননীয় আলি ইমামকে উক্ত পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। ইঁহার এই নিয়োগে আমরা আন্তরিক সুখী হইয়াছি। মুসলমান সমাজ ভারতে হিন্দু সমাজের পরেই, সুতরাং এবার মুসলমান সমাজ হইতে এই পদের জন্য লোক নির্ব্বাচিত হওয়াতে মুসলমানদের স্বাভাবিক অধিকারকে স্বীকার করাই হইয়াছে। তা ছাড়া মিষ্টার আলি ইমাম মুসলমান সমাজের মধ্যে একজন শিক্ষিত ও যোগ্য ব্যক্তি সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইঁহার পরিবারের সকলেই বংশানুক্রমে মুসলমান সমাজের মধ্যে শিক্ষা ও পদে উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আসিতেছেন। ইঁহার ভ্রাতা আমাদের জাতীয় মহাসমিতির একজন প্রধান সভ্য ও সহায়। তাঁহার শিক্ষা ও উদারতার বিষয় আমরা সকলেই

জানি। মিষ্টার আলি ইমামের প্রতিভার বা শাসন-শক্তির কোন বিশেষ পরিচয় আমরা এখনও পাই নাই সত্য, কিন্তু

তিনি যে এই কঠিন কর্ত্তব্য ভার গ্রহণ করিয়া সকলের শ্রদ্ধা ও প্রশংসালাভে সমর্থ হইবেন এরূপ আশা করা যাইতে

অনারেবল মিষ্টার সায়েদ আলি ইমাম।

পারে। ইনি পূর্ব্বে বাঁকিপুরে ব্যারিষ্টারি করিতেন। তখন ইঁহার পরিচয় আমরা বড় একটা জানিতাম না। পরে 'মোসলেম-লিগ' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতেই আমাদের তাঁহার সহিত প্রথম পরিচয় হয়। এখন তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে গবর্ণমেণ্টের ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল পদে অধিষ্ঠিত।

এরূপ পদ হইতে কাউন্সিলের মেম্বর পদ প্রাপ্তি এদেশে নিতান্ত বিরল। কিন্তু ইহা আমাদের সৌভাগ্যই বলিতে হইবে। কেননা এখানে গুণেরই আদর প্রকাশ পাইতেছে। সর্ব্বক্ষেত্রে সর্ব্বতোভাবে গুণের সমাদরই যথার্থ পক্ষে দেশের পক্ষে প্রল্যাণপ্রদ। এই প্রসঙ্গে একটা কথা কর্ত্তৃপক্ষকে বলা আমরা সঙ্গত বিবেচনা করি। বিলাত হইতে যখন বিলাতী সচিব নিযুক্ত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল তখন তাঁহার ব্যারিষ্টার হওয়া আবশ্যক বলিয়া স্থির হইয়াছিল। ভারত হইতে ভারতবাসী যখন এই কর্ম্মে নিযুক্ত হইবেন বলিয়া স্থির হইয়াছে তখন—কি ব্যারিষ্টার কি প্লিডার যোগ্যতানুসারে আইন ব্যবসায়ী মাত্রেরই এ পদ লাভে অধিকার থাকা আবশ্যক। শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ, শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ, শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, মাননীয় শামসুল হুদা ইত্যাদি প্রতিভাবান লোকেরা যে আইন বিষয়ে ব্যারিষ্টার অপেক্ষা অজ্ঞ বা ব্যবস্থাসচিবের কর্ম্মের পক্ষে অনুপযুক্ত এ কথা কোন মতেই বলা যাইতে পারে না। গুণের যথার্থ আদর করিতে হইলে কোন গণ্ডী বিশেষের মধ্যে অন্বেষণ করা ঠিক সঙ্গত নহে। আমরা আশা করি গবর্ণমেণ্ট যোগ্যতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বেড়া যাহাতে শীঘ্র ভাঙ্গিয়া যায় সে বিষয়ে চেষ্টা করিবেন।

কবি রজনীকান্ত সেন।

পাবনা সম্মিলনীর বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

রজনীকান্তের ক্ষুদ্র জীবন কেবলমাত্র ৪৪ বৎসরের সমষ্টিমাত্র। এই অনতিদীর্ঘ জীবনের মধ্যে তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত এমন ভাবে জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন যে তাঁহার বিচ্ছেদ আমাদের সাহিত্যের পক্ষে গুরুতর ক্ষোভের বিষয়।

১২৭২ সালের ১৭ই শ্রাবণ সিরাজগঞ্জের অন্তর্গত ভাঙ্গাবাড়ী গ্রামে রজনীকান্ত জন্ম গ্রহণ করেন। কর্ত্তব্যপরায়ণ পিতার সস্নেহপালনে তাঁহার কিশোর জীবন বিকশিত হইয়া উঠে। পুত্রের শারীরিক ও মানসিক উন্নতির দিকে এই পিতার অনলস সতর্ক দৃষ্টি দেবতার শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদের ন্যায় কার্য্য করিয়া আসিয়াছে। বালক রজনীকান্ত অটুট স্বাস্থ্যের প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। ব্যায়ামের প্রদর্শনীতে প্রত্যেকবারই তিনি প্রথম অথবা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতেন। পুরস্কারও কোনবার ফাঁক যায় নাই। আর তাঁহার মানসিক উন্নতি সম্বন্ধে বঙ্গীয় পাঠকের নিকট আমাকে বিশেষ করিয়া কিছু বলিতে হইবে

না,—তাঁহার বাণী, কল্যাণী এবং অন্যান্য কবিতাই সে বিষয়ের শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

রজনীকান্তের পিতা গুরুপ্রসাদ দুর্লভ কবিত্ব সম্পদের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার "পদচিন্তা মণিমালা" একখানি সুবৃহৎ কাব্য গ্রন্থ। ভাবে এবং ভাষায়, সরস করিত্বে এবং ভক্তি-প্রগাঢ়তায় তাহা বৈষ্ণব কবিদিগের অতুলনীয় গানগুলির মতই কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করে। রজনীকান্তের এই অমর কবিত্ব—স্নেহাতুর জনকের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ দান।

কান্ত কবির বিশেষত্ব এই যে, তাঁহার কবিতা বিশেষজ্ঞ এবং সাধারণ,ভক্ত এবং রসিক সকলেরই সমান উপভোগ্য—সকলেরই সমান আদরের বস্তু। একদিকে যেমন তাঁহার "তব চরণ নিম্নে উৎসবময়ী শ্যাম ধরণী সরসা" প্রভৃতি গান উচ্চাঙ্গের দার্শনিক তথ্যের অবতারণা করিয়া শিক্ষিত সমাজকে মুগ্ধ করিয়া ফেলে অন্য দিকে আবার তেমনি "এস এস কাছে, দূরে কি গো সাজে" প্রভৃতি গান সাধারণের ভিতর কোমল স্পর্শে আনন্দের শতদল পদ্মকে বিকশিত করিয়া তোলে। একদিকে যেমন "আমিত তোমারে চাহিনি জীবনে, তুমি অভাগারে চেয়েছ" ভক্তের চক্ষু হইতে বিহ্বল আবেশের ধারা-প্রবাহ উৎসারিত করিয়া দেয়, অন্যদিকে আবার তেমনি "যদি কুমড়োর মত হতো পাশিতোয়া" মূর্ত্তিমান রহস্যের হাস্যরসপ্রিয় শ্রোতার মুখের উপর অট্টহাস্যের তরঙ্গ রেখা পরিস্ফুট করিয়া তোলে। শতদীপপুলকিত প্রাসাদে তাঁহার সঙ্গীতসমূহ যেমন দেয়ালে বাধিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া ফিরিয়া আসে তেমনি আবার রৌদ্র দগ্ধ প্রান্তরে, "পাখী ডাকা, ছায়ায় ঢাকা পল্লীবাটে" তাঁহারই গীতাবলী গগন পবন পূর্ণ করিয়া দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়ে।

চরিত্রের দিক দিয়াও তাঁহাকে দেখিতে গেলে মুগ্ধ না হইয়া থাকা যায় না। ছোট বড়, ধনী দরিদ্র সকলকেই তিনি স্বভাবসিদ্ধ স্নিগ্ধহাস্যে এবং মধুর বাক্যে পরিতুষ্ট রাখিতেন। তাঁহার গান ব্যক্তি বিশেষের অনুরোধের অপেক্ষা রাখিত না। যে কেহ ধরিলেই কল্লোলময়ী নির্ঝরিণীর মত তাহা নামিয়া আসিত।—নিদাঘের ধারাপাতের ন্যায় হৃদয়ের সমস্ত গ্লানি ধৌত করিয়া নির্ম্মল করিয়া দিত। সঙ্গীতে তাহার ক্ষমতাও এমন অদ্ভুত ছিল যে তিন, চারি ঘণ্টা অবিশ্রান্ত কণ্ঠ পরিচালনার পরও কেহ তাঁহাকে ক্লান্তির নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখে নাই। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অসাধারণ ছিল তাঁহার বাক্ পটুতা এবং পরিহাস করিবার ক্ষমতা। তাঁহার উপহাসের ভিতরেও এমন একটা ঋজুতা এবং স্বাভাবিক স্নিগ্ধতা ছিল যাহা কোনো মানুষকেই আঘাত করিতে জানিত না—অথচ সরল সুন্দর হাস্যে সকলকেই উৎফুল্ল করিয়া তুলিত।

হিন্দু বলিলে যাহা বুঝায় রজনীকান্ত তাহাই ছিলেন। তিনি হিন্দু ধর্ম্মকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিতেন কিন্তু গোঁড়ামিকে কখনো প্রশ্রয় দেন নাই। বরং সমাজকে এজন্য তীব্রকণ্ঠে শাসন করিতে তিনি কোন দিন বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠানুভব করেন নাই। সমাজ সম্বন্ধীয় কবিতাগুলির আলোচনা করিলে—

আমাদের এই অধঃপতিত সমাজের জন্য তাঁহার চক্ষুতে যে অশ্রুর অভাব ছিল না তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। কবিতা হিসাবে সেগুলির স্থান খুব উচ্চে না হইতে পারে—ভাবের নূতনত্বে, চিন্তার বিশালতায় তাহা পরিণত মস্তিষ্কের উপযুক্ত না-ও হইতে পারে কিন্তু তাই বলিয়া বাঙ্গলার জাতীয় সাহিত্য এগুলিকে কখনও উপেক্ষা করিতে পারিবে না।

নবযুগের পুণ্য মন্ত্রে নির্জ্জীব বাঙ্গালা যে দিন সজীব ও চঞ্চল হইয়া উঠিল সেদিনও তাহাতে রজনীকান্তের কৃতিত্ব বা প্রভাব কম ছিল না। নিত্য নূতন সঙ্গীতে তিনি মাতৃপূজার অর্ঘ্য রচনা করিয়া দিতেন আর সমগ্র বঙ্গদেশ তাঁহারই কণ্ঠের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া সেই তীব্রতাহীন খাঁটি স্বদেশী উপহারে মাতৃচরণ অর্চ্চনা করিত। জীবনের শেষ মুহূর্ত্তেও কবি তাঁহার দেশ মাতাকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। একনিষ্ঠ পূজক যেমন মৃত্যু কালে তাহার পাথরের ঠাকুরকে বিশ্বস্ত হস্তে সঁপিয়া যায় রজনীকান্তও তেমনি করিয়া মৃত্যুর পূর্ব্বে যথার্থ—উপযুক্ত সন্তানের হাতে তাঁহার দেশমাতাকে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুবিবর্ণ কবির "কুমার, করুণা-নিধে, দেখো র'ল দেশ"—এ প্রার্থনা ভক্তের প্রার্থনা—সাধকের প্রার্থনা—একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না।

দীর্ঘদিন হইতে কান্ত কবি ক্যান্সার রোগে ভুগিতেছিলেন। এই রোগই তাঁহাকে আমাদের ভিতর হইতে কাড়িয়া লইয়া তিল তিল করিয়া মৃত্যুর মুখে তুলিয়া দিয়াছে। প্রায় ছয় মাস পূর্ব্বে তাঁহার নাক দিয়া নিশ্বাস লইবার ক্ষমতা রুদ্ধ হইয়া যায়। গলায় অস্ত্র করিয়া কৃত্রিম উপায়ে তাঁহাকে এতদিন জীবিত রাখা হইয়াছিল। তাঁহার চিরমুখর কণ্ঠ সেই দিন হইতেই চিরনির্ব্বাক। আর গত ২৮শে ভাদ্র রাত্রি ৮—৩০ মিনিটের সময় তাঁহার বুকের স্পন্দনও চিরদিনের জন্য থামিয়া গিয়াছে। অনাহারই কান্ত কবির জীবন নাটকের শেষ অঙ্কের যবনিকা এত সত্বর টানিয়া দিয়াছে।

কবি তাঁহার জীবনের শেষ অঙ্কে, অমৃত আনন্দময়ী, অভয়া এবং বিশ্রাম এই পুষ্প চতুষ্টয়ে তাহার চিরারাধ্যা বীণাপাণির পূজার শেষ অর্ঘ্যরচনা করিয়া গিয়াছেন।—যে মায়ের সাধনায় তাঁহার সমস্ত জীবন ব্যয়িত হইয়াছে সেই মায়ের পূজা করিতে করিতেই তিনি মায়ের কোলে মিশিয়া গিয়াছেন।

বাঙ্গালীর গীতি কবিতায় রজনীকান্তের স্থান কোথায় তাহা নির্দ্দেশের সময় এখনও আসে নাই। কবে আসিবে আমরা তাহাও বলিতে পারি না। আমাদের শোকসন্তপ্ত হৃদয় কেবল এই মাত্র বলিতে পারে যে, তিনি আমাদের কবি—সমাজের কবি—বাঙ্গলার কবি ছিলেন—তিনি যেখানেই থাকুন সেখান হইতেই আমাদের ভক্তি প্রীতি ভালবাসার অর্ঘ্য গ্রহণ করিবেন।

"Thy thoughts, when thou art gone,
Love itself shall slumber on."

তুমিও যবে মরিবে তবে আমাদের এবুকে
চিরাভিনব স্মৃতিটি তব ঘুমায়ে র'বে সুখে।

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়।

সমালোচনা।

পারস্য উপন্যাস। (গার্হস্থ্য সংস্করণ) শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেস ও কলিকাতা ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। মূল্য বারো আনা। বটতলার দুর্দ্দশাপন্ন অবস্থ পারস্য উপন্যাস ভদ্র সমাজের অযোগ্য ছিল সে অভাব দূর করিবার জন্য এই নির্দ্দোষ সর্ব্বজনপাঠ্য ও সুমুদ্রিত গার্হস্থ্য সংস্করণের আবির্ভাব। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। ইহাতে কবিত্ব রস কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই—সুরুচিও সর্ব্বত্র সুরক্ষিত হইয়াছে। বালকবালিকাগণের হস্তে অসঙ্কোচে উপহার দেওয়া যায়। গ্রন্থখানিকে সর্ব্বতোভাবে রমণীয় করিবার উদ্দেশ্যে ইহাতে আটখানি সুন্দর চিত্র সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে তন্মধ্যে একখানি তিনবর্ণে মুদ্রিত। চিত্রের পরিকল্পনা রমণীয়। গ্রন্থের সুন্দর বাঁধাই, সুন্দর ছাপা, সুন্দর কাগজ। সে হিসাবে মূল্য বেশ সুলভই হইয়াছে।

রবিন্সন ক্রুশো। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ কর্ত্তৃক অনূদিত। এলাহাবাদে ইণ্ডিয়ান প্রেস ও কলিকাতা ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা চারি আনা মাত্র। ডিফো রচিত রবিন্সন ক্রুশো ইংরাজ বালকবালিকার নিকট বিশেষ আদরের সামগ্রী। এমন কৌতুহলপূর্ণ শিশুপাঠ্যগ্রন্থ জগতের সাহিত্যে অল্পই আছে। চারুবাবু সেই গ্রন্থের এমন সুন্দর সমগ্র বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের সম্পদ সবিশেষ বর্দ্ধিত করিয়াছেন। অনুবাদে কোন অংশ বাদ পড়ে নাই। ভাষা দিব্য লঘু ও সরল, কোথাও এতটুকু বাধাবন্ধ নাই। মূলের সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ আছে বলিয়াই আমাদিগের ধারণা। বহিখানি আবালবৃদ্ধবনিতার পক্ষে যে উপাদেয় হইয়াছে তাহার একটি প্রমাণ, সমালোচ্য গ্রন্থখানি বহুদিন বহুপাঠকপাঠিকার হাতে ফিরিয়া তবে সমালোচকের হাতে পড়িয়াছে গ্রন্থে অনেকগুলি চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পুরস্কারযোগ্য ও শিশুপাঠ্য গ্রন্থ তালিকায় রবিন্সন ক্রুশো উচ্চ স্থান পাইবার যোগ্য।

জোলেখা। শ্রীআবদুল লতিফ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। হিতবাদী প্রেসে মুদ্রিত। হিতবাদী লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা মাত্র। "বাইবেলের পুরাতন নিয়মাবলী" ও কোরাণ শরিফের দ্বাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত ধর্ম্মাত্মা ইউসফের জীবন কাহিনী অবলম্বনে কবি জামি কাব্য রচনা করেন—আলোচ্য গ্রন্থখানি তাহারই বঙ্গানুবাদ। উপাখ্যানে শিক্ষার সহিত রোমান্সের সুন্দর সমন্বয় আছে। তবে অনুবাদকের রচনায় রোমান্সের রসটুকু ভালো ফুটে নাই। অনুবাদের ভাষা প্রাঞ্জল কিন্তু উচ্ছ্বাসের ঘটা কিছু অতিরিক্ত, তজ্জন্য স্থানে স্থানে একঘেয়ে হইয়া পড়িয়াছে। এ ত্রুটি সত্ত্বেও গ্রন্থখানি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। লেখকের উদ্যম প্রশংসনীয়।

শিশির। শ্রীমতী হেমন্তবালা দত্ত প্রণীত। চট্টগ্রাম শ্রীশ্রীগৌরীশঙ্কর লাইব্রেরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা হিতবাদী প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা মাত্র। এখানি ক্ষুদ্র কবিতাগ্রন্থ। তেমন বিশেষত্ব কিছুই নাই।

জাপান। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং, ২০৩।৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দেড় টাকামাত্র। গ্রন্থকার সার্দ্ধ চারিবৎসরকাল জাপানে শিক্ষাসৌকর্য্যার্থ বাস করিয়াছিলেন। সেখানে অনেক ভদ্র পরিবারের সহিত মিশিবার পক্ষে তাঁহার সুযোগ ঘটিয়াছিল—সেইহেতু তাঁহাদের পারিবারিক জীবন রীতিনীতি জাপানী সমাজ প্রভৃতি রীতিমত দেখিবারও অবসর মিলিয়াছিল। গ্রন্থখানিতে জাপানের রাজধানী, সমাজ, শিক্ষা, জাপানী চরিত্রের বিশেষত্ব প্রভৃতি বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। লেখক বেশ হৃদয় দিয়া আগাগোড়া বর্ণনা করিয়াছেন। দেখিবার শক্তিও তাঁহার সাধারণের মত নহে।

উপন্যাসের মত গ্রন্থখানি সুখপাঠ্য। গ্রন্থের ছাপা কাগজ মলাট প্রভৃতি অত্যুৎকৃষ্ট। সর্ব্বসমেত ৪৩ খানি চিত্রে পরিশোভিত। চিত্রগুলিরও বিশেষ মূল্য আছে। কারণ তাহা হইতে লেখকের বক্তব্য প্রস্ফুটতর হইয়াছে। ভাষাটুকু সরল, কিন্তু মাঝে মাঝে সংস্কৃত ও প্রাকৃতের মিশ্রণে সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়াছে।

আদর্শ রমণী। মৌলবী শেখ আবদুল জব্বার প্রণীত। ঢাকা আশুতোষ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা মাত্র। সখিনাখাতুন, জোবায়দা খাতুন, দেবী রাবিয়া, সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহল প্রভৃতি কয়েকটি আদর্শ রমণীর কাহিনী লইয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচিত। লেখকের ভাষাটুকু সরল ও মিষ্ট; রচনার বেশ একটি আকর্ষণী শক্তি আছে। মুসলমান লেখকের এমন রচনাকুশলতা আমরা অল্পই দেখিয়াছি। গ্রন্থখানি হিন্দু মুসলমান সকলের নিকটই আদর পাইবার যোগ্য। মুসলমান মহিলাগণের ত অবশ্য পাঠ্য।

মদিনা-শরীফের ইতিহাস। মৌলবী শেখ আবদুল জব্বার প্রণীত। মূল্য এক টাকামাত্র। গ্রন্থের ভাষা সরল প্রাঞ্জল। ইসলাম জগতের বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ এই গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া গ্রন্থকার মুসলমান ও হিন্দু উভয় সমাজেরই ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন।

শুক্লা। শ্রীযুক্ত সুখরঞ্জন রায় বি, এ প্রণীত। কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দশ আনা। এখানি কাব্যগ্রন্থ। অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। উপাখ্যানে কোন বিশেষত্ব নাই। খণ্ডকাব্য রচনায় লেখকের প্রয়াস ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়াই আমাদিগের ধারণা। ভাষা ও ছন্দ অত্যন্ত জটিল; ভাবও আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।

পুণ্যের জয়। শ্রীসুধাকৃষ্ণ বাগচি প্রণীত। মূল্য এক টাকা। গ্রন্থখানির প্রশংসা করিতে পারিলাম না।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

প্রাপ্তি স্বীকার।

আমরা পূজার সময় সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণের নিকট শিল্পসমিতির বিধবাশ্রমের সাহায্যে ভিক্ষা প্রার্থনা করি। মহিলাগণ অনেকেই যেরূপ আন্তরিক সহানুভূতিপূর্ণ ভাবে এই আবেদন রক্ষা করিয়াছেন—তাহাতে আমাদের আনন্দের সীমা নাই। প্রকৃত পক্ষে এ কাজ আমাদের দুই একটি মহিলার কাজ নহে, ইহা সমগ্র বঙ্গরমণীরই কাজ। তাই এই আহ্বানে, তাঁহাদিগকে সাড়া দিতে দেখিয়া আমাদের হৃদয় এত আনন্দগর্ব্বে স্ফীত। আমরা বুঝিতেছি আমাদের ব্রত নিষ্ফল হইবে না,—বঙ্গের অভাগিনী ভগিনীদিগের দুঃখাশ্রু মুছাইতে সমগ্র ভাগ্যশ্রীলা রমণী সস্নেহে অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইবেন। এ আশা যে দুরাশা নহে তাহা শ্রীমতী জ্ঞানদাবালার নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি হইতে সকলে বুঝিবেন।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

বিহিত প্রণাম পুরঃসর নিবেদন মিদং

আপনি যে মহদুদ্দেশ্যে আপনার আশ্বিনের ভারতীতে ৺ পূজার ভিক্ষা চাহিয়াছিলেন কয়েকটী কারণে ঐ সদুদ্দেশ্য আমার সংসারমগ্ন চিত্তকে প্রবলভাবে স্পর্শ করিয়াছিল। তাই আপনার বৃহৎ ভিক্ষাঝুলির আদর্শে নিজে একটী সামান্য রকম ভিক্ষাঝুলি লইয়া যৎকিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়াছি। এই সংগ্রহ কার্য্যে প্রধানতঃ যে কয়েকজন ভদ্রমহিলা আমাকে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের নাম এই সঙ্গে পাঠাইলাম। আনন্দের বিষয় এই যে, ইঁহাদের সকলেই আপনাদের সমিতির বিষয় শুনিয়া আন্তরিক আগ্রহে ও অসঙ্কোচে যথাসাধ্য অর্থসাহায্য করিয়াছেন। বেশ মনে হয়

যে আমার অপেক্ষা বেশী সামর্থ্য, বিদ্যাবত্তা ও অবসর যাঁহার আছে তিনি এই সংগ্রহ কার্য্যে নিয়োজিত হইলে সিমলা পাহাড়ের বাঙ্গালী মহিলাদের নিকট আরও বেশী চাঁদা উঠিত। * * *

যে কয়েকটী কারণে আপনার ভিক্ষা প্রার্থনা আমাকে বিচলিত করিয়াছে তাহার একটি এখানে ব্যক্ত করা আবশ্যক মনে করি। হিন্দু বিধবার সাংসারিক দুর্দ্দশা দেখিয়া আজকাল অনেক সুশিক্ষিত লোক সমাজের উচ্চস্তরে পর্য্যন্ত বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন; ইঁহারা বোধহয় অনুভব করেন নাই অবিকৃতস্বভাব হিন্দু-মহিলার নিকট বিধবার ব্রহ্মচর্য্যরূপ প্রাচীন সুমহান্ আদর্শ কতদূর সম্মান ও আদরের বস্তু। * * এই সঙ্কট সময়ে আপনার হিন্দু-বিধবাশ্রম বিধবার আর্থিক অসহায়তা দূর করিবার প্রয়াসী হইয়া সমস্ত হিন্দুনারী সমাজের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছে। * * *

ইতি কার্ত্তিক সন ১৩১৭ সাল।

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষিনী—মিত্রজায়া জ্ঞানদাবালা।

শ্রীমতী উষা দেবী,	সিমলাপাহাড়	১০৲
" সরলা দেবী বি, এ,	ঐ	৫৲
" শরৎসুন্দরী মিত্র,	ঐ	৫৲
" জ্ঞানদাবালা মিত্র,	ঐ	৫৲
" নীরদবালা দেবী,	ঐ	৪৲
" সরযূবালা দাসী,	ঐ	৪৲
" গোপাঙ্গনা দাসী,	ঐ	২৲
" গোলাপসুন্দরী সিংহ,	ঐ	২৲
" কুমুদিনী দেবী,	ঐ	২৲
" গঙ্গা দেবী,	ঐ	২৲
" প্রেমবালা মজুমদার,	ঐ	২৲
" লতিকা ঘোষ,	ঐ	২৲
" বিষ্ণুপ্রিয়া বসু,	ঐ	১৲
" নগেন্দ্রবালা দেবী,	ঐ	১৲
" প্রকাশনলিনী মিত্র,	ঐ	১৲
" হেমলতা রায়,	ঐ	১৲
" নিত্যকুমারী দেবী,	ঐ	১৲
" মাধুরীবালা দত্ত,	ঐ	১৲
" হরকুমারী দেবী,	ঐ	১৲
" মৃণালিনী ঘোষ,	ঐ	১৲
" ভবানী সুন্দরী দেবী,	ঐ	১৲
" প্রীতিময়ী ঘোষ,	ঐ	১৲
" মণিবালা দে,	ঐ	১৲
" মৃণালিনী বসু,	ঐ	১৲
" তুষারবালা সরকার,	ঐ	১৲
" নবনলিনী সরকার,	ঐ	১৲
" নলিনীবালা দেবী,	ঐ	১৲
" নির্ম্মলাবালা দেবী,	ঐ	১৲
" নীহারিকা দেবী,	ঐ	১৲
" চারুবালা ঘোষ,	ঐ	১৲
" অমূল্যসুন্দরী দত্ত,	ঐ	১৲
মিসেস্ কে, পি, দে,	ঐ	১৲
শ্রীমতী মোহিনী বালা গাঙ্গুলী,	ঐ	॥০
" নবকুমারী দেবী,	ঐ	॥০
" সরযূবালা দেবী,	ঐ	॥০
" সুশীলাবালা ঘোষ,	ঐ	॥০
" দুর্গা দেবী,	ঐ	॥০
" নীলনলিনী দেবী,	ঐ	॥০
" গোপেশ্বরী ঘোষ,	ঐ	॥০
মিসেস্ বিনোদদাস,	সিলেট	১৲
শ্রীমতী হেমনলিনী সেন,	পাটনা	১৲
মিসেস্ গিরীন্দ্রনাথ সেন,	কলিকাতা	২৲
মিসেস্ ওদেদার,	লক্ষ্ণৌ	১০৲
শ্রীমতী কনকলতা রায়,	ঐ	৫৲
" কমলা গুহ ওদেদার,	ঐ	৩৲
কুমারী অমিয়লতা গুহ ওদেদার,	ঐ	২৲
শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী,	শিলং	১৲
মিসেস্ শরৎচন্দ্র বাগচী,	কলিকাতা	২৲
শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী,	কাশীধাম	১৲
শ্রীশৈলজানাথ চক্রবর্ত্তী	আশুগঞ্জ, ত্রিপুরা	২৲
বাবু যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,	দেবগ্রাম	১৲
		৯৯॥০

কলিকাতা, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৪৪, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

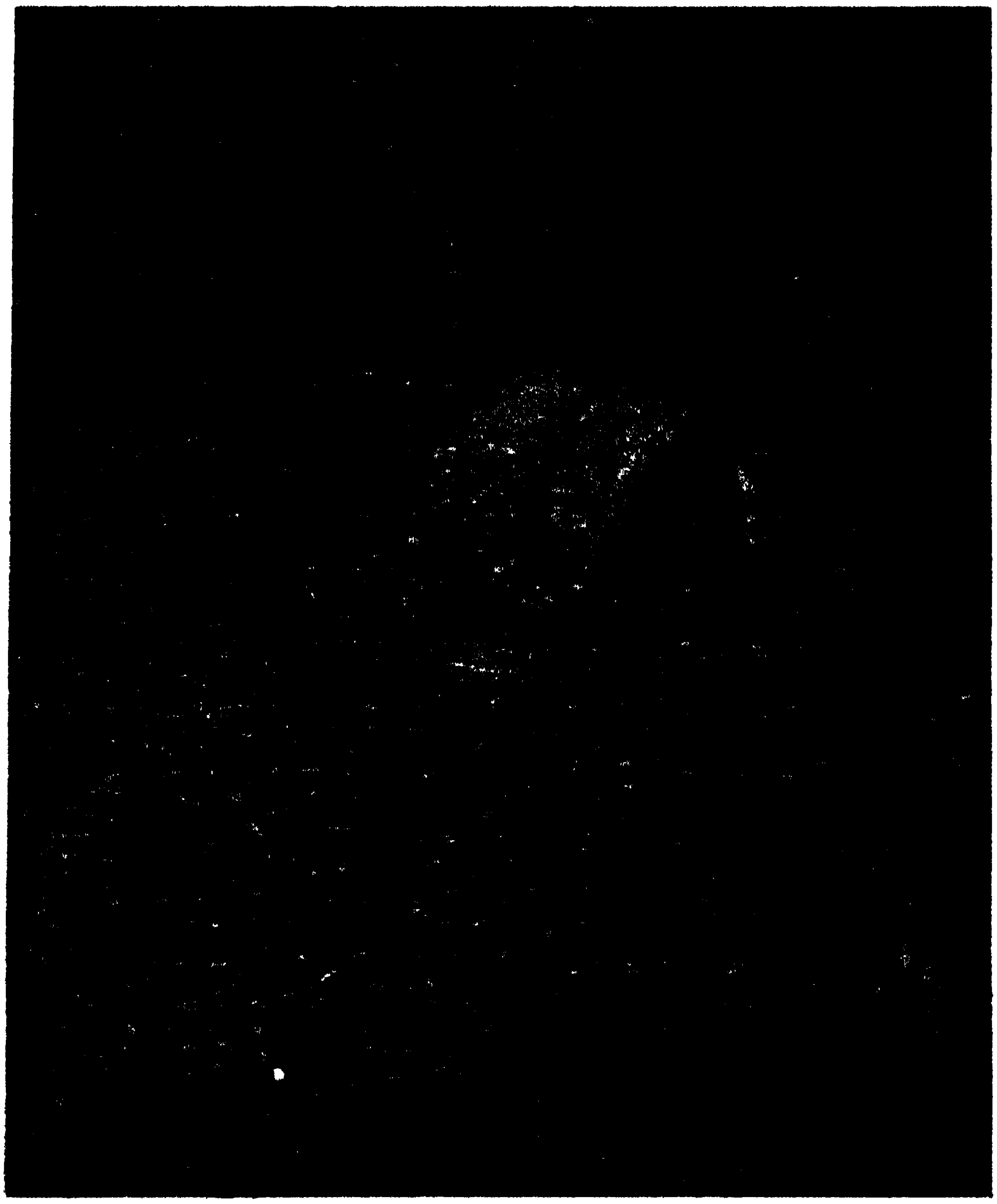

শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার অঙ্কিত চিত্র হইতে

[illegible] [illegible]

ভারতী

৩৪শ বর্ষ] পৌষ, ১৩১৭ [৯ম সংখ্যা

নীলগিরির টোডা জাতি।

বহুদিন পূর্ব্বে ভারতীতে নীলগিরি সম্বন্ধে একাধিক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম! কিন্তু সে সঙ্গে তখন চিত্র ছিল না। টোডাদিগের ছবি দেখাইবার জন্যই প্রধানতঃ পুনরায় সংক্ষিপ্তাকারে এই প্রবন্ধটি লিখিত হইল। ভা সং।

আমরা যখন উৎকামন্দে ছিলাম তখন বর্ষাকাল। কিন্তু বর্ষাকালে সেখানে সারাদিন ধরিয়া টিপটিপ বা ঝুপঝুপ করিয়া বৃষ্টি পড়ে না। যখন বৃষ্টি হয় মুষলধারে খানিকক্ষণ বেশ জোরে বৃষ্টি হইয়া যায়; তাহার পর আবার নির্ম্মল আকাশতলে পরিষ্কার রৌদ্র ফুটিয়া উঠে। দার্জ্জিলিঙ্গে বর্ষার দিনে অনবরত বৃষ্টিবর্ষণশীল মেঘাচ্ছন্ন প্রকৃতিতে একটা বিরক্তির ভাব আছে, শীতে ক্লান্তি আছে, সেখানকার রৌদ্রস্ফুট তুষার দৃশ্যও অতি মহান, অতি গম্ভীর, অতি বিস্ময়কর, তাহা কেবল দূর হইতে দর্শনের, স্পর্শনের নহে, তাই তাহার মধ্যে তৃপ্তির পূর্ণ সুখ নাই। নীলগিরির জলবায়ু হইতে দৃশ্য সৌন্দর্য্য সমস্তই নিরতিশয় তৃপ্তিজনক।

মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের গিরিবিহার এই উৎকামন্দ নীলগিরির সর্ব্বোচ্চ শিখরে অবস্থিত। উচ্চতায় ইহা প্রায় ৭০০০ ফুট দার্জ্জিলিঙ্গেরই প্রায় সমান। কিন্তু ইহার শৈত্য দারজিলিং নৈনিতাল প্রভৃতি গিরি নিবাসের তুলনায় মৃদুমন্দ—এবং দৃশ্যও কোমল-মধুর। উৎকামন্দে হিমালয়ের সেই রজতশুভ্র তুষারসজ্জিত শৈলশৃঙ্গশ্রেণীর সুমহান সৌন্দর্য্য নাই, দিনে নিশীথে ঝিল্লি ধ্বনি মুখরিত নিবিড় গম্ভীর অরণ্যানীর রুদ্রশোভা, অথবা পথপার্শ্বে কোথাও বা লতাশৈবাল জড়িত মহাবৃক্ষনিবিড়তা, কোথাও বা অভ্রভেদী মসৃণ পর্ব্বত প্রাচীর, কোথাও বা গভীর খদের ভয়ঙ্কর ভাব নাই। যত্র তত্র বিবিধবর্ণ বনফুল ও বিচিত্র লতাগুল্মের বিচিত্র সমাবেশ, নির্ঝর প্রপাতের ফেণময় উচ্ছ্বসিত কল্লোল এবং মেঘ রৌদ্রের মুহুর্মুহু লীলাখেলাও নাই। পাহাড়গাত্র যে সকল সুন্দর সুদৃশ্য তরুরাজি সমাচ্ছন্ন—তাহাও রুদ্রভাববিরহিত কানন শোভাসঙ্কুল, ভ্রমণেও পার্ব্বত্য শ্রমক্লান্তি নাই—পথ দুরারোহ উচ্চ নীচ নহে, ঘূর্ণমান সমতল চড়াই পথে—নিম্নভূমির মত গাড়ী ঘোড়া চলিতেছে! সহরের যত ঊর্দ্ধেই উঠিতে চাও ঘোড়ার গাড়ীতে যাইতে পার—বাতাসও মলয়ানিলের ন্যায় উপভোগ্য।

ইহার দিগন্তবেষ্টিত মেঘহীন স্বচ্ছশুভ্র আকাশের কোলে স্তরে স্তরে নীলিমায় তরঙ্গায়িত অতি নীল,—নীলাকাশ হইতেও ঘননীল—স্বনামে সার্থক অনতি উচ্চ শৈলাবলী অতি সুদৃশ্য। এত নবঘন নীল মাধুরী অন্য কোন পাহাড়ে দেখা যায় না। ইহার বক্ষস্থিত

সর্পাকৃতি পথ, সুবিশাল হ্রদ গুচ্ছ, সুদূর বিস্তৃত শ্যামল ক্ষেত্র, সরল সুদীর্ঘ পত্র মুকুট শোভিত, সুরূপ সুন্দর নীল নির্যাস তরুসমাচ্ছন্ন স্তর বিন্যস্ত পাহাড়পুঞ্জ, তৎগাত্রস্থিত রক্তবর্ণ খোলার ছাদবিশিষ্ট কুটীরাবলী ও অট্টালিকা-সমূহ সকলই মনোহর। অধিকতর মনোহারী কেননা মেঘহীন শুভ্র সুনির্ম্মল দিন, রৌদ্রদ্রব সুখকর শীত, বসন্তমধুর সুশীতল সমীরণ এবং স্বাস্থ্যপূর্ণ অনায়াস ভ্রমণ এই দৃশ্য সৌন্দর্য্যকে আমাদের প্রকৃত উপভোগের মধ্যে আনিয়া দেয়। হিমালয় দেবালয়, তাহার দুর্ভেদ্য দুর্গম্য গূঢ় গম্ভীর রহস্যপূর্ণ সৌন্দর্য্যকে মানুষ সম্পূর্ণভাবে আপনার করিতে পারে না,—নীলগিরি মর্ত্ত্যে যেন মানব উপভোগ্য নন্দনকানন। অন্তত দারজিলিং হইতে দূরে—বহুদূরে তাহার সৌন্দর্য্য যখন মানসনেত্রে অদৃশ্য, অপ্রত্যক্ষ, অস্পষ্ট, কাল্পনিক সামগ্রী, তখন নীলগিরির প্রত্যক্ষ, সুদৃশ্য, সুগন্ধ, সুবসন্ত উপভোগ করিতে করিতে আমার এইরূপ মনে হইয়াছিল।

ইংরাজিতে যাহাকে ব্লুগম বলে আমি তাহাকেই নীলনির্যাস বলিয়াছি। ইহা তালগাছের ন্যায় সরল সুদীর্ঘ কিন্তু ইহার গাত্রস্থিত সুদীর্ঘ সরু সরু বিরল শাখায় তেজপত্রের ন্যায় সুদীর্ঘ পত্রাবলী আলম্বিত। শিরোভাগ পত্র ঘন, পত্রগুচ্ছ মুকুটের মত শোভাময়। এই বৃক্ষরাশি শৈশবে ও যৌবনে ভিন্নরূপ। শৈশবাবস্থায় ইহার পাতা লেবু পাতার ন্যায় চ্যাপ্টা এবং আকাশের মত সুনীল আর বড় গাছে ইহা শ্যামকান্তিময়। তরুণ ও বয়স্ক বৃক্ষকে একত্র পাশাপাশি দেখিলে বিশ্বাসই হয় না যে ইহারা একই জাতি। এই শিশু, কিশোর ও বয়স্ক তরুর সমাবেশে, শ্যাম ও নীলকান্তির অপরূপ সম্মিলনে উৎকামন্দের বনস্থলী একদিকে বিচিত্র শোভাপন্ন অন্যদিকে সুগন্ধে আমোদিত। এই সুগন্ধপত্রবিশিষ্ট নীলনির্যাস তরু স্বাস্থ্যকারিতায় এবং জলশোষণ গুণে নীলগিরির প্রধান ভূষণস্বরূপ। শুনা যায় উৎকামন্দের মাটীতে জলীয়তা পূর্ব্বে এত অধিক মাত্রায় ছিল যে রাস্তার যেখানে সেখানে খুঁড়িলেই চোরানদীর মত জল পাওয়া যাইত। পাহাড়ে যেখানে সেখানে নির্ঝর বহিত। রাস্তাঘাট গাড়ী ঘোড়ার ঘর্ষণ অধিকদিন সহ্য করিতে পারিত না—শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া খারাপ হইয়া যাইত। কিন্তু বহুপরিমাণে নীলনির্যাসতরু রোপিত হওয়াও এই পাহাড়ের মাটী এত কঠিন ও নির্জ্জল হইয়া পড়িয়াছে যে, এখন এখানে একরূপ জলাভাব বলিলেই হয়। মাটী খুঁড়িলে ত আর জল ওঠেই না, সহরের ব্যবহারের জন্য রক্ষিত সরোবর হইতে কলে জল আসে। নীল নির্যাস তরু সজিনা গাছের ন্যায় অমর, মুড়াইয়া কাটিয়া ফেল, আবার মূল হইতে শাখা উঠিবে। ইহার শিকড়ে জল শোষণ করে পত্রে তারপিন তেল হয়। এ দেশে লোকেরা সর্দ্দি হইলে ইহার পাতা জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জলে স্নান করে।

সহরের আশে পাশে যে সকল প্রাকৃতিক অরণ্যভূমি রক্ষিত সেখানে নীল নির্যাসের গাছ অপেক্ষাকৃত বিরল, অন্যান্য নানাজাতীয় বন্যগাছেরই প্রাদুর্ভাব অধিক। এই সকল অরণ্যকে এখানে সোলা বলে। সোলায় অনেক পরিমাণে হিমালয়ের প্রকৃতি বিরাজিত।

অরণ্যের মধ্য দিয়া বেশ প্রশান্ত গাড়ীর পথ, পথের স্থানে স্থানে তরুশাখা দুইদিক হইতে খিলানের মত মিলিত হইয়া পথ ছায়াচ্ছন্ন নিকুঞ্জের মত করিয়াছে। স্তব্ধ গম্ভীর অরণ্য লতাজড়িত মহীরুহে, ফলবৃক্ষে, ফার্ণে, বনফুলে ফুলন্ত ফলন্ত শোভা সমাকুল। সহরের ফুলের অভাব এখানে এইরূপেই বিদূরিত হইয়াছে। নইনিতালের ন্যায় বন্য সেঁউতি যূথিতে বনভূমি স্থলে স্থলে আলোকিতা অন্যান্য বনফুলও নানারূপ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অর্কিড বা শৈবাল লতা নিতান্ত বিরল, ফার্ণও তত প্রচুর বা নানাজাতীয় নহে। এখানকার অমরপুষ্প ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হরিদ্রা বর্ণের চন্দ্রমল্লিকার ন্যায় দেখিতে এবং চিরসৌন্দর্য্য বতী। শুকাইয়া গেলেও এমন সুন্দর দেখিতে থাকে যে সোলার নির্ম্মিত ফুল বলিয়া ভ্রম হয়। কোন কোন বনে গাছের ফাঁকে ফাঁকে কুইনিনের চাষ দেখিলাম। বন্যফলের গাছ সমস্ত সোলাতেই প্রচুর। চেরি নানারকম! ষ্ট্রবেরির ক্ষুদ্র লতান ডাঁটার আগায় আমরুল শাকের পাতার মত দুএকটি গোল গোল পাতা আর সমস্ত ডাঁটা ফলে ফলে ভরা। দেখিলে আমাদের দেশের বালিকা মাতাদিগকে মনে পড়ে। আপেল নাসপাতি প্রভৃতি নানাবিধ ফলের বাগানও এখানে অনেক।

টিপু সুলতান এখানে আসিয়া যে উচ্চ পাহাড় শিখরে কেল্লা নির্ম্মাণ করেন তাহার নাম সুলতান শিখর। সেই নাম হইতে আমি এই শিখর সংলগ্ন অরণ্যাবলীর নাম দিয়াছিলাম সুলতান সোলা। কেল্লা নির্ম্মাণ করিয়া বেশী দিন টিপুর এখানে বাস করিতে হয় নাই। শীতক্লান্ত হইয়া শীঘ্রই তিনি এ বাস ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এখনো অরণ্যে পরিণত পাহাড় চূড়ায় গড়ের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান। একটি ক্ষুদ্র নদী সুলতান সোলার পদপ্রান্তে প্রবাহিত।

আমাদের যে মান্দ্রাজি ভৃত্যটি ছিল সে প্রায়ই উৎকামন্দের একটি বিস্ময়জনক প্রাকৃতিক ঘটনার উল্লেখ করিত। বলিত—

"এখানে গরমের দিনে তুষার পড়ে।"

"সে গরমের সময়টা কখন? কি মাস?"

এ প্রশ্নের উত্তরে সে ভাবিয়া চিন্তিয়া কহিত—"ডিসেম্বর জানুয়ারি।"

"সে সময়ে গরম?"

"অত্যন্ত। সূর্য্য তখন সমস্তক্ষণ আকাশে থাকে—বৎসরের সমস্ত সময় অপেক্ষা সে সময় প্রচণ্ড রৌদ্র—অথচ সন্ধ্যায় বরফ পড়ে, শীত ভীষণ।"

আরও একটি বিষয়ে তাহাকে বিস্ময় প্রকাশ করিতে দেখিতাম। ইংরাজ যত জংলি গাছ মস্ত লম্বা চওড়া নামে অভিহিত করিয়া বটানিক্যাল গার্ডেনে লাগায়—আর বেশী বেশী দরে বিক্রয় করে। ইহা তাহার নিতান্তই হীন ছলনা মনে হইত। তাহার ভাষায়—"Madam they bring them all from Jungle and only give a name and sale.

মান্দ্রাজী ভৃত্যেরা প্রায় সকলেই ইংরাজি জানে। কিন্তু এ ভাষা ইহাদেরই অদ্ভুত সৃষ্টি। কোন ইংরাজ নিজের ভাষা বলিয়া ইহা গ্রহণ করিবেন না। ইহাদের ইংরাজির একটি বিশেষত্ব—সমস্ত অতীত ক্রিয়ার পূর্ব্বে তাহারা একটা done বসাইয়া দেয় যেমন done eat

খাইয়াছে বা খাইয়াছি Done put রাখিয়াছে রাখিয়াছি, ইত্যাদি।

উৎকামন্দের হ্রদ অতি সুন্দর। ইহা সুদীর্ঘ সুবিস্তৃত এবং ইহার জলরাশি স্থানে স্থানে প্রণালীর আকারে সঙ্কীর্ণ হইয়া আবার বিশালতা প্রাপ্ত হইয়াছে। সেই জন্য ইহা গুচ্ছাকার। প্রতি সকালে বিকালে ইংরাজ স্ত্রী পুরুষ হ্রদ প্রদক্ষিণ করিয়া বায়ু সেবন করেন। যেমন পদ্মের শোভা জলে জলের শোভা পদ্মে;—সেইরূপ গিরি ও ইংরাজ ললনা উভয়ের রূপে উভয়ে শোভা বর্দ্ধন করেন।

উৎকামন্দের চারিদিকেই এইরূপ সোলা অর্থাৎ অরণ্য আছে।—আমরা কেবল ফার্ণহিল ও সুলতান সোলায় গিয়াছিলাম। দুই অরণ্যেই টোডার বাস দেখিলাম। ইহারা নীলগিরির আদিম অসভ্য জাতি।—নিভৃত অরণ্যপ্রান্তের মুক্ত বিজন স্থলে কাছাকাছি তিনচারিখানি কুটীর, ইহাই এক এক অরণ্যের টোডাপাড়া। এমন এক একটি পাড়ায় স্ত্রীপুরুষ ছেলেমেয়ে মিলিয়া ২০।২৫ জন টোডার বাস, আর সেই অতি ক্ষুদ্র তিন চারি খানি কুটীরই সমগ্র ২০।২৫ জনের রাত্রিকালের আশ্রয় স্থল। কুটীরের আকার ধনুকাকৃতি তিনদিক বন্ধ একদিক খোলা, একেবারে গুঁড়ি গুঁড়ি না দিয়া সেই অতি নিম্ন দ্বারপথে গৃহপ্রবেশ করা যায় না। দ্বারের কাছে বসিয়াও মাথা নীচু করিয়া উঁকি মারিয়া তবে গৃহমধ্য নজরে পড়ে। কুটীর মধ্যে একদিকে একটু রোয়াক তাহাই শয়ন স্থল, অন্যদিকে উনুনের কাছে বাসন প্রভৃতি সাজান। তিন চারি দল বিবাহিত অবিবাহিত স্ত্রীপুরুষ একত্র মিলিয়া এক সঙ্গে সেই রোয়াকে শয়ন করে।

মনুষ্য জাতির আদিম অবস্থায় যখন বস্ত্রবয়ন কৌশল অনাবিষ্কৃত ছিল, যখন কুটীর নির্ম্মাণ সহজ ছিল না তখনকার কালে শীত নিবারণের জন্য এরূপ একত্র শয়ন আবশ্যক হইয়া পড়িত সন্দেহ নাই; কিন্তু সভ্যতার সুবিধার এত সংস্পর্শে আসিয়াও তাহারা সেই হীন আদিম প্রথা এখনো রক্ষা করিতেছে দেখিলে অঙ্গে কেমন কাঁটা দিয়া উঠে। শুনিলাম আগে ইহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকের বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল, সমস্ত ভ্রাতা একজন রমণীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিত। কিন্তু সে নিয়ম এখন আর নাই। এখন প্রত্যেক পুরুষেরই ভিন্ন ভিন্ন পত্নী।—

আদিম অসভ্যজাতি শুনিয়া কেহ যদি মনে করেন ইহারা কাফ্রিজাতির মত ভীষণ মূর্ত্তি বা ভুটিয়াদিগের মত খর্ব্বনাশা ও বিশাল মাংসপেশী তাহা হইলে ভুল করিবেন। ইহাদের চেহারায় অসভ্যত্ব বা অনার্য্যত্ব কিছুই নাই। আর্য্যগণ সন্তুষ্ট হইবেন কিনা জানি না—ইহাদের আকৃতি আর্য্যদিগের ন্যায়ই সুশ্রী সুগঠন। তাহা দেখিয়া ইংরাজ বংশতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহাদের অনার্য্যত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা ইতালীয় হইতে, কেহ বা ইহুদিজাতি হইতে, কেহ কেহ বা আরবজাতি হইতে ইহাদের মূল টানিতে চেষ্টা করেন। এক একজন টোডাকে দেখিলাম—একেবারে গ্রীক প্রস্তর ছবির মত সৌম্য সুন্দর। বর্ণ কাহারও কাল নহে—বেশীর ভাগ শ্যাম, কেহ

কেহ সামান্য গৌরবর্ণ। ইহাদের স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই ভিতরে ঘাগরার স্থায় কটিবন্ধ বস্ত্র—জড়ান; আর একখানা লম্বাচাদর গলা হইতে পা পর্য্যন্ত ঝোলান। ইহাদের সকলেরি কেশ প্রায় কুঞ্চিত এবং আস্কন্ধ লম্বমান। এইরূপ বেশ বলিয়া যাহারা সুশ্রী দেখিতে তাহাদিগকে. যেন ছবির মত দেখায়। দুঃখের বিষয় আমরা যেরূপ সুশ্রী টোটা দেখিয়াছি এস্থলে সেরূপ কোন চিত্র দিতে পারিলাম না।

টোডা খুকী।

আগে নাকি ইহারা একরূপ নগ্ন থাকিত, গভর্ণমেণ্টের আদেশে কাপড় পরিতে বাধ্য হইয়াছে। যাহারা দূর অরণ্যে থাকে তাহাদেরও শুনিলাম এখন এই রকম বেশ। টোডা যুবতীগণ সাধারণতঃ বেশ ফিটফাট, সাজসজ্জার দিকে বিশেষ একটু মনোযোগী। সকলেরই সম্মুখের চুল বেশ একটু পরিপাটি করিয়া আঁচড়ান—মুখ মার্জ্জিত পরিষ্কার, কেহ কেহ কেশগুচ্ছ-কুঞ্চিত করিয়া মাথার মধ্যে গুঁজিয়া রাখিয়াছে, উপযুক্ত সময় ঝুলাইয়া দিবে। কাহারো অলক গুচ্ছ দ্বিধাযুক্ত-সীমন্তের পার্শ্বে ও পৃষ্ঠদেশে আলম্বিত, কাহারো গাত্রে অল্পস্বল্প রৌপ্যাভরণ,—উল্কাভূষাও ইহাদের দেখিলাম; কিন্তু অধিক নহে। বস্তুতঃ চেহারায় নহে, বাসস্থলে এবং আচার ব্যবহারেই ইহাদের অনার্য্যত্ব অসভ্যত্ব প্রত্যক্ষ। তাহা কুটীর চিত্রে পাঠক বুঝিতে পারিবেন।

প্রত্যেক টোডাপাড়ার বাস কুটীর কয়খানি হইতে দূরে একখানি করিয়া শূন্য কুটীর থাকে। ইহা টোডাদিগের দেবস্থান। এখানে কোন প্রকার মূর্ত্তি নাই। ইহারা মহিষ দুগ্ধ আনিয়াএখানে মাখন ঘৃতাদি প্রস্তুত করে। ইহাই টোডাদের পূজা। স্ত্রীলোক এ গৃহে প্রবেশ করে না; দধিমন্থন পুরুষেরই কার্য্য। দেবস্থানের অর্থ কি জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলাম—"যেখানে হারিস ডারিস্—অর্থাৎ ঈশ্বর থাকেন"।

জিজ্ঞাসা করিলাম—"ঈশ্বর কে?"

'যিনি এসব সৃষ্টি করেছেন।'

"তিনি কি ঐ স্থানে থাকেন?"

"আমাদের পূজা লইতে তিনি ঐখানে আসেন। দুধ ঘিতে তিনি সন্তুষ্ট।"

অবশ্য আমাদের ভৃত্য ইন্টারপ্রেটারের কাজ করিয়া আমাদের এইরূপ বুঝাইয়া দিল। টোডাদিগের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল, কেহ দরিদ্র নহে। ২৫।৩০।৪০।৫০ করিয়া এক এক

পরিবারের মহিষ আছে। তাহা হইতে ইহারা প্রচুর ঘৃত মাখনাদি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে। যদি কোন টোডার মহিষ মরিয়া যায় তবে অন্য টোডারা নিজেদের মধ্য হইতে দুই একটি দান করিয়া তাহার মহিষ সংখ্যা পূর্ণ করিয়া দেয়। মহিষ রাখিতেও ইহাদের কোন খরচ নাই। তাহারা সমস্ত দিন পাহাড়ে চরিয়া খায়, আর বিকালে টোডা রমণীর ডাকে কুটীর সন্নিধানে আসিয়া দুগ্ধদোহন করিতে দেয়—তারপর রাত্রে কুটীরের কাছাকাছি যেখানে সেখানে শুইয়া থাকে। মহিষগণ ক্ষুদ্র টোডা বালকের হস্তেও পরিচালিত হইয়া থাকে কিন্তু সহরের লোকের পক্ষে ইহারা ভয়ানক। যে পাহাড়ে মহিষ চরে সেখানে কেহ আসিতে পারে না। বিশেষতঃ ইংরাজ ঘোড়সওয়ার দেখিলে ইহারা মহা ক্ষেপিয়া ওঠে।

মহিষ ঘৃত দুগ্ধাদি বা বাসস্থানের জন্য ইংরাজ গভর্ণমেণ্টকে ইহাদের কর দিতে হয় না। ইংরাজ নীলগিরি লইবার আগে যেসকল অরণ্যভূমি টোডাদের ভোগদখলে ছিল গভর্ণমেণ্ট সেই সকল স্থান ইহাদিগকে নিষ্কর দান করিয়াছেন; তবে ইহাতে তাহাদের বিক্রয়াধিকার নাই।

টোডাদের অবস্থা এত স্বচ্ছল, গভর্ণমেণ্টের ইহাদের প্রতি এত অনুগ্রহ—আবশ্যকের অধিক ইহাদের উপার্জ্জন—তথাপি ইহাদের সন্তানাদি নিতান্ত অল্প। যোগ্যজাতিই যে টেঁকসই (Survival of the fittest) এখানে তাহা প্রত্যক্ষ দেখা যায়। প্রতি অরণ্যে ২০।২৫ জনের বেশী টোডা নাই। দুর অরণ্যেও শুনিলাম টোডার সংখ্যা ক্রমশই কমিয়া আসিতেছে। টোডারা অত্যন্ত অলস। স্ত্রীলোকের গৃহকার্য্য, এবং পুরুষের ঘৃতাদি প্রস্তুত ও বাজারে ক্রয়বিক্রয় কার্য্য ছাড়া অন্য কোন কাজ নাই। ইহারা কৃষিকার্য্য সহজেই করিতে পারে কিন্তু করে না। চাকরী করা ত নিতান্ত অপমানজনক জ্ঞান করে। আসল কথা ইহাদের অন্য কোন কাজের আবশ্যক নাই। ঘৃত বিক্রয়ে ইহারা যাহা উপার্জ্জন করে তাহাতে বেশ বাবুগিরি করিয়া থাকিতে পারে। দুঃখের বিষয়—অর্থের প্রকৃত ব্যবহার ইহারা জানে না। অন্য কোন সভ্যতর জাতি ইহাদের মত স্বচ্ছল অবস্থায় যেরূপ আয়েস আরাম সুবিধা কিনিতে পারিত—ইহারা উপায় সত্বেও তাহা করে না। বন্য ফলমূল, ও দুধই ইহাদের প্রধান আহার। গোধূম চাল ও আলু আজকাল ইহারা খাইতে আরম্ভ করিয়াছে; মাছ মাংস ইহারা খায় না। অন্যান্য তরী তরকারী মিষ্টান্ন দ্রব্যাদি সহর হইতে যাহা সহজেই পাইতে পারে তাহাও তাহারা দৈবাৎ কেনে। নূতন গ্রহণের মধ্যে তামাক ও নস্যের আয়েস তাহারা বুঝিয়াছে—আর বুঝিয়াছে ভিক্ষার আয়েস। দাস্যবৃত্তি তাহারা অপমানজনক জ্ঞান করে কিন্তু ভিক্ষায় অপমান নাই। মেম সাহেবেরা তাহাদের দেখিতে গেলেই তাহারা বক্সিশস্বরূপ কর চাহে,—আমরাও অবশ্য এ দাবী পূরণে বাধ্য হইয়াছিলাম।

টোডার নাচ বড় অদ্ভুত। স্ত্রীলোকে নাচে যোগ দেয় না। ৭।৮ জন পুরুষে মিলিয়া হাত ধরাধরি করিয়া গোল হইয়া দাঁড়ায়,—দাঁড়াইয়া ও হাউ ও হাউ করিয়া চীৎকার করিতে করিতে তালে তালে এক সঙ্গে পা

ফেলিয়া ঘুরিতে থাকে। আসল কথা ইহা আনন্দ নৃত্য নহে। কেহ মরিলে মৃত ব্যক্তিকে লইয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন কালে, প্রতি গ্রামে সকলে মিলিয়া উক্তরূপে শব বেষ্টন করিয়া ঈশ্বর স্তব করে। গ্রাম প্রদক্ষিণ শেষ হইলে তখন মৃত দেহ পুনরায় স্বগ্রামে নীত হইয়া তাহার স্বকুটীরে সমস্ত তৈজস অলঙ্কার দ্রব্যাদির

সহিত দগ্ধীকৃত হয়।" অধুনা এ প্রথার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কেহ মরিলে তাহার কুটীর ও দ্রব্যাদি তাহার সহিত ভস্মীভূত না করিয়া একখানি স্বতন্ত্র কুটীর মধ্যে শবদাহ করা হয় এবং টোডাগণ সকলে মিলিয়া দুই একখানি করিয়া তৈজস পত্রাদি যাহা দান করে তাহাই মৃতব্যক্তির সহিত পোড়ান হয়। শবদাহ হইয়া গেলে পুরুষেরা শড়কি দিয়া ৮।১০ টা মহিষ নিহত করে এবং টোডা নারীগণ সুর করিয়া কাঁদিতে থাকে। ইহারা মাছ মাংস খায় না সুতরাং মহিষ বধ মৃত্যু ভোজের জন্য নহে। মৃত ব্যক্তি লোকান্তরে তাহার সম্পত্তি ভোগ করিবে ইহাই তৈজসাদি দাহন এবং মহিষ বধের অভিপ্রায়। সুখের বিষয় এইখানেই তাহাদের ইতি পড়িয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে পত্নীদাহের প্রথা নাই। আমাদের সুসভ্য ভারতবর্ষ এ-লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই বলিয়াই বোধ হয়, আধ্যাত্মিক ভাবের দোহাই দিয়া সতীদাহেরও প্রবর্ত্তনা করিয়া গিয়াছিলেন!

আমরা তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলাম—"মরিলে কি হয়?"

"ওরুনার—অর্থাৎ মহাপ্রলে কে যায়?"

"ভূতে বিশ্বাস কর?"

"না আমরা জঙ্গলে থাকি—কখনো ভূত দেখি নাই—ভূত বিশ্বাস করি না।"

"মৃত আত্মাকে পূজা কর?"

"না একবার মরিয়া গেলে তাহার কথা আর আমরা ভাবি না।"

এই মৃত্যুৎসব ছাড়া ইহাদের অন্য কোন রূপ উৎসব নাই। এমন কি বিবাহও ইহাদের পর্ব্বদিন নহে। বিবাহে কোন আমোদ-প্রমোদ হয় না। বাপ মায়ের কথায় বিবাহ ঠিক হইয়া যায়। এই সম্বন্ধকেই তাহারা বিবাহ বলে। তাহার পর কোন সময় কন্যা স্বামীর গৃহে গিয়া বাস করে।

নীলগিরিতে কোটা, কুড়ুম্বা, ইরুলা প্রভৃতি নামে আরো কয়েক জাতি পাহাড়ি আছে। ইহাদেরমধ্যে কুড়ুম্বারা যাদুকর বলিয়া খ্যাত। ইহারা আরো সুদূর অরণ্যে বাস করে। এ-দেশের অশিক্ষিত লোকমাত্রেই প্রায় কুড়ুম্বাকে ভয় করে—কেবল টোডারা ভয় করে না। আমাদের ভৃত্য কহিল—"কুড়ুম্বা জাতির পশু বানাইবার ক্ষমতা আছে—ভিক্ষা চাহিলে কেহ যদি না ভিক্ষা দেয় ত তৎক্ষণাৎ তাহাকে পশু বানাইয়া ফেলে। নিজেরাও বাঘ প্রভৃতির বেশ ধরিয়া লোককে ভয় দেখায়। এইরূপ মানুষ পশুর কেবল লেজ থাকে না, ইহাতেই বুঝা যায় যে সে যাদুপ্রাপ্ত।" নীলগিরির অনেকস্থলে পুরাতন সমাধি দেখা যায়। পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহার কোনটাই প্রায় খুঁড়িতে বাকী রাখেন নাই। খুঁড়িয়া ইহার মধ্যে যে সকল দগ্ধ পিত্তল পাত্র, অস্ত্রশস্ত্র ও মনুষ্যের মৃন্ময়মূর্ত্তি প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে—সকলই তাঁহারা লুট করিয়াছেন। এমন কি অঙ্গার পর্য্যন্ত বাকী রাখেন নাই। সমাধিউদ্ধৃত অনেক মৃন্মূর্ত্তি তাতার উষ্ণীষধারী। কোন কোন মতে এই সকল সমাধি টোডাদিগের সাইথীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের। কিন্তু অবোধ টোডাগণ আপনাদিগের এই উৎপত্তি সম্ভ্রম স্বীকারে অনিচ্ছুক। তাহারা এই সমাধি তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের বলিয়া জানেও না, মানেও না।—তাই অবাধে ইহা খনন ও

লুণ্ঠন করিতে দেয়। টোডাদিগের এবং অনেক স্থানীয় লোকের মতে পাণ্ডিয়া বংশ বহুপূর্ব্বে নীলগিরিতে রাজ্য করিতেন—এ সকল সমাধি তাঁহাদিগেরই। নীলগিরির পুরাতন গভীর জঙ্গলের স্থানে স্থানে যেরূপ ভগ্নাবশেষ দুর্গ চিহ্ন এবং দেবমূর্ত্তি পাওয়া যায়, এবং তৎসংলগ্ন দেব ঋষি ও রাক্ষসের গল্প শুনা যায় তাহাতে ইহা যে বহু পূর্ব্বে আর্য্য নিবাস ছিল তাহাতে সন্দেহ থাকে না। সম্ভবতঃ পাণ্ডু বংশীয়েরাই এখনি রাজত্ব করিয়াছিলেন—তাঁহারাই পাণ্ডিয়া নামে খ্যাত। কিন্তু টোডাগণ যদি সেই পাণ্ডিয়াগণেরই বংশধর হয় তবে, ইহাদিগের কি দারুণ পতন? তাহা হইলে উন্নতিও যে কতদূর অবনতিতে পৌঁছিতে পারে ইহাই তাহার জলন্ত প্রমাণ! কে জানে আমাদেরও একদিন এইরূপ অবস্থা হইবে কি না!

খুনে।

সহরের বাহিরে জেলখানার হাতায় জেল-দারোগার বাসার খিড়কির বাগানে একলাটি খেলা করিতেছিল জেল-দারোগার সাত বছরের ছোট্ট মেয়ে মিনু। একটা গোল পাথর পায়ের ঠেলায় ফুটবলের মতন বাগানময় গড়াইয়া লইয়া বেড়ানোই তার খেলা।

জেলখানার মতো খিড়কির বাগানও উঁচু দেয়ালে ঘেরা। কিন্তু এক দেয়ালে আটক আছে কত লোকের স্বাধীনতা, কত লোকের নিরানন্দ পাপের বোঝা; আর এ দেয়ালের অন্তরালে আছে শুধু ফুলের হাসি, সবুজ রঙের চোখজুড়ানো বাহার, প্রজাপতির স্বাধীন নাচ, আর মিনুর সরল পবিত্র আনন্দ।

মিনু খেলা করিতে করিতে শুনিল হঠাৎ কিসের শব্দ। চাহিয়া দেখিল একটা লোক খাটো জাঙিয়া, ঢিলা কুর্ত্তি পরা, গলায় পদক আঁটা, শিকারী বেরালের মতো কুঁজো হইয়া বাগানের ভিতর উঁকি মারিয়া দেখিতেছে।

সে লোকটা এদিক ওদিক চাহিয়া যখন দেখিল সেখানে একটি ছোট্ট মেয়ে ছাড়া আর কেহ নাই, তখন সে ফস্ করিয়া বাগানে ঢুকিয়া পড়িল, আর ঢুকিয়াই তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করিয়া ভিতরদিকের খিল লাগাইয়া দিল।

তখন সে সোজা সটান হইয়া দাঁড়াইয়া হাঁপ ছাড়িল—সে নিশ্বাস আরামের, সে নিশ্বাস মুক্তির।

মিনু আজন্ম কয়েদির সঙ্গে পরিচিত, তার একটুও ভয় হইল না। অনেকের সঙ্গে তো তার খুব ভাব ভালোবাসা। এ লোকটাকে সে কিন্তু কখনো দেখে নাই, কাজেই এর সঙ্গে আলাপও ছিল না। সে লোকটার দিকে চাহিয়া দেখিল—লোকটা বেয়াড়া লম্বা চৌড়া প্রকাণ্ড। হাতের থাবাগুলো শুলতোলা লোহার হাতলের মতো, মুখখানা চৌকো কঠিন অস্থিময়, চোখ দুটো ছোট ছোট, বেরালের মতো তীব্র আর ধূর্ত্ত। তাহাকে দেখিয়া মিনুর তত ভালো লাগিল না।

লোকটা পিঁজরাভাঙা হিংস্র পশুর মতো

একবার খুব আড়ামোড়া ভাঙিল; একবার মুক্তির সম্ভাবনায় দাঁত বাহির করিয়া হাসিল, তারপর মিনুর দিকে কটমট করিয়া চাহিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

মিনুর আর তাহার দিকে নজর ছিল না। সে একবার তাহাকে দেখিয়া লইয়া আপনার খেলা সুরু করিয়াছিল। সে পাথর ঠেলিতে ঠেলিতে, টলমল করিয়া হেলিতে দুলিতে আসিতেছিল—সে দেখে নাই যে লোকটা তাহার কাছে আসিয়াছে। সে পাথরে ধাক্কা দিতে গিয়া টলিয়া পড়িতেছিল—কিছু ধরিবার জন্য হাত বাড়াইয়া দেখিল সেই লোকটা দাঁড়াইয়া আছে, সে তখন অসঙ্কোচে তাহার কুর্ত্তা ধরিয়া পতন সামলাইয়া লইল।

লোকটা অমনি প্রকাণ্ড জাঁতিকলের মতন হাত দুখানা মিনুর গলার দিকে বাড়াইয়া দিল। মিনু তার সরল চোখদুটি তাহার মুখের দিকে তুলিয়া আদরের স্বরে বলিল—তুমি সরে যাও! আমার পাথর ছিটকে যদি তোমার লাগে!

সরল বালিকার সোহাগবাণী তাহাকে যেন বাধা দিল। লোকটা হাত গুটাইয়া মিনুর নিকট হইতে সরিয়া গেল।

মিনু লোকটার দিকে ফিরিয়া বলিল—ওগো এস না, আমরা দুজনে খেলি। তুমি হও ভাই মালি, আমি বাবু।

এই বলিয়া সে ছুটিয়া গিয়া একখান কোদাল আনিয়া লোকটার কাছে বাড়াইয়া ধরিল। লোকটা কোদাল লইতে ইতস্তত করিতেছে দেখিয়া মিনু বলিল—নেও, তুমি কোদাল নেও—এস আমরা খেলি।

কোদালের চকচকে ধার দেখিয়া লোকটার গোল চোখ দুটো জলিয়া উঠিল, চোখের পাতা মিটমিট করিল। সে আবার তখনি কেমন সঙ্কুচিত হইয়া কর্কশ কণ্ঠে বলিল—না না, আমার ও চাইনে! আমায় ও দিসনে!

মিনু কোদাল ফেলিয়া ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল—না, তুমি বড় দুষ্টু! বিষ্টু, নানকুয়া ওরা বেশ! আমার সঙ্গে খেলা করে, বাবার কাজ করে। তুমিও এস, খেলবে এস। তুমি মাটি খুঁড়বে না? তবে জল তোল, ডোলের জল নালায় ঢেলে দেও, আমি তাতে নৌকো ভাসাব। এস———।

মিনু তাহার কুর্ত্তা ধরিয়া টানিতে টানিতে কূপের ধারে লইয়া গেল। সেও যেন কোন প্রবল টানে অসহায়ের মতো একটি বালিকার আকর্ষণ মানিয়া চলিল।

মিনু কূপের পাড়ে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল—দেখ দেখ, জলে আমার ছায়া পড়েছে। আমি তোমায় দেখতে পাচ্ছি, তুমি পাচ্ছ? ও! তোমার চোখ দুটো অমন কটমটে কেন? না, তুমি অমন করে চেয়ো না, আমার ভয় করে।

এই কাতর কথাগুলি লোকটার কঠিন হৃদয়ে যেন ঘা দিল। সে প্রসারিত হাত দুখানা বুকের উপর মুষ্টিবদ্ধ করিয়া চাপিয়া ধরিয়া প্রাণপণ বলে চোখ বুজিয়া অতি মিনতির স্বরে বলিল—ওরে অবোধ, তুই ঝুঁকিসনে, কুয়োর কাছে আমায় ডাকিসনে! ওসব দেখলে আমার গায়ে মরণের জর আসে।

মিনু সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া অতবড় লোকটার ভয়কাতর ভাবভঙ্গি দেখিয়া

খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল—দূর বোকা, তোমার ভয় কি, তুমি থাকতে আমি পড়ব কেন?

সে লোকটা যেই দেখিল মিনু সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, অমনি তাহাকে এক ধাক্কায় কূপের ধার হইতে সে সরাইয়া দিল। তাহার রূঢ় ধাক্কায় মিনুর ভৎসনাভরা দৃষ্টি অশ্রুসজল হইয়া উঠিল। মিনু ক্রন্দনকম্পিত কণ্ঠে বলিল—যাও, তুমি ভারি দুষ্টু! তুমি আমায় মারলে?

লোকটা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহার অভিমানের কান্না দেখিল। তাহার সকল কঠোরতা যেন গলিয়া গলিয়া বালিকার অশ্রুরূপে তাহার প্রাণকে ধৌত নির্ম্মল করিয়া দিতেছে। তাহার কণ্ঠ এবার কোমল হইয়া পড়িল, সে বলিল—নে নে, আর কাঁদিসনে! তুই আমায় অমন করে কোদাল দেখিয়ে, কূপ দেখিয়ে ক্ষেপাসনে, আমি কিছু বলব না। চুপ কর, চুপ কর!

এই সান্ত্বনায় প্রীত হইয়া মিনু অশ্রুজলের ভিতর দিয়াই হাসিয়া উঠিল। বলিল—তবে আমায় একটা গোলাপ তুলে দেও।

ছোট ছোট ঝোপ গাছে টকটকে লাল গোলাপ ফুল গুচ্ছে গুচ্ছে ফুটিয়াছিল। লোকটি বাধ্য শিশুর মতো এক থোলো কুঁড়ি ও ফুটন্ত গোলাপ তুলিয়া মিনুর হাতে দিল। মিনু সেই ফুলের তোড়াটি বুকের উপর জামার গায়ে গুঁজিয়া দিল। মিনু হাসিয়া হাততালি দিয়া বলিল—দেখ দেখ কেমন সুন্দর!

লোকটির মুখ পাণ্ডাশ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে ডোঙার মতো বড় দুখানা হাতে তার প্রকাণ্ড মুখ ঢাকিয়া আহত পশুর মতো কাঁপিতে কাঁপিতে বলিয়া উঠিল—ওরে ওরে তোর বুকের ওপর ওযে রক্তের মতো লাল—ফ্যাল, ফ্যাল, টেনে ফ্যাল, আমায় আর লোভ দেখিয়ে ক্ষেপাসনে।

মিনু ভয় পাইয়া ফুলগুলি খুলিয়া ফেলিল। আবার তাহার চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠিল।

লোকটি চোখ খুলিয়া বলিল—ছি! তুই আবার কাঁদচিস। চুপ কর চুপ কর। আমায় তুই ক্ষেপাসনে, আমিও তোকে কাঁদাব না।

সে তার হাতুড়ির মতন হাতখানা দিয়া মিনুর অশ্রু মুছাইয়া তাহার গালে আদর করিল। সে নত হইয়া মিনুকে চুমু খাইতে যাইতেছিল, এমন সময় বাহিরে অনেক লোকের ব্যস্ত কোলাহল, দৌড়াদৌড়ি শুনা গেল।

ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মতন লোকটা তড়াক করিয়া সোজা হইয়া উঠিল। তারপর এক-লাফে বাগানের এক কোণে গিয়া লুক্কায়িত হইল।

বাহির হইতে কে কপাটে ঘা দিয়া ব্যগ্র স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—মিনু, তুই কোথায়?

"বাবা, আমি এখানে।"

"খোল্ খোল্, দরজা খোল।"

"দরজায় যে খিল দেওয়া।"

"আরে খিলই খোল না।"

"খিল যে উঁচুতে, আমি নাগাল পাই না।"

"তবে দিলি কেমন করে?"

"আমি দিয়েছি বুঝি—খিল তো ও দিলে।"

বাহির হইতে ভীতকণ্ঠে প্রশ্ন হইল—ও কে রে?

মিনু বলিল—ও একজন কয়েদি, আমি ওর নাম জানিনে।

বাগানের কোণ হইতে একটা দুঃখ-বিরক্তি-মিশ্রিত হতাশার শব্দ মিনুর কানে গেল। ফিরিয়া দেখিল কয়েদি সামনের দিকে হেলিয়া গুঁতাইতে উদ্যত গোরুর ভঙ্গিতে কোদাল উচাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। মিনু তাহার সেই ভাব দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—না না, তুমি অমন করে থেকো না—ওগো তুমি আবার ক্ষেপে উঠলে কেন?

এতক্ষণে বাহির হইতে দরজা ভাঙিবার জন্ম খুব চেষ্টা হইতেছিল। মিনু ছুটিয়া কয়েদির কাছে গিয়া তাহার কোর্ত্তা ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল—এস লক্ষ্মীটি, দরজা খুলে দেও - ওরা যে দরজা ভেঙে ফেললে! তুমি কোদাল ফেলে দেও, নইলে আমি আবার কাঁদব!

কয়েদি মিনুর মিনতিভরা চোকের দিকে চাহিয়া দেখিল—দুটি বিন্দু অশ্রু তরল মুক্তার মতন টলটল করিতেছে। কয়েদি সটান হইয়া দাঁড়াইয়া মৃত্যুনিশ্চিত পশুর মতো কাতর শব্দে নিশ্বাস ফেলিয়া কোদাল ফেলিয়া দিল। তাহার সেই চৌড়া বুকখানার মধ্যে যে বিষম তোলপাড় হইতেছিল তাহাতে যেন তাহার বুকখানা এখনি ফাটিয়া যাইবে। মিনু কিন্তু তাহাকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো টানিয়া দরজার কাছে আনিয়া বলিল—দরজাটা খুলে দাও।

কয়েদি একবার খিলের দিকে চাহিল, একবার মিনুর মিনতিভরা চোখের দিকে চাহিল, একমুহূর্ত্ত মাত্র ইতস্তত করিল, তারপর সে দরজার খিল খসাইয়া দিয়া স্তব্ধভাবে মিনুর মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

দরজা খোলা পাইয়া তিনজন পাহারাওলা বাঁধভাঙা জলের মতো ছুটিয়া বাগানে ঢুকিয়া কয়েদিকে ধরিল। সে বন্দী বাঘের মতো আপনার বলের গর্ব্বে দৃপ্তভাবে শুধু দাঁড়াইয়া রহিল, কোনো বাধাই দিল না।

জেল-দারোগা তাড়াতাড়ি আসিয়া কন্যাকে বুকে তুলিয়া চাপিয়া ধরিল, যেন সে হারানো রত্ন ফিরিয়া পাইল।

পাহারাওলারা কয়েদিকে লাথি কিল চড় ধাক্কা গুঁতো মারিতে মারিতে জেলখানায় লইয়া যাইতেছে দেখিয়া মিনুর কোমল প্রাণ ব্যথিত হইয়া উঠিল, সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—বাবা, ওকে মারতে বারণ কর।

জেল-দারোগা কন্যাকে বুকে চাপিয়া বলিল—ওর জন্মে কাঁদিসনে, ও খুনে ডাকাত!

এ কথাতে মিনু কিন্তু কোনো সান্ত্বনা খুঁজিয়া পাইল না।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

কার্য্যকরী শিক্ষা।

জীবনের কর্ত্তব্যকে নিত্যপ্রয়োজনীয় কর্ম্মের উপযোগী করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। সাধারণতঃ প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে, শিল্প ও ব্যবসায় শিক্ষা তাহা হইতে স্বতন্ত্র। স্কুল শিক্ষা ও জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় কর্ম্মোপযোগী শিক্ষার মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ থাকা কর্ত্তব্য ইহা বহুদিবস হইতে ইয়োরপের শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রের আলোচ্য বিষয় হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন মানসিক বৃত্তিনিচয়ের সম্যক্ পরিস্ফুরণ, পর্য্যবেক্ষণ শক্তির উৎকর্ষসাধন, স্মৃতিবৃদ্ধি এবং যুক্তি শক্তির উন্নতি বিধানই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য। জীবনের বাস্তব কার্য্যের সহিত স্কুল শিক্ষার কোনরূপ সম্বন্ধস্থাপন তাঁহারা আদৌ আবশ্যক বলিয়া মনে করেন না।

কিন্তু এই দ্বিবিধ শিক্ষার মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন আধুনিক পণ্ডিত সাধারণের অভিমত। সেই নিমিত্ত ইদানীং পাশ্চাত্য জগতের প্রায় সকল বিদ্যালয়েই মনোবৃত্তি প্রস্ফুরণকারী শিক্ষার সহিত কার্য্যকরী শিক্ষা প্রদানেরও ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রাচীন সাহিত্যে অর্পিত সময়ের কিয়দংশ লাঘব করিয়া তাহা আধুনিক সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চ্চার নিমিত্ত প্রদত্ত হইয়াছে; জ্যামিতি অধ্যয়নের সঙ্গে জ্যামিতি বিষয়ক অঙ্কন এবং ন্যায় ও অলঙ্কার শাস্ত্রের শিক্ষার সহিত ধনবিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। এইরূপ পরিবর্ত্তন অবশ্যই প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতির খর্ব্বসাধন না করিয়া হয় নাই। মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের চিন্তা রাশির সমন্বয় করিয়াই আজকালিকার বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা প্রণয়ন করা হইয়াছে। পূর্ব্বকালেও ইয়োরপে প্রাচীন সাহিত্য কেবলমাত্র মানসিক উন্নতির জন্যই শিক্ষা দেওয়া হইত না; যাঁহারা গির্জ্জায় প্রবেশ করিতেন, এবং যে সকল শিক্ষিত ব্যক্তি পৃথিবীর সকল স্থানে পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত বাক্যের আদান প্রদান করিতেন, কার্য্যোপযোগী বলিয়াই তাঁহারা প্রধানতঃ গ্রীস ও রোমের প্রাচীন সাহিত্য অধ্যয়ন করিতেন—মনোবৃত্তির উৎকর্ষসাধন তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল না।

প্রাচীনকালে শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিবিধান জাতীয় গৌরব বলিয়া বিবেচিত হইত না। য়িহুদীদিগের মধ্যে ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন ও ধর্ম্মানুষ্ঠান কার্য্য জাতীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রধান অঙ্গ ছিল। গ্রীক ও রোমানগণ দক্ষনাগরিক ও রাজনৈতিক সৃষ্টি করাই গৌরবকর বিবেচনা করিতেন। মধ্যযুগে শিক্ষিত সম্প্রদায় গির্জ্জা ও দৈহিক সামর্থ্যের প্রতি সমধিক গুরুত্ব অর্পণ করিতেন। কাজেই পুরাকালে প্রধানতঃ নীতিশিক্ষা ধর্ম্মশিক্ষা ও ব্যায়ামশিক্ষা প্রচলিত ছিল। অশিক্ষিত ও নিম্ন সম্প্রদায়ের মধ্যেই তখন শিল্পচর্চ্চা আবদ্ধ ছিল। ব্যবসা বাণিজ্য চলিত তখন দ্রব্য বিনিময়ে। শিক্ষিত ব্যক্তি ঐ সকল কার্য্য হেয়জ্ঞান করিতেন। গ্রীস এবং রোমে কার্য্যকরী ব্যবসা আদৌ আদৃত হইত না, সুতরাং সাধারণ শিক্ষার সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ ছিল না। তথাপি পেন (Mr. Payne) বলিয়াছেন যে, মনুষ্যকে শিল্প ও ব্যবসায় বিষয়ক কার্য্যের উপযোগী করাই সমুদায়

ঐতিহাসিক যুগের প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির উদ্দেশ্য ছিল। প্রকৃতই শিক্ষা-ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে শিক্ষা এবং মানজীবনের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমূহের মধ্যে বরাবরই সম্বন্ধ স্থাপিত; দেশকাল ভেদে শিক্ষা স্বতন্ত্র হইলেও ইহা সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে সমাজের উপযোগী ছিল।

প্লেটো তাঁহার "রিপাব্লিক গ্রন্থে" অতীব অবাস্তব শিক্ষার অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহার মতে জ্ঞানলাভ বিষয় কর্ম্মে সহায়তা প্রদান জন্য নহে। গণিত ও জ্যামিতি শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য মনোবৃত্তির উৎকর্ষ বিধান। অথচ সেই "রিপাব্লিক" গ্রন্থেরই প্রধান উদ্দেশ্য নাগরিকগণকে রাজ্যের প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদনে উপযুক্ত সামর্থ্য প্রদান করা। এই অর্থে প্লেটোর শিক্ষা ব্যবসায়মূলক এবং জীবনের দৈনন্দিক কর্ম্ম পরম্পরার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে বিজড়িত। অতএব দেখা যাইতেছে যে প্লেটোর শিক্ষারও মূল উদ্দেশ্য কেবলমাত্র মনোবৃত্তি নিচয়ের উৎকর্ষ বিধান নহে; পরন্তু মনুষ্যকে রাজ্যের উচ্চকার্য্য সমূহ সম্পাদন করিবার উপযুক্ত সামর্থ্য প্রদান করা।

প্রাচীন রোমে শিক্ষার উদ্দেশ্য প্লেটোর "রিপাব্লিকে" সূচিত শিক্ষার উদ্দেশ্য হইতে অনেক স্বতন্ত্র। বাগ্মিতা অভ্যাস করিবার জন্য যেরূপ শিক্ষার প্রয়োজন রোমে সাধারণতঃ তদনুযায়ী শিক্ষাই প্রদত্ত হইত। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রথম ভাগে রোমে কিরূপ শিক্ষা-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল তাহা আমরা কুইনটিলিয়ানের (Quintilian A. D. 35-95) প্রসিদ্ধ শিক্ষা বিজ্ঞান হইতে জানিতে পাই। সুবক্তা হইবার জন্য যে শিক্ষার প্রয়োজন তিনি তাঁহার পুস্তকে কেবল তাহারই আলোচনা করিয়াছেন।

মধ্যযুগে সমুদয় শিক্ষিত সম্প্রদায় 'চার্চ্চের' সভ্য ছিলেন এবং যাঁহারা 'ষ্টেটের' কর্ম্ম পছন্দ করিতেন তাঁহাদিগকেও চার্চ্চের সভ্য-মণ্ডলীর ন্যায় শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইত। সে কালে ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন শিক্ষাপদ্ধতির ভিত্তিস্বরূপ ছিল—সমুদয় শিক্ষারই বাইবেলের সহিত সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। শিক্ষণীয় বিষয় সমূহের মধ্যে যথেষ্ট লাটিন এবং সামান্য গ্রীক প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল। আস্‌চামের (Ascham) সুপরিচিত গ্রন্থে মধ্য-যুগের শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রণালী বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। অস্কার ব্রাউনিং (Mr Oscar browning) বলেন যে, প্রাচীন সাহিত্য তখন বুদ্ধিবৃত্তি পরিমার্জ্জনের জন্য পাঠ্য ছিল না,—সৌখিন কলাবিদ্যা হিসাবে শিক্ষা দেওয়া হইত।

পূর্ব্বকালে শিক্ষা ও বাস্তব কর্ম্মের মধ্যে যে সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ তাহার দ্বিতীয় নিদর্শন। আইন, ঔষধ, এবং ঈশ্বরতত্ত্ব তাৎকালিক বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় ছিল। প্রফেসার লরি (Laurie) তাঁহার "বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠন ও উৎপত্তি" নামক গ্রন্থে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে সেলারণো (Salrno) বিশ্ববিদ্যালয় প্রথমতঃ ঔষধ শিক্ষাগার এবং বলোগনা (Bologna) বিশ্ববিদ্যালয় আইন শিক্ষাগার ছিল। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, শিশু বিদ্যালয় সমূহ যে কেবলমাত্র বিশেষ বিশেষ শাস্ত্রালোচনার

আলয় ছিল তাহা নহে; অধিকন্তু ব্যবসায় ও সমাজের নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয় কর্ম্ম সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান করাই তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

পূর্ব্বে দেখান গিয়াছে যে লাটিন ভাষা প্রাচীনকালে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বাস্তব কর্ম্মের উপযোগী ছিল এবং তজ্জন্যই শিক্ষা-শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন মনীষিগণ লাটিন শিক্ষার এতাদৃশ প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর অনেক লেখক বলিয়াছেন "আমরা লাটিনের দাস। বৈদেশিক ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য যৌবনকাল অতিবাহিত করিতে হইলে গ্রীক ও মুসলমানগণ তাঁহাদের ভবিষ্যৎ বংশাবলির জন্য—কখন ঈদৃশ সম্পদ্ রাখিয়া যাইতে পারিতন না"। লক সাহেব (Locke) বলেন যে সন্তানকে ব্যবসায়ের উপযোগী করিতে হইলে তাহাকে লাটিন শিক্ষায় নিযুক্ত করিয়া বৃথা অর্থব্যয় অপেক্ষা অধিকতর হাস্যজনক বিষয় কিছুই হইতে পারে না; কারণ ব্যবসায়ের জন্য লাটিন শিক্ষার আদৌ প্রয়োজন নাই।

সেকালে ধর্ম্মশাস্ত্রালোচনা ও আইন অধ্যয়ন আদরণীয় ছিল, এবং শিক্ষাবিভাগের উপর ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের অধিক আধিপত্য ছিল বলিয়া স্কুলে প্রাচীন সাহিত্য শিক্ষা প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল। এই শিক্ষা পদ্ধতির বিরুদ্ধে দু'চার জন সংস্কারকের চেষ্টা কিছুই করিতে পারে নাই। শব্দশিক্ষা অপেক্ষা বস্তু শিক্ষার উপকারিতা বহুপূর্ব্বে উপলব্ধি করিলেও সে সময়ে সেরূপ শিক্ষার উপযোগী কোন নূতন উপকরণ আবিষ্কৃত হয় নাই। পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের সেই শৈশবাবস্থায়—ইহা বিদ্যালয়ের ছাত্রবর্গের শিক্ষোপযোগী হইবে—এ আশা কেহই করিতে পারেন নাই।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে লক বলিয়াছেন যে, প্রকৃতির কার্য্য এরূপ সূক্ষ্ম ও বোধ শক্তির অগম্য যে ইহাকে কখনও সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর বিজ্ঞানে পরিণত করা যাইবে না। এমন কি রুসো—যিনি তাঁহার এমিলেতে (Emile) শিল্পশিক্ষাকে প্রধান স্থান দিয়াছেন এবং মৌলিক পর্য্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার সহিত তুলনায় পুঁথিগত বিদ্যার অত্যন্ত নিন্দা করিয়াছেন—তিনিও প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির তখন কোন পরিবর্ত্তন সংঘটন করিতে পারেন নাই। রুসো যে শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন তাহা সে সময়ের উপযোগী ছিলনা। কারণ সেকালে কার্য্যোপযোগী শিক্ষালাভ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে তাহা খাটাইবার উপায় ছিল না; অধিকন্তু পুঁথিগত বিদ্যাই মান সম্ভ্রম প্রদান করিত। কাজেই বস্তুগত শিক্ষা সম্বন্ধে উপদেশ সাধারণের নিকট আদরণীয় হয় নাই। কিন্তু রুসো ঠিকই বুঝিয়াছিলেন; এক্ষণে সকলে তাঁহার বাক্যের যাথার্থ্য অনুভব করিতেছেন এবং বলিতেছেন, যে, বাহ্য জগতের সহিত মনোবৃত্তিনিচয়ের সুস্পষ্ট সম্বন্ধ স্থাপনেই বৃত্তিসমূহের প্রকৃত উন্নতি। হারবার্ট স্পেন্সারও বলিয়াছেন যে মনুষ্যকে সর্ব্বতোভাবে জীবন যাপন করিতে সক্ষম করা শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য;—এবং ইহা করিতে হইলে জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয় কর্ম্মের সহিত শিক্ষার সম্বন্ধ থাকা একান্ত আবশ্যক।

শিক্ষা-ইতিহাস, বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের

প্রাথমিক শিক্ষা প্রণালী ও তাহার উদ্দেশ্য, এবং শিক্ষা বিজ্ঞানে ব্যুৎপন্ন মনীষিগণের অভিমত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা গেল যে, আবহমানকাল হইতে বাস্তব কর্ম্মের সহিত শিক্ষার সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে এবং এই সম্বন্ধ স্থাপনের জন্ত বহুবিধ চেষ্টাও হইয়াছে। শিক্ষা দেশ কাল ভেদে বরাবরই সমাজের উপযোগী ছিল। কালক্রমে সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তন নিবন্ধন শিক্ষা প্রণালীরও পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। বিশতাব্দী পূর্ব্বের সমাজ ও আধুনিক সমাজ এক নহে, ইহাদের মধ্যে অনেক পার্থক্য জন্মিয়াছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজেরও বহু পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। এখন আর দ্রব্য বিনিময়ে ক্রয় বিক্রয় চলে না; শিল্প ও বাণিজ্যের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং বহুবিধ শিল্পব্যবসায়েরও সৃষ্টি হইয়াছে। নানারূপ কলকারখানার সৃষ্টি হওয়ায় আজকাল অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বহুবিধ দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে এবং পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যাতায়াতেরও বিশেষ সুবিধা হইয়াছে—একণে এক মাসের পথ এক দিবসেই যাওয়া যায়, স্থানের দূরত্ব আর পূর্ব্বের স্তায় সময়াপহারক নহে। বিজ্ঞান আধুনিক সমাজে এক নবযুগ আনয়ন করিয়াছে; আজকাল একস্থানে বসিয়া নিমেষমধ্যে সমস্ত পৃথিবীর খবর পাওয়া যায়। রেলগাড়ী, ষ্টীমার ও টেলিগ্রাফ স্থান ও সময়ের সঙ্কীর্ণতা দূর করিয়া সমগ্র পৃথিবীকে একসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছে। এই সকল পরিবর্ত্তননিবন্ধন একণে শিল্প ও বাণিজ্য স্বাভাবিক বুদ্ধির দ্বারা চালিত না হইয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চালিত হইতেছে। ইদানীং এমন অনেক নূতন নূতন শিল্প ও ব্যবসায়ের সৃষ্টি হইয়াছে যাহা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ব্যতিরেকে পরিচালিত করা একেবারে অসম্ভব। সুতরাং ব্যবসাবাণিজ্য করিতে হইলে আজকাল বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন।

অতএব আমাদের দেশেও শিক্ষাকে কার্য্যের উপযোগী করিতে হইলে এখন আর অতীতকালের শিক্ষা প্রণালী বজায় রাখিলে চলিবে না; সমাজের নূতন নূতন আবশ্যকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তদুপযোগী শিক্ষা-প্রণালীরও প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। সুখের বিষয় দেশের লোকে অল্পবিস্তর পরিমাণে ইহা বুঝিয়াছেন। শিল্পশিক্ষা ব্যতিরেকে একণে আর ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি সাধন সম্ভবপর নহে, ইহা দেখিয়া অনেকেই শিল্পশিক্ষার জন্ত উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছেন। সংসারে প্রবেশ করিয়া বালক বালিকাদিগকে যে কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে হইবে তাহাদিগকে তদুপযোগী শিক্ষা প্রদান করিবার জন্ত সাধারণের দিন দিন অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ পাইতেছে; ব্যবসায় বাণিজ্যের উদ্যোগ এবং শিল্পবিদ্যালয়াদির প্রতিষ্ঠার-দিকেও লক্ষ্য পড়িয়াছে। তথাপি এখনও আমাদের অভাব বিস্তর। কর্ম্মক্ষেত্রের সকলরূপ বিভাগে প্রবেশ পথ যতদিন না উন্মুক্ত হয় ততদিন এই আগ্রহের অনুরূপ ফললাভে আমরা বঞ্চিত। এপক্ষে আর একটি প্রধান অন্তরায় শিক্ষকের অভাব। জ্ঞান প্রচারের দিকে আমাদের যেমন লক্ষ্য পড়িয়াছে সেই সঙ্গে কার্য্যকরী শিক্ষার সকল বিভাগেই শিক্ষক প্রস্তুতের চেষ্টারও আবশ্যক।

যোগেন্দ্রবাবুর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সমিতি হইতে এতদুদ্দেশ্যে ইয়োরোপ জাপানে মধ্যে মধ্যে ছাত্র প্রেরিত হইয়া থাকে, সম্প্রতি বেঙ্গল শিল্পবিদ্যালয় হইতেও সাতজন যুবক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষা পাইবার জন্য আমেরিকায় গিয়াছেন; ইহা অতিশয় সুলক্ষণ সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপি আমাদের অভাবের পক্ষে এই আয়োজন একদিকে সামান্য —অন্যদিকে আবার যাঁহারা বিদেশ হইতে শিখিয়া দেশে ফিরিতেছেন তাঁহারাও সকলে দেশসেবাই ব্রতরূপে গ্রহণ করিতেছেন না! বস্তুতঃ যেদিন আমরা দেখিব বঙ্গের ফার্গুসন কলেজের ব্রতধারী শিক্ষকগণের ন্যায় বঙ্গদেশেও বিলাত প্রত্যাগত শিক্ষকগণ অনন্য চিন্তাহীনভাবে শিক্ষাদানে নিযুক্ত সেইদিন বুঝিব আমাদের ন্যাসানেল কলেজ বা শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সার্থক।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

ইংরাজের স্বদেশ-প্রেম।

মোগল পাতসাহদিগের রাজত্বের অবসানকালে ভারতের চতুর্দ্দিকে ঘোর অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। দিল্লির সম্রাট তখন নামে সম্রাট বলিয়া পরিচিত হইতেন। তাঁহার হস্ত হইতে শাসন-বল্গা বিচ্যুত হইয়াছিল। গৃহস্বামীর অনুপস্থিতে অথবা কার্য্যকুশলতার অভাবে গৃহের সর্ব্বত্রই যেরূপ বিশৃঙ্খলা পরিদৃষ্ট হয়, মোগল পাতসাহদিগের অকর্ম্মণ্যতায়, দৌর্ব্বল্যে ভারতবর্ষের রাজ্যনিচয়ের তদ্রূপ অবস্থা হইয়াছিল। তখন সকলেই স্ব স্ব প্রাধান্য স্থাপনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন, কাজেই গৃহ-বিবাদাগ্নি ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল।

এই সময়ে বঙ্গদেশ ইংরাজবণিকদলের ক্রমেই করতলগত হইতেছিল। তথায় ইংরাজের প্রভুত্ব লইয়া বিবাদ করিবার আর কেহই ছিল না। উত্তর-পশ্চিমের অবস্থাও প্রায় তথৈবচ হইয়াছিল। দিল্লির সম্রাট কখন মুসলমান রাজদ্রোহীর, কখন মহারাষ্ট্রীয় নরপতির হস্তে ক্রীড়ণকস্বরূপ বিরাজ করিতেছিলেন। দাক্ষিণাত্যে আধিপত্য বিস্তার মানসে কেবল যে ইংরাজ ও ফরাসী রণাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা নহে; দেশীয় রাজন্যবর্গও স্বাধীনভাবে দাক্ষিণাত্য গ্রাসের চেষ্টা করিতে বিরত হন নাই। পঞ্জাবে শিখের বল প্রবল থাকিলেও অরাজকতার অভাব ছিল না।

ভারতবর্ষের এবংবিধ অবস্থায় য়ুরোপ হইতে দলে দলে শ্বেতাঙ্গ আগমন করিতেন। ভারত রত্নপ্রসূ বলিয়া চিরকাল কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। এই সময়ে ভারতবর্ষ হইতে রত্নাহরণ করা সুবিধাজনক, ইহা অনেকেই অনুমান করিয়া—স্বদেশে উপেক্ষিত অবস্থায়, দৈন্যদশায়, অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া অপেক্ষা ভারতবর্ষে ভাগ্য পরীক্ষার্থ আগমন করা শতগুণে শ্রেয়ঃ ভাবিয়া—কোনরূপে ভারতে পদার্পণ করিতে প্রয়াসী হইতেন। বলা বাহুল্য, ইঁহাদিগের অধিকাংশেরই আশা পূর্ণ হইত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমরা যে সময়ের ঘটনা লিপিবদ্ধ করিতেছি, ভারতবর্ষে তদ্রূপ দুঃসময় পূর্ব্বে কখন উপস্থিত হয় নাই। স্বল্পবুদ্ধি নৃপতিরা সে সময়ে ইংরাজ ও ফরাসীর বল অনুভব করিতে পারিয়াও, আগন্তুক "ভবঘুরে" শ্বেতাঙ্গদিগের কল-কৌশলে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাদিগের দ্বারা সৈনিক-বিভাগ অলঙ্কৃত করিতে বিরত হন নাই। তাঁহারা এই শ্রেণীর শ্বেতচর্ম্মীর সাহায্যে পরস্পরে বিবাদ বিসংবাদে মত্ত হইতেন। তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই, এই অন্তর্ভেদে তাঁহাদিগের রাজ্যলাভাকাঙ্ক্ষা কথনই ফলবতী হইবে না। ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রাধান্য, বলদৃপ্ততা তথন কাহারও অগোচর ছিল না। সেই সর্ব্বগ্রাসিনী ক্ষমতা প্রতিহত করণ মানসে দেশীয় রাজন্যবৃন্দ সমবেত না হইয়া আত্মকলহে মত্ত হইলেন, পরস্পরের কণ্ঠচ্ছেদে হস্তপ্রসারণ করিতে লাগিলেন।

দেশীয় নরপতিদিগের মধ্যে মহারাষ্ট্রীয় ভূপতি সিন্ধিয়া সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। হোলকার প্রবল প্রতিপক্ষ সিন্ধিয়াকে দমন করিবার জন্য সতত সচেষ্ট থাকিতেন। সিন্ধিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব লাভের প্রধান কারণ, তাঁহাদের অধীনে যেরূপ শ্বেতাঙ্গ সেনাপতি পরিচালিত সুশিক্ষিত সৈন্যদল ছিল, হোলকারের তাহা ছিল না। তখন পূর্ব্বোক্ত "ভবঘুরে" শ্বেতাঙ্গগণ ভারতবর্ষে আসিয়াই দেশীয় নৃপতিদিগের অধীনে সৈন্যবিভাগে কর্ম্ম গ্রহণ করিতেন। দেশীয় রাজাদিগেরও বিশ্বাস ছিল, সেনাদলের সুশিক্ষায়, শৃঙ্খলা স্থাপনে শ্বেতাঙ্গদিগের ন্যায় দেশীয় সেনানায়কেরা নিপুণ নহেন। এরূপ ধারণা যে ভিত্তিহীন ছিল, তাহা নহে। বস্তুতঃ সে সময়ে যে রাজার অধীনে যত শ্বেতচর্ম্মী সেনানায়ক থাকিতেন, এবং তাঁহাদিগের পরিচালিত সৈন্যবল যত অধিক থাকিত, সেই রাজারই বল সেই পরিমাণে অধিক হইত। হোলকারের উপর সিন্ধিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব এই নিমিত্তই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

এই ত গেল আভিজাত্যবর্গের কথা। তাহার পর ভারতবাসী যোদ্ধৃগণের কথা। ইঁহাদিগের স্বদেশপ্রেম বা স্বজাতিপ্রীতি আদৌ ছিল না। যেখানে অর্থাগমের অধিকতর সুবিধা হইত, সেইখানেই ইহারা গমন করিয়া সৈন্যদল পুষ্ট করিত। ভারতবাসী কৃতঘ্ন নহে বলিয়া যে প্রবাদ প্রচলিত আছে, এই সময়ে তাহার বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল। "নিমকহারামী" তখন দোষের বিষয় বলিয়া পরিগণিত হইত না। ইহারা আজ যাঁহার "নিমক" খাইত, কল্য আবার তাঁহারই বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিতে কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হইত না। সে সময়ে পিতা পুত্রে, সহোদরে সহোদরে, জ্ঞাতি কুটুম্বে ভিন্ন ভিন্ন দলের পক্ষভুক্ত হইয়া রণাঙ্গনে পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্রচালনায় ক্ষান্ত হইত না। এতদপেক্ষা অধিকতর শোচনীয় অবস্থা আর কি হইতে পারে?

যশবন্ত রাও সে সময়ে হোলকারের রাজ-সিংহাসনের শোভাবর্দ্ধন করিতেছিলেন। তাঁহার অন্যতম সেনানায়ক মেজর আর এল এমব্রোস বিলাতের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডাইরেক্টরদিগের চেয়ারম্যানকে এই সময়ে ভারতবর্ষের অবস্থার সম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, পাঠকের অবগতির নিমিত্ত আমরা তাহার অংশবিশেষের অনুবাদ করিয়া দিলাম।

ইংরাজি পত্রের মর্ম্মানুবাদ।*

যখনই সিভ্যালিয়ার ডুডারনেগ এবং মসিঁয়ো প্লুমের কথা হোলকারের মনোমধ্যে উদিত হইত, তখনই তিনি ফরাসীদের নামে ঘৃণা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। ইহার নিমিত্ত তাঁহার প্রতি দোষারোপ করিতে পারা যায় না। কারণ উক্ত সৈনিকপুরুষদ্বয়কে তিনি সেনানায়কের পদে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, অথচ উহারা সিন্ধিয়া-সেনার আগমনের পূর্ব্বেই, উচ্চপদস্থ সৈনিক কর্ম্মচারী এবং পদাতিক সেনাসহ, রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। ইহাতেই সিন্ধিয়ার নিকট হোলকারকে পরাভব স্বীকার করিতে হয়। হোলকার উক্ত ফরাসীদ্বয়ের ব্যবহারে এরূপ বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, ফরাসী দেশেরও নামোচ্চারণকালে তিনি ঘৃণা প্রকাশ করিতেন। তদনন্তর তাঁহার অধীনে যে সকল (Brigades) গঠিত হইয়াছিল, সেই সকল সেনাদলের সেনাপতিগণকে তিনি বিশেষভাবে বলিয়া দিয়াছিলেন, যেন উক্ত "দাগাবাজ" (বিশ্বাসঘাতক) জাতির কোন লোককে আর সৈন্যপদে বরণ করা না হয়।

"যাহারা প্রাচ্য দেশের (ভারতের) অবস্থা পরিজ্ঞাত আছেন, তাঁহারা বিশেষরূপে জানেন যে, সে দেশে যুদ্ধ-ব্যবসায়ী লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি, সুবিধা পাইলেই, এক রাজার অধীনে

" Holkar detested—justly detested—the name of a Frenchman, when he reflected that by the Chevalier Dudernaigue and Morsieur Plumet, to whom in the first instance he was deserted on the near approach of Scindia's army and left with his infantry, depiived of officers, to the defeat which he experienced at Indore. So highly irritated was he, that he never mentioned the country without signs of abhorence, and it was his express order to the commanders of brigades subsequently appointed, that on no account whatever should they afford employment to individuals of a nation by him entitled the *Duggerbaz*, or Faithless.

It is well known, to those conversant with the affairs of the East, that there are in that country many hundreds of thousands, soldiers by profession, who wander continually from service to service, from prince to prince, as the pressure of the moment requires there assistance and promises them employment. Gain is their God, and it is perfectly immaterial to them to whom they serve, while they are paid, and the *minutiæ* of their caste attended to. That an ulter stranger, with effecient funds, might at any times raise an army in Hindustan, who would follow him and fight his battles as long as his resources were sufficient for the current expenses of the day. Born soldiers, without any other profession than that of arms, these men eagerly flock to the standard of any adventurer, however desperate his prospects, if he only possesses then *summum bonum* of their happiness. In the minds of these people no such sentiment as *amor patriæ* is to be founded, above affection for a few clods of earth or stumps of trees, merely from their having been imprinted on their recollection, from the sportive period of infancy. The Indian is, in this point, a citizen of the world. It not unfrequently happens that fathers, sons, and brothers embrance different service, and meet in battle array on the ensanguined plain aganst each other, perhaps unwitting by to fall by each other hands".

চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া, অন্য রাজার অধীনে চাকুরী পাইবার জন্য, নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। অর্থই তাহাদিগের উপাস্য দেবতা। তাহারা কাহার অধীনে কি কার্য্য করিতেছে, তাহা আদৌ ভাবে না, জাতিধর্ম্ম রক্ষা করিয়া অর্থলাভ করিতে পারিলেই তাহার কৃতার্থ হইত। এমন কি, যদি কোন ভিন্নদেশীয় লোক'ও (অর্থাৎ ভারতবাসী নহেন) সৈন্যদিগের দৈনন্দিন ব্যয় নির্ব্বাহকরণোপযোগী অর্থ সংগ্রহ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষেও সৈন্যবল গঠন কোনরূপে দুষ্কর কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয় না। এই সকল সৈন্য তাঁহার পক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইতে কুণ্ঠাবোধ করে না। ইহারা জন্মাবধিই যোদ্ধৃপুরুষ, অস্ত্রচালনা ব্যতীত অন্য ব্যবসায় জানে না। অসাধ্য সাধনার্থও যদি কেহ ইহাদিগকে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ করান্, অর্থ পাইলে, ইহারা তাহাতেও পশ্চাৎপদ নহে। ইহাদিগের "স্বদেশ প্রেম" বলিয়া কোন বৃত্তি নাই, কেবল বাল্যের ক্রীড়াভূমি পাদপশ্রেণী-পরিশোভিত কয়েকটা মৃত্তিকাখণ্ড ইহাদিগের হৃদয়ে সময়ে সময়ে প্রীতিপূর্ণ স্মৃতিকে জাগাইয়া তোলে। এই বিষয়ে ভারতবাসীকে জগদ্বাসী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পিতা, পুত্র, ভ্রাতা প্রমুখ স্বজননিচয় ভিন্ন ভিন্ন লোকের অধীনে পদগ্রহণ করিয়া যুদ্ধস্থলে পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে পরাঙ্মুখ হয় না; এমন কি, একের হস্তে অন্যের নিধনপ্রাপ্তিও যে বিরল ঘটনা এমনও নহে।"

ভারতের এবংবিধ অবস্থার সময়, আর্ম্‌ষ্ট্রং নামক জনৈক ইংরাজ সৈনিকপুরুষ হোলকারের সেনাবিভাগে চাকুরী গ্রহণ করেন। আর্ম্‌ষ্ট্রং মেজরের পদে উন্নীত হন। ডুডারনেগ এবং প্লুমে নামক হোলকারের ফরাসীসেনাপতিদ্বয় যখন সিন্ধিয়ার সেনাগমন দেখিয়া ভয়ে কাপুরুষের ন্যায় স্বদলে রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিল—অন্নদাতা প্রভু হোলকারের সর্ব্বনাশ সাধনে ইতস্ততঃ করিল না—তখন হোলকার গত্যন্তর না দেখিয়া আমষ্ট্রংকে মেজর প্লুমের পদে নিযুক্ত করেন। পাঠক! উপরি-উদ্ধৃত পত্রের অনুবাদ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন, ডুডারনেগ ও প্লুমের বিশ্বাসঘাতকতায় হোলকার সমগ্র ফরাসী জাতির উপর কিরূপ বিরক্ত হইয়াছিলেন; এমন কি; উহাদিগকে "দাগাবাজ" বলিয়া অভিহিত করিতেও বিরত হন নাই।

যাহা হউক, ১৮০২ খৃষ্টাব্দে হোলকারের অনুকম্পায় তদীয় দ্বিতীয় সৈন্যদলের অধিনায়কের পদে মেজর আর্ম্‌ষ্ট্রং বরিত হইয়া সেই বৎসরেই পুণার যুদ্ধে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ মেজর আর্ম্‌ষ্ট্রংএর কার্য্যকাল দীর্ঘ হয় নাই। কারণ পর বৎসরে অর্থাৎ ১৮০৩ সালে ইংরাজ-কোম্পানীর সহিত হোলকারের যুদ্ধ বাধে। হোলকারের বিশ্বাস ছিল, তাঁহার অর্থে পুষ্ট ইংরাজ সেনানীবৃন্দ তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে, "নিমকহারামী" করিবে না। কিন্তু তাঁহার এই সিদ্ধান্ত যে ভ্রমপূর্ণ, কার্য্যকালে তিনি তাহার প্রমাণ পাইলেন। হোলকার স্বয়ং ভারতবাসী। সুতরাং তদানীন্তনকালের ভারতবাসীর ন্যায় তাঁহারও স্বজাতিপ্রীতি, স্বদেশপ্রেম প্রভৃতির মূর্চ্ছাবগত

হইবার শক্তি ছিল না। যাহার বলে ইংরাজ জাতি আজি সসাগরা ধরিত্রীর অধিপতি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, সেই স্বজাতিপ্রীতি, স্বদেশপ্রেমিকতা আবহমান-কাল ইংরাজের অস্থিমজ্জায় সংবদ্ধ হইয়া আছে। কাজেই ইংরাজ কোম্পানীর সহিত যখনই হোলকারের বিবাদ বাধিল, তখনই হোলকারের ইংরাজ সৈনিক কর্ম্মচারীরা পদ ত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। ইংরাজ চরিত্রের এই মহত্ব হোলকার বুঝিতে পারিলেন না, তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া ভাইকার্স, ডড এবং রায়েল নামক ইংরাজসৈনিক কর্ম্মচারীদিগের প্রাণসংহারে আদেশ দিলেন। মেজর আর্মষ্ট্রং ইহাতেও বিচলিত হইলেন না। তিনি স্বদেশের পতাকার বিরুদ্ধে কখনই অস্ত্রধারণ করিবেন না স্থির করিলেন। বহুকষ্টে নানাপ্রকার বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তিনি হোলকাব রাজ্য হইতে অবশেষে পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার এই মহত্বে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে জীবনের অবশিষ্টকাল পর্য্যন্ত মাসিক বারশত টাকা পেন্সন ভোগ করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

এই ঘটনায় ইংরাজ ও ভারতবাসীর চরিত্রের পার্থক্য স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। মেজর আর্মষ্ট্রং প্রভৃতির ন্যায় ভবঘুরে ইংরাজ স্বদেশে উদরান্নের সংস্থান করিতে না পারিয়া, উদরপূর্ত্তির দায়ে আত্মীয় কুটুম্ব, বন্ধুবান্ধব পরিত্যাগপূর্ব্বক ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। এখানে তাঁহাদিগের সৌভাগ্য-সূর্য্য উদিত হয়। অথচ তাঁহারা স্বপ্নেও স্বদেশদ্রোহিতা করিবার কল্পনা করিতে পারেন নাই, প্রাণপাত করিয়া স্বদেশের সেবা করিয়াছিলেন। আর ভারত-বাসী—স্বদেশে থাকিয়া, স্বজাতির অন্নে পুষ্ট হইয়া, স্বদেশদ্রোহী হইয়া, আত্মীয়স্বজন, জ্ঞাতিকুটুম্ব প্রভৃতির কণ্ঠচ্ছেদে পশ্চাৎপদ হয় নাই। তুলনায় আলোচনা করিলে বলিতে হয়, একটি স্বর্গের দৃশ্য, অপরটী রৌরবের জঘন্য নিকৃষ্ট চিত্র। যাঁহার চক্ষু আছে, যাঁহার হৃদয় আছে, তিনিই ইংরাজের এই গুণ দেখিতে পান, ইংরাজের এই চরিত্রমাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারেন।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সুশ্রুত।

কি ঐহিক বিষয়, কি আধ্যাত্মিক বিষয়, কি বিজ্ঞান, কি জ্যোতিষ, যেদিকে দৃষ্টিপাত করি হিন্দুজাতির অপার ভূয়োদর্শন ও গভীর পাণ্ডিত্য দেখিয়া বিমুগ্ধ হই; অপিচ আমিও যে এই জাতি সমুদ্রের একটী কণামাত্র ইহা মনে করিয়া গৌরবান্বিত বোধ করি। সুশ্রুত কাশিরাজ দিবোদাস ধন্বন্তরির জনৈক শিষ্য। গুরুপ্রোক্ত শল তন্ত্র বা ক্ষারদাহন ও অস্ত্রনিষ্পন্ন চিকিৎসাশাস্ত্র ইনি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন; তাহাই কালক্রমে সুশ্রুত নাম ধারণ করিয়াছে। গ্রন্থকর্ত্তার নাম হইতে গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ অথর্ব্ব-

বেদের উপাঙ্গ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই আয়ুর্ব্বেদ স্বয়ম্ভু এক লক্ষ শ্লোকে ও সহস্র অধ্যায়ে প্রণয়ন করেন। ইহাতে অষ্ট বিষয়ের উল্লেখ আছে; ইহাই চিকিৎসা শাস্ত্রের অষ্টাঙ্গ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে—যথা শল্য, শাল্যাক, কায়চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমারভৃত্য, অগদতন্ত্র, রসায়নতন্ত্র ও বাজিকরণতন্ত্র।

যে সুশ্রুত সংহিতা আমরা দেখিতে পাই ইহা ভগবান সুশ্রুতের রচিত নহে। ইহা নাগার্জ্জুন নামক জনৈক নৃপতি দ্বারা প্রতিসংস্কৃত সুতরাং সুশ্রুতের ছায়ামাত্র। সুশ্রুত সংহিতার টীকাকার ডহ্বন ইহা লিখিয়াছেন। প্রতিসংস্কর্ত্তা নাগার্জ্জুন এবং বাগ্‌ভট ও আভাষে তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন যথা:—

ঋষিপ্রণীতে ভক্তিশ্চেন্মুক্ত্বা চরক সুশ্রুতৌ।
ভেলাদ্যাঃকিংন পঠ্যন্তে তস্মাদ্‌গ্রাহ্যং সুভাষিতং।
(অষ্টাঙ্গ হৃদয়)

অর্থাৎ যদি ঋষি প্রণীত গ্রন্থে ভক্তি থাকে তাহা হইলে চরক সুশ্রুত পরিত্যাগ করিয়া ভেল লিখিত চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত সুতরাং যাহা সুভাষিত তাহাই সুধিগণের গ্রহণীয় হইয়া থাকে।

অপিচ চরক সুশ্রুতের টীকায় টীকাকারগণ বৃদ্ধসুশ্রুত হইতে প্রমাণস্বরূপ বচন উদ্ধার করায় বুঝা যাইতেছে সুশ্রুত ঋষির গ্রন্থ তাঁহাদের সময়ে সংসারে বিরাজিত ছিল—তখনও তাহার লোপাপত্তি ঘটে নাই।

বিজয় রক্ষিত মাধবনিদানের জ্বর-টীকায় লিখিয়াছেন—"পুষ্পেভ্যোগন্ধরজসী,—অগ্নেভ্যো যথানিলঃ ইত্যাদিনা বৃদ্ধসুশ্রুতেন পঠিতং—তৃণপুষ্পাখ্যং জ্বর মত্রৈবান্তর্ভাবয়ন্তি।"

অর্থাৎ পুষ্প হইতে গন্ধ ও পরাগ এবং অগ্নি হইতে যেমন বায়ু বৃদ্ধ সুশ্রুতের এই বচন দ্বারা সেইরূপ তৃণপুষ্পাখ্য জ্বরের বিষয় প্রকাশ পাইতেছে।

সুশ্রুত যে hay ও malaria fever জানিতেন ইহাই তাহার প্রমাণ। কিন্তু ইহা সুশ্রুত সংহিতাতে নাই।

চক্রদত্তের বাতব্যাধিপ্রোক্ত শাবন বেদের টীকায় শিবদাস লিখিয়াছেন—

বৃদ্ধ সুশ্রুতে তু কাকোল্যাদি যথা—
কাকোল্যৌ মধুকামোদে জব কর্ষভকৌ সহে।
ঋদ্ধির্বৃদ্ধিস্তু শাক্ষীরী পুণ্ডরীকাং সপদ্মকং।
জীবন্তী সামৃতাশৃঙ্গী মৃদ্বীকাচেতি কুত্রচিৎ।
কাকোল্যাদিরয়ং পিত্তশোণিতানিলনাশনঃ॥

সুশ্রুতসংহিতা সূত্রস্থান ৩৯ অধ্যায়ে ইহা গদ্যে আছে।

বৃন্দের সিদ্ধযোগ অর্শাধিকারে পিপ্পল্যাদি তৈল টীকায় শ্রীকণ্ঠ বলেন—"বৃদ্ধ সুশ্রুতেতু তৈলেঽস্মিংশ্চতুর্গুণং তোয়ং দর্শিতং"।

অতএব দেখা যাইতেছে নাগার্জ্জুন প্রতি সংস্কার করিতে গিয়া বৃদ্ধ সুশ্রুতকে নূতন করিয়া গড়িয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার মনোহর পদ্যগুলি ভাঙ্গিয়া গদ্যাকার প্রদান করিয়াছেন। হিন্দুর দৃষ্টিতে ইহা ভাল হয় নাই।

বর্ত্তমান সুশ্রুতসংহিতা ছয় ভাগে বিভক্ত যথা—সূত্রস্থান, শারীরস্থান, নিদানস্থান, চিকিৎসাস্থান, কল্পস্থান, ও উত্তরতন্ত্র। সূত্র ও শারীর স্থানের অধিকাংশ গদ্যে লিখিত মধ্যে মধ্যে 'ভবতি ভবতঃ ভবন্তি চাত্র' বলিয়া এক দুই বা অধিক ছত্র পদ্যের উদ্ধার আছে। বোধ করি ইহাই বৃদ্ধ সুশ্রুতের প্রতি সম্মানের নিদর্শন স্বরূপ। নিদান ও চিকিৎসা স্থানের

অধিকাংশ পদ্য, অল্প গদ্য। আমার মতে এই পদ্যের অল্প বিস্তর বৃদ্ধ সুশ্রুতের বচন হইতে পারে। কল্প ও উত্তর তন্ত্র সম্পূর্ণ পদ্যে রচিত। ইহা নাগার্জ্জুন কর্ত্তৃক রচিত। ভাষা মার্জ্জিত প্রাঞ্জল ও প্রসাদগুণবিশিষ্ট, বিষয় মনোহারী;—পাঠে পুরাকালের অনেকানেক তত্ত্বের অবগতি হয়। যাঁহারা ইহা একবার পড়িয়াছেন তাঁহারা ভগবান ধন্বন্তরির অসীম জ্ঞানরাশির পরিচয় পাইয়া চমৎকৃত হইবেন সন্দেহ নাই। আর যে ধৃষ্টবুদ্ধিগণ আধুনিক ইউরোপীয় চিকিৎসার বহুমান করিয়া নিজের বস্তুকে অকিঞ্চিৎকর মনে করেন তাঁহারা ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া পাঠ করিলে নিজের দুর্ব্বুদ্ধিতাকে ধিক্কার দিয়া লজ্জিত হইবেন!

আত্রেয় শিষ্য অগ্নিবেশ স্বীয় নামে যে তন্ত্র প্রণয়ন করেন তাহা পরবর্ত্তী কালে চরক ঋষি কর্ত্তৃক প্রতিসংস্কৃত হইয়া চরক নাম ধারণ করিয়াছে। এই চরকে যে অভাব ছিল তাহা পঞ্চনদবাসী বিদ্বান দৃঢ়বল পূরণ করেন এবং কল্প ও সিদ্ধিস্থান গুলিও সংযোজিত করিয়া দেন—যথা

অস্মিন্ সপ্তদশাধ্যায়াঃ কল্প সিদ্ধয়ঃ এব চ।
নাসাদ্যন্তেঽগ্নিবেশস্য তন্ত্রে চরক সংস্কৃতে॥
অখণ্ডার্থং দৃঢ়বলোজাতঃ পঞ্চনদেপুরে।
কৃত্বা বহুভ্যস্তন্ত্রেভ্যো বিশেষাচ্ছবলোচ্চয়ং।
সপ্তদশৌষধাধ্যায়ান্ সিদ্ধিকল্পৈরপূরয়ৎ।

চরক চিকিৎসাস্থান ৩০ অধ্যায়!

অর্থাৎ—চরক সংস্কৃত অগ্নিবেশতন্ত্রে ১৭ অধ্যায়ে পূর্ব্বকল্প ও সিদ্ধি সন্নিবিষ্ট ছিলনা তাহা পঞ্চনদবাসী দৃঢ়বল চরক সম্পূর্ণ করিবার জন্য যোজনা করিয়াছেন।

ইনি নিজের নাম প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন, নাগার্জ্জুন তাহা করেন নাই; কেন ইহা জিজ্ঞাসিত হইতে পারে?

নাগার্জ্জুন জনৈক বৌদ্ধনৃপতি ছিলেন। রাজতরঙ্গিনীমতে ইনি কাশ্মীররাজ অভিমন্যুর রাজ্যকালে প্রাদুর্ভূত হন এবং সেই সময় বৌদ্ধগণ প্রবল হওয়ায় কাশ্মীরও শাসন করিয়াছিলেন যথা,—

আবিভুবাভিমন্যুঃ শতমন্যুরিবাপরঃ।
তস্মিন্নবসরে বৌদ্ধাঃ দেশে প্রবলতাংযযুঃ।
নাগার্জ্জুনেন সুধিয়া বোধিসত্ত্বেন পালিতা।

এই বিদ্বান নাগার্জ্জুন মহাযান নামক বৌদ্ধধর্ম্ম পদ্ধতি নিয়ামকগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সুতরাং ইঁহার প্রতিসংস্কারের অধীনে পড়িয়া বৃদ্ধ সুশ্রুত মাংসবর্জ্জিত কঙ্কালে পরিণত হইয়াছেন। পরবর্ত্তী কালে হিন্দুর নিকট বৌদ্ধগ্রন্থের যে বিষম পরিণামের বিষয় শ্রুত হওয়া যায়, বৌদ্ধপ্রভাবকালে হিন্দুগ্রন্থের প্রতি সেপ্রকার কিছু হইয়াছিল কিনা তাহা শ্রুত হওয়া যায় না। তবে চিকিৎসাশাস্ত্র মানব ও জীবজন্তুর প্রতি হিতকরী বলিয়া এই শাস্ত্রে তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। অন্য সাধারণ ঋষিপ্রণীত গ্রন্থে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস হয় নাই বলিয়া স্বয়ং বিক্রমশালী রাজা তাহার সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি প্রতি সংস্কারে মনোনিবেশ করিয়া ঋষির পদ্যগ্রথিত অংশের বিলোপ সাধন করিয়া তাহার ভাবার্থমাত্র গদ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। টীকাকারগণের উদ্ধারদ্বারা বোধ হয় ইনি বৃদ্ধসুশ্রুতের অনেক অংশ বাহুল্য বোধে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সুতরাং ইহাতে ত্রিকালজ্ঞ ঋষির রচনার অভাব স্বভাবতঃ আমাদের মনকে বিকল করিতেছে।

নাগার্জ্জুন কতকগুলি বিসদৃশ কথাও লিখিয়াছেন। সকলেই জানেন বেদের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত হিন্দুগণ,—শিশির বসন্ত গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শাস্ত্র সম্মত এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে ছয় ঋতুকে স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু সুশ্রুতসংহিতায় প্রচলিত পর্য্যায় পার্শ্বে বর্ষা শরৎ হেমন্ত বসন্ত গ্রীষ্ম প্রাবৃট এইরূপ ক্রম-উল্লেখ করা হইয়াছে। উত্তরতন্ত্রের উপসংহারেও এই শেষোক্ত ঋতুপর্য্যায়ই দৃষ্ট হয়। ইহাদ্বারা দুইটি বিষয় অবগত হওয়া যায়—১ম—সুশ্রুতের বহুকাল পরে প্রতিসংস্কারক প্রাদুর্ভূত হন। ২য়—তিনি কোন বর্ষা বহুল দেশের অধিবাসী ছিলেন। হুষ্কজুষ্ককনিষ্ক আদি তুরুষ্কবংশীয় বৌদ্ধ নৃপতিগণের মথুরার নিকটবর্ত্তী উৎকীর্ণ শিলালিপিদ্বারা জানা যায় যে তাঁহারাও ঋতুপর্য্যায়ে প্রাবৃটকালেরই প্রথম উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং আশ্চর্য্য নাই যে ঋতুর এই শেষোক্ত ক্রমই বৌদ্ধগণেরই অনুমোদিত হইবে। শুনিলাম পারসীকগণও বর্ষাকে আদি স্বীকার করিয়া ঋতু গণনা করেন। হিন্দুগণ প্রাবিট্‌কে বর্ষা পর্য্যায়েই ধরিয়াছেন—যথা শরৎকালং প্রতীক্ষস্ব প্রাবৃট্‌কালোঽয়মাগতঃ। রামায়ণ কিষ্কি ২৭অ ৩৯। আবার ২৬ সর্গে বর্ষার ও শরতের চারি মাসকে বার্ষিক সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে যথা—

পূর্ব্বোঽয়ংবার্ষিকোমাসঃ শ্রাবণঃ সলিলাগমঃ।
প্রবৃত্তাঃ সৌম্য চত্বারঃমাসাবার্ষিকসংজ্ঞিতাঃ ॥১৪
কার্ত্তিকে সমনুপ্রাপ্তে ত্বং রাবণ বধে যতঃ। ১৭

রামায়ণের এই লেখাদ্বারা বেশ বোধ হইতেছে প্রাবিট্ বর্ষা হইতে ভিন্ন ঋতু নহে। আমার বোধ হয় এই বার্ষিক সংজ্ঞাই পরবর্ত্তীকালে বর্ষা প্রাবৃটের বিভিন্ন ঋতুকল্পনার মূল।

সংস্কর্ত্তা চরকের ন্যায় সুশ্রুতের স্থলে নাগার্জ্জুন যদি স্বীয় নাম দিতেন তাহা হইলে তাহা জনসমাজে গৃহীত হইত কি না সন্দেহ। প্রথমতঃ তিনি ঋষি ছিলেন না সুতরাং তাঁহার রচনাও প্রমাদহীন হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ তিনি বৌদ্ধ ছিলেন। এই নিমিত্তই নাগার্জ্জুন সুশ্রুত নামের লোপসাধন যুক্তিসিদ্ধ মনে করেন নাই। প্রত্যুত স্থানে স্থানে ঋষিগণের প্রতি সম্মানের সহিত উল্লেখ আছে, এবং কোনস্থলেই গ্রন্থ বা শাস্ত্রের নিন্দাবাদ নাই।

এক্ষণে সুশ্রুতসংহিতা হইতে কতকগুলি বিষয় উদ্ধার করিয়া ঋষির পাণ্ডিত্য ও প্রমাদ বিহীনতা প্রদর্শন করিয়া সময় নির্দ্ধারণ করিতে অগ্রসর হইব। ইউরোপীয়গণ এত বিজ্ঞান চর্চ্চা করিয়াও অদ্যাপি স্থির নিশ্চয় করিতে পারে নাই যে শরীরাভ্যন্তরে প্লীহা যন্ত্রটী কি কার্য্য করে। এপ্রকার শ্রুত হওয়া যায় যে একজন অন্যমস্ক ডাক্তার এই যন্ত্র নির্ম্মাণের জন্য ঈশ্বরের প্রতি অদূরদর্শিতার আরোপ করিয়া নিন্দা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। অপিচ স্বয়ং একটী কুকুরের উপর আসুরিক পরীক্ষাও দ্বারা প্লীহাটী কর্ত্তিত করিয়া দেখিয়াছিলেন; কুকুরটী হৃষ্টপুষ্ট হইয়া দিন কতক জীবিত ছিল। সুতরাং ডাক্তারের অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত অপনীত হইল না। যাহা হউক এই তামসিক জ্ঞানের সহিত সুশ্রুতোক্ত ধীর শান্ত মতের তুলনা করুন, দেখিবেন উহাতে কি সাত্ত্বিক জ্ঞান রাশি নিহিত রহিয়াছে। সুশ্রুত সূত্র স্থান ১৪ অধ্যায়ে যাহা লিখিত আছে তাহার অনুবাদ এই;—

"পাঞ্চভৌতিক ষড়্রসময় চর্ব্যচোষ্যলেহ্য পেয় এই চতুর্বিধ যে আহার আছে ইহার সম্যক্ পরিণতির যে তেজোভূত পরমসূক্ষ্ম সার তাহাকে রস বলে। ইহার স্থান হৃদয়। তাহাই হৃদয় হইতে দশ উর্দ্ধে নিম্নে দশ ও তির্য্যগ্ ভাবে চার এইরূপে চতুর্বিংশতি ধমনীতে প্রবাহিত হইয়া কৃৎস্নশরীরকে বেষ্টনপূর্ব্বক অদৃষ্টকর্ম্মবলে তৃপ্তি প্রদান, বর্দ্ধন, ধারণ, নিঃসারণ ও জীবনী শক্তি প্রদান করিতেছে। অতএব ক্ষয়বৃদ্ধিবিকার দ্বারা শারীরিক রসের গতি অনুমান করিবে।"

এখন এই সর্ব্বশরীর ব্যাপ্ত রস সম্বন্ধে প্রশ্ন এই যে—ইহা জলীয় না আগ্নেয়? স্নিগ্ধতা, সজীবতা, তৃপ্তিসাধন, ধারণাদি দ্রবণীয় পদার্থের গুণ থাকায় ইহা সৌম্য বলিয়াই বোধ হয়। সেই জলীয় রস যকৃৎ প্লীহায় উপস্থিত হইয়া রক্তবর্ণ প্রাপ্ত হয়। ঋষি তাহাই অন্য যে দুই শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার ব্যাখ্যা এই; "এই যকৃৎ প্লীহান্তর্গত রস শরীরস্থ অগ্নিদ্বারা রঞ্জিত হইয়া প্রসন্নতা (নির্ম্মলতা ক্লেদহীনতা) প্রযুক্ত রক্ত নামে অভিহিত হয়। জলীয় বলিয়াই স্ত্রীলোকের রক্তকে রজ বলে তাহা দ্বাদশবর্ষে উৎপন্ন হইয়া পঞ্চাশৎ বর্ষে ক্ষয়-প্রাপ্ত হয়।"

অতএব দেখা গেল যকৃৎ প্লীহাই রক্ত প্রস্তুত করিবার যন্ত্র। এই মত পাশ্চাত্য কি পুরাতন বা আধুনিক কোন গ্রন্থে নাই সুতরাং ইহা যে **ভারতীয় ঋষিগণের মৌলিক মত তাহার কোন সন্দেহ নাই।**

পাশ্চাত্যগণ বলিয়া থাকেন যে হিন্দুগণ চিকিৎসা শাস্ত্র গ্রীকদিগের নিকট শিক্ষা করিয়াছেন। উপরিউক্ত ঋষিবচন দ্বারা এই প্রলাপও নিরস্ত হইল।

"শরীরে ৩৬০খানি অস্থি আছে ইহা বেদবাদী-গণের উক্তি কিন্তু শল্যতন্ত্রবাদীরা ৩০০ খানি অস্থিরই অস্তিত্ব পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে শাখা অর্থাৎ হস্তপদ বাহু জানু জঙ্ঘা আদি স্থানে ১২০ খানি; নিতম্ব পঞ্জর পৃষ্ঠ উদর ও বক্ষে ১১৭ খানি গ্রীবা ও তাহার উর্দ্ধ মস্তকে ৬৩ খানি,—সকলের সমষ্টি ৩০০ খানি।" শারীরস্থান ৫ম অধ্যায়।

এস্থলে বেদের সহিত উক্তি বিভিন্ন হওয়ায় ঋষি ভীত হয়েন নাই; তাঁহার ভয়ের কোন কারণও ছিল না। কেন না তিনি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যথার্থ মতই ব্যক্ত করিয়াছেন। এ ত আর বাইবেল শাসিত দেশ নহে যে তাহার একটী ভ্রান্ত বচন খণ্ডিত হইলে খণ্ডনকারী শূলোপরি দণ্ডভোগ বা যাবজ্জীবন কারাবাস ভোগ করিবে। ইহা পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ। এস্থানে ভূয়োদর্শন ও পরীক্ষা দ্বারা নির্ম্মলীকৃত জ্ঞানলাভ করাই ঋষিগণের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। কপিলদেব যজ্ঞের দোষ উল্লেখ করিয়া মোক্ষের অনুপযুক্ত বলিয়াছেন তথাপি তিনি বেদে সম্মানার্হ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। তিনি রামায়ণে ঈশ্বরাবতার বলিয়া কথিত হইয়াছেন। মহাভারতে তাঁহার বহু প্রশংসা পাওয়া যায় এবং ভগবদ্গীতায় তাঁহার সাংখ্যযোগ জ্ঞান যোগের নামান্তর বলিয়া লিখিত হইয়াছে। পরবর্ত্তীকালেও ধীশক্তিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ, যুবা আর্য্যভট্ট প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে পৃথিবীর দৈনন্দিন আবর্ত্তন ও শূন্যে সূর্য্য প্রদক্ষিণরূপ স্বীয় মত ব্যক্ত করিয়া জ্যোতিষীগণের

তর্কের বিষয়ীভূত হইয়াছিলেন বটে কিন্তু তজ্জন্য কোনরূপ দণ্ড ভোগ করেন নাই।

"গর্ভে ভ্রূণের প্রথম মস্তক উৎপন্ন হইয়া থাকে ইহা শৌনক বলিয়াছেন কারণ মস্তকই দেহ ও ইন্দ্রিয়গণের মূল। কৃতবীর্য্যের মতে হৃদয়, কারণ তাহাই বুদ্ধি ও মনের স্থান। পারাশর্য্য বা পরাশর মতে নাভি, যে হেতু নাভি অবলম্বন করিয়া দেহ বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে। মার্কণ্ডের মতে হস্তপদ, কারণ গর্ভ তাহাই অবলম্বন করিয়া স্পন্দিত হয়। গৌতম সুভূতির মতে মধ্যশরীর, যেহেতু সকল শরীর তাহাতে নিবদ্ধ রহিয়াছে। ইহার কোনটাই যথার্থ নহে যেহেতু ধন্বন্তরি বলেন শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি যুগপৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে; গর্ভের সূক্ষ্মত্বপ্রযুক্ত উপলব্ধি হয় না। উদাহরণস্বরূপ বংশাঙ্কুর ও আম্রফল। আম্র পরিপক্ব হইলে কালপ্রভাবে কেশর (আঁশ) মাংস (শাঁস) অস্থি (আঁটি) মজ্জা (কশি) গুলি যেমন পৃথক পৃথক প্রকাশিত হয় তরুণ অবস্থায় সূক্ষ্মত্বপ্রযুক্ত সেইগুলি দৃষ্ট হয় না। কালই তাহার কেশরাদি প্রব্যক্ত করিয়া দেয়। এইরূপে বংশাঙ্কুরও ব্যাখ্যাত হইতে পারে সুতরাং সিদ্ধান্ত হইল যে গর্ভের তরুণাবস্থায় সর্ব্ব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বর্ত্তমান থাকিলেও সূক্ষ্মতানিবন্ধন ইন্দ্রিয়গোচর হয় না। তাহাই পরবর্ত্তীকালে প্রব্যক্ত হইয়া ওঠে।" শারীরস্থান তৃতীয় অধ্যায়।

এই বচনে পাঠকবর্গ দেখিবেন ধন্বন্তরির যুক্তি ও সিদ্ধান্তে কত সারবত্তা রহিয়াছে। তাঁহার যুক্তি অখণ্ডনীয় ও সিদ্ধান্ত দোষশূন্য। এস্থানে অনেকগুলি ঋষির মত উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ইঁহারা সকলে যে ধন্বন্তরির পূর্ব্ববর্ত্তী তাহা বোধ হয় না। সুভূতি গৌতম ত বুদ্ধদেবের জনৈক আত্মীয় ও শিষ্য এবং কৌমারভৃত্য নামক বালচিকিৎসা শাস্ত্রের প্রণেতা। পারাশর্য্য অর্থে পরাশর পুত্র অর্থাৎ ব্যাসদেব। তিনি কোন চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রণেতা কিনা তাহা শ্রুত হওয়া যায় নাই। তিনি ধর্ম্মচর্চ্চা ও যোগাভ্যাসেই রত থাকিতেন। তবে আত্রেয় পুনর্ব্বসুর ছয় শিষ্যের মধ্যে একজনের নাম পরাশর ছিল এবং জ্যোতির্ব্বেত্তা পরাশরেরও নাম শ্রুত হওয়া যায়। ধর্ম্মসংহিতাপ্রবক্তা পরাশর মুনির বিষয়ও শোনা যায়। ইঁহারা সকলেই এক বা বিভিন্ন ব্যক্তি তাহা ঠিক বলা যায় না। তবে নাগার্জ্জুন যে চিকিৎসাশাস্ত্রপ্রণেতা পরাশরকে লক্ষ্য করিয়াছেন তাহা আমাদের অনুমান মাত্র।

চরক ও সুশ্রুত উভয় গ্রন্থেই গোমাংসের গুণ ও ব্যবস্থা উক্ত হইয়াছে (চরকবিমান স্থান ৮ম অধ্যায়)। আবার পরক্ষণেই তাহা উষ্ণ অসাত্ম্য—অর্থাৎ যাহা হৃদয় গ্রহণ করিতে চায় না—যাহা আত্মার ভাল লাগে না;—ও অপ্রশস্ত বলিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে। (চরক চিকিৎসাস্থান ১০ম অধ্যায়)। অতএব ইহা নিশ্চয় যে, এ দেশের পক্ষে ইহা অস্বাস্থ্যকর ও অখাদ্য।

চরকে ধান্বন্তরীয় চিকিৎসকদের বিষয় এবং ধন্বন্তরিকে প্রণাম আদি লিখিত থাকায় আত্রেয় পুনর্ব্বসু ও ধন্বন্তরির সমসাময়িকতা প্রকাশিত হইতেছে। তাঁহারা ঋষিসংঘে সম্মিলিত হইয়া মানবহিতকল্পে আয়ুর্ব্বেদের একএকটী অংশের উপদেশ দিতে প্রতিশ্রুত হন। শিষ্যগণ

তাহাই লিপিবদ্ধ করেন। সেই সেই গ্রন্থ শিষ্য নামে সংসারে প্রচারিত হয়। অধুনা চরক ও সুশ্রুতই কালের স্রোত অতিক্রম করিয়া অবশিষ্ট রহিয়াছে। নাগার্জ্জুনের সময় জনক রাজার শালাক্যশাস্ত্র, কৌমারভৃত্য শাস্ত্র এবং অগ্নিবেশ, ভেল, জাতুকর্ণ, পরাশর হারীত ও ক্ষারপাণি আত্রেয়ের এই ষট্‌শিষ্য-রচিত তন্ত্র বা চিকিৎসাশাস্ত্র বর্ত্তমান ছিল। উত্তর তন্ত্রে ইনি তত্তৎ শাস্ত্রের সহায়তা গ্রহণের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী।

সেক্ষপীয়র সম্বন্ধে দুই একটি কথা।

ইংরাজী সাহিত্যে সেক্ষপীয়র সর্ব্বোচ্চ আসন অধিকার করিয়া আছেন। তাঁহার নাটকাবলী মানবচরিত্রের দৃশ্যপট স্বরূপ। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, জগতের এই সাহিত্য সম্রাটের জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা নাই।

নিকোলাস রো সর্ব্বপ্রথমে সেক্ষপীয়রের একটী সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিয়াছিলেন। তৎপরে ম্যালোন্ বহু অনুসন্ধান ও অধ্যবসায় দ্বারা সেক্ষপীয়র সম্বন্ধে বহু তত্ত্ব আবিষ্কার করেন।

কবির পিতার নাম ছিল জন্ সেক্ষপীয়র। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবির পিতা নিজের নামটী পর্য্যন্ত লিখিতে পারিতেন না! কবির মাতা মেরী আর্ডেন্ ওয়ারউইক সায়ারের প্রাচীন আর্ডেন বংশ-সম্ভূতা। ষ্ট্রাটফোর্ড নগরে কবির জন্ম।

১৫৬৪ খ্রীঃ অব্দের ২৬শে এপ্রিল উইলিয়ম সেক্ষপীয়রকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করা হয়। তদানীন্তন রীতি অনুসারে তিন দিবসের নবজাত শিশুকে দীক্ষিত করা হইত। ইহা হইতে অনুমান করা হয় যে ২৩শে এপ্রিলই সেক্ষপীয়রের জন্মদিন। ১৫৬৪ খ্রীঃ অব্দেই ষ্ট্রাটফোর্ড নগরে প্লেগ ব্যাধির প্রাদুর্ভাবে গড়পরতায় ১৪০০ লোকের মধ্যে প্রায় ২৪০ জনের মৃত্যু হয়। ইংরাজী সাহিত্যের গৌরব বর্দ্ধনের জন্যই বোধ হয় বিধাতা এই শিশুটিকে রক্ষা করিয়াছিলেন!

সেক্ষপীয়রের চরিত্রে যে নারীসুলভ কোমলতা এবং সৌন্দর্য্য পরিলক্ষিত হইত সে সমস্ত তাঁহার জননীর আদর্শ এবং শিক্ষা হইতে অর্জ্জিত। স্ত্রীজাতির শ্রেষ্ঠ গুণরাশি তাঁহার জননীর চরিত্রে বর্ত্তমান ছিল, এবং তাঁহার চরিত্র হইতেই তিনি নারীচরিত্র সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন।

টমাস্ জলিফ্ প্রতিষ্ঠিত (Thomas Jolyffe) ষ্ট্রাটফোর্ডের একটি অবৈতনিক স্কুলে সেক্ষপীয়র শৈশবে অধ্যয়ন করেন, এবং একটুখানি লাটিন ও তদপেক্ষাও অল্প গ্রীকভাষা শিক্ষা করেন। সম্ভবতঃ পরে তিনি কিছুকাল এই স্কুলে অধ্যাপকের কার্য্য করিয়াছিলেন।

অনেকে তাঁহার লেখা হইতে এইরূপ অনুমান করেন, যে তিনি কিছুকাল আইন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কিম্বা তাঁহার আত্মীয় ষ্ট্রাটফোর্ডের এটর্ণি টমাস্ গ্রীনের নিকট হইতে তিনি এবিষয়ে যৎসামান্য অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, ইহাও হইতে পারে।

১৫৮২ খ্রীঃ অব্দে ১৯ বৎসর বয়সে সেক্ষপীয়র সন্নিকটস্থ শটারি (Shottery) গ্রামের কুমারী অ্যান্ হ্যাথ্‌ওয়েকে বিবাহ করেন। অ্যান্ সেক্ষপীয়র অপেক্ষা ৮ বৎসরের বড় ছিলেন। আধুনিক কয়েকজন সমালোচকের মতে সেক্ষপীয়র এই বিবাহে সুখী হইতে পারেন নাই। প্রমাণ স্বরূপ তাঁহারা তৎপ্রণীত দ্বাদশ রাত্রি 'Twelfth Night' নাটকের নিম্নলিখিত কয় পংক্তি উদ্ধৃত করেন—

"Let the woman take
An elder than herself;
So wears she to him,
So sways she level in her
husband's heart.
* * * *
Then let thy love be younger
than thyself,
Or thy affection cannot hold
the bent."
(II. 4.)

ইহাতে সম্রাট্ পুরুষবেশী ভায়োলাকে বয়ঃকনিষ্ঠা কোনো রমণীকে বিবাহ করিতে উপদেশ দিতেছেন। সমালোচকেরা বলেন যে সেক্ষপীয়র স্বয়ং বয়োজ্যেষ্ঠা রমণীকে বিবাহ করিয়া পরে আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া ছিলেন, এবং ঐ ঘটনা স্মরণ করিয়াই এইরূপ লিখিয়াছেন। কিন্তু ইহা হইতে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়না একথা বলা বাহুল্য। ইহা কেবলমাত্র সমালোচকদিগের একটি অনুমান। সমালোচক হাড্‌সন্ ইহার বেশ উত্তর দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"কাহারো হৃদয়ে কোনো গুপ্ত বেদনা থাকিলে পরের হৃদয়ের সে বেদনার কথা সে কিছুতেই বলিবে না"।

সমালোচক গ্রাণ্ট হোয়াইট্ বলেন যে অ্যান্ অতি নীচ প্রকৃতি এবং পরুষ স্বভাবা ছিলেন। সুতরাং বিবাহের পর অতি অল্পদিনের মধ্যেই সেক্ষপীয়র তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করেন, এবং তাঁহার ঘৃণিত সংসর্গ হইতে দূরে থাকিবার অভিপ্রায়ে লণ্ডন নগরে প্রস্থান করেন। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। অবশ্য বিবাহের অতি অল্পদিন পরেই সেক্ষপীয়র ষ্ট্রাটফোর্ড ছাড়িয়া লণ্ডনে গিয়াছিলেন, কিন্তু সে কেবল অর্থোপার্জ্জনের জন্য। তাঁহার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, তিনি কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া পুনরায় গৃহে ফিরিয়া জীবনের শেষ অংশটুকু স্ত্রীপুত্রের সহিত একত্রে আনন্দে অতিবাহিত করিবেন।

এই বিবাহে যে সেক্ষপীয়র সুখী হন নাই সমালোচকেরা তাহার আর একটী প্রমাণ দিয়া থাকেন। কবির উইল পত্রে আছে,

"I give unto my wife the second best bed, with the furniture." অর্থাৎ, আমি আমার স্ত্রীকে ভাল পালঙ্কগুলির মধ্যে দ্বিতীয়টী এবং আসবাব পত্র দিলাম।

তাঁহারা বলেন যে, স্ত্রীর প্রতি যে তিনি বীতরাগ ছিলেন ইহাই তাহার স্পষ্ট প্রমাণ। নাইট্ সাহেব কিন্তু তাঁহার উল্লিখিত উইলটিকে অন্য অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন সেক্ষপীয়রের সমস্ত সম্পত্তিতে ইংরাজী আইনানুসারে তাঁহার স্ত্রীর জীবনস্বত্ব ছিল। আর এই যে শয্যাটী, ইহা সাধ্বী

পতিব্রতা স্ত্রীর নিকট পার্থিব সকল বস্তু অপেক্ষা অধিক মূল্যবান্ বিবেচিত হইবে ইহা জানিয়াই সেক্ষপীয়র এইরূপ উইল করিয়া গিয়াছিলেন।

রো সাহেব বলেন যে বাল্যকালে সেক্ষপীয়র অন্যান্য বালকের সংসর্গে সার টমাস্ লুসির শিকারোদ্যানে মৃগশাবক চুরি করিয়াছিলেন বলিয়া অভিযুক্ত হন। এই ঘটনায় তিনি সার টমাসকে ব্যঙ্গ করিয়া এক কবিতা রচনা করেন। ইহাতে সারটমাস্ সেক্ষপীয়রের প্রতি এরূপ ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে তাঁহাকে ষ্ট্রাটফোর্ড ছাড়িয়া লণ্ডনে আসিতে বাধ্য হইতে হয়।

ঘটনাটি সত্য হইলেও হইতে পারে। বিশেষতঃ হরিণ চুরি তখন বড় অন্যায় কাজ বলিয়া পরিগণিত হইত না। ইহা যুবকগণের একটা আমোদের মধ্যে ছিল। এবং সেক্ষপীয়রেরও বাল্যজীবন যে একেবারে নিষ্কলঙ্ক ছিল না তাহা তিনি নিজেই একটী চতুর্দ্দশপদী কবিতায় বলিয়াছেন—"Most true it is that I have look'd on truth Askance and strangely."

তিনি সত্যের প্রতি যে সহজ সরল দৃষ্টিতে তাকান নাই একথা তিনি নিজেই স্বীকার করিতেছেন।

সেক্ষপীয়রের রঙ্গমঞ্চে যোগ দেওয়ার তিনটী কারণ সমালোচকেরা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ, এই হরিণ চুরির ঘটনা, দ্বিতীয়তঃ নাটক এবং অভিনয়ের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক আসক্তি, এবং তৃতীয়তঃ আর্থিক দুরবস্থা।

সে সময়ে ইংলণ্ডের সর্ব্বত্রই নাটকের মহা সমাদর। সেক্ষপীয়রও অভিনয়ে সুনিপুণ ছিলেন। অচিরেই তিনি স্বীয় অসামান্য মেধাবলে নাট্য জগতে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিলেন। এই সময়ে ডিউক সাদাম্‌টন্ তাঁহাকে আর্থিক সাহায্য দেন, এবং কবি ভিনাস্ ও এডোনিস্ এবং লুক্রিশ্ কবিতাদ্বয় তাঁহাকে উৎসর্গ করেন। রাজ্ঞী এলিজাবেথও তাঁহাকে এবিষয়ে সাহায্য করিতে ও উৎসাহ দিতে কুণ্ঠিত ছিলেন না।

১৬১৩ খৃঃ অব্দের ২৯শে জুন গ্লোব থিয়েটার পুড়িয়া যায়। বোধ হয় তাহার সঙ্গে সেক্ষপীয়রের অনেক লেখা নষ্ট হইয়া থাকিবে। ইহা সত্ত্বেও তাঁহার রচিত ৩৮টী নাটক এখন পাওয়া যায়।

শুনা যায় যে রাজ্ঞী এলিজাবেথ্ চতুর্থ হেনরি নামক নাটকের সার জন্ ফলষ্টাফের চরিত্রে এরূপ মোহিত হইয়াছিলেন যে তিনি আর একটী নাটকে ফলষ্টাফের প্রেমের কাহিনী শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সেই অনুরোধেই সেক্ষপীয়র পরে Merry Wives of Windsor নামক নাটক প্রণয়ন করেন।

"সেক্ষপীয়রের পূর্ব্বে ইংরাজী সাহিত্যের কিরূপ অবস্থা ছিল ডাক্তার হাড্‌সনের কথাগুলি হইতে তাহার অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়।—তিনি বলিতেছেন,—

"সেক্ষপীয়রের পূর্ব্বে ইংরাজী নাটকগুলি নীচ আদর্শে রচিত হইত, এবং চরিত্রহীন লোকেরাই নাটক লইয়া থাকিত। সেই হীন দশা হইতে উদ্ধার করিয়া শক্তি, সৌন্দর্য্য এবং সুরস সঞ্চারে ইংরাজী নাটককে সেক্ষপীয়র সর্ব্বগুণসম্পন্ন করিয়া তোলেন। নাট্য

বিষয়ক যাহা কিছু সমস্তেরই জন্ম ইংলণ্ড সেক্সপীয়রের নিকট যে কত ঋণী তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।"

১৬০৪ খৃঃ অব্দে সেক্সপীয়র নাট্যশালার সংসর্গ ত্যাগ করিয়া, শেষ জীবনটুকু নির্জ্জনে ষ্ট্রাটফোর্ডে কাটান। থিয়েটারে অভিনয় করা তিনি মনে মনে ঘৃণা করিতেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

"Alas, 'tis true I have gone
here and there
And made myself a motley
to the view."

শেষ দুই তিন বৎসর তিনি কোনো কবিতা লেখেন নাই। ১৬১৬ খৃঃ অব্দের ২৩শে এপ্রিল, তাঁহার জন্ম তারিখেই, তাঁহার মৃত্যু হয়। ৭ বৎসর পরে তাঁহার পত্নী ইহলোক ত্যাগ করিলে স্বামীর সমাধির পার্শ্বেই তাঁহাকে সমাহিত করা হয়।

শ্রীদেবাংশুনাথ চক্রবর্ত্তী।

প্রয়াণ।

(প্রাঃস্মরণীয়া ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের স্বর্গগমনোপলক্ষে)

নিবিড় নদীর-কোলে অপরূপ ইন্দ্রধনুসম
মলিন এ মহীমাঝে অভিরাম চির-অনুপম,
তুমি ফুটেছিলে দেবি,—আপনার স্বর্গীয় প্রভায়
শুচি-স্নাত করি' এহি পাপে পূর্ণ, পঙ্কিল ধরায়।
হিংসা-দ্বেষ-নির্য্যাতনে নিত্য বিশ্ব কাঁদে হাহাকারে,
স্বজন শোণিত পান করে সুখে স্বার্থের আঁধারে;—
এ শ্মশানে শুধু তুমি মৌন প্রেমে, শান্ত গরিমায়
ধ্যান-মগ্ন ছিলে বসি' মরতের মঙ্গল-চিন্তায়!
জগত-জননীসম আর্ত্ত-দুঃখে আত্ম-বিস্মরিয়া
অসহায় আতুরের সর্ব্ব জ্বালা দিলে জুড়াইয়া!
করে তব শান্তি-সুধা- মুখে তব সান্ত্বনা সরস,
মুমূর্ষু মেলিত আঁখি লভি তব সস্নেহ পরশ;
আজি ওগো জ্যোতির্ম্ময়ি, কোথা চলি' গেলে নাহি জানি।
আঁধারে ছাইছে বিশ্ব তোমা' বিনা হে দেবি কল্যাণি!

শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী।

কুমারী নাইটিংগেল।

গত ৪ঠা আগষ্ট তারিখে কুমারী ফ্লরেন্স নাইটিংগেল নবতি বর্ষ বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন—তাঁহার ন্যায় পরদুঃখকাতরা এবং শুশ্রূষাপরায়ণা রমণী দ্বিতীয় কেহ জন্মিয়াছে কিনা সন্দেহ। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার দয়া এবং পরোপকার স্মরণ করিয়া তাঁহার নবতিবর্ষের জন্মদিনে পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বস্থান হইতেই তাঁহাকে উপহার প্রেরণ করা হইয়াছিল। তাঁহারি যত্নে এবং চেষ্টায় চিকিৎসালয়ে পীড়িতের এবং যুদ্ধক্ষেত্রে আহতদিগের শুশ্রূষা এবং চিকিৎসার সুব্যবস্থা হইয়াছে। বাল্যাবধি কুমারী ফ্লরেন্স বড়ই কোমলহৃদয়া ছিলেন। প্রকৃতির তরুলতা পশুপক্ষীর সৌন্দর্য্য যেমন তাঁহার হৃদয় আকর্ষণ করিত তেমনি তাহাদের অসহায় অবস্থাও তাঁহার করুণার উদ্রেক করিত। বনের পাখী, কাঠবিড়ালী তাঁহার পোষা হইয়া যাইত। তিনি সর্ব্বদাই তাহাদের নিজের হাতে আহার দিতেন। তাঁহার মাতার টাট্টু ঘোড়াটি পোষা কুকুরের মত তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত। বাল্যকালে গ্রামের ধর্ম্মযাজকের সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল—এই ধর্ম্মযাজকটি প্রচার কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিবার পূর্ব্বে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং অস্ত্র চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। যখনি গ্রামে কোনও পীড়া কিম্বা আকস্মিক বিঘ্ন বিপদ হইত তখনি তিনি সেখানে উপস্থিত থাকিয়া সর্ব্বতোভাবে তাহাদের সেবা যত্ন করিতেন। কুমারী ফ্লরেন্সও সেই সকল সময়ে তাঁহার সঙ্গী হইতেন। এই সময় একটি কুকুর সাংঘাতিকরূপে আহত হয়—কুকুরটি একজন বৃদ্ধ কৃষকের; সে তাহাকে বড় যত্ন করিত। কিন্তু বিদ্যালয়ের কোন দুষ্ট বালক প্রকাণ্ড প্রস্তরাঘাতে তাহার পিছনের পা ভাঙ্গিয়া দেয়। তাহার যন্ত্রণা দেখিতে না পারিয়া কৃষক তাহাকে গুলি করিয়া মারিবার ইচ্ছাপ্রকাশ করে। কিন্তু কুমারী ফ্লরেন্সের যত্নে সে পুনরায় সুস্থ হইয়া উঠে। এই সময় হইতেই আর্ত্ত এবং পীড়িতের শুশ্রূষা কার্য্য রীতিমত শিখিবার জন্য তাঁহার মন উৎসুক হয়। ইহার কিছুকাল পরে তিনি একবার সৈনিকদিগের হাঁসপাতাল দেখিতে নেটলিতে যান। সেইখানকার দৃশ্য এবং কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া শুশ্রূষা ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিবার জন্য তিনি দৃঢ়সংকল্প হইয়া ইহাই জীবনের ব্রতস্বরূপ গ্রহণ করেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে Kaisn Worth নামক একটি ক্ষুদ্র জর্ম্মাণ নগরে তিনি একদল প্রটেষ্টাণ্ট শুশ্রূষাকারিণী রমণীদগের সহিত সেবা কার্য্যে যোগদান করেন। পর বৎসর লণ্ডন হার্লি ষ্ট্রীটে পীড়িত শিক্ষয়িত্রীদিগের সেবাভার গ্রহণ করেন। এবং অল্পদিনের মধ্যেই প্রাণপণ চেষ্টা, যত্ন এবং পরিশ্রমে হাঁসপাতালের সুবন্দোবস্ত করিয়া তাহার বিশেষ উন্নতিসাধন করেন। এই সময় তিনি লণ্ডন, এডিনবরা, ডবলিন প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরের চিকিৎসালয়ে বিশেষ যত্নসহকারে শুশ্রূষা কার্য্য শিক্ষা করেন। তাহাকে সেই সকল

চিকিৎসালয়ের বিশেষ উপকার এবং উন্নতি হয়। এইরূপ দারুণ পরিশ্রমে স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় কিছুকালের জন্য তাঁহাকে বিশ্রামে বাধ্য হইতে হয়। কিন্তু অধিককাল নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা নিতান্তই তাঁহার স্বভাব বিরুদ্ধ, তাই বৎসর দুই পরে ক্রিমিয়া যুদ্ধের আরম্ভে যুদ্ধক্ষেত্রে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। আজ কালকার মত তখন আহতদিগের সেবার

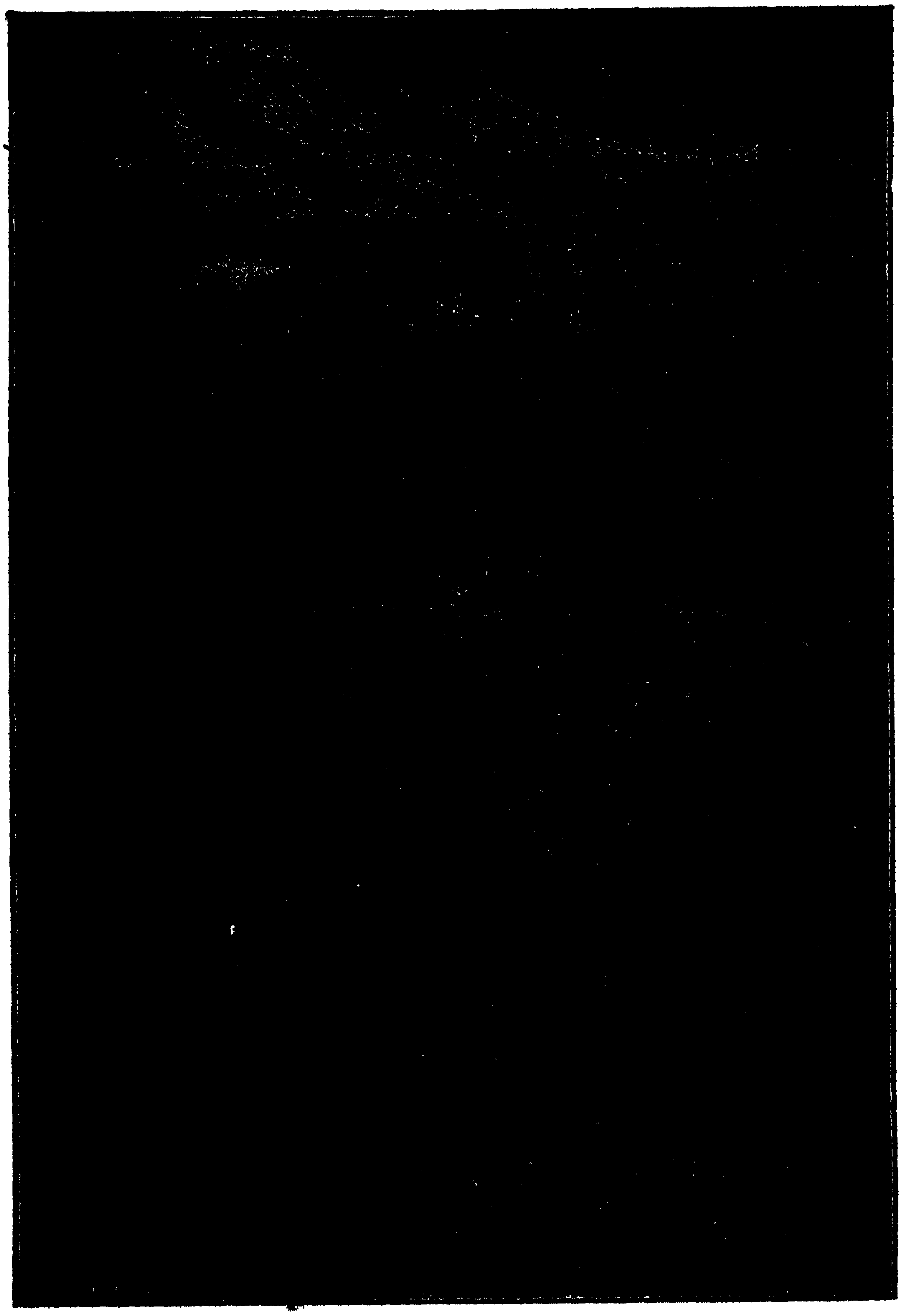

সেবাব্রত কুমারী নাইটিংগেল।

কোনরূপ সুব্যবস্থা ছিল না। তাই আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি এই তন্বী সুকুমারী রমণী যখন সেই যুদ্ধক্ষেত্রে মঙ্গল হস্তে, নিঃস্বার্থভাবে নীরবে করুণাপূর্ণ হৃদয়ে পীড়িত সৈনিকদিগের মুখে ঔষধ পথ্য তুলিয়া দিতেন, তাহাদের যন্ত্রণা দূর করিবার

জন্য কোমল হস্তে তাহাদিগকে সেবা করিতেন, তখন যে তাহারা তাঁহাকে স্বর্গের দেবী বলিয়া মনে করিত তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। সেই ভয়ানক যুদ্ধক্ষেত্রে চারিদিকে বিক্ষিপ্ত, মৃত এবং আহতদিগের মধ্যে অমানুষিক পরিশ্রমে তাঁহার দিন কাটিত। ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়—তাঁহার সুকুমার দেহযষ্টি কেমন করিয়া অবিশ্রান্ত দিনরাত্রি সেই দারুণ ক্লেশ, অভাব ও পরিশ্রম সহ্য করিত। সৈনিকেরা তাঁহাকে এতই ভালবাসিত যে তিনি যখন পাশ দিয়া হাঁটিয়া যাইতেন তখন তাহারা নুইয়া পড়িয়া তাঁহার ছায়াকে চুম্বন করিত। এই অমানুষিক পরিশ্রম এবং দেবদুর্লভ করুণায় তাঁহার নাম জগদ্বিখ্যাত হইয়া পড়িল এবং ইংলণ্ডবাসী সকলেই ১৮৫৬ সালে তাঁহার দেশে প্রত্যাগমন সময়ে বিপুল সমারোহে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিলেন। কুমারী ফ্লরেন্স বাল্যাবধি বাহ্যাড়ম্বরশূন্য এবং মানুষের নিকট যশোমানলাভে অনিচ্ছুক ছিলেন তাই কাহাকেও তাঁহার আগমনবার্ত্তা না জানাইয়া গোপনে আপন দেশে ফিরিয়া আসিলেন! দারুণ পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য চিরকালের মত ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, জীবিতকালে আর তিনি নিজ হস্তে শুশ্রূষা করিবার সুখ লাভ করেন নাই। ইংলণ্ডবাসীরা যখন তাঁহার নিমিত্ত কোনরূপ সমারোহ করিতে পারিলেন না তখন তাঁহাকে উপহার দিবার জন্য সার্দ্ধ সাত লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিলেন, কিন্তু মহৎহৃদয়া কুমারী ফ্লরেন্স সে অর্থও গ্রহণ করিতে অসম্মত হইলেন। তখন সেই অর্থ দিয়া কৃতজ্ঞতার সাক্ষ্যস্বরূপ তাঁহার নামে একটি সেবাগৃহ নির্ম্মিত হইল।

জীবনে কুমারী ফ্লরেন্স যে মহৎ সেবাব্রত প্রচার করিয়া গিয়াছেন তাহার স্থান অতি উচ্চে। কি রাজা কি প্রজা কি স্বদেশী কি বিদেশী—আত্মপর উচ্চ নীচ নির্ব্বিশেষে সকলেই তাঁহার স্বার্থত্যাগ তাঁহার নিরতিশয় পরদুঃখকাতরতা প্রশংসাপূর্ণ কৃতজ্ঞ হৃদয়ে চিরদিন স্মরণ করিবে। ক্রিমিয়া যুদ্ধে সেবাব্রত গ্রহণ করিয়া তিনি যে অপূর্ব্ব আত্মবিসর্জ্জন দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন, ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকিয়া তাহা চিরদিন মানব-হৃদয়কে উৎসাহিত এবং মহত্ত্বে প্রণোদিত করিবে।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

পলিত পত্র।

"একে একে সব সাথী করেছে প্রয়াণ,
শীতের শীতল বায়ু সতত কাঁপায়।
আর কেন? ওহে পর্ণ পাণ্ডু ম্রিয়মান,
এখনও তরুর গায়ে আছো কি আশায়?"

"গেছে সব! তাহে কিবা?—শীতের সমীর
পলে পলে মৃত্যু আনে কাঁপাইয়া কায়া,
ভাবিয়াছি, শেষবিন্দু বুকের রুধির—
শুকাইয়া কিসলয়ে দিব তবু ছায়া।"

শ্রীকালিদাস রায়।

হেঁয়ালি নাট্য।

ভণ্ড সন্ন্যাসীর বটবৃক্ষতলে বসিয়া গাঁজা সেবন। ডাকাতীতে অভিযুক্ত রসিকচন্দ্রের প্রবেশ।

সন্ন্যাসী। ব্যোম্ ব্যোম্—(গাঁজা সেবন)

রসিক। (চমকিয়া) কে আবার! কোথাও দেখছি নিস্তার নাই!—সর্ব্বস্থানেই যমদূত!

স। শিব—শিব—হর—হর—বোম্।

র। তবু ভাল—গোয়েন্দা নয়,—একজন সন্ন্যাসী। বোধ হয় আমারই দলের হবে। (নিকটে গিয়া) সন্ন্যাসী ঠাকুর, প্রণাম হই।

স। বোম্—বোম্। এই ঠো, তোমারা পাস্ রাখ্ দেও। (কিঞ্চিৎ ভস্ম প্রদান)

র। কেন বাবা! নাস নিতে হবে!

স। নাস না আছে লেকন এ নাশ হ্যায়; সব পাপ এসিমে নাশ হো যাতা।

র। আপনার মত অমায়িক প্রকৃতির লোক আমি আর কোথাও দেখি নাই।

স। হাম্‌কো মাফিক সাধুকা সাৎ কৈ কো বাৎ হোতা নেই। লেকন্ এ খবর কোই কো মৎ বলো,—সব আদমি আনে সে হামকো নাশ কর ডালেগা।

র। না ঠাকুর, আমি এ খবর কাকেও বল্‌ব না (স্বগতঃ) একবার একটা ভৌতিক বিদ্যে শিখে নিতে পারি তাহলে সকলকে মজা দেখাই।

স। (গাজা সেবন) বোম্—বোম্।

র। আচ্ছা, বোম্ বোম্ করেন কেন?

স। এ সব, তোম সম্‌জেগা নেই।

র। তা একটু বলুন না কেন?—বল্‌তে কি দোষ আছে?

স। এ সব ধরম্ কা বাৎ,—তোম্ সমজেগা নেই।

র। অ্যাঁ! কি বল্লেন ধর্ম্ম?

স। হাঁ, ধার্ম্মিক আদ্‌মি এই বাৎ লেতা হ্যায়।

র। সর্ব্বনাশ! আপনি তাহলে ধার্ম্মিক!

স। হাঁ হাম্ ধার্ম্মিক হ্যায়।

র। সর্ব্বনাশ! আপনি ধার্ম্মিক?

স। হাঁ ধার্ম্মিক।

র। Virtuous men are always ready to die—তা হলে আপনি মরতে প্রস্তুত?

স। কা, বোল্‌তা?

র। বাবা, বোল্‌তাও না ভীমরুলও না।

স। হাম কুছ্ সমজ্‌তা নেহি—আচ্ছা করকে বাতাও।

র। তা, মর্‌বার সময় কেউ কিছু বুঝতে পারে না, তোমাকে আচ্ছা করে বাতিয়ে কি আর লাভ হবে?

স। হাম্ মরেগা কাহে?

র। আঃ—আপনি যে ধার্ম্মিক বল্লেন।

স। ধার্ম্মিক আদ্‌মি তো মর্‌তা নেহি।

র। না বাবা—এখন কলিযুগ—ধার্ম্মিক হলেই মরতে হয়।

স। তোমারা ও বাৎ ঝুঠা হ্যায়।

র। না কখনই না। ধার্ম্মিক হলেই আপনাকে মরতে হবে। তা যদি না হয় ত বুঝব আপনি ঝুটা, আপনার এই ভস্ম ঝুটা, তামাম্ সব্ ঝুটা।

স। আমি সে ধার্ম্মিক আছি না।

র। এখন মরবার ভয়ে আছি না বল্লে কি আর চলে? তুমি এখন মর, আর আমি আমার পথ দেখি।

[সদল বলে পুলিস ইন্‌স্পেক্টারের প্রবেশ,—রসিকচন্দ্রের বেগে প্রস্থান ও দূরে বৃক্ষের অন্তরালে অবস্থান]

১। (সন্ন্যাসীর প্রতি) এই যে, এই সেই বেটা।

২। হাঁ হাঁ সেই বেটাই বটে। যত দেখবে সাধু সন্ন্যাসী সব বেটা—স্বদেশী,—সিডিসনিষ্ট, বোমাপন্থী, বিদ্রোহী। বাঁধ বেটাকে বাঁধ। (সকলে মিলিয়া সন্ন্যাসীকে বাঁধন)।

স। এ ক্যা কর্‌তা হায়—

১। আবার হিন্দুস্থানী বুলি যেন বাঙ্‌লা জানেন না!

২। কি আর করব! এই সকলে মিলে তোমা হেন ধার্ম্মিক সাধু পুরুষকে ভগবদ্গীতা-উক্ত যোগাসনে বসিয়ে দিচ্ছি। বুঝেছ ত?

স। (ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে) বাবা আমি ধার্ম্মিক না আছে—ঠিক বোলতা হায়—হাম ধার্ম্মিক নেহি হায়।

৩। বেটা ওঠ্ এখন; বাঁধন চোটে—সত্যি কথা বেরিয়ে গেছে—ভণ্ড তপস্বী চল এখন।

[সন্ন্যাসীকে ধরিয়া লইয়া সকলের প্রস্থান]।

রসিক। আঃ কি মজা! সন্ন্যাসী ঠাকুর এখন ফাঁসিতে ঝুলুক আমি ঘরে যাই। কি বুদ্ধিটাই জুগিয়েছিল—একেই বলে, কারো পৌষ মাস কারো সর্ব্বনাশ!

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ সাউ।

প্রাচীন বিবাহ প্রথা।

(খৃষ্টীয় চতুর্থপূর্ব্ব শতাব্দী)

অগ্রহায়ণের 'ভারতী'তে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'প্রাচীন ভারতে বিবাহ পদ্ধতি শীর্ষকে এক সুলিখিত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমরা এই সংখ্যায় চাণক্য প্রণীত 'অর্থশাস্ত্র' নামক পুস্তক হইতে খৃষ্টজন্মের চতুর্থ শতাব্দী পূর্ব্বে আমাদের শাস্ত্রকারগণ বিবাহাদি বিষয়ে কিরূপ আদেশ বিধি বদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাই উদ্ধৃত করিব।

বিবাহ সকল প্রকার আচারের অগ্রবর্ত্তী। ব্রহ্ম, দৈব, আর্য্য, প্রজাপত্য, গান্ধর্ব্ব, অসুর, রাক্ষস এবং পৈশাচ—এই কয় প্রকার বিবাহ প্রচলিত। এই কয় প্রকার বিবাহ মধ্যে প্রথমোক্ত চারি প্রকারের বিবাহ প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত আছে এবং কন্যার পিতা সম্মত হইলেই এই সকল বিবাহ ধর্ম্মানুমোদিত বলিয়া বিবেচিত হয়। অন্য প্রকারের বিবাহে পিতামাতা উভয়েরই অনুমোদন আবশ্যক। কেননা জামাতা তাহাদের কন্যাকে যে শুল্ক প্রদান করে তাহা তাহারাই গ্রহণ করে। পিতা কিংবা মাতার অনুপস্থিতে কিংবা একের মৃত্যু হইলে অন্য জনে এই শুল্ক গ্রহণ করিবে। যদি পিতামাতা উভয়েরই মৃত্যু হইয়া থাকে তবে কন্যা নিজেই এই শুল্ক গ্রহণ করিবে।

যাহারা বিবাহে সংশ্লিষ্ট তাহারা সন্তুষ্ট হইলে সকল প্রকার বিবাহই সিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

পুরুষের দ্বিতীয় বার দার-পরিগ্রহ।

যদি কোন স্ত্রীলোক জীবিত সন্তান প্রসব না করে, অথবা পুত্র উৎপাদনে অক্ষমা হয়, অথবা বন্ধ্যা হয়, তাহা হইলে তাহার স্বামীর দ্বিতীয় দারপরিগ্রহণের পূর্ব্বে অষ্টম বর্ষ অপেক্ষা করিতে হইবে। যদি পত্নী কেবল কন্যা প্রসব করে, তবে স্বামীকে দ্বাদশ বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে। তৎপর, যদি তিনি পুত্র কামনা করেন, তবে বিবাহ করিতে পারেন। যদি স্বামী এ নিয়মের ব্যতিক্রম করেন, তবে পত্নীকে শুল্ক, স্ত্রীধন এবং উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দান ব্যতীত, রাজাকেও তাঁহার চব্বিশ পণ প্রদান করিতে হইবে। যে সকল স্ত্রী বিবাহের শুল্ক বা স্ত্রীধন পায় নাই তাহাদেরও শুল্ক ও স্ত্রীধন দিয়া এবং স্ত্রীদিগকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও বৃত্তিদান করিয়া পরে স্বামী ইচ্ছানুসারে যতগুলি ইচ্ছা স্ত্রীগ্রহণ করিতে পারেন, কেননা পুত্রার্থেই স্ত্রীর প্রয়োজন।* যদি স্বামীর অনেক গুলি পত্নী বা সকল পত্নীই এক সময়ে সন্তানধর্ম্মা হইয়া থাকেন, তবে যাহাকে সর্ব্বাগ্রে বিবাহ করা হইয়াছে অথবা যে স্ত্রী পুত্রবতী তাহাকেই সর্ব্বাগ্রে গ্রহণ করিতে হইবে। যদি স্বামী যথাসময়ে * * স্ত্রীর ধর্ম্মরক্ষা না করেন, তবে তাহাকে ৯৬ পণ অর্থদণ্ড দিতে হইবে। পুত্রবতী, ধার্ম্মিকা, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, এবং যাহারা সন্তানবতী হইবার বয়স অতিক্রম করিয়াছে, তাহাদের অনভিমতে সহবাস নিষিদ্ধ। কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্তা বা উন্মত্তা স্ত্রীর সহিত স্বামীর একত্র বাস করা না ইচ্ছানুসারে নির্ভর করে। পুত্রার্থে স্ত্রী কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত বা উন্মত্ত স্বামীর সহবাস করিতে পারেন।

যদি স্বামী কুচরিত্র, বিদেশবাসী, রাজদ্রোহী, অথবা স্ত্রীর প্রাণহানি করিতে পারে, এরূপ সম্ভাবনা থাকে, অথবা জাতিচ্যুত, বা ক্লীব হয় তবে স্ত্রী স্বামীকে পরিত্যাগ করিতে পারে।

স্ত্রীলোকের পুনর্ব্বিবাহ।

শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণ জাতিভুক্তা যে সকল স্ত্রী সন্তান প্রসব করে নাই, তাহারা প্রবাসী স্বামীর জন্য এক বৎসর অপেক্ষা করিবে। কিন্তু যাহারা সন্তানবতী তাহারা এক বৎসরের অধিককাল স্বামীর জন্য অপেক্ষা করিবে। যদি তাহাদের প্রতিপালনের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে, তবে তাহারা দ্বিগুণকাল অপেক্ষা করিবে। যদি সেরূপ ব্যবস্থা না থাকে তবে তাহাদের ধনী জ্ঞাতিবর্গ তাহাদিগকে চার কি আট বৎসরের জন্য প্রতিপালন করিবে। তৎপর বিবাহের সময় যাহা দান করা হইয়াছিল তাহা গ্রহণ করিয়া, জ্ঞাতিগণ তাহাদের বিবাহে অনুমতি দিবে। যদি ব্রাহ্মণ স্বামী বিদ্যার্থী হইয়া বিদেশে বাস করেন, তবে অপুত্রবতী স্ত্রী দশ বৎসর অপেক্ষা করিবে; এক্ষেত্রে স্ত্রী পুত্রবতী হইলে দ্বাদশ বৎসর অপেক্ষা করিবে। যদি স্বামী ক্ষত্রিয় হন, তবে স্বামীর মৃত্যু পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবে। কিন্তু বংশনাশ ভয়ে স্ত্রী, সবর্ণে বিবাহ করিয়া পুত্রবতী হইলে, সে ঘৃণাস্পদ হইবে না। যদি প্রবাসী স্বামীর স্ত্রীর ভরণপোষণের অভাব হয় এবং ধনী

জ্ঞাতিবর্গ তাহাকে পরিত্যাগ করে তবে স্ত্রী তাহার ইচ্ছানুসারে পুনর্ব্বার যে তাহাকে প্রতিপালন করিতে পারে এরূপ লোককে বিবাহ করিতে পারে।

প্রথমোক্ত চার প্রকারে বিবাহিতা "কুমারী" যাহার স্বামী বিদেশে বাস করিতেছেন এবং যাহার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, সেইরূপ স্ত্রী যদি স্বামীর নাম সাধারণে প্রকাশ না করিয়া থাকে তবে সাতমাস অপেক্ষা করিবে। যদি নাম প্রকাশ করিয়া থাকে, তবে এক বৎসর অপেক্ষা করিবে। প্রবাসী স্বামীর সংবাদ যদি অবগত না হওয়া যায় তবে সাত মাস অপেক্ষা করিতে হইবে। যদি স্বামী প্রবাসী হইয়া থাকেন এবং তাঁহার কোন সংবাদ না পাওয়া গিয়া থাকে এবং স্ত্রী যদি শুল্কের অংশবিশেষ মাত্র পাইয়া থাকেন, তবে স্ত্রী তিন মাস মাত্র অপেক্ষা করিবেন কিন্তু স্বামীর সংবাদ পাইয়া থাকিলে সাত মাস অপেক্ষা করিতে হইবে। সম্পূর্ণ শুল্ক যে স্ত্রী পাইয়াছেন, স্বামীর সংবাদ না পাইলে তিনি পাঁচমাস অপেক্ষা করিবেন কিন্তু সংবাদ পাইলে দশ মাস অপেক্ষা করিবেন। পরে, বিচারকগণের (ধর্ম্ম স্থৌ বিসৃষ্টা) অনুমতি লইয়া ইচ্ছানুসারে বিবাহ করিতে পারেন; কেননা * * স্ত্রীর ধর্ম্মরক্ষা না করিলে কৌটিল্য বলেন, 'ধর্ম্ম বধ' হয়।

যে সকল স্বামী অনেক দিন প্রবাসী, বা যাহারা মৃত তাঁহাদের অপুত্রবতী স্ত্রীগণ এক বৎসর অপেক্ষা করিবেন। এক্ষেত্রে স্ত্রীগণ স্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বিবাহ করিতে পারেন। যদি মৃত স্বামীর অনেকগুলি ভ্রাতা থাকে, তবে স্ত্রী মৃত স্বামীর কনিষ্ঠ সহোদর অথবা যে ভ্রাতা ধার্ম্মিক ও তাহাকে প্রতিপালনে সক্ষম হইবেন অথবা যে সর্ব্ব কনিষ্ঠ ও অবিবাহিত তাহাকে বিবাহ করিবেন। যদি মৃত স্বামীর ভ্রাতা না থাকে তাহা হইলে স্বামীর আত্মীয়গণের সগোত্রে বিবাহ করিবেন। কিন্তু যদি উপযুক্ত অনেকগুলি ব্যক্তি থাকেন, তবে মৃত স্বামীর নিকট-আত্মীয়কে বিবাহ করিবেন।

যদি কোন স্ত্রীলোক উপরি উক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম করেন, তাহা হইলে ঐ স্ত্রী এবং যে তাহাকে বিবাহ করিয়াছে, যাহারা কন্যাকে দান করিয়াছে এবং যাহারা ইহাতে সম্মতি দান করিয়াছে তাহারা সকলেই দণ্ডনীয় হইবেন।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

চয়ন।

হিউয়েনসাং প্রণীত সিউ-ইউ-কি।

লানপো (লম্ঘন) (১)

লানপো রাজ্য পরিধিতে প্রায় সহস্র লি। ইহার উত্তরে তুষার পর্ব্বত শ্রেণী; অন্য তিনদিকে কৃষ্ণ পর্ব্বত শ্রেণী। প্রায় দশ লি স্থান বেষ্টন করিয়া রাজধানী অবস্থিত। কয়েক শতাব্দী হইতে রাজবংশ লুপ্ত হওয়ায়, প্রধান ব্যক্তিগণ স্ব স্ব ক্ষমতা পরিচালনের

(১) এই প্রদেশ কাবুল নদীর উত্তর ধারে অবস্থিত। Ancient Geography of India পুস্তকে কনিংহাম সাহেব ইহার স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহার পশ্চিমে ও পূর্ব্বে আলিঙ্গর ও কুনার নদী।

জন্ত নিজেদের মধ্যে বিবাদ করিয়া আসিতেছেন; কেহ কাহারও প্রাধান্ত স্বীকার করেন না। সম্প্রতি ইহা কপিশার অধীনস্থ হইয়াছে। এদেশ ধান্ত উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী এবং যথেষ্ট ইক্ষু দণ্ড এখানে পাওয়া যায়। দেশে ফলের বৃক্ষ প্রচুর আছে কিন্তু খুব কম ফলই পরিপক্ক হয়। জলবায়ু সুবিধাজনক নয়; ঘন নীহার যথেষ্ট কিন্তু বরফ বেশী নাই। যথেষ্ট শস্ত জন্মে। অধিবাসীরা সঙ্গীত বিদ্যায় অনুরক্ত। স্বভাবতই ইহারা অবিশ্বাসী এবং চৌর্য্যবৃত্তি পরায়ণ; কেহ কাহারও প্রাধান্ত স্বীকার করিতে চাহে না। ইহারা খর্ব্বাকৃতি কিন্তু কর্ম্মঠ এবং বলবান। সাধারণতঃ ইহাদের পরিচ্ছদ শুভ্র এবং সাজসজ্জা সুন্দর। প্রায় দশটি সংঘরাম আছে কিন্তু তাহাতে যতির সংখ্যা অত্যল্প। অধিকাংশই মহাযান মতাবলম্বী। দেব-মন্দিরও বেশ আছে। অবিশ্বাসীর সংখ্যা কম। এই প্রদেশ হইতে ১০০ লি দক্ষিণে যাইয়া আমরা বৃহৎ পর্ব্বত উত্তীর্ণ হইয়া ও নদীপার হইয়া নাকিলোহো অর্থাৎ উত্তর ভারতের সীমান্ত পৌঁছি।

নাকিলোহো (নগরহরা)। (২)

নাকিলোহো পূর্ব্ব পশ্চিমে ৬০০০ শত লি এবং উত্তর দক্ষিণে ২৫০ কি ২৬০ লি বিস্তৃত। ইহার চতুর্দ্দিকেই লম্বমান গিরিশৃঙ্গ। রাজধানী পরিধিতে প্রায় ২০ লি। ইহার কোন প্রধান শাসন-কর্ত্তা নাই। সেনাপতি এবং তাঁহার সহকারীগণ কপিশা হইতে প্রেরিত হইয়া থাকেন। দেশে শাকসবজী, পুষ্প ও ফল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। জলবায়ু আর্দ্র ও উষ্ণ। অধিবাসীরা সরল, সাধু এবং প্রকৃতিতে ইহারা উৎসাহী এবং সাহসী। ইহারা আর্থিক বিষয়ে উদাসীন এবং বিদ্যানুরাগী। ইহারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী এবং অত্যল্প সংখ্যক লোকই অন্ত ধর্ম্মে বিশ্বাস করে। সঙ্ঘরাম যথেষ্ট আছে কিন্তু যতি সংখ্যায় অল্প। স্তূপগুলি জনশূন্ত ও ধ্বংসাবশেষ যথেষ্ট আছে। দেবতাদের পাঁচটী মন্দির আছে ও একশত ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

নগরের তিন লি পূর্ব্বে তিন শত ফুট উচ্চ রাজা অশোক-নির্ম্মিত স্তূপ আছে। ইহা কারুকার্য্য শোভিত এবং খোদিত প্রস্তর নির্ম্মিত। বোধিসত্ত্বাবস্থায় শাক্য এই স্থানেই দীপাঙ্কর বৌদ্ধের দর্শন পান এবং অজিন বিস্তার করিয়া, কেশরাজি উন্মুক্ত করিয়া তদ্বারা কর্দ্দমাক্ত রাজপথ আবৃত করিয়াছিলেন। এই স্থানেই তিনি ভবিষ্যতে যে সফলকাম হইবেন এইরূপ দৈববাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন। যদিও গত কল্পে পৃথিবী ধ্বংস হইয়াছিল তত্রাপি, এই ঘটনার চিহ্ন বিনষ্ট হয় নাই। উপবাসের দিবস আকাশ হইতে নানাপ্রকার পুষ্প পতন হয়। তদ্দৃষ্টে জনপদ বাসীগণও নানাপ্রকারে পূজা করে।

এই স্থানের পশ্চিমে একটী সঙ্ঘরামে কয়েকজন যতি বাস করেন। দক্ষিণে ক্ষুদ্র একটী স্তূপ আছে। এই স্থানেই বোধিসত্ত্ব স্বকীয় চুল দ্বারা কর্দ্দমাক্ত পথ আবৃত করিয়াছিলেন। রাজা অশোক এই স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। নগরাভ্যন্তরে বৃহৎ স্তূপের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান। জনশ্রুতি এইরূপ যে, এই স্থানে বুদ্ধদেবের উজ্জ্বল ও বৃহৎ একটী দন্ত ছিল। বর্ত্তমানে সে দন্ত নাই—কেবলমাত্র ভগ্নাবশেষই বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহারই পার্শ্বে ত্রিশ ফুট উচ্চ অন্ত একটী স্তূপ আছে। কি প্রকারে এ স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা জানা যায় না; তবে লোক পরম্পরায় অবগত হওয়া যায় যে ইহা স্বর্গ হইতে পতিত হইয়া এই স্থানে স্থাপিত হইয়াছে। বস্তুতঃই ইহা মনুষ্য সৃষ্ট নহে, অদ্ভুত ব্যাপার।

নগরের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে অন্ত একটি স্তূপ আছে। পৃথিবীতে যখন তথাগত বাস করিতেন তখন মনুষ্যকে ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্ত তিনি শূন্য হইতে এই স্থানে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ভক্তিপূত হইয়া

(২) সিম্পসন সাহেব নগর হরার সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিহার জেলায়, মেজর কিটো ঘোষ্রাবা স্তম্ভে সংস্কৃত খোদিত লিপিতে নগরহরার উল্লেখ পাইয়াছেন।

জনসাধারণে এই স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছে। এইক্ষণে, স্তূপ জনশূন্য, ইহাতে কোন যতি বাস করেন না। নগরাভ্যন্তরে রাজা অশোক নির্ম্মিত দুইশত ফুট কি ততোধিক উচ্চ স্তূপ আছে। এই সঙ্ঘারামের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে উচ্চ পর্ব্বত গাত্র হইতে প্রবল স্রোত নির্গত হইয়া জলপ্রপাত সৃষ্টি করিয়াছে। পর্ব্বত গাত্রগুলি প্রাচীরের ন্যায়; পূর্ব্বদিকে গভীরগুহাভ্যন্তরে নাগ গোপাল বাস করে। গহ্বরের প্রবেশদ্বার অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ এবং ইহা অন্ধকারময়। প্রাচীনকালে গুহাভ্যন্তরে বুদ্ধদেবের স্বভাব পরিচায়ক এবং উজ্জ্বল ছায়া দৃষ্ট হইত। পরে সেরূপ দৃষ্ট হয় না। কেবল মাত্র সামান্য সাদৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু যিনি ভক্তি-ভরে প্রার্থনা করেন, তিনি ক্ষণকালের জন্য দিব্য চক্ষু প্রাপ্ত হইয়া পরিষ্কার ভাবেই ছায়া মূর্ত্তি দেখিতে পান।

যখন তথাগত পৃথিবীতে বাস করিতেন তখন এই দৈত্য গোপালক ছিল এবং রাজাকে দুগ্ধ ও ক্ষীর সরবরাহ করিত। কোন সময়ে কার্য্যে শৈথিল্যতার জন্য তিরস্কৃত হওয়াতে গোপালক ক্রোধান্ধ হইয়া স্তূপে যাইয়া পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করিয়া প্রার্থনা করে যে সে যেন ধ্বংশকারী দৈত্যে পরিণত হইয়া দেশের ও রাজার সর্ব্বনাশ সাধন করিতে পারে। পরে পর্ব্বতারোহণ করিয়া গোপালক লম্ফ প্রদান করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এবং তৎক্ষণাৎ সে দৈত্যরূপে পরিণত হইয়া এই গুহা অধিকার করিয়া দেশ ও রাজাকে বিনষ্ট করিবার জন্য প্রস্তুত হয়। তথাগত এই উদ্দেশ্য অবগত হইয়া করুণাপরবশ হইয়া মধ্য ভারত হইতে এই স্থানে আগমন করেন। দৈত্য তথাগতের আগমনে অহিংসা পরমধর্ম্ম এই সার সত্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। যাহাতে বুদ্ধদেবের শিষ্যগণ সদাসর্ব্বদা এই গুহায় তাঁহাকে পূজা করিতে পারে, সেইজন্য গুহায় বাস করিবার জন্য দৈত্য বুদ্ধদেবকে অনুরোধ করে। বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন যে,"এই স্থানে আমি আমার ছায়া রাখিয়া যাইব এবং তোমার নিকট হইতে অনবরত পূজা গ্রহণের জন্য পাঁচজন অর্হৎ প্রেরণ করিব। সত্যধর্ম্ম বিনষ্ট হইলেও তোমার দত্ত পূজা গৃহীত হইবে। যদি তোমার অন্তঃকরণে কোন মন্দাভিলাষ জন্মে, তাহা হইলে তুমি আমার ছায়ার দিকে চাহিলে তোমার সে অভিলাষ দূরীভূত হইবে। ভদ্রকল্পে (৩) যে সকল বুদ্ধের আবির্ভাব হইবে তাঁহারা সকলেই স্বীয় স্বীয় ছায়া তোমাকে দান করিবেন।" গুহার বহির্দ্দেশে দুইখানি চতুষ্কোণ প্রস্তর আছে। একখানির উপর তথাগতের পদ চিহ্ন আছে। মধ্যে মধ্যে ইহা উজ্জ্বলিত হইয়া থাকে। গুহার উভয় পার্শ্বে প্রস্তর নির্ম্মিত কক্ষ আছে। এই সকল কক্ষে তথাগতের শিষ্যগণ উপাসনা করিতেন।

গুহার উত্তর পশ্চিম কোণে একটী স্তূপ আছে এই স্থানে বুদ্ধদেব ভ্রমণ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত অন্য একটী স্তূপে তথাগতের চুল ও নখাবশিষ্ট আছে। নিকটেই অন্য স্তূপে তথাগত তাঁহার ধর্ম্মের সূক্ষ্ম বিচার করিয়া স্কন্ধ ধাতু আয়তন সম্বন্ধে নিজ মত প্রচার করিয়াছিলেন। গুহার পশ্চিমে বৃহৎ পর্ব্বতে তথাগত নিজ কশায় বস্ত্র ধৌত করিয়া প্রসারিত করিয়া-ছিলেন। সূত্রের চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

নগরহরার ৩০ লি দক্ষিণ-পূর্ব্বে হিলোনগর। ইহা উচ্চে অবস্থিত। নগরে যথেষ্ট পুষ্প পাওয়া যায় এবং হ্রদের জল দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ। অধিবাসীরা সরল, সাধু এবং সৎ। এখানে দোতলা একটী প্রাসাদ আছে; উহার কড়িগুলি চিত্রিত এবং স্তম্ভগুলি লোহিতবর্ণে রঞ্জিত। দ্বিতলে সপ্তপ্রকার মূল্যবান ধাতু দ্বারা নির্ম্মিত একটি স্তূপ আছে; তথায় তথাগতের করোটীর অস্থি রক্ষিত। করোটীর পরিধি ১ ফুট দুই ইঞ্চি। চুলের ছিদ্রগুলি এখনও পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার বর্ণ কিঞ্চিৎ শুভ্র ও পীত। যাহারা শুভাশুভ লক্ষণ জানিতে চায় তাহারা সুগন্ধি মৃত্তিকা করোটীর উপর স্থাপন করিলে পুণ্যানুসারে মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়া শুভাশুভ সূচনা করে। অন্য আর একটী ক্ষুদ্র স্তূপেও তথাগতের করোটীর অস্থি রক্ষিত

(৩) যে কল্পে আমরা বাস করিতেছি এই কল্পে সহস্র বুদ্ধ আবির্ভাব হইবেন।

আছে। ইহা দেখিতে পদ্ম পত্রের স্থায় এবং ইহার বর্ণ অপর করোটীর স্থায়। ইহা মূল্যবান আধারে সংরক্ষিত।

অন্য স্তূপে তথাগতের চক্ষুর তারা আছে। চক্ষুর তারাটী আমড়া ফলের স্থায় বৃহৎ এবং ইহা উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ; ইহাও একটী মূল্যবান আধারে সুরক্ষিত। উত্তম কার্পাস নির্ম্মিত পীত লোহিতবর্ণ বিশিষ্ট তথাগতের সজ্বরাম বস্ত্রও মূল্যবান আধারে রহিয়াছে। যেহেতু অনেক মাস ও বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে সেই জন্য ইহার সামান্য অনিষ্ট হইয়াছে। তথাগতের লৌহ-মণ্ডলবিশিষ্ট যষ্টি এবং চন্দন কাষ্ঠ নির্ম্মিত যষ্টিও মূল্যবান দ্রব্যনির্ম্মিত আধারে রক্ষিত হইতেছে। সম্প্রতি, জনৈক রাজা এই দ্রব্যগুলি তথাগতের নিজস্ব বলিয়া বলপূর্ব্বক স্বদেশে লইয়া নিজ প্রাসাদে রাখিয়াছিলেন। অল্পক্ষণ পরে যাইয়া তিনি দেখিতে পাইলেন যে দ্রব্যগুলি অন্তর্হিত হইয়াছে। অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে সেগুলি তাহাদের পূর্ব্বতন স্থানে প্রত্যাগমন করিয়াছে। এই পাঁচটি পবিত্র দ্রব্য অনেক সময় অলৌকিক ব্যাপার সম্পন্ন করে।

এইসকল পবিত্র দ্রব্যকে অনবরত পুষ্প ও গন্ধদ্রব্য উপহার দিবার জন্য কপিশারাজ পাঁচজন সদ ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করিয়াছেন। অনবরত জন সাধারণ এই দ্রব্য গুলিকে পূজা করিবার জন্য সমবেত হওয়ায় এবং নির্জ্জনে তপস্যার জন্য, ব্রাহ্মণগণ শান্তিরক্ষণার্থ পূজার জন্য নির্দ্ধারিত শুল্ক স্থির করিয়াছেন। যাহারা তথাগতের করোটী দেখিতে অভিলাষী হয় তাহাদের এক স্বর্ণ মুদ্রা দান করিতে হয়; যাহারা উহার প্রতিকৃতি গ্রহণেচ্ছুক তাহাদের পঞ্চস্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিতে হয়। অন্যান্যগুলিতেও নির্দ্ধারিত শুল্ক আছে। যদিচ এই শুল্ক অত্যন্ত উচ্চ, তত্রাপি অনেক লোক পূজার্থ একত্রিত হয়।

দ্বিতীয় প্রাসাদের উত্তর-পশ্চিম কোণে নাতিবৃহৎ স্তূপ আছে। স্পর্শমাত্রেই ইহা কাঁপিতে থাকে এবং ইহার ঘণ্টা ও ঝুনঝুনিগুলি শব্দ করিতে থাকে। দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে পাঁচ শত লি গমন করিয়া আমরা কিয়েন-টোলো (গান্ধার) রাজ্যে পৌঁছি।

কিয়েনটোলো (গান্ধার)

গান্ধার রাজ্য পূর্ব্ব পশ্চিমে ১০০০ লি এবং উত্তর দক্ষিণে ৮০০ লি বিস্তৃত। ইহার পূর্ব্বসীমায় সিন (সিন্ধু) নদী। রাজধানী পোলুশাপুলো (পুষ্পপুর) নামে কথিত হইয়া থাকে। রাজধানীর পরিধি প্রায় ৪০ লি। রাজবংশ নির্ব্বংশ এবং কপিশা হইতে প্রেরিত প্রতিনিধিগণ রাজ্যশাসন করেন। নগর ও গ্রাম জনশূন্য। রাজকীয় আবাসের সন্নিকটে সহস্র ঘর লোক বাস করে। দেশে শাক, পুষ্প ও ফল যথেষ্ট পাওয়া যায়, ইক্ষুদণ্ডও প্রচুর আছে; এই ইক্ষুদণ্ডের রস হইতে অধিবাসীরা চিনি প্রস্তুত করে। জলবায়ু আর্দ্র এবং উষ্ণ এবং সাধারণতঃ বরফ দেখা যায় না। অধিবাসীরা ভীরু এবং নম্রপ্রকৃতির। ইহারা সাহিত্যানুরাগী। অধিকাংশই ধর্ম্মে অবিশ্বাসী এবং অত্যল্পসংখ্যাই সত্যধর্ম্ম বিশ্বাস করে। অতি প্রাচীনকাল হইতেই এই দেশে অনেক শাস্ত্রকার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন যথা নারায়ণ দেব, অসংখ্য বোধিসত্ব, বসুবন্ধু বোধিসত্ব, ধর্ম্মত্রাতা, পার্শ্ব প্রভৃতি। প্রায় সহস্র সজ্বরাম আছে কিন্তু সকলগুলিই জনশূন্য ও ধ্বংশাবশেষ মাত্র অবশিষ্ট। সেগুলি জঙ্গলাকীর্ণ এবং নির্জ্জন। স্তূপগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। অবিশ্বাসীদিগের শতাধিক মন্দিরে অধিবাসীগণ বাস করে।

রাজধানীর অভ্যন্তরে উত্তর পূর্ব্ব দিকে এক প্রসাদের ভগ্নাবশেষ ভিত্তিমূল দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে এই স্থানে বুদ্ধদেবের পাত্র মূল্যবান প্রাসাদে রক্ষিত হইত। বুদ্ধের নির্ব্বাণের পর, তাঁহার পাত্র এই প্রদেশে অনেক শতাব্দী ধরিয়া পূজিত হইয়াছিল। এইক্ষণে পাত্রটী পারস্যদেশে আছে।

নগর-বহির্ভাগে ৮।৯ লি দক্ষিণ পূর্ব্বে প্রকাণ্ডকায় একটি বৃক্ষ আছে। ইহার শাখাগুলি বৃহৎ এবং ইহারই নিম্নে চারিজন বুদ্ধ বসিয়াছিলেন। বর্ত্তমানেও এই স্থানে চারিটি উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ভদ্রকল্পে আরও ৯৯৬টী বুদ্ধ এই স্থানে উপবেশন করিবেন। শাক্যতথাগত এই বৃক্ষমূলে দক্ষিণামুখে

উপবিষ্ট হইয়া আনন্দকে বলিয়াছিলেন "আমার নির্ব্বাণের চারিশত বৎসর পরে, কনিষ্ক নামে এক নরপতি এই দেশে রাজত্ব করিবেন। এই স্থানের সন্নিকটে তিনি এক স্তূপ নির্ম্মাণ করিবেন; তথায় আমার অনেক অস্থি ও চর্ম্ম রক্ষিত হইবে।"

পিপুল বৃক্ষের দক্ষিণে কনিষ্কনির্ম্মিত একটী স্তূপ আছে। বুদ্ধের নির্ব্বাণের চারিশত বৎসর পরে কনিষ্ক জম্বুদ্বীপ শাসন করিয়াছিলেন। প্রথমে তাঁহার ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান ছিল না এবং বৌদ্ধধর্ম্মে তিনি আদৌ আস্থাবান ছিলেন না। এক দিবস তিনি জলাভূমি অতিক্রমকালে একটী শ্বেত খরগোস দর্শনে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে থাকেন। খরগোস এই স্থানে আসিয়া সহসা অদৃশ্য হইয়া যায়। সেই সময় তিনি দেখিতে পান যে এক বালক নিকটবর্ত্তী বনে তিনফুট উচ্চ এক স্তূপ নির্ম্মাণ করিতেছে। রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বালক, তুমি কি করিতেছ।" বালক উত্তর করিলেন "পুরাকালে শাক্যবুদ্ধ তাঁহার বুদ্ধিবলে নিম্নলিখিত ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন "এই দেশে একজন বিজয়ী রাজা এক স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় আমার স্মরণচিহ্ন রক্ষা করিবেন।" বর্ত্তমানই সেই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইবারই প্রশস্ত সময় এবং সেই জন্য আমি তোমাকে এই কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য আদেশ করিতেছি।" এই কথা বলিয়াই বালক অন্তর্ধান করিলেন।

রাজা এই আদেশে অত্যন্ত প্রীত হইলেন। বুদ্ধদেব যে ভবিষ্যদ্বাণীতে তাঁহাকে উল্লেখ করিয়াছিলেন এই সংবাদে তিনি নিজেকে সম্মানিত বিবেচনা করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। বালকের প্রস্তুত স্তূপ বেষ্টন করিয়া তিনি প্রস্তরের বৃহৎ স্তূপ নির্ম্মাণ আরম্ভ করিলেন। স্তূপ যতই নির্ম্মিত হইতে লাগিল বালকের ক্ষুদ্র স্তূপও ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই প্রকারের ৪০০ ফুট উচ্চ এবং সার্দ্ধ শত লি ভিত্তি লইয়া স্তূপ নির্ম্মাণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার স্তূপ নির্ম্মাণ শেষ হইলেই রাজা দেখিতে পাইলেন যে সহসা ক্ষুদ্র স্তূপটী বৃহৎ ভিত্তিমূলে দক্ষিণ পূর্ব্বকোণে স্থাপিত হইয়া কনিষ্ক নির্ম্মিত স্তূপ ভেদ করিয়া উত্থিত হইয়াছে।

রাজা এই ব্যাপারে দুঃখিত হইয়া তাঁহার স্তূপ ধ্বংসের আদেশ প্রদান করিলেন। দ্বিতীয়তল পর্য্যন্ত ভাঙ্গা হইলে ক্ষুদ্র স্তূপটী পুনরায় স্বস্থানে আসীন হইল। কিন্তু উচ্চতায় অন্যটী অপেক্ষা বেশী থাকিল। রাজা নিজ দোষ স্বীকার করিয়া বলিলেন যে দেবতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করা অসম্ভব। এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। এই দুইটী স্তূপ বর্ত্তমানেও দেখিতে পাওয়া যায়। কষ্টসাধ্য ব্যাধি হইলে আরোগ্য লাভের আশায় লোক এই স্থানে গন্ধদ্রব্য ও পুষ্পোপহার প্রদান করে এবং ভক্তিপূর্ণচিত্তে প্রার্থনা করে। অনেক স্থলেই পীড়িত আরোগ্যলাভ করে।

ক্রমশঃ।

ওলন্দাজি উপনিবেশ সম্বন্ধে কতিপয় মন্তব্য।

(ফেলিসিয়াঁ-শালের ফরাসী হইতে)

বাতাবিয়া—শুক্রবার, ১৯ ডিসেম্বর।

যবদ্বীপে দ্রুত পরিভ্রমণ করিয়া, লোকের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া, গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া, ওলন্দাজের উপনিবেশপদ্ধতি সম্বন্ধে আমার যে ধারণা হইয়াছে, যবদ্বীপ হইতে প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে তাহা লিপিবদ্ধ করিব মনে করিতেছি।

আমার বিশ্বাস, এই উপনিবেশ স্থাপনের

বিবরটি নিঃস্বার্থভাবে অনুশীলন করা আমার পক্ষে নিতান্তই আবশ্যক। এই উপনিবেশ-রাজ্যগুলি যুদ্ধের দ্বারা বিজিত হইয়াছে বাহুবলে বশীভূত হইয়াছে—এই ছুতা করিয়া অনেকে—যাঁহারা যুদ্ধবিগ্রহের স্থানে শান্তিকে ও বাহুবলের স্থানে ন্যায়ধর্ম্মকে স্থাপন করিতে চাহেন—উপনিবেশ-সমস্যার সম্বন্ধে বড় একটা আগ্রহ প্রকাশ করেন না। উপনিবেশ স্থাপনের কাজটাই অন্যায় ও দুর্নীতিমূলক—এই বলিয়া এককথায় তাঁহারা বিচার নিষ্পত্তি করিয়া বসেন। তাঁহারা ইহা বোঝেন না,—এসম্বন্ধে কোন কাজ করিবার পূর্ব্বে বাস্তবিক অবস্থাটা জানা আবশ্যক। একথা স্বীকার করিতে হইবে, উপনিবেশ-তন্ত্রটা একটা বাস্তব তথ্য; ভৌগোলিক সংস্থান, ঐতিহাসিক ঘটনা, দেশকালে জাতিবিশেষের আপেক্ষিক অবস্থা—এই সকল কারণে উপনিবেশস্থাপন অনিবার্য্য। যে জাতি য়ুরোপীয় নহে, এবং যুদ্ধকার্য্যে ও আর্থিক হিসাবে যে জাতি দুর্ব্বল, সে জাতিকে কোন য়ুরোপীয় জাতির অধীনে আসিতেই হইবে—যে য়ুরোপীয় জাতি যুদ্ধে ও অর্থে সমধিক প্রবল বলবান্। উপনিবেশপত্তনের কাজ আপাতত অনিবার্য্য—একথা যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, ন্যায়ানুসারে দেশীয় লোকদিগকে মুক্তিদান করিবার চেষ্টায় উপস্থিতমত বিশেষ-বিশেষ সংস্কার প্রবর্ত্তিত করিয়া ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইবে, সুদূরবর্ত্তী রাষ্ট্রবিপ্লবের শুধু একটা অস্পষ্ট আশা হৃদয়ে পোষণ করিলে কোন কাজ হইবে না। সুতরাং উপনিবেশ সমস্যার সমস্ত খুঁটিনাটিগুলি, সমস্ত মতবাদগুলি, সমস্ত তথ্যগুলি ভাল করিয়া অনুশীলন করা আবশ্যক। বর্ত্তমান অবস্থাটা জানিতে পারিলে, তৎসম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা সহজ হইবে।

যবদ্বীপে ওলন্দাজেরা কি করিতে চাহিয়াছিল?—তাহাদের উদ্দেশ্য কি ছিল?—আর কিছুই নহে,—উপনিবেশ-রাজ্যের যে সমস্ত প্রাকৃতিক সম্বল, তাহার উৎকর্ষ সাধন করিয়া, তাহা হইতে ধন উৎপাদন করিয়া ওলন্দাজ-দেশের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করা, স্বদেশকে লাভবান্ করা,—ইহাই উদ্দেশ্য।

ইহা সেই কার্য্যপ্রণালী, যাহা ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে General Vanden Basch কল্পনা করিয়াছিলেন। উপনিবেশ সম্বন্ধীয় মতবাদের ইতিহাসে, এই প্রণালীটি Basch এর প্রণালী বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। প্রণালীটি এইঃ—য়ুরোপীয় রাজসরকার,—য়ুরোপীয় কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে, কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক প্রয়োজনীয় বিদেশী গাছ রোপন ও চাষ করিবার জন্য দেশীয় লোকদিগকে বাধ্য করেন; দেশীয় লোকেরা তাহাদের কৃষি উৎপন্ন দ্রব্য, একটা নির্দ্দিষ্ট মূল্যে সরকারের গুদামে দাখিল করিতে বাধ্য। এই সকল উৎপন্ন দ্রব্য য়ুরোপে চালান করিলে খুব লাভ হয়। কেননা, খুব কম মূল্যে খরিদ করিয়া খুব বেশী মূল্যে বিক্রয় করা হয়।—প্রথমে চিনি, তামাক, চা, নীল প্রভৃতি সকলপ্রকার চাষের সম্বন্ধেই Basch এর প্রণালী অনুসৃত হইত, পরে ক্রমশঃ শুধু কাফির চাষেই এই প্রণালী প্রযুক্ত হইল। এই অনন্যসাধারণ অর্থনৈতিক বন্দোবস্তটি—যুগপৎ সরকারের অনুকূল ও প্রজার প্রতিকূল; সরকারের

অনুকূল এইজন্য যে, একটা সমস্ত বাণিজ্য সরকারের একচেটিয়া; প্রজার প্রতিকূল এইজন্য যে, খুব অল্প মজুরীতে চাষীদিগকে চাষ করিতে বাধ্য করা হয়। এই প্রণালীটি প্রজাপীড়নের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়—এই প্রণালী অনুসারে প্রজাদিগের সর্ব্বনাশ হওয়া দূরে থাক্, বরং তাহারা প্রভূত ধনশালী হইয়া উঠে; সামাজিক শ্রমের সুশৃঙ্খল বন্দোবস্ত হইতে এইরূপই আর্থিক লভ্য হইয়া থাকে। এই পদ্ধতিটি যেরূপ সরকারের অনুকূল সেইরূপ যদি প্রজারও অনুকূল হইত, যে প্রভূত অর্থ ওলন্দাজেরা আত্মসাৎ করে, তাহা যদি দেশীয় চাষাদিগের ভোগে আসিত, তাহা হইলে অচিরাৎ যবদ্বীপবাসীদিগের অবস্থা অনেকটা উন্নত হইয়া উঠিত সন্দেহ নাই।

যবদ্বীপের ভূমি কর্ষণ করিয়া ধনোৎপাদন ও ধনোপার্জ্জনই ওলন্দাজদিগের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়ায়, এই উদ্দেশ্যের সহিত মিল করিয়া তাহারা রাজ্যশাসনের সমস্ত খুঁটিনাটিগুলি নিপুণভাবে নির্দ্ধারণ করিয়াছে। এইরূপ হীন উদ্দেশ্য হইলেও, অনেক বিষয়ে তাহাদের রাষ্ট্রনীতিকে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। তাহারা দেশীয় লোকের রীতিনীতি আচার ব্যবহার রক্ষা করিয়া দেশ শাসন করিতেছে। রাজপুরুষেরা যাহাতে দেশের রীতিনীতি সম্মানের চক্ষে দেখিতে পারে এইজন্য তাহাদিগকে দেশীয় ভাষা শিখিতে বাধ্য করা হয়। দেশের প্রচলিত ধর্ম্মের প্রতিও তাহারা সম্মান প্রদর্শন করে। ইহাদের মতো পরধর্ম্মসহিষ্ণুতা ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উদাসীনতা আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ইহারা দেশীয় গ্রামমণ্ডলীদিগকে বহুপরিমাণে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রদান করিয়াছে। ইহারা চীনের অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা হইতে দেশীয় লোকদিগকে এবং লুব্ধ য়ুরোপীয় উপনিবেশিকদিগের হস্ত হইতে দেশীয় লোকের অধিকৃত কৃষিভূমিকে রক্ষা করিয়াছে। যবদ্বীপের কৃষিভূমি সম্বন্ধীয় বিধিব্যবস্থা একটু নূতন ধরণের। দেশের অধিকাংশ বিস্তৃত ভূখণ্ডের উপর সরকারের স্বত্বাধিকার। প্রজাদের প্রায়ই অস্থায়ী স্বত্ব—কয়েক বৎসরের জন্য তাহাদের সহিত বন্দোবস্ত করা হয় মাত্র; কোন কোন জমি ৭৫ বৎসরের জন্য ইজারা দেওয়া হইয়া থাকে। সরকারই সাধারণের স্বত্বাধিকারের—দেশীয় লোকের স্বত্বাধিকারের রক্ষক; সুতরাং অন্যায় অত্যাচার হইলে সরকারকে সময়ে সময়ে হস্তক্ষেপ করিতে হয়। একদিকে সরকারের এই হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার, এবং অপরদিকে য়ুরোপীয় ঔপনিবেশিকদিগের ব্যক্তিগত স্বাধীন উদ্যম—এই উভয়ের মধ্যে যেরূপ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কাজ করা হয় তাহা অতীব প্রশংসনীয়। আমাদের দেশেও কুলপরম্পরাগত চিরস্থায়ী স্বত্বাধিকারের বদলে ক্রমশঃ এইরূপ সীমাবদ্ধ অস্থায়ী স্বত্বাধিকার প্রবর্ত্তিত করিতে পারিলে ভাল হয়।

রাজ্যশাসনের দিক দিয়া দেখিলেও, ওলন্দাজদিগের বিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। অব্যবহিত রাজ্যশাসনের লোভ সম্বরণ করিয়া তাহারা শুধু উপরিতন কর্ত্তৃত্বের (protectorate) ভার গ্রহণ করিয়াছে। প্রত্যেক য়ুরোপীয় কর্ম্মচারীর পাশাপাশি সমপদস্থ এক একজন দেশীয় কর্ম্মচারীও অবশ্য আছে। আসল

ক্ষমতাটা য়ুরোপীয় কর্ম্মচারীরই হাতে; তবে যে, একজন সমপদস্থ দেশীয় কর্ম্মচারীকে তাহার সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হয়, তাহার অর্থ আর কিছুই নহে—দেশীয় লোকের দ্বারাই দেশ শাসিত হইতেছে এইরূপ একটা ভান করা মাত্র। এইরূপ মধ্যবর্ত্তী দেশীয় কর্ম্মচারীকর্ত্তৃক যে আদেশ প্রচারিত হয় তাহা প্রজারা ভাল বুঝিতে পারে ও তাহা সহজে সম্পাদিত হয়। দেশীয় বিচারকদিগের দ্বারাই বিচারকার্য্য নিষ্পন্ন হয়, তবে প্রধান বিচারপতি একজন য়ুরোপীয়; তিনি দেশীয় ভাষা ও দেশীয় রীতি নীতি সমস্তই জানেন। ওলন্দাজেরা দেশীয়দিগের প্রতি অবজ্ঞাসূচক উদ্ধত কর্ত্তৃভাব প্রদর্শন করিলেও, নিজের প্রকৃত স্বার্থের উদ্দেশে, যেরূপ শাসন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছে তাহা দেশীয়দিগের স্বার্থেরও অনুকূল। এইরূপ উপনিবেশ-শাসন-পদ্ধতি অন্য সকল জাতিরই অনুকরণীয়। যবদ্বীপে ওলন্দাজদিগের, ভারতে ইংরাজদিগের, ও কোচিন-চীন ও টিউনিসে ফরাসীদিগের যেরূপ পরীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতা, তাহাতে জটিল, স্বেচ্ছাচারী, বহুব্যয়সাপেক্ষ অব্যবহিত শাসন অপেক্ষা এইরূপ মধ্যবর্ত্তীর দ্বারা শাসন করিবার সাদাসিধা পদ্ধতি যে উৎকৃষ্ট তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হয়।

মানুষের সম্বন্ধে যেরূপ,—জিনিসের সম্বন্ধেও সেইরূপ ওলন্দাজদিগের 'কেজো' বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। ভূমি হইতে ধনোৎপাদন করিবার জন্য তাহারা সুপ্রণালী-ক্রমে যেরূপ বিজ্ঞানের প্রয়োগ করে তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তাহারা অসংখ্য খাল কাটিয়াছে। তাহারা কৃষির উন্নতিসাধন করিয়াছে, নূতন-নূতন চাষ প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। কৃষি ও শিল্পবাণিজ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহারা বুদ্ধিপূর্ব্বক বৃক্ষাদির অনুশীলন করিয়াছে। কিসে বৃক্ষাদির পরিপুষ্টি হয়, কোন্ ভূমির কিরূপ শক্তি, কোন্ সার কোন ভূমির উপযোগী, কোন্ ভূমির কিরূপ রোগ ও কিরূপ প্রতিকার—সমস্তই তাহারা সম্যক্‌রূপে আলোচনা করিয়াছে। এই কার্য্যে সরকারের সহিত ব্যক্তিবিশেষেরও সহযোগিতা আছে। Burtenzorg-উদ্যানে যে ব্যয় হয় তাহার একতৃতীয়াংশ প্ল্যাণ্টারেরা দিয়া থাকে; সরকার প্ল্যাণ্টারদিগকে বীজ, গাছের কলম, এমন কি, মূলধনের অগ্রিম টাকা পর্য্যন্ত যোগাইয়া থাকেন।

এইরূপ সুনিপুণ ঔপনিবেশিক শাসন-পদ্ধতির দ্বারা ওলন্দাজেরা যবদ্বীপকে বেশ ফলোৎপাদক করিয়া তুলিয়াছে। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে যবদ্বীপের যেরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল এখন যে ততটা নাই—সে তাহাদের দোষ নহে। কোন কোন প্রদেশে কাফি-গাছ রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে; সেই সব স্থানে কাফির চাষ রহিত করিতে হইয়াছে। অন্যান্য ফলোৎপাদক দেশের প্রতিযোগিতায়—বিশেষত ব্রেজিলের প্রতিযোগিতায়—চিনি ও কাফির মূল্য কমিয়া গিয়াছে। —পক্ষান্তরে, ওলন্দাজদিগের কখন কখন এইরূপ ভয় হয়, পাছে কোন প্রবল রাজশক্তি এই সুন্দর উপনিবেশকে আক্রমণ করে। তাই তাহারা অন্য কোন রাজশক্তির সংস্রবে বড়-একটা আসিতে চাহে না। যবদ্বীপের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হইলে, বৈদেশিককে এইজন্য ছাড়পত্র দেখাইতে হয়, কেন ভ্রমণ করিতে আসিয়াছে তাহার

কৈফিয়ৎ দিতে হয়। বৈদেশিকদের নিকট ওলন্দাজ-কর্ম্মচারীরা সাবধানে কথাবার্ত্তা কহে, দেশ সম্বন্ধে বড়-একটা খোঁজখবর দিতে চাহে না। এই বিষয়ে ইংরাজদের সহিত তাহাদের বিলক্ষণ প্রভেদ; ইংরাজেরা আপনাদের সম্বন্ধে নির্ভয় ও গর্ব্বিত।—ক্ষুদ্র হলণ্ড, বৃহৎ রাজশক্তিদিগকে অত্যন্ত ভয় করে। জাপানও হলণ্ডের মনে ভয় সঞ্চার করিতে আরম্ভ করিয়াছে; আমি যখন যবদ্বীপে ছিলাম, চীনদিগের প্রতিকূলে বিধিবদ্ধ বিশেষ-আইনগুলাকে এড়াইবার জন্য, তত্রস্থ আড়াই কোটি চীন অধিবাসীর মধ্যে ৬০,০০০ চীন, জাপানী জাতিভুক্ত হইতে চাহিয়াছিল; কেননা, নব-সংস্থাপিত সন্ধির বলে, জাপানীরা য়ুরোপীয়দিগের সমকক্ষ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। তাই কতকগুলি ওলন্দাজ এইরূপ মনে করে,—কে জানে যদি জাপানিরা এই চীনদের প্রার্থনা কোন দিন গ্রাহ্য করে, এবং অভিনব জাতিদিগকে রক্ষা করিবার ব্যপদেশে স্বীয় উৎকৃষ্ট নৌ-বহরের সাহায্যে, এই অরক্ষিত দ্বীপটিকে দখল করিয়া বসে?...এইরূপে পূর্ব্বতন উপনিবেশটি ক্রমশই অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছে; বিশেষত সম্প্রতি কোন কোন ভূখণ্ডে যে সকল রাজনৈতিক ঘটনা হইয়া গিয়াছে, সমস্ত রাজ্যসমূহের মধ্যে যেরূপ অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে, তাহার উপর ওলন্দাজদিগের কোন হাত নাই। যাই হোক, তাহাদের উপনিবেশ-পদ্ধতির কোন দোষ নাই। তাহাদের পদ্ধতিকে প্রশংসা করিতেই হয়,—উদারতার জন্য নহে, পরন্তু তাহাদের 'কেজো' বুদ্ধির জন্য।

অবশেষে বক্তব্য,—সমস্ত ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে কতকগুলি প্রয়োজনীয় নিয়ম স্থাপন করা যাইতে পারে। যদি উপনিবেশ-রাজ্য স্থাপন করা অপরিহার্য্যই হয়, তাহা হইলে শান্তি ও ন্যায়ের মিত্রগণ অন্তত এইটুকু দাবী করিতে পারেন যে, বিদেশী রাজা ও স্বদেশী প্রজা—এই উভয়ের স্বার্থের প্রতি যেন সমান দৃষ্টি রাখা হয়। উপনিবেশরাজ্য স্থাপনের এরূপ উদ্দেশ্য নহে যে কতকগুলা দাস-নিয়োগকারী ব্যক্তি কিংবা অ্যাব্‌স্যাঁথ (absinth) মদ্যের কতকগুলি বণিক ধনশালী হইয়া উঠে। রাজ্যকর্ত্তা কোন য়ুরোপীয় জাতি ও প্রজাস্থানীয় দেশীয় লোক—এই উভয়ের মধ্যে সম্মিলন হইয়া যাহাতে উভয়ই লাভবান হয়, ইহাই উপনিবেশ রাজ্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

এই সম্মিলনের ফলে, অর্থনৈতিক হিসাবে বিদেশী রাজসরকারের বিশেষ লাভ হইয়া থাকে; তাঁহাদের অধীনস্থ উপনিবেশ-রাজ্য,—"সুবিধা জনক ক্রয় বিক্রয়ের একটা বৃহৎ বিপণি"; অন্যত্র অপেক্ষা তাঁহারা সহজে স্বকীয় শিল্প সামগ্রী দেশীয় লোকদিগকে বিক্রয় করিতে পারেন এবং সেখান হইতে শিল্প সামগ্রীর যাহা মূল-উপাদান, সেই সকল নিতান্ত আবশ্যকীয় কাঁচা মাল ক্রয় করিতে পারেন। যতই তাঁহারা দেশীয়দের নিকট হইতে কাঁচা মাল ক্রয় করিবেন এবং দেশীয়দিগকে তাহাদের শিল্প সামগ্রী বিক্রয় করিবেন, দেশীয়দিগের আর্থিক অবস্থারও ততই উন্নতি হইবে। উপনিবেশের উন্নতির পক্ষে দেশীয় লোকেরা একটা প্রধান উপাদান। আবার, তাঁহাদের এই দূরস্থ উপনিবেশ রাজ্যটি, তাঁহাদের পররাষ্ট্রীয় কার্য্যসম্বন্ধে; তাঁহাদের যুদ্ধকার্য্যে

সম্বন্ধে, একটা বিশেষ আশ্রয়স্থল ও সহায় হইতে পারে। পক্ষান্তরে, য়ুরোপীয় শাসনাধীনে, যদি দেশীয় লোকদিগের কোন লাভ না হয়, তাহা হইলে সে শাসন নিতান্ত অন্যায় বলিয়া পরিগণিত হইবে। কোন য়ুরোপীয় জাতির সংস্রবে আসিয়া, দেশীয় লোকেরা বেশী স্বাধীনতা লাভ করিবে, বেশী ন্যায়বিচার পাইবে, বেশী সুখশান্তি সম্ভোগ করিবে, তবেই উপনিবেশ রাজ্যের সার্থকতা। যদি উপনিবেশ রাজ্যের দেশীয় অধিবাসীরা বিদেশীয় শাসনে উপকৃত হয় তবেই নৈতিক হিসাবে উপনিবেশ রাজ্যাধিকারকে সমর্থন করা যাইতে পারে।

যাহারা অন্যায় অত্যাচারের প্রতিকূল, যাহারা দেশীয় লোকদিগের ন্যায্য অধিকারের পক্ষপাতী, তাহারা অবশ্য ওলন্দাজি শাসনপদ্ধতির মূল-ভাবটিকে ভাল বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না। তথাপি দেখা যায়, ভিন্ন আদর্শ অনুসরণ করিয়াও ওলন্দাজেরা যবদ্বীপে কতকগুলি সংস্কারকে কার্য্যে পরিণত করিয়াছে। যাবার যেরূপ দেশীয় লোকের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, ধর্ম্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হয় সেইরূপ সকল উপনিবেশ-রাজ্যেই হওয়া উচিত; যাবার ন্যায় সকল উপনিবেশ-রাজ্যেই—কি ব্যক্তিগত, কি সমবেত—সর্ব্বপ্রকার স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত হওয়া উচিত। যাবার ন্যায় সকল উপনিবেশ রাজ্যেই শাসনকার্য্য স্বদেশীয় লোকের দ্বারা নির্ব্বাহিত হওয়া উচিত; কেবল পরিচালনের কর্তৃত্ব এমন য়ুরোপীদিগের হস্তে থাকা আবশ্যক যাহারা দেশীয় ভাষা, দেশীয় রীতি নীতি সমস্তই অবগত আছে। যাবার ন্যায় সকল উপনিবেশ রাজ্যেই অন্ততঃ প্রাথমিক আদালতের বিচারকার্য্য দেশীয় বিচারপতি কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন হওয়া কর্ত্তব্য। অনেকগুলি য়ুরোপীয় উপনিবেশ-রাজ্যে দেশীয়েরা যেরূপ কষ্ট পায়, এই সামান্য নিয়মগুলি প্রয়োগ করিলে অচিরাৎ সেই সব কষ্টের লাঘব হইতে পারে।

আর দুই এক শতাব্দীর মধ্যে আরও বড় বড় সমস্যা উপস্থিত হইতে পারে। পৃথিবীতে যে পরিমাণে সুনীতি ও সদনুষ্ঠানের উন্নতি হইবে, সেই অনুসারে, শান্তি ও ন্যায়-ধর্ম্মের ভাব সর্ব্বত্র প্রসারিত হইবে, উপনিবেশ সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্যসকল য়ুরোপীয়েরা উত্তরোত্তর আরও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে। তখন তাহারা বুঝিতে পারিবে, উপনিবেশগুলি নিত্যকাল পরাধীন থাকিবে—বিধাতার এরূপ অভিপ্রায় নহে। তখন তাহারা দেশীয় লোকের কৃতজ্ঞতা আকর্ষণ করিয়া, তাহাদিগকে প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিবে; এবং দেশীয়েরা অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিলেও সেই প্রেমের বন্ধন বরাবর থাকিয়া যাইবে। তাহারা অধীন জাতিদিগকে এতটা সমৃদ্ধ এতটা শিক্ষিত এতটা বলবান্ করিয়া তুলিবে যে একদিন সেই সকল জাতির অধীনতা ঘুচিয়া যাইবে, তাহারা স্বাধীনতা লাভ করিবে; মহৎ ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া, এই উপনিবেশ-রাজ্য-পদ্ধতি পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের জন্য সচেষ্ট হইবে; এবং সেই শুভদিন অগ্রসর করিয়া দিবে যখন সমস্ত জাতি—সকলেই সমান-স্বাধীন—ভ্রাতৃভাবে সম্মিলিত হইয়া মানব সমাজে শান্তির রাজ্য বিস্তার করিবে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চন্দ্রলোক।

এই বঙ্গদেশের সাহিত্যে চন্দ্রদেবের প্রভাব অপরিসীম। বর্ণনায়, উপমায়, বিচ্ছেদে, মিলনে,—অলঙ্কারে, অনুপ্রাসে,—সুধাকর, হিমাংশু, শশাঙ্ক, কলঙ্ক, প্রভৃতি নহিলে কিছুতেই চলে না। কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীতে এইরূপে কেবল সাহিত্য কুঞ্জে লীলাখেলা করিয়া, চন্দ্রের নিস্তার নাই। বিজ্ঞান দৈত্য সে পথ ঘেরিয়া বসিয়া আছে।

যখন অভিমন্যু শোকে, ভদ্রার্জ্জুন অত্যন্ত কাতর, তখন তাঁহাদিগের প্রবোধার্থ কথিত হইয়াছিল যে, অভিমন্যু চন্দ্রলোকে গমন করিয়াছেন। আমরাও যখন নীলগগন সমুদ্রে এই সুবর্ণের দ্বীপ দেখি, তখন মনে করি, বুঝি এই সুবর্ণময় লোকে সোনার মানুষ সোনার থালে সোনার মাছ ভাজিয়া সোনার ভাত খায়, হীরার সরবত পান করে, এবং অপূর্ব্ব পদার্থের শয্যায় শয়ন করিয়া স্বপ্নশূন্য নিদ্রায় কাল কাটায়। বিজ্ঞান বলে, তাহা নহে—এ পোড়া লোকে কেন কেহ যায় না—এ দগ্ধ মরুভূমি মাত্র।

বালকেরা শৈশবে পড়িয়া থাকে, চন্দ্র উপগ্রহ। কিন্তু উপগ্রহ বলিলে, সৌরজগতের চন্দ্রের প্রকৃত সম্বন্ধ নির্দ্দিষ্ট হইল না। পৃথিবী-ও চন্দ্র যুগলগ্রহ। উভয়ে এক পথে, একত্র সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতেছে—উভয়েই উভয়ের মাধ্যাকর্ষণ কেন্দ্রের বশবর্ত্তী—কিন্তু পৃথিবী গুরুত্বে চন্দ্রের একাশিগুণ, এজন্য পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তি চন্দ্রাপেক্ষা এত অধিক, যে সেই যুক্ত আকর্ষণে কেন্দ্র পৃথিবীস্থিত; এবং এজন্যই চন্দ্র পৃথিবীর প্রদক্ষিণকারী উপগ্রহ। সাধারণ পাঠকে বুঝিবেন, যে চন্দ্র একটী ক্ষুদ্রতর পৃথিবী; ইহার ব্যাস ১০৫০ ক্রোশ; অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাসের চতুর্থাংশের অপেক্ষা কিছু বেশী।

এই ক্ষুদ্র পৃথিবী আমাদিগের পৃথিবী হইতে এক বিংশতি সহস্র ক্রোশ—ত্রিশ সহস্র যোজন মাত্র। গাগনিক গণনায় এ দূরত্ব অতি সামান্য—এ পাড়া ও পাড়া মাত্র। ত্রিশটী পৃথিবী গায় গায় সাজাইলে চন্দ্রে গিয়া লাগে। চন্দ্র পর্য্যন্ত রেলওয়ে যদি থাকিত, তাহা হইলে ঘণ্টায় বিশ মাইল বেগে, দিন রাত্রি চলিলে, পঞ্চাশ দিনে পৌঁছান যাইত।

সুতরাং আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদগণ চন্দ্রকে অতি নিকটবর্ত্তী মনে করেন। তাঁহাদিগের কৌশলে এক্ষণে এমন দূরবীক্ষণ নির্ম্মিত হইয়াছে যে চন্দ্রাদিকে চক্ষু দ্বারা আমরা যত বড় দেখি সেই দূরবীণে তাহার অপেক্ষা ২৪০০ গুণ বৃহত্তর দেখায়। ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে, যে চন্দ্র যদি আমাদিগের নেত্র হইতে পঞ্চাশৎ ক্রোশমাত্র দূরবর্ত্তী হইত, তাহা হইলে আমরা চন্দ্রকে যেমন স্পষ্ট দেখিতাম, এক্ষণেও ঐ সকল দূরবীক্ষণ সাহায্যে সেইরূপ স্পষ্ট দেখিতে পাই। চন্দ্র যদি মেমারি ষ্টেশনে আসিয়া বাস করিতেন, তাহা হইলে কলিকাতাবাসীরা তাঁহাকে যেমন স্পষ্ট দেখিতেন, ত্রিংশৎ সহস্র যোজন দূরবর্ত্তী চন্দ্রকে জ্যোতির্ব্বিদেরা এক্ষণে তেমনি দেখিতেছেন।

এইরূপ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে, চন্দ্র পাষাণময়, আগ্নেয়গিরি পরিপূর্ণ, একটি সুবৃহৎ জড়পিণ্ড। তাহার কোথাও অত্যুন্নত পর্ব্বতাবলী—কোথাও গভীর গহ্বররাজি। আমরা পৃথিবীতে দেখি যে যাহা রৌদ্রদীপ্ত, তাহাই দূর হইতে উজ্জ্বল দেখায়। চন্দ্রও রৌদ্র প্রদীপ্ত বলিয়া উজ্জ্বল। এবং যে স্থানে রৌদ্র লাগে না সে স্থান উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয় না। চন্দ্রের কলার হ্রাস বৃদ্ধি এই কারণেই ঘটিয়া থাকে। চন্দ্রের যে স্থান উন্নত সেই স্থানেই প্রচুর পরিমাণে রৌদ্র লাগে বলিয়া—আমরা তাহা অত্যুজ্জ্বল দেখি—যে স্থানে রৌদ্র প্রবেশ করে না—সে স্থান গুলিই "কলঙ্ক"—অথবা "মৃগ"—প্রাচীনদিগের মতে সেই গুলিই "কদম-তলার বুড়ী, চরকা কাটিতেছে।"

চন্দ্রের বহির্ভাগের এরূপ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অনুসন্ধান হইয়াছে যে তাহার ফলে এখন চন্দ্রের উৎকৃষ্ট মানচিত্র প্রস্তুত। তাহার পর্ব্বতাবলী ও প্রদেশ সকল সেই মান-চিত্রে বিশেষ বিশেষ নামে পরিচিত এবং তাহার পর্ব্বত-

মালার উচ্চতাও পরিমিত। জ্যোতির্ব্বিদগণ অন্যূন ১০৯৫টী চান্দ্র পর্ব্বতের উচ্চতা পরিমিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে "নিউটন" নামপ্রাপ্ত পর্ব্বত ২২, ৮২৩ ফুট উচ্চ। এতাদৃশ উচ্চ পর্ব্বত শিখর, পৃথিবীতে আন্দিস্ ও হিমালয়ে ভিন্ন আর কোথাও নাই। চন্দ্র পৃথিবীর পঞ্চাশৎ ভাগের এক ভাগ এবং গুরুত্বে একাশি ভাগের একভাগ মাত্র; অতএব পৃথিবীর তুলনায়, চন্দ্রের পর্ব্বত সকল অত্যন্ত উচ্চ।

চান্দ্রপর্ব্বত কেবল যে আশ্চর্য্য উচ্চ, এমত নহে; চন্দ্রলোকে অগ্নিহীন আগ্নেয় পর্ব্বতের অত্যন্ত আধিক্য। অগণিত নির্ব্বাপিত আগ্নেয় পর্ব্বত শ্রেণী ভূতপূর্ব্ব অগ্ন্যুদ্গারী বিশাল রন্ধ্র সকল প্রকাশিত করিয়া রহিয়াছে—যেন কোন তপ্ত দ্রবীভূত পদার্থ কটাহে জ্বাল প্রাপ্ত হইয়া এককালে টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিয়া উঠিয়া জমিয়া গিয়াছে। এই চন্দ্রমণ্ডল সহস্রধা বিভিন্ন, সহস্র সহস্র বিবর বিশিষ্ট,—বিদীর্ণ, ভগ্ন ছিন্ন ভিন্ন, দগ্ধ, পাষাণময়। হায়! এমন চাঁদের সঙ্গে কে সুন্দরীদিগের মুখের তুলনা করার পদ্ধতি বাহির করিয়াছিল?

এই ত পোড়া চন্দ্রলোক! এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, এখানে জীবের বসতি আছে কি? যদি চন্দ্রলোকে জল বায়ু থাকে, তবে সেখানে জীব থাকিতে পারে। কিন্তু বর্ণ-পরীক্ষক যন্ত্রের (Spectroscope) বিচিত্র পরীক্ষায় স্থিরীকৃত হইয়াছে; চন্দ্রলোকে জলও নাই বায়ুও নাই। যদি জলবায়ু না থাকে তবে পৃথিবীবাসী জীবের ন্যায় কোন জীব যে তথায় নাই ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

চান্দ্রিক উত্তাপও এক্ষণে পরিমিত হইয়াছে। চন্দ্র এক পক্ষকালে আপন মেরুদণ্ডের উপর আবর্ত্তন করে, অতএব আমাদের এক পক্ষকালে এক চান্দ্রিক দিবস। আমরা যে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে এত তাপাধিক্য ভোগ করি, তাহার কারণ শীতকালে দিন ছোট, গ্রীষ্মকালের দিন তিন চারি ঘণ্টা বড়। যদি দিন তিন চারি ঘণ্টা মাত্র বড় হইলেই, এত তাপাধিক্য হয়, তবে পাক্ষিক চন্দ্রদিবসে না জানি চন্দ্র কি ভয়ানক উত্তপ্ত হইয়া উঠে। তাহাতে আবার পৃথিবীতে জল, বায়ু, মেঘ আছে—তজ্জন্য পার্থিব সন্তাপ বিশেষ প্রকারে শমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু চন্দ্রে জল বায়ু মেঘ কিছুই নাই। তাহার উপর আবার চন্দ্র পাষাণময়। অতি সহজে উত্তপ্ত হয়। অতএব চন্দ্রলোক সূর্য্যালোকে কিরূপ তপ্ত হইয়া উঠে তাহা আমাদের কল্পনাতীত। লর্ড রস চন্দ্রের তাপ পরিমিত করিয়া বলিয়াছেন, যে, চন্দ্রের কোন কোন অংশ এত উষ্ণ যে তাহার তুলনায় পৃথিবীর ফুটন্ত উত্তপ্ত জলও অতিশয় শীতল। সে সন্তাপে কোন পার্থিব জীব রক্ষা পাইতে পারে না—মুহূর্ত্তের জন্যও রক্ষা পাইতে পারে না।

অতএব সুখের চন্দ্রলোক কি প্রকার, তাহা এক্ষণে আমরা এক প্রকার বুঝিতে পারিয়াছি। চন্দ্রলোক—বিদীর্ণ, ভগ্ন, ছিন্ন, ভিন্ন, বন্ধুর, দগ্ধ পাষাণময়। জলশূন্য,—জনহীন, তরুহীন, তৃণহীন, শব্দহীন, উত্তপ্ত, জ্বলন্ত, নরককুণ্ড তুল্য! এই চন্দ্রলোক! ইহাই আমাদের হিমকর, সুধাংশু!

যদি কেহ বলেন, যে চন্দ্র স্বয়ং উত্তপ্ত হউন, আমরা তাঁহার আলোকের শৈত্য স্পর্শের দ্বারা প্রত্যক্ষ জানিয়া থাকি। বাস্তবিক একথা সত্য নহে—আমরা স্পর্শ দ্বারা চন্দ্রলোকের শৈত্য বা উষ্ণতা কিছুই অনুভব করি না। অন্ধকার রাত্রের অপেক্ষা জ্যোৎস্না রাত্রি শীতল, এ কথা যদি কেহ মনে করেন, তবে সে তাঁহার মনের বিকার মাত্র। বরং চন্দ্রালোকের যে কিঞ্চিৎ সন্তাপ আছে তাহা পরীক্ষার দ্বারা স্থির হইয়াছে। তবে সেটুকু এত অল্প যে তাহা আমাদিগের স্পর্শের অননুভবনীয়।

শ্রীসুধাকৃষ্ণ বাগচি।

প্রতিহিংসা।

(গল্প)

আজ বিচারালয় লোকে লোকারণ্য! সারাদিন ধরিয়া সেই বিপুল জনতা কঠোর উৎকণ্ঠায় উদ্‌গ্রীব হইয়া বাদী ও প্রতিবাদী পক্ষের দীর্ঘ কাহিনীর প্রত্যেক কথাটিকে যেন সাগ্রহে গ্রাস করিতেছিল। এতক্ষণে জুরি তাঁহাদের বিচার নিষ্পত্তির জন্য বিচার গৃহ ত্যাগ করিয়া নেপথ্যে গমন করিলেন দেখিয়া, সমাগত জনমণ্ডলী একটু বিশ্রামের অবসর লাভ করিল।

এতগুলি উদ্বিগ্ন মুখের মধ্যে কেবল একখানি মুখ নিতান্তই নিরুদ্বিগ্ন স্থির। সে মুখ সেই কাঠগড়ার মধ্যে শৃঙ্খলাবদ্ধ অভিযুক্ত অপরাধীর! একটা শ্রান্তি ও সন্দেহের কালিমা চিহ্ন সেখানে এখনও স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে সত্য, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে সেখানে নৈরাশ্যের যে একটা নিবিড় ছায়া দেখা গিয়াছিল এখন তাহা অপসৃত হইয়াছে, —এখন তাহাকে দেখিলেই মনে হয় সে অদৃষ্ট স্রোতে আত্মোৎসর্গ করিয়াছে, যেন এতক্ষণে বুঝিয়াছে যে আজ ভাগ্যদেবীর সকল শক্তিই তাহার বিপক্ষ,—এই বিষম সংগ্রামে তাহার পরাজয় অনিবার্য্য।

এতক্ষণ সে আপনার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিবার জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম করিয়াছে; তাহার বিরুদ্ধে যে সকল অকাট্য প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটির বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ করিয়া সে বার বার বলিয়াছে যে সে তাহার প্রভুর অর্থ কখনই অপহরণ করে নাই,—নিশ্চয়ই কোনও অজ্ঞাত ব্যক্তি এই কর্ম্ম করিয়া থাকিবে।

এই স্থলে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগের একটা বিবরণ দেওয়া আবশ্যক। এই ব্যক্তি ন্যাথাল কারষ্টিন্ নামক এক ধনাঢ্য ব্যক্তির নিকট কর্ম্ম করিত। ন্যাথানের অলঙ্কার বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দেওয়া ব্যবসা ছিল। কিন্তু অল্পদিন পূর্ব্বে কতকগুলি বহুমূল্য অলঙ্কার বন্ধক রাখিয়া এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট হইতে কিছু টাকা ঋণ লইয়া যায়। কিছুদিনের মধ্যেই সেই অলঙ্কারগুলি চুরি যায় এবং পরে অন্বেষণে সেগুলি তাঁহার সেক্রেটারির পোর্টমাণ্টো হইতে বাহির হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, সে যখন লুকাইয়া পলায়ন চেষ্টা করিতেছিল তখন অলঙ্কার সমেত ধরা পড়িয়াছে। এবং অলঙ্কারগুলি যে কি প্রকারে তাহার দ্রব্যের মধ্যে আসিল উইল ভেম্বার তাহার কোনই সদুত্তর দিতে পারে নাই।

জুরি বিচার গৃহ ত্যাগ করিবার পরেই বিচারক তাঁহার আপন প্রকোষ্ঠে প্রস্থান করিলেন। গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিচারক থর্ণ চেয়ারে হেলিয়া বসিয়া পড়িলেন, আজ কেমন একটা অভিনব ক্লান্তি আসিয়া তাঁহাকে অভিভূত করিয়াছে! একটা যেন কি অজ্ঞাত বেদনা আজ তাঁহার অন্তরের সুপ্ত তন্ত্রীকে আঘাত করিয়া বহুদিনের অতীত স্মৃতিকে জাগাইয়া তুলিয়াছে! আঘাতটা কিসের তাহা তিনিই নিজেই স্থির করিতে অক্ষম!

সে দিন বিচারালয়ে সারাদিন ধরিয়া একটা যেন ছায়াময়ী মূর্ত্তি,অতীত প্রেমের প্রেতাত্মার

ন্যায় তাঁহাকে ঘেরিয়া ঘুরিতেছিল,—যেন মৃত্যুর কঠোর নিষ্পেষণে নিস্তব্ধ একটি কণ্ঠের ক্ষীণস্বর সারাদিন তাঁহার শ্রবণ মূলে মৃদুগুঞ্জনে কি বলিতেছিল—তাহার অর্থ তাঁহার নিকট অবোধ্য।

আজ এতদিন পরে সহসা বিচারগৃহের পাষাণ দেয়াল বিদীর্ণ করিয়া আইনের নীরস তর্কজাল ভেদ করিয়া তাঁহার স্নিগ্ধযৌবনা পরলোকগতা পত্নীর পবিত্র স্মৃতিটি যে কি কারণে তাঁহার মানসপটে উদিত হইল এবং তাহার আকুলস্পর্শে মর্ম্মমধ্যে বহুদিনের বিস্মৃত বেদনাটিকে জাগাইয়া তুলিল তাহা তিনি কোনমতেই স্থির করিতে পারিলেন না।

পত্নীর প্রেম ও সন্তানের স্নেহে একদিন তাঁহার হৃদয়টি সদ্যপ্রস্ফুটিত পুষ্পের ন্যায় ছিল,—তেমনই স্নিগ্ধ, তেমনি সুন্দর, তেমনি সুগন্ধময়! কিন্তু সে আজ বহুদিনের কথা। যেদিন ভীষণ ভূমিকম্পে দক্ষিণ আমেরিকার সমৃদ্ধ নগরী ধূলিসাৎ হইল এবং সেই সঙ্গে তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী ও প্রাণপ্রিয় পুত্র চিরদিনের মত বিদায় লইল, সেইদিন হইতে তিনি আর সে মানুষ নাই! এক্ষণে তিনি কঠোর, কর্কশ, নির্ম্মম,—তাই আজ এই করুণ স্মৃতির আঘাতে তিনি আপনার প্রতি ক্রুদ্ধ হইতে লাগিলেন।

সহসা কে দ্বারে আসিয়া আকুল আঘাত করিতে লাগিল, যেন প্রাণপণে সাক্ষাৎ ভিক্ষা করিতেছে! থর্ণ চকিতনেত্রে ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া দ্বার খুলিলেন। দেখিলেন সম্মুখে এক আলুলায়িতকুন্তলা, উৎকণ্ঠিত নয়না, যুবতী। রমণী বিনা আহ্বানে গৃহে প্রবেশ করিয়া ত্বরিত করে দ্বার বন্ধ করিল—এবং দ্বারদেশে পৃষ্ঠ স্থাপন করিয়া স্ফীত বক্ষে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল। "এথেল!" সহসা এই নামটি উচ্চারণ করিবা থর্ণ বিস্মিত নেত্রে নবাগতার প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, ক্রমে তাঁহার মুখের ভাব কঠোর হইয়া আসিল! তিনি বার বার বলিয়া থাকেন যে বিচারালয়ের মধ্যে তিনি কেবলমাত্র আইনের দাস, তথায় বাহিরের কোনও ব্যক্তিরই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য নহে। ইহা জানিয়াও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীর পক্ষে এরূপ সময়ে এরূপ স্থলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসা কোনমতেই সঙ্গত হয় নাই!

এই যুবতীটি তাঁহার পোষ্য কন্যা। শৈশবে পিতৃমাতৃহীনা কন্যাটিকে লইয়া তিনি পালন করেন। দক্ষিণ আমেরিকার সেই বিয়োগান্ত অভিনয়ের পরে তাঁহার অন্তর মধ্যে যেটুকু কোমল স্নেহ অবশিষ্ট ছিল, তাহার সবটুকুই তিনি এই কন্যাটির উপর সমর্পণ করিয়াছিলেন।

যে তিরস্কারের উচ্ছ্বাস তাঁহার ওষ্ঠাগ্রে আসিয়া উপস্থিত হইতেছিল, তাহা যুবতীর কাতর দৃষ্টি ও কম্পিত অধর দেখিয়া তৎক্ষণাৎ কণ্ঠ মধ্যেই মিলাইয়া গেল।

"খুল্লতাত! আপনার তাহাকে রক্ষা করিতেই হইবে রক্ষা করিতেই হইবে!" কথা কয়টি রুদ্ধ কণ্ঠের ক্ষীণ গুঞ্জনের ন্যায় কষ্টে বাহির হইল।

"এথেল, আমি মনে করিয়াছিলাম তুমি অসুস্থ বলিয়া গৃহে আছ। কিন্তু তুমি এ ভাবে এখানে উপস্থিত কেন, আর তোমার কথারই বা অর্থ কি? কাহাকে রক্ষা করিব!"

যুবতীর গণ্ড বহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল, সে বলিয়া উঠিল—"যে ব্যক্তি এক্ষণে আপনার নিকট বিচারাধীন আছে তাহাকে। উইল ভেয়ারকেই আমি গোপনে ভাল বাসিয়াছি, এই ব্যক্তিকেই আমি স্বামীরূপে বরণ করিয়াছিলাম! হায়, আপনি যদি লেশমাত্রও দয়াস্নেহ দেখাইতেন, তাহা হইলে আপনার সহানুভূতি লাভের আশায় আশ্বস্ত হইয়া আমি কতই আনন্দের সহিত আপনাকে আমার অন্তরের সকল কথা বলিতাম,—আমাদের প্রথম সাক্ষাতের কথা, দিনে দিনে প্রণয় পরিণতির কথা! কিন্তু,—কিন্তু আমার কেমন একটা ভয় হইত; আজ কেবল আমার সে ভয় আর নাই; আজ তাহার অপেক্ষা অধিক ভয়ে, আমার প্রিয়তমের জন্য ভয়ে, সে ভয় পলাইয়াছে!"—বিচারক বজ্রনিনাদে বলিয়া উঠিলেন—চুপ! এই ব্যক্তিই যদি তোমার প্রেমপাত্র হয় তাহা হইলে লজ্জায় তোমার নীরব থাকাই কর্ত্তব্য।"

যুবতী উন্মাদিনীর ন্যায় অধীর হৃদয়ে বলিয়া উঠিল—"আপনি কি মনে করেন এই ব্যক্তির প্রতি প্রেম প্রকাশ করিতে আমার কোন প্রকার লজ্জা বোধ হয়? সে নির্দ্দোষ, আমি বলিতেছি আপনাকে, সে আপনার আমার মতই সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ।"

"তাহার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া বিদেশে পলায়নের কল্পনা—তাহার আচরণ ও আয়োজন হইতেই বুঝা যায় যে সে পূর্ব্ব হইতেই অপহরণ করিবে বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। তুমি এ সকলের কোন কৈফিয়ৎ দিতে পার?"

"অবশ্যই পারি। আমারই জন্য সে এই সকল ব্যবস্থা করিতেছিল। সে তাহার বর্ত্তমান ঘৃণ্য জীবন ও জীবিকা ত্যাগ করিবার জন্যই সে পলায়নে উদ্যত হইয়াছিল, আমি সহধর্ম্মিণীরূপে তাহার অনুসরণ করিব স্থির করিয়াছিলাম। সে আমার কাছে তাহার জীবনের কোন কথাই লুকায় নাই। আমি জানিতাম সে এক সময়ে নিতান্ত নির্ব্বোধের ন্যায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছে, কিন্তু আমি তাহার পার্শ্বে থাকিলে যে দেব চরিত্র হইত।"

বিচারক থর্ণের পক্ষে আর ধৈর্য্যরক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠিল।

"তাহার মধ্যে যদি এতই মহত্ত্ব ছিল, তাহা হইলে সে যৌবনের শ্রেষ্ঠ কয়েক বৎসর এরূপ জঘন্য সংস্রবে নষ্ট করিবে কেন? বাঃ, সে তোমাকে আচ্ছা বোকা বানিয়েছে দেখছি!"

"তাহার পালকই চিরদিন শনির মত তাহার সর্ব্বনাশের চেষ্টায় লিপ্ত, সেই তাহাকে বাল্যকালে এই সকল জঘন্য সঙ্গীগণের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেয়। এই ব্যক্তিই তাহাকে রক্ষা না করিয়া তাহার দুর্ব্বুদ্ধির ন্যায় নিয়তই ধ্বংসের পথে প্ররোচিত করিত।"

বিচারকের মুখে ঘৃণার হাসির একটা ক্ষীণ রেখা আসিয়া দেখা দিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন—"তোমার উন্মত্ত অনুরাগ তোমাকে অন্ধ করিয়াছে। লোকটা অতি পাষণ্ড, তাহার প্রভুর দ্রব্য অপহরণ করিয়া সে যৎপরোনাস্তি অকৃতজ্ঞের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছে। এখন, এই ব্যক্তি সম্বন্ধে আর কোন কথা যেন তোমার কাছে কখনও না শুনি।"

"খুল্লতাত!" যুবতীর কম্পিত অধর হইতে কাতরে এই সম্বোধনটি বাহির হইল, বিস্ফারিত চক্ষু দুইটি দিয়া বক্ষের বেদনা গলিয়া ঝরিতে লাগিল। "খুল্লতাত, আপনি —আপনি অতি নির্দ্দয়। অনাথিনীর কাতর প্রার্থনা শ্রবণ করুন। আমার জীবনের সর্ব্বস্ব উইল ভেয়ারের সহিত গ্রথিত এবং সেই উইল-ভেয়ারকে রক্ষা করিবার শক্তি আপনার হস্তে!"

"কি ছেলে মানুষের মত বকিতেছ! তাহার অদৃষ্ট যে জুরির হস্তে নির্ভর করিতেছে তা কি তুমি জান না?"

"কিন্তু তাহার শাস্তি বিধানের শক্তি আপনার হস্তে। আপনি ইচ্ছা করিলে তাহাকে সামান্য শাস্তি দান করিতে সহজেই সক্ষম। এইটি আপনাকে করিতেই হইবে।

"চুপ!" দ্বারে দুইবার আঘাত হইল, —বিচারক তাহার অর্থ বুঝিলেন,—জুরি তাহাদের সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে।

থর্ণ এথেলের প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; তাহার রক্তহীন মূর্চ্ছিত প্রায় দেহলতা কপাটের উপর হেলিয়া পড়িয়াছে—বাত্যাবিচ্ছিন্ন শতদলের ন্যায় তাহার মুখখানি মলিন ও শুষ্ক! আজ কয় সপ্তাহ অসুস্থতা বশতঃ সে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয় নাই,—আজ তাহার প্রিয়তমের বিপন্ন অবস্থার সংবাদ পাইয়া তাহার দেহের সকল দুর্ব্বলতা দূর হইয়া গিয়াছে, এবং এই শেষ সময়ে সে বিচারালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে!

বিচারক বিচারগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি মনে মনে কর্ত্তব্যস্থির করিয়াছেন।

আজ তিনি এথেলের প্রতি নির্দ্দয় ভাবে দয়া প্রকাশ করিবেন স্থির করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘকালের জন্য এই নির্ব্বোধ প্রেম-পীড়িতা বালিকা ও তাহার অপদার্থ প্রেমাস্পদের মধ্যে অন্তরায় স্বরূপ কারাপ্রাচীর উত্তোলিত করিবেন স্থির করিয়াছেন। তিনি সময়ের শক্তির পরিচয় জানিতেন এবং এথেল চিরদিনই নম্র ও বাধ্য স্বভাব!

আজ যে ব্যক্তিকে তিনি কর্ত্তব্যের অনুরোধ কারাদণ্ডিত করিতেছেন একদিন এথেল তাহাকে বিস্মৃত হইবে। এই সর্ব্বনাশ হইতে রক্ষা করিবার জন্য একদিন এথেলই তাঁহাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দান করিবে! ইহাই সংসারের চিরদিনের যুক্তি!

জুরির অগ্রগণ্যকে যখন তাঁহাদের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইল তখন বিচার গৃহের চতুর্দ্দিকে সকলেই 'নির্বাত নিষ্কম্প' প্রদীপের ন্যায় রুদ্ধশ্বাসে নিশ্চল নিস্তব্ধতার মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিল! উত্তর হইল—"অপরাধী!" বিচারক তাহা পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন।

তখন বিচারক থর্ণ অপরাধীকে সম্বোধন করিয়া গভীর গম্ভীর স্বরে তাহার অপরাধের বর্ণনা করিয়া অবশেষে বলিলেন—

"সাত বৎসর কঠোর কারাবাস।"

শেষ কথা কয়টি উচ্চারণ করিবামাত্র বিচারক ও অপরাধীর চারি চক্ষু মিলিত হইল—অপরাধীর দৃষ্টি বৈরাগ্যবেদনায় কাতর, বিচারকের দৃষ্টি একটা আকস্মিক দ্বিধার আবেগে প্রশ্নময়—আর সে কঠোর তীব্রতা নাই!

সেই ছায়া মূর্ত্তির, সেই অদৃশ্য আত্মার উপস্থিতির অনুভূতি আসিয়া আবার তাঁহাকে

আকুল করিয়া তুলিল;—বহুদিনের পরিচিত একটা কণ্ঠস্বরের রুদ্ধ কাতর ক্রন্দনধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে থাকিয়া থাকিয়া বাজিতে লাগিল! ব্যাপারটা একটা মানসিক ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই নহে—মুহূর্ত্ত মধ্যে মিলাইয়া গেল! পর মুহূর্ত্তেই উইলভেয়ারের বিচার ও শাস্তির গুরু অভিনয় সমাপ্ত হইয়া গেল!

(২)

কয়েক ঘণ্টা পরে বিচারক থর্ণ তাঁহার পাঠাগারে বসিয়া আছেন,—গভীর চিন্তামগ্ন। সেদিন যে লোকটাকে শাস্তিদান করিয়াছেন সে যেন আজ তাঁহার বুকের ভিতর কি একটা ছুরপনেয় চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে,—যেন কিসের একটা অস্পষ্ট স্মৃতি আসিয়া আজ তাঁহার মর্ম্ম দ্বারে অবিরামই আঘাত করিতেছে!

সহসা তিনি দ্বারের দিকে চাহিলেন,—প্রাণটা যেন শিহরিয়া উঠিল,—বাহিরে যেন একটা পদশব্দ শুনা গেল! বাটীর সকলেই নিদ্রিত—এত গভীর রাত্রে ওরূপে নড়িয়া বেড়ায় কে?

নীরব প্রশ্নের উত্তরে তৎক্ষণাৎ ধীরে ধীরে দ্বারটি উন্মুক্ত হইল এবং সম্মুখে এক দীর্ঘকায় ভদ্রবেশধারী ব্যক্তি আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। তাহার কুটিল মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই থর্ণ তাহাকে চিনিলেন এবং তাঁহার কণ্ঠ হইতে তৎক্ষণাৎ একটা বিস্ময়ের রুদ্ধ ধ্বনি বাহির হইয়া পড়িল!

থর্ণ আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন,—তাঁহার মুখ রক্তবর্ণ! মুহূর্ত্তকাল উভয়ে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

"আমি ভাবিয়া ছিলাম প্রচলিত প্রথায় আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, আপনি হয়ত আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অস্বীকার করিতে পারেন, সেই জন্য সন্ধ্যার সময়ে যখন দ্বার খোলা ছিল, সেই অবসরে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া এতক্ষণ লুকাইয়া ছিলাম।" আগন্তুকের কণ্ঠস্বর অতি কর্কশ ও মৃদু, অথচ ঈষৎ জয়দর্প মিশ্রিত।

বিচারক ঈষৎ কম্পিতস্বরে বলিলেন—"এত বক্রপথ অবলম্বন করিবার কোনও আবশ্যক ছিল না। আমি সাক্ষাৎ করিতাম। অস্বীকার করিব কেন?

আগন্তুক একটা কর্কশ অট্টহাস্য করিয়া উঠিল।

"আমি সেই অতীতে প্রতিহিংসা গ্রহণের যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা হয় ত' তোমার আজিও স্মরণ আছে এবং হয়ত তুমি সেই জন্য ভীত—আমি ইহাই মনে করিয়াছিলাম।"

বিচারক মস্তক উত্তোলিত করিলেন। এই ব্যক্তির আকস্মিক উপস্থিতিতে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য তিনি যেরূপ বিচলিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে আর সে ভাব নাই,—মুখে সেই স্বাভাবিক কাঠিন্য ও দৃঢ়তা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

"আমি কাপুরুষ নহি।" বিচারকের স্বর অতি শান্ত।

"না, তুমি কাপুরুষ নও, তুমি কেবল আমার জীবনের সর্ব্বস্ব অপহারক তস্করমাত্র! আমি যে নারীকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতাম,—যে ভালবাসা জগতের পক্ষে দুর্লভ, যে ভালবাসার ধারণা স্বপ্নেও তোমার পক্ষে অসম্ভব,—তুমি সেই নারীকে অপহরণ করিয়াছিলে। সে আমার আরাধ্যা দেবী ছিল; সে আমার এই তমসাচ্ছন্ন ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ ভবসমুদ্রের মধ্যে

ধ্রুবতারকা ছিল; যদি সে তাহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিত, যদি সে আমার পত্নী হইত, আজ সে আমার জীবনকে পাপমুক্ত পবিত্র করিতে পারিত।" আগন্তুক অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল, তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল,—প্রবল চেষ্টায় আত্মসংযত হইয়া বলিল—"তুমি তাহাকে অপহরণ করিয়া আমার অন্তরাত্মাকে দলিত করিয়াছ,—আজ আমাকে আমার এই বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থায় উপনীত করিয়াছ,—আমাকে অন্তঃসারশূন্য করিয়াছ,—প্রতিহিংসা ভিন্ন আজ এ অন্তরের সকল বৃত্তিরই বিনাশ করিয়াছ!"

বিচারক মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন—"এতকাল পরে আর প্রতিহিংসার কথা উত্থাপিত করা বৃথা।" লোকটিকে দেখিয়া বিচারকের পক্ষে অবিচলিত থাকা অসম্ভব, কারণ এককালে তাঁহারা উভয়ে বাল্যবন্ধু ছিলেন।

তিনি সত্যই তাহার অন্তরে একদিন ব্যথা দিয়াছেন, তাঁহার ন্যায় ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে আজ তাহা অস্বীকার করা অসম্ভব।

"সে সকল অতীত কথা আর স্মরণ কর কেন? এতকাল পরে আমাদের উভয়েরই কি তাহা বিস্মৃত হওয়া কর্ত্তব্য নহে? দেখ যে নারীকে আমরা উভয়েই ভালবাসিতাম সে আজ সমাধিশয্যায় শায়িতা, চিরনিদ্রায় অভিভূতা। দুদিনের জন্য যে সুখভোগ করিয়াছিলাম, তাহার জন্য তোমার এক্ষণে হিংসা ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য।"

"তাহার সহিত কি তোমার পুত্রও শায়িত?"

বিচারক গম্ভীরস্বরে বলিলেন—"হাঁ, মৃত্যু আসিয়া পুষ্প ও কোরক উভয়কেই ছিন্ন করিয়া লইয়াছে।"

আগন্তুক একটা কর্কশ বিদ্রূপের হাসি হাসিল, বিচারক বিস্মিত হইলেন।

"শুন।" লোকটা একটা কম্পিত হস্ত তুলিল,—তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছিল, কিন্তু কণ্ঠস্বর স্থির ও দৃঢ়। "শুন, হিসাব নিকাশের,—তোমার আমার মধ্যে হিসাব নিকাশের দিন এতদিনে উপস্থিত হইয়াছে। তুমি মনে করিয়াছিলে ভূমিকম্পে তাহার জননীর সহিত তোমার পুত্রও পরলোক গমন করিয়াছে? তোমার সে ধারণা ভ্রান্ত। আমি তখন সেই নগরে উপস্থিত ছিলাম। আমি নিজে রক্ষা পাইয়াছিলাম এবং তোমার অসহায় পুত্রকে—রক্ষা করিয়াছিলাম। সে মরে নাই, আজও জীবিত।"

বিচারক চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িলেন তাঁহার দৃষ্টি স্থির, শূন্য ও বিস্ময় পূর্ণ।

"আমার পুত্র—আমার সেই পুত্র!" রুদ্ধকণ্ঠে এই কথা কয়টি উচ্চারিত হইল। তখন তাঁহার মুখে এক নবালোক আসিয়া উপস্থিত হইল। একটা অভূতপূর্ব্ব ভাবের স্রোত আসিয়া তাঁহাকে ডুবাইয়া দিল। অতীত সমস্ত ঘটনাগুলি যেন তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে রক্ত কুহেলিকার মধ্যে ভাসিতে লাগিল। অবিলম্বে তাঁহার একটা অস্পষ্ট অনুভূতি হইতে লাগিল যেন তিনি তাঁহার অতীত বন্ধুকে বজ্রমুষ্টিতে ধরিয়া সবলে ভূমিতলে নিক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন—"আজ বিশ বৎসর তুমি আমাকে আমার পুত্র হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছ। কোথায় সে, আমার পুত্র কোথায়?" কথা কয়টি দন্তের মধ্য দিয়া কষ্টে

বাহির হইল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ চৈতন্য হইল এবং পরক্ষণেই রুদ্ধশ্বাস ত্যাগ করিয়া মূর্চ্ছিতের ন্যায় বিচারক ভূমিতলে পড়িলেন।

অপর ব্যক্তি উল্লাসমিশ্রিত বিদ্রূপের তীক্ষ্ণস্বরে বলিল—

"এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করানই আমার উদ্দেশ্য। তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধ বলিয়াই আজও এ সত্য বুঝিতে পার নাই। যে বালককে আজ কারাগারে প্রেরণ করিয়াছ, সেই উইল ভেয়ারই তোমার পুত্র। আজ সে সমাজে লাঞ্ছিত ঘৃণ্য তস্কর মাত্র,—যে দিন হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়াছি সেই দিন হইতেই আমি তাহাকে এইরূপ শিক্ষাই দিয়াছিলাম। তুমি কি মনে কর আমি দয়া বা স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলাম? না, তাহা নহে। প্রকৃতির চতুর্দ্দিকের প্রলয় নৃত্যের মধ্যে আমার অন্তরে প্রতিহিংসা বহ্নি জ্বলিতেছিল। সুবিচারক ন্যায়পরায়ণ পিতা তাহার নিজের পুত্রকে আজ কারাগারে প্রেরণ করিয়াছে!"

"যথেষ্ট হইয়াছে!" বিচারক ধীরে ধীরে দাঁড়াইয়া উঠিলেন,—তাঁহার মুখ মৃতের ন্যায় রক্তহীন, নিশ্চল। "তোমার এ কথা মিথ্যা!"

আগন্তুক হাসিল। "তাহার মুখে কি সেই সাদৃশ্য দেখিতে পাও নাই? সেই চক্ষু সেই দৃষ্টি, সেই কণ্ঠস্বর!

"যাও!" বিচারক দ্বারের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিলেন। "হাঁ, আমি এখনই যাইতেছি। আর আমার অপেক্ষা করিবার কোনও কারণ নাই। আমার আগমনের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে,—আজ আমার প্রতিহিংসা সম্পূর্ণ।"

লোকটা যখন চলিয়া গেল বিচারক প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় অবিচলিত দৃষ্টিতে তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। দ্বার পুনরায় বন্ধ হইবামাত্র বালুকা প্রতিমার ন্যায় শতধা হইয়া ভূতলে পড়িলেন।

তাঁহার সেই পত্নীর সন্তান,—তাঁহার পুত্র—আজ তস্কর, কারাদণ্ডিত!

ক্ষোভে, অনুতাপে, ঘৃণায় তাঁহার হৃদয় শতধা হইতে লাগিল—দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া বালকের ন্যায় অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

মধ্যে মধ্যে অস্ফুটস্বরে জগৎপতির নিকট দয়া ভিক্ষা ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে সে কালরাত্রি অতিবাহিত হইয়া প্রভাতের অরুণ রশ্মি আসিয়া পাঠাগারে দ্বারদেশে আঘাত করিল। বিচারক সেই গৃহমধ্যেই বদ্ধ রহিলেন।

সুপ্তোত্থিত পৃথিবী পুনরায় কলগানে ভরিয়া উঠিল। সহসা দ্বারদেশে একজন আসিয়া বলিয়া উঠিল—"বিশেষ সুসংবাদ আছে, দ্বার খুলুন।"

কণ্ঠস্বর এথেলের।

তিনি দ্বার খুলিবামাত্র এথেল গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। খুল্লতাতের শুষ্ক, শীর্ণ ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া সে বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া রহিল।

"খুল্লতাত, সেদিন আমি আপনাকে যে কথা বলিয়াছিলাম তাহা আজ সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। আমার প্রিয়তমের নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে; এখনই তিনি মুক্তিলাভ করিবেন। ন্যাথেলের এক পুরাতন ভৃত্য

স্বীকার করিয়াছে যে সেই অলঙ্কারগুলি তাহার প্রভুর নিকট হইতে অপহরণ করিয়া উইল-ভেয়ারের পোর্টমাণ্টোর মধ্যে রাখিয়াছিল।”

বিচারক হতবুদ্ধির স্থায় এখেলের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

বন্দী।

৩৭

রাজার কথাটাই এখন কেবল আমার মনে পড়িতেছে! আশ্চর্য্য! এ চিন্তা মন হইতে যতই দূর করিবার চেষ্টা করি সকলই বৃথা হয়! দুই কাণের পাশে যেন কে বলিতেছে, “রাজা! এমন সময় এই সহরের মধ্যেই এক প্রকাণ্ড অট্টালিকার একটি কক্ষে তিনি বসিয়া আছেন! আমারই মত অসংখ্য প্রহরী তাঁর দ্বারে দাঁড়াইয়া!” তিনি প্রতিষ্ঠার উচ্চাসনে আর আমি কত নিম্নে—এই প্রভেদ! তাঁর জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে—কি মহিমা, কি গরিমা, কি যশ, কি উল্লাস! চারি দিকে প্রেম ভক্তি ও শ্রদ্ধার নির্ঝর ঝরিতেছে! তাঁর সম্মুখে তীব্রস্বর মৃদু, গর্ব্বিত শির নত হয়! তাঁর চক্ষের সমক্ষে স্বর্ণরৌপ্য ঝলসিতেছে! সভাসদ বেষ্টিত রাজাসনে বসিয়া তিনি আদেশ দিতেছেন; সসম্ভ্রমে সকলে সে আদেশ পালন করিতেছে! কখনো মৃগয়া-বসন—কখনো নৃত্য-গীত—মুখের কথাটি বাহির হইলে হয়, অমনি অসংখ্য লোক বিলাসপ্রমোদের আয়োজনে শশব্যস্ত হইয়া উঠিবে।

রাজা! আমারি মত রক্তমাংসবিশিষ্ট মানুষ, এই রাজা! তাঁর লেখনীর একটি ইঙ্গিতে আমার ফাঁসিকাঠ সরিয়া যাইতে পারে! জীবন, স্বাধীনতা, ঐশ্বর্য্য গৃহ—সকল সুখ নিমেষে আমার করায়ত্ত হইতে পারে! আরো শুনিয়াছি, তাঁহার চিত্ত করুণায় ভরা! তবু আমার প্রাণটা কেহ বাঁচাইবে না? একটা মানুষের প্রাণ!

৩৮

তবে এস সাহস! মৃত্যুর বিভীষিকা দূর করিয়া দাও! কিসের আতঙ্ক, কিসের ভয়? এস মৃত্যু—আমি তোমাকে হাস্যমুখে আলিঙ্গন দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি! এস তুমি, মিত্র হও, শত্রু হও, এস তুমি!

চক্ষু মুদিয়া দেখিব—উজ্জ্বল আলোকে চারিধারে ভরিয়া গিয়াছে—আমার আত্মা সে কি আলোকের হ্রদে স্নান করিতে চলিয়াছে। মাথার উপর অনন্ত আকাশ আলোকোজ্জ্বল, আর নক্ষত্রগুলা সেই শুভ্র আলোকের গায় যেন কতকগুলা কৃষ্ণচিহ্নমাত্র! কালো মখমলের মত আকাশে এখন যেমন হীরার টুকরার মত সেগুলা ঝিক ঝিক করিতেছে—তখন আর সেগুলা এমনটি থাকিবে না।

কিম্বা হয়ত, হতভাগ্য আমি দেখিব কোথায় আলো, কোথায়ই বা বায়ু! বায়ুও

আলোকহীন একটা গহ্বরের মধ্যে যেন নামিয়া পড়িয়াছি, আমার চারিধারে অসংখ্য দানব বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে!

হয়ত বা দেখিব সেই অস্ফুট অন্ধকারে আমার শিরোহীন দেহটা পড়িয়া আছে—আর কবন্ধের চারিধারে ভূত প্রেতের উপদ্রব বাধিয়া গিয়াছে! যেন এক বিপুল ঝড়ের আঘাতে পৃথিবীর এক কোণের পর্দ্দা সরিয়া গিয়াছে, আর অসংখ্য দানবের দল পৃথিবীর মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে! চারিধারে নর-কঙ্কালের পর্ব্বত, তাহারি নিম্নে রক্তের নদী বহিয়া চলিয়াছে! মাথার উপর আকাশে আলো নাই—নক্ষত্রগুলা শুধু অগ্নিময় পাখীর মত উড়িয়া বেড়াইতেছে!

আমার পূর্ব্বে ফাঁসিকাঠে যাহারা প্রাণ দিয়াছে, তাহারা আমার জন্য দল বাঁধিয়া প্রতীক্ষা করিতেছে—তাদের মূর্ত্তিগুলা যেন আমি চোখে দেখিতে পাইতেছি—সব রক্তহীন শীর্ণ দেহ, কোটরগত চক্ষু, শুষ্কমুখ, কি ভীষণ! অস্পষ্ট আলো-আঁধারে দাঁড়াইয়া অতিমৃদুকণ্ঠে তাহারা কথা কহিতেছে—মুখে কাহারো এতটুকু হাসির রেখা নাই—কি এক আতঙ্ক—কি সে উদ্বেগ—তাদের অন্তরে বাহিরে একটা বিরাট দাগ পড়িয়া গিয়াছে। কোনদিকে আর কিছু দেখা যায় না—শুধু ভিলা হোটেলের ঐ নির্ম্মম ঘড়িটা—ফাঁসি-কাঠে চড়িবার সময় সে তার রুক্ষ মূর্ত্তি রক্ত চক্ষু লইয়া অচঞ্চল দৃষ্টিতে বিদায় দিয়াছিল! জগতে কোথাও কিছু নাই—এতটুকু সহানুভূতি, এতটুকু করুণা—কিছু না!

এমন নানা কথা মনের মধ্যে আনাগোনা করিতেছে! এক দণ্ড নিষ্কৃতি নাই!

হায়—কি এ মৃত্যু? কে সে? আত্মাটার সহিত তার এত বিরোধ কেন? এক আঘাতে সে যখন দেহটাকে ধূলিসাৎ করিয়া দেয়, তখন মনের এই অনুভূতি, এই প্রেম স্নেহ, দয়া মায়া এমন সর্ব্বব্যাপী যে চিত্ত—এসব সে কোথায় উড়াইয়া দেয়? পৃথিবী—কঠিন পৃথিবীর কি এতটুকু মায়া—এমন শক্তি নাই যে এই মৃত্যুটাকেও জয় করিয়া স্বহস্তে সে তার গঠিত জীবনটাকে রক্ষা করে? ভগবান, এ কি বিচিত্র তোমার সৃষ্টিলীলা! কি নিষ্ঠুর এ রহস্য! নির্ম্মম কৌতুক!

৩৯

একটু নিদ্রার জন্য কাতর হইয়া শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

মাথার মধ্যে রক্তের স্রোত বহিয়া গেল। জীবনে ইহাই আমার শেষ নিদ্রা! স্বপ্ন দেখিলাম!

যেন নিস্তব্ধ গভীর রাত্রি! আমার পাঠাগারে দুইটি বন্ধুর সহিত বসিয়াছিলাম। পার্শ্বের কক্ষে স্ত্রী নিদ্রিতা—কন্যা মেরি তাহারই বুকের কাছে!

আমরা মৃদুস্বরে কথা কহিতেছিলাম—কেহ যেন না ভয় পায়! সহসা একটা শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম! তখনি সন্ধানের জন্য চলিলাম! নিশ্চয় চোর আসিয়াছে!

চারিধারে সন্ধান করিলাম! কেহ কোথা নাই—জনপ্রাণীর চিহ্নও না!

চিমনির পাশে কি ও? কে? দেখি, এক নারী—কেশগুচ্ছ রুক্ষ, মুক্ত, মুখের চারিধারে উড়িয়া পড়িয়াছে—মুখে একটা পরুষভাব! সে চক্ষু মুদিয়াছিল! আমি কহিলাম, "কে তুই?"

সে সাড়া দিল না। আমরা কহিলাম, "কে তুই, বল্ শীঘ্র!" তবু সে কথা কহিল না, বা চোখ খুলিল না!

এক বন্ধু কহিল, "মুখের কাছে আলোটা ধর—এখনি টিট্ হবে!"

তার মুখের কাছে আমি বাতি ধরিলাম! তবু তার মুখে কথা নাই! আমি কহিলাম, "কথা বল্ না মাগী!" তবু সে অচঞ্চল রহিল! আমরা অস্থির হইয়া উঠিলাম! এ কি আপদ আসিয়া জুটিল!

বন্ধু কহিল, "ধর আলো—মুখে!"

আমি তার চিবুকের নিচে বাতি ধরিলাম। সে চোখ খুলিয়া চাহিল! কি ভীষণ তার সে দৃষ্টি! আমি চক্ষু মুদিলাম। সহসা হাতে একটা দংশনজ্বালা বোধ করিলাম! উঃ! চোখ খুলিয়া দেখি, আমার শয্যার সম্মুখে আচার্য্য দাঁড়াইয়া আছেন!

আমি কহিলাম, "আমি কি অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম?"

তিনি কহিলেন, "হাঁ! এক ঘণ্টা ঘুমাচ্ছ! তোমার কন্যাকে এনেছি, মেরি—দেখিবে না? তোমাকে জাগাতে না পেরে আমাকে ডেকেছে—তোমার কন্যা মেরি—"

আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম, "মেরি! আমার কন্যা মেরি—কই সে? কোথা বলুন! আনুন—আমার বুকে তুলে দিন তাকে!"

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

তৈমুর লঙ্গ।

হুসেনের এই পরাজয় হইতেই তৈমুর বুঝিলেন যে, তিনি যে অশ্বারোহী সৈন্য প্রস্তুত করিয়াছেন তাহার সাহায্যে সমগ্র আসিয়া মহাদেশ তিনি পদানত করিতে সমর্থ। তাঁহার প্রজা মেষপালকেরা তাহাদের অশ্বশালা হইতে শ্রেষ্ঠ অশ্বগুলিকে লইয়া রণবিদ্যায় শিক্ষিত করিয়াছে এবং শিশুকাল হইতেই তাহাদিগকে সৈন্যদলের সহিত চালিত হইতে অভ্যস্ত করিয়াছে। এই সকল মেষপালকের অশ্বারোহণ নিপুণতা এবং অশ্বচিকিৎসাব্যুৎপত্তি পরে তাঁহার দেশজয় ব্যাপারে বিশেষ উপকারে লাগিয়াছিল।

হুসেনের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তৈমুর অবাধে সমরখন্দে প্রবেশ করিলেন। এই নগরই হুসেনের বৃহৎ রাজ্যের রাজধানী ছিল। নগরপ্রান্তে তৈমুর উপস্থিত হইবা মাত্র বিনা আপত্তিতে তাহার তোরণ দ্বার মুক্ত হইল এবং প্রজাবৃন্দ অকুণ্ঠচিত্তে মোগল রাজকুমারকে রাজপদে অভিষিক্ত করিল। ইতিপূর্ব্বে তৈমুরের পিতৃপুরুষগণই এই সিংহাসনের অধিকারী ছিলেন। এই নগরকেই তৈমুর তাঁহার বিজিত বিপুল সাম্রাজ্যের রাজধানী করিয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ শক্তির বলে সমরখন্দ সমগ্র আসিয়ার ধনসম্পদের ভাণ্ডারভূমি হইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দুস্থান পারস্য, সিরিয়া এবং মিশর দেশ জয় লুণ্ঠন করিয়া তিনি যে বিপুল মণিকাঞ্চন সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এই সমরখন্দেই তাহা সঞ্চিত হইয়াছিল।

সমরখন্দের অধিকার হইতেই তৈমুরের রাজত্ব আরম্ভ হইল বলিতে পারা যায়। মুসলমান ইতিহাস অনুসারে হিজরা ৭৭১ সালে বা ১৩৭০ খৃষ্টাব্দে তৈমুর এই নগর অধিকার করেন। তৈমুরের বয়স তখন ৩৫ বৎসর। বিশ্ববিজয়ী আলেকজান্দারের জীবনের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে দেখা যায়, যে বয়সে তাঁহার বিচিত্র জীবনের যবনিকা পতন হইয়াছিল, তৈমুর সেই বয়সে তাঁহার জীবন আরম্ভ করিতেছেন মাত্র।

কিন্তু এরূপ ভাবে এই উভয় বীরের তুলনা করা সঙ্গত নহে। আলেকজান্দার রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তৈমুরকে নিজের অতুল চেষ্টায় সিংহাসন গড়িয়া লইতে হইয়াছিল। একজন সুশিক্ষিত অগণ্য সৈন্য বিনাচেষ্টায় লাভ করিয়াছিলেন, অপর জন অশিক্ষিত মেষপালকদের লইয়া এক দুর্জ্জয় সৈন্য গঠিত করিয়াছিলেন। আলেকজান্দারের ন্যায় তৈমুরের আরিষ্টটলের (Aristotle) মত গুরু ছিল না সত্য, কিন্তু তৎসত্ত্বেও চরিত্রগুণে তিনি আলেকজান্দারের তুল্যই ছিলেন। উপরন্তু তাঁহার অপেক্ষা অনেক বিষয়ে নির্দ্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক ছিলেন। তৈমুর মিতাচারী, পবিত্র চরিত্র, সংযমী এবং স্বধর্ম্মে নিষ্ঠাবান ছিলেন। অনেকে তাঁহাকে নৃশংসতার অপরাধে অপরাধী করে সত্য, কিন্তু বিদেশবিজয়ী বীরের পক্ষে তাঁহার চরিত্র যে বিশেষভাবে নৃশংস ছিল এমন কথা কোনমতেই বলা যায় না।

নূতন রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই তৈমুর সাম্রাজ্য বৃদ্ধির সংকল্প করিয়া সমরখন্দের চতুর্দ্দিকস্থ অধিবাসী-দিগকে বশীভূত করিতে অগ্রসর হইলেন। আসিয়ার উত্তর দেশ হইতে মধ্যে মধ্যে যে সকল বীরের অভ্যুদয় হইয়াছে, তাহারা প্রায় সকলেই অনুচর বর্গ লইয়া তুষারমণ্ডিত স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ খণ্ডের ধনধান্যপূর্ণ প্রদেশে বসতি করিয়াছেন। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও ভারতবর্ষের দিকেই সর্ব্বপ্রথমে এই পার্ব্বত্য-জাতির স্রোত প্রবল বন্যার ন্যায় আসিয়া পড়িল। সিন্ধু নদের তীরে আসিয়া তৈমুর দেখিলেন যে সে প্রদেশের অধিবাসিদের ধর্ম্মবিশ্বাস তাঁহাদিগের হইতে বিভিন্ন। সে সময়ে তাতারগণ সাধারণতঃ সকলেই মুসলমান ছিল। তিনি নিজে তাঁহাদের পারিবারিক প্রথা অনুসারে চেঙ্গিস্ খাঁর ধর্ম্ম অনুসরণ করিতেন। এই ধর্ম্ম অর্থে এক অনাদি অনন্ত, সর্ব্ব শক্তিমান অদৃশ্য বিধাতায় বিশ্বাস,—তিনিই সর্ব্বময়, সর্ব্বব, অভেদ অখণ্ড। তৈমুর এই অদ্বৈতবাদে বিশ্বাস করিতেন বলিয়া কোরাণের বচনকে ঘৃণা করিতেন এবং পৌত্তলিক ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই তিনি বিদ্বেষী ছিলেন। শুনা যায় যীশুখ্রীষ্টের ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অনাস্থা ছিল না। তাঁহার পত্নী নাকি খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং সন্তানদিগকে এই ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। যাহা হউক সাম্রাজ্য বিস্তারের উচ্চাকাঙ্ক্ষায় ও পৌত্তলিকতাকে উচ্ছিন্ন করিবার প্রবল আগ্রহে প্রণোদিত হইয়া তৈমুর ভারতের হিন্দুদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

তখন কাবুলই ভারতের উত্তরসীমান্তে প্রধান নগর ছিল। এই নগরের নাম হইতেই সন্নিকটস্থ প্রদেশের নাম কাবুলস্থান হইয়াছিল। তৈমুরের বিজয়ী সেনার সহিত প্রথম যুদ্ধের যে ভীষণ সংঘর্ষ তাহা এই প্রদেশের রাজাকেই সহ্য করিতে হইয়াছিল। তৈমুরই জয়ী হইলেন এবং সমগ্র কাবুলস্থান লুণ্ঠিত, পীড়িত হইয়া তাতারের বশ্যতা স্বীকার করিল। এ যাত্রায় ভারতের অন্যান্য প্রদেশ রক্ষা পাইল। সহসা এই জয়োন্মত্ত সৈন্যের বন্যা যাইয়া পারস্যের উপরে পড়িল। তৈমুরের এ গতি পরিবর্ত্তনের কারণ কি তাহা কিছুই জানা যায় না, কিন্তু তিনি যে সিন্ধুনদ উত্তীর্ণ না হইয়াই পশ্চিমে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

তাঁহার পারস্য ও সিরিয়া জয়ের কাহিনী অনেক লেখক লিখিয়াছেন। হিরাট (Herat) জয় ও ধ্বংস করিয়া তিনি খোরাসানের অধিপতি হন। সিকাবোর দুর্গ অধিকৃত হওয়ায় পরে জার্জ্জিয়া রাজ্য তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। কিন্তু পারস্য দেশ জয় করিতে তৈমুরকে অধিক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। সমগ্র পারস্য দেশ জয় করিতে দুই বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। অবশেষে শিরাজদুর্গে তৈমুরের বিজয় পতাকা উড্ডীন হইল দেখিয়া পারস্যবাসীরা নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল, তখন ভুজবলে ও সদাশয় নীতির ফলে তৈমুর সমগ্র দেশ করায়ত্ত করিলেন। পারস্য হইতে তৈমুর দুর্জ্জয় বাহিনী লইয়া আসিয়ার উত্তরতম প্রদেশ অধিকারে অগ্রসর হইলেন। সে প্রদেশে এক মাস দশ দিন ধরিয়া অস্তহীন সূর্য্য অংশুবিকিরণ করে। সুতরাং সৈন্যের সহযাত্রী ইমানেরা অর্থাৎ ধর্ম্মোপদেষ্টারা সৈনিকগণকে সান্ধ্য উপাসনা হইতে অব্যাহতি দিলেন।

এই বিজয় যাত্রায় তৈমুর উভয় তাতার প্রদেশ অধিকার করিলেন। কিন্তু পারস্যে সৈন্যের মধ্যে অসন্তোষ জন্মিয়াছে সংবাদ পাইয়া তিনি অবিলম্বে তথায় ফিরিয়া আসিলেন। বাগদাদ রাজ্য তখনও প্রাচীন ব্যাবিলনের ন্যায় সমৃদ্ধিশালী ছিল। চেঙ্গিস খাঁর বংশধর এক মোগল, সুলতান বেন্ এভিস্ এই প্রদেশ অধিকার করিয়া রাজত্ব করিতেছিলেন। তৈমুর এই প্রদেশ আক্রমণ করিয়া সুলতানকে বাগদাদ হইতে বহিষ্কৃত করিলেন। বেন্ এভিস্ প্রাণ লইয়া মিশরের সুলতানের আশ্রয় লইলেন।

ইতিমধ্যে ভারতবর্ষ তাহার বিশৃঙ্খল সীমান্তে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত করিয়া দুর্দ্দান্ত দস্যুর ভাবী আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার উপায় অবলম্বন করিতেছিল। কাবুল রাজ্যে দাসত্ব বন্ধন দেখিয়া সিন্ধুনদের পরপারবর্ত্তী রাজারা সকলেই আত্মরক্ষার জন্য উৎকর্ণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

এই সকল রাজারা বিজয়ী তৈমুরের গতিরোধের জন্য বিপুল আয়োজন করিয়া অপেক্ষা করিতে ছিলেন। তাঁহাদের এ ভয় যে ভিত্তিহীন নহে এবং আয়োজন যে নিষ্ফল হয় নাই, তাহা অবিলম্বেই প্রকাশ পাইল। কাবুলে বিদ্রোহের সংবাদ পাইয়া সিরিয়া হইতে তাতার সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। কাবুল বশীভূত করিয়াই তৈমুর এবারে সদলবলে হিন্দুস্থানের দিকে অগ্রসর হইলেন। ভারতজয়ের এ দ্বিতীয় সুযোগ ত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইল।

মুসলমান কাহিনীর মতে হিজরা ৮০০ সালে বা ১৩৯৯ খৃষ্টাব্দে তৈমুর দ্বিতীয় বার ভারতে আসিয়া উপস্থিত হন। তখন তাঁহার ৬৪ বৎসর বয়স। এই সময়েই ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্য-স্থাপনের যথার্থ সূচনা হয়।

কাবুল ধ্বংস করিয়া তৈমুর নিশ্চিন্ত চিত্তে হিন্দুস্থানের মধ্যদেশ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে সমর্থ হইলেন। সিন্ধুনদ ও গঙ্গাতীরের মধ্যবর্ত্তী সমগ্র প্রদেশই তৈমুরের অধিকারভুক্ত হইল। কিন্তু এই ভুবনবিজয়ী বীর ভারতে আসিয়া যে বীরত্ব, দৃঢ়তা ও অধ্যবসায় দেখিয়াছিলেন, আসিয়ার অন্য কোনও দেশেই এরূপ দেখেন নাই। আলেকজান্দারের বিজয়গতি রুদ্ধ করিয়া পুরুবিক্রম যে স্থানে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, ঠিক সেই স্থানে আসিয়াবিজয়ী মোগল বীরের গতিরোধ করিয়া এক নূতন পুরুবিক্রম দণ্ডায়মান হইলেন। উভয়ে যে ঘোরতর সংগ্রাম বাধিল, তাহা রাজপুতের ইতিহাসে দুষ্প্রাপ্য না হইলেও আসিয়ার ইতিহাসে বিরল বলিলেও চলে। ভারতের বীরবৃন্দের শিরোরত্ন চিতোরের রাণা তৈমুরের পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইলেন। যুদ্ধের পূর্ব্বে তৈমুর লঙ্গ তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন করিয়া রূঢ় বাক্যে এক পত্র লিখিলেন। এইরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়া তিনি পূর্ব্বে অনেক দুর্গ ও প্রদেশ বিনা রক্তপাতে অধিকার করিয়াছেন। তিনি রাণাকে লিখিলেন যে তিনি অবিলম্বে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার না করিলে তিনি কঠোর প্রতিশোধ গ্রহণে প্রবৃত্ত হইবেন। যৌবনতেজে উদ্‌ভ্রান্ত রাণা তৈমুরের পত্র পাইয়া অবজ্ঞাভরে উত্তর না দিয়া, প্রবল বাহিনী লইয়া মোগল আক্রমণে অগ্রসর হইলেন। তৈমুরের অপেক্ষা রাণার সৈন্য সংখ্যা অনেক অধিক এবং অজেয় রাজপুত বীরে গঠিত। মনে হইল যেন সমগ্র হিন্দুস্থান তৈমুরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছে। রাণার সহিত রণক্ষেত্রে অন্যূন এক লক্ষ অশ্বারোহী ছিল। তৈমুরের সহিত দ্বাদশ সহস্র মাত্র অশ্বারোহী ছিল। কিন্তু তাহাদের সকলেই রণক্ষেত্রে অভিজ্ঞ এবং তাহাদের অধিনায়কের প্রতি প্রবল বিশ্বাসে এবং বহুদিনের অক্ষুণ্ণ জয়োল্লাসে তাহারা অদৃপ্ততেজে দশগুণ অধিক রাজপুত বীরের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইল। উভয় সেনা সম্মুখীন হইবা মাত্র তাতার সেনানায়কেরা শত্রুসংখ্যায় ভীত হইয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শনের কল্পনা করিতে লাগিলেন। তাহারা পরস্পরে বলাবলি করিতে লাগিল—"এরূপে কতদিন আমরা এই কাণ্ডজ্ঞানহীন খঞ্জের আজ্ঞাবর্ত্তী হইয়া চলিব? উঁহার একটি পা ত গিয়াছে, তাহার উপর গতযুদ্ধে আবার একটি হাতও গিয়াছে। নিজের ন্যায় আমাদিগকে অঙ্গহীন পীড়িত করিয়াও কি উঁহার তৃপ্তি হইবে না? উনি কি ইচ্ছা করেন

যে এই বিপরীত জল বায়ুর মধ্যে আমরা প্রাণ হারাইব ; কেন না এখানে হিন্দুদের বিষাক্ত তীর হইতে রক্ষা পাইলেও, এখানকার দুঃসহ উত্তাপ অসহ।" সমগ্র সৈন্যের মধ্যে এই ভাবের আলোচনা হইতে লাগিল এবং তাহারা সকলে রাণার শক্তি ও স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখিয়া হিন্দুস্থান ত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইল। এদিকে যখন এই সকল গোলমাল চলিতে ছিল সে সময়ে তৈমুর লঙ্গ নির্ভয়ে, তাঁহার সৈন্যের সাহস ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া, শত্রুর অগণ্য সৈন্যের মধ্যে নিশ্চিন্ত চিত্তে আপন শিবিরে নিদ্রা যাইতেছিলেন। এমন সময়ে তাঁহার নিকটে সংবাদ আসিল যে তাঁহার সৈনিকেরা হিন্দুস্থান জয়ের চেষ্টা ত্যাগ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সংকল্প করিতেছে। এরূপ অসন্তোষ নিবারণে অনভিজ্ঞ বলিয়াই হউক বা যুদ্ধে জয়াশা অতি ক্ষীণ বলিয়াই হউক, তৈমুরও সৈন্য লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করাই স্থির করিলেন। শিবির সকল উত্তোলিত হইল এবং রসদ অস্ত্র শস্ত্রাদিও শকটে করিয়া স্থানান্তরিত করিতে আরম্ভ করিল। এরূপ সময়ে এক অশ্বচালক আসিয়া তৈমুরের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া বলিল—"ধর্ম্মাবতার, এতদিন আপনাকে শত্রু রাজের নিকটে জয়ী হইতেই দেখিয়াছি। পারস্য ও সিরিয়া পর্য্যন্ত আপনার-পদানত হইয়াছে। আপনার জন্মভূমি জয় করিয়া, আপনি জগতের অবশিষ্ট অংশ আপনার অধিকার বিস্তৃত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এতকাল আপনার তাতার সৈন্য আপনাকে অধিনায়ক পাইয়া শত্রু সম্মুখে নির্ভীক চিত্তে অগ্রসর হইত, আজ আপনি স্বয়ং সৈন্যগণের ভয়কাতরতার সমর্থন করিতেছেন। যান, অশিক্ষিত, অস্ত্রহীন, বিশৃঙ্খল হিন্দুসৈন্যের সম্মুখ হইতে পলায়ন করুন। হয়ত' আপনি জীবন লইয়া পলায়ন করিতে পারেন সত্য, কিন্তু ভাবী বিজয় গৌরবের আশা চিরদিনের জন্য লুপ্ত হইল।' একজন হীনতম সৈনিকের মুখে এইবার ধিক্কারপূর্ণ কথা শ্রবণ করিয়া, সকলের অন্তরে ঈশ্বরের প্রেরণার ন্যায় প্রভূত বল আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রত্যেকে প্রত্যেকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন এবং যেন পরস্পরের দৃষ্টি হইতে সাহস সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। হয় ত' তৈমুর স্বয়ং এই অশ্বচালককে এইরূপ অভিনয় করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন এবং এক্ষণে এই সুযোগে সৈনিকগণের হৃদয়ে লুপ্ত সাহসের পুনঃ সঞ্চারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। (ক্রমশঃ)

পোষ্যপুত্র।

৩৫

চন্দননগর ষ্টেশনে নামিয়া একখানা ভাড়াটে গাড়ির সাহায্যে দুই মাইল পথ অতিক্রম করিয়া হেমেন্দ্র ও শান্তিকে যোগেশ তাহার শ্যালীগৃহে আনিয়া উপস্থিত করিল। জনবিরল একটি গলির ভিতর কলমিদল, পদ্ম, ও পানাভরা পুষ্করিণীর পাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইটেগাঁথা ছোট একখানা পুরাতন বাড়ী। তাহার দেওয়াল আগাছায় ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছে ও দরজায় তালা লাগান। যোগেশ বলিল, 'তালাটা ভাঙ্গিয়া ফেলা যাক, হেমেন্দ্র আপত্তি করিল,—"না না তালা ভেঙ্গে পরের বাড়ী ঢোকে না। আর তাছাড়া যোগেশ, এই পচা পুখুরের ধারে এই নোংরা জায়গায় একদিন থাকলে আমি প্লেগে মারা পড়বো। বাড়িওতো একতালা আর সেঁৎসেতে বলেই মনে হচ্চে ;—এখানে কি কত্তে আনলে ?" যোগেশ মুখ টিপিয়া একটু হাসিল "হাঁ বাড়িটা তেমন ভাল নয় বটে, তা দুদিন এইখানেই

কষ্ট করে থাকলে হতো না? টাকাকড়ি তেমন কিছুতো আমাদের সঙ্গে নেই, এই দেখনা—মোটে সতের টাকা পাঁচ আনা তিন পয়সা আর বাকি আছে—" এই বলিয়া সে হেমেন্দ্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত মনিব্যাগ খুলিয়া তাহাকে দেখাইল। আকস্মিক একটা লজ্জার আঘাতে হেম আরক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু সে লজ্জার আবরণ আর টানিয়া রাখিতে পারিতেছিল না; জীর্ণ কন্থার মত তাহার একদিকে টানিতে গেলে অপর দিকের নগ্নতা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়া লজ্জা বর্দ্ধিত করিতেছিল মাত্র। আহতগর্ব্ব হেমেন্দ্র মন্ত্রনিরুদ্ধ বীর্য্যহীন সর্পের মত মনের মধ্যে গুমরিতে লাগিল। জীবনে যে বিনা সংগ্রামে পূর্ণজয়ী হইয়া নিজেকে কমলাসনার বরপুত্র বলিয়া চিনিয়াছিল এখনি তাহার সেই প্রচণ্ড অহঙ্কারে এমনি করিয়া আঘাত দান,—একি বিধাতার বিড়ম্বনা!

তালা ভাঙ্গিয়াই বাড়িতে প্রবেশ করা হইল। যোগেশ শান্তিকে পাশের একটা ঘর দেখাইয়া দিয়া কহিল "আপনি ওই ঘরে গিয়ে খাটের উপর একটু শুয়ে নিন, বড্ডই ক্লান্ত হয়েছেন, আমি এখনি সব জোগাড় করে ফেল্‌লুম বলে।" শান্তি নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মানব-বর্জ্জিত গৃহ ধূলা ও ঝুলে ভরিয়া গিয়াছে, ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণে কৃষ্ণকলি ও ভেরেণ্ডাশাকের সঙ্গে বিস্তর বুনোগাছ জন্মিয়াছে, একপাশে তুলসীহীনমঞ্চ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, যোগেশ সামনের ঘরের শিকল খুলিবামাত্র দুইটা চামচিকে পাখী ভাঙ্গা জানলা দিয়া উড়িয়া গেল। ঘরের ঠিক সামনেই খানিকটা স্থান পাখীর পালকাদিতে অপরিষ্কৃত থাকিয়া গৃহস্বামীর পক্ষি প্রিয়তার সাক্ষ্য দিতেছিল। ঘরের মধ্যে একখানি তক্তপোষ ও বড় একটা কাঠের সিন্দুকমাত্র পড়িয়া আছে। একটা কুলুঙ্গীতে দুএকটা মুণ্ডভাঙ্গা মাটির পুতুল ও ঘরের মেঝের খানকতক ছেঁড়া কাগজ, ভাঙ্গা হাঁড়ি ও আবর্জ্জনার রাশি। হেমেন্দ্র ঘরে ঢুকিয়াই দুইপদ পিছাইয়া আসিল, ঘরের ভারাক্রান্ত বদ্ধ বায়ু মুহূর্ত্তেই তাহাকে হাঁফাইয়া তুলিয়াছিল। যোগেশ জানালাগুলা খুলিয়া দিয়া কোঁচার কাপড়ে তক্তাপোষের ধূলা ঝাড়িয়া একটা অংশকে ব্যবহারোপযোগী করিয়া স্তম্ভিত হেমেন্দ্রের দিকে ফিরিয়া বলিল, "আসুন ছোটবাবু আপনি এইখানে বসে বিশ্রাম করুন আমি একটা লোক ও কিছু খাবার চেষ্টায় যাই।" হেম চৌকাটের নিকট হইতে খুব সাবধানে কোঁচাটা গুটাইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভীতভাবে বলিয়া উঠিল "এযে ভয়ানক ড্যাম্প! নিশ্চয়ই আমায় ডিপ্‌থিরিয়া হয়ে মরতে হবে দেখচি।"

যোগেশ আবার মনে মনে একটু হাসিল, কিন্তু বাহিরে সে সহানুভূতি দেখাইতে কোন ত্রুটি করিল না, বলিল "কি করবেন বলুন বিধির বিড়ম্বনা একেই বলে, যাহোক এখন দুদিন কষ্ট সহ্য করুন আবার আমাদের দিনও ফিরে আসবে। তখন সব দুঃখ মেটাবো, যে আপনাকে এতটা কষ্ট দিলে তার কি কখনও ভাল হবে মনে করেছেন? কখন না, ভগবান আছেন তিনিই বিচার করবেন, দেখুন না কেমন মাগীর জাল ফাঁসাই।" হেমেন্দ্র আবেগের সহিত যোগেশকে আলিঙ্গন করিয়া গদগদ কণ্ঠে কহিয়া উঠিল "ভাগ্যে তোমার

সঙ্গে দেখা হলো যোগেশ, নৈলে আমারতো কোন বুদ্ধিই যোগাচ্ছিল না; তুমিই জগতে প্রকৃত বন্ধু।" যোগেশ বলিল "ওকথা বলবেন না ছোটবাবু। আমরা আপনার ভৃত্য; চিরকাল তো আপনাদের দ্বারেই মানুষ, কি আর কর্ত্তে পারলুম বলুন, ক্ষমতাই বা কতটুকু? তবে এশরীরটা, প্রাণটে দিয়েও যদি আপনাদের বংশের মানমর্য্যাদা রক্ষে করবার সামান্য সাহায্যটুকুন্‌ও করতে পারি তাতে পিছুব না। শাস্ত্রে বলে "রাজদ্বারে শ্মশানে চ বঃ তিষ্ঠতি স বান্ধব।" তা আমি রাজদ্বারে দাঁড়াবার সব বন্দোবস্ত করে দেব কোন ভাবনা নেই।" হেমেন্দ্র পুনশ্চ আবেগ রুদ্ধকণ্ঠে কহিল "তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই যোগেশ, ভাগ্যে তোমায় পেয়েছিলুম!"

যোগেশ একজন দাসী ও আহার্য্য সামগ্রীর যোগাড় করিয়া যখন বাড়ি ফিরিল তখন হেমেন্দ্রের ঘড়িতে দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। ক্ষুধা তৃষ্ণা ও ক্লান্তিতে অবসন্ন হইয়া সে সেই শয্যাহীন তক্তপোষের ধূলি-লাঞ্ছিত বক্ষ আশ্রয় করিয়াই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের পদশব্দে জাগিয়া উঠিল। প্রতিবেশির নিকট হইতে আনা গ্লাসে খানিক ঠাণ্ডাজল ও কিছু কেনা খাবারে জলন্ত ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়া হেম বলিল কি অখদ্য জিনিষই কিনেচ হে! কলেয়া না হয়। তা যাহোক যোগেশ, তুমিও কিছু খেয়ে নাও, এসো একটা কিছু পরামর্শ দাও, আমিতো ভাই দুদিন এ অবস্থায় থাকলে নিশ্চয়ই মারা পড়বো, তা তোমাকে বলে রাখলুম। বাপ্! এমন করে মানুষে বাঁচতে পারে।"

যোগেশ হঠাৎ ঈষৎ রুক্ষস্বরে বলিয়া ফেলিল "বৌদিকে একবার দেখবে না? আশ্চর্য্য লোকতো আপনি দেখছি! সে বেচারা এখনও যে মুখে একটু জলও দেয়নি, আমরাতো তবু শ্রীরামপুরে চা টা, খেয়ে নিয়েছিলুম।" হেমেন্দ্র একটু অপ্রতিভ হইয়া গেল, তারপর একটু ভাবিয়া কহিল, "তুমিই গিয়ে বলোনা"। যোগেশের সমস্ত হৃদয় তাহাকে তৎক্ষণাৎ সেইদিকেই টানিতে উদ্যত হইয়াছিল কিন্তু তথাপি সে সেই প্রলোভন হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়া চঞ্চলস্বরে বলিল "না না তা কি হয় তিনি কি ভাবলেন, আপনি যান, আমি ঝিটাকে দিয়ে বরং খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি, ঝি ঝি গেল কোথা"—"হেমেন্দ্র অনিচ্ছার সহিত উঠিল। তাহাকে উঠিতে দেখিয়া যোগেশ মনের মধ্যে শান্তি অনুভব করিল না।

হেমেন্দ্র আসিয়া দেখিল বদ্ধদ্বার ক্ষুদ্র ঘরের ধূলির উপর শান্তি চুপ করিয়া বসিয়া আছে। সে তাহার মুখ দেখিতে পাইল না কিন্তু ভাব দেখিয়া বুঝিতে পারিল সে কাঁদে নাই, এবং অনেকক্ষণ হইতেই এই অবস্থায় রহিয়াছে। মনে মনে একটু ভীত হইল, তাহাকে কাঁদিতে দেখিলে বরং সে সাহস পাইত। কাছে আসিয়া একটু সঙ্কুচিতভাবে ডাকিল "শান্তি!" শান্তি উত্তর দিল না, হেমেন্দ্রও অনেকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, এমন বিপদেও সে পড়িয়াছে যে বলিবার নয়, একি গ্রহ! অথচ রাগ করাও অনর্থক, বুঝিবে কে? এবার একটু উচ্চ করিয়া ডাকিল "শান্তি শুনচো?" শান্তি মুখ ফিরাইল, প্রশ্নহীন মৌনদৃষ্টি একবারমাত্র

স্বামীর মুখে স্থাপন করিয়া আবার চোখ নীচু করিল। ঈষৎ লজ্জার সহিত হেম নত হইয়া তাহার হাত ধরিল,—"ওঠো মুখে একটু জল দাও, উঠে এসো।" কোন কথা না কহিয়া শুধু সে হাতখানা টানিয়া লইল। নির্ব্বাক ওষ্ঠ একটুখানি কম্পিত হইয়াই থামিয়া গিয়াছিল, চোখের পাতা আর একটুখানি নামিয়া আসিলমাত্র। নিতান্ত অপমানিত বোধে হেমেন্দ্র দ্রুতপদে চলিয়া গেল। যোগেশকে গিয়া বলিল "বল্লুম তুমি বলগে তা হলোনা"—ব্যর্থরোষে জলিয়া সে যোগেশের প্রতিই আক্রোশ মিটাইয়া লইল। "তোমাদের কেবল আমায় জ্বালাতন কর্ব্বার ফন্দি বৈতো নয়!" যোগেশ বিরক্ত না হইয়া বরং খুসী হইয়াই উঠিয়া গেল।

দ্বারের নিকটে আসিয়া যোগেশ 'বৌদি' বলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার সম্মুখেই কি কোন ক্ষমতাপন্ন চিত্রকর নির্ব্বাসিতা সীতার চিত্র আঁকিয়া রাখিয়া গিয়াছে নাকি? ঠিক সেই রকমই মুখের ভাবটুকু, বসিবার ধরণটিও যেন তেমনি! করুণস্বরে যোগেশ বলিল 'বৌদি, উঠে আসুন, মুখ হাত ধুয়ে একটু জল টল খেয়ে নিন্, নৈলে আমি প্রসাদ পাইনে যে।" এবার শান্তির নিশ্চলপ্রায় হৃদ্‌পিণ্ড সহসা চঞ্চল হইয়া উঠিল। তুষার যেমন সূর্য্য কিরণে সহসা গলিয়া জলে পরিণত হইয়া যায় তাহার বুকের মধ্যের জমাট বাঁধা বেদনা তেমনি সেই সহানুভূতির স্বরটুকুতেই গলিয়া আসিল। কষ্টে অশ্রুরোধ করিয়া সে মাথার উপর ঘোমটা টানিয়া দিল, যোগেশ একবার চকিত কটাক্ষে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আবার বলিল—এবার একটু স্বর ছোট করিয়া একটু কাছে আসিয়া বলিল; "আমার কথা শুনুন, আমায় বিশ্বাস করুন, আমি প্রকৃতই আপনাদের হিতাকাঙ্ক্ষী, —আমি শীঘ্রই সব ঠিক করে দোব, দুদিনেই আবার আপনি লক্ষ্মীপুরের লক্ষ্মীরূপে সেখানে ফিরে যাবেন, আমার প্রাণ থাকতে আপনাদের কোন ক্ষতি হতে দোব না এই আপনার কাছে প্রতিজ্ঞা করলুম।" যোগেশের গলা কাঁপিতেছিল, হঠাৎ সে চুপ করিল। শান্তির চোখ দিয়া এতক্ষণ পরে বিন্দুর পর বিন্দু করিয়া অসহ্য বেদনারাশি অশ্রুর আকারে ঝরিয়া পড়িতে আরম্ভ হইয়াছিল, সে বিস্ময়ের সঙ্গে প্রতিজ্ঞাকারীর প্রতি চাহিয়া দেখিয়া তাহার উৎসাহিত মুখের আগ্রহ দৃষ্টিতে নিতান্ত আশ্বস্ত হইল। যোগেশ একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া পুনশ্চ আবেগের সহিত জিজ্ঞাসা করিল "বলুন আমি আপনার জন্য কি করতে পারি? আমায় লজ্জা করবেন কেন? আপনি লক্ষ্মীপুরে যেতে চান—না রজনীবাবুর কাছে? বলুন—আমি তারি বন্দোবস্ত করে দেব—" শান্তির সমস্ত শরীরের মধ্যে প্রতি শিরায় শিরায় উত্তেজনার আনন্দ স্রোতের মতন বহিয়া গেল, সে বালিকার মত সরলবিশ্বাসে উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিল "আমি লক্ষ্মীপুরে জ্যেঠা মহাশয়ের কাছেই যাবো—" যোগেশ আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিয়া সসম্ভ্রমে কহিল, "আমি তারি জন্যে চেষ্টা করবো আর বিশ্বাস করুন সে চেষ্টা সফল হবে।"

এদিককার সব এক রকম বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া যোগেশ হেমকে বলিল "টাকার জন্যেই তো বড় মুস্কিল দেখ্‌ছি ছোটবাবু

এখনও মশারি আর একটা ড্রেসিং টেবিল কিনতে বাকি এরি মধ্যেই তো দেড়শো টাকা ধার হয়ে গ্যাছে, কি করি ?" হেমেন্দ্র বিছানায় পড়িয়া কুঞ্চিত ভ্রুর মধ্য হইতে অপরিচ্ছন্ন দেওয়াল ও ছাদ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অস্বস্তি অনুভব করিতেছিল। যোগেশের অভিযোগ শুনিয়া তাহার অপ্রসন্ন চিত্ত আরো অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল, অধীরভাবে মাথা নাড়িয়া কহিয়া উঠিল "নাওনা শ-পাঁচেক টাকা কারু কাছে ধার করে। আমার কি কোথাও তালুক মুলুক আছে!" "তাইতো, শুধু হাতে এখানে যে কেউ ধার দিতে রাজি হয় না, বলে সত্য জমিদার হলে কি ঐ বাড়িতে থাকে! এ আবার ফরাসীর মুলুক, ওরা ভয় পায় যদি এর পর কিছু গোল হয়। আমারও তো জানো 'অন্ধ ভক্তধর্ম্ম গুণ!" হেমেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল, সে কি পরামর্শ দিবে? তাহার নিকট তো আর একটি কপর্দ্দকও নাই! সে কি হাতে কিছু রাখিত, যাহা পাইত তাহাতেই তাহার খরচ পত্রে কুলাইয়া উঠিত না—তবে এখন কি উপায়?

কি ভয়ানক! এমনি ভয়ঙ্কর স্থান এই সংসারটা যে এক মুহূর্ত্ত মাত্র তাহার মধ্যে বাস করিতেও অর্থের দরকার! একটা দিন পর্য্যন্ত কেহ কাহারও পাওনা মাপ করিবে না? বেশ, তবে সেইবা কেন তাহার প্রাপ্য ছাড়িয়া দিবে? সেইবা কেন এ অপমান এ কষ্টের প্রতিশোধ লইবে না? কেন লইবে না, নিশ্চয় নিশ্চয় লইবে! প্রতারণাকারিণী মায়াবিনীর কোন্ শাস্তি তাহার কৃতকর্ম্মের উপযুক্ত হইতে পারে? সে কোন শাস্তি?

হেমেন্দ্রকে নীরব দেখিয়া যোগেশ বলিল "এক কাজ করো না কেন;—তোমার শ্বশুরকে লেখনা কেন কিছু টাকা পাঠাতে?"

গভীর ঘৃণার সহিত তীব্রস্বরে হেমেন্দ্র বাধা দিল, "চুপ করো ও নাম আমার কাছে করোনা। এই নাও ঘড়িটা ও চেনটা রেখে কোথাও থেকে টাকা আনো। জানো তো ওটা বড় কম দামী জিনিষ নয়।" রাত্রে সুন্দর জ্যোৎস্না ফুটিয়াছিল। আকাশ একেবারে মেঘশূন্য। চাঁদের আলোকে আকাশভরা নক্ষত্র দীপ্তিহীন দেখাইতেছে। হেমেন্দ্রের শয়ন গৃহের খোলা জানালার মধ্য দিয়া গৃহতলে জ্যোৎস্নালোক প্রবেশ করিয়াছিল, অল্প অল্প বাতাস গৃহসম্মুখস্থ বাঁশ বনের পাতা কাঁপাইয়া, ঘরের মধ্যে মশারী ও জানলার কাপড় দুলাইয়া ফিরিতেছিল। যোগেশ শান্তির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া ডাকিল "বৌদিদি!" ধ্যানমুগ্ধার মত শান্তি নীরবে জানলার নিকট বসিয়াছিল, চমকিয়া মুখ ফিরাইয়াই প্রথমে মাথার কাপড় টানিতে যাইতেছিল; যোগেশের অনুযোগে নিবৃত্ত হইয়া তাহা যথাস্থানে স্থাপন করিল। যোগেশ বিস্ফারিত নেত্রে তাহার জ্যোৎস্না বিধৌত মুখের পানে চাহিয়া রহিল, সে তাহাকে কি বলিতে আসিয়াছিল বোধ হয় তাহা স্মরণও হইতেছিল না। প্রত্যাশিতনেত্রে শান্তিও তাহার মুখের পানে চাহিয়া দেখিল, তাহাকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া আপনা আপনি তাহার চোখ নীচু হইয়া আসিল, আবার ক্ষণপরে দৃষ্টি উঠাইয়া দেখিল তখনও সে তেমনি করিয়া চাহিয়া আছে, ঈষৎ, অস্বস্তি অনুভব করিয়া সে একটু চঞ্চল হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; যোগেশ তাহার নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত বাহিরের লোক মাত্র!

শান্তিকে উঠিতে দেখিয়া যোগেশ নিজের দুর্ব্বলতায় নিতান্ত লজ্জিত হইয়া আপনাকে তৎক্ষণাৎ সামলাইয়া লইয়া কহিল "আপনি শুতে যান বৌ'দি; রাত হয়ে গ্যাছে।" তাহার কথায় ও স্বরে শান্তির বিশ্বাস ও আশা আবার যেন তাহার হতাশান্ধকার হৃদয়প্রান্তে সহসা জাগিয়া উঠিয়া তাহার সেই এক মুহূর্ত্তের সন্দিগ্ধতার জন্য সবেগে তিরস্কার করিয়া উঠিল। আত্মবিস্মৃত হইয়া সে তখন আগ্রহে বলিয়া উঠিল "কবে আমি লক্ষ্মীপুরে যেতে পারব আমায় আগে বলুন..."

যোগেশ আনন্দরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল "নিশ্চয়ই শীঘ্র যাবেন। আমি—আমি সব ঠিক করে ফেলব। বিনোদবাবুর বউ সেজে যে মাগী আপনার এই কষ্টের কারণ হয়ে এসেছে সেই জালিয়াৎনীকে জেল খাটান তবে আমার নাম যোগেশ মিত্তির, কিন্তু আপনি আমায় ভুলবেন না।"

পথের মধ্যে চলিতে চলিতে বিশ্বাসী পথিক সহসা সম্মুখে দংশনোদ্যত কালসর্পকে ফণা ধরিয়া দাঁড়াইতে দেখিলে নির্ব্বাক আতঙ্কে যেমন স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়ে যোগেশের কথায় শান্তিও ঠিক তেমনি করিয়া সেইখানেই আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তবে তাহার কোনখানে আশা নাই? তবে সে যে এতক্ষণ আবার নূতন আশায় কত নূতন নূতন কল্পনার কানন সৃজন করিতেছিল সে সকল কিছুই নয়? সব মিথ্যা, সব প্রতারণা কোথাও আর তাহার আশা নাই!

তাহার মনের অবস্থা ঠিক না বুঝিলেও সে যে তাহার কথায় বিশেষ খুসী হয় নাই যোগেশ তাহা বুঝিল। কিন্তু তাহাকে কি বলিলে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে, সে কথাটা সে অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিয়াও ঠিক করিতে পারিল না, দূরে বারদোয়ারির ঘড়িতে রাত্রি দ্বিপ্রহর ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে অদূর পথে চৌকিদার হাঁকিয়া উঠিল। যোগেশ একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিয়া সসম্ভ্রমে কহিল "যান আপনি শুতে যান, বড্ড রাত হয়ে গ্যাছে—"

কলের পুতুলের মতন সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। ঘরে ঢুকিতে পা জড়াইয়া আসিতে লাগিল; বিদ্রোহী চিত্ত পুনঃ পুনঃ বিমুখ হইয়া সবলে তাহাকে বিপরীত দিকে টানিতেছিল,—তথাপি সে অনিচ্ছামন্থরগতিতে ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ করিয়া বিছানার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। হেমেন্দ্র তখনও ঘুমায় নাই, জাগিয়াই ছিল, শান্তির চুড়ির শব্দে চাহিয়া দেখিল। "এতক্ষণ ওঘরে কি হচ্ছিল শান্তি?" প্রশ্নটা শুনিয়াই শান্তির হাতখানা মুহূর্ত্তে মশারীর প্রান্ত হইতে সরিয়া আসিল। সে নিশ্চল হইয়া সেইখানেই দাঁড়াইল, আর নড়িল না। বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া ঈষৎ ক্রুদ্ধকণ্ঠে হেমেন্দ্র বলিল, "যোগেশ আমার খুব বন্ধু তা সত্যি, কিন্তু তাই বলে রাত দুপুর পর্য্যন্ত তার সঙ্গে বসে গল্প করা আমি পছন্দ করি না, ওরকম নির্লজ্জ ব্যবহার তোমায় বাপ তোমায় শিখিয়েছেন তা আমি জানি, কিন্তু আমি ওসব চক্ষে দেখতে পারি না।" মানুষের শরীর কিম্বা মনের ঠিক যেখানটায় সম্প্রতি খুব বড় রকম একটা আঘাতের বেদনা সর্ব্বদা দপ্‌দপ্‌ করিতেছে সেইখানটিতেই আবার সামান্য একটুখানি আঘাত লাগিলে অত্যন্ত সহিষ্ণু যে সেও আচমকা একটা যন্ত্রণাধ্বনি করিয়া উঠে। আজিকার তিরস্কারে

প্রতিহিংসার বিষ নিষ্ঠুরভাবেই হেমেন্দ্র ঢালিয়া দিয়াছিল। পিতা ও কন্যার তাহার প্রতি ব্যবহার সে ভুলে নাই,—সুযোগ পাইলেই তাই তাহার প্রতিশোধের স্পৃহা জাগিয়া ওঠে!

কিন্তু আজিকার এ আঘাত শান্তির পক্ষে সহ্য সীমানার বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছিল। সে এক মুহূর্ত্ত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া পরমুহূর্ত্তে আহতভাবে ঘর হইতে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। মনের ঝাল ঝাড়িয়া লইতে পাইয়া হেম ঈষৎ লঘুচিত্তে আবার শয্যা আশ্রয় করিল। সমস্ত দিন ধরিয়া সে শান্তিকে অপমানিত করিবার পন্থা খুঁজিয়া পাইতেছিল না।

তখন তাহার পাশের ঘরে শান্তির পরিত্যক্ত ভূমিতে শয্যা প্রস্তুত করিয়া লইয়া যোগেশ শয়ন করিয়া জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নক্ষত্র ভূষিত আকাশের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল, "হেমের কার্য্যে আমার প্রাণ দিতে হয় তাও আমি দোব। আহা আমার দ্বারা যদি তার একটু উপকারও হয় তাহলে আমার জন্ম সফল হবে। আমার আর এতে লাভ কি;— শুধু একটু দয়া বৈতো নয়! কিন্তু হেম কি দুর্ভাগ্য এমন রত্ন পেয়েও চিনলে না!

দেবদূতের প্রতি রাজা অরিষ্টনেমি।

(যোগবাশিষ্ঠ প্রথম সর্গ)

চির বসন্ত বিরাজিত সেই নন্দন উপবন!
গন্ধ প্রবাহি স্নিগ্ধ পবনে মুগ্ধ হৃদয় মন!
যন্ত্র মিলিত স্বর্গ রাগিণী দিবস রাত্রি বাজে,
কিন্নরী গাহে কোকিল কণ্ঠে! মোহন অপূর্ব্ব সাজে!
অপ্সরা সেথা চিরসঙ্গিনী—সঙ্গী দেবতা সব;
শয্যা আসন পারিজাত রাশি, পানীয় স্বর্গাসব;
উপাধান সেথা সুররমণীর সুললিত ভুজপাশ,—
শুনে কাঁপে প্রাণ! ফিরে যাও দূত চাহিনা স্বর্গবাস।
বোলো দেবরাজে জানায়ে প্রণতি, দাস আমি চির তাঁর,—
অধমের প্রতি অযাচিত রূপে প্রেরিলা করুণা ভার;
সেবক তাঁহার পারিল না নিতে তাঁর সে করুণা রাশি,—
চাহে না স্বর্গ সুখভোগ দেব, ক্ষুদ্র মর্ত্ত্যবাসী!
যাও নিজালয়ে ওগো দূতবর! প্রণাম তোমারো পায়;
কঠিন কঠোর সাধনা মগ্ন রহিব যাবৎ কায়।
সুকৃতি ফুরালে আবার আসিব জন্ম ও কর্ম্মের্ তরে!—
কেন্দ্র ভ্রষ্ট উল্কা তারাটির মত এই পৃথিবীরই পরে?

শ্রীঅনুরূপা দেবী

বিদায় ও আগমন।

আজ প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ মনস্বী দার্শনিক ও উদার নৈতিক লর্ড মর্লি ভারত সচিবের পদ গ্রহণ করিয়া ভারত শাসনে নিযুক্ত হন। বিগত নভেম্বরে তিনি এই কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। লর্ড মর্লির নিয়োগকালে ভারতের চতুর্দ্দিকে যে কি অসন্তোষ ও অশান্তি ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল তাহা আমাদের কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু দেশের সেই দুর্দ্দিন ও দুর্দ্দশা সত্বেও বৃদ্ধ মর্লি এই গুরুভার গ্রহণে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। তাঁহার চিরদিনের উদারতা, তেজস্বিতা, স্বাধীনতাপ্রিয়তা এবং সর্ব্বজীবে সহানুভূতি হইতে আমরা স্বভাবতঃই আশা করিয়াছিলাম যে এতদিনে ভারতবাসীর নিষ্ফল ক্রন্দন বুঝি ঘুচিবে, এইবার বুঝি লর্ড কর্জ্জনের যথেচ্ছ ব্যবহারের প্রতিকার হইবে। কিন্তু এখন তাঁহার কর্ম্মের অবসরকালে হিসাবনিকাশের সময় আমরা বলিতে বাধ্য যে লর্ড মর্লির ন্যায় পুরুষের নিকটে আমরা যতটা পাইব বলিয়া আশা করিয়াছিলাম, ততটা আমাদের ভাগ্যে ঘটে নাই। তাহার জন্য লর্ড মর্লি নিজেও দায়ী হইতে পারেন, বা অপরাপর কারণ ও অবস্থাও দায়ী হওয়া আশ্চর্য্য নহে। এই যেমন বঙ্গবিভাগ একটি! এ বিষয়ে লর্ড মর্লি স্পষ্টাক্ষরে রাজপুরুষগণের অন্যায় স্বীকার করিয়াও ইহার প্রতিকারে হস্তক্ষেপ করা দূরে থাক, উপরন্তু বলিয়াছিলেন যে তাঁহার মতে উহা চিরস্থায়ী ব্যাপারের মধ্যে গণ্য হইয়াছে। এইরূপ তাঁহার আরও অনেক কর্ম্ম ও মতের সহিত আমরা একমত হইতে পারি নাই বা বিশেষ আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ হইবার কোনও কারণ দেখি নাই। কিন্তু দুইটি কর্ম্মের জন্য তাঁহার নাম ভারতের ইতিহাসে চিরস্থায়ী হইবে এবং সেই দুইটি কর্ম্মের জন্য আমরা সকলেই তাঁহার নিকটে অন্তরের সহিত কৃতজ্ঞ। প্রথম ভারতে রাজা ও প্রজার সম্বন্ধ-নীতি পরিবর্ত্তিত করা। কর্জ্জনের কৃপায় দেশে রাজা ও প্রজার মধ্যে যেরূপ দুস্পৃহনীয় সম্বন্ধ দাঁড়াইতেছিল, তাহা স্থায়ী হইলে আমাদের উভয়ের পক্ষেই অমঙ্গল ও অনিষ্ট ভিন্ন আর কিছুই হইত না। বিলাতে লর্ড মর্লি ও ভারতে লর্ড মিন্টো দেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়াই এই অপ্রিয় ভাবটিকে দূর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। ইঁহাদের চেষ্টায় যে আবার উভয়ের মধ্যে অনেকটা সদ্ভাব ও আমাদের অন্তরে আবার আশা ও আনন্দ সঞ্চারিত হইয়াছে যে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় কর্ম্ম, ভারতের শাসন সংস্কার। এই সংস্কারের সহিত আমরা সকল স্থানে একমত হইতে না পারিলেও আমরা তাঁহার বিচক্ষণতা, সহানুভূতি, দূরদৃষ্টি ও সাধু চেষ্টার সুখ্যাতি না করিয়া থাকিতে পারি না। এই দুই মহৎ কর্ম্ম সাধিত করিয়া লর্ড মর্লি ইংলণ্ড ও ভারতের এক মহা সমস্যা দূর করিয়াছেন।

আগামী বড়দিনে লর্ড মর্লির বাহাত্তর বৎসর বয়স পূর্ণ হইবে। তিনি ভারত সচিবের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও, রাজ কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন নাই।

লর্ড মর্লির স্থানে লর্ড ক্রু ভারত সচিবের

পদ গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও মনস্বী লর্ড রোজবেরির জামাতা। ইতিপূর্ব্বে তিনি ইংলণ্ডের উপনিবেশ-সচিবের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইনি বালককাল হইতেই উদারনৈতিক এবং বহুদিন হইতেই পার্লামেণ্টে লর্ড সভার উদারনৈতিক-গণের নেতৃপদ অধিকার করিয়া আছেন। শুনিতেছি তাঁহার ন্যায় ভদ্র, অমায়িক, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও সুচতুর কর্ম্মচারী খুব বিরল। ১৮৯২ হইতে ১৮৯৫ সাল পর্য্যন্ত তিনি আয়র্লাণ্ডের রাজ-প্রতিনিধি-পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। যদিও তাঁহার সম্বন্ধে কোনও মতামত প্রকাশ করার সময় এখনও আসে নাই। তথাপি আশা করি তিনি লর্ড মর্লির দৃষ্টান্তেরই অনুসরণ করিবেন এবং কায়মনোবাক্যে প্রজারঞ্জনে যত্নবান হইবেন।

ভারতেও সাম্রাজ্যের শাসনভার হস্তান্ত-রিত হইয়াছে। গত নভেম্বরের শেষে লর্ড মিণ্টো লর্ড হার্ডিংকে শাসনভার অর্পণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। বিদায়ের

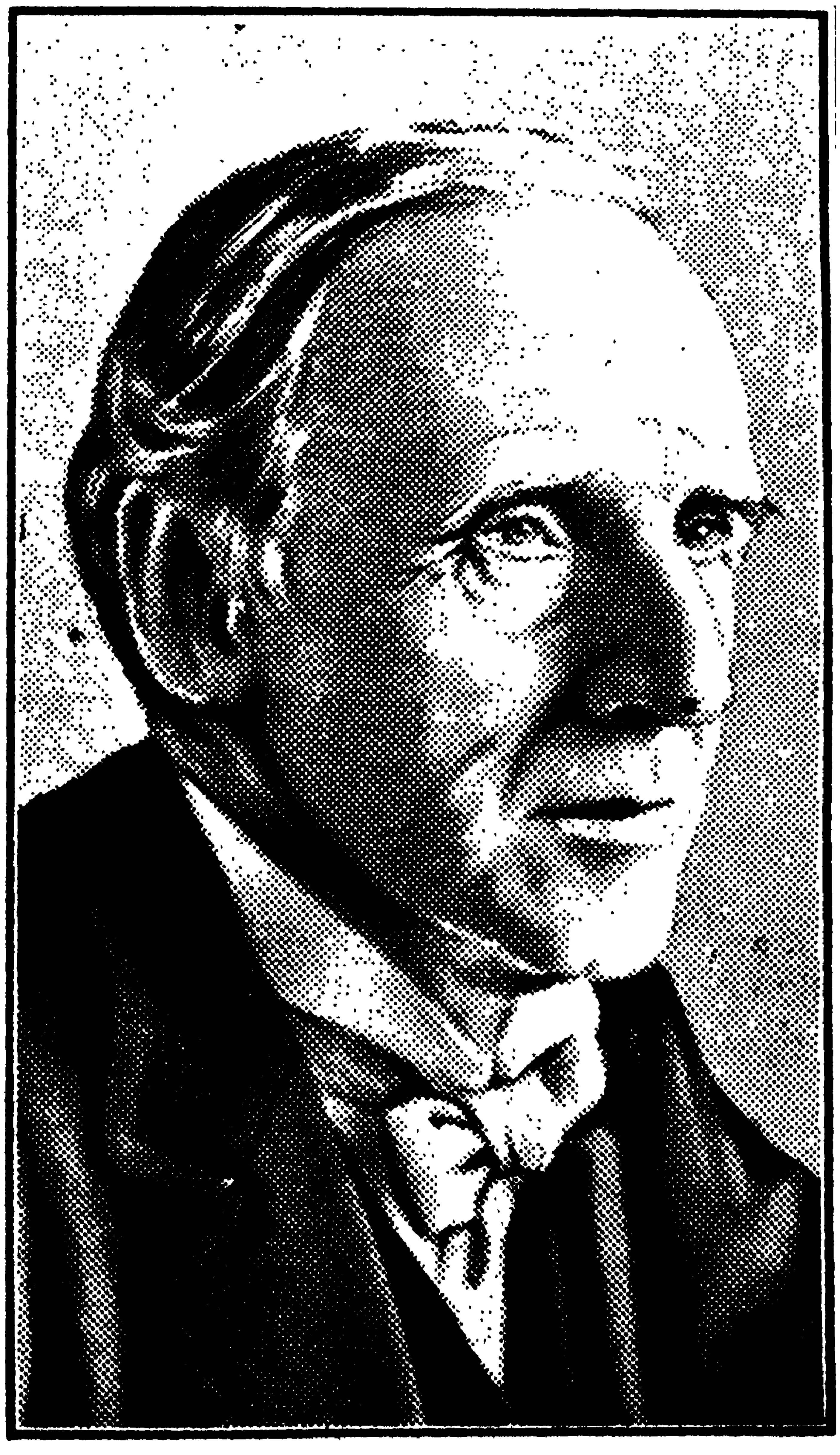

লর্ড মর্লি

পূর্ব্বে সিমলাশৈলের রাজকর্ম্মচারীরা তাঁহার বিদায় অভিনন্দনের জন্য ইয়ুনাইটেড্ সার্ভিস ক্লাবে একটি সান্ধ্য ভোজনোৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষ অবলম্বন করিয়া লর্ড মিণ্টো যে দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা গত পাঁচ বৎসরে তাঁহার ভারত শাসনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলিলেও হয়। ভারতে আসিয়া লর্ড মিণ্টোর ধৈর্য্য, দূরদর্শিতা, উদারতা ও বিচক্ষণতার যে কি কঠোর পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে এবং তিনি কিরূপ সগৌরবে যে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাহা তাঁহার বক্তৃতা পাঠেই বেশ বুঝা যায়। লর্ড কর্জ্জনের তীব্র প্রতিভার ফলে এবং কতকটা কালেরও গুণে লর্ড মিণ্টো যখন ভারতে পদার্পণ করেন, তখন হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত চতুর্দ্দিকেই অসন্তোষ ও অশান্তি গর্জ্জিয়া উঠিতেছিল। প্রতিভাবান হৃদয়বান রাজ-প্রতিনিধি প্রথমেই বুঝিলেন এ আগুন নিবাইতে হইলে দেশের শাসন-বিধির সংস্কার আবশ্যক। বুঝিবামাত্র তিনি সর্ব্বত্র বাধা বিঘ্ন, সন্দেহ ও প্রতিবাদের মধ্যে আপন চিত্তের অটল সাহস ও ধীরতার উপর নির্ভর করিয়া সংস্কার-পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাহার পরের ইতিহাস আমরা সকলেই জানি, সুতরাং এ স্থানে তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। তবে তাঁহার বক্তৃতার দুই এক স্থানের সারাংশ উদ্ধৃত করিয়া আমরা তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টি, সহানুভূতি ও বিচক্ষণতা দেখাইব মাত্র। ভারতের অশান্তি সম্বন্ধে লর্ড মিণ্টো বলিয়াছেন—"আমি ভারতে পদার্পণ করা হইতে দেশের রাজনৈতিক অবস্থার কথাই আমার চিত্তে সর্ব্বপ্রধান ছিল। আমি এদেশে আসিয়া বুঝিলাম যে ভারতের রাজনৈতিক আকাশ নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন ও বজ্রপাতোন্মুখ হইয়া আছে। আমি ইহা বেশ অনুভব করিতাম। দিন দিন যতই অভিজ্ঞতা বাড়িতে লাগিল, ততই দেখিলাম যে চতুর্দ্দিকেই ঘোর অতৃপ্তি ও অসন্তোষ বিরাজ করিতেছে—অনেক রাজভক্তের হৃদয়েও ঘোর অতৃপ্তি। বিদ্রোহ-নীতি হইতে স্বতন্ত্র একটা দেশব্যাপী রাজনৈতিক অশান্তি ছিল। এমন সকল শক্তির ক্রিয়া হইতেছিল যে ভারতগবর্মেণ্টের পক্ষে সেগুলিকে অগ্রাহ্য করা অসম্ভব। এমন সকল আকাঙ্ক্ষা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, যে তাহার ন্যায়সঙ্গত অধিকারকে অস্বীকার করা অসম্ভব। কিন্তু এ আকাঙ্ক্ষা কিসের? অবশ্য এ স্থলে আমি বিদ্রোহবাদীদের কথা বলিতেছি না। এক কথায় মোটের উপর বলিতে গেলে আমার বিশ্বাস যে অনেক শিক্ষিত ভারতবাসীই স্বদেশের শাসন কর্ম্মে অধিক অধিকার লাভের জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল। এ আকাঙ্ক্ষার ভিত্তি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ১৮৫৮ সালের ঘোষণাপত্র। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট নিয়মিত রূপে যে শিক্ষার বীজ এতকাল বপন করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহারই ফলে এই সকল আকাঙ্ক্ষা পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তবে জাপানের রুষযুদ্ধে জয়লাভে তাহারা একটু শীঘ্র পুষ্ট হইয়াছে মাত্র। কিন্তু তাহা না হইলেও আমাদেরই স্বহস্তে রোপিত বীজ যে একদিন অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতই সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে এই সকল ন্যায্য আকাঙ্ক্ষাকে স্বীকার করিয়া আমাদের

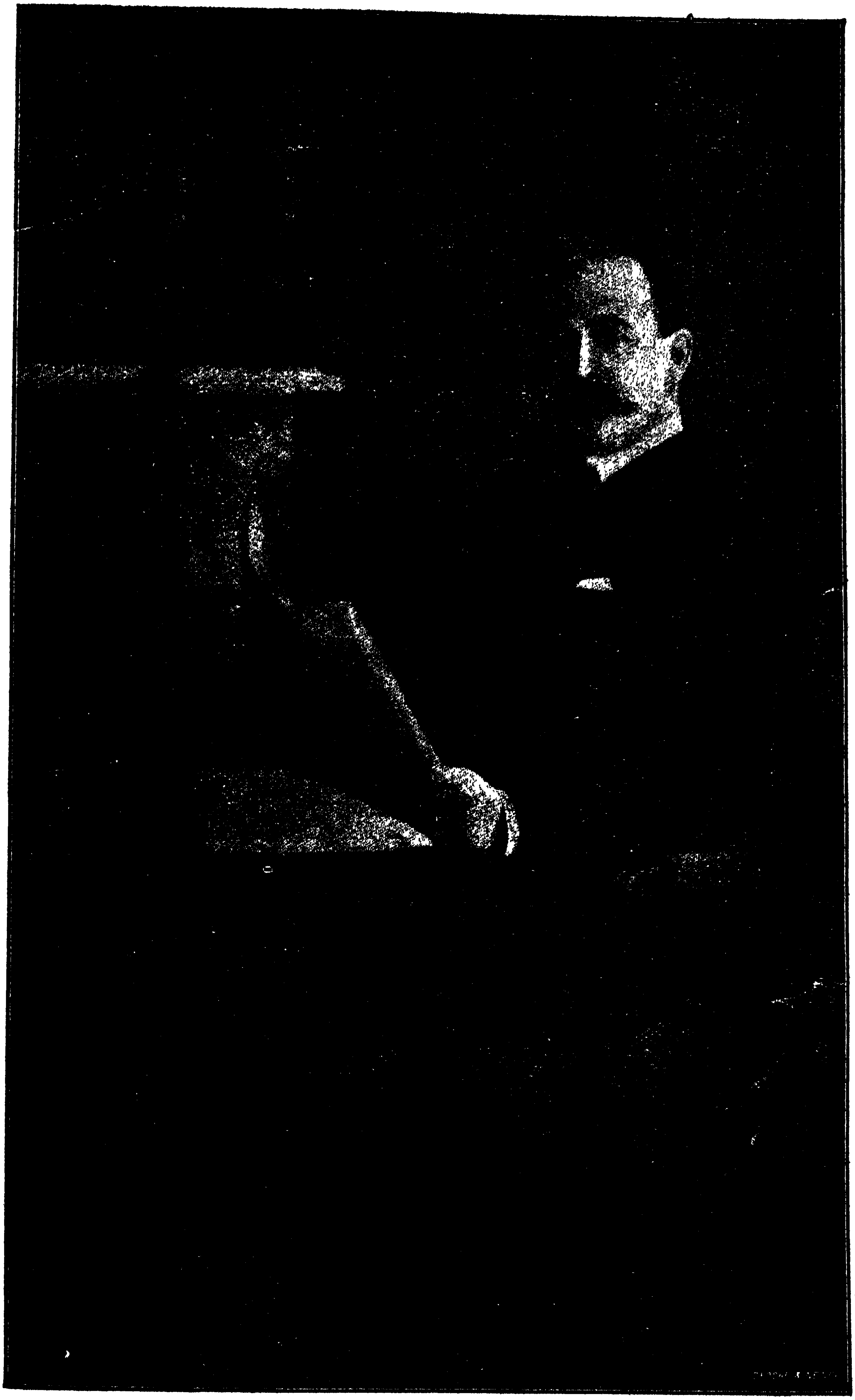

লর্ড ক্রু

কর্ত্তব্যই পালন করিয়াছি, ভবিষ্যতের নানা প্রকার বিপদ হইতে ভারতকে রক্ষা করিয়াছি।"

পরে তিনি বলিয়াছেন—"দেশের এই রাজনৈতিক জাগরণকে নিরস্ত করিবার দুইটি পথ ছিল। এক পক্ষে ভারত গবর্মেণ্ট বলিতে পারিতেন—"এ সকল নূতন ভাব আমরা গ্রাহ্য করিতে প্রস্তুত নহি, এ সকল ভাব ব্রিটিশ শাসনের স্থায়ীত্বের বিরোধী।" অপর পক্ষে তাহাদের ন্যায্যতা স্বীকার করিয়া দেশবাসীর আকাঙ্ক্ষা অনুসারে শাসন বিধি-পরিবর্ত্তিত করাই আমাদের দ্বিতীয় পথ ছিল। দ্বিতীয় পথই যে শ্রেয় পথ সে বিষয়ে আমার মনে সন্দেহমাত্র ছিল না। ০ ০ * ০ প্রথম পথ অবলম্বন করিলে আমরা ভারতে অশান্তি ও অসন্তোষকেই স্থায়ীত্ব দান করিতাম।"

এ সকল উক্তি শুনিলে লর্ড মিণ্টোর উদারতা, সূক্ষ্মদৃষ্টি ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। তাঁহার সকল কর্ম্ম বা মত আমাদের মনোমত না হইলেও, তিনি যে ভারতের মঙ্গল আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া পদে পদে ভারতবাসীর মঙ্গল-সাধনেই রত ছিলেন একথা কেবল আমরা কেন, ভারতের ভবিষ্যৎ ইতিহাস চিরদিনই স্বীকার করিবে। ব্রিটিশ শাসনকর্ত্তাদিগের মধ্যে যাঁহারা ধর্ম্মপথে থাকিয়া যথার্থ প্রজা-পালনে ও প্রজারঞ্জনে রত ছিলেন ও থাকিবেন, লর্ড মিণ্টোর নাম সেই সকল প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষের সহিত সমাসনে স্থান পাইবে। এই স্থলে লেডি মিণ্টোর মহত্ব ও সদাশয়তার কথাও উল্লেখ করিতে আমরা বাধ্য। তিনি যেরূপ সরল ও অমায়িকভাবে আমাদের দেশের নারীদিগের সহিত মিশিতেন এবং যেরূপ সহানুভূতির সহিত নারীদের কল্যাণ কর্ম্মে যোগদান করিতেন, সেরূপ আমাদের ভাগ্যে খুব অল্পই ঘটে। তাঁহার ব্যবহারের গুণে তিনি যে কেবল আমাদের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিতেন তাহা নহে, তিনি আমাদের সকলকেই ভালবাসার বন্ধনে এমন নিবিড় করিয়া বাঁধিয়া ছিলেন, যে তাঁহার ভারত ত্যাগের সময়ে আমরা বন্ধুবিচ্ছেদের ন্যায় বেদনা অনুভব করিয়াছি। তিনি ও তাঁহার স্বামী যখন আমাদের নিকট বিদায় লইলেন তখন অশ্রু-আবেগে তাঁহাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। রাজাপ্রজায় এরূপ আন্তরিক অনুরাগ প্রকাশ আমরা বহুদিন দেখি নাই। এই অবস্থাটি স্থায়ী হইলে আমাদের উভয়ের পক্ষেই কত সুখের ও শান্তির কারণ হইয়া উঠে!

আমাদের নূতন লাট লর্ড হার্ডিং সম্বন্ধে আমরা এখনও বিশেষ কিছুই জানি না, সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে এক্ষণে কোনও মতামত প্রকাশ করাও সঙ্গত হইবে না। তবে ইংলণ্ড হইতে বিদায় উপলক্ষে তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে তাঁহার আদর্শের আভাষ পাওয়া যায়। কিন্তু লর্ড কর্জ্জনের প্রসাদে আমাদের বক্তৃতার মোহ ও মৌখিক আশ্বাসের নেশা অনেকটা কাটিয়াছে। লর্ড মিণ্টোকে দেখিয়াও আমরা বুঝিয়াছি যে কর্ম্মীর পক্ষে অধিক কথার আবশ্যক হয় না। তবে লর্ড হার্ডিংও অধিক কথার ছটা প্রকাশ করেন নাই। সেই জন্যই আশা হয় তাঁহার শাসনকালে আমরা প্রকৃত মঙ্গল কর্ম্মেরই পরিচয় পাইব। তাঁহার বক্তৃতার

লেডি মিণ্টো

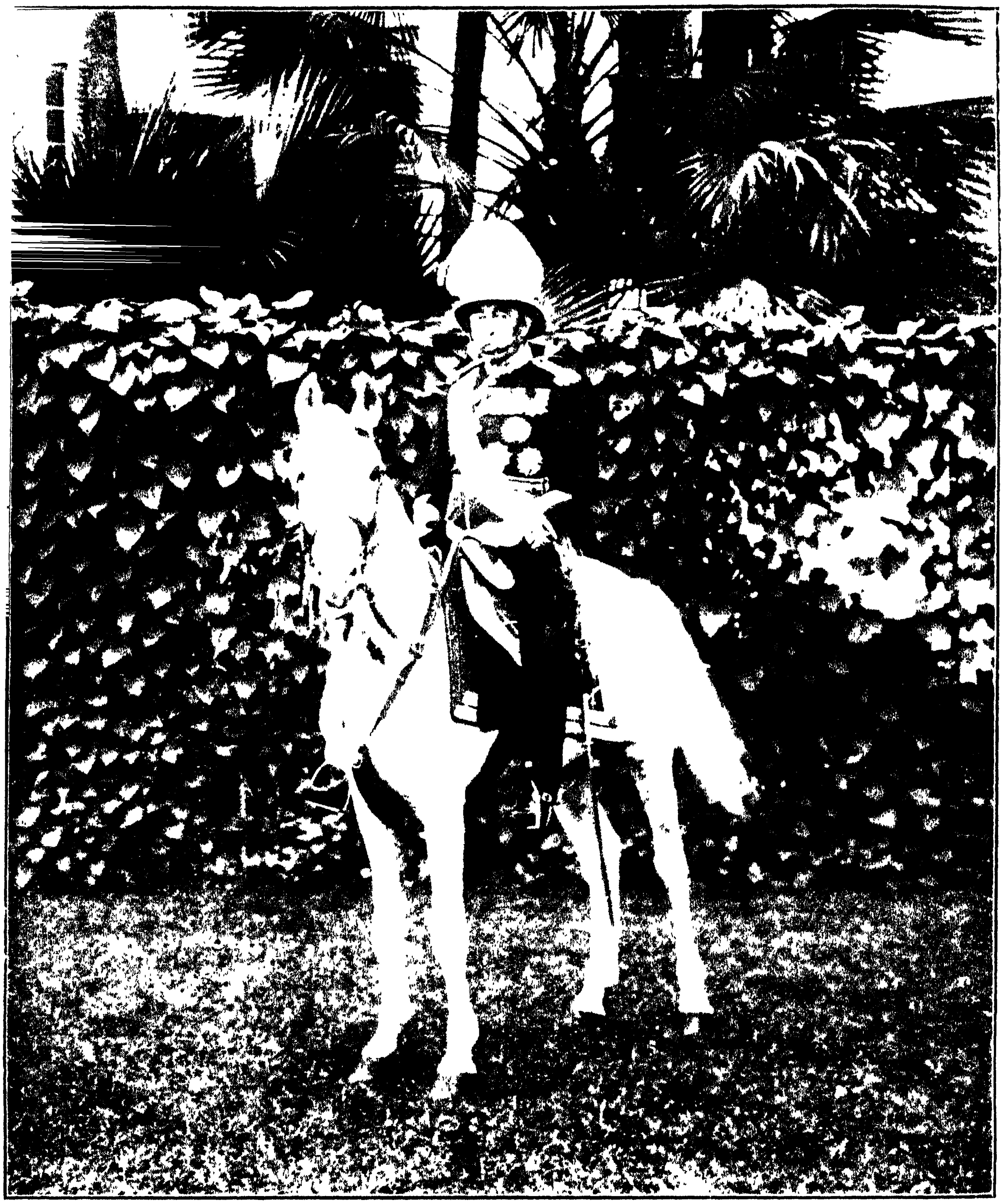

লর্ড মিণ্টো

শেষ ভাগে তিনি বলিয়াছেন—"শাসনকর্ত্তা মাত্রেরই কতকগুলি নীতির অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। সার রবার্ট পীল তাঁহার পিতামহ লর্ড হার্ডিংকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তিনিও তাহারই অনুসরণ করিবেন। পীল লিখিয়াছিলেন—"যদি তুমি শান্তি রক্ষা করিতে পার, বাণিজ্যের উন্নতি করিতে পার, ব্যয় কমাইতে পার, ভারতবাসীর মনে আমাদের ন্যায়পরায়ণতা ও দয়ার উপর বিশ্বাস জন্মাইয়া আমাদের ভারতাধিকারের ভিত্তি দৃঢ় করিতে পার, তাহা হইলে স্বদেশে প্রত্যাগমনকালে তুমি এখানে যে আন্তরিক আনন্দ ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অভিবাদন পাইবে তাহা দ্বাদশ যুদ্ধজয়ী বীরের অভিবাদন অপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক আন্তরিক।" লর্ড হার্ডিং বলিয়াছেন "এই নীতি স্মরণ রাখিয়া ভারতবাসীর প্রতি তাঁহার আন্তরিক স্বাভাবিক সহানুভূতির সহিত তিনি তাঁহার কর্ত্তব্যপালন করিবেন এবং ভারতবাসীর আর্থিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য যথাসাধ্য যত্নচেষ্টা করিবেন। শাসন কর্ত্তার পক্ষে ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নীতি আর হইতে পারে না। তিনি তাঁহার কর্ম্মের দ্বারা এই উচ্চনীতি সফল করিতে পারিলে, ভারতবাসী মাত্রেরই ভক্তি ও কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন সন্দেহ নাই।

লর্ড হার্ডিংকে বিদায় দিবার জন্য তাঁহার বিদ্যালয়ের সহপাঠীরা একটি সভার আয়োজন করিয়াছিলেন। এই সভাতে তিনি ইংলণ্ডে ইংরাজ ও ভারতবাসী ছাত্রের মধ্যে মিলন সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন যে "এই উভয় শ্রেণী ছাত্রের মধ্যে যে সদ্ভাব ও মিলন নাই সেটা নিতান্তই শোচনীয় ব্যাপার। এই কারণেই ভারতবাসী ছাত্রেরা কুসঙ্গে মিশিতে বাধ্য হয়। বিলাতে ভারতীয় ছাত্রদিগকে সাহায্য ও রক্ষা করা প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। হ্যারো স্কুলে এই সকল ছাত্রের সহিত ইংরাজেরা যেরূপ আত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার করে, সকল বিদ্যালয়েই সেইরূপ হওয়া উচিত। ভারতবাসীদের প্রতি ব্যবহার ইংরাজ সাম্রাজ্য রক্ষার পক্ষে বিশেষ মনোযোগের বিষয়।" ভারতে অশান্তি সম্বন্ধে এক স্থানে বলিয়াছেন যে,—ভারতে জনসাধারণের রাজভক্তি সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার উপযুক্ত কারণ তিনি কিছুই দেখিতে পান না। দুই চারি জন বিকৃত মস্তিষ্ক ভিন্ন সিডিশন প্রচারে যে প্রজাসাধারণের কোনও সহানুভূতি আছে এরূপ বিশ্বাস করা অসঙ্গত। তাঁহার স্থির বিশ্বাস যে সহানুভূতি ও করুণার প্রভাবে ভারতের অশান্তি অচিরে লোপ পাইবে!

সহানুভূতি ও করুণার প্রভাবে জগতের সকল অশান্তিই লোপ পায়। লর্ড হার্ডিং যদি এই দুইটী আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার শাসনকর্ম্ম পরিচালিত করেন তাহা হইলে তিনি যে অচিরে দেশের লোকের পূজ্য হইয়া উঠিবেন এবং চতুর্দ্দিকে শান্তি ও সন্তোষ প্রতিষ্ঠিত করিবেন তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। শক্তির অপব্যবহারেই অশান্তির উৎপত্তি। পুণ্যবৃত্তির দ্বারা শক্তিকে সরল ও সংযত করিলে তাহা প্রেমের আকার ধারণ করে। পিতামাতা শাসন করিলেও তাহা প্রেমেরই শাসন।

লর্ড হার্ডিং ইংলণ্ড ত্যাগের পূর্ব্বে একটি

বেশ কৌতুকজনক ঘটনা ঘটিয়াছিল। তিনি ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছেন এমন সময়ে সহসা ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। সেখানে ত' এখানকার ন্যায় নিযুক্ত বড় লাটের জন্য স্পেশাল ট্রেণের ব্যবস্থা নাই। তাহার পর আবার গাড়ীটিকে পিছনে হটাইয়া ষ্টেশনের মধ্যে আনা হয়, তখন আমাদের রাজ-প্রতিনিধি তাহাতে আরোহণ করেন। গাড়ী ছাড়িবার কিছু পূর্ব্বে লেডি হার্ডিং চীৎকার করিয়া উঠিলেন; "ঐ তোমার পকেট হইতে চুরি করিতেছে।" লর্ড হার্ডিং ফিরিয়া দেখেন এক বৃদ্ধ তাঁহার পকেট কাটিবার চেষ্টা করিতেছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ ভিড়ের মধ্য দিয়া তাহার অনুসরণ করিয়া তাহার স্কন্ধে হস্ত দিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার চিত্ত পরিবর্ত্তিত হইল, বৃদ্ধকে কিছু না বলিয়াই ফিরিয়া ষ্টেশনে আসিলেন। রাজপ্রতিনিধি তাহাকে মুক্তি দিলেন দেখিয়া পুলিসেও আর তাহাকে কিছু বলিল না, বিনা উপদ্রবে চোর অন্তর্ধান করিল।

লেডি হার্ডিং

কাউণ্ট লিও টলষ্টয়।

মানব সমাজকে ধর্ম্মে, সমাজশক্তিতে এবং স্বাধীনতায় উন্নত ও সঞ্জীবিত করিবার জন্য বর্ত্তমান যুগে যতগুলি মহৎ জীবনের অমূল্য শক্তি নিয়োজিত হইয়াছে, তন্মধ্যে রুষিয়ার জনসাধারণের গুরু, ধর্ম্মসংস্কারক, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক ও রাজনৈতিক সংস্কারক কাউণ্ট লিও টলষ্টয়ের আসন সর্ব্বশীর্ষে অবস্থিত। এই মহাপুরুষ সম্প্রতি দেহত্যাগ করিয়া, সম্পদ বিপদের দুর্গম পথের মধ্য দিয়া দীর্ঘ দিনের অবসানে এক চিরশান্তিময় বিশ্রামপূর্ণ স্থানে গিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। মৃত্যু আসিয়া মহৎ জীবনের পূত প্রবাহকে রুদ্ধ করিয়া দেয় এবং মানবসমাজের অন্তরালে এক অনন্তরাজ্যে লইয়া যায় বটে, কিন্তু ইঁহাদের বাণীকে শত শত শতাব্দীর স্তর আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে পারে না। ইহা প্রচ্ছন্নভাবে মানবের অন্তঃকরণকে উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া রাখে।

টলষ্টয়ের জন্মকালে রুষিয়া ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। সুপ্তিজাল জড়িত রুষিয়া তখনও সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার বিজয়গীতি—যাহা ইউরোপের অপরাপর দেশকে মুখরিত করিতেছিল, শ্রবণ করিতে পায় নাই। দুর্দ্দমনীয় রাজশক্তি নির্ম্মমভাবে অসহায় প্রজা-

শক্তিকে নিষ্পেষিত করিতেছিল। কত শত হতভাগ্য যে বিনা বিচারে, বিনা অপরাধে রুষিয়ার নরকতুল্য ভীষণ কারাগারে অশেষ যাতনার পর জীবনত্যাগ করিতেছিল এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া হিমময় চিরতুষারাবৃত সুদূর সাইবিরিয়া প্রদেশে চিরনির্ব্বাসিত হইতেছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। তখন দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট হতভাগ্যদের আকুলক্রন্দনে রুষিয়ার আকাশ পরিপূর্ণ। কত নিরাশ্রয়া জননী বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে নিজের এবং শিশুসন্তানের মৃত্যুকামনা করিতেছিল! এইরূপ সময়ে কোন এক ধনীর গৃহে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ২৮শে অগষ্টে টলষ্টয় জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু বাল্যকালেই তাঁহার পিতামাতার মৃত্যু হয় এবং কোন এক গর্ব্বিতা এবং নীচমনা আত্মীয়ার হস্তে তাঁহার প্রতিপালনের এবং শিক্ষার ভার পতিত

হওয়ায়, মাতা শিশুর কোমল হৃদয়ে স্নেহ শিশিরসিক্ত করুণার ও ভালবাসার যে উৎস সৃজন করিয়াছিলেন তাহা অকালে রুদ্ধ হইয়া গেল। ধীরে ধীরে তাঁহার হৃদয়ে বিলাসিতার ও উচ্ছৃঙ্খলতার ভাব প্রবল হইয়া উঠিল এবং ঐ সকলের বিষময় স্রোতে পতিত হইয়া দিন দিন তিনি ধ্বংসের মুখে প্রবাহিত হইতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে তিনি কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলেন, এবং বিদ্যাশিক্ষা সম্পূর্ণ না করিয়াই সামরিক বিভাগে প্রবেশ করিলেন।

আর্ম্মেণিয়ার যুদ্ধের সময় তিনি তথায়

প্রেরিত হন। এই যুদ্ধে সম্মানলাভ করিয়া তিনি সামরিক বিভাগ ত্যাগ করিলেন। সামরিক বিভাগ, বিলাসিতা ও ক্রীড়াকৌতুক তাঁহাকে শান্তি দিতে পারিল না। এই বিস্তৃত পৃথিবী তাঁহার নিকট এক বিরাট দুঃখ ও শোকে পরিপূর্ণ কারাগার বলিয়া প্রতীয়মান হইল এবং নিজের জীবন অত্যন্ত বিষময় হইয়া উঠিল।

একদিন তিনি বৃক্ষতলে বসিয়া নিজের জীবনের কথা ভাবিতে ভাবিতে দেখিলেন, তাঁহার বিলাসমন্দিরের আলোক অন্ধকারে পরিণত হইয়াছে। নিজের চিত্তকে শান্ত করিবার জন্য তিনি নূতন পথে যাত্রা করিয়া এক সহানুভূতির, ভক্তির এবং ধর্ম্মের অমৃত উৎস নিঃসৃত হইতে দেখিলেন। প্রজা সাধারণের নিরাশ্রয়তা ও ক্লেশের কথা ভাবিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। মানুষ মানুষের উপর এইরূপ ব্যবহার করিতে পারে তাহা তাঁহার চিন্তার অতীত ছিল। একদিন ইংলণ্ডের এক প্রকৃতির উপাসক কবির হৃদয়ও এইরূপে কাঁদিয়া বলিয়া উঠিয়াছিল—

To her fair works did Nature link
The human soul that through me ran;
And much it grieved my heart to think
What man has made of man.

অর্থাৎ প্রকৃতি তাহার সুন্দর সৃষ্টির মধ্যে মানবের আত্মাকে যুক্ত করিয়া দিয়াছে; সেই আত্মার আমি অধিকারী। তাই মানুষের প্রতি মানুষের অত্যাচারের কথা ভাবিলে আমার প্রাণটা বেদনায় ক্লিষ্ট হইয়া উঠে।

সেইদিন হইতে তাঁহার বোধ হইল এই ঈশ্বরের রাজ্যে সকল বিষয়ে মানবমাত্রেরই তুল্য অধিকার! যিনি ইহাকে বিনাশ করিতে যাইবেন তাঁহাকে মহাপাপে লিপ্ত হইতে হইবে! তিনি দেখিলেন পদতলের তৃণাগ্র হইতে আরম্ভ করিয়া সুদূর নক্ষত্রলোক পর্য্যন্ত এক আনন্দরূপের স্নেহে ও সহানুভূতিতে মানবসমাজ পরিব্যাপ্ত হইতেছে। সেইদিন হইতে তিনি প্রকৃত খৃষ্টীয় জীবন যাপন করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং যাহারা জীবনে স্নেহ ও ভালবাসা প্রাপ্ত হয় নাই, মানবের প্রীতি যাহাদের অত্যন্ত আবশ্যক সেই সকল ভাগ্যহীন ও প্রীতি-বঞ্চিত মনুষ্যকে ভালবাসা ও স্নেহ করাই টলষ্টয়ের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া উঠিল। সেইদিন হইতে তিনি নিজের বিস্তৃত ভূসম্পত্তি প্রজাদিগের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলেন এবং তাহাদের শিক্ষার জন্য অনেক বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। নিজের বিলাসিতাকে বিসর্জ্জন দিয়া তিনি সাধারণ কৃষকের ন্যায় জীবনের শেষ পর্য্যন্ত কৃষকদের সহিত মাঠে কার্য্য করিয়াছিলেন। পুস্তক লিখিয়া তিনি যে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা পাইতেন তাহা অকাতরে পরের সুখের জন্য বিতরণ করিতেন। শেষ জীবনে টলষ্টয় সম্পূর্ণ নিরামিষাশী হইয়াছিলেন।

তিনি যে কেবল সাধারণ লোকের উন্নতির জন্যই জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন তাহা নহে; সাহিত্য গগনেও তিনি এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন। তাঁহার পুস্তক সকল রুষির সাহিত্যে সম্পূর্ণ এক নবযুগ আনয়ন করিয়াছে। যে স্রোতস্বতী ক্ষীণধারায় প্রবাহিত হইতেছিল, তাহা এখন নূতন পথ পাইয়া বিপুলকা-

গ্রহণ করিয়া দেশ ভাসাইয়া প্লাবন উপস্থিত করিল। তাঁহার পুস্তক সকল পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়া মানব হৃদয়ে ভালবাসার ও ধর্ম্মের বীজ অঙ্কুরিত করিতেছে। সাহিত্যের কোন এক বিশেষ শাখা যে তাঁহার প্রিয় ছিল তাহা নহে; তিনি উপন্যাস, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এবং অর্থ-নৈতিক বিষয়ে বহু পুস্তক লিখিয়াছেন। তাঁহার War and peace, Kingdom of God is unto you, Anna Karenina, Power of darkness on life, Resurrection প্রভৃতি পুস্তক রুষিয় সাহিত্যের পত্তন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

যখন তিনি দেশের প্রচলিত খৃষ্টধর্ম্ম উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন তখন তাঁহার হৃদয় দুঃখে পূর্ণ হইয়া গেল। ধর্ম্মের নামে ধর্ম্মসমাজের নেতাগণ যে সকল গর্হিত কার্য্য করেন তাহা টলষ্টয়ের অসহ্য হইয়া উঠিল। দেশব্যাপ্ত কুসংস্কারকে বিতাড়িত করিবার জন্য এবং বাহ্যিক কার্য্যকলাপ (ceremonies) ত্যাগ করিয়া একমাত্র জগৎ পিতার উপাসনা করিবার জন্য ধর্ম্মনেতাদের এবং রাজশক্তিকে খর্ব্ব করিয়া তিনি আপনার বাণী জগতের সম্মুখে প্রচার করিলেন। ইহাতে রাজপুরুষ-গণের বিরাগভাজন হইলেন এবং ধর্ম্ম-পুরোহিতেরা রাগান্বিত হইয়া তাঁহাকে নাস্তিক বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে প্রকাশ্যভাবে গ্রীক খৃষ্টীয় সমাজ হইতে বিতাড়িত করিয়া দেওয়া হইল। এরূপ ব্যাপার নূতন নহে।* জগতের মঙ্গলের জন্য যখন কোন মহাপুরুষ আপনার বাণী প্রচার করিতে উদ্যত হন, তখন কত মোহান্ধ জ্ঞানশূন্য ব্যক্তি তাঁহাকে প্রতিরোধ করিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু ইহার প্রবল পুণ্য প্রবাহকে ইন্দ্রের ঐরাবতও বাধা দিতে পারে না; তাহা আপনার দুর্দ্দমনীয় বেগে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। আজ রুষের তৃষ্ণাতুর দেশে ইঁহার করুণাবর্ষণে প্রেমের অমৃতপ্লাবন আনয়ন করিয়াছে। এখন কি ছাত্র, কি সাধারণ লোক, কি প্রজা তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করে, এবং তাঁহার মৃত্যুস্থান পবিত্র তীর্থে পরিণত হইয়াছে।

আজ ৮২ বৎসর পরে এই মহাপুরুষের জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার জীবনের কথা যখন মনে করি তখন বোধ হয় শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই আর্য্য-ভূমির কোন এক মহাপুরুষ অজানা অমৃত-ময় রাজ্য হইতে অবতীর্ণ হইয়া ইউরোপের বিলাসিতাপূর্ণ আকাশে এক স্পন্দনের সঞ্চার করিয়া দিয়া গেল। যে দুর্লভ সহানুভূতির পূত প্রবাহে সকল ভেদ ভাসিয়া যায় সেই সহানুভূতি ও প্রেমের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া মৃত্যুকালেও তিনি বলিতে পারিয়াছিলেন, "There are millions of suffering people in the world, why are there so many of you arround me ?" অর্থাৎ "পৃথিবীতে কোটি কোটি ক্লিষ্ট জীব রহিয়াছে, তাহাদের ত্যাগ করিয়া তোমরা এত লোকে আমার কাছে রহিয়াছ কিসের জন্য ?" মৃত্যুর সম্মুখে বসিয়া, সকল জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিয়া যিনি এই কথা উচ্চারণ করিতে পারেন, জানি না তাঁহার হৃদয় কতখানি ভালবাসায় ও সহানুভূতিতে পূর্ণ।

যে স্নেহের স্পর্শে, প্রেমের স্পর্শে তিনি আপনার হৃদয়-বীণাকে স্পন্দিত ও ঝঙ্কৃত করিয়া রাখিতে পারিয়াছিলেন, আমরা যদি তাহার বিন্দুমাত্রও লাভ করিতে পারি তবে জীবন ধন্য মানিব। হে অমৃতের পুত্র, তুমি যে অনন্ত পুণ্যলোকে নিজের অমর আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলে সেই লোকের দিকেই যদি আমরা আমাদের চিত্তকে সতত উন্মুখ রাখিতে পারি, তবে তোমার এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ ধন্য হইবে ও আমরাও ধন্য হইব।

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার।

টলষ্টয় সম্বন্ধে লিখিবার ও জানিবার কথা এত আছে যে তাহা এরূপ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে প্রকাশ করা সম্ভব নহে। যদি সুবিধা হয় ত পরে তাহার আলোচনার চেষ্টা করিব। আজ কেবল তাঁহার জীবনের দুই চারিটি মূলমন্ত্র সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিব মাত্র।

টলষ্টয় তাঁহার জীবনে যে মহামন্ত্র জগৎকে দান করিয়াছেন সংক্ষেপে বলিতে গেলে সেটি হচ্চে—"আঘাতের দ্বারা অসৎকে বাধা দিও না; সর্ব্বাগ্রে আপনাকে সম্পূর্ণ করিতে যত্নবান হও।"

তাঁহার জীবনের প্রথম ভাগ হইতেই তিনি পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু এরূপ কর্ম্মে তাঁহার সন্তোষ জন্মিল না। তাঁহার মনে হইল যে তাঁহার শিক্ষা দিবার যথার্থ সামগ্রী তিনি জীবনে কি সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা ভাল করিয়া না জানিয়া, শিক্ষকরূপে জগতের সম্মুখে দাঁড়াইতে—তিনি অধিকারী নহেন। এই মনে করিয়া টলষ্টয় রাজধানী সেণ্ট পিটার্সবার্গ ত্যাগ করিয়া এক পল্লীগ্রামে গমন করিলেন; এই স্থানেই তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং জীবনের অধিকাংশকাল অতিবাহিত করেন। টলষ্টয় বলেন যে পঞ্চাশ বৎসর বয়সে জীবনের কর্ম্ম ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু আমরা তাঁহার প্রথমজীবনের লেখার মধ্যেই তাঁহার পরজীবনের মতের অঙ্কুর প্রচ্ছন্ন দেখিতে পাই। বিলাসবহুল জীবনের আবরণে তাহা তাঁহার অন্তরের অগোচর ছিল মাত্র।

এইভাবে একদিন তাঁহার অন্তরে এই মহাপ্রশ্ন জাগিয়া উঠিল—আমার এ জীবনের অর্থ কি? তাঁহার মনে হইল এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে না পারিলে, তাঁহার জীবনধারণ অসম্ভব।

কত দীর্ঘ দিন বিনিদ্র রাত্রি ধরিয়া তিনি এই তত্ত্ব চিন্তা করিতে লাগিলেন—কিন্তু কোন পথেই তাহার যথার্থ উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না। অবশেষে সলোমন, বুদ্ধ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছিল টলষ্টয়ের অদৃষ্টেও তাহাই ঘটিল। তাঁহার মনে হইল এ জীবনটা কেবল পাপ তাপ যন্ত্রণাময়! নিজে কিছু নিষ্পত্তি করিতে না পারিয়া তিনি বিজ্ঞানবিদ্‌গণের নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা এ বিষয়ে আধুনিক অভিব্যক্তিবাদের বচন ছাড়া আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। টলষ্টয় জিজ্ঞাসা করিলেন "আমি এ পৃথিবীতে আসিলাম কিসের জন্য?" বিজ্ঞানবিদেরা উত্তর করিলেন "আমরা এ পৃথিবীতে আসিলাম কি উপায়ে!" উভয়ে সম্পূর্ণ সম্পর্কবিহীন!

ইহাদের নিকটে ব্যর্থ মনোরথ হইয়া টলষ্টয় ধর্ম্মযাজকদিগের নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ইঁহারা প্রশ্নটাকে স্বীকার করিলেন

বটে, কিন্তু কোন সম্পূর্ণ উত্তর দিতে পারিলেন না। মানুষ যুদ্ধের নামে যে ভীষণ স্বেচ্ছাকৃত হত্যাসাধন করিয়া থাকে, সেইটাই টলষ্টয়ের অভিজ্ঞতায় এ পৃথিবীর হীনতম অসৎ ব্যাপার। কিন্তু তিনি দেখিলেন যে এই সকল ধর্ম্মযাজক যে কেবল যুদ্ধ নিবারণে সচেষ্ট নহেন তাহা নহে, অনেকেই ইহার পক্ষে সমর্থনের জন্য বিশেষ উৎসাহী। কেবল তাহাই নহে, প্রেম ও ধর্ম্মের নামে তাহারা বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীকে অশেষ প্রকারে নির্যাতন করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। এক ধর্ম্মের মধ্যেও এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের ঘোর বিরোধী এবং পরস্পরের অনিষ্টসাধনে সততই সচেষ্ট। তিনি এই ধর্ম্মযাজকগণের মতানুসারে আপনাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার অন্তর্য্যামী সে কথায় কর্ণপাতও করিলেন না।

পরে তিনি প্রাচ্যদেশের বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু অবশেষে বাইবেলের মধ্যেই তিনি তাঁহার মহাপ্রশ্নের সর্ব্বাপেক্ষা সরল ও সুন্দর উত্তর দেখিতে পাইলেন। জন্ম, মৃত্যু, জীব ও জগদীশ্বর সম্বন্ধে মত জগতের সকল ধর্ম্মগ্রন্থেই প্রায় এক, কিন্তু তিনি তাঁহার নিজেদের ধর্ম্মগ্রন্থেই জীবনের সত্যকে উজ্জ্বল ভাবে উপলব্ধি করিলেন।

যাহা হউক টলষ্টয় অবশেষে জীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে উত্তর পাইলেন তাহা এই, —যাহা সৎ তাহাকে উপলব্ধি করিবার এক শক্তি আমার মধ্যেই নিহিত আছে, এবং আমি সেই শক্তির সহিতই যুক্ত রহিয়াছি; আমার বিচার ও বিবেক সেই শক্তি হইতেই উদ্ভূত। এই শক্তির ইচ্ছা সম্পন্ন করাই আমার এ অস্তিত্বের উদ্দেশ্য, অর্থাৎ মঙ্গল সাধনই আমার ধর্ম্ম।

যীশুখ্রীষ্টের যে প্রসিদ্ধ দ্বাদশটি আজ্ঞা বা উপদেশ আছে, তাহার মধ্যেই টলষ্টয় আমাদের জীবনের সকল নীতি পাইয়াছিলেন। তাঁহার মতে যীশুর নিম্নলিখিত পাঁচটি উপদেশ পালন করিলেই, এমন কি পালন করিতে চেষ্টা করিলেও আমাদের মানবসমাজের জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়ঃ—

(১) কদাচ ক্রোধ করিবে না;

(২) কদাচ ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইবে না;

(৩) বিবেক ভিন্ন অপর কাহারও বশ্যতা-স্বীকার করিবে না;

(৪) তোমার মতের বিরুদ্ধবাদিদের অনিষ্ট করিবে না;

(৫) শত্রু মিত্র সকলকেই ভালবাসিবে।

টলষ্টয় বলিতেন অমঙ্গলকে নষ্ট করিয়া মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা করিবার দুইটি উপায় আছে। প্রথম পথটি জগতের শ্রেষ্ঠ পুরুষেরা চিরদিনই অবলম্বন করিয়াছেন। এই পথ অবলম্বন করিতে হইলে প্রথমে সকল বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্য অনুসন্ধান করা আবশ্যক পরে সতেজে সেই সত্য প্রকাশ করা আবশ্যক এবং জীবনে সেই সত্য পালন করিতে চেষ্টা করা আবশ্যক। উদ্ভিদরাজ্যে বৃষ্টিধারা ও সূর্য্যকিরণের ন্যায় লোকের জীবন প্রভাব জনসমাজের মধ্যে নীরবে ব্যাপ্ত হইয়া ক্রিয়া করিতে থাকে। এই প্রভাবের স্রোত দেশে দেশে, যুগে যুগে প্রবাহিত হইতে থাকে।

দ্বিতীয় পথের লোকেরা অপরের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে একটা ধারণা স্থির করিয়া পরে

আবশ্যক হইলে বলপ্রয়োগ পর্য্যন্ত করিয়া অপরকে নিজের ধারণানুসারে চলিতে বাধ্য করে। কিন্তু এ প্রভাব সেই সকল ব্যক্তির জীবনব্যাপী মাত্র—জীবনান্তে তাহা ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই অধিক করিতে থাকে।

ভারতের আর্য্য সন্তানের নিকটে এ সত্য ও তত্ত্ব চিরপুরাতন। কিন্তু পাশ্চাত্যের শিক্ষা দীক্ষা সাধনার মধ্যে থাকিয়া এই সত্য উপলব্ধি করা ও জীবনে পরিণত করার জন্যই টলষ্টয়ের মহত্ব। এই সত্যের সহিত পরিচিত হইবার পর হইতে টলষ্টয় ধন জন বিলাস সুখ ত্যাগ করিয়া ভোগত্যাগী হিন্দুর ন্যায় জীবন অতিবাহিত করিতেন।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

রাবণ বধ।

বঙ্গের প্রায় প্রত্যেকেই রামচন্দ্রের দুর্গোৎসব এবং রাবণবধের বিষয় রামায়ণপাঠে অবগত আছেন। বিকানীর রাজ্যে দশহরা ও দীপাবলীর সময় এই পর্ব্ব যেরূপে সম্পন্ন হয় তাহা বেশ একটু কৌতুকজনক। নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম।

প্রাচীন বিকানীর রাজ প্রাসাদ অতি সুদৃঢ় প্রস্তর নির্ম্মিত অত্যুচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত কেল্লার ভিতরে অবস্থিত। আজও পর্য্যন্ত সিংহাসন সেই পুরাতন প্রাসাদেই। কেল্লার ভিতরে অনেক দেবদেবীর মন্দিরও আছে। বর্ত্তমান মহারাজা কেল্লা হইতে দেড়মাইল দূরে নব্যধরণের এক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় অবস্থান করেন। দেবদেবীর পূজা কিম্বা দরবার উপলক্ষে তিনি প্রাচীন প্রাসাদে গমন করেন। দশহরার দিন মহারাজার জন্মদিন; তাই সেদিন তাঁহাকে দেবীর আরাধনায় এবং জন্মোৎসব দরবারে যোগদান করিতে পুরাতন প্রাসাদে আসিতে হয়। নেটিবগণ অর্থাৎ ভারতীয় সমস্ত অফিসার দরবারে এবং দেবী নিকেতনে নিমন্ত্রিত হইয়া থাকেন। দশহরার দিন এগারটায় সময় যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া আমরা মহারাজার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। প্রায় একটার সময় তিনি কেশরিয়া অর্থাৎ হলুদ রঙের আচকান, ছাকা এবং হীরক ও মণিমুক্তার হারে ভূষিত হইয়া দেবী পূজায় অগ্রসর হইলেন। এবং একে একে কয়েক জায়গায় পূজা সমাপ্তির পর দরবারে উপস্থিত হইয়া সিংহাসনে আসীন হইলেন। দরবার প্রকোষ্ঠ কিম্বা কারুকার্য্যখচিত সিংহাসন এবং সুবর্ণস্তম্ভোপরি চন্দ্রাতপাদির বর্ণনায় প্রবন্ধকলেবর বৃদ্ধির আবশ্যকতা দেখি না। রাজা সিংহাসন গ্রহণ করিলেন; পশ্চাদ্দেশে এক ব্যক্তি শাসন দণ্ড, দ্বিতীয় ব্যক্তি ঢাল তরবার এবং তৃতীয় ব্যক্তি চামর লইয়া দাঁড়াইল। চিরন্তন প্রথানুযায়ী নজর সেলামী হইয়া গেল। তার পর রাজা অপর আঙ্গিনায় গিয়া সাধারণের সেলামী গ্রহণ করিলেন এবং তিন চারি জন স্থানীয় লোককে জন্মদিনের উপাধি অর্থাৎ অনুগ্রহ সূচক নিদর্শন প্রদান করিলেন। এদিকে গরীবদের ভিতর স্থানে স্থানে আহার্য্য বণ্টন হইতে লাগিল। এইরূপে প্রায় বেলা শেষ হইয়া আসিল। একটী কথা উল্লেখ করিতে ভুলিয়াছি। দরবারের সময় প্রাঙ্গণে

নর্ত্তকীগণ দল বাঁধিয়া মাঙ্গলিক গীত গাইতেছিল।

তার পর সন্ধ্যার প্রাক্কালে রাবণবধের জন্য বিশেষ আয়োজন চলিতে লাগিল। কেল্লা হইতে আনুমানিক অর্দ্ধমাইল দূরে মাঠের ভিতর ৪।৫ ফুট উচ্চবেদির উপর একখানা ২০ ইঞ্চি পরিমিত রাবণ চিত্র দাঁড় করাইয়া রাখা হইয়াছে। কেল্লা হইতে চিত্র পর্য্যন্ত রাস্তার দুই পার্শ্বে ষ্টেটের সমস্ত সশস্ত্র অশ্বারোহী এবং পদাতিক সৈন্য শ্রেণী বাঁধিয়া মহারাজার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল এবং হাজার হাজার দর্শকের উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণ করিতেছিল। আনুমানিক ৬টার সময় রাজা রাবণ বধ করিতে অশ্বারোহণ করিলেন। এইখানে বলা আবশ্যক বিকানীর রাজা দেববংশ সম্ভূত বলিয়া বিবেচিত। আমরা পদব্রজে তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলাম। সুখের বিষয় রামানুচরের ন্যায় রাজার অনুসরণে আমাদিগকে সেতুবন্ধনের জন্য কোনরূপ প্রয়াস পাইতে হয় নাই। তবে কিনা অফিসারদিগকে পদব্রজে অর্দ্ধমাইল যাইতে আসিতেই অনেকটা অবসন্ন হইতে হইয়াছিল। যে রাজপুতগণ অনশনে অনিদ্রায় দিনরাত বিজনকাননে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্ষণেকর তরেও ক্লান্তি বোধ করিতেন না আজ তাঁহাদের বংশধরগণ এক মাইল পথ চলিতেও কাতর। এখানে দেখিতে পাই পঁচিশ ত্রিশ টাকা বেতনের কেরাণীও পদব্রজে চলিতে ফিরিতে কিম্বা সিকি মাইল দূরস্থ আফিষে যাইতে লজ্জা বোধ করেন। পতিত জাতির যতটা অধঃপতন সম্ভবপর তাহা হইয়াছে। যাহা হউক রণসাজে সাজিয়া যখন দশস্কন্ধ-রাবণকে বধ করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম তখন বাদ্য ঘণ্টায় দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত হইতে লাগিল। কতক দূর অগ্রসর হইলে পর মিছিল থামিয়া গেল। মহারাজা অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া এক কুল বৃক্ষের নীচে দেবীর আরাধনায় নিয়োজিত হইলেন। পুরোহিতগণ সজোরে মন্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিলেন। কুলবৃক্ষ এবং খেজুরি নামক এক জাতীয় বাবুল এ অঞ্চলে অতি পবিত্র। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টায় দেবীর আরাধনা সমাপ্ত হইল; তৎপর একটী ছাগশিশুর হত্যার পর মিছিল সোৎসাহে রাবণের দিকে ছুটিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া পৌঁছিলাম। দশস্কন্ধ রাবণকে বধ করিব বলিয়া এক মস্ত আশা পোষণ করিতেছিলাম কিন্তু সেখানে গিয়া এক মাথা এবং দুই হাত বিশিষ্ট রাবণকে দেখিয়া একটু উৎসাহ যেন কমিয়া গেল। রাজা পুনরায় অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন, এবং ধনুর্ব্বাণ হস্তে লইয়া প্রায় পাঁচ হাত দূর হইতে রাবণকে লক্ষ্য করিয়া শর নিক্ষেপ করিলেন। তীক্ষ্ণশর রাক্ষসরাজ রাবণের বক্ষভেদ করিয়া দূরে চলিয়া গেল। এদিকে অনুচরবর্গ ক্ষিপ্রহস্তে রাবণচিত্রকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ধূলিসাৎ করিল। এমন কি ঐ চিত্র যে ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান ছিল সে ভিত্তির উপরের স্তর পর্য্যন্ত দূরে নিক্ষিপ্ত হইলে পর অনুচরগণের আক্রোশ প্রশমিত হইল। রাবণ চিত্রের টুকরা এখানে মাদুলিতে পুরিয়া ছেলে-মেয়েদের গলায় দেওয়া হইয়া থাকে; উহাতে নাকি তাহাদের ব্যারাম পীড়ার আশঙ্কা কম থাকে। রাবণের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই চতুর্দ্দিক জয়ধ্বনিতে নিনাদিত হইতে লাগিল, তোপ-

খানার ১০১টী তোপ ধ্বনিতে মুহূর্ত্ত মধ্যে চতুর্দ্দিকে *বিজয় সন্দেশ বিজ্ঞাপিত হইয়া গেল।* জয়োল্লাসে মাতোয়ারাপ্রায় আমরা মহাসমারোহে কেল্লায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। ফিরিবার বেলায় মহারাজা সুবর্ণ এবং মণি-মুক্তাখচিত হাওদা এবং আস্তরণে ভূষিত হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। প্রায় আটটার সময় আমরা নিজ নিজ বাড়ীতে চলিয়া আসিলাম।

দ্বিতীয় দিবস পুনরায় নজরসেলামীর দরবার বসিল এবং পূর্ব্বদিনের ন্যায় সেলামী হইয়া গেল। প্রথম দিন জন্মোৎসব এবং দ্বিতীয় দিবস দশহরা উপলক্ষে সেলামী। দরবারের পর আমরা এক আঙ্গিনা বিশেষে সম্মিলিত হইলাম, সেখানে আমাদের ভিতর "জোয়ারী" অর্থাৎ দশহরার বক্সিস্ বা পারিতোষিক বিতরিত হইল। আমরা প্রত্যেকেই দুইটি টাকা এবং ছয়টী নারিকেল পাইলাম। পূর্ব্বে প্রত্যেককে একটি বিকানীর ষ্টেট মুদ্রা এবং একটী ব্রিটিশ মুদ্রা প্রদত্ত হইত। কিন্তু আজকাল বিকানীর ষ্টেটে মুদ্রা প্রস্তুত না হওয়ায় এবং সঞ্চিত বিকানীরী মুদ্রা নিঃশেষিত হওয়ায় এ বছর হইতে দুইটীই ব্রিটিশ মুদ্রা দেওয়া হইয়াছে।

দেওয়ালী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াই আজ এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। এ অঞ্চলে দেওয়ালীতে মহাসমারোহ হইয়া থাকে। বঙ্গের ছোট বড় ধনী দরিদ্র সকলেই যেমন দুর্গোৎসব ব্যাপারে মহাব্যস্ত; এখানে সেইরূপ দেওয়ালীতে সকলেই ব্যস্ত। এমন কি, দীনদরিদ্রগণ পর্য্যন্ত এখানে একবেলা ভোজন করিয়াও দেওয়ালীর জন্য কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করিয়া থাকে। এখানে ধনী ব্যক্তির বাড়ীতে প্রস্তর অথবা ইষ্টক নির্ম্মিত পাকা দালান এবং গরীবের কাঁচা দালান বা কোঠা-বাড়ী, বঙ্গের ন্যায় কাহারও বাড়ীতে খড়ের ছাউনী নাই। দেওয়ালীর প্রায় একমাস পূর্ব্ব হইতেই সকলে বাড়ী ঘর, পরিষ্কার করিয়া কোঠাগুলি অনেকটা গেরুয়া রঙের একপ্রকার মাটীতে লেপ দিতে আরম্ভ করে। তারপর উঠান এবং দরজার চারিদিক আলি-পনাচিত্রিত হইয়া থাকে। পিতা মাতা ভাই বন্ধু কোন নিকট আত্মীয়ের মৃত্যু হইলে এক বৎসর কাল ইহারা বাড়ী ঘর রং করে না; যেহেতু ঐ বৎসর ইহাদের শোকের বৎসর।

কার্ত্তিকের অমাবস্যার দিন প্রধান দেওয়ালী। এ অঞ্চলে দেওয়ালী তিন দিন। ত্রয়োদশীর দিন যম দেওয়ালী, চতুর্দ্দশীতে কালী দেওয়ালী এবং অমাবস্যার দিন রাণী দেওয়ালী। প্রথম দুইদিন অর্থাৎ যম এবং কালী দেওয়ালীতে ততটা সমারোহ হয় না। কোন কোন জায়গায় কিছু আলোকমালা এবং আতসবাজী দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের বঙ্গে শ্যামাপূজার দিন অমাবস্যা রাত্রি দীপান্বিতা হইয়া থাকে এখানে ঐদিন লক্ষ্মী পূজা। ঘরে ঘরে একখানা লক্ষ্মীদেবীর চিত্র টাঙ্গাইয়া গৃহস্বামীগণ সেদিন নিজে নিজেই উহার পূজা করিয়া থাকে। কোন কোন অবস্থাপন্ন ব্যক্তির বাড়ীতেই পুরোহিত আসে। চিত্রের সম্মুখে নারিকেল, গুড়, চিনি, লাড়ু, ভাজাভুজি প্রভৃতি রাখা হয়। রাণী দেওয়ালীর দিন এবং তার পর দিন শুধু আফিষ নহে বাজারের ক্রয় বিক্রয় এবং কৃষকের কর্ষণ প্রভৃতিও বন্ধ থাকে। আমাদের

অঞ্চলে সরস্বতী পূজার দিন যেমন দোয়াত পরিষ্কার করা হয় এবং স্বদেশী নলের কলম ব্যবহার করা হয় এ অঞ্চলে দেওয়ালীর দিন সেইরূপ পরিষ্কার দোয়াত, নলের কলম, স্বদেশী কালী, এবং জয়পুরী কাগজ ব্যবহার করা হয়। ঐ দিন যেন হালখাতার কায আরম্ভ হয়, ষ্টেটের ভিন্ন ভিন্ন অফিষেও ঐ দিন হইতে নূতন জিনিস ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

রাণী দেওয়ালীর দিন রাত্রিতে খুব সমারোহ। আলোক মালায় অমাবস্যার রাত্রিও যেন দিনের মত উজ্জ্বল হইয়া উঠে। বিকানীর সহরে অনেক লক্ষপতির বাস;—যদিও এরাজ্য রাজপুতানার মরুভূমিতে অবস্থিত তথাপি বিকানীরে যত ধনাঢ্য বণিকের বাস ভারতের আর কুত্রাপি—তেমন নাই; এই জন্য বিকানীর ভারতের চিকাগো নামে পরিচিত। বিকানীর রাজ্যে ছয় শতের উপর লাখপতি, ইহার মধ্যে আবার কতকগুলি ক্রোরপতি,অথচ এ মরুভূমিতে কৃষি নাই বলিলেও চলে; যত কিছু ধনৈশ্বর্য্য সমস্তই বাহির হঁইতে আহরিত। যে ব্যবসাবাণিজ্যের প্রতি এতদিনে বাঙ্গালীর মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে শুদ্ধ সেই ব্যবসাতেই ইহারা লাখপতি ক্রোরপতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাদের অনেককে কলিকাতা বোম্বে প্রভৃতি বড় বড় সহরে নিঃসম্বল গিয়া ফেরিওয়ালার কায পর্য্যন্ত করিতে হইয়াছে। অনেককে প্রথম অবস্থায় স্কন্ধে কাপড়ের বস্তা লইয়া "ধুতি, সাড়ি, কাপড়" "এক টাকায় তিন থানা কাপড়" বলিয়া গলিতে গলিতে ফেরি করিয়া ঘুরিতে হইয়াছে। বাণিজ্যে বাস্তবিকই লক্ষ্মীর বাস, তাই এ অঞ্চলে দেওয়ালীতে লক্ষ্মীপূজার এত জঁাক। বিকানীর সহরে ধনী বণিকদের মূল্যবান প্রস্তর অট্টালিকার সংখ্যা যথেষ্ট। সেদিন বোম্বের দেওয়ালী বিবরণীতে দেখিয়াছি যে তাড়িতালোক আজকাল তেলের বাতির স্থান দখল করিয়াছে। এখানে রাস্তা ঘাট এবং রাজপ্রাসাদ তাড়িতালোকে উদ্ভাসিত হইলেও পর্ব্বোপলক্ষে তাড়িত আলোকমালার বন্দোবস্ত এখনও হয় নাই। কিন্তু তাড়িতের আলো না হইলেও সেদিন মাড়োয়ারী বণিকদের বাড়ী আলোক রশ্মিতে ঝক্‌মক্‌ করিতেছিল।

উপসংহারে ষ্টেটের দেওয়ালী উৎসব সম্বন্ধে দুই একটী কথা উল্লেখ করিব। রাণী দেওয়ালীর দিন সন্ধ্যাবেলায় আমরা নির্দ্দিষ্ট সময়ে কেল্লায় সমবেত হইলাম, কিছুক্ষণ পরে মহারাজা নূতন প্রাসাদ হইতে কেল্লায় উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মীদেবীর মন্দিরে গিয়া দেবী অর্চ্চনা করিলেন। তার পর সকলে পদব্রজে প্রাসাদের বাহিরে অপর এক মন্দিরের বারেন্দায় গমন করিলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই কয়েকজন ব্যক্তি সমাগত প্রত্যেকের হাতেই দুইটী করিয়া মশাল দিল। মশালগুলি অনেকটা আমাদের হাওয়াই বাজীর মত, নলের মাথায় তেলের ছোট ছোট মশাল। প্রায় পঞ্চাশ হাত দূরে একটী সুসজ্জিত বলদ রক্ষিত হইতেছিল। আমরা সকলে মসালে আগুন লাগাইয়া মহারাজা নিক্ষেপ করার পর একসঙ্গে মশালগুলি বলদের দিকে নিক্ষেপ করিলাম। বলাবাহুল্য মশালগুলি মাত্র পাঁচ হাত দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। তার পর বলদকে তথা হইতে লইয়া গেল। অনেককে জিজ্ঞাসা করিয়াও ইহার কারণ বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। অনেকেই বলিল, প্রাচীন কাল

হইতে এই প্রথার প্রচলন আছে। কারণ অনুসন্ধানে তাহারা নিতান্তই নিস্পৃহ। তার পর মহারাজা এক শিবিকা বা দোলনায় চড়িয়া অপর এক মন্দিরে চলিলেন, আমাদের কায ঐ পর্য্যন্তই শেষ হওয়ায় আমরা বাড়ী ফিরিলাম। মশালগুলি সাধারণ লোকে কুড়াইয়া লইল। উহা ঘরে থাকিলে নাকি অসুখ বিসুখের আশঙ্কা কম থাকে।

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় আবার আমরা কেল্লায় সমবেত হইলাম। সেদিন মহারাজা উপস্থিত হইতে পারেন নাই। শাসন দণ্ড,চামর, ঢাল তরওয়াল প্রভৃতি তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ ধরিয়া লওয়া হইল। মন্দিরে মন্দিরে পূজা হইল, তার পর প্রাসাদের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে হাতি দৌড়, এবং ঘোড়াদৌড় দেখিয়া রাত্রি আটটায় বাড়ী ফেরা গেল। পরদিন প্রাতে অনেকটা বাঙ্গালা দেশের বিজয়া সম্ভাষণ। জাপানের ন্যায় সকলে পরস্পর দেওয়ালীর রাম রাম জানাইতে বাহির হইলাম। ঐ দিবস এগারটার সময় নজর দরবার বসিল। মহারাজা সশরীরে উপস্থিত না হওয়ায় সিংহাসন দণ্ড প্রভৃতিকে প্রতিনিধি ধরিয়া নজর সেলামী শেষ করা হইল। তার পর দশহরার ন্যায় আমরা প্রত্যেকে নারিকেল এবং দুই টাকার জোয়ারী লইয়া ঘরে ফিরিলাম।

শ্রীযদুনাথ সরকার।

অন্তঃপুর প্রসঙ্গ।

লক্ষ্মীর শ্রী।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবার আবশ্যকতা বুঝিলে কোনও বিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য যাইতে হয় না। মহিলাগণ নিজে নিজেই ঘরে ঘরে সে ব্যবস্থা করিতে পারেন। আমরা স্বভাবতঃ এক হিসাবে অপরিষ্কার। "বিছানা শেষ" মাসান্তেও ধোপার বাড়ী যায় না এমন গৃহস্থ বিস্তর। পরিধেয় বসন নিত্য তিন চার বার ধোয়া হয়—কিন্তু মলিনতার দিকে দৃষ্টি আদপে আমাদের নাই! অনেকে বলিবেন যে "আমরা চব্বিশ ঘণ্টা রান্না বান্না নিয়া ছেলে পিলে নিয়া ব্যস্ত থাকি; আমরা গরীব মানুষ—আমাদের মেম সাজিবার অবসরও নাই, অত ধোপার কড়ি 'দেবার পয়সাও নাই।" এক কথায় ইহা সকলেরই সঙ্গত মনে হইবে। কিন্তু আলোচনা করিয়া দেখিলে বেশ বোঝা যায় যে অবসর বা অভাবের জন্য যে আমরা সর্ব্বদা অপরিচ্ছন্ন থাকি তাহা নহে; সে দিকে আমাদের দৃষ্টি নাই বলিয়াই আমরা অপরিচ্ছন্ন থাকি।

ছেলেবেলা গল্প শুনিয়াছি রাজকন্যা "গোসা" ঘরে গিয়া শয়ন করিয়া আছেন শুনিয়া রাজা রাণী অস্থির—"কেন মা তুমি রাগ করিয়া কাঁদিতেছ কেন।" অনেক সাধ্য সাধনায় রাজকন্যা বলিলেন —"আমার ধূলামুঠি কাপড় চাই।" তখন রাজা ও রাণী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন —"তুমি আমাদের সর্ব্বস্ব—সাত রাজার ধন এক মাণিক, আর যা চাও তাই দিব—কিন্তু

ধূলামুঠি কাপড় দিতে পারিব না।” এই কথার অর্থ এই যে, শিশু খেলা করিতে করিতে অপরিষ্কার হাতে মুঠা করিয়া কাপড় ধরিবে সেই অপরিষ্কার কাপড় তিনি চাহেন অর্থাৎ তাঁহার সন্তান হয় নাই তাই মনঃকষ্ট। অতএব দেখা যাইতেছে শিশু সন্তান ঘরে থাকিলেই ঘরদ্বার পরিধেয় বসন প্রভৃতি অপরিষ্কার অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। এবং ইহাও সত্য যে রাজকন্যারা যে “ধূলামুষ্টি কাপড়” পরিতেন তাহা অসচ্ছলতা বশতঃ নহে অভ্যাস বশতঃ।

এই যে সর্ব্বদা অপরিচ্ছন্ন থাকা আমাদের অভ্যাস ইহা আমাদের বহুদিনের। ধনীগৃহেও ইহার প্রচলন খুব বেশি। প্রচুর দাস দাসী থাকিলেও ঘর দ্বার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইলেও বিছানা বা শিশু সন্তানের কাপড় চোপড় বা মহিলাদের বসন সর্ব্বদা মলিন দেখা যায়। অনেক সুশিক্ষিত ভদ্রলোকের এখনও এমন বিশ্বাস যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইলেই সে “বাবু” সে “অকর্ম্মণ্য”। সামান্য আয়াসেই যে পরিচ্ছন্ন থাকা যায়—ইহা আমরা ধারণা করিতে পারি না। রেলওয়ে ষ্টেসনের ধারে ধারে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ম্মচারীদের বাসা দেখা যায়—তাহা দেখিবা মাত্রই বুঝিতে পারা যায় যে ইহাতে বাঙ্গালী অথবা ফিরিঙ্গী বসবাস করিতেছেন। সেই একই বাড়িতে কখনও বাঙ্গালী কখনও ফিরিঙ্গী বাস করেন—কিন্তু ফিরিঙ্গী হইলেও তাহার শ্রী ও পরিচ্ছন্নতা সকলের দৃষ্টি যে বিশেষ করিয়া আকর্ষণ করে তাহা অস্বীকার করা যায় না। এই ফিরিঙ্গী যে ধনী এবং তাঁহার দাস দাসী যে অনেক তাহা নহে—কেবল অভ্যাস বশেই তাঁরা পরিচ্ছন্ন থাকিতে পারেন। অভাব যদি অপরিচ্ছন্নতার মূল হইত তবে ধনী গৃহে অপরিচ্ছন্নতা দেখা যাইত না। আমাদের একটী ধনী আত্মীয়া মহিলা সর্ব্বদা দুই তিন সের সোণার গহনা পরিধান করিয়া থাকিতেন—কিন্তু মলিন বস্ত্রের দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টিক্ষেপ করিতেন না। তাঁহার সন্তানাদি ছিল না তথাপি আমি কখনও পরিষ্কার বস্ত্র পরিতে দেখি নাই। কেবল একদিন কোন নিমন্ত্রণ স্থলে প্রচুর অলঙ্কার ও বহুমূল্য বারাণসী বস্ত্রে ভূষিত দেখিয়াছিলাম। আমাদের দেশে অপরিচ্ছন্নতা অর্থাৎ মলিন বস্ত্র পরিধান বিনয়ের লক্ষণ। মহিলাগণ নিমন্ত্রণে বারাণসী বোম্বাই শিল্ক প্রভৃতির সাড়ী পরিয়া গিয়াছেন—বসিবার জন্য আসন দিবার অপেক্ষা করিয়া থাকা অসম্ভব; “বড় মানুষির” পরিচায়ক; অতএব পরিধেয় বসন যতই বহুমূল্য হউক না কেন “ধুপ” করিয়া যেখানে সেখানে বসিয়া না পড়িলে নিন্দার ভাজন হইতে হয়। এই সকল ভাবিলে দেখা যায় যে অপরিচ্ছন্নতা আমাদের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। আচার অনুষ্ঠানের ত্রুটির দিকে যেমন আমাদের খর দৃষ্টি অপরিচ্ছন্নতার দিকে দৃষ্টি একেবারেই নাই। উঠানের এক কোণে নিকান’ পোঁছান তুলসী মঞ্চ—আর এক কোণে আবর্জ্জনার রাশি। সে আবর্জ্জনা যদি প্রতিদিন বেড়ার ও পারে ফেলা হইত তবে উঠানটি ত পরিষ্কার থাকিত। ইহাতে কিছুমাত্র ব্যয় হইত না। মুষ্টি মুষ্টি আবর্জ্জনা জমা হইয়া এখন একটা ভূতের বোঝা হইয়াছে এখন

আর পয়সা ব্যয় ভিন্ন পরিষ্কার হয় না।

পরিধেয় বসন সর্ব্বদা অল্প আয়াসেই পরিষ্কার যে রাখা যায় তাহা অনেকেই জানেন। প্রত্যহ নিয়মিত শিশুদের ও নিজেদের কাপড় গুলি যদি শুধু "জল কাচার" পরিবর্ত্তে একটু সাবান দিয়া লওয়া হয় তবে সর্ব্বদা পরিষ্কার থাকে। যথেষ্ট ময়লা না হইলে সামান্য সাবান ও অল্প সময়েই কাপড় পরিষ্কার হয়! অনেক মহিলাকে দেখা যায় সন্তানদের জামাটা কিম্বা ধুতি খানা লইয়া ছেলেকে দুধ খাওয়াইতে বসিলেন তার পর তাহাতে দুধ মোছা কাদা মোছা শেষে ঘর শুদ্ধ মোছা হইল—তার পর জলে ধুইয়া দেওয়া হইল পর দিন আবার বালক তাহাই পরিবে। এই প্রকারে যে বস্ত্র ময়লা হয় তাহা শুধু জলে কেন ধোপার বাড়ী গিয়াও ভালরূপ শাদা হয় না। অতএব কাপড়গুলি যাহাতে যত কম ময়লা হয় প্রথমে পরিবারস্থ সকলের সে দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। জামা কাপড়ে কোন মতেই কাদা ধুলা পোঁছা উচিত নহে। অনেক মহিলার আঁচলে হাত মোছা অভ্যাস আছে। তরকারী খাইয়া হাত ধুইয়া আঁচলে হাত মুছিলে তেল ঘি হলুদ কাপড়ে মাখামাখি হয়। এ সকল পরিহার করা কর্ত্তব্য। তার পর নিত্য স্নানের সময় নিজ নিজ পরিধেয় বসন ও শিশু সন্তানদের কাপড় গুলি নিয়মিত সাবান দিয়া ধুইয়া দিলে বিশেষ শ্রম বা পয়সা ব্যয় হয় না। প্রত্যহ এক পয়সার সাবানে ৪।৫ খানা বড় . ধুতি ও ছোট ছোট তোয়ালে, রুমাল মোজা প্রভৃতি ৫।৭ খানা অনায়াসে ধুইয়া লওয়া যায়। ইহাতে ধোবার ব্যয়ও কমান যায়। যাঁহাদের দাসদাসীর অপ্রতুল নাই তাঁহারা নিয়মিত দাসদাসীদের দ্বারা সাবান দিয়া কাপড় ধোয়াইতে পারেন। তবে যাঁহারা মনে করেন যে সাবানের একটা পয়সা থাকিলে মোহন ভোগ কিনিয়া দিব, এবং যতক্ষণ কাপড় ধুইব ততক্ষণ একটু গড়াইয়া বাঁচিব, তাঁহাদের প্রতি নিবেদন এই যে, সাবধানে সাবান খরচ করিলে চারি আনার বারসোপে এক মাস চালান যায়। কি ধনী দরিদ্র ভাত সকল ঘরেই রান্না হয়। এই ভাতের ফেনে একটু সাবান ফেলিয়া গুলিয়া তাহাতে ৪.৫ খানা কাপড় বেশ পরিষ্কার হয়। একটু গরম গরম আছড়াইয়া লইলে শীঘ্র ময়লা দূর হয়।

সকলেই অনুভব করিতে পারেন যে যেদিন ধোপা আসে সে দিন বেশ একটু সচ্ছন্দতা অনুভব করা যায়—মনটা প্রফুল্ল হয়। ইহাতে বুঝা যায় যে মলিনতা অপ্রফুল্লকর।

অতি শিশুকাল হইতে মলিনতার দিকে যদি শিশু সন্তানের ঘৃণা জন্মাইয়া দেওয়া যায় তবে ক্রমশঃ বয়স বৃদ্ধির সহিত সে আপনিই অপরিচ্ছন্নতা হইতে দূরে থাকিবে। জল ঘাঁটিতে সকল শিশুই ভালবাসে; যে কোন কিছু আহারের পর হাত ধুইয়া দেওয়া বা হাত ধুইতে বলায় শিশুরা বিরক্ত হয় না। আমরা ভাত ব্যঞ্জনের বাটীটা যদি স্পর্শ করি তাহা হইলে হাত ধুইয়া ফেলি,—কিন্তু দুধের সরটা হাত দিয়া তুলিয়া বা রসগোল্লাটা ছেলেকে খাওয়াইয়া অনায়াসে কাপড়ে হাতটা মুছিয়া রাখিতে পারি।

কারণ তাহা সখ্‌ড়ি নহে। এইজন্য সচরাচর দেখা যায় খাবার খাইয়া ছেলেরা হাত ধোয় না। তারপর সেই হাতে ছুঁ'নয়ার জিনিষ ধরে। 'কিছুকাল হইতে এই সকলে ঘৃণা জন্মাইলে বালকবালিকা আপনা-আপনি ধূলাকাদা হইতে পরিধেয় বস্ত্রাদি রক্ষা করিয়া চলিতে পারে। ৪।৫ বৎসরের বালকবালিকা স্নানের সময় অনায়াসে নিজের নিজের কাপড় সাবান দিয়া ধুইয়া দিতে পারে।

একজন গৃহস্থের বাড়ীতে প্রবেশ কর—বাড়ীর গৃহিণী কেমন তাহা "এক নজরেই" বোঝা যায়। সুগৃহিণীর যেখানে সেখানে যখনি যাও দেখিবে সমস্তই পরিপাটি। আলনার কাপড়গুলি গোছান থাকিলে যে ঘরের কতখানি শোভা বৃদ্ধি হয়—বিশৃঙ্খলা কতখানি দূর হয় তাহা সুগৃহিণী বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন। বাড়ীর মধ্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঘরটিই আমাদের শয়নগৃহ—অতিথি যে কোন মহিলাই সেইখানে অভ্যর্থনা লাভ করেন। সেই ঘরে গিয়া দেখিবে একদিকে একখানা খাট তার আধখানা মসারি ফেলা আধখানা তোলা ২,৩টা বালিস এলোমেলো ভাবে পড়িয়া আছে—একখানা চাদর জড় করা আছে, একটী ছেলে ঘুমাইতেছে। ওধারে যোড়া তক্তা পাতা তার এক পাশে, কতকগুলা লেপ কাঁথা বালিস স্তুপাকৃতি, এ পাশে কতকগুলা ছোট বালিস কাঁথা, ছোট ছেলের জামা ছড়ান, আর এক ধারে আলনার উপর কর্ত্তার কামিজ কোট, গৃহিণীর ডুরে সাড়ী হইতে ছেলেদের সব কাপড়,—রাশিকৃত ময়লা ফরসা বিবিধ প্রকারের বস্ত্রের বোঝা, আর দিকে আলমারীর মাথায় রাজ্যের বাজে জিনিস—ঘরের মেঝেতে দুধের বাটী ঝিনুক শালপাতা খাবারের গুঁড়া জল কাদা—ইহার মধ্যে কোন মতে আগন্তুকের স্থান হইল। আর যাহাই হউক ইহা যে অশোভন তাহা অস্বীকার করা যায় না। সুগৃহিণীর ঘরে দ্বারে এমন দৃশ্য কোন সময়েই কখনও দেখা যায় না। ঘর দ্বার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, মলিনতা ও বিশৃঙ্খলা দূর করা যে কেবলমাত্র সুগৃহিণীর গৃহিণীপনায় সাধিত হয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। "সকড়ির বিচার" ও "শুচির আচারের" সহিত পরিচ্ছন্নতা মিলিত হইলে আমাদের প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহই সৌন্দর্য্যময় করিতে পারে। একজন দরিদ্র ফিরিঙ্গী মহিলার ঘর দ্বার যে আমাদের সম্ভ্রান্ত মহিলাদের ঘর দ্বারকে ধিক্কার দিতে পারে ইহা গৌরবের বিষয় নহে। অশোভনতার দিকে দৃষ্টি পড়িলে অল্প আয়াসে ও স্বল্প ব্যয়ে ঘরে ঘরে পরিচ্ছন্নতা আনিতে পারা যায়। ইহাতে লক্ষ্মীর শ্রীও বৃদ্ধি হয়।

সমালোচনা।

ঠগী কাহিনী। শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ সান্যাল মল্লিক প্রণীত। হিতবাদী পুস্তকালয় হইতে প্রকাশিত হিতবাদী প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দেড় টাকা মাত্র। গ্রন্থখানি মেডোস টেলর রচিত সুবিখ্যাত ইংরাজী গ্রন্থের (Confessions of a Thug) বঙ্গানুবাদ। মূল গ্রন্থের উপকারিতা ও হৃদয়গ্রাহিতা

বিশ্ববিশ্রুত। গ্রন্থখানি এক অত্যাচারের ভীষণ কাহিনী, পাঠে শরীরে রোমাঞ্চ হয়। অনুবাদের ভাষাও বেশ সরল ও মিষ্ট হইয়াছে। আগাগোড়া দিব্য কৌতূহল জাগরূক রাখে। অনুবাদকের পক্ষে ইহা কৃতিত্বের পরিচায়ক। যাঁহারা Sensational নভেল প্রভৃতির পক্ষপাতী, এ গ্রন্থখানি তাঁহাদিগকে বিশিষ্ট আনন্দদান করিবে।

পাগলের কথা। ৺ দেবেন্দ্রনাথ দাস প্রণীত। দাস যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা মাত্র। স্বর্গীয় গ্রন্থকার শিক্ষাকার্য্যে জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন। প্রোফেসার ডি, এন, দাস নামেই তাঁহার পরিচয়। এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। সরলভাবে এবং এমন অকপট আন্তরিকতার সহিত জীবনকাহিনী অল্প লেখকই বর্ণনা করিতে পারেন। তেজস্বী আচার্য্যের জীবনত্যাগ ও আত্মনির্ভরতার কাহিনীতে সমুজ্জ্বল। বিলাত ফেরত হইয়া তিনি যে অনাড়ম্বর জীবন বহন করিয়া গিয়াছেন আধুনিক বিলাত ফেরত সম্প্রদায় এবং বঙ্গবাসীমাত্রেরই পক্ষে তাহা অনুকরণীয়। আমরা আপামর সাধারণকে এই গ্রন্থ পাঠে অনুরোধ করি,—ইহা মনুষ্যত্ব বিকাশের পক্ষে যে প্রভূত সহায়তা করিবে, তাহা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি। গ্রন্থকারের একখানি হাফটোন চিত্র গ্রন্থাগ্রে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

কাননিকা। বৈভ্রাজিকা। শ্রীমতী ইন্দুপ্রভা প্রণীত। ভারতমিহির প্রেসে মুদ্রিত। দুইখানিই কবিতাগ্রন্থ। কাব্যরচনায় লেখিকার এই প্রথম প্রয়াস। কবিতাগুলির অধিকাংশই জন্মভূমির প্রতি অনুরাগব্যঞ্জক। লেখিকার সাধনা সফল হউক, ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা।

পাপ ও পুণ্য। শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ লাহিড়ী প্রণীত। ইণ্ডিয়া প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা মাত্র। এখানি ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থ। ভারত সম্রাট অশোকের পুত্র কুণালের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। এখানি ক্ষুদ্র কাব্য, মাঝে মাঝে লেখকের কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

ইসলাম চিত্র। মৌলবী শেখ আবদুল জব্বার সম্পাদিত। বনগ্রাম গফরগাঁও, ময়মনসিং হইতে প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা মাত্র। লেখক অল্লায়তনের মধ্যে মুসলমান সমাজের দোষাদি নিরূপণ ও তন্নিরাকরণের উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। লেখকের ভাষা বেশ প্রাঞ্জল ও সরল, এবং সামাজিক মতাদি বেশ সংযতভাবেই তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন। সেগুলির গ্রহণীয়তা অবশ্য মুসলমানগণের বিচার্য্য। লেখকের রচনায় একটী বিশেষ ত্রুটি উচ্ছ্বাসের অতিরিক্ত প্রাবল্য! লেখক এ বিষয়ে অবহিত হইবেন কারণ উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে বক্তব্য পরিস্ফুট হইতে পারে না।

মক্কা শরীফের ইতিহাস। মৌলবী শেখ আবদুল জব্বার প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য বার আনা মাত্র। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা প্রীতিলাভ করিয়াছি। ইহাতে মক্কার ইতিহাস, বেশ সুশৃঙ্খল ধারাবাহিকতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। ভাষাটুকুও সুন্দর। গ্রন্থকার এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

কবিরাজী ঔষধ প্রস্তুত শিক্ষা। শ্রীযুক্ত বিজয়নারায়ণ গুপ্ত কবিরাজ প্রণীত। ৯৪।২নং বিডন ষ্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য চারি আনা। এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিতে পারা, গন্ধক পর্পটী প্রভৃতির শোধনপ্রণালী, ক্বাথ, অরিষ্ট, মধ্যমনারায়ণ তৈল, ছাগলাদ্য ঘৃত প্রভৃতির পাকপ্রণালী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। প্রণালীগুলি অল্পব্যয় সাধ্য বলিয়াই কবিরাজ মহাশয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৪৪, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

রচনা-নিরত রবীন্দ্রনাথ

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক ১৪ই পৌষ ১৩১৭ তারিখে অঙ্কিত

ভারতী

৩৪শ বর্ষ] মাঘ, ১৩১৭ [১০ম সংখ্যা

সামঞ্জস্য।*

এই বিশ্বচরাচরে আমরা বিশ্বকবির যে লীলা চারদিকেই দেখ্‌তে পাচ্চি সে হচ্চে সামঞ্জস্যের লীলা। সুর, সে যত কঠিন সুরই হোক্‌, কোথাও ভ্রষ্ট হচ্চে না; তাল, সে যত দুরূহ তালই হোক্‌, কোনো জায়গায় তার স্খলনমাত্র নেই। চারদিকেই গতি এবং স্ফূর্ত্তি, স্পন্দন এবং নর্ত্তন, অথচ সর্ব্বত্রই অপ্রমত্ততা। পৃথিবী প্রতিমুহূর্ত্তে প্রবলবেগে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করচে, সূর্য্য প্রতিমুহূর্ত্তে প্রবলবেগে কোন এক অপরিজ্ঞাত লক্ষ্যের অভিমুখে ছুটে চলেছে, কিন্তু আমাদের মনে ভাবনামাত্র নেই—আমরা সকাল বেলায় নির্ভয়ে জেগে উঠে দিবসের তুচ্ছতম কাজটুকুও সম্পন্ন করবার জন্যে মনোযোগ করি এবং রাত্রে একথা নিশ্চয় জেনে শুতে যাই যে, দিবসের আয়োজনটি যেখানে যেমনভাবে আজ ছিল সমস্ত রাত্রির অন্ধকার ও অচেতনতার পরেও ঠিক তাকে সেই জায়গাতেই তেম্‌নি করেই কাল পাওয়া যাবে। কেননা, সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য আছে; এই অতি প্রকাণ্ড অপরিচিত জগৎকে আমরা এই বিশ্বাসেই প্রতিমুহূর্ত্তে বিশ্বাস করি।

অথচ এই সামঞ্জস্য ত সহজ সামঞ্জস্য নয়—এ ত মেষে ছাগে সামঞ্জস্য নয়, এ যেন বাঘে গোরুতে একঘাটে জল খাওয়ানো। এই জগৎক্ষেত্রে যে সব শক্তির লীলা তাদের যেমন প্রচণ্ডতা তেমনি তাদের বিরুদ্ধতা—কেউবা পিছনের দিকে টানে কেউবা সামনের দিকে ঠেলে, কেউবা গুটিয়ে আনে, কেউবা ছড়িয়ে ফেলে, কেউবা বজ্রমুষ্টিতে সমস্তকে তাল পাকিয়ে নিরেট করে ফেলবার জন্যে চাপ দিচ্চে, কেউবা তার চক্রযন্ত্রের প্রবল আবর্ত্তে সমস্তকে গুঁড়িয়ে দিয়ে দিগ্বিদিকে উড়িয়ে ফেলবার জন্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে। এই সমস্ত শক্তি অসংখ্যবেশে এবং অসংখ্যতালে ক্রমাগতই আকাশময় ছুটে চলেছে, তার বেগ, তার বল, তার লক্ষ্য, তার বিচিত্রতা আমাদের ধারণাশক্তির অতীত; কিন্তু এই সমস্ত প্রবলতা, বিরুদ্ধতা, বিচিত্রতার উপরে অধিষ্ঠিত অবিচলিত অখণ্ড সামঞ্জস্য। আমরা যখন জগৎকে কেবল তার কোনো একটামাত্র দিক থেকে দেখি তখন গতি এবং আঘাত এবং বিনাশ দেখি কিন্তু সমগ্রকে যখন দেখি তখন দেখ্‌তে পাই নিস্তব্ধ সামঞ্জস্য। এই সামঞ্জস্যই হচ্চে তাঁর স্বরূপ যিনি শান্তং শিবমদ্বৈতং।

* বোলপুর শান্তিনিকেতনের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষ্যে ৭ই পৌষ সন্ধ্যাকালে পঠিত।

জগতের মধ্যে সামঞ্জস্য তিনি শান্তং, সমাজের মধ্যে সামঞ্জস্য তিনি শিবম্, আত্মার মধ্যে সামঞ্জস্য তিনি অদ্বৈতম্।

আমাদের আত্মার যে সত্য সাধনা তার লক্ষ্যও এই দিকে, এই পরিপূর্ণতার দিকে—এই শান্ত শিব অদ্বৈতের দিকে; কখনই প্রমত্ততার দিকে নয়। আমাদের যিনি ভগবান তিনি কখনই প্রমত্ত নন; নিরবচ্ছিন্ন সৃষ্টিপরম্পরার ভিতর দিয়ে অনন্ত দেশ ও অনন্তকাল এই কথারই কেবল সাক্ষ্য দিচ্চে। "এষ সেতু বিধরণ লোকানামসম্ভেদায়।"

এই অপ্রমত্ত পরিপূর্ণ শান্তিকে লাভ করবার অভিপ্রায় একদিন এই ভারতবর্ষের সাধনার মধ্যে ছিল। উপনিষদে ভগবদ্গীতায় আমরা এর পরিচয় যথেষ্ট পেয়েছি।

মাঝখানে ভারতবর্ষে বৌদ্ধযুগের যখন আধিপত্য হল তখন আমাদের সেই সনাতন পরিপূর্ণতার সাধনা নির্ব্বাণের সাধনার আকার ধারণ করলে। স্বয়ং বুদ্ধের মনে এই নির্ব্বাণ শব্দটির অর্থ যে কী ছিল তা এখানে আলোচনা করে কোনো ফল নেই কিন্তু দুঃখের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্যে শূন্যতার মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করাই যে চরম সিদ্ধি এই ধারণা বৌদ্ধযুগের পর হতে নানা আকারে ন্যূনাধিক পরিমাণে সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়িয়ে গিয়েছে।

এমনি করে পূর্ণতার শান্তি একদিন শূন্যতার শান্তি আকারে ভারতবর্ষের সাধনা-ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছিল। সমস্ত বাসনাকে নিরস্ত করে সমস্ত প্রবৃত্তির মূলোচ্ছেদ করে দিয়ে তবেই পরম শ্রেয়কে লাভ করা যায় এই মত যেদিন থেকে ভারতবর্ষে তার সহস্র মূল বিস্তার করে দাঁড়াল সেইদিন থেকে ভারতবর্ষের সাধনায় সামঞ্জস্যের স্থলে রিক্ততা এসে দাঁড়াল; সেইদিন থেকে প্রাচীন তাপসাশ্রমের স্থলে আধুনিককালের সন্ন্যাসাশ্রম প্রবল হয়ে উঠ্‌ল এবং উপনিষদের পূর্ণস্বরূপ ব্রহ্ম শঙ্করাচার্য্যের শূন্যস্বরূপ ব্রহ্মরূপে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদে পরিণত হলেন।

কেবলমাত্র কঠোর চিন্তার জোরে মানুষ নিজের বাসনা ও প্রবৃত্তিকে মুছে ফেলে জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডকে বাদ দিয়ে শরীরের প্রাণক্রিয়াকে অবরুদ্ধ করে একটি গুণলেশহীন অবচ্ছিন্ন (abstract) সত্তার ধ্যানে নিযুক্ত থাকতেও পারে কিন্তু দেহমনহৃদয়বিশিষ্ট সমগ্র মানুষের পক্ষে এরকম অবস্থায় অবস্থিতি করা অসম্ভব এবং সে তার পক্ষে কখনই প্রার্থনীয় হতে পারে না। এই কারণেই তখনকার জ্ঞানীরা যাকে মানুষের চরম শ্রেয় বলে মনে করতেন তাকে সকল মানুষের সাধ্য বলে গণ্যই করতেন না। এই কারণে এই শ্রেয়ের পথে তাঁরা বিশ্বসাধারণকে আহ্বান করতেই পারতেন না—বরঞ্চ অধিকাংশকেই অনধিকারী বলে ঠেকিয়ে রাখ্‌তেন এবং এই সাধারণ লোকেরা মূঢ়ভাবে যে-কোনো বিশ্বাস ও সংস্কারকে আশ্রয় করত তাকে তাঁরা সকরুণ অবজ্ঞাভরে প্রশ্রয় দিতেন। যে যেনে যেটা যেমনভাবে আছে ও চল্‌চে, তাই নিয়েই সাধারণ মানুষ সন্তুষ্ট থাকুক্ এই তাঁদের কথা ছিল, কারণ, সত্য মানুষের পক্ষে এতই সুদূর, এতই দুরধিগম্য, এবং সত্যকে পেতে গেলে নিজের স্বভাবকে মানুষের এম্‌নি সম্পূর্ণ বিপর্য্যস্ত করে দিতে হয়!

দেশের জ্ঞান এবং দেশের অজ্ঞানের মধ্যে, দেশের সাধনা এবং দেশের সংসারযাত্রার

মধ্যে এতবড় একটা বিচ্ছেদ কখনই সুস্থভাবে স্থায়ী হতে পারে না। বিচ্ছেদ যেখানে একান্ত প্রবল সেখানে বিপ্লব না এসে তার সমন্বয় হয় না, কী রাষ্ট্রতন্ত্রে, কী সমাজতন্ত্রে, কী ধর্ম্মতন্ত্রে।

আমাদের দেশেও তাই হল। মানুষের সাধনাক্ষেত্র থেকে জ্ঞানী যে হৃদয় পদার্থকে অত্যন্ত জোর করে একেবারে সম্পূর্ণ নির্ব্বাসিত করে দিয়েছিল সেই হৃদয় অত্যন্ত জোরের সঙ্গেই অধিকার-অনধিকারের বেড়া চুরমার করে ভেঙে বন্যার বেগে দেখ্‌তে দেখ্‌তে একেবারে চতুর্দ্দিক প্লাবিত করে দিলে, অনেকদিন পরে সাধনার ক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন খুব ভরপুর হয়ে উঠ্‌ল।

এখন আবার সকলে একেবারে উল্টো সুর এই ধরলে যে, হৃদয়বৃত্তির চরিতার্থতাই মানুষের সিদ্ধির চরম পরিচয়। হৃদয়বৃত্তির অত্যন্ত উত্তেজনার যে সমস্ত দৈহিক ও মানসিক লক্ষণ আছে, সাধনায় সেইগুলির প্রকাশই মানুষের কাছে একান্ত শ্রদ্ধালাভ করতে লাগল।

এই অবস্থায় স্বভাবত মানুষ আপনার ভগবানকেও প্রমত্ত আকারে দেখতে লাগ্‌ল। তাঁর আর সমস্তকেই খর্ব্ব করে কেবলমাত্র তাঁকে হৃদয়াবেগ-চাঞ্চল্যের মধ্যেই একান্ত করে উপলব্ধি করতে লাগ্‌ল এবং সেই রকম উপলব্ধি থেকে যে একটি নিরতিশয় ভাববিহ্বলতা জন্মায় সেইটেকেই উপাসনার পরাকাষ্ঠা বলে গণ্য করে নিলে।

কিন্তু ভগবানকে এই রকম করে দেখাও তাঁর সমগ্রতা থেকে তাঁকে অবচ্ছিন্ন করে দেখা। কারণ মানুষ কেবলমাত্র হৃদয়পুঞ্জ নয়, এবং নানাপ্রকার উপায়ে শরীর মনের সমস্ত শক্তিকে কেবলমাত্র হৃদয়াবেগের ধারায় প্রবাহিত করতে থাকলে কখনই সর্ব্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের যোগে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগসাধন হতে পারে না।

হৃদয়াবেগকেই চরমরূপে যখন প্রাধান্য দেওয়া হয় তখনই মানুষ এমন কথা অনায়াসে বল্‌তে পারে যে, ভক্তিপূর্ব্বক মানুষ যাকেই পূজা করুক্ না কেন তাতেই তার সফলতা। অর্থাৎ যেন, পূজার বিষয়টি ভক্তিকে জাগিয়ে তোলবার একটা উপায়মাত্র; যার একটা উপায়ে ভক্তি না জন্মে তাকে অন্য যা-হয় একটা উপায় জুগিয়ে দেওয়ায় যেন কোনো বাধা নেই। এই অবস্থায় উপলক্ষ্যটা যাই হোক্, ভক্তির প্রবলতা দেখ্‌লেই আমাদের মনে শ্রদ্ধার উদয় হয়—কারণ প্রমত্ততাকেই আমরা সিদ্ধি বলে মনে করি।

এই রকম হৃদয়াবেগের প্রমত্ততাকেই আমরা অসামান্য আধ্যাত্মিক শক্তির লক্ষণ বলে মনে করি, তার কারণ আছে। যেখানে সামঞ্জস্য নষ্ট হয় সেখানে শক্তিপুঞ্জ একদিকে কাৎ হয়ে পড়ে বলেই তার প্রবলতা চোখে পড়ে। কিন্তু সে ত একদিক থেকে চুরি করে অন্যদিক্‌কে স্ফীত করা। যেদিক থেকে চুরি হয় সেদিক থেকে নালিশ ওঠে, তার শোধ দিতেই হয় এবং তার শাস্তি না পেয়ে নিষ্কৃতি হয় না। সমস্ত চিত্তবৃত্তিকে কেবলমাত্র হৃদয়াবেগের মধ্যে প্রতিসংহরণের চর্চ্চায় মানুষ কখনই মনুষ্যত্বলাভ করেনা এবং মনুষ্যত্বের যিনি চরম লক্ষ্য তাঁকেও লাভ করতে পারে না।

নিজের মনের ভক্তির চরিতার্থতাই যখন মানুষের প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠল, বস্তুত দেবতা যখন উপলক্ষ্য হয়ে উঠলেন এবং ভক্তিকে ভক্তি করাই যখন নেশার মত ক্রমশই উগ্র হয়ে উঠতে লাগল, মানুষ যখন পূজা করবার আবেগটাকেই প্রার্থনা করলে, কা'কে পূজা করতে হবে সেদিকে চিন্তামাত্র প্রয়োগ করলে না এবং এই কারণেই যখন তার পূজার সামগ্রী দ্রুতবেগে যেখানে-সেখানে যেমন-তেমন ভাবে নানা আকার ও নানা নাম ধরে অজস্র অপরিমিত বেড়ে উঠল, এবং সেইগুলিকে অবলম্বন করে নানা সংস্কার নানা কাহিনী নানা আচার বিচার জড়িত বিজড়িত হয়ে উঠতে লাগল;—জগদ্ব্যাপারের সর্ব্বত্রই একটা জ্ঞানের, ন্যায়ের, নিয়মের অমোঘ ব্যবস্থা আছে এই ধারণা যখন চতুর্দ্দিকে ধূলিসাৎ হতে চল্‌ল, তখন সেই অবস্থায় আমাদের দেশে সত্যের সঙ্গে রসের, জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির একান্ত বিচ্ছেদ ঘটে গেল।

একদা বৈদিক যুগে কর্ম্মকাণ্ড যখন প্রবল হয়ে উঠেছিল তখন নিরর্থক কর্ম্মই মানুষকে চরমরূপে অধিকার করেছিল; কেবল নানা জটিল নিয়মে বেদি সাজিয়ে, কেবল মন্ত্র পড়ে কেবল আহুতি ও বলি দিয়ে মানুষ সিদ্ধিলাভ করতে পারে এই ধারণাই একান্ত হয়ে উঠেছিল; তখন মন্ত্র এবং অনুষ্ঠানই দেবতা এবং মানুষের হৃদয়ের চেয়ে বড় হয়ে দাঁড়াল। তার পরে জ্ঞানের সাধনার যখন প্রাদুর্ভাব হল তখন মানুষের পক্ষে জ্ঞানই একমাত্র চরম হয়ে উঠল—কারণ, যাঁর সম্বন্ধে জ্ঞান তিনি নির্গুণ নিষ্ক্রিয়, সুতরাং তাঁর সঙ্গে আমাদের কোনো-প্রকার সম্বন্ধ হতেই পারে না; এ অবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞান নামক পদার্থটাতে জ্ঞানই সমস্ত, ব্রহ্ম কিছুই নয় বল্লেই হয়। একদিন নিরর্থক কর্ম্মই চূড়ান্ত ছিল; জ্ঞান ও হৃদ্‌বৃত্তিকে সে লক্ষ্যই করেনি, তার পরে যখন জ্ঞান বড় হয়ে উঠল তখন সে আপনার অধিকার থেকে হৃদয় ও কর্ম্ম উভয়কে নির্ব্বাসিত করে দিয়ে নিরতিশয় বিশুদ্ধ হয়ে থাকবার চেষ্টা করলে। তার পরে ভক্তি যখন মাথা তুলে দাঁড়াল তখন সে জ্ঞানকে পায়ের তলায় চেপে ও কর্ম্মকে রসের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে একমাত্র নিজেই মানুষের পরম স্থানটী সম্পূর্ণ জুড়ে বস্‌ল, দেবতাকেও সে আপনার চেয়ে ছোট করে দিলে, এমন কি ভাবের আবেগকে মথিত করে তোলবার জন্যে বাহিরে কৃত্রিম উত্তেজনার বাহ্যিক উপকরণ গুলিকেও আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গ করে নিলে।

এইরূপ গুরুতর আত্মবিচ্ছেদের উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে মানুষ চিরদিন বাস করতে পারে না। এই অবস্থায় মানুষ কেবল কিছুকাল পর্য্যন্ত নিজের প্রকৃতির এক অংশের তৃপ্তি সাধনের নেশায় বিহ্বল হয়ে থাকতে পারে কিন্তু তার সর্ব্বাংশের ক্ষুধা একদিন না-জেগে উঠে থাকতে পারে না।

সেই পূর্ণ মনুষ্যত্বের সর্ব্বাঙ্গীন আকাঙ্ক্ষাকে বহন করে এদেশে রামমোহন রায়ের আবির্ভাব হয়েছিল। ভারতবর্ষে তিনি যে কোনো নূতন ধর্ম্মের সৃষ্টি করেছিলেন তা নয়, ভারতবর্ষে যেখানে ধর্ম্মের মধ্যে পরিপূর্ণতার রূপ চিরদিনই ছিল, যেখানে বৃহৎ সামঞ্জস্য, যেখানে শান্তংশিবমদ্বৈতম্ সেইখানকার সিংহদ্বার তিনি সর্ব্বসাধারণের কাছে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছিলেন।

সত্যের এই পরিপূর্ণতাকে এই সামঞ্জস্যকে পাবার ক্ষুধা যে কি রকম প্রবল, এবং তাকে আপনার মধ্যে কি রকম করে গ্রহণ ও ব্যক্ত করতে হয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সমস্ত জীবনে সেইটেই প্রকাশ হয়েছে।

তাঁর স্নেহময়ী দিদিমার মৃত্যুশোকের আঘাতে মহর্ষির ধর্ম্মজীবন প্রথম জাগ্রত হয়ে উঠেই যে ক্ষুধার কান্না কেঁদেছে তার মধ্যে একটি বিস্ময়কর বিশেষত্ব আছে।

শিশু যখন খেলবার জন্যে কাঁদে তখন হাতের কাছে যে-কোনো একটা খেলনা পাওয়া যায় তাই দিয়েই তাকে ভুলিয়ে রাখা সহজ কিন্তু সে যখন মাতৃস্তন্যের জন্যে কাঁদে তখন তাকে আর-কিছু দিয়েই ভোলাবার উপায় নেই। যে লোক নিজের বিশেষ একটা হৃদয়াবেগকে কোনো একটা কিছুতে প্রয়োগ করবার ক্ষেত্রমাত্র চায় তাকে থামিয়ে রাখবার জিনিষ জগতে অনেক আছে—কিন্তু কেবলমাত্র ভাবসম্ভোগ যার লক্ষ্য নয় যে সত্য চায়, সে ত ভুল্‌তে চায়না, সে পেতে চায়। কাজেই সত্য কোথায় পাওয়া যাবে এই সন্ধানে তাকে সাধনার পথে বেরতেই হবে—তাতে বাধা আছে, দুঃখ আছে, তাতে বিলম্ব ঘটে, তাতে আত্মীয়েরা বিরোধী হয়, সমাজের কাছ থেকে আঘাত বর্ষিত হতে থাকে—কিন্তু উপায় নেই—তাকে সমস্তই স্বীকার করতে হয়।

এই যে সত্যকে পাবার ইচ্ছা এ কেবল জিজ্ঞাসা মাত্র নয় কেবল জ্ঞানে পাবার ইচ্ছা নয়—এর মধ্যে হৃদয়ের দুঃসহ ব্যাকুলতা আছে;—তাঁর ছিল সত্যকে কেবল জ্ঞানরূপে নয় আনন্দরূপে পাবার বেদনা। এইখানে তাঁর প্রকৃতি স্বভাবতই একটি সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যকে চাচ্ছিল। আমাদের দেশে এক সময় বলেছিল—ব্রহ্মসাধনার ক্ষেত্রে ভক্তির স্থান নেই এবং ভক্তিসাধনার ক্ষেত্রে ব্রহ্মের স্থান নেই কিন্তু মহর্ষি ব্রহ্মকে চেয়েছিলেন জ্ঞানে এবং ভক্তিতে, অর্থাৎ সমস্ত প্রকৃতি দিয়ে সম্পূর্ণ করে তাকে চেয়েছিলেন—এই জন্যে ক্রমাগত নানা কষ্ট নানা চেষ্টা নানা গ্রহণ বর্জ্জনের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে যতক্ষণ তাঁর চিত্ত তাঁর অমৃতময় ব্রহ্মে, তাঁর আনন্দের ব্রহ্মে, গিয়ে না ঠেকেছিল ততক্ষণ একমুহূর্ত্ত তিনি থাম্‌তে পারেননি।

এই কারণে তাঁর জীবনে ব্রহ্মজ্ঞান একটি বিশেষত্ব লাভ করেছিল এই যে, সে জ্ঞানকে সর্ব্বসাধারণের কাছে না ধরে তিনি ক্ষান্ত হননি।

জ্ঞানীর ব্রহ্মজ্ঞান কেবল জ্ঞানীর গণ্ডীর মধ্যেই বদ্ধ থাকে। সেই জন্যেই এদেশের লোকে অনেক সময়েই বলে থাকে ব্রহ্মজ্ঞানের আবার প্রচার কী!

কিন্তু ব্রহ্মকে যিনি হৃদয়ের দ্বারা উপলব্ধি করেছেন তিনি একথা বুঝেছেন ব্রহ্মকে পাওয়া যায়, হৃদয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ পাওয়া যায়—শুধু জ্ঞানে জানা যায় তা নয়, রসে পাওয়া যায় কেননা সমস্ত রসের সার তিনি—রসো বৈ সঃ। যিনি হৃদয় দিয়ে ব্রহ্মকে পেয়েছেন তিনি উপনিষদের এই মহাবাক্যের অর্থ বুঝেছেন:—

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।

জ্ঞান যখন তাঁকে পেতে চায় এবং বাক্য প্রকাশ করতে চায় তখন বার বার ফিরে

ফিরে আসে কিন্তু আনন্দ দিয়ে যখন সেই আনন্দের যোগ হয় তখন সেই প্রত্যক্ষ যোগে সমস্ত ভয় সমস্ত সংশয় দূর হয়ে যায়।

আনন্দের মধ্যে সমস্ত বোধের পরিপূর্ণতা, মন ও হৃদয়ের, জ্ঞান ও ভক্তির অখণ্ড যোগ।

আনন্দ যখন জাগে তখন সকলকে সে আহ্বান করে ;—সে গণ্ডীর মধ্যে আপনাকে নিয়ে আপনি রুদ্ধ হয়ে বসে থাকতে পারে না। সে একথা কাউকে বলে না যে, তুমি দুর্ব্বল, তোমার সাধ্য নেই, কেননা আনন্দের কাছে কোনো কঠিনতাই কঠিন নয়,—আনন্দ সেই আনন্দের ধনকে এতই একান্ত করে এতই নিবিড় করে দেখে যে সে তাঁকে দুষ্প্রাপ্য বলে কোনো লোককেই বঞ্চিত করতে চায় না—পথ যত দীর্ঘ যত দুর্গম হোক্ না এই পরমলাভের কাছে সে কিছুই নয়।

এই কারণে পৃথিবীতে এপর্য্যন্ত যে-কোনো মহাত্মা আনন্দ দিয়ে তাঁকে লাভ করেছেন তাঁরা অমৃতভাণ্ডারের দ্বার বিশ্বজনের কাছে খুলে দেবার জন্যেই দাঁড়িয়েছেন —আর যাঁরা কেবলমাত্র জ্ঞান বা কেবলমাত্র আচারের মধ্যে নিবিষ্ট তাঁরাই পদে পদে ভেদবিভেদের দ্বারা মানুষের পরস্পর মিলনের উদার ক্ষেত্রকে একেবারে কণ্টকাকীর্ণ করে দেন। তাঁরা কেবল না-এর দিক্ থেকে সমস্ত দেখেন, হাঁ-এর দিক্ থেকে নয় এই জন্যে তাঁদের ভরসা নেই, মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা নেই এবং ব্রহ্মকেও তাঁরা নিরতিশয় শূন্যতার মধ্যে নির্ব্বাসিত করে রেখে দেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চিত্তে যখন ধর্ম্মের ব্যাকুলতা প্রবল হল তখন তিনি যে অনন্ত নেতি নেতিকে নিয়ে পরিতৃপ্ত হতে পারেন নি সেটা আশ্চর্য্যের বিষয় নয় কিন্তু তিনি যে সেই ব্যাকুলতার বেগে সমাজের ও পরিবারের চিরসংস্কারগত অভ্যস্ত পথে তাঁর ব্যথিত হৃদয়কে সমর্পণ করে দিয়ে কোনো মতে তার কান্নাকে থামিয়ে রাখতে চেষ্টা করেন নি এইটেই বিস্ময়ের বিষয়। তিনি কাকে চাচ্চেন তা ভাল করে জানবার পূর্ব্বেই তাঁকেই চেয়েছিলেন জ্ঞান যাঁকে চিরকালই জানতে চায় এবং প্রেম যাঁকে চিরকালই পেতে থাকে।

এই জন্য জীবনের মধ্যে তিনি সেই ব্রহ্মকে গ্রহণ করলেন, পরিমিত পদার্থের মত করে যাঁকে পাওয়া যায় না এবং শূন্যপদার্থের মত যাঁকে না-পাওয়া যায় না।—যাঁকে পেতে গেলে একদিকে জ্ঞানকে খর্ব্ব করতে হয় না অন্যদিকে প্রেমকে উপবাসী করে মারতে হয় না—যিনি বস্তুবিশেষের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট নন অথবা বস্তুশূন্যতার দ্বারা অনির্দ্দিষ্ট নন, যাঁর সম্বন্ধে উপনিষদ্ বলেছেন, যে, যে তাঁকে বলে আমি জানি সেও তাঁকে জানে না, যে বলে আমি জানিনে সেও তাঁকে জানেনা। এক কথায় যাঁর সাধনা হচ্চে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের সাধনা।

যাঁরা মহর্ষির জীবনী পড়েছেন তাঁরা সকলেই দেখেছেন ভগবৎ-পিপাসা যখন তাঁর প্রথম জাগ্রত হয়ে উঠেছিল তখন কি রকম দুঃসহ বেদনার মধ্যে তাঁর হৃদয়কে তরঙ্গিত করে তুলেছিল! অথচ তিনি যখন ব্রহ্মানন্দের রসাস্বাদ করতে লাগলেন তখন তাঁকে উদ্দাম ভাবোন্মাদে আত্মবিস্মৃত করে দেয় নি। কারণ তিনি যাঁকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত

করেছিলেন তিনি শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্—তাঁর মধ্যে সমস্ত শক্তি সমস্ত জ্ঞান সমস্ত প্রেম অতলস্পর্শ পরিপূর্ণতায় পর্য্যাপ্ত হয়ে আছে। তাঁর মধ্যে বিশ্বচরাচর শক্তিতে ও সৌন্দর্য্যে নিত্যকাল তরঙ্গিত হচ্চে—সে তরঙ্গ সমুদ্রকে ছাড়িয়ে চলে যায় না, এবং সমুদ্র সেই তরঙ্গের দ্বারা আপনাকে উদ্বেল করে তোলে না। তাঁর মধ্যে অনন্ত শক্তি বলেই শক্তির সংযম এমন অটল, অনন্ত রস বলেই রসের গাম্ভীর্য্য এমন অপরিমেয়।

এই শক্তির সংযমে এই রসের গাম্ভীর্য্যে মহর্ষি চিরদিন আপনাকে ধারণ করে রেখেছিলেন, কারণ, ভূমার মধ্যেই আত্মাকে উপলব্ধি করবার সাধনা তাঁর ছিল। যাঁরা আধ্যাত্মিক অসংযমকেই আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় বলে মনে করেন তাঁরা এই অবিচলিত শান্তির অবস্থাকেই দারিদ্র্য বলে কল্পনা করেন, তাঁরা প্রমত্ততার মধ্যে বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়াকেই ভক্তির চরম অবস্থা বলে জানেন। কিন্তু যাঁরা মহর্ষিকে কাছে থেকে দেখেছেন, বস্তুতঃ যাঁরা কিছুমাত্র তাঁর পরিচয় পেয়েছেন তাঁরা জানেন যে তাঁর প্রবল সংযম ও প্রশান্ত গাম্ভীর্য্য ভক্তিরসের দীনতাজনিত নয়। প্রাচীন ভারতের তপোবনের ঋষিরা যেমন তাঁর গুরু ছিলেন তেমনি পারস্যের সৌন্দর্য্যকুঞ্জের বুল্‌বুল্ হাফেজ তাঁর বন্ধু ছিলেন। তাঁর জীবনের আনন্দপ্রভাতে উপনিষদের শ্লোকগুলি ছিল প্রভাতের আলোক এবং হাফেজের কবিতাগুলি ছিল প্রভাতের গান। হাফেজের কবিতার মধ্যে যিনি আপনার রসোচ্ছ্বাসের সাড়া পেতেন তিনি যে তাঁর জীবনেশ্বরকে কি রকম নিবিড় রসবেদনাপূর্ণ মাধুর্য্যঘন প্রেমের সঙ্গে অন্তরে বাহিরে দেখেছিলেন সে কথা অধিক করে বলাই বাহুল্য।

ঐকান্তিক জ্ঞানের সাধনা যেমন শুষ্ক বৈরাগ্য আনে, ঐকান্তিক রসের সাধনাও তেম্‌নি ভাববিহ্বলতার বৈরাগ্য নিয়ে আসে। সে অবস্থায় কেবলি রসের নেশায় আবিষ্ট হয়ে থাক্‌তে ইচ্ছা করে, আর-সমস্তের প্রতি একান্ত বিতৃষ্ণা জন্মে, এবং কর্ম্মের বন্ধনমাত্রকে অসহ্য বলে বোধ হয়। অর্থাৎ মনুষ্যত্বের কেবল একটামাত্র দিক অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠাতে অন্য সমস্ত দিক একেবারে রিক্ত হয়ে যায়, তখন আমরা ভগবানের উপাসনাকে কেবলই একটিমাত্র অংশে অত্যুগ্র করে তুলি, এবং অন্য সকল দিক থেকেই তাকে শূন্য করে রাখি।

ভগবৎলাভের জন্য একান্ত ব্যাকুলতা সত্ত্বেও এই রকম সামঞ্জস্যচ্যুত বৈরাগ্য মহর্ষির চিত্তকে কোনোদিন অধিকার করেনি। তিনি সংসারকে ত্যাগ করেন নি, সংসারের সুরকে ভগবানের ভক্তিতে বেঁধে তুলেছিলেন। ঈশ্বরের দ্বারা সমস্তকেই আচ্ছন্ন করে দেখবে, উপনিষদের এই উপদেশ বাক্য অনুসারে তিনি তাঁর সংসারের বিচিত্র সম্বন্ধ ও বিচিত্র কর্ম্মকে ঈশ্বরের দ্বারাই পরিব্যাপ্ত করে দেখবার তপস্যা করেছিলেন। কেবল নিজের পরিবার নয়, জনসমাজের মধ্যেও ব্রহ্মকে উপলব্ধি করবার সমস্ত বিঘ্ন দূর করতে তিনি চিরজীবন চেষ্টা করেছেন। এইজন্য এই শান্তিনিকেতনের বিশাল প্রান্তরের মধ্যেই হোক আর হিমালয়ের নিভৃত গিরিশিখরেই হোক্ নির্জ্জন সাধনায় তাঁকে বেঁধে রাখতে পারেনি।—তাঁর ব্রহ্ম একলার ব্রহ্ম নয়,

তাঁর ব্রহ্ম শুধু জ্ঞানীর ব্রহ্ম নয়, শুধু ভক্তের ব্রহ্মও নয়, তাঁর ব্রহ্ম নিখিলের ব্রহ্ম;—নির্জ্জনে তাঁর ধ্যান, সজনে তাঁর সেবা, অন্তরে তাঁর স্মরণ, বাহিরে তাঁর অনুসরণ; জ্ঞানের দ্বারা তাঁর তত্ত্ব উপলব্ধি, হৃদয়ের দ্বারা তাঁর প্রতি প্রেম, চরিত্রের দ্বারা তাঁর প্রতি নিষ্ঠা এবং কর্ম্মের দ্বারা তাঁর প্রতি আত্মনিবেদন। এই যে পরিপূর্ণস্বরূপ ব্রহ্ম, সর্ব্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ উৎকর্ষের দ্বারাই আমরা যাঁর সঙ্গে যুক্ত হতে পারি—তাঁর যথার্থ সাধনাই হচ্চে তাঁর যোগে সকলের সঙ্গেই যুক্ত হওয়া এবং সকলের যোগে তাঁরই সঙ্গে যুক্ত হওয়া—দেহ মন হৃদয়ের সমস্ত শক্তি দ্বারাই তাঁকে উপলব্ধি করা এবং তাঁর উপলব্ধির দ্বারা দেহমন-হৃদয়ের সমস্ত শক্তিকে বলশালী করা—অর্থাৎ পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের পথকে গ্রহণ করা। মহর্ষি তাঁর ব্যাকুলতার দ্বারা এই সম্পূর্ণতাকেই চেয়েছিলেন এবং তাঁর জীবনের দ্বারা এ'কেই নির্দ্দেশ করেছিলেন।

ব্রহ্মের উপাসনা কাকে বলে সে সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য-সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব—তাঁতে প্রীতি করা এবং তাঁর প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁর উপাসনা। একথা মনে রাখ্‌তে হবে আমাদের দেশে ইতিপূর্ব্বে তাঁর প্রতি প্রীতি এবং তাঁর প্রিয়কার্য্য সাধন, এই উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে গিয়েছিল। অন্তত প্রিয়কার্য্য শব্দের অর্থকে আমরা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ করে এনেছিলুম; ব্যক্তিগত শুচিতা এবং কতকগুলি আচার পালনকেই আমরা ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য বলে স্থির করে রেখেছিলুম। কর্ম্ম যেখানে দুঃসাধ্য, যেখানে কঠোর, কর্ম্মে যেখানে যথার্থ বীর্য্যের প্রয়োজন, যেখানে বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে, যেখানে অমঙ্গলের কণ্টকতরুকে রক্তাক্ত হস্তে সমূলে উৎপাটন করতে হবে, যেখানে অপমান নিন্দা নির্যাতন স্বীকার করে প্রাচীন অভ্যাসের স্থূল জড়ত্বকে কঠিন দুঃখে ভেদ করে জনসমাজের মধ্যে কল্যাণের প্রতিষ্ঠা করতে হবে সেইদিকে আমরা দেবতার উপাসনাকে স্বীকার করিনি। দুর্ব্বলতা বশতই এই পূর্ণ উপাসনায় আমাদের অনাস্থা ছিল এবং অনাস্থা ছিল বলেই আমাদের দুর্ব্বলতা এপর্য্যন্ত কেবলি বেড়ে এসেছে। ভগবানের প্রতি প্রীতি ও তাঁর প্রিয়কার্য্য সাধনের মাঝখানে আমাদের চরিত্রের মজ্জাগত দুর্ব্বলতা যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়েছিল সেই বিচ্ছেদ মিটিয়ে দেবার পথে একদিন মহর্ষি একলা দাঁড়িয়েছিলেন—তখন তাঁর মাথার উপরে বৈষয়িক বিপ্লবের প্রলয় ঝড় বইতেছিল এবং চতুর্দ্দিকে বিচ্ছিন্ন পরিবার ও বিরুদ্ধ সমাজের সর্ব্বপ্রকার আঘাত এসে পড়ছিল, তারি মাঝখানে অবিচলিত শক্তিতে একাকী দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর বাক্যে ও ব্যবহারে এই মন্ত্র ঘোষণা করেছিলেন তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ভারতবর্ষ তার দুর্গতি-দুর্গের যে রুদ্ধদ্বারে শতাব্দীর পর শতাব্দী যাপন করেছে, আপনার ধর্ম্মকে সমাজকে আপনার আচার ব্যবহারকে কেবলমাত্র আপনার কৃত্রিম গণ্ডীর মধ্যে বেষ্টিত করে বসে রয়েছে, সেই দ্বার বাইরের পৃথিবীর প্রবল আঘাতে আজ ভেঙে গেছে; আজ আমরা সকলের কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়েছি, সকলের সঙ্গে আজ

আমাদের নানাপ্রকার ব্যবহারে আস্‌তে হয়েছে। আজ আমাদের যেখানে চরিত্রের দীনতা, জ্ঞানের সঙ্কীর্ণতা, হৃদয়ের সঙ্কোচ, যেখানে যুক্তিহীন আচারের দ্বারা আমাদের শক্তিপ্রয়োগের পথ পদে পদে বাধাগ্রস্ত হয়ে উঠ্‌চে, যেখানেই লোকব্যবহারে ও দেবতার উপাসনায় মানুষের সঙ্গে মানুষের দুর্ভেদ্য-ব্যবধানে আমাদের শতখণ্ড করে দিচ্চে, সেই-খানেই আমাদের আঘাতের পর আঘাত, লজ্জার পর লজ্জা পেতে হচ্চে, সেইখানেই অকৃতার্থতা বারম্বার আমাদের সমস্ত চেষ্টাকে ধূলিসাৎ করে দিচ্চে এবং সেই খানেই প্রবল-বেগে চলনশীল মানবস্রোতের অভিঘাত সহ্য করতে না পেরে আমরা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে যাচ্চি—এই রকম সময়েই যে সকল মহাপুরুষ আমাদের দেশে মঙ্গলের জয়ধ্বজা বহন করে আবির্ভূত হবেন তাঁদের ব্রতই হবে জীবনের সাধনায় ও সিদ্ধির মধ্যে সত্যের সেই বৃহৎ সামঞ্জস্যকে সমুজ্জ্বল করে তোলা যাতে করে এখানকার জনসমাজের সেই সাংঘাতিক বিশ্লিষ্টতা দূর হবে, যে বিশ্লিষ্টতা এদেশে অন্তরের সঙ্গে বাহিরের, আচারের সঙ্গে ধর্ম্মের, জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির, বিচার-শক্তির সঙ্গে বিশ্বাসের, মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রবল বিচ্ছেদ ঘটিয়ে আমাদের মনুষ্যত্বকে শতজীর্ণ করে ফেল্‌চে।

ধনীগৃহের প্রচুর বিলাসের আয়োজনের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে এবং আচারনিষ্ঠ সমাজের কুলক্রমাগত প্রথার মধ্যে পরিবেষ্টিত হয়ে মহর্ষি নিজের বিচ্ছেদ-কাতর আত্মার মধ্যে এই সামঞ্জস্য-অমৃতের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন; নিজের জীবনে চিরদিন সমস্ত লাভক্ষতি সমস্ত সুখদুঃখের মধ্যে এই সামঞ্জস্যের সাধনাকে গ্রহণ করেছিলেন এবং বাহিরে সমস্ত বাধাবিরোধের মধ্যে শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্ এই সামঞ্জস্যের মন্ত্রটি অকুণ্ঠিত কণ্ঠে প্রচার করেছিলেন। তাঁর জীবনের অবসান পর্য্যন্ত এই দেখা গেছে যে তাঁর চিত্ত কোনো বিষয়েই নিশ্চেষ্ট ছিল না, ঘরে বাইরে, শয়নে আসনে, আহারে ব্যবহারে, আচারে অনুষ্ঠানে, কিছুতেই তাঁর লেশমাত্র শৈথিল্য বা অমনোযোগ ছিলনা। কি গৃহকর্ম্মে, কি বিষয় কর্ম্মে, কি সামাজিক ব্যাপারে, কি ধর্ম্মানুষ্ঠানে সুনিয়মিত ব্যবস্থার স্খলন তিনি কোনো কারণেই অল্পমাত্রও স্বীকার করতেন না; সমস্ত ব্যাপারকেই তিনি ধ্যানের মধ্যে সমগ্রভাবে দেখতেন এবং একেবারে সর্ব্বাঙ্গীণ ভাবে সম্পন্ন করতেন—তুচ্ছ থেকে বৃহৎ পর্য্যন্ত যাহাকিছুর সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল তার কোনো অংশেই তিনি নিয়মের ব্যভিচার বা সৌন্দর্য্যের বিকৃতি সহ্য করতে পারতেন না। ভাষায় বা ভাবে বা ব্যবহারে কিছুমাত্র ওজন নষ্ট হলে তৎক্ষণাৎ তাঁকে আঘাত করত। তাঁর মধ্যে যে দৃষ্টি, যে ইচ্ছা, যে আধ্যাত্মিক শক্তি ছিল তা ছোটবড় এবং আন্তরিক বাহ্যিক কিছুকেই বাদ দিত না, সমস্তকেই ভাবের মধ্যে মিলিয়ে, নিয়মের মধ্যে বেঁধে, কাজের মধ্যে সম্পন্ন করে তুলে তবে স্থির হতে পারত। তাঁর জীবনের অবসান-পর্য্যন্ত দেখা গেছে তাঁর ব্রহ্মসাধনা প্রাকৃতিক ও মানবিক কোনো বিষয়কেই অবজ্ঞা করে নি—সর্ব্বত্রই তাঁর ঔৎসুক্য অক্ষুণ্ণ ছিল। বাল্যকালে আমি যখন তাঁর সঙ্গে ড্যালহৌসী পর্ব্বতে একবার গিয়েছিলুম, তখন দেখেছিলুম

একদিকে যেমন তিনি অন্ধকার রাত্রে শয্যা-ত্যাগ করে পার্ব্বত্যগৃহের বারান্দায় একাকী উপাসনার আসনে বস্‌তেন, ক্ষণে ক্ষণে উপনিষৎ ও ক্ষণে ক্ষণে হাফেজের গান গেয়ে উঠতেন, দিনের মধ্যে থেকে থেকে ধ্যানে নিমগ্ন হতেন, সন্ধ্যাকালে আমার বালককণ্ঠের ব্রহ্মসঙ্গীত শ্রবণ করতেন—তেমনি আবার জ্ঞান আলোচনার সহায়স্বরূপ তাঁর সঙ্গে প্রক্টরের তিন খানি জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধীয় বই, কাণ্টের দর্শন ও গিবনের রোমের ইতিহাস ছিল;—তা ছাড়া এদেশের ও ইংলণ্ডের সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র হতে তিনি জ্ঞানে ও কর্ম্মে বিশ্বপৃথিবীতে মানুষের যা কিছু পরিণতি ঘটুচে সমস্তই মনে মনে পর্য্যবেক্ষণ করতেন। তাঁর চিত্তের এই সর্ব্বব্যাপী সামঞ্জস্যবোধ তাঁকে তাঁর সংসার-যাত্রায় ও ধর্ম্মকর্ম্মে সর্ব্বপ্রকার সীমালঙ্ঘন হতে নিয়ত রক্ষা করেছে;—গুরুবাদ ও অবতারবাদের উচ্ছৃঙ্খলতা হতে তাঁকে নিবৃত্ত করেছে এবং এই সামঞ্জস্যবোধ চিরন্তন সঙ্গী-রূপে তাঁকে একান্ত দ্বৈতবাদের মধ্যে পথভ্রষ্ট বা একান্ত অদ্বৈতবাদের কুহেলিকারাজ্যে নিরুদ্দেশ হতে দেয় নি। এই সীমালঙ্ঘনের আশঙ্কা তাঁর মনে সর্ব্বদা কি রকম জাগ্রত ছিল তার একটি উদাহরণ দিয়ে আমি শেষ করব। তখন তিনি অসুস্থ শরীরে পার্ক ষ্ট্রীটে বাস করতেন—একদিন মধ্যাহ্নে আমাদের জোড়া-সাঁকোর বাটি থেকে তিনি আমাকে পার্কষ্ট্রীটে ডাকিয়ে নিয়ে বল্লেন, দেখ আমার মৃত্যুর পরে আমার চিতাভস্ম নিয়ে শান্তিনিকেতনে সমাধি স্থাপনের একটি প্রস্তাব আমি শুনেছি; কিন্তু তোমার কাছে আমি বিশেষ করে বলে যাচ্চি কদাচ সেখানে আমার সমাধিরচনা করতে দেবেনা।—আমি বেশ বুঝ্‌তে পারলুম শান্তিনিকেতন আশ্রমের যে ধ্যানমূর্ত্তি তাঁর মনের মধ্যে বিরাজ করছিল, সেখানে তিনি যে শান্ত শিব অদ্বৈতের আবির্ভাবকে পরিপূর্ণ আনন্দরূপে দেখ্‌তে পাচ্ছিলেন তার মধ্যে তাঁর নিজের সমাধিস্তম্ভের কল্পনা সমগ্রের পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্যকে সূচিবিদ্ধ করছিল—সেখানে তাঁর নিজের কোনো স্মরণ চিহ্ন আশ্রমদেবতার মর্য্যাদাকে কোনোদিন পাছে লেশমাত্র অতিক্রম করে সেদিন মধ্যাহ্নে এই আশঙ্কা তাঁকে স্থির থাক্‌তে দেয় নি।

এই সাধক যে অসীম শান্তিকে আশ্রয় করে আপনার প্রশান্ত গভীরতার মধ্যে অমুত্তরঙ্গ সমুদ্রের ন্যায় জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিলেন সেই শান্তি তুমি, হে শান্ত হে শিব! ভক্তের জীবনের মধ্য হতে তোমার সেই শান্তস্বরূপ উজ্জ্বলভাবে আমাদের জীবনে আজ প্রতিফলিত হোক্! তোমার সেই শান্তিই সমস্ত ভুবনের প্রতিষ্ঠা, সকল বলের আধার। অসংখ্য বহুধা শক্তি তোমার এই নিস্তব্ধ শান্তি হতে উচ্ছ্বসিত হয়ে অসীম আকাশে অনাদি অনন্তকালে বিকীর্ণ পরিকীর্ণ হয়ে পড়চে, এবং এই অসংখ্যবহুধা শক্তি সীমাহীন দেশকালের মধ্য দিয়ে তোমার এই নিস্তব্ধ শান্তির মধ্যে এসে নিঃশব্দে প্রবেশ লাভ করচে। সকল শক্তি সকল কর্ম্ম সকল প্রকাশের আধার তোমার এই প্রবল বিপুল শান্তি আমাদের এই নানা ক্ষুদ্রতায় চঞ্চল, বিরোধে বিচ্ছিন্ন, বিভীষিকায় ব্যাকুল দেশের উপরে নব নব ভক্তের বাণী ও সাধকের জীবনের ভিতর দিয়ে প্রত্যক্ষরূপে অবতীর্ণ

হোক্! কৃষক যেখানে অলস এবং দুর্ব্বল, যেখানে সে পূর্ণ উদ্যমে তার ক্ষেত্র কর্ষণ করে না, সেইখানেই শস্যের পরিবর্ত্তে আগাছায় দেখতে দেখতে চারিদিক ভরে যায়—সেইখানেই বেড়া ঠিক থাকে না, আল নষ্ট হয়ে যায়, সেইখানেই ঋণের বোঝা ক্রমশই বেড়ে উঠে' বিনাশের দিন দ্রুতবেগে এগিয়ে আস্‌তে থাকে;—আমাদের দেশেও তেমনি করে দুর্ব্বলতার সমস্ত লক্ষণ ধর্ম্মসাধনায় ও কর্ম্মসাধনায় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে—উচ্ছৃঙ্খল কাল্পনিকতা ও যুক্তিবিচারহীন আচারের দ্বারা আমাদের জ্ঞানের ও কর্ম্মের ক্ষেত্র, আমাদের মঙ্গলের পথ, সর্ব্বত্রই একান্ত বাধাগ্রস্ত হয়ে উঠেছে; সকল প্রকার অদ্ভুত অমূলক অসঙ্গত বিশ্বাস অতি সহজেই আমাদের চিত্তকে জড়িয়ে জড়িয়ে ফেল্‌চে; নিজের দুর্ব্বল বুদ্ধি ও দুর্ব্বল চেষ্টায় আমরা নিজে যেমন ঘরে বাহিরে সকল প্রকার অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানে পদে পদেই নিয়মের স্খলন ও অব্যবস্থার বীভৎসতাকে জাগিয়ে তুলি তেমনি তোমার এই বিশাল বিশ্বব্যাপারেও আমরা সর্ব্বত্রই নিয়মহীন অদ্ভুত যথেচ্ছাচারিতা কল্পনা করি, অসম্ভব বিভীষিকা সৃজন করি, সেই জন্যই কোনোপ্রকার অন্ধ সংস্কারে আমাদের কোথাও বাধা নেই, তোমার চরিতে ও অনুশাসনে আমরা উন্মত্ততম বুদ্ধিভ্রষ্টতার আরোপ করতে সঙ্কোচমাত্র বোধ করিনে এবং আমাদের সর্ব্বপ্রকার চির-প্রচলিত আচার বিচারে মূঢ়তার এমন কোনো সীমা নেই যার থেকে কোনো যুক্তিতর্কে কোনো শুভবুদ্ধি দ্বারা আমাদের নিবৃত্ত করতে পারে। সেই জন্যে আমরা দুর্গতির ভয়সঙ্কুল সুদীর্ঘ অমাবস্যার রাত্রিতে দুঃখদারিদ্র্য অপমানের ভিতর দিয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে কেবলি নিজের অন্ধতার চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চি। হে শান্ত, হে মঙ্গল, আজ আমাদের পূর্ব্বাকাশে তোমার অরুণরাগ দেখা দিয়েছে, আলোকবিকাশের পূর্ব্বেই দুটি একটি করে ভক্ত বিহঙ্গ জাগ্রত হয়ে সুনিশ্চিত পঞ্চম স্বরে আনন্দবার্ত্তা ঘোষণা করচে, আজ আমরা দেশের নব উদ্বোধনের এই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গল পরিণামের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসকে শিরোধার্য্য করে নিয়ে তোমার জ্যোতির্ম্ময় কল্যাণসূর্য্যের অভ্যুদয়ের অভিমুখে নবীন প্রাণে নবীন আশায় তোমাকে আনন্দময় অভিবাদনে নমস্কার করি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মান ও প্রেম।

মান চাহে আপনার প্রভুত্বের বলে
প্রিয়জনে রাখিবারে ভৃত্যের মতন।
প্রেম শুধু নম্র পদে ধীরে আসে চলে,
বুকে লয়ে ক্ষমাময় আত্ম-সমর্পণ।

শ্রীকুমুদরঞ্জন ঘোষ।

স্বামী রামতীর্থ।

স্বামী রামতীর্থ বা গোঁসাই রামতীর্থ এম,এ, সন ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে দীপান্বিতার পরদিনে, পঞ্চনদের গুজরানওয়ালা জেলার অন্তর্গত মুরলীওয়ালা গ্রামে, গোঁসাই হীরানন্দের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন।

সুবিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদগণ ভবিষ্যৎ গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন এই শিশু জীবিত থাকিলে, কালে একজন মহাপুরুষ হইবেন।

হিন্দী রামায়ণ প্রণেতা মহাত্মা গোঁসাই তুলসিদাস ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ। গুজরানওয়ালার গোঁসাইবংশ ধর্ম্মচর্য্যার জন্য চিরদিনই সুপ্রসিদ্ধ। ইঁহারা বংশপরম্পরাক্রমে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও আফ্‌গানিস্থান প্রবাসী হিন্দুদিগের অধ্যাপনা ও পৌরহিত্যকার্য্যে নিযুক্ত। শিষ্যদিগের গুরুদক্ষিণা ইঁহাদের পারিবারিক ভরণপোষণের একমাত্র উপায় ও অবলম্বন।

বাল্যকাল হইতেই রামতীর্থ একজন

স্বামী রামতীর্থ।

ভক্তিপরায়ণ লোক ছিলেন। গ্রামে যে কোন গৃহে "কথকতা", রামায়ণ পাঠাদি হইত রামতীর্থ তথায় গমন করিয়া শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে আগ্রহের সহিত তাহা শ্রবণ করিতেন। মহাভারত রামায়ণ ভাগবত পাঠ শ্রবণ করিয়া বাল্যকাল হইতেই তাঁহার মনে ধর্ম্মভাবের বিশেষরূপে উদ্দীপনা হয়। যাহা শুনিতেন বা পাঠ করিতেন শ্রদ্ধা সমন্বিত হইয়া বার বার সে বিষয়ে আলোচনা ও চিন্তা করিতেন এবং প্রত্যেক বর্ণনা ও ঘটনা হইতে একটি না একটি আধ্যাত্মিক তত্ত্বলাভ করিতে চেষ্টা করিতেন। দেব মন্দিরের আরতির সময় যখন শঙ্খ ঘণ্টাদি বাজিয়া উঠিত তখন রামের প্রাণ আনন্দে নৃত্য করিত। তিনি দেবমন্দিরে প্রবেশ করিয়া প্রতিমা দর্শন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।

শৈশবকালেই তাঁহার ভক্তিভাব ও সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া লোকে অবাক্ হইয়া যাইত। এখনও তাঁহার বৃদ্ধ গ্রামবাসিগণ তাঁহার বুদ্ধিমত্তা, চিন্তাশীলতা নির্জ্জন-প্রিয়তা ও ভক্তিসত্তার কথা উল্লেখ করিয়া থাকেন।

শিক্ষালয়ে তিনি শিক্ষকদিগের অতি প্রিয় ছিলেন, সকলেই তাঁহাকে আদর যত্ন ও শ্রদ্ধা করিতেন। প্রবেশিকা পরীক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া সকল পরীক্ষায় তিনি উচ্চস্থান অধিকার করেন। বি, এ পরীক্ষায় ইনি প্রথম হন এবং অঙ্কশাস্ত্রে এম, এ, দেন। অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। অঙ্কশাস্ত্র আয়ত্তাধীন করিতে তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত পুরাণ সিংহের * প্রমুখাৎ শুনিয়াছি অধ্যয়ন-কালে তাঁহার অধ্যাপক একদিন তাঁহাকে অঙ্ক শাস্ত্রের একটী জটিল প্রশ্ন সমাধান করিতে দেন। রামতীর্থ দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়াও সেই সমস্যা নির্ণয়ে অক্ষম হইয়া দুঃখে ক্ষোভে ছুরিকা দ্বারা আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। অবশেষে অতি পরিশ্রম ও তজ্জনিত অত্যধিক ক্লান্তিবশতঃ রাত্রি শেষে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়েন। নিদ্রাবস্থায় নাকি তাঁহার নিকট ঐ জটিল প্রশ্নের সুচারু সমাধান প্রতিভাত হয়। পরদিন অধ্যাপক মহাশয় তাঁহার প্রশ্নের এইরূপ সহজ সমাধান দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন।

রাম দুই বৎসরের জন্য লাহোর ক্রিশ্চান কলেজের অধ্যাপক ছিলেন এবং কিছুদিনের জন্য লাহোর ওরিয়েণ্টাল কলেজের পাঠক (Reader) নিযুক্ত হন। লাহোর গভর্ণমেণ্ট কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বেল সাহেব † (Mr. W. Bell) রামতীর্থের গুণের অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। রামতীর্থ প্রাদেশিক শাসনবিভাগে কার্য্য গ্রহণ করেন ইহাই তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল। কিন্তু অঙ্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত রামতীর্থের এ কার্য্য গ্রহণে ইচ্ছা হইল না। তাঁহার বড় সাধ ছিল তিনি অঙ্ক-শাস্ত্রের লীলাভূমি কেমব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়া সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া "নীল ফিতা"

* শ্রীযুক্ত পুরাণ সিংহ এফ্, সি, এস, Imperial Forest Chemist, স্বামী রামতীর্থের প্রিয়তম শিষ্য তাঁহার জীবন চরিতাখ্যক ও তাঁহার গ্রন্থাবলীর সম্পাদক।

† এখন Director, Public Instruction, Punjab.

(Blue Ribbon), পরিধান করিবেন। সেইজন্য তিনি সরকারী বৃত্তি লাভ করিবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন এবং যদিও সে বৎসর বৃত্তি তাঁহারই পাইবার কথা কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি তাহা পাইলেন না। তাই রামতীর্থের নীল ফিতা আর পরা হইল না। তিনি সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং বৎসরকালের মধ্যে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মার্থে জীবন উৎসর্গ করিলেন।

স্বামী রামতীর্থ চিরপ্রফুল্ল ছিলেন। সংসারের কোনও ঘটনাই তাঁহার সদানন্দ ভাবকে তিরোহিত করিতে পারে নাই। তাঁহার সদানন্দভাব যে দেখিয়াছে সেই মুগ্ধ হইয়া যাইত। আমেরিকার Great Pacific Railroad Companyর কার্য্যাধ্যক্ষ তাঁহার এই সদানন্দভাব দেখিয়া বলিয়াছিলেন ইঁহার হাস্য স্বতঃ উৎসারিত,* কিছুতেই ইঁহার প্রফুল্লতা বিনষ্ট হইতে পারে না। সেন্ট লুই প্রদর্শনীতে (St. Louis Exhibition) তাঁহার প্রশান্ত হাস্যোজ্জ্বল বদনমণ্ডল সকল চক্ষুর কেন্দ্রস্থল হইয়াছিল।

স্বামী রামতীর্থের প্রেমোজ্জ্বল বদনমণ্ডল দেখিয়া মানুষ কি যেন একটা নূতন জিনিষের আভাষ পাইত, নবজীবনের দ্বার যেন তাহার নিকট উদ্ঘাটিত হইয়া যাইত, নবাকাঙ্ক্ষা প্রাণে জাগিয়া উঠিত। তাঁহার নিকট কেহ স্থির শান্তভাবে বসিলে তিনি যেন তাহাকে ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরিতেন, নীচতা, ক্ষুদ্রতা হীনতা, মলিনতা, সকল বিদূরিত হইয়া যেন স্বর্গীয় ভাবে তাহার মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত। তাঁহার আত্মতত্ত্ব ও ভগবদ্‌তত্ত্বের ব্যাখ্যা শুনিয়া লোকে মুগ্ধ হইয়া যাইত।

স্বামী রামতীর্থ—সন্ন্যাসীবেশে।

তাঁহার সেই সুমধুর হাস্যময়, চিরপ্রফুল্ল বদনমণ্ডল দেখিয়া প্রাণমন আনন্দে পরিপূরিত হইয়া যাইত। তিনি যখন হাসিতেন কয়েক মিনিট ধরিয়াই হাসিতেন—মনে হইত কি যেন এক অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া আনন্দে বিভোর গিয়াছেন।

স্বামী রামতীর্থ অদ্বৈতবাদী ছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের বিকট অদ্বৈতবাদ তাঁহার অদ্বৈতবাদ এক নহে। তাঁহার অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যা শুনিয়া অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে অনেকের ভুল ধারণা বিদূরিত হইয়াছে।

তিনি যখন বজ্র গম্ভীর স্বরে তাঁহার

* "His smiles are iresristible." "A cheerfulnes that nothing could mar was his

স্বাভাবিক ওজস্বিনী ভাষায় বলিতেন—"আমি রাম বাদসা, আমার সিংহাসন তোমাদের হৃদয়ে সন্নিহিত। আমি যখন বেদ ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম, আমি যখন কুরুক্ষেত্রে জেরুসেলেমে, মেকায় ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলাম তখন তোমরা আমাকে চিনিতে পার নাই। আমি এখন আবার গগনভেদী বাণী উত্থিত করিতেছি তোমরা শ্রবণ কর। আমার বাণী তোমাদেরই বাণী। যাহা দেখিতেছি শুনিতেছি তাহা তুমিই স্বয়ং, অন্য কেহ নহে "তত্ত্বমসি"। রাজা প্রজা দেব দানব কেহই এই সত্যের অপলাপ করিতে পারিবে না, সত্যের জয় অপরিহার্য্য, সত্যের আদেশ অপরিবর্জ্জনীয়। ভীত হইও না। আমার মস্তক তোমারই মস্তক, কাটিতে হয় কাটিয়া ফেল কিন্তু ভাই জানিও এই একটি ক্ষুদ্র মস্তকের পরিবর্ত্তে সহস্র মস্তক উত্থিত হইবে।"

তখন যেন পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিত।

রামের প্রাণ প্রেমে পূর্ণ ছিল। একে অদ্বৈতবাদী তাহাতে আবার প্রেমিক। কোথায় পার্থক্য !! কোথায় বিচ্ছেদ !!! তাঁহার নিকট ভেদাভেদ কিছুই ছিল না ; ধনী দরিদ্র, জ্ঞানী মূর্খ, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সকলেই সমান, সকলেই এক। তিনি সকলকেই সমান ভাবে আলিঙ্গন করিতেন, এমন কি তাঁহার কাগজ কলম ছুরী কাঁচি,পেন, পেনসিল সকলি প্রিয় সম্বোধনে সম্বোধিত হইত। সুহৃদ্বর পুরাণ বলিয়াছেন, তিনি ইতর পশু পক্ষীদিগকে সন্তান সন্ততির ন্যায় সম্বোধন করিতেন। তাঁহার নিকট কেহ পর কেহ দ্বেষ্য বা ঘৃণ্য ছিল না। সকলেই তাঁহার, তিনি সকলের, সকলেই তাঁহার আত্মীয় তাঁহার আত্মার অংশ, সকলেই "আমি" সোঽহং সোঽহং।

কাহারও সহিত ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে রামতীর্থ সর্ব্বতোভাবে তাঁহার সহিত আপনার ঐক্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেন। যখন মনে করিতেন তাহার সহিত তাঁহার কোনও প্রকার অনৈক্যভাব ভেদ বা পার্থক্য জ্ঞান নাই তখন স্থির ধীর সমাহিতভাবে সত্যের নামে আপনার বক্তব্যগুলি বিশদরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন। কথা বলিতে বলিতে তিনি ভাবে বিভোর হইয়া পড়িতেন, তাঁহার চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিত এবং মুখ হইতে পারস্য কবিদিগের সুমধুর কবিতা সকল অনর্গল বাহির হইতে থাকিত। কিয়ৎক্ষণ পরে "ওঁ" "ওঁ" "ওঁ" করিতে করিতে নিস্তব্ধ হইয়া যাইতেন, তাঁহার চক্ষু হইতে দর দর ধারে প্রেমাশ্রু প্রবাহিত হইয়া বক্ষস্থল সিক্ত করিত। তাঁহার সেই সুমধুর দেবদুর্লভ স্বর্গীয় ভাব দেখিলে মনে হইত তিনি যেন আপনাকে ভুলিয়া তন্ময় হইয়া সমাধিমগ্ন হইয়াছেন।

সন ১৯০১ খৃষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার জাপানের রাস্কিন, (Ruskin) পণ্ডিতপ্রবর অধ্যাপক ওকাকুরা (Okakura) ভারতে আগমন করেন। স্বামী বিবেকানন্দের সভাপতিত্বে জাপানে সিকাগো ধর্ম্মমহামণ্ডলের অনুযায়ী একটি ধর্ম্ম মহাসম্মিলনীর প্রতিষ্ঠা করা এবং যদি যুক্তিসঙ্গত ও সম্ভবপর হয় তাহা হইলে ভারত হইতেই তাহার বন্দোবস্ত করিয়া যাওয়া তাঁহার ভারত আগমনের একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

এই প্রস্তাবের অনুকূলে ভারতীয় সংবাদ পত্র সকল সদযুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধাদি প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ভারতের প্রধান প্রধান নেতাগণ এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে অধ্যাপক ওকাকুরার সহিত এক যোগে কার্য্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, একদিকে স্বামী বিবেকানন্দের হঠাৎ অকাল মৃত্যু হইল, অন্যদিকে অধ্যাপক ওকাকুরা আপন স্বদেশবাসীদিগের মতামত গ্রহণ না করিয়া ভারতপ্রবাসকালেই এই প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছিলেন বলিয়া জাপানে তাঁহার বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালিদল সংঘটিত হইল। তাহারা অভিমানে ও আক্রোশে এই ধর্ম্মমহাসম্মিলনের বিরুদ্ধে লেখনী সঞ্চালিত করায় এই প্রস্তাব জাপানে অগ্রাহ্য হইয়া গেল।

এই অশুভ সংবাদ ভারতে পৌঁছিতে বহু সময় লাগিয়াছিল। ভারতীয় সংবাদ পত্র সকল এই সংবাদ না পাইয়া অতি আগ্রহের সহিত জন সাধারণকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করিতেছিলেন। ভারতের নানা স্থানে এই মহা সম্মিলনে যোগ দিবার জন্য প্রতিনিধি নিয়োজিত হইয়াছিল। এমন কি প্রতিনিধিগণ কোন জাহাজে জাপানে যাইবেন তাহা পর্য্যন্ত ঠিক হইয়া গিয়াছিল।

যখন ভারতে এই সব আন্দোলন হইতেছিল তখন স্বামী রামতীর্থ হিমাচল প্রদেশে (Tehri Garhwal) বাস করিতে ছিলেন। তিনি এসব আন্দোলনের কোন প্রকার সংবাদ জানিতেন না। হঠাৎ একদিন সংবাদপত্র পাঠে টিরীরাজ এই ধর্ম্ম মহা-সম্মিলনের সংবাদ জানিতে পারিয়া স্বামী রামতীর্থকে তাহার প্রতিনিধিরূপে এই মহাসম্মিলনে যোগদান করিতে অনুরোধ করিলেন। টিরীরাজ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া প্রিয়শিষ্য শ্রীমান নারায়ণসহ স্বামী রাম কলিকাতা হইয়া জাপান যাত্রা করিলেন। পিনাং, হংকং প্রভৃতি স্থানে বিশ্রাম করিয়া পঞ্চবিংশ তিদিবস পরে তিনি ইয়োকোমাতে উপস্থিত হইলে। হংকং প্রবাসী ভারতীয় হিন্দু মুসলমানগণ তাঁহাকে অতি সমাদে ররসহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

যদিও তিনি হিন্দু সন্ন্যাসী ছিলেন তথাপি মুসলমানগণও তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। এমন কি তাঁহারা তাঁহার মুসলমান শাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য দেখিয়া তাঁহাকে তাঁহাদের প্রিয়তম হাফেজের, এবং তাঁহাদের ভক্তিভাজন শামস্তা-ব্রেজের স্নেহাস্পদ কনিষ্ঠ সহোদর বলিয়া সম্মান করিতেন। ইহা একজন হিন্দু সন্ন্যাসীর পক্ষে কম সম্মানের বিষয় নহে।

স্বামী রামেরও মুসলমানধর্ম্মের প্রতি একটা ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ছিল। মুসলমান শাস্ত্র হইতে কোন বচন অথবা কোন মুসলমান সাধু সন্ন্যাসীর উক্তি স্বামী রাম অতি ভক্তিসহকারে উল্লেখ করিতেন।

স্বামী রাম ষ্টীমার বাসকালে প্রতি সন্ধ্যায় সহযাত্রীদিগকে লইয়া বেদান্তের আলোচনা করিতেন। তাঁহার শ্রীমুখাৎ বেদান্তের সুমধুর ও সরল ব্যাখ্যান শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়া যাইতেন।

রামতীর্থ দুইদিন মাত্র ইয়োকোহামায় অবস্থান করিয়া টোকিও নগরে গমন করেন।

সেখানে কয়েকটী ভারতবাসী ছাত্র ইন্দো-জাপানিজ্ ক্লাব (Indo-Japanese Club) নামে একটী সমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন। সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত পুরাণ সিংহ মহাশয় সেই ক্লাবের সম্পাদক ছিলেন। রামতীর্থ ইন্দো-জাপানিজ ক্লাবের নাম শুনিয়া সেইখানে গিয়া উপস্থিত হন।

শ্রীমান নারায়ণ, পুরাণকে উদ্দেশ করিয়া তাঁহার নিবাস কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে "আমরা বিশ্ববাসী" * বলিয়া পুরাণ উত্তর প্রদান করেন। স্বামী রাম তৎক্ষণাৎ আপনার প্রশান্ত বদনমণ্ডল উত্তোলনপূর্ব্বক গম্ভীর স্বরে বলিলেন "সর্ব্বজীবে হিতসাধন আমার ধর্ম্ম"। তাঁহার এই বিশ্বজনীন প্রেমের বার্ত্তা শুনিয়া সকলে ভক্তি গদগদ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

সেইদিন সন্ধ্যার সময় স্বামী রাম প্রোফেসর চাটার (Prof. Chatre) কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার সর্কাস দেখিতে গমন করেন। সেখানে টোকিও রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক তাকা কাৎসু (Taka Katsu) উপস্থিত ছিলেন। তিনি স্বামী রামের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া বলিয়াছিলেন যে স্বামী রাম একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক। সুবিখ্যাত দার্শনিকদ্বয় অধ্যাপক হিরাই (Hirai) এবং অধ্যাপক তানাকা (Tanaka) স্বামী রামের সহিত আলাপ পরিচয়াদি করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন। অধ্যাপক তানাকা বলিয়াছিলেন "আমি অধ্যাপক মোক্ষমূলারের বাড়ীতে ও জর্ম্মানিতে অনেক সুপ্রসিদ্ধ ভারতীয় পণ্ডিত ও দার্শনিকগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি কিন্তু রামের ন্যায় বেদান্ত দর্শনের একটী জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি দেখি নাই। ইনি একজন অদ্ভুত মানুষ। †

টোকিও Higher Commercial College এর অধ্যক্ষ Baron Kanda স্বামী রামের সহিত আলাপ পরিচয়াদি করিবার জন্য আপন ভবনে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি কেন সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন এবং তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য কি জিজ্ঞাসা করায় স্বামী রাম উত্তর করিয়াছিলেন "আনন্দে আমার অন্তর ফুলিয়া উঠিতেছে, আমি আনন্দে অধীর হইয়া আমার প্রিয়তম ভাই ভগিনীদিগকে এই অপার আনন্দ সম্ভোগ করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি। ভাই ভগিনীদিগের নিকট এই অপার আনন্দের সংবাদ প্রচার করা ভিন্ন আমার জীবনের অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। আমি সংসার

* তৎকালীন জাপান প্রবাসী স্বর্গীয় বন্ধুবর রমাকান্ত রায় প্রমুখ ভারতীয় ছাত্রবৃন্দ আপনাদিগকে বিশ্ববাসী বলিয়া পরিচয় দিতেন। রমাকান্তবাবু লেখককে সর্ব্বদাই "তোমার সিকাইজেন (বিশ্ববাসী) বলিয় পত্র লিখিতেন। সিকাইজেন শব্দটী জাপানি ও ইংরাজি ভাষার অদ্ভুত সংমিশ্রণ।

† Though I have met many Indian Pandits and philosophers at professor Max Mullar's house in Germany but I never saw before a living Picture of Vedanta philosophy as Rama. They knew Vedanta but this man is the teacher of Vedanta and he has full title to the claim. He is simply wonderful.

ত্যাগী নই, আমি ঘোর সংসারী।" ব্যারণ কান্দা রামের সেই আনন্দ বিচ্ছুরিত সমুজ্জ্বল বদনমণ্ডল দর্শন করিয়া স্বয়ং আনন্দে অধীর হইয়া পরিবারস্থ সকলের সহিত রামের পরিচয় করিয়া দিলেন।

অধ্যাপক তাকাকাৎসুর বিশেষ ইচ্ছা ছিল যে, টোকিও রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে রাম বেদান্তের ধারাবাহিক বক্তৃতা প্রদান করেন। কিন্তু অধ্যাপক চাটার আপন সার্কাস দল লইয়া আমেরিকা যাইবার জন্য একটী জাহাজ ভাড়া লইয়া স্বামী রামতীর্থকে সেই জাহাজে আমেরিকা গমন করিতে অনুরোধ করায় এবং স্বামী রামের জাপানী ভাষায় অনভিজ্ঞতা বশতঃ বেদান্তের বক্তৃতা প্রদত্ত হয় নাই।

যদিও তিনি জাপানে অত্যল্প সময় অবস্থান করিয়াছিলেন তথাপি ব্যারণ কান্দার অনুরোধে তিনি তাঁহার কলেজে Secret of Success সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। এই বক্তৃতার সারমর্ম্ম জাপান টাইমস্ (Japan Times) পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা পাঠ করিয়া জাপানের রুষ দূত আলাপ পরিচয়াদি করিবার জন্য স্বামী রামকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। দুঃখের বিষয় এই নিমন্ত্রণ পত্র পাইবার দুইদিন পূর্ব্বে স্বামী রাম জাপান পরিত্যাগ করিয়া আমেরিকায় গমন করিয়াছিলেন।

স্বামী রাম অন্যত্র বহু শ্রোতৃমণ্ডলী সমক্ষে মহাত্মা বুদ্ধ সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সিকাগো ধর্ম্মমহামণ্ডলে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিনিধি মহাত্মা হিরাই বলিয়াছিলেন স্বামী রাম যথার্থই একজন ঈশানুপ্রাণিত ব্যক্তি বটে।

স্বামী রাম প্রিয়শিষ্য নারায়ণকে ভারতে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ করিয়া সন ১৯৯২ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে আমেরিকার সান্ ফ্রান্সিস্কো (San-Francisco) নগরে উপস্থিত হন। তখন তাহার নিকট যথেষ্ট অর্থ ছিল না বা কোথায় যাইবেন তাহারও কোন স্থিরতা ছিল না। জাহাজ বন্দরে আসিবামাত্র আরোহীগণ নামিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন, কিন্তু স্বামী রাম স্থির ধীর গম্ভীরভাবে ডেকের উপর পাদচালনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই নিশ্চিন্ত-ভাব দেখিয়া অনেকে মনে করিয়াছিলেন, যে তিনি জাহাজের কোন লোক হইবেন। তাঁহার এই নিশ্চেষ্টভাব দেখিয়া কৌতূহলবশত আমেরিকার একটী সুবিখ্যাত সংবাদপত্রের প্রতিনিধি তাঁহার নিকট আসিয়া প্রশ্ন করিলেন:—

আপনার নাম কি?

রাম। আমি একজন ফকীর।

প্রতি। আপনাকে দেখিয়া মনে হইতেছে আপনি একাকী আসিয়াছেন। আপনি কি জাহাজ হইতে নামিবেন না?

রাম। আমি সর্ব্বদাই একাকী আপন ভাবে থাকি।

প্রতি। আপনার কোন জিনিস পত্র নাই?

রাম। আমি যাহা বহন করিতে পারি তদনুরূপ জিনিস রাখিয়া থাকি। তদতিরিক্ত কিছুই রাখি না।

প্রতি। আপনার নিকট যথেষ্ট অর্থ আছে ত? আমেরিকা বড় শক্ত দেশ এখানে টাকাকড়ি না থাকিলে কেহ থাকিতে পারে না।

রাম। না, আমি টাকা কড়ি রাখি না।

প্রতি। আপনি তবে কি করিয়া এদেশে থাকিবেন ?

রাম। আমি আমার প্রতিবেশীদিগের সহিত প্রেমযোগ স্থাপন করি মাত্র। তাহার পর দেখিতে পাই আমার যখন যাহা প্রয়োজন তখন তাহাই পাই। আমার তৃষ্ণার সময় জলের বা আহারের সময় খাদ্যের অভাব হয় না।

প্রতি। বেশ ভাল কথা! কিন্তু ইহাতেই হইবে না। আমেরিকা আপনার ভারতবর্ষ নয়। এখানে হয় টাকাকড়ি না হয় বন্ধু বান্ধব চাই। এখানে আপনার কোন বন্ধু নাই ?

রাম। হাঁ, এখানে আমার একজন দয়ালু বন্ধু আছেন।

প্রতি। আমি কি তাঁহার নাম জানিতে পারি ?

রাম সস্নেহে তাঁহার স্কন্ধোপরি আপন হস্ত স্থাপন করিলেন। ডাক্তার হিলার পূর্ব্ব হইতেই রামের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। রাম যখন তাঁহার স্কন্ধোপরি আপনার হস্ত স্থাপন করিয়া জানাইলেন যে তিনিই তাঁহার দয়ালু বন্ধু তখন ডাক্তার হিলার যেন কৃতার্থ হইলেন।

সেই দিন হইতেই রাম ডাক্তার হিলারের গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। মিসেস্ হিলার কোন বিশেষ কারণে অত্যন্ত মানসিক কষ্টে দিনাতিপাত করিতেছিলেন। তাঁহার অব্যবস্থিত চিত্ত ও মানসিক চাঞ্চল্য দেখিয়া ডাক্তার হিলার অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত ছিলেন। রামকে পাইয়া তাঁহার সহিত ধর্ম্মালোচনা ও ধর্ম্ম চর্চ্চা করিয়া [মি]সেস্ হিলারের মানসিক অবসাদ দূর হইল। [ডা]ক্তার ও মিসেস্ হিলার রামকে পুত্রবৎ স্নেহ [ক]রিতেন। তাঁহারা রামের প্রতি এতদূর [আ]কৃষ্ট হইয়াছিলেন যে তাঁহাদের সমস্ত বিষয় তাঁহার ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে উৎসর্গ করিতে চাহিয়াছিলেন। ডাক্তার হিলার সান্ ফ্রান্সিস্কোর যাবতীয় সংবাদপত্রে রাম সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি লিখিতে লাগিলেন। ইহাতে নানা শ্রেণীর লোক রামের সহিত আলাপ পরিচয়াদি করিবার জন্য ডাক্তার হিলারের গৃহে প্রতি সন্ধ্যায় সমবেত হইতেন। তিনি তাঁহাদিগকে লইয়া ধর্ম্মালোচনা ও বেদান্ত চর্চ্চা করিতেন। তাঁহারা তাঁহাকে মানবাত্মা, ঈশ্বর, ইহকাল, পরকাল প্রভৃতি নানা বিষয়ে নানা প্রকার প্রশ্ন করিতেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রশ্নোত্তরে রাম বিশেষ আনন্দ পাইতেন। একদিন আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক অশেষ প্রকারে নিগৃহীতা একটী মহিলা রামের নাম শুনিয়া শান্তি পাইবার আশায় তাঁহার নিকট আসিয়া আত্মকাহিনী বলিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার আত্মকাহিনী বলিয়া যাইতেছেন আর তাঁহার চক্ষুদিয়া দর দর ধারে অশ্রুজল পড়িতেছে ও দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছেন। রাম যোগাসনারূঢ় হইয়া নয়ন মুদ্রিত করিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে সেই দুঃখপূর্ণ কাহিনী শুনিতেছেন, সময়ে সময়ে উচ্চৈঃস্বরে ওঁ ওঁ, মা মা বলিতেছেন, আর এক একবার সেই রোরুদ্যমানা মহিলার প্রতি সকরুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। রামের এই স্বর্গীয় ভাব দর্শন করিয়া মহিলার মনঃপ্রাণ ধীরে ধীরে শান্তভাব ধারণ করিল, তাঁহার নিকট নব আত্মতত্ত্ব প্রকাশ হইল;—তিনি যেন পরম শান্তি লাভ করিলেন। আত্মার অনন্ত ঐশ্বর্য্য দেখিতে পাইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার ক্ষুদ্র ভাব বিদূরিত হইল, তাহার ক্ষুদ্র দুঃখ ক্ষুদ্র অশান্তি যেন অনন্তের মধ্যে মিলিয়া গেল, তিনি উচ্চ জীবনের আস্বাদ পাইলেন এবং এই নব তত্ত্বটী লাভ করিলেন

যে বিশ্বসংসারে মঙ্গলময় বিধাতার রাজ্যে দুঃখ কষ্ট শোক অশান্তি বলিয়া কোন বাস্তব পদার্থ নাই; একবার আপনাকে অনন্তের সুরে মিলাইয়া দাও দেখিতে পাইবে এ জীবন তানলয়যুক্ত একটি সুমধুর সঙ্গীত।

স্বামী রাম ইঁহার এই সুমধুর পরিবর্ত্তন দেখিয়া ইহার সূর্য্যানন্দ নাম দিয়াছিলেন। ইনি অন্য কেহ নন, ভারত প্রদক্ষিণকারিণী সুপরিচিত মিসেস্ ইভা ওয়েলমেন। (Mrs. Eva Wellman]

আর একটী মহিলা আপনার একমাত্র পুত্র হারাইয়া রামকে ঈশ্বরজ্ঞানে শান্তি পাইবার জন্য তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি রামকে বলিলেন, আমি যখন দেখিতেছি আমার মৃত পুত্র ফিরিয়া আসিবে না এবং মৃত্যুর মধ্যে কি যে এক অদ্ভুত রহস্য নিহিত রহিয়াছে তাহা ভেদ করা যখন আমার জ্ঞানের অগম্য তখন আপনার নিকট আমার এই বিনীত নিবেদন যে, আমি যাহাতে সুখী হইতে পারি আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহার একটা উপায় উদ্ভাবন করিয়া দিন। স্বামী রাম উত্তর করিলেন, "আমি যাহা করিতে বলিব তাহা যদি অকপট হৃদয়ে করিতে পার, ও তাহার যদি মূল্য দিতে প্রস্তুত হও তাহা হইলে আমি একটা উপায় উদ্ভাবন করিয়া দিতে পারি।" "আপনি যে কোন মূল্য চাহিবেন আমি তাহাই দিতে প্রস্তুত আছি" এইরূপ উত্তর প্রাপ্ত হইয়া স্বামী রাম বলিলেন,—হে নারী আমি তোমার নিকট আমেরিকান ডলার* চাহি না, আমার সুখের রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে আমি যে মূল্য নির্দ্ধারণ করিব তাহাই দিতে হইবে। মহিলাটী ইহাতে সম্মত হইলে রাম বলিলেন হে মাতঃ তোমার গৃহের সম্মুখ দিয়া ঐ যে কাফ্রি বালক যাইতেছে তাহাকে যদি আপন পুত্রের ন্যায় ভালবাসিতে পার এবং তাহার মধ্যে আপন প্রিয়তম মৃত পুত্রকে দেখিতে শেখ তাহা হইলে আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি তুমি প্রকৃত সুখ পাইতে পারিবে। মহিলাটী বলিলেন, এ যে বড় কঠিন আদেশ। রাম বলিলেন, এ রাজ্যের এই নিয়ম।

মিষ্টার উইলিয়াম গিবন্স্ (Mr. William Gibbons) নামে এক সদাশয় ব্যক্তি রামের সহিত আলাপ পরিচয়াদি করিয়া রামকে খ্রীষ্টাত্মা (Crist-soul) বলিয়া আখ্যা দিয়াছিলেন। রাম তাঁহাকে স্বামী "নারদ" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। যতদূর জানা গিয়াছে ইনি এখন সংসার ত্যাগী হইয়া কালিফোর্নিয়াতে প্রেমানন্দে নারদীয় জীবন যাপন করিতেছেন।

স্বামী রাম আমেরিকার যেখানেই গিয়াছেন সেইখানেই সকলে তাঁহাকে মহা সমাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে বেদান্ত ও ধর্ম্মসম্বন্ধে বক্তৃতাদি করিয়াছেন। পূর্ব্ব সাম্রাজ্যের মিনেসিওটা (Minncse›ta) বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি "থরো, এমার্সন, ওয়াল্ট, হুইটম্যান, ও কার্লাইল (Thorcau, Emerson, Walt Whitman, Carlyle) উদ্ভাসিত "নবধর্ম্ম চিন্তায় বেদান্তের প্রভাব" সম্বন্ধে একটী সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন। তাহা শ্রবণ করিয়া সুধিমণ্ডলী

* প্রায় তিন টাকা।

মুগ্ধ হইয়া একবাক্যে স্বীকার করিয়াছিলেন যে স্বামী রাম ধর্ম্ম ইতিহাসে নবপত্র সংযোজিত করিলেন। রামের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহারা উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বোচ্চ উপাধি প্রদান করিবার জন্য প্রস্তাব উপস্থিত করেন। উপাধি প্রদানের কথা শুনিয়া রাম হাসিতে হাসিতে এই বলিয়া উপাধি গ্রহণে অসম্মত হইয়াছিলেন যে যিনি মানবকে "ঈশ্বরত্বের" উপাধি প্রদান করিতে চান তাহাকে তোমরা আর কি উপাধি দিবে।

মিসর দেশেও স্বামী রাম অতিশয় সম্মানিত হইয়াছিলেন। স্বামী রাম যেখানেই গিয়াছেন সেইখানেই আপন ধর্ম্মপ্রাণতা, সলজ্জ বিনয় ও সরল মধুর ভাবের দ্বারা সকলকেই আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহার সম্পর্কে আসিয়াছিলেন তাঁহার চরিত্রের প্রভাব, তাঁহারাই বিশেষভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

স্বামী রাম যে কেবল ধার্ম্মিক বা গণিতজ্ঞ ছিলেন তাহা নহে, তিনি একজন প্রভূত শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। কালিফোর্নিয়া প্রবাসকালে ডাক্তার হিলার তাঁহাকে একদিন শাস্তা প্রস্রবণের (Shasta spring) রমণীয় উপত্যকাভূমি দেখাইবার জন্য লইয়া যান। সেখানে কয়েকটী ভদ্রলোক তথাকার সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতে কে প্রথমে উঠিতে পারেন তাহা লইয়া বাজী রাখিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে আল্প পর্ব্বত উল্লঙ্ঘনকারী কয়েকজন ভদ্রলোকও ছিলেন। কিন্তু স্বামী রামই সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বোচ্চ স্থানে উঠিয়া গেলেন। স্বামী রাম আর একবার একজন আমেরিকান সৈনিক পুরুষের সহিত ত্রিশ মাইল ব্যাপী দৌড়ে নিযুক্ত হন, এখানেও তিনি সৈনিক পুরুষের কয়েক মিনিট পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

স্বামী রামতীর্থ ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের বড়দিনের সময় ভারতে প্রত্যাগমন করেন। তিনি আমেরিকায় কি কাজ করিয়াছিলেন তাহা সংবাদপত্র পাঠে জানিবার উপায় নাই। তাঁহার কার্য্যাবলীর বিবরণ যাহা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল তাঁহার আমেরিকার বন্ধুবান্ধবেরা ভারত আগমনকালে তাহা তাঁহাকে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি সেই সব বিবরণ সমুদ্রমধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং তিনি আমেরিকা হইতে আপন কার্য্যাবলীর কোন সংবাদ দেন নাই বা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই।

স্বামী রামতীর্থ ভারতে আগমন করিলে তিনি কোন নূতন ধর্ম্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিবেন কিনা তাঁহাকে প্রশ্ন করায় তিনি বলিয়াছিলেন যে, ভারতে অনেক ধর্ম্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তিনি কোন নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে চান না। তাঁহার সকল সম্প্রদায়ের সহিত যোগ রাখিয়া সার্ব্বভৌমিক সত্য ও বিশ্বজনীন প্রেম প্রচার করিবার ইচ্ছা ছিল। তবে যতদূর আমরা জানিতে ও বুঝিতে পারিয়াছি ব্রাহ্মসমাজের সহিতই তাঁহার মতের বিশেষ ঐক্য ছিল।

স্বামী রাম ভারতে আসিয়া দিল্লী, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন, দেরাদুন প্রভৃতি স্থানে, আপনার ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছিলেন। কাশীধামে গিয়া সেখানকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন।

অভ্রান্ত শাস্ত্রে একান্ত বিশ্বাসবান পণ্ডিতবর্গ সরল যুক্তি মার্গের আদৌ পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহারা প্রত্যেক প্রতিপাদিত সত্যকে শাস্ত্রবচন দ্বারা সমর্থিত দেখিতে একান্ত প্রয়াসী। যে তর্কের মূলে শাস্ত্রের সমর্থন নাই তাহা অতীব যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায়ানুমোদিত হউক না কেন তাঁহাদের নিকট তাহার কোন মূল্য নাই। স্বামী রাম তাঁহাদের মত শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন না, বিশেষতঃ শাস্ত্রবচন তাঁহার একেবারেই কণ্ঠস্থ ছিল না, সেই হেতু আপন ধর্ম্মমত প্রচারে বিশেষ ফললাভ করিতে পারেন নাই। তিনি নির্জ্জনে শাস্ত্রালোচনা করিবার জন্য টিরীরাজের আশ্রয়ে ভাগীরথে তীরে "রামাশ্রম" প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর তারিখে স্নান করিতে গিয়া হঠাৎ তিনি জলমগ্ন হন। স্নানান্তে ভাগীরথীকূলে বসিয়া প্রাণায়ামে নিযুক্ত ছিলেন হঠাৎ প্রবল জলস্রোত আসিয়া তাঁহাকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। তাঁহার মৃতদেহ দৃষ্টে মনে হয় তিনি তৎকালে সমাধিমগ্ন ছিলেন। স্বামী রামও রাজর্ষি রামমোহনের ন্যায় মানবজাতির একটী প্রকৃতিগত একতা দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই উদার সার্ব্বভৌমিক ভাব একদিকে তাঁহাতে বিশ্বজনীন প্রেম অন্যদিকে অসাধারণ স্বজাতি প্রীতি ও স্বদেশ বাৎসল্য উৎপন্ন করিয়াছিল। তিনি "আমেরিকাবাসীদিগের নিকট নিবেদন" শীর্ষক বক্তৃতায় হতভাগিনী জন্মদুঃখিনী জন্মভূমির কথা এইরূপে বলিয়াছিলেন—

"সত্য বটে অতীত কালে পরোক্ষ ও অপরোক্ষ ভাবে ভারত জগতকে বিভিন্ন ধর্ম্ম প্রদান করিয়াছিলেন কিন্তু রাম আজ তোমাদিগকে বলিতে চাহিতেছেন যে আজ কাল যে সকল নব ধর্ম্ম ও নব মত ইউরোপ ও আমেরিকাকে আলোড়িত করিতেছে তাহারও আলোক এখনও ভারত হইতে আসিতেছে। তোমাদিগের নব চিন্তা, নব ধর্ম্মতত্ব, প্রেত বিদ্যা, (Spiritualism) খ্রীষ্টবিজ্ঞান, মানসিক চিকিৎসা (Mental Healing) প্রভৃতি যাহার জন্য আজ তোমরা এত গৌরব অনুভব করিতেছ ইহাদের সকলেরই মূল পুণ্য ভারত ভূমি। যে দেশ পুরাকালে এবং বর্ত্তমান সময়ে জগতকে নানাবিধ দর্শন শাস্ত্র প্রদান করিয়াছেন রাম আজ তোমাদিগকে সেই দেশের কথাই বলিতেছেন। দর্শনেতিহাস আজ সুস্পষ্টরূপে প্রচার করিতেছেন প্লেটো, সক্রেটিস্, পিথাগোরাস্, প্রভৃতি গ্রীক দার্শনিকগণ ভারতবাসীর দ্বারাই অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। সপেনহার স্লীগেল, স্লিলিং, কুজিন্ প্রভৃতি দার্শনিকগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহারা শঙ্কর, বুদ্ধ, উপনিষদ ও গীতা হইতেই উদ্দীপনা লাভ করিয়াছিলেন। যে দেশের উচ্চ চিন্তা ও মহৎ আদর্শ তোমাদিগের ভক্তিভাজন এমার্শন, হুইটম্যান, আর্ণল্ড, মোক্ষমুলার প্রভৃতিকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, রাম আজ তোমাদিগকে সেই শঙ্কর ও শ্রীকৃষ্ণের দেশের কথাই বলিতেছেন। ভারত যে কেবল উচ্চচিন্তা ও মহৎ আদর্শ কাব্য ও দর্শনের জন্মভূমি তাহা নহে তিনি শৌর্য্য বীর্য্যের জন্যও সুবিখ্যাত। যে দেশ এককালে ধনরত্নে পরিপূর্ণ ছিল, যাহার ধনরত্ন আহরণ করিয়া জাতির পর জাতি ঋদ্ধিমান হইয়াছেন এবং যে লোভনীয় দেশের অনুসন্ধানে যাইয়া কলম্বস্ আমেরিকা আবিষ্কার করিয়া ফেলেন, রাম আজ তোমাদিগকে সেই দেশের কথাই বলিতেছেন। ভারত যে কেবল শৌর্য্য বীর্য্যে জগতের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন তাহা নহে, ভারত জ্ঞানে, গুণে ও ধর্ম্মে জগতের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। যে মাতা জগতকে কাব্য ও দর্শন, উচ্চ চিন্তা ও উন্নত ধর্ম্মদ্বারা পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন জগতের সেই প্রাচীন শিক্ষাদাত্রী জননী

আজ রোগশয্যায় শায়িতা। তোমরা কি এখন তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইবেনা?"

রাম ভারতের দুঃখ কাহিনী বর্ণনা করিতে করিতে আত্মহারা হইয়া উন্মত্তের ন্যায় বলিয়াছিলেন যে,—

"তোমরা রামের দেহকে পরিত্যাগ করিতে পার, রামকে নিষ্পেষিত করিতে পার, রামকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিতে পার, রামের দেহ লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পার কিন্তু দোহাই তোমাদের ভারতের পক্ষ অবলম্বন কর, সত্যের পক্ষ অবলম্বন কর।"

জাতিভেদের কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছিলেন,—

"কে তুমি কে আমি যে নিম্নশ্রেণীর কার্য্যকে নীচ বলিব বা ঘৃণা করিব। পুরোহিত যোদ্ধা বা ব্যবসায়ী অপেক্ষা তাঁহাদিগের কার্য্য কিসে হীন? ভারতের অবস্থা এমনই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে পথ দিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যেরা গমনাগমন করেন সে পথ দিয়া শূদ্রের যাইবার অধিকার নাই। যে গ্রামে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বাস করিবেন সে গ্রামে নিম্নশ্রেণীর বাসের অধিকার নাই। যদি শূদ্রের ছায়া ব্রাহ্মণের উপর পতিত হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে স্নান করিয়া পবিত্র হইতে হইবে, যদি নিম্নজাতির লোক কোন দ্রব্য স্পর্শ করেন তাহা হইলে তাহা অপবিত্র কলুষিত হইয়া উচ্চ জাতির ব্যবহারের অনুপযুক্ত হইয়া যায়। নিম্ন জাতির বালকগণ উচ্চ জাতির বালকদিগের সহিত একই বিদ্যালয়ে পড়িতে পায় না। ইহা অপেক্ষা অমানুষিক অত্যাচার আর কি হইতে পারে। এ সব কথা ভাবিতে রামের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।"

নারী জাতিকে রাম বিশেষ ভাবে শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহাদের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"ইঁহারা স্বর্গীয় জিনিষ, ইঁহাদিগকে পূজা করিতে হয়। ইঁহারা দেবতা, আনন্দের সৌন্দর্য্যসূর্য্যের সমুজ্জ্বল রশ্মি। যে শাস্ত্র, যে বিধি নারী ও শূদ্রকে অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত রাখিতে চায় তাহাকে কর্ম্মনাশার জলে নিক্ষেপ কর।"

স্বামী রাম বেদান্তদর্শনের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। অনেকে বেদান্ত পাঠ করিয়াছেন বেদান্ত আলোচনা করিয়াছেন কিন্তু কেহ রামের মতন জীবনে বেদান্ত প্রতিপালন করেন নাই। কি প্রাচ্য কি প্রতীচ্য দার্শনিক যিনিই রামের সহিত আলাপ করিয়াছেন, সহবাস করিয়াছেন, তিনিই একবাক্যে ইহা স্বীকার করিয়াছেন।

রাম সত্যের জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। তিনি কোনও দিনই শাস্ত্রের অর্থ কদর্য্য করিয়া আপনার মত সমর্থন করেন নাই। যেখানেই শাস্ত্রের সহজ ও সরল অর্থের সহিত তাঁহার মতের অনৈক্য হইয়াছে সেখানেই সুস্পষ্টরূপে তাহা স্বীকার করিয়াছেন। এখানেও রাজর্ষি রামমোহনের কথা মনে পড়ে। তিনি হিন্দু মুসলমান খৃষ্টীয়ান প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের সহিত ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তিনি কোনও স্বার্থসিদ্ধির জন্য শাস্ত্রের কদর্থ করিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করেন নাই।

স্বামী রাম সরলতার আদর্শ ছিলেন। তাঁহার সরল অমায়িকভাব দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন তাহা সরল স্পষ্ট কথায় বলিয়া যাইতেন। লোক বা সমাজ বিশেষের খাতির রাখিতেন না। দেরাদুনস্থ আর্য্যসমাজ মন্দিরে বক্তৃতাকালে তাঁহাদের অতি প্রিয় "হোমযজ্ঞে"র অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা", উপলক্ষে বলিয়াছিলেন—

"অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া বায়ু পরিষ্কার করিবার জন্য হোমের প্রয়োজন নাই। প্রতি গৃহে শত সহস্র

অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত হইতেছে, কত শত বনাগ্নি সংঘটিত হইতেছে তাহাতে বায়ু সংশোধিত হইতেছে না আর আর্য্য সমাজে কয়েকটা হোম যজ্ঞ করিলেই বায়ু পরিষ্কৃত হইয়া যাইবে ইহা অতি অবৈজ্ঞানিক কথা, অতি অসত্য কথা।"

অনেকে বিদেশে গিয়া এদেশের কুরীতি ও কুনীতি সকলের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিয়া আপনাদিগের গৌরব করিয়া থাকেন, কিন্তু স্বামী রাম এ সব ঘৃণা করিতেন। যাহা লইয়া ভারতের যথার্থ মহত্ত্ব সেই শাশ্বত সত্যের উপর দণ্ডায়মান হইয়া স্বামী রাম মাতৃভূমির গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

এমন ধার্ম্মিক, বিনয়ী, সত্যপরায়ণ, সরলতার সৌম্যমূর্ত্তি স্বদেশভক্তের অকাল-মৃত্যুতে ভারতের কত ক্ষতি হইয়াছে, তাহা ভগবানই জানেন। লীলাময় বিধাতার লীলা কে বুঝিবে?

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র।

পরীক্ষার্থী।

পাস কোরতেই হবে এই মনে কোরে যখন সুরেশ তার ছোট্ট পড়বার ঘরটির দরজা জানলা খুলে দিয়ে 'ভবিযুক্ত' হোয়ে পড়তে বস্‌ল, তখন সবে ভোর হয়েচে। দরজার ভিতর দিয়ে জানালার ফাঁক দিয়ে প্রভাতের বায়ু, অনন্ত পুরুষের আশীর্ব্বাদের মত, অবাধে ঘরে প্রবেশ করে তার সর্ব্বাঙ্গে কোমল স্পর্শ বুলিয়ে গেল। সুরেশ আনমনে সাইকলজির পাতা উল্টাতে লাগল। ভোর যে হয়েচে সে কথা পাখীরা প্রথম রটিয়ে দিলে। পাখীর প্রভাতী সঙ্গীত রক্তের প্রবাহের মত তার শিরায় শিরায় ছুটে গেল। সে মাথা তুলে চেয়ে দেখলে, ছোট ছোট শাদা শাদা মেঘ আকাশময় ছড়িয়ে পড়ে আছে। যখন তাদের উপর সূর্য্যের কিরণ এসে পড়ল তখন মনে হল যেন বিস্ময়ে ও আনন্দে আকাশ রোমাঞ্চিত হোয়ে উঠেছে। প্রভাতের আসার সংবাদ ক্রমে পৃথিবীর কাছে এসে পৌছল। গাছগুলো হাত পা মেল্‌তে লাগল, পাতাগুলো বাতাসের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে নিজেদের শরীর দোলাতে লাগল, ফুলের কুঁড়ি জগতের প্রাণের ভিতর ঢোকবার জন্যে সৌরভ নিয়ে বেরিয়ে এল। পথ দিয়ে দু'একটা লোক চল্‌তে আরম্ভ করলে। পৃথিবীর লোক কাজের জন্য ছুটল। একাজের কি শেষ নেই? কি নির্ম্মম কাজ। সুখ দুঃখ রাখবার ঠাঁই নেই, হৃদয়ের পানে তাকাবার অবসর নেই, প্রাণের প্রতি সুবিচার কোরবার সুযোগ নেই। কি নিষ্ঠুর কাজ! বিয়োগবিধুরা জননী নিঃশব্দে চোখের জল মুছে গৃহকাজে রত হলেন, পতিহীনা রমণী মনের আগুন চাপা দিবার জন্য উননের আগুন জাল্‌লেন, শোকসন্তপ্ত পিতা পুত্র-শোক ভুলবার জন্যে সাংসারিক হিসাবে মনোনিবেশ কোরলেন। এত দুঃখ এ পৃথিবীতে, এত কষ্ট এ জীবনে! দু'পাতা সাইকলজি পড়ে কি এ দুঃখ দূর হবে, এক চ্যাপটার লজিক কি এ কষ্টের অপনোদন কোরবে! সুরেশ বই ফেলে রেখে পৃথিবীর

কাজের ভিতর আপনার মন নিয়ে প্রবেশ কোরে দেখ্‌লে, এ কাজের বিরাম নেই, এ কাজের অন্ত নেই। নিষ্ঠুর কাজ বিরাট অজগর সর্পের মত মানুষের হৃদয় পিষে দিচ্চে। সুরেশের তখন আর পড়া হল না।

বেলা এগারটার সময় সুরেশের মা সুরেশের ঘরের দরজা থেকে ডেকে বোল্‌লেন, সুরেশ, নাবি খাবি আয় বাবা। পড়ে পড়ে যে শরীরটা মাটি হোয়ে গেল, ধন। সুরেশ মায়ের কথা শুনে লজ্জিত হোয়ে বই বন্ধ কোরে স্নান কোরতে গেল। দেখ্‌লে, তার জন্যে স্নানের জল তোলা আছে, কাঁচের বাটিতে জবাকুসুম তেল ঢালা আছে। কাপড় খানি ও গামছা খানি পর্য্যন্ত হাতের কাছে সাজান আছে। সুরেশের ছোট বোন মালতী মায়ের আদেশে দাদাকে তেল মাখাতে ব'সল, এবং সুরেশের মা তার ভাত বাড়তে রান্নাঘরে গেলেন। সুরেশ পরীক্ষা দেবে বোলে বাড়ী-শুদ্ধ লোক শশব্যস্ত। সুরেশের বাবা আফিস চলে গিয়েছেন কিন্তু আফিস যাবার আগে গৃহিণীকে বিশেষ ভাবে বোলে গিয়েছেন যেন সুরেশের আহারের উপর নজর রাখা হয়। গৃহিণী তাই সুরেশের জন্য ভোজের আয়োজন কোরেছেন। সুরেশ যখন খেতে বসল তখন তার মা কাছে বসে, 'এটি খাও ওটি খাও' বোলে অনুযোগ কোরতে লাগলেন, মাছের কাঁটা বেছে দিলেন, নিজে হাতে দুধে অনেক কোরে ভাত মেখে দিলেন। সুরেশ ভাত খেতে খেতে ভাবলে, সকালে যেমন পড়া হয় নি, দুপুর বেলা এমন মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে, যাতে সকালের ক্ষতিটা পূরণ হয়। ভাত খাওয়া শেষ হোলে যখন সে পড়তে গেল তখন সুরেশের মা বাড়ীর সব মেয়েদের ডেকে নিয়ে উপরে চলে গেলেন এবং তাদের বার বার কোরে বোলে দিলেন যেন তারা সুরেশের পড়বার ঘরের দিকে একেবারে না যায়। দাদা পরীক্ষা দেবে বোলে সুরেশের ছোট ছোট ভাই বোনেরা অতি সম্ভ্রমের সহিত সুরেশের পড়বার ঘরটি এড়িয়ে গেল। সমস্ত দিন তারা চুপে চুপে খেলা কোরতে লাগল। কেউ গোলমাল কোরলে মালতী অমনি বোলে উঠল, চুপ, কর ভাই, দাদা পড়ছে। সুরেশ পড়বার ঘরের সকল দরজা বন্ধ কোরে দিয়ে কেবল একপাট জানালা খুলে রেখে পড়তে ব'সল। নীতিশাস্ত্রের দরজা ধোরে যখন সুরেশের বুদ্ধিটা বিস্তর ঝাঁকাঝাঁকি কোরচে এমন সময় সুরেশের তন্দ্রা এল। ঘুমের ভারে তার চোখের পাতা বুজে এল, সে বইয়ের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল'। দুর্গরক্ষককে অনবধান দেখলে বন্দী যেমন এক দিক দিয়ে ছুটে বেরিয়ে পড়ে, সুরেশের মনও সেই রকম সুরেশকে নিদ্রিত দেখে ওধাও হোয়ে অনন্তের পথে ছুটল'। বাড়ীর উপর দিয়ে কতক গুলা কাক একসঙ্গে কাকা কোরতে কোরতে উড়ে গেল। আততায়ীর দেশে সশস্ত্র সৈনিকের মত, দুঃস্বপ্নময় ঘুম থেকে সুরেশ চমকে উঠে বসল। সেই সময় অনেক দূরে একটা চিল চীৎকার কোরে উঠ্‌ল। তার চীৎকারে আকাশের আধখানা কেঁপে উঠ্‌ল। প্রকৃতির নিস্তব্ধতা তরঙ্গায়িত হোয়ে উঠল।' ঠিক সেই সময় আবার বাড়ীর পাশের রাজ-মিস্ত্রীরা সমস্বরে গান ধর্‌লে,—রাধে গো তোর সাধের তরী লেগেছে প্রেমের ঘাটে। বাড়ীর

পাশ দিয়ে কতক গুলো রাজহাঁস এক জোটে প্যাঁক প্যাঁক কোরতে কোরতে পাড়া জাগিয়ে চোল্লো। চিলের চীৎকারের সঙ্গে মানুষের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে আর সেই হাসের ডাকের সঙ্গে সুরেশের মনের কি ষড়যন্ত্র ছিল জানি না। কিন্তু সেই চীৎকার আর সেই গান আর সেই ডাক আর সুরেশের ঘরের শক্র মন এমন কোরে সুরেশকে মাতিয়ে দিলে যে সে আর কিছুতেই ঘরের মধ্যে চুপ কোরে বসে থাকতে পারলে না। সুরেশের মনে হ'ল যেন সমস্ত বিশ্বজীবন তার জীবনকে ডেকে নিচ্চে। তার প্রাণ যেন সব নিস্তব্ধতা সব শব্দের ভিতর তার প্রিয়-তমের সাড়া পেয়েছে। অপরিচিতের মধ্যে মাতৃহারা শিশু যেমন ফুক্‌রে কেঁদে ওঠে, সুরেশের হৃদয়ও তেমনি শুষ্ক কঠোর অক্ষর রাশির মধ্যে কেঁদে উঠল'। সুরেশ তাড়া-তাড়ি ঘরের বার হোয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। রাস্তার রৌদ্রতপ্ত ধূলি এমন কোরে তার পায়ের সঙ্গে জড়িয়ে গেল যেন তারা সুরেশের চরণে শরণ লাভ কোরে বাঁচল। শেষ বেলার পড়ন্ত রৌদ্র কিরণ এমন ভাবে সুরেশের গায়ের উপর এসে পড়ল যেন সেও সুরেশকে পেয়ে বড় খুসি। আকাশ তার স্থির চক্ষু বিস্তার কোরে নীরব তিরস্কার জানিয়ে যেন বোল্লে, নীতিশাস্ত্র ও স্থায়শাস্ত্রের চেয়ে তারই সুরেশের উপর বেশি দাবী। আকাশ বাতাস ও আলোর মধ্যে সুরেশ নিজেকে হারিয়ে ফেল্লে।

সন্ধ্যার সময় সুরেশের পিতা রামতারণবাবু আফিস থেকে ফিরে এসে দেখলেন, সুরেশ তখনো বই হাতে কোরে বসে আছে। ঈষৎ ভৎসনার সুরে তিনি সুরেশকে বল্লেন, "সন্ধ্যা হয়েছে, আর কেন? এখন একটু বেড়িয়ে এস গিয়ে। সন্ধ্যার সময় ঘরে বসে থাকলে অসুখ করবে যে!" সুরেশ খাবার খেয়ে বেরিয়ে গেলে পর রামতারণবাবু স্ত্রীকে বল্লেন, "আমার ত সাতাশ বচ্ছর চাকরী করা হল। তা আমি এই মাস থেকেই পেনসন নিচ্চি।" স্ত্রী বল্লেন, "ভালই হল। তোমার শরীরটা বড় খারাপ হোয়ে গিয়েছে। আর খাটবার বয়স নেই—আর সুরেশও ত মানুষ হয়ে উঠল।" রামতারণবাবু বোল্লেন, "আমি তাই ভেবেই ত পেনসন নিলাম। এই কটা মাস বৈ ত নয়। সুরেশ বিয়েটা পাস কোরতে পারলে আর দুঃখ থাকবে না। বড় সাহেবকে বোলেছিলাম, তিনি ভরসা দিয়েছেন ছেলে বিয়ে পাস কোরলে নিশ্চয়ই বড় চাকরী কোরে দেবেন।" সুরেশের মা তাই শুনে ভারী খুসি হলেন। সুরেশ ভাল ছেলে, বিয়ে পাস কোরবেই। এখন তার বিয়ে দিয়ে একটি সুন্দর বৌ আনতে পারলেই তাঁর সকল সাধ পূর্ণ হয়। রামতারণবাবু আফিসের কাপড় ছাড়তে ছাড়তে জিজ্ঞাসা কোরলেন, "আজ ঘটক ঠাকরুণের আসবার কথা আছে না?" স্ত্রী ঘর ঝাঁট দিতে দিতে বল্লেন, "হাঁ আজকেই ত আসবে, আমি কিন্তু বোলে দিয়েছি নগদ তিন হাজার টাকার কম ছেলের বিয়ে দেব না। মালতী দিদি তার ছেলের বিয়ে দিয়েচে দেখেচ ত? ছেলে ভারী ত একটা পাস কোরেচে। তবু সাড়ে তিন হাজার টাকা নগদ নিয়েচেন, তা ছাড়া ঘড়ি, ঘড়ির চেন, ছেলের জন্তে বাইসিকেল। এ ছাড়া মেয়েকে এক গা গয়না দিয়েছে। আমার ছেলে কি

যেমন তেমন ছেলে। তবু ত আমি তিন হাজার টাকার বেশি বলি নি।” রামতারণবাবু রসগোল্লাটি গালে পূরে দিয়ে বোল্লেন, সুরেশের বিয়ের জন্যে আবার ভাবনা কিসের? ওরা তিন হাজার টাকা না দেয় আমি হরি সান্যালের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেব, তারা চার হাজার টাকা দিতে চেয়েচে। সুরেশের মা, ‘বেশি লোভ কোরতে নাই গো’ বোলে প্রদীপটি জ্বেলে নিয়ে রান্নাঘরে গেলেন। ভাতের হাঁড়িটা উননে চাপিয়ে সরা চাপা দিয়ে যখন তিনি আলুর খোসা ছাড়াতে বসেছেন তখন ঘটক ঠাকরুণ ‘বাড়ীর সব কোথা গো’ বোলে হেলে দুলে পান চিবুতে চিবুতে এসে হাজির হলেন। সুরেশের মা বঁটিখানা সরিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি একখানা পিঁড়ি পেতে দিলেন আর মেয়েকে বোল্লেন, “যালো তোর বিরাজী মাসিকে ডেকে নিয়ে আয়। বোল্‌গে ঘটক ঠাকরুণ এসেছে, শীগগীর এস।” বিরাজী ঠাকরুণ আঁচলে চাবির গোছা বেঁধে হাসতে হাসতে এসে উঠলেন। তখন ঘটক ঠাকরুণ ও ছেলের মা ও ছেলের মাসী গয়নার ফর্দ্দ আর টাকার পণ নিয়ে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত কোরলেন। মেয়ের বাপ মোটে আড়াই হাজার টাকার পণ দিতে স্বীকৃত হওয়ায় বিরাজী ঠাকরুণ গালে হাত দিয়ে বলে উঠলেন, “ও মা এই না কি কথা! তিনটে পাস করা ছেলের বিয়ে কি আড়াই হাজার টাকায় হয়? সুরেশের মা কোলের মেয়েটাকে ধপ কোরে মাটিতে নামিয়ে দিয়ে ডালের হাঁড়িতে সজোরে কাঠি নাড়তে লাগলেন। সে রাত্রে কিছুই মীমাংসা হল না।

তার পর দিন সকালে ঘটক ঠাকরুণ পুনরায় এসে বোলে গেলেন যে মেয়ের বাপ তিন হাজার টাকাই দিতে স্বীকার কোরেছেন। তখন বিরাজী ঠাকরুণ শাঁখটা নিয়ে সজোরে তিনবার ফুঁ দিলেন, বাড়ীর ঝি বিয়েতে নগদ নেবে বোলে সুরেশের মার কাছে বায়না ধরলে, ঘটক ঠাকরুণ বোল্লে, আমি দশ টাকার কম বিদেয় নেব না। সুরেশের ছোট ভাই বিপিন বোল্লে, দাদার বিয়েতে আমি জুনী গালী চলুব। বিরাজী ঠাকরুণের পাঁচ বছরের একটি ছেলে রসগোল্লার ভারী ভক্ত। সে বোল্লে, বিয়েতে আমি রসগোল্লা পরিবেশন কোরব। সুনীতি বোল্লে, আমি উলু দেব আর শাঁখ বাজাব। সুরেশের মা হাসতে হাসতে কর্ত্তাকে সুখবরটা দিতে গেলেন। কর্ত্তা শুনে বল্লেন, দেখ বিয়ের টাকা থেকে এক হাজার টাকা আমায় দিতে হবে, আমি একটা কাপড়ের দোকান খুলব ভাবচি। গিন্নী বল্লেন, আমার বাড়ীর তৈরী না হোলে আমি কাউকেই কিছু দে না। কর্ত্তা বল্লেন, তা হবে এখন।

তার পর মিত্তিরদের বাড়ীর মিনু, ভটচাজের বৌ হরিদাসী, সরকারী উকিলের পিসতত ভাইয়ের নাতজামাইয়ের আপন খুড়ির সহোদর বোন নবীনকালী, জজের পেস্কারের শালীর পুত্রবধূ ভুবনমোহিনী, এক এক কোরে এসে হাজির হলেন। কেউ বল্লেন মাসি, কেউ বল্লেন দিদি, কেউ বল্লেন বোন্, ছেলের বিয়ে দিচ্চ আমরা যেন ফাঁক না যাই। সুরেশের মা হাসতে হাসতে সকলকেই বোল্লেন ওমা তাই নাকি হয়! তোমাদের আগে খবর দেব। তোমরাই হোলে ছেলের মা মাসি। তোমরা কর্ম্মে কর্ম্মাবে না ত পথের লোক ধোরে আনব?

এতগুলা লোকের সাধ আহ্লাদ মিটাবার ভার যার উপর সে লোকটা কিন্তু ঘরোয়া বিবাদে মাটি হতে চোল্লো। সে যখনই বই হাতে কোরে বসে, তখনি তার মনটা আকাশপথে ছুটে যায়, তার প্রাণটা পথে ঘাটে হাটে বাজারে লোকজনের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে। সুরেশ বেচারা স্মৃতি শক্তির সাহায্যে কোন রকমে পরীক্ষা অরণ্য পার হচ্ছিল কিন্তু বাইরের জগৎ তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কোরে তাকে এমন বিপথে নিয়ে ফেল্‌লে যে সে কিছুতেই আর নিজেকে উদ্ধার কোরতে পারলে না।

সুরেশের ফেল হওয়াতে বাড়ীতে শোকের ঝড় বহে গেল। কর্ত্তা দিন কতক ধোরে নিবিষ্ট চিত্তে রামায়ণ মহাভারত পড়তে লাগলেন। গিন্নী অর্দ্ধেক দিন রান্নাঘরেই কাটাতেন। ভাত রান্না খাওয়া হোয়ে গেলেও খোলা চড়িয়ে বসে থাকতেন। মুড়ি ভেজে মুড়ির চাল কোরে নিজের মনকে শান্ত কোরতেন। ঘটক ঠাকরুণ বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে আর এক বাড়ীতে গিয়ে উঠলেন। সুরেশের বন্ধুবান্ধবেরা কেউ মৌখিক কেউ বা আন্তরিক সহানুভূতি দেখালে। সুধাংশুর মা—যাঁর ছেলে তিনবার ধোরে এফ্‌ এ ফেল হচ্ছিল—আঙুল মটকাতে মটকাতে বল্লেন, "ঐ দেখ, অত অহঙ্কার কি আর সহ্য হয়! দর্পহারী মধুসূদন ত আছেন! সুধাংশু আর সুরেশ একসঙ্গে এফ্‌ এ পরীক্ষা দেয়। সুধাংশু ফেল হয়, সুরেশ পাশ হয়ে যায়। সুরেশের মা ছেলের পাশ হওয়ার সন্দেশ বলে সুধাংশুর মার কাছে এক থালা গোল্লা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সুধাংশুর মায়ের সে গোল্লা আজও পর্য্যন্ত জীর্ণ হয় নি। পাড়া-বেড়ানী উমাসুন্দরী যখন সুধাংশুর মার কাছে দৈনিক গেজেট নিয়ে এল, তখন সুধাংশুর মা তাকে হাসতে হাসতে বল্লেন, ওলো সুরেশের মাকে বলিস,—ছেলের বিয়ের সন্দেশটা যেন পাই।

সুরেশ মার্ক আনিয়ে দেখলে সে মোটের উপর আট নম্বরের জন্য ফেল হয়েচে। তবু সে ফেল! সে অঙ্কের পাসের সঙ্গে নিজের ফেলের তুলনা কোরে তার সঙ্গে নিজের মোটে এক বিঘৎ তফাৎ মনে কোরে নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল কিন্তু সে অতি শীঘ্রই টের পেলে যে এই এক বিঘৎ জায়গাতে সমস্ত পৃথিবীটা তার মান অপমান ঐশ্বর্য্য দারিদ্র্য সুখ দুঃখ প্রভেদ নিয়ে এসে দাঁড়াল। সম্মান ঐশ্বর্য্য সুখ তার চোখের সামনে ঘুরতে লাগল কিন্তু সে তাদের কাছ থেকে যেন একটা জীবন পিছিয়ে পড়ল। ব্রজলালের মা যখন নগদ তিন হাজার টাকা, এক প্রস্থ রূপার বাসন এবং সোণা দিয়ে মোড়া বধূটিকে বরণ কোরে ঘরে তুল্‌লেন তখন রামের মা, শ্যামের মা, হরির মা, সকলেই সমস্বরে বল্লেন, আহা, তা হবে না কেন,! ছেলেও যে তেমনি, তিনটে পাস! যথাসময়ে উমাসুন্দরীর মারফৎ ব্রজলালের মার সৌভাগ্যের কথা সুরেশের মার কাছে পৌঁছাল। সুধাংশুর মা উমা-সুন্দরীকে গয়নার ফর্দ্দ লিখে দিয়েছিলেন। এই ধর সিঁথের সিঁতি, কানে মাকড়ী, নাকে নথ, বাজু, তাবিজ, চিক, চন্দ্রহার, বালা, অনন্ত। এক একখানা গহনা এক একটা কাঁটার মত সুরেশের মার বুকে বিঁধে গেল।

অল্প দিনের মধ্যে সুরেশের পিতাও

রোগশয্যায় আশ্রয় নিলেন। তাঁর স্বাস্থ্য আগে থেকেই ভেঙ্গে ছিল, পুত্রটি ফেল হওয়ায় তিনি মনে যে আঘাত পেলেন তাতে শরীর আরো বিগড়িয়ে গেল। সুস্থ শরীরে পেনসনের অল্প টাকায় এক রকম চলে যেত। এখন রোগের খরচ বেড়ে যাওয়ায় বড় টানাটানি পড়ল। সংসারে দারিদ্র্যের ছায়া দেখা দিলে। তার উপর ব্রজলালের ডেপুটী হওয়ার খবর নিয়ে এ পাড়ার মাসী, ও পাড়ার পিসী, নতুন পাড়ার জ্যেঠী সুরেশের মার কাছে এসে সুরেশের ফেল হওয়ার জন্যে কর্ত্তার অসুখের জন্যে আর সংসারে টানাটানি পড়ার জন্যে বিলক্ষণ রসান দিয়ে গেলেন। কর্ত্তার বিছানার কাছে বসে আধখানা ঘোমটা খুলে দিয়ে ব্রজলালের মার সুখ ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে সুরেশের মার দুঃখ দারিদ্র্যের তুলনা কোরতে লাগলেন। মাসী বল্লেন, আহা ব্রজলাল বড় ভাল ছেলে গো। পিসী বল্লেন, উপযুক্ত ছেলে, বিয়ে পাস কোরেচে. তবে ত ডেপুটী হয়েছে। জেঠী বল্লেন, তাতেই ত তাদের সংসারে সুখ ঐশ্বর্য্য উথলে উঠেছে। শুনে সুরেশের মা গোপনে চোখের জল মুছলেন, সুরেশের বাবা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে সুরেশ যে দিকে বসেছিল, সে দিক থেকে অন্যদিকে চোখ্ ফেরালেন।

তার পর সুরেশের বাবা মারা গেলেন। সুরেশের উপর সংসারের ভার পড়ল। সে অনেক কষ্টে অনেক উমেদারী কোরে কোন জমিদারের কাছারিতে কুড়ি টাকা বেতনে একটা চাকরী যোগাড় কোরলে। এতদিন পরে সে আট নম্বরের প্রভেদ বুঝতে পারলে। সে ফেল হয়েছে—তার মানে সে কর্ত্তব্য পালন করে নি। ছাত্রজীবনের যা সর্ব্বোচ্চ পাপ সে তাই অর্জ্জন কোরেচে। জগতের বিচার ঠিকই হয়েচে। অকৃতকার্য্যতার দণ্ড জগৎ এই রকমেই দিয়ে থাকে। তার ব্রহ্মচারী হোয়ে তপস্যা করা উচিত ছিল। সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযত কোরে সাধনা করা উচিত ছিল, সমস্ত অন্তর্জগৎকে অধ্যয়নের কাজে নিযুক্ত করা উচিত ছিল—সে তা পারে নি, তাই তার দাম আজ কুড়ি টাকা। ব্রজলাল পেরেছিল, তাই তার দাম আজ দুশো টাকা। সুরেশ ঠিক কোরলে, সে এবার তপস্যা কোরবে। সে সকালে আর বিকালে কাছারীর কাজ করে, দুপুর বেলা কলেজে যায়। রাশি রাশি বেকন দেকার্ট মিলের টীকা দিয়ে হৃদয়কে চাপা দিয়ে রাখলে, ইংরেজ কবিগণের পার্থিব উন্নতিবিষয়ক শত শত নীতি বচন দ্বারা প্রাণটাকে আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে রাখলে। এক বৎসর এইভাবে সংযম কোরে পরীক্ষা যজ্ঞে দীক্ষিত হল।

কিন্তু পরীক্ষা দিয়ে ফিরে এসেই সে রোগে পড়ল। যে উত্তেজনা ভিতরকার মানুষটাকে চাপা দিয়ে তার উপর বুদ্ধির সঙ্গীন চড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, সে উত্তেজনা সরে পড়বামাত্র ভিতরকার মানুষটা সুরেশকে দণ্ড দেবার জন্য উদ্যত হোয়ে উঠল। বুকের ভিতর দুর্ব্বলতা, মাথার ভিতর দুর্ব্বলতা, প্রাণের ভিতর দুর্ব্বলতা—সুরেশ ভাল কোরে হাত পা মেলতেও কষ্ট বোধ করতে লাগল। সে বেশ বুঝতে পারলে তার জীবনের দিন শেষ হয়ে এসেছে।

এক দিন রাত্রে বড় বাড়াবাড়ি হল। ডাক্তার কাছে বসে আছেন। সুরেশের মা

সুরেশের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্চেন। সুরেশ বোল্লে, জানালাটা খুলে দাও, গরম লাগচে। সুরেশের মা তাড়াতাড়ি জানালা খুলে দিলেন। নিদাঘের নির্ম্মল আকাশ অনন্তনীল কাগজের মত চোখের সামনে পড়ে ছিল। সুরেশের মনে হল সে আজ বিশ্বপতির বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে বসেছে। আজ তার জীবনের পরীক্ষা হবে। আজ তার হৃদয়টা কত বড়, তার প্রাণটা কত মহৎ, তার জীবনটা কতখানি কাজের— সমস্ত জগতের সামনে তারই পরীক্ষা হবে। শত শত তারা উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়ে আছে, সমস্ত জগৎ স্তম্ভিত হোয়ে আছে, বাতাসটি পর্য্যন্ত স্থির হোয়ে আছে। এতবড় পরীক্ষা সুরেশ কখন দেয়নি, পরীক্ষা দিয়ে এত আনন্দ সুরেশ কখন পায়নি! তার চক্ষু স্থির হয়ে এল, তার মুখে মহিমার শ্রী ফুটে উঠল, তার বুক শান্ত হয়ে এল। সে তার সমস্ত হৃদয়টা আকাশের গায়ে মেলে দিলে, আকাশ আরো কোমল নির্ম্মল স্নিগ্ধ হয়ে গেল। সে তার সমস্ত জীবনটা তারার উপর ঢেলে দিলে, তারাগুলো আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল। সে তার সমস্ত প্রাণটা নিঃশেষ কোরে দিয়ে লিখে চল্লো।

রাত দুটোর সময় ডাক্তার বল্লেন, এবার নীচে নামাও। আধঘণ্টার মধ্যে সব শেষ হয়ে গেল।

তার পর দিন সকালে টেলিগ্রাম এল— সুরেশ পাস হয়েছে।

শ্রীনলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

হিন্দুমুসলমানের একতা।

হিন্দুমুসলমানের একতা কথা লইয়া রীতিমত আন্দোলন বাধিয়াছে। কথাটি যখন উঠিয়াছে, তখন তাহার আলোচনা একান্ত প্রয়োজনীয় তাহাতে কর্ত্তব্যের পথ নির্দ্দিষ্ট হয় এবং তাহাতে উভয় পক্ষেরই মঙ্গল।

প্রথমে দেখা যাউক, হিন্দু মুসলমানের এই মিলন বাঞ্ছনীয় কি না? কারণ অনেকে আবার এই মিলন আদৌ পছন্দ করেন না। এই প্রশ্নের উত্তরে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে—

ভারতে এমন প্রদেশ নাই যেখানকার অধিকাংশ মুসলমান হিন্দুজ্যোতির্ব্বিদ ও অপরাপর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সমাদর না করেন, যেখানে হিন্দুদিগের পর্ব্বোৎসবে মুসলমানগণ আমোদ প্রমোদ না করেন, যেখানে আপনাদের বিবাহকার্য্যে প্রতিবাসী হিন্দুগণকে নিমন্ত্রণ না করেন। (স্বর্গীয় ভূদেব বাবু)

ভারতে এমন প্রদেশ নাই, যেখানকার হিন্দুগণ মুসলমানদিগকে স্নেহ না করেন, মুসলমানের মসজিদদরগাদি সম্মান ও শ্রদ্ধার চক্ষে না দেখেন, যেখানকার হিন্দুমুসলমান পরস্পর পরস্পরকে দৈনন্দিন সংসারিক-কার্য্যে সহায়তা না করেন। তবে কেমন করিয়া বলি ভারতে হিন্দু মুসলমানের একতা বাঞ্ছনীয় নহে। এ সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় সার্ সৈয়দ আহম্মদ হিন্দু নামক

পত্রে যাহা লিখিয়াছিলেন আমরা তাহার মর্ম্মানুবাদ উদ্ধৃত করিলাম।

হিন্দু মুসলমান! একাত্মা হইতে চেষ্টা কর। কারণ একত্রিত হইলে, পরস্পর পরস্পরকে বিপদ আপদে সাহায্য করিতে পারিবে। আর যদি একত্রিত না হও, তাহা হইলে তোমাদের বিরোধ উভয়কে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইবে। হে হিন্দু মুসলমান ভ্রাতৃগণ! তোমরা কি একই দেশে বাস কর না? তোমরা কি একই দেশে জন্ম গ্রহণ কর নাই? তোমরা কি একই মাতা ধরিত্রী হইতে আহার্য্য দ্রব্য পাওনা? জানিও "হিন্দু," "মুসলমান" শব্দদ্বয় কেবল ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পার্থক্য বুঝাইবার জন্যই, নতুবা সকল ভারতবাসী এক ও একই "নেশন।" এইহেতু 'নেশন' শব্দ দ্বারা আমি হিন্দু মুসলমান ও অন্যান্য ভারতবাসীকে নির্দ্দিষ্ট করি। আমি এই শব্দ দ্বারা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমত বুঝি না, কেবল বুঝি যে, আমরা একই দেশের অধিবাসী, একই রাজার প্রজা—একই সুখ দুঃখের ভাগী। আমাদের সকলেরই দেশের উন্নতির জন্য একত্রিত হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এবং এইজন্য আমি সকল ভারতবাসীকে এক "হিন্দু" নামে অভিহিত করি।

আমাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন হিন্দুগণের সহিত একতা হইতেই পারে না,—যেহেতু তাহারা ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, তাহারা মুসলমানের গো কোরবাণিতে বাধা দিয়া থাকে, তাহারা নাটকে, নভেলে, কাব্যে, উপন্যাসে মুসলমানদিগকে অকথ্য ভাষায় নিন্দাবাদ ও মুসলমান নরনারীর চরিত্র কৃষ্ণবর্ণে অঙ্কিত করে।

এখন দেখা যাউক, এগুলি কতদূর সত্য,—এবং সত্য হইলেও বাস্তবিকই মিলনের অন্তরায় কি না?

হিন্দুগণ বিধর্ম্মী অতএব তাহাদের সহিত একতা হইতে পারে না—এ কথার কোন সার্থকতা দেখি না। কারণ, একতা ধর্ম্ম লইয়া নহে; একতা স্বার্থ লইয়া। আমার স্বার্থ দেশের উন্নতি সাধন করা, তোমারও স্বার্থ দেশের উন্নতি সাধন করা। আমার স্বার্থ দেশের দারিদ্র্য দুর্ভিক্ষাদি নিবারণ করা, তোমারও স্বার্থ দেশের দারিদ্র্য দুর্ভিক্ষ নিবারণ করা। এইভাবেই একতার সূত্রপাত হয়। আর মানুষের বৈষয়িক স্বার্থ এক হইলে ভিন্ন ভিন্ন জাতিও একতা সূত্রে গ্রথিত হইতে পারে। আবার বৈষয়িক স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটিলে সহোদরে সহোদরেও ঘোর শত্রুতা উপস্থিত হয়।

ইহাই যখন একতার সারতত্ত্ব তখন হিন্দু মুসলমানের একতা হইবে না কেন?

আর হিন্দু মুসলমানের একতা অর্থে ইহা নয় যে হিন্দু মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করুক কিংবা মুসলমান হিন্দু হইয়া গিয়া এক পংক্তিতে বসিয়া আহার করুক।

এখানে আবার প্রশ্ন উঠিতে পারে হিন্দু-মুসলমানের দ্বেষ হিংসা মারে কে?

স্বীকার করি, হিন্দু মুসলমানের হৃদয় দ্বেষ হিংসায় পরিপূর্ণ। কিন্তু পৃথিবী ত আর স্বর্গ নয় যে এখানে দ্বেষ হিংসা বিবাদ কলহ একেবারে থাকিবে না। যখন পৃথিবী—'পৃথিবী' তখন অবশ্যই এখানে দ্বেষ হিংসা বিবাদকলহ কিয়ৎপরিমাণে থাকিবেই। দ্বেষ হিংসা কাহার মধ্যেই বা নাই? বিপক্ষবাদীগণ হয়ত বলিবেন, কই

খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি জাতির মধ্যে দ্বেষ হিংসা ত আদৌ নাই। যাঁহারা একথা বলেন, তাঁহারা খৃষ্টান মুসলমানগণের ইতিবৃত্ত—সম্যক জ্ঞাত নহেন।

খৃষ্টানগণের মধ্যে রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্ট্যাণ্টের অত্যাচার বিভীষিকাময় বিরোধকাহিনীতে ইতিহাসের পৃষ্ঠা পূর্ণ।

মুসলমানগণের মধ্যেও দুইটী দল আছে সিয়া ও সুন্নী। সিয়া-সুন্নীর মধ্যে দ্বেষ হিংসা যেরূপ পূর্ণমাত্রায় পরিলক্ষিত হয়, বোধ হয় জগতের আর কোন জাতির মধ্যে সেরূপ নাই। সে গুলির বিবরণ শুনিলে পাঠক হয়ত চমকিত হইয়া উঠিবেন।

ইহাদের মধ্যে বিদ্বেষের ভাব এত প্রবল যে কোন সিয়া একটী সুন্নীকে প্রাণে মারিতে পারিলে পরম সন্তোষ লাভ করেন। সিয়াগণ ধর্ম্মপ্রাণ সুন্নীর পবিত্র মসজিদকে অপবিত্র করিতে পারিলে বড়ই পুণ্যের কার্য্য মনে করেন। হজরত আচুবাকার, হজরত ওমার, হজরত তাথমান, হজরত আলী এই চারি জন খলিফাকে সুন্নীগণ অতীব শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন। কিন্তু সিয়াগণ এই শেষোক্ত খলিফা ব্যতীত অন্য তিনজনকে এতদূর ঘৃণা করেন যে তাহারা সুন্নিগণের প্রাণে ব্যথা দিবার জন্য, আপনাদের বিনামায় ঐ তিন জন মহাত্মার নাম লিখিয়া রাখে ও সুন্নিগণকে দেখাইয়া বলে এই দেখ তোমাদের আচুবাকার, ওমার, তাথমান আমাদের পায়ের নীচে। সুন্নিগণের প্রতি সিয়াগণের কিরূপ বিজাতীয় ঘৃণা তাহা সবিস্তারে বলিতে গেলে একখানি বৃহৎ পুস্তক হইয়া পড়ে।

আবার সুন্নিগণ যে নিতান্ত নিরীহ ভাবে সহ্য করেন তাহাও নহে। তাঁহারাও এ ক্ষেত্রে সিয়াগণ হইতে কোন অংশে কম নহেন। সিয়ার মহরম উৎসবে সুন্নিগণ বাধা প্রদান করিয়া থাকে ও সুবিধা পাইলে অকারণে সিয়াগণকে নির্য্যাতিত করে। সুন্নিগণও ঘৃণাবশত সিয়াগণের সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া আহার করে না। তাহাদিগের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় না। এইরূপ বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু সে বিবাদের বিবরণী দ্বারা প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না।

স্বাভাবিক দ্বেষ হিংসাদি যে একতার অন্তরায় নয়, প্রাগুক্ত বিষয়গুলি হইতে তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়।

মুসলমানগণের দ্বিতীয় আপত্তি, গো কোরবাণীতে হিন্দুরা বাধা প্রদান করিয়া থাকে। হিন্দুর পক্ষে এই কার্য্য নিতান্ত স্বাভাবিক; এবং ইহাকে একতার অন্তরায় বলা যাইতে পারে না। কারণ, হিন্দুগণ গাভীকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। সুতরাং হিন্দুর পক্ষে গাভী সংরক্ষণের প্রয়াস সর্ব্বপ্রকারে সমর্থন যোগ্য। এই একই কারণে পারাবত বধে মুসলমানের ঘোর আপত্তি। কেননা পারাবত মুসলমানের চক্ষে শ্রদ্ধার সামগ্রী।

তৃতীয় আপত্তি, হিন্দুগণ নাটকে, নভেলে, মুসলমান নরনারীকে অযথা নিন্দাবাদ করিয়া থাকেন।

স্বীকার করি অনেক হিন্দু মুসলমানদিগকে অযথা গালাগালি দিয়া থাকেন। তন্মধ্যে বঙ্কিম প্রমুখ সাহিত্যরথীগণ প্রধান। বাস্তবিকই বঙ্কিমবাবুর এরূপ কার্য্য নিতান্তই

ক্ষোভের উদ্রেক করে। কিন্তু তাই বলিয়া ইহাকে একতার অন্তরায় বলা যাইতে পারে না।

দ্বেষহিংসাদি যখন একতার অন্তরায় নয়, তখন এক মায়ের দুইটি সন্তান হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সখ্য স্থাপন না হইবে কেন? আমার এক বিজ্ঞ বন্ধু বলেন—"হিন্দু মুসলমানে অসদ্ভাব কিসে? এবং কোথায়? যাহারা খাঁটি হিন্দু, তাহারা দোকানপাট চালায়, চাষবাস করে, করিম দাদা, রহীম মামা প্রভৃতি মুসলমান প্রজাদের সহিত বাড়ীর উঠানে কথাবার্ত্তা কহে, চাষ আবাদের বন্দোবস্ত করে, আর কথা শেষ হইয়া গেলেই যে যাহার ঘরে গিয়া উঠে। আবার মুসলমান-কৃষী দাদাঠাকুরের ছেলে মেয়ের জন্য তালটা-বেলটা আনিয়া দেয়, গরু বাছুর গোয়ালে তোলে, বাড়ী যাইবার সময়ে মাঠাকরুণ বা দিদিঠাকরুণের নিকট হইতে তেল, লবণ, লঙ্কা শাকশব্জী চাহিয়া লইয়া যায়। ইহাতে অসদ্ভাবের লক্ষণ ত কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। আর যাহারা খাঁটি হিন্দু, খাটি মুসলমান তাহাদের মধ্যে কোন স্থায়ী বিরোধের সম্ভাবনাই নাই। ইহার হেতু এই যে, খাঁটি হিন্দু নিজের গণ্ডীর মধ্যে থাকিতে জানে, নিজের অধিকার বুঝিয়া কথা কহিতে জানে, আর খাঁটি মুসলমানও কখনও নিজের গণ্ডী কাটিয়া বাহির হয় না। যত গোল বাধিয়াছে বাবুর দলের মধ্যে;—বাবু-হিন্দু এবং বাবু-মুসলমান কোনোমতেই সদ্ভাবে থাকিতে পারে না, যেহেতু উভয়েই গণ্ডী কাটিয়া বাহির হইয়াছে। উভয়েই যেন এক স্বামীর পত্নী, অতএব সপত্নীবিরোধ অনিবার্য্য; প্রণয়ে অক্ষমতা মারাত্মক বিরোধের মূল। ফলে, এ বিরোধ সহজে লয় হইবার নহে।

এখন জিজ্ঞাস্য এই,—মিলনের বাধা কোথা হইতে আসিল? যাহা পূর্ব্বে ছিল না, তাহা এখন জন্মিতেছে কেন? ইহা কেবল বাহিরের লোকের প্ররোচনায়। একজন বাড়ীর চাকর তাহার মনিবের সদয় ব্যবহারে সন্তুষ্ট আছে। এখন একজন বাহিরের লোক আসিয়া সেই চাকরকে যদি ক্রমাগত বলে ঐ দেখ, তোমার প্রভু তোমাকে ভাল করিয়া খাইতে দিল না। তবে সে হয়ত ক্রমে বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে। প্রকৃতপক্ষে কথাটা হইতেছে তাহাই।

মুসলমানের পক্ষে ভারতভূমিকে মাতৃভূমি স্বরূপ জ্ঞান না করা মিলনের অন্যতম অন্তরায়। অর্থাৎ মুসলমান যদি এই স্বর্ণপ্রসূ ভারত-ভূমিকে মাতৃভূমি বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে তথাকথিত মিলনের অন্তরায় অচিরেই দূর হয়। মিলনের পক্ষে ইহাই সুপ্রশস্ত বিধান। কথাটা আরো পরিষ্কার করিয়া বলি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমাদের একতা স্বার্থ লইয়া অর্থাৎ দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য; কেবল এক পংক্তিতে বসিয়া আহার করিবার জন্য নহে।

কিন্তু সাধারণ মুসলমান এই জাতীয় স্বার্থ দেশের শ্রীবৃদ্ধি কথাটার মর্ম্ম আদৌ বুঝেন না। তাই তাঁহারা তার স্বরে বলিয়া উঠেন "একতায় কি হইবে? দেশের উন্নতি আবার কি? আমাদের আবার দেশ কি? আরব ত আমাদের দেশ—ইত্যাদি।" কোন ভূতপূর্ব্ব কালে আরব জাতি ভারতে আসিয়া মুসলমান

ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছেন বলিয়া এইরূপ মনে করা যেমন হাস্তকর তেমনি অসার-অযৌক্তিক। প্রকৃতপক্ষে ভারতের অধিকাংশ মুসলমানই হিন্দুসন্তান; অতএব ধর্ম্ম ভিন্ন আসলে আমাদের ভেদ কিছুই নাই।—আমরা উভয় ধর্ম্ম সম্প্রদায়ই ভারতসন্তান, এবং উভয়ে মিলিয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যত্নবান হইলে অনতিবিলম্বে যে আমাদের প্রণষ্ট গৌরব আমরা ফিরাইয়া আনিতে পারিব তাহাতে সন্দেহ নাই।

পরিশেষে সর্ব্বজন মাননীয় ভক্তিভাজন নবাব আবদুল জব্বার সি, আই, ই, সাহেবের কথায় এ প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি করিতেছি। গত ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতার কোন এক সভায় এইরূপ বলিয়াছিলেন—

আমি আশা করি হিন্দুমুসলমান ভ্রাতার ন্যায় কার্য্য করিবে ও রাজনৈতিক অনুশীলনে পরস্পরকে সাহায্য করিবে। প্রতিদ্বন্দিতায় ক্ষতি নাই, কিন্তু দ্বেষ হিংসা ঘৃণার্হ ও ক্ষতিকর। উভয় জাতির সম্বন্ধ সর্ব্বদা সাম্যভাব সূচক হইবে। যেখানে শান্তি নাই, সেখানে উন্নতিও নাই। প্রজাপুঞ্জের সুখ ব্যতীত কোন মহৎ কার্য্য সাধিত হয় না। যে দেশের লোক অহরহ কলহে মগ্ন সে দেশে বিজ্ঞান বা সাহিত্যের সম্যক বিকাশ অসম্ভব। যেখানে ভূমিবিষয়ক বিবাদ বিদ্যমান সেখানে শস্য কদাচিৎ জন্মায়। সার্ব্বজনীন শান্তি ব্যতীত শিল্পকলারও বিস্তার হয় না। এমন কি মনে শান্তি না থাকিলে দেবারাধনাও সম্ভব নহে। যাঁহারা দেশে শান্তি স্থাপনের প্রয়াস পান তাঁহারাই প্রকৃত দেশহিতৈষী। আর যাঁহারা ঐ বন্ধুত্বকে ভঙ্গ করিতে উদ্যত, তাঁহারা মানব জাতির শত্রু। আমরা হিন্দু-মুসলমান একই দেশের অধিবাসী ও একই রাজার প্রজা,—বিবাদে আমরা কিছুই লাভ করি না; তাহাতে কেবল ক্ষতিগ্রস্ত হই। এ দেশের কুলতিলক স্বনামধন্য মহানুভব মুর্শিদাবাদ নওয়াব বাহাদুরের ন্যায় যাঁহারা আমাদিগকে সখ্যভাবে থাকিতে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, তাঁহারাই আমাদের প্রকৃত হিতৈষী। মতের বিভিন্নতা সময়ে সময়ে হইতে পারে, কিন্তু তাহা যেন আমাদিগকে মন্দ অভিপ্রায় বা ঈর্ষার পথে না লইয়া যায়। শান্তিই আমাদের এখন একমাত্র আদর্শ হউক!

শ্রীমৈমুদ্দীন হোসেন।

বক্তব্য।

যে হিন্দুমুসলমান এতকাল পাশাপাশি আত্মীয়ের মত সদ্ভাবে বাস করিতেছিল, আজ তাহাদের মধ্যে অকারণে একটা অপ্রীতির লক্ষণ আসিয়া দেখা দিয়াছে। সমাজের এরূপ সঙ্কট সময়ে উভয় পক্ষেরই উদারতা ও সহানুভূতির একান্ত আবশ্যক। প্রবন্ধকার মহাশয় এই উভয় সম্প্রদায়ের মিলন সম্বন্ধে যেরূপ অপক্ষপাত উদার মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। তাঁহার ন্যায় মিলনব্রতী হিন্দুমুসলমানের সংখ্যা দেশে অধিক থাকিলে, আমাদের মধ্যে এ মনোমালিন্যের সম্ভাবনাই ঘটিত না। কিন্তু

এই প্রবন্ধে একটা কথা বলিয়া দেওয়া আমরা কর্ত্তব্য মনে করি। বোধ হয় অনেক শিক্ষিত মুসলমানেরই ধারণা যে হিন্দু লেখকেরা মুসলমান জাতিকে অন্যায় আক্রমণ করিয়া থাকেন। কিন্তু একটু প্রণিধান পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলেই তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, সম্প্রদায় বিশেষকে আক্রমণ করা তাঁহাদের কখনই উদ্দেশ্য নয়। মুসলমানেরা এ দেশে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা কালে যে সকল আনুষঙ্গিক অত্যাচার হইয়াছিল, এ নিন্দার তাহাই প্রধান লক্ষ্যস্থল। বঙ্কিমবাবু ব্যক্তিগতভাবে স্থানে স্থানে মুসলমানের চিত্র হীন বর্ণে অঙ্কিত করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তিনি ওসমান, আয়েষা, মবারক, মীরকাসিম প্রভৃতি সুন্দর চরিত্রেরও গুণগানে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। আর এক কথা, আধুনিক মুসলমানেরা অধিকাংশই হিন্দু সন্তান এবং বিজেতৃবংশের যাঁহারা এখনও বিদ্যমান আছেন তাঁহারাও বহুকাল ধরিয়া আত্মীয়েরই ন্যায় আমাদেরই প্রতিবেশী হইয়া বাস করিতেছেন। এরূপ স্থলে তাঁহাদিগকে অকারণ আক্রমণ করা কোন হিন্দুর পক্ষেই সম্ভব নহে। আসল কথা ভাল মন্দ লোক সকল সম্প্রদায়েই আছে। মন্দ লোকের নিন্দা করিলেই ভাল লোকের চরিত্রকে খর্ব্ব করা হয় না, বরং অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াই উঠে। আশা করি ব্যক্তি বিশেষের নিন্দা দেখিলে শিক্ষিত সহৃদয় মুসলমানেরা তাহা তাঁহাদের সম্প্রদায়ের উপর আরোপ করিয়া লইবেন না।

প্রাতঃসূর্য্য।

অতি সুন্দর গতি মন্থর
ভরি অম্বর রাজে।
দীপ্ত মহিমা স্বর্ণ প্রতিমা
শূন্য নীলিমা মাঝে।
শুভ্র আলোক দিব্য গোলক
ধৌত দ্যুলোক ধায়,
চরণ প্রান্তে আজি একান্তে
ভূলোক বন্দে তায়।
নিত্য ধারায় চিত্ত হারায়
মৃত্যু করায় ত্রাণ,
নশ্বর যত বিশ্বের শত
বন্ধন ক্ষত প্রাণ।

উজ্জ্বল শিখা মঙ্গল লিখা
নির্ম্মল রেখাপাত,
শ্যাম বরণী সুপ্ত ধরণী
জাগ্রত তার সাথ।
বিশ্ব কেন্দ্র বিরাট তন্ত্র
মিলন মন্ত্র গাহে,
অসীম বক্র কালের চক্র
ধৃত একত্র তাহে।
চেতন বিন্দু জীবন ইন্দু
ভুবন সিন্ধু মাঝ—
জগত লক্ষ্যে উদিত চক্ষে
বক্ষে হৃদয়রাজ।

শ্রীহেমলতা দেবী।

শ্রীপঞ্চমী।

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

১

মঙ্গল পঞ্চমী আজি ভারতী
গাও পুণ্য সুমিলন গান ;
সুভাব সঙ্গীত বন্যা সরিতে
ঘুচাও,—ঘুচাও এ ভারতে—
দ্বেষ বিদ্বেষ, হীন স্বার্থ অভিমান।

২

আর্ত্ত শোণিত পাতে, দীপ করোটি ভাতে!
হের গো—ভারতী!
একি তোমারি অর্চ্চনা—আরতি!
পুণ্য পূজা—অপমান!

দীন অভাজনে, করুণা বিতরণে
দেহ চেতনা—
নিবার পাপ, কর সুধা বর দান।

৩

প্রসাদ উথলিত, নীরব নিনাদিত
বীণাতানে—
দেবি, প্রীতি পূরিত কর পৃথ্বী বিমান!
বাক্যে কর্ম্মে ভাবে, ধর্ম্মে যজ্ঞ-যাগে—
প্রাণে প্রাণে গো—
বহাও মিলন রাগ—উদার জ্ঞান।

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী।

স্বরলিপি।

॥ র্সা -া র্সা ণা। ণা -ধা ধা পা। পধা মা গরা গা। মা -া -া -া I
ম • ঙ্গ ল প ০ ঞ্চ মী আ জি ভা র তী ০ • ০

I -া -া মা -গা। মা -ণা ধা ণা। ধণা -পা ধা ণা। র্সা -ধা ধণা র্সা II
০ • গা ও পু • ণ্য সু মি ০ ল ন গা ০ ০ ন্

॥ { মা মা -গা মা। পা -মা পা পা। পা -ণা ধা -ণা। র্সা না র্সা -া I
সু ভা ০ ব স ০ ঙ্গী ত ব • ন্যা ০ স রি তে

। র্সা -না র্র্সা -া। -া -া ণা- ধা। (র্সণা -া -া পা। ধা -া -া -পা) I }
ঘু • চা • • • ও • ঘু • • ০ চাও ০ ০ •

। ধণা -র্সা -পধা -ণা। ধণা -র্সা -ণধা -পমা I মা মা- গা মা।
ভা • র • তে ০ ০ • সু ভা ০ ব

। পা মা পা পা। পা -ণা ধা ণা। র্সা না র্সা -া I নর্সা -র্রা র্সা র্সা।
স • ঙ্গী ত ব ০ ন্যা • স রি তে ০ দ্বে ০ ষ বি

। র্সা -র্ণা ণা -ধা। ধা পা মা গা। মা পা ধা -ণা ॥
দ্বে • ষ • হী ন স্বা র্থ • অ ভি মা ন ॥

॥ {পা ধা ধা ধা। ধা ধা ধা ধা। ধা -া ধা ধা। ধা ধা ধা ধা I
(১) আ ০ র্ত্ত শো ণি ত পা তে দী ০ প ক রো টি ভা তে
(২) প্র সা ০ দ উ থ লি ত নী ০ র ব নি না দি ত

I ধণা পা ণা -া। -া -া ণা ণা। ধা -ণা র্সা -া। ণা -ধা -পা -মা I}
(১) হে র গো ০ ০ ০ ভা র তী ০ ০ ০ ০ ০ এ কি
(২) বী ০ ণা ০ ৭ ০ তা ০ নে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I পা -া র্সা ণা। ণা- ধা ধা পা। পা মা মা গা। গমা -রা গা -া I
(১) তো ০ মা রি অ ০ র্চ্চ না আ ০ র তি পু ০ ণ্য ০
(২) দে ০ বি ০ প্রী ০ তি পূ রি ত ক র পৃ ০ থ্বী বি

I মা -া -া রা। গা -া -া রা। সা -া -া -া। -া -া । । I
(১) পূ ০ ০ জা অ ০ ০ প মা ০ ০ ০ ০ ন্
(২) মা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ন্

I {মা -া গা মা। পা -মা পা পা। পা ণা ধা -ণা। র্সা না র্সা র্সা I
(১) দী ০ ন অ ভা ০ জ নে ক রু ণা ০ বি ত র ণে
(২) বা ০ ক্যে ক ০ র্ম্মে ভা বে ধ ০ র্ম্মে য ০ জ্ঞ যা গে

I র্সা না র র্সা -া। -া -া ণা -ধা। (র্সণা -া -া -পা। -ধা -া -া -পা) I}
(১) দে হ চে ০ ০ ০ ত ০ না ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
(২) প্রা ০ ০ ০ ০ ণে ০ প্রা ০ ০ ণে গো ০ ০ ০

I ধণা -র্সা -পধা -ণা। -ধণা -র্সা -ণধা -পমা I
(১) না ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
(২) প্রা ০ ণে ০ গো ০ ০ ০

I মা -া গা মা। পা -মা পা পা। পা ণা ধা -ণা। র্সা না র্সা র্সা I
(১) দী ০ ন অ ভা ০ জ নে ক রু ণা ০ বি ত র ণে
(২) বা ০ ক্যে ক ০ র্ম্মে ভা বে ধ ০ র্ম্মে য ০ জ্ঞ যা গে

I নর্সা র্রা -া র্সা। র্সা -ণা ণা -ধা। ধা পা মা গা। মা পা ধা ণা ॥
(১) নি বা ০ র পা ০ প ০ ক র সু ধা ব র দা ন্॥
(২) ব হা ০ ও মি ০ ল ন রা ০ গ উ দা র জ্ঞা ন্॥

পোষ্যপুত্র।

৩৭

মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া মুক্ত কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিতে ইচ্ছা করিলেও সমস্ত মানসিক শক্তি প্রাণপণ বলে সংগ্রহ করিয়া শান্তি সেই অদম্য প্রলোভনকে জয় করিয়া ঠোঁটে ঠোঁটে চাপিয়া, দেওয়ালে পিঠ রাখিয়া পাথরের মতন শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। গভীর রাত্রি,—বাঁশবনের মধ্য হইতে মধ্যে মধ্যে শৃগালের ডাক ভিন্ন আর কোন রকম সাড়াশব্দে কোন জীবিতপ্রাণীর অস্তিত্ব বুঝা যাইতেছিল না। মাথার উপর এক আকাশ নক্ষত্র ফুটিয়া রহিয়াছে, তাহাদের মাঝখানে রৌপ্য কিরণবর্ষী চন্দ্র বিরাজমান। এই বৈচিত্র্যময়ী সুখোজ্জ্বলা ধরণী, এই পরিপূর্ণ আশাবিহ্বল রাগিণীর অনাদিগান, এ সমস্তই ব্যথিতপ্রাণা শান্তির নিকট যেন কুহেলিকা সমাচ্ছন্ন নিরানন্দ হইয়া উঠিয়াছিল।

নিস্তব্ধ জ্যোৎস্নায় দাঁড়াইয়া স্পন্দনহীন প্রায় চক্ষে সে একবার অতীতের পানে ফিরিয়া চাহিল। অতীত সুখের, অতীত সাধের জীবন! —সে কি আনন্দের কি গৌরবের দিনই গিয়াছে! এতক্ষণ পরে শান্তির মস্তিষ্কের ভিতরে ক্ষুটন্ততরঙ্গ একটুখানি স্থির হইয়া আসিল। শৈশবের সেই নিশ্চিন্ত সুখ কত মধুর! সেই তাহারা দুটি ছোট ভাই বোনে একসঙ্গে খেলা করিত। একসঙ্গে ঘুমাইত, একসঙ্গে দুটি ছোট প্রজাপতির মতই তাহাদের বাগানে ছুটিয়া বেড়াইত, ছোট পাখীদেরি মত আপনার মনে গান গাহিত, হাসিত, খেলা করিত। জগতে আর কাহারও সহিত কি শান্তির পরিচয় ছিল না? ছিল—ছিল সবই গিয়াছে! ক্ষুদ্র একখানিমাত্র হৃদয়—তাহার উপরে কত দিক হইতে কতখানি স্নেহ বর্ষিত হইত। কি অপূর্ব্ব সে সুখ কি অনাবিল সে শান্তি! শান্তির চোখ দিয়া হুহু করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। সে স্বপ্ন তাহার কেন ভাঙ্গিল, কোনো রকমেই কি আর সেই অতীত দিনে ফিরিয়া যাইতে পারেনা? হে ভগবান, শুধু একবার শুধু একটিবার?

"এখনো আপনি জেগে আছেন বৌদি?" এই কথাটি শুনিয়াই সে চমকাইয়া উঠিয়া চাহিয়া দেখিল,—যোগেশ। যোগেশের আবির্ভাবে সহসা সচেতন হইয়া শান্তি শিহরিয়া উঠিয়া দেখিল, স্বপ্নের পরিবর্ত্তে বাস্তব তাহার বিরাট অন্ধকার ও অপর্য্যাপ্ত বেদনা লইয়া স্তব্ধ রজনীর অবিচ্ছিন্ন রাগিণীর তালে জাগিয়া রহিয়াছে, অসহায় সে ইহারই মাঝখানে একেবারে একা। যোগেশের দ্রুত নিশ্বাসের শব্দ সহসা সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া শান্তির নিষ্পন্দ প্রায় শরীরে শক্তি সঞ্চালন করিয়া দিয়া উত্তেজনায় তাহার মাথার ভিতরে দর্‌ দপ্‌ করিয়া উঠিল। বিস্ময়হীন কোমল কণ্ঠে যোগেশ কহিল "বৌদি তুমি কি চাও আমায় ভাল করে বুঝিয়ে দাও—ত। তুমি যা বলবে আমি তাই করতে রাজী আছি, শুধু তুমি বলো একবার,—নিজের মুখে হুকুম দাও—।"

শান্তির চোখের সম্মুখে কুহেলিকাময়

জগৎস্রোত তালে তালে ঘুরিয়া উঠিল; সে অস্ফুটকণ্ঠে বলিল "না না তুমি আমার সঙ্গে কথা কয়ো না, আমি কিছুই চাই না তোমার কাছে, শুধু তুমি আমার সঙ্গে কথা কয়ো না।" বলিতে বলিতে সে পাগলের মত হেমেন্দ্রের ঘরের দ্বারের দিকে ছুটিয়া গেল। যোগেশ তাহার এরকম অদ্ভুত ব্যবহারের কোন অর্থ না পাইয়া প্রথমে কিছুক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া গেল, তারপর হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িয়া গিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে সমুদয় ব্যাপারটা তাহার চোখের সম্মুখে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। শান্তি ঘরে প্রবেশ করিবার পরই সে যেন একবার হেমেন্দ্রের উত্তেজিত কণ্ঠের সাড়া পাইয়াছিল;—ঠিক হইয়াছে,—তাহার মধ্যে যেন যোগেশেরও নাম ছিল না?—যোগেশ রোষে ক্ষোভে অধর দংশন করিল—"বটে, এইটুকু পর্য্যন্ত সহে নাই, বটে? আচ্ছা দেখা যাক্ এই যোগেশ নইলে তোমার কেমন দশা হয়; একবার তবে দেখ। অকৃতজ্ঞ! এত সন্দেহ! এত ভয়—তোমার!"

যোগেশ সহসা একটু কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল,—"সেও কি কোন রকম সন্দেহ, অবিশ্বাস করেচে? তা'ই যেন মনে হয়,—ছি ছি! না আমি এমনিই কি দোষ করেছি? আমার উদ্দেশ্য কিছুই মন্দ ছিল না, শুধু দয়া! ওদের অনেক খেয়েছি অনেক পাবারও আশা রাখি তাই। তবে চাঁদকে দেখে চোখ বুজবে এমন মূর্খ কে আছে? ফুলটি দেখলে মন যে সুন্দর বলে তারিফ করবে, তাতে দোষই বা কি?"

খোলা জানালার মধ্য দিয়া সূর্য্য কিরণ গৃহে প্রবেশ করায় খুব সকালেই হেমেন্দ্রের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বিছানা ছাড়িয়া উঠিবার ইচ্ছা ছিল না। জানালাটা বন্ধ করিতে বলিতে গিয়া হঠাৎ পূর্ব্ব রাত্রির ঘটনাটা মনে পড়িয়া গিয়া মনটা একটু খারাপ হইয়া গেল। শান্তি গেল কোথায়? এই অজানা জায়গা বিশেষ বাড়ীর গায়েই ওই একটা পুকুর আছে। নতুন করিয়া আর ঘুমান হইল না। উঠিয়া বাহিরে আসিতেই দেখিল; দ্বারের পাশে মাটিতে আঁচল পাতিয়া শুইয়া শান্তি ঘুমাইয়া রহিয়াছে। আকস্মিক দুর্ভাবনার আতঙ্ক হইতে মুক্ত হইয়া সে হাঁফ ছাড়িল।

সকাল হইয়াছিল। আজ উজ্জ্বল সুন্দর প্রভাত। উদার উন্মুক্ত আকাশে বিহঙ্গপক্ষের মত লঘু শুভ্র মেঘ প্রাতঃসূর্য্যের স্বর্ণময় কিরণে বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে। চারিদিককার গাছপালা হইতে একটা পাখীর কাকলী, পাতার মর্ম্মর ও ফুলের গন্ধ একসঙ্গেই নির্ম্মল স্নিগ্ধ বাতাসে ভাসিয়া উঠিতেছিল।

হেমেন্দ্র চলিয়া যাইতে উদ্যত হইয়া হঠাৎ কি ভাবিয়া একটু দাঁড়াইল।

সেই রাঙ্গামেঘের ছায়ায় শান্তির বিবর্ণ ললাটে, গণ্ডে কি স্নিগ্ধ রক্তিমাই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আলুথালু কৃষ্ণচুলের রাশি খুলিয়া পড়িয়া পত্রান্তরালম্বিত ফুলটির মতন আধখানা মুখকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে; মুখখানির উপর হইতে সর্ব্বসন্তাপহরা নিদ্রাদেবী তাহার সকল বেদনা সকল ক্লান্তি নিঃশেষ করিয়া মুছিয়া লইয়া তাহাকে প্রশান্ত বিশ্রাম দান করিয়াছিলেন, তথাপি সেই নিদ্রা নিমীলিত চোখের কোলে অশ্রুজলের একটি

বিন্দু সকালবেলাকার শিশির কণাটিরই মত টলটল করিতেছিল। প্রাতঃ সূর্য্যেরই মতন সেই গৌরবোজ্জ্বল মুখ একবার হেমেন্দ্রের অন্ধকার চিত্তের মধ্যে তাহার কিরণ রশ্মি ছড়াইয়া দিয়া তাহার হৃদয়ে প্রেমের আলো জ্বালিয়া তুলিল। হেম শান্তির মাথা নিজের কোলে তুলিয়া লইয়া সেইখানে বসিয়া ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে তাহার মুখের উপর হইতে চুলের গোছাটা সরাইয়া দিয়া অত্যন্ত আদরের সহিত অনুতাপ ও আত্মগ্লানি পূর্ণচিত্তে তাহার অধরে চুম্বন করিল।

"শান্তি আমায় মাপ করো শান্তি, কাল-মাথাটা ঠিক ছিলনা তোমায় অন্যায় বকেচি· ভুলে যাও।" জাগিয়া প্রথমটা শান্তি বুঝিতে পারে নাই সত্যই হেম তাহাকে আদর করিতেছে। ভাবিতেছিল সে স্বপ্ন দেখিতেছে।

হেম আবার মুখের উপর নত হইয়া ডাকিল "শান্তি, রাগ করোনা কথাটা বড় শক্ত বলে ফেলিচি—"

শান্তি আশ্চর্য্যে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল, সত্য! হেমেন্দ্রের এই সম্ভাষণ! অকস্মাৎ তাহার বেদনা বিদ্ধ বক্ষ আলোড়িত করিয়াও বহুদিনের আঘাত ও অভিমানের ব্যথা একসঙ্গে জাগিয়া উঠিল,—সে স্বামীর কোলে মুখ লুকাইয়া সহসা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

আজিকার অম্লান প্রভাত তাহার নবীন সূর্য্যকরে না জানি কি সম্মোহন শক্তি প্রয়োগ করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আকাশে বাতাসে নাজানি আজ কি করুণার কি প্রেমের রাগিণী বাজিয়া উঠিয়াছে, হেমেন্দ্র শান্তির অশ্রুসিক্ত কপোলে চুম্বন করিয়া আদর করিয়া বলিল,—"আমি তোমায় লক্ষ্মীপুরেই পাঠিয়ে দেবো, শান্তি কেঁদোনা তুমি।" হরি দীনবন্ধু! একি সম্ভব! সত্যই কি শান্তির দুঃখ তোমায় স্পর্শ করিয়াছে প্রভু! শান্তি চোখের জল মুছিবার বৃথা চেষ্টা করিতে করিতে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল "আজই তবে যাবে কি?—" হেম তাহার চুলের উপর হাত রাখিয়া তাহার মুখের উপর দৃষ্টি স্থির রাখিয়া ছিল। প্রশ্নটায় একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল, কথাটা সে শুধু সান্ত্বনা দিবার জন্যই বলিয়া ফেলিয়াছিল; কিন্তু—কিন্তু তাছাড়া উপায়ই বা কি? এমন করিয়া কদিন চলিবে? দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল "না—কাল তোমায় পাঠিয়ে দোব,—আজ আর থাক।" শান্তির ম্লান চোখে আনন্দের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল; স্বামীর বক্ষে মুখ রাখিয়া দুই হাতে তাহার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া সাগ্রহে কহিয়া উঠিল" সেখানে আমরা খুব সুখেই থাকবো,—" হেমেন্দ্র বাধা দিল "তুমি সুখেই থেকো, আমিতো যাবোনা—" শান্তির বাহুপাশ মুহূর্ত্তে স্বামীর কণ্ঠচ্যুত হইয়া পড়িল; বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া সে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। হেমেন্দ্র উঠিয়া গম্ভীর হইয়া কহিল "আমি সেখানে যাবো না, আর নাই বা গেলুম আমার জন্যে কার কি ক্ষতি? কে আমায় চায়? তুমি যাও,—সুখে থেকো আমার যা খুসী তাই করবো। আমার প্রতি তোমার তো মায়া নেই আমার বেঁচে না থাকাই ভাল।" হেমেন্দ্রের শেষ কথাগুলা জড়াইয়া আসিতেছিল। শান্তি দেখিল, তাহার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। উঠিয়া বসিয়া সে বেদনাপূর্ণ লজ্জায় স্বামীর হাত

ধরিল "তোমার পায়ে পড়ি ওসব কথা বলোনা, তোমার উপর কার স্নেহ কম? কেন ওরকম মনে করো? ফিরে যাই চলো, আমি সব ছেড়ে তোমার সেবা করবো।" হেমেন্দ্রের চিত্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। শান্তির হৃদয়ের সমস্তটাই তাহার;—সেই উৎসর্গিত প্রাণের সভক্তি পূজার সযত্ন সেবা -আর কিছু না হোক অন্ততঃ সেইটেও তো সে পাইবে, সেই কি কম? কই আজিকার মত আনন্দ তো ইহার পূর্ব্বে শত ভোগবিলাসের মধ্য হইতেও সে লাভ করে নাই? কি সুন্দর, কি কোমল কি উচ্চ তাহার এই স্ত্রী! আর সে অন্ধের মত এত দিন তাহাকে চাহিয়া দেখে নাই! ব্যগ্র করে সে শান্তিকে বুকে টানিয়া লইতে গেল, আবেগ তাড়িতকণ্ঠে বলিতে গেল "তোমার শক্তি তুমি আমায় দিও শান্তি তোমার জন্য আমি সব সহ্য করবো—" কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই পাশের ঘরের দরজা খোলার শব্দে শান্তি চমকিয়া উঠিয়া পড়িয়াছিল, যোগেশ বারান্দায় পড়িয়া হঠাৎ ফিরিতেছিল কিন্তু দেখিল তাহাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি করিয়া ঘোমটা টানিয়া শান্তি ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল, হেম ডাকিল, "যোগেশ!"

হেমেন্দ্রের জন্য চা তৈরি করিয়া নতুন রাঁধুনিকে রান্নার জোগাড় করিয়া দিয়া যোগেশ হেমেন্দ্রের ঘরে আসিয়া দেখিল শান্তি ও হেম নিবিষ্ট মনে কি কথাবার্ত্তা কহিতেছে। দুজনের মুখেই একটা উৎসাহের দীপ্তি; শান্তির অধরপ্রান্তে একটুখানি লজ্জাবিজড়িত সুখের হাসি, হেমেন্দ্রের মুখে তাহার স্বাভাবিক রুক্ষ অপ্রসন্নতার পরিবর্ত্তে একটা কোমল ভাব পরিব্যক্ত।

যোগেশ ভাবিল "একেই বলে দম্পতি কলহশ্চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া"। ডাকিল হেম। শান্তি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া চলিয়া গেল। হেমেন্দ্র প্রসন্ন চিত্তে ডাকিল,—"এস না যোগেশ।"

আসন গ্রহণ করিয়া যোগেশ কহিল "আমার তো এখনি বাড়ি যেতে হবে ছোট বাবু, ছেলেটার ব্যায়রাম দেখে এসেছি।" —হেমেন্দ্র হাসিয়া উঠিল "এতক্ষণে ছেলের কথা মনে পড়লো? তা বেশতো যোগেশ, কালই একসঙ্গে সবাই যাবো এখন। আমরাও তো আবার লক্ষ্মীপুরেই ফিরছি—"

"বটে, আরতোমার যোগেশকে দরকার নাই তবে?" প্রকাশ্যে বলিল "হাঁ তাই চলুন, মিথ্যে কেন কষ্ট পাবেন, তার চেয়ে বড়লোকের বাড়ি গোমস্তাগিরি করাও ভাল। বৌদিকে বলে দেবেন দিদিঠাকরুণের হবিষ্যি বেড়ে যেন একটু ভাল করে ঘি ঢালেন তবু প্রসাদটা প্রাণটাও মিলতে পারবে—"

মুহূর্ত্তের মধ্যে হেমেন্দ্রের ললাটের শিরা স্ফীত হইয়া উঠিল, তাহার মাথার ভিতরে এককালে ঈর্ষার সহস্র বৃশ্চিক দংশন করিয়া উঠিল, চোখের সম্মুখে সমস্ত আলোকের উপর একখানা কালো মেঘ ঘনাইয়া আসিয়া এক মুহূর্ত্তেই সব অন্ধকার করিয়া ফেলিল।

সান্ত্বনার ও সহানুভূতির সহিত ধীরকণ্ঠে যোগেশ কহিতে লাগিল "আপনার শ্বশুর খুব চালাক লোক। কর্ত্তাকে তিনিই উইল করতে বারণ করেছেন। তাঁর মতলব বোধ হয় বুড়ো মরলে তোমায় অক্ষম প্রমাণ করে নিজেই না-বালকের অভিভাবক হয়ে বসবেন। তারপর বুঝেছ তো?"

হেমেন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া বসিয়াছিল,—একি

ব্যাপার! যোগেশ এ কি বলিতেছে! সত্য সত্যই তাহার বিরুদ্ধে ঘোরতর একটা ষড়যন্ত্রই চলিতেছে নাকি? হ্যাঁ সম্ভব বটে,—ঠিক তাই! সে কি মূর্খ, ছিঃ, ভাগ্যে যোগেশ ছিল! সে একটু নড়িয়া বসিল, সন্দিগ্ধভাবে বলিল "তাই কি হবে? আমায় না দেখতে পারলেও নিজের মেয়ে তো আছে?" "হ্যাঃ তুমিও যেমন! মেয়ে আছে আছেই! মেয়েরও ওপোর ভারী দরদ দেখতে পেলেনা? ওরা টাকা বোঝে নিজের স্বার্থ বোঝে। তোমার মতন তো ভালমানুষ নয়, নিজের সর্ব্বস্ব ওদের ধরে দিয়ে পথে দাঁড়ালে যেমন! তা যাহোক ছোট বাবু আমাকে তো আজ যেতেই হচ্চে, ঘরে তো একটা কড়িও নেই! ছেলেটা বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে! আমরা ত আর বড় লোক বাপ নই,—ছেলে মেয়েই আমাদের প্রাণ!"

উত্তপ্ত জল একটুখানি তাপ পাইয়াই যেমন টগবগ্ করিয়া ফুটিয়া উঠে হেমেন্দ্রের প্রতি শিরাস্থ শোণিত স্রোতও তেমনি করিয়া ফুটিয়া উঠিল। মূঢ়! এতটুকু বুঝিবার শক্তিও তাহার নাই! কি মোহেই সে ডুবিতেছিল! যোগেশের হাত ধরিয়া বলিল, "যোগেশ তুমি আমায় ছেড়ে যেওন',—আমার তুমি ছাড়া আর কেউ নেই। আমার বল বুদ্ধি ভরসা সব তুমিই। কি করে আমি আমার ন্যায় সঙ্গত অধিকার ফিরে পাব বলো। আদালতে কি প্রমাণ হবে ও মাগী বিনুদার বউ নয়?" যোগেশ মনের মধ্যে জয়ের হাসি হাসিয়া দম্ভ করিয়া বলিল "বলো কি তুমি! ওতো হয়ে রয়েইছে! ওর জন্যে আবার ভাবনা! বৃন্দাবনের বিশ-টে সাক্ষী হলপ নিয়ে বল্‌বে যে ও বিনোদবাবুর বিয়ে করা স্ত্রী নয়। কুছ পরোয়া নেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তবে ভাবনা এই যে, তোমার মনের সৎসাহস আবার না কোন সময় 'বৌদির চোখের জলে ধুয়ে সাফ হয়ে যায়। তাঁর হুকুম তামিল তো হওয়া চাই তা—" নিতান্ত অপমানিত বোধ করিয়া হেমেন্দ্র গর্জ্জন করিয়া উঠিল "রেখে দাও তোমার বৌদিদি! আমায় কি এমনই ভীরু পেয়েছ? তবে আমার এখন কি করতে হবে বলো দেখি?" "তোমায় আর কি করতে হবে বল, তবে আগে বরং একখানা উকিলের চিঠি বুড়কে পাঠান যাক্। কি বলো? যদি ভালয় ভালয় দেয় তা মন্দ কি? নৈলে তখন—হাতেই তো উপায় রয়েছে।" হেমেন্দ্র একটু চিন্তিত ভাবে আপনা আপনি বলিল "উকিলের চিঠি—কেমন একটা সঙ্কোচ বোধ হয়, হাজার হোক জ্যেঠা হন, এতদিন কাছে ছিলাম।" "ঐ তো গোড়াতেই বলেচি, ওসব আপনার কর্ম্ম নয়। লক্ষ্মীপুরেই বরং ফিরে যান। তবে মাপ কর্ব্বেন তাঁরা কি আপনাকে মায়া করেছিলেন? আপনার শ্বশুর যে শেয়াল কুকুরের মতন করে সেই রাত্রে"—"যোগেশ থামো—তুমি যা বলবে আমি করতে রাজি আছি। ভদ্রতা, চক্ষুলজ্জা-সব ধুয়ে গ্যাছে, ভাই ভাগ্যে তুমি ছিলে।"

ইহার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া দুই বন্ধুতে মিলিয়া পরামর্শ চলিল। এবং বলা বাহুল্য ইহার ফলে যোগেশের বাড়ী যাওয়া ও শান্তির লক্ষ্মীপুরে যাওয়া উভয় যাত্রাই বন্ধ হইয়া গেল।

৩৮

লক্ষ্মীপুরের বাটীতে আবার নিরানন্দ ও হতাশা দ্বিগুণিত হইয়া উঠিয়াছিল, শ্যামাকান্ত

পীড়িত। ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রিপসন ও কবিরাজের বড়িপাঁচন ব্যবস্থার ত্রুটি না থাকা সত্ত্বেও সে রোগের কিছুমাত্র উপশম হইতেছিল না। যে রোগ শরীরের অপেক্ষা মনেরই বেশি, ঔষধে তাহার কি করিতে পারিবে?

শিবানী তাঁহার যথাশক্তি সেবার ত্রুটি করিত না। কিন্তু শ্যামাকান্তের তথাপি সকল সময় মনে হইত শান্তি হইলে ইহার স্থলে এই করিত, এটা না বলিয়া হয়ত অন্য কিছু বলিত। প্রতিনিদ্রাহীন রজনীতে স্তিমিতালোক কক্ষে দ্বারের দিকে সোৎসুকনেত্রে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে গভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইতেন, মনে হইত যেন এখনি ঐ দ্বারপথে নিঃশব্দে সে প্রবেশ করিয়া সাবধান গতিতে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইবে। বুঝি তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইবার ভয়ে শ্বাস রুদ্ধ করিয়া হাতের চুড়ি গুলির শব্দ বাঁচাইয়া সশঙ্ক ব্যাকুলতায় সে মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতেছে। কি সে করুণা-মাখা কোমল দৃষ্টি! স্নেহ কাতরা জননী রুগ্ন সন্তানের মুখে যে দৃষ্টি প্রেরণ করেন তাহাতে কত মাধুর্য্য কত মহিমা!

কতদিন মরিচীকাবৎ আশার প্রতারণায় প্রতারিত বৃদ্ধ সোৎকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিয়াছেন 'মা এলি গো! "অমনি স্বপ্নের মোহ টুটিয়া অনন্ত বাস্তব উচ্চ উপহাসে হাহা করিয়া উঠিয়া উত্তর করিয়াছে 'না।"

কোথা গেলে তুমি স্নেহময়ী জননি! তুমি কেন গেলে! শুধু তোমারি জন্য তোমারি অভাবে শুধু এতো কষ্ট এত হতাশা। আর না হয় তুমিই এসো হে বরেণ্য মৃত্যু! তুমিই এই বহনক্ষম শরীরকে তাপক্লিষ্ট জীবনকে মুক্তি দান করো। হে বন্ধু! হে সুহৃৎ! তাই তুমিই এসো।

অমূল্য নূতন ঠেলাগাড়িতে বেড়াইয়া আসিয়া চাকরের হাত ছাড়াইয়া পালাইয়া আসিয়া নালিশ করিল "দাদামশাই আমায় কেস্‌ত নাস্তায় নাম্‌তে দেয়নি, ও বড় দুত্তু হয়েচে। শ্যামাকান্ত সুপ্তোত্থিতের ন্যায় চমকিয়া উঠিয়া শিশুকে ব্যগ্রভাবে কাছে টানিয়া পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতে লাগিলেন; দুই চোখ দিয়া জলধারা গড়াইয়া পড়িয়া হৃদয়ের পাষাণ ভার সামান্য মাত্র লঘু করিয়া দিতে সক্ষম হইল। এই টুকুই যে তাঁহার সান্ত্বনার অবশেষ! কিন্তু অভাগ্যের ধন অন্ধের নড়িটুকুর উপর দৃষ্টি ফেলিতেও যে সাহস হয় না, নিরালম্বের অবলম্বন যদি তাঁহার দৃষ্টিতে শুখাইয়া যায়!

এই ধনৈশ্বর্য্য পূর্ণ প্রকাণ্ড অট্টালিকায় বাস করা শিবানীর পক্ষেও একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল। আজকাল যদিও শ্বশুরের সেবা ও তাঁহার চিন্তায় তাহার বিক্ষিপ্ত চিত্তকে অনেকখানি অবলম্বন দিয়া তাহাকে সংসারের মধ্যে টানিয়া আনিয়াছে, তথাপি তাহার নিকট সকলি অন্ধকার।

সময় পাইলেই সে বালক বিনোদের পড়িবার ঘরের চাবি খুলিয়া ঘরে প্রবেশ করিত। চারিদিকে পুস্তকভরা আলমারি, দেওয়ালে বঙ্গের খ্যাতনামা মনীষীগণের চিত্র; ঘরের ঠিক মধ্যস্থলে লিখিবার টেবিলের ড্রয়ারের মধ্যে বিনোদকুমারের হাতের লেখা, ও তাহার টুকিটাকি দ্রব্য সকল সাজান। শিবানী সন্তর্পণে একবার ড্রয়ার খুলিয়া জিনিষ পত্রগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া আবার পূর্ব্বের

মতন করিয়া যথাস্থানেই সাজাইয়া রাখিত। আঁচল দিয়া টেবিলটি মুছিয়া কেদারাখানি ঝাড়িয়া সেই আঁচলখানি মাথায় ঠেকাইয়া তারপর অপরিতৃপ্ত চিত্তে আবার দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিত। কই সেখানে তো তাহার জন্য কোন সান্ত্বনা, কৈান আশ্রয়ই নাই! সে যে বিনোদকে জানিত—যে তাহারি স্বামী—তাহার স্মৃতি—তাহার যোগ ত ইহাদের মধ্যে সে দেখিতে পায় না! হাতের লেখাগুলি এমন সুন্দর এমন রচনাসরস! মূর্খ শিবানী তো তাঁহার হস্তাক্ষর পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই তাই তাহার নিকটে তাহাদেরও শক্তি যেন মন্ত্রনিরুদ্ধবীর্য্য! এখানে আসিয়া শিবানী তাহার শ্বাশুড়ির পরিত্যক্ত গৃহে স্থান পাইয়াছিল। সেই ঘরের প্রবেশ দ্বারের উপরে একখানা বিচিত্র ফ্রেমে বাঁধান বিনোদের চিত্র। কিশোর বিনোদ, অজাত গুম্ফ, কুঞ্চিত কেশ উৎসাহ চঞ্চল দৃষ্টি, মাতা ভুবনমোহিনীর কোল ঘেঁসিয়া তাঁহারই বাহুর উপর ঈষৎ হেলিয়া রহিয়াছে। শিবানী প্রভাতে সর্ব্ব দেবতার পূর্ব্বে ইঁহাকেই প্রণাম করিত।

প্রথম ভাগ্য পরিবর্ত্তনের বিস্ময় ও শান্তির ভালবাসার আবর্ত্তে পড়িয়া কিছুদিন যেন সে একটু শান্তি পাইয়াছিল। কিন্তু শান্তির গমনে তাহার অন্তরে পূর্ব্বের মতন হাহাকারই পুনরায় জাগিয়া উঠিয়াছে। সিদ্ধেশ্বরী মেয়েকে এখনও চিনিয়া উঠিতে পারেন নাই, আর যে কখনও পারিবেন সে আশাও অধিক ছিল না। সেই সব ভাবিয়া চিন্তাইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে বেইমানি মেয়েকে কোন কথাই আর বলিবেন না। তবে নেহাৎ মায়ের প্রাণ কিনা সেইজন্যই যা মধ্যে মধ্যে এক-আধ দিন নেহাৎ অসৈরণ হইলে তাহারি ভালর জন্য দুকথা না বলিলেও, চলে না। পোড়া মেয়ের 'বরাত' যে এখনও মেঘাচ্ছন্ন রহিয়াছে, শ্বশুরকে দিয়া ইহার একটা প্রতিকার করান যে তাহার পক্ষে কর্ত্তব্য এই সামান্য কথাটি 'আবাগীর বেটি'কে না বোঝাইয়াই বা থাকেন কেমন করিয়া? কিন্তু একগুঁয়ে মেয়ে এখনও সেই পূর্ব্বের মতনই নিজের গোঁয়ে হয় চুপ করিয়া শুনিয়া যায়, না হয় কাঠের মতন শক্ত হইয়া শুধু বলে "আমি বলব না"। এদিকে সিদ্ধেশ্বরী শুনিয়াছেন কর্ত্তা নাকি উইল করিতেছেন তাহাতে হেম ও হেমের বউ তাঁহার অর্দ্ধেক বিষয় পাইবে। এমন সময় শিবানী যদি শ্বশুরকে বলে—সেটা ঠিক নয়—তবে অনায়াসে কার্য্য-সিদ্ধ হয়,—তাত সে বলিবে না! পোড়া কপাল অমন বুদ্ধির! রাগ করিয়া একদিন সিদ্ধেশ্বরী বলিলেন 'আমার এখানে আর মন টিঁকচে না আমি বৃন্দাবনে যাই, কি বলিস্?" শিবানী আগ্রহে তৎক্ষণাৎ বালল, 'তাই চল মা তাই চল, আমরা দুজনেই যাই।'

হা রে বুদ্ধি! সিদ্ধেশ্বরী আর উচ্চ বাচ্য করিলেন না। কিন্তু শিবানীর চিত্তে এই সম্ভাবনাটা যেমন হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়াছিল তেমনি শীঘ্রই মিলাইয়া গেল না। এক-দিন রাত্রে সে মায়ের ঘরে গিয়া তাঁহার কাছে বসিল। সিদ্ধেশ্বরী একটু বিস্মিত হইয়া গেলেন। সে বড় একটা আপনা হইতে তাঁহার কাছে

আসিয়া বসে না। কোমলস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "কিরে শিবু? এমন সময় এলি যে?" শিবানী ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিল,"এই এলুম একবার।" সিদ্ধেশ্বরী একবার সন্দিগ্ধ নেত্রে কন্যার পানে চাহিয়া দেখিলেন কিছু বলিলেন না, কথাটা বোধহয় তেমন বিশ্বাস হইল না। বিমলাদাসী তাঁহার পায়ে তেল মালিশ করিয়া আগুনের তাপ দিতেছিল তাহার কার্য্য শেষ হইলে আগুনের কড়া লইয়া সে বাহিরে চলিয়া গেল। তখন শিবানী বলিল 'মা'? 'কি মা?' বলিয়া সিদ্ধেশ্বরী সস্নেহে চাহিয়া দেখিলেন। শিবানী সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া কহিল 'মা চলনা কেন আমরা আমাদের সেই নিজের ঘরেই আবার ফিরে যাই!' সিদ্ধেশ্বরীর ওষ্ঠ প্রান্তে দুঃখের হাসি ফুটিয়া উঠিল। পাগলী! হ্যাঁরে দিন দিন কচিটি হচ্চিস না কি? কি বলিস্ বলদেখি? অমুটার কি হবে?" শিবানী উত্তর দিল "সে এখানে থাক না, শুধু আমরা দুজনে চল চলে যাই মা; চলো আর আমি এখানে থাকতে পারচি না।"

শিবানীর কণ্ঠস্বরে আজ সিদ্ধেশ্বরী রাগ না করিয়া বরং বেদনা বোধ করিলেন। তাহার প্রাণের প্রচ্ছন্ন ব্যথা, নিগূঢ় অভিমান ও শূন্যতা তাঁহাকে এক মুহূর্ত্ত যেন আঘাত করিল। সত্যিই তো কেমন করিয়া এখানে তাহার মন টিঁকিবে? চারিদিকে সুখ ঐশ্বর্য্য সবই ছড়ান অথচ সে সকল ভোগেই বঞ্চিত! যার জন্য সব—সেই আজ কোথায়? দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন "যেমন কপাল করে এসেছিলি! কি করবি বাছা, সহ্যি কর। সত্যি ভগবান কি কখনও মুখ তুলে চাইবেন না? এখন কোথায় যাবি—এ যে তোরই ঘর।" শিবানীর সর্ব্বশরীরে তাড়িত সঞ্চালিত হইয়া গেল। ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিবেন? চাহিবেন কি? ওগো সর্ব্বান্তর্যামী! তবে আর কতদিনই বিমুখ থাকিবে? একবার মুখ তোল' একবার চাহিয়া দেখ তোমার একটুখানি দৃষ্টির উপর এখনও কি সব নির্ভর করিতেছে না? এ কথা সে ত প্রায় ভুলিয়াই আসিয়াছিল; যদি আবার স্মরণ করাইয়া দিলে তবে কৃপা দৃষ্টি দাও"। সিদ্ধেশ্বরী শিবানীকে নীরব দেখিয়া তাড়াতাড়ি কথাটা উল্টাইয়া ফেলিবার আশায় বলিয়া উঠিলেন "এবার 'পৈরাগে' অদ্ধ কুম্ভ হবে। মনে কচ্চি 'ছান'টা করে চুলগুলো মুড়িয়ে আনবো, কল্পবাস কর্ব্বারও বড় সাধ আছে। মেজবোন, নিস্তারিণী ওরাও যেতে চায়; দেখি শরীরটা ভাল থাকে তো যাবো।"

শিবানী সে কথাগুলা হয়ত সব শুনিতেও পায় নাই, সে তখন ভাবিতেছিল, যদি তাই হয়, তা হলে সবি আবার ফিরে আসে! তিনি নিশ্চয় ঠাকুরপোকে ফিরিয়ে আনেন। চাও ঠাকুর মুখ তুলে চাও।"

যোগেশ মধ্যে মধ্যে বাহিরের ঘরে শ্যামাকান্তের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে হেমেন্দ্রের সংবাদ দিয়া যাইত। একদিন সে আসিয়া জানাইল; হেমেন্দ্র শিবানীকে ও তাহার পুত্রকে জাল প্রমাণ করিবার জন্য শীঘ্রই মোকর্দ্দমা আনিবে। শুনিয়া বৃদ্ধ জমীদার অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া একদিকে চাহিয়া রহিলেন, জগৎ প্রপঞ্চ স্বপ্নের মতই অলীক প্রতীয়মান হইতেছিল। তারপর বজ্রাহতের মতন সভয়কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন; "সত্যি কি হেম এমন কেলেঙ্কারীর কাজটা করতে পারবে? যোগেশ তুমি ত তার বন্ধু তুমি তাকে

বুঝিও বাবা। শুধু শুধু একটা ঝোঁকে পড়ে সে যেন একেবারে কুলমর্য্যাদা ভুলে গিয়ে শত্রু পক্ষের মুখ হাসায় না। আমি ত তাকে আমার অর্দ্ধেক সম্পত্তি চুলচেরা ভাগ করে দিতে এখনি রাজি রয়েছি। সে আমার কাছে না থাকতে চায় স্বতন্ত্র বাড়িতে থাকতে পারবে। তুমি তাকে ফিরে আসতে বলো। না হয় সে কোথায় আছে—আমায় নিয়ে চল। সেখানে গিয়ে আমি তাদের সঙ্গে করে নিয়ে আসি।"

চতুর যোগেশ টলিল না। বৃদ্ধের কাতরোক্তিতে মনে করুণা আসিতেছিল কিন্তু হেমকে এখন তাহার জ্যেঠার হাতে সঁপিয়া দিলে তাহার কি লাভ হইল? শুধুই কি এতদিন তাহায় বেগার খাটা সার! না, নিজের একটা উপায় না করিয়া শিকার ছাড়া যাইতে পারে না। হেম দারিদ্র্যের মধ্যে এমনি উত্তপ্ত ও অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছে যে অর্দ্ধেক বিষয়েই হয়ত সম্মত হইতে পারে। বলিল, "আপনি হঠাৎ গেলে, সে যে রকম ছেলে হয়ত একেবারেই বেঁকে বসিবে, বিশেষতঃ আপনাকে তাদের খপর দিয়েছি, জান্‌তে পারলে আমার উপর শুদ্ধ অবিশ্বাস হয়ে যাবে, কোন কাযই হবে না। তার চেয়ে বরং আমি তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে যাতে নোয়াতে পারি তারি চেষ্টা করি। দেখুন আমরা পুরুষানুক্রমে আপনাদেরই খেয়ে মানুষ!—আপনাদেরই সেবক আমরা—আমার দ্বারা চেষ্টার কিছু ত্রুটি হবে না। এক কাজ করুন তাদের তো একটা কড়া কড়িও হাতে নেই, বৌঠাক্‌রুণের গহনা বাঁধা রেখে পরশু চারশো টাকা ধার করে দিয়েছি—জানেনতো আমার অবস্থা! আমার নিজের তো কিছুই নেই। তা সেই টাকাটা বরং আমায় চুপে চুপে দিন, গহনা খালাশ করে দিইগে। জিজ্ঞেস করলে না হয় বলব, অন্য জায়গা থেকে ধার করে ছাড়িয়ে এনেছি। আহা বৌঠাক্‌রুণেরই কষ্ট!"

মর্ম্মের মধ্যে তপ্ত লৌহ শলাকা দিয়া যোগেশ খোঁচাইয়া তুলিল। যোগেশ চলিয়া গেলে বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া শ্যামাকান্ত বালকের মতন কাঁদিয়া বলিলেন "মা আমার! কি চণ্ডালের হাতে তোকে দিলুম!"

দেওয়ানকে ডাকাইয়া সেইদিন রজনী-নাথকে পত্র লিখাইলেন "হেম শুনিতেছি সম্পত্তি প্রাপ্তির জন্য নালিশ করিবে। আমি স্থির করিয়াছি তাহার পূর্ব্বেই আমি আমার বিষয় বিভাগ করিয়া ফেলিব। অর্দ্ধাংশ বিনোদের পুত্রকে ও অর্দ্ধাংশ তাহাকে দিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইতে চাই। তুমি একবার আসিয়া তাহার বন্দোবস্ত করিয়া যাও। মা ও হেম শারীরিক ভাল আছে বলিয়া শুনিলেও আমার তাহা বিশ্বাস হয় না। যোগেশ তাহাদের দেখিতেছে, সে বড়ই ভাল ছেলে। শুনিলাম চন্দন নগরে তাহারা আছে। কোথায় আছে হেমের বিরক্তির ভয়ে তাহা বলিতে সাহস করিল না।" তিনদিন পরে রজনীনাথের নিকট হইতে পত্র আসিল। এতদিন ধরিয়া শ্যামা-কান্ত মনে মনে অনেকখানি আশা গড়িয়া রাখিয়া ছিলেন পত্রপাঠে তাহা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। সে পত্র এইরূপ—

"কিসের পুরস্কার স্বরূপ আপনি তাহাকে এত বড় একটা সম্পত্তির অধিকাংশ দান করিতে চাহিতেছেন? উচ্ছৃঙ্খলতার? অবাধ্য-

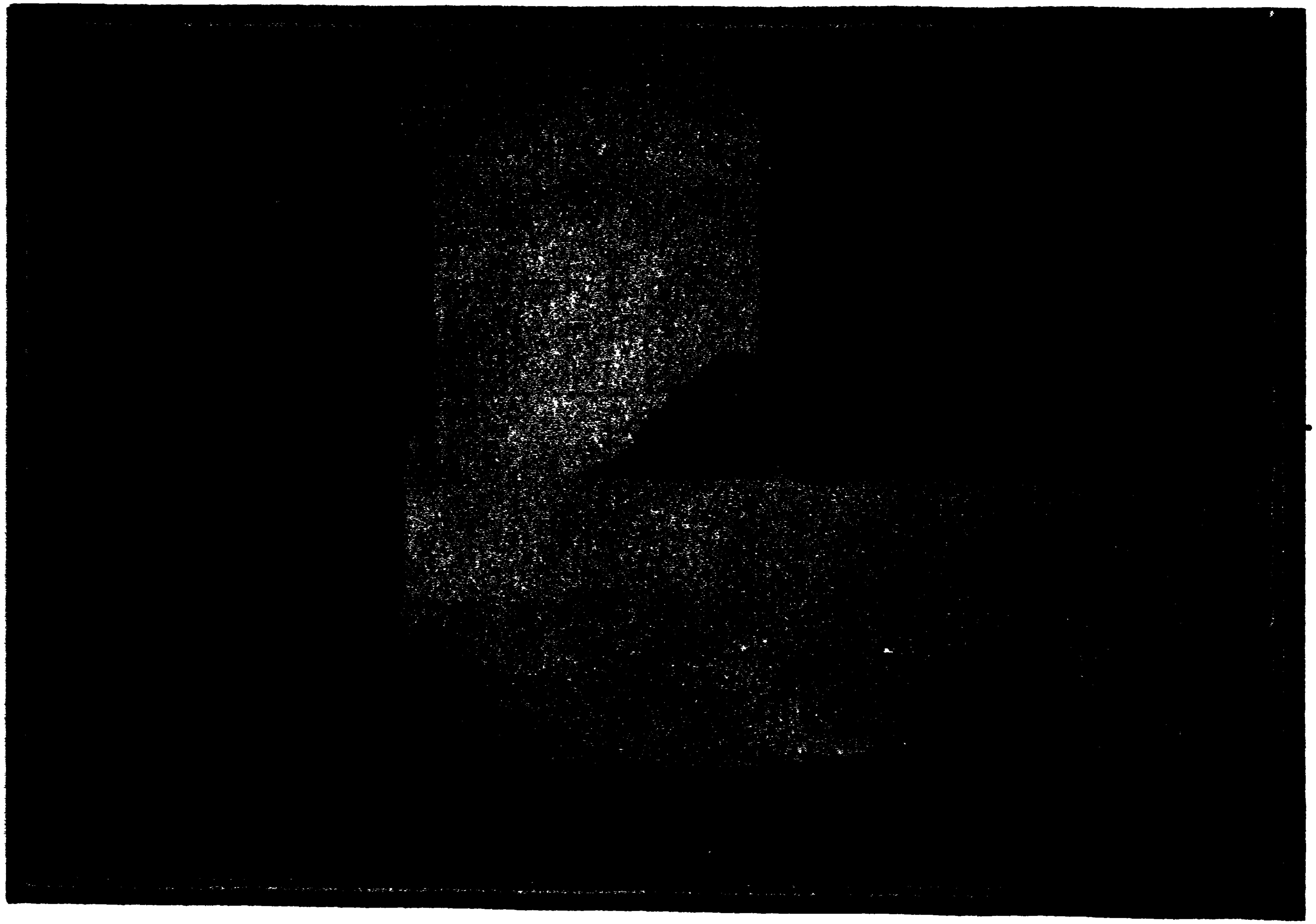

পত্র লেখা

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত চিত্র হইতে

তার? ঈর্ষার? অকৃতজ্ঞতার—কিসের? বিষয় আপনার, আপনি যদি তাহা রাস্তার লোক ডাকিয়াও বিলাইয়া দেন তাহাতে বাধা দিবার আমার অধিকার কি? কিন্তু আমার সহিত তাহাদের যে সম্বন্ধ ছিল তাহারই জন্য শুধু এইটুকু স্মরণ করাইয়া দেওয়া উচিত বলিয়া মনে করিতেছি। দোষীকে দণ্ডের পরিবর্ত্তে পুরস্কার দান যদি নিতান্তই আপনার অভিপ্রেত হয় অন্য কাহারও দ্বারা সে কার্য্য করাইয়া লইবেন আমায় ক্ষমা করুন। আবশ্যক হইলে আপনার দলিলপত্র পাঠাইয়া দিতে পারি কিন্তু আমায় অনুগ্রহ করিয়া কোন সংবাদই দিবেন না।"

কি ভয়ানক! সেই রজনীনাথ সেই সন্তান বৎসল পিতা! প্রাণাধিক স্নেহের কন্যার সম্বন্ধে আজ তাঁহার এই নিষ্ঠুর হৃদয়হীন পত্র!

শ্যামাকান্ত মর্ম্মাহত হইলেন।

দুঃখিনী।*

খে'তে পায়নি, দু'দিন ধরে';
তার উপরে রোগের জ্বালা,
আছে তাহার তিনটি শিশু,—
অন্ন বিনে হাড়ের মালা!

একটি দ্বারের সাম্‌নে এসে
"ভিক্ষে দাওগো" বল্‌লে খালি;
"কোন্ অভাগী, দূর্ হ!" বলে,'
কে যেন তায় পাড়্‌ল গালি!
গরীব বলে' এম্‌নি করে'
সবাই তা'রে কর্‌ছে ঘৃণা;
দেয় না তা'রে কেউ যে কিছুই
গালি কিম্বা প্রহার বিনা!

মধ্যাকাশে তপন তখন
প্রখর তেজে জ্বল্‌তেছিল;
এম্‌নি কালে, বক্ষে-শিশু-
মাকে আমার তাড়িয়ে দিল!

শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী।

স্বপ্রকাশ।

আপন বসন্তরাগে সেথা তুমি পূর্ণ প্রস্ফুটিত
সেথা নাহি দখিন পবন।
নিঃশব্দ বীণায় তব সেথা জাগে সমাপ্ত সঙ্গীত
সেথা নাহি কাকলী কুজন!
অনন্ত মিলন সেথা, চির ভালবাসা;
সেথা স্তব্ধ গুঞ্জরণ, নাহি যাওয়া আসা;
বিরহদহন নাহি, নাহি লুব্ধ আশা;
নাহি স্বপ্ন শুধু জাগরণ!
সেথা তব তন্দ্রাহীন আঁখি জাগে দিনরাত্রি পারে
সেথা নাহি ক্ষণ-চন্দ্র-লেখা।
সেথা পদপ্রান্তে তব চির মেঘ-মুক্ত রক্তরাগ,
সেথা নাহি উষারুণ-রেখা!
নাহি দীপ্তি ক্ষণিকের, নাহি অন্ধকার;
চিরতৃপ্তি, নাহি অতৃপ্তির হাহাকার;
আছে মুক্তি, নাহি সেথা বন্ধন বিকার;
নাহি সঙ্গ, নহ সেথা একা!

শ্রীদীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

* গত পৌষ মাসের ভারতীতে প্রয়াণ নামক কবিতায় নিবিড় নীরদ স্থলে ভুলক্রমে 'নিবিড় নদীর' হইয়া পড়িয়াছে।

চয়ন।

হিউয়েনসাং প্রণীত সিউ-ইউ-কি।

সিঁড়ির দক্ষিণাংশে ও স্তূপের পূর্ব্ব দিকে তিন ফুট ও পাঁচ ফুট উচ্চ দুইটি খোদিত স্তূপ আছে। আকৃতিতে তাহারা বৃহৎ স্তূপের ন্যায়। চার ফুট ও ছয় ফুট উচ্চ দুইটী বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিগুলি বোধি বৃক্ষতলে যোগাসনে আসীন বুদ্ধদেবের মূর্ত্তির ন্যায়। সূর্য্যরশ্মি যখন এই মূর্ত্তিগুলির উপর পতিত হয়, তখন এগুলি উজ্জ্বল সুবর্ণমূর্ত্তির ন্যায় বোধ হয়। এতদ্দেশীয় বৃদ্ধেরা বলিয়া থাকে যে "কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে ভিত্তিমূলের ছিদ্রে বৃহৎ সুবর্ণ পিপীলিকা বাস করিত। প্রস্তর নির্ম্মিত সিঁড়িতে ইহাদের দংশনের চিহ্ন অদ্যাপিও বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং তাহারা যে সুবর্ণ বালুকা রাখিয়া গিয়াছে তাহাতেই বুদ্ধদেবের এইপ্রকার সুবর্ণমূর্ত্তি দেখা যায়।"

বৃহৎ স্তূপের সিঁড়ির দক্ষিণ পার্শ্বে ষোড়শ ফুট উচ্চ বুদ্ধদেবের চিত্রিত মূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিটির মধ্যদেশ হইতে উপরার্দ্ধ দুইভাগে বিভক্ত। প্রাচীন কিংবদন্তীতে জানা যায় যে এক দরিদ্র ব্যক্তি নিজ জীবন রক্ষার জন্য অপরের অধীনে কার্য্য করিত। বেতন স্বরূপ একটী সুবর্ণ মুদ্রা পাইলে সে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি নির্ম্মাণে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হয়; স্তূপের সন্নিকটস্থ একজন চিত্রকরকে নিজের দৈন্যতা জানাইয়া বুদ্ধদেবের সুন্দর একটি মূর্ত্তি একটী সুবর্ণ মুদ্রায় নির্ম্মাণ করিতে বলে। চিত্রকর তাহার ভক্তি ও দৈন্যতার বিষয় অবগত হইয়া মূল্যের সম্বন্ধে কিছু না বলিয়াই মূর্ত্তি নির্ম্মাণে প্রস্তুত হয়। অন্য একটী ঐরূপ দরিদ্র ব্যক্তিও একটি সুবর্ণমুদ্রা দ্বারা বুদ্ধদেবের প্রতিমা নির্ম্মাণে অভিলাষী হয় এবং উপরোক্ত চিত্রকরকে সুবর্ণ মুদ্রা দান করিয়া মূর্ত্তি নির্ম্মাণে অনুরোধ করে। চিত্রকর পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দুইটী সুবর্ণ মুদ্রা পাইয়া উৎকৃষ্ট রং সংগ্রহ করিয়া চিত্র প্রস্তুত করে। একই দিনে উভয় ব্যক্তি ঐ মূর্ত্তি.ক পূজার্থ তথায় উপস্থিত হইলে, চিত্রকর উভয়কেই একই মূর্ত্তি দেখাইয়া বলে যে এই মূর্ত্তি উভয়েরই। দরিদ্র ব্যক্তিরা ইহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হওয়াতে চিত্রকর তাহাদের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলে যে সে তাহাদের অর্থ অপহরণ করে নাই এবং উভয়েরই অর্থ যে ঐ চিত্রে ব্যয়িত হইয়াছে তাহা প্রমাণ করিবার জন্য মূর্ত্তির নিকট প্রার্থনা করে। অবিলম্বে দৈবশক্তিতে ঐ মূর্ত্তির উপরার্দ্ধ দ্বিখণ্ড হইয়া যায় এবং উভয় খণ্ডই তুল্যজ্যোতি বিকাশ করিতে থাকে। এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া সকলেই আনন্দ মুগ্ধ হইয়া যায়।

বৃহৎ স্তূপের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত অষ্টাদশ ফুট উচ্চ বুদ্ধ মূর্ত্তি আছে। এই মূর্ত্তির অনেক অলৌকিক ক্ষমতা এবং ইহা হইতে উজ্জ্বল জ্যোতি নির্গত হয়। কোন কোন সময় এই মূর্ত্তি বৃহৎ স্তূপটী প্রদক্ষিণ করে, লোকে এরূপ দেখিয়া থাকে। কিছুদিন পূর্ব্বে দস্যুগণ চৌর্য্যাভিলাষে স্তূপের নিকট উপস্থিত হয়। বুদ্ধমূর্ত্তি তৎক্ষণাৎ স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া স্তূপের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, দস্যুগণ ভীত হইয়া পলায়ন করে; মূর্ত্তিও স্বস্থানে প্রত্যাগমন করে। দস্যুগণ এই দৃশ্যে মোহিত হইয়া, দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নগরে নগরে ভ্রমণ করিয়া এই অপূর্ব্ব অলৌকিক কাহিনী বর্ণনা করিয়াছিল। বৃহৎ স্তূপের বামে ও দক্ষিণে একশত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তূপ আছে। ইহার প্রত্যেকটীই সুকৌশলে নির্ম্মিত। মধ্যে মধ্যে এই সকল স্তূপ হইতে সুগন্ধ উত্থিত ও নানাপ্রকার বাদ্যধ্বনি শ্রুত হইয়া থাকে এবং ঋষি ও পুণ্যবাণ ব্যক্তিগণও মধ্যেমধ্যে স্তূপ প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন, এইরূপ দেখা যায়। তথাগত বলিয়া গিয়াছেন যে এই স্তূপটী সাতবার পুনর্নির্ম্মিত হইলে বৌদ্ধধর্ম্ম পৃথিবী হইতে লোপ পাইবে। প্রাচীন কাগজপত্র হইতে অবগত হওয়া যায় যে মন্দিরটী তিনবার ভস্মীভূত ও তিনবার পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছে।

যখন আমি প্রথম এই দেশে আসি, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই এই স্তূপটি ভস্মীভূত হয়। পুনরায় নির্ম্মিত হইতেছে। কিন্তু নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয় নাই।

বৃহৎ স্তূপটীর পশ্চিমে রাজা কনিষ্ক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত প্রাচীন সঙ্ঘরাম আছে। ইহার উচ্চ প্রাসাদ, ছাদ, কক্ষ সকলই যে সমস্ত যতিগণ এই স্থানে থাকিয়া কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। যদিও এইক্ষণ ইহার কিছু ক্ষয় হইয়াছে, তাহা হইলেও ইহার অলৌকিক নির্ম্মাণ কৌশল সহজেই প্রতীয়মান হয়। মাত্র কয়েকজন যতি এই স্থানে বাস করেন; ইহারা হীনযানাবলম্বী। সঙ্ঘরাম নির্ম্মাণকাল হইতে অনেক শাস্ত্রপ্রণয়নকারী যতিগণ এই স্থানে বাস করিয়া অর্হত্ব লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের খ্যাতি বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং তাঁহাদের আদর্শ ধার্ম্মিক জীবনের প্রশংসা এখনও শোনা যায়।

তিনতলাতে মাননীয় পার্শ্বিকের কক্ষ; ইহা অনেককাল পূর্ব্বে ধ্বংশ হইয়াছে কিন্তু লোকে এখানে স্মারক লিপি স্থাপন করিয়াছে। পার্শ্বিক প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ ছিলেন কিন্তু অশীতিবৎসর বয়সে তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণাভিলাষে সংসার পরিত্যাগ করেন। নগরের বালকেরা তাঁহাকে নিম্নলিখিতভাবে বিদ্রূপ করিতে লাগিল "হে মূর্খ, অজ্ঞ বৃদ্ধ। তুমি কি জাননা যে যাহারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী তাহাদের উপাসনা ও শাস্ত্র পাঠ করিতে হয়? তুমি এইক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছ। এইক্ষণ শ্রমণ ব্রত গ্রহণে তোমার কি ফললাভ হইবে? তুমি কেবল আহার করিতেই জান—আর ত কিছুই জান না।" পার্শ্বিক বিদ্রূপাত্মক এই কথা শুনিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যতদিন তিনি ত্রিপিটকে পারদর্শী না হইবেন, যতদিন তিনি অসদিচ্ছা প্রতিকরণে সক্ষম না হইবেন যতদিন তিনি অভিজ্ঞ না হইবেন এবং বিমোক্ষলাভে সক্ষম না হইবেন ততদিন তিনি শয়ন পর্য্যন্ত করিবেন না। সেইদিন হইতে দিবাকালে বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত পুস্তক পাঠ এবং রাত্রিতে উপবেশন করিয়া ধ্যান করিতেন। তিন বৎসরে তিনি ত্রিপিটকে এবং ত্রিবিদ্যায় পারদর্শী হইলেন। লোকে সেই সময় হইতে তাঁহাকে মাননীয় পার্শ্বিক নামে অভিহিত এবং যথেষ্ট সম্মান করিত। পার্শ্বিকের কক্ষের পূর্ব্বে অন্য একটী পুরাতন গৃহ আছে; তথায় বসুবন্ধু বোধিসত্ত্ব অভিধর্ম্মকোষ শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ এই স্থানে একটী স্মারকলিপি রহিয়াছে।

বসুবন্ধুর গৃহের প্রায় পঞ্চাশপদ দূরে দ্বিতল গৃহে শাস্ত্রজ্ঞ মনোহৃত বাস করিতেন। এই বিজ্ঞ পণ্ডিত বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের সহস্র বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যৌবনকালে তিনি বিদ্যাভ্যাসে রত এবং বিশেষ প্রতিভাশালী ছিলেন। ধার্ম্মিকদের মধ্যে তাঁহার যথেষ্ট সুযশ ছিল এবং বিষয়ী লোকও তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিত। এই সময়ে সুপ্রতিষ্ঠিত নরপতি বিক্রমাদিত্য রাজত্ব করিতেন। দৈনিক তিনি পাঁচ লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা বিতরণ করিতেন। তিনি দরিদ্র, অনাথ ও আতুরের অভাব মোচন করিতেন। বিক্রমাদিত্যের কোষাগার অচিরে শূন্য হইবে এই আশঙ্কায় তাঁহার কোষাধ্যক্ষ মহারাজকে এইরূপ নিবেদন করিল, "মহারাজ! আপনার খ্যাতি চরাচর ব্যাপ্ত হইয়াছে। আপনি আমাকে প্রত্যহ পাঁচলক্ষ সুবর্ণমুদ্রা আর্ত্তের উপকারার্থ ব্যয় করিতে আদেশ দিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে আপনার কোষাগার শূন্য হইবে এবং কৃষিগণের উপর কর বৃদ্ধি করিতে হইবে; ক্রমান্বয়ে ইহাতে ভূমির উর্ব্বরাশক্তি লোপ পাইবে। ইহাতে প্রজা অসন্তুষ্ট হইবে। মহারাজ দানের জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করিবেন কিন্তু মন্ত্রীবর্গের কুৎসা প্রচারিত হইবে।" রাজা উত্তর করিলেন "আমি আমার ব্যয়াবশিষ্ট হইতেই দরিদ্রের উপকার করিবার চেষ্টা করি। নিজের সুবিধার জন্য অবিবেচনাপূর্ব্বক আমি কখনও প্রজাপীড়ন করিব না।" এই প্রকারে রাজা প্রত্যহ পাঁচলক্ষ সুবর্ণমুদ্রা ব্যয় করিতেন। কিছু দিবস পরে, রাজা বিক্রমাদিত্য মৃগয়াকালীন শূকর অনুধাবন করিতেছিলেন। শূকর অনুসন্ধানে সাহায্যকারী ব্যক্তিকে তিনি লক্ষমুদ্রাদান করিয়াছিলেন। মনোহৃত একদিন তাঁহার মস্তকমুণ্ডনকারীকে লক্ষ সুবর্ণমুদ্রাদান

করিয়াছিলেন. প্রধান ঐতিহাসিক এই দানের কথা আখ্যায়িকায় লিপিবদ্ধ করেন। রাজা ইহা পাঠে লজ্জিত হইয়া মনোহৃতকে শাস্তি দিবার জন্য ব্যগ্র হন। তদুদ্দেশ্যে তিনি ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী একশত বিজ্ঞ ব্যক্তিকে আহ্বান করিয়া এইরূপ আদেশ দেন "আমি ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বীগণের অনুসন্ধান সীমাবদ্ধ করিতে চাই; বর্ত্তমানে প্রকৃত অপ্রকৃত নির্দ্ধারণ করা দুঃসাধ্য। এইজন্য অদ্য আমার আদেশ পালনে আপনারা বিশেষ যত্নবান্ হউন্।" তর্কের জন্য সকলে সমবেত হইলে তিনি এইপ্রকার দ্বিতীয় আদেশ প্রচার করিলেন যে, "শাস্ত্র বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী উভয় পক্ষেই উপযুক্ত বিজ্ঞ ব্যক্তি আছেন। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীগণের তাহাদের নিয়মাবলী যথাযথ প্রতিপালন করা উচিত। যদি ইহারা জয়লাভ করে, তবে উহাতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাববৃদ্ধি পাইবে কিন্তু যদি উহারা পরাজিত হয়, তাহা হইলে উহাদের বিনষ্ট করিতে হইবে।" মনোহৃত এই আদেশে, বিপক্ষপক্ষীয় ৯৯ জনকে পরাজিত করিলেন। তৎপর, সামান্য বুদ্ধিবিশিষ্ট একজন তাঁহার সহিত তর্কের জন্য অগ্রসর হইলে, মনোহৃত তাহাকে অগ্নি ও ধূমের সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। এই প্রশ্নে রাজা ও অবিশ্বাসীগণ বলিয়া উঠিল "সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ মনোহৃত অগ্রে ধূম ও পরে অগ্নি না বলিয়া প্রথমে অগ্নি ও পরে ধূমের কথা বলিয়াছেন; সুতরাং তিনি পরাজিত হইয়াছেন।" মনোহৃত কথা বলিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু জনতা তাঁহাকে বাধা দিতে লাগিল। ইহাতে তিনি লজ্জিত হইয়া নিজ জিহ্বা কর্ত্তন করিয়া শিষ্য বসুবন্ধুকে নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন "পক্ষাবলম্বী ব্যক্তিগণের নিকট ন্যায় বিচার নাই; প্রতারকগণের নিকট বিচার নাই।" এই লিখন সমাপ্ত হইলেই তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন।

কিছুদিন পরে, রাজা বিক্রমাদিত্য সিংহাসনচ্যুত হইলেন এবং অন্য একজন নরপতি রাজসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। বসুবন্ধু পূর্ব্বোক্ত কলঙ্ক অপনয়ন করিবার জন্য এই নূতন নরপতির নিকট আসিয়া বলিলেন "মহারাজ, আপনার সদ্গুণাবলী দ্বারা আপনি রাজ্য শাসন করিতেছেন। আমার গুরু মনোহৃত শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা বিদ্বেষবশতঃ আমার গুরুকে তাঁহার যশ হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। আমি সেই অপমানের প্রতিশোধ লইতে চাই।" রাজা বসুবন্ধুর এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন এবং যে সকল অবিশ্বাসী মনোহৃতের সহিত তর্ক করিয়াছিলেন তাহাদের আহ্বান করিলেন। বসুবন্ধু তাঁহার গুরুর সিদ্ধান্তগুলি পুনর্ব্বার প্রচার করাতে অবিশ্বাসীগণ লজ্জিত হইয়া তর্কস্থান পরিত্যাগ করিল।

রাজা কনিষ্কনির্ম্মিত সঙ্ঘরাম লইতে ৫০লি উত্তর-পূর্ব্বে আমরা এক বৃহৎ নদী উত্তীর্ণ হইয়া পুষ্কলাবতী নগরীতে উপস্থিত হই। নগরীর পরিধি ১৪ কি ১৫লি; লোকসংখ্যা এবং বাসোপযোগী গৃহ যথেষ্ট। নগরের পশ্চিমদ্বারের বহির্ভাগে একটী দেব-মন্দির আছে। তন্মধ্যস্থিত দেবমূর্ত্তি সম্ভ্রমাকর্ষক এবং অনবরত অলৌকিক ঘটনা সম্পন্ন করেন। নগরের পূর্ব্বদিকে রাজা অশোকনির্ম্মিত স্তূপ—এই স্থানেই ভূতপূর্ব্ব চারি জন বুদ্ধ ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। পুরাতন ঋষি এবং প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণের অনেকে মধ্য ভারতবর্ষ হইতে এই স্থানে ধর্ম্মপ্রচারার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে অভিধর্ম্মপ্রকরণপদ-প্রণেতা শাস্ত্রজ্ঞ বসুমিত্র এইস্থানে আগমন করিয়াছিলেন।

নগরের ৪।৫লি উত্তরে প্রাচীন সঙ্ঘরাম আছে—তথায় জনমানব নাই। জনকয়েক হীনযানাবলম্বী যতি থাকেন। সঙ্ঘরামের নিকটে কয়েকশত ফুট উচ্চ রাজা অশোক-নির্ম্মিত স্তূপ আছে। ইহা কাষ্ঠ ও প্রস্তর নির্ম্মিত। শাক্য বুদ্ধ যখন এদেশের রাজা ছিলেন তখন এইস্থানে বোধিসত্ত্বের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। প্রার্থীগণের আবেদনে তিনি সকল দ্রব্যই দান করিয়াছিলেন এবং নিজ শরীর দান করিতেও পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। এই দেশে, তিনি সহস্রবার রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া সহস্রবারই নিজ চক্ষু পরহিতার্থে দান করিয়াছিলেন।

নিকটেই শতফুট উচ্চ দুইটী প্রস্তর স্তূপ আছে। দক্ষিণেরটী রাজা ব্রহ্মদেব কর্তৃক এবং বামেরটী শক্র কর্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। উভয়ই বহুমূল্য রত্ন-মণ্ডিত। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পরে এই সকল রত্নগুলি সাধারণ প্রস্তরে পরিণত হইয়াছিল। যদিও স্তূপগুলির অবস্থা বর্ত্তমানে সুন্দর নহে, তথাপি দেখিতে এখনও তাহারা যথেষ্ট উচ্চ। এই ২টী স্তূপ হইতে ৪০লি উত্তর-পশ্চিমে আর একটী স্তূপ আছে। এই স্থানে শাক্য তথাগত রাক্ষসগণের মাতাকে বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন এবং মনুষ্যের প্রতি তাহার প্রকৃতিগত হিংসা দূর করিয়াছিলেন। এই জন্য এতদ্দেশীয় জনসাধারণ সন্তানকামনায় তাহাকে পূজা করে।

এই স্থান হইতে ন্যূনাধিক ৫০লি উত্তরে আর একটী স্তূপ আছে। এইস্থানে সামক বোধিসত্ব তাঁহার অন্ধ পিতাকে শুশ্রূষা করিতেন। একদিন, যখন তিনি উহাদের জন্য ফল আহরণ করিতেছিলেন তখন মৃগয়ার্থ রাজা ভ্রমবশতঃ বিষাক্ত তীর দ্বারা তাঁহাকে আহত করেন। ইন্দ্র দয়াপরবশ হইয়া ঔষধাদিদ্বারা ক্ষত আরোগ্য করেন।

এই স্থানের দক্ষিণ পশ্চিমে প্রায় ২০০ লি যাইয়া আমরা পোলুসা নগরে পৌঁছি। এই নগরের উত্তরে একটী স্তূপ আছে। তথায় রাজপুত্র সুদান তাঁহার পিতার বৃহৎ হস্তী দান করায় নিন্দিত ও রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত হইয়া এই স্থানে তাঁহার বন্ধুগণের নিকট বিদায় লইয়াছিলেন। নিকটেই অন্য সঙ্ঘরামে হীনযানমতাবলম্বী ৫০টী পুরোহিত বাস করেন। পূর্ব্বকালে এইস্থানে শাস্ত্রজ্ঞ ঈশ্বর অভিধর্ম্ম-প্রকাশসাধনশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। নগরের বহির্ভাগ সঙ্ঘরামে মহাযানমতাবলম্বী প্রায় অর্দ্ধ শত পুরোহিত বাস করেন। রাজা অশোক এই স্থানে স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। নির্ব্বাসিত রাজপুত্র সুদান দণ্ডলোক পর্ব্বতে বাস করিয়াছিলেন। এই স্থানে এক ব্রাহ্মণ তাঁহার পুত্র ও কন্যাকে ভিক্ষা প্রার্থনা করাতে সুদান তাহাদের বিক্রয় করিয়াছিলেন।

পোলুসানগর পরিত্যাগ করিয়া আমরা দণ্ডলোক পর্ব্বতে পৌঁছি। ঐ পর্ব্বতের শৃঙ্গোপরি রাজা অশোক এক স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই স্থানে নির্জ্জনে রাজপুত্র সুদান বাস করিতেন। রাজপুত্র তাঁহার পুত্র কন্যাকে এক ব্রাহ্মণকে দান করাতে ব্রাহ্মণ তাহাদের এত প্রহার করেন যে এ স্থানে রক্ত প্রবাহিত হইতে থাকে। অদ্যাপিও অত্রস্থ বৃক্ষলতাদি রক্তবর্ণ। পর্ব্বতগুহায় রাজপুত্র ও তাঁহার পত্নী ধ্যানমগ্ন থাকিতেন। উপত্যকার মধ্যস্থলে বৃক্ষগণ তাহাদের ডাল সকল নত করিয়া দিত। এই স্থানে পূর্ব্বকালে রাজপুত্র বিশ্রাম করিতেন। এই বনের পার্শ্বে পর্ব্বতগুহায় এক বৃদ্ধ ঋষি বাস করিতেন। পর্ব্বত গুহা হইতে ১০০লি দূরে আমরা একটী ক্ষুদ্র ও একটী বৃহৎ পর্ব্বতের নিকটে পৌঁছি। পর্ব্বতের দক্ষিণে সঙ্ঘরামে মহাযানমতাবলম্বী কয়েকজন যতি বাস করেন। ইহারই নিকটে রাজা অশোক নির্ম্মিত স্তূপ আছে। এই স্থানেই পূর্ব্বকালে একশৃঙ্গ ঋষি বাস করিতেন। এই ঋষি এক বেশ্যাদ্বারা প্রতারিত হইয়া স্বধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছিলেন। ঐ স্ত্রীলোক তাঁহার স্কন্ধে চড়িয়া নগরে প্রত্যাগমন করিয়াছিল।

পোলুসানগরের ৫০ লি উত্তর-পূর্ব্বে উচ্চ পর্ব্বতোপরি পীতবর্ণের প্রস্তর নির্ম্মিত ঈশ্বরদেবের স্ত্রী ভীমা দেবীর মূর্ত্তি আছে। উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকের ধারণা যে এ মূর্ত্তি আপনা হইতেই গঠিত হইয়াছে। ইহা অনেক অলৌকিক ব্যাপার সম্পন্ন করিতে পারে এবং সেই জন্য ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ হইতেই লোকে উন্নতি কামনায় এখানে আসিয়া ইহার পূজা করে। ধনী দরিদ্র সকলেই এই স্থানে সমবেত হয়। যাহারা দেবতার স্বর্গীয় রূপ দর্শনে অভিলাষী হয়, তাহারা সাত দিবস উপবাসী থাকিয়া অসন্দিগ্ধচিত্তে ধ্যান করিলে ঐ মূর্ত্তি দেখিতে পায় এবং প্রায়ই তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ হইয়া থাকে। পর্ব্বত নিম্নে মহেশ্বর দেবের মন্দির; ভস্মাচ্ছাদিত অবিশ্বাসীগণ এই স্থানে পূজার্থ সমবেত হয়। ভীমার মন্দির হইতে ১৫০ লি দক্ষিণপূর্ব্বে ও হিন্দদেশে উপস্থিত হই। এই নগর প্রায় ২০ লি বিস্তৃত এবং ইহার দক্ষিণে সিন্ধু নদী। অধিবাসীরা ধনী এবং

সমৃদ্ধিশালী। চতুর্দ্দিক হইতে এই স্থানে মূল্যবান পণ্যাদি আমদানী হয়। এই নগরের উত্তর পশ্চিমে পোলোটুলো (সলাতুর) নগরে পৌছি। এই স্থানে ঋষি পাণিনী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রাচীনকালে অনেকগুলি বর্ণ (অক্ষর) ছিল; পৃথিবী বিনষ্ট হইলে দেবতাগণ জনসমূহকে শিক্ষা দিবার জন্ম ধরাধামে অবতীর্ণ হন। এই প্রকারে প্রাচীন বর্ণ ও রচনার উৎপত্তি হয়। এই সময় হইতে ভাষার বিস্তৃতি হয়। আবশ্যকানুযায়ী দৃষ্টান্তাদি ব্রহ্মা ও দেবেন্দ্র স্থির করেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ঋষিগণ নানাপ্রকার বর্ণ সৃষ্টি করেন। পরবর্ত্তীকালে মনুষ্যগণ এই সকল ব্যবহার করিতে থাকে। যখন মনুষ্যগণের পরমায়ু শতবর্ষকালব্যাপী হয়, তখন ঋষি পাণিনী জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। পাণিনী ঈশ্বর দেবের সাক্ষাৎ পাইলে তিনি পাণিনীকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। পরে অনেক দিন পরিশ্রম করিয়া অনেক শব্দ সংগ্রহ করিয়া একসহস্র শ্লোক প্রণয়ন করেন। পুস্তক সমাপ্তি হইলে তিনি উহা রাজার নিকট প্রেরণ করিলে রাজা মহাসমাদরে উহা গ্রহণ করেন এবং রাজ্য-মধ্যে সর্ব্বত্র উহা পাঠের জন্ম আদেশ প্রচার করেন। রাজা ইহাও প্রকাশ করেন যে, যিনি উহা আদ্যোপান্ত শিক্ষা করিতে পারিবেন তিনি সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা পারিতোষিক পাইবেন। ঐকাল হইতে শিক্ষকগণ ছাত্র-দিগকে উহা শিক্ষা দিতেছেন এবং এই জন্মই এই নগরের ব্রাহ্মণগণ উচ্চশিক্ষিত এবং বিশেষ প্রতিভাপন্ন।

এই নগরে একটী স্তূপ আছে। তথায় একজন অর্হৎ পাণিনীর একজন শিষ্যকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তথাগতের নির্ব্বাণের পাঁচশত বৎসর পরে কাশ্মীর দেশে একজন অর্হৎ আগমন করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে থাকেন। এই স্থানে আসিয়া উক্ত অর্হৎ দেখিতে পান যে অনেক ব্রহ্মচারী তাঁহার এক শিষ্যকে শাসন করিতেছেন। ঐ দৃশ্যে অর্হৎ ব্রহ্মচারীকে বলিলেন "এবালককে তুমি কেন কষ্ট দিতেছ?" ব্রহ্মচারী উত্তর করিলেন "আমি উহাকে শব্দ বিদ্যা শিক্ষা দিতেছি। কিন্তু বালক কিছুই শিক্ষা করিতে পারিতেছে না।" অর্হৎ ইহাতে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। ব্রহ্মচারী তদ্দৃষ্টে জিজ্ঞাসা করিলেন "শ্রমণগণ সাধারণতঃ সর্ব্বজীবের প্রতি দয়াবান। মহাশয় আপনি কি জন্য হাস্য করিলেন?" অর্হৎ উত্তর করিলেন "তুচ্ছ কথা সকল সময় শোভা পায় না এবং আমি যাহা বলি তাহা আপনি বিশ্বাস করিবেন না। আপনি অবশ্যই ঋষি পাণিনীর কথা শুনিয়াছেন?" ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন "এই নগরের বালকগণ সকলেই তাঁহার শিষ্য, সকলেই তাঁহাকে সম্মান করে এবং তাঁহার স্মরণার্থ এক মূর্ত্তি এখন পর্য্যন্তও দৃষ্ট হয়।" অর্হৎ বলিতে লাগিলেন, যে বালককে আপনি এইক্ষণ শাসন করিতেছেন, এই বালকই সেই প্রাজ্ঞ ঋষি পাণিনী। পার্থিব শাস্ত্রেই পাণিনী নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং সেই সময় হইতে তাঁহার কেবল পুনর্জন্ম হইতেছে। পূর্ব্ব সুকৃতি বলে তিনি আপনার শিষ্যরূপে এইবার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু পার্থিব পুস্তকাদি দ্বারা তাঁহার কোনই উপকার হইবেনা। তথাগতের শিক্ষাই প্রকৃত সুখ ও জ্ঞান আনয়ন করে। দক্ষিণ সমুদ্রের উপকূলে প্রাচীন বৃক্ষের কোটরে পাঁচশত বাদুড় বাস করিত। কোন সময় একদল বণিক ঐ বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। শীত নিবারণের জন্য বণিকগণ বৃক্ষের নিম্নে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিল। বৃক্ষে অগ্নি লাগাতে বৃক্ষ ক্রমে ক্রমে ভস্মীভূত হইয়া গেল এই সময়ে বণিকগণের একজন অভিধর্ম্মপিটক আবৃত্তি করিতে থাকেন। বাদুড়গণ অগ্নিদগ্ধেও ঐ আবৃত্তিতে মোহিত হইয়া বৃক্ষ পরিত্যাগ না করায় সকলেই প্রাণ পরিত্যাগ করিল এবং তাহাদের পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত ফলে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিল। উহারা সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মার্জ্জন করিয়া অর্হত্ব প্রাপ্ত হয়। কিছুকাল পূর্ব্বে রাজা কনিষ্ক কাশ্মীর দেশে পাঁচশত ঋষিকে এক সভায় আহ্বান করেন। এই পাঁচশত ঋষিই সেই বৃক্ষের পাঁচশত বাদুড়। এ মূর্খও সেই পাঁচশতের একজন। এই প্রকারেই মনুষ্য কেহ অগণ্য ভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে, কেহবা

উঠে ওঠে। কিন্তু এইক্ষণে, হে ব্রহ্মচারি, আপনার শিষ্যকে সংসার পরিত্যাগে আদেশ করুন! বুদ্ধদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলে কি ফল লাভ হয়, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব।"

অর্হৎ এই বলিয়াই অন্তর্ধান হইলেন। ব্রহ্মচারী এই বৃত্তান্তে মুগ্ধ হইয়া, এই কাহিনী সর্ব্বত্র প্রচার করিলেন এবং উক্ত বালককে সন্ন্যাস গ্রহণে অনুমতি প্রদান করিলেন। পরন্তু, তিনি নিজে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী হইলেন। গ্রামের জনসাধারণ তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ পূর্ব্বক শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন এবং বর্ত্তমানেও গ্রামবাসীরা ঐ ধর্ম্মাবলম্বী রহিয়াছে।

এই স্থান হইতে আমরা কয়েকটি পর্ব্বত ও নদী পার হইয়া উদয়ানায় পৌঁছিলাম। (ক্রমশঃ)

(দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত)

বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা।

ভূমিকা।

মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র খৃষ্টীয় দশমশতাব্দীর প্রথমাংশে কাশ্মীর দেশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পুত্র সোমেন্দ্র পিতৃকৃত অবদান কল্পলতা গ্রন্থের উপক্রমণিকা লিখনকালে উল্লেখ করিয়াছেন যে মহারাজ অনন্তদেব যখন কাশ্মীর রাজ্য শাসন করেন তাহার সপ্তবিংশ সম্বৎসরে অবদানকল্পলতা গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। এখন রাজতরঙ্গিণী নামক কাশ্মীরেতিহাস গ্রন্থ আলোচনা করিয়া জানা যায় যে অনন্তদেবের রাজ্যকালের সপ্তবিংশ-সংবৎসর খৃষ্টীয় ১০৩৫ সাল।

ক্ষেমেন্দ্র অবদানকল্পলতা, চারুচর্য্যাশতক দর্পদলন, ভারতমঞ্জরী প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষায় বহুতর উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তন্মধ্যে অবদানকল্পলতা গ্রন্থটীই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও বৃহৎ। এই গ্রন্থে ভগবান্ বুদ্ধের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মবৃত্তান্ত কথনচ্ছলে অনেক উপদেশ গর্ভ সার কথা আছে। ইহার কবিত্বও অতি মনোরম এবং ভাষা অতীব প্রাঞ্জল। এই গ্রন্থটী মূল সংস্কৃত ও তিব্বতীয় অনুবাদ সহ এসিয়াটিকসোসাইটী দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে। আমিই ইহার সংস্করণ কার্য্য করিতেছি। প্রায় তিন অংশ ছাপা হইয়াছে। অবশিষ্ট অংশও যথাসম্ভব সত্বরই প্রকাশিত হইবে।

যৎকালে এ গ্রন্থটী লিখিত হয় তখন কাশ্মীরদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব ছিল এবং তিব্বতীয় পণ্ডিতগণ তথায় সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতেন। তিব্বতীয় রাজার আদেশে এই গ্রন্থ তিব্বতীয় কবিতাকারে অনুবাদ হইয়াছিল এবং এই অনুবাদ ও মূল সংস্কৃত উভয়ই ১২৪০ সংখ্যক কাষ্ঠফলকে তিব্বতীয় অক্ষরে খোদিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। এই এক একটী কাষ্ঠফলক দুই ফুট দীর্ঘ ও ৫ ইঞ্চি প্রস্থ। এই কাষ্ঠফলক হইতে ছাপা হইয়া উহা তিব্বত দেশে বহুকালাবধি প্রচার ছিল। ভারতে এ গ্রন্থের সৃষ্টি হইলেও কালক্রমে এখানে উহার লোপ ঘটিয়াছিল।

খৃঃ ১৮৮২ সালে আমি যখন লাসা নগরে উপস্থিত হই তখন বৈশাখ মাসে এই গ্রন্থের অনুসন্ধান পাইয়া বহুকষ্টে সংগ্রহ করিয়াছিলাম।

এই গ্রন্থটী ১০৮ সংখ্যক পল্লবনামক পরিচ্ছেদে বিভক্ত। ৯৩তম পল্লবটী সুমাগধাবদান। ইহাতে বৌদ্ধধর্ম্ম ব্যতীত জৈন ধর্ম্ম নামে আরও একটী ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম লুপ্ত হইলেও জৈন ধর্ম্ম এখনও প্রচলিত আছে। বুদ্ধের নামও জিন। ইহাতে পুণ্ডবর্দ্ধন নামে যে দেশের উল্লেখ আছে উহা আধুনিক গৌড়দেশ।

এই সুমাগধাবদানটী ভারতী পত্রিকার উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া ইহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিলাম ইতি।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস গুপ্ত।

৯৩ তম পল্লব।

(মূল সংস্কৃত হইতে অনুবাদ)

সুমাগধাবদান

শ্লাঘ্যা জয়ন্তি জিন ভক্তি বিশেষ ভাজাং
শ্রদ্ধা সুধাপ্রসর নির্ঝর শীকরাস্তে।
নিশ্চেতনোঽপ্যুচিত চেতনতা মিবৈতি
যঃ পূজ্যপূজন বিধৌ কুসুমাদিবর্গঃ ॥১॥

জিনের প্রতি বিশিষ্ট ভক্তিমান্ জনগণের শ্রদ্ধারূপ সুধানির্ঝরিণীর শ্লাঘনীয় বিন্দুগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয়। পূজ্য ব্যক্তির পূজার জন্য পুষ্প প্রভৃতির যে আয়োজন করা হয় উহা নিশ্চেতন হইলেও যেন সমুচিত চৈতন্যবানের মতই হইয়া থাকে ॥১॥

পুরাকালে শ্রাবস্তীনগরীতে বিজন জেত-কাননে সমাসীন ভগবানের নিকট সমাগত হইয়া অনাথপিণ্ডদ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। "ভগবন্! মহাগুণবতী মদীয় কন্যা সুমাগধা ভবদীয়া ভক্তির ন্যায় সর্ব্বত্রই খ্যাতিলাভ করিয়াছে। এক্ষণে পুণ্ডবর্দ্ধন নগরে শ্রীমান্ সার্থনাথের পুত্র বৃষভদত্ত তাহার পাণিগ্রহণ ইচ্ছা করিতেছেন। আপনি যদি সম্মতি দেন তাহা হইলে আমি তাঁহাকে কন্যাদান করি। আমার ধন ও প্রাণ সমস্তই আপনার অধীন। আপনার আজ্ঞাই আমার একমাত্র আশ্রয়ণীয় ॥ ২, ৩, ৪, ৫ ॥

অনাথপিণ্ডদ এই কথা বলিলে পর বৎসল ও বিমলাশয় ভগবান বলিলেন। দোষ কি? তাহাকেই কন্যাদান কর ॥৬॥

অনাথপিণ্ডদ ভগবানের আজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে সাদরে প্রণিপাত করিয়া নিজালয়ে গমন করিলেন ॥৭॥

তৎপরে তিনি প্রচুর বিভব, ভূরি রত্ন এবং উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে কন্যা দান করিলেন ॥৮॥

প্রদত্তা সুমাগধা দূরতর দেশে যাইবার সময় ভগবচ্চরণ স্মরণ করিয়া সবাষ্পনয়না হইয়াছিলেন ॥৯॥

সুমাগধা অনেকদিনে পুণ্ডবর্দ্ধন নগরে উপস্থিত হইয়া এবং পতির শুশ্রূষায় রত হইয়া পতিগৃহে বাস করিয়াছিলেন ॥১০॥

একদা তাঁহার শ্বশ্রূ ধনবতী ভোজ্যসম্ভার-কার্য্যে অসংখ্য ব্যয় করিতে উদ্যত হইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। "সুমাগধে তুমি সমস্ত পূজোপকরণ সজ্জিত কর। জগৎ-পূজ্যগুণ ভগবান্ জিন (জৈনধর্ম্মপ্রবর্ত্তক) কল্য প্রাতে আমাদের গৃহে আগমন করিবেন ॥১১, ১২ ॥

সুমাগধা শ্বশ্রূ কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্টা হইয়া কার্য্যারম্ভে তৎপরা হইয়াছিলেন। যে সকল জৈন ভিক্ষুগণ সেই পরিকল্পিত পূজার বিষয়

জানিতে পারিয়া তৎপরদিনে নগ্ন ও কেশশ্মশ্রুর উল্লুঞ্চনের জন্য অত্যন্ত ক্লেশপ্রাপ্ত অবস্থায় ঐ গৃহে আসিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে নির্লজ্জ নগ্ন ও মাসভক্ষণাভ্যাসে স্থূলকায় মহিষের ন্যায় দেখিয়া সুমাগধা অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া বস্ত্রদ্বারা বদন আচ্ছাদনপূর্ব্বক খেদ ও নির্বেদে বিনত হইয়া গুরুজনসমক্ষে শ্বশ্রূদিগকে বলিয়াছিলেন ॥১৩—১৭॥

অহো বহুকাল পরে আমি এইরূপ আচার দেখিতে পাইলাম যে দিগম্বরগণের সমক্ষে বধূজন অবস্থিতি করিতেছে। এই সকল শৃঙ্গহীন পশুগণ আপনাদের গৃহে ভোজন করিতেছে। ইহারা মনুষ্য নহে এজন্যই অঙ্গনাগণ ইহাদিগকে দেখিয়া লজ্জিত হন না। অস্থানে আপনাদের ভক্তি দেখিতেছি। এ কিরূপ উচ্ছৃঙ্খল নিয়ম। যে ব্যক্তি ভোজন ত্যাগ করিতে পারে নাই সে কিরূপে বস্ত্র ত্যাগ করে ॥১৮—২০॥

ইহাদিগের কেশ উন্মূলন কর্ম্ম দ্বারাই নির্ঘৃণতা প্রকাশিত হইয়াছে। কৌপীন বস্ত্র বর্জন দ্বারাই সংস্বভাবের আর কথাই নাই। দম্ভবশতঃ ভয়ঙ্কর ইহাদের বদনে ক্রোধ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। ইহারা নগ্ন কিন্তু ভোজনার্থী এবং নিয়মবান্ অতএব ইহারা পশুতুল্য ॥২১॥

এই সকল পশুগণ যেখানে পূজনীয় সেখানে তাড়নীয় কে হইবে জানিনা। অথবা ইহা দেশেরই দোষ। লোকসকল গতানুগতিকই হইয়া থাকে ॥২২॥

সুমাগধা এই কথা বলিলে পর তাঁহার শ্বশ্রূ বিষণ্ণ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন। "ভদ্রে! তোমার পিত্রালয়ে কিরূপ লোকের পূজা করা হইয়া থাকে তাহা বল ॥২৩॥

তিনি বলিলেন আমার পিত্রালয়ে ভগবান্ জিনের (বুদ্ধের) পূজা করা হয়। তিনি কারুণ্যবশতঃ সমস্ত জগতের কুশললাভের জন্য সতত উদ্যত থাকেন ॥২৪॥

ভগবান জিন সর্ব্বদাই ধ্যানে স্তিমিতনয়ন তিনি পূর্ণলাবণ্যের সিন্ধুস্বরূপ। তাঁহার নাসা বংশীর ন্যায় বিপুল ও সরল এবং সেতুর ন্যায়। তাঁহার বিস্তৃত কর্ণপাশ ভূষা শূন্য হইলেও রমণীয়। অধিক কি তাঁহার কান্তি দেখিয়াই বিদ্বজ্জনের হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় শান্তি উদয় হয় ॥২৫॥

তাঁহার মস্তকে একটি স্বাভাবিক মণি আছে তাহার আলোক অত্যন্ত উজ্জ্বল। তাঁহার বাহুদ্বয় করিকরসদৃশ। তাঁহার কান্তি তপ্তকাঞ্চনের ন্যায়। তাঁহার করতলে শঙ্খ, ধ্বজ ও পদ্মমালা রেখা আছে। তিনি শান্তি ও সংযমের সাম্রাজ্যের উপযুক্ত লক্ষণ ধারণ করেন ॥২৬॥

মহামুনিগণেরও অভিলাষজনক সেই মহাপুরুষের স্বভাব সর্ব্বপ্রকার অভিলাষ-বর্জ্জিত। তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সদাই আনন্দময় এবং অনুরাগবর্জ্জিত। তাঁহার অধর অত্যন্ত রক্তবর্ণ ॥২৭॥

তাঁহার মূর্ত্তি দেখিলেই গাঢ় আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা হয়। মৈত্রী তাঁহার মনে সতত শয়ন করিয়া আছেন। তাঁহার ক্ষান্তি তন্ময়তাকারিণী। তাঁহার হৃদয়বর্ত্তিনী দয়া গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে। তিনি বহুদয়িতায় আসক্ত হইয়াও সকলেরই আশা পূর্ণ করেন। তিনি অপূর্ব্ব মুনি তাঁহার মহিমা অসাধারণ। তাঁহার শান্তির মধ্যেও বৈরাগ্য রহিয়াছে ॥২৮॥

যিনি আমাদের গৃহে পূজিত হন তাঁহার উপদিষ্ট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া শীলবান্ সজ্জনগণের মন মোহাবরণ হইতে মুক্ত হয় ॥২৯॥

তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রক্ষামণিস্বরূপ। তাঁহাকে স্মরণ করিলেও রাগদ্বেষরূপ উগ্র দংষ্ট্রাদ্বয়শালী সংসারসর্প আর প্রাণীকে পীড়িত করিতে পারে না ॥৩০॥

শ্বশ্রূ শ্রোত্রের রসায়নস্বরূপ সুমাগধার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সদ্যঃ প্রমোদবশতঃ বৈশদ্যপ্রাপ্ত হইয়া হর্ষসহকারে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন ॥৩১॥

হে বরাননে! তাঁহার দর্শনের কোন উপায় আছে কি। তাঁহার পুণ্যসম্পর্কে আমরাও কি অমৃতাস্পদ হইতে পারি ॥৩২॥

শ্বশ্রূ সমাদরবুদ্ধি ও অনুনয় সহকারে এইরূপ প্রার্থনা করিলে পর ভক্তিমানিনী সুমাগধা বলিলেন যে আমি তোমাদিগকে তাঁহাকে দেখাইব ॥ ৩৩ ॥

সুমাগধা এইরূপ মহাপ্রতিজ্ঞাভার নির্ব্বাহ করিতে অভিলাষবতী হইয়া সংশয়দোলায় আরোহণ পূর্ব্বক ক্ষণকাল ধ্যানপরায়ণ হইয়াছিলেন ॥৩৪॥

তৎপরে প্রাসাদে আরোহণপূর্ব্বক ক্ষণকাল ভগবৎসেবিত দিক লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক পূজ্যপূজোপযুক্ত কুসুমাঞ্জলি নিক্ষেপ করিলেন ॥৩৫॥

তিনি পুষ্প, ধূপ ও উদক দ্বারা পূজা করিয়া ভগবানের পাদপদ্ম স্মরণপূর্ব্বক আনন্দ বাষ্পে সংরুদ্ধ নয়নদ্বয় সেইদিকে প্রেরণ করিয়া বলিয়াছিলেন ॥৩৬॥

হে ভগবন্ তোমার আশ্রমের মৃগীস্বরূপ আমি যে রত্নত্রয় (বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ) বিবর্জ্জিত হইয়া এই দূরদেশে আসিয়াছি ইহা তোমার অনুকম্পাই হইয়াছে। হে দয়ালো আমি দূরস্থ হইলেও তোমার পাদপদ্মযুগলের শরণাগত। দৃষ্টিদ্বারা আমাকে স্পর্শ কর। বাৎসল্যবান্ মহজ্জনের করুণা প্রবাসবশতঃ দূরীকৃত জনে অল্পতা প্রাপ্ত হয় না। ॥৩৭, ৩৮॥

হে ভগবন্ আপনার দাসকন্যা আমি অদ্য আপনাকে নিমন্ত্রণ করিতেছি। হে বিভো প্রাতঃকালে আগমন করিয়া আমার মান রক্ষা করিবেন ॥৩৯॥

সুমাগধা এই কথা বলিয়া বিচিত্র কুসুমাঞ্জলি সমর্পণ করিলে পর উহা সজীব ভক্তিদূতিকার ন্যায় আকাশমার্গে গমন করিতে লাগিল ॥৪০॥

শ্বেত, রক্ত, হরিত ও অসিতবর্ণ এবং ধূপধূম শোভিত ঐ সুমাগধা-প্রদত্ত পুষ্পাবলী আকাশমার্গে ধীরে ধীরে গমন করিতেছিল। উহা দেখিয়া বোধ হইয়াছিল যেন শচীপতি ইন্দ্রের ধনু বালাম্বুদ সংলগ্ন হইয়া আকাশে সঞ্চরণ করিতেছে ॥৪১॥

অতঃপর ভক্তিশালিনী ঐ পুষ্পাবলী ক্ষণকালমধ্যে জেতবনে উপস্থিত হইয়া শাস্তা অর্থাৎ ভগবানের পাদপদ্মদ্বয়ের উপর পতিত হইয়াছিল ॥৪২॥

সর্ব্বজ্ঞ ভগবানও সুমাগধার সমস্ত অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া করুণাবশতঃ পুরোবর্ত্তী আনন্দকে বলিয়াছিলেন ॥৪৩॥

কল্য প্রাতঃকালে আমাদিগকে পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে যাইতে হইবে। সুমাগধা আমার ও মদীয় সঙ্ঘগণের পূজা করিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন ॥৪৪॥

পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগর এখান হইতে শত ষষ্টি যোজনেরও অধিক। একদিনেই সেখানে যাইতে হইবে। এস্থলে বিলম্ব করা উচিত নহে। যে সকল প্রভাবশালী ভিক্ষুগণ আকাশমার্গে যাইতে পারেন তাঁহাদিগকেই তুমি নিমন্ত্রণশলাকা (১) সমর্পণ কর ॥৪৫,৪৬॥

আনন্দ এইরূপে সুগতকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ভিক্ষুগণকে নিবেদন করিয়াছিলেন যে যাঁহারা একাহমধ্যে পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে গমন করিতে পারিবেন শলাকাদ্বারা তাঁহাদিগকেই নিমন্ত্রণ করা হইতেছে ॥৪৭॥

তখন মহর্দ্ধিমান ভিক্ষুগণ শলাকা গ্রহণ করিলে পর পূর্ণকুম্ভোপধানী এক স্থবিরও উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥৪৮॥

প্রভাববান্ স্থবির শলাকাগ্রহণার্থে হস্তপ্রসারণ করিলে পর আনন্দ কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। এই দুইপদ দূরবর্ত্তী অনাথপিণ্ডদগৃহে আপনি যান না কিন্তু শতষষ্টিযোজন দিনার্দ্ধে গমন করিতেছেন ॥৪৯,৫০॥

আনন্দ এই কথা বলিলে পর স্থবির লজ্জায় অধোবদন হইয়া চিন্তা করিলেন যে নিজ দলমধ্যে ন্যূনতা প্রকাশ বড়ই দুঃসহ। অনাদিকাল সঞ্চিত ক্লেশ, জন্ম ও জরাদি সমস্তই যত্নদ্বারা বিনাশ করিতে পারা যায় কিন্তু কতদূর বা ঋদ্ধিপদ পাইয়াছি তাহা কি দেখাইতে পারিব না ॥৫১,৫২॥

এইরূপ তীব্র সংবেগযুক্ত বুদ্ধিদ্বারা চিন্তাপরায়ণ ও বিশুদ্ধচিত্ত ঐ স্থবিরের মহর্দ্ধি ক্ষণকাল মধ্যেই প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল ॥৫৩॥

অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে সমস্ত ভিক্ষুগণ নানাপ্রকার দেববেশ গ্রহণপূর্ব্বক বিমানদ্বারা আকাশমার্গে গমন করিয়াছিলেন ॥৫৫,৫৬॥

ইত্যবসরে মহারম্ভ ও উদ্যোগপূর্ণ সুমাগধার ভর্ত্তৃগৃহে শ্বশ্রূ, শ্বশুর ও ভর্ত্তৃসহ ভগবদ্দর্শনাভিলাষে প্রাসাদসমারূঢ়া হইয়া পুষ্প ও ধূপদ্বারা পূজারচনার সংগ্রহ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন ॥৫৫,৫৬॥

তৎপরে প্রথমে দিব্যর্দ্ধিসম্পন্ন ও বিবিধ আশ্চর্য্যজনক অজ্ঞাতকৌণ্ডিন্য নামক ভিক্ষু অশ্বরথে আরোহণ করিয়া আসিতেছেন দেখা গেল ॥৫৭॥

শ্বশুরাদিগণ সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী ভিক্ষুকে দেখিয়া প্রীতিসহকারে সুমাগধাকে বলিয়াছিলেন যে "ইনি কি ভগবান্"। সুমাগধা বলিলেন "ইনি ভগবান্ নহেন। ইনি সূর্য্যসম তেজস্বী ও অপ্রতিহততেজাঃ ভিক্ষু অজ্ঞাতকৌণ্ডিন্য বলিয়া বোধ হইতেছে" ॥৫৮,৫৯॥

ক্রমে ক্রমে রথ সকল আসিতে লাগিল এবং প্রত্যেকবারেই শ্বশুরাদিগণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন "ইনি কি ভগবান"। সুমাগধা বলিলেন ইনি ভগবান্ নহেন। ইঁহারা সকলেই ভগবানের শাসনাধীন ভিক্ষুগণ। ইহাঁরাও শান্তিগুণে শ্লাঘনীয় ও তপোবলে প্রদীপ্ততেজাঃ ॥৬০,৬১॥

(১) পুরাকালে ভারতে বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের এই প্রথা ছিল যে তাঁহারা নিমন্ত্রণকালে কর্পূর, চন্দন কস্তুরিকা প্রভৃতি সুগন্ধদ্রব্যদ্বারা নির্ম্মিত এক একটী শলাকা পত্রসহ পাঠাইতেন। এখনও তিব্বতে ঐরূপ শলাকার সুগন্ধ প্রাবারক দেওয়া ব্যবহার আছে।

যিনি কমনীয় হেমময় দ্রুমদ্বারা রমণীয় শৈলশৃঙ্গে অধিরূঢ় রহিয়াছেন ইনি আশ্চর্য্যকারী মূর্ত্তিমান্ প্রভাবস্বরূপ ইহাঁর নাম মহাকাশ্যপ ভিক্ষু ॥৬২॥

যিনি জলপূর্ণ মেঘের ন্যায় গভীর ঘোষকারী পঞ্চাননরথে অধিরূঢ় হইয়া আকাশমার্গে আসিতেছেন ইনি বিখ্যাত গুণবান্ ভিক্ষু শারিপুত্র ।৬৩॥

যিনি কৈলাসপর্ব্বতবৎ শুভ্র চতুর্দ্দণ্ডসমন্বিত হস্তীতে আরোহণ করিয়া আসিতেছেন ইনি মহা পুণ্যবান্ মৌদ্‌গল্যনামা ভিক্ষু ॥৬৪॥

যিনি বৈদূর্য্যময়, মৃণালমণ্ডিত ও রত্নাঙ্কুরবৎ কেশরদ্বারাশোভিত কনকপদ্মে আরোহণ করিয়া সৌরভ বিস্তার করিয়া আসিতেছেন ইনি বিখ্যাত ভিক্ষু অনিরুদ্ধ ।৬৫॥

যিনি গরুড়োপরি অধিরূঢ় হইয়া পক্ষানিল দ্বারা মেঘ সকল উৎসারিত করিতে করিতে আকাশাগ্রে অবগাহন করিতেছেন ইনি মৈত্রায়ণীপুত্র ভিক্ষু সুপূর্ণ ॥৬৬॥

যিনি নিতান্ত শান্ত অনন্তে অবস্থান করিয়া প্রভামৃতদ্বারা দিঙ্মুখ তর্পিত করিয়া আসিতেছেন ইনি সত্ত্বমহোদধি, প্রভাববান্ ভিক্ষু এয্যজিৎ ॥৬৭॥

যিনি বিলোল বল্লীবলয়মণ্ডিত বিশাল সুবর্ণময় তালে আরোহণ করিয়া আসিতেছেন ইনি পুণ্যাপূর্ণদ্যুতি, মতিমান্ ভিক্ষু উপালী ॥৬৮॥

যিনি সুবর্ণ ও রত্নে উজ্জ্বল পত্ররেখামণ্ডিত বৈদূর্য্যময় বিমানের শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া প্রভাদ্বারা বিলেপন করিতে করিতে আসিতেছেন ইনি ভিক্ষু কাত্যায়ন ॥৬৯॥

যিনি সাক্ষাৎ ধর্ম্মরূপী বৃষোপরি অধিরূঢ় হইয়া আকাশে অবগাহন করিতেছেন ইনি প্রতিষ্ঠাবান্ ও গরিষ্ঠবুদ্ধি ভিক্ষু কৌষ্ঠিল ॥৭০॥

যিনি বিমান হংসের দ্যুতিদ্বারা অন্তরীক্ষকে হাস্যতরঙ্গে উদ্ভাসিত করিয়া আসিতেছেন ইনি তপোনিধি পিলিন্দবৎস নামক ভিক্ষু ॥৭১॥

যিনি সমুৎফুল্ল লতাবনমধ্যে বিহার করিতে করিতে আসিতেছেন ইনি অক্ষুণ্ণ শোভাবান্ ও গৃহাপেক্ষাবিহীন প্রসিদ্ধ ভিক্ষু শ্রোণকোটি ॥৭২॥

যিনি হেমপ্রভাদ্বারা দিগ্বিভাগ ভূষিত করিয়া অপর সুমেরু পর্ব্বতবৎ সংলক্ষিত হইতেছেন্ ইনি ভগবানের পুত্র চক্রবর্ত্তী রাহুলক ।৭৩॥

এই সকল বিচিত্র রত্নময় আসন ও বাহনস্থিত অসংখ্য ও অদ্ভুতকর্ম্মা ভিক্ষুগণ পর্ব্বতগণ, দিগন্তর, পৃথিবীমণ্ডল ও আকাশতট হইতে আসিতেছেন ॥৭৪॥

সুমাগধা কর্ত্তৃক এইরূপ ক্রমে ক্রমে নির্দ্দিশ্যমান ভিক্ষুসঙ্ঘকে সম্মুখে অনন্যদৃষ্টিতে বিলোকন করিয়া তাঁহারা যুগপৎ হর্ষ, ও অদ্ভুত সম্ভ্রমের বশীভূত হইয়াছিলেন ॥৭৫॥

অতঃপর জগৎ যেন কাঞ্চনবর্ণবৎ উজ্জ্বলবর্ণ ও শতসূর্য্য প্রকাশজনিত আলোকে আলোকিত হইল। এবং অশেষ সন্তাপের প্রশমন হওয়ায় শীতাংশুশতমালা দ্বারা যেন জগৎ শীতল হইয়া গেল ॥ ৭৬ ॥

অনন্তর ধনপতি, ইন্দ্র ও ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ কর্ত্তৃক অনুগম্যমান ও বিপুল গগনযাত্রার অনুরূপ সেব্যমান এবং অমরপুরের পুরন্ধ্রীগণকর্ত্তৃক পুষ্পাঞ্জলি দ্বারা বিকীর্য্যমাণ ভগবান্ জিনেন্দ্র ঐ সকল পুণ্যবান্ গণের নয়নগোচর হইলেন ॥ ৭৭ ॥

ভগবান্ অষ্টাদশ মূর্ত্তিতে অষ্টাদশ দ্বার সমন্বিত ঐ নগরে যুগপৎ প্রবেশ করিয়া সুমাগধার গৃহ যেন শশিকান্ত মণির প্রভাময় করিয়াছিলেন্॥ ৭৮॥

তত্রত্য সকলেই প্রণিপাত পূর্ব্বক বহুপ্রকার পরিপূর্ণ উপচার দ্বারা ভগবানের পূজা করিয়াছিল। পুরবাসী জনগণও বহির্দেশে ভিত্তিতে প্রতিবিম্বিত ভগবানের পূজা করিয়াছিল॥ ৭৯॥

দয়ালু ভগবান্ সুমাগধার প্রতি কৃপাবশতঃ সত্ত্ব সহ পূজা গ্রহণ করিয়া অনুগ্রহালোকন দ্বারা সকলের প্রতিই প্রসাদ বিধান করিয়াছিলেন॥ ৮০॥

শ্বশুরাদি বর্গ সহিত সুমাগধা এবং অন্যান্য সমস্ত পুরবাসী জনগণ শাস্তার উপদেশ দ্বারা বিশুদ্ধাশয় হইয়া তৎক্ষণাৎ সত্যদর্শন করিয়াছিল॥ ৮১॥

ভিক্ষুগণ সুমাগধার কুশলসঙ্গত পুণ্য ও বিপুল প্রভাব বিলোকন করিয়া কৌতূহলবশতঃ ভগবান্‌কে পূর্ব্ববৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন্॥ ৮২॥

সুমাগধার পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত।

সর্ব্বদর্শী ভগবান্ সভাস্থলে ভিক্ষুগণ কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া দন্তপ্রভা দ্বারা দিঙ্মুখ আলোকিত করিয়া সুমাগধার কুশলের হেতু বলিয়াছিলেন॥ ৮৩॥

পুরাকালে বারাণসীতে কৃকি নামক রাজার কাঞ্চনমালা নামে এক কন্যা ছিল। তিনি কাশ্যপ নামক শাস্তার প্রতি সতত ভক্তিশালিনী ছিলেন। তিনি পঞ্চশত সখীগণ সহ তাঁহার পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন॥ ৮৪, ৮৫॥

একদা রাজা কৃকি বিকৃত স্বপ্ন দর্শন করিয়া ভয় ও সংশয়ে ভীত হইয়া স্বপ্নফলজ্ঞ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। দৈবজ্ঞগণ রাজসুতার প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ তাঁহাকে বলিয়াছিল যে অতি প্রিয়জনের হৃৎপিণ্ড হোম করিলে মঙ্গল হইবে॥ ৮৬, ৮৭॥

রাজা দৈবজ্ঞগণের এইরূপ ক্রূরতর বাক্যে অনাদর করিয়া কন্যার কথানুসারে ভগবান্ কাশ্যপকে দেখিতে গিয়াছিলেন। তথায় গিয়া তাঁহার নিকট বলিয়াছিলেন যে আমি অদ্য এক বিকৃত স্বপ্ন দেখিয়াছি হে সর্ব্বজ্ঞ ইহার ফল কি হইবে আপনি তাহা বলুন্॥ ৮৮, ৮৯॥

আমি দেখিয়াছি যে এক রুদ্ধপুচ্ছ গজ বাতায়ন মার্গে নির্গত হইতেছে। এবং কূপ তৃষিত জনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে। একজন মুক্তাপ্রস্থ বিক্রয় দ্বারা শক্তুপ্রস্থ লাভ করিয়া তৃপ্ত হইয়াছে। কতকগুলি কুকাষ্ঠ চন্দনের সমান করা হইয়াছে। একটী হস্তিশাবক একটী মহাগজকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছে। একটা বানর অশুচি লিপ্তাঙ্গ হইয়া অন্যলোকের দেহে লেপন করিয়া পলাইতেছে। কুৎসিত ও চপল একটা বানর স্ফীত রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছে। একটা পট অষ্টাদশ পুরুষ কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়াও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় নাই। রমণীয় পুষ্পফলশোভিত উদ্যান চৌরগণ কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইতেছে। বহুলোক বিদ্বেষ, উপহাস, ও কলহে আসক্ত হইয়াছে। এই সমস্ত অদ্ভুত স্বপ্নের ঘোরতর ফল অন্যলোক বলিয়াছে। রাজকর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া ভগবান কাশ্যপ বলিয়াছিলেন॥ ৯০-৯৫॥

শমগুণান্বিত, অমৃতসাগর, ভগবান্ জিন

শাস্তা শাক্যমুনি রূপে শতায়ুঃ জনমধ্যে জন্ম গ্রহণ করিবেন তাহাই তুমি স্বপ্নে হস্তী দর্শন করিয়াছ। তাঁহারও পশ্চিম কালে শ্রাবকগণ কলহ আশ্রয় করিয়া শীল, গুণ ও আচার ত্যাগপূর্ব্বক বিপ্লবকারী হইবে।

ইহারা স্বয়ং সেবা অবলম্বন করিয়া অংক্ত ও অল্প বিবেক সম্পন্ন গৃহস্থগণের নিকট বলপূর্ব্বক ধর্ম্মঘোষণা করিবে। যিনি প্রার্থনীয় তিনিই প্রার্থিরূপে সেবার জন্য ধাবমান হইবেন্ তাই তুমি স্বপ্নে তৃষিতের পশ্চাদ্ ধাবমান কূপ দেখিয়াছ। ইহারাই লোভান্ধ ও মোহহত হইয়া শক্তুপ্রস্থলোভে বোধ্যঙ্গরূপ মুক্তাপ্রস্থ বিক্রয় করিবে। ইহারা মূর্খতা প্রযুক্ত তীর্থবাহ্য কুদারুগুলি বুদ্ধভাষিতরূপ চন্দনের সমান বলিয়া প্রতিপাদন করিবে কোনরূপ প্রভেদ করিবে না। কোথায়ওবা বিনীত ও ভদ্র ভিক্ষুরূপ কুঞ্জরকে দেখিয়া দুঃশীল কলভরূপ ভিক্ষু স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক তাঁহাকে ধিক্কৃত করিবে। চপলতারূপ অশুচি দ্বারা লিপ্তাঙ্গ ভিক্ষুরূপ মর্কট সুশীল ভিক্ষুগণকে নিজদোষে লিপ্ত করিয়া নিজতুল্য করিবে। কপিসদৃশ ষণ্টকেরও অভিষেক হইবে। সংবুদ্ধের শাসনপদ কৃষ্যমাণ হইয়াও নষ্ট হইবে না। ভিক্ষু সঙ্ঘের দ্রব্যরূপ ফলোদ্যানে চুরি হইবে। তাহারা পরস্পর নিন্দা করিয়া কলহপরায়ণ হইবে। তোমার স্বপ্নের পরিণামে এই সকল ফল পৃথিবীতে প্রাদুর্ভূত হইবে। রাজা কৃকি শাস্তার এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন ॥ ৯৬-১০৬ ॥

অতঃপর ভগবান্ অনুচরগণ সমন্বিত রাজার ধর্ম্মদেশনা করিয়া কাঞ্চনমালার কুশলার্হতা আদেশ করিলেন ॥ ১০৭ ॥

ইনি জন্মান্তরে নারঙ্গমালা দ্বারা স্তূপে অর্চনা করিয়াছিলেন। সেই পুণ্যে হেমমালাঙ্কিতা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ॥ ১০৮॥

সেই কাঞ্চনমালাই মহাপুণ্যপ্রভাবে সুমাগধারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া অদ্য কুশলসেতুতা প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ১০৯ ॥

ভগবান্ জিন এই কথা বলিয়া ভিক্ষুগণসহ আকাশমার্গে কান্তিদ্বারা দিঙমণ্ডল পূরিত করিয়া জেতবনে গমন করিয়াছিলেন ॥১১০॥

জনগণ সৎকুলের অভ্যুদয়ের জন্য বৃথা পুত্র কামনা করে। পুত্র যদি গুণবান্ না হয় তাহা হইলে সমস্ত কুলই দূষিত হয়। এরূপ গুণবতী কন্যাও উৎপন্ন হয় যিনি নৌকার ন্যায় নিজ পুণ্যপ্রভাবে উভয় কুলকেই সংসাররূপ ভীষণ সমুদ্রে পার করিয়া থাকেন ॥ ১১১ ॥

ইতি ক্ষেমেন্দ্র কৃত বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতার সুমাগধাবদান নামক ত্রিনবতিতম পল্লব সমাপ্ত ॥

পুণ্ড্রবর্দ্ধন—অর্থাৎ গৌড়নগর বৌদ্ধযুগে সভ্যতার কিরূপ উচ্চশিখরে সমারূঢ় ছিল—এবং ভারতে নারীজাতি তখন কিরূপ সুশিক্ষিতা ও সম্মানিতা ছিলেন তাহা এই প্রবন্ধটি হইতে সুস্পষ্ট বুঝা যায়।—
ভাঃ সঃ।

জয়পুর।

(ফেলিসিঁয়া-শ্যালের ফরাসী হইতে)

২৮।২৯ জানুয়ারী ১৯০০

জয়পুরের যে একটি চিত্তবিমোহন সাঙ্গীতিক সৌন্দর্য্য আছে তাহা আমি কিরূপে অন্যের হৃদয়ঙ্গম করাইব? এই নগরীটাকে একটি রাগিণী বলিলেও হয়। এই রাগিণীর বাদী-সুরটি গোলাপী।

নগরের প্রাচীর গোলাপী। নগরের দ্বারগুলি গোলাপী। রাজপথের সমস্ত বাড়ী গুলি গোলাপী। প্রাসাদগুলি গোলাপী। দেবালয়গুলি গোলাপী। উদ্যানে গোলাপ। স্বর্ণাভ গোলাপী আলোকে সমস্ত উদ্ভাসিত।

রাস্তায় জীবন-উদ্যমের অসীম স্ফূর্ত্তি; সুশ্রী পুরুষেরা শ্মশ্রুল; ইহাদের কাপড় অতি উৎকৃষ্ট, উজ্জ্বল, প্রায়ই গোলাপী রঙের। তরুণীগণ স্মিতমুখী। সুন্দর শিশুগুলি একেবারে নগ্নকায়। রাস্তার মাঝে, হাতী, উট, জেব্রা, মহিষ, ছাগল, গাঁধা, গরু। বাড়ীর ছাদে—বানর, পায়রা, ময়ূর, টিয়া, কাক। রাস্তায় বিবাহের বরযাত্রী চলিয়াছে—আগে-আগে কোলাহলময় বাদ্যভাণ্ড, বার বৎসর বয়স্ক বরের হাসি মুখ। মহারাজার একজন ভৃত্য, শিকলে-বাঁধা একটা নেকড়েকে লইয়া রাস্তায় ফিরাইতেছে।

আমরা মহারাজার একজন মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছি। তিনি একটি গোলাপী রঙের বাড়ীতে থাকেন; বাড়ীর গায়ে বড়-বড় শাদা হাতী চিত্রিত। বৃদ্ধ মন্ত্রী দেখিতে সুশ্রী, ইহাঁর অপূর্ব্ব ধরণের বড়-বড় চোখ্। মন্ত্রী, তাঁহার ছোট ছেলেদিগকে আমাদের সম্মুখে আনিলেন। তাহারা গোলাপী রঙের কাশ্মীরী কাপড় পরিয়াছে। জাফ্রানের ও পেস্তার মেঠাই, ছোটো-ছোটো কমলালেবু, ছাড়ানো বেদানা, এই সব তিনি আমাদের হাতে দিলেন...

এখানকার সমস্ত পরিবেষ্টনটা এরূপ অপূর্ব্ব, আমাদের অভ্যস্থ কর্ম্মক্ষেত্র হইতে এতটা তফাৎ যে, বাস্তবতার ভাবটা যেন মন হইতে শীঘ্রই তিরোহিত হয়। এই সুন্দর দৃশ্য দর্শনে সর্ব্বপ্রকার ভাবনা চিন্তা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া হৃদয় অসীম আনন্দে,—এক প্রকার লঘু ধরণের অহেতুক আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে।

এই গীতি-নাট্যের সাজসজ্জার মধ্যে মানুষ যে বাধ্য হইয়া, বাস্তব-বোধে জীবনের কাজ কর্ম্ম করিয়া যাইতেছে—ইহা যেন সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় না, একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিতে হয়। জয়পুরের আশপাশ দুর্ভিক্ষে উজাড় হইয়া গিয়াছে। এই স্বর্গপুরীর দ্বার-দেশে, শত সহস্র হতভাগ্য ব্যক্তি অনাহারে মরিতেছে। জয়পুরের নিকটবর্ত্তী মাঠ ময়দানের উপর দিয়া যখন আমাদের গাড়ী চলিতেছিল, অনেকগুলা মৃতদেহ আমাদের পথের সম্মুখে পড়িয়াছিল। মৃত্যুই তাহাদিগকে ভবযন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করিয়াছে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পাণ্ডুয়া।

ছোট খাট গ্রাম হইলেও পাণ্ডুয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহা চুঁচড়া হইতে প্রায় ১৭ মাইল দূরে অবস্থিত। প্রাচীনত্বে হুগলি জেলার মধ্যে ইহা সপ্তগ্রামের অনুরূপ। কথিত আছে এক সময় ইহা জনৈক হিন্দু নৃপতির রাজধানী ছিল। ১০৪০ খ্রীষ্টাব্দে সা সোফি (Shah Sofi) নামক এক মুসলমান নরপতি উক্ত নৃপতিকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া পাণ্ডুয়া অধিকার করেন। এই পাণ্ডুয়া অধিকার সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ একটি জনশ্রুতি আছে।

একদা পুত্রের জন্মোৎসব-উপলক্ষে পাণ্ডুয়ারাজ এক ভোজের আয়োজন করেন। ঠিক সেই দিনই তাঁহার এক মুসলমান কর্ম্মচারীও আপন বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে এক প্রীতিভোজের আয়োজন করেন, এবং সেই উপলক্ষ্যে একটি গো বৎস নিহত হয়। হিন্দুদিগের অসন্তোষ উৎপাদন ভয়ে তিনি নিহত গো-বৎসের অস্থি ও মাংসাদি কোন নিভৃত স্থানে প্রোথিত করান। কিন্তু রজনীযোগে শৃগালেরা সেই সকল অস্থি মাংসাদি মৃত্তিকা হইতে প্রকাশ্য রাজপথে টানিয়া বাহির করে। পরদিন প্রত্যূষে এই ব্যাপার দেখিয়া সমুদয় হিন্দু অধিবাসী উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং রাজপুত্রকেই সকল অমঙ্গলের কারণ বিবেচনা করিয়া প্রথমে তাহাকে হত্যা করিয়া পরে মুসলমানদিগের উপর ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করে। মুসলমানেরা পাণ্ডুয়ারাজের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া নিরাশ হয়; তখন তাহারা দিল্লীতে পলায়ন করে এবং সেখানে যাইয়া সম্রাটের নিকট তাহাদের সমুদয় দুঃখ নিবেদন করে। সম্রাট সমস্ত ব্যাপার জানিয়া পাণ্ডুয়ারাজের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত যুদ্ধের পর হিন্দুরা সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হয়।

কাহারো মতে পাণ্ডুয়ারাজপুত্রের এবং উক্ত মুসলমান কর্ম্মচারীর পুত্রের জন্মোৎসব একই দিনে হয়। সেই দিনই ঐ মুসলমান কর্ম্মচারী গো-বৎস হত্যা করিয়া আপন বন্ধুবান্ধবগণের প্রীতিভোজ দিয়াছিলেন। এবং হিন্দুরা রাজপুত্রকে হত্যা করে নাই,—মুসলমান কর্ম্মচারীর পুত্রকেই হত্যা করিয়াছিল।

উক্ত যুদ্ধের প্রারম্ভে মুসলমানেরা বহুবার হিন্দুদের নিকট পরাস্ত হয়। কথিত আছে পাণ্ডুয়া সহরের সন্নিকটে অলৌকিক প্রভাব সম্পন্ন এক পবিত্র কুণ্ড ছিল। যুদ্ধকালে হিন্দুরা এই কুণ্ড হইতে জল লইয়া আহত সৈন্যদিগের গাত্রে ছিটাইয়া দিলে সেই জলস্পর্শে তাহারা তখনই আরোগ্যলাভ করিত এবং প্রবল উৎসাহে পুনরায় মুসলমান দিগকে আক্রমণ করিত। এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মুসলমানগণ এক অভিনব কৌশল অবলম্বন করিল। তাহারা জানিত হিন্দু গো-মাংস স্পর্শ করে না। একদিন তাহারা একখণ্ড গো-মাংস লইয়া হিন্দুদিগের সমক্ষেই সেই কুণ্ডের মধ্যে তাহা ফেলিয়া দেয়। অতঃপর হিন্দুরা আর সে জল ব্যবহার করিত না,—কাজেই মুসলমানেরা অতি সহজে হিন্দুদিগকে পরাস্ত করিতে পারিল। যে স্থানে এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়া-

ছিল অধিবাসীরা সেই স্থানটীকে জঙ্গ ময়দান নামে অভিহিত করে।

শুনা যায় এই যুদ্ধে পাণ্ডুয়ারাজ মহানাগ বা মণ্ডরাজের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছিলেন। পাণ্ডুয়া হইতে মণ্ড কয়েক ক্রোশ মাত্র দূরে অবস্থিত।

এই যুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ মুসলমানেরা একটী মিনার স্থাপন করেন। এই মিনারটী পাণ্ডুয়া মিনার নামে প্রথিত। বাংলা দেশের মধ্যে এইটীই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন স্তম্ভ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সমগ্র মিনারটী উচ্চতায় প্রায় ১২৫ ফুট।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ইহার জীর্ণ অংশগুলি সুসংস্কৃত হইয়াছে। গম্বুজ এবং চূড়াটুকু ছাড়িয়া দিলেও ইহা পঞ্চতল বিশিষ্ট। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ভীষণ ভূমিকম্পে পঞ্চমতল এবং গম্বুজ চূড়া প্রভৃতি ভগ্ন হইয়া যায়। এক্ষণে ইহা সম্পূর্ণরূপে পুনর্গঠিত হইয়াছে। তলদেশ হইতে গম্বুজ পর্য্যন্ত সমুদয় সোপান-শ্রেণী উত্তমরূপে মেরামত করা হইয়াছে।

মিনারটীর ঠিক পূর্ব্ব দক্ষিণে মুসলমানদিগের এক বৃহৎ মসজিদ আছে। ইহাও এযাবৎকাল জীর্ণ অবস্থায় ছিল। মিনারের সঙ্গে ইহারও কিয়দংশ মেরামত করা হয়। ইহার সর্ব্বোচ্চ চূড়া সাত আট মাইল দূর হইতে বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এই মসজিদই 'পেঁড়োর মসজিদ নামে বিখ্যাত। এই মসজিদের পূর্ব্বদিকে প্রায় ১০০ শত গজ দূরে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। সেই পুষ্করিণীর পার্শ্বে আর একটী পুরাতন মস্‌জিদ আছে। এই মস্‌জিদটি প্রায় ২০০ শত বৎসরের প্রাচীন।

পাণ্ডুয়ার মসজিদ (বর্ত্তমান অবস্থা)

এই মস্‌জিদের পূর্ব্ব পার্শ্বে মুসলমান দিগের গোরস্থান। গ্রাণ্ডট্রঙ্ক রোডের পার্শ্বেই সা সোফির সমাধি মন্দির।

পাণ্ডুয়ার পূর্ব্বদিকে আর একটি বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। এই পুষ্করিণীর নাম পির পুকুর'। ইহার চতুষ্পার্শ্বে মুসলমানদিগের গোরস্থান। কথিত আছে হিন্দুদিগের সহিত যুদ্ধের সময় যে সকল মুসলমান যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছিল এগুলি তাহাদিগেরই সমাধি মন্দির। পাণ্ডুয়ায় প্রতি বৎসর মাঘমাসে এক বৃহৎ মেলার অধিষ্ঠান হয়। মেলায় প্রায় দুই তিন সহস্র লোকের সমাগম হয়।

ম্যালেরিয়ার প্রকোপ পাণ্ডুয়ায় অত্যধিক। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ছয় মাসের মধ্যে প্রায় ১২০০ অধিবাসী এবং ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ৭০০০ হাজার অধিবাসীর মধ্যে প্রায় ৫২০০ অধিবাসী কাল-গ্রাসে পতিত হয়।

হুগলী জেলার মধ্যে পাণ্ডুয়া মুসলমান দিগের একটী কেন্দ্র স্থান। কিন্তু সমগ্র অধিবাসীর মধ্যে প্রায় চতুঃপঞ্চমাংশ হিন্দু। পাণ্ডুয়ার মুসলমানেরা আসরফ্ (Ashrof) শ্রেণীভুক্ত এবং আমেদার (Aimadars) নামে অভিহিত। যখন ইংরাজেরা প্রথম বাংলার শাসনভার গ্রহণ করিলেন সেই সময়ে প্রজাসন্তুষ্টির জন্য রাজ্য পরিচালনের অনেক ভার এ দেশবাসীর হস্তেই অর্পণ করিয়াছিলেন। রাজস্ব আদায় এবং বিচার কার্য্য প্রভৃতি মুসলমান কাজিদিগের হস্তেই ন্যস্ত থাকিত। এই সকল কাজি সাধারণত পাণ্ডুয়ার আমেদারগণের মধ্য হইতেই নির্ব্বাচিত হইত। প্রধান কাজির পদ পাণ্ডুয়ার এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবার বংশপরম্পরায় ভোগ করিয়া আসিতেন। সেই বংশের শেষ কাজির নাম—কাজি মহম্মদ মজ্‌হর।

এক্ষণে পাণ্ডুয়ার সে পূর্ব্ব গৌরব না থাকিলেও ইহা অন্যান্য অনেক পল্লী অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। এখানে একটী থানা এবং মিউনিসিপালিটী আছে। রেলওয়ে ষ্টেসন আছে। এবং সম্প্রতি একটী ইংরাজি বিদ্যালয়ও স্থাপিত হইয়াছে।

পাণ্ডুয়ার নিকটে অনেকগুলি ছোট ছোট গ্রাম।

মণ্ড—পাণ্ডুয়া হইতে চারি মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। ইহাও পূর্ব্বে এক হিন্দু নৃপতির রাজধানী ছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি পাণ্ডুয়ারাজের সহিত মুসলমানদিগের যুদ্ধের সময় ইনি তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। এখানকার প্রসিদ্ধ 'জীবৎ কুণ্ড' এখনও বর্ত্তমান এবং অধিবাসিগণ প্রাচীন জনশ্রুতির উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ইহাকে এখনও অন্তরের সহিত ভক্তি করিয়া থাকে। এখানে একটী শিবমন্দির আছে। এই শিব জাগ্রত দেবতা বলিয়াই কিম্বদন্তী। শিবরাত্রি উপলক্ষে সেখানে বৃহৎ মেলার অধিবেশন হয়।

দ্বারবাসিনী—মণ্ড বা মহানাথ হইতে দুই ক্রোশ পূর্ব্ব-দক্ষিণে অবস্থিত। এই গ্রাম সম্বন্ধেও পূর্ব্বোক্তরূপ একটী গল্প প্রচলিত আছে। দ্বারবাসিনী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয় এ বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন আমরা এখানে তাহা অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"মুসলমানেরা যখন বাংলা দেশ আক্রমণ করেন সেই সময়ে সদ্‌গোপ জাতীয় কৃতিপয়

হিন্দুনৃপতি দ্বারবাসিনীর অধিপতি ছিলেন। এই বংশীয় শেষ নৃপতি দ্বারপাল যখন রাজত্ব করিতেছিলেন সেই সময়ে মাহম্মদ আলি তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন। প্রথম যুদ্ধে হিন্দুরা জয়লাভ করে। কথিত আছে রাজবাটীর সন্নিকটেই যে পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায় পূর্ব্বে ইহাকে 'জীবৎ কুণ্ড' বলিত। এই পুষ্করিণীতে অবগাহন করিলে শরীরের সমুদয় ক্ষত এবং আহত স্থান তৎক্ষণাৎ আরোগ্য লাভ করিত এবং আহত ব্যক্তি দ্বিগুণ বল লাভ করিয়া পূর্ণ উৎসাহে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইত। একদিন সা জোকি নামক একটী মুসলমান স্নান করিবার কালে একখণ্ড গো মাংস গোপনে সেই কুণ্ড মধ্যে রাখিয়া আসে। গো মাংস স্পর্শে কুণ্ডর জল অপবিত্র হইয়া যায় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার পূর্ব্ব শক্তিও নষ্ট হয়। ইহার পর হইতে হিন্দুরা সে কুণ্ডে অবগাহন করিয়াও কোন সুফল লাভ করিত না। কাজেই দ্বিতীয় যুদ্ধে দ্বারপাল সম্পূর্ণ পরাজিত হন এবং রাজপ্রাসাদের মধ্যেই সপরিবারে চিতানলে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষকে এখানকার অধিবাসীরা 'ধনপতি' বলিয়া পরিচয় দেয়।"

'জীবৎ কুণ্ড' পুষ্করিণীর এক্ষণে আর সে শ্রী নাই। জলও তেমন গভীর নহে; ক্রমশই তাহা শুকাইয়া যাইতেছে। এই পুষ্করিণীর দক্ষিণে আর একটী বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। এই পুষ্করিণীটির নাম 'কামনা'। লোকের বিশ্বাস এই পুষ্করিণীতে কামনাস্নান করিলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। 'জীবৎ কুণ্ড'র পূর্ব্বপার্শ্বে সা জোকির কবর ভূমি। পূর্ব্বোক্ত কয়েকটী পুষ্করিণী ব্যতীত এখানে আরও কয়েকটী প্রসিদ্ধ পুষ্করিণী আছে, যথা—চন্দ্রকূপ,—পাপহরণ,—সাত সতীন * ইত্যাদি।

জনশ্রুতি আছে অনেক সময়ে মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে এখানে বিস্তর ধনরত্ন এবং অনেক সময়ে প্রস্তরের বহু ভগ্ন প্রতিমূর্ত্তিও পাওয়া গিয়াছে। প্রস্তর মূর্ত্তি এখনও পাওয়া যায়। দ্বারবাসিনীর অনেক স্থান এক্ষণে উত্তর পাড়ার জমিদার রাজা প্যারি মোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক অধিকৃত। প্রাচীন নীলকুঠীর ধ্বংসাবশেষগুলি দেখিলে স্বর্গীয় দীনবন্ধুর নীলদর্পণের কথা সহজেই মনে জাগিয়া উঠে।

পাণ্ডুয়ার ন্যায় দ্বারবাসিনীতেও ম্যালেরিয়ার যথেষ্ট প্রকোপ আছে।

বৈঁচী পাণ্ডুয়ার অতি সন্নিকটে আর একটী ছোট গ্রাম। গ্রাম্য জমিদারের মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা স্ত্রী জীবনসত্ব ভোগ করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে ইহা গভর্ণমেণ্টের হাতে আসিয়াছে। দাতব্য কার্য্যের সহায়তা কল্পে গভর্ণমেণ্ট এক্ষণে বৈঁচীগ্রাম ট্রষ্ট সম্পত্তিরূপে রক্ষা করিতেছেন।

বৈঁচীতে একটি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ আছে। তাহার গাত্র-ফলক হইতে জানা যায় এই মন্দির ১৬০৪ শকাব্দীতে ইংরাজী ১৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে! সে আজ,

* দ্বারপালের সপ্ত স্ত্রীর নাম অনুসারে যে সাতটী পুষ্করিণী খনিত হইয়াছিল তাহাই সাত সতীন, নামে প্রসিদ্ধ।

কতযুগের কথা! কিন্তু কালের প্রভাবে তাহার শেষ চিহ্ন এখনো অন্তর্হিত হয় নাই --ইহা অল্প আনন্দ ও গৌরবের কথা নহে!—

শ্রীগুরুদাস আদক।

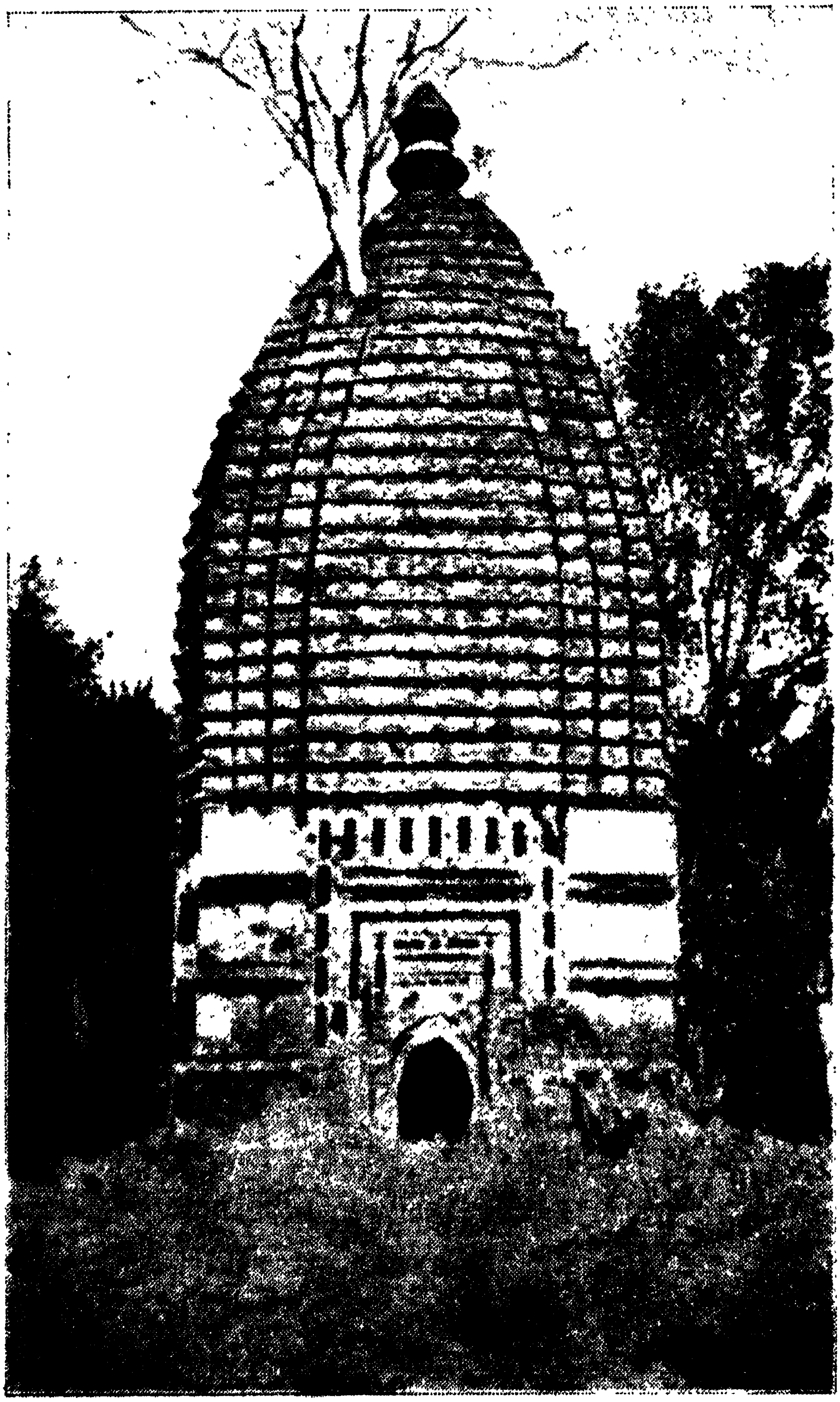

বৈঁচির মন্দির

তৈমুর-লঙ্গ।

(মামুদী হইতে)

তৎক্ষণাৎ তাতার সৈন্যের ব্যূহ রচিত হইল। তৈমুর তাঁহার স্বল্প সৈন্য লইয়া অসংখ্য শত্রুসেনার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু এরূপ যুদ্ধে জয়লাভের সম্ভাবনা অল্প জানিয়া তৈমুর এক কৌশল অবলম্বন করিলেন তাঁহার পশ্চাতে তিনি এক সঙ্কীর্ণ গিরিপথ রাখিলেন এবং তাহার প্রবেশপথে কতকগুলি সুদক্ষ তাতার সৈনিক রাখিয়া দিলেন। হিন্দুগণ আক্রমণ করিবামাত্র ভয়ের ভাণ করিয়া তাহারা পশ্চাতে পলায়ন আরম্ভ করিল। দ্রুতগামী অশ্বের সাহায্যে তৈমুরের অশ্বারোহী সৈন্য নিমেষমধ্যে অদৃশ্য হইয়া নিকটস্থ এক পর্ব্বতের অন্তরালে লুক্কায়িত হইয়া রহিল। হিন্দুরা প্রবল বেগে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল, এবং দ্বারপথে তাতারদিগকে পরাজিত করিয়া সেই সঙ্কীর্ণ গিরিপথ অতিক্রম করিল। বিরাট হিন্দুবাহিনীর প্রায় অর্দ্ধভাগ গিরিপথের পরপারে উপস্থিত হইবামাত্র পলাতক শত্রুগণ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বিদ্যুদ্বেগে হিন্দুদিগের উপর পড়িল। এই অপ্রত্যাশিত আক্রমণেই হিন্দুরা পরাজিত হইল। বিজয়ী তৈমুর সমগ্র হিন্দুস্থানের অধীশ্বর হইলেন। রাণা নিরুপায় দেখিয়া বিজয়ী বীরের সহিত সন্ধিস্থাপনে বাধ্য হইলেন। স্বাধীন হিন্দুনরপতি তৈমুরকে বাৎসরিক কর দান করিতে অঙ্গীকৃত হইলেন। হিন্দুস্থানের প্রধান প্রধান দুর্গে তৎকর্ত্তৃক শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইল। দিল্লী তখন পাঠানরাজের রাজধানী। তৈমুর তাঁহাকেও অব্যাহতি দিলেন না। সেখানেও এক তাতার শাসনকর্ত্তা প্রতিষ্ঠিত হইল। এই পরাজয়ের দিন হইতে হিন্দুরাজারা যুদ্ধক্ষেত্রে আর বার কখনও শত্রুর পশ্চাদ্ধাবিত হন নাই, শত্রু আক্রমণ করিলে তাঁহারা প্রাণপণে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেন মাত্র। যাহা হউক বিজয়ী তৈমুর ভারতের অমূল্য ধনসম্পদ হরণ করিয়া অতুল গৌরবে সমরকন্দে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কিন্তু এত শক্তিসম্পদ লাভ করিয়াও বৃদ্ধ তৈমুর সন্তোষলাভ করিতে পারিলেন না। উচ্চ আকাঙ্ক্ষার তাড়নে তিনি তখনও নূতন শক্তিবিস্তারে লোলুপ। যে বয়সে সাধারণ মনুষ্যের দেহমন অবসন্ন হইয়া আসে, সেই বয়সে তৈমুর যৌবনতেজে নূতন জয়-যাত্রায় সমরকন্দ ত্যাগ করিলেন। সুলতান বেন-এভিসের উপরই তাঁহার প্রথম রোষদৃষ্টি পড়িল। ইঁহাকে তৈমুর পূর্ব্বে পরাজিত করিয়া বগ্‌দাদ্ হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছিলেন, কিন্তু মিশরসুলতানের সাহায্যে তিনি পুনরায় স্বকীয় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। অধিকন্তু তিনি তৈমুরের পুত্র মিরজার রাজ্যভুক্ত পারস্য ইরাই দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তৈমুর তাঁহাকে উপযুক্ত শিক্ষা দান করিবার জন্য সর্ব্বপ্রথম অগ্রসর হইলেন। সুলতান বেন-এভিস পারস্য হইতে বহিষ্কৃত হইয়া নাটোলিয়া দেশে বাজায়েৎ নৃপতির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তৈমুর ডামস্কাস্ অধিকার করিয়া বগ্‌দাদ্ লুণ্ঠন করিলেন। তাঁহার নামে লোকে এত ভয় পাইল যে তিনি যেখানে উপস্থিত হইতে লাগিলেন অমনি সেখানকার লোকেরা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে লাগিল। যে মিশরসুলতান প্রথমে বেন-এভিসকে সাহায্য করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনিই তৈমুরের ইচ্ছানুবর্ত্তী হইলেন এবং তৈমুরের মঙ্গলের জন্য তাঁহার রাজ্যের প্রত্যেক মসজিদে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবার আদেশ প্রচার করিলেন।

একমাত্র কেবল বাজায়েৎ আজিও দুরন্ত তাতারের দুর্দ্ধর্ষ শক্তির পরিচয় পান নাই, এবং সেইজন্য তিনি তাঁহাকে বড় একটা গ্রাহ্যের মধ্যেও আনিতেন না। কেবল তাহাই নহে, বাজায়েৎ তৈমুরের দুইজন মিত্ররাজার প্রতিও অত্যাচার করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। বাজায়েৎও তৈমুর অপেক্ষা অল্প যশস্বী ছিলেন না। হাঙ্গেরির রাজা ও ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ বীরগণকে বুলগেরিয়াতে পরাজিত করিয়া তিনি

কনষ্টাণ্টিনোপল্ আক্রমণ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বেই তিনি সম্রাট ইমানুয়েলের নিকট হইতে উক্ত নগরের প্রান্তবর্ত্তী স্থান সমূহ লইয়া মুসলমানের অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন এবং তথায় মসজিদ ও মুসলমান বিচারালয় স্থাপিত করিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি রুমের সুলতান অর্থাৎ গ্রীক ও রোমান সাম্রাজ্যের অধিপতি এই উপাধি গ্রহণ করিয়া মিশরের সুলতানকে তাহা স্বীকার করিতে পর্য্যন্ত বাধ্য করিয়াছিলেন। এই সকল কারণে তিনি তৈমুরের চক্ষুশূল হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাতারবীর আসিয়া-মধ্যে তাঁহার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর উচ্ছেদ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সেইজন্য তিনি খৃষ্টান রাজা ইমানুয়েলের পক্ষ লইয়া মুসলমান বাজায়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

সমগ্র তাতার সৈন্য বাজায়েতের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্রবেগে যুদ্ধযাত্রা করিল। সকলেই প্রচুর লুণ্ঠনের আশায় উৎফুল্ল, কেবল তৈমুর নীরবে চিন্তান্বিত পদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অনেকে মনে করিল বার্দ্ধক্যের অবসাদ হেতু তিনি এরূপ বিষণ্ণ; আবার অনেকে মনে করিল বাজায়েতের ন্যায় বিজয়ী বীরের সহিত যুদ্ধে জয়লাভের আশা অল্প বলিয়াই তিনি এরূপ বিমর্ষ হইয়া আছেন। যোদ্ধৃপরিবেষ্টিত তৈমুরকে এক সেনাপতি সাহস করিয়া তাঁহার এ বিমর্ষতার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—"আমার চিন্তার যাহা কারণ তাহা দূর করা তোমাদের পক্ষে অসম্ভব,—আমি ভাবিতেছি আমার অনুচরগণের মধ্যে আমাদের নববিজিত সাম্রাজ্যের শাসনভার বহনক্ষম বাজায়েতের শূন্য সিংহাসনের উপযুক্ত কোন লোক আছে কি না।" এই আশাপূর্ণ উত্তরে তাতারগণের হৃদয়ে আবার সাহস আসিয়া দেখা দিল। তৈমুর প্রথমে কতকগুলি দূরবর্ত্তী নগর অধিকার করিয়া রাখিলেন, নচেৎ পরাজয় হইলে সসৈন্যে তাঁহার শত্রুমধ্যে আশ্রয়লাভ সম্ভব হইবে না। পম্পি (Pompy) যে রণক্ষেত্রে মাইথিডেটিসকে (Mithridates) পরাজিত করিয়াছিলেন, এই উভয় বীরের বিরাটবাহিনী সেই পুণ্যক্ষেত্রে মিলিত হইল।

তাতারেরা ধনুর্বিদ্যায় যেরূপ পারদর্শী, মুসলমানেরাও খড়্গ চালনায় সেইরূপ সুনিপুণ জানিয়া তৈমুর দূর হইতে যুদ্ধ করাই স্থির করিলেন, কারণ তাহাতেই তিনি শত্রু বিনাশ করিতে পারিবেন, এবং তাঁহার নিজের সৈন্য নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। তদনুসারে তিনি তাতারগণকে বলিয়া দিলেন তাহারা যেন তীরের সাহায্যে শত্রুকে নষ্ট করিতে পারে এরূপ দূরে অবস্থিত হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করে, এবং শরনিক্ষেপের পরমমুহূর্ত্তেই যেন তাহারা পলায়ন করে এবং পুনশ্চ শরযোজনা সম্পন্ন হইলে যেন ফিরিয়া শত্রুকে আক্রমণ করে। ফলে তাতারের প্রথম আক্রমণই অতি ভীষণ ও প্রবল হইয়া দাঁড়াইল। শরজালে আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল এবং মুহূর্ত্তমধ্যে রণক্ষেত্র মৃতদেহে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মুসলমানেরাও উন্মত্ততেজে মুক্ত অসি লইয়া তাতারগণের পশ্চাদ্ধাবন করিল, যে কোন দল তাহাদের প্রচণ্ড আক্রমণের সম্মুখে পড়িল তাহাই তৎক্ষণাৎ ছিন্ন ভিন্ন ও পরাস্ত হইতে লাগিল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার বিজয়ী সৈন্যের প্রতি শরবৃষ্টি হইবা মাত্র, তাতারেরা পুনরায় তাহাদের ত্যক্তভূমি অধিকার করিতে লাগিল। উভয় পক্ষের দুই অসাধারণ অধিনায়ক অপূর্ব্ব কৌশলে সৈন্যপরিচালনা করিতে লাগিলেন।

বহুক্ষণ ধরিয়া উভয় পক্ষেরই জয় পরাজয় অনিশ্চিত রহিল, অবশেষে বিজয়লক্ষ্মী তৈমুরের প্রতিই প্রসন্না হইলেন। বাজায়েতের সৈন্যমধ্যে কতকগুলি তাতার সৈনিক ছিল। তাহারা তাহাদের স্বদেশীয় বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে বিশেষ অসন্তোষ বোধ করিতেছিল। এক্ষণে তাহাদের স্বজাতির সর্ব্বপ্রধান বীরের এরূপ পরাজয়ে গৌরবহানির ভয়ে তাহারা বাজায়েৎকে পরিত্যাগ করিয়া তৈমুরের পক্ষ লইল। জয়লাভের পক্ষে আর কোন দ্বিধা রহিল না; মুসলমান বাহিনী বহুধা বিচ্ছিন্ন ও বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। এই সুযোগে তাতার অশ্বারোহীরা পলাতক

মুসলমানদিগকে খড়্গাঘাতে বিধ্বস্ত করিতে লাগিল। তৈমুরের যোদ্ধারা পরাজিত শত্রুর বহুদূর অনুসরণ করিয়া চলিল। বাজায়েৎ ক্ষিপ্রগতি তাতার অশ্বারোহীর আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইলেন না কিছুদূর যাইয়াই তিনি বন্দী হইলেন। এই বিপদের মধ্যে পড়িয়া বাজায়েৎ তাতারবীরের দয়া ও মনুষ্যত্বের প্রথম পরিচয় লাভ করিলেন। বিজিত শত্রুর দুরবস্থা দেখিয়া তৈমুর কোনদিন হর্ষ প্রকাশ করেন নাই। প্রতিদিন তৈমুরের শিবিরের ঠিক পার্শ্বেই বেজায়েতের জন্য এক শিবির স্থাপিত হইত, তথায় উভয়ে একত্রে আহার ও আলাপ করিতেন। বাজায়েতের সহিত তৈমুর অতিশয় সম্মানের সহিতই ব্যবহার করিতেন এবং তাঁহার মনস্তুষ্টির যথাসম্ভব আয়োজনের ত্রুটি করিতেন না। শুনা যায় প্রথমে তৈমুর নাকি বাজায়েৎকে লৌহ পিঞ্জরে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন; কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য কোনও ঐতিহাসিক গ্রন্থে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ গ্রীকগণ তাঁহার দুর্দ্দশার চিত্র অতিরঞ্জিত করিবার উদ্দেশ্যেই এই কথার সৃষ্টি করিয়াছেন।

মুসলমান ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় ধিক্কার বশতঃই হউক, বা বিজয়ী শত্রুর নিকট অপমানিত হইবার আশঙ্কাতেই হউক, বাজায়েৎ বিষপান করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই তৈমুরেরও মৃত্যু হয়। এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য ইতিহাসের বিবরণ মুসলমান ইতিহাসের বিবরণ হইতে স্বতন্ত্র। কোন্‌টা ঠিক স্থির করিয়া বলা কঠিন। মুসলমানেরা বলেন তৈমুর চীনরাজ্য আক্রমণ কালে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন এ কথা সত্য নহে। আসমুদ্র ভারতবর্ষ অধিকার করিবার উদ্দেশে তিনি যখন ভারতে প্রবেশের আয়োজন করিতেছিলেন, সেই সময়ে কাবুলে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়।

মুসলমান ইতিহাসে লিখিত আছে তাতারগণের মধ্যে দুই সৈন্যদলের মধ্যে যে ভীষণ প্রাণান্তকর যুদ্ধক্রীড়া প্রচলিত ছিল, তৈমুর তাহা বন্ধ করিবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিতেন, এমন কি এই অপরাধের জন্য তিনি প্রাণদণ্ড আজ্ঞা করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। এরূপ করিবার যথেষ্ট কারণও ছিল; এই যুদ্ধ ক্রীড়ার তাঁহার যে সৈন্যক্ষয় হইত রোগে বা শত্রুর সহিত সংগ্রামে তাঁহার সেরূপ সৈন্যক্ষয় হইত না। এই নিষেধ সত্ত্বেও তাঁহার তৃতীয় পুত্র মিরজা তাঁহার পিতা ও সেনাপতির আজ্ঞা উপেক্ষা করিয়া একদল তাতার সৈন্য লইয়া অপর একদল সৈন্যের সহিত এরূপ ভীষণ যুদ্ধে নিযুক্ত হন, যে উভয় পক্ষেই মুষ্টিমেয় সৈনিক মাত্র জীবিত ছিল। এই অবাধ্যতায় তৈমুর ক্রোধান্বিত হইয়া দুই দুইবার তিনি তাঁহার পুত্রের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দেন, অবশেষে অনুতপ্ত হইয়া দুইবারই তাহা রহিত করেন। শাসন কর্ত্তার কর্ত্তব্যবোধ ও সন্তানস্নেহ এই উভয় প্রবল ভাবের তাড়নাতে তাঁহাকে পীড়িত করিয়া তুলে। বার্দ্ধক্য, মনস্তাপ, উদ্বেগ, ও দেশের উত্তাপে তাঁহার রোগ কঠিন আকার ধারণ করে। মোগল ইতিহাসের মতে তৈমুর ছয় বৎসর নয় মাস বাইশ দিন রাজত্ব করিয়া, হিজরা ৮০৬ সালের অর্থাৎ ১৪০৫ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। তাঁহার মৃতদেহ কাবুলেই সমাধিস্থ হইয়াছিল বলিয়া লিখিত আছে।

(সমাপ্ত)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

বন্দী।

৪০

মেরি! গোলাপের মত রঙ, আঙুরের মত তার ঠোঁট-দুটি—সুন্দরী মেরি!

কালো পোষাকটিতে কি সুন্দর তাহাকে মানাইয়াছিল! আমি তাহাকে বুকে তুলিয়া লইলাম,—তার গালে কপালে অজস্র চুমা দিলাম!

তার মা-ও কেন আসিল না? তার অসুখ!

আমার পানে কি বিস্ময়ের সহিত সে চাহিয়াছিল! চোখে একটা কেমন যেন ভাব! যেন একটা কাতরতার লক্ষণ! মাঝে মাঝে সে শুধু ঘরের কোণে তার ধাত্রীর পানে চাহিতেছিল—ধাত্রী কাঁদিতেছিল।

মেরির গালে চুমা দিয়া তাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া রুদ্ধস্বরে আমি ডাকিলাম,—"মেরি, মেরি আমার!"

মেরি আমাকে মৃদুভাবে ঠেলিয়া মুখ সরাইয়া লইল! কহিল, "আঃ—ছাড়ুন আপনি আমাকে!"

'আপনি!' প্রায় এক বৎসর পরে সাক্ষাৎ! এই এক বৎসরে সে আমাকে ভুলিয়া গিয়াছে! আমার কথা, আমার মুখ, আমার আদর আজ মনের মধ্যে কোথায় সব মিলাইয়া গিয়াছে! তারই বা অপরাধ কি?

আমার এই দীর্ঘ শ্মশ্রু, মস্তকে জটার মত কেশের ভার, শীর্ণ পাণ্ডুর মুখ, কয়েদীর পোষাক, রুদ্ধ ভগ্ন কণ্ঠস্বর—কি করিয়া সে চিনিতে পারিবে?

একমাত্র যে আমাকে মনে রাখিবে বলিয়া হৃদয়ে সান্ত্বনা ও সুখ ভোগ করিতেছিলাম আজ সে,—সে-ই আমাকে ভুলিয়া বসিয়াছে—চিনিতেও পারে না! হা ভগবান!

আজ আমি তার 'বাবা' নহি! নিজের কন্যার মুখে পিতৃসম্বোধন, কচি ফুলের পাপড়ির মত তার হাসিমাখা মুখে সেই মধুর সম্বোধন, "বাবা"! হায়, আজ আমি তাহা হইতেও বঞ্চিত! কি এ দারুণ অভিশাপ!

এ সময়, জীবনের এই শেষ মুহূর্ত্তে, একবার; শুধু একবার ঐ একটি সম্বোধনের পরিবর্ত্তে আমার কন্যার মুখের ঐ একটি আহ্বান মুহূর্ত্তের জন্য শুনিতে পারিলে, চল্লিশ বৎসরের এই সুদীর্ঘ জীবন আমি হাস্যমুখে দান করিতে পারিতাম!

"মেরি"—তার দুটি হাত মুঠার মধ্যে পুরিয়া আমি ডাকিলাম, "মেরি, মা আমার—আমাকে চিনতে পাচ্ছ না?"

সে তার উজ্জ্বল দীপ্ত চক্ষু আমার পানে ফিরাইয়া, ভৎর্সনার স্বরে কহিল, "না!"

আমি কহিলাম, "দেখ, ভাল করে চেয়ে দেখ—কে আমি?"

সে কহিল, "আপনি—আপনি একজন ভদ্রলোক!" কি অম্লান তার কণ্ঠস্বর!

হায়—জগতের যে একটি প্রাণীর প্রতি সমস্ত হৃদয় ঢালিয়া দিয়াছি, যার একটা কথা, একটু হাসির জন্য সর্ব্বস্ব বিকাইয়া দিতে পারি, তার মুখে আজ এই কথা, তার চক্ষুতে আজ এই দৃষ্টি! কি বিড়ম্বিত এ জীবন!

আমি কহিলাম, "মেরি,—তোমার বাবা আছে?"

সে কহিল, "আছেন!"

আমি কহিলাম, "কোথায় সে?"

মেরি আমার পানে চাহিয়া বলিল, "তিনি বলুন!"

হা রে কন্যা আমার! হা রে দীর্ণ পিতৃ-হৃদয়ের ব্যাকুলতা। আমি কহিলাম, "কোথায় তিনি?"

মেরির চক্ষে নিমেষে একটা ম্লানিমা লক্ষ্য করিলাম—মেরি কহিল, "তিনি স্বর্গে!"

আমি কহিলাম, "স্বর্গে? মেরি, জানো, এ স্বর্গ কোথায়? এ স্বর্গের মানে কি?"

মেরির চোখ ছলছল করিয়া আসিল। সে শুধু ঘাড় নাড়িল! আমি মেরির মুখে চুমা দিলাম।

আমি কহিলাম, "মেরি একবার ভগবানকে ডাক!"

সে কহিল, "না মশায়,—দিনে দুপুরে বিনা কাজে তাঁকে ডাকতে নেই—সকালে সন্ধ্যায় তাঁকে ডাকতে হয়! সন্ধ্যাবেলা তাঁর কাছে আমি প্রার্থনা করব!"

আমার সারা চিত্ত অস্থির হইয়া উঠিতেছিল! এ কন্যা—এই মেরি—আমারি, আমারি সে বুকের ধন—হায়, তবু সে আমার নয়—আমি আজ কত দূরে চলিয়া গিয়াছি! না, না, যেমন করিয়া পারি, তাকে বুঝাইব, আমি—তার সেই "বাবা!" স্বর্গে নয়, নরকে নয়, মর্ত্ত্যে—এই জেলের মধ্যে ফাঁসির জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়া রহিয়াছি!

আমি কহিলাম, "মেরি, তুমি চিনতে পাচ্ছনা, আমিই তোমার বাবা।"

ভর্ৎসনার স্বরে সে কহিল, "মশায়—"

আমি কহিলাম, "কেন মাণিক, আমাকে চিনতে পাচ্ছনা! দেখ, চেয়ে, দেখ,—সেই তোমাদের গোলাপগাছগুলার ধারে চাতালে বসে তোমাকে গল্প বলতুম—কত পরীর গল্প, রাজার গল্প—"

মেরির ছোট মুখখানি আমি বুকে চাপিয়া ধরিলাম!

মেরি কহিল, "আঃ, ছাড়ুন, লাগে!"

তখন তাহাকে আমার হাঁটুর উপর বসাইয়া আমি বলিলাম, "তুমি পড়তে জানো?"

"জানি!"

আমি একখানা খবরের কাগজ টানিয়া একটা জায়গা তা'র সম্মুখে ধরিলাম, সে পড়িতে লাগিল, "প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসামী—"

হঠাৎ সবলে আমি কাগজখানা টানিয়া লইলাম—কাগজখানা তার ধাত্রী কিনিয়াছিল—কাগজওয়ালারা খুব বড় বড় অক্ষরে আমার নামের জয়ধ্বজা তুলিয়া দিয়াছে। ফাঁসির তামাসা দেখিবার জন্য লক্ষ দর্শককে সমারোহের সহিত বিজ্ঞাপন দিয়াছে!

আমার মনের ভাব অক্ষরে বুঝাইবার নয়! আমার সে রুক্ষ শুষ্ক মূর্ত্তি দেখিয়া মেরি ভয়ে কাঁদিয়া উঠিল! সে বলিল, "দাও, আমার কাগজ দাও! আমি জাহাজ করব!"

ধাত্রীর হাতে কাগজ দিয়া আমি কহিলাম, "একে নিয়ে যাও—আর বাড়ীতে বলো—" মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল! কি বলিব—জানি না! তার পর জানালার ধারে চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম—চক্ষু মুদিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিলাম—মাথার মধ্যে সোঁ সোঁ করিয়া রক্তের স্রোত ছুটিয়াছে!

কোথায় তারা—যমালয়ের দুরন্ত দূতগুলা! আসুক তারা—আর কি! জগতে আমার কেহ নাই, কিছু নাই, জীবনে আমার স্পৃহা নাই! যে শৃঙ্খলটি দ্বারা ইহলোকের সহিত বদ্ধ ছিলাম—আজ সে শৃঙ্খলও ছিন্ন হইয়াছে—তবে আর কেন,—আর কেন—?

৪১

আচার্য্যের হৃদয়ে করুণা আছে, কারাধ্যক্ষের প্রাণটাও পাষাণে গঠিত নয়! ধাত্রী যখন মেরিকে লইয়া গেল, তখন তাদেরও চোখে জল আসিয়াছিল!

শেষ! এখন সব শেষ! শুধু সাহস, বল,—মৃত্যু! পথে বিপুল জনতা, ফাঁসিকাঠের

নিকট অগ্রসর হওয়া—তার পর, কোথায় জগৎ, কোথায়ই বা আমি!

৪২

কেহ হাসিবে, কেহ আনন্দে করতালি দিবে, কেহ বা চীৎকার করিবে! অথচ ইহাদেরি মধ্যে কত লোক—অদূর ভবিষ্যতে আমারি পথের পথিক হইবে! আমার জন্য আজ যাহারা তামাসা দেখিতে আসিয়া দল বাড়াইয়াছে, একদিন আবার তাহাদেরি মধ্যে কত লোক, নিজেদের প্রয়োজনেই এখানে আসিবে!

৪৩

মেরি! মাণিক আমার! ধাত্রী তাহাকে লইয়া গিয়াছে! গাড়ীর জানালার মধ্য দিয়া সে এই বিপুল জনতা নিশ্চয় লক্ষ্য করিবে, ভাবিবে, দেশে আজ কি এক প্রকাণ্ড তামাসার আয়োজন হইয়াছে! কিন্তু এই "ভদ্রলোকটির" কথা তার তখন মনেও থাকিবে না—অথচ এই 'ভদ্রলোক'কে দেখিবার জন্যই আজ এত লোক আসিয়াছে এবং সেই ভদ্রলোক আর কেহই নহে, তারই স্বর্গগত "বাবা!"

তার জন্য কয় ছত্র লিখিয়া যাই—একদিন সে পড়িয়া বুঝিবে! এবং পনেরো বৎসর পরে সে আজিকার দিনের এই মুহূর্ত্তটির কথা ভাবিয়া কাঁদিয়া সারা হইয়া যাইবে!

হাঁ! আমার সমস্ত কাহিনী আমি তাহার জন্য লিখিয়া যাইতে চাহি! সমস্ত কথা অকপটে বলিয়া যাইব—আমার সমগ্র ইতিহাস—কেন আজ দেশের বুকে রক্তের অক্ষরে আমার নাম চিরকালের জন্য লিখিত রহিল! সেই কাহিনী টুকু এই কয় মুহূর্ত্তের মধ্যে লিখিয়া ফেলি!

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

মেন্তু।

১

"ভুবনে অতুল তুমি!—একি অপরূপ!
কোথা পেলে কুহকিনি! এ মোহন রূপ?
ধরারে করে গো ধন্যা! তোমার ও রূপ-বন্যা,
শোকহরা ঊষার আলোক;
তোমার চরণ-স্পর্শে, মুঞ্জরি উঠে গো হর্ষে
অরি-তরু, অরুণ অশোক!
আমি গো বকুলতরু, কাঁপিতেছি দুরু দুরু
তোমার ও মুখখানি চুমে;—
অধরে কি করে বাস, বারমাস মধুমাস?
ছেয়ে দিলে কুসুমে কুসুমে!"—
এই চারু সম্বোধনে, সে রূপসী নারী-ধনে
তুষিতেছিলাম সঙ্গোপনে;
হেনকালে শর গর, রোষে তনু থর থর,
স্ত্রী আমার, গজেন্দ্রগমনে,
আসিয়া রাগিয়া কহে—"এতো প্রাণে নাহি সহে!
চিরদিন জ্বালাইয়ে হাড়!
এত যে হয়েছ বুড়া, তবুও রসিক-চূড়া!
অবাক!—মুবক মানে হার!"—
শুনি কথা, অপরাধী মোরা দুইজনে,
হাসি মৃদু, থাকি বসে' আনত বদনে!

২

"কাড়িয়া লয়েছ তুমি বিশ্বের সৌন্দর্য্য!
গরবিনি! একি তব রূপের ঐশ্বর্য্য!
একি লাবণ্যের সৃষ্টি!— এহেন চঞ্চল দৃষ্টি
নাই নাই, হরিণ-নয়নে!

হেরি তব কেশগুচ্ছ, প্রসারিত শিখী পুচ্ছ
নৃত্যলীলা ভোলে অভিমানে।
লাজে হয় হীনবর্ণ চম্পক-অতসী স্বর্ণ
চাহি তব চন্দ্রানন পানে!
বিম্বাধরে একি হাসি! দন্তকুন্দ পরকাশি,
কি সুধা ঢালিছ মোর প্রাণে!"—
এত বলি, বসি চুপে, বিমুগ্ধ সুন্দরী-রূপে,
মুখ তার হেরি বার বার!
হেনকালে পেয়ে সাড়া, ক্রুদ্ধা পাগলিনী পারা
স্ত্রী আমার হয় আগুসার।
ঘন ঘন হাত নাড়ি, আকাশ উপাড়ি পাড়ি,
কত কহে ঘূর্ণিত-লোচনা।
লোলজিহ্বা, অসিকরা, ত্রিনয়নী ভয়ঙ্করা,
কালী যেন করালবদনা!
হেরি সেই দাবাগ্নির দাউ দাউ শিখা,
শুষ্ক হই মোরা দুই নায়ক-নায়িকা!

৩

"তব স্পর্শে পুলকে ধরণী তোলো সারা!
উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, কোথা লাগে তারা!
তুমি মম সুখ স্বপ্ন, ভব জলধির রত্ন;
জনম জনমে তব ধ্যানে,
দিবানিশি অবিরত, করেছি তপস্যা কত;
তুমি এলে বিধির বিধানে!
আহা কিবা মনোহরা, তোমার ও ভুরু জোড়া,
অনুচর যেন দুটি ধনু!
নেত্র-তূণ মনোহর করিয়াছে জর জর,
আমার এ বাণবিদ্ধ তনু!"—
এত বলি, অতঃপর, হই আমি অগ্রসর,
অধর-অমৃত-পান হেতু,
কোথা হ'তে আচম্বিত, আসি তথা উপস্থিত
স্ত্রী আমার, কাল-ধূমকেতু!
"ও যেন যুবতী বালা, পাইতে চিকণকালা,
আকুল ব্যাকুল ওর চিত;
কিন্তু তুমি এত বুড়া, তবু চাও প্রেমসুরা!
স্বভাবের একি বিপরীত!"—
শুনি কথা, আপনারে মানি অতি তুচ্ছ;—
আমি যেন দাঁড়কাক, পরি শিখীপুচ্ছ!

৪

"তিল ফুল জিনি নাসা, মরি কি সুন্দর;
দোদুল দুলিছে তাহে সোণার বেসর!
শ্রাবণে সুনীল দুল, চারু ঝুমুকার ফুল
ধরা যেন পরিয়াছে কানে!
নেত্রে জাগে কি পিয়াস, কিছুতে মিটেনা আশ,
চাহি ধনি তব মুখপানে!
কিছুদিন, হেথা থাকি, তুমি যাবে, চক্রবাকি,
আন্ দেশে করিবে প্রয়াণ,
কেমনে ধৈরজ ধরি, পোহাইবে বিভাবরী,
আমার এ চক্রবাক-প্রাণ?"
এতবলি, ছল্ ছল্ নেত্রে বহে অশ্রুজল!—
কোথা হ'তে আসি মোর প্রিয়া,
গালভরা শুভ্র হাসি, আচম্বিতে লয় আসি,
সুন্দরীরে ক্রোড়েতে তুলিয়া।
"ছয় বছরের কন্যা, রূপে গুণে তুই ধন্যা
স্নেহময়ী মোদের নাতিনী,
বহু পুণ্যপুঞ্জফলে, বহু তপস্যার বলে,
পাইয়াছি এ হেন সতিনী!"
শুনি কথা মেস্ত দেয় ঘন করতালি;
সে গো মোর ব্রজরাণী, আমি বনমালী।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

জ্ঞান ও কর্ম্ম।*

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতা, প্রথম অভ্যুদয়কালে এদেশবাসীর মধ্যে এক বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিল। তখন অন্ধ অনুকরণের প্রবল উচ্ছ্বাসে দেশ মাতিয়া উঠিয়াছিল। প্রাচীন ও নবীনের সংঘর্ষের অবস্থায় প্রথম এইরূপই ঘটিয়া থাকে। ক্রমশঃ এভাবের বন্যা চলিয়া যায় কিন্তু একটি সন্দেহের আবর্ত্ত তাহার স্থান অধিকার করে। জাতির পক্ষে সে বড় দুর্দ্দিন! পুরাতন রীতিনীতি, পুরাতন আচার ব্যবহার, পুরাতন ধর্ম্মভাব অক্ষুণ্ণভাবে রাখা অসম্ভব, অথচ নূতনের সমাবেশ করা বড় সহজ নয়! এই সঙ্কটের সময় সময়োচিত সংস্কার দ্বারা সামঞ্জস্য বিধান ও জাতীয় জীবন উন্নত করিবার জন্য স্বতঃই চেষ্টা জাগিয়া উঠে। এই সংস্কার কার্য্য অদ্যাপিও চলিতেছে এখনও হিন্দুসমাজ পরিবর্ত্তিত আকারে গঠিত হইয়া উঠে নাই। আরও কতকাল লাগিবে তাহা বলা যায় না। এই সময়ে চিন্তাশীল লেখকের পুস্তক সমাজের হিতের জন্য বিশেষ উপযোগী। এইজন্য মনস্বী শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'জ্ঞান ও কর্ম্ম' নামক গ্রন্থখানির আমাদের নিকট বিশেষ সমাদর।

মনুষ্যত্ব বিকাশই মানবজীবনের চরম সার্থকতা। যে গ্রন্থ যে পরিমাণে উহার সহায়তা করিবে, সেই পরিমাণে সে গ্রন্থের উৎকর্ষ স্বীকার করিতে হইবে। এ হিসাবেও এ গ্রন্থখানি মূল্যবান। এস্থানে আর একটি কথা বলা কর্ত্তব্য মনে করি। অনেকে উপদেশ দিয়া থাকেন এবং অনেকে গ্রন্থ লেখেন, কিন্তু সকলের কথা সমান ফলপ্রসূ হয় না। The Deserted Village নামক প্রসিদ্ধ কবিতায় গ্রাম্য পাদ্রির বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি বলিয়াছেন যে তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত বাণী যেন দ্বিগুণ প্রভাব লাভ করিত। এ কথা কেবল ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে প্রযুক্ত হইতে পারে। আজন্মনির্ম্মলস্বভাব, সাত্ত্বিক প্রকৃতি, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ হইতে জ্ঞান ও কর্ম্মের যে মহতী বাণী উচ্চারিত হইয়াছে, তাহার যে একটা স্বতন্ত্র শক্তি আছে তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

এই পুস্তকের বিষয়ালোচনা করিবার পূর্ব্বে ইহার ভাষা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যুক্তিযুক্ত মনে করি। বিষয়টী গভীর দার্শনিক এবং জটিল সামাজিক সমস্যাপূর্ণ কিন্তু ভাষা স্বচ্ছন্দ প্রবাহ ও লঘুগতি নদীর ন্যায় অবাধে চলিয়াছে। কোথাও আবিলতা বা অস্পষ্টতার লেশ নাই। সর্ব্বত্র গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় যুক্তিতর্কের অনুসারী। বাহুল্য বর্ণনায় গ্রন্থের কোন অংশই গুরু-ভারাক্রান্ত হয় নাই।

সমুদয় গ্রন্থখানি প্রায় তুল্যাংশে দুইখণ্ডে বিভক্ত। প্রথমভাগে জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, অন্তর্জ্জগৎ, বহির্জ্জগৎ জ্ঞানের সীমা, জ্ঞান-

* জ্ঞান ও কর্ম্ম। শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। এস, কে লাহিড়ী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা।

লাভের উপায়, জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য এই সাতটি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয়ভাগে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ, কর্ত্তব্যলক্ষণ, পারিবারিক নীতিসিদ্ধ কর্ম্ম, সামাজিক নীতিসিদ্ধ কর্ম্ম, রাজনীতিসিদ্ধ কর্ম্ম, ধর্ম্মনীতিসিদ্ধ কর্ম্ম, কর্ম্মের এই সাতটী বিষয় আলোচিত হইয়াছে। যুগ-যুগান্ত হইতে যে সকল প্রশ্ন মানবের চিত্তে গভীরভাবের উদ্বোধন করে, তরঙ্গ তুলে, বহু-

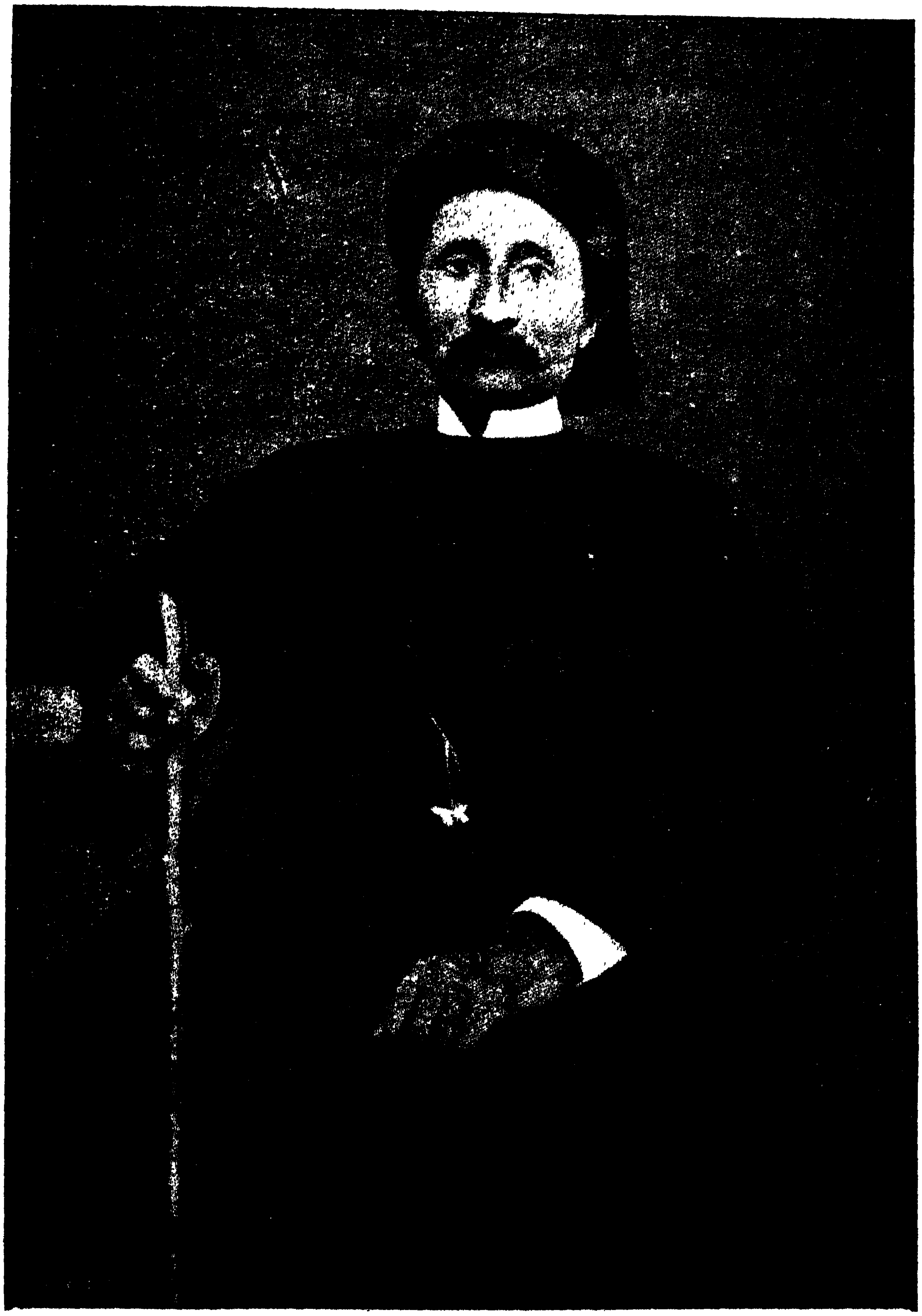

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

শাস্ত্রকার ও দার্শনিক পণ্ডিত যাহাদের মীমাংসায় ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছেন, আত্মজ্ঞান, অভিব্যক্তিবাদ, কার্য্যকারণ. প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, অদ্বৈতবাদ, বিবর্ত্তবাদ, জগতের শুভাশুভ প্রভৃতি অনেক দার্শনিক সমস্যা গুরুদাস বাবু কেবল আলোচনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, আপনার স্বাভাবিক মনীষা বলে, সে সকলের প্রকৃত তথ্য নির্ণয় করিবার জন্য যত্নবান হইয়াছেন। দার্শনিক তত্ত্ব শুনিলেই অনেকে ভয় পাইয়া থাকেন, কিন্তু এস্থলে আশঙ্কার কোন কারণ নাই। স্বীকার করি দার্শনিক প্রসঙ্গ স্বভাবতঃ নীরস এবং অনেক সময় তাহার আলোচনায় নীরসতা বাড়িয়া উঠে এবং আলোচ্য বিষয় অধিকতর দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়ে! কিন্তু সে দোষ কাহার? বিষয়টি সম্যকরূপে বুঝিতে না পারিলে সে বিষয়ে তাহার আলোচনা বিকলাঙ্গ এবং দীর্ঘ দীর্ঘ 'কোটেশন' আপনার বক্তব্যের অভাব পূর্ণ করিতে বাধ্য হইতে হয়।

আলোচনা দ্বিবিধ এক মূল কারণানুসন্ধান, আর ব্যবহারিক কার্য্যে তাহার প্রয়োগ নিরূপণ। গুরুদাস বাবু উভয় ভাবেই 'জ্ঞান ও কর্ম্মের' আলোচনা করিয়াছেন। এ গ্রন্থে, একদিকে যেমন বুধমণ্ডলী, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শাস্ত্র বিজ্ঞানের নিগূঢ় রহস্যজাল কিরূপে অনায়াসে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে দেখিয়া বিস্ময় বিমূঢ় হইবেন অন্যদিকে সাধারণ পাঠক্ জ্ঞানে সমৃদ্ধ এবং কর্ম্মে বলিষ্ঠ হইবার উপযোগী চরিত্রগঠনের অনেক উপাদান পাইবেন। সরসতা বিধানের জন্য ইহাতে মধ্যে মধ্যে মনোহর গল্প সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

অনেকের স্মরণ থাকিতে পারে যে লর্ড কর্জ্জনের শাসনধীনে ছাত্রনিবাস সম্বন্ধে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। সে সম্বন্ধে গুরুদাস বাবুর অভিমত জানিবার জন্য অনেকের কৌতূহল জন্মিতে পারে, তজ্জন্য আমরা নিম্নে তাহা অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

যে সকল ছাত্র দূর হইতে আইসে ও যাহাদের কোন অভিভাবক নিকটে নাই, তাহাদের থাকিবার জন্য বিদ্যালয়ের নিকটে ও বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে ছাত্র-নিবাস থাকিলে ও তথায় ছাত্র ও শিক্ষক একত্রে অবস্থিতি করিলে সুবিধা হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে অসুবিধাও আছে। বহুসংখ্যক ছাত্রের একত্রবাস সুশৃঙ্খলামত হওয়া অতি কঠিন ব্যাপার এবং তত্ত্বাবধানের একটু ত্রুটি হইলেই অনেক অনিষ্টের সম্ভাবনা। স্বজনবর্গের মধ্যে থাকিলে শিক্ষার্থীর চিত্তবৃত্তির যেরূপ বিকাশ হইতে পারে, ছাত্রনিবাসে, শিক্ষকের নিকটে থাকিলেও সেরূপ হওয়া সম্ভাবনীয় নহে। ছাত্রগণ স্ব স্ব আবাসে থাকিলে স্বাতন্ত্র্য ও সংসারের সর্ব্বদিকে দেখাশুনা অভ্যাস করিতে পারে, ছাত্রনিবাসে থাকিলে তাহা না। সুশাসিত ছাত্রনিবাসে ছাত্রগণ কলের মত পরিচালিত হইতে পারে, কিন্তু স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া মানুষের মত চলিতে শিখে কি না সন্দেহের স্থল। অতএব নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে, এবং তত্ত্বাবধারণের বিশেষ সুযোগ না থাকিলে ছাত্রনিবাসে থাকা বাঞ্ছনীয় বোধ হয় না। কেহ কেহ মনে করেন, ছাত্রনিবাসে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সর্ব্বদা সমাবেশ হইতে পারে, অতএব ছাত্র নিবাসে অবস্থান প্রাচীন ভারতে

গুরুগৃহে বাসের ন্যায় ফলপ্রদ। এ কথা ঠিক নহে। কারণ প্রথমতঃ ছাত্রনিবাস গুরুগৃহ নহে, গুরু তথায় সপরিবারে অবস্থান করেন না, এবং নিজের বা গুরুর স্বজন পরিবৃত থাকিয়া ছাত্র যেরূপ পালিত ও শিক্ষিত হইতে পারে, ছাত্রনিবাসে তাহা হইতে পারে না। এবং দ্বিতীয়তঃ পুরাকালে শিষ্য গুরুকে ভক্তি উপহার দিত ও স্নেহ প্রতিদান পাইত। ভক্তি ও স্নেহ এই দুই মাত্র আদান প্রদানের সামগ্রী ছিল এবং এ দুয়ের বিনিময়ই এক অপূর্ব্ব শিক্ষা প্রদান করিত। বর্ত্তমান কালে ছাত্রনিবাসে ছাত্র কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া তদুপযুক্ত বাসস্থান ও খাদ্যদ্রব্যাদি পায় ও বুঝিয়া লয় বা লইবার চেষ্টা করে। এই অর্থ ও দ্রব্যের আদান প্রদান মূলক ব্যাপার সেই ভক্তি ও স্নেহের সম্ভূত সম্বন্ধের সহিত কোনমতে তুলনীয় হইতে পারে না।

যে স্থলে মতভেদ, সে স্থলে গুরুদাসবাবু নিজের স্বাধীনমত জ্ঞাপন করিতে কখন কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। বীরের ন্যায় অগ্রসর হইয়াছেন কখন পশ্চাৎপদ হন নাই।

যে দুইটী সামাজিক বিষয়ে মৃতপ্রায় হিন্দু-সমাজকেও বিচলিত করিয়াছে পারিবারিক "নীতিসিদ্ধ কর্ম্ম" পরিচ্ছেদে গুরুদাসবাবু কিছু বিস্তৃতভাবে তাহার আলোচনা করিয়াছেন। সে দুইটী বিষয়—

১। অল্প বয়সে বিবাহ।

২। বিধবা বিবাহ।

আজকাল এই দুইটী বিষয়ে অনেক বাদ প্রতিবাদ, সভাসমিতিহইতেছে। এক পক্ষে প্রাচ্যভাবেনিমজ্জিত রক্ষণশীলতা অপর পক্ষে পাশ্চাত্যভাবে অনুপ্রাণিত পরিবর্ত্তনপ্রিয়তা —এতদুভয়ের মধ্যে ঘোর দ্বন্দ্ব চলিতেছে। ইহার ফলাফল জানিবার জন্য যখন সর্ব্ব চিত্ত অধীরভাবে প্রতীক্ষা করিতেছে, তখন গুরুদাসবাবু কিরূপে এই দুইটী জটিল প্রশ্নের সমাধান করিলেন, তাহা অবগত হইতে কাহার না বিশেষ ইচ্ছা হইবে? যদিও এ সকল বিষয়ে মতবিভেদ অবশ্যম্ভাবী, তথাপি যেরূপ ধীরতার সহিত ও গভীর ভাবে গুরুদাস-বাবু ইহার প্রকৃত তথ্য নির্ণয়ের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন এবং যেরূপ যুক্তি তর্ক অবলম্বনে আপনার প্রতিপাদ্য স্থির করিয়াছেন, তাহার কেবলমাত্র উল্লেখ করিলাম; সম্যক্ পরিচয় পুস্তকে পাইবেন।

এই সকল স্থানে আমাদের মনে হয় তিনি যেন বিচারপতির আসনে বসিয়া নিরপেক্ষভাবে উভয় পক্ষের বক্তব্য অবহিত হইয়া শুনিয়া, অনুকূল ও প্রতিকূল যুক্তিগুলি একে একে পর্য্যালোচনা করিয়া স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এ কথা যেন কেহ মনে না করেন, যে প্রাচীন প্রথা হইলেই তিনি তাহার সমর্থন করিবেন কিম্বা অবিকৃতভাবে রাখিবার পরামর্শ দিবেন। সহসা কোন প্রাচীন প্রথার আমূল পরিবর্ত্তন করা বিগর্হিত এই মতের তিনি পক্ষপাতী। ইহাতে তাঁহাকে রক্ষণশীল বলিতে হয় বলুন, এ হিসাবে মহামতি এড্মণ্ড বার্কও রক্ষণশীল। তিনি একস্থানে যথার্থই বলিয়াছেন যে সংস্কারকদিগের পক্ষে চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া সাবধানে চলা আবশ্যক। গতির বেগ বৃদ্ধির সহিত গতির দিক স্থির রাখিতে হইবে। এ পুস্তকের বিশেষত্ব এই যে সর্ব্বত্রই একটি শান্ত সংযতভাব বিরাজ করিতেছে। এমন উদারতার সহিত প্রতি-

পক্ষের মতের আলোচনা একান্ত দুর্লভ! এ কথা সাহস করিয়া বলিতে পারি গ্রন্থের সর্ব্বত্র সকলের মতের ঐক্য হউক না হউক কাহারও চিত্ত ক্ষুব্ধ হইবে না!

এ পুস্তক পড়িয়া মন উন্নত হয় প্রাচীন আদর্শের প্রতি সম্ভ্রমের ভাব জাগিয়া উঠে এবং জীবনের উদ্দেশ্য ও গতি লক্ষ্যাভিমুখে সহজে নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে।

হাইকোর্টের বিচারপতির আসন হইতে অবসর লাভ করিয়া দেশের কল্যাণকামনায় গুরুদাসবাবু বঙ্গের প্রতিগৃহে যে অমৃত বিতরণের জন্য সোৎসুক, আশা করি এ সুধার আস্বাদ হইতে যেন কেহ না বঞ্চিত হন। তিনি তাঁহার শান্তিময় বিরাম-অবসরে পরিণত চিন্তার সুমধুর ফল দেশবাসীকে মধ্যে মধ্যে উপহার দিয়া কৃতার্থ করুন, ভগবৎ-সমীপে ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা।

পরিশেষে একটি বক্তব্য আছে। আমাদের এই দরিদ্র দেশে এই প্রয়োজনীয় পুস্তক খানির একটি সুলভ সংস্করণ হওয়া অত্যাবশ্যক ও বাঞ্ছনীয়। তাহা হইলে ইহা সহজেই সাধারণের করায়ত্ত হইতে পারিবে।

শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়।

জাপানের সংবাদপত্র।

জাপানে সংবাদপত্রের প্রবর্ত্তন বেশী দিনের কথা নহে। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে কিশিদা নামক জনৈক জাপানী একজন ইংরাজের সহিত মিলিত হইয়া সর্ব্বপ্রথম এক পাক্ষিক সংবাদপত্র বাহির করেন। তাহার পর হইতে দেখিতে দেখিতে জাপানে সংবাদপত্রের প্রচলন এত বেশী হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে পৃথিবীর অন্য কোন দেশে তেমন দেখা যায় না। জনসাধারণ সকলেই শিক্ষিত এবং সকলেরই জ্ঞান তৃষ্ণা এতদূর প্রবল যে উহাদের বিশ্বাস যে দৈনিক সংবাদপত্র না পড়িয়া কোন ব্যক্তি জীবনাতিবাহিত করিতে পারে না। মুটে মজুরের বাড়ীতেও অন্ততঃ একখানা দৈনিক পত্র আসিয়া থাকে। আমাদের একটী চাকরকেও দৈনিক পত্রিকা রাখিতে দেখিয়াছি। সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে বাহির হইবার পূর্ব্বে মোটামুটি দিনের নূতন খবরগুলি দেখিয়া লয়। অবসর না থাকিলে গাড়ী কিম্বা ট্রামে উঠিয়া অথবা রাস্তায় চলিবার বেলায় দেখিয়া লয়। অবসর মত গাড়োয়ান গুলিও (রিকশাওয়ালা) তাহাদের গাড়ীর উপর বসিয়া সংবাদপত্র পাঠে ব্যস্ত। দোকানে ছেলে মেয়ে যাহারা দোকান রক্ষার ভার লইয়া বসিয়া থাকে, দৈনিক সংবাদপত্র তন্ন তন্ন করিয়া পাঠ করা তাহাদের একটী প্রধান কায। কোন কোন দোকানে ৫০।৬০ বছরের বৃদ্ধাকেও চশমা পরিয়া সংবাদপত্রপাঠে ব্যস্ত থাকিতে দেখিয়াছি। বড় বড় দোকানে গেলে দোকানদার গ্রাহকের হাতে সেইদিনের সংবাদপত্র পড়িতে দিয়া ৫।৭ মিনিটের মধ্যে গ্রাহকের অভীষ্ট জিনিস খুঁজিয়া আনিয়া দেয়। নাপিতের দোকানে কিম্বা টিফিন ঘরে গিয়া কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিতে বৃথা সময় অতিবাহিত না হয় এজন্য আগন্তুকের সুবিধার

দিকে দৃষ্টি রাখিয়া টেবিলের উপর নানারকম দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং পাক্ষিক পত্রিকা রাখিয়া দেওয়া হয়। বলাবাহুল্য রেল ষ্টেশনে ত পত্রিকা আছেই। বড় বড় ষ্টেশনে আরোহীদের সুবিধার জন্য জাপানী পত্রিকার সহিত দুই একখানা দৈনিক ইংরাজী পত্রিকাও থাকে।

আমাদের দেশে কোন গ্রাম্য সহরে একখানা দৈনিকপত্র চলিতে দেখা যায় না। অথচ জাপানে অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট গ্রামে সুন্দরভাবে দৈনিকপত্র চলিতেছে। জাপানের উত্তর প্রদেশে ইয়োছো বা হোক্কাইকো দ্বীপ। ঐ স্থান শীতপ্রধান। বছরে ৫।৬ মাস প্রায় বরফে আচ্ছন্ন থাকে। মধ্যযুগে ঐ দ্বীপে জাপানের অসভ্য পরাজিত আইনুজাতি বাস করিত। এখন লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সুসভ্য ভদ্রলোকও তথায় গিয়া বসতি বিস্তার করিতেছেন। ঐ দ্বীপে লোকসংখ্যায় যে সহরটি তৃতীয় তথায় আমি প্রায় এক বৎসরকাল অবস্থান করি। তথাকার লোকসংখ্যা ন্যূনাধিক পঞ্চাশ হাজার। আমি তথায় গিয়াই আমার জনৈক সহাধ্যায়ীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে তথায় কোন দৈনিক খবরের কাগজ আছে কিনা। প্রত্যুত্তরে তিনি বলিলেন এ দ্বীপও জাপানের অন্তর্গত—কাজেই এখানেও জাপানী সভ্যতা নিশ্চয়ই বর্ত্তমান। যদিও এ দ্বীপের লোকসংখ্যা বিশেষতঃ শিক্ষিত ভদ্রের সংখ্যা তুলনায় কম তথাপি এই সহরে ছয়খানা দৈনিকপত্র আছে। এবং বিশ মাইল দূরবর্ত্তী দ্বীপের দ্বিতীয় সহর ওতরু নামক স্থানে ইহার চেয়ে বেশী সংখ্যক দৈনিক খবরের কাগজ প্রচলিত। তিনি আরো বলিলেন যে এমন কি এই দ্বীপেরই কয়েকটী বড় গ্রামে দৈনিকপত্র ছাপা হয়।

রুষ-জাপান যুদ্ধের সময় হইতে সংবাদ পত্রের সংখ্যা জাপানে অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। সঠিক সংখ্যা অবগত হইতে পারি নাই। তবে তৎপূর্ব্বের পাঁচ বৎসরের তালিকা আলোচনা করিলেই অনেকটা ধারণা হইতে পারে। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে সংবাদপত্রের সংখ্যা ছিল ৮২৯ খানা। কিন্তু পাঁচবৎসরে অর্থাৎ ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে উহার সংখ্যা ১৪৯৯ খানায় দাঁড়ায়। আমার মনে হয় এখন হয়ত ঐ সংখ্যা অন্ততঃ দুই হাজারে পরিণত হইয়াছে। দুই বৎসর পূর্ব্বে কোন ভারতীয় সংবাদপত্রে জাপানের সংবাদপত্রের সংখ্যা চারি হাজার বলিয়া উল্লেখ করে। বোধহয় শিল্প, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, সাহিত্য, গণিত প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ক মাসিক, ত্রৈমাসিক রিপোর্ট বা বিবরণীকে সংবাদপত্রের তালিকাভুক্ত করিলে চারিহাজারের ন্যূন হইবে না।

জাপানের অধিকাংশ বড় বড় কাগজই ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানী দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। অনেক স্থলে সম্পাদক খুঁজিতে গিয়া দেখিতে পাইয়াছি যে কোম্পানীর প্রত্যেক অংশীদারই তাঁহাদের কাগজের সম্পাদক। "জিজি" নামক পত্রিকার সম্পাদক পঞ্চাশজনের কম নহে।

মফস্বলস্থ সহরে এজেন্টের দ্বারা কাগজ বিলি করা হয়। অনেক কাগজ শুধু পুরুষের দ্বারা, কতক স্ত্রীপুরুষ উভয়ের দ্বারাই এবং কতক শুধু স্ত্রীলোকের দ্বারাই পরিচালিত হইতেছে। অধিকাংশ স্কুল কলেজ এবং প্রত্যেক সমিতি হইতে সাপ্তাহিক, পাক্ষিক

কিম্বা মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া থাকে। ঐ সকল পত্রিকায় ছেলেমেয়েদের এবং সাধারণের শিক্ষণীয় বিষয়ের অবতারণা করা হয়। সামান্য সামান্য ব্যবসায়ীদেরও মাসিক পত্রিকা দেখিয়াছি। যথা ধোপা, নাপিত, দুধওয়ালা, চামার, দরজি প্রভৃতি। উহাতে উহাদের ব্যবসাবিষয়ক বিবরণ এবং উন্নতির পন্থাদি বিবৃত হইয়া থাকে।

শিক্ষিতের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক বলিয়া অধিকাংশ কাগজেরই বেশ কাটতি। ব্যবসা বাণিজ্যে দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে কাজেই বিজ্ঞাপনেরও অভাব নাই। ইত্যাদি কারণে কাগজ দামেও সুলভ। বিখ্যাত দৈনিক-গুলির মূল্যই পাঁচ আনা হইতে স-ছয় আনা পর্য্যন্ত। জাপানী ভাষায় জিজি, কোকুমিন, মাইনিচি, মিয়াকো, হোচি, চুয়ো, নিপ্পন, দেম্পো, নিরোকু, আছাহি, চুগাঁই, শোগিও, ইয়োমিটরি, এবং ইয়োরোজু প্রভৃতি কয়েকখানা দৈনিকই তোকিও সহরের প্রধান পত্রিকা। জাপান টাইম্‌স্ নামক একখানা দৈনিক জাপানীদের দ্বারা ইংরাজিতে পরিচালিত হইয়া থাকে। ইংরাজী ছাড়া জার্ম্মাণ, ফরাসী এবং রুষভাষার পত্রিকাও জাপানে রহিয়াছে। ইংরাজ, জার্ম্মাণ, মার্কিণ এবং রুষগণও তথায় পত্রিকা প্রকাশ করিয়া থাকে। বৈদেশিক দ্বারা ইংরাজীতে জাপান য়্যাড্‌ভার্টাইজার, জাপান ক্রণিক্‌ল্, জাপান গেজেট, জাপান হেরাল্ড, জাপান মেল কোবে হেরাল্ড, নাগাসাকি প্রেস প্রভৃতি কয়েকখানা উল্লেখযোগ্য পত্রিকা প্রকাশিত থাকে।

ইংরাজী পত্রিকার কাটতি কম। প্রবাসী বৈদেশিকদের ভিতরই উহার অনেকটা কাটতি দেখা যায়। কাযেই উহা তেমন সুলভ নহে; দৈনিক দুই আনা হইতে চারি আনা।

বিশেষ বিশেষ ঘটনার সময় অতিরিক্ত পত্রের (গোগাই) বিশেষ সমারোহ দেখিতে পাওয়া যায়। রুষজাপযুদ্ধের সময় প্রত্যেক বড় পত্রিকার অফিষ ছাড়াও অনেক স্থান হইতে দিনের মধ্যে কতবার গোগাই অর্থাৎ তারের সংবাদ অতিরিক্তপত্রে প্রকাশিত হইতে দেখিয়াছি।

প্রায় প্রত্যেক বড় বড় সংবাদপত্রের দুই চারিজন পরিচালক ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশে গিয়া পরিচালন কার্য্যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ সংবাদপত্র লিখিতে আরম্ভ করেন। কাযেই বিদেশের নানারূপ আচার ব্যবহার, লোকচরিত্র, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি সর্ব্বসমক্ষে সুন্দরভাবে উপস্থিত করিতে সমর্থ হয়েন। ভারত সম্বন্ধেও অনেক সময় অনেক বিষয় লিখিত থাকে সত্য, কিন্তু ভারতবাসীকে সেদেশে আজকাল অনেকটা অসভ্য বর্ব্বর বলিয়া গণ্য করে তাই আমাদের যাহা কিছু সুন্দর তাহা গোপন করিয়া কেবল কেলেঙ্কারীর কথা অতিরঞ্জিত করিয়া প্রকাশ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দুই একটী এস্থলে উল্লেখ করিলাম। ভারতে বালবিধবা নিগ্রহ সম্বন্ধে একজন লিখিয়াছে যে, "কোন বালিকা বিধবা হইলে শ্বশুর, শাশুড়ী এবং বাড়ীর অন্যান্য সকলে বলিয়া থাকে এই অলক্ষীর জন্যই আমাদের ছেলের অকাল মৃত্যু হইল। বালিকাকে নানাভাবে উৎপীড়ন আরম্ভ

করে। তাহার সুন্দর বসন ভূষণ কাড়িয়া লয়, মস্তকের দিব্য কেশ কাটিয়া ফেলে, সুখাদ্যে বঞ্চিত করে, এমন কি মাত্র একবেলা সামান্য কিছু খাইতে দেয়। বাড়ীর অন্যান্য সকলে কোন কোন পর্ব্বোপলক্ষে আমোদ উৎসবে মাতোয়ারা হয় কিন্তু দুঃখিনী বালিকাকে নির্জ্জনে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয় ইত্যাদি।” আর একদিন দেখিলাম “ভারতের বাল্যবিবাহ অতি আশ্চর্য্য। তিন বৎসরে মেয়েদের বিবাহ হয় এবং ছয় সাত বৎসর বয়সে তাহাদের সন্তান হয়।” “নানারূপ রাসায়নিক দ্রব্যের আবিষ্কার সত্ত্বেও পচা গোবরে ঘর পরিষ্কার করা হয়। উহাতে ব্যারামের বীজ এবং দুর্গন্ধ নাশ করার পরিবর্ত্তে বরং উহার সহায়তা করে।” “বংশ মর্য্যাদা বজায় রাখিবার জন্য কুলীনের ঘরে ৫০।৬০ বছরের কুমারী দেখিতে পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে তিন বছরের ছেলে ৮।১০ টা বিবাহ করিয়া বসে। এবং কোন কোন স্ত্রীর বয়স ২০।২৫ বৎসর।”

সংবাদ পত্রের এইরূপ টিকা টিপ্পনী এবং সহাধ্যায়ীদের উপহাসব্যঞ্জক মন্তব্যে কত যে ঝালাপালা হইয়াছি তাহা বলা যায় না। বালক বালিকাদিগের প্রথম শিক্ষার গ্রন্থে আমাদের দেশীয় লোকের যেরূপ আকৃতি ও গঠনের বর্ণনা করিয়াছে তাহা রামায়ণের রাক্ষসের চেহারার চেয়ে কোন অংশে উৎকৃষ্ট নহে। তবে একটী কথা এই যে, জাপানে অনেক বিষয়ে ভারত-বাসীকে হীনতা স্বীকার করিতে হইলেও স্কুল কলেজে, ভদ্রলোকের বাড়ীতে, হোটেলে এবং দোকানে এখনো ততটা নিগ্রহ সহ্য করিতে হয় না। সভ্যভূমি আমেরিকার সাধারণের ভিতর ভারতবাসীর নিগ্রহের সীমা নাই। তাহা বোধ হয় অনেকেই সংবাদ পত্র পাঠে অবগত হইয়া থাকিবেন। আমার এক বন্ধু লিখিয়াছিলেন তিনি সমস্ত দিন হোটেল হইতে হোটেলান্তরে স্থান না পাইয়া একদিন এক পল্লীর ধারে গাছ তলায় শুইয়া রাত্রি যাপন করেন। বলা বাহুল্য তাঁহার হাতে টাকাও ছিল অথচ হোটেলওয়ালারা ইহা হোটেল নহে বলিয়া তাঁহাকে তাড়াইয়া দেয়। এরূপ ব্যবহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস না হওয়ারই কথা। কিন্তু উহার পর আমাদের ভারতীয় কোন এক বিশেষ শিক্ষিত ব্যক্তি সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া জাপানে আইসেন। তিনি এক এক সুসভ্য দেশে ৫।৬ মাস কাটাইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোক চরিত্র এবং ভিন্ন ভিন্ন ইন্‌ষ্টিটিউশন তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছিলেন। আমি জাপানে তাঁহার মুখেই শুনিয়াছি যে, তাঁহাকেও অনেক হোটেলে হাতে টাকা লইয়াও লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতে হইয়াছিল।

সংবাদ পত্র সম্বন্ধে লিখিতে লিখিতে কিঞ্চিৎ দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। কি করিব অবস্থায় টানিয়া আনে। জাপানের সাময়িক ‘পঞ্চ’ হাস্যোদ্দীপক ব্যঙ্গব্যঞ্জক রং-তামাসাজনক চিত্রে পূর্ণ। সেখানকার অনেক কাগজে মজার গল্প, হেঁয়ালী প্রভৃতি থাকে। ইহা ছাড়া ঐতিহাসিক এবং উপন্যাসিক গল্পের কাগজ ত আছেই।

সংবাদ পত্রের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী হওয়ায় রসদ সংগ্রহ করা মুস্কিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই অতি নগণ্য সংবাদ সমূহেরও স্থানাভাব দেখিতে পাওয়া যায় না।

অন্যান্য দেশের ন্যায় জাপানেও ভিন্ন ভিন্ন দলের ভিন্ন ভিন্ন মতের সংবাদ-পত্র আছে কিন্তু সকলেরই মুখ্য উদ্দেশ্য দেশের উন্নতিতে সহায়তা করা। আমাদের দেশে উহার বেশ ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা দেশে পরিবর্দ্ধিত, দেশের বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ এবং দেশবাসীর অভাব অভিযোগ সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ তাঁহাদের দ্বারা পরিচালিত কাগজ একরূপ; আর যাঁহারা অন্যদেশ হইতে নূতন এদেশে পদার্পণ করেন এবং দেশের আভ্যন্তরিক কেন বাহ্যিক বিষয়ও একবার মনোযোগের সহিত দেখিতে প্রয়াস পান না তাঁহাদের পরিচালিত কাগজ অন্যরূপ। উভয়ের ভিতর এত পার্থক্য যেন উভয়ের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিপরীত।

জাপানে কয়েক বৎসরে প্রেসের বিরুদ্ধে একটী মাত্র মোকদ্দমা দেখিয়াছি। যখন বাল্টিক ফ্লিট জাপানের বিরুদ্ধে আসিতেছিলেন, সেই সময় জাপান গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করেন যে জাপানের কোন পত্রিকা, জাপানের সেনাপতি সৈন্য সামন্ত অ্যাড্‌মিরাল এবং যুদ্ধ জাহাজ প্রভৃতি শত্রুপক্ষীয়দের জন্য কখন কোথায় প্রতীক্ষা করে তাহা যেন প্রকাশ না করে। পক্ষান্তরে শত্রুপক্ষীয়দের গতিরোধ উল্লেখ করিতে এবং যুদ্ধের ফলাফল প্রকাশ করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

এদিকে বাল্টিক ফ্লিট্ মাদাগাস্কর অতিক্রম করিলে এক খানা পত্রিকা প্রকাশ করে যে রুষের জাহাজ অগ্রসর হউক কোন ভয়ের কারণ নাই। আমাদের অ্যাড্‌মিরল তোঁগো হয়ত তাঁহার উপযুক্ত অনুচরগণসহ শত্রুপক্ষ সমূলে নিধন করিতে দক্ষিণ অঞ্চলে চীন সাগরের কোন প্রদেশে প্রতীক্ষা করিতেছেন।

গবর্ণমেণ্টঘোষণা অমান্য করিয়া এই সংবাদ রটনা করায় এবং ইহাতে শত্রুদের সুবিধা হইবার সম্ভাবনা এই ভাবিয়া বিচারে সেই সংবাদপত্রের পঁচিশ ইয়েন অর্থাৎ উনচল্লিশ টাকা অর্থ দণ্ড হয়।

কাগজ পাঠ সমাপ্তির পর যিনি যে বিষয় ইচ্ছা করেন কাটিয়া সযত্নে রাখিয়া দেন। এবং পুরাতন কাগজ বিক্রয় করিয়া ফেলেন। জাপানের দোকানদার যে কোন জিনিষ হউক না কেন অনাবৃত অবস্থায় গ্রাহকের হাতে দেয় না। বিক্রীত দ্রব্যাদি সম্ভ্রান্ত দোকানে সাদা কাগজে এবং ছোট ছোট সাধারণ দোকানে পুরাতন সংবাদ-পত্রে মোড়াইয়া সুন্দর রঙিন ডোরে বাঁধিয়া, ধরিয়া লইবার সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়। আমাদের দেশের বাবুদের ন্যায় জাপানের বিশিষ্ট লোকও বাজারের ক্রীত ভারী দ্রব্য হস্তে করিয়া বাড়ী লইয়া যাইতে লজ্জা বোধ করেন না।

শ্রীযদুনাথ সরকার।

মৃত্যু।

মৃত্যু যদি হয় সখা অমৃতের দ্বার
আমাদের পরে তার আছে অধিকার;
কিংবা যদি জীবনের এই সমাপন
ইথে কোন আশঙ্কার নাহি প্রয়োজন।

শ্রীবিরজাশঙ্কর গুহ।

এলাহাবাদে জাতীয় সম্মিলন।

এবার আমাদের জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন এলাহাবাদে হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে দুই বৎসর সমিতিতে যোগদান লইয়া দেশের দুই পক্ষের মধ্যে যে শোচনীয় মতভেদ দাঁড়াইয়াছিল, এবারকার প্রতিনিধি সংখ্যা দেখিয়া আশা হয়—যেন উভয়পক্ষই ব্যক্তিগত মতামত ত্যাগ করিয়া দেশের এই সাধারণ কর্ম্মে যোগদান করাই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তাহা ছাড়া কিছুদিন হইতে স্থানে স্থানে মুসলমানেরা হিন্দুর রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে স্বতন্ত্র থাকিবার জন্য যে উপদেশ দিয়া আসিতেছেন, তাহাও ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। অনকয়েক শিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ মুসলমানও সমিতিতে উপস্থিত ছিলেন এবং এই জাতীয় কর্ম্মে হিন্দুর সহিত সমস্বরে যোগদান করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। সুতরাং এবারকার জাতীয় সমিতিকে যথার্থ জাতীয় সম্মিলন বলা যাইতে পারে।

ভারতের কল্যাণব্রত উদারনৈতিক স্বনামধন্য শ্রদ্ধেয় সার উইলিয়ম ওয়েদারবর্ণ তাঁহার বার্দ্ধক্য সত্ত্বেও দেশের সঙ্কট সময়ে ভারতে আসিয়া সমিতির সভাপতি পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতের মঙ্গল সাধনই তাঁহার মহৎ জীবনের ব্রত। প্রায় ত্রিশ বৎসর হইল তিনি ভারতবাসীর উন্নতির জন্য কায়মনোবাক্যে প্রাণপণ পরিশ্রম করিতেছেন। তাঁহার এই অপূর্ব্ব আত্মোৎসর্গের ও পরার্থপরতার জন্য ভারতবাসী মাত্রেই সর্ব্বান্তঃকরণে কৃতজ্ঞ এবং এবারে আমরা তাঁহাকে আমাদের জাতীয় যজ্ঞের অধিপতি নির্ব্বাচিত করিয়া সেই কৃতজ্ঞতারই পরিচয় দিয়াছি মাত্র।

সার ওয়েদারবর্ণের বক্তৃতার মধ্যে একটু বিশেষত্ব আছে। দেশের রাজনৈতিক কর্ম্ম ও ব্যবস্থার তিনি উল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নাই—করা আবশ্যকও বোধ করেন নাই। সকল দেশের সকল জাতির সকল কর্ম্মের মূলে যে তিনটি মহাশক্তি প্রচ্ছন্ন থাকে, তিনি তাহাই ভারতের রাজা ও প্রজা উভয়ের চক্ষের সম্মুখে উজ্জ্বলবর্ণে ধরিয়া দিয়াছেন মাত্র। বক্তৃতার প্রারম্ভেই তিনি বলিয়াছেন—"আশা, প্রীতি ও সমবেত উদ্যমই আমাদের সকল কর্ম্মের মূলমন্ত্র হওয়া আবশ্যক।" আশা,—ভারতের ভবিষ্যৎ অদৃষ্টের উপর, ভারতবাসীর উত্থানশক্তির উপর, রাজপক্ষের উদারতা ও প্রজারঞ্জনের আন্তরিক ইচ্ছার উপর। প্রীতি,—ভারতের বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে, রাজনৈতিক বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে এবং প্রধানতঃ রাজা ও প্রজার মধ্যে। আর সমবেত উদ্যম ত' সর্ব্বকালে সর্ব্ব সমাজেই আবশ্যক। এই তিনটি নীতিই তাঁহার মুখ্য বক্তব্য। ওয়েদারবর্ণ সাহেবের বক্তৃতার মধ্যে নূতন কথা নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিগত প্রভাব ও চেষ্টার ফলে তিনি আমাদের মধ্যে এই তিনটি নীতিকে সার্থক করিবার যত্ন করিলে অনেকটা সুফল হওয়া সম্ভব বলিয়া আশা করা যাইতে পারে।

ওয়েদারবর্ণ এই প্রীতি ও সমবেত চেষ্টা প্রতিষ্ঠার সূচনা করিয়া যাইবার যত্ন করিতে ত্রুটি করেন নাই। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যাহাতে ভবিষ্যতে অপ্রীতির কোন কারণ না ঘটে সেই উদ্দেশ্যে তিনি দেশের উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃগণকে লইয়া একটি সমিতি গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন। এবারে এরূপ একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে। ইহাদের চেষ্টা কতদূর সফল হইবে তাহা অবশ্য আমরা জানি না, কিন্তু এরূপ মিলনের চেষ্টাতেও যে একটা সুফল আছে, তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন।

ওয়েদারবর্ণ সাহেবের মতে আমাদের সমবেত উদ্যম তিনটি পথে চালিত হওয়াই কর্ত্তব্য,—প্রথম, ভারতবাসীকে শিক্ষাদান করা, দ্বিতীয় প্রস্তাবিত সংস্কার লইয়া গবর্মেন্টের নিকট উপস্থিত হওয়া এবং তৃতীয় ইংলণ্ডে তাঁহাদের প্রার্থনা প্রচার করা।

সার ওয়েদারবর্ণ মনে করেন প্রতি বৎসরেই জাতীয় সমিতির কয়েকজন প্রতিনিধির তাঁহাদের প্রস্তাব লইয়া বড়লাটের নিকট উপস্থিত হওয়া

কর্ত্তব্য। এরূপ চেষ্টা পূর্ব্বেও দুইবার হইয়াছিল, কিন্তু লর্ড এলগিন ও লর্ড কর্জ্জন উভয়েই কংগ্রেসের প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করিতে অস্বীকার করেন। সৌভাগ্যবশতঃ লর্ড হার্ডিং সঙ্কীর্ণ মতাবলম্বী নহেন। ওয়েদারবর্ণ সাহেব তাঁহার নিকট এইরূপ প্রতিনিধি প্রেরণের অভিলাষ জ্ঞাপন করায় তিনি তাঁহার সম্মতি জানাইয়াছিলেন এবং গত ৫ই জানুয়ারি প্রাতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নেতৃগণ ও কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব সভাপতিগণ ওয়েদারবর্ণ সাহেবকে সঙ্গে লইয়া বড়লাটের প্রাসাদে যাইয়া তাঁহাকে অভিনন্দন করিয়া আপনাদের অভাব জ্ঞাপন করেন। লর্ড হার্ডিং যেরূপ ভদ্রতা ও উদারতার সহিত তাঁহাদের প্রস্তাবের উত্তর দিয়াছেন, তাহাতে আমরা আশা করিতে পারি সাধারণের সমবেত ভিক্ষাকে তিনি কর্জ্জনের ন্যায় পদাঘাত করিবেন না। লর্ড হার্ডিং স্পষ্টতঃ যে তাঁহাদের কোন কথা কার্য্যে সম্পন্ন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন তাহা নহে, বরং বলিয়াছেন কতকগুলি বিষয় কর্ম্মে পরিণত করিতে হইলে অতিরিক্ত ব্যয়ের আবশ্যক। তবে দেশের অভাবটাকে যথার্থ অভাব বলিয়া স্বীকার করিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই, এবং যথাসম্ভব সহানুভূতির সহিত তাহা দূর করিতে যে তিনি যত্ন করিবেন তাহারও আভাষ দিয়াছেন। যাহা হউক এতদিনে গবর্মেণ্ট যে কংগ্রেসকে গ্রাহ্য করিলেন, ইহাই আমাদের পরম লাভ বলিতে হইবে।

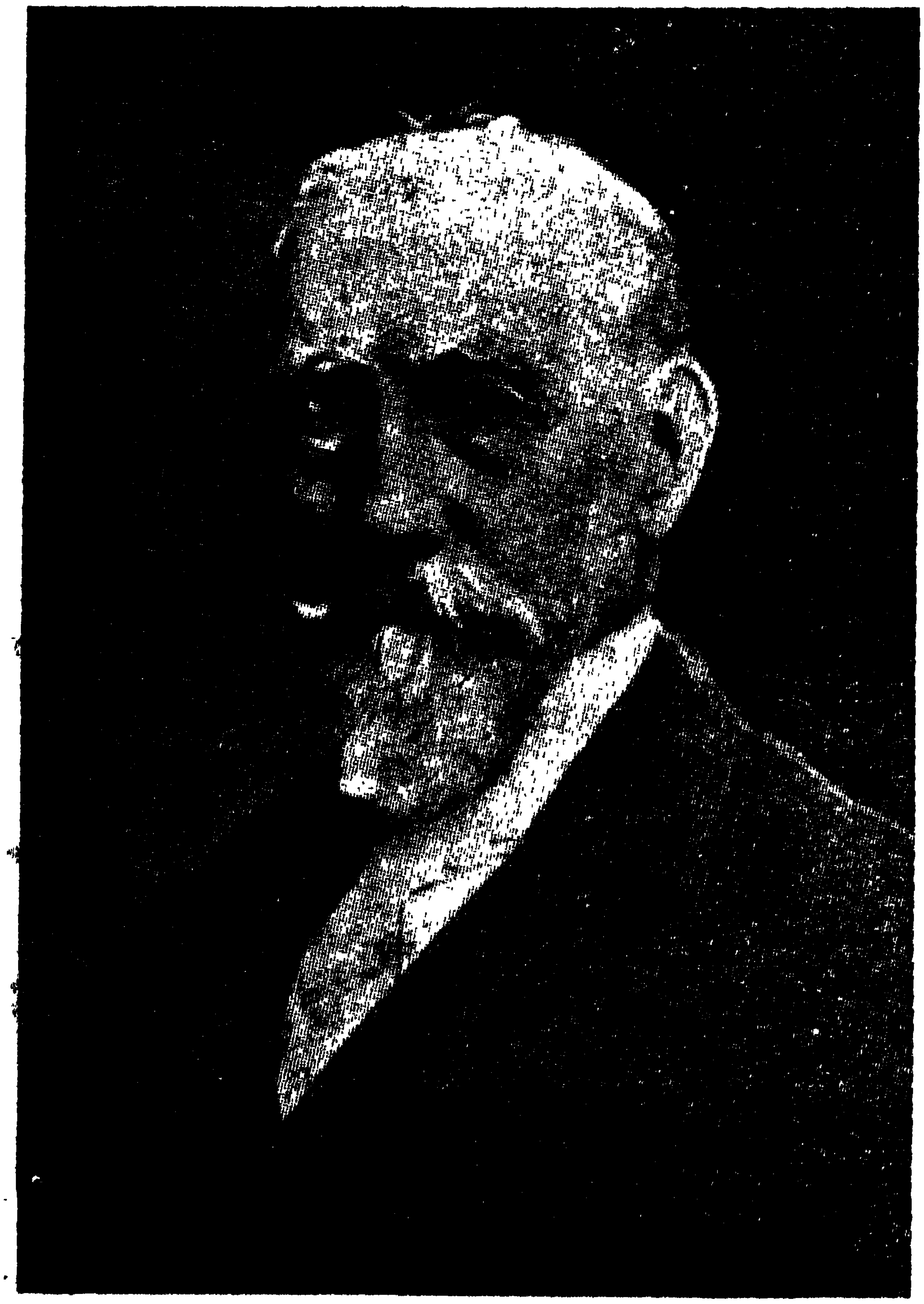

সার উইলিয়ম ওয়েদারবর্ণ।

জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনের পরে শিল্পসমিতি, হিন্দুমুসলমান মিলনসমিতি, সমাজ সংস্কার সমিতি, নারী সমিতি ও আরও দুই একটি সমিতির অধিবেশন হয়। শিল্প সমিতির সভাপতি হইয়া শ্রদ্ধেয় শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাঁহার সকল কথার সহিত আমরা একমত হইতে না পারিলেও, তাহা তাঁহার ন্যায় বিজ্ঞ ব্যবসাবিশারদের যোগ্যই হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার দুইটি প্রস্তাব বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। একটি সমগ্র ভারতের জন্য এক বিরাট শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা;

অপরটি ভারতের অর্থহীন নূতন শিল্পের রক্ষার জন্য গবর্মেণ্টের সাহায্য। এরূপ একটা শিল্প বিদ্যালয়ের যে নিতান্তই আবশ্যক সে কথা বলাই বাহুল্য। শিল্পোন্নতি ভিন্ন ভারতবাসীর আত্মরক্ষার আর অন্য উপায় নাই। গবর্মেণ্টও এ বিষয়ে যে বিশেষ উৎসাহী সে কথা বলা যায় না। সুতরাং আমাদের জাতীয় চেষ্টায় এরূপ একটা ব্যবস্থা না করিলে দেশের হাহাকার ও অধঃপতন অনিবার্য্য।

আমাদের ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে গবর্মেণ্টের সাহায্য করা সম্বন্ধে আমাদের নূতন বলিবার কিছুই নাই। রাজেন্দ্রবাবু যাহা বলিয়াছেন গবর্মেণ্টের জ্ঞানোৎপাদনের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। লর্ড হার্ডিং তাঁহার শাসন কালে যদি এরূপ একটা সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়া যান, তাহা হইলে ভারতে তাঁহার কীর্ত্তি অমর হইয়া থাকিবে।

শ্রীমতী সরলা দেবী প্রবর্ত্তিত ভারতে নারীজাতির অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য যে নারীসমিতির অধিবেশন হইয়াছিল, বিজয়নগ্রামের রাণী তাহার অধিনায়িকা হইয়াছিলেন। নারীজাতির কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তিনি যে বক্তৃতাটি করিয়াছেন তাহা হৃদয়গ্রাহী। আমাদের দেশের উচ্চপদস্থা মহিলারা যে স্বজাতির উদ্ধার কল্পে এরূপ আগ্রহের সহিত অগ্রসর হইয়াছেন, ইহা দেশের পক্ষে সুলক্ষণ। বস্তুত দেশে নারীসমাজ যতদিন শিক্ষায়, জ্ঞানে, কর্ম্মে ও ধর্ম্মে উন্নতিলাভ না করিবে ততদিন আমাদের উন্নতির চেষ্টা কেবল ভিত্তিহীন প্রাসাদের কল্পনা মাত্র।

সার উইলিয়াম ওয়েদারবর্ণ স্বদেশ প্রত্যাগমনের পূর্ব্বদিন বঙ্গ-শিল্প-বিদ্যালয় (Bengal Technical Institute) পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা দেখিয়া তিনি অতিশয় প্রীত হইয়াছেন। নিম্নের চিত্রটি বিদ্যালয়েই লওয়া হয়। মধ্যে সার উইলিয়ম, দক্ষিণে তাঁহার সহচরী নার্স ও সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়; বামে অনারেবল মদনমোহন মালব্য ও অনারেবল গঙ্গাপ্রসাদ বর্ম্মা। পশ্চাতে গুরুদাস বাবুর দিক হইতে প্রথমে অনারেবল দেবপ্রসাদ

সর্ব্বাধিকারী, পরে শ্রীযুক্ত সদানন্দ বসু, শ্রীযুক্ত পৃথ্বীশচন্দ্র রায়, ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিক, বিদ্যালয়ের একজন কর্ম্মচারী, মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত ঋষিবর মুখোপাধ্যায় ও বিদ্যালয়ের ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় দণ্ডায়মান। সার উইলিয়মের শরীর এতই অসুস্থ যে একজন 'নার্স'কে সঙ্গে লইয়া ভারতে আসিতে হইয়াছে।

অন্তঃপুর প্রসঙ্গ।

ইংলণ্ড ও আমেরিকায় সন্তান পালন।

টাইম্‌স্ নামক বিখ্যাত সংবাদপত্রের লেখক বলেন, সন্তানপালন সম্বন্ধে ইংলণ্ড আমেরিকায় প্রভেদ এই যে, ইংলণ্ডে পুত্রের এবং আমেরিকায় কন্যার প্রতি সমধিক যত্ন প্রকাশ করা হয়। কিসে কন্যাটি সুখে থাকিবে, কেমন করিয়া নিত্য নূতন আমোদ উপভোগ করিতে পারিবে, আমেরিকায় পিতামাতার ইহাই বিশেষ চেষ্টা। কন্যার উপর সেখানে প্রায় কোন কর্ত্তব্যের গুরুভার অর্পণ করা হয় না, তাহার আনন্দবিধানের জন্য পরিবারের সকলেই সর্ব্বদা সচেষ্টিত থাকেন।

আমেরিকায় বালিকা-জীবন দুই অংশে বিভক্ত, এক বিশ্ববিদ্যালয়ের—দ্বিতীয় সামাজিক। এই দুই জীবন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যাঁহারা সামাজিক জীবনযাপনে মনোনিবেশ করেন তাঁহাদের সময় অতি লঘুভাবেই কাটিয়া যায়। কিসে লোকপ্রিয় হওয়া যায় স্ত্রীলোক মাত্রেরই তাহা সহজসংস্কারবশতঃ বুঝিতে বিলম্ব হয় না এবং সেই লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া সমাজপ্রিয় রমণী আপন বুদ্ধি এবং চেষ্টাকে নিয়োজিত করেন। কোন্ পরিচ্ছদ কেমন ভাবে পরিলে সুন্দর দেখাইবে, কোন বিষয়ের আলোচনায় অতিথি অভ্যাগতকে সমধিক প্রীতিদান করিতে পারা যাইবে ইহাই তাঁহার বিশেষ ধ্যান ধারণার বিষয় হইয়া থাকে। স্বভাবতঃই তাঁহার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ এবং প্রকৃতি প্রফুল্ল, তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া বড়ই আনন্দলাভ করা যায়। বেশবিন্যাসবিষয়ে যে রীতি সর্ব্বাপেক্ষা নূতন তিনি তাহারই অনুকরণ করিয়া থাকেন; বাক্য ব্যবহারে তাঁহার চতুরতা, উত্তর প্রত্যুত্তরে ক্ষিপ্রকৌশল দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। তিনি যে কেবলমাত্র সুন্দর এবং মূল্যবান পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকেন; এমন নয় প্রত্যেক সামান্য খুঁটিনাটির প্রতি মনোযোগ দান করেন, এই নিমিত্ত যখন সাজিয়া বাহিরে আসেন তখন তাঁহাকে একখানি জীবন্ত ছবির মত দেখায়। যেখানেই দৃষ্টি পড়ে সেখানেই সৌন্দর্য্য ও সামঞ্জস্য দেখিয়া মোহিত হইতে হয়। ইংরাজ মহিলা বর্ণসৌকুমার্য্যে, কেশের প্রাচুর্য্যে, এবং স্বাস্থ্যের লালিত্যে আমেরিকার রমণীদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াও সাজসজ্জায় তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন না। সাজিয়া দুইজনে পাশাপাশি দাঁড়াইলে আমেরিকা মহিলাকে অধিকতর মনোরমা দেখায়। সামাজিক জীবনের পারদর্শিতাতে ইহারা ইংরাজ মহিলাকে পরাস্ত করিয়া থাকেন। জীবনের অধিকাংশ সময় নগর হইতে দূরে অবস্থান জন্য ইংরাজ বালিকা বহুকাল অবধি একটু অধিক লজ্জা কাতর থাকে, এবং সমাজে যে সহজ প্রফুল্ল চতুর কুশল ব্যবহার আদৃত তাহাতে অভ্যস্ত হইতে কিছুকাল তাহার বিলম্ব হয়। নগর হইতে দূরে নিস্তব্ধ প্রাকৃতিক দৃশ্যে সুন্দর পল্লীগ্রামে বাস করিয়া যদিও ইংরাজবালিকারা নিয়ত নগরবাসিনী আমেরিকা বালিকার চটুলতা লাভ করে না, তবুও এই পল্লীবাসের জন্য আজীবনকাল তাহারা প্রকৃতির সহিত একটি মধুর সম্বন্ধে গ্রথিত থাকে, আকাশ বাতাস, সুন্দরী তটিনী, পুষ্পপল্লব, পাখীর আনন্দগান চিরদিনই তাহাদিগকে আকৃষ্ট এবং আনন্দিত করে। বাল্যাবধি প্রত্যেক বালিকাকেই কোন না কোন লোকহিতকর কার্য্যে সংসৃষ্ট থাকিতে হয় বলিয়া তাহাদের স্বভাব দয়াদাক্ষিণ্য এবং পরদুঃখকাতরতায় শোভিত হয়। আমেরিকায় যাঁহারা লোকহিতকর কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করেন তাঁহারা উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত স্বতন্ত্র একটি সম্প্রদায়,—তাঁহারা জীবনের জন্য সকল

কর্ত্তব্যই প্রত্যাখ্যান করিয়া থাকেন। আমেরিকার রমণী সমাজে যে সকল পুরুষের সংসর্গে আসেন প্রায় তাহাদের সকলেরি তীক্ষ্ণ বাণিজ্য বুদ্ধি, এই আলাপ পরিচয়ের ফলে রমণীগণের বিষয় বুদ্ধি পরিণত হইয়া উঠে—তাঁহারা সুচারু নিপুণতার সহিত আপন আপন বিষয় কর্ম্ম চালাইয়া থাকেন। যদিও ধনলাভই তাঁহাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে তবুও সাধারণ্যে প্রতিপত্তি লাভ যে তাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য ইহা অস্বীকার করা যায় না। দেশ ভ্রমণের উৎসাহে, নিত্য নূতনের আকাঙ্ক্ষায় চঞ্চল হইয়া তাঁহারা কত স্থানে উপনিবেশ স্থাপনের নেতা হইয়াছেন, কেবলমাত্র ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে হৃদয়ের সহানুভূতি এবং আবিষ্কারকৌতূহল সংযত করিয়া রাখা তাঁহাদের স্বভাব নয়, তাঁহাদের দয়া সর্ব্বত্র ব্যাপিনী। ইউরোপ, আফ্রিকা, অতি সুদূরতম দেশেও তাঁহাদের হৃদয়ের সমবেদনা প্রসারিত হইয়া যায়, রোগ শোকদারিদ্র্যে মুক্তহস্তে দান করিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত হয়েন না। ইংরাজ মহিলাগণ রাজনীতি এবং ব্যায়ামের বিশেষ পক্ষপাতী, তাঁহাদের স্বাস্থ্যময় জীবন এবং নির্ম্মল চিত্তবৃত্তি সকল এই পক্ষপাতিতার বিশেষ সহায়।

আমেরিকার রমণী স্বভাবতঃই ইংরাজ রমণীগণের অপেক্ষা স্থিরচিত্ত, সহসা কোন বিষয়ে উত্তেজিত হওয়া কিম্বা অধিক ভালবাসায় কাতর হওয়া তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ, পুরুষের সহিত তাহাদের প্রণয় অপেক্ষা বন্ধুত্বের সম্বন্ধই সুলভ। আমেরিকা দেশের পুরুষগণ তাঁহাদিগকে সিংহাসনস্থিত দেবতার ন্যায় স্বতন্ত্র এবং উন্নততর লোকবাসীর ন্যায় ভক্তি করিয়া থাকেন। যদিও অস্বীকার করিবেন তবুও মনে হয় স্ত্রীলোক সম্বন্ধে এখনও তাঁহাদের ধারণা মধ্যযুগের অনুরূপ। আর এক বিষয়ে ইংরাজ এবং আমেরিকাবাসীর বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য হয়। বিবাহের পূর্ব্বে ইংরাজ মহিলার সহিত তাঁহার ভাবী স্বামীর দেখা সাক্ষাৎ তেমন অধিক হয় না। কিন্তু বিবাহের পর স্ত্রী সর্ব্ববিষয়ে গৃহে, সমাজে, সাধারণে তাহার সহযোগিনী, সহধর্ম্মিনী এবং সহায়স্বরূপা। কিন্তু আমেরিকায় বিবাহের পূর্ব্বে বাকদত্ত স্ত্রীপুরুষের বন্ধুত্ব সুদৃঢ়, আমোদ প্রমোদ কিম্বা কর্ত্তব্য কার্য্যে সর্ব্বদাই উভয়ে উভয়ের সহায়ক, কিন্তু বিবাহের পর তাঁহাদের এ সম্বন্ধ আর থাকে না, উভয়ের জীবন যেন স্বতন্ত্র হইয়া যায়। স্বামী আপন ব্যবসায় বাণিজ্যে একেবারে নিমগ্ন হইয়া থাকেন এবং স্ত্রী গৃহকার্য্যের অবসরকাল সামাজিক আমোদে অতিবাহিত করেন—তখন আর তাঁহাদের উভয়ের সাধারণ পারিবারিক জীবন থাকে না। বিবেচনা করিয়া দেখিলে মনে হয় স্বামীর দোষেই এরূপ ঘটিয়া থাকে। কেননা স্ত্রীকে তিনি কোন কঠিন কর্ত্তব্যের সহভাগিনী না করিয়া তাঁহাকে খেলার পুতুলের মত সুন্দর করিয়া সাজাইয়াই সুখী হন। স্ত্রী স্বামীর জীবনের কোন দায়ীত্বের অংশই বহন করেন না, স্বামীর আয় ব্যয় বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ—কেবল আবশ্যক সময়ে যথেষ্ট টাকা পাইয়া থাকেন মাত্র। আমেরিকার রমণী আপনাদিগকে স্বাধীন মনে করিয়া যতই গৌরব অনুভব করুন না কেন কিন্তু একটু বুঝিয়া দেখিলেই স্পষ্ট প্রকাশ পাইবে, তিনি নিতান্তই পরাধীন; কেননা একটিমাত্র পয়সার জন্যও তাঁহাকে স্বামীর নিকট হাত পাতিতে হয়। কিন্তু প্রত্যেক ভদ্র ইংরাজ মহিলা বিবাহ সময়ে সম্পত্তি লাভ করেন।

আমেরিকার রমণীগণ তাঁহাদের তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সুন্দর হৃদয় বৃত্তি, এবং উন্নত শিক্ষার অধিকারী হইয়াও ভবিষ্যৎ জাতীয় জীবনের উন্নতিসাধন করিতে পারিবেন না ইহা অসম্ভব মনে হয়। বর্ত্তমানে যদিও তাঁহাদের এই সকল গুণ ব্যর্থ এবং অপব্যয়িত হইতেছে, তবে নিরাশ হইবার কারণ নাই, এখনই কতকগুলি চিহ্ন দেখা যাইতেছে যাহা হইতে মনে হয় তাঁহারা আর অধিক দিন কর্ত্তব্যবিমুখ থাকিবেন না; নিকট ভবিষ্যতে তাঁহাদের সৌন্দর্য্য, নিঃস্বার্থ সেবা, উন্নততর চেষ্টা, জাতীয় জীবনে নবীন যুগ আনয়ন করিবে।

শ্রীমতী প্র।

আসামে খাসীদিগের মধ্যে নারীর প্রাধান্য।

ভারতের অনেক আদিম পার্ব্বত্য অধিবাসীদের মধ্যে সামাজিক বিষয়ে নারীদিগের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। খাসীদিগের মধ্যে এই নীতিটা কিছু অধিক প্রবল। তাহাদের মধ্যে বিষয়ের উত্তরাধিকারস্বত্ব নারীর দিক হইতেই নামিয়া আসে। ইহাদের মধ্যে বিবাহপ্রথা যেমন সরল, বিবাহভঙ্গও সেইরূপ সহজ। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্বন্ধচ্ছেদের আবশ্যক হইলে সেই মর্ম্মে প্রথমে একটা সাধারণ ঘোষণাপ্রচারিত হয়। পরে পুরুষটি তাহার স্ত্রীকে সামান্য পাঁচটি মুদ্রা দেয়, স্ত্রী আর পাঁচটি মুদ্রা সমেত তাহা স্বামীকে ফিরাইয়া দেয়। স্বামী সেইগুলি লইয়া ছড়াইয়া ফেলিয়া দিবা মাত্র উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ-চ্ছেদ সম্পূর্ণ হয়। খাসীদের মধ্যে ৩৫ বা ৪০ বৎসরের একজন পুরুষ ৩৭ বার বিবাহ করিয়াছে এরূপ লোক অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। স্বনামধন্য পূর্ব্ববঙ্গের লাট ফুলার সাহেব তাঁহার ভারত সম্বন্ধে নূতন পুস্তকে খাসীদের বিষয়ে অনেক কথা লিখিয়াছেন। মাতা-মহীই খাসী-পরিবারের প্রধান ব্যক্তি। খাসীরা পত্রের শেষে নাম লিখিবার সময়ে লিখিয়া থাকে—"তোমার আন্তরিক বন্ধু—মেরি য়্যানের পিতা।" ফুলার সাহেব বলেন খাসীদের সহিত তিব্বত বা ব্রহ্মের লোকের কোন সাদৃশ্যই নাই। তাহারা ভারতব্যাপী একটা বহু প্রাচীন জাতির অবশিষ্ট অংশ মাত্র। ইহাদের ধর্ম্ম বিশ্বাস আসামের অন্যান্য পার্ব্বত্যজাতিরই প্রায় অনুরূপ, কিন্তু তাহাদের একটি সংস্কারের বিশেষত্ব আছে। তাহাদের মধ্যে প্রবাদ আছে যে এক সময়ে এক অজগর সর্প বা থ্লেন অসংখ্য মনুষ্য ও পশুকে হত্যা করিতে আরম্ভ করে। অবশেষে এক অসম-সাহসী খাসী তাহাকে নানা কৌশলে হত্যা করে। তখন খাসীরা সেই সর্পকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া আহার করে। অসাবধানতাবশতঃ একটা ক্ষুদ্র মাংস খণ্ড অভুক্ত ছিল। সেই খণ্ড হইতে আবার অসংখ্য 'থ্লেনের' জন্ম হইল। এক একটি 'থ্লেন' এক একটি পরিবার মধ্যে আশ্রয় লইল। খাসীদিগের বিশ্বাস যে নরবলির দ্বারা এই সকল বাস্তু 'থ্লেন'কে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে গৃহস্থের সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়। এই সংস্কারের ফলে তাহারা যে কত ভীষণ নরহত্যা করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আজ কাল তাহারা অনেকেই সভ্য শান্ত হইতেছে। খৃষ্টান ধর্ম্মপ্রচারকগণ তাহাদের মধ্যে অনেককেই খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছেন। শ্রীভঃ।

শিল্পসমিতির দানপ্রাপ্তি।

পূর্ব্বের জের	৯৯॥০	শ্রীমতী মণিকুন্তলা রায়	২৲
শ্রীযুক্ত সুকুমার পাকড়াশী	১৲	" সৌদামিনী রায়	১৲
শ্রীমতী কিরণশশী দেবী	১৲	" পুষ্পবিহারিণী দাসী	১৲
অনেক ভদ্রমহিলা	২০৲	" হরিপ্রিয়া মিত্রা	১৲
মিসেস এন, চৌধুরী	২৲	" ইন্দিরাকুমারী রায়	৭৲
শ্রীমতী প্রতিভাময়ী রায়	১৲		১৩৫॥০

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৪৪, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

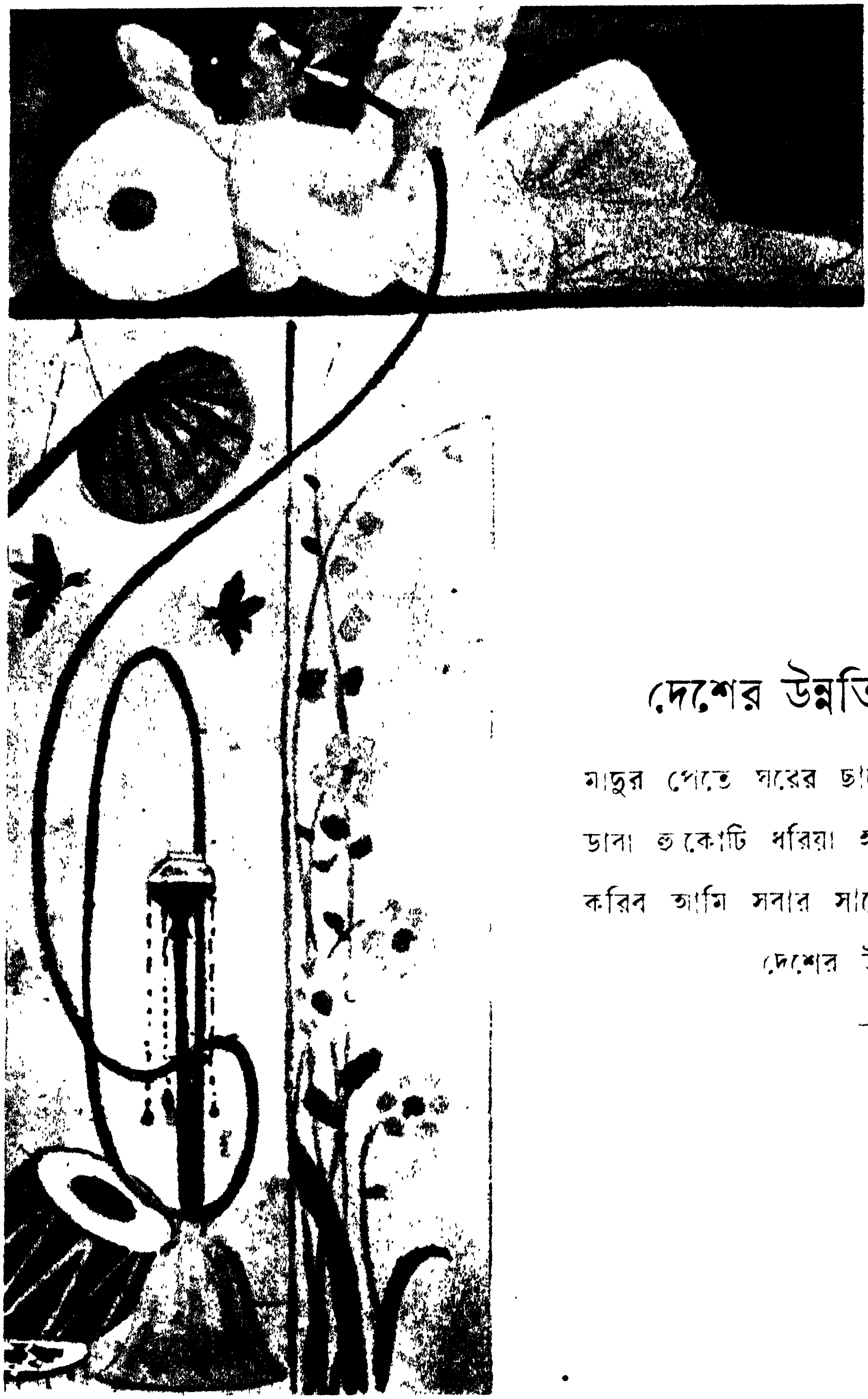

দেশের উন্নতি

মাদুর পেতে ঘরের ছাতে
ডাবা হুঁকোটি ধরিয়া হাতে
করিব আমি সবার সাথে
দেশের উপকার।

— রবীন্দ্রনাথ

শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় অঙ্কিত চিত্র হইতে।

ইউ, রায় কর্ত্তৃক ব্লক [কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত

৩৪শ বর্ষ] ফাল্গুন, ১৩১৭ [১১শ সংখ্যা

কর্ম্মযোগ।

জগতে আনন্দযজ্ঞে তাঁর যে নিমন্ত্রণ আমরা আমাদের জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই পেয়েছি তাকে আমাদের কেউ কেউ স্বীকার করতে চাচ্চে না। তারা বিজ্ঞানশাস্ত্র আলোচনা করে দেখেছে। তারা বিশ্বের সমস্ত রহস্য উদ্ঘাটন করে এমন একটা জায়গায় গিয়ে ঠেকেছে যেখানে সমস্তই কেবল নিয়ম। তারা বল্‌চে ফাঁকি ধরা পড়ে গেছে—দেখচি, যা কিছু সব নিয়মেই চল্‌চে এর মধ্যে আনন্দ কোথায়? তারা আমাদের উৎসবের আনন্দরব শুনে দূরে বসে মনে মনে হাস্‌চে।

সূর্য্যচন্দ্র এমনি ঠিক নিয়মে উঠ্‌চে অস্ত যাচ্চে যে, মনে হচ্চে তারা যেন ভয়ে চল্‌চে পাছে এক পল-বিপলেরও ত্রুটি ঘটে। বাতাসকে বাইরে থেকে যতই স্বাধীন বলে মনে হয় যারা ভিতরকার খবর রাখে তারা জানে ওর মধ্যেও পাগলামি কিছুই নেই—সমস্তই নিয়মে বাঁধা। এমন কি, পৃথিবীতে সব চেয়ে খামখেয়ালি বলে যাকে মনে হয়, সেই মৃত্যু, যার আনাগোনার কোনো খবর পাইনে বলে যাকে হঠাৎ ঘরের দরজার সাম্‌নে দেখে আমরা চম্‌কে উঠি তাকেও জোড় হাতে নিয়ম পালন করে চল্‌তে হয় একটুও পদস্খলন হবার জো নেই।

মনে কোরো না এই গূঢ় খবরটা কেবল বৈজ্ঞানিকের কাছেই ধরা পড়েছে। তপোবনের ঋষি বলেছেন—"ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে"—তাঁর ভয়ে, তাঁর নিয়মের অমোঘ শাসনে বাতাস বইছে; বাতাসও মুক্ত নয়—"ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ"—তাঁর নিয়মের অমোঘ শাসনে কেবল যে অগ্নি চন্দ্রসূর্য্য চল্‌চে তা নয়, স্বয়ং মৃত্যু, যে কেবল বন্ধন কাট্‌বার জন্যেই আছে, যার নিজের কোনো বন্ধন আছে বলে মনেও হয় না সেও অমোঘ নিয়মকে একান্ত ভয়ে পালন করে চল্‌চে।

তবে ত দেখ্‌চি ভয়েই সমস্ত চল্‌চে কোথাও একটু ফাঁক নেই। তবে আর আনন্দের কথাটা কেন? যেখানে কারখানা ঘরে আগাগোড়া কল চল্‌চে সেখানে কোনো পাগল আনন্দের দরবার করতে যায় না।

বাঁশিতে তবু ত আজ আনন্দের সুর উঠেছে এ কথা ত কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। মানুষকে ত মানুষ এমন করে ডাকে, বলে চল্ ভাই আনন্দ করবি চল্! এই নিয়মের রাজ্যে এমন কথাটা তার মুখ দিয়ে বের হয় কেন?

সে দেখ্‌তে পাচ্চে, নিয়মের কঠিন দণ্ড

একেবারে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে; কিন্তু তাকে জড়িয়ে জড়িয়ে তাকে আচ্ছন্ন করে যে লতাটি উঠেছে তাতে কি আমরা কোনো ফুল ফুটতে দেখিনি? দেখিনি কি কোথাও শ্রী এবং শান্তি, সৌন্দর্য্য এবং ঐশ্বর্য্য? দেখ্‌চিনে কি প্রাণের লীলা, গতির নৃত্য, বৈচিত্র্যের অজস্রতা?

বিশ্বের নিয়ম সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকেই চরমরূপে প্রচার করচে না—একটি অনির্ব্বচনীয়ের পরিচয় তাকে চারিদিকে আচ্ছন্ন করে প্রকাশ পাচ্চে। সেই জন্যেই, যে উপনিষৎ একবার বলেছেন, অমোঘ শাসনের ভয়ে যা কিছু সমস্ত চলেছে, তিনিই আবার বলেছেন "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি জায়ন্তে" আনন্দ থেকেই এই যা-কিছু সমস্ত জন্মাচ্চে। যিনি আনন্দস্বরূপ মুক্ত, তিনিই নিয়মের বন্ধনের মধ্য দিয়ে দেশকালে আপনাকে প্রকাশ করচেন।

কবির মুক্ত আনন্দ আপনাকে প্রকাশ করবার বেলায় ছন্দের বাঁধন মানে। কিন্তু যে লোকের নিজের মনের মধ্যে ভাবের উদ্বোধন হয়নি, সে বলে, এর মধ্যে আগাগোড়া কেবল ছন্দের ব্যায়ামই দেখ্‌চি। সে নিয়ম দেখে, নৈপুণ্য দেখে, কেননা সেইটেই চোখে দেখা যায়—কিন্তু যাকে অন্তর দিয়ে দেখা যায় সেই রসকে সে বোঝে না—সে বলে রস কিছুই নেই সে মাথা নেড়ে বল্‌চে, সমস্তই যন্ত্র, কেবল বৈজ্ঞানিক নিয়ম।

কিন্তু ঐ যে কার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ এমন নিতান্ত সহজ সুরে বলে উঠেছে—রসো বৈ সঃ। কবির কাব্যে তিনি যে অনন্ত রস দেখ্‌তে পাচ্চেন। জগতের নিয়ম ত তাঁর কাছে আপনার বন্ধনের রূপ দেখাচ্চে না, তিনি যে একেবারে নিয়মের চরমকে দেখে আনন্দে বলে উঠেছেন—"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।" জগতে তিনি ভয়কে দেখ্‌চেন না, আনন্দকেই দেখ্‌চেন সেই জন্যেই বল্‌চেন "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন" ব্রহ্মের আনন্দকে যিনি সর্ব্বত্র জান্‌তে পেরেছেন তিনি আর কিছুতেই ভয় পান না। এমনি করে জগতে আনন্দকে দেখে প্রত্যক্ষ ভয়কে যিনি একেবারেই অস্বীকার করেছেন—তিনিই বলেছেন "মহদ্‌ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতৎ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি" এই মহদ্‌ভয়কে এই উদ্যত বজ্রকে যারা জানেন তাঁদের আর মৃত্যুভয় থাকে না।

যারা জেনেছে, ভয়ের মধ্য দিয়েই অভয়, নিয়মের মধ্য দিয়েই আনন্দ আপনাকে প্রকাশ করেন তারাই নিয়মকে পার হয়ে চলে গেছে। নিয়মের বন্ধন তাদের পক্ষে নেই যে তা নয় কিন্তু সে যে আনন্দেরই বন্ধন,—সে যে প্রেমিকের পক্ষে প্রিয়তমের ভুজবন্ধনের মত; তাতে দুঃখ নেই, কোনো দুঃখ নেই। সকল বন্ধনই সে যে খুসি হয়ে গ্রহণ করে, কোনোটাকেই এড়াতে চায় না, কেননা সমস্ত বন্ধনের মধ্যেই সে যে আনন্দের নিবিড় স্পর্শ উপলব্ধি করতে থাকে। বস্তুত যেখানে নিয়ম নেই, যেখানে উচ্ছৃঙ্খল উন্মত্ততা, সেইখানেই তাকে বাধে, তাকে মারে, সেইখানেই অসীমের সঙ্গে বিচ্ছেদ, পাপের যন্ত্রণা। প্রবৃত্তির আকর্ষণে সত্যের সুদৃঢ় নিয়মবন্ধন থেকে যখন সে স্খলিত হয়ে পড়ে তখনি সে মাতার আলিঙ্গনভ্রষ্ট

শিশুর মত কেঁদে উঠে বলে "মা মা হিংসীঃ," আমাকে আঘাত কোরোনা। সে বলে বাঁধো, আমাকে বাঁধো, তোমার নিয়মে আমাকে বাঁধো, অন্তরে বাধো, বাহিরে বাঁধো, আমাকে আচ্ছন্ন করে, আবৃত করে বেধে রাখো, কোথাও কিছু ফাঁক রেখোনা—শক্ত করে ধর, তোমারই নিয়মের বাহুপাশে বাঁধা পড়ে তোমার আনন্দের সঙ্গে জড়িত হয়ে থাকি—আমাকে পাপের মৃত্যুবন্ধন থেকে টেনে নিয়ে তুমি দৃঢ় করে রক্ষা কর।

নিয়মকে আনন্দের বিপরীত জ্ঞান ক'রে কেউ কেউ যেমন মাৎলামিকেই আনন্দ বলে ভুল করে তেমনি আমাদের দেশে এমন লোক প্রায় দেখা যায় যাঁরা কর্ম্মকে মুক্তির বিপরীত বলে কল্পনা করেন। তাঁরা মনে করেন কর্ম্ম পদার্থটা স্থূল, ওটা আত্মার পক্ষে বন্ধন।

কিন্তু এই কথা মনে রাখতে হবে নিয়মেই যেমন আনন্দের প্রকাশ, কর্ম্মেই তেমনি আত্মার মুক্তি। আপনার ভিতরেই আপনার প্রকাশ হতে পারে না বলেই আনন্দ বাহিরের নিয়মকে ইচ্ছা করে, তেমনি আপনার ভিতরেই আপনার মুক্তি হতে পারে না বলেই আত্মা মুক্তির জন্যে বাহিরের কর্ম্মকে চায়। মানুষের আত্মা কর্ম্মেই আপনার ভিতর থেকে আপনাকে মুক্ত করচে, তাই যদি না হত তাহলে কখনই সে ইচ্ছা করে কর্ম্ম করত না।

মানুষ যতই কর্ম্ম করচে ততই সে আপনার ভিতরকার অদৃশ্যকে দৃশ্য করে তুলচে, ততই যে আপনার সুদূরবর্ত্তী অনাগতকে এগিয়ে নিয়ে আসচে। এই উপায়ে মানুষ আপনাকে কেবলি স্পষ্ট করে তুলচে—মানুষ আপনার নানা কর্ম্মের মধ্যে রাষ্ট্রের মধ্যে সমাজের মধ্যে আপনাকেই নানাদিক থেকে দেখতে পাচ্চে।

এই দেখতে পাওয়াই মুক্তি। অন্ধকার মুক্তি নয়, অস্পষ্টতা মুক্তি নয়। অস্পষ্টতার মত ভয়ঙ্কর বন্ধন নেই। অস্পষ্টতাকে ভেদ করে উঠবার জন্যেই বীজের মধ্যে অঙ্কুরের চেষ্টা, কুঁড়ির মধ্যে ফুলের চেষ্টা। অস্পষ্টতার আবরণকে ভেদ করে সুপরিস্ফুট হবার জন্যেই আমাদের চিত্তের ভিতরকার ভাবরাশি বাইরে আকার গ্রহণের উপলক্ষ্য খুঁজে বেড়াচ্চে। আমাদের আত্মাও অনির্দ্দিষ্টতার কুহেলিকা থেকে আপনাকে মুক্ত করে বাইরে আনবার জন্যেই কেবলি কর্ম্ম সৃষ্টি করচে। যে কর্ম্মে তার কোনো প্রয়োজনই নেই, যা তার জীবনযাত্রার পক্ষে আবশ্যক নয় তাকেও কেবলি সে তৈরি করে তুলচে। কেননা সে মুক্তি চায়। সে আপনার অন্তরাচ্ছাদন থেকে মুক্তি চায়, সে আপনার অরূপের আবরণ থেকে মুক্তি চায়। সে আপনাকে দেখতে চায়, পেতে চায়। ঝোপঝাড় কেটে সে যখন বাগান তৈরি করে তখন কুরূপতার মধ্য থেকে সে যে সৌন্দর্য্যকে মুক্ত করে তোলে সে তার নিজেরই ভিতরকার সৌন্দর্য্য—বাইরে তাকে মুক্তি দিতে না পারলে অন্তরেও সে মুক্তি পায় না। সমাজের যথেচ্ছাচারের মধ্যে সুনিয়ম স্থাপন করে অকল্যাণের বাধার ভিতর থেকে যে কল্যাণকে সে মুক্তি দান করে, সে তারই নিজের ভিতরকার কল্যাণ—বাইরে তাকে মুক্তি দিতে না পারলে অন্তরেও সে মুক্তিলাভ করেনা। এমনি করে মানুষ নিজের শক্তিকে, সৌন্দর্য্যকে, মঙ্গলকে, নিজের

আত্মাকে নানাবিধ কর্ম্মের ভিতরে কেবলি বন্ধনমুক্ত করে দিচ্চে। যতই তাই করচে, ততই আপনাকে মহৎ করে দেখ্‌তে পাচ্চে—ততই তার আত্মপরিচয় বিস্তীর্ণ হয়ে যাচ্চে।

উপনিষৎ বলেছেন—"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ"—কর্ম্ম করতে করতেই শত বৎসর বেঁচে থাক্‌তে ইচ্ছা করবে। যাঁরা আত্মার আনন্দকে প্রচুররূপে উপলব্ধি করেছেন এ হচ্চে তাঁদেরই বাণী। যাঁরা আত্মাকে পরিপূর্ণ করে জেনেছেন তাঁরা কোনোদিন দুর্ব্বল মুহ্যমানভাবে বলেননা, জীবন দুঃখময় এবং কর্ম্ম কেবলি বন্ধন। দুর্ব্বল ফুল যেমন বোঁটাকে আলগা করে ধরে এবং ফল ফলবার পূর্ব্বেই খসে যায়—তাঁরা তেমন নন্‌। জীবনকে তাঁরা খুব শক্ত করে ধরেন এবং বলেন, আমি ফল না ফলিয়ে কিছুতেই ছাড়চিনে। তাঁরা সংসারের মধ্যে কর্ম্মের মধ্যে আনন্দে আপনাকে প্রবলভাবে প্রকাশ করবার জন্যে ইচ্ছা করেন। দুঃখ তাপ তাঁদের অবসন্ন করে না, নিজের হৃদয়ের ভারে তাঁরা ধূলিশায়ী হয়ে পড়েন না। সুখ দুঃখ সমস্তের মধ্য দিয়েই তাঁরা আত্মার মাহাত্মাকে উত্তরোত্তর উদ্‌ঘাটিত করে আপনাকে দেখে' এবং আপনাকে দেখিয়ে বিজয়ী বীরের মত সংসারের ভিতর দিয়ে মাথা তুলে চলে যান। বিশ্বজগতে যে শক্তির আনন্দ নিরন্তর ভাঙাগড়ার মধ্যে লীলা করচে—তারই নৃত্যের ছন্দ তাঁদের জীবনের লীলার সঙ্গে তালে তালে মিলে যেতে থাকে;—তাঁদের জীবনের আনন্দের সঙ্গে সূর্য্যালোকের আনন্দ, মুক্ত সমীরণের আনন্দ সুর মিলিয়ে দিয়ে অন্তরবাহিরকে সুধাময় করে তোলে। তাঁরাই বলেন "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ" কাজ করতে করতেই শত বৎসর বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করবে।

মানুষের মধ্যে এই যে জীবনের আনন্দ, এই যে কর্ম্মের আনন্দ আছে, এ অত্যন্ত সত্য। একথা বল্‌তে পারব না এ আমাদের মোহ, একথা বল্‌তে পারব না যে এ'কে ত্যাগ না করলে আমরা ধর্ম্মসাধনার পথে প্রবেশ করতে পারবনা। ধর্ম্মসাধনার সঙ্গে মানুষের কর্ম্মজগতের বিচ্ছেদ ঘটানো কখনই মঙ্গল নয়। বিশ্বমানবের নিরন্তর কর্ম্মচেষ্টাকে তার ইতিহাসের বিরাট ক্ষেত্রে একবার সত্য-দৃষ্টিতে দেখ। যদি তা দেখ তাহলে কর্ম্মকে কি কেবল দুঃখের রূপেই দেখা সম্ভব হবে? তাহলে আমরা দেখ্‌তে পাব কর্ম্মের দুঃখকে মানুষ বহন করচে এ কথা তেমন সত্য নয় যেমন সত্য, কর্ম্মই মানুষের বহু দুঃখ বহন করচে, বহু ভার লাঘব করচে; কর্ম্মের স্রোত প্রতিদিন আমাদের অনেক বিপদ ঠেলে ফেল্‌চে অনেক বিকৃতি ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্চে। এ কথা সত্য নয় যে মানুষ দায়ে পড়ে কর্ম্ম করচে,—তার একদিকে দায় আছে, আর একদিকে সুখও আছে; কর্ম্ম একদিকে অভাবের তাড়নায়, আর এক দিকে স্বভাবের পরিতৃপ্তিতে। এই জন্যেই মানুষ যতই সভ্যতার বিকাশ করচে ততই আপনার নূতন নূতন দায় কেবল বাড়িয়েই চলেছে, ততই নূতন নূতন কর্ম্মকে সে ইচ্ছা করেই সৃষ্টি করচে। প্রকৃতি জোর করে আমাদের কতকগুলো কাজ করিয়ে সচেতন করে রেখেছে—নানা ক্ষুধাতৃষ্ণার তাড়নায় আমাদের যথেষ্ট খাটিয়ে

মারচে। কিন্তু আমাদের মনুষ্যত্বের তাতেও কুলিয়ে উঠ্‌লনা;—পশু পক্ষীর সঙ্গে সমান হয়ে প্রকৃতির ক্ষেত্রে তাকে যে কাজ করতে হচ্ছে তাতেই সে চুপ করে থাক্‌তে পারলে না,—কাজের ভিতর দিয়ে ইচ্ছা করেই সে সবাইকে ছাড়িয়ে যেতে হয়। মানুষের মত কাজ কোনো জীবকে করতে হয় না। আপনার সমাজের মধ্যে একটি অতি বৃহৎ কাজের ক্ষেত্র তাকে নিজে তৈরি করতে হয়েছে; এইখানে কতকাল থেকে সে কত ভাঙচে গড়চে, কত নিয়ম বাধ্‌চে কত নিয়ম ছিন্ন করে দিচ্চে, কত পাথর কাটচে কত পাথর গাঁথচে, কত ভাব্‌চে কত খুঁজ্‌চে কত কাঁদ্‌চে; এই ক্ষেত্রেই তার সকলের চেয়ে বড় বড় লড়াই লড়া হয়ে গেছে; এইখানেই সে নব নব জীবন লাভ করেছে, এইখানেই তার মৃত্যু পরম গৌরবময়; এইখানে সে দুঃখকে এড়াতে চায়নি নূতন নূতন দুঃখকে স্বীকার করেছে; এইখানেই মানুষ সেই মহত্তত্বটি আবিষ্কার করেছে যে, উপস্থিত যা তার চারদিকেই আছে সেই পিঞ্জরটার মধ্যেই মানুষ সম্পূর্ণ নয়, মানুষ আপনার বর্ত্তমানের চেয়ে অনেক বড়, এই জন্যে কোনো একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাক্‌লে তার আরাম হতে পারে কিন্তু তার চরিতার্থতা তাতে একেবারে বিনষ্ট হয়—সেই মহতী বিনষ্টিকে মানুষ সহ্য করতে পারে না—এই জন্যই, তার বর্ত্তমানকে ভেদ করে বড় হবার জন্যই, এখনো সে যা হয়ে ওঠেনি তাই হতে পারবার জন্যেই, মানুষকে কেবলি বারবার দুঃখ পেতে হচ্চে; সেই দুঃখের মধ্যেই মানুষের গৌরব; এই কথা মনে রেখে মানুষ আপনার কর্ম্মক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত করে নি; কেবলি তাকে প্রসারিত করেই চলেছে; অনেক সময় এতদূর পর্য্যন্ত গিয়ে পড়চে যে, কর্ম্মের সার্থকতাকে বিস্মৃত হয়ে যাচ্চে, কর্ম্মের স্রোতে বাহিত আবর্জ্জনার দ্বারা প্রতিহত হয়ে মানবচিত্ত এক একটা কেন্দ্রের চারদিকে ভয়ঙ্কর আবর্ত্ত রচনা করচে, স্বার্থের আবর্ত্ত, সাম্রাজ্যের আবর্ত্ত, ক্ষমতাভিমানের আবর্ত্ত; কিন্তু তবু যতক্ষণ গতিবেগ আছে ততক্ষণ ভয় নেই, সঙ্কীর্ণতার বাধা সেই গতির মুখে ক্রমশই কেটে যায়, কাজের বেগই কাজের ভুলকে সংশোধন করে; কারণ চিত্ত অচল জড়তার মধ্যে নিদ্রিত হয়ে পড়লেই তার শত্রু প্রবল হয়ে ওঠে, বিনাশের সঙ্গে আর সে লড়াই করে উঠ্‌তে পারে না। বেঁচে থেকে কর্ম্ম করতে হবে, কর্ম্ম করে বেঁচে থাক্‌তে হবে এই অনুশাসন আমরা শুনেছি। কর্ম্ম করা এবং বাঁচা, এই দুয়ের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য যোগ আছে।

প্রাণের লক্ষণই হচ্চে এই, যে, আপনার ভিতরটাতেই তার আপনার সীমা নেই; তাকে বাইরে আস্‌তেই হবে। তার সত্য অন্তরে এবং বাহিরের যোগে। দেহকে বেঁচে থাক্‌তে হয় বলেই বাইরের আলো, বাইরের বাতাস, বাইরের অন্নজলের সঙ্গে তাকে নানা যোগ রাখতে হয়। শুধু প্রাণশক্তিকে নেবার জন্যে নয় তাকে দান করবার জন্যেও বাইরেকে দরকার। এই দেখনা কেন, শরীরকে ত নিজের ভিতরের কাজ যথেষ্টই করতে হয়; এক নিমেষও তার হৃৎপিণ্ড থেমে থাকে না, তার মস্তিষ্ক তার পাকযন্ত্রের কাজের অন্ত নেই। তবু দেহটা নিজের ভিতরকার এই অসংখ্য প্রাণের

কাজ করেও স্থির থাক্‌তে পারে না। তার প্রাণই তাকে, বাইরের নানা কাজে এবং নানা খেলায় ছুটিয়ে বেড়ায়। কেবলমাত্র ভিতরের রক্ত চলাচলেই তার তুষ্টি নেই, নানাপ্রকারে বাইরের চলাচলে তার আনন্দ সম্পূর্ণ হয়।

আমাদের চিত্তেরও সেই দশা। কেবল-মাত্র আপনার ভিতরের কল্পনা ভাবনা নিয়ে তার চলে না। বাইরের বিষয়কে সর্ব্বদাই তার চাই—কেবল নিজের চেতনাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে নয়, নিজেকে প্রয়োগ করবার জন্যে—দেবার জন্যে এবং নেবার জন্যে।

আসল কথা, যিনি সত্যস্বরূপ, সেই ব্রহ্মকে ত্যাগ করতে গেলেই আমরা বাঁচিনে। তাঁকে অন্তরেও যেমন আশ্রয় করতে হবে বাইরেও তেমনি আশ্রয় করতে হবে। তাঁকে যেদিকে ত্যাগ করব সেইদিকে নিজেকেই বঞ্চিত করব। মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ—ব্রহ্ম আমাকে ত্যাগ করেননি, আমি যেন ব্রহ্মকে ত্যাগ না করি। তিনি আমাকে বাহিরে ধরে রেখেছেন তিনি আমাকে অন্তরেও জাগিয়ে রেখেছেন। আমরা যদি এমন কথা বলি যে, তাঁকে কেবল অন্তরের ধ্যানে পাব বাইরের কর্ম্ম থেকে তাঁকে বাদ দেব, কেবল হৃদয়ের প্রেমের দ্বারা তাঁকে ভোগ করব বাইরের সেবার দ্বারা তাঁর পূজা করব না—কিম্বা একেবারে এর উল্টো কথাটাই বলি, এবং এই বলে জীবনের সাধনাকে যদি কেবল একদিকেই ভারগ্রস্ত করে তুলি তাহলে প্রমত্ত হয়ে আমাদের পতন ঘটবে।

আমরা পশ্চিম মহাদেশে দেখ্‌চি সেখানে মানুষের চিত্ত প্রধানত বাহিরেই আপনাকে বিকীর্ণ করতে বসেছে। শক্তির ক্ষেত্রই তার ক্ষেত্র। ব্যাপ্তির রাজ্যেই সে একান্ত ঝুঁকে পড়েছে, মানুষের অন্তরের মধ্যে যেখানে সমাপ্তির রাজ্য, সে জায়গাটাকে সে পরিত্যাগ করবার চেষ্টায় আছে, তাকে সে ভাল করে বিশ্বাসই করেনা। এতদূর পর্য্যন্ত গেছে যে সমাপ্তির পূর্ণতাকে সে কোনো জায়গাতেই দেখতে পায় না। যেমন বিজ্ঞান বল্‌চে বিশ্বজগৎ কেবলি পরিণতির অন্তহীন পথে চলেছে তেমনি য়ুরোপ আজকাল বল্‌তে আরম্ভ করেছে, জগতের ঈশ্বরও ক্রমশ পরিণত হয়ে উঠ্‌চেন। তিনি যে নিজে হয়ে আছেন এ তারা মান্‌তে চায় না, তিনি নিজেকে করে তুল্‌চেন এই তাদের কথা।

ব্রহ্মের এক দিকে ব্যাপ্তি আর একদিকে সমাপ্তি; একদিকে পরিণতি, আর একদিকে পরিপূর্ণতা; একদিকে ভাব আর একদিকে প্রকাশ—দুই একসঙ্গে, গান এবং গান গাওয়ার মত অবিচ্ছিন্ন মিলিয়ে আছে এটা তারা দেখতে পাচ্চে না। এ যেন গায়কের অন্তঃকরণকে স্বীকার না করে বলা, যে, গান কোন জায়গাতেই নেই কেবলমাত্র গেয়ে যাওয়াই আছে। কেননা, আমরা যে গেয়ে যাওয়াটাকেই দেখ্‌চি, কোনো সময়েইত সম্পূর্ণ গানটাকে একসঙ্গে দেখ্‌চিনে—কিন্তু তাই বলে কি এটা জানিনে যে সম্পূর্ণ গান চিত্তের মধ্যে আছে?

এমনি করে কেবলমাত্র করে যাওয়া চলে যাওয়ার দিক্‌টাতেই চিত্তকে ঝুঁকে পড়তে দেওয়াতে পাশ্চাত্যজগতে আমরা

একটা শক্তির উন্মত্ততা দেখতে পাই। তারা সমস্তকেই জোর করে কেড়ে নেবে, আঁকড়ে ধরবে এই পণ করে বসে আছে—তারা কেবলই করবে, কোথাও এসে থামবে না, এই তাদের জিদ্—জীবনের কোনো জায়গাতেই তারা মৃত্যুর সহজ স্থানটিকে স্বীকার করে না—সমাপ্তিকে তারা সুন্দর বলে দেখতে জানেনা।

আমাদের দেশে ঠিক এর উল্টো দিকে বিপদ। আমরা চিত্তের ভিতরের দিকটাতেই ঝুঁকে পড়েছি। শক্তির দিককে ব্যাপ্তির দিককে আমরা গাল দিয়ে পরিত্যাগ করতে চাই। ব্রহ্মকে ধ্যানের মধ্যে কেবল পরিসমাপ্তির দিক দিয়েই দেখব তাঁকে বিশ্বব্যাপারে নিত্য পরিণতির দিক দিয়ে দেখব না এই আমাদের পণ। এইজন্য আমাদের দেশে সাধকদের মধ্যে আধ্যাত্মিক উন্মত্ততার দুর্গতি প্রায়ই দেখতে পাই। আমাদের বিশ্বাস কোনো নিয়মকে মানে না, আমাদের কল্পনার কিছুতেই বাধা নেই, আমাদের আচারকে কোনোপ্রকার যুক্তির কাছে কিছুমাত্র জবাবদিহি করতে হয় না। আমাদের জ্ঞান বিশ্বপদার্থ থেকে ব্রহ্মকে অবচ্ছিন্ন করে দেখবার ব্যর্থ প্রয়াস করতে করতে শুকিয়ে পাথর হয়ে যায়, আমাদের হৃদয় কেবলমাত্র আপনার হৃদয়াবেগের মধ্যেই ভগবানকে অবরুদ্ধ করে ভোগ করবার চেষ্টায় রসোন্মত্ততায় মূর্চ্ছিত হয়ে পড়তে থাকে। শক্তির ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞান বিশ্বনিয়মের সঙ্গে কোনো কারবার রাখতে চায় না, স্থাণু হয়ে বসে আপনাকেই আপনি নিরীক্ষণ করতে চায়, আমাদের হৃদয়াবেগ বিশ্বসেবার মধ্যে ভগবৎপ্রেমকে আকার দান করতে চায় না, কেবল অশ্রুজলে আপনার অঙ্গনে ধূলোয় লুটোপুটি করতে ইচ্ছা করে। এতে যে আমাদের মনুষ্যত্বের কতদূর বিকৃতি ও দুর্ব্বলতা ঘটে তা ওজন করে দেখবার কোনো উপায়ও আমাদের ত্রিসীমানায় রাখিনি—আমাদের যে দাঁড়িপাল্লা অন্তর বাহিরের সমস্ত সামঞ্জস্য হারিয়ে ফেলেছে, তাই দিয়েই আমরা আমাদের ধর্ম্মকর্ম্ম ইতিহাস পুরাণ সমাজ সভ্যতা সমস্তকে ওজন করে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকি, আর কোনো প্রকার ওজনের সঙ্গে মিলিয়ে নিখুঁৎভাবে সত্য নির্ণয় করবার কোনো দরকারই দেখিনে। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা অন্তর বাহিরের যোগে অপ্রমত্ত। সত্যের একদিকে নিয়ম, একদিকে আনন্দ। তার একদিকে ধ্বনিত হচ্চে ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি, আর একদিকে ধ্বনিত হচ্চে আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। একদিকে বন্ধনকে না মানলে অন্যদিকে মুক্তি পাবার জো নেই। ব্রহ্ম একদিকে আপনার সত্যের দ্বারা বদ্ধ, আর একদিকে আপনার আনন্দের দ্বারা মুক্ত। আমরাও সত্যের বন্ধনকে যখন সম্পূর্ণ স্বীকার করি তখনি মুক্তির আনন্দকে সম্পূর্ণ লাভ করি।

সে কেমনতর? যেমন সেতারে তার বাঁধা। সেতারের তার যখন একেবারে ঠিক সত্য করে বাঁধা হয়, সেই বন্ধনে স্বরতত্ত্বের নিয়মের যখন লেশমাত্র স্খলন না হয় তখন সেই তারে গান বাজে, এবং সেই গানের সুরের মধ্যেই সেতারের তার আপনাকে আপনি ছাড়িয়ে যায়, সে মুক্তি লাভ করতে থাকে। একদিকে সে নিয়মের

মধ্যে অবিচলিতভাবে বাঁধা পড়েছে বলেই অন্যদিকে সে সঙ্গীতের মধ্যে উদারভাবে উন্মুক্ত হতে পেরেছে। যতক্ষণ এই তার ঠিক সত্য হয়ে বাঁধা হয়নি ততক্ষণ সে কেবলমাত্রই বন্ধন, বন্ধন ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু তাই বলে এই তার খুলে ফেলাকেই মুক্তি বলে না—সাধনার কঠিন নিয়মে ক্রমশই তাকে সত্যে বেঁধে তুল্‌তে পারলেই সে বদ্ধ থেকে এবং বদ্ধ থাকাতেই পরিপূর্ণ সার্থকতার মধ্যে মুক্তিলাভ করে।

আমাদের জীবনের বীণাতেও কর্ম্মের সরু মোটা তারগুলি ততক্ষণ কেবলমাত্র বন্ধন যতক্ষণ তাদের সত্যের নিয়মে ধ্রুব করে না বেঁধে তুল্‌তে পারি। কিন্তু তাই বলে এই তারগুলিকে খুলে ফেলে দিয়ে শূন্যতার মধ্যে ব্যর্থতার মধ্যে নিষ্ক্রিয়তা লাভকে মুক্তিলাভ বলে না।

তাই বল্‌ছিলুম, কর্ম্মকে ত্যাগ করা নয় কিন্তু আমাদের প্রতিদিনের কর্ম্মকেই চিরদিনের সুরে ক্রমশ বেঁধে তোল্‌বার সাধনাই হচ্চে সত্যের সাধনা, ধর্ম্মের সাধনা। এই সাধনারই মন্ত্র হচ্চে—যদ্‌যৎকর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ—যে যে কর্ম্ম করবে সমস্তই ব্রহ্মকে সমর্পণ করবে—অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্মের দ্বারা আত্মা আপনাকে ব্রহ্মে নিবেদন করতে থাকবে—অনন্তের কাছে নিত্য এই নিবেদন করাই আত্মার গান, এই হচ্চে আত্মার মুক্তি। তখন কি আনন্দ যখন সকল কর্ম্মই ব্রহ্মের সঙ্গে যোগের পথ, কর্ম্ম যখন আমাদের নিজের প্রবৃত্তির কাছেই ফিরে ফিরে না আসে—কর্ম্মে যখন আমাদের আত্মসমর্পণ প্রতিদিন এখন্ড—হয়ে উঠে—সেই পূর্ণতা, সেই মুক্তি, সেই স্বর্গ,—তখন সংসারই ত আনন্দনিকেতন।

কর্ম্মের মধ্যে মানুষের এই যে বিরাট আত্মপ্রকাশ, অনন্তের কাছে তার এই যে নিরন্তর আত্মনিবেদন, ঘরের কোণে বসে এ'কে কে অবজ্ঞা করতে চায়, সমস্ত মানুষে মিলে রৌদ্রে বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে কালে কালে মানব মাহাত্ম্যের যে অভ্রভেদী মন্দির রচনা করচে কে মনে করে সেই সুমহৎ সৃষ্টিব্যাপার থেকে সুদূরে পালিয়ে গিয়ে নিভৃতে বসে আপনার মনে কোনো একটা ভাবরসসম্ভোগই মানুষের সঙ্গে ভগবানের মিলন, এবং সেই সাধনাই ধর্ম্মের চরম সাধনা! ওরে উদাসীন, ওরে আপনার মাদকতায় বিভোর বিহ্বল সন্ন্যাসী, এখনি শুন্‌তে কি পাচ্চনা, ইতিহাসের সুদূরপ্রসারিত ক্ষেত্রে মনুষ্যত্বের প্রশস্ত রাজপথে মানবাত্মা চলেছে, চলেছে মেঘমন্দ্রগর্জ্জনে আপনার কর্ম্মের বিজয় রথে—চলেছে, বিশ্বের মধ্যে আপনার অধিকারকে বিস্তীর্ণ করতে। তার সেই আকাশে আন্দোলিত জয়পতাকার সম্মুখে পর্ব্বতের প্রস্তররাশি বিদীর্ণ হয়ে গিয়ে পথ ছেড়ে দিচ্চে; বনজঙ্গলের ঘনছায়াচ্ছন্ন জটিল চক্রান্ত সূর্য্যালোকের আঘাতে কুহেলিকার মত তার সম্মুখে দেখতে দেখতে কোথায় অন্তর্দ্ধান করচে; অসুখ অস্বাস্থ্য অব্যবস্থা পদে পদে পিছিয়ে গিয়ে প্রতিদিন তাকে স্থান ছেড়ে দিচ্চে; অজ্ঞতার বাধাকে সে পরাভূত করচে, অন্ধতার অন্ধকারকে সে বিদীর্ণ করে ফেল্‌চে—তার চারদিকে দেখতে দেখতে শ্রীসম্পদ কাব্যকলা জ্ঞানধর্ম্মের আনন্দলোক উদ্‌ঘাটিত হয়ে যাচ্চে। বিপুল ইতিহাসের দুর্গম দুরন্তার পথে মানবাত্মার এই যে বিজয় রথ অহোরাত্র

পৃথিবীকে কম্পান্বিত করে চলেছে তুমি কি অসাড় হয়ে চোখ বুজে বল্‌তে চাও তার কেউ সারথী নেই? তাকে কেউ কোনো মহৎ সার্থকতার দিকে চালনা করে নিয়ে যাচ্চেনা? এইখানেই, এই মহৎ সুখদুঃখ বিপৎসম্পদের পথেই কি রথীর সঙ্গে সারথীর যথার্থ মিলন ঘট্‌চে না? রথ চলেছে, শ্রাবণের অমারাত্রির দুর্য্যোগও সেই সারথীর অনিমেষ নেত্রকে আচ্ছন্ন করতে পারচে না—মধ্যাহ্নসূর্য্যের প্রখর আলোকেও তাঁর ধ্রুবদৃষ্টি প্রতিহত হচ্চে না;—আলোকে অন্ধকারে চলেছে রথ, আলোকে অন্ধকারে মিলন রথীর সঙ্গে সেই সারথীর—চলতে চলতে মিলন, পথের মধ্যে মিলন, উঠবার সময় মিলন, নাববার সময় মিলন, রথীর সঙ্গে সারথীর। ওরে কে সেই নিত্য মিলনকে অগ্রাহ্য করতে চায়; তিনি যেখানে চালাতে চান কে সেখানে চল্‌তে চায় না! কে বল্‌তে চায় আমি মানুষের ইতিহাসের ক্ষেত্র থেকে সুদূরে পালিয়ে গিয়ে নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে নিশ্চেষ্টতার মধ্যে একলা পড়ে থেকে তাঁর সঙ্গে মিল্‌ব। কে বল্‌তে চায় এই সমস্তই মিথ্যে, এই বৃহৎ সংসার, এই নিত্যবিকাশমান মানুষের সভ্যতা, অন্তরবাহিরের সমস্ত বাধাকে ভেদ করে আপনার সকল প্রকার শক্তিকে জয়যুক্ত করবার জন্যে মানুষের এই চিরদিনের চেষ্টা, এই পরমদুঃখের এবং পরমসুখের সাধনা। যে লোক এ সমস্তকেই মিথ্যে বলে কত বড় মিথ্যে তার চিত্তকে আক্রমণ করেছে! এত বড় বৃহৎ সংসারকে এত বড় ফাঁকি বলে যে মনে করে সে কি সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে সত্যই বিশ্বাস করে! যে মনে করে পালিয়ে গিয়ে তাঁকে পাওয়া যায় সে কবে তাঁকে পাবে, কোথায় তাঁকে পাবে, পালিয়ে কত দূরে সে যাবে, পালাতে পালাতে একেবারে শূন্যতার মধ্যে গিয়ে পৌঁছবে এমন সাধ্য তার আছে কি! তা নয়—ভীরু যে, পালাতে যে চায় সে কোথাও তাঁকে পায় না—সাহস করে বল্‌তে হবে এই যে তাঁকে পাচ্চি, এই যে এখনি, এই যে এখানেই—বার বার বল্‌তে হবে আমার প্রত্যেক কর্ম্মের মধ্যে আমি যেমন আপনাকে পাচ্চি তেমনি আমার আপনার মধ্যে যিনি আপনি তাঁকে পাচ্চি; কর্ম্মের মধ্যে আমার যা কিছু বাধা, যা কিছু বেসুর; যা কিছু জড়তা, যা কিছু অব্যবস্থা সমস্তকেই আমার শক্তির দ্বারা সাধনার দ্বারা দূর করে দিয়ে এই কথাটি অসঙ্কোচে বলবার অধিকারটি আমাদের লাভ করতে হবে যে, কর্ম্মে আমার আনন্দ, সেই আনন্দেই আমার আনন্দময় বিরাজ করচেন।

উপনিষদে "ব্রহ্মবিদাংবরিষ্ঠ" ব্রহ্মবিৎদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কাকে বলেচেন? আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্ এষ ব্রহ্মবিদাংবরিষ্ঠঃ। পরমাত্মায় যাঁর আনন্দ পরমাত্মায় যাঁর ক্রীড়া এবং যিনি ক্রিয়াবান্ তিনিই ব্রহ্মবিৎদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আনন্দ আছে অথচ সেই আনন্দের ক্রীড়া নেই এ কখনো হতেই পারে না—সেই ক্রীড়া নিষ্ক্রিয় নয়—সেই ক্রীড়াই হচ্ছে কর্ম্ম। ব্রহ্মে যাঁর আনন্দ, তিনি কর্ম্ম না হলে বাঁচবেন কি করে? কারণ, তাঁকে এমন কর্ম্ম করতেই হবে যে কর্ম্মে সেই ব্রহ্মের আনন্দ আকার ধারণ করে বাহিরে প্রকাশমান হয়ে ওঠে। এই জন্য যিনি ব্রহ্মবিৎ, অর্থাৎ জ্ঞানে যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি আত্মরতিঃ, পরমাত্মাতেই তাঁর আনন্দ, এবং তিনি আত্মক্রীড়ঃ, তাঁর

সকল কাজই হচ্চে পরমাত্মার মধ্যে; তাঁর খেলা, তাঁর স্নান আহার, তাঁর জীবিকা অর্জ্জন, তাঁর পরহিত সাধন সমস্তই হচ্চে পরমাত্মার মধ্যে তাঁর বিহার, তিনি "ক্রিয়াবান," ব্রহ্মের যে আনন্দ তিনি ভোগ করেন তাকে কর্ম্মে প্রকাশ না করে তিনি থাক্‌তে পারেন না। কবির আনন্দ কাব্যে, শিল্পীর আনন্দ শিল্পে, বীরের আনন্দ শক্তির প্রতিষ্ঠায়, জ্ঞানীর আনন্দ তত্ত্বাবিষ্কারে যেমন আপনাকে কেবলি কর্ম্ম আকারে প্রকাশ করতে যাচ্চে ব্রহ্মবিদের আনন্দ তেমনি জীবনে ছোটবড় সকল কাজেই, সত্যের দ্বারা সৌন্দর্য্যের দ্বারা শৃঙ্খলার দ্বারা মঙ্গলের দ্বারা অসীমকেই প্রকাশ করতে চেষ্টা করে।

ব্রহ্মও ত আপনার আনন্দকে তেমনি করেই প্রকাশ করচেন—তিনি "বহুধাশক্তি যোগাৎ বর্ণাননেকান্নিহিতার্থো দধাতি।" তিনি আপনার বহুধা শক্তির যোগে নানা জাতির নানা অন্তর্নিহিত প্রয়োজন সাধন করচেন। সেই অন্তর্নিহিত প্রয়োজন ত তিনি নিজেই। তাই তিনি আপনাকে নানা শক্তির ধারায় কেবলি নানা আকারে দান করচেন। কাজ করচেন, তিনি কাজ করচেন—নইলে আপনাকে তিনি দিতে পারবেন কি করে। তাঁর আনন্দ আপনাকে কেবলি উৎসর্গ করচে, সেই ত তাঁর সৃষ্টি।

আমাদেরও সার্থকতা ঐখানে—ঐখানেই ব্রহ্মের সঙ্গে মিল আছে। বহুধাশক্তি যোগে আমাদেরও আপনাকে কেবলি দান করতে হবে—বেদে তাঁকে "আত্মদা বলদা" বলেছে—তিনি যে কেবল আপনাকে দিচ্চেন তা নয়, তিনি আমাদের সেই বল দিচ্চেন যাতে করে আমরাও তাঁর মত আপনাকে দিতে পারি। সেই জন্যে, বহুধা শক্তির যোগে যিনি আমাদের প্রয়োজন মেট'চ্চেন ঋষি তারই কাছে প্রার্থনা করচেন, মনো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু—তিনি যেন আমাদের সকলের চেয়ে বড় প্রয়োজনটা মেটান, আমাদের সঙ্গে শুভবুদ্ধির যোগ সাধন করেন। অর্থাৎ শুধু এ হলে চল্‌বেনা যে, তাঁর শক্তিযোগে তিনি কেবল আপনি কর্ম্ম করে আমাদের অভাব মোচন করবেন, আমাদের শুভবুদ্ধি দিন তাহলে আমরাও তাঁর সঙ্গে মিলে কাজ করতে দাঁড়াব তাহলেই তাঁর সঙ্গে আমাদের যোগ সম্পূর্ণ হবে। শুভ বুদ্ধি হচ্চে সেই বুদ্ধি যাতে সকলের সার্থকে আমারই নিহিতার্থ বলে জানি, সেই বুদ্ধি যাতে সকলের কর্ম্মে আপন বহুধা শক্তি প্রয়োগ করাতেই আমার আনন্দ। এই শুভবুদ্ধিতে যখন আমরা কাজ করি তখন আমাদের কর্ম্ম নিয়মবদ্ধ কর্ম্ম কিন্তু যন্ত্রচালিতের কর্ম্ম নয়,—আত্মার তৃপ্তিকর কর্ম্ম কিন্তু অভাব-তাড়িতের কর্ম্ম নয়,—তখন আমাদের কর্ম্ম দশের অন্ধ অনুকরণ নয়, লোকাচারের ভীরু অনুবর্ত্তন নয়। তখন, যেমন আমরা দেখচি "বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ" বিশ্বের সমস্ত কর্ম্ম তাঁতেই আরম্ভ হচ্চে এবং তাঁতেই এসে সমাপ্ত হচ্চে তেমনি দেখতে পাব আমার সমস্ত কর্ম্মের আরম্ভে তিনি এবং পরিণামেও তিনি, তাই আমার সকল কর্ম্মই শান্তিময় কল্যাণময় আনন্দময়।

উপনিষৎ বলেন তাঁর "স্বাভাবিকী জ্ঞানবল ক্রিয়া চ" তাঁর জ্ঞান, শক্তি এবং কর্ম্ম স্বাভাবিক। তাঁর পরমাশক্তি আপন স্বভাবেই

কাজ করচে—আনন্দই তাঁর কাজ, কাজই তাঁর আনন্দ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অসংখ্য ক্রিয়াই তাঁর আনন্দের গতি।

কিন্তু সেই স্বাভাবিকতা আমাদের জন্মায় নি বলেই কাজের সঙ্গে আনন্দকে আমরা ভাগ করে ফেলেছি। কাজের দিন আমাদের আনন্দের দিন নয়; আনন্দ করতে যেদিন চাই সেদিন আমাদের ছুটি নিতে হয়। কেন না হতভাগ্য আমরা, কাজের ভিতরেই আমরা ছুটি পাইনে। প্রবাহিত হওয়ার মধ্যেই নদী ছুটি পায়, শিখারূপে জ্বলে ওঠার মধ্যেই আগুন ছুটি পায়, বাতাসে বিস্তীর্ণ হওয়ার মধ্যেই ফুলের গন্ধ ছুটি পায়—আপনার সমস্ত কর্ম্মের মধ্যেই আমরা তেমন করে ছুটি পাইনে। কর্ম্মের মধ্য দিয়ে আপনাকে ছেড়ে দিইনে বলে, দান করিনে বলে কর্ম্ম আমাদের চেপে রাখে। কিন্তু, হে আত্মদা, বিশ্বের কর্ম্মে তোমার আনন্দমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করে কর্ম্মের ভিতর দিয়ে আমাদের আত্মা আগুনের মত তোমার দিকেই জ্বলে উঠুক, নদীর মত তোমার অভিমুখেই প্রবাহিত হোক্, ফুলের গন্ধের মত তোমার মধ্যেই বিস্তীর্ণ হতে থাক্। জীবনকে তার সমস্ত সুখদুঃখ, সমস্ত ক্ষয় পূরণ, সমস্ত উত্থান পতনের মধ্য দিয়েও পরিপূর্ণ করে ভালবাসতে পারি এমন বীর্য্য তুমি আমাদের মধ্যে দাও। তোমার এই বিশ্বকে পূর্ণশক্তিতে দেখি, পূর্ণ-শক্তিতে শুনি, পূর্ণশক্তিকে এখানে কাজ করি। জীবনে সুখ নেই বলে, হে জীবিতেশ্বর, তোমাকে অপবাদ দেব না। যে জীবন তুমি আমাকে দিয়েছ এই জীবনে পরিপূর্ণ করে আমি বাঁচব, বীরের মত এ'কে আমি গ্রহণ করব এবং দান করব এই তোমার কাছে প্রার্থনা। দুর্ব্বল চিত্তের সেই কল্পনাকে একেবারে দূর করে দিই যে কল্পনা সমস্ত কর্ম্ম থেকে বিযুক্ত একটা আধারহীন আকারহীন বাস্তবতাহীন পদার্থকে ব্রহ্মানন্দ বলে মনে করে। কর্ম্মক্ষেত্রে মধ্যাহ্ন সূর্য্যালোকে তোমার আনন্দরূপকে প্রকাশমান দেখে হাটে ঘাটে মাঠে বাজারে সর্ব্বত্র যেন তোমার জয়ধ্বনি করতে পারি। মাঠের মধ্যে কঠোর পরিশ্রমে কঠিন মাটি ভেঙে যেখানে চাষা চাষ করচে সেইখানেই তোমার আনন্দ শ্যামল শস্যে উচ্ছসিত হয়ে উঠ্‌চে; যেখানেই জলাজঙ্গল গর্ত্তগাড়ীকে সরিয়ে ফেলে মানুষ আপনার বাসভূমিকে পরিচ্ছন্ন করে তুল্‌চে সেইখানেই পারিপাট্যের মধ্যে তোমার আনন্দ প্রকাশিত হয়ে পড়চে; যেখানে স্বদেশের অভাব দূর করবার জন্যে মানুষ অশ্রান্ত কর্ম্মের মধ্যে আপনাকে অজস্র দান করচে সেইখানেই শ্রীসম্পদে তোমার আনন্দ বিস্তীর্ণ হয়ে যাচ্চে। যেখানে মানুষের জীবনের আনন্দ চিত্তের আনন্দ কেবলি কর্ম্মে রূপ ধারণ করতে চেষ্টা করচে, সেখানে সে মহৎ, সেখানে সে প্রভু, সেখানে সে দুঃখকষ্টের ভয়ে দুর্ব্বল ক্রন্দনের সুরে নিজের অস্তিত্বকে কেবলি অভিশাপ দিচ্চে না। যেখানেই জীবনে মানুষের আনন্দ নেই, কর্ম্মে মানুষের অনাস্থা সেইখানেই তোমার সৃষ্টিতত্ত্ব যেন বাধা পেয়ে প্রতিহত হয়ে যাচ্চে, সেই খানেই নিখিলের প্রবেশদ্বার সঙ্কীর্ণ—সেইখানেই যত সঙ্কোচ, যত অন্ধ সংস্কার, যত অমূলক বিভীষিকা, যত আধিব্যাধি এবং পরস্পরবিচ্ছিন্নতা।

হে বিশ্বকর্ম্মণ, আজ আমরা তোমার

সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়িয়ে এই কথাটি জানাতে এসেছি, আমার এই সংসার আনন্দের, আমার এই জীবন আনন্দের। বেশ করেছ আমাকে ক্ষুধাতৃষ্ণার আঘাতে জাগিয়ে রেখেছ তোমার এই জগতে, তোমার এই বহুধা শক্তির অসীম লীলাক্ষেত্রে। বেশ করেছ তুমি আমাকে দুঃখ দিয়ে সম্মান দিয়েছ —বিশ্ব সংসারে অসংখ্য জীবের চিত্তে দুঃখ-তাপের দাহে যে অগ্নিময়ী পরমাসৃষ্টি চলচে বেশ করেছ আমাকে তার সঙ্গে যুক্ত করে গৌরবান্বিত করেছ! সেই সঙ্গে প্রার্থনা করতে এসেছি, আজ তোমার বিশ্বশক্তির প্রবলবেগ বসন্তের উদ্দাম দক্ষিণ বাতাসের মত ছুটে চলে আসুক, মানবের বিশাল ইতিহাসের মহাক্ষেত্রের উপর দিয়ে ধেয়ে আসুক, নিয়ে আসুক তার নানা ফুলের গন্ধকে, নানা বনের মর্ম্মরধ্বনিকে বহন করে—আমাদের দেশের এই শব্দহীন প্রাণহীন শুষ্কপ্রায় চিত্ত-অরণ্যের সমস্ত শাখাপল্লবকে দুলিয়ে কাঁপিয়ে মুখরিত করে দিক্—আমাদের অন্তরের নিদ্রোত্থিত শক্তি ফুলে ফলে কিশলয়ে অপর্য্যাপ্তরূপে সার্থক হবার জন্যে কেঁদে উঠুক্! দেখতে দেখতে শতসহস্র কর্ম্মচেষ্টার মধ্যে আমাদের দেশের ব্রহ্মোপাসনা আকার ধারণ করে তোমার অসীমতার অভিমুখে বাহুতুলে আপনাকে একবার দিগ্বিদিকে ঘোষণা করুক্। মোহের আবরণকে উদ্ঘাটন কর, উদাসীনতার নিদ্রাকে অপসারিত করে দাও—এখনি এই মুহূর্ত্তে অনন্ত দেশেকালে ধাবমান ঘূর্ণমান চিরচাঞ্চল্যের মধ্যে তোমার নিত্যবিলাসিত আনন্দরূপকে দেখে নিই, তারপরে সমস্ত জীবন দিয়ে তোমাকে প্রণাম করে সংসারে মানবাত্মার সৃষ্টিক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করি, যেখানে নানা দিক্ থেকে নানা অভাবের প্রার্থনা, দুঃখের ক্রন্দন, মিলনের আকাঙ্ক্ষা এবং সৌন্দর্য্যের নিমন্ত্রণ আমাকে আহ্বান করচে, যেখানে আমার নানাভিমুখী শক্তির একমাত্র সার্থকতা সুদীর্ঘকাল ধরে প্রতীক্ষা করে বসে আছে এবং যেখানে বিশ্বমানবের মহাযজ্ঞে আনন্দের হোমহুতাশনে আমার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখ লাভক্ষতিকে পুণ্য আহুতির মত সমর্পণ করে দেবার জন্যে আমার অন্তরের মধ্যে কোন্ তপস্বিনী মহানিষ্ক্রমণের দ্বার খুঁজে বেড়াচ্চে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দেবশক্তি।

জলিয়া উঠেছে অগ্নি ধরি ধীর বেশ,
জগতের তমোরাশি করিবারে শেষ,
তিরোহিত করিবারে সর্ব্বদুঃখ ভয়
জীবনের সর্ব্বগ্লানি মিথ্যা সমুদয়
করিতে নিঃশেষ,—যাহে মানব জীবন
অন্ধকারে মোহ ঘোরে থাকে অচেতন।
সর্ব্বগ্রাসী বিশ্বনাশি অগ্নি মহাবীর
প্রজ্বলিত করি শিখা হইল বাহির :—
বিশুদ্ধ-মঙ্গল-মূর্ত্তি, নাশি পাপ ভার,
বিনাশিয়া জগতের গূঢ় অন্ধকার,
সাধিয়া মঙ্গল, তবে হইল নির্ব্বাণ,
দিব্য রথে শূন্য পথে করিল প্রয়াণ।
সেথা হতে শান্তিধারে হয়ে বরষণ
সুন্দর শ্যামল করি তুলিবে ভুবন।

শ্রীমতী হেমলতা দেবী।

পোষ্যপুত্র।

৩৮

শ্যামাকান্তের প্রথম পত্রের উত্তর যে রজনীনাথ তেমন নিষ্ঠুরভাবে দিয়াছিলেন, তাহার একটা গোপন রহস্য ছিল।

শান্তির প্রতি অবিচার দণ্ড প্রদান করিবার পর যখন অনুতপ্ত চিত্ত বেদনার কথা পুনঃ পুন আঘাত করিয়া বলিল 'মূঢ়, তুমি নিতান্তই মূঢ়, ধিক্ তোমার বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞানে। এই বুদ্ধিতে তুমি নিরীহ মক্কেল ঠকাইয়া খাও।" তখন ইহাও স্মরণ হইল যে হেমেন্দ্র কোথায় গিয়াছে সে সন্ধান বাহির করিবারও কোন উপায় রাখা হয় নাই। সেদিন তাহাদের সঙ্গে কোন লোকও দেন নাই—যে তাহারা কলিকাতা ত্যাগ করিল, কিম্বা কলিকাতার ভিতরেই রহিল, অন্ততঃ এইটুকুও জানা যাইবে। ছিঃ ছিঃ, একি আত্মবিস্মৃতি! একি বিচারের ভানে পূর্ণ অবিচারকে আশ্রয় করা! শান্তির সেই জলসিক্ত পদ্মপাপড়ির মত সজল চোখ দুটি বেদনাবিক্ষত বক্ষে রাত্রি দিন কাঁটার মতন বিঁধিতে লাগিল।

অনুসন্ধানের পথ নাই, কাহারও নিকট বলিতে আত্মমর্য্যাদায় আঘাত লাগে, বসুমতী অসুস্থতার দোহাই দিয়া শয্যাশ্রয় করিয়াছেন তাঁহার নিকটেই বা সান্ত্বনা কোথায়? গুরুভার চিত্ত কর্ম্মস্রোতে ভাসাইয়া দিন কাটিতে-ছিল বটে কিন্তু বিদ্রোহী রাত্রি যেন কিছুতেই আর পোহাইতে চাহিত না। নিঃশব্দে নিরানন্দে সময় নিজের গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

মন্টু এখন অনেকটা বড় হইয়াছিল, সে এখন লোকের সুখদুঃখ অনেকটা অনুভব করিতে পারে, দিদি হঠাৎ আসিয়া অন্তর্ধান হইয়া যাইবার পর হইতেই যে পিতার মনে কষ্ট আশ্রয় লইয়াছে তাহা সে প্রায় সর্ব্বদাই তাঁহার মুখের ভাবে বুঝিতে পারিত। তবু দিদির সম্বন্ধে অদম্য কৌতূহল ও আগ্রহ সত্বেও পিতাকে কোন প্রশ্ন করিতে সাহস করিত না। কিন্তু এবার দিদি শ্বশুরবাড়ি গিয়ে তাহার চারখানা চিঠির একখানাও জবাব দিলে না কেন? এপ্রশ্ন সে বসুমতীকে দিনের মধ্যে অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়া বলিত, 'দিদি কি যেন হচ্চে।' 'দিদি আমায় বোধ হয় ভুলে গ্যাছে!" বলিয়া অভিমান করিত; আবার মধ্যে মধ্যে "মা আমি দিদির কাছে যাব, আমায় পাঠিয়ে দাওনা" এই আব্দার ধরিয়া কাঁদিয়া রাগিয়া মাকে অস্থির করিয়া তুলিত।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও রজনীনাথ আজ ঘর হইতে বাহির হন নাই। চাকর তাহাকে একখানা ডাকের চিঠি আনিয়া দিল। চিঠিখানা লইয়া ডাকের ছাপ ও হাতের লেখার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই চকিত ভাবে রজনীনাথ বলিয়া উঠিলেন 'চৌধুরী মশায়ের চিঠি—' ক্ষিপ্রহস্তে খামখানা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, মানসিক উদ্বেগে থর থর করিয়া হাত কাঁপিতেছিল। কোন সংবাদ আছে নাকি? তারা কি তবে সেখানে? পত্রপড়া শেষ হইলে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া কাগজ-খানার উপরেই দৃষ্টি স্থির করিয়া নত মুখে রহিলেন। তবে তাহারা ফিরিয়া আইসে

নাই! তবু খপর তো পাওয়া গেল, ফরাসডাঙ্গা কি এমন মস্ত সহর সেখানে তাদের সন্ধান—মিলিবে না? সুপ্রকাশ আসিয়া উৎফুল্ল চক্ষে তাঁহার পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রজনীনাথ কিছু পরে সাগ্রহ আনন্দে পুত্রকে বুকে টানিয়া লইয়া হঠাৎ অজস্র চুম্বনে তাহাকে অভিসিঞ্চিত করিয়া দিলেন, সুসংবাদের আনন্দ চাপিয়া রাখা কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। সুকুও বুঝিয়াছিল এ আদরটা ঠিক তাহার জন্য নহে এর মধ্যে তাহার দিদির প্রাপ্যই অধিকাংশ। জিজ্ঞাসা করিল "বাবা দিদি ভাল আছে?" রজনীনাথ চিঠিখানা আবার একবার পড়িতে পড়িতে উত্তর দিলেন "ভাল আছে।" "দিদি কি আর আসবেনা বাবা?" পিতা শিহরিয়া উঠিলেন বুকের মধ্যে চলন্ত রক্তস্রোত সহসা একটা বাধা প্রাপ্ত হইয়া থমকিয়া গেল, কিন্তু তখনি জোর করিয়া মনকে উৎসাহিত করিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন,—আমি কাল ভোরেই তাকে আনতে যাবো।' সুপ্রকাশ আনন্দে করতালি দিয়া উঠিল "আর আমি?" "তুমি তোমার মার কাছে থাকবে, দিদির জন্যে নতুন নতুন জিনিষ সব তৈরি করে রাখবে, দিদি এসে বলবে সুকু যেন বাঙ্গলার বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন্ হয়েচে।" গৌরবে বালকের ললাট ও নেত্র প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

একটা শিল্পকার্য্য লইয়া বসুমতী অনেকক্ষণ ধরিয়া আলোর কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া নিবিষ্টচিত্তে সেলাই করিতেছিলেন, কিন্তু কাজ কিছুই অগ্রসর হইল না। আজকাল আঙ্গুলের মধ্যে ছুঁচ বিঁধিয়া যায়, চোখের ভিতর কর-কর করে, এমনি নানা রকম বাধায় আজ কাল শিল্পকুশলা বসুমতীর সকল কার্য্যই অসমাপ্ত পড়িয়া থাকে, তথাপি সময় কাটাইবার একটা অবলম্বন তো চাই।

সবে মাত্র একটা ভুল করিয়া মনটা উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে এমন সময় বাহিরে দুপ দাপ শব্দ সুপ্রকাশের আগমন বার্ত্তা ঘোষণা করিল। রজনীনাথেরও সাড়া পাইয়া বসুমতী হঠাৎ কাজের উপর অত্যন্ত মনঃসংযোগ করিয়া ফেলিলেন। সুকু ঘরে ঢুকিয়াই বলিয়া উঠিল "মা মা, বাবা কাল সকালবেলাই দিদিকে আনতে যাবেন" সেলাইটা বসুমতীর হাত হইতে ভূমে পড়িয়া গেল, বিদ্যুৎসঞ্চালিতের মতন স্বামীর পানে ফিরিলেন। রজনীনাথ ধীরকণ্ঠে কহিলেন "আমি কাল ফরাসডাঙ্গায় যাবো।" "ফরাসডাঙ্গা! কেন, সেখানে—" "হ্যাঁ সেখানে তারা আছে খপর পেয়েছি।"

দাসীকে ডাকিয়া বসুমতী হরিরলুটের বন্দোবস্ত করিতে আদেশ দিলেন। ফরাসডাঙ্গায় গিয়া একজন ধনী মক্কেলের সাহায্যে তাহাদের অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু হেমেন্দ্রের বাসার সন্ধান কেহই আনিতে পারিল না। কাজে কাজেই রজনীনাথকে সে রাত্রি সেইখানেই থাকিতে হইল।

পরদিনও অনুসন্ধান ব্যর্থ হইল। ডাকঘরেও খপর লওয়া হইল, হেমেন্দ্র চৌধুরীকে কেহই চেনে না। হতাশ হইয়া রজনীনাথ ফিরিয়া চলিলেন। কলিকাতা ফিরিয়া যোগেশের সন্ধানে লক্ষ্মীপুরে যাইবেন স্থির করিলেন। ষ্টেশনে পৌছিয়া প্রবেশ পথের সম্মুখেই দেখিলেন যোগেশের বাহু অবলম্বনে প্রবেশ করিতেছে হেমেন্দ্র। অভাবনীয় সাক্ষাৎ! প্রথমটা দুইজনেই হতবুদ্ধি হইয়া গেল,

এবং রজনীনাথও বিস্মিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে সর্ব্বপ্রথমেই প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে যোগেশ আপনাকে সামলাইয়া লইয়া দ্রুতহস্তে রজনীনাথের পদধূলী মাথায় গ্রহণ করিয়া নিতান্ত সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিল "এখানে এসেছিলেন, কাজ ছিল?" হেম যোগেশের আড়ালে আপনাকে একটুখানি ঢাকিয়া অল্পদূরেই দাঁড়াইয়া রহিল, সম্মুখেও আসিল না প্রণাম পর্য্যন্ত করিল না। রজনীনাথ উত্তর করিলেন "হ্যাঁ কাজেই এসেছি, তবে সে কাজ এখনও আমার বাকি রয়েছে, যোগেশ! শান্তির কাছে আমায় নিয়ে চলো, আমি বাড়ির সন্ধান করতে না পেয়ে ফিরছিলুম।" যোগেশ হেমেন্দ্রের দিকে চকিত কটাক্ষনিক্ষেপ করিল, দেখিল তাহার মুখ ঈর্ষার বিদ্বেষে বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, কি একটা বলিবার জন্য অধর কম্পিত হইতেছিল। ইঙ্গিতে যোগেশ তাহাকে নিবৃত্ত করিয়া তৎক্ষণাৎ বলিল "বেশতো আসুন না, আপনি না এলে আমিই বোধ হয় কাল আপনার ওখানে যেতুম।—দাঁড়ান্ একটা গাড়ি ঠিক করি"—যোগেশ গাড়ি ডাকিতে একটু অগ্রসর হইয়া গেল, তাহার অনুসরণ করিয়া হেমেন্দ্র বিরক্তির স্বরে বলিল "যোগেশ তোমার মতলবটা কি? ওকে কেন তুমি নিয়ে যেতে রাজি হলে? কি তেজ দেখেচ? আমাকে দৃক্‌পাতও নেই, যেন দেখতেই পেলেন না! মনে করেছেন মেয়ে নিয়ে যাবেন, দিচ্চি তাই নিয়ে যেতে!" যোগেশ মৃদুস্বরে বাধা দিল 'থামো না, লোকটাকে চটিয়ে কি হবে? দেখনা সহজেই কাজ সারা যাবে এখন, তবে আমার ওপোর যদি নির্ভর করো তো তুমি একটিও কথা কয়োনা, আর যদি পারতো ভাল ব্যবহারই করো।"

হেম যোগেশের ক্রীড়াপুত্তলিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে তাহাকে যেমন গড়িতেছে শিব বা বানর সে নির্ব্বিবাদে তাহা হইতেই প্রস্তুত আছে। সে সম্মত হইল। গাড়ি আসিলে প্রথমেই রজনীনাথ উঠিয়া বসিলেন, হেমের দিকে না চাহিয়াই বলিলেন "এসো যোগেশ।" যোগেশের ইঙ্গিতে হেম সম্মুখে আসিয়া প্রণাম করিল। যোগেশ ও হেম গাড়িতে উঠিলে মুমূর্ষপ্রায় অশ্বদ্বয় চাবুকাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া মন্দগতিতে চলিতে আরম্ভ করিল।

পথ অনেকটা দীর্ঘ, অশ্বের গতি অত্যন্ত মন্থর, সময় লাগিল অনেক। পথের মধ্যে যোগেশ বলিল; "আপনার কাছে যাবো বলছিলুম এইজন্যে যে বৌঠাকরুণের মাথাটা যেন দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্চে তাই ছোটবাবু বড় ভয় পেয়েছেন। এই আজই তিনিই আমায় বলছিলেন আমি হঠাৎ রাগের মাথায় বড়ই গর্হিত কাজ করে ফেলেচি, এখন কি করবো ভেবে পাচ্চি না, কেমন করেই বা ওঁদের কাছে মুখ দেখাই, তাছাড়া তোমার বৌঠাকরুণেরও যে কি হয়েচে সে কিছুতেই লক্ষ্মীপুরে বা কল্‌কাতায় যেতে চায় না। জোর করে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলে বলে ট্রেণের তলায় পড়ে মরবো, তুমি কিছু উপায় করো। তা দেখুন এর আর আমি কি করবো? আমার সামান্য বুদ্ধিতে মনে হোল এই যে আপনাকে আমি গিয়ে সব বলি। আপনি যখন নিজেই এসেছেন তখন আর কথাই কি? আমরা নিশ্চিন্ত হলুম আপনি তাঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিয়ে যান।"

রজনীনাথ ভালমন্দ কোন কথাই বলিলেন না, কিন্তু মনের মধ্যে হঠাৎ যে বেত্রাঘাতের জ্বালা জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, গাম্ভীর্য্যের চেষ্টার মধ্য দিয়াও তাহা মুখে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। যোগেশ পুনশ্চ একটা সুগভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিতে লাগিল "নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়ে গ্যাছে, তা নৈলে আর অমন বুদ্ধি কি এমনি হয়েই বদলে যায়? কর্ত্তার নামও শুনতে পারেন না, আপনার কাছে যাবার কথা শুনলেও;—তা ওসব কথায় কাজ নেই আর, আপনাকে দেখলে হয়ত আবার মন ফিরতেও পারে। আমি কত বোঝালুম তা বল্লেন কি,—আমি মনে করি আমার কেউ নেই, এখন বুঝতে পেরেচি স্বামীই জগতে শুধু আপনার, কেউ আপনার নয়,—কারুকে চাই না।"

রজনীনাথের আত্মসম্বরণ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিতেছিল, তথাপি একটা সন্দেহ, একটা আশা—কিন্তু লাভ কি? যোগেশের এত মিথ্যা বলিয়া লাভ কি? লাভ থাকিলে অনেক লোকে মিথ্যাকে কি রকম সাজাইয়া তুলিতে পারে সে কথা রজনী নাথ ভালই জানিতেন, কিন্তু একি অহেতুক মিথ্যা নয়? কষাঘাতে জর্জ্জরিত অশ্ব একটা গলির সম্মুখে থামিলে তেমনি আত্মজর্জ্জরিতচিত্তে রজনীনাথ যখন সেই প্রদর্শিত গলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া সঙ্গীদ্বয়ের সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তখন আবার তাঁহার হৃদয় অনুতাপ পূর্ণ বেদনায় আলোড়িত হইয়া উঠিল। নিশ্চয়ই তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছে, নহিলে এইখানে সে বাস করিতেছে আর সেই ব্যবহার পাইবার পর! কিন্তু হায়! বৃথা তাহাকে দোষী করিতেছেন। সম্মুখেই হেমেন্দ্রের বাড়ী, যোগেশ দ্বার খুলিয়া দাঁড়াইল, রজনীনাথকে একটু ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া যোগেশের ইঙ্গিতে হেম কহিল "আসুন"। যোগেশ কহিল "হাঁ, আসুন আপনার কথা শুনলে তাঁর মন ফিরতেও পারে।"

রজনীনাথ কিছুই বলিলেন না, বলিবার শক্তিও বোধ হয় অল্পই ছিল, আবার দারুণ সন্দেহ ও আশঙ্কা জাগিয়া উঠিয়া হৃদয়কে বিক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতেছিল। সত্যই কি তবে সে এতখানি ভুল বুঝিয়াছে! পিতার একান্ত বিশ্বাস ও স্নেহও কি সেই দণ্ডের মধ্যে সে প্রকটিত দেখিতে পায় নাই? সে কি জানেনা কি কষ্টই এতদিন ধরিয়া তিনি ভোগ করিতেছেন? কষ্ট সে বুঝিয়াছে? এতদিন একখানা পত্রও কি সে কোন রকমে লিখিতে পারিত না? হায়! বুকের রক্ত দিয়া গড়া তাঁহার শাস্তি! উত্তেজনায় মাথায় ও মুখে গরম রক্ত ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে হেমেন্দ্র ফিরিয়া আসিয়া, কহিল সে দেখা করতে চায় না,—বলে"—রজনীনাথ উদ্যত আঘাতের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবারই জন্য যেন দুই পদ পিছাইয়া গিয়া আর্ত্তকণ্ঠে বাধা দিয়া উঠিলেন "থামো আমি শুনতে চাই না সে কি বলে, নিজে একবার"—"তীক্ষ্ণ শ্লেষের মৃদু হাসি হাসিয়া হেমেন্দ্র বলিল "তবু শুনুন কি বলে। সে বলে কুকুর শেয়ালের মত তো রাতদুটোর সময় বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েচেন, তাতেও কি সাধ মেটে নি, আর কেন? একবার চলুন দেখা কুর্ব্বেন,

আমার কোন আপত্তি নেই—"সমরনিপুণ সেনাপতি যেমন তাঁহার দৃঢ় বর্ম্মাচ্ছাদিত বক্ষে সহসা একটা অলক্ষ্যে গোলার আঘাত পাইলে সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও অকস্মাৎ বেদনাত্রস্ত হইয়া উঠে সেইরূপ আশাহতভাবে রজনীনাথ দ্রুতপদে বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেলেন। যোগেশও তাঁহার অনুসরণ করিল। হেমেন্দ্রকে আসিতে ইঙ্গিত করিলেও সে গেল না। নিকটে গিয়া যোগেশ তাঁহার ভূতাগতের মত বিকৃত মুখের দিকে চাহিয়া একটু যেন চমকিয়া উঠিল একটু যেন অনুতপ্তও হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু স্বাভাবিক স্বার্থপরতা করুণাকে সর্ব্বদা পরাজয় করিয়া থাকে, এ ক্ষেত্রেও অসুরের জয় হইল। হেমেন্দ্র শ্বশুরের সহিত মিলিত হইলে মোকর্দ্দমাটা বাধে না, তাহা না বাধিলেও যোগেশ যে তাহার ভাঙ্গা বাড়ি মেরামত করিয়া দ্বিতল গৃহ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে তাহা অসমাপ্তই থাকিয়া যায়, সেজবধূর কোমরের বিছা ও ডায়মণ্ডকাটা তাবিজ পরার সাধও অপূর্ণ থাকে। যোগেশ শ্যামাকান্তের ন্যায় রজনীনাথকেও তাহার স্বার্থসিদ্ধির কল প্রস্তুতের লোভে সঙ্গে আসিয়াছিল। আসিয়া কুণ্ঠিতভাবে কহিল—"আমায় মাপ করবেন,—নিজে একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করলেই ভাল হতো না, হেম যদি ঠিক না বুঝতে পেরে থাকে। তা ছাড়া যদি অভিমান করেই কিছু বলে থাকেন, আপনারই ত সন্তান—" রজনীনাথ দাঁড়াইলেন, তাঁহার দুই চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল "আমার সন্তান? না আমার সন্তান হলে আমায় অপমান করে ফিরিয়ে দিতে পারত না, এ আমি কাকে খুঁজতে কোথায় এসে পড়েছিলাম। আমার সন্তান কাকে বলচো যোগেশ! যে আমায় চেনে না সে আমার সন্তান? না"।

রজনীনাথ একরকম প্রায় ছুটিয়াই গাড়িতে উঠিয়া বসিলেন, ডাকিয়া বলিলেন "ষ্টেশন চলো, হাঁকাও"। হতবুদ্ধি যোগেশ দাঁড়াইয়া রহিল, বুঝিল সবাই শ্যামাকান্ত নহে। হেমেন্দ্র যখন সেই জনহীনপ্রায় নিস্তব্ধ বাড়ীতে প্রবেশ করিল, তাহার দুই চোখে যেন একটা আগুনের হল্কা বাহির হইতেছিল। তাহার ওষ্ঠে নিষ্ঠুর মৃদু হাসি অত্যন্ত গৌরবের ভাবে ফুটিয়া উঠিয়া তাহার সুন্দর চেহারাখানাকে উপাখ্যানবর্ণিত দৈত্যের মতন ভয়ানক করিয়া তুলিয়াছিল। সেদিনকার অপমানের প্রতিশোধ সে যে অক্ষরে অক্ষরে মিলাইয়া লইতে পারিয়াছে তাহার জন্য যোগেশকে ও নিজেকে মনে মনে ধন্যবাদ দিল। শ্বশুরের সম্মুখে মনটা এখনও সঙ্কুচিত হইয়া আইসে বটে কিন্তু তথাপি সে পৌরুষের সাহায্যে সেই দুর্ব্বলতার হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছে।

পশ্চিম দিকের ছোট ঘরখানায় তক্তপোষের উপরে মলিন শয্যায় ম্লান ছায়াখানির মতন শান্তি শয়ন করিয়া আছে। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ঘর কনকনে হইয়া উঠিয়াছিল, দুএকদিন বোধ হয় মেঝেয় ঝাঁট পড়ে নাই। হেমেন্দ্র দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া বলিল "আমি মনে করচি একবার আজ কল্‌কাতা যাবো। কাঁহাতক আর এই বনের মধ্যে পড়ে থাকি। তোমার অসুখ ত কমই আছে?" শান্তি দেওয়ালের দিক হইতে মুখ ফিরাইল "আমি? আমি ভালই আছি—বাইরে কে এলো?

ও জুতোর শব্দ যে আমি চিনি,—উঠতে গেলুম পারলুম না, কে এলো ?”

হেমেন্দ্র একটু চকিত একটু বিস্মিত হইল, কিন্তু তখনি সামলাইয়া লইয়া উত্তর দিল “ও একটি বাবু, ঐ রায়েদের বাড়ির”। শান্তি ধীরে ধীরে নিশ্বাস ফেলিয়া মৃদু স্বরে আপনাআপনি কহিল “বাবার মতন জুতোর শব্দ কিন্তু—”হেমেন্দ্র মনে মনে আশ্চর্য্যানুভব করিলেও প্রকাশ্যে ব্যঙ্গ করিতে ছাড়িল না, বিদ্রুপ করিয়া বলিল “হাঁগো হাঁ, তোমার বাবার ত তোমার জন্ত ঘুম হচ্চে না। তুমিই বাবা, বাবা করে মর, তাঁর ত ভারী মায়া !” আহত ভাবে শান্তি মাথা তুলিল “অমন কথা বলোনা, তাঁর দোষ কি ? তিনি তো বলেছেন জ্যেঠামশাই ক্ষমা করলেই তিনি ক্ষমা কর্‌বেন, আমরা”—

হেম অধৈর্য্য হইয়া উঠিল—“থামো থামো আমার লেকচার শুনবার সাবকাশ নেই। আমি চল্লুম কালও হয়ত আসতে পারব না, যা দরকার হয় ঝিকে দিয়ে করিও, আমি একেবারে হাঁফিয়ে উঠেছি আর পারছি না—”

হেমেন্দ্র গমনোদ্যত হইল, শান্তি ক্ষীণ কাতর কণ্ঠে কহিল “পারবার দরকার কি ? আমায় জ্যেঠামশায়ের কাছে দিয়ে এসোনা—”

হেমেন্দ্র উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল, হাসিতে হাসিতে বলিল “ক্ষেপেচ।”

সেদিন সন্ধ্যার পর রজনীনাথ বাড়ি পৌঁছিলে প্রথমেই সুপ্রকাশ গাড়ির কাছে ছুটিয়া আসিল। “দিদি এলি ভাই ?” গাড়ির মধ্য হইতে রজনীনাথ ধীরভাবে বাহির হইয়া আসিলেন। গাড়ির ভিতরে দিদির কোন চিহ্নই না পাইয়া বালক তাহার গভীর আনন্দের মধ্যে অত্যন্ত আঘাত বোধ করিল। বিস্ময়বেদনাবিস্ফারিত নেত্রে পিতার পানে তাকাইয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল “বাবা, দিদি ?” রজনীনাথ কোন উত্তর করিলেন না বা পুত্রের দিকে চাহিয়া দেখিলেন না, একেবারে নিজের পাঠাগারে প্রবেশ করিলেন। শ্যামাকান্তের পত্রের উত্তর লিখিয়া ভৃত্যকে তাহা ডাকে দিতে দিয়া যখন অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন তখন রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। স্বামী ফিরিয়া আসিয়াছেন বসুমতী পূর্ব্বেই জানিয়াছিলেন, শান্তি যে আইসে নাই তাহাও জানিতে বাকি ছিল না, ভয়ে ভাবনায় তিনি শুখাইয়া উঠিয়াছিলেন, সুপ্রকাশ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

৩৯

যমুনার পোলের উপর হইতে মথুরাপুরীর প্রাসাদমন্দিরময়ী সমৃদ্ধনগরী বড়ই মনোরম দেখায়। সারি সারি উচ্চচ্চ প্রাসাদমালা ও তাহার নীচে প্রশস্ত প্রস্তর সোপান শ্রেণী অগ্রসর হইয়া যমুনার সুনীল জলতলে নামিয়া গিয়াছে। প্রতি ঘাটেই ঘাট আলো করিয়া অপূর্ব্ব গৌরাঙ্গী ব্রজরমণীগণ স্নান করিতেছে, তাহাদের হাস্যের ঝঙ্কারে ও সৌন্দর্য্যের ছটায় জড়প্রকৃতি যেন সজীব হইয়া উঠিয়াছেন। নীরদ গাড়ীর গবাক্ষ হইতে প্রীতপূর্ণনেত্রে চারিদিককার দৃশ্য পরম আগ্রহের সহিত দেখিতেছিল। অনেকদিনের পর কোন আত্মীয়জনকে দেখিতে পাইলে মনের মধ্যে যেমন একটা অব্যক্ত আনন্দ জাগিয়া উঠিয়া নানা কথা, নানা স্মৃতিকে চারিদিক হইতে টানিয়া

আনে তেমনিতর একটা স্মৃতিপূর্ণ আনন্দের ভাব তাহার চিত্তকে ইহাদের দিকেই টানিতে লাগিল। ক্রমে পোল ছাড়াইয়া হরিৎ শস্য ও পুষ্পখচিত মাঠের মধ্য দিয়া কৃষক বালিকার সকৌতুক কালোচোখের সম্মুখ দিয়া মৃদুমন্দ গমনে ট্রেনখানি যথাস্থানে আসিয়া থামিল। সঙ্গে দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যে একটিমাত্র ব্যাগ ও একখানা ছাতা, কাজেই কুলীদের ঝাঁক চারিদিক হইতে ঘেরিয়া ফেলিল না বটে তবে ঘেরিয়া ফেলিল পাণ্ডারা। কি নাম? গোত্র কি? কোথায় নিবাস? বাসা স্থির আছে কিনা? ইত্যাদি প্রশ্ন ও তাহাদের পরস্পরের শিকার পাকড়াইবার বিবাদে যাত্রীকে এক মুহূর্ত্তেই কণ্ঠাগত প্রাণ করিয়া তুলিল। নীরদ তীর্থদর্শন করিতে আসেন নাই, আত্মীয় গৃহে আসিয়াছেন এই সামান্য কথাটা কোনমতেই যখন তাহাদের বুঝাইয়া দিতে পারিল না, তখন অসহায়ভাবে তাহাদেরি হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া দিয়া বলিল 'তবে আমার কোথায় যেতে হবে না হয় চলো তাই যাই।' কিন্তু তাহাতেও মুক্তি পাইল না। সে কাহার ভাগের সম্পত্তি তাহা স্থির না হইলে কেহই তো ছাড়িয়া দিবে না। ক্রমে রীতিমত সংগ্রাম বাধিয়া হাতাহাতির উপক্রম হইল, একজন নীরদের ডান হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল "চলুন বাবু আমি আপনার পাণ্ডা হলুম, রঘুবল্লভ মিশ্র সাড়েসাত ভাই আমরা, আমরাই সকলের প্রধান; আমার সঙ্গে চলুন" আর একজন তাহাকে ধাক্কা দিয়া তাহার অন্য হস্ত ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিল, বলিল "কি মতলববাজ লোক তুমি! এ বাবু আমার, এসো বাবু আমি তোমায় ভাল বাড়ি দোব আমার সঙ্গে এসো।"

এইরূপে অনেকক্ষণ ধরিয়াই পণ্যদ্রব্যের মতন কাড়াকাড়ি টানাটানির পর নীরদ অবশেষে প্রথম পাণ্ডার অংশভুক্ত স্থির হইলে বাকি সকলে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য শিকারের সন্ধানে চলিয়া গেল। নীরদ মুক্তির নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া ভাবিল, রক্তপপাসু কুকুরগুলাই বা ইহাদের চেয়ে কি বেশি অত্যাচার করে!

গাড়িওয়ালারাও একবার এইরকম একটা অভিনয় করিবার ইচ্ছায় প্রস্তুত ছিল কিন্তু সে 'গাড়ি চাহিনা' বলাই তাড়াতাড়ি তাহাদের সীমানা ছাড়াইয়া আসায় একটু ডাকাডাকি করিয়াই অগত্যা তাহারা ক্ষুন্ন মনে নিবৃত্ত হইল। নীরদ ষ্টেশন পার হইয়া সহরের দিকে গেল না, বিপরীত পথ ধরিল, দেখিয়া সঙ্গী পাণ্ডা কহিল "বাবু এই তোমার পাণ্ডা চাইনা, এক্ষুণি পথ ভুল করলে, ও রাস্তা নয় এই সহরে ঢুকবার রাস্তা" নীরদ দাঁড়াইল, পকেট হইতে মনিব্যাগটি বাহির করিয়া তাহা হইতে দুইটি টাকা বাহির করিয়া পাণ্ডার হাতে দিয়া বলিল, "তোমার যা পাওনা তা দিলুম বাপু, তুমি ঘরে যাও, আমার সঙ্গে ঘুরতে তুমি পেরে উঠবে না।" পাণ্ডা বিস্মিত হইয়া নূতনধরণের লোকটাকে সন্দিগ্ধভাবে দেখিতে লাগিল। তারপর জিজ্ঞাসা করিল ঠাকুর দেখবেন না? নীরদ বলিল "তোমার কাজতো হয়ে গেল, তুমি কেন এইবার যাওনা।" পাণ্ডা ভাবিল এলোকটা নিশ্চয় খৃশ্চান! যাই হোক দুটো টাকাতো দিয়াছে

অথচ পরিশ্রমও লাগিল না! সে আশীর্ব্বাদ করিয়া ফিরিয়া গেল। নীরদ সম্মুখে লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিল।

তিন দিকে অসীম প্রান্তর ধূ ধূ করিতেছে, একদিকে যমুনা। মাঠের মধ্যে মধ্যে গম, সরিষা, ও ছোলা মটরের ক্ষেত অর্দ্ধ পক্ক শস্যে হরিতাভ হইয়া উঠিয়া মাতা বসুন্ধরার শ্যামাঞ্চলের মতন শোভা পাইতেছে। স্থানে স্থানে কলাইশুঁটির প্রস্ফুটিত পুষ্পগুচ্ছ বেগুনী রংয়ের উজ্জ্বল আভায় ভায়োলেটের মতন ক্ষেত আলো করিয়া রহিয়াছে! কোথাও সর্ষে ফুলের নিকট মৌমাছির দল মাতাল হইয়া ঘুরিতেছিল। মৃদু বাতাসে গাছের মাথা নুইয়া নুইয়া পড়িয়া একটা সর্ সর্ তর্ তর্ শব্দ উঠিতেছে, এবং তাহার সহিত মিশিয়া যমুনার তীর হইতে কোন একটি যুবকের সুমিষ্ট কণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীতের একটি চরণ ভাসিয়া আসিতেছিল। নীরদ শুধু এইটুকু বুঝিতে পারিল "কৈসে যাউরে যমুনা?" নীরদ মুগ্ধনেত্রে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। পশ্চিমদিকে সীমান্ত রেখা পর্য্যন্ত বিস্তৃত বাধাহীন মাঠের শেষে সূর্য্যাস্তের বিপুল সৌন্দর্য্য তাহার চিত্তকে আকর্ষণ করিল। ভূমার সহিত ভূমির, ক্ষুদ্রের সহিত মহতের এই যে অনাদি সম্বন্ধ-চিরসম্বন্ধ রহিয়াছে ইহা কি কোন একদিনের জন্যও ছেদিত হইতে পারে! রক্তবর্ণ কিরণছটা সহস্রবাহু বিস্তার করিয়া ধরণী বক্ষকে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় চাহিতেছে; আকাশে পুঞ্জমেঘের শুভ্র স্তর তাহার গোলাপী আভায় রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছিল। নীরদ নিকটবর্ত্তী একটা দেবদারু গাছের তলায় বসিয়া দেখিতে লাগিল। আর অল্পক্ষণ পরেই সসীমের সহিত অসীমের মিলনে যে একটু বাধা আছে অন্ধকার সেটুকুও মুছিয়া দিবে। এই যে মিলনের জন্য ব্যগ্র ব্যাকুলতা, এই যে দুই বাহু বাড়াইয়া কাতর আবাহন, অসম্পূর্ণতাকে সম্পূর্ণতার মধ্যে সমর্পণ পূর্ব্বক সম্পূর্ণ হইবার যে একটা ঐকান্তিকতা ইহাদের তো ফল আছে? নীরদ নীরবে চাহিয়া রহিল। চারিদিকের সাড়াশব্দ ডুবিয়া আসিয়াছে। সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা, মধুকরের গুঞ্জন ও রাখাল সখার হাস্য পরিহাস থামিয়া এখন কেবল এক অবিচ্ছিন্ন মহারাগিণীর অনন্ত অব্যক্ত সঙ্গীত জনহীন প্রান্তরে ও অন্ধকার জগতে ব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। নীরব নক্ষত্র বিরল আকাশের পানে চাহিল। স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময় সেই অনন্ত আকাশ চিরপ্রশান্ত চিরউদাসীন ভাবে সস্নেহ নেত্রপাতে জাগিয়া আছে। সূর্য্যের প্রতপ্ত কিরণ গ্রহ তারকার বিমল জ্যোতিঃ কিছুই তাহাকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে না, কি মহান্ উদারতা কি অপূর্ব্ব মহিমা! নীরদ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল, স্তব্ধ অন্ধকারে ঝিল্লীর একতান বিশ্বতপোবনো-চ্চারিত এক অনাদি ধ্বনির সহিতই মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল, শীত রাত্রির মুক্ত আকাশ ঘন কুয়াশার আবরণে ঢাকিয়া গিয়া ক্ষীণ নক্ষত্রালোকে অন্ধকার বিশ্বপ্রকৃতিকে যোগীন্দ্রের সমাধিমূর্ত্তির মতনই স্থির ও প্রশান্ত দেখাইতেছিল।

নীরদ উঠিয়া দাঁড়াইল, কিসের লজ্জা কিসের সঙ্কোচ! এখনও এত অভিমান! আমিত্বের এতখানি অহঙ্কার এখনও হৃদয়দ্বারের কপাট চাপিয়া প্রহরা দিতেছে?

না—বিচ্ছিন্ন বিখণ্ডিত বিভক্ত যেমন এই একের মধ্যে মিশিয়া এক অবিচ্ছিন্ন অখণ্ড ও অবিভক্ত ভাবে পরিণত হইয়া গেল তেমনি করিয়া লজ্জা সঙ্কোচ সব সেই এক কর্ত্তব্যের মধ্যে ডুবাইয়া ফেলিতে হইবে। অন্ধকারে কষ্টে পথ চিনিয়া সে সহরের দিকে ফিরিয়া চলিল।

সূর্য্য পৃথিবীকে ও গ্রহগণকে, আকর্ষণ করিতেছেন, সেই আকর্ষণের বলে সূর্য্যের পানে তাহাদের অবিরাম গতি, আবার গ্রহগণের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া উপগ্রহ সকল তাহাদের চারিদিকে ঘুরিতেছে। এইরূপে কত কোটি সূর্য্য, কত গ্রহ, উপগ্রহকে অবিশ্রান্ত আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে। আবার সেই সমুদয় সৌরজগৎই যে কোন এক অতীন্দ্রিয় মহাশক্তির পার্শ্বে ক্ষুদ্র নক্ষত্রবিন্দুরই মতন আকৃষ্ট হইয়া অহোরহঃ ভ্রমণ করিতেছে না তাহারই প্রমাণ কোথায়! আকর্ষণই সৃষ্টির ধর্ম্ম, তাই দৃষ্ট পদার্থমাত্রেই আকর্ষণধর্ম্মী, পরস্পর পরস্পরের আকর্ষণে আকৃষ্ট! নীরদ কল্পনানেত্রে দেখিতে লাগিল যমুনা-তীরের সেই ক্ষুদ্র বাতায়নটি। যমুনার জল স্থির হইয়া রহিয়াছে আকাশ আপ্রান্তনক্ষত্র খচিত, বাতাস গাছের পাতার মধ্য দিয়া থামিয়া থামিয়া বহিতেছিল, আর সেই স্তব্ধ নির্জ্জনগৃহে দূরআকাশের দিকে অচঞ্চল নির্নিমেষ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া একজন একা বসিয়া। কোথাও কোন মনুষ্যের সাড়াশব্দ নাই, বিশ্রাম শয়নে সকলেই শান্তি উপভোগ করিতেছে, শান্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সকলকেই তাঁহার স্নেহাঞ্চলের ছায়ায় ঢাকিয়া রাখিয়াছেন। শুধু সেই একা জাগিয়া! নীরদ নিজেরও অজ্ঞাতে ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল, ওই যে দুটি নিদ্রাহীননেত্র তাহাদের সুদীর্ঘ কৃষ্ণপল্লবের মধ্য হইতে যুগল তারকার মত রাত্রির পর রাত্রি অনিমেষে চাহিয়া আছে, ওই যে হৃদয়খানি তাহার বাহিরের সকল ঝটিকা, সকল বজ্রনাদ উপেক্ষা করিয়া মৌন দৃঢ়তায় আপনাতে আপনি নিমগ্ন থাকিয়া সদাজাগ্রত রহিয়াছে, উহাদের মধ্যে কি একটা আকর্ষণীশক্তি নিহিত নাই?

জগতে কোন শক্তি ব্যর্থ যায় না, চুম্বক লোহাকে বুঝি এমনি করিয়াই টানিয়া আনে? গভীর রাত্রে বদ্ধগৃহের দ্বার ঠেলিয়া স্পন্দিত বক্ষে রুদ্ধপ্রায় নীরদ ডাকিল "শিবানী! শীতের রাত্রে রুদ্ধদ্বার প্রতিবাসীগণ সকলেই নিদ্রামগ্ন, গলির মধ্যে অন্ধকার নিবিড় হইয়া জমিয়া রহিয়াছে, সম্মুখেই জল কল কল শব্দ করিয়া বহিয়া চলিয়াছে, ঘুমন্তরাত্রে কেবলমাত্র পল্লার প্রান্তবর্ত্তী কোন স্থান হইতে এসরাজ ও তবলার চাঁটির সঙ্গে একটা সঙ্গীতের সাড়া আসতোচ্ছল ও প্রমত্তকণ্ঠে 'হাহাহাঃ, অথবা 'হায় হায়' ইত্যাদি সঙ্গত শোনা যাইতেছে। নীরদের আহ্বান তাহারি বক্ষে কম্পিত হইয়া উঠিল, কেহই উত্তর দিল না। গৃহে কেহ বাস করিতেছে এমন কোন চিহ্নই পাওয়া গেল না, কোথাও আলোকের রেখাটি পর্য্যন্ত নাই। হঠাৎ সে দেখিতে পাইল দ্বারে বাহির হইতেই তালা বন্ধ। নীরদের হৃদয় স্তম্ভিত বেদনায় নিশ্চল হইয়া পড়িল। অবশিষ্ট রাতটুকু—যে দ্বারে সে একদিন আশ্রয়হীন, নিরাত্মীয় ও রোগাক্লিষ্ট আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এবং সেই নিতান্ত

চুরুদূর্বৈন্তু সময় যে তাহাকে নিজের কোলে সাদরে স্থান দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই, আবার একদিন যাহার অনুযোগ তিরস্কার ও মিনতি উপেক্ষা করিয়া সে তাহার নিকট হইতে নিজেকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিল সেই দ্বারে বসিয়াই সে কাটাইল। যেটুকু সুখ সে মাতৃহীন হইবার পর লাভ করিয়াছিল, তাহা এইখানেই—সেকথা আজ সে অনুভব করিতে পারিল। অভাগিনী যে তাহাকে তাহার সর্ব্বস্বই দিয়াছিল, আর সে তাহার মূল্য না বুঝিয়া তাহাকে ধূলায় ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছিল, এতদিন পরে আবার সেই অনাদৃত দান কুড়াইয়া লইতে আসিয়াছে, কিন্তু কই? তাহার পশ্চাতে কি এই ক্ষুদ্র দ্বার চিররুদ্ধ হইয়া গিয়াছে?

ভোরের আলোক প্রকাশিত হইতে না হইতে রাস্তায় লোক চলাচল আরম্ভ হইয়া গেল, ঠাকুরবাড়িতে নহবতে ভৈরবী রাগিণী বাজিতে লাগিল, নীরদ নিকটবর্ত্তী দোকানের সম্মুখাগত ছোকরা দোকানীকে সিদ্ধেশ্বরীর বাটীর অধিবাসিদের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল। এ দোকানী নূতন লোক নীরদকে চিনিত না, সে বাঙ্গালী বাবুকে একজন ভাল খদ্দের মনে করিয়া খাতির দেখাইয়া বলিল "আপনি ও বাড়ী ভাড়া নেবেন? তা নেন্ না, কলি ফিরিয়ে নিলেই সব দোষ কেটে যাবে এখন। না হয় একটু বিলিতি ওষুধ ছড়িয়ে দিলেই হবেন" নীরদ তাহার কথার প্রকৃত ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল "কেন ও বাড়ির কি হয়েছে? বাড়ীর লোকেরাই বা গেল কোথায়?"

দোকানী গম্ভীর হইয়া বলিল "আর সে কি কথা বল্‌বো বাবু! ঐ সে দিন পেলেগ হয়ে বাড়িতে দুজন মারা গেল না! আহা মেয়েটি ত নয় যেন সাক্ষাৎ রাধিকা ঠাকরুণ একখানি থানপরা—তাতেই যেন রূপ ফেটে পড়চে—"

নীরদ আর দাঁড়াইল না।"

বন্ধন কাটিয়া আসিতেছে! শিবানী নাই, পাষণ্ডের নিষ্ঠুর অত্যাচার বক্ষে লইয়া নীরবে জীবনের দুঃখভার বহন করিয়া সে সকল যন্ত্রণার হাত ছাড়াইয়া চলিয়া গিয়াছে! ব্যর্থ জীবনের মর্ম্মচ্ছেদি তৃষা আজ তাহার প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের কানায় কানায় ভরিয়া নাই। অনাহৃত সেই প্রেমমাল্য যাহা সে ছিঁড়িয়া মাটিতে ছড়াইয়া দিয়াছিল, সেই সুরভি হার আজ যাঁহার কণ্ঠ হইতে কোনদিন স্খলিত হইবার আশঙ্কা নাই তাঁহারি বক্ষে লুণ্ঠিত! অনাদৃত ও অনাদৃতা উভয়কেই তিনি তাঁহার অমৃত বক্ষে তুলিয়া লইয়া সাদরে স্থান দিয়াছেন!

নীরদ আজ মুক্ত! যে বন্ধনের ব্যথা বন্ধন ছাড়াইয়া গিয়াও তাহাকে মুহূর্ত্তের জন্য ছাড়ে নাই, আবার যে বন্ধনের মধ্যে আসিতে হইবে মনে করিয়া লজ্জা ক্ষোভ ও ভাবনায় তাহার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া থামিয়া গিয়া তাহাকে পৌরুষহীন জড়ে পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিতে প্রায় সক্ষম হইয়া আসিয়াছিল সে আজ স্বয়ংই যখন তাঁহার বন্ধনরজ্জু কাটিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে শুনিল তখন নীরদ,—কই মনে করিতে ত পারিল না যে সে আজ ভাগ্যবান, সে আজ মুক্ত! মুক্ত! এরি নাম মুক্তি? সে কি ইহাই চাহিতেছিল?

সে অনাহারে অনিদ্রায় যেমনি আসিয়াছিল তেমনি ফিরিয়া চলিল। দেখিতে দেখিতে হিম কুহেলিকার ন্যায় সমস্ত নগরী তাহার চক্ষের সম্মুখ হইতে অদৃশ্য হইয়া দূরে মিলাইয়া গেল। বাষ্পযান প্রচুর ধূমোদ্গারণের সহিত উচ্চ চীৎকার করিতে করিতে দূর হইতে দূরান্তরে ছুটিয়া চলিল। দুই পাশে গিরি, নদী দেবালয় গ্রাম ও সুবিস্তীর্ণ মাঠ বায়স্কোপের বিচিত্র চিত্রের মতন একটার পর একটা দেখা দিয়া আবার অদৃশ্য হইয়া যাইতেছিল। কত পুরাতনের স্মৃতি, কত নূতন অধ্যবসায়, কত সুখদুঃখ, হাসি কান্নার সম্মিলিত রূপ ইহাদের মধ্যে মিশ্রিত, কতদিনের কত কথাই ইহাদের সহিত বিজড়িত রহিয়াছে। নীরদ অপলকনেত্রে চাহিয়া রহিল। চলন্ত গাড়ির সহিত দৃশ্য সমুদয়ও চলিতেছে, চঞ্চল চিত্তের ভিতরেও সহস্র স্মৃতি ওতপ্রোত ভাবে উঠিতে পড়িতেছিল, তাহার জীবনের গতিও এই রকম মুহুর্মুহুঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছিল না কি? বেদনায় বুকের ভিতর হৈ হৈ করিয়া উঠিতেছে, মাথার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল, হাত পায়ের তলা শীতল ও বলহীন হইয়া আসিতেছিল। হায়! কোন দিনই কি সে শান্তির মুখ দেখিতে পাইবে না? অভিশপ্ত! এমনি করিয়া কি আমরণ বিমান মার্গে কেন্দ্রচ্যুত গ্রহের মতন লক্ষ্যহীন পথেই ঘুরিয়া বেড়াইবে, কক্ষায় ফিরিতে পারিবে না?

ইহার পূর্ব্বে আর কখনও তাহার আশা উৎসাহ ও উন্নতির সহিত শিবানীর কোন সম্পর্ক স্থাপিত হয় নাই, বরং তাহাদের নিকট হইতে মূর্খ শিবানীকে সে সন্তর্পণে দূরেই সরাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিত। কিন্তু যখনই সে কল্পনা করিতেছিল তাহার তপোবনে ওই ক্ষুদ্র আশ্রম গৃহের মধ্যে শিবানী গৃহলক্ষ্মীর আসনে উপবিষ্টা,—ক্ষৌমবসনা শঙ্খবলয়ধৃতা প্রশান্তবদনা নারী তাহার পুতহস্তে আশ্রম খানিকে পবিত্রতম করিয়া তুলিয়াছে, আনন্দময়ী জননী রূপে শিশুবৃন্দকে সেবা শুশ্রূষা দ্বারা সে তাহার কর্ম্মভার লঘু করিয়া দিয়া নিজে তাহার অংশ গ্রহণ করিতেছে, আবার নিয়মমত পূজা উপাসনা কালে তাহার পার্শ্বে বিরাজিতা রহিয়া তাহার শাস্ত্রালোচনা, তাহার শাস্ত্র ব্যাখ্যায় প্রাণ ঢালিয়া দিয়া বিশ্রামে কর্ম্মে ক্লান্তিতে সুখেদুঃখে এক হইয়া গিয়াছে,—যখনি এমনি করিয়া তপস্বিনী সহধর্ম্মিনীর একখানি ছবিকে বড়ই সাবধানের সহিত অল্পে অল্পে হৃদয় ফলকে ফুটাইয়া তুলিয়া তাহার দিকেই লোলুপ দৃষ্টি সংন্যস্ত করিতেছিল। তখনি নীরদের সেই আশা কল্পনা যেন মরু মরিচীকা বাগান পুষ্পবৎ কল্পনাতে পর্য্যবসিত হইয়া গেল। শূন্য কামরার জানলার কাঠের উপর মাথা রাখিয়া নীরদ আশাময় চক্ষু মুদিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল, হায় সে যদি আরও কিছুদিন আগে আসিত! সেই যখন আসিলই তখন এত বিলম্ব করিল কেন!

হাট্রাস্ জংশনে গাড়ি থামিয়া গিয়াছে আরোহিগণের এইখানেই, অন্য গাড়ি ধরিবার কথা। কুলীর "বাবু! বাবু!" ডাকে সজাগ হইয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি নীরদ নামিয়া পড়িল, —তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে।

অদূরে বিশ্রাম স্থান, পঞ্জাবমেল আসিতে তখনও প্রায় আধঘণ্টা দেরি, একটা কুলীর

হাতে ব্যাগটা দিয়া নিশ্চল প্রায়-চরণকে টানিয়া সে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল শরীর যেন বহিতে পারিতেছিল না, মাথা ঘুরিয়া পড়িতেছিল। এমন সময় 'মিঃ রায় না? এই যে তুমি কোথা থেকে?' বলিয়া-পিছন হইতে কে কাঁধে হাত দিল। নীরদ ফিরিয়া দেখিল মাদ্রাজের একটি পরিচিত বন্ধু বীরেশ্বর। নীরদকে দেখিয়া সে খুব আনন্দ প্রকাশ করিল তাহার পরে জিজ্ঞাসা করিল "কোথা গেছলে? এখন যাচ্চো কোথায়?" নীরদ বলিল "বৃন্দাবন থেকে আসচি, বোধ হয় কলকাতায় যাবো" "বোধ হয়?" নীরদ একটু খানি ইতস্ততঃ করিল 'না কলকাতাতেই যাবো? তুমি কোথায়"? "আমি যাচ্চি একটু ভ্রমণে। এই দিল্লি। তুমি গিয়েছিলে? নীরদ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে না। "বলোকি জগতের মধ্যে একটা প্রধান জিনিষই দেখলে না, এঁ্যা? না না, তাকি হয় চলো আমার সঙ্গেই চলো একটু ঘুরে আসবে। কটা দিনই বা! তার পর আমি চন্দন নগর, আর তুমি হাবড়া ব্যস্; কিহে কথা কওনা যে, যাচ্চো তো তাহলে? তোমার চেহারাটা বড্ড শুধিয়ে গ্যাছে তা অসুখ বিসুখ হলে কিচ্ছু ভয় নেই, আমার সঙ্গে এই দেখো হোমিওপ্যাথিক বক্স, 'রুবিনীর কাম্ফার 'কুইনিন' এই সব। পেটেণ্ট টেটেণ্টও কিছুই আমি কিনতে বাকি রাখিনি, আমার হৃদয়টা ভারি দুর্ব্বল কিনা তাই ওষুধের বিজ্ঞাপন দেখলেই পড়ি,—হ্যাঁ তবে আমার রোগটার একটা সুলক্ষণ এই, সকল রকম রোগের ব্যবস্থার সঙ্গেই মেলে। এখন ডাক্তারের হুকুমে বেড়াতে বেরিয়েচি। হ্যাঁ তাহলে তুমি দিল্লাই যাচ্চো কেমন? একা মন লাগেনা"।

নীরদ দুটো দিন তাহার অন্তরের আঘাতটা সামলাইয়া লইবার জন্যও ব্যয় করার প্রয়োজন বুঝিয়াই উত্তর করিল "চলো তবে কিন্তু ঐখান থেকেই ফিরবো"। বীরেশ্বর মহাস্ফূর্ত্তির সহিত তাহার হাতটায় একটু ঝাঁকা দিয়া সোৎসাহে কহিয়া উঠিল "ভয় নেই তাই হবে"।

অন্তরতর।

তখন দু'জনে দেখা হয়েছিল
সেথায় মুক্ত মাঠের মাঝে;
ফাল্গুনে মিঠে বসন্ত বায়
বহেছিল ধীরে উদাস সাঁঝে।
দূর হ'তে সেই দেখেছিনু তোরে,
লুব্ধ আমার দু'টি আঁখি ভরে',
কি জানি কি ভেবে হেরিয়া গো মোরে
চকিতে অয়ি,
আনত চক্ষে চলে' গেলে তুমি
লো সুধাময়ি!

এখন যে হেথা কঙ্কণ-করে
কুন্তলজাল এলিয়ে দিয়ে—
লীলায় বহিছে মন্দ মলয়
পুলকে আঁচল দুলিয়ে নিয়ে।
কাছাকাছি আজি রয়েছি হেথায়,
চেয়ে চেয়ে চেয়ে দেখিগো তোমায়,
সরম-পাতার বাঁধন টুটিয়া
ফুটিয়া যেন—
'গুণ্ঠন টানি' নাহি চলে' গিয়ে
হাসিছ কেন?

শ্রীবগলারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

জাপানের খেলা।

জাপানীরা ক্রীড়ায় বড় সিদ্ধহস্ত; বুড়াবুড়ি পর্য্যন্ত খেলিবার জন্য পাগল। জাপানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্ বিজ্ঞানাচার্য্য কৃষিকলেজের অধ্যাপক কে মিয়াবে ডি, এম্, সি (হার্ব্বার্ড) প্রতি নববর্ষ দিনে তাঁহার কলেজস্থ যাবতীয় বৈদেশিক ছাত্রকে নিমন্ত্রণ করেন। তথায় আহারান্তে খেলা আরম্ভ হয়। তাঁহার বয়স পঞ্চাশের উপর। তাঁহার স্ত্রীর বয়স দুই এক বৎসর কম। খেলায় তিনি তাঁহার স্ত্রীপুত্রসহ যোগদান করেন। জাপানের অনেক খেলাতেই সর্ত্ত থাকে। ইহাতে পরাজিত ব্যক্তিকে হয়ত নাচিতে হয়, গাইতে হয় অথবা জন্তুর ন্যায় অব্যক্ত শব্দ করিতে হয়; স্থূল কথা কোন না কোন উপায়ে হাসাইতে হয়। আবার কোন কোন খেলায় পরাজিত ব্যক্তির মুখে চুনকালী দিতে হয়। অধ্যাপকের বাড়ীতে শেষোক্ত সর্ত্তে খেলা আরম্ভ হইল। ছাত্রগণ এবং অধ্যাপক সাহেব পরাজিত হইলে পরস্পর পরস্পরকে রঙে সাজাইতে লাগিলেন। কিন্তু যে সময় অধ্যক্ষ পত্নী পরাজিত হইলেন তখন ছাত্রগণ তাঁহাকে সাজাইতে দ্বিধা বোধ করিতে লাগিল। বৃদ্ধ অধ্যক্ষ মহাশয় সানন্দে পত্নীকে রঙে ঢাকিয়া ফেলিলেন।

তোকিও সহরে মুক্ত কয়েদীদিগকে সংপথে চালাইতে এবং তাহাদের দ্বারা দেশের অনেক রকম মঙ্গলজনক কায করাইতে অনেকগুলি আশ্রম আছে। এইরূপ একটী বিখ্যাত আশ্রমের সেক্রেটারী মিঃ হারা। মিঃ হারার বয়স প্রায় ৬০ বৎসর। তিনি ভারতীয় ছাত্রদের পরমবন্ধু। তাঁহার এক ছেলে ভারতের পঞ্জাব প্রদেশে আছেন। তিনি ভারতীয় ছাত্রদিগকে তাঁহার বাড়ীতে মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করিয়া থাকেন এবং অনেক সময় ভারতীয় ছাত্রদের বাড়ীতেও নিমন্ত্রিত হইয়া থাকেন। বৃদ্ধ বৃদ্ধা এবং পরিবারস্থ সকলেই সর্ত্তের খেলা খেলিতে বড় আমোদ বোধ করিয়া থাকেন। অনেক সময় বুড়োবুড়ীকে অব্যক্ত জন্তুর ডাক ডাকিতে শুনিয়াছি। কোন পরিবারে নিমন্ত্রিত হইলেই বুঝিতে হইবে সেখানে কোন না কোন খেলায় যোগ দিতে হইবেই। কোন জায়গায় ৫।৭ জন মিলিত হইলেই তথায় হাসি তামাসা এবং রসিকতার ফোয়ারা ছুটিতে থাকে।

জাপানে গরমের দিনে অনেকে দোল্‌নায় (হেমকে) দুলিতে বড় পছন্দ করে। আমাদের বাড়ীতে একটী দোল্‌না ছিল। একদা কলেজ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখি আমাদের ৬৫ বৎসর বয়স্কা বৃদ্ধা ঝি (ওবাছান) কষ্টশ্রেষ্টে কেদারায় ভর করিয়া তাহার উপর উঠিয়া এক যষ্টির সাহায্যে দুলিতেছে।

ইহাতেই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে এবং যুবক যুবতী খেলিবার জন্য কত বেশী উদ্‌গ্রীব। জাপানের প্রাচীন খেলা অধিকাংশই বীর-জনোচিত। দৌড়াদৌড়ি, ছুটাছুটি, লাঠিখেলা, তলোয়ার খেলা, ধনুর্ব্বাণ চালান, কুস্তি, ডন প্রভৃতি সে কালের খেলা। আজও পর্য্যন্ত বিশেষ আগ্রহের সহিত উহারা এ সব খেলা

নব্য এবং পাশ্চাত্য ধরণের। একটু বিশেষত্ব এই, কয়েকটি খেলার পর পর এক একবার প্রহসন দৃশ্য বা সামাজিক সঙের দৃশ্য দেখান হয়। সে দৃশ্য অতি কৌতুহলোদ্দীপক। বার্ষিক ক্রীড়া প্রদর্শনীতে উপযুক্ত ছেলে মেয়েকে পুরস্কার দেওয়া হয়। অধিকাংশ স্থলেই নোটখাতা, রুমাল, তোয়ালে, পেন্সিল, কাগজ, কলম, গেঞ্জি, বাক্স, টুল ইত্যাদি পুরস্কারের দ্রব্য।

অনেক দোকানদার নিজ নিজ দোকান সর্ব্বসাধারণে বিজ্ঞাপিত করিবার জন্য ঐ সকল দ্রব্য স্কুলকর্তৃপক্ষের হস্তে অর্পণ করে। সংবাদ পত্রে ঐ সকল মুদ্রিত হইয়া থাকে। তামা, দস্তা, পিত্তল প্রভৃতি ধাতু নির্ম্মিত মেডেলও বিস্তর প্রদত্ত হইয়া থাকে।

আমাদের ধনাঢ্যনন্দনদের ন্যায় জাপানের লর্ড সন্তানগণ সূর্য্যোত্তাপে গলে না, ঠাণ্ডায় জমে না, বাতাসে হেলিয়া পড়ে না, পদব্রজে চলিতে পায়ে ফোস্কা পড়ে না, মাথা ধরেনা, অপাকে পেটফাঁপা বা অজীর্ণে ভোগে না। তাঁহারা সবল ও হৃষ্টকায়, পাঁচ মিনিটের রাস্তা কেন তাঁহারা প্রতিদিন দুই মাইল দূরবর্ত্তী কলেজে মোটার গাড়ীর পরিবর্ত্তে হাঁটিয়াই যাতায়াত করিয়া থাকেন। এবং কুস্তি ডনেও তাঁহারা পশ্চাৎপদ নহেন। আমার সঙ্গে পাঁচটি লর্ড সন্তান পড়িতেন, উঁহারা কাউণ্ট এবং ভাইকাউণ্টের ছেলে। উঁহাদের চারিজন প্রতি বৎসর বার্ষিক ক্রীড়ায় প্রথম দ্বিতীয় স্থান দখল করিয়া তোয়ালে, রুমালের ন্যায় যৎকিঞ্চিৎকর পুরস্কার গ্রহণ করিতেও কত আনন্দ বোধ করিতেন। পিয়ার্সস্কুলের ছেলে মেয়েদের পুরস্কারও একই প্রকার। একদা আমার এক অধ্যাপক ধান্য রোপন সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে করিতে আমাকে বলিয়াছিলেন ধানের চারা গাছগুলি যখন নার্শারিতে তোমাদের দেশীয় রাজপুত্রদের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ দুর্ব্বল রোগীর ন্যায় ফ্যাকাশে হইয়া পড়ে তখন উহাদিগকে যথাস্থানে রোপন করা দরকার। আমাদের শুধু রাজপুত্রগণ বলিয়া কেন, যাহাদের স্বচ্ছলভাবে বসিয়া খাইবার পন্থা আছে তাহাদের অনেকেই এবম্বিধ ধান্যবৃক্ষ স্বরূপ। আর যাহাদের বসিয়া খাইবার যো নাই অতিরিক্ত শারীরিক এবং মানসিক পরিশ্রমে তাহাদের অনেকেই শুষ্ক দণ্ডবৎ।

ইউরোপ এবং আমেরিকার প্রায় সমস্ত খেলাই জাপানে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। জাপানীরা টেনিশ ক্রিকেট, বিলিয়ার্ড, পিংপং, হকি, বেছবল, ফুটবল, রাগবি ইত্যাদি সমস্তই খেলিয়া থাকে। টেনিশ এবং পিংপং খেলিতে নব্য ছেলে মেয়ে অনেকেই সিদ্ধহস্ত, এবং এই দুইটি খেলা মেয়েদের খেলা বলিয়াই ধর্ত্তব্য। আমাদের দেশে ফুটবল ও ক্রিকেটের ন্যায় জাপানে বেছবল খেলার চলনই বেশী। বেছবল খেলা এখনও আমাদের দেশে প্রচলিত হয় নাই। ইহা আমেরিকার প্রধান খেলা। তোকিওর ওয়াছেদা নামক একটী প্রাইভেট ইউনিভার্সিটীর বেছবলপার্টি জাপানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ঐ পার্টি জাপানস্থ অনেক বৈদেশিক পার্টিকে পরাস্ত করিয়া থাকে। দুই বৎসর পূর্ব্বে উহারা হাওয়াইস্থ আমেরিকান পার্টিকে পরাস্ত করিয়াছে।

সহরের অনেক স্থানে পাশ্চাত্য খেলার

অনেক ক্লাব রহিয়াছে। এমন কি বাজারের জায়গায় জায়গায় বিলয়ার্ড খেলিবার টেবিল রহিয়াছে। সামান্য খরচেই ইচ্ছামত তথায় যে কেহ খেলিয়া আসিতে পারে। সভা সমিতিতে বক্তৃতার ছড়াছড়ির চেয়ে খেলার প্রচলনই বেশী।

জাপানে লুকোচুরি, ছুটোছুটি, কাণা-মাছির ন্যায় অনেক খেলাও আছে। ছোট ছোট মেয়েরা আমাদের দেশের মেয়েদের ন্যায় বৌ সাজিয়া রান্না, খাওয়াদাওয়ার খেলাও খেলিয়া থাকে।

দুটি বোন একসঙ্গে খেলা করিতেছে, এখন উহারা বোন নহে, বন্ধু সাজিয়াছে। ছোট বোনটি আগন্তুক। জাপানে আগন্তুকের পরিচর্য্যা যে ভাবে করিয়া থাকে এ চিত্রে তাহাই দেখাইতেছে। বন্ধুকে উপবেশন করিতে আসন দিয়া কিঞ্চিৎ গল্প প্রসঙ্গের পর চা, বিস্কিট, অন্ন ব্যঞ্জন প্রভৃতিদ্বারা পরিতোষ সহকারে ভোজন করান হয়। তারপর কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর বন্ধুর পরিতোষের জন্য গান বাজনা আরম্ভ হয়। বন্ধু গম্ভীর ভাবে একখানা রুমাল হাতে লইয়া আগন্তুকের ন্যায় বসিয়া আছে বড় বোন তিন তারের একটি বাদ্য যন্ত্র বাজাইতেছে। গীত বাদ্যের পর কড়ি, সতরঞ্চ, কিম্বা গোলকধাঁধার ন্যায় কোন খেলা আরম্ভ হইবে। এইরূপ আমোদ উৎসবে যখন ক্লান্ত হইয়া পড়ে তখন তাহাদের খেলা বন্ধ হয়।

আর একটী জাপানী খেলার কথা উল্লেখ করিতে ভুলিয়াছিলাম। উহা নববর্ষের "হানেৎছুকুরী" অর্থাৎ একপ্রকার ব্যাট্‌লডোর শাট্‌লকক্। হানে অর্থে পাখীর পালক আর ৎছুকুরী প্রয়োগ করা; এই অর্থেই খেলাটির নামকরণ হইয়াছে। এ খেলা

দুই বোনে খেলিতেছে

দুই দুই জনে খেলিতে হয়, দুজনের হাতে দুইখানি ব্যাট্‌। ব্যাটগুলি চিত্রিত এবং উহার একধারে রঙ্গিন কাপড়ে এবং অলঙ্কারে সজ্জিত একটি মূর্ত্তি। যে ধারে মূর্ত্তি নাই সেই ধারের সাহায্যে পালকে লাগান ক্ষুদ্র সুপারীর ন্যায় বল অর্থাৎ শাটলকক্‌ ফিরাইতে হয়। বল ফিরাইতে না পারিলেই পরাজয়। নববর্ষদিনে স্ত্রীপুরুষ, যুবকযুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, ছেলে মেয়ে সকলেই এ খেলায় পাগলপ্রায় হইয়া উঠে। জননী ক্ষুদ্র শিশুটিকে পৃষ্ঠদেশে বাঁধিয়া হয়ত নিজের ছেলে কিম্বা মেয়ের সহিতই খেলিতেছেন, পরাজিত ব্যক্তিকে মুখে গালে চুণকালীতে এক অদ্ভুত সজ্জায় ভূষিত হইতে হইয়াছে। ভারতীয় ছাত্রদিগকে ৬।৭ বছরের খোকাখুকীর সহিত খেলিতেও যাত্রার দলের মহাদেব কিম্বা ভূতপ্রেত সাজিতে হয়।

জাপানীরা খর্ব্বাকৃতি হইলেও পৃথিবীর মধ্যে হাইজাম্প রেকর্ডে সর্ব্বপ্রথম। কিন্তু কুস্তি ডন প্রভৃতি শারীরিক প্রক্রিয়ায় জাপানীরা বিশেষ দক্ষ হইলেও এবং সেদেশে বহু সার্কাস পার্টি থাকিলেও আমাদের প্রফেসর ব্যানার্জ্জির কিম্বা বোম্বে গ্রেট সার্কাস পার্টির ন্যায় কোন পার্টি সেখানে নাই। অর্থাৎ বাঘের সহিত এবং ঘোড়ার উপর আমাদের দেশে যেমন খেলা হয় ওদের দেশে তেমন নাই। ওদের সাইকেলের খেলা বেশ। অনেক সার্কাস পার্টিতেই সেখানে মেয়েরা খেলা করে। কোন কোন পার্টিতে কেবল মেয়েরাই খেলে।

আত্মারাম সরকারের ভেল্কিবাজীতে পাঁচ মিনিটে আমের বীজ হইতে গাছ জন্মায়, ফল ফলে। এ বাজিতেও ভারত শ্রেষ্ঠ। জাপানীরা তেমন পারে না।

শ্রীযদুনাথ সরকার।

হার-জিত।

(১)

নন্দলাল তার মাতুলের মুখের উপরেই বলিয়া বসিল—"তাই বেশ!—আমি কালই চলে যাচ্ছি!"

এ পর্য্যন্ত পরাণবাবুর মুখের উপর এমন ভাবে কেহ কখনো জবাব দিতে সাহস করে নাই। তিনি রোষে ও বিস্ময়ে ক্ষণকাল নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। মুহূর্ত্ত পরে জাগিয়া বলিলেন—"এখনি বেরোও!"

নন্দলাল স্থির ও পরিষ্কার কণ্ঠে উত্তর করিল—"বেশ!—টাকা কড়িগুলো ফেলে দিন—যাচ্ছি!"

পরাণবাবু যেন আকাশ হইতে পড়িলেন—বলিলেন—"টাকাকড়ি!"

নন্দলাল কহিল—"আজ্ঞে—হাঁ!—মার তিন হাজার টাকার গহনা আর বাবার বিষয় বিক্রীর টাকা।"

পরাণবাবু একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিলেন—"ও!—তোমার বাবার জমিদারী ছিল!—তাই বুঝি তুমি ছোট বেলা থেকে মামার অন্নে 'মানুষ' হয়ে আসচো?"

নন্দলালের মুখ শুকাইয়া গেল—সে বিকৃত কণ্ঠে বলিল,—"অ্যাঁ!—এত কু-অভিসন্ধি!"

পরাণবাবু তাঁর এক অনুচরের প্রতি চাহিয়া বলিলেন—"শুন্‌চো শ্যামলাল!"

সমগ্র স্তাবকের দল বলিয়া উঠিল—ছিঃ—ছিঃ—একি অসম্মানের কথা!"

পরাণবাবু আল্‌বোলার নল টানিতে টানিতে মোটা গলায় বলিলেন—"কলিকালে উপকার করার ফল—এই!"

সকলে বলিল—"যা বলেচেন!" পরাণবাবু নন্দলালের দিকে চাহিয়া রুক্ষস্বরে বলিলেন—"যাও!—নালিস করে নাও-গে!"

নন্দলাল একবার উর্দ্ধপানে চাহিয়া বলিল—"এর বিচার তিনিই করবেন।" বলিয়া সে তথা হইতে দ্রুত চলিয়া গেল।

পরাণবাবু একবার স্তাবকমণ্ডলীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—"এ হলো কি?—এত আস্পর্দ্ধা কিসের?"

এক ব্যক্তি বলিল—"ও 'বালামে'র গুণ!" পরাণবাবু একটু কৃপার হাসি হাসিয়া বলিলেন; "তাই দেখচি!"

২

নন্দলাল শৈশবেই পিতৃহীন হয়। তাহার পিতা পশ্চিম অঞ্চলে বহুদিন চাকুরী করিতে করিতে অবশেষে সেই দেশেই বসবাস স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার আরো কয়েকটী সন্তানাদি হইয়াছিল কিন্তু দু-এক বৎসরের হইতে না হইতে সবগুলিরই জীবন মুকুল অকালে ঝরিয়া পড়ে। ইহাতে নন্দলালের পিতার, অর্থসঞ্চয়ের দিকে তেমন দৃষ্টি ছিল না—তিনি উপার্জ্জিত অর্থের অধিকাংশই লোকহিতে ব্যয় করিতেন। কিন্তু দশ বৎসর পরে বিধাতা সেই নিরানন্দ সংসারে আবার একটি স্নেহের ধন সন্তান পাঠাইয়া দিয়া পিতামাতার শোকদগ্ধ প্রাণে আনন্দরস সঞ্চারিত করিয়া তুলিলেন।

শোকজীর্ণ প্রৌঢ় কাশিনাথ কিন্তু 'ভাঙিয়া' পড়িয়াছিলেন। নন্দলালকে বেশী দিন বুকে করিয়া জুড়াইবার অবসর পাইলেন না!—পূর্ণিমার এক স্নিগ্ধ রাত্রে তাঁর ডাক পড়িল। অন্তিমকালে অতৃপ্ত পিতৃস্নেহ মায়ার শৃঙ্খলটি আরো জটিলতর করিয়া তুলিয়াছিল! মৃত্যুকালে, পত্নীর হাতখানি ধরিয়া দুই চক্ষে ধারা বহাইয়া বলিলেন—"তুলসি! ছেলে বুকে ধরে সুখ ভোগ করার কপাল আমার নয়!—তবু একে যে রেখে যেতে পারলাম, এই ঢের!"

নন্দলাল তখন পাঁচ বৎসরের। পিতৃকুলে তাহার তেমন কোন আত্মীয় ছিল না। যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা যে অনাথ শিশুর 'রক্ষক' হইবেন এমন সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং তুলসী সহোদর পরাণবাবুর শরণাপন্ন হইলেন—হাজার হ'ক তিনি 'মারপেটে'র ভাই!

পরাণবাবু লোকটী খুব 'পাকা'। তিনি কলিকাতায় বাস করেন। পৈতৃক বিষয় সম্পত্তি যৎকিঞ্চিৎ আছে বটে কিন্তু তাহাতে কলিকাতার বিলাস ব্যয় সঙ্কুলান হয় না। অথচ পরাণবাবুর সাংসারিক অবস্থা বেশ স্বচ্ছল,—বরং স্বচ্ছলেরও বেশী। ইহাতে 'পাঁচজনে' পাঁচ রকম কথা বলিলেও বাহিরে তাঁহার প্রতিপত্তি অটুট—!

তুলসী পাঁচ বছরের ছেলে লইয়া ভায়ের, সংসারে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। এই আশ্রয় গ্রহণের মূলে দৈন্যের দংশন জ্বালা যে এতটুকু ছিলনা এবং অভিভাবকের একমাত্র অভাবই যে

তাঁহাকে—ভ্রাতৃসংসারে টানিয়া আনিয়াছে একথা তুলসী কাহাকে কোনদিন বুঝাইতে চান নাই। তিনি আশ্রিতের মতই কুণ্ঠিত ভাবে জীবনের অবশিষ্ট কালটুকু পূজা অর্চনায় কাটাইয়া দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন!—তিনি ভাবিতেন বৈধব্যের চেয়ে নারীর কপালে আর কি বেশী অভাগ্যের—অধিক দীনতার বিষয় হইতে পারে!

পরাণবাবুও ভগিনীকে মর্য্যাদার সহিত গৃহে স্থান দিলেন; ভাগিনেয়ের যাহাতে মঙ্গল হয় তার জন্য 'প্রাণপণ যত্ন করিতে' ত্রুটি হইবে না বলিয়া আশ্বাস দিলেন। ভগিনীর বিষয় কর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ করিতে গিয়া পরাণবাবু অনেক সময় নিজের ক্ষতিও স্বীকার করিতেন।

এইরূপে এক বৎসরের উপর অতিবাহিত হইয়া গেল। একদিন পরাণবাবু ভগিনীকে কহিলেন—"এত দূরে থেকে বিষয় রক্ষা করা বড়ই শক্ত ব্যাপার! আমার দ্বারা দেখছি আর হয়ে ওঠে না—আর সে সম্ভবও নয়··অথচ বিশ্বাসী লোকও পাওয়া দুষ্কর···"

তুলসী জিজ্ঞাসা করিলেন—"তবে কি করলে ভাল হয়!" পরাণবাবু কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন—"আমার মতে বিদেশের বিষয় সম্পত্তি সব বিক্রী করে সেই টাকা সুদে খাটানো ভাল!—তা'তে কিছু কম লাভ হয় সেও বরং ভাল—'বিষয় আশয়ে'র ঝঞ্ঝাট ঢের!—এই দেখতেই তো পাচ্চো!

কথাটা বিধবার নিকট কতকটা সমীচীন বলিয়া বোধ হইল, তিনি বলিলেন—"তুমি যা ভাল বোঝ তাই কর—তুমি তো আর নন্দর 'পর' নও!"

পরাণবাবুর চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিল—তিনি আর্দ্রস্বরে কহিলেন—"দিদি, নন্দ যে আমার 'পর' নয় তা কি আর বলে বোঝাতে হয়!—ভাগ্নে আর ছেলেতে তফাৎ কি?—বিশেষ যখন অমন সোণার চাঁদ ছেলে! যে দেখে তারই বুকে তুলে নিতে ইচ্ছা করে!" কথাটা বলিয়া পরাণবাবু একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন।

ইহার কিছু দিন পরে পরাণবাবু পশ্চিম যাত্রা করিলেন। ভগিনীপতির মৃত্যুর পর এই চতুর্থবার পরাণবাবুর পশ্চিম যাত্রা। বাহিরে প্রকাশ—তাঁর 'শরীর খারাপ'।

বিষয় বিক্রয় হইল, কিন্তু তেমন 'দর' উঠিল না—পরাণবাবু সে টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিলেন। ভগিনীর অলঙ্কার আদি ইতিপূর্ব্বেই তিনি আপনার লৌহসিন্দুকের নিরাপদ গহ্বরে নিক্ষেপ করিয়া রাখিয়া ছিলেন। সুদের টাকাটাও পরাণবাবুর ক্যাশবাক্সে আশ্রয় লাভ করিত, তবে, ভগিনীর আবশ্যক হইলে পরাণবাবু টাকা লইয়া প্রস্তুত!

তুলসী নিশ্চিন্ত, তাঁহার শিশুপুত্র নন্দলালও নিশ্চিন্ত! একজন নিশ্চিন্ত—গভীর বিশ্বাসে; আর একজন নিশ্চিন্ত—শৈশব সরলতায়!

শুধু নিশ্চিন্ত নহেন—পরাণবাবু!

এইরূপে পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল।—সেই সঙ্গে তুলসীর বৈধব্য জ্বালারও অবসান হইল! মৃত্যুকালে তুলসী পুত্রকে ভ্রাতার হস্তে জন্মের মত সপিয়া দিয়া গেলেন!

তুলসীর মৃত্যুর পর হইতে পরাণবাবুর চক্ষু খুলিয়া গেল—তিনি ভাগিনেয়টীতে অনেক ত্রুটি দেখিতে লাগিলেন;—সে দুরন্ত—উদ্ধত—অশাংস্কৃত—বুদ্ধিহীন—মিথ্যাবাদী—লোভী

—বিলাসপ্রিয়,—এবং উত্তরকালে সে যে একজন দারুণ—দুর্দ্দান্ত লোক হইবে পরাণবাবু যেন তাহা ভবিষ্যতের দর্পণে প্রতিবিম্বিত দেখিতে পাইলেন! পরাণবাবু যখন দেখিতে পাইলেন তখন তাঁহার 'উপগ্রহ'রা যে না দেখিতে পাইবেন এমন কোন মতেই হইতে পারে না।

পরাণবাবুর পত্নী রাজলক্ষ্মীই কেবল স্বামীর মত সূক্ষ্ম-দৃষ্টি লাভে বঞ্চিতা হইলেন। তিনি পূর্ব্বের মতই নন্দলালকে স্নেহ ও শাসন করিতেন।

শাসন করা হয়—হোক্, পরাণবাবুর তাহাতে আপত্তি নাই কিন্তু এত স্নেহ দেখাইয়া অমন 'আব্দারে' করিয়া তুলিবার কি প্রয়োজন! দুধ না হইলে খাওয়া হয়না,—ডালের সঙ্গে 'ভাজি' দরকার,—সকালে-বিকালে জলখাবার,—এত কেন?—কিসের জন্য?

রাজলক্ষ্মী যদি বলিতেন "আহা চিরকাল ও ভাল খেয়ে ভাল পরে' এসেচে!" পরাণবাবু অমনি আঁখি রক্তবর্ণ করিয়া বলিতেন—"পরের বাড়িতে এসে আর ও সব আব্দার করলে চলেনা!"

রাজলক্ষ্মী আশ্চর্য্য হইয়া গালে হাত দিয়া বলিতেন—"ওমা!—সেকি গো! 'পরের বাড়ী' কি গো!"

পরাণবাবু বিরক্ত হইয়া বলিতেন—"হাঁ—হাঁ আর 'আপনার' হয়ে কাজ নেই!—কে কার?"

এই কথায় পত্নী মর্ম্মাহত ও বিরক্ত হইয়া একদিন বলিলেন—"তা না হয় ওর 'খোরাকী'র দাম ধরে নিও—ওর বাপের টাকা-ত তোমার হাতে আছে!"

পরাণবাবু অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"কি?—'বাপের টাকা'!—বাপ কত 'নশ-পঞ্চাশ' রেখে গিছলো যে আজো তাই আছে?"—

শুনিয়া রাজলক্ষ্মী বজ্রাহতের ন্যায় ক্ষণকাল নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন—"ও!—"

অতি অল্প দিনের মধ্যে নন্দলাল পরাণ-বাবুর 'চক্ষুশূল' হইয়া উঠিল। লাঞ্ছনায় ও অপমানে নন্দলাল আরো কিছুকাল কাটাইয়া দিল! পরাণবাবুর অমনোযোগে ও কু-শাসনে নন্দলালের 'লেখাপড়া'ও তেমন হইল না। শেষে একদিন তিনি নন্দকে চাকুরীর চেষ্টা দেখিতে বলিলেন। নন্দ কহিল—"নিজে চাকুরীর যোগাড় করে নেওয়া বড় কঠিন বিশেষত—এই কোলকেতায়।"

পরাণবাবু একটু রুক্ষ স্বরে কহিলেন—"চাকরী করবার ইচ্ছা থাকলে তার চেষ্টা করতে,—সে ইচ্ছা তো নেই!"

নন্দলাল বলিল—"আজ্ঞে চাকরী পেলে আর করিনা!"

"নাঃ—চাকরী আর কোলকেতা সহরে মেলেনা!—এই তো সেদিন ট্রামোয়ের কণ্ডাক্টারী চাকরী কতকগুলো খালি ছিল, একবার তার চেষ্টা করেছিলে?"

নন্দলালের মুখখানা অভিমানে ও অপমানে লাল হইয়া উঠিল!—তাহার অধর বারেকের জন্য স্ফুরিত হইয়া উঠিল, সে একটা ঢোক গিলিয়া যথাসম্ভব আত্মভাব সংযত করিয়া বলিল—"খেতে না পাই সেও-ভাল তবু আমি ও চাকরী করছিনা!"

সুবিধা পাইয়া পরাণবাবু স্পষ্টই বলিলেন

তবে তুমি তোমার বাসা ঠিক কর আমি আর তোমায় বসিয়ে খাওয়াতে পারব না!"

নন্দলালও রাগের মাথায় বলিয়া ফেলিল—"তাই বেশ!—আমি কালই যাচ্ছি!"

৩

রাজলক্ষ্মী সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া নন্দলালকে বলিলেন—"সত্যি! এত লাঞ্ছনায় আর এখানে থাকা তোমার উচিত নয়—তা' তোমার টাকা উনি না দেন আমি দেব!—আমার তো যা হোক দু-দশখানা গয়না আছে! অবিশ্যি তাতে তোমার সব টাকা হবে না—তবু যতটা হয়।"

নন্দলালের বুকটা দুর-দুর করিয়া উঠিল—সে বলিল—"আপনার...গয়না!"

রাজলক্ষ্মী বলিলেন—"হ্যাঁ—তাতে কি? আমার গয়না—সেত তাঁরি পয়সায়!"

নন্দলাল ভাবিল—"তাও তো সত্য! আমি কেন অনর্থক ফাঁকীতে পড়তে যাই?—তবু যতটা পাওয়া যায় তাই লাভ!"

গহনার বাক্সো রাজলক্ষ্মীর কাছেই থাকিত। গহনা প্রায় পাঁচ ছয় হাজার টাকার হইবে। রাত্রে কর্ত্তা নিদ্রা যাইবার পর রাজলক্ষ্মী নন্দকে তাহা দিয়া গেলেন। হাতে রহিল শুধু দুগাছি 'রুলী! নন্দলাল রাজলক্ষ্মীকে দেখিয়া বলিল—"মামিমা আপনাকে বড় বিশ্রী দেখাচ্চে...না আমি গয়না চাইনে—আমার কপালে যা আছে তাই হবে!"

রাজলক্ষ্মী গম্ভীরস্বরে কহিলেন—"না, তোমার নিতে হবে—নইলে আমার সংসারে দোষ লাগবে—আমার ছেলের অমঙ্গল হবে!" বলিয়া তিনি গহনার বাক্স নন্দলালের নিকট রাখিয়া চলিয়া গেলেন!—পরমুহূর্ত্তে আবার রাজলক্ষ্মী ফিরিয়া আসিলেন, বলিলেন—"নন্দ! শুধু একটী অনুরোধ করতে এসেচি—রাখতে হবে!—কাল খুব সকালে বেরিয়ে যেয়ো—উনি ওঠবার আগে—"

"নন্দলাল কঠিনদৃষ্টিতে তার মামীর মুখের পানে চা'হয়া বলিল—"চোরের মত চুপ চুপি?"

রাজলক্ষ্মী বুঝিলেন—তাঁর কথাটা নন্দলালের কোথায় বাজিয়াছে! তিনি তখনি মায়ের মত স্নেহের ভাবে বলিলেন—দূর পাগল!—তা কেন?—বল'ছলুম এই জন্যে,—তুমি যাচ্ছো জানতে পারলে উনি যেতে না দিতে পারেন,—কিন্তু এই রকম বারবার অপমান সহ্য করে যে তুমি এখানে থাকো আমার তা মোটেই ইচ্ছা নয়!—

নন্দলালের মনে কিন্তু কেমন একটা খট্‌কা লাগিয়া রহিল। সে ভাবিতে লাগিল—তাইত! আমার যথাসর্ব্বস্ব মামা ঠকাইয়া লইতে উদ্যত হইয়াছেন!—আমার মার গহনাগুলি পর্য্যন্ত! আহা আমার মরা-মা! যিনি ম'রবার সময় আমাকে তাঁর ভায়ের হাতে স'পিয়া দিয়া গিয়াছিলেন! আর সেই ভাই—তার এই কাজ!!—চোর তস্করের মুখ হইতে যদি কিছু ছিনাইয়া লইতে পারা যায়, তাহাতে কি দোষ?—কিসের সঙ্কোচ?

ভাবিতে ভাবিতে নন্দলাল অস্থির হইয়া উঠিল—তাহার কপালে ঝিন্‌-ঝিন্ করিয়া ঘাম বাহির হইতে লাগিল—সে অস্থির চিত্তে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পড়িল।

পথে কেরোসিনের একটা টিন পড়িয়াছিল সেটা সশব্দে সিঁড়িতে গড়াইয়া পড়িল। কুকুরটা সতর্কতা অপেক্ষা ভীরুতার বশে চীৎকার করিতে লাগিল—নন্দলাল কোনদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া বহির্দ্বার উন্মুক্ত করিয়া একেবারে রাস্তায় গিয়া উপস্থিত! ভৃত্য জনার্দ্দনের নিদ্রা তখন 'পরিপক্ক' হইয়া আসিয়াছিল—সে জাগ্রত হইয়া "চোর—চোর" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। কর্ত্তা গৃহিণী উভয়েই জাগিয়া উঠিলেন এবং বাহিরে আসিয়া দেখিলেন নন্দের ঘরের দ্বার উন্মুক্ত—আলো জ্বলিতেছে। পরাণবাবু 'নন্দ' 'নন্দ' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, নন্দলাল সেখানে নাই। তখন হঠাৎ পরাণবাবুর দৃষ্টি নন্দের টেবিলের উপর পড়িল—তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"সর্ব্বনাশ হয়েছে—গহনার বাক্স এখানে!—একি?—অ্যা!" এই বলিয়া তিনি পশ্চাদনুগামিনী স্ত্রীর পানে চাহিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন!—তাঁহার স্ত্রী একরূপ নিরাভরণা!

বিস্ময় ও উদ্বেগে রাজলক্ষ্মীর কণ্ঠরোধ হইবার উপক্রম হইল—তিনি নির্ব্বাক নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরাণবাবু ছুটিয়া টেবিলের নিকট গেলেন; দেখিলেন গহনার বাক্স অলঙ্কারপূর্ণ আর তার মধ্যে একখানা চিঠি!—এ যে নন্দেরই হাতের লেখা!

নন্দ লিখিয়াছে—"মামিমা! গহনা নিতে পারলুম না—আমার সর্ব্বস্ব গেলেও যা আমার আজো আছে তাও হারাতে বসেছিলুম!—এই রইলো আপনার গহনা—এর বড় নেশা!—আমি পালালুম—দেখচি পাগল হবার জোগাড় হয়েচি!"

প্রণত নন্দ।

জীবনে এই প্রথম পরাণবাবুর চোখের পুরু আবরণ সরিয়া গেল!—তিনি চকিতে দেখিলেন—তিনি কত নীচে, আর হৃতসর্ব্বস্ব পলাতক অনাথ নন্দলাল—কত উচ্চে!

কিন্তু এ ভাব মুহূর্ত্তের জন্য মাত্র! ইহার পর পরাণবাবুর সংসার যেমন চলিতেছিল তেমনিই চলিতে লাগিল!—নন্দলালের কথা কেহই তুলিত না! বরং তুলিলে, পরাণবাবু বিরক্ত হইতেন!

কেবল একটী স্নেহকোমল নারীহৃদয় সেই মাতৃহীন অনাথ সন্তানের জন্য মাঝে মাঝে ব্যথিত হইয়া উঠিত!

শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ।

ভক্তি ও ঘৃণা।

উর্দ্ধে ছুটে উৎস সম ভক্তি, হৃদ ভেদিয়া,
স্বর্গ পানে টানিতে চাহে হৃদয়ে।
ঘৃণা সে প্রপাতসম মরম দ্বার ভাঙ্গিয়া,
ধ্বসিয়ে নাচে অ নিতে চাহে নিরয়ে।

ভক্তি কিবা মরমফুলে আলোকে তুলে ফুটায়ে,
পুঞ্জ করে গন্ধমধু বিতরি,—
ঘৃণা তাহারে সংকোচেতে মুদিয়ে আনে গুটায়ে
অন্ধকারে বৃন্তবনে আবরি।

শ্রীকালিদাস রায়।

প্রয়াগে শিল্পপ্রদর্শনী।

প্রয়াগের শিল্পপ্রদর্শনীর ন্যায় বিরাট-প্রদর্শনী আমাদের দেশে বহুকাল হয় নাই। এবারকার এ প্রদর্শনী যুক্ত প্রদেশের গবর্মেণ্টের উদ্যোগে ও ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত হইলেও, ইহা জাতীয় মহাসমিতিরই অন্তরঙ্গ। মহাসমিতির অধিবেশনের সহিত প্রতি বৎসরে যে প্রদর্শনী হইত, তাহাই অবলম্বন করিয়া যুক্তপ্রদেশের গবমেণ্ট এই বিরাট আয়োজন করিয়াছেন। সমস্ত প্রাদেশিক গবর্মেণ্টই এই প্রদর্শনীর সফলতার জন্য যথাসাধ্য আয়োজন ও ব্যয়ের ত্রুটি করেন নাই, এবং ভারতগবর্মেণ্টও প্রদর্শনীকে পাঁচ লক্ষ মুদ্রা ঋণ দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। এ টাকাটা অবশ্য প্রদর্শনীর আয় হইতেই শোধ যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। ভারতের করদ ও মিত্র রাজারাও গবর্মেণ্টের এই কর্ম্মে যথাসাধ্য সহায়তা করিয়াছেন এবং আপন আপন রাজ্য হইতে শ্রেষ্ঠ শিল্প ও অন্যান্য সামগ্রী প্রদর্শনীতে পাঠাইয়াছেন। ব্যাপার যে কত বিরাট ও চমৎকার তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। আমরা সংক্ষেপে তাহার অল্প আভাষ দিবার চেষ্টা করিতেছি মাত্র।

গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থলে প্রয়াগের প্রাচীন দুর্গের সম্মুখস্থ বিস্তীর্ণ-প্রান্তরে এই প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে। এক একটি বিষয়ের এক স্বতন্ত্র বিভাগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা ছাড়া ভ্রমণ, বিশ্রাম ও আহারাদির জন্য স্বতন্ত্র স্থান ও আয়োজনেরও ব্যবস্থা হইয়াছে।

এই সকল বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে আমরা প্রধান কয়েকটি বিভাগের উল্লেখ করিব। প্রথম দেশীয় রাজাগণের বিভাগ। এই বিভাগে বরোদা, গোয়ালিয়র, জম্মু, কাশ্মীর, জয়পুর, যোধপুর, বিকানির, কোটা, আলোয়ার ও অন্যান্য স্থানের বিভিন্ন মনোহর ও বহুমূল্য শিল্প সামগ্রী প্রদর্শিত হইয়াছে। আধুনিক রুচির অনুগত ও ব্যবহারের উপযোগী শিল্পজাত সামগ্রীতে গোয়ালিয়র রাজ্যই সর্ব্বাগ্রগণ্য। এ সকল দ্রব্য সুন্দর বা মনোহর না হইলেও নিত্য ব্যবহারে নিতান্তই আবশ্যকীয়। গোয়ালিয়রের চামড়ার কলে প্রস্তুত ঘোড়ার সাজ হইতে জুতা পর্য্যন্ত নানা প্রকার চামড়ার দ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায়। ধাতব শিল্পেরও অভাব নাই—বাক্স প্যাটরা হইতে আরম্ভ করিয়া কুলুপ পর্য্যন্ত সকল প্রকার জিনিষই আছে। আবার এই বিভাগে ভুবন-খ্যাত চান্দেরি মস্‌লিনের অপরূপ শিল্পনৈপুণ্য ও কারুকার্য্য দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। সম্প্রতি গোয়ালিয়রে একটি নিবের কল খোলা হইয়াছে। এই কলের বহুপ্রকার নিবও প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া বহুমূল্য কার্পেট, প্রস্তর ইত্যাদি অসংখ্য বস্তুর অভাব নাই।

জয়পুরের বহুমূল্য রত্নাদি ও খোদিত মর্ম্মরে শিল্প চাতুর্য্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। জয়পুরের প্রাচীন চিত্রগুলি বর্ণ বৈচিত্র্যে ও শিল্পগৌরবে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

যোধপুরের গজদন্ত নির্ম্মিত বস্তুগুলি অতুলনীয়। এমন সূক্ষ্ম কারুকার্য্য আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। যোধপুরের শিল্পীরা যে কতকগুলি খোদিত মর্ম্মর

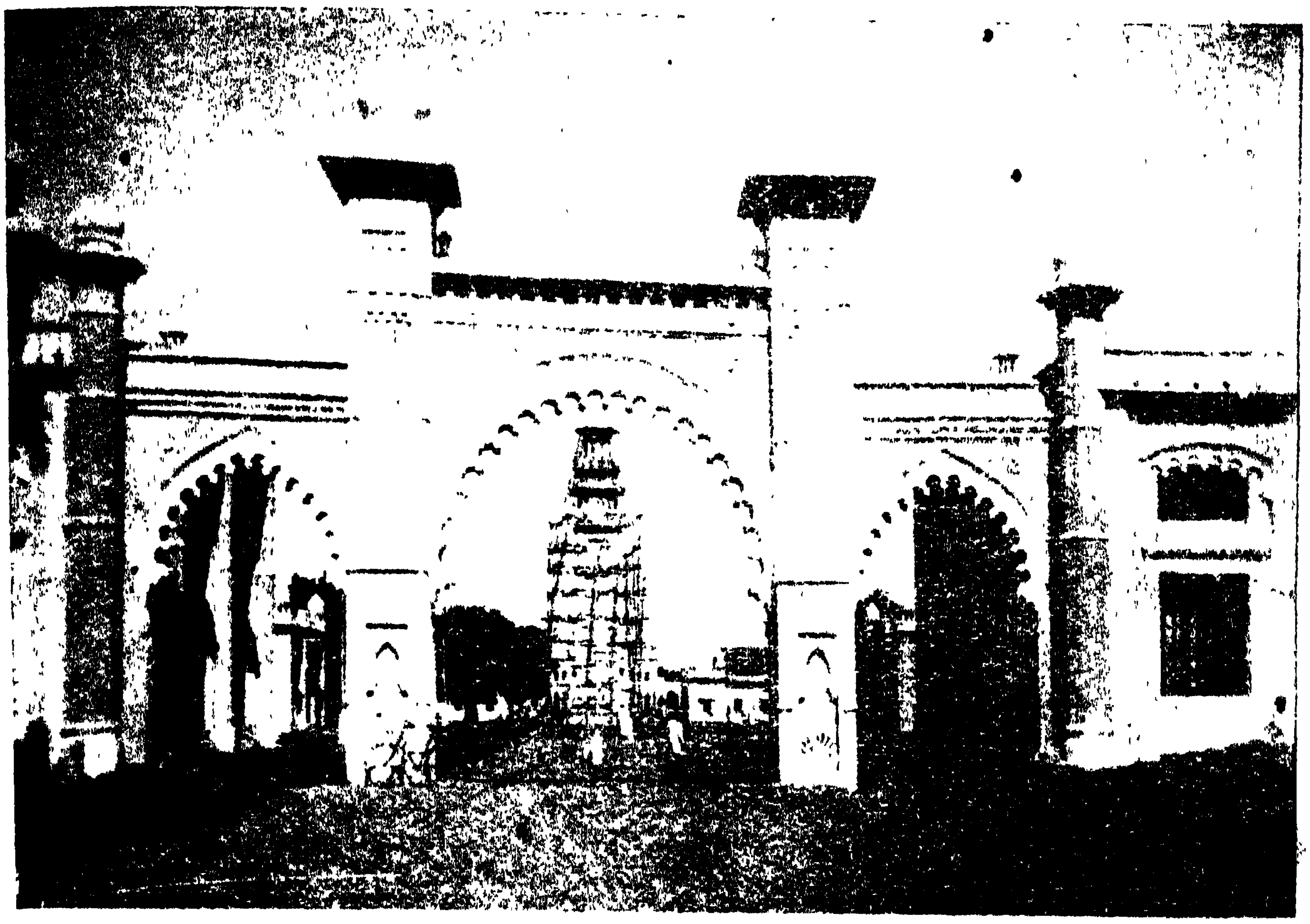

প্রদর্শনীর তোরণ

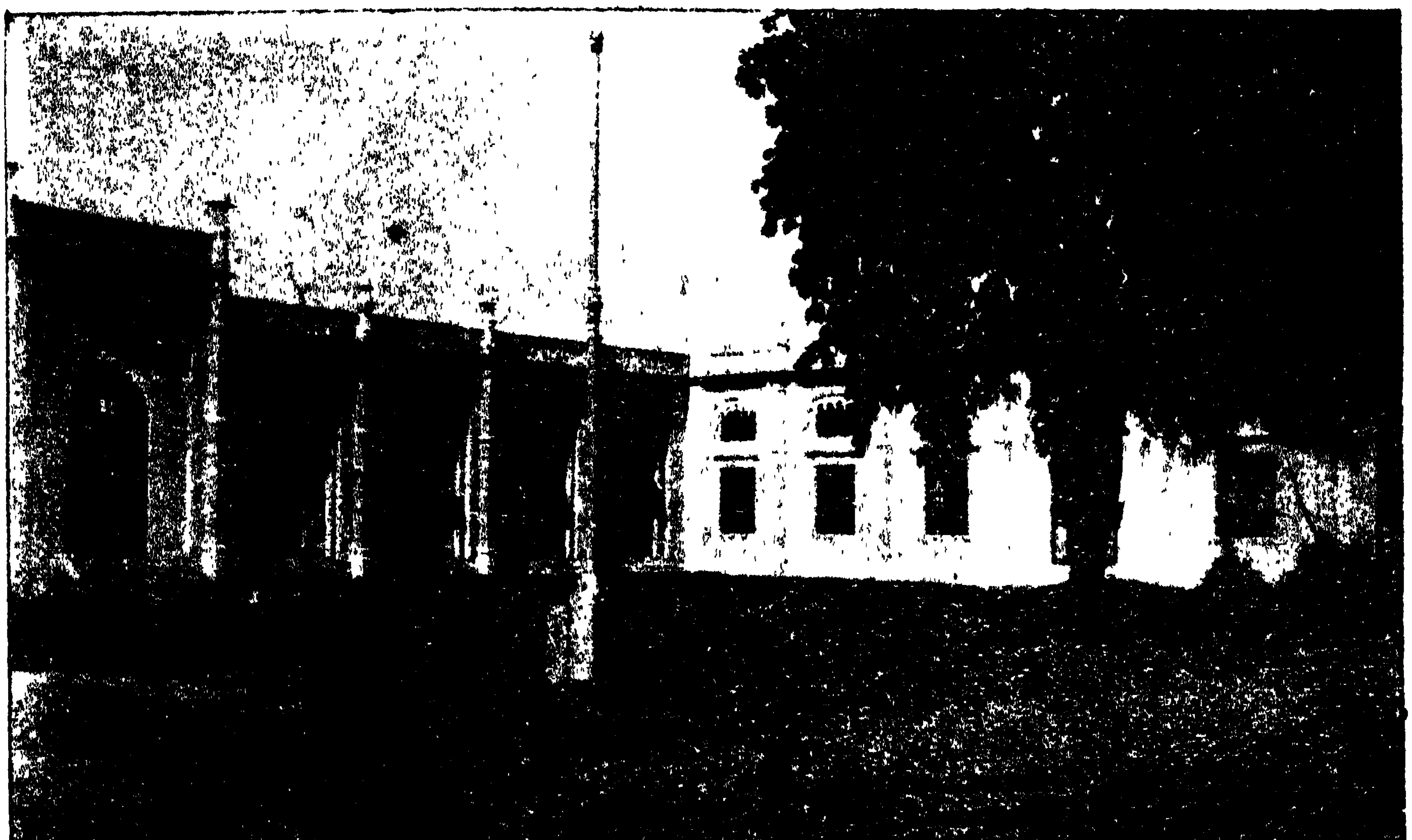

দেশীয় রাজগণের বিভাগ।

প্রস্তরের চেয়ার, ফুলদান ইত্যাদি পাঠাইয়াছেন সেগুলি দেখিলে এ সকল দেশের অতীত গৌরবের কথা মনে পড়ে এবং সুখের সঙ্গে একটা দুঃখের ভাব আসিয়া প্রাণটাকে উদ্বেলিত করিয়া তোলে।

তাহার পর অযোধ্যা বিভাগ। এখানকার দ্রব্যগুলি অযোধ্যা প্রদেশের বর্ত্তমান ভূস্বামীরা দান করিয়াছেন।

ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ দ্রব্যই এককালে অযোধ্যার মুসলমান নৃপতিগণের সম্পত্তি ছিল, এবং এক্ষণে সেগুলি অমূল্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রথমেই দেখিতে পাওয়া যায় কতকগুলি 'ঝোরি' রহিয়াছে। এই সকল 'ঝোরি' অর্থাৎ রেকাব নবাবেরা ব্যবহার করিতেন। দিল্লীর ঘোরিবংশের রাজাগণ এই 'ঝোরি' এদেশে প্রচলিত করেন। এই সকল রেকাবে নাকি বিষমিশ্রিত খাদ্য রাখিবামাত্র এগুলি ভাঙ্গিয়া যায়, বলিয়া তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন। আলোকচিত্রিত হস্তলিপির মধ্যে দুই একটি এরূপ অমূল্য বস্তু আছে যে তাহা একবার নষ্ট হইলে আর তাহার পুনরুদ্ধার অসম্ভব। একটি আবুল ফজলের স্বহস্ত লিখিত আকবর নামার পাণ্ডুলিপি। আকবর স্বহস্তে স্থানে স্থানে যে সকল সংশোধন করিয়াছেন, সেগুলি পর্য্যন্ত আজিও সুস্পষ্ট রহিয়াছে। আর একটি আওরঙ্গজেবের কন্যা জয়বনের অনুরোধে সম্রাটের আদেশক্রমে লিখিত কোরাণের প্রতিলিপি। আওরঙ্গজেব এই কোরাণখানি জুম্মা মসজিদে রাখিয়া রাজ্যমধ্যে ঘোষিত করিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি ইহাতে কোনও ভ্রম বাহির করিতে পারিবে, সে প্রত্যেক ভুলের জন্য লক্ষ মুদ্রা পারিতোষিক পাইবে। অযোধ্যার নবাবদিগের চিত্র এবং তাঁহাদের ব্যবহৃত স্বর্ণ রৌপ্যের হাওদা, পরিচ্ছদ, শাল ইত্যাদি রহিয়াছে। সেকালে চীনরাজ্য হইতে দূতেরা নানা প্রকার উপঢৌকন লইয়া উপস্থিত হইতেন। এইরূপ একটি উপঢৌকন প্রদর্শিত হইয়াছে। জিনিষটি একখানি অত্যন্ত পাতলা কাগজে লেখা বই। ইহার পত্রে পত্রে সেকালে চীনদেশে যে সকল ভীষণ শাস্তি প্রদত্ত হইত, তাহারই চিত্র রহিয়াছে।

তাহার পর মহিলাবিভাগ। এ বিভাগে ভারতের নানা স্থানের বালিকা বিদ্যালয় ও অন্তঃপুর হইতে নানাপ্রকারের বিচিত্র শিল্পজাত বস্তু আসিয়া সমবেত হইয়াছে, সকলগুলিই সুন্দর ও মনোহর।

শিক্ষা বিভাগটি একটি নূতন ব্যাপার। ইতিপূর্ব্বে শিক্ষা সম্বন্ধে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ কোন প্রদর্শনীতেই খোলা হয় নাই। দেশের শিক্ষকদিগকে শিক্ষাদান করা ও জনসাধারণকে শিক্ষাবিষয়ে উৎসাহিত করাই এ বিভাগের উদ্দেশ্য। প্রাথমিক শিক্ষা হইতে মূক ও বধিরের শিক্ষা পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার প্রচলিত শিক্ষার এক একটি স্বতন্ত্র অন্তবিভাগ খোলা হইয়াছে। এবং ভারতীয় এই সকল ব্যাপারের পার্শ্বেই ইংলণ্ডের প্রচলিত শিক্ষানীতি দেখান হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন শিল্পবিদ্যালয়ের দ্বারা নির্ম্মিত যে সকল দ্রব্য প্রদর্শিত হইয়াছে, সেগুলি দেখিলে মনের মধ্যে বেশ একটা আশা ও আনন্দ জাগ্রত হইয়া উঠে।

ইহারই একপার্শ্বে প্রাচ্যশিক্ষা বিভাগ। এখানে প্রাচীন আরবী, পারসী ও সংস্কৃত হস্তলিপিগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনোহর।

পোষ্ট কার্ডের ন্যায় ক্ষুদ্র একখানি কাগজ প্রদর্শিত হইয়াছে। এই কাগজের উপর দুইখানি পারসী পুস্তক লিখিত হইয়াছে। আশ্চর্য্য অধ্যবসায় ও লিপিচাতুর্য্য। একস্থানে সম্রাট আকবরের প্রিয় কবি ও মন্ত্রী আবুল ফজল এবং ফৈজির লিখিত সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদের পাণ্ডুলিপি রহিয়াছে। একখানি বাবরনামা অর্থাৎ বাবরের স্বহস্ত-লিখিত আত্মজীবনী রহিয়াছে। ইহার মধ্যে আকবরের প্রসিদ্ধ চিত্রকরগণের চিত্রিত কয়েকখানি অতি সুন্দর চিত্র রহিয়াছে। বহু বৎসর পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ কবি চাঁদ হিন্দিতে পৃথ্বীরাজের রাজত্বের যে ইতিহাস লিখিয়াছিলেন তাহারও পাণ্ডুলিপি রহিয়াছে।

তারপর এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ। এখানে বিলাতী কোম্পানীরা আধুনিক নানাপ্রকার কলকারখানা দেখাইয়াছেন। এ বিভাগটিতে আমাদের চিহ্ন কোথাও নাই। কলকারখানা ব্যাপারে পাশ্চাত্যেরা এতদুর অগ্রসর, হইয়াছেন, যে এ বিষয়ে তাঁহাদিগের নিকট আমাদের শিক্ষালাভ করিতেই দীর্ঘকালের আবশ্যক; প্রতিদ্বন্দ্বিতা ত' পরের কথা!

বস্ত্রবিভাগের মধ্যে প্রবেশ করিলে যুক্তপ্রদেশের কলপ্রস্তুত নানা প্রকারের কাপড় দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। এবিষয়ে যুক্তপ্রদেশ অল্পদিনের মধ্যে যেরূপ উন্নতি করিয়াছে তাহা প্রশংসা যোগ্য। কলগুলি বিলাতী সত্য, কিন্তু সে দোষ বিলাতবাসীর নয়, আমাদেরই অজ্ঞতা ও উদ্যমহীনতার ফল!

তাহার পর ভারতের শিল্পকলা ও অলঙ্কার বিভাগ। কলাবিভাগে খৃষ্টপূর্ব্ব ২৫০ সাল হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত বিভিন্ন শিল্পযুগের স্বাতন্ত্র্য অনুসারে দ্রব্যগুলি বিভক্ত করিয়া দেখান হইয়াছে।

মোগলশিল্প হস্তলিপির দ্বারাই প্রদর্শিত হইয়াছে। একদিকে স্তরে স্তরে কেবল প্রাচীন আরবী ও পারসীগ্রন্থ রহিয়াছে। অপর একস্থানে মোগল সম্রাটদিগের প্রাচীন চিত্র রহিয়াছে। চিত্রগুলির বর্ণবৈচিত্র্য দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়।

অলঙ্কারবিভাগে কাশ্মীর হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত যত প্রদেশের যত শ্রেষ্ঠ সামগ্রী সবই প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রাচীন কয়খানি জাপানী মুদ্রা রহিয়াছে। সেগুলি সুবর্ণ নির্ম্মিত, এবং আকারে এক একখানি দশ টাকার নোটের মত। অলঙ্কার বিভাগের সুন্দর দ্রব্যগুলির অধিকাংশই সাধারণের পক্ষে দুর্ম্মূল্য। গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলে মনে হয় যেন আলাদিনের রত্নগৃহে প্রবেশ করিয়াছি।

এবারে বনজ দ্রব্য লইয়া একটি স্বতন্ত্র বনবিভাগ খোলা হইয়াছে। বনবিভাগের স্থানটিই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও মনোরম এবং সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। একটি বাটীতে নানা প্রকারের কাষ্ঠ প্রদর্শিত হইয়াছে। আর একটিতে নানা প্রকারের মৃগয়াহত বন্য জন্তু এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন অস্ত্রাদি আর একটি বাটীতে সহস্র প্রকারের শস্য ও বাজ প্রদর্শিত হইয়াছে। বনবিভাগটি দেখিলে অনেক অজ্ঞাত ব্যাপার শিক্ষা করা যায়।

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিভাগটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একস্থানে মেজর বি, ডি বসু নানাপ্রকারের ভারতীয় ভৈষজ্য প্রদর্শিত করিয়াছেন। তিনি একসহস্র তিনশত

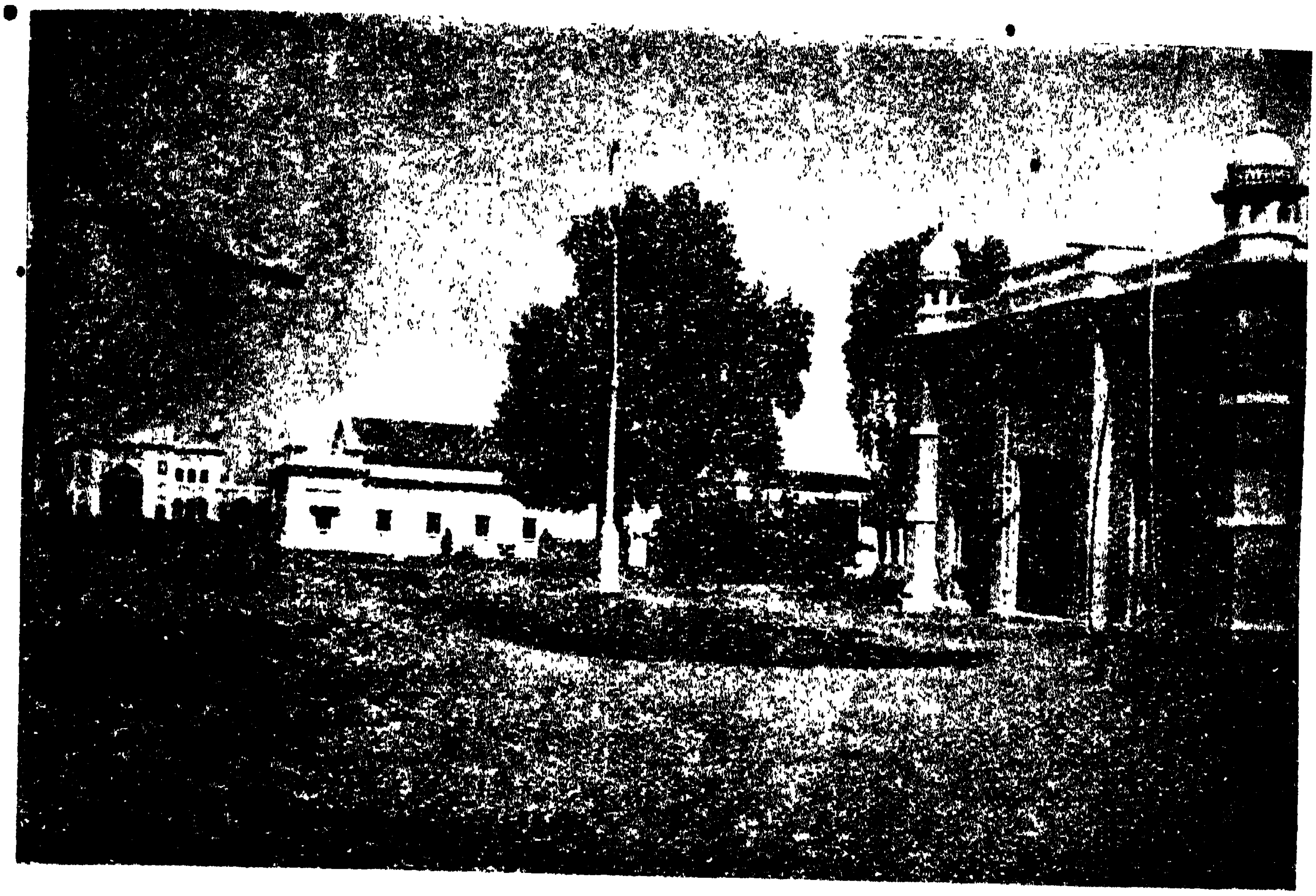

শিল্প ও অলঙ্কার বিভাগ

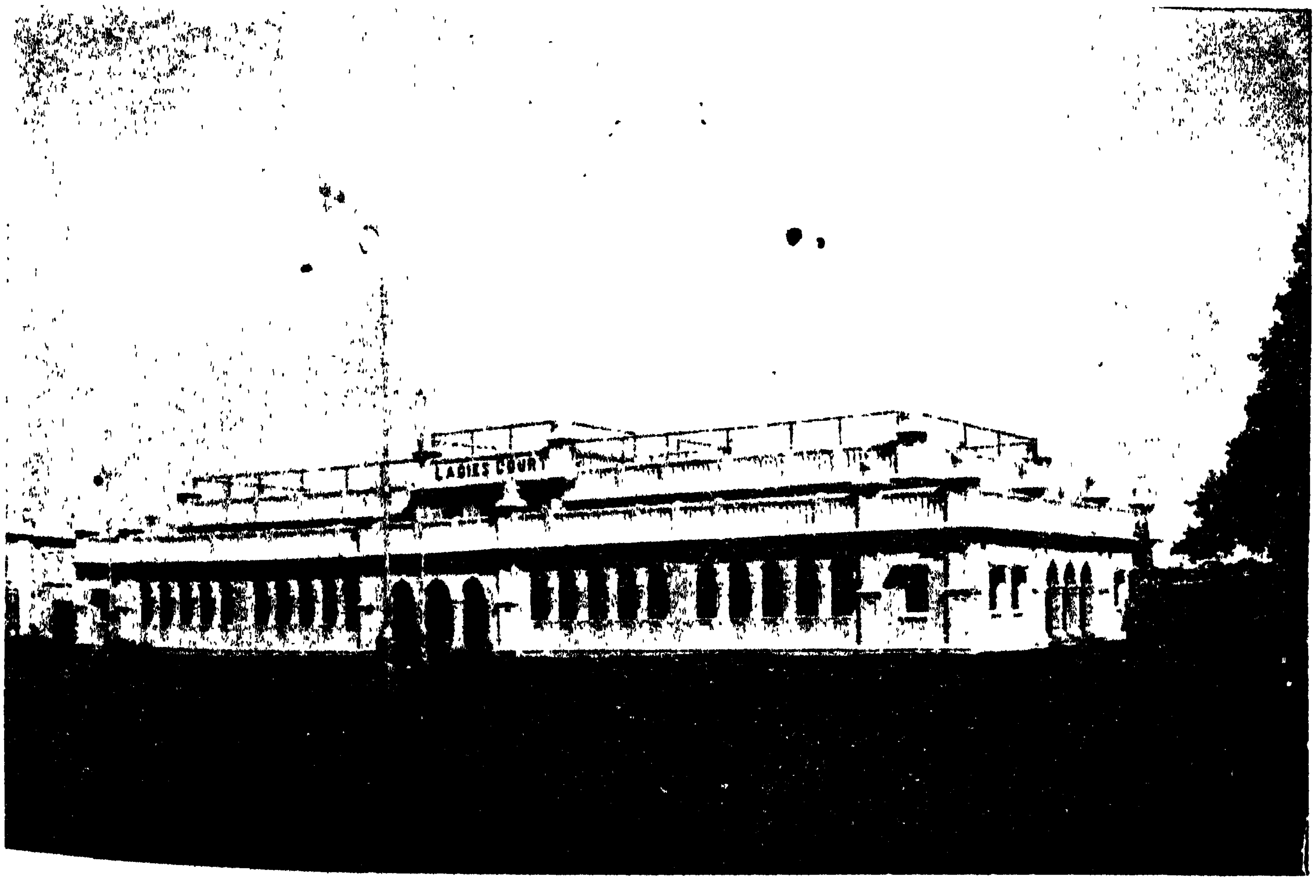

মহিলা বিভাগ।

প্রকারের লতা-গুল্মাদি সংগ্রহ করিয়াছেন। ‘এক্স রে’র ক্রিয়া, প্লেগের বিষপুষ্ট মাছি, ম্যালেরিয়া পুষ্ট মশা ইত্যাদি দেহরক্ষার জন্য জ্ঞাতব্য নানা বিষয় এই বিভাগে পরীক্ষা বা চিত্রদ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে।

আর একটি নূতন ব্যাপার এবার প্রদর্শনীতে দেখা গেল। কিছুদিন হইতে পাশ্চাত্যদেশে অনেকে উড়িয়া বেড়াইতেছেন, কিন্তু ভারতে এরূপ ব্যাপার দেখিবার সুযোগ ইতিপূর্ব্বে ঘটে নাই। বিলাত হইতে দুইজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি আসিয়া উড়িবার যন্ত্র লইয়া আকাশমার্গে উড়িয়া বেড়াইতেছেন। আমাদের কলিকাতাতেও সম্প্রতি দুইবার এরূপ ব্যাপার আমরা দেখিয়াছি, এখন আমাদের কাছে ইহা আর নূতন নাই।

কাব্যে নিদাঘ-চিত্র।

গ্রীষ্মঋতুকল্পনায় শুষ্কশীর্ণতা, রৌদ্রকর-বিচ্ছুরিত অগ্নিবৃষ্টি, নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নের মর্ম্মনিহিত আত্মনাদ, ক্ষীণকায় সলিলধার, বুকফাটা প্রান্তর এবং অলস ও শিথিল কর্ম্মপ্রবাহের একটা চিত্র হঠাৎ আমাদের চোখের সাম্‌নে পড়ে।

ইহার মাঝে কবিচিত্ত কোন্ রসের সন্ধান পাইয়াছে, ভ্রমরের ন্যায় ইহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে কোন্ অমৃত কবিকে লুব্ধ করিয়াছে তাহা জানিতে উৎসুক হওয়া অস্বাভাবিক নহে!

নিদাঘ-মরুর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত খর্জ্জুর-বীথিকা ও তালীবনের অন্তরালে এই গোপন অমৃতাস্বাদ, খরতর উগ্রতার মাঝে গুণ্ঠনময়ী ললিত রূপের অমূর্ত্তমূর্ত্তি সুকুমার শিল্পীর শিরীষ-কোমল তুলিকায় অঙ্কিত।

আরব কবির সুস্থ মুক্ত আনন্দ সাহারার অগ্নির-সমুদ্র নির্ব্বাপিত করিতে পারে নাই। তাহার প্রলুব্ধ দৃষ্টি, শত শত হরিদ্বর্ণ উষ্ণীষধারী নীলবস্ত্রের শিথিল প্রাচুর্য্যে ভরপুর, দীর্ঘকায় মরুপান্থ কর্তৃক অধিষ্ঠিত দীর্ঘগ্রীব উষ্ট্রপর্য্যায়ের পশ্চাতে ছুটিয়াছে। স্বেদাক্ত ললাট, কঠিন ক্লিপ্রহস্ত, রক্তাক্ত কপোল, তীক্ষ্ণনয়ন নরনারী আরব কবির চোখের সাম্‌নে প্রবল ঔদাস্যের সহিত অগ্নিতপ্ত মরুশ্রেণীর মাঝে ডুব দিয়া ছোটে। উষ্ট্রের অনিচ্ছা ও বঙ্কিমদৃষ্টি, রাসরজ্জুদ্বারা সংযত হইতেছে। চারিদিকের ক্ষুধার্ত্ত বিপুল শূন্যতা, শুভ্রকরোজ্জ্বল সুদূরের চক্রবাল, যেখানে সুরম্য মরীচিকায় অলীক-রসে পূর্ণ হইয়া উঠে তাহার প্রান্তশায়ী আরব-পল্লী কোণের কুটির-প্রাণ, এই সাহারা-সমুদ্রে অহরহঃ ভাসিয়া বেড়ায়। এই বিচিত্র, উদ্যম-চঞ্চল, সুদীর্ঘ প্রয়াণে নরনারীর চিত্ত বৈশাখী ঝড়ের হিল্লোলে কম্পমান রক্ত-গোলাপগুচ্ছের ন্যায় উষ্ট্রের পৃষ্ঠে কম্পিত হইয়াছে। এই প্রয়াণের আবর্ত্তমোহে, মরুনির্ঝরের আকর্ষণ বোধহয় পর্য্যাপ্ত নহে। রুদ্রতর দেব, সেই পাগল নিদাঘের হিংস্রতার মাঝে যেন বনলতাকে অয়স্কান্তমণির ন্যায় আকর্ষণ করে।

আরব নরনারী মরুর নিষ্ঠুর কোলে ওমানের শুভ্র মুক্তা, হদ্রমঠের কস্তুরীগন্ধ,

আদীনের বুলবুল বল্লরী ও উপবন এবং থিমেনের এলাইচ ও দারুচিনির সুবাস প্রভৃতির স্বপ্ন দেখে।

আবার চিরস্মরণীয় হারুণ-অল-রসিদের ন্যায় সম্রাট রহস্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে—ইবন্ মোকনেমের ন্যায় কবি, আবেষা ও লয়লার ন্যায় নারী, কসিদা ও গজলগানে মরুভূমে উর্ব্বরতার হিল্লোল তুলিয়াছে।

পূর্ব্বদেশীয়গণের ন্যায় অন্যত্র কেহই নিদাঘে কাব্যকে বিশেষভাবে জীবনের অঙ্গ করে নাই। চারণগণের কবিতার আবৃত্তি শুনিয়া, আরব, তুর্কী, পার্সী, ভারতবর্ষের সহিত একাসনে বসিয়া সহজেই বর্ত্তমানের দৈন্য ও দারিদ্র্য স্মৃতি কল্পনার মধুবক্রোড়ে হারাইয়া ফেলে।

আরবীয়গণ মরুনশীথের কঠোর শীতার্ত্ত সময়, তাঁবুর মাঝে মাঝে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের চারিদিকে উপবেশন করিয়া কাল্পনিক আখ্যান ও কাব্যরসের মাদকতায় নিবিষ্ট হইয়া দিবসের সকল কর্ম্ম, ও শ্রম ভুলিয়া যায়। অন্যত্র নিপুণ ভীষকগণ পীড়িতগণের চিত্তবিনোদনার্থে ভেষজরূপে কবিতা আবৃত্তির ব্যবস্থা করে।

আরবী কল্পনা আরবগণের জীবনের ন্যায়ই বিচিত্র, উজ্জ্বল, ও রসময়ী! আরবী নিশীথের কম্পহীন একাদশ সপ্তর্ট সুন্দরী কাহার না চিত্ত হরণ করে? এইজন্য কল্পনাকুশল কবির আরবসমাজে সুনির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। নরনারীর প্রেম ও আকাঙ্ক্ষা বেদনা আরব কবির চিত্তে প্রতিধ্বনিত এবং সকলের আকাঙ্ক্ষা তাহার মাঝে সহানুভূতি লাভ করে।

মরুভূমি আরবচিত্তে বড়ই মহার্ঘ। তাহার নানা ইতিহাস, নানা সংগ্রাম নানা স্বপ্ন ও আড়ম্বর আরবচিত্ত যেন পূর্ণ করিয়া রাখে।

তাহারই ফলে আমরা সুদূর হইতে দ্রুত সঞ্চরণশীল, বিদুইন-আরবীয়কে কটিপ্রশাণিত ছুরিকা, উদ্গ্রীব দৃষ্টি, তীক্ষ্ণ ঘ্রাণশক্তি লইয়া প্রান্তরে ছুটিতে দেখি। আন্দোলনের উত্তেজনা, বিস্ফারিত দৃষ্টি, চিরপ্রবা, অর্গলহীন সমুজ্জ্বল হাস্য লইয়া যেন ইতিহাসের প্রারম্ভ হইতে বিদুইনগণ হরিণের ন্যায় ছুটিয়া বেড়াইতেছে।

রৌদ্রতীর্থের এই অধিবাসীর হৃদয়কোণে কি নিদাঘের কল্লোল শুনিতে পাইব? খর-রৌদ্রের উষ্ণতার কোলে বর্দ্ধিত ইহাদের প্রকৃতিও যেন খররৌদ্র ধর্ম্মে রূপান্তরিত হইয়াছে। প্রবল জিঘাংসা, শ্রান্তিহীন সংগ্রাম, শাণিত তরবারীর কোষবিহীন অনুতপ্ত রক্তহিল্লোল একদিকে, অন্যদিকে মরুঝরণার ন্যায় হৃদয়কোণে লুক্কায়িত, অপরিসীম অপত্যস্নেহ, প্রেম ও ভক্তি, এবং শৈলকন্দরে গ্রীষ্মাপগম-স্পৃহা—উভয়রসে, যেন যুগপৎ উষ্ণতা ও শৈত্যে অনুসিক্ত মরুরাজ্যের সহিত ইহাদের অবিচ্ছেদ্য যোগ সংঘটন করিয়াছে।

আরবীয়গণ কাব্যচর্চ্চে একেবারে পাগল হইয়া উঠিতে পারে। কালিফ বৈঠকের রাজত্বকালে সঙ্গীতজ্ঞ আবু মহম্মদ, কালিফকে এমন অভিভূত করিয়াছিলেন যে তিনি সিংহাসন হইতে উঠিয়া তাঁহার নিজের বহুমূল্য হীরক-খচিত পরিচ্ছদ তাহার দেহে নিক্ষেপ করিলেন। বিখ্যাত ওস্তাদ অল ফেরবী কালিফ সৈফদ্দৌলাকে যুগপৎ হাস্যে উল্লসিত, ক্রন্দনে বিগলিতাশ্রু, এবং পরিশেষে নিদ্রাতুর করিয়া

কৃষি বিভাগ।

বন বিভাগ।

সঙ্গীতের গৌরব ও বিশ্বজয়ী শক্তি প্রমাণ করিয়াছিলেন।

পারস্য কবির কথাও আসিয়া পড়িতেছে। খরতর নিদাঘে বিপণিশ্রেণীর সুস্থায় স্নিগ্ধতার মাঝে হেনার গন্ধ, তরমুজের সুবাস, আঙুরের গুচ্ছ-প্রাচুর্য্য ও কিস্‌মিসের সরবৎ খুঁজিতে হইলে পারসিক ভূমিতে পদার্পণ করিতে হয়। তরল লোহিত মদিরার অবিচ্ছিন্ন আকর্ষণ এমন আর কোথায় আছে? গোলাপী রঙের কাজল-পরা, অঙ্কিত ভ্রূ রমণীর তরুণ মুখশ্রী এমন সুলভ কোথায়?

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সুনীল-উজ্জ্বল আকাশ তলে আলোক ও হাওয়ার মাঝে সরিৎ-সরোবরের স্রোতময়ী জলধারা উপভোগের সুখ, শীতার্ত্ত জাতির কল্পনায় তেমন স্থান পায়না। গ্রীষ্মভূমিতে এই কারণেই বহির্জগতের সহিত মেলামেশার সুযোগ বেশী ঘটে। কাজেই উদ্যান, উৎস, মুক্ত গবাক্ষ, কুঞ্জবন, তরণীবিহার, জ্যোৎস্না-উৎসব, দক্ষিণ-পবন প্রভৃতির সহিত ভাবের বাণিজ্য একটু বেশী হয়! এখানে মৃগনাভি গন্ধে, গোলাপ-মাল্যের শয্যাস্তরণ, কুঙ্কুম রক্ত গালিচা, উৎসমুখর স্ফটিক-স্নানাগার প্রভৃতির মোহিনী শক্তির আকর্ষণ বড়ই প্রবল। আহমেদের তরমুজপ্রীতি, হাফেজের প্রলাপ-মরীচিকা ও আক্রুটীন সামাজিকতা, ওমর খৈয়মের স্বপ্ন, এসব ত ক্রমশই বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

পল্লব-পরাগ প্রভৃতির মাঝে তন্ন তন্ন করিয়া পারসিক চিত্ত সৌন্দর্য্য খুঁজিয়াছে; এজন্য খণ্ড ও গীতিবাদ্যে ইহার সমকক্ষ জগতের কোথাও পাওয়া যায় না। পারস্য কবির যে কোন কবিতার সৌন্দর্য্য জগতের এই শ্রেণীর অন্যান্য কাব্যচেষ্টাকে ম্লান করিয়া দেয়!

অপরদিকে ভারতবর্ষে এক বিচিত্র ব্যাপক রাগিণী ধ্বনিত হইয়াছে। অধ্যাত্মবাদী ভারতবর্ষ, কবিতার মাঝে কোন খণ্ডগীতি ঝঙ্কৃত করে নাই। কলারাজ্যে ব্যাপকত্বের প্রতি একটা নৈসর্গিক আকর্ষণে, চিত্তবস্তু বৃহৎকে উপলব্ধি করিয়া অংশকে তাহার সম্পর্কেই প্রচার করিয়াছে। প্রতি খণ্ডের সৌন্দর্য্য সমগ্রের মাঝে তাহার সুনির্দ্দিষ্ট আসন অনুসারে, চিহ্নিত হইয়াছে। এজন্য বর্ত্তমান যুগে যাহাকে গীতি কবিতা বলা হয় তাহা সংস্কৃত সাহিত্যে নাই বলিলেই হয়।

ভারতে প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যের অনুরূপে হৃদয়ের পরিধিও বিস্তৃত হইয়াছে। নিবিড়তর সংযোগরজ্জু বসুধাকে আত্মীয়তার আলিঙ্গনে ঐক্য দিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপকতর চরমের, দৃঢ় সৌন্দর্য্য গুণ্ঠনবিহীন সজ্জায় উন্মুক্ত হইয়াছে।

প্রথমেই গাঙ্গসৈকত, সিন্ধুবিতস্তার বেলাবলয়, নর্ম্মদা কালিন্দীর ললিত লাস্যভূমি, কদম্ববনচ্ছায় যমুনার নীলতোয়া, কাশ্মীরের স্নিগ্ধ হ্রদপ্রাচুর্য্য, চিত্রকূট ও বিন্ধ্যের সমারোহ; পঞ্চবটির মহার্ঘ সম্ভার, কৈলাস ও হিমালয়ের উদার মহত্ব—এ সমস্তের সজ্জা বিস্তৃতি ও বিক্ষেপ আমাদিগকে চকিত করিয়া তোলে।

পরম রমণীয়, উপভোগ্য গ্রীষ্মকে অবহেলা করিয়া, ভারতে কে কখন শৈলকন্দরে লুকাইয়াছে? ভারতের সুন্দরতম নাটক অভিজ্ঞান শকুন্তলা গ্রীষ্মকে উপলক্ষ্য করিয়াই রচিত হইয়াছে।—

নটী। তবে কোন ঋতু অবলম্বন করিয়া গান করিব?

সূ। আর্য্যে, তুমি অচিরাগত, উপভোগভোগ্য গ্রীষ্মসময় অবলম্বন পূর্ব্বক গান কর। দেখ এখন অতিশয় সুখদ সলিলস্নান; পাটলীকুসুমের সংযোগে অরণ্যসমীরণ সুরভিময়, ছায়ায় নিদ্রা অতি সুলভ, এবং দিবসের পরিণামভাগ অতি রমণীয়।

নটী। তাহাই হোক্—শিরীষকুসুমের সুকুমার কেশর শিখাসমূহ, ভ্রমর কর্ত্তৃক ক্ষণে ক্ষণে চুম্বিত হইতেছে এবং সদয় হৃদয়া রমণীগণের কর্ণে তাহা ভূষণ রূপে শোভা পাইতেছে।

ভারতবর্ষে গ্রীষ্মে উৎসবের উদ্দামতা বাড়িয়া উঠে। শ্যামল বনরাজির ছায়াঘন প্রান্তরের মাঝে স্তিমিত কল্লোল লোকালয়ের অজস্র গুঞ্জনধ্বনির অবকাশে নিদাঘের উৎসব আয়োজন চলিতে থাকে। বিশেষতঃ দিবসে, অলস আবেশের মাঝে নিদ্রাতুরের, সদ্য অন্তর্হিত বসন্তের উজ্জ্বলস্মৃতি এবং ভবিষ্য-বর্ষার সামীপ্য চিত্তকে উদ্বেলিত করিয়া তোলে।

কাব্য বলে, গ্রীষ্মে "সুভগ সলিলাবগাহাঃ।" প্রখর রৌদ্রাতপদগ্ধ কলেবর সলিল মাতার আলিঙ্গনে যে লোভনীয় স্নিগ্ধতা আনয়ন করে, তাহা বীচিবিক্ষোভ শীতল চম্পক গন্ধভরপুর বায়ু একান্ত পুলকময় করিয়া তোলে। তরুণীরা চন্দন ও পদ্মরেণু মাখিয়া কুঞ্জবনে অলস জীবন যাপন করে।

সংস্কৃত কবিরা গ্রীষ্মপীড়া ও প্রেমসন্তাপকে অনেকটা সমধর্ম্মী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শকুন্তলাকে দেখিয়া রাজা দুষ্মন্ত মনে ভাবিল:—

"তবে কি ইহা আতপদোষ অথবা আমার চিত্তের প্রেমসন্তাপ?"

"অথবা সন্দেহে প্রয়োজন কি? * * একটি মাত্র মৃণালবলয়—তাহাও শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। অতএব প্রিয়ার এই দেহ পীড়াযুক্ত হইলেও অত্যন্ত মনোহর ভাব ধারণ করিয়াছে। প্রেম-সন্তাপ নিদাঘ সন্তাপ তুল্য হইলেও গ্রীষ্মসন্তপ্ত তরুণীদের শরীরে এরূপ কমনীয়তা দেখা যায় না, অতএব ইহা প্রেমসন্তাপই বটে।

বৈজ্ঞানিকগণ এই নূতন আবিষ্কৃত 'সিম্প্টম'টি তাহাদের গ্রন্থে যোগ করিতে পারেন এবং অনুরাগ শাস্ত্রের ডাক্তারগণও ইহা স্মরণ করিতে পারেন।

নিদাঘ ক্লান্তির মূলেও আনন্দরস লুক্কায়িত আছে। তরুণীগণের শ্রান্তি গ্রীষ্মকালে মেঘবাতাহতা ময়ূরীর মূর্চ্ছার ন্যায় প্রতীয়মান হয়। পুষ্পময় শয্যা, উষীরলেপন, শিলাতল, নলিনীদল রচিত তালবৃন্ত, লতামণ্ডপ, মৃণাল-বলয়, কর্ণোৎপল, নিদাঘের সুশীতল এ সমস্ত সজ্জা ভারতের হৃদ্‌রাজ্যে বড়ই উপভোগ্য।

সরিৎ সরোবর, কান্তার কন্দর গ্রীষ্মে কতনা উপভোগ্য। ভবভূতির দণ্ডকারণ্য চিত্র মনে পড়িতেছে।

স্নিগ্ধশ্যামাঃ কচিদপরতো ভীষণাভোগরুক্ষাঃ
ইত্যাদি।

ইহা ছাড়া পরিমুদিত মৃণালের ন্যায় দুর্ব্বল অঙ্গের অলসলুলিত অশিথিল পরিরম্ভের কত চিত্রই চোখের সাম্‌নে ভাসে।

চম্পাসরোবরের মদকল মল্লিকাক্ষের পক্ষ সঞ্চালিত পুণ্ডরীক এবং নীলোৎপল প্রভৃতির দৃশ্যে চিত্ত মোহিত হইয়া উঠে।

পদ্মগন্ধ আকর্ষণকারী শীকরশীতল বীচিমরুৎ, রামচন্দ্রের মোহ অপনয়নে যেরূপ সমর্থ হইয়াছিল, গ্রীষ্মবিভাষিকাপীড়িত শৈলশীর্ষে পলায়নপর বর্ত্তমানের শিমলা-মরীচিকালুব্ধগণকে উহা আকর্ষণ করিতে পারিবে কিনা জানিনা।

এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের একাংশ

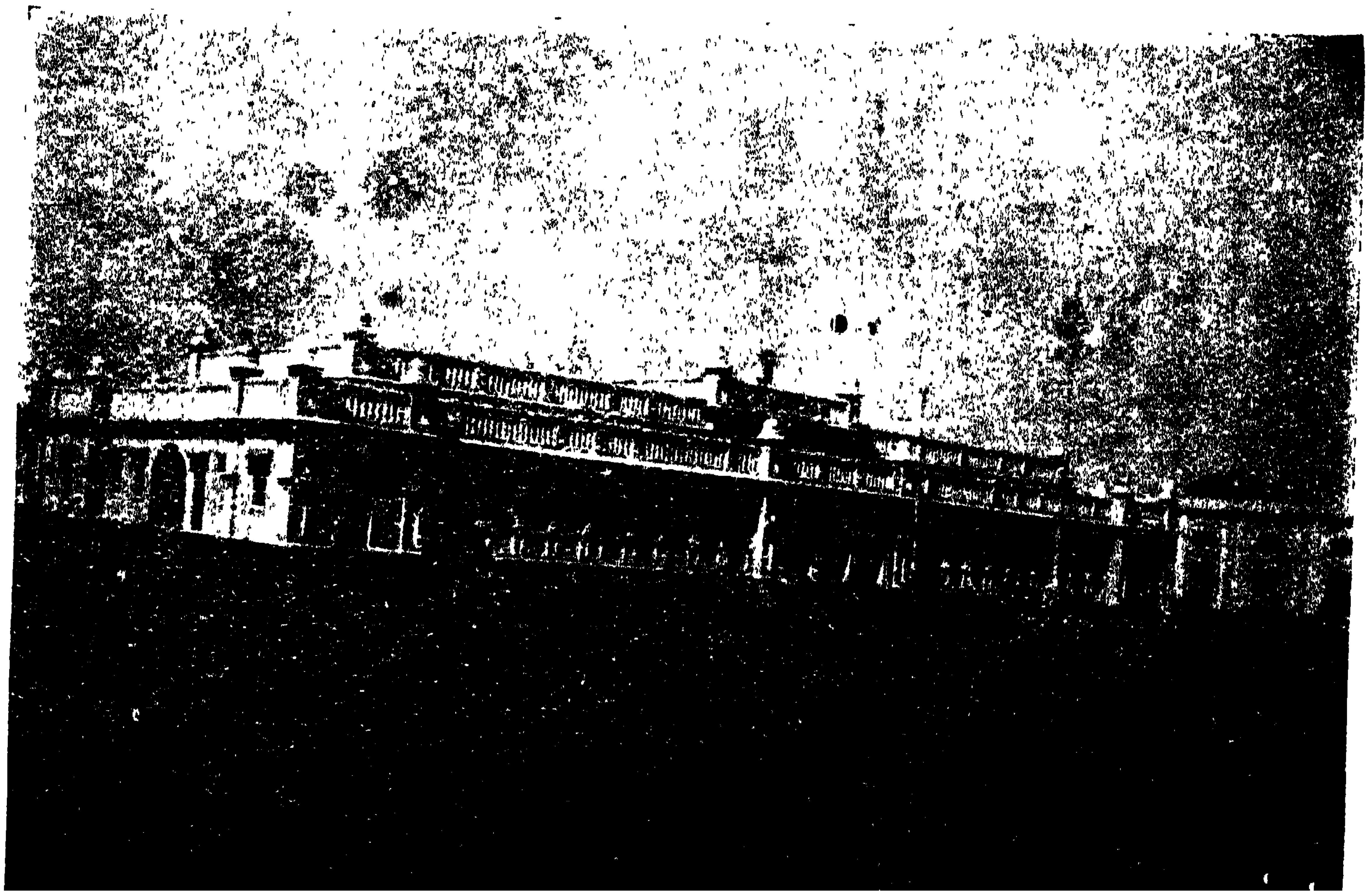

শিক্ষা বিভাগ।

ভবভূতির বিরহপীড়িত রাম সীতাস্পর্শকে মনে করিতেছেন ;—

প্রশ্চ্যোতনং নু হরিচন্দন পল্লবানাং ; ইত্যাদি।

রত্নাবলীর মদনমহোৎসব প্রভৃতির মাঝে গ্রীষ্মভোগ্য কদলীগৃহের ব্যবস্থা আছে!

নিদাঘমিলনের এক অপরূপ শ্রী কালিদাস অঙ্কিত করিয়াছেন।

"প্রচণ্ডসূর্য্য, স্পৃহনীয় শশাঙ্ক, অবিরল অবগাহনে শীর্ণজলাশয়, রমণীয় দিনান্ত প্রভৃতিযুক্ত গ্রীষ্মকাল উপস্থিত হইল।"

ইহাছাড়া বিচিত্র যন্ত্রমুখর মন্দির, সরস চন্দন, সুবাসিত হর্ম্ম্যতল, প্রিয়ামুখোচ্ছাস কম্পিত মধু, সুতন্ত্রিগীত, রমণীয় স্নিগ্ধদৃশ্য-দুকূল, গন্ধদ্রব্য, সুরভিত কবরী, লাক্ষা রসরাগ লোহিত চরণতল, হংসকাকলি অনুকরণকারী নূপুরসিঞ্চন, চন্দনাম্বুসিক্ত বায়ু, বীণাঝঙ্কার-আহুত নিদ্রা,—এ সমস্ত চিত্র পরিস্ফুটভাবে কাব্যে স্থান পাইয়াছে!

কিন্তু এইরূপে শুধু নরনারীর হৃদয়ে প্রেমোন্মাদনা জাগাইয়াই গ্রীষ্মের কার্য্য শেষ হয় নাই। ইহা মানব-বর্জ্জিত সৃষ্টিচিত্র সম্বন্ধেও উদার হৃদয় ভারত কবির কল্পনাকে বিচলিত করিয়াছে।

ক্ষুধাপুষ্ট জিঘাংসা, খাদ্যখাদকের সংহারতন্ত্র অতিক্রম করিয়া গ্রীষ্মের প্রভাবে সর্প ময়ূরের ক্রোড়ে, সিংহ হস্তীগণের সমীপে বিচরণ করিতেছে। আহুতদ্রব্যে বর্দ্ধিততেজ অগ্নির ন্যায় রুদ্রপ্রচণ্ড রৌদ্রে ময়ূরগণের শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছে ; এ জন্য সর্প নিকটে আসিয়া আতপভয়ে পুচ্ছচক্রছায়ায় মুখ রাখিলেও, উহাকে বধ করিতেছে না! এই চিত্র দেখিয়া নিদাঘের কল্যাণ প্রভাবের উদ্দেশে জয়ধ্বনি করিতে ইচ্ছা হয়!

অন্যত্র ভেক ক্লান্তদেহে তৃষ্ণাতুর সর্পের ফণার নীচে নিঃশব্দে শীতল হইবার আশায় অবস্থান করিতেছে। বেচারা বোধ হয় আতপত্রটি ভালরূপে নজর করিবার সুযোগ ও সময় পায় নাই।

যাহা হউক কাব্যেও অন্ততঃ এরূপ মিলন মন্দ কি? যাহাদের চিত্ত অহরহঃ মিলন, অহিংসা প্রভৃতি বিষয়ে চিন্তায় মগ্ন তাহারা কালিদাসের এই সুন্দর সৃষ্টির জন্য নিশ্চয়ই আনন্দ লাভ করিবেন।

গ্রীষ্মের কঠোরশ্রীও আছে। আর এই কঠোর রুদ্র চিত্রের মাঝেও কবি সুন্দরের সন্ধান পাইয়াছেন। নিষ্ঠুর দাব-হুতাশনের দিক্‌দাহ-হাহাকারের মাঝে কবি নির্ম্মল সিন্দুর বর্ণে বিভোর হইয়াছেন ; শাল্মলীবনে রাশীকৃত সূর্য্যকরবহ্নি কবির চোখে সুবর্ণের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। বহ্নির দাহিকা-শক্তিও কবিকল্পনায় যেন সৌন্দর্য্যে লুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

কালিদাসের সমাপ্তিও বড় সুন্দর :—

কমল বন চিতাম্বুঃ পাটলামোদরম্যঃ
সুখ সলিল নিষেকঃ সেব্যচন্দ্রাংশুহাসঃ
ব্রজতু তব নিদাঘঃ কামিনীভিঃ সমেতো
নিশি সুললিতগীতে হর্ম্ম্যপৃষ্ঠে সুখেন॥

নিদাঘনিশীথের জন্য এই ব্যবস্থা করিয়া কবি পুলকিত হইয়াছেন। গ্রীষ্মপীড়ার জন্য মেডিক্যাল কলেজের ফার্ম্মাকোপিয়ায় এই প্রেসক্রিপশনটি লিখিয়া রাখিলে হানি কি?

ক্রমশঃ

শ্রীযামিনীকান্ত সেন।

ক্রমবিকাশে অভ্যাসের প্রভাব।

সমগ্র মানবজাতির ইতিহাস পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্থূলতঃ দেখা যায় যে দুইটি স্বাভাবিক নিয়মের বশে মানবের সমস্ত কার্য্য ও ব্যবহার পরিচালিত হইতেছে। মানব জ্ঞাতসারে হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক সেই দুই নিয়মের বশীভূত হইয়া জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সকল অবস্থায় সকল সময়েই কার্য্য করিয়া থাকে। প্রথম অভ্যাস; দ্বিতীয় বংশানুগত্য; এই দুইটি স্বাভাবিক নিয়ম।

প্রথম নিয়ম অভ্যাসমূলক (Law of Habit)। ভূমিষ্ঠ হইবার সময় মানব অভ্যাসের সম্পূর্ণ অনায়ত্ত। ক্রমশঃ যেমন তাহার ইন্দ্রিয়বৃত্তি সতেজ হইতে থাকে, অভ্যাস তাহার উপর প্রভাব বিস্তার করে। নবজাত শিশুর চক্ষু উন্মীলিত হয় বটে, কিন্তু সে উহার ব্যবহারে অক্ষম। কারণ পূর্ব্ব হইতে তাহার অভ্যাস নাই। তাহার পক্ষে সমস্ত জগৎ গর্ভকোটরের ন্যায় অন্ধকারাচ্ছন্ন। সে চতুর্দ্দিকে অন্ধকার দেখাই অভ্যাস করিয়াছে ও সেই অভ্যাসপ্রযুক্ত সকল দিকই অন্ধকার দেখে। এক দিন, দুই দিন, করিয়া প্রত্যহ তাহার সে অভ্যাস মন্দীভূত হইয়া আসে—সে আলোক দেখিতে অভ্যস্ত হয়। আগ্রহের সহিত আলো দেখিতেই তখন তাহার সুখ বোধ হয়। ঐ সুখের লালসায়, ঐ সুখ বোধের প্ররোচনায়, সে কেবল আলো দেখিলেই সুখী হয় বলিয়া ক্রমশঃ তাহার আলোকের জ্ঞান আসিয়া উপস্থিত হয় তখনও কিন্তু কোন বস্তুর বিস্তার অবধারণ করিবার ক্ষমতা তাহার থাকে না। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে সে সময় চক্ষুর আভ্যন্তরীণ রেটিনা (Retina) নামক ঝিল্লি অপরিপক্ক থাকায়, সেখানে কোন দ্রব্যের ছায়া পড়িলে উহাদ্বারা দর্শনেন্দ্রিয়ের স্নায়ুমণ্ডল উত্তেজিত হয় না, সুতরাং বাহ্য বস্তুর জ্ঞান মস্তিষ্কে পরিচালিত হইতে পারে না। ক্রমশঃ অভ্যাসের গুণে সে অভাবও দূরীভূত হইয়া যায় এবং অর্ভক সম্পূর্ণ দৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ পায়। চক্ষুর সম্মুখ ভাগে যে মসুরাকৃতি ক্ষুদ্র স্বচ্ছ পুটক (crystalline lens) আছে, উহার আলোকরশ্মি বক্রীকরণের ক্ষমতা আছে। সেই বক্রীভূত আলোকরশ্মির সম্মিলনে সম্মুখস্থিত বস্তুর আকৃতিযুক্ত একটি ছায়া রেটিনায় আসিয়া প্রক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু যেমন ফটো ক্যামেরার কাচে, বা ম্যাজিক-লণ্ঠন, বায়োস্কোপ্ প্রভৃতি আলোক যন্ত্রের দ্বারা প্রক্ষিপ্ত ছবি বাহ্য বস্তুর বিপর্য্যস্ত প্রতিকৃতি, উহার উল্‌টা ছায়া, সেইরূপ রেটিনার ছবিও উল্‌টা। বাহ্য বস্তুর উপরিভাগের ছায়া বক্রীভূত হইয়া রেটিনার নিম্নদেশে পড়ে এবং ছবি উল্‌টা দেখায়। শিশু প্রথমতঃ সমগ্র বস্তু উল্‌টা দেখে—তাহার ঐরূপ দেখিয়া দেখিয়া অভ্যাস হইয়া যায়, এবং প্রবীণ চক্ষুতে উল্‌টা ছবি পড়িলেই সেই ছবি যে বস্তুর, সেই বাহ্যবস্তু যে সোজা তাহাই বুঝিবার অভ্যাস আসিয়া পড়ে। ছবি উল্‌টাই পড়ে, আমাদের অভ্যাসবশতঃই আমরা সোজা দেখি।

যেরূপ চক্ষু, সেইরূপ কর্ণ প্রভৃতি অপর অপর ইন্দ্রিয়বোধ ও অভ্যাস সাপেক্ষ।

শব্দ শুনিয়া দূরতা বোধ ও শব্দোৎপত্তির দিঙ্‌নির্ণয় আমরা ক্রমশঃ অভ্যাস করি। এমন কি শব্দের উচ্চতা বা নীচতার তারতম্য লইয়া আমরা যে দূরত্বের উপলব্ধি করি তাহাতে হর্‌বোলা প্রভৃতি (ventriloquist) দ্বারা অনায়াসে প্রতারিত হই। তাহারা উদরাভ্যন্তর হইতে এরূপ ভাবে শব্দ করে যে তাহাতে মনে হয় যে বহু দূর হইতে অথবা ভিন্ন দিক হইতে শব্দ আসিতেছে। এটি অভ্যাসের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত।

ত্বচের দ্বারা আমরা যে উষ্ণতা বা শৈত্য অনুভব করিয়া থাকি তাহাও অভ্যাসবশতঃ আমাদের যথার্থ জ্ঞান উৎপাদনে অনেক সময় ব্যাঘাত জন্মায়। দক্ষিণ হস্তে বরফ ও বাম হস্তে গরম দুধের বাটি কিছুক্ষণ ধরিয়া রাখিলে পরে দুই হস্ত এককালে একটা বাল্‌তীর জলে ডুবাইয়া দিলে, বাম হস্তে ঐ জল শীতল বোধ হইবে ও দক্ষিণ হস্তে উষ্ণ বোধ হইবে। অথচ তাপমান যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায় যে বাল্‌তীর জলের উত্তাপ সর্ব্বত্র সমান। এই প্রকার অনুভূতির বিভিন্নতার স্থূল কারণ আমাদের অভ্যাস। দক্ষিণ হস্ত পূর্ব্ব হইতে বরফ সংযুক্ত আছে বলিয়া উহাতে উত্তাপগ্রহণক্ষমতা জন্মিয়াছে এবং বাম হস্তে উষ্ণ বস্তু ছিল বলিয়া উহা উত্তপ্ত হইয়া রহিয়াছে। এ অবস্থায় বাল্‌তীর জলে হস্তদ্বয় ডুবাইলে বাম হস্ত হইতে উত্তাপ শীতলতর জলে চলিয়া গেল এবং ঐ জলের উত্তাপ শীতলতর দক্ষিণ হস্তে আসিল। যে বস্তু আমাদের ত্বক্ হইতে উত্তাপ দূরীভূত করে সেই বস্তুকে আমরা শীতল বলিয়া অনুভব করিবার অভ্যাস করিয়াছি। যে বস্তু হইতে উত্তাপ আসিয়া ত্বচে প্রবেশ করে সেই বস্তুকে আমরা উষ্ণ বলিয়া অনুভব করিতে অভ্যাস করিয়াছি। সুতরাং বাল্‌তীর জল সমতাপসম্পন্ন হইলেও বাম হস্তে শীতল ও দক্ষিণ হস্তে উষ্ণ বোধ হইল। মার্ব্বেল্ পাথরের টেবিল শীতল বোধ হয়, কাষ্ঠ বা কাপড়মোড়া টেবিল তত শীতল বোধ হয় না, অথচ থার্ম্মমিটর্ বলে উভয়ে সমান গরম। ইহাও আমাদের ত্বচের বিশেষত্ব ও আমাদের অভ্যাসমূলক। মার্ব্বেলের উত্তাপ পরিচালন ক্ষমতা কাষ্ঠ বা কাপড় অপেক্ষা অনেক বেশি; সুতরাং মার্ব্বেল স্পর্শ করিলে ত্বচ্‌স্থিত উত্তাপ শীঘ্রই স্থানান্তরে পরিচালিত হইয়া যায়, কাষ্ঠের দ্বারা তত শীঘ্র হয় না। আমাদের উত্তাপ শীঘ্রই হ্রাস প্রাপ্ত হয় বলিয়া মার্ব্বেলকে কাষ্ঠ অপেক্ষা শীতল অনুভব করি।

আমাদের অভ্যাসনিবন্ধন ইন্দ্রিয়ের সমস্ত ক্রিয়া ও তৎপ্রযুক্ত জ্ঞান উৎপন্ন হইতেছে। অভ্যাস যে কতদূর আমাদের কার্য্যের জন্য দায়ী তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন। আমি যে অভ্যাস করিলাম তাহার দাগ আমার শরীরে এবং মনে চিরকাল রহিয়া যায়। ক্রমশঃ অভ্যস্ত অনেক প্রক্রিয়া সময়ান্তরে কাল ও অবস্থা ভেদে পরিত্যাগ বা পরিবর্ত্তন করা বড় দুরূহ ব্যাপার। একটা গল্প মনে পড়িল। গোয়ালিয়র প্রদেশে গীতবাদ্যের জন্য সুপ্রসিদ্ধ কোন এক পেশাদার গায়ক একটি সুকণ্ঠ বালককে গীত শিখাইত। বালক শুইয়া শুইয়া গীত অভ্যাস করিত এবং শীঘ্রই সুগায়ক হইয়া উঠিল। একদিন ওস্তাদজী চেলা লইয়া রাজবাড়ী গান শুনাইতে গেলেন। ওমরাহগণ বালকের বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে ওস্তাদজি

তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তানপুরায় সুর বাঁধিলেন। বালক বসিয়াই রহিল, কিছুতেই তাহার কণ্ঠ হইতে গান নির্গত হইল না। হতাশ হইয়া ওস্তাদ ঘৃণায় বালককে পদাঘাতে ধরাশায়ী করিবামাত্র বালক অতি সুমিষ্ট গানে সভাসুদ্ধ সকলকে মোহিত করিয়া দিল। হায়! ওস্তাদ জানিত না, এবং খোদ বালকও জানিত না যে গানের সহিত ধরাশয়নও অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে!

যে অভ্যাস বাহ্যবস্তু লইয়া ও যাহা আমাদের শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির প্রক্রিয়ার মূল, তাহা আয়াসে পরিত্যাগ করা যাইতে পারে; কিন্তু যে অভ্যাস আমাদের অন্তরিন্দ্রিয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তাহার প্রভাব শুদ্ধ আমাদেরই উপর নহে, অধস্তন বংশধরগণেরও উপর বিস্তৃত হয়। এই আভ্যন্তরীন অভ্যাসবশতঃ অতি নিম্ন শ্রেণী হইতে ক্রমবিকাশে উন্নত সুগঠিত মানবের সৃষ্টি হইয়াছে দেখা যায়। এ বিষয় পরে আলোচিত হইবে।

কখন কখন প্রকৃতি অভ্যাসের অনুকূলতা সাধন করে, তখন অভ্যাসই দ্বিতীয় প্রকৃতি বা স্বভাব হইয়া দাঁড়ায়। ইহার দৃষ্টান্ত দুই একটি আমাদের শরীরেই বর্ত্তমান। আমরা লিখিবার সময় ও অন্য কার্য্য নিষ্পন্ন করিবার জন্য প্রায় দক্ষিণ হস্তই ব্যবহার করিয়া থাকি। এমন কি লেখার বিষয়ে দক্ষিণ হস্তের ব্যবহার যেন স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু উহা অভ্যাসমূলক মাত্র। যাঁহাদের দক্ষিণ হস্ত কোন কারণে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে তাঁহারা বাম হস্তে অতি উত্তম দ্রুত লিখিতে অভ্যাস করিয়াছেন, দেখা যায়। বালককে প্রথমেই দক্ষিণ হস্তে লিখিবার শিক্ষা দেওয়া হয়। এই প্রথার সুবিধা অনেক, প্রকৃতি এ বিষয়ে অনুকূল এবং পিতৃপিতামহাদি পুরুষানুক্রমে ঐ দক্ষিণ হস্তের ব্যবহার অভ্যাস করা নিবন্ধন বালকের দক্ষিণ হস্তে লিখন অভ্যাস করা বামহস্ত অপেক্ষা সুসাধ্য হইয়াছে। ক্রমশঃ দেখা যাইতেছে যে মানব শক্ত কার্য্যে দক্ষিণ হস্ত ব্যবহার করে বলিয়া ঐ হস্তের মাংসপেশী বামহস্ত অপেক্ষা অধিক বলবান ও শক্ত হইয়া পড়িতেছে। অভ্যাস আভ্যন্তরীণ পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়া ক্রমশঃ এমন রূপান্তর ঘটাইতে পারে যে বামহস্তের মাংসপেশী জন্মাবধিই (ভ্রূণাবস্থাতেই) ক্ষীণ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতে পারে। আধুনিক প্রাণিতত্ত্ববিদেরা স্থির করিয়াছেন যে এই অভ্যাসের বলেই মানবের পুচ্ছহীনতা ও পদদ্বয় হইতে হস্ত দ্বয়ের বিভিন্নতা ঘটিয়াছে। অনভ্যাসের বলে ও অব্যবহারের অভ্যাসে পুরুষানুক্রমে আমাদের উক্ত দ্বিবিধ কায়িক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এই রূপে ক্রমশঃ হয়ত সভ্য জগতে মানবের বামহস্ত একটা অকর্ম্মণ্য কিম্ভূতকিমাকার প্রত্যঙ্গে পরিণত হইয়া অবশেষে লোপ পাইতে পারে। পূর্ব্বে যে মানবের পুচ্ছ ছিল তাহার নিদর্শন খান কয়েক অস্থি মাত্র আজিও নরকঙ্কালে দৃষ্ট হয়।

অভ্যাসের আর এক দৃষ্টান্ত আমাদের দাঁড়াইয়া দুই পায়ে চলা। প্রাণীর মধ্যে এক জাতীয় মর্কট (Gorilla) কেবল মধ্যে মধ্যে ঐরূপ ভাবে সোজা হইয়া চলিয়া থাকে। এখনও অভ্যাসের প্রভাব আমাদের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন করিতে পারে নাই — মানবশিশু জন্মিয়াই দাঁড়াইতে পারে না। ক্রমশঃ তাহার সে অভাবও দূরীভূত হইবার

উপক্রম দেখা যাইতেছে। পদদ্বয় হইতে হস্তদ্বয়ের গঠন একেবারে বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। অবশ্য ইহা যুগযুগান্তরের অভ্যাসের ফল। সোজা হইয়া চলিবার দরুণ আমাদের পদদ্বয় হস্তদ্বয় অপেক্ষা অধিক বলিষ্ঠ লম্বাকৃতি ও দৃঢ় অস্থি সংযুক্ত। আমরা যে সকল কার্য্যের জন্য হস্তের অঙ্গুলি ব্যবহার করিয়া থাকি ;—মুঠা করা, অঙ্গুলি দ্বারা টিপিয়া ধরা প্রভৃতি যে সকল কার্য্যে হস্তাঙ্গুলী ও হস্ততালুর বক্রীভাব ধারণ করাই, পদদ্বয়ের অঙ্গুলিতে সে সকল কার্য্য করা আমাদের আবশ্যক না হওয়ায় আমাদের সে অভ্যাস চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু মর্কট হস্ত ও পদের অঙ্গুলি সমভাবে ব্যবহার করিতে পারে। এই নিমিত্ত প্রাণীতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বানর জাতিকে চতুর্হস্ত (quadrumana) ও মানব জাতিকে দ্বিহস্ত (Bimana) এই দুই প্রাণীবিভাগে ফেলিয়াছেন। মানব দ্বিহস্ত জীবের একমাত্র প্রতিভূ। উপরি উক্ত কারণে আমাদের পদদ্বয়ের অঙ্গুলি ছোট, ও অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে। পায়ের আঙ্গুল এখন না থাকিলেও ক্ষতি নাই ; ক্রমশঃ হয়ত মৎস্যের ডানার ন্যায় আমাদের সমস্ত পদাঙ্গুলি চর্ম্ম ও মাংসপেশী দ্বারা আবৃত হইয়া পড়িবে ও পদতল পাদুকাতলের ন্যায় সমক্ষেত্র হইয়া যাইবে।

ঊর্দ্ধবাহু সন্ন্যাসী যে হস্ত ব্যবহার করেন না, তাহা ক্রমে অকর্ম্মণ্য হইয়া তদবস্থ একখণ্ড কাষ্ঠপ্রস্তরের ন্যায় হইয়া যায়। ঐ অবস্থায় যদি তাঁহার ঔরষে ঐরূপ ঊর্দ্ধবাহুযুক্তা কোন রমণীর গর্ভে সন্তান জন্মে তবে সেই ভ্রূণের ঐ অঙ্গহীন হইবে ইহাই সম্ভব। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে নাও হইতে পারে। সেই ভ্রূণ হইতে যে মানব হইল সেও যদি ঐরূপ ঊর্দ্ধবাহুত্ব অভ্যাস করে এবং ঐরূপ অঙ্গহীনা রমণীর সহিত বিবাহিত হয়, তাহা হইলে তাহাদের সন্তানের ঐরূপ অঙ্গহীন হওয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্ভব। এইরূপে ৫।৭ বংশ ধরিয়া যদি একই অভ্যাস চলিয়া আসে তাহা হইলে স্থায়ী প্রকৃতিগত বিকার আসিয়া পড়ে, আর সে বিষয় অভ্যাস করিতে হয় না। ইহাই অভ্যাসের নিয়ম—Law of Habit।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, এইরূপ অভ্যাসের কারণ কি ? যে অভ্যাসের বলে একটা বিষম পরিবর্ত্তন আমাদের শরীরে ও মনে ঘটিয়া থাকে, সে অভ্যাসের দাস আমরা হই কেন ? এ প্রশ্ন বড়ই জটিল। স্থূলতঃ দেখা যায়, সুবিধা ও সুখবোধ বা দুঃখ ও কষ্ট নিবারণের স্পৃহাই অভ্যাসের মূল। অনেক স্থলে অজ্ঞাতসারে একটা অভ্যাস পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে দেখা যায়। আবার অনেক স্থলে জ্ঞাতসারে একটা সুবিধা বা সুখের চেষ্টায় অভ্যাসটা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং সেই সুবিধা বা সুখ ক্রমাগত অভ্যাসের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যাইত বলিয়া ঐ অভ্যাসের ফল এক্ষণে একটা স্থায়ী পরিবর্ত্তনে আসিয়া পড়িয়াছে। জলচর ও খেচর পক্ষীর পুচ্ছের আবশ্যক ; সেই প্রাণী যখন স্থলে বিচরণ করে তখন তাহাকে পুচ্ছের ব্যবহার আদৌ করিতে হয় না। ক্রমশঃ যে জীব জলে বা আকাশে গতিবিধি একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছে তাহার অব্যবহারের অভ্যাস বশতঃ পুচ্ছ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া অবশেষে একেবারে অন্তর্দ্ধান করে। কিন্তু যদি কোন

স্থলচর জন্তু পুচ্ছের ব্যবহার করিতে থাকে, তাহা হইলে সেই অভ্যাসের বলে তাহার পুচ্ছের আকৃতি ও গঠন বিভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়া দৃঢ়, লোমশ ও মাংসল হইয়া পড়ে। যথা শৃগাল প্রভৃতি।

অধ্যাপক হেকেল্ তাঁহার Evolution of Man নামক সুবিখ্যাত পুস্তকে বহু গবেষণার ফল লিপিবদ্ধ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, মানব ভ্রূণাবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া পরিপক্ক অবস্থায় ভূমিষ্ট হওয়া পর্য্যন্ত যে সমস্ত পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া যায়, তাহাতে সে যে অতি নিম্ন প্রাণী হইতে ক্রমে উদ্ভূত হইয়াছে তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। গর্ভে উহার এক, এক অবস্থা, কোন না কোন নিম্নতর প্রাণীর গর্ভাবস্থার সহিত একেবারে মিলিয়া থাকে। এ বিষয় বারান্তরে আলোচিত হইবে। এরূপ যুক্তি ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন যে ক্রমবিকাশবাদ আর সন্দেহ করিবার যো নাই। ইহার মূলে অভ্যাস ও বংশানুগত্য এই দুইটি নিয়ম বিদ্যমান।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

মহর্ষি রুদ্র।

অতি পুরাকালে, মানব-সভ্যতার সেই আদিম অবস্থায়, মানবজাতির আদিগুরু ঋষিগণ মনুষ্যত্বের দিব্যবীজ মানসক্ষেত্রে বপন করিয়া অঙ্কুরিত করিবার জন্য যখন তাহাতে তপস্যার সলিল সেচন করিতেছিলেন; মনুষ্যত্বের সেই নবশক্তির সাধনা, সভ্যতার বিচিত্র কোলাহলের আবর্ত্তে ঘূর্ণিত না হইয়া, স্বভাবের পথে, সহজে তাহার চরম লক্ষ্যের সান্নিধ্য লাভে যখন সক্ষম হইয়াছিল, সেই সময়ে এ দেশে পশ্চিম অঞ্চলে রুদ্র নামে এক দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ দস্যু বাস করিত। কত শত নিরপরাধ পথিক যে এই দস্যুর হস্তে প্রাণ হারাইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। ইহার নাম শ্রবণমাত্র দেশবাসী সকলেই যৎপরোনাস্তি ভীত হইয়া উঠিত।

এই দস্যুর সপ্তবর্ষ বয়স্ক একটি পুত্র ছিল। দস্যু তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিত। পুত্র-স্নেহ ব্যতীত দস্যুর পাষাণ হৃদয়ে অন্য কোনো কোমল বৃত্তির লেশমাত্র দেখা যাইত না। একদিন মধ্যাহ্নকালে বাড়ী ফিরিবার সময়ে দস্যু দেখিল যে জঙ্গলের ধারে এক প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র তাহার সেই প্রিয়পুত্রকে আক্রমণ করিয়া নখদন্তাঘাতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিতেছে। দেখিয়া দস্যুর প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং পুত্রের প্রাণরক্ষার জন্য তৎক্ষণাৎ সে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ব্যাঘ্রের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল। দস্যু অত্যন্ত বলশালী ছিল। সুতরাং তাহার আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া ব্যাঘ্র, শিশুকে পরিত্যাগ করিয়া, প্রবল বেগে দস্যুকে আক্রমণ করিল। দস্যুও স্বীয় বাহুবলে সেই ভীষণ আক্রমণের বেগ প্রতিহত করিয়া ব্যাঘ্রকে একেবারে ভূতলশায়ী করিয়া ফেলিল। আর কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই দস্যু সেই ব্যাঘ্রকে নিশ্চয়ই যমালয়ে প্রেরণ করিতে পারিত, কিন্তু

যখন সে দেখিল যে তাহার একমাত্র পুত্রের প্রাণবিয়োগ হইয়াছে এবং তাহার রক্তাক্ত মৃত দেহ ভূমিতে পতিত রহিয়াছে, তখন কে যেন তাহার শরীরের সমস্ত বল মুহূর্তমধ্যে অপহরণ করিয়া লইল। সে আর দাঁড়াইতে না পারিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে মাটিতে পড়িয়া গেল। এদিকে সুযোগ পাইয়া সেই মৃতপ্রায় ব্যাঘ্র যথাশক্তি সেই পুত্রশোকাতুর দস্যুকে বারংবার আহত করিয়া মৃত্যুমুখে পাতিত করিল।

ব্যাঘ্রের বারংবার আক্রমণে রুদ্র মৃতবৎ হইয়া পড়িলেও একেবারে তাহার প্রাণবিয়োগ হয় নাই। সে সমস্ত দিন ঐরূপ অবস্থাতেই সেই জঙ্গলের ধারে পড়িয়া রহিল। সন্ধ্যার সময়ে চারিজন পথিক সেই পথ দিয়া যাইতেছিল। পথিপার্শ্বে বালকের রক্তাক্ত মৃতদেহ, ভীমকায় মৃত ব্যাঘ্র ও ক্ষত বিক্ষত শরীর রুদ্রকে দেখিয়া পথিকেরা যারপর নাই ভীত হইল। অনন্তর কিয়ৎক্ষণ পরিদর্শনের পর যখন তাহারা দেখিতে পাইল, যে আহত ব্যক্তি এখনও জীবিত আছে, তখন কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া সকলে রুদ্রের নিকটবর্তী হইল ও তাহাকে স্কন্ধদেশে স্থাপনপূর্ব্বক বহন করিয়া লইয়া চলিল।

নিকটেই পরম দয়ালু মহর্ষি সৌম্যের আশ্রম ছিল। পথিকেরা মৃতপ্রায় রুদ্রকে বহন করিয়া সেই আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল ও মহর্ষির চরণোপান্তে উপনীত হইয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত সবিনয়ে নিবেদন করিল। পরম কৃপালু মহর্ষি পথিকগণের নিকট সবিশেষ অবগত হইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং তাহাদিগের সহৃদয়তার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর অত্যন্ত যত্নপূর্ব্বক ক্ষতবিক্ষত দেহ রুদ্রকে গৃহমধ্যে লইয়া গিয়া একান্ত মনে তাহার সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন।

হোমধূমের পূতগন্ধে আশ্রমস্থ বায়ু সততই পবিত্র থাকিত। তপোবনের সেই বিশুদ্ধ বায়ু সেবনে ও মহর্ষি সৌম্যের ঐকান্তিক যত্নে দীর্ঘকালের পর সে ক্রমশ আরোগ্য লাভ করিল। এই দীর্ঘকাল রোগশয্যায় শুইয়া শুইয়া রুদ্র প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যা সময়ে প্রজ্জ্বলিত হোমাগ্নির দীপ্ত শিখা যখন নিরীক্ষণ করিত; সমবেত ঋষিবালকবালিকাগণের সুকোমল কণ্ঠোচ্চারিত বেদপাঠ ও গায়ত্রী মন্ত্রের উচ্চারণ যখন শ্রবণ করিত, তখন তাহার অন্তঃকরণ এক অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দের রসাবেশে অবশ হইয়া আসিত। বালকবালিকাগণের মধ্যে মহর্ষি সৌম্যের কন্যা দীপিকারই এই কার্য্যে বিশেষ নিষ্ঠা দেখা যাইত। যখন প্রজ্বলিত হোমাগ্নির ঊর্দ্ধশিখা আকাশমার্গ আলোকিত করিত, তখন তাহার উজ্জ্বল চক্ষু দুইটি প্রেমানন্দে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিত; আনন্দের উদ্দাম প্রবাহ তাহার সরল শিশু হৃদয় ভাসাইয়া দিয়া নয়ন প্রান্তে অশ্রুর তরল তরঙ্গ বিস্তার করিত! সে তখন আপন অন্তরস্থিত আনন্দকে কোন্ ঊর্দ্ধলোকে বিসৃত করিয়া দিয়া অনন্ত আনন্দকে আপনার মধ্যে আহ্বান করিয়া আনিত কে তাহা বলিতে পারে!

দীপিকা স্বভাবতঃ অতিশয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী ছিল; সে একাকিনীই সমস্ত গৃহকর্ম্ম ও আশ্রমের অন্যান্য কার্য্যসমূহের তত্ত্বাবধান অনায়াসেই করিত। মহর্ষি সৌম্যের এই

কন্যা ব্যতীত সংসারে আর কেহই ছিল না। দুহিতার অসাধারণ বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় পাইয়া মহর্ষি বিশেষ যত্নে তাহাকে ব্রহ্মসাধনায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। গৃহকর্ম্ম, আশ্রমোচিত কার্য্য ও সাধনার অত্যল্প অবসরেও এই কোমল হৃদয়া ঋষিতনয়া, পিতার সহিত দস্যু রুদ্রের সেবা শুশ্রূষায় যথাশক্তি যোগদান করিত।

একদিন রুদ্র বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিল :—

"ঋষি তনয়ে, তোমরা প্রতিদিন কাহার অর্চ্চনা কর এবং সেই অর্চ্চনারই বা ফল কি" ?

বালিকা উত্তর করিল :—

"যিনি আমার অন্তর্য্যামী পরম পুরুষ, যিনি এই প্রজ্বলিত অগ্নিতে, দিবসে আলোক মালায়, রজনীর গাঢ় অন্ধকার পুঞ্জে, জলে, স্থলে এবং আকাশে সতত বর্ত্তমান আছেন আমি তাঁহাকেই এইরূপে অর্চ্চনা করিয়া থাকি; এইরূপেই তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার সহিত প্রতিদিন যোগযুক্ত হই; পরম আনন্দই ইহার একমাত্র পরিণাম! আমি ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই জানিনা। পিতার নিকট জিজ্ঞাসা করিলে সবিশেষ সমস্তই জানিতে পারিবে।"

বালিকার মুখে এই সকল কথা শুনিয়া দস্যু অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিল:—

"ভাগ্যবতি, আমি আরোগ্য লাভ করিয়া আর গৃহে ফিরিয়া যাইব না; তোমাদেরই আশ্রমে থাকিয়া তোমাদেরই ন্যায় আমিও সেই অন্তর্য্যামী পরম পুরুষকে জলে, স্থলে, অনলে, আকাশে, আলোকে অন্ধকারে সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ করিতে শিক্ষা করিব!"

রুদ্র সেই হইতেই সৌম্যের তপোবনে থাকিয়া গেল; এবং মহর্ষির নিকটে ব্রহ্মজ্ঞানের দীক্ষা গ্রহণ করিয়া, সেই পরম পুরুষের দর্শন মানসে ব্রহ্ম সাধনায় নিযুক্ত হইল।

এই দস্যু রুদ্রই পরে মহর্ষি-রুদ্র নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

শ্রীহেমলতা দেবী।

চয়ন।

আগ্রা।

৩৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯০০।

আগ্রাই ভারতীয় মুসলমান-সভ্যতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পরচনা। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি, উদারচেতা মোগলসম্রাট্ আকবার দিল্লী হইতে তাঁহার রাজধানী আগ্রায় উঠাইয়া আনেন:—এই মহাপুরুষের স্মৃতি এই বৃহৎ নগরটিকে সজীব রাখিয়াছে।

যে সময়ে য়ুরোপীয়েরা, ধর্ম্মসংক্রান্ত তুচ্ছ বিবাদ লইয়া আপনাদের মধ্যে কাটাকাটি করিতেছিল, সেই ষোড়শ শতাব্দীতে এই ভারত-সম্রাট্ সকল ধর্ম্মকে এক করিবেন বলিয়া স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। জাতিতে মুসলমান হইলেও তিনি প্রথমে, উচ্চতম হিন্দুসমাজের অন্তর্ভূত দুইটি কন্যাকে বিবাহ

করিয়া, আত্মবিসর্জ্জনের কমনীয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন। তাহার পর তিনি মহা-ধর্ম্মমণ্ডলী বা ধর্ম্মের 'পার্লেমেণ্ট' আহ্বান করিবার সঙ্কল্প করিলেন। সেই মহাধর্ম্ম-মণ্ডলীতে,—ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টান, জৈন, পার্সি, ইহুদী উপস্থিত হইল। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস—তাহাদের মধ্যে তর্কবিতর্ক চলিতে লাগিল। প্রত্যেকেই যে ধর্ম্মবিশ্বাস লইয়া আসিয়াছিল, সেই ধর্ম্ম-বিশ্বাসকে অক্ষুন্ন রাখিয়া চলিয়া গেল।

এই আকবর, যমুনার তীরে যে প্রসিদ্ধ দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া আজও মুগ্ধ হইতে হয়। ধূসর-লাল রংএর প্রকাণ্ড 'বুরুজ'-বিশিষ্ট দস্তুরপ্রাচীর ;—সাদা মার্ব্বেলে গঠিত এই দুর্গ প্রাচীর, গম্বুজ ও চূড়াবিশিষ্ট একটি রাজপ্রাসাদকে আগলাইয়া রহিয়াছে। এই রাজপ্রাসাদটি প্রকাণ্ড ও পরী স্থানের ন্যায় রমণীয় : ইহার অভ্যন্তরে কত প্রাঙ্গণ, কত ছাদ, কত বড় বড় দালান। সেই সমস্ত হইতে বিযুক্ত মার্ব্বেলের মসজিদ—সমস্ত সাদা—সুনীল গগন-পটে যেন অঙ্কিত রহিয়াছে। সুল্‌তানা-বেগমদিগের কক্ষগুলি অতি সুন্দর : যাহাতে বায়ু ও আলোক প্রবেশ করিয়া, ভিতরে তাপ সংরক্ষিত হয় এইরূপ সূক্ষ্ম খোদাইকাজবিশিষ্ট জালি-কাটা মার্ব্বেলের দেয়াল। নেত্রসমক্ষে প্রসারিত বিশাল ময়দান, মন্থরগতি যমুনার জল ও দূরস্থ তাজমহল।

তাজমহল! ইহাই আগ্রার চিরন্তন গৌরবের সামগ্রী। আকবরের একজন বংশধর শা-জেহান, তাঁহার প্রিয়তমা বেগমের স্মরণার্থ এই সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহা দেখিলে, নিখুঁত-সুন্দর একটি শিল্পসামগ্রীর একটা অপূর্ব্ব ও অলৌকিক স্মৃতি মনোমধ্যে রহিয়া যায়।

ধূসর-লাল রংএর একটা বৃহৎ সিংহদ্বার; তাহার উপর, সাদা মার্ব্বেলে উৎকীর্ণ কোরাণের কতকগুলি বয়েৎ। তাল, কমলা-লেবু, দাড়িম, ঝাউ প্রভৃতি বৃক্ষে সুশোভিত একটি চমৎকার উদ্যান। গোলাপ ও যুঁই-এর গন্ধে সমস্ত স্থান আমোদিত। পদ্মফুলে আচ্ছন্ন কৃষ্ণাভ জলবিশিষ্ট একটি দীর্ঘিকা, তাহার চারিধারে সাদা মার্ব্বেলের সান। কালো-কালো ঝাউ-গাছের মাথা ছাড়াইয়া,—সাদা মার্ব্বেলে গঠিত, সূক্ষ্ম খোদাই-কাজ-করা, বহুমূল্য রত্নখচিত, গম্বুজবিশিষ্ট একটা প্রকাণ্ড ইমারৎ সমুত্থিত হইয়াছে। চারিধারে, চারিটা সাদা মার্ব্বেলের মিনার-স্তম্ভ। ইমারতের অভ্যন্তরে, শাজাহান ও তদীয় প্রিয়তমার সমাধিস্থান, তাহার চারিধারে জালিকাটা মার্ব্বেলের বেব—কি সূক্ষ্ম কারুকার্য্য! তাহার তুলনা নাই...

তাজমহলের জটিল সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে হইলে, দিবারাত্রির সকল সময়েই উহাকে দেখিতে হয়। প্রাতঃকালে, উদীয়মান সূর্য্যের রক্তিম আলোকে, উহাকে অস্পষ্ট ও অবাস্তব বলিয়া মনে হয়; আরও কিয়ৎকাল পরে, মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রখর রশ্মির প্রভাবে, উহার জ্যোতির্ম্ময়ী বিশ্ববিজয়িনী উগ্রমূর্ত্তি প্রকাশ পায়; অবশেষে রাত্রিকালে, চন্দ্রের জ্যোৎস্নায়, কবিকল্পনাসুলভ পাণ্ডুবর্ণ, রহস্যময় কোমলকান্ত, মর্ম্মস্পর্শী, স্নিগ্ধ মূর্ত্তি প্রকটিত হয়।

স্থপতি ও জহুরী—এই উভয়ের হস্তগঠিত

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পসামগ্রী এই তাজমহল; কি পাশ্চাত্য কি প্রাচ্য সকল জাতির লোকেই এই তাজমহল দেখিয়া বিমুগ্ধ হয়। উত্তর-ভারতীয় সমস্ত দেবালয়ের ও সমস্ত সমাধি-মন্দিরের সৌন্দর্য্য এই তাজমহলে যেন একাধারে অবস্থিত। বিচিত্র সৌন্দর্য্যের সমবায়ে ইহার সৌন্দর্য্য একটা বিশালভাব ধারণ করিয়াছে; কিন্তু বিশাল হইলেও গন্ধর্ব্বপুরীর ন্যায় রমণীয়। সুবঙ্কিম ও ঋজু— এই সকল রেখারই বা কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য—এই সকল রেখাগুলির কেমন সুন্দর সামঞ্জস্য! তার পর, অমল-ধবল মার্ব্বেলের শুভ্র সৌন্দর্য্য। আবার যেমন কোন রত্নালঙ্কারে সযত্নরচিত অতি সূক্ষ্ম কত কি খুঁটিনাটি কাজ থাকে, সেইরূপ ইহার সূক্ষ্ম সুকুমার সৌন্দর্য্য। খোদাই মার্ব্বেলে সুন্দর ফিতার কাজ (Lace)। ঝিনুকের পাতের মধ্যে, প্রবালের মধ্যে, ফিরোজা প্রভৃতি মণির মধ্যে ফুল বসানো। বিলাসময়, ছায়াময়, সুগন্ধময় উদ্যানের সৌন্দর্য্য। অক্ষয় প্রস্তর-গাত্রে, মুসলমান-মস্তিষ্ক-প্রসূত যে সকল সুন্দর বাক্য খোদিত রহিয়াছে সেই সকল বাক্যের সৌন্দর্য্য। বৃহৎ সিংহদ্বারের গায়ে লেখা আছে;—"কেবলমাত্র ঈশ্বরই মহান্;" "ঈশ্বরের উদ্যানে শুদ্ধাত্মারাই প্রবেশলাভ করিবে।" তারপর, সেই ভাবের সৌন্দর্য্য যাহা এই সমাধিমন্দিরটিকে অমর করিয়া রাখিয়াছে: সুন্দর সেই জলন্ত প্রেম, সুন্দর সেই নির্ভয় মৃত্যু, সুন্দর সেই অনন্যপরায়ণ প্রেমিকের তীব্র শোক! এবং প্রেমের স্বপ্নকে—ঐশ্বর্য্য-বিভবের স্বপ্নকে বাস্তবতায় পরিণত করিবার জন্য, যতদিন মানবজাতি থাকিবে ততদিন, একজন মৃত রমণীর স্মৃতিকে মানুষের মনে সজীব রাখিবার জন্য, সুন্দর সেই বিরাট্ প্রযত্ন! তাজমহলের দীপ্ত মহিমা,—এই সান্ত্বনাদায়ক বচনটির সত্যতা সপ্রমাণ করে: —"মৃত্যুর চেয়ে প্রেমের বল বেশী।"

হাঁ, পৃথিবীতে যত স্মৃতি-মন্দির আছে তন্মধ্যে তাজমহলই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। একবার যে তাজমহল দেখিয়াছে, তাহার জীবন সার্থক।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বন্দী।

৪৪

আমার কাহিনী।

সম্পাদকীয় বক্তব্য—বহু সন্ধানেও এই উল্লিখিত কাহিনীটি আমাদের করায়ত্ত হয় নাই। বোধ হয় সময়ের স্বল্পতা হেতু তিনি এই কাহিনী লিপিবদ্ধ করিবার অবসর পান নাই।

৪৫

ভিলা হোটেলের একটি কক্ষ হইতে।

ভিল হোটেল হইতে!...আমি এখানে আসিয়াছি! সে স্থানটা—ঐ যে আমার জানালার নিম্নেই! বিস্তর লোক জমিয়াছে। কেহ চীৎকার করিতেছে, কেহ বা হাসিতেছে।

এখন সাহস—শুধু সাহস! ঐ লালরঙের কাঠের থাম দুইটা দেখিয়া আমার বুকটা ধ্বক করিয়া উঠিয়াছে!

কয়টা কথা আমি বলিয়া যাইতে চাহি! সরকারী উকিলকে ডাকিয়া পাঠানো হইয়াছে তাঁহারি জন্ম প্রতীক্ষা করিয়া আছি—যেটুকু সময় এমন করিয়া পাওয়া যায়!

এই যে কাহারা আসে! সময় হইয়াছে! আর অবসর নাই! সমস্ত দেহ কাঁপিয়া উঠিতেছে! এই ছয় ঘণ্টা ধরিয়া, ছয় মাস ধরিয়া যাহা ভাবিতেছিলাম—তাহা ঘটিতে চলিল! এতক্ষণ ভাবিয়াছি—তবু মনে হইতেছে এ মুহূর্ত্ত কি অতর্কিতভাবেই আজ আসিয়া পড়িল!

কতকগুলা অলিগলি, সোপানশ্রেণী ঘুরাইয়া তাহারা আমাকে লইয়া চলিল। শেষে একটা ছোট ঘরে আসিয়া দাঁড়াইলাম—ছোট বায়ুপথের মধ্য দিয়া আকাশ দেখা যাইতেছিল—চারিধার কুয়াশাতে ভরিয়া গিয়াছে! রৌদ্র নাই! আমি চেয়ারে বসিলাম।

ঘরে আরো তিন চারজন লোক ছিল—আচার্য্য ছিলেন!

সহসা আমার কেশে লৌহের শীতলস্পর্শ অনুভব করিলাম এবং কাঁচির শব্দ স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম। কেশের ভার নিমেষে আমার পদতলে লুণ্ঠিত হইল! আমি স্থির হইয়া বসিয়াছিলাম। আশ পাশে সকলে চুপি চুপি কথা কহিতেছিল!

একজন কহিল, "এ কি হচ্ছে?"

আর একজন কহিল, "মাথার চুলগুলো কেটে—দাড়টা কামিয়ে তবে নিয়ে যাব।"

চোখ তুলিয়া দেখি—কাগজের তাড়া ও পেন্সিল লইয়া একটা লোক প্রশ্ন করিতেছে—বুঝিলাম সে কোন পত্রিকার সংবাদদাতা! কালিকার কাগজের জন্ম তথ্য সংগ্রহে আসিয়াছেন! কাল প্রত্যূষে সংবাদ-পত্রের বাজারে আমারি বিষয় লইয়া মহাধুম বাধিয়া যাইবে—হায় তখন কোথায় আমি?

একটা প্রহরী আসিয়া আমার হাত ধরিল—আমি কহিলাম, "আঃ!

সে কহিল, "ক্ষমা করবেন—আপনার কি ব্যথা লাগ্‌ছে?" এই সে—আমাকে যে ফাঁসিকাঠে ঝুলাইবে—সরকারী জহ্লাদ! যে হাতে আমাকে সে স্পর্শ করিয়াছে, সেই হাতে কত লোকের প্রাণ নিয়াছে! এমন নম্র কথা-বার্ত্তা তার এমন শান্ত সুর! আশ্চর্য্য!

তারা একটা সূক্ষ্ম দড়িতে আমার পা দুইটা আল্গা করিয়া বাঁধিয়া দিল—যাহাতে আমার গাত একটু লঘু হয়—দ্রুত না চলিতে পারি!

আচার্য্য ডাকিলেন, "এস বৎস!"

দুইটা প্রহরী আমার দুই হাত ধরিল। আমি ধীর পাদক্ষেপে আচার্য্যের অনুসরণ করিলাম।

বাহিরের দ্বার খুলিয়া গেল! খানিকটা কোলাহল, দমকা ঠাণ্ডা বাতাস ও অস্ফুট আলোক-তরঙ্গ একসঙ্গে ভিতরে ঢুকিল! বাহিরে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে—এই বৃষ্টি একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া আজ দেশের নরনারী এই বীভৎস হৃদয়হীন অভিনয় দেখিতে আসিয়াছে! কি নির্লজ্জ কৌতুক স্পৃহা! কাতারে কাতারে লোক দাঁড়াইয়াছে ছাতাটুপির সংখ্যাই নাই! চারিধারে সশস্ত্র প্রহরীর শ্রেণী—পাছে কোনরূপে শান্তিভঙ্গ

হয়! আমি বাহিরে আসিলেই চীৎকার উঠিল—"ঐ-ঐ-ঐ যে আসছে একধারে বিপুল করতালির ধ্বনি উঠিল! রাজার যোগ্য সম্মানে আমি পথে চলিয়াছি! চমৎকার!

বাহিরেই একটা ছোট ঠেলাগাড়ী—আমি তাহাতে চড়িলাম। সশস্ত্র কয়েকটা প্রহরী গাড়ীর চারিধার ঘেরিয়া দাঁড়াইল। গাড়ী চলিল!

একদল ছেলে চীৎকার করিয়া উঠিল—"নমস্কার, মশায়।" আর একজন কহিল "বহুৎ আচ্ছা! সুপ্রভাত!"

একটি স্ত্রীলোক কহিল, "মরতে চলেছে"।

চারিধারের এই বিকট কোলাহলে মনে একটা সাহস পাইলাম।

পথে আমারি জন্য আজ এই বিপুল জনতা। আবার কে কহিল, "টুপি খুলে ফেল সব!" যেন রাজা চলিয়াছেন!

আমি হাসিলাম—হায় ইহারা টুপি খুলিতেছে,—আমাকে মাথাটা খুলিয়া দিতে হইবে! ফুলের বাজারের পাশ দিয়া গাড়ী চলিতেছিল! মিষ্ট গন্ধে প্রাণ যেন কতকটা আশ্বস্ত হইল; লাল নীল সাদা নানা রঙের ফুলে শোভাও সুন্দর হইয়াছিল! বাজারে-বাড়ীতে—কোথাও তিলমাত্র স্থান নাই—লোক—কেবলি লোক—বাড়ীওয়ালারা বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জনে সুযোগ পাইয়াছে! ক্রমে ভিড় বেশী হইতে লাগিল! মুখখানাতে প্রফুল্লতা আনিবার জন্য আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলাম—যেন কেহ কাপুরুষ না মনে করে।

হায়রে বৃথা দর্প! জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে এখনো এত মায়া কিসের জন্য? লোকের স্তুতি-নিন্দার প্রতি এত শ্রদ্ধা, এত আগ্রহ!

আচার্য্যের হাত হইতে ক্রুশ লইয়া বুকে চাপিলাম, একান্ত আগ্রহে বলিলাম,—"দয়া কর প্রভু—দয়া কর—বল দাও ভগবান, হে আর্ত্তের বন্ধু—"! সমস্ত বাহ্যজগৎটা উড়াইয়া চিন্তার মধ্যে মগ্ন হইবার সঙ্কল্প করিলাম! কিন্তু লোকের কোলাহলে একাগ্রতা ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। কেমন একটা কম্পন আসিল সারা অঙ্গও বৃষ্টি-জলে ভিজিয়া উঠিয়াছিল।

আচার্য্য কহিলেন, "কাঁপছ তুমি? শীত লাগছে বুঝি?"

মুখে বলিলাম, "হাঁ!" কিন্তু ভগবান জানেন, এ কম্পন শীতের জন্য নহে!

কয়েকটি স্ত্রীলোকের করুণ সহানুভূতি কানে গেল—আমার এই তরুণ বয়স দেখিয়া তাহার করুণায় গলিয়া গিয়াছিল!

ক্রমে সেই স্থানে আসিয়া পৌঁছিলাম। আমার দৃষ্টি ও শ্রুতি-শক্তি ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিল। এই কোলাহল, এই অগণিত পরিচিত অপরিচিত নরশির—আমি উন্মাদের মত হইয়া পড়িলাম—এতগুলা লোক আমার পানে চাহিয়া আছে—ইহা ভাবিয়াই অস্থির হইয়া পড়িলাম!

ক্রমে সেই মিশ্র কোলাহলের একটি বর্ণও আয়ত্ত করা দুরূহ হইয়া পড়িল। সমস্ত মিলিয়া একটা ক্ষীণ প্রতিধ্বনির মত কাণে বাজিতেছিল!

দোকানের নাম ও রাস্তায় বিজ্ঞাপনগুলা আপন মনে পড়িয়া যাইতে লাগিলাম!

একধারে নদী চোখে পড়িল—উপরে ছায়ার মত উচ্চচূড়াও অল্প দেখা যাইতেছিল! ইহার মধ্যে কখন সেতু পার হইয়া এপারে আসিয়া পড়িয়াছি—জানিতেও পারি নাই!

হঠাৎ এক সময় গাড়ী থামিয়া পড়িল! আমি শিহরিয়া চাহিয়া দেখি, সম্মুখেই ফাঁসি-কাঠ!

আচার্য্য বলিলেন, "মনে বেশ সাহস আনো, এবার!"

তার পর আমার হাত ধরিয়া প্রহরীগুলা আমাকে উপরে তুলিল! মাতালের মত আমার পা টলিতেছিল, মাথা ঘুরিতেছিল।

আচার্য্যকে বলিলাম, "একটা কথা আছে।"

তিনি কহিলেন, কি?"

আমি কহিলাম, "একটু সময় দিন—ক্ষমা—ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করেছি—যদি দয়া হয়, যদি ক্ষমা মেলে—দোহাই আপনার দয়া করে একটু সময় দিন—একটু শুধু—আমি মরে গেলে যদি ক্ষমার খবর আসে, তখন আর কোন উপায় থাকবে না, তাই—"

আচার্য্য সরিয়া গেলেন! প্রহরী আসিয়া বলিল, "আসুন—সময় হয়েছে!"

আমি কহিলাম—"দাঁড়াও একটু দাঁড়াও, ভাই—ক্ষমার খবরটা আসতে দাও, এখনি এসে পৌঁছিবে—এমন ত কত হয়েছে! শুধু সময় দাও,—একটু সময়—তাতে কারো কোন ক্ষতি হবে না—!"

কেহ সে কথা কাণে তুলিল না।

ওঃ!—ঐ সব উৎসুক দর্শকের সারি! কি বিকট তাদের চীৎকার-ধ্বনি—মানবের কণ্ঠের ভাষা এমন পরুষ, এমন ভীষণ!

তবে কি কেহ আমাকে রক্ষা করিবে না-কেহ বাঁচাইবে না? ক্ষমা—ক্ষমা—কিছুতে না!

প্রহরী দুইটা যমদূতের মত হাত ধরিল—ফাঁসিকাঠের নিকট আনিয়া দাঁড় করাইল—আমার চারিধারে একটা পর্দ্দা খাটাইয়া দিল—

* * * * *

ঘড়িতে চারটা বাজিতেছে!

সমাপ্ত।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

হিউয়েনসাং প্রণীত সিউ-ইউ-কি।

(তৃতীয় খণ্ড)

১। উচাংনা (উদ্যান)

উচাংনা দেশ প্রায় পাঁচ হাজার লি বিস্তৃত। এ দেশীয় পর্ব্বত ও উপত্যকা সমূহ অবিচ্ছিন্ন। উপত্যকা ও জলাভূমির মধ্যে উচ্চ ভূমি। নানা প্রকার শস্য বপন করা হয় কিন্তু তত সুন্দর ফসল হয় না। যথেষ্ট আঙ্গুর পাওয়া যায় কিন্তু ইক্ষুদণ্ড অধিক পাওয়া যায় না। স্বর্ণ ও লৌহ পাওয়া যায় এবং এতদ্দেশীয় ভূমি হরিদ্রা উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। প্রচুর পরিমাণে পুষ্প ও ফল পাওয়া যায়। দেশের জল বায়ুও উত্তম। অধিবাসীগণ ভীরু কিন্তু ধূর্ত্ত ও চতুর। ইহারা যাদুবিদ্যা আচরণ করে। কেবলমাত্র কার্পাস নির্ম্মিত শুভ্র বস্ত্র এইদেশে ব্যবহৃত। এই বস্ত্র ব্যতীত অন্য কিছুই ইহারা পরিধান করে না। সামান্য প্রভেদ সত্ত্বেও এতদ্দেশীয় ভাষা ভারতবর্ষীয়-ভাষার ন্যায়। অক্ষর ও আচরণেও এই প্রথা প্রচলিত ইহারা বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী এবং মহাযান মতাবলম্বী।

সুভাবস্তু নদীর উভয় তীরে প্রায় চৌদ্দশত প্রাচীন সঙ্ঘারাম। বর্ত্তমানে উহারা জনশূন্য। পূর্ব্বে তথায় অষ্টাদশ সহস্র যতি বাস করিত কিন্তু ক্রমে ক্রমে কম

হইয়া এইরূপ অতি অল্প সংখ্যক যতিই বাস করে। ইহারা মহাযান মতাবলম্বী; নির্জ্জনে ধ্যান করে এবং শাস্ত্রপাঠও করে কিন্তু শাস্ত্রে বোধ কম। যতিগণ যাদুবিদ্যা আচরণ করিতে নিষেধ করে। সর্ব্বাস্তি-বাদিন, ধর্ম্মগুপ্ত, মাহিশশাক, কাশ্যপীয়, এবং মহা-সঙ্গিকা—এই পাঁচ প্রকার বিনয়-সম্প্রদায় প্রচলিত। দেবতাদিগের দশটী মন্দির আছে এবং অবিশ্বাসীগণ উহাতে বাস করে। চারিটী কি পাঁচটী সুরক্ষিত নগর আছে। রাজা মুঙ্গলি নগরে বাস করেন। এই নগরটী প্রায় ১৬।১৭ লি এবং লোকপূর্ণ। মুঙ্গলীর ৪।৫ লি পূর্ব্বে একটী বৃহৎ স্তূপে অনেক প্রকার নৈসর্গিক ঘটনা দৃষ্ট হয়। এই স্থানে বুদ্ধদেব বোধি-সত্ত্বরূপে বাস করিয়া কলিরাজার জন্য নিজ শরীর উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

মুঙ্গলি নগরের ২৫০ কি ২৬০ লি উত্তর পূর্ব্বে আমরা এক পর্ব্বতশ্রেণী উত্তীর্ণ হইয়া অপলাল নাগের উৎসে উপস্থিত হই। এই উৎস হইতে সুপোফাৎটু নদীর উৎপত্তি। এই নদী দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত। বর্ষা ও বসন্তকালে এই নদীর জল জমিয়া যায় এবং প্রাতঃ-কাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত বায়ু-তাড়িত তুষার রাশির সুন্দর শোভা দৃষ্ট হয়। এই নাগ, কশ্যপ বুদ্ধের সময়ে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং গাঙ্গি নামে অভিহিত হইতেন। যাদুবিদ্যা বলে এই ব্যক্তি দৈত্যগণকে দমন করিয়া দেশকে ঝটিকা হইতে রক্ষা করিতেন। তাঁহারই অনুগ্রহে দেশে প্রচুর শস্য জন্মিত। এই জন্য প্রত্যেক পরিবারই তাঁহাকে বাৎসরিক কিছু কিছু করিয়া শস্যদান করিতে মনস্থ করিল। কয়েক বৎসর পরে এক ব্যক্তি এই প্রতিশ্রুত শস্য দিতে বিস্মৃত হওয়ায় গাঙ্গি প্রার্থনা করিলেন যে তিনি যেন বিষাক্ত সর্পরূপ ধারণ করিয়া এতদ্দেশ বাসীর শস্য বৃষ্টি ও ঝটিকা দ্বারা নষ্ট করিতে পারেন। জীবনান্তে তিনি সর্পরূপ ধারণ করিলেন; এবং উৎস হইতে একপ্রকার শ্বেত বারি ছড়াইয়া এদেশের সকল শস্য নষ্ট করিতে লাগিলেন। এই সময়ে শাক্য তথাগত দেশবাসীর দুঃখে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া সর্পকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য এই স্থানে অবতীর্ণ হইলেন। বজ্রপাণির দণ্ডধারণ করিয়া তিনি পর্ব্বতে আঘাত করিতে লাগিলেন। সর্পরাজ ভীত হইয়া গুহা হইতে বহির্গত হইয়া তথাগতকে সম্মান প্রদর্শন করিলেন এবং বুদ্ধদেবের বাক্যে সর্পের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইল। বুদ্ধদেব সর্পকে কৃষকগণের শস্য বিনষ্ট করিতে নিষেধ করিলেন। ইহাতে সর্পরাজ উত্তর করিল আমার সকল আহারীয় সামগ্রী এই সকল কৃষকদিগের ভূমি হইতে সংগ্রহ হয় কিন্তু এইক্ষণ আপনার উপদেশে কৃতজ্ঞ হইয়া, আমি এরূপ সংগ্রহ বন্ধ করিব; কিন্তু আমি দ্বাদশ বৎসর অন্তর যাহাতে আহার সংগ্রহ করিতে পারি, তাহার আদেশ প্রদান করুন।" তথাগত করুণা পরবশ হইয়া এইরূপ অনুমতি দেওয়াতে দ্বাদশ বৎসর অন্তর এই দেশে শ্বেত নদীর জল বৃদ্ধি হইয়া অধিবাসীগণের দুর্দ্দশা হয়।

অপলাল নাগের উৎসের ৩০ লি দক্ষিণ পশ্চিমে বৃহৎ পর্ব্বতে বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন আছে। দর্শকের পুণ্য অনুযায়ী এই চিহ্ন হ্রাস বৃদ্ধি হয়। সর্পদমনের চিহ্ন বুদ্ধদেব এই স্থানে রাখিয়া গিয়াছেন। পরে জনসাধারণ এই স্থানে প্রস্তরের আবাসনির্ম্মাণ করিয়াছে। বহুদূর হইতে জন সাধারণ এই স্থানে আসিয়া গন্ধদ্রব্য ও পুষ্পদ্বারা এই পদচিহ্ন পূজা করে। ৩০ লি দূরে বুদ্ধদেব যে স্থানে তাঁহার বস্ত্র ধৌত করিয়াছিলেন আমরা তথায় উপস্থিত হই। কশায় বস্ত্রের সূত্রের চিহ্ন অদ্যাপি ও দৃষ্ট হয়।

মুঙ্গলি নগরের ৪০০ লি দক্ষিণে আমরা হিল পর্ব্বতে উপস্থিত হই। নদীতীরে নানাপ্রকার পুষ্প ও ফল পাওয়া যায়। উপত্যকায় অনেক গুহা ও নদী আছে। অপ্রশস্ত খট্টাঙ্গের ন্যায় অনেকগুলি প্রস্তর আছে; দেখিলে বোধ হয় যেন ইহারা মনুষ্যের সৃষ্ট। এই স্থানে তথাগত একটী গাথা অর্দ্ধেকাংশ শ্রবণ করিয়া আত্মহত্যা করিয়া ছিলেন।

মুঙ্গলি নগর হইতে দুই শত লি দক্ষিণে আমরা মহাবান সঙ্ঘরামে পৌঁছি। এই স্থানেই প্রাচীনকালে তথাগত 'সর্ব্বদাতা রাজা' নামে আখ্যাত হইয়া বোধি-সত্ত্বের ন্যায় জীবনাতিপাত করিয়াছিলেন। শত্রু কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া তিনি স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া

গোপনে এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। একটী দরিদ্র ব্রাহ্মণ এই স্থানে তাঁহার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করাতে এবং তাঁহার সঙ্গে কিছুই না থাকাতে তিনি তাঁহাকে বন্ধন করিয়া তাঁহার শত্রুর নিকট লইয়া পুরস্কার গ্রহণের জন্য ব্রাহ্মণকে আদেশ দেন। মহাবান সঙ্ঘারাম হইতে ৩০।৪০ লি উত্তর পশ্চিমে যাইয়া আমরা "মনুসঙ্ঘারামে" পেঁৗছি। এই স্থানে একশত ফুট বা ততোধিক উচ্চ একটী স্তূপ আছে। এই স্তূপের নিকটেই চতুষ্কোণ প্রস্তরে বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন আছে। প্রাচীনকালে বুদ্ধদেব এই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া কোটি কিরণরশ্মি দ্বারা মহাবান সঙ্ঘারাম আলোকিত করিয়াছিলেন এবং পরে দেবতা ও মনুষ্যের উপকারার্থে নিজের পূর্ব্বজীবন বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া ছিলেন। এই স্তূপের নিম্নদেশে শ্বেত ও পীত বর্ণের একখানি প্রস্তর আছে; এই প্রস্তর হইতে সদাসর্ব্বদা একপ্রকার ঘর্ম্ম নির্গত হয়। এই স্থানে প্রাচীনকালে বুদ্ধদেব যখন বোধিসত্ত্ব ছিলেন, তখন প্রকৃত ধর্ম্ম-বৃত্তান্ত অবগত হইয়া স্বকীয় শরীরস্থ অস্থির চর্ব্বি দ্বারা একখানি পুস্তকের সারাংশ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

মোসু সঙ্ঘারাম হইতে ৬০।৭০ লি পশ্চিমে অশোকরাজ নির্ম্মিত একটী স্তূপ আছে। তথাগত এই স্থানেই পুরাকালে বোধিসত্ত্বরূপে শিবিকারাজ নামে খ্যাত ছিলেন। একটী শ্যেনপক্ষী হইতে একটী পারাবতকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি এই স্থানেই নিজের শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়াছিলেন। এই স্থান হইতে ২০০ শত লি উত্তর-পশ্চিমে আমরা সান-নি লোসির উপত্যকায় পেঁৗছি। এই উপত্যকায় সাপোও-সাটির মঠ আছে। এইস্থানে আশি ফুট বা ততোধিক উচ্চ একটি স্তূপ আছে। প্রাচীনকালে যখন বুদ্ধদেব শক্র নামে খ্যাত ছিলেন, তখন এই দেশে সর্ব্বত্র দুর্ভিক্ষ ও ব্যাধি ছিল। ঔষধে কোন উপকারই হইত না এবং রাজপথ মৃত-পূর্ণ থাকিত। বুদ্ধদেব কি প্রকারে সকলকে রক্ষা করিতে পারিবেন এই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে অকস্মাৎ সর্পমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া উপত্যকায় নিজ মৃত শরীর বিস্তৃত করিয়া তিনি সকলকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তাঁহার আহ্বানে সকলে সানন্দ চিত্তে তথায় উপস্থিত হইয়া মৃতসর্পের শরীর কাটিতে আরম্ভ করিল। যতই তাহারা সর্পের দেহ কাটিতে লাগিল ততই তাহারা সুস্থ হইতে লাগিল এবং সেই সময় হইতে সেই দেশে দুর্ভিক্ষ ও ব্যাধির কোনরূপ প্রকোপ রহিল না।

এই স্তূপের নিকটেই বৃহৎ সুম স্তূপ। এই স্থানে তথাগত করুণ চিত্ত হইয়া সুম নামক সর্পে পরিণত হইয়াছিলেন। যাহারা তাঁহার মাংস গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারাই আরোগ্য লাভ করিয়াছিল। উপত্যকার পার্শ্বেই অন্য একটী স্তূপ। পীড়িত ব্যক্তি এই স্থানে উপস্থিত হইলে আরোগ্য লাভ করে। পুরাকালে তথাগত ময়ূরের রাজা ছিলেন। এক দিন তিনি সহচরবর্গ সহ এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া তাঁহার সহচরগণ জল অনুসন্ধান করিতে লাগিল কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইল না। ময়ূররাজ তাঁহার চঞ্চু দ্বারা পর্ব্বতে আঘাত করাতে জল নির্গত হইল; ঐ জলে হ্রদ নির্ম্মিত হইয়াছে। পীড়িত ব্যক্তি এই হ্রদের জল পান বা ইহাতে অবগাহন করিলে আরোগ্য লাভ করে। পর্ব্বত গাত্রে এখনও ময়ূরের পদচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

মুঙ্গলি নগরের ৬০।৭০ লি দক্ষিণ পশ্চিমে বৃহৎ নদীর পূর্ব্বদিকে ৬০ ফুট উচ্চ স্তূপ আছে। ইহা উত্তরসেনা নির্ম্মিত। পুরাকালে তথাগত ধর্ম্ম-মণ্ডলীকে বলিয়াছিলেন "আমার নির্ব্বাণের পরে উদ্যানরাজ উত্তরসেনরাজ আমার শরীরের চিহ্ন-বিশেষ পাইবেন"। যখন রাজগণ বুদ্ধদেবের শরীরের চিহ্ন সমভাগে বিভক্ত করিতে উদ্যত তখন উত্তরসেন রাজ তথায় উপস্থিত হন। বৈদেশিক রাজা বলিয়া অন্য কোন রাজা তাঁহাকে কোন প্রকার সম্মান করেন নাই। এই সময়ে দেবতাগণ বুদ্ধদেবের শেষ কথাগুলি পুনর্ব্বার প্রচার করেন। পরে চিহ্নের অংশ-বিশেষ প্রাপ্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি সম্মান প্রদর্শনার্থে এই স্তূপ নির্ম্মাণ করেন। এই স্তূপের নিকটেই গজাকার এক পর্ব্বত আছে। উত্তরসেনরাজ শ্বেত হস্তী পৃষ্ঠে বুদ্ধদেবের স্মৃতিচিহ্ন আনয়ন করিয়াছিলেন। এই স্থানে উপস্থিত হইলে

অকস্মাৎ হস্তীটী প্রাণ পরিত্যাগ করে এবং তৎক্ষণাৎ প্রস্তরে পরিণত হয়। ইহার সন্নিকটে স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছে।

মুঙ্গলি নগরের ৫০ লি পশ্চিমে আমরা ৫০ ফুট উচ্চ অশোক রাজ নির্ম্মিত রোহিতক স্তূপে উপস্থিত হই। তথাগত যখন বোধিসত্ত্ব ছিলেন তখন তিনি এই দেশের রাজা ছিলেন। এই স্থানে তিনি নিজ শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া পাঁচজন যক্ষকে নিজ রক্ত দ্বারা আহার করাইয়াছিলেন। মুঙ্গলি নগরের ৩০ লি উত্তর পূর্ব্বে ৪০ ফুট উচ্চ স্তূপ আছে। এই স্থানে, পুরাকালে তথাগত মনুষ্য ও দেবতাগণের জন্য ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তথাগতের প্রস্থানের পরে পৃথিবী গর্ভ হইতে সহসা এই স্তূপ উত্থিত হয়। জনসাধারণ এই স্তূপকে যথেষ্ট ভক্তি করে এবং অনবরত পুষ্প ও গন্ধদ্রব্য দ্বারা পূজা করে। প্রস্তর স্তূপের পশ্চিমে আমরা নদী পার হইয়া একটী বিহারে উপস্থিত হই। এই বিহারে অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি আছে। ইহার অনৈসর্গিক ক্ষমতা প্রহেলিকাপূর্ণ। সকলে এই স্থানে উপস্থিত হইয়া অনবরত ইহাকে পূজা করে।

বোধিসত্ত্বের প্রতিমূর্ত্তি হইতে ১৪০ কি ১৫০ শত লি উত্তর পশ্চিমে যাইয়া আমরা লানপোলু পর্ব্বতে পৌঁছি। এই পর্ব্বতের শিরোভাগে ৩০ লি আন্দাজ পরিধিবিশিষ্ট সর্প-হ্রদ আছে। ইহার জল দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ। পুরাকালে বিরুদ্ধকরাজ শাক্যগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলে শাক্যগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করে। একজন শাক্য রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া এবং ভ্রমণক্লান্ত হইয়া রাজপথের মধ্যস্থলে বিশ্রামার্থ উপবেশন করেন। এক বন্যহংস আকাশমার্গ হইতে তথায় উপস্থিত হইল এবং উক্ত শাক্য বংশীয় ব্যক্তি উহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। তাঁহাকে লইয়া হংস এই সরোবর সমীপে উপস্থিত হইল। এই প্রকারে পলায়িত শাক্য নানাদিকে নানাদেশ ভ্রমণে সক্ষম হইলেন। একদিন তিনি পথশ্রান্ত হইয়া সরোবর তীরে বৃক্ষতলে নিদ্রিত হইলেন। এই সময়ে এক যুবতী নাগকন্যা তথায় ভ্রমণ করিতে করিতে ঐ শাক্য যুবককে দেখিতে পাইল। অন্য উপায়ে, নিজ অভিলাষ চরিতার্থ করিবার সম্ভাবনা না দেখিয়া নাগ কন্যা মনুষ্য মূর্ত্তিতে শাক্য যুবকের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে আদর করিতে লাগিল। যুবক ইহাতে ভীত হইয়া নিদ্রাভঙ্গে যুবতীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, "আমি দরিদ্র ক্লান্ত পর্য্যটক; সুতরাং তুমি আমার প্রতি এত অনুগ্রহ কেন দেখাইতেছ?" অতঃপর যুবক যখন যুবতীকে বিবাহ করিতে চাহিলেন, তখন যুবতী উত্তর করিল যে "তাহার পিতামাতার আদেশ ব্যতীত ইহা সম্ভবপর নহে। যুবক যুবতীর গৃহের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। যুবতী উত্তর করিল যে, সে ঐ সরোবরের নাগরাজের কন্যা।" এবং সে শাক্যগণের পরাজয়ের কথা এবং ঐ যুবকের গৃহ তাড়িত হইয়া যত্রতত্র ভ্রমণের কথা শ্রবণ করিয়াছে। এইক্ষণ পিতামাতার অনুমতি ব্যতীত সে যুবকের প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারে না।

শাক্যযুবক তৎপর বলিলেন যে তাঁহার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যফলে এই নাগ স্ত্রী মনুষ্যরূপে পরিণত হউক। বলিবামাত্রই নাগ-যুবতী তদ্রূপ হইল। ইহাতে যুবতী পরম সন্তুষ্টা হইয়া শাক্যযুবককে কৃতজ্ঞচিত্তে নিবেদন করিল "আমার কুকর্ম্মফলে আমি নানারূপ জন্মপরিগ্রহ করিয়া এইক্ষণ আপনার পুণ্যবলে মনুষ্য দেহ পরিধারণ করিলাম। আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নাই এবং কোটী কোটী বার আপনার নিকট সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেও ইহার শোধ হইবে না। আমি আমার পিতামাতাকে এই বৃত্তান্ত অবগত করাইয়া পরে আপনার অনুবর্ত্তিনী হইব। নাগিনী পরে সরোবরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত তাহার পিতামাতার নিকট বর্ণনা করিয়া বিবাহে সম্মতি প্রার্থনা করিল। নাগরাজ ইহাতে পরম সন্তুষ্ট হইয়া বিবাহে সম্মত হইলেন। পরে সরোবর হইতে যুবকের নিকট গমন করিয়া শাক্য যুবককে নিবেদন করিলেন যে "আপনি অন্য জীবকেও ঘৃণা করেন না; অনুগ্রহ করিয়া আমার আবাসে উপস্থিত হইয়া আমার আতিথ্য গ্রহণ করুন।" যুবক এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া নাগরাজের ভবনে

উপনীত হইলেন। ইহাতে নাগরাজের সকল আত্মীয় অত্যন্ত আমোদ আহ্লাদ করিতে লাগিল কিন্তু যুবক উৎসবাদি কার্য্যে নিযুক্ত সর্পগণের আকৃতিতে ভীত হইয়া সে স্থান পরিত্যাগের অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। নাগরাজ তাঁহাকে বলিলেন যে অনুগ্রহ করিয়া তিনি যেন প্রস্থান না করেন। নিকটবর্ত্তী কোন বাসস্থানে তিনি থাকিলে, নাগরাজ শাক্য যুবককে শীঘ্রই ঐ দেশের রাজা করিয়া দিবেন। ঐ দেশের সকল ব্যক্তিকেই তিনি বশীভূত করিয়া দিবেন এবং শাক্যযুবকের বংশ অনেক দিন ধরিয়া ঐস্থানে রাজত্ব করিতে পারিবে।

যুবক এই প্রস্তাবে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলেন কিন্তু নাগরাজের কথায় সন্দেহ প্রকাশ করিলেন। নাগরাজ ইহাতে মূল্যবান এক তরবারী উষ্ট্রচর্ম্মনির্ম্মিত এক আধারে স্থাপন করিয়া যুবককে বলিলেন যে "ইহা লইয়া আপনি অনুগ্রহ করিয়া রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া এই শুভ্র উষ্ট্রচর্ম্মাধার রাজাকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করুন। রাজা ইহা যেমন গ্রহণ করিতে যাইবেন, তৎক্ষণাৎ আপনি এই তরবারীদ্বারা তাহাকে হত্যা করিবেন। এই প্রকারে আপনি ঐ রাজ্যাধিকারে সক্ষম হইবেন।" শাক্য যুবক নাগাদেশে উদ্যানদেশের রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া রাজাকে হত্যা করিলেন। উপস্থিত মন্ত্রী ও ভৃত্যবর্গ ইহাতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। শাক্য যুবক তাঁহার তরবারী উত্তোলন করিয়া বলিলেন যে "এই তরবারী আমাকে পুণ্যাত্মা নাগরাজ দিয়াছেন; ইহাদ্বারা আমি গর্ব্বিতকে শাসন করিব।" ঐশ্বরিক শক্তিবিশিষ্ট যোদ্ধার নিকট তাহারা পদানত হইল এবং তাঁহাকে রাজ্য প্রদান করিল। শাক্যযুবক দেশে শান্তিরক্ষা ও কুপ্রথা দমন করিলেন। পরে সৈন্যসামন্ত সমভিব্যহারে নাগরাজের প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন এবং তাঁহার কন্যাকে সঙ্গে লইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু এ যুবতী নাগিনীর পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পাপের ক্ষয় না হওয়াতে রাত্রিকালে তাহার মস্তক হইতে নয়টী মস্তকবিশিষ্ট সর্প বহির্গত হইত। শাক্যরাজ ইহাতে ভীত হইয়া একদিন রাত্রিকালে তাঁহার নিদ্রিতা রাজ্ঞীর মস্তক উত্থিত সর্পের মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিলেন। রাজ্ঞী জাগরিতা হইয়া সভয়ে বলিলেন যে "ইহাতে আমার জীবনে আমাকে বিশেষ কিছু কষ্ট দিবে না. কিন্তু আপনার উত্তরাধিকারীগণ চিরকাল মস্তকের বেদনায় কষ্ট পাইবে।" সেই সময় হইতে এতদ্দেশীয় রাজবংশীয়গণ এই ব্যাধিতে আক্রান্ত। শাক্য যুবকের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র উত্তর সেন সিংহাসনাধিরোহণ করেন।

উত্তর সেনের সিংহাসনারোহণের অব্যবহিত পরেই তাঁহার মাতার দৃষ্টিশক্তি লোপ পায়। তথাগত নাগ অপলালকে দমন করিয়া শূন্য হইতে এই স্থানে অবতীর্ণ হন। উত্তর সেন অনুপস্থিত ছিলেন তথাগত তাঁহার মাতাকে ধর্ম্মোপদেশ দেন। বুদ্ধদেবের শ্রীমুখ হইতে এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া রাজমাতা দৃষ্টিশক্তি লাভ করেন। তথাগত উত্তরসেনের মাতাকে পুত্র কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহার মাতা নিবেদন করেন যে রাজা মৃগয়ার্থ গমন করিয়াছেন। তথাগত ও তাঁহার সমভিব্যাহারী ব্যক্তিগণ প্রস্থানোদ্যত হইলে রাজমাতা নিবেদন করিলেন যে "বহুপুণ্য বলে তিনি পুণ্যবংশীয় রাজপুত্রকে গর্ভে ধারণ করিয়াছেন এবং সেইজন্যই তথাগত বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশে আমার গৃহে পদার্পণ করিয়াছেন। আমার পুত্র শীঘ্রই প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। সুতরাং অনুগ্রহ করিয়া কিছু কালের জন্য অপেক্ষা করুন।' পৃথিবীপতি উত্তর করিলেন যে "রাজমাতার পুত্র তাঁহারই বংশীয়। ধর্ম্মের কথা শ্রবণ মাত্রই তিনি বিশ্বাস করিবেন। যদি রাজা উত্তর সেন তাঁহার আত্মীয় না হইতেন, তবে তিনি এইস্থানে থাকিয়া তাঁহার সম্মুখে ধর্ম্মপ্রচার করিতেন। তিনি মৃগয়া হইতে প্রত্যাগমন করিলে তাঁহাকে বলিবেন যে তথাগত এই স্থান হইতে কুশীনগরে গমন করিয়াছেন; শালবৃক্ষতলে শীঘ্রই তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন; আপনার পুত্র যেন স্মরণ চিহ্নের জন্য তথায় গমন করেন।"

তথাগত এই কথা বলিয়া সপারিষদ আকাশমার্গ দ্বারা প্রস্থান করিলেন। পরে উত্তর সেন

মৃগয়াকালীন দেখিতে পাইলেন যে তাঁহার প্রাসাদ সহসা আলোকিত হইয়াছে। সন্দিগ্ধচিত্তে তিনি প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং মাতাকে দৃষ্টি-শালিনী দেখিয়া সানন্দচিত্তে কি প্রকারে তিনি দৃষ্টি-শক্তি লাভ করিলেন এই প্রশ্ন করিলেন। রাজমাতা বলিলেন যে রাজার প্রস্থানের পর তথাগত তথায় আগমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার উপাসনা শ্রবণান্তে তাঁহার দৃষ্টিশক্তিলাভ হইয়াছে। তথাগত কুশীনগরে গমন করিয়াছেন; তথায় তিনি দেহ ত্যাগ করিবেন এবং স্মরণচিহ্ন সংগ্রহের জন্য রাজাকে তথায় প্রয়াণ করিতে আদেশ দিয়াছেন। রাজা এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। পরে জ্ঞান লাভ হইলে তিনি সপারিষদ যথায় শালবৃক্ষ মধ্যে বুদ্ধদেব দেহত্যাগ করিয়াছিলেন তথায় উপনীত হইলেন। বৈদেশিক রাজা বলিয়া প্রথমতঃ অন্যান্য সকল রাজাই তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন কিন্তু দেবতাগণ বুদ্ধদেবের আদেশ জ্ঞাপন করিলে অন্যান্য রাজাগণ তাঁহাকেও স্মরণ-চিহ্নের ভাগ দান করিলেন।

মুঙ্গলিনগরের উত্তর পশ্চিমে আমরা পর্ব্বত উত্তীর্ণ হইয়া এবং উপত্যকা পার হইয়া পুনরায় সিন্ধুনদীর মুখের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। রাজপথ বন্ধুর এবং গড়ানে। উপত্যকাগুলি অন্ধকার। কোন কোন সময়ে রজ্জু সাহায্যে এবং কোন সময়ে লৌহ শৃঙ্খল দ্বারা আমাদের পার হইতে হইয়াছে। প্রায় এক সহস্র লি যাইয়া আমরা টালিলো দেশে পৌছি। পূর্ব্বে এইস্থানেই উচাংনা দেশের রাজধানী ছিল। এই দেশে যথেষ্ট সুবর্ণ ও হরিদ্রা পাওয়া যাইত। বৃহৎ সঙ্ঘারামের পার্শ্বে কাষ্ঠের মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের প্রতিমূর্ত্তি আছে। ইহা সুবর্ণরঞ্জিত, দেখিতে উজ্জ্বল এবং অলৌকিক ক্ষমতাশালী। উচ্চে ইহা এক শত ফুট এবং ইহা অর্হৎ মধ্যনতিক নির্ম্মিত। এই অর্হৎ তাঁহার আধ্যাত্মিক ক্ষমতা বলে একজন ভাস্করকে নিজচক্ষে মৈত্রেয়ের শরীরের চিহ্ন সকল দেখিবার জন্য তিনবার স্বর্গে প্রেরণ করেন। এই মূর্ত্তি গঠনের সময় হইতেই পূর্ব্বাঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। পূর্ব্বদিকে অনেক তুঙ্গ পর্ব্বত উত্তীর্ণ হইয়া এবং উপত্যকা পার হইয়া আমরা ৫০০ লি যাইয়া পোলুলো (বোলর) দেশে উপস্থিত হই।

বোলরপ্রদেশ

এই প্রদেশ ৪০০০ লি; ইহা তুষার পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্যে অবস্থিত। পূর্ব্ব পশ্চিমে এই দেশ খুব লম্বা কিন্তু উত্তর দক্ষিণে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। এই দেশে গম, কলাই, সুবর্ণ ও রৌপ্য জন্মে। প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ পাওয়া যায় বলিয়া, এতদ্দেশবাসীরা অর্থশালী। দেশটি শীতপ্রধান। অধিবাসীরা অসভ্য। তাহারা ন্যায়ের ধার ধারে না এবং আদৌ বিনয়ী নহে। উহারা পশমের বস্ত্র ব্যবহার করে এবং অশিষ্ট। প্রচলিত অক্ষরগুলি ভারতবর্ষের ন্যায় কিন্তু ভাষা স্বতন্ত্র। শতাধিক সঙ্ঘারামে সহস্র যতি আছেন কিন্তু উঁহারা জ্ঞানার্জ্জনে উৎসুক সাধু চরিত্র নহেন। এই দেশ পরিত্যাগ করিয়া আমরা সিন্ধু নদী পার হই। এই নদী ৩৪ লি বিস্তৃত এবং ইহার জল দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ। নদীতীরে বিষাক্ত সর্প এবং হিংস্র জন্তু বাস করে। যদি কেহ মূল্যবান পণ্য বা রত্ন অথবা পুষ্প ও ফল বিশেষতঃ বুদ্ধের স্মরণচিহ্ন লইয়া এই নদী পার হইতে চেষ্টা করে, তবে নদীর ঢেউ নৌকাকে গ্রাস করে। এই নদী পার হইয়া আমরা তক্ষশীলায় পৌছি।

তক্ষশীলা

তক্ষশীলা রাজ্য প্রায় ২০০০ লি এবং ইহার রাজ-ধানীর ১০ লি পরিধি। রাজবংশ নির্ব্বংশ হওয়াতে উচ্চশ্রেণাস্থ ব্যক্তিগণ ক্ষমতা পরিচালনের জন্য বিবাদ করে। এই দেশ প্রথমে কপিশা রাজ্যের অধীন ছিল কিন্তু বর্ত্তমানে ইহা কাশ্মীরের অধিকারভুক্ত। জমী বিশেষ উর্ব্বরা এবং প্রচুর পরিমাণে ফসল জন্মে। দেশে অনেক নদী ও উৎস আছে। নাতিশীতোষ্ণ এই দেশে যথেষ্ট পুষ্প ও ফল পাওয়া যায়। অধিবাসীরা সাহসী, প্রফুল্ল এবং ত্রিরত্নকে সম্মান করে। অনেকগুলি সঙ্ঘারাম আছে কিন্তু বর্ত্তমানে সেগুলি জনশূন্য। তথায়

কয়েকজন মাত্র যতি বাস করে। ইহারা মহাযান মতাবলম্বী। রাজধানীর ৭০ লি উত্তর পশ্চিমে নাগরাজ ইলাপত্রের সরোবর অবস্থিত। ইহার জল সুস্বাদু ও পবিত্র। নানারঙের পদ্ম পুষ্প এই সরোবরের শোভা বৃদ্ধি করে। এই নাগ পূর্ব্বে ব্রাহ্মণজাতীয় ছিল এবং কশ্যপ বুদ্ধের সময় ইলাপত্র বৃক্ষ নষ্ট করিত। এইজন্য এতদ্দেশীয় লোকের যখন বৃষ্টির আবশ্যক হয়, তখন ইহারা শ্রমণগণের সহিত সরোবর তীরে উপস্থিত হইয়া অঙ্গুলিদ্বারা শব্দ করে অথবা প্রার্থনা করিলেই অভীষ্টপূর্ণ হয়।

নাগ-সরোবরের ৭০ লি দক্ষিণ পূর্ব্বে দুইটী পর্ব্বতের মধ্যস্থ গিরিসঙ্কটে উপস্থিত হই। এইস্থানে অশোকরাজ নির্ম্মিত স্তূপ আছে। উচ্চে এই স্তূপ প্রায় একশত ফুট। এইস্থানে শাক্য তথাগত ভবিষ্যদ্বাণীতে প্রকাশ করেন যে যখন পৃথিবীপতি মৈত্রেয় এই জগতে আবির্ভূত হইবেন তখন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চারিটী রত্নও আপনা হইতে আবির্ভূত হইবে এবং ঐ চার রত্নের একটী এই দেশে থাকিবেন। লোক-পরম্পরায় অবগত হওয়া যায় যে, যখন চতুর্দ্দিকে ভূমিকম্প হয়, তখন এই স্থানের একশত পাদভূমি বেষ্টন করিয়া কোনপ্রকার আন্দোলন হয় না। যদি কোন ব্যক্তি এই স্থান খনন করে, তবে পুনর্ব্বার ভূমিকম্প হয়। স্তূপের নিকটে সঙ্ঘারামের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। অনেকদিন হইতে এই সঙ্ঘারাম জনশূন্য এবং এখানে কোন যতি বাস করেন না।

নগরের উত্তরে ১২।১৩লি দূরে অশোকরাজ নির্ম্মিত স্তূপ আছে। উৎসবদিবসে এই স্তূপ আলোকিত হয় এবং ঐশ্বরিক পুষ্প এই স্থানে পতিত হয় সঙ্গে সঙ্গে ঐশ্বরিক বাদ্যও শ্রুত হয়। জনশ্রুতি এইরূপ যে পুরাকালে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত কোন স্ত্রীলোক এইস্থানে বাস করিত। গোপনে স্তূপে আসিয়া সে নানাপ্রকারে পূজা করে এবং নিজ পাপ স্বীকার করে। পরে স্তূপের আঙ্গিনা গোময় এবং ধূলি পরিপূর্ণ দেখিয়া সে উহা পরিষ্কার করে এবং পুষ্প ও গন্ধদ্রব্য বিক্ষিপ্ত করে। পরে নীলপদ্ম সংগ্রহ করিয়া উহাও এইস্থানে প্রদান করে। ইহাতে কুষ্ঠব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ পূর্ব্বক সে দিব্য দেহ লাভ করে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার লাবণ্যময় অঙ্গ হইতে নীলপদ্মের গন্ধ বিকীর্ণ হইতে থাকে এবং এই স্থানও উক্ত গন্ধ লাভ করে। তথাগত এইস্থানে বোধিসত্ত্বরূপে বিনয় শিক্ষা করিয়াছিলেন। তখন তিনি এই দেশের রাজা ছিলেন এবং চন্দ্রপ্রভা নামে খ্যাত ছিলেন। বোধি লাভের জন্য তিনি নিজ মস্তক ছেদন করেন এবং ঐ উদ্দেশ্যে তিনি সহস্র জন্ম ঐরূপ করিয়াছিলেন।

এই স্তূপের পার্শ্বের সঙ্ঘারাম জনশূন্য, কেবলমাত্র কয়েকজন যতি তথায় বাস করেন। প্রাচীনকালে সূত্রপর সম্প্রদায়ান্তর্গত কুমারলব্ধ এই স্থানে কয়েকখানি শাস্ত্র রচনা করেন। নগরের দক্ষিণপূর্ব্বে পর্ব্বতপার্শ্বে ১০০ফুট উচ্চ স্তূপ আছে। এই স্থানে তাহারা কুনালের চক্ষু উৎপাটিত করিয়াছিল। এই স্তূপ অশোক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। অন্ধ ব্যক্তিরা এই স্তূপের সম্মুখে প্রার্থনা করিলে তাহারা দৃষ্টিশক্তি লাভ করে। কুনাল পাটরাণীর সন্তান ছিলেন। তিনি দেখিতে সুন্দর এবং দয়ার্দ্রচিত্ত ছিলেন। যখন পাটরাণীর মৃত্যু হয়, তাহার স্থলাভিষিক্তা ইন্দ্রিয়পরায়ণা রাণী রাজপুত্র কুনালের নিকট কুৎসিত প্রস্তাব করিলে, কুনাল তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া প্রত্যাখ্যান করেন। ইহাতে বিমাতা কুপিতা হইয়া রাজাকে বলে যে জ্যেষ্ঠ পুত্রকেই তক্ষশীলার শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করা উচিত। রাজপুত্র কুনাল দয়ার্দ্রচিত্ত এবং সুধীর। রাজা ইহাতে যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়া কুনালকে তক্ষশীলায় প্রেরণ করেন। এদিকে কুনালের বিমাতা প্রতিশোধ লইবার মানসে মোম দ্বারা পত্র লিখিয়া নিদ্রিত অশোকের দন্ত চিহ্ন পত্রে স্থাপন করিয়া দূত দ্বারা ঐ পত্র তক্ষশীলার মন্ত্রীগণের নিকট প্রেরণ করে। কুনালের মন্ত্রিগণ এই পত্র পাঠ করিয়া বিস্ময়াভিভূত হইয়া একে অপরের দিকে চাহিতে থাকে। রাজপুত্র মন্ত্রীগণকে তাহাদের বিস্ময়ের কারণ জিজ্ঞাসা করায় মন্ত্রীগণ উত্তর করেন যে মহারাজা উক্ত পত্রে রাজপুত্রকে অপরাধী

বিবেচনা করিয়া তাঁহার চক্ষু উৎপাটন পূর্ব্বক সস্ত্রীক পর্ব্বতে নির্ব্বাসনের আদেশ দিয়াছেন। কিন্তু আমরা রাজার এইরূপ আদেশ পালনে সাহসী নই; আমরা দ্বিতীয় আদেশ প্রাপ্তি পর্য্যন্ত আপনাকে বন্ধন করিয়া রাখিব।"

রাজপুত্র উত্তর কহিলেন যে "পিতা যখন এরূপ আদেশ করিয়াছেন তখন অবশ্যই তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিতে হইবে; তাঁহার দন্তের মোহর দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে এই আদেশ সত্য। ইহাতে কোন প্রকার ভ্রম নাই।" এই বলিয়া তিনি চণ্ডালকে তাঁহার চক্ষু উৎপাটিত করিতে আদেশ দিলেন। এই প্রকারে দৃষ্টিশক্তিহীন হইয়া তিনি ভিক্ষাদ্বারা উদর পূর্ণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে চলিতে চলিতে একদিন পিতার রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। পত্নীর নিকট ইহা শুনিয়া রাজপুত্র কুনাল বলিলেন যে, তিনি এককালে রাজপুত্র ছিলেন; এখন পথের ভিখারী। যদি তিনি সুবিধা পাইতেন তাহা হইলে তাঁহাদের দোষস্খালনের চেষ্টা করিতেন। এই মানসে তিনি রাজোদ্যানে প্রবেশ করিয়া রাত্রিতে বংশীবাদন ও সঙ্গে সঙ্গে করুণস্বরে গান করিতে লাগিলেন। রাজা উপরতলা হইতে এই করুণস্বর শুনিয়া ঐ গায়ককে তাঁহার সম্মুখে আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। অন্ধ ব্যক্তি তাঁহার সমীপে আনীত হইলে তিনি শোকাভিভূত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে কে কুনালের এই দশা করিল তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন।

কুনালও ক্রন্দন করিতে করিতে তাঁহার পিতাকে ধন্যবাদ দিয়া উত্তর করিলেন "বস্তুতঃ, পিতৃভক্তির অভাব হেতুই ভগবান তাঁহাকে এই শাস্তি প্রদান করিয়াছেন। অমুক বৎসরের অমুক মাসে এবং অমুক দিনে রাজাদেশ তাঁহার নিকট প্রেরিত হয়। এবং সেই আদেশ প্রতিপালনের জন্যই তিনি অন্ধ হইয়াছেন। রাজা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার দ্বিতীয় পত্নীই এইরূপ করিয়াছেন এবং সেই মুহূর্ত্তেই তাহার হত্যার আদেশ দিলেন।

বোধি বৃক্ষের নিকটস্থ সঙ্ঘারামে ঘোস নামে এক অর্হৎ বাস করিতেন। তিনি বিনা আয়াসেই ভবিষ্যৎগণনা করিতে পারিতেন। তিনি ত্রিবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। অশোক তাঁহার নিকট অন্ধকুনাল সহ উপস্থিত হইয়া কি প্রকারে তাঁহার পুনরায় দৃষ্টিশক্তি লাভ হইতে পারে, তজ্জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করেন। অর্হৎ রাজার অনুরোধ শ্রবণ করিয়া বলেন যে "যে আগামী কল্য আমি ধর্ম্মপ্রচার করিব, প্রত্যেকে একটি পাত্র হস্তে লইয়া আমার নিকট যেন উপস্থিত হয় এবং চক্ষুর জল সেই পাত্রে রক্ষা করে।" পর দিবস, দেশ দেশান্তর হইতে স্ত্রীপুরুষ সমবেত হইলে অর্হৎ দ্বাদশ নিদান সম্বন্ধে আলোচনা করিতে থাকেন এবং তাঁহার বাক্যে সকলেরই চক্ষু হইতে জল নির্গত হয়। স্ব স্ব পাত্রে এই চক্ষুজল সকলেই রক্ষা করিলেন এবং পরে অর্হৎ এই চক্ষুজল সুবর্ণপাত্রে লইয়া বলিলেন "বুদ্ধদেবের সম্বন্ধে আমি যাহা বলিয়াছি তাহা যদি সত্য না হয়, তবে যাহা আছে তাহাই থাকুক; আর যদি সত্য হয়, তবে এই অন্ধ ব্যক্তি যেন এই জলদ্বারা চক্ষুধৌত করিয়া নিজ দৃষ্টি শক্তি লাভ করে।" এই বলিয়া তিনি কুনালের চক্ষু ধৌত করিলে পর তাঁহার চক্ষু পূর্ব্ববৎ হইল। রাজা পরে তাঁহার মন্ত্রিদের নানাপ্রকার শাস্তি প্রদান করিলেন ও অন্যান্য সহকারীগণকে নির্ব্বাসিত করিলেন।

এই রাজ্য হইতে দক্ষিণ পূর্ব্বে ৭০০লি যাইয়া আমরা সিংহপুর রাজ্যে পৌঁছি। (ক্রমশঃ)

খেয়ালির গান।

(ওনুগ্নেসি হইতে)

স্বপ্ন-সুখে আমরা সুখী ছন্দে গাঁথি গান,
সিন্ধুকূলে আমরা শুনি ভাঙা ঢেউয়ের তান!

দুনিয়া ভুলে জ্যোৎস্না-জলে আমরা ফেলি প্রাণ,
ঘোরাই আবার দুনিয়াটারে নাচাই চিরকাল!

গল্প মোরা সত্য করি যখন করি মন,
অমর শ্লোকের ভিত্তি দিয়ে রাজধানী পত্তন!
খোস্-খেয়ালি মুকুট পরে রাজ্য করে জয়,
সুরের হাওয়া ফিরিয়ে কভু সৃষ্টি কভু লয়!

স্বর্গ নরক আমরা রচি, সন্দেহ নেই লেশ,
হাসির ঝোঁকে আমরা গড়ি হবু রাজার দেশ;
অশ্রু দিয়ে গড়েছিলাম সোনার অশোক বন;
গড়েছিলাম অন্ধরাজের হস্তিনা শোভন!

আমরা আবার গেয়েছিলাম পতন তা' সবার,
পুরাতনের অবসানে নূতন অবতার!
একটি ক'রে যুগ চলে যায়, একটি স্বপন শেষ,
নূতন যুগে আমরা রচি নূতন স্বপন-দেশ।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

বিবিধ।

পৃথিবীর আলোক।

জ্যোতির্বিবদগণ আকাশের আলোক লক্ষ্য করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, সমস্ত তারকাকে একত্র করিলে যতটা আলোক পাওয়া সম্ভব, আমাদের আকাশ তাহার অপেক্ষা অধিক আলোকে আলোকিত থাকে। কেবল তাহাই নহে; রাত্রের যামানুসারে এবং এক রাত্রি অপেক্ষা অপর রাত্রে এই আলোকের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া আসে এবং ঊর্দ্ধ অপেক্ষা দিঙ্‌মণ্ডলে এই আলোক অধিক প্রবল বলিয়া বোধ হয়। অনেকে বলেন নক্ষত্রালোক ভিন্ন পৃথিবীর নিজের একটা আলোক আছে। সে আলোকের উৎপত্তি যে কোথায় তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না।

মিশরের প্রাচীনতম শবদেহ। (Mummy)

প্রাচীনকালে মিশরদেশে মৃতদেহকে এরূপ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা রক্ষা করিত যে তাহা সহস্র বৎসরেও ধ্বংস হইত না। এই সকল রক্ষিত শরীরের নামই মামী; (Mummy) ইহারা মৃত দেহের সর্ব্বাঙ্গে একপ্রকার প্রলেপ লাগাইত। তাহার দ্বারাই শবেরা ঠিক স্বাভাবিক আকৃতিতে অমর হইয়া থাকিত। অধুনাকাল মিশরে এরূপ অনেক 'মামী' আবিষ্কৃত হইতেছে। ১৮৯১ সালে অধ্যাপক পেট্রি (Petrie) মিডাম পিরামিডে যে মামীটির আবিষ্কার করেন, এক্ষণে মিশরের সেইটিই প্রাচীনতম যুগের বিজ্ঞানকৌশলে রক্ষিত মামী' বলিয়া প্রমাণ হইয়াছে। জীবিতাবস্থায় এই ব্যক্তির নাম রাণেফার (Ranefer) ছিল। যীশুখৃষ্টের জন্মের প্রায় তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রাজা সেনফ্রু (Senfru) রাজত্বকালে ইহা রক্ষিত। আবিষ্ক্রিয়ার পর 'মামী'টিকে লইয়া ইংলণ্ডের রয়েল কলেজে রাখিয়া দেওয়া হয়। তাহার পর ইহার কথা আর বড় কাহারও মনে ছিল না। তাহার কারণ লোকের একটা বিশ্বাস ছিল যে এরূপ অনেক প্রাচীন 'মামী' এমন কি ইহা অপেক্ষাও প্রাচীনতর 'মামী' আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি এই সম্বন্ধে আলোচনা ও অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে মিশর বা ইংলণ্ডের কোথাও খৃষ্টাব্দপূর্ব্ব ১৫৮০ বৎসরের অধিক পুরাতন 'মামী' রক্ষিত নাই। দশম ও দ্বাদশ রাজবংশের কালে অর্থাৎ ২০০০ হইতে ২৩০৯ খৃষ্টাব্দপূর্ব্ব বৎসরের মধ্যে যে সকল 'মামী' প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার কতকগুলি ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু সেগুলি এতই ক্ষণভঙ্গুর যে তাহা

স্থানান্তরিত করা সম্ভব হয় নাই। মিডাম পিরামিডে (Medum pyramid)"যে মামীটি পাওয়া গিয়াছে ডাক্তার বেস্‌নার (Beisner) বলেন যে সেটি খৃষ্টপূর্ব ২৮৭০ সালের। সুতরাং অদ্যাবধি আবিষ্কৃত 'মামী অপেক্ষা ১১০০ বৎসর পূর্ব্বেকার।

প্রজ্বলন্ত সূর্য্য।

আদিম অবস্থার মনুষ্য ও সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে জগতের আলোক উত্তাপের উৎস যে সূর্য্য তাহা কেবল একটা জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড মাত্র। কিন্তু যে সকল বৈজ্ঞানিক এ সম্বন্ধে আলোচনা ও অনুসন্ধান করিয়াছেন তাঁহাদের অনেকেরই বিশ্বাস স্বতন্ত্র। তাঁহারা বলেন যে এই উজ্জ্বল নক্ষত্রটি জ্বলন্ত হওয়া অসম্ভব, কারণ তাহা হইলে বহুযুগ পূর্ব্বেই ইহার দাহের অবসান হইত। অর্থাৎ তাঁহাদের মতে ইহার উজ্জ্বলতা দাহ্যমান বাতি বা গ্যাসের আলোকের ন্যায় কারণ হইতে উৎপন্ন নহে। বৈদ্যুতিক ল্যাম্পে যেরূপ অম্লজানের অভাবে বিনা রাসায়নিক ক্রিয়াতেই আলোক দান করে ইহাও সেইরূপ। সূর্য্য গ্রহে যথেষ্ট অম্লজান বর্ত্তমান আছে সত্য, কিন্তু ইহার উত্তাপ এতই অধিক যে কোনপ্রকার রাসায়নিক ক্রিয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু তাহা হইলেও আলোক দান করিতে হইলে বস্তু মাত্রেরই শক্তি ক্ষয় হইয়া থাকে এবং এক প্রকারে না এক প্রকারে এই শক্তির পূরণ হওয়া আবশ্যক। দাহ্যমান শিখা রাসায়নিক প্রক্রিয়া হইতে এই শক্তি লাভ করিয়া থাকে। বৈদ্যুতিক ল্যাম্পে তাড়িৎপ্রবাহই এই শক্তিকে পূরণ করে। কিন্তু সূর্য্যের মধ্যে এ শক্তি কোথা হইতে আসে? বহু বৎসর ধরিয়া এ প্রশ্নের কোন মীমাংসাই হয় নাই, কিন্তু এক্ষণে বৈজ্ঞানিগণের সাধারণ মত এই যে, সূর্য্যের অংশগুলি অবিরাম তাহার অন্তরমধ্যে পতিত হইতেছে বা সঙ্কুচিত হইতেছে তাহারই ফলে সেই বিরাট গ্রহের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এই প্রচণ্ড উত্তাপে পরিণত হইতেছে। অনেকে অবশ্য এ মতের বিরোধী আছেন। মিষ্টার এইচ্‌. এস্‌. শেলটন (H. S. Shelton) Knowledge and scientific News নামক পত্রে সূর্য্যগঠনের এক নূতন মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"সূর্য্যগ্রহের গঠন প্রণালী অপেক্ষা অধিক মনোহর বা অজ্ঞেয় বিষয় জ্যোতিঃশাস্ত্রে নাই। সূর্য্যের উজ্জ্বল পিণ্ডের চতুর্দ্দিকে এরূপ একটা তীব্র আলোকের আবরণ আছে যে পার্থিব কোন বস্তুর তুলনায় তাহা কল্পনা করা অসম্ভব। এই আলোক আবরণটি অতি সূক্ষ্ম, সূর্য্যের বাষ্পের তুলনায় ক্ষুদ্র পরমাণুর অপেক্ষাও ক্ষুদ্র। এত সূক্ষ্ম যে সময়ে সময়ে যে সৌরবাত্যা বহিতে থাকে তাহার আঘাতে ইহা অবিরামই ছিন্ন হইতে থাকে। এই সকল ছিন্ন স্থলকেই আমরা সূর্য্যের কলঙ্ক চিহ্ন বলিয়া থাকি।"

"অনেকের মতে এই আলোকপ্রদ আবরণটি কঠিন বা তরল অঙ্গার (carbon) ও সিলিকনে (Silicon) গঠিত এবং ইহা সূর্য্যের তরল বা বাষ্পীয় দেহের উপরে স্থিত। এই একমাত্র প্রচলিত মীমাংসাই বেশ প্রসার লাভ করিয়াছে, কিন্তু এ মতের সমর্থন করার পক্ষে অনেকগুলি কঠিন বাধা আসিয়া উপস্থিত। এই অঙ্গার ও সিলিকন যে কি কারণে সর্ব্বদা সূর্য্যের উপরিভাগেই থাকিবে তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। তদ্ভিন্ন আমরা সূর্য্যের উত্তাপের পরিমাণ ঠিক না জানিলেও, নিতান্ত অল্প করিয়া ধরিলেও তাহা এত অধিক যে তাহাতে কেবল অঙ্গার বা সিলিকন কেন, পার্থিব যাবতীয় বস্তুই দগ্ধ হইয়া বাষ্পে পরিণত হইবে সন্দেহ নাই।"

"অধিকন্তু সূর্য্যের উপরিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা করিলেও উক্ত মতের সমর্থন করা কোনমতেই সম্ভবে না। এই আবরণটি যে এক স্বভাবাপন্ন একটা উজ্জ্বল বস্তু তাহা নহে, পরীক্ষা দ্বারা ইহার গঠনপ্রণালী বেশ স্পষ্টরূপে দানাদার বলিয়াই বুঝা

যায়। ধারের দিকে এই আবরণটি উজ্জ্বল রেখায় পরিণত হইয়াছে। এই রেখাগুলিকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় facula বলে।"

"অনেকগুলি বিশেষত্বের বিষয়ে আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, এই আবরণটি রাসায়নিক ক্রিয়ার ফল। সূর্য্যের কোন কলঙ্কচিহ্ন যখন অপসৃত হইতে থাকে তখনই ইহা আরও স্পষ্টরূপে বুঝা যায়। আবরণের ছেদস্থলের পূরণটি যে ধীরে ধীরে হয় তাহা নহে। সেগুলি সহসা এরূপভাবে পূর্ণ হইয়া যায় যাহা দ্বারা অনুমান হয় যেন একটা বিরাট শিখাস্তম্ভ বেগে সেই অন্ধকার গহ্বরের উপর দিয়া ছুটিয়া গেল। ইহার অপেক্ষা এ সম্বন্ধে আর অধিক স্বাভাবিক বর্ণনা হইতে পারে না। বৈজ্ঞানিক মতের দ্বারা না পাইলে আমাদের পরীক্ষা ও কল্পনা আপনিই বলিতে থাকে যে সূর্য্যগ্রহ একটি বিরাট অনল শিখার আবরণে পরিবেষ্টিত। কিন্তু বৈজ্ঞানিক মতহিসাবে এ কথা বলা চলে না, কারণ অনলশিখা বলিতেই দাহক্রিয়া বুঝায়, দাহক্রিয়া বলিলেই রাসায়নিক ক্রিয়া বুঝায় এবং তথাকার রাসায়নিক ক্রিয়া যে ঠিক কি হইতে পারে তাহা আমরা কল্পনা করিতেও অক্ষম। লর্ড কেল্‌ভিন ত স্পষ্টই বুঝাইয়াছেন যে সমস্ত সূর্য্যটা জ্বলন্ত কয়লা হইলেও, কয়েক সহস্র বৎসর মধ্যেই তাহা দগ্ধ হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হইত।

"সম্প্রতি জ্যোতিষ ও রসায়ন সম্বন্ধে যে সকল নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে সূর্য্য সম্বন্ধে এই আদিম স্বাভাবিক ধারণা আধুনিক বৈজ্ঞানিক ধারণা অপেক্ষা অধিক সত্যানুবর্ত্তী হওয়া আশ্চর্য্য নহে। এক্ষণে ইহা সম্ভব বলিয়া মনে করা যাইতে পারে যে সূর্য্যের এই প্রচণ্ড উত্তাপের অধিকাংশভাগই কোনপ্রকার স্বাভাবিক আভ্যন্তরীণ পরিবর্ত্তন উদ্ভূত। সাধারণ রাসায়নিক বা আণবিক ক্রিয়া হইতে স্বতন্ত্র করিবার জন্য আমরা ইহাকে রাসায়নিক-অতীত (Meta chemical) ক্রিয়া বলিব।"

তাঁহার এই মতের সমর্থনের জন্য শেলটন সাহেব যে প্রমাণগুলির উল্লেখ করিয়াছেন, আমরা নিম্নে সেগুলিকে সংক্ষিপ্ত করিয়া দিলাম।

(১) এরূপ একটা কোন 'মেটাকেমিকেল' শক্তি না থাকিলে অবিরাম সূর্য্যের উত্তাপদানের শক্তি কোথা হইতে আসা সম্ভব তাহা আমরা বুঝিতেই পারি না। পৃথিবী কত শত কোটী বৎসর হইতে বিদ্যমান রহিয়াছে কিন্তু সূর্য্যের মাধ্যাকর্ষণজনিত উত্তাপের কথা বিশ্বাস করিলে পৃথিবী ৫ কোটী বৎসরের অধিক থাকা সম্ভব হয় না।

(২) সার নরম্যান লকিয়ার ও অন্যান্য জ্যোতির্ব্বিদগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে শূন্যস্থিত রাসায়নিক মূল উপাদানগুলি (elements) অবিরামই পরিবর্ত্তিত হইতেছে ধরিয়া লইলে শূন্যস্থিত অনেক ব্যাপারের সহজেই মীমাংসা হওয়া সম্ভব।

(৩) আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দ্বারা বুঝা যায় যে, আমাদের চক্ষের সম্মুখেই একটি রাসায়নিক মূল উপাদান অপর উপাদানে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এইরূপ পরিবর্ত্তনের ফলে এক অতুলনীয় শক্তি সঞ্চারিত হয়।

এই সকল যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া শেলটন্ সাহেব বলেন—"এই সকল কারণে আমরা মনে করিতে পারি যে রাসায়নিক প্রত্যেক মূল উপাদানের (element) পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব, এবং এইরূপ রাসায়নাতীত পরিবর্ত্তনের ক্রিয়া হইতে অনন্ত শক্তি উদ্ভূত।"

"সৌর উত্তাপের এইটিই প্রধান কারণ ধরিয়া লইলে আমরা সূর্য্যের অবস্থা সম্বন্ধে অনেকটা যুক্তিসঙ্গত অনুমান করিয়া লইতে পারি। সূর্য্যের মধ্যে যে একটা ভীষণ উত্তাপতপ্ত বিরাট জড়পিণ্ড রহিয়াছে তাহা আমরা অনায়াসেই বুঝিতে পারি। এই জড়পিণ্ডের অধিকাংশ ভাগেই উত্তাপের একটা সমতা আছে, সুতরাং সে স্থলে কোন প্রকার 'মেটাকেমিকেল' পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু যে সকল স্থান শীতল হইতেছে তথায় উত্তাপ নির্গত হওয়ার জন্য সাম্যাবস্থার ব্যতিক্রম ঘটিতেছে। এই সকল স্থানেই মেটা কেমিকেল পরিবর্ত্তন হওয়া

স্বাভাবিক। ইহার ফলে শক্তি উদ্ভূত হয় এবং আমাদের মনে হয় যে, এই আণবিক পরিবর্ত্তনের ক্ষেত্র হইতেই উত্তাপ বহির্গত হইতে থাকে।

মস্তিষ্ক সম্বন্ধে নূতন মত।

ডাক্তার জোসেফ্ সিমস্ (Dr. Joseph Simms) মস্তিষ্ক সম্বন্ধে এক নূতন মত প্রচার করিতেছেন। এই বিষয়টি আলোচনা কালে তিনি পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের মনুষ্য হইতে পশু পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র জীবের মস্তিষ্ক ওজন করিয়া দেখিয়াছেন। এক কথায় বলিতে হইলে তাঁহার মতে সাধারণতঃ যে সকল ক্রিয়ার জন্য মস্তিষ্ককে গৌরবদান করা হয়, সেগুলি তাহার গুণ নহে, সেগুলি আমাদের হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া মাত্র। তাঁহার মতে মস্তিষ্কের চিন্তা করিবার কোনও শক্তি নাই। তিনি প্রমাণ করিতে চাহেন যে আরিষ্টটল্ হইতে ডারুইন পর্য্যন্ত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনস্বীগণ তাঁহারই মতের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।

তিনি বলেন—"বিজ্ঞান বলে যে, ১৪ হইতে ২০ বৎসর বয়সের মধ্যেই মনুষ্যের মস্তিষ্ক সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হয়। বিংশতি বৎসর বয়সেই মস্তিষ্কের চরম বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মনুষ্যের জন্মকালে তাহার মস্তিষ্ক তাহার দেহের তুলনায় যেরূপ অধিক ভারী থাকে এরূপ জীবনের আর অন্য কোন কালেই দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশ বৎসর বয়স হইতেই আমাদের মস্তিষ্কের দিন দিন হ্রাস ও ক্ষয় হইয়া থাকে, মৃত্যুর পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত প্রতি দশবৎসরে প্রায় এক আউন্স কমিয়া যায়। এ কথা অনেক দিন পূর্ব্বেই প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকগণ প্রমাণ করিয়াছেন। কিন্তু ২০ হইতে ৬০ বৎসরের মধ্যে মস্তিষ্কের এইরূপ অবিরাম ক্ষয় হওয়া সত্ত্বেও আমাদের বুদ্ধির বল ও শক্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

আমরা ইহাও দেখিতে পাই যে, দেশের জল বায়ুর উপর মস্তিষ্কের আকারের পার্থক্য নির্ভর করে। "শীতপ্রধান দেশের লোকদিগের মস্তিষ্ক বড় এবং গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোকের মস্তিষ্ক অপেক্ষাকৃত ছোট;—ইহা আমি বহু পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করিয়াছি এবং জাতীয় অভিমান ব্যথিত হইলেও ব্যাপারটা সত্য সন্দেহ নাই।

"মেরুপ্রদেশ হইতে বিষুবরেখাবর্ত্তী দেশ পর্য্যন্ত পৃথিবীর সকল স্থানের জীবেরই মস্তিষ্ক আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। স্কটল্যাণ্ডের তিমি মৎস্যের মস্তিষ্ক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি—তাহা আকারে সাধারণ মনুষ্যের মস্তিষ্ক অপেক্ষা চতুর্গুণ অধিক। অনেকগুলি হস্তীকে পরীক্ষা করিয়াও দেখিয়াছি তাহাদের মস্তিষ্ক আমাদের অপেক্ষা চতুর্গুণ অধিক বৃহৎ। সাধারণ ভাবে দেখিলে বোষ্টনের মনুষ্যের অপেক্ষা ইংলণ্ডের লোকের মস্তিষ্ক ওজনে আধ আউন্স কম, তাহার কারণ বোষ্টন ইংলণ্ড অপেক্ষা শীতপ্রধান। আমেরিকার দক্ষিণ অংশের লোকের অপেক্ষা নরওয়ে বা স্কটলণ্ডের লোকের মস্তিষ্ক অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা যে অধিক বুদ্ধিসম্পন্ন তাহা নহে।

"আমার মতে মস্তিষ্ককেই বুদ্ধির স্থান বলা ভ্রম। আমি পরীক্ষার দ্বারা যাহা পাইয়াছি তাহা দ্বারা বুঝা যায় যে, আমাদের মন আমাদের দেহময় ব্যাপ্ত রহিয়াছে। ইউরোপের অনেক খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতও আমার এ মতের সমর্থন করিয়াছেন। আমার বিশ্বাস যে আমাদের চিন্তাক্রিয়া আত্মার দ্বারাই সম্পন্ন হয়। আত্মার বাসস্থানের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই, সর্ব্বদেহেই তাহা ব্যাপ্ত এবং সর্ব্ব যন্ত্রের দ্বারাই তাহা রক্ষিত। শরীরের কোন একটি অংশ অসুস্থ হইলে যে আমাদের মনও কতকটা অসুস্থ হইয়া পড়ে, তাহা আমরা নিত্যই দেখিতে পাই।

"মনুষ্যদেহে মস্তিষ্কের একটা উপকারিতা আছে সন্দেহ নাই। অনেকে বলেন দেহের উত্তাপ পূরণ করাই ইহার কর্ম্ম। রক্তের উত্তাপ অপেক্ষা মস্তিষ্কের উত্তাপ অধিক সন্দেহ নাই এবং দেশের উত্তাপের ফলে মস্তিষ্কের আকারের পরিবর্ত্তন হয় ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়। নির্ব্বোধের মস্তিষ্ক বুদ্ধিমানের অপেক্ষা বৃহৎ হয়, কি তাহাদের হৃৎপিণ্ড নিতান্ত ক্ষুদ্র হইতে দেখা যায়। মধুমক্ষিকা, পিপীলিকা, বোতাল্

ও মাকোড়শার কর্ম্ম কৌশলের কথা চিরদিনই শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাদের যে মস্তিষ্ক বলিয়া কিছুই নাই তাহা আমরা সকলেই জানি।

"গ্ল্যাস্‌গো বিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন্ ক্লেলাণ্ড (John Clıland) প্রকাশ্যভাবে বলিয়াছেন যে মস্তিকের সহিত আমাদের স্মৃতি, বিবেচনা বা অন্যান্য মানসিক ক্রিয়ার যে সম্বন্ধ নাই তাহা তিনি প্রমাণ করিতে প্রস্তুত।

মস্তিষ্ক আমাদের মন বা বুদ্ধির আসন এটা নিতান্তই অনুমান। ইহার কোন প্রমাণই দেখিতে পাওয়া যায় না। আধুনিক অনেক বিজ্ঞানবিদ্ বরং আমার মতেরই পক্ষপাতী। মস্তিষ্ক বাহির করিয়া লইলেও যখন আমাদের বুদ্ধির কোন বিপর্য্যয় ঘটে না, তখন মস্তিষ্ককে বুদ্ধিস্থান বলা অযৌক্তিক।"

বণ্টন।

সকলেই অবগত আছেন যে অর্থোৎপাদনে তিনটি শক্তি আবশ্যক—ভূমি, পরিশ্রম ও মূলধন। এই তিন শক্তির অধিকারীগণের মধ্যেই উৎপাদিত অর্থের বণ্টন হয়। ভূমির অধিকারী ভূম্যধিকারী,—পরিশ্রমের অধিকারী শ্রমিক এবং মূলধনের অধিকারী কর্ম্মকর্ত্তা—এই তিনজনে উৎপাদিত অর্থের যে যে অংশ পায় বা ভোগ করে, তাহাকে ক্রমান্বয়ে খাজনা, বেতন এবং লাভ বলে। সাধারণতঃ উৎপাদিত অর্থ এইভাবে তিন প্রকার ব্যক্তির মধ্যে বণ্টন হয়।

অবশ্য সকল স্থলেই যে অর্থ এইভাবে ও এই তিনজনের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া বণ্টন হয় তাহা নহে। কৃষকের নিজেরই যদি জমী থাকে, মূলধন যদি ধার না করিতে হয় এবং নিজে ও তাহার সন্তানগণ দ্বারাই যদি জমীর চাষ ও বুননাদি চলে, তাহা হইলে তাহার আর জমিদারকে খাজনা দিতে হয় না; শ্রমিক রাখিয়াও মাহিয়ানা দিতে হয় না এবং মূলধনের জন্য মহাজনকেও সুদ দিতে হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে, খাজনা, বেতন ও ও সুদ (লাভের অংশবিশেষকেই সুদ বলে) কৃষক নিজেই পায়। কৃষকের নিজের যদি জমী না থাকে কিন্তু শ্রমিকের এবং মূলধনের অভাব না হয়, তবে খাজনাটা কেবল জমীর মালিককে দিলে তাহার আর অন্য কোন দেনা থাকে না। বেতনের বাবত তাহার যাহা খরচ হয় ও সুদের বাবত মহাজনকে যাহা দিতে হয় তাহা তাহার নিজেরই প্রাপ্য হয়। আবার অনেক সময় তাহার নিজের জমী হইতে পারে, মূলধনও তাহার নিজের কিন্তু লোকজন নাই, মাহিনা দিয়া শ্রমিক রাখিতে হয়। সে ক্ষেত্রে বেতনের অংশ মাহিনা করা লোককে দিতে হয়, অন্য দুটি অংশ কৃষকই পায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে অবস্থা বিশেষে উৎপাদিত অর্থের তিন অংশই একব্যক্তি পাইতে পারে—পক্ষান্তরে একব্যক্তি এক বা ততোধিক অংশ এবং কোন কোন সময় ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি, ভিন্ন ভিন্ন অংশের অধিকারী হয়। অদ্য আমরা খাজনার বিষয় আলোচনা করিব।

ভূম্যধিকারীগণ তাহাদের জমী ভোগ দখলের জন্য অপরের নিকট যে পাওনা দাবী

করেন ও পান, তাহাই খাজনা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ অপরে তাঁহাদের ভূমি ভোগ দখল করার জন্য তাঁহারা যে মূল্য গ্রহণ করেন, তাহাই খাজনা। কোন কোন দেশে এই খাজনার হার দেশাচারের উপর, কোথাও প্রতিযোগিতার উপর নির্ভর করে। ইতিহাস পাঠে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে মনুষ্যের আদিম অবস্থায় কেহ প্রতিযোগিতার ধার ধারিত না। "জোর যার মুল্লুক তার" এই নীতিই সকলে অবলম্বন করিত। পরে দেশাচারই ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বলকে বলবানের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে আরম্ভ করিল। (১) মনুষ্যের আদিম অবস্থায় যদিও বলবান দরিদ্রকে পীড়ন করিয়া সময় সময় নিজ অধিকার বৃদ্ধি করিত, তত্রাপি মোটের পর দেশাচার সকলকেই অল্পবিস্তর মানিয়া চলিতে হইত। অর্থনীতিবিৎ মিল এই সম্বন্ধে প্রকৃত কথাই লিখিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে অতি অল্প দিন হইতেই মানুষ প্রতিযোগিতা মানিয়া আসিয়াছে। আমরা যতই প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করি, ততই আমরা দেখিতে পাই যে পূর্ব্বে দেশাচার অনুসারেই সকল চুক্তি সম্পাদিত হইত। ইহার কারণ সহজেই অনুধাবন করা যাইতে পারে। বলবানের হস্ত হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করিবার একমাত্র অস্ত্র—দেশাচার। (২) দুর্ব্বল যে সকল অধিকার বা সত্ব লাভ করে তাহা দেশাচারের জন্যই—বলবানের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া নয়। ভূম্যধিকারী এবং কৃষকের মধ্যে যে সম্পর্ক এবং প্রথমোক্ত পক্ষ শেষোক্ত পক্ষের নিকট যে পাওনা আদায় করে তাহা প্রায়ই ব্যবহার বা দেশাচারের নিয়মাধীন। মিল বলেন যে আদিম কাল হইতে অনেকদিন পর্য্যন্ত এই নিয়মেই ভূম্যধিকারী ও প্রজার দেনা পাওনার সম্পর্ক নির্দ্ধারিত হইত।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ মিল ভারতবর্ষের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে ভারতবর্ষীয় প্রজাগণের খাজনার হার দেশাচারের উপরই চিরকাল নির্ভর করিয়া আসিয়াছে।

অনেক স্থলেই কৃষক বা প্রজাদের দলিলাদি নাই কিন্তু যতদিন তাহারা নির্দ্ধারিত খাজনা দিতে থাকে, ততদিন নিরাপদে জমী দখল করে। প্রকৃত খাজনা কত তাহা জানিবার কোন উপায় নাই—অনেক স্থলেই ইহা তমসাচ্ছন্ন। বলপূর্ব্বক দখল, স্বেচ্ছাচার, বৈদেশিকগণের কবলে পতিত হওয়া প্রভৃত কারণে ইহার উদ্ধারেরও কোন উপায় নাই। কিন্তু যখন কোন হিন্দুরাজ্য ইংরাজগবর্ণমেণ্টের দখলে আইসে, তখনই দেখা যায় যে যদিও হিন্দুরাজা যতদূর ইচ্ছা পাওনা বৃদ্ধি করিয়াছেন, তত্রাপি প্রত্যেক পাওনা ভিন্ন

---

(1) "Custom is a barrier which, even in the most depressed condition of mankind, tyranny is forced in some degree to admit" Mill—Political Economy.

(2) To the industrious population, in a turbulent military community, freedom of competition is a vain phrase ; they are never in a condition to make terms for themselves by it ; their is always a master who throws his sword into the scale and the terms are such as he inposes. But though the law of the strongest decides, it is not the interest nor in general the practice and the strongest to strain that law to the utmost and every relaxation of it has a tendency to become a custom and every custom to become a right." Ibid.

ভিন্ন নামে অভিহিত করিয়াছেন। ব্রিটিশ রাজত্বে গবর্ণমেণ্ট একটা নির্দ্ধারিত হার স্থির করিয়া প্রজার নিকট হইতে খাজনা গ্রহণ করেন এবং সেইজন্য প্রজারা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুবিধা ভোগ করিতেছে।

সাধারণতঃ জমীর উর্ব্বরা শক্তি যতই বেশী হয়, ততই সেই জমির খাজনা বেশী হয়। অবশ্য শুধু যে কেবল জমীর উর্ব্বরার উপরই জমীর খাজনা নির্ভর করে তাহা নয়। স্থান বিশেষেও জমীর খাজনার তারতম্য ঘটে। বড় বড় নগরের নিকটবর্ত্তী জমীর খাজনার হার বেশী; কেননা ঐ সকল জমীতে উৎপাদিত দ্রব্য অল্প বা বিনা আয়াসেই বিক্রেতা সুবিধা দরে বিক্রয় করিতে পারে। মাল লইয়া অধিক টানাটানি করিতে হয় না; কিন্তু বড় বড় নগরাদি হইতে দূরবর্ত্তী স্থানে ভূমি উর্ব্বরা হইলেও তাহার খাজনা কম কেন না সে স্থানে উৎপাদিত দ্রব্য খরিদ্দারের অভাবে বিক্রয় করিতে যথেষ্ট ক্লেশ পাইতে হয়। এবং তজ্জন্য কৃষক সে জমী সহসা চাষ করিতে চাহে না। এই জন্য জমীর উর্ব্বরাশক্তি ও জমীর অবস্থানের সুবিধা অসুবিধানুসারেও খাজনার যথেষ্ট তারতম্য হয়। যখন ঐ দুটীর কোন একটীর অভাব হয় তখন খাজনা কমিয়া যায়। যে জমীর উর্ব্বরাশক্তি এত কম যে উহাতে যে মূলধন ও পরিশ্রম প্রয়োগ করা হয় তাহার ব্যয় যদি উৎপাদিত দ্রব্য দ্বারা পূরণ না হয়, তবে কেহই ঐ জমী চাষ করিতে চাহিবেনা। পক্ষান্তরে, যদি মনুষ্যের অগম্য স্থানে অত্যন্ত উর্ব্বরা জমীও থাকে, তাহা হইলেও কেহই তাহা লইতে চাহিবে না। আমেরিকায় ও অষ্ট্রেলিয়ায় এরূপ অনেক জমী আছে কিন্তু ঐ সকল স্থানে উৎপাদিত দ্রব্য মনুষ্যের ব্যবহারোপযোগী করিতে হইলে টানাটানিতে এত অধিক ব্যয় পড়িয়া যায় যে সেখানে চাষ করা আদৌ লাভজনক নহে।

রিকার্ডো নামক পাশ্চাত্য অর্থনীতিবিদ পণ্ডিত ভূমির খাজনা নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে এক নিয়মের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। মনে করুন ক ও খ নামে দুই খানি জমী আছে। হয় উর্ব্বরাশক্তির জন্য কি সুবিধামত স্থানে স্থিতির জন্য 'ক'-র খাজনা খ অপেক্ষা বেশী। এই উভয় জমীর খাজনার বিভিন্নতা হইতে আমরা এক জমীর উৎপাদন শক্তি (অর্থাৎ উর্ব্বরা শক্তি ও সুবিধা মত স্থান স্থিতি) হইতে অন্য জমীর পার্থক্য বুঝিতে পারি। এইক্ষণে এই ক ও খ ব্যতীত গ নামক আর একখানি জমী আছে যাহাতে এই সকল শক্তির অভাবের জন্য নাম মাত্র খাজনা আদায় হয়। এই গ জমী যাহা হইতে নাম মাত্র খাজনা আদায় হয় ও পূর্ব্বোক্ত ক জমির খাজনা,—এই দুই খাজনার যদি তুলনা করা যায় তাহা হইলে তাহার খাজনা হইতে উভয় জমীর উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায়। কিন্তু গ জমির নাম মাত্র খাজনা, কেননা উহা অনুর্ব্বরা বা অল্পোৎপাদিকা শক্তি বিশিষ্ট। সুতরাং উৎকৃষ্ট জমী নিকৃষ্ট জমী অপেক্ষা যে সকল সুবিধা ভোগ করে ঐ সকল সুবিধার আর্থিক মূল্যই হইতেছে খাজনা।

রিকার্ডোর মতে যে জমী নাম মাত্র খাজনা দেয় উহা "কর্ষণের শেষ মাত্রায় অবস্থিত" (margin of cultivation) এইরূপ

বুঝিতে হইবে। দৃষ্টান্ত দ্বারা এই বিষয়টী বুঝাইবার চেষ্টা করা যাক। রামের জমীর উৎপাদিকা শক্তি ও আয় শ্যামের জমীর অপেক্ষা বেশী। আয় কথাটী দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়—স্থূল আয় ও আসল আয়। চাষের জন্য যে খরচ হয় উহা বাদ না দিয়া মোট যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাকে স্থূল আয় বলে। কিন্তু কৃষকের আসল আয় নির্দ্ধারণ করিতে হইলে এই স্থূল আয় হইতে ঐ জমীর আবাদে যত প্রকার খরচ হয় তাহা বাদ দিতে হইবে। জমীতে যে মূলধন প্রয়োগ করা হয়, তাহার সুদ স্বরূপ কিছু অংশ ঐ স্থূল আয় হইতে বাদ দিতে হইবে; কৃষক যে তত্ত্বাবধান করিবে তাহার বাবদও কিছু বাদ দিতে হইবে; ইহার পর শ্রমিকের বেতন বাবদ, জমির সার অর্থাৎ জমির ফসল উৎপাদন করিতে যত প্রকার খরচ হয় উহা বাদ দিয়া যে আয় অবশিষ্ট থাকিবে উহাকেই আসল আয় বলে। এখন রামের জমীর আসল আয় যদি শ্যামের জমী অপেক্ষা বাৎসরিক ১০৲ বেশী হয়, তাহা হইলে ইহা বুঝিতে হইবে যে আবশ্যক হইলে রাম শ্যামের অপেক্ষা ১০৲ বেশী খাজনা দিতে সমর্থ। যদি শ্যামের জমীর অল্পোৎপাদিকা শক্তির দরুণ নাম মাত্র খাজনা ধার্য্য হইয়া থাকে, তবে ঐ জমীর আসল লভ্যও নাম মাত্র ইহাই বুঝিতে হইবে। অনেকে বলিবেন, এ ক্ষেত্রে শ্যাম জমী চাষ করিবে কেন? তদুত্তরে ইহা বলিলেই যথেষ্ট যে, সমস্ত প্রকার খরচাদি বাদ যৎসামান্য উদ্ধৃত হইলেও কৃষকের ক্ষতি হয় না। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে শ্যামের জমীর উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্যাপেক্ষা রামের জমীর উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য ১০৲ বেশী এবং আবশ্যক হইলে এই ১০৲ রাম জমিদারকে খাজনা স্বরূপ বেশী দিতে পারে। কেননা, সচরাচর দেখা যায় যে, সকল প্রকার খরচ বাদে সামান্য মাত্র লাভ হইলেই লোকে সে জমী বা ব্যবসায় ছাড়িতে চাহে না। এইক্ষণ, রামের ভূম্যধিকারী যদি রামের খাজনা ১০৲ বৃদ্ধি করেন, তাহা হইলেও রাম জমী ছাড়িতে চাহিবেনা কেন না এই ১০৲ এবং অন্য সকল প্রকার খরচ বাদ দিয়াও আসল আয় স্বরূপ সে কিছু পায়; কিন্তু ভূম্যাধিকারী যদি ১০৲ স্থলে ১১৲ খাজনা করিতে চাহেন, তাহা হইলে রাম আর সে জমী চাষ করিতে চাহিবে না। ঐ জমীতে রাম যে প্রকার অর্থ পরিশ্রম ইত্যাদি প্রয়োগ করিত উহা অন্য জমীতে বা অন্য ব্যবসায়ে প্রয়োগ করিলে রামের অধিক লাভ হইবে এবং উক্ত কারণে ভূম্যধিকারী রামের নিকট ১০৲ টাকার অধিক দাবী করিলে রাম জমা ছাড়িয়া দিবে এবং তিনিও এই কারণে ইহার খাজনা আর বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না। এই প্রসঙ্গে ইহাও জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, জমীদার যেমন খাজনা বৃদ্ধির চেষ্টা করিবেন, রামও সেই প্রকার খাজনা হ্রাসের চেষ্টা করিবে। করুক, কিন্তু প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে রামের সমব্যবসায়ীগণ উক্ত জমীতে কত লাভ হইতে পারে অনায়াসে উহা নির্দ্ধারণ করিয়া রামের খাজনা হ্রাসের চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিবে। রিকার্ডোর নিয়ম এই জন্য প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রেই প্রাযুজ্য।

আমরা পূর্ব্বে কয়েকস্থলে উল্লেখ করিয়াছি যে কোন কোন জমী কর্ষণের শেষ মাত্রায় অবস্থিত। 'কর্ষণের শেষ মাত্রা' অর্থে এইরূপ বুঝিতে হইবে যে ঐ জমীর উর্ব্বরাশক্তি ও স্থিতি

এত খারাপ যে অল্প উৎপাদিকা শক্তি প্রযুক্ত না হইলে উহার কোন লাভ হইবে না। দুই প্রকারে এই উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি পাইতে পারে। প্রথমতঃ, কৃষিজাত দ্রব্যের গ্রাহক বৃদ্ধি এবং দ্বিতীয়তঃ সমুন্নত কৃষি পদ্ধতি দ্বারা ঐ জমী হইতে উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি। পূর্ব্বে যে গ ভূমির জমীর কথা লিখিয়াছি ঐ গ জমী হইতে কৃষক কোন প্রকারে নিজের খরচাদি উঠাইতে পারে। কিন্তু ঘটনাপরম্পরায় এই শেষ মাত্রা আরও নামিয়া পড়িতে পারে এবং সেই জন্য খাজনারও তারতম্য হয়। সে ঘটনাগুলি নিম্নে বর্ণনার প্রয়াস পাইতেছি।

ভিন্ন ভিন্ন দেশের লাভের হার ভিন্ন। অষ্ট্রেলিয়ায় শত করা ১০৲ টাকা অনায়াসেই পাওয়া যায়। ইংলণ্ডে প্রচলিত হার ৫৲ মাত্র। আমাদের দেশের মহাজনেরা শতকরা ২০।২৫ টাকা সুদ লাভ করেন। ইংলণ্ডদেশে লাভের হার খুবই নীচু। মনে করুন, সহসা কোন কারণ বশতঃ ইংলণ্ডের লোক প্রচলিত শতকরা পাঁচ টাকা অপেক্ষা আরও কম লাভে টাকা কর্জ্জ দিতে বা ব্যবসায়ে টাকা খাটাইতে প্রস্তুত! এক্ষেত্রে জমীর শেষ মাত্রাও নামিয়া যাইবে। কৃষক কম লাভে ঐ জমী চাষ করিতে চাহিবে, ভূম্যধিকারীও পূর্ব্বাপেক্ষা কম খাজনায় ঐ জমী দিতে চাহিবে। গ নামক যে জমীর কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি তখন ঐ প্রকার জমী অপেক্ষাও খারাপ জমী লোকে চাষ করিতে চাহিবে। এবং গ ও শেষোক্ত প্রকারের খুব খারাপ জমীর উৎপাদিকা শক্তির পার্থক্যে খাজনার হার নির্দ্ধারিত হইবে। এই প্রকারে, অষ্ট্রেলিয়ায় যখন লাভের হার ১০৲ হইতে আরও কমিয়া যাইবে, তখন আরও জমি চাষ হইবে।

লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইলে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়, কেন না লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইলে কৃষিজাত দ্রব্যের গ্রাহকও বৃদ্ধি পায়। গ্রাহক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূল্যও বৃদ্ধি পায় এবং যে সকল জমি কর্ষণের শেষ মাত্রার সামান্য উপরে ছিল তাহাও লোকের আহার সরবরাহ করার জন্য চাষ করিতে হয়। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে কর্ষণের শেষ মাত্রা আরও নিম্নে পড়ে অর্থাৎ আরও অল্পোৎপাদিকা শক্তি বিশিষ্ট জমীর চাষ হইতে থাকে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জমীর খাজনার হারেরও তারতম্য হয়। কৃষিজাত দ্রব্যের বিক্রয় বৃদ্ধির সঙ্গে ভূম্যধিকারী খাজনার হারও বেশী করিতে পারেন।

কিন্তু লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইলেই যে দেশের আর্থিক উন্নতি হইয়াছে এইরূপ বুঝিতে হইবে তাহা নয়। কোন কোন দেশে এইরূপই হয় বটে কিন্তু সর্ব্বত্র এরূপ ঘটে না। অষ্ট্রেলিয়ায় প্রচুর পরিমাণে উর্ব্বর-ভূমি আছে এবং সেইজন্য তথায় আহার্য্য দ্রব্যাদিও যথাসম্ভব সুলভ। ভারতবর্ষের পক্ষে এই নিয়ম প্রযুক্ত হইতে পারে না। এখানে লোকসংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে কিন্তু অর্থ বৃদ্ধি হয় নাই।[১]

(১) "The standard of comfort of the population has been lowered and vast numbers are constantly living just on the verge of pauperism and starvation." Mrs. Fawcett.

অধিবাসীগণের অবস্থা স্বচ্ছল নহে এবং অনেকেই কায়ক্লেশে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। অধিবাসীগণের সঞ্চিত অর্থ নাই এবং কোন কারণে এক সময়ে ফসল না হইলেই তাহারা অভাবগ্রস্ত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ভারতবর্ষে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত আর্থিক উন্নতির কোন সংস্রব নাই। (১)

অনেকেই মনে করেন যে উৎপাদিত দ্রব্যাদির খরচের বিভাগে খাজনার সম্পর্ক বেশী। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে খাজনা আদৌ ধর্ত্তব্য নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতেছে যে যদি গবর্ণমেণ্ট একদিন অকস্মাৎ আদেশ দেন যে জমীর বাবত কাহারও কোন খাজনা গবর্ণমেণ্ট বা অন্য কোন ভূম্যধিকারী গ্রহণ করিবেন না তাহা হইলেও কৃষিজাত দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয় কিছুই কমিবে না বা বাড়িবে না। পেটের ও হস্তের কার্য্য সমভাবেই চলিবে।' অর্থাৎ এই আদেশের পূর্ব্বে অধিবাসীগণের ব্যবহারের জন্য যে পরিমাণ কৃষিজাত দ্রব্যের আবশ্যক হইত, এখনও তাহাই হইবে এবং পূর্ব্বে যে পরিমাণ জমী চাষ হইত এখনও তাহাই হইবে। এই কারণেই কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধির সহিত খাজনার কোন সম্পর্ক থাকে না।

অতঃপর আমরা বেতনের বিষয় আলোচনা করিব। (ক্রমশঃ)

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

পল্লীগ্রামে ডাইনে খাওয়া।

মানুষের উপর ভূতের প্রবল প্রভাবের কথা তো আজি কালি অনেক সুসভ্য শিক্ষিত সমাজেও শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু পল্লীগ্রামে আর এক জাতীয় জীব যে কিরূপ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করে তাহা বোধ হয় অনেকে জানেন না। ভূতের ন্যায় ইহা অশরীরী কল্পনা মাত্র নহে, একটা জলজীবন্ত আস্ত মানুষ, এস্থলে গ্রামের ভীতিস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। ইহার নাম ডাইন্ বা ডান্! অধিকাংশ স্থলে স্ত্রীলোকই উক্ত পদ স্থিতা, পুরুষ ডান্ অতি কদাচিৎ শুনিতে পাওয়া যায়। ভিক্ষাজীবী বৈষ্ণবী, মৎস্য জীবি-মালো বা চাঁড়াল দুহিতা, পণ্য বিক্রেত্রী বেনিয়া রমণী ইহারাই অধিকাংশ স্থলে এই সম্মান লাভ করিয়া থাকে। তাহারা গ্রামে প্রবেশ করিলে বালবৃদ্ধরমণী মহলে সামাল্ সামাল্ পড়িয়া যায়। যুবারা প্রকাশ্যে তাহাদের উদ্দেশে অনেক আস্ফালন করিয়া থাকে

(1) The people have no reserve of any kind and the failure of a crop immediately brings the pinch of want ; they cannot meet bad times by giving up luxuries in order to buy necessaries ; they have no luxuries ; they have no cheaper kind of food to which they can resort ; they are already at the bottom of the scale of human existence and to fall any lower means actual famine "Mrs Fawcet." এই উক্তির মধ্যে সত্য নিহিত থাকিলেও ইহা যে একটু অতিরঞ্জিত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বটে কিন্তু অন্তরে 'ডাইন' নামে সকলেরই হৃৎকম্প হয়। ডাইনী বেচারাদের স্থানে স্থানে লাঞ্ছনার সীমা থাকে না। আমরা অন্য এই বিষয়ের দুই চারিটি চাক্ষুষ ঘটনা লিপিবদ্ধ করিতেছি!

পৌষ মাস। দরিদ্র কৃষকের অঙ্গনে ধনু রাশিস্থ সূর্য্যের মন্দ কিরণ ক্রমে মন্দতর হইতেছে। কৃষকের গৃহে সুখ নাই, দুই তিন বৎসরের অজন্মায় তাহাদের দুরবস্থার একশেষ। এবারে দুরন্ত বন্যায় আউস ধান্য সব ভাসিয়া গিয়াছে। আমন কিছু হইয়াছিল কিন্তু মহাজনের ঋণ এবং জমিদারের খাজনা তাহাতে শোধ করিয়া লওয়ায় অঙ্গনের শূন্য 'গোলা' দুইটা হুম্‌ড়ী খাইয়া পড়িবার জোগাড় করিতেছে। পৌষ যায়, অগ্রহায়ণ হইতে এক ফোঁটা বৃষ্টি না হওয়ায় রবি শস্যের আশাও এবারের মত শেষ।

উঠানের 'আগায়' কৃষকবধূ ধান "ওসাইতে" ছিল। পৃষ্ঠে বেতের ঝাঁপি, তন্মধ্যে গাছ চাঁচিবার তীক্ষ্ণধার অস্ত্র 'দাউলী,' কোমরে জড়ানো প্রকাণ্ড একগাছা দড়া, হস্তে দুইটা কলসী লইয়া যুবা কৃষকপুত্র অঙ্গনে প্রবেশ করিল। কলসী দুইটা একপাশে নামাইয়া, ঝাঁপি ইত্যাদি অঙ্গনে আছড়াইয়া ফেলিয়া হতাশ ভাবে "পিঁড়ে"র এক ধারে বসিল। মাতা, পুত্রের ভাবান্তর দেখিয়া বলিল "কিরে-'রমূল্য'? অমন ক'রে বস্‌লি যে?" পুত্র কোন' উত্তর দিল না! মাতা আবার বলিল "'অস্' কি "চোরে গিয়েছে" সব? "আরে "আরে না, না; এই 'অসের' জন্যেই ত আজ ম'লাম"! মাতা শঙ্কিত হইয়া বলিল "ম'লাম কিরে? কি হ'ল তোর?" "হবে আর কি! এখনি ফটুকে মালোর মা মাগী কোথায় ছিল জানিনা, খেজুরে পুকুরের পাড় থেকে 'অসে'র 'ঠিলি" হাতে করে নাম্‌তেই আমার দফা সেরেছে।"

"ওরে সেকি? সেকি 'অস্' চেয়েছিল? দিলিনে কেন তাকে?"

"হাঁ-সে 'অস্' নেবে কিনা? আমার প্রাণডা বড় কেমন কর্‌ছে শুই একটু।" বলিয়া অমূল্য সেই খানেই ধুপ করিয়া শুইয়া পড়িল। মাতা ডাক্ ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল, "ওগো আমার সর্ব্বনাশ হ'ল! ওগো তোমরা কে কোথায় আছ', আমার "রমূল্য রতনে'র কি হ'ল এসে ত্থাখ' সে"!

অবিলম্বে পাড়ার লোক সব আসিয়া জুটিল। অমূল্য তখন মাটিতে পড়িয়া ছট্ ফট্ করিতেছে। সকলে 'ওঝা আনাইবার পরামর্শ দেওয়ায় একজন পরোপকারী তৎক্ষণাৎ গ্রামান্তরে 'ওঝা' ডাকিতে ছুটিল। ইতি মধ্যে ডাইনে খাওয়ার ঔষধ যে যাহা জানে রোগীর উপরে তাহা প্রয়োগ করিতে লাগিল। হলুদ ও লৌহ পুড়াইয়া কপালে ছ্যাঁকা দেওয়া, নানা প্রকার লতা পাতার রস হস্তে পদে বক্ষে লেপন, তেল পড়া, জল পড়া খাওয়ানো ইত্যাদি। অমূল্যের মা উঠানে বসিয়া হতাশ ভাবে বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতে লাগিল। "ওরে 'রমূল্যের' ভরসাতেই যে চালের তলায় মাথা দিয়ে আছি। 'ম্যালেরি' জ্বরে তিন বছর ভুগে ভুগে মোড়ল, যদু, দুজনেই ফাঁকী দিলে। পুঁটে টাত' নিত্যি রোগা, জন্মকালই জ্বরে ভুগ্‌ছে। বেনে মাগী যেদিন পাড়ায় আসে সেই দিনই আমার পুঁটে 'কেঁথা' ঢাকা দিয়ে শোয়। তার ভরসাত

আমি করিই নে। একা 'রমূল্য'। সে বলে "মা জমী জমা যা আছে ভাগে করি।" একটা 'দোহর' নেই তার, যা আছে তাও আবাদ্ করতে পারে না। তিন বছর ধান হয়'নি, এবার যা হ'ল মহাজনের 'দেন' শোধ করলাম, খন্দ দুটো হয়—সরকারীতে তুলে নেবে, আজ তিন বছর খাজনা দিতে পারিনি! ভাবি 'রমূল্যের' বিয়ে দেব, 'রমূল্য' বলে মা দুবছরের ধাক্কা আগে সামাল্ দিই, আর 'দেন্' করিস্‌নে এখন"! তিন কুড়ী খেজুর গাছ জমা নিয়েছে, বাছা আমার সকল দিন গাছে গাছে আর 'বাইনের আগুনের জ্বালেই থাকে! পুঁটে জ্বালানি কুড়িয়ে কুড়িয়ে ব'সে ব'সে জ্বাল দেয়। সেদিন সাঁজ বেলায় গাছ থেকে প'ল—বলি মা কি হবে! তা আমার "নোয়ার বাঁটুল" রমূল্যর কিছু হয়নি, আজ আমার কপাল বুঝি ভাঙ্গ্‌ল! সর্ব্বনাশীরে আমার কপালই এমন করে খায় কেন রে?"

ইতি মধ্যে রোগী একবার বমি করিয়া একটু সুস্থ হইল। সকলে আশ্বাস দিতে লাগিল, ভয় নেই—ভয় নেই, ওঝা এলেই এখনি সব ভাল হবে।

গরু চরাইয়া জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে পুঁটে আসিয়া সব ব্যাপার দেখিলএবং সেও দাঁড়াইতে না পারিয়া ঘরে গিয়া শয্যা গ্রহণ করিল! মা দ্বিগুণ কাঁদিয়া বলিল "নিশ্চয় আজ বেনে মাগী ওকে দেখেছে। আজ তিন দিন একটু ভাল ছিল, 'রমূল্য' মাঠে যেতে বারণ করে, তা ভাল থাকলেই যায়! আমার কত "দুখ" সইয়ে' 'ধনেরা সব। আমার ছার কপালে বাঁচলনা?"

ওঝা আসিল। অমূল্যের সর্দ্দিগর্ম্মী ভাবটা তাহার আসিবার পূর্ব্বেই কমিয়া আসিয়াছিল। দু তিন বার দাস্ত ও বমি হইয়া সে তখন অনেকটা সুস্থ হইয়াছে। ওঝা দেখিয়া বলিল "আর ভয় নেই। আমার আসার আগেই ভয়ে সে সরে গিয়াছে। এই ওষুধটা ভাতের আমানির সঙ্গে বেঁটে খাইয়ে দাও আর এই সরষের পুঁটুলিটা তিন দিন কাছে রেখো। তেমন কিছু করতে পারেনি। আমি এখনি রতনপুর থেকে আসছি। সে গ্রামের রায়েদের বৌকে আজ তিন দিন ডানে খেয়েছিল। আজ তিন দিন তিন রাত আমি সেইখানে ছিলাম! কত সব ইংরাজি জানা ছেলে পিলেরা 'ফিট্' 'ফিট্' 'হিষ্টির' 'মিষ্টিরি' বলে ডাক্তার এনে কিছুতে কিছু করতে পারেনি! তখন আমি 'রুগী' হাতে নিয়ে তিন দিন তিন রাত খেটে ভাল করে দিয়ে এলাম। ইংরিজি পড়া ছেলেরা সব তখন গাল হাত বসে রইল"। সকলে অমূল্যকে ছাড়িয়া তখন ওঝাকে মহা ঔৎসুক্যে ঘিরিয়া বসিল। ওঝাও সাড়ম্বরে বলিতে লাগিল,—

"আত্ম সাবধান" করে বাড়ী থেকে তো বেরুলাম। 'রুগী'র বাড়ীর দুয়োরে গিয়ে আগে বাড়া বাঁধলাম, আসামী আগেই না পালায়! আমায় দেখে ত সে রেগেই আগুন! "তুই কোথাকার রোজা,—দেখি ত তোর কতবড় সাধ্যি, আমায় কেমন তাড়াতে পারিস্"।* আমিও বলি "দেখি তুমিই কেমন ডান্!" মন্তর পড়ে পড়ে হায়রাণ হয়ে, দড়ী দিয়েবেঁধে কিছুতে যখন পারলাম না তখন একগাছা ঝ্যাটা এনে দুএক ঘা বসাতেই

* বলা বাহুল্য এসব কথা ভূতগ্রস্ত রোগীর মত ডাইন-প্রাপ্ত রোগী স্বমুখেই বলিয়া থাকে।

বল্‌লে "আর না, আর না, এইবার যাচ্চি!" আমি বল্লাম "তোকে যেতে ত হবেই, কিন্তু আমি কেমন রোজা তা টের পেয়ে যেতে হবে। বল্ তুই কে, তবে তোকে ছেড়ে দেব।" বল্লে "না, তাহলে বড় লজ্জায় পড়্‌ব আমায় ছেড়ে দে!" সেকথা কে শোনে! ঝাঁটা আন্‌তেই বল্‌লে "আমি বুড়ো মানুষ, আর মারিস্‌নে! আমি ন গাঁয়ের বুড়ো বষ্টুমী! এ গাঁয়ে ভিক্ষে কর্‌তে আসি! বৌটা এলোচুলে সিঁদুর পরে ব'সে বড়ী দিচ্চিল! আমায় দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখে মুখ ঝাম্‌টা দিয়ে উঠ্‌ল! ভারি কটু কথা বলেছে আমায়, "ভিক্ষে করে মরিস্ কেন, খেটে খেতে পারিস্‌নে, মাগী ডান!" তা যা করেছে তা করেছে এইবার আমি যাচ্চি। তখন বল্লাম অমনি ত যাওয়া হবে না, কিছু নিয়ে যেতে হবে ত! নইলে রুগীর ক্ষেতি। ঐ শিলখানা নিয়ে যেতে হবে!" তা বল্লে "আমি বুড়ো মানুষ। শিল মুখে নিতে পার্‌ব না।" "তবে জুতো নে!" "আমি এই মুখে হরিনাম করি, আমায় জুতো দিস্‌নে তোদের অধর্ম্ম হবে!" "মাগীর ধর্ম্মজ্ঞানও যে বিলক্ষণ" জনৈক শ্রোতা মত ব্যক্ত করিল! অন্য একজন অত্যন্ত চিন্তিত মুখে বলিল, ওদের জ্বালায় তো মানুষের শোয়াস্তিও নেই! 'বিটি'দের জব্দ করাও তো সহজ নয়। আমার মামাদের গাঁয়ে এমনি এক 'বিটি' ডান্ ছিল, তার জ্বালায় গাঁয়ের লোকের সোয়াস্তি ছিল না। শেষে গাঁয়ের ক'জন লোকে ষড় করে তার ঘরে দুতিনটে দামী জিনিষ লুকিয়ে রেখে 'চোর্' বলে ধরিয়ে দিলে! 'বিটি' তখন জেলে গেল,—তবে লোকের শোয়াস্তি!" আর এক ব্যক্তি ব'লিল "কেন আমাদের গাঁয়ের কৈলেস সেখ! সে এমন "ডোকো হাজ্‌রা" মানুষ ছিল যে এক 'বিটি' ডান্‌কে তিন মাসের ভাত খাইয়ে দিয়েছিল! আখের ভুঁইয়ে আখ্ বোঝাই কর্‌ছে গাড়ীতে, আর—সে এক মাগী ডান্ তখন এ গাঁয়ে আস্‌ত, একখানা আখ্ চাইলে তার কাছে। কৈলেস্ আখ্ দিলেও মাগী গাড়ীর পানে তাকাতে তাকাতে যায়, এই সেখের পো আগুন হ'য়ে বল্‌লে "খেলি খেলি আমার একগাড়ী আখ্ খেয়ে নাশ কর্‌লি শালি!" এই বলে দুগাছ মোটা আখ্ না নিয়ে মাগীকে গো বেড়োনে বেড়্‌লে! সেই হ'তে মাগী গাঁ ছাড়ে, তিন মাস নাকি পড়েছিল!" প্রথমোক্ত ব্যক্তি বাধা দিয়া বলিল "কৈলেস কি সোজা লোক ছিল, নইলে ঐসব লোকের গায়ে হাত দিতে পারে। ওদের মোছলমানের কালীতলায় 'প্রীতি' আমাবস্যায় সে মোরগ দিত!"* "ওদের ও মন্তোর শিখে কি হয়? ডান্ হ'য়ে লোকের ক্ষেতি ক'রে 'বিটি'দের লাভটা কি?" ওঝা বিজ্ঞতার বোঝা নামাইয়া বলিল "তা বুঝি জাননা? ওরা কি স্ব-ইচ্ছেয় ডান্ হয়? ডাইনেরা নিজের

---

* পৌষের 'প্রবাসী'তে হেমলতাদেবী "ভারতবর্ষীয় মুসলমান সমাজে হিন্দুয়ানী" ইতি শীর্ষক প্রবন্ধে বহু-দূরদেশের মুসলমানের হিন্দু আচার ব্যবহার গ্রহণের কথা অনেক বলিয়াছেন। আমি দেখিয়াছি, এই বঙ্গদেশের নদীয়া জেলার ঘোর পল্লীগ্রামে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুমুসলমানের আচার ব্যবহারে তফাৎ খুবই কম। এখানে মুসলমানেও গাছতলায় কালী পূজা করে এবং পুত্রের নাম কালিদাস, দ্বারিক, মথুরানাথ, গোপাল, হরি এবং কন্যার নাম গোলাপ, কামিনী প্রভৃতি রাখে।

মন্তর কারুকে না দিলে ত' তাদের প্রাণ বেরোয় না! মর্‌বার সময় মানুষ না পেলে তারা ন্যাক্‌ড়ায় গিঁট বেঁধে ঝাঁটার বাড়ুনে মন্তর রেখে যায়, অজান্‌তে যে সেই গিঁট খোলে বা ঝ্যাঁটা বাড়ুন ছোঁয় অমনি সেই মন্তর তাকে গছে। তারপরে শোন! ডান্‌ মাগীকে বল্‌লাম আমার রুগী ভাল হবে? ঠিক করে বল্? নইলে তোর "ঠিক ঠিকানা তো জান্‌লাম, এমন ক'রে 'বাণ' মার্‌ব যে মুখে রক্ত উঠে তখনি মর্‌বি।" জনৈক শ্রোতা বাধা দিয়া বলিল "তা পারা যায় না কি?" "তা বুঝি জাননা? আচ্ছা বেশ ত' তুমি। হরশে মুচী মিন্সে অম্‌নি ডান্ হ'য়েছিল। কাকে কোন্ গাঁয়ে খেয়ে এসেছিল! কোন্ শক্ত রোজায় 'বাণ' মেরেছিল; ভাল না মন্দ না হরশে মুচী ঘরের মধ্যে জলের কল্‌সীর গোঁড়ায় মুখে রক্ত তুলে মরে আছে!" ওঝা বলিলেন "হ্যাঁ জলের কল্‌সীর গোঁড়ায় যখন—তখন নিশ্চয় ওঝাতেই মেরেছে বটে! তারপর শোন! মাগী শুনে বলে কি ভাত বল্‌তে পারিনে! কচুর পাতে ক'রে বৌর প্রাণটুকু জলের কলসীর কাছে রেখেছিলাম কি হ'ল তা কি জানি!" "জানিস্‌নে বটে!" বলে একটা কুমড়ো এনে মন্তর প'ড়ে যখন বলি দিতে যাই তখন মাগী সোজা হ'য়ে প্রাণটা ফিরিয়ে দিল! তা কি অম্‌নি যেতে দিলাম! সেই হরিবলা মুখে জুতো নিয়ে যেতে হ'ল!" "জুতো কে মুখে নিল—সেই বৌটা?" "সে কি আর তখন বউ? সেই ডান্ মাগী? জুতো মুখে ক'রে উঠোন পর্য্যন্ত গিয়েই বউ ধড়াস্ ক'রে অজ্ঞান হ'য়ে গেল! দুদণ্ড পরে যখন দাঁত ছাড়্‌ল তখন সে মেয়ে আর সে মেয়েই নয়! এক গলা ঘোম্‌টা দিয়ে বস্‌ল!"

গৃহের মধ্য হইতে পুঁটে সহসা বিষম চীৎকার করিয়া উঠিল। সকলে শশব্যস্তে ঘরে গিয়া দেখিল অন্ধকার ঘরে শুইয়া ঐ সব ভীতিজনক কাহিনী শুনিতে শুনিতে দুর্ব্বল রুগ্ন বালক ভয়ে অজ্ঞান হইয়া গিয়াছে। ওঝা দেখিয়া বলিল "কিছু নয় এও ডান্।"

পুঁটেকে তখন বাহিরে আনা হইল, অমূল্য তখন সাম্‌লাইয়া উঠিয়া বসিয়াছে! 'ডানে' পাওয়ার প্রতিকারের ব্যবস্থামত সেই বালকের উপর তখন জুতা ঝাঁটা বর্ষিত হইতে লাগিল। তাহার মাতা চীৎকার করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলে সকলে তাহাকে ধমক দিতে লাগিল "ন্যাকা মাগী এ মার্ কি ওর গায়ে পড়্‌ছে! ছেড়ে গেলে দেখিস্ একটুও গায়ে দাগ থাক্‌বে না! মাতার প্রাণ কিন্তু এ সান্ত্বনায় প্রবোধ মানিল না।

ভীত কম্পিত বালক ওঝার বাক্যের প্রতিধ্বনির মতই প্রায় ঐ রকম কথাবার্ত্তাই বলিয়া গেল। ডান্ ছাড়িয়া যাইবার কালে বালকের মুখে একখানা গুরুভার শিল তুলিয়া দেওয়া হইল। সেই শিল দাঁতে কামড়াইয়া ধরিয়া বালককে আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে হইল না। দুই চারি পা গিয়াই শিলসহ দাওয়ার নীচে পড়িয়া গেল। "আর কোন ভয় নাই। এই বারে ঘরে তুলে নিয়ে এস এই ওষুধটা বেঁটে মাখিয়ে দাও, দু চার দণ্ড পরেই জ্ঞান হবে, তখন এইটে বেঁটে খাইয়ে দিও। যা খেতে চাবে দেবা, আর এই ওষুধট সর্ব্বদা কাছে কাছে রাখবা! আমি এখন চল্লাম!" সকলে অমূল্যর মার পানে চাহিয়

বলিল "ওনার বিদায়?" ওঝা বাধা দিয়া বলিল" এখন ওসব কথা নয়! ছেলে দুটি ভাল হোক্, তখন নিজেই উনি খুসী হয়ে 'বিদেয়' করবেন!

তখন ওঝা বিদায় হইয়া গেলেও অমূল্য ও তাহার মাতা পরদিন ওঝাকে ডাকাইয়া সন্তোষ করিয়া বিদায় দিল, পুঁটেও দু চারি দিন একটু উঠিল বসিল কিন্তু সেই গুরুভার প্রস্তর বক্ষে করিয়া পতনের ধাক্কা সে রুগ্ন বালক সাম্‌লাইতে পারিল না। কয়েক দিন পরেই তাহার মাতার ক্রন্দনে সমস্ত গ্রাম ধ্বনিত হইয়া উঠিল। সকলে চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে 'হায়' 'হায়' করিয়া বলিল, "মাগীর কপাল বড়ই মন্দ! অমন রোজা অমন ক'রে ছেলেকে ডানের মুখ থেকে ফিরিয়ে দিয়ে গেল! এত আর মানুষের হাত নয়, মাগীর কপালই খারাপ!—ছেলেটা সেই জন্যই বাঁচ্‌ল না"!

শ্রী নিরুপমা দেবী।

শিশিরকুমার ঘোষ।

বাংলা দেশের যে সকল কর্ম্মবীরের দ্বারা দেশের নানা কল্যাণ সাধিত হইয়াছে শিশিরকুমার ঘোষ তাঁহাদের অন্যতম। সেই জন্য আজ তাঁহার বিয়োগে বঙ্গবাসীমাত্রেই ব্যথিত। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কে না তাঁহাকে চিনিতেন? নূতন করিয়া তাঁহার পরিচয় দিবার আবশ্যক নাই। তাঁহার কর্ম্ম-জীবন তাঁহার যে উজ্জ্বল পরিচয় রাখিয়া গেছে তাহাই যথেষ্ট; সে পরিচয়কে উজ্জ্বলতর করিবার সামর্থ্য কাহারো নাই।

১২৪২ বঙ্গাব্দে যশোহর জেলায় মাগুরা নামে এক ক্ষুদ্র গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম ছিল হরিনারায়ণ ঘোষ। হরিনারায়ণ ঘোষের পাঁচ পুত্র, তন্মধ্যে শিশির-কুমার ও বিখ্যাত সংবাদপত্র অমৃতবাজার পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষই বিশেষ প্রতিষ্ঠাপন্ন। এই অমৃতবাজার পত্রিকা প্রথমে শিশিকুমারের উদ্যোগে, তাঁহার চেষ্টায় ও অধ্যবসায়ে প্রকাশিত ও পরিচালিত হয়। কি কষ্ট স্বীকার করিয়া শিশিরকুমার অমৃতবাজারপত্রিকা বাহির করেন তাহা শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। এই পত্রিকা খানি তিনি প্রথমে নিজের গ্রাম হইতে বাহির করেন;—সেখানে না ছিল, প্রেস, না ছিল কম্পোজিটার! একটা কাঠের প্রেস ও কতকগুলা পুরাতন টাইপ সংগ্রহ করিয়া কার্য্য আরম্ভ হয়। শিশিকুমার কলিকাতায় আসিয়া প্রেসের সমস্ত কার্য্য নিজে শিক্ষা করিয়া ভ্রাতৃগণকে তাহা শিক্ষা দেন। তিনি এবং তাঁহার ভ্রাতারা মিলিয়া প্রবন্ধ রচনা হইতে আরম্ভ করিয়া, নিজের হাতে কম্পোজ, ছাপা সব কাজই করিতেন। এত কষ্ট স্বীকার করিয়া আর কেহ আমাদের দেশে কাগজ বাহির করিয়াছেন কি না জানি না, কিন্তু তাঁহার এ উদ্যম সত্যই বিস্ময়াবহ ও প্রশংসনীয়! যে অমৃতবাজারপত্রিকা একদিন দারিদ্র্যের মাঝে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, কালে তাহা কিরূপ বিভবশালী ও প্রতিষ্ঠাপন্ন

হইয়াছে তাহা বলিবার আবশ্যক করে না। প্রথমে অমৃতবাজার বাংলা ভাষায় মুদ্রিত হইত। পরে ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে যে সময় সংবাদপত্র আইন বিধিবদ্ধ হয় সেই সময় হইতে ইহা ইংরাজিতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। শোনা যায়, শিশিরকুমার রাতারাতি বাংলা কাগজকে ইংরেজি করিয়া ফেলেন।

বহুদিন এই পত্রিকা যোগ্যতার সহিত চালাইয়া শিশিরকুমার তাহার পরিচালন ভার তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষকে অর্পণ করেন এবং নিজে বিষ্ণুপ্রিয়া নামে একখানি বাংলা কাগজ বাহির করেন। সে কাগজ আজিও চলিতেছে।

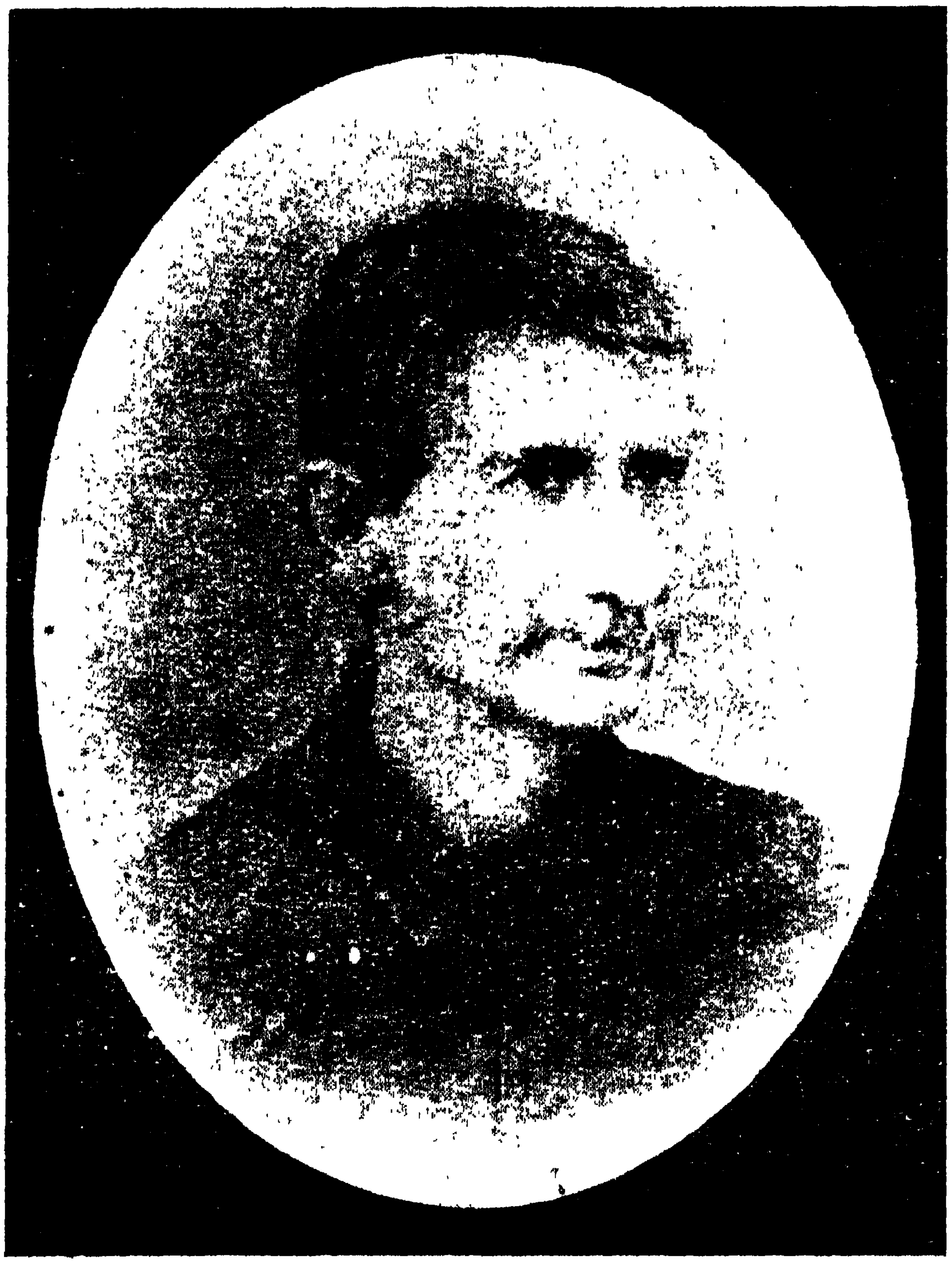

শিশিরকুমার ঘোষ।

সংবাদপত্রের সম্পাদন ব্যতীত শিশির-কুমার 'অমিয় নিমাই চরিত' প্রভৃতি কয়েকখানি বিখ্যাত বৈষ্ণবীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সেগুলি বৈষ্ণবসমাজে বিশেষ ভাবে আদৃত। এই গ্রন্থগুলি তাঁহার ধর্ম্মজীবনের পুণ্যস্মৃতি ও তাঁহার হৃদয়ের ভক্তি-উচ্ছ্বাস বহন করিয়া অমর হইয়া থাকিবে।

সমালোচনা।

বস্তু-উপলক্ষে শিক্ষা। প্রথম ভাগ। মৌলবী সেখ আবদুল জব্বার প্রণীত। মূল্য চারি আনা মাত্র। অধুনা প্রচলিত কিণ্ডেরগার্টেন শিক্ষাপদ্ধতির উপযোগী করিয়া ছাত্রগণের জন্ম এই গ্রন্থ রচিত।

শিক্ষাকোষ। শিক্ষাব্যবসায়। পঞ্চম সংখ্যা। শ্রীযুক্ত মন্মথধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রতি সংখ্যা ৸০। সমগ্র গ্রন্থ ৩০৲ টাকা। শিক্ষাকোষ কার্য্যালয়, বিনোদকুটীর, লক্ষ্ণৌ। ইহার পূর্ব্ব সংখ্যাগুলি দেখিবার আমাদিগের সুযোগ ঘটে নাই—সুতরাং একেবারে পঞ্চম সংখ্যা দেখিয়া গ্রন্থকারের "প্ল্যান" বা উদ্দেশ্যের কোন একটা ধারণা করিতে পারিলাম না। বর্ত্তমান সংখ্যায় "ভূগোল-শিক্ষা" আলোচিত হইয়াছে। ভূগোল-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, ভূগোলের ইতিহাস, ভূগোলশিক্ষায় পর্য্যায় প্রভৃতি সম্বন্ধে লেখকের আলোচনা ও সংগ্রহ বেশ তথ্যপূর্ণ ও সুখপাঠ্য। এখানি প্রতি মাসে প্রকাশিত হয় কিনা তাহাও বুঝিলাম না।

চণ্ডিকা-বিজয়। (সটীক শক্তিবিষয়ক আদি বাঙ্গালা কাব্য গ্রন্থ) দ্বিজ কমললোচন প্রণীত। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার এম, এ, বি, এল সম্পাদিত। বিশ্বকোষ প্রেসে মুদ্রিত। রঙ্গপুর শাখা সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত। এখানি প্রায় আড়াইশত বৎসর পূর্ব্বে রঙ্গপুরনিবাসী কবি দ্বিজ কমললোচন রচিত পুরাতন কাব্য; সম্প্রতি সাহিত্য পরিষৎ ইহার আবিষ্কার করিয়াছেন। গ্রন্থখানির বিশেষত্ব এখানি শক্তি সম্বন্ধীয় গ্রন্থ, বৈষ্ণবগ্রন্থ নহে। কাব্যখানি নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে; গ্রন্থের ভূমিকায় কবির সংক্ষিপ্ত জীবনী ও কবিতাশক্তি বেশ দক্ষতার সহিত আলোচিত হইয়াছে। কবি কমললোচনের সৌন্দর্য্যজ্ঞান, উপমাবৈচিত্র্য প্রভৃতি প্রকৃতই উপভোগ্য।

পত্রলেখা। শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী। প্রণীত কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। প্রকাশক, ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস। মূল্য আট আনা। এখানি কবিতা-গ্রন্থ। কবির রচনার নূতন পরিচয় অনাবশ্যক। এই গ্রন্থে প্রায় দেড়শতাধিক কবিতা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ভাবে ছন্দে এমন একটি করুণ সুর বহিয়া গিয়াছে যে তাহা নিমেষেই হৃদয় স্পর্শ করে। ভাষার গতি লীলাময়-সরল। কবিতাগুলি পাঠ করিবার সময় পাঠকের মনে হয়,—

> "গাঢ়তর সন্ধ্যার আঁধারে
> লুপ্ত আমি, লুপ্ত লেখা অশ্রুবারি ধারে।"

কবির মর্ম্মবেদনায় পাঠকের চিত্ত একটা করুণ সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠে। সে বেদনা একান্ত নিজস্ব বলিয়াই মনে হয়। বাঙ্গালায় কাব্যসাহিত্যে পত্রলেখা বিশিষ্ট উচ্চস্থান লাভ করিবে বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস আছে। শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

শঙ্খ। গীতি কাব্য; শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল প্রণীত। "সান্যাল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস" হইতে মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত; মূল্য ৸০ আনা। এতদিন পরে বঙ্গসাহিত্যের প্রিয় "বড়াল কবির" মাসিক পত্রিকার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কবিতাগুলি গ্রন্থাকারে পাইয়া অনেকেই প্রীতিলাভ করিবেন। অক্ষয়বাবু নূতন কবি নহেন,বহুদিন হইতেই তিনি কবিতা রচনা করিয়া সাহিত্যে আপনার গৌরব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বর্ত্তমান কবিতাগুলিতে, কবির নিজস্ব সকরুণ সুরটী সর্ব্বত্র ঝঙ্কৃত। এই সকরুণ সুরটী নৈরাশ্যব্যঞ্জক হইলেও, ইহার অন্তর একটী গূঢ় নির্ভরতা আছে যাহা নিতান্তই বিশ্বাসলব্ধ। এই গ্রন্থে কবির নানাদিগাভিমুখী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়—একদিকে লঘু গীতি অন্যদিকে গভীর অধ্যাত্মতত্ত্ব। আশা করি বঙ্গীয় পাঠক পাঠিকা কাব্যখানি উপভোগ করিয়া বিশেষ আনন্দ পাইবেন। এবং আমরা অচিরে তাঁহার অন্য সঙ্কলন পাঠ করিবার সুযোগ পাইব।

পরলোকগত চন্দ্রনাথ বসু। প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্, এ, মহাশয় কর্তৃক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে পঠিত প্রবন্ধ। সাহিত্য-পরিষৎ কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত

মূল্য ।৹ আনা মাত্র। ক্ষুদ্র প্রবন্ধে যতদূর সম্ভব, অধ্যাপক মহাশয় তাঁহার বিষয়টী সেই ভাবেই আলোচনা করিয়াছেন। তিনি চন্দ্রনাথবাবুর রচিত গ্রন্থাবলীর অপেক্ষা চন্দ্রনাথবাবুর ব্যক্তিগত জীবনের অধিকতর আলোচনা করিয়াছেন। বিশেষ নূতন কথা না থাকিলেও, খগেন্দ্রবাবু প্রবন্ধটী বেশ মনোরম করিয়া তুলিয়াছেন। আশা করি খগেন্দ্রবাবু এই ক্ষুদ্র রচনা, কালে বৃহত্তর করিতে অবকাশ পাইবেন।

প্রাকৃতিক চিকিৎসা (পূর্ব্বভাগ) শ্রীযুক্ত দুর্গেশনাথ ভট্টাচার্য্য লিখিত। মুরশিদাবাদ কর্ণিকা যন্ত্রে মুদ্রিত। ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখিতেছেন" * * * সম্পাদকেরা কিরূপ সমালোচনা করেন এবং অর্থের বিনিময়ে কেহ পুস্তক লন কিনা তাহা দেখিয়া দ্বিতীয়াংশ প্রকাশিত করিব"। অথচ গ্রন্থকার লিখিয়াছেন তাঁহার নিজের প্রেস আছে! গ্রন্থকার শিক্ষা দিতেছেন "ঔষধ বর্জ্জন করুন"। বলা বাহুল্য এ ধুয়া পাশ্চাত্যজগতে অনেকদিন উঠিয়াছে। এ বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে অক্ষম তবে যাঁহাদের উৎসাহ আছে তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। গ্রন্থকার যদি তাঁহার পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া যে যে ব্যক্তি ফল লাভ করিয়াছেন, তাহার একটী বিস্তৃত বিবরণ দিতেন তাহা হইলে উপকার হইতে পারিত। নতুবা একটী নূতন বিষয়ে গ্রন্থকার আস্থাবান বলিয়া, সাধারণ তাহা সহজে গ্রাহ্য করিতে প্রস্তুত নহে। তাঁহার উদ্দেশ্য সাধু এবং প্রশংসার্হ।

গৃহধর্ম্ম। শ্রীমতী বিদ্যাবতী আরিয়ার সরস্বতী প্রণীত। হিতবাদী প্রেসে মুদ্রিত; মূল্য ॥৹ আনা। গ্রন্থকর্ত্রী সাধারণতঃ "সন্তানের শিক্ষা ও পালন রীতি" সহজ ভাষায় বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন, সেগুলি পাঠ করিলে বঙ্গীয় মাতৃগণ নিশ্চয়ই উপকৃত হইবেন। গ্রন্থকর্ত্রী পরিশিষ্টে সন্তান ও মহিলাগণের পীড়ার সহজসাধ্য হোমিওপাথিক চিকিৎসা প্রণালী সঙ্কলন করিয়াছেন। আমরা এই সঙ্কলনের পক্ষপাতী নহি। যিনি স্বয়ং চিকিৎসক নন তিনি কঠিন চিকিৎসা গ্রন্থের সঙ্কলন করিতে উপযুক্ত নহেন। তাহার উপর, হোমিওপাথিক ঔষধ গুলির অধিকাংশ স্থলে মাত্রা বা ক্রম উল্লিখিত হয় নাই।

শ্রীগঃ

আমার কর্ম্মভূমি।

১

ধন্য মান্য যশে গাঁথা, আমাদের এই কলিকাতা,
তার মাঝে এক আপিস আছে, সব আপিসের সেরা,
ও যে ইট-পাথরে তৈরী সেটি, রেলিং দিয়ে ঘেরা।—
এমন আপিস কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি,
সকল বুদ্ধি হানি-করা, আমার কর্ম্মভূমি।

২

কেরাণী দপ্তরী তারা, কোথায় এমন খেটে সারা,
কোথায় এমন বিষাদ জাগে, এমন মলিন মুখে,
ও তারা 'বেলের' ডাকে আঁৎকে উঠি গভীর মনের দুখে!
এমন আপিস ইত্যাদি।

৩

এত রুক্ষ সাহেব কাহার, কোথায় এমন গালি আহার
কোথায় এমন লোহিত নেত্র কটমটিয়ে থাকে।
এমন কাণের উপর হাত খেলে যায় মৃদু মধুর পাকে!
এমন আপিস ইত্যাদি।

৪

ঘরে ঘরে ভরা বাবু, কলম পিষে দেহ কাবু
এপ্রেণ্টিস পড়ে তবু পালে পালে গিয়ে
তারা টুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে, টেবিলে শির দিয়ে।
এমন আপিস ইত্যাদি।

৫

কেরাণীদের জীর্ণ দেহ, কোথায় এমন পাবে কেহ
চাকরি, মা, তোর চরণ দুটি নিত্য পূজা করি,
আমার এই আপিসে কর্ম্ম যেন বজায় রেখে মরি!
এমন আপিস ইত্যাদি।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক, এম্, এ।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৪৪, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

ভারতী

৩৪শ বর্ষ] চৈত্র, ১৩১৭ [১২শ সংখ্যা

প্রাচীন ভারতের লোকশিক্ষা।

আমাদের জীবধাত্রী বসুন্ধরার একটা সুচিত্রিত ইতিহাস আছে। বায়স্কোপের মত একটির পর একটি স্তরবিন্যস্ত ছবি—ঘনিষ্ঠ ভাবে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে, একটির অঙ্কে আরেকটি বিশ্রাম করিতেছে। অকস্মাৎ একদিন তত্ত্ববিদের হস্ত তাহার লুকানো স্প্রিংটিকে স্পর্শ করে—আর লক্ষ লক্ষ বৎসরের কাহিনী পলি মাটির তল হইতে, প্রস্তর-স্তরের ভিতর হইতে, অঙ্গারীভূত অরণ্যের অন্তর্কক্ষ হইতে বাহির হইয়া দাঁড়ায়,—তাহার বিরাট বপু বহু বহমানকালের প্রত্যেক উর্ম্মি রেখায় আচ্ছন্ন দেখা যায়। শুধু এই খানেই তাহার সমাপ্তি নয়: তাহার জড় ও অজড়, চেতন ও অচেতন অভিব্যক্তির পথে পাশাপাশি চলিয়াছে। সৌরকক্ষে ঘূর্ণন-ক্ষিপ্ত অনলাঙ্গী দ্রবময়ী পৃথ্বী যখন সজল মৃত্তিকার স্নিগ্ধ শ্যামলিমা লাভের জন্য মুহুর্মুহু ভূকম্পনে ও বারিধারাপাতে আপনাকে পর্য্যুদস্ত করিতেছিল, তখন তাহার চিৎশক্তি তাহারই পাশ দিয়া আপনাকে অশেষ প্রকারে ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়াস পাইতেছিল। যুগ যুগান্তরের সংগ্রামের পর অবশেষে চিন্ময় মাহাত্ম্যরূপ মনুষ্যের অভিব্যক্তিতে আপনার সফলতার প্রতিষ্ঠা করিল, সমস্ত সৃষ্টি তাহার পদানত হইল, অন্ধশক্তি জাগ্রত চেতনার করায়ত্ত হইয়া পড়িল।

সেই আদিম দিবসটির সহিত আজিকার দিনটিকে যদি মিলাইয়া লইতে যাওয়া যায়, তবে সেই আত্যন্তিক বিরোধময় পরিবর্ত্তনটির মূলে যে উল্লিখিত বিকাশ আমরা দেখিতে পাই তাহা বুদ্ধি। এই বুদ্ধির সার্থকতার নামই শিক্ষা। পর্ব্বত যেমন সমস্ত সমভূমির মাঝখানে শুধু উচ্চতার দ্বারা আপনার পার্থক্যকে জাগরিত করিয়া রাখিয়াছে, মানুষ তেমনি সমগ্র জন্তুর সৃষ্টির মাঝখানে শিক্ষা দ্বারা আপনাকে স্বতন্ত্র ও অনাবৃত করিয়াছে এবং সমস্ত জড় জগৎ ও জীব জগতের মুখে বল্গা লাগাইয়া আপনার পদানত করিয়াছে!

এই শিক্ষার ঠিক একটি প্রতিশব্দ যদি বলিতে হয়, তবে "মনুষ্যত্বের বিকাশ" বলা বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্গত হইবে। তাহার এই বিশেষ উদ্দেশ্য ও বিশেষ সফলতা তাহাকে একটি অপূর্ব্ব মহিমা দ্বারা মণ্ডিত করিয়াছে। অচেতন উদ্ভিদ্ সূর্য্যালোক লাভ করিবার জন্য যেমন ঊর্দ্ধে বাহু বিস্তার করে, মানবাত্মা তেমনি একটি স্বভাবসিদ্ধ আকর্ষণে শিক্ষার দিকে উন্মুখ হইয়া আছে। তাহার অন্তঃকরণের

ভিতর সে অল্প একটা সুগভীর তৃষ্ণা জাগ্রত রহিয়াছে, নিখিল লোক তাহার পানীয় যোগাইয়া কুলাইতে পারিতেছে না।

শিক্ষাকে দুইটি বিভাগে বিভক্ত করা যায়, ব্যক্তিগত শিক্ষা ও লোকশিক্ষা। একটি ব্যষ্টি ভাবের অনুষ্ঠান, অপরটি সমষ্টি ভাবের। সমাধিনিষ্ঠ ভারতবর্ষে শেষোক্ত প্রকারের শিক্ষা প্রধান্য লাভ করিয়াছিল। এখানে তাহারই কিছু আলোচনা করা যাক।

অবশ্য প্রাচীন ভারতবর্ষ তাহার লোক-শিক্ষার প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ কোনো নৈশ বিদ্যালয় অথবা "ইনষ্টিটিউশনের নাম করিতে পারিবে না, অথবা নিম্ন শ্রেণীর লিখন ও পঠন পদ্ধতির সহিত সবিশেষ পরিচয়ের কোনো উদাহরণ দিতে পারিবে না, কিন্তু তত্রাচ লোকশিক্ষাকে সে এমন একটি বৃহৎ স্থানে বৃহত্তর করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল যে আজিকার এই লোক শিক্ষার (mass education) দুর্ব্বল চেষ্টার সহিত তাহার কোনো উপমাই চলে না। কথকতা, যাত্রাগান, পুঁথিপাঠ—এই সমস্ত ব্যাপার গুলি তাহার লোকশিক্ষার প্রধান উপায় ছিল, এবং ইহা হইতে এমন একটি সুপরিণত সফল মূর্ত্তিতে এই শিক্ষা বিকসিত হইয়া উঠিয়াছিল যে তাহা লইয়া বিচার বা দ্বন্দ্ব করিবার অবকাশ ছিল না। বর্ষার কূলপ্লাবনীর নদীর মতই সে একটি অখণ্ডনীয় পূর্ণতায় মণ্ডিত হইয়া দেখা দিয়াছিল! দাতা ভারতের এ যেন একটি অন্নসত্র—দেশে যত দুঃখী কাঙ্গাল নিরন্ন আছে, সকলেই তাহার অবারিত দ্বারে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইতেছে, অন্নপূর্ণার বেশে বীণাপাণি স্বর্ণথালে ভোজ্য লইয়া তাহাদিগকে সুধা বণ্টন করিয়া দিতেছেন!

ষ্টুয়ার্ট মিল সভ্য জগতের অবস্থা সমন্বয়ের একটি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহাতে অর্থ সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকার না থাকিয়া সাধারণ ভাণ্ডার পূর্ণ করিবার সুদূরতর আশা ব্যক্ত হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, যে লোক সমাজে এমন একদিন আসিবে, যখন ধনী তাহার পৈতৃক অথবা স্বোপার্জ্জিত অধিকারের বিপুল বিত্ত বিলাসব্যসনে ব্যয় করিতে পাইবেন না এবং দুস্থ শ্রমজীবী ও ভিখারীর দল আপনার গ্রাসাচ্ছাদনে অসমর্থ হইয়া কীট পতঙ্গের মত প্রাণত্যাগ করিবে না, সাধারণ ভাণ্ডার মাঝখানে থাকিয়া সামাজিক তুলাদণ্ডের সমতা বিধান করিবে। ষ্টুয়ার্ট মিলের এই অতিপ্রাকৃত স্বপ্নটী—যাহা অধিকাংশ লোকেরই "আকাশগামী ভাবুকতা" বলিয়া মনে হইয়াছে—একমাত্র ভারতবর্ষ তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ দিয়াছে। কি সামাজিক উৎসবে, কি ধর্ম্মোৎসবে, কি আনন্দোৎসবে,—সে শুধু আপনার চিত্ত বিনোদনকেই কেন্দ্রস্থল করে নাই, তাহার চারিদিকে যে পিপাসু হৃদয়গুলি আছে, পানীয় অভাবে যাহাদের তৃষ্ণা দূর করিবার সামর্থ্য নাই,—তাহারা তাহার উৎসব ব্যাপারের প্রধান অঙ্গ, তাহাদের ম্লান চক্ষের আনন্দ-জ্যোতি তাহার প্রধান দীপালোক!

আমাদের যাত্রাগানে ধনী সাধারণের হইয়া মূল্য দান করেন, সকলের সেখানে অবারিত দ্বার, সকলের সেখানে সমান প্রবেশাধিকার। দরিদ্র সাধারণ—তাহাদের মুষ্টিমেয় অন্ন হইতে তাহার অংশ দিতে বাধ্য

হয় না। এই সব নিরক্ষর নিম্নশ্রেণীর লোক গুলি—বর্ণমালা যাহারা কখনো চোখে দেখে নাই, তাহাদের চক্ষের কাছে ব্যাস বাল্মীকি কবি কঙ্কণের সৃষ্টি পর্য্যায়ের পরে পর্য্যায়ে জীবন্ত হইয়া উঠিতেছে,—কত জ্ঞান, কত শিক্ষা, কত ধর্ম্ম—কত প্রেম, ভক্তি, পাপ, পুণ্য—অনাদি কালের কত অনাদি কথা নির্ঝর ধারার মত তাহাদের প্রাণের ভিতর আসিয়া নামিতেছে, তাহাদের জীবনের গ্লানি দুঃখ হতাশা মনস্তাপ সব তাহারা ভুলিয়া যাইতেছে! রাম যখন পিতৃসত্য পালন করিতে বনে যাইতেছেন, সীতা যখন শ্রীরামের মন-স্তুষ্টির জন্য অগ্নিতে প্রবেশ করিতেছেন, রুক্মাঙ্গদ যখন সত্য রক্ষার জন্য বালক পুত্রের শিরশ্ছেদ করিতেছেন, সাবিত্রী যখন সত্যবানের শিয়রে আগত মৃত্যুকে তর্জ্জনী শাসনে ফিরাইয়া দিতেছেন—তখন তাহাদের অন্ধকার হৃদয় গুলি একটি অপরূপ শিক্ষার আলোক উত্তাপে বিস্ফারিত হইয়া উঠিতেছে, তাহাদের প্রতি দিনকার ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষা সুখ দুঃখ বাদ বিসম্বাদ তরঙ্গ-তাড়িত তৃণের মতন সরিয়া যাইতেছে, তাহাদের বিজ্ঞানময় সম্বিৎ সে আলোক-স্পর্শে শতদলের মত প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতেছে, এই ক্ষণিকের হ্রস্ব প্রভাতটি চিরদিনের জন্য তাহাদের হৃদয়ে একটা স্পন্দনের বেগকে জাগরিত করিয়া যাইতেছে। নীহারিকা ঘনীভূত হইয়া যে পৃথিবীর আকার ধারণ করিয়াছে, অথবা সৃষ্টির কীট পতঙ্গ হইতে বহুপদ চতুষ্পদ প্রভৃতির ক্রম পর্য্যায়ে দ্বিপদ মনুষ্যের আবির্ভাব হইয়াছে—বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিয়া তাহারা তাহা নাই বা শিখিল, তাহারা দেখিতেছে তাহাদের চক্ষের সম্মুখে পৃথিবী সৃষ্ট হইতেছে, জল হইতে স্থল উদ্ভূত হইতেছে, অন্ধকার হইতে আলোক জন্ম লইতেছে—অভিব্যক্তির পর্য্যায় ক্রমে তাহাদের দেবতা মৎস্য রূপ হইতে কূর্ম্মরূপে, কূর্ম্ম হইতে বরাহ রূপে, বরাহ হইতে অর্দ্ধনরাকার রূপে অর্দ্ধনরাকার হইতে খর্ব্ব বামন রূপে, বামনরূপ হইতে অবশেষে বিরাট-দেহ বৃষস্কন্ধ শালপ্রাংশু মহাভুজ সুঠাম নরাকারে প্রকাশিত হইতেছে! সভ্যজগতকে বুঝাইতে গিয়া ডারুইন যে গবেষণা করিয়াছিলেন (যদিও এখন ডারুইনের সেই মত সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশিত হইতেছে) —কলালক্ষ্মীর অঙ্গনে সঙ্গীতের সৌন্দর্য্যা-লোকে তাহারা তাহাকে মূর্ত্তিমন্ত হইয়া উঠিতে দেখিতেছে! তাহাতে কোনো কঠোরতার লেশ নাই, পীড়নের অসহিষ্ণুতা নাই, শিক্ষার অত্যাচারের জগদ্দল পাষাণটিকে ঠেলিয়া ফেলিয়া কাব্য সাহিত্য, দর্শন ধর্ম্মশাস্ত্র একটি প্রবল নির্ঝর ধারার মত উৎসারিত হইয়া চলিয়াছে! তাহার অমৃতের এই অনন্ত প্রস্রবণটিতে আপামর সাধারণ তৃষ্ণা নিবৃত্তি করিতেছে, তাহাদের জীবন যাত্রার তিমিরাবৃত পথগুলি এই অপরূপ দীপের শত-শিখা বর্ত্তিকার আলোকে ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিতেছে! তাহাদের সম্মুখে তাহারা দেখিতেছে বিধাতার জগৎ-সৃষ্টির লীলাভিনয়—পাপপুণ্যের দণ্ডাভিনয়, মহৎ ও ক্ষুদ্রের কর্ম্মাভিনয়;—ভক্তিতে আনন্দে ও মহৎ ভাবের উদ্দীপনায় তাহাদের হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠিতেছে, তাহাদের চারিদিককার কারা-প্রাচীর তাহাদের চোখের কাছ হইতে সরিয়া যাইতেছে!

এই নিম্ন শ্রেণীকে অশিক্ষিত বলিয়া শিক্ষিত

সমাজ যতই ঘৃণা করুক না কেন, শ্রদ্ধাযোগ্য চরিত্র তাহাদের ভিতর বিরল নহে এবং মার্জ্জিত রুচি-ই যদি শিক্ষার পরাকাষ্ঠা না হয়, তবে বহুস্থলে-ই তাহারা তাঁহাদের সহিত সমশ্রেণীতে দাঁড়াইবার যোগ্য। একটি বিস্ময়কর বিষয় এই, যে অনুপাতে তাহারা "অশিক্ষিত" সেই অনুপাতে তাহারা ধর্ম্মনিষ্ঠ। ইহা বেশ দেখা যায় যে ধর্ম্মকে তাহারা বিচার করিবার মত কোনো ক্ষুদ্র জিনিস বলিয়া মনে করে না ও তাহার প্রত্যেক অনুষ্ঠান ও অনুশাসন লইয়া আপনার সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির পরিমাপ-যন্ত্রে তৌল করিতে বসে না। যে বৃহৎ শক্তি এই আবহমান কালের ধর্ম্মবুদ্ধিকে ও ধর্ম্মশাসনকে জন্মদান করিয়াছে, একান্ত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সঙ্গে তাহারা তাহাকে মানিয়া লয়, প্রত্যেকের খণ্ড বুদ্ধি দ্বারা সেই অখণ্ড সত্বাটিকে খণ্ডিত করে না। বৃন্তচ্যুত হইলে বৃক্ষের ফল শূন্যমার্গে ভ্রমণ না করিয়া কেন ভূপৃষ্ঠে পতিত হয় অথবা মানবকুলের পূর্ব্ব পুরুষ কপিবংশ ছিল কি না তাহা তাহারা অবগত না থাকিলেও বিধাতার নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মবিধি লঙ্ঘন করিলে যে ফল হয় তাহার সহিত যথেষ্ট পরিচিত আছে। এই বিশ্ব-ভুবনের ভিতরে, সমস্ত সংশয়, দ্বিধা ও মূঢ়তার কোলাহলের পাশ দিয়া নিত্য প্রেমের যে শুদ্ধ নির্ম্মল ধারাটি বহিয়া চলিয়াছে, জীবন তরণী গুলিকে বিশ্বাসের পাল তুলিয়া তাহার প্রবাহ-মুখে ছাড়িয়া দিয়াছে, এবং তাহাদের শ্রদ্ধা ও ঐকান্তিকতা ঝড়ের বাতাস ঠেলিয়া গুণ টানিয়া তাহাদিগকে তীরের দিকে টানিয়া লইতেছে।

এই সব সংখ্যাতীত পথ—সংখ্যাতীত দিক্ দিয়া একটিমাত্র গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়াছে, ভারতবর্ষ তাহার ভিতর হইতে সর্ব্বাপেক্ষা সরল পথটি বাছিয়া লইয়াছে। জ্ঞান জিনিসটা খানিকটা মরীচিকার মত— তাহা শুধু লুব্ধ করে, তৃপ্তিদান করিবার ক্ষমতা তাহার নাই, তাহার অসংখ্য নীর অনুসরণ করিয়া যতদূরই যাওয়া যাক্ না কেন, কাহারও কখনও তাহা পানে তৃষ্ণা নিবৃত্ত হন নাই। নিউটন যাহার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন; "লোকে আমাকে কি মনে করে তাহা আমি বলিতে পারি না। কিন্তু আমার মনে হয় জ্ঞানমহার্ণব আমার সম্মুখে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে—আমি বালকের ন্যায় বেলাভূমিতে উপলখণ্ড আহরণ করিতেছি মাত্র।"

মুষ্টিমেয় আয়ু ও ক্ষণভঙ্গুর কায়া লইয়া সেই মহাসমুদ্র উত্তরণের দুরাশার অনুসরণ করিতে ভারতবর্ষ উদ্যত হয় নাই। ভোরের বেলা পাখী যখন আকাশে উড়িতে থাকে, তখন সেই উড়িবার আনন্দটুকু ছাড়িয়া যদি সে তাহার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের একটা হিসাব খাড়া করিতে উদ্যত হয়, তবে অবোধ ক্ষুদ্র প্রাণী সূর্য্য-রশ্মি-স্পৃষ্ট হইয়াই মরিবে, কোনো আনন্দ সে তাহা হইতে লাভ করিতে পারিবে না। এই সহজ ও সুদূর জ্ঞানকে হৃদ্গত করিয়া ভারতবর্ষ তাহার লোকশিক্ষার মূলে সেই একটি শিক্ষাকেই জাগ্রত রাখিয়াছে, সমস্ত যাত্রাপথে সেই একটি স্থানকেই লক্ষ্যস্বরূপ করিয়া নয়নাগ্রে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, সমস্ত আয়োজনের ভিতর সেই একটি প্রতিপাদ্য বিষয়কে ঘোষণা করিয়াছে! সে কেবল বলিতেছে "যাহাতে তোমরা অমৃতত্ব লাভ

করিবে না—তাহার দিকে তোমাদের চেষ্টাকে পরিচালিত করিয়ো না, আত্মদান কর তোমরা সেই শাশ্বত ভূমাকে—যাহা তোমাদিগকে তোমাদের ক্ষুদ্রতা ও নশ্বরতার উপর উত্থিত করিবে!” প্রাচীন ভারতবর্ষের প্রতি শিরায় সে বাণী স্নায়ুরাগের মত ব্যাপ্ত হইয়া আছে, মজ্জার মত অস্থির ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে, মনের মধ্যে আত্মার মত বিরাজ করিতেছে! যুগ যুগান্তরের স্থিতিতে ক্রমশঃ তাহা প্রস্তরীভূত হইলেও তাহাকে সে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিতে পারিতেছে না, চারিদিক্ হইতে যখন তাড়নার কশা তাহার উপর পড়িতেছে, তখনও সে আপনাকে তাহা হইতে মুক্ত করিতে পারিতেছে না। সকলে তাহাকে বলিতেছে—“জাগ, জাগ, তোমার বুকের উপর হইতে ঐ পাষাণ পিণ্ডটা ফেলিয়া দিয়া লঘুপদে আমাদের সহিত ছুটিয়া চল। দেখিতেছ না, দৌড়ের (race) ঘণ্টা পড়িয়াছে—এই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের বিষম দ্বন্দ্বক্ষেত্রে যে আগে যাইবে, সেই জিতিয়া যাইবে, পিছনে পড়িলে আর রক্ষা নাই। ছুট! ছুট!” কিন্তু তবু সে তেমন করিয়া ছুটিতে পারিতেছে না, তাহার বুকের ভিতর ভঙ্গুর জগতের কঠিন সত্যের গুরুভার তাহার গতি মন্থর করিয়া দিতেছে!

অবশ্য একথা সত্য যে ইউরোপ লোকশিক্ষাকে কোনো ক্রমেই অবহেলা করে নাই। কর্ম্ম ও চেষ্টা দ্বারা যতদূর করা যায় তাহার কোনো দিক্ হইতেই তাহার অভিযুক্ত হইবার আশঙ্কা নাই। কিন্তু এ সম্বন্ধে একটি কথা ভাবিয়া দেখিবার আছে। চন্দ্রের আলো যেমন সূর্য্যালোকেরই আভাসমাত্র—তাহার নিজস্ব কিছু নয়, মানুষের শক্তি মাত্রই ঠিক্ তেমনি একটি মহান্ শক্তির আভাস মাত্র, তাহা ঠিক্ তাহার আত্মগত ক্ষমতা নহে। এই ধীশক্তি—জ্ঞানকে যাহা স্তন্যদান করিয়া পূর্ণবয়ঃ করিয়া তুলিতেছে—তাহার ভিতর যে মহিমার দিব্য জ্যোতি আছে—‘সাধারণ’ ভূমিতে কচিৎ তাহার বিকাশ দেখা যায়। সুপরিণত বিদ্যা—বংশগত ফলের অপেক্ষা রাখে, পুরুষানুক্রমিক প্রবণতার উপর তাহা বহুপরিমাণে নির্ভর করে। চাষার ছেলে যখন চাষের কাজ করিতে আরম্ভ করে, তখন তাহাকে সপ্তসমুদ্র পাড়ি দিয়া কোথাও গিয়া কৃষিবিদ্যা শিখিয়া আসিতে হয় না, তাহার কাজের সমস্ত কৌশলই শৈশব হইতে তাহার অজ্ঞাতসারেই সে অধিগত করিয়া বসিয়াছে। সুতরাং তাহার কার্য্যে তাহার সফলতার মূলে আমরা দেখিতে পাই তাহার বংশগত প্রবণতা তাহার পৃষ্ঠপোষক শক্তিস্বরূপ কাজ করিতেছে এবং তাহার আশৈশবের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা—তাহাকে নিষ্ফলতার বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ সংগ্রামের জন্য প্রভূতরূপে ক্ষমতাপন্ন করিয়াছে। দেবী বীণাপাণি আশুতোষের মত স্বল্প পূজায় প্রসন্ন হন না, অগভীর বিদ্যা উচ্চ জলসেকের মত কল্যাণের মূল বিনষ্ট করে, পুষ্পোদ্গমের সহায়তা করে না। এই শ্রমজীবিগণ ললাটের স্বেদ সিঞ্চন করিয়া যাহারা অন্ন ও লোকসমাজের প্রয়োজনীয় তাবৎ দ্রব্যাদি উৎপাদন করে—বিদ্যামন্দিরে স্বেচ্ছাসেবক (amateur) হওয়া তাহাদের পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র—অন্ততঃ আমাদের দেশে তাহাদের

চেষ্টা ও কর্ম্মকে কমলার দ্বারে অঞ্জলি প্রদান করিয়া যখন তাহারা বীণাপাণির প্রসাদ আকাঙ্ক্ষা করে, তখন তিনি বরের পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করেন।

ইউরোপ সাধারণের শিক্ষার জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়া বিদ্যা শিক্ষার বহু ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। নৈশ বিদ্যালয়, অবৈতনিক বিদ্যালয়, ফ্রি লাইব্রেরী—কোনো দিক্ দিয়া সে কিছু বাকি রাখে নাই। তাহার অতি সচেতন সভ্যতা লিপিবিদ্যার পরিচয়ের অভাবকে জীবনের সমস্ত দৈন্যের ভিতর হীনতম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে এবং বিদ্যাশিক্ষাকে ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও অভি-রুচির উপর ছাড়িয়া না দিয়া সে দেশের আইনকে ও সমাজশক্তিকে তাহার রক্ষার জন্য প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছে। তাহার বিধান অনুসারে প্রত্যেক শিশু পঞ্চম বর্ষে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যামন্দিরে প্রবেশ না করিলে তাহার অভিভাবকগণের দণ্ড গ্রহণ করিতে হয়। এখন দেখা যাক্ শিক্ষার এই বৃহৎ চেষ্টা ও বিরাট্ আয়োজন কি পরিমাণ সার্থকতার দ্বারা পুরস্কৃত হইতেছে। হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের ভাষায় বলিতে গেলে বলা যায় যে, "শিক্ষার প্রধান কার্য্য আমাদিগকে সম্পূর্ণভাবে জীবনযাপনের উপযোগী গড়িয়া তোলা।" সোনাকে পরীক্ষা করিয়া লইতে গেলে যেমন কষ্টি পাথরে আঁক দিয়া লইতে হয়, তেমনি পশ্চিমের প্রবল চেষ্টা ও কঠিন ব্যবস্থার এই শিক্ষা পিণ্ডটাকে আমরা যদি পরীক্ষা করিতে যাই, তাহা হইলে নিকষ সোনার বহ্নিপীত রেখাটির পরিবর্ত্তে একটি মলিন কৃষ্ণ রেখাই আমাদের চোখে পড়িবে। ইউরোপ নিজেও আর একথা অস্বীকার করিতে পারিতেছে না, যে গুরুভার নিষ্ফলতা বৃহৎ বাষ্পের মত তাহার আশা-দীপ্ত চক্ষের আনন্দ-জ্যোতিকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইতেছে—তাহা তাহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে একটা অস্ফুট ভীতির বেদনা-শিহরণ প্রেরণ করিতেছে। আজ আমরা তাহাদিগকে বলিতে শুনিতেছি যে, "শিক্ষা, বিজ্ঞান, কলাবিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষার বহুতরবিষয় সম্বন্ধে আমরা প্রচুর পর্য্যালোচনা করিয়া থাকি, কিন্তু তাহার ফলে এখন এইরূপ প্রমাণই পাইতেছি যে শিক্ষা যখন আইন-নির্দ্দিষ্ট ছিল না তখনকার কাজই সর্ব্বাংশে প্রশংসা যোগ্য ছিল। তখনকার ইমারতের গঠনপ্রণালী আধুনিক প্রণালী অপেক্ষা উন্নততর ছিল, এবং গৃহ-সজ্জার উপকরণাদি অধিকতর স্থায়ীভাবে নির্ম্মিত হইত। ষষ্ঠদশ শতাব্দীর তাপরক্ষার উপযোগী পুরু দেয়াল ও ওক কাষ্ঠের থামওয়ালা কৃষিবাটিকা অথবা বৃহৎ প্রাসাদের সঙ্গে আধুনিক পল্লীস্থাপত্যের কোনো উপমাই চলে না। প্রাচীনকালের কাঠের সিঁড়ি যে বাড়ীতে আছে সে বাড়ীতে তাহা একটি সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে,—তাহা শুধু প্রাচীনত্বের জন্য নহে, গঠনের অনুপমত্বের জন্যই তাহার আদর। আমাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিল্পীগণ চেষ্টার দ্বারা তাহার অনুকরণ করিতে পারে বটে কিন্তু কখনও অতিক্রম করিতে পারে না। ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে আমাদের অপেক্ষা আমাদের

পিতামহগণ যোগ্যতা ও সৌন্দর্য্যজ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। ঈশ্বরার্চ্চনার জন্ম নির্ম্মিত এখনকার এই অশোভন ধর্ম্মমন্দিরগুলির তুলনায় তখনকার মন্দিরগুলি দেখিয়া এ কথার সত্যতা বেশ বোঝা যায়।”

* * * *

“যখন আমরা মনস্বিতার উন্নততর ভূমিতে আসিয়া দাঁড়াই, তখন আমরা দেখিতে পাই যে আর্ট স্কুলের প্রাচুর্য্য সত্বেও কোনো ব্রিটিশ বড় আর্টিষ্ট নাই এবং যদিও প্রত্যেকেই লিখন ও পঠনপদ্ধতির সহিত পরিচিত, তথাপি সেক্সপীয়র্, স্কট্, থ্যাকারে, ডিকেন্সের মত উচ্চাঙ্গ সাহিত্যের এ যুগে একান্ত অভাব। শিক্ষা যে যুগে আইননির্দ্দিষ্ট ছিল না, তাঁহারা সেই যুগেরই লোক ছিলেন।”

শিক্ষা সম্বন্ধে এই অসন্তোষের গুঞ্জরণ এখন চারিদিক হইতেই ধ্বনিত হইতেছে। সভ্যতা বাহিরের ঐশ্বর্য্যকে যতই স্ফীত করিয়া তুলিতেছে, ভিতরের দৈন্ম ততই যেন গভীর হইতেছে। মানুষ সেই অতলস্পর্শ গহ্বরটিকে বুজাইবার জন্ম হাতের কাছে যাহা পাইতেছে তাহাই যেন চোখ বুজিয়া তাহার মধ্যে ফেলিয়া দিতেছে। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের দ্বন্দ্বে ত্বরাগ্রস্ত জনসমূহ যেন তাহাদের হাতের দিকে চাহিবার অবকাশ পাইতেছে না। যুদ্ধ যখন ঘোরতর বাধিয়া ওঠে আগ্নেয়াস্ত্রের ধূমে অন্ধ সেনারা তখন যেমন আপন দলের লোকের উপরেই অস্ত্র বর্ষণ করিতে থাকে তেমনিতর একটা প্রচণ্ড লাভের চেষ্টা আজ তাহাদের এমন পাইয়া বসিয়াছে যে, তাহার প্ররোচনায় কল্যাণবুদ্ধিকে তাহারা যেন বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছে!

কিন্তু সাধারণের ভিতর শিক্ষা কোনো সফলতা উৎপন্ন করিতে পারে নাই একান্ত ভাবেই যদি একথা বলা যায় তাহা হইলে শুধু নিজের মতকেই প্রচার করা হয় সত্যকে নয়। ভিক্টর হুগো বলিয়াছিলেন “বিদ্যামন্দিরের দ্বার যে উন্মোচন করে সে বন্দীশালার দ্বার রুদ্ধ করে।” তাঁর কথা মতই আমরা সার জন লাবকের প্রকাশিত ইংলণ্ডের অপরাধী তালিকায় দেখিতে পাই—১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ইংলণ্ডে ‘এডুকেশন আইন প্রতিষ্ঠার পর তাহার পরবর্ত্তী সাত বৎসরের মধ্যে অপরাধীর সংখ্যা ২০৮০০ হইতে ১৩০০০তে নামিয়া গিয়াছিল। প্রতি বৎসরের লোক-সংখ্যার বৃদ্ধির হারের সঙ্গে যোজনা করিলে ইহা একটি বৃহৎ সার্থকতার পরিচয় প্রদান করে।

প্রাচীন ভারতবর্ষ শিক্ষার একটি বৃহত্তর আকার দিয়াছিল। শুধু সভ্যতার জন্ম নয়, জ্ঞান-গরিমার গৌরবের জন্ম নয়, সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধির জন্ম নয়, মনুষ্যাত্মার মুক্তির, একটি অত্যুন্নত লক্ষ্যের দিকে চাহিয়া সে তাহার বর্ত্তিকা জ্বালাইয়াছিল! একটু একটু করিয়া পথ না চলিয়া সে একদমেই সমস্তটা পথ চলিবার আয়োজন করিয়াছে, পথের ধারে প্রমোদ নিকেতন গুলিতে থাকিয়া দীর্ঘ যাত্রাকে দীর্ঘতর করিয়া তোলে নাই, পথশ্রমে তাহার শ্রান্ত পদ যখন বেদনায় টন্ টন্ করিয়াছে তখন সে এক মনে সেই চিরবিশ্রামের জায়গাটিকে স্মরণ করিয়া তাহার মনের সমস্ত কাঠিন্যকে পুঞ্জীভূত করিয়া যষ্টির মত হাতে আঁটিয়া ধরিয়াছে! বাড়ীতে যাইবার জন্মই যে

পথের সৃষ্টি, পথের জন্য বাড়ীর সৃষ্টি নয়—সেইটে মনে করিয়া সে অলস বিশ্রামে পথের ধারে দাঁড়াইয়া আমোদ উপভোগের বাসনা করে নাই, তাহার স্নেহবুভুক্ষু হৃদয় ছায়া রৌদ্র বিচার না করিয়া আপনার দুঃসহ তাগিদে বাড়ীর দিকে ছুটিয়াছে, তাহার সমস্ত আনন্দ, উল্লাস, বিশ্রাম সেইখানেই অপেক্ষা করিয়াছে, এবং সেইখানে না পৌঁছান পর্য্যন্ত তাহার তৃপ্তি হয় নাই! তুঙ্গ গিরি শিখরে অবস্থিত সেই চির স্থির মৃদু জ্যোতির দিকে তাহার চক্ষু অনিমেষ হইয়া আছে, জীবনের পরপারের অন্ধকারে যেখানে জ্ঞান বিজ্ঞান সভ্যতা হঠিয়া দাঁড়াইবে—যে অজ্ঞাত পথের সম্মুখে আসিয়া ঐশ্বর্য্য ও বৈভবের দীপ্তি কৃত্রিমতার ব্যর্থতায় মলিন হইয়া নিভিয়া যাইবে—সেইখানে সে দীপ্ত-হস্তে জাগিয়া বসিয়া আছে, চারিদিকে তাহার যে সব যাত্রী আনাগোনা করিতেছে তাহাদের সে ডাকিয়া বলিতেছে "গৃহ-গমনোৎসুক কে আছ সে এস, জীবনের এই হ্রস্ব বেলার পারে যে অনন্ত দিবস আছে সেখানে কে পৌঁছিবে এস, তাহার জন্য কে প্রস্তুত হইতে চাও এস!"

ক্লেশের উপর ভারতবর্ষের একটা সহজ স্বাভাবিক প্রবল অবজ্ঞা ছিল। দুয়ারের কাছে করোটি-কপাল-ভগ্নালঙ্কারে সজ্জিত দুঃখকে দেখিয়া সকলে যখন সভয়ে কপাট বন্ধ করিয়া দিয়াছে, তখন সে হাস্যমুখে আপনার ঘরের ভিতর তাহার বসিবার আসন বিছাইয়া দিয়াছে, তাহার অপেক্ষা শক্তিতে যে সে হীন নয়, তাহার প্রবলতম আঘাতকেও যে সে উপেক্ষা করিতে পারে তাহা সে সদর্পে প্রকাশ করিয়াছে।

দারিদ্র্যে, অনাহারে, রোগে, মহামারীতে ভারতের লক্ষ লক্ষ লোক প্রতি বৎসর মৃত্যু-মুখে পতিত হইতেছে কিন্তু এ বিরাট মৃত্যু কি নিস্তব্ধ, নীরব, জড়ের মত কি ভয়ানক মূর্ত্তি! কেহ তাহাকে দেখিতে পাইতেছে না, কেহ তাহার কণ্ঠ শ্রবণ করিতে পাইতেছে না, আলোকিত আকাশের নীচে চলমান্ নিস্তব্ধ মেঘ-পুঞ্জের বিস্তৃত অন্ধকার ছায়ার মত নীরবে তাহা সমাজের উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। প্রাচীন ভারতবর্ষ! তাহার অন্তরের ভিতর সহিষ্ণুতার যে অপরিসীম বীর্য্য রক্ষিত আছে, তাহা বিভীষিকায় বিচ্যুত হয় নাই, ঝঞ্ঝার পর্য্যুদস্ত হয় নাই, কঠোরতায় নম্র হয় নাই; যুগযুগান্তরের সাধনা তাহাতে সঞ্চিত হইয়া আছে, বিপুল তপোতেজে তাহা অক্ষতপ্রায় রহিয়াছে! অবশ্য ইহা সত্য যে ভারতীয় জল বায়ু তাহার অধিবাসী-গণের একটি বিশেষ সম্পদের মধ্যে পরিগণিত। মুষ্টিমেয় তাম্রখণ্ড ও জীর্ণ চীর—ইহা হইলেই তাহারা জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হয়, শীতপ্রধান দেশের লোকেরা প্রকৃতি-জননীর নিকট হইতে এই অনুকূলতা প্রাপ্ত হয় না। হিংস্র প্রকৃতি ক্রূর বিমাতার মত তাহাদের আপনার তীক্ষ্ণ নখরে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া রক্তপানের জন্য লোলুপ হইয়া বসিয়া আছে, এবং গ্রাসাচ্ছাদন যোগাইতে অসমর্থ হতভাগ্যগণ তাহার কবলে পতিত হইয়া জীবলীলা সাঙ্গ করিতে বাধ্য হইতেছে।

দরিদ্র ভারতের সঙ্গে তুলনা করিলে দেখা যায় যে ইউরোপে 'charity'র অশেষ

বিস্তার সত্ত্বেও তাহার নিরন্ন অধিবাসীগণকে মনুষ্যত্ব রক্ষার বীর্য্য দান করিতে পারিতেছে না। জাতীয় সাহিত্যকে যদি জাতীয় অবস্থার নজির ধরা যায় তবে একথা কিছুতেই অস্বীকার করিবার যো নাই। অন্য সব লেখকগণকে বাদ দিয়া কেবলমাত্র ডিকেন্সের উপন্যাস হইতে দরিদ্র পল্লীর রজনীর অতি সংক্ষিপ্ত একটি চিত্র দেওয়া যাক্। ভাগ্য বিপর্য্যয়ের ক্রূর আবর্ত্তে পড়িয়া গৃহহারা বালিকা রাজধানীর ভিতর আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছে, ডিকেন্স বর্ণনা করিতেছেন—

"এই ভয়ঙ্কর স্থানে রাত্রি! ধূম যখন বহ্নিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, এবং প্রত্যেক চিমনি শিখা বিস্তার করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, সেই সব জায়গা গুলি—সমস্ত দিন যাহা মৃতের সমাধি মন্দিরের মত অন্ধকার ছিল, অকস্মাৎ শোণিত-দীপ্ত বর্ণে ঝলকিতে লাগিল। রাত্রি—যখন প্রত্যেক কলের শব্দ ভয়াবহ হইয়া বাড়িয়া উঠিতে লাগিল—যখন তাহার চারিধারে লোকগুলি অধিকতর বর্ব্বর ও বন্য দেখাইতে লাগিল, কর্ম্মহীন শ্রমজীবির দল দলে দলে রাস্তা দিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল, অথবা মশালের রক্ত আলোক ধরিয়া তাহাদের নেতৃদলকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়া কর্কশ ভাষায় তাহাদের কৃত দুষ্কর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতে লাগিল এবং ভয়াবহ চীৎকারে ও ভয় প্রদর্শক বাক্যে তাহাদের উত্তেজিত করিতে লাগিল। সেই সব রমণীরা—যাহারা প্রার্থনা ও অনুনয়ের দ্বারা নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিল—তাহাদের দূরে নিক্ষেপ করিয়া ক্ষিপ্তবৎ লোকগুলি মশাল ও তরবারি লইয়া ভয়াবহ কার্য্য ও ধ্বংসের দিকে ধাবমান হইতে লাগিল, ধ্বংস—যাহাতে অন্যের অপেক্ষা নিজেদের বিনাশই সর্ব্বাপেক্ষা সাধিত হইতেছিল! রাত্রি—শকট সমূহ যখন মৃতের সজ্জাহীন শবাধার বহন করিয়া আনিতে লাগিল, অনাথ বালকবালিকার ক্রন্দন ধ্বনিত হইতে লাগিল, উন্মাদ রমণীগণ চীৎকার করিতে লাগিল, এবং সুপ্তির ভিতর ভ্রমণ করিতে লাগিল! রাত্রি—যখন কেহ আহার্য্যের জন্য, কেহ যন্ত্রণা ভুলিবার উদ্দেশ্যে পানের জন্য চীৎকার করিতে লাগিল, কেহ অশ্রুচক্ষে, কেহ স্খলিত গতিতে কেহ রক্ত চিহ্নিত চক্ষে অন্ধকার চিন্তাচ্ছন্ন হইয়া বাড়ী ফিরিতে লাগিল, রাত্রি—যাহা ঈশ্বরের প্রেরিত রাত্রির মত শান্তি, বিরাম, ও ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ পূত নিদ্রা বহন করিয়া আনিতে ছিল না!"

কি ভয়ানক শোচনীয় এই ছবি! ভারতের নিদ্রামৌন ঝিল্লিমুখর নক্ষত্রের আলোকপাত মধুর রাত্রির সঙ্গে এই রাত্রির কি প্রভেদ! এই সন্ধ্যা—যখন

"মৌন নভস্থল
ছায়াচ্ছন্ন মৌন বন মৌন জল স্থল
স্তম্ভিত বিষাদে নম্র। নির্ব্বাক নীরব
দাঁড়াইয়া সন্ধ্যা সতী,—নয়ন পল্লব
নত হয়ে ঢাকে তার নয়ন যুগল
অনন্ত আকাশ পূর্ণ অশ্রু ছলছল
করিয়া গোপন। বিষাদের মহাশান্তি
ক্লান্ত ভুবনের তলে করিছে একান্তে
সান্ত্বনা পরশ দান।
ক্ষুদ্র নদীতীরে
সুপ্তপ্রায় গ্রাম। পক্ষীরা গিয়াছে নীড়ে
শিশুরা খেলে না, শূন্য মাঠ জনহীন
ঘরে ফেরা শ্রান্ত গাভী গুটি দুই তিন

কুটীর অঙ্গনে বাঁধা, ছবির মতন
স্তব্ধপ্রায়। গৃহকার্য্য হ'ল সমাপন,—
কে ঐ গ্রামের বধূ ধরি বেড়াখানি
সম্মুখে দেখিছে চাহি, ভাবিছে কি জানি
ধূসর সন্ধ্যায়। অমনি নিস্তব্ধ প্রাণে
বসুন্ধরা দিবসের কর্ম্ম অবসানে
দিনান্তের বেড়াটি ধরিয়া আছে চাহি
দিগন্তের পানে, ধীরে যেতেছে প্রবাহি
সম্মুখে আলোক স্রোত অনন্ত অম্বরে
নিঃশব্দ চরণে, আকাশের দুরান্তরে
একে একে অন্ধকারে হতেছে বাহির
একেকটি দীপ্ত তারা সুদূর পল্লীর
প্রদীপের মত।
ক্রমে ঘনতর হয়ে
নামে অন্ধকার, গাঢ়তর নীরবতা,
বিশ্ব পরিবার তাহে সুপ্ত নিশ্চেতন"—

ইহার সঙ্গে এই রক্তচক্ষু বহ্নি-শিখা-স্ফুরিত কোলাহল দুঃসহ আহ্লাদ ঝঙ্কৃত ভয়াবহ দৃশ্যে পরিপূর্ণ সন্ধ্যার কি প্রভেদ! আমাদের এই দরিদ্র, প্রাচীন, অবজ্ঞাত ভারতবর্ষ! তাহার এই পার্থক্য কি অপরিমেয়, কি অনমুমেয়! এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যতা ও সুরুচির ক্ষেত্রে জগতের অপরাপর জাতির সঙ্গে সমকক্ষ হইয়া সে না দাঁড়াইতে পারে, কিন্তু যাঁহাকে পাইলে "পুমান সিদ্ধোভবত্যমৃতী ভবতি তৃপ্তো ভবতি, যৎ প্রাপ্য ন কিঞ্চিদ্বাঞ্ছতি—" তাঁহাকে আপনার বক্ষতলে বন্দী করিয়া সে বিশ্ব সংসার ভুলিয়া গিয়াছে। তাহার নির্ব্বুদ্ধিতার ক্রুদ্ধ হইয়া সকলে তাঁহাকে অভিসম্পাৎ করিতেছে, ব্যঙ্গ করিতেছে, হাসিতেছে। অভাবের ভিতর তৃপ্ত, ভোগের ভিতর রিক্ত, সমস্ত কাঠিন্যের ভিতর আপনার অন্তরের অক্ষয় অমৃত রসধারায় সিক্ত হইয়া ভারতবর্ষ শুধু হাসিয়া বলিতেছে "ঐ খেলার সীমানা দেখিতেছ? আমি তাহা ছুঁইয়া পার হইয়া আসিয়াছি, আমার ছুটী হইয়া গিয়াছে, তোমরা এস, আমার পিছনে এস! তোমাদের বুড়ি যখন ছোঁওয়া হইয়া যাইবে তখন আমি পুরোবর্ত্তী থাকিয়া পরম পরিণামের পথ তোমাদিগকে দেখাইয়া লইয়া যাইব!

শ্রীআমোদিনী ঘোষজায়া।

সন্ন্যাসী।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ তুলিয়া চলিয়াছে চঞ্চলা মধুমতী, আর তার দক্ষিণকূল হইতে নামিয়াছে, সোপান শ্রেণীবদ্ধ জীর্ণ ঘাট্‌লা! সেই প্রস্তর বাঁধা ঘাট্‌লা, কোন্ অতীত যুগের সাক্ষ্য বহন করিতেছে, তাহা সে মুখ ফুটিয়া বলেনা! ঘাট্‌লার অদূরে বিগ্রহশূন্য ভগ্ন মন্দির—তার মাঝে খানিকটা ছাই আর ভস্ম,—কিছু কাঠ, আর একটা ভাঙ্গা হাঁড়ি,—কবেকার এক নৌকারোহী অতিথির রন্ধন-আয়োজন চিহ্ন!

মন্দিরের পাশ দিয়া গ্রামের পথ চলিয়াছে —তার পাশে পাশে দু'একটা ঝাউ, এক আধটা আম কাঁঠালের গাছ, সে পথটিকে শ্যামল ছায়াবৃত করিয়া রাখিয়াছে! পল্লীর লোক দল বাঁধিয়া সেই পথে ঘাটে আইসে,— স্নান করে। বালকবালিকারা ঘাট্‌লার

দাঁড়াইয়া মধুমতীর তরঙ্গ দেখে, আর নৌকা গণে! বধূরা গুণ্ঠনের অন্তরাল হ'তে কৌতূহলী দৃষ্টিতে খোলা মাঠ, নদীর দুকূল আর মৃদুবায়ু কম্পিত হরিৎ ধান্যশীর্ষ দেখিয়া, মধুমতীর মিঠা জলে কলসী ভরিয়া লইয়া, ঘরে ফেরে!

এমনি প্রত্যহই দিন কাটে! সেদিন সকালে গ্রাম্যবধূরা কলসী কক্ষে জল লইতে আসিয়া দেখিল, ছাই ঠেলিয়া, কাঠ সরাইয়া, হাঁড়ি ফেলিয়া দিয়া সেই ভগ্নমন্দির কে পরিষ্কার করিয়াছে! মন্দির মার্জ্জনায় ভক্ত হস্তে সেবাচিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে? যুবকেরা আসিয়া দেখিল, সে এক গৈরিক পরিহিত তরুণ সন্ন্যাসী! অঙ্গ তাহার ভস্মপ্রলিপ্ত নহে, শিরে তার জটাভার নাই, তবু দেবাদিদেবের ন্যায় তাহার কান্তি—প্রভাতারুণের ন্যায় তাহার অপূর্ব্ব শ্রী;—ম্লান মন্দির রূপের আভায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে!

তার সঙ্গে ছোট একটী বীণ্! ভক্তহস্ত স্পর্শে সে বীণ্ সায়াহ্নে প্রভাতে বাজিয়া উঠে —আর সেই তরুণ সন্ন্যাসীর মধুরকণ্ঠ নীলাকাশ প্লাবিত করিয়া বীণের সুরের সঙ্গে সঙ্গে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে। বিহঙ্গ কাকলী ভুলিয়া স্তব্ধ হইয়া সে গান শোনে—মধুমতী সে কণ্ঠ শুনিবার জন্য ঘাট্‌লার পাথরের উপর আছাড়িয়া পড়ে!

বৃদ্ধারা সন্ন্যাসীকে দেখে—মনে করে, 'আহা কার বাছাগো" !"—অশ্রু আসিয়া তাহাদের দৃষ্টিশক্তি ম্লান করিয়া দেয়! যুবতীরা দেখে—ভাবে,—'কোন্ অভাগীর হৃদয়পিঞ্জর ভাঙ্গা পাখীরে!'—অবগুণ্ঠনের মধ্যে তাহাদের পদ্মচক্ষু করুণাপ্লুত হইয়া উঠে!

যে যাহার উপহার আনিয়া মন্দিরের দুয়ারে আনিয়া স্তূপ করে—আর সে তাহার পুঁথি নিয়া, বীণ্ নিয়া, গান নিয়া তন্ময় থাকে! বৃদ্ধারা প্রৌঢ়ারা ছাড়েনা—যেদিন যাহার হাত থেকে সে দুটা ফল গ্রহণ করে, সে কৃতার্থ হইয়া চলিয়া যায়!—এত প্রেম, এত স্নেহ সঞ্চিত মানুষের হৃদয়ে;—সন্ন্যাসী মানুষের মুখে ভগবানের প্রতিচ্ছবি দেখে,—আর তাহার নয়নে অশ্রু ফুটিয়া উঠে!

একজন আসে—সে সন্ন্যাসীকে উপহারও দেয়না—কথাও বলেনা! দিনান্তে সে একবার আসে, দুয়ারে যারা থাকে তারা সম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দেয়! দরিদ্রের কুটীরে, মধ্যবিত্তের গৃহে, ধনীর প্রাসাদে, সর্ব্বত্র তাহার অবাধ গতি! সে বৃদ্ধবৃদ্ধাদের ক্ষমতাশালিনী কন্যা, যুবকগণের স্নেহশালিনী ভগিনী,—বধূদিগের সখী, বালক বালিকাদিগের ক্রীড়াসঙ্গিনী;—সে জমীদারকন্যা বিধবা জ্যোতির্ম্ময়ী!

সন্ন্যাসী প্রতিদিন গ্রামে বাহির হয়;—শুধু একবাড়ী হতে ভিক্ষা চাহিয়া আনে—মুষ্টিভিক্ষা! যে গৃহস্থের বাড়ী সে ভিক্ষার জন্য যায় সে তাহার সর্ব্বস্ব দিতে অগ্রসর হয়—সন্ন্যাসী একটু হাসিয়া তাহার মন্দিরে ফিরে! সঙ্গে ছেলের দল—মন্দির পর্য্যন্ত ছোটে—দুয়ারের স্তূপীকৃত উপহারগুলি সে এই নগ্নশিশুদের হাতে হাতে আনন্দে বিতরণ করিয়া দেয়! পরদিন স্নেহের দান আবার মন্দিরের দুয়ারে স্তূপীকৃত হইয়া ওঠে!

অপূর্ব্ব প্রভাশালিনী জ্যোতির্ম্ময়ী প্রত্যহ একবার আসে—সে তাহার মৌন স্নিগ্ধ দৃষ্টিদ্বারা মন্দিরবাসীকে কি উপহার নিবেদন করিয়া যায়, কে জানে? সন্ন্যাসী তাহাকে

দেখে,—ভাবে,—আবার তাহার পুঁথির মধ্যে তন্ময় হইয়া থাকে! আবার যখন তাহার শান্তদৃষ্টি উৎসারিত করিয়া চাহে, তখন দেখে জ্যোতির্ম্ময়ী—চলিয়া গিয়াছে—আর সেখানে হয়ত দাঁড়াইয়া আছে,—একদৃষ্টে তাহারি দিকে চাহিয়া, একটী চীরপরিহিত রাখাল বালক!

গ্রামে এমন সময়ে একদিন হাহাকার উঠিল—মহামারীতে গ্রাম উৎসন্ন যাইতে বসিল! পুঁথি বন্ধ করিয়া, বীণ্ ফেলিয়া, সন্ন্যাসী সেই মৃত্যু তরঙ্গের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল! সেখানে তাহার সহায় মিলিল জ্যোতির্ম্ময়ী,—আর সন্ন্যাসীর ডাকে দল বাঁধিয়া আসিল গ্রামের যুবকেরা! তার পর চলিল পীড়িতের সেবা, পথ্য ও ঔষধ বিতরণ! —সন্ন্যাসীর আদেশ মত গ্রাম্য যুবকেরা ঔষধ ও পথ্য বিতরণ করে—শবদাহ করে,—কেহ কেহ রোগীর সেবাও করে!

মুমূর্ষুর শিয়রে বীজনরতা জ্যোতির্ম্ময়ী,—আর প্রতি গৃহস্থের বাড়ীতে রোগীর তত্ত্বাবধান ও সেবা করিতে ব্যস্ত, তরুণ সন্ন্যাসী! উভয়েই নীরব, উভয়েরই দৃষ্টি পরস্পরের গুণমুগ্ধ,—কৃতজ্ঞতাপ্রকাশক! কি অকুণ্ঠ তৃপ্তি, কি আনন্দ উভয়ের হৃদয়ে!

(২)

সেদিন বীজনরতা জ্যোতির্ম্ময়ী দেখিল, কখন রজনীর শেষযাম অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে—কিন্তু সে তরুণ সন্ন্যাসী তো সেবা ও শান্তি লইয়া ফিরিয়া আইসে নাই! সারা গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া তার যে এখানেই আসিবার কথা ছিল!

সেবানিরতা মাতৃহৃদয়খানি আজি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় ব্যথিত হইয়া উঠিল! নত মস্তকে জ্যোতির্ম্ময়ী দেখিল প্রভাতের স্নিগ্ধ করস্পর্শে রোগী কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে!—মুখে তার আরাম ও শান্তির চিহ্ন!

তাহার অন্তর বীণার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে কি যেন করুণ সঙ্গীতের সুর বাজিয়া উঠিল!—সে যেন সেই চির পরিচিত পুরাতন আবাহন বাণী "ওগো, এস, এস, এস!"

(৩)

পার্শ্বে সুরবাঁধা বীণ,—মুহূর্ত্তেক পূর্ব্বে বুঝি গায়কের শান্ত করস্পর্শে মৃদুঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছিল! আর অদূরে আস্তৃত গৈরিক অঞ্চলোপরি তন্দ্রানিমীলিত নয়নে ও কে ওগো!

জীবন ও মৃত্যুর পুণ্য সন্ধিস্থলে অবস্থিত;—সেই দীনের বান্ধব, আর্ত্তের সেবক, তরুণ সন্ন্যাসী!

জ্যোতির্ম্ময়ী পলকশূন্য নয়নে চাহিয়া চাহিয়া দেখিল,—তাহার আননে উচ্ছ্বসিত শান্তির পুণ্যলেখা! সে তরুণ তাপসমূর্ত্তি জ্যোতির্ম্ময়ীর নিমেষহীন নয়নের সম্মুখে দেবতার মূর্ত্তির মত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল!

কোন্ পাষাণ মন্দিরের অভ্যন্তরে এই দেবতার অধিষ্ঠান ভূমিরে!

সসম্ভ্রমে, ধীরে, অতি ধীরে জ্যোতির্ম্ময়ী সেই তরুণ তাপসের চরণ স্পর্শ করিল!—এতটুকু চরণ ধূলির ভিখারিণী সে!

চক্ষু চাহিয়া সন্ন্যাসী দেখিল, কে আসিয়াছে!

ইঙ্গিত পাইয়া জ্যোতির্ম্ময়ী পুঁথি আর বীণ্ কুড়াইয়া সন্ন্যাসীর হাতের কাছে আনিল! মৃদুকণ্ঠে সন্ন্যাসী বলিল,—

"পুঁথি—আর বীণ্—আমার সর্ব্বস্ব—তোমাকে দিলাম—আর"—

সেবা, শুশ্রূষার করস্পর্শ করিল!

সন্ন্যাসীর উজ্জ্বল চক্ষু উজ্জ্বলতর হইয়া ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হইয়া আসিল!

তখন পৃথিবীর কোলাহল তাহার চতুর্দ্দিকে যেন মৃদু সঙ্গীতের মত বাজিতেছিল!—আর সেই সঙ্গীত গুঞ্জনের মধ্যে শ্যামসুন্দরের চরণনুপুর শব্দ তাহার কাণের কাছে সুস্পষ্ট হইয়া বাজিয়া উঠিল!

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত।

গুজরাতে অতিথি।

"অতিথির বেশে ঘুরি দেশে দেশে,
কানন কান্তার শৈল লোকাবাসে,
সতত রয়েছ তুমি পরকাশি
স্নেহ মায়া লয়ি আপনা বিকাশি।"

প্রায় চারি বৎসর কাল গুজরাতে অতিথিরূপে অবস্থান করিয়াছি। দীর্ঘ চারি বৎসরের স্মৃতি গুজরাতি নরনারীর সৌজন্যে সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে।

জীবসেবা গুজরাতের জাতীয় অঙ্গের একটা শ্রেষ্ঠ দিক; কিন্তু ইহা কালে কালে মানবসেবা অপেক্ষা বহুলাংশে পশুপক্ষী সেবার দিকে অধিকতর খরবেগে প্রবাহিত হইতেছে।

ক্ষুদ্র পিপীলিকা, কীট, পতঙ্গ কুকুর বিড়াল বানর প্রভৃতির আহার্য্যের সংস্থানের জন্যই ইহাদিগকে বিশেষ ব্যগ্র দেখা যায়। গাছের গুঁড়িতে গুঁড়িতে পিঁপ্ড়ার জন্য গুজরাতিরা চিনি ফেলিয়া রাখে; কাঠবিড়ালীর আহারের জন্য অর্থব্যয়ে স্থানে স্থানে মঞ্চ নির্ম্মাণ করে; বানরের আহারের জন্য বনে জঙ্গলে প্রভূত পরিমাণ রুটী প্রতিদিন বিতরণ করিয়া আসে এবং মাছের আহারের জন্য আটা, বাজরী, 'মুরমুরা' জলে নিক্ষেপ করে; আর গৃহে কোন অতিথি উপস্থিত হইলে, স্বামী স্ত্রী পুত্র কন্যা সকলেই তাহাকে স্নেহ যত্নে অভ্যর্থনা করিয়া লয়। গুজরাত ও মহারাষ্ট্র ব্যতীত ভারতের সর্ব্বত্রই এ ভাব বিরল। প্রবাসীর প্রতিও গুজরাতীরা খুব স্নেহশীল ও অতিথিবৎসল।

গুজরাতের দ্বিতীয় পুলকচঞ্চলদৃশ্য—গরবা-গান। ইহা গুজরাত জাতীয় জীবনের অনিন্দ্য আনন্দ উৎস; শরৎ প্রকৃতির নির্ম্মল নীল আকাশতলে রবিকর বিকীর্ণ শ্যামান্বিত তরুলতা শস্যের আনন্দ উচ্ছ্বাস পরিব্যাপ্ত প্রাঙ্গণতলে গুর্জ্জরী রমণীগণের আনন্দ আবেগ সঙ্গীতস্রোতে দিগ্মণ্ডল প্লাবিত করিয়া তোলে;—এই সময় তাহাদের নওরাত্রি, দিওয়ালী, দেবদিওয়ালী নববর্ষ প্রারম্ভ ও শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব। এই উৎসব সময়ে গুজরাতি রমণীগণের মহিমা-কীর্ত্তন গরবা-গান সুধার মত সুমন্দ পবনে ছড়াইয়া পড়ে।

সন্ধ্যা আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বালবৃদ্ধযুবতী রমণীগণ সুন্দর বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত হইয়া দেবমন্দির প্রাঙ্গণে সম্মিলিত হয়; তারপর একটী দীপশিখা মধ্যস্থলে রাখিয়া করতালি-

তালে দেহ লতা নত করিয়া দুলিতে দুলিতে তাহা প্রদক্ষিণ করিয়া গরবা গান গাহিতে থাকে। তখন যমুনাতীরবিগত—সেই অতীত স্মৃতি,—ব্রজগোপীগণের আবেগ পদকম্পন যেন হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করা যায়। সেই সুদূরতম কাল যেন ছায়া বিক্ষেপণকারীগতিতে আসিয়া হৃদয়ের অন্তস্তল স্পর্শ করে,—তাহার সেই সরল বিলাসশ্রীর মধ্যে যে পবিত্রতা ও নিরাকাঙ্ক্ষ প্রেমতন্ময়তা জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহা আজ স্বপ্নের মত মনে হয়।

গুর্জ্জরী রমণীর কণ্ঠতল-নিঃসৃত বন্দনা-গীতি কঙ্কণসিঞ্চিত করতাল স্তনিত লহরীর সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপে তালে তালে ঢলিয়া পড়ে। প্রথমেই উমা মহেশের বন্দনা, রামসীতাজির মহিমা, তৎপর শ্রীকৃষ্ণের প্রেমতরঙ্গ লীলা তালে তালে মুখরিত হইয়া উঠে। মহারাধা মীরাবাই যে পরাপ্রেমে বিগলিত হইয়া গীতাবলী রচনা করিয়াছিলেন, তাহা গুর্জ্জরী রমণীকণ্ঠে অমিয়ধারা বর্ষণ করে। রাত্রির আঁধার যতই গাঢ় হইয়া আসে স্ত্রীকণ্ঠের আনন্দ উচ্ছ্বাস ততই নিবিড় হইয়া উঠে।

গুজরাতের এই জাতীয় আনন্দ উৎসবের মূলে পরাপ্রেমের আকাঙ্ক্ষা আছে; প্রবাদ এই,—শ্রীহরি বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া স্ত্রী মূর্ত্তিতে সময় সময় এই গরবা গানে নাচিতে আসেন।

গুজরাতে এই আনন্দ উৎস—নওরাত্রি হইতে আরম্ভ করিয়া দেবদিওয়ালী পর্য্যন্ত একমাসকাল খুব সঞ্জীবিত থাকে।

বাঙ্গলা দেশ ছাড়াইয়া বেহারে আসিলে স্ত্রী অবরোধ প্রথা একটু লঘু—অযোধ্যা দিল্লী আগ্রাতে একটু বেশী—রাজপুতানায় এ প্রথা বহুলাংশে লাঘব হইয়াছে; রাজপুতানা ছাড়াইলে মালব, গুজরাত ও মহারাষ্ট্রে রমণীগণের আর্য্য স্ত্রী-স্বাধীনতা পূর্ণ বিদ্যমান,—কাজেই গুজরাতি রমণীরা সাহসী বলবান ও সৌষ্ঠবপূর্ণা, তৎসঙ্গে শ্রমশীলা ও নির্ভরপরায়ণা।

বোম্বাই সুরত প্রভৃতি স্থানের গুজরাতি রমণীরা বেশভূষা ও বিলাস উপকরণের ব্যয়ে কিছু মুক্ত হস্ত। কিন্তু জনসাধারণ গুজরাতের লোক অতি পরিমিতব্যয়ী। তবে বিবাহ শ্রাদ্ধ উৎসবাদিতে তাহারা অনেক সময় এত ব্যয় করে যে অনেককে সেজন্য নিঃস্ব হইতে দেখা যায়। গুজরাতের পল্লীবাসীরা অধিকাংশই মিতাচারী

গুজরাতের তৃতীয় দৃশ্য—রমণীগণের জল সংগ্রহ। পল্লীগ্রামে বা ছোট সহরে—যেখানে জলের কল বা কোন পুষ্করিণী নাই,—প্রায়ই তাহারা মিঠা কুয়ার জল সংগ্রহ করে। প্রতি গ্রামেই একটা না একটা মিঠা জলের কুয়া থাকে; আবালবৃদ্ধরমণীরা দল বাঁধিয়া সেখানে জল আনিতে যায়—অনেক সময় ২।৩ মাইল দূর হইতেও জল আনিতে হয়; মস্তকে জলপূর্ণ কলসী-একটীর উপর আর একটী, হস্তে আর একটী কলসী লইয়া অনায়াসে গৃহে ফিরিয়া আসে।

২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের এই বাঙ্গলা দেশের পূর্ব্ব পল্লিবাসিনীরাও এইরূপ জল সংগ্রহ করিত। "সই জলকে চল" বলিয়া পরস্পরকে ডাকিয়া সকলে মিলিয়া মিঠা পুকুরের জল আনিতে যাইত। এখন সমস্ত মিঠা পুষ্করিণীর জল নল খাগ্‌ড়ার বনে পূর্ণ হইয়া অপানীয় ও দূষিত বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি করিয়া দেশের

লোককে উৎসন্ন দিতেছে। সকলেই সহরে আসিতেছেন আর পল্লিগ্রামগুলি নানা রোগের জন্মভূমি হইতেছে।

গুর্জ্জরাতের চতুর্থ দৃশ্য—পল্লীগুলি—বঙ্গবাসীর চক্ষে এক অভিনব ব্যাপার। পল্লীগুলিতে প্রাচীন সনাতন প্রথা এখনও বিদ্যমান। পল্লীতে এখনও পঞ্চায়িত নির্ব্বাচিত হয়, তাহার হস্তে পল্লী শাসনের কিছু ক্ষমতাও থাকে। এই পঞ্চায়িত এ দেশী ভাষায় পটেল। মেথর, ধোবা, নাপিত ইত্যাদি সে নিযুক্ত করে; তাহাদের বেতনাদি ও গ্রাম সংস্কারের জন্য প্রতি গ্রামে একটী অর্থভাণ্ডার থাকে। পল্লীগ্রামের পাঠশালায় গুরুমহাশয় ছাত্রদিগকে বিনা বেতনে পড়ান—কেবলমাত্র মাসে একদিন প্রতি বাড়ী হইতে এক মুষ্টি চাল ডাল সংগ্রহ করেন।

গুজরাতের পঞ্চম দৃশ্য—গুজরাতের তীর্থগুলি। মঠের কর্ত্তা বা তীর্থের মোহান্তগুলির অখণ্ড প্রতাপ। গুজরাতির অন্ধ ধর্ম্মনিষ্ঠাই তাহার একমাত্র কারণ। এদেশে মোহান্তেরা ধর্ম্মরাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা বলিলেও হয়।

গুজরাতের ষষ্ঠ দৃশ্য,—আত্মীয় স্বজনের মৃত্যু হইলে অর্থ দত্ত-শোকার্থীগণের আগমন; তাহারা আসিয়া তালে তালে চীৎকার করিয়া ও ঘন ঘন বুক চাপড়াইয়া দিক্‌মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া শোক প্রকাশ করিয়া যায়।

গুজরাতের সপ্তম দৃশ্য—অসংখ্য বর্ণবিভাগ; যেমন ৮৪ রকম ব্রাহ্মণ, ৩৬ রকম ক্ষত্রিয় ১২ রকম শূদ্র ৪৬ রকম বেনিয়া—ইহার মধ্যেও আবার শাখা প্রশাখা আছে। এই বর্ণের নাম, নাথ। নাথশ্রেণীর মধ্যেও পরস্পর আচার ব্যবহার বিবাহ সম্বন্ধাদি ক্রিয়া কর্ম্ম পর্য্যন্ত প্রচলিত নাই। যেমন খেরা ব্রাহ্মণ নাথের জল নাগর ব্রাহ্মণ নাথের লোকেরা পান করিবে না। বর্ণ বৈষম্যের এতদ্‌অপেক্ষা—"লঘুতর" সমস্যা জগতের কোন জাতির মধ্যে আছে কি না সন্দেহ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন।

ইয়োরপে সাহিত্য।

অতি অল্পদিনের মধ্যে বঙ্গ সাহিত্য যেরূপ উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তবে আমাদের সাহিত্য ভাণ্ডার যতই বৃদ্ধি হউকনা কেন তন্মধ্যস্থ স্তূপীকৃত বিস্তর আবর্জ্জনা রাশি সত্বেও ইহার গহ্বরদেশ এখনও বহু পরিমাণে শূন্য, এবং এই শূন্যতা পূরণের জন্য বহু রত্ন সংগ্রহের আবশ্যক।—কিন্তু ইয়োরপের সাহিত্য সম্বন্ধে এরূপ শূন্যতা অপবাদ মোটেই খাটে না। সেখানে রাশি রাশি গ্রন্থ, ম্যাগ্যাজিন; সংবাদ পত্র জলপ্রবাহ বেগে দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া ছুটিয়াছে। তবুত হাহাকারের বিরাম নাই! তফাৎ এই আমরা কাঁদি—অভাবে, তাহারা কাঁদিতেছে আধিক্যে। মানুষের কিছুতে দেখিতেছি সুখ শান্তি নাই। বন্যাকার সাহিত্য মূর্ত্তিতে ভীত হইয়া একজন ফরাসী লেখক (Anatole France) যাহা বলিয়াছেন তাহা পড়িলে মনে হয়—তাঁহার মত, দ্বিতীয় ওমার উঠিয়া

ওদেশের প্রধান প্রধান পুস্তকাগারগুলি সব যদি অগ্নিসাৎ করিয়া ফেলে তবেই দেশের মঙ্গল। তিনি বলিতেছেন,—

"পুঁথির পুঞ্জ আমাদের গ্রাস করিতে বসিয়াছে, আমি তাহাদের খুবই ভালবাসি কিন্তু বলিতে কি তাহাদের ভারে আমরা চাপে পড়িয়া মরিতেছি। তাহারা এতই বাড়িয়া উঠিয়াছে যে গণনা করা দুঃসাধ্য – এত রকম হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে মনে করিলে, থতমত খাইতে হয়। সে কালের লোকদের বইপড়া অভ্যাস ছিলনা—তাঁরা কাজের লোক ছিলেন, ভাল ভাল কাজ করিয়া গিয়াছেন, কেন না বর্ব্বর অবস্থা হইতে তখন তাঁহারা সভ্যতার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। এইরূপ বিনা-গ্রন্থে হাজার হাজার বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। অথচ তখন তাঁহাদের কবিত্ব ছিল, ধর্ম্ম ছিল—সৌন্দর্য্য বোধ ছিল—কবিতা গান এ সমস্ত তাঁহাদের মুখাগ্রে ছিল। দিদিমাদের কাছে সরস গল্প শুনিতে শুনিতে তাঁহারা কল্পনা ছাড়িয়া দিতেন।"

"সে কাল আর এ কাল! এখন এ বিষয়ে আমাদের কি বিষম উন্নতি হইয়াছে! ১৬ হইতে ১৮ শতাব্দী পর্য্যন্ত পুস্তক সংখ্যা কত বৃদ্ধি পাইয়াছে। আজিকার কালে পুস্তকের যেন অন্ত নাই। একমাত্র প্যারী নগরীতেই প্রতিদিন ৫০ খানি করিয়া গ্রন্থ বাহির হইতেছে—তাছাড়া সংবাদ পত্রের ত কথাই নাই। কি প্রকাণ্ড কাণ্ড! শেষে আমাদের ক্ষেপাইয়া তুলিবে। আর একটু রশ্মি সংযত করা কি প্রার্থনীয় নহে? বই পড় ক্ষতি নাই কিন্তু ভাল বই বাছিয়া পড়—আমার উপদেশ এই,—তাহা ভিন্ন আর কিছু নয়।"

তিনি আরো বলিতেছেন,

"একদল সাহিত্যব্যবসায়ী উঠিয়াছে তাহাদের মত এই যে ঐতিহাসিক উপকরণ কাগজ পত্র যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহাই আগে ছাপান হউক—সে সমস্ত সংগ্রহ করিবার পর ইতিহাস লেখা সুরু কর। তাঁদের কথামত কাজ করিতে গেলে দু তিন শত বৎসর চলিয়া যায়। পারীর ম্যুনিসিপাল সভা এইরূপ অজ্ঞাতপূর্ব্ব লেখা সকল ছাপাইবার আদেশ দিয়াছেন এবং সেই কাজ এক্ষণে বিলক্ষণ দ্রুতবেগে চলিতেছে। মঁস্যো তুর্নো এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। সে কার্য্যভার এরূপ গুরুতর যে তাহাতে পূর্ব্বকার শ্রমশীল মঙ্কেরাও হস্তক্ষেপ করিতে সঙ্কুচিত হইতেন সন্দেহ নাই। যাহা হইতেছে খুবই ভাল। কিন্তু আর সমস্ত বিষয় রাখিয়া শুধু ফরাসী বিপ্লবের বিষয় ভাবিয়া দেখ। যখন দেখি যে ফরাসী বিপ্লব সম্বন্ধীয় কাগজ পত্র যাহা ইতি মধ্যে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে তাহার সংখ্যা ৫০০০০ এবং যাহা এখনো ছাপানো হয় নাই তাহা আরো অধিক সংখ্যক, তখন ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস আমরা যে কখনও আয়ত্ত করিতে পারিব সে আশা ছাড়িয়া দিতে হয়। এই কথা হইতে একটী গল্প মনে পড়িল তাহা তোমাদের বলি :—

প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জেব শিষ্য পারস্য যুবরাজ যখন সিংহাসনে আরূঢ় হইলেন তখন তিনি রাজ্যের সমস্ত মৌলবীদিগের ডাকাইয়া বলিলেন,—

"গুরুজি জেব আমায় এই উপদেশ দিয়াছেন যে রাজা যদি অতীতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন তবে রাজ্যে

সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল হয়,—নহিলে তাঁহাদের নানা ভ্রমপ্রমাদে পড়িয়া অশেষ দুর্গতি হইবার সম্ভাবনা। এই হেতু আমি এই পৃথিবীর জনপদের ইতিহাস শিখিতে ইচ্ছা করি। তোমরা এই সার্ব্বজনীন ইতিহাস সঙ্কলন করিয়া আমাকে জানাইতে চাও। সেই ইতিহাস যাহাতে সর্ব্বাবয়ব সম্পূর্ণ হয় তাহাতে তোমাদের যত্নের যেন কিছুমাত্র ত্রুটি না হয়-এই আমার আদেশ।"

পণ্ডিতেরা রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া রাজদরবার হইতে বিদায় লইলেন। সেখান হইতে গৃহে ফিরিয়াই প্রত্যেকে আপন আপন কার্য্য আরম্ভ করিলেন। ৩০ বৎসর পরে তাঁহারা পুনরায় রাজার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের পশ্চাতে দ্বাদশ উষ্ট্র গ্রন্থভার বহন করিয়া চলিয়াছে—প্রত্যেকের পৃষ্ঠে ৫০০ পুস্তক। সভাপণ্ডিত রাজসিংহাসনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া রাজাকে অভিবাদন পুরঃসর নিবেদন করিলেন —

"মহারাজ আপনার আজ্ঞানুসারে মৌলবীগণ যে সার্ব্বজনিক ইতিহাস রচনা করিয়াছেন তাহা মহারাজের শ্রীচরণে সমর্পণ করিতে তাঁহারা সমাগত। এই বিরাট পুস্তক ৬০০০ খণ্ডে বিভক্ত—লোকাচার, রাজনীতি, শাসন তন্ত্র, মনুষ্য-সমাজ সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা আবশ্যক তাহা সকলি সংগ্রহ করিতে আমরা কিছুমাত্র ত্রুটি করি নাই। প্রাচীন ইতিহাস যত পাওয়া যায় তাহার মধ্যে সকলি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তদ্ভিন্ন ভূগোল, খগোল, পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র প্রভৃতি আয়ত্ত করিবার জন্য যত প্রকার টিপ্পনী আবশ্যক তাহা দেওয়া আছে। সূচী অনুক্রমণিকাই এত বিস্তৃত যে তাহাদের বোঝাই দুই উষ্ট্র বহন করিয়া আনিতেছে।"

রাজা উত্তর করিলেন—

তোমরা যে এত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া আমার এই আজ্ঞা পালন করিয়াছ তাহাতে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি কিন্তু এক্ষণে আমার হাতে রাজকার্য্য বিস্তর আর তোমরা এত বৎসর ধরিয়া যে লেখা সংগ্রহ করিয়াছ তাহাতে আমার বয়সও বাড়িয়া গিয়াছে। আমি এক্ষণে মধ্যবয়স উত্তীর্ণ করিয়াছি, এই সুদীর্ঘ ইতিহাস পড়িয়া শেষ করিতে না করিতেই আমার আয়ু শেষ হইয়া যাইবে। অতএব আমার অনুরোধ এই যে, ইহার সংক্ষিপ্তসার লিখিয়া আমার কাছে লইয়া আসিবে, তবেই আমি আমার জীবদ্দশায় তাহা পড়িয়া উঠিতে পারিব।"

পারস্যের মৌলবীগণ ২০ বৎসর ধরিয়া এই কার্য্য করিয়া উষ্ট্রপৃষ্ঠে বোঝাই দিয়া ১৫০০ গ্রন্থাবলী রাজার কাছে আনিয়া উপস্থিত করিলেন!

তাঁহাদের অগ্রণী কাজী সাহেব অগ্রসর হইয়া বলিলেন, মহারাজ এই আমাদের নূতন রচনা দর্শন করুন। ইহার মধ্যে সার্ব্বজনিক ইতিহাসের সারকথা সমস্তই রক্ষিত হইয়াছে।

রাজা কহিলেন,

তুমি যাহা বলিতেছ সকলি সত্য কিন্তু আমার পড়িবার অবকাশ নাই। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। এই বয়সে এই দীর্ঘ প্রবন্ধ পড়িয়া উঠিতে পারিব না। আরো সংক্ষেপ করিয়া আন, বিলম্ব করিও না।

তাঁহারা আর অধিক বিলম্ব না করিয়া ১০ বৎসর পরে পুনরায় রাজদরবারে উপস্থিত

হইলেন। পুস্তকখানি ৫০০ কাণ্ডে বিরচিত, একটী উটের বোঝা মাত্র।

কাজি নিবেদন করিলেন "মহারাজ যেমন অনুমতি করিয়াছেন আমরা তেমনি সংক্ষেপে সারিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি।

রাজা—"সত্য বটে কিন্তু আমি যেমন চাই তেমনটি হয় নাই। এখন আমি আমার জীবনের শেষ দশায় পৌছিয়াছি। তোমরা যদি চাও যে আমি পৃথিবীর ইতিবৃত্ত কিছু জানিতে পারিয়া তদনুসারে কাজ করি, তাহা হইলে আরো ছাঁটিয়া সংক্ষেপ করিয়া আনিতে হইবে।"

পাঁচ বৎসর পরে কাজী সাহেব পুনরায় রাজপ্রাসাদে আসিয়া হাজির। এক যষ্টির উপর ভর দিয়া একটি গাধার রাসরজ্জু ধরিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলেন। গাধার পীঠে মহাভারতের মত একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক।

মন্ত্রী ডাকিয়া বলিলেন—কাজি সাহেব একটু তাড়া করুন মহারাজ মৃত্যু শয্যায় কাতর আছেন।

সত্য সত্যই রাজা মৃত্যু শয্যায় শয়ান। তিনি সেই গ্রন্থের দিকে ক্ষীণ দৃষ্টি দিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন "পৃথিবীর ইতিহাস না দেখিয়াই আমি পৃথিবী ছাড়িয়া চলিলাম।"- কাজিও সেই সময় রাজার ন্যায় মুমূর্ষুভাবাপন্ন। বলিলেন, "আমি তিন কথায় পৃথিবীর ইতিবৃত্ত নিবেদন করি মহারাজ শ্রবণ করুন।"

রাজা—বল আমি শুনিয়া বিদায় হই।

কাজী—

১ জন্ম। ২ সুখদুঃখ ভোগ। ৩ মৃত্যু ও পরলোক যাত্রা।

আমি সংক্ষেপে মনুষ্য জীবনের সমুদায় ব্যাপার মহারাজের কর্ণগোচর করিলাম।

রাজা সন্তুষ্ট হইয়া এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক অনুমতি করিলেন ও কিয়ৎক্ষণ পরেই সুখনিদ্রায় দেহত্যাগ করিলেন।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ব্রহ্মপুত্রে উমানন্দ।

অবিশ্রান্ত ধারাবাহী বর্ষা মাথায় করিয়া বিগত ১৩১৫ সনের ১২ই জ্যৈষ্ঠ পূর্ব্বাহ্ণ ১১টার সময় কর্ম্মস্থল শিলং রওয়ানা হই। আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের হিলসেক্‌সনের অপূর্ব্ব ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশল ও চতুর্দ্দিকের নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্য সন্দর্শনের সুযোগ হইবে বলিয়া নারায়ণগঞ্জ হইতে ষ্টিমারে চাঁদপুর আসি। বদরপুর ছাড়াইয়া আসিলেই 'হিল সেক্‌সনে উপস্থিত হইতে হয়। এসব স্থানে পাহাড়ের গা' দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া রেল চলিয়াছে,—দুই দিকে পর্ব্বতশ্রেণী বিশাল নগ্নদেহ ধারণ করিয়া অনন্তকাল হইতে পৃথিবীর এক অজ্ঞাত অধ্যায়ের সাক্ষীস্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে। এই সকল শ্যামায়মান স্নিগ্ধদর্শন বৃক্ষবহুল পাহাড়ের গাত্র হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীগুলি উদ্‌ভ্রান্ত

মধুরিমাময়ী চঞ্চলা বালিকার মত সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া হেলিয়া দুলিয়া আপন মনে চলিয়াছে। বৃষ্টিপাতেই তাহারা উদ্দাম উচ্ছ্বাসে কল গান গাহিয়া বনভূমি মুখরিত করিতে করিতে আপনাদের সজীবতা নিবেদন করে। কোনও স্থানে নিবিড় পত্রাচ্ছাদিত শাল্মলী বৃক্ষে বসিয়া কলকণ্ঠ বিহগকুল তাহাদের সুললিত গীতধ্বনিতে সেস্থান নিয়ত মুখরিত করিতেছে। সে গান কত মধুর ও ভাবোদ্দীপক!

বদরপুর ছাড়িয়াই আমরা ১নং টানেল (সুরঙ্গে) প্রবেশ করি। রাস্তা সংক্ষেপ করিবার জন্যই বড় বড় পাহাড়ের ভিতর বহু অর্থব্যয়ে ও সুকৌশলে ডিনামাইট দ্বারা পাথর ও মাটি খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া এই সুরঙ্গগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে। সুরঙ্গের ভিতর গাড়ি প্রবেশ করিলে কিছুই দেখা যায় না, কেবলি পুঞ্জীভূত অন্ধকার! তখন মনে হয় আমরা কোন পাতালপুরীতে আসিয়াছি, আর বুঝি আলো দেখিতে পাইব না। পূর্ব্বে কখনও টানেল দেখি নাই, এই রেলপথে ৩২টী টানেল। মাহুর টানেল সর্ব্বাপেক্ষা বড়, ইহার ভিতর দিয়া গাড়ী বাহিরে আসিতে দুই মিনিট লাগে। দুপুর ১-৩৯ মিনিটের সময় এই সুরঙ্গে প্রবেশ করিয়া ১-৪১ মিনিটের সময় বাহির হইয়া আসিলাম।

সন্ধ্যার সময় লামডিংএ গাড়ী বদল করিয়া রাত্রি ২টার কিছু পূর্ব্বে আসাম অঞ্চলের প্রধান হিন্দুতীর্থ গৌহাটিতে পৌঁছিলাম। সে সময়ে খুব বৃষ্টি হইতেছিল। মেল টোঙ্গায় স্থান হইল না বলিয়া সে রাত্রে শিলং যাওয়া বন্ধ হইল। এবং পূর্ব্ব হইতে টোঙ্গা কি মোটরে স্থান রিজার্ভ করি নাই বলিয়া পরদিনও গোহাটিতেই অপেক্ষা করিতে হইল।

এই অবকাশে আমি ব্রহ্মপুত্রের মাঝখানে অবস্থিত 'উমানন্দ' দর্শনে রওয়ানা হইলাম। কতকাল হইতে উমানন্দ-মন্দির ব্রহ্মপুত্রের স্রোতমুখে পাহাড়ের শীর্ষদেশে দাঁড়াইয়া আছে কে বলিবে? এমন সুন্দর সুমোহন দৃশ্য সংসারে দুর্লভ! ব্রহ্মপুত্রের স্রোতমুখে তিনটী ক্ষুদ্র দ্বীপ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের নাম কর্ম্মনাশা, উর্ব্বশী ও উমানন্দ। কোন হিন্দুই ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিয়া কর্ম্মনাশার দিকে ফিরিয়া চাহিবে না। তাহাদের বিশ্বাস, ভুলেও যদি কেহ স্নানান্তে কর্ম্ম-নাশা দর্শন করে, তবে তাহাদের সেদিনের কোন কোন কার্য্যই সুফলপ্রসূ হইবে না। পুরাণে কথিত আছে, মহাদেবের কপালের বিভূতি হইতে উমানন্দের উৎপত্তি। জনশ্রুতি এই, শান্তিনিকেতনে শিব "যোগিনী-তন্ত্র" অর্থাৎ আসামের ইতিহাস উমার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। উমানন্দের দিকে চাহিলে মনে হয়, কোমল-কঠোরে মিশ্রিত এই পাষাণ দেবমূর্ত্তি প্রকৃতি মায়ের স্নেহাঞ্চলে ঢাকা তাহার মন্দিরের সুষমাময় পবিত্র চিত্রখানিকে অনাদিকাল হইতে মূর্ত্তিমতী ভক্তির ধারায় হিন্দুর প্রাণ অভিসিঞ্চিত করিতেছে। প্রকৃতি দেবীর স্বহস্ত সজ্জিত এই দেবমন্দির—অদূরে হিন্দুর গৌরব মহিমাময়ী সতীর প্রিয়-ভূমি বিখ্যাত কামাখ্যা শৈল, আর পুণ্য পাদমূলে প্রবাহিত অমোঘা-গর্ভ-সম্ভূত ব্রহ্মপুত্র নদ—এ সব পবিত্র দৃশ্য জীবনে ভুলিবার নয়।

ব্রহ্মপুত্রের ধার দিয়া সুন্দর ট্র্যাঙ্ক রোড চলিয়া গিয়াছে, সেই রাস্তা ধরিয়া পূর্ব্বদিকে

কিছু অগ্রসর হইয়া নদের চড়ায় নামিয়া ষ্টিমার ষ্টেসনের দিকে নৌকার অনুসন্ধানে চলিলাম। শুনিলাম কিছুদিন পূর্ব্বে পদব্রজেই যাত্রীরা উমানন্দ পাহাড়ে যাইত, এখন বর্ষার প্রারম্ভ বলিয়া স্রোতের জল অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাই নৌকা না হইলে আর পাহাড়ে যাওয়া যায় না। ষ্টীমার ঘাটে নৌকা ভাড়া করিতে অসমর্থ হইয়া পাহাড়ের বিপরীত দিকে খেয়ার প্রতীক্ষায় উৎসুক চিত্তে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

উমানন্দমন্দির।

এই সময় পর পার হইতে একখানা ডিঙ্গি নৌকা চারিটি লোক সহ আমার নিকটে আসিল! আমি তাহাতে চড়িয়া লইলাম।

অল্পক্ষণেই তরঙ্গায়িত খরস্রোত নৌকাখানিতে দ্রুতবেগে পাহাড়ের পাদদেশে আনিয়া ফেলিল। স্রোতে নৌকাখানিকে ভাটির দিকে লইয়া যাইবে ভয়ে মাঝি নৌকার অর্দ্ধেকখানি টানিয়া চড়ার উপর রাখিয়া দিল। আমি জুতা, ছাতা নৌকাতেই রাখিয়া মাঝির সহিত তীরে

অবতরণ করিলাম এবং সিঁড়ি বাহিয়া উমানন্দ পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। সিঁড়ির দুই ধারে পাহাড়ের গায় স্থানে স্থানে সিন্দুর-রাগ-রঞ্জিত খোদাই হিন্দুদেবদেবী মূর্ত্তি শোভা পাইতেছে। ব্রহ্মপুত্র চুম্বিত শৈলমালার দিকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে কথঞ্চিৎ শ্রান্তদেহে আমরা মন্দিরের বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে একজন পুরোহিত প্রভু আসিয়া দর্শন দিলেন।

দূর হইতে পাহাড়ের শীর্ষভাগে জাহাজের মাস্তুলের মত একটা উচ্চ স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। উপরে আসিয়া দেখিলাম এই বিশাল স্তম্ভের উপর গবর্ণমেন্টের টেলিগ্রাফের তার দুই দিকে সংযুক্ত রহিয়াছে। নগ্নদেহ পুরোহিত প্রভুর সঙ্গে আমরা মন্দিরাভিমুখে চলিলাম। বর্ত্তমান মন্দিরের অধিকাংশই ইট দিয়া গ্রথিত। চারিদিকের ভগ্ন প্রস্তর দেখিয়া মনে হয় এই মন্দির পূর্ব্বে প্রস্তর নির্ম্মিত ছিল। সম্ভবতঃ গদাধর সিংহের রাজত্বের সময় প্রাচীন মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। মন্দিরের কারুকার্য্য খুব উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইল না। মন্দিরের পুরোভাগে একটী নাটমন্দির আছে। সেখানে প্রবেশ করিয়া প্রতিনিধি শিবলিঙ্গ মূর্ত্তি দর্শন করিলাম। এ সময়ে পাণ্ডা ঠাকুর 'বাবা উমানন্দ' দর্শনে 'দর্শনীর' চুক্তি প্রস্তাব করিয়া বলিলেন, "কাঞ্চনমুদ্রার অভাবে রজতমুদ্রা না হইলে মন্দির গর্ভস্থ ভৈরবদর্শন সম্ভবপর নয়।"

এস্থলে কামাখ্যার হিন্দুমন্দির সংরক্ষিণী সভার (যদি উপরোক্ত নামে কোনও সভাসমিতি থাকে) সভ্যদিগকে আমাদের সানুনয় নিবেদন, তাঁহারা পাণ্ডা প্রভুদের অন্যায় আক্রমণ হইতে যাত্রীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য একটা উপায় করুন। যাহা হউক, পুরোহিতের জ্বালাতন অসহ্য হইলেও সহিষ্ণুতার চূড়ান্ত আদর্শ রূপে তাহা সহ্য করিয়া লইয়া আমরা সিঁড়ি দিয়া মন্দিরস্থ গুহায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মন্দিরের এই অংশ ব্রহ্মপুত্রের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। মন্দিরগর্ভ অন্ধকারময়; সেই গুহাস্থ ভীষণ আঁধারের ভিতর একটি ক্ষুদ্র ঘৃতপাত্রে দীপ শিখা আলোক বিতরণ করিতেছে, এখানে লিঙ্গরূপী উমানন্দ ভৈরব জল হইতে প্রস্তর ভেদ করিয়া উর্দ্ধদিকে উত্থিত। জগতের কারণ এই স্নিগ্ধ ও বিরাট মূর্ত্তি দেখিলে ভয় ও ভক্তিতে মস্তক আপনা আপনি অবনত হইয়া আসে। আমরা ভূমিতে লুটাইয়া বাবাকে প্রণাম করিয়া আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া কৃতার্থ হইলাম।

সহসা শিবের ডানদিকে কিসের একটা ফোঁ ফোঁ শব্দ শুনিতে পাইলাম। প্রশ্ন করিলে পাণ্ডাঠাকুর বলিলেন, "ইহা সাপের ডাক।" উমানন্দের সেই সৌম্য দিব্যমূর্ত্তি দর্শনের পর পুনর্ব্বার আমরা নৌকারোহণে সন্নিকটস্থ "উর্ব্বশীকুণ্ডে" অবতরণ করিলাম। কথিত আছে, এই কুণ্ডে স্বর্গের অপ্সরা উর্ব্বশী স্নান করিয়াছিলেন। এখন আর সেই কুণ্ড অথবা কুণ্ডের কোন চিহ্ন দেখা যায় না। বর্ষাগমে উর্ব্বশীকুণ্ড জলে ডুবিয়া যায়। ষ্টীমার রক্ষা করিবার জন্য এই মগ্নশৈলের উপর একটী স্তম্ভ স্থাপন করা হইয়াছে। এইখানে নানা দেবদেবীর ও বুদ্ধদেবের ধ্যানস্থ দুই একটী মূর্ত্তিও দেখিতে পাইলাম। পদ্মাসনে উপবিষ্ট

সে মূর্ত্তির নয়নে ও অধরে স্নিগ্ধ প্রশান্তভাব বিরাজমান। তথায় শিলার উপর শুইয়া একবার ভৈরব উমানন্দের মন্দির ও আর একবার কামাখ্যা পাহাড়ের নীরব সৌন্দর্য্যের দিকে পুনঃ পুনঃ সতৃষ্ণনয়নে দৃষ্টিপাত করিলাম। ব্রহ্মপুত্রস্থিত উর্ব্বশী-কুণ্ডের শিলাতলে শুইয়া স্বভাবের অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য-সুধা পান করিয়া যে সুখ ও আনন্দ হয়, তাহা মানব-ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। ক্ষণকালের জন্য এই বিশাল সৌন্দর্য্যে রাজ্যে আপনাকে যেন হারাইয়া ফেলিলাম। তখন কে যেন বলিয়া গেল, 'এই সৌন্দর্য্যের চির-উপাসনাই ব্রহ্মভক্তি। এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মের সত্ত্বা উপলব্ধি কেহ কখনও করিয়াছে কি ?

শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

পোষ্যপুত্র।

৪০

দিল্লীর জুম্মা মসজিদ দুর্গ প্রভৃতি দর্শনীয় স্থান সকল খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখা হইয়া গেলে চারদিনের দিন বীরেশ্বর নীরদকে মুক্তি দিয়া বলিল "এবার ফেরা যেতে পারে, আর তোমায় ধরে রাখবো না।" শুনিয়া নীরদ যেমন উচিত ছিল সে পরিমাণে খুসী হইতে তো পারিলই না বরং একটু যেন বিমর্ষ হইয়া পড়িল ? কোথায় যাইবে সে ? স্থিতিতে তাহার শান্তি কোথায় ?

সন্ধ্যার সময় আকাশের বিচিত্র শোভা যমুনার বক্ষে উদ্ভাসিত হইতেছিল। কূলে কূলে পরিপূর্ণা নদী সন্ধ্যারাগরঞ্জিত বক্ষময় গগনছবি আনন্দে নাচাইতেছিলেন। মৃদুমন্দ বাতাসে জল পুলককম্পিত ও মৃদুতরঙ্গিত হইয়া অন্তর্জ্জগতে ও বহির্জ্জগতে অলক্ষ্যে পরিবর্ত্তন আনিয়া দিতেছিল। নদীবক্ষে একখানি নৌকা স্রোতে ছাড়িয়া দিয়া ধীবর গাহিতেছিল "দিন চলিয়া গিয়াছে সম্মুখে গভীর রজনী সমাগত যাত্রীর দল চলিয়া গেল। এখনও ওরে মূঢ়! ওরে ভ্রান্ত! পশ্চাতে ফিরিয়া কাহার পানে চাহিতেছিস ?" নীরদ তাহাদের অল্পদিনের বাসাটির একতল বারান্দায় একা দাঁড়াইয়া গান শুনিতেছিল। যে চলিয়া গিয়াছে তাহার সঙ্গ তো একদিনও তাহার ইপ্সিত প্রার্থিত ছিল না ? হায়! তবুত সে অভাগিনী তাহারি প্রতীক্ষার অবশেষে ম্লান বিশুষ্ক হইয়া মাটিতে ঝরিয়া পড়িয়াছে! শুধু যদি নীরদ দুদিন আগে আসিত! তবে এখন আর কেন তাহার অনুসরণে ছুটিয়া ফিরা ? না কিছু প্রয়োজন নাই, যা ছিল না তা নাইবা থাকিল! লঘুচিত্তে মুক্ত পক্ষ বিহঙ্গের মত সে তাহার স্বহস্তরচিত কানন পাদপছায়ায় নিঃসঙ্কোচে ফিরিয়া যাইবে। কোনও লজ্জা আর তাহাকে পীড়িত করিবে না, অলক্ষ্য উপহাস বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইয়া হৃদয়ের নিভৃতপ্রান্ত হইতে আকর্ণ কপোল রঞ্জিত করিয়া তুলিবে না, জগতের একটিমাত্র প্রাণী ভিন্ন এতবড় একটা কলঙ্কের কাহিনী, কাপুরুষতার ইতিহাস জগৎ হইতে চিরবিস্মৃতির

সমাধিগর্ত্তে লীন হইয়া গেল, উঃ কি মুক্তি দিলে তুমি শিবানী! নীরদ ঊর্দ্ধনেত্রে আকাশে চাহিয়া কাহার উদ্দেশে যেন তাহার কৃতজ্ঞতা প্রেরণ করিল।

কিন্তু পরক্ষণেই যেন চিত্তের লঘুতা একেবারে লঘুতর হইয়া ক্রমে শূন্য হইয়া আসিল। সে যে তাহাকে বিদায় দিল তবে কাহাকে সেখানে স্থাপন করিবে? এত দিন তো তাহার স্মৃতিও কষাঘাতের মতনই যন্ত্রণার ছিল। ইহাকে তো সে দূরে ঠেলিয়াই ফেলিতে গিয়াছে; কখনও ত করুণা কটাক্ষে কাছে টানিয়া লয় নাই! আজ কি ইন্দ্রজাল মায়ায় সেই অনাদৃত মূর্ত্তি তাহার গোপন সৌন্দর্য্যরাশি প্রকাশ করিয়া শত প্রলোভনে তাহারই দিকে সবলে তাহাকে আকর্ষণ করিতেছে। আজ সংযমসংযত চিত্তের শতচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া মনের ভিতর পুঞ্জীকৃত অনুশোচনা তীক্ষ্ণ ছোরার মতন বিঁধিয়া তিরস্কার করিয়া বলিতেছে, সব বৃথা! সব শূন্য! বৃথা এতদিন নষ্ট করিলি, চিরদিনই নষ্ট করিলি!" সত্যই সে চিরদিনই নিজের সম্বন্ধে নিজে অন্ধ, কোনদিনই আপনাকে চিনিল না।

আজ রাজরাজেন্দ্রাণীর মহিমায় সেই সংযতবাক্ রুদ্ধপ্রকৃতি দীনহীনা বালিকা তাহার নিজের অধিকার মধ্যে সগর্ব্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ আর তাহার সেই কৃষ্ণ তারকোজ্জ্বল বিশাল চক্ষে ভিক্ষার আবেদন নাই, মৌন দৃঢ়বদ্ধ অধর প্রান্তে, নিবিড় ছায়া ফেলিয়া অভিমানের হতাশা স্থির হইয়া দাঁড়ায় নাই, দীপ্তিময়ী রমণী তাহার আলোকপ্রদীপ্ত অথচ স্নিগ্ধ দৃষ্টি স্থির রাখিয়া নিজের পরিপূর্ণ গৌরবে পত্নীর আসন গ্রহণ করিয়া বসিয়াছে। কোথাও যেন তাহার কোন একটু অসম্পূর্ণতা নাই। নীরদের সর্ব্বশরীর পুলকে বিস্ময়ে স্পন্দিত হইতে লাগিল, মুদিতনেত্রে স্তম্ভিতবক্ষে স্বপ্নাভিভূতের মত সে আপনা আপনি বলিল "এসো তুমি! সতী! পুণ্যবতী! সহধর্ম্মিণী! হৃদয় আসনে অধিষ্ঠিত হও।"

ষ্টেশনে পৌঁছিয়া টিকিট কিনিবার সময় নীরদ বলিল, "এসো বেনারসের টিকিট কিনি"। বীরেশ্বর হঠাৎ বিস্মিত হইল কহিল "কখন তোমার কি খেয়াল যাচ্চে! প্রথমে তো দিল্লী যেতেই নারাজ! এখন আবার ফিরতেই চাও না। তা যাহোক যাবেতো চলো আমার কোন আপত্তি নেই। কাশীতে আমার মাসিমা আছেন, সেখানে বেশ দুদিন থাকা যেতে পারবে! তাছাড়া যাচ্চিতো কটা দিন থেকে কংগ্রেসটাও দেখে আসা যাবে।" নীরদ জিজ্ঞাসা করিল "তোমার ছুটী কদ্দিনের?" বীরেশ্বর কহিল "বোধ হয় চিরদিনেরি। আমার আর পোষাচ্চে না সেখানে, কলকেতায় ফিরে যদি কোথাও একটা সুবিধে করতে পারি তো আর নাবালকের মোসায়েবী করতে যাচ্চিনে।" টিকিট কাশীরই কেনা হইল। প্ল্যাটফর্ম্মে লোক বেশি ছিল না, দুজনে বেঞ্চে আসিয়া বসিলে নীরদ জিজ্ঞাসা করিল "কত পাও ওখানে?" বীরেশ্বর শালখানা ভাল করিয়া গায়ে টানিয়া দিয়া কাসির একটা পিল পকেট হইতে বাহির করিয়া মুখে দিয়া বলিল "তা মন্দ দেয় না। দেড়শো টাকা মাইনে আর ছাড়া বাড়ী" "তবে হঠাৎ ছাড়বে যে?" "কি

করি বলোনা, ও রকম হস্তিমূর্খ ছেলেকে পড়ানোর চেয়ে সপরিবারে না খেয়ে মরাও ভাল। তাকে আবার কিছু বলবারও যো নেই; একদিন রাজকুমারকে একটু ধমক দিয়ে ছিলুম অমনি দুদিক থেকে দু বেটা মোসাহেব ছুটে এসে তার মাথায় খানিকটা ফুলোন তেল থাবড়ে হাওয়া করতে আরম্ভ করলে। পাছে ধমক খেয়ে ছেলে মূর্চ্ছা যায়! শোন কথাটা! এখানেই শেষ না। বিকেলবেলা গিয়ে শুনলুম আমার ধমকে বাবুয়াজীর জিউ ঘবড়ে গেছে, আজ রাণীজী তাই তাকে পড়তে আসতে দিতে পার্ব্বেন না। এই ত ব্যাপার! তুমিই বল না এমন চাকরী করা কি পোষায়?" ঘণ্টা পড়িল ও গাড়ী হুস হুস শব্দে নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। নীরদ একটু ইতস্তত করিয়া কহিল "আমার স্কুলে কিন্তু পারিশ্রমিক কম! কি করে তাতে পোষাবে?" বীরেশ্বর যেন বর্ত্তাইয়া গেল, "আঃ তা হলে তো ভালই হয়, তুমি ত ৫০ টাকা দাও বলছিলে? তাতেই কোনরকমে চলে যাবে এখন। গিন্নিও কিছু তাঁর পৈতৃক ধন পেয়েছেন। সম্প্রতি বলছেন ব্যবসা করতে, তা তোমার সঙ্গে থাকি ত বিলিতি জিনিষ আর ব্যবহার কর্ব্বোনা তা বলেই রাখচি! আর গায়ত্রী সন্ধ্যেটন্ধ্যেও ক্রমে ক্রমে শিখবো এখন।" নীরদ আবেগের সহিত তাকে আলিঙ্গন করিল।

৪১

বর্ষার বাতাস হুহু করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল। মেঘে এখনও আকাশ ভরা। ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া বৃষ্টিরও যেন কয়দিন ধরিয়া বিরাম নাই। এক পা কাদা মাখিয়া ছাতা বা তালপাতার টোকা মাথায় দিয়া পথিকেরা পথে চলিতেছিল। রাস্তার ওপারে মুদির দোকানে বিলাতি কম্বল গায়ে বুড়া দোকানী, কারিগরকে বেগুনির জন্য ডাল ফেনাইতে উপদেশ দিতেছিল ও মধ্যে মধ্যে থেলো হুকার কলাপাতার নলে টান দিতে দিতে খাঁচায় পোষা ময়নাটিকে সীতারাম 'বুলি শিক্ষা দিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছিল। শীতে ও বাদলায় পক্ষীশিশু একেবারে অস্ফুটবাক হইয়া গিয়াছে। সঙ্কীর্ণ গলিপথ,—দু একখানা গোরুর গাড়ি কেরোসিনের টিন বোঝাই লইয়া বলাইচন্দ্র শীলের আড়তের দিকে অত্যন্ত অনিচ্ছুক মন্থর গমনে চলিয়াছে; তাহাদেরি চক্রমথিত কর্দ্দমে পাশের ইষ্টক প্রাচীরগুলা চিত্র বিচিত্র হইয়া উঠিতেছিল!

সেই অপ্রশস্ত পথের ধারের ক্ষুদ্র একখানা বাড়ির মধ্যে রাস্তার ধারের একটি একতল ক্ষুদ্র গৃহের খোলা জানালার নিকট বসিয়া একটি রমণী সেলাই করিতেছিল। ঘরখানি ক্ষুদ্র, ঘরের আসবাব পত্র ও তেমনি সামান্য,—দেখিলে দরিদ্রের গৃহ বলিয়াই মনে হয়।

রমণী কোলের উপর সেলাইটা রাখিয়া কিছুক্ষণ কার্য্য করিতেছে আবার অল্পপরেই যেন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়া তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক জানলার বাহিরে রাস্তার দিকে চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতেছে, মধ্যে মধ্যে জানালার কপাটে পিঠ রাখিয়া চক্ষুমুদ্রিত করিয়া ক্লান্তিদূর করিয়া লইতেছে।

কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণজ্যোৎস্নার মত শীত রাত্রির কুহেলিকা সমাচ্ছন্ন পাণ্ডুচন্দ্রের ন্যায় বিবর্ণা এই অপরিচিতা নারীই যে শান্তি তাহা তাহাকে দেখিলে সহসা কেহই বিশ্বাস করিতে

পারে না। সুবিধা এইটুকু যে এখানে এই দীর্ঘদিনের মধ্যে কোন একটি পরিচিত লোকের সহিত ইহার সাক্ষাৎ ছিলনা। তাহার স্বামী সেই যে তাহাকে তাহার সকল আশ্রয় সকল আনন্দ সকল গৌরব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আনিয়া স্বামীত্বের সমস্ত দাবী পরিশোধ করিয়া দিয়াছে সেই পর্য্যন্তই এই নিরানন্দ নির্ব্বাসনে সে বন্দিনী। সেই পর্য্যন্তই জগতের সমস্ত আশা আনন্দের আলোক যেন তাহার সম্মুখ হইতে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সূর্য্যাস্তের পর গোধূলীর ম্লান আভাটুকু সন্ধ্যার শ্যামাঞ্চলে নিঃশেষে মিলাইয়া আসিবার পূর্ব্বক্ষণে যেমন তাহা বিষণ্ণ কাতরতার সহিত এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া ধরণীর পানে চাহিয়া দেখে, বিগত দিবসের সুখস্মৃতির পানে শান্তিরও বর্ত্তমান জীবন তেমনিই যেন অবসানোন্মুখ ম্লান দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতেছিল। এই পথ দিয়া দিনের মধ্যে একটিবার করিয়া লালপাগড়ীপরা ডাকের পিয়ন স্কন্ধবিলম্বিত চামড়ার ব্যাগ দুলাইয়া 'চিঠি আছে' হাঁক দিয়া দু একটা দ্বারে আসিয়া দাঁড়ায় এবং চিঠি বিলি করিতে করিতে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চলিয়া যায়। দূর হইতে যতোই সে নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে শান্তির আশাউদ্বেলিত বক্ষ ততই যেন স্থির হইয়া আইসে। অবশেষে সে যখন তাহার দ্বার অতিক্রম করিয়া সম্মুখস্থ আম বাগানের জুলী পথ ধরিয়া দত্ত বাবুদের বাগান বাড়ির অভিমুখে চলিয়া যায় তখন তাহার অশ্রুজল বন্ধনমুক্ত জলস্রোতের মতনই অদম্য হইয়া উঠে।

সেদিন সে রাস্তায় আর লাল পাগড়ী দেখা গেল না, শীতের বাতাসে গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিতে লাগিল, আলস্যে সমস্ত শরীর যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল; তথাপি লৌহাকৃষ্ট চুম্বকের ন্যায় সেই রাঙ্গাপাগড়ীধারী চামড়া ব্যাগস্কন্ধ পিয়নের আকর্ষণে জানালা ছাড়িয়া সে উঠিতে পারিতেছিলনা। ক্লান্ত মস্তক জানালার কবাটের উপর রক্ষা করিয়া অদূরস্থ বৃহৎ অট্টালিকার শ্বেত প্রাচীরের দিকে তাকাইয়া ছিল।

সেও একদিন ঐ অমনি বৃহৎ অট্টালিকায় বাস করিত। এই রকমই আমগাছের ছায়ার মধ্যে প্রশস্ত দীর্ঘিকার সান বাঁধান ঘাট পাখীদের মধুর সঙ্গীতে ও পুরবাসিনী নারীগণের হাস্য কলরবে মুখরিত হইয়া থাকিত। যখন অদূরের কোন দেবালয় হইতে সন্ধ্যারতির কাঁশর ঘণ্টা বাজিয়া উঠে তখন তাহার মনের মধ্যে ব্যাকুলতা আরও যেন উদ্দামভাবে জাগিয়া উঠে। দুই চোখের জলধারার অস্পষ্ট ছায়ার মধ্যে সেই এক পরিচিত মন্দিরের পরিচিত মূর্ত্তিটি মনে পড়িয়া যায়। হয়তো এতক্ষণে সেখানেও এমনি করিয়া কাঁশর ঘণ্টা বাজাইয়া আরতি প্রদীপ জ্বালাইয়া সন্ধ্যারতি আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। সেই আলোকিত মন্দিরের মৃদুগন্ধ সৌরভরাশির মধ্যে দেবপ্রতিমার সমস্ত দৃশ্যটা মনের ভিতরে একখানা ছবির মতন স্পষ্ট হইয়া উঠে। সবি যেন তেমনি আছে শুধু সে নাই! শ্যামাকান্ত সেই যে নববধূর হলুদে সূতা বাঁধা হাতখানি ধরিয়া আনিয়া সর্ব্বপ্রথম দিনেই শ্যামসুন্দরের নিকটে দাঁড় করাইয়া হাসিয়া বলিয়াছিলেন "হরি! আমার মা তোমায় স্থাপন করে গেছলেন, এই দেখ, আবার তিনি

তোমার কাছেই এসেছেন।” শ্যামার দিকে চাহিয়া বলিয়াছিলেন “দেখছিস মা পাষাণি! এই দেখ মাতৃহীন আবার মা পেয়েছে। তুইতো ভাল করে আদর করলিনে শুধুই কাঁদালি—তাই আবার নিজের মাকে খুঁজে আনলুম।” তাহার অধিকৃত স্থানটি আজ কেবল শূন্য আর সবি তেমনি আছে। পাষাণ প্রতিমা তেমনি হাস্যভরা, মন্দিরকক্ষের শুষ্ক বায়ু তেমনি সুরভি স্নাত, সাধক পুরোহিত ও দর্শকগণ তেমনিই ভক্তি বিহ্বল। এইরূপে দিনে নিশীথে— তাহার শ্বশুরবাড়ী ও বাপের বাড়ীর কত কথা, কত আদরযত্ন অবিরামই মনে জাগিয়া ওঠে!

সহসা রাস্তার গমনশীল পথিক জনের মধ্যে কোন এক ব্যক্তি বিরক্তি সূচক শব্দ করিয়া উঠিল “আঃ পিছল দেখ! মিউনিসিপালিটী এখানের কি ঘুমুচ্চে? রাস্তা, ঘাটের এমন অবস্থা!”

পরিচিত স্বর! শান্তি চমকিয়া মুখ তুলিল, পথিকযুবকের প্রতি চোক পড়িতেই সে বিস্ময়ে অস্ফুট ধ্বনি করিয়া উঠিল “মিঃ রায়।” পথিকও শব্দানুসরণ করিয়া আশ্চর্য্যভাবে সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিল, স্বপ্নপূর্ণ স্বরে বলিয়া উঠিল “রজনীবাবুর মেয়ে না?” অনেক দিন পরে শান্তির পাণ্ডুমুখখানা একটু খানি লাল হইয়া উঠিল, ঈষৎ ম্লানহাসি হাসিয়া সে বলিল, “চিনতে পারচেন না মিষ্টার রায়?” “না পারলে কি কথা কইতে সাহস কর্ত্তেম? কিন্তু একি আশ্চর্য্য সাক্ষাৎ শান্তি! কাদের বাড়ি এ?”

শান্তি উত্তর দিল না, তাহার সব টুকু শক্তিই যেন নিঃশেষ হইয়া ফুরাইয়া গিয়াছিল, তাহার মুখের অস্বাভাবিক বিবর্ণতা দেখিয়া নীরদকুমার ব্যাকুল আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল “আমি কি বাড়ির মধ্যে যেতে পারি? কেউ আপত্তি কর্ব্বেন না তো?”

শান্তি উঠিয়া কম্পিত স্বরে “আসুন না” বলিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

নীরদ দুএক কথার পর ব্যাপারটা মোটের উপর এক রকম বুঝিয়া লইল। যে কারণেই হোক হেমেন্দ্র তাহার পিতা ও শ্বশুরের সহিত বিবাদ করিয়া শান্তিকে তাঁহাদের নিকট হইতে কাড়িয়া আনিয়াছে—এই অপরিচ্ছন্ন ক্ষুদ্র আবাসই এখন শান্তির গৃহ,—তাহা বুঝিতে নীরদের বিলম্ব হইল না। সহসা ঈষৎ তীব্রভাবে সে বলিয়া ফেলিল “এমন নিকৃষ্ট লোকের হাতে তুমি পড়েছ শান্তি, কি ভয়ানক! বলিতে বলিতে শান্তির আহতভাবে লজ্জা পাইয়া হঠাৎ থামিয়া আত্মসম্বরণ করিয়া লইয়া মনে মনে নিজেকে তিরস্কার করিল;—“সংসারে কেমন করিয়া চলিতে হয় তাহাও শিখিলাম না।”

নীরদ অত্যন্ত আহতভাবে কাতর হইয়া কহিল “আমায় কিছু লুকিও না। সব কথা খুলে বলো, মনে করো আমি তোমার বড় ভাই, তোমার দাদা আমি, তেমনি বিশ্বাস করে সব আমায় বলো। কেন তোমরা লক্ষ্মীপুর থেকে চলে এলে? আর এলে যদি তবে এ অবস্থায় কেন? রজনীবাবুর মেয়ে তুমি, তুমি আজ এই অবস্থায়? উঃ কি রকম চেহারা হয়ে গেছে! এ সবের মানে কি?”

এই অত্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী স্নেহসম্ভাষণে শান্তির এতদিনকার অনাদৃত বেদনারাশি আবেগ তরঙ্গে উথলিয়া উঠিতে উদ্যত হইল,—সে আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না। কতদিন যে এমনস্নেহের ভাষা সে শুনে নাই! মহুয়ার সেই বিদায় দৃশ্যের পর আজ এই শ্রদ্ধাপূর্ণ মহৎ বন্ধন স্থাপন! এত কষ্টের মধ্যেও যেন তাহাকে অনেকখানি স্বাচ্ছন্দ্য দান করিল। সে চোখ মুছিয়া বলিল "সেখানে দিদি এসেছেন, তাই আমরা থাকতে পারিনি, চলে এসেছি।" বলিতে বলিতেই মুখ ফিরাইয়া লইল। নীরদ আশ্চর্য্যে জিজ্ঞাসা করিল "দিদি? দিদি কে?" শান্তি অন্যদিকে ফিরিয়াই উত্তর দিল,—

"আপনি বুঝি জানেন না,—আমার মা; তিনি বৃন্দাবনে তাঁর ছেলেটিকে নিয়ে, থাকতেন আমরা গিয়ে তাঁকে এনেছি।" বজ্রপাতে স্তম্ভিত পথিকের মতন স্তব্ধ দৃষ্টি বহুক্ষণ পরে ফিরাইয়া নীরদ গভীর বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিল "কে এসেছে? বিনোদের স্ত্রী! সে বেঁচে আছে? সত্যি কথা?" তাঁহার ভাব দেখিয়া শান্তি বিস্ময়বোধ করিল, কিন্তু তাহা প্রকাশ না করিয়া কহিল "আছেন বই কি। তাঁর নাম শিবানী, তাঁর ছেলেটি কি রকম যে সুন্দর আর এমন শান্ত।"—নীরদ তীব্র স্বরে বলিয়া উঠিল "বুঝেছি শান্তি। শিবানীর নাম নিয়ে কোন পাপিষ্ঠা স্ত্রীলোক তোমাদের বিষয় অধিকার করতে এসেছে। সেতো বেঁচে নেই সে স্বর্গে। তাই হেম সহ্য করতে পারেনি রাগ করে চলে এসেছে। আচ্ছা আমি তার ষড়যন্ত্র সব ব্যর্থ করে দিচ্ছি দাঁড়াও—"

লজ্জায় আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া শান্তি আর্ত্তভাবে কহিয়া উঠিল "ও কথা বলবেন না, আপনি অমন কথা বলবেন না! ঐ একজন ভিন্ন কেউ এ কথা বলেনি। তিনি সতী লক্ষ্মী পুণ্যবতী তিনি আজন্ম দুঃখ পাচ্চেন, তার ওপরে এরকম অপবাদ দেওয়া মহা অধর্ম্ম! নিজে তো তিনি আসেনও নি, আর তার স্বামীর পরিচয়ও তিনি এতদিন জানতেন না। জ্যেঠা মশাই-ই প্রথমে আমার ভাসুরের সঙ্গে অমুর মিল দেখে কাঁদতে লাগলেন। তার পর তাঁর কাছে জ্যেঠাইমার একখানি ছবি ও আংটি ছিল তাই থেকে বোঝা গেল কে তাঁরা! সব্বাই বলে,—অমু ঠিক তার বাপের মত দেখতে।

নীরদকুমার শান্তির কথাগুলি স্থির হইয়া শুনিল। সত্যই এমন কিছু ত সে শুনে নাই যাহাতে সে মনে করিতে পারে,—নিশ্চয়ই শিবানীর মৃত্যু হইয়াছে। কি ভয়ানক! সে তাহার সন্তানের মাকে এত দিন ঘৃণা তাচ্ছিল্য ভরে দূরে ঠেলিয়া রাখিয়াছিল। তাহাকে নিজের মিথ্যা মৃত্যু সংবাদ পাঠাইয়া আবার একজনকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল? শান্তি যখন তাহাকে তাহার দিদির স্বামী বলিয়া জানিতে পারিবে! গভীর লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিয়া নীরদ মাথা হেঁট করিল। একটু পরে প্রশান্ত ভাবে কহিল,"হেম কোথায়?" ক্ষীণকণ্ঠে শান্তি উত্তর করিল "কি জানি"? "কখন আসা সম্ভব?" "তাও ঠিক নেই। আজও আসতে পারেন দুদিন দেরিও হতে পারে"। নীরদ বিস্মিত হইল,"এই নির্জ্জন পুরীর মধ্যে একলা তোমায় ফেলে সে বাড়িও থাকেনা নাকি?" বিরক্তিতে তাহার চিত্ত

উত্যক্ত হইয়া উঠিল। "তোমার বাবার সঙ্গে বোধ হচ্চে সে ঝগড়া করেচে? নিশ্চয়ই তাই না?" অশ্রুজলে শান্তির দৃষ্টি লোপ পাইয়া আসিতেছিল। সে উত্তর দিল না। বিরক্ত, বিস্মিত, অনুতপ্ত নীরদ কি বলিতে যাইতেছিল এমন সময় বিদ্যুৎ হানিয়া কড় কড় শব্দে মেঘ ডাকিয়া উঠিল। আকাশ ঘন মেঘে ছাইয়া আসিতেছে। নীরদ বিপন্নের মত খানিকক্ষণ জানালার ভিতর দিয়া বাহির আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল তারপর আবার শান্তির দিকে চাহিয়া দেখিল—নিঃশব্দে উদাস দৃষ্টিতে সে চাহিয়া আছে। সেই অর্থহীন উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি তাহার বক্ষে সজোরে আঘাত করিল। সেই শান্তি! সুন্দর চঞ্চল, আনন্দময় সংসার সুখোদ্যানের সেই ফুটন্ত সুবাসিত ফুলটি দেবতার পায়ের নির্ম্মাল্য টুকুরই মত পবিত্র! সংসারের এই সমরক্ষেত্রের আঘাত হইতে সেও রক্ষা পাইল না! কি বিচিত্র এই জগতের গতি।

সহসা নীরদ জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার মা বাবা তো ভাল আছেন শান্তি? তাঁদের কাছে তো গেলেও হতো? তাঁরা কেন তোমায় এখানে থাকতে দিয়েছেন?"

আবার দমিত অশ্রু উথলিয়া উঠিতে চাহিল, জোর করিয়া চোখের জল চাপিয়া রাখিয়া সে মাথা নীচু করিয়া রহিল।

নীরদ একটুখানি উত্তরের অপেক্ষা করিয়া থাকিয়া তারপর হঠাৎ মনে ঠিক করিয়া ফেলিল, মহৎপ্রকৃতির লোক রজনীনাথের সহিত তাহার লঘুপ্রকৃতির জামাতা হেমের বনিবনাও না হওয়া মোটেই আশ্চর্য্য বা অসম্ভব নয়। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সমবেদনা ও আত্মগ্লানি মিশ্রিত করুণচক্ষে চাহিয়া রহিল।

শীতের অপরাহ্ন মেঘাড়ম্বরে বর্ষারজনীর ন্যায় অন্ধকার হইয়া আসিতেছিল। আসন্ন বর্ষণের একটা বড় রকম যোগাড় হইয়া উঠিতেছে। দুর্য্যোগময়ী প্রকৃতির পানে চাহিয়া নীরদের হঠাৎ স্মরণ হইল তাহাকে যাইতে হইবে, এখানে সে পুরুষহীনগৃহে একজন বাহিরের লোকমাত্র। অথচ শান্তিকে এই দুর্য্যোগ রাত্রে একা ফেলিয়া চলিয়া যাওয়াও তো তাহার পক্ষে কর্ত্তব্য হয় না। ভাবিয়া চিন্তিয়া জিজ্ঞাসা করিল "হেম যদি না আসে রাত্রে কি একাই থাকো? চাকররা বিশ্বাসীতো?" শান্তির ম্লান অধরে অতি সূক্ষ্ম বিষাদের এক ফোঁটা হাসি ফুটিতে ফুটিতে বিদ্যুতের ক্ষণ রেখা পাতের ন্যায় চারিদিকের পুঞ্জীকৃত অন্ধকার রাশির মধ্যে মিলাইয়া গেল। "চাকর তো নেই, একজন ঝি আছে সেই থাকে, সে খুব ভাল।"

নীরদ আবার দণ্ডাহতের মত চমকিয়া উঠিল। কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া লইয়া বলিল "আমি তোমার এ অবস্থায় একা এই বনের মধ্যে ফেলে তো চলে যেতে পারি না,—না হয়—" তাহার কথা শেষ হইতে না দিয়াই তড়িতাহতের মত চমকিয়া উঠিয়া শান্তি তাহার আর্ত্তদৃষ্টি মেলিয়া ঈষৎ উৎকণ্ঠে বলিয়া উঠিল "নানা আমার কোন সাহায্য আপনি কর্বেন না, আমিতো কত দিনই এই রকম থাকি।" পাছে হেমেন্দ্র আসিয়া আবার কোন একটা বিরুদ্ধভাব ইঁহার সম্বন্ধে মনে আনে সেইজন্যই হঠাৎ শান্তি এতখানি উত্তেজনা-ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু নীরদ তাহার

ভিতরের অর্থটা না বুঝিয়া উল্টাই বুঝিল। পূর্ব্বেকার লজ্জাস্কর অভিনয়গুলা চকিতের মধ্যে বায়স্কোপের জীবন্ত চিত্রের মতন মনের মধ্যে আসিয়া পড়িয়া তাহার কর্ণমূল পর্য্যন্ত রাঙ্গা করিয়া তুলিল। ধিক্কারের সহিত সে নীরব হইয়া রহিল। এখন যে সে সকল দুরাশাস্বপ্ন মনের কোণেও জাগিয়া নাই যৌবনের সে সব দুর্দ্দাম চপলতা তাহার উৎপত্তির মধ্যেই নিঃশেষে লীন হইয়া গিয়াছে সে কথা সে কেমন করিয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিতে পারে? একবার ইচ্ছা হইল বলিয়া উঠে,—আমি তোমার রক্ষা করিতে লোকতঃ ধর্ম্মতঃই অধিকারী। সেই আত্মীয়তার সম্পর্কেও আমি তোমায় এ অবস্থায় ফেলিয়া যাইতে পারি না।" কিন্তু সে কথাটা বলা এখন যেন আরও কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। যে দিদি শান্তির শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সামগ্রী সেই দিদিরই স্বামী সে! অমু তাহারই অংশ, তাহার হৃদয় শোণিতের বিন্দু—তথাপি এ কথা কেমন করিয়া ঘৃণা লজ্জার মাথা খাইয়া সে স্বমুখে ব্যক্ত করিবে! দর্পহারী! এ কি প্রায়শ্চিত্ত!

তারপর আবার একটা বাধার কথাও মনে আসিল। হিন্দুর ঘরে তাহাদের সম্পর্কটাও এমনি জটিল সমস্যাযুক্ত যে তাহার প্রকাশেও এ অবস্থায় বড় একটা সুবিধা না ঘটিতেও পারে। মৃদু অনিচ্ছুকভাবে সে বিদায় চাহিল, শান্তি ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল "আর একবার আসবেন কি?" নীরদ আগ্রহের সহিত উত্তর করিল "নিশ্চয়, কাল সকালেই আমি আসবো।"

সে চলিয়া গেল। শুষ্ক অশ্রুহীননেত্রে শান্তি বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার গন্তব্য পথের দিকে চাহিয়া রহিল। ক্রমে যখন সন্ধ্যার ম্লান ছায়ান্ধকারের মধ্যে গলির বাঁকের মুখে তাহার সুদীর্ঘাকৃতি মিলাইয়া গেল, তখনও সে পলকহীন চক্ষুকে সেই দিকেই স্থির রাখিয়া গঠিত মূর্ত্তির মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। অবশেষে যখন মেঘভরা আকাশ হইতে বজ্রপাতের সাড়া আসিয়া ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে ঘরখানাকে শুদ্ধ কাঁপাইয়া তুলিল, এবং ঝুপ্‌ ঝুপ্‌ করিয়া জল পড়িতে আরম্ভ করিল তখন সে সেই লক্ষ্যহীন দৃষ্টি বহুদূর হইতে টানিয়া আনিয়া বিছানার উপরে লুটাইয়া পড়িল।

৪২

শান্তি পাশ ফিরিয়া শুইয়া বলিল "চন্দর, আজ কি রোদ উঠেছে? তবে জানলাটা খুলে দাওনা আমার প্রাণটা যেন কেমন হাঁপিয়ে উঠছে।"

কয়েকদিন হইতেই শান্তির অসুখ চলিতেছে—গত রাত্রি হইতে জ্বর খুব বাড়িয়া উঠিয়াছে। খোলা জানালার মধ্য দিয়া বাহিরের পানে চাহিয়া দেখিবার পূর্ব্বেই দ্বারে জুতার শব্দ হইল ও পরমুহূর্ত্তেই হেমেন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিল; শান্তির উৎসুক-নেত্র মুহূর্ত্তে নিরাশায় ম্লান হইয়া আসিল। সে অবসন্নভাবে বালিসের উপর মস্তক নিক্ষেপ করিয়া একটা হৃদয়ভেদী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। হেমেন্দ্র তাহার অবশ্য লক্ষ্যও করে নাই,—সে আজ বহুদিন পরে অনেকটা যেন প্রফুল্ল। ছাতা ও শালখানা একটা বাক্সর উপর নিক্ষেপ করিয়া পরিশ্রান্তভাবে বিছানার উপর বসিয়া পড়িয়া

পকেট হইতে একখানা রসিদ বাহির করিয়া শান্তির সম্মুখে ধরিয়া প্রফুল্লকণ্ঠে কহিল "আঃ এতদিন পরে কতকটা সুবিধা হয়ে এসেছে, —এইখানা ভাল করে রেখে দাও দেখি? শান্তি বিষণ্ণ দৃষ্টি তুলিয়া স্বামীর পানে চাহিল, কাগজখানা লইতে কোন আগ্রহ প্রকাশ করিল না। হেম তখন নিজে হইতেই বলিল "তোমার গহনাগুলো লক্ষ্মীপুর থেকে যোগেশ আদায় করে এনে একজন ব্যারিষ্টারের কাছে বন্ধক রাখিয়ে দিলে। টাকাগুলো তাঁরি কাছে জমা রইলো, তিনি তো খুব উৎসাহ দিচ্চেন। তিনি নিজে সব ভার নিচ্চেন, বলচেন কোন ভাবনা নেই! এইবার একবার তবে অদৃষ্ট পরীক্ষা করে দেখাই যাক্,—আর তো চলে না নৈলে। চারিদিকে ধার, কেবল নেই নেই! বাসন্তী থিয়েটারে কাল যমুনা প্লে হলো তাতে কুমার উৎপলাদিত্য সেজে উঃ কি নামটাই আমার হয়ে গ্যাছে! ম্যানেজার তো যোড়হাতে দেড়শো মাইনে দিতে চায় হপ্তায় একবার করে অভিনয় কর্ব্বার জন্যে। কিন্তু এখন দিনকতক সব ছাড়তে হবে, ভাল করে এইবার অদৃষ্টকে বোঝা যাক্।"

শান্তি একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। বাবু ঘরে ঢুকিতেই চন্দর ঘর ছাড়িয়া গিয়াছিল। বাহিরে যোগেশের সহিত তাহার কোন্দলের একটা উচ্চ সুর শোনা যাইতেছে। সহসা সে তাহার রক্তহীন পাংশু মুখ স্বামীর পানে ফিরাইয়া প্রদীপ্ত চক্ষু তাহার মুখে স্থির রাখিয়া উচ্চকণ্ঠে তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিল "ভাগ্য পরীক্ষা! ভাগ্য পরীক্ষা বলোনা ভাগ্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বলো,—বিদ্রোহ বলো"—উত্তেজনায় তাহার নিশ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল—"বেশিদিন নয় আর দুচারটে দিন অপেক্ষা করো, আমায় মরতে দাও, তারপরে তোমার যা খুসী করো, কে বারণ করবে? শুধু এই সামান্য দিনকটা ধৈর্য্য রাখো, ভিক্ষা চাইচি দয়া চাইচি কিছুই কি পেতে পারিনা? শেষ ভিক্ষা শেষ—"

হেমেন্দ্র ধড়মড় করিয়া বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, আকস্মিক একটা ভয়ে তাহার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল, শান্তি! শান্তি তুমি পাগল হলে নাকি? একি করচো? থামো—" আলুথালুভাবে বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া চিরসহিষ্ণু শান্তি সবেগে মাথা নাড়িয়া তেমনি তীব্র উত্তেজিতকণ্ঠে বলিতে লাগিল। "আর আমি থামতে পারি না, কত আর থামবো, আমার সময় শেষ হয়ে এসেছে, একটুখানি তুমিই থামো—আমায় মরতে দাও, তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে যা তোমার সাধ তাই করো, কেউ বাধা দেবার নেই। মাগোঃ।" বলিয়া সহসা সে আবার বিছানার উপরে শুইয়া পড়িল, শক্তির অতিরিক্ত ব্যয়ে শরীর অবসন্ন হইয়া আসিয়াছিল। নির্ব্বাক হেম তাহার নিশ্চেষ্ট অসাড় শরীরের দিকে কিছুক্ষণ বদ্ধদৃষ্টি হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া অল্পক্ষণ পরে তাহার নিকটে ছুটিয়া আসিয়া ডাকিল, "শান্তি! শান্তি!" পায়ে হাত দিয়া দেখিল নিশ্চল, তখন ভয়ে বিস্ময়ে তাহার হাত পা যেন অবসন্ন হইয়া আসিল। রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিল "যোগেশ!" যোগেশ দ্রুতপদে ঘরে ঢুকিয়া ক্রোধোত্তেজিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল "কি পাজী তোমার ঐ ঝি মাগীটা! বলে কিনা তুমিই তো

বাবুর শনি হয়েচ,—এ কি হেমবাবু?” হেম মাটিতে অবসন্নভাবে বসিয়া পড়িয়া তীব্র যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদের মতন করিয়া কহিয়া উঠিল “দেখ যোগেশ! আমি ওকে খুন করেচি!”

“এ্যাঁ! সে কি!” কিন্তু সেই সময়েই শান্তিকে একটু নড়িতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি সামলাইয়া লইয়া কাছে আসিল “না, না মূর্চ্ছা হয়েচে! একটু জল আন দেখি এক্ষণি সেরে যাবে, কপালটা ভয়ানক গরম! আমি একজন ডাক্তারকে বরং ডেকে আনি, তুমি কাছে থাকো” হেম আতঙ্কে বলিয়া উঠিল “না যোগেশ আমিই তার চেয়ে ডাক্তারের জন্যে যাচ্চি। তুমি এখানে থাক।”

যোগেশ বলিল “আচ্ছা তাইযাও”মনে মনে বলিল ভীরু! সবেতেই তোমার সমান ভয়, এদিকে আবার যোগেশকে স্ত্রীর সঙ্গে একটা কথা কইতে দেখলেও সয় না।” শান্তির পরিণাম তাহাকেও যেন অলক্ষ্যে অনুতাপের কষাঘাতে ক্লিষ্ট করিতেছিল, সেইতো হেমের মন্ত্রণাদাতা! সেওতো কম পাপী নয়! আহা দুজনে পড়িয়া কি তবে সত্য সত্যই বেচারাকে হত্যা করিয়া ফেলিল না কি? এতোটা হইবে কে জানিত!

হেমেন্দ্রকে অধিকদূর যাইতে হইল না। গলির মধ্যেই পরিচিত প্রসন্নবাবু ডাক্তারের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে হেম ব্যগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—

“আঃ বাঁচা গেল! আমি আপনার কাছেই যাচ্ছিলুম যে, আসুন ডাক্তারবাবু শিগ্‌গির একবার আমার বাড়ি আসুন—”

ডাক্তার কি বলিতে যাইতেছিলেন কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই তাঁহার সমভিব্যাহারী লোকটি তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল “কেন বলো দেখি? শান্তি কেমন আছে?”

হেমেন্দ্র অপরিচিতের এই অযাচিত আত্মীয়তায় মনে মনে যথেষ্ট বিস্মিত হইলেও এ বিপদের সময় বিরক্ত হইতে পারিল না বা তাহার সহিত ঘনিষ্ঠভাব প্রকাশ করায় আগন্তুকের ধৃষ্টতার কথা মনেও পড়িল না। সে তখন ঘোর বিপন্ন,—মনে হইল হয়ত ইহার নিকটও কিছু সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। সে যে কে সে প্রশ্ন পর্য্যন্ত না তুলিয়া ঈষৎ যেন আশ্বস্ত চিত্তেই বলিল “হঠাৎ তার মূর্চ্ছা হয়েচে, আপনারা শিগ্‌গির আসুন।”

ডাক্তারের সঙ্গেই যোগেশ তাঁহার লিখিত প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন দুখানা লইয়া চলিয়া গেলে নীরদকুমার পরুষকণ্ঠে মুহ্যমানপ্রায় হেমেন্দ্রকে বলিয়া উঠিলেন “এমনি করেই মেরে ফেলতে হয়?” নীরদের ব্যবহারে হেম বুঝিয়া লইয়াছিল—তিনি রজনীনাথেরই কোন আত্মীয়,—শান্তির আপনারই লোক। হেমেন্দ্র লজ্জিত মৃদুস্বরে গুণ গুণ করিয়া বলিল “চিকিৎসা হচ্ছিল তো, ডাক্তার বল্লে ম্যালেরিয়া—”

নীরদ বাধা দিল “ছাই চিকিৎসা হচ্ছিল! ওকি জীবনে কখনও এমন অবস্থায় থেকেচে? তা একবার মনে হলোনা!”

অপরিচিতের এই তীব্র তিরস্কারে গর্ব্বিত হেমেন্দ্র আজ রাগ করিল না, বরং লজ্জায় যেন মরিয়া গেল। সে যে কত বড় অপরাধে জগতের ও নিজের হৃদয়ের নিকটে অপরাধী সে কথা যে জলন্ত লোহার

বাড়ি দিয়া বুকের ভিতরে আগুনের অক্ষরে বিধাতা সম্প্রতি লিখিয়া দিয়াছেন। নীরদ তাহার পাশে আসিয়া বসিল। একটুও ইতস্তত না করিয়া একেবারে সোজা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়া ফেলিল—"শুনলে তো ডাক্তার কি বলে গেলেন? এখনও কি রজনীবাবুকে খপর দিতে তোমার কোন আপত্তি আছে? ভেবে দেখ শান্তি যদি না বাঁচে চির দিনের জন্য কি আক্ষেপ থেকে যাবে!"

হেমেন্দ্র তড়িতাহতের মত শিহরিয়া উঠিয়া কাতরকণ্ঠে বলিয়া উঠিল "সেকি বাঁচবে না? দয়া করে আপনি তাকে বাঁচান, আমায় যা করতে বলবেন আমি করতে প্রস্তুত আছি। আমিই তাকে মেরে ফেল্লুম!"

হেমেন্দ্রের চোখ ফাটিয়া জল আসিয়া পড়িল। বিমর্ষ মুখে কহিল "সে যদি না বাঁচে আমি লোকের কাছে মুখ দেখাব কেমন করে। আমার এ সংসারে শান্তি ছাড়া আর আছেই বা কে! আমার—" গভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল "বেঁচে থাকা অসহ্য হয়ে উঠবে, আপনার বলতে কেউ আমার নেই।"

নীরদ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, হেমকে সে যে রকম কঠোর চিত্ত, মমতাহীন পাষণ্ডরূপে কল্পনা করিয়া লইয়াছিল তাহাকে সে রকম ঠিক না দেখিয়া অনেকটা যেন আশ্বস্ত হইল। অবস্থার গতিতে পড়িয়া সেও যে কত সময় তাহার স্বভাবের বিপরীত হইয়া উঠিয়াছে! যে দোষী সে অন্যের বিচারক হইবে কোন মুখে? তাহাকে যে তিরস্কার গুলো করিবে বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিল নিঃশব্দে সেগুলা মনের ভিতরেই চাপিয়া ফেলিয়া সান্ত্বনা পূর্ণ কণ্ঠে সে কহিল "হতাশ হয়োনা হেম, প্রারব্ধ প্রবল বটে, কিন্তু পুরুষকারও সামান্য বল নয়। আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা আমরা করতে যেন পরাঙ্মুখ না হই। তারপর কর্ম্ম-ফলদাতা তাঁর কাজ কর্ব্বেনইতো। তবে টেলিগ্রাম করি? শান্তির পক্ষে এখন তার রোগের মূল ওষুধেই সব চেয়ে বেশি কাজ করবে।" লজ্জায় হেমেন্দ্র আবার কিছুক্ষণ বাক্যহীন হইয়া রহিল। তারপর মুখ না তুলিয়াই মৃদু কণ্ঠে কহিল "তাঁরা কি আমাদের ক্ষমা করবেন?"

হেমেন্দ্র সব কথাই অপরিচিত আত্মীয়ের নিকটে খুলিয়া বলিল,—কেমন করিয়া সে রজনীনাথকে যোগেশের সাহায্যে বিদায় করিয়াছিল, সেদিন তাহার অপমানের তীব্র প্রতিশোধ—তাঁহার আহতমুখের সেই রক্তহীন বিবর্ণতা স্মরণ করিয়া অন্তরের মধ্যে আজ সে লজ্জা ও অনুতাপের তীব্র কষাঘাত অনুভব করিল। এমন বিপদের মধ্যেও নীরদ একটা অদম্য কৌতুহলের হাত হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারিল না। অদূরে দত্তবাবুদের শ্বেত প্রাসাদের উপর হইতে ধীরে ধীরে সূর্য্য-রশ্মি নামিয়া যাইতেছিল এবং শীতের অকাল-সন্ধ্যায় শান্তির ললাটের মতই পশ্চিম আকাশের প্রান্তটা ম্লান হইয়া আসিতেছিল, সেই দিকে চাহিয়া যেন অনাগ্রহভাবে প্রশ্ন করিল "তোমার বিনোদদার স্ত্রী সত্যি সত্যিই জাল নাকি? সে নাকি ভাল লোক নয়?"

হেম ঈষৎ বিস্মিত ও অপমানিত ভাবে হঠাৎ মুখ তুলিয়া অপরিচিত প্রশ্নকারীর প্রতি চাহিল, তাহার মুখের সাগ্রহ সকৌতুকভাব

হঠাৎ তাহাকে কতকটা উত্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল, ঈষৎ গর্ব্বিত ভাবে কহিল "তা আমি কি করে জানবো? তা ছাড়া সে সব পারিবারিক কথা—" বলিতে বলিতে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া হেমেন্দ্র ঈষৎ অপ্রস্তুত ভাবে বলিল "আমায় মাপ কর্ব্বেন সেও যা ঘটেছে সব আমারি দোষে। সত্যি কথা বলতে কি, আমি তাঁকে কিছুই জানিনা, তবে শান্তির তাঁর উপরে যে রকম ভাব তাতে তা'কে দেবী বলেই মনে করা উচিত।' আবার দুজনে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। "সেখানেও একটা খপর দিলে হয় না? তিনি হয়ত এলেও আসতে পারেন। শুনেছি জ্যেঠা মশাই এখনও আমায় স্নেহ করে থাকেন। শান্তির স্বামী বলেও তাঁরা হয়ত আমায় ক্ষমা করতে পারেন, আমার জন্যে না হলেও।"

হেমের এই কথায় নীরদ উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল "তুমি শান্তির কাছে যাও, আমি টেলিগ্রাম দুটো করে আসচি।"

হেমেন্দ্র আসিয়া দেখিল, শান্তি জাগিয়াছে, সে যেন ব্যাকুলনেত্রে কাহাকে অন্বেষণ করিতেছিল, তাহাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া ঘোর অভিমানে অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

সেই রোগক্লিষ্ট চিত্তের অভিমানের নীরব বেদনা হেমকে অত্যন্তই আঘাত করিয়াছিল, কিন্তু তথাপি প্রকৃতিগত আত্মাভিমানের বশে মুখটা একবারের জন্য একটু লাল হইয়া উঠিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে ভাবটা সামলাইয়া ফেলিয়া বিছানার উপরে তাহার অত্যন্ত নিকটে আসিয়া বসিল ও কিছুক্ষণ তাহার অভিমানাহত বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে ডাকিল "শান্তি!" সেই এক উৎসব রজনীর পুষ্পমণ্ডিত প্রাঙ্গণে শঙ্খরোলের মধ্যে যে দুইটি লজ্জা মুকুলিত নেত্র পুষ্প কলিকার মতন, তাহার দিকে প্রথম সলজ্জ দৃষ্টিপাত করিয়াছিল তখন তাহার মধ্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভরতাই তো শুধু ভরা ছিল, কে তাহার পরিবর্ত্তে এ হতাশা ও বেদনা মাত্র প্রতিদান দিল?—সেই না!

"আমার দিকে চাও শান্তি।" এই বলিয়া সে শান্তির একখানা শীর্ণ হস্ত নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইল। তাহার কণ্ঠশব্দে অশ্রুজল পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছিল, শান্তি আশ্চর্য্য হইয়া মুখ ফিরাইল, নিঃশব্দে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি আমার জন্যে দুঃখ করচো? আমি মরে যাবো বলে?"

হেমেন্দ্র দুই হাতে শান্তির দুর্ব্বল হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া তাহার মুখের উপর নত হইয়া তাহার ক্লিষ্ট অধরে চুম্বন করিয়া রুদ্ধ আবেগ পূর্ণ কণ্ঠে কহিয়া উঠিল "হ্যাঁ তোমারি জন্যে শান্তি, তুমি যে আমার সর্ব্বস্ব? আমি সব দুরাকাঙ্ক্ষা ছেড়ে দিয়ে মানুষ হবো শান্তি, শুধু তুমি আমায় ছেড়ে যেও না! শান্তি লক্ষ্মী তুমি আমার, তোমায় চিনিনি তাই আমি লক্ষ্মীছাড়া হয়েছি, আমার মঙ্গললক্ষ্মী অমঙ্গলের মুখে ভাসিয়ে দিয়ে আমায়, তুমি চলে যেও না।"

বলিতে বলিতে হেম দেখিল তাহার কথাগুলা সব ব্যর্থই হইতেছে শান্তি জাগিয়া নাই; তাহার ক্ষীণ হাতখানি তাহার হাতের মধ্যে শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। রোগের গতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হেম তাহার সেই অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত আনন্দের মূর্চ্ছাকে নিদ্রা

ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া কাছে বসিয়া বসিয়া তাহার রুক্ষ চুলগুলাকে মুখের উপর হইতে সরাইয়া দিতে লাগিল। শান্তির মুখখানার এত সৌন্দর্য্য আর কখনও তাহার চক্ষে পড়ে নাই, নির্ব্বাপিত প্রায় দীপশিখাটুকুর ম্লান আলোকে সমস্ত অন্ধকার দূরীভূত হইয়া গিয়া যেন সেখানে দিব্যজ্যোতি প্রকাশিত হইয়া উঠিল।

অন্বেষণ।

এহি বিশ্বের মাঝে বিয়াকুল প্রাণ
নিয়ত কাহারে চাহে?
কাহার লাগিয়া, মরে সে কাঁদিয়া
দারুণ মর্ম্ম-দাহে!
গাহে বিহঙ্গ অম্বর ছাপি';
সারা হিয়া মোর তাহে ওঠে কাঁপি'!
সেই গানে হায়, মরি বেদনায়
গুমরি মরম মাঝে!
মনে হয় মোর—কত কি যেন রে
সে সুরে লুকানো আছে!

হেতা যেখানে যা'কিছু আছে অভিরাম,
ত'রেই এ প্রাণ চায়।
যেন কি আভাসে, অধীর হুতাশে
"ঐ ঐ" বলে' ধায়!
হেরিলে কাহারে মনের মতন,—
তুলে' লয় বুকে করিয়া যতন;
যত চেপে' ধরে বুকের উপরে
ততই জ্বলিয়া মরে;
"এ তো নয়, ওগো, এ তো নয়"—বলে'
কাঁদে সে আর্ত্ত স্বরে!

যবে নিকুঞ্জ মাঝে, তরু-শাখা' পরে,
অপরূপ গরিমায়,
গোলাপের কলি ধীরে পড়ে ঢলি'
মধুর মন্দ বায়;—
সোহাগ-মুগ্ধ আগ্রহ ভরে
ছুটে যাই কাছে; পরম আদরে
যেই তুলি তা'রে, মুঠির মাঝারে
অমনি পড়ে সে ঝরি'!
নিরাশা-দিগ্ধ পরাণ তখনি
ওঠে হাহাকার করি'!

শুধু এমনি করিয়া, ব্যর্থ আবেগে
ফিরি আমি দিবানিশা!
চলেছি কোথায়, কি যে চাহি, হায়—
করিতে পারি না দিশা!
হে মোর তৃপ্তি, ওগো অজানিত,
হে চিরন্তন, চির-বাঞ্ছিত,
আর কত দিন হেন উদাসীন,
ফিরিব পাগলপারা;
দেহ, দেহ দরশন হে হৃদি-রমণ!
—মুছাও নয়ন-ধারা!

শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী।

শতদল-রচয়িত্রী ।

শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী ।

'শতদল' শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী-রচিত একখানি কবিতাগ্রন্থ। একশতটি ভগবদ্ভক্তি বিষয়ক ক্ষুদ্র কবিতার দলে কবির হৃদয় পদ্ম বিকশিত হইয়াছে। কবিতাগুলিতে সুমধুর বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্য আছে, একঘেয়ে নহে। বিধাতার করুণার উপর অটল নির্ভর স্থাপন করিয়া, জগতে সকল কাজের মধ্যে বিধাতার করস্পর্শ অনুভব করিয়া তাঁহারি মহিমা কীর্ত্তনরতা কবি 'পূজিবার শতদল' লইয়া 'পবিত্র মন্দির'দ্বারে আসিয়াছেন। তাঁহার শতদলের মিষ্ট সৌরভে, তাঁহার ভক্ত্যুচ্ছ্বাসের আন্তরিকতায় এ পূজা ব্যর্থ হইবে না। এ কথা আমরা দৃঢ়ভাবে বলিতে পারি।

কবি গাহিয়াছেন,—

"আমার হৃদয় মাঝে প্রেমভক্তি দিয়া'
তোমার পূজার গান রাখিব রচিয়া।
পুষ্পসম যেন প্রাণ তোমার পরশে।
হাসিয়া ফুটিয়া উঠে মঙ্গল হরষে।"

কিন্তু 'শতদলে'র কবি আজ নূতন এ পূজার সাজি লইয়া বাণীর মন্দির দ্বারে উপস্থিত হন নাই। বহুপূর্ব্ব হইতেই তাঁহার কমকণ্ঠের সঙ্গীত রবে পূজার মন্দির ভরিয়া রহিয়াছে। কবিরচিত "হাসি ও অশ্রু," "অশোকা" প্রভৃতি বহুদিন পূর্ব্বেই তাঁহাকে বাঙ্গালার কাব্যসাহিত্যে প্রতিষ্ঠার আসন দান করিয়াছে। সে আজ অনেকদিনের কথা, যখন ভারতী-সম্পাদিকা মহাশয়ার তত্ত্বাবধানে সরোজকুমারীর "হাসি ও অশ্রু" প্রথম প্রকাশিত হয়। সেই এক সঙ্কোচে সরমে মৃদু সঙ্গীতের অস্ফুট রাগিণী ধ্বনিত হইয়াছিল! কবির প্রথম গান,—

আকুল মর্ম্মের মাঝে, যে উন্মাদ সুর বাজে
দুটি ছত্রে লিখিতে বাসনা
গোপন হৃদয় ছায় যে সিন্ধু উচ্ছ্বসে হায়
কি জানাবে দুটি অশ্রু-কণা?

আজ আর সে সুর রুদ্ধ নাই, গুমরিয়া মরে না—আজ তাহা সমস্ত বাধা সমস্ত সঙ্কোচ ঠেলিয়া বিশ্ববাসীর হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে!

"হাসি ও অশ্রু"তে কবির হৃদয়ের উদারতা ও ভাবের বিশালতা প্রথম পরিলক্ষিত হইয়াছিল! 'সন্ধ্যার তারকা' দেখিয়া কবির 'দুইটি নয়ন' ছলছল হইয়া আসিত—'আঁখি স্বপ্নে ভোর' হইয়া আসিত। ভাবের সেই প্রথম বিকাশ—কবির তুলিকায় সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে! শতাধিক খণ্ড কবিতা—সবগুলিই কবিত্বে পূর্ণ—বিমল সহানুভূতির রসে সুস্নিগ্ধ! "হাসি ও অশ্রু"তে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-বর্ণিত নায়ক-নায়িকাগণের উদ্দেশ্যে লিখিত যে কোন 'সনেট' পাঠ করিলেই আমাদিগের কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে! বিষবৃক্ষের কুন্দকে লক্ষ্য করিয়া কবি বলিয়াছেন,

প্রণয় দেবতা তাই হয়ে মূর্ত্তিমান
এসেছেন পূজা তব লইবারে পায়ে;
এইবার সঁপ বালা আপন পরাণ,
লাজে 'না' বলিছ কেন আপনা লুকায়ে?
নীরব তোমার প্রেম দিবানিশি ঝরে;
প্রণয়-দেবতাপদে প্রেমের মন্দিরে।"

রবীন্দ্রনাথের "রাজারাণীর এবং সম্পাদিকা মহাশয়ার উপন্যাসের কয়েকটি চরিত্রও তাঁহার

ছন্দে বেশ নিপুণভাবে ফুটিয়াছে—স্থানাভাবে আমরা তাহা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

"অশোকা" কবির আর একখানি কাব্য-গ্রন্থ। ইহাতে প্রায় শতাধিক কবিতা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অধিকাংশ কবিতাই সরল, মিষ্ট ও ভাবপূর্ণ।

কাব্য-গ্রন্থত্রয় ভিন্ন কবিরচিত ক্ষুদ্রগল্প গ্রন্থও একখানি প্রকাশিত হইয়াছে। সেখানির নাম, "কাহিনী"। গল্পগুলি ঠিক ছোট গল্প নহে। সেগুলি ছোট নভেল। কেবল দুঃখের কাহিনী! অধিকাংশই ইংরাজি গল্পের ছায়াবলম্বনে রচিত। গল্পের

শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী এবং তাঁহার স্বামী ও শিশু পুত্র।

ও সহজ। লেখিকা মনোযোগ প্রদান করিলে মৌলিক উপন্যাস লিখিতে পারিবেন বলিয়া আশা হয়।

ইংরাজী ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে সরোজকুমারী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মথুরানাথ গুপ্ত মহাশয় সবজজ ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ট্রিবিউন সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বঙ্গভাষায় একজন প্রসিদ্ধ গল্প ও উপন্যাস-লেখক। সিভিলিয়ান বঙ্গসাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় সরোজকুমারীর খুল্লতাতপুত্র।

সরোজকুমারী বাল্যে পিতার নিকট শিক্ষালাভ করেন। দশবৎসর বয়সে কলুটোলার প্রসিদ্ধ সেন বংশীয় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। স্বামীর যত্নে সরোজকুমারীর রীতিমত শিক্ষার সুবন্দোবস্ত হয়। যোগেন্দ্রবাবু সম্বলপুরের গভর্ণমেণ্ট উকীল। সরোজকুমারী বলেন, "আমার জীবনে যাহা কিছু সুখ-সৌভাগ্য, যাহা কিছু শিক্ষা, সব স্বামীর জন্য।"

অতর্কিত।

লীলাকে আমি একটি বৎসরমাত্র পেয়েছিলাম।

সে বৎসরটা যেন আরব্যোপন্যাসের একটা কাহিনী। আমার অন্ধকারাবৃত জীবনের মাঝখানে লীলা যে আলাদিনের প্রদীপ জ্বালিয়েছিল, সে যে শুধু আনন্দ ও আলোকের দ্বারা আমাকে উদ্ভাসিত করেছিল তা নয়, আমার নিশ্চেষ্ট প্রাণকে যেন কোন অজ্ঞাতপূর্ব্ব জীবনীশক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত করে তুলেছিল। আকাশের নীলিমা, শূন্যের উদারতা পৃথিবীর সম্পদ তেমন করে আর কখনও আমি উপভোগ করি নি এবং প্রেম ও আনন্দের মধ্যে আমি আর কখনও তেমন করে নিজেকে নিঃশেষ করে দিতে পারিনি।

কিন্তু মাত্র একটি বৎসর। তারপর আমার জীবনের আনন্দ মুছে গেল, আলোক নিভিয়া গেল, এবং এক বর্ষণসিক্ত ঘনান্ধকার বজ্রবিদীর্ণ সন্ধ্যার ম্লানিমার মধ্যে লীলা তাহার ইহজীবনের সংক্ষিপ্ত কাহিনী সমাপ্ত করিয়া দিল!

২

ঝঞ্ঝাবসানে ভগ্নশির বৃক্ষের মত আমার মনে হইল হায় এ কি খেলা, এ কি নিদারুণ খেলা! একটি বৎসরের জন্য এ প্রতারণা কেন?

লীলা বলিয়াছিল আবার তাহাকে দেখিতে পাইব। সেই আশা বুকে করিয়া দীর্ঘ দিবস কাটাইয়া দিতাম, তাহার পর যখন সন্ধ্যা হইয়া যাইত, তখন শয্যাবিস্তার করিয়া তাহারই প্রতীক্ষায় শয্যার একপার্শ্বে বসিয়া থাকিতাম। মনে হইত দূরে যেন কাহার পদশব্দ শোনা যাইতেছে। উন্মুখ ব্যগ্র হৃদয়ে দুয়ারের পানে চাহিয়া থাকিতাম যদি সে আসে! রাত্রি যখন গভীর এবং স্তব্ধতা সুনিবিড় হইয়া আসিত, তখন মনে হইত

সে যেন আরো কাছে আছে। পাছে আমি দেখিলে সে চলিয়া যায় তাই প্রাণপণে দুই চক্ষু বুজিয়া থাকিতাম। যদি তার উপস্থিতি অন্য কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করিতে পারি! সমস্ত দেহ তাহার স্পর্শের প্রতীক্ষায় উন্মুখ হইয়া থাকিত এবং কর্ণ তাহার নিঃশ্বাসের মৃদু শব্দের প্রতীক্ষা করিত! তাহার পর যখন নিশ্বাস রোধ এবং হৃৎপিণ্ড নিশ্চল হইবার উপক্রম করিত তখন অকস্মাৎ চাহিয়া দেখিতাম বৃথা, বৃথা! সে আলোয় নাই, আঁধারে নাই, ঘরে নাই, বাহিরে নাই, কোথাও নাই!

তখন তাহারই জন্য রচিত শয্যায় লুণ্ঠিত হইয়া পড়িতাম, অশান্ত হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিত, এবং চারিদিকের আলো অন্ধকার এক হইয়া যাইত!

৩

এমনি করিয়া একটি বৎসর কাটিয়া গেল, তবু সে আসিল না!

ঠিক সেদিন তাহার মৃত্যু হইয়াছিল—আমি কর্ম্মোপলক্ষে গৃহ ছাড়িয়া অন্যত্র গিয়াছিলাম, যখন সন্ধ্যা হইয়া আসিতে লাগিল তখন মনে হইল আর আমার দূরে থাকা কিছুতেই কর্ত্তব্য নহে!

সেদিনও আকাশ গাঢ় কালো মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছিল, আর্দ্র বাতাস বহিতেছিল এবং আকাশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত বিদীর্ণ করিয়া বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিতেছিল। পাষাণ নগরী ভীত স্তব্ধভাবে আগতপ্রায় ঝঞ্ঝার প্রতীক্ষা করিতেছিল। পথিক পথত্যাগ করিয়াছিল, এবং ফেরিওয়ালা গৃহে ফিরিয়াছিল।

একটা অপ্রশস্ত গলির মধ্য দিয়া আমার রাস্তা। খানিকদূরে ঠিক রাস্তার উপরেই একটা বাড়ি। এবং গলিটা তাহারই পার্শ্ব দিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে।

আমি ত্রস্তপদে চলিতেছিলাম, আজ আমার মনে হইতেছিল কি জানি কেন তাহাকে দেখিতে পাইবই! আজ আমার এক বৎসরের প্রতীক্ষা সফল হইবে;—সেই তাহার ছোট ঘরটিতে, সেই তাহার প্রিয় শয্যায় হয়ত ক্ষণেকের জন্য তাহাকে ফিরিয়া পাইব!

গলিতে পড়িতেই ঠিক সম্মুখে সেই বাড়ী। তাহার নীচেকার দুয়ার বন্ধ কিন্তু জানালাগুলা খোলা, বোধ হয় ঝঞ্ঝার ভয়ে উপরকার জানালাগুলা বন্ধ ছিল।

মনে হইল যেন নীচেকার জানালার গরাদ ধরিয়া কে দাঁড়াইয়া নির্নিমেষ নেত্রে আমার পানে চাহিয়া আছে। সুদীর্ঘ গলি যতক্ষণ অতিক্রম করিলাম সে তেমনি স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। ভাবিলাম কে তাহার দূরগত প্রিয়জনের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, হয়ত আমার মুখের সহিত তাহার সাদৃশ্য আছে, তাই ভুল করিয়া আমাকে দেখিতেছে!

জানালার আরো কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম, সে তেমনি স্থির। সহসা মনে হইল সে আমার লীলার মত দেখিতে, তেমনি মুখ তেমনি চোখ! থমকিয়া দাঁড়াইলাম, দাঁড়াইয়া নির্নিমেষে দেখিতে লাগিলাম,—সে স্থির অচঞ্চল! আমারই পানে তাহার দৃষ্টি আবদ্ধ, কিন্তু সে দৃষ্টিতে আনন্দ নাই, শোক নাই!

কড়কড় শব্দে মেঘ ডাকিয়া উঠিল—সেই শব্দে চমকিয়া ভাবিলাম এ কি করিতেছি, পরের ঘরের সম্মুখে কিসের জন্য দাঁড়াইয়া আছি! লোকে যদি দেখে,—লীলা যদি দেখে!—ত্বরিত পদে সেখান হইতে চলিয়া গেলাম।

কিন্তু আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সেই দুইটি চোখ আমারই পানে চাহিয়াছিল। গলি বাঁকিয়া গেল, তবু আমি পিছনে চাহিয়া দেখিলাম, সামান্য অপ্রশস্ত স্থানের মধ্য দিয়াও বাঁকিয়া চুরিয়া কোনপ্রকারে সে আমাকেই দেখিতেছে!

তাহার পর যখন আর দেখা গেল না, তখন সহসা একটা অনুতাপ বোধ হইল, মনে হইল সে যেই হ'ক, সে যখন আমার লীলারই মত দেখিতে, তখন তাহার এ প্রতীক্ষা অবহেলা করা উচিত হয় নাই। যদি সে লীলা হয়,—আজ এক বৎসর পরে এমন করিয়াই যদি লীলা আমাকে দেখা দিয়া থাকে! তখন সেই চিন্তা আমাকে পীড়িত করিয়া তুলিল, দ্রুতপদে জানালার নিকট ফিরিয়া গেলাম—কোথাও কেহ নাই। তখন দুইহাতে দুয়ারের কড়া ধরিয়া সজোরে নাড়িতে লাগিলাম—বজ্রের ভীষণ গর্জ্জনের মধ্যে তাহা লুপ্ত হইয়া গেল।

সমস্ত রাত্রি ধরিয়া স্বপ্নে ও জাগরণে তাহাকে এক অন্ধকার গৃহের মধ্যে জানালার নিকট দাঁড়াইয়া আমারই পানে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া থাকিতে দেখিলাম। তাহাকে অবহেলা করিয়া আমি চলিয়া আসিলাম—তথাপি তাহার সে দৃষ্টি ফিরিল না! হায় অন্ধ, হায় মূঢ়! সে দৃষ্টির স্মৃতি সমস্ত রাত ধরিয়া আমাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল! তখন বাহিরে বৃষ্টি ও ঝড় মাতামাতি করিতেছিল।

ভোর বেলা উন্মত্তের মত আবার সেই বাড়িতে গিয়া দুয়ারের কড়া নাড়িতে লাগিলাম।

পাশের বাটির একজন লোক আমাকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন "কাকে খুঁজছেন, মশায়, দেখছেন না, ও বাড়ী খালি,—ওপরে চেয়ে দেখুন"। চাহিয়া দেখিলাম লেখা "বাটি ভাড়া দেওয়া যাইবে—"। নিশ্বাস প্রায় তখন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। জিজ্ঞাসা করিলাম "কতদিন খালি আছে?" খানিকটা ভাবিয়া তিনি কহিলেন "এক মাসের উপর হবে।"

তখন নতশিরে নম্রচিত্তে সেই জানালার নিকট গিয়া দাঁড়াইলাম। এবং যে গরাদ সে কাল ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার উপর শির রক্ষা করিলাম। সে কাল এইখানেই আসিয়াছিল। মনে হইল আজও সে সেইখানেই আছে তাহার দেহের সৌরভ আমাকে ব্যাপ্ত করিয়া দিল, তাহার শেষ কথা যেন শুনিতে পাইলাম। এবং তাহার স্নেহ-স্পর্শ যেন আমার বেদনা-কাতর সর্ব্বাঙ্গে অমৃত সিঞ্চন করিল!

তখন বিশ্বের আলো নিভিয়া গেল, এবং আমার চোখের সম্মুখে একটা ঘন কালো পর্দ্দা পড়িয়া গেল।

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল।

"নারীর যে সুকোমল হস্ত শিশুকে দোলাইয়া ঘুম পাড়ায় সেই হস্তই পৃথিবীর শাসন দণ্ড ধারণ করে।" ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক রমণীকেই সমাজ এবং সংসারের শাসন ভার বহন করিতে হয়। আমাদিগকে সেই সম্মানপদবীর যোগ্য করিবার জন্য, সেই পদের যোগ্য শিক্ষা বিধানের নিমিত্ত; এবং ভারতবর্ষীয় সমাজকে উন্নত ও সুশিক্ষিত করিবার জন্যই এই ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল স্থাপিত হইয়াছে।

দেশের নারী শক্তি এক মহতী শক্তি তাহাকে অতিক্রম করিয়া কোন সমাজই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না, সেই মহাশক্তিই যদি সুপ্ত থাকে তবে কেমন করিয়া জাতীয় শক্তি জাগ্রত এবং প্রবুদ্ধ হইবে? সুতরাং সর্ব্বাগ্রে ব্যক্তিগত ভাবে নারীশক্তির উদ্বোধন আবশ্যক। প্রভাতের আলোকে মঙ্গল শঙ্খ রবে যখন আমাদের এই বিশাল ভারতের মন্দিরে মন্দিরে নব দিবসের উদ্বোধন ধ্বনিত হয় তখন আমাদিগকেও জাগ্রত হইতে হইবে। সূচনায় পূর্ণরূপে ধারণা করিতে হইবে আমি এই গৃহমন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, আমি আছি। পরে ধারণা করিতে হইবে মানব সমাজও সংসারের সম্রাজ্ঞী আমরা আছি। পরমা শক্তি যখন সুষুপ্তা তখন বিশ্বপ্রকৃতি প্রলয়নিমগ্না, কালরাত্রির অন্ধকারে লীন এবং নিলুপ্ত। ভারতনারীরাজ্যের পরমা শক্তিকে উদ্বোধিত করিতে পারিলেই সংসার এবং সমাজ জাগ্রত এবং জীবন্ত হইবে।

মহর্ষি পাতঞ্জল তাঁহার যোগসূত্রে বলিয়াছেন—শব্দের একটি বিশেষ এবং মহতী শক্তি আছে।

উপযুক্ত শব্দ নির্ব্বাচন এবং প্রয়োগ, মন্ত্রকে সার্থক এবং সফল করে। 'ভীত হও' এই বাক্যটি উচ্চারণ মাত্র শ্রোতাদিগের হৃদয়ে এক অস্বচ্ছন্দতার উদয় হয় আবার মাভৈঃ শব্দ উচ্চারণে অস্বচ্ছন্দতা দূর হইয়া সঙ্কোচ অপসারিত হয় হৃদয় উদার উৎসাহে পরিপূর্ণ হইয়া আবার স্ফীত হইয়া উঠে।

কত যুগ যুগান্তর হইতে ভারতবর্ষীয় নারীগণ আপনাদিগকে কেবলি হীন তুচ্ছ অক্ষম এবং দুর্ব্বল বলিয়া ধারণা করিয়া আসিতেছেন। সহস্র প্রকারে সহস্র ঘটনায় এই ধারণা তাঁহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। শিশু পুত্রের জন্মে গৃহে গৃহে যে আনন্দ উৎসব হয়, বাঁশরীতে যে আনন্দের রাগিনী বাজিয়া উঠে আত্মীয় স্বজন যেমন মুক্ত হস্তে দান ও পারিতোষিক বিতরণ করেন শিশু কন্যার আগমনে তাহার একাংশও দেখা যায় না। সেদিন মাতা যে সুকুমার শিশু কন্যাটিকে বক্ষের কাছে টানিয়া লইয়া সূতিকা গৃহে শয়ন করিয়া থাকেন কোন আনন্দ কোলাহল কোন উৎসব বাদ্য কোন আত্মীয়ের সাগ্রহ আগমন সে নিভৃত কক্ষের নির্জ্জনতা ভঙ্গ করে না, কোন মঙ্গল অনুষ্ঠান সেই নবীন জীবনের শুভাগমন সূচনা করেনা। তাহার অস্তিত্ব যে আছে তাহা স্বীকার করিতে যেন সকলে কুণ্ঠিত সেই জন্যই ভারতের প্রত্যেক বালিকা যখন নারী পদবীতে উন্নীত তখনও সে আপন গৌরবের অধিকারী হইতে শিক্ষালাভ করেনা,

সে মনে করে সে কিছুই নয়, তাহার কোন শক্তি কিম্বা কোন কর্ম্মের অধিকার পর্য্যন্ত নাই। সে বলে আমি তুচ্ছ মূঢ় নারী আমার দ্বারা সংসারের কোন্ উপকার হইবে! নিত্য নিয়ত আপনাকে এই দীন হীনভাবে ধারণা করিয়া তাহার জীবনের মূল্য যথার্থই হীন হইয়া পড়ে, তাহার দুর্ব্বল ক্ষীণ হস্তে পরিবার সমাজ এবং জাতির শাসন কুশাসনে পরিণত হয়।

হায় ভগ্নিগণ একি ভ্রান্তি! এই অশুভ ভ্রান্তির জন্য আমাদের জাতির কতই না ক্ষতি হইয়াছে। প্রত্যেক শিশু কন্যার জন্ম দিবসকে দুঃখের অকল্যাণের নগণ্য দিন মনে না করিয়া তাহা এক এক জন বিশ্ববিজয়িনী শাসন-দণ্ড-ধারিনী সম্রাজ্ঞীর জন্মোৎসব স্বরূপ শুভ অনুষ্ঠান সমূহে পরিপূর্ণ করা কর্ত্তব্য। এই জন্মের আনন্দ বার্ত্তা চারিদিকে প্রচার করিয়া অতি শিশুকাল হইতে তাহাকে আপন রাজকীয় শক্তি অনুভব করিতে শিক্ষা দান করা আবশ্যক। যাহাতে ভবিষ্যত অভিষেকের দিনে সে আপনার সঞ্চিত সমগ্র শক্তির প্রভাবে সেই মহাভাগ্যের যোগ্য হইতে পারে।

আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এবং আত্মমর্য্যাদাবোধ বিকাশের জন্য প্রথমে 'আমি আছি' পরে 'আমরা আছি' এই মন্ত্র জপ করিতে হইবে। এই মন্ত্র সাধনায় আমাদের হৃদয় যতই বিকশিত হইতে থাকিবে আমাদের মনে স্বতঃই প্রশ্ন উদিত হইবে 'কেন আছি'? আমার ব্যক্তিগত এই নারী জীবনের কর্ত্তব্য এবং উদ্দেশ্য কি? সমাজে আমার এই নারী অস্তিত্বের সার্থকতা কি? এই যে ভারত মহাবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি তাহা সার্থক করিব কেমন করিয়া, কেমন করিয়াই বা বিশ্বনারী-সমাজের সমকক্ষ গৌরব রক্ষা করিতে পারিব?

আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যের প্রশ্নগুলি হৃদয়ে উদয় হইবার পরে ক্রমে কেমন করিয়া সে উদ্দেশ্য সার্থক হওয়া সম্ভব তাহারি চেষ্টায় আমরা অনুপ্রাণিত হইব। এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার উপায় আবিষ্কার করিতে দূরে যাইতে হইবে না, জড়প্রকৃতি জীবদেহে কেমন করিয়া আপন কার্য্যপ্রণালী নিয়মিত করে তাহা বুঝিয়া দেখিলেই আমরা আমাদের পথ দেখিতে পাইব।

জীবদেহের স্নায়ু মণ্ডলীর গঠন এবং কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় ইহা তিনটি পদার্থ যোগে নির্ম্মিত—যথা ইন্দ্রিয়, স্নায়ু এবং মাংসপেশী। বাহিরের সংস্পর্শ যখন কোন জ্ঞানেন্দ্রিয়কে আঘাত করে তখন সেই স্পর্শের উত্তেজনায় সেখানে পরিবর্ত্তন ঘটে। সেই পরিবর্ত্তনের স্রোত স্নায়ুদ্বারা বাহিত হইয়া মাংসপেশীতে নীত হয়। তাহার ফলে কঠিন পদার্থের সান্নিধ্যবশতঃ আমাদের দেহ সঙ্কুচিত হয়। আমরা সেই কাঠিন্যের আঘাত বাঁচাইবার জন্য আপনাকে সতর্ক করি। স্নায়ুমণ্ডলী প্রধানতঃ পেশীসঞ্চালক সূক্ষ্ম শিরা দ্বারা গঠিত, এই সূক্ষ্ম শিরাগুলির দ্বারা মাংসপেশীতে বাহিরের উত্তেজনা বাহিত হয়?

মানব জগতেও তেমনি কতক লোক আছেন যাঁহারা আমাদের দৈহিক ইন্দ্রিয়ের ন্যায় বহির্জগৎ হইতে ভাব সংগ্রহ করেন, সংযোজক পন্থা দ্বারা সেই ভাবগুলিকে অপর কাহারও কাছে উপস্থিত করিলে আবার কতক লোক আছেন যাঁহারা মাংসপেশীর ন্যায় সেই ভাবকে কার্য্যে পরিণত করিতে

পারেন। আমাদের মহামণ্ডলের ন্যায় সভা সমিতিগুলি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে স্নায়ুমণ্ডলীর ন্যায় ভাব সঞ্চার করিবে এবং আমাদের কার্য্যকুশল সভ্যগণ মাংসপেশীর ন্যায় সেই ভাবগুলি কার্য্যে পরিণত করিবেন।

এতদিন পর্য্যন্ত সাম্প্রদায়িক বা প্রাদেশিক মহিলাসমিতি স্থাপিত হইয়াছিল—তাহারা যেন জীবজগতের প্রথম প্রাণীর (Jelly fish) সর্ব্বাপেক্ষা সরল স্নায়ুমণ্ডলের ন্যায়। সেই প্রথম সরল স্নায়ুমণ্ডলী হইতে ক্রমে যেমন এই জটীল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মানব স্নায়ুমণ্ডলীর বিকাশ হইয়াছে তেমনি প্রাথমিক প্রাদেশিক সমিতি সকলের ক্রমোন্নতি স্বরূপ আজিকার এই ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল জন্ম লাভ করিয়াছে। এক্ষণে ভারতে চিন্তাশীলা এবং হৃদয়বতী রমণীগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বিশেষ বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত, ভবিষ্যৎ কর্ম্মীদের সংখ্যাও বাড়িয়া চলিয়াছে, অবস্থার জটিলতার বৃদ্ধি পাইতেছে, সুতরাং চিন্তাশীলা রমণীদিগের সহিত কার্য্যকুশলা নারীগণের সংযোগ একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে, এই সংযোগ সাধনের জন্যই ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের স্থাপনা। পূর্ব্বে কোন ভাবের সঞ্চার কিম্বা বিকাশ তাহার উৎপত্তিস্থানের আশপাশের গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকিত, এখন মহামণ্ডল স্থাপনের জন্য প্রত্যেক নূতন ভাব, নবীন উদ্যম যে কোনও প্রদেশেই উদ্ভাবিত হউক না কেন তাহা ক্রমে শরীরের রক্তস্রোতের ন্যায় ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই সঞ্চারিত হইবে।

চিন্তাশীলা এবং কার্য্যকুশলা ভারতরমণীগণের নিমিত্ত এই স্ত্রী মহামণ্ডলী একটি সাধারণ কেন্দ্র স্থল, ইহার অবলম্বনে প্রথমতঃ আপন জীবনের উন্নতি সাধন করিয়া ক্রমে সমাজের দেশের এবং বিশ্বসংসারের উন্নতি সাধন করিতে আমরা সক্ষম হইব। একই মহৎ আদর্শ আমাদের প্রত্যেক ভারতবর্ষীয় রমণীর জীবনের লক্ষ্য হইলে আমরা একতার যে সুদৃঢ় সূত্রে গ্রথিত হইব তাহা কিছুতেই ছিন্ন হইবার নয়। এই এক লক্ষ্যের আনন্দ আমাদিগকে কর্ত্তব্যপথে উৎসাহিত এবং মহত্ত্বে প্রণোদিত করিবে। পরে সংবাদ পত্রের পৃষ্ঠায় আপনাদের সামান্য পরিচয় লাভের পর যখন আমরা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বাৎসরিক সম্মিলনীর সময় মিলিত হইব তখন সেই অর্দ্ধপরিচিত কিম্বা শ্রুত মাত্র নামা ভগিনীগণের সহিত মিলিত হইয়া পূর্ণ পরিচয় লাভে এবং দেশহিতকর বিবিধ বিষয় আলোচনা করিয়া কি অপূর্ব্ব আনন্দ সম্ভোগ করিব? বিভিন্ন প্রদেশের বিচিত্র স্বভাবের রমণীগণ একত্রিত হইয়া যখন কেহ আপনার বিবিধ চিন্তা ও উন্নতি চেষ্টা কেহ বা সম্পন্ন কার্য্যের বিবরণী প্রকাশ করিবেন তখন সহানুভূতি দান এবং গ্রহণ করিয়া আরও কত ঘনিষ্ঠ এবং স্নেহময় বন্ধনে আমরা আবদ্ধ হইব।

এইরূপে ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল দেশের সর্ব্বত্র বিক্ষিপ্ত নারী শক্তি একত্র করিয়া প্রভূত উন্নতি সাধন করিবে—পুঞ্জীভূত তড়িৎ শক্তি বিবিধ তারসংযোগে সর্ব্বত্র সঞ্চালিত হইয়া যেমন আলোক এবং আরাম বিস্তার করে তেমনি আমাদের ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের পুঞ্জীভূত শক্তি বিবিধ শাখা সমিতির দ্বারা ভারতবর্ষের দূরতম প্রদেশ

সমূহে নীত হইয়া উন্নতি শিক্ষা এবং আনন্দ বিস্তার করিবে। শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতিসকল পর্ব্বত, মরু, নদী ও সমুদ্রের দূরতার ব্যবধানে যথার্থই ভিন্ন ছিল, কিন্তু আজিকার দিনে বাষ্পীয় যান এবং তড়িৎশক্তি প্রভাবে মানব বুদ্ধি এবং পরিশ্রমের উদ্ভাবনে তাহারা ভিন্ন নাই এক হইয়া গিয়াছে, দূরতা দূর হইয়াছে, সেতু, সুরঙ্গ, জলপ্রণালী, তাড়িতবার্ত্তাবহ, বাষ্পীয় যান এবং অর্ণবপোত আজ তাহাদের সন্নিকট করিয়াছে। ভারত মহাদেশের ছিন্ন বিক্ষিপ্ত অংশ গুলি যে একত্রে সংযোজিত হইয়া এক হইয়াছে; বিভিন্ন জাতি সকল যে এক রাজনৈতিক শাসনাধীন হইয়াছে তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে বিশ্বনিয়ন্তা পরম পুরুষ একদিন তাহাদিগকে এক আধ্যাত্মিক সূত্রে গ্রথিত করিবেন ইহাই তাহার পূর্ব্ব সূচনা।

হিন্দুজাতি আমরা আমাদিগকে জগদীশ্বরের বিশেষ কৃপাপাত্র মনে করি। আমাদের ধর্ম্ম শাস্ত্র আমাদের চতুর্ব্বেদ তাঁহারি স্বহস্তের দান বলিয়া বিশ্বাস করি। আমরা যে অংশে সকল জাতির মধ্যে কল্যাণবিস্তার করিতে পারি সেই অংশে আমাদেরপ্রতি তাঁহার দয়ার বিশেষ পরিচয়। ইহাও স্বীকার করিতে হইবে এই বিশাল বিশ্বে যে বিবিধ মানব জাতি সৃষ্ট হইয়াছে তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে বিশ্বমানব সংসারের উন্নতির নিমিত্ত কিছু না কিছু গুণ সঞ্চিত আছে, সেই গুণাবলীর সম্মিলনেই সমগ্র মানব সমাজের শ্রেষ্ঠ কল্যাণ সাধিত হইবে। তাই কেবল আর্য্য রমণীকে এই স্ত্রী মহামণ্ডল ভুক্ত করিলে হইবে না, ইণ্ডো-আরিয়ান (ভারতীয় আর্য্য) ইণ্ডো-সেমিটিক; ইণ্ডোমঙ্গোলিয়ন এবং অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সকলকেই ইহার উদার বেষ্টনের মধ্যে গ্রহণ করিতে হইবে। জাতি বর্ণ ধর্ম্ম রাজনৈতিক মতামত বা দল নির্বিশেষে সকলেই ইহার সভ্য হইতে পারিবেন। এক কর্ম্মসূত্রে ইহা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র মনস্বিনীগণকে গ্রথিত করিবে, তাহাদিগকে উদার উন্নতির পথে অগ্রসর করিবে। ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের সমুদ্রের ন্যায় উদারবক্ষে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাদেশিক সমিতি সকল অসংখ্য স্বল্পতোয়া স্রোতস্বিনীর ন্যায় আসিয়া একত্র সম্মিলিত হইবে।

ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল একটি প্রকাণ্ড যন্ত্র স্বরূপ, ইহা দেশের বিভিন্ন অংশের সর্ব্বত্র নারী-সাধিত কার্য্যের সংবাদ সংগ্রহ করিবে এবং তাহাদিগকে নিত্য নূতন শুভ কার্য্যের প্রেরণায় উৎসাহিত করিবে। প্রারম্ভে ইহার কার্য্যপ্রণালির বিবিধ স্খলন এবং ত্রুটি থাকিয়া যাইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু আশা করা যায় কাল সহকারে সে সকল সংশোধিত হইয়া উত্তরোত্তর, ইহা অধিকতর সফলতা ও কার্য্যকুশলতা লাভ করিতে সক্ষম হইবে এবং শোভা ও সম্পদের অধিকারী হইবে।

ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল দেহস্বরূপ এবং বিভিন্ন শাখাবলী তাহার অবয়ব সমূহের ন্যায় ভারতের সর্ব্বত্র বিস্তারিত থাকিয়া তাহাতেই সংযোজিত থাকিবে। শাখাসমিতিসমূহ, প্রাদেশিক সকল মহিলা সমিতিকে একত্রিত করিয়া মহামণ্ডলের সহিত সংযুক্ত করিবে; বাৎসরিক সম্মিলনের সময়ে প্রত্যেক

প্রাদেশিক মহিলাসমিতিগুলি প্রতিনিধির দ্বারা আপনাপন কার্য্যাবলী পাঠ করাইবেন —প্রশংসা ভাজন হইবার জন্য প্রত্যেকেরি চেষ্টা হইবে যাহাতে অপর অঙ্গগুলির অপেক্ষা কোন বিষয়ে হীন হইতে না হয়।

নিম্ন লিখিত প্রকারে ইহার সংগঠন সাধিত হইবে—দেশের মহারাণী রাণী এবং বেগমগণ পর্য্যায় ক্রমে ইহার সভাপত্নীর পদলাভ করিবেন, অভিজাত এবং ভদ্র বংশোদ্ভূতা মহিলাগণ প্রতিনিধি সভাপত্নীর আসন প্রাপ্ত হইবেন! ভারত সাম্রাজ্ঞী ইহার প্রধান পোষয়িত্রী,বড়লাট পত্নী এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক লাট পত্নীগণ ইহার প্রতিনিধি পোষয়িত্রী হইবেন। কার্য্যকরী সভার সভ্য এবং সম্পাদিকা পদের দায়িত্ব প্রায়শঃই ভারতীয় নারীর উপর ন্যস্ত হইবে, এদেশ বাসী ইংরাজ মহিলাদিগের মধ্য হইতে বিশিষ্ট সহায়কারিণী সভ্য গ্রহণ করা হইবে—তাঁহারা তাঁহাদের অভিজ্ঞতা ও পরামর্শদ্বারা আমাদিগকে লাভবান করিবেন।

আগামী বৎসরের জন্য কি কি কর্ত্তব্যভার হাতে লওয়া যাইবে এখন তাহাই বিবেচ্য। আমাদের বর্ত্তমান জীবনের প্রধান সমস্যা নারীদিগের শিক্ষা সাধন। একজন ইংরাজ মহিলা যথার্থই বলিয়াছেন—গৃহের সৌষ্ঠব সাধনই নারী জীবনের প্রধান এবং বিশেষ কর্ত্তব্য—কোন পুরুষই আমাদিগকে এ অধিকার চ্যুত করিতে পারেন না। কেননা অলস মধুমক্ষিকা যেমন মধুচক্র রচনা করিতে পারেনা তেমনি কোন পুরুষই একক গৃহ রচনা করিতে পারেন না—তিনি প্রাসাদ এবং দুর্গ নির্ম্মাণে সক্ষম কিন্তু কুবেরের ন্যায় অক্ষয় ঐশ্বর্য্যের কিম্বা বৃহস্পতির ন্যায় অপার বুদ্ধির অধিকারী হইয়াও তাঁহার গৃহ নির্ম্মাণ চেষ্টা সার্থক হয়না, একার্য্য এই আনন্দ মন্দির রচনা কেবল মাত্র নারীদ্বারাই সাধিত হয়।

গৃহরূপ আনন্দ মন্দির রচনাই যদি নারী জীবনের বিশেষ কর্ত্তব্য হয় তবে তাহাকে তদুপযুক্ত শিক্ষা দান করিতে হইবে। এখন দেখা যাউক গৃহটি কি কি উপাদানে গঠিত। পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর আবাস, সুচরিত স্বামী, সখি ও পতিব্রতা স্ত্রী এবং সুবাধ্য সন্তান এই কয়টি জিনিষে মিলিয়া একখানি সুন্দর গৃহ হয়—গৃহকে স্বাস্থ্যের আধার করিতে হইলে স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হইতে হইবে এবং সেই নিয়মানুযায়িক বন্দোবস্ত রাখিতে হইবে। গৃহকে পরিপাটি ও আরামের আধার করিতে হইলে শিক্ষার দ্বারা নিয়মিত সময়ে নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য পালনের অভ্যাস রাখিতে হইবে, তাহা সর্ব্বদা সুগোছাল রাখিতে হইবে,—মনে রাখিতে হইবে তাহা দুদিনের পান্থশালা নহে তাহা আজীবনের আশ্রয়।

স্বামীর অনুরক্তাও সঙ্গিনী, তাঁহার সচিব ও সহকারিণী, তাহার বন্ধু ও সান্ত্বনাদাত্রী হইতে হইলে শুধু রন্ধন কার্য্যে নিপুণতায় কুলাইবে না—অনেক বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান আহরণ করিতে হইবে।

কেবল মাত্র স্বামীতে ভক্তিমতী হইলে হইবে না, তাঁহার জীবনের লক্ষ্য এবং আকাঙ্ক্ষা সকলের সহিত বুদ্ধিপূর্ণ সহানুভূতি থাকা প্রয়োজনীয়—শিক্ষা লাভ না করিলে ইহা ভালরূপ হওয়া অসম্ভব। একজন পুরুষ এ সম্বন্ধে কি বলিতেছেন দেখ,—"কোন ভারত রমণী যথার্থ ভাবে স্বামীর বন্ধু হইতে

পারেন না কেননা আজিও তিনি নিরক্ষর। সংসার ও জগৎ সম্বন্ধে কোনই অভিজ্ঞতা না থাকায়, নিতান্ত পারিবারিক ব্যাপার ছাড়া আর কোন বিষয়ে স্বামীকে পরামর্শ দেওয়ার ক্ষমতা তাঁর নাই বলিলেই হয়। অতীত কালের ভগিনীদিগের ন্যায় আজ তাঁহার সে সাহস নাই যাহার বলে তিনি আপন স্বামীকে অধর্ম্মের পথ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারেন। হিন্দু রমণীর হৃদয়ে সে তেজ সে বিজ্ঞতা আজ কোথায় যার প্রভাবে প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলা দুষ্মন্তকে বলিয়াছিলেন "তুমি যদি মনে করিয়া থাক আমি একক অসহায় তবে আপন অন্তর্যামী বিধাতাপুরুষকে জাননা। তিনি তোমার অন্যায় জানিতেছেন—তাঁহার দৃষ্টি সম্মুখে তুমি পাপকারী। পাপ করিয়া অজ্ঞ মনুষ্য মনে করে তাহা বুঝি কেহই জানিতে পারিল না; কিন্তু দেবতাগণ এবং অন্তর্যামী পুরাণ পুরুষ তাহার পাপের নিত্য সাক্ষী"। কোন আধুনিক মূর্খ ভীরু দুর্ব্বল রমণীর মনে উপরোক্ত কথা বলিতে সাহসে কুলায়না। বর্ত্তমান নারীগণ সাহস এবং গম্ভীর ধৈর্য্যের সহিত না পারেন বিপদ বহন করিতে, না পারেন দুর্ব্যবহারের প্রতিকূলতা করিতে। বিপদসঙ্কুল সংসারসমুদ্রের কাণ্ডারী হওয়াত দূরের কথা তিনি আজ কাল স্বামীর বন্ধু নামেরও যোগ্যা নহেন।"

স্বামীর নৈতিক ব্যবহার অনেক পরিমাণে স্ত্রীর কল্যাণপ্রভাবের উপর নির্ভর করে। অন্য একজন পুরুষ বলিয়াছেন "ভারত নারী অশিক্ষিত হওয়ায় শিক্ষিত পুরুষগণ তাঁহাকে আপনাদিগের যোগ্য সঙ্গিনী মনে করেন না কাজেই তাঁহাদের বিবাহিত জীবন নৈতিকশক্তি বিহীন। স্ত্রী যদি সহধর্ম্মিণী সহকর্ম্মিণী না হইয়া কেবলমাত্র বিলাস এবং উপভোগের সামগ্রী হয় তবে গৃহের মঙ্গল প্রভাব নষ্ট হইয়া যায়। গার্হস্থ্য জীবনের এই হীন অবস্থা দাম্পত্য সম্বন্ধকে নিতান্ত কলুষিত করিয়া ফেলে—এই নিমিত্তই ভারতবর্ষীয় পুরুষগণ দিন দিন হীনচরিত্র এবং ধর্ম্ম সম্বল শূন্য হইয়া পড়িতেছেন।" স্বামীকে ধর্ম্ম এবং মহত্ত্বের পথে উৎসাহিত করাই পত্নীর প্রধান এবং শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য—অশিক্ষিতা হইলে ইহাতে অকৃতকার্য্য হওয়া ও তৎফলে দুঃখ পাওয়া অবশ্যম্ভাবী।

শিশুর শিক্ষা সম্বন্ধে আমরাত বিশেষরূপে জানি ক্ষুদ্র শাখা যেদিকে আনত হয়—বৃহৎ মহীরুহ সেই দিকেই ঝুঁকিয়া থাকে। পরজীবনে সংশোধন চেষ্টা সর্ব্বথা বৃথা হয়। মাতা স্বয়ং যদি সংযম, বাধ্যতা, সত্যবাদিতা, আত্মরক্ষা এবং স্বাস্থ্য রক্ষার শিক্ষা না প্রাপ্ত হয়েন তবে কেমন করিয়া সন্তানকে সে শিক্ষা দান করিবেন? সন্তানের যথার্থ শুভজ্ঞানবিরহিত সন্তান স্নেহ ভারতবর্ষীয় গৃহে অকল্যাণের বীজ। পতির কোন দুরূহ উদারকর্ত্তব্য ও চিন্তার অংশে ভাগগ্রাহিতাশূন্য পতিপ্রেম ভারতীয় দাম্পত্যে শনির গ্রহ। স্বাস্থ্য নিয়ম, পরিচ্ছন্নতা ও সময়ের মূল্য জ্ঞানহীন গৃহকার্য্য পরায়ণতা ভারতে গার্হস্থ্যধর্ম্মের অঙ্গহানিতা। অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করিয়া লজ্জার পরিচয় দান অথচ অশ্লীল বাক্যব্যবহার এবং অশ্লীল সঙ্গীত গান করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ না করা ভারতে নারীত্বের কলঙ্ক। নারীগণের বিবেচনা হীন অযথা দান যথার্থ পক্ষে

ভারতে পরোপকার সাধনের বিশেষ বাধা। উল্লিখিত প্রত্যেক ভ্রান্তি অন্যায় ও কুসংস্কার দূর করিবার জন্যই স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ আবশ্যক।

শিক্ষা বিভাগের কার্য্য বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায় শতকরা একজন মুসলমান বা হিন্দুবালিকা শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে যাইয়া থাকে। বাল্যবিবাহ এবং অবরোধ প্রথা স্ত্রী শিক্ষার প্রধান অন্তরায়। এই জন্যই গৃহে থাকিয়া বালিকাগণ যাহাতে শিক্ষালাভ করিতে পারে তাহারি ব্যবস্থা বিশেষরূপে ভারতবর্ষীয় সমাজের উপযোগী। আমাদের খ্রীষ্টান ভগিনীগণ এই সম্বন্ধে যাহা করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রশংসা যোগ্য। তবে তাঁহাদের বাইবেল প্রচারের চেষ্টা তাঁহাদের অন্তঃপুর প্রবেশের বিশেষ বাধা—বিশেষতঃ বিদেশী, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, ভিন্ন পরিচ্ছদ পরিহিত ও আহার বিহারের রুচি স্বতন্ত্র হওয়ায় শিক্ষয়িত্রী এবং শিষ্যার মধ্যে সহানুভূতির বন্ধন দৃঢ় হয় না এবং কচিৎ তাঁহারা ছাত্রীদিগের হৃদয় স্পর্শ করিতে কিম্বা শিক্ষা সম্বন্ধে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে সক্ষম হয়েন। অশিক্ষিত ভগিনীদিগকে শিক্ষা দান করা তাহাদের জীবনে শিক্ষার নবীন আলোক ও আনন্দ আনয়ন করাই আধুনিক শিক্ষা সৌভাগ্যবতী ভারত রমণীর সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য।

সেই জন্যই অন্তঃপুর-শিক্ষা-প্রচার ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের সর্ব্ব প্রথম সাধ্য। এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক প্রদেশে অর্থ ও স্বেচ্ছা শিক্ষয়িত্রী সংগ্রহ ও বেতনপ্রাপ্ত শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিতে হইবে। ভবিষ্যতে কার্য্য সৌকর্য্যার্থে এই উদ্দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংগৃহীত টাকা সম্পূর্ণ ভিন্ন রাখা যাইবে।

ভারত নারীর জন্য পাঠ্য-পুস্তক রচনা এবং ভারতীর সাহিত্যের উন্নতি সাধন আমাদিগের দ্বিতীয় সাধ্য।

এই নিমিত্ত প্রথম প্রথম আমাদিগকে বাধ্য হইয়া ইংরাজী পুস্তক সকল ভাষান্তর এবং আমাদের দেশের উপযোগী করিয়া লইতে হইবে। মহামণ্ডলের প্রত্যেক শাখা সভায় এই কার্য্যের জন্য লেখিকা নিযুক্ত করিতে হইবে। তাঁহারা ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় নির্ব্বাচিত পুস্তক সকল অনুবাদ করিবেন—তৎপরে তাহা মুদ্রিত এবং প্রকাশিত হইয়া অন্তঃপুর শিক্ষার জন্য ব্যবহৃত হইবে। যতদিন না হয় ততদিন যোগ্য যে কোন পুস্তক পাওয়া যায় তাহার দ্বারাই শিক্ষা কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে নারী হস্তের শিল্পকার্য্য বিক্রয়ের নিমিত্ত ভাণ্ডার স্থাপন করা মহামণ্ডলের তৃতীয় সাধ্য।

বিস্তৃত ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে নারীগণের চিকিৎসার জন্য যে যে আয়োজন আছে—ভারতীয় নারীগণ তাহা হইতে কতদূর লাভ উঠাইতেছেন, এ বিষয়ে কোন্ কোন্ বাধা বর্ত্তমান আছে এবং কোন্ উপায়েই বা সে সকল সুন্দররূপে দূর করা সম্ভব এই বিষয়ক অনুসন্ধানই এই বৎসরের চতুর্থ এবং সর্ব্বশেষ কার্য্য। *

শ্রীসরলা দেবী।

* গত ৩০শে ডিসেম্বর এলাহাবাদে আহূত ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের বৃহতী সভায় ইংরাজী ভাষায় পঠিত শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী কর্ত্তৃক বাঙ্গলায় অনুবাদিত।

চয়ন।

হিউয়েনসাং প্রণীত সিউ-ইউ-কি।

সাংহোপুলো (সিংহপুর)।

সিংহপুর রাজ্য ৩৫০০ কি ৩৬০০ লি বিস্তৃত। ইহার পশ্চিমে সিন্ধু নদী। রাজধানী ১৪।১৫ লি; চতুষ্পার্শ্বে দুরারোহ পর্ব্বতশ্রেণী ইহাকে সুরক্ষিত রাখিয়াছে। ভূমি রীতিমত কর্ষণ করা হয় না কিন্তু তত্রাপি দেশে প্রচুর শস্য জন্মে। শীত ঋতুই প্রবল; অধিবাসীরা নিষ্ঠুর, সাহসী এবং অত্যন্ত প্রতারণা-পরায়ণ। এই দেশ কাশ্মীরের অধীন। রাজধানীর দক্ষিণে অশোক-রাজ নির্ম্মিত স্তূপ। কারুকার্য্যগুলি বিনষ্ট হইয়াছে কিন্তু অনবরত এই স্তূপে অনৈসর্গিক ব্যাপার সম্পাদিত হয়। নিকটেই জনশূন্য সঙ্ঘারাম; উহাতে কোন যতি নাই।

নগরের দক্ষিণ পূর্ব্বে ৪০ কি ৫০ লি দূরে অশোক-রাজ নির্ম্মিত প্রস্তরস্তূপ। ইহা উচ্চে ২০০ ফুট। এই স্থানে দশটী পুষ্করিণী; ইহাদের প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকের সংযোগ আছে। দক্ষিণে ও বামে আবৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তম্ভ রাশি। পুষ্করিণীর জল স্বচ্ছ কিন্তু তরঙ্গগুলি মধ্যে মধ্যে শব্দ করে। সর্প ও অন্যান্য নানাপ্রকারের মৎস্য ইহাতে বাস করে। চতুর্ব্বর্ণের পদ্ম স্বচ্ছ জল আবৃত করিয়া রহিয়াছে। শত শত প্রকারের ফলের বৃক্ষ পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিকে থাকিয়া নানারূপে ছায়া প্রদান করে। বৃক্ষের ছায়া জলে প্রতিবিম্বিত হয় এবং ভ্রমণের জন্য এই স্থান অত্যন্ত উপযোগী।

নিকটে জনশূন্য সঙ্ঘারাম। শ্বেতাম্বরদিগের শিক্ষক স্তূপের সন্নিকটে প্রথম প্রচার করিয়াছিলেন। নিকটেই দেবতাদিগের মন্দির। যে সকল ব্যক্তি এই মন্দিরে বাস করে, তাহারা কঠোর তপস্যা করেন। দিবারাত্রির মধ্যে একবারও অবসর গ্রহণ করেন না। ইহাদের প্রবর্ত্তক, বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত পুস্তক হইতে বুদ্ধের আদেশাবলী অপহরণ করিয়াছেন। ইহারা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত এবং তদনুযায়ী নিজেদের উপদেশ নির্ব্বাচিত করেন। প্রধানগণ ভিক্ষু নামে আখ্যাত হইয়া থাকেন; কনিষ্ঠগণ শ্রমণ নামে অভিহিত হন। আচার ব্যবহারে তাহারা বৌদ্ধ যতিগণের ন্যায় কিন্তু ইহাদের মস্তকে শিখা আছে এবং ইহারা উলঙ্গ। যদি কোন সময় বস্ত্র ব্যবহার করিবার ইচ্ছা হয়, তবে শুভ্র বস্ত্র ব্যবহার করে। অপরের সহিত ইহাদের এই মাত্র প্রভেদ।

টাচাসিলোর উত্তর সীমার দিকে অগ্রসর হইয়া সিন্ধু নদী পার হইয়া আমরা দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে ২০০ শত লি অগ্রসর হইয়া যে স্থানে মহাসত্ত্ব রাজকুমার রূপে মার্জ্জারের আহারের জন্য দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, তথায় উপস্থিত হই। এই স্থানের ৪০।৫০ পদ দক্ষিণে প্রস্তর স্তূপ আছে। এই স্থানেই মহাসত্ত্ব মার্জ্জারের দুঃখে দুঃখিত হইয়া বংশদণ্ড দ্বারা নিজ শরীর বিদ্ধ করিয়া নিজ রক্ত মার্জ্জারকে দান করিয়াছিলেন। মার্জ্জার এই রক্ত পান করিয়া সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। এইজন্য এই স্থানের মৃত্তিকা ও বৃক্ষাদি রক্তবর্ণ। মৃত্তিকা খনন করিলে কণ্টকময় যষ্টি এখনও পাওয়া যায়। গল্পটী বিশ্বাসযোগ্য কিনা ইহা বিচার না করিলেও, ইহা যে করুণ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

যে স্থানে মহাসত্ত্ব নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন তাহার উত্তরেই রাজা অশোক নির্ম্মিত দুই শত ফুট উচ্চ প্রস্তর স্তূপ আছে। ইহা কারুকার্য্যে সমন্বিত। মধ্যে মধ্যে অনৈসর্গিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ হয়। এই স্মরণীয় স্থানের চতুষ্পার্শ্বে একশত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তূপে চলনশীল প্রস্তরের কুলঙ্গী আছে। পীড়িত ব্যক্তি এই স্থান প্রদক্ষিণ করিলে আরোগ্য লাভ করে। স্তূপের পূর্ব্বে একটী সঙ্ঘারাম আছে। তথায় মহাযানমতাবলম্বী একশত যতি বাস করেন। ৫০ লি পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া আমরা এক নির্জ্জন পর্ব্বতে উপস্থিত হই। এই স্থানে এক সঙ্ঘারামে

২০০ শত যতি বাস করেন। ইহারা সকলেই মহাযান মতাবলম্বী। এখানে প্রচুর পরিমাণে পুষ্প ও ফল পাওয়া যায়। পুষ্করিণী ও ঝরণার জল দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ।* এই মাঠের নিকটে প্রায় ৩০০ শত ফিট উচ্চ স্তূপ আছে। তথাগত পুরাকালে এইস্থানে বাস করিতেন এবং এক দুষ্ট যক্ষকে মাংস ভক্ষণ হইতে বিরত করেন। দক্ষিণপূর্ব্বদিকে ৫০০ লি যাইয়া আমরা উলাশি (উরাস) দেশে পৌঁছি।

উ-লা-সি।

এই রাজ্য প্রায় ২০০০ লি বিস্তৃত। উপত্যকা ও পর্ব্বতগুলি অবিচ্ছিন্ন। রাজধানী ৭।৮ লি বিস্তৃত। এদেশে রাজা নাই; দেশ কাশ্মীরের অধীন। ভূমি কর্ষণ ও বপনের উপযোগী কিন্তু ফল পুষ্প কম। জল বায়ু উত্তম; অধিক বরফ বা তুষার নাই। অধিবাসীরা বর্ব্বর ও প্রতারণা-পরায়ণ। বৌদ্ধধর্ম্মে ইহাদের আস্থা নাই।

রাজধানীর ৪।৫ লি দক্ষিণ পশ্চিমে অশোকরাজ নির্ম্মিত স্তূপে কয়েক জন যতি বাস করেন। এই স্থান হইতে দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে পর্ব্বতশ্রেণী ও গিরিশৃঙ্গ উত্তীর্ণ হইয়া প্রায় এক সহস্র লি যাইয়া আমরা কিয়া সিমিলো (কাশ্মীর) পৌঁছি।

কাশ্মীর।

কাশ্মীর প্রায় সাত সহস্র লি বিস্তৃত এবং এই রাজ্যের চতুর্দ্দিকেই পর্ব্বতশ্রেণী। পর্ব্বতগুলিও খুব উচ্চ। পর্ব্বতমধ্যস্থিত গিরিসঙ্কট গুলি সঙ্কীর্ণ। নিকটবর্ত্তী কোন রাজাই ইহাকে আক্রমণ করিয়া জয় লাভ করিতে পারেন নাই। রাজধানীর পশ্চিমাংশে বৃহৎ নদী। রাজধানী উত্তর দক্ষিণে ১২ কি ১৩ লি এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে ৪ কি ৫ লি। শাক সব্জী উৎপাদনের পক্ষে প্রশস্ত এবং দেশে যথেষ্ট ফল পুষ্প পাওয়া যায়। এই দেশে দৈত্য—ঘোটক, সুগন্ধি, হরিদ্রা ও ভেষজ লতা পাওয়া যায়।

জলবায়ু শৈত্যপ্রধান। যথেষ্ট বরফ পড়ে কিন্তু ঝটিকা নাই। অধিবাসীরা চর্ম্মের অঙ্গরাখা ও শুভ্রবস্ত্রপরিধান করে। নিকটবর্ত্তী অন্যান্য প্রদেশের জনসাধারণের উপরে ইহারা কর্ত্তৃত্ব করে। অধিবাসীরা দেখিতে সুশ্রী কিন্তু প্রতারক। ইহারা উপযুক্ত রূপে শিক্ষা প্রাপ্ত হয় এবং বিদ্যাভ্যাসে রত। অবিশ্বাসী ও ধার্ম্মিক উভয় প্রকার লোকই ইহাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় একশত সঙ্ঘারাম ও ৫ সহস্র যতি আছে। অশোকরাজ নির্ম্মিত ৪টী স্তূপ আছে। প্রত্যেকটীতেই তথাগতের শরীরচিহ্ন বিদ্যমান। দেশের প্রাচীন ইতিহাস এইরূপ—এই দেশে পূর্ব্বে এক বিশাল হ্রদ ছিল। পুরাকালে বুদ্ধদেব উদ্যান দেশ হইতে এক দৈত্যকে দমন করিয়া মধ্যদেশে (ভারতবর্ষে) আগমন করিতেছিলেন। তখন মধ্যাকাশে তিনি আনন্দকে বলিলেন "আমার নির্ব্বাণের পরে অর্হৎ মধ্যান্তিকা এই দেশে রাজ্যস্থাপনা করিবেন, ও অধিবাসী-দিগকে দমন করিয়া স্বকীয় ক্ষমতায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত করিবেন। নির্ব্বাণের অর্দ্ধশত বৎসর পরে, আনন্দের শিষ্য মধ্যান্তিকা, ষড়ভিজ্ঞ হইয়া এবং অষ্ট বিমোক্ষ লাভ করিয়া বুদ্ধের ভবিষদ্বাণী অবগত হন। তাঁহার অন্তঃকরণ এ সংবাদে প্রফুল্ল হইয়া, তিনি এই দেশে আগমন করেন। উচ্চ এক পর্ব্বতের শীর্ষভাগে অধিবেশন করিয়া তিনি দৈত্যকে অনৈসর্গিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করাইতে লাগিলেন। দৈত্য এই দৃশ্যে আশ্চর্য্য হইয়া অর্হতের কি ইচ্ছা জানিবার জন্য উৎসুক হইলেন। অর্হৎ দৈত্যের নিকট কেবল মাত্র তাঁহার বসিবার স্থান প্রার্থনা করিলেন। দৈত্য তাঁহার বসিবার জন্য স্থান নির্দ্দেশ করিয়া সেই স্থান হইতে জল অপসরণ করিল। অর্হৎ তৎপরে নিজ দৈবশক্তিবলে নিজের শরীর বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন এবং দৈত্যরাজও জল স্থানান্তরিত করিতে লাগিল। এই প্রকারে হ্রদ জলশূন্য হইল। ইহাতে নাগ পরাজিত হইয়া বাসের জন্য স্থান প্রার্থনা করিল। অর্হৎ তখন বলিলেন যে ঐস্থানের উত্তর পশ্চিম কোণে ১০০ লি বিস্তৃত একটী ক্ষুদ্রজলাশয় আছে। ঐস্থানে দৈত্য ও তাহার বংশাবলী বাস করিতে পারিবে। দৈত্য তখন নিবেদন করিল যে হ্রদ ও দৈত্যের আবাস স্থল যখন হস্তান্তর হইয়াছে, তখন অর্হৎকে পূজা করিবার জন্য তাহাকে আদেশ দেওয়া হউক।

মধ্যান্তিকা উত্তর করিলেন যে "কিছুদিন পরেই আমি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইব ; সুতরাং আমার ইচ্ছা থাকিলেও কেমন করিয়া আমি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারি ?" নাগ তখন উত্তর করিল যে তাহা হইলে ৫০০ শত অর্হৎ যেন বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার পূজা গ্রহণ করেন। তৎপর সে মধ্যান্তিকার নিয়োজিত স্থানে প্রত্যাগমন করিয়া বাস করিবে।" মধ্যান্তিকা তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন।

অর্হৎ এই প্রকারে নিজ দৈবশক্তিবলে এই দেশ গ্রহণ করিয়া ৫০০ শত সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করিলেন। তৎপর যতিগণের সেবাশুশ্রূষার জন্য তিনি নিকটবর্ত্তী দেশ সমূহ হইতে অনেক গুলি দরিদ্র লোক ক্রয় করিলেন। কিন্তু তদ্দেশীয় উচ্চবংশীয় ব্যক্তিগণ মধ্যান্তিকার নির্ব্বাণের পর এই নিম্ন-শ্রেণীর ব্যক্তিদিগকে ঘৃণা করিয়া তাহাদের 'ক্রীত' আখ্যা দান করিল। ঝরণাগুলি হইতে এইক্ষণে বুদ্‌বুদ বাহির হইতেছে।

তথাগতের নির্ব্বাণের একশত বৎসর পরে মগধরাজ অশোক পৃথিবীপতি হইলেন এবং দূর দেশের লোকের নিকটও তিনি সম্মানিত হইতেন। তিনি ত্রিরত্নকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন এবং সকল জীবকেই সম্মানের চক্ষে দেখিতেন। তিনি ৫০০ অর্হৎ এবং ৫০০ শত ভিন্ন মতাবলম্বী পুরোহিতকে প্রভেদশূন্য ভাবে দেখিতেন। শেষোক্ত দিগের মধ্যে মহাদেব নামক এক সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি প্রকৃত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে পুস্তকাদি প্রণয়ন করিতেন। যিনি তাঁহার খ্যাতির কথা অবগত হইতেন তিনিই তাঁহার সংসর্গে যাইয়া তাঁহার মতাবলম্বী হইতেন। রাজা অশোক সাধু ও সাধারণ মনুষ্যে প্রভেদ না বুঝিতে পারিয়া এবং বিশেষতঃ যাহারা রাজদ্রোহী তাহাদেরই আনুকূল্য করিতে ইচ্ছুক হইয়া যতিগণকে গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জন করাইবেন বলিয়া গঙ্গাতীরে এক সভা আহূত করিলেন।

অর্হৎগণ বিপদাশঙ্কা করিয়া নিজেদের ঐশ্বরিক শক্তিবলে আকাশ মার্গে উড্ডীন হইয়া এই দেশে পৌঁছিয়া—পর্ব্বতে ও উপত্যকায় লুক্কায়িত রহিলেন। অশোক এই সংবাদে অনুতপ্ত হইয়া নিজ দোষ স্বীকার করিলেন এবং অর্হৎগণকে তাঁহাদের স্বদেশে প্রত্যাগমনের অনুমতি দিলেন। কিন্তু অর্হৎগণ অস্বীকৃত হইলেন। রাজা অশোক, তৎপর, অর্হৎগণের জন্য পঁচশত সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করিয়া এই দেশ তাঁহাদের দান করিলেন।

তথাগতের নির্ব্বাণের চারিশত বৎসর পরে রাজা কনিষ্ক রাজপদে আসীন হইয়া দেশ দেশান্তর জয় করেন। রাজকার্য্যের অবসর সময়ে তিনি বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সংক্রান্ত পুস্তকাদি পাঠ করিতেন। প্রত্যহ তিনি প্রাসাদে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য আচার্য্য আহ্বান করিতেন কিন্তু তিনি দেখিতে পাইলেন যে ভিন্ন ভিন্ন মতে যথেষ্ট পার্থক্য। ইহাতে তিনি সন্দিগ্ধ হইলেন কিন্তু কোন প্রকারেই সন্দেহ ভঞ্জনে সক্ষম হইলেন না। এইসময়ে মাননীয় পার্শ্ব বলিলেন যে "তথাগতের নির্ব্বাণের পর অনেক বৎসর এবং অনেক মাস অতি-বাহিত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় নিজ নিজ গুরুর পুস্তকানুযায়ী মতের অনুসরণ করে। প্রত্যেকে নিজ নিজ মতের অনুসরণের জন্য এত বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়।" রাজা এই সংবাদে অত্যন্ত কাতর হইয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি পার্শ্বকে বলিলেন "যদিও আমার নিজের কোন পুণ্যবল নাই তত্রাপি বুদ্ধদেবের জন্ম জন্মান্তরে যে পুণ্য সঞ্চিত করিয়াছি, তাহারই ফলে এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি আমার স্বকীয় হীন জন্মের কথা বিস্মৃত হইয়া সত্যধর্ম্ম রাখিবার চেষ্টা করিব। এই জন্য আমি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ানুযায়ী ত্রিপিটক চর্চ্চার ব্যবস্থা করিব।" পার্শ্ব তদুত্তরে বলিলেন যে, রাজার পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত পুণ্যফলে এই উচ্চাবস্থা তিনি এই জন্মে প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি যাহাতে বৌদ্ধধর্ম্মানুমোদিত কর্ম্মপদ্ধতি বজায় রাখেন, ইহাই পার্শ্বের একান্ত ইচ্ছা। রাজা দূর দেশান্তর হইতে যতিগণকে আহ্বান করিলেন।

এই সংবাদে চতুর্দ্দেশ হইতে সকলে সমবেত হইতে লাগিলেন ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ অমুত লি দূর হইতে এই স্থানে আগমন করিতে লাগিলেন। সপ্তদিবস ধরিয়া

রাজা নানা প্রকার উপহার প্রদান করিতে লাগিলেন। পরে তিনি সস্নেহ বাক্যে যতিগণকে বলিলেন যে তাঁহারা অর্হত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং যাহারা সাংসারিক মায়ায় বদ্ধ তাঁহারা প্রস্থান করুন। কিন্তু তত্রাপি অনেক যতি রহিয়া গেলেন। পরে তিনি দ্বিতীয় আদেশ প্রচার করিলেন যে যাহারা শ্রমণত্ব লাভের জন্য বিদ্যার্জ্জন করিতেছেন তাঁহারা প্রস্থান করুন। কিন্তু তত্রাপি লোক সংখ্যা যথেষ্ট রহিল। ইহাতে রাজা আদেশ করিলেন যে যাহারা ত্রিবিদ্যায় পারদর্শী ও ষড়ভিজ্ঞ তাঁহারা ব্যতীত অন্যান্য সকলে প্রস্থান করিতে পারেন। কিন্তু ইহাতেও লোকসংখ্যা যথেষ্ট কমিল না। পুনরায় তিনি অন্য আদেশ প্রচার করিলেন যে, যাহারা ত্রিপিটকে ও পঞ্চবিদ্যায় পারদর্শী তাঁহারা ব্যতীত অন্যান্য সকলে প্রস্থান করিতে পারেন। এই প্রকারে মাত্র ৪৯৯ জন যতি রহিলেন। পরে রাজা স্বদেশে প্রত্যাগমনের ইচ্ছা করিলেন। তিনি রাজগৃহে, যেস্থানে কশ্যপ সম্মিলনী আহ্বান করিয়াছিলেন তথায় যাইবার বাসনা প্রকাশ করিলেন। মাননীয় পার্শ্ব ও অন্যান্য সকলে তাঁহাকে এই উপদেশ দিলেন যে "তথায় অনেক অবিশ্বাসী আছে এবং তথায় বিচার আরম্ভ হইলে ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বীদিগের জন্য বিশেষ সুবিধা হইবে। সম্মিলনী এই স্থানই পছন্দ করিয়াছেন। এ দেশের চতুর্দ্দিকে পর্ব্বত শ্রেণী। যক্ষগণ এই দেশ রক্ষা করে; ভূমি উর্ব্বরা ও উৎপাদিকাশক্তি বিশিষ্টা এবং এ স্থানে যথেষ্ট আহার্য্য পাওয়া যায়। এই স্থানে ঋষি ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ বাস করেন এবং এই স্থানেই স্বর্গীয় ঋষিগণ ভ্রমণ করেন।"

সম্মিলনী বিবেচনা করিয়া রাজার সহিত একমত হইলেন। অর্হৎ সমভিব্যহারে রাজা এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে উপস্থিত হইয়া শাস্ত্র প্রণয়নের উদ্যোগ করিলেন। বসুমিত্র এই সম্মিলনীর সভাপতি হইলেন। বিচারে যে সকল বিষয় দুর্ব্বোধ্য হইত তাহা তিনিই মীমাংসা করিতেন। এই পাঁচশত যতি প্রথমতঃ সূত্রপিটক ব্যাখ্যার জন্য একলক্ষ শ্লোক দ্বারা উপদেশ শাস্ত্র প্রণয়ন করিলেন। পরে অভিধর্ম্ম পিটক ব্যাখ্যার জন্য তাঁহারা লক্ষ শ্লোক দ্বারা অভিধর্ম্মবিভাস শাস্ত্র প্রণয়ন করিলেন। এই প্রকারে তাঁহারা ছয়শত ষাট অযুত শব্দ দ্বারা ত্রিশ অযুত শ্লোক রচনা করিয়া ত্রিপিটক ব্যাখ্যা করিলেন। এই পুস্তকের সহিত প্রাচীন কোন পুস্তকেরই তুলনা হয় না; ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ সকল প্রশ্নের সমাধানই এই বিরাট গ্রন্থে হইয়াছিল। সুতরাং এই গ্রন্থ সকল দেশে সমাদৃত হইতে লাগিল।

কনিষ্করাজ লোহিত বর্ণের তাম্রপত্রে এইগুলি খোদিত করিয়া প্রস্তরাধারে তাহা রক্ষা করিয়া মোহর যুক্ত করিয়া এবং উহা মধ্যস্থলে রাখিয়া এক স্তূপ নির্ম্মাণ করিলেন। যাহাতে অপর ধর্ম্মাবলম্বীগণ এই সকল শাস্ত্রে অধিকার না পায় তজ্জন্য তিনি যক্ষগণকে এদেশ রক্ষার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। এই কার্য্য সমাপন করিয়া তিনি সসৈন্যে রাজধানী প্রত্যাগমন করিলেন।

এই দেশ হইতে পশ্চিম দ্বার দিয়া নির্গত হইয়া তিনি পূর্ব্বাস্য হইয়া জানু পাতিয়া উপবিষ্ট হইয়া, এই সমগ্র রাজ্য যতিগণকে দান করিলেন। কনিষ্কের মৃত্যুর পরে "ক্রীত"গণ পুনরায় রাজ্যাধিকার করিয়া যতিগণকে নির্ব্বাসন এবং বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধন করিল।

টোহলো দেশীয় হিমতালের রাজা শাক্যবংশীয়। বুদ্ধের নির্ব্বাণের ছয়শত বৎসর পরে তিনি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের রাজত্ব পাইয়া পুনর্ব্বার বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যগ্র হন। ক্রীতগণ বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছে এই সংবাদে তিনি সহস্র যোদ্ধাকে বণিকের বেশে সজ্জিত করিয়া গোপনে অস্ত্র সহ উহাদের রাজ্যে প্রবেশ করিলে পর, ঐ দেশীয় রাজা তাঁহাদের সসম্মানে অভ্যর্থনা করেন। তিনি পাঁচশত যোদ্ধাকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিয়া উৎকৃষ্ট পণ্য সহ রাজার নিকট প্রেরণ করেন। পরে, হিমতালের রাজা ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া রাজসিংহাসনের নিকট উপস্থিত হইলেন। ক্রীতগণের রাজা ভীত হইয়া কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইলেন। পরে রাজার মস্তক দেহচ্যুত করিয়া হিমতালের রাজা

সভাসদগণকে বলিলেন যে "আমি হিমতালের রাজা। নীচ জাতীয় রাজা এই সকল অত্যাচার করিতেন বলিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলাম; এইজন্য আমি অদ্য তাহার মস্তকচ্যুত করিয়াছি। কিন্তু অধিবাসীদিগের কোনই অপরাধ নাই।" মন্ত্রীগণকে নানা দেশে নির্ব্বাসন করিয়া, তিনি যতিগণকে প্রত্যাগমনে আদেশ দিলেন। এবং সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাদের বাসের সুবন্দোবস্ত করিলেন। পরে তিনি পশ্চিম দ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া পূর্ব্বান্ত হইলেন এবং রাজ্য যতিগণকে দান করিলেন। ক্রীতগণ এই প্রকারে কয়েকবার স্বাধিকার চ্যুত হইল কিন্তু পরে পুনরায় তাহারা এদেশ অধিকারে সক্ষম হইল। এই কারণে বর্ত্তমানে এই দেশে অবিশ্বাসীগণেরই অধিক প্রভাব।

নূতন নগরের ১০ লি দক্ষিণ পশ্চিমে এবং পুরাতন নগরের উত্তরে এবং বৃহৎ এক পর্ব্বতের দক্ষিণে সঙ্ঘারামে ৩০০ যতি বাস করেন। মঠ সংলগ্ন স্তূপে দেড় ইঞ্চি দীর্ঘ শ্বেতপীতাভবর্ণ বুদ্ধ-দন্ত আছে। পূজার দিন এই দন্ত জ্যোতিবিকীর্ণ করে। পুরাকালে ক্রীতগণ বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধন করিয়া, যতিগণকে দূরীভূত করিয়াছিল। এই সময়ে একজন শ্রমণ ভারতবর্ষের মধ্যে বুদ্ধদেবের যত স্মৃতিচিহ্ন আছে তাহা দর্শনে অভিলাষী হইয়া নিজ দেশে শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছে শুনিয়া প্রত্যাগমনের জন্য অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে হস্তীযূথ দেখিয়া তিনি এক বৃক্ষে আরোহণ করিলেন। হস্তীযূথ জলপান করিয়া, ঐ বৃক্ষের মূল উৎপাটন করিয়া বৃক্ষকে ভূমিশায়ী করিল। তৎপরে শ্রমণকে পৃষ্ঠে করিয়া নিবিড় বনের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইল। তথায় আহত এক হস্তী ছিল। শ্রমণের হস্ত লইয়া পীড়িত হস্তী তাহার ক্ষত স্থান দেখাইয়া দিলে, শ্রমণ সেই স্থান হইতে ক্ষুদ্র বংশ খণ্ড বাহির করিলেন। পরে ঐ স্থানে ঔষধি প্রয়োগ করিয়া নিজ পরিধেয় বসন ছিন্ন করিয়া ক্ষত স্থান বাঁধিয়া দিলেন। অন্য একটী হস্তী একটী সুবর্ণাধার আনয়ন করিয়া উহা আহত হস্তীকে প্রদান করিলে, হস্তী উহা শ্রমণকে প্রদান করিল। শ্রমণ আবরণ উন্মোচন করিয়া দেখিতে পাইলেন যে উহাতে বুদ্ধদেবের দন্ত আছে। পরে সকল হস্তীগুলি তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিল। পরদিন প্রত্যেক হস্তী তাঁহার মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য ফল আনয়ন করিলে, তিনি আহারাদি সম্পন্ন করিলেন। পরে তাহারা তাঁহাকে বহন করিয়া অনেক দূর আনয়ন করিয়া অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল।

শ্রমণ ঐ দেশের পশ্চিম সীমায় এক বেগবতী নদী পার হইতে লাগিলেন। ঐ সময় নৌকা নিমজ্জনের সম্ভাবনা দেখিয়া অন্যান্য আরোহীগণ স্থির করিল যে শ্রমণের নিকট নিশ্চয়ই কোন চিহ্ন আছে এবং ঐ চিহ্নের লোভেই দৈত্যগণ নৌকার এই দশা করিতেছে। নৌকাস্বামী শ্রমণের দ্রব্যাদি পরীক্ষা দ্বারা ঐ দন্ত দেখিতে পাইলেন। তখন শ্রমণ ঐ চিহ্ন ঊর্দ্ধে ধরিয়া মস্তক নত করিয়া নাগগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, ইহা এই ক্ষণ আপনাদেরই নিকট ন্যস্ত রহিল; প্রত্যাগমন করিয়া তিনি উহা পুনর্ব্বার গ্রহণ করিবেন। পরে তিনি নদী উত্তীর্ণ হইতে অস্বীকার করিয়া প্রত্যাগমন করিয়া নদীকে সম্বোধন করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন যে "এই দৈত্যগণকে দমন করিতে শিক্ষা করি নাই বলিয়াই আমার এই দুর্দ্দশা।" পরে তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিয়া দৈত্য-দমন শিক্ষা করিলেন এবং তিন বৎসর পরে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া নদীতীরে বেদী নির্ম্মাণ করিলেন। নাগগণ তাঁহার নিকট বুদ্ধদেবের দন্তাধার আনয়ন করিল। শ্রমণ উহা গ্রহণ করিয়া এই সঙ্ঘারামে আনয়নপূর্ব্বক সেই সময় হইতে পূজা করিতেছেন।

এই সঙ্ঘারামের ১৪।১৫ লি দক্ষিণে ক্ষুদ্র এক সঙ্ঘারামে অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের দণ্ডায়মান প্রতিমূর্ত্তি আছে। যদি কেহ অবলোকিতেশ্বরকে না দেখিয়া অনশনে দেহ ত্যাগ করে, তবে এই প্রতিমূর্ত্তি হইতে উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব বহির্গত হয়। ক্ষুদ্র সঙ্ঘারামের দক্ষিণপূর্ব্বে ৩০ লি দূরে বৃহৎ পর্ব্বতে প্রাচীন সঙ্ঘারামের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। বর্ত্তমানে

মহাযান মতাবলম্বী ৩০ জন যতি এই স্থানে বাস করেন। এই স্থানে ক্রিয়ানুসার শাস্ত্র প্রণয়নকারী সজ্ঞভদ্র বাস করিতেন। সজ্ঘারামের দক্ষিণস্তূপে অর্হৎগণের শরীর রক্ষিত হইতেছে। পার্ব্বত্য পশু ও বানরগণ পুষ্পোপহার প্রদান করে। অনেক অনৈসর্গিক ব্যাপার এই পর্ব্বতে সম্পাদিত হয়। অনেক সময় পর্ব্বতের শীর্ষ দেশে অশ্বের মূর্ত্তি দৃষ্ট হয় কিন্তু বস্তুতঃ অর্হৎ ও শ্রমণগণ যাহারা এই স্থানে সমবেত হন, তাঁহাদের অঙ্গুলি অঙ্কিত ছায়া দ্বারাই এই সকল মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়।

যে সঙ্ঘারামে বুদ্ধদেবের দন্ত রক্ষিত আছে, তাহার দশ লি পূর্ব্বে পর্ব্বত মধ্যে ক্ষুদ্র সঙ্ঘারাম আছে। পূরাকালে স্কাণ্ডিল্য এই স্থানে বিভাস-প্রকরণপদশাস্ত্র প্রণয়ণ করেন। নিকটে পঞ্চাশ ফুট উচ্চ স্তূপে একজন অর্হৎ ছিলেন। তাঁহার হস্তীর ন্যায় পান ভোজন ছিল। লোকে তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিত যে তিনি পেটুকের ন্যায় আহার করিতে পারেন কিন্তু তিনি সত্য মিথ্যা সম্বন্ধে কি জানেন? নির্ব্বাণকালে সমবেত জনসাধারণকে অর্হৎ বলিলেন যে, "কিছুদিনের মধ্যেই আমি অণুপরিশেষ অবস্থায় উপস্থিত হইব। কি করিয়া ইহা সম্ভব তাহাই আমি এইক্ষণ ব্যাখ্যা করিব।" জনসাধারণ এই বাক্যে আরও তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন। পরে অর্হৎ এই প্রকারে নিবেদন করিলেন "পূর্ব্বজন্মে আমি হস্তী ছিলাম এবং আমি পূর্ব্বাঞ্চলে কোন রাজার হস্তীশালায় বাস করিতাম। এই সময়ে এই দেশে অনেক শ্রমণ বাস করিতেন। রাজা আমাকে এই শ্রমণকে দান করেন। বুদ্ধদেবের পুস্তক বহন করিয়া আমি এই দেশে আসিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হই। এই সকল পুস্তক বহন করিবার পুণ্যফলে আমি মরিয়া মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করি এবং পরজন্মে আবার পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সুকৃতির বলে সন্ন্যাসীর রঞ্জিত বসন পরিধান করি। পরে অনবরত চেষ্টা করিয়া আমি ষড়বিদ্যা লাভ করি। যদিও আমি পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ অত্যধিক আহার করি, কিন্তু তত্রাপি আমার যাহা আবশ্যক তাহার এক তৃতীয়াংশ মাত্র গ্রহণ করি।" তাঁহার কথায় কেহই প্রত্যয় লাভ করিল না। তৎক্ষণাৎ তিনি সমাধি দ্বারা আকাশে উঠিলেন। তাঁহার শরীর হইতে ধুম ও অগ্নি বাহির হইতে লাগিল এবং তিনি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার অস্থি নিম্নে পতিত হইল এবং সেই স্থানে স্তূপ নির্ম্মিত হইল।

রাজধানী হইতে প্রায় ২০০ শত লি পশ্চিমে যাইয়া আমরা মৈলিন সঙ্ঘারামে পৌঁছি। এই স্থানে পূর্ণ বিভাসশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। নগরের ১৪০ কি ১৫০ মাইল পশ্চিমে মহাসঙ্ঘিকাগণের সঙ্ঘারাম আছে। তথায় একশত যতি বাস করেন। এই স্থানে শাস্ত্রজ্ঞ বোধিনাতত্ত্বসকল শাস্ত্র প্রণয়ণ করিয়াছিলেন। এই স্থান হইতে দক্ষিণ পশ্চিমে আমরা পুণাচ দেশ ও রাজপুর রাজ্য হইয়া তক্ষদেশে পৌঁছি।

(তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত)

স্ত্রীসেনা।

নারী সৈন্যের বিবরণ যদিও পুরাতন বহু গ্রন্থে পাওয়া যায় তবুও অনেকে তাহা সত্য বলিয়া প্রত্যয় করিতে চাহেন না, অনেকেরই দৃঢ় বিশ্বাস তাহা গ্রন্থকর্ত্তাদিগের উর্ব্বর কল্পনা প্রসূত। সম্প্রতি নারী সৈন্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নূতন এমন সকল প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যাহাতে সে বিষয়ে অবিশ্বাস করিবার আর কোন উপায় নাই। এই স্ত্রী স্বাধীনতা পক্ষপাতের দিনে, সুদূর অতীতেও যে নারীগণ পুরুষোচিত বলবীর্য্য প্রকাশ করিতেন,

এবং বীরের ন্যায় কঠোর কর্ত্তব্য পালনে সক্ষম হইয়াছিলেন সে তথ্য সকলেরি নিকট প্রীতিজনক হইবে আশা করা যায়।

সম্প্রতি ইতালীর মধ্য প্রদেশে বেনমণ্ট নামক স্থানে সমাহিত কতকগুলি ইট্রস্কান ভাস্কর মূর্ত্তি আবিষ্কারদ্বারা নারী সৈন্যের অস্তিত্ব নিঃসংশয় রূপে প্রমাণিত হইয়াছে। ইট্সকানগণ এক রহস্যময় জাতি, রোমক অভ্যুত্থানের বহু শতাব্দি পূর্ব্বেই তাহারা সভ্যতার সর্ব্বোচ্চতম স্থান অধিকার করিয়াছিল।

বেনমণ্ট ভূগর্ভউৎখাত দুইটি বহু প্রাচীন সমাধির বহিপ্রাচীর গাত্রে নারী সৈন্যের সংগ্রাম দৃশ্য খোদিত আছে। কোনও রমণী রথ চালনা করিতেছেন, কেহ সগর্ব্বে অশ্ব চালনা করিতে প্রবৃত্ত অপর কেহ বা বর্ষাহস্তে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছেন। এই সকল যুদ্ধদৃশ্যে তাঁহারা নিয়তই পুরুষদিগকে পরাজয় করিয়া জয় গৌরবে গর্ব্বিত। পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের বিশাল বক্ষে অকুতোভয়ে নিষ্ঠুর সাহসের সহিত অসি কিম্বা বল্লম প্রোথিত করিয়া দিতে উদ্যত, এবং পরাভূত পুরুষগণ রণে ভঙ্গ দিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন পূর্ব্বক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছেন। নারীগণ অধিকাংশ স্থলেই দ্বন্দ্ব যুদ্ধে প্রবৃত্ত, তাঁহাদের দৃঢ় মাংসপেশী সম্বদ্ধ বাহুযুগল দেখিয়া স্বতই তাঁহাদিগকে পুরুষ অপেক্ষা অধিকতর বলশালী মনে হয়। সমাধি মধ্যে দুইটি সবল কায় প্রকাণ্ড নারীকঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে আর সেইখানেই তাঁহাদের ধাতুনির্ম্মিত শিরস্ত্রাণ, বর্ম্ম, তরবারি এবং বর্ষাখণ্ড রক্ষিত আছে। পণ্ডিতদিগের বিশ্বাস ইহাদিগের মধ্যে একজন লাটিন কবি ভার্জ্জিন বর্ণিত অসীম প্রতাপশালী চিরকুমারী সাম্রাজ্ঞী কামিনা।

হার্কিউলিনিয়াসের ভগ্নাবশেষ মধ্য হইতে অল্পকাল পূর্ব্বে ধাতুনির্ম্মিত অনেকগুলি অতি সুঠাম যুদ্ধরতা নারীমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, প্রত্যেকটিতেই নারীগণ যে জাতীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আছেন তাহার সহিত রোমক কিম্বা গ্রীসীয় পরিচ্ছদের কোন সাদৃশ্যই দেখা যায় না—এবং এই স্বাতন্ত্র্যই তাঁহাদের বাস্তবিকতার সাক্ষ্যস্বরূপ উল্লেখিত হইয়া থাকে। গ্রীসদেশীয় ভাস্কর এই মূর্ত্তিগুলি খোদিত করিয়াছেন, এগুলি যদি কেবল তাঁহার কল্পনা প্রসূত হইত তাহা হইলে স্বভাবতঃই সেগুলি তিনি স্বীয় জাতীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত করিতেন।

গ্রীক পুরাণে দেখা যায় এই যোদ্ধা স্ত্রীজাতি আসিয়া মাইনরে বাস করিতেছিলেন। কিন্তু আধুনিক Boghany Kniএর ধ্বংসাবশেষের সন্নিকটে থার্মোডন নদীতীরে ক্যাপাডোসিয়া নামক স্থানে তাঁহাদের আদিম নিবাস। সেখান হইতে আসিয়া মাইনরবাসীদিগকে পরাভব করিয়া নূতন রাজ্য সংস্থাপন অভিপ্রায়ে অভিযান করেন। এই রাজত্ব সম্পূর্ণই স্ত্রীশাসনের অধীন ছিল। কখনও যদি কোন নারী স্বয়ম্বরা হইতে ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে পার্শ্ববর্ত্তী কোন রাজ্যের পুরুষকে তিনি মনোনীত করিতে পারিতেন—কিন্তু স্বামীটিকে বন্দী কিম্বা শিক্ষানবীশভাবে বাস করিতে হইত; পত্নী যেদিন ইচ্ছা সেইদিনই তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিতে পারিতেন। রাজ্যে পুরুষ সন্তান হইলেই

তাহাদিগকে রাজ্যান্তরে প্রেরণ করা নতুবা মারিয়া ফেলা হইত।

এই স্ত্রী সাম্রাজ্যের প্রসিদ্ধ রাজ্ঞী পেন্‌থেসিনিয়ার বীরত্ব কাহিনী ইনিয়াডে বর্ণিত আছে। যখন বীরশ্রেষ্ঠ হেক্টর হত হইলেন, যুদ্ধ জয়ের আশা ক্ষীণ হইল, তখন ট্রোজানগণ এই সাম্রাজ্ঞীর সাহায্য প্রার্থনা করেন। পেন্‌থেসিনিয়া পঞ্চ সহস্র সেনা লইয়া তাঁহাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। প্রাচীন কবিগণ অনেকেই তাঁহাদের ভৈরব বীরত্বের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এই স্ত্রী সেনার সহিত যুদ্ধ করিয়া গ্রীকগণ এমনই ভীত হইয়া গিয়াছিল যে তাঁহাদের উচ্চ তীক্ষ্ণ রণহুঙ্কার শুনিবামাত্র পলায়ন করিত। পেন্‌থেসিনিয়ার হস্তে গ্রীসীয় অনেক শ্রেষ্ঠ বীর নিহত হয়েন; পরিশেষে আফিনিসের সহিত যুদ্ধে রাজ্ঞী প্রাণ হারান। যুদ্ধের পর আফিনিস তাঁহার অনুপম রূপ লাবণ্য এবং তরুণ বয়স দেখিয়া অত্যন্ত কাতর ভাবে বালকের ন্যায় রোদন করায় কোনও অভদ্র গ্রীকযুবা তাঁহাকে উপহাস করে। এই কারণে তিনি তাহাকে হত্যা করিয়াছিলেন। প্রাচীন কাব্যে এই স্ত্রী সেনার বহুবিধ কৌতূহলজনক বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। জগদ্বিখ্যাত অমিত-বলশালী হার্কিউলিস বীরোচিত যে দ্বাদশ কার্য্যের জন্য চিরস্মরণীয় তাহার মধ্যে এই স্ত্রী রাজ্যের সাম্রাজ্ঞী হিপোলিটার মেখলা সংগ্রহ করিয়া আনা অন্যতম।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

ব্রহ্মে বো-টো।

ব্রহ্মে যখন ইংরেজের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হয়, সেই সময়ে সে দেশে বো-টো নামে এক প্রসিদ্ধ দস্যু ছিল। তাহার প্রভাবে সকলেই সশঙ্কিত থাকিত। তাহার এরূপ এক আশ্চর্য্য চতুরতা ছিল, যে ইংরাজ গবর্মেণ্ট পর্য্যন্ত তাহাকে বহু চেষ্টাতেও ধরিতে পারেন নাই।

অবশেষে অন্য কোন উপায় না দেখিয়া ইংরাজেরা তাহাকে রাজদ্রোহী বলিয়া ঘোষিত করিলেন, এবং প্রচার করিলেন যে, যে কেহ বো-টোর মস্তক লইয়া আসিতে পারিবে সেই গবর্মেণ্টের নিকট দশ সহস্র মুদ্রা পুরস্কার পাইবে। কিন্তু এ সকল ব্যবস্থা সত্ত্বেও বিধাতা তাহার মস্তকটিকে যেস্থানে রাখিয়াছিলেন, তাহা নিরুপদ্রবে সেই স্থানেই থাকিয়া নিত্য নূতন উপদ্রবের কৌতুক সৃষ্টি করিতে লাগিল।

একদিন সংবাদ আসিল যে বোটো এক জঙ্গলের মধ্যে রহিয়াছে। সেই প্রদেশের সেনাপতি মনে করিলেন বন ঘিরিয়া তাহাকে বন্দী করিবেন। তিনি বহু লোক লইয়া সেই জঙ্গলটি ঘিরিলেন এবং প্রত্যেককে বলিয়া দিলেন যে বোটোকে যে ধরিতে পারিবে সেই দশ সহস্র মুদ্রা পুরস্কার পাইবে।

সৈনিক, পুলিস, কুলি, কৃষক, গ্রামবাসী সকলেই আসিয়া এই ব্যাপারে যোগ দিল। সকলেই পুরস্কারের লোভে উৎফুল্ল। ক্রমে এত লোক আসিয়া জুটিল যে সেই লোকপ্রাচীর ভেদ করিয়া পলায়ন করা বো-টোর ন্যায় দস্যুর পক্ষেও অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু তখন ভাবিবার আর সময় নাই। যাহা হয় একটা কিছু অবিলম্বেই করিতে হইবে। কাজেই বোটো তৎক্ষণাৎ তাহার পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া কুলির মত এক জীর্ণ চীর পরিল এবং একগাছি ছড়ি লইয়া অন্যান্য সকলের সহিত তাহারই অন্বেষণে যোগ দিল। পরিণামে ফল হইল এই বো-টো অপর লোকদের সহিত পারিশ্রমিক চারি

আনা আদায় করিয়া লইয়া হৃষ্ট মনে সে স্থান ত্যাগ করিল। তাহার পরেই সে সেই প্রদেশের সেনাপতিকে এক পত্রের সহিত দুই আনা ফিরাইয়া দিয়া এইরূপ লিখিল যে, সে অর্দ্ধেক দিন মাত্র খাটিয়া পুরা দিনের পারিশ্রমিক লইতে প্রস্তুত নহে।

কিছুকাল পরে একদিন বো-টো এক প্রদেশের কমিশনর সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—"আমিই বোটো, আপনার নিকট ধরা দিতে আসিয়াছি।"

সাহেব একথা বিশ্বাস করিতে না পারিয়া বলিলেন—"বেশ কথা। এখন তুমি কে এবং কি চাও তাহা সত্য করিয়া বল। আজকের এ কাজের জন্য কত পাবার আশা কর?"

বো-টো শান্তভাবে উত্তর করিল—"দশ সহস্র মুদ্রা।" সাহেব অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"আমি তোমার কথার অর্থ ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।"

বোটো উত্তর করিল—"কেন, ইহার মধ্যে দুর্ব্বোধ্য ত কিছুই নাই। গবমের্ণ্ট কোনদিনই সত্য ভঙ্গ করেন না তা ত' আপনি জানেন। গভমের্ণ্ট ঘোষণা করেছেন যে, যে ব্যক্তি বোটোর মস্তক লইয়া আসিবে সে দশ সহস্র মুদ্রা পুরস্কার পাইবে।"

সাহেব এতক্ষণে তাহার কৌশল বুঝিয়া বলিলেন—"কিন্তু তোমার মাথাটি খসিয়া পড়িবে আর তুমি এ টাকা পাইবে কি উপায়ে?"

"আমার স্ত্রী পুত্র ত' পাইবে।"

"সে কথা সত্য, কিন্তু তোমার এ কৌশল চলিবে না। দশ সহস্র মুদ্রার তোমার অভাব কি?"

"অভাব না থাকিলে আপনার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতাম না। আমার অনুচরেরা আমার সর্ব্বস্ব লইয়া আমাকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। আজ এক পক্ষ ধরিয়া এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে আমি কখন ধরা পড়ি তাহার ঠিক নাই। তাই মনে করিলাম স্ত্রী পুত্রের জন্য যদি দশ সহস্র মুদ্রার সংস্থান করিয়া যাইতে পারি ত মন্দ কি।

"কিন্তু টাকাটা ত আমি নিজেও লইতে পারি। আমি তোমাকে ধরিয়া তোমার মাথা গবমের্ণ্টের নিকট পাঠাইয়াছি বলিলেই হইবে।"

"আপনি ভদ্র ইংরাজ, আপনি তা করিবেন না তা আমি জানি।

সাহেব কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন—"দেখ, তুমি যে বোটো নও তা আমি বেশ জানি। তুমি কে তা জানিবার জন্য আমি ব্যস্ত নহি। কিন্তু তুমি কি চাও তাহা আমাকে স্পষ্ট করিয়া বল।"

মুহূর্ত্তমাত্র ইতস্তত করিয়া বোটো বলিল—আপনি ঠিকই ধরিয়াছেন। কিন্তু আমার জীবনও বোটোর জীবনের ন্যায়ই বিপন্ন। আমি তাহার সন্ধান বলিয়া দিয়াছিলাম, সুতরাং আমার জীবনও আর মুহূর্ত্তের জন্য নিরাপদ নহে। আমি তাহার অর্থ অপহরণ করিয়া পলাইয়াছিলাম। আপনি অনুগ্রহ করিয়া মান্দালে পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে একটি লোক দিন। এই নিন সহস্র মুদ্রা; আজ হইতে দ্বাদশ দিনের মধ্যে আমি বোটোকে ধরাইয়া দিতে না পারিলে এ টাকা আপনার হইবে। যতদিন না বোটো ধরা পড়ে ততদিন এ টাকা আপনি নিজের কাছে রাখিতে পারেন।"

মিনিট দুয়েক চিন্তা করিয়া কমিশনর সাহেব দস্যুর প্রস্তাবে আনন্দিত হইলেন।

বোটো নিরাপদে মান্দালেতে উপস্থিত হইবার পর কমিশনর সাহেব তাহার নিকট হইতে এই পত্র পাইলেন—

"দ্বাদশ দিন পূর্ব্বে আমি—বোটো আপনার নিকটে যে টাকা রাখিয়াছিলাম, তাহা আপনিই রাখিয়া দিবেন। আমি আপনাকে সত্য কথাই বলিয়াছিলাম, কিন্তু আপনি তাহা বিশ্বাস করিলেন না দেখিয়া আমি মিথ্যা কথা বলিয়া উক্ত টাকা জমা রাখিয়াছিলাম। ইংরাজ গবমের্ণ্ট সত্য ও টাকা দুইই ভাল বাসেন। কিন্তু তাঁহারা দুইটা জিনিষই একসঙ্গে পছন্দ করেন না।"

শ্রীভঃ

প্রাচ্য-গৌরব।

(Earl of Ranaldshay হইতে)

বিশালকায় আসিয়া মহাদেশের মহীয়সী-মূর্ত্তি জগৎবাসীকে চিরদিনই এক অপূর্ব্বভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে। পর্ত্তুগালের অসমসাহসিক নাবিকগণের অক্লান্ত অধ্যবসায় যে দিন দক্ষিণ-মহাসাগরের রহস্যজাল ভেদ করিল, সেই দিন হইতে সৈনিক ও বাণিজ্যজীবীর ক্রম-বর্দ্ধনশীল প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন ভাবে আসিয়ার প্রহেলিকাময়, বিশাল তটাভিমুখে বহিয়া আসিতেছে। দক্ষিণ-মহাসাগরের উত্তাল তরঙ্গমালার ঘাত প্রতিঘাতে কত মহা-জাতির উত্থান ও পতন হইয়াছে; প্রাচ্য-জগতের বিশাল রঙ্গমঞ্চে কত জাতি কিছু দিনের জন্য রাজ-অভিনয় করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছে। পর্ত্তুগাল, স্পেন, হলাণ্ড, ফ্রান্স সকলেই যথাক্রমে এই বিরাট দেশকে আশ্রয় করিয়াই উন্নতির সর্ব্বোচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিল; এবং আজিও ইংলণ্ড ইহারই উপর নিজের গৌরবসিংহাসন প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে।

কালচক্রের পরিবর্ত্তনে বিজয়-অভিযানের দিন গত হইয়াছে। চারি শতাব্দী পূর্ব্বে যে রহস্য যবনিকার অন্তরালে আসিয়া অস্পষ্ট আলোকে প্রতিভাত হইত, সে যবনিকাও অপসারিত হইয়াছে। আসিয়া আজ উন্মুক্ত, আলোকোদ্ভাসিত। কিন্তু যে ইন্দ্রজালের অপরূপ কুহকচ্ছটায় চারি শত বৎসর পূর্ব্বের বাণিজ্যব্যবসায়ী ও দুঃসাহসিক ব্যক্তিবৃন্দ আকৃষ্ট হইত আজিও তাহার মোহিনী শক্তি কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই; তাহা কেবল রূপান্তর গ্রহণ করিয়া স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতেছে মাত্র।

এ কথা সত্য যে এখনও যুদ্ধ ব্যবসায়ী ও আবিষ্কর্ত্তাদিগের জন্য যথেষ্ট ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। বণিক এখনও তাহার বাণিজ্য-জাল দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তার করিতে পারেন। কিন্তু আসিয়ায় ইউরোপীয় প্রভুত্ব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, বণিক ও সৈনিকের একাধিপত্য অন্তর্হিত হইয়াছে; এবং এই সকল যুদ্ধার্থী ও বাণিজ্যকামীর স্থান পর্য্যটক ও অনুসন্ধিৎসু ছাত্রবর্গ দিন দিন অধিকার করিতেছে। প্রাচ্য জগতের গবেষণা ও পুরাতত্ত্বানুসন্ধানের সীমাহীন ও বিমোহন সাধনাকে এই বিশাল ভূমিতে আকর্ষণ করিয়া আনিতেছে।

প্রতীচ্য হইতে প্রাচ্যরাজ্যে এই ভার-কেন্দ্রের পরিবর্ত্তন-ব্যাপার খুবই ঘটনা পূর্ণ; কিন্তু অবোধ্য কিংবা অনৈসর্গিক নহে। প্রাচ্যদেশ সমূহ ও তাহাদের অধিবাসীবর্গের বিশালত্ব এবং বৈচিত্র্য আসিয়া মহাদেশকে এক বিপুল অনন্ত সৌন্দর্য্যে জড়িত করিয়া রাখিয়াছে। দার্শনিক ও ঐতিহাসিক, সাহিত্য-সেবী ও শিল্পী, প্রত্নতত্ত্ববিৎ ও পরিব্রাজক, রাজনীতিবেত্তা ও বিপ্লবপন্থী সকলেই স্ব স্ব ক্ষমতা পরিচালন ও জ্ঞান প্রয়োগের পথ আসিয়ার এই বিরাট ক্ষেত্রের মধ্যেই দেখিতে পাইবেন।

যে মহান্ ধর্ম্মত্রয়ের সুমধুর শাসন দণ্ডের নিকট আজ সমগ্র জগৎ স্বেচ্ছায় অবনতমস্তক,

যাহাদের মধুময় উৎসের অমৃত প্রবাহ জগতের মানবকুলের ধর্ম্মপিপাসা নিবারণ করিতেছে, সেই বৌদ্ধ, খৃষ্টীয়, এবং মহম্মদীয় ধর্ম্ম এই আসিয়া-জননীর পবিত্র ক্রোড়েই ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। দার্শনিক প্রবর এমার্সনের উক্তি—"ইউরোপ চিরদিনই উচ্চতর ধর্ম্মভাবের জন্য প্রাচ্যপ্রতিভার নিকট ঋণী"। * *

সাহিত্য ও শিল্প জগতেও আসিয়ার দান তাহার সন্তানবর্গের সর্ব্বাভিসারিণী ও বৈচিত্র্যময়ী প্রতিভার জ্বলন্ত কীর্ত্তিস্তম্ভ। আসিয়ার সাম্রাজ্যসমূহ ও নরপতিবৃন্দের বিচিত্র ইতিবৃত্ত জগতের ইতিহাসে কতকগুলি মোহময়ী পৃষ্ঠা সন্নিবিষ্ট করিয়াছে। তাহার বিজেতৃবর্গের কীর্ত্তিগাথা ধরিত্রীর ভূপালবৃন্দের অবদান সমূহের মধ্যে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। দিগ্‌বিজয়ী সাইরাস, ডেরিয়াস ও জারক্‌সেস্, মোগলবীর জঙ্গিস খাঁ, তাতাররাজ তৈমুরলঙ্গ, গজনীর মামুদ, মোগলরাজ্য প্রতিষ্ঠাতা বাবর, রাজনীতি বিশারদ আকবর—ইতিহাসপাঠজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ইঁহাদের নাম কে না অবগত আছেন? ইঁহাদের বীরকাহিনী লোমাঞ্চ শরীরে ও স্তম্ভিত হৃদয়ে পাঠ করিয়া কে না ভীত ও চকিত হইয়াছেন?

প্রাচ্য সাহিত্যের অক্ষয় ভাণ্ডারে বুধমণ্ডলীর জ্ঞান ক্ষুধা মিটাইবার কত বিচিত্র উপকরণ পড়িয়া রহিয়াছে। চীন সাধু কন্‌ফুকাসের উপদেশাবলী কি গভীর তত্ত্বপূর্ণ! পারস্য কবি সাদী ও ফার্দ্দুসীর হৃদয় কন্দরোত্থিত আবেগময়ী কবিতা কি মধুময়ী! Old Testament লেখকদিগের শব্দ-চিত্রাঙ্কন-প্রতিভা কি বিস্ময়করী!

শিল্প জগতে নেত্রপাত করিলে দেখিতে পাই, আসিয়ার মস্‌জিদ, মন্দির এবং হর্ম্ম্যাবলী তাহার সন্তানদিগের অনুপম সৌন্দর্য্যজ্ঞানের মূর্ত্তিমান্ সাক্ষীস্বরূপ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পিকিংএর "ত্রিদিব-মন্দির" (Temple of Heaven) কি সুন্দর! নিকো এবং টোকিয়োর জাপানী মন্দিরসমূহের পরিকল্পনা কত উচ্চ! আবুশৈলের শিখরদেশস্থ জৈন মন্দিরগুলি অপেক্ষা সূক্ষ্ম কারুকার্য্য এবং নির্ম্মাণকৌশল কোথায় দেখিতে পাইব? চারু-শিল্প-কম আগ্রার তাজ অপেক্ষা প্রাণস্পর্শী কি? 'কামকুর'স্থ বুদ্ধদেবের বিরাটমূর্ত্তি কি মহিমাময়ী! সমরখণ্ড দেশের গৌরবস্বরূপ যে সকল বিশালকায় হর্ম্ম্যরাজি এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাদের বিরাটত্ব কত বিস্ময়জনক!

আসিয়ার প্রতি ধূলিকণায় ইতিহাসের কত নিগূঢ় কাহিনী লুক্কায়িত রহিয়াছে। প্রত্নতত্ত্বের বিমোহনক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাই, 'আসিরিয়া' এবং 'ক্যালডিয়া'র দিগন্তব্যাপী প্রান্তর, 'সুসা' এবং 'পার্সিপোলিস্' রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ, জঙ্গলাবৃত 'অনার্য্যপুর' এবং 'পোলানারুয়া' নগরীদ্বয়, অতীতের বিস্মৃত রত্নভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া কত রত্নাদি উপহার দিয়াছে। এখনও 'অকূলামাকামে'র' অগম্য মরুগর্ভে কিংবা 'আঙ্করতোমের' অতিকায় হর্ম্ম্যরাজির অমুত্তিন্ন প্রহেলিকা-গহ্বরে তত্ত্বানুসন্ধান ও আবিষ্ক্রিয়ার কি বিশালক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে!

নিনেভা ও প্রাচীন বাবিলনের ভগ্ন পাষাণ-স্তূপের উপর দণ্ডায়মান হইয়া অতীতের রহস্য যবনিকা উত্তোলন করিবার

দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছায় অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। এই সকল বিস্মৃত জনপদ ও বিলুপ্ত সাম্রাজ্যের মধ্য দিয়া বিচরণ করিতে করিতে সেই সুদূর এবং অতীতের বিপুল কীর্ত্তিগাথার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি যেন আমাদের শ্রুতিপথে আসিয়া আঘাত করে। কিন্তু হায়! মহাকাল একে একে সকল কীর্ত্তিই নাশ করিয়া ফেলিতেছে। বিস্মৃতির অতলজলে সকলই ডুবিয়া যাইতেছে। বাস্তব স্বপ্নে পরিণত হইতেছে কালের এই তাণ্ডব নৃত্যের বিশ্ববিধ্বংসিনী গতির রোধ কে করিবে?

শ্রীদীনবন্ধু সেন বি এ।

আন্দামান দ্বীপ।

বর্ত্তমান কালে আন্দামান দ্বীপ পুঞ্জের নাম শুনিলে আমাদের মনে যে খুব সুখকর ভাবের উদয় হয় তাহা নহে। স্থানটি নির্ব্বাসিত অপরাধীর সহিত আজকাল এরূপ একটা ঘনিষ্ট সম্বন্ধ পাতাইয়া বসিয়াছে যে, আমরা ইহাকে একটা ভয়ঙ্কর স্থান বলিয়াই মনে করি, ইহার ইতিহাসের মধ্যে যে কোন প্রকার বিশেষ চিত্তাকর্ষক ব্যাপার আছে তাহা কল্পনা করিতে পারি না। কিন্তু স্থানটি বহুযুগ হইতে ভারতের সভ্যতা ও সমৃদ্ধির ইতিহাসের সহিত সংশ্লিষ্ট।

প্রাচীনতম যুগ হইতে বঙ্গদেশ শস্যশ্যামল এবং শিল্প সম্পদে ভারতের গৌরবস্থল ছিল। বঙ্গের সমুদ্রতীরবর্ত্তী বন্দরগুলি সমগ্র উত্তর ভারতের বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল। এই বন্দরগুলি হইতে অর্ণবপোতের সাহায্যে ভারতের বাণিজ্যদ্রব্যগুলি নানাস্থানে প্রেরিত হইত এবং সেই সকল স্থান হইতে বণিকগণ তদ্দেশীয় দ্রব্যাদি লইয়া ভারতে বাণিজ্যকল্পে আগমন করিতেন। এইজন্য অতি প্রাচীনযুগ হইতে নাবিক-দিগের নিকটে এই দ্বীপপুঞ্জ পরিচিত ছিল। গ্রীক নাবিকদিগের ভ্রমণ বৃত্তান্তে এই দ্বীপপুঞ্জের উল্লেখ দেখা যায়। চীন, জাপান ও আরব্য দেশের বণিকগণ সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে এই দ্বীপপুঞ্জের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ভারতের ইতিহাসেও প্রায় ৮৫০ বৎসর পূর্ব্বে ইহার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। মার্কো পোলো ১২৯২ সালে যে 'অঙ্গনানায়েন' দ্বীপের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন তাহাই বর্ত্তমান আন্দামান। পরবর্ত্তী পরিব্রাজকগণ ইহার যে নামের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন তাহা অনেকটা ইহার বর্ত্তমান নামের অনুরূপ। ১৪৩০ সালে কণ্টি ইহাকে 'আন্দামানিয়া' বলিয়া গিয়াছেন। ১৭৯০ সালে ব্লেয়ার সাহেব তাঁহার মানচিত্রে এই দ্বীপের চিত্র দিয়াছিলেন বলিয়াই ইহার এক স্থানের নাম পোর্ট ব্লেয়ার হইয়াছে।

ইয়ুরোপের অনেকে মনে করেন গ্রীকগণই সর্ব্ব-প্রথম এই দ্বীপের নামকরণ করেন। ম্যান সাহেব বলেন টলেমি ইহাকে 'আগামাউ ডাইমনোস্' অর্থাৎ সৌভাগ্যদ্বীপ বলিয়া উল্লেখ করিয়া যান, ক্রমে তাহার অপভ্রংশ হইয়া আন্দামান দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে, কারণ গেরিনি তাঁহার প্রাচ্যভূগোলে নিকোবর দ্বীপকেই সৌভাগ্যদ্বীপ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, আন্দামানকে 'পাশা কাটা' বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং 'আগামা ডাইমনোস্' বলিতে নিকোবর দ্বীপকে বুঝান সম্ভব।

যাহা হউক এই দ্বীপপুঞ্জ যে বহুদিন হইতে বিদেশী ও ভারতবাসীর নিকট পরিচিত ছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানির কর্ম্মচারীগণ ইহার চতুর্দ্দিকে সমুদ্র পরীক্ষা করিয়া একটি জরিপের মানচিত্র প্রস্তুত করেন। পরে ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস আর্চিবল্ড ব্লেয়ার সাহেবকে এই দ্বীপে বসতি স্থাপন করিতে আদেশ করেন। বোধ হয় বঙ্গোপসাগরে

জলদস্যুদিগকে শাসিত করা এবং জলমগ্ন নাবিকগণকে এই দ্বীপের বর্ব্বর অধিবাসীর অত্যাচার হইতে রক্ষা করাই কর্ণওয়ালিসের উদ্দেশ্য ছিল। এই বনসঙ্কুল স্থানকে মনুষ্যবাসের উপযুক্ত করিবার জন্যই সর্ব্বপ্রথম কয়েদীগণকে তথায় শ্রমজীবী রূপে পাঠান হয়। সে সময়ে ইহাকে অপরাধীগণের নির্ব্বাসনস্থল করিবার কল্পনা পর্য্যন্ত কেহ করে নাই। যাহা হউক ব্লেয়ার সাহেব একটি উপযুক্ত স্থান নির্ব্বাচিত করিয়া তথায় বসতি স্থাপন করা স্থির করিলেন। এই স্থানটি আজিও পোর্ট ব্লেয়ার নামে পরিচিত। কিছুকাল আয়োজনের পর স্থির হইল যে পোর্ট ব্লেয়ার ত্যাগ করিয়া আরও উত্তরে বসতি স্থাপন করা আবশ্যক। ফলতঃ ১৭৯২ সালে সে স্থান ত্যাগ করিয়া উত্তর আন্দামান দ্বীপে বসতি স্থাপন করা হইল। কিন্তু এই স্থানের জলবায়ু এরূপ ভয়ঙ্কর যে অবশেষে বাধ্য হইয়া এস্থলে বাসের চেষ্টা ত্যাগ করিতে হইল। ইহার পরে বহুকাল আর এই দ্বীপের প্রতি কেহ মনোযোগ দেন নাই। পরে ১৮২৪ সালে ব্রহ্মদেশ আক্রমণে প্রেরিত নৌবাহিনী এই দ্বীপ তাহাদের আশ্রয় স্থল করিল। তাহার পর হইতে মধ্যে মধ্যে পুনরায় ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৪৮ সালে এমিলি নামে একখানি জাহাজ ইহার পশ্চিম উপকূলে লাগিয়া ভাঙ্গিয়া যায়। যাত্রী ও নাবিকগণের রক্ষা করিবার জন্য শত চেষ্টা সত্ত্বেও দ্বীপবাসীরা তাহাদের অধিকাংশকেই নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করে। ১৮৫৬ সাল পর্য্যন্ত প্রায়ই এইরূপ নরহত্যার বৃত্তান্ত শুনিতে পাওয়া যায়। পরে গবর্মেণ্ট পুনরায় এই দ্বীপ অধিকার করিলেন। তাহার পর বৎসরেই ভারতে বিদ্রোহ হয়, গবর্মেণ্ট যে সকল বিদ্রোহীকে বন্দী করিলেন তাহাদিগকে নিরাপদে রাখিবার জন্য কোন একটা স্থানের বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িল। সেই জন্য ১৮৫৭ সালের শেষ ভাগেই এই স্থান সর্ব্বপ্রথম নির্ব্বাসন স্থল রূপে ব্যবহৃত হইল। এই সালেই পোর্ট ব্লেয়ার হইতে মুক্ত এক কয়েদী লর্ড মেয়োকে হত্যা করে।

আন্দামান বাসীর সহিত সৌহৃদ্য স্থাপনের জন্য ইংরাজ কর্ম্মচারীগণ তথায় এক আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। এই আশ্রমে যে কোন দ্বীপবাসী আসিয়া যতদিন ইচ্ছা বিনাব্যয়ে বাস করিতে পারে। তাহাদিগকে থাকিতে নিষেধ করা দূরে থাক, বরং আরও দীর্ঘকাল থাকিবার জন্য উৎসাহই দেওয়া হইয়া থাকে। এখানে বিনামূল্যে তাহাদিগকে সাহায্য দেওয়া হয়। এখানে তাহাদের মাছধরা বা কচ্ছপধরা ভিন্ন অন্য কোন কর্ম্মই করিতে হয় না। এই কর্ম্মটুকুও তাহাদের সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন, ইচ্ছা না করিলে তাহারা ইহাও করিতে বাধ্য নহে। অনেকে আশ্রমে থাকিয়া কেবল আনন্দ ও বন্যপশু শীকার করিয়া বেড়ায়। তবে আশ্রমের নিয়ম এই যে এই সকল লোক আশ্রমে অবস্থান কালে যাহা কিছু সংগ্রহ করিবে তাহা আশ্রমের সম্পত্তি বলিয়াই গণ্য হইবে। এই উপায়ে এক্ষণে আশ্রমের সমস্ত ব্যয় গবর্মেণ্টের বিনা সাহায্যে চলিয়া যায়।

আন্দামান বাসীরা বন্যজীবনই ভালবাসে। সভ্যতার প্রতি তাহাদের কোন আকর্ষণই দেখা যায় না। ইহারা আশ্রমে আসিয়া যখন বাস করে তখনও নিজেদের সেই চিরাভ্যস্ত ভাবেই কালাতিপাত করে এবং যখন পুনরায় অরণ্যের মধ্যে চলিয়া যায় তখন যেন একটা অভিনব আনন্দ ও সুখ অনুভব করে বলিয়া বোধ হয়। গভীর বনের মধ্যে হিংস্র পশু ও শত্রু পরিবেষ্টিত হইয়া দুরন্ত ভাবে জীবন অতিবাহিত করাই তাহারা যথার্থ সুখভোগ বলিয়া মনে করে।

বারাণসী।

(ফেলিসিয়াঁ-শালের ফরাসী হইতে)

এই বারাণসী ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের 'রোম্' (Rome), অর্থাৎ—ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের পীঠস্থান! ইহার দৃশ্য-সমূহ যেরূপ চিত্তবিক্ষোভকারী, যেরূপ অদ্ভুত, ইহার পাগ্‌লামি-কাণ্ডগুলা যেরূপ সংক্রামক এরূপ আর কোথাও দেখা যায় না।

ইহার গলিগুলা গঙ্গাভিমুখে নামিয়া আসিয়াছে; গলির রাস্তায়, পিঁপ্‌ড়ার সারির ন্যায় লোকের জনতা; ভারতের সকল দিক হইতেই লোক আসিয়াছে। এই পুণ্যনগরী একটা তীর্থস্থান, এখানে আসিলে সমস্ত পাপ ক্ষয় হইয়া যায়। উত্তর-প্রদেশের গৌরবর্ণ ব্রাহ্মণ,—নিগ্রো সদৃশ কৃষ্ণকায় দক্ষিণী হিন্দুর গা ঘেঁসিয়া পাশাপাশি চলিয়াছে। জটিল-শ্মশ্রু, জটাধারী, নগ্নপ্রায় ভস্মাচ্ছাদিত সন্ন্যাসীরা চলিয়াছে, অথবা রাস্তার ধারে ধ্যান মগ্ন হইয়া নিশ্চলভাবে বসিয়া আছে;—মনে হয় যেন উহারা কিছুই দেখিতেছে না, কিছুই শুনিতেছে না, চতুষ্পার্শ্বস্থ চঞ্চল জনতার সহিত যেন উহাদের কোন সংস্রব নাই। শাদা ও শীর্ণকায় ধর্ম্মের গরু দেখিবা-মাত্র লোকেরা ভক্তিভাবে তাহাদিগকে পথ ছাড়িয়া দিয়া একপাশে সরিয়া দাঁড়াইতেছে—বাড়ীর ছাদ,—পায়রা, কাক, ময়ুর, টিয়াতে আচ্ছন্ন। দেয়ালের গায়ে, দেবতার মূর্ত্তি ও পৌরাণিক দৃশ্য-সকল চিত্রিত।

এখানে দুই সহস্র মন্দির, অসংখ্য দেবালয়, পাঁচ লক্ষ দেবতার মূর্ত্তি। আমি গাভীগণের মন্দির দেখিতে গেলাম; ভক্তেরা এই পবিত্র গাভীদিগকে আদর করিতেছে; তাহাদিগকে তৃণ ও পুষ্প প্রদান করিতেছে। একজন বৃদ্ধা রমণী, একটা গরুর পুচ্ছ-প্রান্ত আপনার মুখের উপর ধীরে ধীরে বুলাইতেছে। যে তরুণ হিন্দু-অধ্যাপক আমার সঙ্গে ছিলেন তিনি আমাকে বলিলেন,—কোন গরুকে বিপন্ন দেখিলে তাহার জন্য প্রাণ দিতেও তিনি কুণ্ঠিত হন না। আর একটা বানরের মন্দির আছে; শত-শত বানর সেখানে মুক্তভাবে বাস করিতেছে; কেবল মঙ্গলবারেই তাহাদিগকে খাওয়াইবার সুবিধা হয়। আমি এই সকল ক্ষুদ্র দেবতাদিগের ফোটো তুলিবার জন্য অনুমতি চাহিয়া অনুমতি পাইলাম।—একটি নেপালী দেবালয় আছে, তাহার ছাদের চতু-স্পার্শ্বে ভয়ানক-অশ্লীল খোদাই-মূর্ত্তি; আমার ভৃত্য বলিল, এই ইমারৎটিকে বজ্র হইতে রক্ষা করিবার জন্য, এইরূপ মূর্ত্তি সকল খুদিয়া রাখা হইয়াছে। লজ্জাশীলা সৌদামিনী এই সকল বিভীষিকা দর্শনে সঙ্কুচিত হইয়া পিছু হটিয়া যান!—

প্রতি পদক্ষেপেই, শিবলিঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। নবযুবতীরা এই সকল লিঙ্গ-মূর্ত্তিকে ফুলে-ফুলে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে এবং উহাদের উপর পবিত্র জল সিঞ্চন করে।

সর্ব্বত্রই পূজা-সামগ্রীর দোকান; এই দোকানে পুষ্পমাল্য, জুঁই ও গাঁদার মালা, ছোট ছোট মূর্ত্তি ও দেবতাদের বিগ্রহ বিক্রীত হয়; সিংহ, বরাহ,মৎস্য প্রভৃতি বিষ্ণুর বিবিধ অবতার-মূর্ত্তি; নীলবর্ণ দেবতা কৃষ্ণ, তাঁহার প্রণয়িনীর সহিত একত্র রহিয়াছেন; সিদ্ধির দেবতা

গণেশ গজমুণ্ডধারী, লম্বোদর, গোলাপী-রং; কৃষ্ণবর্ণ বিকট-দর্শনা কালীদেবী, বক্ষের উপর শোণিতাক্ত নরমুণ্ডমালা ধারণ করিয়া আছেন।

প্রভাতে, গঙ্গার ধারে শতসহস্র স্ত্রী ও পুরুষ স্নান করিতেছে, স্নানের সঙ্গে কত ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান হইতেছে; কেহ বা, শাস্ত্রের নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জলে প্রক্ষালন করিতেছে; প্রক্ষালন কালে, শরীরের মধ্যে যে অবয়বটি সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র সেই দক্ষিণ কর্ণকেও ভুলিতেছে না; কেহ বা অঞ্জলীতে জল লইয়া, সম্মুখভাগে যতদূর সম্ভব দূরে ছিটাইয়া ফেলিতেছে; কেহ বা বৃক্ষশাখা লইয়া, জল-তরঙ্গের উপর তালে-তালে আঘাত করিতেছে; কেহ বা মল্লিকা কিংবা গোলাপের পাপ্‌ড়ি জলে নিক্ষেপ করিতেছে;—সেই সব ফুল, স্থানে-স্থানে গঙ্গাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে; কেহ বা কয়েক বার ঘোর-পাক খাইয়া আপনার নাকে চিম্‌টি কাটিতেছে, বুক চাপ্‌ড়াইতেছে; কেহ বা নিশ্চল-ভাবে দাঁড়াইয়া, নীল-আকাশে সূর্য্যের উদয় নিরীক্ষণ করিতেছে। তীর্থযাত্রীরা পবিত্র গঙ্গাজলে তাহাদের কমণ্ডলু ভরিতেছে—পরে সেই জল ছিটাইয়া তাহাদের গৃহকে পবিত্র করিবে।

নদীর ধারে, চিতার উপর শব দাহ হইতেছে; মৃতজনের আত্মীয়েরা, শুভ্র শোক-বস্ত্র পরিধান করিয়া, মৃতজনের প্রিয় ভস্ম গঙ্গাদেবীর পবিত্র জলে নিক্ষেপ করিতেছে… এক দিন, একটু সহর ছাড়াইয়া, আমি নদীর উপর নৌকা করিয়া বেড়াইতেছি, নদীর তটের উপর হইতে একটা মর্ম্মভেদী চীৎকার শুনিতে পাইলাম; নিকটে গিয়া দেখিলাম, একজন হিন্দু একটী মৃত শিশুকে উঠাইতেছে। জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, সে এত দরিদ্র যে সে চিতার খরচ দিতে পারে না, তাই ঐ শিশুর মৃতদেহ গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিবে; কিন্তু নদী শিশুটিকে গ্রহণ করিতেছে না,—নদী-কিনারায়, স্রোতের এতটা জোর নাই যে উহাকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। সেই হতভাগ্য ব্যক্তি,—নৌকা করিয়া গঙ্গার মাঝখানে গিয়া মৃতশিশুটিকে ফেলিয়া দিবে—এই জন্য অতি কাতর-স্বরে নৌকা-ভাড়ার কিছু পয়সা, আমার নিকট চাহিল। যখন অনুষ্ঠান পদ্ধতির নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে, শিশুটির অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সে সম্পন্ন করিতে পারিল, তখন তাহার মুখে যে আনন্দ ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা আমি কখনও ভুলিবে না।

এই প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম মানুষকে হতবুদ্ধি ও বিমূঢ় করিয়া ফেলে। যেমন একদিকে বৌদ্ধধর্ম্ম জীবন্ত ও গভীর, তেমনি আবার অন্য দিকে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম নিশ্চল ও উদ্ভট-কল্পনাময়। তথাপি, এই সমস্ত গূঢ়-রহস্যময় সাঙ্কেতিক মূর্ত্তির আবরণের মধ্যে, এই সব অসঙ্গত অদ্ভুত ক্রিয়া-কলাপের অন্তরালে, একটা বিরাট তত্ত্বের ধারণা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন এই যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম,—ইহার মধ্যে, সত্য ও মঙ্গলের একটা মূল-আদর্শ আবিষ্কার করা যাইতে পারে।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম যেমন একদিকে সমস্ত পরস্পর-বিরুদ্ধ জিনিসগুলাকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছে; যেমন একদিকে, গ্রহনক্ষত্র, নদনদী, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু, দেব মনুষ্য—এই সমস্ত একত্র মিশাইয়া একটা অদ্ভুত খিচুড়ী প্রস্তুত

করিয়াছে, তেমনি আবার হিন্দুরা যেরূপ আপনাদের মধ্যে অসীমের অনুশীলন করিয়াছে, সেরূপ আর কোন জাতিতে করে নাই। বহু রূপের অতীত তাহারা একমাত্র অদ্বিতীয় সত্যকে গভীরভাবে দর্শন করিয়াছে; তাহারা উপলব্ধি করিয়াছে, সমস্ত সত্তাই এক মহাসত্তা হইতে উৎপন্ন এবং সেই মহাসত্তারই অংশ। সমুদ্র এক হইলেও, যেমন্ তাহার উত্থান-পতনশীল তরঙ্গরাজি, সমুদ্রকে বহুভাবে প্রদর্শন করিয়া বহুত্বের বিভ্রম উৎপাদন করে, সেইরূপ জন্ম মরণশীল সমস্ত জীব ও সমস্ত পদার্থ বিশ্ব-জীবনেরই বিচিত্র ও ক্ষণস্থায়ী রূপ মাত্র। যে মহাপ্রকৃতি, আমাদের মনোবৃত্তি দিয়াছেন, তাঁহা হইতেই যাহা কিছু এই সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে; আমরা সমস্ত মনুষ্যের ভ্রাতা, সমস্ত জীবজন্তুর ভ্রাতা, সমস্ত বৃক্ষলতায় ভ্রাতা, গ্রহ নক্ষত্রের ভ্রাতা, মেঘ বিদ্যুতের ভ্রাতা।

গভীরতত্ত্বদর্শী দার্শনিক Maurice Maeterlinck বলেন,—"যে স্থানে, আমাদের সমস্ত মনোবৃত্তি, আমাদের সমস্ত হৃদয়-বৃত্তি বিকাশ লাভ করিতেছে, সর্ব্বাগ্রে সেই স্থানকে যতদূর সম্ভব বিশাল করাই উচিত।" আমাদের সসীম সত্তাকে বিশ্ব-সত্তার অসীমতার মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া ভারতের প্রাচীন ধর্ম্ম,—নীতিধর্ম্ম রহস্যের বেশ একটি উদারব্যাখ্যা দিয়াছেন। জগতের একটি ক্ষুদ্র বিন্দুর উপর, আমাদের দেহ বিচরণ করিতেছে; আবার মৃত্যু আসিয়া আমাদের জীবনের দ্রুতগতি দিনগুলাকে অতি শীঘ্রই শেষ করিয়া দিতেছে। আমরা অসীম বিশ্বের সন্তান—আমরা এই সসীম জীবন-কারাগারে বদ্ধ থাকায় আমাদের প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিতেছে। আমরা অহংএর সীমাগুলাকে ভাঙ্গিতে চাই; এবং বিশ্বজগৎ হইতে জীবন লাভ করিয়া বিশ্ব-জগতেরই জন্য জীবন ধারণ করিতে চাই। ইহাই আমাদের অন্তরের আকাঙ্ক্ষা। জ্ঞানের দ্বারা, প্রেমের দ্বারা,—সমস্ত অসীম বিশ্বকে আমাদের সসীম অহংএর মধ্যে প্রবিষ্ট করাইবার জন্য একটা গভীর অভাব আমরা অনুভব করিয়া থাকি। যে চেষ্টার প্রভাবে আমারা পাশবতার গণ্ডি হইতে বাহির হইয়া, ক্রমে পাশবতার ঊর্দ্ধে উত্থিত হই, সেই চেষ্টার উপরেই নীতিধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। সকল মানুষকেই ভালবাসা, সকল প্রাণীকেই শ্রদ্ধা করা, বিজ্ঞানের দ্বারা সমস্ত সত্যকে জানিবার চেষ্টা করা, চিরপরিবর্ত্তনশীল পদার্থ সমূহের পরিবর্ত্তন-দৃশ্য শিল্পীর অনুরাগ দৃষ্টিতে দর্শন করা—ইহাই নীতিধর্ম্ম। সত্য, সুন্দর, মঙ্গলের দিকে অগ্রসর হওয়া—ইহাই নীতি ধর্ম্ম। নীতিধর্ম্ম,—বিশ্বাত্মার জ্ঞান ও প্রেমের সহিত একীভূত হইয়া অবস্থিত। সমস্তকে বুঝিতে পারা ও সমস্তকে ভালবাসা—ইহা অপেক্ষা বিশালতর আদর্শ আর দ্বিতীয় নাই।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

উইলিয়ম রদেন্‌ষ্টাইন।

মিঃ উইলিয়াম রদেনষ্টাইন ইংলণ্ডের একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী। অষ্ট্রেলিয়া আমেরিকা প্রভৃতি স্থানেও তাঁহার চিত্র সাদরে সুরক্ষিত। তিনি সম্প্রতি কলিকাতায় আগমন করেচেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁর সঙ্গে আমাদের বিশেষরূপ পরিচয় ঘটেচে। আমরা সকলেই তাঁর স্বভাবসুলভ সরল ও অকপট ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েচি! তাঁর শান্ত ও মৃদু মিষ্টালাপ বাস্তবিকই উপভোগ্য! তিনি আমাদের দেশকে যে কত ভালবাসেন তাঁর প্রত্যেক কথা থেকে তা' বোঝা যায়।

তিনি কিছুদিন পূর্ব্বে অজন্তার প্রাচীন শিল্প কীর্ত্তি দেখতে গিয়েছিলেন। রাজপুতানা বারাণসী, পুরী প্রভৃতি ভারতের দর্শন যোগ্য নানা রমণীয় স্থানেও তিনি পরিভ্রমণ করেছেন।

মিঃ উইলিয়ম রদেন্‌ষ্টাইন আমাদের দেশের শ্রীমদ্ভাগবতগীতা, পুরাণ, উপপুরাণ আর আর যাবতীয় ধর্ম্ম পুস্তকেরই ইংরাজী অনুবাদ পড়েচেন। তিনি প্রসঙ্গক্রমে বল্লেন, আশ্চর্য্যের বিষয়, আমরা পুস্তক পাঠে তোমাদের দেশের ঋষি তপস্বীদের তপজপাদির যে সব মহৎ কাল্পনিক চিত্র মনে এঁকে থাকি তোমাদেব এ দেশে সেই সকল চিত্র চোখের সম্মুখে প্রত্যক্ষ দেখতে পাই। যেখানে যাই, সেখানেই দেখি—রোমান শিল্পীর সযত্নগঠিত স্তরকুঞ্চিত বসন পরিহিত মনুষ্যমূর্ত্তি! তোমাদের বসন ভূষণ, ভাব ও ব্যবহার যেন ঠিক প্রকৃতির শোভার সঙ্গে মিশিয়ে একেবারে ছবির ভাবে গড়া! তিনি আমাদের উত্তরীয়ের সুকুঞ্চিত ভাঁজকে নির্ঝরের শিথিল জলরাশির স্তরের সঙ্গে উপমা দেন। কিছুদিন হ'ল তিনি হাই-কোর্টের কাছে কোন গাছের তলায় সবুজ ঘাসের উপর একটি লোককে নিরুদ্বেগে ঘুম'তে দেখেছিলেন। তার শোয়ার ভঙ্গীটা তাঁর এতই ভাল লেগেছিল যে, ৫ মিনিট কাল ধরে তিনি তাকে নিরীক্ষণ ক'রেও শ্রান্তবোধ করেন নি। তিনি বল্লেন,—কই এমনতর ভঙ্গীতে ইংলণ্ডে ত কাউকে কখনো শুতে দেখিনি—এ যেন ঠিক একখানি গ্রীক ছবির গঠিত মূর্ত্তি।—তিনি তাঁর স্বদেশীয় মহিলাদের 'লেস' বহুল 'আঁটা-সাঁটা' সজ্জা আদৌ পছন্দ করেন না,—বরং শিল্পীর চক্ষে তা বর্ব্বর আদর্শ বোলে মনে করেন। আমাদের দেশের শিল্প-বিদ্যার্থিদের বিলাতে শিল্প শিক্ষার জন্যে যাওয়ার তিনি একেবারেই পক্ষপাতী নন। তিনি বলেন, তোমাদের ভারতে শিল্পের উপকরণের কোনই অভাব নাই। তোমরা শিল্পের আব-হাওয়ায় বাস করচো; তোমরা ইচ্ছে করলে অতি সহজেই উৎকৃষ্ট শিল্পী হ'তে পার। তোমরা এটা জেনো যে, We have many painters in Europe but few artists—অর্থাৎ "আমাদের ইউরোপে অনেক চিত্রকর আছে বটে; কিন্তু শিল্পী খুব অল্পই।" ঠিক ঐ একইরূপ উক্তি অকপট হৃদয়া মিসেস্ হ্যারিংহাম প্রভৃতি বিলাতের কতিপয় শিল্পীর কাছে আরও অনেকবার শুনেছি। আমার বিলাত-প্রবাসী বন্ধু "লণ্ডন রয়েল কলেজ অব আর্টের" ছাত্র শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় রায় চৌধুরী বিলাত থেকে আমাকে যে

চিঠি লিখেছেন তাতেও ঠিক ঐ রকমই কথা। তিনি লিখেছেন, * * * "ভাই, এখানে আসিস্ না। আমরা মনে করি, না জানি ওরা কত জানে। আর ওরা যা ক'রে তাই বুঝি ভাল!—এই খানেই আমরা আমাদের নিজেকে হারিয়ে "হাঁ ক'রে ওদের দিকে চেয়ে থাকি! ভাই! এতদিন ত এখানে আছি, এদের "আর্ট" আমাদের প্রাণে মোটেই

উইলিয়ম রদেন্‌ষ্টাইন

শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার অঙ্কিত চিত্র হইতে

লাগে না। সত্যি বল্‌চি! এদের সব চক্‌চকানি। এখন দেখচি আমাদের ঐ আঁধারে-ছবির মধ্যে ধ্রুবতারা লুকিয়ে আছে। দেখ, এক আশ্চর্য্যের বিষয়! এদের দেশের অধিকাংশ ফুলে আদৌ গন্ধ নেই। এ পর্য্যন্ত আমি যত ফুল দেখলুম, একটীতেও গন্ধ পেলুম না।—বুঝি ছবিও সেই রকম! একেবারেই নেই কি?—তা' নয়, আছে—তবে, এখানকার 'আর্ট' physical beauty নিয়েই আছে।—তার প্রাণ নেই! জড় তনুখানি রেখে প্রাণ যেন উড়ে গেছে!" * * *

হিরণ্ময় যেমন বিলাতে শিল্পের দৈহিক (physical) সৌন্দর্য্যের উন্নতির কথা লিখেছেন, রদেন্‌ষ্টাইনও ঠিক্ সেই কথাই আমাদের বল্লেন। তিনি বল্লেন,—আমাদের দেশে (ইউরোপে) শিল্পের যে প্রধান সম্পদ ভাব তা থাক্ বা নাই থাক্ হুবহু ফোটোর মত ক'রে প্রকৃতির ছবি আঁক্‌তে পার্‌লেই শিল্পীরা সম্মানিত হন। তিনি তাঁদের পরিকল্পিত চিত্রাঙ্কনের (originl design) রীতি যা' বল্‌লেন তা'তে ভারত ও বিলাতের শিল্প পদ্ধতির পার্থক্য বেশ সুন্দর ভাবে বোঝা যায়। আমাদের দেশের রীতিতে যেমন কোন চিত্র আঁক্‌তে হ'লে প্রথমত চিত্রকর সেই চিত্রের ভাব, ধ্যানে বা মনে ঠিক করে নিয়ে—কোন কিছুর সাহায্য ব্যতিরেকে অনায়াসে স্বাধীন ভাবে চিত্র আঁকতে পারেন—এ' তা' নয়। উঁহারা চিত্রের বিষয় ভাববার পূর্ব্বে প্রথমত, কতকগুলি মানুষের বিভিন্ন ভঙ্গিতে বসা অবস্থার ছবি দেখে দেখে এঁকে নেন। পরে, ঐ ছবিগুলি একত্রে কিরূপে সাজালে সর্ব্ব সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষক বেশ একটা জমকালো চিত্র হ'তে পারে সেইটি দেখেন। এইরূপে যে ছবিটীতে মূর্ত্তি সন্নিবেশ সব চেয়ে সুন্দর দেখায় সেই রেখাঙ্কিত চিত্রটী চিত্রপটে (canvas) আঁকেন। তারপর, রং দেবার সময় একজন লোককে 'মডেল' রূপে পূর্ব্বাঙ্কিত ভিন্ন ভিন্ন লোকদের চিত্রের বেশে সাজিয়ে এবং সেই ভঙ্গিতে বারংবার বসিয়ে পুনঃপুনঃ সংশোধন ও পরিবর্ত্তন কার্য্য করে থাকেন। রদেন-ষ্টাইন বলেন, ইউরোপে সকল চিত্রকরেরাই উক্ত নিয়মে পরিকল্পিত চিত্র এঁকে থাকেন।

তিনি ভারত প্রদক্ষিণকালে নানা স্থানে যে সকল সন্ন্যাসী, ফকির প্রভৃতির রেখাঙ্কিত চিত্র এঁকেছিলেন, সেই সব চিত্র এবং বিলাতে আঁকা তাঁর স্ত্রী পুত্র প্রভৃতির চিত্রের অনেক-গুলি ফোটো আমাদের দেখালেন। ছবিতে তাঁর স্ত্রীপুত্রের পরিচ্ছদ এত সাদাসিধে, যে দেখে আশ্চর্য্য মনে হয়!—বিলাতের শ্রমজীবী পরিবারে যেমন "লেস," "ফ্রিল," প্রভৃতির বাহুল্য নেই, এও ঠিক্ সেই রকম। কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বল্‌লেন,—"আমার এই পছন্দ, এই জন্যেই আমাকে সাধারণ লোকের গালাগালি ও বিদ্রূপ সহ্য কর্‌তে হয়।"

আমরা তাঁর আঁকা ছবির যতগুলি ফোটো দেখ্‌লুম সমস্ত গুলিতেই তাঁর উদার ধর্ম্মভাব ও সরল অন্তঃকরণের ভাবটী বিশেষ ভাবে যেন ফুটে আছে। তাঁর ছবিতে আমরা বিলিতি perspective বা ছায়া আলোর (light and shade) আচার-গত অত্যাচার লক্ষ্য করলুম না।—অর্থাৎ; চিত্রের রেখা এবং ভাব নিয়েই তিনি ছবি আঁকেন। তাঁর মতে,—ব্রহ্ম যেমন এক, তেমনি শিল্পও

এক। সকল দেশের সমস্ত ভাল শিল্প জগতের সকল শিল্পের সঙ্গেই মিল্‌বে। কিন্তু, সর্ব্ব সাধারণের পক্ষে কথাটা ঠিক নয়।—জনসাধারণ চায়, চিত্র লিখিত মূর্ত্তির সুন্দর মুখ ও সুন্দর গঠন, আর শিল্পী চান্‌ মুখের সুন্দর ও কমনীয় ভাবটী এবং গঠনের সুঠাম ভঙ্গী! —সাধারণ চায়, নাট্যালয়ের সজ্জিতা রূপসী— শিল্পী চান, অন্তঃপুরের মলিনা গৃহলক্ষ্মীর অন্তর্ভাব'।

আমরা তাঁর আঁকা কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একখানি রেখাঙ্কিত প্রতিকৃতি দেখেছি। এই ছবিখানিতে রবীন্দ্রের উপাসনা কালীন মুখের এবং অঙ্গের ভক্তি-পুলকসঞ্চারিত প্রকৃতির গম্ভীর ভাবটী সুন্দররূপে ফুটে উঠেছে। ভারতীতে তাঁহার চিত্রের যে প্রতিলিপিখানি প্রকাশিত হচ্ছে এখানি "ধর্ম্মপ্রাণ য়িহুদিদের ঈশ্বর-প্রেরিত ধর্ম্ম বিধির নিকট উপাসনান্তে বিদায় সময়ের প্রার্থনা।"

তাঁর আঁকা শিশুপুত্র কোলে তাঁর সহধর্ম্মিনীর ছবিটী আমাদের অত্যন্ত ভাল লেগেছিল। তা'তে জননীর পুত্র-বাৎসল্য মধুর ভাবটী যেন মূর্ত্তিমতী হ'য়ে আছে! দুঃখের বিষয় ছবিখানি এত মৃদু রেখাপাতে আঁকা যে তার প্রতিলিপি হওয়া অসম্ভব! এখানে রদেন্‌ষ্টাইন সাহেবের যে একটী সামান্য প্রতিকৃতি দিলুম সেটী—আমাদের গভমেণ্ট শিল্প বিদ্যালয়ে তিনি যখন শিল্পগুরু পূজনীয় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের রেখাঙ্কন প্রতিকৃতি আঁক্‌ছিলেন, সেই অবকাশে আঁকা।

অনেকে হয়ত জানেন না, বিলেতে ভারতবর্ষীয় শিল্পশিক্ষার্থীদের ভারত-শিল্পের উন্নতির জন্যে সাহায্য এবং উৎসাহ দেবার ইচ্ছায় সেখানকার অনেকগুলি প্রসিদ্ধ শিল্পী-মহাত্মারা মিলে একটী শিল্প-সমিতি গঠিত করেচেন। মিঃ রদেনষ্টাইন সেই সমিতির একজন প্রধান সভ্য! এখানে হাইকোর্টের উড্রফ সাহেব, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি শিল্পোৎসাহী মহোদয়েরা Indian Society of Oriental art নামে যে একটী সমিতি গঠিত করেচেন বিলাতের উক্ত সমিতিও ঐ একই উদ্দেশ্যে স্থাপিত।

শ্রীঅসিতকুমার হালদার।

বণ্টন।

২। বেতন।

উৎপাদিত অর্থের যে অংশ শ্রমজীবিদিগকে তাহাদের পরিশ্রমের জন্য দিতে হয়, তাহাকেই বেতন বলে। বেতনও খাজনার ন্যায় কোন কোন দেশে দেশাচারের উপর কোথায়ও বা প্রতিযোগিতার উপর নির্ভর করে। ডাক্তার, কবিরাজ, ব্যারিষ্টার, উকীল প্রভৃতিকে পারিশ্রমিক বলিয়া যাহা দেওয়া হয় তাহা অনেক পরিমাণে দেশাচার নিয়ন্ত্রিত। অনেক সময় এরূপও দেখা যায় যে পুরাতন ভৃত্য বা কর্ম্মচারী অন্যত্র অধিক বেতন পাইলেও পুরাতন মনিবকে

পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চাকুরী লইতে ইচ্ছা করে না। অনেক মনিবও সুবিধা দরে বা অধিক কর্ম্মঠ ভৃত্য পাইলেও পুরাতন ভৃত্য পরিত্যাগে ইচ্ছুক হন না। সাধারণতঃ, এই সকল ক্ষেত্র ব্যতীত প্রায় অপর সকল স্থানেই প্রতিযোগিতাই বেতনের হার নির্দ্ধারণ করে। কর্ম্মকর্ত্তা শ্রমজীবী চাহেন, শ্রমজীবিগণ পরিশ্রম বিক্রয় করিতে চাহে। কর্ম্মকর্ত্তা কম বেতনে লোক রাখিবার চেষ্টা করেন এবং শ্রমজীবিগণ বেতনের হার বৃদ্ধির চেষ্টা করেন—এই দুই পক্ষের প্রতিযোগিতায় বেতনের হার নির্দ্ধারিত হয়। মনে করুন তিন জন কর্ম্মঠ এবং সমান অভিজ্ঞ চাকুরী-প্রার্থী কোন কর্ম্মকর্ত্তার নিকট কর্ম্ম প্রার্থনায় উপস্থিত। এ ক্ষেত্রে যে প্রার্থী সর্ব্বাপেক্ষা কম বেতনে কার্য্য করিতে চাহিবে কর্ম্মকর্ত্তা তাহাকেই নিযুক্ত করিবেন। একজন প্রার্থী বেশী বেতন দাবী করিলে অপর দুইজন কম বেতনে নিযুক্ত হইতে চাহিবে এবং সেইজন্য এই তিনজন প্রার্থীর প্রতিযোগিতা দ্বারা ঐ কর্ম্মের বেতন নির্দ্ধারিত হইবে। পক্ষান্তরে তিনজন কর্ম্মকর্ত্তা যদি কোন একজন শ্রমিককে নিযুক্ত করিতে চাহেন, তবে তিনজনের মধ্যে যিনি অধিক বেতন দিবার প্রস্তাব করিবেন, তিনিই এই শ্রমিককে নিযুক্ত করিতে সক্ষম হইবেন।

উপরে আমরা যে বিষয়টি বিবৃত করিলাম উহাকে অর্থনীতির ভাষায় শ্রমিকের "গ্রাহকতা" ও শ্রমিকের "সরবরাহতা" বলে। গ্রাহকতা ও সরবরাহতার উপরেই বেতনের হার নির্দ্ধারিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে বেতন লোকসংখ্যা ও মূলধনের উপর নির্ভর করে। উভয়েরই অর্থ এক। যাহারা শ্রমিকের বেতন দিতে পারেন তাহারাই শ্রমিকের গ্রাহক। শ্রমিককে যে বেতন দিতে হয় তাহা মূলধনেরই অংশ বিশেষ; সেইজন্য যাহারা শ্রমিকের পারিশ্রমিক বাবত মূলধন ব্যয় করিতে সক্ষম, তাঁহারাই কেবল গ্রাহকতা বৃদ্ধি করিতে পারেন এবং যত মূলধন এই কার্য্যে ব্যয় হইবে, ততই শ্রমিকের গ্রাহকতা বাড়িবে। সুতরাং গ্রাহকতা অর্থে "যে মূলধন শ্রমিক নিযুক্তের জন্য ব্যয় করিতে পারে"—ইহাও বলা যাইতে পারে। আবার যাহারা পরিশ্রম করিতে প্রস্তুত তাহারাই শ্রমিক সরবরাহ করিতে পারে এবং সেইজন্য অধিক শ্রমিক সরবরাহ হইলেই বুঝিতে হইবে যে এই শ্রেণীর লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই হেতু যাঁহারা বলেন যে বেতনের হার লোকসংখ্যা ও মূলধনের উপর নির্ভর করে তাঁহারা প্রকারান্তরে এই কথারই পুনরুক্তি করেন যে বেতন গ্রাহকতা ও সরবরহতার উপর নির্ভর করে। এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি, যন্ত্রাদির উৎপত্তি ও উন্নতি এবং মূলধনের রপ্তানীর জন্য অনেক দেশের বেতনের হার বৃদ্ধি হয় নাই।

বেতনের হার জনসংখ্যার উপর নির্ভর করে, এ কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। প্রথমতঃ ম্যালথাস নামক ইংলণ্ডদেশীয় জনৈক অর্থনীতিবিৎ পণ্ডিত এই প্রস্তাবটী উত্থাপন করিয়া ইহার বিচার করেন। ম্যালথাস ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে Essay on Population নামক সুলিখিত প্রবন্ধে লোকসংখ্যা অতিরিক্ত বৃদ্ধি না পায় এই সব

আলোচনা করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষ, মড়ক, যুদ্ধ প্রভৃতি লোকসংখ্যা হ্রাসের দৈব উপায়, এবং অল্প বয়সে এবং কার্য্যক্ষম না হইলে বিবাহ না করা, লোকবৃদ্ধি নিবারণের স্বেচ্ছাধীন উপায়। আমাদের দেশে প্রথমোক্ত কারণ অর্থাৎ ব্যাধি ও দুর্ভিক্ষে অনেক লোক মারা যায় সত্য কিন্তু বাল্যবিবাহে আমাদের দেশে যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে। বাল্যবিবাহের ফল স্বরূপ রুগ্ন পীড়িত সন্তান সন্ততি দ্বারা সংসারের ও দেশের যে কোন কার্য্যই হয় না, একথা আমাদের সকলেরই বিশেষরূপে প্রণিধান করা কর্ত্তব্য। (১)

ভিন্ন ভিন্ন দেশে কি কি কারণে বেতনের হারের তারতম্য হয় তাহার কারণ স্বরূপ আদম স্মিথ পাঁচটী হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রথম, ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ের প্রকৃতি অনুসারে বেতনের তারতম্য দেখা যায়। কয়লার খনিতে যে সকল মজুর কার্য্য করে, তাহারা অন্যান্য মজুরাপেক্ষা অপেক্ষাকৃত অধিক বেতন পায় কিন্তু ঐ প্রকার স্থানে কার্য্য করা কষ্টসাধ্য ও বিপজ্জনক। সেইজন্যই ঐ সব স্থানে মজুরগণ অধিক বেতন পায়। দ্বিতীয়তঃ, কোন কোন ব্যবসায়ে কৃতকার্য্য হইবার জন্য যে শিক্ষার আবশ্যক সেই শিক্ষার ব্যয়ের উপর বেতনের হার নির্দ্ধারিত হয়। বিলাতে বড় বড় ব্যবসা শিক্ষা করিতে হইলে প্রথমে কয়েকবৎসর ধরিয়া—২।৩ এমন কি ৪ বৎসরও শিক্ষানবিশী করিতে হয়। শিক্ষা শেষ হইলে অধিক বেতন পাওয়া যায়। আমাদের দেশেও দেখা যায়, উকীলকে আইন পরীক্ষা পাশ করিতে যে অর্থব্যয় করিতে হয়, মোক্তারদের সেরূপ অর্থব্যয় করিতে হয় না। সেইজন্য উকীলগণ মোক্তারদের অপেক্ষা অধিকাংশ স্থলেই অধিক অর্থ উপার্জ্জন করেন। তৃতীয়তঃ যে যে কার্য্যের স্থায়িত্ব অধিক দিন, সে সব কার্য্যে বেতনের হার কিছু কম। বারমাসই রাজমিস্ত্রীরা বা ঘরামীরা কায পায় না; অনেক সময় তাহাদের বসিয়া থাকিতে হয়। কিন্তু রাখাল বা অন্যান্য যাহারা ভৃত্যের কার্য্যে নিযুক্ত থাকে, তাহারা বার মাসই কাজ পায়; এইজন্য রাজমিস্ত্রীদের বেতনের হার সাধারণ চাকর অপেক্ষা বেশী। চতুর্থতঃ, কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তির দায়িত্বের উপর বেতন হ্রাস বৃদ্ধি হয়। যে সকল কার্য্য অধিক দায়িত্ববিশিষ্ট, সে সকল কার্য্যের বেতন বেশী। ক্যাসিয়ার, খাজাঞ্চী প্রভৃতি শ্রেণীর কর্ম্মচারীগণের বেতন অন্য কর্ম্মচারী অপেক্ষা, তুলনায় অধিক। পঞ্চম কারণ স্বরূপ আদম স্মিথ লিখিয়াছেন যে, কার্য্যে সিদ্ধিলাভের নিশ্চয়তা বা অনিশ্চয়তার উপর বেতনের ন্যূনাধিক্য যথেষ্ট নির্ভর করে। আদম স্মিথ এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, কেহ যদি জুতা

(১) অনেক ইংলণ্ডীয় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, of the children belonging to the upper and middle classes, only 20 p. c., die before the age of five. This proportion is more than doubled in the case of children belonging to the labouring classes." আমাদের দেশের সকলেরই এই সব বিষয় বিবেচনা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে। পূজ্যপাদ ডাক্তার মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও রায় যতেন্দ্রনাথ বাহাদুর প্রমুখ যে "হিন্দু বিবাহসংস্কার সমিতি" সংস্থাপিত হইয়াছে, এরূপ সমিতি দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে হওয়া বাঞ্ছনীয় ও আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

প্রস্তুত বা মেরামতের কার্য্য শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে সে ঐ কার্য্য যে শিক্ষা করিতে পারিবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ থাকে না। কিন্তু আইন, ডাক্তারী ও অন্যান্য সুকুমার বিদ্যায় শিক্ষিত কেহ কেহ অধিক উপার্জ্জন করেন, এবং কেহ কেহ অপরের তুলনায় কম উপার্জ্জন করেন। এই দুই শ্রেণী অর্থাৎ যাহারা বেশী পান ও যাহারা কম পান—ইহাদের পাওনার তারতম্যে একের বেশী পাওয়া ও অপরের কম পাওয়া এ দুটীই সমান দাঁড়ায়।(২) মিঃ ফসেট তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন যে শীত ঋতুতে ইংলণ্ডের অন্তর্গত ইয়র্কশায়ারের শ্রমজীবিগণ ১৬।১৭ শিলিং সপ্তাহে উপার্জ্জন করে কিন্তু ঠিক ঐ সময়ে একই প্রকারের কার্য্যে নিযুক্ত ডর্সেটশায়ার বা উইল্টশায়ারের শ্রমজীবীগণ ১১ কি ১২ শিলিংয়ের অধিক উপার্জ্জন করিতে পারে না। এগেট সাহেব ইহার কারণস্বরূপ লিখিয়াছেন যে ডর্সেটসায়ারের শ্রমজীবিগণের অজ্ঞতাই এই নিম্ন হারের কারণ। অশিক্ষিত বলিয়াই উহারা একস্থান হইতে নড়িয়া অন্যস্থানে অধিক বেতনেও যাইতে চাহে না। ভারতবর্ষেও বিভিন্ন প্রদেশে বেতনের হারের তারতম্য দেখা যায়। পূর্ব্ববঙ্গে বেতনের হার অধিক। যতই পশ্চিমে যাওয়া যায় ততই বেতনের হার নিম্ন। কিন্তু যে সকল জেলায় লোকসংখ্যা কম, সেই সেই স্থলে বেতনের হার বেশী। ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত বর্দ্ধমানে বেতনের হার বেশী। বিহারে বেতনের হার কম। যে সকল নগরে বা বা নগরের নিকটবর্ত্তী স্থানে কল বা ফ্যাক্টরী তথায় বেতনের হার অধিক। যে সকল স্থলে আকর বা খনির কার্য্য হইতেছে তথায়ও বেতন বেশী। কারণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, এসকল স্থলে অধিক সংখ্যক শ্রমজীবি আবশ্যক হয় এবং সেইজন্য বেতনও বেশী। ১৮৭১ হইতে ১৯০৩ সনের বঙ্গদেশে, আসামে এবং পঞ্জাব প্রদেশে বেতনের হার বেশী হইয়াছে। টাকার হিসাবে ভারতবর্ষে ১৮৭৩ হইতে ১৯০৩ সনের সাধারণ শ্রমজীবির বেতনের তালিকা আমরা প্রবন্ধের শেষভাগে যোজিত করিয়া দিলাম।*

দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেতনের হার সকল সময়েই বৃদ্ধি হয় না। ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষকালীন যখন খাদ্যদ্রব্যাদি মহার্ঘ হয়, তখন অল্প বেতনে লোক পাওয়া যায়। শস্য নষ্ট হইলে লোকের বেতন দিবার ক্ষমতা থাকে না এবং সেইজন্য শ্রমজীবীর সংখ্যা বেশী হয় এবং তাহাদের বেতনও কম হয়। আবার যখন কৃষিজাত দ্রব্যের অধিক গ্রাহকতার জন্য মূল্য বৃদ্ধি হয় তখন

(২) আদমস্মিথের এই পঞ্চম কারণ অনেকে স্বীকার করেন না। "A clergy man who is obtaining £100 a year, may feel assured that if he were engaged in some other occupation his income would be far larger; but such a man may be prompted by a high sense of duty to enter the church or he may be influenced by the social position he obtains for being in it and therefore he choose his profession independently of pecuniary consideration."

* পৃঃ ১০৩৪ দেখ।

কৃষকগণ এবং ভূম্যধিকারীগণ অধিক লাভ করে এবং সেইজন্য ঐ সময়ে বেতনের হার বৃদ্ধি হয়।

কি করিয়া শ্রমজীবীগণের বেতনের হার বৃদ্ধি করা যাইতে পারে—ইহার উপায় উদ্ভাবনের জন্য অনেকে অনেকবার চেষ্টা করিয়াছেন। কেহ কেহ আইনদ্বারা বেতনের হার নির্দ্ধারণেরও উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু এক শিক্ষার অধিক প্রচলন ব্যতীত অন্য কোন উপায়েই ইহা সম্ভবপর নহে। জাতীয় শিক্ষা যতই বিস্তৃত হইবে, ততই অন্যান্য উপকারের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমজীবীগণের বেতন বৃদ্ধি হইয়া তাহাদের প্রভূত উপকার হইবে। সর্ব্বত্রই ৮।১০ বৎসরের বালককে পাঠশালা বা স্কুল ছাড়াইয়া তাহাদের পিতামাতা তাহাদের নিজ নিজ ব্যবসায়ে লাগাইয়া দেন। ইহাতে দেশের যে কি পরিমাণ ক্ষতি হয় তাহা বর্ণনাতীত। (৩) শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দেশে চৌর্য্যাদি অপরাধও কম হইবে এবং দেশের যথেষ্ট আর্থিক উন্নতি হইবে। দেশান্তরে যাইয়া কার্য্যের চেষ্টাও শ্রমজীবীগণের বেতন বৃদ্ধির অন্য উপায়। কিন্তু ইহা বলাই বাহুল্য যে ইহাও শিক্ষার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

৩। লাভ।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে খাজনা, বেতন ও লাভ, উৎপাদিত অর্থ এই ৩ অংশে বিভক্ত হইয়া সাধারণতঃ তিনজনের ভাগে পড়ে। যাহাদের ভূমি আছে তাহারা অপরকে ভূমি ভোগ দখল করিতে দেন এবং সেইজন্য এক অংশের অধিকারী হন। এই অংশকে খাজনা বলে। যাহারা অর্থোৎপাদনের জন্য পরিশ্রম করে তাহারা তাহাদের পারিশ্রমিক স্বরূপ বেতন পায়। যাহারা মূলধন সরবরাহ করে, সেই কর্ম্মকর্ত্তাগণ যে অংশ পান তাহাকে লাভ বলে।

সঞ্চয় না করিলে মূলধন সংগ্রহ হয় না এবং মূলধনের অধিকারী ব্যয় না করিয়া যে সঞ্চয় করেন, তজ্জন্য অবশ্যই তাঁহার কিছু প্রাপ্য হয়। এই সংযম বা বীতস্পৃহতার জন্য অধিকারী যে পুরস্কার পান তাহাকেই লাভ বলে। মনে করুন, একজন কৃষক নিজের জমি ১০০৲ শত টাকার মূলধন লইয়া চাষ করিতে আরম্ভ করিল। এই মূলধন অবশ্যই শুধু কয়েকটী টাকা নয়। ইহাতে মাল মসলা, যন্ত্রাদি, শ্রমজীবীগণের বেতনের

---

(৩) "A child, who is taken from school when 8 or 9 years old rapidly forgets almost the whole of the little he has learnt. Widespread ignorance therefore, is a sure indication that a considerable proportion of the population has had inflicted upon it the manifold evils which result from premature employment. Health is sacrificed, physical vigour is diminished and strength often becomes exhausted at an age when men ought still to be in the prime of life. The mischief which thus results is not confined to the labourers themselve, the whole community suffers a severe pecuniary loss if the industrial efficency of those to whom wealth is primarily produced is impaired." Fawcet : National Education to the Remedis for Low wages.

টাকা সবই ধরিতে হইবে। (৪) চাষের পরে ঐ জমি হইতে যে অর্থ উৎপাদিত হইবে, ঐ অর্থ হইতে একশত টাকার মূলধন উদ্ধৃত রাখিয়া যাহা বাদ থাকিবে, তাহাই কৃষকের লাভ। কিন্তু এক্ষেত্রে কৃষকের মূলধনের যথেষ্ট প্রতিদান হইবে না; কৃষক নিজে ও শ্রমজীবীগণের সঙ্গে পরিশ্রম করিয়াছে অথবা তাহাদের কার্য্য তত্ত্বাবধান করিয়াছে। এই পরিশ্রম বা তত্ত্বাবধানের জন্য সেও অবশ্যই পারিশ্রমিক পাইবে এবং সেইজন্য সে যে লাভ পাইবে তাহা হইতে তাহার বেতন স্বরূপ কিছু বাদ দিতে হইবে। বিশেষতঃ প্রত্যেক কার্য্যেই অল্পবিস্তর বিপদ আছে। কৃষক তাহার জমি হইতে ফসল উৎপাদন করিবার জন্য যে মুলধন প্রয়োগ করিবে, যদি জমিতে উপযুক্ত পরিমাণ ফসল উৎপাদিত না হয় তবে মূলধন লোকসান হইবে। এই যে ভাবী বিপদ ঘাড়ে লইয়া কাজ করা, তজ্জন্য কৃষক মোট যে লাভ পাইবে তাহা হইতে এই বাবদও কিছু বাদ যাইবে। এই সমস্ত কারণে কোন ব্যক্তি তাহার ব্যবসায় বা অন্য যে কোন কার্য্যেই লিপ্ত হউক না কেন সেই কার্য্যে যে লাভ পায় তাহা তিন অংশে বিভক্ত করা হয়। প্রথম সঞ্চয় ইহাকে সাধারণ কথায় সুদ বলে। দ্বিতীয় মূলধন হানির আশঙ্কা ও তজ্জনিত ক্ষতিপূরণ। তৃতীয় তত্ত্বাবধানের বেতন। বিশদভাবে এই তিনটী আলোচনা আবশ্যক।

মনে করুন, রামমিস্ত্রী তাহার কাজের সুবিধার জন্য একটি রেঁদা প্রস্তুত করিয়াছে। শ্যাম মিস্ত্রী রেঁদার সুবিধা দেখিয়া রামের নিকট এক বৎসরের জন্য রেঁদাটি ধার চাহিল। রাম বলিল যে, "রেঁদাটী সে নিজের ব্যবহার ও সুবিধার জন্যই প্রস্তুত করিয়াছে। একবৎসরান্তে শ্যাম শুধু রেঁদাটী ফেরত দিলে রামের কোনই লাভ হইবে না।" সুতরাং বাধ্য হইয়া বৎসরান্তে একটিনূতন রেঁদা ও তৎসঙ্গে একখণ্ড তক্তা ক্ষতিপূরণস্বরূপ রামকে দিতে সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল।

বৎসরান্তে শ্যাম যখন রামকে একটি নূতন রেঁদা ও একখণ্ড তক্তা দিল; তখন রাম পুনর্ব্বার উহা ধার দিল; এই প্রকারে সে রেঁদাটী ৪ বার ধার দিয়া ৪ বারে ৪ খণ্ড তক্তা লাভ করিল। বর্ত্তমানে তাহার পুত্রও রেঁদাটী ধার দিতেছে। এই গল্প পাঠে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে এক্ষেত্রে রেঁদাটী মূলধনের প্রতিরূপ এবং তক্তাখণ্ড সুদের প্রতিরূপ। শ্যাম ধার করিয়া এবং সুদ দিয়া সুবিধা পায় তাই রেঁদাটী রামের নিকট হইতে ধার লয়—তাহার সুবিধা না হইলে সে রেঁদাটী আর ধার লইত না। এই যে সুদ ইহা সঞ্চয়ের প্রতিদান। রাম রেঁদাটী নিজে যদি ব্যবহার করিত, তবে আর সুদস্বরূপ তক্তাখণ্ড পাইত না।

প্রত্যেক দেশেই টাকা খাটানোর এরূপ উপায় আছে যাহা নিরাপদ বলিয়া বিবেচিত হয়। গভর্ণমেণ্ট কাগজের সুদের হার কম কিন্তু উহা সম্পূর্ণ নিরাপদ। এই বাবত যে

(৪) "Capital is that part of wealth which is set aside to assist future production" ভাবী অর্থোৎপাদনের জন্য অর্থের যে অংশ আলাহিদা করিয়া রাখা যায় তাহাকেই মূলধন বলে। মূলধন অর্থে শুধু টাকা নয়, গরু, মাল মসলা, যন্ত্রপাতি যাহা কিছু ভবিষ্যৎ অর্থোৎপাদনে ব্যবহৃত হয় তাহাই মূলধন।

সুদ পাওয়া যায় তাহা সঞ্চয়ের পুরস্কার। সঞ্চয় করিয়া না রাখিলে ঐ টাকার সুদ পাওয়া যাইত না। যাঁহারা এই ভাবে টাকা খাটান তাঁহাদের লাভের অংশ এই একটী মাত্র উপাদান—সুদ। ইহাদের মূলধনহানির সম্ভাবনা নাই এবং উহার জন্য কোনরূপ তত্ত্বাবধানও করিতে হয় না।

আমাদের দেশে সুদের হার অত্যন্ত বেশী। গভর্ণমেণ্টের কাগজের সুদের হার ৩॥০ টাকা কিন্তু প্রচলিত সুদের হার ২৫।৩০ টাকা এবং কখন কখন চক্রবৃদ্ধি হারে যে সুদ পড়ে তাহা একশত টাকায় দেড়শত টাকা হয়। ইহার কারণ মূলধন হানির আশঙ্কা। যে সকল ব্যবসায়ে মূলধন হানির আশঙ্কা বেশী, সেই সকল ব্যবসায়েই লাভ বেশী। এ সকল ক্ষেত্রে "চোরের দশ দিন, গৃহস্থের একদিন।" কয়লার খনির কথা ধরুন। অন্যান্য ব্যবসায়ের অংশে যেরূপ ডিভিডেণ্ট বা লাভ পাওয়া যায় কয়লার খনিতে সাধারণতঃ তদপেক্ষা বেশী লাভ পাওয়া যায়। কিন্তু এরূপ হইতে পারে যে, যে খনি হইতে প্রচুর কয়লা পাইবার সম্ভাবনা, হঠাৎ সে খনিতে আর কয়লা নাই। এইরূপ আশঙ্কার কথা থাকে বলিয়াই এই প্রকার ব্যবসায়ে মূলধন হানির আশঙ্কা ও তজ্জনিত ক্ষতিপূরণও বেশী। স্থূল লাভ হইতে প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে তত্ত্বাবধানের বেতন বলা যাইতে পারে। যে সকল কারণে বেতনের তারতম্য হয় সেই প্রকার কারণে লাভের অংশেরও তারতম্য হয়। অনেক কার্য্য পরিদর্শনে অধিকতর নৈপুণ্য এবং সহিষ্ণুতা আবশ্যক; অনেক কার্য্য তত্ত্বাবধান বিপজ্জনক। এই সকল ক্ষেত্রে এই সকল কার্য্য তত্ত্বাবধানে লাভের অংশ অপরাপর কার্য্যাপেক্ষা বেশী থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মিসেস ফসেট কসাইয়ের ও বস্ত্রবিক্রেতার কার্য্য তুলনা করিয়াছেন। ইংলণ্ডে বস্ত্র-বিক্রেতা অপেক্ষা কসাই অধিক লাভ করে। তাহার প্রথম কারণ, কসাইয়ের কার্য্য পরিদর্শন তত পছন্দসই নহে। দ্বিতীয়তঃ হঠাৎ ঋতু পরিবর্ত্তন হইলে কসাইয়ের অনেক পশু মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে। এক্ষেত্রে মূলধন বিনষ্ট হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা থাকে এবং পরিদর্শনের অসুবিধা ও মূলধন বিনষ্টের আশঙ্কার জন্য লাভের অংশ অন্যান্য ব্যবসাপেক্ষা অধিক।

লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে এবং দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইলে সুদের হার কম হয়। আমরা খাজনার বিষয় আলোচনা করিবার সময় রিকার্ডোর নিয়মের কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম। এক্ষেত্রেও ঐ নিয়ম অন্য ভাবে প্রযুজ্য হইতে পারে। পরিশ্রম ও মূলধনের পুরস্কার উৎপাদিত অর্থের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। অর্থাৎ যদি কোন কারণে সমপরিমাণ পরিশ্রম ও মূলধনপ্রয়োগ করিয়া এবং অন্যান্য বিষয় ঠিক থাকিয়া উৎপাদিত অর্থের পরিমাণ বেশী হয়, তবে বেতন ও সুদও বেশী হইবে। পক্ষান্তরে যদি কোন কারণে সমপরিমাণ পরিশ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করিয়া অল্প অর্থ উৎপাদিত হয়, তবে সুদ ও বেতন কম হইবে এক বস্তা চাউল "ধ্বংস" করিয়া যদি কো

লোক দেড়বস্তা চাউল উৎপাদন করিতে পারে, তবে তাহার পরিশ্রম ও মূলধনের সে দেড়গুণ অর্থ উৎপাদন করে। কিন্তু যদি সে সও ১½ বস্তা উৎপাদন করে, তবে বেতন এবং লাভ শতকরা ২৫ কমিয়া যায়। কর্ষণের শেষ মাত্রা যতই নামিতে থাকে অর্থাৎ যতই কম উর্ব্বর ভূমি কর্ষিত হইতে থাকে ততই বেতন ও লাভের অংশও কমিতে থাকে এবং জমির খাজনা বৃদ্ধি পায়; কেননা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে নিকৃষ্ট জমি হইতে উৎকৃষ্ট জমি যে পরিমাণ অর্থ উৎপাদন করে, সেই অধিক অর্থই হইতেছে খাজনা। রিকার্ডো সত্যই বলিয়াছেন যে যতই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায় ততই খাদ্যদ্রব্যের গ্রাহক বেশী হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অল্পোৎপাদিকা জমি কর্ষিত হইতে থাকে। আবশ্যকীয় খাদ্য সেইজন্য অধিক ব্যয়ে উৎপাদিত হয় অর্থাৎ সমপরিমাণ পরিশ্রম ও মূলধনব্যয়ে অল্প অর্থ উৎপাদিত হয় এবং সেইজন্য বেতন ও সুদের হার কম হয়।

অর্থবিৎগণ বলেন যে, লাভের রেট পরিশ্রমের ব্যয়ের উপর নির্ভর করে। শ্রমজীবীগণ যে বেতন পায় এবং তাহারা যে অর্থ উৎপাদন করে এই উভয়ের তুলনায় পরিশ্রমের ব্যয় নির্ভর করে। এইজন্য যদি পরিশ্রম অধিক ফলোৎপাদক হয়, তবে পরিশ্রমের ব্যয় কমিয়া গেল; কেন না হয় সেই পরিমাণে বেতন দিয়া অধিক অর্থ উৎপাদিত হয় অথবা অল্প বেতনে সেই পরিমাণ অর্থ উৎপাদিত হয়। পরিশ্রম অধিক ফলোৎপাদক হইলে লাভও বেশী হইবে এবং সেইজন্য শ্রমজীবীর বেতন এরূপ ক্ষেত্রে ঠিক থাকিলেও উৎপাদিত অর্থের পরিমাণ বেশী হইবে। যদি কোন উপায়ে পরিশ্রম অধিক ফলোৎপাদক হয়, তাহা হইলে শ্রমজীবিগণের বেতনের হার স্থির থাকিলে লাভের হার বৃদ্ধি হইবে। এই জন্য অর্থনীতিবিৎ মিল বলেন যে পরিশ্রমের ব্যয় ও লাভের হার তিনটী উপাদানে গঠিত (১) পরিশ্রমের কার্য্যকারিতা (২) শ্রমজীবীগণের বেতন (অর্থাৎ শ্রমজীবীগণের প্রকৃত পুরস্কার) (৩) বেশী বা কম খরচে যাহাতে এই প্রকৃত পুরস্কারের উপাদানসমূহ উৎপাদিত বা ব্যয় করা যাইতে পারে। যদি পরিশ্রমের কার্য্যকারিতা বৃদ্ধি পায় কিন্তু বেতন ও সাংসারিক খরচের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির মূল্য বেশী না হয় তবে পরিশ্রমের ব্যয় কম হয়। যদি বেতন বৃদ্ধি পায় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে পরিশ্রমের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি না পায়, তবে পরিশ্রমের ব্যয় অধিক হয়। যদি আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সস্তা হয়, তাহা হইলে বেতন কম হয় এবং কর্ম্মকর্ত্তার পরিশ্রমের ব্যয় কম পড়ে।

আমরা এই কয়েক পৃষ্ঠায় অর্থের বণ্টন সম্বন্ধীয় কয়েকটী স্থূল বিষয় আলোচনার প্রয়াস পাইয়াছি। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না। আমাদের দেশে দুর্ভাগ্যবশতঃ অর্থনীতির অধিক আলোচনা নাই। অধিক কেন—নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ বিষয়ে আমাদের সকলেরই দৃষ্টি আবশ্যক।(৬)

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

---

(৬) I am firmly convinced that we need to devote large sums to the founding of chairs of economics in our colleges "And again Let our people, as rapidly as possible be educated in the principles of economics." H. H. The Gaekwar of Baroda.

টাকার হিসাবে ভারতবর্ষে বেতনের তালিকা।

প্রদেশ	মোট— ১৮৭৩-৭৩	১৮৭৬ ৮০	১৮৮১-৫	১৮৮৬-৯০	১৮৯১-৫	১৮৯৬-১৯০	১৯০১-৩	১৮৭৩ হইতে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের বেতন বৃদ্ধির অনুপাত *
বঙ্গদেশ	৫.০-৫.৩	৫.২-৫.৭	৫.৫-৬.০	৬.০-৬.৬	৫.৮-৬.৫	৬.৩-৭.৩	৯.৫-৭.১	৩৯.৩
আসাম	৬.৫-৬.৮	৭.৭-৮.৫	৭.০-৭.৯	৬.১-৭.২	৭.১-৮.২	৮.০-৯.৪	৮.০-১০.৭	৪০.৬
যুক্ত প্রদেশ { আগ্রা	.৪.১	৪.২	৩.৮-৪.১	৪.৩-৪.৪	৪.৪-৪.৮	৩.৯-৪.৪	৪.১-৪.৭	২২.৭
যুক্ত প্রদেশ { অযোধ্যা	৩.২-৩.৪	২.৯-৩.৩	২.৮-৩.১	৩.৪	৩.২-৩.৭	২.৮-৩.৫	৩.০-৩.৭	—২.০ (কম)
পাঞ্জাব	৫.৩	৫.৮	৬.২	৬.৬	৬.৭	৭.৫	৮.০-৮.১	৪৯.৪
মাদ্রাজ	৪.০	৪.৩	৪.৩	৪.৩-৪.৬	৪.১	৪.২	৫.৩	৯.৮
বোম্বাই	৭.৫-৭.৮	৭.১-৭.৬	৭.৪-৮.১	৭.৪-৭.৮	৭.৬-৮.০	৭.১-৭.৫	৭.৬	১১.৬
মধ্যপ্রদেশ	৩.৯	৪.৩	৪.৩-৪.৪	৩.৮-৪.১	৪.২-৪.৬	৪.১	৪.৪	১২.৫
বর্ম্মা	১৬.৬-১৭.৩	১৭.২-১৯.০	১৪.৩-১৫.১	১৫.৩-১৬.৫	১৪.০-১৪.৭	১৪.৫-১৫.২	১৪.১-১৫.১	৮.৫
	৬.২-৬.৪	৬.৫-৭.০	৬.২-৬.৬	৬.৪-৬.৮	৬.৩-৬.৮	৬.৫-৭.০	৬.৭-৭.৩	২০.৬ ।

* ১৮৭৩ ও ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের প্রভেদ।

কাব্যে নিদাঘ-চিত্র।

(২)

মোটামুটি সংস্কৃতকাব্যে নিদাঘের ইতিহাসের কতকটা ছায়া পাওয়া গেল। সম্প্রতি পশ্চিমের কাব্য দেখা যাক্।

গোড়াতেই সেক্সপীয়রের মধ্যনিদাঘের স্বপ্নের কথা মনে পড়ে। এই নাট্যের লঘু কল্পনা মায়াবী ঊর্ণনাভের ন্যায় নিবিড় হাস্য সৃজন করিয়া তৃপ্ত হইয়াছে।

নাটকটির প্রাথমিক সূচনায় ট্র্যাজিডির যাবতীয় উপকরণ সজ্জিত ছিল। নারীর প্রেম, পিতার নিষেধ, প্রেমপ্রার্থীর সংখ্যাধিক্য, কন্যার প্রেমসঙ্ঘর্ষ-রজ্জুর একদিকে পিতার মৎলব, অপরদিকে ঈর্ষাকলুষিতা উপেক্ষিতা দ্বিতীয়া নারীর উত্তপ্ত চিত্ত—এ সমস্ত ষোল আনাই ছিল।

হঠাৎ কোথা হইতে নিদাঘের এক দম্‌কা স্বপ্নমাখা হাওয়ায় এসব উড়িয়া গেল। তৎক্ষণাৎ পরীরাজ্যের দাম্পত্যকলহ পাঠকের মন জুড়িয়া বসিল। তার পর অলস প্রেমপুষ্পের রসে ভালবাসারাজ্যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল! মানুষ, গর্দ্দভ, পরী, কোন পার্থক্য রহিল না! কে কাহাকে ভালবাসে হিসাব নাই—সব এলোমেলো প্যাঁচের মাঝে পড়িয়া স্বপ্নবিভোর হইয়া গেল। ইহার নিবিড় কারণ রহিয়াছে। কিন্তু তাহা আলোচনার পূর্ব্বে নিদাঘের প্রাণকথাটি একবার দেখা যাক্।

প্রেমরাজ্যের ধূর্ত্ত অধীশ্বর বসন্ত অপেক্ষা নিদাঘে কম তৃপ্ত নহে। বসন্তের মুগ্ধ অন্ধতা, রৌদ্রপীড়িতচিত্তে মত্ততায় পরিণত হয়। পাগলের ধর্ম্ম হচ্চে সে সব দিক্ সামলাইয়া চলিতে পারে না, হিসাব কেতাবে যথেষ্ট ভুল হইয়া যায়; একটা ঠিক করিতে গেলে আরও পাঁচটা ভুল হইয়া বসে। আতপ-ক্লান্ত মানবের গ্রীষ্মঋতুতে সহজেই কার্য্যকারণের শৃঙ্খলটি সব দিক বাঁচাইয়া চলিবার উৎসাহ থাকে না। বিলাত এজন্যই একালে লোককে বোকা বলিবার সুযোগ খুঁজিয়া April Fool সৃষ্টি করিয়াছে।

ক্ষুদ্র প্রেমসম্রাটটি এজন্য এই ঋতুতে অনুরাগমূলক নানা কৌতুক সৃজন করিয়া উল্লসিত হয়। বসন্তের মিলন প্রকৃতির সহজ মিলন;—গ্রীষ্মেও মিলন আছে—কিন্তু কাহার সহিত কে সম্মিলিত হইতেছে উষ্ণ স্বপ্ন-উত্তেজিত চিত্ত তাহা ঠাহর করিতে পারে না। এজন্য "কিউপিড্" বসন্তসহায় না হইয়া, নিদাঘের অতিরিক্ত উত্তেজিত হৃদয়ের ভিতর তাহার কারিগরী ও নষ্টামীর যেন বিশেষ সুযোগ পায়। কারণ বসন্তে অসম্বদ্ধ, অসংযুক্ত, প্রকৃতিবিরুদ্ধ ব্যাপারের সঙ্গম সম্ভব নহে—তাহা বসন্তের ধর্ম্ম নহে। কিন্তু নিদাঘের হৃদয়সাহারায় মরীচিকারূপে বসন্তের যাবতীয় স্বপ্নস্মৃতি ছুটাছুটি করে,—কিন্তু হায়, তাহা বালুকারাশির অলীক সৃষ্টি—তাহার সহিত সামাজিকতা সম্ভব নহে। যে তাহার পশ্চাতে ছোটে সে পাগল কিম্বা বোকা। নিদাঘে বসন্তের ছায়া অন্তর্হিত হইয়া যায় না—কিন্তু দেশে একটু অতিরিক্ত উষ্ণতা, এবং ইউরোপে খররৌদ্রের কাঙ্ক্ষিত মাদকতা মস্তিষ্কের সন্ধিস্থল হইতে কোন্ প্যাঁচ খুলিয়া ফেলে। তাহাতে ব্যক্তি

বিশেষকে কৃপার পাত্র করিয়া তোলে। ফলে নানারূপ হাস্যের উপকরণ লইয়া কবিগণ নিদাঘের রহস্য কাব্য-স্বপ্ন গ্রথিত করেন।

বটম্ গর্দ্দভের সহিত মানুষের বা পরীর মিলন ব্যাপারে মূর্চ্ছিত হইবার কোন কারণ দেখা যায় না। কারণ কবি বলেন, প্রেমের দেবতা হিসাবকেতাব খুলিয়া বিচার করে না। নরগর্দ্দভরূপী অবতার Bottom কেন, একেবারে নিখুঁত গর্দ্দভের সহিতও সুন্দরী Titania রাণীর গ্রীষ্মপীড়িত মস্তক যুক্ত হইতে পারিত।

অপরশ্রেণীর মিলন অভাবাত্মক। কালিদাস গ্রীষ্মঋতুকে সংহরণ করিয়া কাব্যে এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন গ্রথিত করিয়াছেন।

মিলন যে কেবল প্রেমের ভিতর দিয়াই সম্ভব, তাহা ঠিক নহে। অভাবাত্মক দিক্ হইতেও তাহা সংঘটিত হয়। জিঘাংসা, নিষ্ঠুরতার অভাব হইতেও যেমন মিলন সম্ভব ভাবাত্মক দিক হইতেও তেমনি ঘটে।

ঋতুসংহারে কালিদাস হিংস্রপশুগণের মাঝে দিবালোকে যে অপূর্ব্ব মিলন সম্ভব করিয়াছেন তাহা অভাবাত্মক। তাহা হিংস্রতার অভাবসঞ্জাত—প্রত্যক্ষ প্রেমের আকর্ষণমূলক নহে। ইহার মাঝেও একটি বিশেষ উপভোগ্য নিবিড় হাস্য লুক্কায়িত আছে। সিংহকে ছায়াসিংহে পরিণত করা, খাদ্যের উপস্থিতি সত্বেও খাদকের স্পন্দনহীন ব্যর্থতা যেন দুর্ব্বল প্রাণীজগৎ হইতে একটি অট্টহাস্য, বিদ্রূপরাগিণী—অরণ্যময় ছুটাইয়া দেয়। দম্ভ—স্খলিতগতি, শক্তি—আশ্রয়হীন, রোষ ঔদাস্যে পরিণত হয়।

যাহাই হোক্ না কেন দৃশ্যটি যথার্থতঃ সুন্দর। বিপরীত ধর্ম্মীগণকে অভিন্ন বেদীতে আহ্বান ব্যাপারটিই দুরূহ। মানুষের মাঝে নানা কবি Utopia কল্পনা করিয়াছে কিন্তু আরণ্যজগৎ তাহাদের সঙ্কীর্ণ চিত্তের পরিসরে স্থান পায় নাই। ভারতীয় চিত্তে, মানব কেন, যাবদীয় প্রাণী ও অপ্রাণী রাজ্যের স্থান আছে—এজন্য কল্পনার লীলায় তাহাদেরও নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে।

কেবল কবির পক্ষেই এই অভিনব মিলন-মন্ত্র ধ্বনিত করা সম্ভব। তাহার অঘটন ঘটন পটীয়সী ছায়াতুলিকা দ্বারা সৃষ্টির নিয়ম বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়—ইহাতে কবিরও আনন্দ-আমাদেরও নিতান্ত কম নহে। কলিযুগে বিশ্বকর্ম্মার ন্যায় কবিই এই ললিত রাজ্য সৃজন করেন।

এই খানেই কাব্যকলা বা আর্ট স্বভাবকে অতিক্রম করিয়া উচ্চতর রাজ্যে অগ্রসর হয়। চিত্তের সুন্দরমুখী বৃত্তি যতদিন বর্ত্তমান থাকিবে ততদিন এই রাজ্যের উত্তরোত্তর বিস্তৃতি হইবে।

নানা দার্শনিক, নানা পন্থায় হিংসা নির্ম্মুক্ত এই মঙ্গলপথের ধ্যান করিয়াছেন। ইহারই ছবি পীড়িত ধরার মুক্তির জন্য দ্বারে দ্বারে বিবৃত করিয়াছে!

একটি পলকে এই মহাদৃশ্যটি দেখান সম্ভব হইলে তাহার প্রলোভন সম্বরণ নিষ্প্র-য়োজন! এই জন্য সংস্কৃত কবি নিদাঘকে শুভলগ্নে এই পথে স্বাগত সম্ভাষণ করিয়াছেন। ভারতের কবি এই মিলনে আনন্দ অনুভব করিয়াছেন। ব্যাপারটি কাব্যের দিক হইতে বা কল্পনার দিক্ হইতে অসত্যও নহে। দেশ

কাল নিমিত্তের মৌলিক ধর্ম্ম অনাহত থাকিলেও সাময়িক শৃঙ্খলার বন্ধন সৌন্দর্য্যের খাতিরে অনেক সময় ছাড়িতে হয়। সৌন্দর্য্য সৃষ্টির গোড়াকার কথাও অনেকটা তাহাই; নতুবা কল্পনার ফানুষগুলি দেশকালের মাধ্যাকর্ষণ অতিক্রম করিয়া অন্তরীক্ষে ছুটিতে পারিত না।

ঋতুমাল্যে গ্রীষ্মের স্থানটি বড়ই রহস্যময়। সদ্য অন্তর্হিত বসন্তের স্বপ্নস্মৃতি চম্পক গন্ধের ন্যায় গ্রীষ্মের মসৃণিনদেহের শিরায় উপশিরায় সঞ্চারিত হয়! অপরদিকে মনোজ্ঞ, লোভনীয় বর্ষাঋতুর নিবিড় বেদনা ও ভবিষ্যতের দূর ক্ষেত্র হইতে হৃদয় পল্বলে আনন্দছায়া নিক্ষেপ করে।

এই উভয় ঋতুর সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া নিদাঘ অনাদিকাল হইতে উভয়ের বৈচিত্র্য ও সজ্জা বিধান করিয়াছে। রক্ত পুষ্পাভরণ বসন্ত ও ও কুন্দ-শিরিষ, মাধবী-কদম্বে সজ্জিত বর্ষা—উভয়ই গ্রীষ্মের সান্নিধ্যে পরম উপভোগ্য হইয়াছে।

পশ্চিম দেশের কবিরাও সেক্ষপীয়রের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া গ্রীষ্ম কাব্যকে সুদর্শন করিয়া তুলিয়াছে। কিট্‌স্ "মানব ঋতু বা Human Seasons নামক কবিতায় গ্রীষ্মের ধর্ম্মটি বড় সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন।—

"He has his summer ; when luxuriously
Spring's honeyed end of youthful
thought, he loves
To ruminate and by snch dreaming high
Is nearest unto heaven"

মহিলা কবি এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং গ্রীষ্মবিদায় ও হেমন্তের আগমন উপলক্ষ্যে যে কবিতাটি রচনা করিয়াছেন তাহাতে নিদাঘের আর একটা দিক্ দেখি। গ্রীষ্মোপভোগের পর সমাগত তুষারশীতল হেমন্তে গ্রীষ্মের স্মৃতিটি বাস্তবিকই অনির্ব্বচনীয় বোধ হয়—বিশেষতঃ শৈত্যের লীলাভূমির অধিবাসীগণের পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক। আমরাও শীতের উপদ্রবে গ্রীষ্মের উপভোগ্য উষ্ণতা যে কামনা করিনা এমন নহে।

" The summer sun is faint on them
The summer flowers depart ;
Sit still—as all transformed to stone
Except your musing heart.
How there you sat in summer time
May yet be in your mind
And how you heard the green wood sing
Beneath the freshening wind?"

কোকিল-কবি শেলির তুলিকায় গ্রীষ্মের আনন্দহিল্লোল চিত্রিত হইয়াছে। নিদাঘের এই আনন্দমর্ম্মর, পশ্চিমের সর্ব্বত্র শোনা যায়—তাহাতে পৌরস্ত্য উগ্রতা নাই—নিদাঘের প্রাণরসে যেন লোকালয় সঞ্জীবিত হইয়া উঠে :—

All things rejoiced beneath the sun
the weeds
The river the cornfields and the reeds
The willow leaves that glanced in the
light breeze
And the firm foliage of the larger trees !

পূর্ব্বদেশীয় উপাখ্যানমূলক কাব্য Lalla Rook প্রণেতা আইরিষ্ কবি মুর্ প্রণীত নিদাঘোৎসব বা Summer Fete নামক কাব্যটি বড়ই রমণীয়। নিদাঘের উদ্দাম কল্পনার উচ্ছ্বাস তাহাতে পাওয়া যায়।

তাঁহার "Irish melodies নামক কাব্যেও এতৎসম্বন্ধে উপভোগ্য কবিতা আছে।

স্কচ্ কবি বার্ণসের নিদাঘসঙ্গীতটি কি সুন্দর!

"Summer's a pleasant time
Flowers of every colour
The water rins over the heugh
And I long for my true lover
Aye waukin O
Waukin still and wearie
Sleep I can get nane
For thinking of my dearie."

Dearie যদি এ দেশেও গরমে ছট্‌ফট করিবার সময় উৎপাত আরম্ভ করে, তবে গ্রীষ্মের রুদ্রত্ব কিছু উৎকট হইবে সন্দেহ নাই।

বাংলা সাহিত্যে নিদাঘের কথা নীড়ভ্রষ্ট ভ্রমর গুঞ্জনের ন্যায় লেখকের কর্ণে বাজিতেছে। বৈষ্ণব কবির—

বৈশাখ মাস বাদ বিধি সাধল
পিককুল পঞ্চম গান।
দারুণ দখিন পবন নাহি ভায়ত
ঝুরি ঝুরি না রহু পরাণ।
জৈঠ হি মিঠ কহত সব রঙ্গিনী
চন্দন চান্দনী রাতি।
শীতল পবন মোহে নাহি ভায়ত
দারুণ মনমথ সাথী।

বৈষ্ণব কবির অন্তর্গূঢ় বেদনা ও কারুণ্যের সুর অজেয়। সংস্কৃত কবিদের গ্রীষ্মপীড়া বাংলা দেশে একেবারে জ্বরে পরিণত হইয়াছে—জ্বরের সহিত বাঙ্গালীর ঘন-নিষ্টের ফল যে ইহা নহে কে বলিবে? উঁহাদের ধন্বন্তরি বলিতেছে:—

"শিরে শিরশূল পীড়িতির জ্বর
হয় থাকে যে রোগীর
বচন না চলে আঁখি নাহি মেলে
তাহারে পিয়াই নীর!"

ধন্বন্তরী জ্বর পরীক্ষা করিল:—

বাম হাত ধরি অঙ্গুলি যে
দেখে ধাতু কিবা বয়।
পীরিতের জ্বরে জরেছে ইহা
পরাণ রয় কিনা রয়।

বিদ্যাপতির বিরহজ্বরে ধূর্ত্ত ডাক্তারের প্রয়োজন হয় নাই। শীতল সলিল এবং চন্দনপঙ্ক প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে:—

শীতল সলিল কমলদল লেপহি
লেপহু চন্দনপঙ্কা।
সো সব যতহু আনল সব হোয়ল
দশগুণ দহই মৃগঙ্কা।

বর্ত্তমান যুগের জটিল বহুমুখী চিত্তচর্চ্চার কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্যনিদাঘের মায়াতরঙ্গগুলি আশ্চর্য্য নিপুণতার সহিত উপলব্ধি করিয়াছেন। ইহাতে বাঁধা রাগিণীর চাপল্য ও শীর্ণতা নাই, রসময়ী নিদাঘলক্ষ্মীর রুদ্র চেহারার মাঝে লুক্কায়িত উৎসটি মুক্তালোক রাজপথে তৃষ্ণার্ত্ত নরনারীর হৃদ্‌বহ্নি নিবাইতেছে।

"খেয়া"য় মুদ্রিত তাঁহার এ সম্বন্ধে শেষ কবিতাটি হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি:—

"তপ্ত হাওয়া দিয়েছে আজ
আমলা গাছের কচি পাতায়।
কোথা থেকে ক্ষণে ক্ষণে
নিমের ফুলে গন্ধে মাতায়।
কেও কোথা নেই মাঠের পরে
কেও কোথা নেই শূন্য ঘরে
আজ দুপুরে আকাশ তলে
রিমি ঝিমি নূপুর বাজে।

বারে বারে ঘুরে ঘুরে
মৌমাছিদের গুঞ্জ সুরে
কার চরণের নৃত্য যেন
ফিরে আমার বুকের মাঝে
রক্তে আমার তালে তালে
রিমিঝিমি নূপুর বাজে।"

নিদাঘলক্ষ্মীর এই অমূর্ত্ত অলসমধুর নিস্তব্ধ মধ্যাহ্ন নৃত্য আর কোথায়ও পাই নাই। আমরা যেন ছন্দের মাঝেই নূপুর শিঞ্জন শুনিতে পাইতেছি।

শ্রীযামিনীকান্ত সেন, বি-এল।

সার্থক দান।

এ সংসারে সবার সাথে অনেক কথা কই
একটি কথা আছে তোমার তরে,
নয়নপাতে নীরবে কত অশ্রুবোঝা বই
তোমার লাগি একটি ফোঁটা ঝরে।
কত না সুরে গাহি যে কত গান
কত বেদনা কত যে অভিমান,
তাহার মাঝে একটি সুর ক্ষণে ক্ষণে বাজে
সে সুর শুধু তোমায় খুঁজে মরে।
আশার কত কুসুম মনে ফুটায়ে তুলি নিতি
একটি আছে তোমার পদতলে,
কত বাসনা প্রদীপে মোর উজলি উঠে প্রীতি
একটি দীপে আরতি শিখা জ্বলে।

কত না রসে হৃদয় উঠে ভরি
প্রকাশে রূপে নব মূরতি ধরি
একটি রূপ রাঙিয়া রহে সে যে তোমার রঙে
একটি মণি ললাটে শুধু ঝলে।
আঁধার পটে কত কত না তারা ফোটে নিবিড় রাতে
সেথায় একা তুমি জোছনা ধারা,
আলো আঁধার মিলেছে যেথা উষার আঁখিপাতে
সেথায় তুমি জাগিছ শুকতারা।
কত ভাবনা নামে হৃদয়তীরে
একটি থাকে চরণ তব ঘিরে
জাগরণে জাগিয়া ছোটে কর্ম্মধারা কত
একটি হ'য়ে তোমাতে হয় হারা।

শ্রীদীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গান।

এই বাসন্তী বাতাসের মতন
প্রাণ কেন মোর হয় না;
কেন এপার হ'তে ওপার সোজা
ভুবন ভরি বয় না?
এই মনোবনের পুষ্পগাছে
যা কিছু মোর গন্ধ আছে,
সবার কাছে বিলিয়ে দিবার
ভার কেন সে লয় না!

ধনীর যেথা বিরাম ভবন
ভক্ত যেথায় পূজে,
দুঃখী যেথা বিছায় শয়ন
প্রণয়ী প্রেম খুঁজে,—
সেই সবার সেবার সেবক হয়ে
সকল কেন রয় না!
কেন উদারতায় উদাস হয়ে
সকল বাধা সয় না!

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

সমালোচনা।

নদীয়া-কাহিনী। শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ মল্লিক প্রণীত। প্রকাশক, গ্রন্থকার, সাহিত্য সভা। গ্রে ষ্ট্রীট কলিকাতা। ওলিম্পিয়ান প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দুই টাকা বারো আনা। প্রবীণ সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় মুখবন্ধ লিখিয়া দিয়াছেন। গ্রন্থখানিতে নদীয়ার রাজনীতি, সমাজনীতি, প্রাচীন ইতিকথা, প্রভৃতি বিবৃত হইয়াছে। আগাগোড়া একটা সুশৃঙ্খল ধারাবাহিকতা না থাকিলেও বহু তথ্যের সমাবেশে গ্রন্থকারের অনুসন্ধিৎসার পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষায় যেন একটি প্রবাহ নাই, তাহারই ফলে এই সুদীর্ঘ গ্রন্থ স্থানে স্থানে একঘেয়ে হইয়া পড়িয়াছে। এ সকল সামান্য ত্রুটি সত্বেও রত্নসঙ্কলনের জন্য গ্রন্থকার বঙ্গবাসী মাত্রেরই নিকট উৎসাহ ও কৃতজ্ঞতা লাভের যোগ্য। গ্রন্থের ছাপা বাঁধাই কাগজ বেশ পরিপাটি হইয়াছে।

সহজ সংস্কৃত শিক্ষা। প্রথম ভাগ। শ্রীযুক্ত বনমালী বেদান্ততীর্থ এম, এ প্রণীত। ভট্টাচার্য্য এণ্ড সনস্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। উইলকিন্স প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য নয় আনা মাত্র। সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার পক্ষে এই গ্রন্থখানি বিশেষ সহায়তা করিবে। এমন সহজ ও সরলভাবে গ্রন্থখানি লিখিত যে শিক্ষার্থী অনায়াসেই সকল তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবেন, শিক্ষকের সাহায্যের প্রয়োজন হইবে না। ছাপা কাগজ ভাল।

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবন বৃত্তান্ত। শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী কর প্রণীত। ভারত-মহিলা প্রেসে মুদ্রিত। ঢাকা। মূল্য দেড় টাকা; কাপড়ে বাঁধাই সাতসিকা। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। বেশ সরল প্রাঞ্জল ভাষায় সাধু-চরিত্রটি বর্ণিত হইয়াছে। কোথাও অনাবশ্যক টীকা-টিপ্পনী নাই, গোঁড়ামি নাই। এরূপ গ্রন্থপাঠে মনুষ্যত্বের বিকাশ-সাধন হয়, হৃদয় পবিত্র মন উন্নত হয়। গ্রন্থের ছাপা কাগজ ও বাঁধাই সুন্দর হইয়াছে।

বঙ্গের কবিতা। প্রথমভাগ। শ্রীযুক্ত অনাথকৃষ্ণ দেব প্রণীত। কলিকাতা সাহিত্য সভা হইতে প্রকাশিত। জুনো প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। প্রাচীন কাব্যসাহিত্যের আলোচনাই এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার উদ্দেশ্য। রচনাটি আগাগোড়া স্কুলের ছাঁচে ঢালা। বিশেষত্ব দেখিলাম না।

বৈজ্ঞানিক পাকপ্রণালী। ডাক্তার শ্রীযুক্ত ইন্দুমাধব মল্লিক এম, এ, এম, ডি, প্রণীত। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দুই আনা মাত্র। গ্রন্থকার অল্পের মধ্যে খাদ্যবিচার খাদ্যপাক প্রভৃতির বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিয়াছেন। কোন্ খাদ্যের কি গুণ, আমাদের সংসারের নিত্য অপব্যয়ের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা এবং তাঁহার নবাবিষ্কৃত 'ইকনমিক্ কুকার' নামক যন্ত্রের সাহায্যে রন্ধন করিলে কিরূপ সুবিধা হইতে পারে তাহাও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থকার বলেন তাঁহার আবিষ্কৃত যন্ত্রের সাহায্যে রাঁধিলে অনেক সস্তায় অর্দ্ধেক খরচে খাওয়া চলে। ভাতের ফেন ফেলিতে হয় না, কুঁড়া বাদ দিতে হয় না। কমদামী আ-ছাঁটা মোটা চাউল বাষ্পে বেশ গলে বলিয়া তাহারও ব্যবহার চলে। জ্বালানি খরচও অনেক কম। ভাত সুসিদ্ধ হয়। বাষ্পে রন্ধনে পুড়িয়া বা ধরিয়া যাইবার ভয় নাই—রাঁধিতে রাঁধিতে বিদেশে যাওয়া চলে। কয়লার মত হাতে কালি নাই, ধোঁয়া নাই, দুর্গন্ধ নাই ইত্যাদি সকলেরই একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

শ্রীশ্রীফলাহারতত্ত্বম্। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জগবন্ধু বিদ্যাবিনোদ সঙ্কলিতম্। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র কবিকুসুমেন বঙ্গানুদিতম্। যশোহর মূল্য দুই আনা মাত্র। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি মহৎ চিত্র হিসাবে মন্দ নহে। ফলাহার সম্বন্ধে নানাবি

কৌতুক কবিতা সংস্কৃতে ও তাহার মর্ম্ম বাঙ্গালা পয়ার ছন্দে গ্রথিত হইয়াছে। বাঙ্গালা কবিতার টুকরা-গুলিতে মূলের সৌন্দর্য্য রক্ষিত হয় নাই। রসিকতাটুকু তেমন ধারাল নহে।

The Present State of Sanskrit Learning in Bengal. Vanamali Chakravarti, M. A. Published by Bhattacharya & Sons. College Street. Price Eight Annas. 1910 এ দেশে সংস্কৃত শিক্ষার ক্ষেত্র সম্বন্ধে লেখক আলোচনা করিয়াছেন। লেখকের মতে টোলের শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রদ ও কার্য্যকরী। আলোচনাটুকু উপভোগ্য।

আরবজাতির ইতিহাস। (প্রথম খণ্ড) শেখ রেয়াজ উদ্দীন আহমদ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। প্রকাশক-মফিজ উদ্দীন আহমদ, দলগ্রাম, তুষভাণ্ডার। রংপুর। মূল্য দেড় টাকা। গ্রন্থখানি স্বনামধন্য আমীর আলি রচিত History of the Saracens গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। অনুবাদের ভাষা সর্ব্বত্র সরল ও প্রাঞ্জল না হইলেও গ্রন্থখানি বঙ্গসাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিবে। অনুবাদে মূলের ভাব সর্ব্বত্র বজায় রাখা দুরূহ ব্যাপার—সৌন্দর্য্যহানি হইবার পক্ষে যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। যতদূর দেখিলাম, অনুবাদক মূলের ভাব, তথাপি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। অনুবাদক মহাশয় সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র। এ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড যন্ত্রস্থ। গ্রন্থের ছাপা ও কাগজ ভালো।

শাহাজলাল। শ্রীযুক্ত রজনীরঞ্জন দেব, বি, এ, প্রণীত। প্রকাশক শ্রীশশিভূষণ দাস, শিক্ষক, রাজা গিরীশচন্দ্র হাইস্কুল, শ্রীহট্ট। মূল্য ছয় আনা। 'হজরত শাহাজলাল কোন সময়ে শ্রীহট্টে আগমন করেন' তাহা লইয়া বিস্তর মতভেদ আছে, গ্রন্থকার বিভিন্ন মতাদির সমালোচনা করিয়া যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহাই পুস্তিকাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন। গ্রন্থকার শিলালিপি ও অনেক প্রাচীন ইতিহাসের সাহায্যে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, "শাহাজলাল ১৩৫৪ খৃঃ অব্দে শ্রীহট্ট আগমন করেন।" গ্রন্থখানি মন্দ লাগিল না।

ঊষা। শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। গুপ্ত প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য বার আনা মাত্র। এখানি উপন্যাস। কালাপাহাড়, সুলেমান, মুকুন্দদেব প্রভৃতির চরিত্রচিত্রণই লেখকের উদ্দেশ্য—তথাপি লেখকের কথায় ইহা 'ঐতিহাসিক উপন্যাস নহে।' লেখকের ভাষাটুকু মন্দ নহে,—স্বচ্ছ ও সরল। তবে উপন্যাসে কোন আর্ট নাই। লিপিকুশলতারও একান্ত অভাব।

নবযুগের সাধনা। শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন বি, এ প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ দত্ত, লোটাস লাইব্রেরী, ৫০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা মাত্র। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। লেখকের মতে "একদিন ধর্ম্মে ধর্ম্মে অনেক বিরোধ অনেক সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। * * * উহা মানবজাতির শৈশবের চপলতা মাত্র। এখন * * এই বিদ্বেষ ও সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতাকে বালকসুলভ চপলতা ও অজ্ঞানতার ফল বলিয়া চিন্তা করিতে হইবে।" এই বিশ্বধর্ম্ম-মহামিলনের প্রতিষ্ঠাকল্পে শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রয়াস ও উদ্যম অপরিসীম। 'দেবালয়'-প্রতিষ্ঠাতেই তাহার পূর্ণ পরিচয়। বর্ত্তমান গ্রন্থে শশিপদবাবুর সাধু-জীবনী-প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। লেখকের ভাষা বেশ সরল, গম্ভীর ও উপভোগ্য।

কবি রবীন্দ্রনাথের ঋষিত্ব। শ্রীযুক্ত ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য দুই আনা মাত্র। 'দেবালয়ে'র একটি অধিবেশনে এই প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল তাহাই পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এখানি কবিবর রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য' খেয়া' ও 'গীতাঞ্জলি'—কাব্যগ্রন্থত্রয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা। লেখক বক্তব্যটুকু ভালো করিয়া গুছাইয়া বলিতে পারেন নাই—অনেক স্থলেই জটিল রহিয়া গিয়াছে—ভাষা ভালো।

THE HERALD. Edited by Krishna Charan Ghosh, Vedanta Chintamani. January 1911. Annual Subscription Rs. 6. Office 64/1 Sukeas Street Calcutta. এখানি সচিত্র ইংরাজী মাসিক পত্রিকা। বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রবন্ধ কবিতা ও গল্পে অনেকগুলি বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হরিনাথ দে তিব্বতীয় ভাষায় লিখিত "ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসের" ও কুমার মিত্র চীনা হইতে ইংরাজী অনুবাদ করিয়া যে দুইটি সন্দর্ভ রচনা করিয়াছেন, তাহা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইলের ইংরাজী অনুবাদ বেশ হইতেছে। "ব্রহ্মসূত্র শঙ্কর-ভাষ্যমে"র অনুবাদ প্রকাশিত হইতেছে। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ রচিত "আত্মহত্যা" গল্পটি নিতান্তই উদ্ভট। বর্ত্তমান্ সংখ্যায় অনেকগুলি সুন্দর চিত্র আছে। পত্রিকা খানিতে প্রবন্ধ বৈচিত্র্যের একটু অভাব লক্ষিত হইল। কেবলই প্রাচীন ইতিহাসের প্রসঙ্গ—একটু 'একঘেয়ে" মনে হয়। যাহা হউক, এ সামান্য ত্রুটি, ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। আমরা সর্ব্বাঃন্তকরণে পত্রিকাখানির উন্নতি ও দীর্ঘজীবন কামনা করি। কাগজ কভার ছাপা চমৎকার হইয়াছে। সমালোচক।

মরণ-রহস্য। শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি,এল প্রণীত। কলিকাতা ইণ্টারন্যাশান্যাল কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মেটকাফ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা।

গ্রন্থকার এই পুস্তকে মরণ কাহাকে বলে এবং মরণের পর আমাদের গতি কি হয় ইহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথমেই গীতার মত উদ্ধৃত করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন 'আমি' আত্মা—অজর, অমর—সুতরাং 'আমি' মরিতে পারি না। তাহার পর, তিনি চার্ব্বাকের মত বিশ্লেষণ করিয়া তাহার খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার যুক্তি যে দার্শনিক হইয়াছে তাহা আমরা বলিতে পারি না। গ্রন্থকার বেদান্তদর্শন লইয়াও একটু বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি "ব্যতিরেকস্তদ্ভাবাভাবিত্বান্নতূপলব্ধিবৎ" সূত্রের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা আমাদের নিকট বেশ সন্তোষজনক বোধ হইল না। এখানে 'উপলব্ধি' শব্দের অর্থ কি—ইহা কি Mill ও Bainএর 'Bundle of sensations.'? আমাদের বোধ হইল গ্রন্থকার ইহার এইরূপ অর্থই লইয়াছেন—তাহা যদি হয় তাহা হইলে বাহ্য জগতেরই অস্তিত্বই ত প্রতিপন্ন হইল। মরণের পর আমাদের কিরূপ অবস্থায় থাকিতে হইবে গ্রন্থকার তাহা 'বিশদ'রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ণনা এত 'বিশদ' হইয়াছে যে তাহা পড়িতে পড়িতে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হয়। হইতে পারে যে ইহাতে গ্রন্থকারের দৃঢ় বিশ্বাস আছে—কিন্তু একখানি দার্শনিক গ্রন্থে কোনও যুক্তি তর্কের অবতারণা না করিয়া—এরূপ dogmatically একটা মত লিখিয়া যাওয়া কোনমতেই সমীচীন নহে। ভূত প্রেতের সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা আমরা পাঠকবর্গকে না শুনাইয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। "এ দেহ ছাড়িয়া যখন আমরা আকাশে বা বায়ুস্তরে থাকি, তখনই আমরা ভূত প্রেত হই", "কোন কোন ভূতপ্রেত যে আমাদিগকে বিভীষিকা দেখায়, তাহা মিথ্যা নহে।" ভূতপ্রেত সম্বন্ধে এরূপ মৌলিক দার্শনিক ব্যাখ্যা বড় একটা শুনা যায় না 'দেবযান' ও পিতৃযানের বিবরণে এবং চন্দ্রলোকে 'অভিযানেও' যথেষ্ট মৌলিকত্ব আছে। গ্রন্থকারের মনে রাখা উচিত ছিল যে তিনি বিংশ শতাব্দীতে গ্রন্থ লিখিতেছেন। এই বর্ত্তমান যুগে উদ্ভট কল্পনা-প্রসূত প্রলাপবাণী অপেক্ষা বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্বের অধিক আদর, তা প্রতিষ্ঠাপন্ন গ্রন্থকারকে স্মরণ করাইয়া দিতে লজ্জা ও ক্ষোভ হয়। উপসংহারে বক্তব্য, গ্রন্থকার আচার্য্যের মত মরণভয়গ্রস্ত বিশ্ববাসীর নিকট এক অমৃত বাণীর আশ্বাস লইয়া আসিয়াছেন—কিন্তু অ বিড়ম্বনায় তাঁহার সে আশ্বাস বাতাসেই মিলাই যায়—কাহাকেও অভয়দান করে না।

লক্ষ্মণ সেন।

লক্ষণ সেনের রাজত্ব তিরভুক্তি বা ত্রিহুত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিরভুক্তি কোন দেশ? সীতাদেবীর যে দেশে জন্ম, নির্ম্মলা বাগ্বতী বা বাগ্মতী যথায় প্রবাহিতা, যে দেশে মীমাংসা, ন্যায় ও বেদাধ্যায়নপটু বটুগণের বাস, ভূদেব যথায় পৃথিবী শাসন করিয়াছেন, ভৈরব যথায় বিরাজমান এবং গঙ্গা যাহার সন্নিকটে সেই দেশই তীরভুক্তি; যথা—

যাতা সা যত্র সীতা সরিদ্‌মালা জলা
বাগ্বতী যত্র পুণ্যা
যত্রাস্তে সন্নিধানা শূর নগর নদী
ভৈরবো যত্র লিঙ্গম্‌॥
মীমাংসান্যায় বেদাধ্যয়ন পটুতবৈঃ
পণ্ডিতৈঃ মণ্ডিতাম্মা।
ভূদেবো যত্র দেবো যবন বসুমতী সান্তি মে
তীরভুক্তিঃ॥

তথায় লক্ষণ সেনের দানশীলতা সম্বন্ধে এক মনোহর শ্লোক প্রচলিত আছে। চক্রবাক্ আপন বধূকে কহিতেছে "প্রিয়ে, আর আমাদিগকে বিরহ যাতনায় অধীর হইতে হইবে না; কারণ আর অল্প দিবস গত হইলেই সেই ভয়ঙ্কর রাত্রির বিনাশ হইয়া যাইবে"। চক্রবাকী কহিল "তাহাও কি সম্ভব? আমাদিগের কি এরূপ সুখের দিন আসিবে? চক্রবাক্ কহিল "আসিবে বৈ কি? কনক গিরি অস্তাচলই যে লোপ পাইতেছে; তাহা হইলে সূর্য্যদেব আর কি করিয়া অস্তমিত হইবেন?" চক্রবাক ঔৎসুক্যের সহিত কহিল "সে কেমন, সে কেমন?" চক্রবাক উত্তর করিল "বীর লক্ষণ সেন যেরূপ উন্মুক্ত হস্তে দানরত হইয়াছেন, তাহাতে তিনি ক্রমে ক্রমে সমুদয় কনক গিরিই নিঃশেষিত করিয়া ফেলিবেন"। যথা—

কতিপয় দিবসৈ ক্ষয়ং প্রয়াস্যৎ
কনক গিরিঃ কৃত বাসরাবসানঃ।
ইতি মুদ মুপযাতি চক্রবাকী
বিতরতি লক্ষণ সেন দেব বীরে॥

ত্রিহুতে লক্ষণ সেনের অব্দ অধুনাও প্রচলিত। উহাকে সংক্ষেপে লসং বলে। পণ্ডিতগণ এখনো এই অব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। সন হইতে শকাব্দা ও লসং বাহির করিবার তথায় তিরহুতীয়া ভাষায় যে সঙ্কেত-সূচক শ্লোক ব্যবহৃত হয় তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

সনমহ লিখহুঁ শর শশী বান।
সো শাকে জানহুঁ পরমাণ॥
পুনি সন বান ইন্দ্র শর থোএ।
বাঁকি বাত্রে লসং বিলোএ॥

অর্থাৎ—

সনের অঙ্কের সহিত—শর (৫) শশী (১) বান (৫) যোগ দিলে শাক প্রাপ্ত হওয়া যায়; এবং সন হইতে বান (৫) ইন্দ্র (১) শর (৫) বিয়োগ করিলে লসং প্রাপ্ত হওয়া যায়। অঙ্কস্য বামা গতিঃ ধরিলেও তাহাই হয়।

শ্রীশশিভূষণ বিশ্বাস।

বর্ষশেষ।

আর একটি বৎসর চলিয়া গেল। স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী সুখ দুঃখের তরঙ্গ সমভাবেই তাহার বক্ষ আলোড়িত করিয়াছে! কিন্তু সে সুখ দুঃখের দিকে চাহিয়া ভাবিবার আমাদিগের সময় নাই—আমরা কাজ করিতে আসিয়াছি, কাজ করিয়া যাইব। সুখদুঃখ প্রকৃতির দান—তাহা চিরদিনই সমভাবে মানবসমাজকে আঘাত করিবে। আমাদিগের নিকট ইহা সহিষ্ণুতার একখানি পরখপাথর মাত্র। তবু আজ এই বর্ষের শেষ দিনে মুহূর্ত্তের জন্য দাঁড়াইয়া সংক্ষেপে একবার—আমরা কি হারাইলাম আর কি-ই বা পাইলাম, তাহার আলোচনা করিয়া লইলে নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না।

রাজনীতিক্ষেত্রে আমাদিগের পরম শ্রদ্ধাপদ সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডকে বর্ষারম্ভেই আমরা হারাইয়াছি। ভারতবাসীর প্রতি তাঁহার অম্লান স্নেহ ও অক্ষুণ্ণ সহানুভূতির সীমা ছিল না। কিন্তু নদী তরঙ্গে যেমন এক কূল ভাঙ্গে, অপর কূল গড়িয়া উঠে, তেমনি তাঁহার পুত্র নবীন সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জকে আমরা রাজাসনে পাইয়া তাঁহার সস্নেহ সহানুভূতি লাভে নূতন আনন্দে সে দুঃখ ভুলিয়াছি। দুঃখ ক্ষণিকের, ঝটিকার ন্যায় তাহার প্রভাব অচিরস্থায়ী; ইহাই জগতের নিয়ম।

লর্ড মিণ্টো ভারত শাসনকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন—তাঁহার স্থানে আমরা সদাশয় মহানুভব লর্ড হার্ডিংকে পাইয়াছি। লর্ড মর্লির আসনে আজ লর্ড ক্রু! মাননীয় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের স্থানে সৈয়দ আমির আলি প্রতিষ্ঠিত।

লর্ড হার্ডিং মহোদয় ইতিমধ্যেই প্রজাবর্গের হৃদয়ে আপনার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ছদ্মবেশে ছাত্রাবাস সমূহ পরিদর্শন করিয়া তিনি ছাত্রগণের সহিত অসঙ্কোচে বন্ধুভাবে মিশিয়াছেন, তাহাদিগের সুখদুঃখের সংবাদ লইয়াছেন, এদৃশ্যে ভারতবাসী আজ আনন্দে উল্লসিত! বর্ত্তমান ভারত ইতিহাসে এ এক নূতন যুগের সূচনা দেখা দিয়াছে। লেডি হার্ডিং তাঁহারই যোগ্য সহধর্ম্মিনী। আমাদের দেশ ও দেশবাসীর প্রতি তাঁহার স্নেহ ও সহানুভূতির আমরা যথেষ্ট পরিচয় পাইতেছি। ইংরাজ ও ভারতবাসীর মধ্যে সকল বাধা বন্ধ তাঁহার সাদর ব্যবহারে আজ টুটিবার উপক্রম দেখা যাইতেছে।

লেডি হার্ডিং মহোদয়া ইংরাজ মহিলাগণের সহিত বাঙ্গালী মহিলাগণকে মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করেন।—অভ্যাগতাদিগের প্রতি সাদর সমাদরে রাজা প্রজার সুদূর সম্পর্ক সেদিন যেন ডুবিয়া যায়;—আতিথ্যের প্রীতি মধুর আপ্যায়নে অভ্যাগতাগণ যে আনন্দ লাভ করেন, যেন তাহা বর্ণনাতীত! প্রতি সেদিন প্রতি নিমন্ত্রিতার নিকট স্বহস্তে মিষ্ট থাল ধরিয়া আতিথ্যের মর্য্যাদা রক্ষা করেন। এই আদর্শ অতিথিসৎকার ভারত মহিলাগণের পক্ষেও অনুকরণীয়। এইরূপ আদর ব্যবহারে ভারতবাসীর চিত্তে আজ শুধু শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম নহে, প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার বন্যা বহিয়া গিয়াছে

জর্ম্মণ যুবরাজ এ বৎসর ভারতে আসিয়া আমাদিগের সুখদুঃখের পরিচয় লইয়াছেন! তাঁহার সুমিষ্ট ব্যবহারে, সুমধুর আপ্যায়নে তাঁহার হৃদয়ের আমরা যে পরিচয় পাইয়াছি; তাহাতে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, তাঁহার হৃদয় রাজারহৃদয়েরই মত—অপূর্ব্ব মহিমায় মহীয়ান!

সম্প্রতি তিনি শিকারোদ্দেশে সুন্দরবন গিয়াছিলেন। তাঁহার সহযাত্রী জনৈক শিকারী ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক [illegible] আহত হইয়া কলিকাতা মেডিকেল কলেজে প্রেরিত হইয়াছিলেন। যুবরাজ সেখানে তাঁহাকে দেখিতে যান! এই ঘটনা তাঁহার সহৃদয়তার ক্ষুদ্র পরিচয়মাত্র।

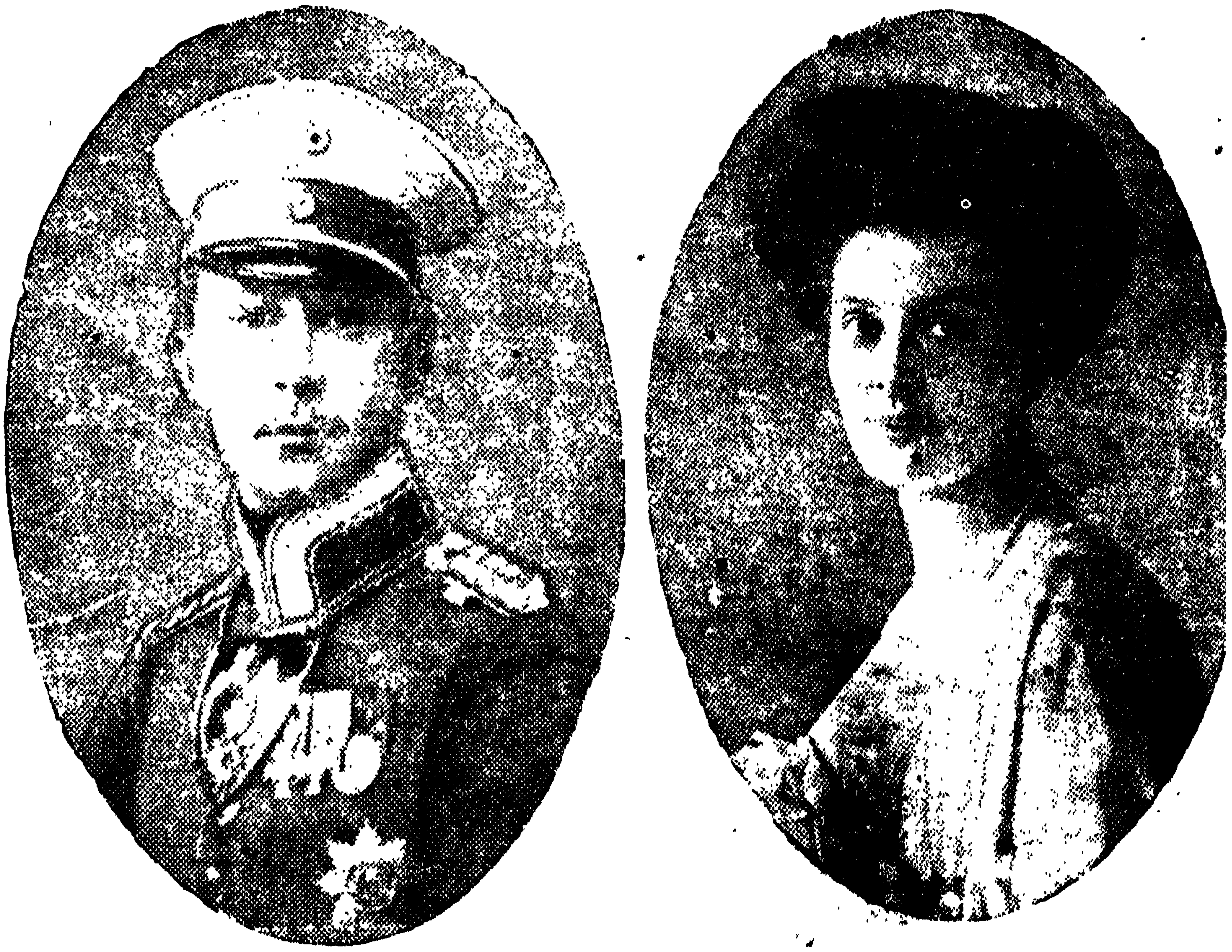

জর্ম্মানীর যুবরাজ ও তাঁহার পত্নী।

বর্ষশেষের একটি নিদারুণ দুঃখের কথা,—কিছুকাল পূর্ব্বে যে অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতায় দেশ জর্জ্জরিত হইয়াছিল, আমরা ভাবিয়াছিলাম তাহার শেষ হইয়াছে—কিন্তু কয়েকদিন পূর্ব্বে একজন কর্ত্তব্যপরায়ণ পুলিশ কর্ম্মচারীর হত্যা ও লালদীঘির ধারে এক দুর্বৃত্ত যুবকের বর্ব্বর আচরণে তাহার পুনরভিনয় দেখিয়া আমরা যারপরনাই নিরাশা-ব্যথিত হইয়াছি। এ কি উন্মাদ দুষ্প্রবৃত্তি! কি বলিয়া এই সকল কাণ্ডজ্ঞানহীন যুবককে তাহাদের দুষ্ক্রিয়ার পরিমাণ বুঝাইব, তাহা জানি না। ইহারা এইরূপ কার্য্যে দেশের কিরূপ অকল্যাণ সাধন করিতেছে, তাহা বুঝিবার শক্তিটুকুও যে তাহাদের নাই ইহাপেক্ষা অধিকতর ক্ষোভের বিষয় আর কি থাকিতে পারে? সুখের বিষয় এইরূপ উদ্‌ভ্রান্ত বালকের দল নিতান্তই নগণ্য।

রাজনীতির ন্যায় সাহিত্যক্ষেত্রেও আমরা

এইবর্ষে ধীরপদে অগ্রসর হইয়াছি। এই এক বৎসরে বহু সদ্‌গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। নানা ভাষার উক্তিরত্ন সঙ্কলিত ও সংগৃহীত হইয়াছে। নূতন লেখকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে! বহু উদীয়মান লেখক সাহিত্যের মর্য্যাদা রক্ষার উপযোগী হইয়া উঠিয়াছেন। চারিধারে একটা আন্তরিক সাধনার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে!

এই সুখের দিনে দুঃখের হস্ত হইতেও আমরা নিস্তার পাই নাই। অকৃত্রিম সাহিত্যসেবী চন্দ্রনাথ, ভোলানাথ, কৃষ্ণচন্দ্র, সুরসিক রজনীকান্ত, মনস্বী কালীপ্রসন্ন, সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী ও লেখক শিশিরকুমারকে আমরা হারাইয়াছি।

এ বৎসর অসাধারণ প্রতিভাশালী আচার্য্য কাউণ্ট লিও টলষ্টয়, ও সহৃদয়া কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল ইহজগত পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের সহিত ভারতের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন সম্পর্ক না থাকিলেও, তাঁহাদিগের প্রভাব সমগ্র জগতের পক্ষে কল্যাণজনক। তাই তাঁহাদিগের মৃত্যুতে জগতের যে ক্ষতি হইল, তাহা কখনো পূরণ হইবে কি না জানি না!

অতঃপর অতীত দুঃখ শোকের জন্য বৃথা অনুশোচনা না করিয়া নববর্ষে নূতন দিবসে আমরা কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হইব। ভগবান আমাদিগের সহায় হউন!

বর্ষ-বিদায়।

আমের মুকুল ঝরিয়া আজিকে মিশেছে নিমের ফুলে,
ম্লান হাসিটুকু কাঁপিছে অধরে অশ্রু আঁখির কূলে!
নীরবে কে ওই যায়,—
ফুল-পুলকিত কাননের পথে নিশীথের সুষমায়!
কত না তাহার শুভ্র-জোছনা, কত স্নেহ, কত প্রীতি,
কত করুণ আঁখি চেয়ে আছে কত তিক্ত-মধুর স্মৃতি!
কত আশা, কত ভয়,
কতই গরব, কত সে কুণ্ঠা—ফুল্ল-কণ্টকময়!
বকুল মরিয়া সুরভি-স্বর্গ ভুবনে রেখেছে পাতি;
সারা যামিনীর যে আলো নিবিল কোথা গেল তার ভাতি
বুক ভরে হাহাকারে,
লতার জালায় লিপ্ত কুঁড়িটি পাপড়ি মেলিতে নারে।
কিশোর আশার কিশলয় ভেঙে কুঁড়িরা আজ বাঁধে নীড়!
অরুণ হৃদয়ে সংশয় আর দুর্ভাবনার ভিড়!
ব্যসন, কলহ, ক্লেশ,
ব্যথিছে আজিকে সারা বরষের অপমান বিদ্বেষ।
অঞ্জলি ভরি' সুন্দরী ঊষা যে সোনা গেছিল ঢালি,
নিশীথের কালো নিকষে কষিতে সকলি কি হ'ল কালি?
জগতের আনাগোনা
সে কি হ'ল ভবে নয়ন জলের মত আগাগোড়া লোণা।

অতসী অশোক গাঁথিতে কি হায় শেফালি অপরাজিতা
প্রাণের স্ফটিক পাত্রে ঢেলেছি মিঠার সঙ্গে তিতা?
বিশ্ব কি বিস্বাদ?
একি ভুল নয়?—নহে এক ক্ষণিক—এই মোহ অবসাদ?
ঝরা ফুল পাতা মাটি হ'য়ে যায় জাগে নব অঙ্কুর,
মৃত্যু প্রবল করে উচ্ছল জীবনের ক্ষীণ সুর,
ওরে! নাই নাই শোক,
ত্যজিছে আবার অনন্ত তার বরষের নির্ম্মোক।
বিশ্ব-নাট্যে নূতন অপটী নীরবে কে নাহে টানি'!
শামুকের দেহ-সাথে বাঁধিল গো কত শঙ্খখানি!
পুরাতন অবসান।
তারার কিরণ-সঙ্গমে ফিরে আজিকে পুণ্য স্নান।
নব জীবনের বিদ্যুৎ—সে যে বেদনার বুকে খেলে,
শিকড় কাটিয়া সফল করে গো নিষ্ফলে অবহেলে!
ভাঙা-গড়া আসা-যাওয়া,
ফুল ফোটাবার, ফল ফলাবার অপরূপ এই হাওয়া!
নিম ফুল আর আমের মুকুলে চুমে আজি ধূলিকণা,
তিক্ত আভাসে বক্ষে ধরেছে মধুর সম্ভাবনা!
পুরাণ চলিয়া যায়,
অশ্রু সরস ক্ষীণ হাসি একা নূতনের পথ চায়!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।